বাদিকা

শিল্পী : শ্রীভবানী লাহা

আমাদের পত্র-পত্রিকা

উইকলী ওয়েস্টবেঙ্গল—বার্ষিক ৬৲ টাকা; ষাণ্মাসিক ৩৲ টাকা।

কথাবার্তা—বাংলা সাপ্তাহিক—বার্ষিক ৩৲ টাকা; ষাণ্মাসিক ১·৫০ টাকা

বসুন্ধরা—বাংলা মাসিক—বার্ষিক ২৲ নঃ পয়সা।

শ্রমিক বার্তা—হিন্দি পাক্ষিক পত্রিকা—বার্ষিক ১·৫০ টাকা; ষাণ্মাসিক ·৭৫ নঃ পয়সা।

পশ্চিম বংগাল—নেপালী সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র। বার্ষিক —৩৲ টাকা; ষাণ্মাসিক ১·৫০ নঃ পয়সা।

মগরেবী বংগাল—উর্দু পাক্ষিক পত্রিকা—বার্ষিক ৩৲ টাকা; ষাণ্মাসিক ১·৫০ নঃ পয়সা।

অনুগ্রহপূর্বক রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা-১

এই ঠিকানায় প্রচার অধিকর্তার নিকট লিখুন।

পৌষ—১৩৬৮

দ্বিতীয় খণ্ড | ঊনপঞ্চাশত্তম বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

উপনিষৎ, রবীন্দ্রনাথ ও বোসাঙ্কে

অধ্যাপক সমর ভট্টাচার্য্য

[র]বীন্দ্রনাথের অনেক কবিতায়, গানে, নাটকে খণ্ডসত্তা ও [অ]খণ্ড সত্ত্বাকে লইয়া দার্শনিক তত্ত্বের সন্ধান মেলে। সীমা [এ]বং অসীমের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করাই যে তাঁহার জীবনের [স]াধনা, একথা তিনি নিজেই বলিয়াছেন। এখন প্রশ্ন [হ]ইতেছে সীমা এবং অসীমকে লইয়া এই দার্শনিক তত্ত্বের [উ]ৎস কোথায়? ইহা কি তাঁহার নিজস্ব চেতনার অনুভব-[ল]ব্ধ সত্য? অনেকে বলিয়া থাকেন রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক [ত]ত্ত্বের মধ্যে স্বকীয়তা কিছুই নাই—ভারতীয় দর্শনের মধ্যে [এ] তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। আবার অনেকে উৎস [স]ন্ধানের জন্য পাশ্চাত্য দেশে চলিয়া যান। রবীন্দ্রনাথের [গ]ান, কবিতা, নাটক আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে [পা]ইব তিনি ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য উভয় চিন্তাধারার দ্বারাই অল্পবিস্তর প্রভাবান্বিত। তাহা হইলে তাঁহার স্বকীয়তা কোথায়? আমরা সেই কথাই এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব; কিন্তু তাহার পূর্ব্বে আমাদের দেখিতে হইবে—ভারতীয় কোন দর্শন কবিকে বিশেষ করিয়া প্রভাবিত করে এবং পাশ্চাত্য কোন দার্শনিকের চিন্তার সহিত তাঁহার চিন্তাধারার মিল দেখিতে পাওয়া যায়।

সীমার সহিত অসীমের সম্বন্ধ নির্ণয়ে রবীন্দ্রনাথ উভয়কেই সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। খণ্ডকে মিথ্যা বলিয়া গ্রহণ করেন [illegible] উপনিষদে আছে—

> অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
> ততো ভূয় ইবতে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥

খণ্ডকে বাদ দিয়া অখণ্ডের সাধনা ব্যর্থ; অখণ্ডকে বাদ দিয়া খণ্ডের উপাসনা মিথ্যা। রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের এই ঋষি-বাণী গ্রহণ করিয়াছেন।

আমাদের ষড়দর্শনে খণ্ডকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। শঙ্কর দর্শনে বলা হইয়াছে "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা।" এই মায়াময় জগতের রূপ রস গন্ধ স্পর্শকে দূরে সরাইয়া রাখিয়া আনন্দরূপ পরম ব্রহ্মে বিলীন হইতে হইবে। ইহাই মোক্ষ। ইহাই মানব জীবনের চরম ও পরম কাম্য। রবীন্দ্রকাব্যে ও সাহিত্যে দেখিতে পাই—কবি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুকে বাদ দিয়া অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মকে একমাত্র সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই। অতএব বুঝিতে পারি যে কবি সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক কি শঙ্কর-বেদান্ত-দর্শনের দ্বারা বিশেষ প্রভাবান্বিত হন নাই। ভারতীয় দর্শনের মধ্যে কবি বিশেষ করিয়া উপনিষদের মর্ম্মবাণী গ্রহণ করিয়াছেন। উপনিষৎ এই জগৎকে আত্মা হইতে উদ্ভূত বলিয়াছেন। পূর্ব্বে এই জগৎ আত্মরূপে বর্ত্তমান ছিল—পরে আত্মা হইতে বাহির হইয়াছে। এই চৈতন্য-বাদ উপনিষদের মূল কথা। "যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশ লোমানি, তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহবিশ্বম্।" পুরুষ হইতে যেমন কেশ লোমের আবির্ভাব হয়, তেমনি অক্ষর পুরুষ হইতে বিশ্ব উদ্ভূত হইয়াছে। ব্রহ্ম বিশ্বরূপ। এই সর্ব্বেশ্বর-বাদ উপনিষদের চরম তত্ত্ব। তবে ইহার প্রকার ভেদ আছে। উপনিষদের বহু ভাষ্য রচিত হইয়াছে—এক-একজন ভাষ্যকার এক এক রকমের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যের মতে বীজ হইতে যেরূপ বৃক্ষ বহির্গত হয়, বিশ্ব সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে বহির্গত হয় নাই। অন্ধকারে রজ্জু হইতে যেরূপ সর্পের সৃষ্টি হয়, জগৎও সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। রামানুজ প্রণীত উপনিষৎ ভাষ্যে অন্য ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। রামানুজের মতে জীবাত্মা ব্রহ্মের সম-জাতীয়—ব্রহ্মের অংশ, অগ্নি হইতে যেরূপ শত সহস্র স্ফুলিঙ্গের আবির্ভাব হয় ব্রহ্ম হইতেও সেইরূপ জীবাত্মা নির্গত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের কোন নির্দ্দিষ্ট ভাষ্যকে অনুসরণ করেন নাই। উপনিষদের সূত্রগুলিকে তিনি হৃদয় দিয়া অনুভব করিয়া সে সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন তাহাই গানে কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন—তবে শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য অপেক্ষা রামানুজের ভাষ্যের প্রভাব কবির উপর অধিক পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। উপনিষদের মত কবিও বলিতে চাহিয়াছেন:

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥

সীমা এবং অসীমকে যে একত্র করিয়া জানে সেই সীমার মধ্য দিয়া অসীমকে উপলব্ধি করিতে পারে এবং হৃদয়ের মধ্যে অমৃতের আস্বাদ পায়। উপনিষদের এই তত্ত্বকেই রবীন্দ্রনাথ পুরাপুরি স্বীকার করিয়াছেন। অপরদিকে পাশ্চত্য দার্শনিকদের মধ্যে বিশেষ করিয়া বোসাঙ্কে-এর (Bosanquet) চিন্তাধারার সহিত কবির চিন্তার সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। অবশ্য একথা সত্য নয় যে কবিচিত্ত বোসাঙ্কে-এর দর্শনদ্বারা প্রভাবান্বিত।

রবীন্দ্রনাথের ধারণায় উপনিষদে এই খণ্ড জগতকে মিথ্যাবলিয়া কল্পনা করা হয় নাই। পরম সত্য যিনি তাঁহারই এক খণ্ডাংশ হইতেছে এই পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য সীমিত পৃথিবী। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অণু পরমাণু সকলকিছুই তাঁহার সৃষ্ট—ব্রহ্ম হইতে উদ্‌ভূত। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ বলেন:

স বিশ্বকৃৎ সহি সর্ব্বস্য কর্ত্তা।
তস্য লোক স উ লোক এব॥

তাই সীমার মধ্যে অসীমের অমৃতস্পর্শ, সসীম অসীমের লীলাভূমি। পরমসত্য খণ্ডসত্যকে বাহিরে রাখিয়া নাই—ইহাকে বুকের মধ্যে লইয়াই তিনি সম্পূর্ণ। না হইলে তিনি অপূর্ণ, সীমার দ্বারা সীমিত। তৈত্তেরীয় উপনিষৎ বলেন:

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি॥
আনন্দম প্রয়ান্ত্যভিসংবিশন্তি॥

আনন্দরূপ সেই পরমব্রহ্ম হইতেই সকল কিছুর সৃষ্টি। আনন্দের মধ্যেই তাহারা বাঁচিয়া আছে। আনন্দের মধ্যে তাহারা মিশিয়া আছে। ব্রহ্মকে বাদ দিয়া জগৎ নাই, জগৎকে বাদ দিয়া ব্রহ্ম নাই। ব্রহ্মসত্য। জগৎ ও সত্য। এই জগৎ ব্রহ্মের আনন্দরূপ, অমৃতরূপ।

আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।

রবীন্দ্রনাথ এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহার

কাছে প্রকাশের জগৎ, সীমার জগৎ মিথ্যা হয় নাই। সীমার মধ্যেই কবি সেই আনন্দরূপমের অমৃতস্পর্শ পাইয়াছেন। তাই সীমা কবির কাছে এক অত্যাশ্চর্য্য রহস্য বলিয়া মনে হইয়াছে। সীমাই যে অসীমকে প্রকাশ করিতেছে—তাহা হইলে এই সীমারই বা সীমা কোথায়? অসীমের মতন সীমাও যে অনির্ব্বচনীয়, অব্যক্ত। কবি এই সীমার জগৎকে অস্বীকার করিতে পারেন না, অবজ্ঞা করিতে পারেন না। অসীমের অপেক্ষা সীমা কম আশ্চর্য্য নয়, অশ্রদ্ধেয় নয়।

বোসাঙ্কে-এর দর্শনে এই তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। The value and the destiny of the individual গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন; The Absolute is a systematic, rational totality of all experience, the whole nature of which is expressed in every part, and in whose wholeness every part finds its explanation and its completion. অপর জায়গায় বলিয়াছেন: It is the world of outstanding and obvious realities as particularly conditioned within the whole; While the only unconditional real is the whole itself, within which all conditions are included. Finite minds and objects, then, though appearances, are not inherently illusions...... The finite has working in it the nature of the whole.

রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় এই সত্যই ধরা পড়িয়াছে। তাঁহার ভাষায়—"বিশ্বজগতে ঈশ্বর জলের নিয়ম, স্থলের নিয়ম, বাতাসের নিয়ম, আলোর নিয়ম, মনের নিয়ম, নানাপ্রকার নিয়ম বিস্তার করে দিয়েছেন। এই নিয়মকেই আমরা বলি সীমা। এই সীমা প্রকৃতি কোথা থেকে মাথায় ধরে এনেছে তা তো নয়। তার ইচ্ছাই নিজের মধ্যে এই নিয়মকে এই সীমাকে স্থাপন করেছে; নতুবা এই ইচ্ছা বেকার থাকে, কাজ পায় না। এই জন্যই যিনি অসীম তিনিই সীমার আকর হয়ে উঠেছেন কেবলমাত্র ইচ্ছার দ্বারা, আনন্দের দ্বারা। যিনি প্রকাশ পাচ্ছেন তাঁর যা কিছু রূপ তা আনন্দরূপ; অর্থাৎ মূর্ত্তিমান ইচ্ছা, ইচ্ছা আপনাকে সীমায় বেঁধেছে।......এইরূপে যিনি অসীম তিনি সীমার দ্বারাই নিজেকে ব্যক্ত করেছেন, সীমা এবং অসীমকে লইয়া তাই পরমসত্য।

সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর
কত বনে কত গন্ধে
কত গানে কত ছন্দে
অরূপ, তোমার রূপের লীলায় জগৎ ভরপুর।

অসীমকে ভুলিয়া রূপরসগন্ধস্পর্শময় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বন্দনা করিলে তাই আমরা পরমসত্য ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ করিয়া পাইব না। আবার চেনার জগৎকে মিথ্যা মনে করিয়া কেবলমাত্র অসীমের উপাসনা করিলেও ঈশ্বরোপলব্ধি হইবে না। এই তত্ত্বটি অতি সুন্দররূপে কবি প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহার "রাজা" নাটকটিতে। রাণী সুদর্শনা রাজাকে বিশেষ-রূপে বহির্বিশ্বে উপলব্ধি করিতে চান। কিন্তু তাঁকে তো বিশেষরূপে দেখিলেই চলিবে না, বিশ্বরূপেও উপলব্ধি করিতে হইবে। সুদর্শনা প্রথমে তাই রাজাকে হৃদয়ের মধ্যে পাইলেন না। ঠাকুরদা রাজাকে বিশ্বরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন। কিন্তু তাহাও সার্থক উপলব্ধি নয়। তাঁহাকে বিশেষ ও বিশ্বরূপে উপলব্ধি করিতে না পারিলে সত্যকার উপলব্ধি হইবে না। এই সত্য জানিবার পর রাণী সুদর্শনা রাজাকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন:

রাণী: প্রমোদবনে আমার রাণীর ঘরে তোমাকে দেখতে পেয়েছিলুম বলেই তোমাকে এমন বিরূপ দেখেছিলুম—সেখানে তোমার দাসের অধম দাসকেও তোমার চেয়ে চোখে সুন্দর ঠেকে। তোমাকে তেমন করে দেখবার তৃষ্ণা আমার একেবারে ঘুচে গেছে—তুমি সুন্দর নও প্রভু, সুন্দর নও, তুমি অনুপম।

রাজা: তোমার মধ্যে আমার উপমা আছে।

রাণী: যদি থাকে তো সেও অনুপম। আমার মধ্যে তোমার প্রেম আছে, সেই প্রেমে তোমার ছায়া পড়ে, সেইখানে তুমি আপনার রূপ আপনি দেখতে পাও—সে আমার কিছু নয়, সে তোমার।

ঈশোপনিষদে এই সত্যই ব্যক্ত হইয়াছে:—

তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ।
অন্তরেও তিনি—বাহিরেও তিনি—তিনি সর্ব্বময়।

বাহিরে বর্ত্তমান; তবে তাহাকে জানিতে হইলে বিশেষ করিয়া অন্তরে খুঁজিতে হইবে। দেহরূপ ব্রহ্মপুরে ক্ষুদ্র পদ্মাকার গৃহ মধ্যে এক অতি ক্ষুদ্র আকাশ অবস্থিত আছে। সেই আকাশের সকল কিছুকে অন্বেষণ করিতে হইবে। অন্তরের সেই আকাশ পরিমাণে বাহিরের আকাশের সমান। অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি সকলই তাহার মধ্যে নিহিত। ইহাই ব্রহ্মপুর। ব্রহ্মকে পাইতে হইলে শুধু বহির্জগতে চাহিলেই চলিবে না—ব্রহ্মপুরে খুঁজিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর কেবলমাত্র মুক্ত নন। তাঁহাকে কেবল মাত্র মুক্ত ভাবিলে তিনি নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়েন। বন্ধনই কর্ম্মপ্রেরণার উৎস। ঈশ্বরের বন্ধন আছে বলিয়াই তিনি নিষ্ক্রিয় নন। তিনি প্রেমময়—প্রেমের দ্বারা নিজেকে বাঁধিয়াছেন। বন্ধনের মধ্যে তিনি যদি ধরা না দিতেন তাহা হইলে জগতের সৃষ্টি হইত না এবং সৃষ্টির মধ্যে কোন নিয়ম কোন তাৎপর্য্যই দেখা যাইত না। ঈশ্বর আনন্দরূপে সীমার মাঝে প্রকাশ পাইতেছেন—এই তো তাহার বন্ধনের রূপ। এই বন্ধনের জন্যই ঈশ্বর আমাদের আপনজন হইয়াছেন—সুন্দরতম হইয়াছেন। উপনিষৎ বলেন: "স এব বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা।" তিনি একাধারে আমাদের বন্ধু, পিতা, বিধাতা। নিজকৃত স্বাধীন বন্ধনের জন্যই ঈশ্বর আমাদের এত আপন জন। এই বন্ধন বাহির হইতে আসে নাই—ইহা তাঁহার প্রেমের বন্ধন। তাই আবার বন্ধনের মধ্যে ঈশ্বর মুক্ত। উপনিষৎ বলেন:

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥

তিনি গতিশীল তবু গতিহীন, নিকটে তবু দূরে, অন্তরে অথচ বাহিরে। ঈশ্বর কোন কিছুকে বাদ দিয়া নাই। সমস্ত বিপরীত এবং বিরোধকে একত্রিত করিয়া তিনি বর্ত্তমান। এই জন্যই তিনি ওঁ। এই জন্যই কবি রবীন্দ্রনাথ সকলের মধ্যে থাকিয়াই তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছেন, বৈরাগ্যের গৈরিক বসন পরিধান করিয়া রূপের জগৎকে দূরে সরাইয়া রাখিয়া তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে চান নাই। তিনি বন্ধনের মাঝেই মুক্তির আস্বাদ পাইয়াছেন।—

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়
লভিব মুক্তির স্বাদ।……
ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে॥
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া॥

রবীন্দ্রনাথের "প্রকৃতির প্রতিশোধ" নাটকে সন্ন্যাসী এই ভুল করিয়াছিল। সে অন্তকে বাদ দিয়া অনন্তের আরাধনা করিয়াছিল। অবশেষে সন্ন্যাসী নিজের ভুল বুঝিতে পারিল—সংসারের মায়ার বন্ধনে পড়িয়া বুঝিতে পারিল—সীমা এবং অসীমকে লইয়াই ঈশ্বর সম্পূর্ণ। এক-কে অবহেলা করিয়া অন্যের উপাসনা করিলে ঈশ্বরোপলব্ধি হইবে না। তাই নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া সন্ন্যাসী আর লোকালয় হইতে দূরে থাকিতে চায় নাই—গেরুয়া কমণ্ডলু সম্বল করিয়া সীমার জগৎ পার হইবার বাসনা প্রকাশ করে নাই। অন্তের মধ্যে থাকিয়াই অনন্তকে পাইবার চেষ্টা করিয়াছে।

উপনিষৎ বলেন, সীমা ও অসীমকে লইয়া সেই পরম ব্রহ্মের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। মৃত্যুও তাঁহার ছায়া, অমৃতও ছায়া। উভয়কেই তিনি নিজের মধ্যে একত্রিত করিয়া এক করিয়া রাখিয়াছেন। যাঁর মধ্যে সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসান হইয়া আছে, তিনিই হইতেছেন চরম সত্য। সীমার রাজ্যে যত কিছু বিরোধ সমস্তই তাঁহার মধ্যে অবসান হইয়াছে—না হইলে ঈশ্বর ব্যতীত অপর একটি সত্তার অস্তিত্ব মানিয়া লইতে হয়। এই অপর সত্তাটি তখন স্বভাবতই ঈশ্বরের সীমারূপে বিরাজ করিবে—ঈশ্বরকে আর পরম সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে না। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ বলেন:—

স বিশ্বকৃৎ সহি সর্ব্বস্য কর্ত্তা
তস্য লোক স উ লোক এব।

এ কথা সত্য হইলে ইহা মানিয়া লইতে হইবে যে, সীমার মধ্যে যে দ্বন্দ্ববিরোধ তাহা তাঁর বাহিরে নয়। তবে সীমা এবং অসীমকে লইয়া সেই পরম সত্যের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব সর্ব্বস্ব হইয়া ওঠে নাই। অসীমের জগৎ হইতে দেখিলে বিরোধ সত্য, কিন্তু অসীমের কোল হইতে

দেখিলে বিরোধ নাই। সকল দ্বন্দ্ব পরমেশ্বরের মধ্যে অবসান হইয়াছে। উপনিষদে আছে—ভৃগু যখন পিতার নিকট গিয়া ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ প্রার্থনা করিলেন তখন পিতা বরুণ বলিলেন—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্ ব্রহ্ম।" যাহা হইতে ভূত সকল উৎপন্ন হয়, যাহাদ্বারা জীবন বাঁচিয়া থাকে এবং মৃত্যুর পর যাহাতে প্রবেশ করে তাহাই ব্রহ্ম। ভৃগু তপস্যা করিয়া প্রথমে বুঝিলেন—অন্নই ব্রহ্ম। পরে বুঝিলেন—প্রাণ ব্রহ্ম; তাহার পরে বুঝিলেন মন ব্রহ্ম, তাহার পরে বিজ্ঞান ব্রহ্ম, এবং অবশেষে বুঝিলেন আনন্দই ব্রহ্ম। আনন্দ বিরোধশূন্য। এই আনন্দরূপ ব্রহ্মের মধ্যে সকল বিরোধের অবসান হইয়াছে বলিয়াই তিনি আনন্দরূপমমৃতম্।

বোসাঙ্কে-র দর্শনের মধ্যে এই চিন্তাধারা লক্ষিত হয়। Principle of Individuality of value গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন: A world of cosmos is a system of member—ssuch that every member, being ex-hypothesis, distinct, nevertheless contributes of the unity of the whole in venture of the peculiarities which constitutes its distinctness. The Universal in the form of a world refers to diversity of content within every member, and the universal in the form of a class, negets it. Such a diversity recognized as a unity, a macrocosm constituted by microcosm is the type of the Concrete Universal. তিনি আরো বলেন If we reflect we find that all our experiences are fragmentary, incomplete and incoherent which tend to become more and more complete and coherent, Every finite experience is opposed by something else, and there is a constant tendency of the finite to expand itself, include its other, overcome opposition and become more and-more complete and coherent. This inward tendency shows that the whole of our being points towards a perfect experience in which all opposition is to be overcome by the harmonious absorption of every thing This inclusive whole of experience is the Absolute.

রবীন্দ্রকাব্যেও এই তত্ত্ব ঘোষিত হইয়াছে:

তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যতদূর আমি চাই
কোথাও দুঃখ কোথাও দৈন্য কোথা বিচ্ছেদ নাই।
মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ
দুঃখ হয় সে দুঃখের কূপ
তোমা হতে যবে হইয়ে বিমুখ আপনার পানে চাই।

শঙ্কর বেদান্তে দেখিতে পাই সেখানে অসীমকে, নির্গুণ ব্রহ্মকে একমাত্র সত্য রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, আবার রামানুজের ব্রহ্ম সগুণ। রবীন্দ্রনাথ শঙ্করাচার্য্য বা রামানুজের মতবাদ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তিনি উপনিষদের ধর্ম্মতত্ত্বের কোন প্রকার বদল করিতে বা তাহাতে কোন প্রকার অভিনবত্ব আরোপ করিতে চান নাই। কবি নিজে যাহা অনুভব করিয়াছেন তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন।

সর্ব্বম্ খল্বিদম্ ব্রহ্ম

ছান্দোগ্য উপনিষদের এই বাণীকেই কবি অন্তর বাহিরে গ্রহণ করিয়াছেন। সমস্ত কিছু লইয়া যিনি এবং সমস্ত কিছুর বাহিরেও যিনি—তিনি কেবলমাত্র নির্গুণ নন—কেবলমাত্র সগুণ নন—তিনি নির্গুণ এবং সগুণ। অসীমের কোটি হইতে দেখিলে তিনি নির্গুণ, আবার সীমার কোটি হইতে দেখিলে তিনি সগুণ। এই সত্য উপলব্ধি করিয়া কবি প্রকৃতির সকল কিছুতেই সেই পরম সত্যের অমৃত স্পর্শ অনুভব করিয়াছেন। "মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।" উপনিষদের এই বাণী কবি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছেন। সব মধু সব মধু—মধুময়ের স্পর্শে প্রকৃতির সকলকিছুই মধুর হইয়া উঠিয়াছে। তাই কবি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে ব্রহ্মস্বাদ পাইয়াছেন। তবে পাশ্চাত্য দার্শনিক স্পিনোজার (spinoza) মতন কবি বলিতে পারেন নাই world is god and god is world অর্থাৎ জগতের মধ্যেই ঈশ্বরের পরিপূর্ণ বিকাশ, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে জানিতে পারিলেই ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করা যাইবে। আমাদের দেশের উপনিষৎ এ কথা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ব্রহ্মকে

বাদ দিয়া বিশ্ব নাই সত্য কিন্তু সেই আনন্দরূপমমৃতমকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিবে এ ক্ষমতা বিশ্বের কোথায়? বিশ্বের সীমা কল্পনা করা যায়, কিন্তু সত্যের কোন সীমা নাই। তাই তিনি বিশ্বেও আছেন, বিশ্বের বাহিরেও আছেন। রূপেও আছেন, অরূপেও আছেন। রূপে তিনি আছেন বলিয়াই কবি কবিতার মধ্য দিয়া রূপের আরতি করিয়াছেন:

শরৎ, তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি
ছড়িয়ে গেল ছাপিয়ে মোহন অঙ্গুলি।
শরৎ, তোমার শিশির ধোওয়া কুন্তলে
বনের পথে লুটিয়ে পড়া অঞ্চলে
আজ প্রভাতের হৃদয় ওঠে চঞ্চলি।

প্রকৃতির সমস্ত প্রকাশের মধ্যে, সমস্ত রূপের মধ্যে কবি ভগবানের করুণা অনুভব করিয়াছেন, ঐশ্বর্য্য অনুভব করিয়াছেন। কবির ভগবান ঐশ্বর্য্যবান। তাঁহার ঐশ্বর্য্য প্রকৃতির সকল কিছুতে প্রকাশ পাইতেছে।—

এই যে তোমার প্রেম ওগো
হৃদয় হরণ।
এই যে পাতায় আলো নাচে
সোনার বরণ।

কিন্তু এই যে পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের পঞ্চ-প্রদীপ জ্বালিয়া রূপের আরতি ইহা তো শুধু রূপকে লইয়া ভুলিয়া থাকিবার জন্য নয়,—রূপের মধ্য দিয়া অরূপকে চিনিবার জন্যও ইহার প্রয়োজন। ভগবান তো শুধু বিশেষ রূপে, বিশেষ স্থানে, বিশেষ দ্রব্যে নাই, তিনি সকল দেশে সকল কালে। তাই এই বিশ্বরূপকে আপন অন্তরের আনন্দরসে বিশেষ ও বিশ্বরূপে উপলব্ধি করিতে হইবে। ছান্দোগ্য উপনিষৎ বলেন:

যো হি ভূমা তৎ সুখম।
নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্।

যাহা ভূমা, তাহাই সুখ। যাহা অল্প, তাহাতে সুখ নাই। সেখানে অন্য কিছু দেখা যায় না, শোনা যায় না, জানা যায় না, তাহাই ভূমা। ভূমা নিম্নে, ঊর্দ্ধে, পশ্চাতে, সম্মুখে, দক্ষিণে, উত্তরে—সর্ব্বব্যাপী।

পাশ্চাত্য দার্শনিক বোসাঙ্কের চিন্তার মধ্যেও এ তত্ত্ব পাওয়া যায়। 'The value and the destiny of the individual গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন: The perfect satisfaction wonld be the possession of the Absolute as such, in short to be the Absolute. But the present realisation of the perfect satisfaction is just the recognition by the finite being of its own impotence, as finite. When besides experiencing finiteness we take hold of the real which it reveals as something more than the finite, then in principle, the troubles and hazards pass into stability and security, In letting go his false fragmentary individuality and accepting its value only as contributory to the true individuaiity manifested through it, the finite creatures replaces the world of chance and disaster by one of stability and security For perfection is stable and secure.

রবীন্দ্রনাথও চেনার জগৎ হইতে তাই অচেনার জগতে পাড়ি দিতে চাহিয়াছেন। রূপ-জগতের মধ্য দিয়া অরূপকে চিনিতে চাহিয়াছেন:

রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি অরূপরতন আশা করি;
ঘাটে ঘাটে ঘুরব না আর ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী।
সময় যেন হয় রে এবার ঢেউ খাওয়া সব চুকিয়ে দেবার
সুধায় এবার তলিয়ে গিয়ে অমর হয়ে রব মরি॥

রূপের খেলাঘরে, নিসর্গের সমস্ত মেজাজের মধ্যে কবি সেই অপরূপকেই আস্বাদ করিয়াছেন—রূপকে ভালবাসিলেও কবির চোখে রূপ সর্ব্বস্ব হইয়া ওঠে নাই। তাই রূপের জগৎ হইতে বিদায় লইবার সময় আসিলে তিনি পরম আশ্বাস ভরে বলিতে পারেন—

বিশ্বরূপের খেলা ঘরে কতই গেলেম খেলে
অপরূপকে দেখে গেলেম দুটি নয়ন মেলে।
পরশ যাঁরে যায় না করা সকল দেহে দিলেন ধরা,
এইখানে শেষ করেন যদি শেষ করে দিন তাই—
যাবার বেলা এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই।

সীমা অসীমকে উপলব্ধি করিয়া যেমন চরিতার্থ হয়, তাহার সীমার সংকীর্ণ গণ্ডি পার হইয়া সীমা-অসীমের মিলিত ভাবে পরম সত্যকে জানিতে পারে, তেমনি অসীম যিনি তিনিও সীমার মাঝে আপনাকে চরিতার্থ করেন। এই রূপের

জগৎ যে অরূপের লীলাক্ষেত্র। জীবাত্মার মধ্য দিয়াই যে পরমাত্মার বিভিন্ন প্রকাশ—জীবাত্মা পরমাত্মার রঙ্গভূমি। এই রূপের জগৎ না থাকিলে এই জীবাত্মার খেলাঘর মিথ্যা হইলে পরমেশ্বর যে অচেতন জড় পদার্থ হইয়া পড়েন; তাঁহাকে আর সচ্চিদানন্দ ভাবা যায় না, আনন্দরূপম্ মনে হয় না। অন্তই যে অনন্তের চেতনার কারণ—আনন্দের উৎস—কর্ম্মের প্রেরণা। রূপ-জগৎ আছে বলিয়াই তো তাঁহার আনন্দ। নিসর্গের মধ্যে ঈশ্বর আনন্দোপলব্ধি করিয়া ধন্য হন। উপনিষদে এই চিন্তাধারা দেখিতে পাওয়া যায়। উপনিষদের বহু স্থলে অদ্বৈতবাদ ধ্বনিত হইয়াছে—ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু। জড়জগৎ ব্রহ্ম, জীব ব্রহ্ম। অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম। কিন্তু জীব যে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র একথাও বহু স্থলে বলা হইয়াছে। মুণ্ডকোপনিষদে আছে: দুই পক্ষী এক বৃক্ষে বাস করে। তাহারা পরস্পর সংযুক্ত ও সখ্য-ভাবাপন্ন। একজন মিষ্ট ফল ভোগ করেন, আর একজন অনশনে থাকিয়া কেবল দর্শন করেন। একজন জীবাত্মা, অপরজন পরমাত্মা; জীবাত্মা ও পরমাত্মা জীবদেহে একত্রে অবস্থান করেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হইয়াছে: "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বৌ অজৌ ঈশানীশৌ, অজা হি একা ভোক্তৃ—ভোগ্যার্থযুক্তা।" এই সকল হইতে মনে হয় যে মুক্তির পর যাহাই হোক না কেন, মুক্তি পর্য্যন্ত জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভিন্ন।

বোসাঙ্কে-র মতেও The Absolute manifests Himself and realises Himself in and through the finites……All the world is a stage and the whole world-process is a play. The Absolute is an artist—a play-writer—actor.

এই ভাবধারাপুষ্ট রবীন্দ্রনাথের অনেক গান কবিতা এবং নাটকের সমারোহ দেখা যায়:

তাই তোমার আনন্দ আমার পর তুমি তাই এসেছ নীচে
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হত যে মিছে।

আমায় নিয়ে খেলেছ কি খেলা
আমার হিয়ায় চলছে রথের মেলা

মোর জীবনের বিচিত্ররূপ ধরি তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।

জীবাত্মার মধ্যে পরমাত্মা নিজেকে বুঝিতে পারেন—আনন্দকে চরিতার্থ করেন।

আমার মাঝে তোমারি মায়া জাগালে তুমি কবি
আপন মনে আমারি পটে আঁক মানস ছবি॥
তাপস তুমি ধেয়ান তব কী দেখ মোরে কেমনে কব,
আপন মনে মেঘ স্বপনে আপনি রচ রবি।
তোমার জটে আমি তোমারি ভাবের জাহ্নবী॥
তোমারি সোনা বোঝাই হল, আমি তো তার ভেলা
নিজেরে তুমি ভোলাবে বলে আমারে লয়ে খেলা।
কণ্ঠে মম কী কথা শোন, অর্থ আমি বুঝি না কোনো,
বীণাতে মোর কাঁদিয়া ওঠে তোমারি ভৈরবী।
মুকুল মম সুবাসে তব গোপনে সৌরভী॥

তত্ত্বটি আরও পরিষ্কার হইয়াছে "রাজা" নাটকে রাজার উক্তিতে:

সুদর্শনা: আচ্ছা আমি জিজ্ঞাসা করি এই অন্ধকারের মধ্যে তুমি আমাকে দেখতে পাও।

রাজা: পাই বইকি।

সুদর্শনা: কেমন করে দেখতে পাও? আচ্ছা, কী দেখ?

রাজা: দেখতে পাই যেন অনন্ত আকাশের অন্ধকার আমার আনন্দের টানে ঘুরতে ঘুরতে কত নক্ষত্রের আলো টেনে নিয়ে এসে একটি জায়গায় রূপ ধরে দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে কত যুগের ধ্যান, কত আকাশের আবেগ, কত ঋতুর উপহার।

চেনার জগৎ, জানার জগৎ, রূপের জগৎ—যে আনন্দ-ময়ের আনন্দের বিচিত্র উপহার, তাঁহার লক্ষ যুগের ধ্যানের বস্তু। ঈশ্বর এক এবং সেই একের মধ্যে কোন বিভেদ নাই, কোন বস্তু নাই—এমন কথা ভাবিলে মনে প্রশ্ন জাগে, এমন একের অস্তিত্ব কেমন? স্বরূপ কেমন? এমন এক নির্ভেদ বস্তুহীন একের সার্থকতা কোথায়? বস্তুছাড়া আত্মার চেতনা জন্মিতে পারে না—সে বস্তু আত্মার ভিতরেও হইতে পারে, বাহিরেও হইতে পারে। তাই বস্তু-শূন্য ঈশ্বরকে জড় ছাড়া চৈতন্যময় ভাবিতে পারা যায় না। তাহা হইলে কি ঈশ্বর জড়? এই প্রশ্ন আজকের দিনে পাশ্চাত্য দার্শনিক হেগেল এর (Hegel) মনে দেখা দিয়াছিল। এই প্রশ্নের সমাধানেই সশিষ্য হেগেল বস্তুহীন অঙ্কশাস্ত্রের এক-এর মত কোন অবাস্তব অস্তিত্বকে পরম সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে পারেন নাই। বোসাঙ্কে

এই বস্তুশূন্য নির্ভেদ এক-কে সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন :

The Universal in the form of a world refers to diversity of content within every member, and the Universal in the form of a class negets it. Such a diversity recognised as a unity, a macrocosm constituted by microcosms is the type of the true or Concrete Universal......The Absolute, therefore, is the concrete Universal a perfect individual. (Principle of Individuality of Value).

রবীন্দ্রনাথের কাছে উপনিষদের ঈশ্বর বস্তুশূন্য নয়। রূপকে বাদদিয়া তিনি নাই। তিনি বিশ্বরূপ। একদিকে তিনি শূন্য, অপরদিকে পূর্ণ। তারই অঙ্কের বিভূতির দ্বারা তিনি এই বিচিত্র জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ বলেন :

মায়াং তু প্রকৃতিম্ বিদ্যাৎ
মায়িনম্ তু মহেশ্বরম্।

ঈশ্বর মায়া অর্থাৎ বহুধা শক্তি হইতে এই জগতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। উপনিষদের মায়াকে রবীন্দ্রনাথ শঙ্করাচার্য্যের মায়া হইতে পৃথক বলিয়া মনে করিয়াছেন। কবির ধারণায় উপনিষদের 'মায়া' ঈশ্বরের নিজস্ব শক্তি—এই শক্তির প্রকাশ অর্থাৎ জগৎ মিথ্যা নয়। উপনিষদের এই 'মায়া'ই গীতায় প্রকৃতিরূপে দেখা দিয়াছে। গীতায় ঈশ্বরকে পরাব্রহ্মরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। পরাব্রহ্মের মধ্যে রহিয়াছে তাঁহার অপরা অংশ। অপরাব্রহ্ম হইতেছে প্রকৃতি। এই অপরাব্রহ্ম বা প্রকৃতির সাহায্যে ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। পরবর্ত্তীকালে রামানুজ এই মতের পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

উপনিষদের মত রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস, রূপের সাহচর্য্যে অরূপ আনন্দলাভ করিতেছেন। আমি আছি তাই তাঁর আনন্দ আছে, আমি আছি তাই তাঁর চেতনা আছে। তাহাঁকে লইয়া আমার সম্পূর্ণতা। আমাকে লইয়া তাঁহার চরিতার্থতা। তাই কবি বলেন :

যদি আমায় তুমি বাঁচাও, তবে
তোমার নিখিল ভুবন ধন্য হবে।

অন্য কবিতায় :

তোমারি মিলন শয্যা, হে মোর রাজন,
ক্ষুদ্র এ আমার মাঝে অনন্ত আসন
অসীম, বিচিত্র, কান্ত। ওগো বিশ্বভূপ,
দেহে প্রাণে মনে আমি একি অপরূপ।

অসীমের স্পর্শে সীমা অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে। আবার সীমাকে লইয়া অসীম ধন্য হইয়াছে।—ইহাই উপনিষদের তত্ত্ব—রবীন্দ্রনাথের অনুভবলব্ধ সত্য, বোসাঙ্কে-এর দার্শনিক মতবাদ।

আমরা দেখিতে পাইলাম, উপনিষদের চিন্তাধারা রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ করিয়া প্রভাবিত করিয়াছে। তাহা হইলে কবির স্বাতন্ত্র্য কোথায় ?

যদিও সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশ হইতেছে, যদিও অন্তের মাঝে অনন্তের স্বাদ লাভ করা যাইতেছে, তবু রবীন্দ্রনাথ সীমা এবং অসীমের মাঝখানে এক সূক্ষ্ম ব্যবধানকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। ইহার কারণ কবির আধ্যাত্মিক সাধনার বিচিত্র পথ ও পরিবেশ। সাধনার বিচিত্র পথের জন্য কবির তত্ত্বমূলক কবিতাগুলি যথার্থ কবিতা হইয়া উঠিয়াছে—যুক্তির জালে বাঁধা না পড়িয়া অনুভূতি ও ভাবপ্রধান হইয়া উঠিয়াছে।

উপনিষদের শ্রেষ্ঠ ভাব আত্মাতে পরমাত্মা দর্শন। শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া সর্ব্বভূতের মধ্যে আত্মাকে দেখিতে হইবে। জীবাত্মার মধ্যে পরমাত্মা দর্শন করিবার জন্য আত্মস্থ হইয়া যোগস্থ হইয়া অনিত্যের মধ্যে পরমেশ্বরকে নিত্যরূপে ধ্যান করিতে হইবে। উপনিষদের সাধনা অন্তর্মুখীন। ঈশ্বরকে উপলব্ধির জন্য অবশেষে বহির্জগত হইতে অন্তর্জগতে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে উদ্দালক পুত্র শ্বেতকেতু ব্রহ্মকে এক পৃথক সত্ত্বা ভাবিয়াছিল। সাধনার মধ্য দিয়া পরে তাহার ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি হইল। উদ্দালক তাহাকে বলিয়াছিলেন—"তৎ ত্বম্ অসি শ্বেতকেতু" এই উপলব্ধি অবশেষে শ্বেতকেতুর হইলে দেখিতে পাইল অহম্ ব্রহ্ম অস্মি। আমিই ব্রহ্মের মধ্যে আছি। ব্রহ্মের করুণা আমার মধ্যে প্রকাশ পাইতেছে। তখন আর পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার বিচ্ছেদ নাই—বিরহ নাই। জীবাত্মা পরমাত্মার মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করিয়া পরমাত্মার সহিত মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। ইহা হইতে

বুঝিতে পারি যে উপনিষদের খণ্ড-জগৎ সত্য হইলেও তাহার চরম সার্থকতা অখণ্ডের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করায়। উপনিষদের সীমা সত্য হইলেও খণ্ডসত্য। এই খণ্ডসত্যকে অখণ্ডের মধ্যে পূর্ণরূপে জানিতে হইবে, চিনিতে হইবে। অপরাব্রহ্মের উৎস পরাব্রহ্ম তাই পরাব্রহ্ম পরম সত্য :

বোসাঙ্কে-র দর্শনেও এই তত্ত্বের সন্ধান মিলে। The Value and the destiny of the Individual গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন : What is certain and what matters to us, is that the finite self is playing world, yet possesses within it the principle of infinity, taken in the sense of the nisus towards adsolute unity and self completion··· The finite Self, like everything in the universe, is now and here beyond escape an element in the Absolute, So its destiny involves becoming more fully one with the Absolute experience than it is in the world we know··· The perfect satisfaction, therefore, would be the possession of the Absolute as such, in sort to be the Absolute.

এ তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের মনকেও নাড়া দিয়াছে। নিসর্গের সকল কিছু সত্য—'তিনি' সত্য বলিয়াই। জীবনের যাবতীয় সম্পদ সত্য, কারণ তাহারা পূর্ণের পদস্পর্শে ধন্য হইয়াছে। উপনিষদের মত কবিও উপলব্ধি করিয়াছেন যে ঈশ্বরের পূর্ণ উপলব্ধির পর নিসর্গের রূপরসগন্ধস্পর্শ আর তেমন বড় বলিয়া মনে হয় না। অখণ্ড সত্যকে জানিতে পারিলে খণ্ডসত্য আর তেমন করিয়া মনকে অভিভূত করে না,—অনন্তের অন্তহীন অনুভবে তখন প্রাণমন আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। তাই মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়াইয়া, রূপ হইতে অরূপের রাজ্যে পাড়ি দিবার পূর্ব্বে কবি গাহিয়া ওঠেন :

চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে
অন্তরে আজ দেখব যখন আলোক নাহিরে।
ধরায় যখন দাও না ধরা
হৃদয় তখন তোমায় ভরা
এখন তোমার আপন আলোয় তোমায় চাহিরে।
তোমায় নিয়ে খেলেছিলেম খেলার ঘরেতে
খেলার পুতুল ভেঙে গেছে প্রলয় ঝড়েতে।
থাক তবে সেই কেবল খেলা
হোক না এবার প্রাণের মেলা,
তারের বীণা ভাঙল যখন হৃদয় বীণায় গাহিরে।

তবে এই তত্ত্ব কবির মনে দেখা দিলেও উপনিষদের ব্রহ্মোপলব্ধি রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ মুগ্ধ করিতে পারে নাই। ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যায় কিনা, এ প্রশ্ন কবির মনে বার বার দেখা দিয়াছে। তিনি অনুভব করিয়াছেন—পরমেশ্বরকে উপলব্ধির শেষ নাই। তাঁহাকে আরও জানার সঙ্গে আরও নববিধানের সৃষ্টি হয়। জীবাত্মার মধ্যে পরমাত্মার আস্বাদ পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু পরমাত্মা কখনও জীবাত্মার মধ্যে নিঃশেষিত হইয়া যান না। তাই নিজের মধ্যে পরমাত্মার আস্বাদ করিয়া পরমাত্মা কোনদিন বলিতে সমর্থ হইবে না "অহম্ ব্রহ্ম অস্মি।" কবির ধারণায় তাই জীবাত্মা সম্পূর্ণ করিয়া না পারে নিজেকে চিনিতে, না পারে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিতে। তাই কবি বলেন :

আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না
এই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা।

কেনোপনিষদে অনুরূপ ধারণার সন্ধান পাওয়া যায়। ইহাতে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মবাক্যও মনের অতীত। আমরা তাঁহাকে জানি না। তিনি বাক্য দ্বারা প্রকাশিত হন না, বাক্য ব্রহ্ম দ্বারা প্রকাশিত। তিনি উপাসনার বস্তু নন। লোকে মন দ্বারা যাঁহাকে মনন করিতে পারে না—কিন্তু যিনি মনকে জানেন, তিনিই ব্রহ্ম। যদি কেহ বলেন যে তিনি ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানিয়াছেন তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে তিনি ব্রহ্মকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। শিষ্য গুরুর মুখে এই সকল কথা শুনিয়া ব্রহ্মকে হৃদয়ে অনুভব করিবার চেষ্টা করিলেন এবং বলিলেন : আমি প্রথম ব্রহ্মকে জানিয়াছি। গুরু ইহা শুনিয়া বলিলেন :

যস্যামতং তস্য মতং, মতং যস্য
ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং, বিজ্ঞাতমাবিজানতাম্॥

যিনি ভাবেন ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মকে জানেন না ; যিনি মনে করেন ব্রহ্মকে জানিতে পারেন নাই, তিনি তাঁহাকে জানিয়াছেন। উত্তম জ্ঞানীর নিকট ব্রহ্ম অবিজ্ঞাত। কেনোপনিষৎ ব্যতীত অন্যান্য উপনিষদে ব্রহ্মোপলব্ধিকে স্বীকার করা হইয়াছে।

উপনিষদের রসে বর্দ্ধিত হইলেও রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের প্রদর্শিত সাধন-পথ ধরিয়া চলিতে পারেন নাই। নিজের পথে চলিতে চলিতে এই লীলাতত্ত্ব জীবনের ভিতর দিয়া ক্রমশঃ উপলব্ধি করিয়াছেন। কবি ভগবানকে কোন বিশেষ রূপ দিতে পারেন নাই। তাঁহার ঈশ্বর চিরচঞ্চল—সুনির্দ্দিষ্ট কোন সত্তা নন, তাই হাত বাড়াইয়া ধরিতে গেলেই দূরে সরিয়া যান। কবির সর্ব্বদাই ভয় ঈশ্বরকে যদি কোন সুনির্দ্দিষ্ট রূপ দেওয়া যায়, কোন সম্পর্কের মধ্যে আনিয়া ফেলা যায়, তবে সেই চিরচঞ্চল অপরূপকে সীমার বাঁধনে বাঁধিয়া ছোট করিয়া ফেলিতে হয়। তখন ভগবান আর ভগবান থাকেন না, তাঁহার অসীমতা অনেকখানি নষ্ট হইয়া যায়। শঙ্কিত ব্যথিত চিত্তে কবি তাই ভাবেন :

আমিও কি আপন হতে
করবো ছোটো বিশ্বনাথে
জানাবো আর জানব তোমার
ক্ষুদ্র পরিচয়ে ?

এই ভাবিয়া কবি উপনিষদের মতন জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত পুরাপুরি একাত্ম করিতে পারেন না। "তৎ ত্বম্ অসি" এ কথা সত্য হইলেও পুরাপুরি উপলব্ধি করা যায় না। অন্ত এবং অনন্তের মাঝখানে একটুখানি সূক্ষ্ম ব্যবধান মুছিয়া দিয়া তাহাদের সমধর্ম্মী করিয়া তুলিতে কবি সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক! যুক্তি দিয়া কবির যাহাই উপলব্ধি হোক না কেন, বুদ্ধি দিয়া তিনি যে কোন সত্যেই উপনীত হোন না কেন, রসের দিক দিয়া, অনুভূতির দিক দিয়া কবি সেই ভগবানকেই সমস্ত অন্তর দিয়া চাহিয়া আসিয়াছেন—যিনি খেলার ছলে সর্ব্বদা আড়াল দিয়া লুকাইয়া চলিয়া যান—যাঁহাকে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা যায় না। এই আড়াল দিয়া লুকাইয়া চলিয়া যাওয়াই তো ঈশ্বরের লীলা—ইহার মধ্যেই তো তাঁহার প্রেম বর্দ্ধিত হইতেছে। তাই তত্ত্বমূলক কবিতাগুলিতে সসীম অসীমের, স্বরূপ অরূপের, জীবাত্মা ও পরমাত্মার নিত্য প্রেমলীলার মাঝে স্বল্প ব্যবধানকে কবি স্বীকার করিয়াছেন। এই ব্যবধানকে উপলব্ধি করিয়াই জীবাত্মা ধন্য হইয়া উঠিয়াছে :

তোমার প্রেম যে বইতে পারি এমন সাধ্য নাই।
এমন সাধ্য নাই।
এ সংসারে তোমার আমার মাঝখানে তাই
কৃপা করে রেখেছ নাথ অনেক ব্যবধান,
দুঃখ সুখের অনেক বেড়া ধন জন মান।

এই চিন্তার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের ধ্যানধারণার বিশেষত্ব। ইহার জন্য তিনি উপনিষদের সত্য উপলব্ধি করিয়াও উপনিষদের কবি হইতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর লীলাময়। লীলার মধ্য দিয়াই তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে হইবে। "সো অহম্" এ কথা বলার পর আর ঈশ্বরের কোন লীলা নাই—উপলব্ধি নাই। ইহাই রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টির পরম বৈশিষ্ঠ্য। তিনি জগৎ ও জীবনকে কখনও সীমার দিক হইতে দেখেন, আবার কখন অসীমের দিক হইতে দেখেন। সীমা কখন আপন সীমা ছাড়াইয়া অসীমের মধ্যে প্রবেশ করে—আবার অসীম কখন সীমার মধ্যে বাঁধা পড়িয়া যায়—তবু যে কোন অবস্থাতেই সীমা অসীমের মাঝে একটুখানি ব্যবধান থাকিয়া যায়। এইভাবে চলিতে থাকে রূপ হইতে অরূপে—আর অরূপ হইতে রূপে অবিরাম আসা যাওয়া। এই রীতিকে স্মরণ করিয়াই কবি বলিয়াছেন যে সীমার সহিত অসীমের মিলন সাধনের প্রচেষ্টাই তাঁহার কাব্যের পরম লক্ষ্য। এই সাধন পথের মধ্য দিয়া কবি যে সত্যকে উপলব্ধি করিয়াছেন তাহা জ্ঞানের দ্বারা নয়, প্রেমের দ্বারা—হৃদয়ের অনুভূতি দ্বারা। উপনিষদের ব্রহ্মকে, বোসাঙ্কের Absolute কে জ্ঞানের মধ্য দিয়া পাওয়া যায়, কিন্তু কবির ভগবানকে প্রেমের মধ্য দিয়া লাভ করিতে হয়। কবির ভাষায়—আমরা আর কোন চরম কথা জানি বা না জানি নিজের ভিতর থেকে একটি চরম কথা বুঝে নিয়েছি এই যে, একমাত্র প্রেমের মধ্যেই সমস্ত দ্বন্দ্ব মিলে থাকতে পারে। যুক্তিতে তারা কাটাকাটি করে, কর্ম্মেতে তারা মারামারি করে, কিছুতেই তারা মিলতে চায় না। প্রেমেতে সমস্তই মিটমাট হয়ে যায়। তর্কক্ষেত্রে, কর্ম্মক্ষেত্রে যারা দিতিপুত্র ও অদিতি-পুত্রের মতো পরস্পরকে একেবারে বিনাশ করবার জন্যই সর্ব্বদা উদ্যত, প্রেমের মধ্যে তারা আপন ভাই। এই প্রেম তত্ত্বই রবীন্দ্রনাথকে কবি করিয়া তুলিয়াছে, উপনিষদের রসে বর্দ্ধিত হইয়াও দার্শনিক না হইয়া তিনি সার্থক কবি হইতে পারিয়াছেন।

পাহাড়

—সঙ্কর্ষণ রায়

বিজিত গীতালিকে চিঠি লিখল, কবে আসবে তুমি আমার বনবাসের ভাগ নিতে ? নিজেকে বড় একা মনে হচ্ছে। বনে পাহাড়ে ঘেরা এই ছোট্ট শহরটি তোমার ভালই লাগবে।

মধ্যপ্রদেশের সুরগুজা ও শ্যাডোল জেলার সীমানায় ঘন শালবন দিয়ে ঘেরা পার্বত্য অঞ্চলটিতে কয়েকটি কয়লার খনিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে চিরিমিরি সহর। ঝড়ে সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের বুকে ঢেউয়ের সমারোহের মত পাহাড়ের পর পাহাড়। যতদূর দৃষ্টি চলে সহরটা পাহাড়গুলোর গায়ে গায়ে এলোমেলোভাবে ছিটোনো, প্রকৃতির প্রস্তরীভূত নিষেধগুলো লংঘন ক'রে যথেচ্ছভাবে গ'ড়ে ওঠে নি। পাথর কেটে পাহাড়ের গা দিয়ে রাস্তা তৈরী করা হয়েছে। সহরের চার পাশেই ঘন শালবন। এই বনের সম্পদের আকর্ষণে কলকাতা থেকে চলে এসেছে বিজিত। কলকাতায় লোহা-লক্কড়ের ব্যবসাতে অসফল প্রয়াসের পর এখানে এসে শুরু করেছে কাঠের ব্যবসা। করাত-কল বসিয়েছে চিরিমিরি সহরের মাঝখানে। কয়লা-খনি-গুলোর আনুকূল্যে তার ব্যবসা দেখতে দেখতে ফেঁপেফুলে ওঠে। এতটা বুঝি সে আশা করে নি।

বিজিতের জীবন তার জীবিকার সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়ান। ব্যবসার বৃত্তের বাইরে দৃষ্টি দেবার অবসর ছিল না তার। কিন্তু তার দিকে নজর দিত অনেকে। তাদের মধ্যে ছিল গীতালি। আর্ট কলেজের ছাত্রী সে। হঠাৎ হার্ড-ওয়্যার মার্চেন্টের দিকে কেন ঝুঁকে পড়ল তা' বলা শক্ত। গীতালি বলত—বিজিতের মত সত্যিকারের পুরুষ মানুষ আর সে দেখে নি।

গীতালির দৃষ্টিতে বিজিত নিজেকে যেন নতুন ক'রে আবিষ্কার করল। তার কর্মনিবিষ্ট সত্তার মধ্যে যে এত ভালবাসা ছিল তা' বুঝি সে জানত না।

কলকাতা থেকে চিরিমিরি রওনা হওয়ার আগে বিজিত গীতালিকে বলেছিল, গীতু, চল আমাদের বিয়েটা সেরে ফেলি।

গীতালি অবাক হয়ে বলে, তাড়া কিসের এত !

বিজিত বললে, তাড়া আছে বৈ কি। তোমাকে ছেড়ে অত দূরে মধ্যপ্রদেশের বনেপাহাড়ে থাকব কী করে !

গীতালি বলে, অচেনা জায়গা—সেখানে তুমি প্রথমে গিয়ে গুছিয়ে না বসলে আমি কী করে যাব।

অনিমেষ চোখে গীতালির মুখের দিকে চেয়ে বিজিত বললে, অচেনা জায়গাটিকে আমরা দু'জনে মিলে চিনে নেব ভেবেছিলাম।

বিজিতের গলা জড়িয়ে ধ'রে গীতালি বললে, প্রথমে আমাদের দু'জনের হ'য়ে তুমিই চিনে নাও—তারপর আমি গিয়ে উপস্থিত হ'ব।

বিজিত আর কিছু বলে নি।

চিরিমিরিতে গুছিয়ে বসতে বিজিতের সময় লাগে নি —মাস ছয়েক পর থেকে সে রোজই গীতালিকে লিখতে লাগল তার কাছে চ'লে আসবার জন্য।

কিন্তু গীতালি একটা প্রদর্শনীর আয়োজনে ব্যস্ত তখন। তার নিজের আঁকা ছবিগুলো সর্বসাধারণের দৃষ্টির সামনে তুলে ধরার প্রয়াস করছে—বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে তাই নিয়ে মেতে আছে। বিজিতকে সে কথা অবশ্য সে লেখে না। সে জানে বিজিতের ওতে উৎসাহ নেই।

বিজিতের আহ্বানের উত্তরে সে লেখে, আর কটা দিন অপেক্ষা কর লক্ষ্মীটি।

গীতালির চিঠি পেয়ে অভিমান হয় বিজিতের। চিঠির জবাব সে দেয় না।

এদিকে প্রদর্শনী সফল হ'ল না। গীতালির শিল্প-প্রয়াসের প্রতিকূলতা করেন সমালোচকেরা—তাঁরা বলেন সে নাকি তার নিজস্ব ফর্ম খুঁজে পায় নি। গীতালি মর্মাহত হ'ল। সমালোচকদের গ্রহণশীলতা সম্পর্কে তীব্র বিদ্রূপ মন্তব্য প্রকাশ ক'রেও সে সান্ত্বনা খুঁজে পেল না। ভাবল নিজের আঁকা ছবিগুলো ছিঁড়ে ফেলবে—তার শিল্পসৃষ্টি প্রয়াসের লজ্জাকর অধ্যায়টির চিহ্ন মাত্রও রাখবে না। কিন্তু পারল না। তার সমস্ত সুখ-দুঃখ মন্থন ক'রে সে যা সৃষ্টি করেছে, তাতে তার বুকের রক্তের স্বাক্ষর আছে—সেগুলো বিনষ্ট করা তো আত্ম বিলোপ।

সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হ'ল বিজিতের কথা। বিজিতের আহ্বানে এত দিন সাড়া দেয় নি সে। এখন বুঝি তার সময় হ'ল। বিজিতকে তার কাছ থেকে আড়াল ক'রে রেখেছিল যে শিল্পযশের দুরাশা—তা' কেটে যেতেই যেন আবার নতুন ক'রে দেখতে পেল বিজিতকে কুয়াশা-বিদীর্ণ করা ভোরের সোনালি আলোয়। তার বেদনার্ত হতাশ মনের সান্ত্বনা যেন চিরিমিরির সুদূর বনে-পাহাড়ের ধূসর শ্যামলিমায় চিত্রিত হ'তে থাকে।

বিজিতকে খবর না দিয়েই চিরিমিরিতে চলে এল গীতালি।

বিজিত যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না যে গীতালি এসেছে।

গীতালিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে সে বললে, শেষ পর্যন্ত এলে তুমি—এসে পৌঁছলে আমার জীবনে।

গীতালি বলে, এসেছি তো। কেন বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?

না—মনে হচ্ছে এ হয়তো স্বপ্ন।

গীতালি ঠোঁট ফুলিয়ে বলে, স্বপ্ন! তা হ'লে তুমি আমাকে চেন নি!

গীতালির ঠোঁটে চুমু এঁকে বিজিত বললে, চিনেছি বৈকি। কিন্তু পুরোপুরি কী চিনেছি!

চিরিমিরির বনে পাহাড়ে নানা রঙে রঙিণ হ'য়ে ওঠে গীতালির দিনগুলি। তখন নবোদ্গত শালের মঞ্জরী শুভ্র আলপনা এঁকেছে বনের সবুজের গায়ে—মহুয়া ফুল-ঝরার পালা হয়েছে শেষ—ফল পাকতে শুরু করেছে। বিজাত্তর-ঝরিয়া নালার ঝর্ণার তলায় ফুটেছে নীল রঙের বুনো ফুল।

বিজিতকে নিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায় গীতালি—সুদুর্গম বনের নিষেধ মানে না—কাঠের ব্যবসার প্রাত্যহিক চাহিদা থেকে নিজের খেয়াল খুশির মধ্যে টেনে রাখে বিজিতকে।

প্রকৃতির বুকের প্রাণোচ্ছাস যেন পাহাড়ের পর পাহাড়ে তরঙ্গায়িত। সুদূর নক্ষত্র-লোকের আকর্ষণে মাটি যেন আকাশ ছুঁতে চেয়েছিল। পৃথিবীর বাঁধন কাটিয়ে উঠতে পারে নি—কিন্তু সুদূরের পিপাসা প্রস্তরীভূত হ'য়ে রয়েছে।

একদিন টেংনি পাহাড়ের খাড়া উৎরাইয়ের সামনে সুদূর বিস্তৃত নীলাভ সমতল ভূমির বুকে আঁকা বাঁকা পাহাড়ী নদীর রূপালি রেখার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বিজিতের হাত দুটি আঁকড়ে ধ'রে গীতালি বলেছিল, তোমাকে যে এত ভালবাসি আগে কখনো এমন নিবিড়ভাবে অনুভব করি নি বিজিত।—আবেগে থর থর ক'রে কাঁপে গীতালির গলার স্বর।

উদ্দাম অরণ্যের প্রাণোচ্ছ্বাস অনুভব করে বিজিত তার সমস্ত দেহ মন দিয়ে, গীতালিকে সে আলিঙ্গন করে তার দেহের সমস্ত পৌরুষ দিয়ে। পাহাড়ী ঝর্ণার মত নামে তার চুম্বনের উচ্ছাস গীতালির পুষ্পিত দেহের তটে। গভীর আবেশে নিজেকে প্রায় হারিয়ে ফেলে গীতালি। কোন কথা বলে না কেউ।

আর এক দিন। সন্ধ্যার একটু আগে বরটুংগা পাহাড়ের মাথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে গীতালি ও বিজিত। চিরিমিরির আর সব পাহাড়কে ছাড়িয়ে উঠেছে তার চূড়া। শালবনে ছাওয়া বিস্তীর্ণ ঘাসে-ছাওয়া মাঠ আছে পাহাড়ের মাথায়। মনোরম এক টুকরো শ্যামল স্নিগ্ধতা। পাহাড়ের গায়ে পাথরের স্তূপের খাঁজে খাঁজে ছোট ছোট ঝর্ণা আছে অনেকগুলো—তরলিত প্রাণোচ্ছ্বাস। পাহাড়ের ধারে দাঁড়িয়ে দেখা যায় ঢেউ-খেলান পাহাড়ের পর পাহাড় দূরে মানেন্দ্রগড়ের সমতলে গিয়ে মিশেছে—নীলাভ নির্জন একটা সুদূর বিস্তৃত স্বপ্ন যেন। পুঞ্জীভূত পাথরের স্তূপ নয়—যেন ধূসর কল্পনা মৌন সঙ্গীতের ছন্দে গড়া।

গীতালি উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বললে, বিজিত এখানেই আমরা ঘর বাঁধব—আর কোথাও নয়। এমন স্বপ্নিল পরিবেশ কোথাও পাবে না।

বিজিত, অবাক বিস্ফারিত চোখে গীতালির মুখের দিকে চেয়ে বললে, এখানে! কিন্তু—

—কোন কিন্তু নয়—আমাদের ভালবাসা আর কোথাও সার্থক রূপ নিতে পারবে না।

গীতালির কথায় আহত বোধ করে বিজিত—সে বলে, কেন নয় গীতু! যেখানেই থাকি না কেন আমাদের ভালবাসা—

বিজিতের গলা জড়িয়ে ধ'রে তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে গীতালি বলে, জানি গো জানি। জানি, আমাদের ভালবাসা সব কিছুর ওপরে। কিন্তু এই পাহাড়েই পারব আমরা সত্যিকারের স্বর্গ রচনা করতে।

ওঁরা দু'জনে তখন একটি ঝর্ণার কাছে বড়ো একটি পাথরের নীচে নরম ঘাসের ওপর পাশাপাশি বসেছে! ওদের সামনে পাহাড়ের গায়ে একটি পলাশ গাছে ফোটা ফুলের সমারোহে যেন তাদের দু'জনের মনের রঙ আত্মপ্রকাশ করেছে। সে রঙের দিকে চেয়ে গীতালি হঠাৎ নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে বেঁধে ফেলে বিজিতকে। বিজিতের সর্বাঙ্গে ফুলের চেয়েও কোমল স্পর্শের ঢেউ তুলে তার কানে কানে বলে, আমার বুকের এই দুর্বার ভালবাসাকে এই নির্জন বনে-ঘেরা পাহাড় ছাড়া আর কোথায় রূপ দিতে পারব বল? এমন নিবিড় ভাবে ভাল বাসার অবসর আর কোথায় পাবো? কথা দাও, এখানেই তুমি আমার জন্য ঘর বাঁধবে।

বিহ্বল কণ্ঠে বিজিত জবাব দেয়, কথা দিচ্ছি গীতু—যে করে হোক এই পাহাড়ের মাথায় তোমার জন্য ঘর বাঁধব।

গীতালি কলকাতায় চ'লে গেল।

সুদুর্গম পাহাড়ের মাথায় ঘর বাঁধার অসম্ভব একটা কল্পনা বিজিতের নিঃসঙ্গ মুহূর্তগুলোকে বিচলিত ক'রে তোলে। সে ক্রমশঃ বুঝতে পারে গীতালিকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তা' কতখানি দুঃসাধ্য। চিরিমিরি থেকে বেশ কিছুটা দূরে বরটুঙ্গা পাহাড়। পাহাড়ের চূড়ায় উঠবার জন্য সরু একটা পায়ে-চলা পথ গভীর অরণ্যের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হ'য়ে আছে। অতখানি দূরত্ব, তার উপর দুর্লঙ্ঘ্য—ওখানে বাড়ি তৈরী করার পরিকল্পনা যে আর সকলের দৃষ্টিতে বাতুলতা মাত্র তা' সে উপলব্ধি করে।

তাই সে তার ওখানকার পরিচিতদের কাউকে কিছু বলে না। গোপনে বাড়ি তৈরীর সব আয়োজন করতে থাকে। প্রথমে বরটুঙ্গা পাহাড়ের মাথায় জমির বন্দোবস্ত নেয়। তারপর পাহাড়ের গা বেয়ে চূড়োয় ওঠার জন্য চওড়া একটি রাস্তা তৈরীর ব্যবস্থা করে। শক্ত পাথরের স্তূপের কঠিন বাধা বিদীর্ণ করতে হয় বিস্ফোরক পদার্থ দিয়ে। পাহাড়ের গা বেষ্টন ক'রে ধীরে ধীরে উঠতে থাকে রাঙা কাঁকরে ছাওয়া সড়ক। বিজিত ও গীতালির অনুরাগের রক্তরাগের স্বাক্ষর নিয়ে যেন পথটি পাহাড়ের শীর্ষে এসে মিশল। ঐ পথ দিয়ে বধূবেশে আসবে গীতালি—বিজিতের কল্পনায় যেন সে আগমন শুরু হ'য়ে যায়। বনের মধ্যে শালগাছের পাতায় পাতায় শুরু হয়ে থাকে একটা রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা। মহুয়ার ডালগুলি সব কান পেতে থাকে অনাগত একটা পদধ্বনির উদ্দেশ্যে।

বিজিত উঠে প'ড়ে লেগে যায় বাড়ি তৈরীর কাজে। টাটা মার্সেডিজের অতিকায় ট্রাকে ক'রে বাড়ি তৈরীর সব উপকরণ পাহাড়ের মাথায় নিয়ে আসা হয়—ইঁট-কাঠ-সিমেণ্ট, ইস্পাতের কড়ি-বড়গা।

বিজিত তার কাঠের ব্যবসার ভার সহকারীদের ওপর প্রায় পুরোপুরি ছেড়ে দেয়। তার সমস্ত সময় বরটুঙ্গা পাহাড়ের মাথায় কেটে যায় বাড়ি তৈরীর কাজে। প্রতিটি ইটের সঙ্গে গাঁথা হ'তে থাকে তার মনের মাধুরী। তার ভালবাসা দিয়েই যেন গড়ে তোলে বাড়িটি।

গীতালিকে সে লিখল—বরটুঙ্গা পাহাড়ের পাথরগুলোর মত মজবুত বাড়ি তৈরী হচ্ছে তোমার জন্য। দেখলে তোমার মনে হবে বুঝি পাহাড়ের খানিকটা বাড়ির আকার নিয়েছে।

গীতালি জবাব দিল, কবে আমাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাবে? আমি যে আর ধৈর্য ধরতে পারছিনে।

গীতালির ধৈর্যহীনতার মাধুর্য বিজিতের সমস্ত মনকে

ভ'রে তোলে। দ্বিগুণ উৎসাহে সে খাটতে থাকে—আরও লোক লাগিয়ে দেয়। রাত্রেও বাড়ির কাজ চলে।

যাদের ওপর ব্যবসার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিল বিজিত, তাদের শৈথিল্য তার অতিযত্নের কাঠের ব্যবসাতে ঘুণ ধরিয়ে দেয়। কোলিয়ারীগুলোতে রীতিমত মাল সাপ্লাই দিতে পারে না—বেশ কয়েকটা শাঁসালো কণ্ট্রাক্ট হাত-ছাড়া হ'য়ে যায়। তা' ছাড়া বাড়ি তৈরীর জন্য ব্যবসার মূলধনে হাত দিতে হয়—ফলে বরটুঙ্গা পাহাড়ের ওপর বাড়িটা যত মজবুত হয় ততটা ফাঁপা হ'য়ে ওঠে বিজিতের ব্যবসার ভিত। হিসেবের খাতায় ডেবিটের অঙ্ক ক্রমশঃ বেড়ে চলে।

কিন্তু বিজিত নির্বিকার। করাত-কল বন্ধ হওয়ার খবর যখন এল তখন সে পাহাড়ের গায়ে একটা ঝর্ণার নীচে একটি কংক্রীটের জলের আধার তৈরীর ব্যবস্থা করছে—অন্য কোন দিকে মন দেবার সময় নেই তার।

ডিজেলের পাম্প কিনে আনল বিজিত; বাড়ির মাথায় বসানো ট্যাঙ্কে জল পাম্প ক'রে তোলবার জন্য।

কিছু দিন বাদে বাড়ি তৈরী শেষ হ'ল। বরটুঙ্গা পাহাড়ের মাথায় শাদা বাড়িটা শালবনের বেষ্টনীর মধ্যে ঝলমল করতে থাকে। বাড়ির চারপাশে বাগান—কেয়ারী করা ফুলের বেড্। গাড়িবারান্দার সামনে কাঁকরে-ছাওয়া রাস্তার দু'পাশে ইউক্যালিপ্টাস ও ঝাউগাছের চারা লাগানো হয়েছে। বিজিত দেবদারুর চারা এনেছে দেরাদুন থেকে। রকমারী মরশুমী ফুলের রঙিণ সমারোহ মেহেন্দী ও পাতা-বাহারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। দেশী ফুলও আছে অনেক—গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা, বেল ও যুথিকা। শোবার ঘরের জানালার ধারে একটা হাস্-নু-হানা গাছের চারা এনে লাগানো হ'ল।

গীতালিকে বিজিত লিখল, গীতু, তোমার বাড়ি তৈরী হ'য়েছে—এস, এবারে দু'জনে মিলে গৃহপ্রবেশ করি।

বিজিতের ইচ্ছে এ বাড়িতেই ওদের বিয়ে হ'বে গৃহ-প্রবেশের দিনটিতে।

গীতালির জন্য প্রতীক্ষা করে বিজিত। গেটে মাধবী-লতা বাতাসে অল্প অল্প দোলে—কচি পাতার আন্দোলনে যেন প্রতীক্ষা-ভীরু হৃদয়ের স্পন্দন। গেটের বাইরে কাঁকরে ছাওয়া রঙিণ পথ এঁকে বেঁকে উধাও হয়েছে শাল-বনের মধ্যে। আলতা-পরা কোমল পায়ের পদক্ষেপে অভিষিক্ত হ'বার জন্য যেন সমস্ত পথটা ব্যগ্র হ'য়ে উঠেছে।

বিজিতের জীবন যৌবন মন্থন করা ভালবাসার পুষ্পাকীর্ণ পথ বেয়ে তার নিভৃত নিঃসঙ্গ জীবনে গীতালি আসবে।

বিজিতের কাঠের ব্যবসা উঠে যায়। নীলামে বিক্রী হয় করাতের কল! পাকা বনিয়াদের ওপর দাঁড়ানো ব্যবসাটি বরটুঙ্গা পাহাড়ের মাথায় এক অসম্ভব পরিকল্পনার রূপায়নে ধ্বসে পড়ে। কিন্তু বিজিতের তাতে দুঃখ নেই। তার ভালবাসার তপস্যায় নিজেকে রিক্ত ক'রেও সুখ। সে মনে করে কাঠের ব্যবসাটি তার প্রেমের নৈবেদ্যের মত সে গীতালিকে উৎসর্গ করেছে।

স্থানীয় সরকারী কোলিয়ারিতে দু' একটা কণ্ট্রাক্ট পাবার আশা আছে—নয়তো সাজা-পাহাড়ের কয়লার খনিতে চাকরি নেবে। গীতালির সঙ্গে তার নতুন জীবনের সঙ্গে নতুন কর্ম-জীবনও শুরু করবে।

নতুন-কেনা উইলিস জীপে ক'রে রোজই দু'বেলা বরটুঙ্গা পাহাড়ে যায় বিজিত। নতুন-কেনা আসবাবে ঘর সাজিয়ে তোলে। বসবার ঘরে কাশ্মীরি কার্পেট পাতে—সেগুনের প্রশস্ত জোড়া-খাটে ডানলপিলো। ম্যানিলা-কেনের চেয়ার-টেবিল ঢাকা বারান্দায় গুছিয়ে রাখে।

গীতালি আসবে।

কিন্তু বেশ কয়েকদিন ধ'রে গীতালি চিঠি লিখছে না—বাড়ি তৈরী সম্পূর্ণ হ'বার পর বিজিত যে চিঠি লিখেছিল সে চিঠিরও জবাব দেয় নি।

বরটুঙ্গা পাহাড়ের মাথায় ভোরের সূর্যের রঙিণ আলপনায় যেন ভৈরবীর সুর বাজে।

রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষার রোমাঞ্চ বনময় স্পন্দিত হয়—আমলকী ও হরিতকীর ডালে ডালে এলোমেলো বাতাসে যেন প্রশ্ন জাগে—কবে আসবে গীতালি।

সূর্য না উঠতেই সেদিন বরটুঙ্গা পাহাড়ের মাথায় এসেছে বিজিত—প্রথম আলোর চরণধ্বনি শুনছে সে ইউক্যালিপ-টাসের কচি পাতায়। চারদিক নিস্তব্ধ। বাতাস বইছে না। বিজিত বাগানে একটা বেতের চেয়ার টেনে ব'সে আছে।

এমন সময় তার আর্দালি এল সেদিনের ডাক নিয়ে। গীতালির চিঠি ছিল।

বিজিত কম্পিত হাতে নীল খাম থেকে বের ক'রে আনে নীলাভ পাতলা একটা কাগজ।

একটি মাত্র কাগজ। খুব সংক্ষিপ্ত চিঠি—তাড়াহুড়ো ক'রে লেখা।

সামনে গেটে মাধবীলতা ভোরের রোদে ঝিকমিকিয়ে উঠেছে। পাশে চন্দ্রমল্লিকার ঝাড়ে দুটো সদ্য-ফোটা ফুল অল্প অল্প দুলছে।

গীতালির চিঠি বার বার পড়ে বিজিত।

গীতালি লিখেছে, সরকারী একটা বৃত্তি পেয়ে ফ্রান্সে চলেছি। তোমার সঙ্গে দেখা করার সময় নেই। কবে ফিরব জানি নে।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে ব'সে থাকে বিজিত। শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে অনেক দূরে কোরিয়াগড়ের পাহাড়ের দিকে। ধূসর আকাশে মিশেছে ধূসর পাহাড়। কাছের সবুজ চোখে পড়ে না—চোখে পড়ে না তার যত্নকৃত বাগানে বীজ অঙ্কুরের পথ বেয়ে নতুন প্রাণ স্পন্দনের আয়োজন। শালবনে উধাও কাঁকরে-ছাওয়া রাস্তাটি থেকে সব রঙ যেন মুছে গেছে।

মুখ তুলে তাকায় সে তার বাড়িটার দিকে। কোথায় তার সেই বুক-নিংড়ানো ভালবাসা দিয়ে গড়া বাসা! এ যে শুধু শুকনো ইঁট-পাথরের স্তূপ।

বরটুঙ্গা পাহাড় থেকে নেমে আসে বিজিত হেঁটে হেঁটে—পাহাড় বেষ্টন ক'রে যে প্রশস্ত রাস্তাটি তৈরী করেছিল সে পথ দিয়ে নয়—কাঠুরেদের তৈরী সরু পায়ে চলা পথ দিয়ে হাঁটতে থাকে সে।

বন

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

সম্মুখে ওই বনের পানে দিন তাকাই।
কতই বদল, তবু যেন বদল নাই।
ঝরছে পাতা সইছে কতই উৎপাত-ই—
হিম ও আতপ ধরছে আহা বুক পাতি,
ঝঞ্ঝা সাথে চলছে তাহার দিন লড়াই।

২

ভাঙা শাখায় নূতন পাতার উদ্ভবে—
ভরে তাহার পর্ণ-কুটীর উৎসবে।
ফুলে ফুলে উঠছে ভরি দিগন্ত,
ফলের ধারা চলছে যেন অনন্ত,
ভরাট ভবন, পুষ্প পাতা পল্লবে।

৩

উহার দশা আমাদেরি মতন তো—
এমনি ধারা উঠন্ত ও পড়ন্ত।
বজ্রও যায় হঠাৎ কভু বুক চিরে,
কখনো বয় মলয় সমীর ঝিরঝিরে,
আসে আবার তেমনি শরৎ বসন্ত।

৪

মূকের সমাজ নাইকো ভাষার গণ্ডগোল—
কথায় ব্যথা দেয়না—মোটেই নয় চপল।
মৌনী-বাবার এ পঞ্চত তো মন্দ নয়—
কয় না কথা, তবুও দেয় বর অভয়,
মগ্ন ধ্যানে, ঝগড়াঝাটি, নাই কোঁদল।

৫

কাছে গেলেই তৃপ্তি আমি দিন লভি—
যেন উহা কল্পতরুর মণ্ডপই।
সকল তরুই তপোবনের অংশরে—
অক্ষয়-বট বোধিদ্রুমের বংশরে—
ছায়াই হল—তাঁহার পদে সব সঁপি।

বাবরের আত্মকথা

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় এম-এ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর

হিন্দুস্থানের বিবরণ

হিন্দুস্থান একটি ঘনবসতিপূর্ণ সমৃদ্ধশালী বিশাল দেশ। পূর্ব্ব, দক্ষিণ—এমন কি পশ্চিমদিকেও ঘিরে আছে সমুদ্র। উত্তরে সুউচ্চ পর্ব্বত শ্রেণী যা হিন্দুকুশ, কাফেরিস্থান ও কাশ্মীরকে সংযুক্ত করেছে। উত্তর-পশ্চিমে কাবুল, গজনি ও কান্দাহার। সমগ্র হিন্দুস্থানের রাজধানী দিল্লী। সাহাবুদ্দিন ঘোরির মৃত্যুর পর (১২০৬ খ্রীষ্টাব্দ) সুলতান ফিরোজ সার রাজত্বের শেষ পর্য্যন্ত (১৩৮৮ খ্রীষ্টাব্দ) হিন্দুস্থানের অধিকাংশই দিল্লীর সুলতানদের শাসনাধীনে ছিল।

আমার হিন্দুস্থান জয়ের সময় এই দেশ পাঁচজন মুসলমান বাদশাহের এবং দুইজন বিধর্ম্মীর শাসনাধীন ছিল। তাঁরা সকলেই স্বাধীন শাসক বলে বিখ্যাত ছিলেন। পার্ব্বত্য ও অরণ্য প্রদেশগুলিতে আরও অনেক রহিস্ ও রাজা ছিলেন, তবে তাঁদের বিশেষ কোনও খ্যাতি ছিল না।

ভারতের রাজধানী দিল্লী আফগান সুলতানের দখলে ছিল। তাঁরা ভিরা থেকে বেহার পর্য্যন্ত দেশ শাসন করতেন। তাঁদের রাজত্বের পূর্ব্বে জৌনপুর সুলতান হোসেন সারকির অধীন ছিল। তাঁদের বংশকে হিন্দুস্থানে 'পুরবী বংশ বলা হতো। তাঁর পূর্ব্ব পুরুষরা সুলতান ফিরোজ সা এবং তুঘলক সুলতানদের জেয়ালা বরদার ছিল। আমার ভারত আক্রমণের সময় সৈয়দ বংশের সুলতান আলাউদ্দিন (ওরফে আলম খাঁ) দিল্লীর শাসনকর্ত্তা ছিলেন। দিল্লী অধিকার করার পর তাইমুর বেগ আলাউদ্দিনের পূর্ব্ব পুরুষের হাতে দিল্লী সমর্পণ করে চলে যান। সুলতান বুলাল লোদি এবং তাঁর পুত্র সেকেন্দার জৌনপুর রাজধানী ও দিল্লী রাজধানী অধিকার পর এই দুইটীকে একত্রিত করে একই রাজ্যরূপে শাসন করতে থাকেন (১৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দ)।

সুলতান মহম্মদ মুজাফফর গুজরাটের শাসক ছিলেন। সুলতান ইব্রাহিমের পরাজয়ের কিছু দিন পূর্ব্বেই তিনি এই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে যান। তিনি আইনজ্ঞ এবং জ্ঞানান্বেষী ছিলেন এবং অনবরত কোরাণ নকল করতেন। তাঁর বংশকে এখানকার জনসাধারণ 'তঙ্ক' নামে অভিহিত করতো। তাঁর পূর্ব্বপুরুষরাও সুলতান ফিরোজ সা এবং অন্যান্য তুঘলক সুলতানদের সুরা পরিবেশকরূপে কাজ করতো। ফিরোজ খাঁর মৃত্যুর পর তারা গুজরাট অধিকার করে।

দাক্ষিণাত্যে বাহমণি সাম্রাজ্য। কিন্তু সেখানে এখন কোনও স্বাধীন রাজা ছিল না। তাদের পরাক্রমশালী বেগরা এই দেশের উপর ক্ষমতা বিস্তার করে যে যার পছন্দমত টুকরো টুকরো করে ভাগ করে নিয়েছে।

মালওয়া প্রদেশের রাজা ছিলেন সুলতান মামুদ। এখানকার লোকেরা এ দেশকে মাণ্ডুও বলতো। তাঁর বংশকে বলা হয় খিলিজি (তুর্ক)। রাণা সঙ্গ সুলতান মামুদকে পরাজিত করে তাঁর রাজ্যের বেশীরভাগই অধিকার করে নেন। খিলিজি বংশও দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল। সুলতান মামুদের পূর্ব্বপুরুষরাও নিশ্চয় ফিরোজ শার অধীনে কাজ করতো। তাঁর মৃত্যুর পর তারা মালওয়া অধিকার করে।

নসরৎ সা এই সময়ে বঙ্গদেশের রাজা ছিলেন। তাঁর পিতাও বাংলার রাজা ছিলেন। তাঁর নাম ছিল সৈয়দ সুলতান আলাউদ্দিন। বাংলা দেশের একটি বিশেষ রীতি এই যে, রাজসিংহাসন অধিকার করাটা উত্তরাধিকারত্বের উপর খুব কমই নির্ভর করে। রাজার জন্য অবশ্য একটি রাজসিংহাসন স্থির আছে। অনুরূপভাবে এক একজন আমিরের জন্যও পৃথক পৃথক আসন ও পদ নির্দ্ধারিত থাকে। এই রাজসিংহাসন এবং পদগুলিই বাংলার জনসাধারণের ভক্তি ও আনুগত্য আকর্ষণ করে। এইসব পদাধিকারীদের জন্য একদল অনুগত অনুচর, ভৃত্য এবং কর্ম্মচারীর গোষ্ঠি নির্দ্দিষ্ট থাকে। রাজা এই সব পদস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে কাউকে বরখাস্ত এবং তার স্থলে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করতে ইচ্ছা করলে তার স্থলাধিষ্ঠিত ব্যক্তিই এইসব ভৃত্য পরিচালকদের আনুগত্য লাভ করে। শুধু তাই নয় এই নিয়ম রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির প্রতিও প্রযুক্ত হয়। যদি কোনও রাজাকে হত্যা করে কেউ রাজসিংহাসনে বসতে সফলকাম হয় তাহলে তাকে সকলেই তৎক্ষণাৎ রাজা বলে মেনে নেয়। সমস্ত আমির, মন্ত্রী, সৈন্য, প্রজা সাধারণ সঙ্গে সঙ্গেই তার বশ্যতা স্বীকার করে এবং তাকেই পূর্ব্বাধিকারীর স্থলাভিষিক্ত বলে স্বীকার করে সর্বপ্রকারে তাদের আনুগত্য জ্ঞাপন করে তার আদেশ অকুণ্ঠভাবে পালন করতে উৎসুক হয়। বাংলার অধিবাসীরা বলে থাকে—আমরা রাজ সিংহাসনের প্রতি অনুরক্ত ও বিশ্বাসী। যে কেউ সিংহাসনে বসবেন আমরা তাঁরই অনুগত ও বাধ্য থাকবো। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে নসরৎ সার পিতার বাংলার রাজতক্তে বসবার আগে একজন আবিসিনীয়াবাসী পূর্ব্বতন রাজাকে হত্যা করে নিজে বাংলার রাজ সিংহাসন অধিকার করে এবং কিছু সময় এই রাজ্যের শাসন পরিচালনা করে। সুলতান আলাউদ্দিন এই আবিসিনীয়াবাসীকে হত্যা করে বাংলার সিংহাসনে বসেন এবং তাঁকেই বাংলার অধীশ্বর বলে জনসাধারণ স্বীকার করে নেয়। তাঁর মৃত্যুর পর অবশ্য তাঁর পুত্র উত্তরাধিকার সূত্রেই সিংহাসন লাভ করেছে এবং এখনও রাজত্ব করছে।

বঙ্গদেশে আর একটি চলতি প্রথা আছে। এখানে কোনও রাজা যদি পূর্ব্বাধিকারীর সঞ্চিত ধনসম্পদ খরচ করে নিঃশেষ করে ফেলে

কিংবা মজুদ অর্থ কমিয়েও ফেলে, তাহ'লে সেটা তার ঘৃণ্য নীচ কাজ বলে গণ্য করা হয়। প্রত্যেক রাজারই সিংহাসন অধিকার করার পর তার নিজের আমলে পৃথকভাবে ধন সঞ্চয় করতে হয়। এইভাবে ধনসম্পদবৃদ্ধি করা রাজার পক্ষে খুব সম্মানজনক এবং মহিমা-ব্যঞ্জক কার্য্য বলে এখানকার জনসাধারণ মনে করে।

আর একটি প্রথাও এখানে চলতি আছে। পুরাকাল থেকেই এই নিয়ম বলবৎ যে প্রত্যেক বিভাগ—যেমন কোষাগার, আস্তাবল এবং রাজকীয় অন্যান্য দপ্তরের খরচ নির্ব্বাহের জন্য আলাদা আলাদা জেলা নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই নির্দ্দিষ্ট জেলার আয় থেকে এই সব দপ্তরের ব্যয় নির্ব্বাহ করতে হয়, অন্য কোনও তহবিল থেকে করবার নিয়ম নাই।

উপরে উল্লিখিত পাঁচজন মুসলমান রাজা হিন্দুস্থানে বিশেষ সম্মানের পাত্র। তাঁরা বহু সৈন্য এবং বিপুল সম্পত্তির অধিকারী। বিধর্ম্মী রাজাদের মধ্যে বিজয় নগরের রাজা—তাঁর রাজ্যের আয়তন এবং সৈন্য-সংখ্যার দিক দিয়ে বিবেচনা করলে সব চেয়ে বড়।

দ্বিতীয় হচ্ছে রাণা সঙ্গ—যিনি তাঁর রাজত্বের শেষের দিকে নিজের শৌর্য্য বীর্য্য এবং তরবারির জোরে পরাক্রমশালী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর নিজের দেশ চিতোর। মাণ্ডু সুলতানদের অধঃপতনের সময় তাদের অনেক অধীনস্থ প্রদেশ যেমন—রস্তনবার, সারংপুর, ভিলসান এবং চান্দেরি রাণাসঙ্গ অধিকার করে নেন। ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে আমি চান্দেরি বিধ্বস্ত করি এবং আল্লার দয়ায় কয়েক ঘণ্টার যুদ্ধেই অধিকার করে নিই। রাণা সঙ্গের বিশ্বস্ত এবং ক্ষমতাবান অনুচর মেদিনী রায় এখানকার শাসক ছিল। এখানেই আমরা বিধর্ম্মীদের হত্যালীলায় মেতে উঠি। সে সম্বন্ধে পরে বলা হবে। যে স্থান বিধর্ম্মীদের সঙ্গে শত্রুতার ক্ষেত্র ছিল সেই জায়গায় ইসলাম ধর্ম্মের ইমারত গড়ে ওঠে।

বিশাল হিন্দুস্থানের বিভিন্ন জায়গায় অনেক রহিস ব্যক্তি ও রাজা আছে। তাদের কেউ কেউ মুসলমান শাসনের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে, আবার কেউ কেউ কেন্দ্রস্থল থেকে অনেক দূরে থাকায় অথবা তাদের দেশ সুরক্ষিত হওয়ায় মুসলমান আধিপত্য স্বীকার করতে চায় না।

হিন্দুস্থানে ঋতু একটি-দুইটি-তিনটি। চতুর্থ বলতে আর কিছু নাই। এই দেশটা অদ্ভুত। আমাদের দেশের সঙ্গে তুলনা করলে এ দেশ সম্পূর্ণ পৃথক বলে মনে হয়। এর পর্ব্বত, নদী, বন, মরুভূমি, এর নগর, শস্যক্ষেত্র, এর পশুপক্ষী, গাছপালা, এর অধিবাসী আর তাদের ভাষা, এর বৃষ্টি এবং আবহাওয়া সবই ভিন্ন রকমের। কাবুলের অধীনস্থ কয়েকটি গ্রীষ্মপ্রধান প্রদেশের সঙ্গে এখানকার কিছু কিছু বিষয়ে মিল আছে, কিন্তু অন্য সব দেশের সঙ্গে কিছুমাত্র মিল নাই। একবার সিন্ধু নদ পার হয়ে এপারে এলেই দেখা যাবে এখানকার মাটি, জল, গাছপাহাড়, জনসমাজ, যাযাবর—সকলেরই মরজি আর রীতিনীতি হিন্দুস্থানের পন্থানুযায়ীই চলেছে।

সিন্ধু নদ পুব দিক থেকে পার হয়ে আসার পর উত্তরের পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্যে কতকগুলি দেশ দেখা যায়। এই দেশগুলি কাশ্মীরেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল, এখন যদিও এদের মধ্যে অনেকগুলি—যেমন পাক্‌লি ও সামাং কাশ্মীরের আধিপত্য মানে না। কাশ্মীরের বাহিরে অগণিত লোক, যাযাবর জাতি, পরগণা ও কৃষিক্ষেত্র আছে এই পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে। বঙ্গদেশেই হোক কিংবা মহাসাগরের তটভূমি পর্য্যন্তই হোক, কোথায়ও অগণিত জনসংখ্যার বিরাম নাই। এই মানবগোষ্ঠির চলমান মিছিলের মধ্যে কেউই আমাদের অনুসন্ধান ও পুঙ্খানুপুঙ্খ জিজ্ঞাসার উত্তরে বলতে পারে নাই কারা এইসব পর্ব্বতে বাস করে। এইটুকু মাত্র বলে যে এই পাহাড়িয়াদের 'কাছ' বলা হয়। এটা আমি লক্ষ্য করেছি যে হিন্দুস্থানীরা 'শ' কে 'হ' বলে উচ্চারণ করে। পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে কাশ্মীর একটি সম্ভ্রান্ত জনপদ, অন্য কোনও নাম ওর শোনেনি। হয়তো হিন্দুস্থানীরা সব জায়গাকেই 'কাছমির' বলে থাকে এবং সেই জন্য এই সব পার্ব্বত্য জাতিদের 'কাছ' বলে অভিহিত করে। পাহাড়ী লোকেরা কস্তুরি, জাফরাণ, সীসা ও তামার ব্যবসা করে।

হিন্দুরা এই পর্ব্বত শ্রেণীকে 'সোওয়ালাখ' (শিবালক) পর্ব্বত বলে। হিন্দুর ভাষায় সোওয়ালাখ অর্থ এক লাখ ও তার এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ ১,২৫,০০০। সুতরাং এখানকার এক লাখ পঁচিশ হাজার পাহাড় নিয়ে 'সোওয়ালাখ' পর্ব্বত নাম হয়েছে এটা অনুমান করা চলে। এইসব পর্ব্বতে তুষার গলে না—অবিকৃত থাকে। দূর—যেমন লাহোর, সিরহিন্দ ও সম্বল থেকে পর্ব্বতের শুভ্র তুষার দৃষ্টি গোচর হয়। কাবুলের দিকের পর্ব্বত শ্রেণীকে হিন্দুকুশ বলা হয় যা কাবুল থেকে পূর্ব্বাভিমুখী হয়ে দক্ষিণ দিকে একটু বেঁকে হিন্দুস্থানে এসেছে। হিন্দুস্থানের দেশ-গুলি এর দক্ষিণ দিকে। তিব্বত এই পর্ব্বত শ্রেণীর উত্তরে। তিব্বতের অজ্ঞাত জাতিকেও 'কাছ' বলা হয়।

এই সব পর্ব্বত হিন্দুস্থানের অনেক নদীর উৎসস্থল। পর্ব্বত থেকে নেমে এসে হিন্দুস্থানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। সিরহিন্দের উত্তর দিক থেকে ছয়টি নদীর উৎপত্তি হয়েছে—যথা সিন্ধু বহত (ঝিলাম), চেনাব, রাবি, বিয়া এবং শতদ্রু। এই কয়টি নদীই মুলতানে এসে মিলেছে, তারপর সিন্ধু এই একক নামে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে নানা দেশের মধ্য দিয়ে এসে সমুদ্রে মিশেছে।

এই ছয়টি নদী ছাড়াও আরও নদী আছে—যেমন যমুনা, গঙ্গা, রহবা (রাপ্তি), গোমতি, গগর, সিরু, গণ্ডক এবং আরও অনেক। এই সমস্ত নদীই গঙ্গায় এসে মিশেছে, তারপর এই নামে পুব দিয়ে এগিয়ে বঙ্গদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে এসে মিশেছে। এই সব নদীরই উৎপত্তিস্থল 'সোওয়ালাখ' (শিবালক)।

হিন্দুস্থান পর্ব্বত থেকেও অনেক নদীর উৎপত্তি—যেমন চম্বল, বনাস, বিতাই এবং সোন। এই সব পর্ব্বতে বরফ নাই। এই নদী গুলো, গঙ্গায় এসে মিশেছে।

হিন্দুস্থানের আর একটি পর্ব্বত শ্রেণী আরাবল্লী পর্ব্বত উত্তর দক্ষিণে বরাবর গিয়েছে। দিল্লী প্রদেশে একটি ছোট পাহাড়ের আকারে এর আরম্ভ। এই পাহাড়ের উপর ফিরোজ সার প্রাসাদ ছিল—নাম 'জাহান নমো'। এখান থেকে দিল্লীর কাছ পর্য্যন্ত দেখা যায়

এখানে ওখানে ছড়ানো বিক্ষিপ্ত নীচু নীচু পাহাড়। মিওয়াৎ ছাড়িয়ে এই পাহাড় শ্রেণী বিয়ানা প্রদেশে প্রবেশ করেছে। শিক্রি, বারি, ঢুলপুর পাহাড়গুলি এই শ্রেণীরই অন্তর্গত। গোয়ালিয়রের পাহাড়গুলি যদিও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্তি মনে করা হয় না তবে বাস্তবিক পক্ষে ওগুলি ঐ শ্রেণীরই প্রশাখা। এই রকম প্রশাখা হচ্ছে রন্তনবার, চিতোর, চান্দেরি এবং মাণ্ডুর পাহাড়গুলি। কোনও কোনও জায়গায় মূল শাখা থেকে এগুলি সাত আট কোশ তফাৎ। পাহাড়গুলি খুবই নীচু, কর্কশ, পাথুরে এবং জঙ্গলে ভর্তি। এখানে কখনই তুষারপাত হয় না। হিন্দুস্থানের অনেক নদীর জনক এই পাহাড়গুলি।

সেচের ব্যবস্থা—হিন্দুস্থানের বেশীর ভাগ অংশই সমতল ভূমি। যদিও এখানে অনেক জনপদ এবং কৃষিক্ষেত্র আছে—কিন্তু সেচের জন্য কোনও খাল নাই। নদী এবং কোনও কোনও জায়গায় বদ্ধ জলাশয়ের ওপর সেচ ব্যবস্থা নির্ভরশীল। এমন অনেক সহর আছে যেখানে খাল কেটে জল আনা যায় অনায়াসে, কিন্তু সে রকম কোনও ব্যবস্থা করা হয় না। এইভাবে সেচ ব্যবস্থা না করার হয়তো অনেক অর্থ আছে—একটা বোধ হয় এই যে শস্য চাষ অথবা উদ্যান রচনার জন্য এখানে সেচের জলের প্রয়োজন হয় না। হেমন্তকালীন শস্য বৃষ্টির জলেই জন্মে। আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার এই যে বসন্তকালীন শস্য বৃষ্টির জল না পেলেও হয়ে থাকে। ছোট খাট চারা গাছে বালতিতে কিংবা চরকি করে জল দেওয়া হয়। দুই তিন বছর চারা গাছগুলিতে প্রতিদিনই জল দিতে হয়—তারপর অবশ্য আর প্রয়োজন হয় না। কতকগুলি সবজি গাছে অনবরত জল সিঞ্চন দরকার।

লাহোর, দিবল এবং কাছাকাছি জায়গায় কৃষকরা চাকার সাহায্যে ক্ষেতে জল দেয়। তারা দড়ি দিয়ে দুইটি বৃত্ত তৈয়ারী করে কূপের গভীরতার মাপে। এই বৃত্ত দুইটির মাঝখানে কাষ্ঠখণ্ড ফেলে তার ওপর জল তোলার কলসী শক্ত করে বাঁধে। কূয়োর চাকার ওপর দড়িগুলো সমেত কলসী বাঁধা কাঠ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এই চাকার অক্ষের একদিকে দ্বিতীয় একটি চাকা বসানো থাকে। আর তারই কাছাকাছি আর একটি চাকা থাকে যার অক্ষ উপরের দিকে খাড়া। এই শেষের চাকাটি বলদের গলার দড়ির সংলগ্ন। বলদ দড়িতে টান দিলে শেষোক্ত চাকাটির দাঁতগুলো দ্বিতীয় চাকার সঙ্গে আটকে যায়। বলদের টানে জলভর্তি কলসীগুলি ওপরে ওঠার পর কূয়োর পাশে রাখা লম্বা সরু পাত্রে সেই জল গড়িয়ে পড়ে। এইখান থেকে জল নিয়ে ক্ষেতে দেওয়া হয়।

আগ্রা, চন্দওয়ার, বিয়ানি এবং তার পাশাপাশি জায়গায় কৃষকরা বালতি করে ক্ষেতে জল দেয়। এটা একটা কষ্টসাধ্য জঘন্য ব্যবস্থা। কূয়োর ধারে সাঁড়াশির মত করে খাড়াখাড়িভাবে কাঠ পোঁতা হয়। মধ্যে থাকে একটা চরকি। একটা লম্বা দড়ির একপাশে একটা বড় বালতি বাঁধা হয় এবং দড়িটি চাকার মধ্যে বসানো হয়। দড়ির অন্য পাশ বলদের গলার সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়। একজন লোক বলদ চালায় ও আর একজন লোক জল ভরতি বালতি উঠলে জল ঢেলে নেয়। যতবারই বলদ দড়ির সাহায্যে কূপ থেকে বালতি তোলে সেই লম্বা দড়ি বলদের চলার পথে মাটিতে ছেঁচড়াতে থাকে এবং সেটা আবার কূয়োর মধ্যে প্রবেশ করার আগে মূত্র ও গোময়ে মাখামাখি হয়ে দূষিত হয়। কোনও কোনও শস্যক্ষেত্রে অনেক সময় মানুষই বারংবার ঘড়া ঘড়া জল বয়ে নিয়ে ক্ষেতে জল দেয়।

হিন্দুস্থানের অন্যান্য বিবরণ

হিন্দুস্থানের নগর বা পল্লী—কোনওটাতেই মন আকর্ষণ করার মত কিছু নাই। সহর ও ফাঁকা জমি সব একরকমের—একঘেয়ে। উদ্যানের চারপাশে কোনও বেড়া নাই। অধিকাংশই সজীবতাহীন সমতল ভূমি। বর্ষাকালে বৃষ্টির ধারায় কোনও কোনও নদী ও স্রোতস্বতীর তীর প্লাবিত হয়ে নানাস্থানে গভীর নালার সৃষ্টি করে। এমন হয় যে সেগুলি পার হয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া কষ্টকর হয়। সমতলভূমির অনেকাংশ কাঁটা ও জঙ্গলে ভরা। এই সব সুন্দর সুরক্ষিত জায়গায় পরগণার যে সব লোক থাকে তারা বিদ্রোহী হয়ে রাজকর দেয় না।

এখানে ওখানে নদী ও বদ্ধ জলাশয় ছাড়া কোনও খাল নালা নাই। ব্যাপারটা এই যে সহর অথবা পল্লীর লোক কূপের জল—না হয় পুষ্করিণীতে বর্ষায় যে জল জমা হয় সেই জলের ওপর নির্ভর করে।

হিন্দুস্থানে ছোট বড় গ্রাম অথবা সহর একমুহূর্তে জনশূন্য—আবার এক মুহূর্তে ভরতি হয়ে যেতে পারে। একটা বড় সহরের বাসিন্দারা যারা সেখানে অনেকদিন থেকে বাস করছে তারা যদি সহর ছেড়ে পালিয়ে যায়, তারা এমনভাবে সেটা করে যে তাদের কোনও চিহ্ন বা নিশানা সহসা খুঁজে পাওয়া যায় না। অপরপক্ষে তাদের যদি এমন কোনও জায়গার উপর দৃষ্টি পড়ে যে সেখানে তারা বাস করতে ইচ্ছুক, তাহলে তাদের জলের খাল খনন ও বাঁধ তৈরীর কোনও প্রয়োজন হয় না—কারণ তাদের খাদ্যশস্য বৃষ্টির জলেই জন্মায়।

হিন্দুস্থানের জনসংখ্যা এমন বিপুল যে যেখানেই তারা বাসস্থান ঠিক করে সেখানেই পালে পালে লোক এসে হাজির হয়। তারা হয়তো একটা কূপ কিংবা একটা পুষ্করিণী খনন করে নেয়। তাদের বাড়ী তৈরীরও কোনও হাঙ্গামা নাই। ছাউনির ঘাস, বাঁশ ও কাঠ অনেক পাওয়া যায়। তাই দিয়ে অসংখ্য কুটির তৈরী হয়ে যায় এবং সোজাসুজি একটা গাঁ বা সহর গড়ে ওঠে।

হিন্দুস্থানের পশু

হিন্দুস্থানের যে জন্তুকে হাতী বলা হয় তার অনেক বিশেষত্ব। কাল্পি প্রদেশের পশ্চিম প্রান্তে এদের বাস। বুনোহাতীর সংখ্যাই উত্তরোত্তর বাড়তির দিকে দেখা যায়—যদি আরও পূর্বদিকে কেউ যায়। এখান থেকে হাতী ধরা হয়। কারা এবং মানিকপুরের ত্রিশ চল্লিশটি গ্রামের লোক হাতী ধরার কাজ করে। তারা কত হাতী ধরলো তার হিসাব সরকারকে দিতে হয়। হাতি বিশালকায় জন্তু এবং খুবই বুদ্ধিমান। যদি কেউ তাকে কিছু বলে তাহলে সে সব বুঝতে পারে। যদি তাকে

কিছু করবার জন্য হুকুম করা হয় তাহলে সে সেই হুকুম পালন করে। এর আকার অনুসারে মূল্য। হাতীকে মাপজোক করে মূল্য স্থির করার রেওয়াজ আছে। হাতী যত বড় তার মূল্যও তদনুপাতে বেশী। জনশ্রুতি এই যে কোনও কোনও দ্বীপে হাতীর উচ্চতা দশ 'কারি' (এক রকমের মাপ), কিন্তু এই দেশে চার পাঁচ 'কারির' বেশী উঁচু হাতী চোখে পড়ে না। হাতী শুঁড় দিয়ে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করে। যদি এর শুঁড় না থাকে তাহলে বাঁচতে পারে না। ওপরের চোয়াল থেকে বড় বড় দাঁত শুঁড়ের দুই পাশ দিয়ে বেরিয়েছে। দেওয়াল কিংবা গাছের সঙ্গে সেই দাঁত লাগিয়ে হাতী ওগুলো উপড়ে ফেলতে পারে। এই দাঁত দিয়েই হাতী যুদ্ধ কিংবা যে সব কঠিন কাজ তাকে করতে হয় তা করে থাকে। এর দাঁতকে গজদন্ত বলে। হিন্দুস্থানীরা হাতীর দাঁতকে খুব মূল্যবান মনে করে। হাতীর চুল নাই। যে সৈন্যদলের সঙ্গে হাতী থাকে তাদের খুবই ভরসা। হাতীর অনেক প্রয়োজনীয় গুণ আছে—যেমন, বিশাল নদী সাঁতার দিয়ে পার হওয়া, বড় ভারি মাল বহন করা। যে কামান বা ভারী অস্ত্রশস্ত্রবাহী শকটগুলি টানতে চার পাঁচশ লোকের দরকার সেগুলো তিন চারটে হাতীই টেনে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু এর পেট খুব বড়। একটা হাতী এমন পরিমাণ শস্য খায় যা পনেরোটা উট খেতে পারে।

হিন্দুস্থানের আর এক জন্তু—গণ্ডার, এরও শরীর প্রকাণ্ড। আমাদের দেশে একটি মতবাদ প্রচলিত আছে যে একটা গণ্ডার তার শিং দিয়ে একটা হাতীকে উপরে তুলতে পারে। কিন্তু এরূপ ধারণার সম্ভবত কোনও মূল্য নাই। গণ্ডারের নাকের উপর একটা শিং উঁচু দিকে এক বিঘত খাড়া—দুই বিঘত উঁচু গণ্ডারের শিং আমার চোখে পড়েনি। যাই হোক, একটা বড় শিং দিয়ে আমি একটা পানপাত্র, একটা পাশা খেলার ঘুঁটি ফেলার বাক্স তৈরী করেও তিন চার আঙুল পরিমাণ শিং-এর অংশ অবশিষ্ট ছিল। গণ্ডারের চামড়া খুব পুরু। কোনও জোরালো ধনুকের জ্যা বগল পর্যন্ত সজোরে টেনে তীর নিক্ষেপ করা যায় এবং যদি এই তীর চামড়ায় বিদ্ধও হয় তাহলে তিন চার আঙুলের মত একটা ক্ষত হতে পারে। এখানকার অনেকে অবশ্য বলে থাকে যে, গণ্ডারের দেহের কোনও স্থানে এমন চামড়া আছে যেখানে তীর বিদ্ধ হলে আরও গভীরে যেতে পারে। গণ্ডারের কাঁধের, হাড়ের দুই পাশে এবং দুই উরুতে এমন চামড়ার ভাঁজ আছে যা দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন কাপড়ের টুকরো ঝলঝল করে নড়ছে। গণ্ডারের সাদৃশ্য অন্য সব পশুর চেয়ে ঘোড়ার সঙ্গে বেশী। ঘোড়ার যেমন পেট বড় গণ্ডারেরও তাই। ঘোড়ার সামনের পা যেমন অস্থিময় গণ্ডারেরও সেইরকম। হাতীর চেয়ে গণ্ডার বেশী হিংস্র। হাতীকে পোষ মানিয়ে বাধ্য করা যায়, গণ্ডারকে সে রকম করা কঠিন পারসাওয়ার ও হাসনাঘরের জঙ্গলে এবং সিন্ধু নদ ও মেহেরার মধ্যের জঙ্গলে প্রচুর সংখ্যায় গণ্ডার দেখা যায়। হিন্দুস্থানে সার নদীর আশে পাশে অনেক গণ্ডার দেখা যায়। হিন্দুস্থানে অভিযানের সময় পারসাওয়ার ও হাসনাঘরের জঙ্গলে আমি প্রায়ই গণ্ডার শিকার করেছি। এরা শিং দিয়ে খুব জোরে গুতোতে পারে, যার ফলে আমার শিকারের সময় অনেক লোক এবং ঘোড়া আহত হয়েছে। একবার শিকারের সময় মকসুদ নামে একজন যুবকের ঘোড়াকে শিং দিয়ে এমন গুতোয় যে একটা বর্শার ফলার সমান ভীষণ ক্ষতের সৃষ্টি হয়। সেই ঘটনার পর থেকে যুবকের নাম হয়ে যায় গণ্ডার মকসুদ।

আর একটি জন্তু হচ্ছে বুনো মোষ। সাধারণ গৃহপালিত মোষের চেয়ে এর দেহ বড়। এর শিং সাধারণ মোষের মতই। এরা অত্যন্ত সাংঘাতিক ও হিংস্র।

আর এক রকমের জন্তু নীল-গো (গাই)। উচ্চতায় এরা প্রায় ঘোড়ার সমান। ঘোড়ার চেয়ে এরা কিছু শীর্ণ। পুরুষ-গো নীলাভ, সেই জন্যই এদের নীল গো বলা হয়। এর দুটো ছোট ছোট শিং এবং ঘাড়ের ওপর চুল আছে। ঘাড়ের নীচের দিকে খুব ঘন চুলের গোছা, যা দেখতে অনেকটা পাহাড়ি গাইয়ের চুলের গোছার মত। এর লেজ ষাঁড়ের মত। স্ত্রী-গোদের গায়ের রং গওযা জেন্ হরিণের মত। স্ত্রী-গোদের শিং নাই, ঘাড়ের নীচে চুলও নাই। পুরুষ-গোয়ের চেয়ে স্ত্রী-গোয়ের শরীর কিছু মোটা সোটা।

আর এক জন্তুর নাম-কোটা-পইচে অর্থাৎ খাটোপা শৃঙ্গের হরিণ। এরা আয়তনে অনেকটা শ্বেত হরিণের সমান। এদের সামনের পা দুটো ও উরু ছোট এবং সেইজন্যই এর নাম হয়েছে লাফাটো পদে শুওর হরিণ। শৃঙ্গ হরিণের মত অতটা না হলেও এদেরও শিং শাখা-প্রশাখা যুক্ত। পুরুষ হরিণের মত এরাও শিং এর খোলস ছাড়ে। এই জাতীয় হরিণ ভাল দৌড়াতে পারে না। সেই জন্য জঙ্গল ছেড়ে আসতে চায় না।

আর এক জাতের হরিণ আছে যার পিঠ কালো। পেটের রং সাদা, শিং খুব লম্বা ও বাঁকা। হিন্দুস্থানীরা এই জাতের হরিণকে বলে—'কাল হরে।' কাল হরে কথাটার অর্থ সম্ভবতঃ কালা হরিণ অর্থাৎ কাল রঙের হরিণ। কালা হরিণ থেকেই কালহরে হওয়া সম্ভব। পোষা কালহরে হরিণের সাহায্যে এখানকার লোক বুনো হরিণ ধরে। কালহরের শিং এ তারা গোলাকার জাল বেঁধে দেয় এবং একটা ফুটবলের চেয়েও বড় পাথর পেছনের একটা পায়ের সঙ্গে বেঁধে রাখে। তার অর্থ এই যে তার সাহায্যে অন্য হরিণ ধরা পড়লে সে যেন দূরে চলে না যেতে পারে। কোনও বুনো হরিণ দেখা গেলে পোষা হরিণটাকে তার সম্মুখে আনা হয়। সে শিং উঁচিয়ে ঢু মারার জন্য প্রস্তুত হয়ে বুনোটার দিকে এগিয়ে যায়। এই জাতের হরিণ লড়াই করতে ভাল বাসে এবং শিং দিয়ে প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য ধাওয়া করে। দুই পক্ষ যখন পরস্পরকে শিং দিয়ে ধাক্কা দিতে আরম্ভ করে তখন একবার পিছিয়ে একবার এগিয়ে যাওয়ার সময় যে জালটা পোষা হরিণের শিং এ বাঁধা থাকে সেই জালে বুনো হরিণের শিং জড়িয়ে যায়। যদিও বুনো হরিণটা পালিয়ে যাওয়ার জন্য খুব চেষ্টা করতে থাকে—কিন্তু পোষা হরিণটা মোটেই পালানোর কোনও উদ্যম দেখায় না। তা ছাড়া, পায়ে পাথর বাঁধা থাকার জন্য তার গতিও বাধা প্রাপ্ত হয় এবং সেই কারণে

বুনোটার পালানও কঠিন হয়ে পড়ে। এই ভাবে অনেক বুনো হরিণ ধরা পড়ে এবং পরে তাদের পোষ মানানো হয়। এই পদ্ধতি ছাড়াও জাল দিয়ে ঘিরেও অনেক হরিণ ধরা হয়ে থাকে। এখানকার লোকেরা হরিণ ধরে পোষ মানিয়ে নিজেদের ঘরে বসে হরিণের লড়াই দেখে। হরিণের লড়াই দেখতে খুব ভাল লাগে।

হিন্দুস্থানের পর্ব্বতের ধারে ধারে আর এক রকমের ছোট জাতের হরিণ দেখা যায়। এদের শরীরের আয়তন এক বছর বয়সের ভেড়ার সমান।

আর এক জাতের হরিণের নাম গৌ-গিনি। এরা এদেশের ছোট জাতের গরুর মত, আর আমাদের দেশের বড় জাতের ভেড়ার মত। এর মাংস খুব নরম ও সুস্বাদু।

আর একজাতের জন্তু আছে যাদের হিন্দুস্থানীরা বাঁদর বলে। বাঁদরের অনেক রকম জাত। এক রকমের বাঁদর আমাদের দেশে নিয়ে যেতে দেখা যায়। বাজিকরটা এদের দিয়ে নানা রকমের খেলা দেখায়। নুন্দরার পার্ব্বত্য প্রদেশে, খাইবারের নিকটবর্ত্তী সফিদ কো'য় পাহাড়ের প্রান্তদেশে এবং সেখান থেকে হিন্দুস্থান পর্য্যন্ত বাঁদর দেখতে পাওয়া যায়। পাহাড়ের খুব ওপরে এরা থাকে না। এর গায়ের চুল পীতাভ, মুখ সাদা এবং লেজ খুব লম্বা হয়। আর এক রকমের জাত হিন্দুস্থানে দেখা যায়,যেগুলো বাজুর, সাওয়াদ বা তার কাছাকাছি জায়গায় চোখে পড়ে না। আমাদের দেশে যে বাঁদর নিয়ে যাওয়া হয় তার চেয়ে এগুলো অনেক বড়। এর লেজ খুব লম্বা. চুল সাদাটে এবং মুখ গভীর কালো। হিন্দুস্থানের পাহাড়ে জঙ্গলে এদের দেখা যায়। আর এক জাত আছে যাদের চুল, মুখ ও শরীর সবই কালো।

নেউল আর একরকমের জন্তু। -কিশ'-এর চেয়ে এগুলো আকারে ছোট। এরা গাছে চড়ে। অনেকে এর নাম বলে মুস-ই-খুরমা (তালগাছের ইঁদুর)। এগুলো দেখা নাকি সৌভাগ্যের চিহ্ন।

ইঁদুর জাতের আর এক রকম প্রাণী আছে যাদের গাচ্‌রি (কাঠ বেড়াল) বলা হয়। এরা প্রায় সব সময়েই গাছে থাকে। অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এরা গাছ থেকে ওঠা-নামা করে।

হিন্দুস্থানের পাখী

ময়ূর—এর রং অতি চমৎকার। এর গঠন-সৌন্দর্য্য এর রংয়ের মত নয়। ময়ূর আকারে হয়তো সারস পাখীর মত হতে পারে, কিন্তু অতটা লম্বা নয়। ময়ূর ও ময়ূরীর মাথায় দুই তিন ইঞ্চি লম্বা বিশ ত্রিশটা পালক আছে। ময়ূরীদের রংয়ের বাহার নাই। ময়ূরের মাথায় রামধনুর রং। এর গ্রীবায় সুন্দর নীল ও বেগুনি রংয়ের সমাবেশ। পিঠের ওপরের চক্রগুলি ছোট ছোট, কিন্তু যত নীচে নেমে এসেছে সেগুলো ক্রমশঃ তত বড় হয়ে উঠেছে। তবে রংয়ের বাহার পুচ্ছের শেষ পর্য্যন্ত একই রকমের। কোনও কোনও ময়ূর পুচ্ছ মেললে তার মাপ মানুষ দুই হাত বিস্তার করলে যতটা হয় ততটা। এর চিত্রিত পুচ্ছের নীচে অন্য পাখীর মত একটা সাধারণ ছোট লেজ আছে। এই ছোট লেজের পালকের প্রান্তগুলি লাল রংয়ের। বাজুর, সাওয়াদ এবং তারও নীচের দেশগুলিতে ময়ূর দেখা যায়, কিন্তু কুনার কিংবা লামঘানাত অথবা তার উপরের দেশগুলিতে ময়ূর দেখা যায় না। ফেজেণ্ট পাখীর চেয়েও ময়ূরের ওড়ার শক্তি কম। দুই একবারের বেশী ছোট রকমের ওড়াও এদের সাধ্যে কুলায় না। ওড়বার ক্ষমতা সীমিত থাকায় এরা পাহাড়ে ও জঙ্গলেই ঘুরে বেড়ায়। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার—যে জঙ্গলে শেয়াল বেশী সেখানে ময়ূরও ঘুরে বেড়ায় বেশী। শেয়ালরা এই সব ময়ূরের কতই না ক্ষতি করতে পারে যেখানে তাদের লেজ মানুষের দুই হাতের মত লম্বা। ইমাম আবু হানিফার মতে ময়ূরের মাংস অনুমোদিত খাদ্য। এর মাংস অনেকটা তিতিরের মাংসের মত এবং খেতেও বিস্বাদ নয়। তবে উটের মাংস খেতে যেমন রুচি হয় না, এর মাংসও অনেকটা সেইরকম অরুচিকর।

তোতা—এই পাখী বাজুর এবং তার নীচের দেশগুলিতেও চোখে পড়ে। গ্রীষ্মকালে যখন তুঁত ফল পাকে, তখন এদের সিংনাহার এবং লামঘানাতেও দেখা যায়। অন্য সময় এরা এখানে থাকে না। এই পাখী নানারকমের জাতের আছে—আর এক জাতের আছে যেগুলো এই দেশ থেকে আমাদের দেশে নিয়ে যাওয়া হয়। এই পাখীকে কথা বলতে শেখানো হয়। এদের বলে জঙ্গলি তোতা। বাজুর, সাওয়াদ এবং এর নিকটবর্ত্তী দেশে প্রচুর তোতা পাখী দেখা যায়—এমন কি এদের পাঁচ ছয় হাজারের উড়ন্ত ঝাঁকও চোখে পড়ে। জঙ্গলি তোতা এবং আর এক-রকমের তোতার কথা যা সর্ব্ব প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে তাদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে শুধু দেহের আয়তনের দিক দিয়ে। পালকের রং কিন্তু হুবহু এক। আর এক রকমের জাত আছে যেগুলো জঙ্গলি তোতার চেয়েও ছোট। এদের মাথা লাল রংয়ের এবং ডানার ওপরের অংশও লাল। এর পুচ্ছের প্রান্তভাগ দশ আঙ্গুল চওড়া এবং উজ্জ্বল রং বিশিষ্ট। এই জাতের কোনও কোনও পাখীর মাথা রামধনু রংয়ের। এগুলো কথা বলতে শেখে না। এ দেশের লোকেরা এদের বলে—কাশ্মীরী তোতা।

আর এক জাতের তোতা আছে তারাও জঙ্গলি তোতার চেয়ে আকৃতিতে ছোট। এর চঞ্চু কালো এবং গ্রীবায় কালো রংয়ের বন্ধনী। এর ডানা লাল রংয়ের। এরা খুব সুন্দর কথা বলতে শেখে। আমাদের ধারণা ছিল যে তোতা কিংবা সারককে (ময়না) যে কথা বলতে শেখানো হয় শুধু সেইগুলিই বলতে পারে অন্য কোনও বুলি তাদের মগজে আসে না।। একবার আমার একজন বিশ্বাসী ভৃত্য—তার নাম আবুল কাশেম জালোয়ার—আমাকে এক অদ্ভুত কথা শোনায়। কথা বলতে পারে এমন একটা তোতার খাঁচা নিশ্চয়ই কাপড়ে ঘেরা ছিল। সে হঠাৎ বলে ওঠে—কাপড়ের ঢাকনি খুলে দাও, আমার দম আটকে আসছে। যে এই কথা আমাকে জানায় তাকে বিশ্বাস করা না করা অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। তবে নিজের কানে না শুনলে একথা বিশ্বাস করা সত্যই কঠিন।

আর এক জাতের তোতা আছে যাদের রং গাঢ় লাল। অন্য

রংয়েরও এ জাতের পাখী আছে কিন্তু তাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না—সেই জন্য তাদের বর্ণনা দিতে পারলাম না। যাহোক,এ জাতের পাখী রংয়ে ও আকৃতিতে খুবই সুন্দর। এদের কথা বলতে শেখানো হয়। কিন্তু দোষ হচ্ছে যে এদের গলার স্বর অত্যন্ত তীক্ষ্ণ—ঠিক তামার থালায় ভাঙ্গা চিনা মাটির বাসন টেনে নিয়ে গেলে যেমন শব্দ হয় অনেকটা সেইরকম।

সারক (ময়না)—এই পাখী লামঘানাত ও তার নীচের দেশ হিন্দুস্থানের সর্ব্বত্র প্রচুর দেখা যায়। এ পাখীও নানা ধরণের হয়। লামঘানাতে এই জাতের যে পাখী অসংখ্য দেখা যায় তার মাথা কালো এবং ডানাগুলো দাগবিশিষ্ট। তুর্কির 'চুখুর চিক্' পাখীর চেয়ে এরা আকৃতিতে বড় এবং মোটা। এদের কথা বলতে শেখানো হয়।

গিণ্ডাওয়ালি নামে আর এক জাতের ময়না বঙ্গদেশ থেকে আনা হয়। এরা আকারে সারকদের চেয়ে বড়। এর চঞ্চু ও পা পীতবর্ণের এবং প্রত্যেক কানে পীতবর্ণের চামড়ার ঝুলি আছে যা দেখতে কুশ্রী। এ পাখী খুব পরিষ্কার কথা বলতে পারে।

আর এক রকমে সারক আছে যার শরীর অপেক্ষাকৃত শীর্ণ এবং তার চোখের চার ধারে লালরংয়ের রেখা আছে। এ গুলো কথা বলতে পারে না। লোকে এগুলোকে বন্-বুনো সারক।

যখন আমি ৯৩৪ হিজরি সনে গঙ্গার ওপর সেতু তৈরী করে গঙ্গা পার হয়ে শত্রুদের বিতাড়িত করি সেই সময় লক্ষ্ণৌ ও অযোধ্যার কাছাকাছি জায়গায় একরকম সারক প্রথম দেখি—যার বুক সাদা, মাথা নানা রংয়ের এবং পিঠ কালো। এই জাতের পাখী কথা বলতে পারে না।

লুজ্ আরবিতে এই পাখীকে 'বু-কালামুন' (গিরগিট জাতীয়) বলে। কারণ- এর মাথা থেকে লেজ পর্য্যন্ত, পায়রার মাথার মত পাঁচ ছয় রকমের রং আছে যা অনবরত বদলায়। কাবুল দেশের নিগার-অ' পর্ব্বতে এবং তার নীচু দিকের পাহাড়ে এই পাখী দেখা যায়, ওপরের দিকে দেখা যায় না। এই পাখী সম্বন্ধে অদ্ভুত কথা শোনা যায়। যখন এই পাখী শীতের প্রারম্ভে পাহাড়ের প্রান্তে এসে নামতে থাকে, তখন যদি দ্রাক্ষাক্ষেত্রের ওপর এসে পড়ে তাহলে আর উড়ে যেতে পারেনা এবং এই সময় তারা ধরা পড়ে। আল্লা জানেন-এই কথার মধ্যে সত্য কতখানি। এই পাখীর মাংস খুবই সুস্বাদু।

দুররাজ (তিতির)—এ পাখী শুধু হিন্দুস্থানেরই বিশেষত্ব নয়। দক্ষিণ আফগানিস্থানেও এ পাখী দেখা যায়। দুররাজের আকার কিক্‌নিকের মত। পুং তিতিরের পিঠের রং স্ত্রী-ফেজেন্টের পিঠের রং এর মত। এর গ্রীবা ও বুক কালো—তাতে সাদা রংয়ের ফুটকি। লাল রংয়ের রেখা দুই চোখের দুই পাশ দিয়ে নেমে এসেছে। এর বুলি হচ্ছে শির দারম্-সাকরাক। (অর্থ-আমার দুধও আছে চিনিও আছে)। শির কথাটা এরা আস্তে এবং দিরাম্ সাকরাক শব্দ জোরে পরিষ্কার ভাবে উচ্চারণ করে। আস্তারাবাদের তিতির 'বাল-মিনি তুতিলার (অর্থ আমাকে ধরে ফেলেছে শীগ্‌গির এস) বলে চেঁচায়। আরব দেশের তিতিরের বুলি নাকি—বিল সকর তদম অন নিরামে (অর্থ চিনি থাকলেই স্ফূর্ত্তির অভাব হয় না)।

স্ত্রী-তিতিরের গায়ের রং ফেজেন্ট শাবকের মত। এই পাখী নিগর-অ'র নীচের দেশেও দেখা যায়।

আর এক রকমের জাত আছে যাকে 'কানিয়াল' বলা হয়। আকৃতিতে এরা উপরি উল্লিখিত জাতেরই মত। এর কণ্ঠস্বর কিকলিক পাখীর মত কিন্তু স্বর তার চেয়ে তীক্ষ্ণ। এ জাতের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে রংয়ের কোনও তফাৎ নাই। এই পাখী পার শাওয়ার হাস্‌নাঘর এবং তার নীচের দেশগুলোতে দেখা যায়, কিন্তু ওপরের দিকে নয়।

ফুল পাইকার (সম্ভবতঃ এ পাখী ধুসর রংয়ের তিতির)—এর আকৃতি কবজ্ ই-দুরি পাখীর মত। এর চেহারার সঙ্গে গোবর-গাদার মোরগের সাদৃশ্য আছে। কপাল থেকে বুক পর্য্যন্ত এর রং উজ্জ্বল লাল। এ পাখী হিন্দুস্থানের পার্ব্বত্য দেশেই দেখা যায়।

মুরগে-এ-সারা (বনমুরগী) এই পাখীর সঙ্গে গৃহপালিত মুরগীর তফাৎ এই যে এরা ফেজেন্ট পাখীর মত উড়তে পারে। গৃহপালিত মোরগের মত এরা নানা বর্ণের নয়। বাজুরের পার্ব্বত্য দেশে এবং তার নীচের দিকের দেশে এ পাখী দেখা যায় কিন্তু উপরের দিকে দেখা যায় না।

চেলুসি-এই পাখীও ফুল পাইকারের মত। কিন্তু ফুল পাইকারের রং বেশী সুন্দর। বাজুরের পার্ব্বত্য দেশে এ পাখী দেখা যায়।

শাম-এরা আকারে সাধারণ মোরগের মত ও গায়ের রং নানা রকমের। এ পাখীও বাজুরের পার্ব্বত্য প্রদেশে দেখা যায়।

বুদিনে—(তিতির জাতীয় পাখী)—এই পাখী হিন্দুস্থানের বৈশিষ্ট্য নয় তবে চারপাঁচ রকমের এই জাতীয় পাখী হিন্দুস্থানে দেখতে পাওয়া যায়। এই পাখীর এক রকমের জাত আমাদের দেশেও যেতে দেখা যায়। তবে সেগুলো সাধারণ বুদিনের চেয়ে দেখতে বড়। আর এক রকমের জাত আছে সেগুলো আমাদের দেশে যে ধরণের পাখী যায় তার চেয়ে ছোট। এর ডানা ও লেজের রং রক্তাভ। চির পাখীর মত বুদিনের উড়ন ভঙ্গী।

এছাড়া এই জাতীয় আর এক রকমের পাখী আছে। সেগুলোও আমাদের দেশে যে পাখী যায় তার চেয়ে আকারে ছোট। এর বুকের এবং গলার রং সাধারণতঃ কালো। আর এক জাত আছে যে গুলো কদাচিৎ কাবুলে যায়। এ গুলো আকারে 'কারচে' পাখীর চেয়ে বড়। কাবুলিরা এ পাখীকে বুরাতু বলে।

গরচাৎ (পারসী)—এ পাখীর আকার তুর্কি দেশের তুখতার পাখীর মত। একে হিন্দুস্থানের তুখ্‌তার পাখীও বলা যায়। এর মাংস সুস্বাদু। কোনও কোনও পাখীর পা এবং কোনও কোনও পাখীর ডানা খেতে ভাল। মোটের উপর এই পাখীর দেহের সমস্ত অংশের মাংসই উপাদেয়।

চারজ্ (পারসী)—তুখদিরি পাখীর চেয়ে এ পাখী আকারে ছোট।

পুং-জাতীয় পাখী তুষদিরি, পাখীর মত তবে এর বুক কালো। স্ত্রী-জাতীয় পাখীর রং একই রকমের।

বাঘ্‌রি-কারা (পাহাড়ি পায়রা)—পশ্চিমের বাঘ্‌রি কারা পাখীর চেয়ে হিন্দুস্থানের এই পাখী আকারে ছোট ও রোগা এবং স্বরও তীক্ষ্ণ।

দিং-জলে এবং নদীর তীরে যে সব পাখী দেখা যায় তার মধ্যে দিং একটি। এরা ওজনে খুব ভারী, এর প্রতিটি ডানা মানুষের মত লম্বা। এর মাথায় কিংবা গলায় কোনও লোম নাই। একটা থলের মত জিনিষ এর গলা থেকে ঝোলে। এর পিঠ কালো, বুক সাদা। এই জাতের পাখী মাঝে মাঝে কাবুলেও যায়। এক বছর এই পাখী একটা ধরে আমার কাছে নিয়ে আসে পাখীটা খুব পোষ মেনেছিল। এর দিকে খাদ্য ছুঁড়ে দিলে ঠোঁটের ফাঁকে সেটা লুফে নিত, কোনও সময়েই বিফল হতো না। একবার ছয়টা নলি লাগানো জুতা এবং আর একবার একটা সাদা মোরগ পাখী ও লোম সহ আস্ত গিলে ফেলে।

সারস-হিন্দুস্থানবাসী তুর্কিরা একে বলে তিওয়া তার্ণা (উঁট সারস) দিং এর চেয়ে এ পাখী আকৃতিতে ছোট হতে পারে কিন্তু গলা লম্বা। এর মাথা লাল। লোকে এই পাখী বাড়ীতে রাখে। এরা খুব পোষ মানে।

মানেক (মাণিক জোড়) এ পাখীর উচ্চতা সারস পাখীর মত কিন্তু আকারে ক্ষীণ। মাণিক জোড় এক রকমের সারস পাখী বলেই বোধ হয়। সারস পাখীর চেয়ে এর ঠোঁট বড় এবং রং কালো। এর মাথা মসৃণ ও চকচকে, গলা সাদা এবং ডানা নানা রংয়ের এর পালকের প্রান্ত ও গোড়ার অংশ সাদা এবং মধ্য ভাগ কালো।

ল্যাগ্‌ল্যাগ্‌—এ পাখীও একজাতীয় সারস। এর গলা সাদা দেহের অন্যান্য অংশ কালো। এ পাখী আমাদের দেশেও দেখা যায় কিন্তু তারা আকারে ছোট। কোনও কোনও হিন্দুস্থানী এ পাখীকে ইয়েক রং (এক রং?) বলে।

আর এক জাতের সারস আছে যার গায়ের রং ও আকার ঠিক আমাদের দেশের এই জাতীয় পাখীর মত। তবে এর ঠোঁট একটু বেশী কালো এবং ওজনেও ল্যাগ্‌ল্যাগের চেয়ে কম ভারি।

আর এক রকমের পাখী আছে যা দেখতে ধূসর রংয়ের বক ও ল্যাগল্যাগের মত। কিন্তু এর চঞ্চু বকের চেয়ে লম্বা এবং শরীর ল্যাগল্যাগের চেয়ে ছোট।

বড়বুজাক—এই পাখীর দেহের ওজন তুর্কির 'সার' পাখীর মত। এর ডানার নীচের দিকে সাদা। এর গলার স্বর খুব জোরালো।

সাদা বুজার—এর মাথা আর ঠোঁট কিন্তু কালো। আমাদের দেশে এই রকমের যে পাখী দেখা যায় তার চেয়ে অনেক বড়, কিন্তু হিন্দুস্থানের বুজাকের চেয়ে দেখতে ছোট।

ঘরম্ পাই পাখি (হাঁস জাতীয় যার চঞ্চুতে ফুটকি দাগ আছে)—এগুলো বুনো হাঁসের চেয়ে বড়। এই জাতের স্ত্রী ও পুরুষ একই রংয়ের। এই পাখী হাসনাসরে সব ঋতুতেই দেখা যায়। কখনও কখনও ওরা লামঘানাতে যায়। এর মাংস খুব সুস্বাদু।

সা-মুরগ্‌—এই পাখী রাজহাঁসের চেয়ে ছোট। এর চঞ্চুর ওপরটা স্ফীত ও পিঠের রং কালো। এর মাংস খেতে খুবই উপাদেয়।

আলা কুর-সে (ম্যাগ্‌ পাই) আমাদের দেশের এই জাতের পাখীর চেয়ে এরা আকারে ছোট। এর গলায় সাদা রংয়ের দাগ আছে।

আর এক জাতের পাখী আছে যাদের সাথে দাঁড়কাকের কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। লামঘানাতে এই পাখীকেও বুনো মুরগী বলা হয়। এর মাথা আর বুক কালো, ডানা ও লেজ লাল ও চোখের রং গভীর রক্তবর্ণ। দুর্বল বলে এই পাখী ভাল উড়তে পারে না। সেইজন্য এরা বন জঙ্গল ছেড়ে বাইরে আসেনা। এই জন্যই এদের বুনো মুরগী বলা হয়।

বাদুড়—অনেকে এদের চাম-গিধর অর্থাৎ উড়ন্ত শেয়াল বলে। এরা আকারে প্যাঁচার সমান এবং মাথাটা পশু শাবকের মত। গাছের শাখা ধরে মাথা নীচু করে এরা ঝুলতে ঝুলতে বিশ্রাম করে। এ দৃশ্য দেখতে অদ্ভুত।

আ—আকে (আরবী)—হিন্দুস্থানে এই জাতীয় পাখীকে মিতা বলে। সাধারণ আ-আকে পাখীর চেয়ে এগুলো ছোট। আরব দেশের আ-আকে পাখীর রং সাদা ও কালোয় মেশানো, আর হিন্দুস্থানের এই জাতের পাখীর রং ধূসর ও কালো।

কারচে—এ পাখী দোয়েলের মত দেখতে কিন্তু আকারে এর চেয়ে বড়। এর রং আগাগোড়া কালো।

আর এক রকমের ছোট পাখী আছে যা আকারে তুর্কিদেশের সাঙুলকে পাখীর মত। এর রং সুন্দর লাল, তবে ডানায় কালো দাগ আছে।

কুইল (কোয়েল-কোকিল)—এ পাখী আকারে প্রায় কাকের মত কিন্তু অনেক রোগা। এর কণ্ঠে গান আছে যেজন্য এই পাখীকে হিন্দুস্থানের বুলবুল বলা হয়। হিন্দুস্থানে এই পাখীর সম্মান আমাদের দেশের বুলবুলের মত। এরা ঘন বৃক্ষপূর্ণ উদ্যানে থাকে।

আরব দেশের শিকার রাক পাখীর মত এ দেশেও এক রকমের পাখী আছে। এই পাখী গাছ আঁকড়িয়ে থাকে। এদের বলা হয় কাট-ঠোক্‌রা। [ক্রমশঃ

ভারতীয় শিল্প-সাধনা

—অমল বিশ্বাস

নিজেকে প্রকাশ করা মানুষের স্বভাব-ধর্ম্ম, তাই সে চেষ্টার অন্ত নেই শিল্প-সৃষ্টিরও বিরাম নেই।

সৃষ্টির এই প্রেরণা মানুষকে এক অপার্থিব আনন্দের অপার উৎসের দিকে নিয়ে যায়। রূপদৃষ্টি আর রূপসৃষ্টির তন্ময়তা ও সাধনা, রসবোধ ও রসবিচার শুধু দিন যাপনের শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানির মাঝে পরম প্রশান্তি আনে। তাছাড়া, শিল্প, সাহিত্য ও সঙ্গীত সংস্কৃতির এই ত্রিধারায় ভাবের আদান প্রদান সহজসাধ্য হয়। সুতরাং শিল্প শুধু অবসর-বিনোদন, খেয়ালখুসী চরিতার্থ ও চক্ষু পরিতৃপ্তির সামগ্রী নয়; এর প্রথম এবং প্রধান আবেদন সৌন্দর্য্যবোধ যা' আনন্দের সঞ্চার করে আর নির্ম্মল আনন্দেই শিল্পের চরম সার্থকতা। অবশ্য এই আনন্দের মূলগত সূত্র আধ্যাত্মিক চেতনা যা সৌন্দর্য্য বোধ বা রস জ্ঞানকে ভাবকল্পনার সাহায্যে ফুটিয়ে তোলে। এই ভাব-সাধনাই ভারতীয় শিল্পের প্রাণধর্ম্ম। মুখ্যতঃ, ভাবপ্রধান হলেও ভারতীয় শিল্পে শারীর স্থানের (anatomy) ঔপপত্তিক (Theory) বিষয়টি অস্বীকৃত নয়। ভাবকে যথাযথ প্রকাশ করার জন্য যেটুকু ঔপপত্তিক জ্ঞানের প্রয়োজন শিল্পীকে অবশ্যই সেটুকু আয়ত্ব করতে হবে। ভাব ও প্রকাশ কুশলতার সুসামঞ্জস্যেই সার্থক শিল্প সৃষ্টি সম্ভব হয়। কেবলমাত্র রেখা ও বর্ণবিন্যাসের বিশ্লেষণে সৃষ্ট শিল্পের আসল্ পরিচয় তথা শিল্পীমনের ভাবটুকুর সন্ধান মেলে না। ভাবের বহিঃপ্রকাশের জন্য রূপ-রেখা। রূপ-রেখার অন্তরালে অরূপের আসর। রূপকে আশ্রয় করেই অরূপের অন্তঃপুরে প্রবেশের ছাড়পত্র মেলে। তবে শিল্প বস্তুর বিচার ও রসগ্রহণের ক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য সৃষ্টির বেলায় অরূপ থেকে রূপে আসা—অর্থাৎ অরূপের ধ্যানলব্ধ প্রজ্ঞা রূপ পরিগ্রহ করে ফুটে ওঠে। ভারতীয় শিল্পীদের ধ্যানলব্ধ অনুভূতি সার্থক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তির মাধ্যমে। মানবীয় রূপে ফুটে উঠলেও সেই সকল মূর্ত্তিতে অতিমানবীয় আবেদন পরিলক্ষিত হয়। অতীন্দ্রিয় অনুভূতির প্রাণময় প্রকাশ প্রায় সময় শারীর স্থানের রীতিনীতি লঙ্ঘন করে ভাব-ব্যঞ্জনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। বৌদ্ধযুগের শিল্প কলায় বুদ্ধের প্রতিমূর্তিতে এর আভাষ পাওয়া যায়। শিল্পে ভাবের প্রকাশ প্রসঙ্গে তিলক-মঞ্জরীতে বলা হয়েছে:

আবিষ্কৃতানেক ভাববিভ্রমানি লিখিতানীব কেনাপি নিপুণ চিত্রকরেণ দিগ্‌ভিত্তিষু দিবনিশং দদর্শ তস্যাঃ প্রতিবিম্বানি।

এক কথায় রসোত্তীর্ণ চিত্রকেই ভাবচিত্র বলা যেতে পারে। রত্নাকরের হরবিজয় গ্রন্থে স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে, চিত্রকর্ম্মবিদ হলেই তাকে শিল্পী বলা চলে না। রেখার বিজ্ঞান আয়ত্ত করা ছাড়া শিল্পীকে আরও অনেক বিষয় পারদর্শিতা দেখাতে হবে।

যুগে যুগে নানা জাতি ও সম্প্রদায় ভারতবর্ষে পদার্পণ করেছে। তাদের শিক্ষা-দীক্ষা, রীতি-নীতির প্রভাব এদেশের শিল্প-সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য ক্ষুন্ন করতে পারেনি। নানা শৈলীর সমাবেশ ঘটলেও ভারত-শিল্পের প্রাণ ধর্ম্ম অক্ষুন্ন রয়ে গেছে। সাম্রাজ্যবাদী গ্রীক, শক, হুণ, ইরাণ প্রভৃতি দেশ থেকে আগত শিল্পীদের শিল্প ভাস্কর্য্যের প্রভাব ভারতীয় শিল্পের ছাঁচে মিশে ভারতীয় ভাব রূপে ফুটে উঠেছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আরম্ভ করে মোগল যুগ এই সুদীর্ঘ অধ্যায় পর্যন্ত এদেশের শিল্পক্ষেত্রে নানা বিজাতীয় ভাব ধারা এসেছে। পরবর্ত্তী কালে ইংরাজী শিক্ষার প্রভাব ভারতের সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এক আলোড়ন সৃষ্টি করে, প্রচলিত হয় পাশ্চাত্য প্রথায় শিল্প সৃষ্টি। সংস্কৃতি বিপর্যয়ের এই অধ্যায়ে (১৯০৫ সাল) শুরু হয় স্বদেশী আন্দোলন। শিল্প ক্ষেত্রে সে আন্দোলনের পুরোভাগে এগিয়ে গেলেন শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ। তাঁর দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার প্রধান সহায় হলেন মনীষী হাভেল আর কুমারস্বামী। শেষে ঐ প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হয়—প্রচলিত হয় সারা ভারতব্যাপী দেশীয় প্রথায় শিল্প সৃষ্টি।

প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল গত হওয়ার পর দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধোত্তর কালে এলো য়ুরোপীয় আধুনিক আর্টের ঝোড়ো হাওয়া। 'ইজম'-এর অজুহাতে নতুনত্বের করণ-প্রকরণ প্রায় ক্ষেত্রেই পাশ্চাত্যের পরোক্ষ অনুকরণ ছাড়া আর কিছু নয়। দেশের ধর্ম্ম-দর্শন, শিক্ষা-দীক্ষা, রীতি-নীতি ইত্যাদি কতকগুলি বিষয় শিল্প সাহিত্য সঙ্গীতাদি সৃজনের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। ভারতের শিল্প সাধনার গতি-প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এদেশের শিল্প-সাধনা অন্তঃমুখী; তাই ধ্যানলব্ধ অনুভূতির প্রকাশে প্রাণময়। পক্ষান্তরে, পাশ্চাত্যের ভোগবাদী মন বহিঃমুখী; তাই সেখানে সৌন্দর্য্যসৃষ্টির প্রেরণা মুখ্যতঃ, বাইরের বস্তু-নির্ভর। আধ্যাত্মিক চেতনা সম্ভূত ভাবময় প্রকাশ ভারত-শিল্পের প্রাণ; এই ধর্ম্মই এদেশের শিল্প সাধনাকে বিশ্বের দরবারে গৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে—এই সত্যটিকে আমাদের মেনে নিতে হবে।

মানুষ সৌন্দর্য্যের পূজারী—অপরাপর জীবের সঙ্গে গুণগত বৈষম্যের একটি বিশেষ দিক; তাই তার জীবন যাত্রার ছন্দের মধ্যে সৌন্দর্য্য বোধের প্রকাশ প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হচ্ছে। এই প্রেরণা ও ধ্যান ধারণায় মানুষ কুৎসিৎ বিভৎস ও নগ্ন প্রবৃত্তিগুলির বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার প্রয়াস পাচ্ছে।

প্রবন্ধটি রচনায় নিম্নলিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধের সাহায্য নেওয়া হয়েছে:-
১। রূপকল্প—শ্রীপ্রবোধ বোস,
২। ভারতীয় শিল্পের প্রাণধর্ম্ম—শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র—প্রবাসী, (জ্যৈষ্ঠ—১৩৬৩),
৩। ভারত শিল্পে আধুনিকতার বিপর্যয়—শ্রীঅসিতকুমার হালদার—'সুন্দরম' (আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৩৬৪)
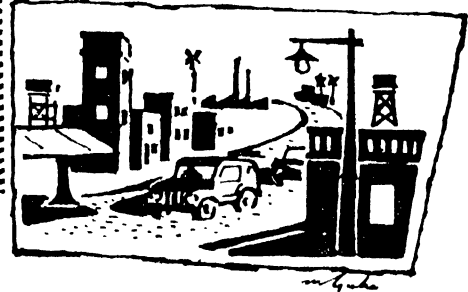
জয় বাবা কাল ভৈরব! দেখিস বাবা টাক-মাথায় ঘি ঢালছি, বেমালুম ব্যোম ভোলানাথ হয়ে থাকিস নি। নড়ে চড়ে বস বাবা।

সতীশ ভটচায-এর জীর্ণ গলা ঘন ঘন করে ধ্বনিত হয়। শীর্ণ প্যাকাটির মত চেহারা, সরু বকের মত লিকলিকে ঠ্যাং দুটো, উর্দ্ধঅঙ্গে হিল হিল করে নড়ছে দুটো কাঠি কাঠি হাত যেন এখুনিই খসে পড়বে টুপকরে বৃন্তচ্যুত সোঁদাল ফলের কাঠির মত। কাঁধের উপর টিকটিক একটা লম্বা কাঠির ডগে বসানো মুণ্ডুটা।

কপাল-এর প্রশস্ত জায়গাটায় রক্ত-চন্দন আর সিন্দুরের লেপা মাড়ুলি। চোখ দুটো দ্রব্যগুণে কোটরের মধ্যেই জ্বলছে ঠক্ ঠক্ করে। ওই শীর্ণ দেহ থেকে একটা বিজাতীয় কঠিন পুরুষ্টু কণ্ঠস্বর বের হয়। ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে ফাঁকা জায়গাটায়।

—জয় বাবা ভৈরব নাথ। কাল ভৈরব নিস্পুত্র করে দে বাবা। এস্পার ওস্পার করে দে।

সতীশ ভটচায লিকলিকে হাত দুটো দিয়ে কালো পাথরের বড় নুড়িটাকে তেল সিন্দুর মাখিয়ে চলেছে আর আপনমনে চেঁচাচ্ছে থেকে থেকে।

পুরোণো ক'টা তেঁতুলগাছ জড়াজড়ি করে রয়েছে ঠাঁই-টায়, কেমন ঘন ছায়া-ঢাকা জায়গাটা গ্রামের প্রান্তসীমা, তার পরই সুরু হয়েছে ধান জমি, কাছিমের পিঠের মত নেমে গেছে অনেকদূর কাটা বাঁধ-এর কোল অবধি—তারপর আবার ধীরে ধীরে উঠেছে, অনেক দূরে গ্রামসীমা দেখা যায় কালো একটু গাছ-গাছালির ঘন সন্নিবিষ্ট রেখা।

দু একটা চিল মধ্যাহ্নের অলস রোদে উড়ে ডানামেলে আকাশে ভাসছে। সতীশ ভটচায গ্রামের অন্যান্য বাড়ীতে শিবপুজো এটাসেটা সেরে শেষকালে বিক্রীর পর ফাউ দেওয়ার মত আসে এখানে ওই অবহেলিত গ্রামদেবতা ন্যাড়া ভৈরবনাথের কাছে।

একপ্রান্তে পড়ে আছে অবহেলিত দেবতা। কোন মন্দির নেই, নেই কোন আচ্ছাদন। বৃষ্টি আর রোদ এর অত্যাচার থেকে যৎটুকু পারে বাঁচায় দুই তেঁতুল গাছ; তাই অঝোর বৃষ্টি আর কড়া রোদ বাধা মানে না।

লাল পিপড়ের সার চলে ওই মাটির হাতি ঘোড়ায় ভাঙ্গাচুরো স্তূপের উপর দিয়ে, বুকে হেঁটে বেড়ায় দুধে খরিস, পাশেই উই ঢিবির তলে ঢোকে তাড়া পেলে। দূর থেকে কেউ কেউ গড় করে।

সাক্ষাৎ কাল ভৈরব। বাবা!

এ হেন জাগ্রত কালভৈরবকে কেন্দ্র করেই গ্রামে মামলা সুরু হয়েছে। অনাদায়ী বাকী করের মামলা।

ধরণী মুখুয্যে গ্রামের সঙ্গতিপন্ন জোতদার, পৈত্রিক আমল থেকেই সুদি কারবার। দুই ভাই বাইরে চাকরি

বাকরী করছে পয়সা-কড়ি দেয়-থোয় ভাল। তাছাড়া তিনখানা হালের চাষ।

রমরম চলতি উঠানে মরাই সার ধরেনা; কড়কড়ে মরাই যেন ধানের চাপে ফেটে পড়বে এখুনি। ধুলোমুঠো ধরে কড়িমুঠো হয়।

ভৈরবনাথের একচকে পঁচিশবিঘে জমির দখলদার। মাথার উপর সিয়াতের খাস পুকুর। বর্ষার সময় উপরের বিস্তীর্ণ ডাঙ্গা গড়িয়ে নামে লাল মাটি ধোয়া জলস্রোত, বন থেকে ভেসে আসে—তীরবেগে বয়ে সেই জলস্রোত এসে থমকে জমা হয় পরাণ বাটির বিশাল বুকে—মজা দিঘী। তবু মরা হাতি সওয়া লাখ।

যে জল এখনও ওর মরাখাতে জমে তাতেই ও পঁচিশ বিঘে জমির চাষ আবাদ হয়েও সঞ্চিত থাকে, ধরণের জন্য। কাঠ-ফাটা রোদ্দুর, বৃষ্টি নেই। না থাকুক! হোক না অন্যান্য কাঁকুড়ে মাঠের বুক ফেটে চৌচির হয়ে, ধরণী মুখুয্যের তিরিশ বিঘে জমির জল কোন দিনই মরবে না। ঝণো ঝরে ওই জমাজল নীচের ধান ক্ষেতকে রসসিক্ত করে রাখে। লকলকে হয়ে ওঠে ধান গাছ। মঞ্জুরী ভারাবনত হয়ে মাথা নুয়ে পড়ে ওদের।

আকালপৌষ জমি আকাল সুকাল এর বাছাবাছি নেই, চিরকালই ধান হবে—হচ্ছেও। এ ছাড়া ও গ্রামের মাঠে ভৈরবনাথের অনেক জমি, কিন্তু আদায় উসুল নেই।

তাই অনাদৃত হয়েই পড়ে আছে তেঁতুল তলায়।

হাঁক পাড়ে সতীশ ভটচায—নড়ে চড়ে ওঠ বাবা।

দুপুরের খর রোদ সামনের ডোবার জলে এসে পড়েছে। ফুটেছে জলকচুর দলের ওদিকে শালুক শাপলা ফুল। বর্ষার জল পেয়ে মাথা তুলেছে পুরুষ্টু জলগাছগুলো। সামনের মাঠে সবুজ ঘাস ছেয়ে উঠেছে চোরকাঁটার আগাছা, ডাঁটার মাথায় তিলরং এর ঝিরিঝিরি দানাগুলো মাথা নাড়ছে।

নিশ্চুপ গ্রামসীমা। ওদিকে বাগানের বাইরের মাঠে ঠায় রোদে দাঁড়িয়ে আছে গরুর পাল। মাঠে নামবার উপায় এখন নেই। ধানগাছ চারি দিকে। তার মধ্যে দু একটা গরু ছিটকে ছাটকে মাঠের দিকে যাবার চেষ্টা করতেই রাখাল বাগালের তাড়ায় সরে আসে, আবার একটু দাঁড়িয়ে ফাঁক খোঁজে ওদের অন্যমনস্কতার।

সতীশ ভটচায উঠে দাঁড়াল। যেন হতাশই হয়েছে। ক্রমশ থিতিয়ে আসছে ওর উৎসাহের স্রোত।

দেবতা!

ধ্যাৎ—সব বাজে কথা। নাহলে এত ডাকেও সাড়া মেলেনা। এতকাল ডেকে আসছে, কোন সাড়া নেই।

চোখেও দেখতে পায় না ওই নুড়ি পাথরটা। নইলে দেখতে পেত কেমন করে ভূষণ মুখুটি ধরণী নরেশ ঢোল ফুলে উঠছে বাবার দেবোত্তর থেকে বছর বছর।

আর সতীশ ভটচায কেবল নুড়ির মাথায় তেল সিন্দুর পালিশই করে ম'ল। সেই সঙ্গে গ্রামের অনান্য যজমান-বাড়ীর পূজোয় উদবৃত্ত দুচারটা কলা আতপ, বেলপাতা ও ছিটিয়ে এসেছে।

ঠুকরে খেয়েছে সেগুলো কাক পাখ পকুড়িতে।

উঠে দাঁড়াল সতীশ।

বেলা হয়ে গেছে। তার অবশ্য খাওয়া দাওয়ার তাড়া নেই। সকাল বেলাতেই স্নান—কিছু মুড়ি গুড় সেঁটেই বের হয় সে।

প্রথম প্রথম শুদ্ধাচারেই থাকতো বয়সকালে। ক্রমশ দেখেছে ওতে কিছু আসে যায় না, তাই জলটল খেয়েই ডিউটিতে বের হয়। পরিক্রমা সারতে হয় অনেকখানি।

ও মাথার মাঠের মধ্যে দত্তদের শিবথান—দাসদের সমাধি-মন্দিরের পাশে রক্ষাকালী তলা থেকে সুরু করে এখানে সেখানে ছড়ানো ঢিবি—উইমৃত্তিকার ঢিবির মত শিব-লিঙ্গের মাথায় দুদানা আতপ আর বেলপাতা ছুড়তে ছুড়তেই বেলা হয়ে যায়। শেষ করে এই বাবা ভৈরব-নাথের তলায়।

ঘাটে পথে মেয়েরা বাসন ধুয়ে ফিরে চলেছে। বেলা অনেক হয়েছে। সতীশ ভটচায চলেছে, সাবা হয়ে চলতে ঠিক পারেনা। স্থান অস্থানে শিববন্দনা করতে গিয়ে পায়ের তলায় কতকগুলো কাঁটা ফুটে রয়েছে বহু কাল থেকে—সেগুলোর কতকগুলো বের হয়েছে, কিছু কিছু কাঁটা পায়ের পাতায় মৌরসীস্বত্ব গেড়ে মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়ে রয়ে গেছে।

চলতি কথায় বলে কুল আঁঠি। সেই কুল আঁঠির জন্যেই সোজা করে দুটো পা ফেলতে পারেনা। ওগুলোয় কাঁকর লাগলে মাথা অবধি ঝনঝন করে ওঠে।

তাই দুটো পা থেকেও—গোটাগুটি না থাকা। বদলোকে আড়াল আবডালে সতীশের নামকরণ করে দেড়ঠেঙ্গে ভটচায।

আনমনে চলেছে সতীশ। দুপুরের রোদ বেশ চড়চড়ে হয়ে উঠেছে। গায়ে পিঠে লাগছে। কথাটা মন্দ লাগে না ভাবতে।

এদ্দিনে একটা বিহিত হবে তাহলে।

বেধেছে। বাবা ভৈরবনাথ আশমোড়া পাশমোড়া দিয়ে চিতিয়ে উঠেছে তাহলে, লাগ বাবা, লেগেবা একটা কিছু।

মামলা বাধলে তদারক তদ্বির তো আছেই, তার উপর যদি রায় বের হয়ে যায়—সাগা ধান পুরোপুরি আদায়ের—বেশ বাৎসরিক মোটা আয়; গাজন টাজন উৎসব ইত্যাদির পরিচালক হবে দেওয়ান সতীশ ভটচায ও মূল দেওয়ান সেই-ই।

সুতরাং সামনের অন্ধকার দিনগুলোর মধ্যে কেমন যেন একটু আলোর সন্ধান পায়। মনের বোঝা হালকা হয়ে আসে।

ধোঁয়া যখন একবার দেখা দিয়েছে, কাঠকুটো যোগাড় করে ইন্ধন ও যোগাবে সে, ফুঁ ও দিতে থাকবে।

ধোঁয়াতে ধোঁয়াতে আগুন একদিন দপ্ করে জ্বলে উঠবেই।

এত দিনের এত পরিশ্রম, একে ওকে তাড়ানো। বাবা ভৈরবনাথের পাথুরে টাকে সিন্দুর ঘসা তার ব্যর্থ হবে না।

চলেছে সে গ্রামের পথ দিয়ে, খিদে লেগেছে ইতিমধ্যে।

মাইল কয়েক হাঁটা হয়ে গেছে এমাঠ থেকে সুরু করে ওই নাদাঁড় অবধি। একটু পা চালিয়ে চলেছে।

হঠাৎ কার গগন-বিদারী চীৎকার, আর এক গুচ্ছের একেবারে ঝংঝরে ঝিল্লীর শব্দে থমকে দাঁড়ালো। সামনের গলিপথটা দিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে একটা লোক, হাতে রংচটা টিনের হাতবাক্স। পরণে একটা ছোট আধময়লা কাপড় আর হাফসার্ট, সিন্দুর-এর লাল দাগে এখান ওখান রঞ্জিত, লোকটার বগলে একটা সাদা কাপড় মোড়া ছাতা, পিছনে এক একবার চাইছে, আর দৌড়চ্ছে কাছা কোঁচা খোলা অবস্থায়।

পিছন থেকে গালিগালাজের আওয়াজটাও এগিয়ে আসছে।

দুপুর তাঁ তাঁ রোদে লোকটা ঘেমে নেয়ে উঠেছে।

ঘামছে সতীশ ভটচাযও, মাথার উপর পাটকরা ভিজে গামছাখানা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

লোকটার পিছনে পিছনে ছুটে আসছে আশু মুখুয্যে।

বিশাল দশাসই চেহারা; তেমনি টকটকে ফর্সা রং। একমাথা ঝাঁকড়া চুল। চোখ দুটো রোদের তাপে আর বিশেষ কোন দ্রব্যগুণে লাল টকটকে হয়ে আছে।

গর্জাচ্ছে আশু—আজ সিন্দুর বেচা বার করবো ওর। আমার সঙ্গে মশ্‌করা! জানেনা?

—এ্যাই এশো! থাম!

সতীশ ভটচায কোন রকমে দেড় ঠাং নিয়েই ওকে সামলাবার চেষ্টা করে। লোকটা হাতযোড় করে কাঁচু মাচু করছে।

—আমি জানিনা বাবাঠাকুর।

আশু গর্জন করে—জানিনা। কে তোকে এ বাড়ী দেখিয়ে দিয়েছে বল।

লোকটার দোষ নেই। ওপাড়ার মোড়ে কতকগুলো ছেলে দাঁড়িয়েছিল, ফিরিওলাকে দেখে তারাই বলে দেয় ওবাড়ীর খবর; ওখানে গেলেই শাঁখা সিন্দুর নেবে। বাড়ীর মেয়েরা কালই নাকি তাদের বলেছিল, কোন শাঁখা সিন্দুরওয়ালাকে দেখলে তারা যেন পাঠিয়ে দেয়।

লোকটা তখনও ভয়ে কাঁপছে। হাতের চ্যালা কাঠখানা কেড়ে নিয়েছে সতীশ ভটচায ইতিমধ্যে।

আশু তখনও গজরাতে ছাড়ে না।

—কোন বাঁদর বলেছে দেখাতে পারবি?

—আর কি তাদের দেখা পাবো ঠাবতা?

লোকটা কাচুমাচু করে। আশু কি ভাবছে।

গাঁয়ের চ্যাংড়াগুলো পর্য্যন্ত যেন পিছু লেগেছে তার; তিন কুলে দুভাই তারা, তাদের কারোও বিয়ে হয়নি।

কেই বা দেবে বিয়ে, ঘর শূন্যই থাকে।

মাঝে মাঝে দুচারমাস দেশ বিদেশে কাজ করে আসে, না হয় গ্রামেই থাকে। গ্রাম সম্পর্কে দাদাও বলে অনেকে।

বৌদিদের মধ্যেও সে পরিচিত ঠেঙ্গো বড়-ঠাকুর হিসেবে।

কথাটা শুনে সামলে নেয় আশু, কিন্তু কি বলবে তাদের—নারী অবলা জাত এই ভেবেই চেপে থাকে।

কিন্তু পাড়ার ছেলেপুলেদের আজকের এই শাগা কেনার রসিকতা সে মেনে নিতে পারেনি। ওর তর্জন-গর্জনে ইতিমধ্যেই দুচার জন লোক জুটে যায়।

নীলাম্বরবাবু বৈঠকখানা থেকে বের হয়ে আসেন।

সিন্দুরওয়ালা একটু ভরসা পায় এতক্ষণে।

আশু ভটচায ব্যাপারটা চাপা দেবার জন্যই ওকে যেন ছেড়ে দিল শেষ বারের মত সাবধান বাণী শুনিয়ে।

ফের যদি জীবনে কোনদিন এমুখো হয়েছিস, হাড়-মাস আলাদা করে দোব। চিনে রাখ আশু ভটচাযকে—এ চাকলার লোক চেনে।

লোকটা সেই রোদের মধ্যেই নাজেহাল হয়ে পড়েছিল, ছাড়া পেয়েই ওপাশে ধরণী মুখুয্যের বার বাড়ীর চাতালেই বসে পড়ে।

ভিড় কমে আসছে। মুখ টিপে ওরা হাসছে—আশু ভটচায একবার চেয়ে দেখল মাত্র।

দুজনে চলেছে বাড়ীর দিকে সতীশ আর ঠেঙ্গো আশু। সতীশ ভটচাযএর সব পেশাই চলে। ইদানীং ঘটকালি ও ধরেছে, তাই বলে ওঠে—কথাটা ভেবে দেখ আশু! লোক হাসাহাসি করে।

আশুর মনের জ্বালা তখনও যায় নি।

ওদের মুখ টিপে হাসিটাও দেখেছে। কিছু বলেনি।

এবার সতীশের কথায় একটু দাঁড়াল—রাগটা যেন দম নিচ্ছে।

—কি বলছ বল দিকি! আশু গোঁ গোঁ করছে।

—একটা বিয়ে থা কর। মেয়ের আবার ভাবনা।

আশু একবার থমকে দাঁড়িয়ে চাইল মাত্র সতীশ ভটচাযের দিকে।

চমকে ওঠে সতীশ!

সিন্দুরওয়ালার দুখানা পা-ই আস্ত ছিল, কিন্তু তার!

সোজা করে মাটিতে পা পড়লে মাথা অবধি ঝনঝনিয়ে ওঠে; ভয়ে ভয়েই পায়-চলা পথটা ধরে এগিয়ে গেল সতীশ ওরই মধ্যে একটু গতি বাড়িয়ে।

আশু বাড়ীতে ঢুকলো।

হাট করে বাইরের দরজাটা খোলা রয়েছে।

রাগের মাথায় বন্ধ করতেও ভুলে গিয়েছিল আশু। উনুন থেকে ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে তরকারীটা সাঁতলাতে যাবে, এমন সময় ওই ডাক শুনে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেছিল সে। তার পরই এই কাণ্ড।

রাগটা ঠাণ্ডা হয়েছে খানিকটা।

বাড়ীতে ফিরেই থমকে দাঁড়াল আশু।

হাঁড়ির ভাতে এসে মুখ লাগিয়েছে খোলাপেয়ে কয়েকটা কুকুর আর কাক। হাঁড়িগ হটপট করছে দাওয়ায়; তাকে দেখে ওরা মধ্য পথে ভোজ থামিয়ে যে যেদিকে পারল সরে পড়ল।

আশু ভটচায সেই কাঠ-ফাটা রোদে খাঁ খাঁ বাড়ীটার অসীম শূন্যতার মাঝে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

শেষ পর্যন্ত মামলাই দায়ের হ'ল।

আপোষ আলোচনা-মীমাংসা-কোন কিছুই ওরা বাকী রাখেনি।

নীলাম্বরবাবু দীর্ঘদিন কোর্টের কেরাণিগিরি থেকে সুরু করে শেষ জীবনে জেলা কোর্টের সুপারইনটেনডেণ্ট হয়ে রিটায়ার করেছেন।

কোর্টের নানা গল্প আছে—স্বয়ং তিনিই করেন।

টুল থেকে সুরু করে চেয়ার নায় টানা পাখা অবধি হাত বাড়াতে জানে সেখানে। যা পাই তাই লাভ। এই তাদের মূলমন্ত্র।

উকিল পেয়াদা পেশকার রেকর্ড ক্লার্ক সবই যেন এক ক্লাশেরই ছাত্র, কেবল ধরণের একটু তরি তফাৎ আর কি।

এ হেন উর্বর জায়গায় সারা জীবন কাটিয়েও কিছু করতে পারেন নি। ধর্মভীরু লোক রিটায়ার করে সামান্য মাত্র কিছু প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড আর মাসবরাদ্দ একশো টাকা পেন্সন সম্বলকরে কাঁধের উপর আইবুড়ো মেয়ে নিয়ে গ্রামে ফিরেছেন।

ধরণী মুখুয্যে অবশ্য বেশ জোর গলাতেই জাহির করে—ঢেঁকি যত মাথা নাড়ুক শেষ তক সেই গর্তেতেই পড়ে। চাকরী থাকতে কত তেরি মেরি, এখন সেই গাঁয়ে এসে কচু সেদ্ধ ভাতই মারছেন।

নীলাম্বর কথাটা শুনে ও জবাব দেননি, হেসেছিলেন মাত্র। সদর কোর্টে হেডক্লার্ক থাকা কালীন নীলাম্বরবাবু ধরণীকে ক'বারই সাবধান করে দিয়েছিলেন।

মিথ্যা মামলা দায়ের করোনা ধরণী। লোক হয়রাণি করা ভাল নয়। ধরণী সেই অযাচিত উপদেশে কর্ণ পাত করেনি আজও।

তবু নীলাম্বরবাবুর চেষ্টাতেই সেদিন পঞ্চগ্রামী মানুষদের ডাকা হয়েছিল—সমবেতভাবে একটা আপোষের চেষ্টা করা দরকার। মামলার পথে গেলে টাইটেল সুটের মামলা; স্বত্ব আর খারিজের দেওয়ানী ব্যাপার, অনেক খরচ এবং সময়-সাপেক্ষ। তাই যদি কিছু ছাড় বাদ দিয়েও রফা করা যায়, তারই চেষ্টা করেন তিনি।

প্রীতির এসব ঝামেলা ভালোলাগেনা।

এতকাল সহরেই কাটিয়েছে, গ্রামে এসেছে বাধ্য হয়েই।

বোর্ডিংএ থেকে কোনরকমে বি-এ টা দিতে পারলে দরকার হয় চাকরী বাকরী নিয়েই অন্যত্র কোথাও থাকবে।

যে কটা মাস মাঝে মাঝে গ্রামে আসে বাইরের দিকটা ভালোই ঠেকে। কেমন একটা শান্ত স্তিমিত পরিবেশ।

কিন্তু এঅঞ্চলে মুষ্টিমেয় কতকগুলো মানুষের অন্তরের পাপ আর নীচতা—তার সুন্দর জীবন-স্বপ্ন কও যেমন যেন বিষিয়ে তোলে। হাঁপিয়ে ওঠে সে। একক নিঃসঙ্গ বোধহয়।

বাবাকে সেও নিষেধ করে—এ সবের মধ্যে জড়িয়োনা বাবা।

হাসেন নীলকণ্ঠবাবু, এতকাল কাটালাম মামলা-মোকদ্দমা নিয়েই, ও যে রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে। তাছাড়া যদি একটু চেষ্টা করলে একটা মীমাংসা হয়ে যায়, হোকনা কেন?

—ছাই হবে!

হাসেন নীলকণ্ঠবাবু মেয়ের কথায়।

নিজেই উপযাচক হয়ে জগন্নাথপুরের হাটে গেলেন।

দু'তিন খানা গায়ের কেন্দ্রে ওই হাটতলা।

সরকারী ডাক্তারখানা, থানা আর দুচারটে অফিস গজিয়ে উঠেছে। তাছাড়া আছে জাগ্রত দেবতা রত্নেশ্বর শিব। এ অঞ্চলের জাগ্রত বনেদী দেবতা।

বহুকালের পুরানো মন্দির, চুণকামের অভাবে বাইরে শেওলার কালো আস্তর, সামনেই বিরাট নাটমন্দির, ওপাশে মহেশপুকুর; পুকুর নয় মস্তদিঘী।

দইগাঁয়ের জমিদারবংশের দ্বিতীয় পুরুষ মহেশ রতন সেবার আকালের বছর লোককে অন্নসংস্থান করে দেবার জন্যই দেবস্থানের সামনে মস্ত দিঘী কাটিয়ে দেন।

কালো টলটলে জল, মন্দিরের পুরোনো গুরুগম্ভীর আবেষ্টনীর মধ্যে মাথা ঠেলে উঠেছে কয়েকটা বট অশথ গাছের প্রহরা—সদর থেকে লাল কাকুরে রাস্তা শালবন থেকে বের হয়ে রুক্ষ বন্ধুর প্রান্তর ফুঁড়ে এসে তৃষ্ণার্ত ক্লান্ত হয়ে যেন অবগাহন স্নানে নেমেছে।

শনি মঙ্গলবারে আসে দূর দূরান্তরের গ্রামথেকে বৃদ্ধা বয়স্কা মহিলা বৌ ঝিএর দল, ছেলে কোলে কাঁখে নিয়ে। বাবার পূজো ও দেওয়া হয়—সেই সঙ্গে লাগোয়া হাটে আনাজ পত্র ও কেনাকাটা করা যায়।

এক যাত্রায় দুই কাজ।

তাই শনি মঙ্গল বারে গমগম করে ওঠে হাটতলা।

শুধু অনাজপত্র কেনাকাটাই আর দেবস্থান দর্শনই নয়, এ ছাড়াও জমে আশপাশের গ্রামের অনেকেই। ইউনিয়ন বোর্ডের সব মেম্বারেরাই—স্কুলকমিটির সবাই জোটে, মদনময়রার বটতলার নীচের দোকানটার সামনেই বাঁশফেড়ে খানিকটা মাচা মত করা;

বেঞ্চিকে বেঞ্চ, আর টেবিলকে টেবিলও, তাইতে বসে দাঁড়িয়ে নানা আলোচনা ও গজায়;

ভক্তি চাটুয্যে এ গাঁয়ের মেম্বর, বাকী সবাই আশপাশের গ্রামের লোক—তাই সেই যেন একটু বেশী মুরুব্বী।

—দে রে, চা দে মদনা।

ধীরেন বাবু চায়ে চুমুক দিতে থাকে। সকালের গিনিগলা রোদ গাছগাছালির মাথায় সোনারং বুলিয়েছে; মহেশপুকুরের ওপারেই সবুজ মাঠের সুরু—মাঠটা চলেগেছে উপুড়-করা আকাশের নীচে দূরে ক্রম-উচ্চ শালবন সীমায় মিশেছে দিক চক্রবাল রেখা।

কয়েকটা পাখী অলসপাখায় ভর করে ভেসে চলেছে।

—আসুন মুখুয্যে মশায়! ওরে মদনা ভালকরে গরমজলে গেলাস ধুয়ে চা দে!

ভক্তি চাটুয্যেই আপ্যায়ন করে নীলকণ্ঠ মুখুয্যেকে। নীলকণ্ঠবাবুদের গাঁয়ের জামাই ওই ভক্তি।

হোকনা বয়স্ক লোক, বড় ছেলে মারা যাবার পর ভক্তি আবার বিয়ে থা করতে বাধ্য হয়েছে। মোটামুটি সঙ্গতিপন্ন লোক। ঘরে জমিজারাত ধান পান ও বাঁধা রয়েছে, তাছাড়া পঞ্চগ্রামীণ সমাজের একজন।

নীলকণ্ঠবাবু বলে ওঠেন—চা খেয়ে বের হয়েছি।

—তা হোক। মদনার চা এ চাকলার সেরা!

মদনা খদ্দের থামিয়ে চা-এর গেলাসটা এগিয়ে দেয়।

হেডমাষ্টার বসন্তবাবু চুপচাপ বসে পাইপ টানছিলেন, ওদিকে এ্যাসিষ্টান্ট হেডমাষ্টার হেলুবাবু আর ধীরেনবাবু কি তর্ক জুড়েছিল, তারাও ওর আগমনে একটু থামল।

কথাটা পাড়েন নীলকণ্ঠবাবুই।

—আপনাদের একটিবার যেতে হবে আমাদের ওখানে।

হেলুবাবু পাশের গ্রামেরই লোক, বহুকষ্টে সামান্য অবস্থাথেকে পড়াশোনা করে কোনরকমে দাঁড়িয়েছে; বর্দ্ধমান জেলার কোন এক গ্রামে মাষ্টারী করতো; গ্রামের স্কুলের উপর ভরসা ছিলনা।

টিমটিম করতো স্কুল, বাঁশবাগান আমবাগানের মাঝে লম্বা একটানা খড়ের বাড়ী, মাটির দেওয়াল নোনা লেগে খসে খসে পড়ে।

ছাত্র কখনও কিছু হয়, আবার ধান না হলেই অজন্মার বছরে তারা সব কে কোনদিকে কেটে পড়ে পাঁচ সাত মাসের মাইনে বাকী ফেলে। ওই নামেমাত্র টুং টাং করে টিকে ছিল মাইনর স্কুল হয়েই।

কিছু দিনথেকে স্কুলের রূপ যেন বদলাচ্ছে, হেলুবাবু ও বাইরে ওই মাইনেতে থাকা আর গ্রামে তার চেয়ে কিছু কমমাইনেতে থাকলেও পড়তাপোষায় দুইশানি করে, এই সব সাতপাঁচ দেখে গ্রামেই এসে ওখানে লেগেছে।

আস্তে আস্তে শিকড় গাড়ছে মাটির অতলে।

বেশ আটপিটে দুরন্ত লোক।

নীলকণ্ঠবাবুর কথাটা লুফে নেয়—কেন বলুনতো!

ভক্তি চাটুয্যে গ্রামের জামাই, সেই সুবাদেও সংবাদটা কানাঘুসো শুনেছে।

—ভৈরবনাথের ব্যাপারে তো।

নীলকণ্ঠবাবু সায় দেন—হ্যাঁ। একটা মীমাংসার চেষ্টা করছি।

বীরেনবাবু এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল, এককালে বেশ বিষয়-আশয়ই ছিল পূর্বপুরুষদের। কবে তারা এ অঞ্চলে এসেছিল ঠিক জানে না বীরেনবাবুও। প্রবল প্রতাপান্বিত রাজপুত ক্ষত্রিয় বংশ।

এ মাটিতেও গেড়ে বসেছিল বোধহয় মল্ল বংশের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই। বিরাট বাড়ী দেউড়ি, সারা গ্রাম-জুড়ে তাদের বাগান আর বাড়ীর সীমানা।

সে সব আজ গল্প কথায় পর্যবসিত হয়েছে। নিজের জীবনেও তার কিছুমাত্র ভগ্নাংশ দেখেছিল বীরেন্দ্রনাথ সিংহ দেও। কেমন তাও ধীরে ধীরে পায়ের নীচে স্রোতের টানে বালি সরার মত সরে গেল।

নিজে ভাসছে স্রোতের আবর্তে, পায়ের তলে মাটি নেই—চারিদিকে কেমন দুর্বার জলস্রোত।

তবু অটুট শক্তি নিয়ে যুঝে চলেছে। কথা কম বলে। এতক্ষণ পর বলে ওঠে—যেতে বলছেন যাবো। কিছু ছাড়গাড় দিয়েও যদি ওটা মিটে যায়, গ্রাম পঞ্চজনের কিছু একটা সুরাহা হবে। কিন্তু—

ভক্তি চাটুয্যে প্রশ্ন করে—কিন্তু কেন?

—খাটোয়ালী সম্পত্তি, তা ছাড়া ধরণী মুখুয্যে আর তারকবাবু আছেন।

হেলুবাবু গ্রাম-গ্রামান্তরে জনপ্রিয় হোতে চায়। একটু সদপদাপেই বলে ওঠে—তারকবাবুদের অমত কেন হবে?

বীরেনবাবু অন্যমনস্কভাবে জবাব দেয়—হয়তো হবে না। এমনি কথার কথা বলছিলাম।

—কাল বৈকাল চারটেয় মিটিং ডাকছি বাবা ভৈরবনাথের থানেই।

বসন্তবাবু চুপ করে ওদের কথাগুলো শুনছিলেন। শুনছিলেন মাত্র—কানে যায়নি ঠিক, বা এনিয়ে চিন্তা-দুশ্চিন্তাও কিছু করেন নি তিনি।

বড় ঘরের ছেলে, পড়া শোনায় খুব ভালোই ছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে পাশ করার পর ইঞ্জিনিয়ার বাবাই তাকে পাঠান বিলেতে আই-সি-এস পরীক্ষা দিতে।

সে এক গল্প কথা—বসন্তবাবুরও সেই দূর বিদেশের কথা মনে পড়ে আবছা আবছা; পাশ করতে পারেন নি সেই

কঠিন পরীক্ষার বেড়াজাল, কিন্তু তার বিনিময়ে পেয়েছিলেন একটি মহামানবের সান্নিধ্য। রবীন্দ্রনাথই তাকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন অধ্যাপনা করবার জন্ম, সেই সঙ্গে গ্রাম-সংস্কারের কাযেও মন দিয়েছিলেন বসন্তবাবু।

সুরুলও আশ-পাশের গ্রামকে কেন্দ্র করে বিরাট একটি ভবিষ্যৎ-এর সম্ভাবনা গড়ে উঠছে, সেই মহৎ কাযের মধ্যে জড়িয়ে ফেলে ছিলেন নিজেকে গুরুদেবের আদর্শে।

কেমন যেন দিনগুলো কোথায় মিলিয়ে যায়। কতো স্বপ্ন-রঙীণ আশা-সম্ভাবনার দিন। একদিন গ্রামের রূপ ফিরবে। হত দরিদ্র গ্রাম, মুমূর্ষু গ্রাম আবার নোতুন জীবনে বেঁচে উঠবে, বেঁচে উঠবে ওই হাজারো মানুষ নোতুন আশায়।

...কিন্তু গুরুদেব মারা যাবার পর কেমন যেন শান্তিনিকেতন ভাল লাগে নি আর। একটি বিরাট সম্ভাবনা ওই শাল-বীথিকায় বাতাসে মর্মর; লাল ধুলো-ঢাকা পথ—কৃষ্ণচূড়ায় ফুলের রং মিশেছে পথের ধুলোয়।

...কেমন যেন মন টেকেনা আর।

নিজের কাজের ঠাঁই তাই বেছে নিয়েছেন এই গ্রামেই তাঁর নিজের দেশে। এইখানেই তার প্রয়োজন বেশী।

...একদিন দেশ-পালানো বসন্ত আবার তার ছোট ঘরে ফিরে এলো। গ্রামের লোক কৌতুহলী দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে।

দাড়ি ঢাকা মুখ—ছুটো চোখ বুদ্ধির দীপ্তিতে জ্বল জ্বল করছে। পরণে একটা প্যাণ্ট আর বুশসার্ট; মুখে ওই পাইপ।

বিদেশের ওইটুকু চিহ্নই শেষ পর্য্যন্ত টিকে আছে। আরও আশ্চর্য্য হল তারা যেদিন দেখল—বসন্তবাবু ওই নুইয়ে-পড়া মাটির লম্বা চালাটার ভার নিলেন।

স্কুলকে নোতুন করে গড়বেন। এই হবে তার প্রথম এবং প্রধান কায। অনেকেই খুশী হল। অনেকেই কথাটার কোন গুরুত্বই দিতে চায় না। হাল্কা চোখে দেখে—বড় লোকের ছেলের খেয়াল। ছুদিন পরই উড়বে আবার। ও বাঁশ বনের আড়ালে মাইনর স্কুল যেমন ধুকছিল তেমনিই ধুকবে।

কিন্তু তা হয়নি। ছু-তিনটা বছর কেটে গেছে। বসন্তবাবু যান নি, বেশ উঠে পড়েই লেগেছেন। এগিয়ে চলেছেন পুরো দমে।

—আপনি যাচ্ছেন তো?

বসন্তবাবু নীলকণ্ঠবাবুর কথায় ওর দিকে চাইলেন! একটু স্থিরদৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে বলে ওঠেন।

—ঠাকুর-দেবতার ব্যাপারে আমাকে টানবেন না দয়া করে।

—কেন? একটু অবাক হন নীলকণ্ঠবাবু।

—ওটা ঠিক বুঝি না। ওরা যাচ্ছেন তাহলেই হবে—

বসন্তবাবু উঠে পড়লেন। এসব ব্যাপারে তিনি নাক গলাতে চান না। নোংরা স্বার্থপরতার ব্যাপার। মনোমালিন্য তিক্ততাকে এড়িয়ে চলেন তিনি।

উঠে চলে গেলেন হাটের দিকে। লোকজনের ভিড়ে আর তাঁকে দেখা যায় না। হেলুবাবু বলেন—সাহেব মানুষ কিনা।

নীলকণ্ঠবাবু লোকটিকে ইতিপূর্বে ভাল করে চেনেন নি, শুনেছিলেন ওর কথা। আজ পরিচয় হ'ল, কিন্তু কেমন যেন বিচিত্র একটি মানুষ। হয়তো এসব ভালোবাসেন না, তাই এর মধ্যে এলেন না, না হয় এড়িয়ে গেলেন সোজাসুজিই। স্পষ্টবাদী লোক—মনের ভাবটা স্পষ্টই প্রকাশ করে গেলেন এটা বেশ বোঝা গেল।

পাঁচগাঁয়ের হাট; সবাই আসে দেখাশোনা হয়।

চাষ-আবাদের খোঁজ খবর নেয়, কুশল-আসল ও বিনিময় হয়।

ওদিকে দামোদর ধার থেকে তরিতরকারী নিয়ে এসেছে চাষী মেয়ে পুরুষের দল। শক্ত অনুর্বর কাঁকুরে মাটির রাজ্য সুরু হয়েছে এখান থেকেই।

ওদের দিকটায় দামোদরের জল আছে—বন্যার পর জমে চন্দনের মত পুরু পলি, তাই ধানের পরে তরিতরকারীও তারা চাষ করে।

সপ্তাহের ছটা দিন তাদের ছক বাঁধা; এহাট ওহাট করেই কেটে যায়।

—দেখি রে পাল্লাটা। পাষাণ দিছিস যে একেবারে ছাপ। মেয়েটি শাক বেচছিল, জলে ভিজিয়ে শাককে খড় আঁটির মত ভারি করে রেখেছে, তার উপর পাষাণের কথা শুনেই ফ্যাঁস করে ওঠে।

—পাষাণ দিছি? কচুমুখো মিনষে এয়েছেন শাগ্ কিনতে?

দুব নাই শাক !

একে এই দাবড়ানি, তার উপর মেয়ের কাছ থেকে—কোন মতেই আশু ভটচায সহ্য করতে রাজী নয়। গর্জন করে ওঠে

—এ্যাও! আলবৎ দেখাবি তুই!

দুচার জন লোক জুটে যায়। চাষীরাও প্রতিবাদ করে—ই হাটে আর আসবো নাই। দুগে্গাপুরের পুলহতে দেরী—তার দেখবে ঠাকুর।

—পরের কথা পরে হবেক। সাতমণ তেল তো পুড়ুক তারপর রাধা নাচবেক। দেখাতোর পাল্লা!

এরই মধ্যে কেমন করে মিষ্টিলোহার মাথা গলিয়েছে কেজানে। এসে সামনেই ওই তর্জনগর্জনরত আশু ভটচাযকে দেখে আদুড় মাথায় একগলা ঘোমটা টেনে জিব বার করে বেশ জোর গলায় বলে ওঠে।

ওমা! ইকি ঢেঙ্গো বড়ঠাকুর গো!

সমবেত জনতা হেসে ওঠে ওর কথায়। মিষ্টিলোগার হাটের মধ্যমণি। একদম নিয়ে মিষ্টি বলে ওঠে শাকওয়ালীকে

—ওলো অ ছুঁড়ি। পাল্লার পাষাণ কেনে হিয়েয়।

পাষাণই বড়ঠাকুরকে দেখা। সব পাষাণই গলে যাবেক, বড় রসিক লোক ওই ঢেঙ্গো বড় ঠাকুর।

আশু ভটচাযএর মুখে কে যেন এক তাল চুণকালি মাখিয়ে দিয়েছে। শাক কেনা দুরে থাকুক; সরে পড়তে পারলে যেন বাঁচে।

হাসছে তখনও ওরা—ওকে হন্তদন্ত করে সরে যেতে দেখে।

হাটের একপাশে বসে আছে লোকটা। মাঝারি বয়েস, দোহারা কালো কালো গড়ন। সামনে নামান কতকগুলো ধামা, আঁটাড়ি লতার তৈরী চুপড়ি, কুলো, মাটির ধূপদান, ধুনুচী।

বেশ রুচিসম্মত কায, পাশে অনেকেই বসেছে ধামা-টোকা কুলো ইত্যাদি নিয়ে। তাদের থেকে এর কায সম্পূর্ণ আলাদা।

বসন্তবাবু ওর সামনেই এসে থমকে দাঁড়ালেন, কি ভেবে মাটির একটা ধূপদান তুলে নিয়ে দেখতে থাকেন। হালকা সোনালীরংএর কাযকরা একটি তথাগত মূর্তি, পিছনে বজ্র যন্ত্রের মত ফণা উঠে রয়েছে, সপ্তফণা! তারই মাথায় ধূপকাঠি গোঁজা যায়।

শান্ত সমাহিত একটি মূর্তি—তাকে কেন্দ্র করে ওই ধূপ গুচ্ছের ম্লান সৌরভ উঠবে আবছা লালাভ শিখা থেকে। চমৎকার পরিকল্পনা।

ওপাশে একটা চুপড়িতে বাঁশের ছিল্‌কের উপর রংকরা একটি নারীমূর্তি, কোমরে ওর কলসী, সুন্দর একটি গতিভঙ্গীর সৃষ্টি করেছে ওই রংটুকু।

বসন্তবাবুকে ডোমরা চেনে সবাই। সমীহ করে।

তাকে ওর জিনিষপত্র নিয়ে পরখ করতে দেখে ওরা একটু জড় সড় হয়ে গেছে।

—তোর তৈরী ?

লোকটা মাথা নাড়ে আজ্ঞে !

—ঘর কোথা তোর ?

ঘর !

কেমন যেন চুপ করে থাকে সে। বসন্তবাবুও চেয়ে থাকেন ওর দিকে।

—হ্যাঁ,

হঠাৎ মিষ্টিলোহারকে আসতে দেখে মুখ তুলে চাইলেন তিনি। পাশের বাগাল ডোম বলে ওঠে—জুটবাবু জল টোপ বলে উকে সব্বাই ডাকে।

জল টোপ! বিচিত্র নামটা শুনে বসন্ত অবাক হয়। কিযে ওই নামের অর্থ ঠিক জানেনা। লোকটাও জানে না। তবে ওই নামেই ডাকে সবাই। তাই সাড়াও দেয় সে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

মিষ্টি মেয়েটাকে এগাঁ ওগাঁয়ে দেখা যায়, লোহার কাহারের ঘরে এমন ফর্সা সাধারণত দেখা যায় না; তেমনি সাজবেশ ও চমকদার।

কপালে কাঁচ পোকার টিপ, টুকটুকে দুটি ঠোঁট পানের রসে জারানো, ধারাল হাসি ওই ঠোট আর চোখের কোলে ছুরির ফলার মত খেলে যায়। আর চলন! যে পথের দুপাশে যৌবনের অপরূপ সম্ভার সৌরভ ছিটিয়ে চলেছে। চোখ ধাঁধানো স্বাস্থ্য আর নেশা লাগানো যৌবন।

—গড় করি জুটবাবু।

হাসির একটা আভা দেখা যায় ডোমদের মধ্যে। বাগালে ডোম একটু মুখফোড় চেঁ-এঠে ছোকরা। বলে ওঠে

—উর থপর ওকেই সুধোন ছুটবাবু। ওই ঘরের এয়েছে কিনা! মিষ্টির চোখের নীরব তর্জনে থেমে গেল বাগাল।

বসন্তবাবু একটা আধুলি নামিয়ে দিয়ে ধূপদানটা তুলে নিয়ে চলে গেলেন ভিড়ের মধ্যে। জলটোপ ও একটু অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

সমজদার বাবু!

কে রে ওই বাবু?

মিষ্টি আধুলিটা কুড়িয়ে নিয়ে খুঁটে বাঁধতে বাঁধতে বলে—খুব মস্ত পড়া নেকা ওয়ালা লোক। বিলেত ফেরত। জল টোপ তখনও যেন ভিড়ের মধ্যে ওকে খুঁজছে দুচোখ দিয়ে।

আর দেখা গেল না তাকে, কোথায় মিশিয়ে গেছেন তিনি। আরও দুএকটা জিনিষপত্র বিক্রী হয়েছে ওর।

ওর জিনিষের একটু দাম বেশী, কিন্তু খদ্দেরের অভাব নেই। পড়ে থাকে না।

বেলা বেড়ে আসছে। হাটের তরিতরকারীওয়ালারা বিক্রী বাটা শেষ করে মহেশপুকুরের ধারে আচলের মুড়ি জলে ভিজিয়ে পেয়াজ আর লঙ্কা দিয়ে চিবিয়ে চলেছে। তার সঙ্গে বড় জোর কেউ কিনেছে দু এক পয়সার ঝালবড়া বেগুণী, তাই টাকনা দিয়ে গলাদিয়ে দড়ি দড়ি মুড়ি গুলো নামাচ্ছে।

ওরা কজন ফিরছে। বাগানের পরই একটু ধানমঠ তার পরই মিষ্টিদের গাঁ। ভাদুরে রোদ গায়ে চিড় বিড়ে জ্বালা ধরায়। আগে আগে চলেছে মিষ্টি।

বাতাসে ধানফুলের সৌরভ, ক্ষেতে জমা জল রোদের তাপে যেন বাষ্পাকারে উঠছে সাবা দিগন্ত জোড়া সবুজের বুক থেকে। শনশন সুরেলা শব্দ। মাথা নাড়ছে থোড় গজানো নিটোল পুরুষ্টু যৌবনবতী ধান ক্ষেত।

পূর্ণতার স্বাদভরা বাতাস।

সাদা পুঞ্জমেঘ ঘন নীল আকাশে ভেসে চলেছে কি যেন স্বপ্ন অভিসারে।

মাথায় ডালা; দুহাত দিয়ে আলি পথে সন্তর্পণে সেটা ধরে চলেছে মিষ্টি, গায়ের কাপড় চোপড় আদুড় বাতাসে আগোছাল।

গুণগুণ করে গান গাইছে ও।

গানের ভাষা ঠিক জানে না—বাতাসে টুকরো টুকরো সুর মিশে যায় যৌবনবতা ধানের পূর্ণতার আনন্দ সুরে।

জলটোপ চলেছে পিছু পিছু।

বর্দ্ধমানের রূপ পসারিণীদের হাটে ওকে দেখেছিল প্রথম!··কি এক মায়াভরা রাত্রি।

মত্তপ লোকটা ওকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিল। স্বৈরিণী এক কামনাময়ী নারী। বৃষ্টি-ঝরা রাত।

—ভিজছো কেনে। ভেতরে এস গো মানুষ।

—পয়সা নাই।

মিষ্টি ওর দিকে চেয়ে থাকে, আচ্ছা আলোয় ওর দুচোখে কিসের নেশা। কাছে দুহাত দিয়ে টেনে নিয়েছিল।

—মনের মানুষ কি গো তুমি। তোমার কাছে পয়সা নোব কি গো কারিগর। এসো।

কি এক শাশ্বত আহ্বান।

সুর জাগে বাতাসে। শন শন বাতাস কাটে শালবনের বুক থেকে আকাশে হারিয়ে গেছে পুঞ্জ সাদা মেঘ, নীল ঘননীল আকাশ।

চলেছে আগে আগে মিষ্টি।

যৌবনবতী একটি কামনাময়ী নারী!

দেহের ভাজে ভাজে পুরুষ্টু উদগ্র কামনা!

জলটোপ চলে এসেছে ওরই পিছু পিছু বহু পথ। বহু সবুজ স্বপ্ন ঘে া মাঠ নদী পার হয়ে।

—কই গো!

ঘুরে দাঁড়িয়ে ডাকাছ তাকে মিষ্টি। ঘেমে উঠেছে সুন্দর সুডোল মুখ—বিন্দু বিন্দু ঘামতেল চুলের সঙ্গে গাড়িয়ে পড়েছে, ডাগর দুচোখে মিষ্টির হাসির আভাষ।

—হাঁ করে কি দেখছো কারিগর?

—তোকে! বড্ড সোন্দর তুই!

—ভর দুপুরে! মরণ। চপ দিকি রোদের তাতে রঙ পুড়ে গেল বাপু। হেসে গড়িয়ে পড়ে মিষ্টি।

মন ভরে ওঠে খুশীতে। আকাশ বাতাস যৌবন-স্বপ্না ধান ক্ষেতের বুকে সেই আগামী পূর্ণতার আভাষ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅরবিন্দ সমাধি সমীপে

হেথায় ফেলোনা অশ্রু কোরোনা ক্রন্দন
প্রশান্ত হৃদয় শুধু দাও প্রসারিয়া ;
প্রভাতের বৃক্ষসম উর্ধ্বে সঞ্চারিয়া
নিঃসীম গগনে শোনো বিরাট স্পন্দন।
জ্যোতির্‌-জনক-সূর্য্য দীপ্ত তপস্যায়
সৃষ্টির আমোঘ-বীর্য্য ঢালে ক্লান্তিহীন ;
অমানিশা লুপ্ত হেথা—হেথা চিরদিন-
হেথায় বেঁধোনা নীড় বিলাপ ব্যথায়।
আনন্দের হৃদি-তন্ত্রী সৌন্দর্য্য সুধায়
রণিয়া রণিয়া ওঠে অশ্রুত সঙ্গীতে ;
প্রশান্তির চির-স্বর্গ হেথা চারিভিতে—
হেথায় জ্বেলোনা দীপ মর্ত্যের ক্ষুধায়।
আপনারে বিসর্জিয়া চির-মৃত্যুঞ্জয়ী,
বিশ্বের বেদনা বহে নিজ বক্ষে ওই ॥

কথা ঃ শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায় ॥ সুর ও স্বরলিপি ঃ তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

II গা পা -র্সা | -া -া -া I -নর্রা- র্সনা -ধপা | -মগা -রগা -া I
হে থা ০ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০ য়্

I মধা ধপা মা | -গা সা -মা I গা -া -া | -া -া -া I
ফে০ লো না ০ অ ০ শ্রু ০ ০ ০ ০ ০

I গা মা পধপা | -গা মা -রা I গা -া -া | -া -া -া I
কো রো না০০ ০ ক্র ন্ দ ০ ০ ০ ০ ন্

I গা গমধা -ধপা | মা -গা সা I সগা -গরা ণ্া | ধ্া সা -া I
প্র শা০০ ন্ ত ০ হ্ব দ০ য়্ শু ধু দা ও

I গা মা পা | ধা -া -াণ I -পধা -মপা -গমা | -গগা -া -া I
প্র সা রি য়া ০ ০ ০০ ০০ ০০ ০ ০ ০

I গা মা পধপা | -গা মা -রা I গা -া -া | া -া -া I
কো রো না ০ ০ ক্র ন্ দ ০ ০ ০ ০ ০

I গা পা পা | -া পা -া I ধনা -র্সা না | র্সা -া -া I
প্র ভা তে র বু ০ ক্ষ০ ০ স ম ০ ০

I র্গা -া র্গা | -া র্রা -া I র্সা না র্সা | -া -া -া I
উ র্ ধে ০ স ন্ চ রি য়া ০ ০ ০

I র্গা -া র্গর্রা | র্সা না ধা I পা র্সা না | -া -া পা I
নি ০ সী ম গ গ নে শো নো ০ ০ বি

I ধা -া মা | -া পা -া I গা -া -া | -া -া -া I
রা ০ ট ০ স্প ন্ দ ০ ০ ০ ০ ন্

I গা পা -র্সা | -া -া -া I -নরা -র্সনা -ধপা | -মগা -রগা -া I
হে থা ৯ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০০ ০ য়

I মধা ধপা মা | -গা সা -মা I গা -া | -া -া -া II
কো০ য়ো না ০ ক্র ন্ দ ০ ০ ০ ন্

II সা গা -া | মা পা গা I পা -ধা ধা | র্গা -া র্রা I
জ্যো তি র্ জ ন ক স্ব র্ ষা দী প্ ত

I -া র্সা না | র্সা -া -া I -া -া -া | পা -না র্সা I
০ ত প স্যা ০ ০ ০ ০ য়্ স্ব ষ টি

I -র্গা -া -া | র্গা র্মা র্পা I র্গা -া র্সা | র্রা না -া I
ভৈ ০ র্ অ মো ঘ বা র্ য্য ঢা লে ০

I পা -গা পা | র্সা -া -া I পা র্গা র্রা | র্গা -া না I
ক্লা ন্ তি হা ০ ন্ অ মা নি শা ০ লু

I -া গা ধা | পা -া ধা I ধপা মা গা | পা -া -া I
প্ ত হে থা ০ হে থা চি র দি ০ ০

I -া -া -া | গা পা -র্সা I -া -া -া | পধা ধপা মা I
০ ০ ন্ হে থা ০ ০ ০ য়্ বেঁ০ ধো না

I গা -া পা | মগা রসা ন্া I সা -া -া | -া -া -া I
নী ড়্ বি লা০ প ব্য থা ০ ০ ০ ০ য়্

II সা -া রা | -া জ্ঞা -সা I রা পা মা | -পা মজ্ঞা -া I
আ ০ ন ন্ দে র্ হৃ দি ত ন্ ত্রী ০

I রা -সা রা | -া সা ন্া I সা -া -া | -া -া -া I
সৌ ন্ দ র্ য্য সু ধা ০ ০ ০ ০ য়্

I রা গা মা | -া -া -া I পা ধা ণা | -ধা ণর্রা র্সা I
র ঙি য়া ০ ০ ০ র ঙি য়া ০ ওং ঠে

I ণা -র্সা ণা | ধা পধা -না I ণধা পা -া | -া -া -া I
অ ০ শ্রু ত সং ঙ গি তে ০ ০ ০ ০

I পা পা -ধা | ণা -র্সা না I র্সর্রা র্সনা -র্সা | ণা ধা পমা I
প্র শা ন্ তি র্ চি রং স্বং র্ গ হে থাং

I পা ণা ণধা | পা -া -া I মা পা -র্সা | -া -া -া I
চা রি ভি তে ০ ০ হে থা ০ ০ ০ য়্

I র্ণা ণপা মজ্ঞা | রা -া -া I সরা -মজ্ঞা রা | সা -রা সনা I
জ্বে লো না দী ০ প মং ০র্ তে র ০ ক্ষুং

I সা -া -া | -া -া -া I
ধা ০ ০ ০ ০ য়্

ঈষৎ ঠায় লয়ে

II রা গা মা | পা পধা ধপা I মগা মা -া | -া মা গা I
আ প না রে বিং সর জিং য়া ০ ০ চি র

I মা -া ধা | -া ধা -া I ধা -া -া | -া -া -া I
মৃ ০ ত্যু ০ ঞ্জ ০ য়ী ০ ০ ০ ০ ০

I ধা -া ধা | ধা ণা র্সা I ধা র্ণা ধা | পা -া -া I
বি ০ শ্বে র বে দ না ০ ব হে ০ ০

I না না না | -া র্সনা -ধনর্সনা I র্সা -া -া | -া -া -া IIII
নি জ ব ০ ক্ষেং ০০০০ ও ০ ০ ই ০ ০

সমবায়, সমাজ ও বিশ্বশান্তি

নারায়ণ চৌধুরী

স্বাধীনতা লাভের পর আজ চৌদ্দ বছর কেটে গেল, কিন্তু আজও ভারতবর্ষে আর্থিক স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি ; অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতার কোন মূল্য নেই। তাই আজ সত্যিকারের স্বাধীনতা, শান্তি ও প্রগতি প্রতিষ্ঠার জন্য আরও জোর আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে ; বাড়াতে হবে দেশের সম্পদ ; আর্থিক কাঠামোকে গড়ে তুলতে হবে সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ। মনে রাখতে হবে যে আমাদের সংগ্রামী ঐক্যের জোরে আমরাই একদিন বিদেশীর ঔদ্ধত্যকে ধুলায় লুটিয়ে দিয়েছিলাম। আমাদের অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্যের কথা স্মরণ রেখে দেশের বিভিন্ন সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানকল্পে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সম্মিলিত প্রচেষ্টার ব্যাপক আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে যে সর্বদিকে সমান দৃষ্টিই স্বাধীনতার মূল্য—"Eternal vigilance is the price of liberty."

আমরা কৃষিজীবী। এই দেশে শতকরা নব্বই ভাগ মানুষই কৃষির উপর নির্ভরশীল, যে দেশের প্রতি দশ জনের মধ্যে নয় জন মানুষই কৃষির উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে সেখানে কৃষি সমস্যাই হলো প্রধান সমস্যা। কৃষির উন্নয়ন তথা ফসল বাড়ানো এবং উৎপাদিত ফসলের উপযুক্ত মূল্য পাওয়ার যথাযথ ব্যবস্থা—এই দুটোই হলো কৃষিপ্রধান দেশের আসল সমস্যা। এই সব সমস্যা সমাধানে 'সমবায়' একটি অমোঘ উপায়রূপে সারা পৃথিবীতে স্বীকৃতি লাভ করেছে। কৃষি, শিল্প, ইত্যাদি সমাজের সর্বস্তরে সমবায় পদ্ধতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আজ আর কোন বিতর্কের অবকাশ নেই। দেশের অভাব-অনটন, খাদ্যসমস্যা, বস্ত্রসমস্যা ইত্যাদি দূর করবার জন্যে আমরা যে সব পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি তার সার্থক রূপায়ণে চাই সমবেত প্রচেষ্টা। এই যৌথ প্রচেষ্টাই হলো সমবায় প্রচেষ্টা (Co operative Approach),

জনগণের মালিকানা প্রতিষ্ঠার পথে 'সমবায়' ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন শান্তিপূর্ণ পথ নেই। সমবায়ই হলো সমাজ বিপ্লবের নূতন পথ। শোষণমূলক ধনতন্ত্রের বদলে সমবায় সাধারণতন্ত্রই আমাদের বিশেষ লক্ষ্য। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে একথা বলতে হচ্ছে যে এদেশে আজও সত্যকারের সমবায় আন্দোলন গড়ে ওঠে নি ; আমাদের দেশে সমবায় আন্দোলনের বয়স আজ ৫৭ বৎসর অতীত হতে চলেছে, কিন্তু বলিষ্ঠ সমবায় আন্দোলন আমরা আজও গড়ে তুলতে পারি নি। কাঠামোর দিক থেকে বিচার করলে হয়তো 'সমবায়' খুব ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী আন্দোলন বলেই মনে হবে ; বস্তুতঃ এই আন্দোলন অত্যন্ত দুর্বল ও শক্তিহীন। যে দেহে প্রাণশক্তির রয়েছে অভাব তাকে বাইরে থেকে ইন্‌জেকশন দিয়ে আর কতক্ষণ বাঁচিয়ে রাখা যায় ? সমবায় আন্দোলনে সেই প্রাণশক্তির সঞ্চার করতে হবে—সত্যিকারের সমবায়ী তৈরী করতে হবে। আমরা এতদিন শুধু সমবায়ের কাঠামো তৈরী করে এসেছি—সত্যকারের সমবায়ী তৈরী করতে পারি নি। মনে রাখতে হবে যে সমবায়ের সার কথা হলো—জনস্বার্থ চেতনা সকলের জন্যে সকলের সহানুভূতি—"সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"—(Each for all and all for each)—এই অনুভূতি ও সমাজ-জাগরণ সম্বন্ধে পণ্ডিত নেহেরু বলেছেন ; 'Co operative not only means producing while it is the way of training to a way of life. it is a question of producing better man and woman in the society."—সমবায় কাঠামো তৈরী নয়, মানুষকে সমবায় মন ভাবাপন্ন ক'রে তোলাই সমবায়ের মূল কথা। আজ সমবায় আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে এই চিন্তাধারা ও নূতন দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন। সমবায় আন্দোলনের মধ্যে এই নূতন দৃষ্টি জাগিয়ে তুলতে হ'লে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সমবায় শিক্ষার বহুল প্রচার ও প্রয়াস। মনে রাখতে হবে—"Education and Continius Education is the motto of Co-operation……Co-operative movement begins with education, not with legislation,"। সমবায় আন্দোলন হলো মূলতঃ বেসরকারী আন্দোলন, গত ৫৭ বৎসর ধরে সরকারী কুক্ষীগত থেকে এই আন্দোলন তার প্রাণশক্তিকে হারাতে বসেছে; একে সরকারী প্রভাবমুক্ত করতে হবে—তবেই পাবে তার সহজ ও স্বচ্ছগতি। জনসাধারণ যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ না করে তাহলে কোন আন্দোলনই বেঁচে থাকতে পারে না। তাই সমবায় আন্দোলনকে গণ-আন্দোলনে পরিণত করার গুরুদায়িত্ব এসেছে আমাদের সামনে। সমবায়নীতি ও ভাবাদর্শকে পরিব্যাপ্ত করতে হবে জন-মনে। এই পটভূমিকায় সমবায় সমিতির কর্মকর্তা ও সদস্যদের সমবায় সমিতি ও আন্দোলন সম্পর্কে শিক্ষণ একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সদস্যগণ সমবায় নীতি কতটুকু উপলব্ধি করেছেন ও কিরূপে দায়িত্ববোধ সহকারে সমিতির কাজ করছেন তারই উপর নির্ভর করে সমবায় আন্দোলনের সাফল্য। আশার কথা যে ভারতবর্ষে সমবায় আন্দোলনকে সরকারী প্রভাব মুক্ত করার প্রচেষ্টা চলেছে। রাজ্য সরকার ইউনিয়ন ও জেলা সমবায় ইউনিয়নের হাতে সমবায় সুহৃদের শিক্ষাদানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন রাজ্যের প্রতি

জেলার সমবায় সদস্যদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন। এই শিক্ষা ব্যবস্থা এখনও দেশের সর্বত্র প্রসার লাভ করে নাই। বাংলার তথা ভারতের পল্লীতে পল্লীতে এর ব্যাপক সম্প্রসারণ প্রয়োজন।

শুধু জাতীয় জীবনে নয়, আন্তর্জাতিক জন-জীবনে সমবায় নীতির সম্যক প্রয়োগ সাধনের মাধ্যমে সমবায় গণরাজ্য প্রতিষ্ঠার আদর্শ অপরিহার্য্য। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার পথে সমবায় এক অমোঘ উপায়। হিংসার প্রয়োজন নেই, বিদ্বেষ বিরোধের প্রয়োজন নেই—প্রয়োজন শুধু সমবায়ী মনোভাব বিবর্দ্ধনের মাধ্যমে মানুষের জন্য মানুষের মানস জাগরণ। মানব সভ্যতার ও সমাজের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে রাষ্ট্র ও সমাজে যে শ্রেণীর সংঘাত ও দ্বন্দ্ব বর্তমান তার অন্তরালে আছে মানুষে মানুষে সহযোগিতা ও মানবতা-বোধের অভাব। মানুষের নূতন সমাজ ও নূতন সভ্যতা কি কেবল হিংসার পথেই সীমিত? সমাজ জীবনের নববিধান প্রবর্তন কি কেবল সন্ত্রাসবাদী নাশকতামূলক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে সম্ভব? আজ পৃথিবীর সামনে এক ভীতিজনক, নৈরাশ্যময় চিত্র সমুপস্থিত। সম্প্রতি রাশিয়ার পঞ্চাশ মেগাটন বা ততোধিক শক্তি সম্পন্ন আণবিক বোমার বিস্ফোরণ মানুষের ইতিহাসে এক প্রচণ্ডতম বিস্ফোরণ—যা মানুষের মনে এনেছে যুদ্ধের বিভীষিকা ও সন্ত্রাস। সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থের উন্মাদনায় ধোয়াটে আদর্শবাদের নামে আজ বিশ্বের শান্তি বিপন্ন। পারমাণবিক শক্তিধর শিবির দুইটি পরস্পরের উপর দোষারোপ কোরে নিজ নিজ নিরাপত্তার নামে প্রতিযোগিতামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণে সমগ্র মানবজাতির সর্বনাশ ঘটাতে চলেছে। বিশ্বশান্তি রক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে আজকের দিনে বিশ্বজোড়া সমবায় আন্দোলনের মহামন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণই মানুষের বাঁচবার একমাত্র পথ। যুদ্ধ ঘোষণা, প্রতিযোগিতামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণ, শ্রেণী-দ্বন্দ্ব—ইত্যাদি ত্যাগ করে সমবায় মহামন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হতে হবে সমগ্র মানব জাতিকে। "কো অপারেটিভ্ কমনওয়েল্থ"—কেবল কথার কথা নয়—তার সমাজ জীবনে আগামী দিনের যে নূতন সভ্যতা ও নূতন পৃথিবীর দিকে চেয়ে আছে, একমাত্র সমবায় আন্দোলনই সেই নূতন পৃথিবী রচনা করতে পারে। সমবায় সমিতিসমূহে সমবায়ী মন, সমাজে সমবায়ী মনোভাব এবং এই সমবায়ী মন ও মনোভাবে গড়ে তোলার মাধ্যমে সমবায়-রাষ্ট্র গঠনের নৈতিক মানসিকতা সৃষ্টির জন্যই আজ সমবায় নীতির বহুল প্রচার প্রয়োজন। বলা বাহুল্য যে অর্থনৈতিক স্বাধীনতাই হলো সমবায় স্বাধীনতা। সমবায় আন্দোলনে ব্যক্তি-স্বাধীনতা, ব্যক্তির স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতার মাধ্যমে সার্বজনীন উন্নতির অধিকার স্বীকৃত। জাতির শক্তি সম্পদকে আশানুরূপ বাড়াতে গেলে আজ দেশের কৃষি, শিল্প ইত্যাদি সর্বস্তরে সমবায় প্রচেষ্টার ব্যাপক সম্প্রসারণ একান্ত প্রয়োজন। ইতিহাসের গতিপথে মানব-নিপীড়ন যন্ত্রের নিষ্পেষণ কেবল বলিষ্ঠ সমবায় আন্দোলনই থামাতে পারে। রাজনৈতিক দলাদলি ও মতবাদের মাতলামি আজ পৃথিবীর সকল দেশেই মানুষকে করেছে উগ্র রাজনীতি রোগ গ্রস্ত, রাজনীতির বিশ্ব উৎসবে সকলেই কথার ফটকাবাজিতে ব্যস্ত; বিশ্বের বর্তমান রাজনৈতিক ঘটনাবলী সারা বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছে যুদ্ধের সন্ত্রাস-এই বিভীষিকা থেকে মুক্তির জন্যে চাই নূতন বিশ্বরাজনীতি—যে রাজনীতি জাতীয় জনজীবনে সর্বৈব কল্যাণকর। সমবায়ই হলো সেই নীতি। তাই বিশ্বমানবতায় উদ্বুদ্ধ সর্বমানবে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সমবায় রাষ্ট্রগঠন আজ অপরিহার্য্য হ'য়ে পড়েছে। বিশ্বব্যাপী সমবায় রাষ্ট্র তাই আজ শুধু জাতীয় জীবনে নয়, আন্তর্জাতিক জনজীবনে এবং বিপন্ন বিশ্বের সমস্যার সমাধানেও অপরিহার্য্য। সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হওয়ার আহ্বান তুলে ধরতে হ'বে আন্দোলনের সামনে—তুলে ধরতে হবে সমবায় রাষ্ট্রের আদর্শ।

"বিশ্বমানব মৈত্রী সাধনা সমবেত ভাবনায়"—বিশ্বমানবের নূতন জাগরণের আহ্বান নিয়েই এসেছে এই সমবায়। সমবায় সভ্যতাই আগামীদিনের একমাত্র ভরসা। এজন্যে চাই মানুষের জন্য মানুষের সহানুভূতি; শোষণের ও হিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজের অবসান-চাই, মানবতাবাদী নূতন জগতের আলো দিকে দিকে বিস্তার করার সাধনা; তবেই অসাম্যের স্থানে সাম্য; জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষের স্থানে মৈত্রী সুপ্রতিষ্ঠিত হ'বে। একথা স্মরণ রেখে সমবায় সপ্তাহ উদ্‌যাপন উৎসবে সাতরাঙ্গা রামধনু পতাকার তলে সমবেত হ'য়ে দেশের সমবায়ী-দের একজোটে সেই সপথই গ্রহণ করিতে হ'বে যে আমরা যেন সমবায় সমাজ গঠনের কাজে ব্রতী হ'তে পারি। ব্যক্তি-স্বার্থ নয়, —শ্রেণী-স্বার্থ নয়, সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ সাধনই আমাদের লক্ষ্য।

পল্লীপ্রধান ভারতবর্ষের পল্লীতে পল্লীতে যাতে সমবায়ের নীতি পরিব্যাপ্ত হয়, সেইদিকে আমরা আজও দৃষ্টি নিবদ্ধ করিনি। আমরা যে কর্মসূচী গ্রহণ করি তাও কিছুটা বার্ষিক নিয়মে বাঁধা। এখানেও সেই নির্ব্বাচন। লেজিস্‌লেটিভ্ আসেমব্লির মত এখানেও সেই নির্ব্বাচনের ভোটাতিশয্য আর ভোট দেয় তারাই বুদ্ধি যাদের ডাঁসা পেয়ারার মত কাঁচা। উৎসবে তাই ফাকা থেকে যাচ্ছে; অলক্ষ্যে ফাঁকি ধরা পড়ছে আমাদের অন্তরে। শুধু দুটি গান, দুইটি বক্তৃতা আর মাইকের কল-কোলাহলই আজ যথেষ্ট নয়; সমগ্র জীবন সত্তা দিয়ে মানুষকে উপলব্ধি করতে হ'বে সমবায় মত আমরা যদি তার পূর্ণ সুযোগ না নিই তা না হলে স্বাধীনতার সত্যিকারের অমৃত ফলের আস্বাদ আমরা পাবো না; স্বাধীনতা সেক্ষেত্রে থাকবে পুঁথির পাতায়, আমাদের মনের পাতায় নয়, সমবায়ের বৃহত্তম ও মহত্তম আদর্শের প্রকৃত ও সর্ব্বাঙ্গীন প্রচার ও প্রসার শুধু শহরের বুকে কয়েকটি সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কখ-ই হ'তে পারে না। আজও "সমবায়" অনেকের কাছেই জনশ্রুতি; যদি তাকে জনশ্রুতির আসন থেকে মুক্ত করতে না পারি, যদি তাকে জনজীবনে প্রতিষ্ঠা করতে না পারি তাহলে আমাদের দুর্গতির সীমা থাকবে না। 'সমবায়' এর মহামিলনের মহামন্ত্রকে নিজেদের চেতনায় সঞ্চারিত কোরে বৃহৎ জনতায় তাকে ব্যক্ত করে দেওয়াই হ'লো আজকের দিনের সর্বপ্রধান

কর্তব্য। আর এই কর্তব্য সম্পাদনের মধ্য দিয়েই আসবে কবিগুরুর আকাঙ্খিত ভারতবর্ষ—"দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে, এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।"

কিন্তু আজও আমাদের খুব দুঃখের সঙ্গে এ কথাই বলতে হয়, সমবায়ের মহামন্ত্রকে সাধারণ মানুষের কানে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব পালনে পরাঙ্মুখ সমবায় সাহিত্য রচনা ও জন সমাজে তার ব্যাপক প্রচার, প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সমবায় প্রদর্শনী, স্কুল ও কলেজে সমবায় বিষয়ক বিতর্ক প্রতিযোগিতা, গ্রামে গ্রামে সমবায় বিষয়ক চলচিত্র প্রদর্শন, বেতার ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে সমবায় নীতির বিভিন্নমুখী প্রচার, সমবায়ীদের উদ্যোগে দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ, সমবায় সপ্তাহ উপলক্ষে প্রখ্যাত দৈনিক পত্রিকাগুলির বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ, ভ্রাম্যমান ও সর্ব্বভারতীয় রূপসজ্জা ও মঞ্চসজ্জার মাধ্যমে সমবায় নীতি জনমনে সম্প্রসারিত করার যথাযথ ব্যবস্থা, স্কুলে ও কলেজে 'সমবায়কে' একটি বিশেষ বিষয় হিসাবে প্রবর্তন করার ব্যবস্থা কোথায়? আমাদের দেশে এই সমবায় নীতির ব্যাপক সম্প্রসারণের জন্যে এই উদগ্র প্রচেষ্টা কি কেউ করেছেন? এখনও কেউ করেন নি—না সমবায় সমিতি না বিদ্যোৎসাহী সরকার। এইগুরু দায়িত্ব বহনের জন্যে সমবায় আন্দোলনের নির্ভীক সৈনিকেরা আজ কোথায়? তাই, কবিগুরুর বাণী পুনরাবৃত্তি কোরে বলি যে আমরা যেন সমবায় সপ্তাহ উদ্‌যাপনের এই পরমলগ্নে "ত্যাগের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, সেবা দ্বারা, পরস্পর মৈত্রী বন্ধন দ্বারা, বিক্ষিপ্ত শক্তির একত্র সমবায়ের দ্বারা ভারতবাসীর বহুদিন সঞ্চিত মূঢ়তা ও ঔদাসীন্যজনিত অপরাধ রাশির সঙ্গে সঙ্গে দুষ্ট দেবতার অভিশাপকে" দূরীভূত করার মহান ব্রতকেই সমবায়ীর মূলমন্ত্র বলে গ্রহণ করি।

তৃতীয় যোজনা ও পরিবার-পরিকল্পনা

শ্রীভবানীপ্রসাদ দাশগুপ্ত এম-এ

বর্ত্তমানে ভারতে যে দ্রুতহারে লোকসংখ্যা বৃদ্ধিপাচ্ছে তাতে দলমত-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক মহলই আতঙ্কিত। কারণ এই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের যথেষ্ট পরিপন্থী হবে বলেই তাদের আশঙ্কা। তৃতীয় যোজনায়ও তাই এ বিষয়ে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অবশ্য প্রথম এবং দ্বিতীয় যোজনায়ও লোকসংখ্যা-নিয়ন্ত্রণের কথা আলোচিত হয়েছিল এবং ঐ খাতে ব্যয় বরাদ্দও হয়েছিল। কিন্তু মৃত্যুহার হ্রাসের কথা যথোচিত বিবেচিত না হওয়ায় লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির হার নির্ণয়ন সঠিক বলে প্রমাণিত হয়নি। এর অনিবার্য্য ফলস্বরূপ প্রথম ও দ্বিতীয় যোজনায় লোকসংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্য স্থির করায় ভুল হয়েছিল। কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থার হিসাবে আমাদের দেশের বর্ত্তমান জন্মহার হাজারে একচল্লিশ এবং মৃত্যুহার হাজারে বাইশ। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে বর্ত্তমানে ভারতের জনসংখ্যা বছরে শতকরা ১'৯ হারে বৃদ্ধিপাচ্ছে। মাত্র ৮৯ বছর আগেও এই লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল বছরে শতকরা ১'২ থেকে ১'৩ মাত্র। অতি অল্প সময়ের মধ্যে লোকবৃদ্ধির এই উচ্চহারের অন্যতম প্রধান কারণ হল, আমাদের দেশের মৃত্যুহার পূর্ব্বের তুলনায় খুব দ্রুতগতিতে হ্রাস পাচ্ছে। স্বাধীন ভারতে জাতীয় সরকার স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত নানা প্রকার সুযোগ ও সুবিধা শহর থেকে আরম্ভ করে গ্রামাঞ্চল পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্যই আমাদের দেশের মৃত্যুহার স্বাধীনোত্তর যুগে অনেক হ্রাস পেয়েছে। অবশ্য চিকিৎসাশাস্ত্রও অন্যান্য গবেষণা ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অগ্রগতি ত রয়েছেই। এই মৃত্যুহারহ্রাসের সংবাদ সত্যই আমাদের আনন্দ ও গর্ব্বের কথা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আশঙ্কার কথা এইযে, যথাবিহিত সতর্কীকরণ করা সত্ত্বেও স্বাধীন ভারতের জন্মহার হ্রাস পাচ্ছে খুবই মন্থরগতিতে। কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থার হিসাবে অনুমান করা হয় যে ১৯৫১ থেকে ১৯৬১ সাল পর্য্যন্ত এই দশবছরে মৃত্যুহার যেখানে হ্রাস পাবে শতকরা ৪'৩, সেখানে জন্মহার হ্রাস পাবে শতকরা ১'০ মাত্র। মোটামুট হিসাবে তাহলে প্রতীয়মান হয় যে বছরে আমাদের দেশে প্রায় সাত থেকে আট লক্ষ লোক বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যাণ সংস্থার হিসাব অনুযায়ী ১৯৬১ সালের শেষভাগে ভারতের লোকসংখ্যা দাঁড়াবে তেতাল্লিশ কোটি দশ লক্ষের মত। কিন্তু দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা রচয়িতাদের হিসাবানুসারে এই সংখ্যা হয় চল্লিশ কোটি আট লক্ষের মত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা রচনার সময় আমাদের দেশের লোকসংখ্যা ছিল ছত্রিশ কোটি দুইলক্ষ।

এই উচ্চহারে লোকসংখ্যাবৃদ্ধি আমাদের দেশের শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথেই বাধা সৃষ্টি করবে না, দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের উপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। এই গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করেই তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার খসড়ায় বলা হয়েছে "The objective of stabilising the population has certainly to be regarded as an essential element in a strategy of

development." আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করবে এই দ্রুতহারে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি রোধের উপর এবং এই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করা তখনই সম্ভব হবে যখন জন্ম এবং মৃত্যুহারের মধ্যে কোন gap বা ফাঁক থাকবেনা অর্থাৎ যখন মৃত্যুহার হ্রাসের সংখ্যানুপাতে জন্মহারকেও হ্রাস করা সম্ভব হবে। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে বর্ত্তমানে আমাদের দেশের মৃত্যুহার হাজার করা বাইশ জন। কাজেই জন্মের হারকেও যখন হাজার করা একচল্লিশ থেকে নামিয়ে বাইশে আনা সম্ভব হবে তখনই কেবল জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করে একটা স্থিতিশীলতা আনা সম্ভব হবে। এর জন্য প্রয়োজন জন্মনিয়ন্ত্রণ ও পরিবার-পরিকল্পনা। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে পরিবার পরিকল্পনা ব্যতীত জন সংখ্যা বৃদ্ধি বন্ধ করার অন্য কোন প্রকৃষ্ট উপায় আছে বলে ত মনে হয় না। অবশ্য দুর্ভিক্ষ, মহামারী বা যুদ্ধ প্রভৃতির কথা এখানে বিবেচ্য নয়; কারণ ঐগুলি হল অস্বাভাবিক অবস্থার কথা, যাইহোক্ খুব আশার কথা যে পরিবার-পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তার কথা দেশবাসী আস্তে আস্তে উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছে।

প্রথম যোজনায় পরিবার পরিকল্পনাখাতে বাজেটে বরাদ্দ ছিল মাত্র পঁয়ষট্টিলক্ষ টাকা, দ্বিতীয় যোজনা ঐ অঙ্ককে বাড়িয়ে বরাদ্দ করা হয় চার শ' সাতানব্বুই লক্ষ টাকা। কিন্তু তৃতীয় যোজনায় আমরা দেখতে পাই ঐ টাকাকে বাড়িয়ে পরিবার পরিকল্পনা খাতে বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছে একেবারে পঁচিশ কোটি টাকা, ক্রমান্বয়ে এই ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধি থেকে সহজেই অনুমান করা সম্ভব কত গুরুত্বের সহিত এই পরিবার পরিকল্পনা সমস্যাটিকে বিবেচনা করা হয়। তবে জন্মের হার হ্রাসকরে কতদিনের মধ্যে লোকসংখ্যার একটা স্থিতিশীলতা আনতে পারা সম্ভব হবে তৃতীয় যোজনার রচয়িতাগণ তার কোন নির্দিষ্ট সময়ের লক্ষ্য স্থির করতে পারেন নি বা করেননি। তবে তাঁরা মোটামুটিভাবে কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থার হিসাব এবং তাদের আগামী পনের বছরের জনসংখ্যা হ্রাসের পূর্ব্বাভাসকেই মেনে নিয়েছে বলেই অনুমিত হয়। কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থার হিসাবানুযায়ী ১৯৬১-৬৬ সালের জন্মের হার ৩৯·৬ থেকে ১৯৬৬-৭১ সালে গিয়ে পৌছুবে ৩২·৯ এবং ১৯৭১-৭৬ সালে ঐ হার আবার নেবে ২৭·৩ দাঁড়াবে। এই হিসাব বা পূর্ব্বাভাস খুবই উচ্চাশা ব্যঞ্জক। উচ্চাশাব্যঞ্জক ওই কারণে যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জন্মহার হ্রাসের গতি আমাদের দেশের জন্মহার হ্রাসেই এই পূর্ব্বাভাসের সমর্থক নয়। উদাহরণ স্বরূপ জাপানের কথাই ধরা যাক যেখানে গত ১৯৪৭—৫৭ সাল এই দশ বছরের মধ্যে জন্মহার প্রায় শতকরা প্রায় পঞ্চাশ ভাগ হ্রাস পেয়েছিল, তথ্যাভিজ্ঞদের অভিমত যে জাপানের ঐ জন্মহার হ্রাসের গতি সুরু হয়েছিল বহুপূর্ব্ব থেকেই। যাই হোক তবে এ বিষয়ে আজ আর কারুর দ্বিমত নাই যে বর্ত্তমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি বন্ধ করতে না পারলে ভারতের কোন অর্থনৈতিক উন্নয়নই সম্ভব নয়। কারণ যে হারে আমাদের দেশের বিভিন্ন পরিকল্পনায় কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ এনে দিচ্ছে তার অনেক অনেক গুণ দ্রুতহারে দেশের লোকসংখ্যা বৃদ্ধিপাচ্ছে। যার ফলে বেকার সমস্যার সমাধান হচ্ছে না এবং জাতীয় আয়বৃদ্ধি পেলেও মাথা পিছু আয় বাড়ছেনা। পরিবার পরিকল্পনার বিরাট কর্ম্মসূচির তুলনায় তৃতীয় যোজনায় ধার্য্য পঁচিশ কোটি টাকাও তাই অপ্রচুর বলেই মনে হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ যোগ্য যে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী কর্তৃক গঠিত পরিবার-পরিকল্পনা কমিটি একশ কোটি টাকার একটি কার্য্যক্রম প্রস্তাব করেছে। তৃতীয় যোজনার Health Pannel এর ১৯৬০ সালের অক্টোবর মাসের এক সভায়ও উক্ত প্রস্তাবের যৌক্তিকতা স্বীকার করে নিয়ে পরিবার পরিকল্পনা খাতে অতিরিক্ত অর্থমঞ্জুরীর কথা চিন্তা করেছে।

পরিবার পরিকল্পনার সফল রূপায়নের জন্য প্রথমেই দরকার সাধারণ মানুষের মনে জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রতিক্রিয়া অনুধাবন করে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের রুচি ও ধর্ম্ম অনুসারে কিভাবে এই পরিকল্পনাকে জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য করা যায় তা নিরূপণ করা। আমাদের দেশের সকলের চেয়ে বড় অংশ বাস করে সহর থেকে দূরে সুদূর গ্রামাঞ্চলে। সেই সকল গ্রামবাসীগণও যাতে পরিকল্পনার সুযোগ ও সুবিধাগুলি পেতে পারে সেইদিকে সবিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন এবং প্রয়োজন তার যথোচিত উপায় উদ্ভাবন করা। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে যে সকল গ্রাম সহরের কাছে বা শহরতলীতে অবস্থিত সেই সকল গ্রামের অধিবাসীগণ সাধারণতঃ খুব তাড়াতাড়ি এবং সহজেই শহরের ভাবধারা গ্রহণ করে। পরিবার পরিকল্পনার ভাবধারা সম্বন্ধে শহরের নিকটে অবস্থিত গ্রামের অধিবাসীরা তাই মোটামুটিভাবে সচেতন হলেও সুদূর গ্রামের অধিবাসীগণ এই বিষয়ে আজও একেবারেই অজ্ঞ অথবা আদৌ আগ্রহশীল নয়। কাজেই এই পরিকল্পনার সাফল্যকল্পে বস্তুতঃ আমাদের করণীয় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করে শহর এবং গ্রামের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করা। তবে খুবই আনন্দের কথা যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির দিকে ইতিমধ্যেই আমাদের জাতীয় সরকার সচেষ্ট হয়েছেন।

প্রসঙ্গতঃ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যেমন পরিবার-পরিকল্পনার সাফল্য প্রয়োজন, তেমনি আবার পরিবার পরিকল্পনার সাফল্যের জন্যও কিছুটা অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার প্রয়োজন। পরিবার পরিকল্পনা কিংবা জন্মনিয়ন্ত্রণ কিছুই সম্পূর্ণরূপে কখনও সাফল্য লাভ করতে পারে না যতদিন না আমাদের দেশের জনসাধারণের আয়ের মান খানিকটা উন্নত হয়। পরিবার পরিকল্পনার জন্য জন্মনিয়ন্ত্রক ঔষধাদি ক্রয় করতে যে ন্যূনতম আর্থিক সঙ্গতির প্রয়োজন, আমাদের দেশের অর্দ্ধভুক্ত গরীব গ্রামবাসীদের তা নেই। তার জন্য দরকার গ্রামীণ অর্থনৈতিক জীবনের উন্নতি বিধান করা। শহরাঞ্চলেই শুধু শিল্প, কলকারখানাগুলিকে কেন্দ্রীভূত না করে গ্রামাঞ্চলে বা গ্রামের উপকণ্ঠে ছোট ছোট কলকারখানার প্রতিষ্ঠা করে এই সমস্যার অনেকটা সমাধান সম্ভব।

তৃতীয়তঃ পরিবার পরিকল্পনার ধারণা বা ভাবভাবনা আমাদের দেশের নিজস্ব নয়। তাই আমাদের দেশের সংরক্ষণশীল অংশ এই পরিকল্পনাকে খুব সুনজরে দেখছে না। যদিও বাস্তব অভিজ্ঞতায় সাধারণ

মানুষ আজ উপলব্ধি করছে যে কর্ম্মসংস্থানের তুলনায় লোকসংখ্যার হার যে দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে তা তাদের অর্থনৈতিক জীবনের বিপদের সংকেতই বহন করে, তবুও তারা সমাজের গোঁড়া সংরক্ষণশীল অংশটি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণরূপে অন্তরের সহিত গ্রহণ করতে পারছে না। এর জন্য প্রয়োজন যথেষ্ট প্রচারের। এই পরিকল্পনার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা পৌঁছে দিতে হবে নগরের প্রাসাদ থেকে সুদূর গ্রামাঞ্চলের পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত। বেতার যন্ত্র, চলচ্চিত্র, সংবাদপত্র এবং বিভিন্ন পত্র পত্রিকার মাধ্যমে প্রচার কার্য্য চালিয়ে যেতে হবে। গ্রামাঞ্চলের দিকে সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা সংস্থা, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রভৃতির কর্ম্মকাণ্ডের সঙ্গে এর কর্ম্মসূচির সমন্বয়-সাধন করে প্রচারকার্য্য পরিচালনা করলে অধিকতর সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা।

চতুর্থতঃ পরিবার পরিকল্পনার সফল রূপায়ণের জন্য প্রয়োজন জন্মনিরোধক বা নিয়ন্ত্রক ঔষধাদি ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে শহর ও গ্রামাঞ্চলের সকল মানুষের কাছে সহজপ্রাপ্য করা। প্রথম এবং দ্বিতীয় যোজনাকালে সাধারণতঃ পরীক্ষাগার বা ক্লিনিকগুলি হতেই ঐ সকল ঔষধপত্রাদি সরবরাহ করা হত। তৃতীয় যোজনায় এই সীমিত সরবরাহ ব্যবস্থাকে আরও প্রসারিত করা প্রয়োজন। ক্লিনিকগুলি ছাড়াও যাতে অন্যত্র প্রয়োজন বোধে নিয়ন্ত্রক ও নিরোধক দ্রব্য ও ঔষধাদির সরবরাহ সম্ভব হয় সেই ব্যবস্থার আশু প্রয়োজন।

উপরে বর্ণিত কার্য্যক্রমের বাস্তব রূপদানের জন্য প্রয়োজন বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত একদল স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন করা। সেই সমাজ সেবার দলই এই কাযে নেতৃত্ব গ্রহণ করবে। এরাই পরিবার পরিকল্পনার বিশদ কার্য্যক্রম, প্রয়োজনীয়তা এবং অর্থনৈতিক জীবনের প্রতিক্রিয়া সকলকে বুঝিয়ে দিয়ে সাধারণ মানুষের মনে এনে দেবে জন্মনিয়ন্ত্রণের অনুপ্রেরণা। এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে, এই সমাজসেবী দলকে সম্যকভাবে সজ্জিত করার জন্য তৃতীয় যোজনায় চিকিৎসা শাস্ত্রীয়, জীববিদ্যা সম্বন্ধীয় প্রচুর বৈজ্ঞানিক গবেষণা কার্য্য পরিচালনার প্রয়োজন। অর্থাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধের জন্য তৃতীয় যোজনায় পরিবার পরিকল্পনার কার্য্যসূচির রূপদানের সঙ্গে সঙ্গে এই বিষয়ে গবেষণা কার্য্যও চালিয়ে যেতে হবে। জাতীয় উন্নতির পথে পরিবার পরিকল্পনার অবদানের কথা সম্যক উপলব্ধি করে দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে এর সফল রূপদানের জন্য যদি আন্তরিক প্রচেষ্টা করা যায় তবে সাফল্য অনিবার্য্য। প্রসঙ্গতঃ পরিকল্পনার কর্ম্মসূচির বাস্তব রূপায়নের দায়িত্ব মুখ্যতঃ রাজ্যগুলির। কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা এ ক্ষেত্রে শুধু উপদেষ্টার। রাজ্যগুলির আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং সঠিক এবং সফল কার্য্যক্রম গ্রহণের উপরই পরিকল্পনার সাফল্য বা অন্যথা। অতএব প্রত্যেক রাজ্য থেকে এ বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ এবং দক্ষ প্রতিনিধিমণ্ডলী নিয়ে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠন করে প্রত্যেক রাজ্যে তার অধীনস্থ একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠন করে প্রত্যেক রাজ্যে তার অধীনস্থ একটি করে শাখা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে এই কার্য্যে আর কাল বিলম্ব না করে আত্মনিয়োগ করা কর্ত্তব্য। কেন্দ্রীয় সংস্থার প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য হবে শাখা সংগঠনগুলির উপর দৃষ্টি রাখা—যাতে প্রত্যেক রাজ্যেই তারা কর্ম্মসূচির বাস্তব রূপদানের জন্য সমভাবে আগ্রহশীল হয়ে এগিয়ে আসে এবং প্রয়োজন বোধে স্থান কাল বিশেষে উপদেশাদি বা সক্রিয় সাহায্য দানে শাখাগুলির কাযে সহায়তা করা, এমনি করে কেন্দ্রীয় সংস্থা এবং শাখা সংগঠনগুলির পরস্পর সহযোগিতা ও সহায়তার ভিত্তিতেই পরিবার-পরিকল্পনার সাফল্য সম্ভব—যার ফলে আমাদের জাতীয় অগ্রগতির পথের একটি মস্তবড় বাধা অপসারিত হতে পারে।

ভূমিকা

বাসুদেব পাল

পর্দ্দা, সে তো ছিঁড়্‌বেই
দেয়ালের ছবি নাচবেই।
রুদ্ধ-গরাদ ঘুঝ্‌বে;
তবু কি বাতাস বুঝ্‌বে···?

মস্করা। সে তো সহজ নয়!
মৌশুমি-বায়ে তাই কি ভয়?

হুঁশিয়ার যত হ'তেই যাও
হাল্ ভাঙ্‌বেই ভাসিয়ে নাও!

প্রেম-প্রেম খেলে ভেঙেছে ভয়
এবারের-আশা তাইতো 'জয়'!
তাই বলি,—চোখ মুছো না আর
উঠুক মুনি বারংবার॥

উত্তরবঙ্গের একখানা প্রাচীন পুঁথি "ইন্দ্র রাজসূয় যজ্ঞ"

শ্রীসুরেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য

পুঁথি ১২৩০ সালে নকল করা হইয়াছে।

পুঁথিতে—"হেনত অদ্ভুত নর শুন একমনে।
দশরথ জর্ম কথা গর্গমুনিভনে॥

প্রভৃতি ভনিতার কবির নাম "গর্গমুনি" পাওয়া যায়। পুঁথির মধ্যে "বৈকুণ্ঠনাথ" নাম পাওয়া যায়—মনে হয় এই বৈকুণ্ঠনাথই পুথির লেখক। কবি বা লেখকের আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। পুঁথির ভাষা দেখিয়া মনে হয় কবি উত্তরবঙ্গের অধিবাসী।

["তুমাক পিতাক মারিঞা গদাধরে"। অকুমারী ভয়ে মুনি আশ্রমন হইল। অনেক অস্তুতি কৈল ভাই দুই জনে। অসুরের হাতে মাও কর প্রতিগার"। ইত্যাদি]

ইন্দ্ররাজসূয় যজ্ঞের কবি নানা পৌরাণিক উপাখ্যান অবলম্বনে নিজ কল্পনায় এক অদ্ভুত কাহিনী বা নব পুরাণ রচনা করিয়াছেন। জনসাধারণ যাহাতে এই উপাখ্যানকে পুরাণের মর্যাদা দান করে মনে হয় এই জন্য কবি নিজ নাম বা পরিচয় প্রভৃতি গোপন করিয়া "গর্গমুনি' এই ছদ্মনাম ব্যবহার করিয়াছেন। পুঁথি সম্পূর্ণ।

পুঁথির প্রথমে—

অসুর নাসনি বন্দো বন্দো যে অভয়া।
চৌসটী জোগিণী বন্দো বন্দো নয়ানা গিরি।
দেবী মহেশ্বরী বন্দো কুলের গঙ্গেশ্বরী॥

ইত্যাদি দেব স্তুতি করিয়া মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে। স্তবস্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া নারায়ণ বরদান করিলেন।

বর পাঞা মুনির পুত্র আনন্দিত হৈল।
ইন্দ্র পুরাণ কবি রচিতে বসিল॥
মাথা এ বন্দিয়া সরস্বতীর চরণে।
ইন্দ্ররাজ সুই কহে ব্যাসের নন্দন॥

মুল কাহিনী—

দুষ্ট দমন করিতে ভগবান রাম রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার সাহায্যের জন্য দেবতারাও বানর রূপে আসিয়াছেন। বানরসৈন্যের সহায়তায় রাম রাবণ বধ করিয়া সকলকে লইয়া অযোধ্যায় আসিয়াছেন।

বানর রূপে বসে দেব শ্রীরামের সনে।
সুখে বসন্তি রাম নইঞা বন্ধুজনে॥
পাছে স্বর্গ আরোহণ কইল গদাধর।
সকল দেবতা গেলন তার দোসর॥

নর বানররূপেই সকলে স্বশরীরে স্বর্গে আসিয়াছেন। আনন্দে দেবতারা তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন। নর ও বানরের আলিঙ্গনে দেবতাদের শরীরে দুর্গন্ধ হইল। আমাদের লোক কল্পনায় এই ভাবে মর্ত্যের ধূলির স্পর্শে মলিন মানুষও বানরের আলিঙ্গনে স্বর্গ লোকচারী দেবতাদের শরীরও দুর্গন্ধে ভরিয়া যায়। জনসাধারণ তাঁহাদের কল্পনায় মানুষ ও দেবতার ভেদরেখা নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিতে পারিয়াছেন বলিয়াই দেবতা আর মানুষ আমাদের সাহিত্যে পরস্পরের নিকট-সংস্পর্শে আসিতে পারিয়াছে। "ইন্দ্র রাজসূয়যজ্ঞ" কাব্যে দেবতা আর মানুষের এই নিবিড় মিলন উজ্জ্বল রেখায় চিত্রিত হইয়াছে।

দেবতারা ব্যাকুল হইয়া ব্রহ্মার নিকট যাইয়া বলিলেন—

আমা সভার সরির গন্ধ করে কী কারণে।

ব্রহ্মা তখন—

হাসিঞা বোলেন তুমরা না কর আক্ষেপ।
মর্থে জর্ম লইল হইঞা এ নর বানর।
সেই নর বানর দেহ পাইঞা অতিশয়।
ব্রহ্ম বদ্ধ্য পাপতাতে হইল মিশ্রয়॥
দুই পাপে একত্র হইঞা মিসাল।
দিপ্ত হইঞা গন্ধ তাহে নিকল বিসাল॥

এই পাপ মুক্তির জন্য ব্রহ্মা দেবতাদিগকে রাজসূয় যজ্ঞ করিতে উপদেশ দিলেন।

জগ্য আরম্ভনা কর ক্ষীরোদের তীরে।
আনিঞা পক্ষিনি ঘোড়া এড় সভাতলে।
জে হইব বলবন্ত ঘোড়া ধরি নিবো।
তাহা জিনি নিষ্কণ্টকা করি ত্রিভুবন ভুঞ্জিবো॥

যজ্ঞ আরম্ভ হইল—

অধিবাস কৈল ইন্দ্র মুনিগণ নেঞা।
অধিবাস কৈলত সুরভী দুগ্ধ দিঞা॥
সভাতে আনিল ঘোড়া মুনির বচনে।
এড়ি বত ঘোড়া গর্গমুনি ভনে॥

এদিকে অসুররাজ চিত্ররথ পিতৃবৈরী নারায়ণকে বধ করার জন্য নানাস্থানে অম্বেষণ করিতেছে।

এই চিত্ররথের জন্ম বৃত্তান্তকে কবি আপন কল্পনায় এক অপূর্ব পৌরাণিক কাহিনীর রূপদান করিয়াছেন

পৃথিবী জলময়—

ত্রিভুবন জল উদরে সুইঞাছিল হরি।

সেখানে পৃথিবী সৃষ্টির বাসনায় তিনি উদ্বেল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার কাণ হইতে মধুকৈটভের জন্ম হইল।

তাহার চারিদিকে জল ভিন্ন অন্য কিছু না দেখিয়া—

মায়া পাতি দুইজন এক নারী পুত্র।
মধুবীর নারী পুত্র কৈটভে ভুজঙ্গ॥
হেন মতে সম্ভোগে মধুর গর্ভ হৈলো।
অঙ্গ চিরি সেই শিশুক বাহির করিল॥

মধুকৈটভ শিশুপুত্র নিয়া বেড়াইতেছিল। হঠাৎ নারায়ণকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। যুদ্ধে তাহারা দুজনই নিহত হইল। তাহাদের রক্ত মাংসে সৃষ্টি হইল এই পৃথিবীর।

পৃথিবীর সৃষ্টি, এই নবসৃষ্ট পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব নিয়া আদিম কালের মানুষ কত ভাবেই না কল্পনা করার চেষ্টা করিয়াছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। এই কাব্যেও দেখি মধু ও কৈটভের রক্তমাংসে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে। তারপর মানুষের জন্মরহস্যকে অদ্ভুতভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা এই কাব্যে লক্ষ্য করা যায়। মান্ধাতার জন্ম বৃত্তান্ত কবি কল্পনার এই অদ্ভুত গতিকে সম্ভবতঃ নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে।

মধুকৈটভ এইভাবে নিহত হইলে তাহাদের পুত্র চিত্ররথ পৃথিবীর বাহিরে অন্ধকারময় স্থানে তপস্যা করিতে লাগিলেন। তাহার কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব তাহাকে বরদান করিলেন।

চিত্ররথ বিশ্বকর্মার দ্বারা নগর নির্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। সমস্ত অসুর এখন চিত্ররথের অধীন। অসুরদের পরামর্শে চিত্ররথ দ্রুপদ-রাজ্য আক্রমণ করিলেন। দ্রুপদরাজ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। দ্রুপদের ধনরত্ন ও কন্যা দন্তাবতীকে লইয়া নিজ রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। দন্তাবতীর গর্ভে চিত্ররথের এক পুত্র হয়—

শুনহ তাহার জর্ম অদ্ভুত কথন।
শুম্ভে দেবী এ পূর্বে হইছিল রণ॥
সেই শুম্ভ রাজা মৈল মহামায়ার শেলে।
সেই শুম্ভরাজা জর্মে দন্তাবতীর উদরে॥

চিত্ররথ এই পুত্রের নাম রাখিল দুঃশীল।

এই দুঃশীল—

গোমতীর তীরে গিয়া সেবন্তী শঙ্করে।
নিরাহারে কৈল সেবা দ্বাদশ বৎসরে॥
সাক্ষাৎ হইয়া শিব দিল তাকে বর।
শম্ভুর বরে হৈল রাজা অজএ অমর॥

নারায়ণের অনুসন্ধানে চিত্ররথ স্বর্গে আসিয়াছেন—

স্বর্গপুরী গিঞা রাজা কৈল পাতাপাতি।
তথা না পাইল বৈরী দেবতা শ্রীপতি॥

ইন্দ্রআদি দেবতারা যজ্ঞ স্থলে, স্বর্গে কেবল দেবপত্নী ও দেবকন্যারাই আছেন। ক্রোধে চিত্ররথ ইন্দ্রের কন্যাকে অপহরণ করিল।

নারদের নিকট কন্যা অপহরণের কথা শুনিয়া—

যজ্ঞ হনে উঠে ইন্দ্র যুঝিবার মনে॥
তবে ত সে গদাধর ইন্দ্রের হাত ধরি।
কহিল কথন কিছু পরাভব করি॥
শুন শুন ইন্দ্র তুমি আমার উত্তর।
মারিতে নারিবে তুমি চিত্র নৃপবর॥
শঙ্করের বরে দুষ্ট হইল অমর।
আমার অবধ্য হইল শতেক বৎসর॥
এতেক প্রভুর বাক্য শুনিয়া পুরন্দর।
বিরস বদনে যজ্ঞ করে বজ্রধর॥

নারদ চিত্ররথকে বলিলেন—বিনা যুদ্ধে এই যজ্ঞের অশ্ব আনিয়া তুমি যজ্ঞ কর—তাহা হইলে তুমি পৃথিবীতে এমন কি দেবতাদেরও অজেয় হইবে। চিত্ররথ পুত্র দুঃশীল দেবতার ছদ্মবেশে এই ঘোড়া চুরি করিল। যজ্ঞ পণ্ড হইল।'

দেবতাদের সহিত ইন্দ্র অমরাবতীতে আসিয়াছেন। মনের দুঃখে উদ্যানে বসিয়া আছেন।

সিংহাসনে না বৈসে ইন্দ্র না বোলে উত্তরে।
লজ্জায় না জাত্র ইন্দ্র শচীর মন্দিরে॥

ইন্দ্র আসিয়াছেন শুনিয়া শচী—

ইন্দ্রক ভছিল আসি গড় আর হঞা॥
ধিক্ ধিক্ পরাণ প্রভু তুমার বীরে।
তুমাক রহিতে পুত্রিক হরিলে নিশাচরে॥
[গড় আর হঞ—ঘার বাঁকাইয়া]

তখন—

ইন্দ্রের করুনা দেখি বোলে প্রজাপতি।
না কর কন্দন তুমি শুন নরপতি॥
দিন কত রহ ইন্দ্র কন্যার হরণ।
অকস্মাত হইব এই দুষ্টের নিধন॥
থর নদী স্রোত জার অবশ্য বালুচরে।
হেন মতো হৈব পাপ মরিব সত্য রে॥

চিত্ররথও যজ্ঞ আরম্ভ করিল। নারদ ইন্দ্রকে এই যজ্ঞ পণ্ড করিতে উপদেশ দিলেন। দেবতারা চিত্ররথকে আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধে ইন্দ্র আদি দেবতারা বন্দী হইলেন।

নারদ গোপনে কারাগারে আসিয়া দেবতাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—

দৈবেত করিল হেন খণ্ডান না জায়।
জেমতে মরিব পাপ বোলি যে উপায়॥
রঘুকুলমণি আছে ভাই অষ্টজন।
লবকুশ আদি তারা হরির নন্দন॥
তাহাকে আনিলে হয় দুষ্টের মরণ।
না হয় কাতর ইন্দ্র স্থির কর মন॥

ইন্দ্র তখন করজোড়ে বলিলেন—

বহ্মানের ঘাত্রপ্রাণ জাগ্রত আমার।

ঝাটে রক্ষ্যাকর জস থাকিব তুমার॥

নারদ দেবতাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া কৈলাসে আসিয়া পার্বতীকে দেবতাদের দুর্দশার কথা বলিলেন। পার্বতী দুঃখে ও ক্রোধে শিবকে বলিলেন—

নাজ নাই পাগলা বেড়াহ দিগম্বর।

জাক তাক বর দিঞা করহ অমর॥

মহাদেব বোলি নাম পাড়োহ কোন কামে।

ডুবাইতে দেবের পুরী ভাঙ্গের ভরমে॥

এই তিরস্কারে শিব বৃষে আরোহণ করিয়া চিত্ররথের নিকট চলিলেন। শিবের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া পার্বতী—

নারদের হস্ত ধরি বাক্য বলন্তি।

শুন সাবধানে বাপু আমার আদেশ।

সতরে চলহ নবকুশ রাজার দেশ॥

কুশ চন্দ্র কেতু নিহ করিঞা জতন।

তাহা হৈতে হৈব এই দুষ্ট নেবারণ॥

এই অসুরের নিধন সাধারণ বাণে হইবে না—সরস্বতীর নিকট অতি গোপনে মায়াচক্রবাণ আছে। সেই বাণে এই অসুর নিহত হইবে।

পার্বতীর উপদেশে কুশ চন্দ্রকেতুকে লইয়া স্বর্গে আসিয়াছেন। নারায়ণের নিকট ইহাদের পরিচয় পাইয়া লক্ষ্মী সরস্বতী আনন্দে—

দুই শিশু তুলি বৈসায় জানুর উপর।

এই স্থানে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে—

এত শুনি কুশ বোলে হোয় সাবধান।

চিত্ররথ মারিতে দেহ মায়া চক্রবাণ॥

চিভুবন জিনিঞা দুষ্ট খটাইল ঘরে।

আছোক অন্যের কার্জ ইন্দ্রক বন্দী করে॥

দেব হিত চিন্ত মাও দেহ চক্র বাণ।

অসুর বধ গেলে হোয়ে সর্বত্রে কল্যাণ॥

[খটাইল ঘরে—দাস করিল]

তখন সরস্বতী—

নেহ মায়াচক্র পুত্র ছয় মাসের তরে॥

মায়াচক্র ভেদ পুত্র না বোলিহ কাহারে।

অসুরা মারিঞা চক্র দিহত আমারে॥

"মায়া চক্র বাণ" লইয়া তাঁহারা বৈকুণ্ঠ হইতে যাত্রা করিলেন। পথে বিভীষণের নিকট "মৃত্যুবাণ" লইয়া চিত্ররথের রাজ্যে আসিলেন। কুশ চন্দ্রকেতু গোপনে সরোবর তীরে থাকিলেন। সেই সরোবর তীরেই চিত্ররথ নানা রাজ্য জয় করে পাঁচজন রাজকন্যা বন্দী করে রাখিয়াছে। কুশের অনুমতি লইয়া চন্দ্রকেতু এই পাঁচ কন্যা বিবাহ করিলেন। কুশ বিবাহ করিলেন না।

নারদের অবাধ গতি। গোপনে কারাগারে দেবতাদিগকে তাঁহাদের আগমন সংবাদ দিলেন। আবার চিত্ররথের নিকট যাইয়া বলিলেন—

জগ্য দেখিবারে আইলো তোমার নিলয়॥

এত দিনে জগ্য কেনে না কর সমাধান।

নারদের উপদেশে চিত্ররথ "জয় পত্র" লিখিয়া ঘোড়া ছাড়িয়া দিলেন। অশ্বের রক্ষক দুঃশীল। অশ্ব নানা রাজ্য ভ্রমণ করিল—

চিত্ররথের নামে ঘোড়া কেহ না ধরে।

ত্রিভুবন ভম্মাইঞা ঘোড়া দুঃশীল বীরে।

ঘোড়া লইঞা প্রবেশিল আপনার পুরে॥

জয়পত্র পড়িয়া চন্দ্রকেতু ঘোড়া ধরিলেন। যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে দুঃশীল নিহত হইল। ক্রমে চিত্ররথের অন্যান্য সেনাপতিরাও নিহত হইল। তখন চিত্ররথ নিজেই যুদ্ধে আসিল। ভক্তকে রক্ষা করিতে স্বয়ং শিবও যুদ্ধ করিতে আসিলেন। কুশ ও চন্দ্রকেতুকে সাহায্য করিতে মুচুকুন্দ রাজাও যুদ্ধ ক্ষেত্রে আসিলেন।

ভীষণ যুদ্ধ চলিতে লাগিল। কিন্তু জয় পরাজয় নির্ণয় হয় না। তখন বায়ুরূপে নারায়ণ আসিয়া বলিলেন—

শিব সে থাকিলে নহে চিত্রের মরণ॥

এক তিলের তরে যদি কাটহ শঙ্কর।

তবেত জিনিতে পার চিত্র নিজ্জ বর॥

নারায়ণের উপদেশে কুশ চন্দ্রকেতু আকাশে উঠিয়া মায়া যুদ্ধে শিবের মাথা কাটিলেন। তার পর চিত্ররথকে বধ করিয়া দেবতাদিগকে উদ্ধার করিলেন।

মুক্ত হইয়া দেবতারা আনন্দ উৎসব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা পুনরায় শিবের জীবন দান করিলেন। শিব জীবিত হইয়াই ভক্ত চিত্ররথের মৃত্যুতে শোকার্ত হইয়া পুনরায় যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলে ব্রহ্মা তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন।

দেবতারা চিত্ররথের অপর পুত্র কালযবনকে রাজা করিয়া অমরাবতীতে আসিয়াছেন। আনন্দোৎসবে কিছু দিন কাটিল।

ব্রহ্মার উপদেশে ইন্দ্র পুনরায় সেই অসমাপ্ত যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন।

রাজা মুচুকুন্দ, কুশ, চন্দ্রকেতু এখন নিজ নিজ রাজ্যে আসিবেন; ইন্দ্রের নিকট বিদায় চাহিলেন। তখন ইন্দ্র সকলকে বর দিতে চাহিলেন—

মুচুকুন্দে বোলিল তবে যদি দিবেন বরে।

তুমার বরে নিদ্রা মুঞি জাঙ নিরন্তরে

কাচা নিদ্রা জেই মোর করিব ভঞ্জন।

আমা দরশনে ভস্ম হৈব সেই জন॥

ইন্দ্র তাঁহাকে এই বর দিলেন কুশকে বলিলেন—

বিষ্ণুর নন্দন তুমি বিষ্ণুর সমান।

তুমাক বর দিতে নাহি আমার পরান॥

তবু বর দিবো তোমাক দৃঢ় কৈল মনে

জেবর মাঙ্গিব তাহা দিব তৎক্ষণে॥

কুশ বলিলেন—

ভুমার বরে নিবংশ মুক্তি হওত জগতে।
পূর্ব বংশে পুরুষ মোর জতেক হৈল।
রিন কর্জ থুইঞা তারা সর্বণাশ হৈল ॥

* * *

দেব রিণ পিতৃরিন আর বিপ্র রিনে।
আমিত সুঝিব রিন বংশ অবসানে।
বেদ রিন সুঝিল এই বধিঞা অসুর গণে।
জগ্য করি তুষিব ব্রাহ্মণের রিণে ॥
ভোজ্য করি সুঝিব কুটুম্বের রিণে।
জাহা হৈতে নিস্তরে মোর পর পিতৃগণে ॥
বংশ হৈলে রিন থাকে শুন সুররায়।
সুপুরুষ হৈলে পাছে সে রিন খণ্ডায় ॥
সংসারের মধ্যে রিনক বড় ডর।
জন্মে জন্মে নাহি খণ্ডে বাঢ়ে ততপর ॥

কুশের প্রার্থনায় ইন্দ্র তাঁহাকে এই বরই দিলেন।

চন্দ্রকেতুর ছয় পত্নীসহ কুশ, চন্দ্রকেতু অযোধ্যায় আসিয়াছেন। দীর্ঘদিন পর আবার সকলে মিলিত হইয়াছেন। নানারূপ উৎসব চলিতেছে; এমন সময় কিরাত-রাজ মেঘনাদ তাঁহার ছয় কন্যা বিবাহ দিতে আসিলেন। কুশ বিবাহ করিলেন না। চন্দ্রকেতু পূর্বেই বিবাহ করিয়াছেন। তখন এই ছয় কন্যার মধ্যে মেঘবতীকে লব, চন্দ্রকান্তিকে, লক্ষ্মণ পুত্র ভাস্কর, কৃত্যাবতীকে ভরত পুত্র পুস্কর, সুবাহু রতিবতীকে, শত্রুঘ্নপুত্র শত্রুঘাতি সুরভীকে, অঙ্গদ হেমবতীকে বিবাহ করিলেন।

বিবাহের পর নারদের উপদেশে রাজসূয় যজ্ঞ করিলেন। পৃথিবীতে বাস কালপূর্ণ হইয়াছে। স্বর্গ হইতে ব্রহ্মা রথ পাঠাইয়াছেন। সুমন্ত্র সারথির পুত্র "লোচনকে অযোধ্যার রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া লব আদি আট ভাই পত্নীগণসহ অগ্নিতে মানবদেহ বিসর্জন করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন।

পৃথিবীতে আবার দৈত্য দানবের অত্যাচার আরম্ভ হইল। লোকের ধর্মকর্ম লোপ পাইল। উৎপীড়িত পৃথিবীর আকুল ক্রন্দনে ব্যাকুল হইয়া ব্রহ্মা বিষ্ণুকে অনুরোধ করিলেন—মর্ত্যে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করিতে। মধ্য যুগের অসহায় সাধারণ মানুষ যেমন সকল কাব্যেই অত্যাচারী শাসকের হাত হইতে মুক্তিলাভের জন্য দেবতার প্রসন্ন রূপ কল্পনা করিয়া পরম তৃপ্তি পাইয়াছে, এই কাব্যেও তেমনি বিষ্ণুর প্রতি পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের জন্য ব্রহ্মার আদেশ ধ্বনিত হইয়াছে।

বিষ্ণু তখন দশরথকে বলিলেন—

বেগ্রসেন গোপ তার নারী তারাবতী।
তার ঘরে জন্ম গিয়া লেহত নৃপতি ॥
বসুদেব বুলি নাম ঘুসিব সংসারে।

* * *

এক অংশে জন্ম নেহ মথুরা নগরে।
নন্দ ঘোষ বুলি নাম হইব তুমারে ॥
বসুদেব ঘরে মুই জনম লইয়া।
থাকি নন্দের ঘরে কংশক ছলিয়া।

কৌশল্যাকে বলিলেন—মথুরার রাজা উগ্রসেন অপুত্রক, তাহার ঘরে তুমি জন্মগ্রহণ কর।

তোমার উদরে জন্ম হইব আমার।
দৈবকী বুলিয়া নাম হইব তুমার ॥

কৈকেয়ীকে বলিলেন—

যদুসেন গোআল আছে গোকুল নগরে।
তুমি জন্ম নেহ দেবি তাহার ঘরে ॥

* * *

দৈবকীর গর্ভে আমি জনম লইয়া।
থাকিব তোমার ঘরে কংসক ভাণ্ডিয়া ॥

সুমিত্রাকে বলা হইল—

রোহিনাথ গোপ আছে মথুরা নগরে।
তুমি জন্ম নেহ গিঞা তাহার ঘরে ॥
রোহিণী বোলিয়া নাম হইবেন তুমারে।
এক অংশে জন্ম মোর তোমার উদরে ॥

তার পর বিষ্ণু, লব, কুশ প্রভৃতি আট ভাইকে বলিলেন—তোমরা অপুত্রক পাণ্ডুরাজমহিষী কুন্তী ও মাদ্রীর গর্ভে পঞ্চপাণ্ডব রূপে জন্মগ্রহণ কর। আট ভাই পাঁচ ভাই হইয়া কিরূপে জন্মগ্রহণ করিবেন? কবি নিজ কল্পনায় অপূর্বভাবে ইহার সমাধান করিয়াছেন—

লবকে বলিলেন—

ধর্মের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে তোমার জন্ম হইবে।
"পৃথিবীর মধ্যে নাম হৈব যুধিষ্ঠির"।

ভাস্কর পুস্কর ও অঙ্গদ তিন ভাইকে বলিলেন—

তিন হু প্রবেশ সে পবন কলেবর ॥
পবনের বীর্যে আর কুন্তীর উদরে।
ভীম সেন বুলি নাম হইব তুমারে ॥

কুশ, চন্দ্রকেতুকে বলা হইল—

দুইজন এক হইয়া জন্ম পৃথিবীতে।
ইন্দ্রের বীর্যে কুন্তীর উদরে।
অর্জুন বুলিয়া জন্ম হইব তুমারে ॥
ভুমি ভার খণ্ডাইতে তুমি যুধাপতি।
তুমির পক্ষ হৈয়া আমি হইব সারথি।

সুবাহু, শত্রুঘাতীকে বলিলেন—

প্রবেশহ অশ্বিনি কুমারের শরীরে ॥
অশ্বিনি কুমার বীর্যে মাদ্রীর উদরে।
নকুল সহদেব নাম হইব তুমারে

লব, চন্দ্রকেতু প্রভৃতি সাতভাইয়ের মেঘবতী প্রভৃতি দ্বাদশ পত্নী ও স্বামীর সহিত মর্ত্যে গমন করিতে বলিলে—

বিষ্ণু বলিলেন—

দ্বাদশ কন্যা এ হোয় এক কলেবর।
একত্র হঞা জন্ম গিয়া মহীর ভিতর ॥
পঞ্চস্বামী মধ্যে তুমি হৈবা এক নারী।
তুমা হেন পুণ্যবতী নাই তিন পুরী ॥

ইহা শুনিয়া মেঘবতী বলিলেন—

পঞ্চস্বামীর এক নারী বহুল থাকার।

বিষ্ণু তখন বলিলেন—

তুমারে আনিবে অর্জুন তেষ্যা রাধাচক্রে ॥
মায় অগ্রসনে তুমা নয়া পঞ্চজনে।
এক বস্তু পাই বুলি কহিবেন কানে ॥
কুন্তী এ কহিব যেই পাইলা বস্তু যোগ।
সেই দ্রব্য পঞ্চ ভাই কর উপোভোগ ॥
মাএর বাক্য কেহো নারিল লংঘিতে।
পঞ্চভাএ তুমাক বিভা করিবেন তবে ॥
শিঘ্রে জন্ম নেহ গিয়া দ্রুপদের ঘরে।
দ্রৌপদী বুলিয়া নাম হইব তুমারে ॥

তারপর লক্ষ্মী সরস্বতীকে বলিলেন—

শুন মহাদেবি লক্ষ্মী আমার বচন।
এক অংশে জন্ম গিয়া ভীষ্মক ভুবন ॥
আর সাত অংশে জন্মিহ রাজ ঘরে।
স্বয়ম্বর করি বিভা করিবো বারে বারে ॥
শুন সরস্বতী তুমি আমার বচন।

* * *

ছত্র অবতারে লক্ষ্মী আমার সংহতি।
ভুঞ্জিল সংসারে সুখ পরম পিরিতি ॥
এই অবতারে সে তুমাক সঙ্গে নঞা।
ভুঞ্জিব নানা সুখ ভুমি ভার খণ্ডাইঞা ॥
তুমি জন্ম নেহ গিঞা সত্রাজিত ঘরে।
সত্যভমা বুলি নাম হইব তুমারে ॥

বিষ্ণুর উপদেশ মত সকলেই মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করিলেন।

কংস ও পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে—দুঃশীল নামে (পুরাণে সৌভপতি দ্রুমিল) এক দৈত্যরাজ উগ্রসেন পত্নী মলয়ার রূপে মুগ্ধ হইয়া উগ্রসেনের ছদ্মবেশে তাহাকে উপভোগ করে—তাহাতেই কংশের জন্ম। মলয়া পরে জানিতে পারিয়া অভিশাপে দুঃশীলকে ভস্ম করে। উগ্রসেন ও মলয়ায় নিকট সমস্ত জানিয়া—

'কোপে উগ্রসেন পুত্র না করেন্তি কোলে'।

কংসও মাতার নিকট সমস্ত জানিয়া কঠোর তপস্যায় মহাদেবকে তুষ্ট করিলেন। মহাদেব বর দিতে চাহিলে কংস বলিল—পৃথিবীর মধ্যে আমিই যেন শ্রেষ্ঠ রাজা হই।

আর—

যদি বা মরণ মোরে থোয় উমাপতি।
আপনি আমাক যেন বধোন শ্রীপতি ॥
মিত্র হইয়া ভাবিলে ঝাটে মুক্তি নত্র।
শত্রু হইয়া চিন্তিলে ঝাটে মুক্তি হত্র ॥

মহাদেব এই বরই দান করিলেন। কংস পূর্ব জীবনে কালনেমি ছিল। রাজা হইয়া কংস জরাসন্ধের কন্যাকে বিবাহ করিল। পৃথিবীতে নানারূপ অত্যাচার আরম্ভ হইল। এই স্থানে পুঁথি সমাপ্ত হইয়াছে।

পুঁথি বড়। সংক্ষেপে পুঁথির বিবরণ দেওয়া হইল। কবি ঘটনা-প্রসঙ্গে পৌর্বাপর্য রক্ষা করিয়া নানা পৌরাণিক কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন, কিন্তু প্রায় সর্বত্রই আপন কল্পনায় কাহিনীগুলিতে নূতন রূপই দান করিয়াছেন।

পুঁথিতে—মাধবী, গুঞ্জারী, পাহাড়ী, তোড়ী প্রভৃতি রাগের উল্লেখ আছে। মনে হয় জনগণের আনন্দ দানের মাধ্যমে শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বও পাপ পুণ্যের ফলাফল দেখানোর জন্য একসময়ে এই পুরাণও পাঁচালীর মতোই গান করা হইত।

বিশেষ বিশেষ উপাখ্যানের শেষে ও পুঁথির শেষে ফলশ্রুতিতে পাওয়া যায়—

হেন কথা অমৃত শুনহ এক মনে।
রোগীর খণ্ডিব রোগ বন্দির বন্ধনে
হেনত অমৃত কথা যে বা জনে গাএ।
তাহাকে আনিতে ইন্দ্র বিমান পাঠাএ
যত জন করে আর যতেক গো দান।
তত ধর্ম্ম হত্র শুনে ইন্দ্রহই পুরাণ ॥

কোচবিহারের ইতিহাসে পাওয়া যায়—কোচবিহরের মহারাজ নরনারায়ণ (১৫৪০—১৫৮০ খৃঃ) বেদপুরাণ প্রভৃতি জাতীয় সম্পদ জনসাধারণের বোধগম্য সহজ সরল ভাষায় লেখার জন্য পণ্ডিতবর্গ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মনে হয় ইহা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া স্থানীয় ভাষাতেও নানা পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে এই সমস্ত পুঁথি লেখা হইয়াছিল।

"ইন্দ্র রাজসূয় যজ্ঞ" পুঁথিতে কবির কল্পনা ধ্যানধারণা অপূর্ব প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশিত। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও বিবিধ পৌরাণিক কাহিনীর সংমিশ্রণে কবি যে "নব পুরাণ" রচনা করিয়াছেন তাহাতে কবিকল্পনার সংগে যুক্ত হইয়াছে কবির মননশীলতা পাণ্ডিত্য (অথচ পুঁথির কোন স্থানে উক্ত বৈদগ্ধ্য প্রকট নয়)—কবি আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া অতি সন্তর্পণে সুশৃঙ্খলিতভাবে গ্রন্থটি রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থে হয়ত কবি কল্পনার উদ্দাম বিকাশ অথবা উচ্চাঙ্গ কবি কৃতির পরিচয় সর্বত্র নাই, তবু আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত একজন অখ্যাত পল্লীকবির পক্ষে ইন্দ্র রাজসূয় যজ্ঞের মতো গ্রন্থ রচনা কম কৃতিত্বের পরিচয় নয়। কবির সংযম, মনন এবং কল্পনার প্রাচুর্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।
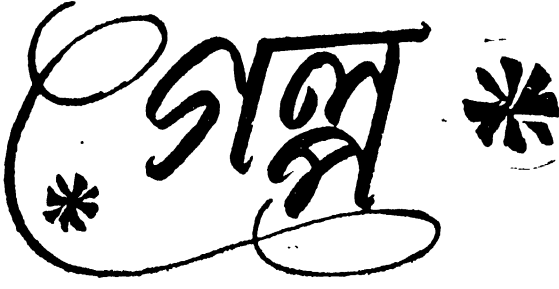
মন না মতি

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাড়ীতে বেশ হুলস্থুল পড়িয়া গেল। বিকাল বেলা কর্ত্তা কালীকিঙ্করবাবু সেভিংস ব্যাঙ্ক হইতে দেড়শত টাকা আনিয়া টাকাশুদ্ধ জামাটা দোতলায় শুইবার ঘরে আলনায় রাখিয়াছিলেন। সন্ধ্যাহ্নিক সারিয়া জামাটা পরিয়া নীচে বৈঠকখানায় নামিবেন—পকেটে হাত দিয়া বুঝিলেন টাকা কয়টা নাই। আশ্চর্য্য হইয়া সব পকেট কয়টা দেখিলেন—না, টাকা কয়টা অদৃশ্য হইয়াছে।

উপরের ঘরে বাহিরের কেহ আসে না। বাড়ীতে থাকে তিন বউ, গৃহিণী, আর বড় ও মেজ দুই ছেলে। ছোট ছেলে ওকালতী পাশ করিয়া সদরে বসিয়াছে। শনি রবিবার বাড়ীতে আসে। বড় ও মেজ ছেলে বাড়ীতে থাকে—বিষয়-কর্ম, চাষবাস দেখে। মেজবৌ আসন্নপ্রসবা, সেই জন্যই ডাক্তার ও ধাই-এর খরচের জন্য টাকা কয়টা কালীকিঙ্করবাবু পোস্ট আফিস হইতে তুলিয়া আনিয়াছিলেন। বড়-বউ বিকাল হইতেই নীচের রান্নাঘরে গিন্নীর সঙ্গে দুধ জ্বাল দেওয়া ও রান্নাবান্নার জোগাড় লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। ছোট-বউ বছরখানেক এ বাড়ীতে আসিয়াছে। ইহার মধ্যেই বুঝা গিয়াছে এ বাড়ীর চালচলনের সঙ্গে তাহার মিল খায় না। এ বাড়ীর ধারণায় শহুরে ছোট-বউ শ্রীলতা "হাল-ফ্যাসানী" মেয়ে; উনুনের ধারে বেশীক্ষণ কাজ করিলে তাহার ফিট হয়; বিবি সাজিয়া নভেল পড়িতে সে ভালবাসে। নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া সে লতার মতই দুর্ব্বল ও 'সোহাগী'। শাশুড়ী ও জায়েরা ইদানীং এরূপ ইঙ্গিতও করিয়া থাকেন যে অন্যান্য ভাইদের অপেক্ষা তাহার স্বামী শিক্ষিত ও সম্প্রতি দু-চারটা কাঁচা পয়সা রোজগার করিতেছে তাই শ্রীলতার 'দেমাক।' সাধারণতঃ শ্রীলতা উপরেই থাকে, তাহার পাশের ঘরেই আসন্ন-প্রসবা মেজ-বউ থাকে, কাজেই কতকটা তাহাকে দেখা-শুনাও সে করে। আর বাড়ীতে আছে পুরাতন চাকর ভোলানাথ। আঠার বৎসর বয়সে সে এ বাড়ীতে চাকরীতে ঢুকিয়াছে—এখন তাহার বয়স প্রায় পঞ্চাশ। এই দীর্ঘ বত্রিশ বৎসরে নানা ব্যাপারে তাহার সততা পরীক্ষিত হইয়াছে। দেড়শত টাকা ত দুরের কথা—গিন্নী যখন এ বাড়ীতে বধু ছিলেন তখন কত সময় তাহার গহনা বিছানায়, স্নানের ঘরে, চুল বাঁধার সময় পড়িয়া থাকিত; ভোলানাথ তাহা দেখিতে পাইয়া আনিয়া দিয়াছে। টাকাকড়ি দরকারী দলিল-পত্র ভোলানাথকে রাখিতে দিয়া কর্ত্তা নিশ্চিন্ত থাকিতেন। গৃহিনী বাপের বাড়ী গেলে ভোলানাথই সমস্ত খরচ চালাইত; কোন দিন কোন মিথ্যা খরচ সে লেখায় নাই বলিয়াই কর্ত্তার বিশ্বাস। নিজের ছেলেদের অপেক্ষাও কালীকিঙ্করবাবু ভোলানাথকে বিশ্বাস করিতেন; তাই চুরির ব্যাপারে ভোলানাথকে সন্দেহ করার কোন প্রশ্নই উঠিল না।

গৃহিণী চেঁচামেচি করিয়া বাড়ী সরগরম করিয়া তুলিলেন—"আমার বাড়ীতে চুরি! কি অলক্ষীর কাণ্ড। কখনও এমন হয় নাই। এত চুরি নয় ডাকাতি, বাঁটপাড়ি; ছ্যাঁচড়াম। বোঝাই ত যাচ্ছে কে চুরি কোরেছে। মেজবউ ত নিজের শরীর নিয়েই শশব্যস্ত; ও কি আর টাকা নিতে গেছে, না সেই ক্ষমতা আছে ওর এখন? ওর জন্যেই ত টাকা আনা; ও কিসের জন্যে নেবে। বড়-বউ আর আমি ত ছিলাম সারাক্ষণ নীচে। তারাপদ আর শঙ্কর ত সেই খেয়ে বেরিয়েছে; এখনও বাড়ীতেই ফেরেনি। অতগুলো টাকার কি ডানা গজাল, যে উড়ে গেল বাবুর পকেট থেকে! কে যে চোর—তা কি আর বোঝা যাচ্ছে না। শুধু ভাল ভাল শাড়ী পরে সেণ্ট মেখে বিবি সাজলেই ভদ্দর হয় না, ভদ্দর বংশে জন্ম নেওয়া চাই। বাপ মা ভদ্দর হওয়া চাই ইত্যাদি।

শ্রীলতা সবই শুনিল—তাহাকে শুনাইবার জন্যই ত বলা!

কিছুদিন হইতেই তাহার শরীর ভাল যাইতেছিল না—ডাক্তার তাহার স্বামী সুরেনকে গোপনে বলিয়াছিল শ্রীলতা স্নায়ুবিক রোগে ভুগিতেছে, মন অত্যন্ত দুর্ব্বল। মন যাহাতে প্রফুল্ল থাকে সেই মত যেন ব্যবস্থা করা হয়। সেই জন্যই শ্রীলতার জন্য কাপড় সেণ্ট ও নানা নাটক নভেল তাহার স্বামী আনিত। ডাক্তারের উপদেশেই উহা প্রয়োজন; তাহার মাকে বলিয়াই সুরেন ইহা করিত। তথাপি আধুনিকা বধুর এত 'আদিখ্যেতা' শাশুড়ী সহজ মনে প্রসন্নতার সঙ্গে গ্রহণ করিতে পারিতেন না। আজকের চুরিকে কেন্দ্র করিয়া সে অপ্রসন্নতা ফাটিয়া পড়িল।

* * *

রাত্রে কর্ত্তা খাইতে বসিয়াছিলেন। গৃহিণী পাশে বসিয়া এই দুঃসাহসিক চুরির কথা আলোচনা করিতেছিলেন। কর্ত্তা ধীর ভাবে পুনরায় কে এ চুরি করিতে পারে তাহা বিশ্লেষণ করিতে ছিলেন। বিশ্লেষণে দেখা গেল উপরে মেজ-বউ, ছোট-বউ ও ভোলানাথ ছাড়া ঐ ঘণ্টাখানেক সময়ের মধ্যে অন্য কেহ আসে নাই। কর্ত্তা চিন্তিতভাবে বলিলেন "কে জানে ভোলানাথ কিনা।" গৃহিণী প্রায় ধমক দিয়া উঠিলেন "ও কথা বোলতে তোমার বাধলো না। ও চিন্তা করলে ধর্মে সইবে না। কোনদিন ও কি কোন অবিশ্বাসের কাজ কোরেছে যে আজ তোমার ঐ সামান্য দেড়শ' টাকা ভোলা নেবে। ও চাইলে তুমি দিতে না ওকে টাকা—না কখনও দরকারের সময় চেয়ে টাকা পায় নাই ভোলা—যে চুরি করবে। চুরি কোরেছে তোমার সোহাগের ঐ ছোট মা।" ছোট বধুর অল্প বয়সের জন্য ও অসুস্থতার জন্য কালীকিঙ্করবাবু তাহাকে একটু বেশী স্নেহ করেন এ অভিযোগ ভিত্তিহীন নহে। ভোলানাথ পাশের ঘরে ছোট-বউয়ের বিছানা পাড়িতেছিল। শ্রীলতা জানলার শিক্‌ ধরিয়া বাহির দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সব কথাগুলিই তাহাদের কানে গেল—কারণ সকলের কানে দিবার জন্যই কথাগুলি বলা হইয়াছিল। শ্রীলতা ঘর হইতে বাহির হইয়া নীচে নামিয়া গেল।

শ্রীলতা শশুরের দুধের বাটীটা লইয়া উপরে আসিতেছিল। বৈকাল হইতেই বাড়ীতে যে আবহাওয়া সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে তাহার দম বন্ধ হইবার মত হইতেছিল। সত্যই ত ঘটনাচক্রে অবস্থা এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে সেই যেন ঐ টাকা চুরি করিয়াছে। ইহা ছাড়াও তাহার সম্বন্ধে এত বিষ যে এ বাড়ীতে জমা হইয়াছিল তাহা এতদিন সে বুঝে নাই। চুরিকে উপলক্ষ করিয়া এমন নির্লজ্জ ও বিশ্রী ভাবে সে বিষ ছড়াইয়া পড়িল যে লজ্জায় ঘৃণায় সে মৃত্যু কামনা করিতেছিল। এমন একজনও এ বাড়ীতে আজ নাই যে এই হীন অপবাদের প্রতিবাদ করে। তাহাকে একটু সমানুভূতি দেখায়, তাহার পক্ষ হইয়া একটা কথা বলে। বাড়ীর চাকরকে চোর বলিয়া সন্দেহ করা যায় না, অথচ তাদেরই সামনে পুত্রবধুকে ইহারা প্রকাশ্যে চোর আখ্যা দিতেছে। শ্রীলতার মাথাটা ঘুরিয়া উঠিল—হাত হইতে দুধের বাটীটা সশব্দে পড়িয়া গেল—সে দেওয়াল ধরিয়া কোন প্রকারে টাল সামলাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া পুনরায় একরাশ বাক্যবাণ তাহার উপর বর্ষিত হইল। অবশেষে শাশুড়ী হাঁকিয়া বড়-বউকে বলিলেন "তোমার শশুরের জন্যে আর এক বাটী দুধ আনো। ভগবান আছেন, তিনি ঐ নোংরা হাতের দুধ কর্ত্তাকে খেতে দিলেন না। আসুক সুরেন, কালই ওকে বাপের বাড়ী বিদেয় কোরব। চোর নিয়ে ত ঘর করা যায় না। আমার এ পুণ্যের সংসার—কালই এ পাপ ঝেঁটিয়ে বিদায় কোরব।"

শশুর কালীকিঙ্করবাবু নিঃশব্দে বিনা প্রতিবাদে এই কথাগুলি শুনিলেন। বাক্যবাণগুলি বড় বেশী কর্কশ হইতেছে বুঝিলেন—কিন্তু নতুন বধু যে নির্দোষ একথাও ঘটনা পরম্পরা বিচার করিয়া জোর করিয়া বলিতে পারিতেছিলেন না।

* * *

রাতের অন্ধকারে গ্রামের প্রান্তে একটি মাটির বাড়ীর দরজায় মৃদু করাঘাত হইল। শব্দের জন্য কেহ ভিতরে প্রতীক্ষা করিতেছিল—দ্বার তখনই খুলিয়া গেল। অন্ধকারের আবরণে লোকটি ঘরে নিঃশব্দে ঢুকিয়া পড়িল।

লোকটি ঘরে ঢুকিয়া এদিক ওদিক তাকাইয়া দেখিয়া লইল আর কেহ আছে কিনা। পরে মৃদু কম্পিত কণ্ঠে বলিল "পরী টাকা ক'টা দেত।" "কেনে?" বিস্ফারিত নয়নে প্রশ্ন করিল বিস্মিত পরী। "দরকার আছে। ওগুলো দে, তোকে আবার কয়েকদিন পরে টাকা দেব"—খিল

খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল পরী; ব্যঙ্গের স্বরে কহিল "কত টাকাই ত দিলে গো। কথার ছিরি দেখ। মাস মাস যেন তঙ্কা দেন। মাইনের টাকা অর্দ্ধেক পাঠাও ত ভাই-পোকে, আর অর্দ্ধেক যায় ত তোমার নিজের খরচে। আমায় আবার দিলে কবে?"

—"এই ত দিলাম···"

চোখ ঘুরাইয়া পরী কহিল "তাই তো রাত না পোয়াতেই ফেরত চাইতে এসেছো। তোমার টাকার মুখে আগুন; টাকা চেয়েছি কোনদিন? কপালে গের, তাই তোমার সঙ্গে ভাব করেছিলাম। গতর খাটিয়ে খাই, তোমার টাকার কি ধার ধারি?"

পরীর স্বর অভিমানে রুদ্ধ হইয়া আসিল। সে দেহ ব্যবসায়িনী নহে: সতীও নহে। বিধবা হওয়ার পর এই একজনকেই অবলম্বন করিয়া আছে। লোকটির অস্থির চিত্তে পরীর অভিমান দাগ কাটিতে পারিল না। সে ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল "দোব, আবার তোকে টাকা দোব, নয়ত হারই গড়িয়ে আনব। এখন টাকাগুলো দে।"
"সে টাকা ত আমি গোপাল সেঁকরাকে সন্ধ্যার সময় দিয়ে এলাম। এক ছড়া হার নিয়েছি, লকেটে তোমার নাম লিখতে দিয়েছি; কাল সকালে দেবে বলেছে"—
"ফিরিয়ে নিয়ে আয় পরী, ফিরিয়ে নিয়ে আয় টাকা। তোর পায়ে পড়ি। ও টাকা আমায় ফেরত দিতে হবে।"
"কেনে, তখন ত সোয়াগ করে বল্লে 'পরী হার চেয়ে ছিলি—এই লে টাকা, হার গড়াবি। ইরি মধ্যে আবার ফেরত চাইছিস কেনে?' "দোব দোব বোলছি ত হার গড়িয়ে দোব। এখন টাকা কটা চেয়ে আন, নয়ত হারটাই চেয়ে আন। হারটা বিক্রী কোরেও আমার টাকা চাই। যা—যা—"

এমন ধমকের সঙ্গে কথাগুলি উচ্চারিত হইল যে অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

* * *

অস্থির অপেক্ষার অবসান করিয়া পরী ফিরিল। সাগ্রহে লোকটী হাত পাতিল "দে।"

"গোপাল বাড়ীতে নাই। উয়োর ছেলেকে বলে এসেছি কাল সকালে টাকাটা আনব। ইকি চোল্লে যে, থাকবে না রেতে আজ?"

কোন কথা না বলিয়া লোকটী রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

* * *

ভোলানাথ কালীকিঙ্করবাবুর বাড়ীর সামনে আসিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। ব্যাপার কি? এত রাত্রে ঐ বাড়ীতে এতগুলি আলো? লোকজন যেন চলাফেরা করিতেছে অথচ কোন শব্দ নাই, সোর গোল নাই। খাওয়া দাওয়া সারিয়া কর্ত্তা ও গিন্নিরা শুইবার পর এক ঘণ্টাও হয় নাই সে বাড়ী ছাড়িয়াছে? ইহার মধ্যে কি হইল? হয়ত আসন্নপ্রসবা মেজ-বউ সন্তান প্রসব করিয়াছে। তাড়াতাড়ি ভোলানাথ বাড়ী ঢুকিল।

লণ্ঠনের স্তিমিত আলোয় দেখা গেল মেঝের উপর শ্রীলতার দেহ পড়িয়া আছে, তখনও ছাদের কড়ি হইতে নীলাম্বরী শাড়ীখানা ঝুলিতেছে; চেয়ারখানা মেঝেয় কাত হইয়া পড়িয়া আছে। শ্রীলতা মৃতা বা জ্ঞানহীনা বোঝা যায় না। ভোলানাথ চমকাইয়া উঠিল। বড়-বউমাকে একান্তে জিজ্ঞাসা করিল "একি হোল? হায় হায় কি করে তোমরা জানতে পারলে?"

"মেজ-বউ পাশের ঘর থেকে গোঙানীর আওয়াজ পেয়ে মাকে ডাকে। মা ডেকে সাড়া পায়নি; তাই শেষে দরজার খিল ভেঙ্গে দেখা গেল গলায় কাপড় বেঁধে ছোট-বউ ঝুলছে।" বড় ছেলে তারাপদ হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া খবর দিল--অম্বর ডাক্তার বাড়ীতে নাই। সন্ধ্যার ট্রেণে সদরে গিয়াছে।

কালীকিঙ্করবাবু অসহায় ভাবে ভোলানাথকে বলিলেন—ভোলা যা বাবা ষ্টেশনের ওপার থেকে হরিপদ ডাক্তারকেই একবার তাড়া-তাড়ি থেকে আন; তবু ত এল এম এফ পাশ। একটা সার্টিফিকেট ত দেবে। নইলে যে গুষ্টি-শুদ্ধর হাতেঃদড়ি পড়বে।" গৃহিনী অস্ফুট-কণ্ঠে রোদনের সুরে আর্ত্তনাদ করিতেছেন "কি কুক্ষণেই অলক্ষুণে বউ এনেছিলাম মা। সকলের হাতে দড়ি পড়াবে শেষে।" ভোলানাথ ব্যাপারটা বুঝিয়া ক্ষিপ্রগতিতে বাহির হইয়া পড়িল।

* * *

ভোর বেলায় ষ্টেশনে একটা সোর গোল উঠিল। মহা ভীড়। এমন সময় সদর হইতে ভোরের ট্রেণটা প্লাট-

প্রভাত-পরশ

ফটো : বিমল সরকার

সন্ধ্যারাগ

ফর্মে ঢুকিল তাহার যাত্রীদের ভীড়—পূর্ব্বের ভীড় আরও বাড়াইয়া তুলিল। কালীকিঙ্কর বাবুর ছোট ছেলে সুরেন উকিলও এই ট্রেণে বাড়ী ফিরিতেছিল। মক্কেলের কাজের জন্য শনিবার রাত্রের ট্রেণে সে আসিতে পারিবে না শ্রীলতা ও বাবাকে পূর্ব্বেই তাহা সে জানাইয়া ছিল। একটু ব্যস্ত হইয়াই নব-বিবাহিত সুরেন বাড়ীর দিকে পা বাড়াইল, প্লাটফর্মের ভীড়ে মাথা গলাইল না। গেটে টিকিট কালেক্টার বলিল "সুরেন বাবু যে। আরে মশাই আপনাদের চাকর ভোলানাথ যে রেলের লাইনে মাথা দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।"

"সেকি! কখন?"

—"তারই লাস ত এনে রেখেছে ঐখানে। বোধ হয় রাত্রের ট্রেণটায় কাটা গেছে" "আত্মহত্যা বুঝলেন কিসে? কাটাও ত যেতে পারে"—"লাইনের সঙ্গে গামছা দিয়ে নিজেকে বেঁধে রেখেছিল। সেই বাঁধন ফেলে তবে লাস এনেছে"—

* * *

গোপাল সেকরার বাড়ী সকালেই গিয়াছিল পরী। সেখানে সে ভোলানাথের আত্মহত্যার কথা লোক মুখে শুনিল। পুলিশে তাহার লাশ ছাড়িয়া দিয়াছে। গ্রামের স্বেচ্ছাসেবকের দল সে লাশ লইয়া শ্মশানে গিয়াছে। শ্মশানের এক প্রান্তে গিয়া এই নষ্টা নারীও নিঃশব্দে দাঁড়াইল।

* * *

দুইটী চিতা প্রায় পাশাপাশি-দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। একই পরিবারের দুইজন, মনিবের পুত্রবধু এবং ভৃত্য একই রাত্রে আকস্মিকভাবে মারা গেল। কি কারণ কেহই সঠিক জানেনা। শ্মশানে উপস্থিত আত্মীয় ও বন্ধুর দল শোকাচ্ছন্ন: কালীকিঙ্কর দেখিলেন পরী দূরে দাঁড়াইয়া; তাহার দুই গণ্ড বহিয়া নীরবে অশ্রু ঝরিতেছে। পরী কয়েক বৎসর পূর্ব্বে চার পাঁচ বৎসর তাঁহার বাড়ীতে ঝিয়ের কাজ করিত এবং পরীর সঙ্গে ভোলানাথের যে প্রণয় ছিল এ কথাও গ্রামের অনেকের মত তিনি ও পরোক্ষে জানিতেন। পরীকে তিনি কাছে ডাকছিলেন। শোকাচ্ছন্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন "ঝগড়া হয়েছিল তোর সঙ্গে? রেলে গলা দিলে কেন?" ফাটিয়া পড়িল পরী। হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া এক মুঠা নোট কালীকিঙ্কর বাবুর পায়ের কাছে ছুঁড়িয়া দিয়া কহিল "এই টাকা, এই টাকা কটাই কাল হোল: সন্ধ্যার দিয়ে রেতে ফেরত চাইলে, বল্লে ফেরত দিতে হবে। গোপাল সেঁকরার কাছে গয়না কিনেছিলেম, আজ সকালে তা বিক্রী করে টাকা ফেরত আনলাম। কিন্তু কে টাকা লেবে, কাকে দোব এ টাকা……ছি ছিঃ টাকার জন্যে একি হোল?" উদভ্রান্তের মত পরী ছুটিয়া চলিয়া গেল।

তোমারে তো আজো ভুলি নাই

রমেন চৌধুরী

ওগো প্রথমা……
তোমারে তো আজো ভুলি নাই,
প্রথম দিনের মতো সকল কাজে
বারে বারে ফিরে তোমা পাই।
ভুলিবার নয় দুটি কাজল আঁখি
কী আবেশ গেছে মোর মরমে আঁকি'
শূন্য শিথান পাশে আজো মনে হয়
জেগে আছে তোমার ছোঁয়াই।

নিবিড় হয়েছো তুমি নিকটে আমার
পারেনি রচিতে বাধা বিরহ-পাথার;
তোমার সে ব্যাকুলতা আমায় ঘিরে
আজো আলো জ্বালে এই ঘোর তিমিরে
তুমি সুখে থাকো মোর এই কামনা
এ-লগনে তোমায় জানাই।
ওগো প্রথমা
তোমারে তো আজো ভুলি নাই……

রসসাহিত্যিক ইন্দ্রনাথ স্মরণে

রমেন গুপ্ত

বর্দ্ধমান জেলায় কাটোয়ার কাছে একটি ছোট্ট জায়গার নাম গঙ্গাটিকুরী। উনবিংশ শতাব্দীর রস-সাহিত্যিক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতি বুকে নিয়ে তাঁর পৈতৃক বাসভবনটি আজও সেখানে বিদ্যমান। ইন্দ্রনাথের এই জন্মভূমিতে এই মাসে তাঁর স্মৃতিপূজার আয়োজন হয়েছিল। কিন্তু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে সাধারণ বাঙালী পাঠকের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। তাই তাঁর সম্বন্ধে কিছু লিখলাম। ইন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষদের নিবাস ছিল শ্রীখণ্ডের নিকটবর্তী গাফুলিয়া গ্রামে। তাঁর প্রপিতামহ সেখান থেকে চলে এসে গঙ্গাটিকুরীতে বসবাস শুরু করেন। নিকটস্থ পঞ্চ-গ্রামে ইংরাজি ১৮৪৯ সালে মাতুলালয়ে ইন্দ্রনাথের জন্ম হয়।

ইন্দ্রনাথের বাবার নাম বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিহারের অন্তর্গত পুর্ণিয়া জেলায় তিনি ওকালতি করতেন। ইংরাজি ও পার্সী ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। ওকালতি করে তিনি প্রচুর খ্যাতি ও অর্থ লাভ করেন।

ইন্দ্রনাথের শিক্ষাজীবন খুবই বৈচিত্র্যপূর্ণ। এক জায়গায় স্থির হয়ে শিক্ষালাভ তাঁর ভাগ্যে ঘটেনি। পাঁচ বছর বয়সে পূর্ণিয়ার সরকারী স্কুলে তাঁর বিদ্যারম্ভ হয়। সেখানে তিনটি বছর অতিবাহিত হওয়ার পর পিতা বামাচরণ অসুস্থ হয়ে পড়েন ও গঙ্গাটিকুরীতে ফিরে আসেন। ইন্দ্রনাথের বয়স যখন মাত্র ন' বছর তখন তিনি পিতৃদেবকে হারান।

বাবার মৃত্যুর পর ইন্দ্রনাথ কৃষ্ণনগর কলিজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভাই। তিনিও সেই স্কুলের ছাত্র। কৃষ্ণনগরে তাঁর বড় ভাই কয়েকবার কঠিন অসুখে পড়েন। কৃষ্ণনগরে জলবায়ু তাঁর স্বাস্থ্যের অনুকূল ছিল না। অগত্যা সেখান থেকে তাঁরা চলে আসতে বাধ্য হন। বীরভূমে গিয়ে উভয়েই পড়াশুনা শুরু করেন এবং বীরভূম সরকারী স্কুলে ভর্ত্তি হন। ১৮৫৯ সালে ইন্দ্রনাথের বিবাহ হয় এবং বীরভূম ছেড়ে তাঁরা ভাগলপুরে চলে আসেন। পর বৎসর তাঁর বড় ভাইএর অকালমৃত্যু হয়।

ভাগলপুরে এসে ইন্দ্রনাথ আবার পূর্ণোদ্যমে পড়াশুনা শুরু করেন। সেখানে তাঁদের একটি ব্যবসায় ছিল। সেখানে তিনি উর্দু ও হিন্দী ভাষাও ভালভাবে শিখে-ছিলেন। হিন্দীর মাধ্যমেই ভাগলপুরে পড়াশুনা করতে হত। সেখান থেকে ১৮৬৩ সালে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেন।

অতঃপর ইন্দ্রনাথ কলকাতায় চলে আসেন। উচ্চশিক্ষা লাভের জন্যে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করেন। কিন্তু কলকাতায় এসে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। প্রেসিডেন্সি কলেজ ছেড়ে দিয়ে তিনি গঙ্গাটিকুরীতে ফিরে যান। শারীরিক সুস্থতা লাভ করে তিনি হুগলি কলেজে ভর্ত্তি হলেন। ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্যে তিনি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলেন। কিন্তু ইন্দ্রনাথ মোটেই দমে যান নি। ছোটবেলা থেকেই বড় হওয়ার উচ্চাভিলাষ ছিল তাঁর। ধৈর্য্য আর অধ্যবসায়ের গুণে তিনি ফার্স্ট-আর্টস পাশ করলেন। আবার কলকাতায় তিনি চলে এলেন এবং ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজ থেকে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

অতঃপর ইন্দ্রনাথ বাড়িতে কিছুদিন বসে কাটান। ভবিষ্যৎ জীবন কীভাবে গড়ে তুলবেন কিছুই ঠিক করে উঠতে পারেন নি। ছ'মাস বসে থাকার পর বীরভূম জেলার হেতমপুরে একটি স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে সেখানকার চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী একটি স্কুলে প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। সেখানেও বেশিদিন তিনি শিক্ষকতা করেন নি। তাঁর বাবার ইচ্ছা ছিল তিনি ভবিষ্যতে উকীল হবেন। সেই জন্যে ইন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত প্রধান শিক্ষকের পদে ইস্তফা দিয়ে কলকাতায় চলে এলেন আইন পড়তে। ১৮৭১ সালে তিনি আইন পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন এবং কলকাতা হাইকোর্টে অ্যাডভোকেট হিসাবে প্রবেশ করেন।

ইন্দ্রনাথ ছিলেন সদাচঞ্চল। একস্থানে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখা কখনও তাঁর দ্বারা সম্ভব হয়নি। হাইকোর্ট ছেড়ে তিনি পুর্ণিয়া আদালতে চলে গেলেন তাঁর পরোলোকগত পিতার কর্ম্মস্থলে। সেখানকার আদালতে বামাচরণের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল অসাধারণ। তিনি ছিলেন পূর্ণিয়ার সর্বজনবিদিত ব্যক্তি। পিতার পরিচয়ে ইন্দ্রনাথ সহজেই সেখানে প্রভাব বিস্তার করলেন এবং ওকালতিতে অল্পদিনের মধ্যেই প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করলেন। দু'বছর পুর্ণিয়া আদালতে ওকালতি করার পর সরকার থেকে মুন্সেফের পদের জন্যে তাঁকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়। ইন্দ্রনাথ সানন্দে তা গ্রহণ করেন।

ইন্দ্রনাথ মুন্সেফরূপে দণ্ডখোবায় যোগদান করেন। সেখানে অমায়িক ব্যবহারে, সুবিচারে এবং পাণ্ডিত্যে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্য তাঁকে বেশি দিন চাকরী করতে দেয়নি। অসুস্থ হয়ে পড়ায় তিনি মুন্সেফের চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে দিনাজপুরে চলে আসেন। সেখানে কিছুদিন পরে আবার স্বাধীনভাবে পেশা শুরু করেন। দিনাজপুরে তিনি ১৮৭৬ সাল পর্যন্ত ছিলেন। তারপর আবার কলকাতায় ফিরে আসেন এবং পাঁচবছর হাইকোর্টে ওকালতি করেন।

বাল্যে ইন্দ্রনাথের মধ্যে সাহিত্য প্রতিভা দেখা যায়নি। কিন্তু বরাবরই তাঁর সব কথার মধ্যে ছিল অফুরন্ত রসের উৎস। সব জিনিষ দেখার মত একটা বিশিষ্ট অন্তর্দৃষ্টি তাঁর ছিল। একটা অন্য চোখ দিয়ে তিনি দেখতেন সব। সে দেখার মধ্যে ছিল ভুল ত্রুটির বিশ্লেষণ, সমালোচনার একটা ব্যঙ্গাত্মক তীব্র কষাঘাত। কিন্তু লেখনী ধরেছিলেন তিনি ১৮৭০ সালে।

১৮৭০ সালে কলকাতায় গুপ্তপ্রেস থেকে একখানি নাটক প্রকাশিত হয়। সেই নাটকখানির সমালোচনা-সূচক একখানি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। সেখানির নাম 'উৎকৃষ্ট কাব্যম্'। রস-সাহিত্যিক হিসাবে সাহিত্য ক্ষেত্রে সেই তাঁহার প্রথম প্রবেশ। কিন্তু একখানি মাত্র পুস্তকেই তিনি বিদগ্ধ পাঠক সমাজে পরিচিত হয়ে উঠলেন।

ইন্দ্রনাথ যখন দিনাজপুর আদালতে ওকালতি করতেন তখন তিনি জনৈক সাহিত্যসেবার সংস্পর্শে আসেন। তাঁর নাম তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি ইন্দ্রনাথের শ্লেষাত্মক রচনাগুলি পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। উত্তরবঙ্গে রাজসাহী থেকে তখন শ্রীকৃষ্ণদাসের সম্পাদনায় একটি উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হত। তারকনাথ ইন্দ্রনাথকে সেই পত্রিকায় লিখতে অনুরোধ জানান। তাঁর অনুরোধে ইন্দ্রনাথ "কল্পতরু" লিখে পাঠান। কিন্তু সে লেখা সম্পাদকের মনোনয়ন লাভ করেনি। অতঃপর ইন্দ্রনাথ 'সাধারণী' পত্রিকায় নিয়মিত লিখতে সুরু করেন। 'সাধারণী'র সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

১৮৭৪ সালে ইন্দ্রনাথের দ্বিতীয় গ্রন্থ "কল্পতরু" প্রকাশিত হয়। ইন্দ্রনাথের কলমে উচ্চগ্রামের রস এবং তীব্র বক্রোক্তির সাহিত্য-রস-সিঞ্চিত ধারা দেখে সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার রচনার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তদানীন্তন 'বঙ্গদর্শনের' পাতায় ইন্দ্রনাথের রচনার প্রশস্তি তাঁহাকে রসসাহিত্যের আসরে স্থায়ী আসন দিল।

ইন্দ্রনাথ যখন কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করতেন তখন তাঁর বাস ছিল সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটে। সেখানে সমসাময়িক সাহিত্যরসিকদের নিয়ে তিনি একটি সাহিত্য-সঙ্ঘ গড়ে তুলেছিলেন। রসিকজনের উপস্থিতিতে প্রত্যহই সেখানে সাহিত্যের সান্ধ্য-মজলিস বসত এবং বাংলা-সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি নিয়ে সারগর্ভ আলোচনা চলত। সেই সাহিত্য সঙ্ঘের গুরু এবং মধ্যমণি ছিলেন সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র। কবিবর হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল, চন্দ্রনাথ, অক্ষয়চন্দ্র সরকার আরও অনেকে ছিলেন সেই সভার সভ্য। ১৮৭৬ সালে ইন্দ্রনাথ একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। সেখানির নাম "ভারত-উদ্ধার"। পর বৎসর তাঁর আর একখানি বিদ্রূপাত্মক রচনা প্রকাশিত হয়। তার নাম "হাতে হাতে ফল।" "হাতে হাতে ফল" তিনি অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সহযোগিতায় রচনা করেন এবং পুস্তকাকারে সেটি প্রকাশিত হয় ১৮৮২ সালে।

"ভারত উদ্ধার" রচনার উৎকর্ষতায় এবং ব্যঙ্গাত্মক বিশ্লেষণে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা এবং একশ্রেণীর লোকের ওপর লক্ষ্য রেখে তীব্র শ্লেষ মিশিয়ে তিনি ভারত-উদ্ধার রচনা করেন।

কিন্তু ইন্দ্রনাথকে রস-সাহিত্যিকের পূর্ণ মর্য্যাদা দিল 'পঞ্চানন্দ'। এই সরস পত্রিকাটি ইন্দ্রনাথেরই সম্পাদনায়

১৮৭৬ সালের ১০ই অক্টোবর চুঁচুড়া থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। পঞ্চানন্দে পাঁচু ঠাকুর' ছদ্মনামে ইন্দ্রনাথের ক্ষুরধার লেখনী প্রসূত রস-রচনা অচিরে তাঁকে সেকালের শ্রেষ্ঠ রস সাহিত্যিকের প্রতিষ্ঠা দিল। কলকাতায় ভবানীপুর থেকে পঞ্চানন্দের কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। তখন ইন্দ্রনাথ হাইকোর্টে বেরোতেন।

'পঞ্চানন্দে' পাঁচু ঠাকুরের রচনা পড়বার জন্যে লোক উদগ্রীব হয়ে থাকত। সামান্য কয়েকটা মাসের মধ্যে ইন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে একটা আলোড়ন এনে দিলেন। যা কিছু অপ্রিয়, যা কিছু অসুন্দর, যা কিছু সমাজবিরোধী, যা কিছু ক্ষতিকর তার বিরুদ্ধে খড়্গহস্তে তিনি লেখনী ধরেছিলেন এবং তাঁর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব কোন অন্যায়কে সমালোচনার কশাঘাত করতে বিরত হয়নি। 'পঞ্চানন্দের' অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও তৎকালীন একদল সাহিত্য-সেবী তার তীব্র বিরোধিতা করেন এবং ইন্দ্রনাথের খ্যাতির প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে উৎসাহী হন। কিন্তু বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও 'পঞ্চানন্দে'র জনপ্রিয়তা একটুও ম্লান হয়নি। ইন্দ্রনাথ হাইকোর্ট ছেড়ে বর্দ্ধমান চলে যান এবং 'পঞ্চানন্দ' বর্দ্ধমান থেকে সর্বশেষ প্রচারিত হয় ১৮৮২ সালে।

পরবর্তীকালে ইন্দ্রনাথ আরও দুখানি গ্রন্থ রচনা করেন। প্রথমটির নাম "ক্ষুদিরাম" এবং পরেরটির "জাতিভেদ"। শেষোক্ত বইখানি তাঁর মৃত্যুর মাত্র একবছর আগে প্রকাশিত হয়েছিল। 'ক্ষুদিরাম' বইখানিতে ইন্দ্রনাথের তীব্র বিদ্রূপের অন্তরালে যে বেদনাবোধ ছিল তাতে পাঠক না কেঁদে থাকতে পারেনি।

ইন্দ্রনাথ যে যুগে জন্মেছিলেন সে যুগ ছিল পাশ্চাত্য অনুকরণে পরম আগ্রহান্বিত ও পাশ্চাত্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। ইংরাজের অনুকরণ করা তখন শিক্ষিত সমাজের আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু ইংরাজি ভাষায় সুপণ্ডিত হয়েও ইন্দ্রনাথ ছিলেন মনে প্রাণে বাঙালী। অন্তরে অন্তরে তিনি বাংলাকে ভালবাসতেন, বাঙ্গালীকে ভালবাসতেন, বাংলা ভাষার উৎকর্ষ সাধনা করে নিজেকে ধন্য মনে করতেন। বাংলা ও বাঙালীর দুঃখ দুর্দ্দশার কথা তিনি গভীরভাবে চিন্তা করতেন এবং বাঙালীর দুরবস্থা দেখে তাঁর চোখ ছাপিয়ে জল আসত। শেষ জীবনে এইসব সমস্যার কথাই তিনি নিরন্তর ভাবতেন।

ইন্দ্রনাথ ছিলেন মনেপ্রাণে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। সে যুগে ইংরাজ সরকারের অধীনে মুন্সেফের চাকরী করেও তিনি তাঁর বাঙালীত্ব বিসর্জন দেননি। তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং বলিষ্ঠ রচনাভঙ্গীর জন্যে তিনি পণ্ডিতপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগরেরও বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁর প্রতিটি রচনারই ছিল কার্য-কারণ সম্বন্ধ। সব লেখাই যেন প্রয়োজনে লেখা। কারণ ছাড়া তাঁর লেখা ছিল না। সবচেয়ে বড় কথা রসসাহিত্যিক ইন্দ্রনাথ শুধু লোককে হাসাবার জন্যই সরস রচনা লিখতেন না। তাঁর ব্যঙ্গাত্মক রচনার আড়ালে থাকত ব্যথার ফল্গুধারা। জীবনের প্রতি মমত্ব, মানুষের জন্য বেদনাবোধ, সমাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ আর প্রতি-বাদ তিনি বিনা দ্বিধায় করে গেছেন। নিপুণ হাতে হাস্য-রসের ভেতর দিয়ে সমাজের পাপ আর গ্লানিকে তিনি পাঠকের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। সেইজন্য ইন্দ্রনাথের পরিচয় শুধু শ্রেষ্ঠ রস-সাহিত্যিক হিসাবেই নয় তার মধ্যেও ছিল সমাজ সংস্কারকের একটি নীরব ভূমিকা।

১৯১১ সালে ৬১ বছর বয়সে রস-সাহিত্যিক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লোকান্তরিত হন।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ফাঁপরে না পড়া পর্য্যন্ত কেউই জানতে পারে না যে উপর-চালাকির ফলটা বেয়াড়া রকম দাঁড়াতে পারে। চালাক মানুষে পাপমোচনের জন্য তীর্থে যায়, গিয়ে একটু উপরি-উপার্জনের আশায় তীর্থদেবতার কাছে মনোবাঞ্ছাটুকু নিবেদন করে ফেলে। তারপর পাপতাপের কথাটা ভুলে গিয়ে অভীষ্টটুকু আদায় করার জন্যেই উৎকট রকম পেড়াপীড়ি জুড়ে দেয়। শেষ অস্ত্র ঐ প্রায়োপবেশন। পাষাণ-দেবতাকে জব্দ করার দরুণ চরমপন্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। ফাঁপরে পড়েন দেবতা, তাঁর দেবমহিমা রক্ষা করার গরজে ঘুষ দিয়ে আপস করার চেষ্টা করেন। তাতেও যখন কুলিয়ে ওঠে না, ভক্তের দাবিটা আকাশের চাঁদ ধরে হাতে দিতে হবে গোছের দাঁড়িয়ে যায়, তখন দেবতাকেও একটু উপর চালাকির আশ্রয় নিতে হয়। ফাঁপরে পড়ে গিয়ে উদ্ধার পাবার আশায় দেবতাও তখন ভক্তকে ফাঁপরে ফেলবার চেষ্টা করেন। যার নাম হোল ছলনা করা। মানুষ মানুষকে ছলনা করে যখন, তখন সেটা আইন-বিরুদ্ধ ব্যাপারে দাঁড়িয়ে যায়। আইনের চোখকে ফাঁকি দিতে পারলে দাঁড়ায় পাপে। দেবতার বেলা আইনও নেই, পাপও নেই, স্রেফ লীলাময় লীলাময়ীদের লীলাখেলা বোঝার সাধ্য কার আছে!

যাঁর আছে তিনি পৈশাচিক হাসি হেসে বলেন—"নিষ্ঠে চাই। নিষ্ঠে নেই, আস্থা নেই, মনের ভেতর চরকির পাক। বাবার নজর বড় সূক্ষ্ম, বাবার নজরকে কি ফাঁকি দেওয়া যায়।"

নিষ্ঠের আগুন জ্বালিয়ে সে আগুনে পাষাণ দেবতাকে পোড়াতে শুরু করলে দেবতাকে আর উপর চালাকি করতে হয় না, এই গুহ্যতত্ত্ব যিনি জানেন তিনি উপর-চালাকের উপর-চালাক। তাঁকে কখনও ফাঁপরে পড়তে হয় না।

যেমন আমাদের পরাণকেষ্ট দাদা। দাদাকে ছলনা করতে বাবাও ভয় পান।

থাক এখন পরাণকেষ্ট দাদার নিষ্ঠের পরিচয়, তার আগে আমাদের ঘর পাওয়ার ব্যাপারটা বলে নিশ্চিন্ত করি।

বাবার মহিমায় মনের মত ঘর জুটল, তৎক্ষণাৎ জুটে গেল। মন্দির থেকে এসে আমাদের ঠাকুরমশাই দয়া করে ব্যবস্থা করে দিলেন। যাত্রী-ওঠা সরাইবাড়ি নয়, গেরস্ত বাড়িতে ঘর পেলাম। নাম মাত্র দক্ষিণা, রাত পোয়ালে মাত্র আট গণ্ডা পয়সা দিতে হবে মালিকের হাতে, দিয়ে আর একবার রাত পোয়ানো পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত হোয়ে ঘরখানি ভোগ উপভোগ করা যাবে। জলকল সমস্ত দরজার গোড়ায়, অর্থাৎ উঠোনের মাঝখানে। উঠোনে তোলা-উনুন ধরিয়ে নিয়ে যাও নিজের ঘরের মধ্যে, দরজা বন্ধ করে যা খুশি রান্না কর' খাও। কেউ কারও ঘরে উঁকি মারতে যাবে না। সব ভাড়াটেই স্বাধীন, সবায়ের স্বাধীনবৃত্তি আছে। তীর্থস্থানে উপার্জন করে, ঘর ভাড়া দেয়, সংসার করে। বাবার মহিমায় কারও ঘরে এতটুকু অশান্তি নেই।

আমাদেরও একটু অশান্তি রইল না। করিত-কর্ম্মা

পরিবার সঙ্গে থাকলে অশান্তি হবে কেমন করে। তীর্থস্থানে দরজায় দরজায় দোকান, বাবার মহাপ্রসাদ চিনির ডেলার কল্যাণে দোকান দিলেই চলে। ধর্ম্ম যে বাঁধা রয়েছেন তীর্থের ঘরে ঘরে। তীর্থ-দেবতার কড়া নজরের সামনে ন্যায্য মূল্যে ন্যায্য ওজনে যেখানে বেচাকেনা হয়, সেখানে ঠকবার ভয় নেই। ধর্ম্মের বাজারে—ধর্ম্মের রসে ভিয়েন-করা ঠকার স্বাদই আলাদা, তাতে না আছে ঝাল নুন টক, না আছে মেজাজ জ্বলানো পচা গন্ধ। মিষ্টি, শুধু মিষ্টি। জল দিয়ে মেখে ডেলা পাকালে চিনি-মিষ্টি ছাড়া আর কি হোতে পারে। সে মিষ্টির মহিমাই আলাদা, তিন টাকায় আড়াই সের চিনি কিনে জল দিয়ে মেখে ডেলা পাখিয়ে শুখিয়ে নিতে পারলে সোয়া ছ'টাকা মূল্যের আড়াই সের মহাপ্রসাদে পরিণত হয়। বাবার মহিমায় দিনে আড়াই সের মহাপ্রসাদ বেচতে পারলেই হোল, দোকান মার খাবে কোন দুঃখে। মহাপ্রসাদ বাদে দোকানে চাল, ডাল, তেল, নুন থেকে শুরু করে চুলো, হাঁড়ি, কলসী, কঞ্চির আঁটি, আলু, পান, বিড়ি, চা-পাতা সমস্ত মেলে। মাটি দিয়ে বানানো চুলোর মূল্য চার আনা, পৌনে হাত লম্বা বিশ বাইশটা কঞ্চির আঁটি মাত্র দু'আনা—দু আঁটি কঞ্চিতেই ভাতে-ভাত হোয়ে যাবে। হাঁড়ি, চুলো, কঞ্চি এনে ঘরের মধ্যেই ভাতে-ভাত চাপিয়ে দিলেন পরিবার। প্রথম দিনটা ঐ ভাবেই চলুক, বেশী দিন থাকতে হোলে কয়লার চুলো কিনতেই হবে। এক বেলার ভাতে ভাত রাঁধবার জন্যে এক সিকের কঞ্চি পোড়ালে পোষাবে না।

বাবার মহাপ্রসাদ চিনির ডেলা গোলা শরবত হাতে করে সতরঞ্চি বাঁধা বিছানার ওপর বসে পরম নির্লিপ্ত ভাবে পরিবারের পিঠে ভিজে চুলের রাশি দর্শন করছিলাম। চাল ধুতে ধুতে অন্যমনস্কভাবে খরচের কথাটা তুলে ফেললেন তিনি। আঁচড় লাগল পুরুষ মানুষের পৌরুষের গায়ে, ফোঁস করে উঠলাম—"ভারী তো খরচ, খরচ হোক। রোজগার করব। খরচের কথা নিয়ে কে তোমায় মাথা ঘামাতে বলেছে ?"

খুবই চিন্তিতভাবে জবাব দিলেন তিনি—"পারলে তো খুবই ভাল হয়। আত্মনাথের ব্যাপারটার একটা কিছু কিনারা করতে পারলে আপাততঃ কিছুদিন নিশ্চিন্দি হওয়া যায়।"

"তার মানে!" বেশ একটু টানটান হোয়ে বসলাম। টাকার কথা নাকি! সাবধানে কথাটা ঘুরিয়ে দিলাম—"তা বৈকি। ভূতের ব্যাগার খাটার হাত থেকে নিষ্কৃতি মেলে।"

ধোয়া চাল হাঁড়িতে ঢেলে দিয়ে পরিবার বললেন—"ভূতের ব্যাগার খেটে আত্মনাথটিকে যদি খুঁজে পাওয়া যায়, তা'হলে দু'তিন মাসের খরচা হাতে আসবে। টাকা আছে তারকের মায়ের হাতে। কোথায় ঘাপটি মেরে বসে আছেন আত্মনাথ, এইটুকু জানাতে পারলেই হোল। সঠিক সন্ধান কিনা, তিনি নিজে গিয়ে বুঝে নেবেন। তারপর কি হবে না হবে, তার জন্যে আমাদের কোনও দায় নেই। আমরা আমাদের খাটা-খাটুনির দাম বুঝে পাব।"

ষোল আনা চাঙা হোয়ে উঠলাম। বললাম—"স্বামী খুঁজে দেবার ঠিকে নিয়েছ! চমৎকার! এতক্ষণ বলতে হয়।"

কাঁধের ওপর দিয়ে সামনে ঝুলে পড়েছিল একগোছা চুল, মাথায় একটা ঝাঁকানি দিয়ে চুল গোছাকে পিঠের ওপর ফেলে ঘুরে দাঁড়ালেন। চোখ-মুখ একটু বেশী জ্বল-জ্বল করছে। খুবই চাপা গলায় খানিকটা খোশামুদির সুরে বললেন—"লাগো না একটু উঠে পড়ে। একটু চেষ্টা করলেই আত্মনাথের হদিস বার করতে পারবে। তোমার মত লোকেও যদি না পারে, তা'হলে ও কর্ম্ম আর কারও দ্বারা কিছুতেই হবে না।"

ব্যাস, অত বড় তারিফের পরে মগজে তোলপাড় লাগে না, এমন মগজ কারও ঘাড়ের ওপর নেই। দস্তুরমত আন্দাজ করে লাগসই জবাবটি লাগসইভাবে আওড়ে গেলাম—"লাগতে তো হবেই। দুটো দিন সবুর কর, ঠিক হোয়ে বসে নি। ঐ উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছি আমরা, কেউ যেন না সন্দেহ করতে পারে। বাবার কৃপায় তোমার এই প্রথম ঠিকের কাজটা ঠিক উতরে দোব।"

বাঁধন খুলে ঘরের এক কোণে বিছিয়ে ফেললাম শয্যা। ঠিক হোয়ে বসতেই হবে যখন, তখন শুয়ে পড়তেই বা আপত্তি কোথায়। ভাত ফুটছে, ঘরের ভাড়া চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে দেওয়া হোয়ে গেছে। সার্থকভাবে ভাড়ার মেয়াদ-টুকু কাটাতে হোলে শুয়ে কাটানোই ভাল। বসে থাকবার

জন্যে নিশ্চয়ই ঘর নেওয়া হয়নি! বিস্তর খোলা বারান্দা রয়েছে পথের ধারে, বসে থাকতে কেউ মানা করত না। ঘর নেওয়া হোয়েছে শুয়ে পড়বার জন্যে, ঠিক-ঠাক হোয়ে দু'দিন শুতে পেলে আশুনাথের খোঁজে ঠিকই লাগা যাবে। শুয়েই পড়লাম। অন্তর্যামী বাবা বোধ হয় ওধারে মনে মনে একটু মুচকি হাসি হেসে নিলেন।

আমাদের খাওয়া-দাওয়া চুকতে চুকতে বাবার বাড়িতে আবার ঢাক বেজে উঠল। ছুটি হোয়ে গেল বাবার সে-দিনকার মত। স্নান করে রাজবেশ পরে বাইশ সের আটার লুচি, ছোলার দাল তরকারি রসগোল্লা জিলিপি, আধ-মণ দুধের পরমান্ন খাবেন বাবা। ঐ ভোগের পরে আর কেউ বাবাকে জ্বালাতন করতে পারবে না। মন্দিরে ঢুকতে পারবে না কেউ, জল দুধ ফুল বেলপাতা চিনির ডেলা বাবার মাথায় ঢালতে পারবে না। সেই ভোর রাত পর্য্যন্ত বাবা আরাম করে বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করতে পারবেন। সন্ধ্যার পরে আর একবার যৎসামান্য ভোগ হবে। আর একবার আরতি হবে। বাবার ঘরে খাট বিছানা দেওয়া হবে। মস্ত বড় গড়গড়ার মাথায় মস্ত বড় কলকেতে অতি-সুগন্ধ তামাক সেজে দেওয়া হবে। এক ছিলিম বড়-তামাকও আগুন ধরিয়ে নিবেদন করা হবে সেই সঙ্গে। তারপর বাবার দরজা বন্ধ হবে।

যাত্রীর ভিড় যে দিন বেশী হয়, সেদিন দুপুরের ভোগ হোতে বেলা চারটে বেজে যায়। তা যাক, বাবা ওই দেরিটুকু গায়ে মাখেন না। কি করবেন, বাবার দরবার সাচ্চা। লোকে সাচ্চা দরবারে ছুটে আসে বিপাকে পড়ে। অন্য কোনও দরবারে যে বিপাকের ফয়সালা হয় না, তেমন বিপাক ঘাড়ে নিয়েই লোকে সাচ্চা দরবারে আসে। বাবাকে বজায় রাখতে হয় দরবারী কায়দা, নিজের আরামের জন্যে দরবারের বদনাম কিনতে পারেন না।

ভোগের পরে আরতি হোল, আরতির পরে ঢাকের বাদ্যি থামল। জুড়ল বাবার 'থান'। নিশ্চিন্ত হোয়ে চোখ বুজলাম। পরিবার গেছেন থালা-বাসন ধুতে, সবে ধন নীল-মণি দু'খানি এলুমিনিয়ামের থালা—আর দু'টি ঐ পদার্থে গড়া বাটি, টিনের সুটকেশে ভরে নিয়ে সংসার পাতবার বাসনায়—ঘুরে বেড়ানো চলছিল। তৈজস-পত্রগুলো কাজে লাগল। কাজে লাগবার পরে মাজতে ধুতে হবে। সেই কাজটি সমাপ্ত করতে গেছেন পরিবার। স্বাধীন সংসারের স্বাধীন কর্তার মত লম্বা হোয়ে শুয়ে চোখ বুজলাম। হায় স্বাধীনতা! সাধে কি আর মানুষে বলে, এ সংসারে স্বাধীনতা বলতে কিছু নেই। চোখ বুজে বিড়িটিতে একটি জুত-সই টান দিতে না দিতেই স্বাধীনতায় বাজ পড়ল। পাশের ঘরের মালিক বাবার বাড়ি থেকে বাবার প্রসাদ নিয়ে ফিরলেন। ফেরবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঘরণীর সঙ্গে প্রেমালাপ শুরু করলেন দরজায় খিল এঁটে। এ ঘর—ও ঘরের মাঝখানে পাঁচ ইঞ্চি চওড়া ইঁটের পাঁচিল, ওপরে খোলার চাল। চালের নিচে থেকে পাঁচিলের মাথা অন্ততঃ আধ হাত নিচু। ও ঘরের প্রত্যেকটি শব্দ অবাধে এ ঘরের কানের ভেতর দিয়ে মরমে পশিয়া প্রাণ অতিষ্ঠ করে ছাড়ল। শুরুর দিকটায় তেমন মন দিতে পারিনি। হঠাৎ একটা হিংস্র হুংকার শুনে তিড়বিড়িয়ে উঠে বসলাম।

"আবার এয়েছিল? হারামীর বাচ্চা আবার এয়েছিল ঘরে?"

ফিসফিস করে কি জবাব দেওয়া হোল। ফল, চাপা হুংকারটা আর চাপা রইল না।

"টাকা ধার করেছিস তুই না আমি? টাকার তাগাদায় তোর কাছে আসে কেন? সকাল থেকে একশ'বার ইষ্টিশান বাজার মন্দির করে মরছি আমি, আমার কাছে যেতে পারে না?"

এবার ফিসফিসানিটা একটু ঝামটা গোছের হোয়ে দাঁড়াল। ফল, হুংকার আর হুংকার রইল না। ছ্যাড়ছেড়ে ছ্যাঁচড়া সুরে ভেঙচি কাটা হোল—"মরে যাই, মরে যাই। আহা—কি দরদ রে। ডুবে ডুবে জল খেলে বাবার বাবাও টের পায় না—কেমন? মনে করেছিস, তোর ছেনালীপনা আমি বুঝতে পারি না—কেমন? বেশ তো, টাকার তাগাদায় যখন তোর কাছেই আসে, তখন তুই শোধ দিবি টাকা, আমার কি।"

তারপর অতি অল্পই আলাপ এগলো। হঠাৎ একবার শোনা গেল—"কি বললি শালী? যতবড় মুখ নয় তত বড় কথা!" পর মুহূর্তে চটাস্ করে এক আওয়াজ, চটাসের পর দুম-দুম টিপ-ঢাপ ইত্যাদি নানাবিধ শব্দ। তারপর

দড়াম করে দরজার খিল খোলার আওয়াজ হোল। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, একপক্ষ ঘর থেকে 'বেগে নিষ্ক্রান্ত' হোয়ে গেলেন।

নেপথ্যাভিনয়ের চরমোৎকর্ষ যার নাম, কেবলমাত্র শব্দের সাহায্যে—এ হেন ভাবান্তর ঘটানো হোল যে বিড়িতে টানটি পর্য্যন্ত দিতে ভুলে গেলাম।

ঘরখানি ভাড়া পেয়ে দরজা বন্ধ করে শয়নের লোভে যেটুকু উত্তাপ জমে উঠেছিল অন্তরে, তা' হিম হোয়ে গেল। উদ্ধারণপুর-ঘাটের সর্ব্বেশ্বর শ্রীমান রামহরে—এবং তস্য পত্নী সীতের-মায়ের একখানি সংসার আছে। সেই সংসারে রাত কাবার করে মদ ধরবার দারোগা যখন প্রস্থান করে, তখন রামহরের পরিবার গোবর গঙ্গার দৌলতে আত্মশুদ্ধি করে সংসারের শুচিতা ফিরিয়ে আনে। খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার মনে হোত তখন ওদের সংসারযাত্রা নির্বাহ দেখে, বড় জোর যৎসামান্য একটু করুণা হোত ওদের জন্যে। বাবার 'থানে' ঘর ভাড়া পেয়ে সংসার পাতবার শুভ মুহূর্ত্তটি পার হবার আগেই নিকটতম পড়শীর সংসার আচম্বিতে এমন পরিচয়ই প্রদান করলে যে, ঘৃণা করুণা কৌতুকবোধ করার স্পর্দ্ধাই রইল না। তার বদলে খুব বোকাবোকা ধরণের একটা আতঙ্কে—হাত-পাগুলো ভারী হোয়ে উঠল। উঠে ঘর ছেড়ে বেরবার জন্যে আঁকু-পাঁকু করতে লাগল বুকের মধ্যে, সামর্থ্যে কুলিয়ে উঠল না। বাইরে বেরলেই চোখোচোখি হবে কারও সঙ্গে, সেই চোখে কি থাকবে! কিছুই নয়, একদম কিচ্ছু নয়। আর একটা জীব এসে জুটেছে কোথা থেকে—একটা মেয়েমানুষ জুটিয়ে নিয়ে বাবার দরবারে। বাবার দরবারে এ রকম কত আসছে, কত যাচ্ছে। থাকুক যতদিন পোষায়, বাবার দরবার থেকে কেউ কাউকে খেদিয়ে দেয় না।

সবই খুব স্পষ্ট, সবই খুব খোলাখুলি ব্যাপার। লুকোছাপার ধার ধারে না কেউ। মিথ্যে সত্যি কোনও পরিচয় দেবার প্রয়োজন নেই। কে কার পরিচয় জানতে চায়। খোঁচাখুচি করে ভেতরের খবর নেবার রেওয়াজ নেই। সাচ্চা দরবারে সব সাচ্চা, সাচ্চা দরবারের কোনও ব্যাপারে কেউ নাক গলাতে যেও না। ও রকম অনাবশ্যক কর্ম্ম করতে গেলে বাবার মহিমাকে খাটো করে ফেলা হবে।

অনাবিল অকপট অনপেক্ষতা, মহাতীর্থে অনধিকার চর্চ্চা কর্ম্মটি শুধু অনাচার। শান্তির স্থানে অনাচার করে কেউ অশান্তি ডেকে এন না। ব্যাস ফুরিয়ে গেল।

ফুরিয়েই গেল। যা ফুরিয়ে গেল তার নাম বলা সম্ভব নয়। কেমন যেন ইজ্জত খোয়ানো গোছের ব্যাপার হোয়ে দাঁড়াল। সেই ইজ্জত আমার নয়। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী-বাবুরও নয়। দশ দরজায় নাম শুনিয়ে পেট ভরাত' যে নিতাই দাসী তারও নয়। দুটি ঘণ্টার ওপর ঠায় বসে বসে দেখলাম যাঁর সংসারযাত্রা নির্বাহ করা। মাটির হাঁড়িতে ভাতে ভাত ফুটিয়ে এলুমিনিয়ামের তৈজস পত্রে পরিবেশন করে খাওয়ালেন যিনি আমায়। খাইয়ে এবং নিজে খেয়ে সেই তৈজসপত্র মাজতে উঠোনের মাঝখানে গিয়ে বসেছেন যিনি এখন। তাঁকে এই ঘর বাড়ি থেকে এই মুহূর্ত্তেই সরিয়ে না নিয়ে যেতে পারলে যা নষ্ট হবে তা ঠিক ইজ্জতও নয়। সে বস্তুর নাম অমৃত। দু-ঘণ্টার সংসার যাত্রায় যে অমৃতটুকু জমে উঠেছে তা' গরলে পরিণত হবে। সে গরল পান করলে সামলাতে পারব কি!

জোর করে উঠে পড়লাম। থাক বাসন মাজা, আগে ডেকে আনি মানুষটাকে উঠোন থেকে, লুকিয়ে ফেলি ঘরের মধ্যে। পাড়াপড়শীর নজরের আড়াল করতে না পারলে সবটুকুই যে বিষিয়ে উঠবে।

দরজা খুলে দাওয়ায় পা দিতেই যে দৃশ্য দেখতে হোল, তারপর আর কিছু সামলাবার প্রশ্ন উঠতেই পারে না।

উঠোনের ওধারে দাওয়ার ওপর মাদুর বেছানো হোয়েছে। মাদুরের ওপর আসীন হোয়েছেন যাত্রী-ওঠা সরাই-বাড়ির সেই অস্বাভাবিক লম্বা দেহযষ্টিখানি। এধারে ওধারে এ বাড়ির মেয়েরা জমা হোয়ে শুনছেন তাঁর বচনা-মৃত। বাবার মহিমা আর ভক্তদের নিষ্ঠে, এই দুই বস্তুর অসামান্য শক্তি সম্বন্ধে অসাধারণ সব উদাহরণ দিয়ে সবাইকে তিনি থ বানিয়ে ছেড়েছেন।

এ ধারের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে আমিও শুনতে লাগলাম।

"এই ধর না আমার কথা। বছরে অন্ততঃ চারটি বার আমি আসি বাবার 'থানে'। দু' দশ দিন কাটিয়ে যাই। কত দেখেছি, কত রকমের জাল-জুচ্চুরি যে ঘটছে এই

বাবার থানে তার কি ইয়ত্তা আছে। ওই এক কথা, সবাই এখেনে ধম্মপত্নী নিয়ে আসেন। দু'দিন না পেরুতেই বাবার দয়ায় চিচিং ফাঁক হোয়ে যায়। ধম্মপত্নীকে ধরবার জন্যে পুলিশ সঙ্গে নিয়ে তার বাপ ভাই বা স্বামী এসে পড়ে। হাটে হাঁড়ি ভাঙতে কতক্ষণ। হুঁ হুঁ, দেখতে দেখতে চোখ দু'টো পচে গেল। ধম্মপত্নী—ধম্মপত্নী রাস্তায় গড়াগড়ি যাচ্ছে! ধম্মপত্নী কাকে বলে তা' এই পরাণকেষ্ট দেখাচ্ছে। এইবার নিয়ে মাগী এই এগারবার ধন্নায় পড়ল। কেন? না সত্যিকারের ধম্মপত্নী বলে। সোয়ামীর ব্যামোর জন্যে একবার নয়, দু'বার নয়, এই এগারোবার ধন্না দিচ্ছে। এর নাম হোল নিষ্ঠে, এ নিষ্ঠে ধম্মপত্নী ছাড়া আর কার হবে?"

প্রশ্নটি করে—তাঁর সেই এক হাত লম্বা গলার ডগায় আটকানো মুণ্ডটি চতুর্দিকে ঘুরিয়ে সবায়ের পানে তাকালেন। যাঁরা শুনছিলেন, তাঁদের ভেতর সত্যিকারের ধম্মপত্নী কেউ আছেন কিনা, তাই দেখে নিলেন বোধ হয়। কেউ একটু টুঁ শব্দ করল না দেখে নিশ্চিন্ত হোয়ে পুনর্বার শুরু করলেন।

"এই যে বিকেলের গাড়ি আসছে, দাঁড়াও গিয়ে এখন ইষ্টিশানে। দেখবে জোড়ায় জোড়ায় সব নামছে। কোলকাতা সহরের এত কাছে এমন নিশ্চিন্দি হোয়ে রাত কাটাবার জায়গাটি আর আছে কোথায়? এক টাকা দু' টাকা দাও, একখানি ঘর নিয়ে রাত কাটিয়ে ভোরবেলা ফিরে যাও। গায়ে আঁচড়টি লাগবে না। হুঁ হুঁ বাব্বা, সব বুঝি। এই পরাণকেষ্টর চোখ দু'টোকে কেউ ফাঁকি দিতে পারে না। এই সেদিন এলেন এক মেমসাহেব-কাকীমা, সঙ্গে এল উপযুক্ত ভাশুর-পো। রাত পোয়ালে বাবার মাথায় জল ঢেলে ফিরবে। রাত আর পোয়াতে হোল না, ট্যাক্সি হাঁকিয়ে দুই সাহেব এসে উপস্থিত হোলেন আদ্দেক রাতে। খুঁজে খুঁজে ঠিক এসে ধরলেন। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে শুধু ঠেঙানি। এতটুকু উ-আ পর্য্যন্ত করবার জো নেই, সাঁই সাঁই করে শুধু চাবুক চলল। তারপর দু'জনকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে পুরলেন ট্যাক্সিতে, ট্যাক্সি উধাও হোয়ে গেল। কাকে বকে টের পেলে না কেলেঙ্কারিটা! পাশের ঘরে ছিলুম, যা জানবার আমিই শুধু জানতে পারলুম।

ওধার থেকে কে একজন বলে উঠল—"ওসব কাণ্ড ঐ সরাই বাড়িতেই ঘটে। আমাদের বাড়িতে রাত কাটাবার জন্যে কাউকে ঘর দেওয়া হয় না।"

পরাণকেষ্ট সজোরে প্রতিবাদ করতে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে লাগল বিষম, উৎকট আওয়াজ করে দম আটকানো কাসি কাসতে শুরু করলেন তিনি। সেই বিষম কাসির চোটে তাঁর চক্ষু দু'টো কপাল থেকে ঠেলে বেরিয়ে এল খানিকটা। এক হাতে মাজা থালা-বাটি, আর এক হাতে এক ঘটি জল নিয়ে তাঁর বচন সুধা পান করছিলেন বিপিনবিহারীবাবুর পরিবারটি। থালা বাটি নামিয়ে জলের ঘটি নিয়ে তেড়ে গেলেন তিনি। থাবা থাবা জল দিয়ে পরাণকেষ্টর চোখে-মুখে ঝাপটা দিতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার—"পাখা, শিগ্গির একখানা পাখা আনগো কেউ। আহা, এমন মানুষটা দম আটকে মরবে আমাদের চোখের সামনে।"

বেদম ঘাবড়ে গেল সবাই। সত্যিই তৎক্ষণাৎ পরাণকেষ্ট মরছেন বা মরতে পারেন, এমন একটা ধারণা সত্যিই তাঁর শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে কারও মগজে উদয় হোল কিনা বলা মুশকিল। আচম্বিতে কিন্তু সবাই মিলে পরাণকেষ্টকে বাঁচাবার জন্য মরিয়া হোয়ে উঠল। সামনেই চৌবাচ্চা, চৌবাচ্চা বোঝাই জল নিমেষের ভেতর খালি হবার উপক্রম হোল। বালতি ঘটি মগ যে যা পেল হাতের কাছে—ডোবাতে লাগল চৌবাচ্চায়, জল ভরে নিয়ে তেড়ে গিয়ে পরাণকেষ্টর মাথায় ঢালতে লাগল। ঢালা মানে সজোরে ঝাপটা মারা, ঝাপটার চোটে পরাণকেষ্ট সত্যিই খাবি খেতে লাগলেন। চোখ মুখ বাঁচাবার জন্যে উপুড় হোয়ে পড়লেন তিনি, তাতেও তাঁর সেবিকাগণের চিত্তে কৃপার উদ্রেক হোল না। ইতিমধ্যে পাখাও এসে পড়ল দু' তিনখানা, সাঁ সাঁ শব্দে পাখা চলতে লাগল। যতবার উনি সোজা হোতে চান, ফটাফট পাখার ঘা লাগে। তুমুল কাণ্ড, পরামর্শ না করে, মতলব না এঁটে—অতবড় একটা কাণ্ড বাধিয়ে তুলে একটা জ্যান্ত মানুষকে যমের বাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা করতে যারা পারে তাদের উপস্থিত-বুদ্ধির তারিফ না করে থাকা যায় না।

সেবিকাগণের সেবার নিষ্ঠা কতদূর পর্য্যন্ত গড়াত কে জানে। নিষ্ঠা থেকে নিষ্কৃতি দেবার জন্যে সদর দরজা

পেরিয়ে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লেন কয়েকজন। সকলে এক সঙ্গে চেঁচাতে লাগলেন—"ঐ যে, ঐ তো সেই পরাণ-কেষ্টবাবু। ও মশাই, আপনি এখেনে বসে আড্ডা মারছেন—আর ওধারে আপনার গিন্নী যে চোখ ওলটাল। ধর ধর, তুলে নিয়ে চল ওকে। গিন্নীকে দিয়ে একশ' বার ধম্না দেওয়াচ্ছে। ব্যাটার শরীরে দয়া-মায়া নেই। নিয়ে চল ওকে ওর গিন্নীর কাছে। কি হোয়েছে? ভিট-কিলিমি করে আবার খিরমি যাওয়া হোয়েছে বুঝি! দাঁড়াও দাঁড়াও, আর তোমাদের জল ঢালতে হবে না বাপু। তোল তোল, যদি মরে তো এক চুলোয় গিন্নীর সঙ্গে তুলে দোব।"

সব সাফ হোয়ে গেল। যাঁরা নিতে এসেছিলেন পরাণকেষ্টকে, তাঁরা তাঁকে চেংদোলা করে ঝুলিয়ে নিয়ে প্রস্থান করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল তাঁর সেবিকারাও। এক চৌবাচ্চা জল ঢেলে যারা তাঁর সেবার চরম করে ছাড়লে, তারা কি সহজে তাঁকে ত্যাগ করতে পারে। পরাণকেষ্টর ধম্মপত্নীর নিষ্ঠের চরম পরিণতি স্বচক্ষে না দেখে এলে স্বস্তি পাবে কেন কেউ।

থালা বাটি কুড়িয়ে নিয়ে নিজের ঘরের দাওয়ায় উঠে এলেন পরিবার। উত্তেজনায় মুখ চোখ লাল হোয়ে উঠেছে। আড় চোখে আমার পানে একটিবার তাকিয়ে ঘরের ভেতর চলে গেলেন। যেন কিছুই হয়নি, একটা জলজ্যান্ত মানুষকে জল ঢালতে ঢালতে খতম করে দেবার চেষ্টা করাটা যেন কিছুই নয়। মুখ ঘুরিয়ে বললাম—"এখন একবার পাশের ঘরের খোঁজটা একটু নাও। ওঘরের ধম্ম-পত্নীর দশাটা একটু দেখা দরকার।"

বেরিয়ে এলেন তেড়ে—"কোথায়। কোন ঘরে? কি হোয়েছে?"

"পতিদেবতা এসে খুব ঘা কতক দিয়ে গেলেন। তারপর থেকে আর সাড়াশব্দ পাচ্ছি না। দেখে এসো গে কি হোল।"

"ও-এই।" তুচ্ছ কথাটা শুনে পরম নিশ্চিন্ত হোয়ে আবার ঘরে ঢুকে পড়লেন। ঢুকে ডাক দিলেন—"এস এস, ওসব ব্যাপারে চোখ কান দিতে নেই। যে যার পরিবার শাসন করবে, সংসার করতে গেলে ও রকম একটু আধটু গোলমাল হয়-ই। ওসব ধরতে গেলে সংসার ধর্ম্ম করা চলে না।"

ঢুকলাম আবার ঘরে, জুত করে বসলাম টিনের সুট-কেশের ওপর। জুত করে নিজের কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সম্পাদন করতে গেলাম। পরিবার শাসন করতে হবে তো।

"বলি—হচ্ছিল কি এতক্ষণ? হতভাগাটাকে খুন করবার জন্যে স্বজাতিদের লেলিয়ে দিলে কেন?

"স্বজাতি! স্বজাতি আবার কারা?" বসতে যাচ্ছিলেন শয্যায়, বসা আর হোল না। সত্যিকাবের চমকে উঠে ফিরে দাঁড়ালেন।

"মেয়েদের স্বজাত হোল মেয়েরা। অমন হিংসুটে জাতের স্বজাত আবার কারা হোতে যাবে।" গলায় যথেষ্ট ঝাঁঝ ফুটিয়ে—তলব করলাম কৈফিয়ত—"একগুষ্টি হিংসুটে মিলে দিন দুপুরে মানুষ মারার মতলব করেছিলে কেন?"

এলিয়ে পড়লেন শয্যায়, গলার সুরও বেশ এলিয়ে পড়ল —"ও তাই বল। ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে বাপু, এখানে স্বজাতি জুটেছে শুনে চমকে উঠেছিলাম। আমিও ঐ কথা ভাবছি কিনা। পালাই চল গোঁসাই এখান থেকে। তাড়াতাড়ি কাণ্ডটা শেষ করে সরে পড়ি আমরা। যা জানা শোনার তাড়াতাড়ি—জেনে নাও। এত বড় তীর্থ, হরদম চতুর্দিক থেকে যাত্রী আসছে। হুট করে কেউ এসে পড়ল বীরভূম থেকে, নিতাই বোষ্টুমীকে দেখতে পেয়ে গড়িয়ে পড়ল একেবারে। বিটকেলের আর বাকী থাকবে না তখন, সোয়ামী-স্ত্রী সেজে ঘর ভাড়া করা বেরিয়ে যাবে। ভাল কাজ হয়নি এখেনে এসে, বীরভূম বর্দ্ধমান এখেন থেকে দশ দিনের পথ নয়।"

ভেবে-চিন্তে একটি একটি করে কথাগুলো উচ্চারণ করে সত্যিই যেন নিভে গেল। ঘর ভাড়া, ভাড়া পাওয়া, ভাতে-ভাত ফোটানো, গুছিয়ে সংসার করা, মাত্র কয়েক ঘণ্টা ধরে চলছিল যে কাণ্ডকারখানা, যার মধ্যে উত্তেজনা থাকলেও উত্তাপ এতটুকু ছিল না, ছিল একটা নিবিড় নিশ্চিন্ততা, যেটাকে শান্তি না বলে স্বস্তি বলাই উচিৎ, সেই স্বস্তিটুকুর ওপর জগদ্দল পাথরের মত কিছু একটা চেপে বসতে লাগল। চুপ মেরে গেলাম। কি যে বলা যায়, খুঁজে পেলাম না।

সমস্যা একটা নয়। খরচ চালাতে হবে, রোজগার

করতে হবে, পবিত্র পরিবেশে আস্তানা গেড়ে সংসার ধর্ম্ম পালন করতে হবে। ও সমস্যাগুলোর সমাধান একে একে হোয়েও যাবে হয়ত। কিন্তু যেটা সব থেকে বড় সমস্যা, নিজেদের লুকিয়ে রাখা, সেটাকে এড়িয়ে থাকা সম্ভব হবে কতক্ষণ! মিথ্যে পরিচয়টাকে দুর করে ছুঁড়ে ফেলে দিলে কি হয়! লাভই বা হচ্ছে কি ছাই এই মিথ্যে পরিচয় আঁকড়ে থেকে! আড়াই হাত তফাতে শয্যার ওপর এলিয়ে আছে একটি সামগ্রী, সুটকেশের ওপর বসে হাত বাড়িয়েও ছোঁয়া যায়। গলা সমান উঁচু ছোট্ট একটু জানলা দিয়ে গড়িয়ে আসা দিনের হাঁপিয়ে যাওয়া আলো গড়িয়ে পড়েছে সামগ্রীটার ওপর। শাড়ীর পাড় ডান পায়ের হাঁটুর কাছাকাছি প্রায় উঠে গেছে। সায়া নেই ভেতরে, রান্নাবান্নার তাড়ায় সায়া পরবার সময় পায়নি বোধ হয়। জামা একটা আছে গায়ে, বোতামগুলো সব আটকানো হয়নি। আঁচল এলোমেলো হোয়ে আছে। খুব বেশী সাবধান হবার প্রয়োজন মনে করে নি। ওধারে সেই ছোট্ট জানলার বাইরে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হোয়ে কি যেন ভাবছে। কি ভাবছে তাও যেমন আন্দাজ করতে পারব না, কে ভাবছে তাকেও তেমনি চিনি না। আঁকাবাঁকা হোয়ে এলিয়ে পড়ে আছে যে সামগ্রীটি, যার প্রতিটি রেখায় প্রত্যেকটি খাঁজে খাঁজে থমথম করছে একটা রহস্য, ওই সামগ্রীটির অন্তরে ঐ রহস্যের আবরণে কি আছে, তা জানতে হোলে তফাৎ থেকে তাকিয়ে থাকলে চলে না। ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়, উৎকট তেষ্টাটাকে আগে খানিক ঠাণ্ডা করতে হয়, তারপর সত্যি মিথ্যে একটা পরিচয় নিজে থেকে জন্ম লাভ করে। সে সম্ভাবনা কোথায়!

ইংরেজী-জানা মানুষেরা যাকে বলে প্যাশন্, বাঙলায় তার সঠিক কথাটা কি হবে! তৃষ্ণা স্রেফ তৃষ্ণা, যে তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় না কিছুতেই। একটা রক্ত মাংসের শরীর আর একটা রক্ত মাংসের শরীরের মধ্যে যে তৃষ্ণা জাগাতে পারে—তার নাম যাই হোক না কেন, অশ্লীল অন্যায় অধর্ম্ম ইত্যাদি কড়া জাতের দাওয়াই গিলিয়ে ঐ তৃষ্ণাটাকে কিছুতে দূর করা যায় না। এই তৃষ্ণা শরীরের মধ্যে পুরে দিয়ে যিনি জীব সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁকে ধরে চিবিয়ে খেলেও তৃষ্ণা মেটে কিনা কে বলতে পারে!

সেই রকম অন্যমনস্ক অবস্থায় বিড়বিড় করে উচ্চারণ করলে—"কোথায় যাব আমরা? কি করে বাঁচব?"

নেমে গেলাম কাছে। পাশে বসে ঝুঁকে পড়ে কানে কানে বলবার মত করে বললাম—"যেমন ভাবে সবাই বাঁচে। কিচ্ছু পরোয়া করি না। যে যা মনে করে করুক, আগলে রাখব, আড়াল করে রাখব। আমার জিনিষ, আমি সামলাব। কোনও বাজে ভাবনা তুমি ভাবতে পাবে না।"

আস্তে আস্তে মাথাটা ঘোরাল এ পাশে। দু চোখ বুজে এসেছে। জড়িয়ে জড়িয়ে বলল—"নিজেকে তুমি জান না গোঁসাই, এখন পর্য্যন্ত নিজেকে তুমি চিনতে পারনি। তোমার জিনিষ নিশ্চয়ই, সামলাবেও তুমি ঠিক। কিন্তু সে কতক্ষণ? সম্পত্তিটা তোমার এমন যাচ্ছে-তাই খারাপ যে দু'চার বেলাও এ সম্পত্তির ওপর তোমার মায়া থাকবে না। যতক্ষণ পার, নিজেকে চোখ রাঙিয়ে বাধ্য রাখ। হোলই বা তোমার নিজের অধিকারের জিনিষ, তা' বলে এখনই এটাকে নিয়ে ভোগ দখল করতে হবে, তারই বা মানে কি? কত লোকের কত ধন-দৌলত তোলা থাকে, কোনও একদিন কাজে লাগবে বলে রেখে দেয়। এও তোমার সেই তোলা গয়না, তোলা থাক। আটপৌরের চেয়ে তোলা কাপড় গয়নার ওপর টানটা বেশী দিন থাকে'।'

বহু কথা এক সঙ্গে গলার কাছে এসে ঠেলাঠেলি করতে লাগল। কেমন যেন কথা বলার শক্তিটাই হারিয়ে ফেললাম। হঠাৎ দেখি, হাতের চেটো দু'টো ঘামে ভিজে গেছে। অসহ্য রকমের ঝাঁঝ বেরচ্ছে চোখ মুখ দিয়ে। মনে হোল, এক ঘটি ঠাণ্ডা জল গিলতে পারলে বেশ হোত। হাত বাড়িয়ে জল ঘটিটা টেনে নেবার কথাটা শুধু মনে হোল না।

বিড়ম্বিত মুহূর্তগুলোর পানে তাকিয়ে রইলাম অসহায়ভাবে। জানলা দিয়ে যে আলোটুকু আসছিল, তার রঙ ক্রমেই ঘোরালো হোয়ে উঠতে লাগল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল, উঠেই হাসি। নিঃশব্দে ফুলে ফুলে হাসতে লাগল মুখের মধ্যে আঁচল গুঁজে দিয়ে। হাসির দমকে জল এসে গেল চক্ষু দু'টিতে, দম আটকে মরে বুঝি। প্রথমটায় খুবই হকচকিয়ে

গেলাম, তারপর গেলাম রেগে। এক হেঁচকায় টেনে বার করলাম আঁচলের খুট মুখ থেকে, পর মুহূর্তে দু'হাতে মুখখানা চেপে ধরে ফেললাম। সঙ্গে সঙ্গে নিথর হোয়ে গেল। ঝোপের আড়ালে সন্ধ্যামালতী যেমন স্তব্ধ হোয়ে অপেক্ষা করে, তেমনিভাবে কিসের জন্যে যেন অপেক্ষা করতে লাগল।

কঁ্যা-কোঁচ-কুঁ, স্বল্প একটু শব্দ গেল কানে। সন্তর্পণে দরজা খুলছে যেন কে। চট করে হাত টেনে নিয়ে দরজার পানে তাকালাম। দরজার মাথায় কাঠের ছিটকিনি যথাস্থানে নামানো রয়েছে। পাশের ঘরে কি যেন নড়ে উঠল। তারপর শোনা গেল খুব চাপা গলায়—খুব করুণ মিনতি—

"ওগো শুনছ। সন্ধ্যে যে হোয়ে এল। উঠবে না?"

কয়েক মুহূর্ত আর কিছুই শোনা গেল না। তারপর রুদ্ধ কান্নায় ভেঙে পড়ল গলা—"গলায় দড়ি দোব আমি, গাড়ির সামনে লাইনের ওপর ঝাঁপ দোব। সেই ভোর থেকে এখন পর্য্যন্ত মানুষের খোসামুদি করে মরছি। কিসের জন্যে—সারাদিন লোকের লাথি ঝাঁটা খাই? দু'টো যাত্রীও আজ ধরতে পারি নি। দু'টো টাকাও আনতে পারিনি ঘরে। কতক্ষণ মানুষের মেজাজ ঠিক থাকে? যার জন্যে মাথা খুঁড়ে মরছি, তার কাছে এলেও সে কথা কইবে না। শুধু শুধু কেন আমি মরছি তা'হলে লোকের পায়ে মাথা খুঁড়ে?"

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। অল্প একটু চাবির গোছা নাড়ার শব্দ শোনা গেল। আবার সেই কাঁদুনি শুরু হোল—"আবার অসুখ করবে তোমার। উপোস করতে করতে একে শরীরে কিছু নেই। চল, উঠে পড় লক্ষ্মীটি। দু'মুঠো খেয়ে নি চল। কথায় কথায় এমন রাগ করলে কি ঘর-সংসার করা চলে?"

কান পেতে শুনছিলাম। হঠাৎ দু'হাতে গলাটা জড়িয়ে ধরল সই। ধরে কানের ওপর মুখ চেপে বলে উঠল—"চল, উঠে পড় লক্ষ্মীটি। কথায় কথায় এমন রাগ করলে কি ঘর-সংসার করা চলে? চল, মন্দিরে যাই। আরতি দেখে রাত করে ঘরে ফিরব।" [ক্রমশঃ

প্রতীক্ষায়

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ সান্যাল

আর নহে কাজ—এবার নয়ন
তব দরশন মাগে!—
এসো মোর পাশে—ত্রিযামা-শিয়রে
শশিলেখা যথা জাগে।
রাতের পাখীর মতো মোর প্রাণ
শান্তির নীড় করে সন্ধান;
স্থান দাও তারে বুকের কুলায়ে
'হলা সহি', অনুরাগে!
শত ঝঞ্ঝাটে তপ্ত ললাট—
এসো মলয়ার পারা;
ধূসর মাঠের ঊষর বক্ষে
এসো বাদলের ধারা।
হেথা অমানিশা—এসো গো ইন্দু,
এসো পিয়াসীর অমৃত-বিন্দু;—
কান্তা আমার, ক্লান্তিহারিণী,
তোমাতেই হই হারা।

তুমি চিক্কণ স্নিগ্ধ বনানী,
আমি পলাতক মৃগ;—
হায় উপবন, শ্রান্ত পথিক
ঠাঁই নাহি পা'বে কিগো?
আজিকার মতো হ'ল সমাপন
সেই বিভীষিকা—বাঁচিবার রণ—
এবার খুশীতে হাসিতে ভরিয়া
তোলো মোর অবনী গো!
তোমার নর্ম—কর্মে আমার
ক'রে তোলে মধুময়,
জীবন সাহারা তাই মাঝে মাঝে
নিকুঞ্জ মনে হয়!
তাইতো দাস্য-শৃঙ্খলধ্বনি
নূপুরগুঞ্জ ব'লে মনে গণি;—
সংসার-বিষবৃক্ষে আমার
অমৃত ফলিয়া রয়!

হিমালয় পাঠশালায়

শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়

[মায়াপুরী।...

গঙ্গা যেখানে মহাদেবের জটা-মুক্ত হয়ে সমতলে প্রবেশ করেছেন সেই পবিত্রভূমি।

তরুণ সন্ন্যাসী গাইলেন,—

পতিতোদ্ধারিণী জাহ্নবী গঙ্গে
খণ্ডিত গিরিবর মণ্ডিত ভঙ্গে
... ...
অলকানন্দে পরমানন্দে
কুরুময়ি করুণাং কাতর বন্দে
... ...
নাহং জানে তব মহিমানং
ত্রাহি কৃপাময়ি মামজ্ঞানং ॥

'অজ্ঞানম্' বা মিথ্যাজ্ঞান নিবারণের পরশমণির উদ্দেশে, আচার্য্য শঙ্কর গঙ্গা তথা অলকানন্দার ধারাপথে ছুটেছিলেন হিমালয়ের নিভৃত অন্তঃরাজ্যে। মহামুনি ব্যাসও ছুটেছিলেন। ছুটেছিলেন আরও বহু মহাপুরুষ। ফিরেছিলেন তাঁরা অমৃত ধারা নিয়ে,—সত্যজ্ঞান নিয়ে। হিমালয়ের ক্রোড়ে, বদ্রীক্ষেত্রে, মানুষ লাভ করেছিল আদি ও শেষ, অনাদি ও অনন্ত সত্যের সূত্র—ব্রহ্মসূত্র।

চারিদিকে বিশাল সুউচ্চ পর্ব্বতের প্রাচীর ঘেরা, নির্জ্জনতার রাজ্য, হিমালয়ের অন্তঃপুরে প্রবেশকারীর মন আপন হ'তেই কেন্দ্রীভূত হয়ে আসে একটি নির্দ্দিষ্ট চিন্তায়। চিত্তের সংসার-বিষয়ক ভাবনা ও বিক্ষেপ কমে আসে। হিমালয়ের বেষ্টনীর আড়ালে,—প্রাত্যহিক জগৎ হ'তে দূরে দাঁড়িয়ে, চিত্তকে একা ও নিভৃতে, অতি একান্তে পেয়ে, মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে।

শহরে বা সমতল ভূমিতে, আজকের অতিব্যস্ত মানুষের নীরব প্রকৃতি ও অন্যান্য প্রাণীদের দিকে দৃষ্টি পড়েনা। কিন্তু এই নির্জ্জন রাজ্যে ওরা যেন মানুষের অতি কাছের হয়ে ওঠে। মানুষের নিজস্ব সৃষ্টি দর্শনে আর স্বকৃত বস্তুতে মন সেখানে অধিকৃত থাকেনা। তাই তখন স্বতঃই প্রশ্ন জাগে—এই বিশাল পর্ব্বত, জল ধারা, তুষার রাশি, পত্র-পুষ্প-তৃণ, শ্যামল বনরাজি সবই কি আপনা হতেই সৃষ্ট? কে এ সবের স্রষ্টা?

এই যে জলধারা সমুদ্রে ছুটে চলেছে ও আবার বারিদ হয়ে ফিরে আসবে। কিন্তু কেন? কা'র নির্দ্দেশে? কোন যন্ত্রীর কৌশলে? কিসের প্রয়োজনে?...শ্বাসের জন্য বায়ু, পানের জন্য জল, এই সব আয়োজনের কর্ত্তা কে?

জাগে আত্মজিজ্ঞাসা,—আমি কে?

কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ বা দিল্লী থেকে এসেছি—এরূপ উত্তরে তখন মন তুষ্ট হয় না। স্থান-মাহাত্ম্যে মনে হয়, যেন ভিতরের আমি বাইরের আমি থেকে আলাদা হয়ে বার বার প্রশ্ন করে, আমি কে? জীব কে? সবের আদি কে? সবের শেষ কি, শেষ কোথায়?

সকল প্রশ্নের শেষ উত্তরটি নিয়ে, যুগে যুগে, বহু মানুষ ফিরে এসেছেন, নেমে এসেছেন, হিমালয় থেকে। জ্ঞানের, সত্যের, আলোক-বর্ত্তিকা হাতে। তাঁরা হয়ে এসেছেন দ্রষ্টা।

যুগে যুগে যাঁরা হিমালয়ের কোলে তপস্যা করেছেন, মহা জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজেছেন, তাঁরা তা' পেয়েছেন নিজেদের মধ্যেই। পরমব্রহ্ম, হিরন্ময় পুরুষ, স্বয়ংই বলে দিয়েছেন উত্তর। কোনও অলৌকিক আবির্ভাবের মাধ্যমে নয়—উত্তর বলে দিয়েছে জিজ্ঞাসু মানুষের নিজেরই মন।

পুরুষোত্তম বলেছিলেন—'ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি।' অর্জ্জুন! আমি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মন। মনই, অন্তঃকরণই পুরুষোত্তম স্বয়ং। মনই মানুষের প্রশ্ন কর্ত্তা গুরু,—উত্তরদাতা গুরু।

হিমালয়ের স্পর্শ মানুষের মনে প্রশ্ন-পত্র ছড়িয়ে দেয়, উত্তর ও জানিয়ে দেয়। তাই হিমালয় পাঠশালা।]

* * * *

দেবপ্রয়াগ

দেব প্রয়াগ।

ভাগীরথী ও অলকানন্দার মিলনস্থল তথা যেথান হ'তে ওরা নিজেদের হারিয়ে দিয়েছে শুধু 'গঙ্গা' নামে। সেই পুণ্যভূমি দেবপ্রয়াগ।

আমাদের বাসটা পৌঁছতেই পাণ্ডার দল এলেন। যাঁদের সঙ্গে মেয়েরা আছেন তাঁদের তাক লাগিয়ে দিয়ে হিন্দী, বাংলা, মারওয়াড়ী ইত্যাদি যে দলের যে ভাষা, সেই ভাষায় সম্ভাষণ জানাতে লাগলেন। যাদের মেয়েরা নেই তাঁদের সঙ্গে বলতে লাগলেন হিন্দী। কারণ, তাঁরা কোন প্রান্তের লোক বোঝা শক্ত যে। ভারতীয় মেয়েদের পোষাক দেখে আজও ধারণা করা যায় কে কোন প্রান্তের কোন
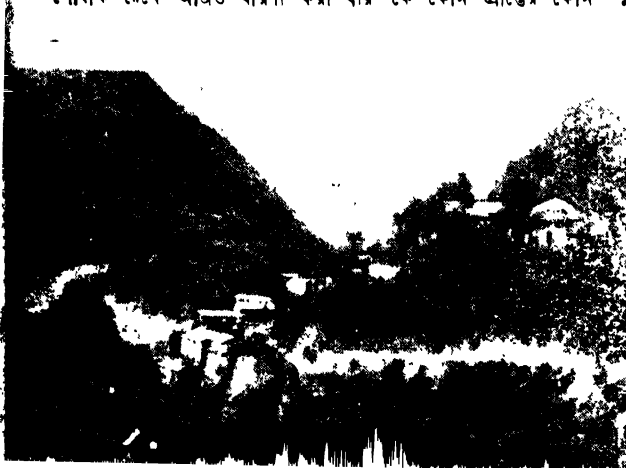
প্রদেশের। কিন্তু পুরুষদের, বিশেষ করে শহুরে পুরুষদের, আধা-বিলিতী পোশাক এর অন্তরায়।

পাণ্ডারা বোঝালেন দেবপ্রয়াগে পিতৃশ্রাদ্ধ ইত্যাদি কর্তব্য। অতএব বহুযাত্রী এখানেই নেমে গেলেন। তাঁরা কয়েকদিন এখানে থেকে যাবেন।

প্রায় আধঘণ্টা কাটিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম। বাস এরপর থামবে কীর্তিনগরে। তারপর শ্রীনগরে। শ্রীনগরে বাস বেশ কিছুক্ষণ থামল। যাত্রীরা আহারাদির জন্য নামলেন। অনেকে আবার কোটদ্বার যাওয়ার বাস ধরতে গেলেন।

বিকালের দিকে আমরা পৌঁছলাম রুদ্রপ্রয়াগ। এটি অলকানন্দা ও মন্দাকিনীর সঙ্গমস্থল। পথ এখান হ'তে দ্বিধা হয়ে একটি গেছে বদ্রীনাথ ও অপরটি কেদার-ক্ষেত্র।

বাস চলল কর্ণপ্রয়াগের উদ্দেশে।

ড্রাইভারের পাশের আসনটায় বসেছিলাম। স্টিয়ারিং কষতে কষতে ড্রাইভার বললেন—"বাবুজী ম্যয় দেখা কি আপ হর স্টাপিজ মে মুন্‌ড্‌ পর পানি ডালা। মালুম হোতা আপকা বুখার জ্যাদা হৈ। আপকা লিয়ে আগে বঢ়না ঠিক ন হি। ম্যয়, আপকো করণ প্রয়াগমে কোই অচ্ছা জগহ মে ঠহরা দেতা হুঁ। উস স্থানপর এক রোজ রহ যাইয়ে, আরাম হো জায়েগা। ম্যয় জোশীমঠ সে লৌটতে বখত আপকো ঋষিকেশ পৌঁছাউঙ্গা।"

সত্যই সেদিন সকাল হ'তে গুরুতর অসুস্থতা হয়েছিল। পিছনের সীট্‌ এর এক ভদ্রলোক হিন্দীতে প্রশ্ন করলেন—

"আপনি কোথায় যাচ্ছেন?"

উত্তর দিলাম—"জোশীমঠ।"

—"জোশীমঠে থাকেন?"

—"না।"

—"তবে?"

—"জোশীমঠ থেকে বদ্রীকাশ্রম যাবার ইচ্ছা আছে।"

—"এই অসুস্থ শরীরে!...আর, পট (অর্থাৎ মূর্তি) খুলতে তো এখনও দশদিন বাকী। চট্টিগুলোতে এখন কোন লোকজনও পাবেন না। বদ্রীনাথ এখন ফাঁকা! কেন খামকা কষ্ট করবেন।"

বললাম—"ভুল খবর নিয়ে এতদূর যখন এসেই পড়েছি তখন জোশী মঠ পর্যন্ত যাই তো তারপর দেখা যাবে।"

সকলেই আমায় নিষেধ করতে লাগলেন।

সন্ধ্যায় আমরা পৌঁছলাম কর্ণপ্রয়াগ। অলকানন্দা আর পিণ্ডারক-এর (বা পিণ্ডর গঙ্গার) মিলনস্থল। বাস আর এগোবে না। এখানেই রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে ছাড়বে।

যাত্রীদের মধ্যে যে কজন ঠিক তীর্থযাত্রী, তাঁরা সবাই একটি ধর্মশালায় স্থান করে নিলেন। মজঃফরনগরের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে এক সর্দারজীর হোটেলে আশ্রয় নিলাম... হোটেল অর্থে পাহাড়ের গায়ে খানকয়েক মাটির ঘর। দেওয়াল,

ঝে, সবই মাটির। খুপরি ধরণের কামরাগুলো এত নীচু যে, সোজা হয়ে ঢোকা দায়। াই হ'ক রাতের আস্তানা হ'ল।

সর্দারজীর হোটেলে মাংস রুটি ছাড়া আর কিছু ছিল না। একটা দোকানে বিষ্ণুখানার ব্যবস্থা করা গেল।

সারাদিনের ভয়ানক অসুস্থতা ও উপবাস, তার ওপর পাহাড়ে পথে বাসের াঁকুনি খাওয়ায় শরীর বিকল হয়েছিল। তবু, যা পাওয়া গেল গোগ্রাসে উদরস্থ করে ফেললাম। ভয় হ'তে লাগল, অসুখ যদি বেড়ে যায় তাহলে কি হবে!

শুয়ে শুয়ে অলকানন্দার প্রচণ্ড গর্জ্জন শুনতে আর ভাবতে লাগলাম—শেষ পর্য্যন্ত বদ্রীনাথ কি যাওয়া হবে না!···শুনেছি, 'তিনি' না ডেকে পাঠালে যাওয়া হয় না। মনটা খুবই খারাপ হয়ে পড়ল।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। চোখ খুলতেই ছোট জানলাটা দিয়ে দেখতে পেলাম বিশাল কালো পাহাড়টার পিছনে ফেকাশে আকাশ আর নিষ্প্রভ দু' একটা তারা। সকাল হচ্ছে।

বাইরে এসে দেখি আলো ফুটেছে।

তাড়াতাড়ি ছুটলাম প্রাতঃকৃত্য সারতে। সকলের আগেই তৈরী হয়ে উঠে পড়লাম।

অনেকক্ষণ পরে মনে পড়ল আগের দিনের অসুস্থতার কথা। মনে পড়ল, কি দুর্ভাবনাই না হয়েছিল আর ভেবেছিলাম তিনি ডেকে না পাঠালে যাওয়া হয়না। অমনি কে যেন বুঝিয়ে দিল—ডাকএসেছে।

থাক না মন্দিরের দ্বার বন্ধ, না হ'ক তাঁর সাকার মূর্ত্তির সঙ্গে চোখের দেখা, তবু যাবই। এল উদ্দীপনা, ব্যাধির বাধা রইল না। চললাম। একেই কি 'ভর' হওয়া বলে?

আমরা পৌঁছলাম নন্দপ্রয়াগে।

অলকানন্দা আর নন্দাকিনীর সঙ্গমস্থল নন্দপ্রয়াগ। এখানে নন্দরাজ যজ্ঞ করেছিলেন। তাই নাম হয়েছে নন্দপ্রয়াগ। বদ্রীক্ষেত্রের সুরু হ'ল এই স্থল হতে।

এর পর এল চামেলী।

চমেলীতে তৈরী হচ্ছে কাছারি অর্থাৎ কোর্ট।

এই অঞ্চলের পাহাড়ীরা, হিমালয়ের শিশুরা, চিরকাল তাদের বিরোধ, বিসংবাদ মিটিয়ে এসেছে পঞ্চায়েতের দ্বারা, মোড়লের মধ্যস্থতা তথা নির্দ্দেশ অনুসারে। বিচারে দণ্ড হ'ত, অপরাধী হয়তো দুটো মোরগ-মুর্গী, একজোড়া ছাগ-ছাগী কিংবা একমণ চাল দিয়ে দণ্ড পালন করত। তাদের এইবার সভ্য জগতের আদালতে এনে ফেলা হচ্ছে। হয়তো দরকারও হয়ে পড়েছে।

বেলা ন'টা নাগাদ পৌঁছলাম পিপলকোঠী। এ অঞ্চলের বিশিষ্টবসতি ও বাজার।

পিপলকোঠীতে ড্রাইভারের পিছনে উঠে বসলেন এক গেরুয়া বসন পরিহিত সাধু। বয়সে ষাটের ওপর। খর্ব্বাকার সৌম্যদর্শন। গাড়ী ছাড়তেই ড্রাইভার তাঁর সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করলেন। বুঝতে পারলাম সাধু এ অঞ্চলে সুপরিচিত। ওঁরা হিন্দিতে কথা কইতে লাগলেন, আমি শুনতে লাগলাম।

একটু পরেই একটা খটকা লাগল। যদিও সাধুটি পরিষ্কার হিন্দী বলছিলেন তবু, তবু তার দু' একটা কথায় আমার সংশয় জন্মাল। বাংলায় বললাম—"মাফ করবেন, আপনাদের কথায় বাধা দিচ্ছি। আপনি বাংলাদেশের মানুষ তো?"

সাধু কিছুক্ষণ নির্ব্বাক থেকে বললেন—"হ্যাঁ। তুমি কি করে বুঝলে?"
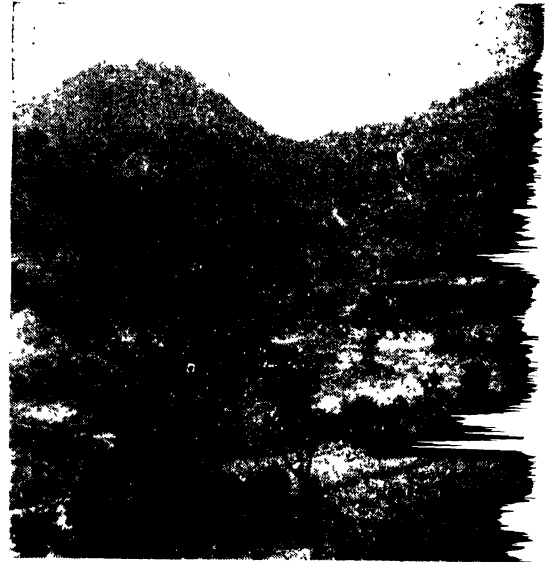
নন্দপ্রয়াগ

সাধু প্রশান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন—"তুমি যাবে তো ?"

বললাম—"হ্যাঁ। আমি ত নিশ্চয় যাব। কিন্তু যেতে পারব কিনা আপনি বলুন না ?" সাধু ফের প্রশ্ন করলেন— তুমি যাবে তো ?"

আমি বললাম—"হ্যাঁ। কিন্তু যেতে"...

সাধু হেসে বললেন—"তুমি যখন যাবেই মনস্থ করেছ তখন তে আর সংশয় নেই। তুমি নিশ্চয় যেতে পারবে।"

জিজ্ঞাসা করলাম—"আপনি তো বদ্রীকাশ্রমেই যাচ্ছেন ?"

সাধু—"হ্যাঁ। কদিন জোশীমঠে থেকে যাব।

—"রাস্তায় কোন ভয় নেই তো ?"

—"না। তবে, সতর্ক হয়ে পাথুরে পথ চলবে। আর এই(নিজের গেরুয়া বসনকে ইঙ্গিত করে) পোশাকের থেকে একটু সাবধান থাকবে। যত গোলমাল এই গেরুয়ার পেছনেই। নীচে (সমতল ভূমিতে) আজকাল যেমন গান্ধীটুপির আড়ালে দুষ্টরা কাজ সারে শুনি তেমনি, এখানে এই গেরুয়া।"

—আমরা গরুড়গঙ্গা ছাড়ালাম।

নন্দপ্রয়াগ হ'তে এই পর্যন্ত ভূমির নাম স্থিত-বদ্রী। সাধুকে প্রশ্ন করলাম—"আপনার দেশ কোথায় ছিল ?" তিনি বলিলেন—"বরিশাল। বিয়াল্লিশ বছর হ'ল বেরিয়ে পড়েছি। বদ্রীনারায়ণের দরজা যতদিন খোলা থাকে ততদিন ওখানেই থাকি। বাকী দিনগুলো নীচে ঘুরে বেড়াই। বদ্রীনাথে আমরা দু'জন মাত্র বাঙ্গালী সাধু আছি।"

ড্রাইভার হঠাৎ হাসতে হাসতে প্রশ্ন করলেন—"আচ্ছা বাবা, এক বাত কহুঁ ?"

সাধু বললেন—"বোলো।"

ড্রাইভার—"ভগবান বহুতই লম্বা চওড়া হৈ কিউ ?"

সাধু হিন্দীতে বললেন—"ওই বিরাট পাহাড়টা এই পৃথিবীটা, অনন্ত আকাশ আর কোটি কোটি নক্ষত্র যাঁর হ'তে সৃষ্ট তাঁর রূপের বিশালতা তো মনের আধারে ধর' যায়না।"

স্বগত আবৃত্তি করলেন—"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। তাঁর ধ্যান ও ধারণা করবার জন্য বাইরে যে যেমন পারে, ছোট বড় মূর্ত্তির কল্পনা করেছে।

বেলা-কুচিতে বাস থামল। নদী এখানে পাতাল-গঙ্গা। বেলা এগারটায় জোশীমঠ পৌঁছলাম।

বাস্ স্টপেজের কাছেই সৈন্যদের তাঁবু পড়েছে। ভারত সীমান্তে চীনাদের অনুপ্রবেশের ফলে ভারত সরকারকেও সীমান্তের এইরূপ জায়গায় সৈন্যাদি পাঠাতে হচ্ছে। হিমালয়ের গাম্ভীর্য্য, ধ্যানমগ্নভাব ও শান্তি বিঘ্নিত হয়েছে। অর্জ্জুন আদি পাণ্ডবগণ অস্ত্রসংবরণ করার অনতিবিলম্বে পীত দস্যুগণের হানা ও গোধন অপহরণের কথা মহাভারতে উল্লিখিত আছে। বোধ হয় তারাই এঁরা।

বললাম—"বোঝা যায় যে।"

সাধু হাসলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি কোথায় চলেছ ?"

বললাম—"বদ্রীনাথ দর্শনে।"

সাধু—"বেশ। কিন্তু মন্দির খুলতে যে দেরী আছে। জোশীমঠে কয়েকদিন থেকে যেও। বদ্রীনাথের রাস্তায় এখনও নিশ্চয় বরফ আছে। আর চটিগুলোতেও মানুষ নেই। একা যাওয়া মুস্কিল।"

তাঁকে বললাম যে, আমি অফিসের কাজের ফাঁকে এসে পড়েছি। অপেক্ষা করার সময় নেই। আজই জোশীমঠ থেকে হাঁটতে সুরু করব।"

ড্রাইভার বললেন—"এই বাঙ্গালীবাবুর খেয়াল দেখে আমি তাজ্জব মহারাজ! কাল বাবুর অসুখ হয়েছিল আর আজই বলেন কিনা জোশীমঠ থেকে হাঁটবেন!

সাধু চুপ করে রইলেন।

প্রশ্ন করলাম—"আপনি কি বলেন ? যেতে পারব না ?"

সাধু কোন কথাই বললেন না।

আমি মুখস্থ বলতে লাগলাম—"আজই বেলা তিনটে নাগাদ জোশীমঠ থেকে বেরিয়ে পড়ব। সন্ধ্যেয় পাণ্ডুকেশ্বর পৌঁছে রাতটা ওখানেই কাটিয়ে দেব। কাল সকালে উঠেই হাঁটতে আরম্ভ করব। পাণ্ডুকেশ্বর থেকে তো মাত্র এগার মাইল শুনেছি। বেলা বারটা. একটায় নিশ্চয় পৌঁছে যাব। আবার ওখান থেকে দু'টোর মধ্যেই বেরিয়ে সন্ধ্যেবেলায় পাণ্ডুকেশ্বর ফিরে আসব।"

ড্রাইভার হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন—"বাবুজী, অত সোজা নয়। বদ্রীনাথ এগার হাজার ফিট উঁচু। শেষের সাত মাইল চড়াই ঠেলে উঠতেই নীচের (অর্থাৎ সমতলের) মানুষের দু'দিন লাগবে। তারপর আপনার খারাপ শরীর।"

দমে গেলাম।

সাধুকে আবার প্রশ্ন করলাম—"আপনি বলুন, আমি পৌঁছতে পারব তো ?

জোশীমঠের নৃসিংহ মন্দির উল্লেখযোগ্য। শীতের ছ'মাস যখন বদ্রীনাথের মন্দির বরফে ঢাকা থাকে তখন তাঁর পুজা হয় এই নৃসিংহ মূর্ত্তিতে।

জোশীমঠের পূর্ব্বনাম ছিল জ্যোতির্মঠ। আচার্য্য শঙ্কর এখানে জ্যোতির্লিঙ্গ শিবের মন্দির ও সন্ন্যাসীদের জন্য মঠ স্থাপনা করেছিলেন। তাই স্থানের নাম হয়েছিল জ্যোতির্মঠ। মঠটির দ্বার রুদ্ধ দেখলাম। সরকারী তালা—আর তার সঙ্গে ঝুলছে হাকিম সাহেবের বিবৃতি। যার মর্ম হ'ল—দু'দল সন্ন্যাসী নিজেদের আচার্য্য শঙ্করের উত্তরাধিকারী দাবী করে ঝগড়া মারামারি করছিলেন বলে, বিবাদের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত সরকার এই মঠ বন্ধ করে দিয়েছেন।

সরকারী কর্ম্মচারীরা পাহারায় আছেন।

শিবাবতার আচার্য্য শঙ্করের উত্তরাধিকার-কামীদের ক্রিয়াকলাপ সকলকেই ব্যথা দিতে বাধ্য।

জ্যোতির্মঠ দেখে, বাস স্ট্যাণ্ড বা দ্বারের কাছে, এক নেপালী হোটেলে আহার সারলাম। খোঁজ করলাম কেউ বদরীনাথ যাচ্ছেন কিনা। শুনলাম কেউই যাচ্ছেন না। চিন্তা হ'ল। রাস্তাঘাট চিনিনা তো।

নেপালী হোটেলওয়ালা শান্ বাহাদুর বুঝাল,—'চিন্তার কোন কারণ নেই। চোর ডাকাত বলতে এধারে কিছু নেই। আর রাস্তা চেনা? সে তো অতি সহজ! একটাই পায়ে হাঁটা পথ। পথে সাথীও হয় তো পেয়ে যাবেন।' শান্ বাহাদুর কিছুদূর পর্য্যন্ত এগিয়ে এসে আমায় দেখিয়ে দিল—পথ কোন দিকে।

জোশীমঠের অনেক নীচুতে, খাদের মত একটা জায়গায় দেখা যাচ্ছে নদী। আর যেন সেই নদীর গা থেকে একটা সরু পথ উঠে পাশের পাহাড়টার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে। পাহাড়ের আড়ালে কি আছে দেখার বা জানার উপায় নেই। নিঝুম, নিস্তব্ধ, জনমানবহীন সেই খাদের মধ্যে ওই যে পথের সুরু ওই হ'ল বদ্রীধামের পথ। আসল হিমালয়ের স্পর্শ বুঝি ওখান থেকেই সুরু। শান্ ফিরে গেল। আমি নামতে লাগলাম। প্রায় চল্লিশ মিনিট উতরাই ভাঙ্গার পর নদীর সেই পাড় এলো। কিন্তু পাড় বলতে যা বুঝায় তা' নেই, আর নদীও একটা নয়। দুই নদীর সঙ্গম হয়েছে। অলকানন্দা ও বিষ্ণুগঙ্গা (বা ধবল গঙ্গা) মিলেছে,—পূত মিলনস্থল বিষ্ণু-প্রয়াগ নাম-গ্রহণ করেছে। গরুড়-গঙ্গা হ'তে এই বিষ্ণু-প্রয়াগ পর্য্যন্ত ভূমিটির নাম সুপ্ত-বদ্রী।

একটা ছোটপুল রয়েছে। সেটা পার হলেই দু'তিনটে দোকান ঘর। একটা দোকানের সামনে একটি পাহাড়ীছেলে জুতোর ফিতে আঁটছিল। আরও দু'জন কাছেই বসে সিগারেট খাচ্ছিল। তারা জানতে চাইল আমি কোথায় যাচ্ছি।

বললাম—আজ রাতটার মত পাণ্ডুকেশ্বর।

যে জুতো পরছিল সে বলল—"চলুন, আমিও পাণ্ডুকেশ্বর যাচ্ছি। আমার বাড়ী পাণ্ডুকেশ্বরেই।" গাইড্ পেয়ে গেলাম। রোগের কথা ভেবে চিন্তিত হয়েছিলাম,—এলো আরোগ্য। পথের একাকীত্বের কথা ভেবে সংশয় হতেই জুটলো সঙ্গী, পথপ্রদর্শক।
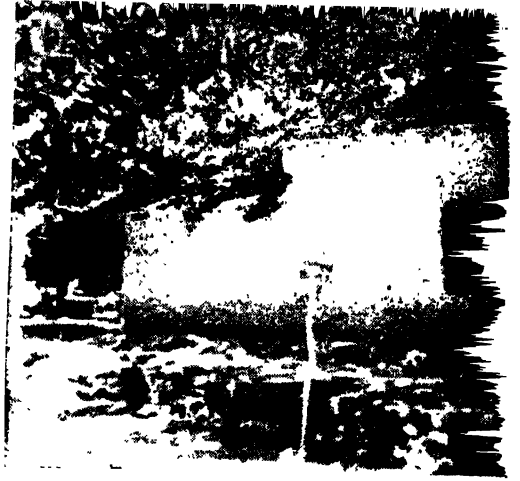
জীবের অসুবিধা হ'লেই শিব যে ছুটে আসেন। ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলাম—"সন্ধ্যের আগে আমরা পাণ্ডুকেশ্বর পৌঁছতে পারব তো?

সে বলল—"নিশ্চয়।"

পাহাড়ের ছেলে, পাহাড়ী। সে যত তাড়াতাড়ি চড়াই পথ চলতে পারে আমি তা পারি না। কাজেই বার বার পিছিয়ে পড়তে লাগলাম।

বেলা গড়িয়ে পড়েছে। আমাদের চলার পথে পাহাড়ের ছায়া।

দু'টি মাত্র প্রাণী পাহাড়ে পথ ভেঙ্গে এগিয়ে চলেছি। হঠাৎ যেন কোথায় বাজ পড়ল, আর তারপরেই একটা হুড়মুড় শব্দ। ছেলেটি বলল—"সরকারী লোকরা পাহাড় ফাটালো। আমাদের একটু সাবধানে, দেখেশুনে যেতে হবে। মাথায় পাথর পড়বার ভয় আছে।"

মাইল দেড়েক যাওয়ার পর পাহাড় ফাটানো দলের দেখা পেলাম। আমাদের পায়ে চলার পথটির প্রায় দু' তিনশ ফিট উঁচু দিয়ে মোটর যাওয়ার একটা রাস্তা তৈরী হচ্ছে। রাস্তাটা বদ্রীনাথ পর্য্যন্ত

বিষ্ণু প্রয়াগ
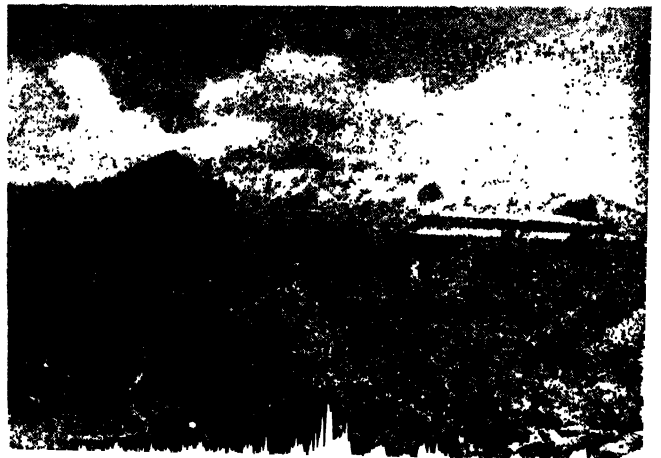
লোকটি—"পথ তো নহি খুলা।"

—"কোই বাত নাই। সিরফ মন্দির তক পৌঁছনা। রাত কে লিয়ে যহাঁ ঠহরনেকা জগহ মিলেগা ক্যা ?"

—"চটি তো খালি দেখ রহে হেঁ। কোই খাস জগহ মিলনা মুসকিল।"

সামনের দোতলাটা দেখিয়ে বললেন—"অগর আপ উস কমরা মে রহনে চাহতে তো রহ সকতে। ম্যয় হু অওর ডি, ডি, টি-ওয়ালা দো আদমি হৈ।"

প্রশ্ন করলাম—"খানা মিলেগী তো ?"

তিনি হেসে উত্তর দিলেন—"কুছ ভি নহি। সব হি দুকান বন্ধ। লেকিন থোড়া দূর বস্তি সে চাওঅল, নিমক অওর আলু মিল সকতা। লকড়ী মিলেগী। আপকো খুদ পকানে পড়েগা।"

যাবে। দু'বছরের মধ্যেই কাজ শেষ হবে। যাত্রীরা ঋষিকেশ হতে বদ্রীনাথ পর্য্যন্ত সমস্ত পথটাই যাতে মোটরে যেতে পারেন তার জন্য এবং সৈন্য চলাচলের জন্যও বটে। শুনলাম, বদ্রীনাথ থেকে মাইল পঞ্চাশ দূরে বসে আছে চীনা সেনা।

এই চীনা হানাদারদের উৎপাতেই বহুশত বৎসর আগে, বদ্রীনাথের বিগ্রহ, তাঁর পূজারী নারদকুণ্ডের জলে ফেলে দিয়েছিলেন। আচার্য্য শঙ্কর যোগবলে জলের মধ্যে মূর্ত্তির অধিষ্ঠান স্থলটি জানতে পারেন এবং মূর্ত্তিটি উদ্ধার করেন।

পাহাড় ফাটানোর ফলে পায়ে-চলা পথটির যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। জায়গায় জায়গায় রাশি রাশি পাথর পড়ে এমনভাবে পথ অবরুদ্ধ করেছে যে, সেই পাথরের স্তূপ পার হওয়া প্রায় অসম্ভব বোধ হচ্ছিল। পাহাড়ী সঙ্গী না থাকলে জোশীমঠে ফিরে আসতে হ'ত।

বিষ্ণুপ্রয়াগ থেকে মাইল পাঁচেকের মাথায় গোবিন্দঘাট। গোবিন্দ-ঘাট হ'তে নয় মাইল দূরে লোকপাল নামক স্থান শিখদের পরম তীর্থ বিশেষ। কথিত আছে, গুরু গোবিন্দজী পূর্ব্ব জন্মে এখানে তপস্যা করেছিলেন। তখন তাঁর নাম ছিল মেধস মুনি। ওখানে যাওয়া হ'ল না বলে একটা ক্ষোভ রয়ে গেল।

জোশীমঠ থেকে পাণ্ডুকেশ্বরের দূরত্ব সওয়া আট মাইল। বিকাল তিনটের জোশীমঠ থেকে হাঁটতে আরম্ভ করে ঠিক পৌনে সাতটায় পাণ্ডুকেশ্বর পৌঁছে গেলাম। পাণ্ডুকেশ্বরের উচ্চতা প্রায় ৬৫০০ ফিট্।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমেছে। চটিটিতে লোকজন নেই। কাঠের বাড়ী ও ধর্ম্মশালাগুলো হানাবাড়ীর মত পড়ে আছে। একখানা দোকানও খোলেনি। খুবই ভাবনা হ'ল। এমন সময় চোখে পড়ল, একটা রোয়াকের মত জায়গায় কম্বল গায়ে কে একজন বসে। কাছে যেতেই লোকটি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন—"আপ কহঁ যাইয়েগা ?

বললাম—"বদ্রীনাথজী।"

শুনে হতাশ হয়ে পড়লাম। যাই হোক, আগে আশ্রয়ের চিন্তা,—এই ভেবে বললাম—"চলিয়ে মহারাজ, ডেরা তো মিলাইয়ে।"

কাঠের দোতলায় আশ্রয় মিলল।

বোধ হচ্ছিল আবার জ্বর এসেছে। খানা বানানো দূরে রইল। এক লোটা জল খেয়ে সটান শুয়ে পড়লাম। ঘরে কেরোসিন তেলের একটা কুপী জ্বলছিল। তাতে অন্ধকার তো দূর হচ্ছিলই না, বরং আলো আঁধারির এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল।

একটু পরেই দু'টি ছেলে ঘরে এসে ঢুকল। সরকারী স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে ডি, ডি, টি, স্প্রে করে বেড়ানোর কাজ এদের। একজন স্প্রে করে, অপরজন ইনস্ট্রাক্‌সন দেয়। যে ইনস্ট্রাকসন দেয় সে ছেলেটি যদিও আলমোড়ার বাসিন্দা হয়ে গেছে কিন্তু, আসলে সে গুজরাটি। অপরজন গড়ওয়ালি। যিনি আমায় পথ থেকে নিয়ে এলেন, সেই লোকটি, রাজকোটের। সংসার ত্যাগ করেছেন।

আলাপ হ'তেই গড়ওয়ালি ছেলেটি আমায় বলল—"আমি খানা বানাবো। আপনি ভাববেননা।" তার কথায় যেন অমৃতের স্বাদ পেলাম।

সেই রাতে ছেলেটি আলু, ডাল চাল আর নুন সংগ্রহ করে আনলো। বাকী সামগ্রী তার ভাঁড়ারে মজুত ছিল। তৈরী হ'ল চমৎকার খিচুড়ি।...ওরা দু'জন, আমি ও রাজকোটের মানুষটি এই চারজনের তাই দিয়ে নৈশভোজন সমাধা হ'ল।

ওঁরা তিনজনেই বললেন—অসুস্থ শরীরে বদ্রী যাওয়ার ঝুঁকি না নেওয়াই উচিত। নানা আলোচনার পর সবাই শুয়ে পড়লাম।

সকাল পাঁচটায় ঘুম ভাঙ্গল।

আশ্চর্য্য হ'লাম পূর্ব্বদিনের অসুস্থতা সম্পূর্ণ তিরোহিত !...

ঠিক ছ'টার সময় পাণ্ডুকেশ্বর ছেড়ে এগিয়ে চললাম। মাইল খানেক যাওয়ার পর পথ রোধ করে দাঁড়াল বড় বড় দাড়িউলী বেঁটে-খাটো ছাগীর এক পল্টন। তা'রা নীচে নামছে। পিঠে বালিশের

মত একটা করে বোঝা,—চাল ভর্ত্তি। ছাগীদেরও এখানে খেটে খেতে হয়। অচেনা মানুষ দেখে শিঙ বাগিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে রইল। না এগোয়, না পেছোয়। শুধু বড় বড় চোখে ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে দেখতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তা'দের মালিক এসে দেখা দিল। বলল—"কোনও ভয় নেই। আপনি এগিয়ে আসুন। ওরা পথ ছেড়ে দেবে। নয়তো ওই ভাবেই দাঁড়িয়ে থাকবে।"

তার কথায় এগিয়ে যেতেই, সত্যি সত্যি, ছাগীর দল হুড়মুড় করে পাহাড়ের একধাপ ওপরে উঠে পালাল। প্রায় চল্লিশ মিনিট চলার পর, শেষধারা পার হয়ে গেলাম। আর পৌনে দু'ঘণ্টার মাথায় লাম্বগড়। এখানে একটা চটি আছে। একটা রেস্ট্ হাউস এবং শিখদের একটা গুরুদ্বারও রয়েছে।

লাম্বগড় ছেড়ে যতই এগোতে লাগলাম শৈত্য ততই বাড়তে লাগল। যদিও তখন গ্রীষ্মকাল এসে পড়েছে তবু কয়েকটা পাহাড় বরফের মুকুট পরে আছে। সূর্য্যদেব পৃথিবীর আরও কাছে এলে তাঁর সম্মানে মুকুট খুলবে বোধ হয়।

লাম্বগড় থেকে হনুমান চটি চার মাইল। এতটা পথের মধ্যে শুধু এক জায়গায় পাঁচ সাতখানা চালা ঘর ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না। মানুষ, পশু, পক্ষী মায় কাক পর্য্যন্ত বিরল। তবে, প্রকৃতি এখানে অপূর্ব্ব সুন্দরী! তাই যাত্রী নিঃসঙ্গ হ'লেও কিছুই এসে যায় না। বরং একা সেই রূপসুধার ষোল আনাই উপভোগ করতে পায়।...বিষ্ণুপ্রয়াগ থেকে কুবের-শিলা পর্য্যন্ত ক্ষেত্রটির নাম অতি সূক্ষ্ম বদ্রী। এই স্থানটি তার মধ্যাঞ্চল।

লাম্বগড় হ'তে পথ ক্রমশঃই উর্দ্ধগামী। দৈহিক কষ্ট যতই বাড়তে থাকে, ততই মনের স্থূল চিন্তা, জাগতিক বস্তু-চিন্তা যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে ঝরে পড়তে থাকে।

চার দিকেই আট ন' হাজার ফিট পাহাড়ের বেড়া আর চিড়, কেলু ফার্ণ-এর ভিড়। শুধু পথের বাঁ দিকে, নীচু দিয়ে অতি বেগে বয়ে যাচ্ছে অলকানন্দা।...সবই স্থিতিশীল, নিশ্চল। শুধু গতিশীল একটি মাত্র প্রাণী, আমি। আর গতিশীলা—নদী অলকানন্দা। তাই যেন স্পষ্ট প্রতিভাত হচ্ছিল নদীও প্রাণময়ী জীবন্ত।

মনে হ'ল আমরা চলেছি, আর স্তব্ধ গম্ভীর পর্ব্বত বসে বসে তাই নিরীক্ষণ করছে। আমি চলেছি উপরে, নদী নীচে। পর্ব্বত যেন ধ্যান মগ্ন বিশ্বামিত্রের মত শান্ত, সমাহিত। অলকানন্দা কোলাহলময়ী। সে কোথাও পাহাড়ের বুক থেকে লাফিয়ে পড়ছে, কখনও বা শিলা-খণ্ডের তলায় লুকোচ্ছে, আবার কোথাও বা আবর্ত্তের সৃষ্টি করছে। নেচে, গেয়ে, কলহাস্যে, মেনকার মত, পর্ব্বত বিশ্বামিত্রের ধ্যান ভাঙ্গাবার চেষ্টা করছে। কি চায় অলকানন্দা?...

গরমের হাওয়া লেগে বেশীর ভাগ বরাঁশ ফুলই ঝরে গেছে তবুও, স্থানে স্থানে তাদের সে কি উজ্জ্বল সমারোহ! পাহাড়ের বুকের সব কিছুই যখন বরফের চাদরের নীচে ঘুমায় তখন গাঢ় রক্তবর্ণের বরাঁশই শুধু জেগে থাকে। খুব ছোট লিচু পাতার মত পাতা, আর কলকে ফুলের গাছের মত উচু গাছের বুক ভর্ত্তি টকটকে লালফুল—বরাঁশ। পাহাড়ীদের সর্ব্বরোগের মহৌষধ। ওরা বলে,—বরাঁশফুল নয়। বরাঁশ বদ্রীনারায়ণের বর, প্রসাদ।

একটা চিড় গাছের কুঞ্জ পার হয়ে গেলাম। নদী এখানে অনেকটা নীচে দিয়ে চলেছে। তার গর্জ্জন প্রায় শোনা যাচ্ছেনা। জায়গাটায় গাছ এত ঘন যে বন বলা যায়। পথের ধারে, একটুখানি জায়গায়, কে যেন নতুন কচি ঘাসের গালিচা বিছিয়ে দিয়ে গেছে। কোথা থেকে একটা মিষ্টি গন্ধ আসছে। কোনও লুকনো ফুলের বোধ হয়। ঝিরঝিরে হাওয়ার একটা ঢেউ লাগল।...পায়ের তলায় কচি ঘাসের স্পর্শ, ভেসে আসা সুগন্ধ, মাথার ওপর চিড়গাছের স্নেহ-ছায়া মনে পড়িয়ে দিল—

"ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি বনের পথে যেতে,
ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে,
ছড়িয়ে গেছে আনন্দেরই দান।"

সেদিনের সেই আনন্দের, সেই আনন্দলোকের অনুভূতি অবিস্মরণীয়।... সেই আনন্দের কারণ কি ওই ফুলের সৌরভ? ওই তৃণরাজির স্পর্শ?

সুখদুঃখের অনুভূতি যেমন আবর্ত্তিত হয়, পরিবর্ত্তিত হয়, তেমনি ওই গন্ধও স্পর্শেরও দিনে দিনে বা ঋতু বিশেষে পরিবর্ত্তন আছে, ওরা পরিবর্ত্তনশীল। মনকে ঘিরে, আশ্রয় করে, সুখ দুঃখ যেমন আসা যাওয়া করে তেমন ফুল বস্তুটিকে অপেক্ষা করে গন্ধের খেলা। আবার গাছকে আশ্রয় করেই ফুলের আসা যাওয়া।...তৃণকে অপেক্ষা করেই শ্যামলতা ও রক্ষতার প্রকাশ। কিন্তু সেই গাছ, সেই তৃণও নিত্য নয়। ওরা যে স্থিত বস্তুটিকে অপেক্ষা করে থাকে তা' ওই পর্ব্বত। পর্ব্বতকে ঘিরেই ওদের আসা যাওয়া। কিন্তু পর্ব্বতও তো পৃথ্বি ধৃত, পৃথিবীকে আশ্রয় করে আছে। আবার পৃথিবীও অপরকে আশ্রয় করে আছে। পৃথিবী মহাকাশের বুকে আবর্ত্তন, পরিবর্ত্তনের খেলা খেলছে। তাই পৃথিবী আকাশ আশ্রিত বা আকাশকে অপেক্ষা করে আছে। সেই মহাকাশ কাকে অপেক্ষা করে আছে?...তাতো জানি না! তাঁর ধারণা করতে পারিনা। তবে জানি তিনিই শেষ। 'তস্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ—আকাশ যাঁকে আশ্রয় বা অপেক্ষা করে আছে তিনিই আত্মা, তিনিই পরমাত্মা, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই বদ্রীনাথ।...কিন্তু তাঁর সঠিক রূপটি তো জানিনা! তাই তো, আমি জানি কিন্তু আমি জানি না—

—"নাহং মন্যে সুবেদেতি
নো ন বেদেতি বেদ চ।"

তাই জানার মাঝে সেই অজানার প্রভাবে, জ্ঞানের সঙ্গে অজ্ঞতার মিশ্রণে, অজ্ঞতা ও আনন্দের অবকাশ ও স্পর্শেই সৃষ্টি হচ্ছে, সৃষ্টি চলেছে।...সেই জ্ঞানাতীত, বোধাতীতকে অপেক্ষা করেই সর্ব ঘুরছে। এই ঘূর্ণন বা চক্রবর্ত্তনের চক্রটিকে যিনি ধারণ করে আছেন তিনিই

বিষ্ণু, তিনিই বদ্রীনাথ। তিনিই ওই হঠাৎ-আসা আনন্দের আসল কারণ। ফুলের গন্ধটি নয়।

আরও মাইল খানেক যাওয়ার পর, অতি সূক্ষ্ম বদ্রীক্ষেত্রের শেষের দিকে, দৈহিক কষ্ট যতই তীব্রতর হ'তে লাগল মনের গতি-প্রকৃতিও ততই যেন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হয়ে উঠল।

আবার নৃত্য-চঞ্চলা অলকানন্দার গা' ঘেঁষে যেতে লাগলাম। এবার কিন্তু মনে হ'ল না সে মেনকা, পর্ব্বত বিশ্বমিত্রের ধ্যানের, সাধনার বিঘ্নোৎপাদিকা।...শারীরিক যন্ত্রণায় মনে হচ্ছিল আর উঠে কাজ নেই, ফিরে যাই। মন-গুরু তখনই দেখিয়ে দিলেন ঢেউয়ের আকারে অলকানন্দার জলকণাগুলি যেন মাথা তুলে বলছে—'দাঁড়িও না। দেখ, আমরা দাঁড়াচ্ছি না শুধু অবিশ্রান্ত ছুটে চলেছি মহাসমুদ্রের পানে। তুমিও চলো তোমার গন্তব্যের দিকে।'

অবিরাম ছুটে চলেছে অলকানন্দা। সুদূর সমুদ্র তার লক্ষ্য। তাকে মহাসমুদ্রে মিশতে হ'বে। তার তো দাঁড়াবার সময় নেই।

মানুষও ছুটে চলেছে এমনই এক বিরাটের উদ্দেশে।

পরমাত্মার চ্যুত অংশ জীবাত্মা, ছুটে চলেছে আবার পরমাত্মার সঙ্গে মিলে যেতে, মিশে যেতে, একীভূত হ'তে। লীলার প্রয়োজনে সাময়িক-ভাবে চ্যুত হয়ে পড়লেও বন্ধন যে তাদের অচ্যুত।...একদিন মহা সমুদ্রের যে জলকণা উত্তাপে বাষ্প হয়ে, মেঘের রূপ ধরে পর্ব্বত শিখরে গিয়েছিল, শৈত্যে তুষার হয়ে পর্ব্বতে বাস করেছিল, তাই আবার উত্তাপে পূর্ব্বাবস্থা পেয়েই নদীর জলধারা রূপ ধারণ করে ছুটে চলেছে স্বস্থানে।...শস্যাধারে যে জীবাত্মা (অনুসায়ী জীব) অন্নরূপে জীবদেহে প্রবেশ করেছিল, বীর্য্যাদি মাধ্যমে একটি দেহ বা আধার রচনা করে নিয়েছিল, যা দেহাধারে কৌমার-যৌবন-জরা রূপ উপভোগ করেছিল, সেই আত্মা আবার দেহত্যাগে পূর্ব্বরূপ ধারণ করে যেন স্বস্থানে ফিরে চলেছে।

চলতে চলতে একসময় এমন জায়গায় পৌছলাম যেখানটার মত নিভৃত, নিঝুম স্থল মনে হ'ল বুঝি আর কোথাও নেই। কিন্তু কি আশ্চর্য্য—ছোট ছোট গাছগুলো মৃদু হাওয়ায় ঢেউয়ে দুলে দুলে যেন কথা কইছে? কি যেন বলতে চাইছে।

শ্বাসকষ্ট ও ভয়ানক ক্লান্তিতে এক শিলাখণ্ডে ঝপ করে বসে পড়লাম। মনে হ'ল পাথর যেন ইঙ্গিত করল—'এখানে বসো।' সেখানে সরব ভাষা নেই। তবু মন যেন কথা কয় সব মূকের সঙ্গে, সব নীরবই যেন কথা কয় মনের সঙ্গে। সবই যেন বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। পাথর, মাটি, নদীর জলকণা, ঘাস-পাতা, সমীরণ—সবের ভাষাই যেন মন বুঝতে পারে।...অন্ধ যেমন স্পর্শের দ্বারা দেখার অনুভূতি পায়, তেমনি এখানে স্পর্শের দ্বারাও দর্শনের মাধ্যমেই মন যেন কথা কয়।...স্পর্শ ও দর্শন রূপ নীরব ভাষায় স্পষ্ট বোঝা যায় সবই সরব, শব্দময়।

নির্ব্বাক শিশু চারিপার্শ্বস্থ পরিবেশে সব কিছুই যেমন জীবন্ত দেখে, তেমনি নতুন দৃষ্টিতে একটি ধূলিকণা, একটি জলকণাও মনে হচ্ছিল চেতন।...বালক ধ্রুবের জানা ছিল এই চেতনার কথা। তিনি জানতেন শ্রীকৃষ্ণের সেই ইঙ্গিত—"ভূতানাম্ অস্মি চেতনা"—'অর্জ্জুন, আমি * ভূতমধ্যে (elements এর মধ্যে) চেতনা; প্রতি পদার্থ চেতন।...তাই ধ্রুব নারকেল ভাঙতে গিয়ে সর্ব্বত্র দেখেছিলেন নারায়ণকে, সেই বিশ্বব্যাপী চেতনাকে, প্রাণকে।...

অধুনা, পদার্থ বিজ্ঞানও প্রকৃতির রহস্য ভেদ করতে করতে পদার্থকে ব্যবচ্ছেদ করতে করতে, পরমাণুতে পৌছে দেখতে পেয়েছে। আপাত-দৃষ্টিতে যাকে অচেতন বলা হয় সেইরূপ পদার্থের পরমাণুটিই শুধু নয়, তার অন্তঃস্থ নিউক্লিয়াসটিতেও স্পন্দন, চেতনা বা অনুভব শক্তি বর্ত্তমান। তবে, জীবদেহে, পদার্থের ভিতর অণু-পরমাণু মধ্যে, ওই চেতনা বা অনুভবশক্তির বিকাশের বা স্ফুরণের, উৎপত্তির বা আগমনের রহস্যটি আজও সকল জ্ঞান বিজ্ঞানের, সকলের অজানা।

সর্ব্বভূতে চেতনার ব্যাপ্তি ও অস্তিত্ব জেনেই দ্রষ্টা বললেন,—'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।' সেই অজ্ঞাত, স্বয়ম্ভু-গুণ আকাশে, বায়ুতে, তেজে জলে ও পৃথ্বিতে (পার্থিব সকল বস্তুতে), প্রত্যেক পদার্থে—সকল পদার্থেই যখন বর্ত্তমান তখন সবই 'তিনি'। তাই সব সমান, সবাই সমান।......

আমার দেহস্থ কোষের একটি পরমাণু আর ওই পাথরের একটি পরমাণু উভয়েই একই চেতনাসমন্বিত,—সমান চেতনার অধিকারী! আমার সঙ্গে তাই তো সমগ্র বিশ্বের সকল পদার্থের এক আত্মীয়তার বন্ধন। তবে কেন অনুভব করবনা মূকের আহ্বান, ইঙ্গিত?

জাগতিক বহু বিষয়ে চিত্তের চাঞ্চল্য একাত্ম ভাবটির অনুভূতিকে উপলব্ধিকে, দূরে ঠেলে রাখে। দর্শন পেতে দেয় না, জানতে দেয়না ওই বিশ্বব্যাপ্ত চেতনার কথা। তাই বিভেদ চিন্তা ও ভিন্ন বোধ ঘটে। মানুষ মানুষকেই আঘাত করে! পরিবেশ গুণে, কালক্রমে যখনই চিত্তস্থির হয় তখন বিভেদ ঘুচে যায়, তখন বিভিন্নে সমবস্তুর দর্শন হয়। সবেই তখন কৃষ্ণ,—যত্র যত্র মনো যাতি তত্র তত্র কৃষ্ণ ভাতি। তখন আর চঞ্চল জলমধ্যে এক সূর্য্যকে বহু সূর্য্য দেখার ভ্রান্তি থাকে না। অনেক সূর্য্য এক সূর্য্য হয়ে যায়। সব মানুষই আত্মীয় হয়ে যায়,—সব জীবই এক হয়ে যায়। সকল ভাব মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

> যথা সূর্য্য একোহপম্বনেকশ্চলাসু,
> স্থিরাস্বপ্যহনন্যবিভাব্য স্বরূপঃ।
> কলাসু প্রভিন্নাসু ধীষ্বেক এব,
> স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা॥" (হস্তামলক)

দ্রষ্টা ঋষিগণ বললেন—'সর্ব্বভূতে হি প্রাণাঃ।' তাঁরা জানতেন ওই অণুতে অণুতে ব্যাপ্ত চেতনার কথা, অনুভূতি শক্তির কথা। তাই বললেন সব কিছুতেই প্রাণ আছে। আর ইঙ্গিত দিলেন যাকে তুমি প্রাণবস্তু বা জীবন্ত বলছ তা' শুধু একটি প্রাণ সমন্বিত নয়। তা বহু প্রাণের বা অসংখ্য সচেতন বস্তুর কোটি কোটি সচেতন অণুর, নিউক্লিয়াসের একটা সমষ্টি,—বহু চেতন elements-এর একত্রীভূত সমন্বয়। আর তাই আদি ভাষা বা দেব ভাষার নির্দ্দেশ হ'ল প্রাণ বোঝাতে প্রাণঃ নয়, প্রাণাঃ বলতে হ'বে। প্রাণ একবচন ভুল, অসম্ভব। প্রাণাঃ সঠিক শব্দ।

আজকের রাজনৈতিক কর্ণধাররা বলেন, তাঁদের এমন হাতিয়ার আছে যা' পৃথিবী থেকে প্রাণ নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। মানুষ ও সকল জীবকুলকে হয়তো নিশ্চিহ্ন করা যেতে পারে, কিন্তু ওই অণুতে অণুতে ব্যাপ্ত প্রাণকে কি পারমাণবিক অস্ত্র সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে ফেলতে পারবে?

(ক্রমশঃ)

ট্র্যাজিডি

রচনা—ও' হেনরী

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চন্দ্র

ফিঙ্ক-গিন্নী দোতলা থেকে একতলায় নেমে আসে। একতলায় ক্যাসিডি দম্পতি থাকে।

ফিঙ্ক-গিন্নীকে দেখে ক্যাসিডি-গিন্নী বলে "বেশ দেখাচ্ছে, না?" বলার মধ্যে বেশ খানিকটা গর্বের ভাব ফুটে বেরোয়।

একটা চোখ প্রায় বন্ধ। চোখের কোলে অনেকখানি জায়গা জুড়ে কালশিরার দাগ। ঠোঁটে তখনো রক্ত লেগে, ঘাড়ের দু'পাশে পাঁচ আঙুলের ছাপ।

ওর ঐ রকম দশা দেখে দোতলার গিন্নী বলে "কী এলাহি কাণ্ড বাবা তোমাদের! আমার কর্তার মাথায় কিন্তু এ-সব চিন্তা আসে না।"

উত্তরে একতলার গিন্নী বলে "এতে এলাহি কাণ্ডটা কী দেখলে? পুরুষ মানুষ নিজের স্ত্রীর গায়ে হাত তুলবে না? এ-রকম পুরুষ তো আমি কল্পনাও করতে পারি না। আমার জন্যে ভাবে, আমাকে ভালোবাসে বলেই তো মানুষটা আমায় মারধোর করে। আজ তো তবুও মারটা কম হয়েছে, তা না হ'লে এতক্ষণ চোখে সরষে ফুল দেখতুম। সপ্তাহের বাকি ক'টা দিন একেবারে মাটির মানুষ হয়ে থাকে। আমাকে ভোলাবার জন্যে মানুষটা কী না করে! চোখের কাছটা দেখিয়ে বলে—এর জন্যে মানুষটা কী করবে জান? আমাকে থিয়েটার দেখাবে, দিনেন অন্ততঃ দু'টো ব্লাউস কিনে দেবে।"

"আমার বিশ্বাস, আমার কর্তা কোনদিনই আমার গায়ে হাত তুলবে না। এই সব ইতরোমি কাণ্ড তাঁর মাথায় আসে না।"

কথাগুলো শুনে একতলার গিন্নী হো হো করে হেসে ওঠে, বলে "যা বলেছো দিদি। তুমি কিন্তু আমাকে হিংসে কর। তোমার কর্তার বয়স হ'য়েছে এ-সব ধকল সহ্য হবে কেন? অফিস থেকে ফিরে হাত মুখ ধুয়ে জল খাবার খাবেন। তারপর টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে পা দুলিয়ে খবরের কাগজ পড়তে আরম্ভ করবেন। এ-সব চিন্তা তাঁর মাথায় আসবে কেন? কথাগুলো কী ঠিক বলিনি?"

দোতলার গিন্নী ঘাড় নেড়ে বলে—"সত্যি বলেছো ভাই। অফিস থেকে ফিরে খাবার খেয়েই উনি কাগজ পড়তে বসেন। তবে এ-কথাও তোমাকে জানিয়ে রাখি যে, স্ত্রীকে ঠেঙ্গিয়ে হাতের সুখ করবেন, এ রকম নীচ-প্রবৃত্তি তাঁর মনে কোনদিনই জাগবে না।"

ও কথার কোন উত্তর না করে একতলার গিন্নী গায়ের গহনাগুলো নিয়ে নাড়চাড়া করে। গহনাগুলো দেখে দোতলার গিন্নীর মুখ শুকিয়ে ওঠে। অতীতের কথাগুলো একে একে মনে পড়ে যায়—ওদের তখন বিয়ে হয়নি। শহর থেকে অনেক দূরে একটা ফ্যাক্টরীতে ওরা কাজ করতো—পিচ্‌বোর্ডের বাক্স তৈরী করার ফ্যাক্টরী। এক সঙ্গে কাজ ক'রে, এক ঘরে থেকে ওদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। পরে দু'জনেরই বিয়ে হয়। ফিঙ্ক-দম্পতী দোতলাটা ভাড়া নেয়, আর একতলাটা ভাড়া নেয় ক্যাসিডি দম্পতি। তাই বান্ধবীর কাছে বেশী ছলাকলা করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না।

"তোমায় যখন মারেন, তখন তোমার লাগে না?"

"লাগে না আবার! মাথার ওপর কোন দিন থান

ইট পড়েছে? পড়লে বুঝতে পাড়তে কেমন লাগে। তা হো'ক, মারের পর কিন্তু আমাকে খুব আদর করেন। কত জায়গায় নিয়ে যান,—থিয়েটার, সিনেমা, আবার কখনো কখনো কত রকমের জামা কাপড় কিনে দেন।"

"আচ্ছা, কেন উনি তোমায় এতো মারেন?"

"একেবারে ছেলেমানুষের মতো প্রশ্ন করলে দিদি। শনিবার সারা সপ্তাহের খাটুনির দরুণ মজুরী পান। কাঁচা পয়সা হাতে পড়ে, তাই নেশায় বুদ্ হয়ে ঘরে ফেরেন।"

"তুমি এমন কি দোষ কর, যার জন্যে তোমায় মারেন?"

"অবাক করলে দিদি! আমি যে তার বউ হই। নেশায় টং হয়ে তিনি যখন বাড়ী ফেরেন তখন আমি ছাড়া আর তো কেউ কাছে থাকে না। তাছাড়া আমার গায়ে হাত তোলার অধিকার তিনি ছাড়া আর কার আছে? কোন দিন হয়তো রান্না করতে দেরী হয়ে যায়, কোন কোন দিন বিনা কারণেই হাত তোলেন। কারণের অপেক্ষায় চুপ করে বসে থাকবেন এমন মানুষ তিনি নন। শনিবার এলেই তাঁর মনে পড়ে যায় যে তিনি বিয়ে করেছেন, ঘরে বউ আছে। নেশায় চুর হয়ে তিনি বাড়ীতে এসেই আমার ওপর অত্যাচার আরম্ভ করেন। তাই শনিবারে আমি ঘরের সব জিনিষ পত্র সরিয়ে ফেলি, পাছে ধাক্কা লেগে মাথা না ফেটে যায়। আমাকে সামনে দেখেই তাঁর পাগলামি বেড়ে যায়—ধাই করে সজোরে ঘুষি চালান। যে-ধার অনেককিছু নেবার ইচ্ছে হয়, সেবার পালিয়ে না গিয়ে পড়ে পড়ে মারখাই। কাল রাত্রি বেলায় আমায় মেরেছেন বটে, কিন্তু দেখো আজ তিনি আমার জন্যে কতো জিনিষ কিনে আনবেন।"

দোতলার গিন্নী কথাগুলো খুব মন দিয়ে শোনে। ওর কথা শেষ হ'লে বলে "তুমি ঠিকই বলেছো ভাই। আমার স্বামী অফিস থেকে ফিরে সেই যে খবরের কাগজ নিয়ে বসবেন আর তাঁর সাড়া পাওয়া যাবে না। মার তো দূরের কথা, আজ পর্যন্ত আমাকে সঙ্গে করে কোথাও বেড়াতে নিয়ে যান নি। এই রকম ভালোমানুষী কিন্তু আমার মোটেই ভালো লাগেনা।"

একতলার গিন্নী বান্ধবীর হাত দু'টো ধরে বলে "কী করবে দিদি, সবই ভাগ্যের খেলা। আমার স্বামীর মতো জোয়ান পুরুষ ক'জন স্ত্রীর ভাগ্যে জোটে? তথাকথিত ভদ্রলোকদের স্ত্রীর জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে যায়। বিয়ের যে-রস, সে-টা তারা উপভোগ করতে পারে না। এই অসুখী স্ত্রীরা কী চায় জান? তারা চায়—স্বামী তাদের ওপর অত্যাচার করুক, তাদের মারুক, আবার আদর করে মারের বেদনাটুকু দূর করুক। এইটাই তো হ'লো আসল দাম্পত্য জীবন। আমি এমন স্বামী কামনা করি যে আমাকে বেদম প্রহার করবে, আবার আদরে-সোহাগে আমাকে ভরিয়ে তুলবে। মাটির মানুষ আমি একেবারেই সইতে পারি না।"

নিঃশ্বাস বন্ধ করে কথাগুলো শুনছিলো দোতলায় গিন্নী। বান্ধবীর কথা বলা শেষ হলে একটা বুকভরা নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে তার বুক থেকে।

হঠাৎ পায়ের শব্দ পাওয়া যায়। একতলার কর্তা ফিরে এলো। দরজার পাল্লাটা খুলে যেতেই মানুষটাকে দেখা গেল-দু'হাত ভর্তি জিনিষ বুকের কাছে ধরে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। স্ত্রী ছুটে এসে স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে। আনন্দে তার চোখ দু'টো ঝলমল করছে।

স্বামীর হাত থেকে কাগজের বাক্সগুলো মাটিতে পড়ে যায়। দু'টো হাত দিয়ে স্ত্রীকে শূন্যে তুলে ধ'রে বলে "তুমি যা যা বলেছিলে সবকটাই এনেছি, ঐ বাক্সগুলো খুললেই দেখতে পাবে। আরে! আপনিও আছেন দেখছি! কর্তার খবর কি?"

"তিনি ভালো আছেন। অফিস থেকে ফেরার সময় হ'লো। আমাকে এখুনি ওপরে যেতে হবে। বান্ধবীকে লক্ষ্য করে বলে—নমুনাটা তোমায় পরে দেখিয়ে যাব, কেমন?"

দোতলায় এসে ফিক্স-গিন্নী নিজেকে আর সামলাতে পারে না, গাল বেয়ে চোখের জল পড়তে থাকে। মনে মনে ভাবে নীচের লোকটার মতো দোহারা চেহারা তার স্বামীর। তবুও কেন সে আমার ওপর অত্যাচার করে না। তাহ'লে সত্যিই কি সে আমাকে ভালোবাসে না? আমার জন্যে এতটুকু ভাবে না? একটা দিনের জন্যেও তাকে রাগতে দেখলাম না। অফিস যাওয়া, অফিসের কাজ করা, কাজ শেষ হলে বাড়ীতে এসে চুপ করে খবরের কাগজ পড়া—যেন একটা কলের মানুষ। কথা

বার্তায় খুব ভালো, কিন্তু জীবনের আসল দিকটাই তার চোখে পড়ে না, কোন মূল্যই সে দেয় না।

সন্ধ্যে সাতটায় স্বামী ফিরে আসে, ভদ্রলোককে দেখলে মনে হয় যেন কোন বাতিকে ভুগছে। অফিস থেকে বেরিয়ে রাস্তা থেকে একটা গাড়ী ভাড়া করে সোজা চলে আসে বাড়ীতে। বাড়ী এসে কোথাও আর বেরোয় না।

স্ত্রী জিজ্ঞেস করে "খাবার দেব কী?"

"দাও।"

খাবার খেয়ে খবরের কাগজ নিয়ে পড়তে বসে।

পরের দিন রবিবার। অফিসে যাবার তাড়া নেই। হৈ চৈ করেই সারাটা দিন কেটে যাবে।

নমুনাটা নিয়ে দোতলার গিন্নী নীচে চলে আসে। ঘরের মধ্যে কাজে ব্যস্ত স্বামী-স্ত্রী। দুজনেরই গায়ে নতুন পোষাক, বিশেষ করে স্ত্রীর গায়ের জামাটা আলোয় ঝলমল করছে। দু'জনেরই চোখে-মুখে খুশির আমেজ। ওরা আজ পার্কে পার্কে ঘুরবে, দু'জনে মিলে চড়ুইভাতি করবে, সারাদিনটা হৈ হৈ করে কাটাবে।

দোতলার গিন্নী আর দাঁড়াতে পারে না। তাড়াতাড়ি ওপরে চলে আসে,হিংসেয় জলে-পুড়ে মরে। মনে মনে ভাবে ওরা কত সুখী! কিন্তু ঐ মেয়েটাই কী একা সুখ ভোগ করবে? তার স্বামীও একজন আদর্শ পুরুষ। এই রকম একজন আদর্শ স্বামীর স্ত্রী হয়েও কী সে চিরকাল অব-হেলিত, অনাদৃত থেকে জীবনটা কাটিয়ে দেবে?

হঠাৎ মাথার মধ্যে একটা ফন্দী আসে। সে ওদের দেখাবে যে জ্যাকের মত তার স্বামীও যেমন মারতে পারে, তেমনি আদরও করতে জানে।

ছুটির দিনেও তাকে রুটিন-বাঁধা কাজ করতে হয়। খাওয়া সেরে স্বামীরও সেই একই কাজ—চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়া।

হিংসার আগুন তখনও মনের মধ্যে ধিকিধিকি জলছে। যদি স্বামী গায়ে হাত না তোলে, যদি মাটির পুতুলের মতো চুপ করে বসে থাকে। না, ওকে আজ যেমন করেই হোক গায়ে হাত তুলতে হবে।

স্ত্রী স্বামীকে লক্ষ্য করে—মানুষটা চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছে। পায়ে একজোড়া মোজা, ঐ একটা সিগারেট ধরালো। গোড়ালী দিয়ে অন্য পায়ের হাঁটু চুলকোচ্ছে। বাহির জগৎ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রেখে ছোট্ট একটা ঘরের মধ্যে বসে খবরের কাগজ পড়তেই মানুষটা অভ্যস্ত। পাশের ঘর থেকে রান্নার গন্ধ ভেসে আসছে, একটু পরেই খাবারের থালা এসে পড়বে। অনেক কিছু চিন্তাই মানুষটার মাথায় আসে না। বিশেষ করে স্বামী হয়ে স্ত্রীর গায়ে হাত তোলা—মোটেই না।

স্ত্রী এক মনে নিজের কাজ করে যায়। ময়লা জিনিষ-গুলো গরম সাবান জলের মধ্যে ডুবিয়ে দেয়। এমন সময় নীচ থেকে হাসির শব্দ ভেসে আসে—স্বামী-স্ত্রী দু'জনে হাসছে। হাসির টুকরোটা ছুরির ফলার মতো ওর বুকে এসে বেঁধে। ও নিজেকে আর সামলাতে পারে না, রাগে মুখ লাল হয়ে ওঠে। স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বলে—তুমি একটা নিষ্কর্মার ধাড়ী। তুমি কী চাও—যে শেষ পর্যন্ত আমিই তোমাকে কিল চড় মারি? তুমি পুরুষ না অন্য কোন জীব?

স্বামী কাগজটা রেখে স্ত্রীর দিকে চেয়ে দেখে—বেশ কিছুটা আশ্চর্য হয়ে পড়েছে লোকটা।

স্ত্রী মনে মনে ভয় পায়, হয়তো তার সব "প্ল্যান" মাটি হবে। মানুষটা হয়তো গায়ে হাত তুলবে না, এখনও বোধ হয় উত্তেজিত হ'য়ে ওঠেনি মানুষটা। তাই স্বামীর কাছে চলে এসে গালে সজোরে চড় বসিয়ে দেয়।

চড় মারার সঙ্গে সঙ্গে সারা অঙ্গে একটা নতুন অনুভূতির ঢেউ বয়ে গেল। আজ এই প্রথম মনে হলো যে সে স্বামীকে কত ভালবাসে। তাই মনে মনে বলে—ওঠো, তোমার অপমানের প্রতিশোধ নাও। প্রমাণ কর তোমার মধ্যেও পুরুষত্ব আছে। আমাকে মেরে গুঁড়িয়ে ফেল—দেখাও তুমিও আমাকে ভালোবাসো।

স্বামী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। স্ত্রী স্বামীর মুখটা এক হাতে তুলে ধরে চোখে চোখ রাখে। এখুনি হয়তো বিরাশী সিক্কার একটা ঘুষি পিঠে এসে পড়বে।

ঠিক ঐ সময় একতলায় স্বামী স্ত্রীর চোখের কাছটা খুব সাবধানে পাউডার লাগিয়ে দিচ্ছে। স্ত্রীর মুখে একটা সলজ্জ ভাব। হঠাৎ দোতলা থেকে মেয়েলী গলার চীৎকার ভেসে আসে—চেয়ার, টেবিল পড়ে যাওয়ার শব্দও পাওয়া যায়।

•˙\

স্বামী বলে "ওপরে অত গণ্ডগোল হচ্ছে কেন ? গিয়ে দেখবো ?"

"না, না, তোমায় যেতে হবে না। একটু দাঁড়াও, চট করে ওপর থেকে একবার ঘুরে আসি।" একতলার গিন্নী পড়িমরি করে ওপরে চলে যায়।

পায়ের শব্দ পাওয়া মাত্র দোতলার গিন্নী রান্না ঘরের দরজা খুলে বাইরে চলে আসে।

ওকে দেখে একতলার গিন্নী জিজ্ঞেস করে "মেরেছেন ?"

বান্ধবীর কাঁধের ওপর আছাড় খেয়ে ছেলেমানুষের মতো কাঁদতে আরম্ভ করলো দোতলার গিন্নী।

একতলার গিন্নী ওর মুখখানা তুলে ধরে—চোখের জলে গাল ভেসে যাচ্ছে। সারা মুখের মধ্যে মারের কোন চিহ্ন নেই।

তাই সে জিজ্ঞেস করে—"কী হয়েছে ? তুমি যদি না বলো, আমি নিজে গিয়ে তোমার স্বামীকে জিজ্ঞেস করবো। কী হচ্ছিলো এতক্ষণ ? উনি কী তোমার গায়ে হাত তুলেছেন ?"

বান্ধবীর বুকের মধ্যে মুখটা লুকিয়ে দোতলার গিন্নী কাঁদতে কাঁদতে বলে—তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, দরজাটা খুলো না। না, ঐ পুরুষটা কিছুতেই আমার গায়ে হাত তুললো না। কথাটা যেন কাউকে বলো না।

বাংলা নাট্য-পরিক্রমা

শ্রীমন্মথ রায়

বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের রজত-জয়ন্তী অধিবেশনেই সর্বপ্রথম নাট্যশাখার পত্তন হলো। সেই শাখার সভাপতিত্বের সম্মান দিয়েছেন কর্তৃপক্ষ আমাকে। এ সম্মান ব্যক্তিগতভাবে আমার জন্য নয়—এ সম্মান, গত দেড় শতাব্দী ধ'রে বাংলা দেশে যাঁরা গৌরবময় নাট্যকীর্তি গঠন করেছেন তাঁদেরই সাধনা ও সিদ্ধির স্বীকৃতির স্বাক্ষর। বাংলার নাট্যকার ও নাট্যশিল্পীদের পক্ষ থেকে এজন্য আমি সানন্দ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আমাদের নাটক ও নাট্যশালার আদি কথা প্রসঙ্গে সংস্কৃত নাটকের ইতিহাস স্মরণীয়। ভাস, অশ্বঘোষ, কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতির গৌরবোজ্জ্বল নাট্যাবদানেই গড়ে উঠেছিল একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সংস্কৃত নাটকের স্বর্ণযুগ। ডাঃ কীথের মতে সংস্কৃত নাটকেই সংস্কৃত কাব্য ও সাহিত্যের পরম প্রকাশ স্বাক্ষরিত হয়েছিল। কিন্তু এই নাট্যচর্চা সীমাবদ্ধ ছিল রাজপুরীর নাট্যশালায়—দেশ ও জাতির মুক্ত অঙ্গনে নয়। বর্ণশ্রেষ্ঠ সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণদের রচিত উচ্চকাব্যরসাশ্রিত সংস্কৃত নাটক অভিজাত-রাজকুলের এবং রাজানুগৃহীত ব্যক্তিদেরই সাংস্কৃতিক বিলাস ছিল।

এথেন্স বা রোমের মুক্তাঙ্গন রঙ্গশালায় যেসব নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা ছিল, জনসাধারণও ছিল তার রসজ্ঞ দর্শক। এদেশে সেরূপ ব্যবস্থা না থাকায় সংস্কৃত নাটক দেশের বৃহত্তম জন-সমাজকে আনন্দ পরিবেশন করেনি কখনো—জাতীয় নাট্যশালাও গড়ে ওঠেনি তৎকালে এদেশে।

রাজানুগ্রহপুষ্ট সংস্কৃত নাটক হিন্দু রাজত্ব অবসানে অবলুপ্তির পথে গেল। ভারতে প্রতিষ্ঠিত হলো মুসলমান শাসন। মুসলমান শাসনকালে নাট্যকথা ও অভিনয়প্রথা রাজানুগ্রহ বা পৃষ্ঠপোষকতা থেকে হলো বঞ্চিত। কিন্তু মানুষের শাশ্বত রসানুভূতি তাতে নিরস্ত থাকলো না। রাজ-উপেক্ষিতা নাট্যকলা প্রজা-বন্দিতা হয়ে আত্মপ্রকাশ করলো বাংলা দেশের মুক্ত অঙ্গনের যাত্রা গানে। শিবের ছড়া, মঙ্গলচণ্ডীর গান, মনসার ভাসান, কৃষ্ণযাত্রা, রামযাত্রা, চণ্ডীযাত্রা, ঢপকীর্তন, কৃষ্ণকীর্তন, গম্ভীরা বা গাজনগান প্রভৃতি লোকনাট্যের সংস্পর্শে প্রভাবিত যাত্রাগান নাট্যরূপে রূপান্তরিত হয়ে ওঠে এবং দেশে বৃটিশ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই যাত্রাগানই বাঙালীর জাতীয় নাট্যোৎসবে পরিণত হয়।

ইংরেজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা দেশে ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রবর্তন হলো। কয়েকটি ইংরেজি থিয়েটার স্থাপিত হলো ক'লকাতায়। আজ থেকে একশ' ছেষট্টি বৎসর পূর্বে ১৭৯৫ সালের ২৭শে নভেম্বর Bengally Theatre'-ও স্থাপিত হলো কলকাতায়। যিনি প্রথম এই বাংলা নাট্যশালা স্থাপন করলেন বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন সেই হেরাসিম লেবেডেফ—একজন ভারতীয় সংস্কৃতিমুগ্ধ রাশিয়ান। তিনি তাঁর ভাষাশিক্ষক গোলকনাথ দাসকে দিয়ে Disguise নামে একটি ইংরেজি প্রহসন বাংলায় অনুবাদ করিয়ে বাঙালী অভিনেতা-অভিনেত্রী দিয়ে ঐ প্রহসনটিকে অভিনীত করান—ঐ 'Bengally Theatre'-এ ১৭৯৫ সালের ঐ ২৭শে নভেম্বর। এই নাটকটিই সর্বপ্রথম অভিনীত বাংলা নাটক।

এর পর ধীরে ধীরে শিক্ষিত ধনী বাঙালীদেরও অনেকে বাংলা নাট্যশালা স্থাপন করতে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। এইরূপ প্রচেষ্টায় প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'হিন্দু থিয়েটার'ই বাঙালী প্রতিষ্ঠিত প্রথম নাট্যশালা। এই সব নাট্যশালায় বাংলা নাটকের অভিনয় ক্রমশঃ জনপ্রিয় হতে লাগল। সে যুগের নাট্যকারদের মধ্যে হরচন্দ্র ঘোষ, রামনারায়ণ তর্করত্ন এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের নাম স্মরণীয়। কিন্তু এঁরা মূলতঃ ছিলেন অনুবাদক নাট্যকার। মৌলিক নাটক রচনার দক্ষতা নিয়ে এসে দাঁড়ালেন —মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্র। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা সত্ত্বেও তাঁদের নাটকে সংস্কৃত নাটকের প্রভাব ছিল যথেষ্ট। এই সময়ে বেশ কিছুকাল ধরে নাট্যরচনায় ও প্রযোজনায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দুই নাট্য-রীতির প্রভাবই পরিলক্ষিত হতে লাগল। অবশেষে প্রতীচ্য রীতিরই হলো জয়। এই সময়েই বাংলার নাট্যাকাশে নবদিগন্ত দেখা দেয়। বাংলার সাহিত্য জগৎ তখন বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাচ্ছটায় উদ্ভাসিত। ভাব প্রকাশে ভাষা তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য লাভ করল। সংলাপ-রচনা আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠে মনকে দোলা দেবার ক্ষমতা পেল। পাশ্চাত্য নাট্যরীতিতে নতুন করে জীবন্ত হয়ে উঠল নাট্যাভিনয়ের পৌরাণিক কাহিনী এবং সামাজিক চিত্র। বাংলা নাটকের সূচনা থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বাঙালীর নাট্যচর্চা অনেকটা প্রভাবান্বিত হয়েছিল এলিজাবে-থিয়ান স্টেজ ও সেক্সপীয়রের নাট্যাদর্শে। কিন্তু এতে লজ্জার কিছু নেই। প্রকৃত আর্টের কোন জাতি নেই। ভৌগোলিক সংজ্ঞা দ্বারা তা' সীমিতও নয় কোন দিন।

বাংলা নাট্য-সাহিত্য ও নাট্যশালার ক্রমবিকাশ বর্ণনা করার দীর্ঘ সময়ের স্বাধীনতা আমার নেই। কিন্তু রেনেশাঁ পর্বে নবজাগ্রত এই নাট্যশক্তি যে নাট্য-দিকপালদের পরিচালনায়, ধর্ম জীবনে, সমাজ-সংস্কারে ও রাজনৈতিক চেতনায় দেশ ও জাতিকে ভাবাপ্লুত ও উদ্বুদ্ধ করেছিল তাঁদের অনুল্লেখ অমার্জনীয় হবে।

রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব', উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎ সরোজিনী', মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী', 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী', 'জামাই বারিক', 'নীল দর্পণ', গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'বিল্বমঙ্গল', 'জনা', 'পাণ্ডবগৌরব', 'প্রফুল্ল', 'বলিদান', 'সিরাজদ্দৌল্লা', অমৃতলাল বসুর 'বিবাহ বিভ্রাট', 'কৃপণের ধন', 'খাস দখল', মনোমোহন রায়ের 'রিজিয়া' দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'মেবার পতন', সীতা', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'প্রতাপসিংহ', 'দুর্গাদাস', 'নুরজাহান' 'সাজাহান', মণিলাল বন্দ্যো-পাধ্যায়ের 'বাজীরাও', ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ক্ষত্রবীর', বরদা-প্রসন্ন দাশগুপ্তের 'মিশর কুমারী', নিশিকান্ত বসুর 'বঙ্গে বর্গী', 'দেবলাদেবী', ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'আলিবাবা' 'প্রতাপাদিত্য', 'রঘুবীর' প্রভৃতি নাটক বাংলার নাট্য-ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে।

আনন্দদানের সঙ্গে সঙ্গে জাতিকে ধর্মানুশীলনে, সমাজ সংস্কারে এবং দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করবার যাদুমন্ত্র ছিল এই সব অবিস্মরণীয় নাটকে। কিন্তু বাংলা নাটকের এই গৌরবময় ঐতিহ্য সম্পূর্ণতা লাভ করেছিল রবীন্দ্র-নাটকে। বাংলা নাট্য-সাহিত্যের মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন থেকেও রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে এক অতুলনীয় ভাব-জগতের সন্ধান দেয়। এই ভাব-জগতের ভিত্তি ছিল রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র জীবন-দর্শন, সৌষ্ঠব ছিল তাঁর অপরূপ কাব্যশ্রী অপূর্ব ভাষাদ্যুতি এবং প্রাণশক্তি ছিল তাঁর উদার উদাত্ত মানবতাবোধ। রবীন্দ্রনাট্যের প্রসাদেই বাংলা নাটক বিশ্বনাট্য-সাহিত্য-গৌরবের দাবিদার হতে পেরেছে। তাঁর গীতিনাট্য, যথা : 'বাল্মীকি প্রতিভা' ও 'মায়ার খেলা', কাব্যনাট্য যথা : 'রাজা ও রাণী', 'বিসর্জন', 'মালিনী', নাট্যকাব্য যথা : 'বিদায় অভিশাপ', 'গান্ধারীর আবেদন', 'কর্ণ কুন্তি সংবাদ', প্রহসন যথা : 'বৈকুণ্ঠের খাতা', চিরকুমার সভা', 'শেষরক্ষা', সাঙ্কেতিক অথবা তত্ত্বনাটক যথা : 'শারদোৎসব', 'রাজা', অচলায়তন', 'ডাকঘর', 'ফাল্গুনী', 'মুক্তধারা', 'রক্ত করবী', সামাজিক নাটক যথা : 'শোধ বোধ', 'বাঁশরী', নৃত্যনাট্য যথা : 'নটীর পূজা', 'তাসের দেশ', 'চিত্রাঙ্গদা', 'চণ্ডালিকা', 'শ্যামা', যে কোন দেশের নাট্য সাহিত্যের গৌরবরূপে অভিনন্দন যোগ্য। এদেশের প্রচলিত নাট্য-রীতি যথাযথ অনুসরণ না করে যে স্বভাব-সঙ্গত নাট্যরীতির প্রবর্তন তিনি করে গেছেন, তা' পূর্ব প্রচলিত যাত্রাগানের নাট্য-রীতিকেই বরং মর্যাদা দান করেছে।

রবীন্দ্র প্রতিভার কল্যাণে অনন্য এক নাট্যধারার প্রবর্তন হলো বটে, কিন্তু তার ভাবাদর্শ উচ্চগ্রামেগ্রথিত থাকায় এবং ব্যাপক প্রচেষ্টার অভাবে তা শিক্ষিত ব্যক্তিদেরই চিত্তানন্দ হয়ে রইল ; জনসাধারণের সাংস্কৃতিক আনন্দের পরিবেশক হয়ে থাকল সাধারণ নাট্যশালাগুলিই। নটগুরু গিরিশচন্দ্রের সৃষ্ট সুদৃঢ় নাট্যভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল যে পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক নাটকের স্বর্ণযুগ, তা ম্লান হবার মুখে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ অবসান কালে আবির্ভাব হলো নবদৃষ্টিভঙ্গী-সম্পন্ন নাট্যকলাবিশারদ এক নতুন নট সম্প্রদায়ের, যার নায়ক ও নাট্যাচার্য ছিলেন নটকুলশিরোমণি শিশিরকুমার ভাদুড়ি—মধ্যমণি ছিলেন নটসূর্য অহীন্দ্র এবং অন্যান্য জ্যোতিষ্ক ছিলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী, যোগেশ চৌধুরী, নরেশ মিত্র, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী তারাসুন্দরী, শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী, শ্রীমতী প্রভা, শ্রীমতী নীহারবালা, শ্রীমতী সরযূবালা প্রমুখ নটনটীগণ। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ষ্টার থিয়েটারে অপরেশচন্দ্রের 'কর্ণার্জুন' ও ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে নাট্য-মন্দিরে যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর 'সীতা' নাটকাভিনয়ে শুরু হল এঁদের নবনাট্য অভিযান। নবাগত এবং ক্রমাগত কুশীলবগণের উচ্চাঙ্গের অভিনয়ে স্মরণীয় হলো, পরবর্তী কালে যে সব নাটক, তাদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখ্য রবীন্দ্রনাথের 'গৃহ প্রবেশ', 'চিরকুমার সভা', শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'ষোড়শী', 'রমা', মন্মথ রায়ের 'চাঁদ সদাগর', 'কারাগার', 'অশোক', 'সাবিত্রী', 'খনা', 'মীরকাশিম', শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'গৈরিক পতাকা', সিরাজদ্দৌলা', 'ঝড়ের রাতে' 'স্বামী-স্ত্রী', 'তটিনীর বিচার', 'ধাত্রীপান্না', রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের 'মানময়ী গার্লস স্কুল', জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'রীতিমত নাটক', 'পি ডাবলিউ ডি',

যোগেশ চৌধুরীর 'দিগ্বিজয়ী', রমেশ গোস্বামীর 'কেদার রায়', মহাতাপচন্দ্র ঘোষের 'আত্মদর্শন', ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলমগীর', মহেন্দ্র গুপ্তের 'উত্তরা', 'পাঞ্জাব কেশরী', রণজিৎ সিং', 'টিপু সুলতান', 'মহারাজ নন্দকুমার', বিধায়ক ভট্টাচার্য্যের 'মাটির ঘর', 'বিশ বছর আগে', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুই পুরুষ', শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বন্ধু', মনোজ বসুর প্লাবন', 'নূতন প্রভাত'. অয়স্কান্ত বক্সীর 'ভোলা মাষ্টার', প্রবোধকুমার মজুমদারের 'শুভযাত্রা', ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শঙ্খধ্বনি'। ১৯২৩ থেকে ১৯৪৩—আধুনিক যুগের বিশিষ্ট এই কুড়ি বৎসর-অস্তে ১৯৪৪ সনে বিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে, শুরু হল অতি আধুনিক যুগ অথবা সাম্প্রতিক যুগ—যে যুগে শুরু হল আবার এক নবনাট্য আন্দোলন।

নাটক ও নাট্যশালাকে জাতির এবং সমাজের দর্পণ বলা হয়। বাংলার নাটক এবং নাট্যশালা এই সংজ্ঞাকে চিরকালই সার্থক করেছে। এই যুগ-সন্ধিক্ষণে, ১৯৪৪ সালে, নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য্যের "নবান্ন" নামক নাটক—সমাজ-বাস্তবতা ও মননশীলতার এক নবজীবন-দর্শন। ফ্যাসি বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের সংস্কৃতির শাখা-উদ্ভুত ভারতীয় গণ-নাট্য সংঘ (I P T A) সমাজ সচেতন 'নবান্ন' নাটকের অপূর্ব অভিনয় করে বাংলার নাট্যজগতে এক বিদ্যুৎ-চমক সৃষ্টি করেন। খ্যাতি ছিল না, পরিচিতি ছিল না, অর্থ সম্পদ ছিল না, ছিল শুধু নিষ্ঠার সম্পদ, প্রাণের ঐশ্বর্য—এই শিল্পী গোষ্ঠীর। ছেঁড়া চট দিয়ে গড়া পট প্রাঙ্গণে গড়ে উঠলো নবনাট্যের এক নতুন আদর্শ—বিজন ভট্টাচার্য্যের রচনায়, শম্ভু মিত্র ও বিজন ভট্টাচার্যের পরিচালনায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য এবং সুধী প্রধান প্রমুখ শিল্পী সহকর্মীদের সহযোগিতায়। নতুন এক সৃষ্টি, নতুন এক ভাবাদর্শ নিয়ে বাংলায় শুরু হয়ে গেল নবনাট্য আন্দোলন। পেশাদার নাট্যশালার বাইরে অপেশাদার নাট্যসংঘও যে জনচিত্ত জয়কারী অভিনয়ে সমর্থ—এটা নতুন করে আবার প্রমাণিত হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠী গঠনের জোয়ার এসে গেলো দেশে। যুগ সত্যকে রূপায়িত করে যুগমানস প্রতিফলিত করে নাট্যকাররা লিখতে লাগলেন যুগোপযোগী নাটক। নাটক ও তার প্রযোজনা নিয়ে শুরু হয়ে গেলো নানা পরীক্ষা ও নিরীক্ষা। আর এতেই আমরা ক্রমে ক্রমে পেতে লাগলাম বহু মননশীল নাট্যকার, প্রতিভাধর পরিচালক, দক্ষ কুশীলব, ঐন্দ্রজালিক মঞ্চশিল্পী, সর্বোপরি প্রগতিশীল প্রয়োগকুশল নাট্যসংস্থা। 'বহুরূপী,' লিটল্ থিয়েটার গ্রুপ,' 'শৌভনিক,' 'থিয়েটার-সেণ্টার 'ক্যালকাটা থিয়েটার—আজ জাতির চিত্তজয়ী স্বনামধন্য নাট্যপ্রতিষ্ঠান। অভ্যুদয়, অনুশীলন সম্প্রদায়, নাট্যচক্র, অশনিচক্র, অচলায়তন, লোকমঞ্চ, রূপকার, শিল্পীমন, বঙ্গীয় নাট্য সংসদ, গন্ধর্ব, রঙ-বেরঙ, শ্রীমঞ্চ, শিল্পীমহল, বৈশাখী, সাজঘর, সামুডে ক্লাব, লোক-সংস্কৃতি-সংঘ, কথাকলি, দশরূপক, চতুর্মুখ, ছদ্মবেশী, কুশীলব প্রভৃতিও আজ জনপ্রিয় সুপরিচিত নাট্যসংস্থা।

এই নবনাট্য আন্দোলনে যে সকল নাট্যকার বরণীয় এবং স্মরণীয়, তাঁদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য 'নবান্ন' ও 'গোত্রান্তর' খ্যাত বিজন ভট্টাচার্য, 'দুঃখীর ইমান' ও 'ছেঁড়া তার' খ্যাত তুলসী লাহিড়ী, 'বাস্তুভিটা', 'মোকাবিলা,' 'তরঙ্গ' ও 'জীবনস্রোত' খ্যাত দিগিন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'নতুন ইহুদী' ও মৌ-চোর' খ্যাত সলিল সেন, 'রাজকন্যার ঝাঁপি' ও 'দিনান্তের আগুন' খ্যাত শশিভূষণ দাশগুপ্ত, 'বারঘণ্টা' খ্যাত কিরণ মৈত্র, 'কেরাণীর জীবন' ও ষ্ট্রীট বেগার' খ্যাত ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ধৃতরাষ্ট্র,' 'রূপোলি চাঁদ' ও 'এক মুঠো আকাশ' ও 'আর হবে না দেরী' খ্যাত ধনঞ্জয় বৈরাগী, 'ছায়ানট' ও 'অঙ্গার' খ্যাত উৎপল দত্ত, 'রাহুমুক্ত,' 'সংক্রান্তি,' 'সাহিত্যিক' খ্যাত বীরু মুখোপাধ্যায়, 'নচিকেতা,' 'নির্বোধ' ও 'থানা থেকে আসছি খ্যাত অজিত গঙ্গোপাধ্যায়, 'হরিপদ মাষ্টার' খ্যাত সুনীল দত্ত, ছায়াবিহীন,' 'সমান্তরাল' ও 'ছারপোকা' খ্যাত সোমেন্দ্র নন্দী, 'নীচের মহল ও শেষ সংবাদ' খ্যাত উমানাথ ভট্টাচার্য, 'শুধু ছায়া ও 'ডানা ভাঙ্গা পাখী, খ্যাত পরেশ ধর, 'লবণাক্ত' খ্যাত পৃথীশ সরকার, 'শততম রজনীর অভিনয়' ও 'অপরাজিত'-খ্যাত রমেন লাহিড়ী, 'এরাও মানুষ খ্যাত' সন্তোষ সেন, 'দলিল'-খ্যাত ঋত্বিক ঘটক, 'দুই মহল' খ্যাত জোছন দস্তিদার, আমার মাটি' খ্যাত মনোরঞ্জন বিশ্বাস, পুর্ণজন্ম' ও 'গাঙ্গুলী মশাই' খ্যাত বীরেন্দ্রনাথ দাস, 'সহরতলী'-খ্যাত প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, কষ্টি পাথর'-খ্যাত বিভূতি মুখোপাধ্যায় এবং 'নাট্যাঞ্জলি' খ্যাত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

এই প্রসঙ্গে একাঙ্ক নাটক, নাট্যকাব্য, জীবনীনাটক অনূদিত নাটক, উপন্যাসের নাট্যরূপও উল্লেখের দাবি রাখে। ৩৮ বৎসর আগে, ১৯২৩ সালের ২৩শে ডিসেম্বর ষ্টার থিয়েটার আমার রচিত একাঙ্ক নাটক 'মুক্তির ডাক' অভিনয় ক'রে একাঙ্ক নাটকের যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন, আজ তা অন্যান্য বহু প্রতিভাশালী একাঙ্ক নাটক রচয়িতার সাধনায় শুধু উর্বর নয়, শস্যশ্যামলও বটে। শচীন সেনগুপ্ত, তুলসী লাহিড়ী, বুদ্ধদেব বসু, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, পরিমল গোস্বামী, প্রমথনাথ বিশী, মনোজ বসু, বনফুল, অখিল নিয়োগী, বিধায়ক ভট্টাচার্য, সলিল সেন মাঝে মাঝে সার্থক একাঙ্ক নাটক রচনা করে নাট্য-সাহিত্যের বৈচিত্র্য সাধন করেছেন, কিন্তু আধুনিককালে একাঙ্ক নাটক রচনাকে সাধনা স্বরূপ গ্রহণ ক'রে বরণীয় হয়েছেন যারা তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে স্মরণীয় দিগীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশংকর, সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, সুনীল দত্ত, অমর গঙ্গোপাধ্যায়; বিদ্যুৎ বসু, অগ্নি মিত্র, অমরেশ দাসগুপ্ত, গোপিকানাথ রায় চৌধুরী, বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়, আগন্তুক, অচল বন্দ্যোপাধ্যায় মনোজ মিত্র, রমেন লাহিড়ী, শৈলেশ গুহনিয়োগী এবং আর একটি বিশিষ্ট নাম অজিত গঙ্গোপাধ্যায়। বিন্দুতে সিন্ধুদর্শনের ন্যায় একাঙ্ক নাটকেও পূর্ণাঙ্গ নাটকের আবেদন দুর্লভ নয়। কর্মব্যস্ততা ও গতিশীলতা আমাদের জীবনকে যেরূপ চঞ্চল করে তুলেছে, তাতে এ ভবিষ্যদ্বাণী আমি করতে সঙ্কোচ বোধ করছি না যে, আজকের একাঙ্ক নাটকই ভবিষ্যতের পূর্ণাঙ্গ নাটক।

জীবনী নাটক-ও নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম জীবনী নাটকের গৌরব 'শ্রীমধুসূদন' খ্যাত কথাসাহিত্যিক বনফুল' বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের প্রাপ্য। তাঁহার 'বিদ্যাসাগরও একটি স্মরণীয় অবদান। অন্যতম জনপ্রিয়' কথা-সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রামমোহন জীবনী' নাটকটিও শ্রদ্ধেয় অবদান। শৈলেশ বসুর 'নেতাজী,' সুনীল দত্তের 'বর্ণ-পরিচয়' এবং মন্মথ রায়ের 'শ্রীশ্রীমা' উল্লেখযোগ্য।

সাম্প্রতিক কালে নাট্য কাব্যের অনুশীলনও এক নব-দিগন্তের সূচনা। পূর্বে রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে অতুলনীয় ছিলেন। আধুনিক কালে ফ্রান্স, স্পেন, আমেরিকা ও ইংলণ্ডের নাট্যকাব্য যেমন নূতন মর্য্যাদা লাভ করছে, বাংলা নাট্য সাহিত্যেও এর অনুপ্রবেশ লক্ষ্যণীয়। দিলীপ রায়ের 'দুই আর দুই', রাম বসুর 'নীলকণ্ঠ' এবং 'একলব্য', গিরিশংকরের 'সমুদ্র দ্রুপদী,' কৃষ্ণ ধরের এক রাত্রির জন্য' প্রশংসনীয় অবদান।

অনূদিত নাটকের ক্ষেত্রও আজ খুবই উর্বর। শ্রেষ্ঠ বিদেশী নাটকের অনুবাদে আমাদের নাট্য সাহিত্য যেমন সমৃদ্ধ হচ্ছে, আবার তেমনি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যও হারাতে পারে এ আশঙ্কাও রয়েছে। উমানাথ ভট্টাচার্যের 'নীচের মহল' 'ঘূর্ণি' ও 'শেষ সংবাদ' অজিত গঙ্গোপাধ্যায় 'থানা থেকে আসছি' শকুন্তলা রায়' 'আকাশ বিহঙ্গী', কুমারেশ ঘোষের Salome' সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর 'ছায়াবিহীন' শিবেশ মুখোপাধ্যায়ের 'তিন চম্পা' সাধনকুমার ভট্টাচার্যের 'রাজা ইডিপাস' বহুরূপীর 'পুতুল খেলা' শৌভনিকের 'Ghosts' লিটল থিয়েটারের 'ওথেলো' আই পি টি-এর '২০শে জুন' স্মরণীয় অনূদিত নাট্যার্ঘ।

উপন্যাসের নাট্যরূপ আমাদের নাট্যশালায় নতুন নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের সার্থক নাট্যরূপ রঙ্গমঞ্চে বহুকাল সুধা পরিবেশন করেছে। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নাট্যরূপও আধুনিককালে সার্থক অভিনয়ে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছে। রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীতে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প ও কবিতার নাট্যরূপেও আমরা উদ্ভাসিত হয়েছি। তারাশঙ্কর, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সুবোধ ঘোষ প্রভৃতির উপন্যাসের নাট্যরূপও জনপ্রিয় হতে দেখেছি। উপন্যাসের নাট্যরূপদাতাদের মধ্যে যোগেশ চৌধুরী, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, বিধায়ক ভট্টাচার্য, শচীন সেনগুপ্ত, তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য; ধনঞ্জয় বৈরাগী শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখযোগ্য, কিন্তু এ বিষয়ে দেবনারায়ণ গুপ্তের কৃতিত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত।

নব নাট্য আন্দোলন দেশে নাট্য রসাস্বাদনের যে দুর্নিবার ক্ষুধা সৃষ্টি করেছে, পেশাদার নাট্যশালাগুলিও তাতে উপকৃত হচ্ছে। পেশাদার নাট্যশালার নাটকও আজ প্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। শ্রীরঙ্গমে 'দুঃখীর ইমান' থেকেই পেশাদার নাট্যশালায় যে নতুন সুর বেজে ওঠে, তা থেমে থাকে নি, বরং নতুন আঙ্গিকে, নবনাট্যরীতিতে পেশাদার নাট্যশালার নাটকও আজ সমাজ-চেতনার ধারক ও বাহক হয়ে দাঁড়িয়েছে। মিনার্ভায় 'জীবনটাই নাটক,' 'কেরাণীর জীবন', 'এরাও মানুষ', রঙমহলের 'শেষ লগ্ন', 'সাহেব বিবি গোলাম', 'এক মুঠো আকাশ', 'অনর্থ', বিশ্বরূপার 'ক্ষুধা' ও 'সেতু', মিনার্ভায় লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের 'ছায়ানট', 'অঙ্গার', 'ফেরারী ফৌজ', ষ্টার থিয়েটারের 'শ্যামলী', 'পরিণীতা', 'শ্রীকান্ত' ও 'শ্রেয়সী' সার্থক নাট্যসৃষ্টিরূপে শত শত রাত্রির অভিনয় গৌরব ধন্য ও জনসম্বর্ধিত। আধুনিক নাট্য প্রযোজনার বাস্তবানুগ নাট্য আঙ্গিকও একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। মঞ্চশিল্পে, বিশেষ আলোকসম্পাতে সতু সেন এবং তাপস সেনের ঐন্দ্রজালিক কৃতিত্ব আজ সর্বজনবিদিত।

কলকাতায় ইংরেজী-আদর্শে থিয়েটার বা নাট্যশালা প্রবর্তনের পূর্বে যাত্রার পালা গানই যে জাতীয় নাট্য-উৎসব ছিল, একথা পূর্বে বলা হয়েছে। ক'লকাতা তথা সমগ্র বাংলা দেশে থিয়েটার ক্রমশঃ চালু হয়ে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করে, কিন্তু যাত্রা গানও পল্লী অঞ্চলে তার জনপ্রিয়তা বজায় রাখতে সমর্থ হয়। মুকুন্দদাসের যাত্রা তো আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। আধুনিক কালের যাত্রা-নাটক অনেকটা থিয়েটারের নাটকের বৈশিষ্ট্য বরণ করে নিলেও স্বকীয় চরিত্র একেবারে হারায়নি এবং রোমান্টিক ধর্মী আবেদন জনসাধারণকে এখনও অভিভূত করে। যাত্রাগানকে আধুনিক সমাজে জনপ্রিয় ক'রবার জন্য 'বঙ্গীয় নাট্য সংগঠনীর' প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়।

বর্তমান কালে থিয়েটার সেণ্টার প্রমুখ বহু নাট্যসংস্থা কর্তৃক আয়োজিত একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা একাঙ্ক নাটকের মান উন্নয়নে বিশেষ সহায়ক হয়েছে—তেমনি সহায়ক হয়েছে 'বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষৎ' কর্তৃক একাঙ্ক ও পূর্ণাঙ্গ নাটকের মান উন্নয়নের জন্য অনুষ্ঠিত আজ তিন বৎসর ব্যাপী অক্লান্ত প্রচেষ্টা। নাট্যকারদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং নাট্যচর্চার উন্নতি ও প্রসার কল্পে স্থাপিত বাংলার নাট্যকারদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান 'নাট্যকার সংঘ' প্রথম নাট্য সম্মেলনের আয়োজন করেন। 'বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষৎ'ও এ পর্যন্ত তিনটি বার্ষিক নাট্য সম্মেলনের অনুষ্ঠান ক'রে প্রগতিশীল নাট্যচর্চার সম্যক আলোচনার সুব্যবস্থা করেছেন।

বাংলা নাটকের এবং নাট্য সাহিত্যের ক্রমবিকাশ অনুধাবন করা নাট্যচর্চার পক্ষে অপরিহার্য। এইরূপ ঐতিহাসিক গবেষণার পথ প্রস্তুত ও প্রশস্ত করে দিয়েছেন ডক্টর সুশীলকুমার দে, শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর সুকুমার সেন, ডক্টর পি. সি, গুহঠাকুরতা, ডক্টর সাধনকুমার ভট্টাচার্য, ডক্টর রথীন্দ্রনাথ রায়, শ্রীক্ষেত্র গুপ্ত, প্রাচীন কাল থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা। ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য এবং 'বাংলা নাটকের ইতিহাস' রচয়িতা ডক্টর অজিতকুমার ঘোষ। এই প্রসঙ্গে প্রধানতঃ বাংলা নাটকের আলোচনাজীবী বর্তমান কালের তিনটি সাময়িক পত্রিকা : 'বহুরূপী', 'গন্ধর্ব' এবং 'সূত্রধারে'র নামও স্মরণীয়। দৈনিক সংবাদ-পত্রগুলি বাংলা নাটক ও নাটকাভিনয়ের তথ্য ও আলোচনা পরিবেশন ক'রে নাট্য আন্দোলনের

সহায়ক হয়েছেন। 'আনন্দ বাজার পত্রিকা'য় প্রতি বৃহস্পতিবার একটি বিশেষ পৃষ্ঠাকে 'আনন্দলোক' নামে অভিহিত ক'রে বাংলার নাট্য চর্চা প্রসারে সাহায্য করছেন। পত্র-পত্রিকার এই প্রচেষ্টা আমাদের ধন্যবাদার্হ।

দেড়শত বৎসরের নাট্যপরিক্রমা স্বল্প পরিসরে পরিবেশনযোগ্য নয়। তাতে ভুল ত্রুটির সমধিক সম্ভাবনা। এই নাট্যপরিক্রমার তালিকায় স্মরণযোগ্য বহু নামই হয়তো উল্লিখিত হয় নি, তাতে কিন্তু তাঁদের অমর্যাদা হলো না, অমর্যাদা হলো আমারই। এ তালিকা দেবার প্রয়োজন বোধ করেছি এই জন্য যে, বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে নাট্যশাখার প্রবর্তন এই প্রথম। তা ছাড়া, দেশের নাট্য সাহিত্য সম্পর্কে বহুলোক উন্নাসিক ভাব পরিপোষণ করেন এটাও মিথ্যা নয়। প্রায়ই শোনা যায়, আমাদের দেশে নাকি নাটক নেই। দেশের নাটক অবহেলা ক'রে পাশ্চাত্য নাটকের গুণপনায় অনেকে শতমুখ। কিন্তু বাংলা নাট্য সাহিত্যের আধুনিক মান আধুনিক পাশ্চাত্য নাটকের মানের চেয়ে নিকৃষ্ট মনে ক'রবার কোন কারণ নেই, একথা নির্ভয়ে ঘোষণা ক'রে আমি বিদায় নিচ্ছি, রবীন্দ্রনাথের ক্ষুদ্র একটি কাবতা পরিবেশন করে:

"বহু দিন ধ'রে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হ'তে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শীষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু।"*

* বর্দ্ধমান, গঙ্গাটিকুরীতে বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের রজত-জয়ন্তী অধিবেশনে নাট্য সাহিত্য শাখার সভাপতির ভাষণ।

গঙ্গাটিকুরীতে বংগ সাহিত্য সম্মেলন

সমীক্ষা

অনুপ সেনগুপ্ত

বংগ সাহিত্য সম্মেলন বহু দিনের পুরাতন অনুষ্ঠান। বিশ বছরেরও বেশী প্রধানতঃ বংগীয় সাহিত্য পরিষদের পরিচালকদের উদ্যোগে এবং বাংলাদেশের সাহিত্যানুরাগী অধিবাসীদের চেষ্টায় তা প্রতিবছর বাংলার বিভিন্ন সহরে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হোত। নানা কারণে সে অধিবেশন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। প্রায় দু'বছর আগে মাসিক "সংহতি" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীহরেন নিয়োগীর আগ্রহে ও চেষ্টায় তার পুণঃ প্রবর্ত্তন সম্ভব হয়। পশ্চিম বাংলার অন্যতম উপমন্ত্রী তমলুকের প্রবীণ দেশকর্মী শ্রীরজনীকান্ত প্রামাণিকের আগ্রহে মেদিনীপুর জেলার বৈষ্ণবচকে এক বিরাট অধিবেশনের সঙ্গে নূতন নামে বংগ সাহিত্য সম্মেলন আরম্ভ হয়েছে। বৈষ্ণবচক রূপনারায়ণ নদীর ধারে একটি ছোট্ট গ্রাম। সেখানে একটি সর্বার্থসাধক বিদ্যালয় বাড়ীতে স্থানীয় শিক্ষক ও অধিবাসীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে, আন্তরিক আদর-আপ্যায়নে, স্বেচ্ছাসেবকদের ঐকান্তিক সেবায় ঐ সম্মেলন সর্বাঙ্গসুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। তারপর প্রায় প্রতিমাসেই কলকাতা সহর ও সহরতলীর কাছে নানা জায়গায় বংগ সাহিত্য সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ মাসিক সভা আহ্বান করে সম্মেলনকে জনপ্রিয় ও সাহিত্যসাধকদের মিলন ক্ষেত্র করে রেখেছেন।

কয়েকমাস আগে কলকাতায় ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটুট হলে ডক্টর প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ-এর পৌরহিত্যে এবং আচার্য্য শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদারের নেতৃত্বে গঠিত অভ্যর্থনা সমিতির সহায়তায় তিন দিন ধরে ৫।৬টি সভায় যেভাবে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উৎসব বংগ সাহিত্য সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ পালন করেছিলেন তা সত্যিই অসাধারণ ও অভিনব হ'য়েছিল। কলকাতার বহু পণ্ডিতমণ্ডলী এই সভাগুলোতে যোগদিয়ে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁদের অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। এর পরই সম্মেলনের নেতৃবর্গ বাংলার গ্রামাঞ্চলে কোথাও সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন করতে উৎসুক হন। ইতিমধ্যে স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতীর আহ্বানে পুরুলিয়া জেলার মুরাডী রেলষ্টেশনের কাছে রামচন্দ্রপুর গ্রামে শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ আশ্রমে বাংলার শতাধিক সাহিত্যসেবী গিয়ে বংগ সাহিত্য সম্মেলনের এক সুন্দর অধিবেশনের ব্যবস্থা করেছিলেন। সেখানে স্বামীজীর বিরাট আশ্রম ও রামচন্দ্রপুরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সকলকে শুধু মুগ্ধই করেনি, স্বামীজী ও তার আশ্রমের আশ্রমিকদের আপ্যায়ন সমবেত সকলকে তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্কে আবদ্ধ করেছিল। দূর দূর গ্রাম থেকে সাহিত্যরসিক মানুষ এই সম্মেলনে সমবেত হয়ে বংগ সাহিত্য সম্মেলনকে বাংলার জনগণের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছিল। মাত্র একমাস আগে তারকেশ্বরের পুণ্যতীর্থে এবং কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর বাসস্থান বর্দ্ধমান জেলার রায়না থানার দামুন্যা গ্রামে বংগ সাহিত্য সম্মেলনের প্রায় ৬০।৬৫ জন সদস্য দীর্ঘ নদী ও পায়ে হাঁটা পথ অতিক্রম করে বাংলার এক অনাদৃত, উপেক্ষিত এবং স্বল্পশিক্ষিতগণের বাসভূমি গ্রামাঞ্চলকে যে ভাবে জাগ্রত করে এসেছেন তা বংগ সাহিত্য সম্মেলনের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

এবারের বার্ষিক অধিবেশনের স্থান ঠিক হলো গঙ্গাটিকুরী গ্রামে। গঙ্গাটিকুরী বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমায় এক প্রান্তে। ব্যাণ্ডেল—আজিমগঞ্জ রেলপথের ছোট্ট একটি ষ্টেশন। কাটোয়া থেকে অজয় নদী পার হয়ে প্রায় ৫ মাইল, আর গঙ্গা থেকে ৭ মাইল ছায়ায় ঢাকা ছোট এই গাঁ। গ্রামটি ছোট হলেও এর কিন্তু ঐতিহ্য ছোট নয়। ৺ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি এক সময় বর্দ্ধমান সহরে খ্যাতনামা উকিল ছিলেন এবং ওকালতি করার সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চানন্দ বা পাঁচু ঠাকুর এই ছদ্মনামে সেকালের রসসাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রচুর যশ ও প্রতিষ্ঠা পেয়ে ছিলেন—গঙ্গাটিকুরী গ্রাম তারই জন্মভূমি। আজ থেকে ১০০ বছর আগে তিনি গঙ্গাটিকুরীতে জন্ম নেন। তখন ছিল ইংরেজী শিক্ষা এবং সভ্যতার যুগ। ইন্দ্রনাথ সেই শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবকে সযত্নে অতিক্রম করে তার পৈতৃক বাসভূমি গঙ্গাটিকুরী গ্রামে যে বিরাট অট্টালিকা তৈরী করেছিলেন তা আজও যে কোনও দর্শককে অভিভূত করে ফেলে। এখন সেই গৃহের নাম "ইন্দ্রালয়"। ইন্দ্রালয় সত্যিই ইন্দ্রের আলয়। ইন্দ্রালয়ে মোট ৮০ খানা ঘর আছে। আর কতো যে দরদালান বা বারান্দা আছে তার ইয়ত্তা নেই। ঐ বাড়ীর দুর্গা দালান বাংলার যে কোন বনেদী ধনীর দুর্গা দালানের চেয়ে ঐশ্বর্য্য আর বিপুলতায়, শিল্পকর্মে ও ভাস্কর্য্যে অনেক বড়। এ ছাড়া রয়েছে বাড়ীর তিনদিকে তিনটি বড় বড় পুকুর, স্নানের ঘাট আর বিশ্রামালয়। ইন্দ্রনাথের স্থাপিত সংস্কৃত শিক্ষায়তন আর অধ্যাপকদের থাকার দালান, সব মিলিয়ে গঙ্গাটিকুরী বহু দালানে সুশোভিত।

বছর কয়েক আগে রসরাজ ইন্দ্রনাথের বার্ষিক স্মৃতিউৎসবে যারা দেখে আসবার সুযোগলাভ করেছিলেন তাঁদের কাছে এই বাড়ীর ও ইন্দ্রনাথের বংশধরদের ঐতিহ্য অপরিচিত নয়।

এবার স্থির হ'লো বংগ সাহিত্য সম্মেলনের বয়স ২৫ বছর পূর্ণ

হয়েছে, কাজেই রজত জয়ন্তী উৎসব ইন্দ্রালয়েই সম্পন্ন হবে। এই অঞ্চলেরই অধিবাসী আমাদের শ্রমমন্ত্রী শ্রীআবদুস সাত্তার সাগ্রহে এই সম্মেলনের আয়োজনে অগ্রসর হলেন। পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষকে সভাপতি করে বর্দ্ধমানবাসী সকলের সমর্থনে একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হ'লো। ২, ৩, ও ৪ঠা ডিসেম্বর (শনি, রবি ও সোমবার) গঙ্গাটিকুরীতে সম্মেলনের দিন স্থির হলো। অভ্যর্থনা-সমিতি তথা সম্মেলন কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে আমরা একদল প্রতিনিধি "ভারতবর্ষ" সম্পাদক শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ১লা ডিসেম্বর রাত ১১ টায় গঙ্গাটিকুরীতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। এর আগে আর একদল সেখানে পৌঁছে সম্মেলনের তদারকী করছিলেন। শনিবার ২রা ডিসেম্বর সকালবেলা প্রায় ১৬০ জন প্রতিনিধি গঙ্গাটিকুরী পৌঁছান। ঐ দিনই অতুলাবাবু, সম্মেলনের উদ্বোধক কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর শ্রীমালিকে নিয়ে উপস্থিত হন, অপরদিকে মূল-সভাপতি প্রাক্তন প্রধানবিচারপতি ও বিশ্বভারতীর উপাচার্য্য শ্রীসুধীরঞ্জন দাশ তাঁর স্ত্রী ও কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রী শ্রী এ, কে, চন্দকে সঙ্গে নিয়ে পৌঁছান।

বেলা ২টায় লোকসভার সদস্য "জন-সেবক" সম্পাদক শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য সম্মেলনের মূল মণ্ডপের পাশে আলাদা একটি মণ্ডপে এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। বেলা ৩টায় সম্মেলন আরম্ভ হলো খ্যাতিমান গায়ক শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিকের উদ্বোধন সঙ্গীত আর অতুল্য বাবুর স্বাগত অভ্যর্থনা দিয়ে। শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর শ্রীমালি হিন্দী ভাষায় বাংলা সাহিত্যের অমূল্য অবদানের কথা উল্লেখ করে সম্মেলনের উদ্বোধন করলেন। তিনি তার ভাষণে রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ ও তার পরবর্তী সাহিত্যিকগণের প্রচেষ্টা কিভাবে বাংলা সাহিত্যকেই শুধু নয়, বাংলা তথা ভারতকে নূতন প্রেরণা ও জীবন দান করেছে তার উল্লেখ করলেন। এর পর বংগ সাহিত্য সম্মেলনের স্থায়ী সভাপতি ডাক্তার কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত একটি ছোট ভাষণে বর্দ্ধমান জেলা তথা বাংলার সাহিত্যের অবদানের কথা উল্লেখ করেন। মূল সভাপতি শ্রীসুধীরঞ্জন দাশ তার লিখিত অভিভাষণে সর্ব্বপ্রথমেই নিজেকে অসাহিত্যিক বলে নিজের অক্ষমতার জন্য ত্রুটী স্বীকার করলেন, কিন্তু তিনি রবীন্দ্র সাহিত্যকে পরে যে নতুন আলোকে বিশ্লেষণ করলেন, তা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও শিক্ষণীয় হয়েছে। এই রকম বিশ্লেষণ তার মত শান্তিনিকেতনের ছাত্র ও সারা জীবন রবীন্দ্র-অনুগামী ভক্ত শিষ্যের পক্ষেই সম্ভব। তিনি রবীন্দ্র সাহিত্যকে শুধু যুগ সাহিত্য আখ্যা দিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন নাই, তাকে যুগ-ধর্মের স্রষ্টা ও পথ-নিরূপক রূপে সকল পাঠককে তা গ্রহণ করতে পরামর্শ দিয়েছেন। শ্রীদাশ সারা জীবন আইনের সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্কে সময় অতিবাহিত করেছেন বটে কিন্তু বাংলা সাহিত্যের সাথে তার যোগ যে কতখানি গভীর তা তার অভিভাষণেই প্রকট হয়ে উঠেছিল। শ্রীদাশের মত অসাহিত্যিককে সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির পদে বরণ করায় কোনও কোনও মহলে যে গুঞ্জরণ শোনা গিয়েছিল সুধীরঞ্জনের অভিভাষণ তাদের সেই অভিযোগই খণ্ডন করেনি, বরং তারা প্রশংসার পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলেন।

সন্ধ্যার আগেই প্রারম্ভিক অধিবেশনের সমাপ্তি হলো। তার পর ইন্দ্রালয়ের বিরাট প্রাঙ্গনে স্থায়ী অভিনয় মঞ্চে সন্ধ্যার পর কথা সাহিত্য শাখার অধিবেশন সুরু হ'লো। বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিতা কথা-সাহিত্যিক শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী ঐ অধিবেশনের উদ্বোধন করলেন। তিনি তার ভাষণে সাহিত্য জীবনের নানা অভিজ্ঞতার কথা এবং নবীন ও প্রবীণ সাহিত্যিকদের মধ্যে পারস্পরিক প্রীতি ও সৌহার্দ্দ-বোধের অভাবের কথা উল্লেখ করলেন। শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের কর্তৃপক্ষকে এই বলে অভিনন্দিত করলেন যে তাঁরা যে মাঝে মাঝে সাহিত্যিকদের মিলনের আয়োজন করছেন তা দিয়ে সাহিত্যিকদের ইচ্ছা পূর্ণ হবার আশা দেখা যাচ্ছে। এই অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে প্রবীণ কথা-সাহিত্যিক শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাহিত্যিকদের প্রচুর অভাব-অভিযোগের কথা এবং অধুনা সাহিত্য ক্ষেত্রে যে বিকৃত রুচি দেখা যাচ্ছে তার সমালোচনা করলেন।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এবারের সম্মেলনে বহু খ্যাতিমান ব্যক্তি এবং বাংলাদেশের বহু অঞ্চল থেকে বহু প্রতিনিধি যোগদান করে অনুষ্ঠানকে সুন্দর করে তুললেও অভ্যর্থনা সমিতি এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ—যারা এই সম্মেলনকে সুষ্ঠুরূপায়ণের জন্য দায়ী—তাদের ত্রুটি ও বিচ্যুতির জন্য বহু প্রতিনিধি সাহিত্য শাখার অধিবেশন শেষেই গভীর রাত্রে কলকাতায় রওনা হয়ে যান। আয়োজনের কোন ত্রুটি না থাকলেও উপযুক্তসংখ্যক কর্মীর অভাব, আলোকের অপ্রাচুর্য্য এবং আরও কতগুলো কারণে অনেক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, আর সে-জন্যই পরে সভায় আশানুরূপ জন সমাগমও হয়নি।

সে যাই হোক সাহিত্য শাখার অধিবেশন উপলক্ষে বাংলার যে সব খ্যাতিমান লেখক উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে সর্বজনশ্রদ্ধেয় বৈষ্ণব-সাহিত্যের পণ্ডিত শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম সর্বাধিক উল্লেখ যোগ্য। আরও অনেকের নাম কার্য্যসূচিতে ছাপা হলেও সকলের পক্ষে যোগদান সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন রবিবার সকাল ৮টায় ঐ ইন্দ্রালয়ের মঞ্চেই আরম্ভ হয়। এইবার সর্বপ্রথম শিশু সাহিত্য শাখা যুক্ত হয়। শ্রীমুরারী মোহন সেন শিশু সাহিত্য শাখার উদ্বোধন এবং আকাশ-বাণীর কলকাতা কেন্দ্রের শিশু মহলের পরিচালিকা শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী সভানেতৃত্ব করলেন। তিনি তার লিখিত ভাষণে শিশু সাহিত্য বিষয় বহু প্রয়োজনীয় তথ্যের অবতারণা করেন। ঐ অধিবেশনে ৮০ বছর বয়স্ক প্রবীণতম শিশু সাহিত্যিক শ্রীযোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত, যুগান্তর পত্রিকার স্বপনবুড়ো শ্রীঅখিল নিয়োগী প্রভৃতি বক্তৃতা দেন। গম্ভীরা পরিষদের সুগায়ক শ্রীতারাপদ লাহিড়ী শিশুদের উপযোগী কতগুলো ছড়া সুরের মাধ্যমে শুনিয়ে উপস্থিত সকলকে আনন্দ দেন।

তার পরই ঐখানে কাব্য-সাহিত্য শাখার অধিবেশন হয়। কবি শ্রীকৃষ্ণধন দে তার উদ্বোধন করেন এবং বাংলার প্রবীণতম কবি সদা-

হাস্যময় শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক সভাপতির আসন গ্রহণ করে প্রথমে একটি ছোট্ট অভিভাষণ দেন এবং পরে তাঁর নিজের লিখিত একটি কবিতা পাঠ করে সকলকে আনন্দ দেন। এই সভাতে শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু, শ্রীহেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনীহার রঞ্জন সিংহ, শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশারিণীপ্রসাদ রায় প্রভৃতি কবিরা প্রায় দেড়ঘন্টা পর্য্যন্ত একটি করে স্ব-রচিত কবিতা পড়েন।

এই দিনই বিকেল ২ টায় সংবাদ-সাহিত্য শাখার অধিবেশন আরম্ভ হয়। দৈনিক "জন-সেবকের" শ্রীশান্তিরঞ্জন মিত্র তার উদ্বোধন করেন এবং যুগান্তরের বার্তা সম্পাদক শ্রীদক্ষিণা রঞ্জন বসু সভাপতির আসন থেকে একটি মনোজ্ঞ লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেন। কৃষ্ণনগরের তরুণ লেখক ও জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীসমীর সিংহরায় নিজের সাংবাদিক জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন।

এর পরই শুরু হলো সমালোচনা সাহিত্যের অধিবেশন। দুঃখের বিষয় রবিবার বিকেলে ও দুপুরে অধিকাংশ প্রতিনিধি গঙ্গাটিকুরী ত্যাগ করে চলে আসেন। সমালোচনা সাহিত্য শাখায় সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ সমালোচক ও খ্যাতিমান সাহিত্যিক অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী মহাশয়। বিশী মহাশয়ের বক্তৃতা সব দিকে থেকেই মনোজ্ঞ হয়। ঐ সভাতেই সর্বজনশ্রদ্ধেয় ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগীশ্বরী অধ্যাপক বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত ও দেশসেবক ডক্টর নীহার রঞ্জন রায় নিজ নিজ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়ে ভাষণ দেন। রাত্রে শ্রীতারাপদ লাহিড়ী মালদহের গম্ভীরা গান শুনিয়ে সকলকে আনন্দ দেন অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত।

পরদিন সোমবার সকালে ডক্টর নীহার রঞ্জনের সভাপতিত্বে শিল্প ও সংস্কৃতি শাখার যে অধিবেশন হয়—তাতে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও ভাষণ দেন। তখনই খ্যাতমান নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়ের সভাপতিত্বে নাট্য সাহিত্য শাখার অধিবেশন বসে। তিনি তাঁর ভাষণে বাংলা নাটকের রচয়িতা এবং অভিনেতাদের একটি বিস্তৃত ইতিহাস পাঠ করেন। ঐ দিন সকালেই শ্রমমন্ত্রী শ্রীসাত্তারের সভাপতিত্বে "ইন্দ্রনাথ স্মৃতি সভা" হলো। তাতে শ্রীকুমারবাবু ছাড়াও শ্রীযোগেন গুপ্ত, কবিশেখর কালিদাস রায় প্রমুখ বক্তৃতা করেন। বিকেলে আবার শ্রীসাত্তারের সভাপতিত্বে গুণীজন সম্বর্ধনা হয় তাতে কবি কুমুদ রঞ্জন মল্লিক, শিশু সাহিত্যিক শ্রীযোগেন্দ্র গুপ্ত, ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও কবিশেখর কালিদাস রায়কে অভিনন্দন পত্র ও অশোকগুচ্ছ দ্বারা সম্বর্ধনা জানান হয়। সন্ধ্যায় শেষ সভায় শ্রীসরোজ কুমার রায় চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন ও শ্রীশম্ভু পাল ও শ্রীসন্তোষ কুমার রায় কয়েকটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সর্বসম্মতিক্রমে সেগুলো গৃহীত হলো। এর পর সম্মেলনের সম্পাদক মাসিক "সংহতি" সম্পাদক শ্রীসুরেন নিয়োগী মহাশয় সমবেত সকলকে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সম্মেলনের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন

গঙ্গাটিকুরী সম্মেলনে অপর বৈশিষ্ঠ্য হলো মহিলা প্রতিনিধিদের যোগদান। এই অনুষ্ঠানে কলকাতা থেকে প্রায় ২০ জন মহিলা সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। এদের মধ্যে একটিতে শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী ও অপরটিতে শ্রীমতী আশাপূর্ণাদেবী যথাক্রমে সভানেত্রী ও উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তা আগেই বলেছি। এ ছাড়া অধ্যাপিকা ডক্টর শ্রীমতী উমা রায়ের নাম বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। তিনি সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যে যে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন তা কাব্য সাহিত্য শাখায় তার সুন্দর ও মর্মস্পর্শী ভাষণে প্রকাশ পেল। এ ছাড়া হাওড়াবার্তা কাগজের সম্পাদক শ্রীশম্ভু পালের স্ত্রী, শ্রীমতী বারি দেবী, শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবীর তরুণী পুত্রবধু প্রভৃতি বহু মহিলা সেখানে উপস্থিত থেকে সম্মেলনের সৌন্দর্য্যকে বাড়িয়ে তুলেছেন।

এর আগে এই রকম গণ্ডগ্রামে আর কখনও সাহিত্য সম্মেলন হয়নি। বংগ সাহিত্য সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ গঙ্গাটিকুরীতে রজত জয়ন্তী উৎসবের এই যে আয়োজন করলেন—তা সব দিক থেকেই সাফল্য মণ্ডিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর শ্রীমালি, শ্রীসুধাংশুরঞ্জন দাশ থেকে আরম্ভ করে প্রবীণ ও নবীন সাহিত্যিকরা এই মিলন ক্ষেত্রে পরস্পর ভাবের আদান প্রদান করতে সমর্থ হয়েছেন। এর ফলে অভ্যর্থনা সমিতির ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি সকলেই উপেক্ষা করে চলেছেন। ঐ সময়টায় অফিস ইত্যাদিতে কোনরূপ ছুটি না থাকা সত্ত্বেও যে সব প্রতিনিধি তিন দিন উপস্থিত থেকে বাংলা সাহিত্যের প্রতি প্রীতি-শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন, আমার বিশ্বাস তাদের সকলের সমবেত চিন্তা ও কাজ বাংলা সাহিত্যের প্রকৃতিকে সকল রকম কলুষতা থেকে মুক্ত করে প্রগতির পথে চালনা ক'রবে। স্বীকার করি সভা-সমিতি সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেনা কিন্তু সেগুলোতে মেলামেশা ও আলোচনার ফলে সাহিত্যিকরা নিজ নিজ রচনা সৃষ্টির সময় বিকৃতি ও বিভ্রান্তির পথ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে সমর্থ হবেন। সাহিত্য সম্মেলনের এটাই বোধ করি উপকারিতা এবং উপযোগিতা। বংগ সাহিত্য সম্মেলন কর্তৃপক্ষকে তাদের নতুন ও বিরাট প্রচেষ্টার জন্য সর্বান্তঃকরণে অভিনন্দন জানাই আবার।

পরম ভাগবত

॥ স্মৃতিচারণ ॥

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

একদিন পুণায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গে আলাপে হঠাৎ কথায় কথায় এসে গেল বুদ্ধদেবের প্রসঙ্গ। আমি খৃষ্টকে গভীর আনন্দে বরণ করেছি, কিন্তু বুদ্ধদেবকে গভীর ভক্তি ক'রেও এযাবৎ ক'রে এসেছি শুধুই দূর থেকে দণ্ডবৎ—মনে হয়েছে বড় সুদূর নক্ষত্র; দীপ্যমান্ কিন্তু নীরস। কবিরাজ মহাশয়ই প্রথম আমার চোখ খুলে দিলেন, বুদ্ধের অপরূপ মহিমা তাঁর আশ্চর্য বর্ণনার মধ্যে দিয়ে। সে-বর্ণনা তিনি তাঁর মনের মনীষা, হৃদয়ের ভক্তি ও প্রাণের সহজবোধের (intuition) আলো মিশিয়ে এমন উপাদেয় ক'রে তুললেন যে মনে হ'ল নীরস কোথায়? এ যে প্রত্যক্ষ অমৃতধারা!

দু'দিন তিনি অনেকক্ষণ ধ'রে অনর্গল বর্ণনা করলেন বুদ্ধের নানা সাধনার নানা স্তরের কাহিনী। সেসব আমার মনে নেই। কেবল তাঁর একটা কথা আমার মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল—যখন তিনি বলেছিলেন যে, নির্বাণ উপলব্ধির পরে বুদ্ধদেব প্রথম উপলব্ধি করেন যে একা মুক্তি পেলে চলবে না—অন্য সব বদ্ধ জীবের বন্ধন মোচন করতে না পারলে সে পরম ও চরম বিকাশ হতে পারে না যা বিশ্বাধিপের অভিপ্রেত। আমি তাঁকে বলেছিলাম যে শ্রীঅরবিন্দও ঠিক এই কথাই লিখেছেন তাঁর সাবিত্রী-তে নানা স্থলেই, যথা

But how shall a few escaped release the world?
The human mass lingers beneath the yoke

লভে মুক্তি কতিপয়—বিশ্বের কোথায় মুক্তি সেথা,
কাঁদে যবে কোটি কোটি জীব দুঃখ তাপ চক্রতলে?

কবিরাজ মহাশয় বলেছিলেন, "ঠিক কথা। আর এই জন্যেই তিনি চেয়েছিলেন সেই সুপ্রামেণ্টাল শক্তির অবতরণ—যা আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয় নি—যার ফলে সব মানুষই ভগবৎ-করুণার স্পর্শ পেয়ে সার্থকতার পথে চলবে।"

ব'লে বুদ্ধদেবের জীবনের নানা কাহিনী বর্ণনা করার পরে আমাকে বললেন যে এসম্বন্ধে তিনি লিখেছেন একটি প্রবন্ধ—আমাকে পাঠাবেন পরে, কাশী থেকে।

কবিরাজ মহাশয় দু'দিন ধ'রে বুদ্ধদেবের মহিমা যেভাবে বর্ণনা করেছিলেন বহু নজির দিয়ে, সেসব কথা মনে রাখা আমার পক্ষে সম্ভব না হ'লেও যেটুকু মনে আছে সেটুকু না লিখে থাকতে পারছি না, একটা রেকর্ড রাখবার জন্যেও বটে। সংক্ষেপেই বলব।

কবিরাজ মহাশয় বললেন যে, বুদ্ধদেব বৈরাগ্যের অঙ্কুশে বেদনায় অধীর হ'য়ে সংসার ছেড়ে ভিক্ষুকের বেশে গেলেন পাঁচটি গুরুভাইয়ের সঙ্গে গুরুগৃহে—দীক্ষা নিতে। তার পরে অশেষ কৃচ্ছ্রসাধন করার ফলে তাঁর শরীর এমন দুর্বল হয়ে পড়ল যে তিনি মূর্ছিত হ'য়ে পড়লেন। সুজাতা তাঁকে দুগ্ধ পান করিয়ে বাঁচালো। দেখে তাঁর গুরুভাইরা তাঁকে ভ্রষ্ট নামে দেগে দিয়ে প্রস্থান করল। অতঃপর তিনি বোধগয়ায় গিয়ে বোধি-তরুর নিচে বসলেন সাধনা করতে প্রাণকে পণ ক'রে:

ইহৈব শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিসবিকল্পদুর্লভাং নৈবাসনাৎ কায়মতঃ

চলিষ্যতি॥

শরীর আমার যাক রসাতলে, ত্বগস্থিমেদ হয় হবে লীন।
এ-আসন হ'তে উঠিব না আমি, বোধিপ্রজ্ঞা না ল'ভি
যতদিন॥

তারপরে—ব'লে চললেন কবিরাজ মহাশয়—বুদ্ধদেবের বহুবিধ উপলব্ধি অনুভূতি দর্শনাদি হ'ল, নানা লোককেই করলেন প্রত্যক্ষ, নানা চেতনার ভূমি ভেদ ক'রে উঠলেন উত্তরোত্তর উর্ধ্বতর ভূমিতে—কিন্তু এমন কোনো লোকের দেখা পেলেন না যেখানে দুঃখ নেই। তবু ছাড়লেন না, প্রাণপণে সাধনা ক'রে চলতে চলতে শেষে মিলল দিশা, কাটল নিশা, মিটল তৃষা—দেখতে পেলেন যে দুঃখের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এক নির্বাণে পৌছলে তবেই। তখন তিনি সংকল্প করলেন দেহ থেকে মুক্তি পেয়ে মহানির্বাণে লীন হ'য়ে যাবেন—এমনি সময়ে তাঁর ধ্যানে এক আশ্চর্য অনুভূতি হ'ল; বিশ্বের আর্তি* তাঁর হৃদয়ে গিয়ে যেন আছড়ে পড়ল, তিনি শুনতে পেলেন জগতের সর্বজীবের কান্না "তুমি তো দুঃখের পারে চ'লে যাচ্ছ প্রভু, কিন্তু আমাদের কী হবে?" এ কান্না শুনতে না শুনতে তাঁর চিত্তলোকে জেগে উঠল প্রগাঢ় করুণা—যাকে যোগিকবি বলেছেন "tenderness for the whole world"; তখন সিদ্ধার্থ স্থির করলেন যে যতদিন পর্যন্ত একজন জীবও বদ্ধ থেকে কাঁদবে নির্বাণমুক্তি না পেয়ে—ততদিন তিনি মহানির্বাণে লীন হবেন না—সকলকে দিতেই হবে নির্বাণের নির্দেশ। ফিরে এসে প্রথমেই সেই পাঁচজন গুরুভাইকে দিলেন দীক্ষা।

কিন্তু তারপরে সিদ্ধার্থ দেখলেন যে সাধারণ জীব সে-সাধনা করতে চায় না—যে-সাধনার পথ ধরলে নির্বাণ সিদ্ধি লাভ হয়। সাধনা করবে কি? নির্মোহ বা অনাসক্তির নাম করলেও যে—তারা শিরপা তোলে! নির্বাণ এমন সস্তা হরির লুট নয় যে—না চাইলেও সবাইকে বিতরণ করা যায়। তখন বুদ্ধদেব অন্বেষণ সুরু করলেন কী ক'রে সকলকে অমৃতমুক্তি চাওয়ানো যায়। ফের তপস্যা করা সুরু করলেন। ক্রমে দেখতে পেলেন যে সাধারণ জীব নানামুখে একাগ্র হ'তে পারে বটে—যার নাম "বৃত্তি-একাগ্রতা" কিন্তু অবিদ্যা ও তার তৃষ্ণা (তন্হা) পরিহার করতে নারাজ হ'লে সে—'ভূমি-একাগ্রতা'-য় আসীন হওয়া যায় না—যার সহায়তা বিনা মানুষ কিছুতেই সমাধিপ্রজ্ঞার উপরে উঠতে পারে না। তখন কেমন ক'রে সাধারণ জীবকে এই ভূমি একাগ্রতায় দীক্ষা দেওয়া যায় সেই সন্ধানে বুদ্ধদেব আরো তপস্যা করতে করতে পৌঁছলেন বোধিসত্ত্বের প্রজ্ঞায়। সেখানে দেখা পেলেন সর্বোত্তম জ্ঞান প্রজ্ঞা-পারমিতার, যার অন্য উপাধি বুদ্ধজননী। আমি জিজ্ঞাসা করলাম খৃষ্টদেব ও তাঁর চিরকুমারী মাতার সঙ্গে বুদ্ধদেব ও প্রজ্ঞাপারমিতার কোনো সাদৃশ্য আছে কি না? তাতে কবিরাজ মহাশয় বললেন: কিছু আছে। যাই হোক আরো তপস্যা করতে করতে প্রজ্ঞাপারমিতাকেও পেরিয়ে বুদ্ধদেব অবশেষে উপনীত হলেন বুদ্ধত্বে। সেখানে তিনি প্রথম বুদ্ধত্বের বীজ সৃষ্টি করবার শক্তি পেলেন যে—বীজ পৃথিবীতে বপন করলে পার্থিব মানুষের দৃষ্টি হবে অন্তর্মুখী বা উর্ধ্বমুখী।

আমি হতাশ হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলাম: "কিন্তু কই, মানুষ তো আজও যে তিমিরে সেই তিমিরে—হয় ত আরো গভীর তিমিরে।"

কবিরাজ মহাশয় বললেন: "সাততলা বাড়ি গড়ে তুলতে হবে। একদল মিস্ত্রি গড়ল একতলা, আর একদল দোতলা, আর একদল তিনতলা—সব শেষে যারা সাততলা তৈরি করবে তারাই না পাবে চরম ও পরম সিদ্ধি! কিন্তু প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ও ষষ্ঠতলা তৈরি হ'লে তবে তো সপ্তম তলা তৈরি সম্ভব হবে। বুদ্ধদেব তাঁর পরমতম চেতনা লাভ ক'রে বুদ্ধত্ব প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে সৃষ্টি করলেন "মন্ত্রযান" বুদ্ধত্বের বীজের বাহনরূপে—রচনা করলেন মুক্তি-মঞ্চের প্রথম তলা বা ধাপ—যাই বলো। এখানে কিন্তু মনে রাখা দরকার যে এই যে বুদ্ধত্বের বীজ—একে তিনি পৃথিবীর মাটিতে বপন করতে চেয়েছিলেন মাত্র দু-চার জন মুমুক্ষুর জন্যে নয়—সকলের জন্যে অমৃতমুক্তির ফল ফলিয়ে সকলকেই তার মহাস্বাদের অধিকারী করতে। এরি নাম বুদ্ধের মহাকরুণা।"

আমি বললাম: "তাঁর মহাকরুণার মহিমা স্বীকার ক'রেও তবু দুঃখ হয় যে। মন যেন ক্ষুব্ধ হ'য়ে বলে এমন

---

* জীবজন্তুর দুঃখেরও যে প্রত্যক্ষ বেদনাভূতি মানুষের সমাধিতে উপলব্ধি হয় ইন্দিরা তার ধ্যানে দুবার প্রত্যক্ষ করেছে, অনেকেই হয়ত বিশ্বাস করবে না, কিন্তু কবিরাজ মহাশয় শুনেই সানন্দে বললেন যে—এ একটি অতি উচ্চ অনুভূতি।

মহাকরুণাময়ের আবির্ভাবের পরেও তো কত যুগ কেটে গেল—অথচ এখনো দেখি অমৃতের অধিকারীর সংখ্যা এ আড়াই হাজার বছরে একটুও বাড়ে নি। তাই তো সিনিকরা বলেন—সাধুসন্ত মুনি-ঋষি অবতারদের ছোঁয়াচে দু-চারজন মুমুক্ষু মুক্তি পেলেও সাড়ে পনর আনা মানুষের অন্তর ব্রহ্ম তো আজো তেম্‌নি হাহাকার করছে—পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম প'ড়ে কাঁদে, বলে না ?"

কবিরাজ মহাশয় বললেন : "সে-কান্নারও যে দরকার ছিল ! আর এই জন্যেই না গীতায় বলেছে 'নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।' অর্থাৎ কোনো মহৎ সাধনাই নিষ্ফল হ'তে পারে না। কি রকম জানো ? পিতৃবীজে মাতৃগর্ভে নবজাতক লালিত ও বর্ধিত হয় মাতৃশক্তিতে। তেমনি গুরুদত্ত বীজে আমাদের মধ্যে গ'ড়ে ওঠে যে ভাবতনু—সাধনার প্রতি জপে ধ্যানে প্রার্থনায় সে-তনু লালিত বর্ধিত হয় সাধকের তপঃশক্তিতে। পরে ঠিক যেমন কাল পূর্ণ হ'লে শুভ জন্ম লগ্নে গর্ভের অন্ধকার-বন্দী ভ্রূণ মুক্ত পায় দেহমনপ্রাণের বিকাশ অনুকূল আলোকলোকে, ঠিক তেম্‌নি আমাদের ভাবতনু—রসময়ী তনু—মুক্তি পায় মৃন্ময়তার তমোলোক থেকে চিন্ময়তার জ্যোর্তিলোকে। এ-লক্ষ ত্রুটি-ভরা জীবনে চেতনায় নিচের তলায়ও যদি এ কথা সত্য হয় যে কোনো সাধনাই নিষ্ফল হয় না, হ'তে পারে না পারে না পারে না—তাহ'লে বুদ্ধের মহিমময় যোগসিদ্ধির ফল হবে নিষ্ফল ? পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম চিরদিন কাঁদতেই থাকবেন ? কখনোই না, বুদ্ধের অদ্ভুত সাধনা নিষ্ফল হ'তেই পারে না। ভাবো তো সে কী অভাববোধ ছিল তাঁর, যার বিরাট আগুনে আর সব ছোটোখাটো অভাবই ভস্ম হ'য়ে গেল। আর কিছু নয়, নয়, নয়, নয়—শুধু চাই মানুষের অশুদ্ধি আর্তির প্রথমে নিদান—পরে নিবৃ'তি, শান্তি। বৈষ্ণবেরা বলেন না যে বিরহের আগুনে অন্য সব কামনাই পুড়ে ভস্ম হ'য়ে যায়—শুধু থাকে বিরহের, অর্থাৎ মিলনতৃষ্ণার দীপ্ত শিখা ? তেম্‌নি অভাববোধ থেকেই আসে শক্তি, সে গ'ড়ে তোলে ভাবতনু। এ-তনু একবার গ'ড়ে উঠলে আর ভয় নেই, কেন না তার আর নাশ নেই, কাজেই অন্তিমে ব্যর্থতা অসম্ভব। কেবল কালের অপেক্ষা—"ব্যাসদেবের ভাষায় : 'কালেন সর্বং বিহিতং বিধাত্রা।'"

প্রাণের তাপেই প্রাণ জাগে, বিশ্বাসের ছোঁয়াচে বিশ্বাস, প্রেমের প্রসাদে প্রেম। বুদ্ধদেবের এমন মর্মস্পর্শী মহিমা-কীর্তন আমি আর কখনো শুনি নি। তাই উৎসাহিত হ'য়ে শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী থেকে কয়েকটি চরণ আবৃত্তি করলাম—যা আমার মনকে দোলা দেয় নানা সংশয়েরই অন্ধকারে (এ চরণগুলি আমি প্রায়ই আবৃত্তি ক'রে থাকি) :

"A few shall see what none yet understands ;
God shall grow up while wise men talk and sleep.
For man shall not know the coming till the hour
And belief shall be not till the work is done.
(লভিবে এ-ধ্যান সত্য শুধু কতিপয় কবি ঋষি—
বোধে যারে পায় নাই আজো কেহ। স্বয়ম্ভু অরূপ
দিনে দিনে অভিনব রূপায়নে লভিবে বিকাশ—
সুবিজ্ঞের গবেষণা, অঘোর নিদ্রার অন্তরালে।
সে-আবির্ভাবের লগ্ন না বাজিলে জানিবে না কেহ,
প্রত্যয় পাবে না ভিত্তি সাধনার সিদ্ধি না মুদিলে।)

বললাম : এই অবতরণকেই শ্রীঅরবিন্দ দেখেছেন মানুষের মহামুক্তির অগ্রদূতরূপে—যার নাম দিয়েছেন তিনি অতি-ম'নস—supramental—শক্তি, ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন এ-শক্তি অবতীর্ণ হবেই হবে। তাঁর জীবদ্দশায় এ-অবতরণ হ'ল না তাতে কি ? তিনি গেয়েছেন মন্ত্রের উদাত্ত কল্লোলে :

Our splendid failures sum to victory…
His failure is not failure when God bads.
প্রতি দীপ্ত বিফলতা রচি' এক নব আরোহিণী
লভিবে অন্তিমে নিত্য মৃত্যুহীন জয়ের শিখর।…
নিয়ন্তা ঈশ্বর যার—ব্যর্থকাম হবে সে কেমনে ?"

কবিরাজ মহাশয় অবশেষে আমার প্রাণের সাড়া পেয়ে খুসি হ'য়ে বললেন : "এই বিশ্বাসই তো চাই—যে বুদ্ধদেবের বা শ্রীঅরবিন্দের মহা তপস্যা ব্যর্থ হ'তে পারে না, পারে না, পারে না। আর আমার নিজের মনে হয় সেই পরম সুদিন আসন্ন—যে দিনে মানুষকে ভগবৎমুখী করবে এক অভিনব প্রেম রুদ্র করুণার মূর্তি ধ'রে—যাকে বলা যেতে পারে

aggressive Grace—যখন জড়ের মৃন্ময়তার মধ্যেও ফুটে উঠবে চিন্ময়ের দিব্য স্পন্দন, নাস্তিকও সে-মহালগ্নে ফিরে পাবেই পাবে বুদ্ধের মন্ত্রযানের বরে আনন্দলোকে তার হারানো স্বাধিকার।

আমি একটু চুপ ক'রে থেকে বললাম: "এখানে আপনাকে আর একটি প্রশ্ন করতে চাই। হয়ত বুদ্ধদেব তাঁর ধ্যানে মানুষের যে মহাভবিষ্যতের ছবি দেখেছিলেন, শ্রীঅরবিন্দও সেই ছবিই দেখেছিলেন যখন লিখেছিলেন তাঁর সাবিত্রীর শেষ অধ্যায়ে—"ব'লে আবৃত্তি করলাম যে-লাইনগুলি আমাদের মন্দিরে মাঝে মাঝেই আবৃত্তি ক'রে থাকি শ্রীঅরবিন্দের মহিমা-তর্পণে—আরো কয়েকটি লাইন আমি মুখস্থ আবৃত্তি করেছিলাম কিন্তু সে থাক:

"A heavenlier passion shall upheave
men's lives;
Their minds shall share in the
ineffable gleam,
Their hearts shall feel the mystery and
the fire.
Earth's bodies shall be conscious
of a soul,
Mortality's bondslaves shall unloose
their bonds;
Mere men into spiritual beings grow···
And common natures feel the
wide uplift,
Illumine common acts with the
Spirit's ray···
The Spirit shall take up the human play,
This earthly life become the life divine···
The Spirit shall look out through
Matter's gaze
And Matter shall reveal the Spirit's face.

(এক দিব্যতর রাগে উচ্ছ্বসিবে মানব জীবন;
অবর্ণ্য প্রভায় দীপ্ত হবে প্রতি মন; প্রতি প্রাণ
উচ্ছল পুলক তথা অনলের লভিবে স্পন্দন,
এ-মৃন্ময় দেহ হবে আত্ম-সচেতন; মরতার
ক্রীতদাস যত হবে মুক্ত বন্ধনের পাশ হ'তে;
সামান্য মানবও হবে বিকশিত আত্মবোধে···প্রতি
নগণ্য আধারও হবে ধন্য সমূর্ধ্বের আকর্ষণে,
দৈনন্দিন নানা ক্রিয়া আলোকিবে আত্মার রশ্মিতে···
মর্ত্যে লীলা নিয়ন্ত্রিত হবে পরমাত্মার নির্দেশে,
পার্থিব জীবন হবে সমুত্তীর্ণ স্বগায় জীবনে···
জড় দৃষ্টি মাঝে হবে মূর্ত শাশ্বতের দৃষ্টিপাত,
জড় বস্তু প্রকাশিবে চিন্ময়ের অরূপ আনন।)

শুনতে শুনতে কবিরাজ মহাশয়ের মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। তিনি বললেন: "এই-ই তো হবে—শ্রীঅরবিন্দ নিশ্চয় দেখেছিলেন সুপ্রামেণ্টাল শক্তির ভাগবতী করুণার অবতরণে আমাদের চেতনার রূপান্তর এইভাবে আসবে ক্রমশ কীর্তনের পথে।"

আমি বললাম: "তা তো হ'ল। কিন্তু যতদিন এ-রূপান্তর না হবে ততদিন কি সাধারণ মানুষ চলবে অশুদ্ধি আধিব্যাধিপীড়নপেষণ অবিচার অত্যাচারের তাপে জর্জরিত হ'য়ে? শুধু সাধারণ মানুষই বা বলছি কেন? অসামান্য মানুষকেও কী দুঃখটাই না পেতে হয় বলুন তা? আপনার মতন পরম ভাগবতেরও এ-দুরন্ত দেহ দুঃখ পেতে হ'ল কেন—জিজ্ঞাসা করেছেন সেদিন আমার এক ব্রহ্মচারী সাধক বন্ধু? এ-দারুণ দুঃখকেও কি বলবেন ভাগবতী করুণা?"

কবিরাজ মহাশয় একটু হেসে বললেন: "বলবই তো। একশোবার। বাইরেটা দেখে বিচার করলে তো সেটা সুবিচার হবে না। দেখতে হবে তিনি দেহ দুঃখ বা বেদনার মধ্যে দিয়ে চেতনার কি রূপান্তর ঘটাচ্ছেন। ভাবো তো, সেণ্ট ফ্রান্সিস কী অসহ্য দেহ-দুঃখ পেয়ে তবে ফুটে উঠেছেন অমন ফুলটি হয়ে! তুমি কি নিজেও কম দুঃখ পেয়েছ? কত দুঃখ কষ্ট জ্বলা যন্ত্রণা দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে গিয়ে তবে না তুমি আলোর মধ্যে ফুটে উঠেছ এমনটি হ'য়ে—এমন সরল উদার সহিষ্ণু সুন্দর। কত বিরহ নিরাশার মধ্যে দিয়ে গিয়ে তবে না তোমার কণ্ঠে জেগে উঠেছে এমন প্রাণগলানো ভক্তির গান। তোমাকে আমি বলছি জোর ক'রেই যে, দুঃখ-বেদনাকে ঠিক মত গ্রহণ করতে শিখলে সাধনপথে সত্যিই এমন উপলব্ধি হয় যে বেদনাকেও মনে হয় ভগবানের দান —যে-কথা কুন্তী বলেছিলেন কৃষ্ণকে তাঁর প্রার্থনায়: বিপদে আপদে বেদনায় যন্ত্রণায় যখনই আমি দিশাহারা হয়েছি তখনই পেয়েছি তোমার দর্শন ঠাকুর!—তাই তোমার কাছে এই প্রার্থনা জানাই আজ যে—তুমি আমাকে দুঃখের বিপদের মধ্যেই রেখো—

বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বৎ তত্র তত্র জগদ্‌গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভবদর্শনম্‌।

একটি অদ্ভুত মামলা

ডঃ শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল

এইদিন থানার অফিসে বসে নিবিষ্টমনে বকেয়া কায-কর্ম গুলি সেরে ফেলছিলাম। কয়েকদিনের জন্য বাইরে যাবার জন্যে ছুটিরও দরখাস্ত করেছি। এই জন্য নূতন কোনও মামলার তদন্ত আমি নিজের ফাইলে নিতে চাইছি না। শেষ করণীয় কাজটি সেরে ফেলে উঠবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। এমন সময় সহকারী ভক্তিবাবু এক ব্যক্তিকে আমার সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। এই আগন্তুক এমন একটি খবর আমাকে দিলে—যা কোনও এক পাকা-পোক্ত অফিসার ভিন্ন অন্য কারুর পক্ষে তদন্ত করা সাধ্যাতীত। আমি ভদ্রলোকের বক্তব্যটি ধীর ভাবে শুনে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে একবার চেয়ে দেখলাম। তারপর তাঁর সকরুণ বিবৃতিটি থানার প্রাথমিক সংবাদ বহিতে লিপিবদ্ধ করে নিলাম। ওই সংবাদদাতার প্রয়োজনীয় বিবৃতি উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

"আমার নাম হরেন্দ্র সরকার, বাপের নাম ৺নীহার সরকার—আদিবাস গ্রাম * * * জিলা অমুক। আমি অমুক রাস্তার অতো নম্বর বাড়িতে থাকি। আমি এইদিন আমার সম্পর্কিত ভগিনী অমুক রাণীর এই রাস্তার অতো নম্বরের বাড়িতে আজ এমনি বেড়াতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখি যে, সেখানে একটা আজব কাণ্ড হয়ে গিয়েছে। এই বাড়িতে আমার এই সম্পর্কিত ভগিনী একাই বসবাস করেন। তিনি এই শহরের কোনও এক ফার্মে টাইপিস্টের কায করেন। এই-দিন তিনি তাঁর এক অফিসের ক্লার্ক বন্ধুকে তাঁর বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। এঁরা এক সঙ্গে সন্ধ্যা সাতটা আন্দাজ সময়ে বাড়ি ঢুকেছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি হঠাৎ তাঁদের বাড়িতে ঢুকে কি একটি দগ্ধকর তরল পদার্থ এই ছেলেটির মুখে ফেলে তার মুখটা পুড়িয়ে দেয়। এর পর সেই লোকটা আমার ঐ ভগিনীর হাত হতে ভ্যানিটি ব্যাগটি ছিনিয়ে নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায়। এই ব্যাগের মধ্যে তাঁর এই মাসের বেতনের ২১০৲ টাকা রাখা ছিল। ভাগ্যক্রমে বাড়িতে উপস্থিত হয়ে এই ঘটনার কথা শুনে অবাক হয়ে যাই। আমি তাড়াতাড়ি একজন স্থানীয় ডাক্তারকে ঐ যুবক ক্লার্কের চিকিৎসার জন্য ডেকে দিয়েই এই থানায় এই ঘটনা সম্পর্কে এজাহার দিতে এসেছি।"

বাপরে বাপরে বাপ! ঘটনাটি যে সাঙ্ঘাতিক তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কে এমন সর্বনাশের কায করলো? সত্যই এটা একটা নিছক রাহাজানি, না প্রেমঘটিত প্রতিশোধ? এই প্রেমিক তার প্রেয়সীর কোনও ক্ষতি না করে শুধু কি তার প্রতিদ্বন্দ্বীকেই ঘায়েল করে গেল? কিন্তু তাই যদি হয় তাহলে প্রেয়সীর ব্যাগটাই বা সে কেড়ে নেবে কেন? তবে এই ব্যাগটা যদি সে ঐ মেয়েটিকে উপহার দিয়ে থাকে তা'হলে সে কথা স্বতন্ত্র। অতি দ্রুতগতিতে মনের মধ্যে সম্ভাব্য কয়েকটি থিওরি ভেবে নিয়ে আমি আবার একবার সংবাদদাতার দিকে চেয়ে দেখলাম। ভদ্রলোকের মুখটা যেন একটা মৃত মানুষের মতই পাংশুবর্ণ ধারণ করেছে। তার সমস্ত দেহটা থেকে থেকে কেঁপে উঠছিল। ভদ্রলোক আহত ব্যক্তিকে চিকিৎসার ব্যবস্থা ইতিপূর্বেই করে এসেছেন। এ'ছাড়া তাঁর সংবাদ অনুযায়ী আততায়ী বহু পূর্বেই সরে পড়েছে। অতএব এই সংবাদদাতাকে জেরা করে আরও কয়েকটি তথ্য জানবার জন্য কিছুটা কালক্ষেপ করলে কোনও ক্ষতি নেই। আমি এইবার তাঁকে কয়েকটি প্রশ্ন করে

আরও কিছু সংবাদ সংগ্রহ করে নিতে মনস্থ করলাম। আমাদের এইসব প্রশ্নোত্তরগুলি যথাযথভাবে নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

প্রঃ—আপনি তো বললেন যে আপনি ঐ গৃহস্বামিনীর সম্পর্কিত ভ্রাতা হন। কিন্তু আপনাদের এই সম্পর্ক কোনও রক্তগত না কুটুম্বঘটিত তা আমাদের একটু জানালে ভালো হয়। আপনার বয়েস তো দেখছি প্রায় চল্লিশের উপরে উঠেছে। আপনার ঐ ভগিনীর তাহলে বয়স কত?

উঃ—আজ্ঞে, এই মেয়েটি আমার গ্রামসম্পর্কিত ভগিনী। ওঁর সঙ্গে আমার কোনও রক্তজ বা কুটুম্বিতার সম্পর্ক নেই। তবে ছেলেবেলা থেকে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে আলাপ আছে। তাই সময় পেলে মধ্যে মধ্যে ওঁর বাড়িতে আমি বেড়াতে যাই। আমার ঐ বোনের বয়সও প্রায় ছত্রিশ হবে আর কি?

প্রঃ—ওঃ! তাহলে তিনি তাঁর বাড়িতে একাকী থাকেন বলে তাঁকে দেখাশুনা করবার ভার আপনি নেননি? আচ্ছা, এখন আপনি আমাদের আর একটি প্রশ্নের উত্তর দিন। ঐ আহত যুবক-ক্লার্কটিরও কি আপনাদের মতই বয়স হবে?

উঃ—আজ্ঞে না। এই যুবকটির বয়স আন্দাজ চব্বিশ-পঁচিশ হবে। এমন কি তার বয়স তেইশও হতে পারে। তাকে দেখলে তো খুবই ছেলেমানুষ মনে হয়। সম্প্রতি আমার এই ভগিনীর চেষ্টাতেই সে তার অফিসে চাকরি পেয়েছে।

প্রঃ—এ্যাঁ! তাই নাকি? এখন আমি আপনাকে আর একটি মাত্র প্রশ্ন করবো। আপনার স্ত্রী-পুত্র আছে, না আপনি বিপত্নীক বা চিরকুমার? এই সব কথা আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করছি বলে রাগ করবেন না। এই সব তদন্তে আমাদের সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তিরই সম্পর্কে আদ্যোপান্ত জেনে নেওয়ার নিয়ম আছে। তাই এই সব আজে-বাজে কথা অবান্তর জেনেও তা আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হচ্ছি।

উঃ—আজ্ঞে দুইটি সন্তানের জন্মের পর প্রায় দুই বৎসর পূর্বে আমি বিপত্নীক হই। মাত্র দুইমাস পূর্বে হঠাৎ একদিন আমার পূর্বপরিচিতা এই মেয়েটির সঙ্গে রাজপথে দেখা হয়ে যায়। এর পর থেকে তার এখানকার বাড়িতে আমি মধ্যে মধ্যে গিয়ে থাকি। আজকে ওর ওখানে একটু সময় কাটাতে গিয়ে এই রকম এক বিপদে পড়ে গেলুম।

ভদ্রলোকের আমতা আমতা করে কথা বলার ভঙ্গি গোড়া হতেই আমার ভালো লাগেনি। এই সংবাদ-দাতার সঙ্গে এই গৃহস্বামিনীর অন্য কোনও সম্পর্ক থাকাও অসম্ভব নয়। তার মনে এতো পাপ না থাকলে—থেকে থেকে সে ভয়ে চমকে উঠেই বা কেন? এরপর তাকে আমাদের এই সব সন্দেহের কথা না জানিয়েই আমি কয়েকজন সহকারীকে নিয়ে ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলাম।

কয়েকজন সহকারীকে সঙ্গে করে রাত্র আট ঘটিকার মধ্যে আমি ঘটনাস্থলে এসে হাজির হয়ে দেখলাম যে সেখানে এক তাজ্জব ঘটনা ঘটে গিয়েছে। অবাক হয়ে আমি পরিলক্ষ্য করলাম যে একটি সুন্দর সুবেশ নিটোল যুবক এই বাড়ির সর্বশ্রেষ্ঠ কক্ষে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় সাংঘাতিক আহত অবস্থায় শুয়ে আছে। তার মুখের উপরকার চোখ দুটোই শুধু পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মুখের ঢলঢলে অপরাংশে বিশেষ কোনও ক্ষত দেখা যায় না। তবে তার চোখ দুটো বিনষ্ট করতে গিয়ে চোখের আশপাশের কিয়দংশ একটু আধটু পুড়ে গিয়েছে এই যা। আরও আশ্চর্য হলাম আমি একটি সেবাপরায়ণা মহীয়সীমন্য নারীর তার প্রতি দরদ দেখে। এই মেয়েটি তার সঞ্চিত ধনভাণ্ডার প্রায় উজাড় করে বোধ হয় এই ছেলেটিকে বাঁচাবার জন্য অর্থব্যয় শুরু করে দিয়েছে। প্রায় পাঁচ-ছয়জন ডাক্তার নানা ঔষধপত্র সহ সেখানে উপস্থিত। এদের দুই-একজনকে দুশো টাকারও উপর ফিস্ দিয়ে সেখানে ডেকে আনা হয়েছে। সবচেয়ে আমি আশ্চর্য হলাম সেই মেয়েটির আন্তরিক সেবার আতিশয্য দেখে। সে যেন তার সমস্ত মায়া, মমতা ও আগ্রহ উজাড় করে তার প্রেমাস্পদেরই বুকের উপর ঢেলে দিতে চায়। তার ব্যস্ততা ও ছুটাছুটি যেন তার মায়ের বা বোনের স্নেহকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। তিনি নিজেই তাঁর পুরাতন এক বন্ধুকে এই ঘটনার সম্বন্ধে থানায় খবর দেবার জন্যে পাঠিয়ে ছিলেন। তাই

প্রতিটি মুহূর্ত্তেই বোধ হয় তিনি সেখানে আমাদের আগমনের অপেক্ষা করছিলেন। সেইজন্য আমাদের সেখানে দেখে কিছুমাত্র চিন্তিত না হয়ে তিনি সেই হতভাগ্য অচৈতন্য যুবকটিকে সেবা করার মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিয়ে মুখের উপর আঙুল রেখে ইশারায় আমাদের চুপ করতে বললেন। 'তুমি ভাই ওঁদের পাশের ঘরে নিয়ে বসাও', ভদ্রমহিলা আমাদের দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে তাঁর পুরাতন বন্ধুটিকে অনুযোগ করে বললেন, 'ডাক্তারবাবুরা চলে গেলে আমি ওঁদের সঙ্গে দেখা করবো। এখান থেকে উঠলেই ও কেঁদে উঠবে। এখনও জ্ঞান ওর একটু আধটু আছে।'

'তা তো বুঝলাম, ম্যাডম, 'একটু এগিয়ে গিয়ে ম্যাডামকেও আমি অনুযোগ করে বললাম, 'এটা যখন একটা সাংঘাতিক পুলিশী মামলা—তখন একে এখানে আপনার হেপাজতে রাখা নিরাপদ হবে না। কে বলতে পারে যে বাড়ির চিকিৎসাতে ফল বিপরীত হবে না? ভগবান না করুন, বলা তো কিছু যায় না। একটা ভালো-মন্দ হয়ে গেলে মার্ডার কেশ হয়ে যেতে পারে। তা ছাড়া ওদের বাড়িতেও তো একটা খবর দেওয়া দরকার। আমরা ওকে কোনও একটা সরকারী হাঁসপাতালে পাঠাতে চাই।'

'এ্যাঁ! কি বলছেন আপনি? হাঁসপাতালে গেলে ও ত বাঁচবেই না'। আমার এই প্রস্তাবে আঁতকে উঠে ভদ্রমহিলা ছেলের গলাটা আঁকড়ে ধরে বলে উঠলেন, ওর মধ্যে এখন এমন একটা মানসিক অবস্থা এসে গিয়েছে যে ও একটুখানিও আমাকে দেখতে না পেলে শিউরে উঠছে। এই অবস্থায় একে এখান থেকে সরিয়ে নিলেই বরং ও বাঁচবে না।'

ভদ্রমহিলার এই সব উক্তিতে উপস্থিত ডাক্তারও একটু হকচকিয়ে গিয়ে ভদ্রমহিলার দিকে চেয়ে দেখলেন। তবু তাঁরা জানতেন না যে এই যুবকটি ঐ প্রায় বিগত-যৌবনা ভদ্রমহিলার কোন আত্মীয় নয়। এদিকে আমার সন্ধানী দৃষ্টি ভদ্রমহিলার চোখের মধ্য দিয়ে তাঁর অন্তস্তলের শেষ সীমায় পৌছিয়ে গিয়েছে। আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম ভদ্রমহিলার চোখের জলের ফাঁকে ফাঁকে একটা হিংস্র ক্রুর দৃষ্টি থেকে থেকে ফুটে উঠছে। এই সময় একজন ডাক্তার যুবকটিকে ঘুম পাড়াবার জন্যে মরফিয়া ইনজেকশন দিচ্ছিলেন। আমি ভীত চকিত হয়ে মহিলাটির ক্রূর দৃষ্টির উপর থেকে আমার দৃষ্টি সেইদিকে নিবদ্ধ করলাম। ভদ্রমহিলার এই ক্রুর দৃষ্টি আমার সন্ধানী দৃষ্টিকেও যে প্রতিহত করে দিতে চায়! মোটের উপর এই মহিলাটি ও সেই সঙ্গে তার বন্ধুটির উপর আমার বারে বারে সন্দেহ জাগছিল। কিন্তু অহেতুক সন্দেহের কোনও কারণ আমি নিজেই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এরা যদি সন্দেহমান মানুষই হবে, তাহলে এমনভাবে প্রাণ ঢেলে এ ঐ মৃত্যুমুখী যুবকটিকে সেবা করবেই বা কেন? নিজের এই অহেতুক সন্দেহে নিজেই সন্দিগ্ধ হয়ে উঠি, কিন্তু তবুও আমার মনের সহজাত বৃত্তি আমাকে তাদের উপর বিরূপ করে রাখে। এইরূপ এক অদ্ভুত অনুভূতি জীবনে কোনও দিন বোধহয় এমন ভাবে আমি অনুভব করিনি।

'আচ্ছা! তাহলে আমি পাশের ঘরে গিয়েই বসছি', একটু কিন্তু কিন্তু করে আমি ভদ্রমহিলাকে জানালাম, 'ডাক্তারবাবুদের কাজ হয়ে গেলে ওঁদের নিয়ে ওখানে একবার আসবেন। এ সময় আপনাদের বিরক্ত করা উচিত হচ্ছে না তা জেনে ও বুঝে আপনাদের এই একটু বিরক্ত করা ছাড়া আর উপায় বা কি? এই রাহাজানি মামলার তদন্তের জন্য কয়েকটা বিষয় আপনার কাছ হতেই জেনে নেওয়ার বিশেষ করে দরকার হয়েছে।'

ভদ্র মহিলাটিকে এই কথা কয়টি গম্ভীরভাবে শুনিয়ে দিয়ে আমি একবার তাঁর দিকে ও একবার উপস্থিত ডাক্তারদের দিকে চেয়ে দেখলাম। এর পর ঐ মহিলাটির সেই পুরানো বন্ধুটির সঙ্গে ধীরে ধীরে পাশের ঘরে এসে বসে এই মামলা সম্পর্কে সম্ভাব্য অসম্ভাব্য অনেক কিছুই ভাবতে শুরু করে দিলাম। পাশের ঘরে পর্দার ফাঁকে সেই অচৈতন্য যুবকটি ও তার সেবারত বান্ধবীকে সুস্পষ্ট ভাবে দেখা যায়। কিন্তু তবু কেন জানি না আমার মনে হল যে সে যেন বাঘিনীর মত তার দ্বারাই নিহত হরিণটিকেই হারানোর আশঙ্কায় থেকে থেকে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠছে। আমার এ-ও মনে হলো, একে বোধ হয় আমার অন্তরাত্মা অন্য কোনও এক কারণে অপছন্দ করছে। তাই তার মধ্যে এতো সদ্‌গুণ থাকা সত্ত্বেও আমি তাকে বরদাস্ত করতে পারছি না।

প্রায় আরও এক ঘণ্টার পর প্রথম আমার ঘরে এলেন

এই ডাক্তার দলের প্রধান ডাক্তার অমুক দত্ত। আমি যে তাঁকে এই ব্যাপারে অনেক কিছুই জিজ্ঞাসা করবো তা তিনি স্বভাবতই বুঝেছিলেন। তাই তিনি আমাকে সেখানে অপেক্ষা করতে দেখে নিজেই তাঁর বক্তব্যটুকু জিজ্ঞাসিত হবার আগেই গড় গড় করে বলে গেলেন। খুব সম্ভবতঃ তাঁর অন্যত্র আরও অনেক কল্ ছিল। তাঁর পক্ষে এইখানে আমার সহিত অধিকক্ষণ কালাপহরণ করা সম্ভব ছিল না। এদিকে তাঁর এই ধরণের মামলার ব্যাপারে আপন কর্তব্য সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। তাই নিজ হতেই এই রোগীর রোগের কারণ সম্বন্ধে অকুণ্ঠিত চিত্তে যেটুকু জানবার তা জানিয়ে দিয়েই গেলেন। এই ঘটনা সম্বন্ধে তাঁর অভিমতটুকু আমি নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম।

"আমি ভাল করেই এই রোগীকে পরীক্ষা করেছি। খুব সম্ভবতঃ ভিরোল জাতীয় তরল বিষের একটা শিশি এর দুইটা চোখে কেউ ঢেলে দিয়েছে। এর ফলে তার চক্ষু দুটি গভীর-ভাবে পুড়ে গিয়েছে। এ ছাড়া এর মাথার পিছনে একটা ছেঁচড়ানোর দাগ দেখা যায়। যতদূর বুঝা গেলো যে প্রথমে একে ধাক্কা দিয়ে মাটির উপর ফেলে দেওয়া হয়। তারপর অতর্কিতে এর চোখ দুটোর উপর এই শিশি হ'তে তরল বিষ ঢেলে দেওয়া হয়েছে। এর শরীরের অন্য কোনও স্থানে খুব বেশি আঘাতের চিহ্ন না থাকায় মনে হয় যে শুধু এর চোখ দুটোই অন্ধ করে দেওয়া আততায়ীর উদ্দেশ্য ছিল। শুধু রাগাজানি করা আততায়ীর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ব'লে মনে হয় না। তবে অপরাধীদের বিবিধ রূপ কার্যপদ্ধতির সম্বন্ধে কোনও কিছু বলা সম্ভব নয়। এমনও হতে পারে যে অর্থাপহরণের সময় যাতে আততায়ীকে সে চিনতে না পারে তার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করে প্রথমে সে এর চক্ষু দুটোই অন্ধ করে দিয়েছে। তবে এ সব বিষয় অপরাধ-বিজ্ঞানীরাই ভালো করে বলতে পারে। চিকিৎসকদের এটা আদপেই বিবেচ্য বিষয় নয়।"

এই বিশেষ অভিমতটি জানিয়ে দিয়ে ডাক্তারবাবু অন্যান্য ডাক্তারদের নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে বাধা দিয়ে এই সম্পর্কে আরও একটি বিষয় জেনে নিলাম। আমাদের প্রশ্নোত্তরগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম।

দুটো মাত্র প্রশ্ন করবো। এর কি এই জন্যে জীবনহানির কোনও সম্ভাবনা আছে? অন্য কথা হচ্ছে এই যে এর কি দৃষ্টিশক্তি পুনরায় ফিরে পাবার কোনও সম্ভাবনা আছে?

উঃ—যারা একে আঘাত হেনেছিল তারা একে সংহার করতে চায়নি। অবশ্য এমনও হোতে পারে তাদের উদ্দিষ্ট কার্য উদ্ধারের জন্য এর প্রয়োজনও হয় নি। তবে সে যাই হোক না কেন, এর জীবনহানির কোনও আশঙ্কাই নেই। তবে এর দৃষ্টিশক্তি এ কোনও দিনই ফিরে পাবে না। এর চক্ষু-রত্ন সম্পূর্ণ ভাবে চিরদিনের মতই নষ্ট হয়ে গেলো।

'এ্যাঁ! ডাক্তারবাবু, এর জীবনের কোনও আশঙ্কা নেই তো, হঠাৎ ক্ষিপ্ত বাঘিনীর মত মহিলাটি ছুটে এসে ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করলে, 'এর চোখ দুটো যায় যাক্, কিন্তু এর জীবন তো থাকবে? আজ থেকে আমিই চির-দিন ওর চক্ষু হয়ে থাকবো। কিন্তু দেখবেন ডাক্তারবাবু! ওর জীবনের কোনও ক্ষতি যেন না হয়। এর জন্য আমার শেষ সম্বল গহনাগুলো পর্যন্ত খোয়াতে রাজি আছি।'

আমি এইবার অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম মহিলাটির চোখের ও ঠোঁটের কোণে একটা তৃপ্তির হাসি। ভদ্র-মহিলা যেন একটা যুদ্ধজয় বা অনুরূপ কোনও এক অসাধ্য-সাধন করে ফিরে এলেন। ডাক্তাররা সকলে একে একে বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছেন। ওদিকে রোগী মরফিয়া ইন্‌জেকশনের গুণে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন। এই সুযোগে আমি এই ভদ্র মহিলাটিকে এই মামলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিলাম। এই সম্পর্কে তাঁর বিবৃতিটি উল্লেখ-যোগ্য বিধায় নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"আমার নাম প্রমীলা চৌধুরী। পিতার নাম ৺রক্ষত চৌধুরী। পূর্বে আমি ২নং বোলাড ষ্ট্রিটে থাকতাম। সম্প্রতি মাস ছয় হলো আমি এইখানে বাসা নিয়েছি। আমি অমুক অফিসের একজন স্টেনো-টাইপিস্ট। এই ছেলেটি আমার এই অফিসেই কাজ করে। সেই সুবাদে তার সঙ্গে আমার আলাপ হয়। অবসর সময়ে আমি তাকে স্টেনো-টাইপ শিখাতাম; অফিসে আমার বয়স লেখানো আছে আটত্রিশ। কিন্তু আসল বয়েস আমার তার চেয়ে অনেক কম। এদানী দুঃখে, কষ্টে ও রোগে আমার দেহটা মুষড়ে পড়েছে। এই জন্যই আমার বয়সটা

অফিস হতে একটু আগে বেরিয়ে দুজনায় মিলে সিনেমায় গিয়েছিলাম। প্রায় আটটার সময় সিনেমা ভাঙ্গার পর আমি একে নিয়ে আমার বাড়ি ফিরি। এরপর তার হাতে আমার ভ্যানিটি ব্যাগটা তুলে দিয়ে সেটা নিয়ে তাকে এগিয়ে যেতে বলি। এই সময় আমি আমাদের বাড়ির উঠানের গেটটা বন্ধ করছিলাম। এর পর আমি ঐ ছেলেটির তীব্র আর্তনাদ শুনে ছুটে গিয়ে দেখলাম যে সে হাউমাউ করে কাঁদছে। তার মুখের উপর সদ্য-অ্যাসিড্ পড়ার মত পোড়া দাগ। ঠিক এই সময়ই আমার এই গ্রাম সুবাদে দাদা এখানে এসে উপস্থিত হলো। আমরা দুজনে একে ধরাধরি করে বিছানার উপর শুইয়ে দিয়ে এনাকে তখুনি একজন ডাক্তারকে এখানে ডেকে আনতে বললাম। এই ডাক্তার এখানে এসে রোগীর অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে যাওয়ায় আমি আরও ক'জন বড়ো ডাক্তারকে ডেকে পাঠাই।"

আমি ধীরভাবে ভদ্রমহিলার এই বিবৃতিটি শুনে নিয়ে সেটি ত্বরিতগতিতে লিপিবদ্ধ করে নিলাম। তিনি তাঁর এই বিবৃতিটিতে ইচ্ছে করেই বহু ফাঁক রেখে গেলেন কি'না তা বুঝা গেলো না। কিন্তু এর মধ্যে যে বহু ফাঁক রয়ে গিয়েছে তা আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। আমাদের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে এই সব ফাঁকগুলি জিজ্ঞাসাবাদ দ্বারা পূর্ণ করে নেওয়া ও সেই সঙ্গে এর ফাঁকে ফাঁকে কয়েকটি অবান্তর প্রশ্ন তুলে এদের মনের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করা। এই বিশেষ উদ্দেশ্যে আমি যা তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এবং সে তার যা যা উত্তর দিয়েছিল তা নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

প্রঃ—আচ্ছা! প্রথমেই আমি আপনাকে একটা অপ্রিয় কথাই জিজ্ঞেস করবো। আমি লক্ষ্য করেছি যে এই সাংঘাতিক মামলার বিবৃতির প্রথমাংশে বারে বারে আপনি আপনার বয়েস নিয়ে বেশি মাথা ঘামালেন। একটু সাবধানে থাকলে মানুষ তার বয়স কিছু কাল ধরে রাখতে যে পারে এ কথা সত্য। কিন্তু সত্যই কি আপনার বয়েস অত কম?

উঃ—আজ্ঞে, আমার বয়েস সম্বন্ধে আমি আদপেই মিথ্যে বলি নি। আমাকে বাইরে থেকে একটু বেশি বয়েসের বলে মনে হলেও আমার বয়েস অতো নয়। আমার জন্মের তারিখ, সাল ইত্যাদি আমার কাছে লেখা আছে। কিন্তু এতো কথা আমি আপনাদের বলতেই বা যাবো কেন, আপনি এখন অন্য কোনও কথা থাকলে আমাকে তা জিজ্ঞেস করুন।

প্রঃ—থাক, ম্যাডাম, ওসব কথা এখন। কারও বয়েস বেড়ে যাবার মধ্যে আমি দোষ তো কিছু দেখি না। আচ্ছা! এখন আপনি বলুন তো—ভ্যানিটি ব্যাগটা এই ছেলেটির হাতে তুলে দিয়ে তাকে এগিয়ে যেতে বলেছিলেন কেন?

উঃ—এই ছেলেটি প্রায়ই সন্ধ্যার পর আমাদের এই বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। এই বাড়িতে আমি একা থাকি বলে এ পাড়ার কয়েকটা ছোকরা তার এখানে আসা অপছন্দ করতো। এই ছেলেগুলো আমাদের সম্বন্ধে কি ভাবতো তা ভগবানই জানেন। এতো রাত্রে আমাদের দুজনাকে পড়শীরা কেউ একত্রে দেখে তা আমি চাইনি। এই জন্য তাকে আমার ভ্যানিটি ব্যাগটা নিয়ে এগিয়ে যেতে বলে আমি এ বাড়ির উঠানের গেটটা বন্ধ করছিলাম।

প্রঃ—এ কথা কিন্তু আপনি পূর্বে আমাকে বলেন নি। যাক্, আপনার এ কৈফিয়ৎ আমি সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিলাম। এই ছেলেটির সঙ্গে আপনার প্রকৃত সম্বন্ধ কি, তা আমি এখুনি আপনাকে জিজ্ঞেস করবো না। এখানে আমাকে আপনি শুধু এইটুকু বলুন যে আপনাদের উঠানের এই গেটটা আপনি বন্ধ করবার সময় পেয়েছিলেন কিনা। না, তার আগেই এই ছেলেটির চিৎকার শুনে এটা বন্ধ না করেই আপনি বাড়ির ভিতর দৌড়ে গিয়েছিলেন? এই ছেলেটিকে তার আততায়ী ঠিক কোথায় আক্রমণ করেছিল? আপনাদের এই বাড়ির উঠানে, না আপনাদের বাড়ির ভিতরে?

উঃ—আজ্ঞে! আমি আমাদের বাড়ির এই উঠানের গেটটি বন্ধ করে মুখ ফেরাবা মাত্র ঐ ছেলেটির চীৎকার শুনতে পাই। ততক্ষণে সে আমাদের বাড়ির ভিতরের প্যাসেজের উপর এসে দাঁড়িয়েছে। আমার ঘরের দুয়ারের বাইরেই এই ঘটনা ঘটে। এই সময় আমার নির্দেশ মত সে ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে চাবি নিয়ে ফ্ল্যাটের দরজা খুলছিল।

প্রঃ—ও, আপনি তাহলে আপনার ভ্যানিটি ব্যাগের অধিকার দেওয়ার সঙ্গে তার ভেতর হতে চাবি বার করবার

অধিকারও তাকে দিয়েছিলেন। থাক, এতে লজ্জারই বা কি আছে ? বিশেষ করে আপনি যখন নিজেকে আজও প্রায় ওর মতই ছেলে মানুষই মনে করেন। কিন্তু এখন বলুন দিকি আপনি এ আততায়ীকে একটুক্ষণের জন্যও খুঁজে ছিলেন কিনা ? আপনি পাড়ার লোকেদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে চেঁচামেচি করেছিলেন কি ?

উঃ—আজ্ঞে, আমি এতোক্ষণ এই আহত ছেলেটির প্রাণ বাঁচাবার জন্যে এতো ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম যে এ কথা এতোক্ষণ আমার মনেই আসেনি। আশা করি এই আততায়ীকে খুঁজে বার করে আপনি সেই শয়তানের যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থা করবেন।

প্রঃ—এই ছেলেটির আততায়ীকে আমরা হয়তো খুঁজে বার করতে পারবো। কিন্তু এজন্য আমাদের সঙ্গে ঘুরা-ঘুরি করে আপনাকে একটু সাহায্য করতে হবে। আপনার এই একতলা বাড়ির দুটা ফ্ল্যাটের মধ্যে একটা দেখছি বন্ধ। এই ফ্ল্যাটটি থেকে ভাড়াটে কতোদিন উঠে গেছে ? এই বাড়িতে ঢুকবার ও বেরুবার তো এই একটা মাত্র প্যাসেজ। আপনি আততায়ীকে এখান দিয়ে বার হয়ে যেতে তো দেখলেন না। তাহলে এর চোখ দুটো নষ্ট করে দিয়ে কোন দিক দিয়েই বা সে পালালো ?

উঃ—আজ্ঞে! আপনাদের সঙ্গে এখন ঘুরাঘুরি করবার আমার সময় কৈ ? এখন ছুটি নিয়ে সেবা করে আমাকে একে বাঁচিয়ে তুলতে হবে। আমার এখন মাথা ঠিক নেই। অতো-শতো আর এখন আমি ভাবতেও পারছি না। আমি এইবার ঐ ছেলেটির কাছে গিয়ে একটু বসবো। ঐ দেখুন ঘুমের মধ্যেও চমকে চমকে উঠছে। আপনারা না হয় কাল এখানে একবার আসবেন। আমি তাহলে চললুম—

প্রঃ—থামুন। আর একটা প্রশ্ন শুধু আমি আপনাকে করবো। আপনি কি এর আততায়ীরূপে কাউকে সন্দেহ করেন ? আপনি তো বললেন যে আপনার গাঁয়-সুবাদে এই ভাইটির সঙ্গে অনেকদিন পর এই কোলকাতায় দেখা হয়েছে। এ কবছর সে কোথায় কি করতো ও কিভাবে কার সঙ্গে মেলামেশা করতো তা নিশ্চয়ই আপনার জানা নেই। তাই আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছিলাম এই যে—

উঃ—আপনারা কি শেষে এই নিরীহ ভদ্রলোককে নিয়ে পড়লেন না কি ? দয়া করে মিছামিছি আর ওনার পিছনে লাগবেন না। এখন ওঁকে দিয়েই আমাকে ডাক্তার বদ্যি ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করতে হবে। একটা অসহায় রোগী নিয়ে একজন মেয়েছেলের পক্ষে এতো দিক সামলানো কঠিন। ওঁকে এখন আমার এখানে বিশেষ দরকার। ওঁকে যা জিজ্ঞেস করবার তা এই বাড়িতেই বসে জিজ্ঞেস করুন। ওকে নিয়ে এখান-ওখান আপনারা ঘুরাফিরা করলে আমার এখন চলবে না।

প্রঃ—তা এই রোগী নিয়ে এত ঝঞ্ঝাট আপনাদের পোয়াবার দরকারই বা কি ? ওর নিজেরও তো বাড়ি ঘর-দোর ও আত্মীয়-স্বজন আছে। তাদের এখানে ডেকে পাঠিয়ে তাদের হাতেই একে সঁপে দিচ্ছেন না কেন ? এই ছেলেটির পিতামাতা বা আত্মীয় স্বজনের ঠিকানা জানা থাকলে তা আমাদের বলুন। আমরা তাদের খবর দিয়ে এখুনি এখানে নিয়ে আসবো।

উঃ—না না না, এখন ও কোথাও যাবে না। আমাকে ছাড়া কোথাও থাকতে পারবে না। এর মা-বাপ বহু দিন মারা গেছে। মামার বাড়িতে মানুষ হয়ে মামার বাড়িতেই ও থাকতো। ওর মামা-মামীরা কোনও দিনই ওকে যত্ন-আত্তি করে নি। এখন ওর ওই অবস্থা দেখে কেউই ওকে তাদের গলগ্রহ করে তাদের বাড়িতে রাখবে না। এখন চিরদিনের মত ওর ভার আমাকেই নিতে হবে। প্রথম প্রথম এর জন্য হয়তো একটুআধটুকু হা হুতাশ করবে। কিন্তু বেশিদিন—

বাংলাদেশে প্রবাদ আছে যে মায়ের চেয়ে মাসীদেরই বেশি দরদ হয়ে থাকে। এক্ষেত্রেও এই প্রবাদটি সত্য হলে নিশ্চয়ই আমি মাথা ঘামাতাম না। কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্রে ছেলেটির উপর এই মহিলাটির দরদ নির্ভে-জাল বলেই মনে হলো। এইখানে একটি প্রশ্ন বারে বারে আমার মনে উঁকি দিতে লাগলো—এইটিই যদি সত্য হয়, তাহলে এই ছেলেটির আততায়ীর উপর এর কোনও ক্রোধ দেখা যাচ্ছে না কেন ? এই ঘটনা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত প্রতিবেদনের পরিশেষ স্বরূপ আমি নিম্নলিখিত রূপ একটি মন্তব্য লিখেছিলাম—

"এই মহিলাটির হাব-ভাব ও কথোপকথন হ'তে

আমি তিনটি বিষয় বিশেষ ভাবে পরিলক্ষ্য করেছি। প্রথমতঃ সে চায় যে যেরকম করেই হোক এই আহত যুবকটি প্রাণে বেঁচে থাকুক। দ্বিতীয়তঃ সে যদি অন্ধ হয়ে যায় তো ভালোই, তাতে বরং তার সুবিধে ছাড়া অসুবিধে নেই। অর্থাৎ সে চাইছে যে অন্ধ হয়ে সে বেঁচে থাকুক। তৃতীয়তঃ এই মহিলাটির ইচ্ছে যে এই অবস্থায় এই যুবকটি অকেজো হয়ে গেছে, সে তার কাছেই চিরকাল থেকে যাবে। এই অবস্থায় তার বাড়ির লোকেরাও একে গলগ্রহ মনে করে এই ব্যবস্থায় সানন্দে সায় দেবে। এর চতুর্থ ইচ্ছা মনে হলো যে, সে এই যুবকটির আততায়ী ধরা পড়ে তা আদপেই চায় না। এই জন্য আমি এই বিশেষ লাইনে আরও তদন্ত করে যাবো ঠিক করেছি। এই যুবকটির প্রতি এই মহিলাটির অদম্য ভালবাসা সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ। কিন্তু তা সত্বেও তার এই ব্যবহারের মূল কারণ সম্বন্ধে বিশেষ রূপে বিবেচ্য। এখনও পর্যন্ত আমি এই বিষয়ে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছুতে পারি নি। এই ছেলেটির আত্মীয়-স্বজনের সহিত এখনও কোনও সংযোগ স্থাপন করতে পারি নি। তাদের ঠিকানা ওখানকার কেউই বললো না বলেই আমাদের এই অসুবিধা। এ'ছাড়া রাত্র হয়ে যাওয়ায় ওখানকার পাড়া-পড়শীদেরও এই ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা সম্ভব হয়নি। আরও তদন্ত সাপেক্ষে মতামত প্রকাশে বিরত থাকাই আমি শ্রেয় মনে করছি।"

[ক্রমশঃ

বিশুদ্ধ, কোমল
লাক্স এবার
৪টি রামধনু-
রঙে
আর আপনার প্রিয় সাদাটিও রয়েছে!
LUX
সবুজ
LUX
নীল
LUX
গোলাপী
LUX
হলুদ
'রঙগুলো এতই সুন্দর,
মনে হয়
সবই আমার চাই'
বৈজয়ন্তীমালা বলেন-
দেখুন ! লাক্স এবার চমৎকার কত সব রঙে আর মানানসই মোড়কে—সাদাটিও রয়েছে। প্রতিটিই আপনার বিশুদ্ধ লাক্স—লাবণ্য রক্ষায় যে সাবান চিরদিনই আপনি চেয়েছেন।
LUX
চিত্রতারকার
বিশুদ্ধ, কোমল
সৌন্দর্য্য-সাবান
LTS. 86A-X52 BG
হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী
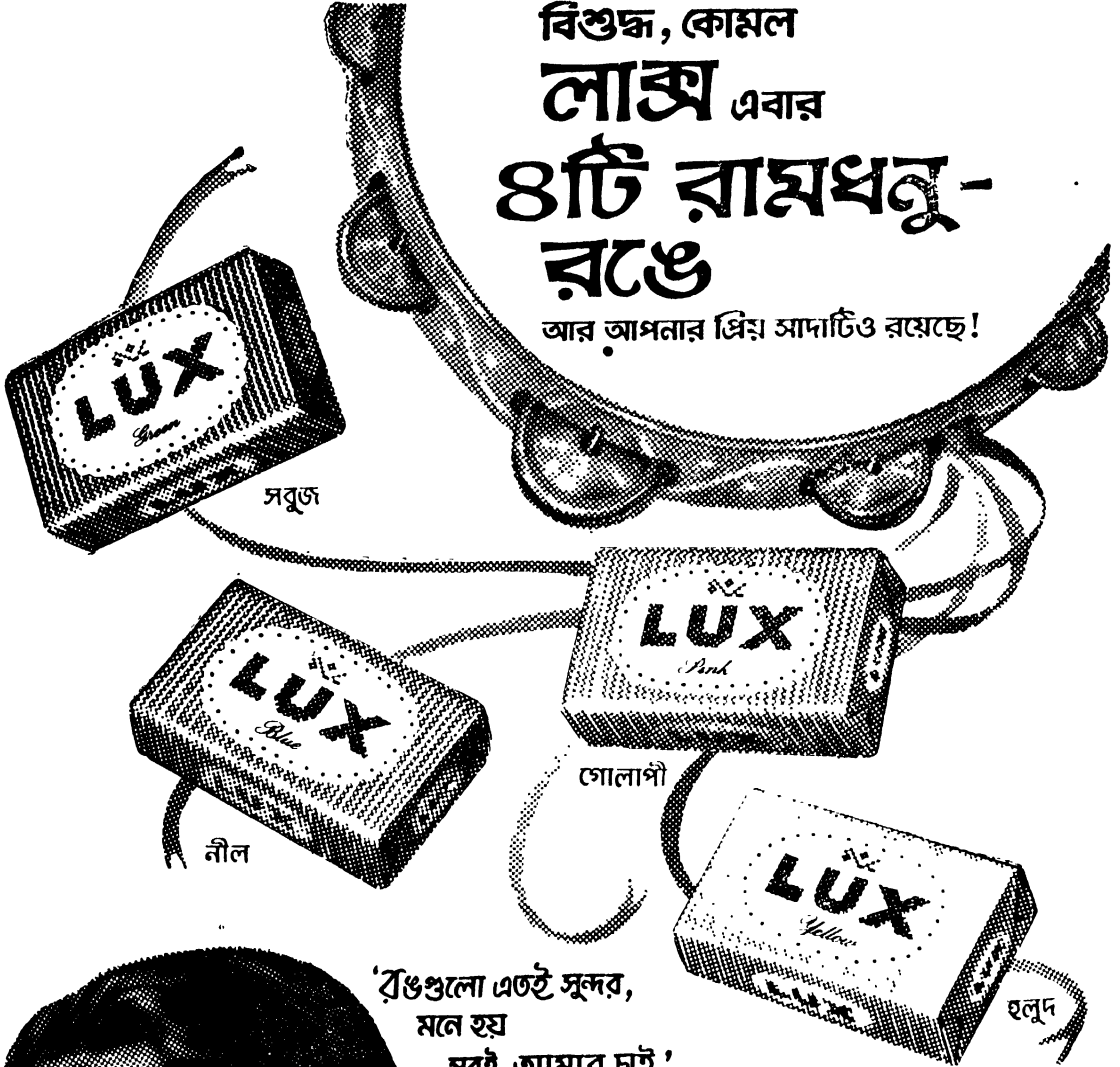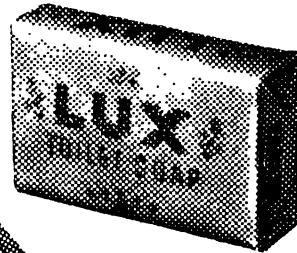
গঙ্গাসাগরতীর্থ—

পৌষ সংক্রান্তির দিন কলিকাতার দক্ষিণে ডায়মণ্ড-হারবারের নিকট গঙ্গাসাগর তীর্থে সারা ভারতের কয়েক লক্ষ হিন্দু স্নান করিতে যান ও সে জন্য তথায় এক দিনের মেলা বসিয়া থাকে। গত ১৩৬৭ সালের আষাঢ় মাঁসে 'দেবযান' নামক মাসিক পত্রে স্বর্গত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ বেদান্ততীর্থ একটি আবেদন প্রকাশ করিয়া গঙ্গাসাগর তীর্থের মাহাত্ম্য প্রকাশ করেন এবং সেই সঙ্গে বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব ভক্ত ঠাকুর শ্রীশ্রীসীতা-রামদাস ওঙ্কারনাথ মহোদয়কে অনুরোধ করেন—গঙ্গা-সাগর তীর্থে যাহাতে ১২ মাস তীর্থযাত্রী যাইয়া স্নানাদি করিতে পারে, সে জন্য যেন ব্যবস্থা করা হয়। ১২ মাস গঙ্গা-সাগরে যাওয়ার পথ নাই—তথায় উপযুক্ত ধর্ম্মশালা প্রভৃতি নাই—সেসকলের অবিলম্বে ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। আজ বাংলার দুর্দ্দিন—বাংলা দেশে এমন কোন তীর্থ নাই যেখানে সর্বভারতের লোককে আকৃষ্ট করা যায়। কালীঘাট বা তারকেশ্বর বাংলা ও বাঙ্গালীর প্রিয় তীর্থক্ষেত্র, কিন্তু পৌষ সংক্রান্তির মেলায় গঙ্গাসাগরে হিমালয় হইতে কুমারিকা এবং দ্বারকা হইতে মণিপুর—ভারতের সকল স্থানের হিন্দু আগমন করিয়া থাকেন! গঙ্গাসাগরে ১২ মাস যাতায়াতের সুব্যবস্থা হইলে সকল সময়ে তথায় লোক স্নান করিতে যাইবে। ফলে সেখানে স্থায়ী সহর গড়িয়া উঠিবে ও বাংলা দেশ অন্য রাজ্যের লোক সমাগমে সমৃদ্ধ হইবে। আমরা এ বিষয়ে শ্রীশ্রীসীতারামদাস মহোদয়কে প্রধান উদ্যোগী হইতে আহ্বান জানাই—সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সরকার তথা বাঙ্গালী জনগণকে এ বিষয়ে অবহিত হইতে অনুরোধ করি। সরকার বিভিন্ন ভাষায় এ বিষয়ে বিজ্ঞাপন ও পুস্তিকা প্রচার করিয়া অর্থাগমের পথ উন্মুক্ত করুন—বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর দল তথায় যাইয়া ব্যবসার ক্ষেত্র প্রস্তত করুন—নানাভাবে গঙ্গাসাগরতীর্থকে সমৃদ্ধ করুন—শুধু বাঙ্গালী সকল ক্ষেত্রে পরাজিত হইতেছে বলিয়া লাভ নাই। পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ আজ আমাদের মধ্যে নাই—তাঁহার শেষ আবেদন যেন বাঙ্গালী হিন্দুমাত্রকে এ বিষয়ে যত্নবান করিতে সমর্থ হয়—আমরা আজ এই প্রার্থনাই প্রচার করিলাম।

দ্বিজেন্দ্র জন্মশতবর্ষ

গত ১২ই নভেম্বর নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে বিষ্ণুমহলে বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তাহাতে স্থানীয় সাহিত্যিক শ্রীঅনন্ত প্রসাদ রায় ঘোষণা করেন যে কবিবর ও ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গত দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের জন্মশত বার্ষিক উপলক্ষে ১৯৬২ সালের ১৯শে জুলাই হইতে এক বৎসরব্যাপী দ্বিজেন্দ্র—উৎসব পালন করা হইবে। ঐ সভায় খ্যাতনামা লেখিকা শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন এবং শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, রাধারমণ মিত্র, ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী ও হাসিরাশি দেবী বক্তৃতা করেন। তথায় কবিতা পাঠ করেন শ্রীকৃষ্ণধন দে, ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা, শরদিন্দু নারায়ণ ঘোষ, তারিণীপ্রসাদ রায়, পান্নালাল মাইতি, শচীন চট্টোপাধ্যায়, যুথিকা দাস, নীহাররঞ্জন সিংহ, মোহিত রায়, রমেন্দ্র কুণ্ডু ও সুজিত মুখোপাধ্যায়। কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে প্রায় একশত সাহিত্যিক সে দিন কৃষ্ণনগরে যাইয়া সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন এবং কৃষ্ণনগর বাণী পরিষদ ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কৃষ্ণনগর শাখা ঐ সম্মিলনে উপস্থিত অতিথিদের সারাদিন আপ্যায়িত করিয়াছিলেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—

গত ২৯শে নভেম্বর নিম্নলিখিত সুধীগণ নির্বাচনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। সেনেট কেন্দ্রে ৮ জন—(১) শ্রীকালাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় (২) শ্রীসুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায় (৩) শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য (৪) শ্রীবিধুভূষণ ঘোষ (৫) শ্রীনন্দ কিশোর ঘোষ (৬) শ্রীসনৎ কুমার গুপ্ত (৭)

শ্রীসোমেশ্বর প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও (৮) ডাক্তার মহেন্দ্র নাথ সরকার। ১১ জন প্রার্থীর মধ্যে ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন ও শ্রীমণীতোষ রায় চৌধুরী পরাজিত হইয়াছেন। একাডেমিক কাউন্সিল কেন্দ্রে নিম্নলিখিত ৫ জন সিণ্ডিকেটের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন—(১) অধ্যক্ষ প্রশান্ত কুমার বসু (২) অধ্যাপক সরোজকুমার বসু (৩) অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্র নাথ ভাদুড়ী ও (৪) শ্রীমতী মুক্তা সেন। (৫) অধ্যক্ষ শ্রীপ্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হইয়াছেন।

রূপনারায়ণের উপর নুতন সেতু—

গত ৯ই ডিসেম্বর শনিবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় কোলাঘাটে যাইয়া হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলার সীমান্তে রূপনারায়ণ সেতুর ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। বোম্বাই—কলিকাতা জাতীয় সড়কের উপর ২৪ শত ফিট দীর্ঘ এই সেতু পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম সেতু হইবে এবং ফলে কলিকাতা হইতে মেদিনীপুরের শেষ সীমান্তে ১০৫ মাইল স্থলপথ খোলা হইবে। সেতু নির্মাণে ১ কোটি ৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে এবং ৬নং জাতীয় সড়কে পশ্চিমবঙ্গে ৪টি সেতুর এটি অন্যতম। অন্যগুলি (১) দামোদরের উপর বাগনানে ও (২) কংসাবতীর উপর পাঁশকুড়ায় সেতু নির্মিত হইয়াছে—(৩) বিহার সীমান্তে ডুলং নদীর উপর সেতুর কাজ আরম্ভ হইয়াছে। এই উৎসবে ডাক্তার রায়ের সহিত সেচমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়, পুর্তমন্ত্রী শ্রীখগেন দাশগুপ্ত, চিফ এঞ্জিনিয়ার শ্রীএস-এন গুপ্ত, উন্নয়ন কমিশনার শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি গিয়াছিলেন। ৩ বৎসরে নূতন সেতুর নির্মাণ কার্য্য শেষ হইলে মেদিনীপুর জেলা নানাভাবে উপকৃত হইবে।

সরলাবালা সরকার—

বাংলা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবিকা সরলাবালা সরকার গত ১লা ডিসেম্বর শুক্রবার বিকালে কলিকাতায় বাস-ভবনে ৮৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি একমাত্র কন্যা শ্রীমতী নির্ঝরিণী সরকার, দৌহিত্র আনন্দবাজার পত্রিকা ও দেশ সম্পাদক শ্রীঅশোক-কুমার সরকার ও দৌহিত্রী রাখিয়া গিয়াছেন। ১৮৭৫ সালে কৃষ্ণনগর কাঁঠালপোতায় তাহার জন্ম—পিতা কিশোরীলাল সরকার কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট ও বড় ভাই সরসীলাল সরকার ডাক্তার ছিলেন। ১২ বৎসর বয়সে রায় বাহাদুর মহিমচন্দ্র সরকারের পুত্র শরৎচন্দ্রেয় সহিত তাহার বিবাহ হয়—১৯০৫ সালে তাঁহার স্বামী অকালে পরলোকগমন করেন। তাঁহার মা ছিলেন অমৃতবাজার পত্রিকার মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের ভগিনী। আনন্দ-বাজার পত্রিকার স্বর্গত সম্পাদক প্রফুল্লকুমার সরকার তাঁহার জামাতা ছিলেন এবং আনন্দবাজারের প্রতিষ্ঠাতা সুরেশচন্দ্র মজুমদার বাল্যকাল হইতে সরালাবালাকে মা বলিয়া ডাকিতেন। সরলাবালা বহু গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন এবং সুদীর্ঘ জীবন সাহিত্যচর্চা, নারী কল্যাণ ও সমাজসেবার কার্য্যে অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন।

দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী—

সুবিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী গত ৯ই ডিসেম্বর শনিবার শেষরাত্রে তাঁহার কলিকাতা বাগবাজার লক্ষ্মীদত্ত লেনস্থ বাড়ীতে ৬৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ফরিদপুর জেলার আমতলী গ্রামের অধিবাসী ছিলেন এবং বাল্যকালে কলিকাতায় আসিয়া ইংরাজি শিক্ষা লাভ করেন। ১৯২২ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত এম-এ পরীক্ষায় প্রথম হন ও পরে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক পদ লাভ করিয়া ২০ বৎসর অধ্যাপনার পর কৃষ্ণনগর কলেজে বদলী হন ও ১৯৫১ সালে অবসর গ্রহণ করিয়া বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বাংলা, ইংরাজি ও সংস্কৃত তিনটি ভাষাতেই তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচারে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। তিনি তিনি বহু সভাসমিতিতে ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে একজন প্রাচীন-পন্থী সংস্কৃত পণ্ডিতের অভাব হইল।

বারাসত হাসানাবাদ রেল—

২৪পরগণা জেলার বারাসত লইতে হাসনাবাদ নূতন ব্রডগেজ রেল লাইন নির্মাণ কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে। ঐ রেল ৩৩ মাইল লম্বা হইবে—তন্মধ্যে ৩২ মাইলে রেল পাতা হইয়া গিয়াছে—১১টি ষ্টেশনের মধ্যে ১০টির নির্মাণ কার্য্য শেষ হইয়াছে—ঐ পথে মোট ১০৩টি পুল নির্মিত হইয়াছে। বিদ্যাধরী নদীর উপর ২টি বড় পুল হইবে—

বিদ্যাধরীর উপর ২নং পুলের নির্মাণ কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই। পুরাতন বারাসত রেল ষ্টেশন ভাঙ্গিয়া উহার কিছু দক্ষিণে নূতন রেলষ্টেশন নির্মিত হইয়াছে ও তাহার কাছে লোকো সেড নির্মিত হইয়াছে। নূতন রেল খোলা হইলে বসিরহাট, টাকী অঞ্চলের অধিবাসীদের যাতায়াতের কষ্ট দূর হইবে। গত কয় বৎসর লাইট রেল উঠিয়া গিয়াছে, বাসে ও মোটরে ছাড়া ঐ অঞ্চলে যাতায়াত করা যায় না। সেজন্য নূতন রেল পথের উদ্বোধনের জন্য ঐ সকল অঞ্চলের অধিবাসীরা সাগ্রহে দিন গণিতেছে। পশ্চিমবঙ্গে আরও কয়েকটি নূতন রেলপথ খোলার প্রয়োজনীয়তা আছে।

উত্তরবঙ্গে নূতন ব্রডগেজ রেল—

গত ১৭ই অক্টোবর উত্তরবঙ্গে সাড়ে ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত নূতন রেলপথ খাজুরিয়াঘাট হইতে নিউ-শিলিগুড়ী লাইনে প্রথম মালগাড়ী চলাচল আরম্ভ হইয়াছে। এপ্রিল মাসে ঐ লাইনে যাত্রী গাড়ী চলিবে। নূতন রেলপথ ১৬৩ মাইল দীর্ঘ—উহাতে মোট ষ্টেশনের সংখ্যা ৩৫টি, তন্মধ্যে ১২টি নবনির্মিত। ঐ রেলপথের ৩৫ মাইল বিহার রাজ্যের মধ্য দিয়া গিয়াছে। এই রেলপথে নূতন সেতু নির্মিত হইয়াছে—তন্মধ্যে ৮টি বৃহৎ সেতু। শিলিগুড়ী হইতে মনিহারীঘাট হইয়া কলিকাতার পথ অপেক্ষা এই নূতন পথ ৭০ মাইল কমিয়া যাইবে। স্বাধীনতার পূর্বে সান্তাহার হইয়া শিলিগুড়ী যাইতে হইত—স্বাধীনতার পর ১৯৫০ সালে আসাম রেল লিংকে-মনিহারীঘাট হইয়া শিলিগুড়ী যাতায়াতের ব্যবস্থা হয়। তাহার পর এই নূতন রেলপথ হইয়া দূরত্ব ৭৫ মাইল কমিয়া গেল। এই নূতন ব্রডগেজ রেল নির্মাণের ফলে উত্তরবঙ্গের ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইবে। এখন ফরক্কায় বাঁধ ও তাহার উপর পুল ও রেল নির্মিত হইলে কলিকাতা হইতে সরাসরি ট্রেণে শিলিগুড়ী যাওয়া যাইবে—কোথাও ষ্টীমারে নদী পার হইতে হইবে না। যে ৩৫ মাইল রেলপথ বিহারের মধ্য দিয়া গিয়াছে, বিহারের সে অংশ পশ্চিমবঙ্গ পাইলে আরও সুবিধা বাড়িবে।

আর্থিক অবস্থার অনুসন্ধান—

১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারত সরকার শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের সভাপতিত্বে ৮জন সদস্য লইয়া একটি কমিটি গঠন করিয়া পল্লী সমাজের দুর্বল শ্রেণীর লোকদের আর্থিক অনগ্রসরতার কারণ অনুসন্ধান ও কল্যাণ সাধনের উপায় সম্বন্ধে নির্দেশ চাহিয়াছিলেন। ঐ কমিটীর মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। কমিটী ভারতের শতকরা ৮০টি পরিবারকে দুর্বল শ্রেণীর মধ্যে ফেলিয়াছেন—কারণ ঐ সকল পরিবারের বার্ষিক আয় এক হাজার টাকারও কম। কমিটির মন্তব্যে বলা হইয়াছে—সরকারী জনকল্যাণ কার্য্যের পরিকল্পনায় ঐ শ্রেণীর লোকদের কাজ দিতে হইবে, গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক শিল্প বিস্তার করিতে হইবে ও শিক্ষার জন্য প্রচুর সাহায্য দিতে হইবে। যে সকল পরিবারের বার্ষিক আয় ৫শত টাকার কম ও যাহাদের বার্ষিক আয় ২৫০ টাকার কম, কমিটি তাহাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়াছেন। কমিটির সদস্য ছিলেন, শ্রীমতী সুচেতা কৃপালানী, শ্রীমানা সাহেব সহস্রবুদ্ধে, এম-আর-রফ, ব্রজরাজসিংহ, এস-শিবরমন, এস-এম-শ্রীকান্ত ও ডিরেক্টর কেন্দ্রীয় সমষ্টি উন্নয়ন পরিষদ। কেন্দ্রীয় সরকার যে এই সকল দরিদ্র ব্যক্তিদের কথা চিন্তা করিতেছেন, ইহাই আশার কথা।

ছাত্রদের বিনা ব্যয়ে যাতায়াত—

পাঞ্জাব সরকার পাঞ্জাব রাজ্যের সকল সরকারী ও বেসরকারী বাসগুলিকে স্কুলের ছাত্রদের বিনা ব্যয়ে স্কুল ও গৃহের মধ্যে যাতায়াতের সুযোগদানের ব্যবস্থার আদেশ দিয়াছেন। ছাত্ররা নিজ নিজ পরিচয়পত্র দেখাইলে তাহাদের বাসে ভাড়া দিতে হইবে না। এইরূপ ব্যবস্থা সকল রাজ্যে চালু করা দরকার। শিক্ষা প্রসারের জন্য সকলে মিলিয়া যদি দায়িত্ব গ্রহণ করে, তবে শিক্ষা-প্রসার কার্য্য দ্রুত হইবে সন্দেহ নাই। আমরা এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি এবং আশা করি, সত্বর এইরাজ্যে অনুরূপ ব্যবস্থা চালু হইবে।

কলিকাতায় শ্রীজহরলাল নেহরু—

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু গত ২রা ডিসেম্বর কলিকাতায় আসিয়া একদিন বাস করিয়া গিয়াছেন। দশটায় দিল্লী হইতে আসিয়া এগারটায় তিনি ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জে সম্মিলিত বণিক সভার বার্ষিক সভায় ভাষণ দিয়াছেন। তথায় তিনি বলেন—কালের দাবী আমাদের মানিতে হইবে। বর্তমান যুগের কালধর্ম হইল সমাজ চিন্তা। যে দেশ কালধর্ম না মানিবে, তাহার দুর্গতি

শেষ থাকিবে না। তিনি বিকালে কলিকাতা গড়ের মাঠে এক জনসভায় বিশেষ করিয়া গোয়া সমস্যার কথা বলেন ও জানাইয়া দেন—দুই সাল আগে বা পরে,গোয়া ভারতের, দখলে আসিবে। সন্ধ্যায় তিনি এলগিন রোডে নেতাজী ভবনে যাইয়া ৪৫ মিনিটকাল নেতাজীর জীবন সম্বন্ধে প্রদর্শনীতে ঘুরিয়া বেড়ান। তিনি তথায় যাইয়া অভিভূত হইয়া পড়েন ও কাহারও সহিত কথা না বলিয়া নীরবে সকল ছবি ও জিনিষপত্র দেখিয়া বেড়াইয়াছিলেন। শ্রীনেহরু বণিক সভায় বক্তৃতার জন্য কলিকাতা আসিলেও বহু স্থানে বহুবিধ কর্তব্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন।

নুতন এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ—

আগামী শিক্ষা বৎসর হইতে কলিকাতার নিকট দক্ষিণেশ্বরে একটি নূতন এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপিত হইয়া তথায় শিক্ষাদান আরম্ভ হইবে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে যাদবপুর, শিবপুর ও জলপাইগুড়ি প্রভৃতি ৪টি স্থানে ৪টি এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আছে। দক্ষিণেশ্বর ছাড়া আর ২টি স্থানে পশ্চিমবঙ্গে আরও ২টি পলিটেকনিক স্থাপিত হইবে। এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপকগণকে অধ্যাপনা বিষয়ে বিশেষ শিক্ষাদানের জন্য একটি শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ হইবে। পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপকভাবে কারিগরি শিক্ষাদানের জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও পলিটেকনিক কলেজের অভাব থাকিবে না। যত বেশী শিক্ষার প্রসার হয়, ততই দেশের কল্যাণ বৃদ্ধি পাইবে।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—

পণ্ডিত শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সহিত্যরত্ন মহাশয় বর্তমানে শ্রীধাম নবদ্বীপে আগমেশ্বরী পাড়ায় রাজ পুরোহিতের বাড়ী বাস করিতেছেন। তিনি বর্তমান সময়ে বৈষ্ণব শাস্ত্র ও দর্শন সম্বন্ধে একজন অসাধারণ পণ্ডিত এবং পদাবলী সাহিত্যে তাহার জ্ঞান অতুলনীয় বলা যায়। সে জন্য গত ১২ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার নবদ্বীপের বঙ্গ-বিবুধ জননী সভার পক্ষ হইতে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত ত্রিপথ নাথ স্মৃতি-তীর্থ প্রমুখ পণ্ডিত মণ্ডলী তাঁহাকে সাহিত্যশাস্ত্রী উপাধি দানে সম্মানিত করিয়াছেন। বয়োবৃদ্ধ হরেকৃষ্ণবাবুর এই সম্মান লাভে বাঙ্গালার সংস্কৃতির অনুরাগী ব্যক্তি মাত্রই আনন্দিত হইতেন। ভারতবর্ষের বহু বৎসরের এই লেখককে আমরা ও অভিনন্দিত করি।

শিশু সাহিত্যে পুরস্কার—

দিল্লীস্থ কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তর শিশু সাহিত্য সম্বন্ধে ১৯৬১ সালের যে পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন—তাহাতে নিম্নলিখিত বাংলা বই পুরস্কার পাইয়াছে—১০০০ টাকার পুরস্কার—শ্রীমনোমোহন চক্রবর্তীর "ছবিতে পৃথিবী" প্রস্তর যুগ। ৫০০ টাকার পুরস্কার—শিল্পী শ্রীশৈল চক্রবর্তীর "ছোটদের ক্রাফ্‌ট" ও অমিয়ভূষণ গুপ্তের "ছোট হলে ও ছোট নয়।" আমরা পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকগণকে অভিনন্দন জানাই।

রাষ্ট্রপুঞ্জে শ্রীনেহরু—

গত ১০ই নভেম্বর নিউইয়র্কে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন—"মাটিতে গর্ত করিয়া ইন্দুরের মত বাঁচিয়া থাকার কথা চিন্তা না করিয়া আণবিক যুদ্ধ এড়াইবার জন্য মানবজাতির সর্বশক্তি নিয়োগ করা উচিত। বিশ্বকে আজ সহযোগিতার পথ গ্রহণ করিতে হইবে। নতুবা বিশ্ব ধ্বংস হইবে। মানুষকে আজ নূতন চিন্তাধারা গ্রহণ করিতে হইবে যে—ঘৃণা ও হিংসার সাহায্যে অশুভকে জয় করা যায় না।

যতীন্দ্রনাথ সরকার—

প্রবীণ সাংবাদিক যতীন্দ্রনাথ সরকার গত ২৯শে নভেম্বর বুধবার বিকালে তাঁহার কলিকাতা শশিভূষণ দে ষ্ট্রীটস্থ বাস ভবনে ৬৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি গত ৩৫ বৎসর কাল সহযোগী সম্পাদকরূপে অমৃতবাজার পত্রিকায় কাজ করিয়াছিলেন। উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলার জাজপুরে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি ১৯২০ সালে ইংরাজিতে এম-এ পাশ করিয়া সাংবাদিকের কাজ গ্রহণ করেন। তিনি সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের অনুপস্থিতিতে বহু বার অস্থায়ী সম্পাদকের কাজ করিয়াছেন; তিনি বহুবার বিদেশ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। যতীন্দ্রনাথ অবিবাহিত ছিলেন এবং তাঁহার সুমধুর ব্যবহার সকলকে প্রীতিদান করিত।

শ্রীমতী মুক্তা সেন—

কলিকাতা অল ইণ্ডিয়া হাইজিন ইনিষ্টিটিউটের ডিরেক্টার শ্রীমতী মুক্তা সেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৫১ সালের নূতন আইন অনুসারে সর্বপ্রথম একজন মহিলা হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। নূতন আইনের পূর্বে লেডীব্রাবোর্ণ কলেজের অধ্যক্ষ স্বর্গত সুনীতি বালা গুপ্ত ও বেথুন কলেজের অধ্যক্ষ স্বর্গত তটিনী দাস সিণ্ডিকেটের সদস্য ছিলেন। শ্রীমতী সেনকে আমরা অভিনন্দন জানাই।

কান্নার মানে

শান্তিময় বন্দ্যোপাধ্যায়

কেন যে আমরা কাঁদি, কেন কাঁদে সমস্ত বাতাস,
সমুদ্র কেন যে শুধু মাথা খোঁড়ে বালির শরীরে
বুঝি না কেন যে কান্না, পৃথিবীর সব বেহালায়
কেন যে অশ্রুর স্বাদ, গানে গানে যন্ত্রণার মীড়ে

জানি না, জানি না কেউ, আকাশের উত্তর সীমায়
কেন যে সপ্তর্ষি কাঁদে, চেয়ে থাকে অতন্দ্র নয়নে
বসন্ত কেবল আসে বিরহের বেদনা জাগাতে
কান্নার মানে খুঁজি বার বার মানুষের মনে।

থেকে ছোট দুটি মেয়ে আকুলিউশ্‌কা আর মালাশ্‌কা (Malashka), দুজনে বেরিয়েছে পথের ধারে বরফ-গলা জলের সেই ডোবাটি দেখতে। ছোট মেয়ে দুটির পরণে 'ইষ্টার'-পার্ব্বণীতে পাওয়া নতুন ফ্রক...তাদের মায়েরা সাজিয়ে দিয়েছে। বয়সে আকুলিউশ্‌কা দু'বছর বড় —মালাশ্‌কার চেয়ে। আকুলিউশ্‌কার পরণে হলদে-রঙের ফ্রক, আর মালাশ্‌কা পরেছে নীল-রঙের পোষাক। মেয়ে দুটির মাথায় রঙীন রুমাল বাঁধা। খাওয়া-দাওয়া সেরে দুজনে এসেছে—এ একে, ও তাকে, 'ইষ্টারের' সাজ-পোষাকের চমক দেখাতে।

দুজনে নামলো পথের সেই বরফ-গলা জলে ভরা ডোবাতে...জল নোংরা। বড় আকুলিউশ্‌কা বললে মালাশ্‌কাকে—পায়ের নতুন জুতো খুলে জলে নামতে হবে, নাহলে জুতো ভিজে যাবে...মায়েরা জানলে না... বাড়ীতে বকুনি খেতে হবে!

দুজনে জুতো খুলে পাড়ে রেখে ডোবার জলে নামলো ...ফ্রক তুলেছে হাঁটুর উপরে যাতে ভিজে না যায়। জল [illegible] হাঁটিমত [illegible]।

মালাশ্‌কা বললে—ও দিদি, [illegible] পারবো না... যদি ডুবে যাই!

আকুলিউশ্‌কা বললে মুরুব্বির ভঙ্গীতে—দেখ, মাঝ-খানে [illegible] কিনারে কিনারে [illegible] পারবো ...ডুববি কেন?

এ কথায় মালাশ্‌কা ভরসা পেয়ে চললো, আকুলিউশ্‌-কার সঙ্গে সেও এগিয়েছে...তার পা পড়ছে চলাৎ চলাৎ করে। আকুলিউশ্‌কা ধমক দিয়ে বললে—আস্তে আস্তে আয়...অমন শব্দ করিস না...বাড়ীর লোক শব্দ শুনলে এখনি বেরিয়ে এসে বকুনি দেবে।

দুজনে চলেছে...খুব সাবধানে...মাঝে মাঝে পিছন ফিরে তাকাচ্ছে—কেউ এদিকে আসে কিনা! অতি সাবধানে পা ফেলতে গিয়ে মালাশ্‌কার পা পড়লো ছোট একটা গর্তে...অমনি ছলাৎ করে ঘোলা জল ছিটকে পড়লো আকুলিউশ্‌কার ফ্রকে...ফ্রক গেল ভিজে! আকুলিউশকার দু চোখে জ্বললো আগুন...রেগে সে মারলো মালাশ্‌কাকে চড়...বললে—হিংসুটিপণা করে আমার নতুন ফ্রক ভিজিয়ে নোংরা করে দিলি!

চড় খেয়ে মালাশ্‌কা জল থেকে উঠলো...পালিয়ে বাড়ী গিয়ে আত্মরক্ষা করবে। ঠিক সেই মুহূর্তে আকুলিশ্‌কার মা এলো বেরিয়ে বাড়ী থেকে...দেখলে—মেয়ে ডোবার মধ্যে হাঁটু-ভোর জলে দাঁড়িয়ে...ফ্রক ভিজিয়েছে! দেখলে —মালাশ্‌কা জল থেকে উঠে ভয়ে-ভয়ে পালাচ্ছে তার বাড়ীর দিকে।

মা তুললে ঝঙ্কার—ঐ লক্ষ্মীছাড়া মেয়েটার সঙ্গে মিশে তো মানুষ হচ্ছো, বটে! ফ্রক নতুন ভিজুলি কি করে লক্ষ্মীছাড়া?

আকুলিউশ্‌কা বললে অভিযোগের সুরে—মালাশ্‌কা যে ভিজিয়ে দিলে—ইচ্ছে করে জল ছিটিয়ে!

আকুলিউশ্‌কার মা তখন মালাশ্‌কার চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে পিঠে কশালো বেশ জোরে একটি চড়...বললে—হতভাগা মেয়ে, হিংসে করবার আর কিছু পেলি না।

মার খেয়ে মালাশ্‌কা ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠলো। তার কান্না শুনে মালাশ্‌কার মা এলো ওপাশের বাড়ী থেকে বেরিয়ে...মালাশ্‌কা [illegible] নালিশ, আমাকে মেরেছে, আকুলিউশ্‌কার মা!

—কী! [illegible] মালাশ্‌কার মা তুললো ঝঙ্কার— পরের মেয়ের গায়ে হাত তোলা! এত বড় আস্পর্দ্ধা! তোমার [illegible] করলো!

আকুলিউশ্‌কার মা [illegible] নয়...বেশ চড়া [illegible] শুনিয়ে দিলে। তার জবাবে মালাশ্‌কার মা ও আরো পাঁচটা কড়া কথা শোনালেন, দুজনের মধ্যে ঝগড়া সুরু হলো...তর্ক-বিতর্ক...চেঁচামেচি, ধমক-ধামক, গালাগাল...

দুজনের ঝগড়ার আওয়াজ শুনে পাড়া থেকে লোকজন এলো বেরিয়ে...তারাও কেউ এ পক্ষ, কেউ ও পক্ষ নিয়ে বাদা-নুবাদ করতে লাগলো...শেষ পর্যন্ত প্রায় হাতাহাতির উপক্রম!

পথের পাশে ঐসব কাণ্ড দেখেছে দেখে, বাড়ীর ভিতর থেকে আকুলিউশ্‌কার বুড়ী ঠাকুরমা এলেন বেরিয়ে... ব্যাপার শুনে ঠাকুরমা বললেন—আহাহা...করো কি তোমরা 'ইষ্টার'-পর্ব্বের সময়...এ কী তোমাদের বকাবকি, ঝগড়াঝগড়ি! সকলে শান্ত হও! এ সময়ে সকলে মিলে-মিশে ভাবসাব করে থাকবে...ঠাকুর-দেবতার নাম করবে ...তা নয়, এ কী কাণ্ড!

কিন্তু কে শোনে বুড়ীর কথা! দু দলে সমানে চলেছে বাক-যুদ্ধ—গালাগালির বন্যা···এমন জোর গলায় এমন গালাগালি যে কানে তালা লাগবার জো!

যাদের নিয়ে ঝগড়া—তারা কিন্তু এর মধ্যে···

আকুলিউশ্‌কা ফ্রকের ভিজে জায়গাটা কোনোমতে শুকিয়ে নিয়ে নির্বিকার মনে ডোবার ধারে এসে একটা নুড়ি দিয়ে মাটি খুঁড়ছে—নালা কেটে ডোবার জল রাস্তায় আনবে বলে; আর ঝগড়া ভুলে মালাশ্‌কা এসেছে তার পাশে···এসে আকুলিউশ্‌কার নালা-খোঁড়ার কাজে তাকে সাহায্য করছে। দুটিকে মিলেমিশে এমনভাবে কাজ করছে যে তাদের দেখলে কে বলবে—একটু আগে দুজনে ঝগড়া-মারামারি হয়েছিল।

পথে এদিকে বড়দের দুপক্ষে গলা সপ্তমে চড়েছে—নামতে জানে না, থামতে জানে না···ছোট মেয়ে দুটির তৈরী নালা দিয়ে ডোবার জল এসে পথে সকলের পা ভিজিয়ে দিলে··বুড়ী ঠাকুরমার পায়েও সে জল স্পর্শ করলো—বুড়ী তখনো সকলকে থামাবার চেষ্টা করছেন। মেয়ে দুটি তখন নালার দুপাশে হাততালি দিয়ে আনন্দে নাচছে।

দেখে বুড়ীর চমক ভাঙলো···বুড়ী বললেন, ছ্যাখ, ছ্যাখ, তোরা সকলে চেয়ে ছ্যাখ, ঐ ছোট্ট মেয়ে দুটোর দিকে··· ওরা দুটিতে ঝগড়া ভুলে, এক হয়ে মিলেমিশে কেমন খেলা করছে, আর ওদের জন্যেই তোদের এত গলা ফাটাফাটি··· তোদের লজ্জা করে না। তোদের চেয়ে ঐ ছোটগুলোর জ্ঞান-বুদ্ধি কত বেশী দ্যাখ দিকিন্!

এ কথা শুনে বড়রা সবাই লজ্জা পেয়ে চুপ করে যে যার বাড়ী ফিরে গেল।

একটি দিন

হীরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়

মিষ্টি মধুর সকালটাকে বড্ড ভাল বাসি
ডালায় রাশি রাশি—
তুলব ভ'রে, ছড়িয়ে দেব
টাটকা ফুলের হাসি।
দুপুর বেলা কিন্তু মাগো ঘুমের ফাঁকে ফাঁকে
ক্লান্ত ঘুঘু ডাকে—
মনে পড়ে বড্ড মাগো
চোড়দি-মণি টাকে।
রাত্তিরটা বাসি নেন, বিচ্ছিরি মা-কালো;
নয়কো মোটেই ভ লো।
কেবল জানাই ঠাকুর তোমার
আলোর প্রদীপ জ্বালো!

অষ্ট্রেলিয়া ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রের পথে প্রশান্ত মহাসমুদ্রের বুকে

২১শে অক্টোবর, ১৯৬১

প্রিয় কিশোর জগতের পাঠক পাঠিকা,

প্রশান্ত মহাসাগর আমার বুকে যে দোলা জাগাচ্ছে তারই ঈষৎ আভাষ দিতে চাই এই চিঠির দক্ষিণালীর মাধ্যমে। সকাল বেলা মহাসাগর ছিল বিক্ষুব্ধ; কাপ্তেন প্রথমবারই নামেন। আমাদের এই নবনির্মিত বিশালকায় "কানবেরাও" বেশ R-n-R এর মত নৃত্য দোদুল ছন্দের তালে তালে মহাদেব নটরাজের তাণ্ডব নৃত্যের "পেলিকান" স্মরণ দেখিয়েছিল।

কাল সিড্‌নি নগরীতে সারাদিন ছুটোছুটি করেছি। প্রায় পাঁচসপ্তাহধরে যে দেশের মাটিতে নতুন করে বন্ধু, সুহৃৎ, সখা বা মিত্র পেয়েছিলাম, তাদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম—কোথাও করমর্দ্দন করে, কোথাও বা চারপেনী ফেলে ফোন করে, বা পাঁচপেনীর খামে চিঠি লিখে শেষ দিনেই বেশী দেখাশুনা, চিঠিলেখার ফলে যখন প্রায় চারটে বাজে, তখন খেয়াল হ'ল ট্যাক্সি ডাকবার কথা।

ভুলে গিয়েছিলাম যে সিড্‌নি (তথা অষ্ট্রেলিয়ার সব সহরেই) শুক্রবারের আপিস বন্ধ হ'তে না হতেই সবাই ঊর্দ্ধশ্বাসে ছোটে নানা দিকে। শনিবার, রবিবার—দু দুটো দিন ছুটি। এরা পাগলের মত উপভোগ করতে চায়। কেউ যায় সমুদ্রতীরে সান্-ট্যান করতে বা মাছ ধরতে, কেউ

ঘাটে Kosciusco পর্ব্বতে Ski-ing করতে, আবার [illegible]উ ঢোকে Bottle shop এ গেলাসের পর গেলাস [B]eer টেনে বা তারচেয়েও আরও কড়া Whisky বা [অ]ন্য ভাল vintage Wine পান করে মশগুল হ'তে। [এ]ই দিশেহারা হয়ে পালিয়ে বেড়ানোর মূলে হচ্ছে দুশ্চিন্তা। [কি]ক করে worry কে ভুলে থাকা যায়, এইটেই হচ্ছে [অ]স্ট্রেলিয়ার বড় সমস্যা। তাই অনেকেই দুতিন সপ্তাহের [ছু]টি নিয়ে নিকটতম Holiday goers' Paradise, [জাহা]জে চড়ে মাত্র দুদিনের পরে তৃতীয়দিনে New Zealand এর শ্রেষ্ঠ বন্দর Auckland এ পৌঁছাতে আসে। Tourist Cla[ss] এ লাগে প্রায় [illegible] (Aust) অর্থাৎ [illegible]।

[illegible] এই Canberra জাহাজে সবশুদ্ধ প্রায় [illegible] নানান দেশের। এর মধ্যে [illegible] যাত্রী বোধ হয় অধিক হ'বে। [illegible] জন্যেই [illegible], [illegible] ধর্ম্ম, [illegible], বা মধু [illegible], [illegible] [illegible] এদের [illegible] দুর্দ্দান্ত, [illegible]; [illegible] [illegible] দেশের পরিশ[illegible]।

[illegible] নৌকো নিয়ে [illegible] বেরিয়ে [illegible], [illegible] বেশিরভাগ লোক ঘর ছেড়ে [illegible] আসতে পছন্দ করে না; বিদেশের [illegible] শিখে তাদের সঙ্গে তাল রেখে [illegible] সহজ মনে হয় না। আমার স্বভাব দোষে, আমি অপরিচিত লোকের সঙ্গে একমিনিটের মধ্যে ভাব জমিয়ে ফেলতে পারি। দু চারটে কথা বলতে না বলতেই হঠাৎ আপনার কটী ছেলেমেয়ে (কটী স্ত্রী একথা জিজ্ঞাসা করি না, লেখাই বাহুল্য) জিজ্ঞাসা করে বসি। অপরিচিত ভদ্রলোক বেশ সানন্দে উত্তর দেন, "Five Sons and six daughters, Five of them are married" এই সেরেছে—কথার মোড় ঘুরিয়ে বলি "I like Australia very much. The people are so very nice and cordial; they are most homely and hospitable." শুনেছি মিষ্টি কথায় এবং দুটো ফুল বেলপাতায় স্বয়ং মহাদেব তুষ্ট হন, এরা ত সামান্য মনুষ্য। এই জাহাজটীকে একটী ছোট-খাট নগরী বলা চলে। ২২০০ যাত্রী (নরনারী শিশু সব মিলিয়ে) এবং প্রায় ১০০০ জাহাজের কর্ম্মী—প্রায় ৩২০০ জন লোক নিয়ে ২৭।৩০ Knot গতিতে চলে এই বিরাট অর্ণবপোত। P. O. Orient Lines এর এইটী সবার সেরা সব দিক দিয়ে। এত 'নবাবী' করার মত ব্যবস্থা অন্য কোনও জাহাজে আমি ত পাইনি দেখতে।

আজ ঘুম ভাঙতেই ভোরে Auckland বন্দরের নিকটে আমার সময় প্রশান্ত মহাসাগরের বুক থেকে সূর্য্যদেবকে উঠতে দেখলাম; সে এক অনির্ব্বচনীয় দৃশ্য। দুটো একটা করে গাল (gull) পাখী দেখা দিতে লাগলো। একটু পরেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্দরের পাহাড়ের দ্বীপগুলো দেখতে পাওয়া যেতে লাগল। এই নগরীতে প্রায় চার লক্ষ লোকের বাস। এমন ছবির মত নিখুঁত শহর আমি এই প্রথম দেখলাম। প্রত্যেক বাড়ীতে সুন্দর করে বাগান নানা রঙের নানা দিয়ে ফুলে সাজানো। প্রতি সপ্তাহে নিয়ম করে জল দেওয়া, ঘাস কেটে এনে [illegible] কলা। বাগানের সব কিছু কাজ—ঘাসের মাঠে [illegible] মালিক নিজের [illegible] machine [illegible] power এর ছাঁটাই পর্য্যন্ত সব কিছু নিজেরা নিজেরাই করে।

এর পরের চিঠিতে New Zealand সম্বন্ধে অনেক মজার মজার গল্প লিখে পাঠাব। আজ এই বলেই চিঠিটা শেষ করছি [illegible] করবার, সেই কাজটা তৎক্ষণাৎ সুসম্পন্ন করাতেই [illegible] শ্রেষ্ঠত্বের লক্ষণ।

আশিস ও শুভেচ্ছা জানাই। ইতি—

তোমাদের নূতন গল্পদাদু

অকল্যাণ্ড
২৩শে অক্টোবর '৬১

ঐ 'সাইফন্' বা কাগজের নলের ছোট দিকটি বোতলের মুখে ঢুকিয়ে, অন্য দিকটি রাখো এই কাঁচের পাত্রের মধ্যে কাৎ করে—উপরের নক্সা যেমন দেখানো হয়েছে, ঠিক তেমনি ধরণে। 'সাইফন্' বা কাগজের নলটিকে এভাবে রাখার ফলে, নলের ভিতর দিয়ে বোতলের 'কার্বন্-ডায়োক্সাইড গ্যাস্' চলে আসবে কাঁচের পাত্রের ভিতরে···ছোট মোমবাতির আলো পর্য্যন্ত ঐ গ্যাস এসে পৌঁছে জ্বলন্ত বাতিটি যাবে নিভে। কারণ, ভারী 'কার্বন্-ডায়োক্সাইড গ্যাসের' চাপে পাত্রের বাতাস উপরে উঠে যাবে এবং বাতাসের অভাবে বাতির [illegible] হবে না—তাই এ বাতি নিভে যাবে। তারপর ক্রমশঃ ঐ গ্যাস যত [illegible] এসে যাবে, মাঝারি আর বড় বাতির [illegible] গ্যাসের চাপে বাতাস উপরে উঠে যাবার জন্য [illegible] যাবে নিভে। এ খেলাটি থেকে বিজ্ঞানের [illegible] জানতে পারবে, সেটি হলো—'কার্বন [illegible] বাতাসের চেয়ে ভারী এবং এ [illegible] আগুন নেভানো যায়।

[illegible], এ ধরণের আরো কয়েকটি মজার [illegible] বিজ্ঞানের খেলার কথা জানাবার [illegible] রইলো।

ধাঁধা আর হেঁয়ালি

মনোহর মৈত্র

১। সার্কাসওয়ালার সমস্যা ঃ

বড়দিনের মরশুমে সহরে সার্কাসের তাঁবু পড়েছে। কিন্তু জন্তু-জানোয়ারের সেই মামুলী-ধরণের খেলা দর্শকের ভীড় তেমন জমছে না। এদিকে দর্শকের ভিড় কমলে সার্কাসওয়ালার লোকসান। তাই ধুরন্ধর সার্কাসওয়ালা মৎলব আঁটলো যে নতুন-নতুন জন্তু-জানোয়ার আমদানী করে, তাদের খেলা দেখিয়ে দর্শকদের মনোহরণ করবে—আর লাভের কুড়ি সিন্দুকে তুলবে। এই ভেবে সে বিদেশ থেকে কিনে আনলো বিরাট এক ভালুক—নতুন ধরণের খেলা দেখানোর জন্য! ভালুক তো এলো, কিন্তু বিভ্রাট বাধলো—সেটিকে রাখবার মতো বাড়তি কোনো মজবুত খাঁচা তখন মজুত নেই সার্কাসের তাঁবুতে। কাজেই সার্কাসওয়ালা ভারী বিপদে পড়লো। সার্কাসের আখড়ায় মাত্র পাঁচটি খাঁচা···সে পাঁচটিতেই রয়েছে পাঁচটি জানোয়ার—দুটি বাঘ, দুটি সিংহ আর একটি চিতা বাঘ···সুতরাং সদ্য-আমদানী করা ভালুকটির [illegible] স্থানাভাব। অথচ, ভালুকের মতো ভয়ঙ্কর জানোয়ারকে তো বাইরে রাখা [illegible] নয়—মজবুত খাঁচায় বন্ধ রাখতে হবে। এদিকে [illegible] খাঁচাও নেই এবং নতুন খাঁচা তৈরী করতেও দিন সময় লাগবে। [illegible] মহা সমস্যায় [illegible] নতুন [illegible] বিরাট [illegible] টিকে নিরাপদে বন্ধ রাখা যায়! [illegible] দলের সবাই [illegible] হিমসিম খাচ্ছে, তখন [illegible] সার্কাসওয়ালাকে। [illegible] আপনারা [illegible] না যতদিন পর্য্যন্ত ভালুকের [illegible] মজুত খাঁচার ব্যবস্থা না হয়, ততদিন
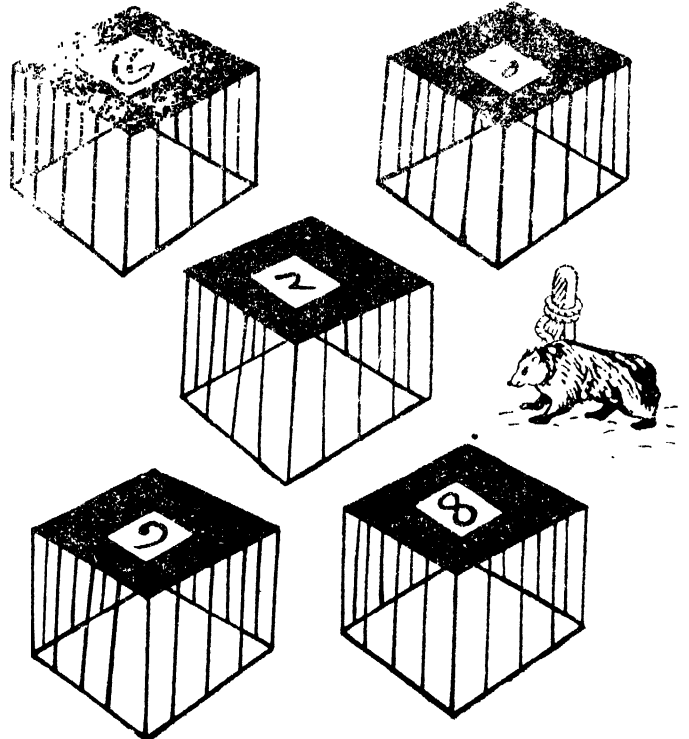
(উপরের ছবিতে দেখানো) ঐ পাঁচটা খাঁচাকেই বুদ্ধি করে সাজিয়ে নতুন জানোয়ারকে আমি সামনে রেখে দেবো—যাতে ও পালাতে না পারে বা কোনো বিপদ না ঘটায়। বলতে পারো তোমরা, সহিস-ছোকরা কি ভাবে কায়দা করে উপরের ঐ পাঁচটি খাঁচা সাজিয়ে ভাল্লুকটিকে বন্ধ রাখবে। মনে রেখো, ঐ পাঁচটি খাঁচাতে যে সব জানোয়ার রয়েছে, তাদের কোনোটিকেও খাঁচা থেকে বাইরে আনতে পারবে না—শুধু খাঁচাগুলিকে এপাশে-ওপাশে সরানো চলবে।

২। 'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত 'ধাঁধা আর হেঁয়ালি':

প্রথমার্দ্ধ মাটির তলায় থাকে, দ্বিতীয়ার্দ্ধ থাকে দেয়ালের গায়ে, আর সমস্তটার মধ্যে সারা পৃথিবীটাকে পাওয়া যায়। কি বলো তো?

রচনা: বাপ্পা সেন ও পম্পা সেন (কলিকাতা)

অগ্রহায়ণ মাসের 'ধাঁধা আর হেঁয়ালির' উত্তর:

১। আধুলির হেঁয়ালি:
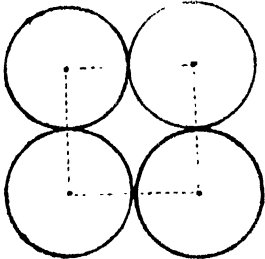
পাশের ছবিটি দেখলেই বুঝতে পারবে যে কি ভাবে আধুলি চারটিকে সাজিয়ে বসালে চতুষ্কোণ রচনা করা যাবে।

২। 'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা আর হেঁয়ালির উত্তর:
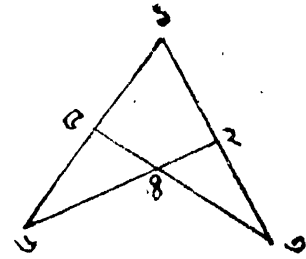
৬	১	৮
৭	৫	৩
২	৯	৪

অগ্রহায়ণ মাসের তিনটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে:

১। রুমা ও অঞ্জু সিংহ (গোরক্ষপুর)
২। টুকুন, মিলু, চিন্ময় ও প্রসেনজিৎ মিত্র (জয়নগর)
৩। রামনদি চট্টোপাধ্যায় (নবদ্বীপ)
৪। বাপ্পা ও পম্পা সেন (কলিকাতা)
৫। শঙ্খ, মিটি, কাজল ও বুবু (পাটনা)
৬। বিশ্বজিৎ, ফাল্গুনী, আশা চট্টোপাধ্যায়, মানস, শুভেন্দু মুখোপাধ্যায় ও সুনীল বসু (কলিকাতা)
৭। পুপু ও রুচির মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)

অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম ধাঁধাটির সঠিক উত্তর দিয়েছে:

১। রবীন্দ্রকুমার পাকড়াশী (কানপুর)

অগ্রহায়ণ মাসের দ্বিতীয় ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে:

১। পরাগ, বিরাগ, সুরাগ, নীরাগ, সিপ্রাধারা ও মণিমালা হাজরা (মেদিনীপুর)
২। কমলেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (সারতা, মেদিনীপুর
৩। অরূপ ও শ্যামলী চৌধুরী (কুটিগোদা)
৪। রিনি ও রনি মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)
৫। কুলু মিত্র (কলিকাতা)
৬। বাপি, বুতাম, পিন্টু গঙ্গোপাধ্যায় (বোম্বাই)
৭। নন্দদুলাল চট্টোপাধ্যায় (রঘুনাথগঞ্জ)

অগ্রহায়ণ মাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে:

১। রেণু ও রুণু চক্রবর্ত্তী (জগদলপুর)
২। রবীন্দ্র ও মণীন্দ্র মুখোপাধ্যায় (গিরিডি)
৩। আলো, শীলা ও রঞ্জিত বিশ্বাস (কলিকাতা)

আজব দুনিয়া

জীবজন্তুর কথা

দেবশর্ম্মা বিচিত্রিত

নাকেশ্বর হনুমান: এরা বিচিত্র এক জাতের হনুমান... বোর্ণিও-দ্বীপে বাস। এদের নাকের গড়ন হয় বেজায় লম্বা-ছাঁদের, তাই নাম দেওয়া হয়েছে 'নাকেশ্বর'। আকারে এদের নাক প্রায় তিন ইঞ্চি লম্বা হয়। তবে এই লম্বা-ছাঁদের নাক থাকে শুধু এ-জাতের পুরুষ-হনুমানদের — স্ত্রী-হনুমানদের এমন লম্বা-নাক হয় না। এরা নিরামিষাহারী বোর্ণিওর বিশেষ এক ধরণের গাছের জংলী পাতা খেয়ে জীবনধারণ করে। এরা জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ে এলে বড় বেশী বাঁচে না। খুব নিরীহ জীব।

উড়ন্ত-গিরগিটি: এরা মালয় দেশে গভীর জঙ্গলে বাস করে — বিচিত্র এক জাতের গিরগিটি। এদের দেহের দু'পাশে পাত্‌লা চামড়ার দুখানি পাখনার মতো ডানা থাকে, সেই ডানার সাহায্যে এরা বাতাসে উড়ে এক গাছ থেকে অন্য গাছে যাতায়াত করে। ডানা মেলে ওড়া ছাড়াও, এরা চতুষ্পদে ভর করে চলে।

পাফিন পাখী: এরা এক ধরণের বিচিত্র পাখী... দেখতে কতকটা ছোট পায়রার মতো। এদের ঠোঁট চওড়া ও ত্রিকোণ আকারের। এরা বাস করে সমুদ্রের উপকূলে এবং হাঁসেদের মতো জলে বেশ সাঁতার দিতে পারে। এরা ভারী নিরীহ আর শান্ত প্রাণী, তবে বেজায় বোকা। এরা ঝাঁকে ঝাঁকে বাস করে আয়ারল্যাণ্ডের সাগরতীরে।

উপাধ্যায়

ব্যক্তিগত দ্বাদশ রাশির ফলাফল

মেষ রাশি

ভরণী নক্ষত্রজাত গণের পক্ষে উত্তম সময়। অশ্বিনী ও কৃত্তিকা-জাতগণের পক্ষে এমাসে সুখদুঃখ ভোগ একরূপই হবে। দ্বিতীয়ার্দ্ধ অপেক্ষা প্রথমার্দ্ধ অনেকটা ভালো। লাভ, সাফল্য, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, সুখ, প্রভাবপ্রতিপত্তির বৃদ্ধি, উত্তম বন্ধু, বিলাস ব্যসন, নূতন বিষয় অধ্যয়ন, জ্ঞান বৃদ্ধি, যশ ও প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা। এগুলি প্রথমার্দ্ধে প্রত্যক্ষ হবে। কলহ, অসৎ সংসর্গ, স্বাস্থ্যের অবনতি, শত্রুতা, অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ, আঘাত, রক্তহ্রাস, ক্লান্তিকর ভ্রমণ, উদ্বিগ্নতা কর্ম্মপ্রচেষ্টার নানা বাধা বিপত্তি, মিথ্যা মামলা মোকর্দ্দমা প্রভৃতি অশুভ ফলের আশঙ্কা আছে। অপ্রত্যাশিত অবাঞ্ছনীয় পরিবর্ত্তন যোগ। স্বাস্থ্য সম্পর্কে মাসটি শুভ বলা যায় না। আঘাত ও দুর্ঘটনা, শারীরিক উষ্ণতার আধিক্য, রক্তের চাপবৃদ্ধি, জীবনী শক্তির হ্রাস এবং সাধারণ দুর্ব্বলতার সম্ভাবনা আছে। যাই হোক্ না কেন মারাত্মক ব্যাপার কিছু ঘটবে না। পারিবারিক কলহ ও মতদ্বৈধতাজনিত কিছু মনোকষ্ট পেতে হবে—বিশেষত স্ত্রীর কর্ম্মপদ্ধতি, পারিবারিক বাজেট এবং সন্তানদের লালনপালন সম্পর্কে মতভেদ ঘটবে। কিছু বিলাস দ্রব্য ক্রয় ও ভোগ দেখা যায়। আর্থিক ক্ষেত্রে লাভ ক্ষতি সমভাবেই হবে। মাসের প্রথমার্দ্ধে ব্যয়াধিক্য এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধে অর্থ কৃচ্ছ্রতা হেতু পারিবারিক অশান্তি ও বিশৃঙ্খলতা, পাওনাদারের তাগাদা। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। রেসে ক্ষতি। বাড়ীওয়ালা ভূস্বামী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী উত্তম। ভূম্যাদিক্রয় ও গৃহনির্ম্মাণের পক্ষে অনুকূল। চাকুরিজীবীর পক্ষে মাসটী সুবিধা জনক নয়। অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা। উপর-ওয়ালার বিরাগভাজন হবার যোগ আছে। সুতরাং রুটিন মাফিক কাজ করে যাওয়াই ভালো। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে দুঃখ কষ্ট ভোগ থাকলেও নিজেদের কর্ম্ম পরিস্থিতি অসুবিধা জনক হবে না। স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রথমার্দ্ধটী দুঃখ জনক। অতিরিক্ত পরিশ্রম বা কার্য্যের জন্য শরীরের আভ্যন্তরীণ অবস্থা খারাপ হোতে পারে। দ্বিতীয়ার্দ্ধটী অনেকটা ভালো হবে। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে শুভ। অবৈধ প্রণয় সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটী উত্তম বলা যায় না।

বৃষ রাশি

মৃগশিরাজাতগণের পক্ষে উত্তম। কৃত্তিকা ও রোহিণীজাতগণের পক্ষে মধ্যবিধ সময়। প্রথমার্দ্ধ অপেক্ষা দ্বিতীয়ার্দ্ধ সন্তোষজনক। মানসিক দুর্ব্বলতা, স্বাস্থ্যের অবনতি, ক্লান্তিকর ভ্রমণ, স্বজন বন্ধুবর্গের সহিত কলহ। আঘাত, প্রচেষ্টায় বাধা, ব্যয়, কষ্টভোগ, স্ত্রীলোকের জন্য ক্ষতি, প্রতিদ্বন্দ্বীদের জন্য কষ্ট ভোগ প্রভৃতি প্রথমার্দ্ধে পরিলক্ষিত হয়। দ্বিতীয়ার্দ্ধে মোটামুটি সাফল্য, বর্দ্ধিত লাভের সঙ্গে সৌভাগ্য। শুভ ঘটনা প্রভৃতির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য সম্পর্কে, বিশেষতঃ প্রথমার্দ্ধে বাধা মুক্ত বলা যায়না। উদর ও গুহ্যদেশে পীড়া, মূত্রাশয়ে কষ্ট, জ্বর, চক্ষু পীড়া, সাধারণ দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি প্রথমার্দ্ধে সূচিত হয়। দ্বিতীয়ার্দ্ধে রক্তের চাপ বৃদ্ধিগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে সতর্কতা প্রয়োজন। সন্তানদের শরীরও ভেঙে পড়তে পারে। পরিবারের মধ্যে নিকট-আত্মীয়ের সঙ্গে কলহ প্রথমার্দ্ধে ঘটবে, দ্বিতীয়ার্দ্ধে কলহাদির অনেকটা উপশম হবে। অবশ্য এমাসে অপরিমিত ও কিছু ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। দ্বিতীয়ার্দ্ধে নানা প্রকার প্রচেষ্টায় সাফল্য, ভূমি, গৃহ ও অনুরূপ বস্তু থেকে লাভ আশা করা যায়। এমাসে শেষ পর্য্যন্ত আর্থিক অবস্থা মোটের উপর সন্তোষ জনক বলা যায়। কিন্তু দৈনন্দিন সাংসারিক ব্যয় ও অর্থে লেনদেন ব্যাপারে সতর্কতা আবশ্যক, অন্যথা ক্ষতির আশঙ্কা আছে। যে কোন বিষয়ে ব্যয়ের মাত্রার নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক, বিশেষতঃ মেয়েদের ব্যাপারে ব্যয় পরিমিত রাখতে হবে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী, ও কৃষিজীবীর পক্ষে উত্তম। আয় ও ফসল বৃদ্ধি। তাছাড়া সম্পত্তি লাভ বা ক্রয়, উত্তরাধিকার বা ভূদান সূত্রে বিষয় সম্পত্তি পাবার সুযোগ দেখা যায়। চাকুরির ক্ষেত্রে প্রথমার্দ্ধ একটু অসুবিধার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হবে আর উপরওয়ালার বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। পদ

প্রার্থী হয়ে কোন অফিসার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ এ মাসে বর্জ্জনীয়। দ্বিতীয়ার্দ্ধে ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে বিশেষ শুভ, আয়বৃদ্ধি ঘটবে।

স্ত্রীলোকদের পক্ষে মাসটী বিশেষ অনুকূল, দ্বিতীয়ার্দ্ধটী উত্তম। অবৈধপ্রণয়লিপ্তা নারীর নানা প্রকার সুযোগ সুবিধা ও লাভ ঘটবে। প্রণয়ের ক্ষেত্রে পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রকার শুভ হবে। জনকল্যাণমূলক কাজে খ্যাতি অর্জ্জন, বিবিধ উৎসব অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ প্রাপ্তি, কলহ বিবাদের অবসান ও সর্ব্বত্র মর্যাদা লাভের যোগ আছে। নানা কার্য্যে অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং ইন্দ্রিয়-সম্ভোগের আধিক্য অপ্রত্যাশিত ভাবে স্বাস্থ্যের অবনতি ও পীড়া দায়ক হয়ে উঠবে। চাকুরিজীবী মহিলাদের পক্ষে মাসটী অনুরূপ অনুকূল হবে না, এজন্যে এদের পক্ষে সতর্কতা আবশ্যক। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটী মধ্যম।

মিথুন রাশি

মৃগশিরাজাত ব্যক্তির পক্ষে উৎকৃষ্ট এবং আদৌ কষ্ট ভোগ হবে না। আর্দ্রা কিম্বা পুনর্ব্বসু জাত ব্যক্তিরা কিছু কিছু কষ্ট ভোগ করবে, সেরূপ আনন্দ উপভোগ করতে পারবে না। প্রথমার্দ্ধটী অনুকূল, দ্বিতীয়ার্দ্ধ প্রতিকূল। প্রথমার্দ্ধে উত্তম স্বাস্থ্য, প্রচেষ্টায় সাফল্য, শত্রুজয়, সুখ স্বচ্ছন্দতা, বিলাস ব্যসন দ্রব্যলাভ সৌভাগ্য জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি। দ্বিতীয়ার্দ্ধে বহু কষ্টভোগ। শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি, ক্লান্তিকর ভ্রমণ, পারিবারিক কলহ, উদ্বিগ্নতা, ক্ষতি বন্ধুবর্গের সহিত কলহ, প্রচেষ্টায় ব্যর্থতা, অসৎ সংসর্গের আবেষ্টন প্রভৃতি দুঃখপ্রদ হয়ে উঠবে। প্রথমার্দ্ধে স্বাস্থ্য ভালোই যাবে, দ্বিতীয়ার্দ্ধে কিছু শারীরিক কষ্টভোগ। উদরঘটিত পীড়া, অজীর্ণতা, আমাশয়, মূত্রাশয়ে বেদনা। স্ত্রী ও পরিবার বর্গের সঙ্গে কলহ ও মনান্তর হবেই। এজন্য সংযত হওয়া ও ক্রোধ দমনের আবশ্যকতা অনুভূত হয়। লাভ ও ক্ষতি এমাসে দুইই হবে। প্রথমার্দ্ধে অর্থলাভ—দ্বিতীয়ার্দ্ধ অপেক্ষা অনেক বেশী হবে। দ্বিতীয়ার্দ্ধে অর্থক্ষতি, প্রথমার্দ্ধের অর্থলাভের মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে। এমাসে অপরের অর্থ গচ্ছিত রাখা বা নাড়াচাড়া করা বাঞ্ছনীয় নয়। স্পেকুলেশন একেবারেই বর্জ্জনীয়। গৃহাদি সংস্কার বা নির্ম্মাণের দিকে এমাসে ঝোঁক না দেওয়াই উচিত। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী মন্দ নয়। ফসল প্রাপ্তি ভালোই হবে। চাকুরির ক্ষেত্রে প্রথমার্দ্ধটী ভালো। দ্বিতীয়ার্দ্ধ নৈরাশ্য জনক। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে চাকুরির ক্ষেত্রের অনুরূপ অবস্থা। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী অনুকূল, বিশেষতঃ অবৈতনিক মহিলারা সম্মান প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। অবৈধ প্রণয়িনীদের উত্তম পরিবেশ সৃষ্টি হবে, তা থেকে লাভজনক পরিস্থিতি আশা করা যায়। সামাজিক পারিবারিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে অনুকূল আবহাওয়া ঘটলেও দ্বিতীয়ার্দ্ধে প্রণয়, বিবাহ, কোর্টসিপ ও গুপ্তপ্রেমের ব্যাপারে নৈরাশ্য জনক পরিস্থিতি বা বিলম্বজনিত চিত্ত চাঞ্চল্য ঘটবে। রেসে জয়লাভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে মাসটি মন্দ যাবেনা।

কর্কট রাশি

কর্কট রাশিতে তিনটী নক্ষত্রের মধ্যে যে কোনটীতে জাত ব্যক্তির ফল একই প্রকার হবে, নক্ষত্রজনিত পার্থক্য হেতু তারতম্য লক্ষ্য করা যায় না। মাসের প্রথমার্দ্ধ অপেক্ষা দ্বিতীয়ার্দ্ধটী অপেক্ষাকৃত ভালো। উত্তম স্বাস্থ্য, শত্রুজয়, প্রচেষ্টায় সাফল্য, সৌভাগ্য, বিলাস ব্যসন দ্রব্য প্রাপ্তি ও উপভোগ, সুখ স্বচ্ছন্দতা, জনপ্রিয়তা, লাভ, নূতন বিষয় অধ্যয়ন, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, যশোবৃদ্ধি প্রভৃতি ফলগুলি মাসের দ্বিতীয়ার্দ্ধে প্রত্যক্ষ হবে। শত্রুদের উৎপীড়ন হেতু প্রথমার্দ্ধে নানা বাধার সম্মুখীন হওয়ার যোগ আছে, তা ছাড়া দুঃসংবাদ প্রাপ্তি-জনিত মানসিক কষ্ট ও মনশ্চঞ্চলা, ক্ষতি ও দুর্ভোগ, ব্যর্থ প্রচেষ্টা প্রভৃতিও উপলব্ধি হবে। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালো গেলেও প্রথমার্দ্ধে দুর্ব্বলতা অনুভূত হবে, সন্তানদের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়বে। এদের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার আবশ্যকতা আছে। মনের অবস্থা কোন মতেই ভালো যাবে না। পারিবারিক শান্তি ও শৃঙ্খলা অব্যাহত থাকবে, কিন্তু পরিবার বহির্ভূত স্বজনবর্গের সহিত মনোমালিন্য, কলহ বিবাদ প্রভৃতি হোতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না। প্রথমার্দ্ধে আর্থিক সঙ্কট ঘটবে না, এজন্যে বৃহৎ পরিকল্পনা নিয়ে অর্থলগ্নীও চলবে না। পথে প্রবাসে গৃহে বা ভ্রমণ কালে টাকা কড়ি চুরি যেতে পারে, অতএব সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। দ্বিতীয়ার্দ্ধে কিছু টাকা ছড়িয়ে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লাভ করে নেওয়া যেতে পারে, প্রথমার্দ্ধে এসব চলবেনা। মাসের প্রথম দিকে বাড়ীওয়ালা, ভূস্বামী ও কৃষিজীবীর পক্ষে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা ও দ্বন্দ্ব কলহ বা সংঘর্ষের সম্মুখীন হোতে হবে, শেষের দিকে সেগুলি বিদূরিত হবে। অনাদায়ী টাকা মাসের শেষে হস্তগত হবে, ফসলের পরিমাণ ও অপর্য্যাপ্ত হবে না। চাকুরিজীবীরা মাসের প্রথম দিকে নানা প্রকার কষ্টের সম্মুখীন হবে, শেষের দিক উত্তম ও উন্নতি কারক। এ সময়ে কর্ম্মক্ষেত্রে আধিপত্য ও সুখ্যাতিলাভ হবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে মাসটী মন্দ যাবে না।

মহিলাদের পক্ষে প্রথমার্দ্ধটী উত্তম। শিল্পী ও মঞ্চ চিত্র-তারকারা সুসময় অনুভব করবে। সমাজকল্যাণকর কর্ম্মে লিপ্ত মেয়েরা সুযোগ সুবিধা পাবে। অবৈধ প্রণয়ে সাফল্যলাভ করবে। সামাজিক, পারিবারিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে ভালো বলা যায়। দ্বিতীয়ার্দ্ধটী এদের পক্ষে ভালো না হোলেও চাকুরিজীবী নারীদের পক্ষে শুভ হবে। তাদের কর্ম্মোন্নতি ও উপর ওয়ালার সুনজর লক্ষ্য করা যাবে। রেসে অর্থলাভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটী শুভ।

সিংহ রাশি

পূর্ব্বফল্গুনীজাত ব্যক্তির পক্ষে মাসটী উত্তম। মঘা ও উত্তর-ফল্গুনীজাত ব্যক্তিগণের পক্ষে মিশ্র ফলাফল। মাসের প্রথমার্দ্ধটি উত্তম ভাবে সকলের অতিবাহিত হবে। দ্বিতীয়ার্দ্ধটী সুবিধাজনক নয়। লাভ,

সুখ সম্মান, আনন্দপ্রদ ভ্রমণ, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান তীর্থযাত্রা, শুভানুধ্যায়ী প্রিয় বন্ধু স্বজনের আগমন, শত্রুজয়, সৌভাগ্য বৃদ্ধি প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়। গ্রহ বৈগুণ্যজনিত অশুভ ফল, যথা-ব্যর্থ প্রচেষ্টা, স্বজন বিরোধ, ক্ষতি, অপমান, শত্রু পীড়ন, স্বাস্থ্যহানি, ইত্যাদি সম্ভব। শারীরিক অসুস্থতা এমাসে অনুভূত হবে, অজীর্ণতা, উদরাময়, আমাশয়, জ্বর প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায়।

দ্বিতীয়ার্দ্ধে দুর্ঘটনাদির আশঙ্কা আছে। সারা মাস ধরে ঘরে বাইরে আত্মীয় স্বজন বন্ধুবর্গের সহিত কলহ বিবাদ যোগ দেখা যায়। আর্থিক ক্ষেত্রে শেষের দিকটা সুবিধাজনক নয়। মাসের প্রথমার্দ্ধে পাওনাদারের তাগাদায় বিব্রত হবার সম্ভাবনা এবং অর্থ কৃচ্ছ্রতা। আর্থিক নব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে, এজন্যে এদিকে অগ্রসর না হওয়াই ভালো। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে মাসটি মিশ্রফল দাতা। কৃষিজীবীর শস্যাদি নষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে। সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে কলহ বিবাদাদির যোগ দেখা যায়। চাকুরির ক্ষেত্রে মিশ্রফল। নানা প্রকার বিশৃঙ্খলতা ও উপর ওয়ালার সঙ্গে মনোমালিন্য হবার সম্ভাবনা। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটি উত্তম। স্ত্রীলোকের শুভ সময়। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে আনন্দজনক পরিস্থিতি। অবৈধ প্রণয়িনীরা আশাতীত সাফল্য লাভ করবে। উপঢৌকন প্রাপ্তি, এক কালীন দান গ্রহণ, উত্তরাধিকার সূত্রে অর্থ সম্পত্তি লাভ, প্রভৃতি সম্ভাবনা আছে। তুচ্ছ ব্যাপারে অত্যধিক ব্যয়ের দিকে ঝোঁক। ভ্রমণ, পিকনিক, পার্টি ও নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে মর্য্যাদা লাভ। কোর্ট সিপে সাফল্য। রেসে কিছু লাভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যবিধ ফল।

কন্যা রাশি

চিত্রানক্ষত্রাশ্রিতগণের পক্ষে উত্তম সময়। উত্তরফল্গুনী ও হস্তাজাতগণের পক্ষে মধ্যম সময়। দ্বিতীয়ার্দ্ধ অপেক্ষা প্রথমার্দ্ধটী বিশেষ শুভ। উত্তম অবস্থা, লাভ, শত্রুজয়, নানা প্রচেষ্টায় সাফল্য, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, জ্ঞানার্জ্জন, বিলাস ব্যসন দ্রব্যাদি ক্রয়, আমোদ প্রমোদের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ, সুসমাচার লাভ প্রভৃতি শুভফলগুলি আশা করা যায়। গ্রহ বৈগুণ্য হেতু উদ্বিগ্নতা, স্বজনবর্গের শত্রুতা, আত্মীয়গণের জন্য নানা প্রকারে বিব্রত হওয়া, বন্ধুদের সহিত কলহ বা মনান্তর প্রভৃতির সম্ভাবনা আছে। স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রথম দিকটা ভালো, শেষার্দ্ধে হজমের গোলমাল, আমাশয়, উদরাময় প্রভৃতি হোতে পারে। বিলাস ব্যসন দ্রব্যাদি ক্রয় এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। প্রথম দিকে পারিবারিক শান্তি ও সুখস্বচ্ছন্দতা অটুট থাকবে, কিন্তু দ্বিতীয়ার্দ্ধে ঘরে বাইরে কলহ বিবাদের যোগ আছে। আর্থিক ব্যাপারে এবং আর্থিক নব প্রচেষ্টায় অনুকূল আবহাওয়া পরিলক্ষিত হয়। অন্যান্য ব্যাপারেও প্রথম দিকটাই বিশেষ অনুকূল। লেখক, প্রকাশক, দালাল, এজেন্ট, কন্‌ট্রাক্টার ও পনিস্যক্রান্ত কর্ম্মে লিপ্ত ব্যক্তিরা অন্যান্য লোকের অপেক্ষা বেশী লাভবান হবে। কিন্তু প্রতারণার মাধ্যমে সমগ্র মাসটি ক্ষতি করবার দিকে সচেষ্ট থাকবে এজন্যে সতর্কতা প্রয়োজন। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে উত্তম সময়। চাকুরিজীবীর পক্ষে প্রথমার্দ্ধটী বেশ ভালোই যাবে। ব্যবসায়ীও বৃত্তিজীবীর পক্ষে দ্বিতীয়ার্দ্ধ অপেক্ষা প্রথমার্দ্ধ উত্তম। শিল্পকলা, যন্ত্র ও কণ্ঠসঙ্গীত, অভিনয়, মঞ্চ ও চিত্রে যে সব স্ত্রীলোক আত্মনিয়োগ করেছে, তাদের খ্যাতি, প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা ও সুযোগ এমাসে প্রত্যক্ষ করা যাবে। তা ছাড়া ভ্রমণ, পিকনিক ও অবাধ বিহারে আনন্দের প্রাচুর্য্য ও লাভ হবে। অবৈধ প্রণয়ে আশাতীত সুযোগ ও সাফল্য। নানাপ্রকার উপঢৌকন ও অর্থপ্রাপ্তি। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে সুখশান্তি ও প্রতিষ্টালাভ। দ্বিতীয়ার্দ্ধে গৃহ মার্জ্জনা ও সংস্কার, অলঙ্করণ, সাজসজ্জা প্রভৃতির দিকে মনঃ সংযোগ। রেসে জয়লাভ। বিদ্যার্থী শিক্ষার্থীর পক্ষে মধ্য বিধফল।

তুলা রাশি

চিত্রাজাতগণের পক্ষে উত্তম সময়। স্বাতী ও বিশাখানক্ষত্র জাতগণের পক্ষে বেশী কষ্ট ভোগ। প্রথমার্দ্ধটী কষ্টপ্রদ। দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ কর্ম্ম প্রচেষ্টায় ব্যর্থতা, ব্যয়াধিক্য, স্বাস্থ্যের অবনতি, মিথ্যা অপবাদ, ক্লান্তি কর ভ্রমণ প্রভৃতি দেখা যায়। দ্বিতীয়ার্দ্ধে সম্মান বিলাসব্যসন, শত্রুজয়, সুখস্বচ্ছন্দতা। প্রথমার্দ্ধে পিত্ত ও বায়ু বৃদ্ধিজনিত কষ্ট, অকারণ কলহবিবাদ। মাসের শেষের দিকে সুখশান্তিলাভ। প্রথমদিকে আর্থিক অবস্থা মোটেই অনুকূল নয়। অপরের জন্যে জামিন হোলে বিপদের কারণ আছে। নানাপ্রকার চাতুরি ও প্রতারণার জন্যে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। ভূম্যধিকারী, বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি উত্তম নয়। প্রথমার্দ্ধ চাকুরিজীবীর পক্ষে শুভ নয়, দ্বিতীয়ার্দ্ধটি আশাপ্রদ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটী মিশ্রফলদাতা। কোন প্রকার পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হবে। স্ত্রীলোকেরা সামাজিক ও শিল্প কলাসংক্রান্ত কার্য্যেই সুনাম অর্জ্জন করবে। অলঙ্কারাদি ও বেশ ভূষার পারিপাট্য রক্ষার মূল্যবান সামগ্রী ক্রয়করবে। এদিকে অপরিমিত ব্যয় হোতে পারে। অবৈধপ্রণয়িনীদের পক্ষে অবশ্য নানা উপহার সহজলভ্য হবে এবং অর্থকৃচ্ছ্রতা ঘটবে না। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে শান্তিও শৃঙ্খলা অটুট থাকবে। এমাসে প্রসাধনের দিকেই দৃষ্টিনিবদ্ধ হবে অতি মাত্রায়। রেসে জয় লাভ। বিদ্যার্থী ওশিক্ষার্থীর পক্ষে মাসটি আশাপ্রদ নয়।

বৃশ্চিক রাশি

বিশাখা, অনুরাধা এবং জ্যেষ্ঠা—এই তিন নক্ষত্রে জাত ব্যক্তি গণের একইপ্রকার ফল। সকলের পক্ষেই মাসটি মিশ্রফলদাতা। ক্ষতি, স্বাস্থ্যের অবনতি, বন্ধুও স্বজন বর্গের সহিত কলহ, অপমান, ক্লান্তিকর ভ্রমণ প্রভৃতি কষ্ট ভোগ যেমন আছে তেমনই আছে সার্বপ্রকার আনন্দ উপভোগ এবং নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদ ও উৎসব অনুষ্ঠানে যোগদান। রক্তের চাপবৃদ্ধি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে মাসের প্রথমার্দ্ধে সতর্ক হওয়া

দরকার। উদর, ফুসফুস ও চোখের পীড়ার আশঙ্কা আছে। পিত্ত প্রকোপ ও যকৃতের দোষ ঘটবে। পরিবার বহির্ভূত আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবর্গের সহিত মনোমালিন্য ঘটবে। পারিবারিক শান্তি ও শৃঙ্খলা ব্যাহত হ'বে না। আর্থিক অবস্থা সন্তোষ জনক নয়। আর্থিক অনটন হেতু উদ্বিগ্নতা এবং কর্ম্ম প্রচেষ্টায় ব্যর্থতা। স্পেকুলেশনে ক্ষতি। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি উত্তম হোলেও ভাড়াটিয়া ও কর্ম্মচারীদের সঙ্গে মনোমালিন্য সৃষ্টি করা চলবেনা, তাতে ক্ষতির আশঙ্কা আছে। চাকুরির ক্ষেত্রে মাসের প্রথমার্দ্ধে উপরওয়ালার বিরাগ ভাজন হওয়া ও পদমর্য্যাদা ক্ষুন্ন হওয়ার সম্ভাবনা। রুটিন মাফিক কাজ করে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উত্তম সময়। শিল্পকলা, গানবাজনা অভিনয় সংক্রান্ত ব্যাপারে লিপ্ত স্ত্রীলোকরাই বিশেষ খ্যাতিপ্রতিপত্তি ও অর্থলাভ করবে। অবৈধ প্রণয়িনীরা ও উত্তম সুযোগসুবিধা লাভ করবে। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে সাফল্য ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন। দ্বিতীয়ার্দ্ধে ব্যয়াধিক্য যোগ থাকায় সংযত হওয়া আবশ্যক। রেসে জয়লাভ। বিদ্যার্থীও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যবিধফল।

ধনু রাশি

পূর্ব্বাষাঢ়াজাতগণের পক্ষে উত্তম ফললাভ। মূলাও উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রজাতগণের পক্ষে সময় একই প্রকার। দ্বিতীয়ার্দ্ধটীতে গ্রহবৈগুণ্য জনিত কুফলগুলি হ্রাস পাবে। দ্বিতীয়ার্দ্ধে মোটামুটি সাফল্য লাভ, পরিবারে সন্তানের জন্ম, নুতন পদমর্য্যাদালাভ, সুখস্বচ্ছন্দতা প্রভৃতি আশাকরা যায়। প্রথমার্দ্ধে কিছু ক্ষতি, স্বজনবিয়োগ, কলহ ও মনোমালিন্য, শারীরিক অসুস্থতা ও ক্লান্তিকর ভ্রমণ। মাসের প্রথম দিকে কিছু শারীরিক কষ্ট ভোগ আছে। জ্বর, পিত্ত প্রকোপ, যকৃৎদুষ্টি বা শারীরিক দুর্ব্বলতা ঘটবে। দ্বিতীয়ার্দ্ধে রক্তর চলাচলের ব্যাঘাত, পিত্তশূল, উত্তাপ জনিত কষ্ট পরিলক্ষিত হয়। সামান্য দুর্ঘটনাদিও ঘটতে পারে। রক্তের চাপবৃদ্ধি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে দ্বিতীয়ার্দ্ধট ভালো নয়, এজন্য বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক। স্ত্রী ও অন্যান্য আত্মীয়ের সঙ্গে কলহ বিবাদ ইত্যাদি সম্ভব। এই মাসে কোন বন্ধু বা আত্মীয়ার মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্তির আশঙ্কা করা যায়। আর্থিক অবস্থা ভালো বলা যায় না। অপরিমিত ব্যায়। এজন্য সতর্ক হয়ে চালা উচিত। ভূসম্পত্তি ব্যাপারে অর্থ বিনিয়োগ অনুকূল নয়। শস্যপ্রাপ্তি আশানুরূপ হবে না। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে মাসটি উত্তম নয়। কলহ বিবাদ, অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ এমন কি মামলা মোকর্দ্দমা পর্য্যন্ত হওয়াও অসম্ভব নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রথমার্দ্ধটী নৈরাশ্য জনক। অবৈধ প্রণয়ে সতর্কতা প্রয়োজন। পারিবারিক ক্ষেত্র অশান্তি প্রদ। নানাপ্রকার দুঃখ কষ্ট প্রাপ্তি। সামাজিক পারিবারিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে দুঃখ জনক অভিজ্ঞতা। শারীরিক অবস্থা খারাপ হবে, নৈরাশ্য হেতু মানসিক অবস্থা একেবারেই ভালো যাবেনা। প্রণয়ভঙ্গ যোগ। রোমান্সেও বেদনা দায়ক পরিস্থিতি। কোর্টসিপ ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হবে। পরপুরুষের ঘনিষ্ট সংস্রবে এসে নৈতিক অবনতি ঘটতে পারে। এজন্য গৃহকর্ম্মের মধ্যে ও দৈনন্দিন তালিকাভুক্ত কর্ম্ম গুলির মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখাই শ্রেয়। দ্বিতীয়ার্দ্ধে অনেকটা শুভ হবে। রেসে পরাজয়। বিদ্যার্থীও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটি আশা প্রদ নয়।

মকর রাশি

ধনিষ্ঠা জাতগণের পক্ষে উত্তম এবং গ্রহ বৈগুণ্যজনিত কষ্টভোগ নেই। উত্তরাষাঢ়া ও শ্রবণার পক্ষে ভালোমন্দ দুইই একই প্রকারে ভোগ করতে হবে। দ্বিতীয়ার্দ্ধটী অত্যন্ত খারাপ যাবে। এই সময়ে শারীরিক অসুস্থতা, স্বাস্থ্যের অবনতি, ভ্রমণে কষ্ট বা বিপত্তি, ক্ষতি অপমান ও দুঃখ ভোগ। প্রথমার্দ্ধে সুখ স্বচ্ছন্দতা, লাভ, সম্বন্ধু লাভ, ও বিলাস ব্যসন দ্রব্যাদি সম্ভোগ। প্রথম দিকে স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকলেও দ্বিতীয়ার্দ্ধে জ্বর, চক্ষু পীড়া পিত্ত প্রকোপ, যকৃৎ দুষ্টি ও সাধারণ দুর্ব্বলতা ঘট্‌বে। প্রথমার্দ্ধে পারিবারিক ঐক্য ও সুখ শান্তি সুনিশ্চিত। সন্তান জন্ম, পারিবারিক সংখ্যা বৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায়। আর্থিক অবস্থা প্রথম দিকে ঠিকই থাক্‌বে। নানা দিক দিয়ে আয় হবে, বিশেষ আয় বৃদ্ধিও ঘট্‌বে। অর্থ বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হবে না। যারা জাহাজের মালপত্র ও দূর দেশে মাল রপ্তানি, প্রভৃতি নিয়ে বড় রকমের ব্যবসা করে এবং যারা আড়তদার তাদের পক্ষে উত্তম। মাসের শেষের দিকে আবার আয়ের হ্রাস হবে। স্পেকুলেশন প্রথম দিকে কর্‌লে লাভ হবে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে প্রথমার্দ্ধটী অতীব উত্তম। চাকুরি জীবির পক্ষেও ঐ একই কথা। পদপ্রার্থী হয়ে দেখা সাক্ষাতে সাফল্য লাভ, এপ্রেন্টিস কাজেও নিযুক্ত হওয়ার যোগ আছে। দ্বিতীয়ার্দ্ধটী ভালো নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে ও দ্বিতীয়ার্দ্ধটী অনুকূল, নয় যৌন প্রবৃত্তির আধিক্য, রোমান্স এড্‌ভেঞ্চার, অবৈধ প্রণয় লিপ্সা প্রভৃতি চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করে তুলতে পারে এজন্যে সংযত হওয়াই বাঞ্ছণীয়। এ সময়ে পর পুরুষের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসা বা অবাধ মেলামেশা নানা বিপত্তি ও বিশৃঙ্খলার কারণ হয়ে উঠ্‌বে। অবৈধ প্রণয়েনারা ও প্রতারিত হবে। মাসের প্রথমার্দ্ধে মহিলারা শুভানুধ্যায়ী বন্ধু, শিল্প কলা সঙ্গীত অভিনয় ও অধ্যয়নে সাফল্য ও সমাজ কল্যাণ কার্য্যে আত্মনিয়োগে প্রশংসা অর্জ্জন কর্‌বে। এ সময়ে পারিবারিক, সামাজিক, ও প্রণয়ের ক্ষেত্র কণ্টকাকীর্ণ থাক্‌বে না। মাসের প্রথম দিকে রেসে জয়লাভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শেষার্দ্ধটী নৈরাশ্য জনক।

কুম্ভ রাশি

ধনিষ্ঠাজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। শতভিষা ও পূর্ব্বভাদ্র পদজাতগণের পক্ষে কষ্ট ভোগই বেশী, সুখস্বচ্ছন্দতার ভাগ অল্প। গ্রহবৈগুণ্য হেতু মামলা মোকর্দ্দমায় পরাজয় ক্ষতি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, পারিবারিক কলহ ও সর্ব্ববিষয়ে অসন্তোষের উৎপত্তি হবে। উত্তম সঙ্গ, উত্তম সদাচার্য্য ও উৎসব অনুষ্ঠানের যোগদান প্রভৃতি শুভফলের আশা করা যায়।

শারীরিক দুর্ব্বলতার প্রবণতা হেতু শারীরিক ও মানসিক কঠিন পরিশ্রম বর্জ্জনীয়। সন্তান জন্ম সম্ভাবনা। আর্থিক অবস্থা অনুকূল হোলেও সঞ্চয়ের পথ রুদ্ধ। অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে প্রথম দিকে অনটন এবং অর্থোপার্জ্জনের প্রচেষ্টাও সাফল্যের পরিপন্থী। সোকুশলনে নৈরাশ্যজনক অবস্থা। শেষার্দ্ধে অর্থাগমসূচিত হয়। ফসল প্রাপ্তি সন্তোষজনক। বাড়ীওয়ালা, ভুস্বামী ও কৃষিজীবির পক্ষে মাসটি উত্তম। চাকুরিজীবিদের পক্ষে উত্তম সময়। স্বার্থের অনুকূল পরিবর্তন, কর্ম্মোন্নতি, আকাঙ্ক্ষার পুর্ণতা প্রভৃতি সম্ভব হবে। যারা জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত এবং গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী তাদের পক্ষেই বিশেষ শুভযোগ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষেও মাসটি উত্তম।

স্ত্রীলোকের পক্ষে নানাদিকেই সুবর্ণ সুযোগ। বিশেষতঃ যারা থিয়েটার সিনেমা শিল্পকলা প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট তাদের খ্যাতি প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হবে। অবৈধ প্রণয়ীদের উত্তম সময়। পারিবারিক সমাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে সুখশান্তি খ্যাতি ও পরিতৃপ্তি লাভ। রেসে জয়লাভ। বিস্তার্থীর ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যবিষফল।

মীন রাশি

পূর্ব্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ এবং রেবতীজাত ব্যক্তিগণের ভালোমন্দ ফলাফল এমাসে একই প্রকার হবে। মাসটি সকলের পক্ষে মিশ্রফল দাতা' শেষার্দ্ধটি প্রথমার্দ্ধ অপেক্ষা ভালো। প্রথমার্দ্ধে শত্রুবৃদ্ধি, হিংসা দ্বেষের কবলে নির্যাতনভোগ, উদ্বিগ্নতার বৈচিত্র্য, স্বাস্থ্যের অবনতি ও শারীরিক কষ্ট ইত্যাদির আশঙ্কা করা যায়। কিন্তু কিছু সুখস্বচ্ছতা নুতনবিষয়বস্তু অধ্যয়ন ও গবেষণায় সাফল্য অর্থপ্রাপ্তি; সম্পত্তি ও উৎসব অনুষ্ঠানে যোগদান প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়। দ্বিতীয়ার্দ্ধে সিদ্ধিও সমৃদ্ধি উত্তম সংসর্গলাভ বন্ধুত্বলাভ প্রভৃতি সূচিত হয় কিন্তু এমাসে মতভেদজনিত অশান্তি ও কলহ বিবাদাদিতে প্রত্যেককেই লিপ্ত হোতে হবে। প্রথম দিকে সামান্য দুর্ঘটনা ভয় আছে তাছাড়া চিত্তের সুস্থতার অভাব। দ্বিতীয়ার্দ্ধে আর দেখা যাবে না। প্রথমার্দ্ধ অপেক্ষা দ্বিতীয়ার্দ্ধে আর্থিক উন্নতি ও অর্থোপার্জ্জনের আধিক্য হেতু চিত্তের প্রসন্নতা পরিলক্ষিত হয়। প্রথমার্দ্ধে আর্থিক ক্ষতি ঘটবে। টাকাকড়ি লেনদেন ব্যাপারে সংযত হওয়া প্রয়োজন। টাকাকড়ি সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে শত্রুতা ও কলহ বিবাদের উৎপত্তি হওয়ার বেশী সম্ভাবনা। দ্বিতীয়ার্দ্ধে আর্থিক উন্নতির ফলে এ সব ব্যাপার ঘটবে না। বাড়িওয়ালা, ভুমধ্যকারী ও কৃষিজীবের পক্ষে সময় মধ্যম। দ্বিতীয়ার্দ্ধে চাকুরিজীবিদের পক্ষে অতীব উত্তম হবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে ঐ একই কথা, সৌভাগ্যলাভ হবে। যে সব স্ত্রীলোক উন্নতধরণের সাহিত্য শিল্পকলা ও সঙ্গীতের সেবিকা, তারা বিশেষ করে উন্নতি করবে, সম্মান ও খ্যাতি অর্জ্জন করবে। নববিবাহিতারা অভিজাত ও ঐশ্বর্য্যশালী সমাজে ভ্রাম্যমান হবে। এদের স্বামীরা কেউবা বৈজ্ঞানিক, কেউবা সাহিত্যিক কিম্বা সাহিত্যরসিক ও গুণী হবে। অবৈধ প্রণয়িনীরা নানাপ্রকারে সুখস্বচ্ছন্দতা ভোগ করবে। কোর্টশিপ প্রণয়, অবাধবিহার, পিকনিক, দূরদেশে গমন প্রভৃতি সন্তোষ ও তৃপ্তি এনে দেবে। রেসে জয়লাভ। বিস্তার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

ব্যক্তিগত দ্বাদশ লগ্নের ফলাফল

মেষ লগ্ন

বহুবাধাবিপত্তির মধ্যে জয়লাভ, ভ্রমণ। অনর্থক পারিবারিক ঝঞ্ঝাট ও বিশৃঙ্খলা। স্ত্রীর জন্য অশান্তি বা ঝঞ্ঝাট। কাজে অবহেলার জন্য আশাভঙ্গ। বাসগৃহের পরিবর্তন। দেহভাবের ফল শুভ। অর্থাগম। স্ত্রীর জরায়ুঘটিত পীড়া। বিদেশ ভ্রমণ যোগ। স্ত্রী ও কন্যার ব্যাপারে মনোকষ্ট। যশের হানি। সাহিত্য, বিজ্ঞান ও গণিতে পারদর্শিতা লাভ। বৈদেশিক কোন ব্যাপারে অর্থহানি। সরকার অথবা জনসাধারণের সংস্রবে পদপ্রাপ্তি। সহসা বিশেষ উন্নতি। শত্রুবৃদ্ধি। সম্পত্তিপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়। বিস্তার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটি প্রতিকূল নয়।

বৃষলগ্ন

স্বভাব সুলভ পরাক্রমে অগ্রগতি, শারীরিক ও মানসিক সুখস্বাচ্ছন্দতা আর্থিক অসুবিধা ভোগ, সহোদরভাবের ফল অশুভ, বিত্তোন্নতি যোগ। সন্তানের শারীরিক ফল শুভ, ভাগ্যোন্নতির পক্ষে কিঞ্চিৎ বাধা। পত্নীর উল্লেখযোগ্য পীড়ায় কষ্টভোগ, মাতার বিশেষ পীড়া এমন কি শয্যাশায়ী অবস্থা, স্বাধীন ব্যবসা অপেক্ষা চাকুরি স্থলের ফল ভালো, নানাপ্রকারে অর্থব্যয়। অসঙ্গত বুদ্ধির জন্য আত্মীয় বিরোধ, মামলা মোকর্দ্দমায় পরাজয়, দাম্পত্য কলহ। স্ত্রীলোকের পক্ষে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি। বিস্তার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

মিথুনলগ্ন

ভাগ্যপ্রতিকূল অতএব পুরুষকারই সম্বল। শারীরিক অসুস্থতা অনুভব। ব্যয় বাহুল্যজনিত বিব্রত হওয়ার আশঙ্কা। সহোদরের সহিত অসদ্ভাব। বিস্তালাভে অন্তরায়। সন্তানদের দেহপীড়া। নূতন গৃহাদি নির্ম্মাণ সুযোগ। কর্ম্মোন্নতি যোগ মধ্যবিধ। আর্থিক ব্যাপারে দুশ্চিন্তা, নিজের জন্যই ব্যয়। প্রদাহমূলক ব্যাধির প্রবণতা। জননেন্দ্রিয়ের পীড়া, ভৃত্য বা অধীনস্থ কর্ম্মচারীর জন্য ঝঞ্ঝাট। স্ত্রীলোক ঘটিত ব্যাপারে আশাভঙ্গ বা মনোকষ্ট। সম্মান বৃদ্ধি। বিবাদবিসংবাদে অশান্তি। জলনিমজ্জন ভয়। চুরি বা প্রতারণার ক্ষতি। স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম সময়! বিস্তার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটী আশাপ্রদ নয়।

কর্কটলগ্ন

ভাগ্য অপ্রসন্ন ও নানা সুযোগ প্রাপ্তি। বিস্তার্জ্জনে কিছু অসুবিধা ভোগ। শত্রুবৃদ্ধি যোগ। শারীরিক অবস্থা শুভ নয়। বেদনাঘটিত পীড়া, দাঁতের পীড়া ও শিরঃপীড়া, পিতামাতার স্বাস্থ্য ভালো যাবে। কর্ম্মোন্নতিতে ব্যাঘাত ঘটবে। চিঠিপত্রের ব্যাপার নিয়ে উদ্বেগ অশান্তি।

মামলহানি, তীর্থদর্শন বা সমুদ্রযাত্রার সম্ভাবনা। স্ত্রীলোকের পক্ষে অশুভ সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটি মধ্যমবিধ।

সিংহলগ্ন

সুযোগ যথেষ্ট কিন্তু মানসিক দ্বন্দ্বভাবের দরুণ বিব্রত। ধনোপার্জ্জন যোগ। সহোদরের স্বাস্থ্যহানি। ভাগ্যোন্নতির পথে অন্তরায় ঘটবে না। নেত্রপীড়া, পায়ে পীড়া হওয়ার সম্ভাবনা। গৃহাদি ও যানবাহনাদি হোতে বিপদের সম্ভাবনা। সন্তানের পীড়া, বিদ্যাভাব শুভ। স্পেকুলেশনে ক্ষতি। কর্ম্মচারী ও ভৃত্যের তরফ থেকে দুঃখ। আশাভঙ্গ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

কন্যালগ্ন

আর্থিকোন্নতি। অনায়াসে ইষ্টসিদ্ধি। সহোদরভাবের ফল শুভ। সন্তানের দেহপীড়া ও লেখাপড়ায় অমনোযোগিতা। দাম্পত্য প্রণয় যোগ। ভাগ্যোন্নতির যোগ। কপটমিত্রের সমাগম। সন্তানজনিত চিন্তা। ব্যবসায়ে ক্ষতি। নিজের বিষয় বুদ্ধির সাহায্যে উন্নতি। বিদ্যোপার্জ্জন, অংশীর জন্য অশান্তি ও উদ্বেগ। বিবাহে বাধা। শক্তিশালী বন্ধুর সাহায্য লাভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটি অনুকূল।

তুলা লগ্ন

নানারকমে ব্যয়ের পথ উন্মুক্ত। আর্থিক সুযোগ কিন্তু মানসিক দুর্য্যোগ। সহোদর ভাবের ফল সম্পূর্ণ শুভ নয়, মাতার দেহপীড়া, পিতার শারীরিক অবস্থা ভালো যাবে, বিদ্যার্থীদের ফল শুভ। মিত্রলাভ যোগ। খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ, ধনভাব শুভ। অপরের সাহচর্য্যে প্রতিষ্ঠা লাভ, স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যবিধ ফল।

বৃশ্চিকলগ্ন

গতিবৃদ্ধি ও অনায়াসে ইষ্টসিদ্ধি। কর্ম্মক্ষমতার বৃদ্ধি। জ্বর ও নানা উপসর্গ। হঠকারিতা, কফ-প্রবণতা, কাম-পরায়ণতা। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে মনোমালিন্য। পৃষ্ঠজাত ভ্রাতা-ভগ্নীর পীড়াদি বিশেষ, ভ্রমণে লাভ, বৈদেশিক ব্যাপার থেকে উন্নতি। ভাগ্যোন্নতি যোগ। কর্ম্মস্থলে দায়িত্ব ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি। নূতন গৃহাদি নির্ম্মাণ ও সংস্কারাদিতে যথেষ্ট পরিমাণে অর্থব্যয়, স্ত্রীলোকের পক্ষে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

ধনুলগ্ন

পড়াশুনায় কৃতিত্ব লাভ। ভাগ্যোন্নতি, সরকারী বা আধা সরকারী কার্য্য লাভ, ধনাগম, সম্মান ও সুখ্যাতি লাভ, শত্রু বৃদ্ধি, মামলা মোকর্দ্দমায় ব্যয়। স্ত্রীলোকের শত্রুতা, আলস্যের জন্য সুযোগ হানি, কোন কোম্পানী, করপোরেশন এসোসিয়েশন ইত্যাদি থেকে বিশেষ অর্থলাভ, সহসা উন্নতি, প্রবাসে ঝঞ্ঝাট ও অশান্তি, আত্মীয় স্বজনের জন্য অনর্থক উদ্বেগ, সৌভাগ্য বৃদ্ধি, স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

মকরলগ্ন

শারীরিক অসুস্থতা, প্রণয়হানি, ধনভাবের ফল মধ্যবিধ, সম্বন্ধু লাভ, শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে আশানুরূপ না হোলেও বিফল-মনোরথ হবার সম্ভাবনা নেই, সর্ব্বত্র সুযোগ, উল্লেখযোগ্য রূপে উন্নতির আশা আছে। ধর্ম্মানুষ্ঠান ও তীর্থপর্য্যটনাদিতে অর্থ ব্যয়, সহোদরের সহিত মনোমালিন্য, শত্রুজয়, স্ত্রীলোকের পক্ষে অনুকূল নয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যবিধ ফল।

কুম্ভলগ্ন

শারীরিক ও মানসিক সুখস্বচ্ছন্দতা। বিদ্যালাভে অন্তরায়, পত্নীর শারীরিক কষ্ট। ভাগ্য বা ধর্ম্মভাবের উন্নতির বাধা। কর্ম্মস্থানের ফল সম্পূর্ণ সন্তোষ জনক নয়। বন্ধুবান্ধবের চেষ্টায় চাকুরি বা পদোন্নতির আশা। সহকর্ম্মী বা অধীনস্থ কর্ম্মচারীর শৈথিল্য বশতঃ অনিষ্টের আশঙ্কা। নিকট সম্পর্কীয় ব্যক্তির দ্বারা প্রতারণা। শ্বশুর বা শ্বশ্রূর কঠিন পীড়াযোগ। পরাক্রমবৃদ্ধি। স্ত্রীলোকের নৈরাশ্যজনক। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়।

মীনলগ্ন

বিদ্যাচর্চ্চায় অমনোযোগিতা। সন্তানের দেহপীড়া। ভাগ্যোন্নতির যোগ, মাতার স্বাস্থ্যভঙ্গযোগ। বিদেশ ভ্রমণ। অধ্যাপনায় সুনাম, বন্ধুর সহিত মতানৈক্য হেতু অশান্তি। প্রণয়ে সাফল্যলাভ। চাকুরির ক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন শত্রু দ্বারা অনিষ্ট যোগ। সঞ্চিত অর্থের নাশ। সম্পত্তিলাভ যোগ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ।

বন্দনা

ইলা অধিকারী

আকাশে বাতাসে ছড়ায়ে আশীস
আসিলে পরিত্রাতা।
সারা নিখিলের অভাগা হৃদয়ে
তোমারি আসন পাতা।
স্বরগে মরতে বাঁধিলে যে সেতু
অমরার প্রেম ডোরে,

অতীত দিনের মধুর সে কথা
রয়েছে হৃদয় ভোরে!
সেই সে প্রেমের ঝরণা ধারায়
ধুয়ে যায় যত ব্যথা
তৃষিত হৃদয়ে শান্তি দানিতে
এসেছে শান্তিদাতা।

আমাদের উৎসব

রেণুকা চক্রবর্ত্তী

সেকালের উৎসব ছিল বেশীর ভাগ ধর্ম সম্বন্ধীয়। বার মাসে তের পার্বণ। দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, মনসা, মঙ্গলচণ্ডী ইত্যাদি নিয়মিত অজস্র দেব দেবীর পূজা ছাড়াও আরও কতগুলি দেখা দিত প্রয়োজনের তাগিদে। প্রতিটি পূজারই সার্থকতা ছিল ব্যাপক। গরুর বাছুর হয়েছে অমনি ত্রিনাথের মেলা করতে হবে। অর্থাৎ ঐ নূতন গরুর দুধে ক্ষীরের নাড়ু করে পাড়া প্রতিবেশীকে ডেকে পূজার নামে আনন্দ করে সবাই মিলে খাওয়া। গাছে কলার কাঁদি পড়লেই নারায়ণ সেবার ইচ্ছা হত। সবাই মিলে সিন্নি মেখে ঐ কলা খাওয়া, সকলে এক সঙ্গে আনন্দ করা। অগ্রহায়ণ মাসে নূতন চাল, খেজুরী গুড় দেখা দিলেই আরম্ভ হত নবান্নের উৎসব। ঘরে ঘরে সেকি আনন্দ! সকলে মিলেমিশে খাওয়া। গ্রীষ্মের ফল, পাকুড় দেখা দিলে ঠাকুরকে শীতল দেয়া হত। এমনিতর প্রতিটি উৎসবে সকলের সঙ্গে যোগাযোগ হত। প্রতিটি পূজায় বহু লোকের সহিত যোগ ছিল, ছিল প্রাণের পরশ।

একটু অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাড়ীতেই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত থাকত। সেখানে প্রতিদিন পূজা হত। সেই সঙ্গে ছিল ন্যায়, নিষ্ঠা, বিশ্বাস, ও কর্ম। বাড়ীর বালিকাটিও ঘুমথেকে উঠে ফুল দূর্বা তুলত, ঠাকুরের বাসন মাজা, ঘর মোছা প্রয়োজনে পূজার আয়োজন পর্য্যন্ত করত। ভাল ফলটি দেখলেই টপ করে মুখে পুরে দেবার কথা কল্পনাও করতে পারত না। জানত সেটি ঠাকুরের নৈবেদ্যে লাগবে এবং আর পাঁচ জনকে প্রসাদ দিয়ে তার ভাগ্যে এক টুকরা পড়তে পারে, নাও পারে। সে জন্য তার কোন মাথা ব্যথা ছিলনা। এই ত্যাগ, এই সংযমই বুঝি উত্তরকালে তাকে দিতে শেখাত। নিজের কথা নিজে ভাবার অবকাশই মিলত না।

এ সব উৎসবের জন্য আর্থিক প্রয়োজনও খুবই কম ছিল। বেশীর ভাগ ফল পাকুড় কলা, শশা নারকেল, বেল ইত্যাদি বাড়ীতেই হত। চাল ডালও অনেক ক্ষেত্রেই নিজেদের জমির ছিল। সর্বোপরি ছিল সহৃদয় আন্তরিকতা। মনে ছিল আনন্দ। সমালোচনার মন-ভাব নিয়ে কেউ আসত না। যা পেত তাতেই খুসী হত সবাই, নিজেদের উৎসব বলেই মনে করত। উৎসবের উদ্যোক্তাদের ও পূর্বে বা পরে আর্থিক সমস্যায় মাথায় হাতদিয়ে বসতে হতনা বলে, আনন্দটা পুরোপুরি উপভোগ করতে বাধত না।

বিয়ে, চুড়ো উপলক্ষে আসত কাশীর ঠাকুমা, বরিশালের মাসী, মৈমনসিংএর দিদি, দিল্লীর পিসী। বহুদিন পরে সকলে দেখা সাক্ষাৎ হত। সংসারের একঘেয়ে খাটুনী হতে সবাই জুড়াতো জিরাতো। এ সব কাজের বাড়ী এসে যে সবাই বসে থাকত তা নয়। সবাই প্রবল উৎসাহে কাজ করত যোগ্যতা অনুসারে। কেউ পিড়ি কুলো চিত্রণ করতে বসে যেত। কেউ বা আলপনা, গান রান্না এমনিতর বহু বিধ কাজ স্বেচ্ছায় আনন্দের সঙ্গে করে যথেষ্ট সুখ্যাতি

অর্জন করত। তারপর পনের দিন বা একমাস থেকে সামান্য উপহার দিয়ে একখানা নমস্কারী শাড়ী নিয়ে বিদায় নিত।

আজ আমাদের অবস্থা অতীব করুণ। জীবনে দুর্দ্দশার অন্ত নেই, তুচ্ছাতিতুচ্ছ জিনিষটি সংগ্রহ করতে ও দম বেরিয়ে যায়। সোজা পথে কোন কিছুই পাবার উপায় নেই, সব ঘোরা পথে সর্বরকমে নাজেহাল অতৃপ্ত মানুষ তবু বাঁচতে চায় উৎসবের মধ্যে। সমস্ত রকম দুঃখ দুর্দ্দশা এক পাশে সরিয়ে রেখে আমরা উৎসব করি। উৎসবে যোগ দিই কিছুক্ষণ আনন্দ করতে। হাসতে চাই, হাসাতে চাই। কিন্তু সে চাওয়া বিরাট ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

এখন উৎসব বলতে আছে বারোয়ারী দুর্গাপূজা, কালীপূজা ও সরস্বতী পূজা। পূজা এলেই অভিভাবকদের হৃদকম্প আরম্ভ হয়, কি করে পূজার মাসের খরচ চালাবেন? কয়েকটি পূজার চাঁদা, দেখতে যাবার খরচ, ঠাকুরের কাছে ভোগ দেয়া, সবাইকে নূতন জামা-কাপড় দেওয়া, তা আবার এক আধখানায় চলবে না। তার উপর কম্পিটিশন—কে কত দামী কিনতে পারে। অনেক কোম্পানীতে এ সময় বোনাস্ দেয় বটে, তবু ব্যয়ের তুলনায় সে কিছুই নয়। আর যাদের বোনাস নেই তাদের তো সোনায় সোহাগা। এড্ভান্স নেয়। পূজার আনন্দ বলতে ঠাকুর দেখে ঘুরে বেড়ানো, এই হল দুর্গোৎসব। এর পর আছে বিজয়া, সেটাও পূর্বের মত অনাড়ম্বর নয় যে নাড়ু মোয়ার হবে, চাই দোকানের নানাবিধ মিষ্টি, বাসি হোক, ছানার বদলে ময়দা থাক, তবু এ না হলে বিজয়া হবে না। উৎসবের প্রাণ হ'ল মাইক। আর পূজার সার্থকতা হ'ল মন্ত্রী উপমন্ত্রীর উদ্বোধনে।

এর পর আছে কালীপূজা ও সরস্বতীপূজার চাঁদার জন্য এসে লোক দাঁড়ায়। এও একাধিক, এ না মিটতেই ভাইফোঁটা দেখা দেয়। আর আছে জন্মদিন, এ্যানিভার্সারি ডে, অন্ন-প্রাশন, বিয়ে ইত্যাদি।

এসব উৎসবের আমন্ত্রণ পেলে সকলের আগে মনে পরে আর্থিক দিক। তারপর আর কোন আনন্দ জাগে না। জাগে আতঙ্ক। উৎসবে গিয়ে দু-দিন থেকে আসার প্রশ্ন তো একেবারেই অবান্তর, সবার সঙ্গে দেখা না করেই ফিরে আসতে হয় গাড়ী না পাবার তাড়ায়, উৎসব দেখে আসাও অনেক সময়ই সম্ভব হয় না। নিমন্ত্রণের নামে মস্ত ঠাট্টা, খাওয়া নয়, খাওয়ার প্রহসন। অনেক ক্ষেত্রেই ডিস্ হয়। সাধ্যের অতিরিক্ত মূল্য দিয়ে, গাড়ী ভাড়া দিয়ে, তারপর ঘরে এসে রেঁধে খেতে উৎসবের আনন্দ ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনাই ভোগ হয়। নিমন্ত্রণের দক্ষিণা বড় প্রাণান্তকর।

সাধ্যের অতিরিক্ত দেয়াটাই আজ রেয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানেও প্রতিযোগিতা কে কত দামী জিনিষ দিতে পারে। ফলে আনন্দের প্রশ্ন তো ওঠেই না। উপরন্তু আছে অস্বস্তি, দুশ্চিন্তা, আর্থিক দুর্গতি।

এই-ই আজ আমাদের উৎসবের রূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অধিকাংশকেই জিজ্ঞেস করে শুনেছি, 'হ্যাঁ বিয়ে তো হবে, দেব যে কি? সামনে আরেকটা জন্মদিনের নিমন্ত্রণ আছে। দিয়ে দিয়েই ফতুর হলাম, আর পারিনে, বহু লোককেই এ কথা বলতে শুনি। তাই ভাবি, আজ আমাদের উৎসবটা কোথায়? উৎসবের নামে আরো খানিকটা দুর্গতিই কি আমরা ডেকে আনি না। কথায় বলে সাধ্যের বাইরে দান হয় না। আজকাল সাধ্যের ভেতর কিছু হয় না। তাই মানুষ মাত্রা ছাড়াতে ছাড়াতে কোথায় যে এসে দাঁড়িয়েছে—তা বুঝি সে নিজেও জানে না। আর উৎসব বলে যাকে আমরা আঁকড়ে ধরতে চাই তাতে উৎসবের কোন মঙ্গল তো নেই-ই, আছে বিকৃত উত্তেজনা পরে সীমাহীন অবসাদ।

—

কাগজের কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

গতবারে কাগজের কারু-শিল্পের নিত্য-প্রয়োজনীয় খাম লেফাপা তৈরীর কথা বলেছি। এবারেও তেমনি আর

একটি প্রয়োজনীয় সামগ্রীর কথা বলছি। এটি হলো —কাগজের বাক্স। বাড়ীতে বা বাইরে কোথাও কারো জন্মদিনে বা কোনো উৎসব উপলক্ষে আমরা সাধারণতঃ নানা রকমের টুকিটাকি উপহার সামগ্রী মনোরম কাগজের বাক্সে পরিপাটিভাবে 'প্যাক্' (Packing) করে দিই। তাছাড়া বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের টুকিটাকি খেলনা, মার্বেল, লাট্টু, পুতুল, পুঁতির মালা, এমন কি মাথার ফিতা, ক্লিপ, পেন্সিল-রবার, লজেন্স, টফি প্রভৃতি এই ধরণের কাগজের বাক্সে সযত্নে সাজিয়ে রাখা যেতে পারে। এ সব বাক্স বেশ মজবুত এবং টুকিটাকি জিনিষপত্র সাজিয়ে গুছিয়ে রাখবার পক্ষে খুবই উপযোগী। এ ধরণের কাগজের বাক্স অনায়াসেই বাড়ীতে তৈরী করতে পারেন—করাও ব্যয়সাধ্য নয়। তাছাড়া এ ধরণের কাগজের বাক্স তৈরী করে (বাজারে এ সব বাক্সের কেনবার খরিদ্দারও মিলবে প্রচুর) বিক্রী করলে

১
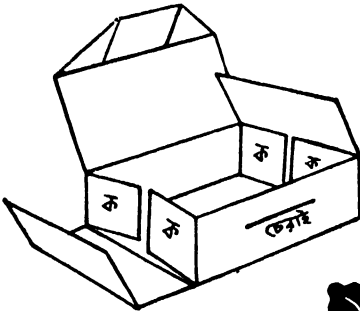
বেশ কিছু রোজগারও হবে। পাশের ছবিতে কাগজের বাক্সের যেমন নমুনা দেখানো হয়েছে, এখন সেই ধরণের বাক্স তৈরা করার প্রণালীর কথা বলি। এ বাক্স তৈরীর জন্ত সরঞ্জাম প্রয়োজন—চৌকোনা বড় সাইজের মোটা কাগজ বা পাৎলা কার্ডবোর্ড (Card board); এই সঙ্গে নেবেন একটি ধারালো ভালো কাঁচি, একশিশি গঁদের আটা একটি কাগজ-কাটা ছুরি, একটি লাইন-টানবার 'স্কেল' বা 'রুলার' (Ruler-Scale) এবং একটি পেন্সিল।

যে সাইজের বাক্স তৈরী করবেন, সেই সাইজ বুঝে অনুরূপ মাপে বড় মোটা কাগজ বা পাৎলা কার্ডবোর্ড নেবেন। এবারে—যে কাগজ বা কার্ডবোর্ড নিলেন, সেটি সমতল টেবিল বা মেঝের উপরে পেতে, পাশের ২নং ছবির ধরণে, সেই কাগজে বা কার্ডবোর্ডে 'রুল' টেনে সম-চতুষ্কোণ কতকগুলি 'ঘর' ছকে নিন—আড়াআড়ি

২
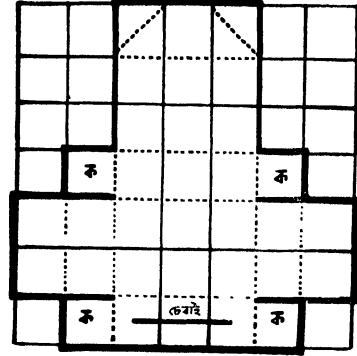
(Horizantal) ও লম্বালম্বিভাবে (Vertical) নক্সার ছাঁদে 'ঘরগুলি' ছকে নেবেন—সব ঘর আগাগোড়া ঠিক সমান মাপের হওয়া চাই।

কাগজ বা কার্ডবোর্ডের বুকে আড়াআড়ি ও লম্বালম্বিভাবে লাইন টেনে সম-চতুষ্কোণ 'ঘরগুলি' ছকে নেবার পর উপরের ২ নং চিত্রে যেমন দেখানো রয়েছে, ঠিক তেমনি ছাঁদে, মোটা-রেখা বরাবর কাঁচি দিয়ে পরিপাটিভাবে বাক্সের 'ফর্ম্মা' (Form) বা 'আকার' কেটে নিন। এবারে কাগজ বা কার্ডবোর্ডের যে 'ফর্ম্মা' বা 'আকারটি' কেটেছেন, সেটিকে উপরের ২নং নক্সায় দেখানো 'ফুটকি-রেখা' (Dotted lines) অনুসারে পরিপাটিরূপে 'ভাঁজ' (Fold) করে নিন—অর্থাৎ দু পাশের 'ক'-চিহ্নিত অংশগুলি হলো বাক্সের 'Corner-Flaps' অর্থাৎ 'কোণার ভাঁজ' এ অংশগুলিকে উপরের ১ নং চিত্রের ভঙ্গীতে ভিতর দিকে মুড়ে দিতে হবে তারপর এই 'ক' চিহ্নিত 'কোণার' দুপাশে কাগজের বা কার্ডবোর্ডের যে বাড়তি 'মোড়কাংশ' বা 'Elaps' আছে, সে দুটিকে প্রাচীরের মতো বাক্সের দুদিককার 'ক'-চিহ্নিত অংশের সঙ্গে আঠা দিয়ে সেঁটে বেশ মজবুত করে জুড়ে দিতে হবে। তাহলেই বাক্সের নীচের অংশ তৈরী হয়ে গেল—এবার উপরের 'ডালার অংশ' তৈরীর পালা। বাক্সের 'ডালার অংশ' তৈরী করার জন্ত ২ নং চিত্রে উপরের দিকে মোটা লাইনের দুই কোনে 'ফুটকি-রেখা' চিহ্নিত কোনাকুনিভাবে যে-অংশ দুটি রয়েছে, সে দুটিকে সুচারুরূপে মুড়ে ভাঁজ (Fold) করে দিতে হবে। বাক্সের ডালার এই অংশটি

তৈরী হয়ে যাবার পর, ১ নং চিত্রে বাক্সের সামনের দিকে নীচেকার অংশে 'চেরাই'-চিহ্নিত জায়গাটিতে আড়াআড়ি-ভাবে লাইন টেনে ছুরি দিয়ে সেই লাইন বরাবর চিরে দিন —এই 'চেরাইয়ের' মধ্যে বাক্সের ডালার ত্রিকোণাকার মুখটি খাপে-খাপে বসিয়ে দিতে হবে·· তাহলেই বাক্স ডালা-বন্ধ থাকবে। এই যে 'চেরাই' করার কথা বললুম, এ 'চেরাইয়ের' কাজটুকু করতে হবে—বাক্সটি ভাঁজ (fold) করে তৈরী করবার আগে। নাহলে, বাক্স তৈরী হবার পর 'চেরাই' করতে গেলে, কাজের অসুবিধা ঘটবে। অর্থাৎ, যখন ২নং চিত্রের ছাঁদে কাগজ বা কার্ডবোর্ড-খানিকে কাঁচি দিয়ে ছাঁটাই করবেন, সেই সময়েই এই 'চেরাই' করার কাজটুকু সেরে নেবেন।

এই হলো কাগজের বাক্স তৈরী করবার মোটামুটি প্রণালী।

বারান্তরে কাগজের কারু-শিল্পের আরো কয়েকটি বিচিত্র সামগ্রী রচনার কথা আলোচনার করবার বাসনা রইলো।

ঘরোয়া সেলাইয়ের কাজ

স্থলতা মুখোপাধ্যায়

'রম্পার' বা 'সান্-স্যুট'

ইতিপূর্ব্বে ছোট ছেলেদের গ্রীষ্মকালে ব্যবহারোপযোগী 'রম্পার' (Romper) বা 'সান্-স্যুট (Sun-Suit) পোষাকের কাপড় ছাঁট-কাট সম্বন্ধে মোটামুটি হদিশ জানিয়েছি। এবারে বলবো ঐ 'রম্পার' বা 'সান্-স্যুট' পোষাকের সেলাই-পদ্ধতির কথা।

পোষাকের কাপড় মাপ-অনুযায়ী বিভিন্ন-অংশে ছাঁটাই হয়ে যাবার পর, সেলাইয়ের পালা। সেলাইয়ের কাজের সময়, প্রথমেই পোষাকের 'নিম্নার্দ্ধ' অংশের অর্থাৎ পাজামার সামনের দিকের একটি অংশের কাপড়ের (পাশের ২ নং চিত্র) সঙ্গে পিছনের দিকের একটি অংশের কাপড় (পাশের ৩ নং চিত্র) আগাগোড়া
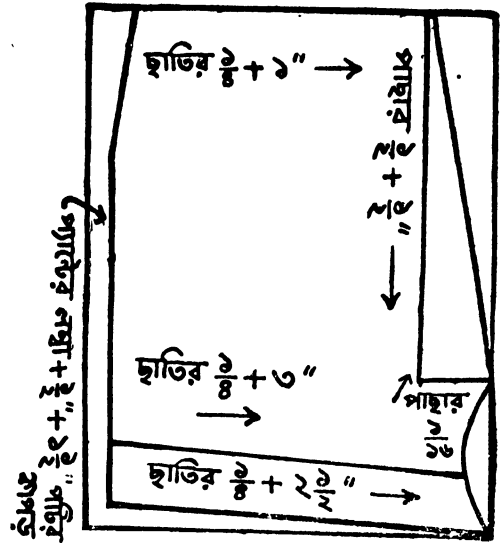
সমানভাবে মিলিয়ে ধরতে হবে। পাজামার কাপড়ের সামনের অংশের সঙ্গে পিছনের অংশটিকে বরাবর সমানভাবে মিলিয়ে ধরলে, দেখবেন—পাজামার সামনের অংশের কাপড়ের টুকরোটি, পিছনের অংশের কাপড়ের টুকরোটির চেয়ে মাপে সামান্য

ছোট। পাজামার পিছনের অংশের কাপড়ের (৩ নং চিত্র) যেখানে 'কোনা' (Corner) ছাঁটাই করা হয়েছে, সেইখানে সামান্য কাপড় 'বাড়তি' বা 'এলাওয়্যান্স' (Allowance) অর্থাৎ উপরে বা কোমরের দিকে $\frac{1}{2}$" ইঞ্চি এবং নীচে বা হাঁটুর দিকে $\frac{1}{2}$" ইঞ্চি মাপের 'বেশী-কাপড়' [Extra pieces of cloth) রাখবেন। এমনিভাবে পাজামার সামনের অংশের কাপড়ের (২ নং চিত্র) উপরের বা কোমরের দিকে $\frac{1}{2}$" ইঞ্চি এবং নীচের বা হাঁটুর দিকে $\frac{1}{2}$' ইঞ্চি বাড়তি মাপের রাখবেন। তারপর কাপড়ের এই দুটি অংশের অর্থাৎ পাজামার সামনের ও পিছনের দিকের দুই টুকরো কাপড়ই বরাবর মিলিয়ে নিয়ে, কাপড়ের 'অন্দর-দিকে' (Inner-Side বা Facing) সেলাই করে পাকাপাকিভাবে জুড়ে দিন। পাজামার কাপড়ের এ দুটি অংশ সেলাই করে জোড়া দেবার সময় বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে সেলাইয়ের কাজ যেন আগাগোড়া সমান লাইনে হয়—কোনো রকম আঁকা-বাঁকা ধরণের যেন না হয়। তাছাড়া 'পাশ' বা 'Side' দুটি যেন বরাবর দু'পাশে সমানভাবে বজায় থাকে।

পাজামার সামনের ও পিছনের অংশ দুটি বরাবর সমানভাবে একত্রে জোড়া লাগানোর পর, কাপড়ের নীচের অর্থাৎ হাঁটুর দিকের 'কিনারার পটি' $\frac{1}{2}$" ইঞ্চি মুড়ে দিয়ে এবং ১" ইঞ্চি ভাঁজ (Fold) করে, 'হেম্-সেলাই' (Hem-Stitch) দিন। তাহলেই পাজামার 'কিনারার পটির' ১$\frac{1}{2}$" সেলাইয়ের কাজ সেরে ফেলবেন। ফলে, পাজামার ঝুল এখন রইলো ১০" ইঞ্চি মাত্র। এবারে পাজামার সামনের 'সেপ' (Shape) বা 'ছাঁদ' যেখানে ছাঁটাই হয়েছে, সেদিকে কাপড়ের অংশ দুটিকে (সামনের ও পিছনের অংশ) বরাবর মুখোমুখি এবং সমানভাবে পেতে রাখুন। বলা বাহুল্য, কাপড়টিকে বরাবর তলার দিকে সমান রেখে উল্টোভাবে অর্থাৎ 'অন্দর-দিকটি' (Innre-facing) উপরভাগে রেখে পেতে নিতে হবে। তারপর পাজামার নীচের দিকের কিনারার 'পটি'-মোড়া, অংশ দুটিকে আগাগোড়া সমানভাবে বিছিয়ে রেখে, গোলাকারে সেলাই দিয়ে ছাঁটাই-করা কাপড়ের টুকরো দুটি একত্রে জুড়ে দিতে হবে। সেলাইয়ের সময় বিশেষ নজর রাখতে হবে—কাপড়ের সামনের অংশ ($\frac{1}{4}$" ইঞ্চি) ছোট এবং পিছনের অংশ ($\frac{1}{2}$" ইঞ্চি) বড়—অর্থাৎ এমনি সামান্য কম-বেশী মাপের যেন থাকে এবং কাপড়টিকে বড়-অংশ থেকে বরাবর যেন ভিতরে মুড়ে সেলাই করা হয়।

অনুরূপ-পদ্ধতিতে পাজামার অপর অংশের সামনের ও পিছনের কাপড় দুটিকেও একত্রে জুড়ে সেলাই করতে হবে। তারপর পাজামার সেলাই-করা এ দুটি অংশ একত্রে জোড়া দেবার কাজ।

এ কাজের জন্যেও, ইতিপূর্ব্বে পাজামার কাপড়ের নীচের দিকে যে দুটি অংশ মুড়ে দেওয়া হয়েছে, সেই দুই প্রান্ত উপরোক্ত প্রথানুসারে অর্থাৎ একটি প্রান্তে $\frac{1}{4}$" ইঞ্চি (ছোট) এবং অপর প্রান্তে $\frac{1}{2}$" ইঞ্চি (বড়) কম-বেশী মাপ বজায় রেখে সেলাই করা দরকার। তাহলেই 'রম্পার' বা 'সান্-স্যুটের' 'নিম্নার্দ্ধ-অংশ' অর্থাৎ 'পাজামার' সেলাই শেষ হলো।

এবারে পোষাকের 'উপরার্দ্ধ-অংশ' অর্থাৎ 'সেস্ত'র (Body) কাপড়ের অংশগুলি সেলাই করার পালা। নীচে 'রম্পার' বা 'সান্-স্যুট' পোষাকের 'সেস্ত' বা 'উপরার্দ্ধ-অংশের' ছাঁটাই করা কাপড়ের অংশ দুটির নমুনা দেওয়া হলো।

পোষাকের 'উপরার্দ্ধ-অংশ' সেলাইয়ের অর্থাৎ 'জামা' সময়, 'রম্পারের গলায় ও কাঁধে (৪ এবং ৫ নং চিত্র) 'পাইপিং' (Piping) বা 'কিনারার পটি' বসানোর আগে, বোতাম ও বোতামের ঘরের জন্য, গোলাকারে ছাঁটা কাপড়ের মাপে চারটি ২" ইঞ্চি পরিমাপের কাপড় দুই ভাঁজ

রে উপরোক্ত ধরণে গোল-ছাঁদে কেটে নিতে হবে। তারপর গোলাকারে-ছাঁটাই-করা ২″ ইঞ্চি ঐ কাপড়ের টুকরো চারটিকে পোষাকের 'উপরার্দ্ধ-অংশের' ভিতরের দিকে বরাবর সমানভাবে সাজিয়ে রেখে 'রম্পারের সামনের (৪ নং চিত্র) ও পিছনের 'উপরার্দ্ধ-অংশে' 'পাইপিং' বা 'পটি' বসিয়ে নিন। যদি বাজার থেকে এ-ধরণের 'পাইপিং' না কিনে, ঘরে কাপড় কেটে 'পাইপিং' রচনা করেন, তাহলে 'বাঁকা' বা 'তেরছা' ছাঁদে ½″ ইঞ্চি চওড়া কাপড় রেখে সমানভাবে 'পটির' কাপড়টিকে ছাটাই করে নেবেন। কারণ, সোজাসুজি-ছাঁদে ছাঁটাই করা কাপড়ে 'পটি' বা 'পাইপিং' ভালো হয় না এবং সে সমানভাবে বসানোর 'পটি' পারেও অসুবিধা ঘটে। 'পাইপিং' এর কাপড় সেলাই য়ে যাবার পর, সেই অংশটিকে কাপড়ের 'অন্দর-দিকে, Inside facing) ভাঁজ (Fold) করে পুনরায় 'হেম্-লাই' বা 'Hem-Stitch' দিন।

এইভাবে পোষাকের উপরার্দ্ধ-অংশে সামনের (৪ নং ত্র) ও পিছনের অংশে 'পাইপিং' বা 'পটি' বসানোর , জামার বগলের দু'পাশে ½″ ইঞ্চি মাপের কাপড় লাইয়ের জন্য বাড়তি রেখে অর্থাৎ সামনে ছাতির দিকে ২″ ইঞ্চি ও পিছনে পিঠের দিকেও ১২″ ইঞ্চি, এবং মরের অংশেও উপরোক্ত ধরণে দু'পাশে ½″ ইঞ্চি পের কাপড় সেলাইয়ের জন্য বাড়তি রেখে সামনের দিকে ১″ ইঞ্চি ও পিছনের দিকে ১১″ ইঞ্চি কাপড় একত্রে জুড়ে সেলাই করে নেবেন। তাহলেই পোষাকের 'উপরার্দ্ধ-অংশটি' সেলাই হলো।

এবারে 'রম্পারের' এই 'বডি' (Body) অর্থাৎ 'উপরার্দ্ধ-অংশের' সঙ্গে পাজামা বা 'নিম্নার্দ্ধ-অংশটিকে একত্রে জুড়ে সেলাই করতে হবে। এক্ষেত্রে পূর্বপ্রথানুসারে ½″ ইঞ্চি মাপের কাপড়, সেলাইয়ের জন্য বাড়তি রেখে, পোষাকের 'উপরার্দ্ধ' এবং 'নিম্নার্দ্ধ' অংশ দুটিকে সেলাই করে একত্রে জুড়ে দিতে হবে। তবে এবারে কাপড়ের সুমুখ-দিকে (Outside-Facing) সেলাই দিতে হবে—আগের মতো 'অন্দর-দিকে' (Inside-Facing) নয়।

অনন্তর, 'রম্পারের' 'কোমর-বন্ধনী' বা 'বেল্টের' (Belt) কাপড়টিকে দু'ভাঁজ (Fold) করে, সেটির একটি প্রান্ত গোলাকারে কেটে নিয়ে, 'পাইপিং' বা 'কিনারার পটি' বসিয়ে নিন। 'পটি' বা 'পাইপিং' সেলাই যেন কাপড়ের 'অন্দর-দিকে' (Inside-Facing) হয়, সেদিকে বিশেষ নজর রাখা দরকার। এ সেলাই হবে 'হাতে-টাঁকা' অর্থাৎ ছুঁচ-সুতো দিয়ে বড়-বড় ফোঁড় তুলে কাঁচা-সেলাইয়ের ধরণে। তারপর ছাতির বা উপরের দিকে ½″ ইঞ্চি এবং পাজামার বা নীচের দিকে ½″ ইঞ্চি কাপড় ছেড়ে, আগাগোড়া কোমরের 'ঘের' (Diameter) অংশে সেলাইয়ের জোড়-লাগানো অংশটুকুর উপরে পোষাকের 'কোমর বন্ধনী' বা 'বেল্টটিকে' সমানভাবে সেলাই করে সেঁটে দিন। এ কাজের সময়, পোষাকের কোমর-বন্ধনী' বা 'বেল্টটিকে' এমনভাবে বসাবেন যে বাঁ-দিকের 'বোতাম-ঘর' থেকে বরাবর সোজা লাইন টানলে, 'বেল্টের' গোলাকার প্রান্তটির মুখ যেন সে লাইনের সমান থাকে।

এই হলো, ছোট ছেলেদের পরিধান-উপযোগী 'রম্পার' বা 'সান্ স্যুট' সেলাইয়ের মোটামুটি নিয়ম।
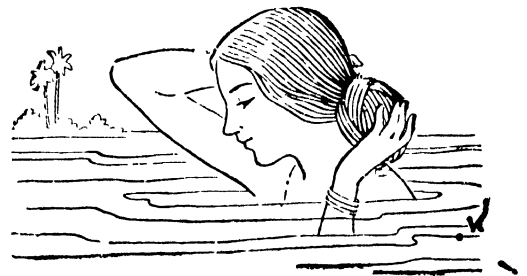
সুধীরা হালদার

গতবারে দক্ষিণ-ভারতের বিশেষ রকম দুটি খাবার তৈরীর কথা বলেছি—দুটি খাবারই সেখানে সাধারণের বিশেষ প্রিয়। এবারে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের দুটি বিশেষ ধরণের খাবার তৈরীর কথা বলবো। প্রথমটি—আমিষ-জাতীয়, দ্বিতীয়টি—নিরামিষ। এ দুটি খাবারই পরম উপভোগ্য।

মোরগ মোসল্লাম্ ঃ

এটি বিচিত্র এক ধরণের মোগলাই খাবার—খেতে বেশ সুস্বাদু। 'মোরগ-মোসল্লাম্' রান্না করতে হলে যে সব উপকরণের প্রয়োজন, গোড়াতেই তার একটা মোটামুটি ফর্দ্দ জানিয়ে রাখি। এ রান্নার জন্য দরকার—বেশ পুরুষ্টু একটি মুরগী, মুরগীর ডিম একটি, টক-দই, আদা-বাটা, হলুদ-বাটা, লঙ্কা-বাটা, ঘি, পেস্তা, বাদাম আর কিসমিস।

উপকরণগুলি সংগ্রহ হবার পর, রান্নার কাজ! রান্নার কাজ সুরু করবার আগে মুরগীটিকে আগাগোড়া পালক ছাড়িয়ে এবং পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি প্রভৃতি সাফ্ করে নিয়ে। সেটিকে বেশ ভালো করে ধুয়ে ফেলতে হবে। তারপর ঐ মুরগীর পেটের ভিতরে, সুসিদ্ধ এবং খোশা-ছাড়ানো মুরগীর ডিম আর আন্দাজ মতো কিস্‌মিস্, পেস্তা ও বাদাম পুরে, আস্ত মুরগীটিকে আগাগোড়া পরিচ্ছন্ন এবং মজবুত সুতো দিয়ে জড়িয়ে বাঁধবেন। মুরগীটিকে এইভাবে আগাগোড়া সুতো জড়িয়ে বেঁধে নেবার পর, উনানের গরম আঁচে ডেকচি চাপিয়ে, সেই ডেকচিতে আন্দাজমতো ঘি দিয়ে "পেটের ভিতরে 'পুর' পোরা" ঐ সুতো-জড়ানো মুরগীটিকে বেশ ভাল করে ভেজে নিতে হবে। এমনিভাবে ভাজার ফলে, মুরগীর মাংস যখন বেশ লাল্‌চে ধরণের দেখাবে তখন ঐ ডেকচিতে আন্দাজমতো জল দিয়ে, সেটিকে খানিকক্ষণ উনানের আঁচে রেখে সু-সিদ্ধ করে নেবেন। মাংস বেশ ভালো-ভাবে সিদ্ধ হলে এবং ডেকচির ভিতরের রান্নার মশলা-মিশ্রিত ঝোল মুরগীর গায়ে আগোগোড়া মাখামাখি হয়ে গেলে উনানের উপর থেকে রন্ধন পাত্রটিকে নামিয়ে ডেকচির মুখে ঢাকা এ... রেখে দিতে হবে। তাহলেই বিচিত্র 'মোগলাই' ...বার—'মোরগ মোসল্লাম্' রান্নার কাজ শেষ।

দই-বড়া—

ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বিচিত্র-জনপ্রিয় নিরামিষ-জাতীয় এই খাবারটিও পরম উপাদেয় এবং রসনা-তৃপ্তিকর। 'দই-বড়া' খাবারটি রান্নার জন্য উপকরণ চাই—মুগের বা কলাইয়ের ডাল, টক-দই, সাধারণ নুন, বিট-নুন, লঙ্কা-গুঁড়ো, সরষের তেল আর ধনে পাতা। এ সব উপকরণ জোগাড় হবার পর, রান্নার কাজ সুরু করবার আগে, প্রয়োজনমতো কলাইয়ে মুগের ডাল নিয়ে, ভালোভাবে বেছে ও ধুয়ে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক কাল সে ডাল পরিষ্কার একটি গামলার জলে ভিজিয়ে রাখুন। এ ভাবে ভিজিয়ে রাখার পর, ভিজা-নরম ডাল পরিষ্কার একটি পাথরের শিলে রেখে বেশ মিহি-ধরণে 'মণ্ডের' (pulp) মতো করে বেটে নিন। তারপর ঐ ডাল-বাটা 'মণ্ডটুকু' বড় একটি গামলায় রেখে, আন্দাজমতো নুন মিশিয়ে 'মণ্ডটিকে' আগাগোড়া ভালোভাবে ফেটিয়ে নিন—যেমন করে সচরাচর বড়ি-দেবার ডাল ফেটিয়ে নেওয়া হয়, তেমনি-ধরণে।

এবারে আন্দাজমতো পরিমাণে রান্নার মশলা অর্থাৎ লঙ্কা ও জিরে নিয়ে সেগুলি ভালোভাবে ভেজে গুঁড়িয়ে রাখতে হবে। তবে খেয়াল রাখবেন—লঙ্কা আর জিরে যেন বেশী ভাজা না হয়; কারণ, বেশী-ভাজা হলে রান্নার মশলার স্বাদ তিক্ত হয়ে যাবে। রান্নার মশলা ভাজা ও গুঁড়ো হয়ে যাবার পর, রন্ধন-পাত্রে আন্দাজমতো সরষের তেল দিয়ে উনানের গরম-আঁচে বসিয়ে দিন। উনানের

আঁচে পাত্রের তেল তপ্ত হয়ে উঠলে, সেই তেলে ঐ ফেটানো ডালের মণ্ড ফেলে প্রয়োজনমতো ছোট-বড় আকারে বড়া ভেজে নিন। এভাবে বড়া-ভাজবার সময়, উনানের পাশেই বড় একটি পাত্রে পরিস্কার জল রেখে, সেই জলে ভাজার সঙ্গে সঙ্গেই গরম বড়গুলিকে সযত্নে নামিয়ে রাখতে হবে। বড়াগুলি যেন অন্ততঃপক্ষে পনেরো থেকে বিশ মিনিটকাল জলে রাখা থাকে—এ রান্নার কাজে সেদিকে সজাগ-দৃষ্টি দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। এমনি ভাবে ডালের বড়াগুলিকে কিছুক্ষণ জলে রেখে দেবার পর, সেগুলিকে জলের পাত্র থেকে তুলে পরিস্কার একটি কাঁচের, এনামেলের বা পাথরের থালায় সাজিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। এবারে ঐ থালায়-রাখা বড়াগুলির উপরে আন্দাজমতো পরিমাণে টক-দই এবং সামান্য জিরে-গুঁড়ো, লঙ্কা-গুঁড়ো, আর খানিকটা ধনে পাতার কুচো ছড়িয়ে দিন। তাহলেই 'দই-বড়া' রান্নার পালা শেষ। তবে রান্নাটিক যদি আরো বেশী সুস্বাদু ও মুখরোচক করে তুলতে চান, তাহলে উপরোক্ত উপকরণের সঙ্গে সঙ্গে আন্দাজমতো পরিমাণে সামান্য একটু বিট-নুন বা সাধারণ-নুন ছড়িয়ে দিতে পারেন। এই হলো বিচিত্র-অভিনব 'দই-বড়া' খাবার রান্নার মোটামুটী নিয়ম।

বারান্তরে, এই ধরণের আরো কয়েকটি বিচিত্র-উপাদেয় ভারতীয় রান্নার বিষয় জানাবার বাসনা রইলো।

সম্পাদনা ঃ শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ভারতের জাতীয় প্রতিযোগিতা এবং রেল ও সার্ভিসেস দল

কলকাতা সহর এম-সি-সি দলের সহিত ভারতের চতুর্থ টেষ্ট খেলার পূর্ব্ব মুহূর্তে সরগরম হয়ে রয়েছে। চতুর্দ্দিকে শুধু একই কথা 'একটা টিকিট হবে?' এতো কলকাতার খেলার আসরের চিরাচরিত ধারা, কি ফুটবল, কি ক্রিকেট, টিকিটের অভাব লেগেই আছে। তারপর এবার কেবল ক্লাবগুলির মাধ্যমে টিকিট দেওয়ার ব্যবস্থার ফলে অনেকের অবস্থা হয়েছে সঙ্গীন। কিন্তু আসন্ন টেষ্টের সম্পর্কে কলকাতা সহর মেতে উঠলেও টেষ্ট খেলা নিয়ে আলোচনা করতে তেমন উৎসাহ আসে না। "ব্রাইট্ ক্রিকেট, ব্রাইট্ ক্রিকেট" করে চেঁচামেচি করলেও বিশেষ করে ভারতীয় দল কোন দিন যে "ব্রাইট ক্রিকেট" খেলবে অন্তত যতদিন নরি কণ্ট্রাক্টর অধিনায়ক আছেন, বলে মনে হয় না। প্রতিবারই টেষ্টের পূর্ব্বে কত জল্পনা-কল্পনা, উৎসাহ-উত্তেজনা আর শেষের দিকে সেই উত্তেজনা বিহীন 'ড্র'। সব টেষ্টগুলির এই একই পরিণতি অসহ্য হয়ে উঠছে। সেজন্য টেষ্টের আলোচনা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়।

ভারতের জাতীয় বা আন্তঃরাজ্য প্রতিযোগিতাগুলিতে সার্ভিসেস ও রেলওয়ে দলের যোগদান সম্বন্ধে কিছু আলোচনার প্রয়োজন আছে। এই রেলওয়ে এবং সার্ভিসেস দলের জাতীয় প্রতিযোগিতায় যোগদানের ফলে বিভিন্ন রাজ্য বা ষ্টেটগুলির শক্তি বিশেষভাবে ক্ষতি হচ্ছে। কয়েকটি ষ্টেটের অধিকাংশ ভাল খেলোয়াড় সার্ভিসেস বা রেলদলে খেলায় সেই ষ্টেটের শক্তি যথার্থ প্রকাশ পাচ্ছে না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে সার্ভিসেস ভারতীয় রেলওয়ে দলকে ভারতের আন্তঃরাজ্য প্র যোগিতায়, যেমন ক্রিকেটের রঞ্জিট্রফি, ফুটবলের সা ট্রফি ইত্যাদি, যোগদানের সার্থকতা আছে খানি। এই দুই দলের যোগদানের স্বপক্ষে যাঁরা, বলবেন, এই দুই দলের যোগদানের ফলে সার্ভিসেস বিশেষ করে রেলদলে অনেক খেলোয়াড়কে গ্রহণ ক খেলাধূলার একটা অর্থকরী দিক খুলে যাচ্ছে এবং ফলে অনেক খেলোয়াড়ের চাকুরীর সংস্থান হচ্ছে। দিক দিয়ে দেখলে এটা খুবই ভাল কথা। কিন্তু জাতী আন্তঃরাজ্য প্রতিযোগিতার বদলে অন্য কোনরূপ প্র যোগিতার ব্যবস্থা করলে এই দুই দল যে খেলো সংগ্রহ করবে না তা মনে হয় না। তা ছাড়া অপর ভারত সরকারের এই দুইটি বিভাগ ছাড়াও আরও ব বিভাগ আছে, এবং তারাও ক্রমশঃ আলাদা রাজ্য এ্যাসোসিয়েশন হিসাবে জাতীয় প্রতিযোগিতায় গ্রহণের দাবী করবে। সার্ভিসেস এবং রেলওয়ে অংশ গ্রহণ করতে দিলে এদের দাবীও মানতে হবে।

সেই ডেকচিতে আন্দ

ভারতীয় পোষ্ট-এণ্ড-টেলিগ্রাফ, ভারতীয় কাষ্টমস, ভারতীয় পুলিশ প্রভৃতি দলের যোগদানের ফলে আন্তঃরাজ্য প্রতিযোগিতা আন্তঃঅফিস প্রতিযোগিতায় পরিণত হবে। বিভিন্ন রাজ্য বা 'ষ্টেটে'র পক্ষে দল গঠন দুষ্কর হয়ে দাঁড়াবে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন 'ষ্টেট' এই ব্যাপারে সজাগ হয়ে উঠেছেন। তাঁরা রেলওয়ে খেলোয়াড়কে বেশী সুযোগ দিতে রাজি নন। এজন্য তাঁদের দোষী করা যায় না।

কারণ সারা বছর একটি রাজ্য এ্যাসোসিয়েশনের পৃষ্টপোষকতায় খেলার এবং বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা লাভের পর যখন একটি খেলোয়াড় জাতীয় প্রতিযোগিতায় রেলওয়ে দলের হয়ে খেলতে যান তখন স্বভাবতই সেই রাজ্য এ্যাসোসিয়েশনের মনে হতে পারে যে এই খেলোয়াড়কে ভবিষ্যতে ভাল খেলার সুযোগ দিয়ে রাজ্যের কোন লাভ হবে না। এর ফলে ব্যক্তিগত ভাবে বিভিন্ন খেলোয়াড় অনেক বিষয় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। তার উপর রেলওয়ে দলের কর্ম্মকর্ত্তাদের আচরণও অনেক খেলায় রাজ্য এ্যাসোসিয়েশনের প্রতি সহানুভূতিশীল নয়। তাঁরা রাজ্য এসোসিয়েশনের শক্তি খর্ব্ব করার জন্য বিভিন্ন ফন্দি ফিকিরের আশ্রয়ও সময় সময় গ্রহণ করেন। ক্রিকেট-ফুটবলের কথা বাদ দিয়ে টেবল টেনিস খেলার কথাই ধরা যাক। এই খেলায় আন্তঃরাজ্য ও আন্ত-এ্যাসোসিয়েশন প্রতিযোগিতায় রেলওয়ে দলের যোগদানের ফলে বাঙ্গলা রাজ্য দল বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একসময় প্রায় সমগ্র রেলদলই বাঙ্গলার খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত হয়। ফলে সেই সময় বাঙ্গলা থেকে ধরতে গেলে জাতীয় প্রতিযোগিতায় দুইটি দল অংশ গ্রহণ করে। বাঙ্গলা রাজ্যদল এজন্য খুবই শক্তিহীন হয়ে পড়ে। রেলওয়ে দলের মনোনয়নের পর যাঁরা দলে মনোনীত হন নি তাঁরা নিজ রাজ্য দলে যদি মনোনীত হন তবে খেলতে পারেন এই নিয়ম আছে। একটি দল (পুরুষ) পাঁচজন খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত হয়। পাঁচজন খেলোয়াড় মনোনীত হবার পর বাকি খেলোয়াড়গণ তাঁদের নিজ নিজ রাজ্য দলের হয়ে খেলতে পারেন। কিন্তু রেলদলের কর্ম্মকর্ত্তাগণ সবশুদ্ধ প্রায় ১০ জন খেলোয়াড়কে 'ট্রায়ালে' আহ্বান করেন এবং তাঁদের চূড়ান্ত দল মনোনয়ন বন্ধ রাখেন যতক্ষণ না রাজ্যদল মনোনয়ন সম্পন্ন হচ্ছে। ফলে কয়েকজন ভাল খেলোয়াড় যাঁরা রেল দলে স্থান পে'লন না, তাঁরা রেল বা তাঁদের নিজ রাজ্য কোন দলের হয়েই অংশ গ্রহণ করতে পারলেন না। এইরূপ আচরণ অতিশয় নিন্দনীয়।

এজন্য জাতীয় বা আন্তঃ রাজ্য প্রতিযোগিতা শুধু রাজ্যগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখাই বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়। তাতে খেলার আকর্ষণও বাড়ে। রেলওয়ে বা সার্ভিসেস দল জিতলো বা হারলো তাতে বিশেষ কেহই মাথা ঘামান না। আর সার্ভিসেস, ভারতীয় রেলওয়ে, ভারতীয় কাষ্টমৃস, ভারতীয় পোষ্ট-এ্যাণ্ড-টেলিগ্রাফ প্রভৃতি দলগুলি নিয়ে আর একটি প্রতিযোগিতা শুরু করলে প্রত্যেকেই নিজ নিজ দলের শক্তি বৃদ্ধির জন্য খেলোয়াড় গ্রহণের দিকে নজর দেবেন। ফলে খেলোয়াড়গণের সম্মুখে আরও নূতন সুযোগ আসবে। নিজ নিজ রাজ্য এবং অফিস এ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতার ফলে খেলোয়াড়দের খেলার মানেরও উন্নতি আশা করা যায়।

***

খেলার কথা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

ইংল্যাণ্ড বনাম পাকিস্থান—১ম টেষ্ট ঃ

পাকিস্থান ঃ ৩৮৭ রান (৯ উইকেট ডিক্লেয়ার্ড। জাভেদ বার্কি ১৩৮, মুস্তাক মহম্মদ ৭৬, সয়িদ আমেদ ৭৪। হোয়াইট ৬৫ রানে ৩, বারবার ১২৪ রানে ৩, এ্যালেন ৬৭ রানে ২ উইকেট)

ও ২০০ রান (আফাক হোসেন ৩৩। ব্রাউন ২৫ রানে ৩, এ্যালেন ৫১ রানে ৩ এবং বারবার ৫৪ রানে ৩ উইকেট)

ইংল্যাণ্ড ঃ ৩৮০ রান (কেন ব্যারিংটন ১৩৯, মাইক স্মিথ ৯৯, এ্যালেন ৪০। মহম্মদ মুনাফ ৪২ রানে ৪ উইকেট)

ও ২০৯ রান (৫ উইকেটে। ডেক্সটার নট আউট ৬৬, বারবার নট আউট ৩৯, রিচার্ডসন ৪৮। ইনতিখ আলম ৩৭ রানে উইকেট)

লাহোরে অনুষ্ঠিত ইংল্যাণ্ড বনাম পাকিস্থানের প্র

কেন্ ব্যারিংটন এম-সি-সি দলের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান

ও ১৮৪ রান (৫ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। ব্যারিংটন নট আউট ৫২। ডুরানী ২৮ রানে ২ উইকেট)

ভারতবর্ষঃ ৩৯০ রান (এস ডুরানী ৭১, বোরদে ৬৯, মঞ্জরেকার ৬৮, জয়সীমা ৫৬ ও কৃপাল সিং নট আউট ৩৮। টনি লক্ ৭৪ রানে ৪ এবং এ্যালেন ৫৪ রানে ৩ উইকেট)

ও ১৮০ রান (৫ উইকেটে। জয়সীমা ৫১ এবং মঞ্জরেকার ৮৪। রিচার্ডসন ১০ রানে ২, ডি আর স্মিথ ১৮ রানে ১, লক ৩৩ রানে ১ এবং এম জে কে স্মিথ ১০ রানে ১ উইকেট)

বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ডের প্রথম টেস্ট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

খেলার ৫ম অর্থাৎ শেষ দিনে ইংল্যাণ্ড ৭২ মিনিটখেলে দ্বিতীয় ইনিংসের ১৮৪ রানের (৫ উইকেটে) মাথায় খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। তখন খেলার সময় পড়েছিল ২৪৫ মিনিট এবং ভারতবর্ষের পক্ষে জয়লাভের জন্যে ২৯৫ রানের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষ ৫ উইকেট হারিয়ে ১৮০ রানের বেশী তুলতে পারেনি। ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ডের প্রথম টেস্ট খেলায় এই কয়েকটি দলগত এবং ব্যক্তিগত রেকর্ড হয়েছে:

ইংলণ্ডের পক্ষে রেকর্ডঃ

(১) প্রথম ইনিংসের ৫০০ রান (৮ উইকেটে) ভারতবর্ষে অনুষ্ঠিত ইংল্যাণ্ড বনাম ভারতবর্ষের টেস্ট খেলায় ইংল্যাণ্ডের পক্ষে এক ইনিংসে সর্ব্বাধিক রানের রেকর্ড। পূর্ব্ব রেকর্ড ৪৫৬ রান, বোম্বাই, ১৯৫১-৫২। (২) ১ম ইনিংসের খেলায় ১ম উইকেটের জুটিতে (রিচার্ডসন এবং পুলার) ১১৯ রান, ভারতবর্ষের বিপক্ষে সমস্ত টেস্ট খেলায় ইংল্যাণ্ডের পক্ষে নতুন রেকর্ড। পূর্ব্ব রেকর্ড ১৪৬ রান (পার্ক হাউস এবং জিওফ পুলার), লিডস, ১৯৫৯।

ভারতবর্ষের পক্ষে রেকর্ডঃ

(১) ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসে উইকেট-কিপার কুন্দরাম ৫ জনকে আউট ক'রে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে টেস্ট খেলার এক ইনিংসে সর্ব্বাধিকজনকে আউট করার রেকর্ড করেন। (২) ৫ম উইকেটের জুটিতে ১৪২ রান (সেলিম ডুরানী এবং চন্দু বোরদে)—ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় ৫ম উইকেটের জুটিতে নতুন ভারতীয় রেকর্ড।

টেস্ট খেলায় ইংল্যাণ্ড ৫ উইকেটে জয়লাভ করে। পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনের খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের ৩৫ মিনিট আগেই খেলায় জয় পরাজয়ের মীমাংসা হয়ে যায়।

পঞ্চম দিনে পাকিস্থান দলের ২য় ইনিংস ২০০ রানে শেষ হ'লে খেলায় জয় লাভের জন্যে ইংল্যাণ্ডের ২০৮ রানের প্রয়োজন হয়। খেলার সময় ছিল ২৫০মিনিট। এই সময়ের মধ্যে তাড়াতাড়ি রান তুলতে গিয়ে ইংল্যাণ্ড ৫টা 'উইকেট হারায় রান ওঠে ১০৮। দলের এই ভাঙ্গনের মুখে খেলেছিলেন ৩য় উইকেটের জুটি নাটা খেলোয়াড় পিটার রিচার্ডসন এবং মাইক স্মিথ। ৭০ মিনিটের খেলায় এই জুটি ৬৯ রান তুলে দেয়। ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটি ডেক্সটার এবং বারবার দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক রান তুলে দেন। জয়লাভের জন্যে প্রয়োজন ছিল ২০৮ রানের; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ইংল্যাণ্ডের ২০৯ রান উঠে যায়।

ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ড—১ম টেস্টঃ

ইংল্যাণ্ডঃ ৫০০ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। কেন ব্যারিংটন ১৫১ নট আউট, টেড ডেক্সটার ৮৫, জিওফ পুলার ৮৩, পিটার রিচার্ডসন ৭১। রঞ্জনে ৭৬ রানে ৪ এবং বোরদে ৯০ রানে ৩ উইকেট।

এম-সি-দলের সহ-অধিনায়ক মাইক্ স্মিথ

ব্যক্তিগত রেকর্ড ঃ ইংল্যাণ্ডের কেন ব্যারিংটনের ১৫১ রান (নট আউট) —তাঁর টেস্ট খেলোয়াড় জীবনে এক ইনিংসে সর্ব্বোচ্চ ব্যক্তিগত রানের রেকর্ড। ভারতবর্ষের ভি এল মঞ্জরেকার তাঁর টেস্ট খেলোয়াড় জীবনে ২০০০ রান পূর্ণ করেন। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় তাঁর পরিসংখ্যান দাঁড়ায় ঃ খেলা ৩৮, মোট রান ২০৮২, এক ইনিংসে সর্ব্বোচ্চ রান ১৭৭, সেঞ্চুরী সংখ্যা ৪।

ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ড—২য় টেস্ট ঃ

ভারতবর্ষ ঃ ৪৬৭ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। পলি উমরীগড় নট আউট ১৪৭, মঞ্জরেকার ৯৬, জয়সীমা ৭০। লক ৯৩ রানে ৩, নাইট ৮০ রানে ২, ডেক্সটার ৮৪ রানে ২ এবং এ্যালেন ৮৮ রানে ১ উইকেট)

ইংল্যাণ্ড ঃ ২৪৪ রান (বারবার নট আউট ৬৯, লক ৪৯, পুলার ৪৬। সুভাষ গুপ্তে ৯০ রানে ৫, বোরদে ৫৫ ৩, রঞ্জনে ৮ রানে ১ এবং ডুরানী ৩৬ রানে ১ উইকেট) ও ৪৯৭ রান (৫ উইকেটে। কেন ব্যারিংটন ১৭২, জিওফ পুলার ১১৯, টেড ডেক্সটার নট আউট ১২৬ এবং রিচার্ডসন ৪৮। গুপ্তে ৮৯ রানে ১, ডুরানী ১৩৯ রানে ১ এবং বোরদে ৪৪ রানে ১ উইকেট)

কানপুরে ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলা বোম্বাইয়ের মতই অমীমাংসিত থেকে যায়। ফলে ভারতবর্ষের উপর্যুপরি ৮টা টেস্ট খেলা ড্র যায়—১৯৬০ সালের অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৫ম টেস্ট, ১৯৬০-৬১ সালের টেস্ট সিরিজে পাকিস্তানের বিপক্ষে ৫টা খেলা এবং ১৯৬১-৬২ সালের টেস্ট সিরিজে ইংল্যাণ্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় টেস্ট খেলা।

দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষের অধিনায়ক কণ্ট্রাক্টর টসে জয়ী হন। পাকিস্তানের বিপক্ষে গত টেস্ট সিরিজের ৫টা টেস্ট খেলার মধ্যে তিনি উপর্যুপরি ৪টে খেলায় টসে জয়ী হ'তে পারেননি। কেবল ৫ম টেস্ট খেলায় জয়ী হ'ন। ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে আলোচ্য টেস্ট সিরিজের ১ম টেস্ট খেলায় পুনরায় তিনি টসে হেরে যান। ক্রিকেট খেলায় টসে জয়ী হওয়ার গুরুত্ব অনেক বেশী।

ভারতবর্ষ প্রথম দিনের খেলায় ৩ উইকেট হারিয়ে ২০৯ রান করে। নট আউট থাকেন ডুরানী (৯ রান) এবং উমরীগড় (১২ রান) মঞ্জরেকার মাত্র ৪ রানের জন্যে সেঞ্চুরী করতে পারেন'নি। দ্বিতীয় দিনেও ভারতবর্ষ ৫½ ঘণ্টা ব্যাট ক'রে। ৭টা উইকেট পড়ে দলের ৪৩৭ রান দাঁড়ায়। উমরীগড় (১৩২ রান) এবং ইঞ্জিনিয়ার (১৮ রান) নট আউট থাকেন। উমরীগড় এই দিন তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় জীবনে ৩০০০ রান পূর্ণ করেন। ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়দের মধ্যে একমাত্র তিনিই ৩০০০ রান পূর্ণ করার গৌরব লাভ করেছেন।

তৃতীয় দিনে ৪৫ মিনিট খেলার পর ভারতবর্ষের অধিনায়ক দলের ৪৬৭ রানের (৮ উইকেটে) মাথায় প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উমরীগড় ১৪৭ রান ক'রে নট আউট থাকেন। ৫১টা টেস্ট খেলায় উমরীগড়ের মোট রান দাঁড়ায় ৩,০৭৯, সেঞ্চুরী সংখ্যা ১১টা—এর মধ্যে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ৩টে। এক ইনিংসে তাঁর সর্ব্বোচ্চ রানের রেকর্ড ২২৩, নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে, ১৯৫৫-৫৬।

ইংল্যাণ্ড প্রথম ইনিংসের খেলায় দারুণ বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে যায়। ৮টা উইকেট পড়ে মাত্র ১৬৫ রান ওঠে। ফলো-অনের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে ইংল্যাণ্ডের ১০৩ রানের প্রয়োজন হয়। বারবার (৪১) এবং লক (০ রান) নট আউট থাকেন। পুরো একদিন বিশ্রাম নিয়ে ইংল্যাণ্ড ৫ই ডিসেম্বর ৪র্থ দিনের খেলা আরম্ভ করে। ইংল্যাণ্ডের

তৃতীয় দিনের নট আউট খেলোয়াড় বারবার এবং লক খুব দৃঢ়তার সঙ্গে খেললেন। তবে ফলো-অন থেকে দলকে রক্ষা করতে পারলেন না। ২৪ রানের ব্যবধানে পিছিয়ে থাকার দরুণ ইংল্যাণ্ডকে ফলো-অন করতে হ'ল। বারবার এবং লক ৯ম উইকেটের জুটিতে দলের ৮১ রান তুলে দিয়ে ভারতবর্ষের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ৯ম উইকেটের জুটির নতুন রেকর্ড করেন। ৪র্থ দিনে ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস ২৪৪ রানে শেষ হয়ে যায়। ফলো-অন ক'রে এই দিন ইংল্যাণ্ড তাদের দ্বিতীয় ইনিংসে ২০০ রান তুলে দেয় ১ উইকেট হারিয়ে। পুলার (১০১ রান) এবং ব্যারিংটন (৪৭ রান) নট-আউট থাকেন।

খেলার শেষ দিনও ইংল্যাণ্ড পুরো ৫২ ঘণ্টা ব্যাট করে, ভারতবর্ষকে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে দান ছাড়ে নি। ইংল্যাণ্ডের ৫টা উইকেট পড়ে ৪৯৭ রান দাঁড়ায়। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ২য় ইনিংসে তিনজন খেলোয়াড় সেঞ্চুরী করেন—কেন ব্যারিংটন (১৭২ নট আউট)। জিওফ-পুলার (১১৯) এবং টেড ডেক্সটার (১২৬ নট আউট)। ভারতবর্ষের পক্ষে সেঞ্চুরী করেন উমরীগড় (১৪৭ নট আউট)।

ভারতবর্ষ টসে জয়লাভ করেও তার সুযোগ পুরোপুরি নিতে পারেনি। অতি মন্থর গতিতে তারা রান করে। ভারতবর্ষ পুরো দু'দিন এবং তৃতীয় দিনের ৪৫ মিনিট ব্যাট করে। ভারতবর্ষের ৮ উইকেটে ৪৬৭ রান দেখতে-শুনতে ভালই। কিন্তু মনে রাখতে তবে টসে জয়ী হয়ে ১১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটের খেলায় এই রান উঠেছে। ক্রিকেট খেলায় জয়লাভের পক্ষে রানের সঙ্গে সময়ও একটা মস্ত বড় ধর্তব্য বস্তু। আলোচ্য টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষের সময়ের জ্ঞান ছিল না। ভারতবর্ষের পক্ষে একমাত্র সান্ত্বনা টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ইংল্যাণ্ডকে প্রথম 'ফলো-অন' করার গৌরব লাভ করেছে। অন্যদিকে ইংল্যাণ্ড উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে—বিপদে পড়লে দৃঢ়তার সঙ্গে কি ভাবে খেলতে হয়।

ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ড—৩য় টেস্ট ঃ

ভারতবর্ষ ঃ ৪৬৬ রান (জয়সীমা ১২৭, ভি এল মঞ্জরেকার ১৮৯ নট আউট, বোরদে ৪৫। এ্যালেন ৮৭ রানে ৪ এবং নাইট ৭২ রানে ২ উইকেট)।

ইংল্যাণ্ড ঃ ২৫৬ রান (৩ উইকেটে। কেন ব্যারিংটন ১১৩ নট আউট, টেড ডেক্সটার ৪৫ নট আউট এবং জিওফ পুলার ৮৯। কৃপাল সিং ২৭ রানে ১, গুপ্তে ৭৮ রানে ১ এবং দেশাই ৫৭ রানে ১ উইকেট)।

নিউ দিল্লীর ফিরোজশাহ কোটলা মাঠে ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ডের তৃতীয় টেস্ট খেলা বৃষ্টির দরুণ চতুর্থ এবং পঞ্চম দিনে অনুষ্ঠিত হয়নি। খেলাটি পরিত্যক্ত হয়েছে। ফলে খেলার ফলাফল ড্র গেছে।

প্রথম দিনের খেলায় ভারতবর্ষ ৩ উইকেট খুইয়ে ২৫৩ রান করে। জয়সীমা তাঁর টেস্ট খেলোয়াড় জীবনের প্রথম সেঞ্চুরী রান (১২৭) করেন। দ্বিতীয় দিনের খেলায় ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ৪৬৬ রানে শেষ হয়। ভারতবর্ষের শেষ দিকের খেলোয়াড়রা কিছুই খেলতে পারেন নি। চা-পানের বিরতির সময় ভারতবর্ষের স্কোর ছিল ৪৪৩ রান (৫ উইকেটে)। চা-পানের বিরতির পরের ৩৫ মিনিটের খেলায় ভারতবর্ষের বাকি সব উইকেট পড়ে গিয়ে রান ওঠে মাত্র ২৩। মঞ্জেরকারের নট আউট ১৮৯ রান, ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষের পক্ষে এক ইনিংসের খেলায় ব্যক্তিগত সর্ব্বোচ্চ রানের রেকর্ড হয়েছে। পূর্ব্ব রেকর্ড ১৮৪ রান (ভিনু মানকড়, লর্ডস, ১৯৫২)। মঞ্জরেকার এবং বোরদের ৫ম উইকেটের জুটিতে ১৩২ রান ওঠে।

দ্বিতীয় দিনে ইংল্যাণ্ড ৪০ মিনিট খেলার সময় পেয়ে ১ উইকেট হারিয়ে ২১ রান তুলে।

তৃতীয় দিনে তারা ২টো উইকেট খুইয়ে ৫৷৷০ ঘণ্টার খেলায় মাত্র ২৩৫ রান যোগ করে। মোট রান দাঁড়ায় ২৫৬ (৩ উইকেটে)। পুলার এবং ব্যারিংটনের ২য় উইকেটের জুটিতে দলের ১৬২ রান ওঠে। ভারতবর্ষের বিপক্ষে ২য় উইকেটের জুটিতে এই ১৬২ রানই ইংল্যাণ্ডের পক্ষে রেকর্ড হয়েছে। পূর্ব্ব রেকর্ড ১৫৮ রান (হাটন এবং পিটার মে, লর্ডস, ১৯৫২)। ব্যারিংটন তৃতীয় টেস্ট খেলায় সেঞ্চুরী (১১৩) রান করায় ভারতবর্ষের বিপক্ষে আলোচ্য টেস্ট সিরিজে উপর্যুপরি ৩টে টেস্টে সেঞ্চুরী করার কৃতিত্ব লাভ করলেন। বোম্বাইয়ের প্রথম টেস্টে ১৫১ নট আউট রান এবং কাণপুরের ২য় টেস্টে ১৭২ রান করেন।

সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলায় যে সব খেলোয়াড় এ পর্য্যন্ত (১৭।১২।৬১) তিন সহস্র রাণ করেছেন তাঁদের নাম :

মোট রান	খেলোয়াড়ের নাম	মোট টেস্ট খেলা
৭,২৪৯	ওয়ালী হ্যামণ্ড (ইং)	৮৫
৬,৯৯৬	ডন ব্র্যাডম্যান (অ)	৫২
৬,৯৭১	লেন হ্যাটন (ইং)	৭৯
৫,৮০৭	ডেনিস কম্পটন (ইং)	৭৮
৫,৭৫৪	নীল হার্ভে (অ)	৭৪
৫,৪১০	জ্যাক হব্‌স (ইং)	৬১
৪,৫৫৫	হার্বাট সাটক্লিফ (ইং)	৫৪
৪,৫৩৭	পিটার মে (ইং)	৬৬
৪,৪৫৫	এ উইকস (ওঃ ইণ্ডিজ)	৪৮
৩,৭৯৮	সি ওয়ালকট (ওঃ ইণ্ডিজ)	৪৪
৩,৫৩৩	এ মরিস (অ)	৪৬
৩,৫২৫	পি হেণ্ড্রেন (ইং)	৫১
৩,৪৭১	বি মিচেল (দঃ আফ্রিকা)	৪২
৩,৪১১	কলিন কাউড্রে (ইং)	৫৩
৩,৪০২	সি হিল (অ)	৪৯
৩,৩৮৬	ফ্র্যাঙ্ক ওরেল (ওঃ ইণ্ডিজ)	৪১
৩,৩৫২	জি সোবার্স (ওঃ ইণ্ডিজ)	৩৭
৩,২৮৩	ফ্রাঙ্ক উলি (ইং)	৬৪
৩,১৬৩	ভিক্টর ট্রাম্পার (অ)	৪৮
৩,০৭৩	এল হ্যাসেট (অ)	৪৩
৩,১০৬	সি ম্যাকডোনাল্ড (অ)	৪৭
৩,১০১	পলি উমরীগড় (ভা)	৫২

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬
ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভাল ভাল উপন্যাস ও গল্প-গ্রন্থ

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়
তৃতীয় নয়ন ৪-৫০

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
নীলকণ্ঠী ৫৲

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
স্বপ্নমঞ্জরী ৩৲

সুধাংশুকুমার গুপ্ত
দিব্যদৃষ্টি ২-৫০

চাঁদমোহন চক্রবর্তী
মিলনের পথে ২-৫০ **মায়ের ডাক** ২৲

অনুরূপা দেবী
গরীবের মেয়ে ৪-৫০ **বিবর্তন** ৪৲
রামগড় ৪-৫০ **বাগ্‌দত্তা** ৫৲
পোষ্যপুত্র ৪-৫০ **পথের সাথী** ৩৲
হারানো খাতা ৩৲ **মন্ত্রশক্তি** ৪-৫০
পূর্বাপর ৪৲

নিরুপমা দেবী
দিদি ৫৲ **পরের ছেলে** ৩৲

পুষ্পলতা দেবী
নীলিমার অশ্রু ৩-৫০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
নীলকণ্ঠ ৩-৫০

শক্তিপদ রাজগুরু
মণিবেগম ৬৲
কেউ ফেরে নাই ৭-৫০
কাজল গাঁয়ের কাহিনী ৪-৫০

জ্যোতির্ময়ী দেবী
মনের অগোচরে ২৲

রাজা রাও ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়
অচল প্রেম ৪৲

ভাস্কর
রুল্‌ অফ থ্রি ২-৫০

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র
উদাসীর মাঠ ২৲ **পরাজয়** ২৲

রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়
কলঙ্কিনীর খাল ২-৫০

কানাই বসু
পয়লা এপ্রিল ২৲
রঙছুট ১-৭৫

ননীমাধব চৌধুরী
দেবানন্দ ৪৲

প্রফুল্ল রায়
নোনা জল মিঠে মাটি ৮-৫০

নরেন্দ্রনাথ মিত্র
উত্তরণ ২-৫০

গিরিবালা দেবী
খণ্ড-মেঘ ২৲

পঞ্চানন ঘোষাল
দুই পক্ষ ২-৫০
মুণ্ডহীন দেহ ৩-২৫
অন্ধকারের দেশে ৩-৫০

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
নতুন আলো (গোর্কীর অনুবাদ) ২-৫০
অসাধারণ (টুর্গেনিভের অনুবাদ) ২৲
মুস্কিল আসান ২-৫০

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
স্বাধীনতার স্বাদ ৪৲
সহরতলী (১ম পর্ব) ২৲

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
স্বয়ং-সিদ্ধা ৩৲
ভুলের মাশুল ১-৫০

পৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য
বিবস্ত্র মানব ৪৲ **কার্‌টুন** ২-৫০
দেহ ও দেহাতীত ৪৲
পতঙ্গ ১ম—২-৫০, ২য়—২-৫০
শ্রেষ্ঠ গল্প (স্ব-নির্বাচিত) ৪৲

আশালতা সিংহ
মধুচন্দ্রিকা ২-৫০ **ক্রন্দসী** ১-৫০
লগন ব'য়ে যায় ১-৭৫

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত
নিষ্কণ্টক ১-৫০ **ভুলের ফসল** ২৲
খেয়ালের খেসারৎ ২৲

উপেন্দ্রনাথ ঘোষ
লক্ষ্মীর বিবাহ ১-৫০

ভোলা সেন
উপন্যাসের উপকরণ ২-৫০

সুধীন্দ্রকুমার দেব
বিচ্ছেদ ২৲

অমরেন্দ্র ঘোষ
পদ্মদীঘির বেদেনী ৩৲
দক্ষিণের বিল ১ম ৪৲, ২য় ৪৲

রামপদ মুখোপাধ্যায়
কাল-কল্লোল ৪-৫০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
কালের মন্দিরা ৩-৫০ **কালকূট** ৩৲
কানু কহে রাই ২-৫০
কাঁচামিঠে ৩৲ **আদিম রিপু** ৩৲
পথ বেঁধে দিল ২-৫০ **গৌড়মল্লার** ৪৲
বিজয়লক্ষ্মী ২-৫০ **কানামাছি** ২-৫০
পঞ্চভূত ২-৫০ **ঝিন্দের বন্দী** ৪-৫০
শাদা পৃথিবী ৩৲ **ছায়াপথিক** ৩৲
বহ্নি-পতঙ্গ ৩-৫০ **বিষকন্যা** ৩৲
দুর্গরহস্য ৩-৫০ **চুয়াচন্দন** ৩-২৫
ব্যোমকেশের গল্প ২-৫০
ব্যোমকেশের কাহিনী ২-৫০
ব্যোমকেশের ডায়েরী ২-৫০

প্রবোধকুমার সান্যাল
নবীন যুবক ২-৫০ **কলরব** ২৲
প্রিয় বান্ধবী ৪৲ **তরুণী-সঙ্ঘ** ২৲
কয়েক ঘণ্টা মাত্র ২৲
দুই আর দু'য়ে চার ২-৫০

অশোককুমার মিত্র
দু'ঘণ্টা ২৲

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
গন্ধরাজ ৩৲
পদসঞ্চার ৫৲

উপনিবেশ
১—৩ পর্ব। প্রতি পর্ব—২-৫০

সরোজকুমার রায়চৌধুরী
বহ্ন্যুৎসব ১-৫০

উপেন্দ্রনাথ দত্ত
নকল পাঞ্জাবী ২৲

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
ঝড়ো হাওয়া ২-৫০

বনফুল
পিতামহ ৬৲ **নবমঞ্জরী** ২-৫০
নঞ্‌তৎপুরুষ ৩৲

সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য
মিলন-মন্দির ৩৲

প্রভাত দেবসরকার
অনেক দিন ৩-৫০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
কাক-জ্যোৎস্না ৩৲

জাতির সেবায় নিয়োজিত
ভারত পটারিজ
এইচ টি ও এল, টি,
ইলেকট্রিক্যাল
ইনস্যুলেটর-এর জন্য
হোটেল ও গৃহের জন্য
শ্রেষ্ঠ সুন্দর পোর্সিলেনের চায়ের সরঞ্জাম
ও বাসন, হস্ত-চিত্রণ এগুলোর বিশেষত্ব।
ইণ্ডিয়া ফিল্টার
ভারতে এই সর্ব্বপ্রথম
INDIA FILTER
প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক ইণ্ডিয়া পটারিজ্ লিমিটেড, ৯১, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩
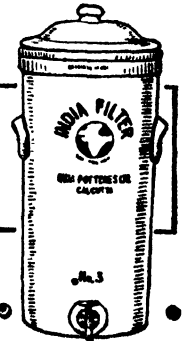
স্বল্প মূল্য
দীর্ঘ স্থায়ী
উজ্জ্বলতর আলো

দ্বিতীয় খণ্ড | ঊনপঞ্চাশত্তম বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

দান তত্ত্ব

অধ্যাপক ডাঃ নৃপেন্দ্রনারায়ণ দাস

উপনিষদে একটী সুন্দর গল্প আছে। প্রজাপতির তিন পুত্র দেব, দানব ও মানব। পুত্রদের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে তিনি মাটীর উপর একটা "দ" লিখিয়া পুত্রদের একে একে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া উপদেশ দিলেন। দেবগণকে বলিলেন—"দ" মানে দমন কর; দানবগণকে বলিলেন—"দ" মানে দয়া কর ও নরগণকে বলিলেন—"দ" মানে দান কর। (১) ব্যাখ্যাকারগণ বলেন—মানুষ সাধারণতঃ লুব্ধ প্রকৃতির—এই জন্যই দান করা মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। মনুসংহিতায় বলা হইয়াছে কলিযুগে দানই একমাত্র ধর্ম্ম। (২) মহাভারতের নানাস্থানে দানের মাহাত্ম্যের কথা বলা হইয়াছে। অন্যান্য ধর্ম্মেও দান করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু গৃহীর পক্ষে

(১) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ পঞ্চম অধ্যায় দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ। দান শব্দটী বহু অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যেমন, (ক) ধনদান অথবা ধনের পরিবর্ত্তে যে সকল জিনিষ পাওয়া যায় যথা অন্নদান, বস্ত্রদান (খ) অভয়দান, প্রাণদান প্রভৃতি অথবা (গ) ত্যাগ অর্থে দান শব্দটি ব্যবহার করা যায়। উপনিষদের এই শ্লোকটীতে দান শব্দটী যে প্রথম অর্থে ব্যবহার করা যাইতে পারে তাহা নিঃসন্দেহ। আমরা এই প্রবন্ধে প্রথম অর্থেই এই শব্দটী ব্যবহার করিব।

(২) মনু সংহিতা—১ অধ্যায়—৮৬ শ্লোক।

কি পরিমাণ দান করা উচিত? সর্ব্বস্ব দান করা কি গৃহীর উচিত? বাইবেলে ও মুসলমানদের ধর্ম্মগ্রন্থে আয়ের বা সম্পত্তির এক দশমাংশ দান করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। (৩) হিন্দুদের পুরাতন গ্রন্থে দানের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করা হয় নাই, কিন্তু অত্যধিক দানের নিন্দা করা হইয়াছে ও নিজের অবস্থানুযায়ী দান করিতে বলা হইয়াছে। (৪)

কি ভাবে দান করিবে? উপনিষদে বলা হইয়াছে, "যাহা কিছু দান করিবে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান করিবে, অশ্রদ্ধায় দান করিবে না; বিভবানুরূপ দান করিবে অথবা প্রসন্নতার সহিত দিবে।"(৫) বাইবেলেও প্রসন্নতার সহিত দান করিতে বলা হইয়াছে। (৬) বাইবেলে আরও বলা হইয়াছে লোকের প্রশংসা লাভের জন্য ঢাক পিটাইয়া দান করিবে না, গোপনে দান করিবে। (৭) কাহাকে করিবে? স্থান, কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়া কি দান করা উচিত নহে? এইরূপ বিবেচনাপূর্ব্বক দান না করিলে সংসারে আলস্য বঞ্চনা ও ভিক্ষুকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, যাহারা সৎকার্য্যে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারে তাহারাও ভিক্ষুক বা প্রবঞ্চক হয়। এই জন্য গীতাতে বলা হইয়াছে, "যাহার প্রত্যুপকার করিবার সম্ভাবনা নাই তাহাকে দান এবং দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়া যে দান তাহাই সাত্ত্বিক দান। প্রত্যুপকারের প্রত্যাশায় যে দান, ফলের উদ্দেশ্যে যে দান ও অপ্রসন্ন হইয়া যে দান করা যায় তাহা রাজস দান। দেশ, কাল, পাত্র বিচারশূন্য যে দান অনাদরে ও অবজ্ঞাযুক্ত যে দান তাহা তামস দান।" (৮) গীতার শঙ্করভাষ্যে এই শ্লোকটীর ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে কুরুক্ষেত্রাদি দেশে, সংক্রান্তি প্রভৃতি কালে এবং বেদজ্ঞ আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণাদি পাত্রে দানই সাত্ত্বিক দান। গীতায় ও মহাভারতের অন্যান্য অংশে ব্যক্তি বিশেষকে দান করার কথা বলা হইয়াছে কিন্তু কোন আশ্রম, সঙ্ঘ, মঠ বা প্রতিষ্ঠানকে দানের কোন উল্লেখ নাই। বৌদ্ধযুগেই বোধ হয় কোন প্রতিষ্ঠানকে বা সঙ্ঘকে দান করা প্রথম প্রচলিত হয়। জেত-বন-বিহার দানের কাহিনী বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। পরবর্ত্তী কালে প্রতিষ্ঠানকে দান করা বিশেষ ভাবে বিস্তার লাভ করে।

যুগধর্ম্মের প্রভাবে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে রাজ্য সরকার বেকার ব্যক্তিগণকে ভাতা, বৃদ্ধদের পেনসান্ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে ও রুগ্ন ব্যক্তিদিগের চিকিৎসার জন্য বহু হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এমন কি কোন কোন দেশে আইন করিয়া ভিক্ষা করা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। আমাদের দেশেও এই সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই প্রবর্ত্তিত হইবে

---

(৩) বাইবেলে "Titho" কথাটি ব্যবহার করা হইয়াছে। Malachi ch III

(৪) অতিদানে বলির্বদ্ধঃ সর্বমত্যন্তগর্হিতম্"—চাণক্য শ্লোক ও সাধারণ প্রবচন।

(৫) শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধয়াঽদেয়ম্। শ্রিয়া দেয়ম্। ভিয়া দেয়ম্। সংবিদা দেয়ম্।

তৈত্তিরীয়োপনিষদ ॥ ৩ ॥ ২৪ ॥

পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ত-তীর্থ মহাশয়ের অনুবাদ। দেব সাহিত্য কুটীর। পাতা ৬৪।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ইহার একটী সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়াছেন। শান্তি-নিকেতন—দ্বিতীয় খণ্ড—২৮৮ পাতা দ্রষ্টব্য।

(৬) God loves a cheerful giver—II Corinthians. 7

(৭) Therefore when thou doest thine alms, do not sound a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets that they may have glory of men ** But when thou doest alms let not thy left hand know what thy right hand doeth" —St. Mathew chap. V.

মনু সংহিতায় ও বলা হইয়াছে দান করিয়া তাহা পরের নিকট কীর্ত্তন করিলে দানের সেই ফল ভ্রষ্ট হইয়া যায়। চতুর্থ অধ্যায় ২৩৭ শ্লোক।

(৮) দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥১৭।২০॥
যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥১৭।২১॥
অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥১৭।২২॥

শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অনুবাদ—ধর্ম্মতত্ত্ব—২৬ অধ্যায়

বলিয়া আশা করা যায়,কারণ আমরা "Socialist pattern of life" আমাদের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। অতএব ভবিষ্যতে এরূপ অবস্থা হইতে পারে যখন সংক্রান্তিতে ব্রাহ্মণকে কেহ দান করিবে না বা দান গ্রহণেচ্ছু ব্রাহ্মণও পাওয়া যাইবে না। কেবলমাত্র সাত্ত্বিক দান নহে, সকল প্রকার দানই হ্রাস পাইবে বা বন্ধ হইয়া যাইবে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে ইহার ফলে ভক্তি, প্রীতি, দয়া প্রভৃতি বৃত্তির অনুশীলন ব্যাহত হইবে ও মনুষ্যত্ব বিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি হইবে কারণ বৃত্তির অনুশীলনই মানুষের মনুষ্যত্ব। (৯) কেবলমাত্র জৈব প্রয়োজন মিটাইলেই মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় না। ব্যক্তি বিশেষকে দান করিবার সুযোগ হ্রাস পাইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রতিষ্ঠানকে দান করার সুযোগ নিশ্চয়ই থাকিবে। ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে Salvation army, Red Cross প্রভৃতি বহু-জনহিতকর প্রতিষ্ঠান সাধারণের দানের উপর নির্ভর করিয়া আজও চলিতেছে। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্বেই বলিয়াছি দান শব্দটী ধন দান বা অর্থদান ভিন্ন অন্য অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই লিখিয়াছেন, "দানের প্রকৃত অর্থ ত্যাগ। ত্যাগ ও দান পরস্পর প্রতিশব্দ। দয়ার অনুশীলনার্থ ত্যাগ শব্দও অনেক স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই ত্যাগ অর্থে কেবল ধনত্যাগ বুঝা উচিত নহে। সর্ব্বপ্রকার ত্যাগ—আত্মত্যাগ পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে। আপনাকে কষ্ট দিয়া পরের উপকার করিবে, তাহাই দান" (১০) এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগে ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় বহু বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা একাকী নিরানন্দময় নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতেছে। তাহাদিগকে সঙ্গদান বা আনন্দদান করা একটী সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে এবং এজন্য বিলাতের কাগজে বিশেষ করিয়া আবেদন করা হইতেছে। আমাদের দেশেও যুগধর্ম্মের প্রভাবে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য হয়ত এইরূপ সমস্যার সৃষ্টি করিবে, তখন অর্থদান অপেক্ষা সঙ্গদান বা অভয়দান করিবার সুযোগ অধিক পাওয়া যাইবে। তাই মনে হয় ভবিষ্যতে সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত হইলেও প্রীতি বা দয়া-বৃত্তি অনুশীলনের জন্য সুযোগের অভাব হইবে না।

(৯) "দয়া বৃত্তির অনুশীলনের জন্য দানকরিবে; দয়া বৃত্তিতে প্রীতি বৃত্তিরই অনুশীলন এবং প্রীতি ভক্তিরই অনুশীলন। অতএব ভক্তি, প্রীতি, দয়ার অনুশীলনের জন্য দান করিবে। বৃত্তির অনুশীলন ও পূর্ত্তিতে ধর্ম্ম, অতএব ধর্ম্মার্থেই দান করিবে।"

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ধর্ম্মতত্ত্ব ২৬ অধ্যায়। "মানুষের সুখ মনুষ্যত্ব, সকল বৃত্তিগুলির উপযুক্ত পূর্ত্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্যের সাপেক্ষ।

ধর্ম্মতত্ত্ব—৫ অধ্যায়।

(১০) ধর্ম্মতত্ত্ব—২৬ অধ্যায়।

(১১) Statesman—issue of 8. 10. 61 pages 8.

প্রস্তুতি

সন্তোষকুমার অধিকারী

এপারে দীপ্তি, ওপারে অন্ধকার
ওপারে আকাশ ভীষণ নীরব শূন্য;
আলোর লগ্নে কখন নেমেছে রাত্রি।
অথচ এপারে এখনও ব্যস্ত ভীড়,
কলরবময় পৃথিবী, মুখর মন,
ভাবি, এইবার প্রস্তুত হ'বে যাত্রী।

শেষ ত' হয়েছে সময়ের হাটে ঘাটে
কেনা বিক্রীর জীবন ভরানো নৃত্য;
সূর্যদীপ্ত দিগন্ত হ'লো ম্লান।
সামনে আঁধার সীমাহীন, মন মুগ্ধ;—
জীর্ণ দেহের অঙ্গে অনেক ক্লান্তি,
এবার শান্ত মৌনের করো ধ্যান।

এ পারে এখনও মুখর জীবন; রাত্রি
আকাশে, খেয়ার প্রস্তুতি কই যাত্রী?

অভিন্ন

শ্রীনির্মলকান্তি মজুমদার

ফুলতলা গ্রামের সবাই তাঁকে হরু খুড়ো ব'লে ডাকে। তাঁর আসল নামটা যে হরেন চাটুজ্যে তা হয়তো কেউ কেউ জানে। কেননা মাসে মাসে ঐ নামে কুড়ি টাকার মনি অর্ডার আসে কলকাতা থেকে।

হরু খুড়ো মানুষটি বেশ লম্বা চওড়া। প্রশস্ত বিদ্যা-সাগরী কপাল, ধবধবে দাঁত, পিঠে মস্ত বড় একটা দাগ। প্রায় বারো মাসই খালি গা। শীতকালে একটা ফতুয়া আর যখন খুব বেশী ঠাণ্ডা পড়ে তখন একটা মোটা চাদর। কোঁচার খুটটা নাইয়ের ওপর কোমরে গোঁজা। হাতে মাঝারি রকমের হুঁকো। সর্বদাই তামাক চলছে।

হরু খুড়োর বয়স ষাট থেকে সত্তরের মধ্যে। অটুট স্বাস্থ্য, কখনও শুনিনি তাঁর রোগ হয়েছে। আহারে অরুচি দূরের কথা, যোল আনা লোভ—বর্তমান।' খাওয়া-দাওয়া, গল্প গুজব, পঞ্চায়েতের কাজ—এই নিয়েই আছেন।

হরুখুড়ো লেখা পড়া তেমন শেখেননি। মোটা মোটা অক্ষরে নাম সই করতে পারেন ঐ পর্য্যন্ত। বংশে অবশ্য সরস্বতীর কৃপা ছিল। ছোট ভাই আইন পাস ক'রে হাকিম হয়েছিলেন। হাকিম ভাইয়ের কথা উঠতে বসতে বলেন হরুখুড়ো—সে যে সে লোক নয়। সাহেব সুবোর সংগে খুব মেলা মেশা। অনেক টাকা খরচ হয় বাসাই বোতলে। বউ থাকতে আবার বিয়ে করেছে। কাউকে গ্রাহ্য করেনা ইত্যাদি ইত্যাদি।

হরুখুড়ো বাস করেন বিরাট দোতলা বাড়িতে। তিন পুরুষের সাবেকী বাড়ি। কোন কোন অংশের গায়ে গাছ পালা গজিয়েছে। কোন কোন অংশের অবস্থা এমনই শোচনীয় যে যখন তখন ভেঙ্গে পড়তে পারে। অন্দর মহলের এক দিকটা এত অন্ধকার যে দিনের বেলাতে ও সেখান দিয়ে যেতে গা ছমছম করে। দুর্জয় সাহস হরু-খুড়োর। সেই নিঝুম পুরীতে একা থাকেন। একদিন দুপুরে কি একটা জিনিস আনতে গিয়েছিলাম। দোতলার সিঁড়ির অন্ধকারে মনে হ'ল কে যেন আমাকে জড়িয়ে ধরছে। ভয়ে ফিট হবার উপক্রম। সেই থেকে আর কোন দিন ওদিক মাড়াইনি—হাজার লোভ দেখালেও না।

বিধু আর সিধুকে রেখে কবে সৌদামিনী ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন সে কথা এখন আর হরুখুড়োর মনে পড়েনা—সে যেন কত যুগ আগে। বিধু দুটো পাশ ক'রে হাইকোর্টে ঢোকে। সিধু সসম্মানে তিনটে পাস ক'রে জামাই হয়েছিল নারাণপুরের মুখুজ্যেদের। হলে কি হবে, অদৃষ্ট মন্দ। দুম করে সিধু মারা গেল দুবছর না যেতেই। বিধু সপরিবারে বাস করে শিবপুরে—বছর বছর পুজোর ছুটিতে বুড়ো বাপকে দেখে যায়। সিধুর বউ কোলের মেয়ে নিয়ে বরাবর বাপের কাছেই ছিল। নাতনীর অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে নবীন মুখুজ্যে চোখ বুঁজলেন। তার পর থেকে সিধুর বউ মাঝে মাঝে ফুলতলায় এসে থাকে, শ্বশুরকে রান্না ক'রে খাওয়ায়। দেখা শোনা করে।

হরুখুড়োর সংগে ভারি বন্ধুত্ব পশুপতি রায়ের। পশু-পতিকে মিতে বলে ডাকেন হরুখুড়ো। পশু হরুর চেয়ে তিন চার বছরের বড়। দেওয়ানী আদালতে সামান্য কাজে ঢুকে শেষে কিছু দিনের জন্য মহকুমা আদালতে নাজিরের পদে বসে ছিলেন। পেনশন নিয়ে এখন গ্রামেই বাস করেছেন। মাইনর পাস—নাটক নভেল পড়ার নেশা আছে। কথায় কথায় ছড়া কাটেন, আর মুখে মুখে কবিতা রচনা করেন। মাথায় মস্ত টাক—আয়নার মতো চকচকে অথচ বেশ কর্মঠ। রোজ ভোর বেলা গঙ্গাস্নান

করতে যান হরুখুড়োর সংগে দুমাইল দূরে খোসালপুরের ঘাটে। আমরা যখন পড়া সেরে মার্বেল খেলি, তখন হরুখুড়ো আর পশু-মিতে বাড়ি ফেরেন—হাতে সরষের তেলের খালি শিশি। কাঁধে নিঙড়ানো ভিজে কাপড়। মাথায় আধ শুকনো গামছা। চাকরি জীবনে পশু রায় গ্রামে গ্রামে ডিক্রি জারি ক'রে ফিরতেন। সে অভ্যাস আজও যায়নি। চটি পায়ে দিয়ে ঘুরে বেড়ান সর্ব্বত্র। হরুখুড়োর পায়ে 'কুল আঁটি'। তাই সব সময়েই পরে থাকেন এক জোড়া ক্যাম্বিসের জুতো—যা বুরুশ করতে হয়না আর যার ফিতে বাঁধার বালাই নেই। দুজনেই খালি পা করতে নারাজ। এই নাগরিক কৌলিন্যটুকু দুই বন্ধুরই আছে।

হরু ও পশুর দাবার নেশা উৎকট। খেলা জমলে একদম খেয়াল থাকেনা। বেলা গড়িয়ে যায়, খাওয়া দাওয়া মাথায় ওঠে, ডাকাডাকিতে ফল হয়না। শেষে যখন পশুর স্ত্রী ইন্দুবালা এসে গালাগালি আরম্ভ করেন তখন ভয়ে পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রে উঠে পড়েন। একদিন সকালে গংগা স্নানের পর জলযোগ ক'রে দুজনে বসেছেন মনের সাধে দাবা খেলতে। গোয়ালাপাড়ার ফটিকের মা ছুটতে ছুটতে এসে বলে—ওখুড়ো মশাই, আমাদের বিপিনের ছেলেটাকে সাপে কামড়েছে। জ্ঞান গম্যি নেই, মুখ দিয়ে ফেনা বেরোচ্ছে। বিপনে বাড়ি নেই, কুসমি কেঁদে আকুল। তুমি গাঁয়ের মাথা, একটা বিহিত কর।

হরু গজের কিস্তি দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করেন—কাদের সাপ?

ফটিকের মা'র বয়সের গাছপাথর নেই, তবে খুব শক্ত সমর্থ। কাউকে ভয় করেনা। বুড়ি রেগে উঠে বলে—আ মরণ! বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরেছে। বলে কিনা কাদের সাপ! মাছ ধরবে ব'লে অন্ধকার থাকতে কেঁচো তুলতে গিয়ে গিয়েছিল বাড়ির পেছনে মান কচু বনে। জাত গোখরো ছোবল মেরেছে কপালের মাঝখানে।

চাল ফেরত নিয়ে হরু আবার বলেন—যাক চোখটা বেঁচে গিয়েছে এই ভাগ্যি।

বুড়ি চেঁচিয়ে ওঠে—মুখে আগুন তোমার, আগে প্রাণ না চোখ? প্রাণটাই যদি যায় তো চোখ নিয়ে কি ধুয়ে খাবে? খেলা বন্ধ কর, গিয়ে দেখ অবস্থাটা কি হয়েছে। তুমি নেশায় মেতে থাকলে গাঁ যে উচ্ছন্ন যাবে।

এতক্ষণে ব্যাপারটা হরুর মাথায় ঢোকে, বলেন—মিতে, আজকের মতো খেলা এখানেই বন্ধ থাক। ছেলেটাকে বাঁচাতে হবে। বড় অন্যায় হয়ে গেল। এতটা দেরি করা উচিত হয়নি।

ফটিকের মা'র সংগে হনহন ক'রে বিপিনের বাড়ি এসে পৌঁছান হরু খুড়ো, খঞ্জনার ক্ষুদিরাম ওঝাকে ডেকে আনতে লোক পাঠান। ভাগ্যক্রমে সে ফুলতলায় এসেছিল কাজে। দশ মিনিটের মধ্যেই ঝাড় ফুঁক আরম্ভ ক'রে দিলে। মন্তর প'ড়ে গাছের শেকড় বেঁটে খাইয়ে আশ্বাস দিলে বেঁচে যাবে ছেলেটা। সারাদুপুর ঠায় বসে থাকেন হরু খুড়ো বিপিনের দাওয়ায়। বিকেলের দিকে ছেলেটা চোখ মেলে চাইতে কতকটা নিশ্চিন্ত হন। ক্ষুদিরামকে থাকতে ব'লে কুসুমকে ভরসা দিয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়ান। অনাহারে উৎকণ্ঠায় দেহ ক্লান্ত।

পশু রায়ের বাড়ির কাছে থমকে দাঁড়ান হরু খুড়ো। ইন্দু-বউঠানের গলা শোনা যায়। খুব ঝগড়া হচ্ছে। এরকম প্রায়ই হয়। মিতের মেজাজ চটা—সামান্য কথায় রেগে ওঠেন। খাওয়া দাওয়ার একটু এদিক ওদিক হ'লে আর রক্ষা নেই। দাঁতের জোর কম—রোজ চাল ভাজা গুড়ো চাই। কতবেলের চাটনির বদলে চালতের অম্বল হ'লে বিরক্ত হন। আজ উচ্ছে, কাল নিম-বেগুন, পরশু পলতার ঝোল। কোন দিন বড়ি ভাজা, কোনদিন মটর ডাল ভাতে, কোনদিন থোড় চচ্চড়ি—নিত্য নতুন ফিরিস্তি, আয়োজন একঘেয়ে হ'লে জলে যান। বউঠানের স্বভাবটাও তিরিক্ষি। দোষ দেওয়া যায় না।—একে দ্বিতীয় পক্ষ, তার ওপর বয়সের পার্থক্য কম ক'রে কুড়ি। একটি মাত্র ছেলে। সেও বেরিয়ে গিয়েছে পরিবার থেকে—শাশুড়ী-বউয়ে বনিবনাও হয়নি। বিদেশে রোজগার করে। ভুলে এক লাইন চিঠি লেখেনা মা-বাপকে। মেয়েটি সন্তান হওয়ার আগেই বিধবা হয়। সেই থেকে নবদ্বীপে থাকে ঠাকুর দেবতা নিয়ে—মায়া বন্ধন সম্পূর্ণ এড়িয়ে। বউঠানের শূন্য সংসার। একটা নাতি নাতনী নেই যে তাকে মানুষ করে সময় কাটাবেন। উদর-সর্বস্ব

স্বামীর হুকুম তামিল করতে করতে এক একদিন ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন।

বাড়ির ভিতর ঢুকে হরুখুড়ো দেখেন কুরুক্ষেত্র বেধেছে। বউঠান চিৎকার ক'রে বলেন—কোথায় ছিলেন আজ ঠাকুরপো, এতক্ষণ টিকিটি পর্যন্ত দেখতে পাইনি? শুনুন আপনার মিতের কাণ্ড। দুধ জ্বাল দিয়ে ক্ষির ক'রে রেখে-ছিলাম। ঢাকা উলটে বেড়ালে খেয়ে গিয়েছে, আমি তার কি করব? আমায় গালাগালি দিচ্ছেন যা মুখে আসে তাই ব'লে, আর শাসাচ্ছেন বাড়ি থেকে দূর ক'রে দেবেন। কাকে ভয় দেখাচ্ছেন জানিনে। আমি কি তোমাক করি এই অলুক্ষণে গেরস্তালির? আটাগের বোনপো ছ মাস ধ'রে সাধছে। আমি কালই যাব তার কাছে। আপনি তো ভাই খেতে দেতে ভালোবাসেন, আর রান্নাবান্নাও জানেন। চালাবেন ঘরকন্না দুই মিতেয় মিলে। ছোট বউমা লক্ষ্মী মেয়ে। সে এলে দুজনকেই দেখবে। আমি কিছুদিন হাড় জুড়িয়ে আসি।

হরুখুড়ো বলেন—ছি ছি, ভারি অন্যায় মিতের। এই সব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে আপনার সঙ্গে রাগারাগির মানে হয়! কতদিন কতবার বলেছি একটু সংযত হতে। কে শোনে কার কথা! মানুষের স্বভাব যে মরলেও যায় না। আপনি দুদিন অন্য কোথাও গেলে চোখে যে অন্ধকার দেখতে হবে। শুধু কি মিতের অসুবিধে, একটু তামাক খেতে ইচ্ছে হলে আমাকেও নিজে সেজে নিতে হবে।

হরু ইন্দুবালার পক্ষ সমর্থন করায় পশু খটখট ক'রে রোয়াকের অপর প্রান্তে চলে যান। তিনি জানেন, হরু তাঁর স্ত্রীর হয়ে ওকালতি করবেই। তার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর রাখে ব'লে বউঠানের ওপর হরুর খুব শ্রদ্ধা।

হরু আবার বলেন—বউঠান, উত্তেজিত হবেন না। মিতের কথা গায়ে মাখবেন না। কাল একটু বেশী করে ক্ষীর খাওয়াবেন, সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। খেতে আমিও ভালবাসি, কিন্তু পান থেকে চুন খসলে অমন মাথায় আগুন জ্বলে না। সব মানুষ তো সমান নয়, উপায় কি? থাক, উঠুন, আমার জন্য একবাটি মুড়ি মেখে আনুন দেখি। বেলা গেল, পেটে কিছু পড়েনি এখনও।

ইন্দুবালা মিষ্টি কথায় জল হয়ে যান। হরু ঠাকুরপো না থাকলে নিত্য নৈমিত্তিক কলহ তাঁদের পারিবারিক জীবনকে কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলত কে জানে! হরুর কাছে সত্যই তিনি কৃতজ্ঞ। বউঠান দৃষ্টির আড়ালে গেলে হরু মিতেকে কাছে ডেকে ধমক দিয়ে বলেন—গজগজ করে আর কি হবে? একবার গোয়ালাপাড়ায় যাও। বিপিনের ছেলেটার বিষ নামল কিনা খবর নিয়ে এস। বাইরের খোলা হাওয়ায় তোমার মনের বিষও নেমে যাবে।

দিন দুই পরে। সকালে কুসুম গোয়ালিনী আসে হরুর বাড়ি। হাতে পোয়াটেক ছানা। ছেলে সেরে উঠেছে। খুড়ো মশায়ের অশেষ দয়া। খুশী হয়ে হরু বলে—কুসমি, তুই আমার মেয়ের মতো। একটা কথা বলি শোন। বড় সরল মানুষ তোরা—যেমন তুই তেমনি বিপনে। তোদের আর জন্মের পুণ্যি আছে, পুত্রশোক হবে কেন? আমি নিশ্চয় পাপী, নইলে কি আর দু দুটো নাবালক শিশু রেখে গিন্নী চলে যায়, না সোমত্ত বউ এক মাসের মেয়ে ফেলে দপ করে মরে যায়। ছেলের মতো ছেলেটা!

কুসুমের চোখ ছলছল করে। খুড়ো মশাইকে ভগবান কেন এমন শাস্তি দিয়েছেন সে কিছুতেই বুঝতে পারে না। আঁচলে চোখ মুছে খুড়োমশাইকে প্রণাম ক'রে বিদায় নেয়।

বেলা আন্দাজ দশটা। হরু পোষ্ট অফিস যাবেন। বিধুর চিঠি আসে মাসে তিন চারখানা। ছোটবউমা কখন কখন ডাকে পোষ্টকার্ড লেখে। তাছাড়া মিতের মাসিক 'ভারতবর্ষ' তিনি নিজে নিয়ে আসেন। সদর দরজা পার হতেই প্রেমচাঁদ সর্দারের সংগে দেখা। সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে—খুড়ো মশাই, বড্ড বিপদে পড়েছি। রক্ষা করুন।

প্রেমচাঁদের চোখে অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য। গলার স্বর জড়ানো। থ্যাবড়া নাকে ফোঁস ফোঁস শব্দ হচ্ছে। দেখে মনে হয় খুব ভয় পেয়েছে। হরু জিজ্ঞাসা করেন—কি ব্যাপার? কি ফ্যাসাদ বাধিয়েছিস? তোকে নিয়ে আর পারিনে।

—আজ্ঞে ঘুম থেকে উঠে একটু তাড়ি খেয়েছিলাম, নেশা হয়েছিল। নিমনে হাড়ির মা এসে খামকা গালাগালি করতে লাগল। মিথ্যে ক'রে বলল, আমার ছেলেটা ওদের গাছ থেকে আতা পেড়ে খেয়েছে। আমার উঠনে দাঁড়িয়ে আমাকে অপমান—কী আস্পদ্দা! মাথায় একলাঠি বসিয়ে দিলাম।

—তারপর ?

—খুব লেগেছে। একটু কেটেছেও কপালের ওপরটা, রক্ত বেরোচ্ছে। নিমনের মা কেঁদে লোক জড় করেছে। আপনার কাছে আসছে নালিশ করতে।

...ভারি অন্যায় করেছিস পেমা। আমদি হাড়িনী জাঁহাবাজ মেয়ে মানুষ। দেখি ব্যাপারটা কতদূর গড়ায়। ব'স তুই এখানে।

প্রেমচাঁদ মাথা হেঁট ক'রে বসে। হরুখুড়ো বাঁ হাত দিয়ে পিঠের আব চুলকুতে থাকেন। অদূরে কলরব শোনা যায়। দেখতে দেখতে রণরংগিণী মূর্তিতে সামনে এসে দাঁড়ায় আমোদিনী হাড়িনী—বেশ কয়েকজন লোক সংগে নিয়ে। গলা ফাটিয়ে বলে—খুড়ো মশাই গো, দেখুন পেমা বাগদি আমার কি দশা করেছে। খুনে, নেশাখোর, চরিত্তিরের ঠিক নেই। আচ্ছা করে সাজা দেন বেহায়া পোড়ার-মুখোকে। মেয়ে মানুষের গায়ে হাত দেয়—এতবড় বুকের পাটা।

আমোদিনীর অবস্থা দেখে হরু প্রথমটা ঘাবড়ে যান। ছি, এমনি ক'রে জখম করতে আছে মানুষকে! কী আক্কেল পেমার! ইশারায় আমোদিনীকে বসতে ব'লে গম্ভীরভাবে আরম্ভ করেন—শান্ত হ আমদি, ক্ষান্ত দে। পেমার অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। তবে কি জানিস, ও তো সজ্ঞানে তোর মাথায় লাঠি মারেনি, মেরেছে নেশার ঘোরে। নেশা এমনি বদ জিনিসরে। এই সেদিনের কথা। বিপনে গোয়ালার ছেলেকে সাপে কামড়েছিল। খবর পেয়েও খেলা ফেলে যেতে কত দেরী করেছিলাম! আর একটু হলে ওকে বাঁচাতে পারতাম না। নেশা ছুটে যেতেই পেমা দৌড়ে এসেছে আমার কাছে, দোষ স্বীকার করেছে। মনে দুঃখও হয়েছে ওর। ঐ ত্যাখ, মুখ নিচু করে ব'সে আছে।

প্রেমচাঁদকে ডেকে বলেন—উঠে আয় পেমা এধারে। এমন নিষ্ঠুর কাজ জীবনে আর কখনও করিসনে। তোর নাক থাকলে নাক খত দিতে বলতাম। ভগবান তোকে বাঁচিয়েছেন। নিমনের মার কাছে ক্ষমা চা। দশ টাকা খেসারত দে। সংগে করে নিয়ে যা ডাক্তারখানায়। আর আমার নাম ক'রে বলিস ডাক্তারবাবুকে, তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করতে যাতে দুএক দিনে সেরে ওঠে। আমদি গতর খাটিয়ে খায়, শুয়ে থাকলে তো চলবেনা।

হরুর রায় দু তরফই মেনে নেয় বিনা প্রতিবাদে। দশ টাকা জরিমানা প্রেমচাঁদের পক্ষে কম নয়। জবা-ডাগর জমিদারের ছেলের বিয়েতে কদিন পালকি ব'য়ে রোজগার করতে হয়েছে ঐ টাকা। আজও গায়ে ব্যথা রয়েছে। কিন্তু উপায় নেই। অন্যায়ের ফল ভোগ করতে হবে বইকি। কাপড়ের খুট থেকে দশ টাকার নোটখানা বের করে খুড়োর পায়ের কাছে রাখে প্রেমচাঁদ। হরু সেখানা আমোদিনীর হাতে তুলে দিয়ে বলেন—পেমার ওপর আর রাগ পুষে রাখিসনে। হাজার হোক ও তোর পড়শী। দুশমন নয়। নেশা ও ছাড়তে পারবেনা। তবে ওকে বুঝিয়ে বলবি—যেন যখন তখন তাড়ি না খায় আর একটু হুশ রেখে চলে। ওর সংগে ডাক্তারখানায় গিয়ে মাথায় ব্যাণ্ডেজ ক'রে নিয়ে বাড়ি যা। গাঁয়ের ঘরোয়া বিবাদ মেটাতে মেটাতে আমার মাথার চুল সব পেকে গেল।

আমোদিনী কৃতজ্ঞচিত্তে বলে—পেন্নাম হই খুড়ো মশাই। আপনি আমাদের ওপর একটু কিপা দিষ্টি রাখেন ব'লেই গাঁয়ে বাস করতে পারি।

হরু যখন পোষ্ট অফিসে এলেন তখন ডাকবিলি শেষ। খান কয়েক খাম পোষ্ট কার্ড কিনে বাড়ি ফিরছেন। পথে মিতের সংগে দেখা। হাসিহাসি মুখ। গুণ গুণ করে ছড়া কাটছেন:—'মহারাজ ভেড়ারাজ এসেছে, আমি স্বচক্ষে দেখেছি সে চালা ঘরে বাঁধা রয়েছে।' হরু জিজ্ঞাসা করেন—খবর কি মিতে ?

—ভোলা মুচি একটা ভেড়া এনেছে সুলতানপুর থেকে। কেটে মাংস বিক্রী করবে। হাড় বাদ দিয়ে একপোয়া মাংস দিতে বলেছি। রাত্রে তুমি আমার এখানে খাবে।

—বেশ।

অনেক রাত অবধি গল্প চলে পশুরায়ের বাড়িতে। ইন্দুবালার হাসি শুনতে পাওয়া যায়। কিছুদিন খিটিমিটি বাধেনি স্বামী স্ত্রীতে। পারিবারিক আকাশে মেঘ ছিলনা। আজ ফুটেছে চাঁদের আলো। ইন্দুবালা চমৎকার মাংস রান্না করেছেন। খেয়ে কর্তা ও হরু ঠাকুরপো ভারি খুশী।

অত্যন্ত গরম। বহুকাল এমন হয়নি। বোশেখ মাসে

কুয়োর জল একদম শুকিয়ে গিয়েছে। ছোট বউমার বড় কষ্ট। তাই পাটুলি থেকে ঝালাইকর এনে কুয়ো ঝালাচ্ছেন হরু। না পেরেছেন স্নানে যেতে, না পেরেছেন আড্ডায় বসতে। মিতে খোঁজ নিতে আসেন। বলেন—ক'দিন তোমাকে না দেখে মনটা উতলা হয়েছে।

—জলের ব্যবস্থা করছিলাম ভাই। তোমার হাতে ওটা কি? কোন খাবার জিনিস বুঝি?

—আজ নন্দ ময়রা ধোকা ছানা-বড়া তৈরী করেছে। গোটাকয়েক খেয়ে ভালো লাগল। তাই তোমার জন্যে দুএকটা—

কথা বন্ধ ক'রে সুর ধরলেন পশু:—'আনিলাম ছানা-বড়া শালপাতা বাংনে, আরশোলা বংশে তুলে দাও তো বদনে'। পশুর হাত থেকে ছানা-বড়া নিয়ে টপাটপ মুখে তুলে দেন হরু। তারিফ করেন নন্দময়রার কারিগরির, আর খুশিভরা দৃষ্টিতে ধন্যবাদ জানান মিতেকে।

অসম্ভব গরমের পর অস্বাভাবিক বর্ষা। গংগায় প্রবল প্লাবন। মাঠ ঘাট সব ডুবে একাকার। চারিদিকে থই থই করছে জল। যাদের মাছ ধরার শখ তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছিপ নিয়ে কাটায় থকথকে কাদায়। সরকারদের গদাই একটা বড় শোল মাছ পেয়ে আহ্লাদে আটখানা। কেটে কুটে পাড়ায় বিলি করে। হরু খুড়ো নিজের অংশটা পাঠিয়ে দেন ইন্দু বউঠানের কাছে। রাত্রে হরু ও পশু পরম আনন্দে খান শোলের কালিয়া।

দুতিনদিন হরুর সাক্ষাৎ মেলেনা। উদ্‌গ্রীব হয়ে পশু গিয়ে দেখেন হরু বিছানায় শুয়ে। রীতিমতো জ্বর। আশ্চর্য! খুড়োর অসুখ কল্পনা করাও কঠিন। হরু কাতরকণ্ঠে বলেন—মিতে, তুমি এসেছ ভালোই। কুক্ষণে পোড়া শোলমাছ খেয়েছিলাম। ভোর না হতেই শরীর খারাপ। তারপর ভয়ানক জ্বর। তোমাদের খবর পর্যন্ত দিতে পারিনি। ভাগ্যিস ছোট-বউমা ছিল। এখন দুচার দিনের মধ্যে সেরে উঠলে বাঁচি।

এক সপ্তাহ কাটে। জ্বর ছাড়ে না। হরু ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়েন। পশু শ্যাম ডাক্তারকে ডাকেন। কিন্তু হরু কিছুতেই অ্যালোপ্যাথি ওষুধ খাবেন না। জীবনে যা করেননি তা করবেন না। ভীষণ জেদ। অগত্যা পশু বিধুকে টেলিগ্রাম করেন। ছুটি নিয়ে বিধু আসে। সাধ্য সাধনা চলে। শেষে হরু বলেন—একবার পেসন্ন কবরেজকে না হয় খবর দাও। ওর হাতযশ আছে।

প্রসন্ন কবিরাজের চিকিৎসায় অপ্রত্যাশিত ফল পাওয়া যায়। তিনদিনের মধ্যে জ্বর ছাড়ে। হরু উঠে বসেন। তাঁকে একটু সুস্থ দেখে বিধু কলকাতা রওনা হয়।

ভাদ্রের মাঝামাঝি। বর্ষা বিদায় নিয়েছে। সুনীল আকাশে শরতের সুস্পষ্ট আভাষ। মল্লিক বাড়িতে ঠাকুরের কাঠামোয় প্রথম মাটি দেওয়া সারা। বেশ কিছুদিন পরে হরু খুড়ো পশু রায়ের ভিতর বাড়ির রোয়াকে জল চৌকির ওপর বসেছেন। পশু লক্ষ্মীর ঘরে ধীরে ধীরে সুর ভাঁজছেন। হুঁকোয় দুড়ুত দুড়ুত ক'রে টান দিয়ে হরু হাঁকলেন—ও মিতে। কি রাগিণী আলাপ করছ? এদিকে এসো, একটা আগমনী গাও শুনি।

—তোমার অসুখ উপলক্ষে একটা গান বেঁধেছিলাম। সেটাতে একটা সুর দেবার চেষ্টা করছি।

হা হা ক'রে হেসে উঠলেন হরু। বললেন—সে কি মিতে, আমার অসুখ নিয়ে গান বেঁধেছ! গাও তো শুনি।

অমনি পশু গাইতে সুরু করেন:—

* * * *

ফুলতলাতে এবার 'শোলো' জ্বর এয়েছে।
হরুবাবু বড়ই কাবু শয্যা নিয়েছে॥
বিধু এসেছে, কাছে বসেছে, কত সেধেছে।
তবু হরু 'না না ওষুধ খাবোনা বলেছে॥
মুষ্টিযোগের গুণে হরু সেরে উঠেছে।
মিতের বাড়ীতে আবার আসর জমেছে॥

* * * *

ভাবাবেগে মাথা দুলিয়ে বলেন খুড়ো—'শোলো' জ্বরই বটে! এত জানো মিতে, এত পারো! এই অখদ্যে গাঁয়ে তোমার কদর হ'ল না।

কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার পর শিবপুর থেকে লোক আসে হরুকে নিতে। বিধু লিখেছে:—

* * * *

বাবা, আপনার শরীর ভাঙতে বসেছে। এ বয়সে আর একা থাকা উচিত নয়। আপনি বউমাকে নারাণ-

পুরে পাঠিয়ে দিবে আমার কাছে অতি অবশ্য চলে আসবেন।

*　*　*　*

হরু যেন হঠাৎ বিমনা হয়ে পড়েন। 'কাল যাব'। 'পরশু যাব' ক'রে ক্রমাগত দিন পেছিয়ে দেন। মুহূর্ত স্থির থাকতে পারেন না—গ্রামময় ঘুরে বেড়ান এপাড়া থেকে ওপাড়া। বুড়ো বটের ছায়ায়, পুরানো শিব-মন্দিরের চত্বরে। মিত্তিরদের ইঁটখোলার ধারে। চড়কতলার মাঠে, রক্ত তেঁতুল গাছের পাশে ডিসপেন্সারির উঠান—দেখতে পাওয়া যায় হরুকে। থমকে দাঁড়ান চলতে চলতে, চেয়ে চেয়ে কি দেখেন, মনে মনে কত কি ভাবেন। কোন্ অন্তরালবর্তিনী গ্রামলক্ষ্মীকে শেষ সম্ভাষণ জানান কে জানে! তারপর একদিন তল্পিতল্পা বেঁধে মিতে ও বউঠানের কাছে বিদায় নিয়ে সজল চোখে গরুর গাড়িতে গিয়ে ওঠেন।

ফুলতলার সমাজজীবনে একটা ফাঁক দেখা দেয়। পশুর পারিবারিক জীবনের ফাঁকটা বোধ হয় আরও বড়। তার সময় যেন আর কাটে না। ইচ্ছা হয় তীর্থ দর্শনে যেতে, কিন্তু বাধা সৃষ্টি করেন ইন্দুবালা। তিনি বাড়ি ছাড়তে একান্ত নারাজ—মুখে যতই বলুন না কেন ঝগড়া-ঝাঁটির সময়। দাবা খেলা বন্ধ। সংগীহীন গংগা স্নানে উৎসাহ পান না। অন্য কাজ নেই—কেবল খাওয়ার ফর্দ। সামান্য ত্রুটির জন্য একদিন বিশ্রী ব্যাপার ঘটে। পশু-রাজের মতো গর্জনে পাড়ার লোক ভিড় করে। দেখি তুলসী মন্দিরের বেদির ওপর বসে আছেন ইন্দুবালা, আর পশু বোঁ বোঁ ক'রে চারপাশে ঘুরছেন আর বলছেন—"উলটো সাত পাক ঘুরছি, বিয়ে নাকচ ক'রে দিচ্ছি, এমন স্ত্রী থাকার চেয়ে না থাকাই ভালো।" পশুর রকম সকম দেখে ছোট-বড় সবাই অবাক। কয়েকজন বয়স্থ লোক এসে পশুকে ধ'রে বাড়ির বাইরে নিয়ে যান। নীরবে কাঁদেন ইন্দুবালা। মনে পড়ে হরু-ঠাকুরপোকে। তিনি উপস্থিত থাকলে আজ এমন লোক হাসাহাসি হ'ত না। গাঁয়েরও দুর্নাম, আর তাঁরও দুর্ভাগ্য!

শীত যায় বসন্ত আসে। পল্লী প্রকৃতির যৌবন মাধুরী ফুটে ওঠে। রায় বাড়ি নিস্তব্ধ। পাড়ার লোককে কথা দিয়েছেন ব'লেই হোক—আর বয়স ক্রমে বাড়ছে বলেই হোক, পশু আজকাল মাথা গরম করেন না। বেশ সংযত হয়ে চলেন। হাসপাতালের রোগীর মতো যা পান তাই খান। স্ত্রীর সংগে বড় একটা কথা বলেন না। বাঁধান ভারতবর্ষ যতক্ষণ পারেন পড়েন। এমনি সময়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে শিবপুর থেকে চিঠি আসে। হরু লিখেছেন:—

*　*　*

মিতে, অনেক দিন তো কলকাতায় এসেছি। কিন্তু আজ পর্যন্ত মন বসাতে পারলাম না। ঘেঁষাঘেঁষি বাড়ি—খোলা বাতাস পাওয়া যায় না। শীতকালে সকালে কুয়াশা, আর সন্ধ্যেকালের ধোঁয়া—ফাঁকা আকাশ নজরে পড়ে না। গাঁয়ের মানুষ আমরা—এসব কি ছাই সইতে পারি? রাস্তায় বেরিয়ে শুনি—গলির দু-পাশের রোয়াকে বড়দের কাগজ পড়া কিংবা আপিসের গল্প আর ছোটদের ফুটবল খেলা—না হয় থিয়েটার বায়স্কোপ নিয়ে তর্কাতর্কি। কোন ভোরবেলা শুনতে পাইনে—"পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল।" ধারণা ছিল পাড়াগাঁয়ের লোক সব মুখ্য, কলকাতার লোক বিদ্যের জাহাজ। সেদিন বোধ হয় আর নেই, হাওয়া বদলে গিয়েছে। শুকতো, মোচার ঘণ্ট, চালতের অম্বল—প্রায় ভুলতে বসেছি। এখানকার তরি-তরকারিতে স্বাদ নেই! ঠাকুর রকমারি রান্না করে, কিন্তু আমার খেতে ভালো লাগে না। বউঠানের হাতের রান্না কতকাল খাইনি!

তোমাদের খবর নিতে খুবই ইচ্ছে হয়। চিঠি লিখে দেবে কে? আমার তো লেখা অভ্যেস নেই। বিধুর মেয়েকে (তার আবার গানের মাস্টার আসবে এখনই) দিয়ে লেখাচ্ছি। গাঁয়ের খবর সব ভালো তো? তোমরা বেশ শান্তিতে আছ তো? আমার রাঙী গাইটার জন্যে মন কেমন করে। কলকাতার জলো দুধ খেতে খেতে তার মিষ্টি দুধের কথা ভাবি। বলে কিসে আর কিসে!

শরীরটা ভালো যাচ্ছে না ভাই। দিন দিন জোর কমে যাচ্ছে। শহরে বাস করা আর জেলখানায় থাকা একই কথা। এই বন্দী-জীবনের দুঃখ আরও কত অদৃষ্টে আছে জানিনে। সন্ধ্যে বোধ হয় ঘনিয়ে আসছে। হয়তো

তোমাদের সংগে আর দেখা হবে না। আসবার সময় মনে হয়েছিল আর বুঝি গাঁয়ে ফিরব না।

* * *

হরুর চিঠি পড়তে পড়তে পশুর মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। অশ্রু সংবরণ করতে পারেন না। নাতনীকে দিয়ে লেখানো হ'লে কি হবে, চিঠির ছত্রে ছত্রে যেন হরুর মনের ভাব ফুটে বেরোচ্ছে, যেন হরু নিজেই কথা বলে যাচ্ছেন মাটির দিকে চেয়ে তাঁর স্বভাব অনুযায়ী। পশু চিঠিটা পড়ে শোনান ইন্দুবালাকে। গ্রামের বিশিষ্ট প্রবীণদের কাছেও উল্লেখ করেন চিঠির। এর করুণ ভাবটি ধীরে ধীরে বিষাদের ছায়া বিস্তার করে পশুর চির-প্রফুল্ল চিত্তের ওপর। পশুর জীবন বীণা ঠিক সুরে আর বাজে না।

শেষ বয়সে মানুষ মরণের চরণধ্বনি শুনতে পায় কিনা জানিনে। তবে অনেক সময় এ রকম হয়ে থাকে। দু-মাস না যেতেই সংবাদ আসে হরুখুড়ো দেহরক্ষা করেছেন। অতীতের একটি মহামূল্য যোগসূত্র সহসা হারিয়ে যায়। গ্রামবাসী সকলেই ব্যথাতুর। পশু রায় একেবারে স্তম্ভিত। হরুখুড়ো গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার পর থেকেই তাঁর ভাবান্তর দেখা দিয়েছিল। তিনি গম্ভীর স্বল্পভাষী হয়ে পড়েছিলেন। ইদানীং সম্পূর্ণ বাণীহীন। সময় মতো খাওয়া-দাওয়া করেন, আর বিছানায় শুয়ে থাকেন। বড়জোর মাসখানেক হবে। আহারান্তে দুপুরবেলা বই নিয়ে খাটের ওপর গা ঢেলে দেন। আর ওঠেন না। পেঁপে গাছের মাথায় পড়ন্ত রোদ। ঘাটে যাবার সময়। বিস্মিত ইন্দুবালা গায়ে হাত দিয়েই বোঝেন দেহে প্রাণ নেই। খবর ছড়িয়ে পড়ে মুখে মুখে। গ্রামশুদ্ধ লোক ছুটে আসে। বিশ্বাস না ক'রে উপায় কি! বামুন পাড়ার বিন্দুবুড়ি মাথা নেড়ে বলেন—হরুখুড়ো মিতেকে কাছে টেনে নিয়েছে।

আরও এক মাস পরে। পশু রায়ের শ্রাদ্ধ-শান্তি নিষ্পন্ন হয়েছে। একা থাকতে না পেরে ইন্দুবালা চলে গিয়েছেন মেয়ের সংগে নবদ্বীপে। একদিন ভোরবেলা ফটিকের মাকে দেখি আমাদের বাড়িতে। এদিক ওদিক তাকিয়ে আস্তে আস্তে ঠাকুরমাকে বলে—দিদি ঠাকরুণ, আশ্চয্যি কাণ্ড! কাল রামায়ণ শুনতে গিয়েছিলাম কথক ঠাকুরের বাড়ি। হাটতলা দিয়ে ফিরছিলাম। রাত দুপুর। জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটছে। দেখলাম চাটুজ্যেদের গোল-দরজায় ব'সে দাবা খেলছেন খুড়োমশাই আর পশু মিতে। ভাবলাম চোখের ভুল। কিন্তু তা তো নয়। অবিকল আগের মতো দুজনে এক মনে খেলছেন! কত পুরণো মানুষ, আমাদের কত আপনার জন! ভয় হ'ল না। অন্য কাউকে দেখলে ভিরমি খেতাম।

* * *

ফটিকের মা'র কথা মনে পড়লে এতকাল পরে আজও আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

ক' কথা ক' পাখী

মিনতি নাথ

চন্দনা তুই খাঁচা থেকে উড়তে কেন চাস
বনের থেকেও আমার কাছে দুঃখ কি তুই পাস?
সেথায় খাবার থালি ভরে,
কে দেয় তোরে দিন দুপুরে?
গায়ে মাথায় হাত বুলালে পাস কেনরে ত্রাস,
উড়তে কেন চাস?
নতুন খাঁচায় বিছনা করে শুইয়ে দিয়ে গেলে
ধড়্‌মড়িয়ে উঠিস দেখি সকল কিছু ফেলে।
দোয়েল শ্যামা ডাকলে পরে,
উদাস হয়ে আকাশ পারে,
কী যেন তুই ভাবিস বসে সজল নয়ন মেলে
সকল কিছু ফেলে।
দুঃখ আমার হয় যে বড়, ক'কথা ক'পাখী,
ডাক শুনতে খাঁচায় ভরে সদাই কাছে রাখি।
ভোরের বেলায় সঙ্গোপনে
গিয়েছিলাম তাই ত বনে
বলতে হবে তাও কি তোকে এতই বোকা নাকি
ক' কথা ক' পাখী॥

পুণ্যতীর্থ শ্রীক্ষেত্র

শ্রীশিশিরকুমার মজুমদার

পুরীর কথা ভাবলেই প্রথমে মনে পড়ে সেই বিরাট নীল, ফিকে নীল আর সতত গর্জনশীল সাগরের কথা। যার গর্জনে মনে হয় ভয়ংকর প্রলয়ের বুঝি আর দেরী নেই। ষ্টেশন থেকে মাইল খানেক হাঁটলেই দূর থেকে ভেসে আসবে 'মহাসাগরের গান'।—সাগরের গম্ভীর নিনাদ। যেন শত শত কারখানা চালু হয়েছে কাছে কোথাও। আরও মাইল দেড়েক হাঁটলেই দেখা যাবে দূর দিগন্তে সেই 'কলঙ্ক রেখা' সমুদ্রের মনোহর রূপ। সূর্যের রশ্মি পড়ে ছোট ছোট ঢেউগুলো ঝকমক্ করে ওঠে। ছোট ছোট ভাঙ্গা-ভাঙ্গা সাদাসাদা ঢেউগুলোকে দূর থেকে মনে হয় যেন কতকগুলো হাঁস ডুবে ডুবে সাঁতার কাটছে।

প্রথম যেদিন সকালবেলার সুন্দর সূর্যের আলোয় দেখতে পেলাম সেই নীল জলরাশি, কী অদ্ভুত একটা আনন্দের শিহরণ সমস্ত দেহমনে খেলে গেল। বন্ধুদের মধ্যে কে একজন বলে উঠল, 'আহা, কী দেখলাম! জন্মজন্মান্তরে, ভুলব না। আর মহাকবি কালিদাসের সেই শ্লোক 'দূর দূরশ্চ ক্রসিভশ্চ তন্বী ....' আবৃত্তি করে গেল। বারংবার আমার মনে বিস্ময় জেগে উঠতে লাগল, এই কী সেই পুরী! আর এই সেই সমুদ্র! যাকে কল্পনার এত সুন্দর এত ভুবন মনোহর রূপে ভাবতে পারিনি.........এই সেই নীল জলধি! এযেন দেবাদিদেব মহাদেবের ভাবগম্ভীর আর এক রূপ!

...এরই নাম শ্রীক্ষেত্র তীর্থ। গোলকধামের পাতায় যার স্থান অনেক উঁচুতে। বিখ্যাত কয়েকটা তীর্থের নাম করতে গেলে শ্রীক্ষেত্র তাদের মধ্যে অন্যতম। যে বিশাল জলধির পাশে দাঁড়িয়ে শ্রীক্ষেত্র তীর্থ ইতিহাসে ভূগোলে একটি বিশিষ্ট মর্যাদা দিয়েছে.........এই সেই পূর্ণতীর্থক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্র।

পুরীর দক্ষিণ দিক ব্যাপী বিরাট উর্মিসংকুল নীল সমুদ্র। আর তারই পাশে দুঃসাহসিক নুলিয়ার দল......যেন সমুদ্র পালিত সন্তান ওরা। তার খেলার সাথী। জলের বুকে বুদ্‌বুদের মত ওদের জীবন। সমুদ্রের বুকে যখন তখন ঝাঁপিয়ে পড়া শুধু ওদের পেশা নয়, নেশাও বটে। সারাদিন ওদের দেখা যায় সমুদ্রের বুকে নয়ত, সমুদ্র বেলায়। যেন ওরা শকুন্তলার পুত্র, যার ভয় সেই ভীষণ সিংহকে। ওরা নির্ভীক। প্রতি ভোরে ওরা ডিঙি ভাসিয়ে দেয় উত্তাল তরংগের মধ্যে। আকাশে মেঘ আছে কি নেই, তা ওদের লক্ষ্য নেই, ঝঞ্ঝা কি বাত্যা—তা ওদের খেয়াল নেই। ওরা ডিঙি বেয়ে যায় সমুদ্রের গর্জনশীল উর্মিরাশি ভেদ করে। ঢেউয়ের সাথে পাল্লা দিয়ে কেমন সুন্দর ওরা নাচ্‌তে নাচ্‌তে, দুলতে দুলতে ঘোলাটে নীল থেকে গভীর নীলে নীল হয়ে যায়। যাকে আমরা করি ভয়, তাকেই ওরা করে জয়। জয়ের সম্মান বহন করে নিয়ে আসে বুক ফুলিয়ে, কালো দেহ আলো করে... আর, সমুদ্রের কাছ থেকে নিয়ে আসে পুরস্কার...মূল্যবান...দুর্লভ শংখ আর ঝিনুক। কিন্তু কে জানে তার মধ্যে থাকে কিনা মুক্তা!

সমুদ্রের তীরে—স্বর্গদ্বারের কাছে আছে বহু সমাধি মন্দির। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল—মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দেবের লীলা-সংগী যবন শ্রীহরিদাসের সমাধি মন্দির।

যেদিন গিয়ে পুরীতে পৌঁছুলাম, সেদিনই সমুদ্রের ডাক উপেক্ষা করতে পারলাম না। ঝাঁপিয়ে পড়লাম সমুদ্রের বুকে। স্নান তৃপ্তি দেয়—ঢেউয়ের সাথে লুকোচুরি খেলে। সমুদ্রে স্নান করার পদ্ধতি একটু স্বতন্ত্র। শিখে নিলাম অভিজ্ঞ এক স্নাত ব্যক্তির কাছ থেকে। অজ্ঞ ব্যক্তির অন্যমনস্কতা নিয়ে সমুদ্র তার বিপদ ঘটাতে পরোয়া করেনা। সেইজন্য বহুলোক নুলিয়াদের সাহায্য নিয়ে স্নান করে। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে সে সব ঝঞ্ঝাট নেই। হলেত লুকোচুরি খেলাটাই বৃথা নষ্ট হয়। এবার পদ্ধতিটা একটু বলা যাক্ :...

পর্বত-প্রমাণ সব ঢেউ কয়েক সেকেণ্ড অন্তর অন্তর আসে। কিন্তু ঢেউ ভাঙ্গার আগেই ঢেউয়ের গোড়ায় টুপ করে ডুব দিতে হয়, ঢেউ যেন আলগোছে মাথার উপর দিয়ে চলে যায়। কিন্তু যত নষ্টের মুল সর্বনাশা ভাঙ্গা ঢেউ। কেমন ফেনা তুলে গড়িয়ে গড়িয়ে আর দেহটাকে ডান দিক অথবা বাঁ দিক কোণ করে হেলিয়ে রাখতে হয়—তাহলে ওর কিছু করার ক্ষমতা নেই। কিন্তু সামান্যতম অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে চুবানি খাইয়ে মারে। মুখটা বিস্বাদ হয়ে যায়। কিন্তু সবচেয়ে বিপদজনক হ'ল সমুদ্রাভিমুখী স্রোত...তাকে আণ্ডার-কারেণ্ট বলে। যে কোন সময় টেনে নিয়ে যেতে পারে মাঝ-সমুদ্রে।

স্নান করতে কী যে আনন্দ লাগে, এ লিখে বোঝান যায় না। ঢেউয়ের পর ঢেউ, এর গায়ে ও ঠোকাঠুকি করে আর এক নতুন ঢেউ সৃষ্টি করে এমনি ভাবে পারে এসে আছড়ে পড়ে। এ দেখতে এত সুন্দর যে ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা মনে আসেনা মোটেই।

এত বড় যে তীর্থ—শ্রীক্ষেত্র কিন্তু আলোর নীচে অন্ধকারের মতই বড্ড নোংরা! আর ফাইলেরিয়া রোগের ডিপো। স্বর্গদ্বার থেকে পুরীর মন্দির পর্যন্ত যেতে যেতে একদিন প্রায় তেরোজন লোককে দেখলাম যে তারা প্রত্যেকেই ফাইলেরিয়া বা শোথ রোগে আক্রান্ত। এদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ই সমান সংখ্যক। ডাক্তারদের কাছ থেকে জানা যায় যে ম্যালেরিয়ার এনোফিলিস মশার মতই ফাইলেরিয়ার বাহক কিউলেক্স মশা এবং বলাবাহুল্য, এই মশার দাপট বিশেষতঃ এই অঞ্চলে। মজা হয়েছিল এই যে, আমরা কেউই মশারী নিয়ে যাইনি। যার ফলে রোজ শোবার সাথে আপাদ মস্তক চাদর ঢাকা দিয়ে 'জয়

বাবা জগন্নাথ, বলে শুয়ে পড়তাম। আর রোজ ভোর বেলা উঠে পায়ের দিকে তাকাতাম।

যাই হোক, এখানকার লোকেরা বড্ড গরীব। আমার মনে পড়েনা, উৎকলবাসী কোন ধনীকে আমি দেখেছিলাম কিনা। কিন্তু জীবন যাত্রা মোটামুটী চালাবার মত কোন অসুবিধাই এখানে নেই, যদিও বেশী সংখ্যক এরা অশিক্ষিত। এরা বড় সরল। কিন্তু যদি বুঝতে পারে যে মানহানিকর কোন ইংগীত কিংবা কথা তার সম্বন্ধে বলা হয়েছে—তবে সে সহজে ছাড়ে না। নিয়মই, যারা বেশী সরল, তারাই আবার রাগলে সাংঘাতিক গরল।

সমস্ত পুরীতেই যেন রোজ মেলা বসে। কত রকম সুন্দর সুন্দর বিভিন্ন রকমের জিনিস পাওয়া যায় তা আর সংখ্যা করা যায় না। পুরীর রথ তৈরী করার কাজ আরম্ভ হয় প্রতি অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে। আমরা সেই কাজ দেখেছিলাম। বিরাট বিরাট সব গাছ গুলোতে আকার দিয়ে প্রতি বছরই রথ তৈরী করা হয়।

পুরীর পথে পথে ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন দেব-দেবীর মন্দির। আর তার গাত্রে গাত্রে অনুপম ভাস্কর্য্য, তার সূক্ষ্ম কারু-কলা দেখবার মত। এখানে এক যায়গায় দেখলাম প্রাচীন ঐতিহ্যের নিদর্শন। এই গুলির এখনও বহন করে চলেছেন। সেই পাল্কী, ঘোড়া ঠাকুর যাত্রা ইত্যাদি।

একদিন জগন্নাথ দেবের চন্দনযাত্রা দেখতে গিয়েছিলাম। সত্যি সেটা দেখবার মত। জগন্নাথ দেবকে নিয়ে চন্দন পুকুরে নৌ-বিহার করা হয়। নৌকাগুলোকে কি অপরূপ সাজে সজ্জিত করা হয়, তা না দেখলে বোঝা যায়না। কি সুন্দর ভাবে আলো দিয়ে সাজান হয়। শুধু সেখানে কেন সমস্ত পুকুরের পাড়েও এই আলোক সজ্জা কম জমকালো নয়।

একদিন গেলাম গম্ভীরাতে। 'গম্ভীরা' হ'ল গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নীলাচলে থাকাকালীন আবাসস্থল। স্বর্গদ্বার থেকে পুরীর মন্দিরের দিকে আধমাইল খানেক হাঁটলেই ডান হাতে পড়ে গম্ভীরা—প্রায় পাঁচশত বছরের গম্ভীরা মহাপ্রভুর সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। ভিতরে প্রবেশ করতেই শুনতে পেলাম শুচিস্নিগ্ধ এই শান্ত পরিবেশের মতো খোল করতালের মধুর ধ্বনি। মন্দির প্রকোষ্ঠে ঢুকতে দেখতে পেলাম বৈষ্ণবদের কণ্ঠে প্রাতঃকালীন মহাপ্রভুর মধুর নামগান। খোল-করতাল আর নামগানের সুরে মধুময় হয়ে উঠেছে এই পরিবেশ। গম্‌গম্ করছে 'গম্ভীরা'। আমাদের দেখে কয়েকজন বৈষ্ণব এগিয়ে এলেন। ঘুরে ঘুরে দেখাতে লাগলেন মহাপ্রভুর ব্যবহৃত চিহ্ন সকল।

দেখলাম বিভিন্ন ভঙ্গিমায় প্রভুর মূর্তি। বেদীর উপর ফুল-চন্দন শোভিত যত্ন সহকারে সাজান একজোড়া মহাপ্রভুর ব্যবহৃত খড়ম। আর কাঁচের বাক্সে রক্ষিত একটুকরো মহাপ্রভুর ব্যবহৃত কম্বল। তাঁদের কাছ থেকে শুনলাম—বহুদিন থেকে বহু ভক্তের দল শ্রীচৈতন্য-দেবের ঐ কম্বল থেকে একটুকরো করে ছিঁড়ে নিত। কিন্তু শেষ কালে এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে যদি ঐ টুকরা খানিকে বদ্ধ কাঁচের বাক্সের মধ্যে রাখা না হয় তবে মহাপ্রভুর এই সুদুর্লভ গাত্রাবাসের চিহ্ন লোপ পেয়ে যায়। তাই ঐ ব্যবস্থা।

'গম্ভীরার পাশ দিয়ে সরু একটা লতাগুল্মে ঢাকা রাস্তা গ্রামের ভিতর চলে গেছে। কত রকম পাখী এখানে কিচির মিচির করে প্রায়-নির্জন গ্রামখানা মুখর করে তুলেছে—আর এই সোনালী সকাল টাকে। এখানেই ডান দিকে পড়ে বেড়া দেওয়া এক বিরাট বকুল গাছ। এর নাম 'সিদ্ধ বকুল।' কিংবদন্তী আছে যে, এই বকুল গাছ মহাপ্রভুর পরিত্যক্ত বকুলের দাঁতনের থেকে জন্ম নেয়। অতি অল্প সময় ভরা যৌবন পেয়ে যায়। ফুলে ফলে ভরে যায় গাছটা। রথ তৈরীর জন্য পুরীর মহারাজার কাঠুরেরা এসেছিল গাছ কাটতে। কিন্তু একটা কোপ বসাতে পারেনা গাছটায়। রাজা সে রাত্রি স্বপ্নে দেখেন যে মর্ত্যের লোকের সিদ্ধির জন্য এ গাছের জন্ম। মহারাজ সপরিষদ গাছটার কাছে গিয়ে দেখলেন এক মহা আশ্চর্যের ব্যাপার। গাছটার গুড়ি নেই। কিন্তু ফুলে ফলে সবুজ পাতায় গাছটা পুর্ণ। শুধু একটা ছালের উপর গাছটা। আর সব ফাঁপা। আজও বহু ভ্রমণকারী এবং উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীরা এর বৈজ্ঞানিক কারণ নির্ণয় করতে পারেনি।

পুরীর ছোট পোষ্ট অফিসের পাশ দিয়ে একটা রাস্তা চলে গেছে পুরীর পশ্চিম দিকে গ্রামের ভিতর। একদিন সে পথে আমরা পা চালিয়ে দিলাম। বালি আর বালি। সমুদ্রের বালি হাওয়ায় বাহিত হয়ে যায়গায় যায়গায় বালিয়াড়ির সৃষ্টি করেছে। প্রায় কোথাও মাটির সাধারণ স্তর দেখা যায় না। এরই মাঝ দিয়ে নানা রকম লতা-পাতা, গাছ-গাছড়ার সৃষ্টি হয়েছে। যার অধিকাংশেরই নাম জানিনা। এখানেই এক জায়গায় আছে উল্লেখযোগ্য গোবর্দ্ধন মঠ। এটা হ'ল হিন্দু এবং ভারতীয় দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা শঙ্করাচার্যের মঠ। এখানে দেয়ালে পণ্ডিতপ্রবরের পাদুকাচিহ্ন সযত্নে বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে। মৃন্ময় একটি মূর্তিও আছে। দুপুরের অন্তঃ-প্রকৃতি বহিঃ-প্রকৃতি সব নিঝুম। শুধু মাঝে মাঝে পিউ কাঁহা পাখীর ডাক কাছের অশোক গাছটার কাছ থেকে ভেসে আসছে। এই শুচিময় শান্ত পরিবেশে সেদিন মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিলাম, হে দার্শনিক তোমার কী বিরাট প্রতিভা। যে প্রতিভাবলে এত অল্প বয়সে হিন্দু ধর্মকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে বিরাট জিনিস, ব্যাপক জিনিস এক নতুন দর্শনের সৃষ্টি করে জগৎ সমক্ষে বরেণ্য হয়ে রইলে! সেদিন তোমার আবির্ভাব ঘটেছিল—"ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে" এক মহা মানবের রূপ নিয়ে।

পুরীর উল্লেখযোগ্য মঠগুলোর মধ্যে অন্যতম হল পুরুষোত্তম মঠ, টোটা গোপীনাথ, নীলাচল আশ্রম, শ্রীগুরুধাম আর শ্রীভারতী কীর্ত্তন মন্দির।

শেষদিনের কথা। ক'লকাতায় ফিরে আসব। রাতে ট্রেন। সকাল নটার সময় গেলাম মন্দিরে ঠাকুর দর্শন করতে আর পুজো দিতে। কিন্তু উৎকলবাসী পাণ্ডাদের যে অত্যাচার আর লাঞ্ছনা আমাদের সহ্য

করতে হয়েছিল তা আর নাই বললাম। পুরীর মন্দিরের ছবি ওরা নিতে দেয়না। যদি তুলতে হয় দেড়শ গজ দূর থেকে ছবি তুলতে হয়। কিন্তু সত্যিই অপরূপ কারুকলা মন্দির গাত্রে। প্রাচীন শিল্পীরা কত ধৈর্য্য ধরে কত কষ্টকরে পাথর কুঁদে কুঁদে যে সুন্দর সুন্দর সব মূর্তির সৃষ্টি করে ছেন তা অবর্ণনীয়। কোন শিল্পীরা সে কোন কালে এত উঁচুতে উঠে তাদের ভাস্কর্যের এই অনুপম সৃষ্টি করে গেছেন—যা আছে কোনারকের সূর্যমন্দিরে, ভুবনেশ্বরের মন্দিরে এর আরও বহু যায়গায়। সেদিন এই সব স্বর্গত শিল্পীদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী আমরা জানিয়েছিলাম। তাঁদের স্পর্শে মন্দির গাত্র মূর্ত হয়ে উঠেছে, শুধু কি বাইরে, চূড়ার ভিতরেও তাঁদের সুন্দর চিত্রকলা চিহ্ন বর্তমান। শ্রীভগবানের বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন অবতারের মূর্তি ওখানে খোদিত। এত উঁচুতে সে সব কারুকার্য দেখতে হলে বাইনাকুলারের সাহায্য নিতে হয়।

জগন্নাথের ভোগরান্না এক অদ্ভুত দর্শনীয় বস্তু। এক বিরাট চুল্লীর উপর থরে থরে একটির উপরে আরেকটি এইভাবে একশ' হাঁড়ি পর্য্যন্ত সাজান থাকে। এইভাবে সারি সারি সাত-আটটা উনোনের উপর সাজান কয়েকশ' হাঁড়ি। তার ভিতর ভাত ফুটছে।

ফেরার পথে সাক্ষাৎ করলাম আমাদের এক প্রবীণ বন্ধুর সাথে। পুরীতে অর্থ সংকটের দরুণ যথেষ্ট অসুবিধা হয়েছিল এমন অবস্থার সৃষ্টি হ'ত যে পাঁচদিনের ক্ষেত্রে দু'দিনেই কলকাতার পথে পা বাড়াতে হ'ত। কিন্তু গল্পের 'মধুসূদন দাদার' মত আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন মৈথিলনাথ মুখোপাধ্যায়। আমরা ছাত্ররা কম টাকায় বেশী দেখব এই পরিকল্পনায় পুরী ভুবনেশ্বর পথে বেড়িয়েছিলাম। কিন্তু কল্পনীয় জিনিসের বাস্তবের সাথে সাদৃশ্য কম। আমাদেরর প্রবীণ বন্ধু হলেন স্বর্গত বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকারের অন্যতম প্রিয় ছাত্র। শুধু তাই নয় বাংলাদেশের বিখ্যাত সাহিত্যিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাতুল। যদি মৈথিলবাবুর নাম এই ভ্রমণ কাহিনীতে লিপিবদ্ধ না করতাম তার নিকট আমাদের ঋণ বাড়ত বই কমত' না। সব কিছু দেখার সাথে সাথে যে সহানুভূতি আর দয়া পেয়েছিলাম যেমন পেয়েছিলেন মাইকেল, তাঁকে স্মরণ করা আমাদের কর্ত্তব্য।

পশ্চিমপারে সূর্যদেব তার সার্চ লাইটটা ঘুরিয়ে নিয়ে নিচ্ছেন পাশ্চাত্যের দিকে। শেষ আভা বিকীরণ করছে। রবির রক্তাভা আলোয় দুলছে সমুদ্রর ঢেউ, অলসে ঝলমল করে। অবিরাম ঢেউ-গুলো আছড়ে পড়ছে পায়ের কাছে। বার বার মন আবৃত্তি করে উঠল,

"একি এ প্রকাণ্ড কাণ্ড সম্মুখে আমার
অসীম আকাশ প্রায় নীল জলরাশি,
ভয়ানক তোলপাড় করে অনিবার
মুহূর্তেক যেন সব ফেলিবেক গ্রাসি।"

তামিল বৈষ্ণব কবি নম্মালোয়ার

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

তামিল শৈব-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি যেমন মাণিক্কবাচকর্, তেমনি তামিল বৈষ্ণব সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি নম্মালোয়ার। তামিল বৈষ্ণবপদ সংগ্রহ "নালায়ির দিব্য প্রবন্ধম"—এর চার হাজার পদাবলীর মধ্যে নম্মালোয়ার—রচিত পদসংখ্যা ১২৯৬। একমাত্র তিরামদৈ আলোয়ার ব্যতীত অন্য কোনো কবির এত অধিক সংখ্যক পদ সংকলিত হয় নাই।

নম্মালোয়ারের রচনা সম্পর্কে তামিল ভক্ত সমাজ যে কিরূপ শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব পোষণ করেন তাহা কতকটা বোঝা যাইবে তাঁহার পদাবলীর সুউচ্চ প্রশস্তির দ্বারা। কেহ তাঁহার রচনাকে বলিয়াছেন ভক্তামৃতম্, কেহ বা বলিয়াছেন সমবেদনার। দ্রাবিড়োপনিষদ্, দ্রাবিড়বেদ সাগরম্ ইত্যাদি নামেও তাঁহার পদাবলী অভিহিত হইয়া থাকে। নম্মালোয়ারের শিষ্য অন্যতম অলোয়ার মধুরকবি তাঁহার গুরু-বন্দনায় বলিয়াছেন—প্রভুর নামোচ্চারণ করিয়া রসনা তৃপ্ত হইল; আমি অন্য কোনো দেবতা জানিনা, কেবল তাঁহারই সুমধুর সঙ্গীত কণ্ঠে লইয়া আমি পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইব।

নম্মালোয়ারের সংকলিত পদাবলী যে চারিটি ভাগে বিভক্ত, তাহাদের নাম ও পদসংখ্যা এইরূপ—তিরুবায়-মোলি—১১০২, তিরুবিরুত্তম্—১০০, পোরিয় তিরুবন্দাদি ৮৭ এবং তিরু আচিরিয়ম্—৭। ইহার মধ্যে "তিরুবায়্-মোলি" (অর্থাৎ শ্রীমুখবাণী) সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ। সমগ্র দিব্য প্রবন্ধম্-এর মধ্যে অংশই সর্বাধিক পরিচিত।

তিরুবায় মোলির প্রথম শ্লোকে কবি আত্ম-জাগরণের

কথা বলিয়াছেন এই ভাবে—যাঁহার উপরে আর কেহ নাই, যাহা কিছু-ভালো-র মালিক যিনি, তিনি কে? তিনিই তিনি। যাঁহার প্রাসাদে উত্তম জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তিনি কে? তিনিই তিনি। অমর দেবকুলের অধিপতি যিনি, তিনি কে? তিনিই তিনি। জন্ম মরণ দুঃখ বিবর্জিত তাঁহার জ্যোতির্ময় চরণযুগল বন্দনা করিয়া হে আমার মন, জাগ্রত হও।১

মানুষের শ্রেষ্ঠ বন্দনীয় বিষয় ঈশ্বরের কথা ভুলিয়া গিয়া কবিরা যে রাজা-মহারাজা কিংবা ধনী ব্যক্তিদের স্তুতি-বন্দনায় তাঁহাদের স্বর্গীয় কবিত্ব শক্তির অপচয় ঘটান ইহা নম্মালোয়ারের পক্ষে বিশেষ বেদনাদায়ক ছিল। সম-প্রাণ কবিদের লক্ষ্য করিয়া তিনি বার বার এই আবেদন জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা যেন গুটি-কয়েক স্বর্ণ মুদ্রার প্রলোভনে তাঁহাদের অমূল্য শক্তির অপব্যবহার না করেন। নশ্বর রাজশক্তির তোষামোদ করিয়া যে ধন পাওয়া যাইবে তাহা ঐ রাজশক্তির মতোই নশ্বর।—"হে কবিবৃন্দ! তোমাদের স্তুতি-তোষামদের বিনিময়ে ঐ ভঙ্গুর মানুষগুলির নিকট হইতে যাহা পাইবে, তাহা কিরূপ সম্পদ্? কতদিন তাহার স্থায়িত্ব?"২

প্রকৃত ধনীর নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিলে কবির হয়তো আপত্তি হইত না। কিন্তু চারিদিকে যে সকল রাজা-মহারাজা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা কি প্রকৃত ধনী? তবে তাহাদের এত অভাব কেন? দীন দরিদ্রের ন্যায় ধন লিপ্সা কেন? কবি বলিয়াছেন—

"হে কবিবৃন্দ! আমি তো দেখিতেছি, এই পৃথিবীতে সম্পৎশালী কেহই নাই। সুতরাং (কাহারও পদসেবা না করিয়া) কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা নিজ নিজ জীবিকা অর্জনের চেষ্টা কর। আর, তোমাদের কাছে যে মধুর কবিত্ব সম্পদ্ রহিয়াছে, তাহার দ্বারা যে-যাহার ইষ্টদেবের উপাসনা কর, স্তোত্র রচনা কর। আমি জানি, তোমরা যে দেবতারই উপাসনা কর না কেন, সমস্ত আসিয়া আমার জ্যোতির্ময় কিরীটধারী বিষ্ণুর চরণতলে পৌঁছিবে।"৩

কবি নম্মালোয়ার স্বয়ং কী করিবেন সে কথা এই পর্যায়ের প্রথম পদে অতি স্পষ্ট ভাবেই বলা হইয়াছে—"আমি যাহা বলিব, তাহা বলিলে অপ্রীতিকর লাগিতে পারে, কিন্তু তথাপি আমি বলিতেছি, শোন। যখন মধুকর—গুঞ্জন-মুখরিত তিরুবেঙ্কট পর্বতে আমার প্রভু, আমার পিতা রহিয়াছেন, তখন আমার কণ্ঠের মধুর গীতি আমি মানুষের সেবায় উৎসর্গ করিব না।"৪

কবির কাছে প্রভু একটা নাম-মাত্র নহে; প্রভুর অস্তিত্ব কবি অনুভব করেন তাঁহার অভ্যন্তরে—সে কখনো মধু, কখনো দুগ্ধ, কখনো ঘৃত, কখনো ইক্ষু, কখনো বা অমৃত। এমন যে মধুময় মধুসূদন, তাহার সহিত কবি এক হইয়া যান। তাই তো কবি নিজের দেহস্থ অন্তরাত্মাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—তুমি ধন্য; আর তোমাকে পাইয়া আমি ধন্য।৫

প্রভুর মাধুর্য এমনই আস্বাদনীয় যে, কবি তাহাকে দেখিতে পাইলে একেবারে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেন, কিন্তু কবির আক্ষেপ এই যে, সেই নিষ্ঠুর কালো মানিক তাঁহার আগেই ভালোবাসিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছেন। ৬

১। উয়র্বর উয়র্নলম্ উডৈয়বন্ য়বন্, অবন্;
মযর্বর মতিনলম্ অরুলিনন্ য়বন্, অবন্;
অয়র্বরুম্ অয়রর্কল অধিপতি য়বন্, অবন্,
তুয়ররু চুডর্অডি তোলুদু এলু, এন্মননে! (১।১।১)

২। এন্ আবদু এত্তনৈ নাট্কুপ্ পোদ্দুম্? পুলবীর্কাল্!
মান্না মনিদরৈপ্ পাডিপ্ পডৈক্কুম্ পোরুম্ পোরুল্। (৩,৯।৪)

৩। বম্মিন্ পুলবীর! নুম্ মেয়বরুত্তিক্ কৈ চেয়দুয়্ম্মিনো।
ইম্মন্ উলগিনিল্ চেল্বর্ ইপ্পোলুদুইল্লৈ নোক্কিনোম্।
নুম্ ইন্ কবিকোন্ডু নুম্ নুম্ ইট্টাতেধ্বম্ এত্তিনাল্
চেম্মিন্ চুড়র্মুডি এন্ তিরুমালুক্কুচ্ চেরুমে। —(৩,৯,৬)

৪। চোন্নাল্ বিরোধমিদু, আকিলুম্ চোল্লুবন্, কেল্মিনো।
এন্ নাবিল্ ইন্ কবিয়ান্ তরু বর্কুন্ কোডুক্কিলেন্।
তেন্নাতেনা এণ্ডু বণ্ডু মুরল্ তিরু বেঙ্কটত্তু
এন্নানৈ এন্ অপ্পন্ এম্ পেরুমান্ উলন্ আকবে। (৩,৯।১)

৫। উনিল্বাল্ উয়্যিরে নল্লৈ, পো উন্নৈপ্পেট্রু
বান্দুলার্ পেরুমান্ মধুসূদন এন্ অম্মান্
তান্নুন্ যানুম্ এল্লাম্ তন উল্লে কলন্দু ওলিন্দোম্
তেন্নুম্ পালুম্ নেয়ুম্ কন্নলুম্ অমুত্তুম্ ওত্তে। (২।৩।১)

৬। বারিক্ বেণ্ডুটৈন্ন বিলুঙ্গুকুবুন্ কানিল্ এণ্ড
আর উট্টু এন্নৈ ওলিয় এন্নিন্ মুন্নম

কবির কাছে ইহা এক পরম বিস্ময় যে, ভগবান্ তাঁহার মধ্য দিয়া নিজেকে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছেন। এই পর্যায়ের কবিতাগুলির মর্মকথাকে সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে—"আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ।" একটি কবিতায় বলা হইয়াছে—"তিনিই যে জগৎ সংসারের আদি কারণ তাহা আমাকে তিনি বুঝাইয়াছেন ; সুন্দর মধুর কবিতারূপে তিনি আসিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন আমার জিহ্বাগ্রে এবং শ্রেষ্ঠ ভক্তদের জন্য নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন—এমন প্রভুকে আমি কিরূপে ভুলিতে পারি ?"৭

কবি নিজের অক্ষমতার কথা ভালো করিয়াই জানেন। ছন্দোবোধ বা সুন্দর মধুর কবিতা রচনার শক্তি যে তাঁহার নাই ইহা তো প্রভুর কাছেও অজ্ঞাত নয়। কিন্তু কী আশ্চর্য, "ঈশ্বর অযোগ্য আমাকে তাঁহার নিজের করিয়া লইয়া আমার দ্বারা তাঁহার মধুর গান গাহিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আরও তো কত পরম-কবি রহিয়াছেন, কত মধুর তাঁহাদের সুর ও ভাষা ; কিন্তু কী আশ্চর্য, বৈকুণ্ঠপতি তাঁহাদের দ্বারা স্বীয় মহিমা প্রকাশ না করাইয়া আজ আমার মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিলেন ; তারপর আমাকে তাঁহার করিয়া লইয়া আমার মধ্য দিয়াই তিনি অমর সঙ্গীত গাহিবার ব্যবস্থা করিলেন।"৮

কবি এই পর্যায়ে যে ঈশ্বরানুভূতির কথা বলিয়াছেন তাহার ভিতরে একটি বাক্যাংশ আমরা এইরূপ পাইয়াছি—"এন্নৈ তন্নাক্কি" অর্থাৎ আমাকে তাঁহার করিয়া লইয়া ; কিন্তু অপর একটি পদে আমরা ঠিক ইহার বিপরীত কথার আভাস পাই। সেখানে (৭।৯।৭ সং পদে) বলা হইয়াছে 'তন্ তন্নৈ এন্নাক্কিক' অর্থাৎ "ঈশ্বর তাঁহাকে (নিজেকে) আমার করিয়া লইয়া" ইত্যাদি। ভক্ত কবির এই জাতীয় রহস্যানুভূতি ও আলোচ্য পর্যায়ের গান গুলির একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

ঈশ্বরের সহিত এইরূপ গভীর সংযোগের কথা বলিবার পরেও, কবির চিত্ত কিন্তু কেবল ঈশ্বর চিন্তায় রত থাকিতেছেনা। "যে বৈকুণ্ঠপতি আমাকে তাঁহার করিয়া লইয়া এবং তাঁহাকে আমার করিয়া লইয়া আমার মধ্য দিয়া মধুর গান গাহিতেছেন, কবে আমি কেবল তাঁহারই চিন্তায় পূর্ণ হইব ?" (তন্ তন্নৈ এন্নাল্ চিন্দিক্ক আবনো ?")—এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে অবশ্যই কবির অস্থির-চিত্ততার অনুভব করা যায়, বোঝা যায় যে ক্ষণে ক্ষণে অন্যরূপ চিন্তাও তাঁহার মনে প্রভাব বিস্তার করে।

তৎসত্ত্বেও কবিচিত্তে নৈরাশ্যজনিত বেদনা অপেক্ষা আত্ম-প্রত্যয়ের দৃঢ়তাই বেশি দেখা যায়। স্বর্গের আনন্দ কিংবা নরকের দুঃখের কথা ভাবিয়া দুর্বল মানুষ উল্লসিত কিংবা বিচলিত বোধ করে। ভক্ত কবি বলিতেছেন—"আমি যখন তুমিই, তখন আর ভয় কী ? অসহনীয় নরক জ্বালার মধ্যে পড়িয়াও তো তোমাকেই পাইব। সুতরাং তোমার আমার সম্পর্ক সত্য হইলে স্বর্গের আনন্দ এবং নরকের জ্বালা দুই-ই আমার পক্ষে সমান।"৯

নম্মালোয়ার নায়ক-নায়িকা ভাবে ভক্ত জীবনের বিরহ বেদনা প্রকাশের জন্য বিশেষ ভাবে 'তিরুবিরুত্তম্' রচনা করিলেও, আলোচ্য 'তিরুবায় মৌলীক' অংশেও আমরা অনুরূপ ভাবের কিছু রচনা দেখিতে পাই। এক স্থলে নায়িকা বিরহ রজনীতে এই বলিয়া আক্ষেপ করিতেছেন—"যাহারা নারীজন্ম ধারণ করিয়াছে তাহাদের নিরতিশয় বিরহ ক্লেশ দেখিতে পারেন না বলিয়া সূর্যদেব উদিত না হইয়া আত্মগোপন করিয়া আছেন (অর্থাৎ দীর্ঘ রাত্রির

পারিত্তুত্ তান্ এন্নৈ মুট্রপ্ পরিকিনান্—
কারোক্কুম্ কাট্ৰবৈ-অপ্পন্ কড়িয়নে। (৯।৬।১০)

৭। আম্মুদল্ এন্ ইবন্ এণ্ড্ তন্ তেট্রি' এন্
নামুদল্ বন্দু পুকুন্দু নল্ ইন্ কবি
তূমুদল্ পত্তর্ক্কুত্ তান্ তন্নৈচ্ চোন্ন, এন্
বায়মুদল্ অপ্পনৈ এণ্ড্রম্ মরপ্পনে ? (৭।৯।৩)

৮। চীর্ কণ্ডু কোণ্ডু তিরুন্দু নল্ ইন্ কবি
নেরপড য়ান্ চোল্লুম্ নীরমৈয়িলামৈয়িল্
এর্ বলা এন্নৈ তন্নাক্কি, এন্নাস্ তন্নৈপ্
পার্পরবু ইন্ কবি পাডুম্ পরমরে।
ইন্ কবি পাডুম্ পরম কবিকলাল্
তনকবি তান্ তনৈপ্ পাডুবিয়াদু—ইণ্ড্
ননকু বন্দু এন্নুডনাক্কি এন্নাল্ তন্নৈ
বন্ কবি পাডুম্ এন্ বৈকুন্তনাথনে। (৭।৯।৫—৬)

৯। য়ানু নী তানে আবদো মেয় য়ে অরুনরকু অবৈয়ুম্ নী—আনাল্
বান্ উয়র্ ইনবম্ ত্রয় দিলেন ? মত্রে নরকমে এয় দিলেন্ ?
...(৮।১।৯)

অবসান হইতেছে না); এদিকে আয়ত-লোচন। রক্তিম-বদন আমার কৃষ্ণর্ষভ ও আসে নাই; আমাকে এই চিন্তা ব্যাধি হইতে কে মুক্ত করিবে? দয়া করিবার ছলনায় কৃষ্ণ আসিয়া আমার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমার দেহ-প্রাণ দুই গ্রাস করিয়াছে—ইহাই হইল আমার কালো মাণিকের ডাকাতি।"১০

ভক্ত নায়িকা পাখিকে দূট দূত করিয়া তাঁহার প্রিয় দেবতার উদ্দেশ্যে পাঠাইতেছেন—"হে তরুণ জলচর কুরুকু (আণ্ডিল্) পাখি, তিরু মূলিক্কলম্ নামক স্থানে আমার প্রিয় রহিয়াছেন; মাথায় তাঁহার সুন্দর তুলসী মাল্য; হাতে তাঁহার স্বর্ণ চক্র, তুমি দেখিলেই তাঁহাকে চিনিতে পারিবে। তুমি তাঁহাকে গিয়া বলিও—আমার বক্ষোহার সমুন্নত; বিরহ বেদনার কুচ যুগল বিবর্ণ, আমার পুষ্পতুল্য নয়ন অশ্রুতে পরিপূর্ণ; আমাকে ভাল বাসিয়া পুনরায় পরিত্যাগ করা কি তাঁহার উচিত হইয়াছে?"১১

দূত মুখে সংবাদ প্রেরণ ব্যর্থ হওয়ায় নায়িকা উন্মত্ত প্রায়। দিন-রাত্রি তাহার মুখে অন্য কথা নাই; কখনো সে বলিতেছে—শঙ্খ, কখনো সে বলিতেছে—চক্র; আবার কখনো বলিতেছে—তুলসী। নায়িকার মাতা কন্যার এই অবস্থায় বিষম বিপদে পড়িয়াছে। সে পল্লীর সকল মেয়ের মায়েদের ডাকিয়া বলিল—ওগো, তোমরাও তো মেয়ের মা হইয়াছ। আমার মেয়ের পাগলামির কথা তোমাদের কাছে আর কী বলিব? সে কখনো বলে শঙ্খ, কখনো চক্র, কখনো তুলসী। দিবা-রাত্রি তাহার মুখে আর কোনো কথা নাই। তোমরা বল আমি এখন কী উপায় করিব?"১২

ভক্তের দৃষ্টিতে জগৎকৃষ্ণময় হইয়া গিয়াছে। কবি নম্মালোয়ার তাঁহার "পেরিয় তিরুবন্দাদি' অংশের কয়েকটি স্তবকে এই প্রসঙ্গে যে কথা বলিয়াছেন তাহা একান্তই হৃদয়-স্পর্শী। কৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে তাঁহার বর্ণ-সাদৃশ্যে ভক্তের বিভ্রম হইতেছে—"মেঘই কৃষ্ণ। কৃষ্ণ ঐ বিশাল পর্বত; নীল সমুদ্রই কৃষ্ণ, কৃষ্ণ ঐ গভীর অন্ধকার; ভ্রমর-পূর্ণ 'পূবৈ' পুষ্পই কৃষ্ণ, কৃষ্ণ ঐ যত কিছু কালো। ইহাদের কালো রূপ যখনই দেখি, তখনই আমার হৃদয়—"এই তো কৃষ্ণের মূর্তি"—ইহা বলিয়া আমাকে ত্যাগ করিয়া সেই কালো রূপের দিকে ছুটিয়া যায়।"১৩

অপর একটি স্তবকে বলা হইয়াছে—"যখনই দেখি পূবৈ, কায়া, নীলম্ ও কাবি ফুল ফুটিতেছে, তখনই আমার হৃদয় মনে করে—ইহারা সকলেই তো আমার প্রভুর অঙ্গ। এই ভাবিয়া ধন্য আমার কোমল অন্তর আমার দেহের অভ্যন্তরে স্ফীত হইতে থাকে।"১৪

নম্মালোয়ারের একশত স্তবক-বিশিষ্ট "তিরুবিরুত্তম" অংশটি মুখ্যত নায়ক-নায়িকা-ভাবকে কেন্দ্র করিয়াই রচিত হইয়াছে। ইহাতে কোনো কাহিনী নাই, বিশেষ কোনো ঘটনারও বিবরণ নাই। তবে ভাবাত্মক শ্লোকগুলির ফাঁকে ফাঁকে কিছু কিছু ব্যাপার ঘটিয়া থাকিবে এইরূপ কল্পনা করিয়া লওয়ার অবকাশ রহিয়াছে। কোনো পদ নায়িকার

১০। পেন্‌পিরন্দয়ে এয়্‌দুম্ পেকম্ তুয়র্ কান্‌কিলেন, এণ্ড্
ওণ চুড়রোন বারাদু ওলিত্তান্; ইম্ মণ অলন্দ
কণ পেরিয় চেববায় এম্ কার্ এক বারানাল্;
এণ পেরিয়ে চিন্তৈনোয় তীর প্পার্ আর্ এন্নৈয়ে?
তিরুবরুল্ চেয়্‌পবন পোল এন উল্ পুকুন্দু
উন্নুবমুম্ আর্ উয়িরুম্ উডনে উন্তান;
তিক বলর্ চৌলেত তেন্ কাট্‌করৈ এন অপ্পন
করুবলর্ মেনি এন কন্নন কল্‌বঙ্গলে!

১১। পূম্ তুলায় মুডিয়ারক্কুপ্ পোন্ আলিক কৈয়ারক্কু
তন্দু নীর্ ইলম্ কুরুকে, তিরুমূলিক্ কলত্তারক্কু—
এন্দু পূণ মুলৈ পয়ন্দু এন্ ইণৈ মলর্‌ক্ কন্ নীর তত্তুম্,
তাম্ তম্মৈক কোণ্ডকল্‌তল্ তকবু অণ্ড্ অণ্ড্ উরৈয়ীরে।

১২। নঙ্গৈমীর্ নীরুমত্তর্ পেন্ পেট্ নল্‌কিনীর;
এঙ্গনে চোল্লুকেন্ য়ানপেট্ট এপৈয়ৈ?
শঙ্খ্ এন্নুম্ চক্রম্ এন্নুম্ তুলায় এন্নুম্
ইঙ্গণে চোল্লুম্ ইরাপ্পকল্; এন্ চেয়্‌কেন্?

১৩। কোণ্ডল্ তান্ মাল্‌বরৈ তান্ মাকডল্ তান্ কুর্ ইরুল্ তান্
বণ্ডরাপ্ পূবৈ তান্ মট্ট্ তান্—কণ্ডনাল্
কার্ উরুবম্ কান্ তোরুম্ নেঞ্জোডুম্—"কন্নার্
পের্ উরুচু" এণ্ড্ এম্মৈবা পিরিন্দু।

—পদ সং ৪৯

১৪। পূবৈরুম্ কায়াবুম্ নীলমুম্ পূক্‌কিণ্ড্
কাবি মলর্ এণ্ডুম্ কান্ তোরুম্—পাবিএন্
মেল্ লাবি মেয়্ মিকবে পুরিক্কুম্—অব্ববৈ
এল্লাম্ পিরামুকবে এণ্ড্। (পদ সং ৭৩)

উক্তি, কোনো পদ বা নায়িকার সখীদের, কোনো পদ বা তাহার মাতার। কোনো পদ বা কবিরই বর্ণনা। এইরূপ পদে গোপীপ্রেমের আকর্ষণে স্বর্গবাসী কৃষ্ণের মর্তাবতরণের কথা বলা হইয়াছে।—"স্বর্গবাসী দেবতারা তোমার পূজার জন্য গ্রহণ করেন সুন্দর মালা, তোমাকে স্নান করান নির্মল জলে, তোমার সম্মুখে করেন ধূপের আরতি। কিন্তু তুমি অনুপম মায়াবলে নামিয়া আস ননী-মাখন চুরি করিয়া খাইতে, বৃষকুলে নৃত্য করিতে, এবং এই সমস্তই তুমি কর গোপকুলসম্ভূতা সেই শাখা (লতা ?)—সন্নিভা বালিকাটির জন্য!" ১৫

গোপকুলসম্ভূতা সেই বালিকা অর্থাৎ 'তিরুবিরুত্তম্' এর নায়িকা আকাশের বিপুল মেঘ-সম্ভারের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ব্যথিতচিত্তে স্মরণ করে মেঘ-শ্যাম কৃষ্ণকে। কৃষ্ণ কি মেঘের ন্যায় শ্যাম ? না না মেঘই কৃষ্ণের ন্যায় শ্যামবর্ণ ধারণ করিয়াছে। নায়িকা তাই আকাশে সঞ্চরমাণ মেঘরাশিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—"হে মেঘ, তোমরা আমাকে বল, কৃষ্ণের দেহকান্তি-সদৃশ রূপ লাভ করিবার মতো সৌভাগ্য তোমরা কিরূপে অর্জন করিলে? ১৬ জীবকুলের প্রাণরক্ষার জন্য তোমরা উত্তম জলভার বহন করিয়া সমস্ত আকাশ বিচরণ কর। এই কাজে (জলভার হেতু) তোমাদের শরীর কত কষ্ট পায়। ইহাই তো তোমাদের তপস্যা, আর এই তপস্যার বলেই তোমরা কৃষ্ণের প্রসাদ লাভ করিয়াছ।"১৭

অবশ্যই ইহা নায়িকার বিরহ-দশার উক্তি। বিরহিণী হংসকে দূত করিয়া পাঠাইতেছে তাহার প্রিয়দেবতার উদ্দেশে।—"হে হংস, হে সারস, তোমরা যাহারা উড়িয়া যাইতেছ, আমি তোমাদের কাছে প্রার্থনা জানাইতেছি। তোমাদের মধ্যে যাহারা আগে পৌঁছিবে, তাহারা ভুলিও না—যদি আমার হৃদয়বাসী কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা হয় তো তাহাকে আমার কথা বলিও; আর জিজ্ঞাসা করিও—'তুমি একান্ত তাহার (তোমার প্রিয়ার) কাছে যাও নাই? ইহা কি উচিত হইয়াছে?" ১৮

আমরা কল্পনা করিতে পারি নায়িকার এইরূপ বিরহাবস্থায় তাহার সখীরা কৃষ্ণের নিন্দা করিয়া কৃষ্ণপ্রিয়াকে সান্ত্বনাদানের চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু বিরহিণী তাহার প্রিয়ের নিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া সখীদের সম্বোধন করিয়া বলিতেছে—"আমি কি প্রতিমুহূর্তেই তাঁহার কৃপা পাইতেছি না? তাঁহার সানুরাগ রক্তিম লোচন—যাহা কিনা শীতল ও কোমল পদ্ম-তড়াগের ন্যায় প্রকাশিত—সেই মধুর নয়ন আমার মনে প্রবেশ করিয়া কৃষ্ণের সেই শ্রীমুখের প্রতি ভালবাসা জাগাইয়া তোলে এবং এখন তাহা আমার অন্তরে বিরাজ করিতেছে।" ১৯

সখীদের কাছে এইরূপ বলিলেও ভক্ত-নায়িকা জানে যে সেই প্রেমিক-প্রবরকে কেবল জানিলেই শান্তি নাই, তাহাকে একান্ত করিয়া পাওয়া আবশ্যক। ঐ ত সূর্য অস্তমিত হইল, রাত্রির অন্ধকার এখনই ঘনাইয়া আসিবে। দেবতা তো ভক্তের সঙ্গে অনেক প্রতারণার খেলা খেলিয়াছে, এখনও কি তাহার কৃপাবিতরণের সময় হয় নাই? ২০

১৫। চুট্টুন্ মালৈকল্ তূয়্ বেন্দি বিণ্ণোরকল্ নন্নীর্
আট্টি ধূপম্ তরানিরকবে অঙ্গোর মায়ৈয়িনাল্
ঈট্টিয় বেণ্ণেয় তোডুবুণ্ণপ পোন্দি ইমিলেট্রুবন্ কূন্
কোট্টিডৈ য়াডিনৈ কুত্তু অডলায়র্ তন্ কোম্বিনুক্কে।
—পদ সং ২১।

১৬। আণ্ডালের পদেও আমরা অনুরূপ ভাবের সন্ধান পাই। সেখানে নায়িকা মেঘের পরিবর্তে শুভ্র শঙ্খকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছে যে, সে শঙ্খ এমন কি মহৎ তপস্যা করিয়াছে যাহার জন্য কৃষ্ণের অধর-স্পর্শের সৌভাগ্যলাভ তাহার ঘটিল।

১৭। মেঘঙ্গলে! উরৈয়ীর্ তিরুমাল্ তিরুমেনি ওক্কুম্
য়োগঙ্গল্ উঙ্গলুক্কু এব্বাক পেট্রীর্? উয়ির্ অলিপ্পান্
মাবাঙ্গল্ এল্লায় তিরিন্দু নন্নীর্কাল্ চুমন্দু নুন্দম্
আকঙ্গল্ নোবু বরুত্তুম্ তবমাম্ অরুল্পেট্রদে।
—পদ সং ৩২

১৮। অন্নম্ চেলবীরুম্ বণ্ডানম্ চেল্গীকম্ তোলুদিরন্দেন্
মুন্নম্ চেল্গীবৃকল্ মরপ্পেল্ মিনো, কন্নন্ বৈকুণ্ডনোড়ু
এন্নম্ নেঞ্জিনারৈক্ কণ্ডাল্ এন্নৈচ্ চোল্লি—অবরিডৈ নীর্
ইন্নম্ চেল্লীরো? ইদুবো তকবু?' এণ্ড্রু ইসৈমিনকলে।
—(পদ সং ৩০)

১৯। বন্নম্ চিবন্দুল বানাড মরুম্ কুলিব্বিলিয়
তণ্ মেন্ কলমত্ তডম্ পোব্ পোলিন্দন—তামিবৈবো
কন্নম্ তিকমাল্ তিরুমুগম্ তন্নোডুম্ কাদল্ চেয় দেরকু
এন্নম্ পুকুন্দু—অডিয়েনোড়ু ইক্কালম্ ইক কিণ্ডদে।
—(পদ সং ৬৩)

২০। পদ সং ৮০।

দেবতার প্রসাদ-লাভের জন্য ভক্তের আকুলতা-প্রকাশের মধ্যে আমরা ইহাও দেখিতে পাই যে, একান্ত নিভৃতে দেবতার সাক্ষাৎলাভের সুযোগ যদি না-ও ঘটে, তবে অন্ততঃ রাজপথের ভীড়ের মধ্যেও যেন একবার তাহার দর্শন-লাভের সৌভাগ্য হয়। 'যেমন করিয়া হউক একবার তুমি দেখা দাও'—এই সুরের আবেদন। ৮৪ পদে বলা হইয়াছে—"সুন্দরী রমণী মহলেই হউক, অথবা ধনী ব্যক্তিদের উৎসব-আড়ম্বরেই হউক, অথবা অনুরূপ অন্য কোনো স্থানেই হউক, হে শঙ্খচক্রধারী, হে অঞ্জনবর্ণ, হে আমার মণি-মুক্তা-মাণিক্য আমি তোমার দর্শন আকাঙ্ক্ষা করি।" ২১

ভক্তের কাতর আবেদনে দেবতা আর কতকাল উদাসীন থাকিতে পারেন? অবশেষে তাঁহাকে আসিতেই হইল। সেই প্রিয়-মিলনের মধুর আনন্দের স্মৃতি নায়িকা এইভাবে তাহার সখীর কাছে ব্যক্ত করিয়াছে—"সখি আর ভয় নাই। একটি শীতল দক্ষিণ বায়ু আসিয়া আমার কাছে পৌঁছিল—কেহ সে আগমনের কথা জানিতে পারে নাই। তারপরে তুলসীমঞ্জরীর মধুর গন্ধ এবং মেঘের শীতলতা লইয়া সে আমার সমস্ত দেহ মনে স্নেহের স্পর্শ বুলাইয়া দিল।"২২

কবি নম্মালোয়ারের প্রধান রচনা 'তিরুবায়মোলি' দিয়া আমরা তাঁহার আলোচনা শুরু করিয়াছিলাম। সেই 'তিরুবায়মোলি' নিয়াই এই আলোচনার উপসংহার করিতেছি। ভগবতপুরাণে যে যুগ সম্পর্কে বলা হইয়াছে

কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্।
কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণ—পরায়ণাঃ॥

নম্মালোয়ার সেই ভক্তজন্ম ধন্য কলিযুগে আবির্ভূত হন। কবি দুঃখ-তাপ ক্লিষ্ট সাধারণ মানুষের জন্য একটা নতুন দিনের আভাস পাইয়াছিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—ভক্তের দল যখন প্রচুর সংখ্যায় মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখন আর ভয় কিসের? 'যুগের পরিবর্তন ঘটিবে, কলিযুগের অবসান হইবে—এই সুরে নম্মালোয়ারের কয়েকটি কবিতা পাওয়া যায়। কবি গাহিয়াছেন—

"জয় হউক, জয় হউক, জয় হউক। মনুষ্যজীবনের নিষ্ঠুর অভিশাপ চলিয়া গেল। নরকের দুঃখ কষ্টও বিনষ্ট হইল। এই পৃথিবীতে যমরাজের আর কিছু করিবার নাই। কলিযুগও শেষ হইতে চলিল। কারণ, সেই সমুদ্র-শ্যাম কৃষ্ণের সহচরগণ দলে দলে আসিয়া এই পৃথিবীতে জন্মলাভ করিয়াছেন। তাঁহারা প্রভুর কীর্তি-গাথা গাহিয়া গাহিয়া ইতস্তত নাচিয়া বেড়াইতেছেন—ইহা আমরা দেখিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি, দেখিয়াছি, দেখিয়াছি। সেই দৃষ্টি-মধুর ব্যাপার দেখিয়াছি। হে ভক্তবৃন্দ! আসুন, আমরা সকলে উচ্চকণ্ঠে তাঁহার পূজার্চনা করিয়া আনন্দোৎসব করি। সেই শীতল-সুন্দর-মালবেষ্টিত-তুলসী-ভূষণ মাধব, তাঁহার সহচরবৃন্দে মধুর রাগে গাহিতে গাহিতে এই মাটির বুকে ব্যাপক ভ্রমণ করিতেছেন—আমরা তাহা দেখিয়াছি। জয় হউক, জয় হউক, জয় হউক!" ২৩

২১। তৈয়নল্লারকল্ কুলাঙ্গল কুলিয় কুলুবিনুল্লুম্
উয়্যন্দ্রল্লারকল্ কুলিয় বিলাবিনুম্—অঙ্গঙ্গেল্লাম্
কৈয়োণ্ডালি শঙ্খোড়ুন্ কান বান অবাবুবন নাদ্
মৈয়ন্না! মণিয়ে! মুত্তমে! এন্তন মাণিক্কম!
— (পদ সং ৮৪)

২২। ...অগ্গন্ম্ তোলি! ওর নন তেণ্ডল্ বন্দু
অংলিডে যাকম্ অরিন্দিলর্। তন্পুম্ তুলায়িনিন তেন
পুংলুড নীর্মৈয়িনাল্—তডবিটেন পুলম্কলণে।
—(পদ সং ৫৬)

২৩। পোলিক পোলিক পোলিক! পোয়িট বল্উয়িরচ্চাপম্,
নলিয়ম্ নরকমুম্নৈনদ নমনুক্কু ইঙ্গুয়াতোণ্ডম্ ইল্লৈ—
কলিয়ুম্ কেডুম্ কণ্ডুকোনমিন. কডল্বন্নন ভূতঙ্গল্ মনমেল্
মলিয়প পুকুন্দু ইচৈ পাডিয়াডিয়ুলি তরক্ কণ্ডোম্।
কণ্ডোম্ কণ্ডোম্ কণ্ডোম্ কন্নুক্কু ইনিয়ন কণ্ডোম্,
তোণ্ডীর! এল্লরুম্ বারীর্! তোলুদু তোলুদু নিণ্ড্রার্তুম্
বণ্ডার্ তন্নম্ তুলায়ান মাধ্বন ভূতঙ্গল্ মনমেল্
পণ্ডান পাডি নিণ্ড্রাডিপ পরন্দু তিরিকিণ্ড্রনবে।
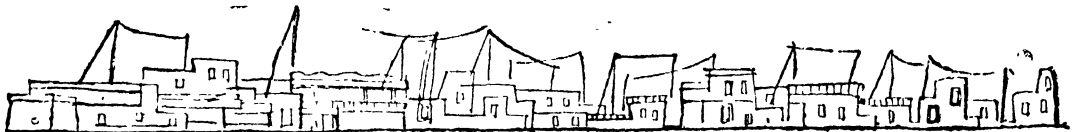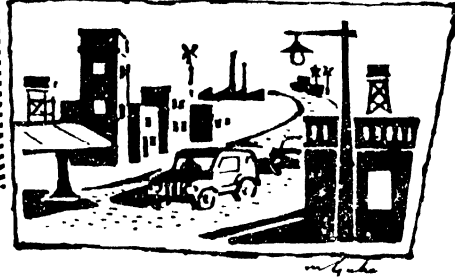
(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তারকরত্ন রায় কথাগুলো সবই শুনেছে। কানে আসে। এককালে ওর দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারাকে দেখা যেত গ্রাম-গ্রামান্তরে হেঁটে—না হয় ঘোড়ায় করে ঘুরেছে। বড়-কালীর জঙ্গলমহালে যেতো আদায় ওয়াশীলে।

রতনেশ্বরের মেলার অন্যতম কর্মকর্তা।

কপালজোড়া সিন্দুর-রক্তচন্দনের ত্রিপণ্ড্র কেটে হুঙ্কার দিয়ে ফিরতো বাতাসে। বলো শিব মহাদেব।

টং টং বেজে উঠতো নাটমন্দিরে টাঙ্গান ঘণ্টা।

ওটা ওই আনিয়ে দিয়েছিল সেবার কাশী থেকে।

এখন আর বড় একটা বের হয় না তারকরত্ন।

বয়স এমন কিছু হয়নি। সেবার ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়েছিল বীরভুবনপুরের বনের ধারে কাঁকুরে ডাঙ্গায়।

অবশ্য অনেকে অনেক কথাই বলে এই নিয়ে।

কেউ বলে জঙ্গলমহলের প্রজারাই বিশেষ কোন অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সেদিন সন্ধ্যার মুখে অন্ধকারে গাঁ-ফিরতি জমিদার তারকরত্নকে একলা পেয়ে একটু জবাব দিয়েছিল মাত্র।

কেউ বলে অতিরিক্ত কারণ বারির প্রসাদে মহলের কাছারীবাড়ীর চিলেকোঠার ছাদ থেকে আকাশে ওড়বার বাসনা থেকেই এই পরিণতি হয়েছে।

এমনিতর নানান কথা কাহিনীই প্রচলিত রয়েছে—ওর পা-টা বিকৃত হওয়ার মূলে; অবশ্য তাতে তারকরত্নের কিছু আসে যায় না। বাড়াতে—কাছারী ঘরে বসেই সব খবর তার নখদর্পণে।

বয়স হয়েছে ইদানীং, বয়সের ছাপ ও তার বলিষ্ঠ দেহের ভাঁজে ভাঁজে ফুটে উঠেছে। চুল সাদা হয়ে উঠছে মাথার ধারপাশে!

শরতের মিষ্টি রোদ কাছারী বাড়ীর চত্বরে লুটিয়ে পড়েছে। মেঘমুক্ত নীল আকাশ, কোণের শিউলি গাছটা সারা বছর অনাদৃত হয়ে মরাই-এর আড়ালে আওতায় দাঁড়িয়ে থাকে, হঠাৎ যেন ওর যৌবন জেগে ওঠে। ফুল-সাজে সেজে ওঠে কোন রূপবতী—বাতাসে যৌবনস্বপ্ন-জাগানো সৌরভ চাঁপাগাছের সবুজ পত্রাবরণের শীর্ষে দু-চারটে সোনা রং-এর ফুল ফোটে।

আনমনে ওই দিকে চেয়ে থাকে তারকরত্ন।

হারানো অতীতের কথা মনে পড়ে, কত স্বপ্নরাঙ্গা দিন। কত মধুসন্ধ্যা।

বৈকালের রোদ বিশাল চত্বরে সারি সারি ধানের গোলার আড়ালে আলোছায়ার ইসারা আনে। সারা উঠান ছড়িয়ে প্রায় পনখানেক মরাই ছিল।

ইদানীং বাজার দর বেড়েছে। তাছাড়া কয়েক বছর আগে মন্বন্তরের সময় ধানটান অনেক ছেড়ে দিয়েছিল—নইলে নাকি 'সিজ' করে নিত ওরা জোর করে।

ধানের সঞ্চয় একবার গেলে আবার জমতে অনেক বছরই লাগে। ঝরণার জল তিরতিরিয়ে ঝরবে, জমবে আরও দেরীতে।

তাই ধানের সঞ্চয় দাঁড়িয়েছে গোটা বিশ পঁচিশ মরাই-এ, তার থেকে আবার চাষবাসের খরচা গেছে।

জায়গাটা অনেকখানি ফাঁকা হয়ে এসেছে, মাঝে মাঝে স্তূপাকার করা খড়—মরাই এর বড়, কাঠের পাটাতন ইত্যাদি। কেমন চাইতে পারে না তারকরত্ন, শ্রীহীন বলে বোধ হয়।

—কে।

কার পায়ের শব্দে মুখ তুলে চাইল। জীবনরত্ন ফিরছে স্কুল থেকে। ছেলের দিকে চেয়ে থাকে তারকরত্ন।

তারই আদল পেয়েছে ছেলে, তেমনি ফর্সা রং, বলিষ্ঠ চেহারা। বাবাকে তির্য্যক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে দেখে একটু অস্বস্তিবোধ করে জীবনবাবু।

পায়ে পায়ে সরে যেতে থাকে ভিতর বাড়ীর দিকে।

—শোন!

বাবার ডাকে থমকে দাঁড়ায়। ছটফট করছে মনে মনে। ওদিকে খেলার মাঠে যাবার দেরী হয়ে গেছে। বন্ধুবান্ধব ইয়ারবক্সীরাও অপেক্ষা করছে বাইরে। বাবার ভয়ে তাদের ভিতরে আনতে সাহস করেনি।

যা দুর্মুখ লোক—বাবাকে এড়িয়ে চলে তাই জীবন।

—হেডমাষ্টারমশাই বলছিলেন, এবার নাকি যাচ্ছেতাই রেজাল্ট করেছ?

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে জীবন বাবার সামনে।

জবাব দেবার ক্ষমতা নেই।

—কি? কথা বলছ না যে?

—ভাল করে পড়ছি এখন।

কোন রকমে সরে আসবার চেষ্টা করে জীবন—জীবনটুকু হাতে করে।

সরে গেল সে।

কাছারীঘরের ওদিকে কয়েকটা পায়রা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পুরোনো আমলের পাল্কীটাও ব্যবহারের অভাবে জীর্ণ রং-চটা অবস্থায় পড়ে আছে এককোণে গৌরবময় অতীতের মত।

কাছারার নায়েব গোমস্তারাও বিশেষ কেউ নেই; ঢুলছে দুলে পাইক। চারিদিকে কেমন একটা ক্লান্ত জীর্ণতার ছায়া। সমস্ত বাড়ীটা যেন ধুঁকছে।

ধুঁকচে রায়জী বাড়ীর অন্তরাত্মা।

—তামাকটা বদলে দে! এ্যাই

ধড়মড়িয়ে ওঠে দুলে বাগদী!

—হুজুরের ডাকে বাঘে বলদে একঘাটে জল খায়, আর ব্যাটা বাগ্দীর কি না নিদ্রাই ভাঙ্গে না। কলির কম্ভু-কন্নো না কি রে তুই! এঁ্যা।

ভাঙ্গা গোলা মরাই-এর আড়াল থেকে যেন মাটি খুঁড়ে উদয় হয়, সতীশ ভটচায। সকালের বেশ এ নয়।

মাথার শিখায় বাঁধা শুকনো টগর ফুল।

পরণে তার কাচা ধুতি—ফতুয়া, গলায় জড়ানো দড়ি-মত পাক দেওয়া উত্তরী, ওটা বোধহয় প্রথমদিন থেকেই পাক খাচ্ছে, পাক খেয়ে খেয়ে ওর অবস্থা সতীশ ভটচাযের ধড়ের মতই পাকানো স্মুঁটকো হয়ে উঠেছে। হাতে তেল পাকানো সরকঞ্চির একটি কাঠি—মাথার দিকের গিঁটটা বহু যত্নে খোদাই করে কুকুরের না হয় আর কিছু পদার্থের মত মুখ বানানো হয়েছে।

সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় বস্তু হচ্ছে ওর পদযুগলে শোভা পাচ্ছে একজোড়া ক্যাম্বিসের জুতো। চালের বাতার বাঁকে বেশীরভাগ সময় তোলা থাকার দরুণ কেমন তেবড়ে ডোঙ্গার মত হয়ে উঠেছে, ধুলোর আস্তর পড়েছে।

ওর এই বেশবাস-এর দিকে চেয়ে থাকে তারকরত্ন।

এ বেশে ওকে অনেকবারই দেখেছে সে, সব বারই সদরে কোন সাক্ষী দিতে গেছে, না হয় অন্য কোন বিশেষ গুরুদায়িত্ব নিয়ে চলে।

—রাজবেশে কোথায় হে?

সতীশ ভটচাযও ওর সমবয়সীই, মাঝে মাঝে ওর কাছে তারকরত্নের গাম্ভীর্য্যের মুখখানা ফুলে পড়ে, হালকা রসিকতার সুরে কথা হয়, দু চারটে।

—আজ্ঞে, ওই যে ভৈরব থানে। এত করে বললে নীলকণ্ঠ, পঞ্চজনের সৎকায, না গিয়ে।

—তা, সৎকাযে আজকাল মতি হয়েছে দেখছি।

তারকরত্নের দিকে চাইল সতীশ, হালকা সুরেই কথা-বার্তা সুরু হয়েছিল, ক্রমশঃ লোকটা যেন বদলে যাচ্ছে।

ওকে চেনে সতীশ। জানে কতখানি ধূর্ত আর কূট-কৌশলী। চুপ করে চেয়ে থেকে বলে ওঠে তারকরত্ন।

—অনেকেই আসছে শুনছি।

—হুজুরকে তো বলেছে শুনলাম।

সতীশ ভয়ে ভয়ে কথাটা বলে। জবাব দিল না তারকরত্ন।

বৈকাল হয়ে আসছে। ঢলেপড়া সূর্য্যের আলো বৈঠকখানার কার্ণিস ছেড়ে উঠে ছাদের আলসেতে পড়েছে।

পুরোনো চুণ-পলেস্তারা-করা বাড়ী, বহুকাল তাতে আর কিছু পড়ে না। কালো শেওলা ঢাকা ছাদের আলসের রোদটুকুও কেমন যেন বিবর্ণ সঙ্কুচিত হয়ে গেছে।

এ বাড়ীতে আলো ঢুকতেও ভয় পায়।

বাতাসে জেগে উঠছে শিউলীফুলের সৌরভ, এ বাড়ীর কঠিন ভিত্তিমূলে ওই যেন একটু অন্য জগতের ইসারা আনে।

সতীশ ভটচায হাওয়া ঠিক বুঝতে পারে না।

এসেছিল একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই। তা ওর মুখ চোখ দেখে খানিকটা খুশীই হয় মনে মনে।

কোন আপোষের পথে রাজী হবে না তারকরত্ন।

না হলেই মঙ্গল!···

উঠি হুজুর। ওদিকে ওনারা বোধহয় সব এসে পড়েছেন।

—হ্যাঁ।

সংক্ষেপে তাকে বিদায় জানিয়ে ওর গতিপথের দিকে চেয়ে থাকে তারক। লোকটা চলে গেল।

সতীশ ভটচায যদি পিছন ফিরে দেখত, তাহলে হয়তো বুঝতে পারতো কিছুটা। তারকরত্নের গোঁফের ফাঁকে ফাঁকে ধারাল একফালি হাসি ও তার নজর এড়াতো না।

তার মত লোক এর অর্থ বুঝতে পারতো নিশ্চয়।

না; সতীশ ভটচায আর পিছন ফিরে চায়নি। বের হয়ে যায় সোজা ফটকের দিকে।

—দুলে!

দুলিচাঁদ হুজুরের ডাকে এসে দাঁড়াল সামনে।

—কেউ এলে বলে দিবি—আজ আর দেখা হবেনা! বুঝলি?

—আজ্ঞে!

দুলিচাঁদ বোঝে, এরপর হুজুরের সঙ্গ আর কারো না করাই উচিত হবে। কারণ আজই বিশে বাগ্দী গোয়াল-বাড়ীর পিছনে বসে সারাদিন জ্বাল দিয়েছে চোরা উনুনে।

এতক্ষণ বোধহয় সতেজ চন্দন রং পানীয় নেমেছে কয়েক বোতল।

···হুজুর উঠে গেল।

—তারকরত্ন আজ অন্য কাযে ব্যস্ত।

এতদিন ঠিক এতটা ভাবেনি। তাই ওদিকে মনও দেয়নি।

এইবার যেন টনক নড়েছে।

বিশাল বাড়ীটা কয়েকটা প্রস্থ ভাগ করা।

আবছা আলোয়-আঁধারিতে কেমন রহস্যপুরী বলে মনে হয়। বদ্ধ গুমোট বাতাসে।

অন্ধকার গলিপথে কয়েকটা চামচিকে ফর ফর করে উড়ে বেড়ায়, বিরক্ত হয়ে ওঠে তারকরত্ন।

মুখে গালে লাগে ওদের ঝাপটা। সংখ্যায় এত ছিলনা তারা, কেমন যেন দিন যাবার সঙ্গে সঙ্গে ওরাও পাল্লা দিয়ে বাড়ছে।

হঠাৎ বাতাসে একটা মিষ্টি সুবাস, গলিটা শেষ হয়ে অন্দরে যাবার মুখে একটু উঠানের মত মুক্ত আকাশ তলে এসে থেমেছে, এক দিকে উঠে গেছে অন্দরের সিঁড়ি;

পথটা অন্যদিকে বেঁকে গেছে গোয়াল বাড়ীর দিকে।

—বাবা।

হঠাৎ শিউলিকে দেখে থমকে দাঁড়াল তারকরত্ন।

আবছা অন্ধকারে কি যেন একটা গর্হিত কায করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে সে। মেয়েকে দেখে এগিয়ে যায়।

—কিছু বলবি?

মায়ের শরীরটা খারাপ; তারকরত্নের মনের সব সুর ছিড়ে যায়। অন্য কেউ হলে কড়া স্বরেই জবাব দিত। কিন্তু এই একটি জায়গায় অনেক চেষ্টা করেও তারকের মত কঠিন একটি মানুষও কঠিনতর হতে পারেনি।

—জীবন কোথায়? শশী গোমস্তাকে বলো—ডাক্তার-বাবুকে খবর দিক। তাছাড়া বারোমাস তিরিশদিনের অসুখ ওর আবার বাড়া কমা কি বল?

শিউলি কথা বলে না, বাবার দিকে চেয়ে থাকে।

বয়স হয়েছে তার। অনেক দেখেছে এ বাড়ীর জীবন-যাত্রা। ওই সরু পথটা বেঁকে গেছে অন্দরের শুচিতা থেকে কোন ঘৃণ্য নরকের পথে—তাও খানিকটা অনুমান করতে পারে আজকাল। রাত্রের আঁধারে তারকরত্নকে মনে হয় অন্য মানুষ।

শিউলি জবাব পেয়ে চলে যাবে ভেবেছিল, কিন্তু যায় না, যেন ওই সরু পথটা আগলে দাঁড়িয়ে আছে সে।

বলে ওঠে তারক—আমি আসছি ওদের সঙ্গে কাষের কথা সেরে। দাঁড়াল না! পাশ দিয়ে বের হয়ে গেল সে। আজ সত্যই তার দরকার রয়েছে—বিশেষ দরকার।

···এসব পরামর্শ সদর কাছারীতে বসে সব সময় হয় না। ভুবন পোদ্দার, হেলু মাষ্টার, বীরেন সিংহ দেও অনেকেই এসেছে। স্কুল কমিটির মিটিং।

বীরেন বাধা দিয়েছিল—আজ পথ-গামী বৈঠক ভৈরব-তলায়, স্কুলএর মিটিং আজ বন্ধ থাকুক! পরে হবে।

ইউনিয়নবোর্ডের অন্যতম সিডিউল-কাষ্ট মেম্বর নিতাই বাগ্দীও আজকাল তারকরত্নের দয়ায় প্রকৃত বস্তুর মর্য্যাদা বুঝেছে। সন্ধ্যার পরই কেমন চাহিদা অনুভব করে শিরা-তন্ত্রীতে।

সুতরাং সেই জবাব দেয়—ইস্কুল আর ধর্ম্মো এক হল বীরেনবাবু।

বিদ্যা নিয়ে কথা; কলিকালে বিদ্যেই ধম্মো!

—নিতাই আজকাল দামী কথা শিখেছে হে! হাসে নিতাই তারকরত্নের কথায়।

হেলু মাষ্টারের একটা আশা মনে রয়েছে। আধ-পাগলা বসন্তবাবুকে হঠাতে পারলে হেডমাষ্টার সেই-ই হবে। তারকবাবু স্কুল কমিটির সেক্রেটারী, সুতরাং তার আদেশই সব। তাকে খুশী করা দরকার। সুতরাং বৈকালে মিটিং শেষ করে ওখানে যাবে তারা।

বৈকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা এসে পড়েছে। ছটফট করছে বীরেনবাবু। আরও দু-একজন। তখন তারকরত্নের দেখা নেই।

শশী গোমস্তা—নটবর পাঁড়ুই ওদিকে ভুরিভোজনের ব্যবস্থা করছে। পোলাও আর মাংস। বাতাসে তারই

ভক্তি চাটুয্যে গলা খাটো করে বলে হেলুকে—কি হে মাষ্টার, এর তুলনায় ভৈরবতলার শুকনো মিটিং।

হেলু স্বপ্ন দেখছে হেডমাষ্টারের বড় চেয়ারটায় সে বসেছে, ওর ডাকে চমক ভাঙ্গে। সায় দেয়—তা আর বলতে।

···নীলকণ্ঠবাবু ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, অনেকেই এসেছে; দইগাঁয়ের দত্তমশায়; চাটুয্যে, হরেকিষ্ট-পুরের বসন্ত মোড়ল, গদারডিহির নোতুন গোঁসাই; এ গাঁয়ের অনেকেই।

তেতুলতলার ঘাস আগাছা মেরে পরিষ্কার করেছে লোহার পাড়ার দুগো, কিষ্ট, পশুপতি সবাই। পানু দাস এসে ভক্তিযুক্ত হয়ে ভৈরবতলায় মাথা ঠেকিয়ে বসে।

সতীশ ভটচায হেঁকে ওঠে—ভালো করে পেন্নাম কর পানু, বাড়বাড়ন্ত হোক কারবার।

পানু বিনয়ের অবতার; পরণের কাপড়খানাই গলায় দিয়েছে; বিনয়ে গদগদ হয়ে হাতযোড় করে বলে—আপনাদের আশীর্বাদ কাকা।

—সে তো বর্মের মত ঘিরে আছে বাবা। বস। হ্যাঁরে ধরণী এসেছে। সতীশ ভটচাযও বলতে ছাড়ে না।

ধরণী মুখুয্যেও এসেছে। ভীরু, শশক-প্রকৃতির একটি লোক। রোদের তাপ এখনও রয়েছে, বগলে ওর সদা-সর্বদাই একটি ছাতা লেগে থাকে।

মেঘের আড়াল থেকে রোদ ঠেলে উঠতেই ছাতা মেলতে যাবে, হঠাৎ ফটাস করে ছাতা বন্ধ করে উঠে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বাড়ীর দিকে চলতে থাকে।

—কি হল ধরণী।

সতীশ ভটচাযের হাঁকে ধরণী পিছু ফিরে চাইল। হাতের মুঠ বন্ধ। সেই অবস্থাতেই জবাব দেয়—এখুনি আসছি কাকা!

—কি ব্যাপার!

দাঁড়িয়েছিল পশু লোহার, সেই জবাব দেয়—আজ্ঞে আর্স্থলা!

—আর্স্থলা কি রে? নীলকণ্ঠবাবুও অবাক হয়েছেন। মিষ্টি হাসছে—ঘরের লক্ষ্মী, ছাতার সঙ্গে আইছেন, ওনাকে আবার ঘরে রেখে ফিরবেন আজ্ঞে।

—সেকি রে?

—হ্যাঁ বাবাঠাকুর, সেবার দুগ্‌গোপুরের হাটে ছাত্

থেকে অমনি আসুলা বেরিয়েছিল, তা খুড়োঠাকুর খুঁটে বেঁধে এনেছিলেন মা লক্ষ্মীকে।

হাসতে থাকে সবাই। ধরণী কোন দিকে না চেয়ে হন হন করে বাড়ীর দিকে চলেছে।

…বৈকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। তখনও চলতি মাতব্বরদের দেখা নেই। হেলু মাষ্টার, ভক্তি চাটুয্যে, নিতে, বীরেনবাবু কেউ এসে পৌছেনি।

সাইকেল নিয়ে ছুটলো পল্টু।

পশু লোহার মাথা নাড়ে—কে জানে কোথায়।

সতীশ ভটচাযও অবাক হয়ে গেছে। লোকগুলো যেন কর্পূরের মত উবে গেল।

—তারকবাবুর ওখানে নেই ত?

—কই দেখলাম না।

—তাই তো!

—ধরণী নিশ্চিন্ত মনে এসে বসেছে।

সন্ধ্যা নেমে আসছে। গ্রামের ইতর ভদ্র সকলেই এসেছে। বাউরী, বাগ্দী-লোহাররা পর্য্যন্ত। তফাতে বসে আছে তারা। গাঁয়ের ভোল ফিরে যাবে, এতগুলো টাকা বার্ষিক আদায় হয়।

হরিচালা হবে, গ্রাম-দেবতা ভৈরবনাথের গাজন হবে। …কিন্তু তারাও যেন বুঝতে পেরেছে একটা গোলমাল কোথা হয়ে গেছে।

—বাবাঠাকুর!

…নীলকণ্ঠবাবু মেয়েটার ডাকে ফিরে চাইলেন। মিষ্টি লোহার।

হাঁপাচ্ছে সে। ওর চোখে-মুখে কি যেন একটা উৎকণ্ঠার ছাপ।

—কি রে? অবাক হয়েছেন নীলকণ্ঠবাবু!

—ইদিকে সরে আসুন বাবাঠাকুর।

মেয়েটার গতি সর্বত্রই; একটা গ্যাস লাইটের আলোর আভা পড়েছে ওর মুখে। কেমন যেন বিবর্ণ পাংশু ছায়া ওর মুখে।

নীলকণ্ঠবাবু স্তব্ধ বিস্ময়ে ওর দিকে চেয়ে থাকেন।

ঝড়ের আগে কি যেন একটা দুঃসংবাদ বয়ে এনেছে সে। আকাশের তারা জ্বলছে কি অসহ্য যন্ত্রণার আভায়। হাওয়া বইছে—শনশন হাওয়া।

রাত নামছে। দুঃস্বপ্নের রাত।

কিরিণী মিষ্টি লোহারও আতঙ্কে শিউরে উঠেছে। সেই ভয়ের ছায়া ওর দুচোখে—নীলকণ্ঠবাবু নির্বাক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন ওর দিকে।

রাত্রি নেমে আসছে।

বিস্তীর্ণ শস্যরিক্ত মাঠে নেমেছে ফিকে অন্ধকার; আকাশের কোলে ছড়ানো টুকরো মেঘগুলো দিনের শেষ-আলোর রং মেখে রঞ্জিত হয়ে উঠেছিল—তারপরই নামে সব-আলো-ফুরোনো অন্ধকার।

দু একটা তারা আকাশের বুকে জেগে ওঠে।

দূর দূরান্তরের সবুজ গ্রামসীমাও হারিয়ে যায় ওই তমসায়।

ভৈরবথানের ঝাঁকড়া তেঁতুল-বট গাছের মাথায় চাপ-চাপ অন্ধকার বাসা বেঁধেছে। বৈঠকের আমন্ত্রিত অতিথিরাও ফিরে গেল। তারকরত্ন আজ তাদের ডাকে আসেনি।

শুধু তাই নয়, আরও ক'জনকে আসতে দেয়নি এই এই আপোষ আলোচনায়।

কথাটা শুনে চমকে ওঠেন নীলকণ্ঠবাবু।

মিষ্টি লোহারের চোখে মুখে তখনও বিস্ময়ের ঘোর—কি যেন আতঙ্কের ছোঁয়া তাতে মেশানো। বলে ওঠে—

হ্যাঁ বাবাঠাকুর, ভৈরবথানে দাঁড়িয়ে কি মিছে কথা বলবো-অয় বাবা জিব খসে যাবেক না! উনারা সবাই রয়েছে দেখলাম। কোন কথা আর বের হয়নি নীলকণ্ঠ-বাবুর মুখ থেকে।

যত সহজে ভেবেছিলেন ব্যাপারটা মেটে—তা গেল না—কি ভাবছেন।

মিষ্টিলোহার পায়ে পায়ে সরে গেল।

…চুপ করে কি ভাবছেন নীলকণ্ঠবাবু; পাঁচখানা গ্রামের লোককে ডাকা হাঁকার পর এমনি করে অপমান—এটা যেন তাঁর নিজেরই অপমান বলে মনে হয়।

গ্রামের ছেলেরা ইতিমধ্যে অতিথি সৎকারের ভার নিয়েছে।

চা আর হালুয়া নিজেরাই কার বাড়ীতে মেয়েদের দিয়ে করিয়ে এনে পরিবেশণ করছে। ওদের তদারক করছিল অশোক।

মিষ্টি লোহারকে ছুটতে ছুটতে আসতে দেখে কি একটা অনুমান করে এগিয়ে আসে। ক্রমশঃ ব্যাপারটা শুনেছে সে।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে।

দু' একটা হারিকেনও হাজির হয় এবং অশোকই বলে ওঠে।

—সংবাদটা ওদের দিন কাকাবাবু! মিছিমিছি হাত-করানো কেন ওদের? ইতস্ততঃ করছিলেন নীলকণ্ঠবাবু। অশোকের কথায় ভরসা পান।

—তুমিই বলো ওদের।

তাঁর নিজের অসম্ভব লজ্জা করছে।

লোকজন সবাই চলে গেছে। নির্জন হয়ে গেছে আঁধার গাছ-ঢাকা ঠাঁইটা। রাতের বাতাস বইছে—হু হু বাতাস।

গ্রামের বেটা ঝিরা আজও সন্ধ্যায় দু একটা প্রদীপ দিয়ে যায় ধ্বংসপ্রায় ও লুপ্তমহিমা দেবস্থানে।

বাতাসে তাও নিভে গেছে।

…একান্তই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছেন নীলকণ্ঠবাবু। কি যেন ভাবছেন।

অন্ধকারে একটা শব্দ উঠছে।

কুড় কুড় কুড় কুড় ঠ্যাং ঢ্যাং। কুড় কুড় কুড়।

ক্রমাগত উঠছে একটানা শব্দ।

গ্রামের বাইরেই একটা পুরোনো বটগাছ ঘিরে অসংখ্য ঝুরি নেমেছে; তারই চারি পাশে আধার ঢাকা এদিক-ওদিক ছড়ানো ঝুপড়ী। কোন রকমে মাটির দেওয়াল এক-ফালি তুলে বাঁশ খড় দিয়ে ছাওয়াবার চেষ্টাও করা হয়েছে।

বাউরীপাড়ায় নেমেছে রাত্রি;

কোথাও ফাঁকা দাওয়ায় কেউ কাঠকুটো দিয়ে উনুন জেলেছে।

ওদিকে বাউরীদের ছেলেগুলো গাছতলায় গোল হয়ে বসে মাটির খোলার মুখ ছাগলের চামড়াদিয়ে মুড়ে দিশী নাগড়চি বানিয়ে তাই পিটছে।

মধ্যিখানের ফাঁকা জায়গাটুকুতে কে যেন নাচছে।

ঘুরে ঘুরে নাচছে। আবছা অন্ধকারে ছায়ামূর্তিটাকে ঠিক ঠাওর করা যায় না। বেদম নাচছে আর ছেলেগুলো তালেবেতালে পিটে চলেছেঃওই খোলাবাদ্যি।

বেজা বাউরীর মেজাজটা ভালো নাই এমনিতেই।

ক'দিন থেকে শরীরটাও খারাপ। তার উপর পানু দাসও বেগড় বাঁই করছে।

—খ টতে না পারিস তবে আসিস কেনে? রূপ দেখে বেতন দোব তুকে? বেজা মুখ বুজে কাজ করবার চেষ্টা করে।

দোকানী পানুদাসের বাড়ীতে কাজ করা—সেকি যে সে কথা। কয়েক বছরেই দেখেছে গাঁয়ের মুনিষ মান্দের পানুদাস যেন আখ মাড়াই কল। আস্ত আস্ত মোটা আখ যেমন এদিকে ঢুকে ওদিকে বের হয় ছিবড়ে হয়ে—ওর বাড়ীর কাজ ও যেন তাই।

বছরের এ মাথায় যে মুনিষ নধর গতর আর স্বাস্থ্য নিয়ে ঢোকে—বছরের ওধারে সে যখন বের হয়—অমনি ছিবড়ে হয়েই কাজ ছাড়ে, তার ঘরের এ মুখো আর হয় না।

পানুদাস ও কাজে লাগাবার আগে থেকে মুনিষ মাহি-ন্দারকে কম কাজ করায়—খেতে টেতেও দেয়; পালপরবে দু চার পয়সাও হাতে দেয়। কিন্তু ক্রমশঃ সইয়ে সইয়ে চাপ দেয়। কঠিন চাপ।

বস্তা বস্তা ধান তোলে গাড়ীতে।

বস্তা কি এমনি তেমনি—দুমণি বস্তা। তাও পঞ্চাশ একশো করে দৈনিক। মাজা কোমর খসে যায়। টন-টন করে গা-হাত-পা।

তারপর আজ যা বাঁকুড়া গাড়ী নিয়ে—মানে দুরাত দুদিন পথে পথে রাতজেগে কাটবে; কাল যা—দুগ গো-পুর অর্থাৎ—দু মাইল করে চার মাইল দামোদরের বুকভোর বালিতে গরু মনিষ লবেজান হয়ে আসবে। তারপর আছে মাঠের কাজ।

…বারোমাস পুরতে হয় না, মুনিষের গতরে ক' মাসেই দুব্বোঘাস গজিয়ে যায়।

গেছেও। তা হাড়ে হাড়ে টের পায় বেজা।

কোমর—শিরদাঁড়া বেঁকে গেছে। পেটে যেন একটা ব্যথা; গা জ্বরজ্বর করছে। তার উপর গিয়েছিল বাকী বেতন চাইতে। আজ পানুদাস এক রকম হাঁকিয়েই দিয়েছে।

—খাটতে এলে পাবি, না'লে গায়ে আর কত রাখবো বল।

চুপ করে বের হয়ে এসেছে বেজা।

দুদিন খোরাকী নেই ঘরে। বুড়ী মায়ের ট্যাকট্যাক কথাও সইতে পারে না।

ফিরে আসছে। বটতলায় ওদের নাচের আসরের পাশে দাঁড়াল।

—দাদা, কি গো? আইস। ছেলেগুলো ওর দিকে চাইল।

—ধর টুকবেন ওই!

ব্যাঙা ওকে বসাবার চেষ্টা করে।

…অন্যদিন বসে পড়তো বেজা। সেই-ই এদের পাণ্ডা। কিন্তু আজ তার মন বসে না। দাঁড়াল না, সরে গেল। চলে গেল অন্ধকারে নিজের ঝুপড়ীর দিকে।

…হাসছে নৃত্যরত মূর্তিটা। এরই মধ্যে একটু থেমে দম নিচ্ছিল টেরি—বলে ওঠে।

—মন দুখাইছে কিনা?

—হাসছে মেয়েটা। নির্লজ্জ বেহায়ার মত হাসছে!

…ঘরটা অন্ধকার। কেরাসিন তেল খরচ করবার মত বিলাস-সামর্থ্য তার নাই। হুমড়ি-খাওয়া ঘরটায় তাই রাতের অন্ধকার ঘিরে এসেছে। পাড়ার শেষপ্রান্তে ঘরখানা। উঠোনের পাঁচিলের বালাই নেই। ফাঁকা—ধূধূ প্রান্তর—তার পরই শালবন; একপাশে ধান মাঠ!

…সবই যেন তার উঠান।

—এই!

কোন সাড়া নেই। দাওয়ায় উঠে আগড়টা ঠেলে ভিতরে ঢোকে বেজা।…ওপাশে পড়ে আছে ময়লা তেলচিটি তালাই।

…বুড়ী এক পাশে বসে একটা হুকোতে তামাক টানছিল। বেজার দিকে চেয়ে আবার তামুক টানতে থাকে।

—বৌটো কুথাকে? অ্যাঁ?

…বুড়ী তখনও টেনে চলে হুকোটা; তামাক আর নেই। এক চিমটে তামাক যা ছিল কখন তা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, আঙ্গরাগুলোর তাপই গলায় লাগছে।

…তবুও টেনে চলেছে আর কাশছে।

বেজা চেঁচিয়ে ওঠে—কুথাকে গেল সিটো? এ্যাই মা?

বুড়ী হুকো নামিয়ে জবাব দেয়—গুটেক চেঁচাস না। চুপ যা—

বেজা বুড়ীর দিকে চেয়ে থাকে; অন্ধকারে খটাসের মত নীল দু'টা চোখ ওর জ্বলছে। শননুড়ির মত চুলগুলো আঁধারে কেমন বিশ্রী লাগছে।

চমকে ওঠে বেজা, ক'দিন থেকেই দেখছে—মা আর বেইটার মধ্যে কেমন যেন আপোষ হয়েছে। যেখানে ঝগড়া আর মুখখিস্তীর চোটে চালে কাক-চিল অবধি বসতো না, সেই বাড়ীতেই দুটো জানোয়ার হঠাৎ খামচাখামচি থামিয়ে চুপ করে আছে কেন বুঝতে পারেনি।… আজ কিছুটা বুঝতে পারে।

আঁধারে বাইরে কিসের একটা ঝটপট শব্দ শোনা যায়। কারা চেঁচাচ্ছে।

…তাড়া করেছে পিছু পিছু বাউরীপাড়ার ছেলেগুলো। কিন্তু তাকে আর ধরা যায় না।

কার উঠোন থেকে একটা মুরগী চকিতের মধ্যে ধরে লোভী শিয়ালটা বনের দিকে দৌড়েছে। চলে গেল এদের নাগালের বাইরে।

… চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে বেজা। এ পাড়ার চারিপাশে শিয়ালের মতই ধূর্ত লোভী অনেক শয়তান জানোয়ার ওঁৎ পেতে রয়েছে শিকারের আশায়। তাদের জিব দিয়ে বিষাক্ত লালা ঝরে—দু-চোখ জ্বলে লালসার আগুনে।

…আগড়টা দিয়ে দে কচুমুখো ছোঁড়া কুথাকার? হিল-হিলিয়ে শীতের বাওড় আসছেনি। বুড়ীর কর্কশ গলা খন্ খন্ করে ওঠে।

বিজা কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল।

ক'দিন ধরে সেই-ই এদের পোষ্য। জানে বৌটা কোথায় গেছে—কোন অন্ধকার নরকের রাজ্যে।

পারতো সে—আগেকার সেই বলিষ্ঠ যোবান বেজাবাউরী তার শক্ত দুটো হাতে ওদের টুটি ছিঁড়ে দিতে। কিন্তু আজ!

…মা তখনও গজগজ করছে—মরদ! দানা নাই তার ফ্যানা আছে।

চুপ মেরে শুয়ে থাক।

…বিজা এসে শূন্য তালাই এলিয়ে পড়ল। পেটের ভেতরটা কেমন মোচড় দিয়ে ওঠে।…গাটা জ্বরজ্বর করছে। মাথার ভেতর কেমন একটা অসহ্য যন্ত্রণা।…ঘুম আসে না।

···নিস্তব্ধতা নেমেছে বাউরী-পাড়ায়। থেমে গেছে ওদের নাচ-গানের আসর।

কোথায় দূর বনের মাঝে একটা শিয়াল ডাকছে তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে—একটা—অনেকগুলো।

রাত নেমেছে—তখনও ফেরেনি বৌটা।

জলটোপের কাযের বিরাম নেই। সারাদিন লোকটা কিছু না কিছু একটা নিয়ে থাকবেই। সাধারণ অতি-সাধারণ চেহারা, কালো মাঝারী গড়ন, মাথার চুলে পাক ধরেছে আশে-পাশে। সামনের দাঁতগুলোও দু-একটা পান-জরদার তেজেই বোধ হয় বাকীগুলো যাই যাই করছে।

হাঁটবার সময় সামনের দিকে ঝুঁকে নিবিষ্ট মনে যেন পথ নিরীক্ষণ করে চলেছে। কথাবার্তা বলে কম—আর যদিও বা দু-একটা বলে—তাও মিষ্টি একটু হাসির আভায় সুরেলা হয়ে ওঠে।

সাগরী বাউরী বলে—মিষ্টির মনেয় মানুষ কিনা তাই হাসিটুকুনেও মিষ্টি মাখানো। লয় গো?

হাসে জলটোপ, কথা বলে না। জলটোপ নামটার মানে একটা আছে। কিন্তু ওই নামের আড়ালে মানুষটার আসল নামটা এ গ্রামে চাপা পড়ে গেছে।

মিষ্টি গুণগুণিয়ে ভাদুর সুর ধরে।

—চল ভাদু, চল দেখতে যাবি
আনীগঞ্জের বটতলা;
হেলে দুলে দেখতে যাবি
কয়লা খাদের জল তুলা॥

···গান ওর মুখে মুখে। গান থামিয়ে বলে ওঠে মিষ্টি।

—রাত হয়েছে, কি খাবি না?

···পিদীমের আলোয় জলটোপ নিপুণ হাতে একতাল মাটি দিয়ে একটা মূর্তি গড়ছিল। বাঁশের চ্যাঁচাড়ি দিয়ে মাঝে মাঝে চাঁচছে ওর দেহ—হাতগুলো মসৃণ করে তুলছে।

···মিষ্টি এগিয়ে এসে থেমে যায়। নামানো চৌখুপী লণ্ঠনটা তুলে ভাল করে মূর্তিটা নিরীখ করতে থাকে। ক্রমশঃ ওর চোখে ফুটে ওঠে বিস্ময় আর আনন্দের চিহ্ন।

—অয়, কবেছিস কি রে?

হাসে জলটোপ—কেনে হল কি তুর?

মিষ্টির দু-চোখে কেমন জমাট আনন্দ, পুরুষ্ট নিটোল দেহ একটা সজীব লাবণ্য, কপালে কাঠপোকার টিপটা মানিয়েছে সুন্দর।

—ময়দরচাপা ঠাকুর কি রে?

জলটোপ কাদা মাখা হাতটা ধুতে ধুতে বলে—বানালাম তুর জন্যে।

—সত্যি! হাঁরে?

ওর মনের গভীরে একটা নিবিড় আশা—কত নিশীথ-রাত্রের ব্যর্থ কান্নার প্রকাশ ওর চাহনিতে।

সৈরিণী মিষ্টি কেমন যেন বদলে গেছে।

—এগিয়ে আসে লোকটার দিকে, কেমন যেন একটা ব্যাকুলতা মিষ্টির দু-চোখে—কণ্ঠস্বরে।

—পূজো করাবি তা হলে?

কথা বলে না জলটোপ। ওর দিকে চেয়ে থাকে।

মিষ্টির মনে যেন হারানো দিনগুলোর কথা মনে পড়ে—ভিড় করে আসে। কি এক নিবিড় বেদনার দিন।

···গ্রামের দিনগুলো এখনও ভোলে নি। কি এক নেশার ঘোরেই সে লালসা আর ভোগের স্রোতে গা ভাসিয়ে ছিল। ঘরে এসে বসেনি এমন লোক গ্রামে কমই ছিল। ঘরের বাতায় কয়েকটা হুকোও রাখতে হয়েছিল এবং বামুনদের জন্য কড়ি বাঁধা হুকোও সাঙ্গায় টাঙ্গানো থাকতো।

···কি এক মোহের বশেই বৃহত্তম জগতে পা বাড়িয়ে-ছিল। বর্দ্ধমান সহরের বিশিষ্ট পল্লীতে ও জমিয়ে তুলেছিল তার রংএর আসর। সে আজ ক'বছর আগেকার কথা। জীবনে অনেক দেখেছে। ভোগও করেছে। টাকা-পয়সার মুখও দেখেছিল। এমন কি শাড়ী গহনাও বানিয়েছিল অনেক। হঠাৎ কেমন যেন বদলে যায় মিষ্টি।

···বিচিত্ররূপিণী নারী বহু বিচিত্র তার মনের গতি প্রকৃতি। হঠাৎ একদিন আবার গ্রামে ফিরে আসে সঙ্গে ওই লোকটা।

অমন দু-একবার এসেছে মিষ্টি—কিন্তু থাকতে আসে নি। এবার তার হালচাল দেখে অনেকে একটু বিস্মিত হয়—খুশীও হয় দু-চার জন—কেউ কেউ পুরোণো কর্তারা ব্যাপারটাকে ভাল চোখে দেখে না।

লোকটা ক'দিনেই ধ্বসে পড়া ঘরখানাকে আবার

নোতুন করে ছাইয়ে নেয়, সামনে ছ্যাচা বাঁশের সুন্দর বেড়া দিয়ে নিজের হাতেই গাছপালা লাগিয়ে সুন্দর একটা পরিবেশ গড়ে তোলে।

পথ চলতি মানুষ দুদণ্ড দাঁড়িয়ে ঘরের ছাউনি—বেড়ার শিল্পী কায দেখে বাহবা দেয়। মনে মনে খুশী হয় মিষ্টি।

—ই যে বালাখানা বানিয়েছিস রে?

হাসে জলটোপ—গরীবের ভাঙ্গা ভিটে, কোঠা বালাখানা পেলি কুথায়?

—এই আমার ঢের।

মন বসে যায় মিষ্টির। উড়ু উড়ু মন বসে—যেমন ডালে বসে ছন্নছাড়া ঘর-পালানে পাখা।

পানুদাসের ভাই ছানু ছোকরা কদিন চোখেই দেখছে। আগেকার সেই মিষ্টি আর নাই—কোথায় বদলে গেছে। কাছে এগোবার পথ নেই। হাসে সত্যি—কিন্তু মিষ্টির সে হাসিতে আর নেশার মাদকতা নেই—কাছে ডাকবার ইসারা নাই। জ্বালা করা সেই হাসি। গ্রামের অনেকেই তা টের পেয়েছে।

লোকটাকে ঘিরেই মিষ্টি আজ নোতুন ঘরের স্বপ্ন দেখছে এটা অনুমান করতে দেরী হয় না। নিরীহ বোকা-বোকা মানুষটা। মিষ্টির মন ভরাবার কি যাদু সে জানে ওরা টের পায় না। সে'দিন ওকে ছানুই পথের ধারে দাঁড় করিয়ে বিঁড় এগিয়ে দেয়।

লম্বা ত্যাড়াঙ্গা ছানু; কুশ্রী রসিকতার ভাব ওর মুখে।

লোকটা জবাব দেয়—আজ্ঞে উতো চলে না?

—তবে কি সিগ্রেটই চলে? তা ভালো।

ছানুদাসের কণ্ঠে বিদ্রূপের সুর। লোকটা হাসে সহজভাবেই।

—আজ্ঞে ওসব কোনটাই চলে না।

সে কি! ছানুদাস একটু অবাক হয়। আর ও উপস্থিত দুচারজনের মধ্যে মুখ চাওয়াচায়ি হয়ে যায়। পরক্ষণেই ছানু বলে ওঠে।

—তা আজ্ঞে আপনার 'মুউন' (মোহানা) গাড়ীটা গোটাটাই যে ছেড়ে গেইছে। বিড়ি ধরবেন কুথাকে?

লোকটার মুখের দিকে ইঙ্গিত করে দেখায়; অর্থাৎ সামনের দাঁতগুলো সবই পড়ে গিয়েছে—সেই ইঙ্গিতই করছে ওরা।

ব্যাপারটা মিষ্টির ও নজর এড়ায় নি।

এসে দাঁড়াল ছানুর সামনে—মুখোমুখি। একবার লোকটাকে বলে ওঠে—ঘর খুলা আছে যাও দিনি?

লোকটা সুড়সুড় করে বাড়ীর দিকে চলে গেল। ওরই জন্য বোধহয় মিষ্টি এতক্ষণ মুখে ফেলে নি। ও চলে যেতেই এগিয়ে যায় ছানুর দিকে।

—লজরে ধরছে নাকি হ্যাঁরে?

দিনে দুপুরে রাস্তায় উদ্ভট প্রেমনিবেদন মিষ্টির কাছে নোতুন কিছু নয়, আগ চটে উঠেছে সে।

—বল! এই ছেনো।

ছানু পা পা করে খামারের দিকে এগিয়ে যায়। বাকী দুএকজনও সরে পড়ে এদিক ওদিকে। হাসতে থাকে মিষ্টি লোছার।

—মরদ! কুকুরগুলো কুথাকার।

ছানুই কেন গ্রামের অনেকেই বুঝতে পারে—লোকটা মিষ্টিকে গেঁথে ফেলেছে। অনেক বড় বড় মেছোল দামী টোপ চার দিয়ে যে মাছকে ঘায়েল করতে পারেনি, ওই লোকটা শুধু বড়শীতে নিনিটোপে—স্রেফ জলে জলটোপ দিয়েই গেঁথেছে ডাগর রুইটাকে।

.. ছানু তখনও হাসছে ওদের কাছে।

—জলটোপ, ছাপ জলটোপ দিয়ে গেঁথেছে বুঝলি।

সেই থেকেই নামটা কেমন করে চালু হয়ে গেছে। জলটোপ।

...মিষ্টিও জানে সে সত্যিই কোথায় বাঁধা পড়ে গেছে।

প্রেম—কাম—ভোগলালসা—বিলাসের উপকরণ সব কিছুই যেন আজ তার কাছে কোন মিথ্যা একটা আতঙ্কের স্বপ্নে পরিণত হয়েছে—মনের কোণে উঁকি মারে অন্য একটি গোপন সুরময় আশা!

...রাত নেমে আসে। ফিকে কুয়াসার লাজ-উত্তরী জড়ানো কোন কুমারী রাত্রি। সমাপ্ত প্রায় কার্তিকের মূর্তির দিকে চেয়ে থাকে।

...প্রণাম করে মিষ্টি...সৈরিণী মিষ্টি লোহার গলবস্ত্র হয়ে।

হাসছে জলটোপ।

—কি হ'ল রে তুব? অ্যাঁ?

রাত নির্জনে কেমন বদলে যায় মেয়েটা; দুচোখ জলে ছাপিয়ে আসে। কাছে টেনে নেয় তাকে লোকটা।

কাঁদছে মিষ্টি—ব্যাকুল ব্যর্থ অন্তরের সেই কান্না। ওর বুকে মাথা রেখে কাঁদছে।

নিথর রাত্রি নেমেছে পল্লী সীমায়। ক্রমশঃ

হিমালয় পাঠশালায়

শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ব প্রকাশিতের পর

বেলা দশটা নাগাদ হনুমান চটিতে পৌঁছলাম। একটাও দোকান বা ধর্ম্মশালা খোলেনি। শুধু দু'ঘর পাহাড়ী এসেছে। বরফ পড়ে ঘরের চালের যে ক্ষতি হয়েছে তার মেরামতির কাজে ব্যস্ত দু'জন পুরুষের সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বললাম। তারা বলল—মন্দির খুলতে দেরী আছে। এ সময় যাওয়া নিরর্থক।... এইটি শেষ চটি।

পথ আর তিন মাইল বাকী। রাস্তা এখান থেকে আরও উর্দ্ধমুখী এবং চড়াই বিশেষ কষ্টকর।

হনুমান চটিতে মিনিট পনের কাটিয়ে এগোতে লাগলাম। বাকী পথের মধ্যে আড়াই মাইল এতই দুর্গম যে, প্রতি মুহূর্ত্তই মনে হচ্ছিল আর এগিয়ে কাজ নেই। পাঁচ মিনিট অন্তর একবার করে বসে পড়তে হচ্ছিল। সমতলের মানুষের পক্ষে এই চড়াইয়ে প্রচণ্ড শ্বাস কষ্ট বোধ অবশ্যই স্বাভাবিক। শেষের এই পথটুকু অতিক্রম করতেই সমতলের যাত্রীদের প্রায় এক বেলা কেটে যায়।

একটা বাঁক ঘুরতেই আমার অদৃষ্টপূর্ব্ব এক দৃশ্য চোখে পড়ল। সামনে প্রায় দু'ফার্লং দূর থেকে আগে যে পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে—সমস্ত পথটাই বা পাহাড়ের গা'টা তুষারাবৃত সূর্য্যের আলো—সেই বরফে ধাক্কা খেয়ে একজায়গায় ইন্দ্রধনুর মত একটা রঙের সৃষ্টি করেছে।

কেমন করে সেই পিচ্ছল বরফ পার হব ভেবে ভয় হ'ল। হাতে একটা লাঠিও নেই যে ভর দেওয়া বা টাল সামলানোর সাহায্য হ'তে পারে।... আশ্চর্য্যের কথা, চিন্তা গতিরোধ করতে পারল না! দিব্যি সেই পিচ্ছল বরফ মাড়িয়ে এগিয়ে চললাম।

মনের ভর কি লাঠির ভরের অপেক্ষা রাখে!...কোন কোন জায়গায় বরফ বেশ মোটা ও পিচ্ছল হ'লেও বেশীর ভাগই আলগা বালির মত। প্রায় এক ফার্লং বরফের ওপর দিয়ে হাঁটবার সেই বিচিত্র অনুভূতি মনে থাকবার মত।

পথ আরও উঁচুর দিকে চলেছে।

পথের ধারের একটা ঝোরায় জল খেয়ে একটা পাথরে বসলাম। পা দুটো যন্ত্রণায় যেন খসে যাচ্ছিল।

সামনের বাঁকের আড়াল থেকে একজন পাহাড়ী নেমে এল। সে কাছে আসতে প্রশ্ন করলাম—"মন্দির অওর কিতনা দূর ভাই সাব?"

লোকটি উত্তর দিল—নজদীকই হৈ। ওই দেখিয়ে দিল, ওই বড়া পত্থর কা পাশ সে দেখাই পড়েগা।"

সে দু' একটা প্রশ্ন করে চলে গেল।

লোকটির কথায় মন্দিরের কাছাকাছি এসে পড়েছি ভেবে উদ্দীপ্ত হয়ে হাঁটতে সুরু করলাম। পাহাড়ীর নজদীক বা নিকটেই কথার অর্থ যে আমাদের গাঁয়ের লোকের 'পোয়াটাক রাস্তা' বলার মতই তা'তো জানতাম না। জানলাম যখন আরও প্রায় দু'ঘণ্টা হেঁটে, অর্দ্ধ মূর্চ্ছিত অবস্থায় সেই বিরাট উপল খণ্ডের কাছে পৌঁছলাম। (পাণ্ডুকেশ্বরের উচ্চতা ছিল ৬৩০০ ফিট, আর এই জায়গাটার প্রায় ১১০০০ ফিট।)

বদ্রীনাথের বসতি

সেইখান থেকে বদ্রীনাথের বসতি প্রথম দৃষ্টি গোচর হ'ল। পাথরটির কাছ থেকে একটা সমতল বা উপত্যকার মত বিশাল ক্ষেত্র দেখা যাচ্ছে। তা'র মাঝ দিয়ে নেমে আসছে অলকানন্দা। একটা সাঁকো পার হ'লেই ঘর বাড়ীর ভিড়। আর তারই মাঝে মাথা তুলে রয়েছে সেই মন্দির। যার মধ্যে তিনি আছেন,—যিনি অদৃশ্য হাতছানি দিয়েছেন। যে ডাকে স্মরণাতীত কাল হতে কোটি কোটি মানুষ, অজ্ঞান অজ্ঞানী, শিষ্ট ও দুষ্ট, রাজা প্রজা, সাধু-তস্কর, সন্ন্যাসী ও গৃহী দলে দলে ছুটে এসেছে এইখানে। তাদের অন্তরের কামনা, বাসনা, ভক্তি, আনন্দ, অশ্রু, সুখ-দুঃখের ডালি নামিয়ে দিয়ে গেছে, নিবেদন করে গেছে একটি মূর্ত্তির পদতলে।

তাই সে মূর্ত্তি কি কখনও জাগ্রত না থেকে পারে? তিনি জাগ্রত। তিনি অনুতে অনুতে, সর্ব্ব তনুতে, সদা জাগ্রত।

তবু, এই সময়টাতেই তিনি মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করে নাকি নিদ্রা যাচ্ছেন,—আমার দর্শন হবেনা!

বোধ হ'ল এ কথা মিথ্যা। এ কথা যদি সত্য হ'ত, তাহ'লে কি তিনি আমায় ডাক পাঠাতেন?…

দূরে মন্দিরটি দেখতে পাওয়া মাত্রই মনে হ'ল যেন আমার আশে পাশে, লক্ষলক্ষ কণ্ঠ চীৎকার করে উঠল—'জয় বদ্রীনাথজী কী জয়! জয় বদ্রী বিশাল কী জয়!' যদিও সেদিন আমিই একা ও একমাত্র যাত্রী ছিলাম।

আমারও মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—জয় বদ্রীনারায়ণের জয়!

আর তখনি অনুভব করলাম ওপর থেকে একটা দায়িত্ব নেমে গেল। একটা শূন্য পূর্ণ হ'ল,—একটা প্রারব্ধের পূর্ত্তি ঘটল।

বিশ্বাস হ'ল যে এখানে পৌঁছতে পারলে সব পাপ সত্যই বিলুপ্ত হয়। এই যাত্রার বা আগমনের যে কৃচ্ছ্র ও অভিজ্ঞতা—তাতেই শোধ হয় সমস্ত পাপ নাশ হয়ে যায়। একটা কথা আছে—'অজ্ঞানের পাপ জ্ঞানে যায়, জ্ঞানের পাপ তীর্থে যায়।' ওই তীর্থে যায়'-এর তাৎপর্য্য বোধহয় যাত্রাপথের ক্লেশরূপ প্রায়শ্চিত্তের মধ্যেই নিহিত। বিশেষ করে এই ক্ষেত্রে ঐ প্রযোজ্য।

বদ্রীনাথের মন্দির

পুলটা পেরোবার আগে, পথের বাঁ দিকে, অন্ধ আশ্রম নামে তেলুগুদের একটি আশ্রম তথা ধর্ম্মশালা আছে। তা'র সামনে দেখা হ'ল একদল পাহাড়ীর সঙ্গে। একটি জোয়ান পুরুষ, দু'টি যুবতী ও একটি কিশোরী একটা টাট্টু নিয়ে চলেছে। ওরা একই পরিবারের মানুষ।

যুবকের নাম মোহন। কিশোরীটি মোহনের ভাগিনি। সেই টাট্টুর লাগাম ধরেছে। যুবতীদের মধ্যে একজন মোহনের বোন। মেয়ে তিনটিই আনন্দ-চঞ্চল ভাবে কথা বলতে বলতে পথ চলেছে।...ওরা পাণ্ডুকেশ্বরে থাকে। বদ্রীনাথেও ওদের একটা ঘর আছে। বরফের সময় ওরা পাণ্ডুকেশ্বরে নেমে যায়। মন্দির খোলার দিন এগিয়ে আসছে—তাই আগের দিন হাতে এসেছিল এখানের ঘর-দুয়ার পরিষ্কার করে বাসন পত্র ও চাল, ডাল রেখে যেতে।

অসময়ের যাত্রী আমাকে দেখে ওরা বিস্ময় প্রকাশ করল। ওরা পাণ্ডুকেশ্বর যাবে শুনে বললাম—"কিঁউ, তুম্ সব অব্ হি জা রহে হো?" তোমরা কি এখুনি যাচ্ছ?

মোহন বলল—"জী। ক্যোঁ (কিঁও)?" হ্যাঁ। কেন?

বললাম—"ম্যয় ভি জানেওয়ালা হুঁ।"—আমিও যা'ব।

—"আপ আজহি জাইয়েগা?" আপনি আজই যাবেন?

—"আজ ক্যা, অব্ হি।" আজ কি এখনি।

—"কিতনা দের কিজীয়েগা? দো তিন ঘণ্টা তো? কত দেরী করবেন? দু' তিন ঘণ্টা তো?"

—"নহি ভাই। মুঝে সনঝা তক পাণ্ডুকেশ্বর পৌঁচনা হৈ। অগর আধা, পৌণ ঘণ্টা মে হঁই কা কাম হো যায় অওর বল দিয়া তো সাত তক পৌঁচ যাউঙ্গা ক্যা?"—না ভাই। আমাকে সন্ধ্যার মধ্যে পাণ্ডুকেশ্বর পৌঁছতে হ'বে। যদি আধ ঘণ্টা বা পৌণে ঘণ্টায় কাজ মিটিয়ে হাঁটতে সুরু করি তা'হলে সাতটার ভেতর পৌঁছতে পারব কি?

—"হাঁ, হম্ জৈসা পাহাড়ীয়া পৌঁছ সকতা। লেকিন আপকা লিয়ে সম্ভব নহি। বিশেষ কি আপ পরেশান হৈ।" হ্যাঁ, আমাদের মত পাহাড়ীরা পারবে। কিন্তু আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। বিশেষ করে আপনি শ্রান্ত।

বললাম—"তুমহারা ঘোড়ী তো হৈ।"

মোহন হেসে বলল—"হাঁ।"

প্রশ্ন করলাম—"ক্যা লেওগে?"

মোহন বলল—"আপ হি বোল দিজীয়ে।"

আমি—"তুম্ হি বোলো।"

সেও বলে না, আমিও বলি না। তখন মোহনের ভগিনীটি কথা বলে উঠল এবং শেষ পর্য্যন্ত তা'র রায়ই মোহন ও আমি, উভয় পক্ষ মেনে নিলাম।

মোহন হিন্দীতেই বলল—"যান, কাজ সেরে আসুন। আমরা এখানেই থাকছি।' তারপর কি ভেবে মেয়েদের ওখানেই থাকতে

মন্দিরের নীচে তপ্ত-কুণ্ড। জল প্রায় ফুটন্ত গরম। অবগাহন স্নানে পথের সকল ক্লান্তি যেন মুহূর্ত্ত মধ্যে জুড়িয়ে গেল।

তপ্ত কুণ্ডের ধার থেকেই মন্দিরের সিঁড়ি উঠেছে। সিঁড়ি পার হ'তে হ'তে গাথাটি মনে পড়ল,—

'কৌন কারণ জগন্নাথ স্বামী, কৌন কারণ রামনাথ হৈ।
কৌন কারণ রণছোড় টিকম, কৌন কারণ বদ্রীনাথ হৈ।
ভোগ কারণ রণছড় টিকম, তপ কারণ রামনাথ হৈ।
রাজ কারণ জগন্নাথ স্বামী, যোগ কারণ বদ্রীনাথ হৈ॥'

মন্দিরের বন্ধ দরজায় মাথা ছুঁইয়ে ফিরে চললাম। ভৃগুর স্বজাতি হয়েও পথশ্রান্ত ও ক্লিষ্ট হয়েও প্রভুকে বিশ্রাম করতে দেখে ক্রোধ হ'ল না। তাঁরও তো বিশ্রামের প্রয়োজন আছে।

দুঃখ হ'ল দরজায় সরকারী তালা আর শীলমোহর দেখে। মূর্ত্তি ও তাঁর অলঙ্কারাদি চুরি যাওয়ার ভয়েই এই আয়োজন হয়তো। তাঁর বাইরের মূর্ত্তিকে আগলে রাখার জন্য মানুষ তালাচাবির আয়োজন করেছে। অন্তরের মূর্ত্তি হারিয়ে যাওয়া বন্ধ করবার ব্যবস্থা কোথায়?

ফেরবার পথ ধরলাম।

অন্ধ আশ্রমের কাছে পৌঁছে দেখি মোহনের সঙ্গিনী মেয়েরা এরই মধ্যে ঘোড়াটাকে বিচালি খাইয়ে, জিন-রেকাব ইত্যাদি লাগিয়ে, যাত্রার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছে। আমি ঘোড়ায় সওয়ার হ'লাম। ওরা সবাই হেঁটে চলল।

উতরাইয়ের পথে ঘোড়ায় চড়া ভীতিকর হ'লেও, মোহনের একটা কথায় সব ভয় দূর হ'ল। মোহন বলল—"বাবু, ঘোড়ারও মরার ভয় আছে। তাই ও খুব সাবধানে পাহাড়ে পথ চলবে। যা'তে পড়ে না যায় তা'র জন্য ঘোড়া সব সময়েই হুঁশিয়ার থাকে। কাজেই, ওর পিঠে বসা আপনার কোন ভয় নেই।"

মোহনকে জিজ্ঞাসা করলাম—"নাকে মস্ত নোলক পরা মেয়েটি কে মোহন?"

মোহন হেসে বলল—"ও আমার ঘরওয়ালী।"

বললাম—"কতদিন বিয়ে করেছো?

—"পাঁচ বছর। ও তখন তেরো বছরের ছিল।"

—"অত বাচ্চা মেয়ে বিয়ে করেছিলে!"

মোহন বলল—"বাবুজী, ওকেই দেড় হাজার টাকায় কিনতে হয়েছে।"

অবাক হয়ে বললাম—"সে কি!"

মোহন উত্তর দিল—"হাঁ। বাবু, আমাদের এখানে তাই নিয়ম। ও ছোট ছিল আর ক্ষেতের কাজ জানতো না তাই রক্ষে। নইলে ও মেয়ের দাম আরও বেশী হ'ত।

প্রশ্ন করলাম—"তা'হলে যে মেয়ে যত কাজের তার জন্য বুঝি তত বেশী দাম দিতে হয়?"

মোহন বলল—"ঠিক তাই।"

—"বাবুজী, ওই নোলক বা ওইরকম মস্ত নথ পরাটা হ'ল এদেশের মেয়েদের বিয়ে হওয়ার চিহ্ন। আর হয়তো দেখেছেন খুব ছোট ছোট মেয়েদের মধ্যে কারও কারও গলায় মোটা হাঁসলি। ওর মানে হ'ল, তার বিয়ের কথা পাকা হয়েছে।"

মোহনদের দেশের বিয়ের নিয়ম অপূর্ব্ব লাগল।

ছেলের বাপের টাকা আছে শুনেই, অপোগণ্ড-অকাল-কুষ্মাণ্ড বেকার ছেলে সেখানে দাঁও-এ বিকোয় না। ছেলেকে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে, নিজে টাকা জমিয়ে, কনে-পণ দিয়ে বিয়ে করতে হয়। বাপেদের নিশ্চয়ই এত পয়সা নেই যে ছেলে প্রতি দেড়হাজার দু'হাজার টাকা পণ দিয়ে ছেলেদের জন্য বউ আনবে। তাই ছেলেদের পূর্ব্বাহ্নেই কাজের লোক হ'তে হয়। তবেই বিয়ে হয়।

চোখ বুজে স্বপ্ন দেখতে চেষ্টা করলাম, বাঙ্গালাদেশে মোহনদের প্রথা চালু হ'লে কেমন হয়! কিন্তু মনের পর্দ্দায় শুধু ভেসে উঠল একটি দৃশ্য, গিরিশচন্দ্রের 'বলিদান'-এর সেই হতভাগ্য বাপটির গলায় ফাঁস লাগানো মৃত, বিস্ফারিত চোখ দু'টি।

আমরা নামতে লাগলাম।

হনুমান চটির কাছাকাছি আসতে হঠাৎ প্রচণ্ড হাওয়া বইতে সুরু করল। অলকানন্দার অপর পারের পাহাড়টির উপর, খানিকটা জায়গায়, যেন ঝুর ঝুর করে জমাট কুয়াশার অজস্র টুকরো পড়তে লাগল। মোহনের ভাগিনি বলল—"বরফ পড়ছে।" মিনিট তিন-চার পরেই হাওয়া ও বরফ পড়া বন্ধ হয়ে গেল। টাটুটা হঠাৎ চীৎকার করে উঠল। বুঝতে পারলাম না কেন। মোহন চট করে বলল—ঐ দেখুন দুটো ঘোড়াকে দেখে ডাকল।

দেখলাম বহু দুরে, আমাদের পথের ধারে, পাহাড়ের এক ধাপ নীচুতে, দু'টো ঘোড়া চরছে। আশ্চর্য্য যে, অতদূরে থাকলেও স্বজাতিকে দেখে ঘোড়াটা মুখর হ'ল ও আনন্দ চঞ্চল হয়ে, বার বার ডাকতে ডাকতে এগিয়ে চলল। কিন্তু সে কাছাকাছি পৌঁছতেই অপর ঘোড়া দুটো পাশ কাটিয়ে পাহাড়ের দু'ধাপ উপরে উঠে গেল! আমাদের ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে পড়ে একবার ওদের দেখে নিল। তারপর করুণভাবে, মাথাটা নীচু করে আবার চলতে সুরু করল।

মোহনকে জিজ্ঞাসা করলাম—"কি ব্যাপার হ'ল?"

মোহন বলল—"মেরা ঘোড়ী তিব্বতী, অওর উহ দোনো হি ভুটিয়া। ইস লিয়ে মিলে ন হি।"

আশ্চর্য্য! পশুসমাজেও এই ইজ্জত বোধ, গোষ্ঠীতন্ত্র ও প্রাদেশিকতা সংক্রামিত হয়েছে না কি?

মোহন বলল—"দেখ বাবুজী, মেরে ঘোড়ী কিতনা হি সাফ দিল কী আদমি।"—আমার ঘোটকী কত সরল মনের মানুষ।

হেসে ফেললাম। ঘোড়াটিকে মোহন আদমি বা মানুষ বললে, শুনে নয়। ঘোড়াটির প্রতি তা'র স্নেহের পরিমাণ অনুভব করে।

যাওয়ার সময় খান পাঁচেক চালা ঘরের একটা বসতি দেখে গিয়ে ছিলাম। তখন ঘরগুলো সবই বন্ধ ছিল। এখন দেখি একখানা ঘরের দাওয়ায় একটি মেয়ে চায়ের দোকান সাজিয়েছে। মোহনরা চা খেতে বসল।

একটি লোক মানুষ বইবার জন্য চেয়ারের মত একটি বস্তুর মেরামতি কাজে ব্যস্ত। ওটির জন্য চারজন বাহক লাগে। নাম—ডাণ্ডি। শুনলাম আর একরকম হয়, ঝুড়ির মত। একজন বাহকই বয়ে নিয়ে যায়। তা'কে বলে কাণ্ডি।

মোহনদের চা পান শেষ হ'লে আবার চলা সুরু হ'ল। খানিকদূর এসেই দেখা সকালের মত এক ছাগী ফৌজের সঙ্গে।

এ'বার তা'রা কিন্তু থামলনা। হুড়মুড় করে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। বোধ হ'ল—ঘরমুখী।

মোহনকে জিজ্ঞাসা করলাম—"তোমরা মাংস খাও?

মোহন—"নিশ্চয়।"

—"খালি বকরার মাংস তো?"

—"কেন? বকরিও খাই।"

—"সে কি! ছাগী কাটো?

মোহন দৃঢ় কণ্ঠে বলল—"কিঁউ নহি? বকরি ক্যায় তো ক্যা হুয়া? দোনো কো হি বরাবর কাটা যাতা।

আর একটা প্রশ্ন করলাম—"মাংস খাওয়ার জন্য প্রাণীবধ করতে কষ্ট হয় না?"

মোহন উত্তর দিল—"মাংস না খেলে খাব কি? আপনাদের দেশের মত নানারকম শাক-সব্জীতো এই পাহাড়ে পাওয়া যায় না।" মনে হল তবে কি প্রকৃতিই মানুষের সর্ব্বথা অহিংস থাকার অন্তরায়?......

তবু, একথা নিশ্চিত যে, মানুষের স্বভাব ও লোভজাত হিংসাই বোধ হয় বেশী, অভাব জাত নয়। যেখানে অন্য উপায় আছে সেখানেও মানুষ অসহায় পশু—এমন কি অতি নিরীহ পাখীদেরও হত্যা করে উদরস্থ করছে তো। আদিম মানুষ আর আজকের সুসভ্য মানুষের আচরণের মধ্যে বিবর্ত্তন এই মাত্র ঘটেছে যে, আজকের মানুষ রেঁধে খায়, আর সেদিনের মানুষ কাঁচা মাংসই খেতো।

মোহন বলল—"বাবুজী একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

বললাম—"কি কথা বল।"

মোহন ইতস্ততঃ করে বলল—"না থাক।"

আবার বললাম—"বল না!"

মোহন তা'র সঙ্গের মেয়েদের এগিয়ে যেতে বলে ঘোড়াটাকে দাঁড় করাল। মেয়েরা এগিয়ে যেতেই বলল—"বাবুজী, আমি কখনও জোশী মঠের ওপারে যাইনি, শহর দেখিনি, তবে শহরের অনেক কথাই শুনেছি। আচ্ছা, একথা কি সত্যি যে শহরে একরকম জায়গা আছে যাকে অনাথালয় বলে। সেখানে নাকি যেসব বাচ্চাদের জন্ম দিয়ে তাদের মা-বাপ পালিয়ে যায় তাদের এনে রাখে?…এ যদি সত্যি হয় তা'হলে শহরের লোক সভ্য হয় কেমন করে।"

নিরুত্তর রইলাম।

সভ্য মানুষের সমাজে বাস করি বলেই আমাদের সভ্যতার সমালোচনা চাইনা,—কপটাও দেখতে পাইনা। কিন্তু যারা তা' থেকে দূরে—তারা আবরণটা সরিয়ে, মোহনের মত করেই তার পশুসুলভ বীভৎসতা দেখে চমকে ওঠে। নিরপেক্ষ মনে প্রশ্ন জাগতে বাধ্য যে, আজও মানুষ যখন অসহায় পশুদের হত্যা করে খেয়ে ফেলে, সন্তানোৎপাদন করে পালিয়ে যায় তখন মনুষ্যজাতির পূর্ণাঙ্গ সভ্য হওয়ার চেষ্টা কি ব্যর্থ হয় নি? আদিম প্রবৃত্তি অভ্যাসমুক্ত থেকে আজকের সুসভ্য মানুষ কতটা মুক্তি পেয়েছে, কতদূর সরে আসতে পেরেছে?

মোহন, হিমালয়ের মোহন, যেন সভ্যতার দম্ভকারীদের চোখের ঠুলি খুলে দিতে পারে মনে হ'ল।

জানতে চাইলাম—"মোহন, অলকানন্দার জল কি কখনও শুকিয়ে যায়?"

মোহন বলল—"না বাবু। গরম এলে যেই জল একটু কমে, অমনি পাহাড়ের চূড়ার বরফ গলে নদীকে পুরো করে দেয়।"

বললাম—"তা' হলে সব বরফ গলে গেলেই নদীও শেষ তো?"

মোহন হেসে উত্তর দিল—বাবুজী, এমনই মজা যে, সব চূড়ায় সব বরফ গলবার আগেই নতুন বরফ আমদানী হয়।"

ছল করে প্রশ্ন করলাম—"আচ্ছা মোহন, পাহাড় বরফ পায় কোথা থেকে?"

মোহন চটপট উত্তর দিল—"কেন বাবু বাদল (অর্থাৎ মেঘ) যে বুন্দি (অর্থাৎ জল বিন্দু) নিয়ে আসে তাই থেকে।"

—"মেঘ কোথা থেকে আনে মোহন?"

—"জানি। সমুন্দর (সমুদ্র) থেকে আনে। সমুন্দর কোথা থেকে পায় তা' জানিনা বাবুজী। তবে, একথা ঠিক জানি যে সব পূরণ (অর্থাৎ পূর্ণ) হয়ে যায়। কেন হয় তা' জানিনা।…আপনি কি জানেন, বাবুজী?

বললাম—"না মোহন। পূর্ণ হয় এইটুকুই জানি।"

মোহন যা জানে না, আমিও তা জানিনা। হয়তো কেউই জানে না। যা হচ্ছে তা কেমন করে হচ্ছে সেটা হয়তো দেখতে বা বুঝতে পারছি কিন্তু হওয়ার কি সে অন্তর্নিহিত কারণ তা'তো জানিনা। নিয়ত দেখছি অজস্র অসংখ্য অপচয়, অথচ আবার সবই পূর্ণ হয়ে উঠছে।

মাঝে মাঝে খণ্ড প্রলয় ঘটছে,—হাঁড়ি উল্টে পড়ছে। কিন্তু দইয়ের হাঁড়িটি উপুড় করে সবটুকু ফেলে দিলেও যেটুকু লেগে থাকছে তা'তেই দুধ পড়ে আবার হাঁড়ি-ভরা দই হচ্ছে। এই দই পাতা স্বয়ংক্রিয় চলেছে।

আঘাতের ফলেও ধ্বংস হচ্ছে না। 'এক' ধ্বংস না পেয়ে বহু 'এক হয়ে যাচ্ছে। একটি নিউক্লিয়াস Fission এর ফলে টুকরো টুকরো হয়ে যারা বেরিয়ে আসছে, তারাও সব এক একটি পূর্ণ নিউক্লিয়াস। সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই যে, একটু সামান্য টুকরো থেকেই পূর্ণবস্তু হয়ে উঠছে।…একটা গাছের কলমটুকু কেটে মাটিতে বসালেই একটা পূর্ণগাছ হয়ে যাচ্ছে। আবার আগের গাছটাও কিন্তু পূর্ণই থেকে যাচ্ছে। ওই রহস্যই জগৎসৃষ্টির রহস্য, জগৎ রক্ষার রহস্য।……১ (এক) থেকে কিছু অংশ কেটে নিলেও ১ পূর্ণই থেকে যাচ্ছে, আবার কেটে নেওয়া ভগ্নাংশটিও ১ হয়ে যাচ্ছে!

দ্রষ্টা তাই বললেন—'পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

—'সেই পূর্ণবস্তু (ব্রহ্ম) হইতেই এই পৃথিবী পূর্ণ হইয়া পূর্ণ আখ্যা পাইয়াছে। এই পূর্ণ (পৃথিবী) সেই পূর্ণের পূর্ণত্ব গ্রহণ করা সত্ত্বেও সেই পূর্ণ (ব্রহ্ম) পূর্ণই রহিয়া গিয়াছে।" ঠিক ওই কলমের গাছের মত।

জিজ্ঞাসু কিন্তু পরের গাছটা নিয়ে সন্তুষ্ট নন। তিনি সেই পূর্ব্বের গাছটাকে, সেই আদিটাকে জানতে চান। এই জগৎ গাছটি কার অংশে পূর্ণ হ'ল জানতে চান। কিন্তু সেই আদিটার অস্তিত্ব বা পরবর্ত্তী গাছটার আদি যে ছিল, এইটুকুর প্রতীতি বা বিশ্বাস করা ছাড়া আর জানা সম্ভব নয়। তাই বিশ্বাসেই দর্শন।…

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে ওঠবার আগেই আমরা পাণ্ডুকেশ্বর পৌঁছে গেলাম।

পরের দিনই ভোরে জোশীমঠের পথ ধরব শুনে ও হাতে কোন কাজ না থাকায় মোহন আমায় জোশীমঠে পৌঁছে আসবে বলল।

পাণ্ডুকেশ্বরের আশ্রয়ে গত রাত্রের সঙ্গীরা তো আমায় দেখেই অবাক। ডি. ডি. টি স্প্রেইংয়ের ছেলে দু'টি মানতেই চাইলনা সমতলের মানুষের পক্ষে সকাল ছ'টায় যাত্রা করে বেলা একটার আগেই মন্দিরে পৌঁছান সম্ভব। রাজকোটের সেই প্রৌঢ়টি তাদের বোঝালেন যে, বাবুটির হাল্কা শরীর বলেই ও কাজ সম্ভব হয়েছে। সেদিনও অনেক রাত পর্য্যন্ত গল্প

চলল। ছেলে দু'টির পাণ্ডুকেশ্বরের কাজ মিটে গিয়েছিল। তারাও পরদিনই তাদের হেড কোয়ার্টার, জোশী মঠে ফিরবে বলল।

পরের দিন।

সকাল হ'তেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

বেলা সাড়ে দশটায় জোশীমঠ পৌঁছলাম।

জোশীমঠের কাছাকাছি মোহন, একটা পাহাড়ে-রাস্তা দেখিয়ে বলল—"বাবুজী ওইটে নিতিঘাটের রাস্তা। চার ক্রোশ আগে ভবিষ্য-বদ্রীর স্থান।... ... ...

জোশীমঠ থেকে বাস্ ধরে বেলা সাড়ে চারটে কর্ণপ্রয়াগে পৌঁছলাম। রাত কাটানোর জন্য আবার সর্দ্দারজীর হোটেলেই ওঠা গেল।

তখনও অন্ধকার সম্পূর্ণ কাটেনি। ঝোরায় কাকস্নান করতে গেলাম। হাত, মুখ ধুইছি, এমন সময় এক বৃদ্ধ সাধু এসে আমার বিপরীত দিক হ'তে একই সঙ্গে, হাত মুখ ধুতে লাগলেন।

আমাকে প্রশ্ন করলেন—"কহাঁ যাওগে?"

উত্তর দিলাম—"ঋষিকেশ।"

—"ক্যা উপর সে আরহে হো?"

—"জী। বদ্রী গয়েথে।"

—"বদ্রী গয়া থা! আরে, অব তো পট নহি খুলা। দর্শন হি হুয়া। তুম্‌হারা জানা হি বেকার হুয়া"—এখনও পট খোলেনি। দর্শন হয়নি। তোমার যাওয়াই বৃথা হল।

চুপ করে রইলাম।

সাধু আরও দু'চার কথা বললেন।

বার বার আমার বদ্রীনাথের মূর্ত্তি দর্শন না হওয়ার উপর মন্তব্য করায় বিরক্ত হয়ে উঠলাম। বললাম—"দর্শন হয়েছে।" সাধু বললেন—"মন্দির বন্ধ ছিল তো তুই দেখলি কি করে?"

বললাম—"চুরি করে।"

সাধু হেসে বললেন—"রাগ করিসনি। চল্ বেটা, আমার সঙ্গে আবার চল। দর্শন বিনা ফল হয় না।"

বললাম—"আমি ফলের জন্য যাইনি।"

সাধু প্রশ্ন করলেন—"তবে কি জন্য গিয়েছিলি?"

বললাম—"ভগবান কোথায় থাকেন, তাঁর আড্ডাটা দেখতে গিয়েছিলাম।"

সাধুর ভাবান্তর হ'ল। তাঁর চোখ দু'টো চকচক করে উঠল। খপ করে আমার দু'কাঁধ ধরে, মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন—"তেরা দর্শন হো গয়া। বেটা তু জ্ঞানী হো।"

ওই কথাটিই তো ভাবি। ভাবি আমার অনেক জ্ঞান হয়েছে। তবু, সাংসারিক সুখদুঃখে এত বিচলিত হই কেন?...সেই Passivity এল না তো, যাতে জাগতিক বা বৈষয়িক সমস্ত সুখ-দুঃখের বোধ বাধিত বা নিবারিত হয়ে যায়।

সকাল ছ'টায় কর্ণপ্রয়াগ থেকে বাস ছাড়ল।

গাড়ী যতই সমতলের দিকে নামতে লাগল, স্বস্থানের দিকে যতই এগোতে লাগলাম ততই অফিসের ভাবনা, এ্যাকাউন্ট্‌স্ এর ব্যাপার, কলকাতার নানা চিন্তা এসে ভিড় করতে লাগল। পাঁচ দিনের জন্য পিছনে ফেলে যাওয়া, ভুলে যাওয়া চিন্তাগুলি একের পর এক এসে মনকে ঘিরতে লাগল। হিমালয়ের স্পর্শ জাগা গত পাঁচদিনের সকল বোধ, সকল অনুভূতি লুপ্ত হয়ে যেতে লাগল।

অন্তরের কবি গেয়ে উঠলেন,—

"আবার এরা ঘিরেছে মোর মন।
আবার চোখে নামে যে আবরণ।
আবার এযে নানা কথাই জমে,
চিত্ত আমার নানা দিকেই ভ্রমে,
দাহ আবার বেড়ে ওঠে ক্রমে,
আবার এ যে হারাই শ্রীচরণ।

হিমালয় মনোরাজ্যের যে দ্বারটি খুলে দিয়েছিল, তা' ক্রমে ক্রমে আবার বন্ধ হয়ে যেতে লাগল। মনে হ'তে লাগল যেন একটা স্বপ্নের ঘোর কেটে, অবাস্তব থেকে বাস্তবে ফিরে যাচ্ছি। তা'হলে কি হিমালয়ের কোলে যখন উঠেছিলাম তখন যে সব জ্ঞান বা জগৎবোধের উদয় হয়েছিল তা' মিথ্যা?...স্থানকালের ভেদে জগৎ-বোধ যে ভিন্ন হয় এ' কথাই তো তা'হলে প্রতিপন্ন হ'ল। মূর্খের জগৎবোধ ও বিজ্ঞের জগৎবোধ আলাদা, নারী ও পুরুষের মধ্যেও জগৎবোধের তারতম্য সম্ভব। কিন্তু একই মানুষের জগৎ বোধ স্থানান্তরে কালান্তরে বিভিন্ন রূপের হয় কেন? তা' হ'লে জগৎ সংসারের সঠিক রূপ বলতে কিছুই কি নেই!

তাই বুঝি 'জগন্মিথ্যা।'

কিন্তু?...সেই absolute এর, সেই অজ্ঞাত বস্তুটির, সেই অচিন্তনীয়ের চিন্তাটি বা বোধটি একইরূপ মনে রইল। তার তো স্থানান্তরে, কালান্তরে রূপের পরিবর্ত্তন হ'লনা।

যা' সর্ব্বত্র, সর্ব্বকালে একরূপ থাকে তাই সত্য।

তাই ব্রহ্ম সত্য।

আর তার জ্ঞানই একমাত্র জ্ঞান,—আর কোনও অভিজ্ঞতাই জ্ঞান নয়।

আমরা বলি নানা জ্ঞানের ভাণ্ডার এই বিশ্ব সংসার।

হিমালয় জিজ্ঞাসু মানুষকে কাছে পেলেই বুঝিয়ে দিতে চায়—'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।' এখানে নানা বলিয়া কিছুই নাই। বহু বলিয়া কিছু নাই। এক ছাড়া দুই নাই।

এই 'এক'-এর জ্ঞান বা সেই একমাত্রের জ্ঞান বিদিত হ'লে তবেই বদ্রীনাথের দর্শন;—হিমালয় পাঠশালার পাঠ সমাপ্তি।

বীমা ব্যবসায় ভারত

সুধাংশু গুপ্ত

ভারত অর্থ ও সম্পদ বুঝতনা এমন নয়। অর্থ ও ঐশ্বর্য সম্ভবত রাজা মহারাজরাই বুঝতেন, ভোগ করতেন। সর্বসাধারণের কল্যাণেও তা ব্যয় হতো। মোটামুটিভাবে মানুষ সন্তুষ্ট ছিল স্বল্পে। অর্থের মাঝে বা অর্থ ছেড়ে পরমার্থের চিন্তাও অনেকে অনন্য মনে করতেন। মূলত অর্থ ও রাজনীতি মানুষের বেশী, কিন্তু হৃদয় বিকিয়ে দেবার জন্যে নিশ্চয়ই নয় —এ উপলব্ধি প্রয়োগধর্মে একমাত্র ভারতই বুঝেছিল। তাঁরা মনে করতেন জীবনই সময়। ক্রমাগত পর্যায়ে ভারতও এখন বুঝতে শিখেছে—সময় মানে অর্থ—অন্য কিছু নয়। যে কোন প্রতিষ্ঠানে পা দিলেই নজরে পড়ে ত্রিকোণ কাঠে লেখা রয়েছে Come with a business, talk with a business—put time into money value, for Time is equal to money. বস্তুবিশ্বকে গোলাম করেছে যন্ত্র। বিজ্ঞানকে বাড়িয়ে রাষ্ট্র আওতায় যে জাতীয়তা, তার অর্থ ও গোষ্ঠী বোধে ব্যষ্টির করতলে বাণিজ্যকে বন্ধক রাখা। এককথায় জাতিধর্ম বর্ণ নিরপেক্ষ মানুষ টাকার চাকায় ঘুরছে—টাকায় মূল্য নির্ধারণ করছে জীবন সত্যের; Money is the Pivot round which we cluster.

এরই ফলিত রূপ প্রথায় রূপান্তরিত। ভারতবর্ষ অতীতে নেই, নেমে এসেছে প্রতিদিনের চালু বর্তমানে। সেও চাইছে অন্নময় জীবনে বিশ্বের একজন সাজতে, অবশ্য বিশ্বে এমন কেউ নেই যে ভারতবাসী হতে উৎসুক। নরদেহময় মনে ও দেহে—বাসনার ডালি তাই দিকে-দিগন্তে। এক মুঠো জীবনে তাই রচনা—সৃষ্টিকে বিশেষ সাজে টানা—It is to create better utility.

গ্রাম-বাংলা অনেকদিনই গর্ব হারিয়েছে—সে আপন নেই, প্রাণে সাড়া তোলেনা। বোধ ও বোধি ঘোরে আজ ব্যক্তি কেন্দ্রে। সেবা স্বল্পসন্তোষ যৌথপরিবার নেই। বেদে বলা হয়েছে "যোগক্ষেম"—মানে সকলের সাথে সসম্মানে সহযোগিতা। এ প্রমাণ ও ভারতে বিরল নয়—কোন গৃহকর্তার (Patriarch) মৃত্যু হতে সমগ্র গ্রামবাসী এগিয়ে এসেছেন দুস্থ সংসারের সর্ববিধ কল্যাণ কামনায়। শিষ্টাচার মানেই ত্যাগ—ত্যাগ মানেই ধর্ম, সমভাব বোধ ও মনে সুন্দর হওয়া। এমনি সর্বজনগ্রাহ্য নীতিই ভগবান বুদ্ধের ধর্ম। সৃষ্টি পূজারী জীবজগৎ আর বিশ্বপ্রকৃতি এমনিই একাধারে মূর্ত। ভারতে সমাজ সমতাই সব মননে জেগেছে —এ বস্তুই উপনিষদ।

কর্ম মানুষ ছেড়ে নয়—সে গুহ্যগতও নয়। মন্দিরে সে সীমিত হয়না —বর্ণনায় সে গ্রন্থের কলেবর ও বাড়ায়না—স্বার্থ ও ত্যাগ এ দুয়ের মাঝেই ধর্ম ও অধর্ম—প্রাণ ও শূন্যতা। রোম একযুগে বীর্যে বেড়ে উঠেছিল—তাও প্রতিষ্ঠিত ছিল নিয়মে। কোন ইংরেজই ভারতে ওরঙ্-জেব সাজেনি—Crown এর নিকট অবিচলিত শ্রদ্ধা সবাই রক্ষা করে গেছে। ইংরেজ মানত নিয়ম, নিয়মই তাদের ধর্ম—গীর্জা গড়েছিল সেই নিয়মে uniformity.

মানুষের যা প্রাণকেন্দ্র যা সৃষ্টি—তা দৃষ্টিতে শান্তি ও সৃজনী বোধে ধরা দেবেই। কোথাও তা নিষ্ঠা, কোথাও তা সত্য কিম্বা সম। অসম সকলের উপরে একক প্রভুত্ব—আমার মতে (ভাল কি মন্দ) সবাই দীক্ষা নাও এটা অর্থহীন মালিকানার ডাক, দস্যুর নিঃস্ব নীতি। বর্তমানের কম্যুনিজম্, কংগ্রেস কি পার্লামেণ্টারী প্রথা মানেই একের স্বীকৃতি, হয়ত পার্লামেণ্টারী প্রথায় কেবিনেট থাকে—ওটা বাইরে লোক-দেখানো —ভিতরে প্রিমেয়ারই প্রিন্স। আর সব দল টেনে খোঁটা আগলায়।

বলা হয়েছে মানুষের মন ও বৃত্তি বদলে গেছে। ধর্ম ও সমাজকেন্দ্রে জীবন প্রতিষ্ঠা নিতে নারাজ। নীতিহীন নোঙরা দুর্নীতিই রাজনীতি। রাজনীতি বর্তমানে decentralised নয়। অর্থাৎ গ্রামীণ বেশ তাতে নেই। সে খোঁজে স্বল্প ঠাঁই—সাজানো সহর। রেলে, বেতারে প্লেনে আলোয়, সুগম পথে সে ঘোরে—আর ছড়ানো ছোটো মানুষগুলো —দুঃখে কষ্টে অভাবে খাটে। মূলতঃ তারা খাটুনির প্রতিদানহীন। যারা নগরে বসে কৃত্রিম উপায়ে পণ্য-সংরক্ষণের দায়দায়িত্ব গ্রহণ করে আসলে তারাই অনলস—পরের পরিশ্রমে বেঁচে থাকে। বস্তুত জ্ঞান (বস্তুজগতে ও ব্যবহারিক মতে) সম নয়। অসম বোধই Technically speaking ছোট বড়, ধনী নির্ধন, আমলা আরদালী, পটুয়া ও কুম্ভকার মানুষকে—এমনি ছোট পর্যায় এনে তাকে স্থিতি দেয় যা জীবনকে করে কর্মের পরিধিতে ব্যাপ্ত। সে হয় বেঁচে থাকবার একটি ক্ষুদ্র মানুষ, আর সমস্ত মূলগত প্রেরণা শুকিয়ে উঠতে—সে হয় কেরাণী।

ধর্ম ও সমাজহীন রাষ্ট্র আওতায় মানুষ এমনিই মরে নগরে; অনামি অসংখ্য তারা, মরে নানা উপায়ে গ্রামে। যত বিজ্ঞান, শাস্ত্র, স্বাস্থ্য—ছোটর জন্য কিছুই নেই। বালিগঞ্জ আর বেলেঘাটা এক কলকাতায় এবং মানুষের নতুন সৃষ্টিরই রূপ। রাইটার্স বিল্ডিং আর বাঁকুড়ার কোন খুদে গাঁ নৈমুদ্দিনের মাকু চালানো মন ভগবান দেয়নি, গেজেটেড্ অফিসার আর আজকের পাশকরা গ্রাজুয়েট—৪০ টাকা, মাইনের চাকুরে বিবাহিত সহরবাসী অসমবণ্টন নয়—অসম বোধে জীবনদ্বন্দ্বে পিছিয়ে পড়ারই নিদর্শন।

সমতা মালিক আর কুলীতে নেই—কুলীন ব্রাহ্মণ আর শূদ্রেও ছিল না। রাষ্ট্র পথে ফেরে না, খতে চলে। কেউ প্রশ্ন কর—Is it humanity? Is the present picture of free India is progre-

ssive—shall future be benefitted even in economic sense? Cabinet reply—reality will follow! Show me where democracy complete and satisfactory in the Present regime. উত্তর তাই নিরুত্তরে বস্তিতেই কঁাদে—কেবিনেটে বিপক্ষ দত্ত উত্তর-প্রত্যুত্তরে সময় কাটায়। নেমে এসে পতিতের ভগবানকে ভাল কেউ বাসে না।

এমনিই বিজ্ঞান বিজ্ঞাপনের যুগে ধুকছে। একের ইচ্ছায় সমগ্র নিয়ন্ত্রিত—মূল অর্থ- money; it is the medium of exchange and measure of Value. অথচ এ সব জীবনে মানুষ ছিন্নমূল। তার আবাস নেই—সে ভাড়াটে, বিত্ত নেই সে বেতন পায়—প্রয়োজন দেখেনা কেউ, প্রথার মাঝে মাইনে।

এমনিই ফন্দির পরিবর্তিত যুগ—যা চলছে জগতে। যার আছে, আছে তা টাকায়—তা পচে না, বেশী হয়না—হাজার লাখে পৌঁছলেও। ধনে যখন ধন ছিল, ধন ছিল গোধন, তখন সবাই খেতো—সমভাবেই। আগামীর আশাও ছিল—পচার ভয়ও কম ছিলনা। ব্যক্তিকেন্দ্রে স্বত্ত্বে ধান ও দুধ কেউ ব্যাঙ্কে রাখতো না—তিন সেরের বদলে তিন মন জঠরে পুরতেও পারতনা। ঈর্ষা তখন কম ছিল, ছিল তাই একান্নবর্তী জীবন। পাঁচশ টাকার অফিসার আর ৫০৲ কেরাণীর ভেদ আসত না সমাজে।

বস্তুতঃ হিন্দুরাজত্ব কি মুসলমান আমল যা সম্ভব করেনি, তাই গড়েছে ইংরেজ। সব কিছুর মূল্য মুদ্রায় পরিবর্তন করে—চাষ আবাদের উপর কৃত্রিম ঘৃণা ঘনিয়ে—চিরস্বত্ব টেনে এবং সহর, কেরাণীগিরি আর ইংরেজী শিক্ষার আপাত-আলেয়া টেনে গৃহগতকে করেছে গৃহহীন—ভেঙে গিয়েছে শান্তির গ্রামীণ মন ও স্থিতি। স্বাধীন সরকার ইংরেজের প্রথায় জের টেনেই চলছে। সামনে ধাঁধানো বিজ্ঞাপন পঞ্চবার্ষিকীর। অসুস্থ শরীর প্রায় পুলোভারে গুটিয়ে ডাক্তারকে ফাঁকি দেওয়ার সামিল। মানুষ ধুকছে সংবাদপত্র আর রেডিওর আওয়াজে। আজকের কল্যাণ ডালদায়—আগামীর স্থিতে হবে সংখ্যায় কুলী বাড়িয়ে এবং টি, বি, র অসংখ্য বেড়ে বেড়ে।

সম্ভবত মনে হয়, মানুষ নতুনের নামে নিপুণ নিখুঁত হয়নি, তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে হয়েছে ঝাড়ীর ছ্যাঁদা। দুঃখ সে বাড়িয়েই চলছে স্বল্পের পোষাই কল্পে মুনাফা আর মজদুর তৈরী করে। অতীত তাই অসমর্থ—মানুষ চাইছে না—স্নেহনির্ভর জীবন—সে আজ সাধ করেই একা—বাপ মা, ভাইবোন অর্থ অর্জনের যুগে যৌথ মন ও মতে ঠাঁই পায়না।

অর্থকে মূল কেন্দ্র বেছেই আগামী নির্ভর চাইছে সঞ্চয়ে। চালু আজকের ক্ষণে যে সমর্থ, যে রোজগার করে—কাল তারই আচমকা অবর্তমানে যারা ভাড়াটে জীবনে, জমিহীন ফল শূন্য সংসারে—সহরে ভিকিরি হবে—যাদের দেখবার নেই সমাজ অভিভাবক। নেই ধর্মগুরু, তাদের আশ্রয় ঐ বীমা প্রতিষ্ঠান, নয় ব্যাঙ্ক!

গোটা ভারতের সর্বব্যাপ্ত প্রাণশক্তি এমনি করে নগরজীবনে ঝুলিয়ে উপায়হারা বিশেষ পরিস্থিতিতে ইংরেজ করেছে দেড়শ বছর রাজত্ব। তাদের এ কর্ম নিয়ম, অনিয়মের নানান্তর ক্ষেত্রেই জেগে ছিলেন বিবেকানন্দ হতে রাজা রামমোহন—বিদ্যাসাগর হতে সুভাষচন্দ্র। সকলের বোধ ও কর্মবিস্তারেই এক পরিকল্পনা ছিল: সেরূপ নিছক মরে বাঁচার নয়—তা সঞ্চারমান প্রাণের বিলাসে বিপুল। মনে জাগে নেতা ও কর্মীদের মরমী এক বিস্তার—যা যুগযুগান্ত জেগেছে, জাগিয়েছে কল্যাণময়ী আনন্দদায়িনী বেশে—স্বেচ্ছা সেবায় মাতৃ মূর্তিতে।

বস্তুতঃ নগর জীবনে—ব্যবসা, সওদাগরী—সরকারী কি আধা সরকারী কর্ম কেন্দ্রিক সীমিত সংসারে (one wife one family) বিশেষ স্বামী নির্ভর সেখানে ভবিষ্যতের উপায় কিছু সঞ্চয়: ১। এই জমা হতে পারে in the form of self-insurance ২। বীমা প্রতিষ্ঠানের মারফতে।

স্বাধীনভাবে ধন সংগ্রহের অসুবিধা প্রচুর:—১। যে কোন সময়ে যে কোন প্রলোভনে হঠাৎ ব্যয়, ২। খরচের সুযোগ ৩। অকাল মৃত্যুতে মাত্র জমানো অর্থের সুযোগ লাভ। যে মানুষ যেটুকু সামর্থ্য অনুপাতে তুলে রাখতে সক্ষম অধিক যে সামান্য সুদ (simple interest) তার সাথে যোগ হবে। বিশেষ প্রথম পর্য্যায়ে মানুষের আয় কম—ব্যয়ের বাহুল্য বেশী বোধে সঞ্চয় হয় সামান্যই—তাই যে পরিমাণে অর্থ কোন গৃহকর্তার বিয়োগে প্রয়োজন তা মেলে না। ৪। মৃত্যুর পরে অগোছালো মনে এবং সংসারী-বোধের অভাবে গচ্ছিত অর্থ সহজেই ব্যয় হয়ে যায়—বহু অনির্ভর ভবিষ্যৎ তখন চায় সংসারটিকে গ্রাস করতে। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়াকে তুলতে আসে না অসময়ে—সম্পর্কে দূরে সরে যাওয়া আত্মীয়েরা। সভ্য নাগরিক জীবনের গোড়াপত্তনে এমনি অশুভ হাহাকারই বিদ্যাসাগর মহাশয়কে উদ্বুদ্ধ করে ছিল—Annuity তহবিল সৃষ্টিতে। ইজ্জত নিয়ে অশিক্ষিত উপার্জ্জনহীন মেয়ে মানুষ যাতে সমাজে স্থান পায়, কিম্বা অপগণ্ড শিশু যাতে আগামী দিনে চিনতে পায় আপনাকে মানুষের শ্রেণীতে।

ভারতে যদিও মৃতের শেষকৃত্যের জন্য বীমার প্রয়োজন দেখা দেয়নি, এর প্রয়োজন নগর পত্তনের সাথে সাথেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বীমার বিষয়বস্তু আমরা ভারতবাসী ইংরেজদের নিকট হতেই কুড়িয়ে পেয়েছি। বীমার প্রচলন হয়—ভারতে অবস্থানকারী ইংরেজকর্মীদের দৃষ্টান্তে। ওদের জীবনের দায়দায়িত্ব নিতো বিলেতী কোম্পানী এবং টাকা দেওয়া হতো ওদের দেশের টাকায় Starling এ। ভারতেও দু একটি কোম্পানী ইংরেজ বণিকই খোলে—কিন্তু স্থায়ী হয় না ব্যবসা। বিশেষ "Albert" ও "European" নামক দুটি বীমা প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা গুটিয়ে যেতে এদেশে বিশেষ শ্রেণীতে পড়ে যায় হাহাকার।

নিদৃষ্টভাবে বীমা ব্যবসার ইচ্ছায় ভারতে সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত কোম্পানী "বম্বে মিউচুয়েল" স্থাপিত হয় ১৭৭০ সালে ব্যবসা সুরু তাঁরা করতে পাননি নানা কারণেই। অতীতের ইতিহাস আর অর্থকেন্দ্রিক কর্মের অভাবেই সম্ভবত কোম্পানী ইচ্ছানুরূপ এগোতে পারেনি। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে মৃত্যুহার-নির্ভর বীমা ব্যবসা শুরু হয়

ভারতে ১৭৭৪ সালে ওরিয়েন্টাল কোম্পানীর আগমনে। কৃষি প্রধান অর্থনীতিবোধে অগোছালো ভারতকে বীমা ব্যবসার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে আরও দীর্ঘকাল। একটা দেশের আদর্শগত জীবনের সম্পূর্ণভাবেই হলো পরিববর্তন—তারা কোদালী ছেড়ে লাঙল ফেলে ধরল কলম—নয় খাটতে এলো নগরে। গ্রামে, শীতে বর্ষায় প্রকৃতির বিরূপ প্রদানে জীবন যতটা অগোছালো ছিল—নগরে (আকস্মিক মৃত্যু বাদ দিলে)—আয়ের পথ নিয়ম মাফিকই চলে। দীর্ঘদিন প্রায় একইভাবে ক্রমবর্ধিত হারে আয় করা চলে। পরিবর্তিত পটভূমিতে দাঁড়িয়ে এদেশের মানুষও বুঝতে শিখলো বীমায় সঞ্চয়ের প্রয়োজন এবং নিয়মিতভাবে প্রদানের উপায়। বস্তুত ধান বিক্রয়ের অর্থে বারোমাস নির্দিষ্ট হারে চাঁদা দেওয়া চলে না—আদান-প্রদানে চাই সম মানের আয় ও সঞ্চয় (Standard money)। টাকার সর্বস্তরে আদান-প্রদান সত্যই এদেশে সহজ হলো। দু-দুটা মহাযুদ্ধ পরোক্ষভাবে ভারতকে সাহায্য করেছে ব্যবসায়ী হতে—কলকারখানা নানা-ভাবে গড়তে। এর সাথে যোগ দিয়েছে ইংরেজের বিরুদ্ধে অসহযোগ নীতি। ভারতে যদিচ আপন আদর্শে আস্থা হারিয়েছে—বিশ্বের আদর্শে সে আপনার বোধে গড়ে নিতে চেয়েছে আপনার মত করেই। গত মহা-যুদ্ধের পরে দেখা গেছে, ভারতীয়েরা বীমা প্রায় ৯০% অংশ দখল নিয়েছে। ১৯৫৫ সালের পরিস্থিতি বর্ণনা করলে দেখা যায় এদেশে স্থায়ীভাবে ও স্বপ্রথায় ১৭০টি জীবন বীমা কোম্পানী ও ৮০টি প্রভিডেন্ট প্রতিষ্ঠান কাজ করে চলছে। দেশ এমনিই ফসল ও ফলন ছেড়ে অর্থাগমের পথে পা বাড়িয়েছে।

অতীতে দেশদেশান্তরে যেতে ব্যবসায়ীরা সমুদ্র পাড়ি দিতেন—মাঝে মাঝে বিপদও ঘটতো। সেই ক্ষতির অঙ্ক অর্থে কষে সবাইয়ের মাঝে সমমানে (Standard) বণ্টন করে দুস্থকে পুনরায় দাঁড়াবার সুযোগ দেওয়া হতো। লাভের কিয়দংশ দিতে কেউই আপত্তি করতেন না—আপন ভবিষ্যত ভেবে। মানুষ ক্রমে ভাবতে শিখলে (আচমকা কোন বিশেষ বিপদ না এলে) ক্ষতির মাত্রা প্রায় সমানই থাকে। এমনি হিসেবে-পটু একদল লোক দায়িত্ব নিলো ক্ষতিপুরণের। সাথে সাথে দুঃসাহসের কাজে হাত দেবার ক্ষমতা ও মানুষের বাড়তে লাগলো—মানুষ হতে চললো অসীমের তীর্থগামী—উপার্জনের নেশায়।

অতীতে (premium) চাঁদা নেওয়া হতো নিছক অর্থ হারে ক্ষতি-পুরণের কিন্তু অধুনা বীমা চলছে জীবনের উপর—কারণ সংখ্যায় ব্যবসায়ীর চেয়ে বিত্তহীন চাকুরের সংখ্যাই বেশী এবং অগ্নিক্ষতি। সমুদ্রের লোকসান (fire and marine) পৃথক করা হয়েছে—জীবন বীমা হতে। "There is difficulty of putting a money value in human life" সময়ে বীমার লাভকে জুয়ার সাথেও তুলনা করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে একটি মাত্র চাঁদা দিয়েও দশ হাজার টাকা ঘরে তোলা সম্ভব—কোন ক্ষেত্রে নিয়ম না বোঝা বা মানার দরুণ বহু টাকা দিয়েও অনেকে লোকসান ভোগ করে। বুঝদার মানুষ, নিয়মমাফ্য এবং বর্তমানের সাথে যোগাযোগসম্পন্ন মানুষই বীমার ক্ষেত্রে উপযুক্ত বলে ধরে নেওয়া চলে। বীমার যেমনি বিশেষ কতগুলি গুণ রয়েছে।১ কোম্পানী হতে বীমা পত্রের বিনিময়ে অর্থ সংগ্রহ।২ নির্দিষ্ট হারে সংরক্ষণ।৩ মৃত্যুর সাথে সাথে মৃতের পরিবারের সাহায্য তেমনি মিথ্যা তঞ্চকতা কিম্বা সত্যের অপলাপ ; দেয় টাকা বরবাদ হইতেও পারে (contract may stand void) জনস্বার্থের খাতিরেই সরকার ১৯১২, ১৯৩৮, ১৯৫০এ সে পর পর কতগুলি বিষয় প্রবর্তন করতে বাধ্য হয়। ১৯৩৮এ সে সমগ্র কোম্পানীকেই রেজেষ্ট্রিভুক্ত হতে হয়—এতৎ বিষয়ে বহু কোম্পানী নতুন করে জীবনের উপর দায়িত্ব গ্রহণে বিরত হয়।

১৯৫০এ সে প্রতি বৎসর বীমা ব্যবসার হিসাব, উন্নতি অবনতি সম্বলিত blue book এবং বীমার আমানত মূলধন (life fund) কি ভাবে নিয়োগ হবে তার ব্যবস্থা করা হয়।

যদিচ বিশেষ ঘোষণা বলে সরকার পূর্বেই বীমাব্যবসা সরকারী আয়ত্তে টেনে নেন—কার্যকারী প্রথায় ১৯৫৬ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হতেই সম্পূর্ণ দায়িত্ব ভারতে গ্রহণ করেছেন ভারত সরকার। সমস্ত কোম্পানীর লাভ লোকসান দায়দায়িত্ব সবই চলে গেল কোম্পানীর হাত হতে। প্রতিষ্ঠিত হলো বীমার মূল কেন্দ্র বোম্বায়ে—তার অধীনে রয়েছে অপরাপর কেন্দ্র—দিল্লী, মান্দ্রাজ, কলিকাতা, কানপুর।

সমাজ, ধর্ম ও গ্রামহীন ভারত—আজ প্রায় অর্থনীতি-নির্ভর জীবনের স্থিতি স্থাপকতা তাই পড়েছে টাকার উপর। দেশের অগ্রগতিতে কল-কারখানা ও যন্ত্রবিজ্ঞানের চলছে বিপ্লব—এক্ষেত্রে বীমাব্যবসা পড়বেই সম্ভবত। মানুষের জীবনে দুঃখ দিনদিন নতুন রূপে ও রকমে এসে পড়ছে. যতদিন ভারত ভারতীয় মতে ও পথে পা না বাড়ায় এবং সমগ্রভাবে বিশ্বস্বার্থে না পৌঁছায় ততদিন কোন ধারাই একাগ্রগতি নেবে না। টানাটানিতে সমতা রক্ষার চেষ্টাই করবে। জীবন ও মৃত্যুর মাঝে দাঁড়িয়ে মানুষ বাজী রাখছে নির্দিষ্ট হারে ভবিষ্যতের দাবী পুরণে। বস্তুত বীমাব্যবসা অধিক দেয় না, দেবেও না—যতটা সংরক্ষণের প্রস্তুতি ব্যক্তি মানুষের গ্রহণে সক্ষম ততটা দায়িত্বই নিয়মে টানা যায় ও চলে।

বীমা যারা করেছেন—তাঁদের সবাই এক সাথে মরে না—অনেকে বেঁচেও যায়। তাছাড়া মানুষ ভালমন্দ বুঝতে শিখবে—বিশেষ census report নির্ভর mortality table নিয়েও চলে না বীমাব্যবসা। প্রাংশঃ শিক্ষিত নগরবাসীর দীর্ঘদিনের মৃত্যুহার হতেই মৃত্যুমান জ্ঞাপক বিধি প্রস্তুত হয়ে থাকে।

বীমা মোটামুটি পক্ষে।১ অকাল মৃত্যুর দুস্থ আত্মীয় পোষণের পক্ষে সাহায্য করে।২ বৃদ্ধ বয়সে (যে উপায়ের উপর বর্তমানের নগর জীবন নির্ভর করে) অসমর্থ ও আয়হীন দিনের সম্বল। এই মূল দুই ধারা হতে বিভিন্ন সমস্যা জড়িত জীবনে এসেছে বীমা সংরক্ষণে বহু শাখা উপশাখা। কেউ চায় মিয়াদ শেষ হবার পূর্বেই দুএক কিস্তি (lump sum payment) টাকা, কেউ ব্যবস্থা করে মৃত্যুর পরে

নির্দিষ্ট হারে বহু দিনের নিয়মবদ্ধ প্রদান। বীমা-দলীল উন্মাদ নাবালক ভিন্ন উপার্জনশীল যে কেউ নিতে পারে। তৃতীয় জীবনের উপরে বীমা গ্রহণ (শিশুর ভবিষ্যৎ ভিন্ন এবং নিকট আত্মীয় ছাড়া) অসম্ভব। বিলাত প্রভৃতি দেশে নেশাপায়া ও বিশিষ্ঠ রাজনীতিবিদের জীবনে যে কেউ বীমা গ্রহণ করতো—এমনি (gambling) জুয়াপ্রথা বর্তমানে অচল। বীমা ও জুয়ার তফাৎ অংশে—সেটি Insurable interest ·· উদ্দেশ্য নিয়েই নিয়মের প্রচলন।

বীমাপত্র দুপক্ষে স্বীকৃতি নির্ভর নিয়মবদ্ধ একটি দলীল। দালালের (appointed agent of the Insurer) মাধ্যমে বীমাকারীকে আসতে হয়। সাধারণত সেই বীমাপত্র চায় (gives offer) যে কোন লোক যার নির্দিষ্ট আয় আসে মোটামুটি যে সংসারী—শরীর ও পরিবারের কোন বিশেষ রোগ না থাকলে এবং বাপ মা ভাই বোনের মৃত্যুহার নিতান্ত নিম্নমানে না নামলেই বীমা পত্র গ্রহণ করা সম্ভব। স্বামী স্ত্রী, দুই ব্যবসায়ীই ও একসাথে বীমাপত্র গ্রহণ করতে পারে—একের দায় সেখানে অপরের দায়িত্বে তুল্য ভাবে গাঁথা। বীমা পত্র বহু সময়ে মৃত্যুকর হতে বাদ পড়ে, কখনো আয়কর দাতার বীমা পত্রের উপরে মোট বীমার টাকায় ১০% বাদ দেওয়া ও হয়।

বীমাপত্রে থাকে ১। Preamble মুখবন্ধ ২। operative clause কার্যকরী ধারা ৩। Proviso করার ৪। schedule স্বত্ব ৫। attestation দায়িত্বের স্বীকৃতি বীমার টাকা সাধারণতঃ স্থানীয় মুদ্রায় দেয়। বীমা কিছু দিন চলার পরে বীমাকারী অচল হলেও সব টাকা গচা যায়না—নানা প্রথাই রয়েছে From the Point of view of law of equity বীমাকারী পেতে পারে (Surrender value) নগদ ফেরত—বন্ধকরে নির্দিষ্ট সময় অন্তে নেবার পথ (paid up) কিম্বা অসুস্থ হবার সুযোগ (Disability benefit) কিম্বা দুর্ঘটনার সাহায্য (Accident benefit) দায়িত্ব গ্রহণের পক্ষেও (life) মানুষকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় ১। স্বাভাবিক শরীর (Standard) ২। মোটামুটি চালু (Sub standard ৩। অচল (declined] মানুষ। সম্ভবত জীবনী শক্তির উপরেই ব্যবসায় নির্ভর করে। ক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য, বিকলাঙ্গ, চিররুগ্ন ও যারা মারাত্মক কাজে যুক্ত—তাদের দায়িত্ব নির্দিষ্ট চাঁদার উপরে নতুন হার যোগ করে তবেই গ্রহণ করা হয়। মেয়েদের বেলায় শিক্ষিত রোজগারে হওয়া দরকার—(First pregnancy clause) অর্থাৎ সন্তান প্রসবের প্রথম অবস্থায় দায়িত্ব গ্রহণে অধিক চাঁদা দিতে হয়।

স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক জীবনের দীর্ঘ মিয়াদী দায়িত্ব গ্রহণে যদি তারতম্য না করা হয়, তাহলে প্রথমোক্তকে দ্বিতীয় পর্যায়ের জীবনে মৃত্যুহার অত্যধিক হওয়ায় বীমা ব্যবসায়ীকে ক্ষতিপূরণ বেশী দিতে হবে। ধার্য্য টাকার মাস হতে এদিক ওদিক করলেই সমস্ত বন্দোবস্ত (estimate) বিগড়ে যাবে। বীমা পত্র হলো—"It is an agreement enforcable at law", তাই চাঁদার হার নির্ধারণে বিশেষ তৎপর হতে হয়। যেখানে ১৪৲ টাকা নেওয়া হয় সেখানে ১৫৲ কিম্বা ১৮৲ কেন নেওয়া হয়না—এমনি প্রশ্ন মনে হতে পারে। বীমার চাঁদা সর্বদা অগ্রীম এবং বার্ষিক পর্যায় দেয়। তাই কেবলমাত্র দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত চাঁদা নিলেই চলে না। মৃত্যুহার সম্ভাব্য হতে বেশী হতে পারে, দাদনে সুদ কমতেও পারে, কিম্বা ক্ষয় খরচা যা ধরা হয় তার চেয়ে বেশী লাগতেও পারে। তাই দায় বইবার মত চাঁদার (net Premium) সাথে কিছু পরিমাণ টাকার অঙ্ক বেশী ধরা (loading) হয় একেই বলে (office Premimu) বা ঠিক দেয় চাঁদা। মানুষের স্বাস্থ্য, বয়স, সংস্থান অনুপাতে চাঁদার হার ধার্য হয়। যদি (Standard life এ) প্রথম শ্রেণীর জীবনে সমস্ত বিষয় (অর্থাৎ Blood, rine) ৫+৫+৫ মাত্রা (১৫) সম্ভাব্য মাপ হয়—যে কোনটা খারাপ হলেই (যথা ৮+১০+১০) হলে দাঁড়ায় ২৮। ১৫ ও ২৮ এর টাকার অঙ্কে তারতম্য দাঁড়ায় এবং উভয় ক্ষেত্রে জীবনকে সমতাভুক্ত করে শ্রেণী মাপা হয়।

টাকার সুক্ষাতিসুক্ষ ব্যবহার ও নিয়োগে টাকা অঙ্কে বাড়ে—যেমনি ভাল বীজ সার, সেচ প্রভৃতির উৎকর্ষে ফসল বাড়ে। বর্তমান শিল্প ও সংগঠনে মূল লক্ষ্যই টাকা—মানুষের সেবা ও সাহায্য গৌণ—মানুষ নানা চক্রান্তে পড়েই বাধ্য হয় বর্তমানের সাথে তাল রক্ষায় বীমা, ব্যাঙ্ক—নানা ব্যবসায় জড়িয়ে যেতে। অতীত অভিজ্ঞতা বীমায় যদি সম্ভাব্য, তবু সম অবস্থার ফল আগামীতেও প্রায় সমই হয়। না হলে বন্দোবস্ত নতুন করে করতে হয়।

বীমা ব্যবসা অন্যান্য ব্যবসা হতে পৃথক ব্যবসায়ী কোন দ্রব্য দেখাতে পারেনা—অথচ ব্যবসা চলে। এ ব্যবসায় প্রথমে কোম্পানীর খরচ খুবই বেশী (New business strain রয়েছে) দীর্ঘকাল সম পরিমাণ চাঁদা গ্রহণে সকলের উপর হবে দায়-দায়িত্ব মিটিয়ে ও প্রচুর টাকা জমে—একেই বলে life fund এবং এ তহবীল হতেই দায়িত্ব মিটানো হয়। সমস্ত স্বীকারোক্তির (contract period) এর মোট টাকা আর দেয় সমান (Technically speaking) সাধারণতঃ Medical fee, office maintenance, stamp duty সবই বীমা পত্র গ্রাহকের নিকট হতে লওয়া হয়—ঠিক indirect taxation এর মতই।

বীমা-ব্যবসা টাকার অঙ্কে লাভজনকই। দেয় টাকা দিয়েই অসময়ে দুস্থর অভাব মিটানো হয়। তবু এক অর্থে, যৌথ পরিবার হীনতা আর বীমা পত্র নিয়ে একক সংসারে আগামীর দায়িত্ব হতে মুক্ত হওয়া এক নয়। এখানে প্রাণ সমবমীতাও বোধ নেই। যে লক্ষ্য অজানা মানুষ অভাবে ভোগে, বীমা ব্যবসায়ীর তা কিছু দেখবার নয়। মূলত বুদ্ধিমানের আধুনিক প্রথায় মস্তিস্ক পরিচালিত একটি ব্যবসা—এবং সম্পূর্ণ unproductive—এতে অভাব মিটানোর দ্রব্যসম্ভার মেলে না—লেনদেন চলে টাকায়।

অত্যন্ত জটিল অঙ্কের ফলাফলে সম্ভাব্য নির্দেশে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত নিয়ে বীমা ব্যবসা। বিশ্বে নানা ভাবেই এ ব্যবসার প্রসার চলছে কিন্তু ভারতে অশিক্ষিত এবং কৃষি প্রধান জীবনে এ ব্যাসা ভালভাবে চলা শক্ত—যারা ব্যাঙ্ক বোঝে না তারা প্রাপ্য টাকা একখানি Cross cheque এ পেয়েও অনেক সময় টাকা ভোগ করতে পারেনা। প্রাণকেন্দ্রিক ভারত বোধহয়—স্বল্পেতুষ্ট, গ্রগত মনে মিলমিশে থাকলেই ভাল—ভারত কোন দিনই গ্রেট বৃটেন কিম্বা রুশ হয়ে উঠবে মতে ও মনের স্বাস্থ্যে—তা ভাবা আজই এক প্রকার অন্যায়।

•

অলক্ষ্যা
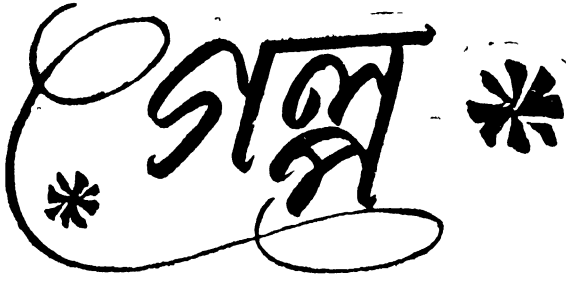
শ্রীবিমল রায়

লেখক নিশীথ চক্রবর্তীকে অনেক কাল দেখা যায় নি।

সাহিত্য রসিক সাবজজ অমূল্য সেনের বৈঠকখানায় হঠাৎ সেদিন তাঁর আগমনে সকলেই অবাক হলেন। দশ বছরের ওপর হ'ল তিনি লেখা ছেড়ে দিয়েছেন। শুধু লেখাই নয়, কলকাতা শহরও। আজকালকার সাহিত্যিকরা অনেকেই তাঁকে চেনেন না। যাঁরা চিনতেন তাঁরাও এখনকার নিশীথ চক্রবর্তীর চেহারা দেখে চিনতে পারবেন না। তাঁর লেখা কোনো বইও এখন বাজারে মেলে না।

অমূল্য সেন উপস্থিত ভদ্রলোকদের সম্বোধন করে বললেন, 'আমাদের সৌভাগ্য আজ আমাদের মধ্যে আমার পুরনো লেখক-বন্ধু নিশীথ চক্রবর্তীকে পেয়েছি।'

সকলের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল নিশীথ চক্রবর্তীর ওপর। সকলের থেকে তিনি খানিকটা দূরত্ব রেখে বসেছেন ঘরের কোণের দিকটাতে। চেয়ারের হাতলে লাঠি গাছ। ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা প্রৌঢ় ভদ্রলোক। চোখের দৃষ্টি বিষণ্ণ, কপালে গভীর কুঞ্চন রেখা। পাতলা অধরোষ্ঠের ওপর লম্বাটে নাক ঝুলে পড়েছে। শীর্ণ দেহ, হাতের আঙুলগুলো কাঠি-কাঠি, শিরাগুলো জেগে উঠেছে। সাবজজ অমূল্য সেনের বৈঠকখানায় প্রতি সন্ধ্যাবেলায় সাহিত্য-আলোচনার আসর বসে। কখনো উপস্থিত লেখকরা লিখিত গল্প কবিতা পড়েন, কখনো অপরের লেখা নিয়ে সমালোচনা হয়। লেখক নিশীথ চক্রবর্তীকে পেয়ে সকলেই তার মুখ থেকে কিছু শুনতে উৎসুক হলেন। সাহিত্যিক উকীল যাদব ঘোষাল বললেন, 'আজকে আমরা নিশীথবাবুর কাছ থেকে একটি গল্প শুনতে চাই।'

রিটায়ার্ড ডি, এস, পি মণি সেন বললেন, 'একদিন ওঁর গল্পের দাম ছিল।'

নিশীথ চক্রবর্তী মাথা তুলে তাকালেন সকলের দিকে। সকলের আগ্রহ-দৃষ্টি তার 'পরে নিবদ্ধ। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ কাটল, নিশীথ চক্রবর্তীর ঠোঁট কাঁপল, মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'ও-সব অনেকদিন ছেড়েচি। আপনারা কেউ বলুন।'

অমূল্য সেন চেয়ার ছেড়ে উঠে বললেন, 'উনি নিজের মুখে গল্প না বল্‌লেও ওঁর গল্প-শোনা থেকে আপনারা বঞ্চিত হবেন না। ওঁর লেখা শেষ গল্পটি আমি যত্ন করে রেখেছি। দশ বছর আগে 'বিচিত্র ভারত' মাসিকে প্রকাশিত হয়েছিল। সেটি আমি পড়ে শোনাব।'

নিশীথ চক্রবর্তী আপত্তি তুললেন, কিন্তু সকলের সায় থাকায় চুপ করতে হ'ল। আলমারী থেকে 'বিচিত্র ভারত' মাসিক বার করে আনলেম অমূল্য সেন। সে-সংখ্যার প্রথম গল্পটিই নিশীথ চক্রবর্তীর লেখা, 'অচেনা।' সাবজজ অমূল্য সেন পড়তে শুরু করলেন।—

"আমি বিয়ের আগেই স্ত্রীর অতীত ইতিহাস জানতুম। অনেকেই ভেবেছে আমি ঔদার্যের বশে মঞ্জুলার পানিগ্রহণ করেছি—, কিন্তু আমি তা মনে করিনি। বিয়ের পর আমার মনে প্রশ্ন জেগেছে আমি সত্যি তাকে পেয়েছি কিনা। মঞ্জুলা তা বুঝতো, অথচ ভীষণ চাপা, কখনো কিছু বলতো না।

বিয়ের পর এক বছর কেটেছে।

আবার বসন্ত এলো। ফুল ফুটলো। পাখিরা গাইলো। আমার মনের কালো যবনিকা কেঁপে উঠলো, ব্যথিত হৃদয় ডুকরে কেঁদে উঠলো। আমার স্থির প্রত্যয় হলো, মঞ্জুলাকে আমি পাইনি। সেদিন সকালে মঞ্জুলাকে দেখলুম বারান্দার রেলিঙে হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকতে। চোখে শূন্যদৃষ্টি। সকালের সোনালী রোদ সিল্কের শাড়ির মতো লুটে পড়েছে তার পায়ের তলায়। বারান্দার টবগুলোয় ফুল ফুটেছে, বিচিত্র পাতাবাহার গাছ গুলোর পাতার মধ্যে হাওয়ার কানাকানি। আমার বুকের

ভেতরটা খাঁ-খাঁ করে উঠলো। কেন সে এমনি দাঁড়িয়ে আছে? তবে কি সত্যি মঞ্জুলাকে আমি পাইনি? ধীরে ধীরে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম, আলগোছে তার পিঠের ওপর হাত রাখলুম। ফিরে তাকালো মঞ্জুলা। আমার ডান হাতের কলমের দিকে তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে বললো, 'লেখা ছেড়ে উঠে এলে কেন?

বললুম, 'লেখা আসে না। নির্ঝরের উৎস মুখ শুকিয়ে গেছে।'

মৃদু অনুযোগ করে বললো মঞ্জুলা, 'তাহ'লে এবারকার পুজো সংখ্যাগুলোর লেখা তৈরী করবে না?'

'হয়তো এবার দু'এক খানার বেশি লেখা ছাড়তে পারবো না।'

মঞ্জুলা চুপ করে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলো।

মঞ্জুলাকে নীরব দেখে আমি স্থির থাকতে পারলুম না, তার একখানা হাত ধরে বললুম, 'আমাকে তুমি ক্ষমা করো, আমি তোমার সুখের অন্তরায় হয়েছি।'

মঞ্জুলা ধীরে ধীরে তাকালো আমার মুখের পানে। স্থির স্বচ্ছ দৃষ্টি অথচ অতল গভীর। তার শিশির-ঝরা গোলাপের খসা পাপড়ির মতো বিবর্ণ ঠোঁট দুটি অকস্মাৎ থর্-থর্ করে কেঁপে উঠলো। বুঝলুম অতি কষ্টে সে নিজেকে সামলিয়ে নিচ্ছে। আমিও চুপ করে থেকে তাকে সময় দিলুম।

কিছুক্ষণ মৌন থেকে মঞ্জুলা মৃদুকণ্ঠে বললো, 'আমি সুখী হইনি তুমি কি করে জানো? তোমার অন্যায় ধারণা।'

'আমার সত্যকারের বিশ্বাস। আমি চব্বিশঘণ্টা নিজের মধ্যে অনুভব করি।'

অপ্রসন্ন মুখে মঞ্জুলা বললো, 'এসব তোমার পাগলামো।'

আমি দৃঢ়স্বরে বললুম, 'না, পাগলামো নয়। আমি লেখক, আমি চরিত্র সৃষ্টি করি, যদি মানুষের ভেতরটা না জানতে পারি ত' লিখি কি করে?'

মঞ্জুলার চোখ জলে ভরে উঠলো, স্বচ্ছ দৃষ্টির মুক্তোর টুকরো ধীরে ধীরে তলিয়ে গেলো। ভারী চোখের পাতা তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'জানারও অনেক বাকি থাকে। এখন যাও, লক্ষ্মীটি, লেখাগুলো শেষ করো গে।'

ঘরে এসে লেখার খসড়াগুলো নিয়ে বসলুম। অনেক চেষ্টা করেও চার লাইন লিখতে পারলুম না। লেখা ছেড়ে উঠে কতক্ষণ পায়চারি করলুম। কিন্তু কিছুতে কিছু লেখার মতো মানসিক স্থৈর্য পেলুম না, চাদরখানা কাঁধে ফেলে ধীরেনের উদ্দেশে বেরোলুম।

ধীরেন আজকাল সর্বক্ষণ বাসায় থাকে; গেলেই পাওয়া যায় জানতুম। আজকাল তার ঠিকাদারী ব্যবসার অবস্থা ভালো নয়। গত বছর বেশ কিছু লোকসান হয়েছে, সে -ধাক্কা এখনো সামলিয়ে উঠতে পারেনি। বাইরে কিছু বিলও আটকা পড়েছে—আদায়ের জন্য মামলা মকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েছে। অনেক দিন পরে হঠাৎ তার বাড়ি এসেছি দেখে সে আশ্চর্য হলো। হাতের কাগজপত্রগুলো এক পাশে সরিয়ে আমাকে অভ্যর্থনা করলো, 'এসো।'

তার পাশের একটি চেয়ারে বসলুম।

'তারপর কি খবর তোমার?'

'তোমার কাছেই এসেছি, ধীরেন।'—আমি বললুম।

'আমার কাছে? বড়োই আশ্চর্য। আমি ভেবেছি তুমি আমায় ভুলেছো।'

আমি হেসে বললুম, 'ভুলতে চেয়ে অন্যায় করেছি, ধীরেন। তুমি জান যে স্নায়বিক রোগী যে জিনিষ ভুলতে উঠে-পড়ে লাগে, সেই জিনিষই বড়ো বেশি ভেবে ভেবে দুর্বল হয়ে পড়ে। আমারও সেই দশা এখন।'

কথাটার পেছনকার উদ্দেশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট। ধীরেন এমন কথা আমার মুখ থেকে শুনতে পাবে কখনো আশা করেনি। সে বললো, 'সাহিত্যিকরা অমন রোগে ভুগে থাকে। তবে কি আমি তোমার কাছে দুঃস্বপ্ন?'

'কখনো মনে করেছি তাই। কিন্তু এখন নিজের ভুল বুঝতে পেরেছি। যে-জিনিষে ভয়, তারই সম্মুখীন হবার মতো সাহস আমার ছিল না তখন। তুমি আমার ভয় ভাঙাতে মাঝে মাঝে বাসায় যাবে।'

একথায় ধীরেন যেন আঁৎকে উঠলো, তাড়াতাড়ি বললো, 'আমায় ক্ষমা করো, তোমার এ অন্যায় অনুরোধ রাখতে আমি পারবো না, অনিল।'

আমি তার হাত দুটি ধরে মিনতি করে বললুম, 'তা'হলে কিন্তু আমি দুঃখ পাবো, ধীরেন।'

ধীরেন আরো আপত্তি জানাতে তৎপর হচ্ছিলো; আমি

তাকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে এলুম। বাড়ি ফিরে দেখি, মঞ্জুলা আমার লেখা গল্পের পাণ্ডুলিপি পড়ছে।"……

সাবজজ অমূল্য সেন 'বিচিত্র ভারত'-এর পাতা উল্টালেন পড়ার সেই অল্প ফাঁকটুকুতে অনেকেই লেখক নিশীথ চক্রবর্তীর দিকে তাকালেন। নিশীথ চক্রবর্তী প্রস্তরের মতো নিষ্প্রাণ মুখে বসে আছেন, চোখের দৃষ্টি ঘসা কাচের মতো ঘোলা, নিষ্পলক। যেন অতক্ষণ তিনি আর কারুর গল্প শুনছিলেন।

উকীল যাদব ঘোষাল পার্শ্বে উপবিষ্ট মিউনিসিপ্যাল কমিশনার মন্মথ মিত্রকে বললেন, 'গল্পটার মধ্যে লেখকের মানস খুব স্পষ্ট, নিজ অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর সর্বত্র। শোনা যায় এ বিচিত্র অভিজ্ঞতা নাকি তাঁর নিজের-ই।'

কমিশনার মন্মথ মিত্র সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, 'হতে পারে, কিন্তু সত্য জিনিষটা দেখাতে গিয়ে তাঁরা বিষয়টা অহেতুক ফেনিয়ে তোলেন—, যেন খুঁচিয়ে ঘা করা। সত্যের টুকরো নুড়ির মতো আবেগের জোয়ারে তলিয়েই যায়।'

যাদব ঘোষাল কমিশনারের যুক্তি খণ্ডন করতে যাচ্ছিলেন, লক্ষ্য করলেন, লেখক নিশীথ চক্রবর্তী তাদের দিকে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে তাকিয়ে আছেন। তাই দেখে কমিশনার মন্মথ মিত্র মাথা নিচু করে ছাইদানিতে সিগারেটের ছাই ঝাড়লেন। সাব্‌জজ অমূল্য সেন গল্প পড়া শুরু করলেন।……

"একদিন আফিস থেকে ফিরতেই মঞ্জুলা বলে উঠলো.

'ধীরেন বাবুকে তুমি এখানে আসতে বলেছ নাকি ?

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পাশ কাটাতে উপক্রম করতে মঞ্জুলা আমাকে সবলে আকর্ষণ করলো—বললো, 'কেন তুমি এমনি করে আমাকে জ্বালাতন করো ?'

আমি শান্ত কণ্ঠে বললাম, 'ধীরেনের আসায় কোনো দোষ নেই, মঞ্জুলা। ওর ওপর এক সময় যে অবিচার করেছি, এবার সংশোধন করবো।'

'তা'হলে তুমিই ওকে আসতে বলেছো ?'

'শুধু বলিনি, হাতে ধরে অনুরোধ করেছি।'

মঞ্জুলার চোখ ছল ছল করে উঠলো, ভারী গলায় বললো, 'শুনে খুশি হবে তোমার অনুরোধ ব্যর্থ হয়নি।' কথাটা বলে মঞ্জুলা মুখ ফিরিয়ে রইলো। মঞ্জুলার চোখের পাতা ভারী হয়, চোখ ছল ছল করে, গলা ধরে, ঠোঁট কাঁপে, কিন্তু কখনো কেঁদে ভেঙে পড়ে না। যদি কাঁদতো কিংবা কান্নার ভান করেও একবার ভেঙে পড়তো, আমি কিন্তু অত্যন্ত সুখী হতুম। তা'হলে মঞ্জুলা ধরা পড়তো, যে ভীষণ দুর্জ্ঞেয় বোবা রহস্যের মধ্যে সে লুকিয়ে আছে সে-আতঙ্ক থেকে আমিও মুক্তি পেতুম।

আমি স্থির নিশ্চয় মঞ্জুলাকে পাইনি, কিন্তু পাইনি বলেই যে তার মনের ওপর দখল নেব—আমি অত পাষণ্ড নয়। আমি স্বামী হতে পারি, স্বামীত্বের জোরে তার কল্পলোকের সমস্ত রঙ্ ঘষে মুছে ফেলে দিতে পারিনে। আমার কর্তব্য কিংবা দায়িত্ব সেটুকু নয়। আমি সব জেনেই তাকে গ্রহণ করেছি, মালিন্য ছেঁকে যদি মাণিক না খুঁজে নিতে পারি তবে অমন দুঃসাহস কেন করতে গেলুম ?

আরেকদিন মঞ্জুলা বললো, 'তুমি ইচ্ছে করলেই এমন করে আমায় অপমান করতে পারো না।'

আমি বললুম, 'তুমি ত নিজেই ধীরেনকে আসতে নিষেধ করতে পারো—'

'তুমি নিজে যেখানে অনুমতি দিয়েছো আমি পারি না', মঞ্জুলা নরম গলায় বললো।

'আমিও পারি না,' বলে বাইরে যেতে উদ্যত হতেই দেখি ধীরেন এসে পড়েছে। আমাকে যেতে দেখে ধীরেন বললো, 'কোথায় যাচ্ছ ?'

আমি ব্যস্তভাবে বললুম, 'বাইরে বিশেষ কাজ আছে, তুমি বসো।'

ধীরেন তাড়াতাড়ি বললো, 'না, না, চলো একত্রে যাই দুজনে, পরে একত্রেই ফেরা যাবে।'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'তুমি কোথায় যাবে আমার সঙ্গে ? আমাকে পাব্লিশারের দোরে দোরে ঘুরতে হবে—, তুমি তা পারবে না। তার চেয়ে তুমি মঞ্জুলার সঙ্গে বসে গল্প-টল্প করো, চা খাও, আমি এলাম বলে—' বলেই ঝড়ের বেগে বেরিয়ে এলুম। এক সময় চকিতে পেছন ফিরে লক্ষ্য করলুম—সিঁড়িতে ধীরেন আশ্চর্য মুখে দাঁড়িয়ে বারান্দায় মঞ্জুলা। বাইরে এসেই আমার মন পরম প্রসন্নতায় ভরে গেলো।

আরো কয়েকদিন কাটলো। ভাবলুম কাজ অনেকটা এগিয়ে নিয়ে এসেছি। মনে আনন্দ হলো। এমন বিচিত্র দরাজ আনন্দ-বোধ কখনো হয়নি।

সেদিন সকালে জানালার গরাদ ধরে দাঁড়িয়েছিলুম। শরতের রোদে আনন্দময়ীর গায়ের রঙ ফুটতে সুরু করেছে, বাতাসে প্রসন্নতার স্পর্শ। সুন্দর সকালবেলা। মঞ্জুলা চা নিয়ে এলো।

চা খেতে খেতে অকস্মাৎ মঞ্জুলা বললো, 'তোমার পায়ে পড়ি, ধীরেনবাবুকে এখানে আসতে বারণ করো।'

বললুম, 'ধীরেনের ওপর তোমার অন্যায় অভিমান মঞ্জুলা, সে এখানে আসে বলেই আমি নিজেকে সহজ করতে পেরেচি।

'কিন্তু আমি আর পারি নে,' মঞ্জুলা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো।

আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, 'আমি তোমাকে অবিশ্বাস করিনে মঞ্জুলা, তুমি আমার ওপর অবিচার কোরো না।'

মঞ্জুলা চুপ করে রইলো। আমার আশঙ্কা ছিল, আজ শরতের সোনালী সকাল বেলায় সে নিজেকে সামলাতে পারবে না। বুঝি সে হঠাৎ সশব্দে ভেঙে পড়বে—ঝর-ঝর করে কেঁদে ফেলবে। আমি লোভে লোভে তার দিকে তাকালুম। কিন্তু সে আমার প্রত্যাশাকে ব্যর্থ করে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো, পরিধেয় সংযত করে কঠিন কণ্ঠে বললো, 'আমাকে তুমি চিনতে পারলে না। তুমি গল্পের মানুষ সৃষ্টি করতে জানো, যারা তোমার খেয়াল-খুসিতে হাসে কাঁদে, যারা কঙ্কাল মাত্র, রক্তমাংসের সম্বন্ধ নেই। সত্যিকারের জানার অনেক বাকি, এটুকু বলে রাখলুম।'

ইতিমধ্যে ধীরেন হাজির হোলো।

অনেকদিন কেটে গেলো। ধীরেনের আবির্ভাব যত ঘন ঘন হতে লাগলো, মঞ্জুলার অনুযোগ বিস্ময়কর ভাবে ততই কমে যেতে লাগলো। আমি ভাবলুম বুঝি সত্যই সহজ হতে পেরেছি মঞ্জুলার কাছে, নিজের কাছেও। আমার ভেতরে যে এমন স্বর্গসুন্দর মানুষটি লুকিয়ে ছিলো কোনো দিনই তার অস্তিত্ব অনুভব করতে পারিনি। সে মঞ্জুলার ঠোঁটের চেয়েও বেশি আরক্ত, চোখের চেয়েও বেশি শান্ত।

আবার বসন্ত এলো। মঞ্জুলার নিজ হাতে লাগানো টবের ফুলগাছগুলোর ওপর মধুর বাতাস বইতে লাগলো। পথের ধুলোমাখা বিবর্ণ শিরীষ গাছের রিক্ত শাখায় বসে পাখিরা শিস দিতে লাগলো। কিন্তু পত্রঝরা শূন্যতার মধ্যেও আমি পরিপূর্ণতার আস্বাদ পেলুম। সে আনন্দ অনির্বচনীয়।

বসন্তের নীরব দুপুরে আফিসে কাজকর্ম কচ্ছিলুম—বেশ নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে বসে কাজকর্ম কচ্ছিলুম। আগে অফিসে এলেও মন পড়ে থাকতো বাড়িতে, এখন সেরূপ লাগে না। সাধারণ পাঁচজন কর্মচারীর মতোই এখন কাজ করতে পারি। কাজ কচ্ছিলুম, অকস্মাৎ ঝড়ের মতো ধীরেন এসে উপস্থিত হলো। অফিসে ধীরেন বড়ো আসে না, তার এরূপ আসায়, উৎসুক হয়ে তাকালুম। ধীরেনের মুখ শুকনো, চুল এলো মেলো—, প্রায় আধ মাইল সে যে পায়ে হেঁটে এসেছে তার পরিচয় পরিস্ফুট।

চমকিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'ব্যাপার কি ?'

প্রত্যুত্তরে সে এক খণ্ড কাগজ আমার হাতে দিলো। দু'চার ছত্র মাত্র—হাতের লেখা মঞ্জুলার, ধীরেনকে সম্বোধন করে লেখা। কাগজ খানা না পড়েই ফেরৎ দিয়ে বললুম, 'পড়তে চাইনে। কি হয়েচে বলো ?'

ধীরেন পুনর্বার কাগজখানা বাড়িয়ে বললো, 'পড়ো, সব বুঝবে।'

'না,' আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলুম, বললুম, 'কিছু অঘটন ঘটেছে কি ? বিষ খেয়েচে না আগুনে পুড়েচে—তোমার মুখেই শুনবো।'

ধীরেন কাগজ খানা টেবিলের ওপর রেখে বললো, 'না, মরেনি।'

রাগে উত্তেজনায় কাগজটা দলে মুচড়ে বললুম, 'মরেছে, নিজেকে বাঁচাতে সে মরেচে।' কাগজখানা বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলতে যাবো, লক্ষ্য করলুম...ধীরেনের দু'চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল ঝরছে। খুব স্বাভাবিক, যথার্থই সে আমার স্ত্রীকে ভালোবাসতো। ধীরেন আমার হাত চেপে ধরে বললো. 'চলো, খুঁজিগে, এখনো বেশি দূর যেতে পারে নি, পাওয়া যাবে।'

আমি চিরকুটখানা বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে

দিয়ে বললুম, 'পাগল নাকি, কাছে থেকেও যাকে খুঁজে পাইনি, লক্ষ লক্ষ লোকের ভিড়ে তাকে পাবো? খুঁজতে হয় তুমি খোঁজগে, আমাকে বিরক্ত কোরো না।' বলেই ফাইল টেনে নিলুম।

ধীরেন চলে গেলো। বেচারা! মঞ্জুলাকে ভালোবাসত; আমি মঞ্জুলাকে কখনো চিনতে পারিনি।"

সাবজজ অমূল্য সেন 'বিচিত্র ভারত' বন্ধ করলেন। গল্প শেষ হয়েছে। উকীল যাদব ঘোষাল বললেন, 'ধীরেন কি খোঁজ করে পাবে মঞ্জুলাকে?'

ডি, এস, পি মণি সেন বললেন, 'গল্প বলেই পাওয়া যাবে না, নয়ত খুঁজে বার করা এমনি কি কঠিন? গল্প-বক্তার খোঁজ করা উচিত ছিল।

নিশীথ চক্রবর্তী লাঠিগাছ হাতে উঠে দাঁড়িয়েছেন। চোখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। মণি সেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'গল্প-বক্তা অত বোকা নয় যে হারায়নি—মিছে তাকে খোঁজ করে বেড়াবে।'

যাদব ঘোষাল বললেন, 'হারায়নি, তবে কি মঞ্জুলা মরেছে?'

'না সে মরেও নি,' নিশীথ চক্রবর্তী উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'মঞ্জুলা ধীরেনের ঘরেই ছিলো—ঘটনাটা জালিয়াতির—এ কথা গল্প বক্তা জানতো।'

যাদব ঘোষাল উৎসুক হয়ে উঠলেন, বললেন, ধীরেনের চরিত্র কি কোনো সত্যকার মানুষের?

নিশীথ চক্রবর্তীর দু'চোখ জ্বলে উঠলো, কুঞ্চিত অধর প্রসারিত হলো। প্রায় চীৎকার করে বললেন, 'রক্ত-মাংসের মানুষের। সে মানুষটি এই ঘরে বসেই গল্প শুনেছে, মঞ্জুলা মিথ্যেই বলতো আমি কঙ্কাল সৃষ্টি করি, মানুষ সৃষ্টি করতে পারি নে।'

নিশীথ চক্রবর্তী চকিতে দোরের দিকে মুখ ফেরালেন। তার জ্বল জ্বল দৃষ্টি অনুসরণ করে সকলে বিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন মিউনিসিপ্যাল্ কমিশনার মন্মথ মিত্র অতি দ্রুত কক্ষ ত্যাগ করলেন।

বাংলায় হিন্দু যুগে চাউলের দর কিরূপ ছিল?

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

নবাব সায়েস্তা খাঁ যে সময়ে বাংলার সুবাদার ছিলেন সে সময়ে চাউলের দর নামিয়া টাকায় ৮ মণ হইয়াছিল। এজন্য তিনি ঢাকার কেল্লা হইতে একটি দরজা দিয়া বাহির হইয়া এই দরজা গাঁথিয়া বন্ধ করিয়া দেন—আর বলেন যে যখন চাউলের দর পুনরায় টাকায় ৮ মণ হইবে তখন যেন এই দরজা খোলা হয়। ইহা ইং ১৬৭৫ সালের কথা।

আচার্য্য স্যর যদুনাথ সরকার মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত বাংলার ইতিহাসের ২য় খণ্ডের ৩৮৭ পৃঃ লিখিয়াছেন যে :—

"As for the cheapness of grain during his (Shaishta khans) vice-royalty it need not excite any surprise. About 1632, Father Sebastion Manrigue during his travels in Bengal, found rice selling at 5 monds to the rupee (Luard's Manrigue. I. 54) and Dacca being in the centre of "rice bowl" of Bengal, grain was naturally still cheaper there than in Central Bengal."

অর্থাৎ শায়েস্তা খাঁর আমলে চাউল সস্তা হওয়ায় আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কারণ নাই। ইং ১৬৩২ সালে পাদ্রী সিবাস্টেন্ মানরিজি মধ্যবঙ্গে টাকায় ৫ মণ চাউল বিক্রয় হইতে দেখিয়াছেন। ঢাকার চারি পাশে প্রচুর চাউল হয়, সেজন্য চাউল আরও সস্তা।

চাউলের দর যে উঠানামা করিত মাত্রাধিক্যভাবে—তাহার পরিচয় পাই কোলব্রুক সাহেবের উক্তি হইতে—

"Rice in husk sold. one season as low as eight muns for the rupiya. In the following year it was eagerly purchased at the rate of a rupiya for two muns" (Bolebrooks Husbandry of Bengal. p 67 f. n)

অর্থাৎ ধান এক বছর টাকায় ৮ মণ করিয়া বিক্রয় হইয়াছিল, পরের বছর টাকায় ২ মণ করিয়া পড়িতে পায় না। ইহা ইং ১৭৮৯-১৭৯০ সালের কথা।

ইং ১৭৮৭ সালে রংপুরে ভীষণ বন্যার পর চাউল টাকায় ৩৭ সের করিয়া বিক্রয় হইয়াছিল।

কিন্তু হিন্দু-যুগে অর্থাৎ ইং ১২০০ সালের পূর্ব্বে বাংলায় চাউলের দর কি ছিল এ বিষয়ে কিছু জানিতে পারি নাই। মনে হয় চাউল খুব সস্তা ছিল।

ডাঃ রাধা কুমুদ মুখার্জ্জী তাঁহার Indian Land System নামক পুস্তিকার (যাহা Land Revenue commission এর রিপোর্টে পরিশিষ্টরূপে দেওয়া আছে) লিখিয়াছেন যে :—

"Revenue was paid in cash under the Sena Kings of Bengal" (১৫২ পৃঃ)

অর্থাৎ বাংলায় সেন বংশীয় রাজাদের আমলে রাজস্ব নগদ টাকায় দেওয়া হইত। সেন বংশীয়েরা মোটামুটি ইং ১১০০ হইতে ১২০০ সাল অবধি সমগ্র বঙ্গে রাজত্ব করিয়া ছিলেন।

তিনি ঐ পুস্তিকার ১৫০ পৃঃ লিখিয়াছেন যে :—

"One inscription [No. 9 of N. G. Majumdar's Inscriptions of Bengal] mentions the assessment of 15 *puranas* for each *drona* of land and the total revenue from a village amounting to 900 *puranas* from its total land measuring 60 *dronas* and 17 *unmanas*"

অর্থাৎ ননীগোপাল মজুমদারের 'বাংলার লিপির' ৯নং লিপি হইতে জানিতে পারি যে প্রতি দ্রোণ পরিমাণ জমীর রাজস্ব ছিল ১৫ পুরাণ করিয়া।

এখন দেখিতে হইবে পুরাণ ও দ্রোণের পরিমাণ বা মান কি ছিল ? জেনারেল এ, বাকিংহাম সাহেব তাঁহার coins of Ancient India প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে পুরাকালে ভারতবর্ষে নিম্নলিখিত রৌপ্য-মুদ্রার চলন ছিল।

পোন	নাম	ওজন	
		রতিতে	গ্রেণে
৪	টংকা বা পাদিক	৮	১৪.৪
৮	কোনা	১৬	২৮.৮
১৬	কার্ষাপন, ধরণ বা পুরাণ	৩২	৫৭.৬
১৬০	পতমন বা পলা	৩২০	৫৭৬

আমাদের রূপার টাকায় ওজন ১ ভরি বা ১৮০ (গ্রেণ) ইহাতে কিছু পরিমাণ খাদ আছে। খাদের হিসাব উপস্থিত বাদ দিলাম—কেন না পুরাণে কি পরিমাণ খাদ আছে তাহা জানা নাই। মোটামুটি হিসাবে ১ টাকা = ৩.১২৫ পুরাণ। এক কথায় আমাদের ১ টাকা = ৩৵০র সমান।

দ্রোণের মাপ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকমের হইত। ঢাকা ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটীয়ারের ১১৫ পৃঃ লিখিত আছে যে :—

"A *nal* is a measure of length varying from 9¾ to 11¼ feet. A *kani* in the Munshiganj subdivision is 24 *nals* by 20 *nals*, the *nal* being usually 11¼ feet in length, and the area about 1 acre 1 rod and 23 poles. Elsewhere a *kani* or *pakhi* is only 12 *nals* by 10 *nals*, A *drona* = 16 kani ; a *khada* = 16 *pakhi*."

এক কানি জমী হইতেছে ৬,৭৪৬ বর্গ গজ বা ৪.২১৬ বিঘা।

১ একর = ৪,৮৪০ বর্গ গজ
১ রড = ১,২১০ „ „
১ পোল = ৩০¼ „ „
২৩ পোল = ৬৯৬ „ „

১ নঃ ১ রু ২৩ পোঃ = ৬,৭৪৬ বর্গ গজ

এক দ্রোণ = ১৬ কানি = ১৬ × ৪.২১৬ বিঘা = ৬৭.৪৫৬ বিঘা

এক দ্রোণ জমীর বা ৬৭.৪৫৬ বিঘা জমীর রাজস্ব বা

খাজনা হইতেছে ১৫ পুরাণ বা ১৫/৩$\frac{১}{৮}$ টাকা—৪'৮ টাকা =৪৮১৬ গণ্ডা। ১ বিঘা জমীর রাজস্ব হইতেছে ৪'৮/৬৭'৪৫৬ টাকা=০'০৭১১৬ টাকা ২২·৭৭ গণ্ডা।

হিন্দু যুগে উৎপন্ন শস্যের ছয় ভাগের এক ভাগ রাজার প্রাপ্য। এই ব্যবস্থা সকলেই মানিয়া লইয়াছেন।

একর প্রতি বাংলা দেশে ধান্যের ফলন হইতেছে ১৮'৮ মণ। চাউলের হিসাব ইহার $\frac{২}{৩}$ অংশ অর্থাৎ ১২'৫ মণ। বিঘা প্রতি ধান্যের উৎপাদন হইতেছে ৪'১৪৩ মণ। ইহার ষষ্ঠাংশ রাজার প্রাপ্যের পরিমাণ হইতেছে ০'৬৯০। মণ। আর ইহার মূল্য হইতেছে ২২'৭৭ গণ্ডা—এমতে ১ মণ চাউলের মূল্য হইতেছে ৩৩ গণ্ডার সামান্য কিছু কম বা টাকায় ৯'৭ মণ।

আমাদের যুক্তিতে বা সিদ্ধান্তে ভুল থাকিতে পারে। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা যদি উপযুক্ত পণ্ডিতেরা করেন ত' বড় ভাল হয়। রাজস্বের হার যদি $\frac{১}{৬}$ অপেক্ষা বেশী হয় বা জমী যদি দো-ফসলী হয় তাহা হইলে চাউলের মূল্য আরও কমিয়া যাইবে। আমাদের উপরের হিসাবটি খসড়া হিসাব মাত্র।

ধ্বন্যাত্মক

শ্রীশঙ্কর গুপ্ত

প্রথমেই জানিয়ে রাখা ভাল যে পিগম্যলিয়নের ডক্টর হিগিন্সের মত ধ্বনিতত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামানর বাতিক আমার নেই। তাই কাউকে আরু বা কুনো (আরো বা কোন) বলতে শুনে তাঁর বাড়ী চব্বিশ পরগণায় কি না জানতে চাই না; কেউ ফাগল (পাগল) বললে তিনি শ্রীহট্টাগত কিনা জানার আগ্রহ থাকে না; কাউকে 'দেখি না যে' বলতে গিয়ে শেষ অক্ষরে ত্রিমাত্রিক স্বর টানতে দেখলে মুর্শিদাবাদ থেকে তাঁর আগমন কি না জানবার জন্যে আমি ব্যাকুল নই; কেউ ক্যানে বা হ'চ্ছে (কেন বা হচ্ছে) বললে তিনি বীরভূমের বীর না বর্দ্ধমানের মান বাড়াচ্ছেন খোঁজ নেবার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার কিছুমাত্র স্পৃহা আমার জাগে না। অর্থাৎ কান বাড়িয়ে লম্বকর্ণ হবার অভিলাষ আমার কুষ্টিতে নেই।

যাঁরা সুকুমার রায়ের বর্ণমালা তত্ত্ব বইখানি পড়েছেন তাঁদের হয়ত মনে আছে সেই বইয়ের বিখ্যাত চিঠিখানি- 'ক্যাবল রামের পত্র'। 'উন্নতিশীলেষু' করে যার আরম্ভ আর তার পরেই তুমি যে আমার কোন পত্র পাও নাই তার কারণ আমি তোমাকে কোন পত্র দিই নাই' ইত্যাদি। ধ্বনি তত্ত্বের সঙ্গে কানের সম্পর্ক নিকট (সব সময় মধুর না হলেও)। ধ্বনিরা তাদের বিশিষ্টতা নিয়ে আমার কানে পশে না তার কারণ এ নয় যে আমি বধির। দেওয়ালেরও কাণ থাকার মত প্রখর বক্রগতি সম্পন্ন না হলেও সাধারণভাবে মোটামুটি শ্রবণ শক্তি আমার আছে।

বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে আমাদের কাণের যে তফাত তা হচ্ছে কিছু শুনলেই আমাদের কিছু বলার বিধি আছে। পদাবলীতে—কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ—কাণে গেলেই কিছু বলার বাধ্য-বাধকতা নেই প্রাণটা একটু আকুল হল ব্যস ফুরিয়ে গেল। (আমাদেরও অন্যভাবে হয়; অন্যমনস্কভাবে পথ চলতে হুস করে পাশ দিয়ে গাড়ী চলে গিয়ে বুক ঢিপ ঢিপ করে); আবার-শ্রবণ কীর্তন ভজন পূজন—ইত্যাদিতে দেখা যাচ্ছে, শুনে তারপর শ্রুত বিষয়টি নিয়েই নাড়াচাড়া—কিন্তু আমাদের তা হবার যো নেই। 'কেমন' শুনতে পেলেই বলতে হবে 'ভাল'। 'টিকিট' শুনলেই পয়সা কণ্ডাক্টারের হাতে দিয়ে বলতে হবে 'গড়িয়াহাটা'।

তাইতেই গোল বাধল। অন্য লোক হলে সেদিন ব্যাপারটা গড়িয়ে বাসের মধ্যে একটা ফাটাফাটি কাণ্ড হয়ে যেত—নেহাত আমার গায় জোর কম তাই আর রক্তারক্তি বাধে নি। মনটা তখন খুব নরম। পি, জি, হাসপাতালে বিকেলে একজন পরিচিত লোককে, যিনি মোটর সাইকেলের ধাক্কায় আহত হয়ে সেখানে রয়েছেন, দেখে

পায়ে পায়ে এলগিন রোড আর চৌরঙ্গীর মোড়ে বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে আছি। একটা বাস এল, উঠলাম এবং বলতে রোমাঞ্চ হয়, বসলাম। বাসটা দক্ষিণগামী। একটু পরেই কণ্ডাক্টার বললেন 'টিকিট'—আমি বললাম 'গড়িয়াহাটা'—বলেই তাঁর হাতে একটি সিকি। কণ্ডাক্টারের পরণে পায়জামা, গায়ে হাত গুটনো (কাজের সুবিধের জন্যেই) ফলদার্ট, পায়ে কাবলী চপ্পল। অঙ্কে বরাবরই কাঁচা, তাই ওদিকটা এড়িয়ে চলি, তবু মনে হল গড়িয়া-হাটার—তুলনায় ভাড়াটা যেন বেশী হয়ে পড়ছে। টিকিট এবং বাকী পয়সা সমেত হাতখানা কণ্ডাক্টারের দিকে মেলে ধরে বললাম, 'এলগিন রোড থেকে গড়িয়াহাটা কত।' কণ্ডাক্টার আমাকে যৎপরোনাস্তি স্তম্ভিত করে বললেন 'এই টিকিট চাইলেন গড়িয়ার আবার এখন বলছেন গড়িয়া-হাটা, কোথায় যাবেন ঠিক করে বলুন।' সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ। গড়িয়াহাটার অর্দ্ধেক ত্যাগ করে গড়িয়া বলতে না পারার কারণ কেবল আমি যে অপণ্ডিত তা নয়, আমার গন্তব্য গড়িয়াহাটা। কণ্ডাক্টার তখনও উত্তরের অপেক্ষায় আছেন। আমি পাড়া গাঁয়ের ছেলে, শহুরে বাসযাত্রীর মত (মানুষে দেখেও শেখে)—চালাকী পেয়েছ জোচ্চর কোথাকার ইত্যাদি বলে হাত গুটিয়ে কণ্ডাক্টারের প্রতি মারমুখী হতে চেয়ে দেখলাম—তাঁর হাত গোটানোই আছে এবং অনাবৃত হাতের মাপ আমার দ্বিগুণ। চকিতে মনে পড়ল ডক্টর হিগিন্সকে। ধন্য শ' কেমন আমায় গড়িয়া আর গড়িয়াহাটার ধ্বনিতাত্ত্বিক ফ্যাসাদে ফেলেছ।

মোলায়েমভাবে কণ্ডাক্টারকে বললাম, 'আপনার বোধ হয় শুনতে ভুল হয়ে থাকবে, আমি গড়িয়াহাটের টিকিটই চেয়েছি।' অভ্যস্ত কর্কশতার পরিবর্তে মোলায়েম কণ্ঠ-স্বর শুনে তিনি এবার—পয়লা রাতেই মারবে বিড়াল নীতি অবলম্বন করলেন। কণ্ঠস্বরে রীতিমত ধমকের ভাব এনে আমায় বললেন, 'আপনারই বলতে ভুল হয়েছে (কি আত্মবিশ্বাস)!' ইচ্ছে হল পরিত্রাহি ঝগড়া করি। সে ইচ্ছে দমন করতে হল। কদিন আগেই পাড়ার নাটকে সুস্পষ্ট উচ্চারণের জন্যেই বিশেষ ভাবে প্রশংসা পেয়েছি—একথাটাও অবান্তর হবে ভেবে বললাম না। বাসের অন্যান্য সহযাত্রীরা তখন প্রস্তুত,—হাওয়া বুঝে যে কোন দিকে ঝুঁকে পড়ার প্রত্যাশায়। তাঁদের নিরাশ হতে হল। হঠাৎ বললাম 'আচ্ছা সে যা হয় হবে এখন, আপনার অনেক কাজ মিনিট দুয়েক সময় দিতে পারেন—একটা ছোট্ট গল্প বলি।' কণ্ডাক্টার একটু হকচকিয়ে গেলেও সেভাব দমন করে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিতেই আমি সেই দার্শনিকের গল্পটা চট করে শুনিয়ে দিলাম।

এক বিখ্যাত দার্শনিক ট্রেণে যাচ্ছেন, এমন সময় চেকার এসে টিকিট দেখতে চেয়েছেন। দার্শনিক আর হাতড়ে হাতড়ে টিকিট খুঁজে পান না। চেকার ইতিমধ্যে দার্শনিককে চিনতে পেরে বলছেন, 'আপনাকে আমি চিনতে পেরেছি আর কষ্ট করে টিকিট খোজার দরকার নেই—আপনি কি আর টিকিট না করে উঠেছেন।' দার্শনিকের কিন্তু ততক্ষণে আরও খোজা বেড়ে গেছে 'ওহে, না হে, তা নয়—তবে কি না—ব্যাপারটা হল কি—ওই টিকিটেই যে লেখা আছে আমায় কোথায় নামতে হবে।'

গল্পটা বলেই কণ্ডাক্টারকে বললাম, 'মশাই আমি দার্শনিক নই, সামান্য লোক; আপনার শুনতে ভুল কিংবা আমার বলতে ভুল কি হয়েছে জানি না—তবে কোথায় আমার গন্তব্য তাও কি আমি জানি না?'

আশ্চর্য মলমের মত ফল পাওয়া গেল। ততক্ষণে ত্রিকোণ পার্ক পেরিয়ে গেছে। নামবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি। কানে সহযাত্রীদের দুয়েকটা মন্তব্য এল—কানে—মানে হয় ভাবলাম আর খানিকটে চললে।

গড়িয়াহাটার মোড়ে নেমে দেখি একটা বাস ষ্টপেজের কাছে পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহনের সংশ্লিষ্ট কর্মচারী দাঁড়িয়ে ষ্টেট-বাসগুলোর দিকে লক্ষ্য করছেন। তাঁকে অবশ্য কেউই লক্ষ্য করছে না কারণ রোজ এমনভাবে তিনি দাঁড়িয়ে নেই।

তোয়াঁ

[গি—দ্যা—মোপাসা হইতে]

অনুবাদক—শ্রীনরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত

বহু নামে পরিচিত, যথা-'তোয়াঁ', 'আহা—আমারটি তোয়াঁ' 'টুর্নভাঁর সেরাটি' 'মোটা তোয়াঁ', অর্থাৎ আন্তোয়া মাসেব্লেকে জানেনা এমন লোক দশ ক্রোশের মধ্যে একটিও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

আ-সমুদ্র বিস্তৃত অধিত্যকাটির প্রায় নিম্ন-তম গহ্বরে এই ক্ষুদ্র গ্রামটি যে চারিদিকে খ্যাতিলাভ করিয়াছে, তাহা শুধু এই তোয়াঁরই জন্য। গ্রামটি সত্যই নগণ্য। বাড়ীগুলি আরো নগণ্য—তাও সর্বসমেত দশ-বারখানির বেশী নয়। সবগুলিই একটি অল্প-প্রশস্ত পরিখা ও কতগুলি বৃহদাকার বৃক্ষের বেষ্টনীর মধ্যে। গ্রামখানি পাহাড়ের বাঁকের নিকটবর্ত্তী ও প্রচুর লতা-গুল্মে ঢাকা, পার্বত্য জল-ধারায় বিদীর্ণ নিম্ন-ভূমির পার্শ্বে অবস্থিত বলিয়াই বোধ হয় ইহার নাম টুর্নভা রাখা হইয়াছে। গ্রীষ্মে তপ্ত রৌদ্রের আগুনের হল্কার মত জ্বালা ও শীতে লবণবাহী সামুদ্রিক ঝঞ্ঝার অন্তর্বিদারী সংঘাত হইতে অব্যাহতি লাভের জন্যই বোধ হয় এই গ্রামের আদিম অধিবাসীরা ঝড়ের মুখে ভয়ার্ত্ত পক্ষীর অনুকরণে বিদীর্ণ জমির অন্তস্থলটির ন্যায় এই আশ্রয় স্থানটি বহু কষ্টে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে।

সমস্ত গ্রামটিই যেন আন্তোয়া মাসেব্লের। সে কিন্তু 'আহা-আমারটি' তোয়াঁ এই নামেই সারা অঞ্চলটিতে সমধিক পরিচিত। মুদ্রা দোষ বা মুদ্রাগুণ হিসাবে 'আহা-আমারটি' এই যুগ্ম শব্দটি সর্বদাই সে প্রয়োগ করিত বলিয়াই তাহার এই উদ্ভট নামটি লোক মুখে প্রচার লাভ করিয়াছে। এই 'আহা-আমারটি' শব্দটির দ্বারা ঢক্কা-নিনাদিত বস্তুটি কিন্তু তাহারই প্রস্তুত সুরা। সেটি সম্বন্ধে তাহারই মুখ দিয়া "আহা-আমারটি, ইহার মতো বস্তু তোমরা সমগ্র ফ্রান্সেও খুঁজে পাবেনা" এই প্রকারের কথা সর্বদাই ঘোষিত হইত। উহারই দ্বারা সে সারা দেশের সন্ধানী লোকদের শুষ্ক মুখ-গহ্বরে দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর ধরিয়া পরমতৃপ্তিকর সুখবারি বরাবর যোগাইয়া আসিয়াছে। পরিবেশনের সময় প্রায়ই সে বোতলটি উর্দ্ধে ধরিয়া বিহ্বল-দৃষ্টিতে সেই দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বলিয়া যাইত—"যাও বৎস! এতে উত্তাপ পাবে দেহে, মাথাটি হবে পরিষ্কার—এক কথায় সমস্ত দেহটা পরকালের মতো ঝর-ঝ'রে হবে। 'আহা আমারটি,'—এর জুড়ি কোথাও কেউ খুঁজে পায়নি, পাবেও না কখনো। চালিয়ে যাও বৎস!"

এই 'বৎস' বলিয়া সবাইকে সম্বোধনটিও তার বাক্য-প্রয়োগের এক নিজস্ব বিশিষ্টতা—যদিও তাহার নিজস্ব বৎস বা সন্তান একটিও জন্ম-গ্রহণ করে নাই।

এ তল্লাটে, এমনকি সারা প্রদেশটির মধ্যে স্থূলতম কলেবরের অধিকারী বৃদ্ধ তোয়াঁ সকলেরই কাছে অত্যন্ত সুপরিচিত। এই সু-বৃহৎ বপুটির তুলনায় ক্ষুদ্রাকার সুরা-খানাটি খুবই হাস্যকর মনে হইত। দিনের অধিকাংশ সময়ই তাহার কাটিত ঐ ঘরখানির দ্বার দেশে বা উহার ভিতরে আনা-গোনা করিয়া। দেখিয়া লোকের খুবই কৌতুহল হইত, কি করিয়া ঐ বিরাট কলেবর লইয়া লোকটি ঐ ক্ষুদ্র ঘরটিতে যাতায়াত করে! অথচ লোক আসিলে প্রতিবারই তাহাকে ঘরটির ভিতরে প্রবেশ করিতে হইত। ইহার আর একটি বিশেষ কারণ এই যে, 'আহা-

আমারটি' তোয়াঁর সাথে অন্ততঃ এক পেগ আস্বাদন না করিতে পারিলে কোন গ্রাহকই পরিতৃপ্ত হইত না। তাই ইহা যেন তাহার এক ন্যায্য অধিকারে দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

তাহার সুরাখানাটির সম্মুখে লম্বিত থাকিত বড় হরফে "সুবন্ধুর আড্ডা" লেখা একখানা নাতি-ক্ষুদ্র কাষ্ঠ-ফলক। নামটি কিন্তু মোটেই নিরর্থক নয়। কারণ, বদ্ধ তোয়াঁ নিঃসংশয়ে এ অঞ্চলের সকলেরই সু-বন্ধু। সুরার সাথে তাহার খোস-গল্পও বহু দূর পর্য্যন্ত প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। তাই দূর গ্রাম হইতেও লোকের পর লোক তাহার সুরা ও তৎসঙ্গে তাহার সহিত খোস-গল্প উপভোগ করিবার নেশায় সর্বদাই সেথায় সমবেত হইত। এই উদার, সু-স্বভাব, সদানন্দ লোকটি তার গল্পের ভাষা ও ভঙ্গীতে কবরেও হাসির ফোয়ারা ছুটাইতে পারিত। কাহাকেও এতটুকু ক্ষুণ্ণ না করিয়া হাসিঠাট্টা জমানটাও ছিল তার চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য। ভাষায় প্রকাশের অতীত ভাবটিও সে আঁখির ইসারায় অতি সুন্দর ফুটাইয়া তুলিত। ইহা ছাড়া তাহার সুরা পানের ভঙ্গীটিও ছিল অতি অপূর্ব। দুষ্টামি-ভরা চক্ষুদুটিতে পরিপূর্ণ আনন্দের উচ্ছ্বাস আনিয়া সে পর পর প্রত্যেক সুবন্ধুর দেওয়া প্রতিটি সুরাপাত্র নির্বিকারে নিঃশেষ করিয়া যাইত। তাহার এই অতি-আনন্দের উৎসটি উদ্ভূত হইত দুইটি বিভিন্ন ভাব-ধারার সংমিশ্রণ হইতে। মুখ্যতঃ সুরাপানের রঙ্গিণ নেশা এবং গৌণত, সুবন্ধুদের নিকট হইতে উপার্জ্জিত মুদ্রাগুলির দৈনন্দিন সমাবেশজনিত আর্থিক সচ্ছলতাটির সুখানুভূতি হইতে।

দুষ্ট লোকেরা ভাবিয়া অবাক হইত, কেন এই সদানন্দ পুরুষটির কোনো সন্তানাদি মোটে জন্মে নাই। একদিন উহারা এই বিষয়টির উল্লেখ করিয়া তাহাকে খোলাখুলি প্রশ্নই করিয়া বসিল। চক্ষু দুটি ঈষৎ বাঁকাইয়া, তাহাতে বেশ একটু দুষ্টামির রেশ টানিয়া তোয়াঁ তৎক্ষণাৎ জবাব দিল—"আমার মতো সুপুরুষকে আকৃষ্ট ক'রবার মতো স্ত্রী যে বিধাতা দেন নি আমায়!"

তোয়াঁর সহিত তাহার অর্ধাঙ্গিনীর অবিরাম সংঘাত সু-বন্ধুগণ তাহার দেশ-বিশ্রুত সুরা সহযোগে, উহাদের বিবাহিত জীবনের ত্রিশটি বৎসর ধরিয়া প্রতিদিন উপভোগ করিয়া আসিতেছে। এই চিরাচরিত দ্বন্দ্বে তাহার স্ত্রী ক্রোধে প্রচণ্ডা মূর্ত্তিধারণ করিলেও, তোয়াঁ কিন্তু সর্বক্ষণ উহা অতি প্রশান্ত মনে গ্রহণ করিত।

ভূতপূর্ব কৃষক-কন্যা তাহার এই পত্নীটির চলনের পাদক্ষেপ ও ভঙ্গীতে দ্রষ্টাদের মনে দীর্ঘ-পাদ পক্ষী বিশেষের কথাই মনে করাইয়া দিত। স্বল্প-প্রস্থ, সুদীর্ঘ, শীর্ণ দেহ-কাণ্ডটির উপরিভাগে তাহার কদাকার মুখখানি দেখাইত অনেকটা পেচকেরই মত। দিনের অধিকাংশ সময়ই তাহার কাটিত সুরাখানার পশ্চাতের আঙ্গিনাটিতে। সেখানে সে তাহার কুক্কুট-বাহিনীর পরিচর্য্যায় ব্যাপৃত থাকিত। মোরগ ও মুরগীগুলির কলেবর বৃদ্ধি সাধনে সে যথেষ্ট সুনাম ও সত্যসত্যই অশেষ নিপুণতা অর্জন করিয়াছিল। আনুসাঙ্গিকভাবে তাহার কুক্কুট-মাংস রন্ধনের নৈপুণ্যও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দূর সহরের অভিজাত-বংশীয় কোনো মহিলা তাঁহার মান্য-অতিথিদের সম্বর্দ্ধনায় ভোজের আয়োজন করিলে. উহার সাফল্য নির্ভর করিত তোয়াঁ-ঘরণীর আঙ্গিনার উৎকৃষ্ট কুক্কুট-মাংসের উপর।

কিন্তু এই মহিলাটির জন্মই হইয়াছিল বোধহয় এক অতি বিশ্রী রুক্ষ মেজাজ সঙ্গে করিয়া। তাই বোধহয়, সব কিছুতেই এক চরম অসন্তুষ্টিও ভাব-ধারায় কাটিয়াছে তাহার দীর্ঘ জীবনের প্রতিটি দিন। সবার উপরই এক বিজাতীয় ক্রোধ ও বৈরীতার ভাব তাহার প্রতিকার্য্য ও আচরণে প্রকাশ পাইত, বিশেষতঃ তাহার বেচারা স্বামীটির উপর। তাহার সদানন্দ ভাব, জন-প্রিয়তা, বিপুল কলেবর ও অটুট স্বাস্থ্য—এ-সবগুলিই তাহার কল্যাণীয়া স্ত্রীটির চরম চক্ষু-শূল ও তাহার অন্তর্দগ্ধী ঠাট্টার বিষয়-বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। স্বামীটি বিশেষ পরিশ্রম না করিয়া প্রচুর অর্থ ও সুনাম অর্জন করিলেও দশজনার খাদ্য একাই ভোজন করিত বলিয়া প্রতিদিনই স্ত্রী বলিয়া যাইত—"উচিত তোমাকে শূয়োরের খাটালে উলঙ্গ জানোয়ার-গুলির সাথে বেঁধে রাখা। তোমার আকৃতি ও প্রকৃতি এ দুয়ের সাথে সেটাই হুবহু খাপ খায়। আহা! কি আকৃতি! যেন চর্বির বোঝা একটা! দেখ্‌লেও যেন গা ঘাকার করে! ও নিয়ে আবার ঢং ক'রে বেড়ানো! সবুর করো—ও চর্বির বোঝাটা ধানভরা পুরোনো বস্তার মতো ফেটে প'ড়বে" শুনিয়া তোয়াঁ কিন্তু হাসিয়া লুটাইয়া পড়িত। হাসির আন্দোলনে তাহাকে

দেখাইত যেন একটি সুবৃহৎ জেলির পাত্রেরই মত। বিরাট উদরে চপেটাঘাত করিতে করিতে সে সোল্লাসে বলিয়া উঠিত—"কিন্তু গিন্নি! শত চেষ্টা ক'রেও তোমার মোরগগুলিকে এতো মোটা-সোটা ক'রে তুলতে পারবে কি তুমি?"

শুনিয়া, সমবেত সু-বন্ধুরা টেবিলে আঘাত করিয়া, হাত-পা ছুঁড়িয়া—এমন কি মেঝেতে নিষ্ঠিবন নিক্ষেপ করিয়া হাসির বেগে লুটাইয়া পড়িত।

তাহাতে গিন্নীর ক্রোধ চরমে পৌঁছিত। তারস্বরে চীৎকার করিয়া বলিয়া যাইত সে—"দেখে নিও, কি ঘটে তোমাদের সাধের 'আগা-আমারটি' তোয়াঁর,—পুরোনো ধানের বস্তার মতোই ফেটে প'ড়বে।"

সুরা-সেবী সু-বন্ধুদের যুক্ত অট্টহাসির বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া পেচক-বদনী ক্রোধে উন্মাদিনীর ন্যায় ঝটিকা-বেগে ঘর হইতে সরোষে প্রস্থান করিত।

তোয়াঁর অতি স্থূল ও পাকা আপেলের ন্যায় লাল বিরাট বপুটি দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসে আন্দোলিত হইয়া অতি অপূর্ব দেখাইত। এইরূপ অতিকায় কিম্ভুত-কিমাকার মানুষের হাসি, ঠাট্টা, উল্লাস, অদ্ভুত হাব-ভাব ও দম্ভোক্তি দেখিয়া গুরু-গম্ভীর যমরাজ ও বিয়োগান্ত কিন্তু আপাততঃ হাস্য-রসাত্মক প্রহসনটি কিছুদিন উপভোগ করিবার জন্যই বোধহয় ইহাদের অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর গতিটি ইচ্ছা করিয়াই মন্দীভূত করিয়া দেন। আর সেজন্যই বোধহয়, বার্দ্ধক্যের চির-সঙ্গী, পক্ক-কেশ, লোল-চর্ম ও জরার অতি দৌর্বল্যের করুণ দৃশ্যের পরিবর্তে তোয়াঁর শরীরের ক্রম-বর্দ্ধমান স্থূলতা, অটুট স্বাস্থ্যের সব লক্ষণ, মুখমণ্ডলে রক্তোচ্ছ্বাস ও তৎসঙ্গে তাহার হাসি, ঠাট্টা, তামাসা, পূর্ণ ভাবে বিদ্যমান থাকিয়া সবারই মনে প্রচুর আনন্দ যোগাইত।

সরোষে ও ক্ষিপ্রহস্তে আঙ্গিনার কুক্কুট-কুলের মধ্যে তণ্ডুল-কণা ছিটাইতে ছিটাইতে তোয়াঁ-ঘরণী চিৎকার করিয়া বলিয়া যাইত—"রোসো না, দেখবে কি হয়! বেশী-দিন আর অপেক্ষা ক'রতে হবে না। তোয়াঁ তোমাদের ধানের পুরোনো বস্তার মতোই ফেটে প'ড়বে।"

কল্যাণীয়া ঘরণীর মনস্কামনা শীঘ্রই আংশিক ফলিয়া গেল। সত্য সত্যই এক দিন তোয়াঁ পক্ষাঘাতের দারুণ আক্রমণে ভূ-পতিত হইল। সু-বন্ধুগণের সমবেত চেষ্টায় তাহার বিশাল বপুটিকে কোনোমতে সুরা খানার পার্শ্বের ছোট কামরাটিতে স্থানান্তরিত করা সম্ভব হইল। সেখানেই তাহাকে শয্যায় শোয়াইয়া দেওয়া হইল—যাহাতে দেয়ালের আড়াল হইলেও সু-বন্ধুদের সাথে আলাপ আলোচনার কোনো বাধা না জন্মায়। সকলেই ভাবিয়াছিল অল্প দিনেই অসীম শক্তিশালী তার অঙ্গগুলি অন্ততঃ কিছু শক্তি পুনরায় ফিরিয়া পাইবে। তাহা দুরাশায় পরিণত হইল। তাহার দেহের অধিকাংশ অঙ্গগুলি চালনা-শক্তি হারাইলেও মস্তিষ্কের বৃত্তিগুলি কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ স্বাভাবিকই ছিল। রাত্রি দিন তাহাকে শয্যাশায়ী হইয়াই থাকিতে হইত। সপ্তাহ অন্তে কয়েকজন সু-বন্ধু মিলিয়া বহুকষ্টে তাহাকে শয্যার উপর শূন্যে তুলিয়া ধরিত আর সেই অবসরে তাহার স্ত্রী গঞ্জনা দিতে দিতে তাহার বিছানাটি কোন মতে বদলাইয়া দিত। স্বাভাবিক প্রফুল্লতা তাহার বজায় থাকিলেও, একটু সঙ্কোচ, কিছু বিনয়ের ভাব, আর স্ত্রীর সম্মুখে একটি করুণ ভীতির আবেশ তাহাকে অভিভূত করিয়া রাখিত। কারণ তাহার স্ত্রীটি এ অবস্থার মধ্যেও তাহাকে 'চরম কদাকার,' 'পরম নিষ্কর্ম' 'উদর-সর্বস্ব প্রভৃতি বিশেষণ যুক্ত বাক্যবাণে সর্বদাই জর্জরিত করিত। উহা কিন্তু তোয়াঁ নীরবে সহ্য করিত। চরমে উঠিলেই শুধু পত্নীর দৃষ্টির অগোচরে তাহার প্রতি একটি বিকৃত মুখভঙ্গী করিয়া ও তাহার আয়ত্তাধীনে এক মাত্র ক্রিয়া, এ-দিক, ও-দিক অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ দিকে পার্শ্ব পরিবর্ত্তনের দ্বারা তাহার মৌন প্রতিবাদ জাগাইয়া দিত। এই দুই দিকে পার্শ্ব পরিবর্ত্তনকে সে সু-বন্ধুদের কাছে রসাইয়া উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ বলিয়া অভিহিত করিত।

এই দুরবস্থার প্রথম পর্বে তাহার একমাত্র আনন্দ দাঁড়াইল, সুরাখানার সু-বন্ধুদের আলাপ-আলোচনা সুমনোযোগে শোনা ও ইচ্ছামত তাহাতে সোল্লাসে যোগদান করা। কোনো অন্তরঙ্গের সাড়া পাইলেই সে সোৎসাহে হাঁক দিত, যথা—"কে বৎস, সেলেস্ত্যাঁ না?"

সেলেস্ত্যাঁ জবাব দিত—"ঠিক বলেছ। তা তোমার গতরটি কেমন চ'লছে গো, বাবাঠাকুর?

"টগ-বগিয়ে চ'লছেনা, তবু রোগাও হচ্ছি না কিন্তু। ভেতরে মাল-মশলা ভালোই ছিল কিনা!" তোয়াঁ জবাব দিত।

পারে—

ফটো : আনন্দ মুখোপাধ্যায়

ফটো : আনন্দ মুখোপাধ্যায়
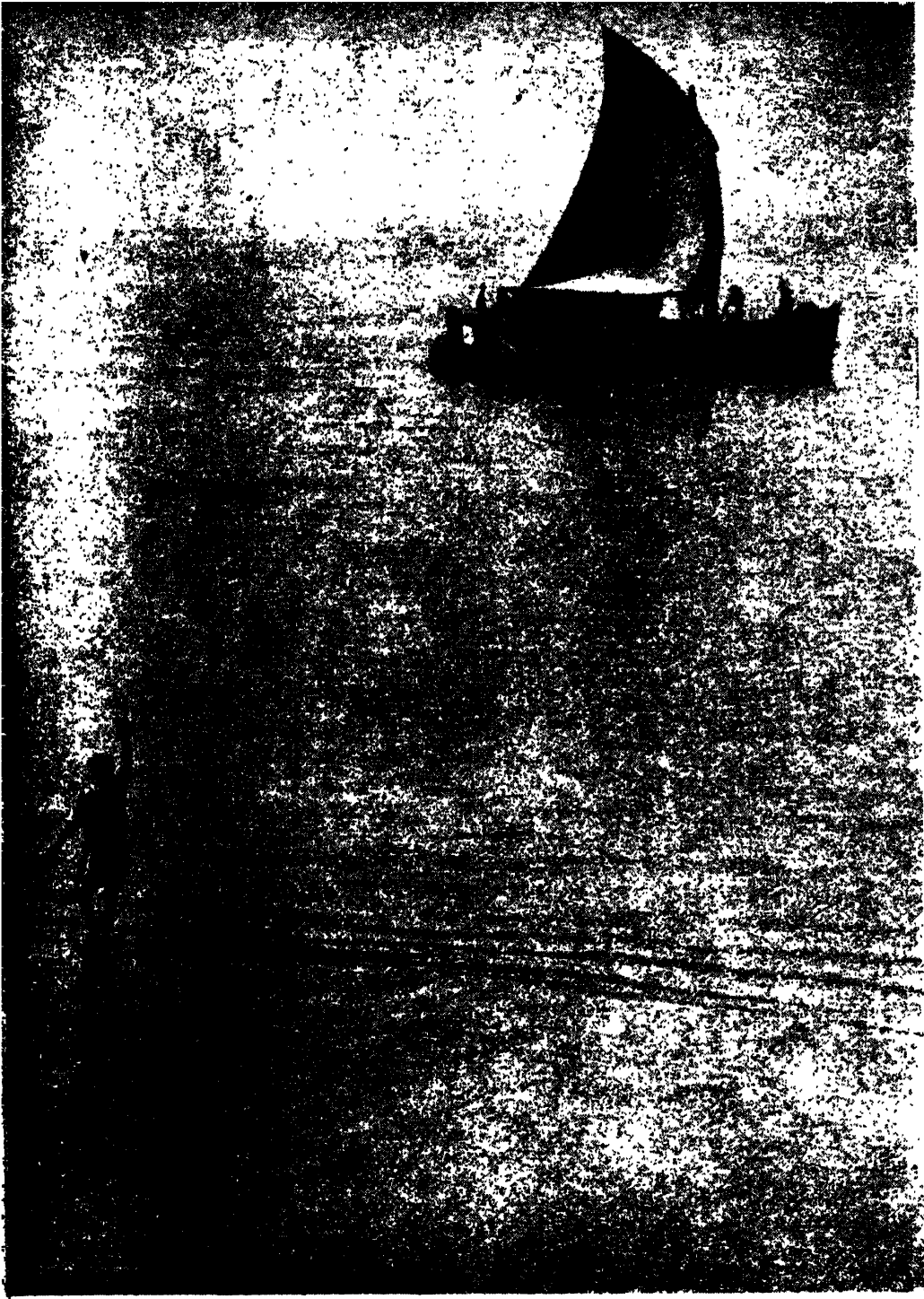
ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

ক্রমে, গভীরতর সাহচর্য্যের জন্য তোয়াঁ অন্তরঙ্গদের নিজ কক্ষে আমন্ত্রণ করিয়া আনিতে লাগিল। কারণ, তাহার সাহচর্য্য বিনা উহাদের সুরা-সেবায় স্পষ্ট এক নিরানন্দের ভাব লক্ষ্য করে মনে মনে যে খুবই দুঃখ পাইত। মুখে কিন্তু সে প্রকাশ করিল—"তোমাদের সাথে পান না করতে পারাটাই আমার একটা গভীর দুঃখের কারণ দাঁড়িয়েছে। সব আমি সইতে পারি, কিন্তু বৎস তোমাদের সাথে পানানন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়াটা সত্যিই আমি একদম্ সইতে পাচ্ছি না।"

অমনি পেচক-বদনী প্রিয়াটি তাহার জানলার বাহিরে দাঁড়াইয়া গর্জন করিয়া উঠিল—"দ্যাখো মিনসের রকমটা। নিষ্কর্মার ঢেঁকি—গিলিয়ে, পুছিয়ে, আঁচিয়ে দিতে হয় শুয়োরের মতো—তবুও রঙ্গ দ্যাখো! যমের অরুচি কোথাকার!"

সে অন্তর্হিত হ'লে তারই লালবর্ণের বড় মোরগটি সেই জানালাটির উপর উঠিয়া কৌতুহলপূর্ণ দৃষ্টিতে ঘরের চতুর্দিক একটিবার নিরীক্ষণ করিয়া কর্ণ-পটাহ ভেদী এক চিৎকার হানিল। সাথে সাথেই দুই তিনটি মুরগী সহ ঝটিকা বেগে সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া খাদ্যাবশেষ রুটির টুকরা গুলির সদ্ব্যবহার সুরু করিয়া দিল।

'আহা-আমারটি' তোয়াঁর সু-বন্ধুগণ ক্রমশঃ সুরাখানা ত্যাগ করিয়া প্রতি অপরাহ্নে অতিকায় বন্ধুটির শয্যার চারিদিক ঘিরিয়া আড্ডা জমাইতে আরম্ভ করিল। শয্যায় শুইয়া শুইয়া উদ্ভট তোয়াঁ তাহাদের স্ফুর্ত্তি ঠিক চিরাচরিত প্রথায় যোগাইয়া যাইতে লাগিল। সদানন্দ ঐ লোকটি এর শয়তানের মুখেও হাসি ফুটাইতে পারিত। অন্তরঙ্গদের মধ্যে তার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ ছিল তিন জনা—সেলেস্ত্যাঁ মাল্ওয়াজেল, প্রস্পার হর্স্লাভো ও সেজ্যায়ের পমেল। তাহারা নিয়মিতভাবে প্রতিদিন বেলা দুইটায় তোয়াঁর শয্যা-পার্শ্বে উপস্থিত হইত এবং বোর্ড ও ঘুঁটি টানিয়া আনিয়া ছয়টা অবধি বন্ধুর সহিত ডোমিনো খেলায় মাতিয়া থাকিত। কিন্তু শীঘ্রই ইহাতে তোয়াঁ-বরণীর প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া সুরু হইয়া গেল। স্বামী তার শুইয়া শুইয়াও খেলায় মত্ত থাকিবে—ইহা সে কোনো মতেই বরদাস্ত করিতে পারিল না। তাই একদিন সে ক্রোধে প্রচণ্ডা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ঝটিকা-বেগে ঘরে অবতীর্ণ হইল এবং ক্ষিপ্রহস্তে বোর্ডটি উল্টাইয়া দিয়া ঘুঁটিগুলি হস্তগত করিল। তাহার পর কর্কশ ভাষায় চীৎকার করিয়া শুনাইয়া দিল—শয্যাশায়ী হইয়া যাহাকে গিলিতে হয়, তার পক্ষে নিজের চিত্ত-বিনোদনের জন্য কাজের লোকদের বহু-মূল্য সময় ধ্বংস করা নষ্টামির চূড়ান্ত!

সেলেস্ত্যাঁ সেই ক্রোধ ঝটিকার দাপটে মাথা নীচু করিয়া থাকিত। প্রস্পার কিন্তু উহাতে ইন্ধন যোগাইয়া সৃষ্ট অবস্থাটি গম্ভীরভাবে পূর্ণ উপভোগ করিত।

একদিন এইরূপে অবস্থাটি চরমে উঠিলে প্রস্পার গৃহিণীকে বলিল—"দেখুন গিন্নী ঠাকরুন, নিকর্ম্মা লোকটিকে শুধু গাদা গাদা খাইয়েই যাচ্ছেন—পাচ্ছেন না কিছুই। একি কম পরিতাপের কথা? আপনার মতো অবস্থায় পড়লে, আমি কি করতাম জানেন?"

প্রস্তাবটি জানিবার আগ্রহে তোয়াঁ-বরণী থামিয়া পেচক দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইল।

প্রস্পার বলিয়া যাইতে লাগিল—"দিবা-রাত্রি বিছানার ওপর ঐ বিশাল বপুটি নাগাড় প'ড়ে আছে। তাতে আপনার স্বামীটি প্রায় একটা উনুনের উত্তাপ দেহে সঞ্চিত করে রেখেছেন। সে উত্তাপটি কিন্তু আমি বৃথা নষ্ট হ'তে কক্ষণো দিতাম না। অতি অবশ্য সেটা ডিমে তা' দেবার কাজে লাগিয়ে দিতাম।

এই উদ্ভট প্রস্তাবে হত-বুদ্ধি হইয়া বৃদ্ধা বুঝিতে পারিল না, ইহা একটি নিছক ঠাট্টা কিনা। তাই সে বিহ্বল দৃষ্টিতে প্রস্পারের দিকে তাকাইয়া রহিল।

প্রস্পার আরো জোরের সহিত বলিয়া যাইতে লাগিল—"হলদে মুরগীটার পেটের তলায় না বসিয়ে পাঁচটি করে টাট্কা ডিম আমি তোয়াঁর দুই বিপুল বগলের তলায় বিছানার গরমে রেখে দিতাম। তারপর যথাসময়ে ওগুলি ফুটলে স্বামীর বাচ্চাগুলিকে মানুষ করে তুলবার জন্যে হলুদে মুরগীটির পেছনে ছেড়ে দিতাম। বুঝলেন, গিন্নী ঠাকরুণ?"

বিস্মিত হইয়া বৃদ্ধা বলিয়া উঠিল—"তাও হয় নাকি?"

উৎসাহভরে প্রস্পার উত্তর করিল—"কেন হবে না গরম বাক্সের কৃত্রিম উত্তাপে ডিম ফোটাবার একটি পদ্ধতি আছে, জানেন ত? তার বদলে গরম বিছানা আর বিপুল বগলের যুক্ত উত্তাপে যে ফুটবে না ডিম, তার কোনো হেতু থাকতে পারে না।"

প্রস্তাবটির যৌক্তিকতা কিন্তু বৃদ্ধা অস্বীকার করিতে পারিল না। তাই একটা শান্ত ও চিন্তা-ব্যঞ্জক ভাব লইয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অল্প দিন পরেই তোয়াঁ-গৃহিণী একটি ক্ষুদ্র পেটিকা হস্তে স্বামী সম্ভাষণে আসিয়া কড়া হুকুমের স্বরে তাকে বলিল—"শোন। এই মাত্র আমি হল্‌দে মুরগীটিকে দশটা ডিম দিয়ে বসিয়ে আস্‌ছি। আর এই দশটা তোমার জন্যে নিয়ে এলাম। হুঁসিয়ার, একটিও যেন না ভাঙ্গে।"

বিস্মিত হইয়া তোয়াঁ জিজ্ঞাসা করিল—"কি চাইছ তুমি?"

"আমি চাই, এ-গুলো তুমি তোমার বগলের নীচে তা দিয়ে ফোটাবে। নিষ্কর্মার ঢেঁকি, এটুকুও তুমি করবে না, না কি?"

তোয়াঁ প্রথমে হাসিয়া ফেলিল। তাহার পর গৃহিণী রীতিমত জিদ ধরিলে সে চটিয়া উঠিল এবং তা দিবার জন্য ডিমগুলি তাহার বাহুদ্বয়ের নীচে স্থাপনের প্রচেষ্টায় দৃঢ়তার সহিত বাধা দিল।

পরাস্ত হইয়া গৃহিণী ক্রোধে অগ্নি-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দৃঢ়তার সহিত সদম্ভে রায় দিলেন—"বেশ দেখি কতো জেদ তোমার। ডিমগুলি না নিলে কণামাত্র খাবারও জুটবে না তোমার—বলে দিচ্ছি" এবং তৎক্ষণাৎ সরোষে প্রস্থান করিল।

দারুণ অস্বস্তিকর অবস্থায় তোয়াঁ পড়িল। বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত নীরবে থাকিয়া সে চীৎকার করিয়া স্ত্রীকে আহ্বান করিল। রান্নাঘর হইতে হুঙ্কার আসিল—"কুড়ের বাদশা! আজ তোমার খাবার জুটবে না—জেনে রেখো।"

প্রথমে তোয়াঁ মনে করিল, স্ত্রী তাহার সহিত রহস্য করিতেছে। ক্রমে তাহার সঙ্কল্প অটুট বুঝিতে পারিয়া সে পর পর অনুনয়, প্রার্থনা, ভৎর্সনা ও ক্রোধে পর্য্যায়ক্রমে 'উত্তরায়ণ' ও 'দক্ষিণায়ন' করিয়া অবশেষে রান্নাঘর হইতে নিস্ক্রান্ত খাদ্য দ্রব্যের সুগন্ধে তীব্রতর ক্ষুধার তাড়নায় উন্মাদের মত দেয়ালে পুনঃ পুনঃ মুষ্ট্যাঘাতে নিস্তেজ হইয়া পড়িল। সেই সুযোগে তাহার প্রিয়তমা ঘরণী বিনা বাধায় দশটি ডিম তাহার বিপুল বাহুদ্বয়ের নিম্নে স্থাপন করিয়া প্রস্থান করিল।

সু-বন্ধুগন যথাসময়ে সেথায় উপস্থিত হইয়া তোয়াঁকে আড়ষ্টভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া ভাবিল, বুঝি তাহার অসুস্থতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ডোমিনোর বোর্ড ও ঘুটি সেখানে দেখিয়া তোয়াঁকে অন্যমনস্ক করিবার জন্য তাহারা খেলা সুরু করিয়া দিল। আজ আর গৃহিণী বাধা দিল না। কিন্তু তোয়াঁর একটি দারুণ অস্বস্তি ও সাবধানী ভাব লক্ষ্য করিয়া তাহারা বুঝিল, ইহার বিশেষ কোনো একটা কারণ নিশ্চয় ঘটিয়াছে।

প্রস্পার তাই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"কিগো, তোমার হাতটা কি কেউ বেঁধে রেখেছে বাবাঠাকুর?"

ক্ষীণকণ্ঠে তোয়াঁ উত্তর দিল—"না গো, কাঁধটা কেন যেন খুবই ভারি ভারি ঠেক্‌ছে।"

সহসা পাশের সুরাখানায় কয়েকজনার পদার্পণের শব্দে ক্রীড়ারতদের মন সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। তাহারা বুঝিল সেই অঞ্চলের নগরপাল ও তাহার সহকারী সুরাপান করিতে করিতে দেশের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতেছেন। তাহাদের মৃদু কথোপকথন অনুসরণ করিবার চেষ্টায় তোয়াঁ ডিমগুলির কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া দেয়ালে কর্ণ স্থাপনের উদ্দেশ্যে সবেগে 'উত্তরায়ণ' করিলে তাহার শরীরের চাপে সে দিকের ডিম পাঁচটি পেষিত হইয়া আমলেটের উপাদানে রূপান্তরিত হইল। সঙ্গে সঙ্গেই ক্রোধ ও বিরক্তিতে সে স্ত্রীকে গালি দিয়া উঠিল। আর কোথায় যায়? সঙ্গে সঙ্গেই তার কল্যাণীয়া ঘরণী এক লম্ফে সোফায় অবতীর্ণ হইল ও দুর্ঘটনাটি আন্দাজ করিয়া লইয়া সত্বর স্বামীর বাহুর আড়াল উন্মোচন করিয়া ফেলিল। তাহার গ্রীবার নীচে হরিদ্রা বর্ণ বস্তুটি লক্ষ্য করিয়া ক্ষণকাল স্তব্ধ ও বাক্ রহিত থাকিয়া তাহার বিরাট কলেবরের উপর দানবীয় ক্রোধে মুষ্ট্যাঘাত সুরু করিয়া দিল। আর সে কি মুষ্ট্যাঘাত! ঢাকের উপর ঢাকীর মুহুর্মুহু অবিশ্রান্ত সজোর আঘাত বর্ষণেরই মত।

সু-বন্ধুগণ হাসিয়া, কাশিয়া, হাঁচিয়া এবং চীৎকার করিয়া লুটাইয়া পড়িতে লাগিল। ওদিকে তোয়াঁ অপর পার্শ্বের ডিমগুলি বাঁচাইয়া অতি সন্তর্পণে আঘাতের প্রতিরোধ করিতে লাগিল।

(৩)

তোয়াঁ পরাজিত হইল। ডিম্ব মোক্ষণের প্রয়াসে বাধ্য করা হইল তাহাকে। কারণ একটিও ডিমের অপঘাতের লঘু পাপ ঘটিলে আহার-চ্যুতির গুরুদণ্ড তাহাকে অবশ্যই

ভোগ করিতে হইবে—এই কঠোর রায় তাহার ঘরণী সুস্পষ্ট ভাষায় তাহাকে জানাইয়া দিয়াছিল। সে সতত উর্দ্ধমুখ এবং বাহুদ্বয় পক্ষীর ন্যায় বিস্তৃত করিয়া শুভ্র ডিমগুলিতে নিহিত ভাবী কুক্কুট-শাবকদের শুভ আবির্ভাবের পথ সুগম করিবার জন্য বিহ্বলদৃষ্টিতে স্থানুর ন্যায় পড়িয়া থাকিত। কথা সে কহিত—কিন্তু অতি ক্ষীণ কণ্ঠে—যেন অশ্ব চালনার ন্যায় শব্দ সৃষ্টির বেগেও তাহার আরব্ধ কার্য্যে বাধা জন্মিবে। তাহার গৃহিণীর কাজ হইল—তাহার বিছানায় ও আঙ্গিনার ঝুড়িতে ন্যস্ত ভাবী শাবকগুলির জন্য চিন্তাকুল চিত্তে ছুটাছুটি করিয়া একবার তাহাকে এবং পরক্ষণেই হরিদ্রাবর্ণের মুরগীটিকে পর্য্যবেক্ষণ করা। এই অদ্ভুত প্রক্রিয়াটির কথা গ্রামে প্রকাশ হইয়া গেলে দলে দলে লোক প্রত্যহই প্রকৃত আগ্রহের সাথে তোয়াঁর খবর লইতে আসিত। রোগীর খবর লইবার রীতি অনুযায়ী সকলেই পা টিপিয়া টিপিয়া তাহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিত—"কেমন আছ তোয়াঁ?"

সে উত্তর করিত—"যেমন দেখছো। কিন্তু আর পাচ্ছিনা আমি। দীর্ঘ অপেক্ষায় খুবই ক্লান্ত বোধ কচ্ছি। একটা ঠাণ্ডা ঢেউ যেন আমার সারা শরীরের চাম্ড়ার ভেতর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চল্‌ছে।"

একদিন প্রাতে গর্ব্ব ও উল্লাসের একটি মিশ্র ভাব প্রকট করিয়া তোয়াঁ গৃহিণী স্বামীর কাছে আসিয়া বলিল—"হল্‌দে মুরগীটা কিন্তু সাতটা বাচ্ছা ফুটিয়েছে। বাকী তিনটা ডিম তার খারাপই ছিল বোধ হয়।"

তোয়াঁর হৃদয়ে মৃদু কম্পন অনুভূত হইল। সে কয়টি ফুটাইবে?

"শীগ্‌গির হবে কি?" ভয়ে ভয়ে তোয়াঁ জিজ্ঞাসা করিল।

সাফল্যে সংশয়ের ভীতিজর্জরিতা বৃদ্ধা ক্রোধভরে উত্তর করিল—"আশা ত কচ্ছি।" তোয়াঁ অপেক্ষায় রহিল।

সু-বন্ধুগণ তোয়াঁর আসন্ন কালটির অপেক্ষায় রীতিমত চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহারা সর্বদাই সেথায় উপস্থিত হইয়া ইহারই আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিত ও মাঝে মাঝে গ্রামের লোকদের কাছে টাটকা খবর পরিবেশন করিয়া তাহাদের কৌতুহল চরিতার্থ করিত।

সে-দিন তিনটার সময় তোয়াঁ তন্দ্রায় ঢলিয়া পড়িল। নিদ্রা তার বড় একটা হয় না! হঠাৎ সে তাহার বাহুর নিম্নে অদ্ভুত এক মৃদু স্পন্দন অনুভব করিয়া জাগিয়া উঠিল। অতি সাবধানে সেই স্থানে হাত দিয়া হরিদ্রাবর্ণ পিচ্ছল বস্তু-মণ্ডিত ছোট একটি প্রাণীকে ধরিয়া ফেলিল। উহা তাহার আঙ্গুলির ফাঁক দিয়া মুক্তির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা সুরু করিয়া দিল। ভাবের আতিশয্যে তোয়াঁ একটিবার চিৎকার করিয়া উঠিয়া উহাকে মুক্তি দিল। ছাড়া পাইয়া উহা তাহার বক্ষের উপর দিয়া ছুটিল। সুরাখানা হইতে সব লোক ছুটিয়া আসিয়া দেখিল যে তাহাদের পূর্ব্বেই তোয়াঁ-গৃহিণী স্বামীর শ্মশ্রু রাশির মধ্যে আশ্রয় প্রয়াসী ক্ষুদ্র জীবটিকে আয়ত্বাধীন করিতেছে। সবাই বিস্ময়ে হতবাক্। তখন এপ্রিল মাস। ঘরের সব জানলাগুলিই খোলা। তাহার ভিতর দিয়া হরিদ্রাবর্ণের মুরগীটির স-কলরবে শাবক-সম্ভাষণ স্পষ্টই শোনা যাইতেছিল। ভাবের আবেশে ঘর্ম্মাক্ত ও চিন্তাকুল তোয়াঁ বলিয়া উঠিল—"এই যে আমার বাঁ হাতের নীচে কি আরো যেন একটা টের পাচ্ছি!"

তাহার স্ত্রী অভিজ্ঞা ধাত্রীর ন্যায় নিপুণ হস্তখানি স্বামীর বিশাল বাহুর নিম্নে অতি সন্তর্পণে প্রবেশ করাইয়া আর একটি শাবক বাহির করিয়া আনিল!

প্রতিবেশীগণ উহা লইয়া ভাল করিয়া দেখিবার জন্য পরস্পরের হস্তে পর পর দিতে লাগিল। সকলেই এক অদ্ভুত সংঘটনের মত শাবকটিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টার ব্যাকুল প্রতীক্ষার পর আর চারিটি শাবকের যুগপৎ জন্মলাভ হইল। দর্শকগণের মধ্যে এই আবির্ভাব তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি করিল। এরূপ অপরূপ দৃশ্য কে কবে দেখিয়াছে আর?

"ছ'টি হ'ল তা হ'লে" তোয়াঁ বলিল, "কিন্তু এদের নামকরণ ত চাই।"

সবাই হাসিয়া উঠিল। আরো লোক সেথায় আসিয়া জুটিতে লাগিল। স্থানাভাবে তাহারা দরজা জানলার ভিতর দিয়া গ্রীবা বাঁকাইয়া অতি কষ্টে কৌতুহল চরিতার্থ করিতে লাগিল।

"কটি হ'ল তোয়াঁর?" তাহারা জিজ্ঞাসা করিল।

"ছ'টি।"

তোয়াঁ-ঘরণী শাবকগুলি লইয়া হরিদ্রাবর্ণের মুরগীটির

জিম্মায় অর্পণ করিল। সে পক্ষদ্বয় আরো বিস্তৃত করিয়া ক্রম-বর্দ্ধিত-সংখ্য শাবকগুলিকে আনন্দ কোলাহলের সহিত আশ্রয় দিল।

"এই যে, আর একটাও যে মনে হচ্ছে" তোয়াঁ চিৎকার করিয়া উঠিল। সে ভুল করিয়াছে—একটা নয়, তিনটি। নিশ্চিত গৌরবেরই কথা। সন্ধ্যা সাতটায় তাহার শেষ ডিম্বটি ফল-প্রসূ হইল। গিন্নী বলিলেন—"তোমার সব ডিমগুলিই ভাল ছিল।" যাহা হউক, এত দিনে তোয়াঁর মুক্তি হইল। আনন্দের আতিশয্যে সে শেষ শাবকটিকে ধরিয়া চুম্বন করিয়া বসিল। আদরের আধিক্যে সে উহাকে পিষিয়া ফেলিতে চাহিল। শাবকটির জন্মলাভে নিজ কর্তৃত্বের জন্যই বোধহয় উহার উপর প্রসবিতা মাতার বাৎসল্য তাহার মনে সঞ্চিত হইয়াছিল। তাই সে স্নেহভরে অন্ততঃ রাত্রিটার জন্য উহাকে নিজের কাছে রাখিতে চাহিল। তাহার রায়-বাঘিনী পত্নী কিন্তু তাহার সব উপরোধ হেলায় তুচ্ছ করিয়া উহা ছিনাইয়া লইয়া গেল।

এক অপূর্ব সংঘটন বই কি এটা! ইহার আলোচনায় কলরব করিতে করিতে সবাই নিজ নিজ গৃহের দিকে অগ্রসর হইল।

প্রস্পার কিন্তু আরো কিছুক্ষণ সেথায় রহিয়া গেল। সবাই চলিয়া গেলে সে তোয়াঁর নিকট গিয়া মৃদুস্বরে বলিল—"তোর স্ত্রী যে দিন ঘটা ক'রে মুরগী রাঁধবে, সেদিন আমায় নেমন্তন্ন করবি ত?"

কুক্কুট মাংসের কথায় তোয়াঁর মুখাভ্যন্তর সজল হইয়া উঠিল। সে বলিল—"নিশ্চয় ক'রব, বৎস!"

তাহার গৃহিণীও নিকটে ছিল। এবারে কিন্তু তাহার শ্রীমুখ হইতে কোন প্রতিবাদ বাহির হইল না।

জার্মান রোমান্টিসিজম-এ 'রোমান্টিক' কথার অর্থ

মলয় রায়চৌধুরী

এ কথা আজ সর্বজনস্বীকৃত যে ফ্রেডরিক শ্লেগেল-এর রচনা, সমালোচনা হতেই 'রোমান্টিক' কথাটি আমরা জানতে পারলাম। উনিশ শতকের দর্শনের আলোচনা ও প্রত্যালোচনায় যে সমস্ত বিশেষণগুলি ব্যবহৃত হচ্ছিল সেগুলির দৈন্য ক্রমশ প্রকট হওয়ায়, Athenaeum (১৭৯৮) এর দ্বিতীয় সংখ্যায় তিনি প্রথম উচ্চমানের বলে ঘোষণা করেন die romanti-che Poesie কে। এই অদ্ভুত কথাটির আবিষ্কারে তদানীন্তন দার্শনিকগণ তাঁদের নবচেতনার উন্মেষকে প্রকাশের একটি পথ পেয়ে গেলেন। কিন্তু ওই নতুন গোষ্ঠির চিন্তানায়কগণ romanticism কথাটিকেই কেনবা তাঁদের দলগত সঙ্কেত শব্দরূপে গ্রহণ করে নিলেন? রোমান্টিসিজম এর বিপ্লবসৃষ্টিকারী ইতিহাসের জন্য এই প্রশ্নটি সূত্রায়ন সর্বপ্রথম প্রয়োজন। পরে, যেহেতু বহু কিছুকেই রোমান্টিক বলে অভিহিত করা হয়েছে, বহু চিন্তাধারার কেন্দ্ররূপে প্রতারিত হয়েছে এই কথাটি, তাই কথাটির অর্থ জানা বিশেষ প্রয়োজন।

অবশ্য সতেরো শতকেও কথাটি কখনও-কখনও যে ব্যবহৃত হয়েছিল, তার হদিশ কিঞ্চিদধিক পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, কথাটি প্রায় ফ্যাশানে রূপান্তরিত হয় বহুকাল পরে, সুখ্যাত ল্যাণ্ডস্কেপ বর্ণনা প্রসঙ্গে। শ্লেগেল কথাটিকে সর্বপ্রথম একটি ভাবনাধারার প্রতীক করে তোলেন।

প্রাগুক্ত প্রশ্নটির যে উত্তর প্রায় শতার্ধকাল স্বীকার করা হয়নি এবং প্রতিক্ষেত্রেই ব্যবহার হয়ে এসেছে সেটি Haym কর্তৃক ঘোষিত। শ্লেগেল-এর দুটি প্রকাশ ভঙ্গীমার মধ্যে আপাত-সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছিলেন Haym। কিন্তু শ্লেগেল যে-সংগা দিয়ে ছিলেন তা বহুলাংশে উদ্দাম ও অসংযত। Haym তাকে স্ফটিক-স্বচ্ছতা প্রদান করলেন। চারুকলার নববিদ্রোহে উৎসাহীরা যে-চেতনাকে জাগ্রত করার চেষ্টা করেছিলেন, Haym-এর মতে তা গ্যেটে-এর চিন্তাধারার প্রভাব চিহ্নিত এবং শ্লেগেল-এর মতে, গ্যেটের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব হল Withelm Minstors dehrjahro। এই বইটির সাথে যখন তাঁর পরিচয় হয় তখন তিনি এর মধ্যে এক নতুন কাব্যরস পান, যা-কিনা তদানীন্তন সাহিত্য সংস্কৃতি হতে সম্পূর্ণ ভিন্নতর বলে তাঁর কাছে প্রতীয়মান হয়। শ্লেগেল মনে করেন যে romantisch এবং romanartig কথাদুটির অর্থ প্রায় একই। এ-প্রসঙ্গ উত্থাপন করার সময়ে তিনি গ্যোটে-এর বইটিকে Romane গুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেন। রোমান্টিক অর্থে তাই অলীকও অবাধকল্পনাপ্রসূত কোনো কিছু মনে করা সম্পূর্ণ সঠিক নয়। অর্থাৎ মনে রাখা প্রয়োজন যে Roman কে তিনি অন্যান্য genres গুলি হতে উচ্চে স্থাপন করতে চেয়েছেন। তাবৎ সমস্ত

গুণাবলী দর্শনেই সৌন্দর্যশাস্ত্রে রোমান্টিক কথাটিকে তিনি আনয়ন করেছিলেন। সৌন্দর্যের একটি বিশেষ ভঙ্গিমাকে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন শুধু একটি মাত্র কথায়।

এই ধরণের একটি ধারণা প্রচলিত ছিল বহুকাল, এবং বহুদিন পর্যন্ত আলোচকগণ এই ধারণাটিকে উল্লেখ্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। সেই জন্যে Thomas লিখে গেছেন ; "By a juggle of words *Romanpoesie* became *romantische Poesie* and Schlegel proceeded to define 'romantic as an ideal of perfection, having first abstracted it from the unromantic *Wilhelen Miester*" আরও একজন, শ্রী Porterfield বলেছেন : শ্লেগেল ১৭৯৬ সনে যেনা গমন করলেন এবং তথায় তাঁর নতুন থিয়োরী আবিষ্কার করলেন গোটে-এর উইলহেল্‌ম্ মিস্টার থেকে, যার নাম তিনি দিলেন রোমান্টিসিজম।

অনেকে আছেন, যাঁরা Haym এর আলোচনাকেই সঠিক বলে মনে করেন, তাঁরা *Roman* কথাটি হতেই রোমান্টিসিজীম এর জন্ম হয়েছে বলে মনে করেন এবং গেটের বইটিকে তার সপ্রতিভ প্রতিকৃতি রূপে গ্রহণ করেছেন। এই মতবাদীদের মধ্যে উল্লেখ্য হচ্ছেন কিরনার, যোল, ও শিয়েলে। ভিন্ন গোত্রের মতবাদী হলেন মেরী জোয়াশিমি। তিনি Haym-এর রোমান্টিক কথাটির পর্যালোচনা সম্পূর্ণ স্বীকার করেন নি। অবশ্য জোয়াশিমি যে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন তার জন্য কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ তিনি দিতে পারেননি। আরেকজন যিনি Haym-এর মতবাদ স্বীকার করেননি তিনি হলেন Walyel। তাঁর Deutsche Romantik গ্রন্থে তিনি তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রোমান্টিসিজম-এর সূক্ষ্ম সূত্রটি কি করে ক্রমাগত হল তা তিনিও জানাননি।

Wilhelm Miester রচনাটির মধ্যে স্বকীয় এমন কিছু নেই যা খোলাখুলিভাবে 'romantische Poesie' এর বিষয়ে উক্তি করে। কিন্তু শ্লেগেল এই রচনাটির মধ্যেই রোমন্টিকধর্মী যাবতীয় গুণাবলী খুঁজে পান—যদ্দারা তিনি জার্মান তথা য়ুরোপীয় সাহিত্যের এক নবোল্লাসের সূচনা প্রত্যক্ষ করেন ; কেননা, তিনি মনে করেছিলেন যে গোটে এর রচনায় যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য জার্মান সাহিত্যে প্রথম এলো সেগুলি প্রচুর প্রভাবশালী এবং অনাস্বাদিতপূর্ব। কবিতার ফর্মের নিপুণতা অন্যান্য সকলের চেয়ে ভিন্নতররূপে প্রতীয়মান হল তাঁর কাছে। গোটে-এর রচনার সঙ্গে die romantische Poesie-এর যোগাযোগ আপাতবিচ্ছিন্ন হলেও একটি সূক্ষ্ম অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক তার মধ্যে বিদ্যমান। কিন্তু তা থেকে প্রমাণিত হয়না যে romantische Poesie এবং Romanpoesie উভয়ই হুবহু একই অর্থে ব্যবহৃতব্য কথা ; অথবা *Wilhelm Miester*-এর প্রমুখ বৈশিষ্ট প্রাগুক্ত কথাদুটিতেই প্রচ্ছন্ন। বহুস্থলে আবার romantische Poesie কথাটিকে আধুনিক আত্মপ্রকাশ ভঙ্গীমার একটি বিশেষ পন্থা বলে মনে করা হয়েছে। আধুনিকার এই-প্রসঙ্গ অবতারণাকালে শ্লেগেল একস্থানে বলেছেন যে আধুনিক কবিতা মাত্রেরই একটি গূঢ় Roman বৈশিষ্ট্য থাকে। শ্লেগেল-এর এই উক্তিটির পাশাপাশি আমরা চেষ্টা করলে কয়েকটি তদানীন্তন য়ুরোপীয় অথবা জার্মান কবিতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারি যেগুলি উপরোক্ত মতে আধুনিক হলেও রোমান্টিক অবশ্যই নয়। এখানে বলা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবেনা যে রোমান্টিক অর্থে কখনই ইতিহাস বর্ণনার পরিকল্পিত উচ্ছ্বাস নয়।

পরবর্তীকালে শ্লেগেল কেবল গোটেকেই রোমান্টিসিজম-এর একমাত্র প্রতিনিধি মনে করেননি, এ-ক্ষেত্রে তিনি পূর্বের ধারণাটি বদলাতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু তা বলে গোটেকে কখনও ক্ষুদ্র করা হয়নি, তাঁর আসন যে সবার উপরে তা একবাক্যে স্বীকৃত। গোটে কেবল শ্লেগেল বর্ণিত রোমান্টিক কবি নন, তিনি সর্বময়। তাঁর বিরাটত্ব কেবল তুলনা করা চলে শেক্সপীয়রের 'হ্যামলেট' অথবা সার্ভেনতেস-এর 'ডনকুইকজোট'-এর সঙ্গে। গোটে-এর unification of the ancient and the modern, তাঁর পূর্বেকার জার্মান সাহিত্যে বিরল।

তাঁর *gesprach uber die poesie*'তে romantische'কে শ্লেগেল যে ঐতিহাসিকালোচ্য কথা বলে অভিহিত করেছেন, Haym তা তাঁর আলোচনাকালে সর্বদাই মনে রেখেছিলেন বলে প্রতিভাত হয়। শ্লেগেল যে সমস্ত ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, তদ্দর্শনে Haym বলেন যে শ্লেগেল-এর কল্পনা দৃশ্যতঃ *Roman* কথাটিকে কেন্দ্র করে, ঐতিহাসিক ব্যাখ্যায় তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসেনি।

লাভজয় মনে করেন যে ১৭৯৮ এর পূর্বে অথবা Haym যে-আলোচনা করে গেছেন, তাতে Romantische poesie কে শুধু-মাত্র Roman poesie অথবা Roman মনে করাটা ভুল হবে, যদিও বা তা ব্যবহার করা হয়, সর্বক্ষেত্রে এবং সর্বসময়ে তা প্রধানত অব্যবহার্য। Haym Roman কথাটিকে এবং *wilhelm Meister* কে যে-বিশেষত্ব দিয়েছেন শ্লেগেল-এর মতবাদ আলোচনাকালে রোমান্টিসিজম-এর ইতিহাস আলোচনায় তা ভিন্নপথগামী করে দিতে পারে।

Haym নিজেও স্বীকার করেছেন যে শ্লেগেল বহুক্ষেত্রে, বিশেষ করে তাঁর পূর্বেকার রচনাগুলিতে romantishe poesie কথাটিকে মধ্যযুগীয় এবং অত্যাধুনিক কবিতা প্রসঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন। শ্লেগেল ১৭৯৪ সনে তাঁর ভাইকে একটি চিঠিতে জানান যে যদি রোমান্টিক কবিতাসমূহের একটি ইতিহাস লিখতে হয়, তবে শেক্সপীয়ার এবং দাঁতেকে আলাদা করে রাখা যায় না এবং সঙ্গে-সঙ্গেই, তাতে অন্তর্ভুক্ত করা চলে না অতি আধুনিক নাটক এবং উপন্যাসগুলি। সেই বৎসরের একটি রচনায় দেখা যায় romantische poesie কথাটিকে বারংবার ব্যবহার করা হয়েছে। কখনও তা বীরত্বব্যঞ্জক কল্পনাপ্রয়োগরূপে এবং কখনও মধ্যযুগীয় অথবা প্রথম-আধুনিক সাহিত্যের চিহ্নিতার্থে। খুব সম্ভব শ্লেগেল যে মতে তাঁর কথাটিকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন তা প্রথমোক্তটিরই নামান্তর,

কেননা, সেই প্রকাশভঙ্গীমায় তিনি-এ-কথা ব্যক্ত করেছেন যে আধুনিক কবিতার স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিনিধিদের মধ্যে শেক্সপীয়ার অন্যতম। বীরত্ব-গাথার প্রসঙ্গে তিনি একস্থানে হোমারের মহাকাব্য ও রোমান্টিসিজমকে একই সূত্রে গ্রথিত করতে চেয়েছিলেন। ১৭৯৮ সনে তাঁর ভাইকে একটি চিঠিতে শ্লেগেল জানান যে Athenaeum এর একটি সংখ্যায় তাঁরা উভয়কেই লিখবেন, যার মধ্যে থাকবে শেক্সপীয়ারের 'রোমান্টিক কমেডি'গুলির আলোচনা এবং সের্ভানতেস-এর রোমান্স এর পর্যালোচনা। পরবর্তীকালে শ্লেগেল যখন তাঁর সমস্ত রচনাগুলি গ্রন্থস্থ করার মনস্থ করেন তখন একটি নতুন পরিচ্ছেদ যোজনা করে তাতে বোকাসিও এবং প্রথম পর্তুগীজ, স্প্যানীশ, ও ইতালীয় কবিদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

অতএব এ-কথা এখন প্রাঞ্জল যে আঠারো শতকের সম্পূর্ণ নবম দশকটিতে শ্লেগেল-এর ওই "romantische" বিশেষণটির ব্যবহার প্রায় একটি অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। বহু সাহিত্য অথবা সাহিত্যিক তিনি বিভূষিত করেছিলেন তাঁর নবাবিষ্কৃত বিশেষণে। সুতরাং আমরা যদি Haym-এর ব্যাখ্যা স্বীকার করে নিই তবে তার ফলে কোনো নির্দিষ্ট অর্থ নিষ্কাশিত করা সম্ভবপর নয়। এর ফলে *Romantische Poesie* অথবা *Romanpoesie* অথবা *Roman*-এর মধ্যে কোনো অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না। শেক্সপীয়ারের ব্যতিক্রম-হীনতার ক্ষেত্রে শ্লেগেল যা বোঝাতে চেয়েছেন, তাকে যদি তিনি অপ্রথাবাহিত বলে ঘোষণা করতেন তাহলে সু-প্রযুক্ত হত। কেন না, এ-কথা মেনে নেওয়া উচিত যে ওরিজিনালিটি মাত্রেই রোমান্টিসিজম নয়।

রোমান্টিসিজম যে একটি বিশেষ কালের অথবা একটি বিশেষ গোষ্ঠিমাত্রের লেখাকেই অভিহিত করেনা, সেকথা এ কালের সমালোচকগণ অগ্রাহ্য করেননি। সাহিত্য-ইতিহাসের একটি বিশেষ সময়ের সমস্ত রচনাকেই রোমান্টিক মনে করা ভুল। সৌন্দর্যবোধ ও দার্শনিক স্বাচ্ছান্দে কথাটি আজকে পরিপূর্ণ। সামান্য উচ্ছাসবশত তার যত্রতত্র ব্যবহার অনভিপ্রেত। মহীরুহের একটি শাখাকেই কেবল আর রোমান্টিক বলা চলেনা, কারণ পাদপটির রন্ধ্রে রন্ধ্রেও তা ছড়িয়ে থাকতে পারে। এখন রোমান্টিক অর্থে চিন্তাধারার একটি বিশেষ স্রোত। Haym এর মতানুসারে আমরা জেনেছি যে সৌন্দর্যবোধ থেকে শব্দটির উৎপত্তি, এবং সে-সৌন্দর্যবোধ গ্যেটেতে মূর্ত; কেননা, Roman কে তিনি genre রূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মতানুসারে Haym সম্পূর্ণ সঠিক নন। রোমান্টিক' কথাটির সঙ্গে ফ্রেডরিক শ্লেগের-এর বহু পূর্বেই পরিচয় হয়েছিল; *Wilhelm Maisser* পাঠেরও পূর্বে।

রোমান্টিকগোষ্ঠী কর্তৃক প্রকাশিত বহু পুস্তিকায় বিভিন্ন মতামত পর্যালোচনার পূর্বে শ্লেগের-এর মনে যে-প্রশ্ন আলোড়ন তুলেছিল তা হল পুরাতন এবং আধুনিক শিল্পকলার গতি প্রকৃতি এবং সম্পর্ক। তিনি বুঝেছিলেন যে ক্লাসিকাল এবং আধুনিক শিল্পকলার মধ্যে একটি সূক্ষ্ম প্রভেদ ক্রমশ জাগ্রত, যার সুচিহ্নিতকরণ একান্তই প্রয়োজন। তাঁর এই ধারণা থেকেই তিনি সৌন্দর্য আলোচনায় এগিয়েছিলেন। তাঁর মনরাজ্যে যে দ্বন্দ্ব চলেছিল, তদানীন্তন জার্মান সংস্কৃতিতেও তিনি তাই প্রত্যক্ষ করলেন এবং সেই জন্যেই তিনি লিখেছিলেন যে সংস্কৃতির মধ্যেও একটি যুদ্ধ আসন্ন। এই যুদ্ধে সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পূর্বে পুরাতন এবং নতুনের সঠিক ভাবে নামকরণ করে দেওয়া উচিত। পুরাতন ও নতুনের সম্পর্ক স্থাপনের সময়ে শ্লেগের তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীকে কখনও ঐতিহাসিকের মতো করে তোলেননি। আধুনিকতাকে সময়ের পরিমাপে না দেখে তিনি দার্শনিক চিন্তাধারায় দেখবার চেষ্টা করেছেন। সর্বকালেই যেমন আধুনিকতাকে ব্যঙ্গ করা হয়ে থাকে, অথচ তা পুরাতন হলে আদর্শ বলে মনে করা হয়, শ্লেগেলও প্রথমদিকে আধুনিকতাকে ব্যঙ্গ করে পুরাতনকে উচ্চে স্থাপন করেছিলেন। আধুনিকতাকে ব্যঙ্গ করলেও শ্লেগেল দুটি থিয়োরী গড়ছিলেন মনে মনে এবং সেই জন্যেই তিনি পূর্ব হতেই পথ প্রস্তুত করে রাখছিলেন। আধুনিক ও পুরাতন কবিতার তুলনালোচনা হতে তিনি ক্রমে সুন্দর কবিতা' ও ভালো লাগা কবিতার আলোচনায় এলেন। তার পরের ধাপ হল বস্তুবাদী ও অধ্যাত্মবাদী তত্ত্ববোধ। শ্লেগেল এই সময়ে সৌন্দর্যকে বস্তুগত রূপে দেখেছিলেন, যার সঙ্গে শিল্পীর মনগত সম্পর্ক থাকুক অথবা না থাকুক দর্শক অথবা শ্রোতার অথবা পাঠকের এক অনমুভূত আকর্ষণবোধ থাকে। অতএব সৌন্দর্যে যে-সমস্ত কয়েকটি নিয়ম আছে তা বস্তুগত ও সার্বজনীন বলে অপরিবর্তনীয়। প্রতি শিল্পেরই উদ্দেশ্য হল এই সৌন্দর্যের অধিগম্য হওয়া—তা আয়ত্তসাধ্য হলে তবেই শিল্প সফল। শিল্পের উদ্দেশ্য কখনই অনুকরণ নয়, অথবা শিল্পির ব্যক্তিগত ইতিহাস রচনা নয়। নিয়মগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান হল এই যে নিজেকে সীমিত রাখা। গঠনবস্তুকে কুশ্রীতার কেন্দ্রগামী করাটুকু এই মতানুসারে অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

ফ্রেডরিক শ্লেগেল *Athenaeum* এর পূর্বেই আধুনিক কবিতার বিষয়ে তাঁর মতামত স্থির করে ফেলেছিলেন। ১৭৯৮-এর পর আমরা যে এতো বেশী রোমান্টিক কবিতার বিষয়ে শুনেছি তা মুখ্যত শ্লেগেল এর পূর্বকথিত 'আকর্ষক কবিতা।'

তদানীন্তন আকর্ষক রচনাবলীর সবিশেষ গুণ হল এই যে—তার মধ্যে এক চিত্রকল্প শিল্প থাকবে, এবং প্রায় প্রতিটি রচনাকেই দেখা গেছে যে তা গতানুগতিকতাকে পরিহার করে কোনো নিয়মকে স্বীকার করে নেয়নি। কর্মের নিপুণতার প্রতি লক্ষ্য না রাখলেও সৌন্দর্যের রূপায়ন সুষ্ঠু হওয়া প্রয়োজন। ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ও স্বাচ্ছন্দ্য সংস্থাপনও দরকার। সৌন্দর্যের পাশাপাশি, দার্শনিক চিন্তাধারাও আকর্ষক কবিতার গুণ বলে মনে করা হয়েছিল।

এই সমস্ত গুণাবলীকে যদি আবেগবিহ্বল ভাষায় বর্ণনা করা হয় তবে ফ্রেডরিক শ্লেগেল-এর রোমান্টিক কবিতার সত্তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য অচিরেই আয়ত্তে আসে। কেননা, তাহলেই রোমান্টিসিজম সম্বন্ধে সব বলা হয়ে যায় বলে প্রতিভাত হয়: আকর্ষণ এবং প্রসঙ্গের সার্বজনীনতা, রুদ্ধশ্বাস অগ্রগতি এবং ক্রমানুক্রমিক আত্ম-অচ্ছেদ্যতা; অতিপ্রাকৃত ও

অন্তরবৃত্তিকেও শিল্পসীমার অন্তর্ভুক্ত করে সার্বজনীনতাকে সপ্রতিষ্ঠ করা ; দর্শন ও কবিতার একাত্মতা এবং সৃজনীশক্তিসম্পন্ন শিল্পিকে অপ্রতিহত স্বাধীনতা প্রদান।

শুধুমাত্র বৈশিষ্টগুলিই নয়, বরং মুখ্য ঐতিহাসিক রূপায়ণেও শ্লেগেল এর আধুনিক কবিতা বিষয়ে মতবাদ আগাগোড়া এক। আমরা পূর্বেই জেনেছি যে শেক্সপীয়ারকেও একস্থানে আধুনিক কবিতার সর্বাগ্রগণ্য প্রতিনিধি বলা হয়েছিল। কিন্তু ১৭৯৫এর শ্লেগেল-এর কাছে শেক্সপীয়ার আধুনিক শিল্পকলার উল্লেখ্য নীতিভ্রংশ সৌন্দর্যশাস্ত্রী। শ্লেগেল শেক্সপীয়ারের ব্যক্তিত্বকে অতুলনীয়রূপে গ্রহণ করেছিলেন পরে। কিন্তু একথাও শ্লেগেল একবার বলেছিলেন যে "শেক্সপীয়ারের কোনো নাটক পরিপূর্ণরূপে সুন্দরকে আয়ত্তে আনতে সক্ষম হয়নি ; সৌন্দর্যের তত্ত্ব তাঁর নাটকের গঠন পূর্ণভাবে নিরূপণ করেনি। যে সমস্ত সৌন্দর্যের অংশবিশেষ তাঁর নাটকে প্রাপ্তব্য তাও বহুসময়ে কুশ্রীতার সঙ্গে মিশেছে। সুশ্রীতার অবস্থান নিজকল্পে নেই, বরং একটি ভিন্ন উদ্দেশ্যের বাহক হয়ে আছে—চরিত্রের প্রকাশের জন্য অথবা দার্শনিক মতস্থাপনের জন্য। বহুক্ষেত্রে শেক্সপীয়ার স্বাচ্ছন্দ্যরহিত এবং তিনি সর্বদা সত্যকে পরিপূর্ণভাবে সংস্থাপিত করেননি। সত্যের মাত্র একটি দিককে তিনি তুলে ধরেছেন। তাঁর সংস্থাপন কখনও বস্তুগত নয় কিন্তু ব্যক্তিগত।" এমনকি শেক্সপীয়ারের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটকগুলিতেও আধুনিক শিল্পকলার প্রমুখ দোষাবলী লক্ষণীয়। সেই জন্যেই *Romeo and juliet*এ কবিতার মূল genressএর একটি অপ্রাকৃত মিশ্রণ দ্রষ্টব্য, কেননা এটি আধুনিক নাট্যপ্রবাহের যে স্রোতটিকে গীতিকাব্য বলা হয়ে থাকে, তারই অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য তা এজন্যে নয় যে তাতে বহু গীতিমূলক অনুচ্ছেদ আছে, কারণ তার মধ্যে কাব্যের আভ্যন্তরীণ শৌর্য বর্তমান—কর্ম শুধুমাত্র নাটকীয়। *Romeo and juliet* হল "but a romantric sigh over the transiency of the joy of youth, যদিও *Hamlet* শিল্পনৈপুণ্যে একখানি মাষ্টারপীস গ্রন্থ, তবু তার মধ্যেও মানবাত্মার অনৈক্য অসুন্দর চিত্রের মতো প্রতিভাত। অর্থাৎ বইটি দার্শনিক ট্র্যাজেডীরূপে উল্লেখনীয় যা'কিনা সৌন্দর্যমূলক-ট্র্যাজেডীর বিরোধী।

শেক্সপীয়ার ১৭৯৪ সনে শ্লেগেল-এর কাছে আধুনিকতার স্বেচ্ছাচারী হলেও, গ্যেটে কিন্তু সমালোচকের কাছে অতি শ্রদ্ধেয়, এবং সাহিত্যে সৌন্দর্য ও কৃষ্টির পরিবর্তনের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে গ্যেটে-এর *wilhelm Meister* তখনও প্রকাশিত হয়নি, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন সম্পূর্ণতঃ তাঁর ক্লাসিকাল দক্ষতার জন্যে—তাঁর স্থৈর্য, তাঁর ভারসাম্য, তাঁর বাস্তবতা, গ্রীককলার প্রতি নৈকট্যের জন্যে, আধুনিক আকর্ষণতা হতে তাঁর স্বাতন্ত্র্য। "গ্যেটে-এর কবিতা অকৃত্রিম শিল্প ও অবিমিশ্র মাধুর্যের আগত প্রত্যূষ।" হয়তো কাব্যশৈলীতে শেক্সপীয়ার তাঁর উর্দ্ধে, কিন্তু বস্তুসম্ভারের শ্রীস্থাপনে তিনি অতুলনীয়। অতএব একটি সার্বিক মাধুর্যের বিদ্রোহ অত্যাসন্ন—যাবহে আনবে প্রাচীন গ্রীককলার সৌন্দর্য। কেননা, গ্রীক শিল্পির মনে সমতা, ভারসাম্য, ঐক্য, পরিমাপ ও শ্রীবোধ কখনও কৃত্রিম ছিলনা, তা সহজাত প্রেরণায় উৎসারিত হত।

যখন ১৭৯৮ সনে শ্লেগেল স্বনামখ্যাত রোমান্টিসিস্ট হয়েছেন, তখন শেক্সপীয়ারের মধ্যে আধুনিক কবিতার সমস্ত বৈশিষ্ট্যমূলক আঙ্গিক স্বীকৃত। তাই *Athenaeum*-এর ২৪৭ অংশে শেক্সপীয়ার, দাঁতে, এবং গ্যেটে আধুনিক কবিতার শ্রেষ্ঠতম প্রতিনিধি। দাঁতে-এর ভাববাদী কাব্য যদিও ওই শ্রেণীর কবিতার মধ্যে অন্যতম, শেক্সপীয়ারের সর্বময়তাই কিন্তু রোমান্টিক কবিতার আনুপাতিক। Haym যে বলেছিলেন *Wilhelm Meister*-এ শ্লেগেল-এর নবাদর্শ সুচারুরূপে পূর্ণতোয়া পরিবেশিত, সে ধারণা কিয়দাংশে ভুল। কেননা, শ্লেগেল শেক্সপীয়ারের ভিতরে মূল প্রতিকৃতি আবিষ্কার করেছিলেন। *Athenaeum*-এর প্রথম সংখ্যায় গ্যেটে এবং শেক্সপীয়ার যেমন একই আসনে ছিলেন, দেখা যাচ্ছে যে শ্লেগেল পরবর্তী কালেও ঠিক তাই রেখেছেন। ১৮০০ সনে শ্লেগেল-পুনর্বার শেক্সপীয়ারকে শ্রেষ্ঠতম রোমান্টিক রূপে ঘোষণা করেছিলেন এবং তখন আমরা পরিষ্কারভাবে জানতে পেরেছি যে romantisch কথাটিকে আধুনিকতার জন্যেই ব্যবহার করা হয়েছে যাতে ক্লাসিকাল হতে তার ভিন্নতা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

অতএব ফ্রেডরিক শ্লেগেল-এর মনে যে-শিল্পের 'রোমান্টিক' বৈশিষ্ট্যের কথা বহু পূর্ব হতেই তৈরী হচ্ছিল তার প্রমাণ আমরা পেলাম। শেক্সপীয়ারকে কেন্দ্র করেই তাঁর এই ধারণাটি উন্মেষিত হচ্ছিল। প্রথমকালের রোমান্টিসিস্টরা শেক্সপীয়ারের কাব্যশৈলীর উৎকর্ষতা স্বীকার করে নিয়েছিল এবং 'রোমান্টিক' কথাটি সম্পর্কে সচেতন হয়েছিল। সে সময়ে প্রকাশিত টিরেক এর একটি পুস্তিকাই তার প্রমাণ। Haym এর মতানুসারে আমরা যদি 'রোমান্টিক কবিতা' সংগাটির সৃষ্টি শ্লেগেল কর্তৃক ১৭৯৬ সনে অথবা তারপরে হয়েছিল বলে মনে করি তাহলে ভুল করা হবে। গ্যেটে এর *Wilhelm Meister* পাঠান্তে শ্লেগেল উৎসাহিত বোধ করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তার সঙ্গে রোমান্টিসিজম-এর পূর্বকথিত প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। একথা বললে হয়ত ভুল হবেনা যে আঠারো শতকের নবম দশকে যে—ক্লাসিসিজম শিল্প-সংস্কৃতি সাহিত্যে ছিল, রোমান্টিসিজম তারই একটি বিচ্ছিন্ন অংশবিশেষ। প্রাচীন আর্ট কাকে বলে ইত্যাদি আলোচনাকালে সে-সময়ের কিছু দার্শনিক সেই আর্টের বিপরীতে কি কি থাকতে পারে তারও প্রত্যালোচনা আরম্ভ করেছিলেন, কারণ তাঁরা মনে করেছিলেন যে তার ফলেই আধুনিকতাকে শ্রেণীভুক্ত করা সম্ভবপর হবে। ক্রমে এমন হল যে তাঁদের মধ্যে একদল, বিশেষ করে শ্লেগেল, আনুগত্যের পরিবর্তে দোষারোপ আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। ১৭৯৮ পর্যন্ত শ্লেগেল ক্রমাগত চারটি বছর কেবল রোমান্টিক কবিতার আলোচনা করেছিলেন। সুতরাং একটি কল্পনা যা পূর্বেই তাঁর মনে ছিল, *Wilhelm Meister* পাঠের পরে সেটি উক্ত রোমান্স হতেই তাঁর চিন্তায় আসতে পারেনা। ১৭৯৬ সনে যা ঘটেছিল তা রোমান্টিক মতবাদের আবিষ্কার নয়, পরন্তু রোমান্টিক মতবাদের প্রতি ফ্রেডরিক শ্লেগেল-এর পরিবর্তন।

এই পরিবর্তনের জন্যেও কিন্তু *Wilhelm Miester* দায়ী নয়। তার জন্যে দায়ী শিলার-এর রচনা *Uber naivenmed sentimentalische Dichtung.* শিলার এই রচনাটিতে রোমাণ্টিক মতবাদের বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার করেছিলেন, এবং শ্লেগেল-এর পরিবর্তনকল্পে তাই যথেষ্ট, কেননা শ্লেগেল কখনই সমতুলন কেন্দ্রে নিজেকে স্থাপিত করেননি।

এখন প্রশ্ন হল এই যে romantisch কথাটিকেই বা কেন সুপ্রযুক্ত বলে মনে করা হল? হল এই জন্যে যে *Modern* কথাটির প্রচলন বহুকাল ধরেই হয়ে আসছিল এবং তার দ্বারা একটি বিশেষত্ব আরোপ করা সম্ভবপর হতনা। রোমাণ্টিক বললে আমরা যে-গুণগুলি বুঝি, মডার্ণ বললে তা বুঝতাম না। আকর্ষক কবিতা (*interessant*) বললেও মূল ভাবধারাটিকে অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হতনা; কেননা, শ্লেগেল কথাটিকে বহুবার বহু অর্থে ব্যবহার করেছিলেন। *Modern* বললে তবু সময়কে কিছুটা সূচিত করা যায়, আকর্ষক বললে তাও যায়না। অপরপক্ষে 'রোমাণ্টিক' কথাটি প্রায় 'তৈরীই ছিল শ্লেগেল-এর মনে এবং কথাটিকে তিনি বারকয়েক ব্যবহারও করেছিলেন ইতিমধ্যে। শ্লেগেল মডার্ন ব্যবহার করেননি, হয়ত বা 'উত্তর ক্লাসিকাল' ব্যবহার করতে পারতেন, কিন্তু তাও তিনি করেননি। রোমাণ্টিক কথাটি ঐতিহাসিক দিক থেকে এবং বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে খাপ খেয়ে গেল। মুখ্যত রোমাণ্টিক কথাটি শ্লেগেল-এর মনে দাঁতে, সের্ভানতেস এবং শেক্সপীয়ারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল, বিশেষ করে শেষোক্তজন। মত পরিবর্তনের পূর্বে অথবা পরে উভয় সময়েই শ্লেগেল শেক্সপীয়রকে আকর্ষক তথা আধুনিক রূপে গ্রহণ করেছিলেন। শ্লেগেল কখনই Haym-এর মতো *Roman*-এর ওপর জোর দেননি। তিনি শুধু তাকে একটি সম্ভাব্য genre বলে মনে করেছিলেন।

জীবন-অভিযান

শ্রীভবানীপ্রসাদ দাশগুপ্ত এম-এ

দুঃখের আঁধার রাতে আজিও ছুটেছে যারা
চিত্তে নিয়ে আশা অনির্ব্বাণ,—
নবজীবনের আশ্বাসে,
উন্মত্ত দুর্দ্দিনে যারা মরণের আলিঙ্গন তুচ্ছ করি
সম্মুখে চলেছে ধেয়ে যুগ হতে যুগান্তরে,
কণ্টকের অভ্যর্থনা জীবনে সম্বল করে
মত্ত বেগে ছুটে চলে তারা জীবনের অভিসারে,
যেন এক অজানার নিঃশব্দ ইঙ্গিতে
শূন্যলোকে গ্রহ হতে গ্রহান্তরে।

সভ্য শিকারী দল পথ রোধ করে
লুকাইয়া আপন স্বরূপ
ঐতিহ্যের আবরণে, কখনও বা ধর্ম্মের খোলসে।
পথের সকল বাধা ভেঙে, দীর্ণ করি মোহ কুজ্ঝটিকা
উদ্দাম উত্তাল বেগে ধেয়ে চলে তারা
নতুন বিশ্বাসে,
মৃত্যুঞ্জয়ী, কালজয়ী সত্যের সন্ধানে বাধাবন্ধহারা।

বেদনায় উদ্বেলিত আর কোন অশ্রুধারা নয়,
দুঃখের ইন্ধনে উঠেছে জ্বলিয়া দীপ্তবহ্নি শিখা।
(সেই) প্রদীপ্ত দুর্ব্বাসা রোষের রক্তিম আলোতে
নিশ্চল অন্তরে জাগে বেগের আবেগ।
সংক্ষুব্ধ মানুষের মুমূর্ষু জীবন এক সত্যের বিকাশে
উন্মীলিত, প্রসারিত দিকে দিকে নতুন প্রকাশে।

আজ্‌কের আমেরিকা

উপানন্দ

আমেরিকার সর্বপ্রথম আবিষ্কারক হোলো দুজন নরওয়েবাসী লীফ ও থোরওয়া। স্কুলপাঠ্য বইতে কলম্বাসকে আবিষ্কারক রূপে প্রাধান্য দিয়ে যে কাহিনীর রচনা হয়েছে, তার বৈশিষ্ট্য ভূমিকার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছে আরো কয়েক শতাব্দী আগে। আটলান্টিক মহাসাগরের তরঙ্গের ব্যবধানের বাইরে ঘুমিয়েছিল আমেরিকা তার অরণ্য-নীরবতার আবেষ্টনে। কেউ জান্‌তো না যে মহাসমুদ্রের পারে আছে একটি বিশাল দেশ। কিন্তু ভারতবর্ষের সঙ্গে মার্কিণ মুল্‌কের ছিল সভ্যতার সংযোগ-সূত্র সংখ্যাতীত শতাব্দীর আগে। তার প্রাচীন মানব সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে এই সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। মানব সভ্যতার প্রৌঢ়ত্বের দিনে জেগেছে আমেরিকা, তার যৌবনে আবার নতুন করে সুরু হয়েছে তার ক্রমবিকাশ। শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী অর্দ্ধ পৃথিবীর ভেতর ছিল সভ্যতার সমারোহ, আর অপরার্দ্ধ পৃথিবীতে ছিল অরণ্যচারী আদিম মানুষ। নতুন পথের সন্ধানে এসে কলম্বাস আধখানা পৃথিবীর বার্ত্তাবহ হয়ে সন্ধান দিলেন সভ্যজগতকে—কিন্তু ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেখা গেল তাঁর শোচনীয় পরিণতি, দেখাগেল স্বদেশের কাছে তাঁর লাঞ্ছনা ভোগ। যিনি পথিকৃৎ, তিনি পথহারা হোলেন, পথেই রচিত হোলো তাঁর গৌরবের সমাধি।

আজকের মার্কিন জাতির সঙ্গে আমাদের যে সৌহার্দ্য এতদিন ধরে অভিব্যক্ত হয়েছে, তার ভেতর যে ভেজাল ঢুকে গেছে একথা আমরা জান্‌তাম না, জান্‌তেন হয় তো জহরলাল। তার রাজনৈতিক কৌলিন্যের আড়ালে রয়েছে যে সম্রাজ্যবাদী শ্বেতাঙ্গ জাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আর রাজনৈতিক স্বার্থের প্রয়োজন, তা প্রত্যক্ষ হোলো আমাদের পর্ত্তুগীজ উপনিবেশ উচ্ছেদ সাধন সময়ে গোয়া দিউ দামনে যখন আমরা অভিযান সুরু করে বিজয় গর্ব্বে জাতীয়পতাকা তুলে ধরলাম। আজকের আমেরিকা ভারত হিতৈষী বলে নিজেদের প্রচার করে কোটি কোটি টাকা ঋণও দেয়, আর নিয়ে যায় এ দেশ থেকে আমন্ত্রণ করে সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনৈতিক ব্যক্তিদের নিজের দেশে। এটা যে মার্কিন রাজনৈতিক জুয়াড়ীদের মস্ত বড় দাবার চাল, তা আমাদের গোয়া অভিযানের মাধ্যমে ধরা পড়েছে। আজ অনুভূত হচ্ছে কী অদ্ভুত ভাবেই না ন্যায্য অধিকার থেকে ভারতকে বঞ্চিত করে রাখ্‌বার দিকে ইংলণ্ডের সঙ্গে একত্র হয়ে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে আমেরিকা অপকৌশল জাল বিস্তার করে চলেছে, ভারতের কাছে এবার তা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠলো। পৃথিবীর আগামী যুদ্ধের মহানায়ক আমেরিকার সম্বন্ধে তোমাদের কিছু মোটামুটি ধারণা থাকা আবশ্যক, কেননা তোমরাই স্বাধীন ভারতের আশাও ভরসা-স্থল, তাই এ সম্বন্ধে তোমাদের কাছে আজ্‌কের আমেরিকা প্রসঙ্গের অবতারণা।

তোমরা জানো, বিভিন্নজাতির সমাবেশে গড়ে উঠেছে মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্র, ইংলণ্ডের কবল থেকে মুক্ত হয়ে সুরু হয়েছে এর জীবনের নতুন অধ্যায়। এ অধ্যায় বহু পরিচ্ছেদে ক্রমশঃই ভারাক্রান্ত। বৈচিত্র্য-প্রধানদেশ। নব্যসভ্যতার চরমোৎকর্ষ সাধন হয়েছে এখানে। এর আছে শিলাময় সমুদ্র উপকূল, উচ্চ পর্ব্বতমালা, গভীর জঙ্গল, বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্র, আর উর্ব্বর উপত্যকা—আটলান্টিক থেকে প্রশান্তসাগর উপকূল পর্য্যন্ত তিন হাজার মাইল। এর উত্তর সীমায় কানাডা আর দক্ষিণ সীমায় মেক্সিকো। এর ভেতর রয়েছে বড় বড় শহর, ছোট ছোট গ্রাম।

একদিকে কল কারখানার দানবীয় গর্জ্জন, অপর দিকে ধ্যানমৌন তপস্বীর মত নীরব নিস্তব্ধক্ষেত্রের পরম প্রশান্তি। মোহিনী সৌন্দর্য্য আর চিত্তের উত্তেজনাপ্রদ স্থানেরও অভাব নেই। তা ছাড়া আছে ধ্যান-ধারণার অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ বিশেষ বিশেষ অংশে।

পূর্ব্বে নিউ ইংল্যাণ্ড। চিত্তাকর্ষক সৌন্দর্য্যের জন্যে এর প্রসিদ্ধি। প্রকৃতির অকৃপণ দানে পরিপুষ্ট প্রশান্ত সাগরের পশ্চিম উপকূল। এখানে নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের প্রাচুর্য্য। জল-প্রপাতের গর্জ্জন, নেমে আসছে তার দুরন্ত প্রবাহ উত্তুঙ্গ শিখর থেকে,—তুষারাচ্ছন্ন শৈলমালা কত বন্যা প্রবাহকেই না বেঁধে রেখেছে। কালিফোর্ণিয়ার সীমারেখাঙ্কিত তটপ্রান্তকে চুম্বন করছে প্রশান্ত সাগরের নীল জলরাশি। সূর্য্যস্নাত তটভূমি। এক সারি মনোহর তালজাতীয় পাদপ শ্রেণী। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এই দক্ষিণ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য দর্শককে বিস্ময়াপ্লুত করে।

আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের নৃশংস ভাবে হত্যা করে তাদের কঙ্কালের ওপর মাটিচাপা দিয়েগড়ে উঠেছে আজকের আমেরিকা। ঔপনিবেশিকদের অধিকাংশই এসেছে ইউরোপের নানা দেশ থেকে, শুধু ইউরোপ কেন, পৃথিবীর সর্ব্বদেশের লোকের সংমিশ্রণ ঘটেছে এখানে। এসেছে চীন, জাপান, পুয়োর্ত্তোরিকা, আফ্রিকা থেকে মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে—এসেছে তারা উদরান্নের সংস্থানের জন্যে। শেষে এদের রক্ত মিশেগেছে তাদের রক্তে। আজকের দিনের মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র গঠনে সকলেই অংশ গ্রহণ করেছে। ফলে প্রত্যক্ষ হয়েছে একটি বিশাল বলিষ্ঠ জাতি দুশো বছরের ভেতর। সকলেই নিজেদের মার্কিন বলে পরিচয় দেয় আর গর্ব্ব অনুভব করে। এখানে পৃথিবীর পরিচিত প্রত্যেক ধর্ম্ম স্থান পেয়েছে। তবে অধিকাংশ মার্কিন প্রোটেষ্টান্ট গির্জ্জায় উপাসনা করে। রাষ্ট্রশক্তি কোন ধর্ম্মের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করেনা। গির্জ্জার জন্যে গভর্ণমেন্ট এক কপর্দ্দকও ব্যয় করেনা। গির্জ্জার সঙ্গে রাষ্ট্রের নৈকট্য রাখা হয় না।

এই বিরাট দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত যাতায়াতের কিছু মাত্র অসুবিধা নেই, অতি অল্প সময়ের মধ্যে পৌঁছানো যায় যে কোন স্থানে। এরোপ্লেন, বাস আর ট্রেণ—যাতায়াতের প্রধান অবলম্বন। বিরাট প্রশস্ত রাজপথগুলি দিয়ে যেন সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে জাল পাতা হয়েছে। সহর থেকে সহরে গ্রামাঞ্চলের মধ্য দিয়ে যাতায়াত করা যায়। যান বাহনের মাধ্যমে অতি অল্প সময়ের মধ্যে যে কোন স্থানে পৌঁছুনো যায়। আমাদের দেশে যেমন ট্রেণে ছত্রিশ মাইল যেতে দুঘণ্টার ওপর লাগে, ওখানে পুরো এক ঘণ্টাও লাগে না, এরূপ পার্থক্য। বড় বড় রাস্তা দিয়ে মোটরে যেতে যেতে ভারি আনন্দ পাওয়া যায়। ঘরের মোটরের সংখ্যাই বেশী। মাল বইবার অতিকায় মোটর লরীগুলি এক উপকূল থেকে অন্য উপকূলে বিশাল সংখ্যক পণ্যভার নিয়ে যাতায়াত করে। সত্তর লক্ষ শ্রমিক এক কোটির ওপর মাল বইবার মোটর লরীর শ্রমশিল্পে নিযুক্ত। রেলপথগুলি প্রাইভেট কোম্পানীগুলির হাতে। ট্রেণে ভ্রমণ অত্যন্ত আরামদায়ক। সাত হাজার বিমান ঘাঁটি। বছরে দেড় কোটির ওপর লোক বিমান ঘাঁটিতে ওঠা নামা করে। এক মাত্র ওয়াশিংটনেই বছরে দুহাজারের ওপর লোক বিমানে যাওয়া আসা করে থাকে।

মার্কিণ জীবন যাত্রার মান অতি উন্নত। ভারতবাসীদের জীবনযাত্রার মান অপেক্ষা চার পাঁচ গুণ বেশী। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের তালিকায় যে হিসাব পাওয়া যায়, তা'তে গড়পড়তা হিসাবে একটি মার্কিণ এক বছরে অষ্টনব্বই পাউণ্ড ফল, ২৫ পাউণ্ড মুর্গির মাংস, ১৪৫ পাউণ্ড অন্যান্য মাংস, ১৪৮ পাউণ্ড টাট্‌কা আর পাত্রে রাখা শাকসব্জি, ৩৫৬টি ডিম আর প্রায় ১৯পাউণ্ড আইসক্রিম বছরে উদরস্থ করেছে। তোমরা তো একরকম নুন ভাত খেয়েই আধমরা হয়ে রয়েছ। কজনই বা এরকম খাবার পাও।

খাদ্যাভাবে ও খাদ্যের ভেজালের চোটে আমাদের দেশে যক্ষ্মা প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধি লেগেই আছে, আমেরিকায় ভেজাল খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায় না। সব খাঁটি। আমেরিকায় নিরক্ষরতা নেই। শিক্ষিত শ্রেণীর লোক বেকার থাকে না। এক লক্ষ দশ হাজার অবৈতনিক সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়, আর তিন হাজার পাঁচশো বে-সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় আছে। বিদ্যাশিক্ষা এখানে বাধ্যতামূলক। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১,৮১২—৮৫৯টী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এর অন্তর্ভুক্ত। ৩১১টী কলেজে বৃত্তিশিক্ষা ও শিল্পশিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষকদের কলেজ বা মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৯৩ আর জুনিয়র কলেজের সংখ্যা ৫১৩। কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়থেকে প্রতিবর্ষে প্রায় তিনলক্ষ আশী হাজার ছাত্র ডিগ্রী লাভ করে। গভর্ণমেণ্ট চাকুরির জন্যে আমেরিকায় কোন হটগোল হয়না। সমাজতন্ত্রবাদকে মার্কিন জাতি কার্য্যে পরিণত করছে। কিন্তু এর তথ্যের সঙ্গে মার্কিণতন্ত্রের ধারা সম্পূর্ণ পৃথক। মার্কিণরা ধনী, কিন্তু সামাজিক মর্য্যাদার এখানে প্রাধান্য নেই। অর্থকৌলিন্য বা আভিজাত্যের গর্ব্বস্ফীতি বোধ বা তজ্জনিত বহিপ্রকাশ নেই। উপর তলার মানুষ নীচের তলার মানুষের সঙ্গে মেশামেশি করতে দ্বিধাগ্রস্ত হয় না। আমাদের দেশে কানাপুংকে পদ্মলোচন বলা হয়, এই যা পার্থক্য। ও দেশে আভিজাত্যের বড়াই নেই, বিদ্যার অহঙ্কারও প্রকাশ পায় না।

নিউইয়র্কে একজন কারখানার শ্রমিক হপ্তায় প্রায় একশো ডলার অর্থাৎ সাড়ে চারশো টাকা পায়। একজন মধ্যবিত্ত চাষী বছরে রোজগার করে প্রায় পাঁচ হাজার ডলার। প্রত্যেক আমেরিকানের শ্রমের মর্য্যাদা বোধ আছে। রেলওয়ে ষ্টেসনে বিমান ঘাঁটিতে যুবক ও বৃদ্ধেরা তাদের দুটো তিনটে বোঁচকা বুচ্‌কি নিজেরাই বয়ে নিয়ে যায়, কুলির জন্যে অপেক্ষা করে না। আমাদের দেশে কুলির ওপর মোট না চাপালে মান যায়। আজ ১৯৬১ খৃষ্টাব্দেও নিজেদের মাল বয়ে নিয়ে যাওয়ার স্পৃহা এদেশের লোকের হোলো না। এখনও মানের বড়াই! সৌজন্য, আন্তরিকতা, সৌহার্দ্দ্য, সম্প্রীতি, কর্ম্মদক্ষতা আর সাহায্য করার মনোবৃত্তি দেখাতে কোন মার্কিন কুণ্ঠাবোধ করেনা। বিদেশী ভ্রমণকারীদের মনে যাতে আমেরিকা সম্বন্ধে উচ্চ-ধারণা হয় এজন্যে প্রত্যেক মার্কিণ সর্ব্বদা সচেষ্ট। বিদেশীর প্রতি অশিষ্টাচরণ এদের স্বভাববিরুদ্ধ। রেস্তোরাঁয়, মিউজিয়মে, প্রাইভেট অফিসে অথবা সাধারণ কার্য্যালয়ে হাসি মুখে এরা সকলকে আদর আপ্যায়ন করে, আর অবিলম্বে এসে আগন্তুকের সুবিধা অসুবিধার প্রতি নজর নেয়। পথ হারিয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে এরা এগিয়ে এসে নবাগতকে গন্তব্য

স্থানে পৌঁছে দেয়। ভদ্রব্যবহার দেখাতে মার্কিণরা অত্যন্ত পটু। আতিথেয়তা দেখাতে এরা দ্বিধাবোধ করেনা। অতিথির সুখস্বচ্ছন্দতা ও সুবিধা সুযোগের দিকে মার্কিণরা বিশেষ দৃষ্টি দেয়। অতিথির কুসংস্কার, ভাবপ্রবণতা ও মতামতকে অবজ্ঞা করে না, এ বিষয়ে এরা খুব সহিষ্ণু, ধুতি চাদর পরে গেলেও হাসেনা. জাতীয় পোষাক পরার জন্যে সমাদরও করে। আমাদের দেশের মোটর ড্রাইভার, ট্রাম বা বাসের কণ্ডাকটাররা যেরূপ অভদ্র ব্যবহার করে—আর গাড়ী থামতে না থামতে ট্রাম বাস চালিয়ে দেয়, ভ্রূক্ষেপ করে না যাত্রী মরে গেল কি বেঁচে রইলো, উঠতে পারলো কি না পারলো, সেরূপ ব্যবহার করেনা ওদেশের এই শ্রেণীর ব্যক্তিরা। যাত্রীদের সুখসুবিধার দিকে তাদের সর্ব্বদা লক্ষ্য, বিরক্ত বা বদমেজাজি নয়—বয়স্ক লোকেরা, সন্তান সহ মায়েরা আর স্ত্রীলোকেরা যখন বাসে ওঠা নামা করে তখন কণ্ডাক্টাররা সর্ব্বদাই সাহায্য করে থাকে। আমাদের দেশের কণ্ডাক্টারদের মত ব্যবহার করে না। আমেরিকায় গরু ভেড়া ছাগলের মত যাত্রীদের বাসের মধ্যে ঠেসা ঠেসি করে ঢুকিয়ে নেওয়া হয়না, আমাদের এখানে দুবেলাই ঘটছে। কণ্ডাকটারদের কাছে এদেশের যাত্রীদের জীবনের কোন দাম নেই। আমাদের এখানে বয়োজ্যেষ্ঠদের কোন সমাদর নেই—একালের মানুষের কাছে। আমেরিকায় বয়স্ক লোকের প্রতি তরুণরা সম্মান দেখায়, নিজেরা উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে বসায়। আমাদের দেশের ছেলে মেয়েরা পাশ্চাত্য জাতির ভালোটা নেয় না, মন্দটাই অনুকরণ করে সাহেব মেম সাজে, তাই এদেশ দুর্গতির চরম সীমায় এসে পৌঁছেচে।

আমেরিকার পদস্থ কর্ম্মচারীদের আচার ব্যবহার প্রশংসনীয়। আমাদের দেশে চলেছে একচেটিয়া ঘুষ—ঘুষ না দিলে কোন কাজ হয় না। ঘুষের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন করবে তারই সর্ব্বনাশ করা হবে। ওদেশের কর্ম্মচারীরা ঘুষ নেয় না। এদেশে ঘুষখোরের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। এখানে ছোট খাটো সরকারী কর্ম্মচারীরা যে ভাবে অহংমন্য ভাব দেখায়, আমেরিকায় এরূপ ভাব কেউ দেখায় না। সকলেই সাহায্য করতে ব্যস্ততা প্রকাশ করে। আমেরিকার সংবাদপত্রগুলি সাংস্কৃতিক, ধর্ম্মসংক্রান্ত, বৈজ্ঞানিক ও জন সাধারণের জানবার উপযোগী সংবাদগুলি প্রকাশের দিকে অত্যন্ত নজর দেয়, রাজনীতি সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশটা মুখ্য বলে মনে করেনা বা রাজনৈতিক বক্তৃতাগুলিকে ফলাও করে কাগজে প্রকাশ করে না। আমেরিকার কবি সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের প্রধান ব্যক্তিগণকে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় প্রাধান্য দেওয়া হয়। সংবাদপত্রে রাজনৈতিকদের স্থান এদের নীচে। যে সব সংবাদ জানবার জন্যে জনসাধারণ আগ্রহশীল, সেই সব সংবাদই সর্ব্বাগ্রে প্রকাশ করা হয়। এদেশের সংবাদপত্রে মন্ত্রীদের বক্তৃতা প্রচারের জন্যে অন্যান্য খবর সংক্ষিপ্ত করা হয়, কিন্তু ওদেশে যাঁরা ধর্ম্ম সাহিত্য বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে স্থান লাভ করেছেন তাঁদের বক্তৃতা প্রকাশের প্রাধান্য সর্ব্বাগ্রে থাকে, স্থানাভাব হোলে মন্ত্রী বা অন্যান্য সরকারী পদস্থ ব্যক্তির ভাষণ সংক্ষিপ্ত বা অনুক্ত করা হয়। ওদেশে মন্ত্রী-মণ্ডলী বা উল্লেখযোগ্য উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীকে কোন জন-হিতকর কার্য্যের উদ্বোধন করবার সুযোগ দেওয়া হয় না—পাছে রাষ্ট্রীয় কার্য্য পরিচালনার সময় অপব্যয়িত হয়। ফলে দেখা যায় ওখানে সেতু রেলপথ, পার্ক, বিদ্যালয়, হাসপাতাল প্রভৃতির উদ্‌ঘাটন বা উদ্বোধন উৎসব অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করবার সুযোগ মন্ত্রী বা অন্যান্য পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীদের দেওয়া হয় না। রাজনৈতিক নেতারা যে সব বিষয় তাঁদের বহির্ভূত, সে সব সম্পর্কে প্রকাশ্য ভাবে সাধারণের সমক্ষে মতামত দেন না। আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতারা হলুদের গুঁড়ো, ঝালে ঝোলে অম্বলে আছেন। আমেরিকার সহর গুলি অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটী। রাস্তার ওপর মাল-পত্রের ছড়াছড়ি নেই, হাট বাজার ও বসে না। রাস্তায় এ দেশের মত হল্লা হয় না। আড্ডাবাজ লোকের সংখ্যা নেই বল্লেই চলে। ও দেশে ফুটপাথের ওপর দিয়ে যাতায়াত করার নিয়ম।

নিয়মানুবর্ত্তিতা, কর্ম্মদক্ষতা, সৌজন্য, নম্রতা এবং দায়িত্ব-বোধ মার্কিণ জাতির কাছ থেকে আমাদের শিখবার আছে। ওদেশের ছেলে-মেয়েরা আড্ডাবাজ নয়। ফোর্ড, কার্নেগি, রকফেলার প্রভৃতি মার্কিণ ধনকুবেররা বিরাট শ্রমশিল্পের, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক এবং বৈজ্ঞানিক যাদুঘর প্রতিষ্ঠানের জন্যে কোটি কোটি ডলার ব্যয় করেন। জনকল্যাণের জন্যে প্রচুর দানের ব্যবস্থাও করে থাকেন। এর জন্যে এঁরা গঠন করেছেন বিশাল অর্থভাণ্ডার। লক্ষ লক্ষ ডলার পৃথিবীর নানা অংশে বিশ্বমানব কল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়। ডিট্রয়েটে হেনরি ফোর্ড মিউজিয়ম চৌদ্দ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত; মার্কিণ জাতির শৈশব অবস্থা থেকে আজ পর্য্যন্ত উন্নয়ন ও বিবর্দ্ধনের ইতিহাস ও বিরাট আলেখ্য এই মিউজিয়ামের মধ্যে সংরক্ষিত রয়েছে। গ্রীণফিল্ড গ্রামে প্রায় একশত বাড়ীর মধ্যে জাতীয় জীবনের প্রতিটি স্তর চিত্রিত রয়েছে। মার্কিণ পূর্ব্ব পুরুষগণের জীবন যাত্রার পদ্ধতিগুলিও এখানে এলে দেখতে পাওয়া যায়। জাতির নীহারিকা যুগের নিদর্শন মিউজিয়মে রয়েছে।

বিখ্যাত মার্কিণদের গৃহগুলি এখানে রাখা হয়েছে। এডিসনের জন্মস্থান, প্রথম ফোর্ড মোটরগাড়ী যে চালাঘরে তৈরী হয়েছিল সেটি, যে রসায়নাগারে এডিসন তাঁর বহু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেছিলেন সেটি, আজও সংরক্ষিত আছে। মার্কিণ জাতির বয়স তরুণ, ১৫০ বছর মাত্র হোলেও এদের ঐতিহাসিকেরা ভূগর্ভ খননের দ্বারা প্রাচীন আমেরিকার তথ্য সংগ্রহে ব্যস্ত, যাতে আমেরিকায় প্রাচীন ইতিহাস গড়ে তোলা যায়। আমাদের দেশের কোন ঐতিহাসিক আজও পর্য্যন্ত সন্তোষজনক প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখেননি, প্রামাণ্য উপাদানও সংগ্রহ করেননি। প্রত্যেক মার্কিন জীবনটা যেন যন্ত্রচালিত। ঘর ঝাঁট দেওয়া থেকে সুরু করে রান্না কাপড়কাচা সব কিছুই যন্ত্রের দ্বারা সম্পন্ন করা হয়, মানুষের স্থান নেই কোথাও। রাস্তার পুলিশ যানবাহন চলাচল প্রভৃতি সম্পর্কে জনসাধারণের স্বার্থটাই বিশেষ করে দেখে, এজন্যে

কোন পথকেই ভিড়াক্রান্ত করে যাতায়াতের ব্যাঘাত বা বিলম্ব ঘটাতে দেয় না। আমাদের দেশে দু বেলাই যানবাহন চলাচলের পথ ভীড়াক্রান্ত হয়ে ওঠে। জনসাধারণ অসুবিধায় পড়ে। মার্কিণরা মাংসভোজী জাতি, তবে অনেক মার্কিন আছেন যাঁরা আংশিক ভাবে নিরামিষাশী।

মার্কিণ গার্হস্থ্যজীবন সাধারণতঃ রীতিহীন। সর্ব্বোত্তম জীবন যাত্রার মান এবং আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ মার্কিণের মানসিক অবস্থা সুস্থ নয়, সন্তোষের অভাব পরিলক্ষিত হয়। তার কারণ যন্ত্র সভ্যতার চরমোৎকর্ষ লাভ হওয়াতে আমেরিকার অধিবাসীরা ধনৈশ্বর্য্য বিলাসব্যসন ও পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্যের বহু প্রকার উপকরণ করায়ত্ত করে আর আহার্য্যের প্রাচুর্য্যে স্ফীত হয়ে, মানসিকতার ক্ষেত্রকে উর্বর করতে পারছে না। মাথা পিছু হিসেব করলে দেখা যায় তিনজন বিবাহিত ব্যক্তির মধ্যে একজনের বিবাহ বিচ্ছেদ, তাছাড়া আছে' স্বামীস্ত্রীর মধ্যে স্বতন্ত্র বাস,পলায়ন প্রভৃতি। এজন্য সন্তানরা কষ্ট পায়। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে এই দেশে। তার কারণ আছে। মার্কিণ নূতন জাতি। এর পশ্চাতে নেই কোন ঐতিহ্য। নতুন কিছু করবার দুর্দ্দমনীয় স্পৃহা থাকায় দাম্পত্য মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকেনা। সাময়িক সুযোগের উদ্দেশ্যে বিবাহ করে শেষে নানা প্রকার ঘটনার মধ্যে দিয়ে এ। চলতে থাকে. তারপর বিবাহ বিচ্ছেদের মাধ্যমে মার্কিন স্ত্রী পুরুষ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, ফলে মানসিক সুস্থতার অভাব ঘটে।

বর্ত্তমানে অবশ্য আমেরিকা এবিষয়ে সচেতন হয়ে উঠছে, ভারতীয় আদর্শ গ্রহণ করে পারিবারিক জীবনকে শান্তিপূর্ণ করবার চেষ্টা করছে। তার কারণ আমেরিকায় রামকৃষ্ণ মিশনের আনুকুল্যে ভারতীয় ভাবধারা প্রবেশ করেছে—আর এই ভাবধারায় অবগাহন করে বহু মার্কিণ স্ত্রী পুরুষ অধ্যাত্ম পথের যাত্রী হয়ে উঠেছে। এখানে আদর্শ মহিলারও অভাব নেই—যারা পতিপরায়ণা ও পবিত্র জীবন যাপন করছে, তবে তাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। আমেরিকার লোকেরা খুব ভদ্র, নম্র, সরল ও সহিষ্ণু। এদের বন্ধুপ্রীতি অসাধারণ। ছাত্রছাত্রীরা আদর্শপরায়ণ, অধ্যয়নশীল. শান্তশিষ্ট বিনয়ী ও অধ্যবসায়ী। ওদেশের ছাত্রছাত্রীরা সময়ের মূল্য বোঝে, আমাদের ছাত্রছাত্রীরা বোঝে না। এই সব কারণেই আমেরিকা আজ বিশ্বের মধ্যে বিশেষ উন্নতিশীল হয়ে উঠতে পেরেছে, তবে রাজনীতি নিয়ে যাঁরা পাশা খেলছেন তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁদের স্বরূপ মাঝে মাঝে আমরা পেয়ে থাকি। আশাকরি আজকের আমেরিকা সম্বন্ধে তোমাদের মোটামুটি একটা ধারণা হবে। এদের সদ্গুণগুলি গ্রহণ করে তোমরা জাতিকে উত্তম ভাবে গড়ে তোলো, এইটুকুই তোমাদের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ।

[পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাহিনীর সার-মর্ম]

সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ-সাহিত্যিক টমাস্ হুড রচিত

একটি রোমাঞ্চকর গল্প

সৌম্য গুপ্ত

আমার এক বিমান-বিহারী বেলুনবাজ (Balloonist) বন্ধুর কাহিনী বলছি। কাহিনীটি সত্য…তাঁরই জীবনের কাহিনী। কাহিনীটি তিনি যেমন বলেছিলেন, তাঁর ভাষায় ও বর্ণনায় পালিশ না দিয়ে তব. তা বলছি।

*   *   *   *

বন্ধু বললেন—সেবারে 'ভক্সহল্' (Vauxhall) সহর থেকে বেলুনে চড়ে আকাশ-পথে বিহারে বেরুবো—ঠিক করেছি…আমার এক বন্ধু মাডর জেদ ধরলেন, তিনি হবেন বেলুনে আমার সাথী। আকাশ-পথে অনিশ্চিত বহু বিপত্তির আশঙ্কা আছে—এ কথা তাঁকে বলা সত্ত্বেও তিনি নিবৃত্ত হলেন না—তখন স্থির হলো, তাকে সাথী নিয়ে এবারে বেলুনে উড়বো।

যাবার দিন যথাসময়ে বেলুন তৈরী—মাঠে অসংখ্য লোক জমেছে—আমার আকাশ-পথে যাত্রা দেখতে…মাডরের কিন্তু দেখা নেই। নির্দ্ধারিত সময় আসন্ন, তবু কোথায় মাডর? বেলুনের নীচে যে ঝুলন্ত ঝুড়ির মতো গাড়ী (Car), তাতে দুটি আসন, একটি আসন আমার জন্য, অপরটি মাডরের জন্য। মাডরের কিন্তু তখনও দেখা নেই। শুধু দেখা নয়, কোনো খবর পর্য্যন্ত নেই!

যথাসময়ে আমি বেলুনের গাড়ীতে বসলুম…বেলুনের দড়ি খুলে দেওয়া হলো · শেষ-দড়িটি খোলা হবে, এমন সময় ভিড় ঠেলে জোয়ান-চেহারার এক ভদ্রলোক পাগলের মতো ছুটে এলেন এগিয়ে। এসে তিনি বললেন—আমি হবো আপনার সঙ্গী…একটা আসন তো খালি—যাঁর যাবার কথা ছিল, তিনি যখন এলেন না, দয়া করে আমাকে নিন্ সঙ্গে!

কী তার আগ্রহ…আকুল-কণ্ঠে কাতর অনুনয়!

তাঁকে চিনি না, জানি না—চোখে কখনো তাঁকে

দেখিনি। তাঁর পরিচয় সম্বন্ধে পাঁচ-সাতটা প্রশ্ন করে যে জবাব পেলুম, বুঝলুম—সম্রান্ত-বংশীয় ভদ্রলোক! তাঁকে বিপদ-আপদের কথা বললুম। তিনি বললেন—তিনি কোনো ভয় করেন না। তারপর মিনতি—দয়া করে নিয়ে চলুন…আপনার বেলুনে যখন জায়গা রয়েছে।

এমন যাঁর আগ্রহ, তাঁকে রোধ করা যায় না। বললুম,—চলুন তবে সঙ্গে!

এ কথা শুনে তিনি বেলুনে উঠে খালি আসনে বসলেন। তারপর বিপুল জনতার বিপুল হর্ষধ্বনি আর করতালি-নাদের মধ্যে দোদড়ি কেটে বেলুন উঠলো উঁচু—মাটি ছেড়ে আকাশে। মাটির দালান বাড়ির ছাদ [illegible] মাথা পার হয়ে বেশ খানিকটা উপরে বেলুন উঠেছে সহসা পানে চেয়ে দেখি, তিনি বেশ [illegible] ভাব! আগে যে সব সাথী নিয়ে আকাশে উড়েছি, নানা নারী পুরুষ, [illegible] উপরে উঠলে তাদের মধ্যে [illegible] দৃষ্টি! কিন্তু এঁর [illegible], মুখে চোখে [illegible] আর [illegible] ভাব! দেখে বেশ খানিকটা আশ্চর্য হলুম।

প্রশ্ন করলুম—আগে কখনো বেলুনে উঠেছিলেন?

তিনি বেশ সহজ-কণ্ঠে বললেন—কখনো না!

তাকে দেখে মনে হলো—ট্রেনের কামরায় মানুষ যেমন নিশ্চিন্ত আরামে বসে, তিনিও তেমনি বসেছেন বেশ স্বাচ্ছন্দ্যে…উড়ন্ত গাড়ীর ওপর যেমন সহজ-স্বচ্ছন্দ ভাব…এঁরও যেন তেমনি।

বেলুন বেশ উর্ধ্বে আকাশ পথে উড়ে চললো। আরো উর্ধ্বে বেলুনকে তোলবার জন্য আমি বেলুনের ভার কমাবার জন্য দুটো বালি-ভরা থলি (Sand-filled Bags) নীচে ফেলে দিলুম। সঙ্গী-ভদ্রলোক বলতে লাগলেন—আরো থলি ফেলে দিন আরো…আরো…বেলুন আরো হালকা করে দিলে আরো উঁচুতে উঠবে!

বলার কি সহজ ভঙ্গী—যেন বালকের সারল্যমণ্ডিত কথা!

বাতাসের বেগে আমাদের বেলুন চললো উত্তর দিকে… দিনটি ছিল নির্মেঘ—স্বচ্ছ রৌদ্র-কিরণে ঝলমলে, তাই উপর থেকে নীচেকার পৃথিবীর সমগ্র রূপ চোখে পড়ছিল…নগর-গ্রাম, পথ ঘাট, নদী-নির্ঝর, গিরি-বন—যেন নানান বর্ণে আঁকা ছবি…তার কোথাও আবিলতা নেই! যে সব জায়গার উপর দিয়ে যাচ্ছিলুম, সে সব নির্দেশ করে বুঝিয়ে সঙ্গী-ভদ্রলোকটিকে আমি বলতে লাগলুম…তিনিও শুনে খুব খুশী হচ্ছিলেন এবং সে আনন্দ নানাভাবে প্রকাশও করছিলেন।

নীচের দিকে নির্দেশ করে আমি বললুম—ঐ হলো 'হৌস্টন্' (Houston) সহর! শুনে তিনি অর্থহীন কি কতকগুলো কথা বললেন, তারপর তাঁর প্রশ্ন—পৃথিবী থেকে কত মাইল উঠে এসেছি? জবাব দিলুম—তা প্রায় মাইল দেড়েক হবে! এ কথা শুনে তিনি যেন চমকে উঠলেন…বললেন—বটে! ওখান থেকে কেউ দেখলে আমাকে চিনতে পারবে? হেসে আমি বললুম—অসম্ভব!

আমার এ কথায় তিনি যেন খুশি হলেন না—মনে যেন বেশ অস্বস্তি! তিনি বলতে লাগলেন—আরো থলি ফেলে বেলুন হালকা করে আরো উঁচুতে উঠুন। নীচে থেকে কেউ যেন বেলুন না দেখতে পায়!

আমি বললুম—কোনো ভয় নেই। বেলুন দেখলেও কেউ চিনতে পারবে না, বেলুনে কে বা কারা আছে।

তবু তাঁর অস্বস্তি যায় না। তখন আমার কেমন মনে হলো—তাঁর এ বেলুনে আমার সাথী হওয়া—স্রেফ খেয়ালের কাজ নয়…কোনো বিশেষ প্রয়োজন-বশে বেলুনে উঠেছেন…এখন ভয় হচ্ছে, পাছে তার কোনো আত্মীয়-বন্ধু তাঁকে দেখতে পান! আমি বললুম—হৌস্টনে আপনার বাড়ী? তিনি বললেন—হ্যাঁ! বলেই কি তাড়াতাড়ি—বেলুন আরো উপরে তুলুন…আরো উপরে!

আমি বোঝালুম—তা হতে পারে না…বেলুন অনেক উঁচুতে উঠেছে…নীচে ধূ-ধূ সমুদ্র… বাতাসে বেশ বেগ… আরো উপরে উঠলে নানা বিপদ ঘটতে পারে…বেলুন ফেঁসে যেতে পারে!

কিন্তু কে শোনে সে কথা! তিনি বললেন—আমি বেলুন আরো হালকা করবোই। বলেই তিনি তাঁর আসনের গদি এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাথার হ্যাট, গায়ের কোট, ওয়েষ্ট-কোট, ওভার-কোট ছুঁড়ে নীচে ফেললেন।

বেলুন একটু হালকা হলো—অত উঁচু আকাশে একটা

সামান্ত জিনিসেরও ওজন আছে। এ জিনিষগুলো ফেলবার পর বেলুন যেন থানিকটা হালকা হয়ে আরো উপরে উঠলো!

বেলুন চলেছে বাতাসের বেগে ঊর্দ্ধলোক ভেদ করে···নীচে পৃথিবী দেখাচ্ছে যেন অস্পষ্ট রেখার মতো। সঙ্গীর তখনও স্বস্তি নেই···তাড়াতাড়ি আরো ছুটো বালির থলি ফেললেন পর পর· বেলুন উঠলো আরো উপরে। সঙ্গী বলে উঠলেন—আরো উপরে ওঠা চাই···আরো উপরে! কেউ তাহলে দেখতে পাবে না!

আমার ভাবনা হলো। আমি বললুম—কোনো ভয় নেই···দুরবীণ চোখেও কেউ আমাদের দেখতে পাবে না।

সঙ্গী বললেন—না, না, না, জানেন না···মাইল্‌স্ সহর থেকে দেখে ফেলে যদি!

আমি বেশ জোর গলায় বললুম, অসম্ভব!

সঙ্গী বললে— আপনি জানেন না—মাইল্‌সের পাগলা-গারদের লোকগুলো···তাদের নজর চলে আকাশ ফুঁড়ে! হ্যাঁ!···

মাইল্‌সের পাগলা-গারদ! তার মানে? তখন আমার মনে হলো—সর্বনাশ! তাহলে লোকটা পাগল···পাগলা-গারদ থেকে পালিয়ে এসে আমার বেলুনে চড়েছে নাকি? সন্দেহ দৃঢ় হলো—তার মুখ-চোখের ভাব দেখে! এখন উপায়?

পাগলা সঙ্গী তখন পেড়াপ্পড় ফেলতে লাগলো বেলুনের বাকী সব বালির বস্তাগুলো···বেলুন হলো খুব হালকা—আরো উপরে উঠলো। আমার মনে আতঙ্ক···বালির বস্তা নিঃশেষ না করে এ তো ছাড়বে না···তা সত্য যদি ঘটে, তাহলে বাঁচবার কোনো উপায় থাকবে না!

পাগলকে যত বোঝাই, সে বোঝে না। বেলুন যত আরো উপরে উঠছে, উল্লাস ততই বাড়ছে তার! হঠাৎ সঙ্গী বললে—আপনার ভয় করছে?

আমি বললুম, না!

সে বললে—বিবাহ করেছেন? ঘরে স্ত্রী আছে?

আমি বললুম—হ্যা, স্ত্রী আর চৌদ্দটি ছেলেমেয়ে···আমাকে এতগুলির খোরাক জোগাতে হয়।

হো-হো করে সে হেসে উঠলো···বললে—মোটে একটি স্ত্রী আর চৌদ্দটি ছেলে-মেয়ে! আর আমার···তিনশো স্ত্রী আর ষোলোশো ছেলে-মেয়ে···তারা আছে আবার কেউ চন্দ্রলোকে, কেউ নক্ষত্রলোকে। তাদের কাছে আমি যেতে চাই···হা-হা-হা···ফ্যালো আরো বস্তা···

বলেই বেলুনে বাকি যে বালির বস্তাগুলো ছিল, সে ফেলে দিলে···বেলুন আরো উঁচুতে উঠে বাতাসে ভেসে চললো। পাগল-সাথী আনন্দে মশগুল···হঠাৎ সে বললে, এখন রয়েছি শুধু আমরা দুজন···একজনকে যেতে হবে, তাহলে বেলুন আরো হালকা হবে।

এ কথা বলে তিলমাত্র বিলম্ব নয়···আমার উপর সে ঝাঁপিয়ে পড়লো আচম্‌কা···আমাকে বাগিয়ে ধরে ধাক্কা-ধাক্কি···তারপর··

কি করে একা বেঁচে ফিরেছিলুম জানি না! হুঁশ হতে এক সময় তাকিয়ে দেখি—সেই পাগল সঙ্গীটি পাশে নেই···কখন সে বেলুন থেকে ছিটকে পড়েছে নীচে—কোথায় কে জানে!
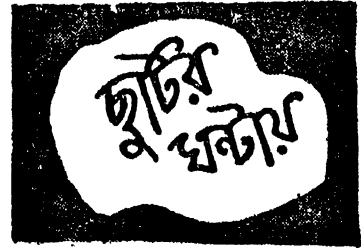
চিত্রগুপ্ত বিরচিত ও চিত্রিত

এবারে তোমাদের বিজ্ঞানের একটি বিচিত্র-অভিনব মজার খেলার কথা বলবো। এ খেলাটি আসলে হলো—ভার-সাম্যের কারসাজি। তবে এ খেলার কায়দাকানুন ঠিকমতো রপ্ত করে নিয়ে, ভার-সাম্যের (Balancing) মজার কারসাজিটি যদি তোমাদের আত্মীয়-বন্ধুদের সামনে সুষ্ঠুভাবে দেখাতে পারো তো সবাইকে রীতিমত তাক্ লাগিয়ে দেবে অনায়াসেই। বিজ্ঞানের এই মজার খেলাটির নাম—'ছুঁচ-সুতোর কারসাজি'!

'ছুঁচ-সুতোর কারসাজি' ঃ

এ খেলাটিদেখাতে হলো যে সব সাজ-সরঞ্জাম প্রয়োজন গোড়াতেই তার একটা মোটামুটি ফর্দ্দ জানিয়ে রাখি।

অর্থাৎ এ কারসাজি দেখানোর জন্য চাই—একটি চৌকোনা বা গোল আকারের কাঠের বা কর্কের '(Cork) তৈরী পাটাতন' (Board), কিম্বা 'ডার্ট-খেলার বোর্ড' (Dart-Board), গোটা কয়েক মাঝারি সাইজের মজবুত ছুঁচ (সাধারণতঃ খাতাসেলাই বা কার্পেটেরকাজের জন্য যেমন ছুঁচ ব্যবহার করা হয়, তেমনি ধরণের ছুঁচ), একগজ মোটা সুতো আর একখানি কাঁচি।

এ সব সরঞ্জামগুলি জোগাড় হবার পর, পাশের ছবিতে
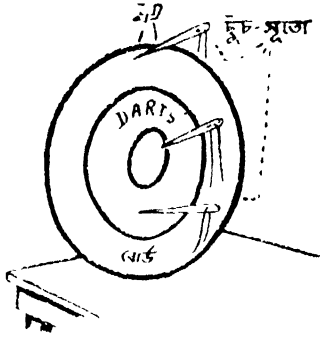
যেমন দেখানো রয়েছে, তেমনিভাবে ঐ কাঠের বা 'কর্কের' পাটাতন কিম্বা 'ডার্ট-খেলার বোর্ডটিকে' সমানভাবে দেয়ালের গায়ে ঠেশ দিয়ে দাঁড় করিয়ে অথবা পেরেক টাঙিয়ে ঝুলিয়ে রাখো। তারপর ঐ দেয়ালের গায়ে ঠেশান দিয়ে-রাখা বোর্ডের থেকে একগজ দূরে দাঁড়িয়ে, সামনের পাটাতন লক্ষ্য করে মাঝারি-সাইজের ছুঁচগুলিকে একের পর এক ছোঁড়ো সেই পাটাতনের গায়ে। ছোড়বার সময় ছুঁচের সরু-মুখটা সামনের বোর্ডের দিকে তাগ্ করে ছুড়তে হবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় হলো যতই কায়দা করে নিশানা ঠিক রেখে ছুঁচগুলিকে সামনের বোর্ডের দিকে ছোড়ো না কেন, দেখবে, প্রত্যেকটি ছুঁচই পাটাতনের গায়ে লেগে মাটিতে খশে-খশে পড়ে যাচ্ছে—কোনোমতেই বোর্ডের গায়ে বিঁধে থাকছে না! অথচ যেমনি ঐ ছুঁচগুলির ফুটোর মধ্যে, উপরের ছবির ছাঁদে, ঈষৎ লম্বা খানিকটা সুতো পরিয়ে দিয়ে, ছুঁচগুলিকে আগের মতো ভঙ্গীতে বোর্ডের পানে ছোড়া হচ্ছে—অমনি সেগুলি একের পর এক পাটাতনের গায়ে দিব্যি বিঁধে থাকছে—মাটিতে আর খশে-খশে পড়ছে না।

কেন এমন হয়, জানো? এর কারণ, ম্যাজিক নয়, বৈজ্ঞানিক ভার-সাম্যের প্রক্রিয়া! অর্থাৎ, যেমন ধনুকের তীরের (Arrow) যে মুখ ছুঁচোলো তার বিপরীত-প্রান্তে থাকে একজোড়া 'পালখ' বা 'ফাত্না' · তীরের ছুঁচোলো-প্রান্তের উল্টো দিকে এই 'পালখ' বা 'ফাত্না' আঁটা থাকার জন্য শূন্যে বাতাসের বুকে ছুটন্ত তীরের ভারসাম্য (Balance) রক্ষা পায়···তীর তাই, যাতে লাগে, বিঁধে যায়··· খশে মাটিতে পড়ে না। তীরের পেছনে এই 'পালখ' বা 'ফাত্না' না থাকলে, ছোড়ার পর সে তীর কোথাও গিয়ে বিঁধবে না—সুতো-বিহীন ছুঁচের মতোই খশে মাটিতে পড়ে যাবে। বিজ্ঞানের এই নিয়মানুসারেই ছুঁচগুলিতে সুতো পরিয়ে ছুড়লে, ঐ সুতো করে ছুটন্ত ছুঁচের ভারসাম্যের কাজ···সেজন্য বোর্ডের গায়ে লেগে সুতো-পরানো ছুঁচ আর খশে মাটিতে পড়বে না—কাঠের গায়ে বিঁধে থাকবে। এই হলো বিজ্ঞানের বিচিত্র মজার খেলা—'ছুঁচ-সুতোর কারসাজির' আসল রহস্য।

এবারে তোমরা নিজেরা পরখ করে দেখো এই অভিনব মজার খেলাটি। তবে সাবধান, এ খেলা পরখ করার সময় যেদিকে তাগ্ করে ছুঁচগুলি ছুড়বে, সেদিকে কেউ যেন থেকো না। কারণ, হাতের তাগ্ যদি ফশকায়, তাহলে ছুটন্ত ছুঁচটি হয় তো আচমকা গিয়ে কারো নাকে-মুখে-চোখে বিঁধতে পারে!

—

ধাঁধা আর হেঁয়ালি

মনোহর মৈত্র

১। আজব-ছবির হেঁয়ালিঃ

সেদিন এক চিত্রকর এসে আমাদের দপ্তরে তাঁর আঁকা একখানি আজব-ছবি দিয়ে গেছেন—তোমাদের 'কিশোর-জগৎ' বিভাগে ছাপানোর জন্য। কিন্তু সেই আজব-ছবিটি দেখে আমরা বড়ই মুস্কিলে পড়েছি—চিত্রকরের ছবিটিতে আঁকা আছে, গোটা কতক আঁকা-বাঁকা তুলির রেখা, আর চব্বিশটি ছোট-ছোট বিন্দু। কাজেই ছবিটি আগাগোড়া বিচিত্র এক হেঁয়ালি বলে মনে হচ্ছে। অথচ চিত্রকর-মশাই বার-বার বুঝিয়ে বলছেন যে—এর মধ্যে হেঁয়ালি কোথায়? ছবিটিতে এঁকেছি, খুবই পরিচিত এবং নিতান্তই

সাধারণ একটি উভচর-জীবের চেহারা—যারা জলেও বাস করে এবং স্থলেও থাকে—এমনই একটি প্রাণীর চিত্র!
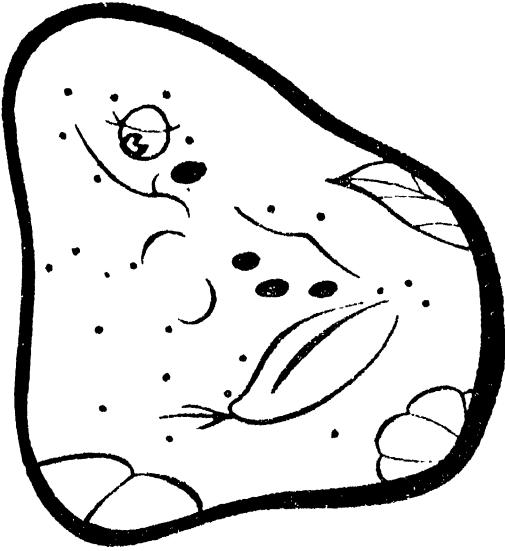
পাশেই আমরা নাছোড়বান্দা-চিত্রকরের সেই আজব-ছবি তোমাদের সামনে পেশ করলুম। দেখো তো, তোমরা কেউ যদি বুদ্ধি খাটিয়ে বিচিত্র ঐ আঁকা-বাঁকা রেখার রেখা আর চল্লিশটি ছোট-ছোট বিন্দুর মাঝে খুঁজে কোনো চিত্রকর-মশাইয়ের বর্ণনামতো সেই অতি-সাধারণ উভচর-জীবের চেহারা খুঁজে পাও! তোমাদের মধ্যে কেউ যদি এ হেঁয়ালির সঠিক মীমাংসা করতে পারো, তাহলে বুঝবো সে সত্যই বুদ্ধিতে বাহাদুর!

২। 'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত 'ধাঁধা আর হেঁয়ালি':

বড়দিনের ছুটিতে রামু গিয়েছিল পাহাড়ী-দেশে বেড়াতে। সেখানে একদিন মস্ত উঁচু একটা পাহাড়ে চড়েছিল রামু। পাহাড়টির চূড়োয় উঠতে রামুর সময় লেগেছিল ঘণ্টায় ১॥০ মাইল হিসাবে এবং সেই উঁচু চূড়ো থেকে সে নীচে নেমে এসেছিল ঘণ্টায় সাড়ে চার মাইল হিসাবে। এই পাহাড়টিতে চড়তে ও নামতে রামুর মোট সময় লেগেছিল—ছ'ঘণ্টা। তাহলে বলতে পারো, রামু যে পাহাড়টিতে চড়েছিল, সেটি কতখানি উঁচু ছিল?

রচনা: পিন্টু হালদার (বৰ্দ্ধমান)

৩। তিন অক্ষরে এমন কিছুর নাম কর যা আমাদের মাথার খুলির ভেতর আছে; প্রথম অক্ষর বাদ দিলে যা হয়, তা পাবে দরজীর কাছে; আর শেষের অক্ষরটি বাদ দিলে, জলের পাত্র হয়ে যাবে।

রচনা: রামহরি চট্টোপাধ্যায় (নবদ্বীপ)

পৌষ মাসের 'ধাঁধা আর হেঁয়ালির' উত্তর:

১। সার্কাসওয়ালার সমস্যা:

পাশের ছবিটি দেখলেই বুঝবে, সার্কাসের দলের বুদ্ধিমান সহিস-ছোকরা কিভাবে কায়দা করে খাঁচা পাঁচটিকে সাজিয়ে ভালুকটিকে বন্ধ রেখেছিল। অর্থাৎ জমীতে 'ক্রুশের' (+) ছাঁদে ১, ২, ৩ এবং ৪নং খাঁচা সাজিয়ে, সেগুলির উপরে ৫নং খাঁচাটিকে ছাদ-হিসাবে বসিয়ে দিয়ে ভালুকটিকে বন্ধ রাখার সুব্যবস্থা করেছিল। এই ভাবেই সার্কাসওয়ালার সমস্যার সমাধান হলো। এ ছাড়াও আরো অন্য কায়দায় খাঁচাগুলি সাজানো যেতে পারে।
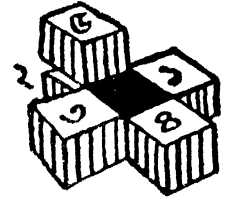
২। 'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা আর হেঁয়ালির উত্তর:

মানচিত্র

পৌষ মাসের তিনটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে:

১। চিন্ময় ও প্রবোধ মিত্র (জয়নগর মজিলপুর)
২। রামহরি চট্টোপাধ্যায় (নবদ্বীপ)
৩। আলো, শানু ও রঞ্জিত বিশ্বাস (কলিকাতা)

পৌষ মাসের প্রথম ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে:

১। পুপু ও ভুটিন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)
২। কুনু মিত্র (কলিকাতা)
৩। বাপি, গৌতম ও পিন্টু গঙ্গোপাধ্যায় (বোম্বাই)
৪। পুতুল, সুমা, হাবলু ও টাবলু মুখোপাধ্যায় (হাওড়া)

পৌষ মাসের দ্বিতীয় ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে:

১। জয়দেব চট্টোপাধ্যায় (নবদ্বীপ)
২। অশোককুমার দত্তরায় (কলিকাতা)

আজব দুনিয়া

জীবজন্তুর কথা

দেবশর্ম্মা বিচিত্রিত

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন

পথিক

ভারতীয় সাংস্কৃতিক জীবনে বাঙলার একটা বিশিষ্টতা আছে। সে বৈশিষ্ট্য তার সাহিত্যে—সামাজিক জীবনের প্রতিদিনকার চলন বলনে। ঐতিহাসিক সত্য-সমৃদ্ধ বাঙলার সাহিত্য, তার ভাব ও ভাষা। সাহিত্যের মধ্য দিয়ে বাঙলাদেশ ভারত তথা পৃথিবীর সীমাকে স্বীকার করেনি। প্রীতি ভালবাসার কথা, মিলনের গান সর্বত্র ছড়িয়ে আছে তার সাহিত্যে।

নিজের দেশের ভৌগলিক সীমা পেরিয়ে সর্ব-ভারতীয় চিন্তায় দীর্ঘকাল চলেছে বাঙলার সাহিত্য-সম্মেলনের নব নব যাত্রা। এশিয়ায় সম্ভবতঃ ইউরোপেও এমনটা খুব একটা দেখতে পাওয়া যায় না। শুধু সৃষ্টি নয়, তার প্রেরণা ও রসধারার প্রবাহ সর্বকালে সর্বমনে অনুরঞ্জিত করা, একাকার হয়ে 'এক' হয়ে যাওয়া।

রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম যাত্রা আরম্ভ হয়। ভাষা ও ভৌগলিক দিক হতে বাঙালী বাঙলার বাইরে প্রবাসী—কিন্তু তার গান, তার বাণী নিখিল ভারতের হৃদয়পুরে।

এমনিভাবে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বাঙালীর মন-চেতনার নব-নব জীবন আনন্দের বাণী বহন ক'রে এসেছে। কটক অধিবেশনে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে শ্রীদেবেশ দাশের বৃহত্তর বঙ্গ শাখায় প্রবাসীর অন্তরে বহু কালের আকাংখিত লালিত সেই নিখিলের' পিয়াসী মন রূপ লাভ করলো নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন মূল-সভাপতি। তাঁর ভাষণে বাঙলা সাহিত্যের বিশ্বমন ও বিশ্বজনীনতা প্রকাশ লাভ করেছে। তাঁর ভাষণে তিনি বার বার উল্লেখ করেছেন—"নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন" এর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা। সেই আশীর্বাদ বহন ক'রে সম্মেলনের কর্মকর্তারা ভারতের বিভিন্ন স্থানে অভাবনীয় সম্মান ও আন্তরিকতা লাভ করেছেন।

বাঙলা সাহিত্য ভারতবর্ষের হৃদয় জুড়ে ঘুরে ঘুরে আজ হৃদয়পুরে এসেছে ৩৭ তম অধিবেশনে।

১৪ বৎসর পর জোড়াসাঁকোর মহর্ষি-ভবনের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে কবিতীর্থে আরম্ভ হয় ২৩ শে ডিসেম্বর শনিবার। বিখ্যাত গুজরাটী সাহিত্যিক উমাশঙ্কর যোশী তার উদ্বোধন করেন।

সম্মেলনে সমাগত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হতে প্রায় তিন শত প্রতিনিধি ও সাহিত্যানুরাগীদের স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন কলিকাতার পৌর-প্রধান রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার। তিনি বলেন, ভারতবর্ষের সম্মুখে বাংলার ঐতিহ্য আলোকমালায় উদ্ভাসিত। সেই আলোর শিখা যেন ভারতের ভবিষ্যৎ পথের বর্ত্তিকা হয়। রবীন্দ্র-ভারতীতে আয়োজিত রবীন্দ্রভারতীর উদ্যোগে অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীর কালীঘাটের পট, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, মুকুল দে, সুনয়নী দেবী প্রমুখ শিল্পীদের অঙ্কিত চিত্র ও রবীন্দ্র প্রতিকৃতি তথা রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ও বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত রবীন্দ্র-সাহিত্যের অনুবাদ-গ্রন্থরাজি শুচিস্নিগ্ধ পরিবেশে একটা স্বপ্নরাজ্যের আনন্দ দান করেছে।

সম্মেলন-উদ্‌বোধক যোশী মহাশয় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য আলোচনা প্রসংগে বলেন, রবীন্দ্রনাথ ভারতের আত্মাকে বাণীরূপ দিয়েছেন। যে চারজন মহাকবির সৃষ্টির মধ্যে ভারতের আত্মা রূপলাভ করেছে তাঁরা হলেন, বাল্মীকি, বেদব্যাস, কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ,...ভারত চিন্তাই ছিল রবীন্দ্রনাথের অন্তরের প্রিয়তম ধ্যান।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, কলিকাতা মহানগরীতে রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।......এই নগরী কবি-প্রতিভার উন্মেশ ক্ষেত্র, তাঁর বৃহত্তর কর্মক্ষেত্র ও কর্মজীবনে গভীর ও বহুমুখী প্রেরণার উৎস।... ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমান বিজ্ঞানের মারাত্মক রূপের কথা উল্লেখ করে বলেন,...আমরা রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সৌন্দর্যে শুধু মুগ্ধ না হয়ে তাঁর সামগ্রিক জীবন-দর্শন, তাঁর অধ্যাত্ম প্রত্যয়, তাঁর উদার ও বিশ্বজনীন, সর্বসমন্বয়কারী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবার জন্য যদি প্রস্তুত হই ও তাঁর বাণী যদি আমাদের সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে পারি তবেই আমাদের রবীন্দ্রপূজা সার্থক হবে।"

তারপর সম্মেলন-সভাপতি শ্রীদেবেশ দাশ তাঁর ভাষণে বাঙলা সাহিত্যের মনোরাজ্যে সর্বকালের ঐক্যের সাধনার কথা বর্ণনা করেন। সম্মেলন সেই সার্বজনীন ঐক্যের ও মিলনের বাণী ছড়িয়ে, —আত্মার আত্মীয়তা লাভ করে ধন্য হয়েছে। তিনি বলেন, আমাদের তীর্থযাত্রার মধ্যে সর্বত্র রবীন্দ্রনাথের ধ্যানের ভারতের ঐক্য আর অন্তরের একীকরণের মহান চিত্র দেখেছি এবং দেখাবার চেষ্টা করেছি। এক দেশ এক আত্মার বন্ধনে মণিহারগাথা ভারতকে তার সাহিত্যে গ্রথিত করবার স্বপ্ন দেখেছি।...

তারপর মূল-সভাপতি সর্বজনশ্রদ্ধেয় ও প্রিয়, প্রবীণ কবি

শ্রীকালিদাস রায়ের ভাষণ সর্বস্তরের মানুষের প্রীতি প্রেমের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। জোড়াসাঁকোর পুণ্যতীর্থে শ্রীকালিদাস রায় তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে "একটা থিসিসের চেয়ে একজন প্রখ্যাত সাহিত্যিকের সারা জীবনের মৌলিক অবদানের মূল্য কি কম?"—এই প্রশ্ন করেন। সাহিত্যিক সম্মাননায় বিশ্ববিদ্যালয়কে ব্রতী হতে আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর ভাষণে বলেন, প্রত্যেক স্কুল-কলেজে সাহিত্যিক আস্টেনীর সৃষ্টি করা উচিত এবং শিক্ষকদের সাহিত্য পাঠনা যাহাতে কেবল পরীক্ষাভি-মুখিনী না হইয়া হৃদয়াভিমুখিনী হয়, সে দিকে অবহিত হওয়া উচিত। ভারতের মুক্তি সংগ্রামে ও জাতীয়তার উদ্‌বোধনে বাংলা সাহিত্যের অমূল্য অবদানের কথা উল্লেখ ক'রে বলেন, বাংলা সাহিত্যকেই জাতীয় সংহতিসাধনের, জাতীয় চরিত্রের উৎকর্ষবিধানের ও আদর্শ নাগরিক গঠনের ভারও লইতে হইবে। পাঠাগার, সাময়িকপত্র ইত্যাদির প্রতি কবির আবেদন,—সাহিত্য পঠন ও পাঠন যত্নের সহিত করিতে হইবে।

মূল-সভাপতি তাঁর অন্তরের সকল দরদ উজাড় ক'রে দিয়ে বাঙলা সাহিত্যের সার্বজনীন মঙ্গল ও কল্যাণ পথটির নির্দেশ দিয়েছেন। রবীন্দ্রপ্রভাবের কথা উল্লেখ করে শ্রীকালিদাস রায় একটা দীর্ঘ আলোচনা করেন। তিনি বলেন, "আমাদের জাতি দুর্বল, দরিদ্র, অসংযত, অসংহত, শিক্ষাবিমুখ ও সঙ্ঘশৃঙ্খলমুক্ত, কিন্তু শৃঙ্খলাযুক্ত নয়। কাজেই ইউরোপীয় সাহিত্য ও সমাজের দোহাই দিয়া লাভ নাই। শুচি-সুন্দর উদাত্ত মহান ভাবগুলিকে কি করিয়া আর্টের অঙ্গহানি না করিয়াই কৌশলে সন্তর্পণে দেশময় বিকীর্ণ করা যায় তাহা আপনারাই জানেন।"

মূল অধিবেশনের পর বিকাল ৫টায় সাহিত্য শাখার উদ্‌বোধন করেন, বর্ষীয়ান কবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক। সমস্ত মনপ্রাণ জুড়ে যাঁর বাণী কল্যাণময়, সর্বকালের মঙ্গলে নিয়োজিত, উদ্‌বোধনী ভাষণে তার পরিচয় দৃষ্ট হল। শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক তাঁর ভাষণে বলেন, যাঁহারা বৃহত্তর ও মহত্তর বঙ্গের স্রষ্টা আপনারা তাঁহাদের যোগ্য বংশধর। আপনারা বাঙলার সংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক।......কবিগুরু আপনাদের ভাষাকে ঐশ্বর্যশালিনী করিয়া জগৎবরেণ্য করিয়াছেন, আপনারা নিজ অব্যভিচারী প্রতিভায় ও মনীষায় সেই সুধাসত্রের অধিকারী হইবেন। আপনাদের সর্বাঙ্গীণ অভ্যুদয় আমি কামনা করি।"

তারপর কাব্য-সাহিত্য শাখার সভাপতি শ্রীসজনীকান্ত দাস কাব্যের ও কবির ধর্ম সম্পর্কে সুন্দর মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। রবীন্দ্রনাথের কবিধর্মকে সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করে নবীন-কবিদের সম্পর্কে সাবধান বাণী দিয়েছেন,—রবীন্দ্রনাথ যে আশঙ্কা ও সন্দেহ লইয়া বিদায় লইয়াছেন, সে আশঙ্কা এখনও অনেকেরই মনে আছে। তবে একথাও আমি বিশ্বাস করি—এই যুগ এখনও যুগের কবির প্রতীক্ষা করিতেছে। এ যুগের জীবন যাত্রার শতধা বিভক্ত পথে পদে পদে যে আঘাত ও বেদনা আমাদিগকে প্রতিনিয়ত সহিতে হইতেছে তাহার অভিজ্ঞতা যেদিন উপযুক্ত প্রকাশের ভাষা খুঁজিয়া পাইবে, যাহা একান্ত ইমোশন অথবা একান্ত যুক্তিই হইবে না, সেদিনই বাংলা-কাব্যে সাহিত্যে নব অরুণোদয় হবে। আমাদের যুগের যে সকল তরুণ ভ্রান্তির পথে না গিয়া সাধনার কুটীল-দুর্গম পথে বিচরণ করিতে করিতে রক্তাক্ত চরণে একটা নূতন কিছু সম্ভাবনার প্রতীক্ষা করিতেছে, তাঁহারা এই ব্যাকুলতার কথা বুঝিবেন। সকল ফাঁকিকে লোকে স্বভাবতই অনুকরণ করিতে চায়, কঠিন এবং দুরূহকে এড়াইতে গিয়া বাঙলা দেশের তরুণ সম্প্রদায় কাব্যের নামে এই যে নিশ্চিত মৃত্যুর উপাসনা করিতেছেন এবং একটা ভ্রান্ত সহজিয়া 'কাল্ট' খাড়া করিয়া সেই তন্ত্রে সকলকেই দীক্ষিত করিতে চাহিতেছেন, তাহাতেই আশঙ্কান্বিত হইয়া সাবধানবাণী উচ্চারণ করিতেছি। তাঁহারা যেন মনে রাখেন এই অভিশপ্ত যুগের অক্ষম কবি-সম্প্রদায়ের আমি ও একজন।"

ভারতীয় সাহিত্য শাখার উদ্‌বোধক শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় একটি মনোজ্ঞ ভাষণে ভারতীয় জীবনের মূলগত ঐক্য বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্যে প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্যন্ত কিভাবে প্রতি-ফলিত হইয়াছে তাহার কয়েকটি বিশিষ্ট উদাহরণ দেন।

কথা-সাহিত্য শাখার সভাপতি শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় অনুপস্থিত থাকায় ঐ দিন তাঁর ভাষণ পাঠ করা হয় নাই। রবীন্দ্র-সাহিত্য শাখার সভাপতি খ্যাতিমান সাহিত্যিক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী রবীন্দ্রনাথের ভারত-বোধ এবং তাঁর সামগ্রিক সাহিত্যের মর্মবাণীর কথা ভাষণে বলেন। তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথ চিরকালের সুখ-দুঃখের কথা বলবার সঙ্গেই বাস্তুহারা উপেনের দুই বিঘা জমির দুঃখের কাহিনী শুনিয়েছেন—যা নিতান্তই একালের কথা।...এ যুগের মহাকবিদের কেবল প্রতিভা থাকাই যথেষ্ট নয়, সেই মহতী প্রতিভাকে স্বর্গ থেকে বিদায় নিয়ে নেমে আসতে হবে মর্ত্যের ধুলো মাটির মধ্যে; তাকে পায়ে পায়ে জরিপ করে চলতে হবে, সংসারের সমস্ত তুচ্ছ-সুখ-দুঃখকে সংসারের ছোট বড় সমস্ত সমস্যাকে স্পর্শ করতে হবে তার মনীষা নিয়ে।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বর্তমান যুগে যে চিত্র ও পরিচয় হচ্ছে তার কথা উল্লেখ ক'রে শ্রীযুক্ত বিশী বলেন, যুগের বিচিত্র নিয়মে রবীন্দ্রনাথ এখন রাজনৈতিক পাশা খেলার একটি ঘুঁটিতে পরিণত হয়েছেন। কোন জাত কত রবীন্দ্রসাহিত্যভক্ত—এই রেষারেষির পথে সকলেই প্রবেশ করতে চেষ্টা করছে ভারতীয় রাজনীতির পাস দরবারে।

ইতিহাস শাখার সভাপতি শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত তাঁর ভাষণে ইতিহাস রচনায় বাংলার অবদান সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেন। বাংলার ঐতিহাসিকদের কথা বলতে গিয়ে বলেন, বাঙালী ঐতিহাসিকরা প্রায় সবাই সব্যসাচী ছিলেন। ইংরেজী ও বাংলা দুই ভাষায় তাঁদের লেখনীর অবাধ গতি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, যদুনাথ সরকার, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ চন্দ ও নলিনীকান্ত ভট্টশালীর রচনার সঙ্গে মাসিক পত্রিকার পাঠকদের পরিচয় ছিল। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো, শ্রীসুকুমার

সেন, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন ও শ্রীনীহাররঞ্জন রায়ের রচনায় বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধি লাভ করছে। শ্রীযুক্ত গুপ্ত সমবেত সকলের কাছে কলিকাতার রাস্তার নব নব নামকরণের প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন; সমস্ত বিদেশীর নাম অপসারণ করব এমন অভিমান স্বাধীন দেশে শোভা পায় না। এমন কোনও কোনও বিদেশী আছেন যাঁরা ভৌগোলিক গণ্ডীর উর্ধ্বে। যে বিদেশীর পরিশ্রম ও চিন্তার ফলে ভারতবর্ষের লিপির পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়েছে তাঁর নাম অপসারণ করতেও চেষ্টার ত্রুটি হয়নি। পৌর প্রতিষ্ঠানের হাতে কাজের অভাব আছে একথা আশা করি কেউ বলবেন না। কলকাতার জঞ্জাল বিলোপের কাজ তাঁদেরই থাক্, কলকাতার ইতিহাস বিলোপের যে কাজ তাঁরা গ্রহণ করেছেন তা পরিত্যাগ করুন।

ঐ দিনের সন্ধ্যায় 'সঙ্গীত সায়াহ্নিকা' রবীন্দ্রভারতী প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়।

২৪শে ডিসেম্বর রবিবার সকাল ৯টায় মূল অধিবেশনের তৃতীয় পর্যায় আরম্ভ হয়।

শিশুসাহিত্য শাখার উদ্বোধক শ্রীবিমল ঘোষ তাঁর ভাষণ দেন। তিনি বলেন, বাংলার শিশু-সাহিত্যকে গলা টিপিয়া হত্যা করা হইতেছে, সম্পাদরের সোবিয়েত শিশু-সাহিত্যের অনুবাদও এ দেশের শিশুসাহিত্যের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিতেছে।

শাখা-সভাপতি শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বলেন; শিশু সাহিত্য 'অতীতের আদর্শচ্যুত।...আমাদের শিশু সাহিত্যকে একদা বিশ্বমানের পর্যায়ে তুলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, সুকুমার রায়, দক্ষিণারঞ্জন, প্রমদাচরণ সেন; তার জন্যে জীবনপাত করেছেন, আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী; তাঁর বিপুল কর্মযজ্ঞে শিশু সাহিত্যের কল্যাণ কামনায়ও একটি সশ্রদ্ধ আহুতি দিয়েছেন।

দর্শনশাখার সভাপতি শ্রীতারকচন্দ্র রায় বলেন, বাংলা ভাষায় দার্শনিক গ্রন্থ বেশী নাই। এই শতাব্দীর প্রারম্ভে তাহার সংখ্যা আরও কম ছিল। বাংলা ভাষায় প্রথম দার্শনিক গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

সংবাদসাহিত্য শাখার সভাপতি শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বলেন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার গুরুত্ব আজ সর্বস্তরে চিন্তা করিতে হইবে। শ্রীযুক্ত ঘোষ সংবাদপত্রের ভূমিকা জাতীয় চরিত্রে কতটুকু কার্যকরী হয়েছিল তার বিস্তৃত.বিবরণ পাঠ করেন।

নাট্যশাখার সভাপতি শ্রীমন্মথ রায় বাংলা নাটক ও নাট্যশালার ইতিহাস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বাংলার বর্তমান নবনাট্য আন্দোলন জাতির সামনে আজ বহু প্রশ্নের অবতারণা করেছে।...তিনি বর্তমান নাট্যশালার সমস্যা সম্পর্কে কতকগুলি সুচিন্তিত অভিমত ভাষণে দান করেন।

সঙ্গীতশাখার সভাপতি স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বলেন—বাংলা গানের বিশেষ ঐতিহ্য আছে এবং সেই ঐতিহ্যে আজ অনেক বাজে জিনিষ ভীড় করিতেছে। তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথের গানের ভাণ্ডারে স্থান পাইয়াছে যেমন উচ্চাঙ্গের চৌতাল, ধামার প্রভৃতি তালের গান, তেমনি বাংলার নিজস্ব গানের ধারা বাউল, ভাটিয়ালী, কীর্তন, জারি, সারি প্রভৃতি পল্লীগীতি।

কথা সাহিত্যশাখার সভাপতি শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতিতে শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর ভাষণ পাঠ করেন—'ভালবাসাই সাহিত্যের প্রেরণা' এ কথাই বার বার তাহাতে বলা হয়েছে।

এবারকার সাহিত্য-সম্মেলনে প্রত্যেক বিভাগের আলোচনাচক্র রবীন্দ্রভারতী প্রাঙ্গণ, মহর্ষিভবন ও সঙ্গীত-ভবনে বিভিন্ন বক্তার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। সাহিত্য সম্মেলনের এ দিকটার খুব প্রয়োজন এবং এবার তার কিছুটা সম্পন্ন হয়েছে।

প্রতি আলোচনাচক্রে জন-সমাগমে মনে খুবই আশা জেগেছে সাহিত্য সম্পর্কে। বিভিন্ন আলোচনায় যোগদান করেছিলেন সর্বশ্রী সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, সমরেশ বসু; রথীন্দ্রনাথ রায়; জ্যোতির্ময়ী দেবী, অখিল নিয়োগী; সুভাষ মুখোপাধ্যায়; আশা দেবী; ইন্দিরা দেবী; সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর; অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়; কাজী আবদুল ওদুদ; বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়; দক্ষিণারঞ্জন বসু; রাজ্যেশ্বর মিত্র; মন্মথ রায়, দেবনারায়ণ গুপ্ত; অজিতকুমার ঘোষ; বিভাস রায়চৌধুরী, রাধামোহন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি কৃতীবৃন্দ।

প্রতিনিধি ও অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যদের আনন্দদানের জন্য এবার সম্মেলনে শিশু রঙমহল ও বিশ্বরূপা বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছিলেন। বিশ্বরূপা ও শিশু রঙমহল এজন্য কোন অর্থ গ্রহণ না করায় সাহিত্যসেবীদের অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা লাভ করেছেন।

নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের কলিকাতা অধিবেশনের কয়েকটি অভাবনীয় বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ অধিবেশনের স্থান জোড়াসাঁকো রবীন্দ্রভারতী প্রাঙ্গণের কবিতীর্থে। মানুষের সবচেয়ে প্রিয় পবিত্র যে মন রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পরম আনন্দ লাভ করেছে সাহিত্যে, গানে, গল্পে—সেই তাঁর জন্মভিটা তথা মহর্ষিভবন—রবীন্দ্রভক্তদের তৃপ্তিদায়ক একান্ত আকাঙ্ক্ষার বস্তু। দূর দেশ হতে আজ সেই মহামানবের জন্মস্থান, লীলাক্ষেত্রে প্রণতি জানাতে এসে ধন্য হয়, আনন্দিত হয়। আজ সেই মহাপুরুষের আশীর্বাদ-ধন্য সম্মেলন তাঁরই প্রতিদিনের আনন্দ-বেদনার আশা-আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ নবীন সেই পদচিহ্নে আমাদের মন ভক্তিভাবময় হয়ে উঠেছে।

মূল সভাপতি নির্বাচন, সাহিত্য শাখার উদ্‌বোধক নির্বাচন ইত্যাদি বিষয়ে সম্মেলন কর্তৃপক্ষ সকলের অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা লাভ করেছেন। শুধু তাই নয়, সম্মেলনে মূল সভাপতির প্রতিদিনের প্রতি অধিবেশনের উপস্থিতি সত্যই বিস্ময়কর। বাঙ্গালোরে শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তী মহাশয় এবং কটকে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছাড়া আর কোন সম্মেলনে এমন বিরাটভাবে কোন মূল-সভাপতি উপস্থিত ছিলেন কিনা জানা নেই। কাব্য, কথাসাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, রবীন্দ্র-সাহিত্য; নাটক, সংবাদ সাহিত্য এমন কি শিশু সাহিত্য শাখার শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় মহাশয়কে উপস্থিত দেখে মন গর্বে ও গৌরবে

দীপ্ত হ'য়ে উঠেছে। আর আমোদ পেয়েছি শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মন্মথ রায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়; কুমুদরঞ্জন মল্লিক; তারকচন্দ্র রায় ও হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ মহাশয়দের মেলামেশার আন্তরিকতায়, বহু জীবনের এ দুর্লভ পরমানন্দ লাভ ক'রে ধন্য হয়েছেন অনেক প্রতিনিধি। এমন আন্তরিকতা খুব কম লক্ষ্য করা যায়। এত সাহিত্যিকও খুব কম সম্মেলনে দেখা যায়।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি সর্বজনপ্রিয় মাষ্টারমশাই ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর সেই সদাহাস্য উজ্জ্বল ভাষায় সকলকে আহ্বান করার দৃশ্যগুলি—কি মঞ্চে, কি বাইরে। এমনটি আজ পর্যন্ত কোন সম্মেলনে হয়েছে কিনা জানা নেই। মাণ্যবর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রতিদিন সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু মঞ্চে না বসে সকলের মধ্যে থেকে সকলের মত তিনিও সব শুনেছিলেন আমাদের হয়ে। খুব গৌরব বোধ করেছি নিজেরা।

আর দেখেছি শৈবালকুমার গুপ্ত, শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুকোমলকান্তি ঘোষ ও শ্রীমনোজ বসুকে—প্রতিনিধি শিবিরে নিজের পরিবারভুক্ত প্রতিনিধিদের সুখ-সুবিধা সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে জিজ্ঞাসাবাদে অকুণ্ঠ প্রীতি-কাতরতায়। ২৫শে ডিসেম্বর দ্বিপ্রহরে যে ঘটনা প্রতিনিধি শিবিরে ঘটেছে—নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ইতিহাসে তাহা নূতন ইতিহাসের সাক্ষ্য হয়ে থাকবে। প্রতিনিধিদের সাথে একই আসনে আহার করেছেন শ্রীকালিদাস রায়, শ্রীসজনীকান্ত দাস, জরাসন্ধ, শ্রীঅশোক সরকার, শ্রীকরুণাকেতন সেন, শ্রীযতীন্দ্রনাথ তালুকদার, দক্ষিণারঞ্জন বসু, শৈবালকুমার গুপ্ত, মনোজ বসু; সুকোমলকান্তি ঘোষ, শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখার্জী; শ্রীদেবেশ দাস ইত্যাদি বিখ্যাত মানুষ, যাঁদের গৌরব সর্বদেশে সর্বকালে অনুভব করার মত। আর তদারক করেছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। উদ্‌বোধক শ্রীউমাশঙ্কর যোশীও শিবিরে প্রতিনিধিদের সহিত একসঙ্গে আহার ও রাত্রিযাপন করেছিলেন। প্রতিনিধিদের ভাষায় বলা যায়—কলকাতায় এবারকার সম্মেলনে যে আন্তরিকতা লাভ করা গেল তাহা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিশেষ করে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের এমন অন্তর উজাড় করা আতিথেয়তায়।

শ্রীমতী অশোক গুপ্তা তাঁর নিষ্ঠা ও সেবার জন্য সর্বজনবিদিত। তার প্রমাণ এবার তিনি শুধু একাই দেন নি; তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে যাঁরা দিনরাত্র নীরবে চারদিন প্রতিনিধিদের সুখ-সুবিধার জন্য পরিশ্রম করে গেছেন তা আন্তরিকতার কাতরতায় সকলেই মুগ্ধ। আর একটি বিশেষ দিক হচ্ছে ব্যাজ সম্পর্কে। সভাপতি যে ব্যাজ স্বেচ্ছাসেবকদেরও সেই ব্যাজ—এটাই গণতান্ত্রিক মিলনবোধ।

নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের এবারকার অধিবেশন সার্থক ও সুন্দর হয়েছে—তার জন্য বঙ্গভাষাভাষী সকলেই আনন্দিত।

বিভ্রান্ত বাঙালীর চিত্তে যে আনন্দ, শান্তি এখনও আছে, সে যে বিরাট কিছু এখনও করতে পারে, সকল রাজনৈতিক মতের উর্দ্ধে থেকে জাতি-গৌরব, দেশ-গৌরবের জন্য এগিয়ে আসতে পারে তার পরিচয় বহুদিন পর-এ সম্মেলনের মাধ্যমে লক্ষ্য করা গেল। হয়তো অনেক দোষ আছে, অসংগতি আছে, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় এমন একটি সাদর সম্মেলনের সার্থকতা—জাতি সম্পর্কে আশার কথা।

সর্বদলনির্বিশেষে আমরা যদি উচিত উচিত পাত্রে নিজেদের প্রেরণাকে সমৃদ্ধ করার জন্য চেষ্টা করি, তবেই আমরা বড় হব, বিরাট হব, সর্বজনীয় হব—নিখিল ভারতের সাধনা সার্থক হবে।

মনে মনে

শান্তশীল দাশ

কী যে ভালো, ভালো নয়—হিসাব নিকাশ
করিনাকো কোনদিন; দেখি আর শুধু দেখে যাই।
আর বুঝি কিছু আনমনে
ভ'রে তুলি সঞ্চয়ের ছোট এ ঝুলিতে
এদিক ওদিক থেকে।
ভালো মন্দ হয়তো বা দু'ই নিই তুলে।
(কে জানে কোনটা ভালো, মন্দ বা কী যে!)

চাওয়া পাওয়া হিসাব নিকাশে
গোলমাল চিরদিন। দূরে দূরে থাকি।
তবু মন উদাসীন হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে;
অকারণ কি সে? জানি না তো!
মনে হয়, কিছু বুঝি বাকী রয়ে গেল—
চাওয়া নয়, পাওয়া নয়—দেওয়া হ'ল নাকো
সবটুকু—যা ছিল দেবার।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পালটে গেল রূপ।

রাতের রং মুখে মেখে ভোল ফিরে গেল সাচ্চা দরবারের। মন্দির নাটমন্দির মস্ত বড় দীঘিটা, এধারে মা কালীর স্থান আর শিব মন্দিরগুলো সব কেমন খাঁখাঁ করতে লাগল। হাটবার ছাড়া অন্য বারে হাটের জায়গাটা যেমন দেখতে হয়, ঠিক তেমনি দশা হোল বাবার বাড়ির। মন্দিরের মধ্যে খাটিয়ায় শুয়ে আলবলায় তামাকু সেবন করতে করতে—জেগে রইলেন না ঘুমিয়ে পড়লেন তারকনাথ—ঠিক বোঝা গেল না। নাটমন্দিরে আর বাবার ঘরের আশেপাশে পড়ে কয়েকটি নরনারী নিঃশব্দে বাবার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাতে লাগল। মাঝে মাঝে অতি-করুণ অতি-অস্বাভাবিক এক জাতের চাপা গোঙানি রাতের বুক মুচড়ে বেরিয়ে অন্ধ ভবিতব্যের চরণে মাথা কুটে মরতে লাগল। ভবিতব্য হচ্ছে সাচ্চা দরবারের মুখ্যমন্ত্রী, ভয়াল বুভুক্ষু তাঁর চাউনি দিয়ে কিছুই তিনি দেখতে পান না। দেখতে পান না বলেই অনায়াসে অন্ধকার রাতে সাচ্চা দরবারে হেঁটে চলে বেড়াতে পারেন, কারও বুকে পা পড়ে না।

ঘুরে বেড়াতে লাগলাম আমরাও পায়ের দিকে নজর রেখে। পড়ে আছে জ্যান্ত মানুষ, যার যেথানে প্রাণ চাইছে. হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ছে। কোনও ঠিক নেই, ঠিক কোনখানটিতে পড়ে থাকলে চট করে বাবার করুণা লাভ হবে তার কি কোনও ঠিক আছে। বহু গল্প শোনা আছে সকলের। কে নাকি পড়েছিল মন্দিরের পেছনে, মন্দির থেকে যে নর্দমা বেরিয়েছে সেই নর্দমার মুখে। তৃতীয় রাতেই তার ওপর দয়া হোল—জটাজুট ধারী একজন এসে বলল—ওঠ, ওঠ, ঐ নর্দমা দিয়ে যা বেরিয়ে আসবে তাই তোর ওষুধ। উঠে বসে লোকটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল নর্দমার দিকে। একটু পরে বেরিয়ে এল ওষুধ, জ্যান্ত ওষুধ সড়সড় করে বেরিয়ে এল। ধরলে চেপে দু'হাতের মুঠোয়, ওষুধও তার লেজ দিয়ে পেঁচিয়ে ধরলে লোকটার হাত দু'খানা। তারপর ছোবল, ফোঁস ফোঁস করে বিকট গর্জন, আর বুকের ওপর ছোবল। দেখতে দেখতে লোক জমে গেল চতুর্দিকে, কেউ কাছে গেল না বা লোকটাকে বাঁচাবার চেষ্টা করল না। সবাই জানে কি না. বাবার লীলাখেলা কে না বুঝতে পারে। তারপর ঢলে পড়ল লোকটা, ওষুধও তখন তার হাত থেকে পেচানো লেজ খুলে নিয়ে সেই নর্দমা দিয়েই বাবার ঘরে অন্তর্ধান করলে। দশ বছরের রাজযক্ষ্মা, ভল ভল করে মুখ দিয়ে রক্ত উঠত, একদম সেরে গেল। সারা দিন ঘুমিয়ে সন্ধ্যার সময় উঠল লোকটা, উঠে হেঁটে দিব্যি নতুন মানুষ হয়ে ঘরে ফিরে গেল।

নর্দমার মুখটাই বেশী পয়মন্ত। বাবার দরজার সামনে ছোট্ট বারন্দাটুকুও কম পয়মন্ত নয়। ওখানে পড়ে দু'তিন রাতের মধ্যে কত লোকে বাবার কৃপা লাভ করেছে। আবার ঠকেছেও, সেবার যেমন এক বড়লোকের গিন্নী এসে ঠকলেন। বাবার দরজা বন্ধ হোলেই পড়তেন তিনি দরজার সামনে। তেরাত্রি পার হোল না, বাবা ওষুধ দিতে এলেন। বললেন—"ধর ধর, হাত পাত শিগ্‌গির।" হাত পাততেই দিলেন ওষুধটি হাতের ওপর। অমনি চিৎকার করে উঠে গিন্নীমা হাত ঝেড়ে ওষুধটি ফেলে

দিলেন। কপাল, সবই কপাল। কপালে যদি না থাকে তা'হলে ঐ রকমই হয়। বাবা হোলেন করুণার সাগর, তিনি করুণা করেন ঠিক। কিন্তু কপালে থাকলে তো বাবার করুণা হাত পেতে নেবে! গিন্নীমা দেখলেন, হাতের ওপর একটা জলজ্যান্ত কাঁকড়া বিছে পড়ল। হাত ঝেড়ে ফেলে না দিয়ে যদি তিনি তৎক্ষণাৎ মুঠো করে ফেলতে পারতেন তা'হলে মুঠো খুলে দেখতেন একটা শিকড় বা একটা চাঁপা ফুল। কপালে নেই, তাই সব ভেস্তে গেল।

তা' যাক, একআধ জনের অমন যায়। কিন্তু ঐ স্থানটিও সহজ স্থান নয়। বাবার দরজার সামনে পড়বার জন্যে সবাই মুখিয়ে থাকে। রাতের ভোগ আরতির পরে দরজা বন্ধ হোলে যে আগে গিয়ে পড়তে পারে তারই জিত। রাতারাতি বাবার কৃপা লাভ করা যায়।

আরও আছে। আরও এমন অনেক স্থান আছে মন্দিরের আশে পাশে, যেখানে চট করে ফল পাওয়া যায়। ঠাকুর মশাইরা সেই সব বিশেষ স্থানের বৈশিষ্ট্য বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন। ভাল যজমান হোলে টিপে দেন। ইশারায় জানিয়ে দেন, কোনখানে গিয়ে পড়তে হবে। দিনের বেলা থাকতেই হবে সবাইকে নাটমন্দিরে, নয়ত লোকের পায়ের তলায় পড়ে চিঁড়ে চেপটা হবার সম্ভাবনা। রাতে যার যেখেনে খুশি পড় গিয়ে, কেউ মানা করতে পারে না।

সন্ধ্যার আগেই সবাই তৈরী হয়। ঝপ করে গিয়ে একটা মোক্ষম ঠাঁই দখল করতে হবে। সম্ভব হয় না, দু'তিন দিনের উপোসে হাত পা চলে না। অনেকের উঠে হেঁটে যাবার সামর্থ থাকে না, হামা টেনে টেনে যেতে হয়। যায়ও, গিয়ে দেখে তার আগেই আর এক জন এসে পৌছে গেছে। তখন ক্ষোভে দুঃখে শুখনো বুকটা পুড়ে যায়। আগে থেকে জায়গা দখল করে রাখা বা আর এক জনের সাহায্যে চটপট চলে এসে সঠিক স্থানটিতে শুয়ে পড়া, এ সমস্ত কাণ্ডকারখানা করার কোনও উপায় নেই। ধন্নায় পড়বার পরে কারও সঙ্গে একটি কথা কয়েছ বা এতটুকু সাহায্য নিয়েছ কারও কাছ থেকে, সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ হোল। ডুবে ডুবে জল খেলে বাবার নজর এড়ানো সম্ভব নয়, এইটুকু মনে রাখতে হবে।

ডুবে জল খাবার সুবিধে আছে, ধন্নায় পড়লে বাবার পুকুরে যাওয়া চলে। যাও, ডুব দিয়ে এস। ভিজে কাপড়ে থাক, কাপড় গামছা গায়ে শুখুবে। গায়ের জ্বালা কমাবার জন্যে অনেকে অনেক বার পুকুরে গিয়ে ডুবে আসে। আবার পুকুরে গিয়ে ডুব দেবার আদেশও হয়।

সেবার যেমন এক জনের ওপর হোল। পাঁচ দিন ধন্নায় পড়েছিল লোকটা। পেটের ভেতর কি ব্যামো হোয়েছে। একটু জল পর্য্যন্ত গলা দিয়েও যাবার উপায় নেই, পেট বুক গলা জ্বলে পুড়ে খাক হোয়ে যাবে। মরণাপন্ন মানুষটা ধন্নায় পড়ল। চার রাত্তির কাটল, পাঁচ রাত্তিরও যায়। ভোর বেলা আদেশ হোল—"যা, ডুব দে গিয়ে আমার পুকুরে। ডুব দিয়ে মুখ তুলে যা দেখবি সামনে তাই তোর ওষুধ। গঙ্গা জলের সঙ্গে বেটে পাঁচ দিন শরবত খাবি—যা।"

গেল সে, হাতে পায়ে যতটুকু শক্তি ছিল তাই দিয়ে কোনও রকমে শরীরটাকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে নিয়ে গিয়ে নামল পুকুরে। দিলে ডুব, ডুব দিয়ে মুখ তুলতেই মুখের সামনে দেখলে একটা পচা ইঁদুর, ভাসছে। দুর্গন্ধে তার দম আটকে এল। তাতে কি! সত্যিকাবের যে ভক্ত বাবার, সে কি অত সহজে ঠকে। ধরলে দু'হাতে সেই পচা ইঁদুরটাকে। ঘাট থেকে উঠে এসে হাতের মুঠো খুলতেই অপরূপ সৌগন্ধে অর্দ্ধেক রোগ সেরে গেল। হাঁ-করে তাকিয়ে রইল একটা টপটপে চাঁপা ফুলের দিকে, বাবার মহিমায় পচা ইঁদুরটা হাতের মুঠোয় চাঁপা ফুল হোয়ে গেছে।

একটার পর একটা গল্প শুনছি। গল্প শোনাতে লাগল বাঘে-খেকো বীরুদাস। বীরুদাস বাবার বাড়িতেই থাকে, দিবা রাত্র অষ্টপ্রহর থাকে। ওর বয়েস ছিল যখন পাঁচ কি সাত বছর, তখন ওর মাসীর সঙ্গে আসে বাবার দরজায়। মাসী এসেছিল, নিজের পেটে যাতে ছেলে মেয়ে জন্মায় সে জন্যে বাবার কৃপা লাভ করতে। সঙ্গে এনেছিল মরা বোনের সন্তান বীরুদাসকে। বাবা বললে—"ঐ তো রয়েছে ছেলে, আবার ছেলে চাচ্ছিস কেন?" মাসী মানলে না সে কথা, ধন্নায় পড়ল। বাবা বললে—"ঐ ছেলেকে যদি বাঘে নিয়ে যায়, তা'হলে তুই কাঁদবি না?" মাসী বললে— "না, ও আপদ গেলেই বাঁচি।" সেই রাত্রেই

বীরুদাসকে বাঘে নিলে। মেসোর সঙ্গেঘুমুচ্ছিল এক যাত্রীওঠা ঘরে, তখনকার দিনে বাবার থানে সব ঘরই ছিল খড়ের। খড়ের চাল আর ছেঁচা বেড়ার ঘর ছিল কয়েকখানা, আর ছিল জঙ্গল। সে কি জঙ্গল! যায় নাম অরণ্য-বন, তাই ছিল বাবার থান। সেই জঙ্গল থেকে বাঘ বেরিয়ে এসে ঘরের বেড়া ফেঁড়ে ঢুকে বীরুদাসকে মুখে তুলে নিয়ে চলে গেল। মাসী মেসো টু শব্দটি করলে না, বাবার পূজো দিয়ে বাড়ী ফিরে গেল। বাবা তুষ্ট হোলেন, ছেলে মেয়ের ঘর বোঝাই হোল দেখতে দেখতে। কখন কি ভাবে বাবা পরীক্ষা করবেন কাকে, তার কি কিছু ঠিক ঠিকানা আছে—আহা!

বীরুদাস হোল বাবার বাড়ির অবৈতনিক বৈতালিক। সেই বাঘে ধরার পর থেকে সমানে ছাপান্ন বছর বাবার বাড়িতে পড়ে আছে! মোট আড়াই হাত লম্বা হোয়েছে, আধ হাত প্রমাণ দাড়ি, এক হাত লম্বা চুল গজিয়েছে মুখে মাথায়। দাড়ি চুল সব লাল, চোখ দুটো আরও লাল। দেহের অনুপাতে চোখ দুটো অস্বাভাবিক বড়, বাঁ চোখের তারাটা আবার নড়ে না। চুল দাড়ির ঝোঁপে নজর করে দেখলে দেখা যায়, মুখের বাঁ দিকে কান, কপাল, চোখ, গাল বিশ্রী ভাবে দরকচা মেরে গেছে। বাঘ নাকি বীরুদাসের মুণ্ডটার বাঁ দিকে কামড়ে ধরেছিল। বাঘের মুখের মধ্যে ছিল মুণ্ডটা অনেকক্ষণ, তাই অমন ভাবে আধ-সিদ্ধ আধ-কাঁচা হোয়ে আছে।

উদ্ধারণপুরের ঘাটে বেশ মানাত বীরুদাসকে। বাঘ যাকে উগরে দিয়ে গেছে, তার উচিত উদ্ধারণপুর ঘাটের মত জায়গায় গিয়ে জমা। একশ' রকমের মজা পেত সেখানে, তারকেশ্বরে পড়ে থেকে কোন মজাটা পাচ্ছে! মনটা খুবই মুষড়ে গেল। উদ্ধারণপুরে যখন ছিলাম, তখন কেন বীরুদাসের সঙ্গে আলাপ হোল না!

তারকেশ্বরেও কি পরিচয় হোত বীরুদাসের সঙ্গে যদি না বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পরিবার মহোদয়া সঙ্গে থাকতেন। উনিই খুঁজে বার করলেন বীরুদাসকে, সন্ধ্যারতির আগে পুকুরে হাত মুখ ধুতে গিয়ে দেখলেন, এক বামন অবতার এক বিপুল কলেবর হনুমান অবতারের সঙ্গে কুস্তি লড়ছে। কি থেকে শুরু হোয়েছিল লড়াইটা, বলা মুশকিল। হঠাৎ একটা হৈ চৈ উঠল পুকুর ঘাটে, ছুটল সবাই তামাসা দেখতে। তারপর কথাটা ছড়িয়ে পড়ল মুখে মুখে। বাবার মন্দিরের দ্বাররক্ষা করে যারা, তাদের মধ্যে যে সব চেয়ে বড় পালোয়ান, তার সঙ্গে লড়াই লেগে গেছে বাঘে-খেকোর। ব্যাপারটা কি দেখবার জন্যে আমিও গেলাম। ব্যাপার তখন একেবারে চরমে উঠে গেছে। এক হাতীকে ধরেছে এক ইঁদুর, ধরেছে মোক্ষম কায়দায়। হাতীর একখানা ঠ্যাং নিজের কাঁধে তুলে ফেলেছে ইঁদুর, বুকের ওপর জাপটে ধরে আছে পায়ের গোছটা। ধরে কোথায় কি ভাবে মোচড় দিচ্ছে কে জানে। হাতী চেঁচাচ্ছে, পরিত্রাহি চিৎকার করছে আর দু' হাত ছুঁড়ছে শূন্যে। যাবতীয় দর্শক মহোল্লাসে বাহবা দিচ্ছে। তাজ্জব কাণ্ড হোল, দ্বাররক্ষকের স্বজাতি কয়েক জনও রয়েছে সেখানে, তাদের স্ফূর্ত্তি আরও বেশী। প্রবল উত্তেজনা, কি হয় কি হয় অবস্থা। অল্প সময়ের মধ্যেই যা হবার তাই হোল। সেই ভাবে ঠ্যাং ধরে বামন অবতার টেনে নিয়ে গেল সেই পর্বত প্রমাণ বপুটাকে জলের ধারে। তারপর একটা পাক খেয়ে ঠ্যাং ছেড়ে দিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ওপরের সিঁড়িতে। সঙ্গে সঙ্গে ঝপাং, বাবার পুকুরে পর্বতপাত হোল।

বিরাট এক জয়ধ্বনি উঠল বাবার নামে, বীরুদাসের নামে নয়। তারপর এখানে ওখানে জটলা গেতে লাগল। পাণ্ডা, পুরুত, পুরুতদের দালালরা দোকানদাররা সবাই এক সুরে বাঘে-খেকোর গুণগান করতে লাগল। সকলেরই এক মত, বীরুদাস হোল সাক্ষাৎ বীরভদ্র, বাবার অনুচর! বীরুদাসের সঙ্গে লাগতে কেউ যেওনা যেওনা যেওনা! এখন যিনি মোহন্ত, এঁর আগে যিনি ছিলেন, তাঁর আগে যে মোহন্ত মহারাজ রাজত্ব করতেন, সেই মোহন্তর যিনি গুরুদেব, তিনি দু'চার বছর পরে পরে নেমে আসতেন হিমালয় থেকে। তিনি একদিন সকালে জঙ্গল থেকে তুলে আনেন ঐ বীরুদাসকে। ছেলেটা তখনও বেঁচে আছে না মরে গেছে কেউ বুঝতে পারে নি। সেই সা... ছেলেটাকে কাঁধে করে বাবার ঘরে ঢুকে হুকুম করলেন দরজা বন্ধ করতে। হোল দরজা বন্ধ। রইলেন তিনি বাবার ঘরে বন্ধ সেই মরা ছেলে নিয়ে। বাবার ভো... পুজো সব বন্ধ হোল। তিন দিন তিন রাত পরে স...

বেরলেন বাবার ঘর থেকে ছেলেটার হাত ধরে। আর তাঁর চেলা সেই মোহন্ত মহারাজকে হুকুম করলেন—লে বেটা, সামলা। খবরদার, যদি কেউ দিক করে এই বাচ্চাকে, তা'হলে এই বাচ্চা তার ঘাড় ভেঙে দেবে।" কথাকটি উচ্চারণ করে বমবম করতে করতে তিনি হিমালয়ে চলে গেলেন।

বাঘেখেকো বীরুদাসের সম্বন্ধে যা কিছু জানার, সব শোনা হোয়ে গেল সন্ধ্যারতির আগেই। অনেক রাত পর্য্যন্ত শুধু বীরুদাসের কথাই চলতে লাগল সর্ব্বত্র। তারপর আরতি হোল, বাবার শয়ন হোল, দোকানগুলোর ঝাঁপ পড়তে লাগল। তখন আবার ঘরের কথা মনে পড়ে গেল। ঘরের কথা মনে পড়তেই পরিবারটিকে স্মরণ হোল। গেলেন কোথায় তিনি! ঘরে ফিরে গেছেন একলা! সম্ভব নয়, ঐ ঘরে রাত কাটাবার বাসনা হোলেও ঐ কর্ম্মটি করার মত প্রবৃত্তি হবে না ওঁর। বিপিনবিহারীবাবুর পরিবারকে না চিনতে পারি, নিতাই বোষ্টুমীকে চিনি। নির্ঘাত নিতাই এতক্ষণে অন্য একটি জুতসই অজুহাত খুঁজে বার করছে। অজুহাতটি এতই চমৎকার যে এই রাতে ঘরে ফেরার কথাটা আর উত্থাপন করাই চলবে না।

মন্দিরের আশপাশটা আর একবার দেখবার জন্যে এগিয়ে গেলাম। পুকুরঘাটে লড়ায়ের সময় দেখেছিলাম একবার ভিড়ের মধ্যে, তারপর থেকে আর নজরে পড়েনি। আছে, নিশ্চয়ই আছে এখনও বাবার বাড়িতে নিতাই। রাতে বাবার বাড়িতে কোন লীলা চলে, তা' না দেখে নিতাই সেই খুপরির ভেতর গিয়ে ঢুকবে—অসম্ভব।

পুকুরঘাট দেখে মন্দিরের পেছন দিয়ে ঘুরে নাটমন্দিরের কোণে পৌছতেই দেখা হোয়ে গেল। আড়াই হাত উঁচু বীরুদাসের পাশে আর এক হাত উঁচু ওটি কে! ঘোমটা নেই মাথায়, এলো চুল ছড়িয়ে পড়েছে পিঠের ওপর, আবছা অন্ধকারে কাপড়ের পাড় দেখা যাচ্ছে না। বিপিনবিহারীবাবুর পরিবার হোয়ে বেশ খানিকটা খাটো হোয়ে পড়েছিল যে লোকটা, তাকে তখন আর খাটো দেখাচ্ছে না। যে চালে চলত নিতাই ঘাড় সোজা করে, সেই চালে চলেছে। পরিবারগিরির ভূতটা নেমেছে ঘাড় থেকে, কিন্তু ব্যাপার কি! বাঘেখেকোর সঙ্গে ইতিমধ্যে অতটা জমিয়ে ফেলল কেমন করে!

এগিয়ে গিয়ে আমিও যোগ দিলাম পদচারণায়। সে রাত্রে কতবার আমরা প্রদক্ষিণ করেছিলাম বাবাকে বলতে পারব না। একের পর এক অলৌকিক কাহিনী আওড়াতে লাগল বীরুদাস। বীরুদাস বাবার বৈতালিক, বহুকাল পরে প্রাণের আশা মিটিয়ে শোনাবার মত মানুষ পেয়ে শোনাচ্ছে। শুনতে লাগলাম বাবার মহিমা। বিশ্বাস করতেও হোল না, অবিশ্বাস করতেও হোল না। শুধু শুনতে হোল বাবাকে প্রদক্ষিণ করতে করতে। কতবার প্রদক্ষিণ করা হোল বাবাকে, তারাও হিসেব রইল না।

রাত তখন কত হবে কে জানে, মায়ের ঘরের বারান্দায় আমরা বসে আছি। কোথাও এতটুকু সাড়া-শব্দ নেই। ধন্নায় যারা পড়েছে, তারাও নিস্তব্ধ হোয়ে গেছে। বীরুদাস তখন বলছে মহাপুরুষদের কাহিনী। কত রকমের মহাপুরুষ দেখেছে বাবার 'থানে', কে কি সাংঘাতিক শক্তির পরিচয় দিয়ে গেছেন, তার জ্বলন্ত বর্ণনা শুনছি। হঠাৎ যেন কে চিল চেঁচিয়ে উঠল। তারপর দৌড়ের শব্দ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে ধস্তাধস্তি আর চাপাগলার ফিসফিসানি স্পষ্ট শুনতে পেলাম। মায়ের মন্দিরের পেছনে বা আশেপাশে কোথাও ঘটছে ব্যাপারটা, লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিলাম। বীরুদাস খপ করে ধরে ফেললে একখানা হাত। চাপা গলায় ধমক দিয়ে উঠল—"বস চুপ করে। যাচ্ছ কোথায় মরতে?"

কি একটা বলতে যাচ্ছিলাম, বলা হোল না। থাম ঠেসান দিয়ে চোখ বুজে বসেছিল নিতাই, হঠাৎ একেবারে তিড়বিড়িয়ে উঠল। দিলে একটা মুখ ঝামটা—"ছিঃ, লজ্জা করে না ছেলেমানুষী করতে। বলি, বয়েসটা বাড়ছে না কমছে?"

বসে পড়লাম আবার। আর একটি অল্প একটু চিৎকার শোনা গেল। খানিক দূর থেকে এল এবার সেই আওয়াজ। মনে হোল, মুখ চেপে ধরা হোয়েছে যেন, কোনও রকমে মুখের চাপাটা একটু খসিয়ে চিৎকারটা করা হোল। সঙ্গে সঙ্গে আবার চাপা পড়ল মুখে, আর কিছুই শোনা গেল না।

তারপর আর কোনও কাহিনী শুরু হোল না। একটার পর একটা বিড়ি ধরিয়ে টেনে যেতে লাগল বীরুদাস। থাম ঠেসান দিয়ে বসে নিতাই দাসী বোধ হয় ঘুমিয়েই

পড়ল। বাবার বাড়িতে ঢাকে বাড়ি পড়ল। বাবার ঘুম ভাঙাবার সময় হোয়েছে।

শুরু হোল বাবার মঙ্গলারতি, দেখতে দেখতে সমস্ত স্থানটা মানুষে মানুষে ভরতি হোয়ে উঠল। চারিদিক থেকে কাঁধে বাঁক নিয়ে ছুটে আসতে লাগল বাবার ভক্তরা, মঙ্গলারতির ঢাকের বাদ্য ছাপিয়ে ঝুন ঝুন টুন টুন শব্দে কাঁপতে লাগল আকাশ বাতাস। সারা রাত ধরে বাবার জল এসে জমেছে। বাঁক টাঙিয়ে রাখার জন্যে বাঁশের আলনা খাটানো আছে আড্ডায় আড্ডায়। সেখানে সবাই অপেক্ষা করছিল, ঢাকের আওয়াজ শুনেই ছুটে আসছে।

এক সুরে এক তালে কাঁসর ঘণ্টা ঢাকের বাদ্যর সঙ্গে মহামন্ত্র উচ্চারিত হোতে লাগল বাবার বাড়িতে। ভোলে বোম তারক বোম—সাচ্চা দরবার কা জয়। ভোলে বোম তারক বোম—সাচ্চা দরবার কা জয়।”

ঐ মন্ত্রের অর্থ সোজা। ঐ মন্ত্রে ঘোরপ্যাচ নেই। ঐ মন্ত্র মনের আগুনে পোড়ানো মহাজাগ্রত মহাশুদ্ধ! গঙ্গাধর তুষ্ট হবেন, সহস্র কলস গঙ্গাজল এখনি পড়বে তাঁর শিরে, সহস্র জনের মনপ্রাণ সেই গঙ্গা জলে মিশে আছে। সাচ্চা দরবার, সাচ্চা দরবারের অধীশ্বর তারকনাথ, এই দরবারে সাচ্চা মন্ত্র ছাড়া অন্য মন্ত্র চলবে না।

ফিরে এলাম ঘরে। ওখানে ঐ সাচ্চা দরবারে আর আমাদের মানায় না। সাচ্চা দরবারে এমন কি পুঁজি নিয়ে এসেছি আমরা—যে ওখানে দাঁড়াবার অধিকার আছে! নিঃস্ব রিক্ত হাড়হাবাতে হতচ্ছাড়া হতচ্ছাড়ী দু’জন মিথ্যে পরিচয়ের পর্দা মুড়ি দিয়ে নিজেদের সামলাবার জন্যে মরে যাচ্ছি, সাচ্চা দরবারে আমাদের মানায় না।

ঘরে ফিরে এলাম। সেই খুপরি, ভোর হবার পরে আট আনা ভাড়ার মেয়াদ ফুরিয়ে যাবে। আবার দিতে হবে আট আনা। কেন দোব? এই খুপরিতে আরও একটা দিন কাটাতে হবে নাকি! কেন—কিসের জন্য এই অনর্থক যন্ত্রণা ভোগ?

কয়েক টুকরো কঞ্চি সামলে রেখেছিলেন পরিবার, সেগুলো চুলোয় গুজে দিয়ে দেশলাই চাইলেন।

“কই, দেশলাইটা দাও একবার। আগুন জ্বালি। চা করে দোব।”

যতদূর সম্ভব বিরক্তিটা চেপে বললাম—“চা থাকুক। একটু পরে দোকান খুললে এক ভাঁড় কিনে খাব। কিন্তু আজও এই ঘরে থাকতে হবে নাকি?”

“পাগল!” অম্লান বদনে পরিবার আওড়ে গেলেন—“পাগল হইনি তো আমি, যে আবার আট আনা গুণতে যাব। একটু পরে আসবে বীরুদাস, জিনিষপত্র সব গুছিয়ে রাখতে বলেছে আমাকে। এসে আমাদের ভাল জায়গায় নিয়ে যাবে। ভাড়া গুণতে হবে না, যতদিন খুশি এমনি থাকতে পারব।”

এত বড় সুসংবাদটা শুনে উচিত ছিল যথেষ্ট আহ্লাদ প্রকাশ করা। পারলাম না। বুক গলা মুখ কি জানি কেন তেতো হোয়ে উঠেছে তখন। তেতো কথাই বেরল মুখ থেকে। স্বরটাও খুব মিষ্টি শোনালো না। বললাম—“সেই খুশির মেয়াদটাই জানতে চাচ্ছি। এই ভাবে বেঁচে থাকার লাঞ্ছনা আর কতদিন সইতে হবে?”

উঠে দাঁড়াল নিতাই দাসী। হঠাৎ সেই বিপিনবিহারী-বাবুর পরিবারটি নিতাই দাসীর আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। এক পা কাছে সরে এসে প্রায় চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে নিতাই—“তাই তো জানতে চাচ্ছি গোঁসাই আমি! সত্যি এ ভাবে চলবে কত দিন! যা হোক একটা ব্যবস্থা কর, আর যে পারি না।”

বোবা হোয়ে গেলাম। যে কথাটা এসে পড়েছিল ঠোঁটের গোড়ায়—সেটা ঠোঁটের গোড়াতেই জমে পাথর হোয়ে গেল। খপ করে ধরে ফেললাম একখানা হাত, দু’থাবার মধ্যে চেপে ধরে রইলাম ওর মুঠিটা। ঠাণ্ডা, খুব ঠাণ্ডা, সেই ঠাণ্ডার ছোঁয়ায় আস্তে আস্তে জুড়িয়ে গেল বুকের জ্বলুনি। দুঃখের না সুখের, কিসের দরুণ জানি না, একটা পরম তৃপ্তিতে বুকটা ভরে উঠল। দুঃখ থেকেও কি তৃপ্তি পাওয়া যায়!

যায়, নিশ্চয়ই যায়। দুঃখের যে পিঠটা দেখা যায় সেটা আঁধার দিয়ে গড়া। উলটো পিঠেই আলো। আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল।

আরে! এ ব্যাপারটা তো তলিয়ে বুঝিনি কখনও! সত্যিই আমার চেয়ে বেশী সুখী কে! আমার জন্যে, শুধু আমার জন্যে আর একজন কি জঘন্য হীনতা সইছে! কেন সইছে! কি আছে আমার? কোন লোভে পথে-ঘাটে

শ্মশানে, শ্মশানের চেয়ে ঢের কদর্য এই হীন খুপরিতে, লক্ষ লক্ষ মানুষের কুৎসিৎ চাউনি গায়ে না মেখে, আমাকে আঁকড়ে ধরে আছে এই নারী ?

ওর দুঃখটা কোনও দিনই দেখতে পাইনি কেন ?

গলা দিয়ে কিছু বার হোল না। শুধু ওর সেই শীতল মুঠিটি ধরে চাপ দিতে লাগলাম।

অনেকক্ষণ দু'জনেই দাঁড়িয়ে রইলাম মাথা হেঁট করে। তারপর ঘুমন্ত মানুষকে যেমনভাবে জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলে তেমনি ভাবে বললে সই—"ছাড়, দেশলাই দাও, চা করি।"

হাত ছেড়ে দিয়ে পকেট থেকে দেশলাই বার করে দিলাম। আবার আগুন জ্বালাতে বসল।

দরজার বাইরে কে যেন একটু কাশল, চাবির গোছার আওয়াজ হোল একটু। সই শুনতে পেলে না। বললাম —"দেখ, বাইরে বোধ হয় কেউ এসেছে।"

উঠে পড়ল নিতাই, দরজা খুলে বাইরে গেল। শুনতে পেলাম কি কথাবার্তা হোল। যিনি এসেছেন তিনি খুবই মিনতি করে একটি টাকা ধার চাইলেন। মর্মান্তিক দীনতা আর কুণ্ঠা ফুটে উঠল তাঁর গলায়। পাছে অন্য কেউ শুনে ফেলে এই জন্যেই বোধ হয় খুবই চাপা গলায় জানালেন তাঁর প্রার্থনা, সর্ব্বশেষে সন্ধ্যার পরেই ঋণ শোধের অঙ্গীকার করলেন—"কি করব দিদি, মেয়েটার আজ সাতদিন জ্বর। এক ছিটে সাবু মিছরি কেনার পয়সা নেই। সাত সকালেই ধার চাইতে এলাম। একটু পরেই আপনারা দর্শন টর্শন করতে যাবেন, ফিরতে দেরি হবে। ততক্ষণ মেয়েটার মুখে একটু সাবু দিতেও পারব না। "সন্ধ্যার পরেই দিয়ে যাব দিদি টাকাটা, আপনারা তো আরও কয়েক দিন থাকবেন।"

এ পক্ষ থেকে একটি বাক্যও উচ্চারিত হোল না। ঘরে এসে বাক্স-মানে সেই টিনের সুটকেশ খুলে কি যেন বার করে নিয়ে আবার বেরিয়ে গেল। তিনটি মুহূর্ত্তও কাটল না, ফিরে এসে উনুনে ফুঁ দিতে লাগল।

ভয়ঙ্কর কয়েকটা দৃশ্য ফুটে উঠল চোখের সামনে। নিমেষের মধ্যে গরল হোয়ে গেল মনের অমৃতটুকু। কোনও রকমে মুখ দিয়ে বেরল ছোট একটি কথা—"দেখেছ অবস্থাটা ?"

মুখ না তুলে সই বললে—"পাঁচ দিন না ছ'দিন মেয়ের বাপ উধাও হোয়ে গেছে। ঘর ভাড়া বাকী পড়েছে। কালই আমি শুনেছি, আজ ভাড়া না দিলে ওকে ঐ রুগ্ন মেয়ে নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হবে।"

"তা'হলে !" আঁতকে উঠলাম—"তা'হলে ! ঐ একটা টাকায় হবে কি ?"

নিরুত্তাপ নির্লিপ্তকণ্ঠে জবাব দিলে সই—"এক টাকা নয়, আট আনা। আট আনা খুচরো ছিল, দিয়ে দিলাম। ঐ আট আনাই দিক না এখন বাড়িওয়ালার হাতে, চেষ্টা করলে সন্ধ্যার ভেতর দু'চার টাকা জোটাতে পারবে।"

"কি ক'রে ?" ঝাঁজিয়ে উঠলাম—"কি ক'রে জোটাবে শুনি ? টাকা গড়াগড়ি যাচ্ছে কি না পথে ঘাটে—" উঠে দাঁড়াল নিতাই, একটা বাটিতে খানিক জল নিয়ে উনুনে চাপালে। তারপর চরম বিরক্তির সঙ্গে বললে—"নেয় না কেন টাকা ? সেই পরাণ কেষ্ট তো কালও এসেছিল, রোজ ওকে টাকা দেবার জন্যে সাধাসাধি করছে লোকটা। কেন নেয় না টাকা ?"

"কি ! কি বললে ?" প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম।

জবাব দেবার অবসর পেল না সই। দরজার বাইরে বীরুদাসের গলা শোনা গেল—"কই গো-দিদি কই। গুছিয়েছ সব, চল।"

[ক্রমশ
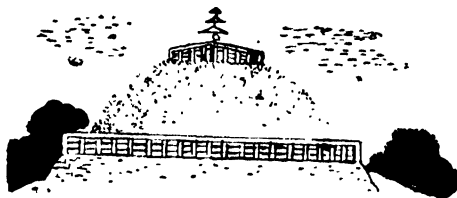
সোভিয়েট দেশে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা

শ্রীশৈলজানন্দ রায়

সোভিয়েট রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক সরকার ধনতান্ত্রিক সভ্যতার অনেক রীতিনীতি নির্মমভাবে পরিহার করলেও বীমা ও ব্যাঙ্কিং-এর মূলনীতি ও সার্থকতা তাঁরা অস্বীকার করতে পারেন নাই। কিন্তু একথা সত্য যে বীমা ও ব্যাঙ্কিংএর ব্যবসায়িক রূপ পরিহার করে তাঁরা তাঁদের সমাজ-ব্যবস্থার সহিত খাপ খাইয়ে নিয়েছেন অর্থাৎ ব্যাঙ্ক ও বীমা ব্যবসার উপর একচেটে সরকারী অধিকার কায়েম করেছেন।

১৯২১ সালে নতুন আইনের ফলে সকল শ্রেণীর বীমার দায়িত্ব ভার সোভিয়েট কর্তৃত্বের অধীনে আসে এবং বীমা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যভার নিয়ন্ত্রণের জন্য পিপলস কমিশনার অব ফিনান্সের অধীনে একটি বীমা বিভাগ (গসট্রাখ) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম থেকেই এই প্রতিষ্ঠান রাশিয়ার সকল শ্রেণীর মানুষ এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপযোগী করে জীবন বীমা, সামাজিক বীমা প্রভৃতি প্রচলন করে আসছেন। এখানে বীমার স্কীমসমূহ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এবং কম খরচে পরিচালিত হয়ে থাকে এবং পরিকল্পনায় সর্বদা সাধারণ মানুষের আর্থিক নিরাপত্তা এবং আর্থিক উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। ফলে সোভিয়েট রাশিয়ায় বীমা পলিসি গ্রহণ সাধারণ মানুষের পক্ষে সুলভ ও সুবিধাজনক হয়েছে। সোভিয়েট রাশিয়ায় সামাজিক বীমা ও সাধারণ বীমা প্রভৃতি বাধ্যতামূলক হওয়ায় বীমার সুফল সোভিয়েট রাষ্ট্রের নাগরিকগণের পক্ষে সার্বজনীন হয়েছে।

সোভিয়েট রাষ্ট্রে প্রচলিত শাসন বিধির ১২০ ধারা অনুসারে রোগে, বার্ধক্যে ও অকর্মণ্য দশায় জীবন যাত্রা পরিচালনার উপযোগী সাহায্য রাষ্ট্রের নিকট হতে পাওয়া সম্পর্কে নাগরিকের ন্যায্য অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। এই বিধান অনুসারে সোভিয়েটরাষ্ট্রে ব্যাপকভাবে সামাজিক বীমা প্রচলিত হয়েছে এবং তার ফলে সোভিয়েট জনগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সামাজিক বীমা সকল শ্রেণীর শ্রমিক ও চাকুরিজীবির সম্পর্কে বাধ্যতামূলক। সোভিয়েট রাষ্ট্রে শিল্প কারখানার আয় হতে শ্রমিকদের মজুরী ও অন্যান্য খরচপত্র মিটিয়ে যে লাভ থাকে তা থেকে একটি অংশ গভর্ণমেন্ট গ্রহণ করে থাকেন। এই ভাবে সমস্ত শিল্পকারখানা থেকে আদায়ীকৃত অর্থ দ্বারা একটি তহবিল গঠন করা হয়। এই বীমা-তহবিলে সোভিয়েট গভর্ণমেন্টও প্রয়োজন মতো অর্থ সরবরাহ করে থাকেন। এইভাবে যে অর্থভাণ্ডার গড়ে ওঠে তা হতে কলকারখানার শ্রমিকগণকে বিপদ আপদে প্রয়োজনানুরূপ সাহায্য দেওয়া হয়। প্রিমিয়াম সম্পর্কে কোনোরূপ দায়িত্ব বহন না করেও শ্রমিকগণ সামাজিক বীমার যাবতীয় সুযোগ ভোগ করে থাকেন।

সামাজিক বীমা থেকে শ্রমিকবৃন্দ কীভাবে সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন তারই কিছুটা আভাস দেওয়া হলো। (ক) সাময়িক অক্ষমতা বীমা—কোনো শ্রমিক অসুস্থ হয়ে বা দুর্ঘটনায় পড়ে যদি সাময়িকভাবে অকর্মণ্য হয়ে পড়ে তবে সামাজিক বীমা তহবিল হতে তাকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়। শ্রমিকদের চিকিৎসার জন্য রাশিয়ায় অনেকগুলি হাসপাতাল ও বিরাম ভবন স্থাপন করা হয়েছে। অসুস্থ শ্রমিকেরা এইসব স্থানে ভর্তি হয়ে ঔষধপথ্য ও সেবাশুশ্রূষা বিষয়ে যাবতীয় সুখসুবিধা ভোগ করে থাকে। (খ) স্থায়ী অক্ষমতা বীমা—বার্ধক্যদশায় উপনীত হয়ে, রোগে, শোকে ভুগে কিংবা দুর্ঘটনায় পড়ে কোনো শ্রমিক স্থায়ীভাবে তার কর্মশক্তি হারিয়ে বসলে গভর্ণমেন্ট সামাজিক বীমা তহবিল হতে প্রয়োজন মাফিক অর্থ দিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত তার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করে থাকেন। (গ) দুঃস্থ পরিবার পরিজনের ভরণ পোষণ বীমা—স্বাভাবিক কারণে কিংবা দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে কোনো উপার্জনশীল শ্রমিকের মৃত্যু ঘটলে প্রয়োজন মাফিক সরকারী বীমা তহবিল হতে তার যথাবিহিত সৎকারের ব্যবস্থা হয়ে থাকে। মৃত শ্রমিকের আয়ের উপর নির্ভরশীল আত্মীয় পরিজনদিগকে জীবনযাত্রার উপযোগী আর্থিক সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা হয়। সন্তানদের মধ্যে ষোলো বৎসরের নিম্নবয়স্কদিগকে এবং স্ত্রী, বৃদ্ধা বা অকর্মণ্য হলে তাকে এই সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে। (২) প্রসূতি কল্যাণ বীমা—রাশিয়ার কলকারখানার নারী শ্রমিকেরা সন্তান প্রসবের পূর্বে ও পরে দুইমাস করে পুরো বেতনে ছুটি ভোগ করে থাকে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তারা যাতে সন্তানের উপযুক্ত রূপে যত্ন ও শুশ্রূষা করতে পারে সেজন্য তাদের নয়মাসকাল সমাজজীবন তহবিল হতে ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

এই কয়শ্রেণীর বীমা ছাড়াও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার প্রথম আমলে সোভিয়েট য়ুনিয়নে শ্রমিকদের ভেতরে বেকার বীমারও প্রচলন ছিল, কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে সম্পূর্ণ কর্মসংস্থানের (Full employment) সমস্যা সমাধান হওয়াতে বর্তমান বেকার বীমার আর প্রয়োজন নেই। যে বেকার সমস্যায় ভারতবর্ষ ক্রমাগত বিব্রত সেই বেকার সমস্যার সম্পূর্ণ মীমাংসা সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ রাশিয়াতে করতে সক্ষম হয়েছেন।

সোভিয়েট সরকার কেবল কলকারখানার শ্রমিকদের জন্য বাধ্যতামূলক সামাজিক বীমা প্রবর্তন করেই ক্ষান্ত হননি; তাঁরা গ্রামীণ

কৃষকদের জন্যও অনুরূপভাবে সামাজিক বীমার ব্যবস্থা করেছেন। রাশিয়াতে ব্যাপকভাবে যৌথ কৃষি-খামার (Collective farm) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে নতুন চীনের গণ-কমিউনের প্রবর্তন উল্লেখযোগ্য। নতুন চীনে গণ-কমিউন সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছে। যৌথ-খামারের আয় হতে কৃষকদের সমুচিৎ প্রাপ্য মিটিয়ে বাকী একটা অংশ সোভিয়েট সরকারের নিকট গচ্ছিত রাখাই সেখানকার রীতি। এই ভাবে যৌথ খামারের নিকট হতে অর্থ গ্রহণ করেও নিজেরা আরও কিছু পরিমাণ অর্থ যোগ করে গভর্ণমেন্ট কৃষকদের কল্যাণ কর্মের জন্য একটি সামাজিক বীমা তহবিল গড়ে তোলেন। ঐ তহবিল হতে শ্রমিক-কল্যাণের মতোই কৃষকদের প্রয়োজন মতো আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে। এই ভাবে সোভিয়েট যুনিয়নে সর্বশ্রেণীর শ্রমিক ও কৃষকদের ভেতর সামাজিক বীমার বহুল প্রচলন হয়ে আজ তাদের সুখ সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি করেছে।

সামাজিক বীমা ছাড়া সোভিয়েট রাষ্ট্রে অগ্নি-বীমা, সম্পত্তি-বীমা, মাল সরবরাহ বীমা ও কৃষি বীমা প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর সাধারণ বীমা বা জেনারেল এসিওরেন্স প্রবর্ত্তিত আছে। সেখানে এই ধরণের বীমাও বাধ্যতামূলক। রাশিয়াতে ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য ব্যবহৃত ও শিল্প-কারখানাতে ব্যবহৃত সমস্ত শ্রেণীর দালান কোঠার উপরই অগ্নিবীমা করতে হয়। বীমাকারীর নিকট হতে নির্ধারিত হারে প্রিমিয়াম আদায় করে গসট্রাখ (সরকারী বীমা বিভাগ) অগ্নিজনিত ক্ষতিপূরণ করে থাকেন। ব্যক্তিগত সম্পত্তি, কলকারখানার যন্ত্রপাতি ও অন্য সম্পত্তি সম্পর্কে রাশিয়াতে সম্পত্তি-বীমার প্রচলন আছে। কৃষি বীমা সম্পর্কিত পরিকল্পনা অনুসারে সরকারী বীমা বিভাগ কৃষকদের উৎপাদিত ফসল সম্পর্কেও দায়িত্ব গ্রহণ করেন। উপযুক্তরূপে বীমা করা থাকলে ঝড়ে শিলাবৃষ্টি অথবা অনাবৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হলে তার যথাবিহিত ক্ষতি-পূরণ করা হয়। কৃষি বীমা অনুসারে রাশিয়ায় গবাদি পশুর জন্যও বীমা-গ্রহণের রীতি আছে। তাছাড়া রাশিয়ার মাল সরবরাহের জন্য বীমার প্রচলনও খুব বেশী। রাশিয়া একটি বিরাট দেশ। এই দেশে একস্থান থেকে অন্যস্থানে মাল প্রেরণের বিস্তর অসুবিধা রয়েছে। নদী পথে ও স্থলপথে মাল চালান দিয়ে তার নিরাপত্তা সম্পর্কে সর্বপ্রকার সুব্যবস্থা করায় ঐ বিষয়ে লোকে অনেকটা নির্ভর ও নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের সরকারী বীমা বিভাগ জীবন বীমার কাজও পরিচালনা করে থাকেন। জীবন বীমার কাজ মুখ্যতঃ দুটি ভাগে বিভক্ত। একটিতে দেশের সকল চাকুরিয়া ও শ্রমিকদের নেওয়া হয়, অপরটি মুখ্যতঃ কৃষিজীবীদের জন্য। রাশিয়াতে সরকারী বীমা বিভাগ নানাপ্রকার সুবিধাজনক স্কীম প্রবর্তন করে ও অল্প প্রিমিয়ামে জীবন বীমার সুযোগ প্রসারিত করে দেওয়া সত্ত্বেও জনসাধারণের পলিসি গ্রহণে উৎসাহ দেখা যায় না, কারণ কমিউনিষ্ট শাসনে লোকের ভবিষ্যৎ সংস্থান ও আর্থিক নিরাপত্তার দায়িত্ব রাষ্ট্র গ্রহণ করাতে ব্যক্তিগতভাবে ভবিষ্যৎ আর্থিক নিরাপত্তা সম্পর্কে মানুষের উৎকণ্ঠার কোনো কারণ নেই। তাই ব্যক্তিগত আর্থিক সঞ্চয় অপেক্ষা জীবন ধারণের মান উন্নয়নের দিকেই বর্তমানে সোভিয়েট জনগণের লক্ষ্য এবং বর্তমানে ক্রুশ্চেভ সরকারের আমলে সেই দিকেই বিশেষ উৎসাহ ও সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে।

সমাজতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ১৯১৭ সালের ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে রাশিয়ার সকল ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হয়, তারপর পিপল্‌স কমিশনার অব ফিনান্সের অধীনে একটি ব্যাঙ্ক বিভাগ গঠন করে দেশের প্রয়োজন অনুসারে নতুন ব্যাঙ্ক স্থাপন ও পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত করেন। তদবধি সরকারী ব্যাঙ্ক-বিভাগ একটি সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা অনুসারে ব্যাঙ্কিংএর যাবতীয় কার্য নিয়ন্ত্রণ করে আসছেন। সোভিয়েট রাষ্ট্রে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা নিম্নোক্তভাবে বিন্যস্ত—

(ক) Gos Bank বা রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক (খ) Prom Bank বা শিল্প সম্পর্কিত ব্যাঙ্ক (গ) Tzekom Bank বা সমাজ কল্যাণ ব্যাঙ্ক (ঘ) Selkoz Bank অথবা কৃষিব্যাঙ্ক (ঙ) Vseko Bank অথবা সমবায় ব্যাঙ্ক (চ) সেভিংস ব্যাঙ্ক।

রাশিয়ার সর্বপ্রধান ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের নাম Gos Bank বা রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক। Gos Bank ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রাথমিক মূলধন ছিল ৬০ কোটি রুবল। এই মূলধনের যোগান দিয়েছেন সোভিয়েট রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ। Gos Bank দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেরও কাজ করে থাকে। দেশের মুদ্রার প্রচলন নিয়ন্ত্রণের জন্যও এই ব্যাঙ্কের হিসেব রাখতে হয়। Gos Bank এর মারফৎ দেশের অন্যান্য সকল প্রকার ব্যাঙ্কের অর্থ লেনদেনের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করতে হয়। সোভিয়েট সরকারের তহবিল ও দেশের অন্যান্য ব্যাঙ্কসমূহের তহবিল এই ব্যাঙ্কের হাতেই সংরক্ষিত থাকে। গভর্ণমেন্টের পক্ষ থেকে এই ব্যাঙ্ক দেশে অর্থ লেনদেনের যাবতীয় কার্য সম্পন্ন করে। দেশে শিল্প ও কৃষির প্রয়োজনীয় স্বল্প-মেয়াদী ঋণ-প্রদান সম্পর্কে এই ব্যাঙ্কের একচেটে অধিকার রয়েছে। শিল্প প্রতিষ্ঠানে ও যৌথ খামার সমূহে যে সরকারী অর্থ নিয়োগ করা হয়, তার ব্যয় সম্পর্কে তদারক করার দায়িত্ব ও এই ব্যাঙ্কের উপর ন্যস্ত আছে। সেজন্য দেশের সকল অঞ্চলেই এই ব্যাঙ্কের শাখা অফিস স্থাপন করা হয়েছে।

বিদেশের সাথে রাশিয়ার যাবতীয় লেনদেনের ব্যাপার Gos Bank এর মারফৎ সম্পন্ন হয়ে থাকে। সেজন্য এই ব্যাঙ্কের অধীনে একটি বৈদেশিক বিভাগ ও একটি বহির্বাণিজ্য বিভাগ রয়েছে। Gos Bank দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠান ও যৌথ খামারসমূহের নিকট হতে আমানত গ্রহণ করে। যৌথ খামারসমূহের পক্ষ হতে অর্থ লেন-দেনের কাজ নির্বাহ করে থাকে। কিন্তু জনসাধারণের নিকট হতে এই প্রতিষ্ঠান কোনো আমানত গ্রহণ করেনা এবং তাদের ব্যক্তি-গত কোনো হিসাব (Accounts) রাখেনা। সেজন্য দেশে স্বতন্ত্র-ভাবে একটি সেভিংস ব্যাঙ্ক গড়ে তোলা হয়েছে। দেশের জনসাধারণ অর্থ সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে এই সেভিংস ব্যাঙ্কে হিসাব খুলতে পারে এবং চলতি ও স্থায়ী আমানতে অর্থ মজুত রাখতে পারে।

জনসাধারণের সুবিধার্থে এই ব্যাঙ্ক তাদের পক্ষ হতে নানারূপ কার্য্য করতে পারে। এই ব্যাঙ্কে যাদের হিসাব আছে তারা ঐ হিসাবের মারফতে বিভিন্ন ধরণের ব্যক্তিগত লেনদেনের কাজ সমাধা করতে পারে। সোভিয়েট রাষ্ট্রে সেভিংস ব্যাঙ্ক আজকাল খুব জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারী ঋণ তুলবার সুবিধার্থেই সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট ঐ দেশে সেভিংস ব্যাঙ্কের বহুল প্রচলন সাধন করেছেন।

দেশে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ প্রদানের সুবিধার্থে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন দাবী দাওয়া মেটানোর জন্য গভর্ণমেণ্ট বিশেষ শ্রেণীর জন্য কয়েকটি ব্যাঙ্কও গড়ে তুলেছেন। এই ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে Prom Bank বা শিল্প-ব্যাঙ্কের কথা সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই উহা সোভিয়েট রাষ্ট্রে শিল্পোন্নতি সাধনের গুরুদায়িত্ব বহন করে আসছে। সোভিয়েট সরকার শিল্প সংগঠনের সম্পর্কে সমুচিত পরিকল্পনা স্থির করে ও তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ নিয়োগের বরাদ্দ ধরে তদনুসারে কাজ চালাবার সমস্ত ভার Prom Bank এর উপর ন্যস্ত করে থাকেন। এইরূপ দায়িত্ব লাভ করে Prom Bank প্রয়োজন মতো নতুন শিল্প স্থাপন সম্পর্কে সরকারী অর্থ নিয়োগ করে থাকে। উহা চলতি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য আবশ্যক মাফিক নতুন যন্ত্রপাতি কাঁচা মাল খরিদ করে থাকে। শিল্প প্রতিষ্ঠান-সমূহের জন্য প্রয়োজনীয় নতুন বাড়ীঘর নির্মাণের ব্যবস্থা করে, তাদের যাবতীয় কাজ কারবারের তদারক এবং সকল বিষয়ের হিসাব রাখে। শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকরী মূলধন ও উদ্বৃত্ত আয় Prom Bank এর হিসাবে সংরক্ষিত থাকে।

সোভিয়েট রাশিয়ায় কৃষির পরিচালনা বিষয়ে প্রয়োজনীয় সাহায্য করবার জন্য একটি ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হয়েছে। উহার নাম Selkoz Bank বা কৃষি ব্যাঙ্ক। সোভিয়েট সরকার সরকারী কৃষি খামার অথবা যৌথ কৃষি খামার প্রভৃতির উন্নতি বিধানের জন্য যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, কৃষি ব্যাঙ্কের মারফতেই তা কার্যে পরিণত করার ব্যবস্থা হয়। যৌথ খামার প্রভৃতিকে প্রয়োজনীয় অর্থ ঋণ দেওয়া, উহাদের আয়ব্যয়ের হিসাব রাখা ও সকল দিক দিয়ে ফার্ম-সমূহের কার্য তদারকের ব্যবস্থা করা—এসমস্তই হচ্ছে Selkoz Bank এর কাজ। Prom Bank ও Selkoz Bank বাদেও সোভিয়েট রাষ্ট্রের সমাজ কল্যাণমূলক বিভিন্ন কার্যধারা নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি ব্যাঙ্ক আছে; তার নাম Tzekom Bank। এছাড়াও সমবায় সমিতি গুলিকে সাহায্য ও পরিচালনা করবার জন্য Vseko Bank বা সমবায় ব্যাঙ্ক রয়েছে।

সোভিয়েট রাশিয়ার ব্যাঙ্কসমূহের বিশেষত্ব এই যে, উহারা ব্যবসায়িক লাভের জন্য পরিচালিত না হয়ে মুখ্যতঃ দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্যই পরিচালিত হচ্ছে। ধনতান্ত্রিক দেশের ব্যাঙ্কসমূহ কোনো দিকে অর্থ নিয়োগ করতে গেলে প্রাপ্য সুদের কথাই সর্বাগ্রে বিবেচনা করে থাকে, যেদিকে লাভের সম্ভাবনা কম সেদিকে তারা তাদের তহবিল দাদন করতে নারাজ। কিন্তু সোভিয়েট রাষ্ট্রের ব্যাঙ্কসমূহের দাদন নীতি ভিন্ন ধরণের। উহারা প্রাপ্য সুদের কথা ভেবে দাদন ও ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণ করে না। দেশের স্বার্থ বুঝেই তাহা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা জাতীয় কল্যাণের দিক দিয়া প্রয়োজনীয় মনে হলে উহারা তাতে কম সুদে অর্থ দাদন করতে দ্বিধাবোধ করে না। এইভাবে রাশিয়ার Prom Bank শতকরা মাত্র দুই ভাগ সুদে বেশী পরিমাণ অর্থ নিয়োগ করে দেশের অত্যাবশ্যকীয় ধাতুশিল্পগুলি গড়ে তুলেছে। এইভাবে সরকারী কৃষিব্যাঙ্ক (Selkoz Bank) দেশে সমুন্নত ধরণের বহু যৌথখামার স্থাপন করে জাতীয় উন্নতি ও কল্যাণের পথে দেশকে কৃষির উৎপাদনের দিক থেকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। সোভিয়েট ব্যাঙ্কের এই সুমহান আদর্শ বর্তমানে পৃথিবীর সকল দেশেরই অনুকরণ যোগ্য। সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মূল সূত্র সোভিয়েট ব্যাঙ্কিংয়ের নয়া গঠনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। ভারত রাষ্ট্রের তন্ত্রধারক শ্রীজহরলাল নেহরু সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য কৃতসঙ্কল্প, কিন্তু কল্যাণ রাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও সমাজতন্ত্রের ফরমুলা অনুসারে সেই পন্থা অনুসরণ না করে তিনি যে Mixed Economy অথবা মিশ্র অর্থনীতির বিচিত্র পথে ভারত রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন—তাতে করে জনসাধারণের অর্থনৈতিক দুর্দশা ক্রমশঃ বৃদ্ধির পথে। নেহরুজী কী তাঁর Originality ত্যাগ করে মহাজনের পথ অনুসরণ করবেন?

প্রচার-সচিব

আমিনুর রহমান

চাকরি করি সংবাদপত্রের অফিসে, মাইনে পাই একশ' টাকা, যদিও ঐ টাকাগুলো একসঙ্গে কখনো দেখি নি—আজ দু'টাকা, কাল একটাকা—এমনি ক'রে ম্যানেজারবাবুকে পান, তামাক খাইয়ে যখন যা আদায় করতে পারে তাই দিয়ে সংসার চালাই বললে ধৃষ্টতা হবে। প্রতিমাসেই কতবার যে চাকরিতে ইস্তফা দিই তার ইয়ত্তা নেই, কিন্তু প্রতিবারই বুড়োকর্তা অর্থাৎ কাগজের মালিক বনাম সম্পাদক বাগড়া দিয়েছেন। আমি চলে গেলে নাকি কাগজ উঠে যাবে। সভা, সমিতি, সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যাওয়া, পাঁচজনের সঙ্গে দেখা করা—আর সেইসব সংবাদ গুছিয়ে প্রকাশ করার ব্যাপারে আমার জুড়ি বাংলাদেশে আর নাকি কেউ নেই। মনে মনে এই বলে নিজেকে প্রবোধ দিই যে—আমার যোগ্যতার মুল্য অবশ্যই একদিন পাব।

সেদিন সরকারের ম্যাজিক দেখতে গিয়েছিলুম, জাতীয় সরকারের ভোজবাজীর কাছে কিছুই নয়, তারপর সারারাত ধরে উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের আসরে কাটিয়ে পরদিন সকালবেলা গেলুম সংবাদপত্রের দপ্তরে রিপোর্টগুলো একেবারে লিখে ফেলব বলে। লেখা তখনও শেষ হয়নি …এমন সময় ম্যানেজারবাবু এসে বললেন, মন্ত্রীর কাছ থেকে আপনার নামে একটা জরুরী চিঠি এসেছে।

ম্যানেজারবাবু আমার সঙ্গে প্রায়ই মস্করা করে থাকেন, আমি মুখ বুজে সহ্য করে যাই, কিন্তু সেদিন খুব চটে গিয়ে বললুম, ইয়ার্কি করবার আর সময় পেলেন না? আপনাদের জন্ম সারারাত জেগে এখন নিশ্চিন্তে রিপোর্টটা লিখে ফেলব তাও আপনার সহ্য হয় না?

ম্যানেজারবাবু আমার সামনে একটা খাম রেখে দিয়ে বললেন, অত মাথা গরম করবার কি আছে, নিজে যাচাই করে নিন না, আমি যা বলছি তা সত্যি কি না।

চেয়ে দেখি মন্ত্রীর দপ্তরের ছাপমারা খামে আমারই নাম লেখা। তাড়াতাড়ি খামটা ছিঁড়ে চিঠিটা বার করে দেখি—মন্ত্রী ডাক্তার দফাদার আমাকে ঐ দিনই দুপুর বারটায় তাঁর সরকারী দপ্তরে দেখা করবার জন্ম অনুরোধ জানিয়েছেন একটা জরুরী গোপন আলোচনার জন্ম। ম্যানেজারবাবু বোকার মত হাঁ করে দাঁড়িয়েছিলেন, যেন কিছুই না—এমনি ভাব দেখিয়ে চিঠিটা তাঁর দিকে এগিয়ে দিলুম। চিঠিটা এক নিশ্বাসে পড়ে নিয়ে ম্যানেজারবাবু চোখ দুটো আমড়ার মত বড বড় করে তিনবার ঢোক গিলে বললেন, মন্ত্রীর সঙ্গে আপনার গোপন বৈঠক, এত চাট্টিখানি কথা নয়। ওরে গণেশ, সিগারেট নিয়ে আয়, ভাল করে চা তৈরি করে আন—আর ঐ সঙ্গে চারপয়সা দিয়ে একটা কেক্ নিয়ে আসবি।

পকেটে পয়সা নেই শুনে ম্যানেজারবাবু একটা আস্ত দশটাকার নোটই আমাকে দিয়ে দিলেন। যথাসময়ে একটা ট্যাক্সি হাঁকিয়ে লালদিঘি হাজির হলুম এবং ঠিক ১১-৫৮ মিনিটে মন্ত্রীর আর্দালির হাতে আমার কার্ডটা দিলুম। সঙ্গে সঙ্গে ডাক পড়ল, যেন আমার অপেক্ষায় বসেছিলেন। ঘরে ঢুকে দেখি—বিরাট টেবিলের ওধারে বেঁটে, কালো, মোটা, টেকো ভদ্রলোকটিই আমাদের জনপ্রিয় মন্ত্রী। খোঁচা খোঁচা গোঁফের ফাঁক দিয়ে একছটাক হাসি ছেড়ে বললেন, বসুন মথুরাবাবু, আপনার সঙ্গে একটা গোপনীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই।

আমার মুখ দিয়ে কোন কথা সরছিল না। আমি হাত তুলে নমস্কার করে যন্ত্রচালিতের মত সামনের একটা চেয়ারে বসে পড়লুম। ডাঃ দফাদার টেবিলের ওপর আগ্রহের সঙ্গে ঝুঁকে পড়ে বললেন, শুনলুম আপনি প্রচার কার্যে সিদ্ধহস্ত। আপনার সুখ্যাতি আমার কাছে কয়েকজন করেছে। তাই কিছুদিন থেকে আমার মনে হচ্ছে যে আপনার মত একজন অভিজ্ঞ লোক পেলে আমাদের অর্থাৎ সরকারের প্রচার কার্যটা ভালভাবে চলতে পারে। জানেন ত এটা হচ্ছে প্রচারের যুগ, জয়ঢাকের যুগ। টাকের তেল, হাঁপানির ওষুধ, স্বপ্নাদ্য

মাদুলির মত সরকারেরও বিজ্ঞাপনের দরকার আছে। আমার মন্ত্রিত্বকে কায়েম করতে হলে, তাকে জনপ্রিয় করতে হলে চাই জয়ঢাক, চাই বিজ্ঞাপন। প্রত্যেক ছোট বড় দৈনিক এবং সাময়িক-পত্রিকার প্রথম পাতায় ছবি দিয়ে সংবাদ পরিবেশন করতে হবে। কোনও ব্যাটা সাংবাদিক যদি তা ছাপতে রাজি না হয় ত তার নিউজ প্রিণ্টের বরাদ্দ কমিয়ে দেব, প্রেসের ওপর মোটা জামানত দাবী করব—মোট কথা দুদিনেই তাকে লালবাতি জ্বালাতে বাধ্য করব।

আমি বোকার মত ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম; মন্ত্রী সমান উৎসাহে বলে যেতে লাগলেন, প্রচারকার্যটা এমন ব্যাপকভাবে করতে হবে যে খবরের কাগজ-ওয়ালাদের বিশেষ কিছু করবারই থাকবে না। সরকারের ফটোগ্রাফার, রিপোর্টার আমার সঙ্গে সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টাই ঘুরে বেড়াবে। উদ্বোধন, দ্বারোদ্ঘাটন, ভিত্তিস্থাপন—এ সব ত মামুলি ব্যাপার। আসলে আমাদের সরকারী পরিকল্পনা অনুযায়ী কতটা কাজ এগুলো, তা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না, আমরা কি করব সেইটাই ঢাক পিটিয়ে প্রচার করতে হবে। তারপর জনসাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করতে গেলে আমার দু একটা দুর্ঘটনা হওয়া দরকার, এমন কি আমার জীবন বিপন্ন হওয়াও প্রয়োজন।

মন্ত্রীর জীবন বিপন্নের আশঙ্কায় আমি আঁতকে উঠলুম। তিনি কিন্তু হেসে বললেন, আরে আপনি এত চট করে ঘাবড়ে যাচ্ছেন কেন? আমার কি সত্যিই হাত-পা ভাঙছে, না আমি মরেই যাচ্ছি। তবে আগে থেকে ব্যবস্থা করে সব ঠিক করে নেওয়া যাবে। যেমন ধরুন আমি গাড়ী থেকে বা বক্তৃতা মঞ্চের সিঁড়ি থেকে নামতে গিয়ে পড়ে গেলুম। আমার সেক্রেটারী বা মহিলা স্বেচ্ছা-সেবিকারা এসে ধরাধরি করে আমাকে তুলল, সে সব ফটো ঠিক করে তুলতে হবে। পরদিন সেই যন্ত্রণাদায়ক খোঁড়া পা নিয়ে চারজন মহিলার কাঁধে ভর করে আমার অফিসে যাচ্ছি এটাও ফলাও করে কাগজে ছাপতে হবে—তাহলে লোকে জানবে যে তাদের প্রধান মন্ত্রী ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধা তুচ্ছ করে জনসাধারণের সেবা করাটা প্রাধান্য দেয়। তারপর আততায়ীর গুলি থেকে নিহত হতে হতে বেঁচে গেছি এ সংবাদটা পেলে পৃথিবীর চারিদিক থেকে আমার কাছে অভিনন্দন পত্র আসবে।

মন্ত্রীর ফাঁড়া কেটে যাওয়ায় আমিও একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললুম। তিনি গলার স্বর খাটো করে বললেন, তারপর আমার পারিবারিক বিজ্ঞাপনগুলোও নিয়মিতভাবে দিয়ে যেতে হবে। যেমন ধরুন—সাঁতারের পোষাক পরে নাতনীদের সঙ্গে সমুদ্র স্নান করছি, কোদাল দিয়ে বাগানে মাটি কোপাচ্ছি, বাড়ীর চাকরটার অসুখে তার পরিচর্যা করছি, কুকুরটার সঙ্গে খেলা করছি, এমনি কত কি।

এমন সময় একটা ট্রেতে করে কিছু ফল আর এক গ্লাস দুধ নিয়ে হাজির হল একজন খানসামা। মন্ত্রী বললেন, আপনাদের দুবেলা কাঁড়ি কাঁড়ি ভাত না খেলে চলে না, আর এই দেখুন আমার দুপুরের খাওয়া। আমার ফটো-গ্রাফার এখুনি আসবে আমার খাওয়ার ছবি তুলতে। যাই হোক, আপনি আমার পরিকল্পনা মোটামুটি শুনলেন ত। এখন বলুন আমার প্রচার দপ্তরের উচ্চতম পদে বহাল হতে রাজী আছেন কিনা। মাইনে আপাততঃ মাসিক দেড়হাজার টাকা পাবেন, তাছাড়া সরকারী গাড়ী বাড়ী ত আছেই—প্রচার কার্য্যের জন্য যা টাকা লাগে পাবেন, কোন অসুবিধা হবে না। আমার বিশ্বাস কাজটা আপনাকে দিয়েই ঠিক মত হবে। কি বলেন?

আমি তখনও পর্যন্ত একটা কথাও বলি নি। দেড় হাজার টাকা মাইনের কথা শুনে আমার গলায় যেন কি একটা আটকে গেল, বহু চেষ্টা করেও একটা কথাও বলতে পারলুম না। মন্ত্রী তখন আরও ঝুঁকে পড়ে আমাকে বলতে লাগলেন, কি বলেন, মথুরাবাবু—শুনছেন—ও মশাই শুনছেন—আচ্ছাই গেরো ত'—

আমার মাথার মধ্যে সব যেন গুলিয়ে গেল। গলা থেকে শুধু গোঁ গোঁ শব্দ বেরুতে লাগল। চোখের সামনে মন্ত্রীর মুখটা ক্রমশঃ ঝাপসা হয়ে যেতে লাগল এবং সেখানে ফুটে উঠল ম্যানেজারবাবুর মুখ। তিনি বলছেন, আচ্ছাই গেরো ত', এমন ঘুম জন্মে দেখি নি। আপনার রিপোর্ট লেখা হল?

মালব্য জন্মশত বার্ষিক—

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, স্বদেশ-প্রেমিক বাগ্মী, মণীষী ও রাজনীতিবিদ পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের জন্মশতবার্ষিক উপলক্ষে গত ২১শে ডিসেম্বর হইতে ৭ দিন কাশীতে উৎসব হইয়াছিল। ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ প্রথম দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারদেশে স্থাপিত মালব্যজীর ৯ফিট উচ্চ ব্রোঞ্জ নির্মিত মূর্তির আবরণ উন্মোচন করিয়াছেন। কংগ্রেসের প্রথম যুগের কর্মী ও সাধক, সারাজীবন জনকল্যাণ ও শিক্ষাবিস্তার কার্য্যে আত্ম-নিবেদিতপ্রাণ পণ্ডিত মালব্যের কথা আজ নূতন করিয়া দেশবাসী সকলকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। দরিদ্র ব্রাহ্মণ মালব্য তাহার ঐকান্তিক চেষ্টার দ্বারা কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের মত এক বিরাট সংস্থা গঠন করিয়া গিয়াছেন। জাতিগঠনে তাঁহার দান অসাধারণ। তিনি সদাচারী, আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং এমন কি, বিলাতে যাইয়াও সম্পূর্ণভাবে আচার নিষ্ঠা পালন করিতেন, অতি সাধারণ—আহার ও পরিধেয় সম্বন্ধে উদাসীন—কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত মালব্য দেশবাসী সর্বস্তরের জনগণের পূজনীয় নেতা ছিলেন। তাঁহার জীবনকথা সর্বত্র শ্রদ্ধার সহিত এ সময়ে আলোচিত হওয়া উচিত।

শ্রীকালিদাস রায়—

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় গত ৫০ বৎসরের ও অধিককাল কবিতা ও অন্যান্য প্রবন্ধ লিখিয়া বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তিনি এবার নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের কলিকাতা অধিবেশনের মূল-সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় বাঙ্গালী পাঠক মাত্রেই আনন্দ লাভ করিয়াছেন। ঐরূপ সম্মিলনের মূল-সভাপতি পদে সাধারণত ধনী ব্যক্তিদেরই নির্বাচিত করা হয়—কবিশেখর দরিদ্র শিক্ষাব্রতী, জীবনের প্রথম ভাগ গ্রামের বিদ্যালয়েই শিক্ষকতায় অতিবাহিত করেন। তাঁহার মত নিষ্ঠাবান, সুপণ্ডিত সাহিত্যসেবীর সংখ্যা কম। তিনি বহু কাব্যগ্রন্থ ও সমালোচনা গ্রন্থ রচনা করিলেও এবারের মত সম্মিলনে তাঁহার মূল-সভাপতিত্ব লাভ সাহিত্য সম্মিলনের ইতিহাসে নবপর্য্যায়ের সূচনা

শ্রীকালিদাস রায়

করিয়াছে। আমরা কবিশেখরকে তাঁহার এই সম্মান লাভে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করি এবং প্রার্থনা করি তিনি সুদীর্ঘ জীবন ও অধিকতর শ্রদ্ধাসম্মান লাভ করিয়া বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রকে তাঁহার দানে সমৃদ্ধ করুন।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত—

বিখ্যাত বিপ্লবী ও স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত গত ২৪শে ডিসেম্বর রবিবার শেষ রাত্রি ৫টা ৫ মিনিটে (সোমবার ভোর) ৮২ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতা ৩নং গৌরমোহন মুখার্জি ষ্ট্রীটের বাস-গৃহে পরলোক গমন করিয়াছেন। পরদিন কেওড়াতলার বৈদ্যুতিক চুল্লীতে তাঁহার দেহ দাহ করা হয়। তাঁহারা তিন ভ্রাতাই, নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ), মহেন্দ্র নাথ

ও ভূপেন্দ্রনাথ অবিবাহিত ছিলেন। ১৮৮০ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর ভূপেন্দ্রনাথের জন্ম হয়—পিতার নাম বিশ্বনাথ দত্ত। ১৯০৩ সালে তিনি বিপ্লব আন্দোলনে যোগ দেন ও ১৯০৫ সালে 'যুগান্তর' পত্রের সম্পাদকরূপে আত্মপক্ষ সমর্থন না করিয়া এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। তিনি আমেরিকায় যাইয়া শিক্ষা লাভ করেন ও ১৯১২ সালে বি-এ ও ১৯১৩ সালে এম-এ পাশ করেন। ১৯১৪ সাল হইতে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত তিনি বার্লিনে ভারতীয় বিপ্লবী দলের সম্পাদক ছিলেন ও ১৯২৫ সালে ভারতে ফিরিয়া আসেন। তিনি সারাজীবন পড়াশুনায় নিযুক্ত ছিলেন ও বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। দেশের যুবক, কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেন। কিছুদিন তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী ও নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। ১৯৩০ সালে কারাবরণ করেন ও বিপ্লবীদের কল্যাণ-আন্দোলন আজীবন পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। আদর্শবাদী দেশসেবক ও জনসেবক হিসাবে তিনি সর্বত্র শ্রদ্ধা অর্জন করিতেন।

ডক্টর শিশির কুমার মৈত্র—

ভারতবিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত, ডক্টর শিশির কুমার মৈত্র গত ২৯শে ডিসেম্বর রাত্রিতে ৭৬ বৎসর বয়সে কাশীধামে নিজ বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন ও একবার নিখিল ভারত দর্শন কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন। বাংলার বাহিরে যাঁহারা বাঙ্গালীর গৌরব প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন—শিশিরকুমার তাঁহাদের অন্যতম।

কৈলাসচন্দ্র জ্যোতিষার্ণব—

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষী পণ্ডিত, রায়বাহাদুর কৈলাসচন্দ্র জ্যোতিষার্ণব গত ২৮শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় তাহার ৩১ শোভাবাজার ষ্ট্রীটস্থ বাসভবনে ৮২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৈমনসিংহ জেলায় একটি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়া তিনি স্বীয় চেষ্টা ও প্রতিভা দ্বারা সমগ্র ভারতে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি ১৯৩২ সালে রায়সাহেব ও ১৯৩৭ সালে রায়বাহাদুর উপাধি লাভ করেন। অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও জ্ঞান লিপ্সা তাঁহার জীবনকে উন্নতির পথে লইয়া গিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে একজন অমায়িক পরোপকারী লোকের অভাব হইল।

বালানন্দ ব্রহ্মচারী সেবায়তন—

শ্রীচন্দ্রশেখর গুপ্ত উত্তর কলিকাতার দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার ও বালানন্দ ব্রহ্মচারী সেবায়তনের প্রতিষ্ঠাতা ও উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া সুদীর্ঘ প্রায় ৪০ বৎসর কাল ঐ অঞ্চলের জনগণকে সেবা করিতেছেন। গত ১৭ই নভেম্বর তাঁহার ৬৩তম জন্মদিনে তাঁহার বন্ধুরা তাঁহাকে এক প্রীতিসম্মিলনে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছেন। ঐ উপলক্ষে শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ ত্যাগব্রতী চন্দ্রশেখরের কল্যাণময় দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া এক শুভেচ্ছা প্রেরণ করেন ও ভাণ্ডারের পক্ষ হইতে শ্রীদুর্গাপদ দত্ত 'আমাদের চন্দ্রদা' নামে চন্দ্রশেখরের এক জীবন কথা প্রকাশ করিয়া সকলকে বিতরণ করেন। ভাণ্ডারের সভাপতি ডাক্তার কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত সম্মিলনে সভাপতিত্ব করেন এবং বহু লোক সমবেত হইয়া চন্দ্রশেখরের গুণাবলী বিবৃত করিয়াছিলেন। চন্দ্রশেখরের মত অন্যান্য সমাজ সেবকের আদর্শ সর্বত্র প্রচারিত হউক ও তিনি শতায়ু হন, আমরাও সর্বান্তঃকরণে ইহাই কামনা করি।

রবিবাসর—

রবিবাসর হইতে সম্প্রতি তাহার সহকারী সম্পাদক শ্রীসন্তোষ কুমার দে 'রবিবাসরে রবীন্দ্রনাথ' নামক একখানি তথ্যপূর্ণ পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সহিত রবিবাসরের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল তাহা এই গ্রন্থ পাঠে জানা যায়। তাহা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ রবিবাসরে যে সকল ভাষণ দিয়াছিলেন, সে গুলি ও এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। কবিগুরু শান্তিনিকেতনে রবিবাসরের সদস্যগণকে আহ্বান করিয়া তথায় রবিবাসরের অধিবেশনের যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ অধ্যাপক শ্রীমোহন লাল মিত্র ও রবিবাসরের সর্বাধ্যক্ষ শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক লিখিত হইয়া এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। মোট কথা এই পুস্তকে রবীন্দ্রনাথের জীবনের একটা দিক মুদ্রিত হইয়া থাকিল।

১৯১২ সালে লণ্ডনের হ্যাম্পষ্টেড পল্লীর যে গৃহে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাস করিয়াছিলেন, সেই গৃহে সম্প্রতি একটি স্মৃতি-ফলকের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিল ইহার উদ্যোক্তা। ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি লর্ড স্পেন্স ঐ ফলকের আবরণ উন্মোচন করেন। চিত্রে ফলকের নিকট দণ্ডায়মান (বাম হইতে দক্ষিণে)— লণ্ডনস্থ ভারতের অস্থায়ী হাই-কমিশনার শ্রী টি-এন-কাউস, ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি লর্ড স্পেন্স, বি-বি-সি'র শ্রীবিনয় রায়, হ্যাম্পষ্টেডের মেয়র মিঃ বার্ণার্ড ওয়েষ্ট এবং রয়েল সোসাইটী অফ্ আর্টস-এর চেয়ারম্যান লর্ড নাথানকে দেখা যাইতেছে।

প্রেসিডেণ্ট কেনেডির সহিত দেখা করিবার জন্য ওয়াশিংটন যাইবার পথে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু লণ্ডনে যাইলে তথায় বি-বি-সি'র হিন্দী সার্ভিস সম্পর্কে শ্রীরত্নাকর ভাতিয়ার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকারের একটি দৃশ্য।

অনাথনাথ বসু—

নিউদিল্লীর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপাল ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগের প্রধান অধ্যাপক অনাথনাথ বসু গত ২৬শে ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনে (বীরভূম) ৬২ বৎসর বয়সে সহসা পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি কলিকাতায় শিক্ষা লাভের পর ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে বিশ্বভারতীর অধ্যাপক হন ও পুনরায় ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, ডেনমার্ক, সুইডেন, আমেরিকা প্রভৃতিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দর্শন করেন। তিনি গান্ধীজির ভক্ত ছিলেন ও তাঁহার শিক্ষাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। ১৯৩৫ সাল হইতে ১৯৪৯ সাল পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও পরে ভারত গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগে কাজ করিয়াছিলেন। সরকারী কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি পুনরায় শান্তিনিকেতনে যোগদান করেন। তিনি গান্ধীজির জীবন ও শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

যতীন্দ্র মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—

খ্যাতনাম সাংবাদিক যতীন্দ্র মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১২ই ডিসেম্বর পরিণত বয়সে তাঁহার কলিকাতা ৮।৬ বি কর্ণফিল্ড রোড বালীগঞ্জের বাড়ীতে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি প্রথম জীবনে অমৃতবাজার পত্রিকা, পরে ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ ও শেষে কমার্স কাগজের সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করিতেন। ১৯৩৭ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বহু পুস্তকও রচনা করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রকুমার মিত্র—

কলিকাতা পোর্ট কমিশনার্সের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও পশ্চিম বঙ্গের স্বরাষ্ট্র সেক্রেটারী রবীন্দ্রকুমার মিত্র, আই-সি-এস গত ৪ঠা ডিসেম্বর সোমবার রাত্রিতে তাঁহার নিউ আলিপুরস্থ বাসভবনে ৫৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি মৃত্যু কালে পশ্চিম বঙ্গ উন্নয়ন কর্পোরেশনের জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—

বিখ্যাত মনীষী, সাহিত্যিক ও সঙ্গীত-সমালোচক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় গত ৫ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ৬৭ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতার বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও বীরবল প্রমথ চৌধুরীর সহিত একযোগে সাহিত্য সাধনা করিয়াছিলেন ও সবুজপত্র যুগের লেখক ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল লখনৌ ও আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক রূপে কাজ করিয়াছিলেন। তিনি গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ সকল বিভাগে খ্যাতিমান লেখক ছিলেন। কিছুকাল তিনি উত্তরপ্রদেশ সরকারের প্রেস এডভাইজাররূপেও কাজ করিয়াছিলেন। তিনি ভারতীয় সোসিওলজি সম্মিলনের প্রথম সভাপতি। নানা সম্মিলনে যোগদানের জন্য বহুবার তিনি বিদেশ ভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত আবর্ত্ত, মহানাল, অন্তশীলা, ঝিলিমিলি, মিউজিকাল মেমারী প্রভৃতি গ্রন্থ সর্বজন-আদৃত।

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ জন্মোৎসব—

গত ৫ই জানুয়ারী কালকাতা ভারত সভা হলে ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে খ্যাতনামা বিপ্লবী নেতা ও সাংবাদিক বারীন্দ্রকুমার ঘোষের ৮৩তম জন্ম দিবস উৎসব পালন করা হইয়াছে। এই উৎসব উপলক্ষে মন্ত্রী শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের নেতৃত্বে গঠিত এক কমিটি একখানি সুমুদ্রিত ও বহু চিত্র শোভিত এবং বারীন্দ্রকুমারের বিভিন্ন ধারার কর্মজীবনের বিবরণ সম্বলিত স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীসর্বজিত উহার সুষ্ঠু সম্পাদনাদি করিয়া বারীন্দ্রকুমারের জীবন কথা সকলের নিকট উপস্থিত করিয়া পাঠক সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। আমাদের দেশে জীবনী ও ইতিহাস গ্রন্থের অভাব এখনও সর্বদা অনুভূত হয়। উৎসব কমিটি শুধু সভা করিয়া ও ভাষণ দিয়া কর্তব্য শেষ না করিয়া এই স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করায় নূতন পথের সন্ধান দিয়াছেন। আমরা স্মৃতিরক্ষা সমিতিকে সে জন্য অভিনন্দিত করি।

সুবোধচন্দ্র রায়—

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার সুবোধচন্দ্র রায় গত ২৭শে নভেম্বর রাত্রি ২টার সময় তাঁহার নিজ বাস-ভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার পত্নী ৮ বৎসর পূর্বে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি শিল্প প্রতিষ্ঠা ও ব্রাহ্ম

আন্দোলনে অনেক কাজ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দুইপুত্র সুকুমার ও সুবিমল এবং এক কন্যা সুজাতা বসু বর্তমান। তিনি গত ৬০ বৎসর কাল আইন ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিলেন।

ব্রহ্মচারী সুধীর ভাই—

দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘের সভাপতি, আদ্যাপীঠের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ব্রহ্মচারী সুধীর ভাই গত ২৯শে নভেম্বর কাশীধামে ৫৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি তাঁহার গুরু অন্নদাঠাকুরের সংস্পর্শে আসিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের দ্বারা আদ্যাপীঠকে সুন্দর করিয়াছিলেন এবং তথায় বিরাট মন্দির প্রতিষ্ঠা তাঁহার জীবনের অন্যতম প্রধান কার্য্য ছিল।

যোগানন্দ ব্রহ্মচারী—

নদীয়া জেলার প্রবীণতম শিক্ষাব্রতী যোগানন্দ ব্রহ্মচারী গত ১৫ই নভেম্বর তাঁহার শান্তিপুরস্থ বাসভবনে ৮৮ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি সাহিত্যিক ও সাংবাদিক ছিলেন এবং ১৮৯৯ সালে শান্তিপুর হইতে 'যুবক' নামক যে মাসিকপত্র প্রকাশ করেন, তাহা নানা বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সম্পাদনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি শান্তিপুরে বহু বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, পরিচালক ও শিক্ষক ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক, অনাথ আশ্রমের সংগঠক প্রভৃতিরূপে সমাজ সেবার বহু ক্ষেত্রে কাজ করিতেন। শান্তিপুরে নারী শিক্ষা বিস্তারেও তঁাহার প্রভূত দান ছিল। শান্তিপুরে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রাঙ্গণে তিনি "দেবী কামিনী স্মৃতি গ্রন্থাগার" প্রতিষ্ঠা করিলে বিধানচন্দ্র রায় তাহাতে ২ হাজার টাকা দান করেন। তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের বহুমুখী কর্ম প্রতিভা তাঁহাকে অমরত্ব দান করিবে।

নূতন ভাইস-চ্যান্সেলার—

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীসুরজিৎ লাহিড়ী ১১ই জানুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ভাইস চ্যান্সেলার (উপাধ্যক্ষ) হিসাবে কাজে যোগদান করিয়াছেন। পূর্ব্বদিন রাজ্যপাল শ্রীপদ্মজা নাইডু তাঁহাকে ঐ পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। বুধবার রাত্রিতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টার শ্রীগোপালচন্দ্র রায়-চৌধুরী তাঁহার গৃহে যাইয়া তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব খবর জানাইয়া আসিয়াছেন। সুরজিৎ লাহিড়ী পাবনা তাঁতি-বাঁধের জমীদার রণজিৎচন্দ্র লাহিড়ীর প্রথম পুত্র, ১৯০১ সালে তাঁহার জন্ম। ১৯২৫ সালে এম-এ পাশ করিয়া তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হন ও ১৯২৭ সালে ওকালতী আরম্ভ করেন। ঢাকার বিখ্যাত জননেতা ও উকীল আনন্দচন্দ্র রায়ের নাতনীকে তিনি বিবাহ করেন। ১৯৪৯ সালে তিনি হাইকোর্টের জজ ও ১৯৫৯ সালে প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন এবং ১৯৬১ সালে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার দ্বারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সকল গ্লানি হইতে মুক্ত হউক—সকলেই ইহা কামনা করিতেছে।

চীনের দাবী—

গত ১০ই জানুয়ারী পিকিং রেডিও হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে—কাশ্মীরের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে গিলগিট ভূখণ্ড হইতে এক হাজার বর্গ-মাইল স্থান চীন পাকিস্তানের নিকট হইতে পাইবার জন্য দাবী জানাইয়াছে। ঐ স্থানটি বর্তমানে পাকিস্তানের অধীন থাকিলেও পূর্বে তাহা চীনের অন্তর্গত ছিল—ইহাই চীনের দাবীর কারণ। পাকিস্থান কাশ্মীরের যে অংশ দখল করিয়া আছে, সেখান হইতেও ৪ হাজার বর্গ মাইল স্থান চীন পাইতে চায়—চীন পাকিস্তানকে তাহাও জানাইয়াছে। চীন ভারতের একটা বিরাট অংশ জোর করিয়া দখল করিয়া বসিয়া আছে। চীন একটি বিরাট দেশ, সম্প্রতি চীন তিব্বত দখল করিয়াছে—সে আরও অধিক জমী চাহে—শেষ পর্য্যন্ত চীন কি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান এবং সমগ্র ভারতরাষ্ট্র দখল করিতে চাহে?

ক্রিকেটের কৃপায়···

এ্যাম্বুলেন্স-গাড়ীর চালক : (দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষান্তে) দোহাই দাদারা···দয়া করে পথটা ছেড়ে দিন্···গলির ও-মোড়ে শেষ বাড়ীতে একজন মুমূর্ষু-রোগী শুষছে···নাভিশ্বাস উঠেছে তাঁর··· তাই তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে এসেছি···দেরী হলে, চিকিৎসার অভাবে বেচারী যে বেঘোরে প্রাণ হারাবেন !

ক্রিকেট-অনুরাগী জনতা : আঃ···কেন মিছে জ্বালাচ্ছেন মশাই। দেখছেন তো, 'টেষ্ট্-ম্যাচের' 'রীলে' (Relay) শুনছি···নড়বার ফুরশৎ নেই এতটুকু !···

—শিল্পী : পৃথ্বী দেবশর্ম্মা
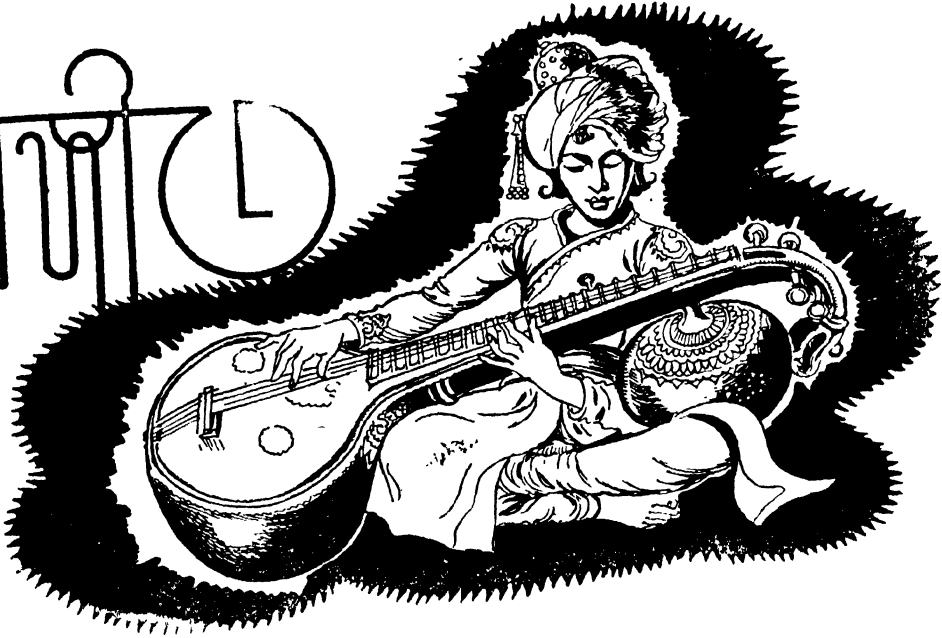
গান

গানে আমার প্রাণকে খুঁজে পাই
ঘুরে ফিরে তাই তো কেবল সেই জগতে যাই।
সেথায় মন্দাকিনী জলে
অবগাহি আপন হারা
সকল মলিনতা ডুবাই
তারই অতলে।

রাগের মায়া-কমল স্রোতে, নিজেকে ভাসাই ;
গানে আমার প্রাণকে খুঁজে পাই ॥
সেথায় মনোবীণার তারে,
সুর লোকের ঝরণা নামে,
কোন চরণের নূপুর ঝংকারে,
সেই চরণের ধুলিকণায় আপনাকে ছড়াই ॥

কথা : দক্ষিণারঞ্জন বসু

সুর ও স্বরলিপি : বুদ্ধদেব রায়

II গা গা -া | মা পা -া | ধা ধা -া | রা গা -া I
গা নে ০ আ মা র প্রা ণ কে খুঁ জে ০

মা -া -া | মা -া -া | গা মা -া | পা ধা ণা I
পা ০ ০ ই ০ ০ ঘু রে ০ ফি রে ০

পা ধা ণা | র্রা র্সা -া | র্সা -া ণা | ধা পমা গা I
তা ই ত কে ব ল সে ই জ গ তে ০

মা -া -া | মা -া -া II
যা ০ ০ ই ০ ০

II মা পা -া | ধা -া র্সা | র্সা র্সা র্রা | র্রা র্রা -া I
সে থা য় ম ন দা কি নী ০ কূ লে ০

ধা র্সা ধা | ধর্সা ধর্জ্ঞা -া | র্রা র্সা -া | র্সা র্সা -া I
অ ব ০ গা হি ০ আ প ন হা রা ০

ধা র্সা -া | র্সা র্রগা র্মা | র্গা র্রা -া | র্সা ণা -া I
স ক ল ম লি ০ ন তা ০ ডু বা ই

ণা -া র্রা | র্সা ণর্সা ণর্সা | ধা -া -া | -া -া -া I
তা ০ রি অ ত ০ লে ০ ০ ০ ০ ০

গা গা -া | গা গা -া | মা মা -া | পা পা -া I
রা গে র মা য়া ০ ক ম ল স্রো তে ০

ধা ধা -া | পধ পা গা | মা -া -া | -া -া -া II
নি জে ০ কে ০ ভা সা ০ ০ ০ ০ ই

গানে আমার প্রাণকে····

II গা গা -া | মা মা -া | সজ্ঞা সজ্ঞা -া | রা সা -া I
সে থা য় ম নো ০ বী ণা র তা রে ০

-া -া সা | রা গা মা | দা -া দা | দা দা -া I
০ ০ সু র লো কের ঝ র ণা না মে ০

পা -া দা | পা মা -া | মা পা ধণা | ণা -া ণা I
কো ন চ র ণে র নূ পু র ঝং কা রে

র্রা র্রা র্সা | র্সা -া -া | ণা ণা -া | ধা ধা -া I
সে ই চ র ণে র ধু লি ০ ক ণা য়

গা গা -া | মা পা -া | ধা -া -া | -া -া -া II
আ প না কে ছ ০ ড়া ০ ০ ০ ০ ই

গানে আমার প্রাণকে খুঁজে পাই·

স্ত্রীণাং চরিত্রম্

মিসেস্ গোয়েল্

কোন মহর্ষির মাথা স্ত্রী চরিত্র নিয়ে ভাবনা করে গরম হয়েছিল, শাস্ত্র থেকে তা' জানা যায় না, অন্তত আমার মত অজ্ঞ নারীর জানা নেই। কিন্তু বেশ পরিষ্কার বোঝা যায় কোন ঋষি কোনও স্ত্রীলোকের নিকট বঞ্চিত হয়েছিলেন। কিন্তু কেন বঞ্চিত হয়েছিলেন, তিনি কি আশা করেছিলেন, তাঁর নিজের চরিত্র কেমন ছিল, তা কেউ ভেবেও দেখছেন না, দেখবেন বলে আশাও নেই। অথচ এই বাক্যের মধ্যে যে একটা কুৎসিৎ ইঙ্গিত রয়েছে—স্ত্রীলোক মাত্রেই যে সন্দেহের পাত্র বা তার চেয়েও অধম—তা অম্লান বদনে সহ্য করে যাচ্ছেন জগতের সকল নারী। কেউ তার প্রতিবাদ করেন নি! করলেও পুরুষের পরুষ কণ্ঠে সে প্রতিবাদ চাপা পড়ে গিয়েছে। পুরুষের দৃষ্টি দিয়ে যাঁরা মেয়েদের বিচার করবেন, তাঁরা যে ভুল করবেন, তা কাকে বোঝাব? নইলে এক অসহায় নারীর নির্লজ্জ উলঙ্গ বর্বর চিত্র যখন তুলে ধরেন বাঙলার এক তরুণ,বাঙালী পাঠকেরা,এমন কি পাঠিকারাও তাঁর বাহবা দেন। কেউ ভেবে দেখেন না—নারী চরিত্র এমন জঘন্য হতে পারে? যদি হয়ই তবে কেন হয়েছে? পুরুষের লালসা যে আগুনের মত লেলিহান হয়ে স্পষ্ট করল নারীর পরম গৌরব। অন্নসংস্থানের কঠিন প্রয়োজন মিটাতে যে নারী কর্মের সন্ধানে বেরুল আফিসে; তার সর্বস্ব লুণ্ঠন করে তারপর তার চরিত্র নিয়ে 'কেচ্ছা' তৈরী করতে বাঁধে না পুরুষের। তাতে পয়সাও আসে, পসারও বাড়ে সাহিত্যের ক্ষেত্রে।

আমি বিশেষ লেখাপড়া শিখিনি। মনোবিজ্ঞানের মোটা বই মুখস্থ করিনি। তবু অনেক সময় ভাবি, ফ্রয়েড, এডলার, জাঙ্গ থেকে ডাঃ ঘোষাল পর্যন্ত নারীর মন সম্বন্ধে যে যা বলেছেন তার সব সত্য নয়। তাঁরা পুরুষের মন নিয়ে নারী-অন্তর বিচার করেছেন; তাঁদের কথা পুরুষ সম্বন্ধে যতটা সত্য, মেয়েদের সম্বন্ধে তার অর্ধেকও সত্য নয়। মেয়েদের আমি যেমন বুঝেছি তেমন ভাবে তাঁরা বুঝেছেন কি? মেয়েদের সম্বন্ধে তাঁরা আমার মত ভাববেন কি করে? তাঁরা ভেবেছেন মগজ দিয়ে। আমার ভাবনা আমার সমগ্র অন্তর দিয়ে, দেহের অণু-পরমাণু দিয়ে।

ভগবান যখন পুরুষকে সৃষ্টি করলেন। আনাড়ী ভগবানের প্রথম সৃষ্টি, বড় কিম্ভুত-কিমাকার। আপনার সৃষ্টির গৌরবে তিনি গৌরবান্বিত হতে পারলেন না। তারপর অনেক পরিশ্রম সাধ্যসাধনা করে তিনি তৈরী করলেন নারী—সৃষ্টির সমস্ত সৌন্দর্য আর আকর্ষণ দিয়ে। সে নারীর সৌন্দর্যে পাগল হয়ে তার পিছনে ছুটল বর্বর সে পুরুষ। তার কদাকার স্পর্শে নারীর রূপ ম্লান হল সত্যি, কিন্তু জন্মলাভ করল বিশ্বে অপরূপ মনোরম শিশু। পরম সুন্দর শিশু, যার মধ্যে স্রষ্টার নিজের রূপ উদ্ভাসিত; তাকে বিকশিত করে তুলল নারীর রক্ত ও স্নেহ।

নারীর দেহযন্ত্র তাই অনেক সূক্ষ্ম ও অনেক জটিল। মনও তার তেমনি। তার চরিত্র বুঝবে পুরুষ? পুরুষের সারাজীবনের সাধনায় তা সম্ভব হবে না। তাই তারা 'স্ত্রীণাং চরিত্রম্' বলে কাব্য রচনা করে। নিজের বুদ্ধির দৌড় যে তাতে প্রকাশ হয়ে পড়ে, সেটুকুও বুঝতে পারে না।

আমি নারী চরিত্র সম্বন্ধে এমন কিছু বলব বা লিখব, যাতে নারীর মন জলের মত পরিষ্কার রূপে ধরা দেবে আপনার সামনে—তা আশা করা ভুল। কারণ প্রথমত আমার বিদ্যাবুদ্ধি সামান্য, যা অনুভব করি তা ভাবতে পারি না, ভাবতে যা পারি তা লিখতে পারি না। তবু যত দূর সম্ভব চেষ্টা করব দৃষ্টান্ত দ্বারা বোঝাতে।

আমার মাসতুত বোন মৌলি সেনের কথাই বলি। মৌলি আমার মত মূর্খ নয়। সে ইংরাজি ও ইকনমিকসের এম-এ, এল-এল-বি ও পাশ করেছে। তার বিয়ে হয়েছে বেশ অনেকদিন আগে এক প্রতিষ্ঠাবান্ পাত্রের সঙ্গে। তার স্বামী ডাঃ সেন জষ্টিস্ সেনের বড় ছেলে। জষ্টিস্ সেন পুত্রবধূর রূপ দেখে বড় মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাকে মেমসাহেব বানিয়ে তুলবার জন্যে কনভেণ্টে ভর্তি করে দিয়েছিলেন দার্জিলিঙে। সেখান থেকে সে সিনিয়ার কেম্ব্রিজ পাশ করে। কোলকাতায় ফিরে এসে সে বি-এ ও দুটি বিষয়ে এম-এ পাশ করল। কিন্তু সাধারণ মেয়ের মত ঘর সংসার সে করল না। যদিও ছেলে হল দুটি, কিন্তু তারা মানুষ হল ঠাকুর-মা ও দিদিমার কোলে। তাদের মানুষ করা নিয়ে দুই বেয়ানে যে কত লড়াই হয়েছে, তার হিসাব দিয়ে স্ত্রী চরিত্রের আরও কলঙ্ক আমি বাড়াতে চাই নে। জষ্টিস সেনের ভাগ্য ভাল ছিল, তিনি পুত্রবধূর মোহিনী রূপ দেখেই স্বর্গে পৌঁছতে পেরেছিলেন। এত শিক্ষা পেয়েও তার মধ্যে যে এত বড় দানবী রূপ ফুটে উঠবে, তা দেখার দুর্ভাগ্য তাঁর হয়নি। অতিক্ষুদ্র ব্যাপার নিয়ে সে শাশুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া করল, ছেলে দুটিকে তাদের বাপের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সে নিজের বাপের বাড়ী চলে গেল। তারপর মায়ের কাছে সঁপে দিয়ে আবার ল'কলেজে ভর্তি হয়ে গেল।

মৌলির বাবা সঞ্জয় গুহ নামকরা হেড্‌মাষ্টার। দিবারাত্র অধ্যয়ন অধ্যাপনা নিয়ে ব্যস্ত। স্ত্রীর উপর সংসারের সমস্ত ভার ন্যস্ত। স্ত্রীর শাসন তাঁর শিরোধার্য। পাঞ্চালী গুহকে তিনি রীতিমত ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন। আর বিয়ের পর নিজেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ-করেছিলেন তার হাতে। সমর্পণ ছাড়া তাঁর উপায় ও ছিল না। একটি ছেলে ও একটি মেয়ের জন্মের পরই পাঞ্চালী গুহ জন্ম-নিয়ন্ত্রণের অপারেশন করেছিলেন। আর পুরুষ জাতটাকে যেন মন্ত্রমুগ্ধ বশীভূত করে রাখবার সাধনায় উঠে পড়ে লেগেছিলেন। যত অবিবাহিত শিক্ষক—সকলে ছিলেন তার বশীভূত! বার বার ফেল-করা খেলোয়াড়, বয়স্ক ছাত্র, স্কুলের সেক্রেটারী, মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান্, স্থানীয় হাসপাতালের বড় ডাক্তার—সকলেই পাঞ্চালী গুহের নামে অজ্ঞান। কিন্তু কেন? কে'নর ব্যাখ্যা আমি করতে চাই না। যার বুদ্ধি আছে সেই বুঝতে পারবেন; পাঞ্চালী গুহের মত দর্জাল, স্থূলতনু নারী এতগুলি পুরুষের নাকে দড়ি দিয়ে টানছে কিসের জোরে।

মৌলি যখন স্কুলে পড়ে তখনই পাঞ্চালী গুহ তাকে ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশার অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছিল। তার নিজস্ব আকর্ষণ শক্তি তখন শ্লথ হয়ে এসেছে। কিন্তু মৌলি বড় আনাড়ী। প্রথম পরিচয়েই সে ডাঃ ধ্রুব সেনকে ভালবেসে ফেললে! ভালবাস্ কিন্তু খেলিয়ে নে, আরো দশটাকে চেখে দেখ, তা নয়, ধ্রুবকে বিয়ে না করলে মৌলি মরে যাবে, এমন রাই-উন্মাদিনী দশা হল তার!

মৌলির বিয়ের পর জষ্টিস সেন তাকে কনভেণ্টের শিক্ষা, কলেজের আর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুললেও শৈশবে মাতৃ-চরিত্রের যে প্রভাব তার উপর পড়েছিল, তার থেকে মুক্ত করতে পারেন নি। পুরুষ স্ত্রী-জাতিকে নিগ্রহ করছে, এই ধারণা (হোক সে কল্পিত) তার মনকে পীড়া দিত, পুরুষ জাতির উপর প্রভাব বিস্তার করারও একটা বাসনা তার মনে জেগে উঠল।

ল'কলেজে পড়ার সময়ে তার সঙ্গে আর একটি মেয়ে পড়ত—তার চেয়ে বয়সে বড়। নাম তার সুশীলা নায়ার। দক্ষিণ ভারতের মেয়ে সে। কালো কুচকুচে চেহারা। কিন্তু মাথায় চুলের বাহার। মৌলি ভাবত, তার নাম যদি কুন্তলিনী হত। এমন চুল সে কোন মেয়ের মাথায় দেখে নি, দেখেনি এত তাড়াতাড়ি ইংরেজি বলার শক্তি। অতি অল্প-দিনের মধ্যেই মৌলি সুশীলার পরম বান্ধবী হয়ে পড়ল। ডাঃ

ধ্রুব সেনকেও এমন নিবিড়ভাবে ভালবাসে নি বুঝি সে। ধ্রুবের উদ্ধত ভালবাসা তাকে সন্তানের জননী করেছে। সে যেন তার মাধ্যমিকতায় সন্তান-লাভটাই শ্রেয় বলে মৌলির দেহ-মনকে অধিকার করতে চেয়েছিল। মৌলি তাই তার বিদ্রোহ ঘোষণার প্রতীক হিসাবে সে ছেলে দুটিকে কেড়ে নিয়েছে। যদিও ছেলে মানুষ করার বিন্দুমাত্র উৎসাহ তার মধ্যে ছিল না।

সে এখন সুশীলাকে ভালবাসে। সুশীলা পুরুষের মত কঠিন, অথচ নারীরই মত অনুদ্ধত দেহের আলিঙ্গন তার ভাল লাগে। এ দেহের আলিঙ্গন দেহকে বিদ্ধ করে না। গর্ভ ধারণের যন্ত্রণা দেয় না। ছেলে মানুষ করার গুরু-দায়িত্ব চাপিয়ে দেয় না। সুশীলার স্নেহ আলিঙ্গনে তাই মৌলি সেন বিভ্রান্ত।

(চলবে)

কাগজের কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

ইতিপূর্ব্বে কাগজের কারু-শিল্পের কয়েকটি নিত্য-প্রয়োজনীয় সামগ্রী তৈরী করার বিষয়ে আলোচনা করেছি। এবারে আপনাদের জানাবো—কাগজের কারু-শিল্পের বিচিত্র এক-ধরণের সৌখিন-সামগ্রী রচনার কথা। এ সামগ্রীটি—হলো অভিনব-ছাঁদের বিশেষ এক রকম সৌখিন 'লেফাফা' (Envelope) বা 'ব্যাগ' (Bag)। এ ধরণের 'লেফাফা' বা 'ব্যাগ', কোনো মূল্যবান কাগজপত্র, দরকারী দলিল রাখা কিম্বা কোনো উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমন্ত্রণ-লিপি, স্মারক-পত্র, শুভেচ্ছা-বাণী বা অভিনন্দন পাঠানোর পক্ষে বিশেষ উপযোগী হবে।

কাগজের কারু-শিল্পের এ সব সৌখিন সামগ্রী দেখতে
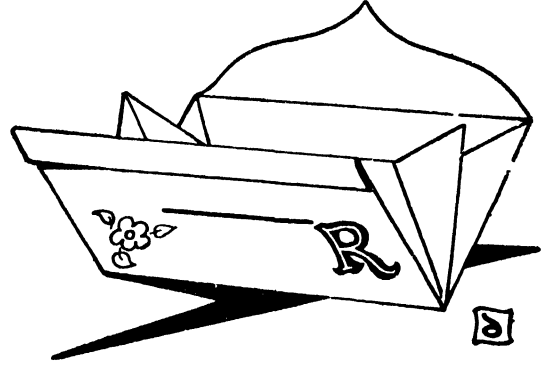
কেমন হবে, পাশের ১নং ছবিতে তার একটি সুস্পষ্ট নমুনা দেওয়া হলো।

উপরের নক্সার ছাঁদে কাগজের এই সৌখিন-লেফাফা রচনা করতে যে সব উপকরণ প্রয়োজন, প্রথমেই তার পরিচয় দিই। এ কাজের জন্য চাই—প্রয়োজনমতো আকারের চৌকোণা-ছাঁদের একখানি শাদা, রঙীণ অথবা চিত্রবিচিত্রিত একখানি পুরু কাগজ বা পাতলা কার্ডবোর্ড, একটি ধারালো ছুরি বা ক্ষুরের ব্লেড (Razor Blade), একখানি ভালো কাঁচি, একশিশি গঁদের আঠা (Pasting-Gum), একটি মাপ-নেবার 'স্কেল' (Scale) বা 'রুলার, (Ruler), একটি পেন্সিল, একটি পেন্সিলের দাগ-মোছবার রবার, জল-রঙের বাক্স (Water-Colour Box) একটি, সরু-মোটা এবং মাঝারি ধরণের কয়েকটি ভালো তুলি (Painting Brush), আর এক পাত্র পরিষ্কার জল। এ সব উপকরণ সংগ্রহ হবার পর, কারু-শিল্পের কাজ সুরু করতে হবে। এ কাজে হাত দেবার সময়, শিক্ষার্থীদের পক্ষে, গোড়ার দিকে খুব বেশী বড় কাগজ বা কার্ডবোর্ড নিয়ে অনুশীলন না করাই ভালো। তার চেয়ে, বরং অপেক্ষাকৃত ছোট কাগজ বা কার্ডবোর্ড ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত। কারণ, তাতে অপচয় এবং অপব্যয়—দুটিরই আশঙ্কা কম। সেইজন্য গোড়ার দিকে, শিক্ষার্থীদের পক্ষে, ৫"×৫" ইঞ্চি অথবা ৬"×৬" ইঞ্চি সাইজের চৌকোণা কাগজ বা কার্ডবোর্ড ব্যবহার করাই বিধেয়।

লেফাফা তৈরীর কাজ সুরু করবার সময়, প্রয়োজন-মতো মাপে ও আকারে, চৌকোণা কাগজ বা কার্ডবোর্ডটির
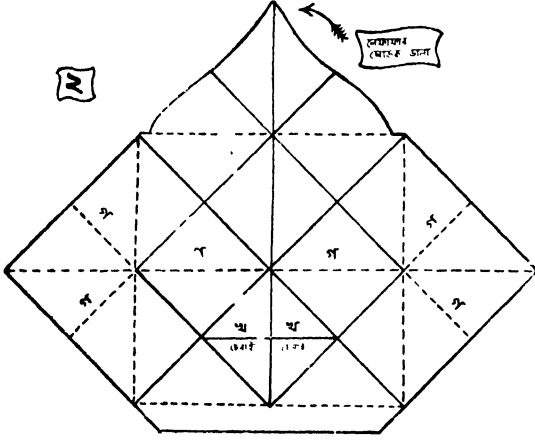
উপর পাশের ২ নং ছবির ছাঁদে আগাগোড়া পরিপাটিভাবে পেন্সিলের রেখা টেনে নক্সা (Diagram) এঁকে নিতে হবে। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি যে, উপরের ২নং চিত্রে যে নক্সা দেখানো হয়েছে—সেটি ৫″ × ৫″ ইঞ্চি কিম্বা ৬″ × ৬″ ইঞ্চি চৌকোণা কাগজ বা কার্ডবোর্ডের হিসাবে রচিত।

কাগজ বা কার্ডবোর্ডের বুকে প্রয়োজনমতো মাপ-অনুসারে নক্সাটিকে এঁকে নেবার পর, ধারালো ছুরি, ক্ষুরের ব্লেড বা কাঁচি দিয়ে উপরের ২নং চিত্রের 'ক'-চিহ্নিত কোণা অর্থাৎ লেফাফার মোড়কের 'ডালা' (Flap) এবং 'খ'-চিহ্নিত অংশ অর্থাৎ লেফাফার 'মোড়ক-ডালা' বন্ধ করবার 'চেরা-গর্ত্ত' (Slot) পরিচ্ছন্নভাবে ছাঁটাই করে নিন। এবারে ২নং চিত্রে দেখানো 'বিন্দু-রেখা' (Dotted Lines) চিহ্নিত লাইনের উপরে তুলির সরু ও ভোঁতা পিছনের দিক (Back-end of the Paint-Brush) অথবা পশম-বোনবার কাঁটার (Knitting-Needle) সাহায্যে মৃদু-চাপ দিয়ে লেফাফা-ভাঁজ করবার ছকটিতে দাগ কেটে নিন। তারপর সেই দাগের নিশানা বরাবর ছাঁটাই-করা চৌকোণা কাগজ বা কার্ডবোর্ডটি পরিপাটিভাবে আগাগোড়া ভাঁজ করে ফেলুন। এভাবে ভাঁজ করবার সময়, ২নং চিত্রে দেখানো 'গ'-চিহ্নিত অংশগুলিকেই শুধু 'পাট' (Fold) করতে হবে। লেফাফাটিকে এমনিভাবে 'গ'-চিহ্নিত 'বিন্দু-রেখার' দাগে-দাগে নিখুঁত-ছাঁদে উপরের ১নং চিত্রের আকারে ভাঁজ করে ফেলবার পর, লেফাফার 'মোড়ক-ডালাটিকে' (Lid-Flap) ২নং চিত্রের 'খ'-চিহ্নিত অংশ অর্থাৎ চেরাই-করা গর্ত্তের ভিতরে পরিয়ে দিন…তাহলেই কাগজের কারু-শিল্পের অভিনব সৌখিন 'লেফাফা' বা 'ব্যাগ' রচনার কাজ মোটামুটি শেষ হবে।

এবারে ঐ 'লেফাফা' বা ব্যাগটিকে চারু-শ্রী-মণ্ডিত করে তোলার পালা। এ কাজের জন্য দরকার—রঙ-তুলির নিপুণ পরশ! উপরের ১ন' ছবির ছাঁদে, কাগজ বা কার্ডবোর্ডের লেফাফার সামনের অংশে রঙীণ ফুল-পাতা কিম্বা অন্য কোনো মনোরম চিত্র এঁকে দিলে, শিল্প-সামগ্রীটি আরো বেশী সুন্দর দেখাবে। তাছাড়া লেফাফার অন্য কোণেও রঙ-তুলির রেখা টেনে—বিচিত্র শিল্পকারুময় নামাঙ্কন করাও যেতে পারে—তাতে শিল্প-সামগ্রীর সৌষ্টব-শ্রী বৃদ্ধি পাবে অনেকখানি।

প্রসঙ্গক্রমে, আরো একটি দরকারী কথা বলে এবারের মতো এ আলোচনা শেষ করি। অর্থাৎ, কাজের সময়, ছাঁটাই করা চৌকোণা কাগজ বা কার্ডবোর্ডটিকে লেফাফার ছাঁদে ভাঁজ করে ফেলার আগে, পেন্সিলের রেখার দাগ-গুলিকে ভালো 'রবার' বা 'Eraser' এর সাহায্যে কাগজের বুক থেকে বেমালুম মুছে দিতে হবে। পেন্সিলের দাগ থাকলে, সৌখিন লেফাফার শোভা যে বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হবে, এ কথা বলা বাহুল্য। সুতরাং এ বিষয়ে প্রত্যেক শিক্ষার্থী-কারুশিল্পীর বিশেষ নজর রাখা প্রয়োজন।

কাগজের কারু-শিল্পের সৌখিন 'লেফাফা' বা 'ব্যাগ' রচনার এই হলো মোটামুটি পদ্ধতি।

বারান্তরে, এ ধরণের আরো কয়েকটি বিচিত্র-অভিনব কারুশিল্প-সামগ্রী রচনার কথা জানাবার চেষ্টা করবো।

ছোট ছেলেদের 'পশমী পুলোভার'

সুলতা মুখোপাধ্যায়

এ বছরে শীত বেশ জোর পড়েছে এবং এই প্রচণ্ড শীতের মরশুমে পরম-উৎসাহে ঘরে-ঘরে সুরু হয়ে গেছে রঙ-বেরঙের 'পশম' বা 'উল' (wool) দিয়ে নানা রকমের পোষাক-আষাক বোনার কাজ। এবারে তাই ছোট

ছেলেদের ব্যবহার-উপযোগী এক ধরণের পশমের 'পুলোভার' (Pullover) রচনার কথা জানাচ্ছি। এ 'পুলোভারের'

ছাঁদটি কি ধরণের হবে, পাশের ছবিতে তার 'নমুনা-নক্সা' (Pattern-Design) দেওয়া হলো। এ-ছাঁদের 'পুলোভার' রচনা করা খুবই সহজ ব্যাপার এবং এটি বুনতে সময়ও লাগে অল্প। এমন কি, শিক্ষার্থীদের পক্ষেও এ-ধরণের 'পশমী-পুলোভার' বোনা তেমন কিছু দুঃসাধ্য ঠেকবে না। এমনি ধরণের 'পুলোভার' বুনতে হলে—'Stocking-Stitch' অর্থাৎ এক লাইন সোজা এবং আরেক লাইন উল্টো'—আর 'Ribbing' অর্থাৎ 'একটা ঘর সোজা এবং একটা ঘর উল্টো'—এই দুই পদ্ধতিতে পশম-বোনার কাজ করা চাই।

ছোট ছেলেদের ব্যবহারোপযোগী পশমের এই 'পুলোভার' বুনতে হলে যে সব উপকরণ দরকার—প্রথমেই সেগুলির কথা বলি। উপরের 'নমুনা-নক্সার' ছাঁদে 'পুলোভার' বোনার জন্য চাই—৩ আউন্স শাদা বা অন্য কোনো রঙের পশম এবং ১ আউন্স লাল বা অপর কোনো মানানসই রঙের ৪ প্লাই (4-ply wool) বা ৪-তারের পশম। 'পুলোভারের' ছাতির মাপ যদি ২৪" ইঞ্চি বা ২৬" ইঞ্চি হয়, তাহলে উপরোক্ত হিসাবে পশম নিলেই কাজ চলবে। কিন্তু ছাতির মাপ যদি ২৮" ইঞ্চি হয়, তাহলে ৪ আউন্স শাদা পশম লাগবে। এই হলো, কতখানি পশম প্রয়োজন—তার হিসাব-নিকাশের আন্দাজ পাবার মোটামুটি নিয়ম। প্রয়োজনমতো পশম ছাড়া, এ কাজের জন্য দরকার—একজোড়া ১০ নম্বর এবং একজোড়া ১২ নম্বর ভালো ও মজবুত ধরণের মোট চারটি 'বোনার-কাঠি' বা 'Knitting-Needle'। তাছাড়া এই 'বোনার-কাঠিগুলি দিয়ে পশম বোনবার সময়—বুননের 'Tension' বা 'টান' যেন প্রতি ৭½ ঘরে ১" ইঞ্চি হয়—সেদিকেও বিশেষ নজর রাখা প্রয়োজন। এ হিসাব-অনুসারে পশম বুনলে, বুননের কাজ যে শুধু পরিপাটি-সুন্দর ছাঁদের হবে তাই নয়, পোষাকটিও মজবুত এবং টেঁকসই হবে সবিশেষ। প্রসঙ্গ-ক্রমে, আরো একটি দরকারী কথা জানিয়ে রাখি এখানে। সেটি হলো—এ 'পুলোভার' বোনবার পদ্ধতি-আলোচনা-কালে, আমরা ছাতির মাপ ২৪" ইঞ্চি হিসাবে ধরে মাপজোপের হদিশ দেবো। তার চেয়ে বড় অর্থাৎ ছাতির মাপ ২৬" ইঞ্চি ও ২৮" ইঞ্চি হলে, মাপজোপের যে হিসাব রাখা প্রয়োজন, তার আন্দাজ পাবেন—'বন্ধনী-চিহ্নের' ভিতরে উল্লিখিত অঙ্কগুলি থেকে। তবে, পশম দিয়ে 'পুলোভার' বোনবার সময়, যে সব অংশে—২৪" ইঞ্চি, ২৬" ইঞ্চি এবং ২৮" ইঞ্চি অর্থাৎ ছাতির মাপ বিভিন্ন হলেও, একই ধরণে বুননের কাজ করতে হবে, সেখানে আর আলাদাভাবে উপরোক্ত 'বন্ধনী-চিহ্নের' ভিতরে কোনো হিসাব-নির্দ্দেশের উল্লেখ থাকবে না। এই নিয়ম মতোই আপাততঃ পশম আর বোনার-কাঠি দিয়ে ২৪" ইঞ্চি ছাতির মাপ হিসাবে 'পুলোভার' বোনবার পদ্ধতির কথা বলছি।

উপরে উল্লিখিত উপকরণগুলি সংগ্রহ করে পশম ও বোনবার কাঠি দিয়ে 'পুলোভার' রচনার সময়, গোড়াতেই পোষাকের 'পিছন' (Back) অর্থাৎ 'পিঠের দিকটি' বুনতে হবে। এ কাজের জন্য—১২ নম্বর 'বোনার-কাঠি' (No. 12 Knitting-Needle) দিয়ে শাদা-রঙের পশমে ৯২টি [১০০ : ১০৮] ঘর তুলে—'এক ঘর সোজা এবং আরেক ঘর উল্টো' অর্থাৎ 'রিবিং, (Ribbing) পদ্ধতিতে বুনবেন। এইভাবে মোট ১৬টি সারি বুনতে হবে। ষোড়শ বা শেষ সারিতে ১ ঘর বাড়িয়ে অর্থাৎ ৯৩টি [০৬ : ১০৯] ঘর বুনবেন। তারপর ১০ নম্বর 'বোনার-কাঠি' (No. 10 Knitting-Needle) ব্যবহার

করে, শাদা-রঙের পশমে—'এক লাইন উল্টো এবং আরেক লাইন সোজা' অর্থাৎ 'স্টকিং ষ্টিচ' (Stocking-Stitch) পদ্ধতিতে ১ম সারি থেকে ৮ম সারি বুনতে হবে। ৯ম সারি লালরঙের পশমে এক ঘর সোজা অর্থাৎ একটি ঘর না বুনে তুলে এবং একটি ঘর সোজা বুনে তুলে এইভাবে সারির শেষ পর্য্যন্ত বুনবেন। ১০ম্ সারিটি আগাগোড়া লাল-রঙের পশম দিয়ে উল্টো বুনতে হবে। ১১শ সারি রচনা করতে হবে—শাদা-রঙের পশমে, এক-ঘর না-বুনে তুলে অর্থাৎ 'একটি ঘর সোজা বুনে এবং একটি ঘর না-বুনে তুলে' নেবার পদ্ধতি-অনুসারে। ১২শ সারি—শাদা-রঙের পশমে,উল্টোভাবে বুনে। ১৩শ সারি বুনতে হবে, আগাগোড়া উপরোক্ত ৯ম সারি বোনারছাঁদে। ১৪শ সারি বুনবেন—লাল-রঙের পশমে,উল্টো-ভাবে। উল্লিখিত এই চৌদ্দটি সারি দিয়েই পুরো প্যাটার্ণটি এবং এটিরই পুনরাবৃত্তি (Repeat) করেই 'পুলোভারের' 'পিঠ' বা 'পিছনের অংশ' বুনতে হবে। এই পদ্ধতিতে এবং প্যাটার্ণ অনুসারে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ৮½ ইঞ্চি [৯″ ইঞ্চি : ৯½″ ইঞ্চি] লম্বা অংশ বোনা হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত 'পুলোভারের' 'পিঠ' (Back) বা 'পিছনের দিকটি' এমনি ধরণে বুনে যাবেন।

এভাবে 'পিছনের অংশের' কাজ শেষ হলেই 'পুলো-ভারের, হাতের 'মুহুরী' বা 'মোহড়া' বুনতে সুরু করবেন। 'পুলোভারের' হাতের 'মুহুরী' বা 'মোহড়া' বোনবার নিয়ম—পর-পর দুটি সারির আরম্ভে ৬টি [৬ : ৭] ঘর বন্ধ রেখে বুনতে হবে। এভাবে বোনা হলে, পরবর্ত্তী ৬টি সারির দুদিকেই ১টি করে ঘর কমিয়ে অর্থাৎ মোট ৬৯টি ঘর [৭৭ : ৮৩] ঘর, সোজা বুনে যান—যতক্ষণ পর্য্যন্ত না বোনার অংশটি লম্বায় ১৩½″ ইঞ্চি [১৪½″ ইঞ্চি : ১৫½″ ইঞ্চি] হয়।

এমনিভাবে জামার হাতের 'মোহড়া' বা 'মুহুরীর' কাজ শেষ হলে, 'পুলোভারের' কাঁধের অংশের 'সেপ্' (Shape) বা 'ছাঁদ' বুনতে সুরু করবেন। 'পুলোভারের' কাঁধের 'সেপ্' বা 'ছাঁদ' বোনবার নিয়ম—পরের দুই সারির আরম্ভে ১৮টি [২২ : ২৪] ঘর বন্ধ করে বুনে যেতে হবে। এ কাজের পর জামার 'পিঠের' বা পিছনের দিকের গলার পটি (Back Neck-band) বোনবার পালা। 'পুলো-ভারের' পিঠের দিকের গলার পটি বোনবার নিয়ম—উপরোক্ত প্রথায় কাঁধের 'সেপ্' বা 'ছাঁদ' বোনবার সময় ১৮টি [২২ : ২৪] ঘর বন্ধ রেখে বাকী যে ঘরগুলি অর্থাৎ ৩৩ [৩৩ : ৩৫] রইল, সেগুলিকে ১২ নং 'বোনার-কাঠিতে' বদলে নিন। এবার শাদা-রঙের পশমে ৬টি সারি—'একটা সোজা এবং একটা উল্টো' পদ্ধতিতে বুনে চলুন—তাহলেই 'পুলোভারের' পিছন (back) অর্থাৎ পিঠের দিকের বুননের কাজ শেষ হবে।

স্থানাভাববশতঃ এ-সংখ্যায় 'পুলোভারের' সামনের (Front) অংশের বোনবার পদ্ধতি বর্ণনা করা গেল না। সুতরাং আগামী মাসে এ বিষয়ে মোটামুটি আভাস দেবো। ক্রমশঃ

সুধীরা হালদার

গতবারের মতো এবারেও ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বিচিত্র-উপাদেয় দুটি বিশেষ-ধরণের খাবার রান্নার কথা বলবো। এ দুটি খাবারই আমিষ-জাতীয়···বাড়ীতে কোনো উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষে আত্মীয়-বন্ধু আর অতিথি-অভ্যাগতদের সমাদর ও রসনা-তৃপ্তির ব্যাপারে এ দুটি খাবারই পরম উপভোগ্য হবে।

মাংসের মেটের দো-পেঁয়াজী ঃ

এটি অভিনব এক ধরণের মোগলাই-খাবার···খেতে বেশ সুস্বাদু। মাংসের 'মেটে' বা 'মেটুলির' দো-পেঁয়াজী রান্না করতে হলে যে সব উপকরণের প্রয়োজন, প্রথমে তার একটা মোটামুটি ফর্দ্দ জানিয়ে রাখি। এ রান্নার জন্য চাই—প্রয়োজনমতো মাংসের 'মেটে' বা 'মেটুলি', পাতি লেবু, পেঁয়াজের কুচো, কিস্‌মিস্, ঘি, নুন, আদা-বাটা রসুন-বাটা, হলুদ-বাটা, লঙ্কা-বাটা, গরম মশলা এবং দই।

উপকরণগুলি সংগ্রহ হবার পর, রান্নার পালা। প্রথমেই মাংসের 'মেটে' বা 'মেটুলি' ছোট-ছোট টুকরো করে কেটে পরিষ্কারভাবে জলে ধুয়ে নিতে হবে। তারপর উনানের আঁচে ডেকচি চাপিয়ে, সেই ডেকচিতে আন্দাজমতো জল দিয়ে মাংসের 'মেটে' বা মেটুলির' টুকরোগুলিকে সুসিদ্ধ করে নিন। 'মেটের' টুকরোগুলি সুসিদ্ধ হলে, সেগুলিকে ভালোভাবে জল ঝরিয়ে অন্য একটি পরিষ্কার পাত্রে তুলে রাখবেন।

এবারে উনানের আঁচে ডেকচি চাপিয়ে, সেই ডেকচিতে আন্দাজমতো ঘি দিয়ে, পেঁয়াজের কুচো এবং আদা-বাটা, রসুন-বাটা, হলুদ-বাটা, লঙ্কা-বাটা, আর দই অর্থাৎ রান্নার মশলা ভেজে নেবেন। এভাবে ভাজার ফলে, পেঁয়াজের কুচো বাদামী-রঙের হলে, রান্নার মশলায় সিদ্ধ-করা 'মেটের' টুকরোগুলি ছেড়ে দিয়ে ভালো করে ভেজে নিতে হবে। কিছুক্ষণ এমনিভাবে রান্নার মশলার সঙ্গে 'মেটের' টুকরোগুলি একত্রে ভেজে নেবার ফলে, বেশ সুগন্ধ বেরুলেই উনানের আঁচে বসানো ডেকচিতে আন্দাজমতো জল দিয়ে, 'মেটুলির' টুকরোগুলিকে আরো খানিকক্ষণ সুসিদ্ধ করে নিতে হবে। 'মেটের' টুকরোগুলি ভালভাবে সিদ্ধ হয়ে গেলে ডেকচিতে সামান্য লেবুর রস ও আন্দাজমতো কিস্‌মিস্‌ মিশিয়ে আরো কিছুক্ষণ উনানের আঁচে ফুটিয়ে নিতে হবে। এমনিভাবে অল্পক্ষণ ফুটিয়ে নেবার পর, ডেকচিটিকে উনানের আঁচ থেকে নামিয়ে, সুসিদ্ধ 'মেটের' টুকরোগুলির সঙ্গে সামান্য লেবুর রস ও আন্দাজমতো গরম মশলা মিশিয়ে বড় চামচ বা খুন্তি অথবা হাতার সাহায্যে একটু নেড়েচেড়ে সযত্নে পরিষ্কার একটি পাত্রে তুলে রাখতে হবে। তাহলেই বিচিত্র 'মোগলাই' খাবার 'মেটের দো-পেঁয়াজী' রান্নার পালা শেষ।

শিক কাবাব ঃ

এটিও আর এক ধরণের জনপ্রিয় ও বিচিত্র-উপাদেয় আমিষ-জাতীয় 'মোগলাই' খাবার। 'শিক-কাবাব' খাবারটি রান্নার জন্য যে সব উপকরণ প্রয়োজন, গোড়াতেই তার মোটামুটি তালিকা দিচ্ছি। 'শিক-কাবাব' রান্নার জন্য দরকার—কয়েকটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন লম্বা-ছাঁদের লোহার শিক। এই লোহার শিকগুলির কোথাও যেন এতটুকু মরচের চিহ্ন না থাকে—সেদিকে বিশেষ নজর রাখবেন। তাছাড়া রান্নার কাজে ব্যবহারের আগেই লোহার এই শিকগুলি আগাগোড়া ছাই দিয়ে মেজে বেশ সাফ করে ধুয়ে নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। যাই হোক, লোহার শিকগুলি সংগৃহীত হবার পর, 'শিক-কাবাব' রান্নার জন্য চাই—প্রয়োজনমতো মাংসের কিমা, ঘি, তেল, নুন, কাঁচা লঙ্কা, পেঁয়াজ, ধনেপাতা, পাতি-লেবু ও টোম্যাটো।

এ সব উপকরণ জোগাড় হবার পর, রান্নার কাজ সুরু করবার আগে, মাংসের কিমার সঙ্গে আন্দাজমতো পরিমাণে পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা ও নুন মিশিয়ে, বেশ ভালভাবে পিষে-মেখে আগাগাড়া 'লেই' বা 'মণ্ডের' (Pulp) মতো করে নিতে হবে। এ কাজের পর, লোহার শিকগুলিকে আগাগোড়া ভাল করে তেল মাখিয়ে নিয়ে, সেই তেল-মাখানো শিকগুলিকে উনানের গরম আঁচে রেখে ঈষৎ-তপ্ত করে নিন। লোহার শিকগুলি তপ্ত হলে, লঙ্কা-পেঁয়াজ-নুন-মেশানো মাংসের কিমার 'লেই' বা 'মণ্ডের' কতকটা নিয়ে প্রলেপের মতো প্রত্যেকটি শিকের গায়ে চারি পাশেই সমান ভাবে লেপে দিন। এবারে মাংসের কিমার প্রলেপ-জড়ানো লোহার শিকগুলিকে একে একে উনানের গরম আঁচে রেখে সযত্নে ঝলসে নিতে হবে। এ কাজের সময় জ্বলন্ত উনানের দু'পাশে ইঁট সাজিয়ে আগুন থেকে সামান্য একটু উঁচুতে মাংসের প্রলেপ লাগানো শিকগুলিতে সাজিয়ে রাখতে হবে এবং আগুনের আঁচে ঝলসানোর সময় প্রত্যেকটি শিক অনবরত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সযত্নে বারে-বারে সেঁকে মাংসটিকে আগাগোড়া সুষ্ঠুভাবে ঝলসে নিতে হবে।

এইভাবে ঝলসে নেবার ফলে, লোহার শিকগুলির গায়ে-জড়ানো মাংস 'সুসিদ্ধ' (Roasted) হয়ে যাবার পর, উনানের আঁচ থেকে সরিয়ে এনে পরিষ্কার একটি কাঁচের বা এনামেলের থালায় রেখে আস্তে আস্তে ও সাবধানে শিক থেকে মাংসের টুকরোগুলি খুলে নেবেন। এমনিভাবে একের পর এক লোহার শিকগুলি থেকে মাংসের ঝলসানো-সুসিদ্ধ টুকরো খুলে নিয়ে থালাতে রেখে, সেগুলির উপর আন্দাজমতো পরিমাণে পেঁয়াজ ও টোম্যাটোর কুচো ছড়িয়ে দিতে হবে। তাহলেই বিচিত্র অভিনব 'মোগলাই-খানা' মাংসের কিমার 'শিক-কাবাব' রান্নার পালা শেষ। এবারে এ খাবার পরিবেশনের আগে, 'শিক-কাবাবের' টুকরোগুলির উপর আন্দাজমতো পরিমাণে সামান্য একটু লেবুর রস আর ধনেপাতার কুচো ছড়িয়ে দিন—তাহলেই খাবারটি পরম উপভোগ্য ও রসনা-তৃপ্তিকর হয়ে উঠবে।

আপাততঃ এই পর্য্যন্তই। বারান্তরে আরো কয়েকটি বিচিত্র-উপাদেয় ভারতীয় রন্ধন-প্রণালীর বিষয় আলোচনা করবার বাসনা রইলো। •

নিরালায়

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

দিনের পাঁপড়ি ঝরে গেছে আর
জেগেছে রাতের কলি,
জ্বলে জোনাকিরা, নিশি-গন্ধার
বুকে এসে পড়ে অলি।
বকুলের বনে ডেকে ডেকে পাখী
তমালের নীড়ে মুদিতেছে আঁখি
এপারের সাথে ওপারের কথা সাঙ্গ হোলো,
নৈশ বিহারে আয়তলোচনা মুখটি তোলো !
আমার প্রথম জীবনের কথা
আবার এলো কি ফিরে ?
মনোবাতায়নে তাই পুলকতা
অতীতের স্মৃতি ঘিরে।
নানা আলাপন করি নিরালায়
দুর বন ছায়ে কাক-জ্যোছনায়
তোমার প্রেমের পাতায় রেখেছি প্রণয় লেখা,
রঙের তুলিতে নব অনুরাগে ফুটায়ে রেখা।

সে কথা তোমার জাগে কি স্মরণে
স্মর-সম্ভোগ মাঝে ?
পর্ণকুটীরে প্রীতি আহরণে
ছিলে যবে মোর কাছে।
শুনায়েছ শেষে মমতা-মেদুর
মীড় টেনে টেনে ছায়া নট সুর
গীতি-গুঞ্জনে রেখেছ রূপের আলিম্পন,
পড়ে কিগো মনে ঘরের দুয়ারে আলিঙ্গন ?
আজ কিছু নয় তোমাতে আমাতে
শুধু বসে গান গাওয়া,
স্বপনের তরী কল্পনা সাথে
যৌবন গাঙে বাওয়া।
এ পথে এখন নাহি কোন প্রাণী
দখিণা বাতাস করে কানাকানি।
পলাশফুলের মঞ্জরী দোলে—সোনালি আলো,
নদীর কিনারে সন্ধ্যা নেমেছে প্রদীপ জ্বালো

[পূর্ব প্রকাশিত অংশের সংক্ষিপ্তসার—অনুরাধা রায় সতীশঙ্কর রায়ের বিধবা স্ত্রী। তিনি রূপবতা এবং বুদ্ধিমতী। সতীশঙ্কর প্রথম জীবনে বিপ্লব আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারাদণ্ডও ভোগ করেছেন। পরে জেল থেকে বেরিয়ে এসে কংগ্রেসে যোগ দেন। উত্তর-জীবনে রাজনীতির সঙ্গে তাঁর তেমন প্রত্যক্ষ যোগ ছিলনা। কিন্তু সমাজের নানাস্তরের মানুষের সঙ্গে তাঁর নানারকম যোগাযোগ ছিল। তাঁর কয়েকজন বন্ধু কলকাতার শহরতলীতে একটি গ্লাস-ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সতীশঙ্কর তাতে সাধারণ কর্মী হিসাবে যোগ দিয়ে বুদ্ধি আর কর্মদক্ষতার জোরে পরিচালকদের অন্যতম হয়ে উঠেছিলেন। তিনি নিঃসন্দেহে আরো কৃতী হতে পারতেন। কিন্তু পঞ্চান্ন বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয় অপঘাতে আততায়ীর ছুরিতে। এই নিয়ে নানা জনশ্রুতি আখ্যান উপাখ্যানের রটনা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এই হিংসা আসলে প্রতিহিংসা। অন্যায় অবিচারের প্রতিশোধ নিয়েছে আততায়ী। কেউ বা অনুমান করেন এই অপঘাত মৃত্যুর মূলে আছে সতীশঙ্করের নারীঘটিত কোন অসঙ্গত অসামাজিক আচরণ; আততায়ী পলাতক। আত্মগোপন করে রয়েছে তাই এ রহস্যের কোন কিনারা হয়নি।

ভবিষ্যতে যে হবে অনুরাধা সে আশা ছেড়ে দিয়েছেন। স্বামীর স্মৃতিরক্ষা করাই এখন তার একটি পরম সাধ। কোন সৌধ গড়ে নয়, সেই স্মৃতি তিনি রাখতে চান স্বামীর একখানি জীবনী রচনা করে। তার জন্যে একজন লেখক দরকার। খুব খ্যাতিমান লেখক না হলেও চলবে। সাহিত্যক্ষেত্রে মোটামুটি রকম পরিচয় আছে, লেখার হাত আছে,স্টাইলটি মুখপাঠ্য,এমন একজন লেখকের কথা বন্ধুদের বলে রেখেছিলেন অনুরাধা। সেই বন্ধু মহলের একজনের সুপারিশ চিঠি নিয়ে এল উৎপল সেন। দুচারখানা উপন্যাস আর গল্প-সংকলন আছে তার বাজারে, সাময়িক-পত্রিকাতেও কিছু কিছু লেখা বেরোয়। কিন্তু তাতে জীবিকার সংস্থান হয় না। উৎপল তাই চাকরিপ্রার্থী। বয়স তিরিশের কাছাকাছি। এখনও অবিবাহিত। তাই বলে স্বজন-হীন নয়। সংসারে দাদা বউদি ভাইপো ভাইঝি আছে। নিয়মিত টাকা দিতে না পারলে পরিবারে মর্যাদা থাকেনা, প্রত্যয়ও শিথিল হয়ে আসে।

উৎপল সেনের সঙ্গে আলাপ করে অনুরাধা খুসি হলেন। সতীশঙ্করের জীবনী রচনার ভার দিলেন তার ওপর। ঠিক হল তিনি মাসে একশ টাকা করে দেবেন উৎপলকে। এই টাকা অগ্রিম রয়্যালটি হিসাবে গণ্য হবে। অনুরাধা ভাবলেন—দু-তিন মাসের মধ্যেই উৎপল বইখানি শেষ করতে পারবে।

লিখবার সময়-স্বাধীনতা রইল উৎপলের। শুধু একটি সর্তের বন্ধনে অনুরাধা তাঁকে বাঁধলেন। বইটি পবিত্র হওয়া চাই। বইটি যেন হয় একটি আদর্শবাদী পুরুষের জীবনগ্রন্থ। তাই দিয়ে অক্ষরে অক্ষরে গেঁথে একটি শ্বেত সুন্দর মন্দির-প্রতিষ্ঠা করতে চান অনুরাধা। এই মন্দিরের বিগ্রহ হবেন সতীশঙ্কর। অনুরাধার ছেলে বিশু—বিশ্বরূপ এখন দশ বছরের বালক। কিন্তু সে তো চিরকাল বালকই থাকবে না। বড় হয়ে সে যেন উৎপলের লেখা সতীশঙ্করের এই জীবন-চরিত পড়ে উদ্বুদ্ধ হয়, অনুপ্রাণিত হতে পারে।

অনুরাধা উৎপলকে ডেকে নিয়ে ভিতরের ঘরগুলি দেখালেন। দোতলার একটি ঘরে পারিবারিক লাইব্রেরী আছে। সতীশঙ্করের বড় একখানি অয়েলপেন্টিং আছে দেয়ালে টাঙানো। ঘরের এক কোণে একটি প্রস্তর প্রতিকৃতিও রয়েছে। মানুষটির মধ্যে পৌরুষ আর দৃঢ়তা ছিল,

চেহারা দেখে তা বোঝা যায়। কিন্তু উৎপল লক্ষ্য করল—সতীশঙ্করের আকৃতি নিখুঁৎ নয়। কোন ক্রমেই সুপুরুষ তাঁকে বলা যায় না। বীরোচিত দৈর্ঘ্য তাঁর নেই, নাক মুখ ঠোঁট চিবুকের গড়নেও সুশ্রীতার অভাব আছে। কিন্তু এই ঈষৎ অসুন্দর দেহের পরিবর্তে অনুরাধা তাঁর চিত্রশিল্পীকে কি ভাস্করকে একটি পরম সুন্দর বরতনু নির্ম্মাণের অনুরোধ করেননি। ভাষা-শিল্পী বলেই কি উৎপলের জন্য এই ভিন্ন ব্যবস্থা?

এই বাড়িতে প্রথম দিনেই আর একটি মেয়ের সঙ্গে উৎপলের পরিচয় হল। তার নাম পদ্মা। শ্যাম বর্ণা, দেখতে তেমন সুশ্রী নয়। তবে তন্বী তরুণী। এ বাড়িতে অনুরাধার আশ্রিতা। কিন্তু অশিক্ষিতা নয়, অসহায়াও তাকে বলা যায় না। বি-এ পাশ করে একটি হাইস্কুলে টিচারী করছে। তার সঙ্গে দু-একদিন আলাপ করে উৎপলের মনে হল—সতীশঙ্করের সঙ্গে এই মেয়েটির বেশ পরিচয় ছিল। তাঁর জীবনের অনেক কথাই হয়তো পদ্মা জানে। কিন্তু সে বড় চাপা। তার এই মিতভাষিতা কি অনুরাধার ভয়ে, না অন্য কোন দুর্জ্ঞেয় আনুগত্যে—উৎপল ঠিক বুঝে উঠতে পারেনা। উৎপলের শিল্পীমনে তাকে নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা চলে।

লিখবার জন্যে এ বাড়িতে প্রায় রোজই আসে উৎপল। অনুরাধা সুস্বাদু খাবার আর সুপেয় চা পাঠিয়ে সৌজন্য দেখান। মাঝে মাঝে বসে স্বামীর জীবন সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্যও শুনিয়ে যান। তার সবই সতীশঙ্করের গুণাবলীর কথা।

তবু লেখা কিন্তু এগোয় না উৎপলের। কাগজ কলম টেনে নিয়ে খসড়া করে, কাটাকুটি করে। নানা ধরণের দ্বিধা সংশয়ে তার মন বার বার আচ্ছন্ন হয়। সতীশঙ্করের জীবন সম্বন্ধে নানা উল্টোপাল্টা কথা কানে আসে। ঠিক একটি ঋষি সতীশঙ্করের মূর্তি কিছুতেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে না। একেক বার ভাবে—অনুরাধাকে টাকা ফিরিয়ে দিয়ে সতীশঙ্করের একটি কৃত্রিম জীবনী-রচনার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়ে নেবে উৎপল।

কিন্তু বলি বলি করেও একথা অনুরাধাকে মুখ ফুটে বলতে বাধে। অনুরাধার সৌজন্য ভদ্রতা সদালাপ গল্প স্বল্প রসিকতায় যেন এক ধরণের সৌহার্দের স্বাদ পায়। অথচ এই দ্বিধাসংশয়ে তার নিজের কাজের যে ক্ষতি হচ্ছে তাও অনুভব করে উৎপল, অন্য কোন লেখায় হাত দেওয়া হচ্ছেনা—অথচ জীবনী-রচনার কাজেও হাত গুটিয়ে বসে আছে।

একদিন পদ্মার সঙ্গে বাইরের ঘরে বসে কথা বলছে উৎপল, একটি লোক এসে পদ্মাকে ডেকে নিয়ে গেল। চোয়াড়ে ধরণের চেহারা লোকটির। দেখলেই মনে হয় সমাজের নিচু তলার মানুষ—পদ্মা তাকে সামান্য কিছু টাকা দিয়ে বিদায় করে এল। এসে বলল—সতীশঙ্করদা এই সব লোকদের বড় প্রশ্রয় দিতেন সেই সুযোগ এরা নিচ্ছে। একথা শুনে উৎপল একটু অবাক হল।

সন্ধ্যার দিকে সতীশঙ্করের বাড়ি থেকে বেরিয়ে খানিকটা পথ আসতেই সেই লোকটি ফের উৎপলের সামনে এসে দাঁড়াল। নিজে নিজেই পরিচয় দিল। তার নাম নিশিকান্ত সে নাকি এক সময় সতীশঙ্করের ডান হাত ছিল। নিশিকান্ত উৎপলকে তার নিজের বাড়িতে নিয়ে এল। উৎপলের মনে একটু আশঙ্কা হল, কিন্তু কৌতূহল সেই আশঙ্কাকে ছাড়িয়ে গেল। উৎপল তার পিছনে পিছনে একটি বস্তীর মধ্যে ঢুকল।]

১২

সরু গলির মুখে বেশ বড় গোছের একটি বস্তী। সামনে ফাঁকা উঠান। একটি জলের কলের সামনে কয়েকজন নারী-পুরুষ ভীড় করে দাঁড়িয়েছে। ভিতরের কোন একটা ঘর থেকে রেকর্ডে হিন্দী সিনেমার হালকা ধরণের গান বেজে চলেছে। খানিক দূর থেকে কিসের একটা চেঁচা-মেচি শোনা যায়, ভিতরটায় বেশ অন্ধকার।

নিশিকান্ত বলল, 'আসুন বাবু। ইলেকট্রিক লাইট-ফাইট নেই, আপনার খুবই কষ্ট হবে। সতীশঙ্করদা থাকলে এতদিনে লাইট হয়ে যেত। এ বস্তীর ওপর তাঁর নজর ছিল। তিনি মারা যাওয়ার পরেও এখানে লাইট আনবার কয়েকবার চেষ্টা হয়েছে। ইলেকসনের সময় কর্তারা একেবারে কল্পতরু। যা চাও তাই এনে দেব। আলো বাতাস জল কিছুরই অভাব থাকবে না। আকাশের চাঁদ পর্য্যন্ত হাতে এনে দিতে চান তখন। তারপর ইলেকসন

শেষ হয়ে গেলে আর কারও টিকিটি দেখবার জো নেই।'

ছোট একটি দরজার সামনে এসে কড়া নাড়ল নিশিকান্ত। সঙ্গে সঙ্গে ডাকও ছাড়ল, 'এই হিমি, দরজা খুলে দে। এই হিমি!' তারপর উৎপলের দিকে চেয়ে বলল, পাঁচ ঘর ভাড়াটের বাড়ি স্যার। কড়া ভেঙ্গে ফেললেও কেউ এসে সহজে দোর খুলে দেয় না। চেঁচামেচি করে নিজের ছেলে-মেয়েদেরই ডেকে আনতে হয়। আমার ঘর একেবারে সব চেয়ে দক্ষিণে।'

একটু বাদে কালো মত রোগাটে একটি মেয়ে এসে দোর খুলে দিল। আধা অন্ধকারে ভালো করে বোঝা যায় না। উৎপলের মনে হল, দশ বারো বছরের বেশি হবেনা ওর বয়স।

নিশিকান্ত বলল, কোথায় ছিলি এতক্ষণ হিমি? চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা ভেঙে গেল।

হিমি ফিস ফিস করে বলল, 'চুপ করো বাবা। মা ভয়ানক চটে গেছে। সেই কখন বেরিয়েছ, বাজার-টাজার কিছু করে দিয়ে যাওনি। আমরা সব খাই কী? মার হাতে কি একটা পয়সা আছে যে আমাদের কিছু এনে দেবে?'

নিশিকান্ত বলল, 'চুপ চুপ। ভারি গিন্নী হয়েছিস একেবারে! দেখেছিস কে এসেছেন?'

বলে নিশিকান্ত সরে দাঁড়াল। এতক্ষণ ওই দৈত্যাকার লোকটির আড়ালে, ঢাকা পড়ে গিয়েছিল উৎপল এবার মেয়েটি তাকে প্রথম দেখতে পেয়ে একটু জিভ কেটে লজ্জিতভাবে বলল, 'কে বাবা?'

নিশিকান্ত বলল, 'ইনি একজন মস্ত লোক। যা বলগে তোর মাকে। ছুটে যা।'

প্রায় ছ'ফুট লম্বা এই লোকটির তুলনায় উৎপলকে মোটেই বৃহৎ বলা যায় না। তার দৈর্ঘ্য পাঁচ ফুট চার ইঞ্চির বেশি নয়। আর্থিক অবস্থা, সামাজিক মর্যাদাতেও আভিজাত্যের দাবি নেই এই উৎপলের। তবু কোন প্রতিবাদ করল না উৎপল, প্রতিবাদ করবার কথা তার মনেও হল না। নিশিকান্তের পিছনে পিছনে সে ভিতরে ঢুকল।

বাইরে থেকে যেমন অপরিচ্ছন্ন মনে হয়, ভিতরটা দেখতে তত খারাপ নয়। পাকা উঠোন, কল-পায়খানা আছে। ঘরগুলি অবশ্য ছোট ছোট। চালটা টালির তৈরি, দেয়াল আর মেঝে পাকা।

পূব দিকের একখানি ঘরের সামনে একটি তোলা-উনুন থেকে ধোঁয়া উঠছে। আর সেই ধোঁয়া প্রায় সারা উঠোন আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

নিশিকান্ত এগোতে এগোতে বলল, 'কেষ্টর মা তোমাকে কতদিন বারণ করেছি—উঠোনে অমন করে উনোন নামিয়ে রেখোনা। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় একাকার করে ফেলেছ। একজন ভদ্রলোক এলে কী ভাবে বল দেখি। এরা কি মানুষ না কি?'

কেষ্টর মার কোন সাড়া পাওয়া গেল না। ভদ্রলোকরা এখানে এসে কী ভাবে না ভাবে—সে সম্বন্ধে নিশিকান্ত ছাড়া আর কারো কোন বিশেষ দুশ্চিন্তা আছে বলেও মনে হল না।

নিশিকান্ত বলল, 'আসুন স্যার।'

ঘরের সামনে একটি ঢাকা বারান্দা। ঘরেরই অঙ্গ। চৌকাঠের সামনে ছোট একটি হ্যারিকেন জ্বলছে। চিমনিটি ফাটা। কিন্তু কোথাও কালি পড়েনি। তাই পরিষ্কার আলো আসছে। উৎপল লক্ষ্য করল—বারান্দাটুকুও বেশ ঝাড়া পোঁছা। কোথাও তেমন অপরিচ্ছন্নতা নেই।

নিশিকান্ত ঘরের এক কোণ থেকে পুরাণ একটা নেকড়া টেনে এনে পেতে দিয়ে বলল, 'বসুন স্যার, ভালো হয়ে বসুন। আমি ভিতর থেকে আসছি।'

ভিতরের দরজা ভেজানো ছিল। একটু ঠেলে দিয়ে নিশিকান্ত ঘরের মধ্যে ঢুকল। চাপা গলায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কী যেন কথাবার্তা হচ্ছে। ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তাদের কথা কানে যেতে লাগল উৎপলের।

'ঘরে একটা দানা নেই—সে চিন্তা আছে তোমার? ছেলে-মেয়েগুলি দাপাদাপি করছে—আর তুমি সেই বেরিয়েছ তো বেরিয়েছই।'

'আরে চুপ করো, একটু চুপ করো। বাইরে একজন ভদ্রলোক এসে বসে রয়েছেন। আমি কি হাওয়া খেতে না মজা লুটতে বেরিয়েছি?'

স্ত্রী আর মেয়েকে ফিস ফিস করে কী নির্দেশ উপদেশ দিয়ে নিশিকান্ত ফের উৎপলের সামনে এসে বসল।

উৎপল একটু কুণ্ঠিত হয়ে বলল, আমি বরং আজকের মত চলি নিশিকান্তবাবু। আর একদিন আসব।'

নিশিকান্ত বলল, 'আরে না না বসুন বসুন। সবে তো সন্ধ্যে। অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন!'

হিমি ছোট একটা থলি নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, নিশিকান্ত তাকে ডেকে বলল, 'এই হিমি, কাঁচের গ্লাসটা নিয়ে যা। মোড়ের দোকান থেকে চা নিয়ে আসবি। ফটিককে বলিস—যেন ভালো করে তৈরি করে দেয়। বাইরের এক ভদ্রলোক এসেছেন। যে সে লোক নন—বলিস।'

উৎপল বলল, 'আবার চ'টা কেন আনতে দিচ্ছেন নিশিকান্তবাবু? ও সবের কি দরকার?'

নিশিকান্ত কোন জবাব না দিয়ে বিড়ি ধরাল। উৎপলের দিকে ফিরে বলল, 'মাফ করবেন স্যার। চলে নাকি?'

উৎপল মাথা নেড়ে বলল, 'না।'

নিশিকান্ত বলল, 'সিগারেট ফিগারেট কিছু নেই। যখন জোটে খুব খাই, যখন জোটেনা তখন—। আমাদের কি আর বাদ বিচার করলে চলে স্যার?'

উৎপল বলল, 'তাতো ঠিকই। আমি, ভাববেন না, আমি ওসব কিছু খাইনে।' তারপর প্রসঙ্গ পাল্টে নিয়ে বলল, 'সতীশঙ্করবাবু সত্যিই এই বাড়িতে আসতেন?'

নিশিকান্ত বলল, 'আসতেন বই কি। দরকার হলেই আসতেন। এই যে সব বাড়ি দেখছেন, একচেটে মুসলমানরা ছিল এখানে। দাঙ্গার সময় অনেকেই পালিয়ে যায়। কেউ কেউ অবশ্য ফিরেও এসেছে। আবার কেউ কেউ বেচে-টেচে দিয়ে চলে গেছে। কত কাণ্ড-কারখানাই হ'ল আমাদের চোখের ওপর। এ দিকটায় সবই এখন হিন্দুরা থাকে। বেশিরভাগই সতীশঙ্করদা এনে বসিয়েছেন। মুসলমান-বাড়িওয়ালাদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে, কাউকে বা ধমকে ভয় দেখিয়ে, কাউকে বা গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে—'যে যেমন—তার সঙ্গে তেমন ব্যবস্থা করতে জানতেন তো সবই। তাছাড়া মানুষটির দয়ামায়া ছিল। এই ঘরের তলায় বসে ভর সন্ধ্যেবেলায় মিথ্যে বলব না স্যার—দোষ যেমন ছিল, গুণও ছিল যথেষ্ট।'

উৎপল বলল, 'আপনারা তাঁর গুণের পরিচয় খুব

নিশিকান্ত বলল, 'তা পেয়েছি বইকি। এই যে সব এদিককার বাড়িগুলি দখল করে যারা আছে তারা এখন সব স্বীকার করুক আর না করুক, বিপদে পড়ে যে যখন তাঁর সাহায্য চেয়েছে তিনি তাঁকে সাহায্য করেছেন। তবে মানুষ বুঝে। কোন্ মানুষটার কি দাম, কে কতটা পেতে পারে না পারে, তা তিনি বুঝতেন। তবে যে তাঁর আশ্রয় চাইত, বিশ্বাস রাখত—তাকে তিনি নিরাশ করতেন না। আবার যারা শত্রুতা করত, তাদেরও তিনি ছেড়ে দিতেন না। সুযোগ সুবিধা পেলেই একটা না একটা থাবা বসিয়ে ছাড়তেন। বাঘের মত পুরুষ—তারা তো এই রকমই হয় স্যার। তারা গেরুয়া-পরা সাধুসন্ন্যাসী হয় না। দুনিয়াশুদ্ধ সব মানুষকে প্রেম বিলায় না। তারা দলের মানুষকে রাখে, তাদের দোষত্রুটি সামলে নেয়, আর যারা শত্রুতা করে তাদের ঠিক উচিত শাস্তি দেয়।'

হিমি ফিরে এল। থলির মধ্যে করে খুব সম্ভব চাল ডাল নিয়ে এসেছে। আর কাঁচের গ্লাস ভরতি ক'রে চা-ও নিয়ে এসেছে সেই সঙ্গে।

ঘরের ভিতর থেকে এরপর দুটি কাপ নিয়ে এল হিমি। একটির আবার হাতল ভাঙা। যেটি ভালো সেইটিই উৎপলের সামনে এগিয়ে দিল। ফ্রকপরা এইটুকু মেয়ে হলে কী হয়, ধরণ-ধারণে পাকা গিন্নী।

একটু বাদে ঘরের ভিতর থেকে রান্নার গন্ধ পাওয়া গেল। বস্তীর অন্যান্য ঘরেও পুরুষেরা ফিরে আসতে শুরু করেছে। কিছু কিছু সাড়া শব্দ শোনা যেতে লাগল। কোন ঘর থেকে শিশুর কান্না, কোন ঘর থেকে মেয়েদের হাসির শব্দ ভেসে এল।

কিন্তু এই হাসিকান্না ভরা, রান্নাবান্নার গন্ধে ভরপুর—দৃশ্যমান বর্তমানের দিকে উৎপলের মনোযোগ এই মুহূর্তে নিবদ্ধ রইল না। তার মন অদূরবর্তী অতীতের আশ্রয় নিয়েছে। সে সময় সতীশঙ্কর বেঁচে ছিলেন। তিনি আর নেই, তাঁর সেই শত্রুমিত্রেরাও কে কোথায় ছিটকে পড়েছে কে জানে। হয়তো সতীশঙ্করের স্মৃতিও তাদের মনে এখন অস্পষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু এই নিশিকান্তের মত অনুগত অনুচরের মন থেকে বোধহয় সব কথা এখনো মিলিয়ে যায়নি। সব স্মৃতি এখনো ঝাপসা হয়ে যায়নি। এই

ক্ষণস্থায়ী অসংলগ্ন অসম্বদ্ধ স্মৃতিলোক ছাড়া মৃত মানুষের কি আর কোথাও কোন দ্বিতীয় বাসভূমি আছে?

চা খেতে খেতে উৎপল সতীশঙ্করের জীবনের আর একটি অধ্যায়ের কথা শুনতে লাগল। এই বস্তিতে নিজের অনুগত আশ্রিতজনকে বসাবার কাজে তিনি নিশিকান্তদের সাহায্য নিয়েছিলেন। তার চেহারার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলেছিলেন, 'বপুখানা তো বেশ বাগিয়েছ দেখছি। মনে জোর আছে কেমন?'

নিশিকান্ত বলেছিল, 'আজ্ঞে কর্তা, মুখে আর কী বলব। দু একটা কাজের ভার দিয়ে দেখুন না।'

মিথ্যা জাঁক করেনি নিশিকান্ত। নিজের কাজ দিয়েই সে মনিবকে খুসি করতে পেরেছিল। আস্তে আস্তে দলের মধ্যে সেরা জায়গা দখল করে নিয়েছিল নিশিকান্ত। খোদ বডিগার্ড হতে পেরেছিল সতীশঙ্করের। অবশ্য দিনের আলোয় নয়। নিজের দশজনের সামনে সতীশঙ্কর এমনভাব দেখাতেন—যেন তিনি নিশিকান্তকে কি তার দলের কাউকেই চেনেন না। চিনলেও সামান্য মুখ-চেনা গোছের আলাপ পরিচয়ই যেন শুধু আছে ওদের সঙ্গে। সতীশঙ্করের প্রকাশ্য দরবারে নিশিকান্তরা ছিল নিতান্তই রাস্তার মানুষ। কিন্তু এই অবহেলা অনাদর যে ভান, শুধু কাজের সুবিধার জন্যে—এই ভোলবদল নিশিকান্তরা বুঝে নিয়েছিল। গোপনে গভীর অন্ধকার রাত্রে নিশিকান্তদের আদর বাড়ত সতীশঙ্করের কাছে। কতদিন শেষ রাত্রে একসঙ্গে বসে তারা মদও খেয়েছে। হ্যাঁ, মদ সতীশঙ্কর খেতেন। রোজ নয় মাঝে মাঝে। খেলেও তিনি যে নেশা করেছেন তা বোঝা যেত না। আশ্চর্য মনের জোর ছিল তাঁর। দু'এক পেগ টেনে তাঁর বন্ধুরা যখন মাটিতে লুটোপুটি খেত, কাঁদত, চেঁচাত, বমি করত, সতীশঙ্কর তখন পুরো বোতল হজম করে নিজের মনে কাজ করে যেতেন—কি অন্যের সঙ্গে জরুরী কথা বলতেন। সাধে আর নিশিকান্তরা তাঁকে দেবতা বলে ভক্তি করত, কি দৈত্য বলে ভয় করত।

পুরোন বাসিন্দাদের হটিয়ে নিজের লোকজনকে এই বস্তিতে এনে বসাতে লাগলেন সতীশঙ্কর। বাইরের লোক মিথ্যে তার দুর্নাম দিত। এই সব কাজের জন্যে তিনি গরীব গৃহস্থদের কাছ থেকে টাকা নিতেন না। সেলাম চাইতেন কিন্তু সেলামী চাইতেন না। মশা মেরে হাত নষ্ট করবার মত মানুষ ছিলেন না সতীশঙ্কর। মারি তো হাতী, লুট তো ভাণ্ডার। তাঁর ছিল সেই মোগলাই মেজাজ। দাঙ্গার সময় কিছু লুঠের মাল তাঁর সিন্ধুকে উঠেছিল। নিশিকান্ত সঠিক জানে না তার পরিমাণ কত। লোকে নানা রকম কানাঘুষো করে। কেউ বলে এক-লাখ, কেউ বলে দেড় লাখ। আবার কেউ বলে বাজে কথা, দশ পনের হাজারের বেশি নয়। নিশিকান্ত শুনেছে—সতীশঙ্করের ওই রাজপুরীর মত বাড়িটাও নাকি এইভাবে পাওয়া। বাড়ীটা আসলে ছিল ওর কোন এক মুসলমান বন্ধুর। দুজনে মিলে অনেক কাণ্ড কারখানা করেছিলেন। শোনা যায় খুন জখম পর্যন্ত। সতীশঙ্কর পাকা লোক। কোন সাক্ষীসাবুদ রেখে কাজ করেননি। তাঁর হাত একেবারে পরিষ্কার, গঙ্গাজলে ধোয়া। কিন্তু মৈনুদ্দিন মুনসী অত চতুর নন। তাঁর কাজের মধ্যে দুএকটা ফুটো ফাটা ছিল। সে খবর সতীশঙ্কর রাখতেন। ছুঁচের সেই ছিদ্র দিয়ে তাই হাতীকে বেরিয়ে যেতে হল। মুনসী সাহেব মনের দুঃখে পদ্মাপারে ফিরে গেলেন। প্রথমে সতীশঙ্কর দোস্তর কাছ থেকে চেয়েই নিয়েছিলেন বাড়িটা। বলেছিলেন—যতদিন নিজে একটা আস্তানা করতে পারেন ততদিন মাসে মাসে ভাড়া দেবেন। কিন্তু মুনসী সাহেব ভাড়া কোনদিন আর নিতে পারেননি। সতীশঙ্করকেও তুলতে পারেনি। তুলতে গেলে মামলা করে তুলতে হয়। কিন্তু আইন-আদালত থানা-পুলিসের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে আর সাহস হয়নি মুনসী সাহেবের। শোনা যায় নারায়ণগঞ্জে না কোথায় যেন ছোট একটা একতলা ভাড়া বাড়ি সতীশঙ্কর বন্ধুকে বদলি হিসাবে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মুন্সী সাহেব নাকের বদলে সেই নরুণ নিয়েছিলেন কি নেননি, নিশিকান্ত তা জানেনা। এই নিয়ে সতীশঙ্করের মনেও কোথায় যেন একটু দুর্বলতা ছিল। তিনি ওই রাজপুরীকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ভোগ করেছেন, কিন্তু পুরোপুরি দখল করেননি। হয়তো ইচ্ছে ছিল নিজে সত্যিই একটা আস্তানা করবেন। তারপর বন্ধুকে তাঁর সম্পত্তি ফেরৎ দেবেন। সে প্রায় যৌতুক দেওয়ার মতই হবে। কিন্তু সতীশঙ্কর সেই সৎকাজটুকু আর করে যেতে পারেননি। অনেক কাজ বাকি রেখে অকালেই তাকে বিদায় নিতে হয়েছে।

এ সব কিংবদন্তীর কতটুকু সত্য, কতখানি রূপকথা উৎপল আপাতত তা যাচাই করবার চেষ্টা করল না। পরম বিশ্বাসী মুগ্ধ শিশুর মত রূপকথা শুনে যেতে লাগল। শুধু তো শোনা নয় রূপকথা শোনানো ও তার কাজ। কিন্তু যা শুনবে যা দেখবে নির্বিচারে তাই যদি লিখে যায় সে লেখা যা তা হবার ভয় আছে সে কথাও উৎপল জানে।

[ক্রমশঃ

১৯৬২ খৃষ্টাব্দ কেমন যাবে?

উপাধ্যায়

কালপুরুষের রাশিচক্রের দশম স্থান মকর রাশি। এটী ভারতবর্ষের রাশি। এখানে অষ্টগ্রহ সম্মেলন সম্পর্কে গত দুবৎসরের ভেতর 'ভারতবর্ষের গ্রহজগতে' নানা ধর্ম্মের ও নানা শাস্ত্রের প্রাচীন পুঁথিগত ভবিষ্যদ্বাণী ও মহাপুরুষগণের বাণী উদ্ধৃত করে একাধিকবার বিস্তৃত আলোচনা করেছি, সুতরাং এসম্বন্ধে এখানে কথিত বাণী ও আলোচনার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। এখন নানা কাগজে গ্রহ সম্মেলনের কথা বলা হচ্ছে। ১৯৬২ সাল ধ্বংসপথের যাত্রী, এর পশ্চাতে অপেক্ষা করছে অনাগত সৃষ্টির সূর্য্যোদয়—রাত্রির ভেতর অপেক্ষিত প্রভাতের মত। তাকে স্বাগত বন্দনা জানাবে তারা, যারা ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের ধ্বংস-লীলার ভেতর থেকে প্রহ্লাদের মত উঠ্‌বে বেঁচে।

১৯৬২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সূর্য্যোদয়ের সময় গ্রহগণ এসে দাঁড়াবে চন্দ্র (৮°) আর বৃহস্পতির (২৫°) মধ্যে। সম্মিলিত গ্রহগণের মকর রাশিতে অবস্থিতিকাল ৩রা থেকে ৫ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত। প্রতিবর্ষে উত্তরায়ণ সুরু হয়, মকর রাশিতে রবির সংক্রমণ কাল থেকে। উত্তরায়ণ বর্ষের শুভকাল। এর কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, এই সত্য উদ্‌ঘাটিত করে গেছেন প্রাচীন তত্ত্বদর্শী আর্য্যঋষিরা।

অষ্টগ্রহ সম্মেলন সময়ে আগামী ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সূর্য্যোদয় লগ্নে, দেব লোকাংশে বিশ্ব পরিত্রাতার জন্ম হবে। এরই মর্ত্ত্যকায়া গ্রহণের পর থেকে নবযুগের উদয়। যিনি বিশ্ব পরিত্রাতা, তাঁর আলৌকিকতা ক্রমে ক্রমে বিশ্বের চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হবে। তাঁর ইচ্ছামৃত্যু, যত কাল ইচ্ছা বেঁচে থাক্‌বেন। এই তারিখে যে সব মানুষ মেষ, বৃষ এবং মীনলগ্নে জন্ম গ্রহণ করবেন, তাঁরা হবেন বিশেষ প্রসিদ্ধ ও অনন্য-সাধারণ, অতিমানব বললেও অত্যুক্তি হয়না।

প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে এই বর্ষে কোন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে দেখ্‌তে পাওয়া যাবে। আটটী গ্রহের মধ্যে সাতটি গ্রহের সম্মেলন ২৪শে জানুয়ারী তারিখে। ঐদিন থেকেই গ্রহদের কুপিত ভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে সঙ্কট দুর্য্যোগের মাত্রাধিক্য ঘটাবে। অষ্টগ্রহ সম্মেলনের শেষ দিন ৯ই ফেব্রুয়ারী। ২৪শে জানুয়ারী থেকে ৯ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত একত্র হয়ে গ্রহরা বিশ্বের অমঙ্গলের পটভূমিকা রচনা করবে। জীব ও জগত তাদের ক্রীড়া-পুত্তলিকা, আধুনিক জড়-বিজ্ঞানীরা তাদের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ কোন মতেই খর্ব্ব করতে পার্‌বে না, বরং পদে পদে নিজেরাই ভুল করে বস্‌বে।

প্লবকালে হচ্ছে অষ্টগ্রহ সংযোগ। এই সংযোগকাল এসেছে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে তেইশবর্ষ পরে। এমনিভাবে সংযোগ কাল এসেছিল একদা সুদূর অতীতে মহাকাব্যের যুগে এই মকর রাশিতে। সে দিন ও এসেছিল প্লববর্ষ। খৃষ্টপূর্ব্ব ৩০৮০-৭৯ অব্দে মকর রাশিতে, রাহু ব্যতীত সকল গ্রহ হয়েছিল সম্মিলিত। তখন কলির ত্রয়োবিংশতি পাদে চলেছে প্লব কাল। রাহু ছিল কর্কটে একা। তখন কলির প্রারম্ভ, প্রমথি বর্ষ। বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অনুরূপ যুদ্ধ সে সময়ে ঘটে গেল। এটাই মহাভারতের মহাযুদ্ধ। হেবিলম্বী বর্ষ এলো কলির অষ্টাদশপাদে খৃষ্টপূর্ব্ব ৩০৮৬-৮৫ অব্দে। শ্রীকৃষ্ণ এই বর্ষে দেহত্যাগ কর্‌লেন।

খৃষ্টপূর্ব্ব ৩০৮৬ ৮৫ অব্দ শ্রীকৃষ্ণ প্রভাসে গেলেন। এই যাত্রাই তাঁর শেষ যাত্রা। এখানে এসে ভবিষ্যদ্বাণী কর্‌লেন দ্বারকা সমুদ্র-গর্ভে বিলীন হবে সাত বছর পরে। হোলোও তাই। খৃষ্টপূর্ব্ব ৩০৭৮-৩০৭৭ অব্দে দ্বারকার সমুদ্র সলিলে সমাধি ঘটলো। শ্রীকৃষ্ণের জন্মের ১৩০ বর্ষ পরে এবং মহাভারতের যুদ্ধের ২৩ বর্ষ শেষে তাঁর মহাপ্রয়াণের পর উক্ত মকর রাশিতে অষ্টগ্রহের সম্মেলন হয়েছিল। তখন ভারত অন্ধকারাচ্ছন্ন।

কলিযুগের অষ্টাদশ এবং ষড়্‌বিংশতি পাদের মধ্যবর্ত্তীকাল বড় করুণ ও বেদনা দায়ক। সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলতা আর হতবুদ্ধির নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগ কর্‌লেন। ক্ষাত্র শক্তির অভাব। দ্বারকার সমুদ্র গর্ভে সলিল সমাধি। মোক্ষলাভ কর্‌লেন ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, উদ্ধব

উগ্রসেন, বাসুদেব প্রভৃতি। কলির ষড়্‌বিংশতি পাদে পরীক্ষিতকে রাজ্য শাসনের ভার অর্পণ করলেন যুধিষ্ঠির, তারপর তাঁর যাত্রাসুরু মহাপ্রস্থানেরপথে সহোদরগণকে সঙ্গে নিয়ে। কলির ষড়্‌বিংশৎ পাদে ঘটে গেল তাঁদের তিরোভাব।

সার্ব্বভৌম সম্রাট পরীক্ষিৎ আনলেন পূর্ণ শান্তি। পৃথিবীর দুর্দ্দৈব দিন প্রস্থান করলো। পূর্ণশান্তি অধিষ্ঠিত ছিল পরীক্ষিতের চৌষট্টি বৎসর রাজ্য শাসনের পর ও হাজার বৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ কলির এক শত বর্ষ কাল পর্য্যন্ত।

নন্দনবর্ষে অর্থাৎ ১৮৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণের মত তাঁরও জন্মের ১৩০ বর্ষপরে আর দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের ৩৩ বর্ষ পরে অনুরূপ ভাবে মকর রাশিতে হোলো আবার অষ্টগ্রহের সম্মেলন। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মের পাঁচ হাজার চল্লিশ বর্ষ পূর্ব্বে নন্দন বর্ষেই অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব্ব ৩২০৯-৩২০৮ অব্দে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করেন। এটি তাৎপর্য্যপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণের জন্মকালে বৃষরাশিতে চন্দ্র, কর্কটে রাহু, রবি, শুক্র, মঙ্গল এবং বুধ সিংহে, তুলায় শনি, মকরে কেতু, কুম্ভে বৃহস্পতি ছিল। শ্রীকৃষ্ণের জন্মলগ্ন ছিল বৃষ।

সেই মহাভারতের যুগের হারিয়ে-যাওয়া স্মৃতি আজ আবার ফিরে পেয়েছি আমরা আসন্ন সঙ্কটের সম্মুখীন হয়ে। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দ তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, মানব ইতিহাসের রক্তাক্ত পৃষ্ঠা রচিত হবে এই সালে। মহাকালের চলেছে আয়োজন মহাকালীর নৃত্যের তালে তালে। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে হচ্ছে বার্হস্পত্য যুগের আবর্ত্তনের অবতরণিকা। যে বৃহস্পতি নৈসর্গিক শুভগ্রহ, ভাগ্যচক্রে সে আজ কোণ-ঠেসা, কোন কল্যাণই করতে সক্ষম হচ্ছে না। এর কারণ সে অতিচারী। ১৯০২ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯২২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গেছে গঠনের পথ যদিও তার মধ্যে এসেছে প্রথম মহাযুদ্ধ। ১৯২২ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সময়টি কেটেছে সুখে, ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে সুরু হয়েছে ধ্বংসাত্মক যুগ। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের প্রচণ্ড সংঘাতের পর এই ধ্বংসাত্মক যুগের অবসান হবে।

আলোচ্যবর্ষে আবহাওয়া ও বায়ুমণ্ডলের পৌনঃপুনিক আকস্মিক পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যক্ষ হয় বারম্বার বহু দুর্ঘটনা। জাপান ও বর্ম্মার সঙ্গে আমেরিকার প্রীতি সম্বন্ধ হ্রাস হবে, ধীরে ধীরে ঘটে যাবে বিচ্ছিন্নতা। নেমে যাবে ডলারের মূল্য। ষ্টক ও শেয়ারের অবস্থা হবে খারাপ, ফলে সমাজের বহু উপরতলার মানুষ একেবারে নেমে আসবে নীচে। যে চীন এবৎসর মহিষাসুরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে, তারও প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় ঘটবে। ভারতবর্ষে নির্ব্বাচনী ব্যাপার বিশৃঙ্খলতায় এসে দাঁড়াবে। ভোট ভণ্ডুল হোতে পারে। কংগ্রেস মনোনীত ভোটপ্রার্থীদের কর্ম্মতৎপরতা দেখাতে হবে নির্ব্বাচনী কেন্দ্রগুলিতে। কংগ্রেসের জয় অনিবার্য্য। বিশ্বপরিস্থিতি এমনই জটিল হয়ে উঠবে, যার জন্যে হয়তো নির্ব্বাচনী ব্যাপার স্থগিত হয়েও যেতে পারে—এরূপ আশঙ্কা করা জ্যোতিষীর পক্ষে অস্বাভাবিক নয়।

ভবিষ্যতের জন্য ভারতের খাদ্য মজুত অত্যাবশক, রপ্তানী কার্য্য বন্ধ রাখাও আশু প্রয়োজন। রাষ্ট্র শাসকমণ্ডলী এদিকে দৃষ্টি আবৃত রাখলে ভীষণ গোলযোগ ও বিপন্নতার সম্মুখীন হোতে হবে। সম্মিলিত অষ্টগ্রহের কোপ বিশেষভাবে গিয়ে পড়বে পৃথিবীর উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণপূর্ব্ব অঞ্চলগুলিতে। দূষিত আবহাওয়া তার ওপর বায়ু পৃথ্বীও জলের উপর অপ্রত্যাশিত বারম্বার দুর্ঘটনা,—মানব সমাজকে ভীত করে তুলবে। বহু জীবন ও শস্য নষ্ট হয়ে যাবে। চাউল, যব, ধাতু পদার্থ, স্বর্ণ, তৈল, গম, তিসি চিনি, মসলা, ডাউল, রত্নালঙ্কার ও বহুবিধ ফলের ক্ষতি হবে। বস্ত্রের মূল্য আবার বৃদ্ধি হবে। ব্যাহত হবে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। তার কারণ বৈদেশিক অর্থসাহায্য পাওয়ার পথ রুদ্ধ হয়ে আসবে রাজনৈতিক আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হওয়ার ফলে। বৈদেশিক বাণিজ্য সুষ্ঠুভাবে চলতে পারবে না, আমদানিও রপ্তানি সম্পর্কে জটিল অবস্থা দেখা দেবে।

এবৎসর বৃহস্পতি প্রতিকূল। জ্ঞানী ব্যক্তি ও অজ্ঞানীদের মত অবস্থায় এসে দাঁড়াবে। ঘটবে নেতাদের বুদ্ধিভ্রংশ। পশ্চিম অঞ্চলে আর গুজরাটে হিমবাহের আধিপত্য বিশেষভাবে দেখা দেবে। কয়লা বিদ্যুৎ, গ্যাস, বস্ত্র শিল্প আর ছোট খাটো শিল্পগুলির অবস্থা দুর্ব্বল হয়ে পড়বে। ২৪ শে জানুয়ারী থেকে ৯ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত শীতের আধিক্য ঘটবে। এই শীতে অনেকেই কষ্ট পাবে।

২১ শে জুন থেকে আবহাওয়ার গোলমাল। অনিয়মিত মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হবে। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলে এই বায়ু প্রকোপ সামধিকভাবে প্রকাশ পাবে। ফেব্রুয়ারী এপ্রিল ও জুলাইমাসে খুব চড়ে যাবে তুলার দর। যে পরিমাণে তুলা উৎপন্ন হবে, সে পরিমাণে আমাদের চাহিদা কোন মতেই মিটবে না। বৎসরের দ্বিতীয়ার্দ্ধে চিনির দর চড়া থাকবে। মহার্ঘ্য থাকবে রাসায়নিক পদার্থগুলি।

ফেব্রুয়ারী মাসের প্রারম্ভে ৫ই ফেব্রুয়ারী ভোরে যে সূর্য্যগ্রহণ হবে সেটা ভারতে অদৃশ্য। প্রত্যক্ষ না হোলেও তার বিষক্রিয়া ভারতেও সঞ্চারিত হবে। এই গ্রহণ এশিয়ার দক্ষিণ পূর্ব্ব প্রান্তে অর্থাৎ চীনের পূর্ব্বপ্রান্তে জাভা, সুমাত্রা, দ্বীপপুঞ্জে, উত্তর আমেরিকার শেষ পশ্চিম প্রান্তে আর অষ্ট্রেলিয়ায় দেখা যাবে। উপচ্ছায়া চন্দ্র গ্রহণ ১৯ শে ফেব্রুয়ারী। এদিকে অষ্টগ্রহ সম্মেলন। এরূপ যোগাযোগ তাৎপর্য্যপূর্ণ ও উদ্বেগের সঞ্চার করবে। সর্ব্বত্র দুর্দ্দশাপন্ন হবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা। নীতি-আদর্শের কোন অনুশীলনই হবে না] অধর্ম্মের প্রাবল্য ঘটবে। নির্ম্মল চরিত্র সংখ্যা লঘু হবে।

বর্ত্তমান শকাব্দ ১৮৮৩ প্লববর্ষ অর্থাৎধ্বংসাত্মক বর্ষ, কালসর্প যোগের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই ধ্বংসাত্মক বস্তুগুলি সক্রিয় হয়ে উঠবে, মারণাস্ত্রের খেলা চলবে। প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ আর যন্ত্র সভ্যতার দানবীয় লীলার সম্মুখীন হবে বিশ্বের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের প্রাণিগণ। বিশ্ববাসীকে সহ্য করতে হবে প্রবল জলোচ্ছাস, ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির বিদারণ ও অগ্ন্যুদগীরণ, আণবিক অস্ত্রের ভয়াবহ রূপ, প্রচণ্ড বন্যা প্রভৃতি—কত লোকক্ষয় হবে তা কে জানে? প্রাচীন পুঁথিতে বলা হয়েছে পৃথিবীর

অর্দ্ধেক লোক লুপ্ত হয়ে যাবে। বহু মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হবে ভারতবর্ষের অধিবাসীরা। অভিজিৎ নক্ষত্রে ৩রা জানুয়ারী শনির প্রবেশ কাল থেকে সুরু হয়েছে দুদ্দিনের পদচারণা, ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে বিশ্বের চতুর্দিকে বিকীর্ণ হবে। ৫ই ফেব্রুয়ারীর পর থেকে ব্যাহত হবে আইনের শৃঙ্খলা। লক্ষ্য করা যাবে বিচারের প্রহসন, আর দুর্নীতির আধিপত্য। বৃদ্ধি পাবে নর নারীর কামলোলুপতা, চল্‌তে থাকবে পশ্বাচার আর পরস্ত্রী সম্ভোগ।

বৎসরের প্রথমার্দ্ধে ব্যবসাবাণিজ্য ও অর্থনৈতিক অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক হবে না। অর্থনীতির চাপে অনেকেরই ভাগ্য তমসাচ্ছন্ন। শেষার্দ্ধে কলকারখানা ও শ্রমশিল্পের উন্নয়ন সন্তোষজনক। গৃহ বিচ্ছেদ, মামলা মোকর্দ্দমা, ও পারিবারিক অশান্তি বৃদ্ধি পাবে। ভারতের নারীর যে বৈশিষ্ট্য আর যে বিশিষ্টতার জন্যে সে মহীয়সী, সেটি তিরোহিত হবে। তার স্বেচ্ছাচারিতা, সতীত্ব মর্য্যাদা নষ্ট করে অবৈধ প্রণয় সম্ভোগ ও কাম লোলুপতা, পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ আর চারিত্রিক অধঃপতন বহু পারিবারিক ক্ষেত্রকে বিধ্বস্ত করবে।

এই বৎসর স্ত্রীলোকেরই বিশেষ আধিপত্য ঘটবে। পুরুষের ভেতর আসবে স্ত্রৈণতা ও ব্যভিচার। রাষ্ট্রের বহু কর্ম্মক্ষেত্রে বিভিন্ন ভূমিকায় বিশেষ অংশ গ্রহণ করবে বিপথগামিনী নারী সম্প্রদায়। রাষ্ট্রের বহু কার্য্যে দেখা যাবে তাদের অসাধারণ প্রভাব প্রতিপত্তি। স্ত্রীলোকের অদূর-দর্শী পরামর্শের দ্বারা পরিচালিত হবে রাষ্ট্র পরি চালক বা শাসকবৃন্দ। পুরুষ হারিয়ে ফেল্‌বে তার পৌরুষ। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অদূর-দশিতা ও চিন্তাশক্তির অভাবে বহু বিভ্রান্তি ঘটে যাবে এই দেশে। সামরিক বিভাগ জিগির দিয়ে উঠে কর্ত্তৃত্ব লোলুপ হোতে পারে।

বিশ্বের প্রধান প্রধান দেশগুলি রণসজ্জায় সুসজ্জিত হবে। বিপর্য্যয় ঘটবে মজদুর শ্রেণীর, এদের উন্নতির বাধা ঘটবে। রাষ্ট্রকর্ণধারগণের চিত্ত যুদ্ধের দিকে কেন্দ্রীভূত হবে, এঁদের মধ্যে দেখা যাবে অতি মাত্রায় ব্যস্ততা। রোগপ্রপীড়িত হবে জনসাধারণের অধিকাংশই। এবৎসর পৃথিবীতে প্রলয় ঘট্‌বেনা বা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে না। অষ্টগ্রহ সম্মেল-নের দিনে রুদ্র হয়ে উঠ্‌বে প্রকৃতি। বিচ্যুত হবে ভূখণ্ড পর্ব্বতাদি থেকে, মাটিতে ফাটল ধরবে, ভূমিকম্প হবে, এক একটি স্থানে দেখা যাবে বিশাল গহ্বর আর হবে লোকক্ষয়। কোথাও হবে আকস্মিক অগ্নিদাহন। সমগ্র বিশ্বে আর্থিক দুর্নীতি আর তজ্জনিত অপবাদ, চিন্তায় এবং কর্ম্মে সমতার অভাব, মন ও মুখের ঐক্যের অভাব, আরও গভীর চিন্তার উদ্রেক করবে। লুঠতরাজ, খুন জখম, শঠতা ও প্রতারণা সর্ব্বত্র প্রকাশ পাবে। সর্ব্বত্র হবে মুদ্রাস্ফীতি।

আন্তর্জ্জাতিক দাবাখেলার ছকে বহু ঘুঁটির ওলোটপালোট ঘটবে, ভয়ে আৎকে উঠ্‌বে নিরীহপ্রাণী, শয়তানের জয় আর তারই আধিপত্য সারা পৃথিবীকে বিব্রত করে তুলবে। কর্ম্মক্ষেত্রে উপর ওয়ালাদের অত্যাচার, অবিচার ও মতিভ্রম হেতু কষ্ট ভোগ করবে অধীনস্থ ব্যক্তিরা, মানুষ আর্ত্তনাদ করবে, ইন্দ্রিয়সুখেচ্ছু ব্যক্তিদের ও মধ্যে জেগে উঠ্‌বে অসন্তোষ।

আগামী মে মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত পৃথিবীর অত্যন্ত দুঃসময়। যে কোন সময়ে তৃতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হোতে পারে। গর্গ বলেছেন, শুধু বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ নয়, ব্যাপক অগ্নিকাণ্ডও ঘটবে। পৃথিবীর শান্তি সংরক্ষণের পক্ষে সমস্যা এতই জটিল হবে যে, তার সমাধান হওয়া এক প্রকার সুদূর পরাহত। তীর থেকে অদূরে শ্রেণীবদ্ধ রণসজ্জা ভয়াবহ হয়ে উঠ্‌বে। বিশ্বে হবে নূতন দল গঠন। উত্তেজনাপূর্ণ আন্তর্জ্জাতিক অবস্থা। সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের সংহতি শক্তির বিলোপ সম্ভাবনা। দ্বন্দ্ব-কলহরত প্রধান প্রধান শক্তি হুঙ্কারে আর ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে কাঁপিয়ে তুলবে পৃথ্বী। ভারতের অহিংসনীতির সমাধিরচনা পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্য থেকেই হবে। বর্ত্তমান ইংরাজী বর্ষের প্রথম দিকে মার্কিন ও সোভিয়েট রক্তদ্বন্দ্বে রত হবে। রণবিভীষিকার করাল ছায়া ছড়িয়ে পড়্‌বে চারি দিকে।

এবৎসরে দুইটি সূর্য্যগ্রহণ—দুইটীই ভারতবর্ষে অদৃশ্য। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে কুপিত গ্রহগণের নিষ্ঠুর কর্ম্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাবে বেলগ্রেড, কেপটাউন, লিওপোল্ডভিলি আর রোমের সন্নিকটস্থ অঞ্চলগুলিতে। প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ, ভীষণ ভূমিকম্প, লোকক্ষয় আর হাহাকার ঘট্‌বে। আইন ও বিধি সঙ্গত ক্ষমতা প্রকাশ্যভাবে অগ্রাহ্য করার পদ্ধতি অনুসৃত হবে। পরিলক্ষিত হবে জনসাধারণের উত্তেজনা ও বিদ্রোহ, পরিণতি হয়ে উঠ্‌বে গুরুত্ব পূর্ণ।

মধ্যএশিয়া ও ইণ্ডোচীনে চাপা উত্তেজনার সৃষ্টি হবে, ফলে পরাজয় ঘটবে কতকগুলি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বিক্ষিপ্ত অবস্থা। আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে ভারতবর্ষ নীরব না থাক্‌লে, তা ভাগ্যে অশেষ দুর্গতি ভোগ করতে হবে। ভারতবর্ষ না ছিন্নমস্তা রূ ধারণ করে, এই ভাবনাই রয়ে গেছে। কেননা ভারতবর্ষের মাথা ওপর চেপে বসেছে দুর্দ্দিন—গ্রহ সম্মেলনের ফলে। এখন থেকে ভারতে সর্ব্ব প্রকারে সতর্কতা আবশ্যক।

স্বার্থপরতা, ঘৃণা, বিদ্বেষ, আত্মঘাতী নীতি, প্রতিহিংসা ও বিবে বুদ্ধির অভাব ভারতীয় রাষ্ট্রকে বিপন্ন করে তুল্‌বে, রাজনৈতিক নে বৃন্দের মধ্যে এসব দোষগুলি পরিহার করা আবশ্যক। অর্থনৈতি হিসাব নিকাশ ঘোলাকরার ফলে জাতীয় ধনের অজস্র অপচয় ঘট্‌বে দেশের লোকের ওপর এসে পড়্‌বে ট্যাক্‌সের চাপ। খাদ্যদ্রব্য প্রয়োজনীয় পণ্যসম্ভারের দর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে, এজন্যে সাধা শ্রেণীর মানুষকে খুব কষ্ট পেতে হবে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে আর্থিক সাহায্যদানে অনেকখানি গুটিয়ে নেবে। এজন্যে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কার্য্যে করিণত সমস্যার বিষয় হয়ে উঠ্‌বে। সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে বিশে রেলওয়ে ও পোষ্টাফিসের কর্ম্মিদের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাবে, এমন ধর্ম্মঘট ও কর্ম্মস্থল থেকে বেরিয়ে এসে আন্দোলন প্রভৃতির মা সরকারকে উত্যক্ত করে তুলবে। সুকৌশলে এই অবস্থা গভর্ণমে

আয়ত্তাধীনে আস্‌বে। দুই বা ততোধিক ট্রেন দুর্ঘটনার আশঙ্কা আছে। এগুলি পূর্ব্ব ও দক্ষিণ রেলপথে ২৩শে মে আর ২১শে অক্টোবর থেকে যে কোন সময়ে ঘট্‌তে পারে। রেলযাত্রীদের জীবন নিরাপদ হবে না।

প্রায় ফেব্রুয়ারীর মধ্যসময়ে নানাপ্রকার গুরুতর দুর্ঘটনা, আকাশ থেকে উড়ো জাহাজ ভেঙে পড়া, অগ্নিকাণ্ড, এমন কি গোলাগুলি ছুড়ে আতঙ্কের সৃষ্টি প্রভৃতি আশঙ্কা আছে। সম্প্রদায়ের সঙ্গে গভর্ণমেন্টের সংঘর্ষ যোগ আছে। এ সংঘর্ষের মাত্রাধিক্য হবে গুজরাটে। হৃদ্‌রোগে ও আন্ত্রিক গোলযোগজনিত পীড়াতে ব্যাপকভাবে বহু লোকের মৃত্যু ঘট্‌বে ৪ঠা মে থেকে ২রা জুনের মধ্যে।

ভারতের কতকগুলি অংশে মহামারীর প্রাদুর্ভাব হবে। মধ্যপ্রদেশ, কেরালা, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ, আসাম এবং পশ্চিম ভারতে জনমত বিরুদ্ধ হয়ে উঠ্‌বে—আর জনসাধারণের ক্ষিপ্ততা হেতু শান্তিশৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যাবে—প্রত্যক্ষ করা যাবে গভর্ণমেন্টের সঙ্গে অধিবাসিগণের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ। শোভাযাত্রা ইত্যাদি মারফৎ চল্‌বে তীব্র প্রতিবাদ ও গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন। সুরু হবে প্রচণ্ড বিক্ষোভ। বাস ট্রেণ ও নৌকা দুর্ঘটনায় নষ্ট হবে বহু জীবন, মৃত্যুর সংখ্যা ও হবে অত্যন্ত বেশী।

উত্তম বৃষ্টিপাত ও শস্য হবে, কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে শস্য নষ্ট হবার ও সম্ভাবনা। জুন মাসের শেষে প্রবল ঝড় আর প্রচুর বৃষ্টিপাত। গঙ্গা প্রভৃতি বড় বড় নদীতে বর্ষার সময়ে জলোচ্ছ্বাস হবে, ফলে ব্যাপক ভাবে সৃষ্টি হবে প্লাবন। ভারতের কতকগুলি অংশ জলে ডুবে যাবে। কাল-বৈশাখীর উন্মত্ততা ও জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রচণ্ড ঝড়ের বেগ ধ্বংস লীলার কারণ হয়ে উঠ্‌বে। জুন ও জুলাই মাসে হবে গ্রীষ্মের প্রখরতা, তারপর ঝড়ের ঘূর্ণাবর্ত্তে মানুষের দৈহিক ও মানসিক সুস্থতার অন্তরায় ঘটবে। কত লোকেরই না ঘরবাড়ী নষ্ট হয়ে যাবে। মহামারী, দুর্ভিক্ষ, দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিপ্রকোপে ভারতের বহুসংখ্যক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হবে। ভূমিকম্প, আবহাওয়ার খেয়াল মাফিক পরিবর্তন, আর প্রচণ্ড ঝটিকার জন্যে বহুধন প্রাণ ও সম্পত্তির নাশ হবে।

১৯৬২ সালের ২৮শে অক্টোবর থেকে ২৭ শে নবেম্বরের মধ্যে কতক গুলি বড় বড় কলকারখানা বা শ্রমশিল্প কেন্দ্রে অগ্নিকাণ্ড ঘট্‌বে। মে মাসে বেরিয়ে পড়্‌বে ইনকম ট্যাক্সের কেলেঙ্কারী, আর অপকৌশল, প্রয়োগ জনিত পরিস্থিতি, কয়েকটী ব্যাপারে এই কেলেঙ্কারী ধরা পড়ে যাবে—আর বেশ চাঞ্চল্য উপস্থিত হবে জন সাধারণের মধ্যে। শিখেরা নিজেদের রাষ্ট্রগঠনের দাবী করবে। ভারতবর্ষে চৈনিক আক্রমণের আশঙ্কা আছে। পূর্ব্ব থেকে রাষ্ট্রকর্ণধারগণের সতর্কতা আবশ্যক, অন্যথা চীনের সঙ্গে ভারতের সাংঘাতিক সংঘর্ষ আসন্ন। এক্ষেত্রে কোন নেতা যেন কুম্ভকর্ণের ভূমিকা গ্রহণ করে নিদ্রিত হয়ে না থাকেন। আমাদের সামরিক শক্তি খুব সজাগ হওয়া আবশ্যক। তাছাড়া ভারতে ছড়িয়ে আছে বহু পঞ্চম বাহিনী। গোয়েন্দা বিভাগের তীক্ষ্ণদৃষ্টি আবশ্যক। ঘনীভূত হবে ভারতের বৈরী সম্বন্ধ পাকিস্তানের সঙ্গে, ভারতের পঞ্চম বাহিনীর যোগ সূত্র অবিচ্ছিন্ন থাকায়, এ সম্পর্কে এই দুর্ব্বৎসরে নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকার অর্থই হবে আত্মঘাতী ও দেশঘাতী নীতির প্রাধান্য।

ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তান অপপ্রচার চালিয়ে যাবে, আর বিভিন্ন রাষ্ট্রের সম্মুখে উপস্থিত করবে নানা অভিযোগ। তার চৈনিক প্রীতি গভীর তাৎপর্য্যপূর্ণ। বহু কষ্টে ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছে, এ স্বাধীনতার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখাই প্রকৃত ধর্ম্মপালন। চৈনিক কূটনীতিজ্ঞ ব্যক্তিরা ভারতের সঙ্গে মৈত্রী ভাণ দেখিয়ে সীমান্ত ঝগড়া মিটাবার ইচ্ছা দেখাবে—আর নেপথ্যে রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে চীন ভারত অভিযানে অগ্রসর হবে। এটা হবে আক্রমণের পূর্ব্বে বিশিষ্ট চাতুর্য্যের ভূমিকা। চীনের রাজনৈতিক চাতুর্য্যের ফাঁদে পড়্‌লেই ভারতের বিপদ ঘট্‌বে। জাতীয় জরুরী ব্যাপার ও আন্তর্জ্জাতিক সমস্যা-জটিল ক্রমবিকাশের দরুণ গভর্ণমেন্টকে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা গ্রহণ-করতে হবে, ভারতীয় শাসন পদ্ধতির কিছু কিছু ধারা এই সব কারণে সংশোধিত হবে। পাকিস্তানের প্রতি প্রেম বিতরণের প্রচেষ্টা চল্‌তে থাক্‌লে ভারতীয় রাষ্ট্রের বহু দুর্গতি ভোগ অনিবার্য্য।

ভারতীয় রাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য সর্বজনবিদিত ব্যক্তির তিরোধান ঘট্‌বে। বৃটেনের সঙ্গে ভারতের সৌহার্দ্দ্যের হ্রাস পাবে, কিন্তু যোগ-সূত্রের বৃদ্ধি হবে। বিশ্বের দুইটী প্রধান ব্লকের সঙ্গে এযাবৎ সমান ভাবে বন্ধুত্ব রক্ষা করে আসছে ভারতবর্ষ, এবৎসর আর সম্ভব হবে না। ভারতে কমিউনিষ্টদের উন্নতির অন্তরায় ও বিপর্য্যয় ঘট্‌বে।

ইংলণ্ডে রাজশক্তি আক্রান্ত হবে, আর গভর্ণমেন্ট মহলে আছে দারুণ কষ্টভোগ। রাজনৈতিক অক্ষক্রীড়ার ফলে গভর্ণ মেন্টের পরিবর্ত্তন ঘট্‌বে। ইউনাইটেড ষ্টেটসের সঙ্গে যে রাজশক্তির স্নায়ু সুদীর্ঘ কাল যুক্ত থেকে এসেছে, তার দৌর্ব্বল্য হেতু ইংলণ্ডের রাণী অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়্‌বেন। সাংঘাতিক রকমের বিমান দুর্ঘটনা হবে ইংলণ্ডে। ব্রিটিশ কমনওয়েলথের দুএকজন সভ্যের সঙ্গে ইংলণ্ডের কোন সম্পর্ক আর থাকবে না। ব্রিটেন ঘরোয়া ব্যাপারে বিব্রত হয়ে পড়্‌লেও তাকে আন্তর্জ্জাতিক সমস্যাগুলির সম্মুখীন হোতে হবে বিশেষভাবে। নিকট-আত্মীয়ের মৃত্যুতে রাণী শোক মগ্ন হবেন। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দ বৃটেনের পক্ষে মারাত্মক বর্ষ।

ফ্রান্সে চল্‌বে অসন্তোষ ও অসঙ্গতি। পৃথিবীর দুর্য্যোগপূর্ণ বর্ষে ফ্রান্স তার ঔপনিবেশিক অধিকারগুলির অধিকাংশকে নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়্‌বে। ফরাসী প্রেসিডেণ্টের গদিতে থাকা বোধ হয় চল্‌বে না। এ্যালজেরিয়াতে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। জেনারেল গল কোন রকমে এই পরিস্থিতি কাটিয়ে তুল্‌বেন। নানা রকম গোলযোগ, ধর্ম্মঘট, মারপিট, বিক্ষোভ প্রভৃতির সম্মুখীন হবে ফ্রান্স। জার্ম্মাণ ও ব্রিটিশ চালগুলি এরূপ হবে, যার জন্যে ফ্রান্সের শাসন কর্ত্তাদের বেশ ভাবিয়ে তুল্‌বে। পশ্চিম-জার্ম্মানী রাশিয়ার আশ্রয় গ্রহণে উন্মুখ হবে। পশ্চিম জার্ম্মানীতে আগুন জ্বলে উঠ্‌বে।

ইটালীতে কমিউনিষ্ট প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। এখানে প্রকৃতি রুদ্র রূপ ধারণ করবে।

আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুদ্গীরণ হবে ফেব্রুয়ারীতে। মার্শাল টিটোর ভাগ্য বর্ষের প্রথমার্দ্ধে উজ্জ্বল। বিশ্বরাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা

গঠনমূলক। পর্তুগাল ভারতের অভিমুখে অভিযান করবার পন্থানির্ণয় করবে। জুলাই মাসে মাদ্রিদ ও লিসবন ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হবে। ফ্রাঙ্কো অবসর গ্রহণ করবেন। লাও বা ভিয়েৎনামে শান্তি ফিরে আসবেনা। ইণ্ডোনেশিয়ায় ঘরোয়া যুদ্ধ বাধবে। ডাঃ সুকার্ণোর শারীরিক অবস্থা ভালো যাবেনা। আরব সমাজতন্ত্র গঠনে প্রেসিডেণ্ট সাফল্য লাভ করবেন না। শুধু মিসরে নয়, আরও অনেক গুলি আরব অঞ্চলে প্রচণ্ড আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ সুরু হবে বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র উচ্ছেদ সাধনের জন্যে।

নাসের যতদিন শক্তিধর হয়ে থাকবেন ততদিন মিসরের মান মর্য্যাদা প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ থাকবে, কিন্তু তাঁর সার্ব্বভৌম শক্তি বিপন্ন হবে। ইজ রায়েলের আর্থিক অবস্থা খারাপ হবে। দক্ষিণ আফ্রিকাকে বর্ণবিদ্বেষ পার্থক্য নীতির পরিবর্ত্তন করতে হবে। সম্মিলিত শক্তি কঙ্গো সমস্যা দূর করতে পারবে না। ভারতবর্ষের পক্ষে সৈন্য সরিয়ে আনা কল্যাণজনক। অষ্ট্রেলিয়া জাপান ও ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা সূত্রে আবদ্ধ হবে। বৃটেনের সঙ্গে সম্বন্ধ, বৈদেশিক বাণিজ্য ও শ্রমিক ব্যাপার নিয়ে সমস্যার উদ্ভব হবে—আর অষ্ট্রেলিয়াকে ভাবিয়ে তুলবে। ল্যাটিন আমেরিকার দুর্ব্বৎসর। আর্জেন্টিনার অর্থ নৈতিক দুর্গতি। ব্রেজিলে আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্নি উদ্গীরণ আর ভূমিকম্প, প্রেসিডেণ্টের পতন প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায়। ডাঃ ক্যাসট্রোর পক্ষে বৎসরটী খুবই খারাপ। পৃথিবীর সর্ব্বত্র সামরিক শক্তির জাগরণ হবে, তাদের প্রভাব প্রতিপত্তির উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হবার যোগ আছে। অনেক রাষ্ট্র সামরিক শাসনের মধ্যে এসে পড়বে।

ভারতবর্ষে কংগ্রেস শক্তি প্রাধান্য লাভ করবে। বাংলাদেশ, উড়িষ্যা ও বিহার রাষ্ট্রনৈতিক, প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়ের মধ্যে পড়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে উঠবে। ধনীসম্প্রদায় বিপন্ন হবে। এ সব অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য লোকক্ষয়ের সম্ভাবনা আছে। ভারতীয় রাষ্ট্রের সীমান্ত অঞ্চল গুলির সমূহ বিপন্নতার সম্ভাবনা থাকায় সতর্কতা অবলম্বন অত্যাবশ্যক। সমুদ্রতীরবর্ত্তী দেশগুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টিরাখার প্রয়োজন আছে। যাহা হউক দুর্যোগের ভেতর দিয়ে ভারতের সুবর্ণ ভবিষ্যতের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ভারতের গৌরব অত্যুজ্জ্বল হবে। ভারতীয় সংসার সমাজে ঝুঁটা ব্যক্তিদের অপসরণ ঘটবে, আর প্রকৃত গুণীরাই সমাদৃত হবে।

ব্যক্তিগত দ্বাদশ রাশির ফল

মেষ রাশি

অশ্বিনী ভরণী ও কৃত্তিকা জাত ব্যক্তিদের ফলের তারতম্য এমাসে দেখা যায় না, তবে মাসের প্রথমার্দ্ধে অশ্বিনী ও কৃত্তিকা জাত ব্যক্তিরা ভরণীর চেয়ে কিছুটা বেশী ভালো ফল পাবে। মাসটী সকলের পক্ষে মিশ্রফল দাতা। সাফল্য লাভ, আশা আকাঙ্খার কিছুটা পূরণ, লাভ, বিলাস ব্যসন, বন্ধুলাভ, সুখ স্বচ্ছন্দতা, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, প্রচেষ্টায় সাফল্য প্রভৃতি মাসের দ্বিতীয়ার্দ্ধে দেখা যায়। প্রথমার্দ্ধে কিছু বাধা বিলম্ব, ক্লান্তিকর ভ্রমণ, ক্ষতি, মিথ্যা অপবাদ, শত্রুতা, তীক্ষ্ণ অস্ত্র লেগে আঘাত-পাওয়া, অপবাদ, প্রভৃতি ঘটবে। স্বাস্থ্যের পক্ষে দ্বিতীয়ার্দ্ধই ভালো হবে। প্রথমার্দ্ধে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে কষ্ট পাওয়া আর শারীরিক দুর্ব্বলতা। দ্বিতীয়ার্দ্ধে রোগীরা আরোগ্য লাভ করবে। পারিবারিক শান্তি সুখস্বচ্ছন্দতা অব্যাহত থাকবে। বাইরে থেকে কোন নিকট-আত্মীয় অথবা শুভানুধ্যায়ী বন্ধুর মৃত্যু সংবাদ এসে পড়বে, এজন্যে দুঃখ শোকও মনশ্চাঞ্চল্য হবে। মাসের প্রথমার্দ্ধে কোন প্রকার পরিবর্ত্তনের দিকে অগ্রসর না হওয়াই ভালো। আর্থিকক্ষেত্রে অনুকূল আবহাওয়াই বইবে। টাকার জন্যে গোড়ার দিকটায় কিছু অসুবিধা ভোগ হোলেও দ্বিতীয়ার্দ্ধে বেশ পয়সা হাতে আসবে, স্পেকুলেশনে যাওয়া অনুচিত। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে মাসটী শুভ, তবে কোন কাজে এমাসে মোটা টাকার মূলধন ফেলে না এগিয়ে যাওয়াই উচিত। কৃষিক্ষেত্রেও নতুন কিছু করতে যাওয়া সুবিধাজনক নয়, যেমন চলছে, তেম্নি ভাবেই চাষবাস চলতে দেওয়াই ভালো। চাকুরির ক্ষেত্র উত্তম। চাকুরিজীবির পক্ষে সাফল্য, বহুদিনের আকাঙ্খার পরিপূরণ, নূতন পদে অধিষ্ঠান, পদোন্নতি, সন্তোষজনক পরিবর্ত্তন প্রভৃতি ঘটবে শেষার্দ্ধে। অস্থায়ী কর্ম্মীদের পদ স্থায়ী হবে, বেকার ব্যক্তি চাকুরি পাবে। প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তির সান্নিধ্য লাভ হবে, আর তাঁর আনুকূল্যে ভবিষ্যতের পথ প্রশস্ত ও সুন্দর হোতে পারে। বৃত্তিজীবি ও ব্যবসায়ীদের সুবর্ণ সুযোগ। মহিলাদের সব কাজেই মাসটা ভালো যাবে। বিশেষতঃ যারা সঙ্গীত, চারু কলা, সমাজ কল্যাণ আর পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে দিন যাপন করছে, তারা উত্তম ভাবে মাসটি অতিবাহিত করবে, বিদুষী রমণী বা ছাত্রী সম্প্রদায়ের বিশেষ উন্নতি। সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম্ম ও সমাজ বিজ্ঞান নিয়ে যাঁরা চর্চ্চা করছে, তারা শুধু জ্ঞান অর্জ্জন করবে না, সুখ্যাতি ও লাভ করবে। অবৈধ প্রণয়ে আশাতীত সাফল্য। বৈধ প্রণয়ের ক্ষেত্রেও প্রীতিপ্রদ। অবিবাহিতাদের বিয়ে হবে এমন সব পাত্রের সঙ্গে—যাদের মেজাজ তৈরী হয়ে রয়েছে আধ্যাত্মিকতা, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্পকলার ভেতর। মাসের দ্বিতীয়ার্দ্ধই স্ত্রীলোকের পক্ষে খুব ভালো। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটা মোটামুটি ভালো বলা যেতে পারে। মাসের শেষার্দ্ধে রেসে লাভ।

বৃষ রাশি

বৃষ রাশির পক্ষেও ঐ একই কথা। সকলেরই একরকম ফল। সকলের পক্ষেই মাসটি মিশ্রফলদাতা, ভালো ফলগুলি শেষার্দ্ধের জন্যে অপেক্ষা করছে। ঝগড়া, বিবাদ, মনোমালিন্য, অসৎসংসর্গ উদ্বেগ ও আশঙ্কা, চতুর্দ্দিকে শত্রুদের অবস্থিতি, অপরের কাছে মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হওয়া, স্বাস্থ্যহানি, দুর্ঘটনা, আঘাত, ক্ষতি, প্রচেষ্টায় বাধা বিপত্তি, ভ্রমণে কষ্ট, শত্রুর উৎপীড়ন, দুঃখ ও মনোকষ্ট, অপবাদ

প্রভৃতি অশুভ ফল পেতে হবে। কর্ম্মে সাফল্য, সৌভাগ্য লাভ, আনন্দ। পারিবারিক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, বিলাস ব্যসন দ্রব্যাদি প্রাপ্তি, যশ ও জ্ঞান বৃদ্ধি, উত্তম স্বাস্থ্য প্রভৃতি শুভফলও লাভ হবে। সুতরাং মোটের উপর মাসটা সন্তোষজনক। উল্লেখযোগ্য কোন অসুখ হবে না, কিন্তু দুর্ঘটনা বা আঘাতপ্রাপ্তির যোগ প্রবল। মাসের প্রথমে রক্তের চাপ বৃদ্ধি, শেষার্দ্ধে শারীরিক দুর্ব্বলতা ও জীবনীশক্তির হ্রাস। পারিবারিক ক্ষেত্র শান্তি ও আনন্দপূর্ণ। গৃহের কয়েকজন ব্যক্তির শরীরের অবস্থা খারাপ হওয়ার জন্য দুশ্চিন্তা। মাসের প্রথমার্দ্ধে পরিবারের বহির্ভূত আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে অসদ্ভাব ঘটবে। আর্থিক অবস্থা উন্নতির পথে অগ্রসর হবে।

প্রথমার্দ্ধটি এক ভাবেই যাবে, আর টাকা কড়ির ব্যাপারে শত্রুতা চল্‌বে, ক্ষতি ও হবে। শেষার্দ্ধে আর্থিক লাভ উল্লেখ যোগ্য হওয়ার ফলে প্রথমার্দ্ধের ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে। স্পেকুলেশনে এমাসে বেশ কিছু টাকা আসবে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে মাসটি মিশ্রফল দাতা—ভালোমন্দ দুই-ই ঘট্‌বে। কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পত্তিহানি বা বিক্রয়, ভাড়াটিয়া আর চাষের মজুরদের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ, জমি নিয়ে গোলযোগ, মামলা মোকর্দ্দমা প্রভৃতির সম্ভাবনা। চাকুরিজীবিরা উপরওয়ালাদের বিরাগভাজন হোতে পারে বিনা দোষে, এ জন্যে সতর্কের সঙ্গে কাজ করা দরকার। মাসের শেষার্দ্ধে শুভ হবে, প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাজয়, খ্যাতি অর্জ্জন। প্রথমার্দ্ধে কাজে কৃতিত্ব প্রদর্শনের পক্ষে এমাসটী অনুকূল, কর্ম্মদক্ষতা প্রমাণিতও হবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবিগণের পক্ষে মাসটী উত্তম। মহিলাদের পক্ষে মোটামুটি ভালো এবং অনুকূল। মাসটী বেশ শান্তিপূর্ণভাবে কাট্‌বে। নানা প্রকার উপঢৌকন প্রাপ্তি যোগ। অবৈধ প্রণয়িনীদের সুবর্ণ সুযোগ। অবৈধ প্রণয়েচ্ছু নারীরও আশাপূর্ণ হবে। সৌখীন দ্রব্যাদি, সম্পত্তি ও নানা প্রকার উপহার পুরুষের কাছ থেকে লাভ হবে। মঙ্ক ও চিত্রে যে সব নারী আছে, তারা নানা প্রকারে সুযোগ সুবিধা, অর্থ ও উপঢৌকন লাভ করবে। তাদের সমাদর প্রাপ্তি যোগ। দ্বিতীয়ার্দ্ধে যাদের বিয়ে হবে, তারা খুব সুখী হবে, আর জীবনের স্থিতি লাভ হবে। কিন্তু স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলমাল জনিত কষ্টভোগ আছে, স্ত্রীব্যাধিতে আক্রান্ত নারীর পক্ষে শারীরিক অবস্থা খারাপই হবে। এজন্যে আহার বিহারে সংযম আবশ্যক। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম সময়। রেসে জয়লাভ।

মিথুন রাশি

পুনর্ব্বসুজাত ব্যক্তির পক্ষে নিকৃষ্ট সময়। মৃগশিরা ও আর্দ্রা জাতগণের অনেকটা ভালো। মানসিক উদ্বেগ, স্বাস্থ্যের অবনতি, মনোমালিন্য, বিবাদ, ভ্রমণ কষ্ট, ক্ষতি দুর্ঘটনা, আঘাত প্রাপ্তি, বন্ধুরূপী মতলব-বাজ ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে দুর্গতি ভোগ, কর্ম্ম প্রচেষ্টায় বাধা প্রাপ্তি, প্রভৃতি অশুভ ফলের সম্ভাবনা। কিন্তু লাভ, সুখ, যশ ও সম্মান প্রাপ্তি। প্রথমার্দ্ধে উদর পীড়া, গুহ্য প্রদেশে পীড়া, প্রস্রাব দোষ ও চোখের কষ্ট। দ্বিতীয়ার্দ্ধে দুর্ঘটনা, রক্তের চাপবৃদ্ধি, দুর্ঘটনা, শরীরে সামান্য আঘাত। প্রথমার্দ্ধে পারিবারিক কলহ, স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য। আয় বৃদ্ধি এবং ব্যয়াধিক্য। ব্যয়সঙ্কোচ প্রয়োজনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে মাসটী উত্তম। চাকুরিজীবিদের পক্ষে উত্তম নয়। উপরওয়ালার বিরাগ ভাজন হোতে হবে। অপবাদের সম্ভাবনা। উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর পক্ষে ভৃত্যাদি ও উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষাদির জন্য দুঃখ ভোগ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবিদের পক্ষে মাসটী সন্তোষজনক। যে সব ব্যক্তি অপরের কাজে ব্যাপৃত (যেমন আইনজীবি, ব্যাঙ্কার, ট্রাষ্টি) তাদের পক্ষে বিশেষ শুভ। মাসের দ্বিতীয়ার্দ্ধে অবিবাহিতাদের বিবাহের যোগ। সামাজিক ক্ষেত্রে যে সব নারী মানমর্য্যাদা ও উন্নতির আশা পোষণ করে, তাদের সাফল্য লাভ হবে। অবৈধ প্রণয়িনীদের উত্তম সুযোগ, পরপুরুষের সংস্পর্শে আশাতীত সাফল্য। এমাসে প্রণয়, কোর্টসিপ, রোমান্স, পার্টি, পিকনিক, ভ্রমণ ও নানা আমোদ প্রমোদে স্ত্রীলোকেরা লিপ্ত হোলে প্রচুর আনন্দ, মর্য্যাদা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। অপরিমিত আহার বিহার, পরিশ্রম ও কর্ম্ম-তৎপরতা স্বাস্থ্যের প্রতিকূল হবে, ফলে শয্যাশায়ী হবার সম্ভাবনা আছে। শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম আর উদ্বিগ্নতা সর্ব্ব বিষয়ে পরিত্যাজ্য। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ। রেসে হার হবে।

কর্কট রাশি

পুনর্ব্বসু পুষ্যা ও অশ্লেষা জাত ব্যক্তিদের ফল একই প্রকার। সকলের পক্ষে মাসটী মিশ্রফলদাতা। কর্ম্মে সাফল্য লাভ, উত্তম স্বাস্থ্য, শত্রুজয়, সৌভাগ্য, বিলাস-ব্যসন দ্রব্যাদি লাভ, নূতন বিষয় অধ্যয়নে জ্ঞানার্জ্জন, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানলাভ প্রভৃতি মাসের প্রথমার্দ্ধে লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয়ার্দ্ধে কিছু কষ্টভোগ আছে, অসৎ ব্যক্তির সংস্পর্শে লাঞ্ছনা-ভোগ ক্ষতি, অপচয়, কলহ বিবাদ ও মনোমালিন্য, ভ্রমণে ক্লান্তি বোধ, পীড়া এবং নানা বিষয়ে উদ্বিগ্নতা। প্রথমার্দ্ধে স্বাস্থ্য ভালোই যাবে। দ্বিতীয়ার্দ্ধে নানা প্রকার ব্যাধির সম্ভাবনা উদর পীড়া, গুহ্যপ্রদেশে পীড়া, জ্বর, মূত্রাশয়প্রদাহ, চক্ষুপীড়া, জননেন্দ্রিয়ের ব্যাধি প্রভৃতি সম্ভব। উপরোক্ত রোগে যারা অনেকদিন ভুগছে, তাদের সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। পারিবারিক ক্ষেত্রে প্রথমার্দ্ধ শান্তিপূর্ণ। শেষার্দ্ধে স্ত্রী পুত্র ও পরিবার বর্গের অপরাপর ব্যক্তির সহিত মনোমালিন্য ও কলহের যোগ আছে।

এমাসে আর্থিক ব্যাপারে ভালোমন্দ দুই-ই ঘট্‌বে। অনেক সময়ে আশা পূর্ণ হবে না। প্রথমার্দ্ধে ভালোই যাবে, দ্বিতীয়ার্দ্ধটী মন্দ হবে। আর্থিক ক্ষতি, ঋণ, মামলা মোকর্দ্দমা, প্রচেষ্টায় বাধা প্রভৃতির সম্ভাবনা। দ্বিতীয়ার্দ্ধে কোন প্রকার নব প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হবে। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়, বাড়ীওয়ালা ভূস্বামী ও কৃষিজীবিগণের পক্ষে মাসটী গতানুগতিক ভাবে যাবে। তবে যারা ভূসম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে দালালি করে বা ষ্টক একসচেঞ্জে লিপ্ত—তারা প্রথমার্দ্ধে

বিশেষ সাফল্য লাভ করবে। নূতন গৃহনির্ম্মাণের পক্ষে এই মাসটী অনুকূল। চাকুরিজীবিরা মাসের প্রথমার্দ্ধে শুভ সুযোগ পাবে, কিন্তু শেষার্দ্ধে তাদের ভাগ্যে বহু কষ্ট ভোগ। চাকুরির ক্ষেত্রে পরীক্ষা বা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রথমার্দ্ধে সাফল্য মণ্ডিত হবে। এই সময়ে শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করে পদলাভ বা পদোন্নতি শুভ সূচনা ঘটবে। দ্বিতীয়ার্দ্ধে উদ্বিগ্নতা ও মর্য্যাদার ক্ষুন্নতা, সহকর্ম্মীদের সঙ্গে কলহবিবাদ, ভৃত্যাদির সহিত প্রীতির অভাব প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়। দ্বিতীয়ার্দ্ধে চাকুরিজীবিরা যেন হুঁসিয়ার হয়ে চলে, আর রুটিন মাফিক কাজ করে যায়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তি জীবিরা মাসের প্রথমার্দ্ধে বিশেষ উন্নতি করবে, গড়পড়তা আয়ের চেয়েও বেশী রোজগার করবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী আদৌ ভালো নয়। এজন্যে যে সব কাজ তাদের ভালো লাগে বা যে সব কাজে তারা আগ্রহ দেখায়, তাদের কোনটীর ফল ভালো হবেনা। অবৈধ প্রণয়ে অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। প্রণয়ের ক্ষেত্রে সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে একটু সতর্ক হয়ে চলা দরকার। পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা না করাই ভালো। বিলাস-ব্যসন দ্রব্যাদি ক্রয়, গৃহ সংস্কার আসবাব পত্র খরিদ ও কক্ষাদি সুসজ্জিত করবার উপযোগী বস্তু সংগ্রহের পক্ষে মাসটী উত্তম। অরক্ষণীয়া নারীর বিবাহ যোগ এবং বিবাহ সুখেই হবে। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে বাধা, এজন্যে আশানুরূপ ফলপ্রাপ্তি হবে না। রেসে জয়লাভ।

সিংহ রাশি

পূর্ব্বফল্গুনী জাত গণের পক্ষে নিকৃষ্ট ফল, মঘা ও উত্তরফল্গুনী জাত গণের পক্ষে মধ্যম। মাসটী সকলের পক্ষে মিশ্রফলদাতা হোলেও শুভ ফলগুলির আধিক্য আছে। প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ, জনপ্রিয়তা লাভ, সুখস্বচ্ছন্দতা, সৌভাগ্য, বন্ধুদের সাহায্য প্রাপ্তি, শত্রুদমন মাঙ্গলিক উৎসবঅনুষ্ঠান মাসের প্রথমার্দ্ধে আশা করা যায়। এতদ্‌সত্ত্বেও শত্রুদের উৎপীড়ন, স্বাস্থ্যহানি, মানসিক উত্তেজনা ও উদ্বিগ্নতা এবং দুঃখ ভোগ। দ্বিতীয়ার্দ্ধে অল্পবিস্তর কলহ ও কর্ম্মেবাধা এবং উত্তম স্বাস্থ্য লাভ, চিত্তের প্রসন্নতা ও শান্তি, কার্য্যে হস্তক্ষেপ করলে তাতে সাফল্য, বিলাসব্যসন প্রাপ্তি, এবং উপভোগ, আয়বৃদ্ধি প্রভৃতি যোগ আছে। বিশেষ কোন পীড়া হবে না। সাধারণ দুর্ব্বলতা, ছোট খাটো দুর্ঘটনায় কিছু আঘাত প্রাপ্তি। ছেলেমেয়েদের অসুখ হবে এজন্যে দুশ্চিন্তা। শত্রুদের কার্য্য কলাপের জন্যে মানসিক চাঞ্চল্য। প্রথমার্দ্ধে পারিবারিক অশান্তি। দ্বিতীয়ার্দ্ধে এ অশান্তি থাকবে না। বিশেষ উন্নতি না হোলেও আর্থিক অবস্থা অনেকটা ভালো। লাভ ক্ষতি দুই-ই আছে, একটু হুঁসিয়ার হোলে ক্ষতির ভাগ কমই হবে। এজেন্ট, দালাল, খাদ্য সরবরাহকারী কন্‌ট্রাক্টার, আর বিলাস ব্যসন দ্রব্যাদি বিক্রেতার পক্ষে মাসটী উত্তম, এরা বেশ লাভবান হবে। সুবিধা সুযোগ সত্ত্বেও ব্যয়াধিক্য। প্রথমার্দ্ধে স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে গৃহ ও ভূমির ক্ষতি হবে মাসের শেষার্দ্ধে, এজন্যে বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবিকে কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হোতে হবে বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবিরা এ মাসে কিছু কষ্ট ভোগ করবে। অর্থব্যয় ও রয়েছে। চাকুরিজীবিদের পক্ষে মাসের প্রথমার্দ্ধ অনুকূল নয়। উপরওয়ালার অপ্রীতিভাজন হবে, কিন্তু সাংঘাতিক পরিস্থিতি কিছু হবেনা। মাসের শেষার্দ্ধে এরূপ অবস্থার পরিবর্ত্তন ও উপর ওয়ালার প্রীতি লাভ ঘটবে। কর্ম্মদক্ষতা সম্বন্ধে উপর ওয়ালার স্বীকৃতি প্রকাশ পাবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী অতীব উত্তম। যে কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলে সিদ্ধিলাভ ঘটবে। অবৈধ প্রণয়ে আশাতীত সাফল্য। পুরুষের উপর কর্তৃত্ব করবার অধিকার জন্মাবে। প্রণয়ের ক্ষেত্রে সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে প্রবল প্রতিপত্তি প্রকাশ পাবে। মান মর্য্যাদা ও প্রভুত্ব বৃদ্ধি, স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছা চারিতার ওপর কেউ হস্তক্ষেপ করবে না, বা বাধাসৃষ্টি করবে না; পরপুরুষের সহিত মেলামেশাতেও আনন্দ লাভ ও সমাদর প্রাপ্তি, নানা প্রকার সাহায্য ও উপহার প্রাপ্তি। কোর্টসিপ, পার্টি, অবাধ-বিহার, পিকনিক, ভ্রমণ, রোমান্স প্রভৃতি অত্যন্ত অনুকূল। শিল্পী, গায়িকা, যন্ত্রী, অভিনেত্রী প্রভৃতির খ্যাতি ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি, কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে সতর্ক হয়ে চলাই ভালো, বেপরোয়া ভাবে চললে শারীরিক ক্ষতি অনিবার্য্য, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যবিধ সময়। রেসে লাভ।

কন্যা রাশি

উত্তর ফল্গুনী, হস্তা ও চিত্রা নক্ষত্র জাতগণের পক্ষে একই রকম ফল। প্রথমার্দ্ধ অপেক্ষা শেষার্দ্ধই ভালো, শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা, বন্ধু-স্বজনের সঙ্গে কলহবিবাদ ও মনোমালিন্য, গৃহে অশান্তি, শত্রু উৎপীড়ন, বন্ধুবিচ্ছেদ, চৌর্য্যভয়, ব্যর্থ প্রচেষ্টা, অপরিমিত ব্যয় প্রভৃতি অশুভ ফলের আশঙ্কা। শেষে সুখশান্তি, আয়বৃদ্ধি, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, শত্রু দমন, বন্ধুর সাহায্য লাভ, বিলাস-ব্যসন, প্রচেষ্টায় সাফল্য, নূতন বিষয় অধ্যয়নে অনুরাগ ও জ্ঞানার্জ্জন, সৌভাগ্যবৃদ্ধি। নিজের এবং সন্তানদের শরীর ভালো যাবে না। আহারাদি বিষয়ে এজন্যে সতর্কতা আবশ্যক। অন্যথা গুহ্যদেশে পীড়া, উদরাময়, হজমের দোষ, আমাশয়, জ্বর, রক্তস্রাব প্রভৃতি মাসের প্রথমার্দ্ধে ঘটতে পারে। মাসের শেষার্দ্ধে সন্তানদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টি নেওয়া আবশক। সামান্য পীড়াতেও অবহেলা করা চলবেনা। গৃহের কলহ বা পারিবারিক অসন্তোষ কোন রকমেই রোধ করা যাবেনা। পরিবার বহির্ভূত আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের সঙ্গে আচার আচরণে সতর্ক হয়ে চলাই বাঞ্ছনীয়। মাসটী অর্থের পক্ষে অনুকূল নয়, পাওনাদারের তাগাদায় বিব্রত হোতে হবে। বন্ধুরূপী মতলব-বাজ লোকের আনাগোনা হবে, এরা প্রতারিত করবে, তার জন্যে ক্ষতির সম্ভাবনা। চুরির ভয় আছে। কোন প্রকার পরামর্শ গ্রহণ করে কোন কাজে হস্তক্ষেপ না করাই ভালো, বরং গতানুগতিকভাবে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করলে কোন প্রকার ঝামেল হবে না। স্পেকুলেশনে কিছু লাভ হোলেও শেষপর্য্যন্ত ক্ষতির আশঙ্কা। বাড়ী-ওয়ালা, ভূস্বামী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি ভালো বলা যায় না। কেননা ভূমিতে উৎপন্ন শস্যের ক্ষতি, ভাড়াটিয়ার কাছ থেকে ভাড়া আদায়ে করবার. তজ্জন্য কথা কাটাকাটি, এমন কি মামলা মোকর্দ্দমাও ঘটে যেতে

পারে। সম্পত্তি কেনা-বেচায় লাভ হবেনা। এজন্যে অধিক লাভার্থ সম্পত্তি কেনা বা বিক্রয় করা একেবারেই বর্জ্জনীয়। মাসের দ্বিতীয়ার্দ্ধে নূতন গৃহের ভিত্তি স্থাপনা বা নির্ম্মাণ বিশেষ অনুকূল হবে। চাকুরিজীবীর পক্ষে মাসের বেশীর ভাগ সময়ই খারাপ। শেষ সপ্তাহটী ভালো যাবে। উপরওয়ালার সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ থাক্‌বেনা, পদে পদে বাধা-বিপত্তি ও কাজের চাপের জন্যে মানসিক অসচ্ছন্দতা। পাছে নিজের অন্যমনস্কতার জন্যে কোন প্রকার ভুল ত্রুটি হেতু কৈফিয়ৎ দিতে হয় এসম্পর্কে পূর্ব্ব থেকে সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। রুটিন মাফিক কাজ করে যাওয়াই ভালো। শেষ সপ্তাহটী শান্তিপূর্ণ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে শেষ সপ্তাহটি ছাড়া এমাসে কেবল বাধা বিপত্তি ও অসাফল্য, শেষ সপ্তাহে সৌভাগ্যলাভ। সমাজ বিহারিণী নারীর চেয়ে গৃহিনীদের পক্ষে মাসটি উত্তম। গৃহস্থালীর ব্যাপারে কৃতিত্ব প্রকাশ পাবে এবং সমাদর লাভ ঘট্‌বে। অবৈধ প্রণয়ে বিপত্তি আছে। প্রণয়ের ক্ষেত্রে মর্য্যাদাহানি। এ মাসে অবিবাহিতা বা অরক্ষণীয়ার বিবাহযোগ নেই, শেষ সপ্তাহে কিছুটা আশাপ্রদ। মাসের শেষ সপ্তাহটী অবৈধ প্রণয়, কোর্টসিপ, ভ্রমণ, পার্টি, পিক্‌নিক, প্রেম ও রোমান্সের অনুকূল, পুরুষের সংস্পর্শে এসে লাভ ও উপহার প্রাপ্তি, তাছাড়া বন্ধুবান্ধব ও স্বজনবর্গের কাছ থেকে প্রাপ্তিযোগ আছে। বিদ্যার্থীও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটি মধ্যম। রেসে লাভ অল্পই হবে।

তুলা রাশি

বিশাখাজাতগণের পক্ষে নিকৃষ্টফল। চিত্রা ও স্বাতীজাতগণের পক্ষে অনেকটা ভালো। মাসের প্রারম্ভটা কোন রকমে ভালো হোলেও ক্রমে ক্রমে খারাপের দিকে যাবে। গোড়ার দিকে উত্তম স্বাস্থ্য, আয় বৃদ্ধি, শত্রুজয়, উত্তমবন্ধুলাভ, প্রচেষ্টায় সাফল্য, সৌভাগ্য বিলাসিতা, প্রভাব প্রতিপত্তি প্রভৃতি দেখা যায়। ক্রমে দুঃখকষ্ট, স্বাস্থ্যের অবনতি, কলহ।বিবাদ, নানাপ্রকার আশঙ্কা, কৃত্রিম বন্ধু ও স্বজনবর্গের কাছ থেকে কষ্টভোগ, মিথ্যা অপবাদ, ভ্রমণে বিপত্তি প্রভৃতি অশুভ ফল। প্রথমার্দ্ধে উত্তম স্বাস্থ্য। অজীর্ণ, উদরাময়, আমাশয়, জ্বর, শারীরিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতির আশঙ্কা আছে। শেষার্দ্ধে ঘরে বাহিরে কলহ বিবাদ, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মনোমালিন্য ইত্যাদি ঘটবে। প্রথমদিকে আর্থিক অবস্থার অবনতি হবে না। কিন্তু দ্বিতীয়ার্দ্ধে টাকার টান ধরবে, নগদ টাকা তহবিলে মজুত থাক্‌বেনা। কর্ম্ম প্রচেষ্টায় ক্ষতি, তাছাড়া তথাকথিত সুযোগবাদী বন্ধুরা প্রতারণা করবে। অপরিচিত বা অবাঞ্ছনীয় ব্যক্তির সংসর্গে না আসা একান্ত আবশ্যক। দীর্ঘমেয়াদী অর্থ বিনিয়োগ এমাসে আদৌ অনুকূল নয়। কোন প্রকার অর্থ বিনিয়োগের সময় খুব সতর্ক হওয়া দরকার, আর ভেবে চিন্তে তবে টাকা দেওয়া উচিত। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী আদৌ শুভজনক নয়। বহু বাধাবিপত্তি, ক্ষতি ও নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি ঘট্‌বে। বহু সতর্কতা সত্ত্বেও অশুভ ঘটনাগুলির কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করা যাবেনা।

চাকুরির ক্ষেত্রে প্রথমার্দ্ধ শুভ, শেষার্দ্ধ অশুভ। প্রথমার্দ্ধে চাকুরিপ্রার্থী হয়ে কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ, পরীক্ষার্থী হওয়া, প্রতিযোগিতা করা প্রভৃতি চল্‌তে পারে, তাতে সিদ্ধি ঘট্‌বে। উচ্চপদে অধিষ্ঠান আর যোগ্যতা ও কর্ম্মদক্ষতা সম্বন্ধে উপরওয়ালার স্বীকৃতি প্রভৃতি যোগ মাসের প্রথমার্দ্ধে। পদমর্য্যাদার হানি, অসম্মান, কর্ম্মের অবনতি, মিথ্যা ষড়্‌যন্ত্রের আবেষ্টনে লাঞ্ছনা ভোগ ইত্যাদি মাসের শেষের দিকে দেখা যাবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটি কর্ম্মবহুল ও আশাপ্রদ। শেষ সপ্তাহটী নৈরাশ্যজনক। এমাসে শিল্পকলা, সঙ্গীত, হালকা ধরণের সাহিত্য পাঠ প্রভৃতির দিকে নারী মহল আকৃষ্ট হবে। অনেকে দক্ষতাও লাভ করবে। সামাজিক ক্ষেত্রে বহু লোকের সঙ্গে পরিচয় হবে। অবৈধ-প্রণয়ের যোগাযোগ আছে। আমোদপ্রমোদজনক ভ্রমণ, কোর্টসিপ, প্রণয়, পিক্‌নিক্ ও সামাজিক উৎসবে যোগদান ঘট্‌বে। প্রণয়ের ক্ষেত্রে, সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে প্রতিপত্তি, মর্য্যাদা ও কর্ত্তৃত্ব লাভ। সমাজ ও দেশহিতৈষিণী কর্ম্মীরা বহু সুযোগসুবিধা লাভ করবে। বিদ্যার্থীও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশানুরূপ নয়। রেসে পরাজয়।

বৃশ্চিক রাশি

বিশাখা, অনুরাধা ও জ্যেষ্ঠাজাত ব্যক্তিগণের একই প্রকার ফল। সকলের পক্ষেই মাসটী উত্তম। প্রথম দিকে সাধারণ ভাবে সময় অতিবাহিত হবে, কিন্তু যতই দিন এগোতে থাক্‌বে ততই শুভ ঘটনা ও সুযোগ বৃদ্ধিপাবে। উত্তম বন্ধুলাভ, বিশেষ সম্মান, সুখ স্বচ্ছন্দতা ও বিলাসিতা, লাভ, উত্তম স্বাস্থ্য, সকল প্রচেষ্টায় সাফল্য, বিদ্যা ও জ্ঞানার্জ্জনে উন্নতি, শত্রুজয়, নূতন পদমর্য্যাদা, প্রভাবপ্রতিপত্তিবৃদ্ধি প্রভৃতি ঘট্‌বে। প্রথমার্দ্ধে কিছু কষ্টকর ভ্রমণ, কলহবিবাদ ও অপ্রীতিকর পরিবর্ত্তন ঘটতে পারে। কিন্তু এগুলি ক্ষণস্থায়ী, স্বাস্থ্যের হানি হবে না। ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিরা আরোগ্য লাভ করবে। পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রথমার্দ্ধে কিছু অশান্তির সৃষ্টি হোতে পারে কলহ বিবাদের জন্যে। মেজাজ খিট্‌খিটে হয়ে থাকবে, একটুতেই রাগ প্রকাশ পাবে, কথায় কথায় ধৈর্য্যচ্যুতি ঘট্‌বে। প্রথমার্দ্ধে কিছু আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। ব্যয়াধিক্য ঘট্‌বে মাসের বেশীর ভাগ সময়ে। হিসাব নিকাশে ও গোলমাল ঘট্‌বে, তাছাড়া অনেকে প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা করবে। এতদসত্ত্বেও মাসের শেষে দেখা যাবে বিশেষ আর্থিকোন্নতি ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়েছে। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি উত্তম, মাসের আরম্ভকালে কিছু কষ্টভোগ হোতে পারে মাত্র। চাকুরিজীবীদের পক্ষে প্রথম দিকটা এক ভাবেই যাবে, কোন ভালো মন্দ ঘট্‌বে না। দ্বিতীয়ার্দ্ধে পদোন্নতি, শত্রুজয়, চাকুরিপ্রার্থী হয়ে কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ, চাকুরির জন্যে পরীক্ষা দেওয়া প্রভৃতিতে সাফল্য লাভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিভোগীর পক্ষে উত্তম সময়। অলঙ্কার, বিলাস দ্রব্য, আমোদপ্রমোদ, পোষাকপরিচ্ছদ প্রভৃতি ক্রয় করার ঝোঁক হবে, আর এসব ব্যাপারে ব্যয়ও হবে। সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠান, আমোদ প্রমোদ ও জন কল্যাণকর কাজে মজুত টাকা ক্ষয় হবে।

অবৈধ প্রণয়ে আশাতীত সাফল্য। প্রণয়ের ক্ষেত্রে, সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ। রোমান্স, কোর্টসিপ, প্রণয়ীর সঙ্গে চিঠিপত্র লেখালেখি চল্‌বে। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম সময়।

ধনু রাশি

ধনুরাশিজাত ব্যক্তিদের পক্ষে সকলেরই এক প্রকার ফল। বিদ্যা ও জ্ঞানার্জ্জনে সাফল্য, সুখ স্বচ্ছন্দতা, মাঙ্গলিক উৎসব অনুষ্ঠান, সৌভাগ্য, উপহার প্রাপ্তি, আশানুরূপ অর্থাগম, শত্রুজয় প্রচেষ্টায় সাফল্যলাভ প্রভৃতি শুভফল দেখা যায়। কিন্তু ক্ষতি, শারীরিক দুর্ব্বলতা, শত্রুবৃদ্ধি ও দুর্নাম, বন্ধুদের সঙ্গে মতভেদ প্রভৃতিও সম্ভব। কিছু স্বাস্থ্যহানি হোতে পারে। হৃদ্রোগ ও রক্তের চাপবৃদ্ধি প্রথমার্দ্ধে ঘট্‌বে, পরিশ্রমসাধ্য কাজ বেশী না করাই ভালো। পেটের গোলমাল হোতে পারে। শ্লেষ্মা বৃদ্ধি ও নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস কষ্ট। পুরাতন হাঁপানী রোগীর সতর্কতা আবশ্যক। মাসের শেষার্দ্ধে এসব গোলমাল কেটে গেলেও পিত্ত ও বায়ুর প্রকোপ আসবে। পরিবারবর্গের সহিত কলহ বিবাদ হবেনা বটে, কিন্তু পরিবার-বহির্ভূত আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবর্গের সহিত মনোমালিন্য ঘট্‌তে পারে। আর্থিক অবস্থা অনুকূল। দ্বিতীয়ার্দ্ধে আর্থিক স্বচ্ছন্দতার কিছু হ্রাস হবে। কোন প্রকার পরিকল্পনায় হস্তক্ষেপ করা অনুচিত। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। ভূমি ও অন্যান্য সম্পত্তি থেকে লাভ। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটী মধ্যম। শিল্পসংক্রান্ত ব্যাপারে নানাপ্রকার সুযোগ সুবিধা ও লাভ। কর্ম্মক্ষেত্রে কিছু অক্ষমতা প্রকাশ পাবে, এজন্যে উপরওয়ালার অসন্তোষের কারণ হবে। সুতরাং চাকুরিজীবিদের পক্ষে এবিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। কোন পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করা উচিত নয়, স্থানান্তর হওয়ার দিকে ঝোঁক দেওয়া চল্‌বেনা। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিভোগীর পক্ষে ভালোই যাবে। পরপুরুষের সঙ্গে অবৈধ প্রণয় সম্পর্কে আসবার ঝোঁক ও তজ্জনিত চাপা উত্তেজনা নারীর মধ্যে থাকবে। অবৈধ প্রণয়িনীরা আমোদ প্রমোদ ও প্রমত্ত বিহারে কালাতিপাত কর্‌বে। পুরুষের সঙ্গে কোন প্রকার মতভেদ বা কলহবিবাদ হবে না। প্রণয়ের ক্ষেত্রে, সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে নারীরা সুখস্বচ্ছন্দতা ভোগ করবে। অনেকেই পর-পুরুষের সাহচর্য্য ও প্রলোভনে বিভ্রান্ত হোতে পারে—সমাজবিহারিণীরাই এদিকে আকৃষ্ট হয়ে উঠ্‌বে বেশী। পিক্‌নিক, ভ্রমণ, পার্টি ও সিনেমা প্রভৃতির মাধ্যমে অবৈধ প্রণয়ের জাল বিস্তার হবে। বিনা চেষ্টায় অবিবাহিতাদের বিবাহ হয়ে যাবে। গৃহিণীরা গার্হস্থ্যদ্রব্যাদির ও বিলাসব্যসনের জন্যে অপরিমিত ব্যয় করবে, আর তৈজস পত্রাদি কিন্‌বে। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে শুভ। রেসে জয় লাভ।

মকর রাশি

মকররাশিজাত ব্যক্তিগণের ফল একইপ্রকার। কলহ বিবাদ, ক্ষতি, ক্লান্তিকর উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণ, স্বাস্থ্যের অবনতি, নানাপ্রকার উদ্বিগ্নতা, মিথ্যা অপবাদ, অসম্মান, স্বজন বিরোধ, আত্মীয়বিয়োগ, ব্যয়াধিক্য গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, বিলাস ব্যসন প্রভৃতি যোগ আছে। শারীরিক অসুস্থতার সম্ভাবনা। জ্বর, রক্তের চাপ বৃদ্ধি, শ্বাসকষ্ট বা শ্বাসপ্রশ্বাসের রোগ, হাঁপানি, পিত্তপ্রকোপ, দুর্ঘটনা প্রভৃতির আশঙ্কা। এইসব রোগে আক্রান্ত পুরাতন রোগীদের সতর্কতা আবশ্যক। পারিবারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যতা ব্যাহত হবে না। সামান্য মনান্তর বা কলহবিবাদ ঘটতে পারে। অর্থক্ষতি যোগ। নানাপ্রকারে অর্থ নষ্ট হবে। এর ক্ষতির কারণ হবে আত্মীয়স্বজনেরাই বেশী। ভ্রমণকালে জিনিষপত্র চুরি যাবে, নিজের প্রতারিত হবার সম্ভাবনা। প্রচেষ্টায় ব্যর্থতার জন্যেও অর্থ ক্ষতি হওয়া সম্ভব। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে নানাপ্রকার কষ্টভোগ, অংশীদার, অধীনস্থ কর্ম্মচারী, চাষী মজুর প্রভৃতির সঙ্গে কলহবিবাদ ঘটবে, মামলা মোকর্দ্দমাও হোতে পারে। মাসের বেশারভাগ সময়েই চাকুরিজীবিরা নানা সমস্যার সম্মুখীন হবে। কর্ম্মক্ষেত্রে বাধাবিপত্তি নানা অশান্তির কারণ ঘটতে পারে। মাসের শেষে উপরওয়ার বিরাগভাজন হবার যোগ আছে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে মাসটি আদৌ সন্তোষজনক নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি ভালো নয়। যে সব ব্যাপারে স্ত্রীলোকেরা আগ্রহশীল সে সব কাজগুলি হোতে পারবে না। অবৈধ প্রণয়ে বিপত্তি, ঘরে বাইরে অসন্তোষের জন্যে চিত্তের উৎক্ষিপ্ত ভাব, পরপুরুষ বা অপরিচিত লোকের সংস্রবে আসা বর্জ্জনীয়। স্বজনবর্গের সঙ্গে ছাড়া ভ্রমণ পরিহার করা কর্ত্তব্য। ভ্রমণ, পিকনিক, সিনেমা দেখা সম্পর্কে একটু সতর্ক হওয়া দরকার। এমন কি পরিবারের বন্ধু বা পরিচিত পরপুরুষের সঙ্গে ঐ সব স্থানে না যাওয়াই ভালো। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম সময়। রেসে ক্ষতি।

কুম্ভ রাশি

কুম্ভরাশিজাত ব্যক্তিমাত্রেই একই ফললাভ করবে। প্রথমার্দ্ধে প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ, সুখ সমৃদ্ধি লাভ, বিলাসব্যসন উপভোগ, ধন প্রাপ্তি প্রভৃতি যোগ আছে। শেষের দিকে সম্পত্তি হানি ও কলহ বিবাদ, সাধারণভাবে শারীরিক দুর্ব্বলতা, চক্ষুপীড়া ও পিত্তপ্রকোপ, পুরাতন রোগীরা জ্বরে আক্রান্ত হবে। ফাইলেরিয়া রোগীর অত্যন্ত সতর্কতা আবশ্যক। আর্থিক ক্ষেত্রে মাসটি শুভ বলা যায়। সাধারণ পথ দিয়েই অর্থাগম হবে। আর্থিক প্রচেষ্টা সাফল্য মণ্ডিত হবে। কিন্তু বন্ধুবান্ধবের সহযোগিতায় আর্থিক প্রচেষ্টা বর্জ্জনীয়। বহু অবিশ্বস্ত বন্ধুর সান্নিধ্যে আসার সম্ভাবনা। কালোবাজারিরা ও বে-আইনি আমদানী রপ্তানী কারকরা এমাসে অনেক অর্থ উপার্জ্জন করবে। কৃষিজীবি ভূম্যধিকারী ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে মাসটি উত্তম। মাসের প্রথমার্দ্ধে চাকুরীজীবীর পক্ষে উত্তম সময়। উচ্চপদ লাভ, চাকুরিপ্রার্থী বা পদোন্নতিপ্রার্থীর টেষ্ট পরীক্ষায় সাফল্য, চাকুরির জন্যে নিয়োগকর্ত্তার দর্শনকামী ও সাফল্য লাভ করবে। দ্বিতীয়ার্দ্ধে নানাপ্রকার সাময়িক বাধাবিপত্তি, প্রতিদ্বন্দ্বীদের জন্যে কষ্টভোগ এবং নানাপ্রকার অশান্তি ও

সকল কার্য্যে বন্ধু বান্ধবদের সাহায্য পাবে। সামাজিকতার ক্ষেত্রে পসার-প্রতিপত্তি,জনপ্রিয়তা ও সাফল্য লাভ। অবৈধ প্রণয়িনী ও সমাজবিহারিণীর সুবর্ণসুযোগ। পরপুরুষের সান্নিধ্য ও ভালোবাসার মাধ্যমে বহু লাভ ঘটবে। প্রণয়ের ক্ষেত্রে, সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা, আনন্দ ও মর্য্যাদা লাভ। অতিরিক্ত পরিশ্রম ও অপরিমিত আহার বিহারে পীড়িত হবার আশঙ্কা, এদিকে সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম সময়। রেসে জয়লাভ।

মীন রাশি

মীনরাশিজাত ব্যক্তি মাত্রেরই একপ্রকার ফল। মাসটি সকলেরই পক্ষে অতীব উত্তম। অন্তরের আশা আকাঙ্ক্ষা আর কামনা-বাসনা পূর্ণ হবে, লাভ, সৌভাগ্য বৃদ্ধি, সম্মানের সহিত উচ্চস্তরে অধিষ্ঠান, বিলাস ব্যসন, কল্যাণকর ঘটনা, কর্ম্ম প্রচেষ্টায় সাফল্য প্রভাব প্রতিপত্তি-সম্পন্ন বন্ধু লাভ, খ্যাতি, প্রতিপত্তির অভাব ঘটবে। মধ্যে মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বীদের জন্য কিছু দুর্ভোগ, তারা অপকৌশল প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হবে, কলহ বিবাদ কোন না কোন ব্যক্তির সঙ্গে লেগেই থাকবে। অবশ্য এজন্যে উপরোক্ত শুভ ফলগুলির হ্রাস হবে না। উত্তম স্বাস্থ্য লাভ, তবে মাসের শেষের দিকে কিঞ্চিৎমাত্র শরীর খারাপ হতে পারে। সন্তানদের পীড়ার আশঙ্কা আছে এজন্যে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। অবশ্য তাদের সাংঘাতিক রকমের কোন পীড়া ঘটবে না। পারিবারিক শান্তি, মাঙ্গলিক উৎসব অনুষ্ঠান, বিশেষ প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন উচ্চস্তরের ব্যক্তিদের বন্ধুত্ব লাভ, ভৃত্যাদি লাভ; প্রিয় বন্ধু ও স্বজন সমাগম, বিলাসিতার বস্তু-লাভ ও উপভোগ। সংসারের শ্রী বৃদ্ধি। আর্থিক অবস্থা অতীব শুভ, প্রচুর উপার্জ্জন। পেশা ব্যবসা, গভর্ণমেণ্টের সংস্রব সংযোগ, বন্ধু সাহচর্য্য প্রভৃতি থেকে আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে। সাগর পার থেকেও লাভের যোগ আছে; আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যোদয়ের সম্ভাবনা দেখা যায় কিন্তু স্পেকুলেশন ক্ষতিদায়ক হবে। ভূম্যধিকারী, কৃষিজীবি ও বাড়ীওয়ালারপক্ষে উত্তম সময়। ভূম্যাদি ক্রয়, গৃহাদি নির্ম্মাণ ও বিস্তৃতি বা গৃহসংস্কার, বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষবাসের জন্যে যন্ত্রাদি ক্রয় প্রভৃতি ঘটতে পারে। দান, উত্তরাধিকার বা ক্রয় সূত্রে সম্পত্তি লাভ। চাকুরিজীবীর পক্ষে অতীব উত্তম সময়। বেকার-ব্যক্তিদের চাকুরি লাভ। অস্থায়ী কর্ম্মচারী স্থায়ীপদে নিযুক্ত হবে। নূতন পদমর্য্যাদা, পদোন্নতি, স্বাধীনভাবে কর্তৃত্ব করবার অধিকার, গ্রেডের পরিবর্ত্তন প্রভৃতি আশা করা যায়। স্ত্রীলোকের পক্ষে সর্ব্ব বিষয়ে অতীব উত্তম সময়। দ্বিচারিণী ও অবৈধ গুপ্ত প্রণয়িনীর পক্ষে সুবর্ণসুযোগ। বিত্তশালী প্রণয়িনীর আনুকুল্যে সুখৈশ্বর্য্য সম্ভোগ। বহু নারীকে রোমাণ্টিক পরিবেশের মধ্যে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে দেখা যাবে। পরপুরুষের সাহচর্য্য ও অবাধ বিহারের সুযোগ আসবে। অলঙ্কার, অর্থ, বিলাস ব্যসনের উপকরণ, যানবাহন ভোগের দ্বারা আনন্দ,—প্রণয়ের ক্ষেত্রে, সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে সুখশান্তি, সম্মান প্রতিপত্তি, আধিপত্য ও স্বাচ্ছন্দতা লাভ। দাম্পত্য প্রীতি অটুট থাকবে। পুরুষের ব্যবহার ও সংসর্গ চিত্তের প্রসন্নতা আনবে। এ মাসে যে সব অবিবাহিতার বিবাহ হবে তাদের স্বামীরা উচ্চস্তরের হবে এবং বিবাহের রাত্রি থেকে স্ত্রীর বশীভূত হয়ে থাকবে ও উত্তম সঙ্গ সুখ বিভোর হবে। শিল্পকলা ও সঙ্গীতবিদ্যা চর্চ্চা নিয়ে যে সব নারী কালাতিপাত করছে, তাদের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা হবে। চাকুরিজীবি নারীর পদোন্নতি ও উপরওয়ালার আনুকূল্যলাভ হবে বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের উত্তম সময়। রেসে জয় লাভ।

—

ব্যক্তিগত দ্বাদশ লগ্নের ফলাফল

মেষ লগ্ন

অনায়াসে আশা আকাঙ্খার সিদ্ধিলাভ। কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রগতি। প্রভাব, প্রতিষ্ঠা, লোক প্রিয়তা ও সম্মানের যোগ। দেহ ভাবের ফল শুভ। সৌভাগ্যোদয়। ব্যয় বাহুল্য। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

বৃষলগ্ন

যথেষ্ট সুযোগ, উদ্ভাবনী-শক্তিলাভ। অনিশ্চয়ের পশ্চাতে নিষ্ফল পরিশ্রম, আর্থিক পরিস্থিতি ভালো বলা যায় না; পুনঃ পুনঃ সুযোগ-গুলি পেয়েও হারাতে হবে। দুর্ঘটনার আশঙ্কা, ব্যবসাক্ষেত্র শুভ, নূতন পথে অর্থোপার্জ্জন চাকরি ক্ষেত্রে পরিবর্ত্তন। স্ত্রীলোকের ভাগ্যে প্রবঞ্চনা, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ।

মিথুনলগ্ন

ঘাত প্রতিঘাতে জর্জ্জরিত; উত্থান পতন সঙ্কুল সময়। ব্যবসায়ীর সাফল্য, চাকুরিজীবীর উন্নতির পথে বাধা। শারীরিক অসুস্থতা। ব্যয় বাহুল্য হেতু চিত্তের উদ্বেগ। বন্ধুলাভ যোগ, স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম সময়, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

কর্কটলগ্ন

বেদনা ঘটিত পীড়া, ভাগ্য সুপ্রসন্ন, উন্নতির যোগ। লাভের আশা যথেষ্ট, অর্থাগম, প্রণয়ের পরিণতি অশুভ হবে। কর্ম্মোন্নতি, স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে অনুকূল নয়।

সিংহলগ্ন

সর্ব্বত্র সাফল্য কিন্তু শত্রু চিন্তা। বন্ধুর সহিত মনোমালিন্য, কর্ম্মস্থলে ক্ষতির আশঙ্কা, দেহপীড়া, ব্যবসা ক্ষেত্রে শুভ ফল, আয় স্থান শুভ, কিন্তু ব্যয়াধিক্য। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ, প্রণয় লেখায় জন্য চাঞ্চল্য। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে সাফল্যে বাধা।

কন্যালগ্ন

আর্থিক পরিস্থিতি অনুকূল। পারিবারিক সুখ সমৃদ্ধি, পুত্রের উন্নতি বা সন্তান নিমিত্ত সুখ ও আনন্দ প্রাপ্তি, সম্মানের যোগ, অতি বুদ্ধিতে অনুতাপ, স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম সময়।

তুলা লগ্ন

প্রভাব বৃদ্ধি, সন্তানের দেহ পীড়া, ভূমি গৃহাদি সংক্রান্ত কোনরূপ গোলযোগের সম্ভাবনা, মাতা বা মাতৃস্থানীয়া গুরুজন বিয়োগ, মানসিক দ্বন্দ্ব ভাব হেতু কষ্ট ভোগ, স্ত্রীলোকের পক্ষে নিকৃষ্ট ফল, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

বৃশ্চিকলগ্ন

মানসিক দ্বন্দ্ব ভাবের দরুণ সুযোগ নষ্ট। পাকযন্ত্রের পীড়া বাত-বেদনা, ধনাগমযোগ, দাম্পত্যসুখ সন্তানের বিবাহ যোগ, কর্ম্মস্থলে দায়িত্ব বৃদ্ধি, সন্তান সৌখ্য যোগ, বিদেশযাত্রার সম্ভাবনা, পারিবারিক পরিস্থিতি অনুকূল। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর সাফল্যলাভ।

ধনুলগ্ন

ব্যবসায়ে উন্নতি, আর্থিক পরিস্থিতি অনুকূল, ধনাগম, কর্ম্মসিদ্ধি, নূতন কর্ম্মলাভ, স্ত্রীর পীড়া, স্ত্রীলোকের পক্ষে অর্থহানি ও প্রণয়ের দিকে অত্যন্ত আগ্রহ,অপরিমিত ব্যয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মোটের উপর শুভ।

মকরলগ্ন

সুযোগ যথেষ্ট, কিন্তু অযথা ব্যয়ের সম্মুখীন। সাময়িক ঝঞ্ঝাট, ধর্ম্মানুষ্ঠান ও তীর্থ পর্যটনের যোগ, সন্তানের বিবাহ, মানসিক উত্তেজনা, বাসস্থান সংক্রান্ত ব্যাপারে অশান্তি, চাকুরির ক্ষেত্রে উন্নতি, স্ত্রীলোকের পক্ষে অশুভ সময়, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম সময়।

কুম্ভলগ্ন

মিত্রভাগ্য অনুকূল। ঘন পরিবর্ত্তনের মধ্যে বিব্রত হওয়ার যোগ। গুরুজনের সঙ্গে মত ভেদ, শারীরিক সুখস্বচ্ছন্দতা, কর্ম্মস্থলের ফল সম্পূর্ণ সন্তোষজনক নয়, পত্নীর শারীরিক অসুস্থতা বা বায়ুঘটিত পীড়া, চাকুরির ক্ষেত্রে পরিবর্ত্তনের যোগ, পরীক্ষার্থী স্ত্রীলোকের সময় মধ্যবিধ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশানুরূপ নয়।

মীনলগ্ন

মাতার স্বাস্থ্যভঙ্গ যোগ। অধ্যাপনায় সুনাম, বিদেশ ভ্রমণ। গভর্ণমেন্টের অনুগ্রহ লাভ। ভাগ্যোন্নতির যোগ, বিশেষ আয় বৃদ্ধি, বন্ধুর সঙ্গে মতানৈক্য হেতু অশান্তি ভোগ, দাঁতের পীড়া, বাত বেদনা সর্বত্র সাফল্য ও মানসিক উল্লাস, বিবাহার্থীর পত্নীলাভ, স্ত্রীলোকের অতীব উত্তম সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ হোলেও বিদ্যা-চর্চ্চায় অমনোযোগিতা হেতু উত্তম ফলের হ্রাস।

চোখের দেখা

শ্রীঅশোককুমার মিত্র

ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

মনে পড়িয়া গেল, স্ত্রীর চিঠি পাইয়া।

..."ট্রেন ছাড়িয়া যাইবার পর এইবার তুমি আমায় 'টাটা' করিবার ভঙ্গিতে হাত নাড়িয়াছিলে কেন? কখনও তো এমন করো না! অমন আধুনিকপনা আমি দুই চক্ষে দেখিতে পারি না। যত বয়স হইতেছে, তত যেন কেমন হইয়া যাইতেছ!..."

মুখটিও যে আমার একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, তা' বোধ হয় তিনি এগিয়ে-যাওয়া-ট্রেনের কামরা থেকে দেখিতে পান নাই!

লক্ষ্ণৌ থেকে কলকাতা অনেকবার যাতায়াত করিতে হইয়াছে আমাদের। কখন দু'জনে, কখনও একেলা। স্ত্রীকে যখনই একেলা যাইতে হইয়াছে তখনই আমি লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনে তুলিয়া দিয়াছি। এ'বারেও তাহাই করিয়াছিলাম। অমৃতসর মেল লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনে আসিতেই নির্দ্ধারিত জায়গায় "স্লিপিং কোচে" স্ত্রীকে বসাইয়া দিয়াছি।

আধ ঘণ্টা দাঁড়াইবে ট্রেণখানা।

ট্রেনের কামরার জানালা দিয়া মুখ বার করা স্ত্রীর সঙ্গে প্লাটফর্মে দাঁড়াইয়া বোকার মত যতরাজ্যের গল্প করিয়াছি!

একেলা যেন কখনও থাকি না, এমনই ভাবে কত যে আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ উপরোধ শুনিতে হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই!

মনে হইয়াছে, ট্রেণটি যেন নড়িতে চায় না! প্লাটফর্মের মস্ত ঘড়িটি যেন চলিতেছে না! সিগন্যালটি যেন বিগড়াইয়া গিয়া সোজা খাড়া হইয়া আছে! লাল আলো আর সবুজ হয় না যেন! ছবিওয়ালা পত্রিকা কিনিলাম স্ত্রীর জন্য। জলের বোতলে জল ভরিয়া দিলাম। ফলওয়ালা ডাকিয়া ফল কিনিয়া দিলাম। দু'জনে দু' বোতল 'অরেঞ্জ' কিনিয়া খাইলাম। তবুও ট্রেণটি দাঁড়াইয়াই রহিয়াছে! সবই তো হইল, তবুও ট্রেণ ছাড়িতে পাঁচ মিনিট বাকি এখনও!

কামরার জানালার সামনে হইতে সরিয়া আসিয়া এ'দিক-ওদিক তাকাইতেছি, স্ত্রী ইসারায় কাছে ডাকিলেন।

—"অমন দূরে দূরে দাঁড়িয়ে আছ কেন?"

—"এই তো কাছে এসেছি, কি বলবে বলো?"

—"কিচ্ছু বলবো না! সামনে এসে দাঁড়াতে পারো না? অমন ছট্‌ফট্ করছো কেন?"

—"একটু পরেই তো দূরে চলে যাবে।"

—"সে যখন যাবো, তখন..."

আবার কামরাটির জানালার সামনে দাঁড়াইয়া রহিলাম!

কোন প্রয়োজন ছিল না, বহুবার বলা হইয়াছে, তবুও হঠাৎ বলিয়া বসিলাম—"গিয়েই চিঠি দিও কিন্তু।"

—"হ্যাঁ গো, দেবো তো বলেছি।"

সিগন্যাল 'ডাউন' হইয়াছে। লাল আলো সবুজ হইয়াছে। গার্ড বাঁশি বাজাইতেছেন। সবুজ পতাকা নাড়িতেছেন।

জনতা চঞ্চল হইয়া উঠিল।

স্ত্রী মুখখানি কেমন বেমানান করিয়া বলিল—"সাবধানে থেকো।"

—"বলেছি তো, সাবধানেই থাকবো।" ট্রেণখানি ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। দু'চার পা ট্রেণটির সাথে আগাইয়া গিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম।

প্লাটফর্মের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া যেন অতি অনিচ্ছায় ধীরে মন্থর গতিতে ট্রেণখানি চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

জানালায় অপলক নয়নে স্ত্রী আমার পানে তাকাইয়া আছে।

স্লিপিংকোচ খানি আমাকে ফেলিয়া রাখিয়া কোথায় যেন চলিয়া যাইতেছে। পাশের কামরাখানি একটি প্রথম শ্রেণী। চলন্ত ট্রেণের কামরাগুলির প্রত্যেক জানালাটিতে একখানি করিয়া মুখ। বেশীর ভাগই মেয়েদের মুখ। চোখ ছলছল-করা মুখ!

আশে-পাশের অনেকেই তখন রুমাল নাড়িতেছেন।

আমি শুধু চুপচাপ দাঁড়াইয়া আছি। প্রথম শ্রেণীর কামরার জানালায় হঠাৎ নজরে পড়িল একটি পরিচিত মেয়ের মুখ।

দেখা মাত্র দুজনে দুজনকে চিনিলাম। কয়েক মুহূর্ত্ত মাত্র।

সময় কই যে বাক্যালাপ করিব? কামরাটি আমাকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া যাইতেছে! নয়ন ভরিয়া দেখিতে লাগিলাম মেয়েটিকে। মেয়েটি হাত বাহির করিয়া নাড়িতে লাগিল আমাকেই উদ্দেশ করিয়া! আমিও হাত নাড়িতে লাগিলাম। বিদায় সম্ভাষণ জানাইলাম তাঁকে। ট্রেণখানি চলিয়া যাইবার পর বহুক্ষণ প্লাটফর্মে দাঁড়াইয়া রহিলাম। চলিয়া যাওয়া ট্রেণখানির দিকে তাকাইয়া।

* * *

আনমনা হইয়া ভাবিতেছিলাম।...

চন্দননগর থেকে হাওড়া ডেলি প্যাসেঞ্জারী করিতাম। সকাল ৮৷১০এ বাড়ী থেকে রোজ বাহির হইতাম। সাই-কেলে ষ্টেশনে আসিয়া নির্দ্ধারিত ব্যাণ্ডেল লোকাল ধরিতাম। ৮৷২৭এর ট্রেণ। নিজের জায়গাটি যেন 'রিজার্ভ' করাই থাকিত। রোজ একই জায়গায় বসিয়া কাগজ পড়িতে পড়িতে পথ চলিতাম। সমস্ত ষ্টেশনগুলি পরিচিত হইয়া গিয়াছিল। এমন কি, চন্দননগর থেকে হাওড়া পর্য্যন্ত লাইনের ধারের মাঠ, ঘাট, গাছপালা-গুলোকেও যেন ঘনিষ্টভাবে চিনিয়া ফেলিয়াছিলাম। একদিন, কি কারণে জানি না; ট্রেণখানি শ্রীরামপুর ষ্টেশন ছাড়িয়া যাইবার পরই হঠাৎ দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। লাইনের ধারেই একটি একতলা বাড়ী। সামনে একটু বাগান। মস্ত বড় বড় সূর্য্যমুখী ফুল ফুটিয়া থাকিত এই বাগানটিতে। মিনিট দু' তিন বোধ হয় ট্রেণখানি দাঁড়াইয়াছিল সেখানে। তার পরই আবার ছাড়িয়া দিয়াছিল। এই দু'তিন মিনিটই 'পরিচয়' হইয়াছিল এই বাড়ীর ছাদে দাঁড়িয়ে থাকা একটি মেয়ের সঙ্গে। শুধু চোখের দেখা। সমস্ত সত্তা দিয়া পরস্পর পরস্পরকে যেন দেখিয়াছিলাম, চিনিয়াছিলাম, জানিয়াছিলাম, বুঝিয়া-ছিলাম! কী ভাল যে লাগিয়াছিল, বলিবার নয়। মেয়েটিকে কেমন অদ্ভুত আশ্চর্য্য মনে হইয়াছিল। তা'র মৃদু একটুখানি হাসি মনে যেন মাদকতা আনিয়া দিয়াছিল। আমিও একটু হাসিয়াছিলাম। তারপর চলন্ত ট্রেণ থেকে দু'জনেই হাত নাড়িয়া বিদায় সম্ভাষণ জানাইয়া-ছিলাম।

অফিসে সেদিন কাজে মন দিতে পারি নাই। দুপুরের পর ঘড়ির দিকে কেবলই দেখিয়াছিলাম, কখন পাঁচটা বাজিবে! ছুটির পর ৫৷২৮এর ব্যাণ্ডেল লোকাল ঠিকই ধরিয়াছিলাম। জানালার বাইরে চাহিয়া উদগ্রীব অপেক্ষায় বসিয়াছিলাম। শ্রীরামপুর আসিবার আগেই চলন্ত ট্রেণ থেকে মেয়েটিকে ছাদের উপর দেখিয়াছিলাম। হ্যাঁ, মেয়েটি সেই বাড়ীর ছাদে ঠিকই দাঁড়াইয়া ছিল যেমনটি আমি আশা করিয়াছিলাম! হাত তুলিয়া সে আমাকে সম্ভাষণও জানাইয়াছিল।

এর পর, দিনের পর দিন, এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইয়াছিল। চন্দননগর থেকে হাওড়া যাইবার পথে, হাওড়া হইতে চন্দননগরের পথে।

এই আশ্চর্য অদ্ভুত মেয়েটির অভূতপূর্ব্ব আচরণ দেখিয়া ডেলী-প্যাসেঞ্জার বন্ধুরা অবাক হইয়াছিল। কেহ ঠাট্টা কেহ বা অযাচিত উপদেশ দিয়াছিল—"শ্রীরামপুরে একদিন নেমেই পড়ো না ভায়া। মালা বদল করে—চন্দননগর নিয়ে যাও বৌঠানকে। অমন করে কতদিন আর ভোগাবে ওঁকে?"

ভুগিতে বেশী দিন হয় নাই।

মাস তিনেক পর।

চলন্ত ট্রেণ থেকে হঠাৎ একদিন দেখেছিলাম, মেয়েটি ছাদে নাই! লোকজন লাগিয়াছে ছাদে মেরাপ বাঁধিতে। মেরাপ বাঁধা বাড়ীটি দেখেছিলাম দিন সাতেক।

তারপর ছাদটি শূন্য হইয়া গিয়াছিল। যেরূপ খোলা হইয়াছিল। খোলা ছাদে মেয়েটিও আর দাঁড়াইল না! বাড়ীটির রূপ আমার কাছে বদলাইয়া গিয়াছিল।

ট্রেণের কামরার অন্য দিকের জানালায় গিয়া বসিতাম আমি। পথ-চলার আনন্দ যেন নিভিয়া গিয়াছিল আমার।

*　　*　　*

আজ হঠাৎ চলন্ত অমৃতসর মেলের প্রথম শ্রেণীর কামরায় মেয়েটিকে দেখিয়া মনে হইল যেন এই জীবনের গতি।...

মুখটি আমার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ভাগ্য সুপ্রসন্ন, স্ত্রী আমার এই উজ্জ্বল মুখ দেখিতে পান নাই!

একটি মালার বিহনে

আরতি মুখোপাধ্যায়

স্তব্ধ নিঝুম রাত
ছন্দ গাঁথিতে বসে আছে কবি কপোলে দিয়ে যে হাত।
সহসা পড়িল মনে
সেই পুরাতন স্মৃতি বিজড়িত গ্রাম ছবি অকারণে।
স্বপ্ন মোহিনী দেশে

কল্প রাজ্য ত্যজিয়া যে কবি যায় আজি ভেসে ভেসে
ছায়া ঘেরা সেই আম্র বনে, কাটায়েছে তারা কত দু'জনে
কভু নদী তীরে স্নিগ্ধ সমীরে হাতে পরে দিয়ে হাত
নদী কলতানে কণ্ঠ মিলায়ে গাহি গান এক সাথ
কিন্তু সে একদিন
সে প্রেম জোয়ারে পড়িল যে ভাঁটা হয়ে গেল সবই লীন
আজিকার মত সে দিনগুলির কীর্ত্তি যশের ছিল না কবির
নাহি ছিল এত গৃহটি ভরিয়া ধন সম্পদ রাশি
সে দিন শুধুই ভগ্ন কুটীরে পড়িত চাঁদের হাসি॥

ধনী দুহিতা যে তাই—
সে ভাঙা কুটিরে আপনার তরে লইতে পারে না ঠাই
দৈবত শঙ্খ সুর
কবিরে জানাল প্রিয়া তার আজি চলে যায় বহু দূর
বিদায়ের কালে এসে
ইন্দ্র ভবনে করি নিমন্ত্রণ চলে যায় মৃদু হেসে।
কবিও ত্যজিল আপনার গৃহ, টুটিয়া গ্রাম-বন্ধন স্নেহ
আসিল সে চুপে একদা নিশীথে মহানগরীর বুকে
ছিন্ন বীণার সুর ঝঙ্কারে করুণ বিধুর দুখে

*　　*　　*

কেটে গেছে বহু কাল
জীবন তরী ভাসায়ে চলেছে ধরি কবিতার হাল
স্বনামে কবি ধন্য যে আজ, বরেণ্যতম জগৎ মাঝ
তবু যেন চির পূর্ণতা মাঝে জাগে এক হাহাকার
একটি মালার বিহনে কবির জীবন অন্ধকার॥

সম্পাদনাঃ শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ভারতীয় ক্রিকেটে নূতন অধ্যায়ের সূচনা

৪ঠা জানুয়ারী কলিকাতার ঐতিহাসিক 'ইডেন গার্ডেনে' ভারতীয় ক্রিকেটের একটি নূতন অধ্যায়ের সূচনা দেখা দেয় আর ১৫ই জানুয়ারী মাদ্রাজে তা সম্পূর্ণতা লাভ করে। গত……টেষ্টের 'ড্র'-এর এক ঘেয়েমী কাটিয়ে কলিকাতায় ভারতীয় দলের জয়লাভ সমগ্র ভারতবাসীর মনে অভূতপূর্ব আনন্দের সৃষ্টি করে। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ২৯ টেষ্টের মধ্যে এইবার সর্ব্বপ্রথম ভারত "রাবার" লাভ করবার গৌরব অর্জন করলো। এর পূর্ব্বে নিউজিল্যাণ্ড এবং পাকিস্থানের বিরুদ্ধে ভারত "রাবার" পায়।

তরুণ দল নিয়ে গঠিত ভারতের এই সাফল্য বিশেষ করে আসন্ন ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফরের পূর্ব্বে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আশা করা যায় এই জয়লাভ সমগ্র দলকে অনুপ্রাণীত করবে। ভারতীয় দলে চৌকস খেলোয়াড়ের অভাব নেই। সে জন্য ব্যাটিং-এর দিক দিয়ে এবারকার ভারতীয় দল বেশ শক্তিশালী বলা চলে। বোলিং-এ নির্ভর করতে হবে সম্পূর্ণ স্পিন বোলারদের কৃতিত্বের উপর। কিন্তু তা হলেও নরি কণ্ট্রাক্টর যদি ঠিক মতো বোলারদের পরিচালনা করতে পারেন তা হ'লে এবারকার ভারতীয় দল ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফরে ভাল ফল প্রদর্শন করবে বলে মনে হয়।

এম-সি-সি'র বিরুদ্ধে কলিকাতায় ভারতের চতুর্থ টেষ্টে ভারতীয় দলে শেষ মুহূর্ত্তে বিজয় মেহেরাকে গ্রহণ কিছুটা বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। জয়সীমা প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় টেষ্টে 'ওপনার' হিসাবে বোধ হয় ভারতের পক্ষে সবচেয়ে সাফল্য লাভ করেছেন, তারপর অধিনায়ক কণ্ট্রাক্টর তিনিও ওপনিং ব্যাট। কিন্তু তা সত্ত্বেও আর একজন ওপনিং ব্যাটস্‌ম্যানকে দলে গ্রহণের কি সার্থকতা ছিল বোঝা কঠিন। বিজয় মেহেরা ভাল খেলেছেন, সে জন্য কিছু বলার নেই। কিন্তু একজন 'ওপনিং ব্যাট' (জয়সীমা) যে, পরপর তিনটে টেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে 'ওপন' করে আসছে তাকে হঠাৎ স্থান পরিবর্ত্তন করে পিছিয়ে দিয়ে আর একজন ওপনিং ব্যাটস্‌ম্যানকে দলে নেওয়ার যৌক্তিকতা পাওয়া যায় না। বিজয় মেহেরা উৎরে গেছেন তাই কোন সমালোচনা হলো না। কলিকাতা টেষ্টে আর একজন বোলারের প্রয়োজন ছিল। সেলিম ডুরাণী ও বোর্দ্দে বাদে কোন 'স্পিনার' দলে ছিল না। আর একজন 'ওপনিং ব্যাটসম্যানে'র চাইতে নাদকার্ণী অথবা অন্য স্পিনার নিলে দল অধিক শক্তিশালী হতো। কলিকাতা টেষ্টে ভারত জিতেছে কিন্তু তা বলে এই গুলি দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। উমরিগড়কে কণ্ট্রাক্টর ঠিক বোলারের পর্য্যায় ফেলেন বলে মনে হয় না। আশ্চর্য্যের বিষয়, এম-সি-সি'র প্রথম ইনিংসে তাঁকে একবারও বল্‌ করতে দেখা গেল না।

আগামী ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফরে নিম্নলিখিত ১৬ জন খেলোয়াড় দ্বারা ভারতীয় দল গঠিত হয়েছে।

নরি কণ্ট্রাক্টর (অধিনায়ক)
পাতৌদির নবাব (সহ-অধিনায়ক)
পলি উমরিগড়
চান্দু বোর্দে
সেলিম ডুরাণী
ফারুক ইঞ্জিনীয়ার
কুন্দরাম
বিজয় মেহেরা
প্রসন্ন
আর, নাদকার্নী
বিজয় মঞ্জরেকার
রমাকান্ত দেশাই
ভি, রঞ্জনে
আর, মূর্ত্তি
সারদেশাই
জয়সীমা

ভারতীয় দল থেকে ভারতের খ্যাতনামা বোলার সুভাষ গুপ্তের বাদ যাওয়ায় কিছুটা বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছে। সুভাষ গুপ্তে দলে থাকলে ভারতীয় দল অনেকখানি শক্তিশালী

পতৌদির নবাব ফটো—ডি, রতন

চান্দু বোর্দে ফটো—ডি, রতন

হতো। কারণ ভারতের আক্রমণ স্পিন বোলিং-এর উপরই প্রতিষ্ঠিত। সেক্ষেত্রে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্পিন বোলার গুপ্তে দলভুক্ত না হওয়া বিস্ময়েরই কথা। বিশেষ করে তাঁর কানপুর এবং দিল্লীর টেষ্টে বোলিং নৈপুণ্যের পর।

ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে ১৯৩২ সাল থেকে আজ পর্য্যন্ত ২৯টি টেষ্ট ম্যাচ খেলা হয়েছে তার মধ্যে ভারত জয়ী হয়েছে মাত্র ৩টি টেষ্ট খেলায়, পরাজিত হয়েছে ১৫টি টেষ্টে এবং বাকি ১১টি টেষ্ট অমিমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছে। ইংলণ্ড এখনও ১২টি টেষ্টে বেশী জিতেছে। টেড্ ডেক্সটারের বর্ত্তমান দলকে অনেকেই ইংলণ্ডের দ্বিতীয় দল বলে ভুল করেন। এই ধারণা ঠিক নয়। কারণ দেখা যাচ্ছে ইংলণ্ডের আগামী অষ্ট্রেলিয়া সফরে ষ্টেথাম, ট্রুম্যান এবং আরও দু'একজন খেলোয়াড় বাদে এই দলটি থেকেই অধিকাংশ খেলোয়াড় গ্রহণ করা হবে। সুতরাং ভারতের এই জয়লাভ ইংলণ্ডের দ্বিতীয় দলের নিকট মনে করা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা।

আজ পর্য্যন্ত ভারত, ইংলণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড এবং পাকিস্থানের বিরুদ্ধে টেষ্টে জয়লাভ করতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু ওয়েষ্ট-ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ভারত আজও কোন টেষ্টে জয়ী হয় নি। আমরা আশা করছি ভারতের আসন্ন ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফরে নরি কণ্ট্রাক্টরের দল ভারতকে এই নূতন গৌরবে ভূষিত করবে।

নিম্নে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে ভারতীয় দলের খেলার তালিকা দেওয়া হলো

৫ই ৬ই ফেব্রুয়ারী—ত্রিনিদাদ কোল্টস।

৯ই, ১০ই, ১২ই, ও ১৩ই, ফেব্রুয়ারী—ত্রিনিদাদ

প্রথম টেষ্ট—১৬ই, ১৭ই, ১৯শে, ২০শে ২১শে ত্রিনিদাদে

২৪শে ও ২৬শে—জামাইকা কোল্টস।

২৮শে ফেব্রুয়ারি—৩রা মার্চ্চ—জামাইকা দল।

দ্বিতীয় টেষ্ট—৭ই, ৮ই, ৯ই, ১০ই ও ১২ই মার্চ্চ, জামাইকাতে

১৬ই, ১৭ই, ১৯শে, ও ২০শে মার্চ্চ—বারবাডোজ দল।

তৃতীয় টেষ্ট—২৩শে, ২৪শে, ২৬শে, ২৭শে ও ২৮শে মার্চ্চ—বারবাডোজে।

৩১শে মার্চ্চ—৪ঠা এপ্রিল—ব্রিটিশ গায়েনা দল।

চতুর্থ টেষ্ট—৭ই, ৯ই, ১০ই, ১১ই ও ১২ই এপ্রিল ব্রিটিশ গায়েনাতে।

পঞ্চম টেষ্ট—১৮ই, ১৯শে, ২১শে, ২২শে ও ২৪শে এপ্রিল—ত্রিনিদাদে

২৭শে ও ২৮শে এপ্রিল—সেণ্টকিটা দ্বীপপুঞ্জে উইণ্ড-ওয়ার্ডস ও লাওয়ার্ডস দলের সঙ্গে শেষ খেলা।

৩০শে এপ্রিল ভারত অভিমুখে যাত্রা।

খেলার কথা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

৪র্থ টেস্ট—ক'লকাতা ঃ

ভারতবর্ষ : ৩৮০ রান (চান্দু বোরদে ৬৮, পতৌদির নবাব ৬৪, বিজয় মেহেরা ৬২ এবং সেলিম দুরানী ৪৩। ডেভিড্ এ্যালেন ৬৭ রানে ৫ উইকেট)

ও ২৫২ রান (বোরদে ৬১। লক ১১১ রানে ৪ এবং এ্যালেন ৯৫ রানে ৪ উইকেট।

ইংল্যাণ্ড ঃ ২১২ রান (রিচার্ডসন ৬২ এবং ডেক্সটার ৫৭। দুরানী ৪৭ রানে ৫ এবং বোরদে ৬৫ রানে ৪ উইকেট)

ও ২৩৩ রান (ডেক্সটার ৬২। দুরানী ৬৬ রানে ৩ উইকেট)

ক'লকাতার রঞ্জি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ডের ৪র্থ টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষ ১৮৭ রানে ইংল্যাণ্ডকে পরাজিত করে। ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ডের টেস্ট সিরিজে ভারতবর্ষের পক্ষে এই দ্বিতীয় জয়লাভ। ইংল্যাণ্ডকে ভারতবর্ষ প্রথম পরাজিত করে ১৯৫১-৫২ সালের টেষ্ট সিরিজের পঞ্চম টেষ্ট খেলায় মাদ্রাজে, এক ইনিংস ও ৮ রানের ব্যবধানে।

টসে জয়লাভ ক'রে ভারতবর্ষ প্রথম ব্যাট করে। খেলার ২য় দিনে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ৩৮০ রানে শেষ হয়। এইদিন ৩ উইকেট খুইয়ে ইংল্যাণ্ড ১০৭ রান করে। ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস ৩য়দিনে ২১২ রানে শেষ হলে ভারতবর্ষ ইংল্যাণ্ডের থেকে ১৬৮ রানে এগিয়ে যায়। ভারতবর্ষের ৩টে উইকেট পড়ে এই দিনের খেলায় ১০৬ দাঁড়ায়।

খেলার ৪র্থ দিনে ভারতবর্ষের ২য় ইনিংস ২৫২ রানে শেষ হয়। ৪র্থ দিন লাঞ্চের পর ভারতবর্ষ ৪০ মিনিট খেলে বাকি উইকেট ১৯ রান যোগ করে লাঞ্চের বিরতির সময়ের ২৩৩ রানের (৭ উইকেটে) সঙ্গে।

খেলার এই অবস্থায় ইংল্যাণ্ডের পক্ষে জয়লাভের জন্যে ৪২১ রানের প্রয়োজন হয়। ৪র্থ দিনে ইংল্যাণ্ড ১২৫ রান তুলে, ৪টে উইকেট হারিয়ে। ইংল্যাণ্ডের নামকরা চারজন খেলোয়াড়—রিচার্ডসন, রাসেল, ব্যারিংটন এবং বারবার আউট হ'ন। ৫ম অর্থাৎ খেলার শেষ দিনে ২-১২ মিনিটে ইংল্যাণ্ডের ২য় ইনিংস ২৩৩ রানে শেষ হয়। ভারতীয় দলের অধিনায়ক নরী কণ্ট্রাক্টরের হাতে আঘাত লাগায় ৪র্থ এবং ৫ম দিনে ফিল্ডিং করতে নামেননি। তাঁর স্থানে দল পরিচালনা করেন পলি উমরীগড়। চান্দু বোরদে উভয় ইনিংসে দলের পক্ষে সর্ব্বোচ্চ রান করেন এবং ইংল্যাণ্ডের ১ম ইনিংসের খেলায় ৬৫ রানে ৪টে উইকেট পান। সেলিম দুরানী মোট ৮টা উইকেট (৪৭ রানে ৫ এবং ৬৬ রানে ৩টে) পান।

৫ম টেষ্ট—মাদ্রাজ ঃ

ভারতবর্ষ ঃ ৪২৮ রান (পতৌদির নবাব ১০৩, কণ্ট্রাক্টর ৮৬, ইঞ্জিনিয়ার ৬৫, নাদকার্নী ৬৩। এ্যালেন ১১৬ রানে ৩ উইকেট)

ও ১৯০ রান (মঞ্জরেকার ৮৫। লক ৬৫ রানে ৬ উইকেট)

ইংল্যাণ্ডঃ ২৮১ রান (মাইক স্মিথ ৭৩। দুরানী ১০৫ রানে ৬ এবং বোরদে ৫৮ রানে ২ উইকেট)

ও ২০৯ রান (ব্যারিংটন ৪৮। দুরানী ৭২ রানে ৪ এবং বোরদে ৫৯ রানে ৩ উইকেট)

মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ডের ৫ম অর্থাৎ শেষ টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষ ১২৮ রানে ইংল্যাণ্ডকে পরাজিত ক'রে ১৯৬১-৬২ সালের টেস্ট সিরিজে ২—০ টেস্ট খেলায় 'রাবার' লাভ করে। সুদীর্ঘকাল অপেক্ষার পর ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ভারতবর্ষের এই প্রথম 'রাবার' লাভ। ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ডের টেষ্ট সিরিজ খেলা সুরু হয়েছে ১৯৩২ সাল থেকে। উভয় দেশের মধ্যে এ পর্য্যন্ত ৮টি টেস্ট সিরিজ খেলা হ'ল—ইংল্যাণ্ডের জয় ৬, ভারতবর্ষের ১ এবং সিরিজ অমীমাংসিত ১।

ভারতবর্ষের অধিনায়ক নরী কণ্ট্রাক্টার ভাগ্যবান পুরুষ। তিনি পঞ্চম টেষ্ট খেলাতে টসে জয়ী হলেন। আলোচ্য টেষ্ট সিরিজে ভারতবর্ষ উপর্যুপরি ৪টে টেষ্ট খেলায় টসে জয়ী হয়।

প্রথম দিনের খেলায় ভারতবর্ষের ৭টা উইকেট পড়ে ২৯৬ রান ওঠে। পতৌদির নবাব মনসুর আলি সেঞ্চুরী (১০৩) করেন। পতৌদির টেস্ট ক্রিকেট খেলায় এই প্রথম সেঞ্চুরী এবং আলোচ্য টেস্ট সিরিজে ভারতবর্ষের ৪র্থ সেঞ্চুরী। দ্বিতীয় দিনে লাঞ্চের পরবর্ত্তী ২০ মিনিটে ৪২৮ রাণে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস শেষ হয়, ৮ ঘণ্টার খেলায় এই রান ওঠে। ৮ম উইকেটের জুটিতে ফারুক ইঞ্জিনিয়ার এবং বাপু নাদকার্নী ৯১০ মিনিটে ১০১ রান তুলেন—এই ১০১ রান যে কোন দেশের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় ভারত বর্ষের পক্ষে ৮ম উইকেট জুটির নতুন রেকর্ড। পূর্ব্ব রেকর্ড ৮২ রান—জি এস রামচাঁদ এবং এম এস তামানে, (বিপক্ষে পাকিস্তান, ভাওয়ালপুর, ১৯৫৪-৫৫)।

ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে পূর্ব্ব রেকর্ড—৭৪ রান (লাল সিং এবং অমর সিং, লর্ডস ১৯৩২)।

খেলার বাকি সময়ে ইংল্যাণ্ড ৪টে উইকেট খুইয়ে ১০৮ রান করে। তৃতীয় দিনে লাঞ্চের সময় ইংল্যাণ্ডের স্কোর ছিল ২১১ রানে ৭টা উইকেট পড়ে। লাঞ্চের পরের খেলায় দারুণ উত্তেজনা দেখা দেয়। দলের ২২৬ রানের মাথায় দুরানীর পর পর বলে ৮ম (এ্যালেন) এবং ৯ম উইকেট (লক) পড়ে যায়। এই সময় ফলো-অন থেকে ছাড়ান পেতে ইংল্যাণ্ডের ৩ রাণের প্রয়োজন ছিল। দুরাণীর হ্যাট-ট্রিকের মুখে ইংল্যাণ্ডের শেষ খেলোড়ার বোলার ডেভিড স্মিথ খেলতে নামেন। তিনি দুরাণীর হ্যাট-ট্রিক ঠেকিয়ে দিলেন। তারপর বেপরোয়া বোলারদের পিটিয়ে খেলেন। ইংল্যাণ্ডের শেষ উইকেটের জুটিতে ৪৮ মিনিটে ৫৫ রান ওঠে। ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস ২৮১ রানে শেষ হ'লে ভারতবর্ষ ১৪৭ রানে এগিয়ে যায়। চা-পানের বিরতির ৪৫ মিনিট আগে ভারতবর্ষ ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে এবং এই দিন ৩টে উইকেট খুইয়ে ৬৫ রান করে। ভারতবর্ষের হাতে জমা থাকে ৭ টা উইকেট এবং খেলার এই অবস্থায় ভারত-বর্ষ ২১২ রানে এগিয়ে থাকে।

খেলার চতুর্থ দিনে ভারতবর্ষের ২য় ইনিংস ১৯০ রানে শেষ হয়ে যায়। মঞ্জরেকার দলের সর্ব্বোচ্চ ৮৫ রান ক'রে রান আউট হ'ন। প্রবীণ খেলোয়াড় লক ৬৫ রানে ৬টা উইকেট পান। এই দিন ভারতবর্ষ লাঞ্চের পরও ৪৫ মিনিট সময় পর্য্যন্ত ২য় ইনিংসের খেলা টেনে নিয়ে যায়। ভারতবর্ষের থেকে ৩৩১ রান পিছনে পড়ে ইংল্যাণ্ড ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। হাতে ৪৯০ মিনিট খেলার সময় এবং জয়লাভের জন্যে ৩৩৮ রানের প্রয়োজন। এই দিনের ইংল্যাণ্ডের ৫টা উইকেট পড়ে ১২২ রান ওঠে।

ইংল্যাণ্ড তখনও ভারতবর্ষের থেকে ২১৫ রানের পিছনে পড়ে আছে। আর একদিন খেলা বাকি, অর্থাৎ খেলার সময় ৫½ ঘণ্টা। এই সময়ের মধ্যে ইংল্যাণ্ড ২১৬ রান তুলতে পারলে তাদের জয় হবে।

পঞ্চম দিনে লাঞ্চের সময় ইংল্যাণ্ডের রান দাঁড়ায় ২০২, ৮টা উইকেট পড়ে। লাঞ্চের পরের খেলায় ইংল্যাণ্ড মাত্র ১০মিনিট টিকেছিল। ২০৯ রানে ইংল্যাণ্ডের ২য় ইনিংস শেষ হয়ে যায় এবং ফলে ভারতবর্ষ ১২৮ রানে জয়লাভ করে।

আলোচ্য টেষ্ট সিরিজে ভারতবর্ষের পক্ষে ব্যাটিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় প্রথম স্থান লাভ করেছেন, বিজয় মঞ্জরেকার—মোট ৫৮৬ রান, সর্ব্বোচ্চ ১৮৯ নট আউট এবং গড় ৮৩.৭১। তাঁর এই ৫৮৬ রান যে কোন দেশের বিপক্ষে টেষ্টের এক সিরিজে সর্ব্বাধিক ব্যক্তিগত মোট রানের নতুন ভারতীয় রেকর্ড। পূর্ব্ব রেকর্ড: ৫৬০ রান—রুসী মোদী (ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ১৯৪৮-৪৯) এবং পলি উমরীগড় (ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে, ১৯৫৩)। ভারতবর্ষের পক্ষে বোলিংয়ে প্রথম স্থান এবং সর্ব্বাধিক ২৩টা উইকেট পেয়েছেন সেলিম দুরাণী, ৬২২ রানে ২৩টা উইকেট, গড় ২৭.০৪।

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ব্যাটিংয়ে প্রথম স্থান পেয়েছেন কেন ব্যারিংটন—মোট রান ৫৯৪, এক ইনিংসে সর্ব্বোচ্চ রান ১৭২ এবং গড় ৯৯.০০। ব্যারিংটন ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ডের টেষ্ট খেলায় ইংল্যাণ্ডের পক্ষে এক সিরিজে সর্ব্বাধিক ব্যক্তিগত মোট রানের নতুনরেকর্ড করেছেন। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে বোলিংয়ে প্রথম স্থান লাভ করেছেন ডেভিড এ্যালেন ৫৮৩ রানে ২১টা উইকেট, গড় ২৭.৭৬।

সর্ব্বাধিক উইকেট পেয়েছেন টনি লক, ৬২৮ রানে ২২টা গড়—২৮.৫৪।

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে সেঞ্চুরী হয়েছে ৫টা। কেন ব্যারিংটন একাই করেন ৩টে, উপর্যুপরি তিনটে টেষ্ট খেলায় (১ম—৩য় টেষ্ট)। জিওফ পুলার (১১৯) এবং টেড ডেক্সটার (নট আউট ১২৬)।

ভারতবর্ষের পক্ষে সেঞ্চুরী ৪টে—মঞ্জরেকার (নট আউট ১৮৯), পলি উমরীগড় (নট আউট ১৪৭), জয়সীমা (১২৭) এবং পতৌদির নবাব (১০৩)। চৌকস খেলোয়াড় হিসাবে সাফল্য লাভ করেছেন চান্দু বোরদে (মোট রান ৩১৪, এক ইনিংসে সর্ব্বোচ্চ রান ৬৯, গড় ৪৪.৮৫) এবং সেলিম দুরাণী (মোট রান ১৯৯, এক ইনিংসে সর্ব্বোচ্চ রান ৭১, গড় ২৪.৮৭)। এই তুলনায় ইংল্যাণ্ডের ডেভিড এ্যালেন এবং লকের সাফল্য অনেক কম।

১৯৬১-৬২ সালের ভারত সফরে এম সি সি দল মোট ১২টি খেলায় যোগদান করে। এর মধ্যে ইংল্যাণ্ডের প্রতিভূ হিসাবে ৫টি টেষ্ট খেলা। ফলাফল: হার ২ (৪র্থ ও ৫ম টেষ্ট), জয় ৪ এবং খেলা ড্র ৯।

ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ড ঃ

টেস্ট খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

সাল	স্থান	ভারতবর্ষ জয়ী	ইংল্যাণ্ড জয়ী	খেলা ড্র	মোট খেলা	রাবার জয় অথবা ড্র
১৯৩২	ইংল্যাণ্ড	০	১	০	১	ইংল্যাণ্ড
১৯৩৩-৩৪	ভারতবর্ষ	০	২	১	৩	ইংল্যাণ্ড
১৯৩৬	ইংল্যাণ্ড	০	২	১	৩	ইংল্যাণ্ড
১৯৪৬	ইংল্যাণ্ড	০	১	২	৩	ইংল্যাণ্ড
১৯৫১-৫২	ভারতবর্ষ	১	১	৩	৫	ড্র
১৯৫২	ইংল্যাণ্ড	০	৩	১	৪	ইংল্যাণ্ড
১৯৫৯	ইংল্যাণ্ড	০	৫	০	৫	ইংল্যাণ্ড
১৯৬১-৬২	ভারতবর্ষ	২	০	৩	৫	ভারতবর্ষ
মোট		৩	১৫	১১	২৯	

রোভার্স কাপ ঃ

১৯৬১ সালের রোভার্স কাপ ফাইনালে সেকেন্দ্রাবাদের ইলেকট্রিক্যাল এ্যাণ্ড মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সেণ্টার দল ১—০ গোলে মোহনবাগান দলকে পরাজিত করে। দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলার চতুর্থ মিনিটে বিজয়ী দলের আউট-সাইড-রাইট খেলোয়াড় শ্রীনিবাসন জয়সূচক গোলটি দেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতীয় সেনা বাহিনী দলগুলির পক্ষে এই প্রথম রোভার্স কাপ জয়।

ন্যাশনাল স্কুলস গেমস ঃ

ভূপালে অনুষ্ঠিত সপ্তম বার্ষিক জাতীয় স্কুল গেমস প্রতিযোগিতার বালক বিভাগে পাঞ্জাব ৭০ পয়েণ্ট পেয়ে প্রথম স্থান লাভ করেছে। ২য় স্থান পেয়েছে উত্তর প্রদেশ (১৪) এবং ৩য় মধ্যপ্রদেশ (১৩ পয়েণ্ট)। বালিকা বিভাগ: ১ম মহারাষ্ট্র (৩৯), ২য় দিল্লী (২৯) এবং ৩য় রাজস্থান (১১)।

হকি চ্যাম্পিয়ান—মধ্যপ্রদেশ। বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়ান মহারাষ্ট্র। বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়ান (বালিকা বিভাগ)—পাঞ্জাব। ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়ান (বালক ও বালিকা বিভাগ)—মহারাষ্ট্র। ভলিবল চ্যাম্পিয়ান—উত্তর প্রদেশ। ভলিবল চ্যাম্পিয়ান (বালিকা বিভাগ)—মধ্যপ্রদেশ। জিমন্যাশটিক্স চ্যাম্পিয়ান—মধ্যপ্রদেশ।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট ঃ

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে মহীশূর ৫ উইকেটে গতবছরের বিজয়ী বোম্বাইকে পরাজিত ক'রে রোহিণ্টন বেরিয়া ট্রফি জয়ী হয়েছে।

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬

ঝুলন — শিল্পী—অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরী

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

HIMANI
GLYCERINE

HIMANI
GLYCERINE
SOAP
PRASA

রাশিয়াকে ভালভাবে জানুন

যেখানে মানুষ গভীরতর রহস্য উদ্ঘাটনে, উচ্চতর কিছু নির্মাণে, দ্রুততর অগ্রগমনে, কঠিনতর প্রচেষ্টায় অধিক থেকে অধিকতর কোন কিছু জানবার আগ্রহে—সর্বোপরি মহাকাশ জয় করেছে সেই "সোভিয়েট দেশ" পড়ুন ও গ্রাহকভুক্ত হোন।

ইহা একখানা পাক্ষিক পত্রিকা। ভারতস্থ সোভিয়েট রাষ্ট্রদূতের তথ্য সরবরাহ বিভাগ কর্তৃক এই পত্রিকাখানা বারটি ভারতীয় ভাষায় এবং ইংরাজী ও নেপালী ভাষায় নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

চাঁদার হার

	এক বৎসরের জন্য	৬ মাসের জন্য	৩ মাসের জন্য	প্রতি সংখ্যা
ইংরাজী—	৬'০০	৩'২৫	১'৭৫	০-৪০ নঃ পঃ
অন্যান্য ভাষায়—	৫'০০	২'৭৫	১'৫০	০-২৫ নঃ পঃ

সোভিয়েট দেশ অফিস

১।১, উড্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—১৬
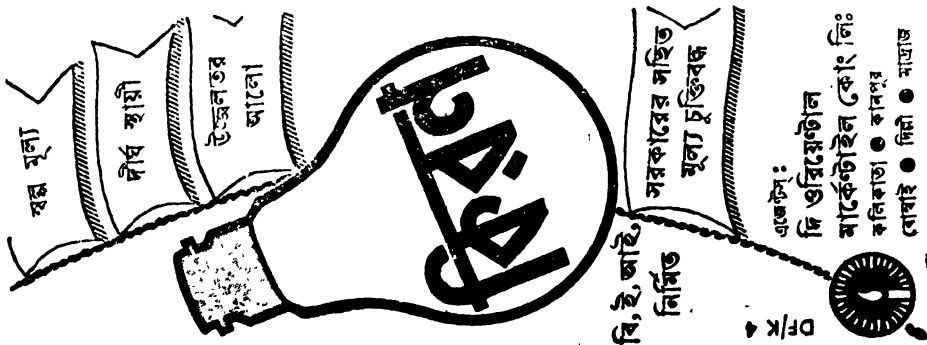
ফাল্গুন—১৩৬৮

দ্বিতীয় খণ্ড | ঊনপঞ্চাশত্তম বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

বেদ কি ?

ডক্টর শ্রীমতিলাল দাশ

যখন বালক বয়সে শতকিয়া পড়ি, এক চন্দ্র, দুই পক্ষ, তিন নেত্র, চারি বেদ, তখনই মাত্র বেদ কথাটি জানি। শতকরা নিরানব্বই জনের বেদের সাথে ইহার অধিক পরিচয় নেই। অথচ ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে বেদের প্রাধান্য অপরিসীম এবং অতুলনীয়। মূলতঃ বেদ একটি অধ্যাত্ম সাধনার, অধ্যাত্ম ভাবনার অনুশীলন। আর সব ছাড়া আশ্চর্য্যের বিষয় যে ইতিহাসের প্রত্যুষকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত এই ভাবধারা অবিচ্ছেদে চলে এসেছে।

সাধারণতঃ আমরা বৈদিক যুগ, তান্ত্রিক যুগ, পৌরাণিক যুগ ইত্যাদি নাম দিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতিকে খণ্ড-বিখণ্ড করতে চাই। সেটা আদৌ ঠিক নয়, স্মৃতিকার যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন :—

পুরাণ ন্যায় মীমাংসা ধর্মশাস্ত্রাঙ্গ মিশ্রিতাঃ।
বেদাঃ স্থানাপি বিদ্যানাং ধর্মস্য চ চতুর্দশ ॥
ইতিহাস পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভ্যেত্যল্পশ্রুতাৎ বেদো মাময়াং প্রহরেদিতি ॥

বিদ্যার চতুর্দ্দশ স্থান, চারি বেদ, ষড় বেদাঙ্গ এবং পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা এবং ধর্মশাস্ত্র। ইতিহাসও পুরাণ থেকে বেদার্থ উদ্ধার করবে। অল্পশ্রুত ব্যক্তি বেদকে প্রচার করবে এই ভয়ে বেদ ভীত থাকে। ইতিহাস ও পুরাণ বেদকে লোকায়ত্ত করবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছে। অনুরাগ-ভাষণ তন্ত্রও তাহারই মাধ্যমেই বৈদিক ভাবধারা নব-জীবন ও নবীন আকাঙ্ক্ষা লাভ করেছে। অতএব এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে ভারতের সভ্যতার জয়যাত্রা চলেছে

বৈদিক সভ্যতাকে কেন্দ্র করে। সেই কথা স্মরণ করে বেদ কি—আমাদিগকে অনুসন্ধান করতে হবে।

মনু বলেছেন, বেদ অখিল ধর্মের মূল। অন্যান্য শাস্ত্রকারেরা এ বিষয়ে একমত। ফলতঃ ব্রাহ্মণ্য সভ্যতা, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, ভারতের জীবন পদ্ধতি, আচার ও আচরণ বেদের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় মানুষের চিন্তায় ও কার্য্যকলাপে যে স্বাতন্ত্র্য, যে বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, তার প্রধানতম কারণ বেদ। আমরা বেদপন্থী। অপৌরুষেয় শ্রুতিই আমাদের পথের দিশারী, অন্ধকারের আলোক এবং জীবন যাত্রায় সারথি। বেদই আমাদিগকে অসত্য থেকে সত্যে নিয়ে যায়, তমসা থেকে জ্যোতিতে উত্তরণ করে, এবং মৃত্যু থেকে অমৃতে জাগ্রত করে।

মনু অন্যত্র বলেছেন :—

যঃ কশ্চিৎ কস্যচিৎ ধর্মো মনুনা পরিকীর্ত্তিতঃ।

স সর্বোঽভিহিতো বেদে সর্বজ্ঞান মায়া হি সঃ ॥২।৭

যা কিছু মনু বলেছেন—কারও ধর্ম বলে যা কিছু লিখেছেন, তা সবই বেদে পরিকীর্ত্তিত আছে, কারণ মনু সর্বজ্ঞানময়। আর মনুর অনুশাসন অনুসরণ করেই চলে আমাদের জন্ম থেকে মরণ পর্য্যন্ত সমগ্র জীবনধারা।

বেদ কাহাকে বলব ? সংস্কৃতে অর্থ নির্ণয়ের সবচেয়ে সহজ ও সুগম পন্থা তার ধাতু প্রত্যয় জানা। বেদ কথাটি এসেছে বিদ্ ধাতু থেকে—তার চারটি অর্থ। জানা, পাওয়া, থাকা এবং বিচার করা। সাধারণতঃ বলা যায়, জ্ঞানার্থক বিদ্ ধাতুর পর ঘঞ্ প্রত্যয় করে বেদ এবং তার অর্থ সে জ্ঞান। কিন্তু অন্য অর্থ নেব না; এমন কোনও কথা নেই। যা থেকে জানা যায়, পাওয়া যায়, বিচার করা যায় তাই বেদ—যা আছে তাই বেদ। প্রথম তিনটি সকর্মক অর্থ, চতুর্থটি অকর্মক। অতএব প্রশ্ন উঠবে কি জানা যায়, কি পাওয়া যায়, কি বিচার করব ?

কি জানব, না পরমার্থ জানব। কি পাব ? না, গীতার কথায়—

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।

যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥ ৬।২২

যা পেলে আর কিছু পেতে মন চায় না, যা পেলে কঠিন দুঃখেও চিত্ত বিচলিত হয় না সেই পরম পাওয়া কে এনে দেয়—বেদ।

কি বিচার করব ? বিচার করব পরম তত্ত্ব। উদ্দালক পুত্র শ্বেতকেতুকে যে কথা বলেছিলেন সেই কথারই পুনরুক্তি করব—যা শুনলে শুনবার কিছু বাকি থাকে না, যা বুঝলে আর কিছু বুঝবার থাকে না, যা জানলে জানবার আর কিছু থাকে না—সেই একেরই বিচার করব। মনন, ধ্যান ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা সেই এককেই জানব, বুঝব এবং হৃদয়ঙ্গম করব। আর কি ? না বেদ নিত্য, ত্রিকালেই বর্ত্তমান। বেদের সত্তা অবিনাশী। বেদের বাণী ব্রহ্মবাণী, বেদের শব্দরাশিও নিত্য। বেদ দিব্যবাণীর অভিব্যক্তি, আমরা নিরন্তর পরিবর্ত্তনের মধ্যে চলেছি—এই পরিবর্ত্তনের স্রোতের মাঝে মানুষ চায় স্থির নির্ভর। সেই শাশ্বত স্থিতির, সেই চরম নির্ভরতার, সেই পরম আহ্বানের দিব্য-ভাণ্ডার বেদ।

বৈদিক সাহিত্যের আয়তন অতি বৃহৎ। একটি জাতির সুগভীর অধ্যাত্ম সাধনার দীর্ঘকালের ইতিহাসকে সে রূপায়িত করেছে। ভট্টমোক্ষমূলর তাকে কম পক্ষে সহস্র বৎসরের অবদান বলেছিলেন আমাদের মনে হয়। অন্ততঃ পক্ষে দুই সহস্র বৎসর ব্যাপী তপস্যায় বৈদিক সাহিত্যের অভিব্যক্তি হয়েছে। বেদের দুটি বিভাগ—মন্ত্র আর ব্রাহ্মণ। আপস্তম্ব বলেছেন—মন্ত্র ব্রাহ্মণয়োর্বোদনামধেয়ম্। মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণেরই অভিধা বেদ। মন্ত্রই মূল, ব্রাহ্মণ তার ব্যাখ্যান। চারিটি বিশাল সংহিতায় মন্ত্রসাহিত্য সঙ্কলিত—ঋক সংহিতা, যজুঃসংহিতা, সাম সংহিতা ও অথর্ব সংহিতা। এই চারি বেদের আবার অসংখ্য শাখা। মহাভাষ্যের পস্পশা আহ্নিকে পাই :—

চত্বারো বেদাঃ সাঙ্গাঃ সরহস্যাঃ বহুধাঃ ভিন্নাঃ। একং পরমধ্বর্য্যু শাখাঃ, সহস্রবর্ত্মা সামবেদঃ একবিংশতিধা-বাহ্বৃচ্যম্ নবধাঽথর্বণো বেদঃ। বেদ চারিটি, তাদের অঙ্গ রয়েছে, রহস্য রয়েছে—যজুর্বেদের একশত শাখা, সামবেদের সহস্র, ঋগ্বেদের একুশটি এবং অথর্ববেদের নয়টি শাখা। শাখায় শাখায় যে ভেদ, তা সাধারণতঃ পাঠবিন্যাসের অবান্তর ভেদ মাত্র। নানা স্থানে এই শাখা সকলের ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা দেওয়া হয়েছে। কালের স্থূল হস্তাবলেপে অধিকাংশ শাখারই মৃত্যু ঘটেছে। এখন যে সকল শাখা পাওয়া যায়, সেগুলি হল ঋগ্বেদের শাকল, শাংখায়ন, এবং বাস্কল। যজুর্বেদের দুইটি ভাগ—কৃষ্ণ যজুঃ

এবং বল্ল যজুঃ। কৃষ্ণ যজুর্বেদের কঠ এবং কঠ-কপিষ্ঠল এই দুই শাখা পাওয়া যায়। তা ছাড়া মৈত্রায়ণী বা কলাপ শাখা আছে। নবকুটস কঠ, কলাপ ও চরক এই তিন শাখায় উল্লেখ করেছেন, কিন্তু চরক শাখার কোনো উদ্দেষ বর্ত্তমানে পাওয়া যায় না।

শুক্ল যজুর্বেদের দুই শাখা, কাণ্ব এবং মধ্যান্দন। সাম বেদের তিনটি শাখা প্রচলিত আছে, কৌথুম, রাণায়ণীয় এবং জৈমিনীয়। অথর্ব সংহিতায় দুইটি বিভাগ শৌনক এবং পিপ্পলাদ। সম্প্রতি উড়িষ্যা থেকে পিপ্পলাদ শাখার পূর্ণ সংহিতার উদ্ধার হয়েছে।

সংহিতার পর ব্রাহ্মণের আবির্ভাব। ক্লীবলিঙ্গ ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ মন্ত্র। মন্ত্রের ব্যাখ্যানই ব্রাহ্মণ। অনির্বাণ লিখেছেন—"ব্রহ্ম মূলতঃ চেতনার বিস্ফোরণ। এই বিস্ফোরণ ঘটে দেবশক্তির আবেশে, পৃথিবী অন্তরীক্ষ এবং দ্যুলোকে দেবশক্তির লীলায়ন দেখে মর্ত্ত্য চেতনার উদ্দীপনা হয়। এই উদ্দীপনই ব্রহ্ম। বৈদিক চিন্ময় প্রত্যক্ষবাদের মূলেও এই তত্ত্ব, তার কথা যথাস্থানে বলা হবে। ব্রহ্মের আবির্ভাবে মানুষ কবি হয়। তার চেতনায় স্ফুরিত হয় বাক্। ব্রহ্মাত্মার বাক্ অবিলাভূতঃ যাবদ্ ব্রহ্ম বিস্থিতং তাবতী বাক্ (ঋ ১০।১১৪।৮) সব মন্ত্রই ব্রহ্ম অর্থাৎ উদ্দীপিত এবং বিস্ফারিত চেতনায় বাকের স্ফুরণ। আবার বলা যায়, বাকের প্রকাশই মানুষকে করে ব্রহ্ম, ঋষি এবং সুমেধা (ঋ ১০।১২৫।৫)

এই ব্রাহ্মণ-সাহিত্য সংহিতার অনেক পরে সৃষ্ট, এ কথা বোধ হয় ঠিক নয়। সংহিতা প্রথমতঃ যজ্ঞ ক্রিয়ার সাথে জড়িত—ব্রাহ্মণে পাই তার প্রয়োগ বিজ্ঞান এবং তত্ত্ববিদ্যা। ব্রাহ্মণের তিনটি অংশ, ব্রাহ্মণ আরণ্যক এবং উপনিষৎ। ব্রাহ্মণে যজ্ঞ সম্বন্ধে বিধি দেওয়া হয়েছে—বিধিগুলির প্রশংসার জন্য কাহিনী বা ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে, বিপরীত বিধির নিন্দা করা হয়েছে। ব্রাহ্মণের দুটি ভাগ—বিধি এবং অর্থবাদ। বিধি অংশই প্রকৃত ব্রাহ্মণ! ষড়্-গুরুশিষ্য বলেছেন—ব্রাহ্মণং বিধায়কং স্তাবকং চ। ব্রাহ্মণে বিধি ও তার প্রশস্তি রয়েছে—বিধিই মূল প্রয়োজন, তার প্রশস্তি পরিশিষ্ট।

সংহিতার ব্রাহ্মণগুলির শেষ অংশই আরণ্যক, ব্রাহ্মণে দেব যজ্ঞের ভাবনা—আরণ্যকে তারই সূক্ষ্ম ভাবনা। গৃহস্থাশ্রমে গৃহী বড় বড় যাগযজ্ঞ করতেন, কিন্তু বানপ্রস্থে তা আর সম্ভব নয়। অরণ্যে পড়তে হয় বলে এর নাম হয়েছিল আরণ্যক। এই আরণ্যক রহস্য বিদ্যা।

এই রহস্য বিদ্যা থেকে এল ব্রহ্মবিদ্যা—উপনিষৎ—বেদের শেষ অংশ তাই বেদান্ত। শঙ্কর বলেছেন—যা অবিদ্যা নাশ করে তাই উপনিষৎ। বৈদিক উপনিষৎগুলির সংখ্যা খুব অধিক নয়। ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, প্রশ্ন, ঐতরেয়, পৌষীতকী, বৃহদারণ্যক, তৈত্তিরীয়, ছন্দোগ্য, শ্বেতাশ্বতর, মহানারায়ণীয় এবং মৈনায়ণীয়—এই চৌদ্দখানি উপনিষদ বাদে অন্যগুলি অর্ব্বাচীন। মুক্তিকোপনিষদে ১০৮ খানি উপনিষদের নাম পাওয়া যায়, তার দশটি ঋগ্বেদের, ১৯টি শুক্ল যজুর্বেদের, ৩২টি কৃষ্ণযজুর্বেদের, ১২টি সাম-বেদের এবং ৩১টিকে অথর্ব্ববেদের বলা হয়েছে। কিন্তু সেখানেই উপনিষৎ রচনা থামেনি—আজ পর্যন্ত প্রায় দুই-শত উপনিষৎ পাওয়া যায়—তার মধ্যে একখানি মুসলমান যুগে রচিত—ব্রহ্মকে আল্লা বলে আল্লোপনিষৎ।

এখন একটি বিতর্ক উঠেছে যে বেদ বলতে কি বুঝব—কেবল মন্ত্র, না মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। আর্য্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত দয়ানন্দ বলেছেন যে সংহিতাই বেদ, ব্রাহ্মণ নয়। কিন্তু এই কথা প্রামাণ্য নয়।

বেদকে ত্রয়ী বলা হয়—যজ্ঞের প্রয়োজন অনুসারে এই বিভাগ। যজ্ঞে হোতা যে সব মন্ত্র উচ্চারণ করতেন, সেগুলি ঋগ্বেদে সংগৃহীত হয়েছে—অধ্বর্য্যুর মন্ত্র নিয়ে যজুর্বেদ—আর উদ্গাতা যে সব মন্ত্র গাইতেন, তারই সংকলন সামবেদ। যাগযজ্ঞে অথর্ব্ব মন্ত্রের প্রয়োগ ছিল না। তাই প্রাচীন যাজ্ঞিকগণ অথর্ব্বকে ত্রয়ী বহির্ভূত করেছেন। ব্রাহ্মণে রয়েছে মন্ত্রের বিনিয়োগ—ব্রাহ্মণ না থাকলে যজ্ঞানুষ্ঠানের অনেক অন্তরায় ঘটত, মন্ত্রের প্রয়োগে বিশৃঙ্খলা ঘটত। অতএব ব্রাহ্মণ বেদের অপরিহার্য্য অঙ্গ।

বেদের ব্যাখ্যাতেও ব্রাহ্মণের দান অসামান্য। ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে বৈদিক মন্ত্রসমূহের যে ব্যাখ্যান পদ্ধতি, তাহা মুখ্যতঃ যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযোগী—এই ব্যাখ্যাকে অধিযজ্ঞ ব্যাখ্যা বলে। কিন্তু বেদের মর্যাদা জানতে এইটুকুই যথেষ্ট নয়। অধিযজ্ঞ ব্যাখ্যা ছাড়া অন্য অনেক প্রণব, ব্যাখ্যা প্রচলিত ছিল। অধিদৈব, অধ্যাত্ম, ঐতিহাসিক। আধুনিক

কালের য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা তাদের নূতন ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

এ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের অবদান অবিস্মরণীয়। তিনি বলেছেন যে বেদ রহস্য বিদ্যা, সাক্ষাৎকৃত ধর্ম। ঋষিরা যে গম্ভীর গহন তত্ত্ব লাভ করেছিলেন, তারা সর্বসাধারণের কাছে বিলিয়ে দিতে চান নি, তাঁদের কাছে বেদ ছিল অলৌকিক অপৌরুষেয় বাণী, সাধারণ মানুষের কাছে এই অতীন্দ্রিয় ভাস্বর বিদ্যার প্রকাশ তাদের পক্ষে ক্ষতিকর হবে। তাই তাঁরা—অরবিন্দের ভাষায়—(Hence they favoured the existence of an outer worship, effective but imperfect, in the profane, an inner discipline for the initiate, and clotted their language in words and images, which had equally a spiritual sense of the elect, a concrete sense for the mass of ordinary worshippers. The vedic hymns were conceived and constructed as this principle, their formulas and cerenonies are overtly, the details of an outward ritual described for the pantheistic nature—worship, which was the common religion covered by the sacred words, the effective symbol of a spiritual expposition and knowledge and a psychological self-discipline and seif-culture, which were the highest achievement of the human race.) বহিরঙ্গ যাজ্ঞিক অনুষ্ঠানের কথা বলেছেন, কিন্তু এক অন্তরঙ্গ আধ্যাত্মিক অর্থের ইঙ্গিত করেছেন। রসিক ভাবুক জন বাইরের কথা নিয়ে মত্ত থাকবে না—তারা ভাষা ও রীতির আড়ালে যে রসকমল লুক্কায়িত রয়েছে, তারই অতিমধুর মধু পান করে আত্মহারা হবেন। তাঁরা যে অধ্যাত্ম ভাবনা, যে অপূর্ব আত্মানুশীলনের কথা বলেছিলেন—তা মানুষের ইতিহাসে সর্বোত্তম প্রাপ্তি।

এই ব্যাখ্যার ফলে ভারতীয় সভ্যতার এক অনুপম সামঞ্জস্য উদ্ঘাটিত হবে। তখন বেদান্ত, পুরাণ ও তন্ত্রের সমন্বয় হবে—ষড় দর্শন এবং বিভিন্ন ধর্মের এক অভাবনীয় জানে না—তা উন্মুক্ত হবে—এবং কূট সূক্তগুলির গূঢ় অর্থ প্রকাশিত হবে। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন :—

Finlly incohereneies of the vedic texts will at once be explained and disappear. They exist in appearance only because the real thread and the sense is to be found in an inner meaning. That thread found, the hymns appear as logical and organic wholes and the expressions though alien in type to our modern ways and thinking and speaking becomes in our style just and seems rather by economy and phrese, than by excess, by over-pregnance rather than by poverty of sense. The veda ceases to be merely an interesting remuant and barbasison and takes rank among the most important of the worlds early seriptures.

অরবিন্দের ব্যাখ্যান গ্রহণ করলে বেদের সব কিছু অক্ষমতা এবং অর্থহীনতা দূর করা যাবে। তখন সূত্রগুলির পরস্পরের মধ্যে এক সুন্দর সামঞ্জস্য পাওয়া যাবে। তখন তাদের অর্থ ব্যঞ্জনা বাড়বে এবং বেদ বর্বরতায় পরিচায়ক গ্রন্থ না হয়ে মানবের আদিতম শাস্ত্রের সবচেয়ে উত্তম শাস্ত্র বলে পরিগণিত হবে।

আমাদের মনে হয়, বেদের তাৎপর্য্য নির্ণয়ে আজ পর্য্যন্ত মনীষীরা যত সব পথ অনুসরণ করেছেন, কোনওটিকে অবহেলা না করে সকলকে মিলিয়ে যদি আমরা বেদের মর্ম উদ্ধারে প্রবৃত্ত হই, তাহলে আমাদের যত্ন ও শ্রম ব্যর্থ হবে না। আমরা এক পরমোদার বোধি ও বুদ্ধির সমন্বয়ে সঞ্জাত অপূর্ব এক অমৃত লাভ করতে পারব।

পুরাণ ও ইতিহাস থেকে বেদার্থ জানতে হবে—এ কথায় অর্থই তাই। বেদকে কোন অতীতের এক কঙ্কাল মনে করলে ভুল করব—তাদের মধ্যে যে অধ্যাত্মভাবনা—পরের যুগে তা নূতনভাবে নূতন পরিবেশে নবীন অভিব্যক্তি লাভ করেছে। বেদকে তাই ভারতবর্ষের সমগ্র ইতিহাসের, সমগ্র সংস্কৃতির পটভূমিকায় অনুধাবন করতে

মধ্য দিয়ে প্রকাশিত ও রূপায়িত হয়েছে, এক মৌলিক চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করে তা পল্লবিত ও পুষ্পিত হয়েছে, এইভাবেই পঞ্চম বেদ, পুরাণ ও ইতিহাসের মাধ্যমেই বেদকে জানতে হবে, বুঝতে হবে এবং হৃদয়ঙ্গম করতে হবে।

বেদের অভিব্যক্তির মধ্যে আরও কিছু জড়িয়ে আছে। তার মধ্যে প্রাণ হল বেদাঙ্গ। ষড়বিংশ ব্রাহ্মণেই প্রথম আমরা ছয়টি বেদাঙ্গের কথা জানতে পারি। ষড় বেদাঙ্গের নাম হল, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, নিরুক্ত ও জ্যোতিষ। বেদ বিদ্যায় অধিগমের জন্য এই বেদ পাঠ। শিক্ষায় বর্ণ ও স্বরাদি উপায়ন প্রকার শিখানো হত। আচার্য্য থেকে শুনে অন্তেবাসীরা বেদের শব্দরাশি গ্রহণ করতেন—সেই পারায়ণের সময় আচায্য শিষ্যের অন্তরে মন্ত্রের শক্তি সঞ্চরণ করে দিতেন। প্রাতিশাখ্য গ্রন্থ ও শিক্ষা গ্রন্থে এই বিভাগটির সম্যক পরিচয় মেলে।

যজমানকে দিব্য রূপ দেওয়াই হল কল্পের কাজ। যজ্ঞের মাঝেই তা সম্ভব। কল্প তাই যজ্ঞের প্রয়োগ-বিকাশ এবং অন্তর্নিহিত ভাবের সম্প্রসারণের যোগ্য। কল্পের চারিটি ভাগ,—শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র আর শুল্বসূত্র। সাতটি হবির্যজ্ঞ এবং সাতটি সোম যাগ—এই নিয়ে শ্রৌতযজ্ঞ তাদের সুসংবদ্ধ বিবৃত রয়েছে শ্রৌতসূত্রে।

গৃহ্যসূত্রে পাই পাকযজ্ঞের বিধান এবং জাতকর্ম থেকে অন্ত্যেষ্টি পর্য্যন্ত সমস্ত সংসারের কথা। গৃহের বাহিরে হল সমাজ, সামাজিক আচরণের জন্য ধর্মসূত্র বা সাময়াচারিক সূত্র। শুল্বসূত্রে যজ্ঞবেদী নির্মাণের বিধির মধ্যে জ্যামিতির প্রথম পরিচয় মেলে।

বেদ ভাষার পরিশুদ্ধি ও সুষ্ঠু করিবার জন্য ব্যাকরণের অনুশীলন। ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রকে বুঝতে চাই ছন্দোজ্ঞান। নিরুক্তে বৈদিক অর্থানুশাসনের ব্যাপার।

বৈদিক সূত্রের অর্থবোধে নিরুক্ত অপরিহার্য্য। নিঘণ্টু ছিল বৈদিক শব্দসংগ্রহ—এই নিঘণ্টু করায়ই যাস্কের ভাষ্য নিরুক্ত নামে পরিচিত।

যজ্ঞানুষ্ঠান করতে হলে জ্যোতিষ জানতে হবে। শুভকালের নির্ণয় তার প্রথম লক্ষ্য, কিন্তু কোন বাইরের জ্যোতির জন্য জ্যোতিষ নয়। সমগ্র বেদশাস্ত্রের লক্ষ্য উত্তম জ্যোতির অবতরণ—জ্যোতিষের পরিগণনার মধ্যে ব্যঞ্জনা অভিব্যক্ত আছে।

বৈদিক সাহিত্যের তিনটি প্রস্থান,—শ্রুতি প্রস্থান, স্মৃতি প্রস্থান আর ন্যায় প্রস্থান। সংহিতা, ব্রাহ্মণক, আরণ্যক এবং উপনিষৎ নিয়ে শ্রুতিপ্রস্থান। এ হল অপৌরুষেয় দিব্য বাক্যের ভাষায়—বোধির আবেশে তার উদ্ভব।

বিদ্যুতের মত অন্তরে যে বোধি ঝলমলিয়ে ওঠে, তা থাকে না, চলে যায়, কিন্তু তার স্মৃতি থাকে। এই পৌরুষের স্মার্বজ্ঞান রয়েছে আমাদের আচার ও আচরণের শাস্ত্র ধর্মশাস্ত্র। বেদ প্রতিপাদ্য যজ্ঞানুষ্ঠান নিয়ে ব্রহ্মবাদীদের তর্কবিতর্ক চলত—সেই তর্কের সমাধানের জন্য মীমাংসা। বৈদিক সাহিত্যে দুটি মীমাংসা—পূর্ব মীমাংসা বা কর্ম মীমাংসা—উত্তর মীমাংসা বা ব্রহ্ম মীমাংসা। সাধারণতঃ বেদের দুটি বিশিষ্ট ভাগের কথা বলা হয় কর্মকাণ্ড আর জ্ঞানকাণ্ড। কিন্তু বস্তুতঃ এরূপ দুটি ভাগ অপ্রামাণ্য—অতি প্রথম থেকেই জ্ঞান ও কর্মের একটি সামঞ্জস্য করে চলেছিলেন বেদপন্থীরা।

বৈদিক ক্রিয়াকলাপের লক্ষ্য ছিল মানুষকে এবং মানুষের চেতনাকে একটি লোকোত্তর চিন্ময় ভূমিতে উত্তরণ। তার পথ দুটি—জ্ঞান বা কর্ম—দুটির মধ্যে শেষকালে যে বিরোধ দেখি, প্রথমে তা ছিল না। সেই জ্যোতির্ময় অমৃতের উপলব্ধি ঘটতে পারে দ্রব্য যজ্ঞে। সহায়তায় অথবা ধ্যান ও ধারণার মাঝে।

ঈশোপনিষৎ শুক্লযজুর্বেদ বা কর্মকাণ্ডের শেষ অধ্যায়। এই উপনিষদের উদার দৃষ্টি ও সমন্বয়ের মাঝে আমরা এক অতুলনীয় সংহতির পরিচয় পাই। বেদমন্ত্র কোন কর্মময় নয়, তার মধ্যে নিহিত রয়েছে একটি রহস্য বিদ্যা—যাকে অধিগম করতে হলে মানুষকে শেষজীবনে উঠতে হবে। যে তপস্বী, ঋজু, সংযমী ও শুচি, যে ব্রহ্মচারী, যার অসূয়া নেই, যে মৌনী ও অপ্রমত্ত, তারই বেদে অধিকার। অতএব বেদ লোকোত্তর বিদ্যা—তাকে পাওয়ার পথ অলৌকিক তপস্যার পথ।

বেদের সম্বন্ধে এত কথা বলা হলেও মনে হবে আমরা বেদ কি তা আদৌ বুঝিনি। এটিই খাঁটি কথা। কারণ বেদ অতীন্দ্রিয়ের উপলব্ধির শাস্ত্র—বুদ্ধির আলোকে তাকে ধরা সম্ভব নয়। একটি শ্লোকে বলা হয়েছে :—

প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তুপায়ো ন বুধ্যতে।
এতং বিন্দতি বেদেন তস্মাৎ বেদস্য বেদ

প্রত্যক্ষ দর্শনে বা অনুমানে যে বস্তু বা যে তত্ত্ব মেলেনা, বেদে তাই পাওয়া যায়—চারি বেদের শ্রেষ্ঠতা। চেতনার উত্তরণে অমৃততায় অনুভবই বেদের মূল লক্ষ্য। এক অখণ্ড বোধের মহিমাময় উপলব্ধির মাঝে ধীরে ধীরে আনন্দলোকের তুঙ্গশৈল শিখরে উত্থানই বৈদিক সাধনার মর্ম্মকথা।

মুক্তিকোপনিষদে পাওয়া যায়—"তিলেষু তৈলবৎ বেদে বেদান্তঃ সুপ্রতিষ্ঠিত" তিলের ভিতর যেমন তৈল থাকে, তেমনই সকল বেদে বেদান্ততত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। সেই বেদান্ততত্ত্ব ব্রহ্মতত্ত্ব ব্রহ্মস্বরূপের অনুভব। প্রজ্ঞাসং ব্রহ্ম—তিনি জ্ঞানস্বরূপ জ্ঞান জ্যোতি, জ্ঞানের সহায়তাতেই সেই ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা যায়। বেদে নানা দেবতার উপাসনা দেখান যায়, কিন্তু সে নানা একেরই অভিব্যক্তি। একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি—একেকেই বিপ্রগণ বহু নামে অভিহিত করেন।

এই এক চৈতন্যময় ও জ্ঞানময় পরম সত্তা। ঐতরেয় উপনিষদে এই ভাবটিকে চমৎকার ভাবে প্রদত্ত হয়েছে। প্রজ্ঞাস্বরূপ আত্মা কি, সেই প্রশ্নের উপরে বলছেন:—সর্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং, প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতম, প্রজ্ঞানেত্রোলোক প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা, প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম। ৩।১।৩ পৃথিবীর অচল ও সচল সমস্তই প্রজ্ঞানের দ্বারা সত্তাযুক্ত, প্রজ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত, সকলের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় প্রজ্ঞানের ক্রিয়া—সমস্ত লোকের প্রবৃত্তি প্রজ্ঞানেরই অধীনে, প্রজ্ঞাই সমস্ত জগতের আশ্রয়—অতএব প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম।

জ্ঞানলভ্য, জ্ঞানস্বরূপ এই ব্রহ্মের কথাই বেদ। লোকোত্তর সেই অনুভবের মাঝেই রয়েছে মানব জীবনের চরম সার্থকতা। মানুষকে পশুত্বের অন্ধকার থেকে মনুষ্যত্বের আলোকে জাগাতে হবে, কিন্তু তাইত যথেষ্ট নয়, আরও উপরে যেতে হবে। এহো বাহ্য আগে কহ আর। মানুষকে অমৃতের দেবতা হতে হবে—দিব্যজীবনের জ্যোতিতে ঝলমল হয়ে মানুষ জানবে সে অমৃতের সন্তান—জীব, জগৎ আর ব্রহ্ম তিনে এক, একে তিন।

দীর্ঘতমা ঔচথ্য একজন মরমীয়া কবি। তিনি প্রথম মণ্ডলে ১৬৪ সুক্তের ৩৯ ঋকে বলছেন:—

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্
যস্মিন দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তন্ন বেদ কিম্ ঋচা করিষ্যতি
যইৎ তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে॥

প্রতি জীবাত্মায় একটি পারমার্থিক স্বরূপ রয়েছে। সে রূপ অমর রূপ—তার লয় নেই—যে রূপ অদৃশ্য, অবিনশ্বর, ও নিত্য, সর্বত্র ব্যাপ্ত ব্রহ্মই সে রূপ। সে রূপ পরম ব্যোম স্বরূপ। নিরতিশয় ব্যোম সদৃশ দেশে তার অবস্থান—সেই পরম তত্ত্বের মাঝেই রয়েছে সকল দেবতার বাস, সমস্ত দেব শক্তি সেই অক্ষরেরই প্রকাশ এবং বিভূতি। সেই অক্ষরকে যারা জানল না—তারা সাঙ্গোপাঙ্গ আর বেদ পড়েই বা কি করবে—আর যারা তা জানে, তারা সেই পরমাব-পুময় অখিলরসঘন ব্রহ্মেই লীন হয়ে যায়।

বেদ তাই অক্ষয় ব্রহ্মবিদ্যা, অতীন্দ্রিয় বোধিতে সেই সুগভীর সত্য বিকশিত হয়। অপৌরুষের নিত্য শ্রুতি বলে যুগে যুগে আমরা তার যে প্রশস্তি পাঠ করেছি, তা মিথ্যা নয়। বেদ অলৌকিকের বাণীরূপ।

যতো বা যো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ নবিভেতি কুতশ্চনঃ।

মানুষের বাক্য সেখানে পৌছায় না, মনও তার নাগাল পায় না, কিন্তু তবু তা অসত্য নয়, কল্পনার জাল নয়। সে পরম সত্য—আনন্দের সুগভীর অনুভূতির মাঝেই হৃদয় যখন সূর্য্য কিরণ স্পর্শমুখী কমল কোরকের মত কুণ্ঠ, তখনই আমরা তাকে অনুভব করি, তখনই তারস্বরে বলতে পারি আছেন, তিনি আছেন। আর তাই বলতে পারলেই সমস্ত ভয় দূর হয়ে চলে যায়। অজ্ঞতার বিজয় শঙ্খ বেজে ওঠে—অমৃতের স্রোতোধারায় হৃদয় প্লাবিত হয়।

বেদ কি এককথায় সদুত্তর তাই বাস্তব বৈদিক সাহিত্য নয়—সে হল অতীন্দ্রিয় রহস্যানুভূতির গভীর আনন্দ, সে হল আনন্দের সর্বব্যাপী বিচ্ছুরণ—সে হল সচ্চিদানন্দের অমৃত-বিলাস।
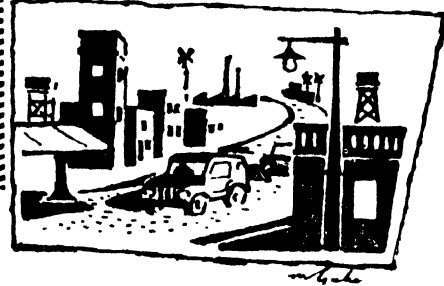
(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

হেমন্তের শেষ···শীত আসছে। ইতিমধ্যেই শীতের আভাষ দেখা দিয়েছে আকাশ বাতাসে—শাল বন সীমায় কঠিন কাঁকুরে ডাঙ্গাটা কেমন রুক্ষ কর্কশ হয়ে উঠেছে তার পরই সুরু হয়েছে ক্রমঃনিম্ন ধান ক্ষেতের সীমানা। সিড়ি সিড়ি নেমে এসেছে, উঁচু জমিতে ঝুলুর কার্ত্তিক কলমা ধানে এসেছে হলুদের আভা-মঞ্জরী, ভারাবনত ধান ক্ষেত বাতাসে মাথা নোয়ান দিয়েছে। তার ও নীচের তলের ক্ষেতগুলোয় তখনও সবুজ ছিটোন।

থোড়গুলো থেকে উকি মারছে শূন্য মঞ্জরী—রাতের আঁধারে ওরা বৃন্ত উন্মুক্ত করে জেগে থাকে জাগর রাত্রির প্রহর-কখন তাদের উন্মুখ ধান শীর্ষে স্পর্শ পাবে এককনা শিশিরের, সার্থক হবে ওর শূন্য বুক ফসলের সম্ভাবনায়।

এক সূর্য্যের আলোয় কেমন গাঢ় হলদের স্বপ্ন-বাসের বুকে ঝকঝক করে শিশির কণা মুক্তোর আভা নিয়ে।··· পুকুর পাড়ের খেজুর গাছ গুলো দাঁড়িয়ে থাকে কলসী কাঁখে কোন বধুর মত—শীত আসছে।

পূর্ণতার ঋতু-কন্যকা ধরিত্রীর মানস কন্যা।

তারকরত্ন সেই সন্ধ্যার পর থেকেই কর্মপন্থা ঠিক করে নিয়েছে। জানে এরপর ওরাও চেষ্টা করবে ভৈরব-নাথের মামলা যেমন তেমন করে দাঁড় করাতে, করাবেও। তার জন্য তারকরত্ন ও তৈরী।

অনেক বছরই উড়িয়ে খেয়েছে—মামলা পড়লে নিদেন সাত আট বছর চলবেই। তারপর দেখা যাবে। সুতরাং দেবোত্তর একচকে পঞ্চান্ন বিঘে নাথোরাদ সম্পত্তির ধান প্রথম চোটেই খামারে তোলবার আয়োজন করেছে। গ্রামের দক্ষিণ সীমায় ঘন বাঁশবন আর মাদার গাছের জঙ্গল। সখ করে বাঁশ ঝাড় লাগিয়েছিল তারকরত্নের পূর্ব্ব পুরুষ—আজ তা গ্রামের দক্ষিণসীমা কেন অন্যদিকে ও মাথা তুলেছে।

রকমারি বাঁশ তল্‌তা; খেউড়-কীবক-গুড়িসার-সটকা গেড়িভেলকি নানা জাতের; বাতাসে ওর পাতা নড়ে বাঁকবন্দী পাতা—কীচক বাঁশের গায়ে গজিয়ে ওঠে অসংখ্য ছিদ্র সেই ছিদ্র পথে বাতাস আনাগোনা করে সুর তুলে গভীর রাতে—কেমন উদাসী একটানা সুর। মনে হয় কে যেন কাঁদছে-শুধু কাঁদছেই।

তারকরত্নের বিশাল বাড়ীটার পিছন থেকে পাচীলঘেরা গোয়াল।

গোলাবাড়ী আর খামারের সুরু; ওখানে কারা যে রাত্রি গভীরে কাঁদে।

সত্যিকার কান্না না কীচক বাঁশের রন্ধ্রে ঝড়ো বাতাসের সুর কে জানে!

মাটি থেকে সুর ওঠে—সুর ওঠে আকাশ বাতাসে।

তৃপ্তমনের সুর। যতদূর চোখ যায় দূরে ওই কাঁটাবাধ আসুড়ে পলাশডাঙ্গা অবধি মাঠের রং সোনা বরণ হয়ে উঠেছে। বাতাসে শিষ দেয় দোয়েল-খঞ্জন উধাও পাখা মেলে নেচে বেড়ায়। কেমন মিষ্টি মৌ মৌ সুবাস।

বড় বাকুরীরে রাধুনী পাগল ধান পেকেছে-ওদিকে কারকাচিতে পেকে উঠেছে গোবিন্দ ভোগ, তারই তীব্র সৌরভে সোনামাঠ ভরে উঠেছে। ভোরের শিশিরস্নাত নরম ধান গুলো কাস্তের ধারে কেটে চলেছে। বেলা বাড়বার আগে রোদের তেজ চড় চড়ে হয়ে উঠলেই ধান শুকিয়ে যাবে, খসে পড়বে ওর মঞ্জরী থেকে পূর্ণগর্ভা ধান, তাই বিয়েন বেলাতেই যতটা পারে ওরা কায এগিয়ে নেয়।

মুনিষগুলো ধান কাটছে।

শিশির-ভেজা ধান আর ঝকঝকে কাস্তের উপর পড়েছে দিনের প্রথম আলো কেমন ঝিকিমিকি তোলে।

নিতে বাউরী গায়ের চাদরটা ভাল করে জড়িয়ে মাঠ থেকে আলের মাথায় উঠে এল।

—শালো ইরির মধ্যে শীত যেন জেকেঁ আইছে। দেদিকিন একটান। বসেপড়ে আলের উপরই।

বেজা বাউরী কোন রকমে এরই মধ্যেও কায করতে এসেছে। না করে উপায় নেই। বুড়ী মা গজ গজ করে।

—বসে বসে কাঁড় গিলছিস, ক্যানে।

—শরীল যুৎ নাই।

—কাঁড়া গতরটোত লাগছেক।

কথার জবাব দেয়নি বেজা; ঠ্যেটাও কেমন যেন মাথা সোজা করে কথাকয় আজকাল। সেই এই টুকুন মেয়েটার আজ ভরযৌবন এসেছে। লেবি হয়ে উঠেছে বামুন বেণে পাড়ায় লবঙ্গ।

হাসে—খিল খিলিয়ে হাসে কেমন ঢেউ তোলা হাসি।

—এ্যাও।

গর্জনকরে ওঠে বেজা। লেবি ঝাঁট দিচ্ছিল সেদিন তারকরত্নের বাইরের গোয়ালে। খামারের বাঁশ বনের ছায়াঘেরা ঠাইটা। কেমন থম থমে।

বেজাকে ধরে নিয়ে গেছে বেগার দিতে—ওর জমিতে ঘর বসত করে, তাই ধান কাটার সময় বেগার দিতে হবে।

একে পয়সাকড়ি মিলবে না, ঘরেও ওই অবস্থা মনে—সুখ নেই। হঠাৎ ধানের পালুই এ থেকে গোয়ালের দিকে চেয়ে একটু অবাক হয় বেজা।

হাসছে জীবনবাবু।

সেই সঙ্গে ওই লেবিও—কেমন বিচিত্র সেই হাসি।

মাথাটা ঝিমঝিম করছে, মনে হয় ধানপালুই থেকে লাফ দিয়ে গিয়ে ওই ছোটবাবুর বেহায়া হাসি থামিয়ে দেবে—কল্লা মটকে দেবে ওই লেবি হতচ্ছাড়ির।

কিন্তু কি ভেবে থেমে গেল।

লেবি ঝাট দিয়ে চলেছে—তালপাতার শিকের মোটা ঝাঁটা দিয়ে বাবুদের গোয়ালের গোবর খিচ সাফ করেও তুলতে পারে না। আর হাসছে মনে মনে—হঠাৎ সামনে ওকে দেখে মুখ তুলে চাইল। বেজার সারা গায়ে ধানের কুটি—মাথায় জীর্ণ গামছাটা বাঁধা।

কঠিন কণ্ঠে বলে ওঠে—ফ্যাক ফ্যাক করে হাসছিলি কেনে?

মেয়েটা একবার ওর দিকে চাইল—ধূর্ত কেমন তীব্র চাহনি। সাধারণ মেয়েটা কেমন যেন নোতুন চাহনি পেয়েছে ওর ডাগর চোখে। বেশ মাথা তুলেই জবাব দেয়, —কেনে?

—খপরদার হাসবি না—লাজ লাগে না?

হাসিতে ফেটে পড়ে মেয়েটা। প্রতিবাদ করে না—ঝগড়া করে না—হাসছে। মনে হয় বেজার পৌরুষকে ধিক্কার দেওয়া সেই হাসি—নিঃশেষ অবজ্ঞাই ফুটে ওঠে ওর প্রতিটি শব্দে।

···সরে এল বেজা। কি যেন ভাবছে।

···যেমন করে হোক নিজেই কায করবে সে। ওর রোজকারে আর বসে বসে খাবে না।

কি যেন পরম বেদনায় আর ধিক্কারে এতবড় জোয়ানটা ঘায়েল হয়ে গেছে। কত আশা করে ঘর বেঁধে ছিল—সেই ঘরে আগুন লেগেছে তা বেশ বুঝতে পেরেছে বেজা।

···ওর বুক পুড়ছে—তবু মনে মনে এখনও সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে চলেছে। কায করতে আসে এ সময় কাস্তে ধরতে পারলেই যেমন করে হোক পাইমাপা চার সের ধান আর মুড়ি মিলবে, তাই কায করতে এসেছে।

কিন্তু দু-চার গণ্ডা ধান কাটবার পরই কেমন যেন

হাঁপিয়ে আসে, টান ধরে বুকে পিঠে। কন-কনে বাতাসে মনে হয় বুক কাঁপছে। একটু তামাক হলে যেন দম পাবে।

…বেজা আগে থেকেই আলের মাথায় বসে রোদ-পিঠ করে হুঁকো টানছিল। নিতেকে উঠে আসতে দেখে ওর দিকে চেয়ে—কলকেটা নামিয়ে দেয়। নিতে গরম তাতা কলকেটা হাতের তালুতে ধরে বেশ আরাম বোধ করে—কেমন উষ্ণ একটা অনুভূতি।

শরীরের হিমজমা ভাব যেন ওই তাতে গলছে—একটা তৃপ্তি আসে। দু-চোখ বুজে টানছে কড়া দা-কাটা তামাক।

গরম ধোঁয়াটা শরীরের কোষে কোষে একটা কবোষ্ণ অনুভূতি আনে—চোখ বুজে একদম ধোঁয়া টেনে বেশ তারিয়ে তারিয়ে অনুভব করছে সে।

চোখ খুলে দেখে বেজা তখনও তেমনি গুম হয়ে ঠায় বসে আছে। একটু অবাক হয় নিতে।

—কি হ'ল রে তুর?

—না! যেচ্ছি মাঠকে।

চুপ করে গিয়ে ধানে কাস্তে লাগালো বেজা।

নিতে ও কথা বাড়াল না।

ওদিকে দেখা যায় তারকরত্নের বড় ছেলে জীবনবাবু মাঠের দিকে আসছে। হাওয়ায় উড়ছে ওর গায়ের গরম শালখানা। পিছনে পিছনে আসছে ছানুদাস।

—ভোর থেকে কবার তামুক খেলিরে নিতে? এঁ্যা জীবনবাবু নিতে বাউরীকে যেন হাতে-নাতে ধরে ফেলেছে—কি এক গর্হিত কায করছে। নিতে কলকেটা নামিয়ে জবাব দেয়।

—আজ্ঞে যা জাড়, তার ওপর এই লেহর—

ছানুদাস ফোড়ন কাটে—তাই রোদ পুইছিলি। আজ্ঞে বেজোবাবু থি ভাল আছেন?

ছানুদাস লম্বা লিকলিকে শরীরটা যেন সাপের মত পাক দিচ্ছে। বেজো কাস্তে থামিয়ে একবার ওদের দিকে চেয়ে থাকে।

জীবনবাবু কথা বললো না। সরে গেল ওপাশে।

ওরা আবার ধান কাটায় মন দেয়।

নীচেকার বাকুড়িতে ছানুদাস ধান গুণছে। দু-এক আটি তুলে নিয়ে পরখ করে ধানের ফলন।

ব্যাপারটা একটু গোপনই। বাবাকে লুকিয়ে লুকিয়ে জীবন কিছু হাতখরচ বাড়তি রোজকার করে নেয়—ছানুদাসকে তাই দরকার। দোকানদার মানুষ—সব রকমই ব্যবসা করে সে। এটাও তার বেশ লাভেরই ব্যবসা।

ধান পরখ করছে।

নিতে বাউরী কি ভেবে একবার ওদের দিকে চেয়ে থাকে। আবার কাযে মন দেয়।

রোদ বেড়ে ওঠে। পুব দিকের মহুয়াডাঙ্গা তাল-বন-সমাকীর্ণ পুকুরের সীমানা ছাড়িয়ে সূর্য্য উঠেছে আকাশে। বাতাসে একটা উষ্ণ মধুর উত্তাপ, আকাশে সকালের শিশির-ধোয়া আমেজ কেমন ধোয়াটে একটা ভাব।

লোকটা তখনও ধান কেটে চলেছে অবিরাম গতিতে, পিছনের কিরষাণ ভিকু তাল রাখতে পারছে না। মাজা টন টন করে ওঠে। উঠে এসে আলের মাথায় ওদের কলকেটা তুলে টানতে থাকে। রোদটা বেশ লাগে মন্দ নয়।

—এঁ্যা·· আঁ্যা—!

একটা ভাষাহীন চীৎকার শোনা যায়। কেমন তীক্ষ্ণ—মাঠের নিরবতা ভরে তোলে।

ভিকু বিরক্ত হয়ে ওঠে—মলো কিলা চেঁচাচ্ছে দেখ না।

হাসে নিতে—যারে মুনিব চেঁচাছে থি।

ভিকু বেশ নিরাসক্তের মতই জবাব দেয়।

—চেঁচাক, দোমাড়ে চেঁচাক। বিয়েন থেকে একটান তামুক খাবো তার যো নাই। লিজে শালা খাটবেক মানুষরের মত, দেখনা একপোন ধান কেটেছে। সব্বাই যেন শালার মত কাটবেক! লারবো—

ভূষণাবাউরী বলে ওঠে—বামুন হয় যি রে, গাল দিছিস! ভিকু গজগজ করে।

—উ আবার বামুন নাকি? পৈতে নিলেই বামুন। বলুক দিকি সতীশ ভট্‌চাযের মত মন্তোর—সব শ্যালার মুখে আঁ্যা—আর প্যাঁ হয়ে বেরুবেক। ঠাকুর?—প্যাঁ ঠাকুর।

তবু চীৎকার থামেনা ওর। ভিকু বার কতক মরীয়া টান দিয়ে কলকে নামিয়ে রেখে মাঠে নামলো।

নারাণ ঠাকুর ওর দিকে ইসারা করে দেখায় অর্থাৎ পড়ন ধরতে বলছে।

পড়ন অর্থে ধান কাটার একটা সারি। একসারিতে ধান কাটতে কাটতে মাঠের এক আলের মাথায় ঠেকবে, আবার সে আল থেকে সুরু করে ফিরবে অন্য আলের মাথায়।

কিন্তু নারাণ ঠাকুরের সঙ্গে পড়ন ধরতে পারে এমন মুনিষ এ চাকলায় দু একজন মাত্র খুঁজে পাওয়া যায়। ভিকু জবাব দেয় ইসারা করে—যেচ্ছি।

"নারাণ ঠাকুর তা জানে—মনে মনে হাসে।

ভাষা নেই ওর মুখে—বোবা।

তবু সংসারের পক্ষে একটি অপরিহার্য অঙ্গ।

বলিষ্ঠ দুর্মদ যোয়ান। বড় ভাই ফকীর ভটচায কয়েকবছর আগেই দেহ রেখেছে। বড় হাসিখুশী রসিক লোক ছিল ফকীর।

কাযকর্মের মধ্যে দুচারঘর যজমান দেখা—আর মাঝে মাঝে পূজো আশ্রায় ঠেকা দমকা কিছু রোজকার—এই সে করতো। কিন্তু বাকী জমিজায়গা চাষ বরাত সবই করতো ওই নারাণ।

...ছেলেবেলা থেকে যৌবনে পা দিতেই ভাগচাষ ছাড়িয়ে নারাণঠাকুর নিজেই চাষ করতে সুরু করেছে এই দুবছর থেকে।

বামুন—লাঙল ধরার বিধান নেই, তাই ওই ভিকুকে কিরষাণ রেখেছে। কোনরকমে লাঙল ধরে, বাকী সব কায একাই নারাণ ঠাকুর করে। ভিকু সঙ্গে থেকে ঠেকা দেয় মাত্র।

...পরবছরই ফকীর মারা যায়, সে এক স্মরণীয় ঘটনা। ভুবনপুরের আচাই বাড়ীতে বরযাত্রী গেছল গরমের দিন। আচাইরা আয়োজন করেছে প্রচুর।...মস্ত বড় বড় কয়েকটা খাসিই কাটলো—মাংস যাকে বলে কব্জী ডোর, আর সন্দেশ রসগোল্লা মিহিদানা তারও কমতি নেই।

—এক হাত দেখিয়ে দিয়েছিল সেদিন ফকীর।

খাইয়ে মরদ—ওর পাতের চারিপাশে লোক জুটে যায়। ছুটে আসেন আচাই-কর্তা স্বয়ং। হুকুম করতে থাকেন।

—লে আও মাংস! এ্যাই সন্দেশ বোলাও। ফকীর সেদিন যেন রাজ্যজয় করে খেলে।

গরুরগাড়ীগুলো রওনা দিয়েছে দামোদরের বালি পার হয়ে। গ্রীষ্মের খররোদ তখনও লি লি করছে লাল গেরুয়া ডাঙ্গায়।

ফকীর বেসামাল হয়ে পড়ে। পর পর কয়েকবার বমি করেছে, সেই সঙ্গে দাস্ত হবার পরই কেমন যেন নেতিয়ে পড়ে যোয়ান মানুষটা।

গরুর গাড়ী থেকে আর নামবার সামর্থ্য নেই। ওরা গাড়ীর উপর পাতা খড় ফাঁক করে শুইয়ে দেয়। অসাড় অবস্থায় ফকীর সারাপথ ওই ভাবেই আসে।

—বিড়ি খাবি ফকির! সতীশ ভটচায জিজ্ঞাসা করে।

ফকীর স্বভাবজাত রসিকতা তখনও যায়নি। শুয়ে শুয়েই হাত বাড়িয়ে জবাব দেয়।

—লড়িয়োনা চড়িয়োনা ধরিয়ে দাও।

পড়ে পড়েই বিড়ি টানবার চেষ্টা করে।

কয়েক ক্রোশ পথ, শস্যরিক্ত মাঠের উপর দিয়ে গাড়ী-গুলো যখন গ্রামে ফিরে এল রাত্রি নেমে এসেছে।

—ফকীর!

ফকীর তখন বেহুঁস।

ধরাধরি করে নামায় তাকে।

লোক ছুটলো রমণ ডাক্তারের কাছে।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। রমণ বলে ওঠে।

—ই কি করে এনেছেন ভটচাযমশায়!

দেড়ঠেঙ্গে সতীশ ভটচায ও চমকে উঠেছে।...আর্তনাদ করে ওঠে বড়বৌ।

ফকীর নেই।

ছোট ছেলে সনাতন তখন বছর কয়েকের। ও ঠিক বুঝতে পারে না কি তার চরম সর্ব্বনাশ হয়ে গেল। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকে ওর নিদারুণ আঘাতে আর একটি মানব!

ওই মূক নারাণ!

...কেমন যেন পাষাণের মত স্থির অপলক দৃষ্টিতে ভাই-এর মৃতদেহের দিকে চেয়ে থাকে।

হঠাৎ অব্যক্ত ভাষাহীন আর্তনাদে ফেটে পড়ে নারাণ।

...একটা আহত জানোয়ার যেন মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায়

…আজও সেই সন্ধার স্মৃতি ভোলেনি নির্বাক ওই মানুষটা। কেমন যেন সব ঘুলিয়ে যায়। দাদার সেই মুখখানা মনে পড়ে বারবার। বাইরের জগতে যার বেদনা-প্রকাশের কোন ভাষা নেই, অপরের প্রীতির সাহচর্য যাকে ভুলিয়ে দেয় না সেই বেদনা—সে ওই গুরুভার একাই বয়ে চলে অন্তরের অব্যক্ত গভীরে।

সামান্য আঘাতে তাই সেই জমাট পুঞ্জীভূত বেদনা ঝরে পড়ে ভাষাহীন আর্তনাদে।

…কায আর কায।

সঙ্গী সাথী নেই—শূন্য জীবন তাতেই পূর্ণ করে রেখেছে বোবা মানুষটি।

রোদ বেড়ে ওঠে। শস্যরিক্ত কার্তিককলম-ধানের ক্ষেতে সবুজ ঘাসের ফুলগুলো মাথা তুলেছে, দ্রোণপুষ্প—সাদা বেলকুড়ির মত ছোট্ট ফুলগুলো। কেমন একটা চিড়চিড়ে ভাব এসেছে রোদে।

মাথা তুললো নারাণ ঠাকুর।

বাতাসে খেজুর রস থেকে গুড়ের মিষ্টি গন্ধ। আলের মাথায় একটা খেজুর গাছের থেকে তখনও চুইয়ে পড়ছে দু একবিন্দু রস—একটা কাক ঠোকর মারছে ঠুঙ্গিতে।

সনাতন এসে আলের মাথায় দাঁড়িয়েছে। হাতে ন্যাকড়ার পুটুলিতে চাট্টি মুড়ি বাঁধা, বাড়ী গিয়ে মুড়ি খেয়ে আসতে দেরী হয়ে যায়। ততক্ষণে নারাণ দশগণ্ডা ধান কাটবে—মুনিষটাও ফাঁকি দেবে। তাই পাঠশাল থেকে সনাতন ফিরলে সেইই মাঠে মুড়ি আনে।

…ইসারা করে দেখায় নারাণ।

কলম ধরবার ভঙ্গীতে—লিখে এলি।

ঘাড় নাড়ে ছেলেটা।

নারাণ কাস্তে নামিয়ে এগিয়ে যায়, মুখে ওর কেমন হাসি ফুঠে ওঠে।

খাওয়া পাওনা তেমন, শীতের হাওয়ায় ঠোঁটের দুপাশে গজিয়ে উঠেছে শাল্‌কির ঘা।

হাতগুলো ধানের শিষে ফেটে ফেটে গেছে, পা-গুলোও। সনাতন ওর দিকে চেয়ে থাকে।

শন শন হাওয়া বইছে খোড়ধারের সবুজ আখের ক্ষেতে। ক্রমনিম্ন মাঠের মধ্যখানে বয়ে গেছে ওই মাঠ গড়ানি জলধারা নিয়ে ছোট কাঁদরটা। দুপাশে ওর অর্জ্জুন জাম তিরোল গাছের নিবিড় ছায়া।

বৈচিঝোপে উড়ে বেড়ায় শালিখ পাখীর ঝাঁক রঙীণ ফড়িং এর আশায়, পেয়াঁজ আলুর ক্ষেতের কালোমসৃণ ভিজে মাটির বুকে মাথা তুলেছে সবুজ চারাগুলো।

মাথার উপরে উঠছে সূর্য্য—শীতের আমেজ-মাথা দিন। তখনও নারাণ ঠাকুরের বিরাম নেই।

ধান কেটে চলেছে। পিছনে সারি দিয়ে নামিয়ে চলেছে সোনাধান; শুকুলে এঁটিয়ে গাড়ী বন্দী করে খামারে তুলবে।

সারাবছরের পরিশ্রম সম্বৎসরে অন্ন সংস্থান ওই ক'টি প্রাণীর। গরুর গাড়ীতে করে তারই শোভাযাত্রা চলেছে।

পাকাধান চলেছে গ্রামের পথে—চাকায় চাকায় ঠেকছে ওর রাশিকৃত মঞ্জরী—একটা শিহর জাগে।

আর একটা শ্রেণী আছে তারা এ দলের বাইরে, এই ভূমি নির্ভর জীবন থেকে তারা একরকম বিচ্ছিন্ন।

কামার পাড়ার লোকেরা দুএকজন শালের বাইরে দাঁড়িয়ে দেখে ওদের ধান বোঝাই গাড়ীর দিকে কেমন শূন্য দৃষ্টিতে।

বৈকালের গেরুয়ারোদ পাল্‌তে-মাদার গাছে স্পর্শ বুলিয়েছে, গোদালেলতায় ঝুলছে ল্যাজঝোলা টুনটুনি পাখী।

ওদের বেশবাসও আলাদা—পরিবেশও।

এ পাড়ায় ঢোকবার অনেক আগে হতেই গ্রামের বাইরে কাঁকুরে ডাঙ্গা শালবনের কাছ থেকেই শোনা যায় বাতাসে কাঁসা-রাং এর উপর হাতুড়ির শব্দ।

ঠং ঠাং। ঠং ঠাং।

শান্ত নিথর পাখীডাকা বন্য পরিবেশে ওই শব্দটা কেমন একটা বিজাতীয় ভাব আনে। এখানে যেন বেমানান।

কিন্তু এ-গাঁ :কেন—আশপাশের অনেক গ্রামেই এ একটা বেশ স্থায়ী আসন গেড়ে বসেছে। বাঁকুড়ার কাংস্য শিল্পীদের এলাকা।

বাটি-থালা রকমারি জামবাটি কলসী সবই এরা বানায়।

দিনরাত্রি পরিশ্রমের শেষ নেই।

মহাজনের লোক বাসন খুট-ভাঙ্গাকাঁসা-রাং এর

তাল পৌছে দিয়ে যায়, আবার সপ্তাহান্তে তাগাদা দিতে আসে।

স্থানীয় দু-একজন মহাজনও আছে—তারা যেন ভাগাড়ে শকুন পড়ার মত এসে উদগ্রীব হয়ে বসে থাকে, তারকরত্নের পূর্ব পুরুষ ও এই কারবার করেছিল। অনেকে বলে সেই নাকি এখানের প্রথম কারবারী।

বাঁকুড়া সদর—বিষ্ণুপুর না হয় কলকাতা বাসনপট্টি থেকে নিজেই আমদানী করতো পিতলের চাদর খুঁট, বাসন ভাঙ্গা, রাং এর তাল—তাই দিয়ে কারিগর রেখে মাল গড়াতো। চালান দিত বাইরে।

তারও আগে লোকটা নাকি নিজের কাঁধে মাল নিয়ে ফিরি করেছে।

সে সব আজ গল্প কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। এও প্রচলন আছে—নাকি তারকরত্নের সেই পিতামহ ব্রহ্মরত্ন রাং এর তাল এর মধ্যে কি করে এক তাল সোনাও পেয়ে যায়, তার পর থেকেই এই বোল বোলাও।

জমিদারী-বাড়ী—বাগবাগিচা—ঠাকুর দালান সবকিছু।

ওসব কথা কতদুর সত্যি তা কে জানে। তবে এখনও কামার গুষ্ঠি সেই দিনরাত পরিশ্রম করে চলেছে—তাদের লভ্যাংশে একশ্রেণী ফুলে-ফেঁপে উঠছে।

—কইরে কালো। ধরা হাপরটা।

কালো কি ভাবছিল—বাইরের ফাকা হাওয়ায় দাঁড়িয়ে। শীতের টান হাওয়ায় তবু কেমন ভাল লাগে। বেলা দুপুরে শালে ঢুকেছে কালীচরণ।

ছোট্ট নীচু একটা চালাঘর, গণগণ করে জ্বলছে কয়লার আগুন, বড় হাপরের বুক থেকে ভস্ ভস্ করে উঠছে দমকা একটানা আর্তনাদ—যেন একটা বন্দীজানোয়ার অসহ্য যন্ত্রণায় গর্জন করছে থেকে থেকে।

নিশ্বাসে তার বের হয় উষ্ণ অগ্নিস্পর্শ!

রুদ্ধ ঘরের মাঝে ক'টী লোক মাথায় একটা করে ফেটি জড়ানো; নইলে কয়লা আর আগুনের তাপে চুলগুলো পুড়ে ঝলসে যাবে। আর পরণে এইটুকু একটু কাপড়।

নেউল কামার নেহানের উপর লাল বাটির মত ছাঁচ থেকে গলানো পদার্থটা সজোরে পিটে চলেছে। দুজন পালাপালি করে পিটছে বিরামহীন গতিতে।

ভুষোকালির দাগ। শাল ঘরের ভিতরটায় যেন আগুন উঠছে।

অতুল কামারের ডাকে ফিরে চাইল কালীচরণ। বলিষ্ঠ দুর্মদ চেহারা—দেহের পেশীগুলো এতক্ষণ হাতুড়ি চালিয়ে ফুলে উঠেছে।···ঠাণ্ডা হাওয়ায় দম ফিরে পায়।

···ওরা ধানের গাড়ী নিয়ে ফিরছে মাঠ থেকে; মাটিতে—চাকার গায়ে ঠেকছে পুরুষ্টু মঞ্জরীগুলো, একটা মিষ্টি সুর ওঠে—বাতাসে গোবিন্দভোগ ধানের সৌরভ।

·· একটা কেমন যেন স্বপ্ন বলে মনে হয়।

—এ্যাই এসো!

কালীচরণের ডাক নাম ওটা।

এ গাঁয়ে অন্ততঃ গোটা পাঁচেক কালীচরণ—কালিদাস—কালীপদ ইত্যাদি আছে। তাদের পরস্পরকে চিহ্নিত করবার জন্য ডাকটাও তারা বের করে এবং গ্রামের সকলেই তা জানে।

কান্তকালি—পদোকালী—এই কালীচরণের বাড়ীতে দুটো আমগাছ আছে। তাই এমোকালী বলেই সে চিহ্নিত। কাঁঠালে কালীও আছে আর একজন।

অতুল বুড়োর ডাকে কালীচরণ ভিতরে ঢুকল—আবার সেই গণগণে আগুনে হাপরটানা। হাত দুটো কণকণ করে। তবু হাতুড়ি মারার বিরাম নেই।

একফালি জানলা দিয়ে দেখা যায় ক্রম-নিম্ন লাল ডাঙ্গার শেষে সোনা ধানের ক্ষেতের পারে আবার সবুজ শাল বনে এসেছে পাতা ঝরার হলদে আবেশ। সন্ধ্যা নেমে আসছে। গরু বাছুর ফিরছে বন থেকে—ওদের খুরের ধুলোয় লাল সূর্য্যকিরণ আর হলদে বনতল আরক্তিম হয়ে উঠেছে।

ওদের তখনও কায চলেছে। পিতল খুঁট আর রাং একত্রে গালিয়ে সারি সারি পোড়ামাটির মুচিতে ঢালছে ওরা।

—অতুল!

ভারি গলার আওয়াজ শোনা যায়। শানা দিয়ে বাটি চাঁপছিল অতুল—চোখে নিকেলের ফ্রেমের চশমা—ময়লা চিটকেনি দড়ি দিয়ে মাথার সঙ্গে ঘুরিয়ে বাঁধা। বাইরে থেকে ডাক শুনে হাতের কায ফেলে উঠে গেল বুড়ো।

প্রান্তদেশ গলায় জড়িয়ে হেঁট হয়ে প্রণাম করে ব্যস্তসমস্ত হয়ে টিনের রিপিট করা চেয়ারটা এগিয়ে দিয়ে যোড়হাত করে দাঁড়িয়ে থাকে।

ব্যাপারটা নজর এড়ায় না এমোকালীর। স্বয়ং তারকরত্ন বের হয়েছে বেড়াতে, পিছনে পিছনে রয়েছে দেড় ঠেঙ্গে সতীশ ভটচায—হেলু মাষ্টার আরও দু একজন, আবছা অন্ধকারে তাদের ঠিক ঠাওর করতে পারে না।

বসলো না তারকরত্ন। কঠিন কণ্ঠে বলে ওঠে—মাল-পত্র কবে উত্তল করছিস—অ্যাঁ?

অতুল বলবার চেষ্টা করে—তৈরী করছি বড়বাবু।

—সে তো অনেকদিন থেকেই শুনছি। খবর পেলাম সদরের নোতুন মহাজনও এসেছিল। তাকেও কথা দিইছিস—

অতুল চুপ করে থাকে।

কথাটা মিথ্যা নয়। এতদিন গ্রামের কারিগরদের সবই কায করতে হয়েছে ওদেরই তাঁবে। মজুরী বানী যা দিয়েছে তাতে পেট ভরেনি, দিন চলেছে আধপেটা খেয়ে। আজ সদর থেকে—কোন অন্য মহাজন যদি মজুরী বেশী দিতে চায় তাদের রাজী হতে দোষ কি!

অতুল মনে মনে কি ভাবছে। তারকরত্ন ধমকে ওঠে।

—কই রে, জবাব দিচ্ছিস না যে।

...পাড়ার মধ্যে বড়বাবুকে দেখে আশপাশের শাল থেকে আরও দু-চার জন এসে জোটে, জায়গাটা একটু ঘন বসতির।

ওদিকে গোবিন্দ ময়রার চা তেলে-ভাজার দোকান, পান্নুদাসের ধানের আড়ত—গোলদারী দোকান—সেখানেও লোকজনের ভিড় রয়েছে—এদিকে বড়বাবুর চীৎকার শুনে বের হয়ে এসেছে তারাও।

ছান্নু তড়বড়ে শরীর নিয়ে ভিড় ঠেলে এসে হাজির হয়েছে। অতুল কামারের দিকে চেয়ে আছে কামার-পাড়ার অনেকেই। কথাটা তাহলে প্রকাশ পেয়ে গেছে। তারাও শলাপরামর্শ করছে এ নিয়ে, প্রবীণ অতুল কামারের দিকে চেয়ে আছে তারা।

অতুলও বুঝতে পেরেছে ব্যাপারের গুরুত্ব।

বলে ওঠে—আজ্ঞে, এখনও ঠিক করিনি। আপনারা মা-বাপ—কিছু করবার আগে আপনাদিকে বলবো বই কি?

তারকরত্ন যেন খুব খুশী হয় না জবাবে। বলে ওঠে—তা দেখ ভেবে-চিন্তে। তবে গাঁয়ে বাস করতে হবে তো! সে কথাটাও ভেবে দেখ। দাঁড়াল না তারকরত্ন।...ওদের ভিড় ঠেলে বের হয়ে গেল। পিছু পিছু চলেছে দেড়ঠেঙ্গে ভটচায—আর দলবল। যেন শাসিয়ে গেল আজ পাড়া বয়ে এসে ওই তারকরত্নবাবু। চুপ করে শালের মধ্যে গিয়ে ঢুকলো অতুল কামার। মুখে চোখে একটা থমথমে জমাট অন্ধকার নেমে এসেছে।

...এমোকালী বলে ওঠে—ছাপ জবাব দিলা না কেনে কাকা? যে মাল দিতে পারবো না—বাণী বাড়াতে হবেক।

অতুল জবাব দিল না।

কালী গজ গজ করে—ভাল্‌মানুষী কাল নাই গো, ইবার জবাব দিতে হয় আমাদিকে পাঠাবা। শুনিয়ে দিয়ে আসবো ন্যায্য কথা।

অগ্নিগর্ভ হাপরের মত ফুলছে তেজী যোয়ান ছেলেটা। আংরার আগুনের গণগণে আভায় ওর মুখে ফুটে উঠেছে একটা দৃপ্ত আভাস।

ব্যাপারটা সবই দেখেছিল অশোক, শুনেছিল ও। তারকরত্ন তাকে এখানে দেখবে কল্পনা করেনি। শুনে-ছিল, কানেও এসেছিল ওর সম্বন্ধে অনেক কথা। হঠাৎ ওকে এগিয়ে আসতে দেখে তারকরত্ন দাঁড়াল।

—তুমি।

সাইকেলটা হঠাৎ লিক হয়ে যেতে সাইকেলখানা ঠেলে অতুল কামারের ছেলের দোকানে আসছিল অশোক। ব্যাপারটা দেখে সেও শুনছিল। জবাব দেয়—সাইকেলটা বিগড়ে গেছে, তাই দিতে এলাম দোকানে।

—ও!

কেমন অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে চেয়ে থাকে তারকরত্ন তার দিকে। সম্পর্কে ভাগ্নে ওই অশোক।

ওর বাবা সীতাংশবাবু তারকরত্নের কাকার জামাই। একটি মাত্র মেয়ে তাঁর। তারই ছেলে ওই অশোক।

কেমন যেন বরাত জোরেই অশোক ওই বিরাট সম্পত্তির মালিক হয়ে তার সরিকান হয়েছে, তারকরত্নকে তারা নায্য দাবী থেকে বঞ্চিত করে।

সীতাংশুবাবু কোন কলিয়ারীর ম্যানেজার।

দেশেও বিরাট সম্পত্তি, অশোক এখানেই থাকে। যেন সীতাংশুবাবু ইচ্ছা করেই ওই একটি দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন এখানে।

কি বলছিল ওরা?

তারকরত্ন কথা বলে না। ভাগ্নের দিকে চেয়ে থাকে। হঠাৎ কঠিন কণ্ঠে বলে ওঠে—এর মাঝে নাই বা এলে অশোক।

অশোকের মুখে ফুটে ওঠে হাসির আভা।

তারকরত্নের চোখ এড়ায় না সেটা—ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। ওই যুবকটিও যেন আজ তাকে প্রকাশ্য পথে ব্যঙ্গ করতে সাহস করেছে।

···কথা বললো তারকরত্ন।

—চল ভটচায!

—ভটচায দেড়ঠ্যাং নিয়ে টিং টিং করে এগিয়ে চলে। তারও কেমন যেন এসব ভাল লাগছিল না।

অশোক সাইকেল ঠেলে নিয়ে চলে অতুলের দোকানের দিকে।

মা-লক্ষ্মী অতুল কর্মকারের দিকে মুখ তুলে যে চায়নি তা ওর বাড়ী ঘর—কামার-শাল—আর ওকে দেখলেই চেনা যায়। দিনান্তে পরিশ্রম করে লোকটার মুখে চোখে কালির দাগ পড়েছে—শরীরও নুয়ে এসেছে ওই হাতুড়ি ঠুকে, আর আগুনের গণগণে তাপে শরীরের মেদটুকু নিঃশেষে দড়ি পাকিয়ে গেছে। এত করেও মা লক্ষ্মীর কৃপা পায়নি।

কিন্তু মা ষষ্ঠীর দরদে হাতের দানে উপছে পড়েছে অতুলের সংসার। অতুলের স্ত্রী রত্নগর্ভা। এক এক করে সাতটি পুত্ররত্ন সে এই পুণ্য ধরিত্রীর বুকে এনেছে।

অতুল বলে—মুয়ে আগুন। যতো সব শূয়োর পালের মত কিল্লিবিল্লি। বৌ বলত—বালা বাড়ে দারিদ্দি খণ্ডে। তবু তো ওজকার করবেক।

সেদিন অতুল হালে পানি পায়নি।

আজ যাহোক তারা বড় হয়ে উঠেছে। শালে এক-মাত্র দূর সম্পর্কের ভাগ্নে ওই এমোকালী ছাড়া আর বাইরের কেউ নেই। তারাই সব কায করে।

শুধু তাই-ই নয়, ছোট ছেলে কার্ত্তিক ওদিকে সাইকেল-ডেলাইট-ষ্টোভ-টর্চ টুকিটাকি সারাই, বাসনপত্র রাং ঝালাই—এটা সেটার দোকানও দিয়েছে।

অন্ধকার পথটা একটা হেসাকের আলোয় ঝকমক করছে; কার্ত্তিক পুরুণের আগুরিদের হেসাকটা মেরামত করে জেলে দেখছে। কেরাসিন তেল পোড়ার গন্ধ, উজ্জ্বল আলোটা ওপাশের গাছগাছালির মাথা ভরিয়ে তুলেছে।

—কিরে কেতো, বিয়ে বাড়ী নাকি? এত আলো—লোকজন? দেখাদিকি—হাতের সাইকেলটা একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে এগিয়ে গেল অশোক। অতুলের তারকবাবুর সঙ্গে ওই আলোচনার পর কেমন মেজাজটা খিচড়ে গেছে। চুপচাপ বসেছিল।

কেতোকে আলোটা জ্বালতে দেখে মেজাজ আরও বিগড়ে যায়।

অশোকবাবু কেন অনেক লোকজনই হঠাৎ আলো দেখে কৌতূহলী হয়েই নানা কথা জিজ্ঞাসা করেছে।

বুড়ো বলে ওঠে—জানেননা ছোটবাবু—শালা কেতোর বাপের বিয়ে হচ্ছে যি।

কাতিক কথার জবাব দিল না, চুপ করে থাকে।

অশোকই ওর কণ্ঠস্বরে বিস্মিত হয়। অনেকদিন থেকেই দেখছে বুড়োকে। বেশ ভদ্র বিনয়ী। আরও পাঁচজনের কথা ভাবে। আজ হঠাৎ ধৈর্য্যচ্যুতির ব্যাপারে একটু বিস্মিত হয় অশোক।

পাশেই একটা গরুর গাড়ীর চাকা ভাঙ্গা পড়েছিল—আরাগুলো ছেড়ে গেছে। মাঝখানের গোল টুকরোটা মোড়ার মত ব্যবহার করে ওরা, তাতেই চেপে বসে অশোক।

—কি হয়েছে বল দিকি মামা?

গ্রামসুবাদে অশোক বুড়োকে মামা বলেই ডাকে। আগেই তারকরত্নের সঙ্গে ওদিকে দেখা হওয়ার পর থেকেই অনুমান করছিল অশোক একটা কিছু ঘটেছে।

অতুল কামার ওর দিকে চেয়ে থাকে। কেতোর হেসাকের একফালি আলো পড়েছে ওর মুখে; সুন্দর যৌবনপুষ্ট দেহ। কেমন যেন এখানের ওই জমিদারনন্দন ছগণ্ডা চার আনা তিন আনার তরফের বাবুদের থেকে একটু পৃথক একটি যুবক।

তারকরত্নবাবুর সমানই সরিক, বরং বাবার দিক

থেকেও অশোকের যা আছে, তা এর থেকেও বেশী। তবু কেমন যেন ওকে বিশ্বাস করা যায়।

চুপচাপ ওর দিকে চেয়ে থাকে অতুল।

…খবরটা ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে কামারপাড়ার বিভিন্ন শালে, ছোলাই ঘরের চালায়, বড়বাবু নিজে শাসিয়ে গেছেন—নোতুন মহাজনকে মাল দিতে পাবে না। এমন কি একথাও বেশ জাহির করে বলে গেছে—গ্রামে তাঁরই তাঁবে বাস করতে হয়, ভবিষ্যতেও হবে—এটা যেন কামার-পাড়ার লোক ভুলে না যায়।

মনে মনে অনেকদিন থেকেই ওরা তারকরত্নের মজুরি ফাঁকি দেওয়া, বাণী কমানো, খুটের ওজনে কার চুপি সবই দেখে আসছিল, আর গুমরে উঠেছিল মনে মনে। কোন অন্যপথ ছিল না, কিছুদিন থেকে সদরের মস্ত ব্যবসায়ী কানাই চক্রবর্ত্তী মশায় রাজী হয়েছেন তাদের মাল নিতে; দরকার হলে তিনিই খুট বাসন দেবেন।

দাদনও; ওরা শুধু তৈরী করে দেবে মহাজনের লোক এসে মাল নিয়ে যাবে, হিসাব মিটিয়ে আবার দাদন দিয়ে যাবে দফায় দফায়। সেই খবরটাই জেনে ফেলেছে তারকরত্ন।

কানাইবাবুর গদি-সরকার আজই এসে পড়েছে কামার-পাড়ায়—রাত্রে আলোচনা হবে, ফিরবে কাল সকালে।

হঠাৎ সন্ধ্যাবেলাতেই এই ব্যাপার, হাকাহাকি দেখে বুড়ো ভদ্রলোক একটু ঘাবড়ে যায়। জানে ওইসব লোক কতখানি সাংঘাতিক হতে পারে। বনের ধারে গ্রাম, তারপর থেকেই বনের সীমানা সুরু, বড় রাস্তাও দূরে—কোন রকমে নজর এড়িয়ে যদি পালানো যায় তাই ভাবছে।

বের হতে যাবে, বাধা দেয় অতুল কামারের বড় ছেলে।

—আজ্ঞে যাবেন নাই সরকার মশায়।

—কেন! চমকে ওঠে বৃদ্ধ লোকটা। অজানা অচেনা জায়গা, ভয়ে কেমন কাঠ হয়ে যায়। গলা শুকিয়ে আসে।

অতুলের বড়ছেলে বলে ওঠে—এসময় না বেরুলেই ভাল, কথাটা পাঁচকান হয়ে গেছে।

—বুড়ো ভীতকণ্ঠে বলে—আমি তো নিমিত্তমাত্র বাবা!

জবাব দেয় না ভুবন। বলে ওঠে—আজ্ঞে তা আর বোঝে কে বলেন। থেকে যান রাতটা—কুন ভয় নাই। বিবর্ণমুখে লোকটা শালেই আটকে থাকে।

…রাত হয়ে আসছে—কেতোর জ্বালানো হেসাকটা নিভে গেছে একটু আগেই বিনা নোটিশে। আবার আঁধার নেমে আসে সরু মাটির পথটায়, গাছ-গাছালির মাথায়। একটা হ্যারিকেনের ম্লান আলোটাকে কেমন যেন একক অসহায় বলে মনে হয়। কোথায় ডাকছে রাতজাগা একটা পাখী।

এক ফালি আলোয় জমায়েত কামারপাড়ার লোকদের কেমন যেন আদিম অন্ধকারে পথহারা একদল ছিন্নবাস ক্লান্ত পথিক বলে মনে হয়।

চুপ করে বসে ভাবছে অশোক। এত গভীরভাবে ওদের সুখ-দুঃখের কথা আগে কোন দিনই যেন শোনেনি; ওরা ও জানায় নি। দূর থেকে পথের উপরই ছোটবাবুকে গড় করেছে।

—কি করবে ভেবেছ তোমরা? অশোকই তাদের জিজ্ঞাসা করে। কেউই জবাব দেয় না। এমোকালী ওর দিকে চেয়ে থাকে। জবাব দেয় অতুল কামারই।

—ঠিক কিছু করিনি ছুটবাবু। জানেন তো দায়ের ওপর কুমড়ো পড়লেও কুমড়োর বিনেশ, আর কুমড়োর ওপর দা পড়লে তো কথাই নাই। একবার কথাটা যখন রটেছে তখন বড়বাবু কি ছেড়ে কথা কইবে? তাই ভাবছিলাম—

জবাবটা সে নিজেও যেন দিতে পারছে না। মাথা চুলকোতে থাকে অতুল।

এমোকালী প্রশ্ন করে—আপনি কি বলেন?

অশোক ওর দিকে চাইল। ওরা সকলেই মুখ চাওয়া-চায়ি করে। অশোক একটু চুপ করে থেকে জবাব দেয়—হাঁ না কিছুই এখুনি বলা যায় না কালী, সবদিক ভেবে দেখতে হবে।

[ক্রমশঃ

ডাক্তার নীলরতন সরকার স্মরণে

ডাঃ শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মৈত্র

আমরা যখন স্কুলের ছাত্র এবং মফঃস্বলের ইস্কুল হইতে রাজসাহী কলেজে অধ্যয়ন করি, তখন আমাদের অঙ্ক শাস্ত্রের অধ্যাপক রাজমোহনবাবু আমাদের অঙ্ক কষান ও আমাদের প্রিন্সিপাল কুমুদিনীবাবু পদার্থবিদ্যা পড়ান। পদার্থবিদ্যা ক্লাসে আমরা বসিয়া আছি; এমন সময় প্রদর্শক (Demonstrator) হেমবাবু আসিয়া বলিলেন, "এসো আমি তোমাদের ব্যবহারিক পদার্থবিদ্যার ক্লাস লইব, আজ প্রিন্সিপাল ব্যস্ত আছেন, তাঁহার বাড়ীতে সিণ্ডিকেটের একজন বড় সভ্য আসিয়াছেন, তিনি একজন বিচক্ষণ ডাক্তার। আমরা পরে নানা প্রকার জল্পনা-কল্পনা শুনিলাম এবং রাজমোহনবাবু বলিলেন—আমার বাড়ীতে কোনও বড় রুগী নাই যে অত বড় ডাক্তার স্যর নীলরতন সরকার আমার গৃহে আসিবেন। ইতিমধ্যে আমাদের রাজসাহী কলেজে পড়া শেষ হইয়া গেল, আমরা প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হইলাম। আমাদের বৎসরে রাজসাহী কলেজ হইতেই বিজ্ঞান ও কলা শাখায় কুড়ি জনের মধ্যে বোধ হয় চৌদ্দ কি পনের জন স্থান পাইয়াছিলেন। স্নাতক ক্লাসে তিনমাসের মধ্যেই দেখিলাম যে আমাদের শিক্ষার জন্য রাজসাহী কলেজ হইতে ভাল ভাল প্রায় সকল অধ্যাপকই প্রেসিডেন্সী কলেজে বদলী হইয়া আসিয়াছেন এবং আমরা স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে উঠিয়াই স্যর নীলরতন সরকারকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-অধ্যক্ষ রূপে আমাদের মাঝে পাইলাম।

প্রত্যেক স্নাতকোত্তর বিষয়ের প্রধান অধ্যাপককে ডাকিয়া সহ-অধ্যক্ষ আদেশ করিলেন যে প্রত্যেক স্নাতকোত্তর ছাত্রকেই গবেষণামূলক কার্য্য করিতে হইবে এবং যদি কৃতিত্বের সহিত তাহারা গবেষণাকার্য্য চালাইতে পারে তাহা হইলে এম. এ এবং এম. এস্‌সি পরীক্ষায় অর্দ্ধেক নম্বর গবেষণামূলক প্রবন্ধের পরিবর্ত্তে গৃহীত হইবে।

১৯২০ সালে; তখনও প্রথম মহাযুদ্ধের ভয়াবহ অনটনের অবসান হয় নাই—আমাদের গবেষকদের অনেকেরই কার্য্য অসম্পূর্ণ ছিল। তাহার মধ্যে আমিও একজন। স্যর নীলরতন বিলক্ষণ জানিতেন যে গবেষণাকার্য্য তখন কত কঠিন ছিল। তথাপি তিনি স্নাতকোত্তর বহু ছাত্রকে আবার গবেষণা কার্য্য চালাইতে উপদেশ দিলেন। তখন ১৯২১ সালের মহা-অসহযোগ আন্দোলন;—কলেজে কলেজে ধর্ম্মঘট, স্যর নীলরতন মধ্যপন্থী (Moderate)। চরমপন্থী ও মধ্যপন্থীর মধ্যে স্যর নীলরতন শিক্ষা ক্ষেত্রে অসহযোগের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন। আমরা তাঁহার আদেশে আবার স্নাতকোত্তর গবেষণা কার্য্যে মনোযোগ দিলাম। ব্যক্তিগত ভাবে আমি নিজে তাঁহার স্বদেশপ্রীতি, গবেষণা ও বিজ্ঞান চর্চ্চা, এই তিনের মধ্যে সমন্বয় দেখিয়া প্রায়ই তাঁহাকে বুঝিতে পারিতাম না।

তাহার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিজ্ঞানের প্রসার ও গবেষণা কার্য্যের বিস্তৃতি হয়। এ বিষয়ে অন্যান্য লেখকগণ এবং স্যর নীলরতনের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রয়োগ অনেকেই বিস্তারিত জানেন এবং বলিবেন।

স্যর নীলরতন স্মারক গবেষণা আরম্ভ হইলে দেশবাসী দেখিতে পাইবেন স্যর নীলরতন কি পরিমাণে দূরদর্শী ও ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ছিলেন। বিলাতী পোষাকে সজ্জিত নেক্‌টাই কোট প্যান্ট পরিহিত ফিট্‌-ফাট ভদ্রলোক। কিন্তু ভিতরে তাঁহার চাণক্য অপেক্ষাও কুটনীতিপূর্ণ হৃদয়, ১৮৯৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটর নির্ব্বাচিত হন স্যর নীলরতন। দুই তিনজন বড়লাটের পরে লর্ড কার্জ্জন আসিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ (Chancellor) হইলেন। এবং ১৯০৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে নূতন আইন প্রবর্ত্তন করিলেন। স্যর নীলরতন দেখিলেন যে এই দুর্ব্বার শক্তি রোধ করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই। তিনি মধ্যপন্থী হিসাবে এটি গলাধঃকরণ করেন। কিন্তু অন্তরালে স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রধান সহায়ক হিসাবে জাতীয় শিক্ষাপরিষদের সভ্য রহিয়া গেলেন। আমরা ভুলিয়া না যাই যেন স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিশ্ববিদ্যালয় রিফর্ম (১৯০৪ অ্যাক্ট) মানিয়া লন নাই। এবং তাহার অনুগামী স্যর আশুতোষকে ঠেকাইয়া দিয়া নিজে অবসর গ্রহণের সময় হইবার দুই বৎসর পূর্ব্বেই হাইকোর্ট এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-অধ্যক্ষ পদে ইস্তফা দিয়া মানিকতলা এবং পরে যাদবপুরে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধ্যক্ষ হিসাবে ব্রতী হন। এই সময়ে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ তাঁহার নেতৃত্বাধীনে অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন। স্যর নীলরতন সরকার একদিকে মধ্যপন্থী হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে, অপরদিকে তাঁহার দৈনিক আয়ের অধিকাংশই যাদবপুরের জাতীয় পরিষদ ও টেক্‌নিকাল প্রতিষ্ঠানে বিবিধখাতে নাম গোপন রাখিয়া দান করিতেন। তাঁহার অন্তদৃষ্টি এবং দূরদৃষ্টি এত সুদূর প্রসারী যাহার উন্মেষের নিমিত্ত স্যর নীলরতন স্মারক বক্তৃতা ছাড়া এইরূপ সাধারণ ভাবে বলিলে দেশবাসীর সম্মুখে ঠিকভাবে আনা হইবে না। যাঁহারা চিন্তাশীল, দূরদর্শী এবং প্রকৃত বিজ্ঞানের পথিকৃৎ তাঁহারাই স্যর নীলরতন সরকার বক্তৃতাবলী হইতে জাতীয় আদর্শের পাথেয় যোগাইবেন।

তাহার পর ব্যক্তিগত ভাবে ১৯২১ সালে তাঁহার সহ-অধ্যক্ষ পদের অবসান ঘটিল এবং প্রকৃত গবেষণা ও বিজ্ঞানের কার্য্যে সহায়তায়

দেশকে আগাইয়া লইতে লাগিলেন। ১৯২৩ সালে যখন আমরা একদল ছাত্র সরকারী চাকুরী করিব না, অথচ বিজ্ঞান চর্চ্চা চালাইয়া যাইব বলিয়া মনস্থ করিলাম, তখন তিনি তাহাদের সহায়ক হইলেন। আমাদের দলের মধ্যে ডাঃ জিতেন দত্ত ও স্বর্গীয় তারকনাথ পোদ্দার স্যর নীলরতনের দক্ষিণ ও বাম হস্তরূপে সত্যকারের সহায়ক হইলেন। ব্যক্তিগত হিসাবে তিনি আমাকে স্যর উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর সহিত গবেষণাকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। একদিকে যক্ষ্মারোগের বিশেষজ্ঞ রায়বাহাদুর গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত ও অপরদিকে ডাঃ কার্ত্তিকচন্দ্র বসুর সহিত যোগাযোগ করাইয়া দিলেন। ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি ও পুরাতন ঔষধের গবেষণা বিষয়ে তিনি উপদেশ দিতেন। তখনকার চলিত ব্যাধি ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর এবং যক্ষ্মার অভ্যুত্থান তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল। একদিকে সরকারের ডাইরেক্টর ব্রেন্টলী সাহেব—অপরদিকে জাতীয় প্রতিষ্ঠান, জাতীয় শিক্ষা পরিষদ। উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখিয়া মধ্যপন্থী স্যর নীলরতন তাঁহার দূরদর্শিতার কার্য্য করিয়া চলিতেছেন—এই সময় বহু প্রকারের ব্যাধিতে ঔষধ নিরূপণ এবং গবেষণার নুতন নুতন দিঙনিরূপণে তাঁহার দৃষ্টি আবদ্ধ হইল। ১৯২৬ সাল আমার পক্ষে একটি স্মরণীয় বৎসর। মেডিক্যাল কলেজে অবৈতনিক প্রদর্শক হিসাবে বাইও কেমিষ্টি ও ইলেক্ট্রোকার্ডিয়োগ্রাফী আরম্ভ হইবে এই সংবাদ স্যর নীলরতনকে দিতেই সর্ব্বাগ্রে স্যর নীলরতন Cambridge Model standard Electrocardiograph এর আদেশ দিলেন। তাঁহার যন্ত্র অবিলম্বে আসিয়া পড়িল। অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও প্রদর্শক নরেন্দ্রনাথ সেন তাঁহার যন্ত্র সাজাইয়া দিলেন। এদিকে হৃদ্‌রোগগ্রস্ত রোগীর সংখ্যা বাড়িতে লাগিল এবং সমস্ত রোগীকে বাড়ীতে লওয়া অসম্ভব প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তাঁহার উপদেশে অনুরূপ মডেলের স্থানান্তরযোগ্য এক টি আমাকে ক্রয় করিতে হইল। অতঃপর ডাঃ জিতেন দত্তও Valve মডেলের স্থানান্তরযোগ্য যন্ত্র ক্রয় করিলেন। যখন সম্ভব হইল আমার যন্ত্রে তাঁহার পুরাতন রোগীদের একাধিক বার ছবি লইতাম। হৃদরোগের রোগীরা নানারূপ রোগযন্ত্রণার বিষয় জ্ঞাপন করিত। স্যর নীলরতনের বিশেষত্ব এই যে, তিনি ধীর ভাবে সমস্ত ইতিবৃত্ত শুনিতেন এবং প্রয়োজনবোধে জুনিয়ারদের দ্বারা সেগুলিকে সুস্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিবার জন্যে চেষ্টা করিতেন। সমগ্র পৃথিবীতে কোথায় কি কার্য্য হইতেছে তাহার সঠিক বিবরণ জানিবার জন্য তাঁহার ঔৎসুক্যের অন্ত ছিলনা।

যখনই এক একটি নুতন হৃদরোগের রোগী পাইতাম, তখনই মেডিকাল কলেজে Mac Gilchrist সাহেবের নিকট ছবি (Electro cardiogram) তোলাইতাম এবং অনুরূপ ছবি নিজে তুলিতাম। একদিকে আমি আর সাহেব এবং অপরদিকে স্যর নীলরতন ও ডাঃ জিতেন দত্ত। আমাদের দুই বন্ধুর লড়াই (আমি আর দত্ত) মনে হইত, একদম যেন ইংরাজ ডাক্তার সাহেবের সহিত বাঙালী স্যর নীলরতনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। আমি সকালে সাহেবের সহিত ও বিকালে স্যর নীলরতনের চেম্বারে—আমাদের নরেনদা স্যর জগদীশ বসুর যান্ত্রিক বিশেষজ্ঞ—উভয়ে এই বিদ্যা-শিক্ষা। Fibro ভাঙিল। আমরা স্যর জগদীশের পরীক্ষাগারে ইলেক্ট্রোগ্রাফ আনা হইয়াছে—সেখানে Fibro প্রস্তুত করা যায় কিনা দেখিতে গেলাম। স্যর নীলরতনের ঐকান্তিকতায় নরেনদা বিব্রত। এই ঘটনা আমাকে ও বন্ধু জিতেন দত্তকে বাস্তব ক্ষেত্রে নিক্ষেপ করিল। অনন্যকর্ম্মা ডাঃ জিতেন দত্ত স্যর নীলরতন গবেষণা প্রতিষ্ঠান খুলিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চেষ্টাতে যে অর্থ সংগৃহীত হইল অধুনা প্রখ্যাত আর. জি. কর মেডিকাল কলেজে সেই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইল। ইহার পর অপ্রত্যাশিত ঘটনা পরম্পরায় আমার বন্ধু ডাঃ দত্ত উক্ত প্রতিষ্ঠান হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। তাহার পর নানবিধ ঘাতপ্রতিঘাতে এবং বয়সের আতিশয্যে স্যর নীলরতন পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইলেন। কলিকাতা হইতে দূরে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষার সুবিধার জন্য গিরিডিতে নীত হইলেন। ১৯৪৩ সালের ১৮ই মে তাঁহার জীবনাবসান ঘটিল।

তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন তাঁহার জীবন আমার নিকট যেন একটি রহস্যময় প্রহেলিকা বলিয়া মনে হইত। ১৮৬১ সালে নববাংলা গঠনের ভবিষ্যৎনিয়ন্তাগণ জন্মগ্রহণ করিলেন। সেই বৎসর মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধকাব্য বাহির হইল। বহুমুখী মনীষা বাংলার স্বাতন্ত্র্য। ডাঃ কলিদাস নাগ, স্বর্গীয় বিনয় কুমার সেন ও স্বর্গীয় অরবিন্দ ঘোষ নব বাংলা গঠনে যে যে উপকরণ প্রয়োজন তাহার ইংগিত দিয়াছেন। প্রাচীন মিশরীয় পুরাণে আছে যে ফিনিক্স পাখী জরাগ্রস্ত হইলে নিজেই নিজের চিতা সাজাইয়া নিজেকে ধ্বংস করে; সেই চিতাভস্ম হইতে পুনরায় নবকলেবর ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করে। স্যর নীলরতন ১৮৮৫ সালে যখন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়, তখন হইতে শিক্ষা-ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটর হিসাবে সরকারের শিক্ষানীতির সহিত তাল রাখিয়া ১৯০৪ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইনে চিতাভস্ম সাজাইয়া একদিকে যেমন চিতাগ্নিতে ইন্ধন যোগাইতে লাগিলেন, অপর দিকে নবকলেবর লইয়া স্যর গুরুদাসের সহায়তায় পালিত এবং রাসবিহারী ঘোষের অর্থে উভয় দিকেই অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

আমি ছাত্র হিসাবে তাঁহার এই মধ্যপন্থীয় মডারেট চালে বিহ্বল হইয়া গেলাম। এদিকে কলেজ ষ্ট্রীট দ্বারভাংগা বিল্ডিংসে ১৯১৯ সালে সহ-অধ্যক্ষ হইয়া জ্ঞানবিজ্ঞান ও গবেষণার নুতন তোরণ খুলিয়া দিলেন, অপর দিকে ৫ মাইল দক্ষিণে যাদবপুর টেক্‌নিকাল প্রতিষ্ঠানে এবং এদিকে ওদিকে অন্যত্রও হাতের কাজ, চর্ম্মশিল্প, সাবান শিল্প এবং চা-শিল্পের উন্নতির জন্য বাঙালীকে আগাইয়া দিতে তৎপর হইলেন।

বাঙালী মানুষ স্যর নীলরতনের কর্ম্ম প্রচেষ্টার সূত্র ধরিয়া বড় হউক—এই তাঁহার আশীর্বচন। আমরা তখন রাজসাহী কলেজের ছাত্র, নানা জিলায় নানা ব্যপদেশে কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন এবং নানাপ্রকার কার্য্যব্যপদেশে কলিকাতায় আসি। তিনি তাঁহারই সমবয়সী আমাদের জ্যেষ্ঠতাত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির উদ্বোধন করিয়াছেন। আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডাক্তার রাধাগোবিন্দ বসাক, যিনি

রাজসাহী কলেজের একজন সংস্কৃতের অধ্যাপক মাত্র ছিলেন—এখনও তিনি জীবিত। স্যর নীলরতন সরকার শতবার্ষিক স্মারক ব্যাজটি আমার বুকের উপর দেখিয়া স্যর নীলরতন বিষয়ে বলিলেন যে—তিনি নাকি প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে খুব উৎসাহী ছিলেন। তাঁহার সহ-অধ্যক্ষ পদে অবস্থিতির সময়ে দীঘাপতিয়ার রাজা শরৎকুমারের অর্থে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্কুলের একজন শিক্ষক রমাপ্রসাদ চন্দ বি-এ ও ডাঃ রাধাগোবিন্দ বসাক প্রভৃতি কর্ম্মীবৃন্দকে উদ্বুদ্ধ করিয়া পাহাড়পুর গৌড়, মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা এবং বাংলারসুদুর পল্লীতে কোথায় কোন প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ আছে তাহার গবেষণায় উন্মত্ত হইলেন। এই সব জিনিষের গোড়ায় স্যর নীলরতন সরকার। তিনি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের গবেষণার ফলে তাঁহার সিরাজদ্দৌলা পুস্তকে সন্নিবিষ্ট ঘটনাপরম্পরা এবং ইংরাজের চাতুরী শেষ পর্য্যায় বিশ্লেষণ করিয়া যে উদাত্ত বাণী দিয়া গিয়াছিলেন তাহারই ফলে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও এ. কে ফজলুল হক—(তদানীন্তন অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী) সেই গ্লানিকর হলওয়েল মনুমেণ্ট গভীর রাত্রে দুই ঘণ্টার মধ্যে অপসারণ করিয়া ফেলিলেন। ইংরেজের গ্লানিকর ইতিহাসের শেষ যবনিকা টানিয়া দিলেন। এই সমস্ত ঘটনা পরম্পরায় স্যর নীলরতনের প্রতি আমার প্রগাঢ় ভক্তির উন্মেষ হইয়াছে। আজ ১৮৬১তে জন্মগ্রহণ যাঁহারা করিয়াছেন এবং ১৯৬১ সালে যাঁহাদের শতবার্ষিকপূর্ত্তি হইল, বাংলা এবং বাঙালী অধ্যুষিত বারাণসীধামের পণ্ডিত মালব্য প্রভৃতি মধ্যপন্থী (যাঁহারা ধর্ম্ম এবং রাজনীতি উভয় দিকেই সম পরিমাণ অগ্রণী) ইঁহাদের মধ্যে স্যর নীলরতন উজ্জ্বল হীরকখণ্ড বিশেষ ছিলেন, তাঁহার অনুপ্রেরণা ধর্ম্মময় উদারতা—ব্রাহ্ম সমাজের একজন বিশেষ আচার্য্য হিসাবে তাঁহার দান, বাঙালীর নিকট অনবদ্য। এই শতকের প্রারম্ভে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখে গোলদীঘিতে মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন, স্যর নীলরতন, স্বর্গীয় কৃষ্ণকুমার মিত্র, হেরম্ব মৈত্র, ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং রেভারেণ্ড বি-এ, নাগ সকলেরই কেহ না কেহ প্রত্যহ বিকালে ছাত্রসমাজের প্রতি আদর্শ স্থাপন করিবার জন্য বক্তৃতামালার উদ্বোধন করিতেন। আমার ঠিক স্মরণ আছে, একদিন সন্ধ্যায় দেখিলাম কৃষ্ণকুমারবাবু "যাহারা চা খায় তাহারা চা বাগানের কুলির রক্তপান করে" এই শ্লোগান প্ল্যাকার্ডে লিখিয়া বেঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতেছেন।

আমরা ছাত্রেরা দুই হষ্টেলের হিন্দু হষ্টেল এবং ডাফিঁস্ হষ্টেলের ছাত্রেরা প্রতিজ্ঞা করিলাম সেদিন হইতে আর কেউ চা পান করিব না। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়, দেখিলাম তাহারই কয়েকদিনপরে স্বর্গীয় এ, সি, সেন এবং স্যর নীলরতন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত পৃথ্বীশচন্দ্র রায়ের বাড়ীতে বসিয়া কিরূপে চা-শিল্পের উন্নতি হয় এবং নূতন নূতন বাগান প্রতিষ্ঠা করিয়া চায়ের চাহিদা বাড়াইয়া বিদেশে রপ্তানী করিবার প্রচেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার এই সু দূরপ্রসারী অন্তর্দৃষ্টির কথা ভাবিয়া আমি এখনও বিহ্বল হই।

কি না—করিলে অবশ্যই জানিতাম। তবে বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত সক্রেটিসের ন্যায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রোগী পরীক্ষার পর তাহার পথ্যাদির বিচার করিয়া, নিজ হস্তে নহে—তাঁহার জুনিয়র ডাক্তারের হস্তলিখিত ব্যবস্থাপত্র দিয়া দিতেন এবং তাহার পর আরম্ভ হইত সেই রোগীর গৃহের সামনেই তাঁহার বিশেষ ভাষণ—সেটি নিধুবাবুর টপ্পাই হউক, দাশু রায়ের পাঁচালীই হউক, কিংবা বৈষ্ণব পদাবলীর বিশ্লেষণই হউক, সব বিষয়গুলির নিপুণভাবে অগাধ পাণ্ডিত্যের সহিত—মধ্যে মধ্যে তাঁহার অদ্ভুত ধীশক্তির পরিচয় দিয়া অনর্গল আবৃত্তি করিতেন। মধ্যে মধ্যে আমার মনে হইত, স্যর নীলরতন একটি ভ্রাম্যমান লাইব্রেরী বিশেষ।

সম্পূর্ণ বিদেশী পোষাক পরিহিত—চাকচিক্যপূর্ণ নেকটাইযুক্ত স্যর নীলরতন কি ভাবে বিদেশী ডাক্তারের সহিত বুঝিয়া চলিতেন, এখনও আমার নিকট তাহা প্রহেলিকাপূর্ণ। মনে আছে তিনি ডেন-হ্যাম হোয়াইট সাহেবকে তাঁহার সময়ানুবর্ত্তিতার আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছিলেন। ডেন-হ্যাম্ হোয়াইট সাহেব "Excuse me Sir Nilratan I was busy in a difficult case so I am late. অপরদিকে বহুবার দেখিয়াছি তিনি ইচ্ছা করিয়া নিজে দেরী করিলেন। সহাস্যে হাত কচলাইতে কচলাইতে বিনয় সহকারে ঠিক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় বলিতেন, "মাফ কর সাহেব, টেবিলের উপর চটিজুতা পায়ে দিয়া তোমাকে অপমান করি নাই ; ভাবিয়াছি এই তোমাদের রীতি।

ক্ষীয়মান ইংরাজ শাসনের অবসানে চিকিৎসার দিকে স্যর নীলরতনের অবদান জাতীয় ইতিহাসের সৃষ্টি করিয়াছে। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (Indian Medical Association) Calcutta Medical club, journal of the Indian Medical Association Journal of the Calcutta Medical club প্রতিষ্ঠা করিয়া বাঙালী তথা ভারতীয় চিকিৎসকবৃন্দের উন্নতি সাধন এবং সমগ্র পৃথিবীতে ডাক্তারদের অবদান, তাঁহার স্মরণীয় কীর্তি। আমার স্পষ্ট মনে আছে Electrocardiograph কিনিবার পর Indian Medical Association পত্রিকায় আমাকে দিয়া দুই তিনটি প্রবন্ধ লিখাইয়াছিলেন এবং নিজে হাতে প্রুফ সংশোধন করিয়া প্রধান সম্পাদক হিসাবে ছাপাইয়া আমাকে কি পরিমাণ স্নেহবন্ধনে বাঁধিয়াছিলেন—এখন ভাবিলে তাঁহার প্রতি ভক্তিরসে হৃদয় বিগলিত হয়।

অতঃপর 'করোনারি অকুশান' (Coronary Ocusion) বলিয়া ১৯২৬ সাল হইতে Sign Sympton Complsx গবেষণা করিতেছিলাম এবং এই রোগ বিষয়ে রোগী পাইলেই তাঁহার দ্বারস্থ হইতেছিলাম—ইহা একটি স্মরণীয় ঘটনা। শরীরে কোনও ব্যাধির ইংগিত ধরিতে পারা যাইতেছে না ; তিনি বলিলেন Blood Chemistry ভাল করিয়া করুন, Electrocardiography করুন। কিছুদিন পরে স্যর জগদীশ বসুর গবেষক আমার সহপাঠী বন্ধু ডাক্তার নগেন্দ্রনাথ দাসকে নিয়োগ করিলেন, "তুমি E. E. G. (Eiectrone-phalography) কর। আমার বন্ধু নগেন্দ্রনাথ দাস সমগ্র পৃথিবী ঘুরিয়া

ও তৎসংলগ্ন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উক্ত যন্ত্র E. E. G. প্রবর্তন করিলেন।

"ব্যথা" "বুকেব্যথা", "যেখানে সেখানে ব্যথা", "মাথায় ও বুকে একসংগে ব্যথা"—যে ব্যথা নিরসনের জন্য ২৫৫৫ বৎসর পূর্ব্বে রাজার পুত্র, গৌতম বুদ্ধ হইয়াছিলেন অর্থাৎ জ্ঞানী হইয়াছিলেন, সেই ব্যথা নিরসনের জন্যই স্যর নীলরতন আমাদের কতিপয় যুবকছাত্রের অনুপ্রেরণা যোগাইতেন।

যাহার জন্য স্যর নীলরতন ডেন-হ্যাম হোয়াইট হইতে এখনকার প্রধান চিকিৎসক ডাক্তার হরিহর গাঙ্গুলী পর্য্যন্ত আস্ফালন করিতেছেন যে করোনারি থ্রম্বোসিস" একটি ভয়ানক ঘটনা। অপর পক্ষে আমি একলা বুকে ব্যথা দেখিলে এবং S. T. Segnaut উঁচুনীচু হইলে Anterior Posterior, বা Septal Thrombosis বলিয়া আপামর সাধারণে পরিবেশন করিতেন। এই প্রকার S. T. Segnunt এর কোনও প্রকার উঁচুনীচু গলদ দেখিলেই আমি অক্লান্ত ভাবে একাধিকবার এবং বহুবার নূতন নূতন E. C. G Pattern দেখিতাম বুঝিতে চেষ্টা করিতাম এবং বিহ্বল হইয়া "একলা চলো রে" পন্থা অবলম্বন করিয়া ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে যোগদান করিতাম। Indian Medical Association পত্রিকা Indian Cardiological Societyর পত্রিকা আমার প্রবন্ধ প্রত্যাখ্যান করিতে লাগিল। একাধিক বার ও বহুবার বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে লইয়া—রোগী হিসাবে স্যর নীলরতন, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত ও ডাঃ রজতচন্দ্র সেনকে রোগী এবং Electro cardiographic tracing এবং রঞ্জন রশ্মি দ্বারা হৃৎপিণ্ডের ছবি উঠাইয়া Cardi troraic Ratio জ্ঞাত হইয়া কতবারই না স্যর নীলরতনের দ্বারস্থ হইয়াছিল। ধর্ম্মীয় বিশ্বাসের ন্যায় করোনারি থ্রম্বোসিস আঁকড়াইয়া ধরিয়াছি। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মান্তিক আমার নিকট প্রতিবারই মনে হইত তাঁহার সাহায্য এবং উদ্দীপনা পূর্ণ উৎসাহ বাক্য। তাঁহারই উপদেশ মতো ১৯৩৮ সালে স্যর উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর সভাপতিত্বে (লর্ড রাদার ফোর্ড মৃত হওয়ায়) আমার প্রথম প্রবন্ধ করোনারি অক্রুসান (Coronary Occlusion) বিষয়ে পঠিত হইল। এই বারেই পঠনের আর একটি সুযোগ ছিল যে বিজ্ঞান কংগ্রেস তাহার রজত জয়ন্তী বৎসর উদ্‌যাপন করেন কলিকাতায়। আমার করোনারি অক্রুসান প্রবন্ধটি এখনও দেখিতেছি আমাদের দেশে অপরিজ্ঞাত এবং অসম্মানিত। গত ৪ঠা অক্টোবর ১৯৬১ সালে বিজ্ঞান মন্দিরে যদিও কোনও তরুণ বৈজ্ঞানিকের মুখে একবারের অধিক উচ্চারিত হয় নাই; ও অধিবেশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত ডাক্তার……মহাশয়ও তাঁহার অভিভাষণে পুরাতন সংজ্ঞার অবতারণা করেন। অপর পক্ষে পশ্চিম জার্ম্মানীর প্রতি চক্ষুরুন্মেলন করিলে আমাদের দেশের তথাকথিত বৈজ্ঞানিকেরা এখনও অপাংক্তেয় এক অস্পৃশ্যতার পরিপন্থী। ২৬০০ (দুই হাজার ছয়শত) করোনারী অকৃরুশান ব্যাধির রোগীর বিবরণ দিয়া লিখিয়াছেন যে তাঁহাদের দেশের বৈজ্ঞানিক ডাক্তারেরা হৃদ্‌রোগ ব্যাধির নবতম শ্রেণীবিভাগ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব। তাঁহারা একবাক্যে বলিয়াছেন যে (ক) প্রথমতঃ ইহা একটি সংক্রামক ব্যাধি নহে (খ) বিজ্ঞানের অগ্রসরের গতিতে ব্যাধিটি সম্পূর্ণভাবে সনাক্ত (Diagnosis) হইতেছে। কারণ মামুলি রক্ত পরীক্ষা ছাড়াও Electro phorasis প্রভৃতি পরীক্ষা দ্বারা এবং করোনারী অকুশান ব্যাধিতে মৃত ব্যক্তিদের ময়না তদন্ত করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, যে কোনও বয়সে করোনারী ধমনীর সঙ্কোচন কোলেষ্টরিণ কেলাস যুক্ত হইয়া ও ধমনী সংকোচন হইতে পারে। এ বিষয়ে আমাদের নবীন কর্ম্মী স্নেহাস্পদ সরসী মুখোপাধ্যায় বলিলেন যে একমাত্র কোলেষ্টিকরণ ও স্নেহজাতীয় পদার্থের উপর (catalotion) দোষারোপ করা কর্ত্তব্য নহে। এই বক্তৃতা মালায় এটিই প্রতিভাত হইয়াছে যে খাদ্যাভাবে ক্লিষ্ট যক্ষ্মা রোগে মৃত প্রভৃতি খাদ্যাভাব জনিত ব্যাধিতে মৃত ব্যক্তিগণের ময়না তদন্তে করোন্যারী ক্লোরোসিস দেখা দিয়াছে। আমার প্রতিপাদ্য বিষয়টি এই যে করোনারি অকুরুশান একটি ব্যাধি—থ্রম্বোসিস নহে। যতগুলি ময়না তদন্ত আমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং ময়না তদন্তের টেবিলে ডাঃ সরকার যিনি এখন নীলরতন সরকার মেডিকাল কলেজের ময়না তদন্তের অধ্যাপক তিনি ইহার সাক্ষ্য বহন করেন।

এখন আমার সম্পাদ্যটি হইবে :—(১) করোনারী অকুরুশান নিবার্য্য ব্যাধি; (২) এই ব্যাধি যে কোনও বয়সে সংঘটিত হইতে পারে; (৩) ইহার সুচিকিৎসা হইলে প্রত্যেক রোগীই নিরাময় হইতে পারে; (৪) রাসায়নিক ক্রিয়া যেমন প্রতিবর্ত্তনীয় (Every Chemical actions inversible) তেমনই কলাতন্ত্রের পরিবর্ত্তন প্রতিবর্ত্তনীয়। এই নীলরতন সরকার স্মারক বক্তৃতাবলীতে শল্য চিকিৎসক অজিত কুমার বসু, ডাঃ আইকৎ ও তাঁহাদের সহকর্ম্মীরা দেখাইয়াছেন যে যকৃতের বহু কোষ যদি তন্তুীভূত হইয়া যায় (Filrosis) এই দুই কারিচি যদি পুষ্ট কোষ (Healthy live Cells) বিদ্যমান থাকে তাহা হইলেও অপ্রতিবর্ত্তনীয় কলাতন্ত্রের পরিবর্ত্তন হইয়া নূতন পুষ্ট কোষের সমাবেশ হইতে পারে। তেমনই আমি বিশ্বাস করি হৃৎপিণ্ডের ওজন যাহা ৫ হইতে ৭ আউন্স পর্য্যন্ত সাধারণ ওজন বাড়িয়া ১৫-১৬ এমনকি ৪০ আউন্স পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়াছে (ময়না তদন্তে আমি স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি) তাহাও পরিবর্ত্তনীয়। পরিশেষে এই সম্পর্কে আমি শেষ আবেদন জানাইব যে আমাদের এই স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশে লোকমত পরিবর্ত্তন করিয়া এমন একটি পরিবেশের সৃষ্টি করিতে হইবে যাহাতে ময়না তদন্ত প্রত্যেক মৃতদেহে করণীয় বলিয়া ধার্য্য হয়, তাহা হইলে দেখা যাইবে কী ব্যাধিতে আমার পিতামহ, পিতামাতা, বা পুত্র অকালে কাল গ্রাসে পতিত হইল। আমারই করোনারী অকুরুশান ঘটিত এক স্মারক Calcutta Madical Club এ বক্তৃতার ছলে সভার সভাপতি স্বর্গীয় ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল তাঁহার একমাত্র পুত্র ও পত্নীর মৃত্যু এই করোনারী অকুরুশানে সংঘটিত হয়। তিনি আমা কর্ত্তৃক ময়না তদন্তে

টেবিল হইতে আনিতে পুলিশ কমিশনার আদেশ ক্রমে আনীত হৃৎপিণ্ড-গুলি পরীক্ষা করিয়া এই তথ্যে উপনীত হইয়া ছিলেন যে এমন সময় আসিবে যখন প্রত্যেক রোগ ময়না টেবিলে প্রমাণিত হইবে। ডাক্তার-আইন (Medicolegal) ময়না তদন্তে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও ময়না তদন্তের ক্লেশ ব্যাধির জীবাণু ও বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য পরীক্ষার পর দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিগণের সাজা হইয়াছে। সম্পাদ্য বিষয়ের মধ্যে আরও বলিতে চাই যে পুলিশ যদি কুকুর নিযুক্ত করিয়া এবং সন্দেহ হইলে ময়না তদন্ত করিতে পারে, তখন আমরা সাধারণ লোক আমাদের পরমাত্মীয় স্বজনের ময়না তদন্ত করিয়া কেন আমরা বৈজ্ঞানিকেরা নূতন তথ্য উত্থাপন করিয়া বিজ্ঞানের জ্ঞানে অগ্রসর হইব না ? স্যর নীলরতন স্মারক বক্তৃতায় আমার একইমাত্র নিবেদন হইবে, জীবনে মরণে সর্ব্ব বিষয়েই বৈজ্ঞানিক ভাবে আমাদের চলিতে হইবে।

বসু বিজ্ঞান মন্দিরে স্যর নীলরতন মেমোরিয়াল প্রতিষ্ঠিত থাকুক যতদিন না আমরা স্যর নীলরতনের নামে কয়েক লক্ষ টাকা উঠাইয়া নবতমভাবে রোগ নির্ণয় ও পরম চরম কার্য্য ময়না তদন্ত আপামর সাধারণে প্রচার করিয়া বিজ্ঞানের অবদান গ্রহণে কেহ কার্পণ্য না করি।

পরিশেষে আমার একইমাত্র সবিনয় নিবেদন এই মৌলিক গবেষণায় ব্যক্তিবিশেষের বা প্রতিষ্ঠান বিশেষের প্রতি যদি অপমানের কোনও অবতারণা করিয়া থাকি, একজন বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক কর্মঠ স্যর নীলরতনের অনুগামী শিষ্য হিসাবে ক্ষমার্হ। ইহাই আমার বক্তব্য।

বাংলা সাহিত্যে যদুনাথ সরকার

অমল হালদার

দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণা নদীর তীরে বদ্রি গ্রামে বাদশাহ আওরংজীব বসে কাছারি করছিলেন, এমন সময় সালাবৎ খাঁ-মীর তুজুক একজন লোককে এনে উপস্থিত করল। লোকটি বলল :—আপনার শিষ্য হবার জন্য আমি সুদূর বাঙলা দেশ থেকে এখানে এসেছি ; আশা করি আমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে।'

বাদশাহ মুচকি হেসে পকেটে হাত চালালেন। প্রায় একশ টাকা ও সোনা রূপোর টুকরো বার করে ঐ লোকটির নিকট পাঠিয়ে দিলেন, বললেন :—'ওকে বলো যে আমার নিকট থেকে যে অনুগ্রহ প্রত্যাশা করেছে তা এই।' লোকটি করলে কি, টাকাগুলো হাত পেতে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল নদীতে। হুকুম পেয়ে চাকরেরা তাকে জল থেকে টেনে তুলল। বাদশা তখন একজন মন্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন, বাঙলা থেকে একজন লোক আমার শিষ্য হবে এই পাগলা খেয়াল নিয়ে এখানে এসেছে। ওকে সরহিন্দ শহরের পণ্ডিত মিঁয়া মহম্মদ নাফির নিকট নিয়ে গিয়ে তাঁর শিষ্য করে দাও।

"টপু লেণ্ডা, বাউরী ডেণ্ডী,

চুহা খাদন মাউমী,

তু-খাল্‌, বাধে হজ্‌॥

আওরংজীব ও বাঙ্গালী মুসলমান বিষয়ক অজানিত ও অনালোচিত একটি বাদশাহী কাহিনী মূল ফরাসী পুথির উপেক্ষিত পাতা থেকে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে প্রকৃত রসপিপাসু ও তথ্যসন্ধানী ইতিহাস-বেত্তার গবেষণার আলোক সম্পাতে। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর দলিল-দস্তাবেজ ঘেঁটে বা দুষ্প্রাপ্য ফরাসী পুঁথি সন্ধান করে শাহজাহানের প্রজাবাৎসল্য' বা আওরংজীবের প্রজাপালন কিংবা নূরজাহানের বাঘ-শিকার' নিয়ে লেখা এমনি খোস মেজাজী বহু বিচিত্র 'বাদশাহী গল্প' পরিবেশন করে গেছেন আচার্য যদুনাথ সরকার (প্রবাসী-৬ষ্ঠ সংখ্যা ১৩১৮ সাল)। শুধু মোগল আমলের অনধিগম্য অন্ধকারময় প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে তিনি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নানা উপকরণ সংগৃহীত করে বঙ্গ ভারতীর সমৃদ্ধি সাধন করে যাননি; শিবাজী ও মারাঠা জাতির অভ্যুদয় আর মারাঠা ইতিহাসের ধারার বিজ্ঞানদীপ্ত গবেষণার দ্বারাও তাকে করেছেন সুষমামণ্ডিত। আচার্য যদুনাথের নিরলস এই জ্ঞান-তপস্যা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ছিল অটুট-অম্লান।

ইতিহাস পাঠ ও ইতিহাস চর্চা জীবনে তাঁর প্রধান ব্রত হলেও আচার্য যদুনাথ ছিলেন বঙ্গ সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক। তিনি কেবল ইংরেজীতে প্রথম-শ্রেণীর প্রথমই হননি (অধ্যাপক পার্সিভ্যাল ও অধ্যাপক এইচ-আর জেমান-এর কাছে ইংরেজী প্রবন্ধপত্রে শতকরা নব্বই-এর উপর নম্বর পেয়ে রেকর্ড করেন) প্রথম জীবনে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক ও ছিলেন। আচার্য যদুনাথের জীবনভর সাধনা ও গবেষণার প্রায় পুরোপুরি সবগুলি ইংরেজীতে রচিত। তবু বঙ্গভারতীর প্রতি তাঁর কথনও বৈমাত্রেয় মনোভাব ছিল না। বাংলা কাব্য ও উপন্যাসের তিনি ছিলেন পরমভক্ত। বাল্যে বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সাহিত্যিকদের রচনা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই এসে পৌঁছত তাঁর নিকট। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর হয়েছিল 'রাখীবন্ধন'। ১৬ই অক্টোবর, ১৯০৫-সালে রবীন্দ্রনাথ রাখীর সঙ্গে যদুনাথকে যে কার্ডখানি পাঠিয়ে ছিলেন, তার এক পিঠে লেখা ছিলঃ শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার

কর প্রকোষ্ঠেষু

ভাই ভাই এক ঠাঁই
ভেদ নাই, ভেদ নাই !

কার্ডের অপর পিঠে :—

বন্দে মাতরম!

এক দেশ এক ভগবান
এক জাতি এক মহাপ্রাণ।

বাংলার মাটি ইত্যাদির ১৬ পংক্তি। রবীন্দ্র-যদুনাথ পত্রাবলীঃ—'প্রবাসী'

ফাল্গুন,-১৩৫২

আন্তরিক শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ তাঁর "অচলায়তন" নাটকখানি অধ্যাপক যদুনাথের নামে উৎসর্গও করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের "সোনার তরীর ব্যাখ্যা ও দুই কবি হেমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্রনাথের একটি দান, প্রভৃতি নানা বিবিধ নিবন্ধে রবীন্দ্র-কাব্যের প্রতি যদুনাথের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও রসবেত্তার নিবিড় পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, সমাজ, শিক্ষা, রাজনীতি সম্বন্ধে বহু বাঙ্গলা প্রবন্ধের এবং কয়েকটি গল্পের ইংরাজী অনুবাদ করে তিনি "মডার্ণ রিভিয়ু" প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশ করেন। অধ্যাপক যদুনাথের এ সব অনুবাদের স্বীকৃতি ও প্রশংসা সি, এফ, এণ্ড্রুজ সাহেবের এক পত্রে উল্লেখ রয়েছে। 'শকুন্তলার' ("প্রাচীন সাহিত্য") কিছু বাদ-সাদ দিয়ে যদুনাথ যে অনুবাদটি করে 'মডার্ণ-রিভিয়ু' তে প্রকাশিত করেছিলেন, সে সম্পর্কে এক পত্রযোগে কবি তাঁকে জানান।

'আপনি যেভাবে তর্জমা করিয়াছেন, ইহাই আমার কাছে ভাল বোধ হইল। বাংলায় যে সকল অলংকার শোভা পায়, ইংরাজীতে তাহা কোনো মতেই উপাদেয় হয় না, এইজন্ত বাংলা মূলের অনেকটা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। ইংরাজীতে সর্বপ্রকার বাহুল্যবর্জিত বক্তব্য বিষয়টির অনুসরণ করিলে ভাল হয়।'

('প্রবাসী' ফা ১৩৫২)

ইংরেজী অনুবাদের মারফৎ বাংলা না জানা পাঠকদের নিকট রবীন্দ্র কাব্য ও সাহিত্য সাধনার মূল সুরটি তুলে ধরার উদ্দেশে অধ্যাপক যদুনাথ রবীন্দ্র সাহিত্যের অনুবাদে নিশ্চয় প্রণোদিত হয়েছিলেন। তাঁর অনুবাদের মধ্যে 'মডার্ণ রিভিয়ু' তে প্রকাশিত নীচের এ রচনা কয়টি বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়:—Phillosophy of Indian History (vol, VIII, 1910) Sakuntala Its Inner Meaning (1911), Future of India (1911), Impact of Europe on India (I & II) India's Epic (1912). The Supreme Night Short Story (1912) Admant Short Story (1912) Kalidas the Moralist [1913], ইত্যাদি।

মনীষী যদুনাথের লেখা বাংলা বইয়ের সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়। আঙ্গুলের করেই গোণা যায়। 'শিবাজী'ই তাঁর পুস্তাকাকারে প্রকাশিত প্রসিদ্ধ বাংলা গ্রন্থ। 'শিবাজী' প্রকাশিত হয় ১৯২৯ সালে, এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৬৪ "মারাঠী জাতীয় বিকাশ" (সরল কাহিনী) প্রকাশিত হয়, ইংরাজী ১৯৩৬ সালে। বইখানি আকারের দিক থেকে খাঁটি বইয়ের পর্যায়ে পড়ে কিনা সন্দেহ। পৃষ্ঠা সংখ্যা তার মাত্র ৪৮। তার শেষ নিবন্ধ মহারাষ্ট্রে সাহিত্য ও ইতিহাস উদ্ধারের কাহিনী'টি।

এব্যতীত বহু বাংলা বইয়ের গল্প উপন্যাসের, ভূমিকাও তিনি লিখেছেন। তাদের মধ্যে বংগীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীসজনীকান্ত দাস ও ব্রজেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত বঙ্কিম গ্রন্থাবলী—'দুর্গেশনন্দিনী,' 'আনন্দমঠ' ; 'দেবী চৌধুরাণী,' 'রাজসিংহ ও 'সীতারাম' এর আচার্য যদুনাথের লিখিত—ভূমিকাগুলি তাঁর ইতিহাস অনুশীলন ও সাহিত্যবেত্তার শ্রেষ্ঠ নির্দশন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মোগল যুগে স্ত্রীশিক্ষা', 'জাহান-আরা' 'শিবাজী' মহারাজ,' রেজাউল করীমের বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ' প্রভৃতি বহু গ্রন্থের সুচিন্তিত ভূমিকা লিখে দিয়ে তিনি তাঁদের গৌরব বর্ধিত করেছেন।

আচার্য যদুনাথ সরকার লিখিত—দেবী চৌধুরাণীর ঐতিহাসিক ভূমিকাটি থেকে নীচে খানিকটা উদ্ধৃত করা গেল।

"...আনন্দমঠ, সীতারাম ও দেবী চৌধুরাণীতে বঙ্কিম কাব্য রচনা করিতে বসিয়াছিলেন। 'রাজসিংহ' এ তিনটি অপেক্ষা অনেক অধিকমাত্রায় ঐতিহাসিক হইলেও তাহাকে কাব্য বলা ভুল হইবে, যদি "কাব্য" বলিতে জীবনের অন্তস্থলের পর্যালোচন,—"a criticism of life" (ম্যাথু আর্ণল্ডের ব্যাখ্যা) বুঝি, এই তিনখানি মহাগ্রন্থে ইতিহাস লেখা, এমনকি ঐতিহাসিক দৃশ্যপট আঁকা পর্যন্ত বঙ্কিমের উদ্দেশ্য ছিল না ; মানবের হৃদয়কে দিব্য জ্যোতিতে আলোকিত করা, তাহাকে উর্দ্ধতম স্তরে তুলিয়া দেওয়া, এক্ষেত্রে ইহাই ছিল তাঁহার প্রতিভার কাজ। ..." (ভূমিকা :— দেবী চৌধুরাণী। বঙ্কিম শত-বার্ষিক সংস্করণ)

বংগীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত আনন্দমঠের যদুনাথের বিশদ ঐতিহাসিক ভূমিকাটিও এখানে স্মরণীয়। ভারতে ইতিহাসের দুরূহ গবেষণাক্ষেত্রে তিনি যেমন পরাঙ্মুখ মেকি মামুলি পথ ছেড়ে বিজ্ঞানসম্মত জাতীয়তাবাদী ইতিহাস চর্চার পথ প্রদর্শন করেছিলেন, তুলনামূলক সাহিত্যালোচনার ক্ষেত্রেও তেমনি তিনি তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও সুনিপুণ বিশ্লেষণী শক্তির পরিচয় দেখিয়েছেন ......বঙ্কিমের আনন্দমঠ প্রথা লীটনের পন্থার বিপরীত।... (ভূমিকা আনন্দমঠ, বঙ্কিম শত-বার্ষিক সং।)

আচার্য যদুনাথ সরকারের জীবনভর ইতিহাস ও সাহিত্য সাধনার বহু নিদর্শন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়, এমনি শতাধিক রচনা পুরনো 'প্রবাসী' 'প্রভাতী' ভারতবর্ষ, 'সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা', 'মাসিক বসুমতী', 'দেশ', [illegible] 'শনিবারের চিঠি' প্রভৃতি বিভিন্ন সাময়িক পত্র পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। আচার্য যদুনাথকে তাঁর ৭৮তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে যে সম্বর্ধনা জানান হয়েছিল, তখন অবশ্য তাঁর ইংরাজী বাংলা রচনার মোটামুটি একটা তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছিল। এ তালিকা সংকলিত হয়েছিল ১৯৪৯ সালে। তার পরও নানান প্রবন্ধ তার বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বিস্মিত প্রায় তাঁর কয়েকটি পুরনো প্রবন্ধের উল্লেখ করিলাম এখানে :—

প্রবাসী :—আওরংজীবের আদি লীলা (কার্তিক—১৩১১) চাটগাঁ ও জলদস্যুগণ (পৌষ—১৩১২) 'বাঙালীর ভাষা ও সাহিত্য' (মাঘ ১৩১৭) 'বাদশাহী গল্প' (আশ্বিন—১৩১৮) মুসলমান আমলের ভারত শিক্ষা' (কার্তিক ১৩২৭) পাটনার প্রাচীন চিত্র (মাঘ ১৩২৩) 'মুর্শীদকুলী খাঁর অভ্যুদয়' (কার্তিক ১৩২৯) বঙ্গের শেষ পাঠান বীর (অগ্র ১৩২) 'বাঙ্গলার স্বাধীন জমিদারের পতন' (ভাদ্র ১৩২৯) দেশের ভবিষ্যৎ (আশ্বিন ১৩৫৫) 'আমার জীবনের তন্ত্র' (পৌষ ১৩৪৫) কবি বচন সুধা (অগ্রহায়ণ ১৩৫৮) দুই রকম কবি—হেমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ (ভাদ্র ১৩১৪) ইত্যাদি।

ভারতবর্ষ :—পাটনার কথা (ফাল্গুন ১৩২৩) রামমোহন রায়ের কীর্তি (অগ্রহায়ণ ১৩২৬) মুঘল ভারত ইতিহাসের লুপ্ত উপাদান (চৈত্র ১৩২৬) 'বেকার' (আষাঢ় ৪৪) অরাজক দিল্লী (১৭৪৯—৮৮) ইত্যাদি।

'প্রভাতী' (অধুনালুপ্ত) :—বাঙ্গলার একখানি প্রাচীন ইতিহাস আবিষ্কার' (বৈশাখ ১৩২৯) শাহজদার শিক্ষা—(মাঘ ১৩৩০) সম্রাট শাহজহানের দৈনন্দিন জীবন' (পৌষ ১৩৩০) 'ভারতের ঐশ্বর্য' (ভাদ্র ১৩২৯) ইত্যাদি।

শনিবারের চিঠি—'রবীন্দ্রনাথের একটি দান'—(আশ্বিন ৪৮) 'বঙ্কিম প্রতিভা—(আষাঢ় ১৩৪৫) প্রতাপাদিত্যের সভায় খ্রীষ্টান পাদরী—(১৩৫৫)।

সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা :—রামমোহন রায়ের বিলাত যাত্রা (১৩৪৭) হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৩৪৯) নাট্য সাহিত্য কোথায় গেল ? (১ম সংখ্যা,—১৩৫১) ইত্যাদি।

এ ছাড়াও অধুনালুপ্ত 'অলকা' 'মানসী ও মর্মবাণী,' 'জাহ্নবী' প্রভৃতি বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় আচার্য যদুনাথের একাধিক তথ্যপূর্ণ সুচিন্তিত বাংলা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে যেগুলি আজিও রয়ে গেছে [illegible]

পাঠকদের দৃষ্টির আড়ালে। শুধু ইতিহাস বা সাহিত্য নয়, বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান, অর্থনীতি, শিক্ষা প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে তাঁর বহু জ্ঞানপূর্ণ বাংলা প্রবন্ধ এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে—যাদের অবিলম্বে সংকলিত করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা কর্তব্য। বর্তমান বাংলা নাটকের দুরবস্থা দেখে এ-সম্পর্কে রচিত তাঁর একটি প্রবন্ধের অংশ বিশেষ প্রকাশ করলাম। বাংলাসাহিত্যের দরদী আচার্য যদুনাথের মনীষার ছাপ এখানেও প্রস্ফুটিত।

"আজ আমাদের মধ্যে থিয়েটার প্রায় লোপ পাইয়াছে, যে দুই একটি এখনও বাঁচিয়া আছে, তাহারা ক্ষয়িষ্ণু বাঙালী জাতির মতই আসন্ন মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রামে ক্রমশঃ পিছাইতেছে। আজ সিনেমা টকির রাজত্ব, এই একচ্ছত্র আধিপত্য রাজধানী ছাড়িয়া মফঃস্বলের ছোট ছোট শহরে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে।······

কিন্তু থিয়েটার একেবারে উঠিয়া গেলে মানবের আদিম কাল হইতে প্রিয় একটি লোকশিক্ষার উপরে এবং হৃদয়ের রসগ্রহণ ও রস প্রকাশের সহজাতশক্তিকে বিকাশ করিবার একটি পন্থা একেবারে লোপ পাইবে।···আমি শুধু ভাবিতেছি যে, থিয়েটার ত গেল, কিন্তু নাটকেরও কি মৃত্যু হইয়াছে? যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে বাঙ্গলা সাহিত্যের একটা অঙ্গ গেল। এই নাটকের ভিতর দিয়াই আমাদের পূর্বসুরিদের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা—প্রকাশ পাইয়াছিল, সংস্কৃতে এবং প্রথম যুগের নববঙ্গ সাহিত্যে নাট্যকারদের দানে অমর হইয়া আছে। সে পথ কি চিরতরে বন্ধ হইল? (নাট্য সাহিত্য কোথায় গেল?) —সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা (১ম ও ২য় সংখ্যা .৩৫১)

এমনিতরো বহু প্রবন্ধে জ্ঞানতাপস সাহিত্যসাধক আচার্য যদুনাথের পাণ্ডিত্য ও মননশীলতার প্রত্যক্ষ ছাপ ছড়িয়ে আছে। ব্যবসা প্রণোদিত নয়, ব্যবসা প্রণোদিত নয়ই বা কেন? প্রগতিশীল এমন বহু পুস্তকব্যবসায়ীর বা সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের অভাব নাই আজ দেশে, জাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারকল্পে জাতীয় সরকারও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই, আচার্য যদুনাথ নিজেও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের দীর্ঘকাল ধরে সভাপতি ও অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, আচার্য যদুনাথের লেখা পুস্তকাকারে প্রকাশিত নয় এখন সব বাংলা রচনাবলীর সঙ্কলনে আশা করি তারা সচেষ্ট হবেন। এ বিষয়ে এঁরা যতসত্বর অগ্রসর হবেন ততই বঙ্গ সাহিত্য ও বঙ্গ সংস্কৃতি শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠবে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে মেদিনীপুরের ইতিহাস

শ্রীবিনোদ কিশোর গোস্বামী

(১৬০১খৃঃ-১৭০০খৃ)

শালি-ধানস্য চোহপাদ গণ্ডিচাদেশে প্রজায়তে
কৃষ্ণকানাং ভূরিবাসো যত্র নাস্তি চ কাননম্।
প্রাণকরাখ্যো নৃপতির্গণ্ডিচাদেশস্য শাসকঃ
মেদিনাকোষকারশ্চ যস্য পুত্রো মহানভূৎ
বিহায় গাণ্ডিচাদেশং মেদিনীপুরং জগাম সঃ॥
(রাজা রামচন্দ্রকৃত প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথি)

মহামহোপাধ্যায় ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় শিখরভূমির অধিপতি ৺রামচন্দ্র কৃত প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথি হইতে উদ্ধৃত এই শ্লোকটির সহায়তায় মেদিনীপুর জেলার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় অনুমান করিয়াছেন যে, মেদিনীকোষ ১২০০খৃঃ হইতে ১৪৩১ খৃঃ মধ্যে লিখিত হইয়াছে। এই সময়েই মেদিনীপুর নগর স্থাপিত হয়। সেই কালে মুসলমান আধিপত্যের সময়েও গৌড়াঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দুরাজা ছিলেন। রাজা প্রাণকরের পুত্র মেদিনীকর মেদিনীপুর নগর স্থাপন করেন। তাঁহার নামানুযায়ী এই নগরের নাম বঙ্গের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছে। মেদিনীপুর জেলার ইতিহাস বহু বিচিত্র ঘটনায় সমৃদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ষোড়শ

শতাব্দীর রাষ্ট্র বিপ্লবের প্রধান ভূমি ছিল এই মেদিনীপুর। পাঠান রাজত্বে মেদিনীপুরের জনজীবনে দুঃখের অবধি ছিল না। ১৫৯৯ খৃঃ হইতে ১৬০০খৃঃ ওসমান খাঁর নেতৃত্বে আফগানগণ বিদ্রোহী হইয়া জলেশ্বর ভূখণ্ড সহিত সমগ্র উড়িষ্যা অধিকার করেন। তৎকালে রাজা মানসিংহ তদীয় নৈপুণ্য ও বীর্যবত্তায় এই বিদ্রোহ দমন করিয়া দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর সূচনায় মেদিনীপুরের শাসনের পটভূমিকায় এই থমথমে ভাব বিদ্যমান।

হিজলীর জমিদার সলিম খাঁ বিচিত্র মানুষ। সপ্তদশ শতাব্দীর মেদিনীপুরের ইতিহাসে ইহার প্রভাব কম নয়। শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক ৺যদুনাথ সরকার মহোদয় ইহার পরিচয় বিশেষভাবে তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথমে ইসলাম খাঁ বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। ১৬০৮খৃঃ আবুল হসন্ (পরবর্ত্তীকালে আসাব খাঁ উপাধিতে ভূষিত) সম্রাট সাজাহানের শ্বশুর —বঙ্গের দেওয়ান নিযুক্ত হন। নূতন সুবাদারের সহিত তিনি আগ্রা হইতে বঙ্গে আগমন করেন। ১৬০৯খৃঃ ৩০শে মার্চ্চ নবাব ইসলাম খাঁ ফতেপুর খাঁ ফতেপুর হইতে কুঁচ করিয়া তাণ্ডাপুর পৌছান। তাণ্ডাপুরে সেই সুবেদার সাহেবের অভ্যর্থনার কথা আজ আর কাহারও মনে নাই। কিন্তু ইতিহাস ভুলিবে না। সেইদিন উড়িষ্যার অন্তর্গত হিজলীর জমিদার সলিম খাঁ, গেঁচটের জমিদার ইন্দ্রনারায়ণের ভ্রাতা, মন্দারণের রাজার পিতৃব্য পুত্র ১০৯টি হাতী লইয়া নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। নবাবের বিশ্বস্ত কর্মচারী শেখ কমাল সাক্ষাৎকারের এই জাঁকজমকপূর্ণ ব্যবস্থা করেন। পাঠান রাজত্বে মেদিনীপুরের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। পাঠান মোগলের সংঘর্ষ, জমিদারের অত্যাচার সর্বত্র বিভীষিকার সঞ্চার করিয়াছিল। জনসাধারণ দুঃখেও অশান্তিতে দিন কাটাইতেছিল। মোগল সম্রাট আকবর শাহের কালে উড়িষ্যা মোগল-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। মেদিনীপুরও মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। বিখ্যাত রাজস্ব-সচিব টোডরমল্ল মেদিনীপুর জেলাকে ২০টি মহলে বিভক্ত করেন। মহল গুলির নাম যথাঃ- (১) বাগড়ী (২) ব্রাহ্মণভূম (৩) মহাকালঘাট ওরফে কুতুবপুর (৪) মেদিনীপুর (৫) খড়গপুর (৬) কেদারকুণ্ড (৭) কাশিজোড়া (৮) সবঙ্গ (৯) তমলুক (১০) নারায়ণপুর (১১) তরকোল (১২) মালপিটা (১৩) বালীগাছী (১৪) ভোগরাই (১৫) দ্বারশ্বরভূম (১৬) জলেশ্বর (১৭) গাগনাপুর (১৮) রাইন (১৯) করোই (২০) বাজার। ইহা ছাড়া তৎকালে বাংলা সরকার মান্দারণের অন্তর্গত চিতুয়া, সাহাপুর, মহিষাদল, হাভেলী মান্দারণ এই চারিটী মহালও মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত হয়। এক একজন জমিদারের হস্তে প্রত্যেক মহালের শাসন সংরক্ষণ ও রাজস্ব আদায়ের ভার সংন্যস্তছিল। অর্দ্ধস্বাধীন দেশাধিপতিগণের বংশধরেরা এই মহালগুলির জমিদাররূপে আত্মপ্রকাশের কেহ কেহ সুযোগ পান। মোগল শাসনকালে পাঠান রাজত্বের ন্যায় শাসনকার্য্যে দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইত না। জমিদারী সনন্দ দান প্রথাও মোগল রাজত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। নূতন জমিদারী পত্তনেও নূতন জমিদারকে সনন্দের নিয়মগুলি পালন করিতে হইত। মোগল বাদশাহের জমিদারী যথেচ্ছ উচ্ছেদের ক্ষমতা থাকিলেও তাহার অপব্যবহার হইত না। জমিদারের পরলোকগমনের পর তাঁহাদের উত্তরাধিকারীরাই জমিদারী পাইতেন। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের নূতন সনন্দ লইতে হইত। মহালের কার্য্যাদি পরিদর্শনের জন্য আমিন ও কানুনগো কর্মচারী থাকিত। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে একজন সুবাদারই বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা তিনটি রাজ্যের শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে উড়িষ্যায় স্বতন্ত্র শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হয়। ১৬২২খৃঃ জাহাঙ্গীরের তৃতীয় পুত্র শাহাজাদ খোরাম (পরবর্ত্তীকালে সম্রাট সাজাহান নামে সুপরিচিত) পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া দাক্ষিণাত্য হইতে উত্তর অভিমুখে অগ্রসর হন। তিনি উড়িষ্যা ওমেদিনীপুরের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলে উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা আহম্মদবেগ খাঁ পলাইয়া বর্দ্ধমানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বর্দ্ধমান অধিকার ও নবাব ইব্রাহিম খাঁকে পরাজিত করিবার পর শাহজাদা বঙ্গবিজয়ের পর দুইবৎসর বঙ্গাধিপতি ছিলেন। এই বিদ্রোহের সহযোগীরূপে কয়েকজন হিন্দু রাজা ও পাঠান সামন্ত শাহজাদার বলবৃদ্ধি করিয়াছিল। ১৬২৪ খ্রীঃ সম্রাট জাহাঙ্গীরের সেনাদল এলাহাবাদের সন্নিকটে শাহজাদার দলকে পরাজিত করিলে তিনি মেদিনীপুরের মধ্য দিয়া দাক্ষিণাত্যে চলিয়া যান। এই সময়ের একটি

টনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিদ্রোহী খোরাম যখন মেদিনীপুরের মধ্য দিয়া সুদূর দাক্ষিণাত্যে চলিয়া যাইতে ছিলেন সেই সময় নারায়ণগড়ের জমিদার রাজা শ্যামবল্লভ এক রাত্রির মধ্যে দ্রুত গন্তব্য পথ প্রস্তুত করেন। বিদ্রোহী খোরাম সেই দুর্দিনে সহযোগিতার কথা মনে রাখিয়াছিলেন, তাই পরবর্ত্তীকালে তিনি যখন শাহজাহান রূপে ভারত সাম্রাজ্যের অধিপতি হইলেন তখন তিনি রাজা শ্যামবল্লভকে গাড়ী-সুলতান বা 'পথের রাজা' উপাধিতে ভূষিত করেন। সেই ঐতিহাসিক দলিল সম্রাট শাহজাহানের পঞ্চাঙ্গুলি চিহ্নাঙ্কিত রক্তচন্দনেলিপ্ত পারস্যভাষায় লিখিত উপাধিনামা পুরুষানুক্রমে নারায়ণগড়ের রাজভবনে রক্ষিত ছিল। শাহজাদা খোরাম বিদ্রোহীরূপে যখন বাংলায় আগমন করেন তখন পর্ত্তুগীজগণের অত্যাচার তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাই পরবর্ত্তীকালে তিনি যখন ভারত সিংহাসনের অধীশ্বর হইলেন তৎকালে বাংলার শাসনকর্ত্তা কাশীম খাঁকে পর্ত্তুগীজ ব্যবসায়ীগণের প্রধানকেন্দ্র হুগলী অধিকারের আদেশ প্রদান করেন। ১৬৩২ খৃঃ কাশীম খাঁ হুগলী অধিকার করেন। ১৬৬৬ খ্রীঃ পর্ত্তুগীজগণের হিজলীর কুঠীও তিনি তাঁহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া অধিকার করেন। শাজাহান মগ-দস্যুদের দমনের জন্য নওয়ার মহল গঠনের আদেশ দেন এবং ফৌজদারী বঙ্গোপসাগর উপকূলে স্থাপন করেন। ভৌগলিক সংস্থানের দিক হইতে সেকালে হিজলীর গুরুত্ব অনেকখানি ছিল। তাই তিনি ব্যবসায়ীগণকে, নৌযাত্রীগণকে, পণ্যবাহী জলযানকে জলদস্যুর হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য এবং বঙ্গোপসাগর কূলকে সুরক্ষিত করিবার নিমিত্ত হিজলীতে একটি ফৌজদারী প্রতিষ্ঠিত করেন। সুলতান সুজা কুড়ি বৎসর বাংলার সুবাদার ছিলেন। তিনি মগ ও ফিরিঙ্গীর উৎপাত বন্ধ করিয়াছিলেন। সুজার রাজত্বকালে ডক্টর বৌ-টনের কল্যাণে ইংরেজ কোম্পানী বার্ষিক তিনহাজার টাকা দিয়া বাংলায় বিনাশুল্কে বাণিজ্যের অনুমতি পায়। কোম্পানীর অধ্যক্ষ যব চার্ণকের সহিত দেশীয় শাসক কর্ত্তৃপক্ষগণের বিবাদের সূত্রপাত হয়।

মোগল ও ইংরাজের সংঘর্ষ—বাংলার নবাবের সহিত ইংরাজের বিপদ্-নাটকের এক অঙ্ক মেদিনীপুরের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। হুগলী যুদ্ধের পর হুগলী নদীর উপর ইংরাজদিগের কর্ত্তৃত্ব যথেষ্ট বাড়িয়া যায়, ইংরাজদিগের রণপোতসমূহ একপ্রকার সমগ্র হুগলী নদী অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু নদীর পার্শ্ববর্ত্তী যুদ্ধোপযোগী তেমন কোনো স্থান তাঁহাদের অধিকারে ছিল না। বাংলার নবাব শায়েস্তা খাঁ প্রথমে ইংরাজদিগের ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, চার্ণক সেই আশাতেই সুতানুটিতে অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু ইহার কিছুকাল পরেই ইংরাজদিগের জনৈক বন্ধুর সহিত নবাবের মনোমালিন্য ঘটে; ইংরাজেরা প্রকারান্তরে তাহার সহায়তাকারী বিবেচনা করায় নবাব পূর্ব্বকৃত প্রতিশ্রুতিভঙ্গ করিয়া প্রকাশ্যভাবে তাহাদের সহিত শত্রুতা করিতে লাগিলেন। সুতরাং ইংরাজদের যুদ্ধ ভিন্ন গত্যন্তর রহিল না। কাপ্তেন্ নিকলসন্ নবাবের হুগলীর কুঠী ভস্মসাৎ করিয়া হিজলী অধিকার করিলেন। হিজলীর মোগল-সৈন্যাধ্যক্ষ মালিক কাসিম বিনাযুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন। তাঁহার রসদ, কামান, দুর্গ ইত্যাদি সমস্ত ইংরাজদিগের হস্তগত হইল। ১৬৮৭ খ্রীঃ ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ৪২০ জন সৈন্যসহ চার্ণক হিজলীতে উপনীত হইয়া নিজেকে সুরক্ষিত করিলেন। (মেদিনীপুরের ইতিহাস—শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু পৃঃ ১৯৯) ২৮শে মে নবাবের বহুসংখ্যক সৈন্য রসুলপুর নদী পার হইয়া হিজলীর দক্ষিণ দিকে ঘন অরণ্য মধ্যে শিবির স্থাপন পূর্ব্বক সুযোগের অপেক্ষায় রহিল। নবাবসৈন্যের বিপুল উদ্যোগ আয়োজনে ইংরাজদের মনে আতঙ্কভীতি সঞ্চার হইয়াছে। কিন্তু চার্ণক হতাশ হইলেন না। তিনি বুঝিয়াছিলেন, এই যুদ্ধের জয়পরাজয়ের উপরই তাহাদের ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল। তাঁহার দৃঢ়মনোবলে দুর্গ অধিকারে অসমর্থ মুসলমান সেনাপতি আবদুস সামাদ সৈন্য হটাইয়া লইলেন। স্মরণীয় ১লা জুন তারিখে ডেনহ্যাম সাহেব ৪০।৫০ জন সৈন্য লইয়া ইংল্যাণ্ড হইতে আসিলেন, এই ৪০।৫০ জন সৈন্য পাইয়া যব চার্ণক সাহেবের হৃদয়ে নবীন বল সঞ্চার হইল। রণকুশলী ধূর্ত্ত চার্ণক সাহেব কৌশল অবলম্বন করিয়া তিনি এই মুষ্টিমেয় সৈন্যদলকে একবার জাহাজ হইতে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া পশ্চাৎ দিক দিয়া আবার জাহাজে গিয়া উঠিবার আদেশ দিলেন। এইভাবে ৫।৭ বার প্রদক্ষিণ করিয়া তাহারাই পুনরায় দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল। মোগল সৈন্যেরা দূর

হইতে এইভাবে সৈন্যবাহিনীর গমনাগমনে আতঙ্ক ও ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। মোগল সেনাপতি চিন্তাক্লিষ্ট-ভীতিগ্রস্ত-নৈরাশ্যে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। ৪ঠা জুন তারিখে তিনি সন্ধির প্রস্তাব করিয়া চার্ণক সাহেবের কাছে লোক প্রেরণ করিলেন। শত্রু পরিবেষ্টিত দুর্গমধ্যে ক্ষুধাপীড়িত উপবাসকৃশ সৈন্যেরা নৈরাশ্যের ধূম্রজালে আবৃত। তাহাদের দুর্গে খাদ্য নাই। দীর্ঘদিন রণশ্রমে ক্লান্ত সৈন্যদল। রোগক্লিষ্ট অসমর্থ শরীর বহন করিয়া বাঁচিয়া আছে অল্পসংখ্যক সৈন্য। প্রধান জাহাজের তলা ছিদ্র হইয়া গিয়াছে। যব চার্ণকের শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। এই নৈরাশ্যময় পটভূমিকায় দুর্গে অবরুদ্ধ চার্ণকের নিকট সন্ধির প্রস্তাব অনিবার্য্যরূপে শুভকারক হইয়াছিল। তাই তিনি কালবিলম্ব না করিয়া ১০ই জুন সন্ধির দিবস স্থিরীকৃত করিয়া দিলেন। সন্ধির সর্ত্ত নির্দ্ধারিত হইল। তারপর চার্ণক সাহেব বিজয়গৌরবের দীপ্ত গরিমা লইয়া উলুবেড়িয়া ফিরিয়া গেলেন।

সম্রাট ঔরঙ্গজেবের (১৬৫৮ খৃঃ—১৭০৭ খৃঃ) সময়ে শায়েস্তা খাঁ ছিলেন বাংলার সুবাদার। পরবর্ত্তীকালে সুবাদার হন নবাব ইব্রাহিম খাঁ। সেই সময়ে চিতুয়া বরদা পরগণার ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারী তেজীয়ান্ শোভাসিংহ বর্দ্ধমানের জমিদার কৃষ্ণরামের সহিত সংঘর্ষ উপলক্ষ করিয়া অস্ত্রধারণপূর্ব্বক বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্বলিত করেন। উড়িষ্যার পাঠান দলপতি রহিম খাঁকে (১৬৯৫-৯৬ খৃঃ) শোভাসিংহ তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করেন। রহিম খাঁ শোভাসিংহকে বিদ্রোহে সহায়তা করেন। যুদ্ধে কৃষ্ণরাম রায় নিহত হন। তৎপুত্র জগৎরাম রায় পলাইয়া ঢাকা গমন করেন। তিনি শান্তিপ্রিয় বীর নবাব ইব্রাহিম খাঁকে সকল ঘটনা বিস্তারিতভাবে জানাইলেন। নবাব বাহাদুর সকল কথা শ্রবণ করিয়া বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তাই তিনি হুগলী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুরের যুক্ত ফৌজদার নুরউল্লা খাঁকে বিদ্রোহ দমনের জন্য পরোয়ানা জারী করেন। নুরউল্লা খাঁ ছিলেন যুদ্ধানভিজ্ঞ, ব্যবসায়ী, অর্থলোলুপ ও লোভী। সুবাদারের নির্দেশমত ফৌজদার হিসাবে সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। তোড়জোড় সবই করিলেন। কিন্তু যুদ্ধের বিভীষিকা স্মরণ করিয়া আতঙ্কে ম্রিয়মান হইয়া পড়িলেন। যুদ্ধও করিলেন না। ভয়ে চুঁচুড়ার ওলন্দাজ বণিক সম্প্রদায়ের নির্ভর পক্ষপুটে তিনি আশ্রয় লইলেন। অবশেষে ভীতচিত্ত নুরউল্লা কৌপীন পরিয়া ফকির সাজিয়া নিঃশব্দে পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। সুবাদার ইব্রাহিম খাঁ এই দুঃসংবাদে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তাড়াতাড়ি ওলন্দাজদের সহায়তায় তিনি হুগলী অধিকার করিলেন। সপ্তগ্রাম হইতে বিদ্রোহীরা পশ্চাদপসরণ করিল। এদিকে শোভাসিংহ বিদ্রোহী বর্দ্ধমানরাজকে নিজ অধীনে আনয়ন করেন। বর্দ্ধমান রাজপরিবারের এক অনিন্দ্যসুন্দরী কুমারী কন্যাকে শয্যাসঙ্গিনী করিবার লোভে অধীর হইয়া পড়িলেন। কামান্ধ শোভাসিংহ পৈশাচিক বৃত্তিতে উন্মত্ত হইয়া যেই পবিত্র স্নিগ্ধমূর্তি নারীকে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইবেন, তৎক্ষণাৎ সেই বীরাঙ্গনা নিজ অঞ্চলে লুক্কায়িত শাণিত ছুরি তাঁহার উদরে বসাইয়া দিলেন। কামাসক্ত শোভাসিংহের মরদেহ ধরণীর ধূলায় লুটাইয়া পড়িল। রাজকুমারীও নির্ভীককণ্ঠে বলিলেন, পাপীর স্পর্শে কলঙ্কিত দেহ আর বহন করিব না। এই বলিয়া নিজ বক্ষে শাণিত ছুরি আমূল বিদ্ধ করিলেন। মেবারের রমণীগণের গৌরবের ন্যায় ব্রতচারিণী নারীর জীবন চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। পরবর্ত্তীকালে বিদ্রোহীদলের অধিনায়ক নির্ব্বাচিত হইলেন রহিম খাঁ। শোভাসিংহের ভ্রাতা হিম্মৎ সিংহ রহিম খাঁর সহিত মিলিত হইয়া শান্তিপ্রিয় জনসাধারণের উপর অত্যাচার সুরু করিলেন। বিদ্রোহীদের দ্বারা রাজমহল হইতে সমগ্র মেদিনীপুর অধিকৃত হইল।

দিল্লীর সম্রাট ঔরঙ্গজেব সংবাদপত্র মারফৎ এই সব সংবাদ জ্ঞাত হইলেন। তিনি কুপিত হইলেন। রাজ্যের এই বিশৃঙ্খলায় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ক্রোধাগ্নিতে ইব্রাহিম খাঁর পদচ্যুতির সময় ঘনাইয়া আসিল। অবিলম্বে তিনি ইব্রাহিম খাঁকে পদচ্যুত করিলেন, স্বীয় পুত্র আজিম ওসমানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করিলেন, ইব্রাহিমের সাহসী পুত্র জবরদস্ত খাঁকে সেনাপতি পদে বৃত করিলেন। জবরদস্ত খাঁর নামের ভিতর যে তেজ লুক্কায়িত ছিল তাহার কর্ম্মেও সেই বীরত্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। সেনাপতি জবরদস্ত খাঁর প্রতাপ ও প্রবল আক্রমণে রহিমা খাঁ উড়িষ্যা পলাইয়া গেল। ধীরে ধীরে সকলেই তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে। বিদ্রোহের তরঙ্গাভিঘাতে মেদিনীপুর জেলার অবস্থা খুব

শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। একটানা অরাজকতায় চারিদিকে অশান্তির বিষ ছড়াইয়া ছিল। অসংখ্য নিরপরাধ ব্যক্তি উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হয়। এই সময়ে শিবায়ন কাব্য রচনাকারী রামেশ্বর ভট্টাচার্য উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্যকে জন্মভূমি বরদা-পরগণাভুক্ত যদুপুর গ্রাম হইতে বিতাড়িত হইয়া কর্ণগড় রাজার আশ্রয় লইতে হয়।

জমিদার বংশ—মেদিনীপুরে জমিদার বংশ অনেক। তাঁহাদের কীর্ত্তি মেদিনীপুর জেলার সর্ব্বত্র বিরাজিত। যদিও কোনো কোনো কীর্ত্তি কালগর্ভে বিলীন হইয়াছে—কোনোটি অদ্যাবধি জীর্ণপ্রাসাদে পরিণত হইয়া সেকালের সাক্ষ্য দিতেছে।

চন্দ্রকোণার রাজবংশ স্মৃতির মণিকোঠায় রাজপুতের চৌহান বংশের বগড়ীতে প্রতিষ্ঠার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ১৬১০ খৃঃ চৌহানের মৃত্যুর পর পুত্র আউর সিংহ রাজা হইলেন, কিন্তু রাজ্যে সুখ ছিল না। নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা রাজ্যে দেখা দিল। ১৬৬০ খৃঃ আউর সিংহের মৃত্যুর পর চৌহান বংশীয় ছত্রসিংহ চন্দ্রকোণা প্রদেশের শাসনকর্ত্তা বগড়ীরাজ্য অধিকার করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর পুত্র তিলকচন্দ্র ১৬৪৩ খৃঃ এবং পৌত্র তেজচন্দ্র ১৬৭৬ খৃঃ বগড়ি রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হন। ছত্রসিংহের পুত্র তেজচন্দ্র বিষ্ণুপুর মল্লরাজের দুর্দ্দমনীয় আক্রমণে পরাভূত হইলেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেন, তিনি নিহত হন। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি পলায়ন করেম। মল্লভূমির রাজা বগড়ি রাজ্যে দুর্জ্জনমল্ল নামক এক ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তমলুক রাজবংশের রাজা রামভুঁঞার পুত্র শ্রীমন্ত রায় ১৫৬৬ খৃঃ হইতে ১৬১৭ খৃঃ পর্য্যন্ত ছিলেন। এই সময়ে তোডরমল্ল সুবা বাংলার রাজস্ব হিসাব প্রস্তুত করেন।

কাশীজোড়া রাজ-বংশ—রাজা প্রতাপনারায়ণ রায়ের পরলোকগমনের পর তদীয় পুত্র হরিনারায়ণ রায় ১৬৬০ খৃঃ রাজা হন। ১৬৬৯ খৃঃ রাজা হরিনারায়ণের পরলোকগমনে তৎপুত্র রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ পিতৃরাজ্যে স্থলাভিষিক্ত হন। নবাবের রাজস্ব বাকী পড়ায় অত্যাচারিত রাজা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। রাজা বাকী-রাজস্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করেন। ১৬৯২ খৃঃ পুত্র দর্পনারায়ণ রায়ও ঐ মতানুযায়ী চলেন।

নারায়ণগড় রাজ-বংশ—গোপীবল্লভের (১৫৮৯ খৃঃ—১৬১৩ খৃঃ) পরবর্ত্তী তৎপুত্র শ্যামাবল্লভ শ্রীচন্দন রাজা হন। তাঁহার সময়ে রাজ্যের প্রভূত উন্নতি ঘটে। ১৬৭৮ খৃঃ শ্যামাবল্লভের মৃত্যুর পর ক্রমান্বয়ে বলভদ্র (১৬৭৯ খৃঃ—১৬৮৭ খৃঃ), রঘুনাথ (১৬৮৮ খৃঃ—১৬৯৫ খৃঃ), লালমণি (১৬৯৬ খৃঃ—১৭০৫ খৃঃ) পর্য্যন্ত রাজা ছিলেন।

কিশোরনগর রাজ-বংশ—দ্বারিকানাথের মৃত্যুর পর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রায়কিশোর ভ্রাতুষ্পুত্রকে বঞ্চনা করিয়া প্রায় ৫০ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। রায়কিশোর ১৬৯৩ খৃঃ পরলোকগমন করেন। তৎপুত্র ভূপতিচরণ রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হন।

জলাযুটা জমিদারী ও বাসুদেবপুর রাজবংশ—কৃষ্ণ পণ্ডা এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি ১৬০৭খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিনারায়ণ চৌধুরী ১৬০৫খৃঃ হইতে ১৬৪৫ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। কনিষ্ঠ পুত্র গোপাল নারায়ণ চৌধুরী ১৬৪৫ খৃঃ হইতে ১৬৮৫ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজা ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে হরিনারায়ণ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র দিবাকর চৌধুরী (১৬৮৫ খৃঃ ১৬৯৪ খৃঃ) তৎপর দিবাকরের পুত্র রাম চৌধুরী (১৬৯৪ খৃঃ-১৭৩৪ খৃঃ) রাজত্ব করেন। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান।

গোপীবল্লভপুরের রাজবংশ—রাজা অচ্যুতানন্দের পুত্র রসিকানন্দ এই বংশের প্রধান পুরুষ। ১৬৫২ খৃঃ তাঁহার পরলোকগমনের পর হইতে ইহা গোপীবল্লভপুরের গোস্বামী বংশ বলিয়া সুপরিচিত।

মন্দির, মসজিদ ও গীর্জা—দ্বারশরভূম মহলের অন্তর্ভুক্ত ছিল বর্ত্তমান কেশিয়াড়ী নামক পরগণা। ঐ স্থানে সুপ্রসিদ্ধ সর্ব্বমঙ্গলার মন্দির। সেই মন্দিরের গাত্রে ও মন্দিরের অভ্যন্তরে বিজয়মঙ্গলা মূর্ত্তির পাদপীঠে সংলগ্ন উড়িষ্যাভাষায় লিখিত শিলালিপি হইতে জানা যায়, ঐ ভূমিখণ্ডে রঘুনাথ ভূঞা নামে জনৈক জমিদার ছিলেন। তৎপুত্র চক্রধর ভূঞা ১৫২৬ শকাব্দে (১৬০৪ খৃঃ) মহারাজ মানসিংহের অনুরোধক্রমে দেবীমন্দির ও জগমোহন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। রাণী লক্ষণাবতীর গিরিধারী জিউর মন্দির ১৬৫৫ খৃঃ লালগড় দুর্গে প্রতিষ্ঠিত হয়।

মেদিনীপুরের অন্তর্গত নরমপুরে অসম্পূর্ণ একটি মসজিদ আছে। জনশ্রুতি আছে, সাহজাদা খোরাম দাক্ষিণাত্যে

ফিরিবার সময় একদিন সেখানে ছিলেন। সেদিন ছিল ঈদপর্ব। সাহজাদার উপাসনার জন্য ঐ মস্‌জিদ তৈরী হইয়াছিল। অল্পসময়ে নির্ম্মাণে উহা অসম্পূর্ণ থাকে। সাহজাদা নমাজ পড়েন। সাহজাদা খোরাম পরবর্ত্তীকালে সাহজাহানরূপে মেদিনীপুর আগমনের স্মৃতিটি আজও নরমপুরের ভূমি বহন করিয়া আছে। সম্রাট সাজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুজার কশবাগ্রামে (নারায়ণগড় অন্তর্গত) বাংলার তৎকালীন শাসনকর্ত্তা থাকাকালে ১০৬০ বঙ্গাব্দে মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। মখদুম শাহের মসজিদ ১৬৬০ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৬২৬ খৃঃ জেসুইট নামীয় পাদরী ধনশালী খৃষ্টানের নিকট হইতে ভিক্ষালব্ধ অর্থে হিজলী সহরে গীর্জ্জা নির্ম্মাণ করেন। সংক্ষিপ্তভাবে সপ্তদশ শতাব্দীতে মেদিনীপুরের মন্দির-মস্‌জিদ-গীর্জ্জার ইতিহাস সংগ্রহ করা হইয়াছে।

অদ্ভুতপুরুষ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব—ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব বাঙ্গালীর জনজীবনে ও সাংস্কৃতিক জীবনে যুগান্তর আনয়ন করে। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু এই ভূমির উপর দিয়া পুরীধামে গিয়াছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মেদিনীপুরের সুসন্তান ভক্তবীর শ্যামানন্দের কথা কাহারও অবিদিত নাই। প্রেমবিলাসে আছে—

নিত্যানন্দ ছিলা যেই, নরোত্তম হৈলা সেই
শ্রীচৈতন্য হইলা শ্রীনিবাস।
শ্রীঅদ্বৈত যাঁরে কয়, শ্যামানন্দ তিঁহো হয়,
ঐছে হৈলা তিনের প্রকাশ॥

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের আবেশাবতার শ্রীশ্যামানন্দ। তাঁহার লিখিত 'অদ্বৈততত্ত্ব', 'উপসনাসার সংগ্রহ' 'বৃন্দাবন পরিক্রমা' গ্রন্থত্রয় প্রসিদ্ধ। ১৬৩০ খৃঃ শ্যামানন্দের তিরোভাব হয়। শ্যামানন্দের দিব্যজীবনের অলৌকিক মহিমা বৈষ্ণবসমাজে সমাদৃত। তাঁহার সম্প্রদায়ের পরবর্ত্তীকালে আচার্য্যরূপে তদীয় শিষ্য রসিকানন্দ সুপ্রতিষ্ঠিত হন। রসিকানন্দ গোবিন্দপুরে গুরুর মহোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত করেন। বাসুদেব ঘোষ শ্রীগৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী। তাঁহার পাদস্পর্শে মেদিনীপুরভূমি পবিত্রীকৃত হইয়াছে; রসিকানন্দ শ্যামানন্দের শিষ্য হইয়া উড়িষ্যায় শ্রীচৈতন্যধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীলরসিকানন্দ ১৫৯০ খৃঃ পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্যানুবাদ করেন সনাতন চক্রবর্ত্তী ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে। ঐ শতাব্দীতে কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য শিরায়ন কাব্য রচনা করেন। শ্যামানন্দের শিষ্য দুঃখী শ্যামদাস 'গোবিন্দমঙ্গল' ভক্তিগ্রন্থ ও 'শ্রীরাধিকার বারমাস্যা' লিখিয়া অমর হইয়া রহিয়াছেন। পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতি। মাঝে মাঝে এই কথা বিবেককে কষাবাত করে। বঙ্গের প্রাচীন গৌরব মধ্যযুগের ইতিহাস আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে স্মৃতির অগ্নিরেখায় দীপালী মহোৎসবের মতই ইতিহাসের ঘৃত প্রদীপ শত শত অনাবিষ্কৃত অধ্যায়ের দীপাবলী মনের আঙ্গিনায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিবে।

কবি

শ্রীরবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

রহিয়াছ বসি লেখনি লইয়া কে তুমি
কি ছবি আঁকিবে বল রক্তে ভাসে ভূমি,
মানুষ দানব হয়ে সেই রক্তে দিতেছে
সাঁতার। অঞ্জলী ভরিয়া সবে নিতেছে
লুটিয়া; এই পৃথিবীর কণ্ঠ চাপি যত ঘন তার।
কোথায় সৌন্দর্য্য, আলো, শুধু অন্ধকার।
কবি, বুঝিতে কি পারিতেছ সেই মর্ম্মব্যথা?
শুনেছ কি বুভুক্ষের অন্তরের কথা!
আকাশের বাণী যদি শুনে থাক কবি,
রক্তের আখরে তবে আঁক রাঙা ছবি।

পাঞ্জাবে পাঁচদিন

নারায়ণ চৌধুরী

গত সেপ্টেম্বর মাসে আমরা জনকয় সহকর্মী ও বন্ধু মিলে পাঞ্জাব গিয়েছিলাম। যাওয়াটা ঠিক ভ্রমণ উপলক্ষে নয়, কার্যোপলক্ষে—তবে ওই সুযোগেই পাঞ্জাবের কয়েকটি জায়গা ঘোরা হয়েছিল। আজ তারই স্মৃতির টুকরো এখানে পরিবেশন করি।

প্রতি বৎসর গান্ধী স্মারকনিধির একটি বাৎসরিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এক এক বার এক এক রাজ্যে এর অধিবেশন হয়। এবার হয়েছিল পাঞ্জাবের কর্ণাল জিলার পট্টিকল্যাণ নামক জায়গাটিতে। তিন দিন ব্যাপী এই সম্মেলন হয়। অন্যান্য বারে নিধির সঞ্চালকেরাই (প্রতি রাজ্যের শাখার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) এতে যোগ দিয়ে থাকেন; এবারে সঞ্চালক বাদে প্রতি রাজ্যশাখা থেকে প্রকাশন বিভাগের সম্পাদক, একজন প্রতিনিধি-স্থানীয় গ্রামসেবক ও একজন তত্ত্বপ্রচারক (গান্ধী ভাবধারার প্রচারক) সম্মেলনে আহূত হয়েছিলেন। আমরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে এই চারজন সম্মেলনে যোগদান করি—শ্রীশক্তিরঞ্জন বসু (সঞ্চালক), শ্রীনীতীশ রায়চৌধুরী (মুখ্য গ্রামকর্মী ও বর্ধমান জিলাস্থিত সেনপুর গ্রামের গান্ধীঘরের পরিচালক), শ্রীশিশির সান্যাল (বাঁকুড়া জিলার ভারপ্রাপ্ত তত্ত্বপ্রচারক) ও আমি। আমাদের বাংলা শাখার চেয়ারম্যান ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয়েরও এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকবার কথা ছিল, কিন্তু কার্যান্তরে ব্যাপৃত থাকায় শেষ পর্যন্ত তাঁর যাওয়া হয়নি।

সম্মেলনে গান্ধী স্মারকনিধির অনেক বড় বড় কর্তাব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ সর্বভারতীয় জনজীবনেও সুপরিচিত। তিনদিন ব্যাপী সম্মেলনে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। অনেক প্রস্তাব পাশ হয়। সে সব গান্ধীনিধির ঘরোয়া ব্যাপার। এখানে সে সবের বিবরণ দেবার প্রয়োজন নেই। সম্মেলন শেষ হবার পর আমরা পাঞ্জাবের অভ্যন্তরভাগের কিছু কিছু অংশ ঘুরে দেখেছিলাম—সে কথাটাই এখানে বলি। অবশ্য তার আগে পট্টিকল্যাণ জায়গাটির একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

পট্টিকল্যাণ কর্ণাল জিলার একটি গ্রাম। দিল্লী থেকে চল্লিশ মাইলের মধ্যে। এখানে পাঞ্জাব গান্ধী স্মারকনিধির মূল কেন্দ্র স্থাপিত। দিল্লী থেকে আম্বালা অভিমুখে যে রাস্তা চলে গিয়েছে, তার গা ঘেঁসে এক বিরাট প্রান্তরের মধ্যে কেন্দ্রটির অধিষ্ঠান। স্কুল, লাইব্রেরী, কুটীর-শিল্প ভবন, আশ্রমিকদের থাকবার পাকা ঘরবাড়ী, অতিথি-শালা পুষ্করিণী ইত্যাদি নিয়ে কয়েক একর জমির উপর এক জমজমাট ব্যাপার। শুনলাম নিধির আনুকূল্য ছাড়াও পাঞ্জাব গভর্ণমেন্টের অর্থ সাহায্য এর পিছনে আছে। জায়গাটি গ্রামবাসীদের দেওয়া। মাত্র কয়েক বছর আগে যে জায়গা একটি জঙ্গলাকীর্ণ ঊষর ভূমি ছিল, পাঞ্জাব নিধি-কর্মীদের চেষ্টায় আজ তাই এক কলকোলাহলময় কর্মমুখরিত বিশাল সেবা-নিকেতন হয়ে উঠেছে। এখানে বুনিয়াদী শিক্ষার স্কুল আছে, খাদি-উৎপাদন ও বিক্রয়ের ভাণ্ডার আছে, গ্রাম-সংগঠনের অন্যান্য আয়োজন আছে। বেশ পরিপাটি সুবিন্যস্ত একটি সমাজ-সেবা কেন্দ্র। কেন্দ্রটির পরিচালকের নাম ওমপ্রকাশ ত্রিখা। সুদর্শন মধ্যায়তন ধীরস্থির একটি মানুষ। গায়ের রঙ্ বেশ ফর্সা। বয়স ষাটের কোঠায়। পাঞ্জাবের গান্ধীবাদী মহলে ত্রিখাজী সবিশেষ পরিচিত।

অধিবেশন চলা কালে আমরা একদিন পট্টিকল্যাণ গ্রামখানি ঘুরে দেখতে গিয়েছিলাম। আমাদের সঙ্গে ছিলেন মহারাষ্ট্র থেকে আগত কয়েকজন প্রতিনিধি। তাঁরাও আমাদেরই মত পাঞ্জাবের গ্রামজীবনের অবস্থা সরজমিনে পর্যবেক্ষণ করবার জন্যে সমুৎসুক।

পট্টিকল্যাণ গ্রামটি আশ্রমের অদূরেই অবস্থিত। বেশ সম্পন্ন গ্রাম, তবে বড় নোংরা। রাস্তা-ঘাট খুবই অপরিচ্ছন্ন। গ্রামের প্রবেশ পথে একটি জলায় অনেকগুলি মোষ গলা ডুবিয়ে আছে। এ দৃশ্য উত্তর-ভারতে হামেসাই দেখা যায়। গ্রামের দুই অংশ। এক অংশে অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্নেরা বাস করে—তাদের মধ্যে এককালীন জমিদার জোতদার থেকে শুরু করে সাধারণ মধ্যবিত্তরা রয়েছে, অন্য অংশে হরিজনদের বাস। হরিজনদের অবস্থা খুবই অনুন্নত। বাড়ী-ঘর দোরের অবস্থা শ্রীহীন। রাস্তাঘাট খুবই অপরিষ্কার। রাস্তার ধারে এক চারপায়ার উপর বসে কয়েকজন সকালের অনুগ্র রোদে গল্প-গুজব করছিল। আমাদের দেখতে পেয়ে অভিবাদন জানাল ও আমাদের বসতে বলল। চার পায়াটি আমাদের বসবার জন্য ছেড়ে দিয়ে নিজেরা মাটির উপর বসল। আলাপ আলোচনায় জানা গেল, এদের অনেকেরই জমি নেই, যথা-মহলে জমির জন্যে আবেদন জানিয়েও নাকি কিছু ফল হয় নি। মাঝে-মাঝে মজুরীর কাজকর্ম জোটে, তাইতেই কোন রকমে দিন-গুজরান করে। সকালের রোদে ওই যে ওরা ধূমপানের সূত্রে বেশ একটা জমাট পাকিয়ে নিজেদের মধ্যে গল্প-গাছা করছিল, তার অর্থই হল ওদের হাতে কোন কাজ নেই। বাধ্যতামূলক আলস্যের গ্লানি দমিত করবার জন্যে ওদের ওইভাবে সময় কাটানো।

দেখলুম গ্রামে সম্পন্ন অংশের মানুষদের বিরুদ্ধে ওদের মনে শতেক অসন্তোষ। ওদের মোড়লস্থানীয় ব্যক্তিটি কয়েকটি অভিযোগের বর্ণনা করল। দেখলাম সকল স্থানেই এই এক অবস্থা—বিত্তবান ও বিত্তহীনদের মধ্যে লড়াই, মন কষাকষি। সমাজে বর্তমানে যে দ্বন্দ্ব

ষম্য—বর্তমানে তা সুপরিকল্পিত শান্ত উপায়ে দূর করবার চেষ্টা না হলে এই অবস্থার অবসান ঘটবে বলে মনে হয় না।

গ্রামে হরিজনদের আলাদা মন্দির। বর্ণহিন্দুদের মন্দিরে তাদের বেশ করতে দেওয়া হয় না। পাশেই গ্রাম সংগঠনের আদর্শযুক্ত কটি বিশাল সেবা-প্রতিষ্ঠান অবস্থিত, তথা এখানে এই অব্যবস্থা চলিত—এই অসঙ্গতি আমার মনকে পীড়া দিল। আশেপাশের মুষদের ভাগ্যোন্নয়নের কাজেই যদি নিজেদের দলবল ও সঙ্গতিবলকে বিশেষভাবে কাজে না লাগালুম, তবে কী হবে ব্যাপক ও দূর প্রসারী ঠনমূলক পরিকল্পনা হাতে নিয়ে। এই বৈষম্য এখানেই যে প্রথম দেখলুম তা নয়। আরও অনেক জায়গায় দেখেছি। তাইতেই অবিচারটা আরও বেশী করে চোখে পড়ল।

আমরা দুটি মন্দিরই দেখেছিলুম। আয়োজন ও উপচারে কী আকাশ পাতাল পার্থক্য। হরিজনদের মন্দিরে কোন বিগ্রহ নেই। একটি মাটির ঢিবির মত জায়গায় খানিকটা তেল-সিঁদুর লেপে রাখা হয়েছে। দেয়ালের গায়ে একটি ত্রিশূল ঝুলানো। ব্যস, এইমাত্র উপকরণ। আর-কোন উপচার কুঠরীটির মধ্যে নেই। এতই সামান্যদর্শন ও উপাদান-বিরল একটি ঘর যে মন্দির বলে এর পরিচয় না দিলে মন্দির বলে একে চেনা শক্ত। হরিজনদের ভাগ্য সর্বত্রই এরকম রিক্ততার উপর নড়বড়ে ভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

আমরা মোড়লকে বললুম—জমির জন্য পাঞ্জাব সরকারের কাছে আবেদন করতে। সরকার সদাশয় হলে জমি মিলেও যেতে পারে। আমরা আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি ও জানিত মত কোথায় আবেদন করতে হবে তার একটা ঠিকানা বাতলে দিলুম। মোড়ল ঠিকানাটি লিখে রাখবার জন্যে কাগজ কলম আনতে ছুটল। সারা হরিজন পাড়ায় দোয়াত-কলম খুঁজে পাওয়া গেল না। শেষে বেশ-কিছুক্ষণ খোঁজাখুজি ও এ বাড়ী সে-বাড়ী তল্লাসের পর তাদেরই স্বজাতি এক পাঠশালা পড়ুয়া ছেলের বাড়ীতে একটি ভাঙা কলম ও কালি-শুকিয়ে আসা দোয়াতের সন্ধান মিলল। তাইতেই কোন রকমে নাম-ঠিকানা লিখে দিয়ে এককালীন কর্তব্য পালনের স্বস্তি ও নিখরচায় সমাজ সেবার তৃপ্তি পাওয়া গেল।

গ্রামের যেদিকটায় অপেক্ষাকৃত সচ্ছল গৃহস্থদের বাস, তাদের অনেকেরই পাকা কোঠা-বাড়ী। বাড়ীগুলি বেশ ঠাসাঠাসি—শহরের বাড়ীর মতই পরস্পরের গা ঘেঁষে আছে, মধ্যে কোন ফাঁক নেই। আমাদের বাংলাদেশের গ্রামঘরের চেহারা থেকে এ গ্রামের চেহারা একেবারেই আলাদা। গ্রামের ভিতরে গাছপালা ঝাড়-জঙ্গল ডোবা-পুকুর কিছুই চোখে পড়ল না। মাঝে-মাঝে পাকা ইঁদারা, তা থেকে জল নেবার ব্যবস্থা। পাঞ্জাবের ভূমিপ্রকৃতি শুষ্ক, ভূমিতে তৃণ তরুলতার আচ্ছাদন নেই তা নয়, তবে তা গ্রাম থেকে দূরে-দূরে। জলাভাবও খুব প্রকট। অথচ ইদানীং সেচের কল্যাণে এই উষর পাঞ্জাবের [illegible]

কৃষককুলের মধ্যে পাঞ্জাবের কৃষকরাই সবচেয়ে সমৃদ্ধ, এই তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা। অথচ ভাবতে অবাক লাগে, মাত্র পনেরো বছর আগে এই পাঞ্জাবের উপর দিয়ে দেশ বিভাগের সবচেয়ে বড় ঝাপ্টাটি বয়ে গেছে অতি নিষ্করুণভাবে। বাইরে থেকে পাঞ্জাবকে দেখে বড় শান্ত স্থিতিশীল বলে মনে হয়। বিপর্যয়ের আঘাত বোধ করি তারা এতদিনে সামলে উঠেছে। হৃদয়-ক্ষত এত সহজে শুকোয় না, সে ভিতর থেকে হৃদয়কে কুরে-কুরে খায় ও যন্ত্রণার অনুভূতিকে জাগিয়ে রাখে; তবে বাইরে অনেক সময় তার উপর পুরু প্রলেপ পড়ে। পাঞ্জাবের বর্তমান অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, সে তার হৃদয়বেদনাকে বিস্মৃতির ঘন আবরণ দিয়ে ঢেকে বাইরে পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে আপনাকে মানিয়ে নেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেছে।

বাংলার অবস্থা কিন্তু আদৌ সেরকম নয়। এখনও তার হৃদয়-ক্ষত দগদগে ঘায়ের মত হয়ে আছে, তা থেকে প্রতিনিয়ত রক্ত ঝরছে। দেশভাগের চূড়ান্ত বিপর্যয়কারী আঘাতের টাল সামলাতে না পেরে বাংলাদেশ আজও অশান্ত, অস্থির, চঞ্চল।

* * *

অধিবেশন চলতে থাকা কালে ত্রিপাঠী এসে জানালেন, পাঞ্জাব সরকার সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দকে ভাকরা-নাঙ্গাল বাঁধ দেখবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, যাঁদের যাবার ইচ্ছা তাঁরা যেন নির্দিষ্ট সময়ে প্রস্তুত থাকেন। সম্মেলনে প্রায় শতাধিক প্রতিনিধি সমাগত হয়েছিলেন, তার মধ্যে জনা আশি-পঁচাশি যাবার জন্যে তৈরী হলেন।

আমাদের নিয়ে যাবার জন্য পাঞ্জাব সরকারের দুটি বড় বাস রাত থেকে মোতায়েন ছিল, ভোর চারটেয় অন্ধকারের কুয়াসার মধ্যে আমাদের যাত্রা শুরু হল। যাত্রী-বোঝাই দুটি বাস পল্লিকল্যাণ কেন্দ্রের গেট পেরিয়ে বড় রাস্তায় এসে পড়ল।

রাস্তার দুই ধারে বিস্তীর্ণ মাঠ। মাঝে মাঝে গ্রাম। অন্ধকারে ভাল ঠাহর হয় না। পথে আমরা খাদি গ্রামোদ্যোগ কমিশনের অন্যতম কর্মকেন্দ্র নীলোখেরি পেরোলাম, তারপর পানিপথ। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ পাণিপথের যুদ্ধ-প্রান্তর হয়তো নিকটেই কোথাও অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে আছে, বাস থেকে তাকে চিহ্নিত করবার উপায় নেই। রাস্তার ধারে যে পাণিপথকে আমরা দেখলাম, তাকে একটি শহর ও গঞ্জের মত জায়গা বলে মনে হল। দুপাশে রুক্ষ ধূসর কোঠা-বাড়ির সারি, চায়ের স্টল, পান বিড়ি ও খাবারের দোকান—যেমন আর দশটা জায়গায় পথিমধ্যস্থিত সাময়িক বিশ্রাম-স্থলে দেখা যায়। তবে তফাতের মধ্যে, একাধিক বাড়ীরই সদর দেউড়ির বড় কাঠের দরজার উপর গজাল-পোঁতা, দরজার পাল্লা দুটি বিশাল ও পেল্লায় ভারী। কেমন যেন একটা দুর্গ দুর্গ ভাব বাড়ীর চেহারায়। পাঞ্জাবীরা সামরিক মনোভাবাপন্ন জাত বলেই বোধ হয় এইরকমের ব্যবস্থা, কিংবা মধ্যযুগের ইতিহাসের স্মৃতি এই সংস্কারের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে। সব মিলিয়ে জায়গাটার একটা শ্রীহীন রুক্ষজীর্ণ চেহারা। শুধু এ জায়গা বলে নয়, পাঞ্জাবের

সকল গ্রাম বা শহরই, এরকম ধূলিমলিন, অসুন্দর। পাঞ্জাববাসীদের বাসস্থানের আদল দেখে তাদের সৌন্দর্য প্রীতির প্রশংসা করা যায় না।

পথে কর্ণাল জিলার সদর কর্ণাল শহর পড়ল। সেই একই রকম শ্রীহীন চেহারা। রুচির ছাপ বড় কোথাও একটা চোখে পড়ে না। দারিদ্র্য এই রুচিহীনতার একটা কারণ হতে পারে, তবে দারিদ্র্যই একমাত্র কারণ নয়। অনেক সম্পন্ন গৃহেরও দালান-কোঠা-বাড়ি অনাদর রক্ষিত বলে মনে হল।

এইখানে বাস কিছুক্ষণের জন্য থামল। কর্ণাল পটিকল্যাণ থেকে চল্লিশ মাইল। কথা আছে আরও সাত-চল্লিশ মাইল উজিয়ে আম্বালা ক্যান্টনমেন্টে গিয়ে সরকারী বাংলোয় আমরা প্রাতরাশ সারব ও বিশ্রাম করব। তারপর আবার একটানা যাত্রা। কর্ণালে আমরা প্রায় সকলেই অল্প-বিস্তর এক-প্রস্থ চা-পর্ব সারলুম।

কর্ণালের পরেই কুরুক্ষেত্র। ঠিক সদর রাস্তার উপর পড়ে না, পিপরি নামে সদর রাস্তার উপর একটি জায়গা আছে, সেখান থেকে মাইল চারেকের পথ। বাসে যাওয়া যায়।

কুরুক্ষেত্র দেখবার আমার খুবই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এই দর্শনীয় স্থানটি আমাদের ভ্রমণ-তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল না বলে তাকে পাশ কাটিয়ে যেতে হল। মনের ভিতর একটা আক্ষেপ গোপন করলুম ও পটিকল্যাণ কনফারেন্সে কোন এক আমন্ত্রিত বক্তার (সমাজোন্নয়ন দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রীবি, এস, মূর্খি) প্রদত্ত বক্তৃতার অংশ বিশেষ স্মরণ করে সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা করলুম। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন, কুরুক্ষেত্র বলে আলাদা কোন জায়গা নেই, বস্তুতঃ সমগ্র কর্ণাল জিলাটাই ছিল কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধক্ষেত্র। কর্ণাল জিলার ভূমি-প্রকৃতি লক্ষ্য করে কথাটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়। যেদিকে তাকানো যায় কেবল মাঠ, মাঠের পর মাঠ। বিস্তীর্ণ প্রান্তর-শোভার শ্যামশ্রীর উপর কৃষ্ণবিন্দুর মত মাঝে-মাঝে মাটি আর ইট-সুরকির তৈরী ঘর-বাড়ী। গ্রামগুলি চোখে পড়ে না, প্রান্তরের বিস্তারটাই চোখ ভরিয়ে রাখে। সুতরাং গোটা কর্ণাল জিলাটাই যুদ্ধক্ষেত্র ছিল—এ কথা আর এমন অবিশ্বাস্য কী।

আম্বালা শহরে যখন আমাদের বাস এসে ঢুকল তখন বেলা আটটা। শহরের দুই অংশ—বেসামরিক ও সামরিক। সামরিক অংশেরই বিস্তার বেশী। বড় বড় পিচ-ঢালা বাঁধানো রাস্তা শহরের বুক চিরে নানা মুখে বেরিয়ে গেছে। একটি রাস্তা গেছে অমৃতসরের দিকে। আর-একটি রাজধানী চণ্ডীগড় হয়ে ভাকরা-নাঙ্গাল বাঁধের দিকে। আমরা শেষোক্ত রাস্তার যাত্রী।

আম্বালা শহরের গুরুত্বের কথা শুনেছিলুম, কিন্তু পথ-ঘাট ওই তুলনায় জনবিরল বলে মনে হল। বিরাট বিরাট হাতা-ওয়ালা বাংলো বাড়ীগুলি যে খুব যত্ন-রক্ষিত—তা-ও মনে হল না। একাধিক বাড়ীর সম্মুখে অগযত্নিত লনে ঘাস আর আগাছার জঙ্গল দেখতে পেলুম। মনে হয় ইংরেজ শাসনের আমলে সামরিক কর্তা-ব্যক্তিদের ব্যবস্থাধীনে এই শহর খুব জমজমাট ছিল, এখন পরিবর্তিত রাষ্ট্রিক পরিস্থিতিতে এই সামরিক শহরের পূর্বতন গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে।

প্রাতরাশের জন্য যে বাংলো-বাড়ীতে এনে আমাদের তোলা হল, তা এক প্রকাণ্ড উদ্যান বাটিকা। শুনলাম এখানে পূর্বে ক্যান্টনমেন্ট এলাকার সামরিক-শাসক বাস করতেন, এখন এটি উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের অতিথি-শালায় রূপান্তরিত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে অন্যান্য পদস্থ ব্যক্তিগণ সরকারী কার্যোপলক্ষে আম্বালায় এলে এই বাড়ীতে থাকেন।

চমৎকার ব্যবস্থা, দামী আসবাব-পত্র, স্বাচ্ছন্দ্যের সুপ্রচুর উপকরণ। গান্ধী-মহারাজের আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত সরকারের দেখছি ভোগে অরুচি নেই। সর্বত্রই ভি, আই, পি দের অর্থাৎ হোমরা-চোমরাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা। ভি, আই, পি কথাটির মধ্যেই বোধহয় সরকারী মনোভাবের সূক্ষ্ম অথচ প্রকৃত পরিচয় লুকিয়ে রয়েছে। সর্বত্রই জনসাধারণ থেকে আলাদা করে একটি কৃত্রিম শ্রেণীর সৃষ্টি করা হয়েছে; তাঁরা জনসাধারণের কেউ নন, তাঁরা জনসাধারণের উর্ধ্বে। তাঁদের জীবনযাত্রার আদর্শ ভিন্ন, তাঁদের ভোগ-সুখের মান আলাদা। এমন জানিয়ে-শুনিয়ে জনগণ থেকে হোমরা-চোমরাদের পৃথকীকরণ বোধহয় ইংরেজ আমলেও ছিল না।

যাই হোক, আপাতত আমরা পাঞ্জাব সরকারের অতিথি। অতিথি হয়ে আতিথেয়তার অবমাননা করব না। সরকারের নিন্দাবাদ করব না। পাঞ্জাব সরকার প্রাতরাশের ভূরি-পরিমাণ আয়োজন করেছিলেন। সুতরাং সমালোচনার ক্ষোভ ভুলে গিয়ে তাঁদের দু-হাত তুলে সাধুবাদ জানাব।

ঘণ্টা খানেক সময় আম্বালায় কাটিয়ে পুনরায় বাস ধরা গেল। আম্বালার আকাশে ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের কতকগুলি বিমান নানা কায়দায় হেলে বেঁকে গোত্তা খেয়ে অদ্ভুত রকমের সব কসরৎ প্র্যাকটিশ করছিল, দেখতে চমৎকার লাগছিল। বলা প্রয়োজন, আমার এই অনুমোদন শুধুমাত্র দৃশ্যটরই অনুমোদন, কোনরূপ সামরিক মহড়ার অনুমোদন নয়। সর্বপ্রকার সামরিক মহড়াকে আমি মনে প্রাণে খণ্ডন করি তা সে অন্যদেশের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হোক, আর ভারতীয় দ্বারাই অনুষ্ঠিত হোক।

বাস ত পূর্ব-পাঞ্জাবের রাজধানী চণ্ডীগড়ে এসে পড়ল। চণ্ডীগড় বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে একটা হঠাৎ-ভুঁই ফুঁড়ে ওঠা শহর। মাত্র পাঁচ বছর হল এর পত্তন হয়েছে। শৈশবের চিহ্ন শহরটির গায়ে সুপরিস্ফুট। রাস্তাঘাট পরিচ্ছন্ন, সুন্দর, কিন্তু রাস্তার কোন গাছপালা নেই। চারাগাছ বেড়ে ওঠার এখনও সময় হয় নি। বাড়ীগুলি সব লাল রঙের, তার কতক অংশ পলেস্তারা-করা, কতক অংশ উদোম। বেশীর ভাগ বাড়ীই এক ধাচের দেখতে।

চণ্ডীগড়ে আমাদের নামবার কথা ছিল না। কিন্তু এক জায়গায় এসে একটু ক্ষণের জন্য বাস থামল। এখানে গান্ধী স্মারকনিধির পাঞ্জাব শাখার একটি তত্ত্ব-প্রচার বিভাগ ও লাইব্রেরী-স্থাপনার জন্য জায়গা কেনা হয়েছে ও সম্প্রতি তার উপর গৃহের ভিত গাঁথা হয়েছে।

ত্রিপাঠী আমাদের জায়গাটি ঘুরে ঘুরে দেখালেন। বেশ পছন্দসই জায়গা, রাজধানীর একেবারে কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত।

এর পরে বাস আর কোথাও থামল না, একেবারে পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত নাঙ্গালের কাছাকাছি সীমানায় একটি বাঁধের ধার ঘেঁসে দাড়াল। বাঁধের গা বেয়ে পুঞ্জ পুঞ্জ জলরাশি সফেন তরঙ্গের সৃষ্টি করে প্রচণ্ড শব্দে উপচে পড়েছে একটি সেচ-খালের ভিতর। বাঁধের মুখে জলোচ্ছাস, এদিকে অদূরে খালের জল স্থির। জলের রঙ সবুজ। দৃশ্যটি ভাল লাগল। পরে অবশ্য ভাকরা বাঁধ দেখবার পর এ দৃশ্যের রমণীয়তা ফিকে হয়ে গিয়েছিল।

বেলা তখন প্রায় সাড়ে বারো। আমাদের বাস নাঙ্গাল বাঁধ আপাতত পাশে রেখে যে রাস্তা ভাকরা অভিমুখে চলে গেছে সেই দিকে বেশ কিছু দূর এগিয়ে পাহাড়ের সানুদেশে এসে থামল। সেখানে একটি সুন্দর রেষ্ট-হাউস। বিশিষ্ট দর্শনার্থীরা এলে সরকারের পরিচালনাধীন এই রেষ্ট-হাউসে এসেই ওঠেন। এখানে আমাদের দ্বিপ্রহারিক আহারের আয়োজন হয়েছে। স্থির ছিল এখানে আহার সমাপন করে আমরা সরাসরি পাহাড়ে উঠব ভাকরা দেখতে। তারপর ভাকরা দেখা শেষ করে ফিরবার পথে নাঙ্গাল হয়ে নীচে নামব। ভাকরা থেকে নাঙ্গাল আট মাইল। একটি পাহাড়ের উপরে, অন্যটি পাহাড়ের পাদদেশে উচ্চভূমির উপর। বাস-রাস্তা ভিন্ন নাঙ্গাল থেকে ভাকরা পর্যন্ত পাহাড়ের মধ্য দিয়ে রেলপথ গেছে।

আ'হারের প্রচুর আয়োজন ছিল। এই একটানা দীর্ঘপথ অবিচ্ছেদ বাসভ্রমণের পর আমরা সকলেই বেশ ক্ষুধার্ত হয়ে উঠেছিলাম। বেলাও বেশ চড়েছে। সুতরাং ক্ষুধার দোষ নেই। সকলকেই টেবিলের উপর থরে থরে সুসজ্জিত খাদ্য সামগ্রীর বেশ সদ্ব্যবহার করতে দেখা গেল। তবে 'বুফে' পদ্ধতির খাওয়া, অর্থাৎ থালা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে খাওয়া—ওই-যা এক অসুবিধা। উপবেশন ব্যতিরেকে অশন যেন ঠিক জমতে চায় না। তবে তাতে খাদকের দল যে বিশেষ দমলেন বা তাঁদের খাদ্যগ্রহণের ক্ষিপ্রতা ও খাদ্যবস্তু উদরসাৎ করবার পটুতা দেখে মনে হল না। টেবিলের চারপাশ ঘিরে যাঁরা দাঁড়িয়ে-ছিলেন তাঁদের আহার নৈপুণ্যে ডিসের পর ডিস উড়ে যেতে লাগল। মুস্কিল হল তাঁদের যাঁরা ভিড় ঠেলে কিছুতেই ওই সামনের সারির ভিতর নিজেদের জায়গা করে নিতে পারছিলেন না। এঁদের গায়ের জোর কম, চক্ষুলজ্জা বেশী। পেটে খিদে থাকলেও মুখের লাজ ঘুচতে চায় না। ফলে এঁদের কাউকে কাউকে একেবারে অভুক্ত না থাকলেও অর্ধভুক্ত হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল। 'অর্ধভুক্ত' পরিমাণেও বটে, বৈচিত্র্যেও বটে। ডারুইনের 'সারভাইব্যাল অব দি ফিটেস্ট' থিয়োরীর সত্যতার একটি কার্যকরী প্রমাণ পেলুম এই ভোজের টেবিলে। 'খাদক' কথাটা আমি ইচ্ছাপূর্বক ব্যবহার করেছি। মানুষ যখন অতি ক্ষুধার তাড়নায় আহার করে, তখন তাকে আহার-কারী না বলে খাদক বলাই সঙ্গত। আদিম মানুষের সঙ্গে তখন তাদের বিশেষ কোন পার্থক্য থাকবে না।

পাঠক নিশ্চয় এতক্ষণে অনুমান করে নিয়েছেন যে, আমি 'ফিটেস্ট'-এর দলে নই। কিন্তু আমার ওই স্বভাব এবং তার জন্য আমি লজ্জিত নই। যেখানে দশজনারই সমান দাবী সমান অধিকার, সেখানে অপরকে দাবিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে আমার বাধে। একে যদি কেউ দুর্বলতা বলতে চান তো তা তিনি বলতে পারেন। আমি সেই দুর্বলতা কবুল করে নিচ্ছি। খুব সম্ভবতঃ ওই 'দুর্বলতা'র বশে আমি সভা-সমিতিতে আমন্ত্রিত হয়ে গিয়ে একেবারে সব-শেষের কোণার আসনটিতে বসি, নিজের গুরুত্ব জাহির করবার জন্য সামনের সারির আসনে গিয়ে জাঁকিয়ে বসতে পারি না। কোথায় যেন এতে রুচিতে বাধে।

আমিই যে এই ক্ষেত্রে একমাত্র একক মনোভাবের দৃষ্টান্ত, এরূপ মনে করলে নিজের প্রতি অযথা গুরুত্ব আরোপ করা হয়, আমার দলে আরও আছেন। এঁরা চক্ষুলজ্জাবিশিষ্ট প্রাণী, সুতরাং অবধারিতভাবে সংসারে কষ্ট পান। বাস-ট্রামের ভিড়ে এঁরা পরের পায়ের কড়া মাড়িয়ে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে যেতে দ্বিধা করেন, ফলে পিছনে পড়ে থাকাই এঁদের বিধি-নির্দিষ্ট নিয়তি। ট্রাম বা বাসের টু-সীটেড আসনে যদি কোন হোমরা চোমরা স্যুটধারী বাবু পা ফাঁক করে একাই গোটা আসনের তিন-চতুর্থাংশে মৌরসী-পাট্টার অধিকার বিস্তার করে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকেন, তবে নিতান্ত কাচুমাচুভাবে যেটুকু জায়গা খালি আছে তাতেই কোন প্রকারে সার্কাসের কায়দায় শীর্ণ দেহটিকে বিন্যস্ত করে এঁরা ভ্রমণ-সুখ অনুভব করবার চেষ্টা করেন, তবু পার্শ্ববর্তীকে মুখ ফুটে বলতে পারেন না যে—দয়া করে তিনি একটু সরে বসুন, তা হলে দুজনেরই আরামে যাওয়া হয়। এইটুকুতেই এত সংকোচ, ধাক্কা দিয়ে পা সরিয়ে নিজের জায়গা করে নেওয়া তো এঁদের পক্ষে স্বপ্নাতীত ব্যাপার। হক্‌দার সীটের দখল নেবেন না, কনুই দিয়ে গুঁতো মেরে পাশের লোককে সরিয়ে সামনে জায়গা করে নেবেন না—তবে আর এই তীব্র প্রতিযোগিতার সংসারে টিকে থাকবার উপায় রইল কই? শুনেছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণী রাজ্যগুলির কোন কোন শহরে (যথা আল-বামা, নিউ অরলিন্স) বাসে নিগ্রোদের সামনের আসনগুলিতে বসতে দেওয়া হয় না, তাদের জন্য পিছনের সারির আসন নির্দিষ্ট। এখানকার বাসে সেরকম কোন নির্দেশ না থাকলেও অলিখিত বিধান এই যে, যাঁরা নিজেদের 'কেউকেটা' বলে মনে করেন তাঁরা তরতর করে এগিয়ে যান—আর যারা ঝড়তি-পড়তির দলে, তাদের বসা এবং দাঁড়িয়ে যাওয়ার কাজটি ওই শেষের দিকেই কোনমতে সেরে নিতে হয়। ব্যবহারিক জীবনের নিয়ম অনুযায়ী, যার চক্ষুলজ্জা যত কম ছিল সে তত বেশী শক্তিমান।

যাক এ সব অবান্তর কথা। ধান ভানতে শিবের গীত যদি অগ্রাহ্য হয়, ভোজন-ক্রিয়ার তণ্ডুলদানার প্রসঙ্গে ততোধিক। আমরা আমাদের পুরাতন কথায় অর্থাৎ ভ্রমণের কথায় ফিরে আসি।

আহার ক্রিয়ার পর আর জিরোবার অবসর পাওয়া গেল না, তখুনি বাসে চাপতে হল। নিমন্ত্রিত সকলের এই হয়েছে অসুবিধা। নিজের ইচ্ছামত কিছু করবার উপায় নেই, সবই 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'। এই ক্ষেত্রে আবার কর্তা একেবারে খোদ সরকার, সুতরাং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের

ভরাডুবি বললেও চলে। সরকারকে অবশ্য এক-তরফা দোষ দিয়ে লাভ নেই। ভাকরা বাঁধ দেখে ওইদিনই দিল্লী ফেরবার কথা ছিল। পট্টি-কল্যাণ থেকে ১৮০ মাইল বাস ঠেঙ্গিয়ে সেইদিনই ২২০ মাইলের মাথায় দিল্লী ফিরে যেতে হলে তড়িঘড়ি কাজ সারতে হবে বইকি। সেই রাত্রে অবশ্য আমাদের দিল্লী ফেরা হয় নি, রাত্রিটা চণ্ডিগড়ে কাটাতে হয়েছিল। কিন্তু সে কথা যথাস্থানে।

বাস পাহাড়ে উঠল। পাহাড়ের গা বেয়ে স্বল্প পরিসর পিচের রাস্তা আঁকা-বাঁকা পথে উপরে উঠে গেছে। রাস্তার একদিকে খাড়াই পাথরের প্রাচীর, অন্যদিকে খাদ। বাস কোন গতিকে একবার খাদে পড়লে, ব্যস, আর দেখতে হবে না, হাড়গোড়ের টুকরো শুধু পাথরের শানের উপর পড়ে থাকবে। ক্রমাগত এঁকে বেঁকে রাস্তা উপরের দিকে ঠেলে উঠেছে, উপরের রাস্তা থেকে নীচের রাস্তা কালো একটা সরীসৃপের মত পড়ে থাকতে দেখা যায়। পথের বাঁকে বাঁকে পাহাড়ের দেওয়ালের গায়ে হলুদ রঙের উপর কালো কালো অক্ষরে সতর্কতামূলক নির্দেশ—Safety Saves, Drive Safe,' Running fast at the cost of an accident,' When you get hurt, your family members also affected by it' ইত্যাদি। এইরূপ অসংখ্য ভাবের বচনে পাহাড়ের পথ সমাকীর্ণ। বর্তমানে মানুষের প্রাণ বড় সস্তা হয়ে গেছে। মানব জীবনের এই সর্বব্যাপী মূল্যহীনতায় দিনে মানুষের প্রতি অপর মানুষের মমতার নিদর্শনরূপী, এই বাণীগুলি দেখে বড় ভালো লাগল।

অবশেষে ভাকরায় আসা গেল। পাহাড়ের উপর শতদ্রু নদীর জল বেঁধে এই সমুচ্চ বাঁধের সৃষ্টি করা হয়েছে। বাঁধের সিমেন্টে বাঁধানো কপাটের ফাঁক দিয়ে জল সগর্জনে বিরাট উচ্ছাসের সৃষ্টি করে নিম্নে পতিত হচ্ছে। পুঞ্জ পুঞ্জ উৎক্ষিপ্ত জলকণা একত্রীভূত হয়ে ধূম্রজালের সৃষ্টি করেছে—রৌদ্রকিরণ সম্পাতে তার ভিতর রামধনুর আভাস। শীকর কণাগুলির সম্মিলিত সাদার সমারোহ দেখে মনে হয় ধনুকরের ধনুকের ছিলায় যেন ক্রমাগত চাপ-চাপ প্যাঁজা তুলো উড়াচ্ছে। রাস্তায় বেশ গ্রীষ্ম অনুভব করেছি, গরমে কষ্ট হয়েছে, এখানে জলের ধারে রেলিং-য়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে জলকণা থেকে উদ্ভূত ঠাণ্ডাটুকু গায়ে মাখিয়ে নিয়ে বেশ আরাম পেলুম। অদূরে মাইকে শিখ সরকারী কর্মচারী ইংরেজীতে ও হিন্দীতে সমাগত অতিথিবৃন্দকে ভাকরার গঠন বৈশিষ্ট্যের কারিগরী দিকটি সম্বন্ধে বিশদ ভাবে বোঝাচ্ছিলেন। আমার অত কথা শোনবার ধৈর্য ছিল না,আমি শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে জলের সৌন্দর্য পান করছিলুম।' যেখানে উদার বিশাল একটি দৃশ্য চোখের সামনে প্রসারিত, সেখানে কথার কোলাহল দর্শনেন্দ্রিয়ের উপভোগের পথে একটি প্রতিবন্ধক স্বরূপ মনে হয়?

ভাকরা বাঁধ উচ্চতায় প্রায় সাড়ে সাতশো ফিট। পৃথিবীর উচ্চতম বাঁধগুলির এটি অন্যতম। কেউ কেউ বলেন এটি উচ্চতম। দাবীর সত্য-মিথ্যা নির্ধারণ করতে পারব না, কারণ এ সকল বিষয়ে আমার জ্ঞান অতিশয় সীমাবদ্ধ। জল-সেচ এবং বিদ্যুৎ-উৎপাদন এই দুই উদ্দেশ্যেই ভাকরা বাঁধের পরিকল্পনা করা হয়েছে। অদূরে বাঁধের অপর পার্শ্বে জল থেকে বিদ্যুৎ আহরণের জটিল যন্ত্রপাতি। কলকব্জার ব্যাপক আয়োজন মনকে বিস্ময়াবিষ্ট করে তোলে। সে এক এলাহি কাণ্ড। আমার উড়িষ্যার হীরাকুঁদ বাঁধ দেখা ছিল। সেখানেও জল-বিদ্যুতের কারখানা আছে। কিন্তু হীরাকুঁদের চেহারাই একরকম; হীরাকুঁদ বাঁধ লম্বায় তিন মাইল, পৃথিবীর দীর্ঘতম বাঁধে রূপে পরিচিত; আর ভাকরার পরিসর অতি-সঙ্কীর্ণ, পরস্পর সন্নিহিত দুই পাহাড়ের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র সেতু রচনা করেছে বাঁধের কপাট। হাত বাড়ালেই যেন সেতুর এক প্রান্তবর্তী পাহাড় থেকে অন্য প্রান্তের পাহাড়কে ছোঁয়া যায়। একটি ছোট নদীর ব্যবধান থেকেও বোধ করি এই সেতু অপ্রশস্ত। কিন্তু বাঁধের এই বিস্তারের অভাব পূর্ণ করেছে বাঁধের উচ্চতা। সমুচ্চ পাহাড়ের মহিমার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই যেন এই উচ্চতার নির্মাণ। হীরাকুঁদের তুলনায় কলকব্জার জটিলতা ভাকরায় বেশী। ভাকরা বাঁধ স্বাধীন ভারতের শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে যন্ত্র দক্ষতার উচ্চতম একটি চূড়ারূপে পরিকীর্তিত।

ভাকরা থেকে ফেরবার পথে আমরা প্রথমে গেলুম নাঙ্গাল, তারপর একটি শিল্প কারখানা পরিদর্শনের জন্য আমাদের নিয়ে যাওয়া হল। নাঙ্গালে বাঁধের জল সেচের খালের মুখে ছড়িয়ে দেবার সেই পরিচিত আয়োজন। স্বাধীন ভারতে এই জাতীয় আয়োজনের সঙ্গে আমাদের পূর্বেই একাধিকবার পরিচয়লাভ ঘটেছে। আমাদের বাংলাদেশেই দামোদর পরি-কল্পনায় ঠিক সম পর্যায়ের না হলেও সমধর্মী একাধিক সেচব্যবস্থা আছে। কাজেই এখানকার বিস্তৃত পরিচয় দান অনাবশ্যক। তবে নাঙ্গালের পরিবেশটি দেখতে বেশ পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর। একটি সুদৃশ্য প্যাভিলিয়নে নানা চার্ট ও ম্যাপ রাখা হয়েছে দর্শনার্থীদের বোঝবার সুবিধার জন্য।

প্যাভিলিয়নের ভিত্তি-গাত্রটি নানা বর্ণের নুড়ি-পাথর দিয়ে মজবুত করে গাঁথা। রঙের বৈচিত্র্য মনে মোহের সৃষ্টি করে।

বেলা প্রায় পাঁচটা বেজেছিল। বৈকালিক চা পর্ব নাঙ্গালেরই একটি বাংলোয় সমাধা করা গেল। তারপর বাংলোর সামনে বিস্তৃত ঘাসের জমিতে আমরা বিশ্রাম নিতে বসলম। আজই বাস দুশো কুড়ি মাইল পথ ভেঙে দিল্লী গিয়ে পৌছবে, না কি রাত্রির জন্য আমরা চণ্ডীগড়ে আশ্রয় নেব—এই নিয়ে আমাদের মধ্যে মতভেদের অবকাশে দুটি দলের সৃষ্টি হল। কেউ আজই দিল্লী ফিরতে উৎসুক, ফিরতে যত রাতই হোক। আবার কেউ কেউ এই যুক্তিতে তাঁদের নিরস্ত করবার চেষ্টা করলেন যে ড্রাইভার দুজন সারাদিন গাড়ী চালিয়ে এসেছেন, তাঁদের বিশ্রাম প্রয়োজন। পুনরায় এতটা রাস্তা গাড়ী চালাবার ঝুঁকি নিয়ে তাঁদের পথে বাহির করলে শেষটায় না নিছক ক্লান্তির বশেই এরা একটা অ্যাকসিডেন্ট ঘটিয়ে বসেন রাস্তায়। তা ছাড়া এই ব্যাপারে ড্রাইভার দুজনারও মত লওয়া আবশ্যক। আজকাল আর কর্তার ইচ্ছা কর্ম হলে চলে না, হয়ও না; যাঁরা এতটা পথ আমাদের বাসে চালিয়ে নিয়ে এসেছেন তাঁদের অভিমতকে এই ক্ষেত্রে গুরুত্ব দান করতে হবে বইকি! ড্রাইভার দুজন চণ্ডীগড়ে রাত্রির জন্য বিশ্রামের অনুকূলেই মত দিলেন। অগত্যা আমাদের সকলকেই এই ব্যবস্থায় সায় দিতে হল।

চণ্ডীগড়ে গান্ধী-স্মারক-নিধির একটি তত্ত্ব-প্রচার কেন্দ্র আছে। রাত দশটায় আমরা চণ্ডীগড়ে এসে পৌছলাম। তাতে জায়গার নিতান্ত অকুলান। মেয়েদের ঘরে জায়গা করে দেওয়া হল, আমরা বাইরের অপরিসর প্রাঙ্গণে কোন রকম ঠাসাঠুসি করে উন্মুক্ত আকাশের চন্দ্রাতপের তলায় যে-যার বিছানা পেতে নিদ্রার আয়োজন করলাম। সারাদিন এক নাগাড়ে প্রায় ১৩/১৪ ঘণ্টা বাস ভ্রমণের ধকল গেছে, তার উপর পর্যটনের ক্লান্তি। শয্যায় আশ্রয় গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রাকর্ষণ।

পরদিন ভোর চারটেয় পুনরায় বাস যাত্রা। বেলা একটায় দিল্লীতে পদার্পণ। দিল্লীর বৃত্তান্ত এ প্রসঙ্গের বহির্ভূত থাকুক।

ডাঃ সুবোধ মিত্র

ডাঃ শ্রীনগেন্দ্রনাথ দে

ডাঃ সুবোধ মিত্র গত ৪ঠা আগষ্ট রাত্রিকালে করোনারী থ্রম্বোসিস্ রোগে আক্রান্ত হইয়া ভিয়েনা সহরে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৬৫ বৎসর; তিনি তাঁহার স্ত্রী, কন্যা, জামাতা ও একটি দৌহিত্রী রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি ভিয়েনায় গিয়াছেলেন আন্তর্জাতিক গাইনকোলজিক্যাল কনফারেন্সে ডেপুটি চেয়ারম্যানের কাজ করিতে। ইহা ছাড়া য়ুরোপে আরও কয়েকটি সভায় তাঁহার যোগ দিবার কথা ছিল।

ডাঃ সুবোধ মিত্র

ডাঃ মিত্রের মনের জোর ছিল অসাধারণ। তিনি যাহা করিতে মনস্থ করিতেন, তাহা না করিয়া কখনও বিরত হইতেন না। তিনি যখন মাত্র স্কুলের ছাত্র, তখন তাঁহার বড় বৌদিদি প্রসূতি অবস্থায় মারা যান; তখন তাহার করিবার কিছু ছিল না—তবু তিনি তখনই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন আমি একজন বড় প্রসূতি-বিশারদ (obstetrician) এবং স্ত্রীরোগ চিকিৎসক (gynoecologist) হব। তিনি ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ obstetrician and gynoecologist হইয়াছিলেন—এ বিষয়ে তাহার খ্যাতি পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছিল। তাহার Mitra Opertion তিনি য়ুরোপ ও আমেরিকায় করিয়া দেখাইয়াছেন এবং বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। এবারেও ভিয়েনায় ঐ অপারেশন করিয়া দেখাইবার কথা ছিল।

স্ত্রীরোগে বিশেষজ্ঞ হইবার জন্যই তিনি যখন চিত্তরঞ্জন সেবাসদন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ (অধুনা আর, জি, কর মেডিকেল কলেজ) পরিত্যাগ করিয়া চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে যোগ দেন এবং নিজ অধ্যবসায়ের গুণে ক্রমশঃ সেখানে ডিরেক্টর হন।

স্ত্রীরোগ চিকিৎসা করার সময় তিনি দেখিলেন ক্যানসার মেয়েদের একটি মারাত্মক ব্যাধি; সেইজন্য এই ক্যানসার রোগের চিকিৎসার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন এবং আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া অনেক টাকা সংগ্রহ করিয়া এবং নিজে আমেরিকায় যাইয়া উন্নত ধরণের রেডিয়াম এক্স্-রে এবং নানারূপ আধুনিক যন্ত্রপাতি আনিয়া বিরাট চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হসপিটাল স্থাপনা করিলেন।

তাহার মনের জোর যেমন ছিল তেমনি প্রতিষ্ঠান গঠনের ক্ষমতাও ছিল প্রচুর। তিনি আই-এন-এ সি-র সদস্য ছিলেন। একবার উহার কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে তাহার মতবিরোধ হয়। তিনি তৎক্ষণাৎ উহার সদস্য পদ ত্যাগ করিয়া ৭ দিনের মধ্যে আর-ডব্লিউ-এ-সি প্রতিষ্ঠা করেন। আজ ইহা আগের সমিতির চেয়ে বেশী জনপ্রিয়।

তাহার বিশেষ কৃতিত্ব ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে; তিনি ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে সিনেটের এবং ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে সিণ্ডিকেটের সভ্য হন। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে তিনি মেডিক্যাল ফ্যাকাল‍টির সদস্য হন এবং ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহার

ডীন হন। এই সময় হইতেই তাহার মাথায় যুনি-ভার্সিটি কলেজ অব্ মেডিসিন স্থাপনা করার ইচ্ছা ঘুরিতে ছিল। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ইহা স্থাপনা করেন, এখন পর্যন্ত ইহার কাজ শেষ হয় নাই। এখন পর্য্যন্ত যাহা হইয়াছে তাহা শুধু তাহার একার চেষ্টাতেই হইয়াছে। তিনি য়ুনিভার্সিটি গ্রাণ্টস কমিশন হইতে অনেক টাকা যোগাড় করিয়াছেন এবং সেই টাকায় এখন বেসিক মেডিক্যাল সায়ান্সের বাড়ী হইতেছে। গত ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি য়ুরোপে ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহাকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে ভাইস্-চ্যান্সেলার নির্বাচিত করা হয়। মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত তিনি সেই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

বাণী বন্দনা
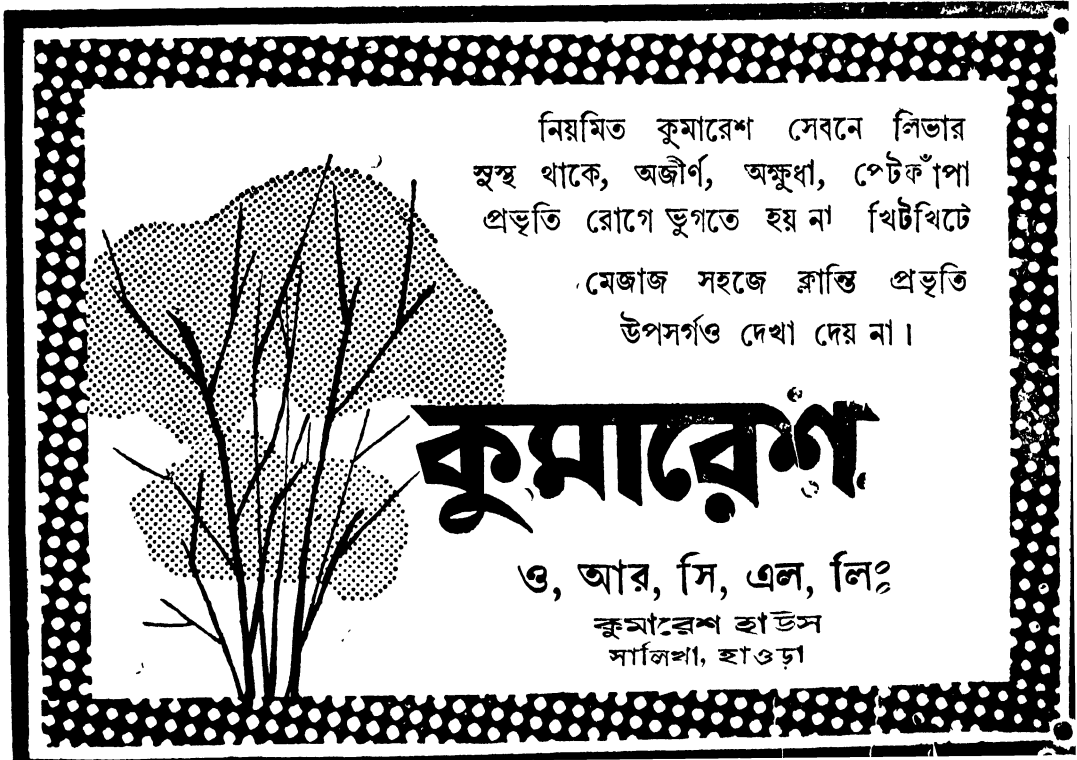
শ্রীসর্বজিত

বাক্ হ'ল বীণাপাণী,
রাগানন্দ-স্বরূপিণী
শ্বেতবর্ণা কামরূপিণী,
হ'ল দেবী জ্ঞানরূপিণী।

স্বচ্ছমনা আনন্দদায়িনী,
রাগ-রাগিনী অভিলাষিণী,
সৌন্দর্য্যপ্রিয়া বিদ্যাদায়িনী
বিদ্যারূপিণী জ্ঞানদায়িনী।

কামিনী ঐশ্বর্য্যশালিনী,
বিষ্ণু-প্রিয়া ঐশীধারিণী,
হ'ল দেবী সরস্বতী,
বিশ্বরূপা অয়ি বাণী।

ছদ্মরাগ

সত্যচরণ ঘোষ

সকালের আপ্ গাড়ীখানা চলে গেছে অনেক আগে। দুপুরের আপ গাড়ীখানাও স্টেশন থেকে বেরিয়ে সিগ্‌ন্যালের কাছে বাঁকা পথে একরাশ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চলে যাচ্ছে।

স্টেশনটা ছোট—তবে অনেক দিনের। যাত্রীর ভীড় বেশী হয় না বটে, তবে সাজ-সরঞ্জামের ত্রুটি নেই—কেবিন, স্টেশন মাস্টারের ঘর, কোয়ার্টার, ওয়েটিং রুম, প্লাটফরম্ ও তার ওপরে শেড্—এ সবই একে একে গড়ে উঠে স্টেশনের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়েছে। কিন্তু কাজের চাপে এ নিয়ে ভাববার অবসর থাকে না কারুর। এসব পরিবর্ত্তনকে বড় বলে ধরা হ'লেও বড় হয় না—বড় কাজ এখানে হয় গাড়ীতে চড়া, আর গাড়ী থেকে নামা—এ কাজই এর যেন চিরন্তন।

কিন্তু স্টেশনের কাছে আট দশখানা মাঠের শেষে একটা পুরোনো বাড়ীর 'চিলেকোঠা'র জানলা থেকে মধুময় তো ঠিক এ কথা ভাবে না। সে ভাবে 'ওঠানামাই' ওর বড় কাজ নয়, ওর আধুনিক পরিবর্ত্তন ওকে বড় করেনি। ওকে বড় করেছে ওর নির্লিপ্ত সেবা। ওর পরিসর থেকে এ অঞ্চলের কার না প্রিয়জন এসেছে ও গেছে। ও ছিল বলেই এ দেশের সংগে কত দেশের জিনিস-পত্রের বিনিময় হচ্ছে—কত আশা কত উৎসাহ নিয়ে কত লোকই না ওর অঙ্গনে ছুটোছুটি করছে। কিন্তু ও নির্ব্বাক—সকলের লভ্য বস্তুকে সকলের কাছে পৌছে দেবার জন্যেই ও যেন সৃষ্টি হয়েছে। বাইরের পরিবর্ত্তনে ওর ভ্রূক্ষেপ নেই—অন্তরে তার আজও ঐ একই সুর গেয়ে চলেছে।

মধুময়েরও অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। বাইরের পরিবর্ত্তন যত বেশী হয়েছে, মনের পরিবর্ত্তন তত বেশী হয়নি! দেহের পরিবর্ত্তন মনের ওপর বড় একটা প্রভাব ছড়াতে পারে নি।

ঐ স্টেশনকে কেন্দ্র করেই তার অতীত জীবনের আশা-ভরসা গড়ে উঠেছিল। সকালে ঐ স্টেশন দিয়ে শহরে যাওয়া, আর বিকেলে বাড়ীর শান্ত নীড়ে ফেরা। প্রিয়-জনকে কতবার তুলে দিয়েছে, আবার কতবার অধীর আগ্রহে স্টেশনে অপেক্ষা করে প্রিয়জনদের নামিয়ে নিয়ে এসেছে। এ সবের কোন হিসেব নেই তার। একদিন সংসারের সব বন্ধনই ছিল; কিন্তু একে একে সে সব ছিন্ন হয়ে গেছে। কাজেই মায়া-মমতার আকর্ষণ তার দিনে দিনে বিকর্ষণের দিকে এসেছে। কিন্তু তবু এসব সত্ত্বেও আজও সে চিলে-কোঠার জানলা দিয়ে চেয়ে আছে ঐ স্টেশনটার দিকে কি এক অধীর প্রতীক্ষায়।

স্টেশনের সব যাত্রীই তো চলে গেছে। দূরে মাঠের মাঝ দিয়ে দুপুরের যাত্রীরা বাড়ী ফিরছে। কিন্তু কই সে তো নেই ওদের মধ্যে। ছোট রঙিণ ছাতায় একটু একটু দোলা, কাল রঙের ওপর সোনালি জরি-বসান ভ্যানিটি-ব্যাগের ঈষৎ আন্দোলন, জরির ওপরে রোদের চোখ-ঝলসানো হাতছানি আর গোলাপী-রঙের পুরবী শাড়ীর আস্ফালন স্টেশনে একটা স্বতন্ত্র দৃশ্যের পরিবেশ সৃষ্টি করতো! তখন দূর থেকে তাকে চিনতে কোন কষ্ট হত না।

কিন্তু দুপুরের গাড়ীখানা আজও তো চলে গেল। কিন্তু কই, বিশেষ কায়দায় ভ্যানিটি-ব্যাগটি দোলাতে দোলাতে সে তো আজ নামলো না। চিলেকোঠার ঘর থেকে ভেবে চলে মধুময়।

মিতা এসে বলে, দাদু, খুব যে বেলা হ'য়ে গেল—চান করবে না? খাবে কখন? মা রাগ করছে—"

চমক ভাঙ্গে মধুময়ের। মেয়েটির দিকে ক্ষণকাল চেয়ে থেকে বলে, "চান করতে হবে না? তাই ত দিদি, আমার তো খেয়ালই ছিল না—রাগ করবার তো কথাই—"

উঠে পড়ে বিছানা থেকে। গড়গড়ার নলটায় দুটো টান দিয়ে সরিয়ে রাখে শীরওঠা রোগা হাত দুটো দিয়ে।

ক'লকেটার দিকে চেয়ে মিতু বলে. "ও দাদু, তোমার কলকেয় আগুন কিছু নেই—সব ছাই হ'য়ে গেছে—"

"তাই নাকি! তাহলে এতক্ষণ এমনিই টানছিলাম!" এই বলে মধুময় কি যেন ভাবে। অন্যমনস্কভাবে একবার স্টেশনের দিকে, আর একবার ঐ আগুন-শূন্য ক'লকেটার দিকে তাকায়। তারপর বলে ওঠে. "কি করি ভাই, তোর দিদিভাই তো নেই! হুকোর আওয়াজ শুনেই সে বুঝতো আগুন ফুরিয়েছে। ডাকের অপেক্ষা না করেই সে আগুন ফিরিয়ে দিত—সেদিন তো আর নেই ভাই!"

ধীরে ধীরে উঠে বাইরে যায়। বাঁকান সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে অতি সাবধানে। কোনরকমে দুটো মুখে দিয়ে রেলিংটাকে ধরে ধরে আবার সেই চিলেকোটায় গিয়ে বসে। দুটো পাকাটি ধরিয়ে তামাক সাজে নিজেই। বুড়ুক বুড়ুক ক'রে তামাক টানতে টানতে নিজের অর্দ্ধ-মলিন বিছানাতে আধশোওয়া অবস্থায় স্টেশনের আঁকা-বাঁকা সরু পথটার দিকে চেয়ে থাকে তারই অপেক্ষায়।

কত কি ভেবে চলে মধুময়। আজ দেহ মনের সংগে সংগতি রেখে চলতে পাচ্ছে না। দেহ চলেছে ভাঙ্গনের দিকে। মনের শত সরসতাকে তুচ্ছ করে সে তার পরিণতির দিকেই চলেছে। মনের সজীবতার দিকে তার কোন লক্ষ্যই নেই। নিজের জীবনের গতি যে শেষ ধাপে নামতে সুরু করেছে, তা বুঝতে মধুময়ের একটুও কষ্ট হয় না। কিন্তু তবুও মনের এ অশোভন আকর্ষণ কেন? একদিকে দেহ, একদিকে মন—আর দুয়ের মাঝে পড়ে মধুময়ের আমিত্ব অসহায়ের মতন ঝাঁকানি খেয়ে চলেছে।

অনমী তো তার কেউ নয়। সমাজ উন্নয়ন কাজের জন্যেই তো সে মাঝে মাঝে আসতো এ গাঁয়ে। থাকতোও ক'দিন ধরে। এ গাঁয়ে, ও গাঁয়ে ঘুরে ঘুরে পল্লীর ভাই-বোনদের কাছে, জাতিগড়ার কাজে কত উৎসাহই না দিত সে। অনমী নিজেই বেছে নিয়েছে মধুময়ের এই শান্ত আবাসটিকে তার সাময়িক আস্তানা হিসেবে। অবশ্য অনমীকে আশ্রয় দেবার আগ্রহের অভাব ছিল না এ গাঁয়ের কারুর। সাময়িক আস্তানা দেবার জন্যে অনেকেই তাদের বাড়ীর আসবাবযুক্ত ঘর ছেড়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু অনমী সে সব আশ্রয় নিতে চায়নি। কারণ জিজ্ঞেস করলে মধুময়কে সেদিন পরিহাস করে বলেছিল, "ওদের চেয়ে আপনাকে সুন্দর দেখায় কিনা—তাই—"

মধুময় হেঁসে বলেছিল, "সুন্দর দেখায় আমাকে!—তা ঠিকই বলেছো, তবে স্থান, কাল, পাত্র হিসেবে তার রূপ বদলায় কিনা তাতো পরখ করিনি।"

খিল খিল করে হেসে উঠে অনমী বলেছিল, "তাহলে এবার পরখ করে দেখুন—"

সেই থেকে আজ তিন বছর কেটে গেছে। মধুময় আটষট্টি পার হয়ে একাত্তরের ঘরে পা দিয়েছে, অনমীও পঁচিশ পার হয়ে আটাশে পা দিয়েছে।

সমাজ-উন্নয়নের কাজে অনমী খুবই খাটে। কখন শীতের ঠাণ্ডা রাত্রে কোথাও ছায়াচিত্রের মাধ্যমে বক্তৃতা দিয়ে ঘরে ফিরেছে, বর্ষার জলকাদায় নিজের অলক্ত দেহ-রাগকে রঞ্জিত করে ঘরে ফিরেছে, আবার কখনও ঘামে ভিজে রোদের তাপে নিজের পলাশ-চাঁপার রঙকে কিছুটা কালচে করে আস্তানায় ফিরেছে। কিন্তু এত খাটুনির পরও চিলে-কোঠার ঘরে ঐ আধ-ময়লা বিছানার ওপর নিশ্চিন্ত মনে ঠেস দিয়ে বসে মধুময়ের সংগে গল্প করতে ভুলতো না। উন্নয়ন পরিকল্পনার কোথায় কি কাজ হল, সে কোথায় কি কি কথা বলেছে, বোঝাতে পেরেছে—মেয়েরাই বা কি রকম সাড়া দিয়েছে—এই সব ছিল তার গল্পের বিষয়বস্তু।

মধুময় গড়গড়া টানতো, আর মুগ্ধ হয়ে এই মেয়েটির কথা শুনে যেতো। কলকের আগুন ফুরিয়ে গেলে নতুন করে আগুন দিতে মধুময় যখন উঠতো, অনমী বাধা দিয়ে বলতো, "থাক, থাক, আপনাকে উঠতে হবে না—আমি সেজে দিচ্ছি।" এই বলে নিজে তামাক সেজে মধুময়ের হাতে গড়গড়ার নলটি তুলে দিত। শুধু গড়গড়ার কাজ কেন, অনেকবার আধময়লা বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় নিজে কেচে দিয়ে ফরসা ক'রে দিয়েছে ও।

অনমী, কেন কি জানি, মধুময়ের কাছে কোন কথাই গোপন করতো না। ছেলে বেলার কথা, মা-বাপ হারিয়ে পিতৃ-বন্ধুর কাছে মানুষ হওয়ার কথা, কলেজের কথা, খেটে খাওয়ার কথা, এমন কি পিতৃ-নির্বাচিত ভাবী-স্বামী শেখর সম্বন্ধে কয়েকটি সমস্যার কথা সে অকপটে প্রকাশ

করে মধুময়ের মতামত জিজ্ঞেস করতে কোন সংকোচ করত না। মধুময়ও পরম আত্মীয় বন্ধুর মতনই উপদেশ দিতো, আর এ নিয়ে মৃদু অথচ সরস হাসির একটা দোলায় মেতে উঠতো এদের মন। এই আনন্দের পরম মুহূর্তে বয়সের বিরাট ব্যবধান দূর হয়ে একটি মনেরই প্রকাশ ঘটতো।

তিন বছর অনমী এখানে রয়েছে। এই তিন বছরের মধ্যে সে মধুময়ের কত সেবাই না করেছে। মিতার মাকে তো এই সব কাজের জন্যে রাখা হয়েছে—কিন্তু কই সে তো এত করে না। চান করার এক বালতি জল, কি ভাতের থালাটা সে এই চিলে কোঠায় তুলে দেয় না। আর অনমী কতদিন চানের জল, ভাতের থালা এই চিলে-কোঠার ঘরে বয়ে দিয়েছে। মুখরোচক খাবার, অসময়ের জিনিস নানা জায়গা থেকে বয়ে এনেছে মধুময়ের জন্যে। টুর-প্রোগ্রাম না থাকলে নিজের হাতে রান্না করে মধুময়কে কতবার খেতে দিয়েছে।

কেন সে এত করে? এখানে থাকার আশ্রয় পেয়েছে বলেই কি? কই তার মতন আর তো কেউ এমন করে না! অনমীই বা এত করে কেন? সে আমার কে? এই রকম কত কথাই না তার মনে জেগে ওঠে। এ চিন্তা-জাল ছিন্ন করতেও তার ইচ্ছে হয় না। সুদীর্ঘ কর্মহীন সময়ের অসহ্য বেদনাকে দূর করার জন্যেই বোধ হয় সে ভেবে বসে ঐ স্টেশনের দিকে চেয়ে।

অনমীর জন্যে তারই বা এত আগ্রহ কেন? আনন্দ মূর্চ্ছনার এমন অনুভূতিই বা তাকে আচ্ছন্ন ক'রে তোলে কেন? অনমীর অস্বাভাবিক সেবা অন্তরে তার জাগিয়ে তোলে শেষ-হওয়া দাম্পত্য-জীবনের কথা। একদিন অনমীকে তাই বলেছিলো, "অনমী, তোমার এই সেবা বড্ড বেশী করে মনে করিয়ে দেয় তার কথা—যতদিন ছিল সে ঠিক এমনি করেই আমার সব অভাব না বলতেই মিটিয়ে দিতো—তাই ভাবি তুমি আমার কে?"

অনমী পক্ক-কেশ বৃদ্ধের চোখের দিকে চেয়ে কি যেন ভাবতো। দেহ-মন্দিরের ঐ দুটি ক্ষুদ্র দ্বার দিয়ে অন্তরের শত হাহাকারের দৃশ্যও যেন দেখতে পেত। অনমীর যৌবন-দীপ্ত-হৃদয়ের কোণে মধুময়ের ঐ অসহায় জীবনের স্পন্দন ধ্বনিত হত। তাই এই অসহায় জীবনের [illegible] দূর করার জন্যে অনমীর হৃদয়-মন এক অকম্পিত আবেগে মূর্ত হয়ে উঠত। সে ধীরে ধীরে ঈষৎ হেসে বলতো, "আপনি আমার কে তা জানি না—তবে আপনার তীর্থ-যাত্রার পথে আমি একজন পথিক।"

মধুময় চমকে উঠতো। বলতো, "তীর্থযাত্রীর পথ বড় দুর্গম—সে পথের পথিক হ'য়ে শেষ পর্যন্ত কি চলতে পারবে?

অনমী হেসে বলতো, "ক্ষতি কি!"

মধুময়ের কাছে অনমীর অস্তিত্ব বেশ রহস্যময় হয়ে উঠেছে। সে নিজেও যেন অনেকখানি জড়িয়ে পড়েছে। অথচ এ রহস্য ভেদ করাও সম্ভব নয়। কারণ বিগত-যৌবন, শুষ্ক মরু-দেহের অন্তরে মরুদ্যান-প্রতিষ্ঠা তো সম্ভব নয়। তবু মনের মধ্যে অনমীর অস্তিত্ব এত অবিচ্ছিন্ন হয়ে উঠছে কেন? ক্ষণিকের অদর্শন তাকে চঞ্চল করে তোলে কেন? শতবিরহের তাপপ্রবাহ ক্লান্ত জীর্ণ স্নায়ুতন্ত্রকে এত দুর্বল ক'রে তোলে কেন?

তিনদিন হল অনমী টুরে গেছে। এই তিনদিন তার কাছে যেন তিন বছরেরও বেশী—কেন? যাবার সময় বলে গিয়েছিলো, একদিনের বেশী হবে না। কিন্তু তিনদিন হয়ে গেল, তবু তো এলো না! তবে কি কোন বিশেষ কাজের চাপ—না অসুখ-বিসুখ! মধুময়ের মন যেন দমে আসে কি এক অধীর আশঙ্কায়। আঙুল দিয়ে মাথায় চুলগুলোকে টানতে টানতে ঐ ষ্টেশনের দিকে চেয়ে থাকে।

সন্ধ্যের আঁধার আস্তে আস্তে নেমে আসে। আকাশ, মাটি, চিলে-কোঠা, আর ষ্টেশন সব অদৃশ্য হয়ে যায় মধুময়ের দৃষ্টিপথ থেকে। শুধু প্লাটফরমের টিম্‌টিমে আলোর ক্ষীণ রশ্মিগুলি তার চোখের ওপরে পড়ে ফিরে যায়। দখিনের ফুরফুরে বাতাস সুরু হয়েছে। সে হাওয়ার আমেজে মধুময়ের চোখ যেন জুড়ে আসে। আপন মনে জড়িতকণ্ঠে বলে ওঠে, "আজও বোধ হয় সে এল না।" শীর্-ওঠা হাতের দিকে চেয়ে কত কি ভাবতে ভাবতে সে ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ে। মিতা এসে আলো জেলে দিয়ে গেছে। মধুময় তা জানতেও পারে নি।

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল অনমীর মধুর স্পর্শে। অনমী ডাকে, "ঘুমিয়ে পড়েছেন?"

সচকিত হয়ে ওঠে মধুময়। অপলক নেত্রে চেয়ে থাকে অনমীর দিকে। ক্ষণপরে বলে ওঠে, "ও—তুমি অনমী—

এসেছো ?" এই বলে ধীরে ধীরে অনমীর হাতটিকে ধরে কপাল থেকে সরিয়ে নিয়ে নিজের বুকের ওপর ধরে। কিছুক্ষণ চোখ বুঝে রইল। দু'এক ফোঁটা জল চোখের কোণ দিয়ে নেমে এল।

অনমী বিস্ময়ে চেয়ে দেখে ঐ চোখের জল। অনেক সে ভাবে। বুঝে উঠতে পারে না এ চোখের জল কেন ? এ তার হৃদয়ের প্রীতির উচ্ছাস—না অভিমান—না ক্ষুব্ধ ব্যথিত অন্তরের অনাবিল স্নেহের ধারা! কিছুই ঠিক পায় না অনমী। কিছু জিজ্ঞেস করতে পারে না—পাছে তার এই অনন্ত শান্তির মোহঘোর ভেঙ্গে যায়। তাই খাটের পাশটিতে বসে আঁচলের খুঁট দিয়ে তার চোখের জল মুছিয়ে দেয়।

ক্ষণকাল নির্লিপ্ত ভাবের পরিচয় ঘটে। মধুময়ের চোখ দুটি স্নেহের পরশে আচ্ছন্ন হয়েছিল। অনমীর স্পর্শে এক কল্পিত রাগের সুর মূর্চ্ছনায় সে অভিভূত হয়েছিল।

অনমী ধীরে ধীরে মধুময়ের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলে ওঠে, "এ কদিন আসিনি বলে আপনার খুব ভাবনা হয়েছিল, না ?"

মধুময় চোখ চায়। অনমীর দিকে ক্ষণকাল তাকিয়ে তার বাঁ হাতটিকে বুকের ওপর থেকে তুলে উঁচু করে নিজের হাতের সঙ্গে মিল করে ধ'রে বেশ খানিকক্ষণ কি দেখে—তারপর বলে, "অনমী, মিল না থাক, এই হাত দুটি পাশাপাশি থাকা সত্বেও এর ব্যবধান যে কত, তাতো এখন বেশ বুঝতে পারি—তবুও তোমার না আসার ভাবনা এই ব্যবধানের অস্তিত্বকে বুঝতে দেয়নি—কেন বলতো ?" এই বলে বিছানার উপর আস্তে আস্তে উঠে বসে।

অনমী চেয়ে থাকে মধুময়ের ভেঙ্গে আসা বাইরের দেহটার দিকে, কিন্তু দৃষ্টি তার ঐ দেহের অস্থি মজ্জা ভেদ ক'রে সন্ধানী আলোর মতন অন্তরের অন্তরতম বস্তুটির ওপর উপছে পড়ে। ক্ষণকাল পরে সে একটু হেসে বলে, "স্নেহ করেন—ভালবাসেন আমাকে তাই—"

মধুময় প্রথমে কিছু বলে না। তারপর ষ্টেশনের ক্ষীণ আলোটিকে লক্ষ্য ক'রে বলে, "জীবনের স্নেহ ভালবাসার সতেজ রশ্মিগুলি সব ঐ আলোর মতই ক্ষীণ হয়ে এসেছে। দেওয়ার পালা বুঝি কিছু নেই—শুধু যাবার ও পাবার পালাই এই অন্তরের শেষ আসরকে কোন রকমে ভাসিয়ে রেখেছে।

"পাবার পালাই কি সব ?"

"তাছাড়া আর কি!—পেতে চাই এখন অনেক-মানুষের সংগ, স্নেহ, ভালবাসা—এখন বেশি ক'রে পেতে চাই দেবার সামর্থ, কিন্তু কিছুই নেই অনমী—তোমার সংগ, তোমার ভালবাসা চাই—কিন্তু তোমায় দিতে তো কিছু পারি না—"

অনমী বেশ একটু হেসে বলে, "দেবার সামর্থ তো সব সময় থাকে না—তাছাড়া এ বয়সে সমাজ তো কিছু আশা করে না—"

মধুময় অনমীর দিকে ক্ষণকাল চেয়ে কি ভাবে, তারপর একটু হেসে বলে, "আশা করে না বলেই আমরা গলগ্রহ হয়ে আছি—না আছে সংগ, না আছে সংসারের মধুর স্পর্শের পরিবেশ। চিলেকোঠায় পড়ে আছি, কি সমাজ-সংসারের বন্ধন ছিন্ন কোন্ এক জনহীন অনুর্বর মরুভূমিতে পড়ে আছি—তা কিছু বুঝতে পারি না অনমী! সব হারিয়ে এই বয়সে বেঁচে থাকা একটা পাপ—"এই বলে গড়গড়ার নলটা তুলে নিয়ে বলে, "আগুন বোধ হয় নেই—"

অনমী বলে ওঠে, আমি দিচ্ছি ঠিক করে। এই বলে কলকেটায় তামাক দিতে নিয়ে যায় বাইরে। ক্ষণপরে কলকের আগুনে ফুঁ দিতে দিতে ঘরে এসে হুকোর ওপরে কলকেটাকে বসিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করে, "মিতারা বুঝি আজ বাড়ী নেই ?"

মধুময় বিস্ময়ে বলে, "তাই নাকি! কই—তাতো আমি জানি না—"

কথা শেষ হতে না হতে সিঁড়িতে ছোট পায়ের শব্দ শোনা গেল। মিতা চিলেকোঠায় ঢুকে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, "মা, হরিনাম শুনছে—"

কিন্তু হঠাৎ সামনে অনমীকে দেখে একটু থমকে দাঁড়িয়ে যায়—পরে বলে, "আপনি কখন এলেন ?"

"এই একটু আগে এসেছি—"

"তাহলে রান্নাঘরের চাবিটা আপনিই রাখুন। ও বেলায় মা দাদুর খাবার করে রান্নাঘরে ঢাকা দিয়ে রেখেছে—আপনি দাদুকে দিয়ে দেবেন"—এই বলে চাবিটা অনমীকে দিল।

মধুময় একটু বিস্ময়ে বলে ওঠে, "তোর মা তো

জানে যে আমি বাসি-খাবার খেতে পারি না—তবে জেনে শুনে সে এরকম করলো কেন ?"

মিতা কোন উত্তর না দিয়ে আস্তে আস্তে নেমে যায়।

অনমী বলে, "বিকেলের খাবার খেয়েছেন ?"

মধুময় বলে, "বিকেলের খাবার তো হয় না—তারপর অত বারে বারে খাবার দেবেই বা কে !"

"ক্ষিধে পায়না আপনার ?

"ক্ষিধে ? তা যে পায়না এমন কথা নয়—তবে কি জানি কেন—ও কথা যেন প্রায় ভুলেই গেছি"—মধুময় আর কিছু বলে না। একটা চাপা নিশ্বাস আস্তে আস্তে তার জীর্ণ দেহ থেকে বেরিয়ে যায় নিঃশব্দে।

অনমী কি ভাবে মধুময়ের দিকে চেয়ে। তারপর আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

মধুময় গড়গড়া টেনে যায়। ছেড়ে দেওয়া ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকানোর দিকে চেয়ে অতীতের ফেলে-আসা দিনগুলির কথাই ভাবতে থাকে আনমনে। এ বয়সে নিজের অসহায়তার কথাটাই তার মনে জেগে ওঠে বেশি ক'রে। যত দিন যাচ্ছে বার্দ্ধক্যের অসহায় অবস্থা তাঁর জীবনকে পাথরের মতন অচল করে তুলছে। তবু বেঁচে থাকতে হবে! আকর্ষণের কোন বস্তুই নেই তবু এই পৃথিবীতে সকলের অবহেলিত হয়ে পথিপার্শ্বে ফেলে দেওয়া আবর্জনার মতনই পড়ে থাকতে হবে—এই তো জীবন—এই তো পরিণতি !

মধুময়ের চিন্তা ভেঙ্গে যায় অনমীর প্রবেশে। টেবিলটার ওপর খাবারের থালাটি রেখে অনমী বলে, "খেতে বসুন।"

মধুময় খাবারের থালাটার দিকে চেয়ে বলে, "কষ্ট করে গরম খাবার করতে গেলে কেন অনমী ?"

"কষ্ট কিসের ? আমায় তো খেতে হবে—কাজেই আপনাকেই বা আমি ঠাণ্ডা খেতে দেব কেন ?—তারপর আপনি যখন ঠাণ্ডা খেতে ভালবাসেন না—নিন্—খান্।"

খেতে খেতে মধুময় বলে; "এ সন্দেশ আবার কোথেকে আনলে ?

"বর্দ্ধমানে ঘণ্টাখানেক ছিলাম—তাই আপনার জন্যে ভাল দেখে কিছু সন্দেশ নিয়ে এলাম।"

সন্দেশটি গালে দিয়ে খুব খুশী হয়ে বলে, "খেতে কিন্তু সত্যিই খুব ভাল।"

'এটা খান, ওটা খান'—এই সব বল্‌তে বল্‌তে অনমী মধুময়ের খাওয়ার তদ্‌বির করে চলে।

মধুময়ের দেহ মন যেন এক অনির্বচনীয় আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠলো। মনে হল, যে অসহায়ের ভাব তাকে আচ্ছন্ন করেছিল একটু আগে, সে ভাব, সে মলিনতা যেন নিমিষে দূর হয়ে গেছে। জরাজীর্ণ দেহের প্রাণ-বন্দরে যেন নব-প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। তারি সাড়া যেন তার দেহের সারা অঙ্গে মেরু প্রভার মতন ছড়িয়ে পড়েছে।

খাওয়া শেষ হলে মধুময় নিজেই বিছানা থেকে নেমে পাকাটি দিয়ে কলকের আগুন তৈরি করতে সুরু করে। অনমী পাকাটিগুলি ধরে বলে, "ছাড়ুন, আমি করে দিচ্ছি।"

মধুময় বাধা দিয়ে বলে, "না-না টুর থেকে ফিরছো এখনো খাওনি—তুমি খেয়ে এস অনমী—তামাক আমি নিজেই সেজে নিতে পারবোখন।"

অনমী আর কিছু না বলে খাবারের থালাটা কুড়িয়ে নিয়ে ঘর থেকে চলে যায়।

মধুময়ের আর যেন কোন দুঃশ্চিন্তা নেই। বিছানার এক পাশে ঠেস্ দিয়ে আস্তে আস্তে তামাক টানে। কি এক আনন্দে কত কি ভেবে চলে সেই ষ্টেশনের দিকে চেয়ে। অন্ধকারের ভেতর দিয়ে ষ্টেশনের ক্ষীণ আলো ছড়িয়ে গেছে, তার দৃষ্টি আকাশের আধ-ফালি চাঁদের দিকে। চাঁদের ফিকে আলোর ভেতর দিয়ে সাদা মেঘের মন্থরগতিকে লক্ষ্য করছে। অসংখ্য নক্ষত্রের হারিয়ে-যাওয়া সৌন্দর্যকে সে যেন হঠাৎ দেখতে পেয়েছে। প্রকৃতির শোভা যে মনের মধ্যে এ কদিন কোন শোভা ফুটিয়ে তুলতে পারেনি, আজ যেন সেই শোভা তার অন্তরকে নতুন ভাবে জাগিয়ে তুলেছে।

আপন মনে বুড়ুক বুড়ুক করে তামাক টানে.আর ভেবে চলে, জীবনের এই বিচিত্র দর্শন। জীবনের বোঝা কখন যে বাড়ে আর কখন যে হালকা হয়ে ফুলের মতন নিষ্পাপ পাপড়ি মেলে মনের ওপর পত্ পত্ ক'রে উড়তে থাকে তার কোন নিশানা মেলে না। হঠাৎ নীচে থেকে কতকগুলো কথা ভেসে এসে মধুময়ের চিন্তাধারার পথকে

রুদ্ধ করে দিল। সচকিত হয়ে মিতার মায়ের কথাগুলি আগ্রহের সংগে শোনে।

মিতার মা বেশ জোরে অনমীকে বলছে, "ঠাণ্ডা খেতে পারেন না, তা রোজ রোজ গরম করে দেবে কে? আপনি নয় দরদ দেখিয়ে আজ করে দিয়েছেন—রোজ দিতে পারবেন?"

অনমী বলে,—"বুড়োমানুষের খাওয়ার দিকে লক্ষ্য না দেওয়াটা তো অন্যায়—"

ফোঁস করে মিতার মা বলে ওঠে—"ও ভারী আমার নয়া গিন্নী হয়েছেন—অত যদি দরদ তো বুড়োর গলায় মালা দিয়ে গিন্নিপনা করুন। বাকি তো কিছু রাখেন নি—ওটাই বা বাকি থাকে কেন? তাতে ধনেপুত্রে লক্ষ্মী-লাভ হবে।

অনমীর গলার আর কোন আওয়াজ পাওয়া গেল না। সে যেন হঠাৎ এই কথার ইঙ্গিতে মুষড়ে পড়েছে। সামলে নিয়ে বলে—"এসব আপনি বলছেন কি?"

মিতার মা বলে ওঠে; ঠিকই বলেছি—বাড়ী না আসা পর্যন্ত বুড়ো যেমন পথের দিকে 'হা-পিত্যেস' করে চেয়ে থাকে—আপনিও তেমন বাড়ী এলেই ও ঘর আর ছাড়তে চান না—দিনরাত গুজুর গুজুর—ফুসুর ফুসুর—কি জানি বাপু, কি মধুই যে ওখেনে আছে—আর এত দরদই বা কিসের!"

অনমীর মুখে কোন কথা ফোটে না। রাগে সমস্ত শরীর কাঁপতে থাকে। নিষ্পাপ সেবার এমন কদর্য ব্যাখ্যা যে মানুষ করতে পারে তা সে কল্পনা করতে পারে না। তবু মনের খেদে, অভিমান ও রাগ চেপে কিছু না বলে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসে।

মধুময় মিতার মায়ের কথাগুলো শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নীচের দিকে চেয়ে বলে—"দরদ কিসের ওকে আর বুঝতে হবে না—ও যেন কালই এ বাড়ী থেকে চলে যায়।

নীচে থেকে গর্জে উঠল মিতার মা—"কাল কেন—এখনই যাচ্ছি। আমার কি কাজের অভাব—না থাকার জায়গা নেই! বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরেছে কিনা। তা না হ'লে নতুন রাধিকা জুটবে কেন?"

মধুময় ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে বলে, "কী—যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা—কালই চলে যাবি আমার বাড়ী থেকে —লোকের কি অভাব?"

মিতার মা ঝাঁজিয়ে উঠে বলে, "বেশ—তাই যাবো—"

আর কোন কথা শোনা গেল না। সবদিকের চেঁচামেচি হঠাৎ যেন থেমে গেল। মধুময় ধীরে ধীরে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবে মধুময়, মিতার মায়ের এসব কথায় অনমী কি মনে করছে। অনমীকে ডেকে কি বলবে যে, সে যেন ওসব কথায় কিছু মনে না করে। কিন্তু ক্লান্ত দেহ তার এতে সায় দিল না। অনেকক্ষণ চুপ করে শুয়েছিল। আশা ছিল, হয়ত অনমী নিজেই ওপরে উঠে এসে এসব বিষয়ে কিছু বলবে। কিন্তু সে এল না। অধীর আগ্রহে সময় কাটাতে কাটাতে মধুময় ঘুমিয়ে পড়ে।

* * *

অনমী ওপরে উঠে এসে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে কত কি ভাবে। এমন কথা আজ পর্যন্ত কেউ তো তাকে বলতে পারেনি। এও কি সম্ভব! সে যা ক'রে এসেছে তাতে কি ঐ মালা-দেওয়ার কাজকেই মিতার মা বড় করে ধরেছে! লোকের কাছে কি শুধু ঐ দৃশ্য ছাড়া আর কোন দৃশ্য জাগে না? ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ ঘটানো ছাড়া এদের কি আর কিছু ভাববার নেই! মধুময়বাবুর সম্পত্তি আছে, তাই কি ঐ সম্পত্তির লোভে অনমী মধু-ময়ের সেবা করে চ'লেছে? না মধুময়বাবু অতীত জীবনের চলে-যাওয়া মোহডোরকে অনমীকে দিয়ে জাগাতে চায়? কিন্তু এও কি সম্ভব। তবে মিতার মা ও সব কথা পেল কোথা থেকে? সত্যিই কি আমাদের অজ্ঞাতসারে আমরা পরস্পরের খুব কাছে চলে এসেছি? মধুময়বাবু তো তার কেউ নন। তবে অনাত্মীয়ের মধ্যে পরমাত্মীয়বোধ তাদের মধ্যে জাগলো কেন?

অনমীর সমস্ত শরীর ঝিম্ ঝিম্ করে উঠলো। মনে এল মধুময়বাবুর কথা। শোবার আগে সে রোজই এক-বার করে তাঁর কাছে বসে আসে। রাতের জন্যে কি তার দরকার, তা সব যথাস্থানে গুছিয়ে দিয়ে আসে। আজ তো যাওয়া হয়নি। মন তার যেতে চাইছে, কিন্তু দেহ সায় দিচ্ছে না। কি জানি মিতার মায়ের কথা যদি সত্যি হয়ে যায়—শক্ত মন যদি নরম হয়ে পড়ে! মনের ওপরে

যেন একটা আবছা শঙ্কা জেগে ওঠে। তবুও সে যাবার জন্তে উঠলো। কিন্তু পারল না।

সকাল হ'লে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে চান করতে গিয়ে দেখে, রান্নাঘরের শিকলের সংগে চাবির তাড়াটি ঝুলছে। তবে কি তারা চলে গেছে? না চাবির খোলেটা নিতে ভুলে গেছে? ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে কি ভাবলো। তারপর বুঝতে পারে যে মিতাদের ঘরটি ভেতর থেকেই বন্ধ। কিছুক্ষণ দরজাটার দিকে চেয়ে পুকুর থেকে চান ক'রে এল। কাপড় ছেড়ে চা তৈরি করে একটা প্লেটে কতগুলো বিস্কুটও চা নিয়ে উঠে পড়ে। দরজার কাছে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। মিতার মার কথাগুলো মনের মধ্যে ভেসে ওঠে। "বুড়োর গলায় মালা দিয়ে গিন্নীপনা করুন।"

মনে হল চায়ের কাপটি বুঝি তার হাত থেকে পড়ে যাবে। পাশের চেয়ারটায় বসে পড়ে। অনেক কিছু ভাবে। মিতার মার ঐ মিথ্যে কথা কি এতই শক্তি রাখে? যে দ্বিধা, যে সংকোচ তার অন্তরে কোন দিন জাগেনি, আজ হঠাৎ তার এত দ্বিধা, এত সংকোচ কেন? তবে কি অনমীর নিজস্ব শিক্ষার অভিমান, ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীন সরল মনোভাবের কোন মূল্য নেই? একটা মিথ্যে অপ-প্রচারের ঘায়ে তার ঐ মনোবল কাঁচের মতন ঠুন্ ঠুন্ করে ভেঙ্গে পড়বে? আর সে তাই মাথা নত করে দেখবে। ক্ষণকাল চুপ করে কি ভাবে। তারপর আপনমনে বেশ জোরেই বলে ওঠে, "না, মিতার মা সব মিথ্যে বলেছে, ঈর্ষায় বলেছে—তবে কেন সে মিথ্যে অপবাদের ভয়ে নিজেকে ক্ষুণ্ণ করবে?

শক্তি ফিরে পায় সে। যে কদিন এখানে থাকবে, তার কর্তব্য সে করে যাবে। চা আর একবার গরম ক'রে নিয়ে চিলেকোঠায় গিয়ে ওঠে। মধুময় তখন মুখ ধুয়ে সেই জানলাটা দিয়ে ষ্টেশনের দিকে চেয়ে ছিল আনমনে।

অনমীকে দেখে কিছু বলে না। শুধু অনমীর দিকে একবার চাইল। সে চাহনিতে যেন একটা থমথমে ভাব। অনমী চায়ের কাপটি মধুময়ের হাতে দিয়ে নিঃশব্দে চা খেয়ে যায়।

মধুময় একটু কি ভেবে বলে, "ও বড্ডো মুখরা, নিতান্ত উপায় নেই বলেই ওকে রেখেছি, কিন্তু ওযে এতটা বাড়াবে তা ভাবতে পারিনি"—মধুময় এই কথাগুলি বলে অনমীর দিকে ক্ষণকাল চেয়ে থাকে। দেখে অনমীর মুখের ওপর একটা অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যের ছায়া পড়েছে। যে অনাবিল সরলতা তাকে সরস করে রেখেছিল, সে সরসতা আজ যেন কত মলিন—কত শুষ্ক। তাই মধুময় দ্বিধাগ্রস্ত ভাবেই বলল, "তুমি বোধ হয় রাগ করেছো অনমী?"

অনমী এবার একটু হাসির রেখাটেনে বললে, "রাগ করিনি বটে, তবে আপনার এখানে থাকা বোধ হয় আমার আর হবে না"—অনমীর মুখ থেকে হাসির রেখাটি আবার স্তিমিত হয়ে গেল।

মধুময় ঈষৎ উদ্বিগ্ন হ'য়ে বলে, "মিতার মার কথায় কিছু মনে কর না—ও পাগল—"

অনমী কিছুটা উত্তেজিত হয়ে বলে—"উনি পাগল কিনা জানি না, তবে এটুকু বুঝেছি যে এরপর এখানে থাকা আমার আর চলে না। এরি মধ্যে 'নতুন রাধিকার' পদে যখন তুলেছে, তখন থাকলে পদমর্যাদা যে আরও বাড়বে না তা কে বলতে পারে।" অনমী আর কিছু না বলে কাপ দুটো নিয়ে নীচেয় নেমে গেল।

মধুময় চুপকরে দরজাটার দিকে চেয়ে থাকে। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। যারা ছিল তার সব চেয়ে আপনার, তারা তো সবাই চলে গেছে—সেকি তাদের ধরে রাখতে পেরেছে? পারেনি। অনমীকেই বা সে কি করে ধরে রাখবে? গড়গড়ার নলটি দু'একবার টানে—আর চেয়ে থাকে ষ্টেশনের দিকে তার চিরকালের সঙ্গীটির দিকে।

অনমী ফিরে আসে। চমক ভাঙ্গে মধুময়ের। হাতে তার রঙিণ হাতল লাগানো ছোটছাতা, কালো রঙের ওপরে সোনালী জরি-বসানো ভ্যানিটি ব্যাগ, আর পরণে সেই গোলাপী রঙের পুরবী শাড়ী।

মধুময়ের সারা দেহ ও মনের ওপর এক অভাবনীয় ব্যর্থ আবেদন যেন হাহাকার করে উঠলো। বেদনাজড়িত কণ্ঠে সে বলে ওঠে, "অনমী, সত্যিই তুমি চলে যাচ্ছো?"

অনমী মধুময়ের কথার মধ্যে আর্দ্রতা উপলব্ধি করলো, নিজের অন্তরের আর্দ্রতাও অনুভব করলো। কিন্তু এ সব কিছুকে চেপে রেখে বলে ওঠে, "মশাগ্রামে টুর প্রোগ্রাম আছে—আর ওখানেই একটা থাকবার আস্তানা করে নেবো—

আর—” অনমীর গলাটা কিছুটা ধরে এল। কি যেন বলতে গিয়ে বলতে পারলো না।

মধুময় ক্ষণকাল অনমীর প্রতি চেয়ে থাকে। অনমীর অন্তরে যে একটা অশান্তির ভাব এসেছে তা সে অনুভব করে। নিজের মনের মধ্যেও অনেক কথা জমে উঠেছে বলবার জন্যে। এতদিন ধরে অনমীর অলক্ষে নতুন ঘর বাঁধার যে কল্পনা করেছিলো, সে কথা আজ তাকে না বললে আর তো বলা হবে না। একান্তই যদি সে চলে যায় তাহলে তার অন্তরের কথা তো বলা হবে না। অনমীর অশান্তির বোঝাও তো নাম্‌বে না। তাই দুর্বল মনকে একটু শক্ত করে অনমীকে জিজ্ঞেস করে, “আর বলে থামলে কেন? কি বলতে চাও বল?”

আজ অনমীরও বলার অনেক কিছুই ছিল; কিন্তু সে সব কথা বলতে তার যেন সংকোচ হ’ল। মিতার মা যে মিথ্যে সম্বন্ধ গড়ে দিয়েছে—তারিই আশাপথ চেয়ে মধুময়ের ‘হা-পিত্যেস’ করে ব’সে থাকার যে ইংগিত সে দিয়েছে, তাতে অনমী ‘ধনেপুত্রে লক্ষ্মা লাভ’ছাড়া আর কিইবা ভাবতে পারে! কাজেই তার সংকোচ। কাল রাত থেকে এ সব মিথ্যে অপপ্রচারকে মন থেকে সরিয়ে দেবার অনেক চেষ্টা করেছে সে—কিন্তু পারেনি। অথচ এই লোকটিকে সেবা করার জন্যে তার অন্তরে যে আগ্রহ ছিল তা একটুও কমে যায়নি আজও।

অনমীকে চুপ করে থাকতে দেখে মধুময় বলে, “তুমি হয়ত ভুল বুঝেই চলে যেতে চাইছ—কিন্তু অনমী, স্নেহ, ভালবাসা, প্রেম ছাড়া কি মানুষের ঘর সুন্দর হ’তে পারে?”

অনমী একথায় চমকে ওঠে। তবে কি মিতার মার কথা সত্যি! মধুময়ের দিকে চেয়ে একটু দৃঢ় অথচ ধীর-ভাবেই বলে, “তা অবশ্য হয় না—কিন্তু আপনি কি—”

“কিন্তু কিছু নেই অনমী—আমি বৃদ্ধ এটা ঠিক—কিন্তু মন তো আমার বৃদ্ধ হয়নি; সাধারণ অনুভূতি, রাগ এসব তো বিকৃত হয়নি। বাইরে অপটু দেহের ছদ্ম আবরণে সে যে গা ঢাকা দিয়ে আছে এই যা তফাৎ। আবরণ সরিয়ে তার কাছে এস—দেখবে সে সবুজ—বার্দ্ধক্যের আঁচ সেখেনে কোথাও লাগেনি—”

মধুময় কি বলতে চায় অনমী যেন তা সবই বুঝতে পেরেছে। মিতার মার কথাগুলি যে একেবারে নিরর্থক নয় তা যেন সে এখন কিছুটা বুঝতে পারলো। মধুময়ের সমস্ত দেহের দিকে আর একবার ভাল করে দেখে নিল সে। বিশ্বাস হল না—তা কি করে সম্ভব। বার্দ্ধক্যের আঁচ তার সারা দেহতে, অথচ মনে তার এ আঁচ লাগেনি! অনমীর যেন সব গোলমাল হয়ে গেল। তবে কি এই সেবার ভেতর দিয়ে সে ঐ বৃদ্ধের অন্তরে মোহ ভালবাসার বীজ নতুন করে বপন করে দিয়েছে? এই জন্যেই কি মিতার মা অতবড় কথা বলতে সাহস পেয়েছে!

মধুময় অনমীর চিন্তাক্লিষ্ট মুখের দিকে চেয়ে বলে, “মিতার মার কথায় তুমি রাগ ক’র না—এতদিনের স্নেহ ভালবাসার কথাকে তুমি কি এমনি ক’রেই অবিশ্বাস করবে?”

অনমী কিছু বলে না। মিতার মার আর অপরাধ কি! সেই-ই তো তার মনে এ ধারণার সৃষ্টি করে দিয়েছে। তাই মধুময়ের কথার উত্তরে বলে, “না, মিতার মার আর অপরাধ কি! অপরাধ যত এই স্নেহ ভালবাসার। অবশ্য এ স্নেহকে আমি অবিশ্বাস করছি না, তবে আপনার ছদ্ম আবরণের রূপটিকেই সব বলে ধ’রে নিয়ে আমি ভুল করেছি—মাফ্ করবেন—আমি যাই—গাড়ীর সময় হয়ে এসেছে—”

অনমীর চোখ দুটো ছল ছল করে উঠলো। আরও কিছু বলার ছিল, কিন্তু বলতে পারলো না। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

মধুময় স্থির থাকতে পারলো না! বিছানা থেকে নেমে এসে কাঁপতে কাঁপতে অনমীর হাতখানা ধরে বলে ওঠে, “অনমী, তুমি চলে যাবে? তাহলে যে সব—” আর বলতে পারে না—একটা রুদ্ধ বেদনার চাপা মূর্চ্ছনা তাকে অস্থির ক’রে তোলে।

অনমী বিরক্ত হয়ে বলে ওঠে, “হাত ছাড়ুন—গাড়ীর সময় হয়েছে—”

মধুময় ব্যাকুল হয়ে বলে ওঠে “গাড়ীর সময় হোক—কিন্তু আমার ব্যবস্থা না করে তুমি তো যেতে পার না অনমী! আর আমার সব কথাও তোমাকে শুনতে হবে। দেখছ, আমি কত অসহায়—আমার এই মরুময় জীবনের মাঝে তুমি স্নেহের মরুদ্যান রচনা করেছো অনমী—তাকে সরিয়ে নিলে আমি বাঁচবো না—”

মধুময়ের এই কথায় অনমী থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। কিছু বলে না। মধুময়ের দুটি অসহায় চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

মধুময় বলে চলে—"সব হারিয়ে বিশবছর ধরে আমি এই সংসার মরুর ওপর দিয়ে পাড়ি দিচ্ছি—এক কণা স্নেহ নেই—এক কণা সমবেদনা নেই! জীবনের সব শুকনো রিপুগুলো যখন স্বচ্ছ স্নেহরসে সিঞ্চিত হতে চায়, তখনই এক এক ক'রে সরে গেল সব কটি স্নেহের উৎস—আজ আমি নিঃস্ব অনমী—আমি রিক্ত—"

মধুময় হাঁফিয়ে ওঠে। তার দেহ কাঁপতে থাকে। অনমী মধুময়কে ধ'রে ধীরে ধীরে বিছানার ধারে নিয়ে গিয়ে বলে, "বসুন—আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন—"

অনমী পাখা নিয়ে বাতাস করে। একটু পরে মধুময় বলে, "ঐ সমস্ত হারিয়ে যাওয়া স্নেহসমুদ্র মন্থন করে আশীর্বাদের মতন তুমি আমার জীবনে এসে পড়েছো অনমী। তাই তো আমি ঐ স্টেশনের দিকে তাকিয়ে থাকি তোমার আশায়"—বলতে বলতে মধুময়ের চোখ দুটি সজল হ'য়ে ওঠে।

ক্ষণকাল উভয়েই চুপ করে থাকে। অনমীর চোখের ওপর ভেসে ওঠে ষোলবছর আগের ঐ রকম দুটি সজল চোখের কথা। তারই দুটি হাতকে আঁকড়ে ধরে তার দিকে চাইতে চাইতে শেষ নিশ্বেস ফেলেছিল তার বাবা। সে চোখের চাহনির সংগে মধুময়ের এ চাহনির কোন পার্থক্য আছে বলে তার মনে হল না।

মধুময় একটু পরে বলে চলে, "তোমাদের নিয়ে আমি আবার সংসার পাতবো। সেই সংসারের সজীব রূপ দেখতে দেখতে আমি শেষ নিশ্বেস ফেলবো—এই তো আমার বাসনা। তাই আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি তোমাকে আর শেখরকে দান করবো ঠিক করেছি—" এই বলে বিছানার নীচ থেকে দানপত্রের খসড়া নথিটি অনমীর কাছে তুলে ধরে।

অনমী বিস্ময়ে ক্ষণকাল চেয়ে থাকে, তারপর বলে ওঠে, "শেখর! কিন্তু সে তো আমার সংগে কোন সম্বন্ধ রাখেনি—"

মধুময় একটু দম নিয়ে বল্লে, "সম্বন্ধ সে যেমন রাখেনি, লণ্ডনে শেখর ডোরথীকে ভালবেসেছে—এই মিথ্যে সংবাদ তুমি যে কার কাছে পেয়েছিলে তা জানি না। কিন্তু তোমার কাছ থেকে জোর করে ঠিকানা নিয়ে শেখরের সংগে যোগাযোগ আমি রেখেছি।"

অনমীর মনের ওপর যেন একটা দমকা আঘাত লাগল। শেখর তাহলে ডোরথীকে ভালবাসেনি? তবে কি তার বন্ধু শিপ্রা লণ্ডন থেকে মিথ্যে সংবাদ দিয়েছিলো—তাদের মধ্যে একটা বিরাট সংশয় গড়ে তোলার জন্যে। অনমী বেশ উৎকণ্ঠিত হয়ে বলে, "আপনি কি করে জানলেন?"

মধুময় বইয়ের তাক থেকে একটা খাম বার করে বলে, "শেখরকে আমি এ প্রশ্ন করেছিলাম যে ডোরথী বলে যে মেয়েটি তার সংগে সাইকোলজির গবেষণা করছে—সে তাকে ভালবাসে কিনা। এ প্রশ্নের উত্তর শেখর দেয়নি—ডোরথীকে দিয়েই শেখর উত্তর পাঠিয়েছে। এই চিঠিখানা ডোরথীর লেখা—এই নাও পড়—"

অনমী চিঠিখানা পড়লো—একবার, দুবার, তিনবার পড়লো। তারপর বেশ একটু সহজ অথচ অনুতপ্তের মতন বলে, "ডোরথী এত ভাল মেয়ে, তাতো জানতাম না। শিপ্রা আমার কি অনিষ্টই না করেছে—শিপ্রা বন্ধু কিনা—তাকে খুব বিশ্বাস করেছিলাম।" অনমীর গলা ভারী হয়ে উঠলো। চোখ দুটোও ছল ছল করে উঠলো।

মধুময় অনমীর দিকে চেয়ে ক্ষণকাল কি ভাবে। তারপর বলে, "হাঁ, ডোরথী ভাল মেয়ে বইকি। শেখরের পাণ্ডিত্যে সে মুগ্ধ—সাইকোলজির গবেষক পৃথিবীতে খুব দুর্লভ—তাই সে শেখরের প্রতিভাকে ভালবাসে—তাকে শ্রদ্ধা করে। শিপ্রা এই সুযোগে তোমার মনকে শেখরের বিরুদ্ধে বিষিয়ে তুলে শেখরের গলায় মালা দিতে চেয়েছিল—"

অনমীর হৃদয় বিস্ময়-অভিভূত হ'য়ে পড়ে। বিছানার একপাশে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ধরা গলায় বলে, "কিন্তু এ কথা তো আপনি আগে বলেননি—"

"শেখর যখন আসছে, তখন তাকে দিয়েইতোমাকে এই কথাগুলি বলাতাম—কিন্তু সে অবসর তো আর হ'ল না—"

অনমী ক্ষণকাল মধুময়ের দিকে চেয়ে কি ভাবলো। তারপর বলে, "শেখর আসছে?"

মধুময় বালিশটায় ঠেস দিয়ে বলে, "হাঁ—তার পড়া শেষ হয়েছে—ডক্টর উপাধি নিয়ে সে দেশে ফিরছে—"

অনমী বলে, "এখানের বিষয় সম্পত্তি বেচে সে তো বিলেত গেছলো—এখন কোথায় থাকবে ?"

মধুময় ঈষৎ হেঁসে বলে, "সোনার চাঁদ ছেলে—তার আবার থাকার অভাব। সে সোজা আমার এখেনে আসছে না—তোমার বাবার পাত্র নির্বাচন যেমন ভাল তেমনি সুন্দর। আজ যদি তিনি থাকতেন ?—"

মধুময়ের কথা শেষ হতে না হতে মিতা এসে বলে, "দাদু কে একজন ডাকছে—"

মধুময় বলে, "কে ডাকছে ?"

মিতা বল্লে, "তা জানি না—বল্লে বিলেত থেকে আসছে—"

মধুময় বিছানা থেকে তাড়াতাড়ি উঠে বলে ওঠে, "অনমী যাও—যাও—শেখরকে নিয়ে এস—"

অনমী চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তার যেন চলার শক্তি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। কি ভেবে বললে, "মিতা যা—তাকে ওপরে নিয়ে আয়।"

মিতা চলে যায়। মধুময় বিস্ময়ে অনমীর দিকে চেয়ে কি ভাবে। তারপর একটু হেসে বলে, "মান-অভিমানের সময় ত এখন নয়—শেখর সেই শেখরই আছে—তা ছাড়া এতদিন পরে যখন সে এসেছে তখন তাকে অভ্যর্থনা জানানোও তোমার দরকার—ভাগ্যিস আজ তুমি চলে যাওনি—

অনমী আর কিছু বলে না। কি একটু ভেবে নীচেয় নেমে যায়। সবটা নামতে হল না। শেখর দোতলার বারান্দায় উঠে এসেছে। অনমীকে সামনে দেখে বলে ওঠে, "কেমন আছ ?"

অনমী ক্ষণকাল শেখরের দিকে চেয়ে থাকে, তারপর বলে—"চিনতে তাহলে পেরেছো ?"

শেখর বলে ওঠে, "চিনতে না পারার তো কিছু নেই—তবে আমাদের মাঝে বিচ্ছেদের যবনিকা ফেলার জন্যে শিপ্রা যে ষড়যন্ত্র করেছিলো, মধুময়বাবু না থাকলে তা কিছুতেই ফাঁস হত না—তিনি কোথায় ?"

"ওপরে আছেন—"

"চিঠির মাধ্যমেই তার সংগে আমার পরিচয়—তার সংস্পর্শে তুমি না এলে তোমাকে আমি, আর আমাকে তুমি যে হারাতে তাতে কোন সন্দেহ ছিল না—চল, আগে তাঁকে আমাদের প্রণাম জানাই—"

দুজনে ওপরে সেই চিলেকোঠায় গিয়ে উঠলো। মধুময় দরজার দিকে আগ্রহের সংগে চেয়েছিল।

এদের দেখেই বলে ওঠে, "এসেছো শেখর, এস বাবা—এস বাবা! বস—আজ যে আমার কি আনন্দ হচ্ছে তা আর কি বলবো—"

মিতার মাকে দরজার কাছে দেখতে পেয়ে মধুময় বলে ওঠে, "মিতার মা—অত পেছনে কেন—ঘরের মধ্যে এস—"

মিতার মা কিছুটা সলজ্জভাবে ঘরের মধ্যে এসে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো। তখন মধুময় ধীরে ধীরে বলে, "জান, মিতার মা, অনমীকে নিয়ে সংসার পাতার সাধ আজ আমার পূর্ণ হবে। অনমী আমার মেয়ে—আর এই শেখর—এ হচ্ছে বিলেত-ফেরৎ সাইটোলজির গবেষক—বড় ভাল ছেলে—আয় ত মা—"

এই বলে অনমীর হাতটি ধরে অপর হাতে শেখরের হাতটি ধরে দু'টি হাত এক করে বলে ওঠে, "শেখর, আজ থেকে তুমি অনমীর ভার নিলে—আর অনমী তুমিও আজ থেকে শেখরের ঘরণী হলে। অনমী, তোমার বাবার ইচ্ছে আজ পূর্ণ হল—তোমাদের সুখের সংসার হবে—আমারই নতুন সংসার—সবহারা রিক্ত জীবনের শেষের কটা দিন তোদের স্নেহ, ভালবাসা নিয়েই যেন শেষ হয়—এই কথা বলে বালিশের নীচে থেকে চাবির তোড়াটি অনমীর আঁচলে বেঁধে দিয়ে বলে, "তোর এ বুড়ো বাপটার সব ভার আজ থেকে তোদের ওপরই রইল—পারবি তো মা, বুড়ো বয়সের ভার নিতে ?"

শেখর ও অনমী মধুময়ের পায়ের ধুলো নেয়। কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে দুজনেরই চোখ ভরে এল। মিতার মা শেখর ও অনমীকে নিয়ে নীচেয় নেমে যায়।

মধুময় বিছানায় আড় হয়ে শুয়ে প্রশান্ত মনে সেই স্টেশনের দিকে চেয়ে থাকে। আজ তার মন, প্রাণ, দেহ এক অনির্বচনীয় তৃপ্তিতে ভরে উঠেছে। চেয়ে দেখে, ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সকালের শেষ গাড়ীখানা সিগন্যালের কাছে বাঁকা পথ বেয়ে চলে যাচ্ছে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র স্মৃতিকথা

শ্রীঅমিয় কুমার সেন

সালটা ঠিক মনে নেই। ১৯২৪ অথবা ১৯২৫। খুলনা সহরে সমগ্র খুলনা জেলার এক জাতীয় সম্মেলন আহুত হয়েছে। সেই সম্মেলনে বাংলার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি আমন্ত্রিত হয়েছেন। সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন দেশবরেণ্য আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। খুলনা জেলার কয়েকটি স্কুল কলেজের ছাত্রদের উপর স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। আমরা কেউ কেউ তখন সেনহাটি স্কুল ও দৌলতপুর হিন্দু একাডেমীর ছাত্র। যখন জানতে পারলাম নির্বাচিত স্বেচ্ছাসেবকদের মাঝে আমিও একজন, তখন আমার কিশোর মন এক অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে গেল। সম্মেলনের আগের দিন আমরা কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক খুলনায় গিয়ে অভ্যর্থনা সমিতির কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি এবং ঐদিনই স্বেচ্ছাসেবকদের কার কোন্ বিভাগে কাজ করতে হবে তার চূড়ান্ত তালিকা নির্দিষ্ট হয়ে যায়। সৌভাগ্য ক্রমে আমি ও আমার খুড়তুত ভাই অমলকুমারের উপর দায়িত্ব পড়ে—সর্ববিষয় সভাপতির তত্বাবধান করা। এই ব্যবস্থায় আমরা প্রথমটা খুব মুষড়ে পড়লাম, দুটি কারণে একটি এতবড় বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক, এত বড় মহামান্য দেশ-প্রেমিক, এত বড় ত্যাগী জ্ঞান-তপস্বীর যথাযোগ্য সম্মান দেখাতে যদি আমরা না পারি—যদি আমাদের কার্যকলাপে, কর্তব্যের ত্রুটিতে তাঁর অসুবিধার সৃষ্টি করি, তিনি নানাভাবে যদি বিপন্ন বোধ করেন, তখন সারা জীবন সে লজ্জা, সে ত্রুটির গ্লানি আমরা কোনদিনই মন থেকে মুছে ফেলতে পারব না। আর একটি কারণ—বন্ধুবান্ধবেরা খানিকটা ভয় দেখিয়ে দিল এই বলে, 'ওরে বাবা, তোরা গেছিস্, পি, সি, রায়ের কিল ঘুসি বুকে পিঠে পড়লে আর তোদের রক্ষা থাকবে না।' কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন কারণই আমাদের মনে বাধা সৃষ্টি করতে পারলনা। দুইভাই প্রতিজ্ঞা করলাম—আমরা ছায়ার ন্যায় তাঁকে সব সময়েই অনুসরণ করব—আমাদের সেবা দিয়ে, শ্রদ্ধা দিয়ে, মানসিক ভক্তি ও শারীরিক শক্তি দিয়ে তাঁকে সর্বদা ঘিরে রাখব, এতটুকু কষ্ট তাঁকে পেতে দেবনা, কারণ এতবড় সত্যদ্রষ্টা ত্যাগী মহাপুরুষের সঙ্গ লাভ করা আমাদের জীবনে ভগবানের পুণ্যাশীর্বাদ বলেই আমরা গ্রহণ করলাম।

সম্মেলনের দিন সকালের দিকে আচার্য্যদেব খুলনায় এসে গেলেন। তাঁর সামনে গিয়ে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে সসম্মানে অভ্যর্থনা করলাম এবং আমাদের পরিচিতি জানালাম। আমার যতদূর মনে পড়ে—খুলনার গৌরব, ৺দেশভক্ত স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ সেনের বাসগৃহের একটি বিরাট কক্ষে আচার্যদেবের থাকবার স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল। তাঁকে আমরা সেই কক্ষে নিয়ে এলাম। তিনি এসে একখানা চেয়ারে বসতেই আমরা দুভাই তাঁর পায়ের জুতার ফিতে খুলতে লাগলাম। তিনি হেসে বললেন—'ওরে অতিভক্তি চোরের লক্ষণ, তা আমার আর কি চুরি করবে—আছে ত 'গায়ের এই জিনের কোটটা, আর তার পকেটে কিছু পয়সা।' আমরাও হেসে উঠলাম। তারপর তিনি জামা খুলে, একটা চৌকিতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন। আমরা একজন তাঁকে হাওয়া করতে লাগলাম, আর একজন তাঁর পা টিপতে লাগলাম। হঠাৎ তিনি আমাদের কাছে টেনে নিয়ে খুটিয়ে খুটিয়ে আমাদের পরিচয় নিতে লাগলেন। তখন আমাদের গ্রাম সেনহাটিতে খুব ম্যালেরিয়া হত এবং আমি প্রায়ই ম্যালেরিয়ায় ভুগতাম। তাই আমার ক্ষীণ স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য করে বললেন—দেখ না তোর চেহারা? তোদের দিয়ে কি হবে? আমার দেহে এখনো যে জোর আছে তাও ত তোদের নেই। তোরাই আবার মাষ্টার অব্ সায়ান্স হবি—তোদের দিয়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল হবে?' এই কথাগুলি বলার পর স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে আমাদের যে অজস্র উপদেশ দেন, তা আজও আমার স্মরণীয় হয়ে আছে।

সম্মেলনে আচার্যদেব যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তার সবটুকু তখন হয়ত আমরা বুঝিনি—মনেও নেই আমার। কিন্তু যেটুকু মনে আছে তা আজও আমি ভুলতে পারিনি। তিনি অনেক কথার মাঝে বলেছিলেন, 'যে শিক্ষায় শুধু গ্রাজুয়েট তৈরী হয়, মনুষ্যত্বের সঙ্গে যার পরিচয় হয়না, যে শিক্ষা আমাদের ক'রে খেতে শিখায় না, সে শিক্ষার প্রয়োজন কি? কঠিন সমস্যা সকলের মীমাংসা করবার ভার আমাদের হাতে। আমাদের কি দুর্বলচিত্ত, চাকুরীপ্রিয়, বিলাসী বাবু হওয়া সাজে? শক্ত হতে হবে, দৃঢ় হতে হবে, অন্ন সমস্যার সমাধান হলে সঙ্গে সঙ্গে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তাই ব্যবসা ছাড়া আমার আর কিছু বলবার নেই।' তারপর আর এক জায়গায় ছেলেদের নির্দেশ করে তিনি বলেছিলেন, 'তোমরা জান যে আমি কখনো জাগতিক ধন-সম্পত্তি খুব সাবধানে ব্যবহার করিনি। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন-প্রেসিডেন্সী কলেজে এতদিন চাকরীর পর আমি কি ধন দৌলত সঞ্চয় করেছি? তা হলে আমি ইতিহাসের কর্ণোলিয়ার ভাষায় জবাব দেব, আমি কর্ণোলিয়ার মত একজন রসিক লাল দত্ত, একজন নীলরতন ধর, একজন জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, একজন জ্ঞানেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় কে দেখিয়ে বলব—এরাই আমার রত্ন।' আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে, বক্তৃতা শেষ করবার আগে তিনি তাঁর সামনের টেবিলের উপর থেকে দুখানা বই দুই হাতে তুলে ধরে বলেছিলেন, আজ বাংলার ইতিহাস যারা ভুলে যাচ্ছেন, বাংলার বর্তমান সমাজকে আজো যাঁরা চিনে উঠতে পারলেন না, তাঁদের অনুরোধ করব এই বই দুখানি পাঠ করবার জন্য,

একখানি স্বনামধন্য ঐতিহাসিক অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র প্রণীত 'যশোহর ও খুলনার ইতিহাস—দ্বিতীয়খণ্ড' আর একখানি বাংলার দরদী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'পল্লী সমাজ।'

সম্মেলনের পরের দিনটা আচার্যদেব তাঁর কক্ষে তাঁর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করার জন্য লোকের ভীড়ে বড় ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর একটু সান্নিধ্য পাবার জন্য, তাঁর বহুমূল্য উপদেশ শুনবার জন্য, খুলনা তথা বাংলার অনেক সুধী ব্যক্তিই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। কাজেই তাঁকে সেদিন সম্পূর্ণ একক করে পাবার কোন ব্যবস্থাই আমরা করতে পারছিলাম না। যা হোক, বিকালের দিকে আমরা আচার্য দেবের অনুমতি না নিয়েই বোধ হয় একটা অন্যায় করে ফেললাম। স্বেচ্ছাসেবকের উপর অর্পিত দায়িত্ব বলে আমরা বাইরে ঘোষণা করে দিলাম, ঘণ্টা দুই আচার্যদেব বিশ্রাম করবেন। এই সময়টুকুর মধ্যে তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁর বিশ্রামের ব্যাঘাত না ঘটাবার জন্য আমরা তাঁর দর্শনপ্রার্থীদিগকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি।' এই ব্যবস্থায় কাজ হল এবং এ ব্যাপারের মূলে যে তাঁর দুটি কিশোর স্বেচ্ছাসেবক, তিনি তা বুঝতে পেরে আমাদের ডেকে বল্লেন, কিরে, খুব কূটনৈতিক চাল দিলি। আচ্ছা, এখন চল্, খানিকটা বেড়িয়ে আসি—দেখি তোদের পায়ের তাগদ্।

তখন পড়ন্ত বেলা। অস্তগমনোন্মুখ সূর্যের শেষ রশ্মিটুকু তখনও স্তিমিত হয়নি। আমরা বেরিয়ে পড়লাম। আচার্যদেবের সঙ্গ পাবার লোভে আরও ২।৩ জন স্বেচ্ছাসেবক আমাদের সঙ্গী হল। করনেশন্ হলের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটি সোজা এগিয়ে গেছে দক্ষিণ দিকে, সেই রাস্তা দিয়ে আচার্যদেব সমভিব্যাহারে আমরা এগিয়ে চল্লাম। কিন্তু এগিয়ে তিনিই চল্লেন—আমরা তাঁর পেছনে পেছনে জোর পায়ে হেঁটেও তাঁর নাগাল পাচ্ছিলাম না। মনে মনে ভাবছিলাম—এই বয়োবৃদ্ধ শীর্ণ, কৃশ, রোগা মানুষটির চলনে কি অপরিসীম প্রভাব। কি দ্রুতগতিসম্পন্ন তাঁর পা দুখানি!—আমরা যে কিছুতেই সে তালে চলতে পাচ্ছিলামনা। মনে হয়েছিল তখন তিনি ছুটছেন—ছুটছেন যেন বিরাট এক জ্ঞান সমুদ্র—যাঁর মহামূল্য জ্ঞান-রত্ন আহরণ করবার জন্য আমরা কয়েকটি কিশোর বিদ্যার্থী ছুটে যাচ্ছিলাম—সমুদ্র গামিনী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর চঞ্চল গতিশীলতা নিয়ে।

অনেকটা হেটে এসে তিনি আমাদের নিয়ে বসলেন করনেশন হলের অনতিদূরে একটা ক্ষুদ্র মাঠের মাঝে। আমরা তাঁকে ঘিরে বসলাম। হঠাৎ আচমকা তিনি অমলকুমারের পিঠে প্রকাণ্ড একটা কিল দিয়ে বলে উঠলেন—'পড়েছিস, Lord Tennyson এর 'The charge of the light Brigade?'

আমরা সকলে সমস্বরে বলে উঠলাম, হ্যাঁ, সকলে পড়েছি।' তিনি বল্লেন,

'Their's not to make reply,
Their's not to reason why',—

পড়েছিস, তারপর?'—

আমরা বললাম—'Their's but to do and die.'

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তোদের সৈনিকের মত কর্তব্যপরায়ণ হতে হবে, কোন যুক্তি নয়, তর্ক নয়, প্রত্যুত্তর নয়—অবিচলিত ভাবে নির্ভীক চিত্তে গুরুর আদেশ মানতে হবে, তাতে যদি মৃত্যুই আসে সে মৃত্যু তোদের জীবনের গৌরব। তোদের জীবন নৌকার কাণ্ডারী ঠিক করে নে—না হলে নৌকা নিয়ে সংসার সমুদ্রের কোন ফেনিল আবর্তে ঘুরপাক খাবি, তোদের জীবন নৌকার কাণ্ডারী তোদের ঠিক পথে চালিয়ে নিয়ে যাবে।'

পরে বললেন, 'বুড়োর আর কয়েকটি কথা জেনে রাখ্, জীবনে ভুলিসনা—বড় হয়ে কাজ করতে করতে যখন কাজের মধ্যে ডুবে যাবি তখন পড়াশুনা জীবনে কখনও ছাড়িসনা। সব সময়েই নিজেকে ছাত্র মনে করে সারাজীবন জ্ঞানের চর্চা করে যাবি, তবেই তোদের জীবন সার্থক হবে। তারপর তাঁর কণ্ঠে ফুটে উঠ্ল এক অপরিসীম মমত্ববোধ—তিনি বলে গেলেন, 'তোদের উপর আমার কত আশা জানিস্? তোরাই দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। আমার বিশ্বাস অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ সকল বিষয়ে প্রাধান্য লাভ করবে। যে দেশে রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেছেন, গোখলে ও গান্ধীর মত আদর্শ ত্যাগী যে দেশের সন্তান; যে দেশের জগদীশচন্দ্র, রামানুজম, পরাঞ্জপের প্রতিভায় আজ পাশ্চাত্য জগৎ মুগ্ধ সে দেশের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল আমি বিশ্বাস করি—তাই তোদের বলছি তোরা ভাব্, বোঝ্ এবং কাজে লেগে যা—পৃথিবীতে তোদের দাঁড়াতে হবে—মানুষের মত উচ্চশির হয়ে দাঁড়াতে হবে—দাঁড়াতে হবে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মূর্তিতে, দাঁড়াতে হবে মনের দৃঢ়তা ও একনিষ্ঠতা নিয়ে, দাঁড়াতে হবে আদর্শ চরিত্র বলে বলীয়ান হয়ে।'—এই বলে আচার্যদেব কিছুক্ষণ নীরব রইলেন।

তখন দিগ্বলয়ে নেমে এসেছে সন্ধ্যার ম্লান ছায়া। আকাশের বুকে একটা দুটো করে ফুটে উঠ্ছে নক্ষত্রের পর নক্ষত্র। দূরের কোন এক দেব-দেউলে তখন সন্ধ্যারতির কাঁসর ঘণ্টা একটানা বেজে চল্ছিল। গোধূলির রংস্ত ঘন আলো আঁধারে বায়ুমণ্ডল পরিব্যাপ্ত পবিত্র দেবারতির বাদ্যধ্বনিতে এক অপূর্ব পরিবেশের মাঝে, এক সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষের কণ্ঠ নিঃসৃত উপদেশ বাণী, দৈববাণীর ন্যায় আমাদের কর্ণে প্রবেশ করে তড়িৎপৃষ্টবৎ আমাদের অভিভূত করে ফেল্ল। সেই মুহূর্তে অপূর্ব এক ভাবাবেশে তাঁর চরণ প্রান্তে লুটিয়ে পড়ে সমস্ত অন্তর দিয়ে গ্রহণ করলাম, বরণ করলাম তাঁর সেই অমৃত নিস্যন্দিনী উপদেশ-বাণী।
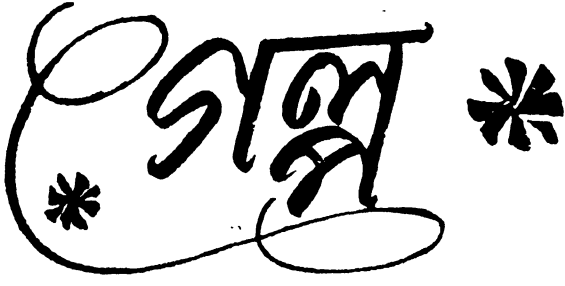
ধোঁকা

মিঠু

বেঞ্চিটাতে একাই বসেছিল সমীরণ সমাদ্দার।

বেশ নিরিবিলি জায়গাটি, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পশ্চিমে, রেস কোর্সের দিকে। পূরবী বলেছে সে আসবে ছ'টায়।

একটু আগে থাকতেই এসেছে সমীরণ। আজকাল ট্রাম বাসের যা অবস্থা, তাতে কিছু ভরসা করা যায়না একটু আগে আসাই ভাল। তাছাড়া এই কথা ভেবে পূরবীও যদি আগে এসে পড়ে—বলা যায় কি? অনেক ভেবে চিন্তে সব কাজ করে সমীরণ।

নভেম্বরের মাঝামাঝি, শীতের আমেজ দিয়েছে একটু সন্ধ্যের পর বেশ একটু গা শির শির করে। ফিরতে যদি রাত হয় এই আশঙ্কায় একখানা আলোয়ানও সঙ্গে এনেছে সমীরণ। পাঁচটা বাজে বাজে, এর মধ্যেই অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে চারিদিকে।

এই কিছুক্ষণ আগে রেস ভেঙ্গেছে, রাস্তায় মোটরের স্রোত বইছে যেন। আর তার সঙ্গে চলেছে আশাহত মানুষের এক বিরাট মিছিল—ম্লান মুখ, ধূলি ধূসরিত দেহ, কোন রকমে ক্লান্ত দেহটাকে যেন টেনে নিয়ে চলেছে তারা।

তাদের দেখে বড় মায়া হল সমীরণের। নিজের মনেই মন্তব্য করে, মূর্খের দল, কি আশায় যে আসে এখানে। তবু সমীরণ সকালে তাদের আশা-উজ্জ্বল মুখখানা দেখেনি, তাহলে হয়ত বলতো—প্রভু, তুমি এদের কল্যাণ কর। ব্রাহ্ম সমাজেও যাতায়াত আছে সমীরণের।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র সে, বাংলায় এম, এ। বর্তমানে কলকাতার এক বেসরকারী কলেজে অধ্যাপনা করে। শুধু বাংলা কেন, ইংরাজি সাহিত্যটাকেও সে এক রকম গিলে খেয়েছে। আজকাল ফরাসী সাহিত্য নিয়েও খুব সে নাড়াচাড়া করছে, ইচ্ছে আছে সব সাহিত্যের তুলনামূলক একটা কিছু লেখা, অসম্ভব কিছু নয়, সমীরণের মত ছেলের পক্ষে এটা খুবই সম্ভব—সে বিদ্যে বুদ্ধি তার যথেষ্ট আছে।

পূরবী যে তার চিঠির উত্তর দেবে এটা সে জানতো, বেশ ভাল করেই জানতো। কয়েক দিনের আলাপ-পরিচয়েই সেটা সে অনেকটা অনুমান করতে পেরেছিল। তাছাড়া আরও একটা জিনিষ আছে, নারীচরিত্র সে খুব ভাল বোঝে, এ নিয়ে সে অনেক পড়াশুনা করেছে।

গবেষণাও করেছে অনেক। তার মতে—যারা সোনা চেনে তারা মানুষও চেনে, আসল নকলের পার্থক্যটাও তারা অতি সহজে ধরে ফেলতে পারে। অনুমানটা তার একেবারে অমূলক নয়, তা না হলে এত গুণগ্রাহী থাকতে তাকেই বা কেন বেছে নিল পূরবী। বস্তুজগতের আকর্ষণীয় বলতে তো এমন কিছু নেই তার। ভবানীপুরের এক এঁদোপড়া গলিতে একখানা ঘর নিয়ে সে থাকে। থাকার মধ্যে আছে একখানা নড়বড়ে তক্তাপোষ, খানকয়েক বই, একটা রিষ্টওয়াচ আর একটা পার্কার পেন, হোটেলে খায়, আর অবসর সময়ে পড়াশুনা করে কাটায়। অধ্যাপনা আর টিউসানি করে যে পয়সা সে রোজগার করে তাতে একটা ছোটখাট সংসার সাধারণ ভাবে চলে যেতে পারে, কিন্তু তাতে বাবুয়ানী করা চলেনা। আসলে সমীরণ যে একজন জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি, এটা পূরবী বেশ ভাল করে জানে. এতেই হয়ত তার প্রতি এখানে আকৃষ্ট হয়েছে সে।

গুণী না হলে কেউ গুণের আদর দিতে পারেনা, পূরবী নিজেও একজন সত্যিকার গুণী মেয়ে, এ অনেক গুণের অধিকারিণী সে। লেখাপড়া জানে, সুন্দর চেহারা, গানের গলাও চমৎকার, আর অভিনয়ে তো তার জুড়ে নেই। এক কথায় বলা চলে পূরবী শুধু রূপসী নয়, সত্যিই

একজন বিদুষী, যা অনেক পুরুষের হৃদয়ে চাঞ্চল্য ঘটায়।

পূজোর ছুটীর আগে সমীরণের কলেজের মেয়েরা অভিনয় করবে রবীন্দ্রনাথের 'মালঞ্চ'। মেয়েরা গিয়ে ধরে বসলো পূরবীকে—তাদের একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দিতে হবে—সব কিছু বুঝিয়ে দিতে হবে তাদের। রাজী হয়ে গেল পূরবী—রোজই সন্ধ্যের পর রিহার্সাল বসে, সমীরণও এসে তাতে যোগ দেয়। মেয়েদের মধ্যে সমীরণের একটু প্রতিপত্তি আছে, অনেক বিষয়ই তাদের সে সাহায্য করে। দরকার হলে বাড়ী গিয়েও পড়িয়ে আসে সে। এইখানেই পূরবীর সঙ্গে সমীরণের আলাপ। রিহার্সালের মধ্যেই অনেক বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা চলে তাদের, দুজন দুজনাকে সাহায্যও করে সব সময়।

নির্দিষ্ট দিনে থিয়েটার হলো। মেয়েদের অভিনয় দেখে সবাই খুসী, দৈনিক কাগজে এবং মাসিক পত্রিকাতেও তাদের খুব উচ্ছসিত প্রশংসা হলো, পূরবীও বাদ গেলনা, সবাই সমস্বরে বললে, এর সব কৃতিত্বই পূরবীর, তার পরিচালনা সত্যিই অপূর্ব। সবার চেয়ে খুসী হলো বোধহয় সমীরণ নিজে—অভিনয়ান্তে ষ্টেজে দাঁড়িয়ে সে একটা মস্ত বক্তৃতা দিলে পূরবীকে উপলক্ষ করে।

এতেও শেষ হলো না, এরপরে অনেক জলসায় অনেক বিচিত্রানুষ্ঠানে পূরবীর সঙ্গে দেখা হয়েছে সমীরণের, তার অভিনয় দেখে সে একেবারে মুগ্ধ হয়েছে, প্রশংসা স্তুতি-বাক্যও সে অনেক শুনিয়েছে তাকে। তবু তার মন ভরেনি, তাই সে একদিন তাকে লিখে জানালে, নিরিবিলিতে বসে দুটো কথা বলতে চাই, যদি না আপত্তি থাকে। রাজী হয়েছে পূরবী, সমীরণকে সে বিশ্বাস করে।

সমীরণ ঠিক করেছে মনের কথাটা তার আজ সে খুলে বলবে। মনে মনে যদিও সে জানে আবেদনটা তার অগ্রাহ্য হবে না, তবু পূরবীর কোন কিছু অসুবিধা থাকতে পারে হয়ত—কিছুদিন সময় চাইতে পারে, যদি সে একান্তই চায় তবে সে সময় তাকে দিতেই হবে, প্রণয় ও পরিণয়ের মধ্যে ব্যবধান অনেকখানি।

বিয়েটা সে করতে চায় অত্যন্ত সাধারণভাবে; অনুষ্ঠান পর্বটা যত অল্পের মধ্যে সারা যায় ততই ভাল। রেজেষ্ট্রি করে করতে তার কোন আপত্তি নেই—যদিনা পূরবীর কোন কিছু বাধা থাকে। কিন্তু সবার আগে চাই একটা ভাল বাড়ী, দুখানা ঘরের ফ্ল্যাট হলেই চলবে, বড় বাড়ী নিয়ে লাভ কি? তবে একটা খোলা বারান্দা থাকা চাই; গরমের দিনে সন্ধ্যেবেলা কিম্বা শীতের সকালে দুজনে বসে একটু গল্প গুজব করবে। আর একটা কথা, পূরবী নামটা তার ভাল লাগেনা, ওর মধ্যে সবসময়েই যেন একটা বিষাদের সুর বাজে, ওনামটা বদলাতেই হবে—তার সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করবে সে।

বসে বসে অনেক কথাই ভাবে সমীরণ।

পৌনে ছটা হলো। রাস্তায় অনেক ভীড় কমেছে। রেসকোর্সটা ইতিমধ্যে অন্ধকারের মধ্যে ডুবে গেছে। রাস্তার আলোগুলোও যে কখন জ্বলে উঠেছে সে ঠাওর করতে পারেনি।

জায়গাটা বড় নির্জন। লোক চলাচল থাকলেও কেমন যেন একটু ছমছম করে। জায়গাটার নাম দোষও আছে অনেক, প্রায়ই রাহাজানির খবর বেরয় কাগজে, কলকাতা সহরে চোর-ছ্যাচড়ের ত অভাব নেই। জায়গা বাছাইটা কিন্তু মোটেই ভাল হয়নি পূরবীর। থাক্ সে এলেই তারা চলে যাবে সেখান থেকে। একটু শীতশীত করছে, আলোয়ানটা গায়ে জড়িয়ে নিলে সমীরণ।

আর একজন এসে বেঞ্চিটাতে বসলো। মনে মনে অনেকটা আশ্বস্ত হলো সমীরণ। এসব জায়গায় এক-আধজন লোক থাকা ভাল। যে রকম দিনকাল, রোজই ত একটা না একটা কিছু লেগেই আছে, হঠাৎ এসে হাত-ঘড়িটা ছিনিয়ে নিতে কতক্ষণ! লোকটীকে দেখে ত বাঙ্গালী বলে মনে হয় না, তবে পোষাক পরিচ্ছদে ভদ্রলোক বলেই মনে হয়। খাসা চেহারাটি কিন্তু ভদ্রলোকের। এমন চেহারা খুব কমই নজরে পড়ে, টকটকে রং, টানা টানা চোখ, মাথায় ঢেউ খেলানো চুল, ভদ্রলোক কি তা হলে কবি; হতেও পারে। তার পানে তাকিয়ে কেমন একটা কুণ্ঠার ভাব এল সমীরণের।

ছ'টাতো অনেকক্ষণ বেজে গেছে, পূরবী ত এখনও এলোনা। তবে কি সে ভুলে গেল। না ভুলবার মেয়ে সে না। নিশ্চয়ই কোন কাজে আটকে পড়েছে, কিম্বা হয়ত ড্রাইভার আসতে দেরী করেছে—নিজের গাড়ীতেই যাতায়াত করে পূরবী। এমনি আর একদিনও হয়েছিল

তার। থিয়েটার আরম্ভ হবে পাঁচটায়, পূরবীর আসবার কথা চারটের সময়। কিন্তু সাড়ে চারটা বেজে গেল—তবু পূরবীর দেখা নেই। সবাই উতলা হয়ে উঠল, বাড়ীতে লোক পাঠাবে পাঠাবে করছে, এমন সময় পূরবী এসে হাজির। সেদিন বেজায় লজ্জা পেয়েছিল সে, জোড়হাত করে সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে সে বলেছিল, আমায় মাপ করবেন, বেজায় দেরী করে ফেলেছি। সেদিনের সেই লজ্জানত মুখখানা হয়ত কোন দিনও ভুলতে পারবে না সমীরণ।

হাত-ঘড়িটার পানে তাকিয়ে একটা সিগারেট ধরালেন পাশের ভদ্রলোক। গন্ধটা ত ভারী মিষ্টি, ভদ্রলোক মনে হচ্ছে ভাল সিগারেটই খান। সিগারেট কেসটাও খুব দামী, বোধহয় খাঁটি রূপোর তৈরী—আবছায়া অন্ধকারেও বেশ একটুখানি জ্বলজ্বল করে উঠলো। সমীরণ নিজেও সিগারেট খায়, পকেট থেকে প্যাকেট বার করে একটা চারমিনার ধরালে সে।

আর একদিনের কথা মনে পড়লো সমীরণের। এক চায়ের আসরে পূরবী তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'আপনি সবার চেয়ে কি খেতে ভালবাসেন সমীরণবাবু? হঠাৎ এ-হেন প্রশ্নে একটুখানি ঘাবড়ে গিছলো সমীরণ, জবাব দিয়ে বলেছিল 'ধোঁকা'—পিসিমার হাতের তৈরী ধোঁকার কথা এখনও ভুলতে পারেনি সমীরণ, সেটা যেন তার সব সময়েই মুখে লেগে আছে। হেসে লুটিয়ে পড়েছিল পূরবী, বললে এত জিনিষ থাকতে আপনি ধোঁকা খেতে ভালবাসেন—সমীরণবাবু? তা আর কি করি বলুন, সত্যি কথা বলতে হবে ত, হেসে জবাব দিয়েছিল সমীরণ। 'আচ্ছা, আমিও একদিন আপনাকে ধোঁকা খাওয়াব, আশা দিয়েছিল পূরবী। সেদিন সারা রাত্রি ধরে ধোঁকার স্বপ্ন দেখেছিল সমীরণ।

নাঃ পূরবী সত্যিই বড় দেরী করছে। এত দেরী করা তার উচিত নয়, শীত পড়েছে এটা তার জানা উচিৎ। কিন্তু এমন ত কোনদিন করেনি সে, তবে কি তার রাস্তায় গাড়ী খারাপ হলো! গাড়ীখানা ত' নতুনই, তা হলেও কিছু বলা যায় না—কল-কব্জার ব্যাপার ত, বিগড়লেই হলো। কিন্তু পূরবী না আসা পর্য্যন্ত তো বসতেই হবে, চলে যাওয়া যায় না, শেষকালে যদি সে এসে ফিরে যায়, তাহলে আর লজ্জায় তার কাছে মুখ দেখানো যাবে না কোন দিন, শুধু তাই নয়—কাজটাও অত্যন্ত অভদ্রোচিত। কিন্তু জায়গাটা বড় খারাপ, মোটেই নিরাপদ নয়। মনে একটু ভয় পেল সমীরণ।

পাশের ভদ্রলোকটিও বেশ দিব্যি বসে আছে, উঠবার নামগন্ধ নেই, সিগারেটের পর সিগারেট ধ্বংস করে চলেছে। লোকটার কোন বদ মতলব নেই ত? কলকাতায় আজকাল ভদ্রবেশী গুণ্ডারও অভাব নেই। হয়ত আর একটু রাত্রির জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু তাকে মেরে কি লাভ হবে তার, কি বা তার আছে। একটা রিষ্টওয়াচ, গোটা পাঁচেক টাকা, এরা কি এতই বোকা, লোক বুঝেই এরা কোপ মারে শুনেছি, হয়ত অন্য কোন তালে আছে। নিজেকে অনেক রকম প্রবোধ দেয় সমীরণ। লোকটা আবার টিকটিকি নয় ত। হতেও পারে, হয়ত তাকে সে সন্দেহ করেছে, তাই গ্যাট মেরে বসে আছে এখানে। তাড়াতাড়ি গা থেকে আলোয়ানটা সরিয়ে ভেতরের খদ্দরের পাঞ্জাবীটা একধার দেখিয়ে দিলে সমীরণ।

অন্ধকার আরও ঘনিয়ে আসে। রাস্তায় গাড়ী চলাচলটাও অনেকটা কমে যায়। আশে-পাশে যারা এতক্ষণ ছিল তারা অনেকেই বাড়ী ফিরে গেছে। মাঝে একজন ফুচকাওয়ালা ঘুরে গেল, ইচ্ছে থাকলেও খেতে পারলেনা সমীরণ, ভয় পেল পাছে পূরবী এসে পড়ে, মুখ দিয়ে একটু লালা গড়িয়ে পড়ল এই পর্য্যন্ত। পাশের ভদ্রলোকটি ঠিক তেমনি বসে আছে, কিন্তু উপায় কি—জায়গা ছেড়ে ত যাওয়া যায় না। পূরবীর তখনও দেখা নেই, তাহলে কি সত্যি সত্যিই ভুলে গেল, না, এ হতেই পারে না, এ কথা চিন্তাও করতে পারে না সমীরণ। সে আসবে, নিশ্চয়ই সে আসবে। সে যতক্ষণ না আসবে, ততক্ষণ সে বসে থাকবে এখানে। কিন্তু পাশের লোকটাই যত গণ্ডগোল বাধাচ্ছে, ঠায় বসে আছে। অন্যধারে গিয়ে যে বসবে সে উপায়ও নেই সমীরণের, পূরবী এই জায়গাটার কথাই বলে দিয়েছে। এ জায়গা ছেড়ে নড়া চলবে না। আতঙ্কে দোদুল দোলায় দুলতে থাকে সমীরণ।

আটটা বাজলো। একখানা গাড়ী আসছে, ধীরে মন্থর গতিতে। গাড়ীটা চেনা চেনা মনে হচ্ছে, তবে কি পূরবী আসছে, ঠিক তাই সে আসছে, সে আসছে, তার অনুমা

মিথ্যে হতে পারে না—খুসীতে নেচে উঠলো সমীরণ। গাড়ীখানা আরও এগিয়ে এল কাছে। লাফিয়ে উঠলো সমীরণ, সঙ্গে সঙ্গে পাশের ভদ্রলোকটি।

—হ্যালো, মিস পুরকায়স্থ—

—এই যে পূরবী দেবী, আমি এখানে।

পূরবী শুধু গাড়ীতে বসে একবার তাদের পানে তাকিয়ে হাত নেড়ে একটু হাসলে। গাড়ীখানা যেমনি এসেছিল তেমনি আস্তে আস্তে চলে গেল।

—এই যা। চিৎকার করে ওঠেন পাশের ভদ্রলোকটি।

ফ্যাল ফ্যাল করে তার পানে তাকিয়ে থাকে সমীরণ। রেসকোর্সের মাথায় একফালি চাঁদ দেখা দিয়েছে তখন।

গোষ্ঠযাত্রা

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

বিশ্রাম সুখ—চিত্ত বিনোদ তরে
যাইনা সাগরে অথবা ভূধরে—রয়ে যাই নিজ ঘরে।
বাঙালী কবির গড়া ব্রজধাম ঘরে বসে আমি পাই।
জুড়াতে পরাণ সেই ব্রজধামে যাই।
ফুটে যেথা সারা বরষই কদম, ছুটে যেথা কুহু-কেকা।
সেথা হয় মোর নন্দ-কিশোর কানুর সঙ্গে দেখা।
নয় নিকুঞ্জে, নয় মধু বনে হোলী লীলা হিন্দোলে,
নয় সখাদের ঝুলনের কলরোলে,
হয়নি আমার চিত্তশুদ্ধি লাভ
মনে যে জাগে না গূঢ় রহস্যময় সে সখীর ভাব।
সেথা পাই আমি বাংলা গোঠের বাট,
দূর্বা শ্যামল মাঠ—
দেখা হয় সেথা ঘন শ্যামল রাখাল রাজের সাথে,
অঙ্গে যাহার পিয়ল কাঁচনি, বাঁশরী পাঁচনি হাতে।
সেথা হয়ে আমি রাখাল দলের সাথী—
শ্যামের সঙ্গে খেলায়-ধূলায় মাতি।
ভুলে যাই মোর জরা,
পরণের বাস হয়ে যায় পীতধড়া।
মধু-মঙ্গল শ্রীদাম সুবল সুদামে সঙ্গী পাই,
তাদের খেলায় কত না ভঙ্গিমাই।
সেথা হেরি কানু সকল খেলায় হারে
জেতায় যাদেরে হারিয়া তাদেরে হেসে বয় পিঠে ঘাড়ে।

কানুরে সাজায় তারা কত বনফুলে
বন ফল খেয়ে মিঠা স্বাদ পেয়ে তার
মুখে দেয় তুলে।
খেলায় শ্রান্ত বসি যবে মোরা বংশী বটের তলে,
বাঁশরী বাজায় কানাই মোদের নয়নে অশ্রু গলে।
কেন তা জানি না পরাণ উদাসী হয়,
নিখিল ভুবন হয় যে স্বপন, হয়ে যাই শ্যামময়।
আধা তনু-তৃণে আধা ধেনু দেহ উপাধানে দিয়ে ঠেস
দুপুরে ঘুমাই ঘনালে তন্দ্রাবেশ।
শ্যামল তৃণেরে কেমনে তুচ্ছ গণি।
সে তৃণ শ্যামের বরণ পেয়েছে—তাই হয় শেষে ননী।
সেই তৃণে পেয়ে শয্যা যে শ্যাম মার
কোল গেল ভুলি'
সে তৃণ রচেছে লীলা প্রাঙ্গণ মুচেছে চরণ ধূলি।
দিগন্ত-জোড়া সারা প্রান্তরে ধেনুরা ছড়ায়ে পড়ে—
তৃণ সন্ধানে, যেন নীলাকাশে তারারূপ তারা ধরে।
দিবসের অবসানে
বলাইএর শিঙা কানাইএর বেণু তাদের জুটিয়ে আনে।
ফিরে ধেনুদল তুলি তরঙ্গ আলোকিয়া সারা পথ,
আগে আগে চলে কানু যেন দুধ-গঙ্গার ভগীরথ।
আয়ান-বধূর অনিমিখ-দিঠি সেই দুধী গঙ্গায়
বাতায়ন পথে প্রতি গোধূলিতে গাহন করিয়া যায়।

ভারতীয় দর্শন সমুচ্চয়

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

যে জগতে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি তাহার ব্যাখ্যাই দর্শনশাস্ত্রের বিষয়। জগৎকে সত্যরূপে দেখাই দর্শন। আমাদের দেশে কোন কোন দর্শনে দুঃখত্রয়ের অভিঘাত হইতে নিষ্কৃতিই তাহার উদ্দেশ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই নিষ্কৃতি সম্ভবপর কি না, জগতের সত্য ব্যাখ্যা জানিতে পারিলে তাহা বোধগম্য হয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের লক্ষ্যও জগতের ব্যাখ্যা। কিন্তু দর্শনের দৃষ্টি—বিজ্ঞান অপেক্ষাও দূরতরপ্রসারিত। বিজ্ঞানের অনুসন্ধান-প্রণালীও ভিন্ন। এতদিন দর্শনের উপাদান সরবরাহ করিয়া বিজ্ঞান এমন স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে যেখানে দর্শনের নিম্নতম সীমা বিজ্ঞানের উর্দ্ধতম সীমার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানের শ্রেষ্ঠতম বৈজ্ঞানিকগণ দার্শনিক বিষয়ের আলোচনা করিতেছেন। মুক্তিশাস্ত্র বলিয়া গণ্য হওয়ায় ভারতে দর্শনশাস্ত্রের গৌরব সর্ব্বাধিক।

বাংলা ভাষায় দার্শনিক গ্রন্থ বেশী নাই। এই শতাব্দীর প্রারম্ভে তাহার সংখ্যা আরও কম ছিল। তখন ৺উমেশচন্দ্র বটব্যাল, ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভিন্ন অন্য কেহ বাংলায় দর্শনের চর্চ্চা করিতেন বলিয়া আমার জানা নাই। ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ পরে লিখিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে দার্শনিক-গ্রন্থের সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে, কিন্তু দার্শনিক সাহিত্য যথোপযুক্ত বিস্তৃতি লাভ করে নাই। বাংলায় অনেক দার্শনিক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। রঘুনাথ শিরোমণি, জগদীশ তর্কালঙ্কার, গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি নব্যন্যায়ের পণ্ডিতগণ নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মধুসূদন সরস্বতী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কোটালীপাড়ায়। কিন্তু তাঁহারা সকলেই লিখিয়াছিলেন সংস্কৃত ভাষায়। বাংলা ভাষায় কেহই লেখেন নাই। বাংলা ভাষায় প্রথম দার্শনিক গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। তাহাতে চৈতন্যদেবের জীবনীর সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন বিস্তৃতরূপে বিবৃত হইয়াছে। শাক্ত ও শৈবদর্শন কোনও গ্রন্থে বাংলা ভাষায় বিবৃত হইয়াছে বলিয়া আমি জানি না। ইহার পরে বহুদিন যাবৎ দার্শনিক কোনও গ্রন্থ বাংলা ভাষায় রচিত হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে অনেক দার্শনিক বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও সাংখ্যদর্শন উক্ত পত্রিকায় ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। তাহার পরে ৺উমেশচন্দ্র বটব্যাল ও ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বাংলা ভাষায় দর্শনের আলোচনা করেন। উমেশচন্দ্র বটব্যাল সাংখ্যদর্শনের এক নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থ অধিকাংশ ইংরাজীতে লিখিত হইয়াছে। রামেন্দ্রসুন্দরের পরে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত অনেকগুলি দার্শনিক গ্রন্থ বাংলা ভাষায় লিখিয়াছেন। গত কয়েক বৎসর হইতে মাসিক পত্রে দার্শনিক প্রবন্ধের অভাব নাই এবং আশা করা যায় অচিরেই এই সাহিত্য আশানুরূপ পূর্ণতা লাভ করিবে।

দর্শনের কয়েকটি ক্ষেত্র এখনও বাংলা ভাষায় অকর্ষিত অবস্থায় আছে। Hindu philosophy of law, Hindu political philosophy ও Ethics, শঙ্করোত্তর দর্শন ও বিবিধ পুরাণে বর্ণিত দর্শন এখনও বাংলা ভাষায় লেখা হয় নাই। ইহার কিছু লিখিবার ইচ্ছা আমার ছিল, কিন্তু তাহা আর হইয়া উঠিল না।

সরস্বতীর সেবকেরা চিরকাল দরিদ্র বলিয়া খ্যাত। প্রাচীন লেখকদিগের কথা ছাড়িয়া দিলেও মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের আর্থিক দুরবস্থার কথা আমরা জানি। কিন্তু সম্প্রতি পুস্তকবিক্রয় একটি লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। মুদ্রাযন্ত্র হইতে বাংলাদেশে বত মানে রাশি রাশি গ্রন্থ বাহির হইতেছে। তাহা হইতে গ্রন্থকারদিগের যতটা না হোক, প্রকাশকেরা প্রচুর অর্থ লাভ করেন। অনেক গ্রন্থকারও Royalty হিসাবে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন বলিয়া শোনা যায়। এই সকল গ্রন্থের অধিকাংশই স্কুল ও কলেজপাঠ্যগ্রন্থ, ধর্ম্মগ্রন্থ অথবা উপন্যাস। দার্শনিক গ্রন্থের গ্রাহক বেশী নাই বলিয়া তাহাদের প্রকাশকও মেলে না। তবুও অনেকে যে দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করেন তাহা তাঁহাদের অন্তরের তাড়নায়। স্বাধীনতা লাভের পর হইতে গভর্ণমেণ্ট সাহিত্যরচনায় উৎসাহদানের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেছেন। 'রবীন্দ্র-পুরস্কার' ব্যতীত গ্রন্থ প্রকাশের ব্যয় বহনের জন্যও গভর্ণমেণ্টের সাহায্য পাওয়া যায়। এজন্য গভর্ণমেণ্ট ধন্যবাদের পাত্র। শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথের বৈষ্ণবধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধে বিরাট গ্রন্থ প্রকাশের সমগ্র ব্যয় শুনিয়াছি গভর্ণমেণ্টই বহন করিয়াছেন। এই মূল্যবান দার্শনিক গ্রন্থ বাংলা ভাষার ঐশ্বর্য্য যথেষ্ট বৃদ্ধি করিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের সাহায্য লাভের জন্য যে পরিমাণ উদ্যমের প্রয়োজন সকলে তাহা সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারেন না। রবীন্দ্র-পুরস্কারের জন্য গ্রন্থনির্ব্বাচন-প্রণালীরও সংশোধন বাঞ্ছনীয়।

আমার দর্শন লিখিবার প্রেরণালাভের একটি মনোজ্ঞ ইতিহাস আছে। আমার ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসের প্রথম খণ্ডের মুখবন্ধে যাহা আমি লিখিয়াছি, সংক্ষেপে তাহা এই :

১৯০০ অব্দে আমি B. A. পাশ করি। পরীক্ষার ফল বাহির হইবার অত্যল্পকাল পরেই Presidency Colleg-এর দর্শনের অধ্যাপক বিদ্বজ্জন-বরেণ্য ডাঃ প্রসন্নকুমার রায়ের (Dr. P. K. Ray) সহিত ঘটনাক্রমে আমার পরিচয় হয়। আমি Presidency College-এর ছাত্র ছিলাম না। ডাঃ রায় আমাকে তাঁহার বাড়ীতে

বিবেকানন্দ শিল্পী: অসিতরঞ্জন বসু

বিভোর

ফটো : চঞ্চল মিত্র

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

যাইতে বলেন এবং বাড়ীতে গেলে তাঁহার নিজের ছাত্রের মতই আমার সঙ্গে ব্যবহার করেন। সেখানে অনেক দার্শনিক বিষয়ের আলোচনা হয়। Martineauর ছাত্র ডাঃ রায় দেখিলাম ঈশ্বরে দৃঢ়বিশ্বাসী। বিদায় লইবার সময় তিনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন "You are much indebted to Philosophy. Remember Philosophy expects from you something in return."

ইহার কয়েক মাস পরে আমি চাকুরীতে প্রবিষ্ট হই এবং ৩৩ বৎসর চাকুরীর পরে ১৯৩৫ সালে অবসর গ্রহণ করি। ডাঃ রায়ের কথা আমার প্রায়ই মনে হইত, কিন্তু দর্শনের ঋণ কিরূপে পরিশোধ করিব ভাবিয়া পাইতাম না। Descartes-এর দর্শন লিখিয়া একবার রবীন্দ্রনাথকে দেখাইয়াছিলাম, কিন্তু আমার ব্যবহৃত কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ তাঁহার মনঃপূত হয় নাই। পাশ্চাত্ত্য দর্শনের পারিভাষিক শব্দগুলির অনুবাদ করা দেখিলাম বড়ই কঠিন। কাজের চাপে পড়া, ভাবা ও লেখা—এই তিন ব্যাপারে চাকুরীতে আবদ্ধ থাকাকালে বিশেষ সময় দিতে পারি নাই। অবসরগ্রহণ করিবার পরে পারিয়াছিলাম।

প্রাচীনকালে গ্রীসের সহিত ভারতীয় চিন্তার বিনিময় ছিল। গ্রীক দর্শনের উপর ভারতীয় দর্শনের এবং ভারতীয় দর্শনের উপর গ্রীক দর্শনের যে কোনও প্রভাব ছিল তাহা ম্যাক্সমূলার স্বীকার করেন নাই। কিন্তু ডাঃ রাধাকৃষ্ণন তাঁহার Eastern Religions and Western Thoughts গ্রন্থে গ্রীক দর্শনের উপর ভারতীয় দর্শনের প্রভাব যে ছিল, তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমার পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাসে প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্টে আমি দেখাইয়াছি যে, বৃহদারণ্যকোপনিষদে মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা হইতে দেখা যায় যে মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণের যাজ্ঞবল্ক্য-বর্ণিত দর্শনের সহিত প্লেটোর দর্শনের বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

কিন্তু পাশ্চাত্ত্যের সহিত ভারতীয় চিন্তার এই বিনিময়সূত্র বহুদিন হইল ছিন্ন হইয়াছে। বর্ত্তমানে টোলের দর্শনের অধ্যাপকদিগের চিন্তা প্রাচীন খাতেই প্রবাহিত হইতেছে। ইহার ফলে বহুদিন যাবৎ ভারতে নূতন কোনও দর্শনের উদ্ভব হয় নাই। ভারতীয় দর্শনের সংস্পর্শে আসিয়া পরবর্ত্তীকালে পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদিগের প্রতিভার যে স্ফুরণ হইয়াছিল তাহা আমরা জানি। পাশ্চাত্ত্য দর্শনের সংঘাতেও আমাদের ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের প্রতিভার কিছু স্ফূর্ত্তি হইবে ইহা আমার বিশ্বাস। তাহা যদি হয় তাহা হইলে বাংলায় পাশ্চাত্ত্য দর্শন প্রকাশিত করিয়া দর্শনরূপিণী দেবী সরস্বতীর নিকট আমার ঋণ কথঞ্চিৎ পরিশোধ হইবে কি না জানি না।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে স্বামী বিবেকানন্দ ইয়োরোপ ও আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার করিয়া আসিয়াছিলেন ; তৎপরবর্ত্তী পাশ্চাত্ত্য-দর্শনে বেদান্তের প্রভাব লক্ষিত হয়। বর্ত্তমান শতাব্দীতে বাংলায় চারিজন বড় দার্শনিক আবির্ভূত হইয়াছেন—ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, হীরালাল হালদার, কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ডাঃ গোপীনাথ কবিরাজ। ইঁহারা সকলেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় দর্শনেই অভিজ্ঞ। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ এখনও জীবিত আছেন। মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালংকারের "ফেলোসিপের লেকচার" বেদান্ত সম্বন্ধে একখানি মূল্যবান গ্রন্থ।

ভারতের সর্ব্বশেষ দার্শনিক শ্রীঅরবিন্দ। Life Divine, Essays on the Geeta, এবং অন্যান্য গ্রন্থে তাঁহার দর্শন বিবৃত হইয়াছে। মানবমনের আস্পৃহা (Aspiration) হইতে অরবিন্দের দর্শনের আরম্ভ। এই আস্পৃহা উন্নততর, মহত্তর এবং দুঃখবিমুক্ত জীবনলাভের জন্য। প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক দেশে অনেকের মনে এই আস্পৃহা উদিত হইয়াছে। প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত মানুষের মনের এই আস্পৃহা হইতে অনুমান করা যায় যেপ্রকৃতির মধ্যে মহত্তর জীবন উদ্ভাবনের উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে, এবং সেই উদ্দেশ্য মনুষ্যের সংবিদে প্রকাশলাভ করিয়াছে। মানুষের মনে কোনও আদর্শের আবির্ভাব প্রকৃতির ভাবী অভিব্যক্তির একটা স্তরের সূচনা। এই আদর্শ অনেক সময় ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয় সত্য, কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে এই আদর্শের উদ্ভাবক উদ্দেশ্যের অস্তিত্ব দর্শনের অবহেলার বিষয় নহে। মানুষ কি, তাহার পরিপূর্ণ ধারণা করিতে হইলে তাহার বর্ত্তমান অবস্থার আলোচনাই যথেষ্ট নহে, মানুষ কি হইতে সক্ষম তাহার আলোচনারও প্রয়োজন।

মানুষের মধ্যে যে সম্ভাবনা আছে, তাহার প্রকাশ তাহার আস্পৃহায়। অরবিন্দের দর্শনে মানুষের সম্ভাব্য পরিণতি একটা বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

অরবিন্দ সংবিদকে (consciousness) একটা অপ্রকৃত বস্তু (Miracle) বলিয়াছেন। এই সংবিদ সর্ব্বত্র বিস্তৃত। বাসুদেব সর্ব্বম্। যাহা কিছু আছে সকলই বাসুদেব। অরবিন্দের মতে জড় চৈতন্যের অভিব্যক্তির এক প্রান্ত। এই অভিব্যক্তির অন্য প্রান্ত অসঙ্গ পরমাত্মা। অতিমানস, উচ্চমানস, মানস, জৈব ও পার্থিব সংবিদ, সংবিদের এই সকল ক্রম।

অরবিন্দের অসঙ্গ আত্মা (Absolute Spirit) বেদান্তের ব্রহ্ম। অরবিন্দ মায়াবাদ সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তাঁহার মতে অসঙ্গ পরমাত্মা জীব ও জগৎরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছেন। জীব ও জগৎ মিথ্যা নহে। ব্রহ্ম-চৈতন্য জীবও জড়ে সর্ব্বত্র বিদ্যমান। জড়ের মধ্যে যে চৈতন্যের প্রকাশ প্রত্যক্ষ হয়, তাহা জড়েই অপ্রকাশিত অবস্থায় ছিল। যাহার অস্তিত্ব নাই তাহার ভাব (অস্তিত্ব) কখনও হইতে পারে না। জড়ে অনুস্যূত চৈতন্য বিকাশপ্রাপ্ত হইতে হইতে মানুষের আত্মসংবিদে উত্তীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু এই মানসচৈতন্যই আরোহণের (Ascent) শেষ পর্য্যায় নহে। অরবিন্দ বলেন, মানুষের স্বাধীন চেষ্টার সহযোগে এই ঊর্দ্ধগতি দ্রুততর হইতে পারে। এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে পরিণত করিবার উপায় অরবিন্দের যোগ। যে ঊর্দ্ধগতি ক্রমে জড়ে আবদ্ধ ক্ষীণচৈতন্য মানবীয় সংবিদে উপনীত হইয়াছে, মানুষে আসিয়া সে

গতি শুরু হইয়া যায় নাই। মানুষ সহযোগিতা করুক আর না করুক, একদিন তাহা স্বীয় লক্ষ্যে পৌঁছিবে।

Annie Besant এক নূতন Race-এর আবির্ভাব শুরু হইয়াছে বলিয়াছিলেন। এই Race বর্ত্তমান মানবসমাজ হইতে জ্ঞানে, বুদ্ধিতে ও চরিত্রে উন্নত হইবে—এই ছিল তাঁহার বিশ্বাস। অরবিন্দ তাঁহার যোগের সাহায্যে মানবীয় সংবিদকে উন্নততর সংবিদে পরিণত করিতে চাহেন। যোগবলে মানুষ মানসসংবিদ হইতে অতিমানস সংবিদে আরোহণ করিতে সমর্থ—ইহাই অরবিন্দের মত। মানুষের বর্ত্তমান মানসসংবিদের (Transformation of Consciousness) সমূল পরিবর্ত্তন ভিন্ন ইহা অসম্ভব। অরবিন্দের যোগ কেবল ব্যক্তির মুক্তির নহে, সমগ্র মানবজাতিকে উর্দ্ধে তুলিবার উপায়।

অরবিন্দ যেমন সংবিদের উর্দ্ধে আরোহণের (Ascent) কথা বলিয়াছেন তেমনি ঐশ্বরিক সংবিদের অবরোহণের (Descend) কথাও বলিয়াছেন। কিন্তু ক্ষুরধার নিশিত দুরত্যয় দুর্গম পথ অতিবাহন করিয়া লক্ষে পৌঁছিবার উপযুক্ত লোকের সংখ্যা অধিক নহে। না হইলেও সামান্যসংখ্যক লোকের দৈহিক জৈব মানসিক সংবিদে উন্নততর সংবিদের অবতরণ সংঘটিত হইলে তাহা মানবজাতির পক্ষে পরম মঙ্গলের সূচনা করিবে। তাহাই পরবর্ত্তীকালে বৃহত্তর ক্ষেত্রে সংঘটিত হইবে। সেই দিনের প্রতীক্ষায় অরবিন্দ সকলকে প্রস্তুত হইতে আহ্বান করিয়াছেন।

অরবিন্দের উন্নততর সংবিদের মানুষ ও Nietzsche-র Superman এক নহে। অরবিন্দের Superman ঐশ্বরিক ভাবাপন্ন, আর Nietzsche-র Superman আসুরিক।

অরবিন্দ জন্মান্তরে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহার মতে জাগতিক সর্ব্ব বিষয়ের অভিজ্ঞতা লাভের জন্য জীবাত্মার বহুবার জন্মগ্রহণের প্রয়োজন।

শ্রীঅরবিন্দের দর্শন দর্শনের ইতিহাসে ভারতের সর্ব্বশেষ দান।

বাংলায় দর্শনের আকর্ষণ ক্রমশই হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্র বিজ্ঞান শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইতেছে, এবং দর্শনশিক্ষার্থী ছাত্রদিগের সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে বলিয়া শুনিতে পাই। ইহাতে আক্ষেপ করিবার কিছু নাই। বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে সীমারেখা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে এবং Jeans, Eddington ও Whitehead প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ এখন দর্শনের চর্চ্চা করিতেছেন। বিজ্ঞানশিক্ষা দর্শনশিক্ষার সোপান। আমাদের ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকে স্বাধীনভাবে দর্শনের আলোচনা করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

[নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনে (ডিসেম্বর ১৯৬১, কলিকাতা) দর্শন শাখার সভাপতির অভিভাষণ হইতে

তারে কি শব্দ মাত্র

বিভূতি বিদ্যাবিনোদ

প্রেম, শ্রদ্ধা, ব্যথাবোধ, দয়া ও মমতা
এগুলি যে মানুষের অন্তরের কথা।
নহে সত্য? সত্য শুধু জয়-পরাজয়?
কেড়ে নেওয়া দুর্ব্বলের যা কিছু সঞ্চয়?

চাই, চাই, আরো চাই—লিপ্সা লেলিহান
তারই পায় বলি দিয়ে কোটি কোটি প্রাণ
কাটে নাই তবু নেশা? মত্ততার মাঝে
অনুভূতি কোথা বল? কা'র বুকে বাজে?

তৃপ্তি, ত্যাগ, ক্ষমা, দান, সংযম রক্ষণ
নাই তবে এগুলির কোন প্রয়োজন
মানুষের তরে আজ? শক্তির গৌরব
নাশি সৃষ্টি সৃজিবে কি জীবন্ত রৌরব?

আজো চলে হানাহানি, জিঘাংসা ও দ্বেষ
লজ্জার কোথাও নাই এতটুকু লেশ॥

সংস্কৃত নাটক ও সংস্কৃতি

পণ্ডিত শ্রীঅনাথশরণ কাব্যব্যাকরণতীর্থ

আমাদের ভারতীয় মতে জনসাধারণের ভিতর দেশ বিদেশের সংস্কৃতি প্রচারের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায় নাটক। কারণ নাটকের মাধ্যমেই জীবনী ও ঘটনা চক্ষের সম্মুখে মূর্ত হইয়া ভাসিয়া উঠে। বর্তমানে বাংলা দেশে এরূপ সাধু প্রচেষ্টায় ব্রতী আছেন কলিকাতার প্রসিদ্ধ প্রাচ্য গবেষণাগার প্রাচ্যবাণীমন্দির। ১৯৪৩ সালে পশ্চিমবঙ্গীয় সরকারের সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের অধ্যক্ষ সর্বজনবরেণ্য ডক্টর যতীন্দ্রবিমল এবং তাঁহার সুযোগ্যা সহধর্মিণী লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজের সর্বজনপ্রিয় অধ্যক্ষা ডক্টর রমা চৌধুরী এই প্রতিষ্ঠানটী স্থাপিত করেন। সেই হইতেই প্রায় কুড়ি বছর ধরিয়া ইহার সংস্কৃত পালি নাট্যসঙ্ঘ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে এবং বাহিরেও বহু প্রাচীন এবং ডক্টর চৌধুরী বিরচিত বহু সংস্কৃত ও পালি নাটক অভিনয় করিয়া বিশেষ সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। ইহাদিগের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, বিশ্বের সর্বপ্রথম পালি নাটক ডক্টর চৌধুরী বিরচিত "বিম্বসুন্দরী-পটিবিম্বনম্"। জননী যশোধরার জীবনী অবলম্বনে রচিত এই নাটকটি সর্বপ্রথম রেঙ্গুন সহরে বিশেষ সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়।

বিগত ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে এই নাট্যসঙ্ঘের সহিত মাদ্রাজ, পণ্ডিচেরী ও বৃন্দাবনধামে আমার যাইবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। আমরা ছিলাম একটি প্রকাণ্ড দল—সঙ্গে গায়ক, বাদক সকলেই ছিলেন। অতি নির্মল আনন্দে সুদীর্ঘ দুই দিন ট্রেণে কাটিল। ২৫শেডিসেম্বর সকালে মাদ্রাজে পৌছিয়া দেখিলাম সহাস্যবদন গৌড়ীয় মঠের পূজ্যপাদ সন্ন্যাসী-গণকে। তাঁহাদের আদর যত্নের কথা জীবনে ভুলিবার নয়। মাদ্রাজে সর্বভারতীয় বৈষ্ণব সম্মেলন উপলক্ষে তাঁহারা আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন। অতি বিস্তৃত প্রাঙ্গণ ঘিরিয়া চন্দ্রাতপ; ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত সহস্রাধিক পণ্ডিত ও ভক্ত তাহাতে ধ্যানমগ্ন-ভাবে সমাসীন। কি অপূর্ব পরিবেশ! দেখিয়া সকলেই নিজেদের ধন্য মনে করিলাম।

অপরাহ্নে ডক্টর যতীন্দ্রবিমল ও ডক্টর রমা চৌধুরী যথাক্রমে "ভারতের বৈষ্ণব সাধিকা" (সংস্কৃতে) এবং "নিম্বার্ক-দর্শন" (ইংরেজিতে) বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করিয়া সকলকে বিশেষ মুগ্ধ করিলেন। তাহার পর রাত্রে সেই বিশাল প্রতিনিধিমণ্ডলীর সম্মুখে বেদান্তাচার্য শ্রীরামানুজের পুণ্য জীবনী অবলম্বনে ডক্টর যতীন্দ্র বিমল চৌধুরী বিরচিত নূতন সংস্কৃত নাটক "বিমল যতীন্দ্রম্" প্রাচ্যবাণী কর্তৃক বিশেষ সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়। রূপসজ্জা ও দৃশ্যসজ্জা অপূর্ব। রূপসজ্জার ভার গ্রহণ করিয়া সর্বজনসম্মানিত শ্রীযুক্ত হরিপদবাবু আমাদের বিশেষ ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। সাড়ে আটটা হইতে রাত্রি এগারটা পর্যন্ত সর্ব-ভারতীয় বিশাল শ্রোতৃমণ্ডলী প্রত্যেক দৃশ্যে দৃশ্যে করতালি দ্বারা আনন্দজ্ঞাপন পূর্বক এই অভিনয়ের রসপান করিলেন। একজনও স্থান ত্যাগ করেন নাই। সভান্তে গৌড়ীয় মঠের সর্বাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎস্বামী ভক্তিবিলাসতীর্থ, ভারতের ভূতপূর্ব বিচারপতি এবং বর্তমানে কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বোর্ডের সভাপতি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত পতঞ্জলি শাস্ত্রী মহাশয় প্রমুখ সুধীবর্গ নাটকটীর ভাষা-মাধুর্য, অভিনয়ের উচ্চমান এবং সঙ্গীতের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। ইহাতে আমরা পরম কৃতার্থ বোধ করিলাম।

মাদ্রাজে রামানুজাচার্যের জীবনচরিত অবলম্বনে "বিমলযতীন্দ্রম্" নামক ডাঃ চৌধুরীর সংস্কৃত নাটক অভিনয়ের পরে সেণ্ট্রাল সংস্কৃত বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট শ্রী পতঞ্জলি শাস্ত্রী প্রাচ্যবাণীর সদস্যবৃন্দকে আশীর্বাদ জানাচ্ছেন। তাঁর ডান দিকে ডাঃ চৌধুরী দণ্ডায়মান।

পরদিন পণ্ডিচেরী যাত্রা। শ্রীঅরবিন্দের ও শ্রীশ্রীমায়ের পদরজঃ-পূত কি অপূর্ব এই পণ্ডিচেরী আশ্রম। দেখিয়া সকলেই ধন্য হইলাম। ইহাদেরও আদরযত্নের তুলনা নাই। সেই সময়ে পণ্ডিচেরীতে সর্ব-ভারতীয় অরবিন্দ সোসাইটী সমূহের একটি সুবিশাল সম্মেলন হইতেছিল। দেশ-বিদেশ হইতে বহু পণ্ডিত ও ভক্তের সমাগম। কি অপূর্ব ইহাদের প্রেক্ষাগৃহ। সদাহাস্যময়ী ব্রতচারিণীদের সযত্ন রূপসজ্জায় অভিনয়ের আমাদের "বিমল যতীন্দ্রম্" সংস্কৃত নাটকের সৌষ্ঠব বহুল পরিমাণে বর্ধিত হইল। সুবিশাল প্রেক্ষাগৃহে দুই সহস্রাধিক দর্শক অতি শ্রদ্ধা

ও আদর সহকারে আমাদের এই অভিনয় দর্শন করিয়া আমাদের কৃতার্থ করিলেন। অভিনয়ান্তে আশ্রমের পরমশ্রদ্ধেয় সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদী খেলনা ও মিষ্টান্ন আমাদের সকলকে বিতরণ করিলেন। সত্যই আমরা শ্রীশ্রীমায়ের

পন্দিচেরীতে ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বিরচিত "বিমল যতীন্দ্রম" নাটক অভিনয়ের পর সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় শ্রীমতী নন্দিতা মজুমদার, শ্রীমতী রত্না গোস্বামী, শ্রীমতী উর্মি চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিকে শ্রীমায়ের দেওয়া আশীর্বাদী পুরস্কার প্রদান করিতেছেন।

নিকট ক্ষুদ্র সন্তান; তাঁহার আশীর্বাদ পাইয়া আমরা নিজেদের ধন্য মনে করিলাম। মাতৃস্বরূপিনী ডাঃ শ্রীমতী রমার অপূর্ব ইংরাজী মাতৃবন্দনা কোনও দিন ভুলিবার নহে।

পন্দিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে অভিনয়ের পরে নলিনীকান্ত গুপ্ত সহ প্রাচ্যবাণীর সংস্কৃত পালি অভিনয় সভ্য। ডাঃ গুপ্তের পার্শ্বে ডাঃ চৌধুরী দম্পতী দণ্ডায়মান।

সত্যই মাদ্রাজ ও পণ্ডিচেরী এই দুই প্রসিদ্ধ ও পবিত্র স্থানে অভিনয় করিয়া আমরা যেরূপ আনন্দ লাভ করিয়াছি তাহা পূর্বে কোনদিনও আশা করি নাই। অবশ্য ডক্টর চৌধুরীর অন্যান্য সুপ্রসিদ্ধ নাটকগুলির ন্যায় এই নবতম নাটকটিও ভাষার সারল্যে ও সাবলীলতায় কবিতা ও সঙ্গীতের সৌন্দর্য ও মাধুর্য্যে পরিকল্পনা ও আঙ্গিকের নৈপুণ্যে অতুলনীয়। তাহা সত্ত্বেও ইহার অন্তর্নিহিত ঐশ্বর্য্য শ্রীশ্রীভগবানের কৃপায় এমন সুন্দর ফুটিয়া উঠিবে তাহা কোনদিন ভাবি নাই।

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াই তার পরের দিন ৩রা জানুয়ারী ১৯৬২ পুনরায় যাত্রা করিতে হইল পুণ্য বৃন্দাবনধামের উদ্দেশ্যে। সেখানে ইউনেস্কো এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের তত্ত্বাবধানে ইনষ্টিটিউট অফ অরিয়েণ্ট্যাল ফিলসফির সর্বাধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় স্বামী শ্রীমৎ শ্রীভক্তিহৃদয় বন মহারাজ মহাশয় একটি অতি সুন্দর সম্মেলনের আয়োজন করিয়াছিলেন। ইহার আলোচ্য বিষয় ছিল—"Spiritual Values of Life—Eastern and western." ছাব্বিশটী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিবর্গ এবং ভারতের বাহির হইতে বহু পণ্ডিত এই মহাসম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। সকল প্রকার বন্দোবস্তই অতি সুন্দর ছিল। ইহাতেও ডক্টর যতীন্দ্রবিমল ও ডক্টর রমা চৌধুরী—"Spiritual Values of Goudiya Vaisnavism এবং "Message of the Vedanta" সম্বন্ধে সুললিত ভাষণ দান করিয়া সকলকে চমৎকৃত করেন। পরে পূর্বের সেই "বিমল যতীন্দ্রম্" নামক নাটকটী সুবিশাল বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর সম্মুখে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত অভিনীত হয়।

সভান্তে শ্রীমৎ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, ভারতের প্রধান বিচারপতি শ্রীভুবনেশ্বর প্রসাদ সিংহ, ও রোমের রেভারেণ্ড ডি স্মেৎ প্রমুখ সুধীবর্গ প্রাচ্যবাণীর এই অভিনয়ে ও ডক্টর চৌধুরীর সংস্কৃত ভাষার অপূর্ব সারল্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। শ্রীযুক্ত বন মহারাজ ইনষ্টিটিউটের পক্ষ হইতে প্রাচ্যবাণীকে একটি পদক পুরস্কার দিবেন বলিয়া ঘোষণা করেন।

অভিনয়াংশে বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ করেন—রামানুজের ভূমিকায় শ্রীসুনীল দাস, রামানুজপত্নীর ভূমিকায় শ্রীমতী নন্দিতা দত্ত মজুমদার, চোলরাজের ভূমিকায় শ্রীমিহির চট্টোপাধ্যায়, গুরুপত্নীর ভূমিকায় শ্রীমতী রত্না গোস্বামী, যাদব প্রকাশের ভূমিকায় শ্রীমৃত্যুঞ্জয় মিত্র, কুরিশের ভূমিকায় শ্রীঅনিন্দ্য সুন্দর চট্টোপাধ্যায় এবং ভক্ত গায়কের ভূমিকায় শ্রীপূর্ণেন্দু রায়।

এই পরিভ্রমণের মধুর স্মৃতি চিরকালই মনের মণি কোঠায় সঞ্চিত হইয়া থাকিবে। কেবল অভিনয়েই যে আমরা আশাতীত সাফল্য লাভ করিয়াছি তাহাই নহে, সেই সঙ্গে সর্বত্রই প্রচুর স্নেহ ভালবাসা শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করিয়াছি শ্রীভগবৎ কৃপায়। কিন্তু সকলের উপর আমাদের লাভ হইল সর্বজনশ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ও ভক্তাগ্রগণ্য ডক্টর চৌধুরী-দম্পতীর মধুর সাধুসঙ্গ। "বিদ্যা বিনয়ং দদাতি "—এই কথাটি তাঁহাদের ক্ষেত্রে অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কিন্তু তাহার থেকেও বড় কথা—তাঁহাদের অনুপম আনন্দময়তা। ব্রহ্মানন্দে ভরপুর এই সুধী দম্পতী সেই আনন্দ দুই হাতে অকাতরে বিলাইয়া দিলেন আমাদের সকলের মধ্যেই। তাঁহাদের সংস্কৃত প্রচার প্রচেষ্টা সার্থক হউক, এবং জয়যুক্ত হোন আমাদের প্রাচ্যবাণী ও গীর্বাণ বাণী!

মিশ্র-বাউল—কার্ফা

তুই আপন ব'লে ভাবিস কারে মন।
ওরে এ দুনিয়ায় সবাই যে পর—
তোর কেউ নয় রে আপন ॥

বালির 'পরে বাঁধিস যে ঘর
এক নিমেষে ভাঙ্‌বে সে চর রে—
তখন হতাশ হ'য়ে দেখবি শুধু—
মেলিয়া নয়ন ॥

তোর মাটির এ-ঘর, আর মায়ার বাঁধন—
রয়না চিরদিন ;
ওরে দু'দিন পরেই হয় যে ভেঙে
মাটিতেই বিলীন।

আপন ব'লে ভাবিস যারে—
সে তো ফিরে চাইবে নারে—
অথৈ জলে—অন্ধকারে—
পড়বিরে যখন ॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি ঃ জগৎ ঘটক

সা -া II সধ্‌া সা সা -া | সা -া সা -রা I গা -া গা -মা | গা -া রা -গা I
তু ই আ ০ প ন্ ব ০ লে ০ ভা ০ বি স্ কা ০ রে ০

সরা -া -া -সা | -া -া } { সা সা I রা মা -া মা | মা -া মা -া I
ম ০ ০ ০ ০ ন্ ও রে এ ০ ০ দু নি ০ য়া য়্

-া -া } রমা মা | -পা পা ধা -া I -পধা -পা -মা -া | -া -া মা -পা I
০ ০ স বা ই যে প ০ ০০ ০ ০ র্ ০ ০ তো র্

পা র্সা র্সা র্র্সা | র্র্সা -া ণা ণধা I পধা -া -ণধা -পা | -মা মগা -রা -সা II
কে উ ন ০ ০ য়্ রে আ ০ প ০

-া -া II {পা -ধা ধা -া | -া -া পমা পা I ধা -া ধর্সা -া | র্সা -া র্সা -া I
০ ০ বা ০ লি ০ ০ র্ প রে বাঁ ০ ধি স্ ষে ০ ঘ ০
-া -া -া -া | -া -া -া -া I র্সা -া -র্রা র্রা | র্রা -া র্রা -া I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ র্ এ ০ ক্ নি মে ০ ষে ০
র্সা -া -া সর্গা | র্গা -া র্রা -র্গা I গর্রা -া -র্সা -া | -া -া (পা পা)} I
ভা ং ঙ্ বে সে ০ চ র্ রে ০ ০ ০ ০ ০ ও রে
পা ধা I ধা র্সা র্সা -া | -া -া র্সা র্সা I না -া -র্সা না | ধা -ণা ধা -পা I
ত খন্ হ ০ তা ০ ০ শ্ হ য়ে দে ০ খ্ বি শু ০ ধু ০

-া -া পা পা | ণা ধা পা -ধা I মপা -ধা -পধপা -মা | -গমা -গরা -সা -া I
০ ০ মে লি ০ য়া ন ০ য় ০ ০০ ০ ০০ ০০ ০ ন্
গা -া গা -মা | গা -া রা -গা I রা -া -া সা | -া -া সা -া II
ভা ০ বি স্ কা ০ রে ০ ম ০ ০ ০ ০ ন্ তু ই
সা -া II গাঃ মঃ -গা রা | সা -া -া সা I ন্সাঃ ধ্ঃ -ণ্ া ধ্ া | প্ া -া -া -া I
তো র্ মা টি র্ এ ঘ ০ র আর্ মা০ য়া র্ বাঁ ধ ০ ০ ন্
ধ্ া -া সা সা | -া -রা গা মা I গা -রা -া -া | -া -া রা রসা I
র ০ য় না ০ ০ চি র দি ০ ০ ন্ ০ ০ ও রে
সা রগা -মা গা | মা -া -া -া I গা -া মা গা | রা -গা রসা -া I
দু দি০ ন্ প রে ০ ০ ই হ য়্ ষে ০ ভে ০ ঙে ০
ধ্ া সা -া সা | রা -গা -পমা গা I রা গসা -রা -া | -া -া পা পা I
মা ০ ০ টি তে ০ ই বি লী ০ ০ ন্ ০ ০ ও রে
{পা পধা -া পা | মা -া -া -পা I ধা ধর্সা -া র্সা | র্সা -া -া -া I
আ প০ ন্ ব লে ০ ০ ০ ভা বি স্ যা রে ০ ০ ০
র্সা সর্রা -া র্রা | র্রা -া -া -া I র্সা -া র্সর্গা র্রর্গা | র্রর্সা -া -া -া I
সে তো ০ ফি রে ০ ০ ০ চা ই বে০ না০ রে ০ ০ ০
(-নর্সা -না -ধণা -ধা | -পা -া -া -া)} I ধা ধর্রা -া সর্রা | র্সা -া র্রর্সা -না I
০০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ অ থৈ ০ জ লে ০ ০ ০
া না -র্সা না | ধা -ণা ধা -পা I া পা -া ণা | ধা -পা -ধা পমা I
০ অ ন্ ধ কা ০ রে ০ ০ প ড়্ বি রে ০ ০ য
পা -া -া -া | -া -া গা -সরা I গা -া গা -মা | গা -া রা -গা I
থ ০ ০ ০ ০ ন্ তু ০ই ভা ০ বি স্ কা ০ রে ০
সরা -া -া -সা | -া -া সা সা II
ম ০ ০ ০ ০ ন্ ও রে

প্রাচীন বাংলার গৌরব

কালীপদ লাহিড়ী

সনাতন ধর্মের স্ফুরণ এই বাংলা দেশেই প্রথম হয়েছিল। সৃষ্টির আদি কাল থেকে শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প, ভাস্কর্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শৌর্য্য ও বীর্য ও বাণিজ্য বিষয়ে বাংলাদেশ যে চিরদিনই গৌরবের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, তার নিদর্শন সুদূর সিংহল, যবদ্বীপ কম্বোডিয়া, চীন ও শ্যাম, নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি স্থানে আজও বর্তমান।

চীন, সিংহল, যবদ্বীপ, কম্বোডিয়া, নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি দেশের পুরাতত্ত্বে এখনও অতীত বাংলার গৌরব কাহিনী বিবৃত আছে।

সমষ্টিগতভাবে বিচার করলে দেখা যায় পুরাবৃত্তের ভারতবর্ষের যেমন গৌরবের অবধি নাই, ব্যষ্টিগত ভাবে বিচার করলে তেমনি বাংলা দেশেরও গৌরব গরিমার অবধি নাই। ভারতের সভ্যতার প্রাচীনত্ব যেমন পৃথিবীর সকলদেশের পূর্ববর্তী তেমনি ব্যক্তিগত ভাবে বিচার করলে বাংলাদেশ ও পৃথিবীর সভ্যজনপদের আদিভূত বলে প্রতীয়মান হয়।

বাংলাদেশের প্রাচীনত্বের পরিচয় পাওয়া যায় বেদে, আরণ্যকে, সূত্রে, সংহিতায়, রামায়ণে, মহাভারতে এবং পুরাণ প্রভৃতিতে। মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে বাংলা দেশের নৃপতি আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। কালিদাসের রঘুবংশ রচনার বহু পূর্বে বাংলা দেশের সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। বিক্রমাদিত্য অভিধেয় ২য় সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে খৃষ্টিয় চতুর্থ শতাব্দিতে মহাকবি কালিদাসের আবির্ভাব। হুয়েন সাং-এর বিবরণে জানা যায় যে তিনি অখণ্ড বাংলার কতকগুলি সমৃদ্ধিশালী নগর দর্শন করেছিলেন। উহার মধ্যে ছিল, বর্তমান ভাগলপুরের নিকটবর্তী চম্পানগর মালদহ জেলায় অবস্থিত পৌণ্ড বর্দ্ধন বা পাণ্ডুয়া, কর্ণসুবর্ণ ও তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি নগর। এ ছাড়াও তিনি কামরূপ, শ্রীহট্ট, কাছাড় ও শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি তৎকালীন বাংলাদেশের অন্তর্গত নগরগুলি পরিদর্শন করেন।

মিশর সভ্যতা সবচেয়ে প্রাচীন ব'লে জানা যায়। কিন্তু মিশরের 'মামি' অর্থাৎ ধনবানের মৃতদেহগুলি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উৎকৃষ্ট শিল্পজাত বস্ত্রাদিতে আবৃত করা হ'ত। এ গুলির অধিকাংশই ভারতজাত বলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারণ করেছেন, আর বাংলা দেশই এই মসলিনের জন্মভূমি। পৃথিবীর কোথাও এ প্রকার সূক্ষ্ম বস্ত্র তৈরী হয় না।

"In the tombs dating from the time of the 18th dynasty which ended in 1462 B. C., there are said to have been found mummies wrapt up in Indian muslin (The ancient History of the Egyptians published by the Religious tract society"

খৃষ্টের জন্মের প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সেই মসলিন মিসরে ব্যবহৃত হ'ত। তা ছাড়া বোগদাদের কালিফগণ এবং পারস্যের বাদশাহগণ এই মসলীন শিরস্ত্রাণে ব্যবহার করতেন এবং চীন, জাপান ও রাশিয়া প্রভৃতি দেশে এ বস্ত্র রপ্তানি হ'ত। এ সম্বন্ধে Encyclopoedia Britanica গ্রন্থে উল্লেখ আছে,—

It is beyond our conception how the yarn can be spun by the distaf and spindle, or woven afterwards by any machinery. Encyclopoedia Britanica, 7th edition, Vol III page 396.

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গবেষণা প্রভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে সিংহল দ্বীপের স্থাপত্য ও শিল্পে বাংলা দেশের প্রভাব বিদ্যমান। সিংহলের ইতিহাসে স্যার এমারসন টেনেন্ট্ এ সম্বন্ধে বলেছেন, খৃষ্ট জন্মের পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে যুবরাজ বিজয়সিংহ সিংহলদেশ অধিকার করেন। বিজয়-সিংহের বংশধর, হিন্দু নৃপতিগণের নিকট সিংহলের অধিবাসীরা কৃষিকার্য্য, জলাশয় নির্মাণ, জলসেচন, প্রভৃতি বিষয় জ্ঞানলাভ করেন। রাজা অশোকের রাজত্ব কালে বহু বাঙালী বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। সিংহলের দেবদেবীর মূর্তিগুলিতে ও বাংলাদেশের স্মৃতি উজ্জ্বল হ'য়ে আছে। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান যখন সুদূর যবদ্বীপে গিয়েছিলেন, তখন সেখানে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রাবল্য দেখা যায়। যবদ্বীপের—"বোরোবেদার" মন্দিরে রামায়ণ ও মহাভারতের অনেক দৃশ্য খোদাই করা আছে। সেখানে প্রাপ্ত দেবদেবীর মূর্ত্তি ও প্রাচীর গাত্রের চিত্রাদিতে বাংলার শিল্পীগণের শিল্প চাতুর্যের নিদর্শন বর্তমান। এ বিষয় তৎকালীন ব্রিটিশ গভর্ণর স্যার ষ্টাফোর্ড রাফেল্‌স্ প্রণীত যবদ্বীপের ইতিহাস ও Mr. E. B. Hovell's Indian Sculpture and Painting প্রভৃতিতে এ বিষয়ের উল্লেখ দেখা যায়। যবদ্বীপের পূর্ব্বাংশে মলেং বিভাগে সিংহেশ্বরীর ও বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। কেবল সিংহল ও যবদ্বীপে নয়, তিব্বত, চীন' জাপান, ব্রহ্মদেশ, শ্যামরাজ্য, কম্বোডিয়ায় বাঙালীর প্রাধান্য ও শিল্প নৈপুণ্যের বহু নিদর্শন আজও বর্ত্তমান। ধাতু গলাইয়া ঢালাই কার্য্য শিক্ষার প্রনালী বাংলা দেশ হ'তে নেপালের মধ্য দিয়ে চীনে প্রচারিত হয়েছিল। নবম শতাব্দির মধ্যভাগে বরেন্দ্রভূমের অধিবাসী শিল্পী ধীমান ও তাঁহার পুত্র বিটপাল নেপালে যে শিল্প শিক্ষা দেন, ক্রমে তা চীনে ও অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। তিব্বত, চীন, ও জাপানে যে সব বৌদ্ধমূর্ত্তিগুলি দেখা যায় তার অধিকাংশই বাংলাদেশের শিল্পীর তৈরী।

"Hindu Sculpture has produced masterpiece in the great stone alto-relievo of Durga slaying (alto-relievo) the demon, Mahisa found at singasari, in Java and now in the Ethnographic Museum, Layden. It belongs to the period of Brahmanical ascendency in Java which lasted for abont A. D. 950 to 1500 etc"

(Indian Sculpture and Painting by Mr. E. B. Hovell.)

"Artists and art-critics also see in the magnificient sculptures of the 'Borobhudur' temple in Java, the hands of Bengali artists who worked side by side with people of Kalinga and Guzrat in their building of its early civilization etc."

(A History of Indian shipping by Radha kumud Mukherjee.)

মহাবংশ নামক ধর্মগ্রন্থে প্রমাণ পাওয়া যায়, খৃষ্টের জন্মের ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে বাংলার যুবরাজ বিজয়সিংহ নিজ বাহুবলে সিংহল দ্বীপ অধিকার করেন। বিপুলায়তন অর্ণবপোতে সপ্তশতাধিক সৈন্য নিয়ে তিনি সিংহল জয় করেন এবং এর পর হ'তে বাংলার বিদ্যা, শিল্পকলা প্রভৃতি সিংহলে বিস্তৃতি লাভ করে। বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে অজন্তার গিরিগহ্বরের প্রাচীর গাত্রে বিজয়সিংহের সিংহল-বিজয় চিত্র অঙ্কিত হয়েছিল, খৃষ্টের জন্মের ৫৫০ বৎসর পূর্বে ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে, এমন কি সিংহল দ্বীপে বাঙালীর শৌর্য্য বীর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সিংহলাধিপতি পরাক্রমবাহুর রাজত্বকালে সিংহলের সংঘারাম সমূহের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষের পদে বাঙালী ব্রাহ্মণ সন্তান রামচন্দ্র কবিভারতী অধিষ্ঠিত ছিলেন। বাঙালীর সিংহল বিজয়ের পর হইতেই সিংহলে জ্ঞান বিজ্ঞানের নূতন আলোক প্রবেশ করে। সিংহলবাসীর প্রায় সকল সদনুষ্ঠানের মূলে বাঙালীর প্রভাব আজও বিদ্যমান। বিজয়সিংহ কর্তৃক সিংহল বিজয়ের পর আড়াইশত বৎসর কাল অর্থাৎ খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত সিংহলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রভাব বিদ্যমান ছিল এবং রাজা পাণ্ডুকাভয় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সেবক ছিলেন।

কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্য গুপ্তঘাতক দ্বারা গৌড়েশ্বরকে ত্রিগামী নামক স্থানে হত্যা করেন। সেই গুপ্ত হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বিক্রমশালী বংগাধিপতি সৈন্যগণ ও গৌড়বাসীগণ কাশ্মীর রাজ্য আক্রমণ করে এবং পরিহাস কেশব মনে করে রজতময় রামস্বামীর বিগ্রহ চূর্ণ বিচূর্ণ করে। এই সকল ঘটনা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, শৌর্য, বীর্য ও জ্ঞান গরিমায় বাংলাদেশ চিরকালই সম্মানের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। মহাভারতের কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে বাংলার সৈন্য যোগদান করেছিল। গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ কালে বীরভূমের (গংগা রাঢ়ীর) সৈন্যগণ তাহাকে প্রবলভাবে বাধা দিয়েছিল। মেগাস্থিনিসের বর্ণনায় এই সকল গংগারাঢ়ীর বীরগণের বীরত্বের জন্য স্থানের নাম বীরভূম হয়েছে। এ ছাড়া গুপ্তবংশ, পালবংশ ও সেন-বংশের রাজাদের রাজত্ব কালে তাঁহাদের প্রভাব সম্বন্ধে সকলেই জ্ঞাত আছেন। পালবংশীয় রাজা দেবপাল কামরূপ, উড়িষ্যা অধিকার করেছিলেন।

এই বংশের নারায়ণ পাল উত্তর ভারতে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। সেনবংশীয় রাজা বল্লালসেন ও লক্ষ্মণ সেন দক্ষিণে উড়িষ্যা প্রদেশ ও পশ্চিমে বারাণসী পর্য্যন্ত প্রভাব অক্ষুন্ন রেখেছিলেন। গৌড়াধিপতিগণের রাজত্ব কালে নবদ্বীপ শিক্ষার কেন্দ্রস্থল ছিল। নব্যন্যায়শাস্ত্র নবদ্বীপের নিজস্ব সম্পত্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। স্মৃতি শাস্ত্রে স্মার্ত রঘুনন্দন বাংলা দেশে যুগান্তর এনেছেন। বাংলা দেশে মুসলমান আগমনের অব্যবহিত পূর্ব মিথিলায় ব্রাহ্মণদের বিশ্ববিদ্যালয় সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। মুসলমানদের উৎপাড়নে বৌদ্ধগণ নেপাল, তিব্বত ও তিব্বতীয় উপত্যকায় বাস করতে আরম্ভ করে। বক্তিয়ার খিলিজী বিহার হতে বাংলায় এসে বিক্রমশীলার বিশ্ববিদ্যালয়ে অগ্নি সংযোগে ধ্বংস করেন, এতে মিথিলার দর্প খর্ব হয় এবং নবদ্বীপের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বাসুদেব সার্বভৌম ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষার জন্য মিথিলায় গমন করেন। তখন ন্যায়শাস্ত্র সংক্রান্ত কোন গ্রন্থ বা টীকা মিথিলার বাহিরে নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। বাসুদেব মিথিলার অধ্যক্ষ পক্ষধর মিশ্রের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য দেখে পক্ষধর মিশ্র বাসুদেবকে সার্বভৌম উপাধি প্রদান করেন। নবদ্বীপে এসে বাসুদেব এক অভিনব বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই বিশ্ববিদ্যালয় রাজকীয় সনন্দ লাভ করে। তাঁর প্রধান ছাত্রদের মধ্যে রঘুনাথ শিরোমণি, ইনি নব্যন্যায়শাস্ত্রের প্রবর্তক। রঘুনন্দন বাংলা দেশে প্রচলিত হিন্দু ব্যবহার বিধি স্মৃতিশাস্ত্রের প্রবর্তক। তৃতীয়তঃ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, ইনি তান্ত্রিক শাস্ত্র মতের প্রতিষ্ঠাতা। চতুর্থতঃ শ্রীচৈতন্যদেব বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক। বাসুদেব সার্বভৌম নিরুক্তি নামক ন্যায়গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন। তিনি মিথিলার অধ্যক্ষ ও তাহার শিক্ষাগুরু পক্ষধর মিশ্রকে তর্কে পরাজিত করে নবদ্বীপকে উচ্চ সম্মানের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার ফলে তক্ষশীলার বিশ্ব-বিদ্যালয়ে কাশী, কাঞ্চি, দ্রাবিড়, গুর্জর, উজ্জয়িনী এমন কি সিরিয়া, আরব ফিনিসিয়া, ইউফ্রেসিয়া (এশিয়া-মাইনরের সমৃদ্ধশালী প্রাচীন নগর) এবং সুদূর চীন হতে বহু ছাত্র এই তক্ষশীলার বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞান আহরণের জন্য সমবেত হত। পুরাকালে এক সময়ে এই বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিনিময়ের কেন্দ্রস্থলে পরিগণিত হয়েছিল। রামায়ণ মহাভারতে ও এই তক্ষশীলার নামের উল্লেখ আছে।

প্রকৃত পক্ষে দশম একাদশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের গোড়া পত্তন হলেও পরবর্ত্তীকালে সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। দ্বাদশ শতকে লক্ষ্মণ সেনের রাজত্ব কালে গীতগোবিন্দ রচয়িতা জয়দেব, ধোয়ী, হলায়ুধ, শ্রীধর দাস, উমাপতি ধর প্রভৃতি সাহিত্যিক

ও মনীষিগণ তাঁর সভা অলঙ্কৃত করেন। গৌড় বাদশাহ হোসেন শাহের পুত্র নসরৎশাহ বংগ সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। তাঁর আদেশে মহাভারতের বংগানুবাদ করা হয়েছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ রচিত হয়েছিল। পরবর্তী কালে কাশীরামদাসের মহাভারত এবং আলাওল মালিকের পদ্মাবতী কাব্য অনুবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত হল মুকুন্দরাম, নারায়ণ ঘোষ, বিজয় গুপ্ত, কেতকদাস, ও ক্ষেমানন্দ প্রভৃতি রচয়িতার মঙ্গলকাব্যগুলি, অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত মালিক জয়সী, ঘনরামের ধর্মমঙ্গল, ভারতচন্দ্রের অন্নদামংগল প্রভৃতি কাব্যগুলি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। আধুনিক সাহিত্যের উন্নতির পেছনে প্রাচীন সাহিত্যের সে দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে সে কথা অনস্বীকার্য।

খ্রীষ্ট জন্মের পরবর্তীকালে পালবংশের রাজত্বকালে ধর্ম্মপাল ও অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, জিনমিত্র, বোধিদেব প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে গমন করেন এবং চীন, জাপান, তিব্বত, সিংহল প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন। ইহারা তুষারমণ্ডিত হিমালয় অতিক্রম করে তিব্বত চীন প্রভৃতি দেশে ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে গমন করেন। ইঁহারা সকলেই বাংগালী।

প্রাচীন বাংলা দেশ শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতিতে যেরূপ উন্নত ছিল, শিল্প ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও তেমনই সমৃদ্ধ ছিল। বাংলায় প্রাচীন ও মধ্যযুগের মধ্যদিয়ে অন্যূন হাজার বৎসর ধরে প্রবাহিত বৈশিষ্ট্যই হ'ল বাঙ্গালীর সংস্কৃতি। বাংলার সংস্কৃতি গ্রাম্য জীবনকে কেন্দ্র করে সমস্ত জ্ঞান, বিজ্ঞান, সৃষ্টি, সম্পদ, শিল্প, সামাজিক রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠান, চিন্তাধারা, নৃত্য, গীত, চিত্রকলা কাব্য প্রভৃতি সমস্তই সাংস্কৃতিক শিল্প ও চারুকলার বৃহত্তর বাংলার যে কৃষ্টি রচনা করেছিল, তার নিদর্শন সুদূর সিংহল, যবদ্বীপ, কম্বোডিয়া শ্যাম, চীন নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি স্থানে আজও বিদ্যমান। এ বিষয় বাংলার রাজন্য-বর্গের পৃষ্ঠপোষকতা তৎকালীন সংস্কৃতিকে নব নব রূপে রূপায়িত করেছিল।

রাজচক্রবর্তী অশোক যে সকল ধর্ম্মপ্রচারক দেশ বিদেশে পাঠিয়ে ছিলেন তাদের মধ্যে অনেকেই বাঙালী ছিলেন। ধর্মপাল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। ধর্মপালের নির্বাণের পর শীলভদ্র নালন্দার অধ্যক্ষ পদে বৃত হন। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে পঞ্চাশ বৎসরাধিককাল শীলভদ্র নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। সেই সময় সহস্রাধিক অধ্যাপক এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তন্মধ্যে শীলভদ্র সর্বাধিক সূত্রগ্রন্থে ও সর্বশাস্ত্র গ্রন্থে পাণ্ডিত্য লাভ করায় অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত হন।

নবদ্বীপের পতনের পর অধ্যক্ষ শীলভদ্রের কৃতিত্ব দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাং ভারতবর্ষে আগমন করে শীলভদ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশই আদি বর্ণমালার উৎপত্তি স্থান। ফিনিসিয়ার গ্রীসে, মিশরে ও সিরিয়ার বলুন, বাংলা বর্ণমালার পূর্বে কোথাও কোন বর্ণমালার উৎপত্তি হয়নি। অতি প্রাচীনকালে বাংলা বর্ণমালাই শাস্ত্রগ্রন্থে ও লিপিকার্য্যে ব্যবহৃত হ'ত। আর্য্যভট্ট—প্রবর্তিত বীজগণিতের সংখ্যা-লিখন প্রণালীতে বর্ণমালার প্রত্যেক বর্ণে এক একটি সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট ছিল। বাঙালী আর্য্যভট্ট বাংলা বর্ণমালা ব্যবহার করতেন, ইনিই বীজগণিতের প্রবর্তক।

সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত বাংলা দেশে তাম্রলিপ্ত, হারিকেল্লা এবং সমতট এই তিনটি বাণিজ্য বন্দরের উল্লেখ পাওয়া যায়'। পুরাণসমূহের আদি বিষ্ণুপুরাণে তাম্রলিপ্ত যে বিখ্যাত সমুদ্র বন্দর ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়।

"তাম্রলিপ্তান্ সমুদ্রতট পুরীশ্চ দেব রক্ষিতো রক্ষিসংতি" (বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্বিংশ অধ্যায়, অষ্টাদশ শ্লোক)। বর্তমান হুগলী জেলার ত্রিবেণী-সংগমের সন্নিকটে অবস্থিত সপ্তগ্রাম এক সময়ে সমৃদ্ধিশালী রাজধানী ছিল। এই সপ্তগ্রাম হ'তে বাণিজ্য পোত সমূহ আরব, পারস্য, মিশর, চীন, মালয়, যবদ্বীপ, প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করত। এ সম্বন্ধে ভিনিস্ দেশীয় পরিব্রাজক সিজার ডি ফ্রেডারিক ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে সপ্তগ্রাম দর্শন করেন। এই বন্দরের সম্বন্ধে প্রচুর সুখ্যাতি করেন। ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ বণিক ফীচ্ ভারতে এসে এই সপ্তগ্রাম শ্রীপুর, সোনার গাঁ প্রভৃতি বন্দর দেখে সুবিখ্যাত বন্দর বলে মন্তব্য করেন। এ ছাড়া ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে (১৪১৭ শকে) বিপ্রদাস কর্তৃক রচিত মনসা মঙ্গল এবং বৃন্দাবনদাস বিরচিত শ্রীচৈতন্যভাগবতে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর সপ্তগ্রাম দর্শনের বিষয় উল্লিখিত আছে। ষষ্টিমঙ্গল প্রণেতা কবি কৃষ্ণরাম এবং আইন—ই—আকবরী প্রণেতা সপ্তগ্রাম বা সাত গাঁয়ের উল্লেখ করেছেন। মাধবাচার্য্যের ও মুকুন্দরামের চণ্ডীমংগলে বেতোর বন্দরের কথার উল্লেখ দেখা যায়। ভিনিস দেশীয় পরিব্রাজক ফ্রেডারিকের গ্রন্থেও বেতোর বন্দরের সমৃদ্ধির কথার উল্লেখ আছে।

For as I passed up to Satgaon I saw the village standing with a great number of people with an infinite number of ships and bazars and at my return coming down I was all amazed to see such a place so soon razed and burnt and nothing left but the sign of the burnt houses" vide Hakluyt's "The principal Navigations, voyages, Traffiqves and Discoveries etc.

পণ্যদ্রব্য নিয়ে পোতগুলি পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যাত্রা করবার সময় পর্তুগীজেরা ঘরবাড়ী গুলিতে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিত। বৃন্দাবন দাস বিরচিত শ্রীচৈতন্য ভাগবতে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর সপ্তগ্রাম দর্শনের কথার উল্লেখ আছে।

"কথোদিন থাকি নিত্যানন্দ খড়দহে।
সপ্তগ্রাম আইলেন সর্বগণ সহে॥

সেই সপ্তগ্রামে আছে সপ্ত ঋষির স্থান।
জগতে বিদিত সে ত্রিবেণী ঘাট নাম।" ইত্যাদি।

চণ্ডীমংগল প্রণেতা কবি কৃষ্ণরাম সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধির কথা বর্ণনা করেছেন,—

"সপ্তগ্রাম যে ধরণী নাহি তুল।
চালে চালে বৈসে লোক ভাগিরথির কুল॥
নিরবধি যজ্ঞদান পুণ্যবান লোক।
অকাল মরণ নাহি নাহি দুঃখ শোক" ইত্যাদি।

এই সপ্তগ্রাম পরিত্যক্ত হ'লো। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বৈদেশিক বাণিজ্য হুগলী, চুঁচুড়া, চন্দননগর ও শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থান প্রসিদ্ধি লাভ করে। বাণিজ্যে বাংলা দেশের মধ্যে সুবর্ণগ্রাম চট্টগ্রাম, সন্দীপ, শ্রীপুর, গৌড়পাণ্ডুয়া ও হাণ্ডার (চাঁড়ার) কথা উল্লেখ যোগ্য। ১৪০৫ খৃষ্টাব্দে চীন সম্রাট 'য়ুঙলো' ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য সংবন্ধ স্থাপনের জন্য 'চেংহো নামক এক দূত প্রেরণ করেন। তাঁর বর্ণনায় বাংলা দেশের বিষয় জানা যায়। "এদেশের ধনবানগণ অনেকেই অর্ণবপোত নির্মাণ করাতেন এবং সেই সকল অর্ণবপোতের সাহায্যে বৈদেশিক জাতির সহিত বাণিজ্য কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। অনেকে ব্যবসা বাণিজ্য করতেন, অনেকে চাষ আবাদ করতেন, কেহ কেহ শিল্পকলায় নৈপুণ্য দেখাতেন। রাজকীয় অর্ণবপোত-সমূহ সজ্জিত হয়ে বিদেশে বাণিজ্যের জন্য প্রেরিত হত। এই দেশ হ'তে মুক্তা এবং বহুমূল্য প্রস্তরসমূহ চীনসম্রাটক উপঢৌকন স্বরূপ পাঠাবার ব্যবস্থা ছিল।

বাণিজ্য বন্দরের মধ্যে পূর্ববংগের ঢাকা একটি পুরাতন প্রসিদ্ধ বন্দর, অন্যান্য বন্দরের মধ্যে ছিল প্রাচীন গৌড় ও লক্ষ্মণাবতী। খৃষ্ট জন্মের ৭৩০ বৎসর পূর্বে এই গৌড় বাংলার রাজধানী ছিল। হুমাযুন বাদশা এই নগরের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হ'য়ে 'জেন্নাতাবাদ নাম রাখেন। 'তবকাতে নশেরী' নামক গ্রন্থের রচয়িতা মেনহাজ উদ্দিন গৌড়ে বসে এই গ্রন্থখানি লিখেন ১২৪৩—১২৪৪ খৃষ্টাব্দে। এই গ্রন্থে মেজর রেনেল্ কর্তৃক রচিত বিবরণে গৌড়ের প্রাচীনত্ব, প্রভাব প্রতিপত্তি, বাণিজ্য ও সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় (Major Renel's memoir of a map of Hindoostan, Stewarts History of Bengal, Sec III and Asiatic Researches vol II সুলতান গয়েসউদ্দিনের রাজত্বকালে বাংলার রাজধানী গৌড় পাণ্ডুয়ার সঙ্গে বসোরা, চীন, জাপান ও রুশিয়ান বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল। নিদর্শন স্বরূপ সুলতান গয়েসুদ্দিনের মুদ্রা বসোরায় পাওয়া গিয়েছিল। পর্তুগীজ ঐতিহাসিকের চীনা ভাষায় লিখিত 'চিয়েন লেহান, নামক এনসাইক্লোপিডিয়া গ্রন্থে এবং ইংলণ্ডের বণিক রাল্ফ ফীচ এর বর্ণনায় পাণ্ডুয়ার বাণিজ্যের প্রাধান্যের কথা উল্লেখ আছে। গৌড়ের প্রভাব হ্রাসপ্রাপ্ত হ'লে পুরাতন মালদহ বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠে। রেশম ও তুলার ব্যবসার জন্য পুরাতন মালদহ বিখ্যাত হয়েছিল। গৌড়, পাণ্ডুয়া, টাঁড়া, ও পুরাতন মালদহ ধ্বংসাবশেষ দেখে সহজেই মালদহের ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ও ঐশ্বর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। গৌড়ের ইতিহাসে এবং উইলিয়াম্ হান্টার রচিত ষ্টাটিস্‌টিক্যাল একাউণ্ট অফ বেঙ্গল (১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত) গ্রন্থে জানা যায়, মালদহের সেখ্ ভিখ্ নামে এক ব্যবসায়ী কাতার, মুসরী প্রভৃতি মালদহজাত রেশম বস্ত্র অর্ণবপোত যোগে রুশিয়ায় বাণিজ্য উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিলেন। তা ছাড়া কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে ধনপতি সওদাগরের পুত্র শ্রীমন্তের গৌড় রাজধানীতে বাণিজ্যের প্রসঙ্গ আছে। কুশাই নামক গৌড়ের জনৈক শিল্পীর নিকট চাঁদ-সওদাগর কতকগুলি বাণিজ্যতরী তৈরী করিয়েছিলেন বলে জানা যায়। পালবংশের রাজত্বকালে রাজারাম পালের রাজধানী 'রমবতী' বা—'রমতীকে' কবি সন্ধ্যাকর নন্দী বিশ্বকর্মা নির্মিত সুবর্ণপুরী বলে আখ্যাত করেছেন। ঘনরাম রচিত ধর্মমংগল মহাকাব্যে ও রমাবতীর সৌন্দর্যের বর্ণনা আছে। কবিকঙ্কন চণ্ডীতে ক্ষেমানন্দ কেতকাদাস কৃত মনসার ভাসানে, বংশীদাস কৃত পদ্মাপুরাণে, বিজয় গুপ্তের মনসা মঙ্গলে, নারায়ণ দেবের পদ্মপুরাণে উজানী নগরের বিভিন্ন সময়ের সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ আছে।

আওরঙ্গজেবের নিকট হতে আর্মেনিয়ানগণ মুর্শিদাবাদে বাণিজ্যের অধিকার পেয়েছিলেন। সৈয়দাবাদে শ্বেতাঙ্গ পল্লীতে তাঁদের বাণিজ্য কেন্দ্রের চিহ্ন আজও বর্তমান আছে। চুচুড়া, চন্দননগর এবং শ্রীরামপুর যথাক্রমে ওলন্দাজ, ফরাসী এবং দিনেমারগণের বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। কলিঙ্গ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মূলেও বাঙ্গালীরই প্রভাব প্রতিপন্ন হয়। জাপানের "Shintoism" 'শিণ্টোইজম্' হিন্দুদের পিতৃপিতামহের শ্রাদ্ধের অনুরূপ। বাংলা ও বিহারের কয়েকটি তাম্রশাসনে প্রাপ্ত খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী হতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত নৌবলের বিষয় জানা যায়। ফরিদপুর জেলায় প্রাপ্ত ৩ খানি তাম্রশাসন ১৮৯১-৯২ খ্রীষ্টাব্দে আবিস্কৃত হয়। মিঃ পার্জিটার উহার অনুবাদ করেন। রঘুবংশে রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে এবং খৃষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজকের বিবরণে বংগের নৌবাহিনীর নিদর্শন দেদীপ্যমান। অষ্টম শতাব্দী হতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পাল ও সেনবংশীয় নৃপতিগণের তাম্রশাসনে বহু নৌবল ও বাহুবলের নিদর্শন পাওয়া যায়। তুরস্কের সুলতান এই বাংলা দেশ থেকে যে পোত নির্মাণ করাতেন, তার থেকেই প্রাচীন বাংলার অর্ণবপোত ও নৌবলের আভাষ পাওয়া যায়। চাঁদ সদাগর, শ্রীমন্ত সদাগর ও ধনপতি সদাগর প্রভৃতির বাণিজ্য বিবরণ থেকে বিভিন্ন প্রকারের অর্ণবপোত এবং বহু দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্বন্ধের বিষয় জানা যায়। চাণক্য প্রণীত অর্থশাস্ত্র বাংলার নগরের যে উল্লেখ পাওয়া যায়, তাতে বাংলা দেশের তৎকালীন সমৃদ্ধির কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজা চন্দ্রগুপ্তের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ চাণক্য-পণ্ডিত বাঙ্গালী ছিলেন। তাঁর রচিত অর্থশাস্ত্রের ইংরাজী অনুবাদক মিঃ আর শ্যামশাস্ত্রী এই প্রসঙ্গে তাঁর Arthasastra in the Bibliotheca Sanskrita, No 37, Edited by R. Shamsastry, B. A.) গ্রন্থে ও 'তরকাত-ই নাশিরী' নামক গ্রন্থে গৌড় ও লক্ষ্মণাবতীর নৌবলের কাহিনী বিবৃত আছে। ইবন বাতুতা

যখন বাংলাদেশে আগমন করেন, তখন রাজা দনুজরায়ের সংগে ভুখরিল খাঁর যুদ্ধে নৌশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট ফিরোজসার সঙ্গে বাংলার অধিপতি ইলিয়াস সার যে যুদ্ধ হয়, তাতে সম্রাটের পক্ষে সংগ্রাধিক রণতরী- সত্তর হাজার মালিক সম্প্রদায়ের যোদ্ধা, দুই লক্ষ পদাতিক, ষাট হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। তা সত্ত্বেও, সম্রাট জয়ী হ'তে পারেননি, বাংলা দেশকে স্বাধীন ব'লে ঘোষণা করতে সম্রাট বাধ্য হয়েছিলেন। ১৩৫৯ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে সেকেন্দর শা গৌড়ের এবং জাফর খাঁ সোনার গাঁয়ের কর্তৃত্বে লাভ করেছিলেন। এই যুদ্ধ সম্রাটকে বাংলাদেশে প্রবল বাধার সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল। এই যুদ্ধে ঐতিহাসিক সামস্-ই-সিরাজ আফিফের পিতা সম্রাটের একজন সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন, এই ঐতিহাসিকের রচিত "তারিখ-ই-ফিরোজসাহি' গ্রন্থে তিনি এ বিষয় উল্লেখ করেছেন। সুতরাং তৎকালীন বাংলার নৌবল ও বাহু বলের নৈপুণ্যের কথা যে সত্য, তার বহু প্রমাণ আছে।

পাঠান নৃপতিগণ যখনই বাংলাদেশ অধিকার করতে এসেছেন, তখনই প্রবল বাধার সম্মুখীন হ'তে হয়েছে। পশ্চিম বংগের নবদ্বীপ আফগানগণের অধিকারভুক্ত হ'লেও পূর্ববঙ্গ বহুদিন পর্য্যন্ত স্বাধীন ছিল। রাজচক্রবর্তী লক্ষ্মণ সেনের পুত্র বিশ্বরূপ সেন গৌড় হস্তচ্যুত হলেও বিক্রমপুরের স্বাধীনতা রক্ষা করেছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলার অধিপতি সুলতান হোসেন সাহ আসাম জয়ের জন্য অসংখ্য রণতরী ও চব্বিশ সহস্র অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য সহ আসামের স্বাধীন রাজা নীলাম্বরের রাজ্য আক্রমণ করেন, ভয়ে নীলাম্বর পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১২৬৭ খৃষ্টাব্দে সমগ্র বাংলা দেশ মোগল সম্রাটের পদানত হয়নি। সেই সময়ে বাংলার বার ভুঁইয়াগণের (সামন্তরাজা) বীরত্বের কাহিনী এবং মোগল বাদসার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয় উল্লেখ যোগ্য। কেদার রায়ের পর প্রতাপাদিত্যের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি বহু যুদ্ধেই মোগল সৈন্যকে পযুদস্ত করেছিলেন। ক্রমে দক্ষিণ বংগের অধিকাংশ স্থান প্রতাপাদিত্যের বশ্যতা স্বীকার করেছিল। তৎকালে চণ্ডীগান বা সাগরদ্বীপ, ধুধালী, জাহাজ ঘাটা, চাকশ্রী প্রভৃতি বন্দরে পোত নির্মিত হ'ত। অৰ্দ্ধবংগেশ্বরী মহারাণী ভবানীর রাজত্বকালে সীতারাম রায় স্বাধীন হিন্দু রাজা মুর্শিদকুলি খাঁর প্রতিষ্ঠ করতে যত্নবান হন। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর সঙ্গে যুদ্ধে সীতারাম অপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শন করেন এবং যুদ্ধে কয়েক বার নবাবের সৈন্যদল পরাজিত হয়। বাঙ্গালীর এইরূপ বীরত্বের বহু বিবরণ পাওয়া যায়। বিক্রমপুরের অন্তর্গত শ্রীপুরের রাজা চাঁদরায়, চন্দ্রদ্বীপের দনৌজমাধব, ফতেহাবাদও ভুষণা পরগণার কুন্দরাম রায়, ভুলুয়ার লক্ষ্মমাণিক্য ইহারা সকলেই ভৌমিক আখ্যায় আখ্যাত এবং বীর বলে পরিচিত। যশোহর চাঁচড়া রাজবংশের ভবেশ্বর রায়, দিনাজপুর রাজবংশের আদিপুরুষ রাজনাথ রায় প্রভৃতির বীরত্বের খ্যাতি বড় অল্প ছিল না। প্রাচীন বাংলাদেশ শিল্প বাণিজ্য শৌর্ঘ বীর্যে যেমন উন্নত ছিল, শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও তেমনই সমৃদ্ধ ছিল। দেশের পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধান করলে এ সবের অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। চীন, সিংহল যবদ্বীপ, আসাম, কম্বোডিয়া নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি দেশের পুরাতত্ত্বে এখনও বাংলার গৌরব কাহিনী বিবৃত আছে। তিব্বতী ভাষায় 'তেঙ্গুর' নামক বিরাট গ্রন্থের উপক্রমণিকায় পঞ্চাশজন বাঙ্গালী পণ্ডিতগণের নাম লিপিবদ্ধ আছে। কারণ, তাঁহারা তিব্বতী পণ্ডিতগণকে এই গ্রন্থ রচনায় সাহায্য করেছিলেন। তিব্বতীগণ সেইজন্য তাদের গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করে যথোচিত সম্মান দিয়েছিলেন। এক কালে নেপাল বাংলার উপনিবেশ ছিল। মুসলমান রাজত্বের পূর্বে বাংলা ভাষায় লিখিত পুস্তক এখনও নেপালে পাওয়া যায়। সেই পুস্তকে বাংলার গৌরব প্রতিষ্ঠার বিষয় উল্লিখিত আছে।

অভিসারিকা

শ্রীসুধীর গুপ্ত

দুর্গম সঙ্কট-বর্ত্মে সঙ্কেত-লগনে
অগ্রসর হও ধীরে ; হে অভিসারিকা,
আমি তব অন্তরের ধ্রুব প্রেম-শিখা,
নীরবে জ্বলিতে থাকি নিরালা গগনে।—
স্ফুলিঙ্গ ফুটাই তব যৌবনের বনে ;
পরাই একান্তে সুখে দীপ্ত জয় টীকা।

পঙ্কিল—পিচ্ছিল পন্থা—সে তো ভাগ্য-লিখা ;
প্রীতিই দেখাবে পথ প্রতিটি চরণে।
অগ্রসর হও ধীরে ; প্রতি পদ-পাত
শঙ্কিল—পঙ্কিল পথে পঙ্কজ ফুটাবে ;
দৃষ্টি-ঠুলি খুলে যাবে শেষে অকস্মাৎ ;
দয়িত-দর্শন যত প্রদাহ ভুলাবে।

প্রেম তো ফোটে না হেথা না পেলে সংঘাত ;
প্রাণ-পাত বিহনে কে প্রিয়ে বক্ষে পাবে।

অবাঞ্ছিত

হরিরঞ্জন দাশগুপ্ত

মহানগরীর কর্ম-কোলাহল, ব্যস্ততা, রুটিন-বাঁধা জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে সুকান্তির পক্ষে। গাড়ি-ঘোড়া, ট্রাম-বাস, বিপুল জনস্রোত, দানবাকৃতি ইমারৎ—এদের অন্তরালে জীবনের কোন স্পন্দনই সে অনুভব করতে পারে না, কল্পনা করতে পারে না—এখানে রয়েছে সমাজ, সহজ জীবনযাত্রা চলে এখানেও।

কয়েকমাস হলো সে এসেছে মহানগরীতে। একটি কাজও পেয়েছে। শুধু তা' নয়; এরই মধ্যে বড়-সাহেবের সুনজরে পড়ে গেছে। সবাই বলছে, তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। আপিসের কেরাণীবাবুরা, বিশেষ করে তরুণেরা, তার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করেছে। দু একজনের সঙ্গে বেশ ভাবও হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। তাদের কাছে সে জিগ্যেস করেছে—এখানকার সমাজ-জীবনের কথা। তারা নিরাশ করে দিয়েছে তাকে। বলেছে, এখানে সমাজ নেই—সাধারণ লোকেদের জন্য। মফঃস্বলে সে সমাজেরই একজন, কিন্তু এখানে অগণিত সমাজহীন নাগরিকদের অন্যতম। বিশাল সমুদ্রে একটি ক্ষুদ্র তৃণখণ্ড। প্রেম সম্বন্ধে তাদের কাছ থেকে সে শুনেছে এখানে সত্যিকারের প্রেম নেই, আছে টাকার ছিনিমিনি খেলা, প্রাণের দাম কেউ দেয় না, এখানকার বিস্তীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে অর্থের বিনিময়ে পাওয়া যায় সবই। অর্থ-উপার্জনের তাগিদে যারা এখানে আসে, ও-সব কথা ভাববার অবকাশ নেই তাদের, সুযোগও নেই।

সুকান্তি তাদের কাছে বলেছে—সে ভালবাসে একটি মেয়েকে, ভুলতে পারে না তার কথা একটি মুহূর্তের জন্যও।

মনের এই দুর্বলতার জন্য বন্ধুরা উপহাস করেছে তাকে। বলেছে, মানুষের মনের অবচেতন-লোকে সংস্র প্রেমের স্মৃতি সমাহিত হয়ে থাকতে পারে। দুঃখ করা পুরুষের ধর্ম নয়।

বন্ধুরা তাকে বলে নিজেদের জীবনের বিচিত্র প্রেম-কাহিনী। তাদের কথা বিশ্বাস হয় না সুকান্তির। অশান্ত মন শান্ত হয় না কিছুতেই। মনে হয়, বেশিদিন এখানে থাকলে সে হয়তো বাঁচবে না।……

সেদিন কাউকে কিছু না বলে সুকান্তি দেশের দিকে যাত্রা করলো। বর্ষাকাল! পল্লী-অঞ্চলের পথঘাট কাদা জলে ভরে আছে। সন্ধ্যা আসন্ন। অদূরে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। বিদায়ী সূর্যের রক্তিম আলোয় রাঙা আকাশ। পাখীরা বুকে আলোর রঙ মেখে নীড়পানে ছুটে চলেছে—তৃপ্তির কূজনে চারদিক মুখর করে।

সুকান্তি দাঁড়িয়ে একবার দেখল, প্রকৃতির স্নিগ্ধ শান্ত মূর্তিখানি।

দীর্ঘদিন পরে পল্লীমায়ের কোলে ফিরে এসে পরম তৃপ্তি অনুভব করল সে। ঐ দেখা যাচ্ছে সুষমাদের বাড়ীখানি। মনে মনে এই ভেবে সে খুশী হলো—সুষমাকে অবাক করে দেবে আজ। আবার মুখর হয়ে উঠবে তার সেই হারানো অতীত। অভিমান হলো—সুষমা তো তার কাছে একখানি চিঠিও দিতে পারতো! কিন্তু অন্তরের আকুলতায় সে ভুলে গেল সব।

কিছুক্ষণের মধ্যে সুকান্তি পৌঁছলো সুষমাদের বাড়ি। দেখল, সুষমা চায়ের বাটি হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকছে। তার মা রান্নাঘরে বসে চা করছেন। বাইরের ঘরে কেউ নেই। সুকান্তি বারান্দায় উঠলো সন্তর্পণে। ঘর থেকে বেরিয়ে এলো সুষমা। চোখাচোখি হলো দু'জনের। সুষমা স্তব্ধ হয়ে রইলো। বিস্ময় বাড়লো সুকান্তির। আগে—রোজ যখন তার সঙ্গে সুষমার দেখা হতো, তখন তাকে দেখে

আনন্দের সীমা থাকতো না সুষমার। তার দুচোখে ফুটে উঠতো হাসি। আজ কোথায় গেল সেই উচ্ছলতা, সেই গভীর উল্লাস-তৃপ্ত? এগিয়ে এলো সুকান্তি। ধরলো সুষমার একখানি হাত। সুষমা কাছে এলো তার আকর্ষণে। সুকান্তি বলল, কেমন আছ সুষমা?

: ভাল। তুমি ভাল ছিলে তো?

ছোট্ট কথা, ছোট্ট উত্তর।

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল সুকান্তি। ছেড়ে দিল সুষমার হাতখানি। নীরবে ঘরে ঢুকলো সুষমা। সুকান্তি গেল রান্নাঘরে। তাকে দেখে মুচকি হাসলেন সুষমার মা অণিমা। বললেন, তুমি এসেছো ভালই হয়েছে। তোমার কথাই বলছিলাম আমরা। তুমি খাবার ঘরে বোস, আমি লুচিটা ভেজে নিয়ে আসছি।

পাশেই খাবার ঘর। সুকান্তি সে-ঘরে ঢুকলো। সাজানো-গোছানো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘরখানি। মনে হলো—সদ্য গুছিয়ে রাখা হয়েছে, কার অভ্যর্থনার আয়োজন হয়েছে যেন।

একটু পরেই অণিমা প্রবেশ করলেন। খাবারের থালাটি টেবিলের উপর রেখে সুষমার নাম ধরে ডেকে বললেন, এবার অমিয়কে ডেকে নিয়ে আয়, ওর আবার দেরী হয়ে যাবে। এই বৃষ্টি-বাদলার দিনে তিন তিন মাইল পথ যেতে হবে।

সুষমার সঙ্গে বেরিয়ে এলো জনৈক সুদর্শন যুবক। অণিমা সুকান্তির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন তার।

অমিয় গ্রামের মধ্য-ইংরেজী স্কুলে হেডমাষ্টার হয়ে এসেছে কিছুদিন আগে। সুষমার বাবা জীবনবাবু স্কুল কমিটির সদস্য; সুষমা ম্যাট্রিক দিচ্ছে শুনে সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাকে পড়াবার ভার নিয়েছে। মাসখানেক ধরে সে তাকে পড়িয়ে যায় রোজ। অমিয়র মতে, সুষমা পরীক্ষা পাশ করবেই।

অমিয় নমস্কার জানালো সুকান্তিকে। সুকান্তি প্রতি-নমস্কার জানাল। সুষমা সুকান্তির পরিচয় প্রসঙ্গে অমিয়কে বলল, ইনি হচ্ছেন—শ্রীযুত সুকান্তি মজুমদার, বি-এ পাশ করে কোলকাতায় চাকরী করছেন। আমাদের পরিবারের সঙ্গে এঁর বিশেষ আত্মীয়তা। ছুটিতে কোলকাতা থেকে দেশে ফিরে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

ম্লান হাসি ফুটে উঠল সুকান্তির মুখে, ভাষা ফুটল না।

অণিমা বললেন, কোলকাতা শহরের নতুন খবর-টবর আমাদের শোনাও সুকান্তি। আমরা পাড়াগাঁয়ে থাকি, শহরের খবর শুনতে আমাদের যে কতো ভালো লাগে।

সুকান্তি বলল, খবর? হ্যাঁ খবর তো অনেক। সে-দিন নতুন বড়লাটের বক্তৃতা শুনলাম পুরাণো-লাটের বিদায় সভায়। এসেম্ব্লিতে এম্-এল্-এ'দের বাক-যুদ্ধ দেখলাম। সব চেয়ে বড় খবর হলো—ক'দিন আগে একদিন কলকাতার রাস্তার উপর দিয়ে নৌকা চলেছিল। বর্ষার বৃষ্টির জল প্রায় চার ঘণ্টা ধরে রাস্তায় জমে ছিল। সে এক চমৎকার দৃশ্য। জেমিনীর "বরানা", অগ্রদূত-এর "বাবলা", শরৎচন্দ্রের "দত্তা" বঙ্কিমবাবুর "আনন্দমঠ"—এতগুলি ভালো ছবি একযোগে চলছে। হাজার হাজার লোক ছবিগুলো দেখছে, তবু ভিড় একটুও কমছে না। সত্যি, আশ্চর্য সেই শহরটি।...

এমনি আরো সব খবর সে বলল—যা বলবার জন্য প্রস্তুত ছিল না সে। মন থেকে তৈরী করে বলল অনেক—অনেক কথা।

তারপর কল্পনার গতি থেমে গেল।

চা-পান শেষ হলো।

সপ্তর্ষিমণ্ডলের উপরে তারা দেখা দিয়েছে। আকাশের মেঘ গেছে কেটে। অমিয় বলল, এবার তাহলে চলি—

সুষমা তার সাইকেলের আলোটি জ্বালিয়ে দিল। তাকে "গেট" পর্যন্ত এগিয়ে দিল। ফিরে এলো তারপর।

সুকান্তি টেবিলের উপর থেকে "ভারতবর্ষ"টি তুলে নিয়ে পাতা উল্টাচ্ছিল। অনিমা রান্নাঘরের কাজে চলে গেছেন এরই মধ্যে। সুষমা এসে দাঁড়ালো সুকান্তির কাছে। বলল, ভিতরের ঘরে চল, এখানে ঠাণ্ডায় বসে আছ কেন? যাও তাড়াতাড়ি। আমি আসছি এক্ষুণি।

সুষমার আদেশ অমান্য করতে পারলোনা সুকান্তি। ঘরে ঢুকে বসে পড়লো একখানি ইজি-চেয়ারে। তার সকল স্ফূর্তি যেন চলে গেছে, প্রাণখানি হাঁফিয়ে উঠেছে। সুষমা এলো; সুকান্তির অস্বস্তি লক্ষ্য করল। আধ-ভেজানো দরজাটি বন্ধ করে সুকান্তির সামনে এসে দাঁড়ালো।

মুহূর্ত কেটে গেল। দু'জনেই নীরব। সুকান্তিকেই

ভাঙতে হলো মৌনতা। বলল, আমি এসেছি বলে তোমরা কেউ যেন সুখী হওনি। কেন, বলত সুষমা ?

সুষমা সহজভাবে বলল, তুমি আগে খবর দাওনি বলে।

: আগে খবর দেবার সময় ছিল না। তা ছাড়া, দরকারও মনে করিনি। ভেবেছিলাম, আগে যেমন রোজ বিকেলে এসে চায়ের আসর জমাতাম, আজও ঠিক তেমনি করবো। এখন দেখছি, ভুল হয়েছে আমার। আমি আজ অবাঞ্ছিত। আমার কথা ভুলে গেছ তোমরা। নোতুন লোকের সন্ধান পেয়েছ। নিরুপদ্রবে দিন কাটছিল। নোতুনেই তো আনন্দ বেশি। পুরানোর দাম কোথাও নেই—কিছু নেই।

আবেগজড়িত হলো সুকান্তির কণ্ঠস্বর।

: এ কী বলছ তুমি ?

: বলছি ঠিকই, তিন মাসের অনুপস্থিতিতে তিন বছরের ভালবাসা ভুলে গেছ। আশ্চর্য লাগছে আমার! তবে আমার বন্ধুরা বলেছে—প্রেম দু'দিনের, প্রেমের সমাধি রচনা করা এমন কোন কঠিন কাজ নয়। আমার এখানে না আসাই ছিল কর্তব্য।

: আর ক'টা দিন পরে এলে আমাদের সঙ্গে তোমার আর দেখা হতো না। আমরা তো শিগগিরই এখান থেকে চলে যাচ্ছি। কোলকাতা শহরে গিয়ে এদিককার কথা তোমার কি মনে ছিল ?

—অনুযোগের সুরে বলল সুষমা।

সুকান্তি বলল, ছিল বৈকি! ছিল বলেই তো এখানে এলাম চাকরী ছেড়ে।

: চাকরী ছেড়ে দিয়েছ ? তা'হলে খাবে কী ?

: চাকরী আবার একটা খুঁজে নেব। দরকার হলে আবার কোলকাতা শহরে যাবো চাকরীর সন্ধানে।

অসহায়ের মতো সুষমা চাইলো সুকান্তির মুখের পানে। সুকান্তি বুঝলো তার মনের কথা। বলল, বেশ তো, চলে যাবার আগে চল না একবার নদীর ধারে বেড়িয়ে আসি। আপত্তি আছে ?

সুষমা বলল, তোমার সঙ্গে নরকে যেতেও আমার আপত্তি ছিল না, সে কথা কি তুমি জাননা ?

সুষমাকে বুকে জড়ালো সুকান্তি। তাড়াতাড়ি নিজেকে মুক্ত করে সুষমা বলল, এ কী করছ ? তুমি কি আজ পাগল হলে ?

আরো বিস্মিত হলো সুকান্তি। সুষমা আজ এ কী কথা বলছে ? যে একদিন তার আলিঙ্গনের জন্য দু'বাহু প্রসারিত করে দিত, ঠোঁট জড়িয়ে ঠোঁটের স্পর্শ নিত, সে আজ এমনি সঙ্কুচিত হচ্ছে কেন ? তবে, সত্যিই কি সে তাকে চায় না ?

গভীর চিন্তাকুল হলো সে।

সুষমা তার হাত ধরে টেনে বলল, চল না, জোছনা থাকতে থাকতে ঘুরে আসি নদীর ধার থেকে। কতদিন হলো তোমার সঙ্গে বেড়িয়েছি !

সুকান্তি উঠল। সুষমা তার হাত ধরলো। ঘরের বাইরে এসে অণিমাকে ডেকে বলল—মা, আমরা বাইরে থেকে ঘুরে এখুনি আসছি।

রান্নাঘরের ভিতর থেকেই অনিমা বললেন, তাড়াতাড়ি আসিস্ কিন্তু। আমার রান্না হয়ে গেছে। তাছাড়া, সুকান্তি আজ শহর থেকে এসেছে। খুব ক্লান্ত হয়েছে নিশ্চয়।......

নদীর তীর। দুকুল-ভরা নদী বয়ে চলেছে। নদীর বুকে ঝলমল করছে—জ্যোৎস্নার আলো। ঝিঁঝিঁর ডাক শোনা যাচ্ছে শুধু—নীরব প্রকৃতির বিস্তীর্ণ রাজ্যের ঘুমন্ত অধিবাসীদের মিলিত দীর্ঘশ্বাসের মতো।

সুকান্তি বলল, একবার কাছে এসো, সুষমা। আমার কোলে মাথা রেখে গাও তোমার সেই গানটি :

আকাশের কালো মেঘের বুকেতে
চাঁদিনী লুকাল মুখ,
নাহি জানি প্রিয়, নাহি অনুভব
সে কী বাধাহীন সুখ।

সুষমা গাইল গানটি। সুমধুর তার কণ্ঠস্বর। সুকান্তি তার মুখখানি তুলে ধরে ঠোঁট স্পর্শ করতে যাচ্ছিল।

তাকে হাত দিয়ে ঠেকিয়ে রাখলে সুষমা। বলল—ছিঃ ছিঃ, ওকী করছ ? তা' তো আর হয়না প্রিয়।

সুকান্তি স্তব্ধ হয়ে রইলো, কিন্তু সুষমাকে ছাড়লোনা বাহুর বন্ধন থেকে। বলল, না-না, সুষমা, আর দেরী নয়। এবার আমি প্রস্তুত হয়ে এসেছি তোমার কাছে। আমাদের

বিয়ে হয়ে যাক। তারপর দুজনে সুখে নীড় বাঁধবো। আজ আর অমত নয়, লক্ষ্মীটি !···

একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো সুষমা। বলল—কিন্তু এখন যে বড় দেরী হয়ে গেছে। তুমি আমাদের বাড়িতে এসে যে সম্বন্ধ পেতেছিলে, তুমি নিজেই তো তা' ছিন্ন করে দিয়ে চলে গিয়েছিলে! আজ সে ছেঁড়া তার তো আর জোড়া লাগবেনা।

সুষমার কথা শুনলোনা সুকান্তি। চুম্বনের পর চুম্বনে সুষমার মুখখানি সিক্ত করে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—আজ আর কোন কথা নয়, কোন যুক্তি আমি মানবো না আজ, তোমাকে আমার চাই—আমার সর্বস্বর বিনিময়ে তোমায় আমি নেবো।

সুষমার দু'টি চোখ অশ্রুসিক্ত হলো। সে বলল—আমি জানি, আমায় ছাড়া তোমার চলবেনা। তোমায় আমি জেনেছিলাম, পেয়েছিলাম তোমায়। কিন্তু তুমি যখন অর্থের মোহে অন্ধ হয়ে আমায় একা ফেলে চলে গেলে, তখন আমি ভাবলাম, আমি অসহায়, তুমি আমায় করেছ ছলনা—আর-আর যারা আমার সরলতার সুযোগ নিয়ে আমায় করেছে প্রবঞ্চনা, ঠিক তাদেরই মতো। কিন্তু আজ দেখছি তুমি তা নও—অন্ততঃ প্রতারক নও তুমি। এটুকু সান্ত্বনা নিয়ে, এই পাথেয়টুকু নিয়ে আমায় সরে যেতে দাও তোমার জীবন থেকে। আমি আজ আর তোমার হতে পারবোনা। তোমার উপর মিথ্যা অভিমানে আর একজনের আশ্রয় নিয়েছি। সে আমায় আশ্রয় দিয়েছে। তার সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করবো কোন মুখে? তুমিই বল, তুমি যাকে নিয়ে ঘর বাঁধবার জন্য ব্যাকুল, সে যদি কারো সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাহলে তুমি তাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারবে কি-না? তোমারই ভুল কিংবা আমারই ভুলে—এ জীবনে আমাদের প্রেমের সমাধি এখানেই রচনা করি—চল।···

ধীরে ধীরে শিথিল হলো সুকান্তি বাহুর বন্ধন। উঠে দাঁড়ালো সুষমা। সুকান্তিও মন্ত্রমুগ্ধের মতো উঠলো সেখান থেকে। জ্যোৎস্নার আলো ম্লান হয়ে এসেছে। গভীর হয়েছে রাত। সুকান্তি ধীরে ধীরে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। সুষমা তার অনুসরণ করলো। সুকান্তি সুষমাদের বাড়ি ছাড়িয়ে চলে গেল অনেক দূর। আধ-আলো-অন্ধকারে তার মূর্তিটি অস্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছিল। সুষমা গেট-এ দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। দূরে—আরো দূরে অশথ গাছের ছায়া পেরিয়ে যাবার পর অদৃশ্য হয়ে গেল সুকান্তি।

সুষমা হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠলো, ওগো যেয়োনা—যেয়োনা, ফিরে এসো।

সুষমার চিৎকারে অণিমা ঘর থেকে ছুটে এলো বাইরে। মার বুকে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো সুষমা।

কোথা সেই আলো

শ্রীরাইহরণ চক্রবর্তী

আকাশ থেকে ঝরে পড়ে
তোমার দেওয়া আলো—
ভোরের হাওয়ায় মিশে গিয়ে
ছুনিয়া রাখে ভালো।

আমরা শুধু হাওয়ায় উড়ে
কোথায় চলে যাই-
আলো হাওয়া কেঁদে মরে
নাহি পেয়ে ঠাঁই।

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত

গত ১লা জানুয়ারী (১৯৬২) অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথের ৬৮ বৎসর পূর্ণ হয়েছে। (তাঁর পিতা শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসুর বয়স এখন ৯৩ চলছে।) সত্যেন্দ্রনাথকে এখনও প্রতিদিন অনেক জটিল ও বিচিত্র অঙ্ক কষতে দেখি। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব,—সব বিষয়েই তাঁকে পড়াশুনা, আলোচনা ও অনুশীলন করতে দেখছি। তাঁর বৈঠকখানা যেন একটি জ্ঞানচর্চার মজলিস, বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরী, গবেষণার পাঠাগার।

মাত্র ২৯ বৎসর বয়সের তাঁর আবিষ্কার মহামতি আইনষ্টাইনের স্বীকৃতিলাভ করে—বসু-আইষ্টাইনের নাম যুক্ত হয়ে তাঁদের বিজ্ঞান-কথা জগৎসভায় প্রচারিত হয়। গুরু আইনষ্টাইনের মৃত্যু হয়েছে ১৯৫৫ সনে। তাঁর শিষ্য অধ্যাপক বসু আজও তাঁদের চিন্তাকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাচ্ছেন। আমরা তাঁর দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।

তাঁর জীবনের নানা বৎসর স্মরণীয়, কর্ম ও সম্মানে সমুজ্জল। এগুলি পঞ্জী করে সাজালে তাঁর জীবন কথা জানা কিছু সহজ হয়। আমরা নিম্নে একটি পঞ্জী সঙ্কলন করে দিলাম।

অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসুর জীবন-পঞ্জী

খৃষ্টাব্দ

১৮৯৪ হরিণঘাটা (২৪ পরগণা)র নিকটস্থ বড়জাগুলিয়ায় পিতৃগৃহ। কলকাতায় পিতৃগৃহ ২২নং ঈশ্বর মিল লেনের বাড়ীতে ১লা জানুয়ারী তারিখে জন্ম।
প্রাথমিক শিক্ষা—নিমতলা ঘাটের নর্মাল স্কুল, তারপর গোয়াবাগানে New Indian School এ (গদাধর স্কুল)

১৯০৭ হিন্দুস্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হলেন। পান-বসন্ত হওয়াতে এক বৎসর পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই।

১৯০৯ এণ্টান্স পাশ করেন: পঞ্চম স্থান। প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হলেন।

১৯১১ I.Sc. পাশ করেন। প্রথম হলেন। Physiology অতিরিক্ত বিষয়।

১৯১৩ B.Sc. পাশ করেন। গণিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম।

১৯১৪ বিবাহ; ডাঃ যোগীন্দ্রনাথ ঘোষের (বসুলিয়া টোলা) একমাত্র সন্তান ঊষা সহধর্মিণী।

১৯১৫ M.Sc. পাশ করেন। মিশ্রগণিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম।

১৯১৬ কলকাতা বিজ্ঞান কলেজে রিসার্চ স্কলার হলেন। গবেষণার বিষয়, Relativity ইত্যাদি।

১৯১৭ বিজ্ঞান কলেজের লেকচারার হলেন—বিষয়, সাধারণ পদার্থ-বিদ্যা, গণিত।

১৯২০ পুস্তক রচনায় (Einstein. A and Minkowski H—The Principles of Relativity, 1920. Published by the University of Calcutta, 1920) P. C. Mahalanobis ও Dr. Meghnad Saha র সঙ্গে যুক্ত-গ্রন্থকার হলেন।

১৯২১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের রীডর হলেন।

১৯২৪—২৫ Zeitschrift fur Physik পত্রিকায় অধ্যাপক বসুর "Planck's law and the light quantum pypothesis" শীর্ষক আবিষ্কার-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।
দ্বিতীয় প্রবন্ধ Heat equilibrium in Radiation field in presence of matter" ঐ পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রবন্ধটি আইনষ্টাইন স্বয়ং জার্মাণ ভাষায় অনুবাদ করে ঐ পত্রিকায় ছাপেন। আইনষ্টাইন অধ্যাপক বসুর আবিষ্কৃত তত্ত্বের বিস্তারিত ব্যাখ্যাও করেন। পরে ওই তত্ত্ব এবং অধ্যাপক বসুকে অভিনন্দিত করে তিনি একপত্র লিখেন। এই তত্ত্ব বসু—আইনষ্টাইন তত্ত্বরূপে জগতে প্রসিদ্ধিলাভ করে। ফ্রান্সে গমন। সিলভাঁ লেভি ও মাদাম কুরীর সাথে সাক্ষাৎকার।

১৯২৫ জার্মানীতে আইনষ্টাইনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা।

১৯২৬ অক্টোবরে দেশে প্রত্যাবর্তন।

১৯২৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক হলেন।

১৯২৯ ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনের গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞান শাখার সভাপতি। ভাষণের বিষয় Tendencies in the Modern Theoretical Physics.

১৯৩৭ রবীন্দ্রনাথ তাঁর বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ 'বিশ্বপরিচয়' অধ্যাপক বসুকে উৎসর্গ করলেন।

১৯৪৪ ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের দিল্লী অধিবেশনে সাধারণ সভাপতি। ভাষণের বিষয়—The classical determinism and the quantum theory.

১৯৪৫ ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনের সভাপতি ডাঃ ভাটনগরের অনুপস্থিতিতে অধ্যাপক বসুই সভাপতিত্ব করেন।

অক্টোবর মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক হলেন।

১৯৪৮—৫০ ভারতের ন্যাশনাল ইংস্টিটিউট অব সায়ান্সের চেয়ারম্যান।

১৯৪৮ বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি; 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার জন্ম।

১৯৫১ Unesco র আহ্বানে প্যারিসে যান। তখন ইংলণ্ড ও জার্মানীতে ভ্রমণ করেন।

১৯৫২ ৮ ভারতীয় রাজ্য সভায় মনোনীত সভ্য

১৯৫৩ ফ্রান্সের Council of National Scientific Research (CNRS) এর আমন্ত্রণে ইউরোপ যান। তাঁর নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার বিষয় আইনষ্টাইনের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ হয়। গবেষণা-আবিষ্কার প্রবন্ধ প্রকাশ—বিষয়ঃ Unitary Theory.

Comptes rendus 1953

বুদাপেষ্টে শান্তি সম্মিলনে যোগদান। তথা হতে রাসিয়া।

১৯৫৪ ফ্রান্স ও জার্মাণীতে গমন। প্যারিসে আন্তর্জাতিক সভায় পঠিত—প্রবন্ধের বিষয় Crystallography.

ভারত সরকার পদ্মবিভূষণ উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৯৫৫ CNRS এর আমন্ত্রণে ফ্রান্সে গমন করেন। সেখান হতে সুইজ্যারল্যাণ্ডের অন্তর্গত বার্ণ সহরে অনুষ্ঠিত 50 years of Relativity Conference এ যোগদান করেন। (আমেরিকাতে এক হাসপাতালে ১৮ই এপ্রিল, ১৯৫৫ অধ্যাপক বসুর গুরু আইনষ্টাইনের মৃত্যু)

১৯৫৬ ১লা জুলাই বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যপদে অধিষ্ঠিত হন। পঠন ও পরীক্ষা সম্বন্ধে একটি পরিকল্পনা উপস্থিত করেন।

ব্রিটিশ এসোসিয়েসন ফর দি এডভান্সমেণ্ট অব সায়ান্সের সভায় যোগদানের জন্য লণ্ডনে গমন।

১৯৫৭ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত। এলাহাবাদ ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডক্টরেট উপাধি প্রদান।

১৯৫৮ রয়াল সোসাইটি অব লণ্ডন ফর প্রোমোটিং ন্যাচারাল নলেজ তাঁকে ফেলো নির্বাচন করেন। এই উপলক্ষে তিনি প্যারিস হয়ে লণ্ডনে যান।

তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এমেরিটাস প্রফেসর নির্বাচন করেন।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ বিজ্ঞানের ক্লাস প্রবর্তিত হয়।

ভারত সরকার তাঁকে জাতীয় অধ্যাপক পদে বরণ করেন এবং তিনি বিশ্বভারতীর উপাচার্যপদ পরিত্যাগ করেন।

১৯৬১ রবীন্দ্র শতবার্ষিকীতে বিশ্বভারতী 'দেশিকোত্তম' উপাধি প্রদান করেন।

১৯৬২ ইনডিয়ান ষ্ট্যাটিসটিক্যাল ইনষ্টিটিউট কর্তৃক ডক্টরেট উপাধি প্রদান।

স্বামী বিবেকানন্দ জন্ম শত বার্ষিক—

গত ২৮শে জানুয়ারী ভারত গৌরব স্বামী বিবেকানন্দের বয়স ৯৯ বৎসর পূর্ণ হইয়া শততম বর্ষের আরম্ভ হইয়াছে। আগামী বৎসর অর্থাৎ ১৯৬৩ সালে তাহার শততম বর্ষ পূর্ণ হইবে। এই উপলক্ষে সারা ভারতে তথা সারা বিশ্বে এক বিরাট উৎসব পালনের আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। ভারতের জাতীয় জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের দান অপরিসীম। শুধু রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি একদল ত্যাগী ও সেবাব্রতী সন্ন্যাসী কর্মী সৃষ্টি করিয়া যান নাই, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তিনি এক নবজাগরণের সাড়া আনিয়া দিয়া গিয়াছেন। ভারত স্বাধীনতা লাভের পর তাঁহার আদর্শে অধিকতর শ্রদ্ধাবান হইয়া তাঁহারই প্রদর্শিত পথে ভারতের জীবন যাত্রা গঠনে মনোযোগী হইয়াছে। দেশের সর্বত্র রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মীরা শিক্ষা ও সেবা ক্ষেত্র রচনা ও তাহাকে বিস্তৃত রূপ দান করিয়া ভারতকে অগ্রগতির পথে লইয়া যাইতেছেন। ক্ষেত্রকে সম্পূর্ণতা দানই স্বামীজির প্রতি তাঁহার শত বার্ষিক উৎসবে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের প্রকৃষ্ট উপায়। আমরা দেশবাসী সকলকে এই কার্য্যে নূতন ভাবে মনোযোগ প্রদানের জন্য আহ্বান জানাই।

পূর্ববঙ্গে অশান্তি—

সম্প্রতি পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী শ্রীএইচ-এস-সুরাবর্দীকে গ্রেপ্তার করার ফলে পূর্ববঙ্গ তথা পূর্ব-পাকিস্তানে যে অশান্তি আরম্ভ হইয়াছে তাহা শান্তি-কামী মানুষ মাত্রকেই বিচলিত করিয়াছে। বর্তমান শাসক আয়ুব খাঁ সম্প্রতি ঢাকার সফরে আসিলে তাঁহার বিরুদ্ধে সমগ্র পূর্ববঙ্গে যে বিক্ষোভ প্রদর্শন আরম্ভ হয়, তাহার ফলে আয়ুব খাঁ পশ্চিম পাকিস্তানে গোপনে পলাইয়া যাইতে বাধ্য হন। আয়ুব খাঁর শাসন নীতিতে পূর্বপাকিস্তানের শাসন কার্য্যে অধিক সংখ্যায় পূর্ব পাকিস্তানের লোক নিযুক্ত না হইয়া পশ্চিম পাকিস্তানের লোক নিযুক্ত হইতেছিল। তাহার ফলে সর্বত্র এক অসন্তোষের আগুন জ্বলিয়া উঠিতেছিল। তাহার উপর পূর্ব-পাকিস্তানবাসী নেতা বাঙ্গালী সুরাবর্দীকে বিনা বিচারে গ্রেপ্তার ও আটক রাখায় লোক আরও উত্তেজিত হইয়া উঠে। প্রায় চারিদিকে ভারত রাষ্ট্র-বেষ্টিত হইয়া পূর্ব-পাকিস্তানের অধিবাসীরা গত ১৫ বৎসর ধরিয়া লক্ষ্য করিয়াছে যে, ভারত রাষ্ট্রের অধিবাসীরা দিন দিন অধিকতর সুখ-সমৃদ্ধি ভোগ করিয়া চলিয়াছে—আর তাহারই পাশে থাকিয়া পূর্ব-পাকিস্তানের অধিবাসীদের দুঃখ দুর্দ্দশা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। শাসন ব্যবস্থার অনাচারের ফলে পূর্ব পাকিস্তান হইতে হিন্দুরা ক্রমে ক্রমে প্রায় সকলেই ভারত রাষ্ট্রে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে ও ফলে পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের অসুবিধা ও কষ্ট দিন দিন বাড়িয়া গিয়াছে। খাদ্যাভাবে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা পূর্ববঙ্গেও লোক প্রায় না খাইয়া থাকিতে বাধ্য হইতেছে। তাহার উপর নানারূপ অনাচার তাহাদের সর্বত্র বিব্রত করিয়া রাখিয়াছিল। ফলে সুরাবর্দীর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে যে গণ-বিক্ষোভ আরম্ভ হইয়াছে, তাহা ঢাকা হইতে ক্রমে সকল বড় বড় সহরে, এমন কি গ্রামে পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িতেছে ও জনগণের সাধারণ জীবন যাত্রা বিপন্ন করিয়া তুলিতেছে। ইহার ফলে সর্বত্র অশান্তি ও অরাজকতা ছড়াইয়া পড়িতেছে এবং ভবিষ্যতে কি হইবে সে বিষয় চিন্তা করিয়া লোক শঙ্কিত হইয়াছে। পাকিস্তানে এখনও কোন স্থায়ী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন সম্ভব হয় নাই। আয়ুব খাঁ বল-প্রয়োগের দ্বারা দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার যে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে এবং একদল মানুষ দেশের শান্তি-কামনায় যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বদ্ধপরিকর। সুরাবর্দী সাহেব সে বিষয়ে চেষ্টা করিতে যাইয়া গ্রেপ্তার হইয়াছেন। পাকিস্তানের এই অশান্তি ভবিষ্যতে কি রূপ ধারণ করিবে সে চিন্তা সমগ্র বিশ্বের মানুষকে আজ চিন্তান্বিত করিয়া তুলিয়াছে।

বারাসত বসিরহাট নূতন রেল—

গত ৯ই ফেব্রুয়ারী বেলা ১ টার পর কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম বারাসত হইতে হাসনাবাদ—৩৩ মাইল নূতন রেলপথের গাড়ী চলাচল উদ্বোধন করিয়াছেন। গত ৭ বৎসর ঐ লাইনের লাইট রেলের গাড়ী বন্ধ ছিল এবং অধিবাসীদিগকে নানাপ্রকার কষ্ট সহ্য করিয়া যাতায়াত করিতে হইত। এই ৩৩ মাইল রেলপথ নির্মাণে প্রায় আড়াই কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। লাইন খুলিলেও যাত্রীদের কয়েকটি অসুবিধা থাকিয়া গেল—বারাসত হইতে ট্রেণ ছাড়িয়া হাসনাবাদ যাতায়াত করিবে। কলিকাতা অর্থাৎ শিয়ালদহ হইতে সরাসরি হাসনাবাদে গাড়ী যাতায়াত না করিলে যাত্রীদিগকে বারাসতে গাড়ী বদলের কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। ঐ লাইনে ডবল রেল না হওয়ায় অধিক সংখ্যায় গাড়ী যাতায়াত সম্ভব হইবে না এবং সত্বর ঐ লাইন বিদ্যুতিকীকরণ করা না হইলে যাতায়াতের বিলম্ব থাকিয়া যাইবে। গাড়ী বারাসত ষ্টেশন হইতে ছাড়িয়া কদম্বগাছি, সন্তানিয়া, বেলিয়াঘাটা, ভাসিক হাড়োয়া রোড, মালতীপুর, বসিরহাট, মধ্যমপুর ও টাকী রোড ষ্টেশন হইয়া হাসনাবাদ যাইবে। ইছামতী নদী বা বর্ত্তমানের বাস-পথের প্রায় পাশ দিয়াই রেলপথ নির্মিত হইয়াছে; কাজেই যাত্রীদিগকে সামান্য হাঁটিতে হইবে। রেলপথের উভয় পাশে এখন নূতন পথ নির্মিত হইবে ও সাইকেল-রিক্সায় সে পথে জনগণ রেল ষ্টেশনে যাতায়াত করিতে পারিবে। ১৯০৫ সালে মার্টিন কোম্পানী বারাসত বসিরহাট রেলপথ নির্মাণ করিয়াছিল—৫০ বৎসর ঐ পথে ছোটগাড়ী যাতায়াতের পর ১৯৫৫ সালে তাহা বন্ধ হইয়া যায়। হাসনাবাদ পর্য্যন্ত নূতন রেল পথ হওয়ায় এখন কলিকাতা হইতে সুন্দরবনের একাংশে যাতায়াতের পথ খুলিয়া গেল। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়ের চেষ্টায় এই নূতন রেল পথ খোলা হইল এবং আমাদের বিশ্বাস, এ ছোট ছোট অসুবিধাগুলি ক্রমে তাঁহারই চেষ্টায় দূর করা সম্ভব হইবে। ২৪ পরগণা জেলার একটা বড় অংশ এই নূতন রেলপথ নির্মাণের ফলে বিশেষ উপকৃত হইল এবং আমাদের বিশ্বাস, বারাসত ও বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত ঐ অঞ্চলটি ক্রমে শিল্পসমৃদ্ধ স্থানে পরিণত হইবে। ঐ অঞ্চলের কৃষির উন্নতি সর্বজনবিদিত—তাহার সহিত নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা ঐ অঞ্চলকে আরও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবে।

বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ বসু—

ভারতের জাতীয় অধ্যাপক বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু গত ১লা জানুয়ারী ৬৯ বৎসর বয়সে পদার্পণ করায় তাঁহার গুণমুগ্ধ বন্ধুগণ তাঁহার গৃহে সমবেত হইয়া ঐ দিন তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ভারতের বিজ্ঞান-সাধনার ক্ষেত্রে শ্রীবসুর দান অসাধারণ। আমরাও দেশবাসীর সহিত একমত হইয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধাভিবাদন জ্ঞাপন করি ও তাঁহার সুদীর্ঘ কর্মময় জীবন কামনা করি।

নেপালে অশান্তি সৃষ্টি—

চীনারা তিব্বত অধিকারের পর দলে দলে নেপালে প্রবেশ করিতেছে ও বিদ্রোহী নেপালীদিগকে অস্ত্র সরবরাহ করিয়া নেপালের বর্তমানে শাসন ব্যবহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্ট করিতেছে। নেপাল মুখ্যতঃ ভারতরাষ্ট্রের সহিত নানা সম্বন্ধযুক্ত এবং তাহার উন্নয়নে নেপাল ভারতের সকল প্রকার সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকে। চীনাদের ইহা আদৌ সহ্য হয় না। সে জন্য চীন নেপালকে নানা ভাবে বিপন্ন করিতেছে। তিব্বত যেমন এতদিন অনগ্রসর দেশ ছিল—তেমনই নেপাল, সিকিম, ভুটান প্রভৃতিতেও উন্নয়ন ব্যবস্থা কম ছিল। ভারত নিজ দেশের উন্নয়নের সহিত ঐ সকল দেশকে ক্রমশঃ উন্নত করিয়া তুলিতেছে। চীন শুধু ভারতের উত্তরাংশে কয়েক হাজার বর্গমাইল জোর করিয়া দখল করে নাই—অন্যান্য দেশগুলিতেও অধিকার বিস্তারের চেষ্টা করিতেছে। এখন সে জন্য সকল দেশকে সতর্ক থাকিতে হইতেছে। যাহাতে চীনারা নেপালে অশান্তি সৃষ্ট করিতে না পারে, সে জন্য নেপাল সরকার সকল প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন।

শ্রীসুধীরঞ্জন দাশ—

ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য শ্রীসুধীরঞ্জন দাশ গত ৩রা ফেব্রুয়ারী স্বর্গত নির্মল কুমার সিদ্ধান্তের স্থলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ-মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন। সুধীরঞ্জনবাবু জীবনে নানা কর্মক্ষেত্রে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দান করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, তাঁহার এই নিয়োগও সারা ভারতের অধিবাসীদের উপকারে লাগিবে।

নূতন বৈদ্যুতিক ট্রেণ—

১৯৬৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে শিয়ালদহ-রাণাঘাট ও দমদম-বনগাঁ লাইনে বৈদ্যুতিক ট্রেণ যাতায়াত করিবে বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। শিয়ালদহ ডিভিসনের দক্ষিণাংশের বৈদ্যুতিককরণ ১৯৬৫ সালের মধ্যে শেষ হইবে। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের মোহনপুর হইতে রাউরকেল্লা বৈদ্যুতিককরণ শেষ হওয়ায় ২ই ফেব্রুয়ারী ঐ পথে রেল চলিয়াছে। ইহার ফলে ভারতের প্রধান ৪টি ইস্পাত কারখানা—রাউর-কেল্লা, জামসেদপুর, দুর্গাপুর ও বার্ণপুর— বৈদ্যুতিক রেলপথে যুক্ত হইয়া গিয়াছে। ১৯৬৫ সালের মধ্যে ওয়ারিয়া—বর্দ্ধমান, ব্যাণ্ডেল—নৈহাটি, শক্তিগড়—বজবজ, (গ্রাণ্ডকর্ড ও ডানকুনি—দমদম) সকল পথেই বৈদ্যুতিককরণ শেষ হইবে। দেশ যে ক্রমশঃ অগ্রগতির পথে চলিয়াছে, এই সকল সংবাদে তাহা বুঝা যায়। স্বাধীনতা লাভের পর যেরূপ দ্রুতগতিতে দেশের উন্নয়ন কার্য্য সমাধান করা হইতেছে, তাহা সত্যই বিস্ময়কর।

কুমারডুবিতে নূতন কারখানা—

যুক্তরাষ্ট্রের একটি কোম্পানী ধানবাদ জেলার কুমারডুবিতে ১০ কোটী টাকা ব্যয়ে একটী কয়লা ধৌত করিবার যন্ত্র স্থাপন করিবে। এই নূতন কোম্পানী উন্নত ধরণের কয়লা উৎপাদন, কয়লা ধৌত করিবার যন্ত্রপাতি তৈয়ারী, কমব্যয়ে কয়লা পরিবহন ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে সাহায্য করিবে। ইহা ধানবাদ এলাকার সমস্ত কয়লা খনিতে ঘণ্টায় ২৫ হইতে এক হাজার টন পর্য্যন্ত কয়লা ধৌত করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবে। কুমারডুবি বিহারে অবস্থিত হইলেও পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত হইতে এক মাইলের মধ্যে বরাকর নদীর অপর পারে অবস্থিত। কুমারডুবিতে বহু বাঙ্গালীর বাস—কাজেই আমাদের বিশ্বাস, এই নূতন কারখানা বাঙ্গালীরও উপকার করিবে।

নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর বিতর্ক—

গত ১লা ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রপুঞ্জে নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল। মাত্র দুই ঘণ্টা কাল আলোচনার পর ভারতের সাধারণ নির্বাচন শেষ হওয়ার পর অর্থাৎ ১লা মার্চের পর একটি সুবিধাজনক তারিখ পর্য্যন্ত বিতর্ক মুলতুবী রাখা হয়। সে দিন রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি শ্রী সি-এস ঝা তাঁর বক্তৃতায় বলিয়াছেন—পাকিস্থানই কাশ্মীর আক্রমণ করিয়াছে। শ্রীঝার ভাষণ খুব যুক্তিপূর্ণ ছিল। সে দিন পাকিস্তানের প্রতিনিধি স্যার মহম্মদ জাফরুল্লা বিতর্ক আরম্ভ করিলে শ্রীঝা তার উপযুক্ত উত্তর দেন এবং সভাপতি বিতর্ক বন্ধ করিয়া দেন. সোভিয়েট প্রতিনিধি ঐ দিনই জানাইয়া দেন যে সোভিয়েট ইউনিয়ন বরাবরই ঐ বিতর্কের বিরোধী ছিল। ইঙ্গ-মার্কিণ দলের সমর্থন পাইয়া পাকিস্তান এই বিতর্ক করিতে সাহসী হইয়াছে। ক্রমে জগতের সমস্ত শক্তি ২টী দলে বিভক্ত হইয়া যাইতেছে—ইহাই এই বিতর্ক প্রমাণ করিয়াছে।

সজনীকান্ত দাস—

খ্যাতনামা কবি ও সমালোচক সাহিত্যিক এবং শনিবারের চিঠি মাসিক পত্রের সম্পাদক সজনীকান্ত দাস গত ১১ই ফেব্রুয়ারী রবিবার বিকালে তাঁহার বেলগাছিয়া (কলিকাতা) ইন্দ্র বিশ্বাস রোডের বাড়ীতে করোনারী থ্রম্বসিস রোগে ৬১ বৎসর বয়সে সহসা পরলোকগমন করিয়াছেন। শুক্রবার তিনি হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন; মৃত্যুকালে তিনি পত্নী, একমাত্র পুত্র ও ৫ কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। ১৩০৭ সালে বর্দ্ধমান জেলায় মাতুলালয়ে তাঁহার জন্ম হয়—তাঁহার পৈতৃক নিবাস ছিল বীরভূম জেলার রায়পুর গ্রামে। তাঁহার পিতা হরেন্দ্রলাল দাস ডেপুটী কালেক্টার ছিলেন। দিনাজপুর জেলা স্কুল হইতে ১৯১৮ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিয়া তিনি বাঁকুড়া হইতে আই-এস-সি ও স্কটীশ চার্চ-কলেজ হইতে ১৯২২ সালে বি-এস-সি পাশ করেন। তাহার পরই তাঁহার কর্মজীবন আরম্ভ হয়। তিনি কিছুকাল প্রবাসী প্রেসের ম্যানেজার এবং বঙ্গশ্রী মাসিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। প্রথম জীবনে বহু স্থানে কাজ করার পর তিনি শনিবারের চিঠির সম্পাদক রূপে খ্যাতিলাভ করেন এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহিত দীর্ঘকাল যুক্ত থাকিয়া পরিষদের সেবা করিয়া গিয়াছেন। কয়েক বৎসর তিনি পরিষদের সভাপতি ও ছিলেন। ১৯৫৫ সালে তিনি নূতন গৃহনির্মাণ করিয়া তথায় ছাপাখানা করিয়া বাস করিতেছিলেন। তিনি কিছুকাল দৈনিক বসুমতীর সম্পাদকীয় বিভাগেও কাজ করিয়াছিলেন। তাহার কবিতা বাংলা সাহিত্যকে দীর্ঘকাল সমৃদ্ধ করিয়াছে এবং তাঁহার সমালোচনা সাহিত্য তাঁহাকে প্রসিদ্ধি দান করিয়া-

ছিল। তিনি বহু গ্রন্থের প্রকাশক ছিলেন এবং বাংলার বহু খ্যাতিমান সাহিত্যিক তাঁহার সহযোগিতায় জীবনে উন্নতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে শুধু বাংলা সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই—তাঁহার বিরাট বন্ধু সমাজ তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার অভাব বিশেষ ভাবে অনুভব করিবে।

পশ্চিমবঙ্গে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ—

পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতের অভাব রহিয়াছে। বিদ্যুতের অভাবে প্রায়ই কলিকাতা ও সহরতলীকে অন্ধকার থাকিতে হয়। সে জন্য তদন্তের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার এক কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করিয়া পশ্চিম বঙ্গের দক্ষিণাঞ্চলে ৮ কোটি ৪০ লক্ষ ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা ভারত সরকার মঞ্জুর করিয়াছেন। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে ১৫ লক্ষ ওয়াট বিদ্যুৎ-উৎপাদন-ক্ষম ৬টি কেন্দ্র স্থাপন করা হইবে। কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী ৫কোটি ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষম একটি যন্ত্র স্থাপন কার্য্যে শীঘ্র অগ্রসর হইবেন। বিদ্যুতের চাহিদা সর্বত্র খুবই বাড়িয়াছে। তাহা ছাড়া নূতন নূতন কারখানার জন্য প্রচুর পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার প্রয়োজন হইয়াছে—এ অবস্থায় অধিক পরিমাণে বিদ্যুৎ-উৎপাদন একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। সে বিষয়ে সরকারী বেসরকারী সকল প্রচেষ্টারই প্রয়োজন হইয়াছে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—

গত ২৬শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবসে বাংলার খ্যাতনামা প্রবীণ সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পদ্মশ্রী সম্মান লাভ করায় বাঙ্গালী মাত্রেই আনন্দিত হইয়াছেন। তারাশঙ্করবাবু আজ বাংলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক—কাজেই ইহার পূর্বেই তাহাকে সম্মানিত দেখিলে লোক অধিকতর আনন্দ লাভ করিত। ইহার পূর্বে গত কয় বৎসরে কয়জন অবাঙ্গালী সাহিত্যসেবীকে উচ্চতর সম্মানে ভূষিত করার পর এত বিলম্বে তারাশঙ্করবাবুকে 'পদ্মশ্রী' উপাধি দেওয়ায় তাঁহার গুণমুগ্ধ বন্ধুরা ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। শেষ পর্য্যন্ত যে তিনি সম্মান লাভ করিয়াছেন, সে জন্য আমরা তাহাকে অন্তরের অভিনন্দন জানাই ও প্রার্থনা করি, তিনি সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া বাংলা সাহিত্যকে আরও সমৃদ্ধ করিতে থাকুন।

যুদ্ধ সম্পর্কে ভারতের মনোভাব—

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু গত ২৪শে জানুয়ারী ফিরোজপুরে এক জনসভায় বলিয়াছেন—ভারত পাকিস্তানের সহিত যুদ্ধ করিতে চাহে না। তবে পাকিস্তান যদি ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করে, তাহা হইলে ভারতকে সর্বপ্রকার প্রস্তুত হইয়া এই যুদ্ধের সম্মুখীন হইতে হইবে। পাকিস্তানের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখিয়া চলিতে ভারত বারবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু ভারতের বিরুদ্ধাচরণ করা পাকিস্তানের শাসকদের যেন প্রধান পেশা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাকিস্তানের নেতাদের এই মনোভাবের জন্য ভারতবাসী মধ্যে মধ্যে বিরক্ত হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় ভারতবাসীরা পাকিস্তানের সহিত যুদ্ধ করিবার কথা মনে করে। শ্রীনেহেরু গত ১৫ বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ এড়াইয়া চাহিতে থাকায় তাঁহার প্রতিও ভারতীয়রা বিরক্ত হইয়া উঠে। এ সমস্যায় সমাধান কোথায়? শ্রীনেহেরুকে এখন যে অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইতেছে, তাহা সত্যই ভীষণ। ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ভারতবাসীরা সর্বদা সতর্ক অবস্থায় দিন যাপন করিতে বাধ্য হইতেছে।

ফরক্কা বাঁধের কার্য্য আরম্ভ—

২৩শে জানুয়ারী দিল্লীর খবরে প্রকাশ, ভারত সরকার ফরক্কা বাঁধ নির্মাণের আবশ্যক সাজ-সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির জন্য বিদেশে অর্ডার দিয়াছে। অধিকাংশ সাজ-সরঞ্জাম মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন হইতে আসিবে। ১৯৬২ সালেই বর্ষা ঋতুর পর সেপ্টেম্বরে প্রকৃত নির্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইবে। গঙ্গা ও ভাগীরথীর সঙ্গম স্থানের কিছু উত্তরে ফরক্কায় গঙ্গার উপর বাঁধ তৈরী হইবে এবং বাঁধ দ্বারা সঞ্চিত জলরাশি ২৬ মাইল দীর্ঘ একটি খাল দ্বারা ভাগীরথীতে বহাইয়া দেওয়া হইবে। বাঁধের জল সেচের জন্য ব্যবহৃত হইবে না। ভাগীরথীতে বালি জমিয়া নদীর খাত রুদ্ধ হইতে থাকায় কলিকাতা বন্দরের যে বিপদ দেখা গিয়াছে, প্রধানতঃ তাহা দূর করাই ফরক্কা বাঁধের উদ্দেশ্য। ফরক্কা বাঁধ নির্মাণ পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। কাজেই তাহার কার্য্য সত্বর আরম্ভ হইবে জানিয়া দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরা অবশ্যই আশ্বস্ত হইবেন। তবে বাঁধ যাহাতে ত্রুটিপূর্ণ না হয়, প্রথম হইতে সে জন্য সকলকে অবহিত থাকিতে হইবে।

প্রজাতন্ত্র দিবসে সম্মান লাভ—

গত প্রজাতন্ত্রদিবসে যে সকল ব্যক্তি সরকারী সম্মান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত নামগুলি বাঙ্গালীর পক্ষে আনন্দদায়ক। পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু পদ্মবিভূষণ সম্মান লাভ করিয়াছেন। ৩৭ জন পদ্মভূষণ—তন্মধ্যে আছেন বিখ্যাত গায়ক বড়ে গোলাম আলি খাঁ, খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদ ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, জাতীয় বুক ট্রাষ্ট্রের সভাপতি শ্রীজ্ঞানেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নয়াদিল্লীর চিকিৎসক শ্রীসন্তোষকুমার সেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ডাঃ শিশির কুমার মিত্র, রাষ্ট্রপতির চিকিৎসক কর্ণেল সুধাংশু শোভন মৈত্র ও কলিকাতার সমাজসেবী সীতারাম সাকসেরিয়া। ২৫ জন পদ্মশ্রী সম্মান লাভ করিয়াছেন, সে দলে আছেন—সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়ার শ্রীগোষ্ঠবিহারী পাল, বোম্বাযের চিত্র তারকা শ্রীঅশোককুমার গাঙ্গুলী ও কলিকাতায় সমাজসেবী মাদার টেরেসা। পদ্মভূষণ দলে আরও আছেন রাজ্য সভার সেক্রেটারী শ্রীসুধীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মারাঠী লেখক শ্রীনারায়ণ সীতারাম ফাটকে, উর্দু কবি শ্রীনিয়াজ মহম্মদ খাঁ, বিহারের হিন্দী লেখক শ্রীরাধিকাপ্রসাদ সিংহ প্রভৃতি। পদ্মশ্রী আরও যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আছেন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ডিরেক্টার জেনারেল শ্রীঅমলানন্দ লক্ষ্ণৌয়ের কেন্দ্রীয় ভেষজ গবেষণাগারের ডিরেক্টার বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায়, গুজরাটের কবি শ্রীদুলাভাই কা মধ্য প্রদেশের চিকিৎসক ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যা উড়িয়া কবি শ্রীশচী রাউত রায় প্রভৃতি। সকলকে অভি নন্দন জানাইয়া আমরা একটি কথা বলি। এই সম্মা প্রদত্তদের তালিকার বাঙ্গালীর সংখ্যা কম—অথচ সম্মা লাভের যোগ্য বাঙ্গালী গুণীজ্ঞানীর অভাব এখনও হয় নাই দিল্লীর কর্তৃপক্ষকে আমরা এ বিষয়ে অবহিত হইতে অনুরোধ করি।

শ্রীঅর্দ্ধেন্দু শেখর নস্কর—

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্যতম উপ-মন্ত্রী শ্রীঅর্দ্ধেন্দু শেখর নস্কর ২৪ পরগণা জেলার মগরাহাট পূর্ব তপশীল নির্বাচন কেন্দ্র হইতে বিনা বাধায় বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন জানিয়া সকলে আনন্দিত হইয়াছেন। তিনি পুলিশ বিভাগের উপমন্ত্রী ও ডেপুটি চিফ হুইপ। অর্দ্ধেন্দুশেখর স্বর্গত মন্ত্রী হেমচন্দ্র নস্কর মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং হেমবাবুর মতই সহৃদয়, সেবাপরায়ণ ও কর্মনিষ্ঠ যুবক। আমরা তাহাকে এই অসাধারণ সাফল্য লাভে অভিনন্দিত করি এবং তাহার সুদীর্ঘ উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ কামনা করি।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তেতো, যার নাম হাকুচ তেতো, মুখ গলা, শরীরের সমস্ত রক্তটাই বিষিয়ে গেল। তবু গোছগাছ করে বেরিয়ে পড়তে হোল বীরুদাসের সঙ্গে। রাগ অভিমান চটাচটি, কোনও রকম ছেলেমানুষী করতে প্রবৃত্তি হোল না। কত সহজ উপায়েই না টাকা নেওয়া যায়! সহজ উপায়টা কেন হেলায় হারাচ্ছে হতভাগী বউটা? টাকা রোজগার করে রুগ্না মেয়েটার মুখে দুধ সাগু দিলেই তো পারে!

উৎকট নেশা হোলে কেউ যদি ঠাস করে এক চড় কষায় গালে—তা'হলে যে ফলটা হয়, তাই হোল। নেশাটা ছুটে গেল একদম। আর কত টাকা ক'দিনের খরচা আছে ট্যাঁকে, মনে মনে হিসেব করে দেখলাম। ঐ কটা টাকা ফুরলেই সহজ উপায় ব্যবসা, পণ্য সঙ্গেই আছে। কয়েক হাত সামনে বীরুদাসের সঙ্গে বকবক করতে করতে চলেছে পণ্য। কেমন দাম পাওয়া যাবে!

বিছানা সুটকেশ বয়ে চলেছি পিছু পিছু। ভারটা খুবই বেশী বলে মনে হোল। হাত বদল করে নিলাম। চষা ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে নিয়ে গেল বীরুদাস। তারকনাথের এলাকার বাইরে গাঁয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যার বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে তার পরিচয় দিচ্ছে। কান পাতলাম। হাঁ, কান পেতে শোনার মত পরিচয়ই বটে। এগারটা ব্যাটা, এগারটা ব্যাটার এগারটা বউ, আর কুড়ি দুয়েক নাতি-নাতনী সবাই একই দিনে এক সঙ্গে চলে গেছে যেখানে যাবার। বেঁচে আছে শুধু বুড়ো, সংসারের কর্ত্তা। বেঁচে আছে বিধাতাকে গাল পাড়বার জন্যে। ধান পাট বাঁশ কলা হাঁস মোষ গোরু থৈ থৈ করছে সংসারে। খাবে কে!

বাড়িটার নাম গোড়ুই বাড়ি, কর্ত্তার নাম শিবকালী গোড়ুই। নামকরা মানুষ, দুর্দান্ত দুর্মুখ বলে ও তল্লাটে অতি বিখ্যাত। মুখের জোরে চাষ আবাদ চালায়, ঐ মুখের ভয়ে লোকে ঠকিয়ে নিতে ভয় পায়। তিন কুলে আপন বলতে কেউ নেই, থাকলেও কাছে ঘেঁষতে সাহস করে না। গোড়ুই শুধু বীরুদাসকেই সহ্য করে, বীরুদাসের সঙ্গে ট্যাঁ করতে সাহস করে না।

সুতরাং সেইখানে পরম নিশ্চিন্তে যতদিন খুশি পারব আমরা, বীরুদাসের নিজের বাড়ি মনে করে নিলেই আর কোনও ঝঞ্ঝাট থাকবে না। বুড়োর সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ না রাখলেই হোল।

খাটো হাত-পা গুলোকে সজোরে ঝাঁকুনি দিয়ে বীরুদাস প্রচণ্ড বিক্রমে বুঝিয়ে দিলে, তার সঙ্গে চালাকি করতে এলে শিবকালী গোড়ুইকেও তার বংশধরদের কাছে পৌছে যেতে হবে।

মাঠ পার হোয়ে গাঁয়ে গিয়ে উঠলাম। গাঁয়ে ঐ একখানাই বাড়ি, গোড়ুই বাড়ি। প্রকাণ্ড একটা উঠোনের চতুর্দিকে মাটির দেওয়াল টিনের চাল দিয়ে খান বিশেক ঘর বানানো হোয়েছে। চতুর্দিকে বাগান, বাগানের মাঝখানে পুকুর। ফলে ফুলে সাজানো সোনার সংসার, মা লক্ষ্মী যেন আঁচলা ভরে সোনা ঢেলে দিয়েছেন।

কর্ত্তার সঙ্গে দেখা হোল। তামাক পোড়া গুলের মত রঙ, শালতির মত একখানি শরীর ধনুকের মত বেঁকে

গেছে। দক্ষিণহস্তখানি নেই, কনুয়ের ওপর থেকে কেটে বাদ দেওয়া হোয়েছে। চক্ষু দুটো প্রায় বোজা, একটিও দাঁত না থাকার দরুণ দু'গাল তুবড়ে বসে গেছে। চুল-দাড়ি একদম নেই, বোধহয় ওই জঞ্জাল গজায়ও নি কখনও। মুখ মাথা চকচক করছে। গোড়ুই মশাই দন্তহীন মুখে অতি অস্বাভাবিক আওয়াজ করে অভ্যর্থনা করলেন। বললেন—"থাকুন, যতক্ষণ খুশি থাকুন। থাকবার জন্যে কত মানুষই এল, কিন্তু থাকল কই। যাবার সময় হোল, আর সুট করে সরে পড়ল। যাবার সময় হোলে আর গোড়ুই বুড়োকে শুধবার কথা কারও মনে থাকে না।"

একটা মোচড় লেগে গেল। নতুন আশ্রয়ে পদার্পণ করেই উদ্ধারণপুর ঘাটের সুর শুনতে হোল। সোনার সংসার, সোনার সংসার কথাটার মর্মে মর্মে ছারখার কথাটা কি চমৎকার ভাবে আত্মগোপন করে আছে!

কর্ত্তা আর দাঁড়াতে পারলেন না। ক্ষেতে খামারে বিস্তর লোকজন খাটছে। নজর না রাখলে যে যা পাবে হাতিয়ে নিয়ে সরবে, অবাচ্য সম্বোধনে কাকে যেন ডাকতে ডাকতে ঠিকরে বেরিয়ে গেলেন। বীরুদাসকে সব ব্যবস্থা করে দেবার ভার দিয়ে গেলেন। ব্যবস্থা অর্থে চাল থেকে চুলো পর্য্যন্ত সমস্ত, গোড়ুইদের বাড়িতে থাকতে গেলে নিজেদের কিছু কিনে খাবার উপায় নেই। তবু কেউ ঐ বাড়িতে তিষ্ঠতে পারে না—অদ্ভুত ব্যাপার বটে!

ব্যবস্থা করে দিয়ে চলে গেল বীরুদাস, সকালের দিকে মন্দিরের আশেপাশে তার থাকা চাই। চেনা জানা যাত্রী একদল এসে পড়তে পারে, বীরুদাসকে না পেয়ে পড়ল হয়তো তারা কোনও দালালের খপ্পরে, বাবার ভক্ত বাবার 'থানে' এসে নাস্তানাবুদ হোয়ে ফিরে গেল। বাবার বুকে বাজবে, সাচ্চা দরবারের অবৈতনিক বীরুদাসের সেটা সহ্য হবে না।

সচল সংসারটি পুব দিকের শেষ ঘরখানায় পাতা হোল আবার, সংসার যাঁর তিনি স্নান করতে গেলেন। স্নান সেরে এসে রান্না চড়ালেন, চাল দাল আনাজ তরকারি মায় কাঠখড় পর্য্যন্ত জুটে গেছে। উপচারের কোনও অভাব নেই, নিশ্চিন্ত হওয়া উচিৎ।

তবু—

করুণ নয়নে তাকিয়ে রইলাম উপচারগুলোর পানে। মনে মনে তাদের বললাম—"তোমরা এসেছ, অভাব বিদেয় হোয়েছে অন্ততঃ কয়েকটা দিনের জন্যে। কিন্তু স্বস্তি কই! তোমরা যখন ফুরিয়ে যাবে তখন কি হবে, এই ভাবনায় আঁতকে উঠছি। আজ আর আমাকে নিশ্চিন্ত করবার শক্তি নেই তোমাদের, তোমাদের পেয়েও আমি সুখী হোতে পারলাম না। কি বিপদ দেখ!"

আঁতকেই রইলাম। উপার্জ্জন করতেই হবে, উপার্জনের পন্থা একটা খুঁজে বার করতেই হবে। নয়ত—

নয়ত উপার্জ্জনের সহজ উপায় কি, ভোরবেলাই তা' জানতে পেরেছি।

অভাব এবং স্বভাব, অভাবেই স্বভাব নষ্ট। অভাব হোতে পারে ভবিষ্যতে, এই দুশ্চিন্তাতেও স্বভাব নষ্ট হয়। আজকের দিনটা পরমানন্দে কেটে যাবে, আজকের দিনটার মত অভাব যখন ঘুচে গেছে, তখন আজকের মত হাহাকারটা ঘুচুক না কেন। অনাগত ভবিষ্যতের চিন্তায় আজকে যা জুটেছে সেগুলোও শান্তিতে উপভোগ করতে পারা যাবে না। কি বিড়ম্বনা! ভবিষ্যতের ভাবনা, ভবিষ্যৎ চিন্তা করে কাজ করার শক্তি, পূর্ব্বাপর বিবেচনা করার মত মন, এইগুলো আছে বলেই মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব। পশুর সঙ্গে মানুষের তফাৎ নাকি ঐটুকুই, আহার নিদ্রা মৈথুন এই তিনটি ব্যাধি ছাড়া আরও একটি ব্যাধি নিয়ে মানুষ জন্মায়। ব্যাধিটা হোল হাহাকার। মানুষ কিছুতেই সন্তুষ্ট হয় না। মানুষ ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবে বর্ত্তমানকে গলা টিপে মেরে ফেলতে পারে। ঐ ব্যাধিটার ফলে মানুষ সভ্য হোয়েছে, সংযত হোয়েছে, নীতিবাগীশ হোয়েছে। ফলে বেঁচে থাকার মিয়াদটুকু গোঁজামিল দিয়ে বেঁচে থাকতে বাধ্য হোয়েছে।

একবার একটা কাঁচা ধরণের গল্প শুনেছিলাম এক বাবাজীর কাছে। বাবাজীরা সহজভাবে সমস্ত রহস্যের সমাধান করে নেয়, তাই তাদের গল্প কাঁচা হবেই। শিক্ষিত মানুষের পাকা মনে এ সমস্ত উদ্ভট কাহিনী এতটুকু দাগ কাটতে পারবে না। গল্পটা যত তুচ্ছই হোক, তার মধ্যে মজার ব্যাপার ছিল একটা! ব্যাপারটা হোল বাঁদরদের নাকি মানুষের চেয়ে বেশী বুদ্ধি আছে। গল্পটা যেমনভাবে শুনেছিলাম, হুবহু তুলে দিচ্ছি। বাঁদরে বুদ্ধির নমুনাটা সবায়ের জানা উচিৎ।

পণ্ডিতপ্রবর বীরবল সম্রাট আকবরকে বহুবিধ শাস্ত্র থেকে শাস্ত্রের নিগূঢ় মর্ম্ম শোনালেন। সমস্ত শুনে সম্রাট বললেন—"সবই তো বুঝলাম পণ্ডিত। ঈশ্বর আছেন এটা আমিও মানি। কিন্তু—"

বীরবল বললেন—"এতে আর কিন্তু নেই শাহানশাহ, এই যেমন আপনার সামনে আমি রয়েছি, আপনি আমায় চাক্ষুষ দেখছেন, এই রকম তাঁকেও দেখা যায়। সেই সর্ব্বশক্তিমান কি করছেন, তা' দেখা যায়। শাস্ত্র কি কখনও মিথ্যে হোতে পারে।"

সম্রাট বললেন—"একটিবার যদি দেখতে পেতাম পণ্ডিত। মাত্র একটিবার যদি এই চর্ম্মচক্ষে তাঁকে দেখতে পেতাম, তিনি কি করেন তা' বুঝতে পারতাম, তা'হলে এই বাদসাগিরি করাটা সার্থক হোত।"

ঝোঁকের মাথায় বীরবল বলে ফেললেন—"নিশ্চয়ই দেখা যায় জাঁহাপনা, প্রত্যক্ষ দর্শন নিশ্চয়ই হয়।"

সম্রাট বললেন—"কে দেখাবে? তুমি দেখাবে? তা' যদি পার পণ্ডিত, আমি তোমার চেলা বনে যাব।"

পণ্ডিতের মগজ তেতে গেছে তখন। বলে ফেললেন—"নিশ্চয়ই পারি।"

অতঃপর সম্রাট মোক্ষম চাল চাললেন। বললেন—"বেশ, কতদিন সময় চাও বল। সেই সময়ের মধ্যে আমাকে তুমি চাক্ষুষ দর্শন করাবে। স্বচক্ষে আমি দেখব ঈশ্বরকে, তিনি কি করেন তাও দেখব। নয়ত বুঝতেই পারছ—"

চমকে উঠলেন বীরবল। ইস্, জেদাজেদি কয়তে গিয়ে কি ফ্যাঁসাদেই পড়লেন তিনি! এখন। ঐ সর্ব্বশক্তিমান আকবরের হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করে কে!

বীরবল কথা ফিরিয়ে নেবার মানুষ ছিলেন না। একটা সময় নির্দিষ্ট হোল। বীরবল বিদায় নিলেন।

ঘুরতে লাগলেন তিনি তীর্থে তীর্থে। সাধু মহাত্মাদের শরণাপন্ন হোলেন। সবাই এক কথা বললেন—হাঁ, তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব। ভক্তের হৃদয়ে তিনি আছেন, ভক্ত তাঁর সাক্ষাৎ পায় হৃদয় মধ্যে। ভক্তির আলোয় হৃদয়ের অন্ধকার ঘুচলে তাঁকে দেখা যায়। কেউ কাউকে দেখিয়ে দিতে পারে না, কি করে দেখা পাওয়া যায় সে পন্থাটি বাতলাতে পারে।

কিন্তু ঐসব যুক্তি দিয়ে তো রক্ষা পাওয়া যাবে না। কড়ার হচ্ছে, চাক্ষুষ দেখাতে হবে। সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরকে চাক্ষুষ না দেখাতে পারলে সর্ব্বশক্তিমান আকবর বাদসাকে কিছুতেই শান্ত করা যাবে না।

নির্দিষ্ট তারিখটা এগিয়ে আসতে লাগল। বীরবল মরণাপন্ন হোয়ে উঠলেন। না, রক্ষা পাবার কোনও উপায় নেই। মান-সম্মান সব গেল। এরপর বেঁচে থাকতে হোলে ম'রে বেঁচে থাকতে হবে। মাথা হেঁট করে কোনও মতেই তিনি আকবরের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারবেন না।

ঘুরতে ঘুরতে বীরবল এসে পড়েছেন তখন প্রয়াগে। প্রয়াগে এসে শুনলেন, গঙ্গার অপর পারে ঝুঁসীতে কয়েকজন সাধু বাস করেন। আশা তখন তিনি ছেড়েই দিয়েছেন, তবু একদিন হোলেন গঙ্গা পার। শোচনীয় মনের অবস্থা, চেহারার অবস্থা ততোধিক শোচনীয়। কোনও রকমে উঠতে লাগলেন ওপরে গঙ্গাপার হোয়ে! অদ্ভুত একটা ব্যাপার তাঁর নজরে পড়ল। কতকগুলো ছোলা ছড়িয়ে পড়েছে পথের ওপর, একটা ছেলে সেই ছোলা তুলছে আর মুখে ফেলছে। ঐ কর্ম্মটি করছে সে বাঁদরের মত, যে ছোলাটাকে দেখতে পাচ্ছে, খুঁটে নিয়ে তৎক্ষণাৎ মুখে পুরছে। ছোলাগুলোকে কুড়িয়ে নিয়ে মুঠো মুঠো খেলেই পারে, তা নয়। হুবহু বাঁদরের মত কাণ্ড—দু'হাত চালিয়ে যাচ্ছে সমানে। যে ছোলাটাকে ধরতে পারছে, সেটা আগে মুখে ফেলে আর একটার জন্যে হাত বাড়াচ্ছে।

মানুষের বাচ্চার বাঁদুরে স্বভাব দেখে বীরবলের গা জ্বলে উঠল। বললেন—"এই ছোকরা, অমন বাঁদুরে খাওয়া খাচ্ছিস কেন? ছোলাগুলোকে কুড়িয়ে নিয়ে শান্তিতে বসে খেতে পারিস নে?"

ছোকরা বললে—"তুমি তো দেখছি—মস্ত পণ্ডিত হে! সব কটা ছোলা এককাট্টা করতে করতে যদি টেঁসে যাই, তা'হলে কি একটাও খাওয়া হবে আমার? কখন যে টেঁসে যাব—তার কি কোনও ঠিক আছে?"

বীরবল বোবা হোয়ে গেলেন। মরণ যে কখন আসে তা' কেউ জানে না। এই সহজ কথাটা সবাই জানে যে—যে কোনও মুহূর্ত্তে সে মরতে পারে। কিন্তু বাঁদরের

যখন যেটা হাতের কাছে পেত, টপ করে ধরে মুখে পুরে ফেলত।

তারপর, তারপর কি হোয়েছিল তা' শুনিয়ে লাভ নেই। বীরবলের সঙ্গে গিয়ে সেই ছোকরাই নাকি বাদশাকে ঈশ্বর দেখিয়েছিল। ঈশ্বর-দর্শন নিয়ে আমার মাথা গরম হয়নি তখন, অন্য এক ভাবনা মগজের মধ্যে ঢুকে মেজাজ খিঁচড়ে তুলেছিল। সেটা হোল, অভাবটা স্বভাবে দাঁড়াল নাকি। থাকবার জন্যে উপযুক্ত আশ্রয়, পেট ভরাবার জন্যে—প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য জুটে গেল। অনায়াসে কয়েকটা দিন নির্ভাবনায় কাটানো যায়। কিন্তু পারলাম কই! তারপর কি হবে, এই দুশ্চিন্তা তাড়িয়ে বার করলে পথে। উদ্ধারণপুর ঘাটের সেই মড়ার শয্যা যে ঢের ভাল ছিল, ভবিষ্যতের ভূত ধারে কাছে ঘেঁষতে পারত না।

হা-হুতাশ করে কোনও লাভ নেই। উদ্ধারণপুরের ঘাট নেই, উদ্ধারণপুরের সেই সাঁইপজ মরেছে। শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী ভবিষ্যৎ চিন্তা করতে বাধ্য। নয়তো বিপিনবিহারী-বাবুর পরিবারটি জানে, সহজ পন্থায় অভাব ঘোচাবার কায়দাটুকু।

বেরিয়ে পড়তে হোল। চুপ চাপ বসে থাকাটা যে একটা কাজ, সে কাজটা করার জন্যে দস্তুরমত সাধনা করে সিদ্ধি লাভ করেছিলাম, সে কাজটাকে আর কাজ বলেই মনে হোল না। মিছিমিছি ঘুরে মলে কোন ফল হবে না জেনেও ঘুরতে বেরলাম। কোনও কাজ যখন নেই, তখন কাজের জন্যে চেষ্টা করাটা সব থেকে বড় কাজ। বসে শুয়ে থাকলে যে কাজকে ফাঁকি দেওয়া হবে।

গোড়ুই বাড়ির সীমানা ছাড়িয়ে মাঠে নামলাম। অনেকটা দূরে সত্যকারের কাজ হচ্ছে। বিস্তর মানুষ ঝোড়া মাথায় করে একটা উঁচু পাড়ের ওপর যাওয়া আসা করছে। একটা পুকুর টুকুর গোছের কিছু কাটানো হচ্ছে বোধ হয়, অনেকটা লম্বা জায়গা জুড়ে ছোট খাট একটা মাটীর পাহাড় তৈরী হোয়েছে। আগে আগে এগিয়ে গেলাম। নিজের যখন কোনও কাজ নেই তখন ওদের কাজই দেখা যাক।

কাজের জায়গায় পৌঁছে দেখি লেগেছে গণ্ডগোল। ঝুড়ি কোদাল ফেলে সাঁওতালরা চেঁচামেচি জুড়ে দিয়েছে। মেয়ে-মদ্দ সবাই উঠে পড়েছে পাড়ের ওপর, ওখানে আর তারা মাটী কাটবে না। যাঁর কাজ তাঁকে ডাকতে গেছে কয়েকজন। তিনি এলে ওরা ওদের পাওনা গণ্ডা নিয়ে বিদেয় হবে। ব্যাপার সাংঘাতিক, মাটির তলা থেকে মানুষের মুণ্ড, মানুষের হাড়গোড় বেরতে সুরু করেছে। সাঁওতালরা জ্যান্ত মানুষ, মরা মানুষকে তারা খেপাতে যাবে কেন। মরা মানুষদের খেপিয়ে কি তারা জান দেবে।

যাঁর কাজ তিনি তারকেশ্বরের বাজারে বসে আছেন। বড় বড় গুদোম আছে তাঁর, ধান চাল পাট কিনতে কিনতে আর বেচতে বেচতে বিস্তর টাকা করে ফেলেছেন তিনি, তাই একটা দীঘি কাটাচ্ছেন। দীঘির চতুর্দিকে মনের মত করে একটা বাগান করবেন। বাগড়া পড়ল গোড়াতেই, মানুষের মুণ্ড মানুষের হাড়গোড় বেরিয়ে পড়ল দীঘি কাটাতে গিয়ে। বরাত আর কাকে বলে!

সাঁওতালদের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলাম। হাড়গোড় বেরচ্ছে বলে তারা যদি কাজ না করে, তা'হলে কি দীঘিটা কাটানো হবে না? হাড়গোড় সরাবার মানুষ কোথায় মিলবে?

ওদের সর্দার বললে—"মিলবে না কেন। হাড়গোড় কুড়িয়ে বেড়ায় যারা, তাদের ধরতে হবে। মাঠে ঘাটে কোথায় হাড় পড়ে আছে তাই তারা খুঁজে বেড়ায়। সেগুলো তুলে নিয়ে গিয়ে বেচে দেয়। বড় বড় কারখানা আছে সহরে, সেখানে হাড় কেনে। হাড় দিয়ে সেই সব কারখানায় সাহেব লোকের খাবার তৈরী হয়। হাড় তুলে নিয়ে যাক তারা, তারপর আমরা মাটি কাটব। আমাদের মেয়েরা মাথায় করে হাড় বইবে না।"

জিজ্ঞাসা করলাম—"তারা এসে কি মাটি কেটে হাড় বার করবে—না মাটি কেটে দেবে তোমরাই?"

সর্দার বলল—"মাটি আমরাই কাটব, কিন্তু হাড় আমরা সরাব না। মাটি কাটতে কাটতে হাড় বেরলেই তারা তুলে নেবে।"

বললাম—"চল, হাড় আমি সরিয়ে নোব। দেখাই যাক, কত হাড় বেরোয়।"

ওরা একটু হকচকিয়ে গেল, কথাটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারল না। নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করতে লাগল। নেমে পড়লাম দীঘির গর্ভে। প্রায় দেড় মানুষ

সমান গর্ত হোয়েছে, কালো মাটি উঠছে। এগিয়ে গেলাম মাঝামাঝি জায়গায়। হাঁ, মানুষের মুণ্ডই বটে। কালো মাটিতে বোঝাই হোয়ে আছে মুণ্ডটা। তুলে নিলাম, বেশ ভারি লাগল। খানিক তফাতে উঁচু জায়গায় রেখে এলাম সেটাকে। তারপর খুঁজতে লাগলাম, আরও কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে কি না। ইতিমধ্যে দীঘির মালিক এসে পড়লেন। পাড়ের ওপরে দাঁড়িয়েই হাঁক ডাক জুড়ে দিলেন তিনি। মুখ তুলে দেখলাম, আদর্শ একটি আড়ৎদার। ভুঁড়ি ফতুয়া, গলায় কণ্ঠী, নাকে তিলক,ডান হাতের কনুয়ের ওপর মস্ত একটা সোনার তাবিজ—যা যা থাকা উচিৎ সমস্ত রয়েছে। বৈষ্ণব মানুষ তুলসীর মালা নিয়ে নামতে পারলেন না হাড়গোড়ের মাঝখানে। কবচটি থাকার দরুণ আরও বিপদে পড়লেন, মড়ার ছোঁয়া লাগলে কবচ নষ্ট হোয়ে যাবে। ধমকে ধামকে সাঁওতালদের নিচে পাঠালেন। ওপরে দাঁড়িয়েই দু'হাত জোড় করে কৃতজ্ঞতা জানালেন আমায়। বললেন—"বড়ই উপকার করলেন বাবু, আপনি না থাকলে এ ব্যাটারা কাজ বন্ধ করে পালাত। এ হারামজাদা জায়গায় কি দীঘি পুকুর কাটাবার জো আছে, সব জায়গায় মানুষের হাড়। মানুষ মেরে পুঁতে রেখেছে সর্ব্বত্র। খুনেদের দেশ ছিল মশাই এটা, এ দেশে জমি কেনা পাপ।"

সাঁওতালরা আবার কোদাল চালাতে লাগল। বেরল একটা আস্ত মানুষ, টান দিতেই হাত পা গুলো আলগা হোয়ে গেল। একে একে টেনে বার করে এক ধারে জমা করতে লাগলাম। তারপর মেতে উঠলাম কাজে, প্রচুর কাজ। যত মাটি কাটে তত হাড় বেরোয়। মুণ্ডই বেরল এক গাদা। তখন একটা ঝুড়ি নিলাম ওদের কাছ থেকে। ঝুড়ি বোঝাই করে সেই মাল উলটো দিকের পাড়ে তুলে এক জায়গায় ডাঁই লাগালাম। কতবার ওঠানামা করলাম তার হিসেব নেই। জামা কাপড়ের কি দশা হোয়েছে সেদিকেও নজর নেই। হাড় বেরচ্ছে, মানুষের হাড়। ছেলে বুড়ো বহু মানুষকে মাটির তলায় জমিয়ে রাখা হোয়েছিল। সবাই মুক্তি পেল। ওদের যে মুক্তি দিতে পারছি এই আনন্দেই মশগুল হোয়ে আছি। ডাঁইনে বাঁয়ে তাকাবার অবকাশ নেই। কাজ পেয়েছি, মনের মত কাজ। কাজ খোঁজবার জন্যে আর হন্যে হোয়ে ঘুরে মরতে হোল না।

এক ঝুড়ি মাল নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ওপরে উঠে যেই মালটা ফেলেছি, সঙ্গে সঙ্গে একটা হাত ধরা পড়ল পেছন থেকে। চমকে উঠে ফিরে দাঁড়ালাম।

হাতখানা ধরা পড়েছে যার হাতে তার মুখে রা ফুটল না, শুধু ঠোঁট দু'খানি একটু একটু কাঁপতে লাগল। একটা অদ্ভুত কিছু ফুটে উঠেছে চক্ষু দুটিতে। রাগ নয়, ঘৃণা নয়, অসহ্য যন্ত্রণা প্রাণপণে চাপবার চেষ্টা করলে যে দৃষ্টি ফুটে ওঠে চোখে—সেই রকম একটা ব্যাপার। দেখতে দেখতে চক্ষু দুটি জলে বোঝাই হোয়ে গেল। আর তাকিয়ে থাকতে পারলাম না সেই চক্ষু দুটির পানে, মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

তারপর—

তারপর আর কাজ করা গেল না। মুখ বুজে ফিরে এলাম সঙ্গে সঙ্গে। সোজা এসে গোড়ুইদের পুকুরে ডুবলাম দু'জনে। স্নান করে ঘরে ফিরে দেখি, যেখানকার যা সব পড়ে রয়েছে। আগুন উনুনে, রান্না চড়েনি।

মুখ বুজে থাকতে হোল। কাজের খোঁজে বেরিয়ে অকাজে লেগে পড়েছিলাম। কাজ অকাজ কুকাজ, কাজের আবার জাত আছে। বিবেচনাপূর্বক কাজে লাগা চাই। নয়ত ষোল আনা লোকসান। কিন্তু সেই টলটলে চক্ষু দুটির বোবা চাউনি, সেই চরম অসহায়তা, সেই একান্ত আত্ম-সমর্পণ, যা ভাষায় ফুটে বেরল না, তাও কি লোকসানের ঘরে জমা পড়ল। পড়ুক, লোকসানের তৃপ্তিটুকু চাখতে লাগলাম চোখ বুজে শুয়ে। রোজগারের চিন্তাটা তখনকার মত ঘাড় থেকে নামল।

[ক্রমশঃ

ইতিহাসের পুরানো পাতা

উপানন্দ

১৪৯২ খৃষ্টাব্দে কলম্বাসের সমুদ্রযাত্রা আর আমেরিকা আবিষ্কারের পর এলো একটা নতুন যুগ, বিশ্ব ইতিহাসের নতুন অধ্যায় রচনা সুরু হোলো। অর্দ্ধ পৃথিবী যা অন্ধকারে ঢাকা ছিল, তা চোখের সামনে ভেসে উঠলো, জাগলো নতুন উৎসাহ আর উদ্দীপনা। ফরাসী, ইংরেজ, পর্ত্তুগীজ আর স্পেনের অধিবাসীরা সুরু করলো নব নব অভিযান, নতুন জগতে এসে উপনিবেশ স্থাপনে প্রকাশ করলো তাদের ব্যগ্রতা। এই সব অভিযানের মধ্যে ছিল কতকগুলি মাছধরা আর ব্যবসাবাণিজ্যের অভিযান। এ ছাড়া আরও উদ্দেশ্য ছিল উপনিবেশ স্থাপন। ষোড়শ শতকের শেষ পাদের প্রথমে মেক্সিকো থেকে ব্রেজিল পর্য্যন্ত ভূখণ্ডে স্পেনবাসীরা সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত করলো তাদের উপনিবেশ। ইংরাজরা এদিকে প্রেরণা পেলো রাণী এলিজাবেথের আনুকূল্যে। ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি আগ্রহ দেখালেন মার্কিন মুলুক সম্বন্ধে। ইংলণ্ডের উপনিবেশ গঠন ও বিস্তারের স্পৃহা ক্রমেই বর্দ্ধিত হোতে লাগলো। পরবর্ত্তী কালে দেখা গেছে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে যখন রাজা তৃতীয় জর্জ্জ ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করলেন, তখন তেরোটি উপনিবেশের লোক সংখ্যা ছিল ১,৬০০,০০০

প্রথমে যে সব ইংরেজ সমুদ্রযাত্রা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে স্যর হাম্‌ফ্রে গিলবার্ট আর স্যর ওয়াল্টার র‍্যালের নাম অবিস্মরণীয়। গিলবার্ট দাবী করেছিলেন নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড। র‍্যালের অধীনস্থ কাপ্তেনরা বর্ত্তমান উত্তর ক্যারোলাইনের উপকূল আবিষ্কার করেছিলেন—আর সমস্ত উপকূল অঞ্চলকে ইংলণ্ডের কুমারী অধীশ্বরীর নামে অমরত্ব দিয়েছেন,—তাকে অভিহিত করেছেন ভার্জিনিয়ার নামে। তোমরা জানো তামাকের জন্যে ভার্জিনিয়া বিশ্ববিখ্যাত।

রাজা প্রথম জেম্‌সের সময়ে আমেরিকায় ইংরেজদের সত্যিকার উপনিবেশ স্থাপন সুরু হয়। ১৬০৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। ঐদিন লণ্ডন আর প্লীমাথ কোম্পানিকে সনদ দিলেন রাজা প্রথম জেম্‌স। ঐ বৎসরের শেষের দিকে লণ্ডন কোম্পানীর সদস্যরা ১০৫ জন ভার্জিনিয়াগামী যাত্রীদের বিদায় সম্ভাষণ জানালেন।

পরবর্ত্তী বৎসরে অর্থাৎ ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ছোট ছোট তিনটি জাহাজে তাঁরা ভার্জিনিয়ায় এসে পৌঁছলেন, আর রাজার নামে তাঁদের নতুন উপনিবেশের নাম রাখলেন জেম্‌সটাউন। এঁরাই হোলেন প্রথম ঔপনিবেশিক। তারপর দেখতে দেখতে প্রায় সতের বছর কেটে গেল, তীর্থযাত্রীরা (Pilgrim father) প্রথম দলের অনুসরণ করলেন। তাঁরা ইংলণ্ড থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। তার কারণ, তাঁরা ধর্ম্ম বিশ্বাস আর উপাসনার স্বাধীনতা দাবী করেছিলেন। এদাবী অপরাধ বলেই গণ্য হয়েছিল। এঁরা উঠলেন মে ফ্লাওয়ার জাহাজে, আর সাগরের ওপর দিয়ে পাড়ি দিতে দিতে শেষে পৌঁছলেন নতুন পৃথিবীর ম্যাসাচুসেটসের কেপ কডের অদূরে—এটা হচ্ছে ১৬২০ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগের ঘটনা। জাহাজ নোঙর করে এঁরা নেমে এলেন নতুন পৃথিবীর মাটিতে, তারপর প্লিমাথে বসবাস সুরু করলেন। এরপর এঁদের পদাঙ্কানুসরণ করে দলে দলে বহু তীর্থযাত্রীর সমাগম হোতে লাগলো নতুন পৃথিবীর উপকূলে। স্বদেশের নিগ্রহ ভোগ থেকে নতুন যাত্রীরা প্রথম দলের সঙ্গে প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হয়ে ঘর বেঁধে বাস করতে লাগলেন।

১৬৩০ খৃষ্টাব্দে ম্যাসাচুসেটস্‌ বে কলোনির দিকে পিউরিটানদের যাত্রা সুরু হোলো আর প্লিমাথের বদলে বোষ্টন হয়ে উঠলো এঁদের আকর্ষণের মধ্য বিন্দু। কোয়েকাররা হোলেন ভাগ্যবিড়ম্বিত, তাই দেখা গেছে বিশ ত্রিশ বছর ধরে কেউ শান্তিতে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করতে পারেন নি। অনেকের ভাগ্যে জরিমানা দিতে হয়েছে, কাউকে হোতে হয়েছে কারারুদ্ধ, কেউ বা ভোগ করেছে নির্ব্বাসন দণ্ড। এই অসহায় অবস্থায় এঁরা পেলেন উইলিয়ম পেনকে। ইনি যেন দৈব প্রেরিত হয়ে এলেন। আজও ইনি উপনিবেশের আদি প্রতিষ্ঠাতা রূপে ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করে রয়েছেন। পেনসিলভেনিয়া, নিউজার্সি আর ডেলাওয়ার—এই

তিনটি উপনিবেশ গড়ে তুলতে এঁর সক্রিয় অংশ গ্রহণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হাডসান আর ডেলাওয়ার নদীর মধ্যবর্ত্তী অঞ্চল অধিকার করার ভেতর রয়েছে তাঁর অদম্য প্রচেষ্টার বহিঃপ্রকাশ।

ইংলণ্ডের অভিজাত পরিবারে জন্ম, জমিদারের ছেলে, অতুল ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিতপালিত উইলিয়ম পেন। কিন্তু আদালের ঘরের দুলাল হয়ে কখন জীবন অতিবাহিত করেন নি। তাঁকে দেখা যায়নি সাধারণ শ্রেণীর ভেতর, বরং দেখা গেছে একটু অদ্ভুত ধরণের মানুষ হিসেবে। সচেষ্টার স্যাফট সবেরি আর স্বয়ং রাজা চার্লস্‌ ও নেল গিউনকে কেন্দ্র করে বিলাসিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতায় নিমজ্জিত ইংলণ্ডের রেষ্টরেসন যুগের রাজসভায় যে চিত্র উইচারলি আর কনগ্রীভের দুঃসাহসিক নাটকগুলির মধ্যে পাওয়া যায়, তারই মধ্য থেকে বেরিয়ে এসেছেন এই অনন্যসাধারণ অভিজাত মানুষটি।

উপনিবেশ যাঁরা গড়ে গেছেন তাঁরা ছিলেন মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষ। তাঁরা ছিলেন কর্ম্মঠ ব্যক্তি। তাঁদের মধ্যে কেমন করে ধনী ও জমিদারের সন্তান উইলিয়ম পেন স্থান করে নিয়েছিলেন, তার আলোচনার দিন আজ এসেছে। তাই তাঁর সম্বন্ধে তোমাদের কাছে কিছু বলবার আছে। ছেলেবেলা থেকে লেখাপড়ায় তিনি কোন রকমে ফাঁকি দেন নি, সভায় বিশ্রাম করবার ফাঁকও খোঁজেন নি। তাই তাঁর পক্ষে মহৎকাজ করে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। তিনি যে পরিবেশের মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন, সে হচ্ছে সমাজের খুব উচুঁ স্তরের পরিবেশ, যেখানে ইংলণ্ডের শাসন কর্ত্তা ও রাজা রাজড়াদের সমারোহ। এঁদের সংস্পর্শে এসে তাঁর যথেষ্ট দূরদর্শিতা ও জ্ঞান আহরণ সম্ভব হয়েছিল। তবেই না তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর রাজনীতিজ্ঞ রূপে তদানীন্তন কালে সমাদর পেয়েছিলেন।

অক্সফোর্ডে দুবছর ও ফ্রান্সের একাডেমি অব সামুরে কিছুকাল তিনি অধ্যয়ন করেছেন, আর ভ্রমণ করেছেন ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে। মনুষ্য সমাজকে তিনি পর্য্যবেক্ষণ করেছেন অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে। এরই ওপর যে শিক্ষা তাঁর লাভ হয়েছিল সেই শিক্ষাই তাঁর মনীষার প্রধান উপকরণরূপে গণ্য হয়েছে। তাঁর তারুণ্যের দীপ্ত প্রতিভার বহিঃপ্রকাশ আর মানবিকতা বোধ প্রত্যক্ষ করা গেছে, আর ও প্রত্যক্ষ করা গেছে তাঁর সমসাময়িক খুব কমলোকই তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিতে সক্ষম ছিল। পিতার অধীনে নৌবাহিনীতে আর আয়র্লণ্ডে সমর বিভাগে অল্পবয়সেই পেন যোগ্যতা ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। ঐতিহাসিকের চোখে তিনি বিরাট পুরুষ বলেই সমাদর পেয়েছেন, আর তাঁকে বলা হয়েছে ইংলণ্ডের অভিজাতশ্রেণীর ও সমসাময়িক কালের একটি পরিপূর্ণ সৃষ্টি। যে যুগে ইংলণ্ডের ভদ্রলোকেরা সাধারণত যাদের সঙ্গে মিশতেন না, পেন তাদের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতাসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। চিন্তাপ্রবণ পেন ছিলেন রহস্যবাদী, চার্চ্চ অব ইংলণ্ডের ধর্ম্মমত তাঁর আধ্যাত্মিক ক্ষুধা মিটোতে পারেনি। কোয়েকার প্রচারক টমাস লো শুনালেন তাঁকে নতুন বিশ্বাসের বাণী, শুনালেন নির্য্যাতীত মৈত্রী সমাজের কথা (সোসাইটি অব ফ্রেণ্ডস), আর জীবনের একটি মহৎ উদ্দেশ্যের কথা। পেন রাজসভার সঙ্গে ছিন্ন করলেন তাঁর সম্পর্ক, কিন্তু জেমস, ডিউক অফ্‌ ইয়র্কের মত বন্ধুর সঙ্গে রইলো যোগাযোগ। সুরু করলেন নতুন আদর্শ গ্রহণ করে অধ্যাত্ম পথে যাত্রা। ধর্ম্মপ্রচারের কাজে আর কোয়েকারদের শিক্ষার প্রসারের জন্যে তিনি আত্মনিয়োগ করলেন। তাঁর বলিষ্ঠ লেখনী জনসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। তাঁর হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা মানুষের মন টলিয়ে দিল। তদানীন্তন কালের মানুষের লঘু চিত্ততা ও বিলাসপ্রিয়তার বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র সমালোচনা সার্থক হয়ে উঠলো, মুষ্টিমেয় সমষ্টিবদ্ধ মানুষের ওপর সে সময়ে চলেছে অর্থনৈতিক উৎপীড়ন। পেন তার বিরোধিতা করলেন।

লিনকিন্‌স ইনে তিনি যে আইন শিক্ষালাভ করে ছিলেন—তারই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে সুরু করে ছিলেন আন্দোলন আর পরিণত হয়েছিলেন ইংরাজদের নিরাপত্তা ও বিত্তের একজন সার্থক রক্ষাকর্ত্তারূপে। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত বুশেলের মোকর্দ্দমায় জজদের অনুশাসন থেকে জুরীদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে তিনি যে মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা তাঁর ঐতিহাসিক বক্তৃতারূপে পরিগণিত হয়েছে। ধর্ম্মবিশ্বাস আন্দোলনে তিনি কারাবরণ করেছিলেন, সেই সময়ে তিনি রচনা করেন 'নোক্রশ, নোক্রাউন'। এর ভেতর যে সব আদর্শের বর্ণনা আছে, সেইসব আদর্শ আজকের আমেরিকা গ্রহণ করেছে।

১৬৭৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৬৮০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে পেন কোয়েকার প্রচারক হিসাবে হল্যাণ্ড আর জার্ম্মানীতে কয়েকবার যাত্রা করেন। ইংলণ্ডে তিনি কোয়েকার ভ্রাতৃমণ্ডলীকে উদারনৈতিক গবর্ণমেণ্টের জন্যে আন্দোলন করতে আর রাজনীতিতে যোগদানের জন্যে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু একাজে তিনি সফল হোননি। এই সময়ে পার্লামেণ্টের নির্ব্বাচনে বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি ত্রুটিগুলিকে ধরিয়ে দিয়ে আর নিন্দা করে কয়েকটি চমৎকার পুস্তিকা রচনা করেন। তাঁর জীবনের এই নতুন অধ্যায়ে তাঁকে যুগোপযোগীপুরুষ বলেই মনে হয়, কারণ রেষ্টরেশন যুগের ইংলণ্ডের একটি আদর্শবাদী দিক ও ছিল।

যে সময়ে পেনের মহৎ বিশ্বাসগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিণতি লাভকরেছে, সে সময়ে তাঁর বয়স মাত্র তেত্রিশ বৎসর। এই গুলিকে কাজে রূপ দেবার জন্যে তাঁর ডাক এলো। মৈত্রী সমাজের (সোসাইটি অফ্‌ ফ্রেণ্ডস্‌) সভ্য সদস্যদের আশ্রয় হিসাবে ব্যবহারের জন্যে সংগৃহীত পশ্চিম নিউ জার্সির সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে তাঁকে একজন ট্রাষ্টি করা হোলো। পেলেন তিনি উত্তম সুযোগ। ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে এক সনদের বলে বার্লিংটন নগর স্থাপিত হোলো। এই সনদ প্রধানতঃ পেনই রচনা করেছিলেন—আর আইন সুবিধা ও চুক্তির লেজ, কনসেসনস অ্যাণ্ড এগ্রিমেণ্টস) উপর সনদের ভিত্তি স্থাপনা হয়েছিল। এই সনদে ধর্ম্মের স্বাধীনতাকে স্বীকার করবার জন্যে বলা হোলো—'এই পৃথিবীতে একক বা দলবদ্ধ মানুষের অধিকার বা ক্ষমতা নেই ধর্ম্ম ব্যাপারে মানুষের বিশ্বাসের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করবার'—এই সনদের মধ্যে প্রত্যক্ষ হোলো উদারনৈতিক মনোভাব।

একদা নিউ জার্সি সম্বন্ধে পেন আর তাঁর সহযোগীরা যে কথা বলেছিলেন, এই সনদ তা সপ্রমাণ করেছে—'এই খানে আমরা ভবিষ্যতের

জন্যে ভিত্তিস্থাপন করেছি, যাতে তারা মানুষ হিসেবে স্বাধীনতা কি তা বুঝতে পারে……কেন না আমরা সমস্ত ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত করেছি।' পেন যে কথা বলেছিলেন, প্রথম সুযোগ পেয়েই তাকে কাজে পরিণত করে গেছেন। এই অভিজাত মানুষটি তাঁর রাজনৈতিক উদার মতবাদকে মৌলিক আইনে লিপিবদ্ধ করে যে নতুন সমাজ বাস্তবে রূপায়িত করে গেছেন, আজও তা অবলুপ্ত হয়ে যায় নি। স্বাধীনতা ও তার আনুষঙ্গিক গণতন্ত্রের ভিত্তিভূমি গঠিত হয়েছে, পেনের মস্তিষ্কপ্রসূত চিন্তাধারার মূলনীতিকে অবলম্বন করে, তাই তিনি মানব সমাজের চির-নমস্য।

১৬৮১ খৃষ্টাব্দে রাজা দ্বিতীয় চার্লস এডমিরাল পেনের বহুদিনের ঋণ শোধের জন্যে তাঁর পুত্রকে মেরিল্যাণ্ডের উত্তরে এক বিরাট জমিদারী দান করেন। মৃত নৌবীরের সম্মানের জন্যে রাজা এঅঞ্চলের নামকরণ করলেন পেন সিলভেনিয়া অর্থাৎ পেনেদের বন। কোয়েকার রাজনীতিজ্ঞ পেন এই সময়ে নিজের রাজনীতিকে কাজে পরিণত করবার উত্তম সুযোগ পেলেন। আরও সুযোগ পেলেন পর বৎসর যেদিন তাঁর বন্ধু ডিউক অব ইয়র্ক (কিছুদিন পরে রাজা দ্বিতীয় জেমস হোলেন) ডেলাওয়ার অঞ্চলটি দান করলেন। ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত গবর্ণমেণ্টের কাঠামো (ফ্রেম অব গবর্ণমেণ্ট) বা সংবিধানে তিনি রূপ দিলেন অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে। ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে ব্রিষ্টলের উপরে ডেলাওয়ারে পেন একটি বড় জমিদারী পত্তন করলেন। এর নামকরণ হোলো পেনসবেরি। আমেরিকায় এই নতুন উপনিবেশে তিনি ছিলেন মাত্র বাইশ মাস। তার মধ্যে স্থাপনা করলেন ফিলাডেলফিয়া, প্রতিষ্ঠা করলেন শক্তিশালী গভর্ণমেণ্ট। তাঁরই ব্যক্তিত্বের মহনীয় আকর্ষণে উপনিবেশিকরা ও স্থানীয় ইণ্ডিয়ানরা শান্তি ও সৌহার্দ্দের মধ্যে কালাতিপাত করতে সক্ষম হয়েছিল। যখন তিনি ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে ন্যায় ও সৌহার্দের সম্পর্ক স্থাপন করছিলেন তখন তাঁকে ইংলণ্ডে ফিরে যেতে হোলো। ইংলণ্ডে চলেছে তখন কোয়েকারদের ওপর অত্যাচার। ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ফিরে এলেন এই মানব-প্রেমিক মানুষটি। তাঁর বন্ধু রাজা দ্বিতীয় জেমসকে বললেন জেলখানাগুলি থেকে ১২০০ কোয়েকার বন্দীকে ছেড়ে দিতে—রাজা ও রাজী হোলেন।

তিনি ছিলেন যুদ্ধবিরোধী মানুষ। ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান নীতি যুদ্ধ বন্ধ করার প্রতি দৃষ্টি নিয়োগ করেন। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের শান্তি বিষয়ক প্রবন্ধ (Essay Towards the Present and future Peace) নামে প্রকাশিত গ্রন্থে পেন প্রায় দুই শতাব্দী আগে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মত একটি সংগঠনের কথা কল্পনা করেছিলেন যেখানে খোলাখুলি শত্রুতা সৃষ্টির পূর্ব্বেই আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলির সমাধান করা হবে। সাধারণ প্রয়োজনে ব্রিটিশ উপনিবেশগুলির ঐক্যের জন্যে ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি মিলনের খসড়া (Plan of union) নামে একটি পরিকল্পনাও প্রকাশ করেছিলেন। এগুলি যদিও কাজে আসেনি—তবু এর থেকে প্রমাণিত হয় কতখানি ছিল তাঁর জ্ঞানের পরিধি। তদানীন্তন কালের তুলনায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রগতিশীল।

পেন আবার গেলেন তাঁর উপনিবেশগুলি পরিদর্শন করতে মালিক হিসাবে। ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৭০১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই কাজেই তাঁর সময় অতিবাহিত হোলো। তাঁর উদার মনের লাভ করেও অধিবাসীরা আত্মকলহ থেকে মুক্ত হোতে পারেনি। এজন্যে তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন—আমি তোমাদের এই পরস্পরের শত্রুভাবের জন্যে অন্তরে বড়ই দুঃখিত। ভগবানের দোহাই—হতভাগ্যদেশ আর আমার প্রতি তোমাদের ভালোবাসার দোহাই। অসন্তোষকে এত বেশী গভর্ণমেণ্ট বোঁধা করোনা, এত খোলাখুলি আর কোলাহল মুখর করে তুলোনা।

চার বছরেরও কম সময় উইলিয়ম পেন কাটিয়েছেন উপনিবেশগুলির মধ্যে। উপনিবেশ স্থাপয়িতা ও রাজনৈতিক প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা হিসাবে তিনি দেখিয়েছেন মহত্ব—আর জনকল্যাণের জন্যে করে গেছেন বহু কাজ। উপনিবেশের উন্নতিতে রয়ে গেছে তাঁর প্রভাব। উল্লেখযোগ্যভাবে সাহায্য করে গেছেন নিউজার্সি, ডেলাওয়ার ও পেনসিলভেনিয়া এই তিনটি উপনিবেশ গঠনে। সকলের সঙ্গে তিনি মিশেছেন, সকলকে আপনার করে নিয়েছেন, আর দেখিয়ে গেছেন মানব সভ্যতার চরমোন্নত বিকাশ। নিজের জীবনের দৃষ্টান্তকে অপরের অনুকরণ যোগ্য করে নির্দ্দিষ্ট অমানুষিকতার মুখে তিনি ছিলেন মহৎ মানবতাবাদী আর মানব প্রেমিক। work is worship কাজের অপর নাম পুজা—এই সত্যই তিনি উদ্ঘাটিত করেছেন। আজও আমাদের চিত্ত অন্তঃপুরে তাঁর মহৎ আদর্শের পদধ্বনি শোনা যায়—তোমরা এই সব মহৎ কর্ম্মবীরের আদর্শ অনুধ্যান করে মানুষের মত মানুষ হয়ে ওঠ, এই কামনা আন্তরিকভাবেই করি। তোমরা জাতির জীবন নদীর শৈবাল অপসারিত করে আবার তাকে উত্তাল-তরঙ্গমালায় পরিণত করো, আবার জাতির জীবন-নদীতে বান ডাকুক তোমাদের অদম্য সাধনায়।

—

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাহিনীর সার-মর্ম্ম

জুয়ান ভ্যালেরা

রচিত

স্বর্গের অমৃত

সৌম্য গুপ্ত

[উনবিংশ শতাব্দীতে স্পেনদেশে যে সব কৃতী কবি-সাহিত্যিক, সুধী-সমালোচক বিশ্ব-জগতে সুনাম-অর্জ্জন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সুলেখক জুয়ান ভ্যালেরা বিশেষ উল্লেখযোগ্য, এবারে, তাই তাঁর একটি সুবিখ্যাত কৌতুক-কাহিনীর সার-মর্ম্ম তোমাদের বলছি। এ কাহিনীটি

স্পেনীয়-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রস-রচনা। জুয়ান ভ্যালেরার জন্ম—১৮২৪ খৃষ্টাব্দে···সুদীর্ঘ ৮১ বছর বয়সকাল অবধি সাহিত্য-সাধনার পর, ১৯০৫ সালে তিনি পরলোক-গমন করেন।]

অনেকদিন আগেকার কথা। ইউরোপে তখন ক্রীশ্চান-ধর্ম্মযাজকদের যেমন প্রতিপত্তি, তেমনি ধন-সম্পত্তি ছিল। এই সময়ে স্পেনদেশের 'টোলেডো' (Toledo) শহরের গির্জ্জায় ছিলেন এক ধর্ম্মাচার্য্য (আর্ক-বিশপ)···তাঁর আচার-নিষ্ঠার সীমা ছিল না এবং তিনি ছিলেন পরম আত্মত্যাগী অর্থাৎ বিলাস-বাসনা বা সাংসারিক ভোগ-সুখের সম্পূর্ণ বিরাগী। তাঁর বসন-ভূষণ-আহারাদি ছিল খুব সরল ও সাদাসিধা। পালে-পার্ব্বণে তিনি উপবাস করতেন এবং তাঁর আহার ছিল নিরামিষ···সামান্য একটু শব্জী, রুটি আর ডাল। এ সব খাবার তিনি নিজের হাতে তৈরী করতেন না···তাঁর এক পাচক ছিল, সেই এ সব রান্না করে খাওয়াতো। এই পাচকের রান্না খাওয়াই ছিল তাঁর যা একমাত্র বিলাস বা সৌখীনতা!

তাঁর খানা-টেবিলে এই পাচক প্রত্যহ পরিবেশন করতো কলাইশুটি, বরবটি আর মুশুর ডাল দিয়ে তৈরী পরম উপাদেয় ও পুষ্টিকর নিরামিষ-সুরুয়া (Vegetable Soup)। পাচকটি ছিল রীতিমত কুশলী···এই সব সামান্য উপাদানে যে নিরামিষ-সুরুয়া সে তৈরী করতো, স্বাদে, বর্ণে, গন্ধে তার কাছে কোথায় লাগে ধনীর বিলাস-ভোজের টেবিলের দামী-উপাদানে-রান্না পশু বা পক্ষী-মাংসের সুরুয়া!

পাচক এমন গুণী হলেও, মনিবের খানসামার সঙ্গে তার বনতো না···অতি-তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে খানসামার সঙ্গে তার নিত্য খিটিমিটি-কলহ চলতো! শেষে একদিন অতি-সামান্য কি ব্যাপার নিয়ে খানসামার সঙ্গে হলো তার তুমুল বচসা···মনিবের বিচারে পাচক হলো দোষী সাব্যস্ত এবং সঙ্গে সঙ্গে মনিব তাকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করলেন।

নূতন পাচক এলো মনিবের খানা-পাকাবার জন্য···তাকে ফরমাশ দেওয়া হলো, মনিবের জন্য সেই কলাইশুটি, বরবটি আর মুশুর ডালের উপাদেয় এবং পুষ্টিকর নিরামিষ-সুরুয়া তৈরী করতে হবে। মনিবের ফরমাশমতো নূতন পাচক ঐ সব উপাদান দিয়ে সেই সুরুয়া বানালো এবং খানা-টেবিলে মহা-সমাদরে মনিবকে করলো পরিবেশন। কিন্তু মনিবের সে সুরুয়া এমন বিশ্রী এবং বিস্বাদ লাগলো খেতে, যে তিনি সুরুয়া ফেলে দিলেন এবং এ পাচককে আকাট বলে তখুনি বরখাস্ত করে খানসামাকে আবার নূতন-পাচক আনতে বললেন।

তিন-নম্বর-পাচক এলো···তার হাতের নিরামিষ-সুরুয়াও তেমনি বিস্বাদ, তেমনি বিশ্রী···পত্রপাঠ তাকেও বরখাস্ত করা হলো। তারপর আট ন'দিন ধরে নিত্য একজন করে নূতন পাচক আসে···কারো হাতের সুরুয়ায় আগেকার সে 'তার' আর মেলে না···সঙ্গে সঙ্গে তারাও হয় বরখাস্ত।

শেষে আর এক নূতন-পাচক এলো···সে রাঁধে যেমন ভালো, তেমনি তার বুদ্ধিশুদ্ধিও বেশ পাকা। চাকরী পেয়েই রান্নার কাজে হাত দেবার আগে এ পাচক গেল ধর্ম্মাচার্য্যের সেই প্রথম-বরখাস্ত পুরোনো-পাচকের কাছে গিয়ে তাকে সাধ্য-সাধনা—দোহাই দাদা, বলো ভাই আমাকে···তোমার সেই নিরামিষ-সুরুয়া-তৈরীর হদিশ··· কি মশলা দিয়ে তুমি অমন রসাল রান্না রাঁধতে?

পুরোনো-পাচকের মমতা হলো···সে স্পষ্টই খুলে বললো—তার সেই সুস্বাদু নিরামিষ-সুরুয়া-তৈরীর প্রণালী।

তার কাছ থেকে হদিশ পেয়ে নূতন-পাচক এসে তারই বর্ণিত-প্রণালীতে মনিবের প্রিয় সেই নিরামিষ-সুরুয়া তৈরী করলে। এ সুরুয়াতে ঠিক প্রথম-বরখাস্ত-পাচকের হাতের সুরুয়ার মতোই স্বাদ, বর্ণ এবং গন্ধ! এ সুরুয়া খেয়ে মনিব মহা-খুশী···নিশ্বাস ফেলে বললেন,—আঃ, ভগবানের অসীম দয়া···এতদিন পরে সেই আগেকার পাচকের মতো পাচক আমায় জুটিয়ে দিয়েছেন···সুরুয়াতে আবার সেই পুরানো স্বাদ ফিরে পেলুম আজ!···

এই বলেই তিনি খানসামাকে হুকুম করলেন,—ওকে ডাকো এখানে···ওর হাতের সুরুয়া খেয়ে খুব খুশী হয়েছি··· ···সে কথা ওকে জানাতে চাই!

নূতন-পাচক এলো···মনিবের সামনে দাঁড়ালো। মনিব তার রান্নার খুব তারিফ করে বললেন,—আমি খুব খুশী হয়েছি তোমার রান্না সুরুয়া খেয়ে! ভগবান তোমার মঙ্গল করুন!

নূতন-পাচক চালাক-চতুর হলেও, খুবই ধর্ম্মনিষ্ঠ··· সত্য আর ন্যায় মেনে চলে! তাছাড়া চাকরীর স্থান—গির্জ্জা, তার উপর মনিব—ধর্ম্মাচার্য্য···এবং সে নিজে—ক্রীশ্চান···কাজেই মনিবের কাছে মিথ্যাচার··· তার বাধলো! উপরন্তু রান্নার কেরামতির জন্য তার এ সুখ্যাতি প্রাপ্য নয়···এ সুখ্যাতি প্রাপ্য—সেই প্রথম-বরখাস্ত পাচকের···কেন না, তার বর্ণিত-প্রণালীতেই এ সুরুয়া সে তৈরী করতে পেরেছে!

হাতজোড় করে এ পাচক বললে,—ধর্ম্মাবতার···এ সুরুয়া আমি বানিয়েছি, আপনার সেই পুরোনো প্রথম-পাচকের কাছ থেকে রান্নার মশলা জেনে এসে···সে শুধু মুশুর ডাল, কলাইশুটি আর বরবটি দিয়ে এ সুরুয়া বানাতো না···তাতে নিরামিষ-সুরুয়ার এমন স্বাদ, এমন রঙ, এমন গন্ধ হতে পারে না···সে এ-সুরুয়া বানাতো—শুয়োরের মাংস, মুরগীর মাংস, ছোট-ছোট পাখীর মেটে আর কলিজা এবং বেশ শাঁসালো-চর্ব্বিওয়ালা ভেড়ার মাংস মিশিয়ে উপাদেয় ঝোল রেঁধে···তারপর সেই ঝোলটুকু ছেঁকে নিয়ে, মাংসের সব টুকরো বাদ দিয়ে, মুশুরের ডালের সঙ্গে কলাইশুটি আর বরবটি মিশিয়ে আপনার খানা-টেবিলে নিরামিষ-সুরুয়া বলে পরিবেশন করতো!

এ কথা শুনে ধর্ম্মাচার্য্য প্রথমটা কেমন চকচকিয়ে গেলেন···তারপর নূতন-পাচকের দিকে চেয়ে গম্ভীরমুখে বললেন,—হুঁ, তাহলে আমার সঙ্গে সে এতদিন তঞ্চকতা করছিল! তা যাক, তুমিও এই তঞ্চকতাটুকু বজায় রেখে চলো···কেন না, এ সুরুয়ার মায়া আমি কিছুতেই আর ত্যাগ করতে পারবো না! সুরুয়াটা খেতে যা হয়··· আঃ!···যেন স্বর্গের অমৃত!

একতার বল

যোগেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য

অসংখ্য প্রবাল কীট সাগর তলায়।
স্রোত মনে ইতস্ততঃ খেলিয়া বেড়ায়॥
চলিতে চলিতে কোথা হলে সমবেত।
ধীরে ধীরে দ্বীপাকারে হয় পরিণত॥
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিন্দু এরূপে মিলিয়া।
রেখেছে ধরায় কত সাগর রচিয়া॥
সংখ্যাতীত মুহূর্ত্তের বৈধ সম্মেলন।
অসীম অনন্ত কাল করেছে সৃজন॥
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যত বস্তু একতার বলে।
অসম্ভব কর্ম্ম সাধে এই ধরাতলে॥
ক্ষুদ্র পিপীলিকা জানে একতার বল।
একতায় বদ্ধ রয় ভ্রমর সকল॥
মিলনেই স্থিতি আর বিচ্ছেদে মিলন।
ছোট বড় সমবায় ঘোষে অনুক্ষণ॥
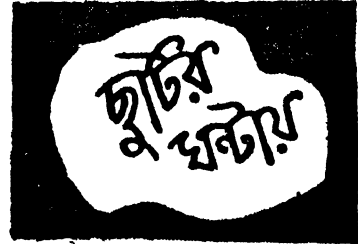
চিত্রগুপ্ত

এবারে তোমাদের বিজ্ঞানের আরো একটি বিচিত্র মজার খেলার কথা বলি। এ খেলার কায়দা-কানুন ভালো-ভাবে রপ্ত করে নিয়ে, তোমাদের আত্মীয়-বন্ধুদের সামনে ঠিকমতো দেখাতে পারলে, তাঁদের তোমরা অনায়াসেই রীতিমত তাক্ লাগিয়ে দিতে পারবে।

উর্দ্ধ-গতি জলের ফোঁটা ঃ

ইস্কুলের বইয়ে তোমরা পড়েছো—"নীচু বিনা উঁচুদিকে জল কভু যায় না!" অর্থাৎ, জলের স্বাভাবিক-গতি সব সময়ই উঁচু থেকে নীচের দিকে···কোনো জায়গায় জল ঢেলে দিলে, সে-জল, সাধারণতঃ যেদিকটি ঢালু, সেই দিকেই গড়িয়ে যায়—এই হলো জলের স্বাভাবিক-গতি। তবে এ-নিয়ম সব সময়ে ঠিক খাটে না···এর ব্যতিক্রমও ঘটে কোনো-কোনো ক্ষেত্রে। এবারে বিজ্ঞানের যে বিচিত্র-খেলাটির কথা বলছি, সেটি জলের গতির এই স্বাভাবিক-নিয়মের ব্যতিক্রম সংক্রান্ত। এই মজার খেলাটি

দেখানোর জন্য যে সব সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োজন,গোড়াতেই তার একটা মোটামুটি ফর্দ্দ তোমাদের জানিয়ে রাখি। অর্থাৎ, এর জন্য চাই—দু'তিন হাত লম্বা খানিকটা পাতলা অথচ মজবুত-ধরণের 'তেলা-কাগজ' (Oil-paper) কিম্বা 'প্লাষ্টিকের-কাপড়, (Plastic-Cloth), ছোট, বড় এবং মাঝারি আকারের খানকয়েক মোটা-বাঁধানো বই, একটি বড় রেকাবী (Saucer), একটি চামচ (Tea-spoon) আর এক গ্লাস জল। এ সব সরঞ্জাম সংগ্রহ হবার পর, পাশের ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে, ঠিক তেমনি-ধরণে সমতল মেঝে কিম্বা টেবিলের উপরে এক-লাইনে পর-পর বড়, মাঝারি এবং ছোট সাইজের বাঁধানো বইগুলিকে খাড়াভাবে সাজিয়ে রেখে, সেগুলির উপরে লম্বা-আকারের ঐ 'তেলা-কাগজ' অথবা প্লাষ্টিকের কাপড়খানি ঢালু ছাঁদে আগাগোড়া পরিপাটিভাবে বিছিয়ে দাও। তবে এ-কাজের সময় বিশেষ নজর রেখো যে, 'তেলা-কাগজ' বা প্লাষ্টিকের-কাপড়ের কোথাও যেন কোনো 'কোঁচ-খাঁজ' (wrinkles), 'টোল-টাল' (Bumps) কিম্বা এতটুকু 'ভাঁজ' (Folds) না পড়ে। কারণ, বিভিন্ন-আকারের বইগুলির উপর বিছানো 'কাগজ' বা 'কাপড়ের' কোথাও এ-ধরণের সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলেই, মজা মাটি···সুষ্ঠুভাবে খেলার কারসাজি দেখানোর পক্ষেও প্রচুর অসুবিধা হবে। কাজেই এদিকে নজর রাখা একান্ত আবশ্যক। তবে, বিভিন্ন-ছাঁদের বাঁধানো বইগুলির উপরে লম্বা 'কাগজ' বা 'কাপড়টিকে' আগাগোড়া সমান ও পরিপাটিভাবে বিছিয়ে রাখার জন্য তোমরা যদি কয়েকটি ছোট 'আলপিন' (Pins) দিয়ে 'তেলা-কাগজ' অথবা 'প্লাষ্টিকের কাপড়টিকে' বেশ টান করে বাঁধানো-বইগুলির গায়ে গেঁথে রাখো, তাহলে 'কোঁচ-খাঁজ', 'টোল-টাল' কিম্বা 'ভাঁজ' পড়ার সম্ভাবনা কমবে অনেকখানি এবং খেলাটি দেখানোর সময়ও বিশেষ কোনো অসুবিধা ভোগ করতে হবে না।

এমনিভাবে বড়, মাঝারি আর ছোট—বিভিন্ন আকারের বাঁধানো-বইগুলির উপরে আগাগোড়া পরিপাটিছাঁদে লম্বা 'তেলা-কাগজ' বা 'প্লাষ্টিকের কাপড়-খানিকে' ঢালু-ভঙ্গীতে বিছিয়ে রাখার পর, জল-ভরা গ্লাশ থেকে এক চামচ জল নিয়ে সন্তর্পণে ঢেলে দাও ঐ 'কাগজ' বা 'কাপড়' দিয়ে রচিত 'Switchback' বা 'গড়ানে-ঢালুজমীর' সব চেয়ে উঁচু-জায়গাতে। চামচের জলটুকু ঢালবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখবে, সেটি দিব্যি বড় একটি ফোঁটার ছাঁদে স্বচ্ছন্দ-গতিতে সজোরে গড়িয়ে চলছে অভিনব এই 'Switchback' বা 'গড়ানে-ঢালুজমির' উঁচু দিক থেকে নীচের দিকে
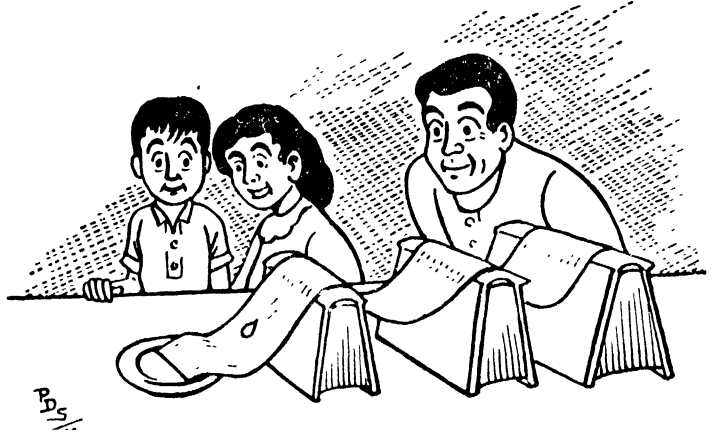
একের পর এক বড়, মাঝারি, আর ছোট বিভিন্ন আকারের বাঁধানো-বইগুলি দিয়ে ঢেউয়ের ভঙ্গীতে রচিত উঁচু-নীচু প্রাচীর-বেড়াগুলি ডিঙিয়ে মেঝে বা টেবিলের-বুকে-রাখা রেকাবীর আশ্রয়ে। এমনটি হবার কারণ—জলের ফোঁটাটি 'Switchback' বা 'গড়ানে-ঢালুজমীর' সর্বোচ্চ-চূড়ো থেকে গড়িয়ে নেমে আসার সময় যে 'গতি-বেগ' (Rolling Speed) সঞ্চয় করে, তারই জোরে নিম্নগামী জলের ফোঁটা অনায়াসেই মাঝারি চূড়োটি অতিক্রম করে চলে এবং মাঝামাঝি-উচ্চ চূড়ো থেকে নামবার সময় পুনরায় যে 'গতিবেগ' সঞ্চয় করে, তার শক্তিতেই সে অবলীলাক্রমে ঠেলে ওঠে সব চেয়ে ছোট-চূড়োটি। এমনিভাবেই একের পর এক বড়, মাঝারি আর ছোট চূড়োগুলি ডিঙিয়ে এসে 'ঊর্দ্ধগতি' জলের ফোঁটাটি অবশেষে বিরাম নেয় ঢেউ-খেলানো 'Switchback' বা 'গড়ানে ঢালুজমীর' নীচেকার শেষপ্রান্তে-রাখা রেকাবীর আশ্রয়ে! এই হলো এবারের বিজ্ঞানের বিচিত্র মজার খেলাটির রহস্য। এ খেলাটি আরো অনেক বেশী মজাদার হয়ে উঠবে, যদি তোমরা 'Switchback' বা 'গড়ানে-ঢালুজমীর' শেষপ্রান্তে

রেকাবী না রেখে তার বদলে কাউকে আরেকটি চামচ ধরে ঐ গড়িয়ে-আসা জলের ফোঁটাটী লুফে নেবার জন্য দাঁড় করিয়ে রাখতে পারো।

আপাততঃ বিচিত্র এই মজার খেলাটি তোমরা নিজেরাই হাতে-কলমে পরখ করে ছাখো। বারান্তরে বিজ্ঞানের আরো নানান নতুন-নতুন মজার খেলার কথা তোমাদের জানাবো।

ধাঁধা আর হেঁয়ালি

মনোহর মৈত্র

১। বেলুনের আজব-ধাঁধা ঃ

এ বছরের 'প্রজাতন্ত্র-দিবসের' শোভাযাত্রা-উৎসব দেখতে ২৬শে জানুয়ারী সকালবেলা সদলে গিয়েছিলুম গড়ের মাঠে। সেখানে বিপুল জনতার মাঝে হঠাৎ চোখে পড়লো—আজব এক বেলুনওয়ালা…হাতে তার একরাশ
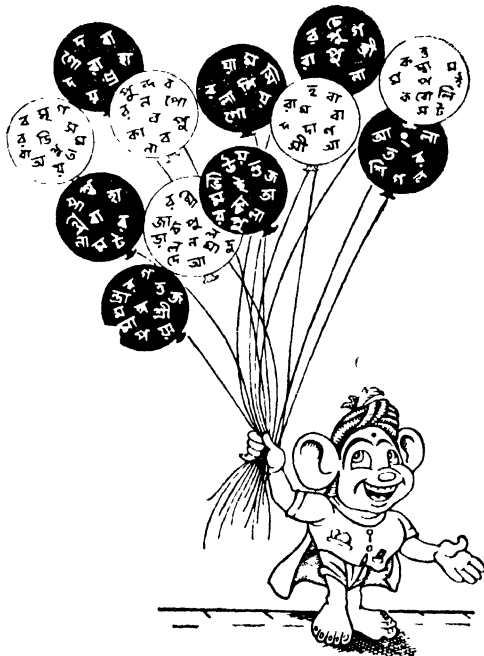
রঙ-বেরঙের বেলুন। বেলুনগুলি বিচিত্র মজার…প্রত্যেকটি বেলুনের গায়ে এলোমেলো-ভঙ্গীতে লেখা রয়েছে একরাশ বাঙলা হরফ। ব্যাপারটা ভারী অদ্ভুত ঠেকলো…তাই বেলুনওয়ালাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম সেই আজব-হরফের রহস্য। বেলুনওয়ালা হেসে বললে,—বুঝতে পারছেন না হেঁয়ালিটা! আমার হাতের এই বারোটি বেলুনের গায়ে এলোমেলোভাবে যে সব বাঙলা হরফ লেখা রয়েছে, সেগুলির মধ্যে লুকোনো আছে ভারতবর্ষের নানা সহরের নাম…একটু বুদ্ধি খাটিয়ে হিসাব করে দেখলেই সেগুলির সন্ধান পাবেন!

বেলুনওয়ালার কথামতো আমরা সবাই চেষ্টা করে দেখলুম, কিন্তু এ ধাঁধার কোনো মীমাংসা করতে পারলুম না। এখন তোমরা সবাই চেষ্টা করে ছাখো তো, উপরের ছবিতে বারোটি বেলুনের গায়ে এলোমেলোভাবে যে সব আজব হরফগুলি লেখা রয়েছে, তার মধ্যে ভারতবর্ষের কি কি এবং মোট কতগুলি সহরের নাম লুকোনো আছে! এ রহস্যের সমাধান যদি করতে পারো তো বুঝবো যে তোমরা বুদ্ধিতে রীতিমত দড়! প্রত্যেকটি বেলুনের গায়ে যে হরফগুলি লেখা রয়েছে, সেগুলিকেই বুদ্ধি করে সাজিয়ে এ সব সহরের নাম খুঁজে বার করতে হবে—তবে এ বেলুন থেকে একটা হরফ, ও বেলুন থেকে দুটো এমনিভাবে হরফ বেছে নিয়ে সাজানো চলবে না—এটি কিন্তু মনে রেখো।

২। 'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত হেঁয়ালি ঃ

সন্তু গোয়ালার কাছে তিনটি পাত্র আছে…একটি 'আট-সেরী', একটি 'পাচ-সেরী' এবং একটি 'তিন-সেরী'। এ তিনটির মধ্যে, 'আট-সেরী' পাত্রটি ভর্তি রয়েছে দুধে। স্বপনবাবুর একসের দুধ চাই। সন্তু গোয়ালার মাথায় বুদ্ধি একটু কম…কাজেই কিভাবে সে একসের দুধ মাপবে, হিসাব করতে পারছিল না। তোমরা যদি কেউ পারো, তাহলে 'ভারতবর্ষের' মারফৎ সন্তুকে জানিও।

রচনা: বিশ্বজিৎ, ফাল্গুনী, আশীষ চট্টোপাধ্যায়, মানস, শুভেন্দু মুখোপাধ্যায়, সুনীল বসু (?)

মাঘ মাসের 'ধাঁধা আর হেঁয়ালির' উত্তর ঃ

১। **প্রথম ধাঁধার উত্তর ঃ**

পাশের ছবিটি দেখলেই বুঝতে পারবে কিভাবে

চব্বিশটি 'বিন্দু-চিহ্ন' থেকে তুলির রেখা টেনে চিত্রকর-মশাই উভচর-জীব ব্যাঙের ছবি আঁকার সমস্যাটি সমাধান করছেন।

২। **দ্বিতীয় ধাঁধার উত্তর ঃ**
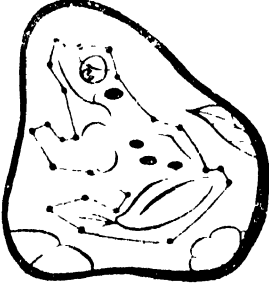
নীচের সমতল-জমী থেকে পাহাড়ের চূড়ো পর্য্যন্ত ৬৩ মাইল। সুতরাং পাহাড়ের চূড়োয় পৌঁছতে সময় লেগেছিল ৪২ ঘণ্টা এবং সেখান থেকে সমতল-জমীতে নেমে আসতে সময় লেগেছিল ১২ ঘণ্টা।

৩। **তৃতীয় ধাঁধার উত্তর :**

মগজ

মাঘ মাসের তিনটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে।

১। উৎপলা ও পৃথ্বীরঞ্জন ভট্টাচার্য্য (চুঁচুড়া)
২। রেখা মাইতি (ওসমানপুর)
৩। আশীষকুমার মল্লিক (হুগলী)
৪। বিদ্যুতকুমার মিত্র (জয়নগর)
৫। অরিন্দম, সুপ্রিয়া ও অলকানন্দা দাস (?)
৬। কমল দে (কলিকাতা)
৭। তারাপদ সরকার (পুরুলিয়া)
৮। রুমা ও অঞ্জু সিংহ (গোরক্ষপুর)
৯। রেবা, রবীন্দ্র ও মনীন্দ্র মুখোপাধ্যায় (গিরিডি)

মাঘ মাসের দুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে।

১। সুজাতা কোঙার (বাতাজল)
২। আনন্দ, কিশোর ও অসীম সিংহ (হাজারীবাগ)
৩। সুব্রতকুমার পাকড়াশী (কানপুর)
৪। অরূপকুমার ও শ্যামলী চৌধুরী (ফুটগোদা)
৫। শ্যামদা, ধরম ও ভানু (বিষ্ণুপুর)
৬। আলো, শীলা ও রঞ্জিত বিশ্বাস (কাশীপুর)
৭। অশোক, নীতা ও গৌতম ঘোষ (কলিকাতা)
৮। মানসমোহন বসু (কোন্নগর)
৯। অলোক, কৃষ্ণা, চীনু ও ভুতো (লাভপুর)
১০। দ্বিজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, নন্দদুলাল ও শ্যামলী চট্টোপাধ্যায় (রঘুনাথগঞ্জ)

মাঘ মাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে।

১। প্রবীর মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)

যোদ্ধা হ'ল বুদ্ধ

শ্রীকমলকান্ত দে

যাত্রা দেখে ফটুলালের হয়নি রাতে ঘুম।
সব চেয়ে বেশ লেগেছিল,—লড়াই, দমাম্, দ্রুম্॥
সেই থেকে সে ফন্দী আঁটে, খেলব লড়াই লড়াই।
ছাতার বাঁট্ই হয় তরোয়াল, ঢাল্ হবে ত সরাই॥
কেমন করে সব কটাকে করবে কুপোকাত্।
তাই ভেবেছে ফট্লাল, সকাল থেকে রাত॥
সার্ট পরেছে প্যাণ্ট এঁটেছে তার জড়ায়ে বেল্ট্,
তার ওপরে মাথার ওপর পরেছে এক ফেল্ট্॥
নাগরা জুতো পায়ে শোভে, আর উচু করে মাথা।
ইংরাজী ঢঙ্গে কথা বলে, বুকনি কাটে যা' তা'॥
এক হাতে তার তরোয়াল, আর এক হাতে ঢাল্।
তাই না দেখে মুচকি হাসে পাড়ার ছেলের পাল॥
ঢাল তরোয়াল সাম্লে ধরে, ঘুরল দু'চার পাক্।
লড়্বি কে আয়—কণ্ঠে বলে, সিট্কে খাঁদা নাক্॥
বন্‌বনিয়ে ক'পাক ঘুরে, বললে, খেল্‌ছি যুদ্ধ্।
মাথা ঘুরে পড়েই গেল! সবাই বলে বুদ্ধ্!

আজব দুনিয়া

জীবজন্তুর কথা

দেবশর্ম্মা বিচিত্রিত

মোয়া : এরা 'অষ্ট্রিচ' বা উটপাখীর সগোত্র... বিচিত্র এক ধরণের 'ধাবক-পক্ষী'— আকারে বিরাট এবং ডানা থাকা সত্ত্বেও উড়তে পারে না সহজে, শুধু লম্বা পা দুখানির উপর ভারী দেহের ভার রেখে দ্রুতগতিতে দৌড়াতে পারে। এ সব পাখী আজকাল ক্রমশঃই পৃথিবীর বুক থেকে লুপ্ত হয়ে যেতে বসেছে। এরা আকারে উটপাখীর চেয়ে অনেক বড় হতো...এদের বাস ছিল নিউজিল্যাণ্ড দেশে। ইদানীং সে দেশে এ পাখী একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। মোয়া-পাখীরা ছিল নানা জাতের...সব চেয়ে বড়-জাতের পাখী আকারে প্রায় বারো ফুট দীর্ঘ হতো এবং ছোট-জাতের পাখীর আকার ছিল এখনকার টার্কি পাখীর মতো। মোয়া-পাখীদের স্বভাব-চরিত্রাদি ছিল ইদানীং-আমলের উটপাখীদেরই অনুরূপ।
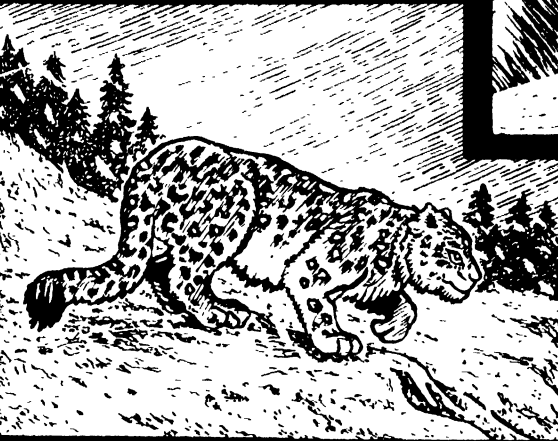
তুষার-চিতাবাঘ : এরা এক জাতের চিতাবাঘ—এদের বাস হিমালয়ের হিম-তুষার অঞ্চলের বরফাচ্ছন্ন জঙ্গলে। এদের দেহের রঙ খুব ফিকে-ধরণের হলদে—অন্য চিতাবাঘের মতো অত গাঢ় নয়। এরা তুষার-অঞ্চলের বাসিন্দা বলে, এদের গায়ের লোম অপেক্ষাকৃত বড় ও ঘন হয়। উষ্ণ-অঞ্চলের চিতাবাঘের মতো এরাও বেশ চতুর, হিংস্র ও মাংসাশী প্রাণী। তবে শীত-প্রধান অঞ্চলের বাসিন্দা এরা, তাই উষ্ণ-অঞ্চলের আবহাওয়ায় এলে এদের খুব কষ্ট হয়— সহজেই প্রাণ হারায়। এরা দুষ্প্রাপ্য প্রাণী।

টেপির : এরা এক ধরণের বিচিত্র জীব—এদের বাস এশিয়া মহাদেশের উষ্ণ-প্রধান অঞ্চলের জলা-জঙ্গলে। সাধারণতঃ এ-জাতের টেপির দেখা যায় মালয়দেশে আর বোর্ণিও, সুমাত্রার জঙ্গলে; আরো অন্যান্য জাতের টেপির মেলে মধ্য আর দক্ষিণ আমেরিকার বন-জঙ্গলে। এদের চেহারা কিম্ভূত-ছাঁদের—কতকটা হাতীর মতো, কতকটা শূয়রের মতো। মালয়দেশের টেপির আকারে বড়, লম্বায় পাঁচ-হাত ও উচ্চতায় দু'হাত হয় প্রায়। এদের গায়ের রঙ কটাশে-কালো, শুধু পিঠ, দেহের দু'পাশ আর কান দুটি ধোঁয়াটে-শাদা। তবে আমেরিকার টেপিরদের রঙ হয় আগাগোড়াই কালো। এদের গায়ের চামড়া নরম ও মোটা...লোম থাকে ছোট-ছোট। এদের প্রাণশক্তি খুব প্রখর। স্বভাব ভারী ভীরু ও নিরীহ। এরা নিরামিষভোজী প্রাণী। এরা স্থলচর হলেও জলে-কাদায় থাকতে ভালবাসে। নিশাচর জীব

শ্রীঅরবিন্দের "সাবিত্রী"

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

(প্রথম উল্লাস)

রাত্রির ধ্যানমৌন স্তিমিত শুদ্ধ ক্ষণে শর্বরীর বাক্যহীন জাগ্রত সভায় এক সভাকবিকে দেখেছি তাঁর নিদ্রাহীন চক্ষু নিয়ে যুগে যুগে প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন।

শুম্ভিত তমিস্রপুঞ্জ কম্পিত করিয়া অকস্মাৎ
অর্ধরাত্রে উঠেছে উচ্ছ্বাসি
সদ্যস্ফুট ব্রহ্মমন্ত্র আনন্দিত ঋষিকণ্ঠ হতে
আন্দোলিয়া ঘন তন্দ্রারাশি
পীড়িত ভুবন লাগি মহাযোগী করুণা কাতর
চকিত বিদ্যুৎ-রেখাবৎ
তোমার নিখিললুপ্ত অন্ধকারে দাঁড়ায়ে একাকী
দেখেছে বিশ্বের মুক্তিপথ

তার পর ভোর হল রাত্রি, মন দাঁড়িয়ে উঠে বলে—আমি পূর্ণ, তার অভিষেক হল আপনারি উদ্বেল তরঙ্গে, উপচে উঠল, মিলতে বলল চারিদিকের সব কিছুর সঙ্গে!

প্রসারিত চৈতন্যের এই অনুভূতিতে কবিদের, সাধকদের রসিকদের কণ্ঠে শুনেছি আবরণ-উন্মোচনের প্রার্থনা—বলে দাও, জানিয়ে দাও, দেখতে দাও, বুঝতে দাও, শুনতে দাও, সরিয়ে দাও এই আচ্ছাদন, তুলে নাও এই যবনিকা জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী হও, প্রাণের নেতা চোখ দাও অবিচ্ছেদে দেখা দিক।

দেশহীন কালহীন আদি জ্যোতি—
শাশ্বত প্রকাশ পারাবার
সূর্য যেথা করে সন্ধ্যাস্নান
যেথায় নক্ষত্র যত
মহাকায় বুদ্বুদের মত—
উঠিতেছে ফুটিতেছে

সেখানে নিশান্তযাত্রী আমি
চৈতন্য সাগর তীর্থপথে
... ...
এ চৈতন্য বিরাজিত আকাশে আকাশে
আনন্দে অমৃতরূপে

কিন্তু কোন জানারই যে শেষ নেই, কোন চলারই যে অন্ত নেই, নির্মম সে পথ, নিরীহ সে অহংকার—শুধু ওযে দূরে, ও যে বহুদূরে—শুধু সেই ঊর্ধ্বের ছায়া নেমে আসছে সত্তার গভীরে—স্বচ্ছ শুভ্র চৈতন্যের প্রথম প্রত্যুষ-অভ্যুদয়ের মত, শূন্য হতে জ্যোতির তর্জনী নিয়ে নবপ্রভাতের উদয়-সীমায় রূপ ও অরূপ লোকের দ্বারে।

কবির অপূর্ব ভাষায় রবীন্দ্রনাথের দিব্যদৃষ্টিতে ফুটেছিল।

অসীম আকাশে মহাতপস্বী
মহাকাল আছে জাগি
আজিও যাহারে কেহ নাহি জানে
দেয়নি যে দেখা আজো কোনোখানে
সেই অভাবিত কল্পনাতীত
আবির্ভাবের লাগি
মহাকাল আছে জাগি

যুগ থেকে যুগান্তরে, কল্প থেকে কল্পান্তে, সৃষ্টির চতুর্দিকে আমাদের অন্তরে বাহিরে মনে চেতনায় প্রতিনিয়ত যে আলোড়ন চলছে, যে অভিব্যক্তি ফুটছে, যে রূপ থেকে রূপান্তরে নিত্য যাওয়া আসা হচ্ছে, সেইত মহাকালের নৃত্য বিহঙ্গ। তাকে ছন্দের বন্ধনে, ভাষার নিগাড় কল্পনার অপরূপ মহিমায় কাব্যরসসিঞ্চিত করা যায় কিনা, তারই পরীক্ষা করলেন শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সাবিত্রীতে। তাই এ কাব্যকে সাধারণ কাব্যের পর্য্যায়ে ফেলা যায় না। তথাকথিত mystic বা mythical poetry ও

এ নয়। এখানে অস্পষ্টতা নেই। আলোকোজ্জ্বল প্রজ্ঞা-উদ্ভাসিত মানস নিজের চিন্তালব্ধ, ধ্যানলব্ধ, জ্ঞানলব্ধ অনুভূতিরই বিবরণ দিয়ে যাচ্ছে, মহাভারতের একটি কাহিনীকে (legend) সাধনার প্রতীক (symbol) করে নিয়ে। তাই অনেকের মতে "সাবিত্রী" কাব্যই নয়। তার ভাব, তার ভাষা, তার উপমা, তার বাক্যসম্ভার, তার ছন্দবদ্ধতা (Rhythm Structure), তার রচনা-শৈলী সবই বক্তব্যের উপযোগী হয়েছে বলেই এই কাব্যকে বলা হয়েছে গুরুগম্ভীর এপিক্‌ধর্মী। এখানে শুধু সাহিত্যের কল্পনা নেই, আছে দর্শনের বিন্যাস, সাধনার একাগ্রতা—ত্রিকালের ত্রিকায়, অনন্তের রাজ্য, অনির্বাণের পথ, অচিন্ত্যনীয়ের সুর। ফলে সাধারণ পাঠকের কাছে সাবিত্রীর গল্পাখ্যান সুন্দর ও মনোরম হলেও এবং পূর্বপরিচিত ট্রাডিশনের সঙ্গে যুক্ত হলেও দুর্বোধ্য হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থেকে যায়, কারণ আমাদের সময় নেই, মন নেই, আর নেই মনের সেই উত্তুঙ্গী আভিজাত্য—এ হচ্ছে অচেনা পথের কথা—একে সম্পূর্ণ বুঝতে গেলে সেই পথের পথিক হতে হয়—যে ছবি আঁকা হচ্ছে তার সঙ্গে একান্ত হতে হয়। তাই শ্রীঅরবিন্দ বললেন—the truths it Expresses are unfamiliar to the ordinary mind or belong to untrodden domain or enter into a field of intuitive experience. It expresses a vision by identity, by entering into it.

"সাবিত্রী" সম্বন্ধে তাই বলা যেতে পারে যে কবির দিব্য-জীবনের বিবর্তন ও বিবর্ধনের সঙ্গে এই কাব্যও গড়ে উঠেছে, বেড়েছে। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে এই কাব্য লেখা হয়েছে বললে অত্যুক্তি হয় না। অন্তত: সাবিত্রী সত্যবানের এই গল্পটি তাঁর কবিচেতনায় বহুদিন থেকেই ঘুরপাক্ খাচ্ছিল। ১৮৯৮-৯৯ সালে এর প্রথম কল্পনা। ১৯১৩ সালে দেখি যে তিনি স্বরচিত "সাবিত্রী" কবিতা পড়ছেন। ব্যাসের সাবিত্রী তাঁকে শুধু মুগ্ধ করেনি, অভিভূতও করেছিল—There has been only one who could give us a Savitri. তাই এই কাহিনীকে কেন্দ্র করে ভাবরসে সমৃদ্ধ করে সাধনলব্ধ রূপ দিয়ে তপস্যাপূত চিত্র এঁকে কবি এক মহাসম্পদ এনে দিলেন। বিভ্রান্ত সমালোচক বললেন—he thinks too much—বড্ড বেশী চিন্তা, বড্ড বেশী কসরৎ—বড্ড বেশী কল্পিত। এখানে আছে "more than more logical language addressed to the intellect—ন্যায় ও তর্কশাস্ত্রের গণ্ডীতে বাঁধা বুদ্ধিদীপ্ত চেতনার কাছে এই আর্জি পেশ নয়, এখানে তার চেয়েও বেশী প্রাপ্তি আছে। নীরদবরণের সঙ্গে সান্ধ্য-বৈঠকে শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন যে বারো বার সংশোধন করে তবে প্রথমপর্ব শেষ করেছিলেন তিনি। Mother এর আশ্রমে আসবার পূর্বেই এই কাব্যের পত্তন হয়। অবশ্য এতদিন ধরে লেখায় কিছু কিছু variation of tone থাকতে বাধ্য। আর তাঁর নিজের কথাতেই বলি, নেই "drastic economy of word and phrase" অর্থাৎ ভাষা হার মানছে ভাবের কাছে—মালার্মের মত thought upon thought ভাবের উপর ভাব আসছে, ভাষার উপর ভাষা, উপমার পর উপমা। বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা করে বিচার করবার আগেই মন দিয়েই বোঝা হয়ে গেছে। কাব্যের জগত শুধু যে ইয়েটসের কথায় তন্দ্রা-ময় জগত তা না (a record of a slate of trance)। এ হচ্ছে অনুভূতিময় প্রকাশময় চিন্ময় জগত ও। একত্রীকৃত (integrated) সত্তার আত্মউন্মীলনও।

সাবিত্রীর কাহিনী মহাভারতের। নি:সন্তান অশ্বপতি সন্তান কামনায় তপস্যায় বসলেন। তাঁর সিদ্ধিলাভ হলো। জগৎজননী তার কন্যারূপে অবতীর্ণ হলেন। সেই কন্যা বয়:প্রাপ্তা হয়ে দ্যুমৎসেন পুত্র সত্যবানকে কামনা করলে। নারদ এসে সাবধান করে দিলেন যে এই সত্যবান স্বল্পায়ু, বিবাহের এক বৎসর পরেই এর মৃত্যু অবধারিত। সব জেনেও, নিয়তির এই নির্দেশ নিয়েও সাবিত্রী স্বেচ্ছায় এই বন্ধন পরলেন—তারপর বিধিনির্দিষ্ট দিনে অরণ্যের গভীর সমারোহের মাঝখানে, শ্যামশ্রীর দ্যোতনার মধ্যেই মৃত্যু এসে নিয়ে গেলো সত্যবানকে। সাবিত্রী চললেন, পিছু পিছু, যমের সঙ্গে তর্ক করলেন, তাকে বোঝালেন—মৃত্যুর উপরে অমৃতময়ী জয়ী হলেন, নিয়মের (অর্থাৎ যমের) নিগড় ভাঙলেন—ফিরে পেলেন তার স্বামীকে, তার দয়িতকে। এই কাহিনীকে কবি শ্রীঅরবিন্দ কি রকম ভাবে অপরূপ কল্পনায় ও কাব্য সুষমায় মণ্ডিত করে মানুষের চিরন্তনী সাধনার প্রতীক করে দিলেন তারই আভাস 'সাবিত্রীতে'।

কাব্য আরম্ভ হলো এক দিব্য উন্মেষের চেতনায়। জ্যোতিষাং জ্যোতি। জাগৃহি জননী—জাগো, জাগো—ভোরের শুকপাখী ডাকে—জাগরণের লগ্ন এসেছে। সামনে পিছনে উর্ধে অধে সব ঘিরে সব নিয়ে কালো কালো অন্ধকার—একটা জমাট নিরেট কালো, কায়াহীন রূপহীন বোবা তিমির নিবিড় অচেতনা। সেই নৈঃশব্দের মহা-সাগরে মহাতামসী শুয়ে আছেন—তারই গর্ভে আছে আলো। এখানে রূপ নেই, রস নেই, শূন্য, মহাশূন্য—নিঃসীম নিথর স্তব্ধতা। তখনও অসীম সীমার বন্ধনে ধরা দেননি, তখনও অনাগুন্তবান সান্তের রূপ দেননি, পদ্মনাভ তখনও অনন্ত শয্যায়, তখনও ধ্যানমগ্ন মহাদেব, তিন-কাল ত্রিনয়ন মেলি দিক-দিগন্তর দেখেননি, জগতের আদি অন্ত থরথর কেঁপে ওঠেনি। মহাতামসী বসে আছেন, মেঘাঙ্গী বিগতাম্বরা—কাল-নিরোধজঙ্ঘা, কালভয়বারিণী সেই তারিণী, মহাকালের (Time space, continunum) হৃদি পরে যিনি পা রেখেছেন যে পরাশক্তি। কে তিনি, কী তিনি, তার রূপ কী, তার সংজ্ঞা কী—সবই যে তন্দ্রাতুরা—কিন্তু সে তন্দ্রা সৃষ্টিমুখী (creative slumber)। তাই বুঝি সাধক গান গায়—

নিবিড় আঁধারে তোর চমকে অরূপরাশি
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরি-গুহাবাসী

কিন্তু দিশাহারা সেই অন্ধকারের মাঝে স্পন্দন জেগে ওঠে—নতুন সৃষ্টির বেদনা। সমাধিস্থ শিবের কি যোগ-ভঙ্গ সুরু হলো—নামহীন অচিন্তনীয়ের আবেগ উথলে উঠছে—কি যে হবে তা কেউ জানে না—কিন্তু ভোরের আগের প্রহরই যে দেবতাদের জাগৃতির লগ্ন—তন্ত্রে বলে রাতের শেষ প্রহরই যে কালীর রাত—মহাতিনিশায় সাধককে যে তাই বসতে হয় তার শবাসনে বীরাচারী দিব্যাচারী—চতুর্দিক আলো করে মা নামবেন—শুধু বর আর অভয় নিয়ে নয়, শুধু শক্তি আর মুক্তি নিয়ে নয়, ভক্তি ও প্রেম নিয়েও—সর্বাঙ্গীণ সাধনাই যে আলোর সাধনা, অমৃতের সাধনা—অন্ধকারকে চলে যেতে হয়, মৃত্যু হয়ে ওঠে অমৃত। তাই বাণী উঠলো—অনাহত সে ধ্বনি—তমসঃ পরস্তাৎ—আসছেন, তিনি আসছেন—আকাশের দিকে দিকে প্রতিটি রন্ধ্রে সেই শুভ্রতার আভাস, সেই দিব্যদ্যুতির পরশ—রাত্রির গভীর তিমির ভেদ করে মহা-তামসীর গর্ভ হতে মহাকালীর কোল হতে তিনি আসছেন—আলোর দেবতা—পরম অভ্যুদয়—বহ্নিমান্‌, দীপ্তিমান, জ্ঞানবান, রূপময়, প্রকাশময়, সেই ভদ্র—সেই ময়োভব সেই ময়স্কর, অনন্ধকার। অনালোকিত অনন্তের মন্দিরে (unlit temple of eternity) দীপ জ্বলে উঠলো। কবির কল্পনা এই উপমাটিকে গ্রহণ করলে—কারণ প্রতি-দিনের সূর্যোদয়ের পথের সঙ্গে এই ঘটনাটি (across path of the divine event) আমাদের জীবনে অচ্ছেদ্য ও তাই সহজবোধ্য। আমাদের এই স্থূল পৃথিবীর জগতে প্রতিদিন ভোর হচ্ছে, আলো নামছে, দীপ্ত কৃপাণ হস্তে সপ্তাশ্ববাহিত দেবতা বহ্নিবীণা বক্ষে লয়ে দীপ্ত কেশে উদ্‌-বোধনী বাণী শোনাচ্ছেন—

আলোকের বর্ণে বর্ণে নির্নিমেষ উদ্দীপ্ত নয়ন করিছে আহ্বান, আমার মনের জগতেও, বুদ্ধির ক্ষেত্রেও, বোধির পরিবেশেও এই অন্ধকার, এই কালো, এই সংশয়, এই বেদনা, বিরোধ বিবাদ বিতণ্ডা। সেখানেও আমরা কর্ম-ক্লান্ত জীবনের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার থেকে চাইছি একটু আলোর রেখা, একটু বোধির দীপ্তি, একটু বিজ্ঞানের প্রভাস। এই জাগা বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়। এই জাগরণ মহাপ্রকৃতির জগতেও চলছে, বিশ্বাতীত জগতেও সেই ধারা—মহাসতীর গর্ভ হতে জাগবেন মহাবিষ্ণু পরমশিব। বিবশ বিশ্ব চেতনায় জাগবে। মায়ের কোলে যেন একটি অজ্ঞান শিশু বসে—সে চাইছে আশ্রয়, সে চাইছে বুকের অমৃত, সে চাইছে অজ্ঞানের মাঝে একটু আলো। হ্যাঁ, কালোর ভেদ হলো (tusensibly somewhere a breach began) তারপরেই একটু রং, একটু আলো—পতনোন্মুখ কালোর বহির্বাস গেলো ছিঁড়ে—আলোর বন্যা ছড়িয়ে গেলো, ছাপিয়ে গেলো দিকে দিগন্তরে—হলো এক জ্যোতির্ময় উন্মেষ। দ্রুত পরিবর্তনশীল চিত্রলেখার (Rapid series of transitions) মধ্য দিয়ে কবি নিয়ে গেলেন তার সোনার তরীটিকে। বৃহদারণ্যকের ঋষির মত খুলতে লাগলেন তার ঝাঁপিটি—আবরণ উন্মোচনের পালা। কালের গহ্বরে, অন্ধকারের গভীরে, সীমাহীন শূন্যে, অভীপ্সার অগ্নি এসে লাগলো একটি স্ফুলিঙ্গের মত, বপন

হলো একটি চিন্তার কণা, জন্ম নিলে নতুন এক অনুভূতি, কাঁপতে লাগলো একটি হারাণো স্মৃতি—

এ যে অনেকদিনের, অনেকদূরের, বিস্মৃত অতীতের পদধ্বনি। এ যেন রবীন্দ্রনাথের

কোন দূরের মানুষ এল যেন কাছে
তিমির আড়ালে, নীরবে দাঁড়ায়ে আছে
বুকে দোলে তার বিরহ ব্যথার মালা
গোপন মিলন অমৃত গন্ধ ঢালা
মনে হয় তার চরণের ধ্বনি জানি

শ্রীঅরবিন্দের শেষের কবিতাতেও পড়ি এই কথা—

In some faint down
In some dim eve,
Like a gesture of light
Like a dream of delight
Jhon comest nearer, nearer to me.

কোন ছায়াঘন প্রত্যুষের আলোতে
কোন বিস্মৃত সায়াহ্নের ধূসর প্রাঙ্গণে
দয়িততম তুমি আসো
দীপশিখা সম
আনন্দ স্বপন মম

তুমি আসো, আরো, আরো নিকটে আরো—

কিছুই হারায়না, কিছুরই বিলুপ্তি নেই—আছে সব আছে, পরমের মধ্যে বিলীন হয়ে আছে। তাকে নব স্বীকৃতিতে, নব রূপায়ণে, নব জাগরণে বিভাসিত করাই হলো সাধনা, এ সাধনা শুধু মানুষের প্রকার নয়, মহাপ্রকৃতির ও, ভগবতী-সত্তারও পশুপক্ষীকীট আব্রহ্মস্তম্ভপর্য্যন্ত যে জগৎ তারও বিরাট বিপুল যে বিশ্ব, তার প্রতিটি অনুতে রেণুতে এই সাধনা চলেছে এই আলোড়ন বলছে তোমায় নিজের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে ফিরে আসতে হবে আবার মায়ের কোলে—যিনি ছড়িয়ে পড়েছেন তিনিই গুটিয়ে নিচ্ছেন Return of the Spirit to itself. যোগ মানেই যুক্ত হওয়া সাধনার সেই পন্থা। যে ধারা স্মৃতি মুছে গেছে (had blotted the crowded truths of the part) তাকে নতুন করে জাগিয়ে তোলো, নতুন করে সৌধ গড়ে তোলো। মাভৈঃ অভীঃ—সবই সম্ভব যদি ঊর্ধে'র পরশ থাকে।

আশা জাগছে, পৃথিবীর বুকে, মানুষের মনে আর বিশ্বসত্তার নির্জ্জন অন্ধকারের মাঝে—ও সবই যে এক সুরে বাঁধা, এক তারে সাধা সুসংজ্ঞানস্তিমিত বলেই অসুর জেগে ওঠেন। এখানে নিত্যরাস, মনে বনে বৃন্দাবনে এক হয়ে গেলেই সেই আলো জাগে, চোখ খোলে —সৃষ্টিদৃষ্টি এক হয়—তখন আর প্রশ্ন করতে হয়না কে জানে কে তুমি—চিরকালের সেই চিরন্তনী জিজ্ঞাসা—

কো অদ্ধা বেদ কইহ প্রবোচৎ কুত আতা কুস্নাত ইয়ং বিসৃষ্টি :

অর্বাগ দেবা অস্য বিসর্জনেন যা কো বেদ যত আবভূব বেদের ঋষি যে প্রশ্ন করেছিলেন উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞ যাকে অবিজানতাং বললেন, আজকের কবিও পশ্চিম সাগরতীরে নিস্তব্ধ সন্ধ্যাতেও সে প্রশ্নের উত্তর পেলেন না—কো বেদঃ! চরম প্রশ্নের উত্তর হয়ত নেই—কারণ যাকে নিয়ে উত্তর, তিনিই যে অনন্ত, তিনিই সীমাহীন, তিনি যে বিজ্ঞাত ও অবিজ্ঞাত মিলিয়ে—তবু সাধকের চিন্তায় মরণের অতীত স্তরে যে একটা সুদৃঢ় প্রতীতি আসতে পারে তারই পরিচয় বহন করে নিয়ে চলেছে শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী।

হে মাধবী দ্বিধা কেন—র মত আলোকলতার যে দ্বিধা ছিল তাও মুছে গেল। প্রথমে যা ছিল একটু জ্যোতির্ময় কোণ (lacent corner) তাই হয়ে উঠলো আলোর বন্যা। আলোকের ঝরণা ধারায় ধুয়ে গেল যেন সব। মহাভাস্বর মহাদীপ্ত মহাসৌম্য মহেশ্বর মহাকাল ধীরে ধীরে তিমির বন্ধন থেকে জেগে উঠলেন। বৈদিক কবি দিন ও রাত্রির সংগ্রামের মধ্যেই এই উষাকে দেখেছিলেন, জাগিয়েছিলেন, প্রতীক রূপে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শাশ্বত আর নশ্বরের মাঝে, আলো আর অন্ধকারের মাঝে দূতী তিনি। তিনি মঘোনী, তিনি রিতাবরী, তিনি দাঁড়িয়ে আছেন—আছেন জ্ঞান ও অজ্ঞানের মাঝে। স্বর্গের প্রখর দীপ্তিকে তিনি দেখিয়ে দেন, তারপর ধরণীর ধ্যানমন্ত্রের ধ্বনির সঙ্গে মিলিয়ে যান। কিন্তু মুছে গেল কী সেই মহা বিস্ময়, নির্মল নির্ভয়, দিব্য অভ্যুদয়, শুধুই কী প্রত্যহের ম্লান স্পর্শ, জীবনের খরবেগ, তার অশান্ত প্রবাহ, অসন্তুষ্টি, অতৃপ্তি—গ্যয়টের ভাষায়—walpurgis night, কেবলই কী আমি বলবো, আমি আর পারছি না, আমার ভাল লাগছেনা, আমার বত মানে আমি সন্তুষ্ট নই, আমার অতীতে

আমি তৃপ্ত নই, আমার ভবিষ্যৎ আমার কাছে অস্পষ্ট। উষা কিন্তু দিয়ে যায় মহান্ ভবিষ্যতের আভাস, বৃহতের, মহতের মহত্তমের বীজ হয় বপন। সাধারণ মানুষ আমরা বলি—কী হবে আমার অন্ধ অতীতে, যে অতীতে ইতিহাস হয়ে গেছি আমি—কী হবে আমার ভবিষ্যতে—ভবিষ্যৎ শেষ হয়ে যাবে আমার সঙ্গে। সাবিত্রীর কবি আশ্বাস দিচ্ছেন—না, না, তোমার অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ—সব একই কালচক্রে বাঁধা, একই সূত্রে গাঁথা—তোমার যাত্রা নিত্য—তার শেষ নেই—তোমায় চলতে হবে রূপ থেকে রূপে, পথ থেকে পথে, স্তর থেকে স্তরান্তরে, লোক থেকে লোকান্তরে, অনুভূতির অনন্ত রাস্তা দিয়ে—তবেই তোমার উর্ধ্বাশী মানবাত্মার শান্তি—অশ্বপতি ত তুমি—তোমারই যোগ—এগিয়ে যাওয়া—মহীদাস তুমি এগিয়ে চলো—আত্মসিদ্ধির যোগ ত সেইখানে…পাহাড়ের পর পাহাড় অতিক্রম করে, শিখরের পর শিখর…বরৈবেতে

তাহারি অন্তর মাঝে
উর্ধ্বপানে উঠিয়াছে
উজ্জ্বল সুবর্ণ গিরি
স্বর্ণদম বিচ্ছুরিত কাঞ্চন শিখর (নিশিকান্ত)

মানুষ তাই—Insatiate Seeker—আবার সে সহজ উন্মত্ত, সে বোধিচিত্ত—তার জ্ঞানপিপাসা রূপপিপাসা রসপিপাসা অদম্য—তার জীবনের বহিরঙ্গে কর্ম-শেষই শেষ কথা নয়—বাইরের নাম সংকীর্তন যেদিন সমাপ্ত হবে সেদিন অন্তরঙ্গ রসাস্বাদন সুরু হবে তা নয়, বাইরের কপাট বন্ধ না হলে ভিতরের কপাট্ খুলবেনা তা নয়, ভিতর ও বাহির এক হয়ে যাবে—শুধু চেতনার মুর্ত্তিতে নয় চেতনার ব্যাপ্তিতে চেতনার সমন্বে। বিশ্বোত্তীর্ণ আর বিশ্ব যে একই—উজিয়ে যাওয়া যেমন চাই, ভাটিয়ে আসাও তেমনি দরকার। এই বিরাটের পটভূমিকায় সহায় যে তিনিই, তাই ত স্বেচ্ছায় এই জোয়াল তুলে নেওয়া, মানবসত্তার ভার—lifted up the burden of his fate এই তো আত্মাহুতি, আত্ম-তর্পণ, আত্ম-বিসর্জন। ত্বং ধ্যায়ন্ মূঢ় চেতা অপি কবি। মহাপ্রকৃতির এই বিলোপের কথা চিন্তা করলে মূঢ়রাও কবি হয়ে ওঠে। কারণ এই পৃথিবীই হবে দিব্যের আধার। তার বীজ ত আছে নিহিত সেইখানে—পৃথ্বীসত্তার রূপান্তর কাম্য। বারে বারে জ্ঞানী-গুণী মহাজন সে আলোক পেয়েছেন, বুঝেছেন—জেনেছেন, অমৃত কলস ভর্তি অমিয় এসেছে—কিন্তু মনমন্থনে বিষ নিঃশেষ হয়নি, অজ্ঞান মন তার সাম্রাজ্য ফিরে পেয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে সে শক্তি কার্যকরী হলেও সমষ্টিগত রূপায়নে সে বারে বারে হটে গেছে, ফিরে গেছে। অমরতার স্পর্শ মরতার জগত সইতে পারেনি। আগুন এসেছে, পুরোহিত অগ্রণী অগ্নি তার শিখা জ্বেলেছেন, হোমাগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছে—কিন্তু গৃহীতার আধার বিশুদ্ধ নয় বলে শুধু কয়েকজনই সে আগুনের স্পর্শ পেয়েছেন; কিন্তু অজ্ঞান এসে সামনে দাঁড়িয়ে বলেছে—নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী। পিছনে পিছনে দুঃখ এসেছে, মৃত্যু এসেছে, খণ্ডতা এসেছে, বিচার বৈকল্য এসেছে, মলিন আবরণ পরতে হয়েছে। আত্মার এই যে দুর্দিন, এই যে দুঃখ তাপ শোক, নাশ, তবু সে ত সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করেনা—পৃথ্বীসত্তার একদিক ত উর্ধের দিকে—তার এক কোটিতে সীমা, আর এক কোটিতে অসীম—মানবসত্তার মধ্যেও ত দেবসত্তা নিহিত, সর্বব্যাপী যিনি, সর্বগত যিনি তার সঙ্গে যুক্ত। তার চেয়েও বড় কথা হচ্চে—

The Universe Mothers love was hers

পৃথ্বীসত্তা পেয়েছে সেই মহামায়ার প্রীতি তার ভালবাসা। অজ্ঞান আর নিয়তির ছদ্মাবরণে মর্ত্যের ক্লান্তি, অবসাদ আর গ্লানির মাঝখানে সেই অমৃত ও অমর্ত্যেরই ইঙ্গিত। তাই এই সবুজ-মেখলা পরা বসুন্ধরা বেদনার অর্ঘ নিয়ে দাঁড়ালো বিশ্বমাতার ছন্দকে মূর্ত করতে। আনন্দের মহাযজ্ঞে তারও নিমন্ত্রণ প্রেমঘন অভয় হস্ত প্রসারিত হলো পৃথ্বী সত্তার দিকে। সাবিত্রী জাগলেন—দৃষ্টিপাত করলেন। প্রতিটি পলে গাঁথা মহাকাশ কালসীমায় পদ ভার রেখে চলেছেন—কালাগ্নি পরিবেষ্টিত হয়ে অবোধ জীবরা কলরব করছে—সাবিত্রী জগদ্ধিতায় ব্রত নিলেন—মহান নেতৃত্বের সাথে, মৃত্যুর সাথে মুখোমুখী দাঁড়াতে হবে বজ্রের আলোতে।

Her Soul arose confronting Time and Fate Immobile in herself, She gathered force.

ভাগ্যবিধাতার লিপিকে অগ্রাহ্য করে দুর্ভাগ্যের সামনে দাঁড়াতে পারে কোন শক্তিমতী। বিধিলিপির বিধানকে

উল্টে দিতে পারে কোন পরমা। কোন জাগ্রতা কুলকুণ্ডলিনী কবির কল্পনার সাবিত্রীই তিনি। নিষ্ক্রিয় যিনি, তিনি সক্রিয় হলেন—যিনি কালাতীতা তিনি কালের বন্ধন মেনে নিলেন, তার সঙ্গে তর্ক করলেন, কালজয়ী হলেন, প্রেমের শক্তি দিয়ে তপস্যার মুক্তি দিয়ে, জীবনের ভুক্তি দিয়ে। সাবিত্রী বলেছিলেন—মৃত্যুদেব আমি তোমাকে স্বীকার করি না, মৃত্যু মানেই খণ্ডতা—মৃত্যু মানেই দ্বৈতকে স্বীকার, মৃত্যু যখন জিজ্ঞাসা করলে—কিসের শক্তিতে তুমি বিশ্ববিধাতার চিরন্তন বিধানকে উল্টে দিতে চাও নারী? সাবিত্রী বলেছিলেন—My God is Love, Swiftly Suffers all প্রেমের ঠাকুরই আমার দেবতা, আমিই ত দুঃখ ভোগ করছি, আমি জাগরী, আমি ক্রন্দসী, আমি রাণী, আমি গরবিণী আমি দাসী আমি নির্য্যাতীতা, আমি প্রেমিকা, আমি সেবিকা। আমার ঠাকুর ঐ মাটিতেও আছেন, ঐ আকাশেও আছেন দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ। সেদিন কালপুরুষকে হঠতে হয়েছিল—কারণ সেদিন সাবিত্রী দাঁড়িয়েছিলেন তপ্ত ক্লান্ত, আতুর পৃথ্বীর প্রতিনিধি হয়ে।

I am a deputy of the aspiring world
by spirits liberty I ask for all

দাও, দাও, ফিরিয়ে দাও, মুক্তিকামী মানুষের মনকে ফিরিয়ে দাও—সেই ত সত্যবান—সত্যে সে বিধৃত। তাই সাবিত্রী জেগে উঠলেন—কোনদিন—না যেদিন সত্যবানের মৃত্যু হবে। অবশ্য মৃত্যু প্রাণেরই একটি ভঙ্গিমা। প্রাণের অন্নময় ভূমি থেকে যে বিদায় নিয়েছে তাকে যমের অর্থাৎ নিয়ম চক্রের নিগড় থেকে ফিরিয়ে এনে বিজ্ঞানময় আনন্দময় ভূমিতে স্বস্থ ও আত্মপ্রতিষ্ঠ করার যে সাধনা সেই হচ্ছে সাবিত্রীর তপস্যা। অশ্বপতির যোগে পেলাম উন্মুখী মানুষের ঊর্ধারোহণের বিচিত্র কাহিনী—তার চলার বিরাম নেই, যাত্রার শেষ নেই, অনন্ত অগ্নিময় রথে সে যাত্রা—প্রতিটি পদবিন্যাসে পরিণতির সম্ভাবনা—কতো দেবতা, কতো সাধনা,কতো সিদ্ধি, কতো প্রাপ্তি, কতো জ্ঞান, কতো রূপ, কতো শাস্ত্র, কতো রূপাতীত, কতো জ্ঞানাতীত—স্তরের পর স্তর-ঊর্ধে, ঊর্ধে, ঊর্ধে—আরো আরো, আলোর পর আলো, তারপর পৌছলেন সেই উৎসে—সেখানে দুই এক—এক দুই। তান্ত্রিকের সাধনায় শিবশক্তির যুক্ত বিন্যাসে শক্তি প্রবল, শিব স্থাণু—রাধাকৃষ্ণের প্রেমে রাধাভাবই প্রবল, কৃষ্ণ আকর্ষণ করলেও আবিষ্ট হলেও। বৌদ্ধ চিন্তায় প্রজ্ঞার সঙ্গে সংসারের মিলনে একটি দিক static, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের ধ্যানে শিব আর শক্তি দুই-ই dynamic, সাংখ্যের পুরুষের মত নিষ্ক্রিয় নয়, কারণ মূলে দুইএর পিছনে আছেন এক অনির্বচনীয়।

মানুষের মধ্যে যে দ্বৈত সত্তা আছে, বেদনা তারই অন্ধকার দিকের প্রতিভূ। হাতুড়ি পিটিয়ে যেমন লোহাকে ঠিক করতে হয়, সোনাকে অলংকার করে তুলতে হয়—তেমনি দুঃখের হোমানলে, বেদনার বহ্নিতে নিজেকে পিটে পুড়িয়ে শুদ্ধ করে নিতে হয়। এটা হোল একদিক—আর একদিক হচ্ছে ভাগবতী লীলার দিক, তিনি স্বেচ্ছায় এই অজ্ঞানের আবরণ পরেছেন, সীমার জগতে ঢুকেছেন-কেন—এটা হচ্ছে তাঁর অভিব্যক্তির স্বরূপ।

মৃত্যুকে জয় করাই সাবিত্রীর যোগ। তাঁর নিজের আত্মশক্তিতে প্রবুদ্ধ হয়েই তিনি মৃত্যুর বিরুদ্ধে অমৃতত্বের যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। এই আত্মশক্তি প্রেমের ঘনীভূত শক্তি এবং সেই প্রেম শুধু মানবীয় প্রেমের প্রতীক নয়—সর্বার্থসাধক সর্বাস্তিমূলক ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য বিশ্বানুগ এক অখণ্ড ভাবের দ্যোতক্। তবু দুটো বাধা অতিক্রম করতে হয়—শক্তি এলেই প্রেম আসেনা, জ্ঞান আসেনা, এলেও বিশুদ্ধ পরিণতি নিয়ে আসেনা—আর প্রেমের ঐশ্বর্য এলেও শক্তির স্ফুরণ না হলে অত্যাচার অনাচার থেকে পৃথ্বীসত্তাকে রক্ষা করা যায়না।

সত্যবানের মৃত্যুর পর সাবিত্রী তাঁর জীবনের মিশন্‌কে রূপায়িত করবার সুযোগ পেলেন—মৃত্যু তাকে নেতৃত্বের লোভ দেখালে, সংসার সমাজ সেবার লোভ দেখালে, আত্মমুক্তির লোভ দেখালে—কি হবে আর এগিয়ে—পৃথিবীতে সবই তুচ্ছ, সবই মরণশীল—কিছুই থাকে না। সাবিত্রী বললেন ভুল—এই পৃথিবীই দিব্যের কাছে Wager wonderful' for a divine game, এই খেলায় যোগ দিতে হবে সকলকেই, মৃত্যুর লেজ খসাতেই হবে—তখনই দেখা যাবে সে হচ্ছে ছদ্মবেশী বৃদ্ধ, অমৃতেরই এ পিঠ আর ওপিঠ। অশ্বপতির যোগে তিনি দ্রষ্টাপুরুষ, তিনি চলেছেন, দেখেছেন—বুঝেছেন। কিন্তু হিরণ্যগর্ভ, চৈতন্যঘন বিরাট যে মানসের অতীত তাঁকে যে নামতে হবে সে সোনার

কাঠির পরশে একজনকে বিশ্বাত্মলীন হলে চলবেনা—পরশপাথর ছুঁইয়ে দিতে হবে সব খ্যাপাদের। অশ্বপতির যোগ সেই transcendent Divine চেয়েছে—সাবিত্রীর যোগ তাকে নামিয়ে আনতে চেয়েছে পৃথিবীতে—ব্যক্তিগত সত্তা থেকে বিশ্বগত সত্তায়—Carries out the Divine Dynamics.

এই আশার বাণীই শোনালেন শ্রীঅরবিন্দ। কিন্তু আমরা শুনতে চাইনা, বুঝতে চাইনা। মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের কথা—

সময় হলে রাজার মত এসে
জানিয়ে কেন দাওনি আমায় প্রবল তোমার দাবী
ভেঙে যদি ফেলতে ঘরের চাবী
ধুলার পরে মাথা আমার দিতাম লুটিয়ে
গর্ব আমার অর্ঘ হোত পায়ে।

* বন্ধু স্মরণে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

তোমার জনম দিন এলো বন্ধু! এই বঙ্গভূমে,
বসন্তের সমীরণে কাননের পল্লবে কুসুমে
দোলা লাগে, কানে আসে কুহুরব রাত্রি অবসানে,
তুমি তো এলেনা ফিরে আশাবরী-সুরের সন্ধানে!
তুমি যে চলিয়া যাবে ত্যজি তব প্রবাস জীবন
ছিন্ন করি ধরণীর মায়াচ্ছন্ন সর্ব্ব আবরণ
ভাবি নাই কোনদিন, বেদনায় হে বন্ধু আমার!
স্মৃতির তর্পণ করি। কত কথা জাগে অনিবার
জানাবো কেমনে? কেন মোরে বেঁধে ছিলে
প্রীতিডোরে
প্রবাসের পান্থশালা মাঝে, একান্ত আপন করে'
যদি ছিল সাধ মনে রহিবারে হেথা ক্ষণকাল?
তোমার বিরহে হের মেঘে-ভরা দিক্‌চক্র বাল,
অন্ধকারে চমকে দামিনী, আমার গোধূলি বেলা
তোমার বিহনে বন্ধু! শোকাচ্ছন্ন—আমি যে একেলা।

প্রজ্ঞানের দীপশিখা করে লয়ে এসেছিলে তুমি,
তোমার প্রভাতে আলো হয়ে গেছে মোর জন্মভূমি।
জানি বন্ধু! মৃত্যুহীন তুমি, জীর্ণবাস সম দেহ
ফেলে গেলে লোকান্তরে যেথা রাজে তব পুণ্য গেহ,
যেথা চির আনন্দের আস্বাদন, রাত্রি আর দিন
জ্যোতির তরঙ্গে যেথা হারায়েছে, শূন্যে সবি লীন।
অরূপের আভরণে অপরূপ তুমি জ্যোতির্ম্ময়
সেথা কি তোমার মনে কভু মোর হবে পরিচয়?

বর্ষণ মুখর রাত্রে আলাপন তোমাতে আমাতে,
আশ্বিনের উৎসবের সমারোহে তুমি মোর হাতে
তুলে দিয়েছিলে গান খানি তব প্রীতি অনুরাগে,
সখা! সেই সব কথা অন্তরের অন্তস্তলে জাগে।
মুঞ্জরিয়া তব কল্পলতা, আজি কুটীর অঙ্গনে,
উৎসবের আয়োজন করে গেছে প্রাণের স্পন্দনে
ডাকিয়া আমারে। আজ তব শূন্যকক্ষ, তুমি নাই,
বন্ধু মিলনের দিন ফিরিবেন', তাই ব্যথা পাই।

তোমার আয়ুর পাতা উড়ে যাবে মৃত্যু ঝটিকায়
সংসার-অরণ্য হোতে, তুমি লবে অকালে বিদায়
ছায়া-আলোকের খেলা করি শেষ, স্বপ্নে আমি
ভাবিনাই কভু, আঁখি হোতে অশ্রু ঝরে দিবাযামী।
তব শেষ বিদায়ের দিনে নীরবতা সুগম্ভীর
ভূমি ও ভূমার মাঝে। ফেলে রেখে পরাণ গ্রন্থির
স্নায়ুসূত্র, তুমি কি আনন্দ মগ্ন চিন্ময় আলোকে,
আজি ব্রহ্ম বিহারের অমৃতের রস উপভোগে!
ধরণীর খেলাঘর ভেঙে যবে যাবো তব পাশে,
তব আতিথেয়তার পরিচয় দেবে কি উল্লাসে?

[কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের দর্শন বিভাগের পুরোধা স্বর্গত ডক্টর প্রবাস জীবন চৌধুরীর স্মরণে]

স্ত্রীণাং চরিত্রম্
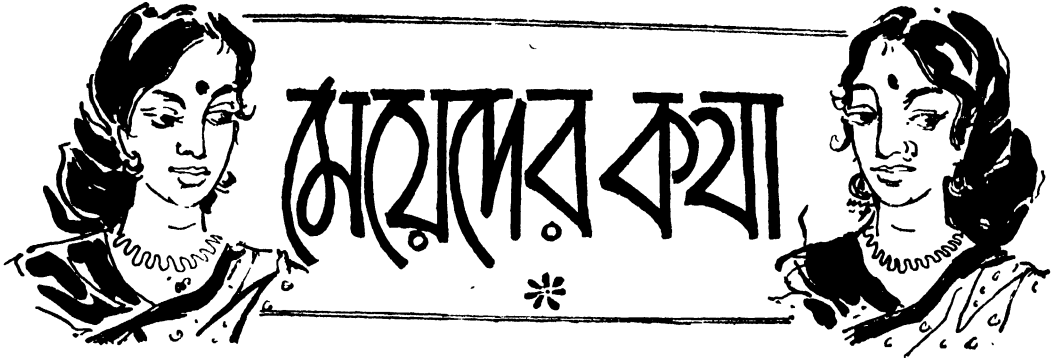
মিসেস্ গোয়েল

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

২

সুশীলা নায়ার দক্ষিণ ভারতীয় মেয়ে। অতি চালু মেয়ে। জন্ম তার এক দেবদাসীর গর্ভে। পিতা তার কেরালার এক উকীল। পিতার স্নেহ সে পায় নি, কিন্তু পেয়েছিল ইংরেজী স্কুলে লেখাপড়ার সহায়তা। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম-এ পাশ করে সে কলিকাতার এক মার্চেন্ট অফিসের চাকুরী নিয়ে আসে। ইঞ্জিনিয়ার্স এ্যাণ্ড কন্ট্রাক্টারস্ এর অফিসের রিপ্রেজেন্টেটিভ হয়ে সে নানা জায়গায় ঘোরে—কলিকাতা থেকে দিল্লী, বোম্বাই, ভিলাই, রাউরকেল্লা। কন্ট্রাক্ট পাওয়ার জন্যে যে-সব ফাঁদ পাতা দরকার সে-সব তার কোম্পানী তাকে দিয়েই করায়। কিন্তু সুশীলা অনেক জায়গায় বড় ঘা খেয়েছে। অনেক জায়গায় তার সুন্দর ইংরেজি, সুন্দর কুন্তল, তার শক্ত কালো চেহারায়ও কোন কাজ হয়নি। সে-সব বড় সাহেব যদিও তারা নিজে কালো, দেখতে কদাকার, ফর্সার উপর তাদের অসম্ভব রকমের মোহ। তার উপর ফট্ ফট্ করে ইংরেজি বলতে পারলে ওদের বুকের ভিতর থেকে কন্ট্রাক্ট বের করে আনা যায়। তাই নিজের শক্তি বাড়াবার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ পরিপূরক আকর্ষণী শক্তি সংগ্রহের চেষ্টায় ল'কলেজে ভর্তি হয়ে গেল।

পতিবিদ্রোহিনী মৌলি সেনকে মুগ্ধ করতে তার তিন দিন সময় লাগল না। সে শুধু মুগ্ধ করল না। সে মৌলি সেনকে অর্থের সন্ধান দিল। অর্থাৎ নিজের অফিসে তাকে একটা রিপ্রেজেন্টেটিভের কাজ দিল সে। মৌলির মা-বাবা অতিরিক্ত আনন্দিত হ'ল এই অর্থপ্রাপ্তিযোগ দেখে। মৌলি এখন ভেনিটি ব্যাগের বদলে কোম্পানির সেল্স্ রিপ্রেজেন্টেটিভের ব্যাগ তুলে নিয়েছে। তার মধুর ফটফট ইংরেজি, আর সুন্দর চেহারায় আর চোখের মায়ায় প্রত্যেক মক্কেল ঘায়েল হতে লাগল। সমৃদ্ধি বাড়তে লাগল কোম্পানীর।

বড় একটা কন্ট্রাক্ট আদায় করার কাজে সুশীলা আর মৌলিকে যেতে হল দিল্লী। তারা একটা সাহেবী হোটেলে উঠল। কোম্পানীর খরচে যত রকমের সম্ভোগ সম্ভব সবই করল। কন্ট্রাক্ট দাতা বড় সাহেব আর তার পি-এ-কে আপ্যায়িত করল হোটেলে এক নাচের অনুষ্ঠান সহ-যোগে। কিন্তু নাচের শেষে যা ঘটল তার জন্য মৌলি মোটেই প্রস্তুত ছিল না। নাচতে নাচতে কায়দা করে কন্ট্রাক্টদাতা দাড়িওয়ালা বড় সাহেব মত্ত অবস্থায় মৌলিকে টেনে নিয়ে গেল নৃত্যগৃহের পার্শ্বস্থ গুপ্ত গৃহে। সুশীলার জীবনে এ ধরণের ঘটনা কত ঘটেছে তার হিসেব নেই। কিন্তু মৌলির জীবনে এমন অঘটন এই প্রথম। একটা আকস্মিক ঝড়ে যেন তার নারীজীবনের সমস্ত কাঠামো ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে গেল। চোখের মায়া দিয়ে, মধুর

ইংরেজিতে বিদায়-ভাষণ জানিয়ে মৌলি সেদিন তার ব্যবসায়গত ভদ্রতা রক্ষা করতে পারল। সে নাচের ঘর থেকে বস্তুত অভদ্রভাবেই ছুটে চলে গেল। সুশীলা ঘুঘু মেয়ে। সমস্ত ব্যাপারটা সে অকাট্য ব্যাখ্যায় জলের মত বুঝিয়ে দিয়ে ক্ষমা চাইলো। তাতে বড় সাহেব বিরক্ত হবার সুযোগ পেলেন না।

মৌলি ও সুশীলা কণ্ট্রাক্ট আদায় করে কলকাতা ফিরল। মৌলি সুশীলার সঙ্গে তিনদিন কথা বলে নি। সুশীলা অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে তবে তার আড়ি ভাঙ্গল। বলল, তোর যদি কিছু হয়ই তবে কোম্পানী থেকে আমি ক্ষতিপূরণ আদায় করে দোব। এমন আমার কতবার হয়েছে।

আশ্বস্ত হল মৌলি। সুশীলার সঙ্গে চলা বসা খাওয়ার মাত্রা এখন আরো বেড়ে চলল। বাসে ট্রামে দুজনে ধাক্কাধাক্কি করে প্রতিযোগিতার ভাব নিয়ে উঠা-নামা দুজনেরি বেশ ভাল লাগত। কিন্তু হঠাৎ কি বিপদ হলো? নামবার সময় একদিন মৌলির ধাক্কায় সুশীলা পড়ে গেল বাস থেকে। ভেঙ্গে গেল তার একখানা হাত—যে হাত দিয়ে মৌলিকে সে টেনে নাচের ঘরে বড়সাহেবের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছিল। সুশীলাকে ট্যাক্সিতে করে হাস-পাতালে নিয়ে ভর্ত্তি করে দিয়ে এল মৌলি। মৌলির মা-বাবা খবর শুনে হাসপাতালে গেল সুশীলাকে দেখতে। পরিবারের এত বড় বন্ধুকে না দেখলে বড় অকৃতজ্ঞতা হবে না? সুশীলার হাতে তখন প্ল্যাষ্টার লাগানো হয়েছে। সুশীলা শয্যায় শুয়ে আছে। মুখে বিরক্তির ভাব। কথা প্রসঙ্গে সে মৌলির মাকে বলল, মৌলিই তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে। অত্যন্ত দুঃখিত হলেন সঞ্জয়বাবু আর পাঞ্চালী দেবী। বাড়ী এসে সঞ্জয়বাবু মৌলিকে এ নিয়ে একটু ভর্ৎসনা করলেন। যে রকম ভদ্রলোক সারা জীবনই করে এসেছেন। তাতে যোগ দিলেন পাঞ্চালী দেবীও।

প্রথমত শুনেই অবাক্ হল মৌলি। দুর্ঘটনা থেকে তাকে বাঁচাবার জন্যে এত করল মৌলি, আর সুশীলা বলে কিনা একথা! আকস্মিক উত্তেজনায় ফেটে পড়ল সে। ছেলে দুটিকে সামনে পেয়ে প্রথমত তাদের পিঠেই এক-চোট ঝাল ঝাড়লে। "ও কী করছিস? ওদের কি অপরাধ?" বলে ধমক দিলেন সঞ্জয়বাবু। মৌলির চেহারা তখন দেখে কে? তার বড় বড় চোখ দুটি জবা ফুলের মত লাল হয়েছে। দুধে আলতায় মুখখানা রক্তিম হয়েছে রাগে। চীৎকার করে উঠল সে। "আর কথা বলতে যেয়ো না। একটা নষ্টা মেয়ের কথায় বিশ্বাস করে তোমরা আমাকে শাসাচ্ছ?"

"নষ্টা মেয়েকে তো আমি ডেকে আনিনি। তুমিই কোথা থেকে জোগাড় করেছ।"

এবার রাগে আর কথা বলতে পারল না মৌলি। মূর্চ্ছা হল তার। ডাঃ দত্তকে ডাকা হল। তিনি প্রাথমিক চিকিৎসা করে বলে গেলেন, "এ কেস্‌টা জটিল মনে হচ্ছে। আপনারা সাইকোলজিষ্ট ডাঃ অমলা মণ্ডলকে দেখাবেন একটু সুস্থ হলে।"

জগৎমণ্ডলের মেয়ে ডঃ অমলা মণ্ডল। বাল্যকাল থেকে খুব ভাল মেয়ে তিনি। স্কুলের সেরা ছাত্রী ছিলেন। সাইকোলজির পরীক্ষায় এম-এতে প্রথম স্থান লাভ করেন। দু-বছর আগে ডক্টোরেট পেয়েছেন সাইকোলজিতে। তারপর ক্লিনিক খুলেছেন ল্যান্সডাউনে। বয়স তার ত্রিশের কাছে। চমৎকার মিষ্টি চেহারা। পোষাকে বেশ পারি-পাট্য আছে, কিন্তু চাকচিক্য নেই।

ক্লিনিকে যখন মৌলি সেন তার মা ও বাপের সঙ্গে এল, তখন ডঃ অমলা চেম্বারেই ছিলেন। কোনও মনো-বিজ্ঞান পত্রিকার জন্য তিনি প্রবন্ধ রচনা করছিলেন। রোগীদের অপেক্ষাঘরে ঢুকে স্লিপ দিয়ে একটু বসতে না বসতেই ভিতরে ডাকলেন তাদের ডঃ অমলা। স্নিগ্ধ হাস্যে অভ্যর্থনা জানিয়ে তাদের বসতে অনুরোধ করলেন তিনি। তিন জনেই বসে পড়লেন। মা ও বাপের মাঝখানে বসলেন মৌলি। মৌলির কাছ থেকেই সব শুনলেন ডঃ অমলা। তার শারীরিক দুঃখ-কষ্টের কাহিনী। সব শুনে তার রক্তের চাপ পরীক্ষা করলেন। তারপর সকলের চোখের উপর একবার স্মিত হাসি বুলিয়ে নিয়ে বললেন, আপনাদের অনেক বিরক্তিকর প্রশ্ন আমাকে করতে হবে। দয়া করে বিরক্ত না হয়ে তার সঠিক জবাব দেবেন। তাতে চিকিৎসার খুব সুবিধা হবে।

মৌলির বাবা বললেন, "তা ত নিশ্চয়ই। তা'ত নিশ্চয়ই।"

মৌলির মা মুখটা গম্ভীর করে রইল। মৌলি শুধু দু-জনের মুখের দিকে তাকাল।

"আমার মনে হচ্ছে মিসেস্ সেন আপনি অসুখী দাম্পত্য জীবনের দুঃখে ভুগছেন।" মৌলির দিকে চেয়ে বললেন ডঃ অমলা।

"না, না, কিছু অসুখী সে নয়। তার তো স্বামীর সঙ্গে বেশ ভাব আছে। ডাঃ সেন তো প্রায়ই আসে আমাদের বাড়ী। মৌলির শাশুড়ীর সঙ্গে বনছে না তাই।" প্রতিবাদ করলো মৌলির বাবা।

মৌলির মা তেলে-বেগুনে জ্বলে বলল, "আর ঢাকতে যেয়ো না। মেয়ে আমার বড় অসুখী। সত্বরই সে এমন স্বামীকে ডাইভোর্স করবে।"

"না, না, ডাইভোর্স করার ইচ্ছে আমার এখন নেই", বলল মৌলি।

ডাঃ অমলা বুঝতে পারল ওদের কাছ থেকে কথা আদায় করে রোগিনীর চিকিৎসা করা কঠিন ব্যাপার।

"আপনার কি অসুবিধা বলুন?" মৌলিকে প্রশ্ন করল, অমলা অন্য উপায় না দেখে।

উত্তর দিল তার বাবা, "দেখুন, ও যখন তখন রেগে যায়, আর ছেলে দুটোকে বড় মারে!"

ডঃ অমলা বলল, "ও তাই? একটা কথা জানবেন, মেয়েরা যখন তাদের বাচ্চাদের মারেন, আসলে বাচ্চাদের বাপের উপর প্রতিশোধ নেন।"১

"না, না! আমি তো কখনও তাদের বাপের কথা ভাবিও না।"

"ভাবেন অজান্তে।" বললেন ডঃ অমলা।

"না, না, তার জন্যে কিছু নয়। সম্প্রতি মৌলির একটি মেয়ে বন্ধু তাকে বড় আঘাত দিয়েছে। তাই তার মনের এ দুর্দশা।" বলল মৌলির বাপ।

"কি হয়েছিল বলুন তো?" মৌলিকে প্রশ্ন করলেন ডাঃ অমলা।

"দেখুন আমার কলেজের বন্ধু সুশীলা নামার বাস থেকে পড়ে গেল। আমি তাকে টেক্সি করে হস্পিটালে নিয়ে ভর্তি করলুম। সেই আমার মা-বাবাকে বলেছে কিনা, আমি তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছি বাস থেকে।" বলল মৌলি বড় অনুযোগের সুরে।

"সুশীলা আপনার খুব বন্ধু বুঝি। আচ্ছা, ওর সঙ্গে আপনার চেনা হওয়ার পর থেকে অকপটে সব বলে যান। কোন লজ্জা করবেন না।" আশ্বাস দিল ডাঃ অমলা।

মৌলি সব বলে গেল। এমন যে দর্জাল মহিলা শ্রীমতী পাঞ্চালী গুহ তাঁরও মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। সব শুনে ধীরে ধীরে ডাঃ অমলা বললেন, সুশীলার কথা হয়ত মিথ্যা নয়। অবশ্য তাতে আপনার বিন্দুমাত্র দোষ নেই। সুশীলাই আপনাকে আসলে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে। যতখানি নীচে ফেলেছে, যতখানি আহত করেছে আপনাকে, আপনি বাস থেকে ফেলে দিয়ে তাকে ততখানি আহত করতে পারেন নি।"

"আমি সত্যি ওকে ধাক্কা দিই নি।" প্রতিবাদ করল মৌলি।

"না আপনি সত্যি ধাক্কা দেন নি। ধাক্কা দিয়েছে আপনার নির্জ্ঞান মন, যার মধ্যে সুশীলার বিরুদ্ধে অনেক ক্ষোভ জমা হয়ে রয়েছে। আসলে কথা কি জানেন, দুজন মেয়ের বন্ধুত্ব কখনও সুফল আনতে পারে না। মেয়েদের পক্ষে তাদের স্বামীরাই প্রকৃত বন্ধু। অপর পুরুষ বন্ধুর চেয়ে অপর মেয়ে বন্ধুরা কম মারাত্মক নয়।২ এসব মেয়ে বন্ধুদের এড়িয়ে চলবেন। আসলে ওরা procureress."

মৌলির বাবার মুখটা প্রসন্ন হ'ল, কিন্তু মৌলির মার মুখটা তেমনি অপ্রসন্ন।

"তা হলে এখন কি করতে হবে বলুন।' অসহায় ভাবে তাকালেন মৌলির বাবা।

---

(১) "A mother who punishes her child is not beating the child alone, in a sense she is not beating it at all, she is taking her urgence on a man, on the world, or on herself. Such a mother is often remorseful and the child may not feel resentful but it feels the blows· (the Second Sep by Simone De Beauvoir)

(২) In fact, the theme of woman betrayed by her best friend. is not mere literary connection. the more friendly two women and, (the more dangerous their duality becomes. (The Second sep)

"না চল চল, ওর কত ফি দিয়ে চল। এসব রোগ মেয়ে ডাক্তারের কাজ নয়। আরো বলেছিলুম পুরুষ-ডাক্তারের কাছে চল"—বলে উঠলেন পাঞ্চালী দেবী।

"তা যাবেন বেশ যান। মৃদু হেসে বললেন ডঃ অমলা —জানেন, মেয়েদের একটা বিশেষ আসক্তি রয়েছে পুরুষ ডাক্তারদের প্রতি।" (৩)

তিন জনে উঠে দাঁড়াল। ফি দিলেন মৌলির বাবা। মৃদু হেসে নমস্কার জানালেন ডাঃ অমলা। [ক্রমশ

(৩) Three fourths of men pursued by other erotic women are doctors.

কাগজের কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

গতবারের মতো এবারেও কাগজের কারু-শিল্পের বিচিত্র আরেক-ধরণের সৌখিন-সামগ্রী রচনায় কথা জানাচ্ছি। এ সামগ্রীটি হলো — রঙ-বেরঙের 'ক্রেপ্-কাগজের' (Coloured Crape-Paper) তৈরী নানা রকম অভিনব-ছাঁদের ফুল-লতা-পাতা রচনার শিল্প-কাজ। রঙীণ-কাগজের তৈরী বিভিন্ন-ছাঁদের এমনি সব ফুল-লতা-পাতা বাজারে বেশ চড়া-দামেই কিনতে পাওয়া যায় এবং অনেকের মতে, আধুনিক সৌখিন-সমাজে গৃহ-সজ্জার অন্যতম আবশ্যকীয়-উপকরণ হিসাবে কাগজের কারু-শিল্পের এই মনোরম-সুন্দর আলঙ্কারিক-নিদর্শনগুলি রসিকজনের কাছে রীতিমত সমাদর লাভ করে। তাছাড়া, বিশেষ কোনো উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষে স্বল্প-ব্যয়ে এবং অল্প-আয়াসে রচিত রঙীণ কাগজের তৈরী এই সব অভিনব-অপরূপ শিল্প-সামগ্রী উপহার দিয়ে আত্মীয়-বন্ধু-প্রিয়জনদেরও প্রচুর আনন্দদান করা চলে। এ ধরণের কাগজের তৈরী ফুল-লতা-পাতা নানা বর্ণে এবং বিভিন্ন ছাঁদে রচনা করা যায়। শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য, পাশের ছবিতে ফুল-পাতা-সমেত একটি গোলাপ-গাছের নমুনা দেওয়া হলো — নক্সাটি দেখলেই এ-ধরণের শিল্প সামগ্রী কি ছাঁদে রচনা করতে হবে, তার সুস্পষ্ট আভাস পাবেন।

উপরের নক্সার ছাঁদে কাগজের গোলাপ ফুল ও গাছ-পাতা রচনা করতে হলে যে সব উপকরণ প্রয়োজন, প্রথমেই তার একটা তালিকা দিই। এ কাজের জন্য দরকার — লাল, গোলাপী, হলদে কিম্বা ফিকে-নীল রঙের মজবুত-ধরণের 'ক্রেপ্-কাগজ' (Coloured Crape-Paper)। এ কাগজ দিয়ে পছন্দমতো রঙের গোলাপ ফুল রচনা করতে হবে। গোলাপ-গাছের ডাল, পাতা ও ফুলের কুঁড়ি রচনার জন্য প্রয়োজন—হালকা-সবুজ (Light Green) এবং গাঢ়-সবুজ (Deep Green) রঙের 'ক্রেপ-কাগজ'। সহরের বড়-বড় কাগজের দোকানে বিভিন্ন বর্ণের 'ক্রেপ-কাগজ' কিনতে পাওয়া যায় — কাজেই এ সব উপকরণ সংগ্রহের জন্য বিশেষ অসুবিধা ভোগ করতে হবে না। রঙীণ 'ক্রেপ-কাগজ' ছাড়া আরো যে সব সরঞ্জাম দরকার, সেগুলিও নিতান্তই ঘরোয়া-সামগ্রী — প্রায় সব বাড়ীতেই এ সব জিনিস মিলবে। এই জিনিসগুলি হলো — নক্সার খশড়া আঁকার উপযোগী খান কয়েক শাদা কাগজ, কাগজ-কাটার জন্য ছোট, বড় ও মাঝারী সাইজের গোটা তিনেক ভালো কাঁচি, গজ কয়েক সরু এবং মোটা আকারের 'গ্যাল্‌ভানাইজড্‌' টিনের তার (Galvanized Wire), তার-কাটবার ও মোড়বার উপযোগী ভালো একটি 'প্লায়াস' (Pliers) যন্ত্র, 'প্রলেপনী-বুরুষ" (Brush)

সমেত একশিশি গঁদের আঠা (Gum), একটি ভালো পেন্সিল, পেন্সিলের দাগ-মোছার 'রবার' (Eraser),

জ্যামিতিক-চক্র রচনার 'কম্পাস-যন্ত্র' (Geometrical Compass for drawing circles etc), কাগজের বুকে নক্সার প্রতিলিপি রচনার (Tracing the Designs) উপযোগী খানকয়েক ভালো 'কার্বন-কাগজ' (Carbon Paper), রঙের বাক্স (Colour-Box) ও ছোট-বড়-মাঝারী সাইজের কয়েকটি ভালো ছবি-আঁকার তুলি, কয়েকটি আলপিন (Pins) এবং যদি সম্ভবপর হয় তো কাগজ-আঁটার উপযোগী ভালো একটি 'ষ্টেপ্লার-যন্ত্র (Stapler-Punching Instrument)।

এ সব উপকরণ সংগ্রহ হবার পর, কারু-শিল্পের কাজ সুরু করার পালা। প্রথমেই পাশের ছবিতে যেমন দেখানো
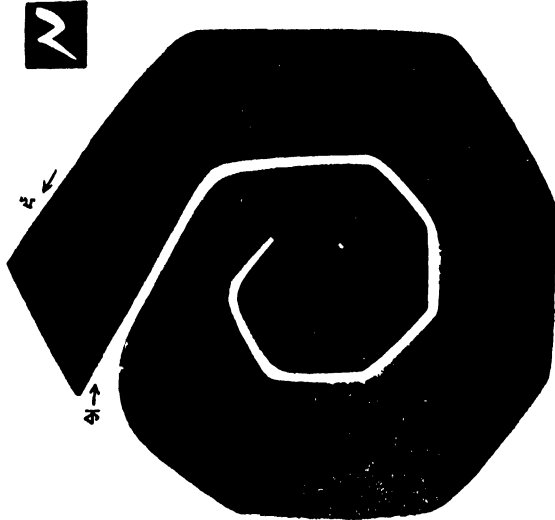
রয়েছে, তেমনি-ছাঁদে 'স্কেল-কম্পাসের' সাহায্যে কিম্বা শুধু-হাতেই (Free-hand drawing) পেন্সিলের রেখা টেনে শাদা কাগজের বুকে গোলাপ ফুলের নক্সার খশড়াটিকে (Outline of the floral design) আগাগোড়া পরিপাটিভাবে এঁকে নিতে হবে। তারপর সেটিকে পছন্দমতো লাল, গোলাপী, হলদে বা আশমানী রঙের 'ক্রেপ-কাগজের উপর 'কার্বন-পেপারের' সাহায্যে পরিপাটিভাবে 'প্রতিলিপি-চিত্রণ' বা 'ট্রেস্' (Tracing) করে নেবেন। প্রত্যেকটি গোলাপ ফুল রচনার জন্য আলাদাভাবে এই নক্সাটির 'প্রতিলিপি-চিত্রণ' বা 'ট্রেসিং' করে নেওয়া প্রয়োজন। কাজেই শাদা কাগজের উপর একটি গোলাপ-ফুলের 'খশড়া' এঁকে নিলেই, ঐ ধরণের আরো অনেকগুলি 'প্রতিলিপি-চিত্রণ' বা ট্রেসিং'-এর কাজ করা চলবে। তবে সব ফুল যদি একই আকারের না হয়ে ছোট-বড়-মাঝারি বিভিন্ন সাইজের হয়, সেক্ষেত্রে প্রয়োজনমতো আকারের আরো কয়েকটি বাড়তি-খসড়া-চিত্র (Extra designs according to different sizes) এঁকে নেওয়া প্রয়োজন।

যাই হোক, উপরোক্ত-প্রথায় গোলাপ-ফুলের 'খশড়া-প্রতিলিপি' রচনার পর, আরেকটি শাদা কাগজের উপরে গোলাপ-গাছের পাতার নক্সার 'খশড়া' এঁকে নেবেন। পাশের ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে, ঠিক তেমনি-ছাঁদে
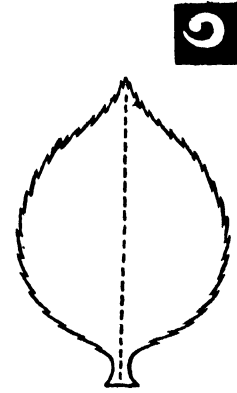
গোলাপ-গাছের পাতার নক্সাটি রচনা করতে হবে। একই আকারের পাতার বদলে যদি ছোট-বড়-মাঝারি বিভিন্ন ধরণের পাতা তৈরী করতে চান, তাহলে ফুলের মতোই আলাদা-আলাদা তিন-ছাঁদের পাতার নক্সা এঁকে নেওয়া প্রয়োজন। গোলাপ-গাছের পাতার নক্সা আঁকা হয়ে গেলে, গাঢ়-সবুজ রঙের 'ক্রেপ-কাগজের' বুকে 'কার্বন-পেপার' রেখে, তার উপরে 'খশড়া-চিত্রটিকে' বসিয়ে সুষ্ঠু-ভাবে পেন্সিল বুলিয়ে পাতার-নক্সার সুস্পষ্ট 'প্রতিলিপি' (Tracing) তুলে নিন।

এমনিভাবে বিভিন্ন রঙের 'ক্রেপ-কাগজের' বুকে গোলাপ ফুল এবং পাতার নিখুঁত 'নক্সা-প্রতিলিপি' (Exact Tracing of Designs) এঁকে নেবার পর, কাজের সুবিধামতো ছোট, বড় কিম্বা মাঝারি সাইজের কাঁচির সাহায্যে সেগুলিকে আগাগোড়া পরিপাটিভাবে ছাঁটাই করে নিতে হবে। গোলাপ-ফুলের নক্সা-আঁকা 'ক্রেপ-কাগজটি' কাটতে হবে উপরের ২নং ছবিতে দেখানো

'ক'-চিহ্নিত অংশ থেকে এবং কালো-রঙের চক্রাকার ঐ নক্সাটির দু'পাশের কিনারা বরাবর।

এইভাবে গোলাপ-ফুলের প্রতিলিপিটি ছাঁটাই করে নেবার পর, উপরের ৩নং ছবিতে দেখানো গোলাপ-গাছের পাতার নক্সা-আঁকা 'ক্রেপ-কাগজখানি' আগাগোড়া নিখুঁত-ছাঁদে কেটে নিতে হবে। তবে পাতার-নক্সার মাঝখানে 'ফুটকি'-চিহ্নিত যে রেখাটি রয়েছে, সেটির উপর কাঁচি চালাবেন না। পাতার নক্সা-আঁকা 'ক্রেপ-কাগজের' টুকরো কেটে নেবার পর, এই 'ফুটকি-চিহ্নিত' রেখা বরাবর লাইনে কাগজখানি ভাঁজ করে নেবেন এবং পরে 'গ্যাল্‌ভানাইজ্‌ড্‌' তার দিয়ে রচিত গোলাপ গাছের ডালের (Stem) গায়ে পাতাটিকে এঁটে দেবার সময়, কাগজের ভাঁজ করা অংশটিকে পরিপাটিভাবে বসিয়ে গঁদের আঠা দিয়ে মজবুতভাবে সেঁটে দেবেন।

এমনিভাবে নক্সা-আঁকা 'ক্রেপ-কাগজের' টুকরোগুলি যথাযথ-আকারে ছাঁটাই হয়ে গেলে, গঁদের আঠা দিয়ে গোলাপ-গাছের ফুল, পাতা ও ডালপালা প্রভৃতি তারের গায়ে সেঁটে জোড়া-লাগানোর কাজ সুরু করতে হবে। এবারে স্থানাভাববশতঃ সে বিষয়ে বিশদ-আলোচনা করা সম্ভবপর হয়ে উঠলো না। আগামী সংখ্যায় এ সম্বন্ধে মোটামুটি হদিশ জানাবো।

ছোট ছেলেদের 'পশমী পুলোভার'

সুলতা মুখোপাধ্যায়

গতবারে ছোট ছেলেদের 'পশমী' পুলোভারের 'পিছন' (Back) অর্থাৎ পিঠের দিকের অংশ বোনবার পদ্ধতি সম্বন্ধে মোটামুটি আভাস দিয়েছি, এবারে জানাচ্ছি পোষাকের সামনের (Front) অংশটি বুননের বিষয়।

উপরের নক্সানুসারে পুলোভারের সামনের (Front) অংশটি বুনতে হবে, ইতিপূর্ব্বে পিছনের (Back) অংশ যেমনভাবে বোনবার কথা বলেছি, হুবহু তেমনি পদ্ধতিতে। অর্থাৎ, পুলোভারের সামনের অংশটি বুনতে হবে আগাগোড়া পিছনের অংশ বোনবার পদ্ধতি-অনুসারে এবং

যতক্ষণ পর্য্যন্ত না জামার হাতার 'মুহুরী' বা 'মোহড়ার' 'সেপ্‌' (Shape) অর্থাৎ 'ছাঁদ' বোনার কাজ সুরু করবার অবস্থায় আসে, ততক্ষণ অবধি পূর্ব্বোক্ত-নিয়মে পশমের ঘর তুলে বুনে যাবেন। এবারে পরের দুই সারির প্রথমে ৬ [৬ : ৭] ঘর করে কমিয়ে নিন। তাহলে ৮১ [৮৯ : ৯৫] ঘর রইল। এখন এই ঘরগুলি দুইভাগ করে অর্থাৎ ৪০ [৪৪ : ৪৭] ঘর নিয়ে বুনে যান। তারপর পরের ছয়টি সারিতে 'মুহুরী' বা 'মোহড়ার' দিকে ১টি করে ঘর কমান। এবারে পুলোভারের সামনের অংশে 'মুহুরী' বা 'মোহড়ার' দিকের ঘর কমানো বন্ধ রেখে, জামার গলার দিকে ১ সারি বাদ দিয়ে ২ ঘর কমিয়ে বুনে, যখন বোনার-কাঠিতে Knitting-needles ১৮ [২২ : ২৪] ঘর থাকবে, তখন ছেড়ে দিতে হবে। অতঃপর, এই ১৮ [২২ : ২৪] ঘর এবারে একভাবে বুনে যেতে হবে—যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ১৩½" [১৪½" : ১৫½"] ইঞ্চি লম্বা অংশ বোনা হয়। এইভাবে বুনে ঘর বন্ধ করুন। তারপর বোনার-কাঠিতে বাকী যে ৪১ [৪৫ : ৪৬] ঘর আছে, সেগুলি বুনতে হবে। পুলোভারের সামনের অংশে গলার দিকে ১ ঘর কমিয়ে দিলে ৪০ [৪৪ : ৪৮] ঘর রইলো। এবারে অন্য অংশের মতোই বুনে যান এবং যখন ১৩½" [১৪½" : ১৫½"] ইঞ্চি অংশ বোনা হবে, তখন ঘর বন্ধ করুন। তাহলে পুলোভারের সামনের অংশ বোনার কাজ মোটামুটি শেষ হবে।

'...তবে নিশ্চয়ই আপনি ভুল করবেন'—বোম্বের শ্রীমতী আর. আর প্রভু বলেন। 'কাপড় জামার বেলাতেও কি উনি কম খুঁতখুঁতে...!' 'এখন অবশ্য আমি ওঁর জামা কাপড় সবই সানলাইটে কাচি—প্রচুর ফেনা হয় বলে এতে কাচাও সহজ আর কাপড়ও ধব্‌ধবে ফরসা হয়।...উনিও খুশী!'
'কাপড় জামা যা-ই কাচি সবই ধব্‌ধবে আর ঝলমলে ফরসা—সানলাইট ছাড়া অন্য কোন সাবানই আমার চাই না'

গৃহিণীদের অভিজ্ঞতায় খাঁটি, কোমল সানলাইটের মতো কাপড়ের এত ভাল যত্ন আর কোন সাবানেই নিতে পারে না। আপনিও তা-ই বলবেন।

সানলাইট

কাপড়জামার সঠিক যত্ন নেয়!

L. 30-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

এ কাজের পর, পুলোভারের সামনের দিকে 'গলার পটি' (Front Neckband) রচনার পালা। পুলোভারের সামনের দিকের 'গলার পটি' বোনবার সময় ১২নম্বর বোনার কাঠির-সাহায্যে বাঁ-দিকের অংশ থেকে শাদা-রঙের পশম বা 'উল' (Wool) দিয়ে সোজা দিকে ৫০ [৫৪ : ৫৮] ঘর তুলে নিন। তারপর 'গলার পটি'র মাঝখানে যে 'কোণা' (Corner), সেখানে ১ ঘর এবং পুনরায় ডানদিকের অংশে ৫০ [৫৪ : ৫৮] অর্থাৎ বাঁ-দিকের পটি যেমনভাবে বুনেছেন, ঠিক তেমনি ধরণে ঘর তুলে নেবেন। এভাবে ঘর তোলার সময় ৬ সারি, ১ সোজা ১ উল্টো অর্থাৎ 'রিবিং' (Ribbing) পদ্ধতিতে বুনবেন—তবে এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক সারির মাঝখানে ১টি করে ঘর কমাতে হবে। এই পদ্ধতি-অনুসারে উপরোক্ত ৬ সারি বোনা হয়ে গেলে ঢিলাভাবে ঘর বন্ধ করবেন। তাহলেই পুলোভারের সামনের দিকের 'গলার পটি' অর্থাৎ 'Front Neckband' বুননের কাজ শেষ হবে।

এমনিভাবে সামনের দিকের 'V-shape' বা 'ত্রিকোণাকার' 'গলার পটি' বোনার পালা শেষ হলে পুলোভারের দুদিকের 'হাতের পটি' বোনবার কাজ সুরু করবেন। বলা বাহুল্য, পুলোভারের 'হাতের পটি' দুটিই যেন একই ছাঁদের এবং একই নিয়মে বোনা হয়, সেদিকে সবিশেষ নজর রাখবেন। তাছাড়া পুলোভারের দুদিকের অর্থাৎ সামনের (Front) ও পিছনের (Back) অংশে 'হাতের পটি' রচনার আগে, জামার দুই-অংশের 'কাঁধ' Shoulder সমানভাবে মিলিয়ে রেখে, কার্পেট-বোনবার মোটা একটি ছুঁচে পশম (Wool) পরিয়ে নিয়ে পরিপাটিছাঁদে সেলাই করে একত্রে জুড়ে নেবেন। এইভাবে পুলোভারের সামনের (Front) ও পিছনের (Back) অংশ দুটিকেও পরিপাটিভাবে একত্রে মিলিয়ে নিয়ে, উপরোক্ত প্রথানুসারে 'গলার পটির' বোনা-অংশটির সঙ্গে সেলাই করে জুড়ে দিতে হবে। এ কাজের পর, ১২ নম্বর 'বোনার-কাঠি' দিয়ে ১০৬ [১১০ : ১১৪] ঘর তুলে, পুরো 'মুহুরী' বা 'মোহড়াটি' ৬ সারি 'রিবিং' (Ribbing) অর্থাৎ ১ সোজা ১ উল্টো পদ্ধতিতে বুনে ফেলুন। এমনিভাবে বুননের পর, ঘর বন্ধ করে, পুলোভারের সামনের (Front) ও পিছনের (Back) দুই অংশের দুটি পাশ সমানভাবে মিলিয়ে পূর্ব্বোক্ত-প্রথায় কার্পেটের-ছুঁচে পশম (Wool) পরিয়ে পরিপাটিছাঁদে সেলাই করে একত্রে জুড়ে নিন। তাহলেই পশমী' পুলোভারটি আগাগোড়া তৈরী হয়ে যাবে। এই হলো উপরের ছবিতে দেখানো অভিনব-ছাঁদের ছোট ছেলেদের ব্যবহারোপযোগী সুন্দর 'পশমী' পুলোভারটি বোনবার মোটামুটি পদ্ধতি।

—

সুধীরা হালদার

গতমাসের প্রতিশ্রুতিমতো এবারেও ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের আরো কয়েকটি বিচিত্র-উপাদেয় আমিষ ও নিরামিষ খাবার রান্নার কথা বলছি। প্রথমেই নিরামিষ খাবারটির রন্ধন-প্রণালীর বিষয় জানাচ্ছি।

আলুর পাকৌড়া ঃ

এই মুখরোচক নিরামিষ খাবারটি ইদানীং ভারতের সর্ব্বত্রই বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এটি অনেকটা আমাদের বাংলা দেশের 'ফুলুরী' জাতীয় খাদ্য এবং এর রন্ধন-প্রণালীও কতকটা সেই ধরণের। অল্প-ব্যয়ে এবং সল্প-আয়াসে এ খাবারটি অনায়াসেই বৈকালিক জলযোগের সময় কিম্বা ছুটি-ছাটার দিনে চায়ের মজলিসে আত্মীয়-বন্ধু আর অতিথি-অভ্যাগতদের রসনাতৃপ্তির উদ্দেশ্যে সাদরে পরিবেশন করা যেতে পারে।

'আলুর পাকৌড়া' রান্নার জন্য যে সব উপকরণ দরকার, গোড়াতেই তার একটা মোটামুটি ফর্দ্দ দিই। এ খাবারটি রান্নার জন্য চাই—প্রয়োজনমতো পরিমাণে আলু, ব্যাসন, নুন, তেল, আদা-বাটা, লঙ্কার গুঁড়ো, জিরের গুঁড়ো এবং ধনেপাতার কুচো। এ সব উপকরণ জোগাড় হবার পর, বড় একটি পাত্রে আন্দাজমতো জল দিয়ে প্রথমেই ব্যাসনটি

ভালো করে ফেটিয়ে নিতে হবে। তারপর এই জলে-মেশানো ব্যাসনের মধ্যে আন্দাজমতো পরিমাণে নুন, আদা-বাটা, লঙ্কার-গুঁড়ো মিশিয়ে আরো কিছুক্ষণ ভাল করে ফেটিয়ে নিতে হবে। এভাবে রান্নার মশলার সঙ্গে ব্যাসনটি বেশ করে ফেটিয়ে নেবার পর, বঁটি বা ছুরির সাহায্যে আলুগুলিকে বড়-বড় ডুমো অথবা চাকলা করে কুটে নেওয়া প্রয়োজন। আলুগুলি টুকরো করে কোটা হয়ে যাবার পর, উনানের আঁচে কড়া চাপিয়ে, তাইতে আন্দাজমতো তেল ঢেলে দিয়ে, রান্নার তেলটুকু গরম করে নেবেন। তেল গরম হলে, আলুর টুকরোগুলি ইতিপূর্ব্বে গুলে-রাখা ব্যাসনে ডুবিয়ে নিয়ে, কড়ার তপ্ত-তেলের মধ্যে ফেলে ভালভাবে বাদামী-রঙ করে ভেজে নিতে হবে—অর্থাৎ সাধারণতঃ যেমনভাবে 'ফুলুরী' ভাজা হয়, ঠিক তেমনি ধরণে। তা হলেই দিব্যি মুচমুচে 'আলুর পাকৌড়া' তৈরী হয়ে যাবে। রান্নার পালা চুকলে, পরিষ্কার একটি রেকাবীতে 'আলুর পাকৌড়া'গুলি সুষ্ঠুভাবে সাজিয়ে রেখে, সেগুলির উপরে অল্প জিরের গুঁড়ো আর মিহি-করে-ছাঁটা সামান্য কিছু ধনেপাতার কুচো ছড়িয়ে দিলেই, উত্তর-পশ্চিম ভারতের এই বিচিত্র-মুখরোচক খাবারটি পাতে পরিবেশনের উপযোগী হবে। এই হলো 'আলুর পাকৌড়া' রান্নার মোটামুটি নিয়ম।

মাছের ফেরেজি ঃ

এবারে যে বিচিত্র-অভিনব আমিষ-রান্নার কথা বলছি, সেটি ভারতের উত্তরাঞ্চলের, বিশেষ করে, পাঞ্জাব ও উত্তর-প্রদেশের অন্যতম জনপ্রিয় এবং মুখরোচক খাবার। এ রান্নার জন্য যে সব উপকরণ প্রয়োজন, গোড়াতেই তার পরিচয় দিই। 'মাছের ফেরেজি' রান্নার জন্য দরকার—প্রয়োজনমতো, পাবদা, 'বোয়াল', বা 'বাটা' জাতীয় আঁশ-শূন্য কিম্বা কম-আঁশওয়ালা মাছ, ঘি, ময়দা, নুন, শুকনো-লঙ্কা, পেঁয়াজের কুচো এবং টোম্যাটো।

উপকরণগুলি সংগ্রহ হবার পর রান্নার কাজ সুরু করবার পালা। রান্নার কাজে হাত দেবার আগে, মাছটিকে কুটে, পেটের ময়লা নাড়িভুঁড়ি বার করে ফেলে, পরিষ্কার জলে আগাগোড়া ধুয়ে সাফ্ করে নিতে হবে।

এবারে উনানের আঁচে কড়া চাপিয়ে, সেই কড়াতে আন্দাজমতো ঘি দিয়ে, মাছটিকে ঈষৎ ভেজে নিতে হবে। তারপর কড়ায় ঐ ঘিয়ে সামান্য ময়দার গুঁড়ো ফেলে কিছুক্ষণ খুন্তি দিয়ে নেড়ে ভেজে নেওয়া প্রয়োজন। খানিকক্ষণ এভাবে নাড়াচাড়ার ফলে, ময়দার রঙ বেশ বাদামী-ধরণের হলে, কড়াতে আন্দাজমতো পরিমাণে পরিষ্কার জল, নুন, শুকনো লঙ্কার টুকরো, টোম্যাটো ও পেঁয়াজের কুচো ছেড়ে দিতে হবে। এ সব উপকরণগুলি মিশিয়ে দেবার পর, কড়ার মধ্যে ঘিয়ে-ভাজা ময়দার জলে মাছটিকে খানিকক্ষণ ফুটিয়ে সু-সিদ্ধ করে নিতে হবে। আগুনের আঁচে কিছুক্ষণ ফোটানোর ফলে, মাছটি আগাগোড়া সু-সিদ্ধ এবং কড়ার ঝোলটি বেশ ঘন আর কাই-কাই ধরণের হলে, উনানের উপর থেকে সাবধানে কড়াটিকে নামিয়ে পরিষ্কার একটি পাত্রে সদ্য-রান্না-করা 'মাছের ফেরেজি' ঢেলে রেখে দেবেন। তাহলেই রান্নার পালা শেষ হবে। বিচিত্র-সুস্বাদু 'মাছের ফেরেজি' রান্নার এই হলো মোটামুটি নিয়ম। আত্মীয়-বন্ধু-অতিথি সমাদরের ব্যাপারে, এ রান্নাটি শুধু যে উপাদেয় হবে তাই নয়, অভিনবত্বের দিক থেকেও খাদ্য-তালিকায় এর একটি বিশেষ মূল্য আছে।

বারান্তরে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের এই ধরণের আরো কয়েকটি বিচিত্র খাদ্য-রন্ধন-প্রণালীর পরিচয় দেবার বাসনা রইলো।

॥ ভোট-রঙ্গ ॥

আগন্তুক-পথচারী : তাই তো, এ কোথায় এলুম রে বাবা!
বাড়ী-ঘর-দোর, গোটা সহরটাই যে
প্ল্যাকার্ড আর পর্দ্দার আড়ালে গা-ঢাকা
দেছে!···ব্যাপার কি.? · অষ্ট-গ্রহের
লড়াইয়ের ভয়ে?···

সহরবাসী-তরুণ : আজ্ঞে না···এ ভোট-রঙ্গ!···অষ্ট-গ্রহ
এখানে থৈ পাবে না! এ আরো
জবর লড়াই!···

শিল্পী : পৃথ্বী দেবশর্ম্মা

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার রাত্রি শেষ ২টা ১৭ মিনিটের সময় (শুক্রবার ভোর) বাংলার প্রবীণতম খ্যাতিমান সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজনীতিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় সুদীর্ঘ ৭০ বৎসর ব্যাপী অসাধারণ কর্মজীবন শেষ করিয়া ৮৬ বৎসর বয়সে সাধনোচিত ধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। যশোহর চৌগাছার সম্ভ্রান্ত ও ধনী কায়স্থ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে এম-এ পড়িয়াছিলেন এবং ছাত্রাবস্থায় সাহিত্য ও রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। অল্পকাল মধ্যে তিনি সাংবাদিকতার কাজ গ্রহণ করেন এবং সারা জীবন অনন্যসাধারণ নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া শুধু বাংলায় নহে, সমগ্র ভারতে একজন প্রখ্যাত সাংবাদিক ও বক্তারূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি প্রায় ৫০ বৎসর কাল বসুমতী সাহিত্যমন্দিরের সহিত যুক্ত ছিলেন এবং সাপ্তাহিক, দৈনিক, মাসিক ও ইংরাজি-দৈনিক বসুমতীর সম্পাদকরূপে কাজ করিয়া সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। যৌবনে তিনি সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' মাসিক পত্রের লেখক হন ও পরে কয়েক বৎসর নিজে 'আর্য্যাবর্ত্ত' নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদন করিয়াছিলেন। সেকালে বঙ্গবাসী, হিতবাদী প্রভৃতি সাপ্তাহিক পত্রিকায় এবং পরে সারাজীবন বহু বাংলা ও ইংরাজী দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিকে তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। ভারতবর্ষের জন্মাবধি তিনি ভারতবর্ষের সহিত যুক্ত ছিলেন এবং কয়েক বৎসর তাহাতে তিনি নিয়মিত ভাবে 'সাময়িক' লিখিয়াছিলেন।

প্রথম জীবনে তিনি গল্প, উপন্যাস ও কবিতা লিখিয়া সাহিত্যিক জীবন সুরু করেন এবং তাঁহার অনেকগুলি উপন্যাস বসুমতী সাহিত্য-মন্দির হইতে প্রকাশিত হেমেন্দ্র-গ্রন্থাবলীতে স্থান পাইয়াছে। তাঁহার শ্রীকৃষ্ণলীলা বিষয়ক কবিতা ভক্ত পাঠকদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল এবং তাহার মধ্য দিয়া তাঁহার অন্তরের ধর্মভাব প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা তাঁহাকে গত ৪২ বৎসর কাল অতি ঘনিষ্ঠভাবে দেখিবার সুযোগ লাভ করিয়াছি এবং তাঁহার জীবনে (শেষ ৫ দিন ছাড়া) বোধ হয় এমন দিন ছিল না—যে দিন তিনি কিছু না কিছু লিখেন নাই। তিনি জীবনে সকল অবস্থাতেই অবিচলিত থাকিতেন এবং দারুণ শোকের দিনেও তাঁহাকে নিয়মিতভাবে লেখনী চালনা

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

করিতে দেখা যাইত। তাঁহার পুস্তক পাঠের আগ্রহ এত অধিক ছিল যে তিনি নিজ গৃহে কয়েক লক্ষ টাকার পুস্তক সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া ছিলেন।

তাঁহার স্মৃতিশক্তি অসাধারণ ছিল এবং সারাজীবন ধরিয়া তিনি সর্ব্বদা নিজেকে লেখা-পড়ার মধ্যে ডুবাইয়া রাখিতেন বলিয়া বহু ইংরাজি, বাংলা ও সংস্কৃত বিষয় তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল; তিনি সর্ব্বদা সে সকল বিষয় আবৃত্তি করিতে পারিতেন। তাহার বিরাট পাঠাগারের কোন পুস্তক কোথায় আছে এবং কোন পুস্তকের কোথায় কি উল্লেখযোগ্য লেখা আছে তাহা তিনি একস্থানে বসিয়া বলিয়া দিতে পারিতেন এবং কোন উক্তি উদ্ধার করিতে তাঁহাকে নিজে উঠিয়া যাইতে হইত না, অপরকে নির্দ্দেশ দিয়া সে কাজ করাইয়া লইতেন। শুধু পুস্তকের লেখা সম্বন্ধে নহে, যে কোন ঘটনার কথাও তিনি স্মৃতি হইতে সর্বদা সাল, মাস, তারিখ প্রভৃতি বলিয়া দিতে পারিতেন। প্রথম জীবন হইতে তিনি কলিকাতার শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত মহলের সুপরিচিত থাকায় কলিকাতার সামাজিক, সাহিত্যিক,

রাজনীতিক ও পারিবারিক জীবনের বহু ঘটনা তাঁহার নখদর্পণে ছিল।

বসুমতীর প্রতিষ্ঠাতা ৺উপেন্দ্রনাথ ও তাহার পুত্র ৺সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা এত অধিক হইয়াছিল যে, সতীশচন্দ্র মৃত্যুকালে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়কে তাহার সম্পত্তির অন্যতম পরিচালক করিয়া গিয়াছিলেন এবং শেষ জীবন পর্য্যন্ত তিনি লেখক হিসাবে বসুমতীর সহিত যুক্ত ছিলেন।

তিনি ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকলের সহিত ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করিতেন এবং তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা, প্রতিপত্তি ও প্রভাব জনকল্যাণ কার্য্যে নিযুক্ত রাখিতেন।

প্রথম জীবনে তিনি বিপ্লববাদ আন্দোলনের সহিত যুক্ত হইয়াছিলেন এবং ঋষি শ্রীঅরবিন্দের সহিত 'বন্দে-মাতরম' নামক ইংরাজি দৈনিকের সম্পাদকীয় লেখক-রূপে কাজ করিয়াছিলেন।

সেকালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি ভারতীয় সাংবাদিক-দের অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবে প্রথমে ইরাকে ও পরে ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্র দর্শনে গিয়াছিলেন এবং বাংলা দেশে তিনি "সম্রাটের করমর্দনকারী সম্পাদক" বলিয়া অভিহিত ছিলেন।

অল্পকথায় তাঁহার বিরাট ও সুদীর্ঘ কর্মজীবনের পরিচয় দান সম্ভব নহে। তাঁহার জীবনে একটি জিনিষ বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার ছিল—তাহা ছিল তাঁহার সর্বদা নিজেকে লেখা ও পড়ার মধ্যে নিমগ্ন রাখা। সারা জীবন তিনি ভোর ৫টা হইতে রাত্রি ১২ টা পর্য্যন্ত সর্বদা কাজ করিয়া যাইতেন এবং কখনও কাজে তাঁহার আলস্য ছিল না এবং কখনও তিনি বাজে সময় নষ্ট করেন নাই। লোকের সঙ্গে মেলা মেশার সুযোগ তিনি সর্বদা গ্রহণ করিতেন এবং সে জন্য প্রতিদিন এক বা ততোধিক সভা-সমিতিতে যাইয়া জন-সংযোগ রক্ষা করিতেন। বক্তা হিসাবে তাঁহার সুনাম ছিল। সে জন্য সকল স্থানের সকল লোক তাঁহাকে নিজ নিজ সভায় বক্তারূপে পাইতে আগ্রহ প্রকাশ করিত।

স্বর্গত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সময় হইতে তাঁহার প্রতিষ্ঠানের সহিত ও পরিবারবর্গের সহিত হেমেন্দ্র-প্রসাদের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল—সে জন্য তিনি পরিণত বয়সে পরলোকগমন করিলেও আমরা তাঁহার অভাব বিশেষ ভাবে অনুভব করিতেছি এবং তাহার উদ্দেশ্যে অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার স্বর্গত আত্মার চিরশান্তি কামনা করিতেছি।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

তোমারে হেরিয়া মন আমাদের নতুন শক্তি পেত
আজও পাহাড়ের আড়ালে রয়েছি তাই সদা মনে হতো।
তুমি রবীন্দ্রযুগের মনীষী তুল্য তোসম কেবা?
নানা ভাবে তুমি দেশজননীর নিত্য করেছ সেবা।
সুদীর্ঘ কাল লভেছি যে আমি তব অকৃপণ স্নেহ—
কত উৎসাহ, প্রেরণা লভেছি অন্যে জানে না কেহ।

যেথায় গিয়াছ বাড়ায়েছ তুমি তব স্বদেশের মান,
কনিষ্ঠদিকে সম্মান দিতে নিজে হয়ে আগুয়ান।
গৌরবময় একটা যুগের জীবন্ত ইতিহাস—
দেখিবার সুখ লভিতাম—যেন দাঁড়ায়ে তোমার পাশ।
খাঁ খাঁ লাগিছে সারাদিন—আজ তুমি নাই তুমি নাই।
রবি-পারিজাত পরিমণ্ডলে হউক তোমার ঠাঁই।

একটি অদ্ভুত মামলা

ডঃ শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

প্রত্যুষে উপরের কোআর্টার হ'তে নিচের আফিসে নেমে দেখলাম, ঊর্ধতন অফিসারের পরিদর্শনের পর এই মামলার ডাইরিটা কাল রাত্রেই থানাতে ফিরে এসেছে। ঊর্ধতন অফিসার প্রভাতবাবু ডাইরির পাতায় কোনও মন্তব্য করেন নি। তবে একটা পৃথক শ্লিপে আমার কল্যকার অভিমত সম্পর্কে একটা মন্তব্য লিখে তিনি এই ডাইরির সঙ্গে তা সংযুক্ত করে রেখেছেন। তাই সেই মন্তব্যটির সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

"এই মামলা সম্পর্কে আপনার অভিমতটি পড়ে কৌতুক অনুভব করলাম। কিন্তু আমার মতে আপনার মনকে প্রি-ডিসপোসড্ [চিত্তপ্রস্তুতি] করা উচিত হবে না। এই মামলার তদন্তে মনকে নিরপেক্ষ না রাখতে পারলে কারও উপরই আপনি সুবিচার করতে পারবেন না। আগে থেকে একটা ধারণা মনে জেঁকে বসলে ঐ ধারণার অনুযায়ী তদন্ত চালাতে ইচ্ছা হয়। এই অবস্থায় ঐ মহিলাটির দোষ-গুলিই চোখে পড়বে, কিন্তু ঐ একই চোখে তার নির্দোষিতার প্রমাণগুলি ধরা পড়বে না। এই মহিলাটির এই বিষয়ে একান্তরূপে নির্দোষী হওয়া অসম্ভব নয়।"

আমাদের বড়-সাহেবের এই মন্তব্যটি পড়ে আমি বেশ একটু লজ্জিত হয়ে পড়েছিলাম। সাধারণত মানুষ দুই প্রকারের হয়ে থাকে, যথা—সাধারণ ও অসাধারণ। এই অসাধারণ মানুষের মধ্যে পড়ে মহাপুরুষ ও অপরাধীরা। এদের মতিগতি ও রীতিনীতি সাধারণ মানুষের সমপর্যায়-ভুক্ত না হওয়ারই কথা। এই জন্যে সাধারণ মানুষ যা করে বা বলে, তা এঁদের নিকট আশা করা অন্যায় বৈকি। কে জানে হয় তো আমি একজন দয়াবতী নারীর প্রতি অবিচারই করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু একটা প্রশ্নের সদুত্তর আমি কিছুতেই খুঁজে পেলাম না। এই দরদী মহিলাটি ঐ আহত যুবকের আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সংযোগ রাখতে নারাজ কেন? এমনি উল্টাপাল্টা চিন্তার পর আমি ঐ পাড়ায় কিছুটা গোপনে তদন্ত করার প্রয়োজন মনে করলাম।

এই দিন হাতে অন্য কোনও কায না থাকায় ভাবছিলাম যে প্রাতঃভ্রমণ করতে করতে ঐ রহস্যময়ী মহিলাটির বাড়ির আশে-পাশে একটু ঘুরা-ফিরা করে আসবো কিনা। এইরূপ একটা অদ্ভুত মামলার তদন্তে গোপন তদন্তের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আমার মত একটি দীর্ঘদেহী অফিসারের পক্ষে সকল ক্ষেত্রে ছদ্মবেশে ঘুরা-ফিরা করার মধ্যে অসুবিধা আছে। এই অবস্থায় অবাঞ্ছনীয় মানুষ সন্দেহে নাগরিকদের কাছে নিগ্রহের সম্ভাবনা তো আছেই; এমন কি এই অবস্থায় নিজেদের বিভাগের লোকেরাও আমাদের না জেনে না চিনে বেকায়দায় ফেলে দিয়ে থাকে। কল্যকার ডাইরিখানার পাতা উল্টাতে উল্টাতে ভাবছিলাম—গোপন তদন্তের সময় একজন সহকারী অফিসারকে সঙ্গে নেবো কিনা? এমন সময় ইউনিফর্ম-পরিহিত অবস্থায় জনৈক সহকারী সুবোধ রায় সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

"কালকের সেই মামলার ডাইরিটা পড়ছেন বুঝি?" আমার সামনেকার একটা চেয়ার টেনে নিয়ে তাতে বসে পড়ে সহকারী সুবোধবাবু বললেন, "মামলাটা স্যার, সত্যই দুর্বোধ্য মামলা। আমি ওপাড়ার খবর একটু-আধটু রাখি। ওদের ঐ পাড়ার লোকেদের কাছেও এই মহিলাটি রহস্যময়ী। ভদ্রমহিলা রাস্তার ধারের জানালাগুলো ভুলেও কোনও দিন খুলেন না। পাড়ার লোকজনের সঙ্গে তাঁর মেলামেশার তো কোনও প্রশ্নই নেই! তবে সাজ-সজ্জার

চটকের তাঁর অন্ত নেই। মাসিক বাঁধা মাহিনায় ওঁর একটা ট্যাক্সি আছে। এই ট্যাক্সিটা করে তিনি অফিসে যান এবং অফিস থেকে ফিরে আসেন। পাড়ার লোকের কাছে শুনেছি যে, তাঁর বাড়িতে কোনও ঝি-চাকরও কেউ কোনও দিন দেখে নি। অথচ উনি বাড়ীতে একটা টেলিফোন রেখেছেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ওঁর ঐ দ্বিতল বাটীর ওপরতলায় কোনও ভাড়াটে নেই। আমার মতে স্যার এই বাড়ির মালিককে খুঁজে বার করলে রহস্যের একটা মীমাংসা হতে পারে।"

"এ্যাঁ? বলো কি? তুমি তো দেখছি ও পাড়ার অনেক খবরই রাখো," আমি সহকারীর নিকট হতে এই নূতন তথ্য শুনে বিস্মিত হয়ে বললাম, 'তাহলে এসো, তোমাকে সঙ্গে নিয়েই ওদের পাড়াটা একবার ঘুরে আসি।"

থানার সামনে একটা পুলিশ ট্রাক যথারীতি প্রস্তুতই ছিল। দুজনে মিলে গন্তব্য স্থানের কাছাকাছি এসে ট্রাকটা থামিয়ে দিলাম। তারপর ইউনিফর্ম-পরিহিত সহকর্মীকে যথাযথ উপদেশ দিয়ে ট্রাকেই অপেক্ষা করতে বললাম। ট্রাক থেকে নেমে তাঁকে আমি নিম্নস্বরে তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে স্মরণ করিয়ে দিয়ে—আর একবার বললাম, "যদি দরকার হয় তো হুইসল দেবো। হুইসলের আওয়াজ শুনে তাড়াতাড়ি গাড়ি চালিয়ে আমাকে উদ্ধার করো।" তারপর সেখানে সহকারীকে অপেক্ষমান রেখে ইতস্তত ভ্রমণ করতে করতে আমি ঐ মহিলাটির বাড়ির সম্মুখে এসে উপস্থিত হলাম। ভোরের আলোয় এই দ্বিতল বাড়িটা সুস্পষ্টভাবেই দেখা যায়, এই বাড়ির দ্বিতলের সব কয়টি জানালাই বন্ধ দেখা গেল। উপরের ফ্ল্যাটটি খালি থাকায় ওখানকার জানালাগুলো খোলা থাকবারও কথা নয়। কিন্তু উপরের ফ্ল্যাটের ন্যায় একতলের জানালাদরজাগুলোও ভিতর হতে বন্ধ কেন? ইতিমধ্যে তো সাতটা বেজে বিশ মিনিট হয়েছে। তাহলে সত্যই ভদ্রমহিলার বাড়িতে কোনও ঝি বা চাকর নেই, কিংবা তাদের তখনও আসবার সময় হয়নি। ইতিমধ্যে ঐ আহত ছেলেটি টেঁশে গেলে তো জানাই যেতো। তা হলে? আমি আপন মনে ভদ্রমহিলার বাড়ির সামনে পায়চারী করছিলাম। এমন সময় হঠাৎ সামনের বাড়ির বারান্দায় কয় ব্যক্তির একটা চাপা হাসির শব্দ শুনে কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। বেশ বুঝা গেল যে আমাকে উপলক্ষ করেই এই হাসির উৎপত্তি। আমি আর দেরী না করে প্রথমে এই বাড়ির লোকদেরই জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা মনস্থ করলাম। এই বাড়ির নীচের বৈঠকখানা খোলাই ছিল। সৌভাগ্যক্রমে বাড়ির মালিক নিজে ও তাঁর বন্ধুস্থানীয় অপর এক ভদ্রলোক এই সময় এই ঘরে উপবিষ্ট ছিলেন।

"ঘুরছিলেন তো মশাই ঐ ভদ্রমহিলার বাড়ির সামনে," ভদ্রলোক আমাকে দেখে খেঁকরে উঠে বললেন, "এখন আবার এই বাড়িতে কেন? এটা গৃহস্থ পাড়া, মশাই। তা ছাড়া আপনাদের ব্যক্তিগত ঝগড়া বা মার-পিঠের মধ্যে আমরা নেই। সাক্ষী-টাক্ষী আমরা কারুর হয়েই দেবো না।"

"আরে এ আপনি কি বলছেন মশাই?" আমি বিব্রত হয়ে ভদ্রলোককে অনুযোগ করে বললাম, "কৈ! আমার সঙ্গে তো কারুর মারপিঠ বা ঝগড়া হয় নি। আমি আপনাদের নিকট হতে সামনের বাড়ির মহিলাটি সম্বন্ধে কিছু সংবাদ সংগ্রহ করতে এসেছি। আমার একজন আত্মীয় যুবককে কিছুকাল হতে পাওয়া যাচ্ছে না। সম্প্রতি গোপনে সংবাদ পেলাম যে সে এখানকার একজন স্বাবলম্বিনী মহিলার বাড়ীতে লুকিয়ে আছে।"

"এ্যাঁ! এই খেয়েছে" আমার এই সব কথা শুনে ভদ্রলোক তাঁর বন্ধু ভদ্রলোকটিকে উদ্দেশ করে বললেন, "তা হলে ওটা ছেলেধরার একটা আড্ডা। ভদ্রমহিলাকে বাড়ি ভাড়া দিয়ে তাহলে তো মুস্কিলে পড়লাম। শেষে আমাদের নিয়ে না পুলিশে এই ব্যাপারে টানাটানি করে। কিন্তু কৈ? খুব বেশি ছেলে-ছোকরাকে তো ওঁর ঐ বাড়িতে আসা-যাওয়া করতে দেখি নি। তবে হ্যাঁ, একটা অল্প বয়সের যুবককে মাস চারেক আগে কয়েকবার এখানে যাতায়াত করতে দেখেছিলাম বটে। একজন মাত্র বয়স্ক লোককে সম্প্রতি আমি ভদ্রমহিলার বাড়িতে কয়েক-বার ঢুকতে দেখেছি। তবে হ্যাঁ, কালকের রাত্রের কথা স্বতন্ত্র। কয়েকটা মোটরকার রাত ভোর ওর ঐ বাড়িতে এসে থেমেছিল। আমরা বিছানায় শুয়ে শুয়েই তা বুঝতে পারছিলাম। তার পর সকালে ফুট-পাতের ওপর এই মারপিঠ। বাপরে বাপ! মহিলাটির

সে কি দাপট রে বাবা! এতো দিন মহিলাটিকে কম বয়সের বলেই মনে হতো। কিন্তু এই দাপাদাপির সময় ভদ্র মহিলার রূপ যেন বেরিয়ে পড়লো। আমার মনে হয়, বয়স ওঁর চল্লিশ নিশ্চয়ই পেরিয়েছে।

এমনিভাবে নিজেদের মধ্যেই কিছুক্ষণ কথোপকথন করে উভয় ভদ্রলোকই আমাকে ঐ ভদ্রমহিলার কাছেই এই ব্যাপারে খোঁজ-খবর করবার উপদেশ দিলেন। এখুনি ভদ্রলোক দুটির নিকট আত্মপরিচয় দেওয়া আমি সমীচীন মনে করি নি। আমি ধীরে ধীরে বেরিয়ে পড়ে ভদ্র-মহিলার বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়িয়েছি মাত্র, এমন সময় হঠাৎ প্রায় চার পাচ জন লোক কোথা থেকে এসে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। এই ভাবে আক্রান্ত হয়ে ভীত হওয়ার চেয়ে আমি বিস্মিতই হয়েছিলাম অধিক। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে আমি আপন কর্তব্য ঠিক করে তাদের প্রতি আক্রমণ শুরু করে দিলাম। আমাকে এই অবস্থায় দেখে সামনের বাড়ির ভদ্রলোক দুজন বেরিয়ে চীৎকার শুরু করে দিলেন, "আরে সকাল থেকে পাড়ায় এ সব কি? আরে দাদা, ওপরে গিয়ে থানায় এখুনি ফোন করো। পুলিশ! পুলিশ!"

ভদ্রলোকদের আর পুলিশ ডাকবার প্রয়োজন হয় নি। অদূরে পুলিশ ট্রাকে উপবিষ্ট সহকারী দূর হতে আমার এই বিপাক দেখতে পেয়েছিলেন। মোটর ট্রাকটি সজোরে চালিয়ে তিনি ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হলেন। ইউনিফর্ম পরিহিত সহকারীকে দেখা মাত্র আততায়ীর দল নিমেষে অলি-গলি দিয়ে উধাও হয়ে গেল। ইতিমধ্যে পাড়ারও বহু লোক সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু সেখান-কার কোনও ব্যাক্তিই এই আততায়ীদের কোনও হদিস দিতে পারলো না। কিন্তু এত গোলমালের মধ্যেও আমাদের সে ভদ্রমহিলা মিস্ অমুকরাণীর এক তলার ফ্ল্যাটের একটি জানালাও কাউকে খুলতে দেখা গেল না। এদিকে আমাকে পুলিশ বলে বুঝে বিপদের আশঙ্কায় পাড়ার লোকেরা যেমন ত্বরিত গতিতে সেখানে জমা হয়েছিল, তেমনি ত্বরিত গতিতেই তারা যে যার বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ে নিমেষের মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে গেল। অগত্যা আমি সহকারীকে নিয়ে সেই সামনের বাড়ির বাইরের ঘরটার মধ্যে আর একবার ঢুকে পড়লাম। ভদ্র-লোক ও তাঁর বন্ধুবর তখনও তাঁদের সেই বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছিলেন।

"এইবার বোধ হয়, স্যার, আপনি বুঝতে পারছেন যে আমি একজন ছদ্মবেশী পুলিশ অফিসার", আমি ভদ্রলোক-দ্বয়কে আশ্বস্ত করে বললাম, "প্রথমে আপনাদের কাছে নিজের প্রকৃত পরিচয় না দেওয়ার জন্য ক্ষমা চাচ্ছি। এখন দয়া করে আমাকে আপনাদের একটু সাহায্য করতে হবে।"

আমার এই কথায় ভদ্রলোক তাঁর ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত হয়ে উঠলেন। আমাকে পুলিশ অফিসার জেনে তিনি বারে বারে তাঁর ত্রুটি স্বীকার করে ক্ষমাও চাইলেন। এর পর আমার অনুরোধে নিম্নোক্তরূপ একটি বিবৃতিও তিনি প্রদান করেছিলেন। তাঁর সেই বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"আজ্ঞে; আমার নাম শ্রীঅমুক, পিতার নাম ৺অমুক। এই বাড়ির আমি মালিক এবং এইখানেই সপরিবারে আমি বসবাস করি। এই সম্মুখের বাড়িটি আমার এক বন্ধুর। সম্প্রতি সপরিবারে তিনি কাশীবাসী। আমিই এই বাড়ির ভাড়া-টাড়া আদায় করে তাঁকে পাঠাই। ঐ বাড়ির ওপরের ফ্ল্যাটটি খালি নেই। তবে ওটা বন্ধই থাকে। এক ব্যক্তি ওটা ভাড়া করে ভাড়ার টাকা নিয়-মিত মনিঅর্ডার করে পাঠায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত ওখানে তারা বসবাস করলো না। প্রায় ছয়মাস এইভাবে চলেছে। নীচের ভদ্রমহিলাটি আট মাস হলো এখানে এসেছেন। ভাড়া-টাড়া অবশ্য তিনি নিয়মিতই দিয়ে থাকেন। অন্তত এই ব্যাপারে তাঁর ওপর আমার কোনও অভিযোগ নেই। তবে, হাঁ হুঁ হাঁ, এই—তাহলে সব কথা খুলেই আপনাকে বলতে হলো। ভদ্রমহিলা একাই তাঁর ফ্ল্যাটে থাকেন। শুনেছি মোটা টাকা বেতনে কোন অফিসে তিনি চাকুরি করেন। বয়েস তাঁর গড়িয়ে পড়লেও নিজেকে তিনি এখনও ছেলেমানুষই মনে করেন। এতো সাজগোজের ঘটা, এই বয়সের কোনও মহিলার মধ্যে আমি দেখি নি। প্রথম প্রথম তাঁর চাল-চলন ভালোই দেখতাম। কিন্তু মাস দুই আগে উনি ওঁর হাঁটুর-বয়সী একটি যুবককে সঙ্গে করে প্রায়ই তাঁর এই বাড়িতে ফিরতেন। এই নিয়ে পাড়ার ছেলেরা ওঁদের ঠাট্টা

বিদ্রূপও করেছে। এই সম্বন্ধে তিনি কয়েকবার আমার কাছে অভিযোগও করে গিয়েছেন। তবে সেই ছেলেটির সহিত তাঁর প্রকৃত সম্পর্ক সম্বন্ধে আমাকে তিনি ভেঙ্গে কিছু বলেননি। আর আমিও তাঁদের ঐ সব বিষয়ে কোনও জিজ্ঞাসাবাদও করিনি। আজ সকালে আমি প্রতিদিনের অভ্যাস মত এই ঘরের জানালা খুলে বসে আছি, এমন সময় একটি আধা-বয়সী ভদ্রলোক এসে তাঁর দরজায় বহুক্ষণ ধরে ধাক্কা দিতে লাগলো। অনেক পরে ভদ্রমহিলা বার হয়ে এসে তাঁকে কি বললেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভদ্রলোক তাঁর বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ছিলেন। কিন্তু ভদ্রমহিলা বোধহয় তাকে অন্যসময় আসতে বলছিলেন। এমনি কথা কয়টির পর তাঁদের মধ্যে ধাকাধাক্কি মারপিট শুরু হয়ে গেল। খুব নিবিড় সম্বন্ধ না থাকলে এমনি ধাক্কাধাক্কি মারপিট হতে পারে? ভদ্রলোক চলে যেতে যেতে শাসিয়ে গেলেন—"যেও! তাহলে আমি পুলিশে সব কথাই খুলে বলবো।" ভদ্রমহিলাটিও প্রত্যুত্তরে রাগে গজগজ করতে করতে তাকে জানালেন, "আমিও জেন নিঃসহায় নই। এখুনি ওদের আমি টেলিফোনে জানিয়ে দিচ্ছি।" এদের বচসার মধ্যে মাত্র এই একটি উক্তিই আমি স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিলাম। এর একটু পরে আপনাকে ওর বাড়ির সামনে পায়চারী করতে দেখে মনে করেছিলাম যে সেই আগের লোকটাই বুঝি নির্লজ্জের মত আবার ওঁর বাড়িতে আসতে চাইছে। এর পর আপনাকে আমার বাড়ি ঢুকতে দেখে মনে করছিলাম, ঐ লোকটা বুঝি এবার আমাকে সাক্ষী খাড়া করতে চায়। যাই হোক মশাই, আমার এই ভুলের জন্য ক্ষমা চাইছি। তবে কি জানেন মশাই। পরের কথায় কান না দেওয়াই ভালো। কিন্তু মজা দেখবার জন্য আমাদের ছেলেমেয়েগুলো পর্যন্ত যে দোরগোড়ায় ভিড় জমায়। ওদের জন্যই না যত কিছু আমার ভাবনা।"

ভদ্রলোকের এই বিবৃতিটি আমাদের সমস্যা না কমিয়ে বরং আরও বাড়িয়েই দিলে। এ'ছাড়া এই বাড়ির নীচের ওপরের ফ্ল্যাটটা সমভাবেই সমস্যা-সঙ্কুল বলে মনে হলো। এই বাড়ির ওপরের ফ্ল্যাটের ভাড়াটিয়া সেটা ভাড়া নিয়ে সেখানে বাসই বা করে না কেন? সকালের আগন্তুক তা'হলে কে? ভদ্রমহিলার কোনও পূর্ব-প্রেমাস্পদ—না সে ঐ আহত যুবকের কোনও আত্মীয়? এই দুর্ঘটনা সম্বন্ধে খবর পেয়ে তার কোনও আপনার লোকের পক্ষে তার খোঁজে সেখানে আসা অসম্ভব ছিল না। এদিকে ভদ্রলোকের এই বিবৃতি হতে বুঝা গেল যে, তিনি কন্যাকার দুর্ঘটনা সম্বন্ধে অবগত হতে পারেন নি। তা'হলে ঐ যুবককে খুব সাবধানেই আক্রমণ করা হয়েছিল। আমি ধীরভাবে ভদ্রলোকটির বিবৃতিটি লিপিবদ্ধ করে তাঁর নিকট হতে আরও কয়েকটি তথ্য সংগ্রহ করতে মনস্থ করলাম। এই সম্পর্কে আমাদের প্রশ্নোত্তরগুলি নিম্নে লিপিবদ্ধ করে দেওয়া হলো।

প্রঃ—আচ্ছা! এই বাড়ির উপরতলার ভাড়াটিয়ার সঙ্গে নীচের তলার ঐ ভদ্রমহিলার কি কোনও সম্পর্ক আছে? ওপর তলার ভাড়াটিয়ার নাম ধাম কি আমাকে আপনার বলতে হবে।

উঃ—আজ্ঞে! নীচের এই ভদ্রমহিলাই তাঁর পরিচিত এক ভদ্রলোকের জন্য ফ্ল্যাটটা ভাড়া করেছিলেন। কোট-প্যান্টলুন পরা এক ভদ্রলোককে তিনি আমার কাছে নিয়েও এসেছিলেন। দুটো ফ্ল্যাটের ভাড়াই নিয়মিত পেয়ে যাচ্ছিলাম বলে ওদের নিয়ে আমি বেশি মাথা ঘামাই নি। কার্ডে তাঁর নাম লেখা ছিল, এইচ্‌ ডট্‌ কাশীপুর। যাকগে যাক্‌। আর কি কথা আছে বলু মশাই।

প্রঃ—আর একটা মাত্র কথা আপনাকে আমি জিজ্ঞাস করবো। আপনি মনে করে বলুন কোনও রাত্রে ঐ ওপরে ফ্ল্যাটে আপনি আলো জ্বলতে দেখেছিলেন কিনা? দিনে বেলায় ভিতরে লোকজন আছে কিনা তা বোঝা না গেলে রাত্রে আলো জ্বলার জন্যে তা বোঝা যায়।

উঃ—আজ্ঞে, এই আমাকে আপনি মুস্কিলে ফেললে মশাই। মনে হচ্ছে কাল সন্ধ্যায় যেন ওপরের ঐ ফ্ল্যা হতে আলো বেরুতে দেখেছিলাম। হ্যাঁ, ভূতুড়ে কা বলে মনে হচ্ছে মশাই।

প্রঃ—আচ্ছা মশাই, কাল সন্ধ্যের সময় ওদে বাড়িতে যে একটা মর্মান্তিক রাহাজানি হয়ে গেল, তা কোনও খবর আপনি বা আপনাদের পাড়ার অপর কে শুনেছেন কি?

উঃ—আরে, রাহাজানি? রাহাজানি টাহাজানি আবা

কোথায় হলো ? কালকে কয়েকটি মোটর ওদের বাড়িতে রাত আটটা আন্দাজ সময়ে দেখেছি বটে। কিন্তু রাহাজানির কোনও খবর শুনিনি তো! এ পাড়ার ছেলেরা একটু দুষ্টু বটে, কিন্তু কারুর বাড়ি চড়াও করে রাহাজনি করার লোক তারা নয়। আমি বেলা চারটা থেকেই কয়েকজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে এই ঘরটাতেই ছিলাম। কোনও চেঁচামেচিও কি তাহলে আমরা শুনতাম না ? না না মশাই, ও সব ওদের মিথ্যে কথা। ওরকম মহিলা ভাড়াটিয়ানী আমি আর রাখতে চাই না। ওকে এখান থেকে উঠিয়ে দিতে পারেন, মশাই!

এই ভদ্রলোকের এই শেষ কথাটা হতে বুঝা গেল যে তিনি ইতিমধ্যেই এই মহিলাটির ওপর যে কোনও কারণেই হোক বিরূপ হয়ে উঠেছেন। এই মহিলাটির বিরুদ্ধে তাঁর পক্ষে দুই একটি সত্য মিথ্যা কথা বলা অসম্ভব ছিল না। কাল রাত্র আটটা আন্দাজ সময় এই বাড়ির সামনে ডাক্তারদের কয়েকটি মোটরই দেখে থাকবেন। কিন্তু রাহাজানির মত এতো বড়ো একটা ঘটনা তাঁর বাড়ির সামনে ঘটলেও তিনি এব বিন্দুবিসর্গও জানতে পারলেন না কেন ? এই ভাবে আক্রান্ত হলে মানুষের পক্ষে তো পাড়া মাত করে চেঁচামেচি শুরু করার কথা। তা হলে কি নিজেদের জীবনের চেয়ে লোক-লজ্জার বিষয়টিই তাদের কাছে বড় হয়ে উঠেছিল ? এ ছাড়া আমার উপর এখানে আজ অতর্কিতে হামলা করলোই বা তাহলে কারা ?

আমি ও আমার সহকারী এইবার ধীর পদ-বিক্ষেপে রাস্তার এপারে এসে ভদ্রমহিলার দরজায় ধাক্কা দিলাম। ভদ্রমহিলা সহজে দরজা খুলতে নারাজ ছিলেন। হঠাৎ আমি লক্ষ্য করলাম দরজার পাল্লার ভিতরকার একটা স্বল্প পরিসর ছিদ্রের ওপারে একটা অগ্নিবর্ষী চোখ ফুটে উঠলো। আমাকে বোধ হয় ওপার থেকে দেখে তিনি চিনতে পেরেছিলেন। তাঁর চোখ দু'টা এতক্ষণে শান্ত করে তিনি দরজা খুলে বাইরে এসে বললেন, 'ওঃ আপনারা এসেছেন। আসুন আসুন। ছেলেটি এখন ভালোই আছে। ও বাবা, কালকের ঘটনা মনে পড়লে শরীরটা এখনও পর্যন্ত শিউরে উঠে। তা এই নিষ্ঠুর আততায়ীর কোনও খোঁজ খবর করতে পারলেন ?

ভদ্রমহিলা আবেগ ভরা কণ্ঠে কথা কয়টি বলতে বলতে আমাকে সঙ্গে করে তাঁর পার্লারে এসে একটা সোফায় আমাকে বসতে বললেন। এতক্ষণ বাইরে আমার উপর যে হামলা চলছিল তার বিন্দু-বিসর্গও তিনি জানতে পারেন নি বলেই মনে হলো। এর পর আমরা দুজনাই আসন গ্রহণ করে তাঁর সঙ্গে কথোপকথন শুরু করে দিলাম। এই সম্পর্কে আমাদের প্রশ্নোত্তরগুলির প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম।

প্রঃ—যাক, তাহলে এই ছেলেটি আরোগ্যের পথেই চলেছে। ডাক্তার বাবুরা কি রাত্রে আর একবার ওকে দেখতে এসেছিলেন ? আমার মতে ওকে এখন হাঁস-পাতালে পাঠালেই ভালো হয়। সময় মত চিকিৎসা হলে ওর চোখ দুটো রক্ষা পেলেও পেতে পারে।

উঃ—আজ্ঞে! ওর চোখের আশা তো ওঁরা এক রকম ছেড়েই দিয়েছেন। তবুও ডাক্তার সেন একজন চক্ষু-বিশারদকে নিয়ে বিকালের দিকে আসবেন বলেছেন। রাত্রে দুটোর সময় সেন সাহেবের সহকারী ওকে দেখে আরও একটা ইনজেকশন দিয়ে গিয়েছেন। ওকে হাস-পাতালে পাঠাবার জন্যে আপনারা ব্যস্ত হবেন না। হাস-পাতালের চেয়ে ঢের ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা এখানেই আমি করছি। প্রয়োজন হলে দশহাজারের উপর টাকা আমি খরচ করবো।

প্রঃ—এরকম সহৃদয়তা কারুর মধ্যে আছে বলে কল্পনাও করা যায় না। একটা বাইরের লোকের জন্য আপনি কি কষ্টই না করছেন। তার চেয়ে ওকে ওর আত্মীয়দের কাছে পাঠিয়ে দিন না ?

উঃ—আজ্ঞে! ওর আত্মীয়রা ওকে ত্যাগ করেছে। তা ছাড়া তাদের ঠিকানাও আমি জানি না। ছেলেটি ভালো হয়ে উঠলে তাদের খুঁজে বার করা যাবে। এখনও তো ছেলেটি ভালো করে কথাই বলতে পারে না। বেচারা ছেলে মানুষ! আমার চেয়ে আর কতো ছোটই বা হবে!

আমি ভদ্রমহিলাটির এই শেষ কথাটি শুনে ভ্রূকুঞ্চিত করলাম। কিন্তু মুখে কোনও সন্দেহ প্রকাশ করলাম না। ভদ্রমহিলার এই বয়েস-ভীতি তাৎপর্যপূর্ণ। কিংবা এটা তাঁর একটা মুদ্রাদোষও হতে পারে। আমি এইবার

সরাসরি তাঁর প্রতিবেশী অমুক বাবুর বিবৃতির পরিপ্রেক্ষিতে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিলাম। বেশ বুঝা গেল যে আজ সকালের মারপিটের ঘটনাটি আমি জানতে পেরেছি শুনে তিনি শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আত্মসংবরণ করে ধীর শান্ত ভাবে ঘটনাটি সম্পর্কে নিম্নোক্ত রূপ একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন। তাঁর দীর্ঘ বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করে দিলাম।

"আজ্ঞে! কোনও কথা আমি আর আপনাদের কাছে গোপন করতে চাই না। বাল্যকালে একটি লোকের সঙ্গে আমার বিবাহের কথা-বার্তা হয়। কিন্তু তার স্বভাব চরিত্র ভালো না হওয়ায় আমি তাকে প্রত্যাখ্যান করি। এর পর লোকটি কিছুদিন আমার পিছু পিছু ঘুরে বেড়িয়ে শেষে নিরস্ত হয়। এ প্রায় বহু বৎসর আগেকার ঘটনা। ইতিমধ্যে লোকটা বিবাহাদি করে কয়টি পুত্রের জনকও হয়েছে। লোকটা তার সমস্ত দোষ শুধরে সংসারী হতে পেরেছে শুনে আমি খুবই আনন্দিত হই। অন্তত আমাকে না পাওয়ার জন্যে তার জীবনটা যে নষ্ট হয়নি—এটা ছিল আমার কাছে একটা মস্ত সুখের কথা। কিছুদিন আগে হঠাৎ একদিন রাস্তায় তার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যায়। আমার সঙ্গে সঙ্গে সে আমার বাড়িতেও এসেছিল। এরপর প্রায় সে রাত্রের দিকে আমাদের বাড়িতে এসে পূর্বেকার বহু কথা তুলতো। হাজার হোক এখনও আমার বয়স এমন কিছু বেশি নয়। এই ভাবে রাত্রে তার পক্ষে এখানে আসা যে দৃষ্টিকটু, তা সে বুঝেও বুঝতে চাইতো না। উপরন্তু সে আমার আপত্তি সত্বেও বহু পূর্বেকার ভুলে যাওয়া কথাগুলো বারে বারে আমার সামনে বলতে চাইতো। আমার বাড়িতে আমার সহকর্মী এই যুবকটির আগমন সে বরদাস্ত করতে পারতো না। কালকের সেই আততায়ীর আক্রমণের অব্যবহিত পরেই ঐ লোকটিকে আমাদের বাড়ির কাছে দেখতে পাই। এদিকে আমাদের এই মহা বিপদ ঘটে গেল। এই সুযোগে সে আমাকে পুনরায় উত্যক্ত করে তুলেছে। গত রাত্রে জোর করে আমি তাকে তার বাড়ী পাঠিয়ে দিই। কিন্তু তা সত্বেও আজ ভোর হতে না হতে সে আবার এখানে হাজির। আমার উপর তার দাবী নাকি সর্বাগ্রে। উঃ, কি ভয়ঙ্কর স্পর্ধা ও আজে-বাজে কথা! আজ তাই মাথা আর আমি ঠিক রাখতে পারি নি। আমার আশঙ্কা ছিল প্রতিশোধ নেবার জন্যে হয়তো সে থানায় গিয়ে এই ছেলেটি ও আমার সম্বন্ধে কয়েকটা মিথ্যে কথা বলে আসবে। যাক্ তাহলে সে রকম সাহস তার হয়নি। আপনারা দয়া করে যেন তার একটা কথাও বিশ্বাস না করেন।"

ভদ্রমহিলার এই অতিরিক্ত বিবৃতিটি সাবধানে লিপিবদ্ধ করে আমি ভাবলাম—কোথাকার জল কোথায় এলো। শেষে কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ না বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু আসল সাপটি কে? ঐ ভদ্রলোক, না এই ভদ্রমহিলা? তবে এই ভেবে আমি আশ্বস্ত হলাম যে, এদের দুজনার বিভেদ যখন হয়েছে, তখন এই মামলার কিনারা আর বেশি দূরে নেই। কিন্তু ভদ্রলোক এই ব্যাপারে থানায় যেতে সাহসী হলো না কেন? এই সম্পর্কে আরও কিছুটা চিন্তা করে আমি ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও কয়েকটি তথ্য জেনে নিতে সচেষ্ট হলাম। এই সম্পর্কে আমাদের প্রশ্নোত্তরগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

প্রঃ—আচ্ছা, একটা কথা আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো। কোনও লজ্জা না করে উত্তর দেবেন কিন্তু—। যতদূর বুঝা গেল আপনার ঐ তথাকথিত প্রেমিকটির আপনার উপর আগ্রহ আজও পর্যন্ত কমে নি। তা'হলে তার মধ্যে কি এই আহত যুবকটিকে উপলক্ষ করে হিংসার উদ্রেক হয়েছিল? আপনার ঐ তথাকথিত লোকটি প্রতিশোধ নেবার জন্য লোক মারফৎ এই ঘটনাটি ঘটিয়ে দেয় নি ত?

উঃ—আজ্ঞে, তার মধ্যে লালসা আছে, কিন্তু ভালবাসা নেই। এর উপর তার রাগ হলেও হতে পারে, কিন্তু এ জন্য হিংসে তার মধ্যে হতে পারে না। এতো বড় জঘন্য কাযে যে সে হাত দেবে তা আমার মনে হয়না। এতো সাহস, ধৈর্য ও সামর্থ্য তার নেই। এইসব দস্যুপনা কোনও পেশাদারী দস্যুরাই করেছে। এইদিকে তদন্ত চালিয়ে আপনাদের কোনও লাভ হবে না।

প্রঃ—দেখুন! কিসে লাভ হবে—কিসে বা হবেনা, তা বলা বড়ো শক্ত। কিন্তু ঐ লোকটিকে আমাদের এখুনি এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন হবে। প্রয়োজন

মনে হলে তাকে আমাদের গ্রেপ্তারও করতে হতে পারে। দয়া করে তার নাম ও ঠিকানাটা আমাকে বলবেন কি?

উঃ—আজ্ঞে। তার নাম জানলেও তার এখনকার ঠিকানা আমি জানি না। ওদিকে আর বেশি তদন্ত দয়া করে করবেন না। তাহলে আমার অপবাদের আর সীমা থাকবে না।

প্রঃ—এইবার আমি আর একটিমাত্র প্রশ্ন আপনাকে করবো। উপরে ফ্ল্যাটটি কার বেনামে আপনি ভাড়া নিয়েছেন বলুন তো? এতো টাকা মাসে মাসে গুণে আপনার কি লাভ হয় বলুন তো? এতো টাকা আপনি পানই বা কোথা থেকে? আমি ওপরের এই ফ্ল্যাটটি একবার দেখতে চাই।

উঃ—আপনি এই সম্পর্কে ভুল খবর পেয়েছেন। ওপরের ঐ ফ্ল্যাটটির সহিত আমার কোনও সম্পর্ক নেই। কাশীপুরের জমিদার অমুক রায়ের স্ত্রী আমার সহপাঠিনী। প্রয়োজন মত কলকাতায় থাকবার জন্যে ওঁরা একটা বাড়ি খুঁজছিলেন। এঁরা আমার মাধ্যমে এই ফ্ল্যাটটি ভাড়া করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের কাশীপুর গ্রামে সরিকদের সঙ্গে মামলা বাঁধায় এই কয়মাস তাঁরা কলকাতায় আসতে পারেন নি। ভবিষ্যতের প্রয়োজনের জন্য ওঁরাই এই বাড়ির ভাড়া গুণে যাচ্ছেন। এই ফ্ল্যাটের চাবি আমার কাছে নেই মশাই। জমিদারীর কাছারীর লোকেরা কলকাতায় এলে এই ফ্ল্যাট খুলে ঘর-দোর পরিষ্কার করে চলে যায়। সাধারণত তারা এখানে বাস করে না। তবে কালে-ভদ্রে যে এক রাত্রি তারা এখানে থাকেনি তাও নয়।

প্রঃ—হুম্। তাহলে কাল রাত্রে কি ওদের কেউ ওপরের ঐ ফ্ল্যাটে এসেছিল? আপনাদের সামনের বাড়ির মালিকের কাছ হতে শুনলাম যে তিনি কাল সন্ধ্যায় ওপরের ঐ ফ্ল্যাট হতে আলো বেরুতে দেখেছিলেন। শুনেছি গ্রামাঞ্চলের জমিদাররা ডাকাত গুণ্ডাদের পুষে থাকে। ওদের কলকাতায় জমা করে পরে গ্রামে নিয়ে যায়। আপনিই তো বললেন যে ওদের সঙ্গে গ্রামে সরিকদারদের সঙ্গে মামলা চলছে। এখন এই মামলাবাজ সরিকদের ঠাণ্ডা করবার জন্য এই ফ্ল্যাটটা গুণ্ডা আমদানীর একটা ক্যাম্পরূপে ব্যবহার হচ্ছে না তো? এমনও তো হতে পারে যে ঐ গুণ্ডারাই সব অনিষ্টের মূল।

উঃ—আজ্ঞে, এসব কি কথা আপনি বলছেন? ওদের দেশে ভুঁইয়ে লাঠিয়ালের কি অভাব আছে? কলকাতা থেকে ওরা গুণ্ডাদের দেশে নিয়ে যাবেন কেন? তবে এঁদের বড়দরের আমলারা কেউ কেউ কয়েকবার দু' একদিনের জন্য এখানে থেকে গিয়েছেন। সম্প্রতি সহপাঠিনী ও তাঁর জমিদার স্বামী হাইকোর্টের মামলার সময় একবার কলকাতায় এসে দুদিন এখানে ছিলেন। তবে হাঁ! কলকাতায় ওদের চার পাঁচটা ট্যাক্সি চলে। এই ব্যবসা দেখা-শুনা করার জন্যে ওঁদের একজন ম্যানেজারও আছেন। তিনি নিউ-তাজমহল হোটেলের একটা ঘরে থাকেন ও মধ্যে মধ্যে মনিবের ফ্ল্যাটটা ঝাড়া-পোঁছা করেও যান, তবে প্রয়োজন হলে ওঁকে টেলিফোন করলেই উনি আমার ব্যবহারের জন্য একটা ট্যাক্সি পাঠিয়ে দিয়েছেন।

প্রঃ—হুম্। এই ট্যাক্সির প্রশ্নই আমি করতে যাচ্ছিলাম। আচ্ছা। এই ঘটনা সম্বন্ধে—যাকে থানায় প্রাথমিক সংবাদ দিতে পাঠিয়েছিলেন তিনি এখন কোথায়? আপনার সঙ্গে আজ সকালে যিনি মারপিট করে গেছেন তিনি আর উনি একই ব্যক্তি নন তো? দুজনার নাম তো একই দেখছি—

উঃ—আজ্ঞে! না, হ্যাঁ। ওরা—না না ওরা দু'জনে এক ব্যক্তি নয়। আশ্চর্য এদের নাম একই তো বটে! থানায় আমি যাকে পাঠিয়েছিলাম সে হচ্ছে আমার এক গ্রাম-সম্পর্কিত ভাই। এই বিপদ দেখে যাওয়ার পর সেও তো আর এলো না। তার কলকাতার ঠিকানাও আমি জানি না ছাই। সেই জন্যে আমার সহপাঠিনীর কলকাতার ম্যানেজারকে আসার জন্যে নিউ তাজমহল হোটেলে আজ ফোন করেছি। কিন্তু তিনিও তো এখনও পর্যন্ত এখানে এলেন না!

প্রঃ—আচ্ছা। আপনার ঐ গ্রামের নামটা কি? বলুন তো এইবার? আরও একটা বিষয় আপনাকে আমাদের জানাতে হবে। আপনার অফিসটা কোথায়, আর তার বর্তমান মালিকই বা কে? আপনার নিজের কোনও গাড়ি নেই, অথচ বাড়িতে একটা টেলিফোন তো দেখছি আছে।

উঃ—আজ্ঞে তাহলে আমার জীবন বৃত্তান্ত আপনাদের

শুনতে হয়। আমাদের ঐ আফিসটার সাহেবী নাম হলেও ওটার অংশীদারদের মধ্যে আমার স্বর্গীয় পিতাও ছিলেন একজন, আর আমি হচ্ছি আমার স্বর্গীয় পিতার একমাত্র সন্তান। সুতরাং আমি আমাদের অফিসের শুধু কর্ম্মচারী নই, আমি সেখানকার একজন অংশীদারও বটে। আমাদের ফার্মের অধীনে দুটো চা-বাগান ও অন্যান্য দুই তিনটে ফ্যাক্টরি আছে। আমার চাকুরি ও মুনাফা বাবদ মাসে আমার ১৭০০৲ টাকা আয় হয়। এখন আত্মীয় বলতে আমার বিশেষ কেউই অবশিষ্ট নেই। তাই ভুলে থাকবার জন্যে আমি এই শহরতলীতে বাসা নিয়েছি। আমি ট্যাক্সি করে কর্মস্থলে যাই। তাই এ পাড়ায় নিজেকে একজন স্টেনো-টাইপিস্ট বলে পরিচয় দিই। আমার এই পরিচয় বোধ হয় আমি আপনাকেও কাল দিয়ে থাকবো। বস্তুত আমি আফিসে টাইপিস্ট ও স্টেনোদেরই খবরদারি করে থাকি।

প্রঃ—আপনার জীবন-কাহিনী শুনে আশ্চর্যই হতে হয়। কিন্তু কৈ? আসল কথা তো আপনি আমাদের বললেন না? আপনার গ্রামের নামটা কি?

উঃ—আমাদের গ্রাম ছিল পদ্মা নদীর ধারে। এখন সমস্ত গ্রামটাই নদীর গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। আমাদের গ্রামবাসীরা সারা ভারত জুড়ে আজ ছড়িয়ে পড়েছে। এই ক্ষেত্রে আমাদের গ্রামে গিয়ে কারুর খোঁজ খবর করা আপনাদের পক্ষে সুবিধে নেই। আপনি তো আমার সেই গ্রাম সম্পর্কিত ভাই ও আজ সকালের কেলেঙ্কারীর নায়কের ঠিকানা চান। তারা এখানে আবার এলে তখুনি আপনাদের টেলিফোনে জানিয়ে দেবো। এই ছেলেটি আরোগ্য লাভ না করা পর্যন্ত আমি আফিসে যাবো না। আমাকে আপনারা বিশ্বাস করুন, আমি ওদের উভয়ের কারুরই ঠিকানা জানি না। এদের আমার এখানে বেশি যাতায়াত আমি পছন্দ করি নি। তাই তাদের ঠিকানাও আমি জানতে চেষ্টা করিনি। তাদের দুজনার নাম ও পদবী একই শুনে আপনারা আশ্চর্য হচ্ছেন কিন্তু এর মধ্যে দৈব-চক্রের একটা আশ্চর্য ঘটনা ছাড়া অন্য কিছুই নেই।

প্রঃ—না না। আপনার কোনও উক্তিই আমরা অবিশ্বাস করি নি। এখন আপনাকে আমাদের এই আহত যুবকটির প্রকৃত পরিচয় জানাতে হবে। এর সঙ্গে আপনার প্রথম পরিচয় কবে হয়েছিল, তা ছাড়া কোন সূত্রে ও কতো দিন পূর্বে সে আপনাদের আফিসে চাকুরি নেয় তাও আমাদের জানা দরকার। তা ছাড়া এই যুবকের আত্মীয় স্বজনের সঙ্গেও আমাদের একটু কথা বার্তা বলা দরকার। তাদের ঠিকানাটা আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে। এতোক্ষণে আপনার পক্ষে তাদের খবর দিয়ে এখানে আনিয়ে নেওয়া উচিত ছিল।

ভদ্রমহিলাকে এই শেষ প্রশ্নট করে আমরা ভাবছিলাম যে এর উত্তর পাওয়ার পর এই বাড়ির একতল ও দ্বিতলের ফ্ল্যাটটি ও ওদের আশে পাশের অলিগলির অবস্থান ভালো করে একবার দেখে নেবো। এই সঙ্গে আমরা এও ভাবছিলাম যে আজ সকালে আমার উপর বিনা কারণে যারা আক্রমণ করেছিল তারাই বা কারা? এই সম্বন্ধে ভদ্রমহিলাকে ও পাড়ার লোকজনদের বিশেষ করে জিজ্ঞাসাবাদ করাও দরকার। কিন্তু একসঙ্গে এতোগুলো করণীয় কায একদিনে সমাধা করাও সম্ভব নয়। অন্যকার আমার আততায়ীদের খোঁজ খবর করার পূর্বে এই বাড়িটার উভয় ফ্ল্যাটটি খানাতল্লাস করার কথাও যে আমরা না ভাবছিলাম তা নয়। এই সব করণীয় কাযের পূর্বে আমরা ভদ্রমহিলার শেষ উত্তরের জন্য প্রতীক্ষা করছি। এমন সময় পাশের ঘর হতে ঘুমন্ত আহত যুবকটি জেগে উঠে কেঁদে ডেকে উঠলো—ডলি ডলি! কোথায় তুমি? এসো'—

আহত যুবকটির এই কাতর আহ্বান কানে যাওয়া মাত্র ভদ্রমহিলা আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি আমাদের এই শেষ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে দৌড়ে পাশের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলে উঠলেন,—'এই যে মনি! এই তো আমি।' পাশের ঘরে বসেই আমরা অনুভব করলাম যে তিনি একজন সেবাব্রতী নারীরূপে যুবকটির শয্যার একপাশে গিয়ে বসলেন। আমরা বাইরের এই ঘরে বসে দুজনার নাম ধরাধরি করে এই ডাকের বাহার শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এই বর্ষীয়সী মহিলা ও তার হাঁটুর বয়সী এই যুবকের পারস্পরিক সম্বন্ধটা তাহলে কি? আমি ও আমার সহকারী পরস্পর পরস্পরের দিকে একটু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নিলাম। কিন্তু তখুনি এই সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য প্রকাশ করা আমরা সমীচীন মনে করলাম না। [ক্রমশঃ

সৃষ্টির রহস্য ও গ্রহযুদ্ধের ফলাফল

উপাধ্যায়

জ্যোতিষ অধ্যয়ন ও চর্চ্চা সভ্যতার প্রথম উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয়েছে। যীশুখৃষ্ট জন্মাবার প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের আর্য্য সন্তানরা গণিত ও দর্শনে উন্নত ধরণের জ্ঞান অর্জ্জন করেছিলেন। তাঁরা গ্রহনক্ষত্রাদির পরীক্ষা নিরীক্ষা সম্পর্কে আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মত যন্ত্র ব্যবহার করেননি। তাঁরা যন্ত্র ব্যবহার না করে যে সব তত্ত্ব ও তথ্য উদ্‌ঘাটিত এবং নির্ণয় করে গেছেন, যে সব সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে গেছেন, তা এখনও যন্ত্রের সাহায্যে পূর্ণভাবে ধরে ওঠা যায়নি। সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম অংশ যন্ত্রে ধরা আয়াস সাধ্য নয়। সূর্য্য সিদ্ধান্তের গ্রন্থকার পাঁচ হাজার বছর আগে উন্নত গণিতের সাহায্যে ও অধ্যাত্ম শক্তির আনুকূল্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বার্ত্তা প্রচার করেছিলেন যা এখনও বিস্ময়ের বস্তু। আমাদের নিজস্ব সৌরজগতের পশ্চাতে তিনি ব্রহ্মাণ্ড সম্পুট পরিভ্রমণের পরিকল্পনা উদ্ভাবন করেছিলেন এবং এর আয়তন সম্পর্কে প্রায় ছয় হাজার আলোক বর্ষের কথা বলে গেছেন। তিনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের বয়স নির্দ্ধারণও করেছিলেন, আর বিশ্বের উৎপত্তি তত্ত্বের পার্থিব ও অপার্থিব এবং দার্শনিকতার বিভিন্ন দিক আমাদের অন্তরে উন্মোচন করে গেছেন। এ ব্যাপারে খ্রীষ্টান জগতের পুরোহিত ও জ্ঞানীগুণীরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও অধ্যাত্ম প্রকর্ষের অভাবে অনেকখানি পিছিয়ে গেছেন। খ্রীষ্টান ধর্ম্মতত্ত্ববিদরা এই পৃথিবীর সম্বন্ধে সর্ব্বদাই বিতর্ক সাপেক্ষ নানা পরস্পরবিরোধীমত আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। কিভাবে এর জন্ম হোলো তাও বলতে গিয়ে ধাঁধাই সৃষ্টি করেছেন। ১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ওল্ড-টেষ্টামেন্ট অধ্যয়ন করে জনৈক আর্কবিশপ বল্লেন, খৃষ্টপূর্ব্ব ৪০০৪ অব্দে পৃথিবী সৃষ্টি হয়। একথা ঠিক নয়, অন্যতম বিশপ লাইটফুট বল্লেন। তাঁর মতে খৃষ্ট পূর্ব্বের ৪০০৪ অব্দের ২৩শে অক্টোবর বেলা ৯টার সময় সৃষ্টি কার্য্য সুরু হয়েছিল। ইউরোপে বিজ্ঞানের চিন্তা ধারার উপর ধর্ম্মযাজকেরা প্রভাব বিস্তার করেছিলেন ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত। কিন্তু ভারতবর্ষে এই সব বিষয়ে ঋষিদের আবিষ্কারগুলি কেবলমাত্র বিজ্ঞান সম্মত নয়, অধ্যাত্ম আলোকে ও পরিকীর্ণ। ভারতের ইতিহাসের দুর্ভাগ্য যে, স্বাধীনতা লাভের পনরো বছর পরেও বরাহমিহির ও আর্য্যভট্টের অবদান উপহাসের বস্তু হয়ে রয়েছে, কিন্তু গ্যালিলিও আর নিউটনের তত্ত্ব ও তথ্যগুলি সমাদৃত হচ্ছে। আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদরা সূর্য্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্রদের সম্পর্কে বহু তত্ত্ব ও তথ্য আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু তাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশ বিষয়ে তাঁরা আলোক সম্পাত করতে পারেননি। এক একটি অতি ক্ষুদ্রতারা পৃথিবীর চেয়েও কত বৃহৎ সে সম্বন্ধে ভারতের আর্য্যঋষিদের মত তাঁরা সঠিক ধারণা করতে পারেননি। সৌর জগতের নক্ষত্রপুঞ্জ আর এই ক্ষুদ্র পৃথিবী সম্বন্ধে বলতে গেলে এই কথাই মনে আসে যে, এরা ১০০০০০ আলোক বর্ষ ব্যাস রেখায়, আর ১০,০০০ আলোকবর্ষ ঘনতায় পূর্ণ। আমাদের নক্ষত্রপুঞ্জের এক বারের পূর্ণ আবর্ত্তন হোতে প্রতিবারে প্রায় দুশত মিলিয়ন বর্ষ লাগে, আর প্রতি ঘণ্টায় সৌর মণ্ডলী মোটামুট ৬০০,০০০ মাইল বাহিত হয়। লক্ষ লক্ষ তারা—সারা আকাশ জুড়ে আছে, আমাদের কাছ থেকে অতি দ্রুত বেগে ছুটে চলেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, সিংহরাশির একটি নীহারিকা যা একশত পাঁচ মিলিয়ন আলোক বর্ষের দূরে রয়েছে, প্রতি সেকেণ্ডে বারো শত মাইল বেগে পিছু হটে চলেছে। অনন্ত বিশ্বের ভেতর চলেছে অবিশ্রান্ত সৃষ্টি, কত নক্ষত্রেরই না জন্ম হচ্ছে, ক্ষণে ক্ষণে, কে তার সংখ্যা করবে, কিন্তু এর পশ্চাতে যে রহস্য আছে, সে রহস্য একমাত্র ভারতবর্ষের ঋষিরা উদ্‌ঘাটিত করতে পেরেছেন, জড়বস্তুবিজ্ঞান এদিকে অজ্ঞানে আবৃত্ত রয়েছে। সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে ডাঃ কার্ল ভন উইজ স্যাকারের আবর্ত্তবাদ ল্যাপলেসের মতবাদকে খণ্ডন করে কিছু নূতন আলোক সম্পাত করছে। ল্যাপলেসের ধারণা সূর্য হালকা গ্যাসীয় অতি বৃহৎ বস্, ইউরেনাস এবং অন্যান্য গ্রহের পশ্চাতে বিস্তৃত ছিল, ক্রমে ক্রমে দিনের পর দিন সঙ্কুচিত হয়ে তার বিরাট আবরণ পশ্চাতে ফেলে এসেছে আর এইসব খোলা আবরণই অবশেষে কঠিন পদার্থে ঘন হয়ে গ্রহে পরিণত হয়েছে। প্রোফেসার হয়েলের অবিশ্রান্ত সৃষ্টিবাদ অনেকটা আমাদের প্রাচীন

ঋষিদের মতবাদের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। তিনি বলেছেন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের আদি ছিলনা, অনন্ত হবে না। তার মতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যত বিস্তার ঘটে ততই তার শূন্য পূরণ করবার জন্যে নূতন পদার্থ আবির্ভূত হয়। হাইড্রোজেন এটম সর্বদাই সৃষ্টি হচ্ছে নব নবতারা আর নক্ষত্রপুঞ্জকে রূপ দেবার জন্যে। এই সব বিভিন্ন মতবাদের কোনটি যে সঠিক নয়, তা বিশেষ ভাবে আলোচনা করলে বুঝা যায়। আধুনিক জড়বিজ্ঞানীরা বোধির স্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এঁরা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের তিনটী স্তরের সংবাদই রাখেন, আরেকটি স্তরের সংবাদই এঁরা রাখেন না—সেটি হচ্ছে তুরীয়ভূমি। আমাদের ঋষিরা যোগবলে এই ভূমির ভেতর দিয়ে বস্তুবিশ্বের জড়তা ভেদ করে তার পশ্চাতে কি রহস্য আছে এবং কোথা থেকে বিশ্বের মহাশক্তির উৎস উৎসারিত হয়ে সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত হচ্ছে, তার সন্ধান তাঁরা রাখতেন। সূক্ষ্ম মন স্তত্ত্বে বা বুদ্ধি তত্ত্বে তাঁদের অবস্থিতি ছিল। তাঁরা জানতেন সামান্য ধূলিকণাও জড়চৈতন্যাত্মক। চৈতন্যের সাধারণতঃ চারি অবস্থা—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্ত ও তুরীয় অবস্থা। মানবে সেই চৈতন্যের জাগ্রৎ অবস্থা, অন্য প্রাণীতে ও উদ্ভিদে তার স্বপ্নাবস্থা, আর জড়ে তার সুপ্ত অবস্থা। জড়ে জড়শক্তি উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীতে জৈবশক্তি, আর উচ্চতর জীবে ইচ্ছাশক্তিরূপে সর্ব্বজীব মধ্যে ভগবানের প্রকৃতিই অধিষ্ঠিত, তাও চৈতন্যেরই একরূপ অভিব্যক্তি। ঋগ্বেদের ১।২২ সূক্তে আছে ইদং বিষ্ণু বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম এবং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।' অতএব বিষ্ণুর চারি পাদ। এর তিন পদে বিশ্বভুবন সকল, আর এক পদে অব্যয় পদ বিশ্বাতীত। ঋষিরা তাঁর চারি পাদেরই খবর রাখতেন। যোগ ভূমিতে আরূঢ় হয়ে সৃষ্টি স্থিতি লয়তত্ত্বের সমাচার পাওয়া যায়, এটা তাঁরা জানতেন। ক্ষণিক জড়বিজ্ঞানের প্রবাহ অতিক্রম করে, তাঁরা বিজ্ঞান ঘন প্রজ্ঞানে পৌছুতে পেরেছিলেন বলেই কোন যন্ত্রের সহোযা না নিয়ে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ও বিশ্বাতীত লোকসমূহের সমাচার দিতে অভ্যস্ত ছিলেন। ঋতম্ভরা প্রজ্ঞালোক তাঁদের মধ্যে ছিল বর্ত্তমান। জগতের বস্তু সংখ্যা অনন্ত। এই অসংখ্য বস্তুর মধ্যে যে নিয়ত সঙ্কলন ব্যাকলন ক্রিয়া, যে যোগ বিয়োগ ক্রিয়া নিয়ত চলছে তাতেই জগতের স্থিতি। এই কলনদ্বারা ক্রমাভিব্যক্তি ও ক্রমপরিণতি হেতু যে নিত্য পরিবর্ত্তন, তার কারণ কাল। আমাদের অন্তরে যে একের পর একটি করে নিয়ত জ্ঞান ক্রিয়া চলছে, সেই ধারা বাহ্যিক জ্ঞান ক্রিয়ার স্মৃতি থেকে আমাদের জ্ঞানে এই কালের ধারণা হয়। এই যে নিয়ত কলন ক্রিয়া থেকে কালের ধারণা—সেই কালের ওপরই কলন মূলক গণিতশাস্ত্র (calculus) প্রতিষ্ঠিত। অতএব, সমুদয় কলন ক্রিয়ার কারণ 'কাল', এই পরিবর্ত্তন ক্রিয়ার কলন কারীই কাল। এক একটি কলন ক্রিয়ার এক খণ্ড কাল। এই কাল ক্রিয়াত্মক, পরিবর্ত্তনাত্মক। আর যে শক্তি বলে এই ক্রিয়া হয়, তিনি কালী বা মহাকালী। এই শক্তির আধার যিনি, তাঁকেই বলে অক্ষয় কাল মহাকাল। চিৎ বা নিত্য বিজ্ঞানই সর্ব্ব অস্তিত্বের মূল। যা গ্রীক স্টোয়িকদের 'লোগোস', বা প্লেটোর 'আইডিয়া' যা হেগেলের 'এ্যাবসলিউট আইডিয়া যা স্পাইনোজার 'থট' যা কঁতের এ্যাবসলিউট রিজন্ যা কাণ্টের, 'ট্রান্সেনডেন্টাল রিজন তাই হচ্ছে চিৎ, জ্ঞান বা বিজ্ঞান বা ঈক্ষণ। আমাদের এ সৌরজগৎ অথবা অন্য কোন নক্ষত্রে জগতের যে প্রলয়, তা কাল্পিক প্রলয়। এ সৌরজগতের যে নীহারিকা অবস্থার পরিণতির কথা আধুনিক জড়বাদী বৈজ্ঞানিকরা বলেন—তা কাল্পিক প্রলয়ের অনুরূপ। আর সমুদয় সৌরও নক্ষত্রজগতের বা এই বিশ্বের যে প্রলয় তা মহাপ্রলয়। তত্ত্ব সকল বা প্রকৃতির বিকৃতি মূল প্রকৃতিতে লীন হয়। তখন কোন লোক থাকে না। তখন ভূতক্রম অবশ হয়ে সূক্ষ্মবীজ রূপে অব্যক্ত সংজ্ঞক মূল প্রকৃতিতে লীন থাকে। মূল অষ্টধ অপরা প্রকৃতি তখন অব্যক্তে বিলীন হয় মাত্র। শ্রুতিতে বলা হয়েছে —'সৃষ্টির প্রারম্ভে মায়া হেতু সগুণ ভাবে ব্রহ্ম যে রূপ কল্পনা করেন, তদনুসারে সৃষ্টি হয়। "তদৈক্ষত বহু স্যাম প্রজায়েয়"—ইতি শ্রুতি এই যে ঈক্ষণ বা কল্পনা, এথেকেই কল্পারম্ভ হয়। এইটাই হচ্ছে বিশ্বের বিসৃষ্টির তত্ত্ব। এটি কোন বিশেষ জগতের বিসৃষ্টির তত্ত্ব নয়। ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর আপনিই আপনাকে উপাদান করে এই জগৎরূপে অভিব্যক্ত হন। ব্রহ্ম থেকে জড়জীবময় জগতের বিকাশ আর ব্রহ্মেই লয়, যেমন উর্ণনাভ আপনার শরীর থেকে তন্ত বাহির করে জালবিস্তার করে, আর আপনার শরীরে তা লয় করে, ব্রহ্মথেকে সেইরূপ জগতের সৃষ্টি ও লয় হয়। বৃহাদরণ্যক উপনিষদ (১৪।৩ মন্ত্র) থেকে জানা যায় যে এই সৃষ্টির অগ্রে আত্মাই ছিলেন। তা পুরুষবিধ। সেই পুরুষবিধ আত্মা ঈক্ষণ করে (অনুবীক্ষ্য) নিজেকে ছাড়া অন্য কিছু দেখতে পেলেন না। তাতে তিনি রতি অনুভবই করলেন না। একাকী রমণ বা আনন্দ অনুভব হয়না (তস্মাৎ একাকী ন রমতে) তিনি দ্বিতীয়ের জন্যে ইচ্ছা করলেন। তিনি এতাবৎ সম্মিলিত স্ত্রী পুরুষ ভাবেই ছিলেন (স হ এতাবান আস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষক্তৌ।) তিনি এইরূপ আপনাকে দ্বিধা বিভক্ত করলেন (য ইমমেব আত্মানং দ্বেধাপাতয়ৎ) এবং পতিপত্নীরূপ হলেন (ততঃ পতিশ্চ পত্নী চ অভবতাম্) অতএব ভগবানের অধ্যক্ষতায় যে প্রকৃতি এইজগৎ সৃষ্টি করেন তার মূলে এই রতি বা রমণ ভাব বৈষ্ণবাচার্য্যগণ তারই বার্ত্তা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, সে বার্ত্তার মূলে রয়েছে এই জগৎ স্থিতিকালে নিয়ত পরিবর্ত্তন বা পরিণামের অধীন। ঈশ্বরের সঙ্গে প্রকৃতির অবিশ্রান্ত রমণ ও মৈথুন চলেছে আর হচ্ছে নবনব সৃষ্টি। এসব তত্ত্ব জড়বাদী পাশ্চাত্য বিজ্ঞানী ও পাশ্চাত্য ভাবধারায় অবগাহন স্নানরত এদেশের তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তি বা মনীষিরা কেমন করে উপলব্ধি করবেন?

কিন্তু করেছেন আইন ষ্টাইন তাঁর জীবন সন্ধ্যায়। তিনি বিশ্ব প্রকৃতির লীলা রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে বলেছেন—'a spiritual reality—an illimitable suporior spirit who reveals himsolf in tho slight details wo are able to perceive with our frail and feeble minds"

আরও ভাবসমাধিস্থ হয়ে আইনষ্টাইন বলে উঠলেন—"That deeply emotional conviction of the presenic of a superior reasoning power, which is revealed in the

incomprehensible universe, forms my idea of God.

সূক্ষ্মযন্ত্রপাতি নিয়ে ও আজকের দিনের জ্যোতির্ব্বিদরা যে, ক্রান্তি (Equinox) ঘটন কাল পর্য্যবেক্ষণ ও অঙ্কপাত করেও যথাযথ ভাবে নির্দ্ধারণ করতে পারলেন না, ভারতবাসী হিন্দুরা তা বহুযুগ আগেই নির্ভুল ভাবে স্থির করে গেছেন। তাই কিরো (couto Lovis Hammon) তাঁর you and your Hand গ্রন্থে বলেছেন—'People who in their ignorance disdain the wisdom of ancient races forget that the past of India contained secrets of life and philosophy that following civilisation could not controvert but were forced to accept......... The majority believe that the Hindus made no mistake, but how they arrived at such a calculaticu is as great as my story as origin of life itself.

আমরা যে সময়ের মধ্য দিয়ে চলেছি এটা হচ্ছে কলি যুগের প্রভাত কাল। মাত্র পাঁচ হাজার একষট্টি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, এখনও এযুগের আয়ুনিঃশেষিত হোতে ৪২৬৯৬৮ বর্ষ বাকী। সুতরাং হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন প্রভৃতি যত রকমের বোমা বিস্ফোরণ হোক্‌না কেন, পৃথিবীর ধ্বংস হোতে পারে না। বিশ্বধ্বংসকারী মারণাস্ত্র প্রস্তুত হয়েছে সত্য, কিন্তু এরা আগামী আসন্ন তৃতীয় মহাযুদ্ধের সময় ব্যবহৃত হবেনা, সকলে প্রচলিত অস্ত্রাদি প্রয়োগ করবে। আমরা বর্ত্তমানে যুগের অধঃপতিত কালাবর্ত্তের মধ্য দিয়ে চলেছি। গত পঞ্চাশ বৎসর ধরে কতিপয় প্রধান প্রধান গ্রহসংযোগ বা সম্মেলনের মধ্যে কোন না কোন উল্লেখযোগ্য পাপগ্রহ যেমন রাহু, মঙ্গল, শনি অবস্থিত—যার ফলে পৃথিবীতে শান্তি আসছে না, আর এদের সঙ্গে আছে ধ্বংসকারী নক্ষত্রেরা। পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ শক্তিশালী রাষ্ট্রযুদ্ধে লিপ্ত হয় কতকগুলি গ্রহণ যোগা যোগের ফলে—যার মূলে থাকে শনি, রাহু আর মঙ্গল, পরস্পর কেন্দ্রে থেকে দৃষ্টি বিনিময় করে আর যে সব রাশি ও নক্ষত্রে এরা অবস্থান করে সেগুলি বিশেষ ভাবে সংবেদনশীল ও চড়াও হয়ে আক্রমণ প্রবণ চরিত্র বিশিষ্ট হয়। যে বর্ষে ত্রয়োদশ দিনে শুক্লপক্ষ সেবৎসরে যুদ্ধ হয়। কালসর্প যোগ বর্ত্তমান অর্থাৎ সমস্ত গ্রহই রাহু ও কেতুর কবলে পড়েছে। গ্রহ-সম্মেলন মকর রাশির ১০ ডিগ্রী থেকে ২৭ ডিগ্রী মধ্যে অর্থাৎ ১৬ ডিগ্রীতে সীমিত, ফলে ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে কমিউনিজম বনাম পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের শক্তি পরীক্ষা, এজন্যে যুদ্ধ অনিবার্য্য এবং প্রচুর লোক ক্ষয়। এই দুঃসময় আসবে জুন—জুলাইয়ের মধ্যে যে সময়ে তেরো দিনে হবে চন্দ্র পক্ষ। কিন্তু এযুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে না। আমেরিকা ও রাশিয়ার যুদ্ধে অবতীর্ণ হোতে হবে তাদের মিত্রদের রক্ষার জন্যে। পৃথিবীর অধিকাংশ রাজশক্তি অবলুপ্ত হয়ে যাবে ১৯৬২ সাল শেষ হোতে না হোতে। চীন ও রাশিয়ার কতিপয় বিশ্ববিদিত নেতাদের পতন আর অন্যান্য ব্যক্তিদের উত্থান হবে। হিমালয় ও হিমাচল প্রদেশে ও চীনে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় ঘটবে। সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হয়ে বহু অঞ্চল গ্রাস করবে। ভীষণ ঝড় ও সাংঘাতিক রকমের বৃষ্টিপাত হবে পৃথিবীর নানা স্থানে, কোথাও প্রচণ্ড গরম ও কোথাও বা হিমবাহে বহু লোকের মৃত্যু। সূর্য্য গ্রহণের সময় কলিকাতা এবং ঢাকার লগ্নের খুব সন্নিকটবর্ত্তী মঙ্গল গ্রহ হওয়ার ফলে আর রেঙ্গুনের, ব্যাঙ্ককের, লাওসের রাজধানীর লগ্নে গ্রহণ দৃশ্য হওয়ার ফলে ভারতের পূর্ব্ব তোরণ ভাঙবার জন্যে নটরাজের চণ্ডনৃত্য সুরু হবে। ভূমিকম্প, তাপের মাত্রাধিক্য, আইন অমান্যতা, স্বেচ্ছাচার, ব্যভিচার, দ্বন্দ্বসংঘর্ষ প্রভৃতির মাধ্যমে ভারতের এই পূর্ব্ব দিকের অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ হবে। বহু রকম দুর্ঘটনা, সামাজিক বিপ্লব, বিদ্রোহ, রণবিভীষিকা, চৈনিক ও পাকিস্থানী স্পর্দ্ধা, প্লাবন ও লোকক্ষয় দেশের জনসংঘটকে বিপন্ন ও চিন্তাভারাক্রান্ত করবে। দৈন্যদুর্দ্দশা চরমে উঠবে। কাজেই বহু বিঘোষিত সংবাদ-পত্র ও পত্রিকার মাধ্যমে যারা ফ.তায়া জারী করে বলছেন—কিছু হবেনা, সব বাজে, সব ঝুটা হ্যায়, তাদের মুখে ফুল চন্দন পড়ুক—কিন্তু যাঁরা প্রকৃত জ্যোতিষ শাস্ত্রে পারঙ্গম তাঁরা আতঙ্কে শিউরে উঠছেন—কে জানে কখন কি হয়? কলিকাতা ও রুদ্রের রোষ কবল থেকে মুক্ত হবে না, তবে গ্রহস্বস্ত্যয়ন বা প্রার্থনা হোম প্রভৃতির দরুণ নিশ্চয়ই গ্রহকোপ অনেকটা এখানে খণ্ডন হবে। পৃথিবীর অর্দ্ধেক লোক মহাপ্রস্থান করলেও মানব সভ্যতা, সমাজ ও সংস্কৃতি কোন ক্রমেই নিশ্চিহ্ন হবে না। এই টাই আমাদের পরম সান্ত্বনা। এই দুঃসময়ে দেবতা জন্ম নিলেন এইটি আমাদের পরম আনন্দের কথা।

——

ব্যক্তিগত দ্বাদশ রাশির ফল

মেষ রাশি

মাসটী মিশ্রফলদাতা। প্রথমার্দ্ধ অপেক্ষা শেষার্দ্ধ ভালো। স্বাস্থ্যের বিশেষ অবনতি হবে না, সামান্য শারীরিক অসুস্থতা। সন্তানদের স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি আবশ্যক। আত্মীয় স্বজন বর্গের সঙ্গে কলহ বিবাদ ঘটলেও পারিবারিক অশান্তির যোগ নেই। লাভ ক্ষতি দুই প্রকারই ঘট্‌বে। প্রথমার্দ্ধে ক্ষতির মাত্রাধিক্য, শেষার্দ্ধে অত্যধিক লাভ ও প্রচেষ্টায় সাফল্য, মাসটী উন্নতি প্রদ। স্পেকুলেশনে শেষার্দ্ধে কিছুটা লাভবান হবার সম্ভাবনা। শেষার্দ্ধে রেসে লাভ, বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষি জীবির পক্ষে সর্ব্বপ্রকার কার্য্যে বাধা বিপত্তি। বাড়ীভাড়ার টাকা, খাজনা আর শস্যোৎপাদন সম্পর্কে নৈরাশ্যের অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগই হবে এ বিষয়ের প্রধান কারণ। কোন প্রকার পরিবর্ত্তন বা নূতন বিষয়ের সমাবেশ বা উন্নয়নের পরিকল্পনা ব্যর্থ হবে, এজন্যে এসব দিকে দৃষ্টি আবৃত রাখাই সমীচীন। দৈনন্দিন কর্ম্মের ধারা বজায় রেখে চলাই বাঞ্ছনীয়, চাকুরির ক্ষেত্র ভালোই বলা যায়, দ্বিতীয়ার্দ্ধে বিশেষ

অনুকূল। এ সময়ে সম্মান, প্রতিষ্ঠা, পদোন্নতি বা নূতন পদ মর্য্যাদা আশা করা যায়, বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ী সারামাস ধরে কর্ম্মমগ্ন হবে আর নব নব কর্ম্মতৎপরতা ও সামাজিক অনুষ্ঠানে আত্মপ্রসাদ লাভ. এই রাশিগত নারীবৃন্দের পক্ষে মাসটী আনন্দদায়ক। শিল্পী ও সঙ্গীতকুশলী নারী উত্তম সুযোগ পাবে। অবৈধ প্রণয়ে ও পুরুষের সান্নিধ্যে লাভজনক পরিস্থিতি ঘটবে। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে আধিপত্য লাভ, সন্তোষ বৃদ্ধি ও সুখ-সম্ভোগ। অবিবাহিতাদের মধ্যে অনেকেই বিবাহিতা হবে, কোন কোন কুমারীর বিবাহ প্রসঙ্গ পাকাপাকি হয়ে থাকবে, এই রাশির নারীদের অনেক নূতন ও আকর্ষণীয় বন্ধুলাভ ঘটবে, অর্থলাভ যোগ আছে। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটী অশুভ নয়।

বৃষ রাশি

মাসটী আশাপ্রদ নয়। জীবনীশক্তির হ্রাস হেতু সারা মাসটীতে শারীরিক দৌর্ব্বল্যের প্রাধান্য, শরীরে আঘাতপ্রাপ্তি, ক্ষত প্রভৃতির সম্ভাবনা, ধারালো অস্ত্র নিয়ে চলাফেরা বা নাড়া চাড়া করা যুক্তিযুক্ত নয়, গুরুতর পীড়ার যোগ নেই। পারিবারিক ক্ষেত্র বহুলাংশে শান্তিপূর্ণ। খুব সামান্যই কলহ-বিবাদ বা মনোমালিন্য ঘটতে পারে। আর্থিক স্বচ্ছন্দতার আশা করা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হবে, অভাব ও অনটন কিছু কিছু দেখা যাবে। টাকাকড়ি লেন দেন ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। প্রথমার্দ্ধে টাকাকড়ি সংক্রান্ত বিষয়ে মনান্তর হোতে পারে। স্পেকুলেশনে সাফল্য সুদূর পরাহত। বহু প্রকার কারণ ও জটিল পরিস্থিতি বশতঃ বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীকে ক্ষতিগ্রস্ত হোতে হবে। চাকুরির ক্ষেত্র একভাবেই যাবে, তবে শেষের দিকে কিছুটা অবস্থার অবনতি আশঙ্কা করা যায়, এজন্যে দৈনন্দিন কর্ম্মধারা নিষ্ঠার সঙ্গে বহন করে চলাই ভালো। বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীরা উত্থান পতনের মাধ্যমে এমাসে চলতে থাকবে। মহিলাদের পক্ষে প্রথমার্দ্ধে অনুকূল, অবৈধ প্রণয়ে উত্তম সুযোগ সুবিধা ও প্রাপ্তি যোগ। সামাজিক পারিবারিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে সন্তোষজনক পরিবেশ, ভ্রমণ আমোদ প্রমোদ ও চিত্ত-সুখ। দ্বিতীয়ার্দ্ধে রঙ্গমঞ্চে বা ছায়াচিত্রে যন্ত্র ও কণ্ঠ সংগীতে আর শিল্প কলায় যে সব নারী আত্মনিয়োগ করেছে, তাদের পক্ষে বিশেষ অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি হবে। গৃহিণীরাও নূতন আসবাব পত্রাদি লাভ হেতু আত্মতৃপ্তিতে বেশ-ভূষায় ও প্রসাধনের উপকরণ সামগ্রী প্রাপ্তির ফলে শ্রীমণ্ডিত হওয়াতে চিত্তের প্রসন্নতালাভ করবে, আর গৃহাদি সাজ-সজ্জায় মনোরম ও বর্ণাঢ্য করে তুলবে। রেসে সুবিধা হবে না। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটী অনুকূল নয়।

মিথুন রাশি

মাসটী মিশ্রফল দাতা। প্রতিকূল পরিস্থিতি প্রাধান্যলাভ করবে। শেষের দিকে কিছুটা অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি হবে। স্বাস্থ্যের বিশেষ অবনতি। শারীরিক আঘাতপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে, এজন্যে সতর্ক হওয়া বাঞ্ছনীয়। ভ্রমণ ক্লান্তিকর ও কষ্টপ্রদ হবে। ভ্রমণের সঙ্কল্প না করাই ভালো। সন্তানদের শরীর ভালো যাবে না। পারিবারিক ক্ষেত্র মন্দ যাবেনা, গৃহে সুখশান্তি বজায় থাকবে। আর্থিক অবস্থা বিশেষ খারাপ হবে না, কিছু ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। অমিত ব্যয় বা অমিতাচারের প্রবণতা আছে, এদিকে সংযত হওয়া প্রয়োজন। যৌথ-কারবারী ব্যক্তির পক্ষে প্রাত্যহিক ব্যবসায়ের হিসাব নিকাশ সম্পর্কে বিশেষ হুঁসিয়ার হওয়া আবশ্যক। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। সম্পত্তি ব্যাপারে অশুভ হবে না। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে দৈনন্দিন কর্ম্মগুলির মধ্যে মগ্ন থাকাই ভালো.কেন না কোন প্রকার পরিকল্পনা বা প্রচেষ্টা আশাপ্রদ নয়। চাকুরি জীবিরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, প্রথমার্দ্ধে উপরওয়ালার বিরাগভাজন হোলেও শেষের দিকে অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি হবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবিরা নানা প্রকার অসুবিধা ও কর্ম্মে বাধা বিঘ্ন অবস্থার সম্মুখীন হোলেও শেষ পর্য্যন্ত সন্তোষ-জনক অবস্থা দেখা যাবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী শুভ, কোন উদ্দেশ্যে স্বার্থের হানি হবে না। অবৈধ প্রণয়ে সাফল্য লাভ। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে উত্তম পরিস্থিতি। অবিবাহিতাদের মধ্যে অনেকেরই সঙ্গতিপন্ন পরিবারে বিবাহের সম্ভাবনা। যে সব নারী বিদুষী, অধ্যাপিকা, সাহিত্যিকা ও বক্তৃতাপটু, তারা খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করবে। সমাজ কল্যাণে ও দেশহিতকর কর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যাপৃতারাও নিজেদের উদ্দেশ্য সাফল্য মণ্ডিত করতে সক্ষম হবে। রেসে আশানুরূপ লাভ হবে না। পরিক্ষার্থী ও বিদ্যার্থীর পক্ষে আশানুরূপ নয়।

কর্কট রাশি

মাসটীতে অশুভ ঘটনারই আধিক্য। আশাপ্রদ মাস বলা যায় না। শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি। উদ্বেগ আশঙ্কা ও মনস্তাপ। অজীর্ণতা জ্বর, চক্ষুপীড়া। পারিবারিক অশান্তি। গৃহ বিবাদ। স্বজন বিরোধ। আর্থিক সৌভাগ্য লাভের আশা সুদূরপরাহত। আর্থিক প্রচেষ্টায় নৈরাশ্য। বন্ধুদের কাছ থেকে কিছু সাহায্য প্রাপ্তি। স্পেকুলে-শনে বা বিপদ সঙ্কুল কর্ম্মোদ্যমে অগ্রসর হওয়া অবাঞ্ছনীয়, দুর্ভোগও ক্ষতির আশঙ্কা আছে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর অবস্থা মোটেই ভালো নয়। ভাড়া, খাজনা বা শস্য সংক্রান্ত ব্যাপারে গোল যোগের সৃষ্টি হবে। ভাড়াটিয়া চাষী প্রভৃতির কাছ থেকে নানা প্রকারে বাধা বিপত্তি আর প্রতারণার জন্যে তাদের বিব্রত হোতে হবে। মামলা মোকর্দ্দমার সম্ভাবনা আছে, এদিকে সতর্ক হোতে হবে। চাকুরি স্থানে সাংঘাতিক কিছু হবে না। দ্বিতীয়ার্দ্ধে উপরওয়ালার বিরাগভাজন হবার সম্ভাবনা, এজন্যে এমাসে যতদূর সম্ভব উপরওয়ালার সঙ্গে সম্প্রীতি বজায় রেখে চলাই ভালো। বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীর পক্ষে প্রথমার্দ্ধটি মোটামুটি ভালো যাবে, শেষার্দ্ধে সাংঘাতিক রকমের ক্ষতি হবে, আর এ ক্ষতি আয়ত্তের বাইরে। সমাজবিহারিণী নারীর পক্ষে প্রথমার্দ্ধটি অতীব উত্তম। অবৈধপ্রণয়িনীরা কিছু কিছু বাধা বিপত্তি ও দুর্ভোগের সম্মুখীন হবে। অবিবাহিতাদের বিবাহ সম্ভাবনা। যে সব নারী যৌথ কারবার বা ব্যবসায়ে ইচ্ছুক, তারা অনেকটা অনুকূল আবহাওয়ার সম্মুখীন হবে মাসের শেষার্দ্ধে। পারিবারিক, ও প্রণয়ে

ক্ষেত্রে কিছু বিশৃঙ্খলতা ভোগ। রেসে পরাজয়। পরীক্ষার্থী ও বিদ্যার্থীর পক্ষে শুভ নয়।

সিংহ রাশি

মাসটী শুভপ্রদ ও সাফল্যদায়ক। শত্রুজয়, প্রতিদ্বন্দ্বীর পরাভব, লাভ, সুখস্বচ্ছন্দতা, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ও উৎসব সমারোহে যোগদান, সৌভাগ্য, জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি প্রতিপত্তি। মাসের শেষে সামান্য পরিমাণে স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটবে মাত্র। শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা। পারিবারিক শান্তি ক্ষুণ্ণ হবে না। বিলাসব্যসন দ্রব্যাদি লাভ। আত্মীয় স্বজনবর্গের পরিবারে কিছু কিছু মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান বা বিবাহ। আয় স্ফীতি হেতু আর্থিক অবস্থা সম্পূর্ণ সন্তোষজনক। নানাপ্রকারে আয়। স্পেকুলেশনে ও রেসে লাভ হবে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে উত্তম সময়। গৃহাদি সংস্কার বা নির্ম্মাণ, কৃষির উন্নতিকল্পে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার, ভাড়ার হার বৃদ্ধিতে সাফল্য লাভ প্রভৃতি যোগ আছে। চাকুরিজীবিদের অতীব উত্তম সময়। পদোন্নতি, বেতন বৃদ্ধি নুতন পদমর্য্যাদা লাভ, প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাভূত করে উদ্দেশ্য সিদ্ধি, বেকার ব্যক্তিদের কর্ম্মপ্রাপ্তি, চাকুরিপ্রার্থীর নিয়োগকর্ত্তার কাছে আনুকুল্য লাভ। বিভাগীয় পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হওয়ার যোগ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের সুবর্ণ সুযোগ এবং কর্ম্মের বৃদ্ধি বিস্তার হেতু বিশেষ অর্থাগম। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়। অবৈধ প্রণয়িণী ও দ্বিচারিণীরা নানাপ্রকারে প্রচুর সুযোগ সুবিধা, অর্থ ও উপহার লাভ করবে। সামাজিক, পারিবারিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে আশাতীত সাফল্য লাভ। অলঙ্কারাদি, প্রসাধন ও উত্তম বসনাদির জন্য অর্থ ব্যয় করবে। শারীরিক স্বচ্ছন্দতা অটুট রাখবার জন্যে আহার বিহারে সংযত হওয়ার আবশ্যক। স্ত্রীব্যাধির আশঙ্কা আছে এজন্য সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে এ মাসটী উত্তম।

কন্যা রাশি

মাসটী মিশ্রফলদাতা। পরিবারভুক্ত ব্যক্তিদের শারীরিক অসুস্থতার আশঙ্কা আছে। নিজের শারীরিক দুর্ব্বলতা অনুভূত হবে, তা ছাড়া শরীর ভেঙেও পড়বে একটু। সামান্য দুর্ঘটনাদির ভয় আছে। পারিবারিক ব্যাপারগুলি ভালোমন্দের সংমিশ্রণে কেটে যাবে। দ্বিতীয়ার্দ্ধে পারিবারিক কলহ বা মনোমালিন্য ঘটতে পারে। আর্থিক অবস্থা প্রথমার্দ্ধে উন্নত হবে। কর্ম্ম প্রচেষ্টায় জয় পরাজয় থাকবে, তবে সাফল্য বা জয়লাভের আধিক্য। ভূম্যধিকারী, বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবির পক্ষে মাসটি উত্তম। চাকুরির ক্ষেত্রে বিশেষ হুঁসিয়ার হয়ে কাজ করা আবশ্যক। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটি মন্দ নয়, প্রথমার্দ্ধে উন্নতির লক্ষণ প্রকাশ পাবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে সময় ভালোই যাবে। অবৈধ প্রণয়িনীর সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। কোর্টসিপ ও প্রণয় সম্পর্কে পুরুষের সহিত আচার আচরণে সতর্কতা, চিত্তের সংযম ও স্থৈর্য্য প্রয়োজন, অন্যথা নানাপ্রকার অশান্তির কারণ ঘটবে। দেশের কাজে, সমাজ কল্যাণে, চিত্রে ও রঙ্গমঞ্চে যে সব নারী নিয়োজিত তাদের শুভ সময় ও বিশেষ সাফল্য। যে সব নারী বুদ্ধি বিবেচনা প্রয়োগ না করে ভাব প্রবণতায় প্রণয় অর্পণ করবে, তারা লাঞ্ছনা ভোগ করতে পারে। রেসে পরাজয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে এ মাসটি মন্দ যাবে না।

তুলা রাশি

অশুভ ফলের আধিক্য। মাসটী মিশ্রফলদাতা। শেষার্দ্ধটি কিঞ্চিৎ ভালো। সামান্য স্বাস্থ্যহানির কারণ ঘটবে। অজীর্ণ, উদরাময়, আমাশয়, জ্বর ইত্যাদির সম্ভাবনা। আহারাদি সম্পর্কে সতর্ক হওয়া বিধেয়। অনৈক্য মতভেদ ও দ্বন্দ্ব কলহ হোতে পারে স্বজনবর্গের সঙ্গে। মাসের শেষের দিকে সর্ব্বপ্রকারে শুভ। আর্থিক অভাব অনটন এমাসে প্রত্যক্ষ হবে। মতলববাজ বন্ধুরা প্রতারণা করতে পারে, এজন্যে টাকাকড়ি ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। সামান্য কিছু ক্ষতি হোলেও শেষের দিকে লাভজনক পরিস্থিতি। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। রেসে ক্ষতি। ভূম্যধিকারী, বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি মধ্যম। প্রথমার্দ্ধটি চাকুরিজীবির পক্ষে কিছুটা প্রতিকূল, দ্বিতীয়ার্দ্ধটি বিশেষ অনুকূল। উপরওয়ালার সহিত ব্যবহারে সতর্ক হয়ে চলা আবশ্যক কেন না বিরাগ ভাজন হওয়ার আশঙ্কা আছে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে হ্রাসবৃদ্ধি সম্পন্ন আয়। শেষার্দ্ধটি অনেকটা ভালো। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়। প্রত্যেকেরই মনের কামনা পূর্ণ হবে। গৃহিণীদের পক্ষেই উত্তম সময়। এ মাসে বাইরে ঘোরাঘুরি না করে গার্হস্থ্য ব্যাপারে নিজেকে সীমিত করা বাঞ্ছনীয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে অনুকূল।

বৃশ্চিক রাশি

মাসটি মিশ্রফল দাতা। প্রথমার্দ্ধটি বিশেষ ভালো যাবে। স্বাস্থ্যের অবনতি হবে না। পারিবারিক অশান্তির যোগ আছে। প্রথমার্দ্ধে পরিবারবহির্ভূত স্বজনবর্গের সহিত কলহ। এই কলহ থেকে পারিবারিক অশান্তি আসবে। মাসের প্রথমার্দ্ধে কিছু অর্থপ্রাপ্তি যোগ আছে। প্রতারণার আশঙ্কা। ভ্রমণে কিছু ক্ষতি যোগ। অর্থলাভের সুযোগসুবিধা প্রাপ্তি ঘটবে। আর্থিক নব প্রচেষ্টায় সিদ্ধিলাভ। ফাট্‌কার ব্যাপারে গেলে ক্ষতি হোতে পারে। ভূম্যধিকারী, কৃষিজীবী ও বাড়ীওয়ালার পক্ষে উত্তম। কৃষি ব্যাপারে নব পরিকল্পনা সিদ্ধি লাভের পথ প্রশস্তকর হবে। চাকুরিজীবীর পক্ষে মাসটি সম্পূর্ণ ভালো বলা যায়না, তবে বিবেক সম্মত হয়ে ধীর বিবেচনার সঙ্গে যে সব কাজ করা হবে তার পরিণতি শুভভাবাপন্ন। প্রথমার্দ্ধটি চাকুরিজীবীর অনুকূল। ব্যবসায় ও বৃত্তিজীবীরা মিশ্রফল ভোগ করবে। প্রচেষ্টার সাফল্যের আধিক্যই বেশী। মানসিক স্বচ্ছন্দতার অনুকূল কর্ম্মগুলি স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভপ্রদ হবে। সঙ্গীত চিত্র ও রঙ্গমঞ্চ ও অন্যান্য কলাচর্চ্চার দিকে আগ্রহশীলা নারী বহুবিধ সুযোগসুবিধা পাবে। অবৈধ প্রণয়ে আশাতীত সাফল্যলাভ। কোর্টসিপেও সাফল্যলাভ। তা ছাড়া ভ্রমণে আনন্দ। পরপুরুষের সঙ্গ ও সাহচর্য্য লাভের যোগ আছে, তাতেও অর্থ ও উপহারপ্রাপ্তি ঘটবে। পারিবারিক ক্ষেত্রে সামান্য অসুবিধা ভোগ। রেসে লাভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ বলা যায় না।

ধনু রাশি

মাসটি মিশ্রফল দাতা হোলেও শুভসংযোগই বেশী। স্বাস্থ্যের অবনতি ঘট্‌বেনা। বায়ুও পিত্তের কিঞ্চিৎ প্রকোপ হোতে পারে। পারিবারিক শান্তি ও শৃঙ্খলা অটুট থাকবে। পরিবারের বহির্ভূত স্বজন ও বন্ধুবর্গের সহিত কিঞ্চিৎ মনোমালিন্য হবার যোগ আছে। লাভ ক্ষতি দু'ইই হবে, কিন্তু ক্ষতির চেয়ে লাভের ভাগই বেশী। আর্থিক অবস্থা উত্তম হবে। ফাট্‌কার দিকে ঝোঁক দিলে ক্ষতি হবে। রেসে পরাজয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি উত্তম। কৃষিক্ষেত্রে নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ সুরু করা বাঞ্ছনীয়, অধিক উৎপন্ন ও লাভ আশা করা যায়। চাকুরীর ক্ষেত্রে দ্বিতীয়ার্দ্ধটি বিশেষ শুভ। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাফল্য। চাকুরিপ্রার্থীগণ নিয়োগ কর্ত্তার দর্শনেচ্ছু হয়ে এসে কর্মস্থলে সুযোগ-সুবিধালাভ করবে। প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রুদের ষড়যন্ত্রপূর্ণ কার্য্যের জন্যে নানা প্রকার অসুবিধা ও কষ্টভোগ হবে। কিন্তু নিজের কর্ম্ম দক্ষতা বলে এদের সর্ব্ব প্রকার কু-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিভোগীদের বিশেষ লাভ হবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি শুভ। অপরের কাছ থেকে উপহার প্রাপ্তি। অভিজাত সৌখীন সমাজে মেলামেশা ও সকল রকম সুযোগ-সুবিধা লাভ। অবৈধ-প্রণয়িনীরা নানা প্রকারে সুখস্বচ্ছন্দতা ভোগ করবে। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে আশাতীত সাফল্য। মর্য্যাদা ও প্রতিষ্ঠালাভ। বিলাস ব্যসনের জন্য ব্যয়ের দিকে বিশেষ ঝোঁক। বহু পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে প্রীতিজনক পত্রাদির আদান-প্রদানে চিত্তের প্রফুল্লতা। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

মকর রাশি

মাসটী মোটামুটি এক ভাবেই যাবে। স্বাস্থ্যের কিছু অবনতি ঘট্‌বে। শেষার্দ্ধ অপেক্ষা প্রথমার্দ্ধে শারীরিক কষ্ট ভোগ। উদরশূল, শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট, রক্তের চাপ বৃদ্ধি প্রভৃতির সম্ভাবনা, শেষার্দ্ধে মানসিক কষ্ট। এই কষ্ট পারিবারিক অবস্থা থেকেই উদ্ভব হবে। পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ও বহির্ভূত ব্যক্তিরাই হবে দুঃখ কষ্টের কারণ। অর্থ ক্ষতি যোগ। টাকা কড়ি লেনদেন ব্যাপারে, ভ্রমণে বা অর্থ নিয়ে চলা ফেরার সময়ে সতর্ক তা আবশ্যক। মতলববাজ ব্যক্তিদের পরামর্শ বা প্রলোভনে পড়লে ক্ষতি হবে। এরা রাতারাতি বড় লোক করে দেবার লোভ দেখাবে সহজ উপায় সামনে তুলে ধরে। স্পেকুলেশনে অবাঞ্ছিত সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। রেসে পরাজয়। ভূমি, সম্পত্তি, উত্তরাধিকার সূত্রে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি প্রভৃতি প্রাপ্তি যোগ আছে। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে মধ্যম। প্রথমার্দ্ধে চাকুরির ক্ষেত্র শুভব্যঞ্জক নয়, দ্বিতীয়ার্দ্ধটী অনুকূল। পদোন্নতি যোগ। নূতন পদমর্য্যাদালাভ ও বেতন বৃদ্ধি। যারা পরীক্ষা দিয়েছে, তারা সাফল্য লাভ করবে ও পদে নিযুক্ত হবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবিরা মাসের প্রথমে নানা প্রকার বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হবে। অবিবাহিতাদের এমাসে বিবাহের যোগ আছে। বিবাহিতারা সামাজিক বিবিধ অনুষ্ঠানে, উৎসবে, পার্টিতে যোগদান করে আনন্দলাভ করবে। অবৈধ প্রণয়ে আশাতীত সাফল্য লাভ ঘট্‌বে। পুরুষের সান্নিধ্য ও সাহচর্য্য প্রাপ্তি ও ঘনিষ্টতাসূচিত হয়। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে অতীব উত্তম পরিস্থিতি। চাকুরি জীবি নারী অনুগ্রহলাভ করবে। তাদের পদোন্নতি পুরস্কার ও নিয়োগ কর্ত্তার কৃপা লাভ হবে। বিদ্যার্থী ও পক্ষে উত্তম সময়।

কুম্ভ রাশি

মাসটী অবসাদকর। স্বাস্থ্যের অবনতি ও পীড়ার সম্ভাবনা। উদরের গোলমাল ও রক্তের চাপবৃদ্ধি। পরিবারের মধ্যে কলহবিবাদের আশঙ্কা ঘরেবাইরে মনোমালিন্য। আর্থিক স্বচ্ছন্দতার অভাব। প্রথমার্দ্ধে অভাব অনাটন, ব্যয়বৃদ্ধি এমনকি বিশেষ অর্থক্ষতি। দ্বিতীয়ার্দ্ধ বিশেষ শুভজনক হবে। কিছু লাভ, বিলাস ব্যসন ও আনন্দ উপভোগ। স্পেকুলেশনে লোক সান। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে সন্তোষ জনক নয়, নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা। দৈনন্দিন জীবন ধারা বজায় রেখে চলাই ভালো। চাকুরিজীবিদের পক্ষে মাসের প্রথমার্দ্ধ শুভজনক নয়। দ্বিতীয়ার্দ্ধ প্রতিকূল না হলেও উল্লেখ যোগ্য কোন ঘটনা দেখা যায় না। দৈনন্দিন কর্ম্মে মনঃ সংযোগ করে থাকাই ভালো। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে মাসটি মন্দ নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি একভাবেই যাবে, ভালোমন্দ বিশেষ কিছু দেখা যায় না। রোমান্সের দিকে না ঝুঁকে গৃহস্থালীর ব্যাপারে মনঃ সংযোগ বাঞ্ছনীয়। অবৈধ প্রণয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশঙ্কা। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে সময় একপ্রকারে উত্তীর্ণ হবে। এ মাসে রোমান্স, অবৈধ প্রণয় প্রভৃতির দিকে সাধারণতঃ মন টান্‌বে। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

মীন রাশি

অতীব শুভ মাস। শেষার্দ্ধ অপেক্ষা প্রথমার্দ্ধ উত্তম। সাফল্য ও সৌভাগ্য, সুখ, লাভ, আমোদ প্রমোদ, বিলাস ব্যসন প্রাপ্তি প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়; দ্বিতীয়ার্দ্ধে দুয়েকটি ক্লান্তিকর ভ্রমণ, দুঃখ ও উদ্বিগ্নতা। স্বাস্থ্য উত্তম। দ্বিতীয়ার্দ্ধে আবহাওয়া পরিবর্ত্তনহেতু অসুস্থতা ঘটতে পারে। পারিবারিক শান্তি ও সুখ স্বচ্ছন্দতা, বিলাসব্যসন, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি প্রথমার্দ্ধে সম্ভাবনা আছে। আর্থিক অবস্থা অতীব শুভ। কর্ম্মপ্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ। প্রচুর লাভ। দ্বিতীয়ার্দ্ধে বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক। অপরিমিত ব্যয়, অর্থ অপচয় ও কিছু ক্ষতি ঘটতে পারে। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। ভূমি, গৃহ, খনিজ সংক্রান্ত বিষয়ে মাসটি বিশেষভাবে অনুকূল। ভূমি ও গৃহ ক্রয়, বিক্রয় ও বিনিময়ে যথেষ্ট লাভ। ভাড়া বিলি বন্দোবস্ত করলেও গৃহ থেকে আয় বৃদ্ধি বিশেষ ভাবে হবে আর তাতে যথেষ্ট লাভবান হওয়ার যোগ। চাকুরির ক্ষেত্র অতীব শুভ. পদোন্নতির বা পদমর্য্যাদা বৃদ্ধির সুসংবাদ অপেক্ষা করছে। বেকার ব্যক্তিরা কর্ম্মলাভ করবে। যারা অস্থায়ী পদে আছে তাদের চাকুরি পাকা হবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে প্রথমার্দ্ধে বিশেষ উন্নতি

লাভ। দ্বিতীয়ার্দ্ধে তারই ফলপ্রাপ্তি। স্ত্রীলোকের আশা আকাঙ্ক্ষা সর্ব্ববিষয়ে পূর্ণ হবে, কর্ম্মকুশলতার আনুকূল্যে সামাজিক সাফল্য, সম্মান, প্রতিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তা, প্রথমার্দ্ধে আশানুরূপ উন্নতি। নানা আমোদ প্রমোদে সময় অতিবাহিত হবে। অবৈধ প্রণয়ে নানাপ্রকার লাভ, প্রফুল্লতা ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যভোগ। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে প্রসার প্রতিপত্তি ও সাফল্য লাভ। এ মাসটী রোমান্টিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে যাবে। অবিবাহিতাদের প্রেমে পড়া, বিবাহ প্রভৃতির সম্ভাবনা। অলঙ্কার, মূল্যবান আসবাবপত্র ও বসনভূষণ, প্রসাধন বস্তু প্রভৃতি প্রাপ্তিযোগ।

—

ব্যক্তিগত দ্বাদশ লগ্নের ফলাফল

মেষ লগ্ন

কল্পিত বা উদ্দিষ্ট কর্ম্মে বিঘ্ন। উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তি প্রাপ্তি, কিম্বা সম্পত্তি প্রাপ্তিতে বাধা বিঘ্ন। পারিবারিক কারণে বা গৃহভূমির ব্যাপারে অর্থহানি, কাজকর্ম্মের জন্য বহু অনুগত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সদিচ্ছা লাভ, সন্তানের ব্যাপারে অশান্তি ও ঝঞ্ঝাট। মুরুব্বির সাহায্যে কর্ম্মোন্নতি, আয়বৃদ্ধি, আর্থিক সুযোগ কিন্তু মানসিক দুর্য্যোগ। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়। পরীক্ষার্থী ও বিদ্যার্থীর পক্ষে শুভ।

বৃষলগ্ন

পিতৃবিয়োগ সম্ভাবনা, প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তির শত্রুতা। দায়িত্বপূর্ণ ও মর্য্যাদাপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন। বৃথা ব্যয়ের জন্য অনুশোচনা ও মনোকষ্ট। স্ত্রীর জন্য অশান্তি বা ঝঞ্ঝাট, কাজে অবহেলার জন্য আশাভঙ্গ, উত্তম অর্থোপার্জ্জন যোগ। নানাপ্রকারে অর্থব্যয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি মধ্যম। পরীক্ষার্থী ও বিদ্যার্থীর পক্ষে উত্তম।

মিথুনলগ্ন

শারীরিক অসুস্থতা, ভাগ্যোন্নতি, কর্ম্মোন্নতির যোগ মধ্যবিধ। নূতন গৃহাদি নির্ম্মাণ, ভ্রমণ, মামলা মোকর্দ্দমা, শিরঃপীড়া, গতিপথে প্রবল বাধা, পারিবারিক দুর্য্যোগ। সন্তান, পত্নী ও গুরুস্থানীয়ের পীড়া যোগ। রবিশস্যের ব্যবসায়ীর ক্ষতি। দুর্ঘটনার ভয়। সহোদরের জন্যে অশান্তির সৃষ্টি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আংশিক বাধা। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ সময়।

কর্কটলগ্ন

ক্ষণপরিবর্ত্তনের মধ্যে দিশাহারা। ব্যক্তিত্বের প্রভাব। সর্পাঘাতের আশঙ্কা বা শরীরে বিষ প্রবেশ, স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য ও বিচ্ছেদ, উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে বিরোধ, ব্যবসায়ে ক্ষতি ও প্রতিষ্ঠাহানি, আর অংশীর দ্বারা শত্রুতা, ভাগ্যোন্নতি যোগ, শারীরিক বিষয়ের ফল শুভ নয়, সন্তানের বিবাহ সম্ভাবনা, স্ত্রীলোকের পক্ষে অশুভ সময়, পরীক্ষার্থী ও বিদ্যার্থীর পক্ষে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি।

সিংহলগ্ন

সহোদরের স্বাস্থ্যহানি। উত্তম ধনোপার্জ্জন। কর্ম্মস্থলে অশান্তি অপব্যয় ও লোকাপবাদ। সম্ভোগের ব্যাপারে বহু ব্যয়, নানা রকমে দ্রব্যাদির অপচয়। ভ্রমণ ও স্থান পরিবর্ত্তনে অনর্থক ব্যয়, কামপ্রবণতা মামলা মোকর্দ্দমায় পরাজয়। মধ্যে শারীরিক অসুস্থতা, কণ্ঠনালী প্রদাহ স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়। পরীক্ষার্থী ও বিদ্যার্থীর পক্ষে শুভ।

কন্যালগ্ন

বন্ধুর জন্য অপব্যয়, শিরঃপীড়া বা চক্ষুপীড়ার প্রবণতা, সাফল্যের জন্য খ্যাতি, গৃহভূমির ব্যাপারে অর্থহানি, স্ত্রীর সঙ্গে মতভেদহেতু পারিবারিক সুখের অভাব, কর্ম্মোন্নতি বা পদোন্নতি। অবিবাহিত ও অবিবাহিতাদের বিবাহ যোগ। নানাবিধ উত্তম সুযোগ প্রতিযোগিতায় জয় লাভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যবিধ সময়। পরীক্ষার্থী ও বিদ্যার্থীর পক্ষে কিঞ্চিৎ বাধা।

তুলা লগ্ন

ভাগ্যোন্নতি। মাঙ্গলিক কার্য্যে অন্তরায়। বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রে উন্নতি লাভ। সুযোগ লাভ, কর্ম্মস্থানে বিশৃঙ্খলা। কর্ত্তৃত্বপূর্ণ পদে অবস্থান। সন্তোষজনক আয় ও উপার্জ্জন। আমোদ উৎসবে ব্যয়। সাহিত্যিকের পক্ষে সম্মান ও প্রতিপত্তি। পদোন্নতি যোগ, মায়ের বিশেষ পীড়া। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম সময়।

বৃশ্চিকলগ্ন

ভাগ্য সুপ্রসন্ন। প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি। কর্ম্মস্থলে দায়িত্ব ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি। পত্নীসুখ ও দাম্পত্যপ্রণয়। পাকযন্ত্রের পীড়া, বাতবেদনা। ধনবৃদ্ধি, উচ্চপদ, সময়ে সময়ে ব্যয় বাহুল্য। গৃহে উৎসব অনুষ্ঠান, প্রতিবেশীদের সঙ্গে হৃদ্যতা, স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম, পরীক্ষার্থী ও বিদ্যার্থীর পক্ষে মধ্যবিধ ফল।

ধনুলগ্ন

বিশেষ অর্থাগম। মানসিক ব্যগ্রতার মধ্যে অগ্রগতি। অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন। ভ্রমণের দ্বারা সম্মান লাভ। এজেন্সি কন্ট্রাক্ট কাজে অর্থপ্রাপ্তি, ব্যবসায়ে সাফল্য, বৈদেশিক ব্যাপারে ও আয়। আধিপত্য ও উৎসাহ বৃদ্ধি। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভাশুভ সময়। পরীক্ষার্থী ও বিদ্যার্থীর পক্ষে অনুকূল।

মকরলগ্ন

ভাগ্যোন্নতির পথে অন্তরায় বা বাধা বিপত্তি, আকস্মিক অপ্রিয় ঘটনায় মানসিক উদ্বেগ, ধনোপার্জ্জনে সুযোগ-সুবিধা, বাসস্থান সংক্রান্ত ব্যাপারে অশান্তি, স্ত্রীর সহিত মনোমালিন্য, নূতন ঋণের সম্ভাবনা, দেহ ভাব শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ বলা যায় না। পরীক্ষার্থী ও বিদ্যার্থীর পক্ষে আশানুরূপ হবে।

কুম্ভলগ্ন

ভাগ্য ও ধর্ম্মভাবের উন্নতির যোগ প্রবল নয়। কর্ম্মস্থানের ফল ও সম্পূর্ণ সন্তোষজনক বলা যায় না। শারীরিক ও মানসিক সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভ। প্রতি কার্যের প্রারম্ভে বাধা, গুরুজনের সঙ্গে দ্বন্দ্বভাব, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, পোষাক পরিচ্ছদের আড়ম্বর। শত্রুহানি। সংগঠনে দক্ষতা, কিঞ্চিৎ আয়বৃদ্ধি। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। পরীক্ষার্থী ও বিদ্যার্থীর পক্ষে শুভ।

মীনলগ্ন

ভাগ্যোন্নতির যোগ। বিদেশ ভ্রমণ। বিবাহার্থীর পত্নীলাভ, মাতার স্বাস্থ্যহানি বা পীড়া। ভূসম্পত্তি বা নূতন গৃহাদি যোগ। উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ। আর্থিক পরিস্থিতি বিশেষ অনুকূল, অপ্রত্যাশিত সুযোগ, বায়ু প্রকোপজনিত যে কোন রূপ পীড়ায় আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা। সন্তানের দেহপীড়া, বিদ্যা চর্চ্চায় অমনোযোগিতা। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম সুযোগ লাভ।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ শ্রদ্ধাঞ্জলি

শান্তশীল দাশ

তোমার জীবনদীপ নিবে গেল অকস্মাৎ
বলবো না ; পেয়েছিলে সুদীর্ঘ জীবন
নিরাময় বিধির আশীষে।
আর সেই জীবনের প্রতিদিন পরম নিষ্ঠায়
ব্রতী ছিলে সাধনার মাঝে :
সে তো সাধনাই, অখণ্ড অটুট।

নিন্দা-স্তুতি অবহেলা করে গেছ অকাতরে,
সত্য যাহা, যা শুচি সুন্দর
কুণ্ঠাহীন উচ্চস্বরে বলে গেছ বারবার :
শুনেছি, জেনেছি নানা মুখে।

জ্ঞানের বিচিত্র ক্ষেত্রে নিত্য তব ছিল
আনাগোনা ;
একটি শতাব্দী প্রায় ধরা ছিল তোমার মাঝারে
আপন বৈচিত্র্য নিয়ে—ভাল মন্দ,
উত্থান পতন ;
যুগের প্রতিটি পাতা স্বচ্ছ ছিল মনের মুকুরে।

তোমার পথের যাত্রী এলো যারা, দিলে অকাতরে
তোমার অমূল্য দান—অমেয় সঞ্চয়।
সে-দানের মাঝে তুমি চিরদিন রবে দীপ্যমান
কালের পাতায় আর মানুষের মনে।

অবেলায়

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

যবে মধুমাসে ফুল ছিল মধুভরা
এলো নাকো অলি হায়রে!—
আহা এ ধূ ধূ নিদাঘে ফুলবনে বঁধু
বৃথা শুধু কেঁদে যায় রে।
কোথা সে মলয়?—বৈশাখী বায়ু
শোষে কুসুমের দুদিনের আয়ু ;
ক্ষণ-বসন্ত,—বন-বনান্তে
আজি মিছে খোঁজা তা'য়রে!
আর কোথা সে আবেশ?—সব হ'ল শেষ,—
কি ফল গীতিগুঞ্জে!
ঐ মরণ হানিছে ঘন করতালি
লতাপল্লব পুঞ্জে।
এযে ভাঙা জলসায় বাজানো সানাই
শুধু সুর ঢালা,—শ্রোতা কোথা পাই!
শায়কবিহীন ঋতুরাজ আজ,
রিক্ত তাহার তূণ যে!

বলো এতদিন কোথা ছিলে হে ভ্রমর?
গেছে ঘুঁচে অভিমান তো?
কেন ফুলের শ্মশানচিতায় লুটিতে
অবেলায় এলে ভ্রান্ত?
তুমি কোন্ উপবনে ছিলে বসি' বঁধু,
পান করি কার মর্মের মধু!
প্রাতের মাধুরী মিলিবে কি রাতে?—
দিন হ'ল অবসান তো!
এই যৌবন সে যে উষার শিশির—
রহে বলো কত দিন গো?
সে যে নদীর পুলিনে প্রবাহের মতো
রাখে ক্ষণিকের চিন্ গো।
হের পেলব পুষ্পে নামিয়াছে জরা,
আর ফোটা নয়,—ঝরা—শুধু ঝরা!
আজি নিকুঞ্জে বাজিছে ব্যাকুল
বিদায়ের সুরে বীণ গো!

সম্পাদনা : শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

খেলার কথা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

ইংলণ্ড-পাকিস্তান—২য় টেস্ট :

পাকিস্তান : ৩৯৩ (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। হানিফ মহম্মদ ১১১, জাভেদ বার্কি ১৪০ এবং সয়িদ আমেদ ৬৯। লক ১৫৫ রানে ৪ উইকেট) ও ২১৬ (হানিফ মহম্মদ ১০৪ এবং আলিমুদ্দিন ৫০। এ্যালেন ৩০ রানে ৫ এবং লক ৬৯ রানে ৪ উইকেট)

ইংলণ্ড : ৪৩৯ (পুলার ১৬৫, বার্বার ৮৬ এবং ব্যারিংটন ৮৪। ডি'সুজা ৯৪ রানে ৪ এবং সুজাউদ্দিন ৭৩ রানে ৩ উইকেট) ও ৩৮ (কোণ উইকেট না খুইয়ে)

ঢাকায় অনুষ্ঠিত পাকিস্তান বনাম ইংলণ্ডের দ্বিতীয় টেস্ট খেলা ড্র যায়। ইংলণ্ড প্রথম টেস্ট খেলায় ৫ উইকেটে জয়লাভ করায় ১—০ খেলায় অগ্রগামী হয়।

ইংলণ্ড টসে পরাজিত হয়—ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান সফরে ভাগ্যের খেলায় ইংলণ্ডের ৭টা টেস্ট খেলায় ৬ষ্ঠ পরাজয়—উপর্য্যুপরি ৫ম পরাজয়।

পাকিস্তান প্রথমদিন ব্যাট ক'রে ২ উইকেট হারিয়ে ১৭৫ রান করে।

দ্বিতীয় দিনে পাকিস্তান ৭ উইকেটে ৩৯৩ রান তুলে প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। এইদিন ইংলণ্ডের কোন উইকেট না পড়ে ৫৭ রান ওঠে।

খেলার তৃতীয় দিনে ইংলণ্ড ১ উইকেট হারিয়ে ৩৩৩ রান দাঁড় করায়। চতুর্থ দিনে ইংলণ্ডের ৯টা উইকেট পড়ে। ২য় উইকেট পড়ে দলের ৩১৫ রানের মাথায়, কিন্তু বাকি ৮টা উইকেট পড়ে গিয়ে ইংলণ্ডের মাত্র ৯৪ রান যোগ হয়। ইংলণ্ড ৪৬ রানে অগ্রগামী হয়। এইদিন পাকিস্তানের কোন উইকেট না পড়ে ৩৫ রান ওঠে।

খেলার পঞ্চম দিনে পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংস ২১৬ রানে শেষ হয়। হানিফ মহম্মদ পাকিস্তানের পক্ষে সর্ব্ব প্রথম একটি টেস্ট খেলার উভয় ইনি'সে সেঞ্চুরী (১১১ ও ১০৪) করার গৌরব লাভ করেন। এ পর্য্যন্ত সরকারী টেস্ট খেলায় ১৮জন খেলোয়াড় এই কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। তাঁদের মধ্যে তিনজন খেলোয়াড়—ক্লাইড ওয়ালকট, জর্জ্জ হেডলি (ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ) এবং হার্বাট সাটক্লিফ (ইংলণ্ড) দু'বার এইভাবে সেঞ্চুরী ক'রে বিশ্ব রেকর্ড করেছেন। ক্লাইড ওয়ালকট অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে একই টেস্ট সিরিজে (১৯৫৪-৫৫) দু'বার টেস্ট খেলার উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী ক'রে যে নতুন ধরণের বিশ্ব রেকর্ড করেছিলেন তা আজও কেউ করতে পারেন নি। একটি টেস্ট খেলার উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করেছেন—ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ৫জন মোট ৭ বার, ইংলণ্ডের ৫জন মোট ৬বার, অস্ট্রেলিয়ার ৪জন মোট ৪বার, দক্ষিণ আফ্রিকার ২জন ২বার, ভারতবর্ষের একজন (১৪৫ ও ১১৬ বিজয় হাজারে, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে, এডলেড, ১৯৪৭-৪৮) ১ বার এবং পাকিস্তানের একজন ১বার।

এই দ্বিতীয় টেস্ট খেলারই দ্বিতীয় দিনে ইংলণ্ডের টনি

লক্ তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে ১৫০টি উইকেট পূর্ণ করার গৌরব লাভ করেন।

পঞ্চম দিন ইংলণ্ড ৩৫ মিনিট খেলার সময় হাতে নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে এবং কোন উইকেট না হারিয়ে ৩৮ রান তুলে দেয়।

তৃতীয় টেষ্ট ঃ

পাকিস্তান: ২৫৩ (আলিমুদ্দিন ১০৯ এবং হানিফ মহম্মদ ৬৭। নাইট ৬৬ রানে ৪ উইকেট) ও ৪০৪ (৮ উইকেটে। হানিফ ৮৯, ইমতিয়াজ ৮৬ এবং আলিমুদ্দিন ৫৩। ডেক্সটার ৮৬ রানে ৩ এবং বার্বার ১১৭ রানে ৩ উইকেট)

ইংলণ্ড ঃ ৫০৭ (টেড ডেক্সটার ২০৫, পিটার পার-ফিট ১১১, জিওফ পুলার ৬০ এবং মাইক স্মিথ ৫৬। ডি'সুজা ১১২ রানে ৫ এবং নাসিমুল গনি ১২৫ রানে ৩ উইকেট)

করাচীর তৃতীয় বা শেষ টেস্ট খেলাটিও দ্বিতীয় টেস্ট খেলার মত ড্র গেছে। ইংলণ্ড প্রথম টেস্ট খেলায় ৫ উইকেটে জয়লাভ করায় শেষ পর্য্যন্ত পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে ১—০ খেলায় 'রাবার' লাভ করেছে।

তৃতীয় টেস্ট খেলাতেও ইংলণ্ড টসের বাজিতে হেরে যায়। ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের বিপক্ষে মোট ৮টি টেস্ট খেলার ৭টি খেলায় ইংলণ্ড টসে হেরে যায়। টসে ইংলণ্ডের জয় হয় ভারতবর্ষের বিপক্ষে প্রথম টেস্ট খেলায়।

প্রথম দিনের খেলাতেই ২৫৩ রানে পাকিস্তানের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। এইদিন সময়ের অভাবে ইংলণ্ড প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করতে পারেনি। খেলা ভাঙ্গার নির্দ্দিষ্ট সময়ের মাত্র দু'মিনিট আগে পাকিস্তানের প্রথম ইনিংস শেষ হয়।

দ্বিতীয় দিনে ২টো উইকেট হারিয়ে ইংলণ্ড ২১৯ রান করে।

তৃতীয় দিনে ইংলণ্ড আরও ২টো উইকেট হারিয়ে ২৩৪ রান যোগ করে। মোট রান হয় ৪৫৩, ৪টে উইকেট পড়ে।

ডেক্সটার ডবল সেঞ্চুরী (২০৫ রান) করেন। বিদেশে সরকারী টেস্ট খেলায় ইংলণ্ডের অনেক কাল পর ডবল সেঞ্চুরী ক'ল। শেষ ডবল সেঞ্চুরী করেছিলেন ১৯৫৩-৫৪ সালে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের কিংস্টোনে লেন হাটন—সেও ২০৫ রানের ডবল সেঞ্চুরী।

এই ডবল সেঞ্চুরী ছাড়া ডেক্সটার তাঁর টেস্ট খেলোয়াড় জীবনে এই তৃতীয় টেস্টে ২০০০ রান পূর্ণ করেছেন। তাঁর মোট রান হয়েছে ২,১২৭।

চতুর্থ দিনে ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ৫০৭ রানে।

চতুর্থ দিনটা ছিল পাকিস্তানেরই সাফল্যের দিন। মাত্র ৯০ মিনিটের খেলায় তারা ইংলণ্ডের বাকি ৬ জন খেলোয়াড়কে আউট করে মাত্র ৫৪ রান দিয়ে। পাকি-স্তান এই দিন দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ ক'রে ২টো উইকেট হারিয়ে ১৪৭ রান করে। ফলে পাকিস্তান ইংল-ণ্ডের প্রথম ইনিংসের রানের থেকে ১০৭ রানের ব্যবধানে পিছিয়ে থাকে।

পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনে পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংস অসমাপ্ত রয়ে গেল, ৮ উইকেটে ৪০৪ রান। ফলে খেলা ড্র গেল।

ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় ইংলণ্ডের এইতিন জন খেলোয়াড় তাঁদের টেস্ট খেলোয়াড় জীবনে ২০০০ রান পূর্ণ করেছেন—কেন ব্যারিংটন (২৮টা খেলায় ২২৪৩ রান), টেড ডেক্সটার (৩০টা খেলায় ২১২৭ রান) এবং রিচার্ডসন (৩৩ টা খেলায় ২০৫৫ রান)।

আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতা ঃ

আমেদাবাদের আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতায় দশটি দেশ যোগদান করেছিল এবং ভারতবর্ষ ৯টি খেলাতে জয়লাভ করে অপরাজেয় অবস্থায় হকি চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। ভারতবর্ষ ৯টি খেলায় ৫১টি গোল দেয় এবং ভারতবর্ষের বিপক্ষে কোন দেশই গোল দিতে পারেনি।

জার্মানী প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করে ৯টি খেলায় ১৪ পয়েন্ট ক'রে। জার্মানী ০-১ গোলে ভারত-বর্ষের কাছে হার স্বীকার করে এবং দু'টি খেলা ড্র করে-হল্যাণ্ডের কাছে গোলশূন্যভাবে এবং নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১-১ গোলে। অস্ট্রেলিয়া তৃতীয় স্থান পেয়েছে হার দুটো ভারতবর্ষের কাছে ০-৩ গোলে এবং জার্মানীর কাছে ০—৩ গোলে এবং ড্র ১টা—মালয়ের সঙ্গে ১ গোলে।

লীগ খেলায় চুড়ান্ত ফলাফল

দেশ	খেলা	জয়	ড্র	হার	পঃ	বিঃ	পঃ
ভারতবর্ষ	৯	৯	০	০	৫১	০	১৮
জার্মাণী	৯	৬	২	১	৩০	৩	১৪
অস্টেলিয়া	৯	৬	১	২	৩০	৯	১৩
হল্যাণ্ড	৯	৫	২	২	১২	১৫	১২
মালয়	৯	৩	৩	৩	১৪	১২	৯
নিউজিল্যাণ্ড	৯	২	৪	৩	১৫	৯	৮
জাপান	৯	৩	২	৪	১০	১৮	৮
বেলজিয়াম	৯	৩	০	৬	১১	১৮	৬
সংযুক্ত আরব	৯	০	১	৮	৪	৪২	১
ইন্দোনেশিয়া	৯	০	১	৮	২	৫৪	১

গোলদাতা ঃ দর্শনসিং (ভারত) ২০ (দুইটি ; হ্যাট্রিকসহ) ; বি পাতিল (ভারত) ১১ (একটি হ্যাট্রিকসহ) পৃথিপাল সিং (ভারত) ও পরমলিঙ্গম (মালয়—একটি হ্যাট্রিকসহ) ৯ ; গুরুদেব সিং (ভারত) ৮ ; স্থলের (জার্মাণী) (হ্যাট্রিকসহ) ; ই পিয়ার্স (অস্ট্রেলিয়া) ও ডি পিপার (অস্ট্রেলিয়া) ৭ ; কানবে (জাপান) ৬ ; কেলার (জামাণী) ৫ ।

ভারতবর্ষের জয় (৯) : জাপানকে ১১—০ গোলে, ইন্দোনেশিয়াকে ১১—০ গোলে, মালয়কে ৩—০ গোলে, হল্যাণ্ডকে ৯—০ গোলে, নিউজিল্যাণ্ডকে ৪—০ গোলে, ইউনাইটেড আরব রিপাবলিককে ৫—০ গোলে, অস্ট্রেলিয়াকে ৩—০ গোলে, বেলজিয়ামকে ৪—০ গোলে এবং জার্মাণীকে ১—০ গোলে ভারতবর্ষ পরাজিত করে।

জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা ঃ

১৯৬১ সালের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে রেলওয়ে দল ৩—০ গোলে মহারাষ্ট্র দলকে পরাজিত ক'রে সন্তোষ ট্রফি জয়লাভ করেছে। রেলওয়ে দলের পক্ষে এই প্রথম ফাইনাল খেলা এবং প্রথম সন্তোষ ট্রফি জয়। ফাইনাল খেলায় মহারাষ্ট্র দল রেলওয়ে দলের সঙ্গে মোটেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেনি। বিরতির সময় রেলওয়ে দল ২—০ গোলে অগ্রগামী ছিল। রেলওয়ে দলের তৃতীয় গোলটি হয় খেলা ভাঙ্গার নির্দ্দিষ্ট সময়ের দু'মিনিট আগে।

প্রথম সেমি-ফাইনালে রেলওয়ে দল ১—০ গোলে বাংলাকে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠে। বাংলা গতবার (১৯৬০) ফাইনালের দ্বিতীয় দিনে ০—১ গোলে সার্ভিসেস দলের কাছে পরাজিত হয়ে রানার্স-আপ হয়েছিল। সেমি-ফাইনালে রেলওয়ে দলের কাছে বাংলার এই পরাজয় অপ্রত্যাশিত ঘটনা। মোট ১৭ বার (১৯৬০ পর্য্যন্ত) খেলার মধ্যে বাংলা মোট ১৪ বার ফাইনাল খেলে ১০ বার সন্তোষ ট্রফি লাভ করেছে। প্রতিযোগিতার সূচনা (১৯৪১) থেকে ১৯৫৩ সাল পর্য্যন্ত বাংলা প্রতিবারই অর্থাৎ উপর্যুপরি ১০ বার ফাইনাল খেলে ৭ বার সন্তোষ ট্রফি জয়লাভ করে। এর মধ্যে উপর্যুপরি জয় ৩ বার (১৯৪৯—১৯৫১)।

দ্বিতীয় সেমি-ফাইনালের খেলায় মহারাষ্ট্র তৃতীয় দিনে ৩—১ গোলে গত বারের (১৯৬০) বিজয়ী সার্ভিসেস দলকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে রেলওয়ে দলের সঙ্গে মিলিত হয়। প্রথম দিন ৩—৩ গোলে এবং দ্বিতীয় দিন ১—১ গোলে এই মহারাষ্ট্র-সার্ভিসেস দলের সেমি-ফাইনাল খেলাটি ড্র যায়। প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী দলগুলি প্রথমে আঞ্চলিক লীগ প্রথায় খেলে। এই লীগ খেলার ফলাফলের ভিত্তিতে মূল প্রতিযোগিতায় আসে ৮টি দল। মূল প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভের জন্যে এই দলগুলিকেও পুনরায় লীগ প্রথায় খেলতে হয়। সেমি-ফাইনালে ওঠে সার্ভিসেস, রেলওয়ে, বাংলা, এবং মহারাষ্ট্র।

লীগ খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

'এ' বিভাগ

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পঃ
সার্ভিসেস	৩	২	১	০	৫	০	৫
রেলওয়ে	৩	১	২	০	৫	০	৪
অন্ধ্র	৩	১	১	১	২	২	৩
আসাম	৩	০	০	৩	০	১০	০

'বি' বিভাগ

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পঃ
বাংলা	৩	৩	০	০	১২	০	৬
মহারাষ্ট্র*	৩	২	০	১	১০	৭	৪
মহীশূর*	৩	১	০	২	৮	১৫	২
দিল্লী	৩	০	০	৩	০	৮	০

*মহারাষ্ট্র বনাম মহীশূর দলের খেলা প্রথম দিন ০-০ গোলে এবং দ্বিতীয় দিন ৩—৩ গোলে ড্র যায়। তৃতীয় দিনে মহারাষ্ট্র ৫—১ গোলে জয়লাভ করে।

এশিয়ান লন্ টেনিস ঃ

১৯৬১ সালের এশিয়ান লন্ টেনিস প্রতিযোগিতায় অস্ট্রেলিয়া এবং ইংলণ্ড সরকারীভাবে যোগদান করায় প্রতিযোগিতার গুরুত্ব যথেষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছিল অস্ট্রেলিয়া, ইংলণ্ড, জাপান, যুগোশ্লাভিয়া, ডেনমার্ক, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান এবং ভারতবর্ষ।

এশিয়ান লন্ টেনিস প্রতিযোগিতা প্রথম আরম্ভ হয় ১৯৪৯ সালে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ক্যালকাটা সাউথ ক্লাবের লনে। প্রতিযোগিতাটি নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়নি, কয়েক বারই প্রতিযোগিতা বন্ধ থাকে।

ফাইনাল খেলা

পুরুষদের সিঙ্গলস: ১নং বাছাই খেলোয়াড় রয় এমার্সন (অস্ট্রেলিয়া) ৭—৫, ৬—৪, ৬—৩ সেটে রমানাথন কৃষ্ণণকে (ভারতবর্ষ) পরাজিত করেন। রয় এমার্সনকে স্ট্রেট সেটে গত বছর কৃষ্ণন পরাজিত করেছিলেন বিশ্ববিখ্যাত উইম্বলডন লন্ টেনিস খেলার কোয়ার্টার-ফাইনালে।

মহিলাদের সিঙ্গলস: ১নং বাছাই খেলোয়াড় মিস লেসলি টার্ণার (অস্ট্রেলিয়া) ৬—৩, ৬—২ সেটে ২নং বাছাই খেলোয়াড় মিস ম্যাডোনা সাকটকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস: ১নং বাছাই জুটি রয় এমার্সন এবং ফ্রেড ষ্টোলি (অস্ট্রেলিয়া) ৬—৩, ৬—২, ৯—৭ সেটে ৩নং জুটির খেলোয়াড় রমানাথন কৃষ্ণন এবং নরেশ কুমারকে (ভারতবর্ষ) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস: মিস লেসলি টার্ণার এবং মিস ম্যাডোনা সাকট (অস্ট্রেলিয়া) ৬—৪, ৬—১ সেটে পি বেলিং (ডেনমার্ক) এবং মিস আপ্পিয়াকে (ভারতবর্ষ) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস: মিস লেসলি টার্ণার এবং ফ্রেড ষ্টোলি (অস্ট্রেলিয়া) ৬—১, ৬—৩, ৬—১ সেটে রয় এমার্সন এবং ম্যাডোনা সাকটকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

প্রতিযোগিতায় অস্ট্রেলিয়ার বিরাট সাফল্য উল্লেখযোগ্য। তারা পাঁচটি অনুষ্ঠানেই জয়লাভ করেছে। মহিলাদের সিঙ্গলস এবং মিক্সড ডাবলস ফাইনালে কেবল অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রাই পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। অস্ট্রেলিয়ার মিস লেসলি টার্ণার 'ত্রিমুকুট' এবং অষ্ট্রেলিয়ার রয় এমার্সন 'দ্বিমুকুট' লাভ করেছেন যথাক্রমে তিনটি এবং দু'টি অনুষ্ঠানে জয়লাভ করে।

জাতীয় বিলিয়ার্ডস ও স্নুকার

১৯৬২ সালের জাতীয় বিলিয়ার্ডস প্রতিযোগিতার ফাইনালে ভূতপূর্ব বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান বব্ মার্শাল (অষ্ট্রেলিয়া) উইলসন জোন্সকে পরাজিত করেন। বব্ মার্শাল স্নুকার প্রতিযোগিতার ফাইনালে বি ভি কোমটিকে পরাজিত ক'রে একই বছরে দুটি খেতাব লাভ করেছেন।

খেলোয়াড়দের রাষ্ট্রীয় খেতাবলাভ ঃ

ভারতবর্ষের ত্রয়োদশ সাধারণতন্ত্রদিবসে এই চারজন খেলোয়াড় 'পদ্মশ্রী' খেতাব লাভ করেছেন—ফুটবল খেলোয়াড় গোষ্ঠ পাল, টেনিস খেলোয়াড় রমানাথন কৃষ্ণন এবং ক্রিকেট খেলোয়াড় পলি উমরীগড় এবং নরী কণ্টাক্টর।

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

ডঃ শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল প্রণীত "বিখ্যাত বিচার ও তদন্ত-কাহিনী" (৩য় পর্ব)—৩·৫০

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত নাটক "চন্দ্রগুপ্ত" (৩১শ সং)—২·৫০

শ্রীবাসুদেব রায় প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "এ মুহূর্ত নতুন"—১৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬
ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সঞ্জয়-সংবাদ

শিল্পী—শ্রীবীরেশচন্দ্র গাঙ্গুলী

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীদিলীপকুমার রায়ের "স্মৃতিচারণ" সম্বন্ধে কতকগুলি অভিমত

৺রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ (স্মৃতিচারণ) ভালো লেখেছে বললে কিছুই বলা হয় না। সবচেয়ে ভালো লেগেছে পড়তে যে-অংশে সুভাষের কথা লিখেছ। সুভাষের সঙ্গে তোমার যে-আন্তরিকতা ছিল, তার সঙ্গে বন্ধুত্বের মধ্যে যে-গভীরতা ছিল, তার প্রকাশ প্রতি লাইনে ধরা পড়ে। হৃদয়ের পূর্ণ আবেগে বন্ধুস্মৃতি লিখে গেছ, অথচ কোথাও আতিশয্য নেই, অতিরঞ্জন নেই। সত্যিকার সুভাষ কী ছিল—একমাত্র তার বন্ধুর লেখা থেকেই পাওয়া যাবে।...স্মৃতিচারণে তুমি নিজেকে যেমন ফোটাতে পেরেছ আর কোনো বইতে তা হয় নি। সব সময় consciously করেছ তা নয়, যেটা unconsciously করা তার মূল্য বেশি। সরলভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে লিখতে গিয়ে লেখা থেকে তোমার আত্মপরিচয় কত স্পষ্ট ফুটে উঠেছে তা তুমি বোধ হয় নিজেও বুঝবে না।

অধ্যাপক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার ঃ স্মৃতিচারণ পূর্বেই পড়িয়াছিলাম, আর একবার পড়িলাম। ইহাতে যে যুগের চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার সম্বন্ধে আমার কতকটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। সুতরাং আমি ইহা পড়িয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি। আপনি আমার ঐতিহাসিক চিত্তের অনেক রস যোগাইয়াছেন। আপনার মানস যবনিকার উপর যে সমুদয় বিচিত্র ঘটনা ও বহু প্রকৃতির বহু মানুষ ছায়াপাত করিয়াছে অপূর্ব ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিয়া আপনি বঙ্গ সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন। আপনি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানিবেন।

অধ্যাপক শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ ঃ স্মৃতিচারণ কেমন লাগিল তাহা বলি। প্রথমতঃ দোষের কথাই বলি—it whots the appetite—আপনার নানাবিষয়িণী রসাল বর্ণনা আস্বাদনের ফলে "আরও চাই, আরও চাই" এই পিপাসা জাগিয়া উঠে। আপনার বাল্য কৈশোর-যৌবনের স্মৃতিচারণ তো প্রথম খণ্ড শেষ হইল—এখন অবুঝ মন যে দ্বিতীয় খণ্ডে আপনার যোগজীবনের রহস্য আস্বাদনের জন্য আঁকু পাঁকু করিতেছে। এই অসঙ্গত লোভের কারণ আছে। আপনি যে উপাদেয় সামগ্রী পরিবেশন করিয়াছেন—যে সব নানা গুণীর চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তাঁহাদের অনেকেই যে আমার বিশেষ পরিচিত তাই absorbing interest বোধ হইয়াছে। সুভাস ও সত্যেনের সঙ্গে আপনার নিবিড় পরিচয় আমাকে বড় আনন্দ দিয়াছে।...এসব ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ ছাড়াও আপনার সাঙ্গীতিক ও বিশেষ করিয়া আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের যে বিচিত্র—অথচ সরল ও অকপট বিবরণ—আপনি দিয়াছেন তাহাতে আমি মুগ্ধ হইয়াছি। সবচেয়ে আমার ভালো লাগিয়াছে কি জানেন? আপনার শ্রদ্ধাভক্তি পূত হৃদয়খানি। আপনি লিখিয়াছেন যে আপনাকে অনেক hevo-worshipper বলিয়া বিদ্রূপ করে। করে করুক। আমি তো মনে করি nil admirari ভাব হইতে গুণিপূজা সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ। আমাদের শাস্ত্রে তো পরিষ্কার নির্দেশই আছে—"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্", অপরদিকে "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি"। কথা তো মিথ্যা নয়। ঠাকুর আপনার মনস্কামনা পূর্ণ করুন, আপনার ব্যাকুল সাধনায় আপনি সিদ্ধিলাভ করুন।

চাণক্য সেন (প্রবাসী) ঃ দিলীপকুমার রায়ের কৈশোর ও যৌবন কালের বিপুলায়তন স্মৃতিকথা বিশেষ উপভোগ্য এই জন্যে যে তিনি নিজের কথা "রসিয়ে" ও "উজিয়ে" বলতে গিয়ে তার সঙ্গে লেখেন এমন অনেক মানুষের কথা যা পড়তে, জানতে, বুঝতে পাঠকের ভালো লাগে।...দিলীপকুমার পাঠককে নির্দিষ্ট মানুষটির বড় কাছে এনে উপস্থিত করতে পারেন। তাঁর কলমে অনেকের চরিত্র সুন্দর ফুটে উঠেছে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি সুন্দর হয়ে ফুটেছে দ্বিজেন্দ্রলালের পরে অতুল প্রসাদের চরিত্র।...দিলীপকুমার কবি, সাহিত্যিক, বাণীবাহ, সাধক। কিন্তু তিনি যদি স্ব-মূল্যায়ন "সুর সুধাকর" নির্ধারণ করে থাকেন, তাঁকে সাবাস দেব। কারণ উত্তরকালের বাঙালী তাঁকে এই ভূমিকাতেই জানবে মানবে। দিলীপকুমারের...ভাষার লালিত্য, চিন্তার তীক্ষ্ণতা, মননের স্বচ্ছতা, অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির ব্যাপকতা ও সর্বোপরি নিবিড় সত্যনিষ্ঠা তাঁর সাহিত্য-কৃতির প্রতি বারংবার আমাদের আকর্ষণ করেছে।

অনির্বাণ ঃ স্মৃতিচারণ পেলাম। যদিও আগের পড়া তবুও পাতা ওলটাতে গিয়ে যেখানে সেখানে আটকে পড়ছি, আর আপনার সাবলীল বর্ণনার মুক্তধারায় ভেসে চলেছি। এমন অকপট দিলখোলা লেখা বড় একটা চোখে পড়ে না। বলার গুণে শ্রোতাকে আপন ক'রে নিতে পারেন বটে।...আপনি অকৃপণ বদ্ধ মুষ্টি নন। চিরজীবন যেখানে যেটুকু ভালো পেয়েছেন আহরণ ক'রে এনে সবার মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছেন। আমটি খেয়ে মুখটি পুঁছে ফেলেন নি।

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী ঃ "স্মৃতিচারণ"-এর জীবন কাহিনীর বিবরণ খুব ভালো লেগেছে। বক্তব্যের সঞ্চার নাটকীয় উৎকণ্ঠার (dramatic suspense) ম'ত পাঠককে কৌতূহলী ক'রে তোলে পরের ঘটনা জানার জন্য। আত্মকাহিনী লেখায় সংযম একটি কঠোর পরীক্ষা। আপনি অবলীলাক্রমে এ দুর্যোগ কাটিয়ে এসেছেন। পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীতে প্রতিকূল প্রভাব থাকা সত্ত্বেও কি ভাবে আপনি আধ্যাত্মিক সত্যসন্ধানী হয়েছিলেন, কি ভাবে ভক্তির টানে ঘরছাড়া হয়েছিলেন তার বিশদ বিবরণ পড়লে জনসাধারণ আপনাকে সাধক ব'লেই শ্রদ্ধা করবে, আমিও যথার্থ বিশ্বাসীকে শ্রদ্ধা করি, সুতরাং আমার শ্রদ্ধার্ঘ্যও অপরের সঙ্গে জমা রইল। বিরুদ্ধ মতাবলম্বী লর্ড রাসেল আপনার স্তুতির পাত্র হওয়ায় বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়েছি। আপনার উদারতার দৃষ্টান্ত অনেকের কাছে আদর্শ হয়ে থাকবে। ধর্মান্ধরা আপনার মহৎ গুণের কিছুটা পেলেও আমাদের দেশে অনেক উপকার হ'ত—গোঁড়ামি (fanaticism) এমন মারমুখী হ'য়ে উঠত না, হত্যার বিলাসে দেশের মাটি রক্তাক্ত হ'য়ে যেত না।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ঃ স্মৃতিচারণ পড়লাম। লেখা খুবই ভালো হয়েছে। আমার সম্বন্ধে এতে যা লিখেছ তার জন্যে আমি বড় কৃতজ্ঞ, দিলীপ। সঙ্গীত সম্বন্ধে ছোট একটা বই লিখেছি... তোমার গান সত্যিই অপূর্ব। কিন্তু ভালো করে লিখতে পারি নি। তোমার মতন অমন করে কে লিখতে পারে বলো?

দাম ঃ বারো টাকা

প্রকাশক ঃ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লি:

৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

চৈত্র—১৩৬৮

দ্বিতীয় খণ্ড | ঊনপঞ্চাশত্তম বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

রসতত্ত্বের ব্যাখ্যানে পাশ্চাত্য অবদান

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আরিস্টটল

সাহিত্য-রসিকদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে—রসবাদ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের গবেষণা কিছু আছে কি? আমাদের উত্তর হচ্ছে—"খুবই আছে। শুধু রস সম্বন্ধে নয়, রঙ্গ-রীতি বক্রোক্তি ব্যঞ্জনা অনেক কিছু সম্বন্ধেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আলঙ্কারিকদের মধ্যে আশ্চর্য্য মিল দেখতে পাওয়া যায়। যে সব সত্য সার্ব্বজনীন, বিভিন্ন দেশে সেগুলি আশ্চর্য্য সাদৃশ্যের সঙ্গেই ব্যাখ্যাত হয়েছে।"

পাশ্চাত্য দেশে অলঙ্কার শাস্ত্রের পথিকৃৎ হচ্ছেন Aristotle; খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতকে তাঁর আবির্ভাব হয়। ইংরাজ পণ্ডিত বুচার ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে Aristotleএর "Poetics"এর একটি ভাষ্য রচনা করেন। এই ইংরাজী ভাষ্য থেকেই গ্রীক ভাষায় অনভিজ্ঞ জনসাধারণ Aristotleএর মতবাদের সঙ্গে পরিচয় লাভ করেন।

প্রত্যেক দেশেরই সাহিত্য ও সংস্কৃতির একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। সেটা আসে বিভিন্ন দেশ ও জাতির শিক্ষা, সাধনা ও সভ্যতাগত স্বকীয়তা থেকে। এই জন্যই ভারতীয় ও গ্রীক দৃষ্টি ভঙ্গীর মধ্যেও কিছু কিছু পার্থক্য আছে। সেই জন্যই গ্রীস ও ভারতের সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বটা দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন জিনিসের উপর। তা হলেও এই দুটি দেশের সাহিত্য-সমীক্ষার কয়েকটা ব্যাপারে আশ্চর্য্য রকমের মিল দেখতে পাওয়া যায়।

গ্রীক তথা পাশ্চাত্য জীবনে বাস্তবপ্রিয়তা ও রজোগুণের অভিব্যক্তি যতটা দেখতে পাওয়া যায়, আধ্যাত্মিক উন্নতি

বা সত্ত্বগুণের বিকাশের জন্য ততটা ব্যগ্রতা দেখতে পাওয়া যায় না। গ্রীক চিত্র বা ভাস্কর্য্যের মধ্যে আছে বাস্তব মানুষের অনুকরণ। তাই এ্যাপোলো বা ভেনাসের মূর্ত্তি তৈরী করবার জন্য শিল্পীদের ছুটতে হয়েছে রক্ত মাংসের মানুষের কাছে, দেবী প্রতিমার জন্য মডেল করতে হয়েছে হয়ত নগর-নটীকে। কিন্তু ভারতীয় শিল্পীরা তাঁদের শিল্পে মূর্ত্তি তৈরী করতে গিয়ে বাহ্য-বাস্তবতার চেয়ে লক্ষ্য করেছেন আন্তর বৈশিষ্ট্যের। তাই তাঁদের হাতে বুদ্ধের মূর্ত্তি হয়েছে কখন স্থূল, কখনও কৃশ, কখনও হ্রস্ব, কখনও দীর্ঘ। তাই ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক "বুদ্ধের" চেয়ে "বুদ্ধত্ব" সৃষ্টির চেষ্টাটাই বেশী হয়েছে। ভারতীয় শিল্পে দেব-দেবীর মূর্ত্তি তৈরী করবার সময় ইচ্ছা করেই তার চোখ দুটিকে করা হয় আকর্ণ-বিস্তৃত, ইচ্ছা করেই তার মধ্যে এমন কতকগুলি অলৌকিকতা ফুটিয়ে তোলা হয়, যাতে সেগুলিকে ঠিক মানুষ বলে মনে করা না যায়। ভারতীয় শিল্পের লক্ষ্য হচ্ছে আন্তর উপলব্ধি; বাস্তব অনুকৃতি সেখানে গৌণ ব্যাপার।

তাই শিল্পের দিক দিয়ে, বা সাহিত্যের দিক দিয়ে ভারতবর্ষে বাহ্য অনুকৃতির চেয়ে আন্তর উপলব্ধির এবং আন্তর বৈশিষ্ট্যের অভিব্যক্তির দিকেই লক্ষ্য করা হয়েছে বেশী মাত্রায়। তাই গ্রীক সাহিত্য দর্শনে নাটকের কেন্দ্রগত জিনিস হচ্ছে "অনুকরণ"; আর ভারতীয় সাহিত্য-দর্শনে নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে "রসসৃষ্টি।"

অবশ্য পাশ্চাত্য অলঙ্কারতত্ত্বেও রসের আলোচনা আছে, আবার ভারতীয় নাটকেও অনুকরণের প্রয়োজন স্বীকার করা হয়েছে। নাট্যাচার্য্য ভরত বলেছেন—

"লোকবৃত্তানুকরণং নাট্যমেতন্ময়া কৃতম্।
উত্তমাধমমধ্যানাং নরানাং কর্ম্মসংশ্রয়ম্॥১।১১২

দশরূপকে বলা হয়েছে "অবস্থানুকৃর্নাট্যম্' ১।৭। তবে এদেশে বাহ্য অনুকরণের উপর ততটা জোর দেওয়া হয়নি, যতটা জোর দেওয়া হয়েছে রসোৎপত্তি বা রসোপলব্ধির উপর। ভরত বলেছেন "রসসমুদয়োহি নাট্যম্" (নাট্যশাস্ত্র ৬।৩৬)। পাশ্চাত্য আলঙ্কারিকরা "রস"কে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্বীকার করলেও তাঁরা গুরুত্ব আরোপ করেছেন "অনুকরণের" উপর। পাশ্চাত্য অলঙ্কারতত্ত্বে বাস্তবের অনুকরণের উপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছে বলেই Plot action character unities প্রভৃতির আলোচনা তাতে বেশী মাত্রায় হয়েছে। তবে নাটকের ব্যাপারে রসোৎপত্তি বা রসোপলব্ধির দিকটা যে তাঁরা লক্ষ্য করেন নি, তা নয়। Aristotleএর মৌলিক রচনা অথবা তাঁর ভাষ্যকার বুচারের রচনা থেকে রসবাদ সম্বন্ধে ভুরি ভুরি উদ্ধৃতি ও ব্যাখ্যান পাওয়া যায়।

রসের আস্বাদ্যমানতা; স্থায়িভাব প্রভৃতি—

রস শব্দের মূল অর্থ হচ্ছে আস্বাদ বা আনন্দ। এই আনন্দটা স্থায়িভাব-(emotion) জাত। এখন দেখা যাক পাশ্চাত্য মতে কাব্যনাটকের সঙ্গে emotional delightএর সম্পর্ক স্বীকৃত হয়েছে কিনা। বুচার বলেছেন—

"The other theory tacitly held by many, but put into definite shape first by Aristotle was that poetry is an emotional delight, its aim is to give pleasure."

(Aristotle's theory of poetry and Fine Art p. 215)

এখানে emotional delight কথাটা লক্ষ্যণীয়। রসের আনন্দের উৎসটাই হচ্ছে ভাব বা স্থায়ী ভাব। বলা বাহুল্য, এই স্থায়ী ভাব ও emotion একই পদার্থ।

নিছক স্থায়িভাবটা রস নয়।

তবে নিছক স্থায়িভাবটা রস নয়, কারণ emotional delight এর মধ্যে প্রক্ষোভগত উত্তেজনা প্রায়ই আনন্দবোধকে ব্যাহত করে। রসের আনন্দটা নিছক স্থায়ী ভাবের আনন্দের চেয়ে নির্ম্মলতর ও উচ্চস্তরের পদার্থ। পাশ্চাত্য মতবাদেও এই কথাটা স্বীকৃত হয়েছে। উল্লিখিত গ্রন্থেই বলা হয়েছে "The object of poetry as of all fine arts is to produce on emotional delight, a pure and elevated pleasure" (p 221)

Aristotle লক্ষ্য করেছিলেন যে লৌকিক স্থায়িভাবজাত আনন্দের (emotional delight) মধ্যে একটা চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভ আছে। তিনি বলেছেন "The emotions, the positive needs of life, have always in them some elements of disquiet" (P 123)

এই বিক্ষোভকে কাটিয়ে মনের আবর্ত্ত তরঙ্গ আবিলতাকে প্রশমিত করে চিত্ততরঙ্গিণীকে স্বচ্ছ নিস্তরঙ্গ করতে

পারলেই তবে তাতে প্রতিবিম্বিত হয় চিদানন্দের নির্ম্মল জ্যোতি। এই ব্যাপারটাই হচ্ছে ভারতীয় অলঙ্কারতত্ত্বের "আবরণ ভঙ্গ"। ব্যক্তিগত লৌকিক অনুভূতির আবেগ উত্তাপ চাঞ্চল্য বিক্ষোভ থেকে বিনির্মুক্ত হতে না পারলে স্থায়ী ভাবের আনন্দের আবিলতা কাটেনা, সেটা লৌকিক সুখেরই ব্যাপার থেকে যায়, তার মধ্যে চিত্তোজ্জ্বল থাকে তাই তার উপভোগের মধ্যে কিছুটা দুর্ভোগের ব্যাপারও জড়িয়ে থাকে। এই তত্ত্বটি ভারতীয় আচার্য্যের মত ও Aristotle বুঝতে পেরেছিলেন। তাই কাব্যানন্দের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি সাধারণ আনন্দ (Pleasure) শব্দটি ব্যবহার না করে "মার্জ্জিত আনন্দ" (refined pleasure) "আনন্দময় প্রশান্তি" (pleasurable calm) "ধীর ও হিতকর আনন্দ" (sure and wholesome pleasure) প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন। সাহিত্যিক আনন্দ যে অলৌকিক পদার্থ, তার সৃষ্টির জন্য যে লৌকিক আনন্দের আবেগ উত্তেজনা প্রভৃতি প্রশমিত করা প্রয়োজন, সেটা অন্যান্য পণ্ডিত কর্ত্তৃকও স্বীকৃত হয়েছে। বার্গস বলেছেন।

"The aim of art indeed is to put to sleep the active Powers of our personality and so to bring into a perfect state of divinity in which we sympathise with the emotions expressed."

রসের আশ্রয়

ভারতীয় কাব্যদর্শনে "রসের আশ্রয়টা কে," এই নিয়ে বহু তর্ক আছে। কেউ বলেছেন—তার আশ্রয় হচ্ছে অনুকার্য্য পাত্রপাত্রী, কেউ বলেছেন—অনুকর্ত্তা নটনটী, আবার কেউ বলেছেন—সেটা হচ্ছে সহৃদয় সামাজিক। এই সম্বন্ধে সর্ব্বাধিক জনস্বীকৃত মতবাদ হচ্ছে রসের আশ্রয় হচ্ছে সহৃদয় সামাজিক। ইউরোপের প্লেটো এবং এ্যারিষ্টটলও সেই কথাই বলেছেন। বুচারের ভাষায়

Aristotle's theory has regard of the pleasure not of the maker but of the spectator, who contemplates the finished product. Thus while the pleasures of philosophy are for him who philosophises the pleasures of the art, are not for the astists but for those who enjoy what he creates.

এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার একটা ঘটনা স্মরণীয়। মৃণ্ময়ীকে তার ননদী শ্যামাসুন্দরী চুল বেঁধে ভালভাবে সাজসজ্জা করতে বলছে। বনবিহারিণী মৃণ্ময়ী সাজসজ্জার প্রয়োজন বোঝে না, তাদের মধ্যে কথাবার্ত্তা হচ্ছে—

মৃণ্ময়ী কহিলেন ভাল বুঝিলাম।……চুল বাঁধিলাম, কাপড় পরিলাম, খোঁপায় ফুল দিলাম, কাঁকালে চন্দ্রহার পরিলাম, কানে দুল দুলিল, চন্দন কুঙ্কুম চুয়া পান গুয়া, সোনার পুত্তলি পর্য্যন্ত হইল। মনে কর সকলি হইল। তাহা হইলেই বা কি সুখ?

শ্যামা—বল দেখি ফুলটি ফুটিয়ে কি সুখ?

মৃণ্ময়ী—লোকের দেখে সুখ, ফুলের কি?

শ্যামাসুন্দরীর মুখকান্তি গম্ভীর হইল।

এখানে অনভিজ্ঞা বন-বালিকার মুখ দিয়ে রসতত্ত্বের একটা চরম সত্য প্রকাশিত হয়েছে। বাস্তবিকই ফুলটিকে যে দেখে, সেই দ্রষ্টারই সুখ। ফুল ফোটে তার নিজের জৈবিক প্রয়োজনে। নট ও অভিনয় করে হয় পেটের দায়ে, না হয় সখের প্রেরণায়। তার কৃতিত্বের শেষ পর্য্যায়ে অবশ্য সখ ও আনন্দ একসাথী হয়ে যায়। সার্থক সৃষ্টির মধ্যেও স্রষ্টার এক জাতীয় আনন্দ আছে। তবে সে আনন্দ হচ্ছে কৃতিত্বের আনন্দ, স্বীকৃতির আনন্দ, সৃষ্টির আনন্দ, ফুটে ওঠার আনন্দ, বিকশিত হবার আনন্দ, অথবা পরিবেশনের আনন্দ। সে আনন্দ আস্বাদনের আনন্দ নয়, ভোক্তার আনন্দ নয়, রসের আনন্দ নয়।

রসের নিষ্পত্তি।

রসের নিষ্পত্তির ব্যাপারে ভরতাচার্য্যের সূত্র হচ্ছে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারি ভাবের সংযোগে রস নিষ্পত্তি হয় (বিভাবানুভাব ব্যাভিচারি সংযোগাৎ রস-নিষ্পত্তিঃ ১.২৭৪)। এখন এই বিভাব ও অনুভাব কথা দুটির মধ্যেই স্থায়ীভাবের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। কারণ বিভাবটা হচ্ছে স্থায়ীভাবের বহিঃপ্রকাশ। কাজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে ভরতের রসসূত্রে স্থায়ীভাব বা আবেগ অনুভূতিটাকেই (emotions and feelings) প্রাধান্য দেওয়া হয় নি। অর্থাৎ ভরতাচার্য্যের মতে রসের আবেদন হচ্ছে হৃদয়ে, মস্তিষ্কে নয়। Aristotle ও এই কথাই বলেছেন। বুচারের ভাষ্যে আছে—

"...He (Aristotle) makes it plain that aesthetic enjoyment proper proceeds from an emotional rather than from an intellectual source. The main appeal is not to the reason but to the feelings"

(বিঃ দ্রঃ—অবশ্য এমন সাহিত্যও আছে, যার আবেদন মূলতঃ মস্তিষ্কে, হৃদয়ে নয়। সে সাহিত্য হচ্ছে বক্রোক্তির সাহিত্য, দীপ্তি কাব্যের সাহিত্য। আপাততঃ সে সাহিত্যের আলোচনা হচ্ছেনা)

এইবার ভরতের রসসূত্রে ফিরে আসা যাক্। তাঁর রসসূত্র অনুসারে "রসোৎপত্তিটা হয় বিভাব অনুভাব ব্যভিচারিভাবের সংযোগে।" আমরা জানি বিভাবটা হচ্ছে দু রকম —আলম্বন বিভাব ও উদ্দীপন বিভাব। আলম্বনের মূল কথাই হচ্ছে নর-নারী, কারণ তাদের অবলম্বন করেই রসের সৃষ্টি হয়, যেমন দুষ্মন্ত-শকুন্তলা, ভীম-দুর্যোধন, লিয়ার-হ্যাম্‌লেট্ প্রভৃতি। উদ্দীপনের মূল কথাটা হচ্ছে ঐসব নরনারীর পরিবেশ; যার প্রভাবে তাদের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের লীলা চলতে থাকে। পাশ্চাত্য আলঙ্কারিকরাও এই বিভাবের প্রয়োজন স্বীকার করেছেন। মানুষকেই তাঁরা রসসৃষ্টির কেন্দ্র বলে নির্দ্দেশ দিয়েছেন। বুচার বলেছেন—

"..for all the arts immitate human life in some of its manifestations and immitates material objects for as theer serve to intprete spiritual and mental processes. (p. 144)

রস চর্ব্বণায় "বাসনার" স্থান

রসবাদের ব্যাখ্যাতাদের মধ্যে রসের "সাধারণীকরণ" ও "বাসনা" নিয়ে অনেক আলোচনা আছে। ভট্টনায়ক তাঁর "ভুক্তিবাদে" রস-নিষ্পত্তির জন্য "ভাবনা" ও ভোগীকৃতির প্রয়োজন সার্থক ভাবেই আলোচনা করেছেন। তবে তাঁর মতের মধ্যে একটু দুর্ব্বলতা ছিল। 'বাসনা''র প্রয়োজনটা তেমন ভাবে উপলব্ধি করতে পারেন নি। অভিনব গুপ্ত তাঁর "অভিব্যক্তিবাদে" সেই "বাসনার" তত্ত্বটি পরিস্ফুট করেন। তিনি বলেছেন, রসের "সাধারণীকরণ" বা "হৃদয় সংবাদ'' তখনই সম্ভব হয়, যখন সামাজিকদের মধ্যে অভিনীয়মান রসে রসান্বিত হবার সম্ভাবনা থাকে অর্থাৎ যদি তাদের "বাসনা লোকটা'' রস সংক্রমণের উপযুক্ত হয়। "বাসনাটা কি জিনিস? সেটা হচ্ছে পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতা-সৃষ্ট সংস্কারজাতীয় জিনিস। এর মূল কথা হচ্ছে—আমাদের সমস্ত অভিজ্ঞতাগুলিই আমাদের মনের মধ্যে কতকগুলি ছাপ রেখে যায়, ফলে বিশেষ ঘটনায় এক এক জাতীয় অবচেতন স্মৃতির প্রভাবে আমরা যেন আকৃষ্ট বা অভিভূত হই। মনস্তত্ত্বের পরিভাষায় এই ছাপ গুলিকে engram বা engram complex বলা হয়। এরই ফলে এক এক জাতীয় প্রবণতা আমাদের অগোচরে আমাদের মনের মধ্যে কাজ করতে থাকে। এই প্রবণতা কখন কখনও জন্মান্তর প্রসারী হয়েও কাজ করে যায়। এই জিনিসটাকেই কেউ কেউ "সংস্কার" নামেও অভিহিত করেন। এই সংস্কারগুলিকেই অলঙ্কারতত্ত্বে "বাসনা" বলা হয়। সজ্ঞান নির্জ্ঞান মনের "বাসনার" প্রভাবেই আমরা রতি, হাস, শোক ক্রোধ প্রভৃতি রস উপলব্ধি করতে সমর্থ হই। যাদের মধ্যে এই বাসনা নেই, তাদের মধ্যে রসের সংক্রমণ বা সাধারণীকরণ সম্ভব হয় না। সেই জন্য আজন্ম নপুংসকের মনে হয়ত রতিভাবের আবেদন উন্মাদনা থাকবেনা, জড় বুদ্ধির (idiot) কাছে হয়ত শোক ক্রোধ প্রভৃতির আবেদন অনেকাংশেই ব্যর্থ হবে।

পাশ্চাত্য রসবাদে এই "বাসনা"-বাদটি সুস্পষ্ট ভাবে ব্যাখ্যা হয়নি বটে, তবে ডাঃ সুধীর দাশগুপ্ত দেখিয়েছেন—কাব্যে phantasy র প্রসঙ্গে Aristotle প্রভৃতি "বাসনার" কথাই প্রকারান্তরে স্বীকার করেছেন। এটা কি জিনিস? ডাঃ দাশগুপ্ত বুচার থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

"...more simply we may define it as the after-effect of a sensation, the continued presence of an impression after the object which first caused it, has been withdrawn from the actual experience" (p 125)

এই phantasyর প্রভাবেই অভিনীত ঘটনা দেখতে দেখতে প্রেক্ষকদের নয়নে জেগে ওঠে নয়নাতীত ছবি, জেগে ওঠে কালাতীত অভিজ্ঞতার

"কত স্মৃতি, কত গীতি,
কত স্বপন, কত ব্যথা" ফলে প্রেক্ষকরা

যতটুকু পায়, তার চেয়ে বেশী তৈরী করেন মনের তুলিকা দিয়ে, কল্পনার রং দিয়ে।

এই শক্তির লীলা প্রসঙ্গে বুচার বলেছেন—

It is treated as an image-forming faculty by which we can recall at will pictures previously presented to the mind (p 126)

জেমস্ ড্রেভার (Drever) তাঁর "Dictionary of Psychology" গ্রন্থে Phantasy র সংজ্ঞা দিয়েছেন—

A form of creative imaginative activity, where the images and trains of imagery are directed and controlled by the whim a pleasure of the moment"

এই phantasyর ফলেই কাব্য নাটকের কাহিনী পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, তার অসম্পূর্ণতা সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে, বর্ণবিন্যাস উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে, অসংখ্য বাক্য-ব্যঞ্জনায় ভাষা সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, রসের আবেদন ঘনীভূত হয়ে ওঠে।

এইটেই হচ্ছে "বাসনার" কাজ। হৃদয় সংবাদের জন্য এই বাসনার প্রয়োজন যে কতটা গুরুত্ব পূর্ণ, সেটা আচার্য্য অভিনবগুপ্ত অনন্যসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে দেখিয়েছেন। পাশ্চাত্য রসবাদে বাসনার উপযোগিতা সম্বন্ধে সে রকম সমর্থ আলোচনা নেই বটে, তবে বাসনার তত্ত্বটা যে সেখানেও পরোক্ষভাবে স্বীকৃত হয়েছিল, সেটা স্পষ্টই বুঝতে পারা যাচ্ছে।

সাধারণীকরণ

রসতত্ত্বে "ভুক্তি বাদের" আলোচনা প্রসঙ্গে ভট্টনায়ক প্রভৃতি এবং "অভিব্যক্তি"বাদের আলোচনা প্রসঙ্গে অভিনবগুপ্ত প্রভৃতি স্থায়ীভাবের রসত্বপ্রাপ্তির ব্যাপারে সাধারণী-করণের কথা আলোচনা করেছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন লৌকিক স্থায়ীভাবের মধ্যে অহংতা" "মমতা"-বোধ টাই অর্থাৎ আমি ভোগ করছি. আমার সুখদুঃখ এই জাতীয় বোধ বড় হয়ে থাকে। ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের এই সঙ্কীর্ণ সীমিত অনুভূতির মধ্যে রস বোধের সৃষ্টি হয় না। শিল্প কলার রস বোধের জন্য প্রয়োজন হয় আমিত্ব মমত্ববোধের প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলা—যার ফলে অভিনীয়মান সুখ দুঃখ রতি শোক প্রভৃতি বিনা বাধায় সামাজিকের মনে প্রবেশ করতে পারে—অভিনয়ের অনুকার্য্য পাত্র পাত্রীর সঙ্গে প্রেক্ষক একটা সহানুভূতি জনিত একাত্মতা অনুভব করতে পারে, তাদের সুখ দুঃখের অংশীদার হতে পারে। অথচ এই সুখদুঃখের মধ্যে ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের উদ্বেগ উত্তেজনা অবসাদ প্রভৃতি তাদের মধ্যে থাকবে না। এই ভাবেই অভিনীত স্থায়িভাবটা সাধারণীকৃত হয়ে রসের বস্তু হয়ে ওঠে। এই সাধারণী করণের জন্য দুটি জিনিসের দরকার। প্রথমতঃ আলম্বন বিভাবের মধ্যে এমন একটা সার্ব্বজনীনতা থাকা দরকার—যে তার অনুভাব বিভাব দেখে দর্শকরাও তদগতচিত্ত হয়ে তাদের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতে পারে। দ্বিতীয়তঃ সামাজিকের মনে অহংতা মমতা বোধটা কেটে যাওয়া দরকার। এই অহংতা মমতার বোধ ভেঙ্গে না গেলে দর্শক নিজের প্রাত্যহিক জীবনের সুখ দুঃখ আশা-আকাঙ্খার চিন্তাতেই আচ্ছন্ন থাকবে, অভিনীত কাহিনীকে মন দিয়ে গ্রহণ করতে পারবে না, প্রাণ দিয়ে অনুভব করতে পারবে না, অভিনেতার অভিনীত কাহিনীর সঙ্গে তাদের একাত্মতা স্থাপিত হবে না।

সাধারণী-করণের এই দুটি তত্ত্বই Aristotle উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বলেছেন—গায়কের মধ্যে এমন একটা সার্ব্বজনীনতা থাকা চাই, যার ফলে দর্শকরা তাঁর সুখদুঃখের সমমর্ম্মী হয়ে উঠতে পারে, তাদের সুখদুঃখকে নিজেদের সুখদুঃখ বলে গ্রহণ করতে পারে।

…We are able in some slnse to identify ourselves with him to make his misfortunes our own.

এই ত গেল আলম্বন বিভাগের কথা।

সামাজিকের দিক দিয়েও "সাধারণী-করণের" জন্য তাদের অহংতার প্রাচীর ভঙ্গের প্রয়োজন বুচার স্বীকার করেছেন। এই প্রক্রিয়ার ফলেই "The spectator is lifted out of himself. He becomes one with the tragic sufferer and through him with humanity at large" (P266)

এর ফলেই দর্শক তার ব্যক্তিগত জীবনের ছোট ছোট দুঃখ যন্ত্রণার কথা ভুলে যায়, সে তার ব্যক্তিত্বের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছাড়িয়ে চলে যায়। বুচার ঠিক এই কথাটারই প্রতিধ্বনি করে বলেছেন "He forgets his own petty sufferings. He quits the narrow sphere of his individual (P266)

নাটকের অভিনয়ের সময় সাধারণী-করণের ফলে দর্শকের নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ সমস্যা প্রভৃতি ভুলে যায়

বলেই অভিনেতাদের অভিনীয় মনের ভাবগুলি (emotion) তাদের হৃদয় মুকুরে সহজে প্রতিফলিত হ'তে পারে। একার পক্ষে নিজেদের ব্যক্তিগত সুখদুঃখের উত্তেজনা উদ্বেলতা অধীরতা প্রভৃতিও সাধারণী-করণের জন্য কেটে যায় বলেই স্থায়ী ভাবটাও শুদ্ধ ও নির্ম্মল হয়ে জয়প্রাপ্তির উপযুক্ত হয়ে ওঠে। ব্যক্তিগত ভাবগুলি তখন বিক্ষোভশূন্য হয়ে নৈর্ব্যক্তিক উপভোগের সামগ্রী হয়ে ওঠে। এইটেই হচ্ছে স্থায়ীভাবের রসত্বপ্রাপ্তির সূত্রপাত। বুচার এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করেছেন। তিনি বলেছেন—

The true tragic fear becomes almost impersonal emotion attaching itself not so much to this or that particular incident, as to the general course of the action which is for us an image of human destiny."

ভাবের রসত্বপ্রাপ্তি ও ক্যাথারসিস্ (Kathorsis)

ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রে ভাবের রসত্বপ্রাপ্তি নিয়ে যেমন বহু মতভেদ আছে, পাশ্চাত্য অলঙ্কার শাস্ত্রে "ক্যাথরসিস" (kathorsis) তেমনি—বহু আলোচনা মূলতঃ একই বিষয় নিয়ে হয়েছে। আমরা জানি ভরতের "বিভাব অনুভাব ব্যভিচারি ভাবের সংযোগে রসের নিষ্পত্তি" সূত্রটি নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গেই তৈরী হয়েছিল। এ্যারিষ্টটলের "ক্যাথারসিস্"-বাদও বিয়োগান্ত নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে হয়েছিল।

Aristotle এর মতে tragedyর সংজ্ঞা হচ্ছে

"Tragedy is the imitation of a great and Impressive event, having a certain duration and complexity, and forming a complete hole in itself, it is expressed in language made agreeable by rhythm, harmony and music varying in keeping with different parts of the work, it is not merely recited but acted before an audience and by exciting pity and fear it effects a purgation (Kathorsis) of such iike passions."

(A syllabus of Poetics—H. Stephen P.123)

এই সংজ্ঞার মধ্যে কয়েকটি পর্ব্ব লক্ষণীয় (১) ট্রাজিডি হচ্ছে অনুকরণাত্মক (২) এটা এক গুরুতর ঘটনার অনুকরণ (৩) এর মধ্যে কিছুটা রহস্য ও জটিলতা থাকবে (৪) একটা সংহত একত্ব থাকবে (৫) এর ভাষা ও ছন্দ বিষয়বস্তু অনুসারে পরিবর্ত্তিত হবে (৬) এটা শুধু আবৃত্তির জিনিস নয়, এটা দর্শকের সম্মুখে অনুভব সমৃদ্ধ অভিনয়ের জিনিস (৭) এটা দর্শকের মনে শোক ভয় প্রভৃতি ভাবের উদ্রেগ করবে এবং (৮) শেষ পর্যন্ত ঐ সমস্ত ভাবের "ক্যাথরসিস" করবে।

Aristotle-এর এই "ক্যাথরসিস" তত্ত্বের একটিইতিহাস আছে। Plato নাট্যাভিনয় প্রভৃতিকে আক্রমণ করে বলেছিলেন—ঐগুলির মধ্যে একটা পাপাত্মক ফল আছে, কারণ ঐ অভিনয় প্রভৃতিতে আবেগ উদ্বেগ ইত্যাদি প্রক্ষুব্ধ হয়। এর উত্তরে Aristotle বলেছিলেন—ট্যাজিডিতে আবেগ প্রভৃতি সৃষ্ট হয় বটে, তবে সেগুলির ক্যাথারসিস ও হয়।

"This theory of Kathorsis was started by Aristotle against Plato's attack against tragedy. Plato said that tragedy has a vicious effect due to its power of exciting emotion etc Aristotle says that tragedy not only rouses these emotions but effects a Kathorsis of them"

(Outlines of modern knowledge P 891)

এই ক্যাথারসিস শব্দটির ইংরাজী প্রতিশব্দ দেওয়া হয়েছে purgation। এই purgation শব্দটির অর্থ হচ্ছে—পাপ স্খালন করা, পরিশুদ্ধ করা, পরিষ্কার করা ইত্যাদি। এখন প্রশ্ন থাকতে পারে নাটকে ক্রোধ শোক ভয় প্রভৃতি আবেগের সৃষ্টি করে—তাকে পরিশুদ্ধ করে কি ভাবে? অর্থাৎ আবেগের ক্যাথারসিসটা কি ভাবে হয়? ইউরোপে ক্যাথারসিস তত্ত্বটা রেসাইন ভিসিং গেটে প্রভৃতি পণ্ডিতেরা নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। বুচারের আরিষ্টটল-ভাষ্যে ও তার ব্যাখ্যা আছে। অলঙ্কারতত্ত্ব ছাড়া ক্রীড়াতত্ত্ব মনস্তত্ত্ব প্রভৃতিতেও "ক্যাথারসিস" নিয়ে বহু আলোচনা আছে।

শীলার (Scheller) স্পেন্সার (Spencer) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ খেলার তত্ত্ব প্রসঙ্গে "ক্যাথারসিশ্" মতবাদ প্রচার করেন। তারা বলেন—খেলা জিনিসটা হচ্ছে শিশুদের বাড়তি উদ্যমের স্বতস্ফূর্ত্ত প্রকাশ। বয়লারে বাষ্প বেশী হয়ে গেলে সেটা বয়লারকে ফাটিয়ে দিতে পারে। তাই বাড়তি বাষ্পটাকে মাঝে মাঝে বহির্মুক্ত করে করে

কমিয়ে দিতে হয়। সেই জন্যই বয়লারে Safety valve এর ব্যবস্থা থাকে। বেশী Steam হয়ে গেলেই তার নিজের চাপেই সেটা Safety valve ঠেলে বেরিয়ে যায় ও বয়লারটিকে সুস্থ রাখে। লীলার প্রভৃতির মতে ছেলেদের খেলাধূলা লাফালাফি দাপাদাপি হচ্ছে এই জাতীয় ব্যপার। সেটা অতিরিক্ত উদ্যমের একটা স্বতস্ফূর্ত বিনির্গমন বা পরীবাহ। "ক্যাথারসিশ্‌" হচ্ছে এই পরিবাহ মাত্র।

মহাকবি ভবভূতি শোকের প্রসঙ্গে এই পরিবাহের কথাই বলেছেন। উত্তররামচরিতের তৃতীয় অঙ্কে সেই পরিবাহের কথা আছে। শম্বুকের শাস্তিবিধানের জন্য রামচন্দ্র পঞ্চবটী বনে এসেছেন। পঞ্চবটীতে সীতার স্মৃতি-বিজড়িত দৃশ্যাদি দেখে রামচন্দ্রের হৃদয় আর্ত্ত হয়ে উঠেছে, পরিস্ফুরিত-গর্ভ-ভারালসা, কুরঙ্গ শিশুর মত বিলোল-দৃষ্টি, জ্যোৎস্নাময়ী মৃদু-বাল-মৃণাল-কল্পা সতী তৎকর্ত্তৃক বিসর্জ্জিতা হয়ে নিশ্চয়ই এই অরণ্যে ব্যাঘ্রাদি দ্বারা ভক্ষিতা হয়েছে মনে করে রামচন্দ্র কেঁদে উঠলেন। ভাগীরথার চরে সীতা তখন দেবগণেরও অদৃশ্য হয়ে তার পার্শ্বেই ছিলেন। তিনি রামচন্দ্রের এই আর্ত্তি দেখে খেদ করে উঠলেন। তখন তমসা তাঁকে বল্লেন—"এটা ঠিকই হয়েছে, নিবিড় দুঃখের সময় কান্নার প্রয়োজন আছে, এই কান্নাই সুস্থ করবে হৃদয়াবেগকে, যেমন পয়ঃপ্রণালী দিয়ে খানিকটা জল বেরিয়ে গেলে বন্যাপীড়িত তড়াগ সুস্থ হয়ে ওঠে তার জলের দুর্বহ চাপ থেকে"—

"পুরোৎপীড়ে তড়াগস্থ পরিবাহ প্রতিক্রিয়া।
শোক ক্ষোভে চ হৃদয়ং প্রলাপৈরের ধার্য্যতে॥"

উঃ ৩।২৯

(পুর—বন্যা, পরিবাহ—জলনির্গম, প্রলাপৈঃ—কান্নার দ্বারা ধার্য্যতে—রক্ষা পায়)

টেনিসনের একটা বিখ্যাত কবিতায় আমরা এই পরীবাহবাদের ইঙ্গিত দেখতে পাই। যুদ্ধহত বীর-স্বামীর মৃতদেহ বাড়ীতে নিয়ে আসা হয়েছে, সাধ্বী স্ত্রী নির্ব্বাক শোকে প্রস্তরীভূতা হয়ে বসে আছে, তার চক্ষেও অশ্রু নেই, কণ্ঠেও ক্রন্দন নেই। তার ধাত্রী-মাতা বুঝলেন এই অন্তর্দাহী নির্ব্বাক শোকের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ, একে খানিকটা কাঁদতেই হবে, কারণ কান্নাই লঘু করে অন্তরের শোকের ভারকে।

বাস্তব জীবনে আমরা এই পরিবাহ বা "ক্যাথারসিস্‌"-এর লীলা দেখতে পাই। শোকের সময় খানিকটা কাঁদতে পারলে আমাদের মনের ভার কেটে যায়, ক্রোধের সময় খানিকটা চেঁচামেচি করে আস্ফালন করলে তার তাপ কমে যায়, নতুবা বন্ধ্যা ক্রোধের চাপা আগুনে মর্ম্মদাহ হতে থাকে; এই সমস্তই হচ্ছে Katharsis-এর লীলা।

প্রশ্ন আসতে পারে অভিনয়ের ক্ষেত্রে এই katharsisটা কি ভাবে হয়?

খেলার ছলে শিশুরা যে সব অভিনয় করে, তার মধ্যে katharsis-এর লীলা দেখতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের শৈশব জীবনে শিক্ষকদের সম্বন্ধে খুব সুখের অভিজ্ঞতা ছিল না। তাঁর মনে একটা অন্তর্লীন ব্যথা ও বিক্ষোভ ছিল। তাই তিনি সেই ব্যথার পরিবাহের জন্য খেলার ছলে শিক্ষকদের ভূমিকায় অভিনয় করতেন। তিনি বেত দিয়ে রেলিংগুলি ঠ্যাঙ্গাতেন। ঐ রেলিংগুলি ছিল তাঁর কল্পনায় অমনোযোগী ছাত্রের দল। শিশু রবীন্দ্রনাথ শিক্ষকের ভূমিকা নিয়ে তাদের ভয় দেখাতেন "বড় হলে কুলিগিরি করতে হবে"। তবু তারা শুনতো না তাঁর উপদেশ। তাই তিনি তাদের মারতেন বেত!

রবীন্দ্রনাথের এই রেলিং ঠেঙ্গানোর হয়ত একটা অন্যতম ব্যাখ্যা হতে পারে। এটাকে হয়ত Adler বর্ণিত "ক্ষমতা লিপ্সা" (Will to power) বলেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। তবে তার অভিব্যক্তিটা অভিনয়ের মাধ্যমেই হয়েছে।

ফ্রয়েড যে জিনিসটাকে "অনুকর্ম্মী পুনরাবৃত্তি" (Repetition Compulsion) বলেছেন, তার ব্যাখ্যাটা katharsis এর তত্ত্ব দিয়ে বোঝান যায়। গত মহাযুদ্ধের সময় একটি শিশুর মাতাপিতা বোমার আঘাতে নিহত হয়। ঐ ঘটনাটি শিশুটির মনে গভীরতম শোকের সৃষ্টি করে। এর পর থেকে সে একটি অদ্ভুত খেলা দ্বারা ঐ শোক করা ঘটনার অনুকরণ বা অভিনয় করতে থাকে। সে একটি বালির ঘর তৈরী ক'রে তার ভিতর দুটি পুতুল (তার মাতা-পিতার প্রতীক) রাখতো। তারপর ভীষণ শব্দ করে ঐ বালির ঘর (তথা পুতুল দুটি) ভেঙ্গে ফেলতো। এই যে পুতুল ভাঙ্গা খেলার অভিনয়, এটাকে ফ্রয়েড "অনুকর্ম্মী পুনরাবৃত্তি" (Repetition Compulsion)

নাম দিয়েছেন। কারণ এর মধ্যে অতীত দুঃখের ঘটনার বাধ্যতামূলক পুনরাবৃত্তি আছে। বলা বাহুল্য, এই "অনুবর্তী পুনরাবৃত্তি"র ব্যাপারটাকেই katharsis এর ব্যাপার বলে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। কারণ এতে শোকের ঘটনাকে শোকের অভিব্যক্তি দিয়েই লঘু করে তোলবার চেষ্টা আছে।

এই থেকে আমাদের মনে হয় মানুষের আদিম অভিনয়-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে একটা katharsis-এর লীলা আছে। কিন্তু সে ক্যাথারসিস্‌টা কার হয়? হয়ত অনুকর্ত্তা অভিনেতাদের। এ্যারিষ্টটল তবে কি আচার্য্য ভট্টলোল্লটের মত অনুকর্ত্তা নট-নটীকে ক্যাথারসিসের পাত্র বলে নির্দ্দেশ করেছিলেন? আমাদের মনে হয় এই সম্বন্ধে এ্যারিষ্টটলের ধারণাটি খুব স্পষ্ট ছিল না। অন্ততঃ পরবর্ত্তী যুগে ভারতবর্ষে আচার্য ভট্টনায়ক অভিনবগুপ্ত প্রভৃতি মনীষীগণ যে-ভাবে রসতত্ত্বের আলোচনা করেছেন, সেটা এ্যারিষ্টটলের যুগেও সম্ভব ছিল না, আর তাঁর দেশের ঐতিহ্যের দিক দিক দিয়েও সম্ভব ছিল না। বিভাব অনুভাব প্রভৃতির ফলে সহৃদয় সামাজিকের মনে যে আবরণ ভঙ্গ হয়, যার সত্ত্বগুণের প্রকাশ হয়, যার ফলে হৃদয়ের স্বচ্ছ মুকুরে ব্রহ্মস্বাদ-সহোদর চিদানন্দের প্রতিফল হয়, সেটা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ধারণার অতীত ছিল। তবে এ সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট উপলব্ধি এ্যারিষ্টটলের মধ্যে ছিল। ক্যাথারসিস্‌ যে শুধুই স্বতস্ফূর্ত্ত পরিবাহ বা বিনির্গম মাত্র নয়, তার মধ্যে যে ভাবের শুদ্ধীকরণ আছে, ব্যক্তিগত আবেগের প্রশান্তীকরণ আছে, সাধারণীকরণজনিত অহংতা-বোধের বিলুপ্তি ও রজোগুণের প্রশমন আছে, এই জাতীয় কথা এ্যারিষ্টটলের আলোচনার মধ্যে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। এই প্রক্রিয়া-গুলিকে তিনি কখনও "clarifying process", কখনও বা "refining process", কখনওবা "durifying process" প্রভৃতি ভাষায় প্রকাশ করেছেন।

তবে কিভাবে এই শুদ্ধিকরণের প্রক্রিয়াই চলতে থাকে, এ সম্বন্ধে স্পষ্ট ব্যাখ্যান তাঁর আলোচনার মধ্যে ছিল না। বুচার বলেছেন—"But what is the nature of this clarifying process? Here we have no direct reply from Aristotle" (p 235)।

তবে Aristotle এর ভাষ্যকার বুচার এই প্রক্রিয়াটার একটা ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন লৌকিক জগতের ক্রোধ শোক প্রভৃতি ভাবের ব্যক্তিগত অনুভূতির মধ্যে একটা যন্ত্রনার দংশন আছে, একটা অশান্তি ও বেদনার ভাব আছে। নাটকের সাধারণী-করণের ফলে যখন ব্যক্তি-বোধের অপসারণ হয় তখন ঐ বেদনা ও অপসারিত হয়।

The sting of pain, the disquiet and unrest arise from the selfish element which in the world of reality clings to these emotions. The pain is expelled when taint of egoism is removed (P 268)

বুচার বলেছেন এর পর নাটকের অভিনয় যতই অগ্রসর হতে থাকে, মনের তরঙ্গ বিক্ষোভ ততই প্রশমিত হতে থাকে, আবিল আনন্দ ততই অনাবিল হতে থাকে, শেষ পর্য্যন্ত আবেগ গুলিই পরিশুদ্ধ হয়ে ওঠে। এইটেই হচ্ছে "Katharsis এর মূল তত্ত্ব।

"As the tragic action progresses when the tumnlt of the mind first aroused has afterwards subsided, the lower forms of emotions are found to have been transmuted into higher and more refined forms The painful element in the pity and fear of reality is purged away, the emotions them-selvs are purged. The curative and tranquillising influence that tragedy exercises follows an imnediate accompaniment of the transformed feeling"

কিন্তু এইখানে একটা প্রশ্ন জাগে। Katharsis কি শুধুই পরীবাহাত্মক? সেটা শুধুই কি দুঃখাবহ স্মৃতির আংশিক অপসারণ? এ্যারিষ্টটল্‌ হয়ত তাই মনে করেছিলেন—আবিলতা ও পঙ্কিলতার তলানি চলে গেলেই নির্ম্মল জিনিসটি পড়ে থাকে। শোক ক্রোধ প্রভৃতির আবিলতা হচ্ছে অহংজ্ঞান ঘটিত। এই অহংজ্ঞান কেটে গেলেই শোক প্রভৃতি ভাবগুলিরও বিশুদ্ধি ঘটে।

"The pleasurable calm follows when passion is spent, an emotional cure has been wrought" (P 246)

এখানে ডাঃ সুধীর দাশগুপ্ত একটা প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেছেন—

"আমরা জিজ্ঞাসা করি, মনের আগোচর দেশ হইতে স্থির আনন্দের প্রকাশ না হইলে মনোরাজ্যের বিক্ষোভ প্রশমিত হয় কি করিয়া? ঊর্দ্ধ ভূমি হইতে নবীন চেতনার স্পর্শ না পাইলে ভাব তাহার স্থূলতা পরিহার করিয়া সূক্ষ্ম রূপ লাভ করে কি করিয়া? আমরা জিজ্ঞাসা করি—ভাবাবেগ কি অমনি বিনষ্ট হয় এবং pleasurable calm অর্থাৎ আনন্দময় প্রশান্তি কি অমনি আসিয়া থাকে? সকল প্রশ্নেরই একই উত্তর—"taint of egoism" বা অহমিকার দোষ একেবারে দূরীভূত হইলে মনোরাজ্যের অতীত দেশে আমাদের বোধানন্দময় সত্তার প্রকাশ উপলব্ধি এবং তখন সমস্ত অলৌকিক ব্যাপারই সহজে বোধগম্য হয়।

কেবল মাত্র Katharsis বলিলে অথবা তাহাকে "expulsion of a painful and disquieting element" অর্থাৎ দুঃখাবহ অশান্তিকর উপাদানের অপসারণ বলিয়া বুঝাইলে বিশেষ কিছুই বলা হইল না। স্বয়ংপ্রকাশ আত্মার সাক্ষাৎ স্পর্শ না পাওয়া পর্য্যন্ত প্রশ্নের পর প্রশ্ন উঠিতে থাকিবে"

(কাব্যালোক ২য় সং ১১০ পৃঃ)

এই আধ্যাত্মিক তত্ত্বটি পাশ্চাত্য পণ্ডিত এ্যারিষ্টটলের অনধিগম্য ছিল। তাই মনে হয় এ্যারিষ্টটলের মধ্যে রসতত্ত্বের সূচনাটুকুই হয়েছিল তার পরিণতিটা তখন সম্ভব হয় নি। এ্যারিষ্টটলের মধ্যে যে তত্ত্বটির সূচনা হয়েছিল, তারই পূর্ণ পরিণতি হয়েছে ভট্টলোল্লট, ভট্ট শঙ্কুক, ভট্ট নায়ক ও অভিনব গুপ্তের দার্শনিক আলোচনার মধ্য দিয়ে।

ক্যাথারসিস্ তত্ত্বের অবাপ্তিদোষ।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা স্মরণীয়। ভরত এবং এ্যারিষ্টটল দুজনেই নাটকের চমৎকারিতা প্রসঙ্গে রস ও ক্যাথারসিস্-তত্ত্বের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু ভরতের রসতত্ত্বটা পরে দৃশ্য কাব্যের সীমানা ছাড়িয়ে শ্রব্য-কাব্যের ব্যাপারেও প্রযুক্ত হয়েছে। কিন্তু এ্যারিষ্টটলের ক্যাথারসিস্ তত্ত্বটি ট্রাজিডির বাইরে তেমন ভাবে প্রযুক্ত হতে পারেনি। ট্রাজিডিতে Katharsis এর দিক দিয়ে ক্রোধ শোক উৎসাহ ভয় প্রভৃতি স্থায়ি ভাবের রৌদ্র করুণ বীর ভয়ানক প্রভৃতি রসে পরিণতিটা যতটা সহজ, শৃঙ্গার, শান্ত বা অদ্ভুত রসের পরিণতিটা ততটা সম্ভব নয়। কাজেই Katharsis মতবাদে কাব্যতত্ত্বের অনেকটা জায়গাই বাদ পড়ে গেছে! এ্যারিষ্টটলের ব্যাখ্যাতা বুচার সাহিত্যে রতিভাব বা আদিরসের খুব কৃপণ সমালোচনাই করেছেন। এই প্রসঙ্গে ডাঃ দাশগুপ্ত বলেছেন

"বুচার রতিভাব বা ভালবাসার সম্পর্কে প্রশ্নটি তুলিয়াছিলেন, কিন্তু সম্যক আলোচনা না করিয়াই সিদ্ধান্ত করিলেন অহমিকাময় ও আত্মকেন্দ্রিক বলিয়া রতিভাবের অবলম্বনে সাধারণীকরণ হইতে পারে না"

ভারতীয় রস—তত্ত্বের সম্পূর্ণতা—করুণ রসের স্বীকৃতি

ভারতীয় আলংকারিকরা কাব্যতত্ত্বে আদিরসকে খানিকটা প্রাধান্য দিলেও ট্রাজিডির রস বা করুণ রসকে ছোট করেন নি। ধ্বন্যালোকে অভিনবগুপ্ত স্পষ্ট-ভাবেই বলেছেন—"সম্ভোগ শৃঙ্গারের চেয়ে মধুরতর হচ্ছে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার; আর সকলের মধ্যে মধুরতম হচ্ছে করুণ রস" "সম্ভোগ শৃঙ্গারাৎ মধুরতরো বিপ্রলম্ভ ততোঽপি মধুরতমো—করুণ" ইতি ২৯ টীকা।

কবি ভবভূতি সোজাই বলেছিলেন—"জগতে একটা রসই আছে, সেটা হচ্ছে করুণ রস, সেই করুণ রসই অবস্থা-ভেদে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে। আবর্ত্ত বুদ্বুদ তরঙ্গ প্রভৃতির আকৃতি যতই পৃথক হোক না কেন, তাদের সকলের মূলেই আছে একটা জিনিস, সে জিনিসটা হচ্ছে জল—"

"একো রসঃ করুণঃ এব নিমিত্ত ভেদাৎ
ভিন্নঃ পৃথক পৃথগিবাশ্রয়তে বিবর্ত্তান্।
আবর্ত্ত বুদ্বুদ তরঙ্গ ময়ান্ বিকারান্
অম্ভো যথা সলিলমেব তু তৎ সমগ্রম্॥"

উত্তরচরিত ৩।৪৭

(বিবর্ত্তান্ = পরিণাম সমূহ, নিমিত্তভেদাৎ = কারণ ভেদে)

ভারতবর্ষের আদি-কবি বাল্মীকি দেখিয়েছেন বিরহিণী ক্রৌঞ্চীর সহানুভূতিতেই তাঁর শোকের স্থায়িভাবটাই করুণ রসে পরিণত হয়ে জগতে আদি কাব্যের সৃষ্টি করেছিল, উৎসারিত হয়েছিল তার বাণী নির্ঝর স্বতস্ফূর্ত্ত ছন্দের ভাষায়।

এ কথা সত্য যে ভারতীয় আলঙ্কারিকরা ট্রাজিডির

গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। তবে ট্রাজেডির মধ্যেই তাঁদের দৃষ্টি সীমিত ছিল না। তাঁরা তাই সাহিত্যের ক্ষেত্রে ট্রাজিডির করুণরস ছাড়া শৃঙ্গার শান্ত প্রভৃতি রসকেও স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এই স্বীকৃতিটা এ্যারিষ্টটলের মধ্যে তেমন অভিব্যক্ত হয়নি।

এ্যারিষ্টটলের উত্তরসাধকগণের অবদান

তবে পরবর্তীকালে Wordsworth, Shelly প্রভৃতি কবি এবং বার্গস ক্রোচে প্রভৃতি দার্শনিকগণ এ্যারিষ্টটলের এই অসম্পূর্ণতা কাটিয়ে উঠেছিলেন এবং করুণ ছাড়া অন্যান্য রস অর্থাৎ ব্যাপক ও স্থূল অর্থে অনুভূতি (feeling) গুলি থেকেও যে কাব্যের উৎপত্তি হতে পারে, সেটা স্বীকার করেছিলেন। তাই দেখতে পাওয়া যায় Wordsworth তাঁর কাব্য-সংজ্ঞায় বলছেন—

"...Poetry is the overflow of powerful feelings ; it takes its origin in emotion recollected in tranquility."

ডাঃ সুধীর দাশগুপ্ত দেখিয়েছেন Wordsworthএর কাব্য-সংজ্ঞাটা মুখ্যতঃ পাঠকের দিক থেকে নয়, সেটা হচ্ছে মুখ্যতঃ কাব্যের স্রষ্টা কবির দিক থেকে। তাহলেও এর মধ্যে করুণ রস ছাড়া অন্যান্য রস যে কাব্যের প্রেরণা হতে পারে, এই স্বীকৃতিটা আছে। শুধু তাই নয়, feeling বা স্থায়িভাবজনিত চিত্ত-বিক্ষোভটা কেটে যাবার পর মনের প্রশান্তির অবস্থাতেই যে রসের উৎপত্তি সম্ভব হয়, তার ইঙ্গিতও এই সংজ্ঞার মধ্যে রয়েছে।

স্থায়িভাবটা যতক্ষণ না অহংতা মমতাবোধজনিত আবেগ উদ্বেগ কাটিয়ে নির্ম্মল প্রশান্ত হয়ে আসে, ততক্ষণ স্থায়িভাবের উপভোগটা রসত্বে পরিণত হতে পারে না, তার উপভোগের মধ্যে একটা দুর্ভোগের কক্ষ থেকে যাবেই। এই তত্ত্বটিও পাশ্চাত্য আলঙ্কারিকরা পরোক্ষভাবে স্বীকার করেছেন। বার্গস বলেছেন—

"সত্যি কথা বলতে কি—আর্টের লক্ষ্যই হচ্ছে ব্যক্তি-পুরুষের কর্ম্ম-চঞ্চল শক্তিগুলিকে ঘুম পাড়িয়ে আমাদের এমন একটা শান্ত অবস্থায় নিয়ে আসে যে আমরা অভিব্যক্ত অনুভূতির সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতে পারি।"

"The aim of art, indeed, is to put to sleep the active powers of our personality and bring us to a perfect state of docility in which we sympathise with the emotion expressed."

ব্যক্তিগত উপভোগের চিত্ত-জয় বা চিত্ত বিক্ষোভের উর্দ্ধে উঠতে না পারলে যে কাব্য-রসের উপলব্ধি হয় না, একথা ক্রোচেও স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন—

..."Poetic idealization is not fraivolous embellishment of a pro found penetration in virtue of which we pass from troublous emotion to the sincerity of contemplation...he who fails to accomplish this passage but remains immersed in passionate agitation, never suceeds in bestowing pure poetic joy either upon others or upon himself, whatever may be his efforts.

স্থায়িভাব থেকে আস্বাদ্যমান রসের বিবর্ত্তনের ইঙ্গিতটি এই উক্তির মধ্যে প্রায় স্পষ্টভাবেই ফুটে উঠেছে। বস্তুতঃ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্য সমীক্ষার মধ্যে যে এতটা মতৈক্য আছে, এটা ভাবতেও বিস্ময় জাগে। বুঝতে পারা যায় যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে মানুষ যতই বিচ্ছিন্ন হোক না কেন, মৌলিক সত্যের উপলব্ধির দিক দিয়ে তাদের মধ্যে মত বিরোধ নেই।
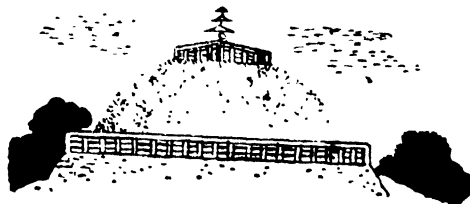
অন্তঃসলিলা

রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়

বিয়েতে মুকুল রাজি হবে বা হতে পারে, কথাটা বোধ হয় বিশ্বাস করতে পারেন নি মীরাদি। তাই প্রথমটায় তিনি হকচকিয়ে গিয়েছিলেন, চোখে পলক ছিল না, মুখও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

তারপর অবশ্য স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিলেন একসময়, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিগেস করেছিলেন মেয়ের বাড়ির খবর, চোখ মুছেছিলেন মা-মরা ভাই মুকুলের কথা বলতে বলতে। খুশি যে কতখানি হয়েছিলেন, তা টের পেয়েছিলাম তাঁর মুখের হাসিতে, আর চোখের চাউনিতে।

মীরাদিদের এই ছোট্ট পরিবারটির সঙ্গে আমার আলাপ আজ প্রায় পঁচিশ বছরের। তখন ওরা পাটনায়—মীরাদির বাবা অতনুবাবু কাজ করতেন জি. পি. ও তে। কোয়ার্টারে থাকতেন, একটি ছেলে আর একটি মেয়ে মুকুল আর মীরাদিকে নিয়ে। সংসারে গৃহিণী ছিল না, মীরাদির মা গত হয়েছিলেন মুকুলকে পৃথিবীতে আনার সঙ্গে সঙ্গেই। সাত ঘণ্টার কচি বাচ্চার ভার প্রথম কয়েক মাসের জন্যে পড়েছিল একটি নার্সের ওপর, অবশ্য সে-ভার বদল হয়েছিল —মীরাদিই স্বেচ্ছায় আগ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, সাত মাসের শিশুর পরিচর্যার সকল দায়িত্ব তুলে নিয়েছিলেন নিজের কাঁধে। আত্মীয়স্বজন অবশ্য ছিল অনেক, কিন্তু শুনেছিলাম, অতনুবাবুর সঙ্গে সদ্ভাব ছিল না কারোরই।

মুকুল ছিল আমার সহপাঠি। ওর সঙ্গেই যেতাম ওদের বাড়ি। মীরাদি আদর করতেন খুব, খাওয়াতেনও প্রচুর। খবরাখবর নিতেন—আমরা ক'টি ভাই, বোন আছে কিনা, বাবা কি কাজ করেন, কে বেশি ভালো বাসেন-বাবা না মা, ইত্যাদি।

মুকুল না থাকলেও আমাকে ডেকে ভেতরে নিয়ে যেতেন মীরাদি, বসাতেন খাটে। যতক্ষণ না মুকুল আসে, গল্প করতেন আমার সঙ্গে। সেই একই গল্প—বোনেরা কত বড়, ভাইয়েরা কোন্ কোন্ ক্লাসে পড়ে, বাবা অপিস থেকে এসেছেন কিনা, কিম্বা মা কি করছেন। আমিও কিছু কিছু জবাব দিতাম, কিছু কিছু বা চেপে যেতাম ভালো লাগত না বলে। গল্প করতে করতে অনেক সময় মীরাদি আমার ছেঁড়া জামা সেলাই করে দিতেন, মাথা আঁচড়ে, মুখ মুছিয়ে, গালে পাউডার বুলিয়ে দিতেন, সময় সময় বুট জুতোর ফিঁতেও বেঁধে দিতেন ভালো করে।

যখনই মীরাদির বাড়িতে যেতাম, সকালে কি বিকালে কিম্বা দুপুরেও, সব সময়েই মীরাদিকে দেখতাম তাঁর ঘরটিতে থাকতে। গুন্‌গুন্ করে একটা গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে হয় দেরাজ থেকে জামা-কাপড় বের করে গুছোচ্ছেন, নয় ড্রেসিং-টেবিলের আয়নায় আঁচল ঘসে ময়লা তুলছেন। আর না হয় টেবিলের জিনিসপত্র ঝাড়ছেন। ঘরখানাও ঝক্‌মক্ করতো সব সময়, ঠিক মীরাদির মতই। মীরাদি নিজেও ছিলেন খুব পরিষ্কার, রঙ ময়লা হলেও স্নো-পাউডার সাবানে আর রঙ-বেরঙের কাপড়ে-ব্লাউজে ফিটফাট ছিমছাম থাকতেন সর্বদাই।

মুকুলেরও প্রতিটি ব্যাপারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল তাঁর। খাওয়ানো শোয়ানোয় ঘড়ির কাঁটার মতই চলে নিয়মিত। স্কুলে টিফিনের সময় দুধের পাত্র পাঠানোয় একদিনও ভুল করতেন না, ছুটির পর দু-মিনিট দেরি হলে ছটফট করতেন, খেলতে গিয়ে হাত-পা কেটে এল কিনা—সে লক্ষ্যও ছিল তাঁর পুরামাত্রায়।

এই ভাবেই দিন কেটেছে, মাস, বছর পার হয়েছে। অনেকের সঙ্গে মুকুল আর আমিও সর্বোদয় বিদ্যাভবন থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেছি যথাসময়ে, ভর্তি হয়েছি কলেজে। আমার বাবার মত মুকুলের বাবার চুলেও পাক

হয়েছে, রিটায়ার করেছেন অপিস থেকে। কোয়ার্টার ছেড়ে উঠে এসেছেন নয়া-টোলার এক ফ্ল্যাটে। মাস আটেক বাদে, ইণ্টারমিডিয়েটের গণ্ডী পার হলে মুকুলকে নিয়ে তিনি হয় তাঁর গ্রামের বাড়িতে, নয়তো কলকাতায় ফিরবেন।

এমনি একদিন বিকেলে মুকুলকে খুঁজতে গিয়ে আমাদের সেই মীরাদি হঠাৎ যেন আমার কাছে এক নতুন মীরাদি হয়ে দেখা দিলেন। রোজ না হলেও, সপ্তাহে দিন তিন-চার তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়ই, কথাও হয়, তবু সেদিন যেন হঠাৎ চোখে পড়ল মীরাদি একটু পাল্টে গেছেন। আগের চেয়ে একটু গম্ভীর হয়েছেন, ঘর পরিস্কারের বাতিকও আর তেমন নেই। নিজেও যেন ঠিক আর সেই আগের মত গায়ে সাবান মাখেন না, মুখে স্নো-পাউডার ঘসেন না, কিম্বা রঙ-বেরঙয়ের শাড়িতে ফিটফাট থাকেন না সর্বদা। খবরাখবর অবশ্য নিলেন, বোনেদের বিয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে কিনা, বড় বোনের বয়স কত হলো, ছোটটি তার থেকে কত ছোট, ইত্যাদি। কিন্তু তবু কেমন যেন আমার মনে হলো, আমাদের সেই মীরাদি আর আগের মতনটি নেই, কোথায় যেন একটা পরিবর্তন ঘটেছে।

মাসতিনেক বাদে হঠাৎ একদিন আমার বাবা মারা গেলেন, সংসারও অচল হয়ে উঠল, তাই পড়াশুনা ইস্তফা দিয়ে মা আর ছোট ভাই-বোনেদের নিয়ে আমরা চলে এলাম কলকাতায়। গড়পার অঞ্চলে ছোট ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে, আর কোন এক সদাগরী অফিসে সর্বসাকুল্যে একশো তেপ্পান্ন টাকার এক চাকরি জুটিয়ে নিয়ে দিন কাটাতে লাগলাম কোন রকমে। পাটনা থেকে মুকুল আমাকে চিঠি দিত প্রায়ই, আমি কোনটার জবাব দিতাম, কোনটার নয়। তবে কাজের ফাঁকে ফাঁকে প্রায়ই আমি ভাবতাম ওদের কথা। দশ বছর আগের এবং দশ বছর পরের মীরাদির কথা।

আমরা আসার মাস পাঁচেক পরে মীরাদিরাও চলে এলেন কলকাতায়। দর্জিপাড়ায় বাড়ি ভাড়া নিলেন অতনুবাবু, মুকুল গিয়ে ভর্তি হলো বিদ্যাসাগর কলেজে। মাঝে মাঝে দেখা করত আমার অফিসে। সকাল-সন্ধ্যায় টিউশনি আর দুপুরে অফিস ক'রে সময় পেতাম না আমি এক মুহূর্তও, তবু একদিন ছুটির বারে দুপুরে গেলাম মুকুলকে খুঁজতে। শুনলাম বেরিয়েছে কোথায়, মীরাদি'ত ঘুমোচ্ছেন।

তারপর হঠাৎ একদিন অফিসে মুকুলকে দেখেই চমকে উঠলাম। অতনুবাবু মারা গেছেন। করোনারি থ্রম্বসিসে। বিকেলের দিকে গেলাম ওদের বাড়ি, মীরাদির সঙ্গে দেখা করতে। সঙ্গে আমার মাও গেলেন। রাস্তা থেকেই ভাবতে ভাবতে যাচ্ছিলাম, কি ভাবে গিয়ে দাঁড়াব মীরাদির সামনে, কি কথা বলে সান্ত্বনা দোব, মৃত্যুশোকে মীরাদির চেহারা কেমন হয়েছে, আমাদের দেখে ডুকরে কেঁদে উঠবেন কিনা। কিন্তু না, গিয়ে দেখি মীরাদি প্রায় স্বাভাবিকই আছেন, শুধু সামান্য একটু রুক্ষ। মাকে নিয়ে মীরাদি তাঁর নিজের ঘরে গেলেন, আর আমি মুকুলের সঙ্গে তার বাবার ঘরে বসে গল্প করতে লাগলাম। প্রথম কিছুক্ষণ আলোচনা চলেছিল এই মৃত্যুকে ঘিরেই, তারপর কখন কোন্ ফাঁকে মৃত্যু থেকে সরে গিয়ে আমাদের আলোচনা আশ্রয় নিয়েছিল জীবনের অন্যান্য দিকে। পাশের ঘর থেকে মীরাদির গলাও কানে আসছিল, কখনও বা হাসিও। বুঝলাম শোকটাকে বেশ সামলে নিয়েছেন মীরাদি।

ফেরবার সময় গাড়িতে মায়ের মুখে শুনলাম, অতনু বাবু নাকি মেয়ের বিয়ের জন্যে পনেরো হাজার টাকা আলাদা ক'রে রেখেছেন, এছাড়া গহনাও আছে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট ভরি। চেষ্টা অবশ্য হয়েছে কয়েকবার, কিন্তু কোন পাত্রই নাকি অতনুবাবুর পছন্দ হয় নি। পাত্র ভালো তো বংশ ভালো নয়, বংশ ভালো তো পাত্র ভালো নয়। আর এই দুই ভালো খুঁজতে গিয়ে সময়ের সঙ্গে মীরাদির বয়সটাই গেছে বেড়ে, বিয়ে আর হয়নি। অতনুবাবু চোখ বুজলেন, এখন পাত্র সন্ধান করারও কেউ নেই। তাই একটি উপযুক্ত পাত্রের জন্যে মীরাদি নিজেই মায়ের কাছে বলেছেন। কথায় কথায় নাকি মীরাদি তার বাবাকে গাল পাড়ছিলেন, নিন্দে করছিলেন তাঁর স্বভাবের। মীরাদি বলেছেন, তাঁর বয়েস সবে আটাশে পা দিয়েছে, কিন্তু আমার মায়ের অনুমান ওটা আটাশ নয়, আটত্রিশ।

শ্রাদ্ধের দিন সকালে গিয়ে মীরাদির ঘরে বসেছিলাম। উনি কেবল কথায় কথায় আমার মাকে আনার কথা বলছিলেন, আর মাঝে মাঝে আনমনা হয়ে ডান হাত দিয়ে

বাঁ হাতের চুড়িগুলোকে ঘুরিয়ে দিয়ে দেখছিলেন। আর, আমি দেখছিলাম ঘরখানা। যেমন দেয়ালের কোণে কোণে ঝুল, তেমনি ধুলো দেরাজের এধারে ওধারে। ড্রেসিং টেবিলের আয়নাখানা ভেতর থেকে দাগ পড়ে পড়ে ঝাপসা হয়ে উঠেছে কয়েক জায়গায়। কোন দিকে যেন নজর নেই মীরাদির। না ঘরের দিকে, না নিজের দিকে। চুলে চিরুণী নেই, গায়ে ব্লাউজ নেই, পরণের ডুরে কাপড়-খানাও খুব সম্ভব আটহাতি।

অফিস থেকে ফিরে প্রায়ই শুনতাম, মীরাদি আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। বেশিক্ষণ অবশ্য থাকেন নি। মুকু অর্থাৎ মুকুলের বাড়ি ফেরার আগেই তিনি ফিরে গেছেন। মুকুল নাকি মীরাদির বেরোন পছন্দ করে না।

এরপর মীরাদির পরিবর্তনটুকু যেন দিনে-দিনে চোখে পড়তে লাগল আমার। আগে মাঝে মাঝে লাইব্রেরী থেকে আনিয়ে বই পড়তেন, এখন একেবারে ছোঁন না পর্যন্ত। বলেন, ভালো লাগে না! কি হবে কতকগুলো প্রেমের পড়া পড়ে। যখনই ডাকতে গেছি মুকুলকে, দেখেছি দোতলার জানালার ধারে চুপ করে বসে আছেন মীরাদি। ডাকলে সাড়া দেন না, বোবা চোখে তাকিয়ে থাকেন কিছুক্ষণ। মুকুল আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলেও মখে রা কাটেন না। ইচ্ছে হলে ঘাড় নাড়েন, নাহলে নয়। আবার কোন সময় বা হুড়মুড় ক'রে নিচে নেমে আসেন, আগ বাড়িয়ে জানতে চান, কোথায় চলেছি, কি দিয়ে ভাত খেয়েছি আজ। কথার যেন ফোয়ারা ছোটে। বলেন, বোনেদের বিয়ের কি হলো রে। মা থাকতে থাকতে ব্যবস্থা কর। তারপর তুইও একটা করে নে।

কথা পেয়ে আমি হয়তো বললাম, মুকুলের বিয়ে দিন!

অমনি চটে গেলেন। বলে উঠলেন, তোরা দেনা, আমার কথায় বিয়ে হবে! আমার কথা শুনবে নাকি! আমি তো চাকরানি এ বাড়ির। আমার মুখ দেখলেই পাপ—তো কথা শোনা! বাপটাও যেমন বজ্জাত ছিল, ছেলেও তো তেমনি হবে।

কথায় যে ঝাঁজটুকু নজরে পড়ে। তার গতি উর্ধমুখী দেখে আমিও আর বেশিক্ষণ দাঁড়াই না। দু-এক কথার পর সরে পড়ি।

ও-পথ দিয়ে যেতে যেতে মীরাদিকে চোখে পড়ে প্রায়ই। হয় সেই জানালার ধারে বসে বোবা চোখ মেলে তাকিয়ে আছেন পথচারীদের দিকে, নয়তো আশপাশের বাড়ির কোন মেয়ে বা বৌকে ডেকে এনে গল্প করছেন। কিম্বা তাদের কোন ছেলেমেয়েকে কোলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরছেন, চুমু খাচ্ছেন, আর শিশুর গলার আধো-সুর নকল করে খেলা করছেন।

একদিন আমার বোনের বিয়ের সব ঠিক্‌ঠাক্ হয়ে গেল। মুকুল জানতো, কিন্তু মীরাদিকে আর জানানো হয়নি। গেলাম খবরটা জানাতে এবং সেই সঙ্গে নিমন্ত্রণ করতেও। মীরাদি বললেন, আমি যদি নিজে এসে নিয়ে যাই, তাহলে হতে পারে যাওয়া। নইলে যাওয়ার নাম শুনে মুকু রাগারাগি করবে। তাই বিয়ের দিন সন্ধ্যের মুখে নিজে এক ফাঁকে গেলাম মীরাদিকে আনতে। দোতলায় উঠে মীরাদির ঘরের ভেজানো দরজাটা খুলতে গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ভেজানো দুটি কপাটের মাঝখানে যে ইঞ্চিটাক ফাঁক, সেখান দিয়েই নজরে পড়ল আমার একটা দৃশ্য এবং অনেক দিন পর সে-দৃশ্য দেখলাম বলেই হয়তো একটু আশ্চর্যও হলাম।

মীরাদি আজ সেজেছেন। সিল্কের শাড়ি আর ব্লাউজে, স্নো আর পাউডারে, এবং সোনার অলঙ্কারে—বহুদিন বাদে এক অপরূপ সাজে সাজবার চেষ্টা করছেন মীরাদি। দাগ-পড়া ঝাপসা আয়নাতেও বার বার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছেন নিজেকে। দেখছেন কেমন মানিয়েছে বা মানায়—এই ভাবে দেখতে দেখতে এক সময় মাথায় ঘোমটা তুলে দিলেন মীরাদি। একটু অবাক হলাম আমি এবং আরো একটু অবাক হলাম, যখন দেখলাম মাথায় ঘোমটা দিয়ে মীরাদি শুধু মুখই দেখছেন না আয়নায়, ঠোঁটের কোণে আর চোখের তারায় ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন কিশোরী বধূর মত সলাজ এক ব্যঞ্জনা।

মীরাদির এই অনুভূতিতে বাধা দেওয়া উচিত হবে না। তাই শুধু সরে এলাম না, চলেও এলাম। বাড়িতে ফিরে ছোট ভাইকে পাঠালাম নিয়ে আসতে। বিয়ের সময় ব্যস্ত ছিলাম, কোন খোঁজ খবর নিতে পারিনি, পরে বাসরে তার ওপর একবার চোখ পড়েছিল আমার। আসরের মাঝে ছোট-বড় মাঝারি, সবার সঙ্গে মিতালী পাতিয়ে খুশিতে একটু যেন চপল হয়ে উঠেছিলেন মীরাদি।

বোনের বিয়ের কিছুদিন পর আমার নিজেরও বিয়ে হয়ে গেল। অনেকের সঙ্গে মীরাদিও এসেছিলেন, কয়েক ঘণ্টার জন্যে আনন্দ করেছিলেন, আবার চলে গিয়েছিলেন। তারপর কয়েক মাস মীরাদিকে আর চোখেই পড়েনি আমার। নানান কাজে ব্যস্ত থাকায় ও-পথে আর যাওয়া ঘটে ওঠেনি। একেবারে ঘটে ওঠেনি বললে ভুল হবে, মঞ্জুর সঙ্গে, মানে আমার স্ত্রীর সঙ্গে মীরাদির আলাপ করিয়ে দিয়েছি এবং ওদের সে-আলাপ ইতিমধ্যে বেশ জমেও গেছে। একদিন রাত্রে খেতে বসেছি, হঠাৎ দেখি ফিক্ করে হাসছে মঞ্জু। অবাক হয়ে জিগেস করলাম, হঠাৎ হাসছো যে! মাথা খারাপ হলো নাকি তোমার?

তরকারির থালাটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে মঞ্জু বললে, আজ একটা ভারি মজার ব্যাপার হয়েছে।

মজার ব্যাপার! কেন, কি হলো?

আজ মীরাদির সঙ্গে যখন গল্প করছিলুম, একথা-সে কথার পর এক সময় হঠাৎ মীরাদি আমাকে জিগেস করলেন—ফুল শয্যার রাতে আমাদের প্রথম আলাপ হলো কি কথা দিয়ে।

মনে মনে একটু চমকালাম। তবু বাইরে তা প্রকাশ হতে না দিয়ে বললাম, তুমি কি বললে?

আমিও যত এড়িয়ে যেতে চাইছি অন্য কথা পেড়ে, মীরাদিও দেখি ঠিক ততই জেদ ধরছেন বলবার জন্যে। শেষে যদিও বা পার পাবার জন্যে একটা কিছু বললাম বানিয়ে, দেখি আবার প্রশ্ন করছেন। আমিও বলব না, উনিও ছাড়বেন না—কেবলই জিগেস করেন, তারপর কি হলো? কাছে সরে এল? তারপর? জড়িয়ে ধরল? তারপর—তারপর কি করল?' মীরাদির রকম সকম দেখে আমার কেমন হাসি পেয়ে গেল। কিন্তু হাসব কি, মীরাদি তখন আমার বাঁ হাত দিয়ে এমনভাবে জড়িয়ে ধরেছেন যে আমার তো দম বন্ধ হবার—

কথাটা শেষ করল না মঞ্জু। তার আগেই খিল্ খিল্ হাসিতে যেন ফেটে পড়বার উপক্রম হলো।

কথাটা শুনে আমারও হাসি পেয়েছিল। কিন্তু হাসতে গিয়েও হাসতে পারলাম না আমি। গলার কাছ অবধি এসেও হাসিটা যেন আমার আটকে গেল। মীরাদির এই কৌতূহলের অন্তরালে কোথায় যেন তাঁর এক বেদনার আভাষ পেলাম আমি। আর এই বেদনার আভাষ পেতেই হাসির বদলে মুখটা আমার গম্ভীর হয়ে উঠল। তবু মঞ্জুকে কিছু বুঝতে দিতে চাই না বলেই নিজেকে সামলে নিয়ে যথাসম্ভব হাসবার চেষ্টা করে বললাম, ভারি রসিক মহিলা তো মীরাদি। তোমার সঙ্গে জমেছে দেখছি বেশ!

অফিস থেকে ফিরে মাঝে মাঝে শুনি, মঞ্জু বেড়াতে গেছল মীরাদির বাড়ি। মীরাদি বেশ মিশুকে লোক, তবে বাড়িতে এমন একটা লোক নেই যে দু-দণ্ড কথা বলেন তার সঙ্গে বা সময় কাটান। মীরাদির ইচ্ছে, এবার মুকুলের একটা বিয়ে হয়, বৌ আসে, দুজনে বেশ হেসে-খেলে সময় কাটান। সাধও তো হয়!

কিন্তু মুকুল এমনই এক প্রকৃতির ছেলে, বিয়ের কথা তুললে হেসেই উড়িয়ে দেয়, নানান্ অজুহাত দেখায়। মঞ্জুও অবশ্য মুকুলের কাছে বিয়ের কথা তোলে মাঝে মাঝে, কিন্তু মুকুল কথাটা বরাবর এড়িয়েই যায়। বিয়ে করে মীরাদিকে সুখী করার কথা তুললে সে কেমন যেন গম্ভীর হয়ে যায়, অন্য প্রসঙ্গ পাড়ে।

মীরাদির সঙ্গে দেখা হলে, কথা বললে বোঝা যায় ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর তেমন বনিবনা নেই। তাই নাকি তাঁকে একদম দেখতে পারে না। কথা বলতে বলতে মীরাদি তো দেখেছি ক্ষেপেই যান মাঝে মাঝে। নিজের বাবাকে গাল পাড়েন, ভাইকে গাল পাড়েন, আর বলে ওঠেন, দুনিয়াটাই বড় স্বার্থপর!

একদিন মঞ্জু বললে, আমি বাজিয়ে দেখছি মুকুলদাকে বিয়ে করার ইচ্ছে ওর ষোলো আনার ওপরে আঠারো আনা। শুধু অভিভাবক হিসেবে একজন না জোর করলে মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে না কথাটা। তুমি একদিন বুঝিয়ে বলো। পাত্র হিসেবে সে তো আর খারাপ নয়! তিন তিনটে পাশ করা, স্বাস্থ্য ভাল, স্বভাব-চরিত্র ভালো, বংশও ভালো। দেশে বাড়ি-ঘরদোর আছে, জমিজমাও আছে বাপের কিছু নগদ টাকাও আছে। বলতে পারো—চাকরির ওর দরকারটাই বা কি? দেশের সম্পত্তি থেকে যা আয় শুনেছি, তাতে তো ওরকম চারটে সংসারে তিন পুরুষ ধরে বসে খাবে। আমার মনে হয়, ও মীরাদির কথা চিন্তা করেই পিছিয়ে যায়। তুমি যদি না পারো তো বল, আমি

না হয় একবার দেখি শেষ চেষ্টা ক'রে। বাস্তবিক মীরাদি সেদিন আমার কাছে যা দুঃখু করছিলেন! বলছিলেন একা থাকেন, সময় কাটে না! তবু বৌটা এলে তাকে নিয়ে একটু নাড়েন চাড়েন। মা-মরা ভাইকে কোলে-পিঠে করে নিজের হাতে মানুষ করেছেন, নিজের হল না বলে ভাইটার দিতেও তো সাধ হয়! কি নিয়ে থাকবেন তাহলে সারাজীবন? মারা পড়বেন যে! তোমরা বন্ধু-বান্ধবেরা যদি উঠে পড়ে না লাগো, তাহলে আর লাগবে কে।

সমস্যাটা যে চিন্তা করবার মত তা আমি জানি। আর চিন্তা যে না করেছি এমনও নয়। চিন্তাও করেছি, বহু রকমে চেষ্টাও করেছি, কিন্তু কোনই ফল হয়নি। দেখো, তুমি যদি কিছু করে উঠতে পারো। তোমাদের তো ছলাকলার অভাব নেই!

বিচিত্র এক মুখভঙ্গি করে উঠল মঞ্জু: না নেই!

কিন্তু আশ্চর্য, মঞ্জু সফল হ'ল কাজে। মুকুল প্রায়ই আসত আমার বাড়ি। নিশ্চয়ই বেগ পেতে হয়েছে, তবু রাজি তাকে শেষ পর্যন্ত করিয়েছে মঞ্জু! এমন কি পাত্রীও একটা জুটিয়ে ফেলেছে সে। মীরাটে থাকে মেয়েটি, মঞ্জুর মামীমার কে এক বান্ধবীর মেয়ে। বাবা মিলিটারীতে কাজ করেন। দুই ভাই, একটি ছোট একটি বড়, মাঝে বোনটি। বড় ভাই বেনারসে তার মামীর বাড়িতে থেকে পড়ে, আর ছোটটি বাপের কাছেই আছে। সবে ক্লাস নাইনে উঠেছে। মেয়েটি দেখতে ভাল, ম্যাট্রিক পাশ, গান-বাজনাও জানে—মুকুল যা চায়।

মঞ্জু বললে, এবার একদিন মীরাদিকে নিয়ে তুমি দেখে এস।

কোথায়? সেই মীরাটে?

না, না, মীরাটে নয়। মেয়ে এখন শ্রীরামপুরে তার জ্যাঠার কাছে আছে!

মুকুলও যাবে তো?

মুকুলদার দেখা হয়ে গেছে!

আশ্চর্য, কাজ এতদূর এগিয়ে রেখেছো? নাঃ, সত্যিই তুমি বাহাদুর! মুকুল কি বলে? পছন্দ হয়েছে তার?

পছন্দ হবে না মানে? বর্তে যাবে এমন মেয়ে পেলে!

সকৌতুকে বলি, বর্তে যাবে? যেমন আমি গেছি?

কৃত্রিম ঝাঁজ দেখিয়ে মঞ্জু বলে, হ্যাঁ, যেমন তুমি গেছো।

মেয়ে দেখার কথায় মীরাদি বললেন, তোরা দেখে আয় ভাই। আমি আর গিয়ে কি করব বল্! মুকুলকে দেখা, তুই দেখ, তোর মাকেও একবার নিয়ে যা একজন গিন্নি-বান্নি লোকও তো থাকা উচিত! আর শোন, যদিও কোনও সম্পর্ক রাখেনি বাবা, তবু আমার মামার বাড়িতে একবার খবরটা দিতে হবে। কাজকর্ম করবে কে? মুকুকে বল একবার যেতে। ও হয়েছে ঠিক ওর বাপের মত। কোথাও যাবে না, কারও সঙ্গে কথা কবে না, মান-সম্মান যাবে! লোকের সঙ্গে ঝগড়া করবার বেলায় তো মান যায় না। আমাদের এক পিসিমা আছেন বেলে-ঘাটায়, তাঁর ওখানেও একবার খবরটা দিতে হবে। যাই হোক, যা করবার, উঠে পড়ে তুই-ই একটু কর। তোরই তো বন্ধু!

খুশি আর কৌতুকে বিচিত্র এক হাসি হাসলেন মীরাদি।

আশ্চর্য, মাত্র ক'টা দিনের মধ্যেই মীরাদি যেন এক অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। যখনই যাই, মীরাদি ব্যস্ত। হয় খাটের তলা থেকে তোরঙ্গ-সুটকেশ বের করে সব গুছোচ্ছেন, গরম কাপড় জামাগুলো রোদে দিচ্ছেন, মায়ের বেনারসীখানা উল্টে-পাল্টে দেখছেন পোকায় কেটেছে কিনা, আর না হয় ঘরের ঝুল ঝাড়ছেন, তাক পরিষ্কার করছেন, কাঁচের আলমারির জিনিসপত্রগুলো সাবান-ধোয়া করে রাখছেন। এরই মধ্যে খাটের গদী সারিয়েছেন। চাদর পাল্টিয়েছেন, বালিশে ঝালরওলা ওয়াড় পরিয়ে দিয়েছেন কবে। যা কোনদিন দেখিনি, দু'খানা ঘরের প্রতিটি জানলায় পর্দা ঝুলছে, দরজাতেও তাই। সবই মীরাদি করেছেন নিজের হাতে। এমন কি টুলের ওপর দাঁড়িয়ে পাখার ব্লেডগুলো পর্যন্ত মুছে দিয়েছেন।

একদিন বললেন, একটা মিস্ত্রী ডেকে মুকুলের ঘরে আর একটা আলোর পয়েণ্ট করাতে হবে। আর, দুটো ভালো দেখে সেডও আনতে হবে। নীল আলো নইলে ঘর মানায় না।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম মীরাদির দিকে।

মীরাদি ভ্রুক্ষেপও করলেন না সেদিকে। বলে চললেন, সংসারের আরও কয়েকটা টুকিটাকি জিনিস কেনার দরকার। সরু কাঠির মাদুর দু'খানা, সামনেই শীত একখানা বড় দেখে লেপ করাতে হবে মুকুলের জন্যে। যেটা আছে, তার আর কিছু পদার্থ নেই—ছিঁড়ে তুলো বেরিয়ে পড়েছে চারধারে। একখানা ডবল-বেড নেটের মশারি। ড্রেসিং-টেবিলের আয়নাটা খারাপ হয়ে গেছে পাণ্টাতে হবে।

ব্রাশো দিয়ে ফুলদানি মাজছিলেন মীরাদি। বললেন, এসব কতকালের জিনিস—নিকেল উঠে লোহা বেরিয়ে পড়েছে। দেখি যদি পরিষ্কার না হয় তো আরেক জোড়া কিনতে হবে। কবে যে কি হবে, বুঝতে পারছি না। রাত পোহালেই তো বিয়ে—

রাত পোহালে না হলেও বিয়ের তারিখ খুবই এগিয়ে এসেছিল। আর দিন সাতেক মাত্র বাকি। এরই মধ্যে যা কিছু। চিরকালের মুখচোরা মুকুল তো সর্বদাই জবুথবু। কোন কাজেই যেন গা নেই। বিয়ের চিঠি ছাপা—সে আমারই ওপর ভার, বিয়ে করতে যাবে যে জামা পরে, ওকে সঙ্গে নিয়ে দর্জির দোকানে গিয়ে মাপ দিয়ে আসা সে-ভারও আমার কাঁধে। কেনা কাটা, বাজার-দোকান-সবই যেন আমার মাথাব্যথা। এমন কি এথানে ওথানে নিমন্ত্রণ করতে যাওয়া তাও আমাকে সঙ্গী হতে হবে।

মীরাদি হেসে বললেন, যদি না করবি তো বন্ধু কিসের!

বলা বাহুল্য, আমাকে অফিস থেকে ছুটি নিতে হলো ক'টা দিনের জন্যে। দিন চারেক আগে পাতি পুকুর থেকে নিয়ে এলাম মামা-মামীমাকে, বেলেঘাটা থেকে বুড়ি পিসিমা, তাঁর দুই ছেলে আর তিন নাতিকে। খিদিরপুর থেকে এলো খুড়তুতো ভাইয়ের একটি সংসার। সারা বাড়িটা যেন মেতে উঠল আনন্দে। তার চেয়েও মেতে উঠলেন আর খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠলেন মীরাদি। জীবনে এত খুশি তাঁকে আমি কোনদিনই দেখিনি। তাই প্রতিটি মুহূর্তেই অবাক হচ্ছিলাম আর ভাবছিলাম। মঞ্জু বললে, বিয়ের ব্যাপারে মুকুলদার চেয়ে মীরাদিই খুশি হয়েছেন বেশি।

বললাম, খুশি হওয়ারই তো কথা। এতদিনে একটা সঙ্গী পাচ্ছেন মনের মত। তাছাড়া, মুকুলকে যে উনি সাত মাসের শিশু থেকে এত বড়টি করে তুলেছেন।

আমি আর মুকুলের মামা ছিলাম বাইরের কাজে। মামার বয়স হয়েছে, জিনিস কেনাকাটায়, বাছাই করায়, দর কষাকষিতে পাকা লোক। অনেক সুবিধে হলো তাঁকে সঙ্গে পেয়ে। আর, ভেতর-বাড়ির কাজে ছিলেন মীরাদি আর মামীমা। বুড়ি পিসিমা ছিলেন ভুল ত্রুটি শুধরে দেবার জন্যে। কিন্তু আশ্চর্য, পরে আমার মায়ের মুখে শুনেছিলাম, নিজের বিয়ে না হলে কি হয়, অনুষ্ঠানের সকল পর্বই মীরাদির নখদর্পণে। গায়ে হলুদ থেকে ফুলশয্যা কি অষ্টমঙ্গলা যেখানে যেটির প্রয়োজন—সবই মীরাদির জানা। এদিক থেকে তিনি একজন পাকা গৃহিনীর চেয়েও পাকা। বুড়ি পিসিমার বরং এক আধ জায়গায় বিস্মরণ হচ্ছিল, মীরাদির কিন্তু কোথাও না। বরণডালা, শ্রী ইত্যাদি সাজানো গড়ানোর কাজ নিজের হাতেই করেছেন মীরাদি।

ছাদ ত্রিপল-ঘেরা হ'ল। শুরু হলো বাচ্চা ছেলে-মেয়েদের হুটোপুটি। দোতলার দালানে আর ঘরে মেয়েদের মজলিশ, প্রতিবেশীদের আনাগোনা। এক মীরাদিই যেন একশ। একবার ছাদ, একবার দোতলা একবার একতলা—এটা-ওটা-সেটা নিয়ে সদাই ব্যস্ত। কাউকে কিছু করতে দেবেন না, নিজেই আগ্ বাড়িয়ে যান, ঝাঁপিয়ে পড়েন কাজে। সদ্য-আগতকে আপ্যায়ন সকালে-বিকালে চা-জল থাবারের আয়োজন, দুপুরে-রাতে কি রান্না হবে—ঠাকুরকে তার নির্দেশ দেওয়া, বাজার তোলাপাড়া—সব ভারই মীরাদি কাঁধে তুলে নিয়েছেন। ফর্দ মিলিয়ে জিগেস করেন, নিমন্ত্রণ বাদ পড়ল নাকি কেউ। এ-পাড়ার অমুক বিয়ের দিন সকালেই আসছে কিনা, ও ও-পাড়ার অমুক কখন আসবে বলেছে।

বুড়ি পিসিমা মীরাদিকে লক্ষ্য করেন আর তাঁর দন্তহীন মুখ বিকশিত করে মাঝে মাঝে বলে ওঠেন, মেয়েটা যেন তিনকেলে গিন্নি। সবই শিখে নিয়েছে।

মীরাদি ভ্রুক্ষেপও করেন না সেদিকে। বলেন, কিরে, সানাই বলেছিস তো? সানাই নইলে বিয়ে বাড়ি মানায় না। পরক্ষণেই বছর সতেরোর একটি মেয়েকে ওপাশ থেকে ডেকে বলেন, চুপচাপ ঘুরছিস কেন রে গীতু

তোর মুকুলদাকে বল না টেবিলের তলা থেকে গ্রামোফোনটা বের করে দিতে। বাজা না বসে বসে। ভালো ভালো রেকর্ড তো আনিয়েছি! ওই কে যেন এল না? গাড়ির শব্দ হলো—

মীরাদি আর দাঁড়ালেন না। তর্‌তর্‌ করে নেমে গেলেন নিচে। জলে-জলে পিছল সিঁড়ি, তবুও হুঁস নেই যেন তাঁর।

যত দেখি ততই অবাক হই। ছোট একটা তুবড়ির খোল যেমন আলোর অনেক উচ্ছ্বাস চাপা দিয়ে রাখে, মনে হলো মীরাদিও যেন এতদিন ধরে তেমনি লুকিয়ে রেখেছিলেন তাঁর মনের যত কিছু ইচ্ছা আর আশাকে। আজ বিয়ে নামে একটা উৎসবের ছোঁয়া পেয়ে তাঁর সে ইচ্ছা আর আশা যেন পরিপূর্ণ আবেগে আর উচ্ছ্বাসে আলোর ফুল হয়ে উৎসারিত হচ্ছে, আর রঙীণ করে তুলছে চারধার।

নহবৎ বসল, বিয়ের দিন ভোর থেকেই শুরু হলো সানাই। দূর-দূর থেকে আসতে লাগল আমাদেরই বন্ধু-বান্ধবের দল, আর তাদের ছেলেমেয়ে-বৌ। প্রতিবেশিনীরাও এলেন অনেকে। সারা বাড়ি গমগমে হয়ে উঠল। ছেলে-মেয়েরা হুটোপুটি করছে কখনও ছাদে, কখনও নিচে। কখনও বা দোতলার বারান্দায়, যেখানে নান্দীমুখে বসেছে মুকুল, যেখানে মন্ত্রপাঠ করাচ্ছেন বৃদ্ধ পুরোহিত, আর ওধারে গায়ে হলুদের তত্ত্ব নিয়ে ব্যস্ত আছেন মেয়েমহল।

বেলা ন'টায় তত্ত্ব পাঠানোর কথা। তার ভার পড়েছিল আমার ওপর। বাড়ি থেকে স্নান সেরে আটটা নাগাদ পৌঁছলাম ও-বাড়ি। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় সারা দালানটা ভরে গেছে। কাঠের আগুনে চোখ জ্বলছে, তবু সবাই-ই ভিড় করে আছে ওখানে। শুধু মীরাদিকে দেখলাম না। পিসিমাকে জিজ্ঞাসা করতেই মুকুলের ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে দিলেন।

দরজাটা ভেজানো ছিল, ঠেলতেই খুলে গেল। দেখি বিছানার একধারে ওপাশে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে আছেন মীরাদি, আর তাঁরই মাথার কাছে বসে মামীমা আর মঞ্জু। কি ব্যাপার, শুয়ে কেন, শরীর খারাপ হলো নাকি! ডাকতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ ইসারায় বাধা দিয়ে উঠল মঞ্জু। ফিসফিসিয়ে বলল, চলো, বাইরে চলো, সব বলছি।

শুধু বাইরে নয়, ছাদে উঠে এলাম দুজনে। মঞ্জু বললে, মীরাদির শরীর খুব খারাপ। কিছুক্ষণ আগে মাথা ঘুরে পড়ে গেছলেন। অনেকক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিলেন। চোখে-মুখে জল ছিটোতে জ্ঞান ফিরেছে। এখন ঘুমুচ্ছেন।

বললাম, আমি জানতাম এরকম একটা কিছু হবে। ক'দিন ধরে যা ধকল পোয়াচ্ছেন। একা হাতে সব করব—কাউকে কিছু করতে দোব না বললে কি চলে! মানুষের শরীর তো!

কাল রাতেই আমার সন্দেহ হয়েছিল। রাত তখন একটা। বাইরে বেরিয়ে দেখি গায়ে হলুদের জিনিসপত্র গুছোচ্ছেন। বললাম, শুতে যান মীরাদি। রাত একটা বেজে গেছে। কাল ভোরে আবার করবেন'খন। উনি বললেন, আর সামান্যই বাকি। এটুকু একেবারে চুকিয়েই শুতে যাব। দ্বিতীয়বার যখন উঠলাম, তখন রাত তিনটে। দেখি চুপ চাপ বসে আছেন বারান্দায়। জিগেস করলাম, এখনও শুতে যান নি। শরীর ভালো তো? বললেন, শরীর ভালো, তবে ঘুম আসছে না কিছুতেই। ভাবলাম, সারাদিন এর-ওর-তার সঙ্গে অনবরত বকে বকে—আর এই রাত অবধি কাজ করে মাথাটা হয়তো গরম হয়ে গেছে। ঘাড়ে-মুখে-চোখে জল ছিটিয়ে ওঁকে নিয়ে এলাম আমার সঙ্গে। পাখাটা জোরে চালিয়ে দিয়ে বললাম শুয়ে পড়তে। উনি শুয়েও পড়লেন, কিন্তু ভোরে উঠে দেখি বিছানা খালি। শুনলাম গঙ্গাস্নানে বেরিয়েছেন। ঘণ্টা দেড়েক বাদেই ফিরে এলেন অবশ্য, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই বারান্দায় রেলিং ধরে বসে পড়লেন হঠাৎ, আর চোখ দুটো কপালে তুলে গোঁ গোঁ করতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার আনা হলো। জ্ঞান ফিরল মিনিট কুড়ি পর। ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, অতিরিক্ত পরিশ্রম আর মানসিক দুশ্চিন্তার জন্যেই এটা হয়েছে। তবে ভয়ের কিছু নয়—ওর এখন সম্পূর্ণ বিশ্রামের দরকার। একটা ঘুমের ওষুধ লিখে দিয়ে গেলেন ডাক্তার। সেই ওষুধ খেয়েই এখন ঘুমোচ্ছেন।

মনটা খারাপ হয়ে গেল অত্যন্ত। আজকের দিনে সব চেয়ে বেশি আনন্দ করবেন যিনি, তিনিই কিনা বিছানায়

পড়ে। বললাম, মীরাদির কাছে কাছে থেকো তুমি, আর কোন কাজ করতে দেবে না ওকে। উনি হয়তো একটু সুস্থ হতে না হতেই আবার কোমর বাঁধবেন।

পাথুরেঘাটায় এক আত্মীয়ের বাড়ি কন্যাপক্ষ এসে উঠেছেন। বিয়ে ওখান থেকেই হবে।

পাত্রীর বাবা বিপ্রদাসবাবু অতিশয় সজ্জন ব্যক্তি। মিলিটারিতে কাজ করলে কি হবে, চেহারাতে যেমন ব্যবহারেও তেমনি মিষ্ট ভাব। তেমনি শান্ত স্বভাবের স্ত্রীলোক পাত্রীর মা। অত্যন্ত খুশী হলো তত্ত্ব দেখে। বললেন, এমন নিখুঁত তত্ত্ব সাজানো বড় একটা দেখা যায় না।

হঠাৎ মীরাদির কথা মনে পড়ে গেল, আর মনটাও খারাপ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। কাল অনেক রাত পর্যন্ত তিনি একাই সব কিছু সাজিয়েছেন গুছিয়েছেন। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে আজকের দিনটিতেই তিনি রইলেন বিছানায় পড়ে।

বিকেল চারটে নাগাদ সারা বাড়ি জুড়ে যেন বাজার বসে গেল। তেমনি হৈ হৈ, তেমনি সোরগোল। সকাল-সকাল বর বেরোবে। সন্ধ্যে রাতেই লগ্ন। তাই সবাই যে-যার তৈরী হতে লাগল। বাথরুম একটা, জলেরও টানাটানি। কেউ কেউ আশপাশের বাড়ী থেকে স্নান সেরে এল, কেউ কেউ বা শুধু মুখ-হাত-পা ধুয়েই কাজ সেরে নিল।

মীরাদি সুস্থ হয়ে উঠেছেন অনেকটা। তবে উঠতে দেওয়া হয়নি তাঁকে একেবারেই। জনকয়েক শক্ত ধাতের মানুষ এমনভাবে তাঁকে ঘিরে বসেছিল যে সে ব্যূহ ভেদ করে বেরোন তাঁর পক্ষে বেশ কঠিন। ওরই ফাঁকে তবু একবার নাকি বাথরুমে যাবার নাম করে এঘর-ওঘর ঘুরে এসেছেন, নিচে ফটকের কাছেও দাঁড়িয়েছেন মিনিট কয়েকের জন্যে; এখন কেবলই ছটফট করছেন, আর বারবার ধরে জিগেস করছেন, বর বেরোবে কখন, লগ্ন ক'টায়, নতুন কেউ এল কিনা, বরযাত্রীরা কজন এসেছে ইত্যাদি।

মঞ্জু বললে, দুপুরে চোখ দিয়ে টপ্‌টপ্‌ করে জল পড়ছিল মীরাদির।

বললাম, খুবই স্বাভাবিক। এমন দিনে বিছানায় পড়ে থাকতে কারই বা আনন্দ হয় বলো! তবু ওঁকে উঠতে দিও না। আজকের দিনটা বিশ্রাম নিলেই সেরে উঠবেন। কাল থেকে আবার সব করবেন'খন। তাছাড়া, আজ আর করবারও তো বিশেষ কিছু নেই। বর বেরোবার সময় যা কিছু করবার সে তো মামীমাই করবেন।

মেয়েমহল ব্যস্ত বর সাজানোয়। বুড়ি পিসিমা এগিয়ে এসে বললেন, ওরে, সানাই বাজছে না কেন? বর সাজানো হচ্ছে, এখন যে বাজাতে হয়!

কথাটা উচ্চারণের যা অপেক্ষা, শুরু হয়ে গেল সানাই। কান ঝালাপালা হবার জোগাড়। বাচ্চা একটি মেয়ে হঠাৎ কোথা থেকে ছুটে এসে আমার ডান হাতখানা টানতে টানতে বলে উঠল, দেখবে এসো কাকা, মুকুলকাকাকে কেমন সাজাচ্ছে মা! ঠিক যেন বর—

হাসি পেলো। বললাম, যাচ্ছি, তুই যা।

মীরাদি তখন ওপাশ ফিরে শুয়ে। কাছে গিয়ে দেখি চোখ বুজে আছেন। মুখে আঙুল চেপে ইসারায় বুড়ি পিসিমা বললেন, রাগ হয়েছে, তাই চোখ বুজে পড়ে আছে।

মুকুলের অবস্থা তখন দেখবার মত। বেচারা একে মুখচোরা, তার ওপর পড়েছে মেয়েদের হাতে—তায় আবার বিয়ের সাজ সাজতে। বললাম, কিরে, কেমন লাগছে, বিয়ে করবি না বলেছিলি?

আরও লজ্জা পেলো বোধহয়, বেচারা কোন কথা বলল না, মুখ টিপে হাসল শুধু একটু।

সিগারেট ধরাতে ধরাতে বারান্দা থেকে আসা[illegible] ডাকলেন মামা। বললেন, তুমি একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়বে দেবু। অন্ততঃ খান ছয়েক ট্যাক্সি নিতে হবে লগনসার বাজার, ট্যাক্সি পাওয়া শক্ত। রাস্তা থেকে ধরতে হবে। মেয়েরা যে ক'জন যাবে, আমার গাড়িতেই তুলে নোব।

ঘরে ঘরে আলো জ্বলে উঠল। নহবৎখানার চা[illegible] পাশেও। সোরগোল আরও পড়ল। বরযাত্রীর দ[illegible] এসে পড়ছে একে একে। বর সাজানো শেষ হ[illegible] শাঁখটা কে যেন বাজিয়ে দিল বারকয়েক। হৈ [illegible] করতে লাগল ছেলেমেয়ের দল।

বুড়ি পিসিমা ভিড়ের মধ্যে এগিয়ে গিয়ে বললে[illegible] বর তো হলো, নিদ্‌বর কেমন হ'ল দেখি না রে! ক[illegible] কোথা গেলি, ও দীপু—

চায়ের ট্রে হাতে পুরোন চাকর হরিয়া এই সময় পেছন থেকে চীৎকার শুরু করল, একটা করে কাপ তুলে নিন বাবু···একটু সরে দাঁড়াবেন কত্তারা···পড়ে গেলে পুড়ে খুন হবেন—

মামা আর একধার তাড়া লাগালেন, আর দেরী করলে ট্যাক্সি পাবে না দেবু। এইবার বেরিয়ে পড়ো তুমি।

লোকে লোকে ঘর বোঝাই। ঢোকবার উপায় নেই। তাই দোর থেকেই চেঁচিয়ে বললাম, এখন আপনি কিছু-ক্ষণের জন্যে ছুটি পেতে পারেন মীরাদি—

ঘরের সব ক'টি প্রাণীই মনে হ'ল যেন একটা পরম অস্বস্তির হাত থেকে রেহাই পেলো এতক্ষণে।

কুমীরের হাঁ-এর মত গলির মুখটা চওড়া, কিন্তু ভেতর দিকটা ক্রমেই সরু হয়ে গেছে। গাড়ি ঢোকালে ব্যাক করে আসা ছাড়া উপায় নেই। তাই মোড়ের মাথাতেই দাঁড় করাতে হলো।

হাতঘড়ির দিকে একবার তাকালাম। মামা ঠিকই বলেছিলেন, ট্যাক্সি ধরতে সত্যিই সময় লাগল বেশ। প্রায় ঘণ্টাখানেক পার হয়ে গেল দু'খানা গাড়িকে একত্র করতে।

গাড়ি থেকে নেমে কয়েক পা এগিয়ে হঠাৎ নজরে পড়ল, নহবৎখানা শূন্য। সানাই বন্ধ করে নেমে পড়েছে বাজিয়েরা। কিন্তু কেন? বিশ্রাম নিচ্ছে নাকি? এই কি তার সময়? রাগ হ'ল লতিফ মিঞার ওপর। লোকটার কি রসবোধটুকুও নেই! বর বেরোবে, আর ও কিনা ঠিক এই সময়টিতেই বাজনা বন্ধ করেছে!

আরও কয়েক পা এগোতেই বাড়িটা আবার কেমন থমথমে মনে হ'ল। কি ব্যাপার! আমার দেরি দেখে ওরা সব ইতিমধ্যে বেরিয়ে পড়ল নাকি?

আরেকবার হাতঘড়ির দিকে তাকালাম। দেরি যতই হোক, এখনও যথেষ্ট সময় আছে হাতে। তাছাড়া আমাকে—যে কিনা আজকের এই অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান হোতা, তাকে পেছনে ফেলে বাকীরা যাবে এগিয়ে—এ হতেই পারে না!

নিজেই বুঝতে পারিনি, পা দুটো আপনা থেকেই জোরে জোরে চলতে শুরু করেছিল। হঠাৎ পাশ থেকে ভারি গলার আওয়াজে মুখ ফেরাতেই দেখি, মামা। বললাম, গাড়ি এসে গেছে। গলির মধ্যে আর ঢুকোলাম না, বেরোতে অসুবিধে—

কথাটা আমার শেষ হলো না। তার আগেই মামা বললেন, এক কাজ করো—কয়েকটা টাকা দিয়ে ট্যাক্সি ছেড়ে দাও—

কেন, ওরা কি সব চলে গেল নাকি? এখনও তো যথেষ্ট সময় ছিল হাতে—

না, ওরা কেউ যায়নি। তুমি আগে ট্যাক্সিগুলোকে ছেড়ে দিয়ে এসো, তারপর বলছি সব—

ব্যাপার কি? তবে কি রাত করে বেরোতে চান সব, শেষ রাতের লগ্নে বিয়ে হবে বলে? বললাম—বেরোতে যদি দেরি থাকে, ওদের একটু ওয়েট করতে বললেই তো হয়। পরে কিন্তু আরো মুসকিল হবে ট্যাক্সি জোগাড় করতে। এই তো প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে—

না, না, তুমি ট্যাক্সি একেবারে ছেড়ে দিয়ে এসো, মামার মুখটা কেমন অস্বাভাবিক গম্ভীর: তাড়াতাড়ি করো, অনেক কথা আছে।

একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় বুকটা আমার ধড়াস করে উঠল। তাহলে কি কোন বিপদ হলো নাকি? মীরাদির শরীর ভালো তো? না কি সারাদিনের উপবাসের পর মুকুলের কিছু হলো? যা নার্ভাস প্রকৃতির ছেলে ও।

একরকম দৌড়ে গিয়েই ট্যাক্সিগুলোকে বিদেয় করে এলাম। ফিরে যাবার সময় আমার দিকে ওরা ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে তাকিয়েছিল কিনা জানিনা। কারণ সেদিকে নজর দেবার মত সময় তখন আমার ছিল না, মানসিক অবস্থা তো নয়ই। একটা অদম্য কৌতূহল, একটা অজানা উদ্বেগ, আর একটা নিদারুণ অস্বস্তি আমাকে যেন ব্যাধের মতই তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে।

বাড়ির সামনে এখানে খানিক জটলা, ওখানে খানিক ভিড়। আশপাশের জানলায় আর বারান্দায় কৌতূহলী উঁকি-ঝুঁকি। একটা অস্পষ্ট চাপা গুঞ্জন।

বাড়ির পাশে একটা ছায়া-ছায়া কোণে দাঁড়িয়ে মামা বোধ হয় আমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। কাছে যেতেই বললেন, ওধারে চলো, বলছি।

একটু দূরে একটা লাইট পোষ্টের নিচে গিয়ে মামা

পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বের করে বললেন, পড়ে ছাখো।

এটা কি?

পড়েই ছাখো না!

ভাঁজ খুলে কাগজখানার ওপর চোখ বুলোতেই চমকে উঠলাম। আর, সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল বুকে যেন কেউ আমার একটা প্রকাণ্ড হাতুড়ির ঘা মারল। ঝাপসা চোখে কতক্ষণ অক্ষরগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম, কিন্তু এ যে মিথ্যে—সম্পূর্ণ মিথ্যে—

অস্থিরভাবে পায়চারি করছিলেন, আর ঘন ঘন সিগারেটে টান দিচ্ছিলেন মামা। থেমে পড়ে বললেন, আমরা তা বুঝলাম, কিন্তু মেয়ের পক্ষ? খবরটা পেয়ে মেয়ের মা জ্ঞান হারিয়েছেন, বিপ্রদাসবাবু পাগলের মত ঘর-বার করছেন অনবরত, বাড়িময় কান্নাকাটি পড়ে গেছে।

চিঠিটা দিয়ে গেল কে?

বিপ্রদাসবাবুর ভাই।

পেয়েছেন কখন?

বিকেলের ডাকে।

পা দুটো কাঁপছিল আমার ঠক্‌ঠক্‌ করে। কি করব না করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। মুকুলের সঙ্গে আলাপ আমার আজ পঁচিশ বছরের। তার চেয়েও বড় কথা ওদের পরিবারের সঙ্গে যেরকম ঘনিষ্ঠতা আমার, তাতে কোথাও কোন গোপনতার অবকাশ মাত্র ছিল না। মীরাদির বাবা পাগল ছিলেন, ঠাকুর্দা পাগল ছিলেন, বংশ পরম্পরায় ওঁরা পাগল—বিয়ের পর ও পরিবারের সবাইয়েরই মাথার গোলমাল দেখা দেয়! ওই কারণেই নাকি বিয়ে হয়নি মীরাদির। আর, ঠিক ওই একই কারণে মুকুলের হাতে মেয়ে তুলে দিতে রাজি নন ওঁরা। দড়ি-কলসী দিয়ে মেয়েকে বরং জলে ভাসিয়ে দেবেন, তবু জেনে শুনে একজন ভাবী পাগলের হাতে তুলে দেবেন না কিছুতেই মেয়েকে!

চিঠির শেষে 'পুনশ্চ' জানিয়েছেন, নেহাৎ জানাশোনার মধ্যে সম্বন্ধটা হয়েছিল, নইলে এ-অপরাধের শাস্তি কি ভাবে দিতে হয়, তা ওঁদের জানা আছে।

বুকের রক্ত হঠাৎ যেন আমার চমক খেয়ে উঠল। বললাম, আরে ওঁরাই তো পাগলের মত ব্যবহার করছেন! চিঠিটা কে দিয়েছে, কথাটার সত্যি মিথ্যে যাচাই না করেই—

সে-কথা আমি বলতে গিয়েছিলাম বিপ্রদাসবাবুর ভাইকে। কিন্তু তিনি কিছুই শুনতে চাইলেন না। বললেন, কথা যখন উঠেছে, তখন একটা কিছু গলদ আছে নিশ্চয়ই!

সেটা যাচাই করেই নিন না কেন!

না, তাতে ওঁরা রাজি নন। ওদের ধারণা, এতখানি বয়েস পর্যন্ত মীরার বিয়ে যখন হয়নি, তখন—

এ মিথ্যা—মিথ্যা—মিথ্যা! এর চেয়ে মিথ্যা আর কিছু থাকতে পারে না দুনিয়ায়। কিন্তু এ ভয়ঙ্কর চিঠি পাঠালে কে? কে করলে এমন শত্রুতা? কোন অভিপ্রায়ে আজকের এই আনন্দময় অনুষ্ঠানের মাঝে সর্বনাশের ছায়া ফেলল সে? কিসের লোভে একটা এতবড় মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে দিল দুটি নবজীবনের শুভ সূচনাকে?

এ-বিয়েতে মধ্যস্থতা করেছে মঞ্জু—আমারই স্ত্রী মঞ্জু। কি কৈফিয়ৎ দেবে সে তার মামীমার বান্ধবীকে? যিনি তাঁর একটিমাত্র মেয়েকে সুপাত্রস্থ করার জন্যে সুদূর মীরাট থেকে ছুটে এসেছেন কলকাতায়! যিনি মেয়ের বিয়েতেও সরল বিশ্বাসে নির্ভর করেছেন তাঁর বন্ধুর ভাগ্নীকে। যিনি একমাত্র তার কথাকেই শেষ কথা মনে করে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে এসেছেন এতদিন? তাঁর সে-বিশ্বাসের মর্যাদা দিতে পারল কই মঞ্জু? আর, কি কথা বলে আমি সান্ত্বনা দেব মুকুলকে, আর সেই মীরাদিকে, যিনি তাঁর একমাত্র ভাইয়ের বিয়েতে-রাজি-হওয়ার খবর পেয়ে আনন্দে কেঁদে ফেলেছিলেন—আর খুশিতে ঘুমোতে পারেন নি রাতের পর রাত, যিনি বহুদিনের আশা আর আকাঙ্খাকে সুচরিতার্থ করার প্রয়াসে নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন সকল কাজের ভার, সকল দায়-দায়িত্ব?

মুহূর্তের জন্যে বোধ হয় একটু আন-মনা হয়ে গিয়েছিলাম। চমক ভাঙল মামার কথায়—যাও, একবার ভেতরে যাও। মুকুলের সঙ্গে দেখা করো—

মুকুল নয়, আমি তখন ভাবছিলাম মীরাদির কথা, যে মীরাদির বহুদিন ধরে মনে-মনে গড়ে-তোলা সুখের সৌধ দুর্বার নিয়তির মুহূর্তের ফুৎকারে ধুলো হয়ে মিশে গেল মাটিতে, যে মীরাদির সব সাধ আর আহ্লাদ আতসবাজীর মত মুহূর্তের রঙ নিয়ে জ্বলে উঠতে না উঠতেই আবার গেল নিভে!

হঠাৎ একটা কথা খেয়াল হ'ল আমার। মীরাদি এখন কোথায়? কি করছেন? আজকের এই দুর্ঘটনা বজ্র হয়ে তাঁরই মাথায় আঘাত হেনেছে বেশি—সন্দেহ নেই, কিন্তু সে দুঃসহ আঘাত তিনি গ্রহণ করেছেন কি ভাবে?

পা দুটো আর চলতে চাইছিল না—তবু এগোলাম। বাইরের ঘরে একটা বড় জটলা, সিঁড়ির ধাপে ধাপে মেয়েদের ফিসফিস, দোতলার বারান্দায় বুড়ি পিসিমাকে ঘিরে একটা চাপা আলোচনা। মুকুলের ঘর অন্ধকার। দরজায় মুখ বাড়িয়ে দেখি বেতের চেয়ারটায় চুপচাপ বসে আছে মুকুল! রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের এক ফালি আলো জানলা দিয়ে এসে পড়েছিল ওর মুখে। তাইতেই দেখলাম, উদ্বেগে, উৎকণ্ঠায়, লজ্জায় আর অপমানে মুখখানা ওর কালো অন্ধকারের চেয়েও কালো হয়ে উঠেছে। মনে হল একবার ঢুকি ঘরে, কাছে গিয়ে একটু দাঁড়াই, কিন্তু পারলাম না—পেছন থেকে কে যেন আমায় সজোরে টেনে রেখেছে।

মীরাদির ঘরও অন্ধকার। মেঝেয় ক'টা বাচ্চা ছেলে-মেয়ে অকাতরে মাদুরের ওপর পড়ে ঘুমোচ্ছে। খাটের বিছানা শূন্য।

বাইরে বুড়ি পিসিমা কাঁদছিলেন, আর বারে বারে চোখ মুছছিলেন। মীরাদির কথা জিজ্ঞাসা করতেই মুখ ফিরিয়ে বললেন, এই তো এখানে ছিল—বোধ হয়—

এক সঙ্গে সিঁড়ির তিন-চারটে ধাপ পার হয়ে উঠে গেলাম ছাদে। সেখানেও একটা মেয়েদের বৈঠক—কিন্তু মীরাদি নেই। মঞ্জু এগিয়ে আসতেই জিজ্ঞাসা করলাম, মীরাদি কোথায়? মীরাদিকে দেখেছো?

কেন, একটু আগে মীরাদিকে তো দোতলাতেই দেখে এলাম।

আবার নেমে এলাম নিচেয়। বুড়ি পিসিমা কিছু বলতে চাইছিলেন বোধ হয় আমাকে, সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে আমি সোজা মীরাদির ঘরে ঢুকে আলোটা জ্বেলে এদিক-ওদিক দেখলাম আর একবার ভালো করে, কিন্তু মীরাদি নেই—

মুকুলের ঘরের আলোটাও জ্বাললাম, সেখানেও দেখলাম না ওঁকে। তারপর বারান্দা পার হয়ে পুবমুখো ছোট্ট ঠাকুর ঘরটার সামনে এসেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। মীরাদির জড়ানো গলা কানে আসতেই মনে হল পেছন থেকে কে যেন আবার আমায় টেনে ধরেছে। সে-টান অগ্রাহ্য করে আর এক পাও এগোতে পারলাম না আমি।

দরজাটা হাওয়ায় আধা-বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তারই ফাঁক দিয়ে দেখলাম, প্রতিবেশিনী একটি মহিলার সঙ্গে কথা বলছেন মীরাদি, আর সাজানো বরণ ডালার জিনিষগুলোর একটা একটা করে চুপড়িতে তুলে রাখছেন। আলোর দিকে পিছন করে বসলেও, মঙ্গলঘটের প্রদীপের আলোয় বেশ ভালো ভাবেই দেখা যাচ্ছিল ওঁর মুখ।

কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি পড়তেই চোখ দুটো আমার স্থির হয়ে গেল। দেখি, প্রতিবেশিনী মহিলাটির সঙ্গে দিব্য হাসি মুখেই গল্প করছেন মীরাদি। সে-হাসি শোকের নয়, দুঃখের নয়, কোন ব্যথা বা বেদনারও নয়, সে-হাসি জয়ের, সে-হাসি যেন একটা পরম উল্লাসবোধের।

আবোল-তাবোল চিন্তা করতে করতে মন্ত্রমুগ্ধের মত কতক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়েছিলাম জানি না, হঠাৎ পিসিমার ডাকে সম্বিত ফিরে পেতেই চট্ ক'রে সরে দাঁড়ালাম পাশেই একটা অন্ধকার কোণে।

পিসিমার ডাকে সাড়া দিয়ে মুহূর্তের জন্যে মীরাদি কি ভাবলেন, তারপর মঙ্গলঘটের প্রদীপটা এক ফুঁয়ে নিভিয়ে দিয়ে প্রতিবেশিনীটির সঙ্গে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে।

মাথাটা তখন আমার একেবারেই ছেড়ে গেছে। জিজ্ঞাসার কোন জটই আর সেখানে নেই।

বাবরের আত্মকথা

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় এম-এ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

হিন্দুস্থানের জলজন্তু

জলজন্তুর মধ্যে একটি হচ্ছে কুমির। স্থির জলে এদের বাস। এরা মানুষ—এমন কি মোষ পর্য্যন্ত ধরে নিয়ে যেতে পারে। কুমিরের এক রকমের জাত আছে যাকে বলে সিপ্‌সার। হিন্দুস্থানের সব নদীতেই এরা ঘুরে বেড়ায়। একটাকে ধরে আমার কাছে নিয়ে আসা হয়েছিল। সেটা লম্বায় ছিল চার পাঁচ গজ। কোনও কোনটা এর চেয়েও বড় হয়। এর মুখ ও নাক ওপরের দিকে আধ গজ লম্বা। কুমীরের নীচ ও ওপরের চোয়ালে অনেকগুলি ছোট দাঁতের সারি। এরা জল থেকে উঠে এসে জলের ধারে ঘুমায়।

আর একরকমের জলজন্তু—শুশুক। হিন্দুস্থানের সমস্ত নদীতেই এদের দেখা যায়। এরা ঝাঁকি মেরে জল থেকে মাথা তুলে আবার জলে ডুব দেয়—তখন আর এক লেজ ছাড়া দেহের কোনও অংশই দেখা যায় না। এর চোয়ালও অনেকটা কুমিরের চোয়ালের মত। এর চোয়াল লম্বা এবং দাঁতের সারিও ঐ একই রকম। কিন্তু অন্য বিষয়ে এর শরীর ও মাথা মাছেরই মত। যখন এরা জলে খেলা করে তখন এদের ভিস্তির মশকের মত দেখায়। সারু নদীতে যে সব শুশুক আছে তারা জলে খেলার সময় লাফিয়ে সমস্ত শরীরটাই জলের ওপরে তুলতে পারে। এরা মাছের মতই জল ছেড়ে থাকতে পারে না।

খড়িয়াল আর এক রকমের জলজন্তু। আমার অনেক সৈন্যই সারু নদীতেই এই জলজন্তু দেখেছিল। এরাও মানুষ ধরে জলের মধ্যে টেনে নিয়ে যায়। যে সময় আমরা সারুনদীর ওপরে ছিলাম সেই সময় দুই একজন ক্রীতদাস বালককে খড়িয়াল জলের তলে টেনে নিয়ে যায়। এই জায়গায় দূর থেকে খড়িয়াল দেখেছিলাম, কিন্তু এর সম্পূর্ণ চেহারা আমার নজরে পড়েনি।

এক রকমের মাছ হচ্ছে—ক'কে। এর দুই কানের সমান্তরালে দুটো হাড়—যা লম্বায় তিন আঙুল পরিমাণ। এই মাছ ধরা পড়লে যখন হাড় দুটো নাড়ে তখন এক রকমের শব্দ বের হতে থাকে। এর জন্যই নাকি এর নাম হয়েছে ক'কে।

হিন্দুস্থানের মাছ খেতে খুব সুস্বাদু। এদের খুব অল্পেই ছোট ছোট কাঁটা আছে। এরা অদ্ভুত চটপটে। একবার জাল ফেলে নদীর এ পাশ ও পাশ ছেঁকে ফেলা হয়। অনেক মাছ জালে ধরা পড়ে। জালের দুই পাশ আধগজ পরিমাণ উঁচু করে তোলা হলো। তখন অনেক মাছ একের পর এক গজখানেক জালের ওপর দিয়ে লাফিয়ে উঠে ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেল। এ ছাড়া, হিন্দুস্থানে এমন অনেক ছোট ছোট মাছ আছে যারা কোনও জোর শব্দ—এমন কি পদধ্বনি শুনলেও জলের ওপর এক দেড় গজ লাফিয়ে ওঠে।

হিন্দুস্থানের ব্যাং দেখবার মত। যদিও এগুলো আমাদের দেশের ব্যাংএর জাতেরই মত, কিন্তু এরা জলের ওপর ছয় সাত গজ দৌড়িয়ে যেতে পারে।

হিন্দুস্থানের ফল

'আম্বে (আম) হিন্দুস্থানের বিশেষ ফলের মধ্যে আম প্রধান। প্রসিদ্ধ কবি খাজা খসরু বলেছেন—

> 'হে আম্রসুন্দরী, তুমি উদ্যানের শোভা।
> হিন্দুস্থানের ফলের মধ্যে তুমিই মনোলোভা।

যে আম ভাল জাতের সেগুলো খুব সুস্বাদু। হরেক রকমের আমই লোকে খায়, তবে সবই ভাল নয়। এদেশের লোক কাঁচা আম পেড়ে বাড়ীতে রেখে পাকায়। কাঁচা আমের টক খেতে ভাল এবং এ দিয়ে সুন্দর আচার তৈরী হয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে হিন্দুস্থানে এইটিই সব চেয়ে ভাল ফল। এর গাছ খুব বড় হয় এবং একটা গাছে অনেক ফল ধরে। অনেকে আমের এমন প্রশংসা করে যে একমাত্র খরমুজা ছাড়া আর কোনও ফলেরই আমের সঙ্গে তুলনা হয় না। আম এতটা প্রশংসার যোগ্য কিনা আমার সন্দেহ আছে। আম দুই রকম ভাবে খাওয়া হয়। একরকম আম এখানকার লোকেরা হাত দিয়ে টিপে টিপে নরম করে নিয়ে এর একপাশে ছেঁদা করে সেইখানে মুখ লাগিয়ে রস চুষে নেয়। আর একরকমের আম কাঁদি পিচের মত ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে তবে খায়। এর ছাল দেখতে অনেকটা পিচের মত। বাংলা ও গুজরাটের আম খেতে খুব সুন্দর।

কলা—এখানকার আর একটা ফল—কলা। আরবদেশের লোকেরা একে বলে মেজ়ি। এর গাছ খুব বড় হয় না। সত্যি কথা বলতে গেলে কলা গাছ বৃক্ষ পর্য্যায়েরও নয়। এক রকম সরাজ জাতীয় উদ্ভিদ। কলার পাতা লম্বায় প্রায় দুই গজ। চওড়ায় গজ খানেক। কলা গাছের মধ্য দিয়ে হৃদপিণ্ডের মত একটা নব পল্লব বেরিয়ে আসে। কলার মুকুল (মোচা) এই পল্লব থেকে ঝুলে পড়ে। কলার মোচা যেন একটা ভেড়ার হৃদপিণ্ড। যখন এই মোচা এক একটা পাতার খোলস ছাড়ে তখন ছয় সাতটা ফুলের সারি বের হয়। এই ভাবে খোলস ছাড়তে ছাড়তে শেষ পর্য্যন্ত শ্রেণীবদ্ধ কলার সারি দেখা দেয়। প্রথমে যা থাকে ফুল, তাই ক্রমে পুষ্ট হয়ে কলার আকার ধারণ করে নয়ন গোচর হয়। কলার দুইটি গুণ—প্রথমত: এর ফল অনায়াসেই ছাড়ানো যায়, দ্বিতীয়ত:এর কোনও বীচি নাই এবং খেতে মোলায়েম।

বেগুনের চেয়ে কলা লম্বা ও সরু। কলা খেতে খুব মিষ্টি নয়, কিন্তু বাংলা দেশের কলা খুব মিষ্টি। কলা গাছ দেখতে খুব সুন্দর। এর পাতা বেশ চওড়া এবং রং উজ্জল সবুজ।

মহুয়া—একে গুলচিকান বলা হয়। এ গাছ খুব ঝাঁকড়া হয়। হিন্দুস্থানীরা তাদের ঘর সাধারণতঃ এই গাছের তক্তা দিয়ে তৈরী করে। মহুয়ার ফল থেকে এক রকমের মদ হয়। হিন্দুস্থানীরা এই ফুল শুকনো করে কিস্‌মিসের মত খায়। এই থেকেই মদ তৈরী হয়। কিসমিসের সাথে এর খুব সাদৃশ্য আছে। এর গন্ধ ভাল নয়, খেতেও খুব সুস্বাদু নয়। মহুয়ার গাছ বুনো ধরণের। মহুয়া ফল খেতেও সুবিধার নয়। এর বীচি আকারে বড়। খোসা পাতলা। বীচির শাঁস থেকে এক রকমের তেল তৈরী হয়।

আম্বলি—এই ফল এক জাতের হিন্দুস্থানী খেজুর। এর ছোট ছোট পাতা খাঁজকাটা ঠিক জায়ফল গাছের পাতার মত। তবে এই গাছের পাতা অপেক্ষাকৃত ছোট। এই গাছ খুব সুন্দর এবং বহুল-পরিমাণে ছায়া দান করে। গাছও খুব বড় হয় এবং বন জঙ্গলে অসংখ্য জন্মে।

কিরণি—এই ফলের গাছ সাধারণতঃ গুজরাটে দেখা যায়। এই গাছ ঝাকড়া না হলেও ছোট আকারের নয়। এর ফল পীত বর্ণের, কুলের চেয়ে আকারে ছোট ও স্বাদে আঙ্গুরের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। তবে খাওয়ার পর শেষে একটা খারাপ স্বাদ রেখে যায়। তাহলেও এ ফল ভাল এবং খাওয়াও চলে। এর বীচির খোসা পাতলা।

জামান (জাম)—এর গাছের পাতা উইলো গাছের পাতার মত, তবে একটু বেশী সরু এবং সবুজ। মোটের ওপর এ গাছ দেখতে খুব সুন্দর। এই গাছের ফল কালো আঙ্গুরের মত দেখায়। কিন্তু এতো অম্লস্বাদ বেশী, খেতেও অত সুস্বাদু নয়।

কারমেরিক (কামরাঙ্গা) এই ফলের পাঁচটি ধার। আকারে পিচের মত, লম্বায় চার পাঁচ আঙ্গুলের সমান। পাকলে এর রং পীত বর্ণের হয়। এই ফলের কোনও বীচি নাই। কাঁচা গাছ থেকে তুললে খেতে বেশ তেতো। কিন্তু ভাল ভাবে পাকলে এর বেশ মিষ্ট সুগন্ধি অম্ল স্বাদ।

কাটাইল (কাঁঠাল)—এই ফল দেখতে খারাপ, গন্ধও ভাল নয়। দেখায় যেন ভেড়ার ভরা পেটের মত। খেতে মিষ্টি, কিন্তু বিস্বাদ-জনক। এর ভেতরের বীচি হেজেল গাছের বাদামের মত। এই বীচির সাথে খেজুর বীচির সাদৃশ্য আছে, যদিও কাঁঠালের বীচি অনেকটা গোলাকার এবং খেজুরের বীচির মত শক্ত নয়। কাঁঠালের বীচিও লোকে খায়। কাঁঠালে খুব আঠা আছে। এই আঠার জন্য কাঁঠাল খাওয়ার আগে অনেকে মুখে (হাতেও) তেল মেখে নেয়। কাঁঠাল কেবল গাছের শাখা ও কাণ্ডতেই ফলে না, গাছের মূলের কাছেও ফলে। কাঁঠাল গাছ দেখলে মনে হবে যেন চারদিকে ভেড়ার পেট ঝুলছে।

বাখিল্—এই ফল আকারে আপেলের মত। খুব খারাপ গন্ধ না হলেও এ ফল রসহীন ও বিস্বাদ।

বইর—পারস্য দেশে এর নাম বুনার। এ ফল নানা রকমের হয়। আলুচের (কুল) চেয়ে এ ফল কিছু লম্বা। এ রকমের জাত আছে যা আকারে এবং দেখতেও হুসেনি আঙ্গুরের মত। কিন্তু এ জাতের ফল কদাচিৎ খেতে ভাল হয়। আমি মন্দানিয়ে এক রকম জাতের বইর দেখেছিলাম যা খেতে খুব ভাল। সেরি জগতের বৃষ ও মিথুন রাশির স্থিতি কালে এই গাছের পাতা ঝরে পড়ে। কর্কট ও সিংহ রাশির স্থিতি কালে অর্থাৎ বর্ষার ঋতুতে নতুন পাতা গজায়। তখন গাছ সজীব ও প্রাণবন্ত হয়। কুম্ভ ও মীন রাশির অবস্থান কালে এর ফল পাকে।

করেন্দা—আমাদের দেশের 'জিকে' গাছের মত এ গাছ ঝুপসি হয়। জিকে পাহাড়ি দেশে জন্মে, কিন্তু করেন্দা জন্মে সমতল ভূমিতে। এই ফলের গন্ধ 'মারমেনজানের' মত, কিন্তু তার চেয়ে বেশী মিষ্ট তবে রস কম।

পানিয়ালা—এই ফল কুলের চেয়ে বড় এবং লাল আপেলের মত দেখায়। খেতে অম্লস্বাদ কিন্তু সুস্বাদু। ডালিমের গাছের চেয়ে এ গাছ বড় হয়, এবং এর পাতা বাদাম গাছের পাতার মত, তবে কিছু ছোট।—

গুলের—গাছের গুড়িতে এই ফল ধরে। দেখতে ডুমুরের মত। ফল বিস্বাদ।

আমলে (আমলা)—এই ফলের পাঁচটা খাঁজ। না-ফোটা তুলোর গুটির মত এই ফল দেখতে। খেতে কটু। এই ফলের আচার তৈরী করলে খেতে মন্দ হয় না এবং উপকারিও বটে। গাছ দেখতে সুন্দর, পাতা ছোট ছোট।

চিরঞ্জি—এই গাছ পাহাড়ে জন্মে। ফলের শাঁস খুব সুস্বাদু। অনেকটা ওয়ালনাট ও বাদামের শাঁসের মত। পেস্তার চেয়েও এ ফল ছোট ও গোল। মিষ্টান্নে এর ব্যবহার আছে।

খেজুর—হিন্দুস্থানে এর বিশেষত্ব নাই। তবে এ ফল আমাদের দেশে নাই, এজন্য এর কথা লিখছি। নামখানাতে ও খেজুর গাছ দেখা যায়। খেজুর গাছের সমস্ত শাখা এক জায়গা থেকে বেরোয় অর্থাৎ গাছের মাথার দিক থেকে। শাখার দুই দিকেই ওপর থেকে নীচ পর্য্যন্ত পাতা গজায়। গাছের গুড়ি অমসৃণ, রং বিশ্রী। খেজুর ফল আঙ্গুর গুচ্ছের মত, কিন্তু আকারে অনেকটা বড়। এখানকার লোক বলে উদ্ভিদ জগতের মধ্যে এক খেজুর গাছেরই প্রাণী জগতের সঙ্গে দুই বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। একটা হচ্ছে কোনও প্রাণীর মাথা কেটে ফেললে যেমন সে মরে, তেমনি খেজুর গাছের মাথা কাটলেও এ গাছও বাঁচে না। আর একটা বিষয় হচ্ছে—যেমন কোনও পুরুষ সংসর্গ না হলে স্ত্রীলোকের সন্তান হয় না তেমনি যদি পুরুষ খেজুর গাছের ডাল এনে স্ত্রীখেজুর গাছের ওপর না নাড়া দেওয়া হয় অর্থাৎ এই ভাবে স্ত্রী-পুরুষের সংযোগ না হয় তাহলে গাছে ফল ধরেনা। এ কথা

কতদূর সত্য তা অবশ্য আমি বলতে পারবো না। খেজুর, গাছের মাথার দিকটাকে মুলা বলে। সেই জায়গা থেকেই শাখা ও পাতা বের হয়। যখন পাতা সমেত শাখা বাড়তে থাকে তখন পাতা ক্রমশঃ বেশী সবুজ হতে থাকে। এই খেজুরের মূল খেতে মিষ্টি। এর স্বাদের সঙ্গে অনেকটা আখরোটের স্বাদের সাদৃশ্য আছে। খেজুরের মাথার দিকে এখানকার লোকেরা একটা ক্ষতের সৃষ্টি করে', সেই ছিদ্রের মধ্যে খেজুরের পাতা এমন ভাবে ঢুকিয়ে দেয় যে ভেতর থেকে যে রস নির্গত হয় তার সবটাই এই পাতা দিয়ে চুঁইয়ে পড়ে। মাটির হাড়ি গাছের সঙ্গে বেঁধে তার মুখে ঐ পাতাটা পুরে দেয় যাতে সব রসটা ঐ পাত্রে জমা হতে পারে। এই রস টাটকা খেলে বেশ মিষ্টি লাগে। যদি তিন চার দিন পর খাওয়া যায় তাহলে এতে মদের মত নেশা হয়। একবার যখন আমি চম্বল নদীর তীরে বারি সহরে (ঢোলপুর রাজ্যের একটি সহর) পর্যবেক্ষণের জন্য গিয়েছিলাম সেই সময় আমাদের গমন পথে একটি উপত্যকায় এমন কতকগুলো লোক দেখতে পেয়েছিলাম যারা খেজুর গাছের রস দিয়ে মদ তৈরী করে। আমরা এই মদ অনেকটা পান করেছিলাম, কিন্তু আমাদের কারও কোনও রকম মাতলামির ভাব হয়নি। সম্ভবত খুব বেশী পরিমাণে না খেলে কিছুই হয়না—কারণ এর মাদক গুণ খুবই অল্প।

নারগিল (নারিকেল)—আরববাসীরা বলে, নারগিল আর হিন্দুস্থানীরা বিশ্রী উচ্চারণ করে বলে নাখির (হিন্দুস্থানে এর চলতি নাম নাড়িয়াল)। নারিকেলের খুলি দিয়ে কালো রংএর চামচে তৈরী হয়। 'ছিচক' নামে এক রকম বাদ্যযন্ত্রের (গিটার জাতীয়) খোল বড় নারিকেলের খুলি দিয়ে তৈরী হয়। নারিকেল গাছ অনেকটা খেজুর গাছের মত, কিন্তু এর পাতা খেজুর গাছের পাতার চেয়ে বড়। সংখ্যায় বেশী ও অনেক বেশী উজ্জ্বল রংয়ের। আখরোটের যেমন বাহিরের খোসা সবজে নারিকেলের ও তাই, তবে নারিকেলের ওপরের খোসা তন্তুময় পদার্থের। নারকেলের খোসা ছাড়িয়ে যে দড়ি তৈরী হয় তা দিয়ে জাহাজ অথবা নদীতে যে সব নৌকা চলে সেগুলো তীরে বাঁধার কাজ হয়। নারিকেলের দড়ি দিয়ে নৌকার পাটাতনের তক্তার জোড়ও বাঁধা হয়। ওপরের খোসা ছাড়িয়ে নিলে এর খুলির এক পাশে তিনটি ছিদ্রের মত দেখা যায় যা একটা ত্রিভুজের মত। দুইটি ছিদ্র শক্ত ভাবে বন্ধ, কিন্তু আর একটা বন্ধ থাকলেও নরম এবং একটু কষ্ট করে জোরে চাপ দিলে সেটা ফুটো হয়ে যায়। নারকেলের মধ্যে শাস হওয়ার আগে জলে পূর্ণ থাকে। সেই জলই ছেঁদার মুখ লাগিয়ে এখানকার লোকেরা পান করে। এ কথাও বলা যায় যে নারকেলের শাসই গলিত অবস্থায় জলের আকারে থাকে।

তাল—তাল গাছের শাখাও মাথার দিক থেকে বের হয়। খেজুর গাছে পাত্র বেঁধে যেমন রস আহরণ করা হয়, তাল গাছ থেকেও সেই একই ভাবে রস সংগ্রহ করে এখানকার লোকেরা পান করে। তালের রসকে এরা 'তাড়ী' বলে। খেজুরের রসের চেয়ে তালের রসের মাদকতা বেশী। তালের শাখার ওপরের দিকে এক কি দেড় গজের মধ্যে কোনও পাতা থাকে না। তারপর ত্রিশ চল্লিশটা পাতা এক সঙ্গে শাখার নীচ দিকে বের হয়, দেখতে ঠিক হাতের ছড়ানো আঙুল গুলোর মত। এই পাতা গজ খানেক লম্বা। হিন্দুস্থানীরা তাল পাতা কাগজের মত ব্যবহার করে। এই তাল পাতাতেই পুথি লেখে। এই দেশবাসীরা যখন কানে ধাতু নির্মিত মাকড়ি পরে না, তখন তারা দুই কানের বড় বড় ছিদ্রের মধ্যে তালপাতার তৈরী মাকড়ি গুজে রাখে। তাল পাতার তৈরী এই জাতীয় আভরণ বাজারে বিক্রয় হয়। তাল গাছের গুঁড়ি খেজুর গাছের গুঁড়ির চেয়ে দেখতে অনেক সুন্দর এবং মসৃণ।

নারাং [কমলা]—নারাং ছাড়াও অনেক জাতের কমলা এখানে দেখা যায়। নামখানাতে, বাজুর ও সাওয়াদেও ভাল কমলা পাওয়া যায় এবং প্রচুর ফলে। নামখানাতে কমলা আকারে ছোট কিন্তু খুব রসালো এবং তৃষ্ণা নিবারণের পক্ষে খুব উপাদেয়। এর গন্ধ মিষ্ট, স্পর্শে নরম এবং দেখতে সজীব। খোরাসানের কমলার সঙ্গে এ কমলার তুলনা হয় না। এর কমনীয়তা এমন যে নামখানা থেকে কাবুলে নিয়ে যেতে—যার দূরত্ব মাত্র পঞ্চাশ কি পঞ্চান্ন মাইল—রাস্তাতেই এই কমলা নষ্ট হয়ে যায়। আস্তারাবাদের কমলাও সমরকন্দে নিয়ে যাওয়া হয়। —যার দূরত্ব প্রায় এগারশ মাইল—কিন্তু তার খোসা পুরু এবং রস কম হওয়ায় মোটেই তেমন ক্ষতি হয় না। বাজুরের কমলার আকার লেবুর মত। এগুলো খুব রসালো, কিন্তু অন্য জায়গার কমলার চেয়ে অম্লস্বাদ বেশী। খাজা কালান আমাকে একবার বলেছিল যে বাজুরে এই জাতীয় কমলা লেবুর একটা গাছের ফল পাড়িয়ে গুণে দেখেছিল যে সেই গাছের ফলের সংখ্যাই সাত হাজার। আমার মনে হয় নারাং কথাটা আরবি নারাঙ্গ কলারই অপভ্রংশ। বাজুর ও সাওয়াদের অধিবাসীরা নারাঙ্গকে নারাং বলে।

লেবু (বিহি)—লেবু এদেশে প্রচুর ফলে। আকারে মুরগীর ডিমের মত। গঠনেও প্রায় ঐ রকম। কেউ বিষদুষ্ট হলে অর্থাৎ কারও দেহে বিষের ক্রিয়া প্রকাশ পেলে লেবু গরম জলে সিদ্ধ করে তার আস খেলে বিষের ক্রিয়া দূর হয়।

তুরাঙ—কমলার মতই আর এক রকমের লেবু—নাম তুরাঙ [কলম্বী লেবু)। বাজুর ও সাওয়াদের লোকেরা একে বলে বালেং। এই লেবুর খোসা দিয়ে মোরব্বা তৈরী করলে তাকে বলা হয়—বালেং মোরব্বা। কলম্বী লেবুকে হিন্দুস্থানীরা বলে—বাজুরি। এই লেবু দুই জাতের হয়। এক জাতের লেবু পানসে, অল্প মিষ্ট স্বাদ। খেতে মোটেই ভাল নয়, তবে এর খোসার মোরব্বা তৈরী হয়। নামখানাতের লেবু এই ধরণের। হিন্দুস্থান ও বাজুরের কলম্বী লেবু অম্লস্বাদের, কিন্তু এর সরবৎ হয় খুব সুস্বাদু ও আরামদায়ক। কলম্বী লেবু আকারে খরমুজের মত। এর ওপরের ছাল কর্কশ ও কোঁচকানো। এর প্রান্তভাগ সরু ও সূঁচালো। এই ফলের রং গাড় পীতবর্ণের। গাছের গুঁড়ি মোটা নয়। গাছ ছোট ছোট কিন্তু ঝাঁকড়া। কমলা লেবুর গাছের পাতার চেয়ে এর পাতা বড়।

সানতারা—এও এক রকমের কমলা লেবু। চেহারা ও বর্ণে কলমী-লেবুর মত, তবে এই ফলের ত্বক মসৃণ। মোটেই খসখসে নয়। ক্ষুদ্রাকারের কলমী লেবুর চেয়েও এগুলো ছোট। এর গাছ বেশ বড় হয়, প্রায় খুবানি গাছের মত। গাছের পাতা নারেঙের পাতার মত। এই লেবুর মিষ্ট-অম্ল স্বাদ। এর সরবৎ খেতে খুব ভাল এবং স্বাস্থ্যপ্রদ। লেবুর মতই এই ফল পাকস্থলীকে ঠাণ্ডা রাখে এবং কলমী লেবুর মত অম্লত্বেজক নয়।

কমলা জাতীয় আর এক ধরণের লেবু আছে যা দেখতে বড়। হিন্দুস্থানীরা একে বলে—কিল্ কিল্ লেবু। এর আকার হাঁসের ডিমের মত, কিন্তু দুই প্রান্ত ডিমের মত ছুচলো নয়। সান্তারার মতই এর ত্বক মসৃণ। এ লেবুতে রস খুব বেশী।

জামিরি (জম্বুরা, বাতাবি লেবু)—এর গঠন কমলার মত, কিন্তু রং গাঢ় পীতবর্ণ। এর গন্ধ কমলা লেবুর মত হলেও এ কমলালেবু নয়। এর স্বাদ—মিষ্ট-অম্ল।

সাদা ফল [মুসম্বি ?]—এও এক রকম কমলাজাতীয় ফল, আকারে ন্যাসপাতির মত, খেতে মিষ্ট, কিন্তু কলার মত গুকারজনক মিষ্ট নয়।

অম্রৎ ফল—এ ফলও কমলা জাতীয়। [তুর্কি ভাষায় লিখিত আত্মচরিতের কপিতে সম্রাট হুমায়ুনের নিম্নলিখিত মন্তব্য লেখা আছে যা পারস্য ভাষার কোনও অনুবাদে দেখা যায় নি। মন্তব্যটি এই—পরলোকগত বর্ত্তমানে স্বর্গবাসী মহান সম্রাট—খোদা তাঁর গৌরব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করুন। অম্রত ফল সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট রকম পর্য্যবেক্ষণ করেন নি। তিনি বলেছেন—এই ফল মিষ্ট হলেও স্বাদে পান্‌সে এবং এর সঙ্গে কমলা লেবুর তুলনা করেছেন ও এই ফল তাঁর ভাল লাগেনি বলেছেন। তিনি বরাবরই কমলা লেবু পছন্দ করতেন না। অম্রত ফলের মৃদু অম্ল-মিষ্ট স্বাদের জন্য এখানকার সকলেই এই ফলকে কমলালেবুর মত বলতো। এই সময়ে বিশেষ করে যখন তিনি প্রথমবার হিন্দুস্থানে আসেন, তখন তাঁর সুরাপান করার অভ্যাস ছিল। সেই জন্য তিনি কোনও মিষ্ট রসের জিনিষ পছন্দ করতেন না। অম্রত ফল সত্যই খেতে চমৎকার। এর রস উগ্র মিষ্ট না হলেও খেতে খুব ভাল। পরবর্ত্তীকালে আমরা এই ফলের প্রকৃতি ও উৎকর্ষ আবিষ্কার করতে পেরেছিলাম। অপক্ক অবস্থায় এই ফলের অম্লস্বাদ কমলা লেবুর মত। এই অম্লস্বাদ পাকস্থলী সহ্য করতে পারেনা। কিন্তু যখন ক্রমে ক্রমে এই ফল পাকে তখন খুব মিষ্টি হয়]।

বঙ্গদেশেও এই জাতীয় দুই রকম অম্লগন্ধী ফল আছে-আম্রত ফলের উৎকর্ষতার সঙ্গে যার তুলনা হতে পারে।—এর একটির নাম কাম্‌লা (কমলা)—যা আকারে নারাং এর সমান। অনেকে একে বড় লেবু বলে, কিন্তু লেবুর চেয়ে এ ফল অনেক ভাল। এই ফল দেখতে খুব জমকালো নয় এবং আকারেও বড় নয়। আরও এক জাতের ফল হচ্ছে সানতারা। এগুলোর আকার কিছু বড় কিন্তু অম্ল নয় এবং আম্রত ফলের ন্যায় বিস্বাদও নয়—তবে খুব মিষ্টও নয়। সত্যিই সান্তারার মত ভাল ফল দুর্লভ। এ ফলের আকার সুন্দর এবং খাদ্য হিসাবে স্বাস্থ্যপ্রদ। এই ফল পাওয়া গেলে লোকে এ ফল ছেড়ে অন্য ফলের কথা মনে করে না এবং খেতেও আকাঙ্খা করে না। এর খোসা হাত দিয়ে ছাড়ানো যায়। যত গুলিই তুমি খাওনা কেন তোমার তৃপ্তি মিটবে না। তোমার মন আরও চাইবে। এই ফলের রসে হাত ময়লা হয় না। ভেতরের কোমলাংশ থেকে সহজেই এর কোয়া ছাড়িয়ে নেওয়া যায়। আহারের পর এই ফল খাওয়া চলে। এই জাতের সান্তারা খুব কমই পাওয়া যায়। বঙ্গদেশের স্বর্ণগ্রাম নামে এক পল্লীতে এই ফল ফলে এবং স্বর্ণগ্রামেরও বিশেষ এক জায়গার মাটিতে এই বিশেষ গুণসম্পন্ন ফলের গাছ দেখা যায়। মোটের ওপর এই শ্রেণীর নানা ফলের মধ্যে বাংলার সান্তারার মত উপাদেয় আর কোনও ফল নাই—এমন কি অন্য কোনও ফলের সাথেও বাস্তবিক পক্ষে এর তুলনা হয় না।

কিরণে—এও কমলা জাতীয় ফল। আকারে কিলকিল লেবুর মত এবং অম্ল স্বাদবিশিষ্ট।

আমিলবিদ্—এ ফলও কমলা জাতীয়। আমি এই ফল প্রথম দেখি বর্ত্তমান বৎসরে—ভারতে আগমনের তিন বৎসর পর ১৫২৯ সালে—সম্ভবতঃ বাবর তাঁর আত্মকথার এই অধ্যায় এই বৎসর লেখেন। এখানকার লোকেরা বলে—যদি এই ফলের গায়ে সুচ বেঁধানো হয় তাহলে সমস্ত ফলটাই গলে যায়। এই ফলের অম্ল গুণ খুব বেশী অথবা অন্য কোনও বিশেষ গুণের অধিকার জানা সম্ভবতঃ এই রকম হয়ে থাকে। এর অম্লভাব অনেকটা কমলা এবং লেবুর মত।

হিন্দুস্থানের ফুল

হিন্দুস্থানে অনেক রকম ফুল আছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে—

জাগুন (জবা ?)—হিন্দুস্থানীদের অনেকে আবার এই ফুলকে বলে গুরহাল। যে গুল্মের ওপর এই ফুল হয় সেটা লম্বা। রক্ত গোলাপের ঝোপের চেয়ে এর ঝোপ বড় হয়। এই ফুলের রং ডালিমের রংয়ের চেয়েও গভীর লাল। আকারে এই ফুল প্রায় রক্ত গোলাপের সমান। রক্ত গোলাপের কুঁড়ি একবারেই ফুটে ওঠে, কিন্তু জাগুন ফুল ধীরে ধীরে পাঁপড়ি মেলে। প্রথমে কোরকের দিক একটু উন্মীলিত হয়ে মধ্যের হৃদপিণ্ড দৃষ্টি গোচর হয়, তারপর ক্রমশঃ গোটা ফুল হয়ে ফুটে ওঠে। যদিও এই ফুলের অন্তর ও বহিরভাগ একই ফুলের অংশ, তবুও দেখে মনে হয় যেন আলাদা। কারণ, এই ফুলের মধ্য দিয়ে একটা সরু শুঁড়ের মত বেরিয়ে আসে যা লম্বায় প্রায় এক বিঘতের মত এবং এই বৃন্ত ঘিরে পাঁপড়িগুলো ফুটতে থাকে যা অপূর্ব্ব দেখায়। প্রস্ফুটিত ফুলের বর্ণ উজ্জ্বল। তবে এ ঔজ্জ্বল্য বেশী সময় থাকেনা, এক দিনেই মলিন হয়ে যায়। বর্ষাকালের চার মাস এই ফুল গাছ আলো করে থাকে। অবশ্য বার মাসই এই ফুল ফোটে, তবে বর্ষাকালের মত অজস্র নয়।

কানির (করবি ?)—এই ফুল সাদা ও লাল দুই রংয়েরই হয়। পীচের ফুলের মত এই ফুলের পাঁচটি পাঁপড়ি। লাল রংয়ের কানির দেখতে ঠিক পীচ ফুলের মত, তবে চোদ্দ পনরোটা কানির ফুল এক জায়গাতেই ফোটে তাই দূর থেকে মনে হয় যেন একটা বড় ফুল। এই ফুল গাছের ঝোপ জাম্বুন গাছের ঝোপের চেয়ে বড়। লাল কানিরের গন্ধ মৃদু হলেও ভাল। এই ফুলও বর্ষাকালে তিন চার মাস অজস্র ফোটে। অবশ্য বছরের অধিকাংশ সময়ই এই ফুল দেখা যায়।

কেওরা—এই ফুলের গন্ধ খুব মিষ্টি। আরববাসীরা এই ফুলকে বলে—'কাবি'। কস্তুরি ফুলের দোষ এই যে তা তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। কিন্তু এই ফুল অনেকদিন টাটকা থাকে—সেইজন্য একে ভিজে কস্তুরি ফুলও বলা যায়। এই ফুলের আকৃতি এক বিশেষ ধরণের। কস্তুরি ফুল আকারে এক দেড় বিঘত, কখনও কখনও দুই বিঘত ও দেখা যায়। এই ফুলের পাঁপড়ি সেরু (এক জাতীয় গোলাপ) ফুলের মত লম্বা। গোলাপ কুঁড়ির মত এই ফুলেও কাঁটা আছে। এই ফুল ফুটতে যখন দেরী থাকে তখন এর কুঁড়ির বাইরের পাঁপড়ি থাকে সবুজ, আর ভেতরের পাঁপড়ি সাদা ও নরম। পাঁপড়িগুলির মধ্যে একটি স্তবক মনে হয় যেন ফুলের হৃদপিণ্ড। এর গন্ধ সত্যিই খুব মধুর। এই ফুল দেখতে মনে হয় যেন একটা ছোটখাট ফুটন্ত ঝোপ, যার গুড়ি যেন এখনও বড় হয়নি। ফুলের পাতা বেশ চওড়া এবং কণ্টকময়। গাছের গুঁড়ি দেখতে সামঞ্জস্যহীন। গুঁড়ি থেকে একটা ডাটা ওঠে সেই ডাঁটায় ফুল ফোটে।

চামেলি—এ ফুল আমাদের দেশের জুঁই ফুলের চেয়ে বড়, গন্ধও তীব্রতর।

হিন্দুস্থানের ঋতু

অন্য দেশে চারটি ঋতু—কিন্তু হিন্দুস্থানে তিনটি। বছরের চারমাস গ্রীষ্ম, চারমাস বর্ষা ও চারমাস শীত। নয়া চাঁদ থেকে এর মাস সুরু হয়। প্রতি তিন বছর অন্তর এরা বর্ষা ঋতুর সঙ্গে এক মাস যোগ করে, আবার তার তিন বছর অন্তর একমাস যোগ করে শীত ঋতুর সঙ্গে এবং তার তিন বছর পর একমাস যোগ করে গ্রীষ্ম ঋতুর সঙ্গে। এদের ঋতু গণনার পদ্ধতি এই। চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় হচ্ছে গ্রীষ্ম ঋতুর মাস অর্থাৎ মীন, মেষ, বৃষ ও মিথুন রাশির মাস। শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক হচ্ছে বর্ষা ঋতুর মাস অর্থাৎ কর্কট, সিংহ, কন্যা ও তুলা রাশির মাস। অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন হচ্ছে শীত ঋতুর মাস অর্থাৎ বৃশ্চিক, ধনু, মকর ও কুম্ভ রাশির মাস। হিন্দুস্থানের অধিবাসীরা যদিও এক একটা ঋতু চারমাস করে ধরে, কিন্তু যে দুই মাসে সেই ঋতুর প্রাবল্য বেশী সেই মাস দুটিকেই সেই ঋতুর মাস অর্থাৎ গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীতের মাস বলে থাকে। গ্রীষ্ম ঋতুর শেষ দুই মাস—জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়কে অন্য দুইমাস থেকে পৃথক করে নিয়ে বলে গ্রীষ্মকাল, বর্ষা ঋতুর প্রথম দুই মাস অর্থাৎ শ্রাবণ ও ভাদ্রকে বলে বর্ষাকাল। শীত ঋতুর মাঝের দুই মাস অর্থাৎ পৌষ ও মাঘ মাসকে বলে শীতকাল। এই নিয়মে এখানকার ঋতু প্রকৃতপক্ষে ছয়টি।

হিন্দুস্থানের সপ্তাহ

হিন্দুস্থানীরা সপ্তাহের সাতটি দিনের নামকরণ করেছে—শনিচর (শনিবার), এতোয়ার (রবিবার), সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার।

সময়-বিভাগ

আমাদের দেশের 'কিচা গুন্দুজ' (তুকি) কথার মত এখানেও 'দিন-রাত' এই কথা চলতি। আমাদের দেশের মত এখানকার দিনরাতও চব্বিশ ভাগে বিভক্ত—এক একভাগ এক এক ঘণ্টা আবার ৬০ ভাগে বিভক্ত—প্রত্যেক ভাগ এক মিনিট অর্থাৎ গোটা দিনরাত ১৪৪০ মিনিটের সমষ্টি। হিন্দুস্থানীরা দিনরাতকে ৬০ ভাগেও ভাগ করে থাকে—এক এক ভাগ হচ্ছে এক এক ঘড়ি। তারা আবার রাতকে চার ভাগে এবং দিনকে চারভাগে ভাগ করে—এক এক প্রহর, ফারসিতে থাকে বলে 'পাস্'। আমাদের দেশেও প্রহর ও প্রহরী (পাস্-উ-পাস্বান) আছে কিন্তু তাদের বিবরণ আলাদা। হিন্দুস্থানের অনেক সহরে প্রহর ঘোষণার জন্য 'ঘড়িয়ালি' (ঘড়ি পেটানোর লোক) নিযুক্ত করা হয়। দুই ইঞ্চি পুরু একখানা বড় পিতলের থালার মত পাত্র যাকে বলা হয় 'ঘড়িয়াল'—সেটাকে উচুতে ঝুলিয়ে রাখা হয়। সময় ঠিক করার জন্য এদের আর একটা পাত্র থাকে যার তলায় ফুটো। সেই পাত্রটি জলে বসিয়ে রাখলে এক ঘড়িতে অর্থাৎ ২৪ মিনিটে পূর্ণ হয়ে যায়। 'ঘড়িয়া-লিরা' এই পাত্র জলে বসিয়ে রাখে এবং যতক্ষণ না এ পাত্র পূর্ণ হয় ততক্ষণ অপেক্ষা করতে থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা এক ফুটো পাত্র জলে রাখে। যখন এই পাত্র প্রথম পূর্ণ হয় তখন ছোট একটা কাঠের মুগুর দিয়ে ঝুলানো ঘড়িতে একবার আঘাত করে। দ্বিতীয়বার যখন এই পাত্র পূর্ণ হয়—তখন ঘড়িতে আঘাত করে দুইবার, এই ভাবে যতক্ষণ না সেই প্রহর শেষ হয় ততক্ষণ চলতে থাকে। এক প্রহর শেষ হওয়ার পর তারা খুব দ্রুত কয়েকটি ঘা মারে ঘড়িতে—তারপর একটু থেমে যদি প্রথম প্রহর শেষ হয় তাহলে একটা, দ্বিতীয় প্রহর হলে দুইটা, তিন প্রহর অতীত হলে তিনটা এবং চতুর্থ প্রহর অতিবাহিত হলে চারটি ঘা মারে। দিনের চার প্রহর শেষ হয়ে রাতের প্রহর আরম্ভ হলেও এ একই ভাবে সময় নির্দেশ করা হয়। এখানকার নিয়ম ছিল এই যে প্রহর শেষ হলে তবেই সেই প্রহরের সঙ্কেত জানানো হতো। কিন্তু তাতে অসুবিধা ছিল এই যে রাতে যে সব লোক ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে উঠে ঘড়ি পেটার শব্দ শুনতো এবং ঘড়িতে তিন বা চারবার আঘাতের শব্দ শুনলে তাদের বোঝবার পক্ষে অসুবিধে হতো—যে এটা রাতের কোন প্রহরের ঘণ্টা দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রহরের। আমি সেইজন্য নির্দেশ দিই যে রাত্রে কিংবা মেঘলা দিনে ঘড়ির সঙ্কেত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রহরের সঙ্কেতও জানাতে হবে—যেমন প্রথম নৈশ প্রহরের তিন ঘড়ি বাজানোর পর ঘড়িয়ালিদের

একটু থেমে সেই প্রহরের সঙ্কেত বাজাতে হবে যাতে লোকে বুঝতে পারে যে এই তিনঘড়ি হচ্ছে প্রথম নৈশ প্রহরের। অনুরূপভাবে তৃতীয় নৈশ প্রহরের চার ঘড়ি বাজানোর পর একটু থেমে তৃতীয় প্রহরের সঙ্কেত ধ্বনি করতে হবে যাতে লোকে বুঝতে পারে যে তৃতীয় নৈশ প্রহরের চার ঘড়ি বাজলো। এই নিয়মের ফল খুব ভাল হয়। কেউ রাতে জেগে উঠে ঘড়ি পেটা শুনলে বুঝতে পারে কোন প্রহরের কত ঘড়ি বাজছে।

আবার, এখানকার লোকেরা এক ঘড়িকে ৬০ ভাগে ভাগ করে। এক এক ভাগকে বলে পল। (তালিকা এইরূপ—৬০ বিপল=১ পল, ৬০ পল=১ ঘড়ি (২৪ মিনিট), ৬০ ঘড়ি বা আট প্রহর=এক দিন রাত)। এই নিয়মে দিন ও রাত ৩৬০০ পলের সমষ্টি। (পল সম্বন্ধে গ্রন্থকারের মন্তব্য—এখানকার লোকে বলে—চোখের পাতা ৬০ বার বন্ধ করতে ও খুলতে যেটুকু সময় লাগে সেই সময়টুকু হবে পল অর্থাৎ এইভাবে ২,১৬,০০০ বার চোখের পাতা বন্ধ করলে ও খুললে হয় এক দিনরাত। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এক পল সময়ে আট-বার 'কুল হো আল্লা' ও 'বিসমিল্লা' অর্থাৎ দিনরাতে এইভাবে ২৮,০০০ আবৃত্তি করা যায়।

পরিমাপ পদ্ধতি

হিন্দুস্থানে সুশৃঙ্খল পরিমাপের নিয়ম আছে। যথা—৮ রতি=এক মাসা, ৪মাসা=১ টাক=৩২ রতি, ৫ মাসা=১ মিশকাল=৪০ রতি, ১২ মাসা=১ তোলা=৯৬ রতি, ১৪ তোলা=১ সের।

সর্ব্বত্রই এই মাপ চলতি—৪০ সের=১ মন্‌ন্, ১২ মন্‌ন্=১ মানি। ১০০ মানির ওজনকে এরা বলে মিনাসা।

মুক্তা ও জহরতের মাপ হয় টাক দিয়ে।

গণন পদ্ধতি

হিন্দুস্থানের গণনার পদ্ধতিও খুব ভাল। এরা ১০০০০০ কে বলে এক লাখ। ১০০ লাখকে এক কোটি একশ কোটিকে এক অর্ব্বুদ। একশ অর্ব্বুদকে এক কুর্ব। ১০০ কুর্বকে ১ নীল, ১০০ নীলকে এক পদম্ (পদ্ম), ১০০ পদমকে এক সাং [শঙ্খ ?]। এই রকম উচ্চ গণনা সংখ্যাতেই প্রমাণিত হয় যে হিন্দুস্থানে কিরূপ ঐশ্বর্যশালী।

হিন্দুস্থানের অধিবাসী

এখানকার অধিকাংশ অধিবাসীই বিধর্ম্মী। এই বিধর্ম্মীদের হিন্দু বলা হয়। অধিকাংশ হিন্দুই মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম বিশ্বাস করে। এখানকার সমস্ত কারুশিল্পী, মজুর ও কর্ম্মচারী হিন্দু। আমাদের দেশের যারা অরণ্যে বাস করে অথবা যাযাবর, তাদেরই উপজাতীয় নাম আছে। কিন্তু এখানে যাদের কৃষিজমি আছে এবং পল্লীতে স্থায়ী বাস তাদেরও জাতের নাম আছে (সম্ভবতঃ হিন্দু বর্ণাশ্রম সমাজের জাতের নাম]। আবার এখানকার প্রত্যেক কারিগর তাদের পূর্ব্ব পুরুষের বৃত্তি অবলম্বন করে সংসার চালায়।

হিন্দুস্থানের ত্রুটী

হিন্দুস্থানে এমন কোনও আনন্দ দায়ক ব্যাপার নাই যার প্রশংসা করা যেতে পারে। এখানকার অধিবাসীরা মোটেই সুশ্রী নয়। তাদের আকর্ষণীয় কোনও সামাজিক সখ্য নাই, পরস্পর বন্ধুর মত মেলা মেশার অভ্যাস নাই, অথবা একতা বদ্ধ হয়ে আনন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করার রীতি নাই। তাদের না আছে কোনও বিষয়ে প্রতিভা, না আছে মনের স্থৈর্য্য, না আছে ব্যবহারে শিষ্টতা, না আছে দয়া অথবা বন্ধুপ্রীতি। তাদের না আছে নব নব যান্ত্রিক উদ্ভাবনের ক্ষমতা, না আছে হস্ত-শিল্পের সাধনা এবং কাজে তার প্রতিফলন, না আছে স্থাপত্য শিল্পের জ্ঞান ও নৈপুণ্য। তাদের ভাল ঘোড়া নাই, খাওয়ার ভাল মাংস নাই। আঙ্গুর কিংবা খরমুজ নাই, কোনও ভাল ফল নাই। বরফ নাই, শীতল জল নাই, তাদের বাজারে ভাল খাদ্য ও রুটি নাই। কোনও স্নান লীলা অথবা উচ্চ শিক্ষায়তন নাই, আলোর জন্য মোমবাতি নাই।

মোমবাতি অথবা মশালের স্থান অধিকার করে আছে একদল নোংরা লোক—যাদের বাঁ হাতে ধরা থাকে একটা ছোট তেপায়া কাঠের পাত্র, তার এক কোণায় মোমবাতির মাথার দিকের মত একটা জিনিষ বসানো—তাতে বুড়ো আঙ্গুলের মত মোটা একটা পাথরে। তাদের ডান হাতে থাকে একটা লাউয়ের খোল তার নীচে একটা ছোট ছ্যাদা' সেই ছ্যাদার ভিতর একটা সরু সুতো। সেই সুতোর মধ্য দিয়ে টপ টপ করে তেল ঝরে পড়ে বাঁ হাতে ধরা পাত্রের পলতের ওপর, যখনই সেই পলতেয় তেলের দরকার হয়—এখানকার ধনী লোক এই রকম একশ, দুশ বাতিওয়ালা রাখে। প্রদীপ আর মোমবাতির পরিবর্ত্তে ব্যবস্থা হিন্দুস্থানে এই প্রকার। এখানকার শাসক ও আমিরদের যদি রাতে কাজ থাকে এবং আলোর দরকার হয়—তা হলে এই সব নোংরা বাতিওয়ালা এই ধরণের বাতি নিয়ে তাদের গা ঘেসে দাঁড়ায়।

এখানে নদী এবং হ্রদ ছাড়াও কতকগুলো খাদ ও গর্ত্ত আছে, যাতে জল পাওয়া যায়। এদের উদ্যানে এবং প্রাসাদে জল নিয়ে আসার জন্য কোনও নলোর ব্যবস্থা নাই।—এদের বসত বাড়ী শ্রীহীন, তাতে হাওয়া খেলেনা এবং কোনও রকম শৃঙ্খলা বা সামঞ্জস্য নাই।

এখানকার কৃষক এবং দরিদ্র লোকেরা প্রায় নগ্ন অবস্থায় থাকে। ল্যাঙট নামে একটা জিনিষ যা দিয়ে তারা লজ্জা নিবারণ করে সেটা দুই বিঘত পরিমাণ একটা ন্যাকড়া যা নাভির নীচ দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে দেয়। আর একটা ন্যাকড়ার ফালি তার সঙ্গে জুড়ে দুই উরুর মাঝ দিয়ে পেছনের দিকে টেনে তুলে কোমরের বাঁধনের সঙ্গে আটকে রাখে। স্ত্রীলোকেরা ও একটা কাপড় কোমরে বাঁধে, যার অর্দ্ধেকটা থাকে কোমরে ঘের দেওয়া—আর অর্দ্ধেকটা মাথার ওপর ফেলা। (ক্রমশঃ)

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

(পূর্বানুবৃত্তি)

বস্তীর ঘরে ঘরে এবার কিছু কিছু হৈচৈ হাঁক-ডাক শোনা যেতে লাগল। বেশ বোঝা যায়, আফিস থেকে কারখানা থেকে, পুরুষরা সব ফিরে এসেছে। নিশিকান্ত বোধ হয় ওসব কাজের ধার ধারে না। জীবিকার জন্য সে কোন সুড়ঙ্গ পথ বেছে নিয়েছে কে জানে। সোজা পথ ফেলে বাঁকা পথে সতীশঙ্করই ওকে হয়তো টেনে নিয়েছিলেন, বা সেই পথে লেগে থাকতে প্রশ্রয় আর পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি নিজে ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছেন, কি বাধ্য হয়ে তাঁকে সরে যেতে হয়েছে, নিশিকান্ত আর সরতে পারছে না। তার আর পথ বদলাবার জো নেই। কিন্তু ওদের মত লোকের তো এই সংসারে অনাথ হবার কথা নয়। বারবধূর যেমন বরের অভাব হয় না, নিশিকান্তদেরও তেমনি কান্তের অভাব হয় না। উৎপল মনে মনে হাসল। চা শেষ করে একদিকে কাপটিকে সরিয়ে রেখে উৎপল বলল, 'সতীশঙ্করবাবু আপনাকে অমন একটা বাড়ি-টাড়ি ঠিক করে দিয়ে যেতে পারলেন না?'

তার কথার মধ্যে একটু হয়তো শ্লেষের খোঁচা ছিল। নিশিকান্তের তা ভালো লাগল না। একটু গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমরা কি আর ওই সব বাড়িতে থাকবার যুগ্যি উৎপলবাবু? তবে যদি বেঁচে থাকতেন একটা গতি নিশ্চয়ই করে দিতেন। বাড়ি-ঘরতো আমাদের কিছু দরকার ছিল না; যতদিন তিনি ছিলেন আমরা একটা বটগাছের তলায় ছিলাম উৎপলবাবু। আমাদের কোন কিছু চিন্তা ভাবনা ছিল না। যখন যা দরকার চাইলেই পেতাম। বকতেন, ধমকাতেন, গাল-মন্দ করতেন—আবার সংসারের জন্যে যা দরকার তাও দিতেন। অমন মানুষ আর হয় না।'

নিশিকান্ত থামল। উৎপলও চুপ করে রইল। সতীশঙ্করের মত মানুষ নিজের কাজ-কর্ম চালাবার জন্যে একদল লোককে টাকা পয়সা দিয়ে অনুগ্রহ দেখিয়ে বাধ্য করে রাখবেন তার আর বিচিত্র কি। কিন্তু তিনি মারা যাবার পরে ও যে নিশিকান্ত তাঁকে মনে করে রেখেছে, কৃতজ্ঞ ভাবে তাঁর নাম উচ্চারণ করছে এইটাই আশ্চর্য। অথচ হয়তো তাঁর অনেক দোষের অনেক অপকর্মেরই সাক্ষী নিশিকান্ত। সে সব কথা নিশ্চয়ই সে অস্বীকার করেনা। কিন্তু তা সত্বেও সতীশঙ্করের কাছ থেকে এমন কিছু এই নিশিকান্ত পেয়েছে, যার উষ্ণতা সে কোন দিন ভুলতে পারেনা। স্ত্রী হিসাবে যেমন পেয়েছেন মিসেস রায়। সতীশঙ্কর নিশ্চয়ই দাম্পত্য রীতিনীতি অক্ষরে অক্ষরে মানেননি, নিয়মকানুনের শিকল কখনো ছিঁড়েছেন কখনো ভেঙেছেন, তবু এমন একটি আসক্তির বন্ধনে স্ত্রীকে বেঁধে রেখেছিলেন যার জন্যে মিসেস রায় বিচ্ছিন্ন হতে পারেননি, হয়তো বিচ্ছিন্ন হতে চাননি। আচ্ছা সত্যিই কি তিনি তাঁর স্বামীকে ভালোবাসতেন! স্বামী যদি চোর হয়, ডাকাত দুর্বৃত্ত হয় কোন সাধ্বী স্ত্রী কি তাঁকে ভালোবাসেন? হয়তো বাসেননা। বাধ্য হয়ে তাঁর সঙ্গে বাস করেন তাঁর সন্তানের মাও হন, কিন্তু স্বামীকে নিশ্চয়ই শ্রদ্ধার আসনে বসাতে পারেন না। আর শ্রদ্ধা ছাড়া কি ভালোবাসার অস্তিত্ব সম্ভব? স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরকে শ্রদ্ধা না করে, পরস্পরের গুণকে স্বীকার না করে শুধু জৈব আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তির জন্য সাময়িক ভাবে আকৃষ্ট হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু সেই আকর্ষণ কিছুতেই স্থায়ী হতে পারে না। মিসেস রায় আর সতীশঙ্করের মধ্যে কী ধরণের সম্পর্ক ছিল? শ্রদ্ধা প্রীতি প্রেমের? না কি অশ্রদ্ধা ঘৃণা বিদ্বেষের? ওঁদের অদ্ভুত দাম্পত্যজীবন নিয়ে উৎপল একখানা উপন্যাস লিখতে পারে। উপন্যাসের থীম হিসাবে বিষয়টি মন্দ নয়। যে স্ত্রী স্বামীর জীবিত অবস্থায় তাঁকে ভালোবাসতে

পারেননি, স্বামী মারা যাবার পর তিনি তাঁর স্বামীর পবিত্র স্মৃতি রক্ষায় উদ্যোগী হয়ে উঠেছেন। সব রকম মালিন্য কলঙ্ক মুছে ফেলে তাঁকে আদর্শ পুরুষ হিসাবে ধরে রাখতে চাইছেন। মন্দ না—বিষয় হিসাবে। কিন্তু মিসেস রায় যেমন তাঁর স্বামীকে জানেন এই নিশিকান্তও তেমনি তাদের নেতা সতীশঙ্করকে জানে। মিসেস রায় তাঁর স্বামীকে কতখানি শ্রদ্ধা করতেন, ভালোবাসতেন তা স্পষ্ট নয়, কিন্তু এই নিশিকান্ত যে তাদের ওস্তাদকে ভয় করত শ্রদ্ধা করত—আবার এক ধরণের ভালোওবাসত। উৎপলের মনে হল তা বুঝতে দেরি হয় না। অথচ সতীশঙ্করের দোষ ত্রুটি যা আছে তা গোপন না করেও নিশিকান্ত তাঁকে ভালোবাসতে পারে। কিন্তু মিসেস রায় তা পারেন না। এইখানেই দুজনের মধ্যে পার্থক্য। ন্যায় অন্যায় বোধটা কম বলেই নিশিকান্ত তার পুরোন মনিবকে ভক্তিও করতে পারে, আবার তাঁর দোষের কথা অসঙ্কোচে বলতেও পারে। সতীশঙ্করের সঙ্গে নিশিকান্তের সম্পর্ক অনেক সরল ছিল নিশ্চয়ই। স্বামীর সঙ্গে মিসেস রায়ের সম্পর্কের মধ্যে এই সারল্য আশা করা যায় না। একটি সাধ্বী স্ত্রীর যদি অসৎ স্বামী থাকে, তাদের সম্পর্ক কী রকম হয়? উৎপলের মনে হল উপন্যাসের একটা থীম বটে। স্বামীর ব্যক্তিত্ব যদি প্রবল হয় স্ত্রীকে সহজেই বদলে নেয় নিজের ধর্মে—মানে—অধর্মে দীক্ষিত করে, অন্তত সহনশীল করে তোলে। সংসারে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তাই দেখা যায়। স্ত্রীর বিবেকবুদ্ধি বিশ্বাস আদর্শ সব সেই দেবতার পায়ে সমর্পণ করে। কিন্তু তা যদি না হয়, স্ত্রীও যদি ব্যক্তিত্বময়ী হয়, কিছুতেই সহ্য না করে আপোষ না করে—তাহলে সংঘাত অনিবার্য। মিসেস রায় কী ধরণের মহিলা? দেখে তো মনে হয় ব্যক্তিত্ব আছে, দৃঢ়তা আছে। সহজে নুয়ে পড়বার মত মেয়ে তিনি নন। উৎপলের জানতে ইচ্ছা করে স্বামীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কেমন ছিল। স্বামীর ভালোবাসা পাওয়ার জন্যে তিনি কি নিজের নীতিবোধকে নামিয়ে এনেছিলেন? না কি নিজের উচ্চ আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখতে, স্বামীর ঘর করলেও আজীবন সংগ্রাম করেছেন, অশান্তি দিয়েছেন—অশান্তি পেয়েছেন। দ্বিতীয় বিকল্পই উৎপলের মনঃপূত। সে তার নায়িকাকে আদর্শবাদিনী, তেজস্বিনী করেই আঁকতে চায়। কিন্তু মিসেস রায়ের ব্যবহারের সঙ্গে সেই যে সত্যবাদিনী ব্রতচারিণীর পুরোপুরি মিল হয় না। মিসেস রায় স্বামীর দোষত্রুটি কলঙ্ক, কেলেঙ্কারী ঢাকবার জন্যে উৎসুক—বরং উৎপলের সত্যানুসন্ধিৎসায় তিনি বিরক্ত। এতো ঠিক আদর্শবাদের লক্ষণ নয়। মানুষকে বুঝতে পারা বড় কঠিন। মেয়েই হোক, পুরুষই হোক, কয়েকটি সরল রেখায় তার আকৃতি আঁকা গেলেও প্রকৃতি আঁকা যায় না। তবু এরই ভিতর থেকে কাজ চালাবার মত একটা ব্যবস্থা মানুষ করে নেয়। কাউকে ভালো বলে চিনে রাখে, কাউকে মন্দ বলে জানে। কিন্তু সামান্য চেনা জানা নিয়ে তাকে মাঝে মাঝে বড়ই অসুবিধেয় পড়তে হয়। তার হাতে যে কয়েকটি মাপ-কাঠি আছে তাতে সবাইকে সব সময় মাপা যায় না, যে মাপার চলতি বাটখারা আছে তাতে মানুষের দোষগুণের ওজন চলে না।

নিশিকান্ত বলল, 'কী হল উৎপলবাবু? অমন চুপ করে রইলেন যে? রাগ-টাগ করে বসলেন নাকি? মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ কথা বলতে পারিনে। যদি বেফাঁস কিছু বলে ফেলি দোষ ধরবেন না।'

উৎপল হেসে বলল, 'আরে না না। আপনি বেফাঁস বলবার মানুষই নন মোটে। আমি আপনাদের সতীশঙ্কর-বাবুর কথাই ভাবছিলাম। তাঁর কথা কিছু শুনব বলেই তো আপনার এখানে এলাম, আপনিও ডেকে নিয়ে এলেন।'

নিশিকান্ত বলল, 'এনেছিই তো ডেকে। ভাববেন না বাজে একটা ধাপ্পা দিয়ে এনেছি। আপনি বই লিখছেন। একখানা কেন পাঁচখানা বইয়ের মাল-মশলা আমি আপনাকে দিতে পারি। কাণ্ডকারখানা কি কিছু কম দেখেছি, না কম করেছি? গুছিয়ে লিখলে সে এক মহাভারত।'

উৎপল হেসে বলল, 'তা তো বটেই। আপনাদের অভিজ্ঞতার দাম অনেক। আমি আস্তে আস্তে সব শুনব।'

নিশিকান্ত বলল, 'এই একটা কথার মত কথা বললেন! আস্তে আস্তে। রয়ে-সয়ে। এক সঙ্গে সব মনেই বা পড়বে কেন মশাই। আমি তো আর মুখস্ত করে রাখিনি।

বরং তেমন তেমন ব্যাপার একেবারে ধুয়ে মুছে ফেলেছি। নিজের বিশ্বাসী বন্ধুকে বলিনি, পরিবারকে পর্য্যন্ত বলিনি। সতীশঙ্করদারও ঠিক এই রকম স্বভাব ছিল। সব কথা বউদিকে বলতেন না। বললেই অশান্তি। আর ভয়ও আছে। তাঁরা কেঁদে-কেটে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে অস্থির করে তোলেন। তা ছাড়া তাদের পেটে কথা থাকে না। তাদের কাছে যদি কোন গোপন কথা বলেন সঙ্গে সঙ্গে জেনে রাখবেন—আপনার কথা পরদিনই হাটে-বাজারে ছড়িয়ে পড়েছে। মেয়েদের স্বভাবই এই। পেটে কথা রাখতে পারে না। বড়লোকের ঘরের বউই হোক, আর আমাদের মত কুঁড়ে ঘরের গরীব মানুষের বউই হোক—জাতের যা স্বভাব তা যাবে কোথায়। সতীশঙ্করদাও জানতেন মেয়েদের কী স্বভাব। কোনটা তারা পারে না। সতী-শঙ্করদাও মেয়েদের হাড়ে হাড়ে চিনতেন। চিনবেন না? ওসব নিয়ে কি কম ঘাটাঘাটি করেছেন? বলতে গেলে বোকা ছিলেন।—বলেই নিশিকান্ত জিভ কাটল। তার-পর একটু লজ্জিত হয়ে হেসে বলল—'বলতে নেই। মরে স্বর্গে গেছেন। মরা মানুষের নামে—তবে মিথ্যে তো কিছু বলছিনে। যার যা স্বভাব তা যাবে কোথায়। একেক জন মানুষের একেক রকম দোষ থাকে উৎপলবাবু। আর সেই দোষেই সে নাশ হয়ে যায়। যত বড় বড় মানুষ, তাদের তত বড় বড় গর্ত। কোন এক মোল্লা নাকি নিজের কবর নিজে খুঁড়ে রেখেছিলেন। মানুষও তাই করে। জ্ঞানে অজ্ঞানে নিজের কবর নিজেই কেটে রাখে। শুধু বাইরে থেকে কারো একজনের ধাক্কা দিয়ে ফেল দেওয়ার অপেক্ষা। সতীশঙ্করদাও তো জ্ঞানী কম ছিলেন না, বুদ্ধিমান কম ছিলেন না। কুস্তিগীর পালোয়ানের মত যেমন ছিল গায়ের জোর, তেমনি ছিল মনের জোর। সেই মানুষের যখন বদ-খেয়াল জাগত, তখন যেন আর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকত না। আমরা ছিলাম পায়ের কাদা। আমাদের তো মুখ ফুটে কিছু বলা সাজে না। আমাদের কথা উনি শুনবেনই বা কেন। কিন্তু বউদি বলতেন, কোন কোন বন্ধুও সাবধান করে দিতেন। কিন্তু সতীশঙ্করদা গ্রাহ্য করতেন না। হেসে বলতেন, সাপ নিয়ে যারা খেলে তারা সাপের মন্তর জানে। বিষদাঁত ভেঙে নেয়। ধুলো-পড়া, গাছ-গাছড়া সব জেনে তারা সাপুড়ে হয়। বলতেন সতীশঙ্করদা। তিনি নিজেও জানতেন ওস্তাদ সাপুড়েরাই সাপের হাতে মরে, ওস্তাদ শিকারীদেরই বাঘে খায়। সতীশঙ্কর অনেক বউ-ঝিকে অসতী করেছেন, কি অনেক অসতীদের নিয়ে কাটিয়েছেন এসব কথা উৎপল কম শোনে নি। কিন্তু ইঙ্গিত আভাস, আর ভালভাসা সব অভিযোগ শুনে কী হবে; উৎপল চায় খাঁটি প্রামাণ্য তথ্য। ঘটনার পর ঘটনার বিবরণ। তার সামনে স্তূপীকৃত হোক ঘটনার রাশ। উৎপল ইচ্ছামত তার কোনটিকে নেবে, কোনটিকে বাদ দেবে। নিজের পছন্দ মত সাজাবে, গুছাবে, কাটবে, ছাঁটবে, তার নিজের সুবিধা মত কখনো বাড়াবে, ছড়াবে, কখনো বা শীতার্ত শিশুর মত সংকুচিত হয়ে থাকবে।

কিন্তু ইচ্ছা করেই হোক আর অনিচ্ছাতেই হোক, নিশিকান্ত কোন ঘটনা কি নামধামের ধার ঘেঁষেও যাচ্ছে না। শুধু আড়ালে থেকে শব্দভেদী বান ছাড়ছে। উৎপলের ইচ্ছা হ'ল তাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করে। স্পষ্ট করে বলে, 'অমন ইসারা ইঙ্গিতে চলবে না। আমি সত্য ঘটনার যা শুনলে আমার বিশ্বাস হবে, কি বা আমি বিশ্বাস্য করে তুলতে পারব। আর যদি ইতিহাস লিখি, তার প্রমাণপঞ্জীও আমাকে হাতে রাখতে হবে। আমাকে শুধু কিংবদন্তীর ওপর নির্ভর করলে চলবে না।'

কিন্তু কারো একজনের গোপন জীবন রহস্যের কথা অমন সরাসরিভাবে জিজ্ঞাসা করতে উৎপলের রুচিতে বাধল। লোকটি হয়তো ভাববে এইসব কেচ্ছা কাহিনী শুনতে উৎপলের খুব আনন্দ আছে। যাদের সাহস আছে তারা অসামাজিক ব্যাপার নিজেরা ঘটায়, আর যাদের তা নেই তারা এই সব রটিয়ে কি সেই রটনা উৎকর্ণ হয়ে শুনে পরোক্ষভাবে পরিতৃপ্ত হয়। উৎপল এই দ্বিতীয় শ্রেণীর সম্ভোগকামীদের দলে যেতে রাজী নয়। কিন্তু নিশিকান্তও বেশ চতুর লোক বলেই মনে হচ্ছে। ওর কাছ থেকে জেনে না নিলে সহজে বলবে না। ও আলগা আলগা ঝোপের গায়ে লাঠি পিটাতে থাকবে, তাতে ভিতরের পাখীর গায়ে আঁচড় লাগবে না। উৎপল কী ভাবে কথাটা জিজ্ঞাসা করে, নিজের মান-সম্মান বাঁচিয়ে তথ্যের তৃষ্ণা মিটায় ভাবছে, ভিতর থেকে নিশিকান্তের ডাক এল, 'বাবা ঘরে এসো, মা ডাকছে তোমাকে।'

নিশিকান্ত বিরক্ত হয়ে বলল, 'আঃ রাত-দিন কেবল ডাকছে আর ডাকছে। তোদের ডাকাডাকির কি শেষ নেই ?'

হিমি বলল—'মা বলছে একবার এসে শুনে যাও, তারপর রাতভর বসে বসে গল্প কোরো।'

অসহিষ্ণুতার ভঙ্গি করে নিশিকান্ত উঠে দাঁড়াল। তারপর প্রায় অনিচ্ছায় ভিতরের দিকে পা বাড়াল।

স্বামীস্ত্রীর মধ্যে ফিসফিস শব্দে কিছুক্ষণ কী যেন পরামর্শ হল। তারপর একটু বাদে নিশিকান্ত ফের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। অমায়িকভাবে হেসে বলল, 'কিছু মনে করবেন না উৎপলবাবু। সারাদিন কারো খাওয়া-দাওয়া হয়নি। আমি না খেলে আবার মুখে কেউ দানা তুলবে না। আচ্ছা ফ্যাঁসাদে পড়েছি। আপনি কি একটু বসবেন ?'

উৎপল বলল, 'না না, আমি এখন উঠছি আর একদিন বরং আসা যাবে।'

নিশিকান্ত তাকে বস্তীর বাইরে এসেও খানিকটা পথ এগিয়ে দিল। তারপর ফিরে যেতে যেতেও গেল না। উৎপলের কাছে এগিয়ে এসে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল, 'ভালো কথা, উৎপলবাবু, গোটা পাঁচেক টাকা হবে আপনার কাছে ? বড় ঠেকে পড়েছি। আমি আবার কদিন বাদেই—'

উৎপলের একবার ইচ্ছা হল, পরিষ্কার জানিয়ে দেয় 'হবে না।' কিন্তু কী ভেবে পাঞ্জাবির ভিতরের পকেট থেকে তিনটে টাকা বের করল। বলল, "এই আছে।'

নিশিকান্ত নিরাশ হয় না, বরং একটু হেসে বলল, 'আচ্ছা তাই দিন। এতেই আমার খুব উব্‌গার হবে।'

টাকা তিনটি ট্যাঁকে গুঁজতে গুঁজতে নিশিকান্ত বলল, 'আসবেন উৎপলবাবু, আমি সব বলব আপনাকে। গুল নয়, গুল দেওয়ার মানুষ আমি নই। সব সত্যি কথা। একবার একটি মেয়েকে তো আমাদের এই বস্তীতে এনেই রেখেছিলেন সতীশঙ্করদা। ঠিক আমার পাশের ঘরে ছিল: দেড় বছর কাটিয়ে তবে গেল। কত কাণ্ড। আমার ওপর দেখাশোনার ভার দিয়েছিলেন। এ সব ব্যাপারে আমাকে যতটা বিশ্বাস করতেন তেমন আর কাউকে না। আমি যা জানি তা আর কেউ জানে না। আসবেন সব বলব আপনাকে। অনেক খোরাক পাবেন আপনি।'

উৎপল একটু ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে দ্রুতপায়ে হাঁটতে শুরু করল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, তার তথ্য সংগ্রহের আর দরকার নেই। এ ধরণের লোকের ছায়াও সে আর মাড়াতে চায় না।

ক্রমশঃ

শিক্ষাচিন্তায় রবীন্দ্রনাথ

ডক্টর দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সময় এমন স্থানে তাদের রাখা দরকার যেখানে তারা মিশে থাকবে প্রকৃতির সঙ্গে, আর জ্ঞানচর্চার পূর্ণ সুযোগ পাবে সর্বদা গুরুর সান্নিধ্য লাভে। এই শিক্ষার উপযুক্ত স্থান হচ্ছে আশ্রম। 'পারিপার্শ্বিকের জটিলতা, আবিলতা, অসম্পূর্ণতা থেকে' যাতে বিদ্যালয়কে মুক্ত করা যায়, তাই ছিল কবির উদ্দেশ্য। এই কারণেই তিনি শিলাই-দহ থেকে তাঁর বিদ্যালয়কে এনে প্রতিষ্ঠিত করলেন মহর্ষিদেবের প্রতিষ্ঠিত আশ্রম শান্তিনিকেতনে। এক সময় রবীন্দ্রনাথ বিশেষ চিন্তাকুল হয়ে পড়েছিলেন নিজের ছেলে মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে। প্রচলিত বিদ্যালয়ে ছেলে মেয়েদের শিক্ষার নামে যে বিভীষিকা তিনি অনুভব করেছিলেন নিজের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, তার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে সে-জন্যই তিন জন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে তিনি শিলাইদহে বিদ্যালয় খুলেছিলেন ; কিন্তু তার পরিবেশ আশ্রমের মতো ছিলনা। শেষে মহর্ষির অনুমতি নিয়ে শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। বিদ্যালয়ের নাম হয় 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম'। পরে এর নাম হয় 'ব্রহ্মবিদ্যালয়'। বিদ্যালয়ের নামকরণেই বোঝা যায় যে এখানকার শিক্ষা ছিল সাধনার সঙ্গে যুক্ত এবং সব সাধনার উপরে ছিল 'ব্রহ্মের সাধনা, ভূমার সাধনা'।

কবি প্রচলিত বিদ্যালয়কে মনে করতেন তথাকথিত একটি যন্ত্রমাত্র; কারণ সেখানে নাই কোনো প্রাণের সাড়া। শিশুর শিক্ষার জন্য দরকার তপোবন, 'যেখানে আছে সমগ্র জীবনের সজীব ভূমিকা'। এই তপোবনের সত্তা হচ্ছে গুরুকে কেন্দ্র করে; সেখানে গুরু হচ্ছেন নিরন্তর সক্রিয় আর 'মনুষ্যত্বের লক্ষ্য সাধনে তিনি প্রবৃত্ত'। গুরুর সাধনার অন্যতম মুখ্য কর্তব্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর চিত্ত গতিশীল করা। সর্বদা গুরুর সান্নিধ্যেই শিষ্যদের চিত্তে আসে নানা প্রেরণা। 'নিত্য জাগরূক মানবচিত্তের এই সঙ্গ জিনিসটাই আশ্রমের শিক্ষার সব চেয়ে মূল্যবান উপাদান। গুরুর মন প্রতিমুহূর্তে আপনাকে পাচ্ছে বলেই আপনাকে দিচ্ছে। পাওয়ার আনন্দ দেওয়ার আনন্দেই নিজের সত্যতা প্রমাণ করে, যেমন পাওয়ার যথার্থ পরিচয় ত্যাগের স্বাভাবিকতায়।'—রবীন্দ্রনাথের এই মত কাল্পনিক নয়; তার কারণ, এই রকম শিক্ষার স্থান তিনি নিজেই গড়ে গেছেন। কবিগুরু তাঁর 'ধর্মশিক্ষা' প্রবন্ধে শান্তিনিকেতনে শিক্ষার বিশিষ্টতা সম্বন্ধে একটি বিবরণ প্রকাশ করে ছিলেন। তিনি বলেছেন, 'এই সেই স্থান যেখানে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানবজীবনের যোগ ব্যবধান বিহীন ও যেখানে তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে মানুষের আত্মীয়সম্বন্ধ স্বাভাবিক, যেখানে ভোগের আকর্ষণ ও উপকরণ-বাহুল্য নিত্যই মানুষের মনকে ক্ষুব্ধ করিতেছে না, সাধনা যেখানে কেবলমাত্র ধ্যানের মধ্যেই বিলীন না হইয়া ত্যাগে ও মঙ্গলকর্মে নিয়তই প্রকাশ পাইতেছে।' এই রকম আশ্রমে ছেলেমেয়েরা যখন শিক্ষায় নিরত হবে, তখন তাদের জন্য চাই এমন একজন মনুষ্যত্ব-আদর্শের গুরু যিনি সকলের জীবনকে 'গতিদান' আর 'চিত্তের গতিপথকে বাধামুক্ত' করতে পারেন। এ বিষয়ে তিনি বলেছেন, 'যেমন করিয়া হউক, সকল দিকেই আমরা মানুষকেই চাই; তাহার পরিবর্তে প্রণালীর বটিকা গিলাইয়া কোনো কবিরাজ আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেননা।

ছাত্রশিক্ষকের বনিবনাও নিয়ে যে মাঝে মাঝে সমস্যা দেখা যায়, সে সম্বন্ধেও কবির মনে চিন্তা এসেছিল। কোনো সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজি-অধ্যাপক ওটেন সাহেবের সঙ্গে ছাত্রদের বিরোধ হয় ভারতীয়দের সভ্যতাসম্বন্ধে আলোচনায়। এ সম্বন্ধে সাহেব অধ্যাপক ভারতীয় সভ্যতার অপমান করলে উক্ত সাহেব বিশেষভাবে অসম্মানিত হন। ফলে, দেশের মধ্যে নানা আন্দোলনের সৃষ্টি হয় ও ছাত্রদের কড়াশাসন বিষয়ে তৎপর হওয়ার জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজ কর্তৃপক্ষের উপর চাপ দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে মন্তব্য করেন, 'ছেলেরা যে বয়সে কলেজে পড়ে সেটা একটা বয়ঃসন্ধি কাল।...এই সময়েই অল্পমাত্র অপমান মর্মে গিয়া বিঁধিয়া থাকে, এবং আভাসমাত্র প্রীতি জীবনকে সুধাময় করিয়া তোলে। এই সময়েই মানব সংশ্রবের জোর তারপরে যতটা খাটে এমন আর কোনো সময়েই নয়। এই বয়ঃসন্ধিকালে ছাত্রেরা মাঝে মাঝে এক একটা হাঙ্গামা বাধাইয়া বসে। যেখানে ছাত্রদের সঙ্গে অধ্যাপকের সম্বন্ধ স্বাভাবিক, সেখানে এই সকল উৎপাতকে জোয়ারের জলের জঞ্জালের মতো ভাসিয়া যাইতে দেওয়া হয়—কেন না তাকে টানিয়া তুলিতে গেলেই সেটা বিশ্রী হইয়া উঠে।"

শিক্ষকের মনে উচ্চতা বোধ থাকলে তিনি কখনই ছাত্রকে কাছে পাবেন না; পক্ষান্তরে স্নেহ ও প্রীতি দিয়ে শিক্ষক অনায়াসেই ছাত্রদের মন কেড়ে নিতে পারেন। কবিগুরু শান্তিনিকেতন আশ্রমেই এর অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। আশ্রমের এক ইংরেজ শিক্ষক ছাত্রদের মাঝে মাঝে গাল দিতেন; শেষে জাত তুলে যখন তিনি গাল দিতে আরম্ভ করলেন, তখন ছেলেরা তাঁর ক্লাসে যাওয়া বন্ধ করে। কোনো এক সময় কবিগুরু একজন বিশেষ অভিজ্ঞ হেডমাষ্টার নিযুক্ত করেন। কয়েক দিনের মধ্যেই উক্ত শিক্ষক কবির কাছে নালিশ করেন যে ছেলেদের পড়াশুনার দিকে তেমন মন নেই, অনবরত তারা গাছে গাছে চড়ে বেড়াতে চায়, সুতরাং তাদের কড়া শাসনের দরকার। রবীন্দ্রনাথ এর উত্তরে তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে শিক্ষকের মতো বয়স হলে ছেলেরা কখনও গাছে চড়বেনা; গাছ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে তাদের আহ্বান করবার জন্য। তাতে সাড়া দেওয়াই যে ছেলেদের ধর্ম। কিছু দিনের মধ্যেই উক্ত কড়া শিক্ষককে আশ্রম ছেড়ে চলে যেতে হয়। কবি আবার পরে এমন দু-জন ইংরেজ শিক্ষক পান, যাঁদের গুণ দেখে তিনি বলেছিলেন 'আজ ইংরেজ গুরুর সঙ্গে বাঙালি ছাত্রের জীবনের গভীর মিলন ঘটিয়া আশ্রম পবিত্র হইয়াছে।'

গুরু শিষ্যের মধ্যে থাকবে আত্মীয়তার সম্বন্ধ। অনেক সময় পিতা-মাতার সুযোগ বা যোগ্যতা থাকে না শিশুদের পালন ও শিক্ষার বিষয়ে। এ-অবস্থায় গুরুই স্বয়ং পিতামাতার স্থান গ্রহণ না করলে শিশুদের মনে আসবে শিক্ষার নামে বিভীষিকা, আর তাতে হবে অনর্থের সৃষ্টি। গুরু-শিষ্যের মধ্যে গড়ে ওঠা চাই পরস্পর সাপেক্ষ সহজ সম্বন্ধ। ছেলেদের সঙ্গে মিশতে গেলে গুরুকে হতে হবে ছেলেমানুষের মতো। 'যিনি জাতশিক্ষক, ছেলেদের ডাক শুনলেই তাঁর ভিতরকার আদিম ছেলেটা আপনি বেরিয়ে আসে। মোটা গলার ভিতর থেকে উদ্ভাসিত হয় প্রাণে-ভরা কাঁচা হাসি,। গুরুর হৃদয়ে অফুরন্ত এই কাঁচা হাসির, সত্তার পূর্ণ হয়ে থাকবে, আর ছেলেরাও তাদের স্বশ্রেণী বলে তাঁর কাছে আসবে ছুটে। আজকাল আমাদের গুরুরা অযথার্থ প্রবীণতা নিয়ে ছেলেদের সামনে আসেন, আর ছেলেরা তাঁকে 'প্রাগৈতিহাসিক মহাকায় প্রাণী' ভেবে বিহ্বল ও আড়ষ্ট হয়ে পড়ে।

শিষ্যের দায়িত্ব নেবার সঙ্গে গুরু যদি মূলতঃ দুটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখেন, তবে উভয়ের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে উঠতে পারে। ছেলেদের বয়স লক্ষ্য করে শিক্ষককে হতে হবে ধৈর্যবান ও সহানুভূতিসম্পন্ন এবং পড়াশুনার বিষয়ে শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে ছাত্রদের 'মনোবিকাশের ছন্দ'। এই ছন্দ না ধরার ফলেই নানা অঘটন ঘটে; ফলে শিক্ষক অনেক সময় হয়ে পড়েন রূঢ়, আর ছেলেরা হয়ে ওঠে ক্ষিপ্ত। ছাত্রদের মন যখন এই ভাবে চঞ্চল হয়ে যায়, 'তখন সব বিষয়েই শিক্ষার উপরে আসে বিরাগ ও বিতৃষ্ণা। মেধা সকলের সমান নয়। এই তারতম্য লক্ষ্য না করে পাইকারি হারে একই রকম শিক্ষা সকলের উপর প্রয়োগ করলে ছাত্র বোধ করে অস্বস্তি; ফলে সে কিছুই গ্রহণ করতে পারেনা; এতে ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ই হয় ব্যর্থ। 'মনস্তত্ত্বের পর্যালোচনা বিশেষ

চিন্তাও অভ্যাসের অপেক্ষা রাখে'। এই মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষার চর্চা কবিগুরু করেছিলেন শান্তিনিকেতন আশ্রমের শিক্ষকদের নিয়ে। কবির মতে, 'ছেলেদের পক্ষে এগার বৎসর বয়সটি এঁদের মতে বুদ্ধি বিকাশের বিশেষ প্রতিকূল সময়। মেয়েদের পক্ষে জাতি বা দেশ অনুসারে এই বয়সটি বারো, তেরো বা চৌদ্দ'। বিভিন্ন ঋতুতে দেহ ও মনের তারতম্য আসে। এ বিষয়ে লক্ষ্য করে বিশেষ বিশেষ পাঠক্রম বিশেষ বিশেষ ঋতুতে নির্ধারিত করা উচিত কিনা, সে-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ চিন্তা করেছিলেন। এমনও হওয়া অসম্ভব নয় যে বিশেষ কালে মনের কোনো একটি শক্তির হ্রাস হয়ে যায়, আর অন্য শক্তির হয় প্রকাশ। শক্তির এই হ্রাসবৃদ্ধি দেখে পাঠক্রম নির্ণয় করা ঠিক কিনা, এ চিন্তাও রবীন্দ্রনাথকে অধিকার করেছিল। তিনি এ-বিষয়ে মন্তব্য করে বলেছেন, 'কী জানি সাহিত্য-শিক্ষা, গণিতশিক্ষা ও বিজ্ঞান শিক্ষার বিশেষ বিশেষ চাতুর্মাস্য আছে কিনা—একই ঋতুতে এক সঙ্গে নানা বিচিত্র বিষয় শিক্ষা মনের পক্ষে অজীর্ণকর ও ক্লান্তিকর কিনা তা ভেবে দেখা দরকার।" কবির মনে এ বিষয়েও সন্দেহ জেগেছিল যে একই দিনে অনেক বিষয়ের পাঠগ্রহণ ছাত্রদের পক্ষে ক্ষতিকর কিনা। এক একটি বিষয় নিয়ে কাজ করার কথাও কবি ভেবেছিলেন।

লাইব্রেরি বা পাঠাগার জ্ঞান-অর্জনের পক্ষে একটি মুখ্য অঙ্গ। এই পাঠাগারে বই থাকবে সকলের ; যেমন থাকবে বড়োদের, তেমনি থাকবে ছোটদের। বই সংগ্রহ করা ব্যাপারে বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। নানা স্থান থেকে বই সংগ্রহ করে পাঠাগারকে তুলতে হবে উপযুক্ত করে। এই কাজে প্রত্যেক লাইব্রেরি যদি সাহায্য করেন, তবে কাজ হবে সর্বাঙ্গসুন্দর। পাঠাগারের প্রধান কাজ-সম্বন্ধে কবির বক্তব্য—'লাই-ব্রেরির মুখ্য কর্তব্য, গ্রন্থের সঙ্গে পাঠকের সচেষ্টভাবে পরিচয় সাধন করিয়ে দেওয়া—গ্রন্থসংগ্রহ ও সংরক্ষণ গৌণ কাজ।'

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কবিগুরুর অবদান রয়েছে শান্তিনিকেতনে 'শ্রীসদন' প্রতিষ্ঠার মধ্যে। মেয়েদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা আছে এখানে। পড়াশুনোর সঙ্গে সঙ্গে খেলাধূলা, চিত্রাঙ্কন, সেলাই, নৃত্যগীত ইত্যাদি সব ব্যবস্থাই আছে। এ বিষয়ে তিনি ভারতের সনাতন আদর্শকেই অনুবর্তন করেছেন।

পল্লীশিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষিত সমাজের যে অবহেলা রয়েছে, তা কবি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছিলেন। শিক্ষার ব্যবধানেই মানুষে মানুষে আসে মিলনের বাধা। পল্লীবাসীর অশিক্ষা, কুসংস্কার, দুর্নীতি ইত্যাদি দূর করতে না পারলে দেশ চিরকালই থাকবে পিছিয়ে। এ-বিষয়ে শিক্ষিত সমাজের উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়। তাঁদের কাছে স্বদেশ অপেক্ষা বিদেশ যে কত পরিচিত, সে সম্বন্ধে কবি বলেছেন—'ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানীর চিত্তবৃত্তি আমাদের কাছে সহজে প্রকাশমান—তাদের কাব্য, গল্প, নাটক যা আমরা পড়ি সে আমাদের কাছে হেঁয়ালি নয়—এমন কি, যে কামনা যে তপস্যা তাদের, আমাদের কামনা সাধনাও অনেক পরিমাণে তারই পথ নিয়েছে। কিন্তু যারা মাষষ্ঠী মনসা ওলাবিবি শীতলা ঘেঁটু রাহু শনি ভূত প্রেত ব্রহ্মদৈত্য গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা পাণ্ডা পুরুতের আওতায় মানুষ হয়েছে, তাদের থেকে আমরা খুব বেশি উপরে উঠেছি তা নয়, কিন্তু দূরে সরে গিয়েছি, পরস্পরের মধ্যে ঠিক মতো সাড়া চলেনি।' এই বিষয় লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন পল্লীশিক্ষার জন্য। পল্লীশিক্ষা বিস্তারই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসবে তিনি বলেন—'কখনও আমাদের সাধনায় যেন এ দৈন্য না থাকে—যে পল্লীর লোকের পক্ষে অতি অল্পটুকুই যথেষ্ট। তাদের জন্যে উচ্ছিষ্টের ব্যবস্থা করে যেন তাদের অশ্রদ্ধা না করি। শ্রদ্ধয়া দেয়—পল্লীর কাছে আমাদের আত্মোৎসর্গের যে নৈবেদ্য তার মধ্যে শ্রদ্ধার যেন কোনো অভাব না থাকে।" পল্লীসমাজে যাত্রা, কীর্তন ইত্যাদি এখনও চলে আসছে, তার সঙ্গে নগরবাসীর যোগ থাকলে অনুষ্ঠান কেবল সার্থক হবেনা, পল্লীবাসীরা পাবে মনে নূতন শক্তি। তাদেরও ডেকে আনতে হবে নগরের উৎসব অনুষ্ঠানে, সেখান থেকে তারা পাবে নূতন আলো—আর তাতে তাদের সংস্কৃতি হয়ে উঠবে উজ্জ্বলতর এবং দেশেরও হবে শ্রীবৃদ্ধি।

সুশিক্ষার শ্রেষ্ঠ বা সার জিনিষ হচ্ছে সংস্কৃতি। সংস্কৃতিবান মানুষের চিত্তে জন্মে উদারতা, সংযম, আত্মবিশ্বাস ইত্যাদি বহুবিধ গুণ। তার মধ্যে সংকীর্ণতা দূর হওয়ায় সে অন্যের থেকে নিজেকে পৃথক মনে করেনা। ফলে, অন্যের সুখে সুখবোধ ও দুঃখে দুঃখানুভূতি হওয়ার পৃথিবীর সকলকেই সে নিজের আত্মীয় মনে করে। অতি অল্প কথায় রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃতির যে স্বরূপ লক্ষণ বিশ্লেষণ করেছেন, তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, সংস্কৃতির প্রভাবে চিত্তের সেই ঔদার্য ঘটে—যাতে করে অন্তঃকরণে আসে শান্তি, আপনার প্রতি শ্রদ্ধা আসে, আত্মসংযম আসে এবং মনে মৈত্রীভাবের সঞ্চার হয়ে জীবনের প্রত্যেক অবস্থাকেই কল্যাণময় করে।' যখন কবি শান্তিনিকেতনের ছেলেদের মধ্যে এই সংস্কৃতি লক্ষ্য করেছিলেন, তখন তিনি বুঝলেন, আশ্রমের শিক্ষা সার্থক হয়েছে। তিনি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন, 'একদিন দেখেছিলাম শান্তিনিকেতনের পথে গরুর গাড়ির চাকা কাদায় বসে গিয়েছিল, আমাদের ছাত্ররা সকলে মিলে ঠেলে গাড়ি উদ্ধার করে দিলে, সেদিন কোনো অভ্যাগত আশ্রমে উপস্থিত হলেন, তাঁর মোট বয়ে আনবার কুলি ছিলনা, আমাদের কোনো তরুণ ছাত্র অসংকোচে তাঁর বোঝা পিঠে করে নিয়ে যথাস্থানে এনে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। অপরিচিত অতিথি-মাত্রের সেবা ও আনুকূল্য তারা কর্তব্য বলে জ্ঞান করত। সেদিন তারা আশ্রমের পথ নির্মাণ করেছে, গর্ত বুজিয়ে দিয়েছে। এ সমস্তই তাদের সতর্ক ও বলিষ্ঠ সৌজন্যের অঙ্গ ছিল, বইয়ের পাতা অতিক্রম করে তাদের শিক্ষার মধ্যে সংস্কৃতি প্রবেশ করেছিল।' মানুষের সেবার কাজে যখন শিক্ষিত লোক আপনা থেকেই এগিয়ে আসবে, তখনই তিনি হয়ে উঠবেন সংস্কৃতিবান্।

শিক্ষায় চাই ছেলেদের নির্মুক্ত মন। তারা সমবয়সীদের কাছে অতি সহজভাবে মনের কথা বলে এবং তার মধ্যে ভাল-মন্দর বিচার করেনা। তেমনি মন-খোলা ছাত্রদের সঙ্গে মিশতে গেলে শিক্ষককেও হতে হবে অতি সরল, যাতে ছেলেমেয়েরা অকপটে তাঁর কাছে সকল

কথা বলতে পারে। কবিগুরু যখন তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন, তখন উভয়ের মধ্যে কোনো বয়সের ব্যবধান থাকতনা। একদিন আশ্রমে বসে কবিগুরুর সঙ্গে ছেলেমেয়েদের আলোচনা হচ্ছিল মেয়েদের চাল-চলন, বেশভূষা, সৌন্দর্য ইত্যাদি নিয়ে। কবি একটি ছাত্রকে ঐ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে বললে সে অনায়াসেই বলল, 'যাই বলুন, এই বাঙালি মেয়েদের কাছে আর কেউ নয়। এই ব্যাপারে স্পষ্টই বোঝা যায়, কবিগুরু ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কেমন সহজ, সরল সম্বন্ধ পেতে ছিলেন। শিক্ষক যদি এইভাবে ছাত্রদের মধ্যে মিশে যেতে পারেন, তবে শিক্ষায় কোনো গ্লানিই থাকতে পারেনা।

ছেলে মেয়েদের মনে কৌতূহল থাকা নিতান্ত প্রয়োজন, নতুবা তারা হয়ে যাবে জড় পদার্থের মতো। কৌতূহল থাকাটাই যে জাগ্রত চিত্তের পরিচয়।' যে সব দেশ আজকের দিনে উন্নতি করেছে, সেই সব দেশবাসীর ঔৎসুক্যই হল উন্নতির মূলে। ছেলে মেয়েদের মনে ঔৎসুক্য জাগানও শিক্ষকের অন্যতম প্রধান কাজ। কবিগুরু বলেছেন, 'আশ্রমের ছেলেরা চারদিকের অব্যবহিত সম্পর্ক লাভে উৎসুক হয়ে থাকবে; সন্ধান করবে, পরীক্ষা করবে, সংগ্রহ করবে। এখানে এমন সকল শিক্ষক সমবেত হবেন যাঁদের দৃষ্টি বইয়ের সীমানা পেরিয়ে, যাঁরা চক্ষুমান, যাঁরা সন্ধানী, যাঁরা বিশ্বকুতূহলী, যাঁদের আনন্দ প্রত্যক্ষ জ্ঞানে।'

ছাত্রদের দায়িত্ববোধ জাগানোও শিক্ষার অন্যতম অঙ্গ। শান্তিনিকেতন আশ্রমের নানা কাজে ও ব্যবস্থায় ছাত্রদের কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ছেলেমেয়েরা যাতে বিভিন্ন বিষয়ে নিজেরাই পরিচালনা করতে পারে, সেই আত্মকর্তৃত্ববোধ রবীন্দ্রনাথ জাগিয়ে দিয়েছিলেন ছেলেমেয়েদের মনের মধ্যে। 'ত্রুটি সংশোধনের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করার উদ্যম যাদের আছে, খুঁতখুঁত করার কাপুরুষতায় তাদের আসে ধিক্কার। আশ্রমের নানা বিষয়ের ভার ছেলেমেয়েরাই গ্রহণ করেছিল। খাদ্য বিভাগ, ক্রীড়াবিভাগ, সেবাবিভাগ, স্বাস্থ্যবিভাগ, বিচার বিভাগ ইত্যাদি ছেলেমেয়েদের দ্বারাই পরিচালিত।

ছাত্রদের জন্য পাঠ্য স্থির করে দেওয়া ও বৎসরান্তে তার পরীক্ষা নেওয়াতেই যে বিদ্যাশিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না, তা রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে বুঝিয়েছেন। ছাত্ররাই জিজ্ঞাসু হয়ে শিক্ষকের কাছে আসবে, যেমন আসত প্রাচীনকালে শিষ্য গুরুর কাছে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'যথাসম্ভব ছাত্রদিগের পুঁথির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে হইবে। পারতপক্ষে ছাত্রদিগকে পরের রচনা পড়িতে দেওয়া উচিত নহে—তাহারা গুরুর কাছে যাহা শিখিবে, তাহাদের নিজেকে দিয়া তাহাই রচনা করাইয়া লইতে হইবে; এই স্বরচিত গ্রন্থই তাহাদের গ্রন্থ।'

রবীন্দ্রনাথের ধারণা, ছাত্রদের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা অতীব ক্ষতিকর। দলীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোমলমতি ছাত্রদের উস্কিয়ে দিয়ে নিজেদের ইষ্টসিদ্ধিকে তিনি অত্যন্ত পাপের কাজ বলে মনে করতেন। ছাত্ররা হচ্ছে দেশের সম্পদ; ভাল-মন্দ বোঝার ক্ষমতা অর্জনের আগেই যদি তাদের মনকে চঞ্চল করে দেওয়া হয়, তবে সকলেরই অমঙ্গল। 'কিছু না করে পাততাড়ি গুটিয়ে বসে থাকা যদি সাময়িক ভাবেও হয়—সে যে কারণেই হোক' কবির মতে তা বলিদান স্বরূপ। ছাত্রদের প্রত্যেক দিনের কর্তব্য হচ্ছে কিছু না কিছু শেখা। শিক্ষকেরও কর্তব্য হচ্ছে এই বিষয় নিয়ে তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকা।

শরীর চর্চাও অবশ্য করণীয়—এ কথা কবিগুরু বার বার বলেছেন। দৈনিক শরীর চর্চাও যে শিক্ষারই একটা অঙ্গ, তার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েদের জন্য জাপানী যুযুৎসুর পেছনে কবির প্রচুর অর্থব্যয়ে। দৌড় ঝাঁপের সঙ্গে ছেলেদের বাগানের কাজও করতে হত। কোদাল, কুড়ুল নিয়ে তারা নিয়মিত কাজ করে যেত।

জনশিক্ষার তেমন ব্যবস্থা রবীন্দ্রনাথ করে যেতে পারেন নি বলে তার বড় ক্ষোভ ছিল। এই ক্ষোভ তিনি কিছুটা মিটিয়ে ছিলেন 'লোক-শিক্ষা সংসদ' প্রতিষ্ঠা করে। যাদের বাড়ীঘর ছেড়ে অন্যত্র যাবার সুবিধে নেই, তারা যাতে ঘরে বসেই শিখতে পারে, সেই কাজ করে যাচ্ছে এই লোকশিক্ষা-সংসদ। এই প্রতিষ্ঠান দেশের অশিক্ষা দূর করার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। আশ্রমের ছেলেমেয়েরা আশে-পাশের গ্রামে গিয়ে সেখানকার জনসাধারণের সঙ্গে মিশে যাতে শিক্ষা-বিস্তারের সাহায্য করতে পারে, তার ব্যবস্থা তিনি করেন নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করে। ছাত্রীরা গিয়েছে গ্রামের মেয়েদের গার্হস্থ্য বিদ্যা শেখাতে। গ্রামের নানা তথ্য সংগ্রহের জন্য শিক্ষকগণ ছেলেমেয়েদের নিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তর গিয়েছেন। যদিও রবীন্দ্রনাথকে একটি কেন্দ্রে জন-কয়েক নিয়ে তাদের গড়ে তোলার কাজেই সীমায়িত থাকতে হয়েছিল, তথাপি নানাভাবে জনশিক্ষার কথাও তিনি ভেবেছেন। পল্লীশিক্ষার চিন্তায় রবীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রয়াস শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা। এই প্রতিষ্ঠান পল্লীর অশিক্ষা দূর করা বিষয়ে বিশেষ সহায়ক।

কবিগুরু প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন ব্যাপারে শিক্ষাকে নিয়েছিলেন একান্তভাবে। শিক্ষাকে সর্বাঙ্গসুন্দর করতে গেলে পাশ্চাত্য শিক্ষারও যে অবশ্য প্রয়োজন, সে চিন্তা করার ছিল। এ-জন্যে তিনি আশ্রমের কয়েকজন ছাত্র ও কর্মীকে বিদেশে পাঠান—তাঁদের মধ্যে কালী-মোহন ঘোষ, অজিত চক্রবর্তী, গৌরগোপাল ঘোষ, সন্তোষ মজুমদার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বিদেশ থেকে এরা সকলেই বিশেষ কৃতিত্ব নিয়ে ফিরে এসেছিলেন আশ্রমে এবং নিজেদের আত্মনিয়োগ করেন এই আশ্রমের সেবায়।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা মোটামুট আলোচিত হল। তাঁর শততম জন্মোৎসব বর্ষে নানা দেশে নানাভাবে উৎসবের আয়োজন হয়েছে; কিন্তু তাঁর জন্মতিথি-পালন যদি উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্যেই সীমায়িত থাকে তবে তাঁকে পুজো করার সার্থকতা হবে কি? শিক্ষাচিন্তা ছিল রবীন্দ্র-নাথের অন্যতম মুখ্য অনুধ্যান। তাঁর উপদেশ ও নির্দেশ অনুসারে যদি আমরা শিক্ষা গ্রহণ ও বিস্তার করি এবং তাঁর নির্ধারিত শিক্ষাপদ্ধতি সর্বত্র প্রচারিত করার চেষ্টা করি, তবে তাঁর প্রতি কর্ত্তব্য অংশতঃ সম্পাদিত

হতে পারে। তিনি শিক্ষিত যুবকদের বলেছিলেন—গ্রামে গ্রামে ঘুরে শব্দ (Dialect) সংগ্রহ করতে। সকলেই যদি এই কাজে নিরত হয় তবে সেই উদ্ধারপ্রাপ্ত শব্দাবলীতে রচিত শব্দকোষ হবে বাংলাভাষার প্রকৃত ব্যাকরণ। গ্রামের লোকেরা নগর সভ্যতার সংস্পর্শে নিজেদের কথা ভুলতে বসেছে; তারা মনে করে এখানকার যুগে ঐ সব কথা ব্যবহার করা অসভ্যতার নামান্তর। এই দুর্বলতা তাদের মনে আসার ফলে তারা যেমন মেকী হয়ে যাচ্ছে, তেমনি বাংলাভাষাও হারাচ্ছে তার অমূল্য সম্পদ। গ্রামীণ শব্দ সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার পাল-পার্বণ ব্রতকথা ধর্মানুষ্ঠান ইত্যাদির ঐতিহ্য সংগ্রহও অবশ্য করনীয়। গ্রামের এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যেই হয়ত লুকিয়ে আছে বাংলার তথা ভারতীয় কৃষ্টির বিবর্তিত রূপ। এ সব বিষয়ে অনুসন্ধান, গবেষণা, আলোচনা ইত্যাদির বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। আমরা যদি এই উদ্দেশ্যে কাজ আরম্ভ করে দিই, তবে অংশতঃ সার্থক হয়ে উঠবে রবীন্দ্রের শততম জন্মোৎসব।

দীপ জ্বালো

শ্রীসুধীর গুপ্ত

নিভেছে এখন সজনি, দিনের আলো,—
নীরাজনাময়ী রজনীর দীপ জ্বালো।
এবার প্রেমের দিগ্‌বিজয়ের তরে
দীপাবলি যেন পথে পথে আলো ধরে।
যেখানে প্রাণের গহনে ঘুমায় প্রীতি,
যেখানে প্রেমের নাহি কোনো পরিমিতি.
সে দেশ-বিজয়ে উদ্দীপনারে ঢালো;
কালোয় জ্বলুক তোমারই আরতি-আলো;—
নীরাজনাময়ী রজনীর দীপ জ্বালো।

২

জ্বালো—জ্বালো আলো, জ্বালো—
জ্বালো সখি, প্রাণ;
হেরিব আলোকে যৌবন অফুরাণ।
যৌবন দিয়ে করিব দিগ্‌বিজয়,—
তব দীপে সখি, তাহারই তো পরিচয়।
নীরাজনাময়ী রজনীর আব্‌ডালে
গোলাপ ফুটাক্‌ তব দীপ এই গালে;
পরাণে উঠাক্‌ ফোয়ারার মত গান;
করুক্‌ সজনি, সতত-দীপ্যমান।
জ্বালো—জ্বালো আলো, জ্বালো-জ্বালো সখি, প্রাণ।

৩

স্পষ্ট দিনের স্থূলতার অবরোধ
নিয়ত নষ্ট করিছে সূক্ষ্ম-বোধ;
সেই স্থূলতার বাধারে করিয়া দূর
সীমন্তিনি গো, উতলা আলোর সুর
পরাণ-প্রদীপ উপচিয়া শুধু ঢালো;—
নীরাজনাময়ী রজনীর দীপ জ্বালো।
দিগ্‌বিজয়ের বিজয়ী করিয়া শেষে
মহানদ যথা মোহনায় এসে মেশে,—
মিশাও আমারে মহাপ্রেমে ভালোবেসে।

স্মৃতিচারণ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

শ্রীমান্ নীলকণ্ঠ মৈত্র,

কল্যাণীয়েষু,

২০শে নভেম্বর ১৯৬১

আমরা পরশু রাতে কলকাতা কাশী অযোধ্যা ও প্রয়াগ ঘুরে পুনায় ফিরেছি। তুমি জানতে চেয়েছ এবারকার সফরের খবর। বলি। স্মৃতিচারণী ভঙ্গিতেই সুরু করি—মন্দ কি—যখন এ-ভঙ্গি জনপ্রিয় হয়েছে?

প্রতিভাবান্ অভিনেতা শ্রীতরুণ রায় কলকাতায় আমার "অঘটন আজো ঘটে" উপন্যাসটির নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করেছে। তাদের থিয়েটার-সেণ্টারে সপ্তাহে চারবার ক'রে অভিনয় হচ্ছে। নাটকটি সে আমাদের মন্দিরে ব'সেই লিখেছিল গত আগস্টে। অসিতকে কেন্দ্র ক'রে সে এ-নাটকটির চমৎকার রূপ দিয়েছে—আমার সংলাপকে প্রায় সর্বত্রই বজায় রেখে। কৃতিত্ব হিসেবে আশ্চর্য বৈ কি, যেহেতু তরুণ আমার ভাবের ভাবুক না হওয়া সত্ত্বেও আমার ভাবধারা মোটামুটি বজায় রেখেছে বলব, যার ফলে উপন্যাসটির মূল ভক্তিরস নাটকীয় চরিত্র-সংবাতের মধ্যে দিয়ে বেশ ভালোই ফুটেছে।

আমি কলকাতায় গিয়েছিলাম এবার শুধু এই অভিনয়টি দেখতেই। দেখলাম দর্শকেরা সাড়া দিল। কেউ কেউ তিনবার দেখতে এসেছেন। ভাবো!

রকসিতে আমাদের জন্যে একটি বিশেষ অভিনয় হ'ল ৭ই নভেম্বর সকালে। অভিনয়ের আগে আমি প্রায় এক-ঘণ্টা গান করেছিলাম।

প্রথমে আমি গেয়েছিলাম আমার স্বরচিত শ্যামাসঙ্গীত "মন্ত্রজ্বালাও মন্ত্রময়ী"—ধ্রুপদ-ধামারে পাখোয়াজের সঙ্গতে (অনামীতে গানটি দ্রষ্টব্য)। ধ্রুপদের চল আজ বাংলা-দেশে লুপ্তপ্রায়—এ-দুঃখ রাখবার আমার জায়গা নেই। কারণ খেয়াল ঠুংরিতে ধ্রুপদের বীর্য, ওজস্ ও প্রাণশক্তি ঢিমিয়ে আসে। পাখোয়াজের সঙ্গতে এ-ধ্রুপদ-ধামারটি সেদিন জমেছিল আরো এইজন্যে যে, সেদিন ছিল কালী-পূজা। ইদানীন্তন বুদ্ধিবাদীরা বুদ্ধি ও আধুনিকতার যতই স্তবগান করুন না কেন, ভারত আজও ভারত—যে কথা কয়েক সপ্তাহ পরে অযোধ্যায় দেখলাম—(সে কাহিনী পরে বলছি)—তাই কৃষ্ণ কালী শিবের নাম-কীর্তনে আজো হিন্দুর হৃদয় আর্দ্র হ'য়ে ওঠে—সম্ভ্রমে, ভক্তিতে, আবেশে। শুধু তাই নয়, শ্রীঅরবিন্দ বলতেন: ভারতীয় মনের এই একটি বৈশিষ্ট্য আছে যে আমাদের মধ্যে ভগবানে অবিশ্বাস প্রবল হ'লেও অনেক সময়েই সাধুসন্তকে দেখে আমরা মাথা নোয়াতে কুণ্ঠাবোধ করি না। ঠিক তেমনি, গানে আর্টই সর্বেসর্বা—একথা মেনে নেওয়া সত্ত্বেও যদি কোনো গান ভজন হ'য়ে উঠে ভক্তি-রস পরিবেশন করে—তাহ'লে দেখেছি বহুবারই যে—শ্রোতারা ভক্ত না হ'য়েও ভক্তিরসে আবিষ্ট হয়েছেন। রকসিতেও এবার ঠিক এই ঘটনাটিই ফের ঘটল: যাঁরা এসেছিলেন শুধু গানের সঙ্গীতরস উপভোগ করতে তাঁদের মধ্যেও অনেকেই ভজন শুনে চোখের জল ফেললেন, তর্ক তুললেন না—ভজনে শিল্পের অনুপাতে ভক্তির মশলা বেশি না কম। যাক।

এর পরে ধ্রুপদী ভঙ্গিতেই ঢিমা তেতালায় গাইলাম পিতৃদেবের অপূর্ব গঙ্গাস্তোত্র সংস্কৃত লঘুগুরু ছন্দে: "পতি-তোদ্ধারিণী গঙ্গে।" পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এ-স্তোত্রটি অত্যন্ত ভালোবাসতেন, যখনই কাশী যেতাম আমাকে অনুরোধ করতেন গাইতে বলতেন: এমন গঙ্গাস্তোত্র আর রচিত হয়নি—শংকরাচার্যের "দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে" স্তবটির পরে। সম্প্রতি ইন্দিরা এ-গানটির চমৎকার হিন্দি অনুবাদ করায় আমার এই মস্ত সুবিধে হয়েছে যে—যত্রতত্র বাংলাগানটি গেয়েই পিঠপিঠ হিন্দি তর্জমাটি গাই একই সুরে তালে, ফলে বহু হিন্দি-শ্রোতাও পরম তৃপ্তি লাভ করেন—যেমন সেদিন রকসিতে করেছিলেন।

তার পরে ইন্দিরার বাঁধা একটি মঞ্জুল মীরাভজন গাইলাম:

মেরো ধন শ্যাম নাম কৃষ্ণ হে মুরারি,
মেরী সখি, টেক এক মোহন বনওয়ারি।

এ-অপরূপ ভজনটির আমি অনুবাদ করেছি (অনামী ২৯৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) :

সখা, মোর প্রাণধন মরণহরণ কান্ত বঁধু মুরারি।
মীরা শরণ তাহার যাচে শুধু—যার মধুনাম বনোয়ারি।

এ-গানটি গাইতে গাইতে আর একটি অঘটন ঘটল। ভজন গায় অনেকেই। কিন্তু ভজনে ভক্তির পদার্পণ না হ'লে সে থাকে মাত্র গান—অতি মনোহর, শ্রুতিমধুর গান হ'তে পারে, কিন্তু ভজন হয় না। যাঁরা ভক্তিকামী—ওরফে আমাদের মতন সেকেলে—তাঁরা গাইবার সময়ে ঠাকুরের চরণে শুধু একটি প্রার্থনা করেন—ভজনে ভক্তির তোড় নামুক। কারণ ভক্তিকামীরা ভজন গেয়ে তৃপ্তি পান না, যদি না গাইতে গাইতে বুকের মধ্যে অশ্রুসাগর দুলে ওঠে। ভাগবতের ভাষায় :

কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা
বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুধ্যেদ্ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ (১২,১৪,২৩)

অর্থাৎ

পুলকের শিহরণ না জাগিলে, প্রাণ
আনন্দাশ্রু না ঝরিলে অঝোর ধারায়—
কেমনে লভিবে ভক্তি ভক্তিবরদান
বাসনা মলিন চিত হবে শুদ্ধ, হায় ?

এই গানটি গাইতে গাইতে যেন আবার নতুন ক'রে ভাগবতের এ-বাণীটি অনুভব করলাম—যখন তা আঁখরের সহযোগে গাওয়া সুরু করলাম—শেষ চারটি চরণ :

যার গান করে গুণী, ধ্যান ধরে মুনি, রঙে রাঙে মীরা মাতি'
জপি প্রতি শ্বাসে যার নামঝংকার—জনম মরণ সাথী,
শিরে শিখিচূড়া যার—মীরা দাসী তার—জীবনের কাণ্ডারী
মীরা শরণ তাহার যাচে শুধু—যার মধুনাম বনোয়ারি।

সুর ভঙ্গি তান মূর্চ্ছনা আঁখর সবই আছে—নেই কেবল ভক্তি—এ অভিজ্ঞতা তো কতবারই হয়েছে আমার, আর সঙ্গে সঙ্গে মন ধিক্কার দিয়ে বলেছে—"কী হবে মিথ্যে গানের শিল্পে এর ওর তার চিত্তরঞ্জন করে—ভজনকে শুধু শিল্পসুন্দর সঙ্গীতে রূপ দিয়ে ?" মীরার ভাষায় ; "যদি ভক্তির রঙে হৃদয় না ওঠে রঙিয়ে, ঠাকুরের প্রেমে মন না ওঠে মেতে—তাহলে সে-গান গেয়ে হাজার বাহবা পেলেও অন্তর তো থেকে যাবেই যাবে—যে-তিমিরে সেই তিমিরে !" এ-গানটি গাইবার সময়ে তাই ঠাকুরকে ডাকছিলাম ; "ঠাকুর, লজ্জানিবারণ করো—ভক্তির একটু ছোঁয়াচ দাও"—এম্নি সময়ে হঠাৎ কী একটা ওলটপালট ঘটে গেল অন্তর গহনে !—পরিষ্কার বুঝতে পারলাম গানের ভোল বদ্‌লে গেল—সঙ্গে সঙ্গে যেন আগুন ছুটে গেল ঠাণ্ডা সুরবিহারে ! অম্‌নি মুহূর্তে বুকের মধ্যে নামল ভক্তি, চোখে ঝরল ধারা। অবশ্য আমার মতন অনধিকারীর ভক্তির আবেশ কতটুকুই বা, কিন্তু সেই অণুপ্রমাণ ভক্তিতেই ফেটে পড়ল আণবিক বোমার অঘটন—রকসির বহু শ্রোতারই হৃদয় উঠল আর্দ্র হ'য়ে—নয়ন হ'ল সজল। যখন এ-ভক্তির জোয়ার একবার অন্তরে জাগে, তখন গায়কের মনে আর সংশয়ের লেশও থাকে না যে—ঠাকুরের কৃপা সাড়া দিয়েছে প্রার্থীর আকুল ডাকে। তখন শুধু মন চায় তন্ময় হ'তে, আর প্রাণ চায় তাঁকে প্রণাম করতে—যাঁর বরে গান ভজনের সুরধুনীছন্দে ব'য়ে চলে বাঁধভাঙা আনন্দে।

এর পরেই ধরলাম চণ্ডীদাসের অবিস্মরণীয় কীর্তন :

বঁধু, কী আর কহিব আমি ?
জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণনাথ হোয়ো তুমি।

ভাব তখন গাঢ় হ'য়ে উঠেছে, পরিবেশ সম্বন্ধে এসে গেছে অর্ধ-বিস্মৃতি—আঁখরের পর আঁখর কে যেন জুগিয়ে দেয় একটার পর একটা—বিনায়াসে—সে আর এক অঘটন ! গান যখন শেষ হ'ল, তখন রকসির বিরাট প্রেক্ষাগৃহ থমথম করছে ভাবাবেগের নীরব স্পন্দনে ! তরুণ তো আমাকে আলিঙ্গন করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। একাধিক বন্ধু আমাকে সাশ্রুনেত্রে বললেন ; "আহা ! কলকাতায় এমন গান আপনি বোধ হয় আর কখনো গান নি !" অশীতিবর্ষীয় অধ্যাপক শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় বললেন, "মহাপ্রভুর ভাবগঙ্গার বন্যা বইয়ে দিলে তুমি, দিলীপ !" কত লোকে দেখলাম চোখ মুছছে ! কিন্তু এসব বলছি নিজের কোনো কৃতিত্ব জাহির করতে নয়, শুধু এই সত্যটির 'পরে জোর দিতে যে—সুরে প্রেমের আগুন জ্বলে কেবল—তখনই যখন তিনি আগুন জ্বালিয়ে দেন।

"অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহম্ ইতি মন্যতে"—আমি নিজের চেষ্টায় এ-আগুন জ্বালাতে পারি একথা যিনি বলেন, তিনি অহঙ্কারের মূঢ় পথে চলেছেন দেউলে হ'তে। কারণ সত্যিকার, আগ্নিক হতে পারে শুধু সেই অকিঞ্চন, যে অমৃতনিধানের কাছে হাত পাতে চোখের জলে: এই দীনতাই সব সম্পদের মূল। আমি একবার একটি গান বেঁধেছিলাম:

বহুদুর্লভ তুমি হে শ্যামল, আপনি না দিলে ধরা,
কে কোথায় কবে শুনেছে তোমার মুরলী মধুস্বরা?…
অকিঞ্চনের বল্লভ তুমি তারে শুধু দাও ধরা।
নয়নের নীরে তাই গাই; করো আমারে হে দীনতম;
তনুমন হোক আমার তোমার চরণের ধূলিসম।
প্রতিভা শক্তি গরব-বিভব
করো পদানত প্রণতি-নীরব,
হে ঘনশ্যামল, অহেতু বরষা হ'য়ে এসো তাপহরা।"
দুর্লভ তুমি, তাই গাই কেঁদে; "করুণায় দাও ধরা।"

আমার ভজন শেষ হবার পরে "অঘটন আজো ঘটে" অভিনীত হ'ল। সাঙ্গীতিক কয়েকটি ত্রুটি সত্ত্বেও দীনদয়ালের করুণার বাণী এ-নাট্যরূপে ফুটেছে—এইতেই আমার আনন্দ হয়েছে সবচেয়ে বেশি। আমার মনে আজকাল কেবল দুটি প্রার্থনা জাগে—যখনই লিখি বা গান গাই বা কোনো ভাষণ দিই সভাসমিতিতে: "যেন আমার প্রতিকৃতি সুকৃতি হয়ে ওঠে ভক্তির ছোঁয়াচে, আর যেন এই ভক্তির রঙে ভক্তিকামীদের মন একটুও অন্তত রাঙিয়ে ওঠে—নৈলে বৃথাই গান গাওয়া, কথা বলা, গল্প গাঁথা কাব্য রচনা।"

আমাকে ভুল বুঝো না। সাহিত্যসাধনায় উল্লাস নেই এমন কথা আমি বলি না। ঋষিরা বলেছেন উপনিষদে—আনন্দেই আমাদের জন্ম, আনন্দেই আমরা বিধৃত, আনন্দেই আমাদের লয়।" শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রীতে আছে:

There is a joy in all that meets the sense,
A joy in all experience of the soul,
A joy in evil and a joy in good,
A joy in virtue and a joy in sin.
Indifferent to the threat of Karmic law,
Joy dares to grow upon forbidden soil.

অর্থাৎ

ইন্দ্রিয়ের প্রতি পথে আনন্দের পাই নিত্য দেখা,
অন্তরের প্রতি অনুভবে জাগে আনন্দ-স্পন্দন,
আনন্দ সুকৃতি মাঝে, দুষ্কৃতির মর্মেও সে রাজে,
আনন্দ পুণ্যের মাঝে, আনন্দ নিহিত পাপ বুকে,
কর্মের শাসন ভয় অবহেলি নিষিদ্ধ মাটিতে
আনন্দ বিকাশ লভে দুর্দম স্পর্ধার রঙ্গে যেন!

তাই তো "শিল্প শিল্পেরই জন্যে art for art's sake এ-জাতীয় মন্ত্রেরও সবটুকুই মেকি নয়। কারণ এ-মন্ত্রের মূল নিহিত রসের সত্যে। যেখানেই মানুষ রস পায় সেখানেই তার গতিবিধি হবেই হবে, কারণ আমাদের মনপ্রাণ এই ভাবেই গড়া—রস নইলে সে শুকিয়ে যায়। কিন্তু এ-কথা মেনে নিয়েও বলা যায় যে—রসেরও স্তর আছে, ভাবেরও গভীরতার পর্যায় আছে। তাই যে-গান, যে-কাব্য শিল্পকলার আনন্দ জোগায়, তাদের রসমূল্য স্বীকার ক'রেও বলা চলে যে তাদের আঙ্গিক (কারুকৃতি) ভক্তির বাহন হ'লে গভীরতর আনন্দ সঞ্চার করে, পূর্ণতর সার্থকতার স্বাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়। তাই সাহিত্য যখন পার্থিব রসের রসদ-দার হয়—তখন সে যেভাবে আমাদের মনপ্রাণের পুষ্টিসাধন করে—তার চেয়ে গভীরতর বিকাশের সহায় হয় যখন সে পার্থিবতার আবহ কাটিয়ে আসীন হয় ভাগবতী কৃপার অপার্থিব রসলোকে। এই ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েই আমি "অঘটন আজো ঘটে" লিখেছিলাম—গল্প-ভারতীকে দেবী উপাধি দিয়ে শিল্পী নাম কিনতে নয়, কল্পনাকে ভক্তির চরণমূলে নত ক'রে দাসী পদবী নিয়ে ধন্য করতে। ঠিক তেমনি এক সময়ে গান গাইতাম শিল্পানন্দে, আজ তাই ভজনানন্দে—গানের কাব্যসৌন্দর্য্য তথা সুরের ধ্বনিসুষমার মাধ্যমে শুধু ভক্তি পরিবেশন করতে। এরই নাম শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়—"Art for the Diviness sake," জানি অবশ্য—এ ধরণের উক্তিকে ইদানীন্তনেরা সেকেলে medieval—নাম দিয়ে নস্যাৎ করতে চাইবেন। কিন্তু আজকের দিনে তাঁরা নাস্তিকের দাপটে ভক্তি ও ভগবানের চিরন্তনী মহিমা নিয়ে হাসাহা[সি]

ক'রে যতই কেন না আসর জমান, কালাতিপাতে শাশ্বত সত্য ফিরে পাবেই পাবে তার সনাতন আসন মানব-হৃদয়ে—

রবীন্দ্রনাথের ঝংকৃত ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হ'তে পারে না :

মরে না মরে না কভু সত্য যাহা শত-শতাব্দীর
বিস্মৃতির তলে,
নাহি মরে উপেক্ষায়, অপমানে না হয় অস্থির,
আঘাতে না টলে।

* * * *

এবার কলিকাতার পরম-ভাগবত শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেনকে ফের দর্শন করতে গিয়েছিলাম, বন্ধুবর শ্রীশিশিরকুমার ব্রহ্মচারীর সঙ্গে। সেন মহাশয় একটি চমৎকার বই লিখেছেন : "জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে"—তাঁর একটি দিব্য-অনুভূতিকে ভিত্তি ক'রে। এবইটির একটি ভূমিকা আমি লিখে দিয়েছিলাম শিশিরকুমারের অনুরোধে। বইটির কথা একটু বলাই চাই, কেন না সেন মহাশয়ের অনুভূতিটি শুধু দিব্য নয়—অলৌকিক আশ্চর্যতার দিক দিয়ে একটি অবিস্মরণীয় উপলব্ধি-রূপে গণ্য হবেই হবে—ভক্ত তথা জ্ঞানীদের সংসদে। ঘটনাটি দুর্ঘটনার চরম হয়েও ভগবৎ কৃপায় হ'য়ে দাঁড়ালো আনন্দময় অঘটন—যার ফলে ভক্ত বঙ্কিমচন্দ্রের নবজন্ম হ'ল কৃষ্ণৈকান্ত বৈষ্ণবরূপে। দুর্ঘটনা এই : ১৩৫৬ সালে ট্রাম থেকে প'ড়ে গিয়ে চলন্ত গাড়ির চাকায় তাঁর একটি পা কাটা পড়ে। এ-শাপ কি ভাবে বর হয়ে দাঁড়ালো ঠাকুরের কৃপায়—তাঁর ভাষাতেই বলি :

"পা-খানা তখনো ট্রামের নিচে পড়িয়া আছে। কিন্তু এতবড় একটা আঘাতে বিশেষ ব্যথা অনুভব করিলাম না। কেহ যেন জোরে পাখানি একটু টিপিয়া দিয়াছে—বড় জোর এইটুকু মনে হইল। (জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে—৫ পৃষ্ঠা))।

কিন্তু এ তো স'বে আদিপর্ব, অঘটনঘটনপটীয়সীর কৃপার। তার প'রেই কী হ'ল ? না :

"ট্রাম হইতে পড়িয়া যাইবার পর দেখিতে পাই—চারিদিকে যেন একটা জ্যোতির তরঙ্গ খেলিতেছে ; হঠাৎ এক অপূর্ব আলোক চতুর্দিকে ঝকমক করিয়া উঠিল এবং সেই আলোকের স্পর্শে আমার দেহ মন যেন একটা গোটা পদ্মফুলের মত দল মেলিয়া দিল।" (৯ পৃষ্ঠা)

অপিচ : "সেই রূপের স্ফুরণজনিত কিরণ-বিকীরণে জগৎ ডুবিয়া গেল, অন্য কোনো আলো থাকিল না।" (১৪ পৃষ্ঠা)

সঙ্গে সঙ্গে : "চারিদিকে মধুর ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। যতদূর দৃষ্টি যায়, দেখিলাম সকলেই ভগবানের নামকীর্তন করিতেছে।…এক সঙ্গে যেন 'ভয় নাই, ভয় নাই,' এইরূপ শব্দের ঝংকার চারিদিক হইতে ভাসিয়া আসিতেছিল। 'জয়, জয়, জয়' এইরূপ ধ্বনি মধুর ছন্দে হিল্লোল তুলিতেছিল। সেই স্বরের লহরে, ভাবের প্লাবনে আমার মনোবুদ্ধি এবং অহংকার ভাসিয়া গেল—আমি ডুবিলাম।" (১০ পৃষ্ঠা)

সর্বোপরি : "শুধু শোনাই নয়, শ্রবণের সঙ্গে অপূর্ব দর্শনলাভও আমার ঘটে। ফলতঃ, সেই অবস্থায় আমি অন্তরে বাহিরে যাহা উপলব্ধি করিয়াছিলাম তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।" (৯ পৃষ্ঠা)

তাঁর এই ইষ্টদর্শন ছিল একটি দিব্য দর্শন, অকাট্য সত্য-দর্শন। তাই তার ফলে তাঁর জীবনে বিপ্লব ঘ'টে গেছে : ভক্তকামী আসীন হয়েছেন পরম-ভাগবতের ভূমিকায়, জিজ্ঞাসু লাভ করেছেন জ্ঞানীর পদবী, সুখ দুঃখের বাজারে আলো-আঁধারী পথের পথিক হয়েছেন "আনন্দী।" তাই তিনি একটি সংকীর্ণ গলির ছোট্ট বাসায় একটি ঘরে পঙ্গু হ'য়ে ছেঁড়া মাদুরে ব'সেও অষ্ট প্রহর কৃষ্ণভাবে ভাবিত হয়ে পরমানন্দে শুধু কৃষ্ণকথাই ব'লে চলেন। আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে আমাকে বলেছিলেন যে নামানন্দ তাঁর অন্তরে সমস্তক্ষণই প্রবহমান—এক মুহূর্তও তিনি কৃষ্ণনাম ভোলেন না। কোনো ধ্যানোপলব্ধির প্রসঙ্গে বলেছিলেন ভাবাবেগে—"ও কিছুই নয়, কৃষ্ণলীলার সাথী হ'য়ে সব কিছুর মধ্যে তাঁর লীলা দেখে হ'তে হবে কৃষ্ণদাস। দর্শন ক'রে তাঁর সেবাদাস হ'তে না শিখলে কিছুই হ'ল না, কিছুই হ'ল না, কিছুই হ'ল না, কিছুই হ'ল না, কিছুই হ'ল না। ব'লে সোচ্ছ্বাসে ভাগবতের একটি বিখ্যাত শ্লোক উদ্ধৃত করলেন :

"আহো বতৈষাং কিমকারি শোভনং
প্রসন্ন এষাং স্বিদুত স্বয়ং হরিঃ।
যৈর্জন্ম লব্ধং নৃষু ভারতাজিরে
মুকুন্দ সেবৌপয়িকং স্পৃহা হি নঃ॥ (৫,১৯,২০)

এর ভাবার্থ : দেবতারা স্বর্গ থেকে কৃষ্ণের মানুষ-লীলাসাথীদের ভাগ্যকে ঈর্ষা ক'রে বলেছেন সখেদে :

লভিল ভারতে জনম যাহারা—করেছিল কোন্ পুণ্য হায় ?
কৃষ্ণের লীলাসাথী আজ তারা—জাগে সাধ যার দেবহিয়ায়।

সেন মহাশয় এই ভাবে বিহ্বল হ'য়ে কত কথাই যে ব'লে চললেন একটানা! আর কী আনন্দেই যে উজিয়ে উঠলেন আমাদের দেখবা মাত্র! বললেন ইন্দিরাকে দেখে যে তাঁর হৃদয়মধ্যে দেখেছেন সাক্ষাৎ গোপীকে। ইন্দিরা আমাকে বলেছিল দুবৎসর আগে (সেন মহাশয়কে প্রথম দর্শনের পরে)—যে তিনি সত্য দর্শন পেয়েছেন ঠাকুরের, তাই তাঁর আজ এমন সদাবিহ্বল অবস্থা—ভাবমুখে স্থিতি। আগে আগে ইন্দিরা প্রায়ই আমাকে বলত—যে কৃষ্ণ ঠাকুরটি সহজে সকলকে দর্শন দেন না। বলত আরো এই জন্যে যে, পণ্ডিচেরিতে ও অন্যত্র নানা বন্ধুই আমাকে সঘনে বলতেন যে তাঁরা কৃষ্ণের দর্শন পেয়েছেন, আর অম্নি আমি হাহুতাশ করতাম যে : "সবাই পেল পরশমণি, আমিই শুধু রইনু প'ড়ে।" ইন্দিরা হেসে বলত:—"এত বুদ্ধি যার সে বুদ্ধি খাটার না—এ আর এক আশ্চর্য! ঠাকুর কি এতই সস্তা যে তুমি তাঁর জন্যে সংসার ছেড়ে দুর্নাম কিনে নিঃস্ব হ'য়ে এত ডাকাডাকি ক'রেও তাঁর দর্শন পাচ্ছো না, আর যাঁরা তাঁর অভিসারে বিশেষ কিছুই ছাড়ে নি, তাঁকে যারা চেয়েছে বড় জোর হাতের পাঁচ হিসেবে—তারা শুধু দু চারটে তীর্থদর্শন ক'রে গঙ্গা-যমুনায় ডুব দিয়ে, কি কিছুদিন 'জয় গুরু জয় গুরু' ক'রে মেরে দেবে ? যারা সত্যি তাঁর দর্শন পায় তাদের জীবনের গতি ছন্দ ভাব দৃষ্টিভঙ্গি সবের মধ্যেই বিপ্লব ঘটে যায়। তাঁর দর্শনের পরেও যাদের জীবনযাত্রা টিকিয়ে টিকিয়ে চলে যথাপূর্বং তথাপরং' ছন্দে—ত রা নিজেদের ভোলাচ্ছে জেনো।"

সেন মহাশয় একথায় পুরো সায় দেন। লিখছেন তাঁর ইষ্টদর্শনের পরে ২১ পৃষ্ঠায় "ভগবদ্দর্শন দিব্যদর্শন, জ্যোতি—এসব দেখা এদেশে নূতন নয়। ছোটবড় অনেকের মুখেই আমরা ঐ সব কথা যেখানে সেখানে শুনিতে পাই। ...মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন, কৃষ্ণ ঐভাবে দেখা দেন না।... বাস্তবিক পক্ষে, প্রেমস্বরূপ ভগবান্‌কেও দেখিব, অথচ আমাদের দৈনন্দিন জীবনধারার কোনো পরিবর্তন ঘটিবে না, ইহা সম্ভব নহে। একখানা সুন্দর মুখ দেখিলে আমরা সহজে ভুলিতে পারি না, আর যিনি চিরসুন্দর তাঁহাকে দেখিবার পরেও বাহ্য ভোগ-বিহারে মাতামাতি করিব, রেষারেষি দ্বেষাদ্বেষি চালাইব, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলির নিতান্ত স্থূল আকর্ষণের দিকে শিশুর মত আসক্ত থাকিব, ইহা স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না।"

ইন্দিরাকে এ-কথাগুলি পড়ে শোনাতেই সে খুসি হয়ে আমাকে বলেছিল : দেখলে তো ? উনি যে সত্যি দেখেছেন, তাই না সে-দেখার ফলে আজ ভূমিশয্যায়ও পরমানন্দে আছেন! গতবৎসর বলেছেন মনে নেই—এক সাধুর দুই শিষ্য তাঁকে দর্শন করতে এসেছিল, কারণ সাধু বলেছিলেন সেন মহাশয় পরমভাগবত। শিষ্যদুটি সেন মহাশয়ের অসংলগ্ন ভাবোচ্ছ্বাস শুনে গিয়ে গুরুকে বলে : কার কাছে পাঠিয়েছিলেন আমাদের? বদ্ধ পাগল।' শুনে সেন মহাশয় কী বলেছিলেন মনে আছে ? বলেছিলেন হাততালি দিয়ে : এই ভালো, ঠাকুর এই ভালো। আমার পাগল নামই কায়েমি কোরো—ভক্ত নাম রটলে যদি অভিমান হয়! কারণ অভিমানের লেশ উঁকি দিলেও যে তোমাকে হারাব।"

শোনার মতন কথা বলার মতন ক'রে বলেছিলেন এই অকৃত্রিম নিষ্কিঞ্চন ভক্ত, তাই যখন বলেছিলেন: "শুধু নাম, শুধু নাম—নামেই সব মিলবে। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা—" তখন তাঁর কণ্ঠস্বর ভাবাবেগে কেঁপে উঠেছিল। এরি তো নাম—পরমভাগবত।

শেষে আমাকে প্রণাম ক'রে বললেন: "ভক্তের মধ্যে দিয়ে আমার কাছে আজ ভগবান্ এলেন।" আমি প্রতিপ্রণাম ক'রে করজোড়ে বলেছিলাম : "ভক্ত নই, তবে ভক্তিকামী বটে। তাই প্রার্থনা—আশীর্বাদ করুন, যাতে আপনার আত্মহারা ভক্তির ছিটে ফোঁটাও পাই।"

ইন্দিরার ভাবসমাধি হ'য়ে গেল তাঁর নাম-গানের উচ্ছ্বাসে—শুধু গাল বেয়ে অবিরল জলধারা! .....

* * *

কলকাতায় এবার ফের দেখা হ'ল আর এক পরম-ভাগবতের সঙ্গে : শ্রীমৎ গুরুদাস ব্রহ্মচারী—সাঁচ্চা সাধু। থাকেন দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পঞ্চবটীতে একটি ভাঙা ঘরে বহুবৎসর কাটিয়েছেন শুধু কৃষ্ণনাম জপ

আনমনা

ফটো : প্রাণগোপাল পা

আহরণ

ফটো : রনেন্দ্রশেখর ঘোষ

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

ক'রে। বৎসর কয়েক আগে—তাঁর সিদ্ধিলাভের পরে—একটি ভক্ত কাছেই গঙ্গাতীরে তাঁর জন্যে একটি ছোট ঘর ক'রে দেন—সঙ্গে শুধু একটি কলতলা। ব্যাস। নেই কোনো আসবাবপত্র, সতরঞ্চি কি আলমারি—শুধু মাটিতে একটি আসনে ব'সে ব্রহ্মচারী ধ্যান-জপ স্বাধ্যায়ে নিরত থাকেন দিবারাত্র। এই ঘরেই আমি তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখা করি বৎসর দুই আগে।

শ্বেতশ্মশ্রু অশীতিপর বৃদ্ধ। ভূমিশয্যায় নিদ্রা যান। কিন্তু মুখে সে কী অপরূপ প্রশান্তি! কণ্ঠস্বরও কি স্নিগ্ধ, মধুর! কোথায় পড়েছিলাম—সিদ্ধপুরুষেরা কঠোর সাধনার অন্তে সিদ্ধিলাভের ফলে কঠোর কি শুষ্ক হন না, হয়ে ওঠেন আরো কোমল, রসাল। সব সিদ্ধপুরুষের সম্পর্কেই একথা খাটে কি না বলতে পারি না, তবে এটুকু বলতে পারি যে এই মহাত্মার মধুর বচনে তথা কোমল চাহনিতে প্রাণ ভ'রে যায়। ইনি আজকাল কেবল দুপুর বেলা দেখা করেন—বারোটা থেকে পাঁচটা। বাকি সময়টা একলাই কাটান। আজকাল এঁর কাছে অনেক ভক্ত জিজ্ঞাসুই আসে—ইনি কদাচ কোনো সূত্রেই আর কোথাওই যান না—এই ঘরেই নিঃস্ব হ'য়েও বিশ্বলাভ ক'রে নিত্যানন্দ-ভূমিতে চিরাসীন। বই বলতে দুটি—গীতা ও ভাগবত। এবার বললেন আমাকে: "এই দুটি ধর্মগ্রন্থে সবই আছে, আর কোনো বই না পড়লেও চলে। গীতা আর ভাগবত সর্বশাস্ত্রের সার।"

তিনবারই তাকে নানা প্রশ্ন করেছিলাম—শুধু তাঁর কথামৃত পান করতে। সেন মহাশয়ের ম'ত তিনিও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেন শুধু একটি মধুর কথা: "নাম করো, শুধু নাম নাম নাম। ওতেই সব পাবে। জপাৎ সিদ্ধি। কলিতে আর পথ নেই। নিখাদের সঙ্গে নিরন্তর কৃষ্ণ-নাম নিলেই সর্বরোগ থেকে মুক্তি। কলিতে কৃষ্ণনাম ছাড়া আর গতি নেই।"

এ-বৎসর একটি নতুন কথা বলেছিলেন: "লোকে বলে কৃষ্ণ চ'লে গেছেন। সে কি কথা? নাম রেখে গেছেন যখন, তখন চ'লে গেছেন বলব কেমন করে? ঐ নামেই যে তিনি বাঁধা। পালাবেন কোথায়?

মনে পড়েছিল ভাগবতের একটি বিখ্যাত শ্লোক—একাদশ স্কন্দে:

> বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাদ্
> হরিরবশোঽভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
> প্রণয়রশনয়া ধৃতাংঘ্রিপদ্মঃ
> স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ॥

আমার "ভাগবতী কথা—"য় আমি এ শ্লোকটির অনুবাদ করেছি:

> আনমনে বলে: "কোথা বল্লভ?—অমনি সে-আহ্বান
> তাঁহার চরণডোর হ'য়ে তাঁকে টেনে আনে লগমান।
> এমন প্রেমে যে আসীন—সে ভাগবতের মাঝে প্রাণ,
> পাপহ'রী হরি তার হৃদ সন ভুলেও ছেড়ে না যান।

আমি এ-প্রসঙ্গে ব্রহ্মচারীজিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এর আগের বার: "কিন্তু নাম তো অনেকেই করে—ফলে ভক্তি নামে কতন ভাগ্যবানের হৃদয়ে?"

তিনি বলেছিলেন:" নাম যতদিন হৃদয়ে না জেগে ওঠে' ততদিন ভক্তি আসবে কেমন ক'রে? কামনা বাসনার লেশ থাকলেও ভক্তি তো হৃদয়ে স্থায়ী হতে পারে না।"

আমি বলেছিলাম: "কিন্তু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কি বলেন নি: 'ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদো, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো চোখের জলে?" তাতে শ্রীগুরুদাস হেসে উত্তর দিয়েছিলেন: "কিন্তু ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদতে চাইলেই কি কান্না আসে? চোখে জল আসা কি সহজ কথা? চিত্ত-শুদ্ধি না হ'লে হৃদয়ে ব্যাকুলতা বা চোখে প্রেমাশ্রু জাগে কি? যথার্থ প্রার্থনা আসে কি? তাই তো বিধি দিয়েছেন মুনিঋষিরা—নাম করো, নিরন্তর নাম করো। অবশ্য যতদিন নামে রুচি না হয় ততদিন যে নামে মন বসে না তোমার—একথা সত্যি। কিন্তু নামে রুচি হবেও ঐ নাম করতে করতেই। আর কোনো পথ নেই। ব্যাপার কি জানো? আমরা পাঁচটা নিয়ে থাকি। বলি ভগবানও ভালো, জগৎও ভালো, ঘরবাড়ি মানযশ সবই ভালো। যখন নাম করতে করতে এমন অবস্থা হবে যে, নাম ছাড়া আর কিছুই ভালো মনে হবে না—তখনই হবে নামের সুরু—আর সে অবস্থা হ'লে তবেই তিনি ধরা দেবেন, তার আগে না। আর তিনি আলো ক'রে এলে দেখবে যে—যে-সংসার বিষ হ'য়ে গিয়েছিল তাঁর অভাবে, সে-সংসার

মধুময় হ'য়ে উঠেছে তাঁর অবির্ভাবে—শুধু মানুষে নয়, পশু পক্ষী গাছ পালা ধুলো বালি সব কিছুর মধ্যে।”

এই হ'ল তাঁর সাধনলব্ধ মহোপলব্ধির রোমাঞ্চকর মূল বাণী। নির্দেশ কিছু অভিনব নয়, সেন মহাশয়ও ঠিক এই কথাই বলেন—কিন্তু যে-জাপক নাম ছাড়া আর কিছুই ভালোবাসেন না, যিনি পার্থিব ধুলোবালিতেও ঠাকুরকে প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁর শ্রীমুখে নামকীর্তনের গুণগান শুনলে মন সহজেই আর্দ্র হ'য়ে ওঠে। এরই নাম উপলব্ধির ছোঁয়াচ। পরম-ভাগবত বঙ্কিমচন্দ্র সেনও এবার বলেছিলেন কথায় কথায়: “শ্রীগৌরাঙ্গের মুখে হরিনামে যে আগুন ছুটত, সবার মুখে কি সে-আগুন ছুটতে পারে?”

এতএব দাঁড়িয়ে দাঁড়ায়: চিত্তশুদ্ধি হ'লে তবেই ধ্যানধারণা নামপ্রার্থনার উদ্দীপন হয়, নৈলে যে-পথ বেয়েই চলো না কেন, তীর্থলক্ষ্যে মন প্রাণ হবে না একান্তী—চাইবে না শুধুই তীর্থসিদ্ধি। পক্ষান্তরে একবার চিত্তশুদ্ধি হ'য়ে গেলেই ব্যস, কেল্লা ফতে! নির্ভাবনা! সংশয়ও যাবে কেটে, হৃদয়ও উঠবে মেতে। এই অবস্থায়ই সাধনা হয় রসময়, ভুবন মধুময় মন তন্ময় প্রাণ প্রেমময়—পথ চলতে তখন ধুলোকাদায়ও আনন্দের মণি মুক্তা ঝিকিমিকিয়ে ওঠে। তখন—ব্রহ্মচারীজির ভাষায়—“প্রতি জীবের মধ্যেই শিবকে দেখতে পাওয়া যায়, কাজেই বিরহ থাকে না আর, আলোর পরে ফের অন্ধকার উড়ে এসে জুড়ে বসতে পারে না।” শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন ও শ্রীগুরুদাস ব্রহ্মচারীর চিত্তশুদ্ধি হ'য়ে গেছে ভগবৎ করুণায়। তাই তাঁদের মুখে নামজপের গুণগান শুধু যে সাজে তাই নয়—যে শোনে, তার ও উদ্দীপন নয়—রাতারাতি নামে রুচি না হোক শ্রদ্ধা আসে।

[ক্রমশঃ

কারক সম্বন্ধে পাণিনীর ধারণা

শ্রীমানস মুখোপাধ্যায়

নবীন শিক্ষার্থীর কাছে পাণিনী ব্যাকরণ একটি বিভীষিকা। বিভীষিকায় জন্যে অষ্টাধ্যায়ীকার পাণিনী দায়ী নন। দায়ী নন তাঁর সুনিপুণ ভাষ্যকার পতঞ্জলি। দায়ী হলেন পরবর্তী যুগের পণ্ডিতসমাজ। প্রত্যেক দেশেই এক এক সময় যেমন উদ্ভাবনার যুগ আসে তেমনি তার ঠিক পরেই আসে একটি ক্ষয়িষ্ণু যুগ—যখন প্রতিভাধর মনীষীর বদলে আধিপত্য হয় পণ্ডিতসমাজের, যখন মননশীলতার চেয়ে প্রধান হয়ে ওঠে মস্তিষ্কের কসরৎ। ভারতবর্ষে এরকম একটা যুগ এসেছিল। প্রতিভা সেখানে হয়ে এল জড়। প্রাধান্য পেল কসরৎ। এ যুগে ভারতবর্ষের চমৎকার চমৎকার শাস্ত্রগুলো লাভ করলো বীভৎস পরিণতি। ব্যাকরণশাস্ত্রও নিষ্কৃতি পায় নি। ন্যায়বিদ্ ন্যায়শাস্ত্রের আলোকে ব্যাকরণ শাস্ত্রকে দেখতে লাগলেন, মীমাংসক দেখতে লাগলেন মীমাংসার দৃষ্টিতে, বেদান্তী বেদান্তের দৃষ্টিতে—এরকম প্রত্যেক শাস্ত্রবিদ্ নিজ নিজ শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য ঢেলে দিলেন ব্যাকরণ শাস্ত্রের ওপর। সর্বশেষে চমৎকার একটা climax এর মতো দেখা দিল টীকাগ্রন্থগুলি। সেগুলি হোলো সবকিছুর জগাখিচুড়ী। সাধারণ শিক্ষার্থীর কাছে এগুলি হয়ে গেল একটা ভয়াবহ ব্যাপার। এগুলি যত জটিল হতে জটিলতর হয়ে উঠতে লাগলো, পণ্ডিতসমাজের পরিতৃপ্তি তত বাড়তে লাগলো। কেননা অজ্ঞ সাধারণ মানুষের কাছে আত্মম্ভরিতা প্রচারের এমন চমৎকার সুযোগ আর দ্বিতীয়টি ছিল না। কিন্তু মাঝখান থেকে পিছিয়ে পড়তে লাগলেন শব্দশাস্ত্রের শিক্ষার্থীগণ কেননা এই জটিল অরণ্যের মধ্যে শব্দশাস্ত্রের আসল রহস্যগুলো ধামাচাপা পড়ে যেতে লাগলো। বাস্তবিক ত্রিমুণি ব্যাকরণের সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচিতি কমতে লাগলো, আর বাড়তে লাগলো কতগুলি কসরতের সঙ্গে পরিচিতি।

আসল ব্যাপারটা হোলো এই যে—মা সরস্বতী অতো নিষ্ঠুর প্রকৃতি মহিলা নন। তিনি খুবই সহজ, খুবই সরল। তাঁর কাছে সহজভাবে হাজির হতে হয়। তাহলেই সব জিনিষগুলো সহজ ঠেকে। নিজে জটিল হলেই তিনিও জটিল হয়ে গেলেন। জগতের সকল কঠিন কথাগুলো কতকগুলো সহজ কথার সমষ্টিমাত্র। কতকগুলো সহজ কথা জট পাকিয়ে কঠিন কথা হয়ে দাঁড়ায়। যাই হোক, আমার বক্তব্য শুধু এইটুকু যে শব্দশাস্ত্রের নবীন শিক্ষার্থীর পক্ষে সর্বাগ্রে ত্রিমুণি ব্যাকরণের সঙ্গে পরিচিতি দরকার। খুব সহজ জিনিষ ত্রিমুণি ব্যাকরণ ত্রিমুনি ব্যাকরণের অন্তরে প্রবেশ করতে গেলে মস্তিষ্কের কসরতের চেয়ে প্রয়োজন মননশীলতার। এ মননশীলতা নিয়ে ত্রিমুণি ব্যাক

আরম্ভ হবার পর যতো বালমনোরমা, তত্ত্ববোধিনী পড়ুন আপত্তি নেই ; কিন্তু ন্যায়শাস্ত্র মীমাংসার বিন্দুমাত্র না জেনে, ত্রিমুনি ব্যাকরণের বিন্দুমাত্র না জেনে প্রথমেই বালমনোরমা, তত্ত্ববোধিনী নিয়ে বসে যাওয়া যে একটা বিরাট ভুল সে সম্বন্ধে আমি ছাত্রবৃন্দের অবহিত করতে চাই।

পাণিনী ব্যাকরণ পড়বার সময় শিক্ষার্থীকে কিন্তু একটা কথা খুব ভালভাবে মনে রাখ্‌তে হবে যে পাণিনি ব্যাকরণ আর Nesfield এর English Grammar এক জিনিষ নয়। পাণিনী ব্যকরণ ডুবে রয়েছে এক গভীর মননশীলতার অতলান্তিক সমুদ্রে ; বাস্তবিক ব্যাকরণশাস্ত্র কেন সকল ভারতীয় শাস্ত্রগুলোই যেন মেরুপ্রদেশের হিমশৈলগুলোর মতো। তার এক তৃতীয়াংশ জলের ওপরে দেখা, আর বাকী অংশ ডুবে আছে গভীর জলে। ঠিক তেমনিভাবেই ভারতীয় শাস্ত্রগুলোর অন্তর ডুবে আছে আধ্যাত্মিকতার অতলান্ত সমুদ্রে। এটা পাশ্চাত্য শিক্ষায় অভ্যস্ত আমাদের কাছে বিসদৃশ ঠেকে। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয়দের ঐ ছিল রীতি। মা সরস্বতীর হাত-পাগুলোকে তাঁরা খণ্ড খণ্ড করতেন না, কী Science কী arts তাঁদের কাছে এক অখণ্ড জ্ঞানের প্রকাশরূপে প্রতিভাত হোতো। এটা ভারতবর্ষের—বৈদিক ভারতবর্ষের একটা বিশেষ রীতি। এই রীতিতে বিশেষভাবে অভ্যস্ত হয়ে তবে ভারতীয় শাস্ত্রগুলোর চর্চ্চা করা উচিত। তা না হলে ভারতীয় শাস্ত্রগুলোর ওপরের কাঠামোগুলোকে ধরা যাবে মাত্র, তাদের অন্তর স্পর্শ করা যাবে না।

সে যাই হোক, এখন আমার আলোচনার বিষয় হোলো কারক সম্বন্ধে পাণিনীর ধারণা। পাণিনী ব্যাকরণের হাব ভাব দেখ্‌লেই বোঝা যায় পাণিনীমুণির মতে ভাষা শব্দব্রহ্মের প্রকাশ। যে আইন কানুনে এই মায়াসৃষ্টি চলেছে তারই ছায়া প্রতিফলিত ভাষার মধ্যেও। ঠিক এই জিনিষটা অনুধাবন করেই কারক সম্বন্ধে পাণিনীর ধারণাটাকে আমাদের বুঝতে হবে। কারক একটি সংজ্ঞা। কিন্তু তাকে ব্যাখ্যা করবার জন্যে কোন সংজ্ঞাসূত্র পাণিনী প্রণয়ন করেন নি। এর কারণ তাঁর সুনিপুণ ভাষ্যকার দেখিয়ে গেছেন যে কারক কথাটাই একটা মহাসংজ্ঞা অর্থাৎ বড় সংজ্ঞা। টিখু প্রভৃতির মতো ছোটখাটো সংজ্ঞা নয়। তার কারণ কারক কথাটার মধ্যেই এর সংজ্ঞা লুকিয়ে আছে। কারক ব্যাপারটা কি না করোতি ইতি কারকম্‌। যে করে সেই কারক। এখন করা ব্যাপারটা কি, ক্রিয়া ব্যাপারটা কি ? সম্প্রসারিতকরুন আপনার অখণ্ড দৃষ্টি, চোখ মেলে তাকান এই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দিকে। বেদাম্যহম্‌ পুরুষং মহান্তং, আদিত্যবর্ণং ; তমসো পরস্তাৎ। অন্ধকারের পরপারে আদিত্যবর্ণ পুরুষ আর এ পারে মায়াময়ী প্রকৃতি বা ক্রিয়া। আদিত্যবর্ণ পুরুষ বিভক্ত হলেন মায়াময়ী ক্রিয়ার। এই বিভজনের মূলে যে ছয় উপাদানই কারক। যথা কর্ত্তা, কর্ম, অধিকরণ, অপাদান, সম্প্রদান ও করণ। এই বৃহৎ মায়াসৃষ্টির পরিকল্পনার সর্ব্বপ্রথমে কর্ত্তা ছিলেন হিরণ্যগর্ভ। কর্ম হোলো তার মায়া। হিরণ্যগর্ভ ও তার মায়ার যে আধার ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—তাই হোলো অধিকরণ। তারপর এই সমস্ত উপাদানের মধ্যে সংযোগসূত্র স্থাপনের জন্য, এ মায়াসৃষ্টিকে চলমান করবার জন্যে সৃষ্টি করলেন প্রাণরূপী উপাদানকে—যার উপস্থিতি ও অনুপস্থিতিতে ফুটে উঠ্‌লো মায়াময়ী ক্রিয়ার চলমান রূপ। এ উপাদানই সাধকতমম্‌ করণম্‌। তারপর হিরণ্যগর্ভ ও তার মায়া যখন নবতম সৃষ্টি করলেন তখন তাই হোলো সম্প্রদান। এই নবসৃষ্টি অন্যান্য উপাদানগুলির সহায়তায় নবতম সৃষ্টির উদ্ভব ঘটালেন। এই নবসৃষ্টিতে পূর্ব্বেকার হিরণ্যগর্ভ হয়ে গেলেন যতো বিলোপ অপাদানম্‌—যাইহোক, এইভাবে চল্‌তে লাগ্‌লো নব সৃষ্টির মহড়া। একের এক পল্লবিত হতে লাগ্‌লো এই উর্দ্ধশাখ অখণ্ডরূপী সংসার। তারপর যখন সম্পূর্ণ হোলো সৃষ্টি তখন কে ধরে এর ভেতরকার রহস্য। কিন্তু দৃষ্টি এড়াতে পারে নি ঋষির সন্ধানী দৃষ্টি। তিনি ঠিক খুঁজে বার করেছেন এর আন্তর রহস্য। কর্ত্তা, কর্ম, করণ, অপাদান, সম্প্রদান, অধিকরণ—পাণিনীর প্রত্যেকটি কথাই মহাসংজ্ঞা। গভীর এর রহস্য। যাই হোক যে নিয়মে এই বৃহৎ মায়াসৃষ্টি হোলো সে নিয়মের দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিয়ার মধ্যেও প্রতিফলিত। সেখানেও কর্ত্তা কর্ম প্রভৃতি ছ'টি উপাদান। এই হোলো কারক সম্বন্ধে পাণিনীর ধারণা। তবে ভাষার কর্ত্তৃত্ব, কর্মত্ব সম্প্রদানত্ব প্রভৃতির বিভেদে ঠিক কোথায় কোথায় হয়, তা বোঝাবার জন্যে অতগুলো করে সূত্রের প্রণয়ণ করেছেন। কেননা ভাষা জড় বস্তু নয়। বক্তার বিবরণ অনুসারে সে চলমান হয়ে উঠেছে। এ ব্যাপারটা আপনাদের খুব ভাল করে বোঝাতে পেরেছি কিনা আমি জানি না। হয়তো আমার ধারণার মধ্যে অনেক অস্পষ্টতা রয়েছে। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস কারক সম্বন্ধে পাণিনীর ধারণা এইটাই। অনেকে হয়তো বল্‌বেন প্রবন্ধে প্রথমে পাণ্ডিত্যের নিন্দা করে আমি নিজেই একটা বেদান্তী ব্যাখ্যা দিলাম। আসল ব্যাপারটা কি জানেন—বেদান্তই বলুন, ন্যায়ই বলুন, আর সাংখ্যই বলুন, সকলেরই মূল বিষয় একই। একই কথাকে বিভিন্ন ভাষায় বলা আর কি। আমি কিন্তু নিন্দা করেছি মস্তিষ্কের কসরতের। ঐ পবিত্র চিন্তাধারাগুলো যখন শুষ্ক পাণ্ডিত্যে রূপ নেয় তখন তার বিসদৃশ রূপটিকে পরিহার করবার প্রয়োজনীয়তার কথাই আমি লিখেছি।
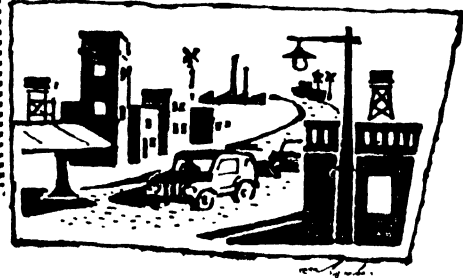
(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

অতুলও তাই ভাবছিল। ছোটবাবুর কথায় যেন একটু আন্তরিকতার সুর খুঁজে পায়। বলে ওঠে।—

—তাই দেখুন ছুটবাবু।

—ব্যোম ভোলানাথ!

হঠাৎ অন্ধকার পথটা কার হাঁকডাকে সরগরম হয়ে ওঠে।···ওরা থেমে গেল। লোকগুলোর মুখের কথা, ভাব সবই বদলে যায়। এগিয়ে আসে মূর্ত্তিটা। লম্বা লিকলিকে বেতের মত পাকানো শক্ত চেহারা, চোখ দুটো জলজল করছে। দ্রব্যগুণে ঈষৎ লাল। গলাটাও ফাটা বাঁশের মত।

হাঁক পেড়ে আসছে গোকুল নায়েক।—কিরে বাবা, পাতাল ফোঁড় শিব উঠেছে তুদের পাড়ায় শুনলাম। তা কই পেসাদ-টেসাদ কই? আন দিকি—

লোকগুলো জবাব দেয় না। গোকুল সোজা এসে শালঘরের বারান্দায় উঠতে যাবে—সামনেই আবছা আলোয় অশোককে ওই কাঠের চাকা ভাঙ্গার উপর বসে থাকতে দেখে একটু থমকে দাঁড়াল। রীতিমত অবাক হয়েছে সে।

—আপনি দাদা!

··স্তব্ধ বিস্মিত আতঙ্কগ্রস্ত লোকগুলো ওকে দেখে আরও ঘাবড়ে গেছে। গোকুলের দুটো চোখ যেন আঁধারে জলছে, শিকারী বিড়ালের মত শালঘরের একোণ ওকোণ এদিক সেদিক কাকে যেন খুঁজছে।

ঘরের মধ্যে সদরের সরকার মশাই দেওয়ালের সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটাকে এক নজর দেখেই ভয় পেয়ে গেছে সে—আর গলাটাও ওর তেমনি কর্কশ বাঁশফাটা আওয়াজের মত। রক্ত শুকিয়ে আসে। ভয় পেয়েছে কামারপাড়ার ওরা—ওকে এই সময় দেখে।

গ্রামের মধ্যে অকায-কুকাযে ওর জুড়ি আর নেই। যেমনি ধূর্ত তেমনি শয়তান—আর অকহতব্য নিষ্ঠুর ওই গোকুল। পুলিশের খাতায়ও নাম আছে—দাগী আসামী। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক বিশেষ কিছু সাজা তার হয়নি, কোন না কোন ফাঁক দিয়ে বার বার ওই উটরূপী মহাত্মা সূচের ফাঁক গলিয়ে এহেন স্বর্গরাজ্যে ফিরে এসেছে, আসন কায়েম করে রেখেছে। আজও এই সময় তারকরত্নের ওই বিশেষ অনুচরটিকে শিকারী বিড়ালের মত গোঁফ মেলে আসতে দেখে তারাও ভয় পেয়েছে। বিশেষ করে বিদেশী অতিথি ওই সরকার মশায়ের জন্যই তারা চিন্তিত। অশোককে দেখে দাঁড়িয়েছে গোকুল।

—অশোকও নেমে আসে—চল গোকুল! একটু এগিয়ে দেবে ওপাড়ায়। সাইকেলটা লিক হয়ে গেল। গোকুল যেন হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেছে। বলে—এ্যাই কেতো হারামজাদা, একটা লিক সারতে লাগে কতক্ষণ?

—দোকান বন্ধ করে দিইছি দাদা। কাল সকালেই সেরে দোব।

গোকুল গর্জন করে—আভি বানাও।—গোকুল চেপে বসে।

অশোক নেমে যায়। একটু কঠিন স্বরেই বলে—কাল সকালেই ও দেবে। চল গোকুল।

গোকুল পা পা করে এগিয়ে যায় অগত্যা। যাবার সময় পিছু ফিরে ওদের দিকে চাইতে ছাড়ে না। অতুল কামারের দিকেই একবার চেয়ে গেল। যেন নীরব চাহনিতে শাসাচ্ছে ওই দুর্বৃত্তটা—আবার আসবে দরকার হলে।

কথা কইল না অতুল।

গর্জন করছে এমো কালী—শানের হাতুড়ি দিয়ে কোন দিন বাসন পেটা করে দোব শালা মড়ুইপোড়া বামুনকে। কুমোরের ঠুকঠাক—কামারের এক ঘা। আমরক্ত বার করে দোব।

—চুপকর কেলে। ভুবন ওকে থামাবার চেষ্টা করে। কেমন যেন একটা দুশ্চিন্তার ছায়া মেনে আসে ওদের মধ্যে। রাত নামে—অন্ধকার তমসা-ঢাকা রাত্রি।

অতুল বলে ওঠে—সরকার মশাইকে বাড়ীতে নিয়ে যা ভুবন।

সরকার মশাই বের হয়ে আসে শালের ঘর থেকে। এরই মধ্যে বয়স্ক লোকটা যেন ভয়ে শুকিয়ে গেছে। টের পেয়েছে এদের বিরুদ্ধশক্তির—তারা সত্যিই শক্তিমান। এদের চেয়ে অনেক ধুর্ত কৌশলী তারা।

তারকবাবু নিজে দেখে গিয়েও চর পাঠিয়েছে। শুধু চর নয়—কুখ্যাত একটি মানুষকে তার সম্বন্ধে আরও তল্লাস নিতে।

...অতুল বলে ওঠে—ভুবন—একটু সজাগ থাকবি সবাই।

এমোকালী বলে ওঠে—আম্মোও আজ ইখানেই থাকবো মামা। বলিষ্ঠ তেজী যোয়ান,...ও থাকলে সকলেই যেন সাহস পায়। এমো বলে ওঠে—তোরা পথে এদিক ওদিকে নজর রাখিস। শালা অন্য কিছু যেন না করে।

...ভয় একটাই, কাছাকাছি আসতে সাহস করবে না, চড়াও হতেও পারবে না। অন্তত: আজ গোকুলও টের পেয়েছে—সামনাসামনি কিছু হবে না। যদি রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে এসে চরম আঘাত হানে সেই-ই ভয়।

সারা কামারপাড়ার তাই ভয়।

ছোট খানিকটা জায়গা, মাঝখান দিয়ে কয়েকটা সরু পথ, তারই উপর বাড়ী—ঘিঞ্জি একটার পর একটা খড়ো বাড়ী, চালে চালে ঠেকাঠেকি। খড়ের চাল—রোদে শুকিয়ে বারুদ হয়ে আছে। মাটিসই নোয়ানো খড়ের ছাউনি, কোন রকমে একবার একটা দেশলাই কাঠি ঠেকাতে পারলে আর রক্ষা নেই।

এদিক থেকে ওদিক অবধি ধারাল জিবে সাপটে সব নিয়ে নেবে। ইতিপুর্বে সেই সর্বনাশ ঘটেছেও কামারদের জীবনে। তাই ওইটাকে তারা বেশী ভয় করে।

আজ যেন তারাও একটা সংহত শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করে নিজেদের মধ্যে। মনের অতলে যে দুর্বার জ্বালা এতদিন অসহায় বিক্ষোভেই সীমাবদ্ধ ছিল, আজ তা কঠিন প্রতিবাদে ফেটে পড়ে।

আকাশের বুকে একটা তারা দপ্ দপ্ করে জ্বলছে।

কোথায় ডাকছে রাতজাগা পাখী।

হু হু হাওয়া বইছে—শীৎরাতের হিমসিক্ত হাওয়া।

কোথায় বনধারে ডাকছে দু একটা শিয়াল—কেমন বন্য আদিম সুরে।

গোকুল আর অশোক চলেছে।

গ্রাম নিশুতি। শীতের রাতে দরজা কপাট বন্ধ করে ইতিমধ্যে অনেকেই নিদ্রার আশ্রয় নিয়েছে। বাবুপাড়াটা গ্রামের অন্যান্য বসত থেকে একটু দুরে যেন ঘৃণায় ওই পাড়ার অধিবাসীরা ইতিজাতের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে তফাতেই রয়ে গেছে।

তার মাঝখানে তারকবাবুদের দিঘী একটা, তার পাড় দিয়ে কাঁকুরে এতটুকু পথ। তারার আলোয় ওরা দুজন চলেছে।

গোকুল মনে মনে কি ভাবছে।

তারকবাবুরই পোষ্য সে। তার সব ভার নিয়েছে তারকবাবুই। অশোককে শুধু মুখের খাতিরই করে মাত্র, ছেলেটা যেন গোঁয়ার কাঠখোট্টা—তাই খাতির নয়, ভয়ই করে তাকে।

আজ যেন হেরে গেছে গোকুল ওই অশোকের কাছে।

হঠাৎ দাঁড়াল গোকুল।

অশোকও যেন তৈরী ছিল। সরুপথটা আটকে দাঁড়িয়েছে।

—পথ ছাড়ুন ছুটবাবু।

—কেন ?

—একবার যেতে হবে।

—না। চল।

অশোক গম্ভীর স্বরে জবাব দেয়। তবু দাঁড়িয়ে থাকে লোকটা। আঁধারে চোখ দুটো জ্বলছে কি এক শ্বাপদ লালসায়। বলে ওঠে অশোক—

—ওদের সঙ্গে পারবি ?

ব্যাপারটা সবই ধরা পড়ে গেছে অশোকের কাছে।

যার এক কান কাটা সে ঢেকে ঢুকে পথের একপাশ দিয়ে যায়, আর দুকানই যার কাটা সে যায় পথের মধ্য দিয়ে মাথা উঁচু করে! এতক্ষণে গোকুল যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। হাসছে সে।

নীরব শ্বাপদ হাসি, তারার আলোয় উপচে ওঠে তার দুচোখ।

আঁধারে মিশিয়ে গেল লোকটা চকিতের মধ্যে নিঃশব্দ পায়ে।

একাই দাঁড়িয়ে থাকে অশোক।…

এগিয়ে আসছে বাড়ীর দিকে—পাশেই তারকরত্নবাবুর দেউড়িতে আলো জ্বলছে। দোতালায়, জীবনের ঘর থেকে রেডিওর সুর শোনা যায়।

কিছুদিন হ'ল জীবন একটা রেডিও কিনেছে তাই বাজছে—কেমন একটা মাদকতা-আনা আধুনিক চাঁদ-ফুলের সংমিশ্রণের গান, তেমনি তার সুর।

ওই অন্ধকারঢাকা বন—ওই নিদ্রামগ্ন দরিদ্র পল্লীর জীবনের সঙ্গে এর কোনখানেই কোন মিল নেই।

ঠিক জীবন তারকবাবুর মতই ওরা ভিন্ন শ্রেণীর পৃথক ; জীবনের আলোটা এগিয়ে আসতে দেখে দাঁড়াল ঝুপসি তেঁতুল তলায়।

হিমভরা কুয়াসা রাত্রি।

—বাহাদুর !

বাহাদুর আলো হাতে তাকে খুঁজতে চলেছিল, মুনিবকে দেখে দাঁড়াল।

—চল, ফিরে চল।

—জী। এত্না রাত হোগিয়া।

কথা কইল না অশোক, কি যেন ভাবছে।

হঠাৎ ঝোপের পাশ থেকে জ্বলন্ত দুটো চোখ মেলে কি যেন একটা সরে গেল—একটা শিয়াল। আলোয় জ্বলছে ওর দুটো চোখ।

গোকুলের কথা মনে পড়ে, ওর চোখদুটোও যেন অমনি জ্বলছিল।

অন্ধকারে চলেছে গোকুল গ্রামের প্রান্তে লাল কপিশ ডাঙ্গা পার হয়ে বনের দিকে। কাকুঁরে ডাঙ্গা, মাঝে মাঝে বনখেজুর আর অাঁচাড়ি লতায় ঝোঁপ ক্রমশঃ ঘনতর হয়ে উঠেছে, হেথা হোথা দাঁড়িয়ে আছে দুএকটা নির্জন সাথীহীন কেঁদগাছ—কালো পাতায় জমেছে রাতের অন্ধকার—কোথায় হুট্টি পাখার ডাক শোনা যায়। কয়েল আর বনতিতির ডাকছে।

গোকুল এগিয়ে চলেছে—ক্রমশ সমতল ছেড়ে একটা বনগড়ানী খুসের ভিতর নামলো। দুদিকে উচু ভাঙ্গা ক্রমশ আরও উচু হয়ে উঠেছে।

সরু খাদটা এগিয়ে চলেছে গভীরতর হয়ে বনের অন্তর প্রদেশের দিকে। দুপাশের গায়ে জন্মেছে সরু আর বিন্নাবাসের ঘনজঙ্গল, কোথায় মাথার উপরের আকাশ দেখা যায় না—মহুয়া কেঁদগাছের নীচে দিয়ে চলেগেছে—ওদের ঘন পত্রাবরণে আকাশটুকুও হারিয়ে আছে।

বনের বৃষ্টির জল নেমে নেমে ওর প্রসার বেড়ে গেছে, পায়ের নীচে মসমস করে ভিজে বালি কাঁকর—কোথাও জল ঝরণা ঝরছে ঝিরঝিরিয়ে। গোকুল একবার থামলো।

একটা শিয়াল ডাকছে।

অন্ধকার বনের গাছ পাতায় বিন্দু বিন্দু ঝরছে রাতের জমাট কুয়াসা—ক্রমশঃ উত্তর আসে খুলের ভিতর থেকে।

—কু—উ—উ!

গোকুল এপথে কি করে এল কে জানে, নিজেও জানেনা সে। এপথে যারা আসে তারাও প্রথমে বোধহয়

টের পায়না। বসতে চলতে হঠাৎ একদিন আনমনে আবিষ্কার করে কেমন যেন অনেক দূর এসেগেছে—আষ্টে-পিষ্টে জড়িয়ে গেছে এই জীবনের জালে—যা কাটিয়ে আর বেরুবার উপায় নেই। কেউ সহজে বাধ্য হয়েই মেনে নেয় এর পরিবেশ, কেউ বা মুক্তির চেষ্টায় আরও হার্কি পাক করে—মুক্তির পথ আর মেলেনা।

জড়িয়ে যায় সাফ নিবিড়ভাবে।

গোকুল অবশ্য দ্বিতীয় দলের নয়, সে সহজভাবেই মেনে নিয়েছে এটাকে। বাবা বসন্ত নায়েব ছিল গ্রামের পূজারী ব্রাহ্মণ—সতীশ ভটচায-এর মতই। কিন্তু সতীশ যেমন নানা পাকপ্রকারে জড়িয়ে থাকে—বসন্ত তেমন ছিলনা। নির্বিরোধী নিরীহ গোবেচারা লোক।

সামান্য যজমান যাচক নিয়েই থাকতো—আর দেবসেবার বাঁধি বন্দোবস্ত আছে বেনেদের শিব-মাঠে, দত্তদের মাঠের মন্দিরে—আরও দুচার জায়গায়। সকাল থেকে পূজো আশ্রা সেরে কোন রকমে যা পেতো তাই দিয়েই চলতো, গোকুলকে স্কুলে পাঠিয়েছিল—যদি ছেলেটা মানুষ হয়।

কিন্তু গোকুলের এসব ভালো লাগতো না।

হা'তেলায় ঈশ্বর কেওট বসতো ঝাঙ্গির ছকনিয়ে, কেমন ছবি আঁকা ছটা ঘর, আর ওর হাতে একটা চামড়ার কালো কৌটায় কয়েকটা ঘুঁটি।

এঘরে ওঘরে দান আড়ো—সিকি আধুলি টাকা—ঈশ্বরের ঘুঁটি কেমন চকিতের মধ্যে উলটে পড়েছে।

সকলেই অবাক। কোন ঘরেই দান ওঠেনি—উঠেছে যে ঘরে সেখানে কেউই আড়েনি কোন বাজী। মুঠো করে কুড়িয়ে নেয় ঈশ্বর করকরে রূপোর টাকা আধুলি সিকি গুলো।

পয়সা এত সহজে এইটুকুর মধ্যে পাওয়া যায়, এত গুলো টাকা কুড়িয়ে আঁচলে বেঁধে লোকটা ছক নিয়ে উঠে গেল।

চুপকরে চেয়ে দেখে গোকুল—ও যেন যাদুজানা।

ছেলেবেলা থেকেই দেখেছে বাবা দিনান্ত পরিশ্রম করেও দুবেলা খাবার জোটাতে পারে না।

ভাত—তাও গিলতে কেমন কষ্ট হয়। আতপচালের পিণ্ডি—তার সঙ্গে কচু, না হয় এর ওর বাড়ী থেকে সংগৃহীত সিদে বাবদ কাঁচকলা—বেগুন আলু দু একটা।

তাও অচল হয়ে উঠলো—বাবা হঠাৎ মারা যাবার পর থেকে। সবে পিতা হয়েছে—ন্যাড়ামাথায় আবার ক্ষুর বুলিয়ে বাপের শ্রাদ্ধশান্তি চুকিয়ে গোকুল যেন অকূলে পড়ে।

মা ছোট ভাই বোনদের কিই বা খাওয়াবে—বাবা যে শতছিদ্র সংসারের মাথায় কত বড় ছাতা ধরেছিল তা এতদিন টের পায়নি, এই বার পেয়েছে। যজমানরাও এই বিপদে এগিয়ে আসে।

মধুদত্তর বেলেতোড়ে বড় রাখি কারবার। বাড়ীতেও দেবসেবা বিগ্রহ আছে। সে বলে—পূজোটা একটু শিখে নাও গোকুল—আমার বাড়ীতেও তো বাঁধা পুরোহিত লাগে।

ইতিমধ্যে গোকুল কোন রকমে লক্ষ্মী পুজো ষষ্ঠীপুজো করতেশিখেছে, সকালেই হিহি শীতে স্নান করে চাদর গায়ে গ্রামের এমাঠ থেকে ওমাঠের বাথানে পুরোনো শিবমন্দির—এদিক ওদিকে কাদের ভিটে পুরীতে পরিত্যক্ত ভাঙ্গা মন্দিরে সঙ্গীহীন শিবঠাকুরের মাথায় তফাৎ থেকেই ফুল-বেলপাতা দুকণা আতপ চাল ছিটিয়ে বেড়ায়।

তাতেও যেন ভরাপেট দুবেলা আহার জোটেনা। সতীশ ভটচাযের কাছেও গিয়েছিল গোকুল।

—কাকা দেবপূজো—বিগ্রহ সেবা, শ্রাদ্ধ-শান্তিটা একটু যদি দেখিয়ে দেন।

সতীশ ভটচায এতদিন যেন মনে মনে এই চেয়েছিল, একবার বসন্ত নায়েক যেতে যা দেরী। তারপর এ গ্রামে সেইই হবে একছত্র অধিপতি। সব ঘর আসবে তার তাঁবে।

এসেছেও। গোকুলকে আসতে দেখে সতীশ অন্যমনস্ক জবাব দেয়—এ সংযমের কাজ বাবা। কুলপুরোহিত মানে তার বংশের মঙ্গল অমঙ্গলের দায়িত্ব সব তোমার হাতে। গুরুদায়িত্ব। এ বয়সে কি তা শোভা পায়! একটু বড় হও। তখন সব শিখিয়ে দিয়ে যাবো।

গোকুল ক্ষুণ্ণমনে বের হয়ে আসে।

শীর্ণ বিটলে লোকটা তখন বিরামহীন গতিতে হুঁকো টানছে দাওয়ায় বসে। মনে হয় হাতের ওই হুঁকোটাই কেড়ে নিয়ে ওর টাকপড়া মাথায় ঠুকে চুর করে দিয়ে আসে।

হঠাৎ একদিন যেন কথাটা কয়ে বসে গোকুল। নাকরে উপায় ও ছিল না।—মায়ের একজ্বরী ভাব—একনাগাড়ে বাইশদিন চলেছে। ওষুধও জেটেনি, পথ্য বলতে এক আধটু সাবু আর মিছরীর জল।

বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে গেছে।

সবদিকে চেষ্টা করেও পারে না গোকুল কোন কিছু ব্যবস্থা করতে:

হঠাৎ যেন সেদিন পথ পেয়ে যায়। সব জুটবে মায়ের—ওষুধ পথ্যি-সবকিছু।

…দত্তদের বাড়ীতে লক্ষ্মীপূজা করতে গেছে।

বৌরা এদিক ওদিকে কাযে ব্যস্ত—গিন্নীও কোথায় গেছে পূজোর ফুল আনতে, হঠাৎ কুলুঙ্গিতে রাখা একছড়া হারের দিকে চোখ পড়ে—বৌরা কেউ তাড়াতাড়িতে খুলে রেখেছে।

…হাত পা কাঁপছে।

মায়ের মুখখানা মনে পড়ে, দুদিন ধরে বাড়িতে ছোট ভাই বোনগুলোও একবেলা খেয়ে রয়েছে। পাড়াপ্রতিবেশীরাও কেউ দেবে না এক কণা চাল।

রোজকারের পথ আটকে দাঁড়িয়েছে সতীশ ভটচায।

কেমন যেন হয়ে যায় সে।

কোমরের কাছে দলামোচা পাকানো গোটহারটা একটা জ্বালাময় অনুভূতি আনে সারা অঙ্গে। পূজোয় মন বসে না।

বুড়ী গন্নী ওর দিকে চেয়ে থাকে। দরদভরা কণ্ঠে বলে।

—মায়ের শরীর ভাল নাই?

কথার জবাব দিল না গোকুল, দিতে পারে না। মাথা নাড়ে।

—অ'চ্ছা।

বুড়ির কণ্ঠে দরদ দেখা যায়।

কোনরকমে বের হয়ে আসে গোকুল। মনে হয় দুপাশের সবাই যেন ওরদিকে চেয়ে আছে, তীর সন্ধানী দৃষ্টিতে। হনহন করে বাড়ির দিকে ফেরে।

—গোকুল নাকি! অ গোকুল।

ছানু ডাকছে, কদিন তেলমশলার দাম বাকী পড়েছে তাদের দোকানে। গোকুলের দাঁড়াতে মন চায় না।

ছানুও ছাড়বার পাত্র নয়, লম্বা লম্বা পা ফেলে সামনে এসে ওর পথ আগলে দাঁড়িয়ে বলে ওঠে।

—বলি কথা কানে যেছে না? নিয়ে থুয়ে এখন আর যে চিনতেই পারো না ঠাকুর।

রোদে তেতেপুড়ে ফিরছে গোকুল, মাঝপথে ছানুকে এগিয়ে আসতে দেখে কেমন যেন মাথায় রক্ত উঠে যায়। কোমরে তখনও গোঁজা রয়েছে হার ছড়াটা।

গর্জে ওঠে গোকুল—গায়ে হাত দিবি না বেনে কোথাকার।

ছানু জবাব দেয়—আজ্ঞে না, গলায় গামছা দিয়ে শুধু টাকাটা আদায় করবো। বামুনের গায়ে হাত দিতে পারি হেই বাবা।

গোকুলের মাথায় যেন আগুন জ্বলে ওঠে।

—খবরদার। বৈকালেই তোর টাকা পাবি।

—হ্যাঁ। কথার যেন নড়চড় না হয় ঠাকুর।

গোকুল বৈকালেই নগদ সাত টাকা ওর নাকের উপর ফেলে দিয়ে আসে। পানু দাশ একটু অবাক হয়।

সবই জমা করে লোব হ্যাঁগো দাদা।

—হ্যাঁ।

ছানু দাস পাল্লা ধরে কাকে খোল ওজন করে দিচ্ছিল। একবার চাইল মাত্র। গোকুলের বড় বড় চোখদুটো জ্বলছে কি এক অসহ্য জ্বালায়। চুপচাপ উঠে বের হয়ে এল।

পরদিনই ব্যাপারটা অনেকেই জানতে পারে। গোকুলও।

তবু কেমন যেন ঢাক ঢাক গুড় গুড় ব্যাপার। সবাই জেনেছে অথচ মুখফুটে কিছু বলতে পারে না।

দত্তগিন্নী গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করে বলে ওঠে—

—অপরাধ নিও না বাবা, কর্তা সতীশ ভটচাযকে দিয়েই কাজকম্ম করাতে চান।

গোকুল কথার জবাব দিল না।

ওরা জেনে ফেলেছে, ছানুদাসের দোকানে কালই যে বকেয়া পাওনা মিটিয়ে দিয়েছে গোকুল, সে খবরও পেয়েছে ওরা।

তাই আর ব্যাপারটা নিয়ে ঘাটাঘাটি না করে ওরা এইখানেই চাপা দিয়ে সাবধান হয়ে গেল।

চুপচাপ বের হয়ে আসছে গোকুল, বারান্দার এদিক

ওদিকে ফিস্‌ফাস্‌ কথার শব্দ কাদের কৌতূহলী দৃষ্টি অন্তরাল থেকে এসে যেন গায়ে তীরের ফলার মত বিঁধছে।

এতদিন ওরা সামনে এসে বসেছে, পুজোর মন্তর শুনেছে, শান্তিজলও নিয়েছে পুণ্য কামনায়, একদিনের একটা কাযের মধ্যেই সেই দৃঢ় বিশ্বাস ওদের ভেসে—

বের হয়ে এল গোকুল।

বেলা হয়ে গেছে। সোনারোদ গেরুয়া হয়ে উঠেছে। ধূ ধূ কাঁপছে তীব্র রোদ গৈরিক প্রান্তরে। জনহীন পথ দিয়ে আসছে গোকুল।

তখনও কানে ভাসছে দত্তগিন্নীর কথাগুলো। এড়িয়ে গেল তাকে—বৌঝিরাও যেন আড়াল থেকে মন্তব্য করে—ঘৃণা করে তাকে। নোতুন এই গোকুলকে।

—শোন।

কোন্‌ বাড়ীর ছোট্ট মেয়েটা যাচ্ছিল, একলা পথে ওকে দেখে একটু চমকে ওঠে মেয়েটা!

কেমন বিবর্ণ হয়ে ওঠে ওর সুন্দর মুখ।

গলায় চিকচিক করছে সরু একটা হার—কানে দুল—হাতে দুটো ছোট্ট বালা।

মেয়েটা চকিতের মধ্যে দৌড় মারে।

কে যেন ছিনিয়ে নেবে ওর গহনাপত্র।

হাসছিল গোকুল ওর পালানো দেখে—হঠাৎ কেমন হাসি থেমে যায়।

পালালো মেয়েটা!

ছোট্ট মেয়েটার চোখে মুখেও কেমন একটা নিবিড় ঘৃণা আর আতঙ্কের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। তাকে সবাই ঘৃণা করে—ভয় করে।

ওই দত্তবাড়ীর গিন্নী-বৌ-ঝিরা সবাই—ওই সাধারণ ছোট্ট মেয়েটা অবধি।

থম্‌কে দাঁড়াল গোকুল।

…হাতে তখনও রয়েছে পিতলের ছোট্ট রেকাবিতে চাট্টি আতব চাল-বেলপাতা। পুজোর উপাচার—সেগুলো নিমিষের মধ্যে টান মেরে ফেলে দিল—পড়ল পুকুরের জলে।

ভারমুক্ত হল যেন সে—হন হন করে এগিয়ে চলে।

হঠাৎ হাসির শব্দে চমকে ওঠে।

বিজাতীয় কণ্ঠের হাসির শব্দটা নির্জন ছায়াঘন পুকুরপাড় ভরিয়ে তোলে। ঈশ্বর কেওট!

জুয়াড়ী ঈশ্বর দূর থেকে দাঁড়িয়েই সব ঘটনাটাই দেখেছে।…

হাসছে বুড়ো—শণ নুড়ির মত পাকা চুল, কিন্তু শরীর এখনও সতেজ, পেটা গড়ন। বয়সের ছাপ তাতে এতটুকুও পড়েনি। দাঁতগুলো দু একটা খসে পড়েছে অকালে—পুলিশের শাসনের চিহ্ন লেগে আছে ওইখানেই। দেহের আর কোথাও কোন শাসনের চিহ্ন ফুটে ওঠেনি—মনেও নয়।

—কি হল ঠাকুর!

…জবাব দিল না গোকুল, তেজী যোয়ান দুর্মদ ছেলেটা দাঁড়িয়ে আছে কর্কশ বন্ধুর প্রান্তরের শেষে উঁচু পুকুরের পাড়ের উপর। যতদূর নজর যায় কোথাও কোন ছায়ার চিহ্নমাত্র নেই, জ্বলে পুড়ে থাক হয়ে গেছে মাঠ—তপ্ত ভ্রান্ত প্রান্তর। চাওয়া যায় না। দামোদরের বিস্তীর্ণ বালুচরে হাজারো বিসপিল রেখায় নেচে চলেছে মহাদেবের ধ্বংস-দূতের দল।

…দূরে ক্রম-উচ্চ শালবনসীমা গিয়ে আকাশে মিশেছে—দিগন্তরে যায়। অসীম শূন্য জ্বালা-ভরা পৃথিবীর একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে গোকুল। হাসছে ঈশ্বর কেওট।

—সব ফক্কিবাজী ঠাকুর। দুনিয়ার সব ফক্কিবাজী।

কথা বললো না গোকুল—ক্লান্ত পরাজিত অপমানিত গোকুল বাড়ীর দিকে পা বাড়ায়।

দুপুরের রোদে দু-একটা কাক কর্কশস্বরে ডাকছে। জলভরা ডোবায় পড়ে আছে রোওয়াওঠা কুকুরগুলো—রোদের জ্বালা সইবার ক্ষমতা তাদের নেই, তাই কাদায় পড়ে আছে।

একটা কান্নার সুর ওঠে।

জীর্ণ দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল গোকুল।

মা তার পাপের বোঝকার খায়নি—এতদিন রোগভোগ করে অনাহারে বিনা চিকিৎসায় মারা গেল সে।

তখন গোকুলের কাছায় বাঁধা হারবিক্রী করার বাকী তেত্রিশ টাকা যেন কঠিন অস্তিত্বের মত জানান দিচ্ছে। পায়ে পায়ে বাড়ী ঢুকলো—শূন্য ধ্বসে-পড়া একটা ধ্বংসস্তূপে ঢুকলো অর্দ্ধমৃত একটি মানুষ।

রাত হয়ে গেছে।

তারাজ্বলা রাত! বনের বুকে শন্‌শন্‌ বাতাস বইছে।

সেই শীতের হিমবাতাসে ভেসে আসে হারানো অতীতের কথাগুলো।

সেই গোকুল লায়েক্ আজ কোথা থেকে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে।

শীত শীত করছে।

অন্ধকার খুলের ভিতর রাতের বন্দী বাতাস জলকণা-সিক্ত হয়ে শরীরের হাড় অবধি কাঁপিয়ে তোলে।

বিড়ি ধরাল একটা।

—কে!

—হঠাৎ হাতের আগুনটা দপ্ করে নিভিয়ে দেয় গোকুল।

—আমি গো লায়েকমশোয়। আমি পেতো।

গম্ভীর কণ্ঠে গোকুল যেন দলের আর সকলের কৈফিয়ৎ তলব করছে।

—সে শালারা কোথায়!

—সব্বাই আসবে বলেছে, তাইতো এইরো আস্মোও এলাম।

গর্জে ওঠে গোকুল—চুপ মেরে থাক শালা ভীম কোথাকার।

একটা পাথরের উপর বসে গোকুল চুপচাপ বিড়ি টানতে থাকে। অধীর আগ্রহে আরও কাদের আগমন প্রতীক্ষা করছে।

সব কেমন প্রথম থেকেই গোলমাল হয়ে গেছে। সব ভেস্তে দিয়েছে ওই অশোকবাবুই। কেমন যেন টের পেয়ে গেছে ওর মনের ভাব।

নিজেই খবর নিতে গিয়ে একটু বেকুবি করেছে আজ গোকুল।

হঠাৎ গোবরাকে আসতে দেখে আশাভরে চাইল গোকুল। কাসরে পাড়ার গোবর্দ্ধন কামার তার অন্যতম সাগরেদ—শুধু সাগরেদই নয়।

দলের মধ্যে ওর বিশেষ একটা কাম আছে যা আর কেউ পারেনা। যে কোন রকম তালাই হোক না কেন গোবরার হাতের ছোঁয়ায় তা যেন খুলে পড়ে। তালা যদি তেমন বেগড়বাই করে, দরজার মুড়শো শেকল উপড়ে ফেলতে তার মোটেই সময় লাগেনা। তাছাড়া আজকের ব্যাপারে গোবরাকে তার বিশেষ দরকার।

তবু কণ্ঠস্বর কঠিন করে বলে ওঠে গোকুল—

—শালা এতক্ষণ ছিলি কোথায়?

—খপর সপর সব নিতে হবেতো।

—পেয়েছিস? চিনে রেখেছিস লোকটাকে? সেই শালা সরকার ব্যাটাকে! গোকুলের দুচোখ জ্বলছে। তারকরত্নবাবুর বিশেষ কাষ এটা—এমন ওষুধ দিতে হবে এরপর যেন কোন মহাজন কারবারী এদিকে না ভেড়ে।

গোকুল অভয় দিয়েছিল তাকে—নিশ্চিন্ত থাকুন বড়বাবু, তিনি মহাজন তো আমরাই বা কমতি নাকি। মহাযম।

চুপচাপ বাড়ীর সামনের বাগানমত একটু ঠাঁই-এ পায়চারী করছে অশোক।...রাত কত জানে না।

আকাশের বুকে হাজারো তারার রোশনী, শালবন সীমার উপর দিয়ে তারার আভা লাগা ছায়াপথ ঊর্দ্ধাকাশ থেকে নেমে গেছে ওদিকে।

তারকবাবুর বাড়ীর আলো নিভে গেছে। সুপ্তিমগ্ন সারা গ্রাম। কেন জানেনা অশোকের ঘুম আসেনি।

কেমন একটা উত্তেজনায় মাথাটা দপ্ দপ্ করছে।

হঠাৎ আবছা অন্ধকারে কাদের আসতে দেখে একটু থমকে দাঁড়াল। এগিয়ে আসছে ছায়ামূর্তি কটা।

—কে!

—আমরা ছুটবাবু!

সামনে এসে দাঁড়াল অতুল কামার পিছনে আরও ক'জন। কে একজন নোতুন লোক সঙ্গে—ভয়ে কাঁপছে সে।

—কি ব্যাপার।

বয়স্ক লোকটা ভীতকণ্ঠে বলে—রাতের মত একটু আশ্রয় দেন বাবু, কাল সকালেই চলে যাবো। এমন জানলে ওখানে কে আসতো।

অশোক ঠিক বুঝতে পারে না ব্যাপারটা।

অতুল বলে ওঠে—সরকার মশাই। সদরের কানাই চক্রবর্তী মশায়ের লোক। বড়বাবুর ভয়ে এইখানেই রেখে গেলাম বাবু, উনিও ওপাড়ায় থাকতে চান না।

—বেশ তো। থাকুন। কোন ভয় নেই।

অশোক তাকে বাড়ার ভিতরে নিয়ে এল। লোকটা তখনও যেন ভয়ে কাঁপছে।

—বসুন।

একটু জল দেবেন ? খাবার জল।

নিজের হাতে অশোকই জল গড়িয়ে দেয়।

লোকটা জল খেয়ে এখানে নিরাপদ বোধ করে। অশোক বলে ওঠে—আপনি অকারণেই ভয় পেয়েছেন।

—হয়তো তাই-ই, কি জানেন, নোতুন জায়গা—আর এ জায়গার বদনাম আগেই শুনেছি।

—ওসব ভুল শুনেছেন। মানুষ এখানেও বাস করে।

—তা সত্যিই।

—লোকটা ওর দিকে চেয়ে থাকে।···চাকর কিছু দুধ আর কয়েকখানা রুটি গুড়—কিছু ছানা নিয়ে আসে।

—কিছু খেয়ে নিন, পাড়াগাঁ—এত রাত্রে কিইবা পাওয়া যায়।

—না, না। এই ঢের। কথাটা অশোকই বলে—যদি এরা মত দেয়—কারবার করতে পারেন। আর নিরাপত্তার জন্য সব ব্যবস্থাও হয়ে যাবে।

কর্কশ শব্দে শিয়ালটা সরঝোপের কাছেই ডাকছিল—হঠাৎ মানুষের সাড়া পেয়ে সরঝোপ ভেদ করে দৌড় মারে।—ওদিকে নজর নেই গোকুলের।

গোবরার মুখে কথাটা শুনে অতর্কিতে এক লাথি মেরেছে—ছিটকে পড়ে গোবরা খুলের জলের উপরই। ভিজে যায় পিঠ-গা। শীত রাতে আরও ঠাণ্ডা লাগে। গর্জাচ্ছে গোকুল—জলজ্যান্ত লোকটাকে নিয়ে গেল ছোট-বাবুর বাড়ীতে, আর তোরা দাঁড়িয়ে দেখলি! অসহায় কণ্ঠে বলে গোবরা—কি করবো। সঙ্গে এতগুলো লোক ছিল। এমোকালীর হাতে আবার একটা পাঁঠা বলি দেওয়া খাঁড়া।

বিকৃত কণ্ঠে বলে ওঠে গোকুল—কালীর হাতে খাঁড়া! ইতো তালপাতার খাঁড়া—

কথার জবাব দিল না গোবরা, পিঠের জল-কাদা মুছতে থাকে উঠে বসে। মনে মনে গোকুল ওই এমোকালীকে ভয় করে—দারুণ যোয়ান ছেলেটা—ও সব পারে।

—আজকের সব চেষ্টা ওরা বরবাদ করে দিল। শুধু তাই নয়—এমন একটি প্রতিপক্ষকে আজ কামারপাড়া দলে এনেছে যে তারকরত্নের চেয়ে কোন অংশে কম নয়—বরং বেশী জোরালো। তাকে চটানোও গোকুলের পক্ষে নিরাপদ হবে না।

চুপচাপ বসে থাকে। আঁধারে লোকগুলোও যেন আদিম বন্য জীবনের একটি বিভীষিকাময় ছন্দে মিলিয়ে গেছে।

নীলকণ্ঠবাবু সেই সন্ধ্যার পর থেকে কেমন যেন একটু হতাশ হয়েছেন। এতদিন বিদেশেই কাটিয়েছেন চাকরীর ব্যাপারে, সামান্য কেরাণী থেকে ক্রমশঃ ধাপে ধাপে উঠে-ছিলেন উপরের দিকে! কোনদিন কাযে ফাঁকি দেননি, আর কেউ কাযে ফাঁকি দেয় সেটাও তিনি সহ্য করতে পারেন নি।

তাই ধাপে ধাপে সুপারইনটেণ্ডেণ্ট পর্য্যন্ত উঠেছিলেন। সৎ ভাল মানুষ, তাই ওই পদ থেকে রিটায়ার করেছেন শুধু পেনসন আর গ্রাচুইটি নিয়েই। সদরে ছোট একটা বাড়ী করেছেন—ওই মাত্র।

পেন্সন—আর সামান্য ধানিজমি নিয়েই তৃপ্ত হয়েছেন। প্রীতি সদরে থেকেই পড়ে, ছুটি ছাটায় গ্রামে আসে!

—বাবাকে এবার এসে একটু মনমরা দেখে বলে ওঠে।

—দিনকতক সদরে গিয়েই থাকো বাবা, সারা জীবন সহরে শিক্ষিত সমাজে কাটিয়ে শেষ জীবন এই এদোঁ পাড়া-গাঁয়ে কি কাটাতে পারো ?

হাসেন নীলকণ্ঠবাবু—এইখানেই যে জন্মেছি মা।

—তাই এখানকার যত বাজে ঝামেলায় জড়াতে হবে, এমনওকি কথা আছে ?

—বাজে ঝামেলা ?

প্রীতি একটু জোরের সঙ্গেই জবাব দেয়—নয়তো কি ? কোথায় কোন বাবা ভৈরবনাথের সম্পত্তি কে খাচ্ছে—তোমার মাথাব্যথার কি আছে ? এতদিন যে ভাবে চলেছিল—সেই ভাবেই চলুক না।

—অন্যায়ের প্রতিবাদও করা যাবে না ?

—অন্যায় বলছে কে ? মাটি বাপেরও নয়—দাপের! তারকরত্নবাবুর দাপট আছে তিনিই ভোগ করবেন।

হঠাৎ কাকে ঢুকতে দেখে থেমে গেল প্রীতি। অশোক সাইকেলটা রেখে উঠে আসছে। প্রীতির কথাগুলো খানিকটা শুনেছিল। তারই যেন জবাব দিচ্ছে সে।

—চিরকাল ও দাপট চলেনা, একদিন তা শেষ হয়ে যায়। সেই ফুরিয়ে যাবার দিনও এসেছে।

প্রীতি ওরদিকে চেয়ে থাকে। অশোকের সারা দেহে একটা ঋজু কঠিন রুক্ষতা ছাপ। সহরের কমনীয়তা অনেক ঝরে গেছে! এম-এ পাশ করে গ্রামেই এসে বসেছে। ওর এই নিষ্ক্রিয়তা প্রীতির যেন ভাল লাগেনা।

বলে ওঠে—তাই তোমরা উঠে পড়ে লেগেছ সেই হারানো দাপট নিজেদের হাতে তুলে নিতে!

হাসে অশোক—ব্যক্তি বিশেষের হাতে কোন ক্ষমতা থাকবেনা প্রীতি—

—তবে?

—গণতন্ত্রে বিশ্বাসী কোন মানুষই তা সহ্য করবে না। সেই দিনই এসেছে।

প্রীতি কথার জবাব দিল না। ওর দিকে চেয়ে থাকে। নীলকণ্ঠবাবুই প্রসঙ্গটা বদলাবার জন্য বলে ওঠেন—

—এসো অশোক। ভাবছি ভৈরবনাথের কাগজপত্র নিয়ে একটা কমিটি—তৈরী করে সদরেই মামলা রুজু করি।

প্রীতি বাবার দিকে চেয়ে থাকে। ঝামেলায় যেতে দিতে তার মন চায় না। অশোকের জবাবের উপরই যেন খানিকটা নির্ভর করছে।

চুপ করে ভাবছে অশোক।

দিন বদলাচ্ছে। কয়েক বৎসরের মধ্যেই সবকিছু বদলে যাচ্ছে। যুদ্ধের ভাঙ্গন দেখেছে মন্বন্তরের করালরূপ, তারই মাঝে স্কুল কলেজ থেকে তারা দলবেঁধে এগিয়ে গেছে স্বাধীনতা সংগ্রামে—মুক্তি সংগ্রামে।

মানুষের জন্য—দেশের জন্য এমনি সংগ্রামও করেছে মানুষ চরম বিপদ আর দুঃখের মাঝে। আজ দেশ-স্বাধীন হবার পর। তারা উদগ্রীব হয়ে চেয়ে আছে কোথায় কখন কি ভাবে মানুষের বন্ধনমুক্তি।

বেঁচে থাকার একটা পরম সান্ত্বনা খুঁজেছে।

না এর মাঝে ওই মৃত পাষাণ ঠাকুরের অস্তিত্ব—তার বেঁচে থাকার প্রশ্নটা মনেও জাগেনি।

গতরাত্রেও দেখেছে একটি প্রবলপ্রতাপ মানুষের অত্যাচারের বিভীষিকায় রাতের অন্ধকারও তমসাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল।

আজও ওই সাধারণ মানুষের দল মাঠের মাঝে—কোন অসহ্য উত্তাপময় অগ্নিকুণ্ডের সামনে গত উত্তম অবস্থায় দুবেলা দুমুঠো খেয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে আপ্রাণ।

তার মাঝে ওই পাষাণ দেবতার বাঁচার প্রশ্নও ওঠেনি। বেচে থাকে থাকুন তিনি—তার জন্য এত চিন্তাকরার কারণ খুঁজে পায়নি অশোকের আজকের মন।

—চুপ করে রইলে যে?

নীলকণ্ঠবাবুর প্রশ্নে মুখতুলে চাইল অশোক। প্রীতি ওরদিকে চেয়ে আছে শুব্ধ দৃষ্টিতে। সারা বাড়ীতে একটা স্তব্ধতা।

মাঝে মাঝে খাঁচায় বদ্ধ পাখীটার কাকলি শোনা যায়।

বলে ওঠে অশোক—আপনার বাবা ভৈরবনাথের চেয়ে অনেক বড় সমস্যা আজ চারিদিকে রয়েছে।

একটু চমকে ওঠেন নীলকণ্ঠবাবু।

—মানে!

ভুল বুঝবেন না আমাকে। এমন দিন আসছে যেদিন এ একটা সমস্যাই হবে না।

অর্থাৎ।

—জমিদারী যদিন থাকে এসব কোন প্রশ্নই উঠবেনা। সেই দিনই আসছে কাকাবাবু। তাই বলছিলাম আপনার ভৈরবনাথের সমস্যার চেয়ে অনেক বড় সমস্যা চারিদিকে ছড়ানো আছে—

প্রীতি ওর দিকে চেয়ে থাকে। মুখে ওর একটা যেন স্বস্তির চিহ্ন। এর বড় কথাটা নীলকণ্ঠবাবু যেন বিশ্বাস করতে চান না—পারেন না। অবাক হয়ে ওরদিকে চেয়ে থাকেন।

উঠে পড়ে অশোক—এবেলা চলি, একটু বেরুতে হবে।

উঠে গেল অশোক।

নীলকণ্ঠবাবু আনমনে ফুরসিতে টান দিতে থাকেন।

কেমন সব মনের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে যায়, অশোক কি যেন বলে গেল। সব চলে যাবে। এত বিষয় সম্পত্তি প্রভাব প্রতিপত্তি সবকিছু।

যে মাটির উপর দাঁড়িয়েছিল এতকালের গ্রামীণ জীবন তার সংস্কৃতি সমাজ সব কিছু সেই মাটি, সেই সমাজ-ব্যবস্থা আমূল বদলে যাবে, ঠিক যেন ভেবে উঠতে পারেন না তিনি।

তারপরই বা কি হবে?

কেমন যেন একটা অন্ধকার যবনিকা তার এতদিনের অভ্যস্ত চিন্তাধারাকে বিভ্রান্ত করে তোলে।

—বাবা !

প্রীতির ডাকে মুখতুলে চাইলেন নীলকণ্ঠবাবু। প্রীতি ওইদিকে সহাস্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে—একি তামাক যে পুড়ে গেছে কখন। এখনও টানছ ওই ফুরসি। ওঠো-স্নান করবেনা ?

—হ্যাঁ! উঠছি।

হঠাৎ ঢোলের শব্দ কানে আসে। ঢোল বাজছে। শব্দটা কেঁপে কেঁপে ওঠে, কি একটা কঠিন ঘোষণার মত। যেন বাশগাড়ী দখল করছে কে এতদিনের সমাজ ব্যবস্থার ধ্বংশস্তূপের উপর।

নিঃশব্দ গ্রামসীমায় ঢোলের শব্দটা উঠছে।

আচমকা ওই শব্দে পাখপাখালিগুলো ও শান্তিনীড় ছেড়ে আকাশে ডানা ঝাপটে কলরব করে ওঠে।

নীলকণ্ঠবাবু যেন উদাস ওই আকাশের অন্তহীন মহাশূন্যের দিকে চেয়ে আছেন কোন ঝড়ের প্রতীক্ষায়।

ঢোল বাজছে লোহার পাড়ায়।

ঢোল আর সানাইও রয়েছে সেই সঙ্গে। যে সে সানাইদার নয়, পাতাজোড়া থেকে এনেছে স্বয়ং অবিনাশকে—পঞ্চাশটাকার কমে যে সানাই-এ ফুঁ দেয় না।

সেই অবিনাশের দলকে ও এনেছে, আর এনেছে গাবাল থেকে গোবিন্দ ডোমের ঢোল। মিষ্টি লোহার আয়োজনের কোন ত্রুটি রাখেনি।

এ গ্রামে একটি মাত্র কার্তিকই আসতো রমণ ডাক্তারের বাড়িতে—এবার মিষ্টি লোহার কার্তিক এনেছে এবং রবরবা করেই এনেছে।

দেখবার মত প্রতিমাও গড়েছে জলটোপ। লোকটার হাতের কাষ যেমনি সুন্দর, তেমনি পরিস্কার। রমণের ঠাকুর গড়ে এঅঞ্চলের ভূষণ ছুতার। ভূষণ সব ঠাকুরই গড়ে। মাটির সাজের দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী লক্ষী সরস্বতী সবই।

রমণ ডাক্তারের কার্তিকও সেই গড়েছে।

রমণ এই উপলক্ষ্যে গ্রামের মুখধরা কয়েকজনকে নেমতন্ন করে—অর্থাৎ রসাল এবং শাসাল রোগী এবং গ্রামের মাতব্বরদের হাতে রাখে একদিন তোড়জোড় করে খাওয়ায়।

অবনী মুখুয্যেও গ্রামের গুণতির মধ্যে একজন। লেখাপড়া অনেককষ্টে অর্থাৎ বাবার চেষ্টা এবং অটুট অধ্যবসায়ের ফলে শিখেছিল তাও পলাসডাঙ্গার হাইস্কুল অবধি এবং শেষ বেড়া ডিঙ্গোবার আগেই অবনীর পরমারাধ্য পিতৃদেব সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করার ফলে অবনী নিশ্চিন্ত মনে স্বস্থানে ফিরে আসে।

কিছু ধানিজমি এবং মধ্যস্বত্ব ধান এবং চালসাজা আদায় আছে তাতেই সংসার চলে, এবং অবনীর দিনকাটে গ্রামের সাতপাঁচ নানা ব্যাপারে মাথা গলিয়ে, বিশেষ করে মামলা মোকদ্দমার তদারক করে এবং গঙ্গাজলঘাটি রেজেষ্ট্রি অফিসে এ এলাকার জমি কওলাদার এবং গ্রহীতাকে জানি চিনি দিয়ে।

সকালেই একবার পোষ্টাপিসে যাবে চিঠির খোঁজে।

অবশ্য কোনদিনই চিঠি এতাবৎ বড় একটা এসেছে বলে কানাই এর জানা নেই, আসে একখানা করে তারকরত্নবাবুর নামে হিতবাদী কাগজ, তাই বগলদাবা করে চটি পায়ে গ্রামে ঘুরে বেড়ায়, মদনের চায়ের দোকানে বসে কাচা শালপাতায় গরম চপ—পিঁয়াজবড়া দুএকটা খায় আর চা গেলে, তারপরই এগোয় তারকরত্নবাবুর বৈঠকখানার দিকে, হাটবারের দিন তার কর্মব্যস্ততা বাড়ে।

একজন কিষাণকে নিয়ে অবনী নিজে যায় হাটে ; চার আনার বখরাদার সে হাটের জমিদারই বলা যেতে পারে, সেই জমিদারীতে দখল জানান দিতে যায়। আর তরকারীওয়ালাদের সঙ্গে মুলো—কচুশাক কুমড়োর তোলা নিয়ে বচসা সুরু করে, তারপরই বের হয়ে পড়ে পৈত্রিক প্রচেষ্টায় পলাশডাঙ্গায় অর্জিত সেই মহামূল্য বিদ্যার ধ্বংসাবশেষ।

—ননসেন্স, ষ্টুপিড—ব্লাডি।

এ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা, তার থেকেই কমবয়সী তরকারীওয়ালি কোন মোড়লবৌ নাম দিয়েছিল—বেলাডিবাবু।

অবনী মুখুয্যের ওই যোয়ান মেয়েটার হাসিভরা স্বরে বেলাডিবাবু ডাকটা মন্দ লাগেনি। ওর দিকে চেয়ে থাকে।

ছায়াঘন মন্দিরের পাশেই ঘাসঢাকা একফালি সবুজ ঠাঁই ওপাশে মহিষা দিঘীর টলটলো জলের মতই একটা নিটোল পূর্ণতা ওর দেহে, গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে এসেপড়েছে কিশোরী মেয়েটার মুখেগালে এক ফালি রোদ।

ঝগড়াবচসা থামিয়ে অবনী মুখুয্যে ওর দিকে চাইল।

আমাকে ডাকছিস ?

হাসছে খিলখিলিয়ে মেয়েটা—হ্যাগো বেলাডিবাবু! বেলাতি লেবানা ?

ঝুড়িতে এনেছে ও গাছপাকা বিলাতী বেগুন, কেমন লাল নিটোল সিঁদুরে রং এর ফল গুলো। অবনী মুখুয্যে এগিয়ে এসে ওর বাজরা থেকে তোলা নেয়—বেশী নয় কয়েকটী মাত্র।

কি যেন একটি দুর্বলতম মুহূর্তেই তাই নামটা বহাল হয়ে গেছে অবনীর বেলাডিবাবু।

অবশ্য তাতে মুখুয্যের কিছু আসে যায় না।

মরিচকাটা চাষীদের সঙ্গে তার বচসা আজও বাধে। ওরা জানে এর পরই বাবু হাঁক পাড়বে ননসেন্স ইষ্টুপিড —ব্লাডি।

এহেন অবনী মুখুয্যে অনেক যত্নে রাখা একখানি কাঁচি ধুতি আজ কুঁচিয়ে পদ্মফুলের মত ইঞ্চিপাড় ধুতির কোচাটিকে মেলেধরে পাঞ্জাবী আর ছড়িহাতে বের হয়েছে নেমতন্ন খেতে।

নেমতন্ন অবশ্য দু-জায়গাতেই হয়েছে ; মিষ্টি লোহারও এসেছিল সকালে। বিনীতভাবে প্রণাম করে হাতযোড় করে মিষ্টি।

অবনী ওর দিকে চেয়ে অতীতের দিনগুলো মনে করতে থাকে। আজও যেন তা একেবারে হারায়নি। ঝরে পড়ার আগেও শুকনো ফুলের মিষ্টি এতটুকু সৌরভের মত তা লেগে রয়েছে ওর অঙ্গে অঙ্গে। মানিয়েছে চমৎকার একটা ডুরে নোতুন শাড়ীতে।

—একবার পায়ের ধুলো দিতে হবে বিলাতীবাবু।

হাসে অবনী—গলা নামিয়ে অবনী আজও রসিকতা করবার লোভ সামলাতে পারে না।

—ও তোর ঘরের একোণ ওকোণ ঝাঁট দিলেই অনেক পাবি মিষ্টি।

মিষ্টি ওদিকেই গেল না। একটু সংযত কণ্ঠে বলে—ঠাকুরের মানসিক করেছি। পঞ্চজনের আশীর্ব্বাদও চাই কিনা।

অবনী ওর দিকে একটু অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। সেই স্বৈরিণীর কণ্ঠস্বর যেন এ নয়। একটু চুপ করে থেকে বলে ওঠে অবনী—তা যাবো বই কি ! নিশ্চয়ই যাবো।

প্রণাম করে বের হয়ে গেল মিষ্টি।

অবনী হাসতে গিয়ে চুপ করলো। মিষ্টি লোহারণীও মানসিক করছে আজকাল। কেমন যেন হাসি আসে। উর্বশীর আবার বিয়ে—রম্ভার আবার সংসার। হাসি আসে। হেসেছিলও। একবার ব্যাপারটা তলিয়ে দেখতে হবে। অবনীর পুরোণো কাসুন্দি-ঘাঁটার অভ্যেস চিরকালেরই। তাই আরও উৎসাহ নিয়ে চলেছে অবনী মুখুয্যে সাজ-গোজ করে। ওখান থেকে ফিরবে রমণের ওখানে। খাওয়া-দাওয়া হতে রাত্রি হবে—আরও অনেকেই জুটবে ওখানে। তাই শেষ আড্ডা ওখানেই জমিয়ে রাতে ফিরবে।

শীতের আমেজ এরই মধ্যে চেপে বসেছে। বিকাল হতে না হতেই সন্ধ্যা নামে। ধান বোঝাই গাড়ীগুলো আসছে ধুলো উড়িয়ে খামারের দিকে, সবে তো সুরু এই উৎপাত—এইবার চলবে সারা অগ্রহায়ণ মাস পুরো—পৌষের মাঝ অবধি।

ধোঁয়াটে আকাশ—কুয়াসার ঘন আবরণ আর ধুলো যেন একত্রে মিশে রয়েছে বাতাসে।

অবনীবাবু পুরোণো আমলের শালখানা যত্নে পাট করে কাঁধে ফেলে ছড়ি হাতে চলেছে। দামী কাজ করা শাল—ওই পাট করেই কাজ চালিয়ে আসছে—পাট খুলে ফেললেই বিপদ, শাল বোধ হয় কয়েক ফালি মাফলারে পরিণত হয়ে খুলে পড়বে।

বেনেদের দোকানের সামনে অনেক আশ-পাশের গ্রামের খদ্দের রয়েছে। এখনকার সবারই অবস্থা ভালো, বিশেষ করে এই কয়েক মাস। শিমুল ফুল ফোটার আগে পর্য্যন্ত—অর্থাৎ ফাল্গুন মাসের সঙ্গে সঙ্গেই আবার ভাত উঠবে, ধরে ঘরে সেই হা হা অবস্থা।

কথায় বলে—শিমুলের ফুল ফুটলো।
ঘরের ভাত উঠলো।

এখন ক'মাস দোকানে ঢোকা যাবে না। দু-হাতে পয়সা কুড়োবে পানু দাস। শাঁখারীর করাতের মত চালাবে। ধান কেন এক দামে, চলতা করালি বস্তা শুক্‌নো বাদ, সেখানে তো রইলই। তারপর আছে জিনিষ বিক্রীর পড়তা। গমগম করছে ব্যবসা। লক্ষ্মীর আটন।

—দোকানের সামনে দিয়ে চলেছে অবনীবাবু মশমশ পেটেণ্ট লেদারের তোলা জুতো ডাকিয়ে, হাতে হরিণমুখো ছড়ি।—ছানু দাস কেরোসিনের টিন কাটছিল বাইরে—হঠাৎ ওকে দেখেই একটু অবাক হয়ে যায়।

ছানুর মুখের লাগাম নেই, যা তা কথা আর রসিকতা করা তার সহজাত ধর্ম। ওকে দেখেই হেঁকে ওঠে—পেন্নাম হই অবনীবাবু। তা ইদিকে? এই মু আঁধারি বেলায় এত সেজে-গুজে?

—অবনীবাবু আপ্যায়িতই বোধ করে, দু-পাঁচখানা গাঁয়ের লোকের সামনে এই বেশ-বাস খাতিরও সকলকে দেখাতে চায়। জবাবটা কি দেবে ভাবছে।

ছানু দাসই বলে ওঠে—তা ময়ুরটো কুথা ছেড়ে এলেন আজ্ঞা?

—মানে?

অবনীবাবু যেন অন্য কিছুর সন্ধান পায় ওর কথায়। একটু মেজাজেই বলে ওঠে। কি বলছিস তুই?

সহজাত বিনয়ের সঙ্গে ছানু জবাব দেয়। বলছিলাম মিষ্টিদিদির কার্তিকের মতই লাগছে কিনা, তা ফারাক শুধু ওই মোউন পোড়াতেই; আপনার আজ্ঞা গোটাটাই ছেড়ে গেইচে।

—ছেনো! অবনী মুখুয্যে চটে উঠেই ধমক দেয়।

হাসছে লোকগুলো মুখ টিপে, ছানুদাস বেশ গম্ভীর, ভাবেই কেরাসিন-এর টিন কেটে চলেছে। এ সময় কথা বাড়ানো ভালো নয়।

জ্বলছে অবনী মুখুয্যে—বড় বেড়েছিস না?

চলে যাচ্ছিল হঠাৎ নিভু নিভু প্রদীপ উস্‌কে দেয় ছানু।

—ও আজ্ঞা, ফুলল তেলের টিনতো কাটলাম, একটু জামায়, কাপড়ে একটুন বাস ছিটিয়ে লিয়ে যান কেনে। মো মো করবেক।

ঘুরে দাঁড়াল অবনী মুখুয্যে—আবছা অন্ধকারে বোঝা যায়, মোম মাজা শুঁচলো গোঁফ দুটো খাড়া হয়ে উঠেছে রাগি বিড়ালের মত, নাগালের মধ্যে থাকলে হাতের ওই হরিণ-মুখো ছড়ি নির্ঘাৎ ছানুর পিঠেই পড়তো।

একটু থেমেই সরে গেল অবনী মুখুয্যে। জুতোর শব্দ অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

হাসিতে ফেটে পড়ে ছানু। কে বলে ওঠে—ভালো পুজো করেছে মিষ্টি লোহার, গুটা গাঁয়ের লুক হুমড়ে পড়েছে। বাবু ভায়দের সব্বাইকে তো দেখলাম যেতে। বড়বাবু এখনও যায়নি নারে?

ছানু জবাব দেয়—যাবে বৈকি, তবে গভীর জলের মাছ তো, একটু রাত করে চার ঠোকরাবে।

বাঁশীর সুর শোনা যায়। কেমন যেন ব্যাকুল একটি শূন্য কান্নার মত সুর।

সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালা হয়ে গেছে—বেজে গেছে তুলসী-তলায় মঙ্গল শঙ্খ। গোধূলির শেষ আলো মিশিয়ে গেছে আকাশ কোলে, নেমেছে সন্ধ্যার অবগুণ্ঠনবতী তমসাময়ী রাত্রি।

ঠাইটা ভরে উঠেছে হেসাক-এর আলোয়। সামিয়ানা টাঙ্গিয়েছে মিষ্টি—বড়বাবুর বাড়ী থেকে এনেছে বড় সতরঞ্চ, ফরাস পেতেছে।

সাজিয়েছে ঠাঁইটাকে দেবদারু পাতা দিয়ে,

—বাঃ grand ঠাকুর এনেছিস মিষ্টি। fine.

অবনীবাবু ঠাকুরের দিকে চেয়ে থাকে, মনে মনে তারিফ না করে পারে না—ছানু ঠিকই বলেছিল। দেখবার মত কার্তিক করেছে মিষ্টি, কেমন টানা টানা চোখ—সরু গোঁফ, বিরাট এক ময়ুরের উপর বসা মূর্তি, মায় ধুতিটিও কোঁচানো—হাতে ধরে রয়েছে ফুলটা।

—কে করেছে রে ঠাকুর? ভূষণার হাতের তো এ কাজ নয়?

মিষ্টির মুখ ফুটে ওঠে সলজ্জ হাসির আভা। সামনেই লোকটাকে দেখায়।

—ও করেছে।

—তোর জলটোপ!

—মিষ্টি লোহার কথা বলেনা, লোকটার দিকে চাইল।

নিরাসক্ত বিচিত্র ওই লোকটা। লালপরবের দিন বাড়ীতে লোকজন মানী-ব্যক্তিরা পায়ের ধুলো দিয়েছে, একটু ছিমছাম থাকবে তা নয়, সেই মুনিষ মাঙ্গেরের মতই একটা আধময়লা হাফসার্ট পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তার পাশে মিষ্টি লোহারের এই দামী শাড়ী দু একখানা গয়না কেমন যেন বেমানান ঠেকে। বলে কয়েও পারেনি ওকে মিষ্টি।

হাসে লোকটা ওর কথায়।

—বেশ রইছি। আবার ভদ্দর লোক সাজা কেনে বাপু।

—লোকে কি বলবে? বলে ওঠে মিষ্টি লোহার। কথাকইলনা লোকটা; লোকের দেখা না দেখায় তার যেন কিছুই আসে যায় না।

অবনীবাবু লোকটার দিকে চেয়ে থাকে।

সত্যি জলটোপই বটে, কি যেন নেই পুঁজির লোক। মিষ্টির মন পেল কি করে ভাবা যায় না। অবনী মুখুয্যে জানে মিষ্টির মনের তল নেই। এককালে সে—সে কেন তারকবাবু অবধি এই বাড়ীতে পায়ের ধুলো দিয়েছে, কিন্তু তবু মিষ্টিকে বাঁধতে কেউ পারেনি।

সে উধাও হয়েছিল। ফিরে এসেছে সঙ্গে ওই লোকটা।—সেই আজ মিষ্টির মনের সবটুকু জুড়ে বসেছে, কি যেন ভাবছে অবনীবাবু।

—আবছা অন্ধকারে সুরটা উঠছে। সানাই বাজাচ্ছে অবিনাশ বায়েন।

ছোকরা—কালো কুচকুচে গড়ন। মাথায় একরাশ কোকড়ানো চুল। দু-চোখ বুজে বাঁশীতে ফুঁ দিচ্ছে—পিছনে বসেছে পোঁধার; মাঝে মাঝে ওপাশের তলের সানাইদারকে ছাড়িয়ে উঠছে তার নিপুণ ফুঁয়ে জয়জয়ন্তীর বিস্তার। ফরাসে বসে পড়েছে বাবুরা।

—একবার দাঁড়িয়েই চলে যাবো মনে করে এসেছিল অনেকে, তাদের আটকে ফেলেছে অবিনাশ তার সুরের মায়ায়।

বিষ্টুপুরের ঘরে রেওয়াজ করেছে দীর্ঘ দিন, ওর বাপও সানাইদার ছিল। কিন্তু অবিনাশের জ্ঞান আর রেওয়াজ এ এলাকার সব সানাইদারকে ছাড়িয়ে গেছে।

[ক্রমশঃ

ভালোবাসা সম্পর্কে উনি

মলয় রায়চৌধুরী

"কোনো নারীর কাছে যাচ্ছো?
সঙ্গে একটা চাবুক নিয়ে যাও।"

এই ধরণের কথা শুনে কেবল প্রেমিকবৃন্দই নন, পাঠকমাত্রই চম্‌কাবেন। কিন্তু বিশ্বাস করুন, কথাগুলো আমার নিজের নয়। ওঁর। ওঁকে চেনেন নিশ্চয়ই? উনি উনিশ শতকের দার্শনিক—ফ্রাইদরিখ নীৎশে। প্রেম ভালোবাসা-রমণী সম্পর্কে ওঁর বিধ্বংসী মতবাদ ওই দুটি লাইনে-ই শুধু ব্যক্ত করেননি নীৎশে। আরও বলেছেন আরো জোরদার, আরো চমকপ্রদ। শুনুন তবে।

উচ্চস্তরের ব্যক্তিরা কি-করে যে প্রেম করে বিয়ে-করে, তা ভেবে পাইনে—হিরোরা বিয়ে করেছে চাকরাণীদের, প্রতিভাবানরা বিয়ে করছে দরজির মেয়েকে! শোপেনহাওয়ার [ইনিও একজন প্রখ্যাত দার্শনিক] কিছুই জানতনা; প্রণয় কোনো ক্রমেই সুপ্রজনন-সংক্রান্ত নয়; যখন কোনো লোক প্রেমে পড়ে তখন তাকে তার নিজের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে দেওয়া উচিত নয়; প্রেম-ও করব আবার বুদ্ধিও বজায় রাখব, এদুটো একসঙ্গে হয়না। আমাদের উচিত প্রেম যারা করে, তাদের অঙ্গীকারকে অবৈধ ঘোষণা করা, আর আমাদের কর্তব্য হল আইন বলে প্রেমজ বিয়েকে অস্বীকার করা। যারা সর্বোৎকৃষ্ট তাদের পাত্রীও বাছতে হবে ভালো দেখে; ভালোবাসা পাদন নয়, উন্নতিও বটে। বিয়ে: তাই আমি বলব—দুজনের সৃষ্টি করা ইচ্ছে এমন আরেকটি যা ওই দুজনের চেয়েও বড়ো।

নীৎশে কি বলেন তা আরও শুনুন—

জন্ম ভালো না হলে আভিজাত্য অসম্ভব। কেবল মেধা থাকলে মহৎ হওয়া যায় না, তার সঙ্গে আরেকটা জিনিসের দরকার। সে জিনিসটি হল রক্ত। ওসব নীতির অম্লরসে জারিয়ে মহান-ব্যক্তি তৈ করা যায়না, কেননা মহানদের কাছে ভালো খারাপ কিছুই নয়, তা ও-সবের অতীত। গণতন্ত্র এবং খৃষ্টধর্ম হল মেয়েলীপনা [মেয়েলীপ কথাটা ওর খুব প্রিয়]। ও'তে পুরুষতা নেই; সেই জন্যে নারী সব সম পুরুষের মতো হবার চেষ্টা করে। কারণ যে-লোকটার মধ্যে পুরুষ আছে সে নারীকে সর্বদা নারীর মতো করে দেখে। ইবসেন আবা বিমুক্ত নারীত্বের কল্পনা করেছিলেন! নারীকে নাকি সৃষ্টি করা হয়েছি পুরুষের কব্জি থেকে। বন্ধনমুক্ত হয়েই নারী তার ক্ষমতা এবং প্রতিপ হারিয়েছে। বোরবোনদের কালে মেয়েরা যে-পোজিশান উপভোগ কর তা আর আজকাল কোথায়? পুরুষ ও রমণীর মধ্যে সাম্য অসম্ভ কেননা যুদ্ধ তাদের মধ্যে শাশ্বত। এখানে বিজয়ী না হলে শান্তি নেই শান্তি তখনই আসে যখন একজন অথবা অন্যজন স্বীকৃত প্রভু। মহিলাদে সাম্য দেওয়ার চেষ্টাটা ভয়ঙ্কর; তারা কখনই ও নিয়ে সন্তুষ্ট থাক

সত্যিই পুরুষ হয়। সবার ওপরে, তাদের পূর্ণতাপ্রাপ্তি এবং আনন্দ নির্ভর করে মাতৃত্বে। নারীর মধ্যে সব কিছুই প্রহেলিকা, আর নারীর সব কিছুরই স্রেফ একটা উত্তর আছে : এর নাম হল সন্তানোৎপাদন। রমণীর কাছে পুরুষ শুধু নিমিত্তমাত্র ; উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে সন্তান। তাহলে পুরুষের কাছে নারী কি? কেন......একটি ভয়ঙ্কর খেলনা। মানুষকে তৈরী করতে হবে যুদ্ধের জন্যে এবং মানুষীকে সেই যোদ্ধার চিত্ত বিনোদনের জন্যে। বাকী সব কিছু ভুল। তবু, পূর্ণনারীই হল শ্রেষ্ঠতমা, এমনকি পুরুষের চেয়েও শ্রেষ্ঠ—যদিও, তার দৃষ্টান্ত খুব কম। কিন্তু রমণীদের প্রতি কেউই যথেষ্ট নম্র হতে পারেনা।

এখানেই থামতে পারেননি নীৎশে আরো এগিয়েছেন—

সোশ্যালিজম্ এবং এনার্কিজম্ ও প্রেম করার মতো এক ধরণের মেয়েলীপনা, যখন কোনো পুরুষ পরিণয়ের উদ্দেশ্যে একজন রমণীর প্রেম যাচ্ঞা করে তখন সে তার সমস্ত পৃথিবী মহিলাটিকে দিতে চায় ; বিয়ে করবার পর সে তা দেয়ও। কিন্তু সন্তান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষের উচিত ওই জগতটির কথা ভুলে যাওয়া ; প্রেমের পরার্থবাদ পরিবারের অহংকারে বদলায়। সদাচার অথবা নতুন কিছুর প্রবর্তন করা জিনিসটা হল কৌমার্যের বিলাসিতা। উচ্চস্তরের-দার্শনিক চিন্তা প্রসঙ্গে বলা চলে যে, বিবাহিত পুরুষ মাত্রেই সন্দেহভাজন। এটা আমার একেবারে আশ্চর্য লাগে যে, যে-লোকটা সমস্ত অস্তিত্বের বিচারের দায়িত্ব নিয়েছে —সে কিনা শেষকালে পরিবারের বোঝা মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়াবে, তাও আবার রুটি, নিরাপত্তা কিংবা ছেলেমেয়েদের সামাজিক স্থানের কথা ভেবে মরবে। ছেলেমেয়ে হবার পর অনেক দার্শনিকেরই মৃত্যু ঘটেছে। বাতাস বইলো—'এসো'! আমার দ্বারও খুলে গেল, বলল, 'যাও'! অথচ আমি সন্তানের প্রেমে মশগুল রইলাম।

দেশকে গড়ে তুলতে হলে, নীৎশে বলে চলেছেন, চাই আভিজাত্য, চাই নেপোলিয়ানদের মতো মানুষ। সমাজে অভিজাতদের বজায় রাখতে হবে, ভালোবেসে প্রেম করে তাকে নষ্ট করে দিলে চলবেনা। চলো আমরা মহান হই, অথবা কোনো মহান-এর যন্ত্র কিংবা দাস হই, আহা কি সুন্দর সেই দৃশ্যগুলো, যখন হাজার হাজার য়ুরোপবাসী নেপোলিয়ানের জন্যে প্রাণ দিলো—হাসতে হাসতে, গান গাইতে গাইতে, গণতন্ত্র নামক ওই "নাক গোনবার ম্যানিয়াটাকে" একেবারে দূর করে দিতে হবে। ওতেই মানুষ প্রেম, ভালোবাসা, সাম্য, মৈত্রী এইসব শেখে। মানুষ কখনই সমান হতে পারেনা। সমান বলে আমাদের মধ্যে কিছুই নেই। প্রকৃতি আমাদের মধ্যে সাম্য রাখেনি, সে চায়— ব্যক্তি, সমাজ, শ্রেণী আর প্রাণীদের মধ্যে পার্থক্য বজায় থাকুক। সমাজতন্ত্রবাদ জিনিসটা জীববিজ্ঞানসম্মত নয়। দোকানদার, খৃষ্টধর্মী, গরু, নারী, ইংরেজ, আর গণতন্ত্রবাদীরা সব এক জাতের। ইংরেজ তো কেবল ফরাসীদের মনটাকেই বিগড়ে দেয়নি, পুরো য়ুরোপীয় সংস্কৃতিকে নষ্ট করে দিয়েছে। আরো বহুকিছু মিলে খারাপ করেছে সংস্কৃতিটাকে। সংস্কৃতিতে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছিল যখন জার্মানী হারিয়ে দিয়েছিল নেপোলিয়ানকে, কিংবা যখন লুথার হারিয়ে দিয়েছিল চার্চকে। এর পরেই জার্মানী যতো গোটে, সোপেনহাওয়ার আর বিটোফেনকে জন্ম দিয়েছে, এবং "দেশপ্রেমিকদের" পুজো করতে আরম্ভ করেছে। প্রোটেষ্টাণ্টরা আর বিয়ার, এই দুটো জার্মান বুদ্ধিকে ভোঁতা করে দিয়েছে। এখন প্রয়োজন জার্মান এবং স্লাভ জাতির মিলন। আর তার সঙ্গে দরকার পৃথিবীর বিখ্যাত টাকার জোগানদার ইহুদীদের। তাহলেই পৃথিবীর রক্ষাকর্তা হওয়া সম্ভব হবে।

নীৎশে-র মতে, পৃথিবীর নিয়ম হচ্ছে নিচুস্তরের প্রাণী, জাতি, শ্রেণী, অথবা ব্যক্তিকে ব্যবহার করে উচুস্তর বাঁচবে। সমস্ত জীবনটাই কেবল শোষণ আর শাসন। বড়ো মাছেরা ছোটো মাছদের ধরে ধরে খাবে— এইটাই তো নিয়ম, এখানে আবার প্রেম ভালোবাসা কিসের। শেষ এবং মুখ্য নীতি হচ্ছে জীববিজ্ঞানসম্মত। জীবনে মূল্যায়ন দেখেই সমস্ত জিনিসের বিচার করতে হবে। প্রকৃত মানুষ, অথবা গোষ্ঠি, অথবা প্রাণীর সুপ্রমাণ হচ্ছে শক্তি, সামর্থ্য, ক্ষমতা। একবিন্দু রক্ত ব্রেণের মধ্যে পৌঁছে গিয়ে এমন কষ্টের কারণ হতে পারে যা প্রমেথেয়াস-এর থেকেও বেশী যন্ত্রণা দেবে। যেমন লোক যেমন ভাবনা—তার সবকিছুই তেমন হবে। ভাত খেলে বৌদ্ধ তৈরী হবে, অথচ জার্মান দর্শন হল বিয়ার-এর ফলাফল।

এ-পর্যন্ত কেবল নীৎশে-র জবানীতে তাবৎ বৃত্তান্ত অবগত হওয়া গেল। এখন তাঁর নিজের বিষয়ে কিছু জানা প্রয়োজন।

এই দার্শনিক ভদ্রলোকের জন্ম হয়েছিল প্রশিয়ায়। বাবা ছিলেন মন্ত্রী এবং মা পিউরিটান। মা গোঁড়া খৃষ্টধর্মী হলেও, মাত্র আঠারো বছর বয়সেই নীৎশে তাঁর বাবা-মা'র ভগবানে অবিশ্বাস আরম্ভ করে দিলেন, এবং তারপর সারা জীবন কাটিয়ে দিলেন নতুন এক দেবতার খোঁজে; তিনি মনে করে ছিলেন যে তাঁর লেখায় যে-একটি মহান ব্যক্তি-র' কথা তিনি লিখেছেন অতঃপর তার মধ্যে দেবত্ব আরোপ করা সম্ভব। তেইশ বছর বয়সে তাঁকে সৈন্যদলে নাম লেখাতে হয়। কিন্তু ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়ার ফলে তিনি এমন আঘাতপ্রাপ্ত হন যে, তা থেকে তাঁকে ফিরে আসতে হয়। অতঃপর তিনি ব্যক্ত করেছেন যে, জীবনের ইচ্ছে কেবল অস্তিত্ব বজায় রাখার মধ্যে প্রকাশ হয়না, হয় যুদ্ধের ইচ্ছেয়—উইল টু ওয়ার, উইল টু পাওয়ার, উইল টু ওভারপাওয়ার। তদানীন্তন সমাজের স্বরূপ তাঁকে খুব বেশী বিব্রত করেছিল। গুঁদাল এর মতো উনিও ঘোষণা করলেন : একটা দ্বন্দ্বযুদ্ধ নিয়ে আমি সমাজে প্রবেশ করছি। পরে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হল সঙ্গীতের যাদুকর। রিচার্ড ওয়েগনার-এর সঙ্গে যার চিন্তাধারা নীৎশে-র ওপর প্রচণ্ড প্রভাব ফেলেছে মহিলাদের সম্পর্কে আর বিশেষ করে প্রেম সম্পর্কে তাঁর অমন মতবাদের উদ্ভব কি করে সম্ভব হল তা বলা মুস্কিল। তবে, প্রেমে উনিও যে পড়েননি তা নয়। কিন্তু লোও সালোমে নামের মহিলাটি সে-প্রেমকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনেনি। আর এই জন্যেই বোধ হয় নারীর ওপর উনি এমন গরম মেজাজের। এর পর থেকে তাঁর সব লেখাতেই প্রায় রমণীদের বিরুদ্ধে উক্তি। আসলে নীৎশে ছিলেন একটু রোমাণ্টিক প্রকৃতির

কোমলতার প্রকৃতির। কোমলতার প্রতি তাঁর যুদ্ধ তাঁর নিজের কোমল প্রকৃতির জন্যেই। এক কোমলতাই তো তাঁর নিজের হৃদয়কে এমন এক আঘাত দিয়েছিল যা কখনো ঠিক হয়নি।

এ-সময় থেকে উনি একা থাকাই পছন্দ করতে লাগলেন। একাকীত্বের জন্যে চলে গেলেন ইতালী, ইতালী থেকে আল্পস এর নীল উচ্চতায়। এখানেই সৃষ্ট হল তাঁর আলোড়নসৃষ্টিকারী বই 'দাস্ স্পেক জারাথুস্ত্রা।' বইটার প্রথমাংশ ছাপতে দেরী হয়, কারণ প্রকাশকের ছাপাখানায় তখন পাঁচলক্ষ পুস্তিকা ছাপা হচ্ছিল। পরবর্তী অংশ তিনি নিজেই প্রকাশ করেন। চল্লিশখানি কপি বিক্রি হয়েছিল; সাতটি উপহার দেওয়া হয়েছিল; একজন প্রাপ্তি স্বীকার করেছিল; কেউই গুণগান করেনি। একাকীত্ব সত্যিই ভদ্রলোকের ছিল।

নিজের সম্পর্কে নীৎসে সর্বদা সচেতন। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন যে এমন দিন আসবে—যখন লোকে বলবে হাইনে এবং নীৎশে জার্মান ভাষায় মহান শিল্পী। নীৎশের লেখা পড়লে মনে হবে যে সব কিছুর বিরোধিতা করতে তাঁর যেন ভালো লাগত, পাঠকের সংস্কারাচ্ছন্ন মনের ওপরে চাবুক লাগাতে তাঁর আনন্দ। নীৎশে যেন রোমান্টিক আন্দোলনের সন্তান। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন: একজন চিন্তাবিদের পক্ষে সর্বপ্রথমে কি প্রয়োজন? তার উত্তর উনি নিজেই দিয়েছেন, বলেছেন: সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ কাজ হল। নিজের সময়কে অতিক্রম করা, "সময়হীন" হয়ে যাওয়া। চিন্তার বিরুদ্ধে সহজাত প্রবৃত্তির প্রশংসা, সমাজের বিরুদ্ধে ব্যক্তির মহিমাগান ইত্যাদি সত্যিই তাঁর নিজের সময়কে অতিক্রম করেছে। তাঁর রোমান্টিক প্রকৃতি আরো ভালভাবে বোঝা যায় তাঁর লেখা চিঠিগুলো থেকে। হাইনের চিঠিতে যতোবার "আমি মৃতপ্রায়" কথাটি এসেছে। প্রায় তেমনই বারেবারে নীৎশের চিঠিতে দেখা যাবে "আমি যন্ত্রণাত" শব্দটিকে।

নীৎশের সমস্ত জীবন শুধু দুঃখের। হয়ত কয়েকজনও যদি তাঁর লেখার প্রশংসা করত, তাহলে শেষ বয়সের অপ্রকৃতিস্থতাকে তিনি এড়িয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু গুণগান যখন আরম্ভ হল তখন আর সময় নেই। শেষকালে চোখের শক্তিও তাঁর গিয়েছিল। মৃত্যুর একবছর পূর্বে ১৮৮৯ এর জানুয়ারীতে হঠাৎ একদিন পথের মাঝে অজ্ঞান হয়ে যান। জ্ঞান ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে নিজের ঘরে প্রচুর চিঠি লিখে ফেলেন।

তার মধ্যে একটি কোসিমা ওয়েগনারকে উদ্দেশ্য করে লেখা: "আরিয়াদ্নে, আমি ভালোবাসি তোমায়"।

চিঠিগুলো পেয়ে বাইরের পৃথিবী যখন তাঁর সাহায্যার্থ এগিয়ে এল, অন্ধ নীৎশে তখন নিজের কনুই দিয়ে পিয়ানোর ওপর আঘাত করে চলেছেন এবং গেয়ে চলেছেন গান।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল তাই নীৎশের চাবুক নিয়ে-যাওয়া প্রসঙ্গে বলেছেন যে, নীৎশে জানতেন—দশজন রমণীর মধ্যে নজন ওই চাবুকখানি কেড়ে নিত; কেড়ে নেবার ক্ষমতা তাদের মধ্যে আছে।

Friedrich Nietzsche: Thus spake Zorathustra, The Birth of Tragedy, Thoughts Out of Season' Human All Too Human, The Dawn of Day, The Joyful Wisdom, Beyond Good and Evil, The Geneology of Morals, The Case of Wagner, The Twilight of the Idols, Antichrist, Ecce Homo. The Will to Power. [নিৎশেকে জানতে হলে Beyond Good and Evil এবং The Will to Power প্রথমে পড়াই ভালো]

সমস্বার্থের প্রেরণা ও এশিয়া আফ্রিকা অর্থনৈতিক সম্মেলন

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত এম, এ

পশ্চিম ইউরোপে, এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় তিনটি বারোয়ারী বাজারের পরিকল্পনার কথা আমাদের অনেকেরই হয়ত জানা আছে। ঐ বাজারের সুযোগ নিয়ে কতকগুলো দেশ অর্থনৈতিক সংহতি গড়ে তুলেছেন। ফলে এশিয়া এবং আফ্রিকার অন্তর্গত দেশগুলো স্বভাবতঃই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ইউরোপীয় এবং আমেরিকান বারোয়ারী বাজারের পিছনে দুটো প্রধান উদ্দেশ্য রয়েছে। প্রথম উদ্দেশ্য হল উৎপাদনের পড়তা খরচ হ্রাস করা। দ্বিতীয়তঃ যাতে চেষ্টা করেছেন। সুতরাং এই দুটো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বারোয়ারী বাজারের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলো যদি নিজেদের মধ্যে বুঝাপড়া করে বাইরে থেকে আমদানীকৃত পণ্যের দাম হ্রাস করেন তাহলে এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগুলো বিশেষ করে অনুন্নত দেশগুলো এককভাবে নিজেদের বাঁচাতে পারবেন কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এশিয়া এবং আফ্রিকা থেকে চা, তৈলবীজ, এবং বিভিন্ন ধরণের কাঁচা মাল ইউরোপ এবং আমেরিকার বাজারে আমদানী করা হয়। এক

এবং আফ্রিকার দেশগুলো শেষপর্য্যন্ত একটা অর্থনৈতিক সম্মেলনে মিলিত হয়েছেন। যদি দেশগুলো পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে রপ্তানীযোগ্য পণ্যের ন্যূনতম দর ঠিক করে দিতে পারেন, তাহলে তাঁরা ইউরোপীয় এবং আমেরিকান বারোয়ারী বাজারের উদ্যোক্তাদের চক্রান্তের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারবেন। এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগুলোর অর্থনীতি সম্পর্কে কলিকাতার দি ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা মন্তব্য করেছেন "The Secret for common factors has apparently intensified. foremost among them are a common fear of the effects of economic blocks in Europe and Latin America and the worsening of trade with the industrial countries."

মাত্র অল্প কয়েক বছরের মধ্যে চীন এবং ভারতে শিল্পের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে। তবে এশিয়া এবং আফ্রিকা এই দুটো মহাদেশে জাপান হলেন একমাত্র দেশ—যেখানে আধুনিক শিল্পের সবচাইতে বেশী উন্নতি চোখে পড়ে। অবশ্য এই এলাকার অন্যান্য দেশে প্রচুর কাঁচামাল, কৃষিপণ্য এবং বিভিন্ন প্রকার খনিজ সম্পদ রয়েছে যদিও দেশগুলো ঠিক শিল্পোন্নত নয়। এখানে আমরা কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি। আফ্রিকা মহাদেশের নানা এলাকা থেকে একদিকে যেরকম বনজসম্পদ সেরকম অন্যদিকে অর্থকরী ফসল বাইরে রপ্তানী করা হয়। প্রশ্ন হতে পারে, অর্থকরী ফসল বল্লে কি বুঝায়। এখানে আফ্রিকার অর্থকরী ফসল হিসাবে কোকো, তুলা, তৈলবীজ ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। জানা গেছে, এই মহাদেশের উত্তরে বিরাট এলাকা জুড়ে খনিজ তৈল রয়েছে। এছাড়া রোডেসিয়ার হীরকখনি এবং আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলে কয়লা ও স্বর্ণখনি আছে। এগুলোকে নিঃসন্দেহে জাতীয় সম্পদ বলা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে ভারত, পাকিস্থান, ইন্দোনেশিয়া এবং সিংহলের চা-শিল্পের কথাও উল্লেখ করছি। পৃথিবীর বহুদেশে চাহিদার একটা বিরাট অংশ ভারত, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া এবং সিংহলের চা দিয়ে মেটান হয়ে থাকে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব-এশিয়ার নানা স্থানে প্রচুর পরিমাণে রূপা, দস্তা, চিনি এবং পেট্রোল পাওয়া যায়। আরব এলাকার খনিজ তৈলও উল্লেখ করার মত। এইভাবে এশিয়া এবং আফ্রিকা মহাদেশের সম্পদের বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু দুঃখের কথা হল এই যে, এই সম্পদের সদ্ব্যবহার করা হয়নি এবং নিকট ভবিষ্যতে সদ্ব্যবহার করা সম্ভবপর হবে কিনা বলা শক্ত। অথচ ঠিকভাবে সম্পদের ব্যবহার হলে জাতীয় উন্নতির মাত্রা বেড়ে যেত। কাজেই প্রশ্ন উঠেছে, কেন সম্পদের সদ্ব্যবহার সম্ভবপর হয়নি। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে প্রথমে শিল্প এবং বাণিজ্যের ধারা বিবেচনা করতে হবে। দেখা যবে শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পরমুখাপেক্ষিতার দরুণ এশিয়া এবং আফ্রিকার অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর সম্পদের সদ্ব্যবহার বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। এছাড়া সম্পদের সদ্ব্যবহারের পথে প্রাচীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অন্যতম প্রধান অন্তরায় হিসাবে দেখা দিয়েছে। অবশ্য আরো এমন কয়েকটা অন্তরায় আছে, যেগুলোর ফলে এশিয়া এবং আফ্রিকার অর্থনৈতিক উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ এখানে আমরা গোটা তিনেক অন্তরায়ের কথা বলছি। প্রথম অন্তরায় হচ্ছে মূলধনের অভাব। দ্বিতীয়তঃ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি পাওয়া যায় না। তৃতীয় অন্তরায় হল উপযুক্ত কারিগরের অভাব। যদি দেশগুলো পরস্পর পরস্পরের সাথে সংযোগিতা করেন তাহলে অন্তরায়গুলো খুব গুরুতর হতে পারবেনা এবং অবস্থার বেশ কিছুটা উন্নতি হবে বলে আশা করা যেতে পারে।

বেশ কিছুদিন ধরে আমরা লক্ষ্য করে আসছি, আফ্রিকায় ফ্রান্স এবং বেলজিয়ামের অধিকৃত যে সব অঞ্চল আছে এবং যে সব অঞ্চল সম্প্রতি পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তিলাভ করেছে—সে সব অঞ্চলকে পক্ষপাতিত্ব মূলক সুবিধা দেবার নীতি অনুসৃত হচ্ছে। এর উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়। ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের পরিধি বিস্তৃত করার চেষ্টা চলেছে। যদি ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের উদ্যোক্তাদের চেষ্টা সফল হয় তাহলে এশিয়া এবং আফ্রিকার গোটা অর্থনীতি বিপন্ন হয়ে পড়বে। কেন বিপন্ন হয়ে পড়বে সেটা একটু চিন্তা করলেই বুঝা যাবে। আফ্রিকার যে সব দেশ ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের মাতব্বরদের কাছ থেকে পক্ষপাতিত্ব মূলক সুবিধা পাচ্ছেন তাঁদের সাথে আফ্রিকার অন্যান্য দেশের যোগসূত্র স্বভাবতঃই ছিন্ন হয়ে যাবে। তাছাড়া ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের সভ্যরা পক্ষপাতিত্বমূলক সুবিধাভোগী আফ্রিকান এলাকায় দেশজ সম্পদ ও কাঁচামাল নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করবেন এবং অন্যান্য অনুন্নত দেশকে কোনঠাসা করতে চাইবেন। অন্যদিকে এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগুলোর সম্মুখে বাণিজ্যবাহী জাহাজের বৈদেশিক মালিকরা আবার ক্রমাগতভাবে দুরূহ সমস্যা সৃষ্টি করে চলেছেন। ঐ সমস্যার সমাধান করতে না পারলে জাতীয় উন্নতি নিঃসন্দেহে ব্যাহত হবে। এশিয়া এবং আফ্রিকার সমস্ত দেশ বৈদেশিক বাণিজ্যবাহী জাহাজের জন্য একদিকে ইউরোপ এবং অন্যদিকে উত্তর-আমেরিকার উপর কতটা নির্ভর করে আছেন সে সম্পর্কে নূতন করে কিছু বলার নেই। সমস্ত দেশ বলা বোধ হয় ভুল হবে, কারণ এই ব্যাপারে জাপান আত্মনির্ভরশীল বলে মনে হচ্ছে। এখানে আমরা এশিয়া এবং আফ্রিকার অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর যে গুরুতর অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি সে অসুবিধাটি হল এই যে, বৈদেশিক বাণিজ্যবাহী জাহাজ-কোম্পানীগুলো বৈষম্যমূলক হারে চড়া মাশুল আদায় করে থাকেন। ফলে এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগুলো ক্ষতি এড়াতে পারেননা। অর্থাৎ চড়া মাশুলের দরুণ বাইরের বাজারে পণ্যের দাম বেড়ে যায়। ফলে স্বাভাবিক লেনদেন বাধাপ্রাপ্ত হয়। সোজা কথা হল এই যে, এশিয়া এবং আফ্রিকার শিল্প, এবং আমদানী, রপ্তানী ও বন্টন সম্বন্ধীয় ব্যবসায়ে বিদেশীদের প্রভাব খুব বেশী। কাজেই একদিকে যেরকম অর্থনৈতিক সংহতি গড়ে তোলা যাচ্ছেনা সেরকম অন্যদিকে কর্ম্মসংস্থান সমাধান দুরূহ হয়ে উঠছে।

এশিয়া এবং আফ্রিকা মহাদেশে যে ধরণেরকাঁচামাল উৎপন্ন হয় কিম্বা

যে ধরণের খনিজ সম্পদ আহরিত হয়ে থাকে, শিল্পের ক্ষেত্রে সে ধরণের কাঁচামাল কিম্বা সে ধরণের খনিজ সম্পদের অপরিহার্যতা সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। অথচ এ যাবৎ ঐ কাঁচামাল এবং খনিজ সম্পদ কাজে লাগাবার জন্ত উপযুক্ত প্রচেষ্টা হয়নি। অবশ্য এ সম্পর্কে আমরা আগেই আভাষ দিয়েছি। হয়ত একথা ঠিক যে, কোন কোন দেশে কয়েকটা কলকারখানা আছে। কিন্তু এগুলোর সংখ্যা নগণ্য। তাই কাঁচামাল এবং খনিজ সম্পদ বিদেশীদের কাছে বিক্রি করা ছাড়া উপায় নেই। ফলে এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগুলো অসুবিধাজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে বাধ্য হন। অর্থাৎ আমরা বলতে চাইছি, যখনই দেখা যায়, আন্তর্জাতিক দর নিম্নমুখী হতে চলেছে কিম্বা নিম্নমুখী হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে তখনই বিদেশী ক্রেতারা দলবদ্ধ হয়ে দর হ্রাস করে দেন। সুতরাং এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগুলোর কপালে ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই জোটেনা। এই ক্ষতির পরিমাণ ও গুরুত্ব কতখানি সে সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত এশিয়া আফ্রিকা অর্থনৈতিক সম্মেলনের পিছনে অনেকগুলো উদ্দেশ্য রয়েছে। তবে প্রধানতম উদ্দেশ্য হল একটি। অর্থাৎ এশিয়া এবং আফ্রিকা এই দুটো মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে যাতে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে নিবিড়তম সম্বন্ধ স্থাপিত হতে পারে সেজন্ত উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। এ সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ করার জন্ত সম্মেলন ডাকা হয়েছে। কলকাতার দি ষ্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকা একটা সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলেছেন "Closer economic co operation and mutual help have been part of the aspirations of the newly independent Afro-Asian countries, at least since the Bandung confernce, whether they are nearer to realization of these objectives is still doubtful. The obstacles seem over-whelming" সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায়, তেইশটি দেশ এশিয়া আফ্রিকা অর্থনৈতিক সম্মেলনে সরকারীভাবে প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন। এছাড়া মোট ত্রিশটি দেশের নেতৃস্থানীয় শিল্প-ব্যবসায়ী-সম্মেলনে যোগদান করেছেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাথে সংশ্রব রয়েছে এমন কয়েকটা সংস্থাও সম্মেলনে পর্যবেক্ষক পাঠিয়েছেন। এক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, এশিয়া আফ্রিকা অর্থনৈতিক সম্মেলনটি খুব গুরুত্বপুর্ণ। শেষ পর্যন্ত সম্মেলনের ফলাফল কি দাঁড়াবে সে সম্পর্কে এশিয়া এবং আফ্রিকার প্রত্যেকটি দেশে কৌতুহলের অন্ত নেই। কেন কৌতূহলের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে সেটা বুঝতে হলে গোটা এশিয়া এবং আফ্রিকা মহাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামো বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। গোটা এশিয়া এবং আফ্রিকা মহাদেশে শিল্পের দিক থেকে মাত্র তিনটি দেশ মোটামুটিভাবে উন্নত। অর্থাৎ আমরা চীন, জাপান এবং ভারতের কথা বলছি। এই তিনটি দেশ ছাড়া অন্যান্ত দেশগুলোতে শিল্পের উন্নতি উল্লেখযোগ্য নয়। এমনকি কয়েকটা দেশ একেবারেই অনুন্নত। তাই বলে ঐ সব দেশে-বিভিন্ন প্রকার শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা কম, একথা বলা চলেনা। তাছাড়া এশিয়া এবং আফ্রিকার যে সব দেশে শিল্পের ক্ষেত্রে কিছুটা উন্নতি চোখে পড়ে সে সব দেশে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করা কষ্টকর হয়ে পড়েছে, যদিও উৎপাদনের পরিমাণ সামান্ত। এইসব কারণ বশতঃ এশিয়া এবং আফ্রিকার সমস্ত দেশের মধ্যে নিবিড়তম অর্থনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। মনে হচ্ছে, যদি দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেন চলার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা হয় তাহলে মোটামুটিভাবে তিনটি সুফল পাওয়া যাবে। প্রথমতঃ অনুন্নত এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোর পক্ষে চাহিদা অনুযায়ী পণ্য সংগ্রহ করা কষ্টকর হবেনা। দ্বিতীয়তঃ ভারত, চীন এবং জাপানে উৎপন্ন পণ্যের বিক্রয় বেড়ে যাবে। তৃতীয়তঃ এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগুলোর প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতি রেখে কৃষি এবং খনিজ পণ্যের লেনদেন বৃদ্ধি পাবে। সোজা কথা হল—শেষপর্যন্ত এশিয়া এবং আফ্রিকার সমস্ত দেশ লাভবান হবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। তাছাড়া "The New Delhi conference has once again revealed the feeling of insecurity in trade which the advanced countries have a duty to allay by adopting constructive and liberal policies."
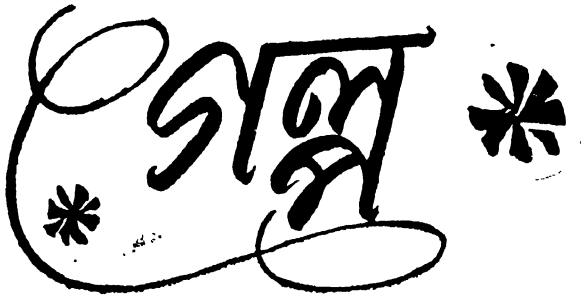
বিকেলের রঙ

শ্রীমঞ্জুষ দাশগুপ্ত

'হ্যাঁ, আট আনার দুটো টিকিট দিন।'

চশমার আড়ালে বুকিং ক্লার্কের চোখ দুটি বড়ো হয়ে উঠলো। যুবকটির দিকে তাকিয়ে একমুঠো বিস্ময় ছুঁড়ে দিলেন—'কোথায় যাবেন ঠিক করেন নি?'

'না, আট আনায় যতদূর যাওয়া যায় ততদূর যাব। গন্তব্য সেই ষ্টেশনই।'

গন্তব্য স্থলের নাম করেই লোকেরা টিকিট কেনে—কিন্তু এ যে একেবারে উল্টো। ভদ্রলোক শ্রীরামপুরের দুটি টিকিট দিয়ে আরেকবার জরিপ করলেন যুবকটিকে। যুবকটি 'কিউ' থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো।

'বাব্বা, এত দেরী হোলো কেন তোমার? দুখানা টিকিট করতে এতক্ষণ লাগে?' সুপ্রিয়া চোখ দুটি একবার ছোট এবং তারপর বড় করে প্রশ্নটা তুলে ধরলো ইন্দ্রনীলের দিকে।

ইন্দ্রনীল হাসলো। বললো, 'তোমার প্ল্যানটার জন্যেই এত দেরী। তবে সকলের তাক লেগে গেছে। খানিকক্ষণ তো আমি ওদের দ্রষ্টব্য হয়ে থাকলাম।'

সুপ্রিয়া উচ্ছ্বাস ঝরালো—'দেখলে তো…'

ইন্দ্রনীল সুপ্রিয়ার হাতটাতে একটা ছোট্ট চাপ দিয়ে বললো—'তোমার কৌতুকী মনটার জন্যেই তো তোমায় ভালোবাসি এত।'

হাওড়া ষ্টেশনের সমস্ত কোলাহল কোথায় মিশে গিয়েছে। সুপ্রিয়ার কানে বাজছে শুধু ইন্দ্রনীলের কথাটি। কি বলবে সে ঠিক করতে পারলো না। গাল দুটিতে একটুখানি পলাশের আভা।

হাঁটতে হাঁটতে ইন্দ্রনীল প্রশ্ন তুললো—'চুপ করে রইলে যে! কিছু বলবে না?'

প্লাটফর্মের দিকে এগুতে এগুতে সুপ্রিয়ার উত্তর—'কি বলব…'

কিছু সে বলতে চায় কিন্তু বলতে পারছে না—ইন্দ্রনীল বুঝলো সুপ্রিয়া খুশী হয়েছে। আনন্দ হলেই কি গলাটা ধরে আসে!

'আমি লেডিস কামরায় উঠব।' সুপ্রিয়া বলে উঠলো 'ওই একগাদা পুরুষের সাথে বসতে আমার শরীরটা গুলিয়ে উঠবে। যা ঘামের গন্ধ—অসহ্য। এই বিকেলের রঙটাই মাটি হয়ে যাবে।'

'আর তোমাদের মেয়েদের গা থেকে খুব ভালো গন্ধ বেরোয়—মিষ্টি মিষ্টি যুঁই ফুলের গন্ধ।' ইন্দ্রনীল চোখ দুটি একটু স্বপ্নালু করেই মুখটা ব্যঙ্গমুখর করল যেন।

সুপ্রিয়া ওর হাতটা ইন্দ্রনীলের নাকে চেপে ধরে বললো—'দেখো কেমন গন্ধ—যুঁই ফুলের না গোলাপ ফুলের বুঝতে পারবে।

'তোমার তো আর অফিস যেতে হয় না—তা না হলে বুঝতে ঘামের গন্ধ কেন হয়। এই বিকেলে ওরাও বেড়াতে বেরুলে গায়ের গন্ধ যুঁই ফুলের মত হোতো।'

এক্ষুণি ঝগড়া হয়ে যেত—ভাগ্যে গাড়ীটা ছেড়ে দিলো। ইন্দ্রনীল লেডিস কামরার পাশেরটায় উঠলো।

গাড়ীটা চলছে। ইলেকট্রিক ট্রেন বেশ জোরে যায়। তাই বাতাস চোখে-মুখে ঝাপটা দেয় জোরে। ইন্দ্রনীল দরজার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে বাতাসে ভাসতে ভাসতে ভাবছে—ঝগড়া করে বেশ মজা পাওয়া যায় সুপ্রিয়ার সংগে। সুপ্রিয়া তখন একেবারে ছোট মেয়েটি হয়ে যায়। ওর যুক্তিগুলিও বেশ। অন্ততঃ ইন্দ্রনীল তাই ভাবে।

গাড়ীটা ষ্টেশনগুলো পেরিয়ে যাচ্ছিল একটু থেমেই। অন্য ষ্টেশনে আর ইন্দ্রনীল নামবে না সুপ্রিয়ার খোঁজে। সহযাত্রিনীরা কি ভাববে কে জানে! হিন্দ-মোটর ষ্টেশনে একটা লোক নেমে যাওয়ায় ইন্দ্রনীল বসবার জায়গা পেলো

জানালার ধারে। আকাশটা জানালাটা ছুঁয়ে আবার উপরে উঠে যাচ্ছে। ইস্ কী গাঢ় নীল আকাশটা। আজকের বিকেলের রঙটাও ওই আকাশটার মত নীল। বিকেল যত গভীর হচ্ছে—রঙটা তত ঘন হচ্ছে।

ইন্দ্রনীলের চুলগুলি বাতাসে উড়ছে—পাঞ্জাবীর বোতাম যেন খুলে দেবে এই বাতাস। তবু এই বাতাসকেই আদর করতে ইচ্ছে হচ্ছে—চুমো খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। বাতাসটা ঠিক সুপ্রিয়ার মত; অমনি নরম আর অমনি দুষ্টু।

শ্রীরামপুর ষ্টেশনে নেমেই ইন্দ্রনীল বললো—'নামো সুপ্রিয়া।'

কিন্তু কোথায় সুপ্রিয়া? ইন্দ্রনীলের বুক ধক্ করে উঠলো। সে করুণ চোখে প্রতিটি মেয়ের মুখ পরীক্ষা করলো। তবে কি ল্যাট্রিনে গেছে—এদিকে গাড়ী যে ছেড়ে দিচ্ছে। ইন্দ্রনীল কি করবে বুঝতে পারলো না।

একজন তরুণী ওকে অনেকক্ষণ ধরেই দেখছিল সেই হাওড়া ষ্টেশন থেকে। হাজার লজ্জা তার চোখের সামনে ঢেউ তুলে তুলে সরে যাচ্ছিল—সঙ্কোচ সরিয়ে দরজায় এসে বললো—'উনি কোন্নগর নেমে গেছেন।'

ইন্দ্রনীল কি বলবে মেয়েটিকে! ঠোঁট দুটি একবার কাঁপলো—তারপর বললো—'অনেক ধন্যবাদ।'

ট্রেন ছেড়ে দিলো। মেয়েটি তেমনি দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। হঠাৎ ইন্দ্রনীলের মনে হোলো মেয়েটি তাকে অপমান করলো। কিন্তু যুক্তিশীল—দ্বিতীয় মন সংশোধন করলো—'ওর দোষ কি?'

তক্ষুনি রাগ হোলো সুপ্রিয়ার ওপর। এরকম ভাবে বোকা বানাবার অর্থ কি? মেয়েরা কি ভাবলো তাকে? সুপ্রিয়ার সাথে কথা বলবে না বেশ কয়েক দিন। দুষ্টুমি করারও একটা সীমা থাকা দরকার।

তারপরেই কোন্নগরের কথা মনে পড়লো। এই কোন্নগরেই তো সুপ্রিয়ারা আগে থাকতো। আর এখানেই তো সুপ্রিয়ার শ্যামলদা থাকে—যে শ্যামলদা সুপ্রিয়াকে ভালোবাসতো বা আজো বাসে।

উচ্ছের মত তিতো হয়ে গেলো মনটা। বিকৃতির চিহ্নগুলি মুখের রেখাতেও ফুটে উঠলো।

এই শ্যামলদা ছবি আঁকে—সুপ্রিয়ার কত যে ছবি এঁকেছে তার সংখ্যা নেই। সুপ্রিয়াও আঁকতে দিয়েছে সহজ ভাবে। কিন্তু যে দিন সুপ্রিয়ার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করলো শ্যামলদা সেদিন সে বলেছে 'তা হয় না।'

শ্যামলদা যুক্তিসহ প্রশ্ন তুলেছেন 'কেন হয় না? আমি কি অযোগ্য?'

সুপ্রিয়া জবাব দেয় নি। জবাব দিয়েছিল ইন্দ্রনীলের কাছে—'কতগুলি পুরুষ আছে যাদের শ্রদ্ধা করা যায়—ভক্তি করা যায় কিন্তু ভালোবাসা যায় না। শ্যামলদা সেই জাতেরই পুরুষ।'

ইন্দ্রনীল জিগ্যেস করেছিল, 'আমি কি জাতের পুরুষ?'

একটু হেসে সুপ্রিয়া উত্তর দিয়েছিল ছোট্ট করে—'যাকে শুধু ভালোবাসা যায়।'

ইন্দ্রনীল কোনো কথা বলতে পারে নি সেদিন খুশীতে।

আজ বিশ্লেষণ করে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। শ্যামলদাকে বিয়ে না করার পেছনে যে যুক্তি তুলে ধরেছে সুপ্রিয়া তা এক ধরণের সৌখীনতা। এর সত্যতায় ইন্দ্রনীল বিশ্বাস করে না—অথচ সেদিন তো করেছিল! আজ মনে হচ্ছে সুপ্রিয়া তাকে মিথ্যা কথায় রম্যগীতি শুনিয়েছে।

মাথাটা ঝিমঝিম করছে—সমস্ত পৃথিবীটা দুলছে যেন। আর ভাবতে পারে না ইন্দ্রনীল। উঠে পড়ে ষ্টেশনের বেঞ্চিটা থেকে।

দুটো কোলকাতাগামী ট্রেন চলে গেছে। আরেকটা আসছে। ডিসট্যাণ্ট সিগন্যালটা সবুজ—টিয়ে পাখীর রঙ জ্বলছে।

এক গভীর ক্লান্তিতে মনটা টনটন করে উঠছে থেকে থেকে। কোনও প্রকারে পা টেনে টেনে উঠে পড়লো গাড়ীতে। আজ রাত্রিতে কিছু খেতে পারবে না—সব বিস্বাদ ঠেকবে। ইন্দ্রনীল গাড়ীতে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে।

হাওড়া ষ্টেশনে গাড়ীটা এসে থামলো—নামলো ইন্দ্রনীল। কিছু ভালো লাগছে না। ট্যাক্সী করেই হোষ্টেলে ফিরবে।

কিন্তু একি! ওই তো সুপ্রিয়া হাসছে একটু দূরে—হাতে তার একটা চকোলেট। চকোলেটটা উঁচু করে ইন্দ্রনীলকে দেখাচ্ছে।

সব রাগ কোথায় ভেসে গেলো—এত যে অভিমান তাই বা কোথায়। ইন্দ্রনীলও হাসছে—এগিয়ে গেলো

সুপ্রিয়ার দিকে। সুপ্রিয়াকে আরো বেশী ভালো লাগছে।

ষ্টেশন ডিঙিয়ে হাওড়া ব্রিজে এলো দুজনে। সেই বাতাসটা সব কিছু এলোমেলো করে দিচ্ছে। সুপ্রিয়ার দুই একটা চুল লাগছে ইন্দ্রনীলের মুখে। অসহ সুখ যেন।

দুজনে গংগার দিকে তাকিয়ে রইলো। জলের গভীরে ইলেকট্রিক আলো কাঁপছে।

রাত গাঢ় হচ্ছে—ঘন হচ্ছে। ওরা ওই অন্ধকারে অনেকক্ষণ বসে থাকবে গংগার তীরে।

বিকেলের রঙ ওদের দুজনের মধ্যে রাত্রির খুশীকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়ে মিলিয়ে গেছে।

বিহারীলালের কবিপ্রকৃতি

হরেন ঘোষ

ঊনবিংশ শতকের বাংলা কাব্যক্ষেত্রে একাধিক শক্তিশালী কবির বলিষ্ঠ আবির্ভাবে বিস্মিত হ'তে হয়। ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে যেমন প্রাচীন ধারার বিলুপ্ত ও নবীন ধারার সূচনায় সমস্যা লক্ষ্য করি, মাইকেলে তেমন নবযুগ সৃষ্টির স্বাক্ষর। রঙ্গলাল ঐতিহাসিক কাহিনী থেকে কাব্য সৃষ্টি করলেন, হেম-নবীন খণ্ডকাব্য মহাকাব্য রচনার ব্রতী হলেন। যে যুগে খণ্ডকাব্য, মহাকাব্য, ঐতিহাসিক কাহিনী, পৌরাণিক আখ্যায়িকা দেশাত্মবোধক কাব্যের প্রাচুর্য্য, বাঙলা কাব্যসাহিত্যের প্রাঙ্গন কলরবে মুখর করে রেখেছে, ঠিক তখনই এই যুগ প্রভাব ও বন্ধন থেকে বেরিয়ে এসে সম্পূর্ণ এককভাবে নিরালায় নিভৃতে বসে আপনমনে গুণগুণিয়ে গান গেয়েছেন বিহারীলাল। Epic এর কলনিনাদে যখন দিগন্ত চঞ্চল তখন lyric এর বাঁশির সুর কানে আসা সহজ নয়, কিন্তু বিহারীলালের কণ্ঠ এত মধুর যে সমস্ত বাধা অতিক্রম করেও সে সুর শুধু কানে আসেনি, মনেও বেজেছে।

কবির মনের সুখদুঃখ ব্যথা বেদনা মহাকাব্যে রূপ পায় না তার জন্য প্রয়োজন গীতি কবিতার। আজ বাঙলা সাহিত্য গীতিকবিতারই প্রাধান্য তাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে বিহারীলালের সঙ্গেই আধুনিক বাঙলা কবি ও কবিতার আত্মিক যোগ রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালকে কাব্যগুরু বলে স্বীকার করেছেন। তবে রবীন্দ্র প্রতিভার ওপর অন্য কোন প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই তাঁর প্রথম জীবনের কাব্যকে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু আমরা সে কবিতাকে অস্বীকার করতে পারি না। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের কবিতায় বিহারীলালের প্রভাব উগ্রভাবে বিদ্যমান।

জনৈক সমালোচক বিহারীলালকে যুগপ্রবর্তক আখ্যায় ভূষিত করেছেন। ভাববিভোরতাই বিহারীলালের কাব্যের মূল লক্ষণ। তাঁর কবিতা Subjective, পাঠকের প্রতি দৃষ্টি রেখে তিনি কাব্য রচনা করেননি। আপন মনের আনন্দে গান গেয়েছেন। প্রায়ই দেখি তাঁর মনের ভাব অস্পষ্ট রয়েছে। তিনি অনেক সময় নিজেও এ বিষয়ে সচেতন কিন্তু কখনো কুণ্ঠিত বা সংকুচিত হন নি।

অস্বীকার করার উপায় নেই, একটি নতুন যুগ সৃষ্টি করার দুর্দ্দম সাহস প্রথম বিহারীলালেই দেখি। তাঁকে তাই 'যুগপ্রবর্তক' হিসেবে মেনে নিলে খুব অন্যায় করা হবে না। উপরন্তু এ সম্মান তাঁর প্রাপ্য বলেই মনে করি।

'প্রেমপ্রবাহিনী', 'বন্ধুবিয়োগ,' 'নিসর্গসন্দর্শন' বিহারীলালের কাঁচা হাতের রচনা। এখানে ভাষার প্রতি তিনি যত্নশীল নন। কবি সমস্ত কিছু গ্রহণ করেন না, তাঁকে গ্রহণ ও বর্জ্জন করতে হয়, ভাষার সরসতার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়, ভাব প্রকাশের প্রতি যত্নশীল হতে হয়। বিহারীলাল এসব দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতেন না। যা তাঁর মনে আসতো নির্বিবাদে তাকেই প্রকাশ করতেন। তবে স্বভাবতই ভাষা তাঁর অত্যন্ত মিষ্ট ছিল। কাব্য রচনার সময় তিনি আত্মবিস্মৃত হয়ে যেতেন। কাব্যসুন্দরীর অলঙ্কারের বা আভরণের কথা তখন থাকতো না তাঁর।

বিহারীলালের কৃতিত্বের নিদর্শন দুটি কাব্যগ্রন্থে সমধিক বিদ্যমান। সারদামঙ্গল ও সাধের আসন। তবে অন্যান্য কাব্যগ্রন্থকেও অনাদর করা যায় না। তাঁর সহজ, সরল কবি ভাষার নিদর্শন পাই একাধিক পংক্তিতে। 'বন্ধুবিয়োগের' একটি পংক্তিতে দেখি,

> "স্নানের সময় পড়িতেম গঙ্গাজলে,
> সাঁতার দিতেম মিলে একত্রে সকলে।
> তুলার বস্তার মত উঠিতেছে ঢেউ,
> ঝাঁপাতেছে, লাফাতেছে, গড়াতেছে কেউ।
> আহ্লাদের সীমা নাই, হো হো কোরে' হাসি,
> নাকে মুখে জল ঢুকে চক্ষু বুজে কাসি।"

পূর্বস্মৃতি স্মরণ করে এমনি অজস্র চিত্র অঙ্কন করেছেন, সেখানে কাব্যের

চাইতেও উচ্চস্থান পেয়েছে বাস্তব চিত্র বর্ণনা। চোখে যা দেখেছেন, মনে যা ভেবেছেন তাই লিখে গিয়েছেন দ্বিধাহীন চিত্তে।

বিহারীলালের কাব্য পাঠের আগে বিহারীলালের কবি মানস সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট করে নিতে হবে। তাঁর বাস্তবপ্রীতি স্মরণ করতে হবে। বাস্তবচিত্র আঁকতে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি যথাযথ অঙ্কন করেছেন। কাব্যের অর্থ বাড়িয়ে বলা। যা আছে, শুধু তাই নয়, কবির মনের জারক রসে রসিয়ে উপস্থাপিত করতে হবে। আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে ছবি আঁকতে হবে। Skylark একটি পাখীমাত্র কিন্তু শেলীর Skylark, একান্ত ভাবে তাঁর ব্যক্তিগত। বিহারীলালের ক্ষেত্রে প্রায়শ এ নীতি ব্যাহত হয়েছে। তাই অনেক ক্ষেত্রে মিষ্ট ভাষা ও গভীর অনুভূতি থাকা সত্ত্বেও তাঁর কাব্য হৃদয়স্পর্শ করে না। এ যেন কবির স্বেচ্ছাকৃত। তিনি আপন মনে স্বগত ভাষণ করে চলেছেন, শ্রোতা পাঠকের কথা চিন্তা করেন নি।

বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবহৃদয়ের মিলনতীর্থ আবিষ্কারই বিহারীলালের কাব্যসাধনার মূলমন্ত্র। বিহারীলালের সৌন্দর্যবোধ সূক্ষ্ম ও সুমার্জিত। বিহারীলালের কল্পনায় বাস্তবপ্রীতি ও অবাস্তব সৌন্দর্য্য-ধ্যান একটি অতি অভিনব যোগসূত্র—যোগসাধনার মত—কাব্যসাধনায় নির্ব্বন্ধ হইতে চাহিয়াছেন।

যে সৌন্দর্য্য, প্রীতির রসে সিক্তিত নয়, তা যথার্থ সৌন্দর্য্য নয়। মানুষ যদি ভালো না বাসে তবে সৌন্দর্য্যকে উপলব্ধি করবে কি ভাবে!

'প্রেম প্রবাহিনী'তে কবি মানসের যে পরিচয় পাই, বিহারীলালকে জানবার পক্ষে তা সাহায্য করবে। এখানে কবির মন অতৃপ্ত। তাঁর স্ত্রী জায়া সবই আছে, তবু কাব্যসুন্দরীর জন্যে তাঁর অধীরতা। এই কাব্য গ্রন্থে কবি বাস্তবের সঙ্গে আরপেরি বিরোধ দেখিয়েছেন। অবশ্য আদর্শই অবশেষে জয়লাভ করেছে। মধ্য ঊনিশ শতকের প্রচলিত কাব্য-ধারার প্রতি বিহারীলালের তীব্র বিতৃষ্ণা পরিলক্ষিত হয় সর্বত্র। তিনি নিজ হৃদয়ের সত্য অনুভূতির প্রতিই আস্থাবান। তবু আক্ষেপ করে ছেন আপনমনে। তিনি বুঝেছিলেন যে তাঁর কাব্য সে যুগে যথার্থ সমাদর পাবে না।

> "এই পোড়া বর্ত্তমানে নাই গো ভরষা
> তাই আরো দমে যাই, ভেবে ভাবী দশা।"

বিহারীলালের সমাদর সম্বন্ধে মতভেদ থাকতে পারে; তবু একথা বলা যায় যে আধুনিক কাব্য সাহিত্যে বিহারীলাল অবস্তৃত ধারাই প্রবহমান।

বহুস্থানে দেখি কবির অনুভূতি প্রগাঢ় কিন্তু প্রকাশে নৈপুণ্য বা কুশলতা কম।

> "কিছুতেই তোমাকে যখন না জেলেন
> একেবারে আমি যেন কি হয়ে গেলেন।"

সহজ সত্য, স্বীকার করি। কিন্তু একে কাব্য বলি কি ভাবে?

'সারদামঙ্গল' কবির শ্রেষ্ঠ কাব্য গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃত। সারদা যে এক্ষেত্রে অস্পষ্ট। অন্তরের অন্তস্থলে গিয়ে আত্মমগ্ন ভাবে সমস্ত বাস্তব জগতের স্থূল বিষয় বস্তুকে বিস্মৃত হয়ে সূক্ষ্মান্তরে চিন্তা করে কবি সারদার মূর্তি অথচ করেছেন। এই আত্মসমহিত ভাব, এই নিবিড়তা, আধুনিক কবিদের মধ্যে জীবনানন্দে রূপলাভ করতে দেখি। কবি সারদাকে কখনো প্রেমময়ী পত্নীরূপে দেখেছেন—

> "প্রিয়ে তুমি মোর অমূল্য রতন
> যুগযুগান্তরে তপের ফল,
> তব প্রেম-স্নেহ—অমিয়—সেবন
> দিয়েছে জীবনে অমর বল।"

আবার বলতে দেখি,

> "তুমিই মনের তৃপ্তি
> তুমি নয়নের দীপ্তি
> তোমা-হারা হলে আমি
> প্রাণহারা হই।"

এক্ষেত্রে কবি যথেষ্ট সচেতন।

কিন্তু এরপরই কবি সম্মোহিত হয়ে যান। এবার সারদা পত্নীমাত্র নয় বিশ্বের সৌন্দর্যরূপিনী।

> "তুমিই বিশ্বের আলো তুমি বিশ্বরূপিনী
> প্রত্যক্ষ বিরাজমান,
> সর্বভূতে অধিষ্ঠান,
> তুমি বিশ্বময়ী কান্তি, দীপ্তি অনুপমা,
> কবির যোগীর ধ্যান,
> ভোলা প্রেমিকের প্রাণ,
> মানব—মনের তুমি উদার সুষমা।"

মানুষের জাগ্রত—জীবনের যে প্রেম এবং কবির স্বপ্নদৃষ্ট যে সৌন্দর্য্য, এই দুইয়ের মধ্যে কোন সত্যকার বিরোধ নাই।" বিহারীলালের কাব্যের মূল লক্ষণ Real Ideal এর সমন্বয় সাধন।

কবির মন তন্দ্রালস হয়ে পড়ে। সমস্ত বিশ্ব তিনি বিশ্ব তিনি বিস্মৃত হন।

> কায়াহীন মহাছায়া
> বিশ্ববিমোহিনী মায়া
> মেঘে শশী—ঢাকা রাকা—রজনীরূপিনী
> অসীম কানন তল
> ব্যেপে আছে অবিরল
> উপরে উজলে ভানু, ভূতলে যামিনী।"

অন্তরে তখন আলোজ্জ্বল, নয়নে ঘন অন্ধকার। কখনো সারদাকে কান্তিরূপিনী বলেছেন, আবার তারই অন্যনাম দিয়েছেন। করুনা।

বিহারীলাল মানুষকে ভালোবাসেন, জীবনের প্রতি তাঁর প্রবল আকর্ষণ, পৃথিবী তার অতি আপনার। স্বর্গের প্রতিও তাঁর মোহ আছে, কিন্তু সেখানে তিনি তৃপ্তি পান না। কবির মন অস্থির চঞ্চল,

"স্বর্গেতে অমৃত সিন্ধু
পাই নাই, একবিন্দু।

বিহারীলালের কাব্যের দুটি প্রধান লক্ষণ স্মরণীয়। প্রথমেই বলা হয়েছে তাঁর কাব্য-সাধনা মৌলিক কবি-প্রেরণাকে বাহির থেকে অন্তরে ফিরিয়েছেন,—কাব্যের চেয়ে কবির মূল্য তাঁর কাছে বেশী। দ্বিতীয়তঃ তাঁর কাব্যে রূপের চেয়ে ভাবই প্রধান স্থান অধিকার করেছে। Intellect এর চাইতে Sentiment কেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন।

বিহারীলাল শুধুমাত্র সৌন্দর্য্যের পূজারী। পৃথিবীর কোমল, উদার মধুর দিকটই দেখেছেন। স্বভাবতই তাঁর কাব্যে আবেগ, উচ্ছাস বেশী। তাঁকে অনেক পরিমাণে Escapist আখ্যা দেওয়া যায়।

বিহারীলালের কাব্যের ব্যাপ্তি কম। একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার বলেছেন। তাঁর অবাধ মানস লোক বিচরণই এজন্যে দায়ী। কাব্যে আত্মভাব সাধনার ভঙ্গী বিহারীলালেই প্রথম। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী জীবনে বিহারীলালের প্রভাব মুক্ত হন। তবু তাঁর কবিতার বিহারীলালের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়েছে। 'চিত্রা কবিতাটি স্মরণ করা যায়। এখানে বিহারীলালের ভাবই নয়, ভাষাও প্রায় এক। তবে রবীন্দ্রনাথের কাব্যলক্ষ্মী শুধু অন্তরেই সীমাবদ্ধ নয়, তিনি বিচিত্ররূপিণী।

বাঙলা কবিতায় কবির নিজের সুর শুনলেন রবীন্দ্রনাথ, সর্বপ্রথম বিহারীলালের কণ্ঠে। তিনি বিহারীলালকে 'ভোরের পাখী' আখ্যা দিয়েছেন। যখন সকলে নিদ্রামগ্ন—ভোরের পাখী কল কাকলিতে মুখর করে দিগ্‌দেশ।

বিহারীলাল লিখছেন :—

সর্বদাই হু হু করে মন,
বিশ্ব যেন মরুর মতন,
চারিদিকে ঝালাপালা
উঃ কি অনন্ত জ্বালা।
অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গ পতন।"

মাইকেলের কয়েকটি সনেটে কবির আত্মকথন ব্যক্ত হয়েছে, কিন্তু সে অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে স্বল্পতম প্রকাশ।

বিহারীলালের কাব্যপাঠে এক অনৈসর্গিক আনন্দানুভূতিতে হৃদয় পূর্ণ হয়। তাঁর কাব্যে সত্য, শিব, সুন্দরের প্রকাশ। সেখানে কোন সমস্যা নেই, দ্বন্দ্ব নেই, যুদ্ধবর্ণনা নেই, পৌরাণিক কাহিনীর চর্বিত চর্বণ নেই, দেশপ্রীতির নিদর্শন নেই। তাঁর কাব্যপাঠের সময় পাঠক ও কবি একাত্ম হয়ে ওঠেন।

বিহারীলালের কাব্যের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ তাঁর নিসর্গ প্রীতি। নিসর্গকে এত উচ্চমূল্য বোধহয় ইতোপূর্বে অন্য কোন কবি দেন নি। মাইকেলে কয়েকস্থানে নিসর্গ প্রীতির নিদর্শন পাই। তবু তিনি নিতান্ত Conventional—মানুষ, প্রকৃতি, ঈশ্বর এই তিন ছাড়া কাব্যের বিষয় নেই। মানুষকে বিহারীলাল ভালো বেসেছেন, কিন্তু তিনি তার বহির্জীবনের খুটিনাটি, দুঃখবেদনা, হতাশা-ক্ষোভ বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে মগ্ন থাকেন নি। মানুষের অন্তলোকের সৌন্দর্য্যের প্রতিই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ। দ্বিতীয়ত প্রকৃতি। তিনি নানাভাবে প্রকৃতি বন্দনা করেছেন, সেই সঙ্গে ঈশ্বর বন্দনা। প্রকৃতি ও ঈশ্বর, তাঁর কাব্যে একাত্ম। এই সুর রবীন্দ্রনাথে সার্থকতা লাভ করেছে।

গ্রাম্য জীবনের প্রতি কবির আকুতি গভীর। এক সময়ে বলেছেন—

"কভু ভাবি পল্লীগ্রামে যাই
নাম ধাম সকল লুকাই
চাষীদের মাঝে রয়ে
চাষীদের মত হয়ে
চাষীদের সঙ্গেতে বেড়াই ॥"

এখানে গভীর মানবপ্রেম মূর্ত হয়েছে।

বিহারীলালের ছন্দে, মিলের ও ভাষার দৈন্য নেই। তিনি জটিলতা সর্বত্র পরিহার করেছেন—সহজ সরলের প্রতিই তাঁর দৃষ্টি। তাই তাঁর ভাষার প্রবাহ ঝরণা ধারার মত অবাধ, গতিশীল। অনেক ক্ষেত্রে দেখি ভাষা ও ছন্দ স্বেচ্ছাচারী হয়েছে, কিন্তু কবি ভাবপ্রকাশেই ব্যস্ত, তাই এদিকে মনোনিবেশ করেন নি। ভাষা ও ছন্দরক্ষায় তাঁর দক্ষতা ছিল, এ প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। অনুসন্ধিৎসু পাঠক তাঁর মূল কাব্যগ্রন্থ পাঠ করলেই জানতে পারবেন।

"ঠাম শরীর পেলব-লতিকা
আনত-সুষমা কুসুম ভরে;
চাঁচর চিকুর নীরদ-মলিকা
লুটায়ে পড়েছে ধরণী পরে।"

এখানে লক্ষ্য করি যুক্ত অক্ষর বর্জনের সযত্ন প্রয়াস। কিন্তু যুক্ত অক্ষরে কাব্যের ধ্বনি মাধুর্য্য বাড়ে, পাঠে আনন্দ বর্দ্ধন করে।

বিহারীলালের সমগ্র কাব্য যেন একটি সঙ্গীত এবং এই সঙ্গীত প্রতি কাব্যপাঠকের মনেই আনন্দ জাগাবে। আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে প্রেমসঙ্গীত বিহারীলালের কণ্ঠেই সর্বপ্রথম ধ্বনিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন সুন্দর ভাষা কাব্য সৌন্দর্য্যের একটি প্রধান অঙ্গ। বিহারীলালকে এ ক্ষেত্রে সশ্রদ্ধ চিত্তে কাব্যগুরুরূপে তিনি স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনে রচিত বাল্মীকি প্রতিভার তার এমনকি অনেকক্ষেত্রে ভাষাও বিহারীলালের সারদা মঙ্গলের থেকে গ্রহণ করেছেন। চিত্রার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

বিহারীলাল সম্বন্ধে সমালোচকের একটি মন্তব্য স্মরণ করতে হয়। তিনি যে পরিমাণে ভাবুক ছিলেন, সে পরিমাণে স্রষ্টা ছিলেন না। তাঁর কাব্যপাঠের সময় প্রায়ই এই কথা মনে পড়া স্বাভাবিক। একাধিক সমালোচক বিহারীলালকে মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করেছেন। হয়ত সবটা প্রশংসা তাঁর প্রাপ্য নয়। তবু তাকে অস্বীকার করতেও পারি না।

যে যুগে বাঙলা সাহিত্যে আখ্যায়িকা কাব্যের প্রচলন সমধিক, যখন একটি কৃত্রিম classic যুগ সৃষ্টি হচ্ছে, তখনি একক স্পর্দ্ধায় Romantic যুগসৃষ্টি করলেন বিহারীলাল। এটাই মনে হয় তাঁর সবচেয়ে বড় কীর্ত্তি। এ প্রসঙ্গে Wordsworth কে স্মরণ করতে পারি। তাঁর lyrical ballads ইংরেজ সাহিত্যে নতুন যুগের সূচনা করেছিল।

যথার্থ অর্থে বাঙলা সাহিত্যে Classic যুগ বলে পৃথক কোন যুগ গড়ে ওঠেনি। বাঙ্গালীর মন গীতিপ্রবণ, বাঙ্গালীর রক্তে গীতি-কবিতার সুর। মাইকেলের একাধিক সনেটে গীতিকবিতার সুর ধ্বনিত হয়েছে। রঙ্গলাল-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রে ceassical romanticism এর সংমিশ্রণ ঘটেছে। বিশুদ্ধ Romantic রস শুধুমাত্র বিহারীলালেই ঘটেছে। বাঙলা গীতিকাব্যের ধারাকে বিহারীলাল একটি নূতন গতিপথে চালনা করেছেন।

বিহারীলাল সম্বন্ধে কোন এক সমালোচকের উক্তি স্মরণ করা যাক। তিনি প্রশস্তি রচনা করেছেন,—"বিহারীবাবু সর্বদাই কবিত্বে মসগুল থাকিতেন, তাঁহার হাড়ে হাড়ে, প্রাণে প্রাণে কবিত্ব ঢালা থাকিত, তাঁহার রচনা তাঁহাকে যত বড় কবি বলিয়া পরিচয় দেন, তিনি তাহা অপেক্ষা অনেক বড় কবি ছিলেন।'' এ যদি যথার্থ হয়, তাহলে বিহারীলালকে বড় কবি বলে স্বীকার করা যায় না। কারণ নীরব কবিত্বের কোন মূল্য সাহিত্য সমাজে নেই। কবি একস্থানে স্বীকার করেছেন,—"কেবল হৃদয়ে দেখি, দেখাইতে পারিনে।'' কবির কি শুধু অনুভূতিই থাকবে, প্রকাশ ক্ষমতা থাকবে না।

সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, "it is not to be heard but overheard." বিহারীলালের কবিতায় এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। কবি আপন মনে গান গেয়েছেন। বৈষ্ণব কবিতা সঙ্গীতধর্ম্মী। সেখানে lyric রাধাকৃষ্ণ নামের অন্তরালে আত্মগোপন করেছে। ব্যক্তিভাব বর্জ্জনই বৈষ্ণব সাধনার প্রথম কথা। বৈষ্ণব কবিতার গোষ্ঠী ভাব প্রধান। রাধাকৃষ্ণের মাধ্যমে সমস্ত বক্তব্য ব্যক্ত হবে। লৌকিক প্রেমকে বৈষ্ণব কবি প্রধান স্থান দিতে পারেন না। বিহারীলালই সর্বপ্রথম এই প্রথা ভেঙ্গে কবির ব্যক্তিমানসকে প্রকাশ করেছেন।

বঙ্গসুন্দরীকে বিহারীলালের প্রথম সার্থক সৃষ্টি বলা যায়। কিন্তু কবির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'সাধের আসন'। সারদা মঙ্গলের মধ্যে এই গ্রন্থটির নিবিড় যোগ রয়েছে। সাধের আসন নামকরণ প্রসঙ্গে কবি বলেছেন, কোন সম্ভ্রান্ত মহিলা (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী) তাঁকে স্বহস্তে তৈরী করে একটি আসন উপহার দেন। সেই আসনে সারদা মঙ্গলের একটি পংক্তি লেখা ছিল—"হে যোগেন্দ্র যোগাসনে, ঢুলুঢুলু দুনয়নে, বিভোর বিহ্বল মনে, কাহারে ধেয়াও ?" প্রশ্নের উত্তর কবি যথাসময়ে দিতে পারেন নি। উক্ত সম্ভ্রান্ত মহিলার মৃত্যুর পর তিনি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন 'সাধের আসন' নামে। সেখানে প্রথমেই কবি বলেছেন—'ধেয়াই কাহারে দেবি, নিজে আমি জানিনে'। এই কাব্যে কবি আবার বিশ্বসৌন্দর্য্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীকে অম্বেষণ করেছেন।

রোমান্টিক কবির অন্যতম বৈশিষ্ট্য বর্তমানের জটিলতা, দীনতা থেকে মুক্তি নিয়ে বাস্তবকে অস্বীকার করে মানসলোকে বিচরণ করা। কঠোর, বাস্তবকেও তিনি রঙীণচোখে দেখেন, কল্পনার আস্তরণ পরিয়ে নবরূপ দান করেন। বিহারীলালের পূর্বে শুধুমাত্র নিসর্গকে নিয়ে কবিতা খুব বেশী লেখা হয়নি। ঈশ্বরগুপ্ত শুধুমাত্র নিসর্গকে নিয়ে কাব্যরচনা করেন নি। মাইকেলেও নিসর্গচেতনা কম। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথে নিসর্গচেতনা সার্থকতম। এক্ষেত্রে বিহারীলালকে তাঁর পথপ্রদর্শক বলা যেতে পারে। রোমান্টিক কবি বলেই তিনি নিসর্গের দিকে ফিরে তাকিয়েছেন। নিসর্গের সঙ্গে তাঁর মনের নিবিড় যোগ। গোধূলি বর্ণনায় কবি বলেছেন—

গঙ্গা বহে কুলু কুলু
যেন ঘুমে ঢুলুঢুলু
ধীরে ধীরে দোলে তরী, ধীরে ধীরে বেয়ে যায়,
মাঝিরা নিমগ্ন মনে ঝুমুর পূরবী গায়।

অন্যত্র প্রভাত বর্ণনায় দেখি :—

"গন্ধবায়ু ঝুরুঝুরু কাঁপে তরুরেখা ভুরু
আরামে পৃথিবীদেবী এখনো ঘুমায় রে
চলে মেঘ সারি সারি গুঁড়ি গুঁড়ি পড়ে বারি
কণকবরণী ঊষা লুকালো কোথায় রে।"

'সারদামঙ্গলে' ঊষাবন্দনা করেছেন,

"চরণ কমলে লেখা
আধ আধ রবিরেখা
সর্বাঙ্গে গোলাপ আভা
সীমন্তে শুকতারা জ্বলে।"

এ প্রকার উদ্ধৃতি আরো অজস্র দেওয়া যেতে পারে, যেখানে বিহারী-লালের Romantic কবিমনের পরিচয় পাই। তবু দেখি, বিহারী-লাল শেষপর্যন্ত mystic হয়ে উঠেছেন। তাই তাঁকে বলতে শুনি,

'রহস্য বিশ্বের প্রাণ।
রহস্যেই স্ফূর্তিমান
রহস্যে বিরাজমান ভব।'

এ পৃথিবী তাঁর কাছে রহস্যময়। কবি জানতে চেয়েছেন, জানতে পারেন নি, বিহ্বল হয়ে ভাবতে বসেছেন।

'রহস্য রহস্যময়
রহস্যে মগন রয়।
খুঁজিয়া না পেয়ে তাকে
সবে 'মায়া' বলে ডাকে।
আদরের নাম তার বিশ্ববিমোহিনী।"

Mystic অনুভূতি হ'ল একের অনুভূতি, অদ্বয়ের অনুভূতি। Romanticism এ আছে সংশয়, দ্বিধা, mysticism এ দৃঢ় বিশ্বাস। Romanticism ও mysticism কবিমনের দুটি ভাবমাত্র

—দেখবার দুটি বিভিন্ন ভঙ্গী। রবীন্দ্রনাথকেও mystic অনুভূতিতে এসে পৌঁছতে দেখি—"আমার মাথা নত ক'রে দাও হে তোমার চরণ ধূলির তলে।"

'সাধের আসনে' কবি নানা প্রসঙ্গের আলোচনা করেছেন। যেমন মাধুরী, প্রভাত, যোগেন্দ্রবালা, মায়া, কে তুমি? ইত্যাদি। কিন্তু সমস্ত প্রসঙ্গের ভিতর একটি অন্তর্নিহিত মিল আছে। বিহারীলাল জানেন, সৌন্দর্য্য বিশ্বের সঙ্গে নিবিড় ভাবে যুক্ত। "বিশ্ব গেছে কান্তি আছে, অনুভবে আসে না।" সেজন্যে তিনি নারীর প্রেয়সীর, জননীর মধ্যে সৌন্দর্যের উপাদান খুঁজে পেয়েছেন। এই সৌন্দর্য্য রহস্যময়। এই সৌন্দর্য্যকে—

"কবিরা দেখেছে তারে নেশার নয়নে
যোগীরা দেখেছে তারে যোগের সাধনে।"

সমগ্র প্রসঙ্গে সৌন্দর্য্যের জয়গান। বিহারীলালের মর্ত্য স্বাধীনতাও স্মরণীয়। তাঁর কল্পনার মূল ভিত্তি হ'ল

"যা দেবী সর্বভূতেষু কান্তিরূপেন সংস্থিতা—

অর্থাৎ এই কান্তিরূপিণীর প্রশান্তি।

রহস্যভেদ করবার কোন ইচ্ছাও কবির নেই। তিনি বলেছেন

—'রহস্যভেদিতে তব আর আমি চাবনা
না বুঝিয়া থাকা ভাল
বুঝিলেই নেবে আলো।
সে মহাপ্রলয়-পথে ভুলে কভু ধাব না।"

কবি সে চেষ্টাও করেন নি।

বিহারীলালের সমগ্র কাব্যগ্রন্থ পাঠ করলে দেখি, তিনি আপনমনে গুনগুনিয়ে গান গেয়েছেন। তাই যথার্থ অর্থেই তিনি 'ভোরের পাখী' বাঙলা কবিতার ক্ষেত্রে বিহারী লাল lyric কে উচ্চস্থান দিয়েছেন বিহারীলালের মন Romantic, তিনি mystic ও হয়ে উঠেছেন। বিহারীলালের নিসর্গচেতনা অত্যন্ত তীব্র। লৌকিক ভাবের বর্ণনায় তাঁর শক্তি প্রকাশিত হয়েছে। নিসর্গবর্ণনায় তিনি সংযত, কিন্তু ভাব বর্ণনায় মাঝে মাঝে সীমা লঙ্ঘন করেছেন। তাঁর কাব্যের প্রধান বাহন হচ্ছে সুর। বিহারীলাল সর্বত্র সার্থক চিত্রসৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েও হন নি। তাঁর কাব্যে, তাঁর শিল্পীমন ও ধ্যানীমন মিলিত হয়েছে। কাব্যের সর্বত্র বিহারীলাল সার্থকতার স্বর্ণশিখরে হয়ত আরোহণ করতে পারেন নি, তবু আজকের সাহিত্য পাঠকের পবিত্র কর্তব্য হবে তাঁর সমগ্র রচনা শ্রদ্ধাভরে পাঠ করে, যথার্থ মূল্যায়ন করা এবং যথাযোগ্য মর্যাদা দান করা।

পল্লীর প্রাণ

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

দুগ্ধফেননিভ শয্যা, রাজ সজ্জা, রাজগৃহে বাস,
রাজার আতিথ্যে লভি নানা ভৃত্য পালিতে ফর্মাস।
চীনাংশুক চন্দ্রাতপ, কিংখাবের কারুকার্য করা,
সুরভি নিকুঞ্জ হতে বহে গন্ধবহ গন্ধভরা।
যেথা যত সুখে থাকো, মন তবু ভরেনাকো হায়!
পল্লীর প্রাঙ্গণ তলে ফিরে চলে ধূলামাখি গায়।
সরকারী দরকারী কাজে, মাঝে মাঝে
দূরে যাই চলি,
আরামে তাঞ্জামে চড়ি পরি অঙ্গে পরিচ্ছদাবলী।
নানাবিধ সরঞ্জাম, নানা সাজে সুসজ্জিত করা,
দ্বারে দ্বারে প্রতিহারী শস্ত্রধারা সান্ত্রীর প্রহরা।
তবু মন ভরে নাকো, যেথা থাকো
পিছুপানে ফিরে,
অতৃপ্ত নিশ্বাস ফেলি মন চায় দীন পল্লীটীরে।
হয়তো বিচার করি দণ্ডধরি ধর্মাধিকরণে
নয় তো বিতর্ক করি সেথা ব্যবহারাজীব সনে।
স্বপক্ষে ও প্রতিপক্ষে গণ্যমান্য নানা অন্যজন
হয়তো, সম্মান করে সেথা মোরে শসম্ভ্রম মন।
আমি শ্রীমধুসূদন গ্রাম বৃদ্ধে ডাকে মোরে মোধো!
মন বলে—'চল তবু পার যদি কিছু ঋণ শোধো'।
পল্লীরে প্রণাম করি মাখি তার পদধূলি গায়
স্বমাতারে ছাড়ি কেবা বিমাতার শিষ্টাচার চায়?
মুখের সৌজন্য নাই, ব্যবহারে নাই কৃত্রিমতা,
খোলা মন, খোলা হাসি, সমাদরে সরল গ্রাম্যতা।
গ্রামের সে ইক্ষুরস সুধাভরা যেন গিঁঠে গিঁঠে
সহরের বিষকুম্ভ পয়োমুখে মধুমাখা মিঠে।
কি তোর আঁচলে ভরা, কি আছে মা বুকভরা মধু?
ঘরে ঘরে আলো করে অবলা সরলা পল্লী বধূ!
নাহি চাই রাজ কাজ, রাজভোগে মানি কর্মভোগ,
শান্ত সন্ধ্যাকাশে চাই গোধূলির রক্তরাগ যোগ।
সায়াহ্নের শঙ্খধ্বনি ধূপ ধুনা আরতি মন্দিরে
বিহঙ্গের কলকলি মাতা বলি জানি সে পল্লীরে।

সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র

অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন গোস্বামী

বাংলা সমালোচনার সুরু বঙ্কিমচন্দ্র থেকে নয়, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই যে বাংলা সমালোচনা একটা নির্দিষ্ট আকার নিতে পেরেছে তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। বিবিধধর্ম সংগ্রহ'১ ও কবি হেমচন্দ্রের লেখায়২ কাব্য-সাহিত্য সম্পর্কে যেমন স্পষ্ট ধারণা ফুটে উঠে না তেমনি যে প্রাচীন ও আধুনিক সমালোচন রীতির অনুসরণ দেখা যায়—তার পাশ্চাতেও সুচিন্তিত পরিকল্পনার পরিচয় মেলে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় কোন দিক থেকে কোন অস্পষ্টতা নেই। তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও তীব্র জীবন-জিজ্ঞাসা নিয়ে জীবন ও সভ্যতা সংক্রান্ত সব কিছু সম্পর্কেই যেমন তিনি সুনির্দিষ্ট ধারণায় পৌঁছার চেষ্টা করেছিলেন—সাহিত্য সম্পর্কেও তেমনি।

'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হলে, ১৮৭২ থেকে ১৮৭৮ সালের মধ্যে তিনি সাতটি সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ৩ রচনা করেন। পরে বিভিন্ন প্রসঙ্গে ঈশ্বর গুপ্ত, দীনবন্ধু মিত্র ও প্যারীচাঁদ মিত্রের কাব্য সাহিত্যের আলোচনা করেন। এই সমস্ত প্রবন্ধে আমরা একদিকে পাই সাহিত্য বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা, আর একদিকে তাঁর সমালোচক পদ্ধতি।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত লেখার মধ্যে গভীর স্বাজাত্য বোধ প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সমালোচনায়, বোধ হয় সাহিত্য তথা স্বদেশের হিতের জন্যেই, তিনি জাতীয়তার পক্ষপাত নিয়ে আসেন নি।৪ হিন্দুধর্মের প্রতি বঙ্কিমের গভীর অনুরাগের কথা সকলেই জানেন; কিন্তু সাহিত্যদৃষ্টি ও সমালোচনায় তিনি হিন্দুয়ানির ধারে কাছে যান নি। প্রাচীন ভারতের গৌরব ও মহিমাপ্রচারে বঙ্কিমচন্দ্র কখনও পরাঙ্মুখ হন নি, কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনায় পক্ষপাত তাঁর মধ্যে কোথাও পাওয়া যাবে না। অপরপক্ষে স্বাজাত্য, হিন্দুয়ানি, প্রাচীনের প্রতি পক্ষপাত ইত্যাদির জন্যে সেযুগের বেশ কয়জন সমালোচকের লেখা গুরুত্ব হারিয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র নীতিবাদী একথা খুবই শোনা যায়। হয়ত তাঁর অন্য লেখায় এমতের সমর্থন মিলবে, কিন্তু সাহিত্য সমালোচনায় তিনি নীতিকে দূরে রেখেছেন,—"কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে…কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা৫ কিন্তু নীতি ব্যাপারদ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। কথাচ্ছলেও নীতিশিক্ষা দেন না।"৬ বঙ্কিমচন্দ্রের পরে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' এর উপর তিনজন বিশিষ্ট সমালোচকের তিনটি প্রবন্ধ ৭ দেখতে পাই; কিন্তু আশ্চর্য বঙ্কিম ছাড়া আর সকলেই সাহিত্য বিচারে নীতিকে প্রাধান্য দিয়ে বসে আছেন। বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্টই বলেছেন, "সৌন্দর্য সৃষ্টিই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য।"৮ কিন্তু কাব্যের সঙ্গে নীতির

---

১ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় ১৮৫৬ সালে প্রথম প্রকাশ

২ মেঘনাদবধ কাব্য ২য় সংস্করণের ভূমিকা ১৮৬২ সাল।

৩ সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলোর নাম—পরিষৎ সংস্করণের জন্যে হীরেন্দ্রনাথ দত্তকৃত শ্রেণীবিকাশ অনুযায়ী—উত্তর চরিত (১৮৭২) সঙ্গীত (১৮৭২) গীতিকাব্য (১৮৭৩); বিদ্যাপতি ও জয়দেব (১৮৭৩) অর্থ জাতির সূক্ষ্ম শিল্প (১৮৭৪); শকুন্তলা মিরন্দা ও দেসদিমোনা (১৮৭৪) বাঙ্গলা ভাষা (১৮৭৮)

৪ ক্ষুদ্রাশয় সমালোচকেরাই বুঝেন না যে, দেশভেদে বা কালভেদে কেবল বাহ্যভেদ হয় মাত্র, মনুষ্যহৃদয় সকল দেশেই সকল কালেই ভিতরে মনুষ্য হৃদয়ই থাকে।"—শকুন্তলা ও দেবদিমোনা।

৫ তুলনীয় Shelly র "Poets are the unacknowledged legislators of the world"—A Defence of poetry.

৬, ৪, ৬, ৭ উত্তর চরিত

৭ অভিজ্ঞান শকুন্তলের অর্থ—চন্দ্রনাথ বসু (১৮৮১); শকুন্তলা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯০২) দুর্বাসার শাপ—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৯১৭)।

৮ ধর্ম ও সাহিত্য প্রবন্ধ (১৮৮৪)

বিরোধ নেই—"নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য কাব্যের ও সেই উদ্দেশ্য।" তেমনি কাব্যের সঙ্গে ধর্মেরও বিরোধ তিনি স্বীকার করেন নি;—"সাহিত্যও ধর্ম ছাড়া নহে, কেননা সাহিত্য সত্যমূলক। যাহা সত্য, তাহা ধর্ম।" এইভাবে বঙ্কিমচন্দ্র দেখাতে চেয়েছেন যে নীতিসাহিত্য ও ধর্ম পরস্পর সম্পৃক্ত এবং সকলেই জীবন ও সভ্যতার মহত্তর বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য। সাহিত্য মানুষের চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করে, পরিশুদ্ধ করবে স্বীয় ধর্মে অটুট থেকে—"সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা।······যাহা সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করিবে তাহার সৃষ্টির দ্বারা।" 'দীনবন্ধুমিত্র' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, "বাঙ্গালা ভাষায় এমন অনেকগুলি নাটক নবেল বা অন্যবিধ কাব্য প্রণীত হইয়াছে, যাহার উদ্দেশ্য সামাজিক অনিষ্টের সংশোধন। প্রায়ই সেগুলি কাব্যাংশে নিকৃষ্ট, তাহার কারণ—কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্যসৃষ্টি, তাহা ছাড়িয়া, সমাজ সংস্কারকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিলে কাব্যেই কবিত্ব নিস্ফল হয়।" পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর নিজস্ব চিন্তা ও অনুভূতি সহায়ে সত্য, শিব ও সুন্দরের অনুরূপ একটি সমন্বয় বোধে পৌচেছিলেন।

সমালোচনা পদ্ধতিতে দেখতে পাই বঙ্কিমচন্দ্রে একেবারেই পাশ্চাত্যপন্থী। সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল নিবিড়, অলংকারশাস্ত্রের সঙ্গেও অপরিচয় ছিল না। কিন্তু কোথাও তিনি সংস্কৃত রীতির অনুসরণ করেন নি—না রামায়ণ মহাভারত শকুন্তলা উত্তরচরিতের সমালোচনায় না বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস মুকুন্দরামের ব্যাপারে,—আধুনিক সাহিত্যালোচনায় ত নয়ই। সংস্কৃত রীতি সম্পর্কে তাঁর মনের ভাবও তিনি গোপন রাখেন নি। উত্তরচরিত প্রবন্ধে এক জায়গায় তিনি লিখলেন, "কবির আর একটি বিশেষ গুণ রসোদ্ভাবন। রসোদ্ভাবন ব্যাপারটি কি বুঝাতে গিয়ে বললেন, "কিন্তু রস শব্দটি ব্যবহার করিয়াই আমরা সে পথে কাঁটা দিয়াছি। এদেশীয় প্রাচীন আলঙ্কারিক ব্যবহৃত শব্দগুলি একালে পরিহার্য। ব্যবহার করিলেই বিপদ ঘটে। আমরা সাধ্যানুসারে তাহা বর্জন করিয়াছি কিন্তু এই রস শব্দটি ব্যবহার করিয়াই বিপদ ঘটিল নয়টি বৈ রস নয়, কিন্তু মনুষ্যচিত্তবৃত্তি অসংখ্য। রাত, শোক, ক্রোধ, স্থায়ীভাব, চিত্ত হর্ষ, অমর্ষ প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব। স্নেহ, প্রণয়, দয়া ইহাদের কোনও স্থান নাই. না স্থায়ী না ব্যভিচারী—কিন্তু একটি কাব্যানুপযোগী কদর্য মানসিক বৃত্তি আদিরসের আকারস্বরূপ স্থায়ীভাবে প্রথমে স্থান পাইয়াছে। স্নেহ, প্রণয়, দয়াপরিজ্ঞাপক রস নাই, কিন্তু শান্তি একটি রস। সুতরাং এবম্বিধ পারিভাষিক শব্দ লইয়া সমালোচনার কার্য সম্পন্ন হয় না। আমরা যাহা বলিতে যাই, তাহা অন্য কথায় বুঝাইতেছি—আলঙ্কারিকদিগকে প্রণাম করি।"

উত্তরচরিত নাটকটির চমৎকারিত্ব দেখিয়ে লেখক ওটির দোষের প্রসঙ্গও তুলেছেন, কিন্তু তাঁর দোষগুণের বিচারে ঔচিত্যবাদ বা সাহিত্য-দর্পণের সপ্তম পরিচ্ছেদের ৯ কোন প্রভাব দেখা যায় না। গীতিকাব্য' প্রবন্ধে কাব্যের শ্রেণীবিভাগ করতে গিয়ে দৃশ্যকাব্য, আখ্যানকাব্য, খণ্ডকাব্য—এই তিনটি প্রাচীন নাম ব্যবহার করেছেন। প্রাচীনেরা এই শ্রেণীবিভাগ করেছেন রচনার বাহ্যলক্ষণের দিকে নজর রেখে। এজাতীয় শ্রেণীবিভাগ আধুনিক কালে সাহিত্য বিচারে তেমন কার্যকরী নয়। তাই লেখক—"এই ত্রিবিধ কাব্যের রূপগত বিলক্ষণ বৈষম্য আছে। কিন্তু রূপগত বৈষম্য প্রকৃত বৈষম্য নয়"—এই মন্তব্য করে মহাকাব্য, নাটক, গীতিকাব্য ইত্যাদির আধুনিক তথা পশ্চিমী রীতিতে অন্তর বৈষম্য নির্ধারণে প্রবৃত্ত হন।

একথা স্বচ্ছন্দে বলা চলে যে বঙ্কিমচন্দ্র পশ্চিমী রীতি অবলম্বন করে বাংলা সমালোচনার ধারাকে স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট খাতে বইয়ে দিয়ে যান। পরবর্তী কালের সর্বশ্রেষ্ঠ সমালোচক রবীন্দ্রনাথও সযত্নে সংস্কৃত রীতি পরিহার করে চলেছেন। কেবল সাম্প্রতিক কালে ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ডাঃ সুধীর দাশগুপ্ত, ডাঃ সুবোধ সেনগুপ্ত প্রভৃতি পণ্ডিতের চেষ্টায় প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্র সাহিত্য সমাজে খানিকটা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে—তাও এই তথ্যের আবিষ্কারে যে আমরা যে সব নিরিখে সাহিত্য বিচার করি, তার কতক প্রাচীনদেরও মধ্যে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন অলঙ্কারের যে তত্ত্বটি সব চেয়ে বেশি করে আত্মঘোষণা করছে সেই ধ্বনি-রসবাদ ও দেখা গিয়েছে শেষ পর্যন্ত সমগ্র গ্রন্থের মূল্যায়নে অচল—বিশেষ বিশেষ অংশ সম্পর্কেই এর প্রয়োগ সম্ভব। ১০

৯। দোষনিরূপণঃ

১০। ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তৎসম্পাদিত সমালোচনা সাহিত্য'

প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্রে সাহিত্যালোচনার সবটাই পাঠকের দিক থেকে। লেখকের মন, শিক্ষা, সমাজ, পরিবেশ ইত্যাদির দিকে কিছুমাত্র নজর দেওয়া হয় নি। আজকের দিনে লেখকের পরিচয় না নিয়ে তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের আলোচনা করতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তাছাড়া চরিত্র-বিশ্লেষণ, সমাজ-সচেতনতা, বাস্তবতা-অবাস্তবতা বিচার—এ সমস্তও প্রাচীন অলঙ্কারে দুর্লভ।

এখন বঙ্কিমের সমালোচনার প্রত্যক্ষ পরিচয় নেওয়া যাক্। প্রথমে দেখি তিনি কাব্যের পশ্চাতে রচনাকালের বিশেষ সমাজিক প্রভাব আবিষ্কার করছেন এবং যুগ ও সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে কবিকে বুঝার চেষ্টা করছেন। "প্রথম ভারতীয় আর্যগণ অনার্য আদিবাসিদিগের সহিত বিবাদে ব্যস্ত, তখন ভারতবর্ষীয়েরা অনার্যকুলপ্রমথনকারী, ভীতিশূন্য, দিগন্তবিচারী বিজয়ীবীর জাতি। সেই জাতীয় চরিত্রের ফল রামায়ণ। ১১ তারপর অনার্যদের উপর জয়লাভের পরে জাতীয় সমৃদ্ধি ভারতভূমির ভোগের জন্যে আভ্যন্তরিক বিবাদ, তখন আর্য পৌরুষ চরমে উঠেছে "এই সময়ের কাব্য মহাভারত।" ১২ এইভাবে তিনি দেখিয়েছেন ধর্মমোহে পুরাণের সৃষ্টি। তারপরে গীতিকাব্য গীতগোবিন্দের রচনার কারণভূমি বাঙ্গালীর চিত্তক্ষেত্রের কথা বলতে গিয়ে, আশ্চর্যের বিষয়, তিনি ভৌগোলিক প্রভাব কেও স্বীকৃতি দিয়েছেন। "ভারতবর্ষীয়েরা শেষে আসিয়া একটি এমন প্রদেশ অধিকার করিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন যে, তথাকার জলবায়ুর গুণে তাহাদিগের স্বাভাবিক তেজ লুপ্ত হইতে লাগিল" ১৩ ইত্যাদি।

ঈশ্বরগুপ্তের কবিত্বের আলোচনায় ১৪ কবির কাব্যে অশ্লীলতা দোষের কথা বলেই বঙ্কিমচন্দ্র এই অশ্লীলতার কারণ অনুসন্ধানে লেগে গিয়েছেন এবং ঈশ্বরগুপ্তের জীবনের দুঃখধন্দা, শিক্ষা, পরিবেশ প্রভৃতির বিশ্লেষণ করে বলেছেন, "এইভাবে ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় অশ্লীলতা আসিয়া পড়িয়াছে।" এরকম সহানুভূতির দৃষ্টি নিয়ে কবির মন ও পারিপার্শ্বিকের মধ্যে প্রবেশ করে তাঁর কাব্যের বিচার একেবারেই আধুনিক। 'দীনবন্ধুমিত্র' প্রবন্ধেও তিনি অনুরূপভাবে দীনবন্ধুর নাটকের সংলাপে গ্রাম্যতা দোষ ক্ষালনের চেষ্টা করেছেন। দ্বিতীয়তঃ চরিত্রবিশ্লেষণ। বিশ্লেষণ ক্ষমতায় বঙ্কিমচন্দ্র অদ্বিতীয়। তাঁর সব কয়টি প্রবন্ধেই এই ক্ষমতার পরিচয় ছড়িয়েআছে। 'উত্তরচরিতে' বাসন্তী চরিত্রটি লেখকের বিশ্লেষণের গুণে পাঠকের মনে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। শকুন্তলার চরিত্র বিশ্লেষণে লেখক শকুন্তলাকে মিরন্দা ও দেসদিমোনার সঙ্গে তুলনায়, তাদের সঙ্গে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখিয়ে বেশ স্পষ্ট করে তুলেছেন। তুলনামূলক বিচার বঙ্কিম-সমালোচনার অন্যতম বিশিষ্টতা। কুমার সম্ভবের সঙ্গে Paradise Lost, জয়দেবের সঙ্গে বিদ্যাপতি, কালিদাসের সঙ্গে শেক্সপীয়র—এইভাবে তুলনা তিনি করেই যাচ্ছেন। তুলনার সাহায্যেই তাঁর বিশ্লেষণ উজ্জ্বলতা লাভ করে।

সাহিত্যবিচারে খণ্ড খণ্ড করে বিশ্লেষণ করার যেমন প্রয়োজন আছে তেমনি আবার বিশ্লেষণেই যে কাব্যনাটকের সামগ্রিক পরিচয় ফুটে ওঠে না—এ সম্পর্কেও বঙ্কিম কিছুমাত্র অসচেতন ছিলেন না। উত্তরচরিতের আলোচনায় বৈশ্লেষিক পথে কিছুদূর অগ্রসর হয়েই লিখলেন, "এরূপে গ্রন্থের প্রকৃত দোষগুণের ব্যাখ্যা হয় না। এক একখানি প্রস্তর পৃথক পৃথক করিয়া দেখিলে তাজমহলের গৌরব বুঝিতে পারা যায় না।...এই স্থান ভাল রচনা, এই স্থান মন্দ রচনা, এইরূপ তাহার সর্বাংশের পর্যালোচনা করিলে, প্রকৃত গুণাগুণ বুঝিতে পারা যায় না। যেমন অট্টালিকার সৌন্দর্য বুঝিতে গেলে সমুদয় অট্টালিকাটি এককালে দেখিতে হইবে, সাগর-গৌরব অনুভব করিতে হইলে তাহার অনন্ত বিস্তার এককালে চক্ষে গ্রহণ করিতে হইবে কাব্য

গ্রন্থ পরিচিতিতে এক জায়গায় লিখেছেন, "সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে এমন কোন নিদর্শন পাওয়া যায় কি—যাহাতে মনে হইতে পারে যে রঘুবংশ, কুমার সম্ভব, শকুন্তলা, উত্তর চরিত প্রভৃতি দীর্ঘ রচনার সমগ্র কাব্য দেহপরিব্যাপ্ত রস বৈশিষ্ট্যটি সমালোচকের চিত্তে প্রতিভাত হইয়াছিল?" ডাঃ ব্যানার্জির এই আপত্তি কাটাবার চেষ্টা করেছেন ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁর 'ধ্বন্যালোক ও লোচন' গ্রন্থের ভূমিকায়। কিন্তু শেষটায় তাঁকেও লিখতে হল, "অবশ্য ইহা সত্ত্বেও ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় যে অসম্পূর্ণতা দোষের কথা বলিয়াছেন তাহা আংশিকভাবে স্বীকার করিতে হইবে।"

১১, ১২, ১৩ 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধ।

১৪ 'ঈশ্বরগুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব' (১৮৮৫)

নাটক সমালোচনাও সেইরূপ।" তারপরে তিনি খণ্ড খণ্ড অংশের আলোচনা ছেড়ে দিয়ে সমস্ত নাটকখানির গঠন-কৌশল ও অঙ্কের পরে অঙ্কে ঘটনার বিকাশ ও ভাবের পরিণতি, এবং সাকুল্যে নাটকখানির বিশিষ্টতা, শ্রেষ্ঠত্ব ও ত্রুটি পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন। ডঃ শ্রীকুমার ব্যানার্জি বলেন, "এইরূপ সমগ্র আঙ্গিকের বিচার সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে অপ্রাপ্য।" ১৫ 'উত্তর চরিতে' একদিকে যেমন আধুনিক সমালোচনার মূলনীতি নির্দিষ্ট হয়েছে আর এক দিকে তেমনি তার সার্থক প্রয়োগ ঘটছে।

আধুনিক সাহিত্য সমালোচনায় আর একটি আবশ্যিক প্রসঙ্গ বাস্তবতা অবাস্তবতার বিচার—তারও অবতারণা বঙ্কিমচন্দ্রই করে গিয়েছেন। 'দীনবন্ধু মিত্র' প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন, কাব্য নাটককে সত্যমূলক হতে হলে লেখকের অভিজ্ঞতায় ফাঁক থাকা চলে না। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জোরেই একদিকে যেমন দীনবন্ধু জীবন্ত তোরাপ, আদুরি, ক্ষেত্রমণির সৃষ্টি করেছেন, আর একদিকে তেমনি অভিজ্ঞতার অভাবের ফলেই কামিনী, লীলাবতী, ললিতের মত বিকৃত সৃষ্টি হয়েছে। আর শুধু অভিজ্ঞতায়ই হয় না। সৃষ্টির জন্যে সহানুভূতি অপরিহার্য্য। দীনবন্ধুর সহানুভূতি শুধু দুঃখের সঙ্গে নয়, সুখদুঃখ, রাগদ্বেষ, পাপী তাপী সকলের সঙ্গেই ছিল তার তুল্য সহানুভূতি। "সকল কবিরই এ সহানুভূতি চাই, তা নহিলে কেহই উচ্চশ্রেণীর কবি হইতে পারেন না। ১৬

বঙ্কিমচন্দ্র শিল্পীমনের ক্রিয়াপদ্ধতিও দেখার চেষ্টা করেছেন। দীনবন্ধুর চরিত্রসৃষ্টি সম্পর্কে লিখেছেন, "দীনবন্ধু অনেক সময়েই শিক্ষিত ভাস্কর বা চিত্রকরের ন্যায় জীবিত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চরিত্রগুলি গড়িতেন। সামাজিক বক্ষে সামাজিক বানর সমারূঢ় দেখিলেই অমনি তুলি ধরিয়া তাহার লেজশুদ্ধ আঁকিয়া লইতেন। এ টুকু গেল তাহার Realism ; তাহার উপর Idealise করিবারও বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল। সম্মুখে জীবন্ত আদর্শ রাখিয়া আপনার স্মৃতির ভাণ্ডার খুলিয়া, তাহার ঘাড়ের উপর অন্যের দোষগুণ চাপাইয়া দিতেন। যেখানে যেটি সাজে, তাহা বসাইতে জানিতেন।"

বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা সাধারণভাবে বস্তুনিষ্ঠ। তিনি আলোচ্য কাব্যে নিজের মনের ভাব আরোপ করেন না। কিন্তু তাঁর ঈশ্বর গুপ্ত ও উত্তরচরিতের আলোচনার কোন কোন অংশে, পরবর্তীকালে ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথের হাতে পুষ্ট Impressionistic Criticismএর পূর্বাভাস পাই। লেখক ঈশ্বর গুপ্তের প্রতি গভীর প্রীতি ও সহানুভূতি বয়ে তার শিক্ষা সমাজ ও মনের খবর দিয়ে ব্যঙ্গ কবিতাগুলোকে এমন ভাবে উদ্ধার করেছেন যাতে করে সৃষ্টিক্ষণ ও পরিবেশটুকু ফিরে পেয়ে আমরা সেগুলোর রসাস্বাদ পাই, এবং অশ্লীলতা দোষটি তেমনভাবে অনুভবের মধ্যে আসে না। উত্তরচরিতের বিস্তৃত অংশ উদ্ধার করে, তার অনুবাদ দিয়ে, ব্যাখ্যা করে বস্তুত, তিনি নতুন ভাবে ভবভূতির জগৎকে মূর্তি দিয়াছেন এবং নিজের আস্বাদ-অনুভূতির সাহায্যে পাঠককে সেই অপরূপ কাব্য জগতের সৌন্দর্য মাধুর্যে স্নাত করিয়েছেন।

শুধু সাহিত্য তত্ত্ব ও বিচার পদ্ধতিতেই নয়, ভাষা সৌষ্ঠবে ও বঙ্কিমের সমালোচনা প্রবন্ধগুলো অনবদ্য। ভাষা প্রয়োগ, ভাবানুবর্তিতা, সরলতা, স্পষ্টতা ও সর্বশেষে চারুতা-বিধানের যে আদর্শ তিনি তুলে ধরেছিলেন ১৭ এগুলোতে তা অক্ষরে অক্ষরে অনুসৃত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দু'একটি অংশ উদ্ধার করা যাক :—রঙ্গরসের ব্যাপারে প্রাচীন কালের সঙ্গে আধুনিক কালের রুচির পার্থক্য দেখাতে গিয়ে লিখছেন, "আগেকার লোক কিছু মোটা কাজ ভালবাসিত, এখন সরুর উপর লোকের অনুরাগ। আগেকার রসিক লাঠিয়ালের ন্যায় মোটা লাঠি লইয়া সজোরে শত্রুর মাথায় মারিতেন, মাথার খুলি ফাটিয়া যাইত। এখনকার রসিকেরা ডাক্তারের মত সরু ল্যানসেটখানি বাহির করিয়া, কখন কুচ করিয়া ব্যাথার স্থানে বসাইয়া দেন, কিছু জানতে পারা যায় না, কিন্তু হৃদয়ের শোণিত ক্ষতমুখে বাহির হইয়া যায়। ১৮ এর চেয়ে সরস ও উজ্জ্বল বর্ণনা আর কি হতে পারে। আর একটি অংশ—"জয়দেবের গীত, রাধাকৃষ্ণের বিলাসপূর্ণ;

১৫ গ্রন্থপরিচিতি—'সমালোচনা সাহিত্য'।

১৫ 'দীনবন্ধু মিত্র'।

১৬। 'দীনবন্ধু মিত্র'।

১৭। দ্রষ্টব্য 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধ।

১৮। 'দীনবন্ধু মিত্র'।

বিদ্যাপতির গীত রাধাকৃষ্ণের প্রণয়পূর্ণ। জয়দেব ভোগ; বিদ্যাপতি আকাঙ্ক্ষা ও স্মৃতি।...জয়দেবের কবিতা, উৎফুল্ল কমলজাল শোভিত, বিহঙ্গকুল, স্বচ্ছবারিবিশিষ্ট সুন্দর সরোবর। বিদ্যাপতির কবিতা দূরগামিনী বেগবতী তরঙ্গ-সঙ্কুলা নদী। জয়দেবের কবিতা স্বর্ণহার, বিদ্যাপতির কবিতা রুদ্রাক্ষমালা...। ১৯ ভ.ষা এখানে ততটা সরল নয় যতটা সৌষ্ঠবপূর্ণ। ছোট ছোট বাক্য অল্প কথায় অনেকখানি ভারপ্রকাশ করছে, এবং এদের সুসম বিন্যাসে একটি সুন্দর ছন্দস্পন্দ অনুভূত হচ্ছে। শ্রেষ্ঠ গদ্যলিখিয়ের হাতে যে কোন বিষয় সুখপাঠ্য হয়ে উঠে। বঙ্কিমের প্রবন্ধগুলোর কোনটি পড়ে ক্লান্তি আসে না।

১৯। 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব।'

সন্তোষকুমার অধিকারী

গোধূলি যেমন ঝ'রে যায় মেঘে মেঘে
দিনান্ত থেকে দিনগুলি যায় ঝ'রে
পাতা ঝরে শেষ রিক্ত অরণি থেকে
ঢেউ ওঠে আর নামে সমুদ্র ভ'রে;
আগুনের প্রাণ শিখায় শিখায় জ্বলে,
থাকে না সে শিখা—হারায় তিমির তলে,
জীবনও হারায়, পলকে ফুরিয়ে যায়
অসীম শূন্যে সময়ের বালুচরে;
আমিও ত' এই আছি, এই নেই, তবে
কি নামে তোমায় বাঁধবো এ' অন্তরে!
দেখছোত' এই পৃথিবীটা শুধু খেলা,
শুধু ভাঙ্গা আর নতুন গড়ার খেলা,
সারাদিনে যত ফুল ফোটে তত ঝরে,
কে এক পাগল সাজায় ফুলের মেলা!

সকাল সে ভাঙ্গে সন্ধ্যের গানে গানে,
স্বপ্ন ফুরোয় রাত্রির অবসানে;
জীবনের মানে কোন দিন কেউ জানে?
যে জানে, জীবনে তার শুধু অবহেলা,
সে এক পাগল সারাদিন ব'সে থাকে,
সময়ের তীরে ভাঙ্গা-গড়া তার খেলা।
কি লাভ তাহ'লে বালুচরে ঘর বেঁধে
বালি ত' নদীর জলে জলে ধুয়ে যায়,
সারাদিন শুধু গুণি অজস্র ঢেউ,
ঢেউ ভাঙ্গে, প্রেম, স্বপ্ন আশা মিলায়।
অথচ দেখোনা, সেই এক যাওয়া আসা,
সেই ভাঙ্গা-গড়া, খেলা আর ভালোবাসা,
সে এক পাগল চিরকাল থাকে ব'সে
ছড়ায় দু'হাতে যখনই যা কিছু পায়,

কি লাভ তাহ'লে বালিতে জীবন বেঁধে
বালি যে নদীর জলে জলে ধুয়ে যায়।

জাল নেপোলিয়ন

উপানন্দ

তোমরা যারা ইতিহাসের ছাত্রছাত্রী—নিশ্চয়ই জানো ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ৫ই মে তারিখে সেন্টহেলেনার লংউডে একটি ক্ষুদ্র কারাগৃহে মহাবীর সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টের মৃত্যু হয়।

যদি বলা যায় সেন্টহেলেনায় যে নেপোলিয়নের মৃত্যু হয়েছিল, সে নেপোলিয়ন ফ্রান্সের সম্রাট দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়ন ন'ন, তিনি 'জাল' নেপোলিয়ন, তা হোলে নিশ্চয়ই তোমরা অবাক হবে, আর কথাটা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করবেনা। আর তা হওয়াটাও অস্বাভাবিক নয়।'

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে পীয়ারসনস্ উইকলি নামক বিখ্যাত বিলাতী পত্রিকায় যে অশ্রুতপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল, তা তোমাদের কৌতূহল নিবারণের উদ্দেশ্যে তোমাদের অবগত করছি। উক্ত পত্রিকায় বলা হয়েছে—ফ্রান্স সম্রাট দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়ন সেন্ট হেলেনায় প্রাণত্যাগ করেন নি। তিনি অষ্ট্রিয়ায় নিহত হন। অনুচরবর্গের কথা স্মরণ করে তাঁর প্রাণবায়ু বহির্গত হয় নি। একজন অষ্ট্রিয়ান শাস্ত্রীর বন্দুকের গুলিতে তিনি প্রাণ হারিয়েছেন। তিনি মহাবীর নেপোলিয়ন হয়ে পৃথিবী থেকে চির বিদায় নেননি, ইটালী থেকে সামান্য একজন পলাতক হয়ে শেষে প্রাণ হারিয়ে ছিলেন।

মহাবীর নেপোলিয়নের অনুরূপ আকৃতিসম্পন্ন আর একজন সেনানী ছিলেন। নেপোলিয়ন তাঁকে অনেক স্থলে 'নেপোলিয়ন' সাজিয়ে কাজ সারতেন। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হোলে 'জাল' নেপোলিয়নের মাধ্যমে অনেক সময় তার অনুসন্ধান 'করা হোতো। 'ইম্পিরিয়াল' পুলিসের কাছে 'জাল' নেপোলিয়ন নামে আর অনুরূপ আকৃতিতে বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত ছিলেন, কিন্তু কখন তিনি কোথায় কি কারণে যেতেন, পুলিস তার সন্ধান রাখ্‌তো না।

ওয়াটারলুর যুদ্ধ শেষ হোলে মহাবীর নেপোলিয়ন ধরা পড়্‌লেন। আট্‌লাণ্টিক শৈলে নির্ব্বাসনের সময় বীরচূড়ামণি কৌশলে অন্তর্হিত হোলেন, তাঁর অত্যন্ত অনুগত 'জাল' নেপোলিয়ন 'বেলারোফোন' জাহাজে আসল নেপোলিয়ন সেজে নির্ব্বাসন দণ্ডাজ্ঞা ভোগ করবার জন্যে কাপ্তেন মেটল্যাণ্ডের পরিদর্শনে যাত্রা করলেন। এই জাল নেপোলিয়নই সেণ্ট-হেলেনায় ছিলেন।

অতঃপর আসল নেপোলিয়নের কি হোলো এইবার বল্‌ছি—তোমরা মন দিয়ে শোনো। নেপোলিয়ন সকলের অজ্ঞাতসারে ইটালীর ফ্লোরেন্স সহরে গিয়ে উপস্থিত হোলেন, সেখানে একজন চশমাওয়ালার একটি ছোট দোকান কিনে নিয়ে শান্ত ও নীরবভাবে তিনি ব্যবসা সুরু করলেন, এই সামান্য ব্যবসাদারের ভেতর থেকে একটি অসামান্য জ্যোতি প্রকটিত হোতো, লক্ষ্য করতে লাগ্‌লো অনেকে—কিন্তু তাকে সন্দেহ করবার কোনই কারণ ছিলনা। অনেকে তাকে সরলভাবে নেপোলিয়ন বলে ডাক্‌তো, কিন্তু তিনি যে কর্ম্মবীর নেপোলিয়ন ন'ন, এবিষয়ে তিল বহু লোকেরই সন্দেহ। সবাই তাকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে ভালোবাসতো, তিনিও যতদিন ফ্লোরেন্স সহরে ছিলেন, ততদিন প্রতিবেশীদের কাছে বন্ধুর মত আচার ও আচরণ দেখিয়ে তাদের অন্তর জয় করেছিলেন। হঠাৎ একদিন নেপোলিয়ন অদৃশ্য হোলেন, ফ্লোরেন্সের লোকেরা অনেক অনুসন্ধান করলো, শেষ পর্য্যন্ত তাঁর অনুসন্ধান করে শেষে তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। ফ্লোরেন্স ছেড়ে যাবার সময় নেপোলিয়ন ফ্রান্সের নতুন রাজাকে একখানি পত্র লিখেছিলেন, পত্রখানি পড়ে ফ্রান্সের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়েছিল। যাঁরা এই কথা শুনতে পেয়েছিলেন তাঁদের মুখ চাপ্‌বার জন্যে সম্রাট অষ্টাদশ লুইকে বহু অর্থ ব্যয় করতে হয়েছিল।

ইতিহাসে অনুসন্ধান কর্‌লে দেখ্‌তে পাওয়া যাবে, ঐ সময় অষ্ট্রিয়া রাজ্যে সোনব্রেন পার্কের প্রাচীর ডিঙ্‌বার অপরাধে অষ্ট্রিয়ান সম্রাটের একজন সৈন্য পঞ্চাশ বছর বয়সের একজন লোককে বন্দুকের গুলিতে নিহত করে,

এই নিহত ব্যক্তিই নাকি সেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়ন। ইতিহাসের পাতা উল্‌টোলে তোমরা জানতে পারবে, নেপোলিয়নের পুত্র রিচ্‌ট্যাডের ডিউক জননী মেরী লুই কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে সোনব্রানে একরূপ বন্দীভাবে বাস করছিলেন। পুত্রবৎসল নেপোলিয়ন পুত্রকে দেখ্‌বার জন্য ব্যাকুল হয়ে সোনব্রানে গিয়েছিলেন। প্রকাশ্যভাবে কারাগারে পৌঁছুবার উপায় না থাকায় তিনি কারা প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করে কারাগারে প্রবেশের চেষ্টা করছিলেন, এমন সময় একজন কারা-প্রহরী গুলি করে তাঁকে মেরে ফেলেছিল। এই গুলি মারার সংবাদে ফ্রান্সে খুব সোর গোল সুরু হয়েছিল, কিন্তু কারও কোন কথাটি বল্‌বার উপায় ছিল না।

এদিকে জাল নেপোলিয়ন যে সেণ্ট হেলেনায় মারা যান, তা লোরেন নগরের 'সিভিল রেজিষ্টার' পড়লেই বেশ বুঝতে পারা যায়। এই লোরেন নগরে জাল নেপোলিয়ন জন্মগ্রহণ করেছিলেন, আর এখানকার সিভিল রেজিষ্টারে লেখা আছে—'ডবল নেপোলিয়ন সেণ্ট-হেলেনায় প্রাণ-ত্যাগ করেন—'

যে তারিখে মহাবীর নেপোলিয়নের মৃত্যু ঘোষিত হয়েছিল, এই 'ডবল' নেপোলিয়নেরও সেই তারিখে মৃত্যু সংবাদ লিখিত হয়েছে। আর এক কথা—জনৈক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ মহিলা সেণ্ট হেলেনায় ইউরোপের সিংহাসন চ্যুত সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে মহিলাকে দেখে বন্দী মৃদুস্বরে বলেছিলেন—'আপনি আমাকে চিনতে পারেন নি'—এই মহিলার কথা। কর্ণগোচর হয়েছিল, কিন্তু আসল কথা তখন তিনি বুঝতে পারেননি।

এই অভূতপূর্ব অশ্রুত সংবাদ বহুকাল যাবৎ ইংরাজী ভাষায় মুদ্রিত হয়নি, শেষে ভাষান্তরে মুদ্রিত হয়ে এই অত্যাশ্চর্য্য বিবরণী বিলাতে প্রকাশিত হয়েছিল। ফ্লোরেন্স সহরের চশমা-ব্যবসায়ী নেপোলিয়ান আর 'জাল' নেপোলিয়নের ইতিহাস শুনলে তোমরা সবাই চমকে উঠবে, শুধু তোমরা নও, যে পড়বে সে বিস্মিত হবে—হয়তো সবাই বলবে—এটা অলীক কল্পনামাত্র। কিন্তু ইতিহাস-লেখক বলছেন, যাদের মনে সন্দেহের উৎপত্তি হবে, তাঁদের কে জিজ্ঞাসা এই যে,—এটা যদি অলীক বা মিথ্যা হয়, তা হোলে Memorial of St, Helena নামক গ্রন্থ কে লিখেছে এটা কি কথিত 'জাল' নেপোলিয়নের লিপিপ্রসূত? রহস্য চিরদিনই মনের খোরাক হয়ে রইলো, হয় তো এ রহস্য একদিন না একদিন গবেষকের মাধ্যমে ক্রমশঃ প্রকাশ হয়ে পড়বে কোন এক অনাগত দিনে।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাহিনীর সার-মর্ম্ম :

পেদ্রো কালদেরন দ্য লা বার্কা

রচিত

সত্য আর স্বপ্ন

সৌম্য গুপ্ত

[পঞ্চদশ শতাব্দীতে স্পেনদেশে যে সব কৃতী কবি-সাহিত্যিক, সুধী-নাট্যকার তাঁদের অভিনব চিন্তাধারা আর রচনা-কৌশলে সারা জগতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন, বিখ্যাত নাট্যকার পেদ্রো কালদেরন দ্য লা বার্কা তাঁদের অন্যতম। আজ তাই তাঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যে সব চেয়ে সেরা—"লা ভিদা এস্ সুয়েনিয়ো" কাহিনীটির সার-মর্ম্ম তোমাদের বলছি। এ নাটকটি সে যুগে সারা স্পেনদেশে রীতিমত সাড়া জাগিয়ে তুলেছিল এবং শুধু স্বদেশেই নয়, পরবর্ত্তীকালে বিদেশে বহু ভাষাতেই সুবিখ্যাত এই স্পেনীয় নাটকটির অনুবাদ হয়েছে। নাট্যকার কালদেরনের জন্ম ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে…স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ শহরে।

পোলাণ্ড রাজ্যের কথা। সে-রাজ্যের রাজা-রাণী খুবই ভালো…প্রজাদের সুখ-দুঃখের দিকে তাঁদের সদা নজর। প্রজাদেরও কোনো অভাব-অভিযোগ নেই, দুঃখ নেই… তারা তাদের রাজা-রাণীকে বাপের মতো ভালোবাসে, শ্রদ্ধা-ভক্তি করে।

রাজ্যে একদিন খবর ঘোষণা হলো—রাজার ছেলে হবে! রাজা-রাণী খুব খুশী…প্রজারাও মহা খুশী…রাজ্য জুড়ে আমোদ-প্রমোদ আর নাচগান উৎসব চললো। জন্মাবার আগেই রাজা ছেলের নাম রাখলেন—সেগিস্‌মুন্দো।

রাজ-জ্যোতিষীকে ডাকিয়ে এনে রাজা বললেন—ভাগ্য গণনা করে বলো, ছেলে হবে, না, মেয়ে হবে…আর কেমন হবে?

জ্যোতিষী গণনা করে বললে—ছেলে হবে, মহারাজ! কিন্তু ছেলের জন্য আপনাকে দুঃখ পেতে হবে। এ ছেলের জন্ম-পত্রিকায় দেখছি, আপনার সঙ্গে হবে রাজ্য নিয়ে বিবাদ—আর ছেলের হাতেই ঘটবে আপনার পরাজয়।

জ্যোতিষীর কথা শুনে রাজা হতভম্ব! এত সাধের পুত্র…সে হবে বিদ্রোহী! না, তা হতে পারে না।

রাজা ভাবতে লাগলেন—কি করে ভাগ্যের এ লিপি খণ্ডন করা যায় ?

যথাসময়ে রাজার পুত্র জন্মালো। প্রজারা খুব খুশী, রাণীও খুশী···কিন্তু রাজার মনে শান্তি নেই। রাজা তার পরম-বিশ্বাসী ভৃত্য ক্লোতালদোকে জ্যোতিষীর গণনার কথা জানিয়ে বললেন—তুমি আমার অনুগত, বিশ্বাসী। পারবে এ ছেলেকে সরাতে ?

ভৃত্য চমকে উঠলো···বললে—বলেন কি মহারাজ! রাজপুত্রকে হত্যা করবো !

রাজা বললেন—না, না, হত্যা নয়! গোপনে একে রাজপুরী থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবে···নিয়ে যাবে, অনেক দূরে, নির্জন কোনো গিরি-গুহায়···সে-গুহায় একে বন্দী রেখে লালন-পালন করবে। ছেলে বড় হলে, তার পায়ে লাগাবে লোহার শিকল···গুহা থেকে ছেলে যেন বেরুতে না পারে···কোনো মানুষের মুখ না দেখতে পায়। আর একে ওর আসল পরিচয় কখনো বলবে না।

ক্লোতালদোর দু'চোখ সজল হলো···চোখের জল মুছে নিশ্বাস ফেলে সে বললে—আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য, মহারাজ!

গভীর নিশুতি-রাতে সকলের অলক্ষ্যে ঘুমন্ত রাজ-শিশুকে নিয়ে ভৃত্য ক্লোতালদো গেল দূরে নির্জন গিরি-গুহায়।

তারপর সুদীর্ঘ কুড়ি বছর কাটলো। নির্জনে গিরি-গুহায় পায়ে শিকল-বাঁধা বন্দী রাজপুত্র এখন তরুণ যুবক। একমাত্র ক্লোতালদো ছাড়া দুনিয়ার আর কোনো মানুষকে তিনি জানেন না। সারাক্ষণ গুহার কন্দরে বন্দী তরুণ রাজপুত্র দেখেন—দূরে পথে মানুষ-জন চলেছে। দেখেন—আকাশের বুকে উড়ে চলেছে পাখীরা···উন্মুক্ত গিরিকন্দরে অবাধ-আনন্দে চরছে হরিণ, ভেড়া, ছাগল! এ সব দেখে বন্দী রাজপুত্রের মন ওঠে ক্ষেপে···ক্লোতালদোকে বলেন—আমি ওদের মতো বাইরে বেরুতে চাই!···কেন, কেন আমি এমন শিকলে-আঁটা বন্দী ? কি অপরাধ করেছি···কার কাছে কি অপরাধ···যার জন্য আমার এ শাস্তি ?

তরুণ নধরকান্তি-সুপুরুষ রাজপুত্র···তাঁর এ দুর্দশায় ক্লোতালদোর বুকে ব্যথার ভার! রাজপুত্রের কথা শুনে তার দু'চোখে জল ওঠে ছাপিয়ে···তবু সে কোনো কথা বলতে পারে না রাজপুত্রকে! নীরবে সে নিজের দুঃখ সহ্য করে।

একদিন গুহার পাশ দিয়ে চলেছে দু'জন পথিক··· একজন পুরুষ, আরেকজন কন্যা। কন্যার নাম রোসাউরা। বাড়ীতে নানা দৈব-দুর্বিপাক···তরুণী রোসাউরা তাই তার ভৃত্যের সঙ্গে চলেছে রাজার দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করতে। পথে তারা শুনলো গুহার মধ্যে রাজপুত্রের ঐ কাতর মর্ম্মভেদী বিলাপ। রোসাউরা সহানুভূতিভরে এগিয়ে এলো গুহার সামনে···বললে—কে আছো গুহার ভিতরে ?···তোমার কথা শুনে আমার বড় দুঃখ হচ্ছে! কি তোমার দুঃখ, আমায় বলবে ?···

রাজপুত্রের হলো আক্রোশ। উত্তরে তিনি রোসাউরাকে বেশ কর্কশভাবে তিরস্কার করলেন। রোসাউরা ব্যথা পেয়ে চলে গেল নিজের পথে।

রাজধানীতে রাজা বৃদ্ধ হয়েছেন···বিনা দোষে পুত্রের উপর যে নির্ম্মম অত্যাচার করেছেন, তার জন্য তিনি পলে-পলে কি নিদারুণ যাতনায় দিগ্ধ হচ্ছেন! জ্যোতিষীর কথায় অবিশ্বাস জন্মেছে···না, না, রাজপুত্র কখনো পিতৃ-দ্রোহী হতে পারে না! কেন, কি দুঃখে রাজ্য নিয়ে বিবাদ হবে ? রাজ্য তো রাজপুত্রই পাবেন রাজার মৃত্যুর পর···রাজা নিজেই তাঁকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করবেন!···তবে ?

রাজা অনুচর পাঠিয়ে ডাকিয়ে আনালেন ক্লোতাল-দোকে—রাজপুত্রকে পরীক্ষা করবেন। ক্লোতালদো এলে, রাজা তাকে বললেন—ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে গভীর রাত্রে রাজপুত্রকে রাজপুরীতে নিয়ে এসো···তবে হুঁশিয়ার, সে যেন না জানতে পারে!

তাই হলো। ঘুমের ওষুধ খাইয়ে রাজপুত্রকে ঘুমন্ত অবস্থায় রাজপুরীতে আনা হলো। রাজপুত্রকে বন্ধন-মুক্ত করে তাকে রাজবেশে সাজানো হলো···তারপর সোনার পালঙ্কে নরম বিছানায় শোয়ানো!

রাজা স্থির করলেন—পরের দিন পুত্রকে সব কথা বলবেন···শুনে যদি সে শান্ত থাকে, তবেই মঙ্গল···রাজপুত্র আবার রাজপুরীতেই থাকবেন। না হলে, অন্য ব্যবস্থা।

ক্রোতালদো বললে—আর যদি রাগে ক্ষেপে ওঠেন ?

রাজা বললেন—তাহলে আবার গুহায় বন্দী থাকবে !

ক্রোতালদো বললে—তিনি রাজপুত্র, এ কথা জানবার পরেও !

রাজা বললেন—হ্যাঁ !

পরের দিন সকালে ঘুম ভেঙ্গে উঠে রাজপুত্র অবাক ! কোথায় সে গুহা ? কোথায় তাঁর পায়ের শিকল ?··· পরণে এমন রাজবেশ···তার উপর এই রাজপুরী···এই সোনার পালঙ্ক···এমন নরম বিছানা···ঐশ্বর্য্যের এমন সমারোহ !

ক্রোতালদো বললে তখন তাঁকে, তাঁর আসল পরিচয়··· শুনে রাজপুত্র রাগে আগুন ! তিনি বললেন—হোন্ তিনি পিতা, হোন্ তিনি রাজা···জ্যোতিষীর কথায় শিশু অবস্থায় বিনাপরাধে আমার উপর এমন অত্যাচার ? না, না, এর অর্থ নেই···ক্ষমা নেই !

তিনি রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন ··· ওদিকে প্রজারা পেলো খবর···রাজপুত্রকে তারা দেখলো···রাজপুত্র তখন প্রাসাদের দোতলায়··বারান্দায় !

রাজা সকলকে বললেন—রাজা তোমাদের রাজপুত্রের ! রাজপুত্র অবাক ! তিনি বললেন—না, না, এর ক্ষমা নেই ! এত বড় অবিচার···এ কি রাজার কাজ ?

এমন সম্বর্দ্ধনাসত্ত্বেও রাজপুত্র যেন উন্মত্ত হয়ে উঠলেন ···রাজ-দরবারে আশ্রিতা রোসাউরাকে দেখতে পেয়ে, রাগের ঝোঁকে তাকেও তিনি অপমান করে বসলেন। তখন ক্ষিপ্ত রাজপুত্রকে কোনোমতে ধরে বন্ধ রাখা হলো। ক্রোতালদো বললে—এখন উপায় ?

রাজা বললেন—আজ আবার ঐ ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও সেই গিরি-গুহায়··· সেখানে শিকল বেঁধে বন্দী করে রাখো। রাজবেশ, রাজপুরীর কথা বললে, তুমি ওকে বলবে—রাজপুরী··· রাজবেশ···কোথা থেকে আসবে ? ওসব রাত্তিরে তুমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলে।···

রাজার আদেশ প্রতিপালিত হলো। পরের দিন সকালে রাজপুত্রের ঘুম ভাঙলো সেই নির্জ্জন গুহায়···পায়ে শিকল তেমনি বন্দী !

রাজপুত্র অবাক·· ক্রোতালদোকে প্রশ্ন করলেন—এর অর্থ ?···কোথায় সে রাজপুরী ? কোথায় সে রাজা ? প্রজারা কৈ ?···আমি তো কাল এখানে ছিলুম না !

ক্রোতালদো বললে—কি আপনি বলছেন !

রাজপুত্র দিলেন গতকাল রাজপুরীতে সাদর-সম্বর্দ্ধনার বর্ণনা···বললেন—কোথায় সে সব ? যা দেখেছি, সে কি স্বপ্ন, না সত্য ?···

চোখের জল ফেলে ক্রোতালদো বললে—আপনি তাহলে স্বপ্নই দেখেছিলেন ! আপনি তো চিরকাল গুহার মধ্যেই আছেন···এখান থেকে কোথাও যাননি।

রাজপুত্র ভাবলেন—তাই হবে· স্বপ্নই তিনি দেখে থাকবেন !

কিন্তু ব্যাপার এখানেই থামলো না। রাজধানীতে প্রজারা দেখেছে তরুণ রাজপুত্রকে···পেয়েছে তাঁর পরিচয়। তারা দল বেঁধে রাজপুরীর সামনে এসে কলরব তুললে— কোথায় আমাদের রাজপুত্র ?

রাজা বললেন—রাজপুত্র নেই।

প্রজারা বললে—তাঁকে চাই ··না হলে আমরা বিদ্রোহ করবো ! তাঁর উপর অন্যায়-অবিচার করেছেন রাজা !

রাজা কিন্তু প্রজাদের দাবী মানলেন না। প্রজার দল বিদ্রোহী হলো· রাজ্যে জ্বলে উঠলো তুমুল গৃহযুদ্ধের আগুন। প্রজারা বললে—রাজা বৃদ্ধ হয়েছেন···অবিচার করেছেন···তিনি সিংহাসন ত্যাগ করুন···রাজপুত্র তরুণ সেগিসমুন্দো বসবেন দেশের রাজ-সিংহাসনে।

প্রজাদের এই বিদ্রোহাচরণে রাজাকে শেষ পর্য্যন্ত তাদের দাবী মেনে নতিস্বীকার করতে হলো।

রাজপুত্রকে শৃঙ্খলমুক্ত করে গুহা থেকে আনিয়ে সিংহাসনে বসালেন ! জ্যোতিষীর কথা ফললো···রাজ-পুত্রের কাছে হলো রাজার পরাজয়। তরুণী রোসাউরা রাজপুরীতে আশ্রয় পেয়েছিল···তার সঙ্গে মহা ধূমধামে সেগিসমুন্দোর হলো বিবাহ।

—

চিত্রগুপ্ত

এবারে তোমাদের বিজ্ঞানের আরো একটি বিচিত্র মজার খেলার কথা বলি। বিজ্ঞানের এই আজব খেলাটি থেকে তোমরা শব্দ-তরঙ্গের অভিনব এক রহস্যের সন্ধান পাবে…তাই এ খেলার নাম দেওয়া হয়েছে—'শব্দ-তরঙ্গে নক্সা আঁকা'। খেলাটি দেখানো, এমন কিছু কঠিন-সাধ্য ব্যাপার নয়। তাছাড়া বিচিত্র রহস্যময় বিজ্ঞানের এই অভিনব মজার খেলা দেখাতে হলে, যে সব উপকরণ প্রয়োজন, সেগুলি নিতান্তই ঘরোয়া সামগ্রী এবং সংগ্রহ করাও খুব একটা ব্যয়-সাপেক্ষ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে না।

শব্দ-তরঙ্গে নক্সা আঁকা ঃ

বায়ু-মণ্ডল আসলে নিঃশব্দ। এই বায়ু-মণ্ডলে স্পন্দন (Vibration) জাগলে, সেই স্পন্দন আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে মস্তিষ্কে এসে লেগে সাড়া জাগায়। তার ফলেই, আমরা শব্দ শুনি। শব্দ তরঙ্গের এই স্পন্দন যত দ্রুত হয়, ততই তীব্র ও তীক্ষ্ণ সাড়া জাগায়। শব্দ তরঙ্গের এই স্পন্দনের প্রচুর বৈচিত্র্য আছে। দরজায় টোকা মারলে, পিস্তল ছুড়লে, ঘণ্টায় আঘাত করলে কিম্বা তারের বাদ্যযন্ত্রে ছড় টানলে…এগুলির ফলে, শব্দ-তরঙ্গে বৈচিত্র্য ঘটে। তাই আমরা প্রত্যেকটি থেকে আলাদা আলাদা ধরণের শব্দ শুনি—কোনোটি কর্কশ, কোনোটি মধুর।

শব্দ-তরঙ্গের এই বিচিত্র স্পন্দন খালি চোখে (Ordinary vision Naked Eye) দেখা না গেলেও, একটু কৌশল অবলম্বন করলে, এ সব শব্দ-স্পন্দন (Sound Vibration) অনায়াসেই দেখতে পাওয়া সম্ভব। শব্দ-স্পন্দন প্রত্যক্ষ করবার নানা রকম উপায় আছে—আজ সেই সব উপায়েরই বিশেষ একটি উপায়ের কথা তোমাদের
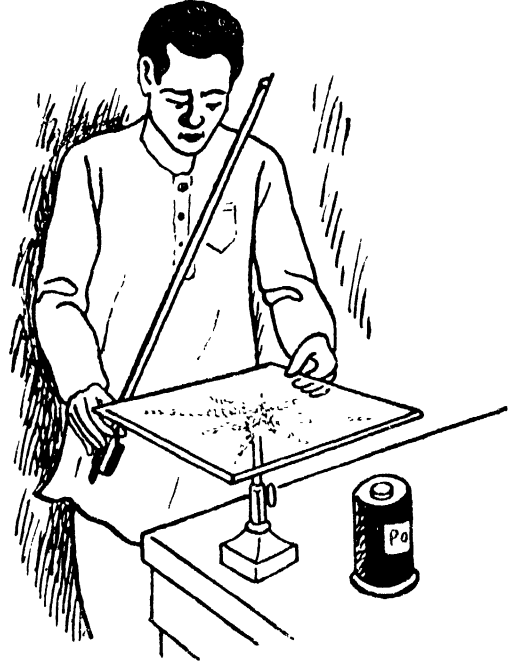
জানাচ্ছি। উপরের ছবিতে যেমন দেখছো, তেমনি ধরণের, বড় একখানা কাঁচ নাও। নিয়ে তোমার কোনো সঙ্গীকে বলো, সে কাঁচখানির এক প্রান্ত ধরে থাকতে। কিম্বা সঙ্গীর অভাবে কাচখানিকে, ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে, তেমনি ভঙ্গীতে 'Flat' অর্থাৎ সমানভাবে কাঠের একটি মজবুত 'ষ্ট্যাণ্ডের' (Stand) উপর বসিয়ে রাখতে পারো। এবারে ঐ কাঁচখানির উপরে খানিকটা খুব মিহি খড়ির গুঁড়ো (French Chalk) সাধারণ পাউডার (Powder) ছড়িয়ে দাও। তারপর এস্রাজ বা বেহালার একটি ছড়ি নিয়ে ঐ কাচের কিনারায় (The edge of a sheet of glass) বাজানোর ধরণে টানো। কাঁচের কিনারা জুড়ে ছড়ি চালানোর জন্য যে শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি হবে, তার ফলে, কাঁচের বুকে যেখানে যেখানে এই স্পন্দন জাগবে, সেখানকার পাউডার বা খড়ির গুঁড়ো সরে যাবে এবং কাঁচের বুকে যে সব জায়গায় এই শব্দ-তরঙ্গের স্পন্দন লাগছে না, সেই সব জায়গায় খড়ির গুঁড়ো বা পাউডার ধীরে ধীরে জড়ো হয়ে, নানা বিচিত্র ছাঁদের নক্সা রচে তুলবে। তাহলেই, ঐ নক্সার সাহায্যে শব্দ-তরঙ্গের স্পন্দন-গতি আমরা চোখে সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাবো।

পরের বারে এ ধরণের আরো কয়েকটি মজার-মজার বিজ্ঞানের খেলার কথা তোমাদের জানবার চেষ্টা করবো।

——

ধাঁধা আর হেঁয়ালি

মনোহর মৈত্র

১। তিনটি বেড়াল-ছানা আর তিনটি পশমের-গোলার হেঁয়ালি ঃ—
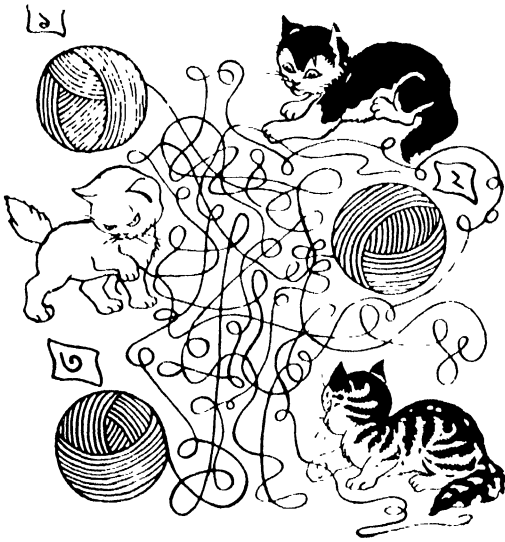
সরস্বতী পূজোর ভাসানের দিন দুপুরে বিবি, বিজু আর ভুটু এরা তিনটি বোন ঘরের সামনের বারান্দায় বসে একমনে পশমের তিনটি গোলা পাকাচ্ছিল এবং সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল এদের পোষা তিনটি বেড়াল-ছানা। সাদা বেড়াল-ছানাটি হলো বিবির, কালো-ডোরাওয়ালা বেড়াল-ছানাটি হলো বিজুর এবং সাদা-কালো ছোপওয়ালা বেড়াল-ছানাটি হলো ভুটুর! এই পোষা বেড়াল-ছানা তিনটির ভারী ইচ্ছা, বিবি, বিজু আর ভুটুর হাতের ঐ পশমের গোলা তিনটি নিয়ে তারা খেলা করবে কিন্তু উপায় নেই! কারণ, ১ নং পশমের গোলাটি বিবির হাতে, ২নং পশমের গোলাটি বিজুর হাতে এবং ৩নং পশমের গোলাটি ভুটুর হাতে—তিনবোনেই পশম-গোটানোর কাজে এমনই ব্যস্ত যে হাতের পশমের গোলা নামাবার ফুরসৎ নেই কারো। কাজেই বেড়াল-ছানা তিনটির মনের সাধ আর মিটছে না কিছুতেই। এমন সময় দূরে পথের মোড়ে শোনা গেল ঢাক-ঢোল-কাঁশির আওয়াজ—পাড়ার ছেলেরা মহা ধুমধামে বাদ্যি বাজিয়ে বিকেল থাকতেই শোভাযাত্রা করে ঠাকুর ভাসান দিতে বেরিয়েছে। বাজনা শুনেই বিবি, বিজু আর ভুটু হাতের কাজ ফেলে রেখে ছুটে এল বারান্দার রেলিং-এর পাশে—ঠাকুর-ভাসানের শোভাযাত্রা দেখতে। সেই অবসরে তাদের পোষা বেড়াল-ছানা তিনটি মহানন্দে পশমের তিনটি গোলা নিয়ে প্রশস্ত বারান্দার মেঝের উপর গড়িয়ে-গড়িয়ে খেলা সুরু করে দিলে। এ খেলায় তারা এমনি মশগুল হয়ে মেতে উঠলো যে, ১, ২ আর ৩ নম্বর পশমের গোলা তিনটি এলোমেলো-ভাবে গড়াগড়ির ফলে বেয়াড়া-ধরণে জোট পাকিয়ে, জড়িয়ে একাকার হয়ে গেল! অর্থাৎ কোনটি যে ১নং গোলার পশমী-সুতো, কোনটি যে ২নং গোলার পশমী-সুতো আর কোনটি যে ৩নং গোলার পশমী-সুতো, সেটা বোঝবার আর কোন হদিশই মেলে না সহজে! তোমরা বলতে পারো—কোন বেড়াল-ছানার থাবার ১নং গোলার পশমী সুতো, কোন বেড়াল-ছানার কাছে ২নং গোলার পশমী-সুতো এবং কোন বেড়াল-ছানার কাছে ৩নং গোলার পশমী-সুতো রয়েছে? যদি পারো তো বুঝবো—খুবই বুদ্ধিমান আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আছে তোমাদের।

২। 'কিশোর জগতের' সভ্য সভ্যাদের রচিত 'ধাঁধা আর হেঁয়ালি' ঃ

একটি মাত্র সংখ্যা পর-পর এমনভাবে পাঁচ লাইনে সাজাও, যাতে সেই লাইনের যোগফল হয়—এক হাজার।

রচনা: রেবা মুখোপাধ্যায় (গিরিডি)

৩। এমন একটি পথ আছে, যে পথ দিয়ে কেউ কোনদিন হাটেনি। তোমরা কী কেউ বলতে পারো, পথটি কী?

রচনা: কমলেশ দে (কলিকাতা)

ফাল্গুন মাসের 'ধাঁধা আর হেঁয়ালির' উত্তর ঃ

১ বেলুন আজব ধাঁধার উত্তর ঃ

বারোটি বেলুনের গায়ে এলোমেলোভাবে যে সব আজব হরফগুলি লেখা রয়েছে, তার মধ্যে লুকানো আছে ভারত-

বর্ষের ৩১টি সহরের নাম। সে সহরগুলি হলো—শিলং ও আগরতলা, মসলিপত্তম, কটক ও বোম্বাই, আহমদাবাদ ও বারাণসী, চেরাপুঞ্জী ও নাগপুর, গোয়ালিয়র ও সিমলা, কানপুর ওপোরবন্দর, পুনা, হায়দ্রাবাদ ও গোয়া, অমৃতসর, মথুরা ও ডিগবয়, মহাবালেশ্বর ও পাটনা, শ্রীরঙ্গপত্তম, মাদ্রাজ ও গয়া, জামালপুর, আলমোড়া ও দেরাদুন, উতকামণ্ড, জয়পুর ও ভিলাই।

২। ফাল্গুন মাসের 'কিশোর জগতের সভ্য-সভ্যাদের রচিত হেঁয়ালির উত্তর

প্রথমে আট-সেরী পাত্র থেকে তিন-সেরী পাত্রে তিন-সের দুধ ঢালতে হবে। এই তিন-সের দুধ পাঁচ-সেরী পাত্রে ঢালতে হবে। আবার তিন-সেরা পাত্রে দুধ নিতে হবে। এই দুধ আবার পাঁচ-সেরী পাত্রে ঢালতে হবে। পাঁচ-সেরীর বাকী দুধের জায়গা ভর্তি হয়ে গেলে, তিন-সেরা পাত্রে এক-সের দুধ থাকবে।

ফাল্গুন মাসের তিনটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ

১। পুপু ও হুটিন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)
২। কুল মিত্র (কলিকাতা)
৩। গৌরাংশু ও বিজয়া আচার্য্য (কলিকাতা)
৪। সুব্রতকুমার পাকড়াশী (কানপুর)

ফাল্গুন মাসের প্রথম ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে।

১। রিনি ও বনি মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)

ফাল্গুন মাসের দ্বিতীয় ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে।

১। তাপস, নমিতা, ছবি কবি, কবিতা, সবিতা, ডাল, অনিতা, জয়ন্তী ও শঙ্কর (কোন্নগর)
২। মানসমোহন বসু (কোন্নগর)
৩। পুতুল, সুষমা, হাবলু ও টাবলু মুখোপাধ্যায় (হাওড়া)
৪। দিপ্তী বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা)
৫। চন্দন, অলোক, পটু, পাপু কমল, চীনু (লাভপুর)
৬। স্বপন, সন্ধ্যা, মুরারী, অজিত, বাবলু (কুটিগোদা)
৭। চন্দন, নন্দন ও বন্দিতা লাহিড়ী (আসানসোল)
৮। সদানন্দ সিংহ (কাছাড়)
৯। অরূপকুমার ও শ্যামলী চৌধুরী (কুটিগোদা)
১০। অনিতা, অনুরাধা, অরূপ ও অপন সেন (আগরপাড়া)
১১। মালা সেন ও ইলা দত্ত (পাটনা)
১২। অমিয়কুমার মল্লিক (হুগলী)
১৩। অরিন্দম, সুপ্রিয়া ও অলকানন্দা দাস (কৃষ্ণনগর)
১৪। পুষ্পরঞ্জন ও উৎপলা ভট্টাচার্য্য (চুঁচুড়া)
১৫। সুজাতা কোঙর (বাতানল)
১৬। অশোক, নীতা ও গৌতম ঘোষ (কলিকাতা)
১৭। রেখা মাহাতো (ভসমানন্দ)
১৮। যোগেশচন্দ্র ঘোষ (কুটিগোদা)
১৯। দেবাশিস মৈত্র (কলিকাতা)
২০। অর্পণা ঘোষ (কলিকাতা)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ এবার থেকে প্রতিমাসের ২০শে তারিখের মধ্যে যাদের কাছ থেকে 'ধাঁধা ও হেঁয়ালির' লিখিত উত্তর আমাদের দপ্তরে এসে পৌছুবে, শুধু তাদেরই নাম পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে। বিলম্বে যে সব উত্তরদাতার চিঠিপত্র আসবে, অনিবার্য্যকারণে তাঁদের নাম প্রকাশ করা সম্ভবপর হবে না।

—সম্পাদক

"দেখবে এস"

শ্রীনৃপেন আকুলি

নাচ শিখেছি হরেক রকম দেখবে এস ভাই
চোখ জুড়ানো মন ভুলানো যেমন খুশী চাই

ইঁদুর নাচে চমকে যাবে পড়বে লুটে ভুঁয়ে
ফড়িং নাচে গড়াগড়ি দেবেই শুয়ে শুয়ে
কাঠবেড়ালী নাচ দেখে সব যাবে কেমন করে
বিড়াল নাচে ডিগবাজীতে আসবে জানি ঘরে
বাঁদর নাচে ভালুক নাচে লাগবে মজা ঠিক
নাচ দেখে সব হাসির চোটে নাচবে নানা দিক
নাচ দেখানো ব্যবসা করি নানান্ দেশে যাই
দেখলে পরে বুঝবে সবাই বলবো কত ভাই
আমার কাছে দেখবে এস দেখতে যদি চাও।
শিখতে যেটা চাইবে তুমি শিখতে পাবে তাও।

শিঙওয়ালা মাছের শিকার কৌশল

গৌর আদক

শিঙ, শিঙ, শিং আর শিঙ ; গরুর শিং, মোষের শিঙ, ছাগলের শিং হরিণের শিঙ এই রকম যে কত রকমের শিং আছে তার আর ইয়ত্তা নেই। কোনটা চাঁদের মতন বেঁকান, কোনটা গোল ভাবে ঘোরান আবার কোনটা বা গাছের শাখা প্রশাখার মতন এঁকা বেঁকা। তা তো তোমরা হরদম দেখছ কারণ এখানে যে কটা প্রাণীর কথা বললাম তার মধ্যে দু একটি প্রাণী তো রাস্তায় রাস্তায় অনবরত ঘুরেই বেড়ায় তা হয়তো তোমাদের দৃষ্টির আড়াল হয় না।

এই রকম শিঙ মাছেরও হয়। শুনে একেবারে অবাক হয়ে গেলে নয়? ভাবছ এ যতসব আজগুবি খবর। কিন্তু এটা আজগুবি নয় এটা একেবারে সত্য। এরকম মাছ দেখনি বলেই তাই আজ তোমাদের কাছে এটা আজগুবি বলে মনে হচ্ছে। দেখলে তখন আর তোমাদের আজগুবি বলে মনেই হবে না, উল্টে আজগুবি কথাটা তোমাদের মন থেকে একেবারে লোপ পেয়ে যাবে। তবে এধরণের মাছ না দেখাটা খুবই স্বাভাবিক কারণ এ সমস্ত মাছতো আর পুকুরের কই কাতলা নয় যে দেখবে। এ সমস্ত মাছ হচ্ছে সমুদ্রের মাছ, তবে তা বলে আমি বলছি না যে তোমরা সমুদ্রের মাছ দেখনি। সমুদ্রের মাছ ও তোমরা দেখে থাকবে কারণ আজ কালকার বাজারে প্রচুর পরিমাণে সমুদ্রের মাছ আমদানি হয়। তবে ঐ সমস্ত মাছের মধ্যে অবশ্য কোন বৈশিষ্ট্য নেই। আমি যে মাছটির কথা তোমাদের কাছে বলছি এটি হচ্ছে গভীর সমুদ্রের মাছ, সত্যি এদের দেখা মেলা বড়ই ভার। অবশ্য সব সময় সব জিনিষটা সকলের ভাগ্যে জোটেনা, তাই অনেকসময় মানুষের কথার উপর বিশ্বাস করে নিয়ে নিজের মনের ভুল ধারনাটাকে দূর করে নিতে হয়।

শুধু শিং ওয়ালা মাছই নয় আরও বহু বিচিত্র রকমের মাছও আছে সমুদ্রের মধ্যে, যে তোমরা না দেখলে কল্পনাই করতে পারবে না। সে যেন একটা আলাদা জগৎ।

যাক সে কথা পরে হবে। এখন শিঙওয়ালা মাছের শিকার কৌশলের কথা বলি শোন। শিং ওয়ালা মাছের মাথার উপরই আছে একটি চকচকে ধপধপে সাদা শিং। ঐ শিঙটাই হচ্ছে ওদের আসল। অনেক প্রাণী আছে যাদের শিঙটা হচ্ছে একটি প্রধান অস্ত্র যা দিয়ে তারা শত্রুর সঙ্গে লড়াই করে নিজেকে শত্রুর হাত থেকে বাঁচায়, কিন্তু শিং ওয়ালা মাছ তা করে না ওরা ঐ শিং দিয়ে শিকার ধরে নিজের জীবিকা অর্জন করে।

ওদের শিকার ধরার কৌশলটি বড় অদ্ভুত। শিকার ধরার সময় ওরা শরীরটাকে সম্পূর্ণ ভাবে কাদা জলের মধ্যে লুকিয়ে রেখে, চকচকে শিঙটাকে বার করে রাখে এবং মাঝে মাঝে নাড়াতে থাকে। তখন ছোট ছোট মাছেদের ঐ চকচকে শিঙটার উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ছোট ছোট মাছেরা ভাবত নিশ্চয়ই কোন পোকা মাকড়, এই লোভে মাছগুলো শিঙটার কাছে আসে, ঠোকরাতে আরম্ভ করে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে সেই জিনিষটা অদৃশ্য হয়ে সেখানে ভেসে ওঠে বিরাট একটা হাঁ। তারপর সেই ছোট মাছগুলো সরাসরি শিং ওয়ালা মাছের পেটের ভিতরে চলে যায়।

অনবরত এরা এরকম ভাবে খেয়েই চলেছে। খিদে যেন এদের মেটেই না। পয়লা নম্বর পেটুক রাম, এ কথায় যাকে বলে রাক্ষস পেট তো নয় ঠিক যেন একটি জালা !

আজব দুনিয়া

জীবজন্তুর কথা

দেবশর্ম্মা বিচিত্রিত

মেঘলা-রঙীন চিতাবাঘ: এরা বিচিত্র এক জাতের চিতাবাঘ ... আকারে সাধারণ চিতাবাঘের চেয়ে ছোট হয়। এদের গায়ের মেঘলা-ধূসর বর্ণের উপর কালো ডোরা ও বুটি দেওয়া লোম থাকে বলে, এরা জংলী-পাতাঝোপের আড়ালে অনায়াসে আত্মগোপন করে থাকতে পারে এবং শীকার পেলেই অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। এরা যেমন সেয়ানা-ধূর্ত্ত, তেমনি ক্ষিপ্র-চটপটে। এরা গাছে চড়তে খুবই দড় এবং বসবাসও করে গাছের ডালে পাতার ঝোপেঝাড়ে - জঙ্গলের অন্যান্য প্রাণীদের নজরের বাইরে। এরা সচরাচর ছোট-ছোট জীবজন্তু আর বনের পাখী শীকার করে খেয়ে জীবন কাটায়। এদের বসবাস বোর্নিও-দেশের নিবিড় অরণ্যে। এরা হিংস্র হলেও সাধারণতঃ পোষ মানে ও বাধ্য হয়।

হুলওয়ালা শয়তান-মাছ: এরা বিচিত্র এক ধরণের সামুদ্রিক মাছ। এদের দেহ চ্যাটাল-ছাঁদের ... ল্যাজ লম্বা চাবুকের মতো কড়া ... সে-ল্যাজে থাকে ক'টি ডানা। এদের দেহে থাকে একরাশ কাঁটার মতো হুল — এই হুল হলো এদের আত্মরক্ষা করবার মারাত্মক অস্ত্র। এই হুলওয়ালা লম্বা ল্যাজের ঝাপটায় এরা বড়-বড় জীবকে রীতিমত কাবু করে এবং তীক্ষ্ণ-হুলের কাঁটা বিঁধিয়ে তীব্র জ্বালা দেয়। তাই এদের সবাই ডরায়। এই হুলওয়ালা ল্যাজের দাপট আর বিকট চেহারার লোকে এদের নাম দিয়েছে 'DEVIL-FISH' বা 'শয়তান মাছ'। এরা আকারে প্রায় পনেরো-ষোলো ফুট বিরাট হয়। এদের মেজাজও সাংঘাতিক উগ্র ... দেহেও প্রচণ্ড শক্তি। দক্ষিণ আমেরিকার সাগরে এ সব ভয়ানক মাছ প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়।
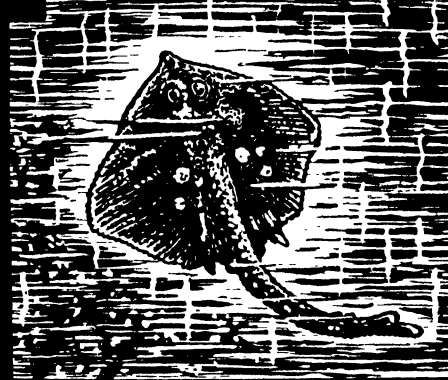
সোনালী-কালো ফেজান্ট-পাখী: এরা হলো 'কর্ষক'-বর্গের পাখী — পায়ের ও ঠোঁটের সাহায্যে মাটি খুঁড়ে খাবার খুঁটে খায় ... ময়ূর আর মুরগীর জাতভাই। তবে এদের চেহারা বেশ সুন্দর আর বিচিত্র বর্ণের পালখে ঢাকা হয়; পুরুষ-পাখীদের মাথা, ঘাড়, গলা, ডানা ও ল্যাজ খুবই বাহারে ... লাল, কালো, সোনালী আর শাদা রঙের পালখের শোভায় অপরূপ। এরা নানা রকমের শস্য আর পোকা-মাকড় খেয়ে আর নিরালা-ঝোপের মধ্যে মাটির বুকে বাসা বেঁধে জীবনধারণ করে। এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নানা রকমের ও জাতের ফেজান্ট পাখী পাওয়া যায়। তবে এ-জাতের ফেজান্ট পাখী মেলে চীনদেশে। এরাই সেরা সুন্দর।

পশ্চিমবঙ্গে নূতন মন্ত্রিসভা—

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার কংগ্রেস দলের নেতা নির্বাচিত হইয়া ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় মোট ১৬ জন মন্ত্রী লইয়া মন্ত্রী-পরিষদ গঠন করিয়াছেন। রাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের নাম পরে ঘোষণা করা হইবে। বলা বাহুল্য গত নির্বাচনে মন্ত্রী শ্রীআবদুস সত্তার, মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার, রাষ্ট্র-মন্ত্রী ডাক্তার অনাথবন্ধু রায় ও উপমন্ত্রী শ্রীসতীশচন্দ্র রায় সিংহ পরাজিত হইয়াছেন। পুরাতন মন্ত্রীদের মধ্যে ডাক্তার আর আমেদ অবসর গ্রহণ করিয়াছেন এবং শ্রীশ্যামাপ্রসাদ বর্মণ নির্বাচনে জয়লাভ করিয়াও মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন নাই। নূতন মন্ত্রী হইয়াছেন—(১) ডাক্তার জীবনরতন ধর—স্বাস্থ্য (২) শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, পঞ্চায়েৎ, সমাজ উন্নয়ন, জাতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনা ও উপজাতি কল্যাণ, (৩) শ্রীমতী আভা মাইতি—উদ্বাস্তু সাহায্য, পুনর্বাসন ও রিলিফ (৪) শ্রী এস-এস-ফজলর রহমন—পশু-পালন ও পশু চিকিৎসা (৫) শ্রীবিজয় সিং নাহার—শ্রম। এই নূতন ৫জন ছাড়া ৩জন রাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী পূর্ণ মন্ত্রীর পদ পাইয়াছেন—(৬) শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায়—কারা ও সমাজ কল্যাণ (৭) শ্রীশ্যামাদাস ভট্টাচার্য্য—ভূমি ও ভূমি রাজস্ব (৮) শ্রীজগন্নাথ কোলে—স্বরাষ্ট্র বিভাগের প্রচার শাখা, আবগারী ও পরিষদীয় কার্য্যকলাপ। বাকী ৮জন মন্ত্রী পূর্বেও মন্ত্রী ছিলেন—(৯) ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় মুখ্য-মন্ত্রী। সাধারণ শাসন পরিচালনা, রাজনীতিক বিষয়, পরিবহন, সংবিধান ও নির্বাচন, স্বরাষ্ট্র বিভাগের দুর্নীতি-দমন ও এনফোর্সমেণ্ট শাখা, অর্থ, উন্নয়ন, শিল্প ও বাণিজ্য, মৎস্য ও গৃহ-নির্মাণ। (১০) শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন—খাদ্য, কৃষি ও সরবরাহ (১১) শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়—পুলিস, প্রতি-রক্ষা, পাসপোর্ট, ও স্বরাষ্ট্র বিভাগের প্রেস শাখা (১২) শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—পূর্ত (১৩) শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, সেচ ও জলপথ (১৪) শ্রীঈশ্বরদাস জালান—আইন (১৫) রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী—শিক্ষা ও (১৬) শ্রীতরুণ-কান্তি ঘোষ—কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্প, বন ও সমবায়।

লোক সভা সদস্য—

গত সাধারণ নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ হইতে নিম্নলিখিত ৩৬ জন লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন—তন্মধ্যে কংগ্রেস দলের—(১) শ্রীগুরুগোবিন্দ বসু, বর্দ্ধমান (২) শ্রীঅতুল্য ঘোষ, আসানসোল (৩) ডাক্তার মনো-মোহন দাস, আউসগ্রাম (৪) শ্রীনলিনী রঞ্জন ঘোষ, জল-পাইগুড়ী (৫) শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য, রায়গড় (৬) শ্রীরামগতি বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঁকুড়া (৭) শ্রীগোবিন্দকুমার সিংহ, মেদিনীপুর (৮) শ্রীশচীন চৌধুরী, ঘাটাল (৯) শ্রীমতী রেণুকা রায়, মালদহ, (১০) শ্রীসতীশচন্দ্র সামন্ত, তমলুক (১১) শ্রীথিয়োডর যামেন, দার্জিলিং (১২) শ্রীশিশির কুমার সাহা, বীরভূম (১৩) হুমায়ুন কবীর, বসিরহাট (১৪) শ্রীপশুপতি মণ্ডল, বিষ্ণুপুর (১৫) শ্রীসুবোধ হাসদা, ঝাড়গ্রাম (১৬) শ্রীকমল কুমার দাস, কাঁথি (১৭) শ্রীসুধাংশু দাস, ডায়মণ্ডহারবার (১৮) শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ, বারাসত (১৯) শ্রীপূর্ণেন্দু খাঁ উলুবেড়িয়া (২০) শ্রীপরেশনাথ কয়াল, জয়নগর (২১) শ্রীপূর্ণেন্দু নস্কর, মথুরাপুর (২২) অশোক কুমার সেন উত্তর-পশ্চিম কলিকাতা। বাকী ১৪ জন বিভিন্ন দলের—(১) শ্রীত্রিদিব চৌধুরী, বহরমপুর (২) শ্রীশরদীশ রায় কাটোয়া (৩) সৈয়দ বদরুদ্দজা, মুর্শিদাবাদ (৪) শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়, নবদ্বীপ (৫) শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীরামপুর (৬) প্রভাত কর, হুগলী (৭) ভজহরি মাহাতো, পুরুলিয়া (৮) শ্রীদেবেন্দ্রনাথ কার্যজ, কুচবিহার (৯) শ্রীসর্দ্দার মুর্মু, বালুরঘাট (১০) রেণু চক্রবর্ত্তী, বারাকপুর (১১) মহম্মদ ইলিয়াস, হাওড়া (১৩) হীরেন্দ্রনাথ মুখার্জি, মধ্য কলিকাতা (১৩) ডাঃ রনেন সেন, পূর্বকলিকাতা (১৪) ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, দক্ষিণপূর্ব কলিকাতা। এই ১৪ জন বিভিন্ন বামপন্থী দলভুক্ত।

বিধান সভায় দলগত সংখ্যা—

এবার পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার মোট ২৫২ জন সদস্যের মধ্যে কংগ্রেস দল হইতে ১৫৭ জন সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় বাঁকুড়ার শালতোড়া ও কলিকাতার চৌরঙ্গী ২টি আসনে নির্বাচিত হওয়ায় সদস্য সংখ্যা হইয়াছে—১৫৬ জন। তাহা ছাড়া আর-এস-পি দলের ৭, পি-এস-পি দলের ৫, ফবোয়ার্ডব্লক—(১ জন মার্ক্সিষ্ট সহ) ১৪, কম্যুনিষ্ট—৪৯, লোকসেবক সংঘ—৪, নির্দলীয়—১২, গোর্খা লীগ—২ এবং আর-সি-পি-আই দল ২। কাজেই কংগ্রেস দল লঘিষ্ঠতা অর্জন করার ও ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ঐ দলের নেতা নির্বাচিত হওয়ায় তিনিই মুখ্যমন্ত্রী হইয়া নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের অধিকার লাভ করিয়াছেন। ষঠবাম দলের বিকল্প সরকার গঠনের স্বপ্ন কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

মহিলা এম এল এ—

এবার পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত ২৫২ জন সদস্যর মধ্যে ১৩ জন মহিলা আছেন। তন্মধ্যে ১২ জন কংগ্রেস দলের—তাঁহাদের নাম—

(১) শ্রীমতী মায়া বন্দ্যোপাধ্যায়, কাকদ্বীপ, ২৪ পরগণা (২) নীহারিকা মজুমদার, রামপুরহাট, বীরভূম (৩) ডাক্তার মৈত্রেয়ী বসু ফোর্ট কলিকাতা (৪) আভা মাইতি ভগবানপুব, মেদিনীপুর (৫) তুষার টুড্ডু, গড়বেতা, মেদিনীপুর (৬) শান্তি দাস, চাকদহ, নদীয়া, (৭) শাকিলা থাতুন, বাসন্তী, ২৪পরগণা (৮) সুধারাণী দত্ত, রাইপুর বাকুড়া (৯) মহারাণী রাধারাণী মহতাব, বৰ্দ্ধমান (১০) শান্তিলতা মণ্ডল, বিষ্ণুপুর পূর্ব ২৪ পরগণা (১১) পূববী মুখোপাধ্যায়, তালডাংরা বাঁকুড়া (১২) বিভা মিত্র, কালীঘাট কলিকাতা। কমুনিষ্ট দলের ইলা মিত্র কলিকাতা, মাণিকতলা হইতে নির্বাচিত হইয়াছেন। ১৫২ জনের মধ্যে ১৩ জন মহিলা—কাজেই সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে পুরবী মুখোপাধ্যায় ও মায়া বন্দ্যোপাধ্যায় গত বারে রাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীর কাজ করিয়াছেন।

নেতাদের পরাজয়—

গত সাধারণ নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে নিম্নলিখিত নেতারা পরাজিত হইয়াছেন—মন্ত্রীমহলে—শ্রীআবদুস সাত্তার, শ্রীভূপতি মজুমদার ও ডাঃ অনাথবন্ধু রায়। কংগ্রেসী কর্তা মহলে—শ্রীঅমর সরকার (বীরভূম)। শ্রীহংসধ্বজ ধাড়া (২৪ পরগণা) ও শ্রীনারায়ণ চৌধুরী (বর্দ্ধমান)। বঙ্কিমচন্দ্র কর, স্পীকার, হাওড়াকম্যুনিষ্ট দলে—শ্রীমতীমনি-কুন্তলা সেন, শ্রীহেমন্ত ঘোষাল, শ্রীসত্যেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার, শ্রীভবানী সেন, শ্রীকংসারী হালদার, শ্রী সুধাংশু আচার্য্য ও রতনলাল ব্রহ্ম। ফরোয়ার্ড ব্লকের অংবিন্দ ঘোষাল, নাড়ু ঘোষ, সুবিমান ঘোষ ও চিত্ত বসু। পি-এস-পি দলের—ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ দেবেন সেন, সুনীলদাস ও শিশির দাস। আর-এস-পি দলের যতীন চক্রবর্ত্তী ও বীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়। এস-ইউ-সি দলের—সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রেণু পদ সরকার। নির্দলীয়—ব্যারিষ্টার নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

জেলা হিসাবে সাফল্য—

গত সাধারণ বিধানসভা নির্বাচনে—পশ্চিম বঙ্গের ১৬টি জেলায় কংগ্রেস পক্ষ নিম্নলিখিত রূপ সদস্য পাইয়াছে—জেলার নাম, মোট নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা ও কংগ্রেস সদস্যের সংখ্যা পর পর দেওয়া হইল—কলিকাতা—২৬-১৪। ২৪ পরগণা—৪২—৩৩। হাওড়—১৫—৯৯। হুগলী ১৫—১০। নদীয়া—১১—৬। বৰ্দ্ধমান ২১—১০। বাঁকুড়া ১৩—৯। বীরভূম—১০—৪। পুরুলিয়া—১১—৬। মেদিনীপুর ৩২—৮। মুর্শিদাবাদ—১৬—১১। পশ্চিম দিনাজপুব—১০—৬। কোচবিহার—৭—১। জলপাই-গুড়ী—৯—৭। দার্জ্জিলিং—৫—২। মোট—২৫২—১৫৭।

শ্রীজহরলাল নেহরু—

উত্তর প্রদেশের ফুলপুর কেন্দ্র হইতে প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু লোক সভার সদস্য পদ প্রার্থী ছিলেন। তিনি মোট ১১৮৯৩১ ভোট পাইয়া সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছেন তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ডাক্তার রাম মনোহর লোহিয়া (সোস্যালিষ্ট) ৫৪:৬৯ মাত্র ভোট পাইয়াছেন।

বিধান সভায় মনোনয়ন—

পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল নিম্নলিখিত ৪ জন এংলো-ইণ্ডিয়ানকে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য মনোনীত করিয়াছেন—(১) মিস ওলিভ পিনেণ্টল (২) আর-ই-প্ল্যাটেল (৩) সি-এল-বাঞ্চে ও (৪) ক্লিফোর্ড নরোন। তাহারা গত

৫ বৎসর বিধান সভার সদস্য ছিলেন—আগামী ৫ বৎসর ও সদস্য থাকিবেন।

বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী—

গত সাধারণ নির্বাচনের পর প্রায় সকল রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন শেষ হইয়া আসিল—(১) পাঞ্জাবে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্দ্দার প্রতাপ সিং কাইরণ পুনরায় মুখ্যমন্ত্রী হইয়াছেন (২) উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সম্পূর্ণানন্দ গুপ্ত আবার মুখ্যমন্ত্রী হইয়া মন্ত্রিসভা গঠনের ভার পাইলেন (৩) মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই-বি-চ্যবন ও আবার মন্ত্রিসভা গড়িয়াছেন, (৪) গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার জীবরাজ মেটাও আবার সেখানে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হইয়াছেন, (৫) পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস দল গত বৎসর অপেক্ষা ভোট বেশী পাওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ই আরও ৫ বৎসর মুখ্যমন্ত্রীর কাজ করিবেন, (৬) বিহারে দলাদলি সত্ত্বেও বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী পণ্ডিত বিনোদানন্দ ঝা আবার মুখ্যমন্ত্রীর কাজ করিবার অধিকার লাভ করিয়াছেন (৭) মাদ্রাজে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকামরাজ নাদারের বিরুদ্ধে কেহ কথা না বলায় তিনিই আবার মুখ্যমন্ত্রী হইয়াছেন। (৮) আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিমলাপ্রসাদ চালিহা আবার দলের নেতৃত্ব লাভ করিয়াছেন। (৯) মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার কৈলাসনাথ কাটজু নির্বাচনে পরাজিত হওয়ায় রাজস্বমন্ত্রী শ্রীভগবন্ত রায় মাণ্ডলোয় নূতন নেতা ও মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। (১০) অন্ধ্র রাজ্যে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীএন, সঞ্জীব রেড্ডী নূতন নেতা ও প্রধান মন্ত্রীর কাজ গ্রহণ করিয়াছেন। (১১) রাজস্থানে শ্রীমোহনলাল সুখাদিয়া আবার মুখ্যমন্ত্রী হইয়াছেন।

সিংহলে নূতন গভর্ণর জেনারেল—

সিংহল সরকার গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী ঘোষণা করেন যে সার অলিভার গুণতিলকের স্থানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সিংহল রাষ্ট্রদূত শ্রী ডবলিউ গোবল্লভ নূতন গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছেন এবং ২রা মার্চ তিনি কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীগোবল্লভ চীনেও রাষ্ট্রদূতের কাজ করিয়াছেন এবং তাঁহার বয়স ৬০ বৎসর। সর্বত্রই শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন হইতেছে।

নিশাপতি মাঝি—

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী নিশাপতি মাঝি গত ২৮শে জানুয়ারী ৬৩ বৎসর বয়সে চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বোলপুরের অধিবাসী এবং বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্রনাথের আদিবাসী সেবাকার্য্যের সহায়ক ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল কংগ্রেস ও জনসেবার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং ১৯৫২ ও ১৯৫৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি ভাল বক্তা ও লেখক ছিলেন।

কলিকাতায় জল সরবরাহ বৃদ্ধি—

কলিকাতা সহরে অধিক পরিমাণে জল সরবরাহ করিবার জন্য কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ ১৯৫৯ সালে পলতা হইতে টালা ১৩ মাইল ৭২ ইঞ্চি মেন পাইপ বসাইবার কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। এখন পর্য্যন্ত ৯½ মাইল পাইপ বসানো হইয়াছে—১৯৬১ সালের জুন মাসে কাজ শেষ হওয়ার কথা। কবে শেষ হইবে কেহ বলিতে পারে না। এই পাইপ বসাইবার কাজের জন্য জনগণের অসুবিধার শেষ নাই, বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের ধারে গর্ত করায় ঐ রাস্তার ধারের সকল স্থানের লোক নানা ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। কেন যে যথাসময়ে কাজ শেষ হয় নাই—তাহার কারণ জানা যায় না। এই প্রসঙ্গে কলিকাতার উত্তরে টালার মাটির পুলের সংস্কারের কথা বলা চলে, বহু দিন ঐ পুল অব্যবহার্য্য হইয়া আছে। বাস লরী প্রভৃতিকে ৩।৪ মাইল ঘুরিয়া কলিকাতায় আসিতে হয়। ৩।৪ বৎসর ধরিয়া পুলের মেরামতের কথা শুনা যায়—কিন্তু কাজ আরম্ভ হইল কি না বুঝা যায় না। আমরা উভয় বিষয়ে কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ ও পশ্চিম বঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

মাধ্যমিক শিক্ষার শোচনীয় অবস্থা—

ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত মধ্যশিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুসারে এখন পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন ও উন্নয়নের কাজ দ্রুতগতিতে চলিতেছে। দশম মানের বিদ্যালয়গুলিকে ক্রমশ একাদশ মানের বহুমুখী বিদ্যালয়ে পরিণত করা হইতেছে। উদ্দেশ্য অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সুযোগ বৃদ্ধি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগ সম্প্রতি এ বিষয়ে সমীক্ষা করিয়া এক

সুপ্রিয়া চৌধুরীর সৌন্দর্য্যের গোপন কথা...

'লাক্সের মধুর পরশ আমায় সুন্দর রাখে'

সুপ্রিয়া চৌধুরী বলেন -'সাবানটিও চমৎকার, আর রঙগুলোও কত সুন্দর!'

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

LTS. 110-X52 BO

রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন—তাহা সত্যই হতাশাব্যঞ্জক। রিপোর্টটি ঐ বিভাগের প্রধান ডাক্তার পি-কে-বসু পুস্তিকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে বহু বিষয়ে অধ্যাপনা প্রায় বন্ধ হইয়াছে। হঠাৎ ৩ বৎসরের ডিগ্রী কোর্স-কলেজের সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়ায় যেমন সেখানে অধ্যাপকের অভাব, তেমনই অনেক বহুমুখী বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান পড়াইবার শিক্ষকের অভাব। ভাল গবেষণাগার, পাঠাগার, সংগ্রহশালাও করা অসম্ভব হইতেছে। এ সকল বিষয়ে সুপরামর্শ দিবার লোকের ও অভাব। নূতন শিক্ষামন্ত্রীর এ বিষয়ে বিস্তারিত নির্দ্দেশ প্রকাশ করিয়া বিদ্যালয়-পরিচালক ও শিক্ষকগণকে সর্ব প্রকারের সাহায্য করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

শরৎচন্দ্রের জীবনী প্রভৃতি প্রকাশ—

কলিকাতার শিল্পীসংস্থা নামক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান অপরাজেয় কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী, গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশের সহিত তিনখানি গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদ এবং একখানি গ্রন্থের উড়িয়া অনুবাদ প্রকাশ করিবেন স্থির করিয়াছেন। সে জন্য তাঁহারা ৭৪ হাজার টাকা ব্যয় করিবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি বিভাগ ঐ কার্য্যের জন্য অর্দ্ধেক ব্যয়ভার বহন করিবেন অর্থাৎ শিল্পী সংস্থাকে ৩৭ হাজার টাকা দান করিবেন। কথা-সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বাংলা দেশে এখনও অধিক গবেষণা হয় নাই। শিল্পীসংস্থা এ বিষয়ে অগ্রণী হইয়া বাঙ্গালী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

ডক্টর শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত—

৮ই মার্চ নয়াদিল্লীতে সাহিত্য একাডেমীর কার্য্যনির্বাহক বোর্ড ১৯৬১ সালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের ১২টি পুস্তক নির্বাচন করিয়া প্রত্যেককে ৫ হাজার টাকা করিয়া একাডেমী পুরস্কার দান করিয়াছেন। বাংলা ভাষায় "ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য" সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডক্টর শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত ঐ পুরস্কার লাভ করিয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। 'ভারতবর্ষে' তাঁহার বহু রচনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহাকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। ১৯১১ সালে বরিশাল জেলার চন্দ্রহার গ্রামে তাঁহার জন্ম—১৯৩৫ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাংলা এম-এতে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান পাইয়া তিনি ১৯৩৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং ১৯৫৫ সালে রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক অর্থাৎ বাংলা বিভাগের প্রধান নিযুক্ত হন। তিনি অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। পুরস্কারপ্রাপ্ত বই ছাড়াও তাঁহার লিখিত—শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ, বাংলা সাহিত্যের নবযুগ, বাংলা সাহিত্যের এক দিক, সাহিত্যের স্বরূপ, শিল্পলিপি, উপমা কালিদাসস্য প্রভৃতি প্রবন্ধ গ্রন্থ বিশেষ আদর লাভ করিয়াছে। তিনি গল্প, কবিতা, উপন্যাস প্রভৃতিও লিখিয়া থাকেন। আমরা তাঁহার সুদীর্ঘ কর্মময় জীবন কামনা করি।

ব্রহ্মে শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তন—

গত ২রা মার্চ সহসা ব্রহ্মের সৈন্য বাহিনী এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দেশের শাসন ক্ষমতা দখল করিয়াছে। ব্রহ্মের সেনাবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল নে উইন দেশের শাসন ব্যবস্থা দখলের সংবাদ ঘোষণা করেন। সৈন্যবাহিনী একে একে ব্রহ্মের প্রেসিডেণ্ট সাও-সুয়ে হাইক, প্রধান মন্ত্রী উ-নু, অর্থমন্ত্রী থাকিন তিন, গৃহমন্ত্রী উ-লাইয়ান ও অন্যান্য মন্ত্রীদের গ্রেপ্তার করে—প্রেসিডেণ্টের গৃহে বাধা প্রদানের চেষ্টার ফলে প্রেসিডেণ্টের পুত্র গুলীতে নিহত হয়। রাত্রি ৩টায় মন্ত্রীদের বাড়ীগুলি ঘেরাও করা হয় ও বেলা ৯ টায় জেনারেল নে-উইন ঘোষণা করেন—দেশের শান্তির জন্য এবং ভাঙ্গনের হাত হইতে দেশকে রক্ষা করার জন্য সামরিক কর্তৃপক্ষ শাসন ভার গ্রহণ করিয়াছেন। নে-উইন সকলকে শান্তিপূর্ণ ভাবে নিজ নিজ কাজ চালাইয়া যাইতে নির্দ্দেশ দেন। ছাত্রগণকেও তিনি নিজ নিজ বিদ্যালয়ে যোগদান করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ইহা রাজনীতি ক্ষেত্রে সত্যই এক অদ্ভুত ব্যাপার, ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী উ-নু সম্প্রতি ভারতের বৌদ্ধ তীর্থগুলি দেখিতে আসিয়াছিলেন—তখন তিনি এ বিষয়ে কিছুই জানিতেন না। তিনি অবসর গ্রহণের পর ভারতে আসিয়া বাস করার কথা চিন্তা করিতেছিলেন।

হেমপ্রভা মজুমদার—

কুমিল্লার খ্যাতিমান কংগ্রেসনেতা বসন্তকুমার হালদারের পত্নী দেশসেবিকা হেমপ্রভা মজুমদার ৭৪ বৎসর বয়সে গত ৩১ শে জানুয়ারী পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি

১৯৪৪ হইতে ১৯৪৮ পর্য্যন্ত কলিকাতা করপোরেশনের অলডারম্যান ছিলেন। তিনি প্রায় ৫ বৎসর কাল বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সদস্য ও এক কালে তাহার সভানেত্রী ছিলেন। ১৯৩৫ হইতে ১৯৪৫ পর্য্যন্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ও ছিলেন। বহুবার তিনি কারা বরণ করিয়াছিলেন। স্বামীর সহিত একযোগে দীর্ঘকাল দেশসেবা করিয়া তিনি সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন।

জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত—

খ্যাতনামা রাসায়নিক ও ভারত সরকারের রসায়ন পরীক্ষক জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত গত ২৭ শে জানুয়ারী ৭৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রতিভাবান ছাত্রদের অন্যতম ছিলেন। তিনি বর্দ্ধমান আকালপৌশ গ্রামের লোক ও দীর্ঘ কাল অনুশীলন সমিতির সাধ্যমে দেশসেবা ও করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রকাশিত প্রায় ৫০ খানি পুস্তক তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় দান করে।

হলদিয়া বন্দর ও উপনগরী—

পশ্চিমবঙ্গে হলদিয়া বন্দর নির্মাণ সম্পর্কে গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী লণ্ডনে কলিকাতা ও লণ্ডনের বন্দর কর্তৃপক্ষ একমত হইয়া বিরাট পরিকল্পনায় স্বাক্ষর করিয়াছেন। ঐ সঙ্গে হলদিয়া উপনগরী নির্মাণের পরিকল্পনাও গৃহীত হইয়াছে। প্রয়োজন হইলে লণ্ডন বন্দরের বিশেষজ্ঞরা ভারতে আসিয়া এই কার্য্যে ভারত সরকারকে সাহায্য করিবেন। কলিকাতা বন্দরের চাপ কমাইবার জন্য হলদিয়ায় বন্দর নির্মিত হইবে এবং তাহার ফলে কলিকাতা সহরের ভিড়ও কমিয়া যাইবে। এ সংবাদ পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে সুসংবাদ।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সভাপতি—

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সভাপতি স্বামী শংকরানন্দ মহারাজ সাধনোচিত ধামে মহাপ্রয়াণ করায় গত ৬ই মার্চ মঠের অছি পরিষদ ও মিশনের পরিচালক সমিতি স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজকে নূতন সভাপতি নির্বাচিত করিয়াছেন। তিনি ১৯৪৭ হইতে সহকারী সভাপতি পদে কাজ করিতেছিলেন এবং বারাণসীতে বাস করিতেন। তিনি ৭ই মার্চ বেলুড়ে আগমন করিয়াছেন। স্বামী বিশুদ্ধানন্দ ১৯০৬ সালে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করেন এবং বাংগালোর, মাদ্রাজ, বারাণসী, মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম প্রভৃতি কেন্দ্রে দীর্ঘকাল কাজ করিয়াছেন।

পরলোকে বলরাম সেন—

খ্যাতনামা ভারতীয় ভূতত্ত্ববিদ বলরাম সেন গত ৬ই মার্চ ৭১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি রাউরকেল্লায় বড় ছেলের সহিত দেখা করিতে যাইয়া হঠাৎ তথায় মারা গিয়াছেন। ১৮৯১ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি ১৯১৬ সাল হইতে টাটা কোম্পানীর কাজ করিতেন। তিনি জাতীয় পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ও ভারত সরকারের ধাতু উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্য ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও কর্মশক্তি তাঁহাকে জীবনে উন্নতির পথে লইয়া গিয়াছিল।

পরলোকে অম্বিকা চক্রবর্ত্তী—

খ্যাতনামা বিপ্লবী নেতা ও পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রাক্তন সদস্য অম্বিকা চক্রবর্ত্তী গত ৪ঠা মার্চ কলেজ স্কোয়ারে মোটর দুর্ঘটনায় আহত হইয়া মঙ্গলবার শেঠ সুখলাল কার্ণানি হাসপাতালে ৭০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ১৮৯২ সালে চট্টগ্রাম জেলায় জন্মগ্রহণ করিয়া ১৯০৭ সালে স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করেন ও ১৯২১ সালে চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেস কমিটীর সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। নানা আন্দোলনে তিনি বহু সময় কারারুদ্ধ ছিলেন—অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার আসামীদের তিনি অন্যতম। ১৯৪৬ সালে তিনি কম্যুনিষ্ট দলে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ সাহস ও কর্মশক্তি দ্বারা তিনি সকলের প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

॥ গৃহিণী ॥
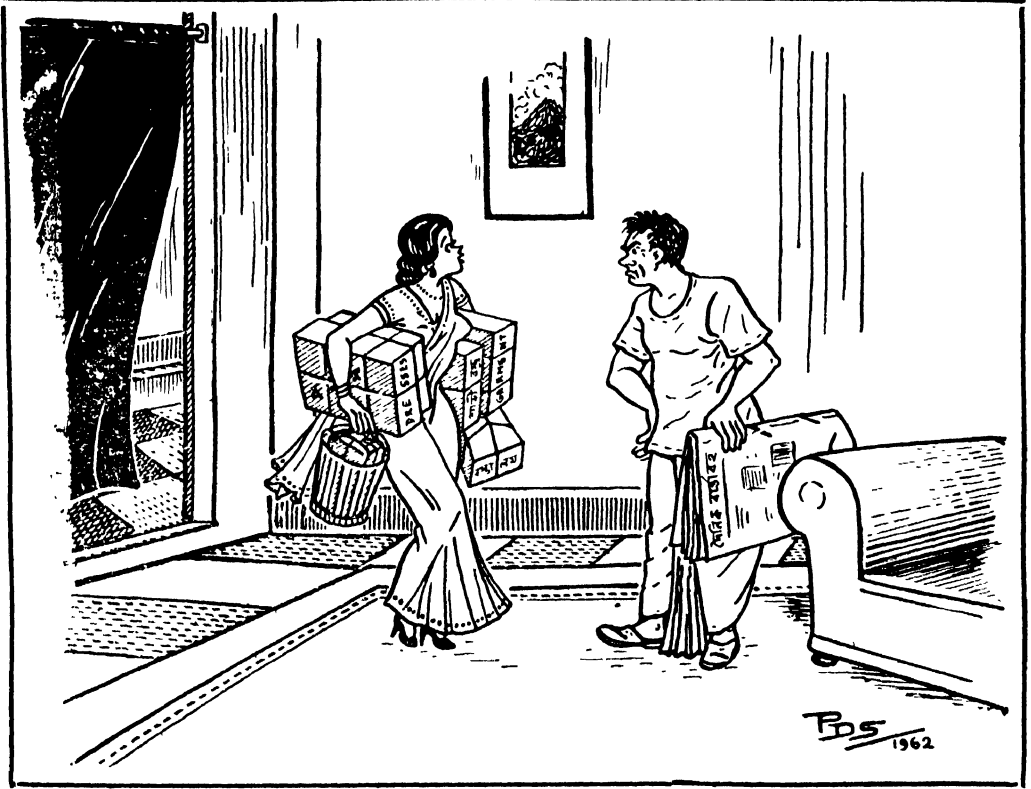
কর্ত্তা—(সচকিত ভাবে) ব্যাপার কি ?···নিত্য বাজার ঘুরে এই রাশ-রাশ কাপড় কিনে আনছো···

গৃহিণী—(বাধা দিয়া) তোমারই সংসারের সাশ্রয় করতে! যত বেশী-বেশী কাপড় থাকবে, ততই বেশী দিন টেঁকবে !

কর্ত্তা—(সখেদে) কিন্তু, এ সবের দাম জোগাতে জোগাতে আমি টেঁকবো কি করে ?

শিল্পী :—পৃথ্বী দেবশর্ম্মা

ভিলাই চেতনা

ও, বোরিসভ

রাজনৈতিক পরাধীনতা থেকে মুক্ত কোন দেশের প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন হল তার নিজস্ব শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন। অর্থনীতিতে অনগ্রসর কোন দেশ যখন তার নিজস্ব ধাতু-শোধনের কারখানা নির্মাণ করে, তখনই তার শেষ হয় ইস্পাতের জন্য বিদেশী সরবরাহের উপর নির্ভরের কাল এবং প্রগতির পথে সেই দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ঘটে। তখন সেই দেশ তার আভ্যন্তরীণ সম্পদ থেকে তৈল ও তৈলজাত দ্রব্যের চাহিদা পূরণের চেষ্টা করে। আর যে দেশ সেই দেশকে প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে সে দেশও ধন্যবাদের পাত্র।

সদ্যপরাধীনতামুক্ত যে দেশের জনগণ স্বাধীন জাতীয় অর্থ-নীতি গঠন করেছেন, তারাই সবচেয়ে ভাল করে জানেন যে শুধু বন্ধুত্বের প্রতিশ্রুতি ও শুভেচ্ছার চেয়ে, মিত্রভাবাপন্ন একটি জাতির সাহায্যে তৈরী একটি ইস্পাতের কারখানার মূল্য অনেক বেশী। তেমনি একটি মিত্রভাবাপন্ন জাতির সাহায্যে আবিষ্কৃত একটি তৈলখনিও কয়েক ডজন শুভেচ্ছাকারীর চেয়েও বেশী শুভেচ্ছা প্রকাশ করে। ভিলাই, রাঁচী, আংক্লেশ্বর ও জ্বালামুখী হল—দুই মহাজাতির মৈত্রীর প্রতীক। ভিলাইয়ের চেতনার অর্থ —ভারতের চেতনা।

কোন এক ইউরোপীয়ান গ্রন্থকার ভিলাই ইস্পাত কারখানা পরিদর্শনের পর লিখেছেন 'ভিলাইয়ের সাংগঠনিক দিকটাই শুধু ভিন্ন নয়, এখানকার চেতনার মধ্যে একটি পার্থক্য রয়ে গেছে। এই কারখানার শ্রমিকদের পরস্পরের মধ্যে যে মধুর সম্পর্ক আছে তা নিঃসন্দেহে বহু উন্নত ও সুস্থ।

ভিলাইয়ে ইস্পাত ঢালাই বিভাগের আভ্যন্তরীণ দৃশ্য

১৯৪৯ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত ভারত যখন তার ইস্পাত-শিল্প নির্মাণে আন্তরিক প্রচেষ্টায় নিযুক্ত ছিল তখনই এক চূড়ান্ত সন্ধিক্ষণে সোভিয়েট ইউনিয়ন ভারতের দিকে প্রসারিত করল তার বন্ধুত্বের হস্ত। ১৯৫৫ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে ভিলাইয়ে একটি লৌহ ও ইস্পাত কারখানা নির্মাণের চুক্তি হল স্বাক্ষরিত। এর ফলে পৃথিবীর আরও দুটি দেশ ভারতে ইস্পাত কারখানা নির্মাণে প্রভাবিত হল। এই হল ভারতের পক্ষে ভিলাইয়ের তাৎপর্য।

সহযোগিতা বেড়েই চলেছে

সোভিয়েটের সাহায্যে ভারতে আজ ত্রিশটিরও বেশী শিল্প-সংস্থান নির্মিত হচ্ছে। এগুলি যন্ত্রপাতি-মেরামতের

ভিলাইয়ে ইস্পাত নির্মাণ কারখানার অভ্যন্তর ভাগের দৃশ্য

বৎসর ভারতে একটি করে ভিলাইয়ের ন্যায় কারখানা তৈরী করা যাবে।

আর দুর্গাপুরের কারখানায় প্রতি বৎসর ৪৫ হাজার টন যন্ত্রপাতি নির্মিত হবে। এর অর্থ হবে ভারতের খনিশিল্প নিজস্ব খনির যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত হবে। অর্থাৎ এই সব মেশিনের যন্ত্রপাতি আর বিদেশ হতে আমদানী করতে হবে না। এই কারখানার তৈরী যন্ত্রপাতি বৎসরে ৮০ লক্ষ টন কয়লা উত্তোলন করবে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যত কয়লা বাৎসরিক উত্তোলন করার কথা আছে এর পরিমাণ প্রায় তারই সমান। দুর্গাপুরের কারখানাটি ১৯৬৩-৬৪ সালে চালু হবে।

যে কোন দেশের শ্রমশিল্পের উন্নতির জন্য বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব হল অপরিসীম। সে জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে তার ভারতীয় বন্ধুদের সাহায্যের জন্য ইহার নির্মাণ কার্য্যে অগ্রসর হয়েছেন। ইহা নির্মাণ হবে নিভেলি, কোরবা এবং সিংগ্রাউলিতে। কোরবার বিদ্যুৎকেন্দ্রটি ভিলাইয়ের কারখানায় বাৎসরিক উৎপাদনে যখন ২৫ লক্ষ টন ইস্পাত হবে তখনকার প্রয়োজন সম্পূর্ণ মেটাবার মত করে সজ্জিত করা হবে।

এই বিদ্যুৎকেন্দ্রটি কোড়বার কয়লা ও লৌহখনি ইস্পাতের কারখানা ও অন্যান্য কয়েকটি শ্রমশিল্পে বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে।

দোকান বা গাড়ীর টায়ার জুড়বার কারখানা নয়, এগুলো হচ্ছে তেমন শিল্প—যা স্বাধীন ভারতে অর্থনীতি বিকাশের ভিত্তিস্বরূপ। এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে ভারী যন্ত্রপাতি নির্মাণ, বৈদ্যুতিক শক্তি, তৈল নিষ্কাশন, তৈল-শোধন শিল্প।

ভারতের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নয়টি বৃহৎ রাষ্ট্রীয় যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা তৈরীর কথা আছে। তার মধ্যে চারটি হবে সোভিয়েট সাহায্য নিয়ে তৈরী। এগুলি হল রাঁচিতে অবস্থিত একটি ভারী যন্ত্রপাতি-নির্মাণের কারখানা, একটি দুর্গাপুরে কয়লা খনির উপকরণ নির্মাণের কারখানা। হরিদ্বারে একটি ভারী বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা এবং কোটায় (রাজস্থান) একটি সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা।

রাঁচির কারখানায় বৎসরে ৮০ হাজার টন যন্ত্রপাতি তৈরী হবে। এর মধ্যে ৬৫ হাজার টন হবে ধাতু শোধনের সরঞ্জাম। এ কথা বললেই যথেষ্ট হবে যে, বৎসরে দশ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদন করার উপযোগী একটি লৌহ-ইস্পাত কারখানাকে সম্পূর্ণরূপে যন্ত্রসজ্জিত করার পক্ষে এ হবে যথেষ্ট। এই কারখানার তৈরী যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রতি

"ভারতের কি নিজস্ব তৈল সম্পদ হবে?"

বছর চার আগেও অর্থনৈতিক পত্রিকাগুলিতে এমনি শিরোনামার প্রবন্ধাদি দেখা যেত। বিতর্কমূলক এই প্রশ্ন আজ বাতিল হয়ে গেছে। ভারতের রয়েছে নিজস্ব তৈল সম্পদ। সোভিয়েট ভূতত্ত্বজ্ঞদের দ্বারা আবিষ্কৃত ক্যাম্বে, আংক্লেশ্বর, রুদ্রসাগর এবং আমেদাবাদের তৈলখনিগুলো থেকে এই তেল হবে উৎপাদিত। ভারতের শিল্প-মন্ত্রী কে, ডি, মালব্য দেরাদুনে সোভিয়েট বিশেষজ্ঞদের সম্বোধন করে উল্লেখ

করেছেন যে এই নতুন খনি-সম্পদ ইতিমধ্যেই শিল্পের প্রয়োজনে লাগান হয়েছে।

সোভিয়েট বিশেষজ্ঞরা সর্বাধুনিক ড্রিলিং মেশিনের সাহায্যে ইতিমধ্যেই তিনটি তৈলখনি এবং একটি ভূগর্ভস্থ গ্যাসের খনি আবিষ্কৃত করেছেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল তৈলখনি আবিষ্কার।

তৃতীয় পরিকল্পনায় তেমনই লক্ষ্য হয়েছে নিজস্ব রাষ্ট্রীয় তৈলখনি ও গ্যাসের খনি প্রতিষ্ঠা। সোভিয়েট ইউনিয়নের সাহায্যে বারুণীতে একটি তৈল শোধনাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও গুজরাটে আর একটি প্রতিষ্ঠিত হবে। এই দুটি শোধনাগারের বৎসরে ৪০ লক্ষ টন তৈল শোধনের ক্ষমতা হবে।

দিন দিন এই সব যন্ত্রপাতি নির্মাণের ফলে ভারতীয় অর্থনীতিক স্বাধীনতা ও প্রগতির পথ আলোকিত হচ্ছে, ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্ভাবনায় ভারত আজ সমুজ্জ্বল।

উড়ু উড়ু মন

সতীন্দ্রনাথ লাহা

আপিস ঘড়িতে বাজেনি পাঁচটা,
উড়ু উড়ু করে ক্লান্ত মন।
লোহার বাঁধনে মনের মাঝটা
ব্যথা বোধ করে অনেকক্ষণ॥

কঠিন ধাতুর অকরুণ দাগ
ছাপ ত্যাখো তার সারাটা গায়।
তবুও সে ক'টা টাকার ডাক
বল না, কি করে এড়ানো যায়?

উড়ু, উড়ু মন শুধু চেয়ে থাকে—
কেন যে আসে না বিকেল বেলা!
হয়তো বা কেউ পিছু থেকে ডাকে,
তার কাছে মজা ঠাট্টা খেলা॥

ওরা তো জানে না বাড়ির খবর—
কি করে কাটাই প্রতিটি দিন।
জোড়া তালি দেওয়া আমরা নফর,
তার ছিঁড়ে কাঁদে মনের বীণ॥

উড়ু, উড়ু মন বশ মানে না'ক,
হাতছানি দেয় পড়ন্ত রোদ!
বিকেলের মায়া মনে কি আঁকো?
সৌখিন বোধে করেছি রোধ॥

ওরা কারা যায় বেশ সেজে-গুজে,
হয় তো বা যাবে সিনেমাতে।
মনকে বোঝাই দু'টি চোখ বুঁজে
যে যায় যাক না, তোর কি তাতে?

পোড়া মন কোন যুক্তি মানে না,
চেয়ে চেয়ে তার বেড়েছে লোভ।
উড়ু, উড়ু মন থামতে জানে না,
বড় সাধ তার, এ এক ক্ষোভ।

টাকার বদলে কাজ তো রাখলে,
এই তো নিয়ম বেচা ও কেনার।
পড়ন্ত রোদ পালাতে ডাকলে
শোধ কে করবে আমার দেনার?

একটি অদ্ভুত মামলা

ডঃ শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল

(পূর্ব প্রাকাশিতের পর)

'এতো এক গোলমেলে ব্যাপার, স্যর'—সামনের ঘরটার দিকে স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে আমার সহকারী অফিসার কনকবাবু নিম্নস্বরে বললে, 'এদের মধ্যে সম্পর্কটা তো যেন একটু মধুর মধুর বলে মনে হচ্ছে। তা ব্যাপারটা যখন এতোদূর গড়িয়েছে, তখন এই ব্যাপারে এই মহিলাটিকে সন্দেহ করার আমাদের কোনও কারণ নেই। আমার মনে হয় এদের এই সব দৃষ্টিকটু ব্যাপারে একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বী আছেন। এই স্বাবলম্বিনী ধনী মহিলাটির উপর একাধিক ব্যক্তির আগ্রহ থাকা অসম্ভব নয়। সম্প্রতি ওঁর ঐ যুবক-প্রণয়ী অপর সকলকে হটাবার উপক্রম করার জন্যেই এইরূপ এক অঘটন ঘটে থাকবে। তাই—

উহুঁ উহুঁ। এতো শীঘ্র কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া উচিত হবে না ; সামনের ঘরের দিকে আমিও একবার চেয়ে দেখে উত্তর করলাম, 'আজ কাল বড়ো-ছোটো ও মেয়ে পুরুষের মধ্যে সমবয়স্কদের মত বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে বাধা কোথায় ? এই অবস্থায় এই ধাঁচের ও জাতের বন্ধুদের মধ্যে এইভাবে নাম ধরাধরি করা আজকাল চলছে। আমাদের তো এখন তদন্ত করে জানতে হবে যে এই মহিলাটি কিরূপ ধনী—সেই তুলনায় এই হতভাগ্য ছেলেটি আরও বেশী ধনী কিনা, একজন ধনীর পক্ষে অপর এক ধনীকে ঘায়েল করে আরও ধনী হওয়ার জন্য চেষ্টা করা অসম্ভব নয়। তা ছাড়া এদের সকলেরই পক্ষে একই একটা অপদলের দলী হওয়াও অসম্ভব নয়। এখনো এই ভদ্রমহিলার স্বগ্রাম, অফিস ও সেই সঙ্গে এই আহত যুবকের নিজ-বাড়ীতে আমাদের খোঁজ-খবর করতে হবে। তা ছাড়া ভদ্রমহিলার সহপাঠিনী জমিদার-গিন্নী ও তাঁর স্বামী, আমাদের এই মামলার সংবাদদাতার ঘর-বাড়ীতে ও নিউ তাজমহল হোটেল—আদিতেও এখনো খোঁজ-খবর করা হয় নি—আগে আমাদের এই মামলার তদন্ত তো এখনোও সুরুই হয়নি।

তা হলে এখন কি করবেন স্যার, সহকারী আমার কাছে তার চেয়ারটা আরও একটু সরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলো। আমার মতে এই মহিলাটিকে আর বেশী আস্কারা দেওয়া ঠিক নয়। এই আহত যুবকটিকে হাসপাতালে পাঠাতে তো ইনি এখনও নারাজ। ইতি-মধ্যে এই ছেলেটির একটা ভালো মন্দ কিছু হয়ে গেলে এই সম্বন্ধে আমাদেরই দাবী করে অনেক প্রশ্ন উঠতে পারে। আমার মনে হয়—আমাদের এ্যামবুলেন্স আনিয়ে জোর করে এই আহত যুবককে হাসপাতালে পাঠানো উচিত হবে।

এ সব কথা যে আমিও ভাবিনি তা নয়। আমার সহকারী এই যুক্তিপূর্ণ উপদেশ মেনে নিয়ে আমি উত্তর করলাম, 'শহরের এক প্রধান হাসপাতালের প্রধান ডাক্তারকে দিয়ে ইনি এই যুবকটির চিকিৎসা করাচ্ছেন। আজকেই এখানে একজন নার্স ও সহকারী ডাক্তারেরও এসে পড়বার কথা। এখন এই আহত যুবককে জোর করে হাসপাতালে পাঠাতে গিয়েই যদি ওর একটা ভালো-মন্দ হয়ে যায় ? উহুঁ। এই যুবকটির আসল অভিভাবক-

দের খুঁজে না বার করা পর্য্যন্ত কিছুই করা যাবে না। তা ছাড়া এখন কি আমাদের মাত্র একটা সমস্যা? এদিকে আজকের মধ্যেই আমাদের খুঁজে বার করতে হবে আমার উপর আজকের আক্রমণকারী গুণ্ডাদের। এটি একটা পৃথক ঘটনা হলেও শাসনতান্ত্রিক দিক থেকে এরও গুরুত্ব কম না। সেই জন্য এই ভদ্রমহিলার এই বাড়ীটা আগাগোড়া তল্লাস করার ঝুকি আজ আর আমি নিতে চাই না। অবশ্য এই কাজটা আজই সেরে ফেলতে পারলে ভালোই হতো। কিন্তু এতোগুলো কায একসঙ্গে করতে গেলে কোনটাই সুষ্ঠু ভাবে করা যাবে না। এই মহিলাটি-কেও যে আমরা এই ব্যাপারে কিছু কিছু সন্দেহ করছি, তা একে এখন না জানানোই ভালো।

আমরা পার্লারে বসে কয়েকটি বিষয়ে এমনি এলোমেলো আলোচনা করে চলেছি। এমন সময় সামনের ঘরের পর্দ্দাটা ঈষৎ নড়ে উঠলো। অনুমানে আমরা বুঝলাম যে আহত যুবকটিকে ঘুম পাড়িয়ে ভদ্রমহিলা এইবার তার ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন। তাঁর মাথার এলোমেলো চুল কপালের উপর তুলে দিতে দিতে তাঁর সাড়ীর আঁচলটা কাঁধের উপর তুলে নিতে নিতে ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এসে আমাদের বললেন 'অনেকক্ষণ আপনাদের আমি বসিয়ে রেখেছি। এখনই কি আপনারা ওর একটা এই মামলা সম্পর্কে বিবৃতি নিতে চান? কিন্তু ওর উপর মরফিয়ার এফেক্ট এখনও তো কাটে নি। সাত আট দিনের মধ্যে ও আপনাদের এই ঘটনা সম্বন্ধে কিছু জানাতে পারবে বলে মনে হয় না।

এই আহত যুবকটির বর্ত্তমান মানসিক ও দৈহিক অবস্থাতে তার কোনও এক বিবৃতি গ্রহণ করার প্রশ্নই উঠে না। এসম্বন্ধে ভদ্রমহিলার সহিত আমরা একমতই ছিলাম। এই সম্বন্ধে তাঁকে আশ্বস্ত করে আমরা অন্য কয়েকটি প্রশ্ন তাঁকে করবো ভাবছিলাম। এমন সময় বাইরে একাধিক মোটরের থামবার আওয়াজ আমাদের কানে এলো। এর একটু পরেই কয়জন ডাক্তার ও দুইজন নার্স সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। এতো ডামাডোলের মধ্যে আর কোনও তদন্ত চালানো এখানে সম্ভব হলো না। অগত্যা বাধ্য হয়ে ভদ্রমহিলা ও ডাক্তার এবং নার্সদের নিকট বিদায় নিয়ে আমরা পাড়ায় সকালে আমার উপর আক্রমণকারী গুণ্ডাদের খোঁজে বার হয়ে গেলাম।

এই বাড়ী হতে বার হয়ে আসবার সময় বাড়ীটা আর একবার ভালো করে দেখে নিলাম। এই বাড়ীর দ্বিতলের ফ্ল্যাটটার প্রতিটি জানালা আগেকার মত বন্ধ, সেখানে কোনও জনপ্রাণী নেই বলেই মনে হয়। এর পর রাস্তার উপর বেরিয়ে এসে বাড়ীর ভিতরে ঢুকবার প্রবেশ-পথটিও ভাল করে দেখে নিলাম। পকেটে আমাদের উভয়েরই কয়েকটা কাগজ পূর্ব্ব হতেই রাখা ছিল। এই খানে একটা কাগজ বার করে এই প্রবেশ পথ সমেত একটা নক্সা সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই এঁকে নিলাম। বাড়ীটার দক্ষিণ দিকে একটা পাঁচিল-ঘেরা সরু প্রবেশ-পথ বাড়ীর দুয়ার পর্য্যন্ত এসে থেমে গিয়েছে। এই দুয়ার দিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকেই দেখা যায় একটা বড় চাতাল। এই চাতালের এক দিক হতে একটা সিঁড়ী দ্বিতলের উপর উঠে গিয়েছে, আর তার অপর দিকে রয়েছে নীচের ফ্ল্যাটে ঢুকবার দরজা। এই সাধারণ প্রবেশ পথের প্রবেশ মুখে একটা রেলিঙ-দেওয়া দরজা দেখা যায়—সাধারণতঃ এইটে খুলে তবে এই প্রবেশ পথে পা বাড়ানো সম্ভব।

একটু চিন্তা করে আমার সহকারী অফিসার বললেন, এই যুবকের আততায়ী, নয় এই প্রবেশ পথে—নয় এই বাড়ির দ্বিতলে পূর্ব হতেই অপেক্ষা করছিল; তা' না হলে এতো অতর্কিতে বাইরে থেকে কেউ এসে তাকে আক্রমণ করতে পারতো না। আজ সকালে আপনাকে যারা আতর্কিতে আক্রমণ করেছিল, খুবই সম্ভবতঃ সেই লোকটি ছিল এই দলেরই একজন বেপরোয়া সদস্য। এখন কথা হচ্ছে এই যে, এরা কেন এই ভাবে তাকে আক্রমণ করে শুধু তার চোখ দুটো নষ্ট করে দিল। এই কেনর উত্তরের সুমীমাংসা না করা পর্যন্ত এই মামলার কিনারা করা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।

হুম্! কিন্তু এখানে অন্য একটা কথাও আমাকে ভেবে দেখতে হবে—সহকারী অফিসারের এই মতটি ধীর, ভাবে শুনে আমি উত্তর করলাম এই যুবকের আততায়ী যদি এই দলের লোক হয় তা' হ'লে তো সে তার কায সুষ্ঠুভাবে সমাধা করে নিরাপদে সরে পড়েছে। এখন আবার নুতন করে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে ওরা সদলবলে আমাকে

খাম্‌কা আক্রমণ করতে এলো কেন? এখন সকালে যে ভদ্রলোকটিকে এই মহিলা অপমান করে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, সেই লোকটি ব'লে ভুল করে ওরা যদি আমাকে আক্রমণ করে থাকে—তাহলে তো তা এক সাংঘাতিক ঘটনা। তাহলে বুঝতে হবে এই ভদ্রমহিলাকে সাহায্য করবার জন্যই তারা পূর্ব হতে এখানে মোতায়েন ছিল। আমার এই অনুমান সত্য হলে এই মহিলা তাজমহল হোটেলে ফোন করে ওদের সাহায্যের জন্য ডাকিয়ে এনেছেন। কিসের মধ্যে কি যে আছে, তা কে জানে বাবা? এই সব ঘটনার আদ্যোপান্ত ভাবলে গাটা যেন শিরশির করে উঠে। এখন থানায় ফিরে গিয়ে আরও বেশী করে লোকজন নিয়ে এসে তবে এখানে তদন্ত করা উচিত মনে হচ্ছে।

এই বাড়ি থেকে বাইরে বড় রাস্তায় নেমে দেখলাম যে সামনের বাড়ির নীচের ফুটপাথে পাড়ার কয়েকজন বয়স্ক লোকের ভীড় জমে গিয়েছে। এদের মধ্যে সামনের বাড়ির দুজন ভদ্রলোকও দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এদের মধ্যে একজনও ছেলে ছোকরাকে দেখা গেল না। আমাদের নিকটে আসতে দেখে এঁদের একজন মুরব্বি গোছের লোক ভীড় থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের নমস্কার জানিয়ে আপ্যায়িত করতে সুরু করলেন।

আরে মশাই! আপনাদের শরীরে কোথাও আঘাত লাগে নি তো! 'ভদ্রলোক বেশ একটা ব্যস্ততা দেখিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, একেবারে দিনের আলোকে পুলিশের উপরেই ওরা চড়াও হলো। ওরা স্যার একজনও কিন্তু এপাড়ার কোনও লোক নয়। ঐ বাড়ির ঐ মহিলাটিই বোধ হয় ফোন করে ওদের ডেকে এনেছে।

আমাদের পাড়ার ছেলেপুলেদের এজন্য টানাটানি করবেন না। তারা তো ভয়ে সকাল থেকে আর বাড়ির বাইরে বেরুতেই চায় না।

'তা হয়তো আপনাদের কথাই সত্যি' আমি আরও একটু এগিয়ে এসে ভদ্রলোককে আশ্বস্ত করে উত্তর করলাম, 'না না—এজন্য খামকা ওদের উপর কোনও উৎপীড়ন হবে না। তা ছাড়া ওরা আমাকে পুলিশ ব'লে চিনে আমাকে আক্রমণ করেছে বলে মনে হয় না। কিন্তু মশাই! এমনও তো হতে পারে যে এই বাড়ির সামনে যতো সব ঝামেলা এপাড়ার ছেলেরা স্বাভবতঃই পছন্দ করে না। তাই আমাকে এই বাড়ির একজন নূতন অতিথি ব'লে ভুল বুঝে তারা একটু উত্তম-মধ্যম দাওয়াই-এর বন্দোবস্ত করেছিল। তা যাই হোক মশাই, এই ব্যাপার নিয়ে আমি খুব বেশী হৈ চৈ করবো না। এখন দয়া করে পাড়ার ছেলেদের দুই একজনকে এখানে ডেকে আহুন না। সেদিনকার সেই রাহাজানি সম্বন্ধে তাদের দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো।

ভদ্রলোক আমার কথায় নূতন করে বোধ হয় প্রমাদ গুণলেন। এই ভদ্রলোক ছিলেন এই পাড়ার একজন প্রধান মুরুব্বি। লোকের বিপদে আপদে তিনি পথ দেখিয়ে থাকেন। এই সম্ভাব্য বিপদে নিজে ভয় পেলে তাঁর চলবে না। নিমিষে তিনি আপন কর্তব্য ঠিক করে নিতে পেরেছিলেন।

আরে! তাতে আর অসুবিধে কি আছে, 'ভদ্রলোক এই বার অনুনয় করে আমাদের বললেন, তা রাস্তায় দাঁড়িয়ে কষ্ট না করে এই বাড়ির ভিতরে আসুন। একটু চা টা খেয়ে জিরিয়ে তো নিন। তারপর না হয় ওদের কাউকে কাউকে ডাকিয়ে আনা যাবে এখন।

তদন্তে এসে এই সব চায়ের নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করাই ভালো। কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষ এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করলেও অসুবিধা আছে। এই অবস্থায় লোকের পেটের কথা বার করা দায় হয়ে উঠে। আমরা ভদ্রলোককে ধন্যবাদ দিয়ে তাঁদের বাড়ীর বৈঠকখানা ঘরে এসে আসন গ্রহণ করলাম। আমাদের ঘিরে সেখানে একটা বড়ো ভীড়ও জমে গিয়েছে। কয়েকটী গরম সিঙ্গাড়া ও চায় সদ্ব্যবহার করা মাত্র উপস্থিত ভদ্রলোকদের নিকট আমরা অতি আপনার জন হয়ে উঠলাম। এদের অনেকেরই ধারণা যে পূর্বেকার ডাকাতদের ন্যায় পুলিশকেও একবার নুন খাওয়াতে পারলে তারা তাদের কোনও ক্ষতি করবে না। আমাদের এ অনুমান মিথ্যে হয় নি। একটু পরে দেখলাম পাড়ার অনেক যুবক ও বালকও একে একে সেখানে এসে উপস্থিত হচ্ছে। এতক্ষণে আমাদের বন্ধু ভেবে এদের অনেকেই আমাদের নিকট তাদের মনের আগোল খুলে দিয়েছিল। এর পর আমি উপস্থিত যুবকদের দিকে

চেয়ে চেয়ে তাদের বেশভূষা চালচলন হতে বুঝতে চেষ্টা করলাম যে এদের মধ্যে সবচেয়ে ওস্তাদ লোক কে হতে পারে। এদের মধ্যে একজনকে আমার বেশ একটু সরেস ও চৌকষ বলেই মনে হলো। আমি পরে জেনেছিলাম যে এই ছেলেটিই এই পাড়ার ছেলেদের ছিল একজন অবিসংবাদী নেতা।

কি হে খোকা ভাই, আমি এই ছেলেটিকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম—তোমাদের এই সবার একটা ক্লাব আছে না! এই ক্লাবের সেক্রেটারীর নাম কি? আজ্ঞে আজ্ঞে! একটু মাথা চুলকে ছেলেটি উত্তর করলো, একটাই ক্লাব আছে এ পাড়ায়। এর সেক্রেটারী হচ্ছি আমি। কিন্তু, এ কথা কেন, স্যার—

এই ভাবে আমার পূর্ব্ব অনুমান সত্য কিনা তা কৌশলে যাচাই করে নিয়ে তাকে আমি কাছে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ সুরু করে দিলাম। এই যুবকের বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

আমার নাম নবীন চন্দ্র সরকার। পিতার নাম ধীরেন সরকার, হাল সাং ১২ নং……। গ্রাম ও পোঃ ও জিলা অমুক। আমি অমুক কলেজের প্রথম বার্ষিকের ছাত্র। আমি এ পাড়ার ফুট ক্লাবের ক্যাপ্টেন। তা ছাড়া এই পাড়ার ড্রামা ক্লাবের ও আমি একজন প্রধান উদ্যোক্তা। এ পাড়ার ছেলেদের আমি সব সময়েই সৎপথে পরিচালনা করে থাকি। এদের কাউকে কোনও রাজনীতিতে বা রকবাজীতে আমি যোগ দিতে দিই নি। এ রাস্তার ও পারের ঐ বাড়ীটার ভিতরে আমরা কোনও দিনই যাই নি। আজ্ঞে, না। ওদের ওখানে ক্লাবের চাঁদা আমরা কখনও চাই নি। আমরা যতদূর জানি একজন ভদ্রমহিলা একাকিনী এই বাড়িতে এক তলায় বসবাস করেন। এই বাড়ির দ্বিতলায় কখনও কখনও আমরা আলো জ্বলতে দেখেছি। তবে প্রায় সব দিনই উপরের তলার জানালাগুলো বন্ধই থাকে। এই ভদ্রমহিলা পূর্ব্বে পায়ে হেঁটে সকালে বেরিয়ে রাত্রে ফিরে আসতেন। ইদানিং কিন্তু, তিনি একটা নূতন ট্যাক্সি করে বাড়ী হতে বেরুতেন ও সেই একই ট্যাক্সি করেই বাড়ীতে ফিরে আসতেন। আজ্ঞে হাঁ। এই ট্যাক্সীর নম্বর B. L T(c) 40. একজন বাঙ্গালী বুড়ো ড্রাইভার এই ট্যাক্সীটা চালিয়ে আনে। আমরা কয় মাস আগে মাত্র বার চার আমাদের বয়সী সুট-পরা ছেলেকে সন্ধ্যের দিকে ওর সঙ্গে এই বাড়ীতে ঢুকতে দেখেছি। ইদানীং আবার একজন বয়স্ক লোকও মহিলাটীর বাড়ী যাতায়াত করতেন। এই মহিলাটী খুব সেজে গুজে বাড়ী হতে বার হতেন। কিন্তু বাড়ীর বারান্দার দিকের কোন জানালা তিনি খুলে রাখতেন না। আমরা স্যার—পরের বাড়ীতে কে আছে বা না আছে, তার কোনও খবর রাখতে চাই না। তাই এর বেশী আমরা ওদের সম্বন্ধে কিছু জানাতে পারবো না।

আমি উপরোক্ত বিবৃতিটি অনুধাবন করে বুঝলাম যে এই বাড়ীর সম্বন্ধে তাঁদের যথেষ্ট কৌতুহল থাকলেও তার নিবৃত্তি করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। তবে বয়স্ক ব্যক্তিদের চেয়ে সে ঐ মহিলাটীর চালচলন আরও বেশী লক্ষ্য করেছে বলে মনে হলো। এ ছাড়া সে বহু তথ্য ইচ্ছে করেই হয়তো পুলিশকে জানালে না। এই জন্যে আমি তাকে একটু জেরা করে প্রকৃত সত্য জেনে নিতে মনস্থ করতাম। এই সম্বন্ধে আমাদের প্রশ্নোত্তর গুলি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো।

প্রঃ—তুমি ভাই এ পাড়ার একজন তো খুবই ভালো ছেলে, তা আমিও স্বীকার করি। কিন্তু তাই বলে তো চোখ কান বন্ধ করে তুমি পথ চলতে পারো না। এ বাড়ির ভিতরে কি ঘটে বা না ঘটে, তা তোমার না জানবারই কথা—কিন্তু এই বাড়ির সামনে রাস্তায় কোনও ঘটনা ঘটলে তা তোমাদের চোখে তো পড়বে। এখন বলো দেখি, কালকে রাত্রে এই বাড়ির সামনে কোনও ঘটনা তুমি ঘটতে দেখেছিলে কি না?

উঃ—আজ্ঞে। কালকে ওর বাড়ির সামনে বা ভিতরে কোনও ঘটনা ঘটেছিল কিনা তা আমি জানি না। তবে কাল সন্ধ্যা সাতটা আন্দাজমত আমাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে এই বাড়ির ভদ্রমহিলাকে একজন আমাদের সমবয়সী সুট-পরা একটা ছেলেকে সঙ্গে করে তাদের এই বাড়ির দিকে যেতে দেখেছিলাম। এইদিন ভদ্রমহিলার হাতে একটা ভ্যানিটি ব্যাগ ছিল। এই ছেলেটিকে প্রায় চার মাস আগে মাত্র দশ বা বারো বার এই বাড়িতে এই মহিলাটির সঙ্গে আমি আসতে দেখেছি। কিন্তু মধ্যে বহু দিন আমাদের কেউই এই ছেলেটাকে এদিকে কখনও

দেখি নি। তবে দিন দশ বারো আগে আমি একজন আধা-বয়সী ভদ্রলোককে সর্ব প্রথম এই ভদ্র মহিলার সঙ্গে একটা ট্যাক্সি করে এই বাড়ীতে আসতে দেখেছিলাম। এর পর তাকে রোজই সন্ধ্যার পর এই বাড়িতে আমি আসা যাওয়া করতে দেখেছি। এই দুই ব্যক্তি ছাড়া আর কাউকেই আমরা কখনও এই বাড়িতে আসতে দেখি নি। তবে হ্যাঁ। কাল রাত্রে বহু মোটর গাড়ী করে বহু লোককে আমরা এই বাড়িতে যাতায়াত করতে দেখেছি। এতো ভীড় এ-বাড়িতে পূর্ব্বে আমরা কোনও দিনই দেখি নি।

প্র:—আচ্ছা! তাহলে তুমি তো দেখছি ঐ বাড়ী সম্বন্ধে অনেক খবরই রাখো। কিন্তু কে কতোবার এ বাড়ীতে এলো, তা তুমি একা এতো খবর রাখলে কি করে। তা ছাড়া আরও একটা বিষয় তোমাকে মনে করে বলতে হবে। তুমি যা না কি আমাকে জানালে তা নীচের ঐ ভদ্রমহিলাটির ফ্ল্যাট সম্বন্ধে। এখন এই বাড়ীর দ্বিতলের ফ্ল্যাটটি সম্বন্ধে কোনও খোঁজ খবর কোনও দিন তোমরা করেছো কি ?

উ:—আজ্ঞে। আমি নিজে তো সব খবর একা রাখতে পারি না। তবে এই বাড়ীটার এ পাড়ায় ভূতুড়ে-বাড়ী বলে একটা দুর্ণাম আছে। এই জন্যে আমাদের ক্লাবের ছেলেরা এখানে নূতন কিছু দেখলেই তা আমাকে জানিয়ে দিয়ে থাকে, প্রায় দুই মাস আগে দুই বা তিন রাত্রি আমরা এই বাড়ীর দ্বিতলে আলো জলতে দেখেছিলাম তবে ঐ সময় এই বাড়ীটা সম্বন্ধে আমরা কেউই এতো বেশী মাথা ঘামাতাম না। সেই জন্য ওখানে কে এলো বা গেল তা আমরা জানবার চেষ্টা করি নি। তবে হাঁ। এই বাড়ীর পিছন দিকেও একটা গেট আছে। এই গেটের দরজা খুলে স্বচ্ছন্দে আর একটা বাড়ীর কমপাউণ্ডে যাওয়া যায়। আমাদের ক্লাবে বিচকে নামে একটা ছেলে আছে। সে দিনকতক এদের এই রহস্যের পেছনে ঘুরে বেড়িয়েছে। এ সব জানতে পেরে তাকে আমি একবার খুব বকে দিই—তা বলে বিচকেকে আপনারা মন্দ ছেলে বলে ভুল করবেন না। তার মত সত্যবাদী সচ্চরিত্র ও পারোপকারী ছেলে কম দেখা যায়, তার কাছে আমি শুনেছি যে এই মহিলাটী তার এই বাড়ী হতে সেই বাড়ীতেও গিয়ে থাকে। এই বাড়ীর পিছনের সেই বাড়ীটার কমপাউণ্ডের সামনে থেকে একটা গাড়ী যাবার মত দুপাশে পাঁচিল ঘেরা একটা লম্বা রাস্তা একেবারে একটা দূরের বড় রাস্তা পর্য্যন্ত চলে গিয়েছে। অতো দূরে আমাদের এ পাড়ার লোকেদের যাতায়াত নেই। তাই সেদিককার কোনও খবর আমরা রাখি না। এই বিচকের কাছে আমি শুনেছি যে ঐ মহিলাটি এই দুটো বাড়ী প্রায় এক করে নিয়েছেন; আমার মনে হয় এই পিছনের বাড়ীর লোকেরা প্রয়োজন হলে এই দুই বাড়ীর উপরের তলায় এসে থাকে। ওরা আমাদের এই রাস্তা দিয়ে এ বাড়ীর ওপরতলায় কখনও উঠেছে বলে মনে হয় না। আমাদের এই বিচকের ভালো নাম হচ্ছে বেচারাম রায়। সে আমাদের এই পাড়াতেই থাকে. মধ্যে সে একটু আধটু গোঁয়ার গোবিন্দ হয়ে গিয়েছিল। আমি চেষ্টা করে তাকে ও তার দলের চার পাঁচটা ছেলেকে এখন ভালো ছেলে করে তুলেছি।

[এই যুবকটি তার এই উক্তি শেষ করা মাত্র সেখানে একটি অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেল। হঠাৎ একজন বৃদ্ধা মহিলা বাড়ীর ভিতরে যাবার দরজাটি ঈষৎ-ফাঁক করে বলে উঠলেন —আরে বিচকের নামে পুলিশের কাছে এ কি সব আজে বাজে কথা বলছিস, তুই বেশী দুষ্টু, না বিচকে বেশী দুষ্টু রে! যা তা একজনের নামে বললেই হলো। আমি আড় চোখে চেয়ে এই বৃদ্ধা মহিলাটিকে ভালো রূপেই চিনে নিতে পেরেছিলাম। আজ সকালে এই বাড়ীর উপরের বারাণ্ডায় জন চার নাতনীর ন্যায় স্বল্পবয়স্ক কন্যাকে নিয়ে তিনি বসে ছিলেন। ঐখানকার স্বল্পবয়স্ক মেয়েরা আমাকে দেখে 'কি নির্লজ্জ বাবা' বলে হেসে উঠলে ইনিই তাদের ধমক দিয়ে চুপ করিয়েছিলেন। আমি বৃদ্ধা মহিলার দিকে মুখ তুলে চাইতেই তিনি দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বাড়ীর ভিতর অন্তর্ধান হয়ে গেলেন। আমি মনে মনে ভাবলাম, একে ভালো করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সত্যকার খবর হয়তো কিছু কিছু জানা যেতে পারে। কিন্তু এখন আর তাঁকে ডাকাডাকি না করে এই পাড়ার এই নেতৃস্থানীয় যুবকটিকে পূর্ব্বের ন্যায় জিজ্ঞাসাবাদ সুরু করে দিলাম।]

প্র:—আরে এ সব কি কথা তুমি বলছো হে—কৈ এ বাড়ীর কেয়ার-টেকার এই ভদ্রলোক তো এতো কথা

আমাদের বলেন নি। তাহলে মহিলাটির এই বাড়ীর পিছনের দরজা দিয়ে অপর এক বাড়ীর মধ্য দিয়ে একেবারে দূরের অপর আর রাস্তায় বেরিয়ে পড়া যায়। আমরা তো এতোক্ষণ এই বাড়ীটা ভালো করে দেখে এলাম। কৈ এরকম কোনও দরজা তো আমাদের নজরে পড়লো না।

উঃ—আমাদের এই মেসমশাই ওর ওটা আর নিজের বাড়ী তো নয়। উনি ওঁর এক বন্ধুর হয়ে ঐ ভাড়ারই শুধু ব্যাবস্থা করে থাকেন। উনি নিজে কোনও দিনই ঐ বাড়ীতে কি ঢুকেছেন না কি! এদিককার এই বাড়ীর পাশের প্যাসেজটার শেষের দিকে তো উঁচু পাঁচিল তোলা আছে। এই জন্য আপনারা এই বাড়ীর পিছনের দরজাটা একেবারেই আবিষ্কার করতে পারে নি। এদিকে বিচকে ও তার দলবলের তো অগম্য কোনও জায়গাই নেই। ওদের মুখে শুনেছি যে মধ্যে মধ্যে বহু লোক মোটরে করে সোজা সেই পিছনের কমপাউণ্ড ওয়ালা বাড়ীতে চলে আসেন। ওদেরই কেউ কেউ দরকার হলে এই দুই বাড়ীর মধ্যকার দরজা দিয়ে এধারকার এই বাড়ীর দুতলাতে এসেও বাস করে গিয়েছেন। এই জন্য এ পাড়ার লোকেরা এই বাড়ীর দুতলায় মাঝে মাঝে আলো জ্বলতে দেখলেও সেখানে এদিক-কার রাস্তা দিয়ে অন্য কোনও মানুষকে কখনও ঢুকতে দেখে নি। কিন্তু আমাদের এই বিচকে হচ্ছে, স্যার একজন রহস্য সিরিজ পড়া ছেলে। তাই সে আনাচে কানাচে ঘুরে ও পাঁচিলে উঠে এই সব রহস্য বার করতে পেরেছে। আমাদের এই মেসমশাইকে ঐ সব কথা কত-বার আমি বলেছি, কিন্তু তিনি বিচকের এই সব কথা বাজে কথা বলে কানেই তুলতে চান নি।

'আরে বাপরে, বাপরে বাপ। এ সব কথা তা হলে সত্যি আমাদের এই যুবক সাক্ষীর মেসমশাই ভদ্রলোক এই সব কথা শুনে বলে উঠলেন, আমার বন্ধুটি তো বেনারসে বসে সুখেই আছেন। এদিকে তাঁর উপকার করতে গিয়ে আমি যে বিপদে পড়ে গেলুম। তাহলে সর্ব্বনেশে এক মেয়ে লোককে ওর বাড়ীটা আমি ভাড়া দিয়ে বসেছি। বাড়ীর মধ্য দিয়ে পথ করে একেবারে এ রাস্তা থেকে ও রাস্তা পর্য্যন্ত ওরা পথ করে নিয়েছে। এতো কথা জানলে আজ সকালেই আপনাকে সব কথা খুলে বলতাম মশাই। দেখবেন যেন আমি আবার—

'না না। এতে আপনার কোনও বিপদ নেই, এই ভদ্রলোককে আমি আশ্বস্ত করে বললাম 'এখন এই বাড়ীর মালিক আপনার ঐ বন্ধুর পরিচয়টা আমাকে দিতে হবে। দরকার হলে আমাদের একজন অফিসার বেনারসে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আসবে।

তা এসব আমি আপনাকে এখুনি জানাচ্ছি।

আমার এই প্রশ্নে ভদ্রলোক একটু কিন্তু কিন্তু করে উত্তর করলেন, কিন্তু সে ভদ্রলোকও একজন সজ্জন লোক। তাঁর নাম হচ্ছে দ্বিজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, তিনি আমার এক পূর্ব্ব সহপাঠী। আমার এ বাড়ীতে আসবার আগে থেকেই তিনি ওঁর ঐ বাড়ীতে বসবাস করতেন। সংসারে থাকার মধ্যে তাঁর ছিল—তিনি নিজে, তাঁর স্ত্রী ও তাঁর বারো বৎসরের একমাত্র পুত্র। জাবনের প্রথমটা অবশ্য আমার মনে নেই। এতোদিন পরে তাকে দেখলে আমি চিনতেও বোধ হয় পারবো না। হঠাৎ একদিন শুনলাম তাঁর অপুত্রক শ্বশুর বেনারসে বহু টাকার সম্পত্তি রেখে মারা গিয়েছেন। সেখানে তাঁর বিপুল সম্পত্তি দেখা-শুনা করবার কোনও নির্ভরযোগ্য লোক নেই। যেহেতু ওরাই ঐ সব সম্পত্তির ভবিষ্যৎ মালিক তাই ভদ্রলোক তাঁর শাশুড়ীর অনুরোধে এই বাড়ীর ভার আমার উপর দিয়ে সপরিবারে বেনারস রওনা হয়ে গেলো। আজ হতে চললো প্রায় আট-দশ বৎসর আগেকার কথা। সেই থেকে তাঁর এই বাড়ীতে ভাড়াটে থাকলে মাসে মাসে আমি তাঁকে ভাড়াই পাঠিয়ে যাচ্ছি, এইটুকু যা—

আমি এতোক্ষণ ধীর ভাবে এদের এই সব বিবৃতি লিপিবদ্ধ করে যাচ্ছিলাম। এইবার আমি কলমের গতি থামিয়ে সহকারীর দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকালাম। আমার সহকারীও এই সব নতুন তথ্য অবগত হয়ে কম আশ্চর্য্য হন নি। এতোগুলি বিচ্ছিন্ন কাহিনী আপাত দৃষ্টিতে পরস্পরের সহিত সম্পর্ক শূন্য বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলেই মনে হয়। তবু আমার সন্দিগ্ধ মন বোধ হয় অকারণেই এদের মধ্যে নিরবিচ্ছিন্ন যোগ সূত্রের খোঁজ করতে চাইছিল। কিন্তু আমি ঔপন্যাসিক নই যে সুবিধামত এদের একসূত্রে গেঁথে একটা চমক প্রদ কাহিনীর সৃষ্টি করবো। আমি একজন পুলিশ কর্ম্মচারী বিধায় তদন্ত করে বার করতে হবে যে সত্যই এদের মধ্যে পারস্পরিক কোনও সম্পর্ক

আছে কিংবা তা নেই। কিন্তু এই সব ঘটনার মধ্যে কোনও যোগাযোগের সম্ভাবনার চিন্তা করা মাত্র আমি আতঙ্কে শিউরে উঠছিলাম।

কোনও প্রকারে মনের আশঙ্কা মনেই চেপে রেখে আমি এই ভদ্রলোককে উদ্দেশ করে বলে উঠলাম, 'আচ্ছা মশাই, আপনার এই বাড়ীটা তো একটা তিনতলা বাড়ী। আমরা এর উপরকার ছাদে একবার উঠে চারিদিকে একবার ভালো করে দেখে নিতে চাই। ভদ্রলোকের আমার এই প্রস্তাবে অমত করার কিছুই ছিল না। তিনি সানন্দে আমার এই প্রস্তাবে সায় দিয়ে উত্তর করলেন, তা নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। এতে আর আপত্তির কি আছে। এই ত্রিতলের ছাদের উপর হতে সিড়ির ও চিলের ঘরের উপরকার ছাদে উঠবারও একটা সিড়ি আছে। একেবারে চারতলায় উঠে আপনারা বহু দূর পর্য্যন্ত একটা মোটামুটি সরজমীন জরীপ করে নিতে পারবেন।

আমি সহকারী কনক বাবুকে নিয়ে একেবারে এই বাড়ীর ছাদের উপর উঠে ভদ্রমহিলার বাড়ীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলাম। ওঁদের এই বাড়ীর পিছনের পাঁচিল ঘেরা প্রাঙ্গনে যুক্ত বাড়ীটাও এখান হতে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। এই দুইটি বাড়ীরই পিছনে সীমা নির্দ্দেশক একটি পাঁচিল আছে। যতদূর বোঝা যায় এই পাঁচিলটি ওপারের বাড়ীরই অধিকারভুক্ত। এ পারের বাড়ীর মালিক নূতন করে এই পাঁচিলের গায়ে নিজের আর একটি সীমা নির্দ্দেশক পাঁচিল তৈরী করার প্রয়োজন মনে করেন নি। কিন্তু এতো দূর থেকে এই মধ্যবর্ত্তী পাঁচিলের মধ্যে কোনও প্রশস্ত দরজা আছে কিনা তা বুঝা গেলো না।

আশে পাশে পরস্পরের সহিত সম্পর্ক রহিত আরও বহু বাড়ী দেখা যায়। চারি দিকে চক্রাকারে বাড়ীরই পর বাড়ী, বাড়ীর যেন আর শেষ নেই। দূরদিগন্ত বিস্তৃত উঁচু নীচু পর্ব্বত শ্রেণীর ন্যায় দ্বিতল ত্রিতল ও বহু তল রঙবেরঙের বাড়ীর সার। এদের এক সারির পিছনে আর এক সারি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এমন কি একতলা বাড়ীগুলি পর্য্যন্ত আপন মহিমায় বড় বড় বাড়ীর মধ্যে মধ্যে নিজেদের স্থান করে নিয়েছে। এই পরস্পরের সহিত বিবাদহীন মক বাড়ীগুলি যেন অনন্তকাল হতে একই ভাবে একই স্থানে দাঁড়িয়ে তাদের আশ্রিত আশ্রিতাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে।

আমি অনেকক্ষন ধরে মুগ্ধ হয়ে এই প্রাসাদ সাগরের দিকে চেয়ে রইলাম। তার পর নিজেকে জোর করে এই সুখাবেশ থেকে মুক্ত করে নিয়ে আবার সম্মুখের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করলাম। এপারে বাড়ীটার ভিতরের অংশ চোখে না পড়লেও ওপারের বাড়ীটার ভিতরের অংশ স্পষ্ট চোখে পড়ে। আমি এতো দূর হতেই দেখতে পেলাম ওপারের বাড়ীর দ্বিতলের ঘরগুলি ঝাড় পোঁছ করা হচ্ছে। কয়েকজন লোক ঘরে ঘরে আসবার পত্র সাজিয়ে রাখতে ব্যস্ত। আমার চক্ষের সামনে ওখানকার প্রাঙ্গনের পার্শ্বের একটা গ্যারেজ হতে একটা গাড়ী বার করাও হলো। এর পর দুই জন লোক এই গাড়ী খানা ধোয়া ধোয়ী করতে লেগে গেলো। আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে এই বাড়ীর কোনও ধনী মালিক বা বাসিন্দার আগমনের সম্ভাবনায় এই বাড়ীটিকে আসবাব পত্র ও যানবাহন সহ উৎসব মুখর করে তুলবার চেষ্টা করা হচ্ছে। এখান হতে ওপারের বড় রাস্তাটি ও ঐ বাড়ীর দুইটা গেট অতি স্পষ্ট ভাবেই দেখা যায়। হঠাৎ এই সময় আমি লক্ষ করলাম একটি ট্যাক্সী ওপারের রাস্তা দিয়ে এসে ঐ বড় বাড়ীর একটা গেটের মধ্য দিয়ে তার প্রশস্ত প্রাঙ্গনে প্রবেশ করলো। এই ট্যাক্সীর ধীরে ধীরে এই উভয় বাড়ীর মধ্যেকার পাঁচিলের একেবারে গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

এই ট্যাক্সীখানা থেকে নেমে এলেন একজন মোচওয়ালা ষণ্ডাগুণ্ডা গোছের পেশীবহুল দীর্ঘদেহী ভদ্রলোক। ট্যাক্সী গাড়ীটা থেকে নেমেই তিনি আশে পাশে লোকজনদের ধমকা ধমকী সুরু করে দিলেন। তাঁর গলার আওয়াজ এতোদূর থেকে শুনা না গেলেও তাঁর তর্জ্জনী হেলন ও আস্ফালন হতে বুঝা যাচ্ছিল যে তিনি ওখানকার লোকজনদের শাসন সুরু করে দিয়েছেন। কিছুক্ষণ পর তিনি শান্ত হয়ে অপর কয়জনকে বোধহয় কিছু উপদেশ দিতে সুরু করে দিলেন। তাঁর সহাস্য মুখের বিকশিত দাঁত গুলো রৌদ্র কিরণোজ্জল হয়ে সুস্পষ্ট ভাবে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। আমি এতো দূরে দাঁড়িয়েও উপলব্ধি করতে পারলাম যে তাঁর মনের যা কিছু মেঘ তা কেটে গিয়েছে এবং এখন তিনি খুস মেজাজ হয়ে উঠেছেন। ভদ্রলোক সংশ্লিষ্ট

সকল ব্যাক্তিকে তাদের করণীয় কাজগুলো সম্বন্ধে যথাযথ ভাবে উপদেশ ও নির্দ্দেশ দিয়ে ট্যাক্সী থানাতে উঠে বসতেই সেখানা একটু পিছিয়ে এসে ওপারের বড় রাস্তার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো। এই সময় ওদের বাড়ীর দ্বিতলের সারসীর একটা বৃহদায়তন ফাঁকে এক ঝলক রৌদ্র কিরণ প্রতিফলিত হয়ে এই ট্যাক্সীর পিছনে এসে পড়ছিল। এই রৌদ্রের উজ্জল আলোকে আমি পরিষ্কার ভাবে দেখতে পেলাম যে এই ট্যাক্সীর পিছনের নম্বর-প্লেটে লেখা রয়েছে B L C (C) 44 এই নম্বরটি নজরে পড়া মাত্র অস্ফুট স্বরে আমার মুখ থেকে বার হয়ে এলো, 'সর্ব্বনাশ। এই নম্বরের টাক্সীটাই তো এধারের এই বাড়ীর এই মহিলাটিই তো ব্যবহার করে থাকেন। তাহলে, তাহলে কি—

আমি বিমুগ্ধ নেত্রে আশে পাশের নীচু বাড়ী গুলি আর একবার দেখে নিয়ে তর তর করে সিড়ি করে এই বাড়ির একতলের বৈঠক খানায় এসে দেখলাম যে সেখানে ইতি-মধ্যে আরও বহু লোক এসে জমা হ'য়েছে। ওদিকে রাস্তার উপর সেই মহিলাটীর বাড়ির সামনে ডাক্তারদের যে গাড়িগুলো দাঁড়িয়েছিল সে গুলি এখন আর সেখানে নেই। খুব সম্ভবত: ডাক্তার ও নার্স আপন আপন কর্ত্তব্য শেষ করে এতক্ষনে একে একে বিদায় নিয়েছেন। রহস্যময়ী মহিলাটীর বাড়ির এধারের জানলা গুলো বন্ধ থাকায় সেখানে কি হচ্ছে বা না হচ্ছে তা বুঝবার উপায় নেই। আমি সেইদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে দেখবার ঘরের মধ্যকার ভীড়ের সকল লোকেই এইবার আমার সঙ্গে কথা বলতে উৎসুক। এই ভীড়ের মধ্যে পল্লীর বহুনিন্দিত বালক বিচকে ওরফে বেচারামও ছিল। এতক্ষনে পড়শাদের কাছে সাহস পেয়ে এই কৌতুহলী বালকটীও সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছে।

আমারই নাম স্যার বেচারাম রায়, আমাকে আপনি খুঁজছিলেন স্যার, তাই আমি খবর পেয়েই এখানে এলাম, এখানকার এক ব্যক্তি তার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলে, বিচকে ওরফে বেচারাম হাত কচলাতে কচলাতে আমাকে বললো, 'এখানকার এই বাড়ি দুটোর অনেক খবর আমি আপনাকে দিতে পারবো। আমি খুবই ভালো গোয়েন্দার কাজ করতে পারি। আমাকে আপনা-দের পুলিশে একটা কাজ জুটিয়ে দিন না, স্যার।

আমি ধীর স্থির ভাবে বিচকে ওরফে বেচারাম রায়ের দিকে চেয়ে দেখলাম। একটি শ্যামল দোহারা স্বাস্থ্যবান তীক্ষ্ণ বুদ্ধি চপলমতি ষোল সতের বৎসরের বালক। তার বেশ ভূষার ন্যায় মান অপমানের কোনও বালাই আছে বলে মনে হয় না। মুখে চোখে তার একাগ্র মুখী বুদ্ধি ও সাহস। এই সাহস ও বুদ্ধি বহুমুখী না হওয়ায় সাধারণ লোক তা উপলব্ধি করতে পারে না। এই একাগ্রমুখী সাহস ও বুদ্ধি-মাত্র একটি পথেই পরিচালিত হতে পারে। তাই ভুল পথে তা পরিচালিত হলে এই সব ছেলের একাগ্র-মুখী সাহস দুঃসাহসে ও বুদ্ধি দুর্ব্বুদ্ধিতে পরিণত হয়ে যায়। আমি ভালো করে এই ছেলেটিকে আদ্যপান্ত নিরীক্ষন করে বুঝে নিলাম যে এই মধ্যযুগীয় মনোবৃত্তি সম্পন্ন ছেলেটিকে বাক্ প্রয়োগ দ্বারা তাঁবে আনতে পারলে তাকে দিয়ে অসাধ্য সাধনও করা যেতে পারবে। এতো গুলো লোকের মধ্যে এক মাত্র বিচকে দ্বারাই আমাদের এই তদন্তের কাজের একটা সুরাহা করা যাবে। এই জন্য এখানকার অন্যান্য লোকেদের কাছে বাজে কথা আমার আর শুনতে ইচ্ছে করছিল না।

তা এতো খুবই ভালো কথা, খোকা তোমার মত ওস্তাদ ছেলেই তো আমরা চাই, আমি খুশী হয়ে উঠে বেচারামে ওরফে বিচকের পিঠটা সস্নেহে চাপড়ে দিয়ে বললাম, তাহলে আজই তুমি আমার সঙ্গে এসো। থানায় আজই তোমাকে আমরা নিয়ে যাচ্ছি।
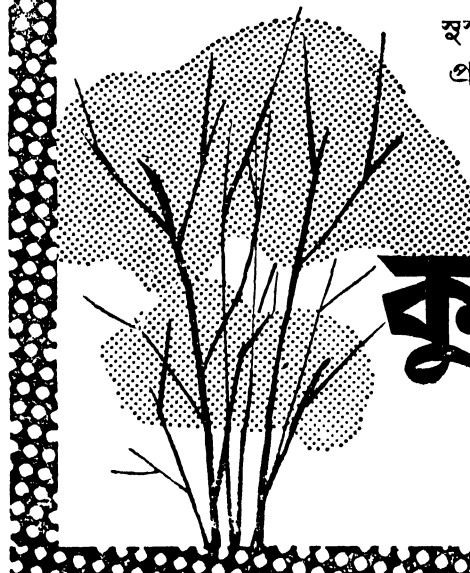
এরপর আর দেরী না করে আমি ও আমার সহকারী বেচারাম রায় ওরফে বিচকে বাবুকে নিয়ে পুলিশ ভ্যানে উঠে পড়লাম। কিন্তু এ পাড়ার অনেক লোকই আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠেছিল। এদের একজন এগিয়ে এসে আমাকে বিনয় করে জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে কি স্যার ওকে আপনারা এ্যারেষ্ট করলেন, আমরা তো ওকে নির্দ্দোষ বলেই জানি তাই যদি বলেন তো আমরা কেউ ওর জামিন হয়ে ওকে ছাড়িয়ে আনতে পারি।

আজকে সকালে আমার উপর আক্রমনের জন্য এদের অনেকেরই ধারণা হয়েছিল যে এই উপলক্ষে এপাড়ারই কয়েকজনকে বেছে বেছে আমরা ধরে নিয়ে যাবো। শাসনতান্ত্রিক কবলে কখনও কখনও দোষী নির্দ্দোষী নির্ব্বি-

শেষে এইরূপ ধরপাকড় করার অন্যায় রেওয়াজ থাকলেও তাদের এইরূপ এক আশঙ্কা ছিল অমূলক। এ পাড়ার ছেলেরা কেউই তো আমার উপর আক্রমণের জন্য দায়ী নয় তা আমরা ইতি মধ্যেই বুঝে নিতে পেরেছিলাম। আমি বিরক্তির সহিত গাড়িতে উঠতে উঠতে তাদের আশ্বস্ত করে বললাম, কেন আপনারা মিছে মিছে ভয় করছেন বলুন তো? আপনাদের এই বেচারাম ওরফে বিচকে এ পাড়ার ভালো ছেলে না হলেও ও হচ্ছে এখানকার সব চেয়ে বেশী কাজের ছেলে। এখানে দাঙ্গা হাঙ্গামা ও অন্যান্য আপদ বিপদ না হলে তা আপনারা কোনও দিনই বুঝতে পারতেন না। এত বাড়ির লোকেদের বলে দেবেন যে এক্ষুনিই থানা থেকে ফিরে আসছে। এদিকে বাড়ির লোকেরা তাকে ফিরিয়ে নিতে খুব ব্যস্ত ছিল তা আদপেই আমাদের মনে হলো না। আমরা ইতিমধ্যেই বুঝে নিয়ে ছিলাম যে এই বিচকে হচ্ছে এক পরাশ্রয়ী গলগ্রহ অবজ্ঞাত ও অবহেলিত এক দুঃখী বালক। এতোদিন সে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে চোর ডাকাতদের দলে নাম লেখায় নি তা বোধ হয় এর অন্তর্নিহীত সহনশীলতা ও মহানুভবতার পরিচায়ক। এই বিচকে ওরফে বেচারাম কে নিয়ে ভ্যানে উঠা মাত্র ভ্যান থানার পথে এগিয়ে চললো। এই চলন্ত গাড়ি থেকেই আমরা শুনতে পেলাম বিচকের ভক্ত শিষ্যবর্গ কাতর স্বরে চেঁচিয়ে উঠছে এইা, বিচকেদকে ধরে নিয়ে গেল, খোদ বিচকেও যে আমাদের খুবই বিশ্বাস করছিল তা নয়। সেও আমাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে আমাদের মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখলো।

[ক্রমশঃ
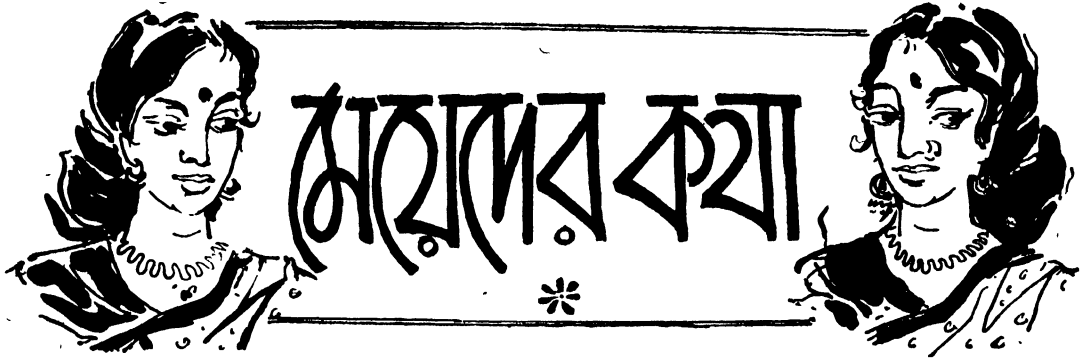
স্ত্রীণাং চরিত্রম্

মিসেস্ গোয়েল্

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

৩

পাঞ্চালী গুহ আমার মাসী। আমার মার খুড়তুতো বোন। আমার মার চেয়ে দশ বছরের ছোট। আমার দাদুরা দুই ভাই ছিলেন—তারক রায়, নিবারণ রায়। মায়ের বাবা তারক রায়ের অনেকগুলি ছেলেমেয়ে ছিল—মা, মাসী ও মামা নিয়ে সাতটি। নিবারণ রায়ের শুধু একটি মেয়ে পাঞ্চালী। নিবারণ রায় ভাল চাকুরী করতেন। তা ছাড়া খরচ ছিল সামান্য—মাত্র তিনজনের পরিবার। কিন্তু তারক রায়ের আয়ের তুলনায় ব্যয় ছিল বেশী। তাই নিবারণ রায় গিন্নী সোহাগিণী দেবীর প্ররোচনায় ভিন্ন হয়ে গেলেন। পৃথকান্ন হলেও তাঁরা পৃথকালয় হন নি। এক বাড়ীতেই বাস করতে লাগলেন। দুইজনেরই ছেলে মেয়ে এক উঠোনে খেলা-ধূলা করতে লাগল। কিন্তু আমার মামা ও মাসীদের বড় সাবধানে চলতে হতো। পাঞ্চালীর গায়ে একটু ধূলি লাগিয়েছে কি তার প্রায় সমবয়সী টুটুন, চিপু, ফেলু, প্রভৃতিরা অমনি সোহাগিনী দেবীর কণ্ঠ হতে সোহাগ ঝরে পড়তো। তা সহ্য করা তারক গৃহিণী উমাতারার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ত।

পাঞ্চালীর অতি বাল্যকাল থেকে ছেলে ও মেয়ের পার্থক্য বোঝার দিকে বিশেষ ঝোক ছিল। সোহাগিনী দেবী তাকে যত অন্য ছেলেদের সঙ্গে মিশে খেলা করতে বাধা দিতেন, ততই সে ছেলেদের সঙ্গে মিশতে চাইত ও সব কিছুতেই ছেলেদেব নকল করতে চাইত। সোহাগিনী মেয়ের উৎসুক্যে রেগে গিয়ে, তাকে আটকে রাখতে না পেরে, উমাতারার সঙ্গে যুদ্ধে নেমে যেতেন কারণ তিনি এতগুলি অপোগণ্ডকে সভ্যতা শিখাতে পারতেন না।

মনে বড় দুঃখ হল নিবারণ রায়ের। মেয়েটা মেয়ে না হয়ে যদি ছেলে হত! এ দুঃখ কর্তা গিন্নী দুজনেরই ছিল। তাঁরা মেয়েকেই ছেলের মত আদরে যত্নে, খেলায় ধূলায়, পোষাকে পরিচ্ছদে মানুষ করে তুলতে লাগলেন। পাঞ্চালী ছয় সাত বছর থেকে পায়জামা পরত, পাঞ্জাবী পরত। কিন্তু তার চুল লম্বা করে, বব ছাটিয়ে দিলেন সোহাগিনী। মেয়ে যে মেয়েই একথা তিনি ভুলতে পারতেন না।

পাঞ্চালী যখন উচ্চ প্রাইমারী পরীক্ষা দিতে গেল ভিন্ন ইস্কুলে একটা সমস্যা দেখা দিল। পরীক্ষা-কেন্দ্রের কর্তা পাঞ্চালীর চলাফেরা চেহারা ও পোষাক দেখে তাকে ছেলে বলে সন্দেহ করলেন। মেয়েদের পরীক্ষা কেন্দ্রে কেমন করে সে পরীক্ষা দেবে। নিবারণবাবু রেগে বল্লেন এ হচ্ছে আমার মেয়ে নাম পাঞ্চালী। কিন্তু তাঁর রাগে ভয় পেলেন না পরীক্ষা কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ। তাঁরা পাঞ্চালীকে

ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করিয়ে তবে পরীক্ষা-গৃহে প্রবেশ করতে দিলেন।

এতে সত্যি পাঞ্চালী একটা আঘাত পেল। তার চেয়েও বেশী আঘাত পেলেন নিবারণ বাবু। তিনি এর পর থেকে বাস্তবকে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। মেয়ের দেহে মেয়ের পোষাক তুলে দিলেন ধীরে ধীরে যদিও পাঞ্চালীর তা ভাল লাগে নি। সোহাগিনী দেবী তাকে ছেলেদের সঙ্গে ধেইধেই করে নেচে খেলে বেড়ানোয় বাধা দিতে লাগলেন। কিন্তু পাঞ্চালীকে সামলানো তাঁর সাধ্যের মধ্যে ছিল না। বাপের আদর ও মায়ের তাড়নার মধ্যে পাঞ্চালী একটি অদম্য বালিকায় পরিণত হল। তার খেয়ালের কোন মাথা-মুণ্ডু ছিল না।

কিন্তু পাঞ্চালী তের-চোদ্দ বয়সে যেন নিজেই কেমন বদলে যেতে লাগল। দেহের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার মনেরও যেন পরিবর্ত্তন আরম্ভ হল। তার দিকে অন্য ছেলেদের, জোয়ান ছেলেদের উৎসুক দৃষ্টি। পাঞ্চালী এমন হয়ে যাচ্ছে কেন? পাঞ্চালীওতো এমন হতে চায় নি। খেলা-ধূলায়, লাফালাফি-ঝাঁপাঝাঁপি, কিছুতেই সে কোন ছেলের পেছনে পড়ত না, এখন কেন সে পড়বে, দেহের রূপান্তর কেন তাকে ছেলেদের থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে? সোহাগিনী দেবী তা বুঝতে পেরে শুধু বলেছিলেন—পাঞ্চালী, ভুলে যেওনা তুমি মেয়ে।

[ক্রমশঃ

কাগজের কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

গতমাসে রঙীন 'ক্রেপ্-কাগজের' (Coloured Crepe Paper) টুকরো কেটে গোলাপ ফুল আর ডাল-পাতা রচনা-প্রণালীর মোটামুটি আভাস দিয়েছি, এবারে জানাবো —যথাযথ নক্সানুসারে গোলাপ-গাছের ফুল, পাতা ও ডালপালা প্রভৃতির বিভিন্ন-ছাঁদে ছাঁটাই-করা কাগজের টুকরোগুলিকে কিভাবে গঁদের আঠা দিয়ে, সরু এবং মোটা 'গ্যাল্ভানাইজড্' টিনের তারের (Galvanized Wire) গায়ে জুড়তে হবে—তারই কথা। এ কাজ সুরু করবার আগে, পাশের ১নং ছবিতে যেমন

দেখানো হয়েছে, তেমনিভাবে গোলাপ-ফুলের নক্সার ছাঁদে ছাঁটা লাল, গোলাপী, হলদে বা আশমানী রঙের কাগজের টুকরোগুলিকে (গত মাসের-সংখ্যায় প্রকাশিত ২ নং চিত্র দেখুন) একটি একটি করে কাঁচির ডগায় পাক দিয়ে জড়িয়ে বেশ নরম ও সাবলীল (Flexible) করে রাখুন—যাতে পরে গোলাপ-ফুলের আকৃতি-গঠনের সময়, এই কাগজের টুকরোগুলিকে সহজেই হাতের আঙুলের

সাহায্যে প্রয়োজনমতো-ছাঁচে পাকিয়ে (Rolling) নিতে পারেন।

এমনিভাবে পাকিয়ে নেবার ফলে, 'ক্রেপ্ কাগজ-গুলি বেশ নরম ও সাবলীল হলে, ফুলের নক্সানুসারে ছাঁটাই-করা কাগজের টুকরোগুলিকে কাঁচির ডগা থেকে খুলে নিয়ে (Unroll) পাশের ২নং চিত্রের ভঙ্গীতে ছোট
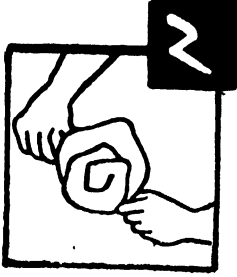
এক টুকরো লম্বা-তারের ডগায় বসিয়ে নিপুণ-কৌশলে হাতের সাহায্যে পাক দিয়ে গুটিয়ে সেগুলিকে ক্রমশঃ ফুটন্ত বা আধ-ফুটন্ত ফুলের-ছাঁদে আকারদান করতে হবে। এ কাজের সময় ফুলের ছাঁদে-কাটা কাগজের টুকরোর বাইরের প্রান্ত থেকে বরাবর পরিপাটিভাবে পাক দিয়ে ভিতরের অংশে এসে শেষ করতে হবে। এভাবে রঙীন 'ক্রেপ্ কাগজটিকে' আগাগোড়া পাকিয়ে নেবার পর, ফুলের আকারে গোটানো-কাগজের বাইরের দিকের উপর-প্রান্তগুলিকে সন্তর্পণে হাতের আঙুলের মৃদু চাপ দিয়ে সুকৌশলে ফুটন্ত-পাপড়ির ছাঁদে ঈষৎ মুড়ে দিতে হবে। পাপড়িগুলি মোড়বার সময়, সামান্য-লম্বা তারের ডগায়-বসানো কাগজের মোড়কের ভিতরের অংশ থেকে সুরু করে, ক্রমশঃ বাইরের অংশে এসে কাজ শেষ করতে হবে। তবে নজর রাখবেন—ফুলের 'ডাঁটি' (Stem) হিসাবে ঈষৎ-লম্বা যে তারটির ডগায় কাগজের মোড়কটিকে জড়িয়েছেন, সেই তারের খানিকটা অংশ যেন বজায় থাকে —পাকানোর সময়, সে তারের সবটুকুই না কাগজের মধ্যে গুটিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। এ ত্রুটি ঘটলে, পরে ডালের গায়ে ফুলটিকে এঁটে-বসানোর সময়, কাজের অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে। তাছাড়া পাপড়িগুলিকে মোড়বার সময়ে যদি উপরোক্ত-প্রণালীতে কাজ না করেন, তাহলে কাগজের তৈরী ফুলগুলি দেখতে বেয়াড়া ও অসুন্দর

ফুলের আকার যথাযথ হলে, কাগজের প্রান্তভাগে সামান্য গঁদের আঠার প্রলেপ লাগিয়ে বেশ মজবুত এবং পাকাপাকিভাবে জুড়ে দিলেই গোলাপ-ফুল রচনার কাজ শেষ হবে। এবারে গোলাপ-গাছের ডালপালা আর পাতা
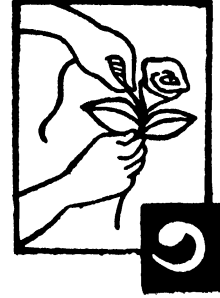
রচনার পালা। এ কাজ করতে হলে, পাশের ৩নং ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, ঠিক তেমনি ভঙ্গীতে প্রয়োজনমতো লম্বা খানিকটা মোটা 'গ্যালভানাইজ্ড' তার নিয়ে সেই তারের গায়ে মানানসই জায়গায় একের পর এক ছোট-বড় বিভিন্ন আকারের পাতার ছাঁদে-কাটা সবুজ রঙের 'ক্রেপ্ কাগজের' টুকরোগুলিকে বসিয়ে ছোট-ছোট সরু-তারের টুকরো জড়িয়ে মজবুত করে এঁটে নিন। পাতাগুলিকে সেঁটে নেবার পর, এমনিভাবেই গোলাপ ফুলগুলিকেও ঐ মোটা তার-দিয়ে-রচিত ডালের যথাযথস্থানে বসিয়ে পাকাপাকিভাবে জুড়ে দেবেন। তাহলেই ডালপালার কাঠামোর গায়ে ফুল-পাতা বসানোর পালা চুকবে।

এবারে পাশের ৪ নং ছবির ধরণে, সবুজ রঙের 'ক্রেপ-

কাগজের' সরু-লম্বা কয়েকটি 'ফালি' (Strips) টুকরো কেটে নিয়ে, সেগুলির একপাশে ভালো করে গঁদের আঠার প্রলেপ মাখিয়ে, তারের তৈরী ঐ গোলাপ-গাছের ডালপালার কাঠামো আর ফুল-পাতার 'ডাঁটির' গায়ে
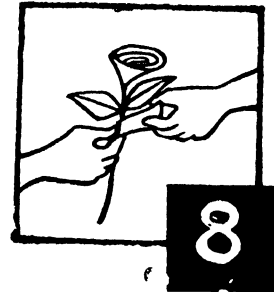
কোথাও যেন এতটুকু তারের চিহ্ন বা অসমান জোড়ের দাগ নজরে না পড়ে। তাহলেই 'ক্রেপ্-কাগজের' তৈরী রঙীণ ফুল-পাতা ও ডালপালা সমেত গোলাপ গাছ রচনার অভিনব শিল্প-কাজ শেষ হবে। এ পর্ব চুকলে, ছায়া-শীতল ঘরে বা বারান্দায় খানিকক্ষণ খোলা বাতাসে রেখে ভিজা আঠা দিয়ে জোড়া 'ক্রেপ্ কাগজের, তৈরী এই সব ফুল-পাতা আর ডালপালা আগাগোড়া বেশ ভালো করে শুকিয়ে নিতে হবে।

সম্পূর্ণভাবে শুকিয়ে যাবার পর কোনো সৌখিন ফুল-দানী বা টবে (Vase) রঙীণ 'ক্রেপ কাগজের' তৈরী বিচিত্র এই ফুল-পাতা আর ডালপালা সমেত গোলাপ-গাছ সাজিয়ে রেখে অনায়াসেই গৃহসজ্জার শ্রী-সৌন্দর্য্য অনেক-খানি বাড়িয়ে তুলতে পারবেন।

বারান্তরে, এ-ধরণের আরো কয়েকটি বিচিত্র-অভিনব কারুশিল্প-সামগ্রী রচনার কথা আলোচনা করবার বাসনা রইলো।

—

ঘরোয়া সেলাইয়ের কাজ

ছোট ছেলেমেয়েদের বিচিত্র 'এ্যাপ্রন'

সুচন্দ্রা দেবশর্ম্মা

যাঁরা সীবন-শিল্পের অনুরাগী, তাঁদের কাছে আজ ছোট ছেলেমেয়েদের পোষাকের উপরে 'বহির্ব্বাস' (Overall) হিসাবে ব্যবহারোপযোগী বিচিত্র এক ধরণের 'এ্যাপ্রন' (Apron) বা ধূলো-কাদার মলিনতা বাঁচানোর 'আচ্ছা-দনী' রচনার বিষয় জানাবো। যে সব সুগৃহিণী বাড়ীতে নিজেদের হাতে সীবনশিল্প-সামগ্রী রচনা করেন, তাঁরা নিশ্চয় দেখেছেন যে সেলাইয়ের কাজের পর অনেক সময় নানা রকমের টুকরো কাপড়ের ফালি জমে থাকে। নিতান্তই অনাবশ্যক জঞ্জাল মনে করে অনেকেই কাজের পর সেগুলি ফেলে দেন। কিন্তু কারো কারো ধারণা সে সব টুকরো কাপড়ের ফালি ফেলে দেবার সামগ্রী নয়। বরং সামান্য কষ্ট স্বীকার করলেই বিনাব্যয়ে সেগুলি দিয়ে অনায়াসেই ছোট ছেলেমেয়েদের ব্যবহারোপযোগী নানা রকমের বিচিত্র-সুন্দর 'এ্যাপ্রন' বা 'আচ্ছাদনী-বহির্ব্বাস' সেলাই করা যায়। নিছক সীবনশিল্প-চর্চা ছাড়া এ কাজে গৃহস্থের সংসারে খরচেরও সাশ্রয় হয় অনেকখানি।

এ ধরণের 'এ্যাপ্রন' তৈরীর প্রণালী সহজ...কিভাবে এ পোষাক তৈরী করতে হবে, আপাততঃ তারই মোটামুটি হদিশ জানাই। পাশের ছবিতে ছোট মেয়েটির পরণের

ফ্রকের উপরে যে 'এ্যাপ্রন' বা 'আচ্ছাদনী-বহির্ব্বাসের' নমুনা দেখছেন, সেটির জন্য প্রয়োজন—৩″ ইঞ্চি চওড়া-মাপের ও চৌকোণা ছাঁদের ১২টি রঙীণ কাপড়ের টুকরো এবং ৫০″ × ২¼″ ইঞ্চি মাপের লম্বা ১টি মানানসই ধরণের এক-রঙা কাপড়ের ফালি। শেষোক্ত এই এক-রঙা লম্বা-কাপড়ের টুকরোটি দিয়ে 'এ্যাপ্রনের' কুঁচিদার 'ঝালর' (Frilled Border) রচনা করতেহবে। 'এ্যাপ্রনের' বুকের মাঝখানে যে 'তালিটি' (Breast-Patch) রয়েছে, সেটির জন্য দরকার ৪¼″ ইঞ্চি মাপের চওড়া ও মানানসই রঙের এক টুকরো কাপড়। 'এ্যাপ্রনের' কোমরের 'পটি' (Waist-Band)

বানানোর জন্য চাই ৩০″×২১/২″ ইঞ্চি মাপের লম্বা এক ফালি মানানসই-রঙীণ কাপড়।

এবারে 'চৌকোণা'-ছাঁদের ঐ ১৫টি কাপড়ের ফালি-টুকরো উপরের নক্সানুসারে তিনটি সারিতে (Line) সেলাই করে জোড়া দিয়ে নিন। টুকরোগুলিকে সুষ্ঠুভাবে সেলাই করে জুড়ে নেবার পর, উপরের ১নং ছবির 'ক' চিহ্নিত অংশে যেমন দেখানো রয়েছে, কাপড়ের নীচের দিককার কোণগুলি তেমনি-ধরণে গোল করে ছেঁটে নিতে হবে। এবারে উপরের ছবির 'খ'-চিহ্নিত অংশের নমুনানুসারে 'এ্যাপ্রনের' তিনদিকে লম্বা 'ঝালরের' কাপড়টি সেলাই করে বসিয়ে দিন। এ কাজের পর, উপরের ১নং ছবিতে 'গ' ও 'ঘ' চিহ্নিত অংশে যেমন দেখানো রয়েছে, ঠিক তেমন ভঙ্গীতে 'এ্যাপ্রনের' বুকের মাঝখানের 'তালিটিকে' কোমরের 'পটির' সঙ্গে সেলাই করে জুড়ে দিন এবং লম্বা-পটির কিনারাগুলি আগাগোড়া পরিপাটিভাবে সেলাই করে নিন। তাহলেই ছোট ছেলেমেয়েদের ব্যবহারোপযোগী দিব্যি সুন্দর রঙীণ 'এ্যাপ্রন' তৈরী হয়ে যাবে।

অনেকটা ঠিক এমনি পদ্ধতিতেই হরেক রকমের রঙীণ
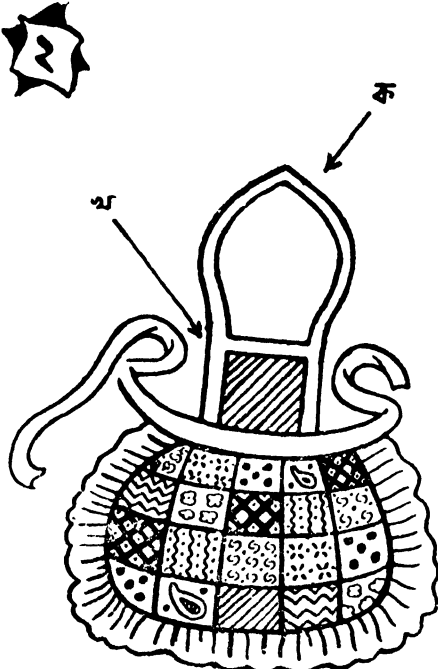
কাপড়ের টুকরো-ফালি জুড়ে, উপরের ২নং চিত্রের নমুনা-'এ্যাপ্রন' তৈরী করা যেতে পারে। তবে শিশুদের ব্যবহারের উদ্দেশ্যেই, এ সব 'এ্যাপ্রনের' ছাঁদ ঈষৎ বিভিন্ন ধরণের... অর্থাৎ, 'কোমর-বন্ধনী (Waist-Band) ছাড়াও শিশুদের গলায় দিয়ে পরবারযোগ্য গোলাকার আরো একটি 'বন্ধনী' রচনা করে এ-ধরণের 'এ্যাপ্রন' তৈরী করতে হবে। উপরের ২নং ছবির 'ক'-চিহ্নিত অংশে যেমন দেখানো রয়েছে, তেমনিভাবে শিশুদের গলায় গলিয়ে পরাবার একটি 'কণ্ঠ-বন্ধনী' (Neck-Band) রচনা করে নিন। তারপর জোড়া-কাপড়খানিকে লম্বালম্বিভাবে ভাঁজ (Fold) করে পাটি-পাটে সেলাই দিয়ে জুড়ে নিন। এভাবে সেলাইয়ের সময়, কাপড়ের পাশে-পাশে বরাবর প্রায় ১″ ইঞ্চি পরিমাণ অংশ ছেড়ে দিয়ে যেতে হবে। এ কাজের পর, কাপড়খানিকে সোজা দিকে (Outer Facing) উল্টে নিয়ে, পরিপাটিভাবে ভাঁজে-ভাঁজে পাট করে চাপ (Pressing) দিয়ে রাখবেন।

এবারে উপরের ২নং ছবির 'খ' চিহ্নিত অংশে যেমন দেখানো রয়েছে, তেমন ভঙ্গীতে 'এ্যাপ্রনের' বুকের মাঝখানে 'তালি' (Breast-Patch) বসানোর টুকরো-কাপড়টিকে প্রয়োজনমতো মাপানুসারে ছাঁটাই ও সেলাই করে জোড়া দিন। তারপর কাপড়ের উপরাংশে অল্প 'কুঁচি' (Frill) দিয়ে 'এ্যাপ্রনের' কোমরের 'পটির' (Waist-Band) নীচের অংশের সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে সেলাই করে জোড়া দিয়ে দিন। তাহলেই শিশুদের ব্যবহারোপযোগী রঙ-বেরঙের টুকরো-কাপড়ের তৈরী বিচিত্র 'এ্যাপ্রন' রচনার কাজ শেষ হবে।

এ ধরণের সেলাইয়ের কাজের সময় ফালি-কাপড়ের রঙ ও নক্সা যদি মানানসইভাবে বেছে নিতে পারেন, তাহলে 'এ্যাপ্রনের' বাহার খুলবে চমৎকার। সুতরাং এদিকেও বিশেষ নজর রাখা দরকার।
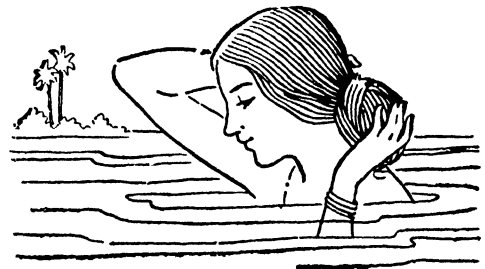
সুধীরা হালদার

এবারে ভারতের দক্ষিণাঞ্চলের বিচিত্র এক ধরণের উপাদেয় মিষ্টান্ন রান্নার কথা বলছি। এ মিষ্টান্নের নাম—'মৈশূর-পাক'…খেতে বেশ সুস্বাদু…খাস্তা-মচমুচে ধরণের। শো না যায়, এ খাবারটির রন্ধন-প্রণালী সর্ব্বপ্রথম উদ্ভাবিত হয় ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে মহীশূর (Mysore) প্রদেশে…হয় তো সেই কারণেই এ-খাবারটির এমনি নামকরণ হয়েছে। তবে দক্ষিণাঞ্চলে উদ্ভব হলেও, পরম-মুখরোচক খাদ্য-হিসাবে, বিচিত্র এই মিষ্টান্নটি ইদানীং ভারতের বহু অঞ্চলেই ব্যাপক-প্রসারতা লাভ করেছে। আপাততঃ এই জনপ্রিয় দক্ষিণ-ভারতীয় মিষ্টান্নটির রন্ধন-প্রণালীর মোটামুটি পরিচয় জানাই।

মৈশূর-পাক ঃ

এ মিষ্টান্ন রান্না করা খুব একটা দুঃসাধ্য বা ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার নয়। অথচ অনায়াসে এবং স্বল্প-খরচে, এ ধরণের খাস্তা-মচমুচে মুখরোচক খাদ্য পরিবেশন করে যে কোনো সুগৃহিণীই গৃহে বৈকালিক জলযোগ কিম্বা উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষে তাঁর আত্মীয়-বন্ধু আর অতিথি-অভ্যাগতদের রসনাতৃপ্তির সুব্যবস্থা করতে পারেন।

'মৈশূর-পাক' মিষ্টান্ন রান্নার জন্য যে সব উপকরণ প্রয়োজন, গোড়াতেই তার একটা মোটামুটি ফর্দ্দ জানিয়ে রাখি। এ খাবারের জন্য চাই—আধ সের পরিষ্কার জল, দেড় পোয়া ভালো ব্যাশন, তিন পোয়া ঘি, আর পাঁচ পোয়া চিনি। উপরে যে ফর্দ্দ দেওয়া হলো, সেই ফর্দ্দের হিসাব অনুসারে প্রায় চল্লিশ টুকরো মিষ্টান্ন রান্না করা যাবে। যাই হোক, উপকরণগুলি জোগাড় হবার পর, বড় একখানি থালাতে বেশ পুরু করে ঘিয়ের প্রলেপ মাখিয়ে রাখুন। থালাটিতে ঘিয়ের প্রলেপ লাগানোর সময় হাত বা চামচ ব্যবহার করবেন না…সাবধানে ঘিয়ের পাত্রটিকে কাৎ করে থালার উপর আন্দাজমতো ঘিটুকু ঢেলে বেশ পুরু-ধরণের প্রলেপ রচনা করবেন। তারপর উনানের উপর ডেকচি চাপিয়ে, সেই ডেকচিতে আন্দাজমতো জল আর চিনি মিশিয়ে, মাঝারি-গরম আঁচে খানিকক্ষণ ভালো করে জাল দিয়ে ফুটিয়ে, বেশ-পাৎলা অথচ ঘন-ধরণের 'চিনির-রস' পাক করে নিতে হবে। পাক করার সময়, 'চিনির-রস' যেন দীর্ঘক্ষণ বা বেশী-ঘনভাবে জ্বাল দেওয়া না হয়, সেদিকে নজর রাখা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ, 'চিনির-রস' বেশী-ঘন বা বেশী-পাৎলা হলে, খাবারটি রান্নার দোষে পাথরের মত কড়া ও শক্ত কিম্বা মাখনের মতো তুলতুলে এবং নরম ধরণের হবে…বেশ খাস্তা এবং মুচমুচে ছাঁদের হবে না। কাজেই 'চিনির-রস' পাক করার সময়, এদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন…এর উপরেই খাবার-রান্নার ভালো-মন্দ নির্ভর করে অনেকখানি।

এ কাজের পর, উনানের আঁচে-বসানো ডেকচিতে-পাক-করা 'চিনির-রসের' সঙ্গে অর্দ্ধেক পরিমাপে ঘি মিশিয়ে, কিছুক্ষণ হাতা দিয়ে নেড়েচেড়ে, এ দুটি উপকরণকে একত্রে আগুনের তাপে ফুটিয়ে নিন। এবারে ডেকচির ভিতরে ব্যাশনের গুঁড়ো ঢেলে, হাতা দিয়ে নেড়েচেড়ে, সেগুলি ঐ ঘী-মেশানো 'চিনির-রসের' সঙ্গে ভালো করে মিলিয়ে দিন। হাতার সাহায্যে নাড়াচাড়ার ফলে, কিছুক্ষণ বাদে ব্যাশনের গুঁড়ো, 'ঘি আর চিনির রসের' সঙ্গে মিশে একাকার ও ফুটন্ত হয়ে গেলে, বাকী ঘিটুকু ডেকচিতে ঢেলে দিয়ে রসটিকে উনানের আঁচে রেখে আরো খানিকক্ষণ ফুটিয়ে নিতে হবে। এভাবে ফোটানোর সময় হাতার সাহায্যে ডেকচির মধ্যে ফুটন্ত রসটুকু ক্রমাগতই নাড়াচাড়া করা দরকার, নাহলে রান্নার গলদ ঘটবে এবং খাবারটিও খেতে সুস্বাদু হবে না।

খানিকক্ষণ গরম-আঁচে ফুটিয়ে নেবার ফলে, ডেকচির ভিতরকার রসে যখন বুদ্বুদ জাগবে, তখন সন্তর্পণে উনানের উপর থেকে ডেকচিটিকে নামিয়ে, ঘিয়ের পুরু-প্রলেপ মাখানো থালাতে সদ্য-রান্না-করা কাদার তালের মতো নরম থলথলে-ছাঁদের খাবারটি ঢেলে রেখে দেবেন। ঢেলে রাখার সময় থলথলে-নরম খাবারের তালটিকে থালার উপরে আগা-

গোড়া পরিপাটি-ধরণে ও সমানভাবে বিছিয়ে দিতে হবে —কোথাও যেন কোনো রকম এবড়ো খেবড়ো বা উঁচু-নীচু অসমতলভাবে না থাকে। এজন্য ঢালার সঙ্গে সঙ্গেই থালার কিনারা ঈষৎ কাৎ করে বা সামান্য হেলিয়ে ধরে মৃদু ঝাঁকানি দিয়ে কাদার তালের মতো থল্‌থলে খাবারের ঐ তপ্ত-তালটিকেও অনায়াসেই আবশ্যকমতো সমতল-ছাঁদে বিছিয়ে পরিপাটিভাবে সাজিয়ে নিতে পারেন। অর্থাৎ সচরাচর বাড়িতে হালুয়া, মোহনভোগ প্রভৃতি খাবার রান্নার সময় মেয়েরা যে পদ্ধতিতে কাজ করেন, এক্ষেত্রেও তেমনি ধরণে কাজ করতে হবে।

গরম-থল্‌থলে খাবারটিকে ঘিয়ের পুরু-প্রলেপ-মাখানো থালার উপরে আগাগোড়া সমানভাবে বিছিয়ে রাখার পর, ধারালো একখানি ছুরির সাহায্যে বরাবর আড়াআড়ি ও লম্বালম্বি রেখা টেনে চৌকোণা বরফি বা রুইতনের ছাঁচে ছোট-ছোট টুকরো করে সেটিকে কেটে নেবেন। খাবারের তাল গরম এবং থল্‌থলে-নরম থাকার সময়েই এ কাজটুকু সেরে নিতে হবে। কারণ সদ্য রান্না-করা খাবারের নরম ও গরম তালটি যতই জুড়িয়ে যাবে, ততই দিব্যি খাস্তা এবং মুচমুচে হয়ে উঠবে···তার ফলে, টুকরো করে কাটবার কাজে অসুবিধা ঘটবে সবিশেষ। এমনিভাবে বরফি কেটে নেবার পর, গরম ও থলথলে খাবারটিকে অন্ততঃ-পক্ষে মিনিট দশ-পনেরো কোনো ঢাকা জায়গায় খোলা-বাতাসে রেখে বেশ ভালো করে জুড়িয়ে নিতে হবে। খাবারের গরম টুকরোগুলি সম্পূর্ণভাবে জুড়িয়ে যাবার পর, সুষ্ঠু-ধরণে পরিবেশনের উদ্দেশ্যে, অন্য একটি পরিষ্কার থালায় পরিপাটি-ছাঁদে সাজিয়ে তুলে রাখবেন।

এই হলো পরম মুখরোচক খাস্তা-মুচমুচে জনপ্রিয় দক্ষিণ-ভারতীয় 'মৈশূর-পাক' মিষ্টান্ন রান্নার মোটামুটি নিয়ম।

আগামী সংখ্যায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের আরো কয়েকটি বিচিত্র-অভিনব জনপ্রিয় খাদ্য রন্ধন-প্রণালীর বিষয় আলোচনা করবার চেষ্টা করবো।

আল্পনা—

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

রোজগারের চিন্তাটি ঘাড় থেকে নামবার পর স্বয়ং রোজগার পিছু পিছু তাড়া করল। ঘণ্টাখানেক পার হোল না, সশরীরে সমুপস্থিত হোলেন সেই পরম বৈষ্ণব আড়তদার মশায়। মূর্তিমান উপার্জন, খুঁজতে খুঁজতে সন্ধান নিতে নিতে ঠিক বার করে ফেলেছেন আমাকে। আড়তদার মানুষ, দু'একজন সাঙ্গপাঙ্গ থাকবেই। সাঙ্গপাঙ্গ সমেত গস্ত করতে এলেন একটা মানুষ, মানুষটিকে না পেলে তাঁর সাধের দীঘি, সাধের বাগান তৈরী হবে না—সব সাধ ভেস্তে যাবে।

একেবারে দাদন দিতে এসেছেন। বললেন—"নিন বাবু, এই পঞ্চাশটি টাকা এখন দাদন নিন। ধাঙড় বেটাদের ধরে রাখা দায়। একবার ওরা কাজ ছেড়ে চলে গেলে মাথায় হাত দিয়ে বসতে হবে। ওদের জাতকে জাত ও দীঘিতে আর হাত দেবে না। কাজটা উদ্ধার হোক, আপনাকে আমি সন্তুষ্ট করে দোব। এয়েছেন আমাদের এখেনে, ভদ্দরলোকের ছেলে আপনি, থাকুন। কোনও চিন্তা নেই। আমরা পাঁচজনে যখন আছি, তখন—"

আড়তদারের আমড়াগাছিটুকু সমাপ্ত হবার সময় পেল না। তাঁর পেছন থেকে শিবকালী গোড়ুই শুধু মাঢ়ার সাহায্যে দরদস্তুরটা পাকা করে ফেলতে চাইলেন। একটা হাঁড়ির ভেতর তপ্ত বালুতে ভুট্টার দানা ছেড়ে হাঁড়ির মুখটা বন্ধ করে উনুনে চাপিয়ে রাখলে যে রকম আওয়াজ করে ফুটতে থাকে দানাগুলো, সেই রকম ভাবে বেরুতে লাগল গোড়ুই কর্তার বচন—"বলি, খুব যে ট্যাকার গরম হোয়েছে মাইতি। গরুর চামড়া-বেচা পয়সা রাখবার আর জায়গা পাচ্ছ না—নয়? বলি, হাড়গুলো তুমিই তুলে নাও না গো, বেচলে আরও দুটো পয়সার মুখ দেখবে। সেই পয়সায় গয়না গড়িয়ে দেবে বিন্দ্যেশ্বরীকে, যার লেগে ঐ বাগান-বাড়ি বানাচ্ছো। বলি, গোড়ুই বাড়ি এয়েছ ট্যাকা গছাতে—কেমন? বলি এখন যদি তোমার চামড়াখানা খুলে লি—তা'হলে কেমন হয়?"

বৈষ্ণব তত্ত্বে আগুন ধরে গেল আড়ৎদারের। ফতুয়ার কাঁধে ছিল লাল টকটকে—তারকেশ্বরের বিখ্যাত গামছা, গামছাখানা কাঁধ থেকে টেনে নামিয়ে ভুঁড়িটি বাঁধতে বাঁধতে তড়পাতে লাগলেন—"শুনলে? শুনলে তোমরা? দাঁড়া আজ—দেখাই তোকে হারামজাদা, কে কার চামড়া খুলে নেয়। চিরকাল মানুষ খুন করেছ বলে শালার তেলী বে-ফয়দা তিলিয়ে উঠেছ—লয়? আজ শালা তোরই চামড়া খুলে লিয়ে গিয়ে বেচব।"

ভুঁড়িটি বাঁধা সমাপ্ত হবার আগেই ঝুপ করে আকাশ থেকে পড়ল যেন বীরুদাস। এক হেঁচকায় গামছার দু'-মাথা আড়ৎদারের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পাক দিতে সুরু করলে। পাক তো পাক, সে একেবারে জাহাজ বাঁধা কাছির পাক। পাকের চোটে ভুঁড়ির মাঝখানটা ক্রমেই সরু হোতে লাগল। যাঁর ভুঁড়ি তিনি প্রথমে খানিক টানা-হেঁচড়া করলেন বীরুদাসের হাত থেকে গামছার খুঁট ছাড়াবার জন্যে। তারপর তাঁর দু'চোখ ঠেলে বেরবার জোগাড় হোল। দু'খানা হাত মাথার ওপর তুলে পরিত্রাহি চিৎকার করতে লাগলেন। কে তাঁকে উদ্ধার করবে,

বীরুদাসের আবির্ভাব হোতেই তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা অন্তর্ধান করেছেন।

যাকে বলে বিদ্যুৎগতি, বৈদ্যুতিক বেগে ঘটে গেল ঘটনাগুলো। চরম পরিণতিটাও ঘটে বুঝি চোখের সামনে। গলায় গামছা দিয়ে মানুষ মারা সম্ভব, এইটুকুই জানা ছিল। ভুঁড়িতে গামছা কষে একটা জ্যান্ত মানুষকে খতম করা হচ্ছে দেখে কেমন যেন জবুথবু মেরে গেলাম। কয়েক হাত তফাতে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছি, মাঝখানে পড়ে থামিয়ে দেবার কথাটাও খেয়ালে এল না। চমকে উঠলাম ঢিপ করে একটা আওয়াজ হোতে। আধ-ফুটন্ত ভাত-সুদ্ধ একটা মাটির হাঁড়ি আছড়ে পড়ল উঠোনের মাঝ-খানে, পড়েই হাঁড়িটা গেল ফেঁসে। তার ওপর এসে পড়ল এক কড়াই ডাল, লোহার কড়াইটা ডিগবাজি খেতে খেতে চলে গেল খিড়কি দরজা পার হোয়ে। তারপর এল এক গোছা আধপোড়া কাঠ। তার ওপর পড়ল এক চুপড়ি কাটা আনাজপাতি। এলাহি কাণ্ড যাকে বলে, একটার পর একটা অদ্ভুত জিনিষ ছিটকে বেরিয়ে আসছে রান্নাঘর থেকে আর আছড়ে পড়ছে উঠোনের মাঝখানে, কামাই নেই।

বীরুদাসের হাতের কাজ বন্ধ, আড়ৎদার মশাই ছাড়া পেয়েও পালাতে ভুলে গেছেন, গোড়ুই কর্ত্তা নাচছেন। বৃন্দাবনী ঢঙে দু'হাত ওপর দিকে তুলে ঘুরে ঘুরে নৃত্য জুড়ে দিয়েছেন তিনি, মুখে বেরচ্ছে—জয় রাধে শ্রীরাধে বল হরিবোল হরিবোল।

দু'টো দরজা বাড়ির, একটা সদর একটা খিড়কী। দু'টো দরজা দিয়েই হুড়মুড় করে ঢুকতে লাগল মানুষ। মাথায় গামছা জড়ানো হাতে কাস্তে নিয়ে ঢুকে পড়ল কয়েক জন, কেউ কেউ ঢুকল কোদাল হাতে করে। কাঁধে মাছ-ধরা জাল নিয়ে এসে পড়ল কেউ কেউ, যে যেখানে ছিল, হাতের কাজ ফেলে ছুটে এল। এসে এক মুহূর্ত্ত সময় নষ্ট করল না, কাস্তে কোদাল একধারে নামিয়ে রেখে গোড়ুই-কর্ত্তাকে ঘিরে নাচতে লাগল—হরিবোল হরিবোল। দেখতে দেখতে পালটে গেল উঠোনের চেহারা। একজন কোদাল দিয়ে চেঁচে ভাত ডাল আনাজ ভাঙা-হাঁড়ি একধারে জড়ো করে ফেললে, আর একজন একটা ঝোড়ায় সেগুলো বোঝাই করে বাইরে নিয়ে চলে গেল। তুলসী তলার পেছন দিকে খুব ছোট খুব বেঁটে একখানি ঘর থেকে বার করে নিয়ে এল খোল একটা আর কয়েক জোড়া কত্তাল। গিজ্‌তা গিজাং গিজতা গিজাং বেজে উঠল। আড়ৎদার মশাই উঠোনের মাঝখানে একবার গড়াগড়ী দিয়ে লাফিয়ে উঠলেন। তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরাও তখন নৃত্য জুড়ে দিয়েছে। তাদের একজনকে একধারে টেনে নিয়ে গিয়ে ফতুয়ার পকেট থেকে টাকা বার করে হাতে গুঁজে দিলেন। সে লোকটা ছুটল। বেঁটে বীরুদাসকে কোথাও দেখতে পেলাম না।

আধ ঘণ্টাও পার হোল না, এসে গেল এক ধামা বাতাসা। বাতাসার সঙ্গে সমুপস্থিত হোল ছেলে বুড়ো আণ্ডা বাচ্চা, অন্ততঃ আরও একশ জন। লুট, দু'হাতে— বাতাসা ছাড়াতে লাগলেন আড়ৎদার মশাই। হুমড়ি খেয়ে গিয়ে পড়ল সবাই বাতাসা কুড়োবার জন্যে। হরি হরি বল, হরি বোল হরি—তিন বার প্রচণ্ড চিৎকার দিয়ে সংকীর্ত্তন খতম হোল। সঙ্গে সঙ্গে ওপাশের বারন্দা থেকে শোনা গেল সুর। দুপুরের রোদ ঝিমিয়ে পড়ল তৎক্ষণাৎ, সমস্ত মানুষ নিস্তব্ধ হোয়ে তাকিয়ে রইল। একটা বাঁশের খুঁটি ঠেসান দিয়ে বসে চোখ বুজে নিতাই বোষ্টুমী গাইতে লাগল—

এযে এক রসিক পাগল, বাধালে গোল
নদের মাঝে দেখরে তোরা।
পাগলের সঙ্গে যাব, পাগল হব,
হেরবো রসের নব গোরা॥
নিতাই পাগল, গৌর পাগল,
চৈতন্য পাগলের গোড়া।
অদ্বৈত পাগল হোয়ে, রসে ডুবে,
প্রেম এনেছে জাহাজ পোরা॥
ব্রহ্মা পাগল, বিষ্ণু পাগল,
আর এক পাগল না দেয় ধরা।
কৈলাসের শিব পাগল, শিবানী পাগল
সার করেছে ভাং ধুতুরা।

কেউ পাগল নয়। অথবা এ কথাও বলা যায় সবাই সেয়ানা পাগল, সেয়ানা পাগলে কিছুতেই বোঁচকা আগ-

লাতে তোলে না। গান শেষ হবার আগেই সব পাগলে একজোট হোয়ে ভক্তি সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে লাগল। কোথায় গেল হতভাগা বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী, আর কোথায়ই বা গেল চক্রবর্ত্তীর ঘোমটাঢাকা পরিবারটি। হাঁড়ি কুঁড়ি ছুড়ে ফেলে দিয়ে চক্ষু বুজে বাঁশের খুঁটি ঠেসান দিয়ে বসে যে মানুষটি পাগলের গান গেয়ে মানুষকে পাগল করে ছাড়লেন, তিনি এক সাক্ষাৎ মা-গোঁসাই। বাছাদের সঙ্গে একটু ছলনা করছিলেন, নিজেকে গোপন রাখার চেষ্টা করে। আত্মপ্রকাশ করে ফেললেন, হাঙ্গামা চুকে গেল। কাড়াকাড়ি পড়ে গেল চরণধূলির জন্যে, অমন একটি মা-গোঁসাই পেয়ে অন্ততঃ একটি বার তাঁর চরণ দু'খানি খামচে ধরতে না পারলে বেঁচে থেকে লাভ কি।

সেই ভয়ানক হৈ হট্টগোলের মাঝখান থেকে চুপি চুপি সরে পড়লাম। করবার আর কিছুই নেই, সসম্মানে আপন আসনে প্রতিষ্ঠিতা হোয়ে গেল নিতাই বোষ্টমী। এখন আর ওর ধারে কাছে যায় কে! চারিদিকে গড়, অথৈ জল। জল নয়, অমৃত। ভক্তি জিনিষটাই অমৃততুল্য। সেই ভক্তি গড়ে সাঁতার দেবার সামর্থ্য ছিল না। সামর্থ্য থাকলেও প্রবৃত্তি হোল না। রেষারেষি জেদাজিদি করার গরজ কি সব সময় থাকে?

সাঁই সাঁই করে পা চালিয়ে পৌছে গেলাম বাবার বাড়িতে। মাটি তেতেছে, পা পুড়ছে, পুড়ছে সর্ব্বশরীরও। কোঁচার খুঁটটি মাত্র গায়ে আছে! স্যাণ্ডেল সার্ট পড়ে রইল ঘরে, কোঁচার খুঁট গায়ে দিয়ে শুয়েছিলাম, আড়তদার মশাই ডাকতে সেই অবস্থাতেই ঘর থেকে বেরুই। তারপর আর ঘরে গিয়ে জামা স্যাণ্ডেল নেবার কথাটা মনেই পড়ল না। আপদ গেল, বাবার বাড়িতে পৌছে পুকুরে গিয়ে নামলাম একেবারে। অনেকক্ষণ ধরে ডুব দিতে দিতে শরীর জুড়ল। ভিজে কাপড় নিউড়ে পড়লাম গিয়ে নাট মন্দিরের এক কোণায়। এক বুড়ো পাণ্ডা এসে জানতে চাইল, হত্যা দেবার অভিপ্রায় আছে নাকি। বললাম আজ্ঞে না, এমনই একটু জুড়িয়ে নিচ্ছি। খানিক পরেই উঠে যাব।" তিনি আর কিছু বললেন না, বেশ কিছুক্ষণ চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থেকে সরে গেলেন।

চোখ বুজলাম। সঙ্গে সঙ্গে বোজা চোখের সামনে এসে দাঁড়াল রামহরে ডোম, পউকা রামহরের বউ। ওদের পানে তাকাবার শক্তি হোল না। হঠাৎ মনে হোল, সর্ব-হারা হোয়ে পড়েছি। গড়াগড়ি খাচ্ছি পথের ধুলোয়—আজ আর আমার পরিচয় দেবার মত কিছু নেই। হু হু করে জল গড়াতে লাগল দু'চোখ দিয়ে। মরা মানুষের কান্না। যাকে কেউ চেনে না, যার-কোনও পরিচয় নেই, সে মরা। ম'লে পরে কি হয়! ভয়ানক সাংঘাতিক রকমের একটা ওলট পালট কিছু হয় না। ম'লে এমন একটা স্থানে পৌছতে হয়, যেখানে চেনা-জানা আপন-জন একটিও নেই। নিরম্বু একলা হোয়ে যাওয়ার নামই মরণ, মরণের ওপারের জীবনে দোসর খুঁজে পাওয়া যায় না।

দোসন, সুখের দোসর—দুঃখের দোসর, অথবা দুঃখ বাদ দিয়ে শুধু দোসর, বেঁচে থাকার জন্যে দোসর চাই। বহু দোসর ছিল উদ্ধারণপুরের ঘাটে, তাদের কাছে বেঁচে-ছিলাম এক জনের জন্যে, মাত্র এক জনের কাছে বিশেষ ভাবে বেঁচে থাকবার জন্যে সেই দোসরদের ছেড়ে এসেছি। উদ্ধারণপুরের ঘাটে মরে অন্যত্র বাঁচবার জন্যে চেষ্টা করতে বেরিয়েছি। সেখানে ভিড়, সেই ভিড়ে নিজের স্থান করে নেবার প্রবৃত্তি নেই। প্রবৃত্তি থাকলেও সামর্থ্য নেই। যত সহজে, চট্ করে শুধু একখানি গান গেয়ে নিতাই বোষ্টমী নিজের মর্য্যাদা ফিরে পেতে পারে, উদ্ধারণপুর ঘাটের সাঁই বাবা তা পারে না। বহু রকমের তোড়জোড় চাই। চুল দাড়ি নেই, রক্তবর্ণ চক্ষু দুটোর চাউনিও পালটে গেছে! মড়ার বিছানায় আসন নেই, নেই গণ্ডা গণ্ডা বোতল। শেয়াল শকুন নেই, আধ-পোড়া আধা-খাওয়া মড়া নেই। কিছুই নেই, সাদা হাড় আর কালো কয়লায়—সাজানো আমার সেই সংসার কোথায় পাব আজ যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করব! মরেছি, মরবার পরে বেঁচে থাকাটা কি বিড়ম্বনা, তাই চাখবার জন্যে বেঁচে আছি। এ বিড়ম্বনা থেকে উদ্ধার পাই কেমন করে!

শোকেও নয় দুঃখের নয়, চোখের জল গড়াতে লাগল অন্য কারণে। ওটা হোল এক রকমের তৃপ্তির কান্না। নিজেকে নিজে খুজে না পাবার তৃপ্তি। সর্ব্বস্ব খোয়া গেলেও মানুষ কাঁদে না। কাঁদে যখন নিজেকে খোয়ায়। এ কান্নাটাকে আদিখ্যেতা বলতে হয়, বল। কিন্তু এই আদিখ্যেতাটুকুর মূল্য অপরিসীম। নিজের কাছে নিজে ধরা পড়ে যাওয়া কি একটা যা তা কথা। জীবনে

কতবার সে সুযোগটা আসে, যখন নিজেই নিজেকে ভাল করে বোঝানো যায় যে জগতের কাছে কানাকড়ি মূল্য তো তোমার কোনও দিনই ছিল না, আজ আমার কাছেও তুমি তোমার মূল্য হারালে। আজ আমি বেশ করে বুঝতে পারলাম যে আমি বলে যে জীবটি বেঁচে রয়েছি এই জীবটির বেঁচে থাকা না থাকা সমান। বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য কি! এত বড় দুনিয়াখানায়—কার মনে পড়ে যে তুমি বেঁচে আছ! বেঁচে না থাক যদি তুমি, কার কতটুকু ক্ষতি বৃদ্ধি হবে!

এতগুলো প্রশ্নের সামনে নিজেকে চিরে চিরে দেখতে হোলে চোখের জল পড়েই। সে জলটা অপচয় নয়। বরং বলা উচিৎ—ভাগ্যে ঐ সম্বলটুকু ছিল! ঐ চোখের জলটুকুও যদি শুকিয়ে যেত, তাহলে কি হোত! মরার পরেও তেষ্টায় ছাতি ফাটত যে।

তেষ্টাটা হঠাৎ বিষম রকম পেয়ে বসল। মনে হোল, খানিক জল না গিলতে পারলে তখনই দমটা ফেটে যাবে। ফাটুক, উঠলাম না। কুঁকড়ি সুঁকড়ি মেরে পড়ে রইলাম। ভিজে কাপড়খানা শুকিয়ে উঠল গায়। শুকলেও জ্বালা নেই। সাচ্চা দরবারের নাটমন্দির হিম ঠাণ্ডা। বাইরের আঁচ একটুও ভেতরে ঢুকতে পায় না।

হঠাৎ বেজে উঠল ঢাক। ঢাক দুটোও ঝুলছে সেই নাট-মন্দিরের মধ্যে। খোলা আকাশের তলায় যে ঢাকের বাদ্য না থামলে মিষ্টি লাগে না, সেই বাদ্য বাজছে দালান-টার মধ্যে। আওয়াজটা কড়ি বরগায় ঠোক্কর খেয়ে হাজার গুণ বেড়ে গিয়ে আছড়ে পড়ছে নিচে। সে যে কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড, তা' ভাষায় ফুটিয়ে তোলার সাধ্য নেই। মিনিট খানেকের মধ্যেই ধড়-মড়িয়ে উঠে বসতে হোল। তোল-পাড় লেগে গেল শরীরের রক্তে। বলবার কিছুই নেই। বাবা খাচ্ছেন তখন, ঐ রকম বিষম আওয়াজ কানের কাছে না করলে কি অতবড় নেশাখোরকে সজাগ রেখে খাওয়ানো যায়।

ছিটকে বেরিয়ে পড়তে হোল নাটমন্দির থেকে। বেরিয়ে পড়তেই বীরুদাস ধরে ফেললে। আধ মিনিটটাক চুপ করে তাকিয়ে থেকে বললে—"চলুন, খানিক টেনে আসা যাক। দূর শালা, নেশা না করলে কি মানুষ চললাম। কথাটা বীরুদাস মন্দ বলেনি। বহু কাল বোতলের মুখে মুখ ছোঁয়াই নি। কে বলতে পারে, ঐ দ্রব্যটি পেটে পড়লে আবার বেঁচে উঠব-কি না!

রওয়ানা হোলাম বীরুদাসের সঙ্গে। বাবার ভোজন চলতে লাগল।

শক্তি আছে বীরুদাসের, শক্তি আছে বলেই মানুষে শ্রদ্ধা ভক্তি করে। বোতলের দোকানের মালিক পর্য্যন্ত বীরুদাসের ভক্ত। স্বয়ং মালিক স্বহস্তে দুটি বোতল বার করে আনলেন তাঁর ভাঁড়ার ঘর থেকে। বোতল দুটির গায়ে বিশেষ রকম চিহ্ন দেওয়া আছে। বিক্রির মাল নয়, সরকারের লোককে নমুনা দেবার জন্য ও-রকম বোতল আলাদা করে রাখতে হয়। বিক্রির মাল গণ্ডা গণ্ডা সামনেই বসানো রয়েছে। সে হোল বোতল ধোয়া জল। সে মাল বীরুদাসের হাতে দিলে খুনখারাপি হবার ভয়ও আছে! ভয় থেকেই ভক্তি—বেঁটে বীরুদাসকে ভক্তি করে না, এমন পাষণ্ড তারকেশ্বরে নেই। কারণ বীরুদাস মানুষের প্রাণে ভক্তি জন্মাবার চাষ করতে জানে।

বোতল বগলদাবায় পুরে দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম দু'জনে। মুখ বুজে কাঠ ফাটা রোদ মাথায় করে ওর পেছন পেছন হাঁটতে লাগলাম, হাঁটছে তো হাঁটছেই। ব্যাপার কি রে বাবা! মাল টানবার জন্যে কি এক দেশ থেকে আর এক দেশে যেতে হয়!

সরকারি রাস্তা ছেড়ে মেঠো পথ ধরলাম শেষকালে। তারপর এসে পৌছে গেলাম এক কানা নদীর ধারে। তখন পথ বলতে কিছুই নেই। ঝোপ ঝাড়ের মাঝখান দিয়ে নালা টিলা টপকে নিজেদের পথ নিজেরা করে নিয়ে চলতে হচ্ছে। হাত দুয়েক লম্বা কুচ-কুচে কালো একটা সাপ বেতের মত সপাং করে পড়ল বীরুদাসের সামনে। বিকট চিৎকার করে উঠলাম। বীরুদাস নির্বিকার, চুক-চুক করে ঠোঁট দিয়ে একটু আওয়াজ করলে শুধু। নিচু হোয়ে মুঠো করে ধরলে সাপটার মাথা। আশ্চর্য্য হোয়ে দেখলাম, সাপটা কেমন ঝিমিয়ে পড়ল। সাপটাকে ধরে বিড়বিড় করে কি যেন মন্ত্র পড়লে বীরুদাস। তারপর সেটাকে একটা গাছের ডালে জড়িয়ে দিলে। মুখে বললে "ঘুমো, ঘুমো! কালনাগিনী দুষ্টু মেয়ে, যাকে ছোঁয় সে

কাল ঘুম ঘুমায়। আমি তোকে ছুঁয়ে দিলাম, এখন তুই ঘুমো। কার আজ্ঞে—বাবার আজ্ঞে—সচ্চা দরবারের আজ্ঞে—নে এখন ঘুমিয়ে থাকো।"

তারপর আরও খানিক এগিয়ে দেখা গেল, বাঁশ ঝাড়ের মধ্যে লুকনো এক আদ্যিকালের মন্দির। মন্দিরটার ওপরে মস্ত এক বটগাছ জন্মেছে। তার শিকড় নেমে মন্দিরটাকে ছেয়ে ফেলেছে। ভাঙ্গা ইটের স্তূপ ছড়িয়ে আছে চারিদিকে, তার ওপরে জঙ্গল জন্মেছে; সে জঙ্গলে শুধু সাপ কেন, বাঘ থাকাও বিচিত্র নয়।

কানা নদীর কূল দিয়ে ঘুরে মন্দিরটার অপর ধারে গিয়ে পৌছলাম। বীরুদাস একটা হুংকার ছাড়লে—"বাবা তারকনাথের চরণে সেবা লাগে—"

মন্দিরের ভেতর থেকে ক্ষীণ জবাব ভেসে এল—"মহাদেব।"

সন্ধ্যা ঘনিয়ে উঠছে। বোতল দুটো গড়াগড়ি যাচ্ছে এক পাশে। মন্দিরের সামনে ভাঙ্গা রোয়াকের ওপর আমরা বসে আছি। আমরা তিন জন, দু'জন নই। আমি বীরুদাস, আর একজন অদ্ভুত প্রাণী। প্রাণীটি কোন জাতের বলা মুশকিল। একদা হয়তো মানুষই ছিল, হাত পা সবই ছিল হয়তো মানুষের মত। পালটে গেছে। মানুষ বলে আর চেনা যায় না। কোনও রকমের জানোয়ার বলেও মনে হয় না। মনে হয় পিশাচ। পিশাচ-কেমন জীব, পিশাচ আদবেই জীব কি না, এ সব প্রশ্নের সঠিক জবাব কেউ দিতে পারে না। তার কারণ, পিশাচের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় কারও নেই। পিশাচের সঙ্গে পরিচয় থাকলেও সে পরিচয় বর্ণনা করে বোঝানো সম্ভব নয়। পিশাচ হোল পিশাচ, যার শ্বাসে প্রশ্বাসে পৈশাচিক হলাহল। যার ছোঁয়ায় বাতাস পর্য্যন্ত বিষিয়ে ওঠে।

চামড়া-ঢাকা হাড় গোড় রক্ত মাংস, তার ওপর অনেক কিছু গজিয়েছে। মন্দিরটাকে যেমন ছেয়ে ফেলেছে বট গাছের শিকড়ে, তেমনি পিশাচটাকে ছেয়ে ফেলেছে চুল দাড়ি গোঁফে। সমস্ত জট পাকিয়ে গেছে। সেই জটের ভেতর দেখা যাচ্ছে নানা আকারের গেঁজ, ওলের গায়ে যা দেখা যায়। কোনটা আঙ্গুলের মত, কোনটা বেলের মত, কোনটা বা পটলের মত। হাতে পায়ে বুকে পিঠে মুখে কপালে সর্ব্বাঙ্গে নানা আকারের অজস্র গেঁজ গজিয়েছে। কোনটা ঝুলছে, কোনটা খাড়া হোয়ে আছে। কোন কোনটা ঠেলে বেরিয়ে রক্তবর্ণ চোখে প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে দেখছে। তার ওপর জীবটাই আবার বর্ত্তুলাকার, অনেকটা কাছিমের মত দেখতে। সেই কিম্ভুতকিমাকার প্রাণী কয়েক হাত তফাতে বসে বিড়বিড় করে একটা কাহিনী আওড়াচ্ছে। ভাষাটাও অদ্ভুত, সে ভাষা বাউল নয়, হিন্দী নয়, উর্দু ইংরাজী সংস্কৃত নয়। বিদেশী ভাষা, অক্ষরের সঙ্গে বড় একটা সম্পর্ক নেই সে ভাষার, টান আর সুর দিয়ে যা বোঝাবার বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

বুঝতে লাগলাম। যা বুঝলাম তার চেয়ে লোমহর্ষক কাণ্ডকারখানা কেউ কখনও শুনেছে বলে মনে হয় না।

একদা ঐ সাচ্চা দরবারের মালিকানা নিয়ে নাকি খুব বড় এক লড়াই শুরু হয়। তামাম দেশ থেকে হাজার হাজার মানুষ এসে উপস্থিত হয়—সাচ্চা দরবারের গদি থেকে বাবার বাবাকে উৎখাত করার জন্যে। লড়াই চলতে লাগল। মন্দির ঘিরে রইল সরকারি শান্তিরক্ষকের দল। হাজার হাজার জোয়ানকে ধরে তারা জেলে পুরতে লাগল।

কত মানুষকে জেলে পুরবে! সমস্ত দেশটা জুড়ে শুধু জেলখানা বানালে অত লোককে জেলে নেওয়া সম্ভব। নাচার হোয়ে শান্তিরক্ষকরাই অশান্তির সৃষ্টি করে বসল। স্বেচ্ছায় আইন অমান্য করে যারা জেলে যেতে এসেছে, তাদের মার-ধোর করে তাড়াবার চেষ্টা করা হোলি। মারই বা কত মানুষকে দেওয়া যায়। মানুষের তো অভাব নেই দেশে। মার খাবার জন্যে এত মানুষ তৈরী হোয়ে আসতে লাগল যে তাদের মারবার মানুষ জোটানো মুশকিল। তখন শান্তি-রক্ষকরাই বাবার শরণাপন্ন হোল। আপনিই একটা ব্যবস্থা করুন।

হাঁ, ব্যবস্থা তিনি করলেন।

বহুকালের একটা সাধ ছিল তাঁর মনে। ইষ্ট দেবতার কাছে এক হাজার আটটি নরবলি দিয়ে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ঘটাতে পারেন, এমন একটি বর চেয়ে নেবেন, এই সাধটি

ছিল তাঁর মনে। এত বড় মওকাটা তিনি ছাড়লেন না। হিমালয় থেকে বেছে বেছে নাগা সন্ন্যাসী আনালেন। তারপর শুরু হোয়ে গেল বলিদান। জেল খাটবার জন্যে আর মরবার জন্যে এত মানুষ এসে জমা হচ্ছে যে কে তার হিসেব রাখে। দু'চার জন করে রোজ চুরি হোতে লাগল। চুরি করে মানুষ পাচার করতে গেলে তাদের বেহুঁশ করা দরকার। এক ছোকরা বাঙালী ডাক্তার জুটল ঐ কাজটি করার জন্যে। সে এসে দীক্ষা নিল বাবার বাবার কাছে। সেই বাঙালী ডাক্তারটি ছুঁচ দিয়ে বেহুঁশ করে ফেলত জোয়ান জোয়ান ছোকরাদের। তারপর তাদের যথাস্থানে নিয়ে গিয়ে সঠিক শাস্ত্র সম্মত ভাবে বলি দেওয়া হোত। ঐ যে অত হাড় বের হচ্ছে আড়ৎদারের দিঘীর ভেতর থেকে, ওগুলো সেই সব বলিদানের হাড়। ওখানে একটা দল ছিল জঙ্গলের মধ্যে। বলিদান দেবার পরে মানুষগুলোকে তার মধ্যে ফেলে দেওয়া হোত। কাকে বকে টের পেত না।

কি যেন বলবার জন্যে বীরুদাস মুখ তুলল। তার আগেই আমি সেই পিশাচকে জিজ্ঞাসা করলাম—"সেই বাঙালী ডাক্তার ছোকরাটির নাম আপনি জানেন বাবা? তার নাম কি আপনার মনে আছে?"

পিশাচ-বাবা অদ্ভুত ভাবে উচ্চারণ করলেন নামটা—"আউদোয়ানাথ, হাঁ, উনকা নাম আউদোয়ানাথ আসিল। হামার বিলকুল খিয়াল আশে।"

বীরুদাস বলল—"ব্যাস ব্যাস, আর নয়। শালার নেশাটাই ছুটে গেল। চলুন, আরও খানিক টানিগে। দমভোর না টানলে মেজাজ আজ ঠিক থাকবে না। শেষে আমরাই হয়তো বলিদান জুড়ে দোব।"

(আগামীবারে সমাপ্য)

মুক্ত

শ্রীগোবিন্দপদ মান্না

আমাকে বাঁধতে চেয়োনা হে সংসার
তোমার দারিদ্র্যের নাগপাশ দিয়ে—
আমাকে ভোলাতে চেয়োনা হে পৃথিবী
তোমার মোহিনী ছলনা জালে।

আমি মুক্ত···কোকিলের মত গান গাই—
জানিনা বন্ধন—চিনিনা দাসত্ব
আমার পায়ে দিওনা সোনার শিকল
হে সংসার—হে নিষ্করুণ পৃথিবী।

অসীমের মাঝে মিলিয়ে যেতে দাও আমাকে
জ্যোতিষ্কের দুর্ব্বার গতির ছন্দে দাও মিলিয়ে—
সৌরজগতের গ্রহনক্ষত্রের প্রতি আবর্ত্তন পথে
যেতে দাও আমাকে হে সংসার!

চাইনা তোমার জড়তার অন্ধকূপে বন্দী হ'তে
চাইনা তোমার আবিল রুদ্ধস্রোতের শেওলা হ'তে
চাইনা হতে তোমার সনাতনত্বের পূজারী,
চাই গতি···চাই বেগ···শুধু চলা হে জগৎ।

তুমি তো চলেছ হে চলমান কোটী কোটি বৎসর ধরে
জ্যোতিষ্কের মুক্ত পথে অসীম গতির তালে—
তবে আমরা কেন অচল—কেন বন্দী
অজস্র আচারের সহস্র পৌন পৌনিকতায়?

ভুলে যাও আমাকে হে সংসার হে প্রতিবন্ধক!
চাইনা তোমার সনাতনত্বের পূজারী হ'তে—
বাঁধতে চেয়োনা আমায় হে মায়াবী পৃথিবী
তোমার মোহিনী ছলনা জালে॥

জন্ম কুণ্ডলীতে দুঃস্থানগুলির পর্য্যালোচনা

উপাধ্যায়

প্রত্যেক জন্ম কুণ্ডলীতে দ্বাদশটি ভাব আছে। লগ্ন থেকে বামাবর্ত্তে দ্বিতীয়, তৃতীয়াদি গৃহ বা ভাবগণনা করতে হয়। প্রত্যেক ভাবের বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন তনুভাব থেকে জাতকের শারীরিক অবস্থা বর্ণ, শারীরিক চিহ্ন, আয়ু, বয়সের পরিমাণ, সুখদুঃখ, জাতি, স্বভাব প্রভৃতি বিষয়গুলির বিচার করতে হয়, এমনিভাবে অন্যান্য ভাবও যেমন, ধন, সহোদর, বন্ধু, পুত্র প্রভৃতি বিচার করতে হয়। দ্বাদশ ভাবের শুভাশুভত্ব আছে। লগ্ন, চতুর্থ, পঞ্চম, সপ্তম, নবম ও দশম এই ছয়টি শুভ ভাব, আর দ্বিতীয়, তৃতীয়, ষষ্ঠ, অষ্টম, একাদশ ও দ্বাদশ এই ছয়টি অশুভ ভাব। অশুভ ভাবপতি গ্রহ অশুভ ফল, শুভ ভাবপতি গ্রহ শুভফল এবং মিশ্রভাবপতি গ্রহ মিশ্রফল প্রদান করে।

ধনু লগ্নে জাত ব্যক্তির মঙ্গল, পঞ্চম ও দ্বাদশ ভাবপতি। সুতরাং গ্রহটি মিশ্রফল প্রদান করে থাকে। মিথুন লগ্নে জাত ব্যক্তির শনি অষ্টম ও নবম ভাবপতি, অতএব গ্রহটি মিশ্রফল প্রদান করে। পরাশর বলেন শুভ গ্রহ কেন্দ্রাধিপতি হোলে অশুভ ফল প্রদান করে থাকে-- এই উক্তির উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে হোলে জ্যোতিষে বিশেষ জ্ঞান ও সূক্ষ্ম দর্শন আবশ্যক করে। একই পদার্থ অবস্থা ভেদে শুভ ও অশুভ। অগ্নির উত্তাপ এক সময় ভালো লাগে, আর এক সময় ভালো লাগে না। কেন্দ্র স্থানই হচ্ছে শক্তি। পাপগ্রহ কেন্দ্রপতি ও কেন্দ্রস্থ হোলে জাতক প্রবল পরাক্রান্ত, ক্রূর প্রকৃতি ও দুর্দ্দান্ত হয়। কিন্তু শুভগ্রহ কেন্দ্রপতি হোলে মারকত্ব দোষ হেতু সম্ভবতঃ ঐরূপ উক্তি করা হয়েছে।

দ্বাদশ ভাবে আত্মীয়গণের শুভাশুভ বিচার করা যায়। যে ভাবে যার বিচার করতে হয়, সেইটিকে তার লগ্ন মনে করে জাতকের কোষ্ঠী থেকে গ্রহ সংস্থান দেখে তার শুভাশুভ আর তার অন্যান্য আত্মীয়দের ভালোমন্দ বিচার করতে হয়। প্রথমা কন্যা বা প্রথম পুত্রবধূর সম্বন্ধে বিচার করতে হলে লগ্ন থেকে একাদশ স্থান অর্থাৎ আয় ভাবকে তার লগ্ন মনে করে তার সম্বন্ধে বিচার করতে হবে। তৃতীয়, ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশ ভাবাধিপতি গ্রহ শুভই হোক্ আর অশুভই হোক, এরা অশুভ বলে পরিগণিত। উক্ত ভাব চতুষ্টয়ের মধ্যে যে কোন ভাবাধিপতি স্বক্ষেত্রে না থেকে অন্য যে কোন ভাবে থাক্‌লে, সেই ভাবের নাশ বা অশুভ হবে। যে ভাবাধিপতি তৃতীয়, ষষ্ঠ, ও অষ্টম দ্বাদশ স্থানে থাক্‌বে সেই ভাবের হানি বা নাশ কল্পনা করে নিতে হয়। যে ভাবাধিপতি গ্রহ শত্রু গৃহী, শত্রুদৃষ্ট, নীচস্থ, অস্তমিত, পরাজিত, স্বকীয় বর্গ বিহীন আর সেই ভাবে কোন শুভ দৃষ্টি না থাক্‌লে, সেই ভাবের ফল অত্যন্ত মন্দ বলে স্থির করতে হবে।

কোষ্ঠী বিচার করে ফল গণনার সময় দুঃস্থানের অধিপতি বা দুঃস্থানে অবস্থিত গ্রহদের সম্পর্কে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। কারণ এরাই বহু শুভ ফলের হন্তারক হয়। এখানে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া গেল। ধরুন কোন ব্যক্তির জন্ম লগ্ন মিথুন। নৈসর্গিক শুভ গ্রহ শুক্র পঞ্চম এবং দ্বাদশ ভাবের অধিপতি। গ্রহটী দশমস্থানে মীন রাশিতে তুঙ্গস্থ (In exaltation) আর চন্দ্রের সঙ্গে এখানে সহাবস্থান করেছে। বিচারে প্রথমেই দেখা যায়, সন্তানদের সৌভাগ্য কারক হবে শুক্র, দশমস্থ হওয়াতে অবশ্যই বলী ও শুভ ব্যঞ্জক। জাতক ইংরাজী ১৯৪৩ সালে বিয়ে করেছেন, আজও পর্য্যন্ত সন্তানাদি হয়নি। আমরা জাতকের লগ্ন থেকে পঞ্চম স্থানকে সন্তানাদির বিচার সম্পর্কে লগ্ন বলে ধরে নিয়ে বিচার সুরু করলাম। দেখলাম পঞ্চমাধিপতি শুক্র পঞ্চম স্থান থেকে গণনায় ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে। ষষ্ঠস্থান দুঃস্থান। চন্দ্র ও শুক্রের সঙ্গে সহাবস্থান করেও অনুকূল নয়। তাই জাতকের আজ পর্য্যন্ত সন্তান হয়নি। যদিবা কখন সন্তান হয়, তা কুসন্তান হবে। এই উত্তর পুরুষেই ধনৈশ্বর্য্য লুপ্ত হবে। সন্তান সুখ হবে না অবাধ্য সন্তানের জন্য মনোকষ্ট পেতে হবে। সপ্তমাধিপতি অষ্টম স্থানে আর অষ্টমাধিপতি সপ্তম স্থানে থাকা খুব খারাপ। অষ্টমাধিপতি সপ্তম স্থানে অত্যন্ত অশুভ, তার কারণ সপ্তম স্থানের দ্বিতীয় হচ্ছে অষ্টম। লগ্নের পক্ষে অষ্টমাধিপতি অশুভ। যদি সপ্তমাধিপতি অষ্টমে থাকে আর সপ্তমাধিপতি বৃহস্পতি, শুক্র অথবা শুভ বুধের সঙ্গে সহাবস্থান করে তা হোলে শুভ ফল দান করবে।

শুভগ্রহ অষ্টমে থাকলে দীর্ঘজীবন, ধনৈশ্বর্য্যও সুখদান করে। ধরা যাক তুলা লগ্নের জাতকের কথা। মঙ্গল অষ্টমস্থান বৃষে রয়েছে। মঙ্গল অশুভ। সপ্তমাধিপতি হয়ে এই গ্রহ নিধন স্থানে অবস্থিত। মঙ্গল শুক্রের গৃহকে শুধু ক্ষতি করছে না, শুক্রের কারকতাকেও নষ্ট করছে। কর্কটলগ্নের জাতকের পক্ষে শনি সপ্তমাধিপতি ও অষ্টমাধিপতি। এই শনি যদি কুম্ভরাশিতে অষ্টম স্থানে থাকে, তাহলে দুভাবে বিচার করা যেতে পারে—সপ্তমাধিপতি অষ্টমস্থানে আর অষ্টমাধিপতি অষ্টম স্থানে। অষ্টমাধিপতি অষ্টম স্থানে থাকার সূত্র ধরে বলা যেতে পারে বিপরীত রাজযোগ। বিবাহ সম্পর্কে সপ্তাধিপতি অষ্টমস্থানে থাকায় একত্রে অশুভফল প্রদাতা হোলেও খুব খারাপ হবে না। তবে দাম্পত্য জীবনকে কোনদিন শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে রাখবে না। একনিষ্ঠ দাম্পত্য প্রণয়ের নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি ঘটবে।

ষষ্ঠস্থানে রবি, মঙ্গল ও শনি অবস্থান করলে বিক্রমবৃদ্ধিও শত্রুজয় হয়। ষষ্ঠস্থান থেকে শত্রু, বাধা, বিঘ্ন, রোগ, রোগপ্রতিরোধ শক্তি, ক্ষত ক্লেশ, নাভিদেশ, মধুরাদি ষড়রস, মাতুল, মাসী (মায়ের ছোট বোন) জ্ঞাতিবর্গ, দ্যূতক্রীড়া (ও লটারির দ্বারা প্রাপ্ত অর্থ) মামলা মোকর্দ্দমা প্রভৃতি সম্বন্ধে গণনা ও বিচার করা হয়। ষষ্ঠস্থানে চন্দ্র অবস্থান করলে শরীর শীর্ণ হয়, মন্দবুদ্ধি, বহুশত্রু, কর্ম্মে তৎপরতাহীন, ক্ষুধামান্দ্য, ইন্দ্রিয় দৌর্বল্য হয়। জাতক দুঃখী হয়। তার শত্রু ও আলস্যের দরুণ কার্য পণ্ড হয়। ক্ষীণ চন্দ্র না হোলে দীর্ঘজীবী ও সুখী হয়। বুধ বৃহস্পতি ও শুক্র অবস্থান করলে শত্রুর উৎপীড়ন ঘটে না। বরাহমিহিরের বৃহজ্জাতকের বিশ অধ্যায়ের এক থেকে নবম শ্লোক মধ্যে এই কথাই বলা হয়েছে। পাপগ্রহ ষষ্ঠে থাকলে শত্রু হয় বটে কিন্তু সে শত্রু পরাজিত হয়। শুভগ্রহগণ পীড়িত হলে জাতক অল্পায়ু বিশিষ্ট হয় তার শত্রুরা আত্মসমর্পণ অথবা বন্ধুত্ব করবে কিম্বা সরে পড়তে পারে।

বৈদ্যনাথ দীক্ষিত তাঁর জাতক পারিজাতের অষ্টম অধ্যায়স্থ ৭৫—৭৮ শ্লোকের মধ্যে বলেছেন রবি ষষ্ঠে থাকলে রাজসম্মানপ্রাপ্তি, কামাসক্তি, শৌর্য্যবীর্য্য, খ্যাতি, আত্মমর্য্যাদা, ও ধনযোগ হয়। এখানে ক্ষীণচন্দ্র অল্পায়ু দান করে আর ক্ষীণ না হলে অত্যন্ত কামপ্রবণতাও দীর্ঘজীবন দেয়। ষষ্ঠে মঙ্গল সম্পত্তিদাতা, শত্রুনাশক, প্রচুর ক্ষুধা, ধন, খ্যাতি ও শক্তি প্রদান করে। ষষ্ঠে বুধ বিদ্যা আর আমোদ প্রমোদ ও কলহপ্রিয়তা এবং স্বজনবর্গের সহিত ব্যবহারে অবাধ্যতা প্রভৃতি প্রদান করে। বৃহস্পতি এখান থেকে মানুষকে কামুক করে, দুর্বলতা দেয় আর শত্রুজয়ী করে। এখানে শুক্র ভালো করে না, দুঃখ কষ্ট দেয় প্রায় মিথ্যা অপবাদ সৃষ্টি করে। শনি অধিক ভোজী করে, কামাসক্তি আসে, শত্রু ভয়ে ভীত করে। শ্লোকগুলি বিশেষভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় রবি, মঙ্গল, শনি প্রভৃতি পাপগ্রহ ষষ্ঠে থাকলে জাতক ধনী, কামুক ও সাহসী হয়। জাতকের সারল্য অথবা কলহপ্রবণতা হেতু কিছু শত্রুসৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু, এসব শত্রু ক্ষমতাহীন হয়ে পড়বে যদি মঙ্গল অথবা রবি ষষ্ঠে থাকে।

এই গ্রহটি—পুত্র, ধন, বৃত্তি ও লাভ কারকগ্রহ। এই গ্রহ ষষ্ঠে থাকলে এইগুলির বিশেষ ক্ষতি কারক হয়। শুক্র নারী ও কাম কারক গ্রহ। ষষ্ঠস্থানে শুক্র থাকলে তার কারকতা বা সাধারণ গুণ ও লক্ষণগুলি নষ্ট হয়ে যায়। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে ষষ্ঠস্থানে মঙ্গল ভূমি, সাহস দিতে পারে কিনা—ভূমি, শৌর্য্য: ভ্রাতা প্রভৃতির কারক মঙ্গল। এই সব ক্ষেত্রে প্রত্যেক ভাবটিকে লগ্ন মনে করে বিচারে অগ্রসর হোতে হয়, তাহলে ঐ ভাবের বলাবল ও গ্রহসমাবেশ পর্যবেক্ষণ করে ফল গণনা উত্তমভাবে সম্ভব হোতে পারে। ভূসম্পত্তি সম্বন্ধে গণনা সম্পর্কে চতুর্থ স্থানটিকে লগ্ন ধরে নিতে হবে। চতুর্থ কারক মঙ্গল ষষ্ঠে স্থানে আছে, অর্থাৎ চতুর্থ থেকে তৃতীয় স্থানে রয়েছে: চতুর্থ থেকে উপচয়স্থ। ভূসম্পত্তি সম্পর্কে মঙ্গল ষষ্ঠে উত্তম ফলদাতা হয়েছে…উপরোক্ত সূত্রধরে। এইভাবে বিচার করলে কোষ্ঠীর ফল বলা সোজা হবে আর নির্ভুলও।

ষষ্ঠাধিপতি ষষ্ঠস্থানে থাকলে জাতকের স্বজনেরা শত্রু হয় আর তার সঙ্গে বাইরের লোকের বন্ধুত্ব হয়। ষষ্ঠাধিপতি অষ্টমস্থানে অথবা দ্বাদশ স্থানে থাকলে জাতক শিক্ষিতব্যক্তিকে ঘৃণা করবে, লম্পট হবে আর মায়াচ্ছন্ন করে আনন্দ পাবে।

ষষ্ঠস্থানে বৃহস্পতির অবস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করলে দেখা যায়, গ্রহটি একাদশ স্থানের অষ্টমে রয়েছে। বৃহস্পতির একাদশ ভাবের কারকতা আছে। তাছাড়া সে পঞ্চম ভাবের কারক, সুতরাং পঞ্চম থেকে দ্বিতীয় স্থানে অবস্থিত। এজন্য জাতকের জ্যেষ্ঠ থাকবে না, কেননা একাদশ স্থানটি জ্যেষ্ঠ কারক। ধনসম্পত্তি বিষয়েও বাধাপ্রাপ্তি ঘটতে দেখা যায়, আয়ের নিধন স্থানে বৃহস্পতি আছে বলে। ষষ্ঠে মঙ্গল বিশেষ জীবনী শক্তি বৃদ্ধি করে আর অষ্টমে গেলে আয়ুবৃদ্ধি কারক, গ্রহটি দ্বাদশে থাকলে জাতককে দর্শনশাস্ত্রে অনুরাগী করে। এই সব পর্য্যালোচনা করাও দরকার। বৃহজ্জাতকে বরাহমিহির বলেছেন, রবি, মঙ্গল অথবা শনি অষ্টমে থাকলে জাতক অন্ধ হয় আর তার সন্তান হয় অল্পসংখ্যক। বৃহস্পতি অথবা শুক্র যদি এস্থানে থাকে তাহোলে জাত কদর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করবে। অষ্টমে চন্দ্র থাকলে মন দৃঢ় হবে না, জাতক রুগ্ন হবে। অষ্টমে বুধ সর্বগুণদাতা।

জাতক পারিজাতে বলা হয়েছে অষ্টমে রবি হৃদয় জয়, দ্বন্দ্বে দক্ষতা ও অসন্তোষ আনে। চন্দ্র দেয় যুদ্ধপ্রিয়তা, উদারতা, আমোদ প্রমোদে ঝোঁক ও বিদ্যা। মঙ্গল জাতককে সাদা সিধা পোষাক, ধন ও অপরাপর ব্যক্তিদের ওপর কর্তৃত্ব প্রভৃতি দেয়। এখানে বুধ থাকলে জাতকের সদ্‌গুণ ও অর্থ হয়। বৃহস্পতি দীর্ঘজীবী করে, দূরদর্শী করে ও নীচ কার্য্যে প্রবৃত্তি এনে দেয়। শুক্র থাকলে দীর্ঘজীবন, সুখস্বচ্ছন্দতা সহিত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ, শক্তি ও ধন হয়। শনি ঈর্ষ্যা প্রবণতা আর দুঃসাহসিকতা, অর্থের অনটন আনে। অষ্টম স্থানে পাপগ্রহ প্রকৃতপক্ষে এই স্থানের পরিবর্তন সাধন করেনা। অষ্টমে বৃহস্পতি ও শুক্র নবম স্থান থেকে দ্বাদশে অবস্থিত হওয়ায় বিশেষ ক্ষতি করে না, তবে অষ্টম স্থান দুঃস্থান হওয়ায় কিছু অশুভ ফল দেয়। অষ্টম

শুভ গ্রহরা সর্ব্বদাই উন্নত করে। অশুভ গ্রহরা সর্ব্বদাই নাশ-কারক। ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশ গ্রহ দুঃস্থান। যে ভাব ও কারকের অধিপতি দুঃস্থানে থাক্‌বে, সেই ভাব ও কারকতা নষ্ট হবে। যে ভাবের ফলাফল গুণতে হবে সে ভাবের অধিপতি ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশে থাক্‌লে সেই ভাব নষ্ট হয়ে যায়। গ্রহ শুভ নক্ষত্রের সঙ্গে থাকলে শুভ ফল দেয়, অশুভ নক্ষত্রের সঙ্গে থাক্‌লে অশুভ ফল দাতা হয়। ভাবাধিপতি ও ভাব বিশেষ বলবান না হোলে শুভাশুভ ফল যাই হোক না কেন, বিশেষ ভাবে প্রকাশ পায় না।

মীন লগ্নের পঞ্চমাধিপতি চন্দ্র দশম স্থানে অবস্থিত হোলেও সে পূর্ণ শুভফল দাতা হোতে পারে না—তার কারণ দশমের ষষ্ঠা-ধিপতি চন্দ্র। এজন্য বিংশোত্তরীমতে চন্দ্রের দশায় মীন লগ্নের জাতকের ব্যবসায় বা কর্ম্মক্ষেত্রে কিছু গণ্ডগোলের সৃষ্টি হবে। কোন গ্রহ অশুভ ভাবের অধিপতি হোলে কিছু না কিছু অশুভ ফল দেবে, দুঃখ কষ্ট ও ক্ষতিকারক হবে।

ফলিত জ্যোতিষের মধ্যে কতকগুলি কূট (Astrological Paradoxes) আছে। এমন কতকগুলি ভালোমন্দ গ্রহসংস্থান আমাদের নজরে আসে যেগুলি অদ্ভুত বলে মনে হয়। তমসাচ্ছন্ন দূরবর্ত্তী গ্রহ শনিকে সর্ব্বোত্তম জ্যোতিষ্ক সূর্য্যের তনয় বলা হয়েছে। পিতা রবি প্রত্যেক জিনিষের ঔজ্জ্বল্যকে প্রকাশ করেন, দূর করে দেন, তার অন্ধকার ও কুৎসিত দিকটা যেটি, আক্‌ড়ে বসে আছে তাঁর ধীরগতি বিশিষ্ট পুত্র শনি।

রবির কারকতা রয়েছে রাজবংশ, রাজা, শাসন, জনগণের প্রদত্ত সম্মান, রাজসম্মান, ধন প্রভৃতির ওপর—আর শনির কারকতা ক্রীতদাস ঝি-চাকর, কুলি মজুর, ভাঙা বাড়ী, দুঃখ কষ্ট, আপদ-বিপদ ব্যাধি, আয় প্রভৃতির ওপর। এটা আশ্চর্যের বিষয়—পিতা পুত্রের মধ্যে প্রকৃতিগত বৈষম্য ও পারস্পরিক বিরুদ্ধতা সাংঘাতিক রকমের। শুক্র পার্থিব সুখ সম্পদ, যানবাহন, কাম ও যৌন সম্ভোগ, দাম্পত্য-সুখ আর সর্বপ্রকার আমোদ-প্রমোদের কারক। এটি অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে পার্থিক সুখ সম্পদ দাতা শুক্রের সঙ্গে দুর্ভাগ্যের স্রষ্টা শনির প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। তুলা শনির উচ্চ স্থান। এটি হচ্ছে শুক্রের গৃহ। এখানে শনি অবস্থান করলে জাতকের শুভ হয়। আশ্চর্য্য নয় কি?

বৃহস্পতির নৈসর্গিক শত্রু শুক্র, ইনি অসুরদের গুরু আর বৃহস্পতি দেবগুরু। উভয়েই জ্ঞানের কর্ত্তা, বেদবেদাঙ্গ, দর্শন, ধর্ম্ম আর পাণ্ডিত্যের কারক। শত্রু বৃহস্পতির গৃহ, মীনে শুক্রের তুঙ্গ অবস্থান আশ্চর্যের বিষয়নয় কি? বৃহস্পতির গৃহ ধনু রাশিতে শুক্রের অবস্থান মিত্রভাব্যঞ্জক। এখানেও কূটচক্র। মঙ্গল অগ্নিসংজ্ঞক গ্রহ। পৃথিবীর নিকটতম এই গ্রহটী শনির সর্ব্বাপেক্ষা শত্রু। শনি মঙ্গল সংযোগ অথবা পারস্পরিক বৈপরীত্যজনিত প্রতিকূলতা জাতকের পক্ষে অশুভ ফল প্রদ। মঙ্গল শনির ক্ষেত্র মকর রাশিতে তুঙ্গস্থ আর বুধ মনকারক গ্রহ চন্দ্রের পুত্র। মানসিক ক্ষেত্রে এই দুইটি গ্রহ একান্ত প্রয়োজন। উভয়েই সুন্দর ও দ্রুতগামী। আশ্চর্য্যের বিষয় এরা পরস্পর শত্রু।

রাহু ও কেতু ছায়া, প্রকৃত পক্ষে গ্রহ নয়। এদের গতি বিপরীতা-ভিমুখী। কিন্তু এরা আসল গ্রহদের চেয়ে অনেক বেশী প্রভাব বিস্তার করে মানুষের জীবনে, তা ভালোই হোক্, আর মন্দই হোক্। চন্দ্র ও মঙ্গল পরস্পর বিশেষ শত্রু নয়। আশ্চর্য্য এই যে, চন্দ্রের ক্ষেত্র কর্কটে মঙ্গল নীচস্থ। আর চন্দ্র মঙ্গলের ক্ষেত্র বৃশ্চিকে নীচস্থ। অগ্নি সংজ্ঞক মঙ্গল, জল রাশি কর্কটে নীচস্থ শীতলগ্রহ, চন্দ্র অপর জলসংজ্ঞক রাশি বৃশ্চিকে, নীচস্থ এর তাৎপর্য্য কিছুই না হয় বুঝ্‌তে পারা যায় কিন্তু বৃহস্পতি ও মঙ্গল পরস্পর মিত্র হওয়া সত্বেও এদের মধ্যে একজন যেখানে উচ্চস্থ, অপরজন সেখানে নীচস্থ এটা অদ্ভুত ঠেকে না কি। রবি ও শনি উভয়েই একই রাশিতে উচ্চস্থ এবং নীচস্থ। মেষ রাশিতে রবি উচ্চস্থ আর শনি নীচস্থ মঙ্গলের ক্ষেত্রে। এটা তাৎপর্য্যপূর্ণ। জ্যোতিষের এই সব কূট পদ্ধতি বা অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ না হোলে উত্তম ভাবে কোষ্ঠীর ফলাফল বলা যায় না। মানব জীবনের অবস্থা ও পরিচয় কোষ্ঠী থেকে বলা যায়। কোষ্ঠি বিচারের দ্বারা নির্ণীত হয় তার ভাগ্য, কর্ম্ম ও সঙ্গতি। গ্রহগণের দশান্তর্দ্দশা ও গোচর মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা গুলিকে পরিবর্ত্তন করে আর রূপান্তরিত করে। কোষ্ঠীতে উত্তম গ্রহ সংস্থান থাকা সত্বেও কালসর্প যোগ এবং অন্যান্য দৈন্য যোগের কুফলগুলি জোরালো হোলে উত্তম গ্রহ সংযোগ সত্বেও শুভফল গুলি নষ্ট হয়ে যায়। জ্যোতিষের এই সব কূট ও কূটাভাস সম্বন্ধে রীতিমত জ্ঞান না হোলে আর গণনার সময় এদের প্রকৃত অর্থ ও গুরুত্ব উপলব্ধি না হোলে ঠিকভাবে ফলাফল বলা যায় না। এই অক্ষমতার জন্য ভবিষ্যতের কথা যা বলা হয় তা সব সময় ঠিক মেলেনা। ঈশ্বর জ্যোতিষের মাধ্যমে মানুষের জীবনের ফলাফল জানবার পথ করে দিয়েছেন। জ্যোতিষীরা ভাগ্য গণনা করে বলেছেন মানুষের জীবনের ঘটনাগুলি, কিন্তু যে সব ঘটনা ক্ষতিকারক সেগুলি যাতে না ঘটে তার ও ব্যবস্থা করে নিতে পারে মানুষ, সীমার মধ্যে—মানুষ তার ভাগ্য পরিবর্ত্তন কর্‌তে পারে। "More things are wrought by prayer than the world dreams of' এজন্য ঈশ্বরের আরাধনা ও প্রার্থনা প্রয়োজন। শান্তি স্বস্ত্যয়ন ও কবচ ধারণের আবশ্যকতা। যাঁরা ঈশ্বর বিশ্বাসী ও সাধনা করেন তাঁদের সহজে অমঙ্গল হয় না। ভারতের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু বাইরে জ্যোতিষ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সব মন্তব্য করেন সেগুলি তাঁর ভেতরের কথা নয়। তাঁর সম্বন্ধে গণনা করিয়ে নেবার জন্যে ও রাষ্ট্রের অন্যান্য কর্ণধারদের ভাগ্যের ফলাফল গণনা করিয়ে নেবার জন্যে যে প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি দিল্লী থেকে কল্‌কাতায় কয়েকবার লেখকের কাছে এসেছেন তাঁর মুখথেকে জানা গেছে প্রধানমন্ত্রী যোগী, ধর্ম্মবিশ্বাসী ও জ্যোতিষ বিশ্বাসী।

পণ্ডিত নেহরুর রাশিচক্র বিচার করলেও এই সত্য উদ্‌ঘাটিত হবে।

তার রাশিচক্র থেকে তার স্বরূপ, চরিত্র, আকৃতি প্রকৃতি, মনোভাব সব কিছুই জানা যায়। জহরলালের কোষ্ঠীতে ষষ্ঠস্থানে বৃহস্পতি অবস্থিত। এজন্যে তাঁর ঋণ, রোগ ও শত্রুর প্রাধান্য নেই। এই গ্রহ তাঁর পঞ্চমাধিপতি হয়ে ষষ্ঠস্থানে অবস্থিত। বৃহস্পতি সন্তান, ধনৈশ্বর্য্য, বৃত্তি ও লাভের কারক। তাঁর কোষ্ঠীতে ষষ্ঠস্থানে বৃহস্পতির অবস্থানহেতু তিনি ঋণভারে প্রপীড়িত ভারতের ভাগ্যবিধাতা। বৃহস্পতি ষষ্ঠে অর্থাৎ একাদশ থেকে নিধনস্থান অবস্থিত। এজন্য জ্যেষ্ঠের অভাব এবং তিনি পিতার একমাত্র পুত্র।

ইতিপূর্বেই গ্রহজগতে কংগ্রেসের জয় অনিবার্য ও সুযোগবাদীদের ভোটগুলের প্রচেষ্টার কথা বলেছি, তা মিলেও গিয়েছে। কংগ্রেস পক্ষকে নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিশেষ তৎপর হবার কথা বলেছিলাম, তাতে তাঁদের তৎপরতাও দেখেছি। এজন্য তাঁরা আমাদের আনন্দবর্দ্ধন করেছেন। কমিউনিষ্ট শক্তি ভারতে দুর্বল হয়ে পড়বে, শেষপর্যন্ত নিজেদের অস্তিত্বরক্ষা সমস্যাজনক হবে, একথাও বলেছি। এবারের নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপুল ভোটাধিকারে জয়লাভই আমাদের ভবিষ্যৎবাণীকে সার্থক করে তুলবার পক্ষে আলোকসম্পাত করেছে। আমরা কংগ্রেস পক্ষকে আন্তরিক অভিবাদন জানাই।

ব্যক্তিগত দ্বাদশ রাশির ফলাফল

মেষরাশি

অশ্বিনীনক্ষত্র জাতগণের উত্তম সময়। কৃত্তিকাজাতগণের মধ্যম। ভরণী জাতগণের নিকৃষ্ট সময়। সাধারণতঃ উত্তম স্বাস্থ্য। শেষার্দ্ধে কিঞ্চিৎ জ্বরভাব এবং মানসিক অস্বচ্ছন্দতা ও উদ্বেগ। সমগ্র মাসব্যাপী পারিবারিক শান্তি সুখ। পরিবারবর্গের সহিত মতৈক্য। পরিবারের বহির্ভূত আত্মীয় কুটুম্বের সঙ্গে প্রীতি সম্বন্ধ ও আনন্দের অভিব্যক্তি। টাকাকড়ি লেনদেন ও আর্থিক উদ্যমে সাফল্য। একাধিক উপায়ে অর্থাগমহেতু আত্মসন্তোষ। দ্বিতীয়ার্দ্ধে সামান্য ক্ষতি, এ ক্ষতির পূরণ বিভিন্ন ভাবে অর্থাগম হেতু। দূর কল্প'র দিকে দৃষ্টিপাত জনিত কার্য্যকলাপ আশাপ্রদ নয়। বাড়িওয়ালা, ভূস্বামী ও কৃষিজীবের পক্ষে শুভ। গৃহসংস্কার ভূমাদি ক্রয়, গৃহ নির্মাণ ও আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত কৃষিকার্য্যে হস্তক্ষেপ প্রভৃতি সম্ভাবনা। চাকুরীর ক্ষেত্রে শুভ। বহুদিনের আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতালাভ। পদোন্নতি, যন্ত্রশিল্প পরীক্ষায় সাফল্য, পদপ্রার্থীর নির্বাচনে আহুত হওয়ার যোগ ও সাক্ষাতে সিদ্ধিলাভ। নূতনপদে অধিষ্ঠান, সম্মান, অথবা অন্যান্য দিকে অনুকূল আবহাওয়া। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর উত্তম সময়। উন্নতির উর্দ্ধস্তরে পদক্ষেপ। নব প্রচেষ্টা ও কর্মোদ্যম সফল হবে, মাসের গোড়ায় আরম্ভ করলে। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়। সুখস্বচ্ছন্দতা, অলঙ্কার ও প্রসাধন দ্রব্যলাভ, প্রভাব প্রতিপত্তির বৃদ্ধি বিস্তার। আমোদ প্রমোদ আহার বিহার ও যৌন সম্ভোগে পরিতৃপ্তি। সুখকরদূর ভ্রমণ। অবৈধ প্রণয়ে আশাতীত সাফল্য। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে পরিতোষ বৃদ্ধি। কোর্টসিপ, রোমান্স ও প্রণয় ঘটিত ব্যাপারে সাফল্য। দ্বিতীয়ার্দ্ধে ব্যয় সংক্রান্ত ব্যাপারে ও পরপুরুষের সঙ্গে মেলামেশায় একটু সতর্কতা প্রয়োজন। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীগণের পক্ষে উত্তম। রেসে জয়লাভ।

বৃষরাশি

কৃত্তিকাজাত ব্যক্তিগণের পক্ষে উত্তম সময়। রোহিণী ও মৃগশিরা-জাতগণের পক্ষে মধ্যম। স্বাস্থ্য ভালোই যাবে। মানসিক অবস্থা ভালো বলা যায় না। ঘরে বাইরে উদ্বিগ্নতা, দুশ্চিন্তা, সন্তানদের স্বাস্থ্যের জন্যে উদ্বেগ, শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্যে কষ্টভোগ, দুঃখ, দুঃসংবাদ প্রাপ্তি অপ্রত্যাশিত অপ্রিয় পরিবর্তনহেতু মনশ্চাঞ্চল্য। স্বজনবন্ধুবর্গের সহিত মনোমালিন্য। আর্থিকক্ষেত্রে মিশ্রফল। গড়পড়তা পরিমাণের আয় হ্রাস হবে। ক্ষতির অপেক্ষা লাভের ভাগ বেশী হবে। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। বাড়িওয়ালা, ভূম্যধিকারি ও কৃষিজীবের পক্ষে মাসটি মোটা-মুটিভাবে যাবে। ভাড়াটিয়া, মজুর প্রভৃতির জন্য কিছু কষ্ট ভোগ। চাকুরীজীবির পক্ষে মাসটি উত্তম। প্রথমার্দ্ধে কিছু অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি হওয়াতে পরিবর্তন প্রীতিকর হবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উত্তম, সৌভাগ্যবৃদ্ধি ও সুবিধাসুযোগ লাভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে নূতন বন্ধুলাভ। অবৈধ প্রণয়ে উত্তম সাফল্য। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে সুখস্বচ্ছন্দতালাভ। সামাজিক কার্যগুলি সুন্দরভাবে রূপ নেবে।

জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি প্রতিপত্তি বৃদ্ধি। পর পুরুষের সঙ্গে অবাধে মেলামেশার সুযোগে আত্মতৃপ্তিলাভ। সঙ্গীত ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ। শিল্পী ও গায়িকার পক্ষে সুবর্ণ সুযোগ ও আয়বৃদ্ধি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীগণের পক্ষে উত্তম সময়। রেসে জয়লাভ।

মিথুন রাশি

আর্দ্রাজাতগণের পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট সময়। পুনর্বসুর পক্ষে মধ্যম। মৃগশিরার পক্ষে অধম সময়। শারীরিক দুর্বলতা। ক্লান্তিকর ভ্রমণ। দুর্ঘটনায় আঘাত প্রাপ্তির সম্ভাবনা। মানসিক উত্তেজনা। আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবর্গের সহিত শত্রুতা। পারিবারিক ক্ষেত্রে মনোমালিন্য। আর্থিক বিষয়ে অনুকূল নয়। আর্থিক প্রচেষ্টায় ক্ষতি। সর্বপ্রকার কর্মোদ্যমে বাধাপ্রাপ্তি। আর্থিক বিষয়ে মনান্তর ও কলহের সম্ভাবনা। বাড়িওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীদের পক্ষে উত্তম নয়। ভাড়াটিয়াদের সঙ্গে মনোমালিন্য হতে পারে। মামলা মোকর্দ্দমার যোগ আছে। টাকা লেনদেন ব্যাপারে সতর্কতা আবশ্যক। চাকুরীজীবীর পক্ষে সময়টি মধ্যম। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে সময়টি একভাবে যাবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে অশুভ সময় নয়। গায়িকা, শিল্পী ও অভিনেত্রীর উত্তম সময়। অবৈধ প্রণয়িনীদের সুযোগসুবিধা। পারিবারিক, সামাজিক ও

প্রণয়ের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা ও সাফল্যলাভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম সময়। রেসে পরাজয়।

কর্কটরাশি

পুষ্যাজাতগণের পক্ষে উত্তম। পুনর্বসু ও অশ্লেষাজাতগণের পক্ষে মধ্যম। স্বাস্থ্য ভালো যাবে না। রক্তের চাপবৃদ্ধি প্রথমার্দ্ধে। দুর্ঘটনার আশঙ্কা। পুরাতন ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। স্ত্রী ও সন্তানাদির সঙ্গে কলহ ও মনান্তর। আর্থিক অবস্থার উন্নতি। কিন্তু ক্ষতি ও ব্যয়বৃদ্ধিযোগ। প্রথমার্দ্ধ অপেক্ষা দ্বিতীয়ার্দ্ধ শুভ। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। বাড়িওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি একভাবে যাবে, কোনপ্রকার উন্নতির লক্ষণ নেই। গৃহাদি সংস্কার বা কৃষি ও ভূমিসংক্রান্ত ব্যাপারে কোন প্রকার পরিবর্তনের প্রচেষ্টা বাঞ্ছনীয় নয়। চাকুরীজীবির পক্ষে মাসটি অনুকূল নয়। উপরওয়ালাদের বিরাগ ভাজন হবার সম্ভবনা। অপ্রত্যাশিত অবাঞ্ছনীয় পরিবর্তন কর্মস্থলে বদ্‌লি হওয়া প্রভৃতি ঘট্‌তে পারে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটী মোটামুটি ভালো যাবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী অনুকুল। বিশেষতঃ শিক্ষিতা নারীদের পসার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি। অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত বা অভিলাষী ললনা বহু প্রকার সুবিধা সুযোগ ও আনন্দ লাভ করবে, মনের মত প্রণয়ী লাভ। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তিলাভ। রঙ্গমঞ্চে, ছবিতে, বেতারে, অপেরা ও গানবাজনায় যে সব নারী আত্মনিয়োগ করেছে তাদের পক্ষে মাসটী উল্লেখযোগ্য ভাবে শুভ। কোর্টসিপে সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। রোমাণ্টিক নারীর আত্ম তৃপ্তিলাভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে ভালো বলা যায় না। রেসে আংশিক লাভ।

সিংহ রাশি

মঘাজাতগণের পক্ষে উত্তম সময়। পূর্ব্বফল্গুনীজাতগণের পক্ষে মাসটি অনুকূল নয়। উত্তরফল্গুনীজাতগণের পক্ষে মধ্যম সময়। স্বাস্থ্য ভালো যাবে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো বলা যায় না। পারিবারিক শান্তি অব্যাহত থাক্‌বে। বিলাসব্যসন প্রবণতা। সাজসজ্জার দিকে দৃষ্টি ও তজ্জন্য ব্যয়। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, আর্থিক অবস্থার উন্নতি। অর্থ প্রচেষ্টায় সাফল্য। একাধিক উপায়ে লাভ, পরিমিত ব্যয় করলে এ মাসে কষ্টভোগ করবে না। অংশীদারী ব্যবসায়ের পক্ষে মাসটি অনুকূল নয়। অপরের জন্য জামীন হওয়া অবাঞ্ছনীয়। স্পেকুলেশনে কোন লাভ নেই, সম্পত্তিসংক্রান্ত ব্যাপারে মাসটি শুভ, বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে উত্তম সময়, বিষয় সম্পত্তি ঘটিত মামলা মোকর্দ্দমায় প্রতিকূল পরিস্থিতি, চাকুরির ক্ষেত্রে উত্তম সুযোগ। প্রতিদ্বন্দী ও শত্রুগণের বিড়ম্বনা ভোগ, ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবিদের পক্ষে মাসটি একভাবেই যাবে, স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি মিশ্রফলদাতা। অবৈধ প্রণয়ে মাত্রাধিক্যহেতু স্বাস্থ্যের অবনতি, পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে উদ্বেগ ও অশান্তি। ভ্রমণ, পিকনিক প্রভৃতি যোগ, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ সময়, রেসে পরাজয়।

কন্যা রাশি

উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রজাতগণের পক্ষে উত্তম। চিত্রার পক্ষে মধ্যম, হস্তার পক্ষে অধম, মাসটি মিশ্রফলদাতা। প্রথমার্দ্ধটীতে উত্তম স্বাস্থ্য, স্ত্রীর শরীর ভালো যাবে না। দ্বিতীয়ার্দ্ধে ক্লান্তিকর ভ্রমণ, উদর ও গুহ্য দেশে পীড়া, প্রস্রাবের অসুখ। এগুলি মারাত্মক হবে না। স্বজন বন্ধুবর্গের সহিত কলহ ও মনোমালিন্য, পারিবারিক ক্ষেত্রে প্রধান ব্যক্তিদের সঙ্গে বিবাদ, আর্থিক অবস্থা মোটামুটি একভাবেই যাবে, আয়বৃদ্ধি হবে সত্য কিন্তু অপরিমিত ব্যয়ের জন্য আশানুরূপ অর্থসঞ্চয় হবে না। অর্থোপার্জ্জনে কিছু পরিশ্রমজনিত কষ্ট ভোগ। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়, ভূম্যধিকারী বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবির পক্ষে মাসটি উত্তম বলা যায় না। ভাড়াটিয়াদের কাছ থেকে ভাড়া আদায় বিলম্বিত হোতে পারে। শস্যক্ষেত্র নষ্ট হবে, গৃহ নির্ম্মাণের জন্যে এমাসে বিশেষ অর্থব্যয়ের দিকে না যাওয়াই উচিত। চাকুরিজীবির পক্ষে বিশেষ শুভ সময়। পদপ্রার্থীর পক্ষে সাক্ষাৎ বা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা অনুকূল হবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবিরা অত্যন্ত সুবিধা সুযোগ পাবে, ফলে হবে উত্তম অর্থোপার্জ্জন, যে সব নারী সমাজ, মঞ্চ ও চিত্রে আত্মনিয়োগ করেছে সে সব নারীর উত্তম সময়। গার্হস্থ্য ধর্ম্মপরায়ণ ও পারিবারিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ গৃহিণীদেরই পক্ষে মাসটি সর্ব্বোত্তম। পুরুষের সাহচর্য্য ও সংসর্গ এবং ব্যয় সম্পর্কে সতর্কতা আবশ্যক। অবৈধ প্রণয়িণীরা প্রতারিত হোতে পারে। পুরুষের সহিত মেলামেশায় এ মাসে অতি উদার মনোবৃত্তিকে সংযত রাখা দরকার, তাছাড়া অমিতাচার বর্জ্জনীয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটি অনুকূল, রেসে অর্থপ্রাপ্ত।

তুলারাশি

স্বাতীনক্ষত্রজাতগণের পক্ষে উত্তম সময়, বিশাখার পক্ষে মধ্যম সময়, চিত্রার পক্ষে অধম। শত্রু ও প্রতিদ্বন্দীদের কাছ থেকে কষ্ট ভোগ। সৌভাগ্য বৃদ্ধি, নূতন বিষয় অধ্যয়ন। সুখ স্বচ্ছন্দতা, কর্ম্মে সাফল্য, উৎসব অনুষ্ঠান, লাভ, ক্লান্তিকর ভ্রমণ, দুঃসংবাদ প্রাপ্তি প্রভৃতির সম্ভাবনা। সন্তানদের পীড়া। প্রথমার্দ্ধে সামান্য দুর্ঘটনা। মানসিক উদ্বেগ ও ভয়। পারিবারিক ক্ষেত্র মোটের উপর সন্তোষজনক। ঘরে বাইরে আত্মীয় কুটুম্ব ও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সদ্ভাব, মতের ও মনের মিল থাক্‌বে। পারিবারিক উৎসব অনুষ্ঠান। আর্থিক ক্ষেত্র মোটের উপর ভালো যাবে। আর্থিক প্রচেষ্টায় বিশেষ সাফল্য হোলেও বড় বড় পরিকল্পনায় অর্থ নিয়োগ অবাঞ্ছনীয়। অপরের জন্য জামিন হওয়া বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি ভালো বলা যায় না। সম্পত্তির স্বত্বাধিকারের ওপর অপরের হস্তক্ষেপ বা আক্রমণের সম্ভাবনা, এজন্যে পূর্ব্ব থেকে সাবধান হওয়া প্রয়োজনীয়। চাকুরিজীবীদের মাসটি মোটামুটি ভালোই বলা যায়। শেষার্দ্ধে উপরওয়ালার সঙ্গে মনোমালিন্যের সম্ভাবনা, এজন্য সতর্কতা আবশ্যক। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে আশানুরূপ সাফল্য না হোলেও মোটের উপর মাসটি মন্দ যাবে না। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি মোটামুটি মন্দ নয়

তবে অবৈধ প্রণয় প্রভৃতি দুঃসাহসিক কার্য্যে লিপ্ত হওয়া বিপজ্জনক। দৈনন্দিন কর্ম্মতালিকার মধ্যে নিজেকে কেন্দ্রীভূত রাখাই নিরাপদ। যে সব নারী চাকুরিজীবি, তাদের পক্ষেই মাসটি বিশেষ শুভ। কর্ম্মক্ষেত্রে সম্মান ও মর্য্যাদা লাভ, পদোন্নতি, উপরওয়ালার আনুকূল্য লাভ প্রভৃতি যোগ আছে। শরীরের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলির ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটতে পারে এজন্যে আহার বিহার প্রভৃতি বিষয়ে মিতাচারী হওয়া আবশ্যক নতুবা অসুখের আশঙ্কা আছে। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম সময়। রেসে জয়লাভ।

বৃশ্চিক রাশি

অনুরাধাজাতগণের পক্ষে উত্তম সময়, বিশাখা ও জ্যেষ্ঠাজাতগণের পক্ষে মধ্যম। মাসটি একভাবেই যাবে। প্রিয়বন্ধুর আগমন, জনপ্রিয়তা, আমোদপ্রমোদ, ভ্রমণ, সুসংবাদপ্রাপ্তি, বন্ধুর সাহায্য লাভ প্রভৃতি যোগ আছে কিন্তু আত্মীয়স্বজনের জন্য কষ্টভোগ। স্বাস্থ্য ভালো গেলেও শেষার্দ্ধে সামান্য পীড়াদি হোতে পারে, যেমন জ্বর, পেটের গোলমাল, আমাশয়, হজমের দোষ প্রভৃতি। ছোটখাটো দুর্ঘটনার ভয় আছে, সতর্কতা প্রয়োজন। আর্থিক ক্ষেত্র ভালো হোলেও সহজশক্তির অভাব। মাঝে মাঝে অর্থের চাপ ও পাওনাদারদের তাগাদা, বন্ধুদের প্রতারণা জনিত ক্ষতি আর চুরির জন্য কিছু চিন্তার কারণ ঘটবে। এজন্য টাকাকড়ি সংক্রান্ত ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন। অর্থাগমের পথ কোনমতেই রুদ্ধ হবে না, রুদ্ধ হবে সঞ্চয়ের পথ। স্পেকুলেশন চলতে পারে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবিদের অবস্থা একইভাবে যাবে। চাকুরিজীবিদের অবস্থা ভালো বলা যায় না। উপরওয়ালার বিরাগভাজন হবার সম্ভাবনা, এজন্যে মানসিক অশান্তির সৃষ্টি হবে। এমন কি কাজের গলদ বা দোষত্রুটির জন্য অনুসন্ধানের ব্যবস্থা ও কৈফিয়ৎ তলব হোতে পারে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে উত্তম সময়। শিল্পকলা নৃত্য সঙ্গীত ও অভিনয়ের ক্ষেত্রে সে সব নারী কর্ম্মে ব্যাপৃত, তাদের আর্থিক উন্নতি, মর্য্যাদা বৃদ্ধি, প্রতিষ্ঠা লাভ প্রভৃতি ঘটবে। অবৈধ প্রণয়ের ক্ষেত্রে আশাতীত সাফল্য, সুযোগ সুবিধা লাভ, রোমান্স ও কোর্টশিপের পক্ষে এ মাসটি বিশেষ অনুকূল। পরপুরুষের সান্নিধ্যে অভীপ্সিত আবহাওয়ার সৃষ্টি হবে। সামাজিক, পারিবারিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে উত্তম পরিস্থিতি। অধ্যাত্মপথের যাত্রীর অলৌকিক অনুভূতি। ভ্রমণ, পিক্‌নিক, সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানে যোগদান প্রভৃতি সম্ভব। জনপ্রিয়তা ও আকর্ষণ বিকর্ষণ যোগ। কিন্তু অপাত্রে চিত্তের উত্তেজনাহেতু ভালোবাসা বা স্নেহপ্রীতির আধিক্য প্রকাশ করলে ভাব দুঃখের কারণ হবে এ বিষয়ে সতর্ক হয়ে চলা দরকার। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম। রেসে জয়লাভ।

ধনু রাশি

মূলাজাতগণের পক্ষে উত্তম সময়। উত্তরাষাঢ়ার পক্ষে মধ্যম। পূর্ব্বাষাঢ়ার পক্ষে অধম। দ্বিতীয়ার্দ্ধ অপেক্ষা প্রথমার্দ্ধই ভালো। উত্তম প্রমোদ সংক্রান্ত ভ্রমণ, সুসমাচার লাভ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করা যায়। পারিবারিক ক্ষেত্রে শুভ ঘটনার উৎপত্তি হবে, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের ও যোগ আছে। ঘরে বাইরে আত্মীয়স্বজন কুটুম্বাদির সঙ্গে প্রীতি সম্বন্ধ আর মতের ঐক্য। সামাজিক পরিবেশে বন্ধুদের সৌহার্দ্দ্য সম্প্রীতি বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হবে। বিলাস ব্যসন দ্রব্য লাভ ও সম্ভোগ। নূতন বন্ধু ও ভৃত্য লাভ, এরা মাসটীকে আরও সুখী করে তুলবে। জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি, আর্থিক প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ হোলেও আশাতীত অর্থ সৌভাগ্য লাভ হবে না। দৈনন্দিন তালিকাভুক্ত কর্ম্ম ভিন্ন কোন প্রকার স্পেকুলেশনে হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় নয়। কৃষিজীবির পক্ষে শেষার্দ্ধে শস্যের অবস্থা সন্তোষজনক হবে, লাভও আশাপ্রদ হবে, স্থাবর সম্পত্তির পক্ষে মাসটি সন্তোষজনক নয়, ভাড়া আদায়ে কিছু বাধা। মোটের উপর বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে মাসটি মিশ্রফলদাতা। কোন বড় রকমের পরিকল্পনা নিয়ে টাকা লেনদেন বা লগ্নী করা বাঞ্ছনীয় নয়, শেষে অনুতপ্ত হোতে হবে। চাকুরির ক্ষেত্রে প্রথমার্দ্ধ মোটের উপর মন্দ যাবে না, নূতন পদমর্য্যাদা বৃদ্ধি, চাকুরিপ্রার্থীর পক্ষে কর্ম্মকর্ত্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ বা প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা প্রদান সাফল্য নির্দ্দেশ করে। দ্বিতীয়ার্দ্ধে অস্থায়ী পদে নিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে শুভ নয়, ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটি একভাবেই যাবে, অধ্যয়নরতা নারীর পক্ষে মাসটি উত্তম, নূতন বিষয়ে অধ্যয়ন ও তজ্জনিত জ্ঞানার্জ্জন, লেখাপড়ায় কৃতিত্ব অর্জ্জন প্রভৃতি যোগ আছে। সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপ্তি, নূতন প্রভাব প্রতিপত্তিশালী বন্ধু লাভ, অলঙ্কার ও বিলাসব্যসন সামগ্রী লাভ, অবৈধ প্রণয়িনীদের আশাতীত সাফল্য লাভ, পুরুষের উপর প্রভাব বিস্তারে সিদ্ধি লাভ। নানাপ্রকার উৎসব অনুষ্ঠানে যোগদান ও আনন্দ লাভ, পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম সময়। রেসে জয়লাভ।

মকর রাশি

উত্তরাষাঢ়া জাত গণের পক্ষে উত্তম, শ্রবণা ও ধনিষ্ঠার পক্ষে মধ্যম সময়। মাসটী মোটের উপর মন্দ নয়। সৌভাগ্য, আনন্দ লাভ, প্রচেষ্টায় সাফল্য, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, বিলাস ব্যসন, অর্থবৃদ্ধি প্রভৃতি সূচিত হয়। স্বাস্থ্যের হানি ঘটবে। বায়ুপিত্ত প্রকোপ। প্রথমার্দ্ধেই উপসর্গ দেখা দেবে, শেষার্দ্ধে স্বাস্থ্যের অবনতি। অবশ্য এগুলি মারাত্মক হবে না। পারিবারিক ক্ষেত্র সন্তোষ জনক ও দুঃখ দুর্দ্দশা মুক্ত হবে। ঘরে বাইরে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বর্গের সঙ্গে প্রীতিসম্বন্ধ অটুট থাকবে। পারিবারিক সুখ স্বচ্ছন্দতা, শান্তি ও ঐক্য প্রথমার্দ্ধে নিগূঢ় হবে। প্রথমার্দ্ধে অর্থের কিছু অনাটন হবে, কিছু ক্ষতির ও আশঙ্কা আছে। ভ্রমণের সময় চুরি যাওয়ার ভয় আছে। সন্দেহ জনক ব্যক্তিকে সঙ্গী করে ভ্রমণে বাহির হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। মাসের দ্বিতীয়ার্দ্ধে অর্থের প্রাচুর্য্য অবশ্যম্ভাবী, কর্ম্মে প্রচেষ্টায় বিশেষ সাফল্য স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। ভূসম্পত্তি ও কৃষি সম্পর্কে শুভফল। ভূমি ও বাড়ী কেনা বেচার বা বিনিময়ে লাভ, খনি সংক্রান্ত ব্যাপারে ও লাভ। কৃষির অবস্থা ও

ভূম্যধিকারী ও কৃষি জীবির পক্ষে মাসটী উত্তম। চাকুরির ক্ষেত্রে মাসটী উত্তম, বিশেষতঃ দ্বিতীয়ার্দ্ধটী বিশেষ ভালো। প্রথমার্দ্ধে উপর ওয়ালার সঙ্গে কিছু মনোমালিন্যের সৃষ্টি হোতে পারে। অধীনস্থ ব্যক্তির জন্য উপর ওয়ালার বিরাগ ভাজন হবার সম্ভাবনা। এতদ্‌সত্ত্বেও কর্ম্মক্ষেত্রে শুভ যোগ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবিদের পক্ষে মাসটী মিশ্রফল দাতা। দ্বিতীয়ার্দ্ধটী সৌভাগ্য ব্যঞ্জক। যে সব নারী চারু কলা, শিল্প, সঙ্গীত, অভিনয়, সুকুমার সাহিত্য প্রভৃতি চর্চ্চা করে, তাদের আত্ম প্রসাদ লাভ, মানসিক উৎকর্ষ বৃদ্ধি ও আনন্দ লাভ ঘট্‌বে। এ সব বিষয়ে তাদের সিদ্ধি লাভ হবে। অবৈধ প্রণয়ে উত্তম সুযোগ সুবিধা ও সুখ সম্ভোগ। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয় ক্ষেত্রে সুখ স্বচ্ছন্দতা ও সাফল্য লাভ। পুরুষের সান্নিধ্যে নানা প্রকার প্রাপ্তি যোগ ও সন্তোষ জনক পরিস্থিতি। চিঠিপত্র আদান প্রদানে ও ভ্রমণে সাফল্য। কোর্টসিপে ভালোবাসা আদান প্রদানে অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস ও আন্তরিকতা বা ব্যাকুলতা প্রকাশ বাঞ্ছনীয় নয়, এ বিষয়ে সংযম আবশ্যক। বিদ্যার্থী ও শিক্ষার্থীর পক্ষে শুভ। রেসে জয়লাভ।

কুম্ভরাশি

শতভিষা জাত গণের পক্ষে উত্তম সময়। পূর্ব্বভাদ্র পদ নক্ষত্র জাত গণের মধ্যম এবং ধনিষ্ঠা জাত গণের নিকৃষ্ট সময়। মাসটি অব সাদকর। বিলাস ব্যসন, বিদ্যাশিক্ষায় সাফল্য, সুখ সম্ভোগ, সৌভাগ্য বৃদ্ধি ও লাভ যোগ আছে, আরও আছে দুঃসংবাদ প্রাপ্তি, ক্ষতি স্বাস্থ্যের অবনতি, কলহ বিবাদ ও ক্লান্তিকর ভ্রমণ। স্বাস্থ্যের কিছু হানি হবে। শারীরিক দৌর্ব্বল্য প্রকাশ পাবে। উদরের গোলমাল, শ্বাস প্রশ্বাস জনিত কষ্ট শ্বাসকাসের পীড়া প্রভৃতি সম্ভব। পিত্ত ধাতু গ্রস্ত ব্যক্তির সতর্কতা আবশ্যক। পারিবারিক কলহ। স্বজন বিরোধ। ঘরে বাইরে আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে বিবাদ, মনোমালিন্য প্রভৃতি সম্ভব। ক্ষতি ও অপরিমিত ব্যয় অর্থের চাপ ও অনাটন হেতু চিন্তা। অপর পক্ষে অর্থ সমাগমের প্রাবল্য, লাভ, বন্ধুর সাহায্য, প্রচেষ্টায় সাফল্য। এই দুই রকম ভাবই এমাসে আলোড়ন এনে দেবে। একটু সংযত হোলে এ মাসে অর্থের অনাটন হবে না কিন্তু বুঝে চলা সম্ভব হবে কিনা সেবিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। বিষয় সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে মামলা মোকর্দ্দমার ভয় আছে। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে মাসটী আশাপ্রদ নয়। এজন্যে দৈনন্দিন তালিকা ভুক্ত কর্ম্মের মধ্যে নিজেকে সীমিত রাখাই ভালো। চাকুরিজীবিদের পক্ষে মাসটী উত্তম। কিন্তু বিনা দোষে উপর ওয়ালার বিরাগ ভাজন হওয়ার সম্ভাবনা। শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বীরা ক্ষতি করার চেষ্টা করবে শেষ পর্য্যন্ত পরাজিত হবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তি জীবির পক্ষে মাসটী ভালো বলা যায় না। গৃহিনীদের পক্ষেই মাসটি সর্ব্বোত্তম। সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা ও মর্য্যাদা লাভ। গৃহে বন্ধু সমাগম। অবৈধ প্রণয়ে সাফল্য, পারিবারিক মঙ্গল। উৎসব অনুষ্ঠানের দিকে ঝোঁক। পারিবারিক ও প্রণয় ক্ষেত্র মন্দ নয়। কোর্টসিপ রোমান্স, পরপুরুষের সংসর্গ, প্রভৃতি সম্পর্কে সংযমের আবশ্যক, নতুবা বিপত্তি, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম সময়, রেসে জয়লাভ।

মীনরাশি

উত্তর ভাদ্রপদজাত গণের পক্ষে উত্তম। পূর্ব্বভাদ্রপদ ও রেবতী জাত গণের পক্ষে মধ্যম। বিদ্যার্জ্জনে ও পরীক্ষায় অতীব সাফল্য লাভ ও কিছু আমোদ প্রমোদে আত্ম সন্তোষ লাভ। রক্তের চাপবৃদ্ধি, উদরের গোলমাল, শ্বাস প্রশ্বাসে ব্যাঘাত, চক্ষু পীড়া, ভ্রমণে ক্লান্তি ও কষ্ট ভোগ। ফাইলেরিয়া, ম্যালেরিয়া প্রভৃতিতে আক্রান্ত হবার ভয় আছে। পারিবারিক অবস্থা শান্তিপূর্ণ। বন্ধু বান্ধব ও স্বজন বর্গের সঙ্গে কলহ। পরিবারের কোন ব্যক্তির সঙ্গে বিশেষ মনান্তর। আর্থিক অবস্থা আশাপ্রদ নয়। ক্ষতি ও প্রচেষ্টায় ব্যর্থতা। ব্যয়ের আতিশয্য, প্রতারণা, চুরি ও শঠতার দরুণ কষ্টভোগ। জামিন হওয়া অনুচিত। দৈনন্দিন কর্ম্ম সম্বন্ধে যত্ন নেওয়া আবশ্যক। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। শস্যোৎপাদন, কৃষি সংক্রান্ত ব্যাপারে ও ভাড়া আদায়ে সন্তোষ জনক পরিস্থিতি। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে সন্তোষ জনক অবস্থা। চাকুরির ক্ষেত্র শুভ। বেকার ব্যক্তিদের কর্ম লাভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তি জীবিদের পক্ষে হ্রাস বৃদ্ধি সম্পন্ন আর্থিক অবস্থা। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী মন্দ নয়। সামাজিক ক্ষেত্রে দেশের কল্যাণকর কার্য্যে, শিল্প সাহিত্য ও বৃত্তি সম্পর্কে বিশেষ ভাবে আত্মনিয়োগ করলে সাফল্য লাভ হবে। দৈনন্দিন তালিকাভুক্ত কর্ম্মে লিপ্ত হওয়া আবশ্যক। অবৈধ প্রণয়ে অগ্রসর না হওয়া কল্যাণকর, বিপত্তির সম্ভাবনা, রোমান্স, কোর্টসিপ, পরপুরুষের সহিত মেলা-মেশা একেবারে বর্জ্জনীয়, কোনপ্রকার উৎসব অনুষ্ঠানে, পিকনিকে বা ভ্রমণে স্বজনের সহিত যোগদান বাঞ্ছনীয়, অপর পুরুষের সান্নিধ্যে এলে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটি শুভ, রেসে লাভ ও ক্ষতি দুই-ই সম্ভব।

ব্যক্তিগত দ্বাদশ লগ্ন ফল

মেষ লগ্ন

মানসিক বিপর্য্যয়ে সুযোগ নষ্ট, বন্ধু ও মহৎলোকের সহিত আলাপ, পত্নীবিয়োগ বা স্ত্রীর পীড়া, পিতা বা কর্ম্মস্থান সংক্রান্ত ব্যাপারে ক্ষতি, রাজার দ্বারা ক্ষতি, কন্যা লাভ, মাতৃপীড়া' বন্ধু নাশ, সম্পত্তির হ্রাস, স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

বৃষলগ্ন

সর্ব্বত্র সুযোগ প্রাপ্তিতে উল্লাস, পিতৃহানি বা পিতার অনিষ্ট, অংশ্বার

উন্নতি, ব্যয়াধিক্য, কর্ম্মোন্নতি, যশো লাভ, উচ্চপদ প্রাপ্তি, আয় বৃদ্ধি, স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম সময়।

মিথুনলগ্ন

বাধার মধ্যেও অগ্রগতি স্বাভাবিক, ধন হানি, ভাগ্যোদয়ে বাধা বিপত্তি, ঋণ গ্রহণ, বিলাস বিভব, প্রণয়েচ্ছা, স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভাশুভ, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে অশুভ।

কর্কটলগ্ন

শারীরিক পীড়া, স্ত্রী বাণিজ্যাদির হানি বা ক্ষতি, ভ্রাতার জীবনসংশয় পীড়া, উদ্বেগও আশাভঙ্গ, কর্ম্মোন্নতিতে বাধা, নূতন কার্য্যারম্ভ, স্ত্রীলোকের পক্ষে অশুভ সময়, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে ভালো বলা যায় না।

সিংহলগ্ন

স্ত্রীর স্বাস্থ্যের অবনতি, কখনো উত্থান, কখন বা অশ্রুপাত, সহোদরের স্বাস্থ্য হানি, কর্ম্মোন্নতি, কর্ম্মস্থানে ক্ষতির আশঙ্কা নাই, সন্তানাদির পীড়া, দাম্পত্য ব্যাপারে গুপ্ত কারণে অশান্তি, আত্মীয়ের দ্বারা অপমান, অপবাদ ও লোকাপবাদ, স্ত্রীলোকের পক্ষে নিকৃষ্ট সময়, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ সময়।

কন্যালগ্ন

বন্ধুর দ্বারা বিপন্নতা বা বন্ধুর ষড়যন্ত্রে বিপন্নতা, বন্ধু ও অনুচরের দ্বারা চুরি ও প্রতারণা, স্পেকুলেশনে লাভ, সন্তানজনিত চিন্তা, আশাভঙ্গ, পুত্রাদির পীড়া, নিম্নের উদর পীড়া, অংশীর সাহায্যে অর্থাগম, প্রতিষ্ঠা লাভ, সুযোগও সাফল্য লাভ, স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যবিধ সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে অনুকূল।

তুলা লগ্ন

ভাগ্য সুপ্রসন্ন, কর্ম্মক্ষেত্র অনুকূল। মাতা, ভূসম্পত্তি ও বন্ধুর ক্ষতি, নাশ এবং হ্রাস, পিতার স্বাস্থ্য হানি, সন্তানের পীড়া, নূতন ধরণের ব্যবসায়ে ভাগ্য বৃদ্ধি, স্নেহপ্রীতির ব্যাপারে অশান্তি, প্রণয় ঘটিত ব্যাপারে অপবাদ, পুত্র লাভ, স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ সময়, বিদ্যার্থী পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম সময়।

বৃশ্চিকলগ্ন

বুদ্ধিমত্তায় ইষ্টসিদ্ধি, সুখ সম্পত্তি হানি, বন্ধু বিয়োগ, আশা আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা লাভ, চিত্তের প্রসন্নতা, প্রণয়ের মনোকষ্ট, আত্মীয় স্বজনের সংস্রবে কোনরকম দুঃখ ও অশান্তি, স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভাশুভ সময়, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

ধনুলগ্ন

উত্তম ধনভাব, আর্থিক সুযোগ কিন্তু পারিবারিক চিন্তা, আয়ের পথ লোকচক্ষুর অগোচরে থাকবে, মস্তিষ্ক পীড়া, উদ্বেগ ও অশান্তি, ভাগ্য বৃদ্ধি, বিবাহাদির প্রসঙ্গ, ভ্রমণ, ব্যসন ও ভোগাসক্তি, পিতার জন্য ঝঞ্ঝাট প্রাপ্তি, মামলা মোকর্দ্দমা, স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যবিধ সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম।

মকরলগ্ন

ধনভাবের ফল মধ্যবিধ, স্ত্রীর পীড়া, শারীরিক অসুস্থতা, তীর্থ পর্য্যটনে অর্থব্যয়ের যোগ, মানসিক দ্বন্দ্বভাবের দরুণ বিব্রত, অর্থাগম, কুটুম্ব লাভ, প্রভুত্বপ্রিয়তা, স্ত্রীলোকের পক্ষে অশুভ সময়, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

কুম্ভলগ্ন

শরীরে রক্তাধিক্য, দেশ ভ্রমণ, হৃৎপিণ্ডের পীড়া, ভ্রাতার অসুস্থতা, প্রণয়েচ্ছা, বিলাস ব্যসন, ইন্দ্রিয়াসক্তির আতিশয্য, স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভাশুভ সময়, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে কিঞ্চিৎ অশুভ।

মীনলগ্ন

বিলাস ব্যসন সম্ভোগ, যৌনস্পৃহা, প্রণয় লাভ, ব্যয় বৃদ্ধি, সন্তানের পীড়া, আয়, আকস্মিক দুর্ঘটনার আশঙ্কা, শারীরিক অসুস্থতা বা স্বাস্থ্যের অবনতি, ভ্রমণ যোগ, স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ সময়, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যবিধ ফল।

সম্পাদনা ঃ শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়
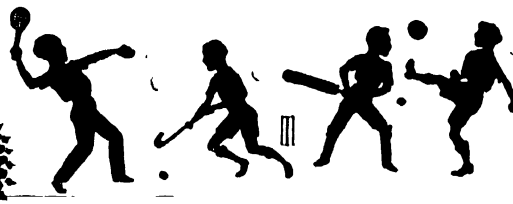
দ্বিতীয় টেষ্টে ভারতের পরাজয়

এম, সি, সি, বিজয়ী ভারতীয় দল জামাইকতে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের কাছে দ্বিতীয় টেষ্টে পুনরায় শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়েছে। শক্তিশালী ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের কাছে ভারত যে সুবিধা করতে পারবে না তা জানা ছিল। কিন্তু প্রথম এবং দ্বিতীয় টেষ্টে ভারত যেরূপ শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে এতটা আশা করা যায় নি। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে সাফল্যের পর ভারতীয় দলের মনোবল ফিরে এসেছে মনে হয়েছিল। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল আমাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। ১৯৫৮—৫৯ সালের ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের ভারত সফরে ভারতীয় দলের 'আতঙ্ক' ওয়েস্লি হল্ ১৯৬২ সালের ভারতীয় দলেরও 'আতঙ্কই' রয়ে গেলেন।

আঘাত জনিত কারণে ভারতীয় দলকে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে সত্য। পাতৌদির নবাব প্রথম এবং দ্বিতীয় উভয় টেষ্টেই খেলতে পারেন নি। সেই রকম জয়সীমার সাহচর্য্যও ভারতীয় দল প্রথম টেষ্টে পায়নি। পুনরায় দ্বিতীয় টেষ্টে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফররত ভারতীয় দলের সবচেয়ে আস্থাবান ব্যাটসম্যান দিলিপ সারদেশাই আঘাতের জন্য খেলতে পারেন নি। ভারতীয় দলের মনোবল এই সকল কারণে ক্ষুণ্ণ হয়েছে সত্য। কিন্তু প্রত্যেক সফরকারী দলকেই অল্পবিস্তর এইরূপ দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়। ভারত যে দ্বিতীয় টেষ্টে হেরেছে সেটাই পরিতাপের কারণ নয়, যে ভাবে হেরেছে সেইটাই সবচেয়ে দুঃখের। দ্বিতীয় টেষ্টের প্রথম ইনিংসে ভারত যে ভাবে খেলেছে তাতে আশা হয়েছিল ভারত তার সম্মান বজায় রাখতে পারবে। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতীয় ব্যাটস্ম্যানরা যে রকম লাইন দিয়ে প্যাভেলিয়নে ফিরে এলেন তাতে সম্মান তো বজায় রইলই না বরং ভারতীয় ক্রিকেটের ওপর পড়লো একপ্রস্ত কালী। বিপর্য্যয়ের কারণ সেই পুরাতন হল্ আর নূতন করে গিব্স। সমালোচকগণের মতে উইকেট রাণ করার উপযোগী ছিল। ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের এইরূপ ব্যর্থতার কোন সঙ্গত কারণই পাওয়া যায় না। ফারুক ইঞ্জিনীয়ার তাঁর ব্যাটিং-এ সাহস এবং কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু অতি অল্প রাণে সোবার্সের ক্যাচ ফেলে দিয়ে তিনি ভারতীয় দলকে পথে বসিয়েছেন। ভারতের অপরাজিত অধিনায়ক (ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত) নরি কণ্ট্রাক্টরের খেলায় অপরাজিত আখ্যা ক্ষুণ্ণ হলেও 'টসে' তিনি তাঁর খ্যাতি অম্লান রেখেছেন। উভয় টেষ্টেই তিনি 'টসে' জয়লাভের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। কিন্তু ভারতীয় দল এই সুযোগ কার্য্যকরী করতে পারলো না।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে, টেষ্টে আম্পায়ারিং সম্পর্কে সমালোচনা দেখা গেছে। দ্বিতীয় টেষ্টে ভারতের প্রথম ইনিংসে উমরিগড়ের এবং সেলিম ডুরাণীর আউট সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। এ'কথা সমালোচকরা বলেছেন। আবার ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে মঞ্জরেকারের আউট সম্পর্কেও সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। আম্পায়ারের এইরূপ সন্দেহপূর্ণ সিদ্ধান্তের ফলে ভারতীয় দলকে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে। অপর পক্ষে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের সলোমনের রান আউট সম্বন্ধেও যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। আশা করা যায় পরবর্ত্তি টেষ্টগুলিতে আম্পায়ারগণ এই বিষয় সজাগ থাকবেন।

আর তিনটি টেষ্ট বাকি আছে। এই গুলিতে পাতৌদির নবাব, দিলীপ সারদেশাই যদি খেলতে পারেন, তাহলে ব্যাটিং শক্তিশালী হবে। ভারতের ওপনিং জুটি যদি একটু ভালভাবে গোড়াপত্তন করতে পারেন আর উইকেট কিপার ইঞ্জিনীয়ার যদি তাঁর চঞ্চলতা দমন করতে পারেন তাহলে বোধহয় ভারত তার সম্মান বাঁচাতে সক্ষম হবে।

সর্ব্ব ভারতীয় ক্রীড়া কংগ্রেস

প্রদীপ ব্যানার্জ্জি (রেলওয়ে) ফুটবলে ১৯৬১ সালের 'অর্জ্জুন পুরস্কার' লাভ করেছেন।
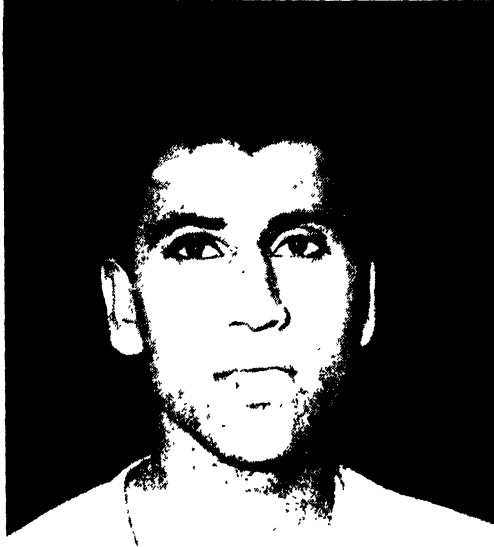
নিম্নে যাঁরা ১৯৬১ সালের জন্য 'অর্জ্জুন পুরস্কার' পেয়েছেন তাঁদের নাম দেওয়া হলো।

রমানাথন কৃষ্ণান (টেনিস)
সেলিম ডুরাণী (ক্রিকেট)
প্রদীপ ব্যানার্জি (ফুটবল)
পৃথ্বিপাল সিং (হকি)
জয়ন্ত ভোরা (টেব্‌ল টেনিস)
কুমারী এ্যান্ লাম্‌সডেন (মহিলা-হকি)
নান্দু নাটেকার (ব্যাডমিণ্টন)
গুরবচন সিং (এ্যাথলেটিকস)
সরাবজিৎ সিং (বাস্কেট বল)
শ্যামলাল (জিম্‌নাষ্টিক)
এল, ডি'সুজা (বক্সিং)
এ, এন, ঘোষ (ভারোত্তলন)
বজরঙ্গী প্রসাদ (সাঁতার)
মহারাজা শ্রীকারণী সিংজী (রাইফেল সুটিং)
হাবিলদার উদয় চাঁদ (কুস্তি)
মহারাজ প্রেম সিং (পোলো)
ক্যাপ্টেন, কে, এস. জৈন (স্কোয়াস)
ক্যাপ্টেন, পি, জি, সেথী (গল্‌ফ)
ম্যানুয়েল এ্যারণ (দাবা)

নূতন দিল্লীতে বিজ্ঞান ভবনে সর্ব্ব ভারতীয় ক্রীড়া কংগ্রেসের তিনদিন ব্যাপী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রী ডাঃ কে, এল, শ্রীমালী এই অধিবেশনের উদ্বোধন করেন। খেলাধুলার প্রায় সকল বিভাগের প্রতিনিধিগণই এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। ক্রীড়ার ক্ষেত্রে এইরূপ সম্মেলন ভারতবর্ষে এই সর্ব্বপ্রথম। ক্রীড়া কংগ্রেস আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য হলো খেলাধুলার উন্নতির জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন এবং পন্থা নির্ধারণ। দিল্লীর পর পালা করে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এই ক্রীড়া কংগ্রেসের অধিবেশন হবে। এই কংগ্রেসের অধিবেশনের শেষ দিনে ভারতের উপরাষ্ট্রপতি, ডাঃ রাধাকৃষ্ণান ২০জন বিশিষ্ট খেলোয়াড়কে তাঁদের স্ব-স্ব বিভাগে ক্রীড়া কংগ্রেস প্রদত্ত 'অর্জ্জুন পুরস্কার' প্রদান করেন। এই সম্মান শুধুমাত্র নিজনিজ বিভাগে খেলায় পারদর্শিতা প্রদর্শনের জন্যই নয়, খেলোয়াড়-চিত উচ্চ আদর্শ এবং মনোভাবের জন্য দেওয়া হবে।

কুমারী এ্যান লাম্‌সডেন (বাংলা) মহিলাদের হকিতে 'অর্জ্জুন পুরস্কার' লাভ করেছেন।

জব্বলপুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ভারোত্তলনের ব্যাণ্টম্ ওয়েষ্ট বিভাগে শ্রীএ, কে, দাস (রেলওয়ে) নূতন জাতীয় রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। তিনি ৬৪৫ পাউণ্ড উত্তোলন করেন। 'লিফ্‌টে' তিনি ২১৫ পাউণ্ড তুলে তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠিত পূর্ব্ব রেকর্ড (২১১ পাউণ্ড) ভঙ্গ করেন।

খেলার কথা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

ভারতবর্ষ-ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ টেষ্ট ক্রিকেট

প্রথম টেস্ট—পোর্ট-অব-স্পেন

ভারতবর্ষ ঃ ২০৩ রান (স্মৃর্তি ৫৭, দুরাণী ৫৬। সোবার্স ২৮ রানে ৩, স্টেয়ার্স ৬৫ রানে ৩, হল ৩৮ রানে ২ এবং ওয়াটসন ২০ রানে ২উ ইকেট) **ও ৯৮ রান** (বোরদে ২৭ এবং উমরীগড় ২৩। হল ১১ রানে ৩, সোবার্স ২২ রানে ৪ এবং গিবস ১৬ রানে ২ উইকেট)

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ঃ ২৮৯ রান (হেনড্রিকস ৬৪, হাণ্ট ৫৮, সলোমন ৪৩, সোবার্স ৪০ এবং হল ৩৭ নটআউট। দুরাণী ৮২ রানে ৪, দেশাই ৪৬ রানে ২, উমরীগড় ৭৭ রানে ২ এবং বোরদে ৬৫ রানে ২ উইকেট) **ও ১৫ রান** (কোন উইকেট না পড়ে)

বৃটিশ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের অন্তর্গত ত্রিনিদাদ দ্বীপের রাজধানী সহর পোর্ট-অব-স্পেন। এই সহরের বিখ্যাত কুইন্স পার্ক ওভাল মাঠে ভারতবর্ষ বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম টেস্ট খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল ১০ উইকেটে ভারতবর্ষকে পরাজিত করে। পাঁচ দিনের খেলা চতুর্থ দিনের লাঞ্চের আগেই খতম হয়। মাত্র ১২ রানের জন্যে ভারতবর্ষ ইনিংস পরাজয় থেকে অব্যাহতি লাভ করে। ভারতবর্ষের দুই ইনিংসে মোট রান দাঁড়ায় ৩০১ রান (২০৩ ও ৯৮ রান) এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংসে ২৮৯। এই ১১ রান বেশী করার দরুণ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজকে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে হয় এবং কোন উইকেট না খুইয়ে তারা ১৫ রান তুলে দিয়ে ১০ উইকেটে জয়লাভ করে।

ভারতবর্ষের অধিনায়ক কণ্ট্রাক্টর টসে জয়লাভ ক'রে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ নেন। প্রথম দিনে ভারতবর্ষের ৬ জন খেলোয়াড় আউট হন, রান দাঁড়ায় মাত্র ১১৩। এই শোচনীয় অবস্থায় ভারতবর্ষকে ফেলেছিলেন ফাষ্ট বোলার হল, স্টেয়ার্স এবং ওয়াটসন। ভারতবর্ষের এই শোচনীয় অবস্থা দেখে কেউ ধারণা করেননি দ্বিতীয় দিনের খেলায় ভারতবর্ষ ভাঙ্গা কোমর নিয়ে ভাল খেলবে। দ্বিতীয় দিনে ভারতবর্ষ বাকি ৪টে উইকেটে ৯০ রান তুলে দেয়, ১০৭ মিনিট খেলে। প্রথম ইনিংস শেষ হয় ২০৩ রানে। দলের শেষের দিকের খেলোয়াড়রাই শেষকালে দলের মুখ রাখেন। এই দিন ভারতবর্ষ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজকে একহাত নেয়। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের ৬টা উইকেট পড়ে যায়, রান ওঠে মাত্র ১৪৮। তৃতীয় দিনের খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ তাদের বাকি ৪টে উইকেটে ১৪১ রান তুলে দেয়—প্রথম ইনিংস ২৮৯ রানে শেষ হয়। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ মাত্র ৮৬ রানে অগ্রগামী হয়। ভারতবর্ষের জাত ব্যাটসম্যানরা আবার শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিলেন—৪টে উইকেট পড়ে দলের মাত্র ৪৯ রান ওঠে। চতুর্থ দিনে ভারতবর্ষের বাকি ৬টা উইকেট পড়ে যায় ৪৯ রানে—৮৯ রানে দ্বিতীয় ইনিংস শেষ। এবার স্পিন বোলাররা সাফল্যলাভ করেন। প্রথম ইনিংসে সাফল্য লাভ করেছিলেন ফাষ্ট বোলাররা। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ

কোন উইকেট না হারিয়ে জয়লাভের প্রয়োজনীয় রান তুলে দিয়ে ১০ উইকেটে জয়লাভ করে। এই চারদিন পুরো খেলা হয়নি—বৃষ্টির জন্যে ৩ঘণ্টা ৪৫মিনিট খেলা বন্ধ ছিল।

ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় এই ৯৮ রানই ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে টেষ্টের এক ইনিংসে সর্ব্ব নিম্ন রান হিসাবে রেকর্ড হয়েছে। পূর্ব্বে রেকর্ড: ১২৪ রান, কলকাতা, ১৯৫৮—৫৯। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের মাটিতে এক ইনিংসের খেলায় ভারতবর্ষের পক্ষে সর্ব্বনিম্ন রানের পূর্ব্বে রেকর্ড ১২৯ রান (বার্বাদোজ, ১৯৫২—৫৩)। এই নিয়ে ভারতবর্ষ টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় ৭বার একশত রানের কম রানে আউট হ'ল—ইংলণ্ডের বিপক্ষে ৪ বার অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ২ বার এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ১ বার। টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় সর্ব্ব নিম্ন রানের ভারতীয় রেকর্ড: ৫৮ রান বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, ম্যাঞ্চেষ্টার, ১৯৫২) এবং ৫৮ রান (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, ব্রিসবেন, ১৯৪৭—৪৮)। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ এপর্যন্ত টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় ৮বার একশত রানের কম রানে আউট হয়েছে—৩বার ইংলণ্ডের বিপক্ষে, ৩বার অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে, ১বার করে নিউজিল্যাণ্ড এবং পাকিস্তানের বিপক্ষে। টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় সর্ব্বনিম্ন রানের ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান রেকর্ড—৭৬ রান (বিপক্ষে পাকিস্তান, ঢাকা ১৯৫৮ ৫৯)।

দ্বিতীয় টেষ্ট—কিংষ্টন ঃ

ভারতবর্ষ ৩৯৫ রান (বোরদে ৯৩, নাদকার্ণী ৭৮ নট আউট, ইঞ্জিনিয়ার ৫৩ এবং উমরীগড় ৫০। সোবার্স ৭৫ রাণে ৪, হল ৭৯ রানে ৩, গিবস ৬৯ রানে ২ এবং স্টেয়ার্স ৭৬ রানে ১ উইকেট) **ও ২১৮ রান** (ইঞ্জিনিয়ার ৪০, নাদকার্ণী ৩৫ এবং উমরীগড় ৩২। হল ৪৯ রানে ৬, গিবস ৪৪ রানে ৩ এবং সোবার্স ৪১ রানে ১ উইকেট)।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ: ৬৩১ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। সোবার্স ১৫৩, কানহাই ১৩৮, ম্যাকমরিস ১২৫, মেনডোনকা ৭৮, ওরেল ৫৮ এবং স্টেয়ার্স ৩৫ নট আউট। প্রসন্ন ১২২ রানে ৩, দুরাণী ১৭৩ রানে ২, দেশাই ৮৪ রানে ১ এবং নাদকার্ণী ৫৭ রানে ১ উইকেট)।

জামাইকা দ্বীপের রাজধানী কিংস্টনের সাবিনা পার্কে ভারতবর্ষ বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় এবার প্রথম বারের মত উইকেটের মাপ কাঠিতে হার নয়, ইনিংস পরাজয়। ক্রিকেট খেলায় এই ইনিংস পরাজয় সব থেকে বড় লজ্জা। ১৮ রান কম করার জন্যে ভারতবর্ষ ইনিংস পরাজয় থেকে ছাড়ান পায়নি। প্রথম টেস্টের বার রান বেশী করার দরুণ খুব জোর ইনিংস পরাজয়ের হাত থেকে বেঁচে ছিল।

দ্বিতীয় টেষ্টেও ভারতবর্ষের অধিনায়ক কণ্ট্রাক্টর টসে জয়ী হ'ন। এই জয়লাভের বিশেষ গুরুত্ব ছিল। এই দিনটি ছিল অধিনায়কের শুভ জন্মদিন।

কিন্তু তাঁর এবং ভারতবর্ষের পক্ষে দুর্ভাগ্য, দিনের সূচনা ভাল হ'লেও ভারতবর্ষকে শোচনীয় হার স্বীকার করতে হয়েছে।

প্রথম দিনে ভারতবর্ষের ৭ উইকেট পড়ে ২৮০ রান ওঠে। দ্বিতীয় দিনে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ৩৯৫ রানে শেষ হয়। এই দিনে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের ১টা উইকেট পড়ে ১৫৭ রান দাঁড়ায়। তৃতীয় দিনের খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ পূর্ব্ব দিনের ১৫৭ রানের সঙ্গে ২৪১ রান(৪ উইকেটে) যোগ করে। মোট রান দাঁড়ায় ৩৯৮ (৫ উইকেটে)। ৪র্থ দিনের খেলায় হাওয়া বদলে যায়। বোলার পরিবর্ত্তন এবং ফিল্ডিং সাজানোর দোষে রান দ্রুত উঠতে থাকে। তাছাড়া ভারতীয় দলের পক্ষে ক্যাচ ফেলা এবং ক্যাচ ধরতে না পারায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল নির্ভাবনায় খেলে যায়। যে সোবার্স তৃতীয় দিনে মাত্র ২ রাণের মাথায় ধড়ে প্রাণ পেয়েছিলেন তিনি চতুর্থ দিনে মারমুখী হয়ে খেলে নিজস্ব ১৫৩ রাণ ক'রে তবে ব্যাট ছাড়েন। ৬ষ্ট উইকেটের জুটিতে সোবার্স এবং ওরেল দলের ১১০ রান এবং ৭ম উইকেটের জুটিতে সোবার্স এবং নবাগত টেষ্ট খেলোয়াড় মেনডোনকা ১০৮ মিনিটে দলের ১২৭ রান (ভারতবর্ষের বিপক্ষে টেষ্ট খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের পক্ষে এই রান ৭ম উইকেট জুটির নতুন রেকর্ড) তুলেছেন। ৮ম উইকেটের জুটিতে মেনডোনকা এবং ষ্টেয়ার্স ৫২ মিনিটে দলের ৭৪ রান তুলে দিয়ে এই জুটির নতুন রেকর্ড করেন। মেনডোনকা ৭৮ রান করেন। তাঁর বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গেই অধিনায়ক ওরেল দলের ৬৩১ রানের (৮ উইকেটে) মাথায় প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। ভারতবর্ষের বিপক্ষে

ইনিংসে ৬০০ রান করলো। সর্ব্বোচ্চ রান ৬৪৪, ৮উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড, নিউ দিল্লী, ১৯৫৮-৫৯। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের টেষ্ট খেলায় আলোচ্য ২য় টেষ্টের এই ৬৩১ রান (৮ উইকেটে ডিক্লে:) আবার উভয় দলের পক্ষে এক ইনিংসে সর্ব্বোচ্চ রান হিসাবে রেকর্ড হয়েছে। পূর্ব্ব রেকর্ড: ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ৫৭৬, কিংস্টন, ১৯৫২-৫৩। আর একটা লক্ষ্য করার বিষয়, এই ৬৩১ রানের মধ্যে তিনটে ব্যক্তিগত সেঞ্চুরী —কানহাই ১৩৮, সোবার্স ১৫৩ এবং ম্যাকমরিস ১২৫! ভারতবর্ষের বিপক্ষে টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় এই ভাবে ব্যক্তিগত তিনটে সেঞ্চুরী ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের পক্ষে হয়েছে ৫টি ক্ষেত্রে। চারটি ক্ষেত্রে দলের রান ছিল ৬০০ রানের বেশী এবং একবার ৫৭৬ রান (কিংস্টন, ১৯৫২-৫৩)। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের বিপক্ষে ভারতবর্ষ আজ পর্য্যন্ত এক ইনিংসের খেলায় ৫০০ কিম্বা ৬০০ রান তুলতে পারেনি অথবা এক ইংনিসের খেলায় ভারতবর্ষের তিনটে ব্যক্তিগত সেঞ্চুরী হয়নি।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের থেকে ২৩৬ রানের পিছনে পড়ে ভারতবর্ষ দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে এবং চতুর্থ দিনের বাকি ২ঘণ্টার খেলায় ভারতবর্ষ ৩টে উইকেট খুইয়ে মাত্র ৮৩ রান করে। জয়সীমা, কণ্ট্রাক্টর এবং দুর্স্তি আউট হন। চতুর্থ উইকেটের জুটি নাদকার্নী এবং উমরীগড় এই দিন উইকেটে নট আউট থাকেন।

পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনেখেলা ভাঙ্গার নির্দ্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস ২১৮ রানে শেষ হয়। লাঞ্চের পর ভারতবর্ষ ৫৫ মিনিট খেলেছিল; ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস মোট ৫ঘণ্টা স্থায়ী ছিল। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতীয় খেলোয়াড়রা কাবু হন হলের ফাস্ট বলে। হল দ্বিতীয় ইনিংসে ৪৯ রানে ৬টা উইকেট পান। দুটো ইনিংস নিয়ে হল ৯টা উইকেট পান ১২৮ রানে। চতুর্থ দিনের খেলায় তিনটে উইকেট নিয়ে ওয়েশলি হল তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে শততম উইকেট পাওয়ার গৌরব লাভ করেন। টেস্ট খেলায় তাঁর বোলিং সাফল্য—২০টা টেস্ট খেলায় ১০৬ উইকেট। আলোচ্য টেস্ট খেলার দ্বিতীয় ইনিংসে গিবস পান ৩টে উইকেট ৪৪ রাণে। শেষ দিনে ৪র্থ উইকেটের জুটি উমরীগড় এবং নাদকার্নী দলের ৬৬ রাণ তুলে দেন। উমরীগড়ের বিদায় থেকেই ভারতীয় দলের দারুণ ভাঙ্গন সুরু হয়। শেষ দিকে ৯ম উইকেটের জুটিতে ইঞ্জিনিয়ার এবং দেশাই যা কিছুটা ভাঙ্গন প্রতিরোধ করেছিলেন—এই জুটিতে ৪৮ রান ওঠে। দলের শেষ বিদায় নেন ইঞ্জিনিয়ার ৪০ রান ক'রে। দ্বিতীয় ইনিংসে তিনিই দলের সর্ব্বোচ্চ রান করেন। শেষ দিনও ভারতবর্ষকে দুর্ভাগ্যের কবলে পড়তে হয়। মঞ্জরেকার সোবার্সের বলে এল-বি-ডবলউ হয়ে আউট হন। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে সোবার্সের বল লেগ ষ্টাম্পের অনেক বাইরে পিচ খেয়েছিল।

এ পর্য্যন্ত ভারতীয় ক্রিকেট দল ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফরে ৬টি খেলায় যোগদান ক'রে প্রতিটি খেলায় টসে জয়লাভ করেছে। খেলার ফলাফল: ভারতবর্ষের হার ২ (১ম ও ২য় টেষ্ট) এবং খেলা ড্র ৪।

জাতীয় লন টেনিস ঃ

জাতীয় লন টেনিস প্রতিযোগিতার ফাইনালে অস্ট্রেলিয়া সর্ব্বাধিক তিনটি খেতাব লাভ করেছে—পুরুষদের সিঙ্গলস, মহিলাদের সিঙ্গলস এবং মিক্সড ডবলস। অস্ট্রেলিয়ার একনম্বর বিশ্ববিখ্যাত খেলোয়াড় রয় এমারসন দুটি খেতাব পেয়েছেন—পুরুষদের সিঙ্গলস এবং মিক্সড ডাবলস। তিনি পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে ভারতীয় ১নং খেলোয়াড় রমানাথন কৃষ্ণনকে স্ট্রেট সেটে পরাজিত করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, গতবার উইম্বলডন্ লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইনালে কৃষ্ণন স্ট্রেট সেটে এমারসনকে পরাজিত করেছিলেন কিন্তু এশিয়ান লন্ টেনিস এবং ভারতীয় জাতীর লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার ফাইনালে এমারসন পূর্ব্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছেন। আলোচ্য জাতীয় লন টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের ডাবলস সেমি-ফাইনালে এমারসন এবং স্টোলি উঠেছিলেন। কিন্তু স্টোলি অসুস্থ হয়ে পড়ায় এই খেলা হয়নি। ভারতীয় জুটি জয়দীপ মুখার্জি এবং প্রেমজিৎলাল ওয়াক ওভার পান এবং ফাইনালে যুগোশ্লাভিয়ার প্রতিনিধিদ্বয়কে পরাজিত করেন।

ফাইনাল খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

পুরুষদের সিঙ্গলস: রয় এমারসন (অস্ট্রেলিয়া)

৬—৪, ৬—৪, ৬—৩, সেটে রমানাথন কৃষ্ণনকে (ভারতবর্ষ) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস ঃ মিস লেসলী টার্ণার (অস্ট্রেলিয়া) ৬—১, ৬—৩, সেটে মিস্ ম্যাডোনা সাকৃটকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস ঃ প্রেমজিৎ লাল এবং জয়দীপ মুখার্জি (ভারতবর্ষ) ৬—৩, ৬—২, ১—৬ ৬—৩ সেটে জ্যাভানোভিক এবং পিলিককে (যুগোশ্লাভিয়া) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস ঃ মিস ম্যাডোনা সাকৃট এবং রয় এমারসন (অস্ট্রেলিয়া) ৬—৪, ৬—৩ সেটে মিয়াগি (জাপান) এবং মিসেস পি এন আমেদকে পরাজিত করেন।

রঞ্জি ট্রফি ঃ

রঞ্জি ট্রফি প্রতিযোগিতার একদিকের সেমি-ফাইনালে রাজস্থান ৫ উইকেটে বাংলাকে পরাজিত করে। বাংলা দল খেলার শেষ দিন অর্থাৎ ৪র্থ দিনে ২৯১ রানে (৩ উইকেটে) দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। তখন খেলার সময় ছিল ২১০ মিনিট। রাজস্থান দলের জয় লাভের জন্যে ১৯২ রানের প্রয়োজন হয়। রাজস্থান ৫ উইকেটে ১৯৫ রান তুলে দেয়।

বাংলাঃ ২৯২ রান (শ্যাম মিত্র ১১৭, প্রকাশ ভাণ্ডারী ৫৮ এবং সি সি পোদ্দার ৪৬) ও ২৯১ রান (৩ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। প্রকাশ ভাণ্ডারী ১১১ নট আউট, শ্যাম মিত্র ৭৯ নট আউট)

রাজস্থানঃ ৩৯২ রান (সূর্যবীর সিং ১২৬, হনুমন্ত সিং ৫৯, অর্জ্জুন নাইডু ৪৬, যোশী ৫২। সুনীল কাপুর ১০৬ রানে ৬ উইকেট) ও ১৯৫ রান (৫ উইকেটে রুংটা ৯৭, মানকড় ৪১। ভাণ্ডারী ৬৬ রানে ৫ উইকেট।

অপর দিকের সেমি-ফাইনালে গত বছরের রঞ্জি ট্রফি জয়ী বোম্বাই ৬ উইকেটে দিল্লী দলকে পরাজিত করে। চতুর্থ দিনের প্রথম ১৫ মিনিটের খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়।

দিল্লী : ১৭৯ রান (পাই ৫৮ রানে ৫ উইকেট) ও ২৬৭ রান (সুদ ৬৮। বালু গুপ্তে ১১১ রানে ৮ উইকেট)

বোম্বাই : ২৯০ রান (হরদিকার ৮৯ এবং তামানে ৫১। সীতারাম ৬৬ রানে ৫ উইকেট) ও ১৩৮ রান (৪ উইকেটে। এম এল আপ্তে ৪৯ এবং আমরোলীওয়ালা ৬৭)।

জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান ঃ

জব্বলপুরে অনুষ্ঠিত ২০তম জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানে অন্যান্য বারের মত সার্ভিসেস দল অধিক সংখ্যক পদক লাভ ক'রে প্রথম স্থান লাভ করেছে। ২৩টি অনুষ্ঠানে যোগদান ক'রে সার্ভিসেস দল ৩৭টি পদক লাভ করেছে—স্বর্ণ ১৬, রৌপ্য ১৩ এবং ব্রোঞ্জ ৮। দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে মহারাষ্ট্র (স্বর্ণ ৩, রৌপ্য ৪ এবং ব্রোঞ্জ ২)। বালক বিভাগেও প্রথম স্থান লাভ করে সার্ভিসেস—মোটপদক ১১ (স্বর্ণ ৪, রৌপ্য ২ এবং ব্রোঞ্জ ৫)। বালক বিভাগে ২য় স্থান পায় বাংলা—মোট পদক ১০ (স্বর্ণ ২, রৌপ্য ৫ এবং ব্রোঞ্জ ৩)। মহিলা এবং বালিকা বিভাগে অধিক সংখ্যক স্বর্ণ পদক লাভ ক'রেছে মহারাষ্ট্র—মহিলা বিভাগে ৪ এবং বালিকা বিভাগে ৬টি স্বর্ণ পদক। মহিলা বিভাগে সর্ব্বাধিক পদক পেয়েছে বাংলা এবং মহীশূর—৭টি (স্বর্ণ ১, রৌপ্য ৩ এবং ব্রোঞ্জ ৩) মহীশূর—(স্বর্ণ ১, রৌপ্য ২ এবং ব্রোঞ্জ ৪)। এর পরই মহারাষ্ট্র ৬টি পদক (স্বর্ণ ৪ ও ব্রোঞ্জ ২)। বালিকা বিভাগে মহারাষ্ট্র পেয়েছে মোট ৯টি পদক (স্বর্ণ ৬, রৌপ্য ২ এবং ব্রোঞ্জ ১)। বালিকা বিভাগের মোট ১০টি স্বর্ণ পদকের মধ্যে মহারাষ্ট্র ৬টি মহীশূর ৪টি পেয়েছে।

প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিগত সাফল্য প্রদর্শন করেছে মহারাষ্ট্রের ক্রিস্টিন ফোরেজ বালিকা বিভাগে এবং মহাশূরের কৃষ্ণপ্রতাপসিং লাম্ব বালক বিভাগে। কৃষ্ণ প্রতাপ সিং লাম্বা বালক বিভাগের লংজাম্প, হাইজাম্প এবং হপ-স্টেপ-জাম্পে প্রথম স্থান লাভ ক'রে এই তিনটি অনুষ্ঠানে নতুন ভারতীয় রেকর্ড করে। অপর দিকে বালিকা বিভাগে ক্রিস্টিন ফোরেজ ১০টি অনুষ্ঠানে নেমে ৫টিতে প্রথম, ২টিতে দ্বিতীয় এবং ১টি অনুষ্ঠানে তৃতীয় স্থান পায়। সটপুটে ফোরেজ নতুন রেকর্ড স্থাপন করে। বালিকা বিভাগে মহীশূরের শীলা পলের সাফল্যও বিশেষ উল্লেখযোগ্য —৪টি [illegible] এবং ৮০ মিটার হার্ডলসে ২য় স্থান

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

গরমে চলুন হালকা পায়ে
পা হাওয়ায় খেলবে
চলবে যেন আছে কি নেই
তবেই না গরমে
আরামে চলা। তার মানে
চপ্পলে চলা।
পা বেশি ঢাকবে না
এমন চপ্পল।
হাঁটবে হালকা এমন চপ্পল।
ভাঙবে না, মচকাবে না,
থাকবে ছিমছাম,
এক কথায় বাটার চপ্পল।
কাঞ্চন
৩·৫০
কেতকী
৬·৫০
৫·২৫
রীমা
৪·৭৫
বিক্রম
৫·৯৫
Bata

ভারতবর্ষ

বৈশাখ—১৩৬

দ্বিতীয় খণ্ড | ঊনপঞ্চাশত্তম বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

ভাগবতধর্মের গোড়ার কথা

ডঃ ক্ষেত্রমোহন বসু

বাসুদেবের গোঁড়া ভক্তদের 'ভাগবত' বলে। খৃ. পূ. চতুর্থ শতাব্দীতে ভাগবতগণ মথুরা অঞ্চলে বর্তমান ছিল। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সভায় ম্যাকিদনের রাষ্ট্রদূত মেগাস্থিনিস এ কথা বলে গেছেন। মেগাস্থিনিস ও য়্যারিয়ানের মতে সৌরসেনীয়গণের দুইটি বৃহৎ শহর ছিল; তাদের নাম মেথোরা ও ক্লাইসোবোরা—উভয়েই আইয়োবারেস নামক নাব্য নদীটির তীরবর্তী। হিরাক্লীসকে সৌরসেনীয়গণ দেবতারূপে গণ্য করিতেন। এই সৌরসেনীয়, হিরাক্লীস ও আইয়োবারের নামগুলির বর্তমান নাম যথাক্রমে সাত্বত, বাসুদেবকৃষ্ণ ও যমুনানদী। মেথোরা ও ক্লাইসো-বোরাকে যথাক্রমে মথুরা ও কৃষ্ণপুরা (কৃষ্ণপুর বৃন্দাবন) বলা হয়। Mc. Grindle, Hopkins ও Lassen এর এই মন্তব্য যদি মান্য করা যায় তবে মনে হয় যে, যাদবরাজ বাসুদেব কৃষ্ণ এবং মথুরাবাসী সাত্বতগণের মধ্যে কোন যোগাযোগ বর্তমান ছিল। কৃষ্ণই অর্জুনের নিকট প্রথম ভাগবতধর্ম প্রচার করেন, যথা—

সমুপোঢ়েষ্বনীকেষু কুরুপাণ্ডবয়োর্মৃধে
অর্জুনে বিমনাস্ক চ গীতাভগবতস্বয়ম্। মহা ১২।৩৪৮।৮

কৃষ্ণের বাহন গরুড় ও অস্ত্র চক্র প্রভৃতির সহিত—সৌরপুরাণতত্ত্বের যোগসূত্র আছে (Macdonnell, *vedic Mythology*], এবং সাত্বত যাদবকুলের রাজা কৃষ্ণ

সৌর ঘোর অংগীরস নামক ঋষির শিষ্য ছিলেন [ছান্দোগ্য উপ, ৩।১৭।৬ ; কৌশীতক ব্রাহ্মণ, ৩০।৬ ; Keith]।

ভাগবতধর্মের পূর্ববর্তী প্রচলিত ধর্ম ছিল সৌরধর্ম বা সূর্য উপাসনা। খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর পর এই ধর্ম সম্ভবতঃ মথুরার চারিদিকে বিস্তার লাভ করে, কারণ ঘাসুণ্ডী ও বেসনগরের শিলালেখ হইতে ভাগবতধর্মের বিস্তৃতি লক্ষ্য করিবার বিষয়। খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে দেবাদিদেব বাসুদেবের পূজা যে প্রচলিত ছিল তাহা চূড়ান্তভাবে প্রতিপন্ন হয়। দিয়ন নামক গ্রীকীয়ের পুত্র হেলিও-ডোরাস যে ভাগবতধর্মী ছিলেন তাহা শিলালেখে উৎকীর্ণ আছে [*Epigraphic Indica*, X APP p. 2 ; *Jour Asiatic Soc. Bengal* [LVI Pt1, PP-77-78] মধ্যভারতের পুরাতন শহর বিদিশায় বর্তমান গোয়ালিয়র রাজ্যের বেসনগরস্থিত গরুড়স্তম্ভে উৎকীর্ণ শিলালেখটি প্রাকৃত ভাষায় এইরূপ :

[প্রথমাংশ]

[দে] বদেবস বা [সুদে] বস গরুড়ধ্বজে অয়ং
কারিতেই [অ) হেলিও দোরেণ ভাগবতেন
দিয়স পুত্রেণ তখখসিলা কেন
যোন- দুতেন [আ] গতেন মহারাজস
অন্তলিকিতস উপ [ং] তা সকাসং রঞো
[কো] সী পু [ত্র] স [ভ]াগভদ্রস ত্রাতারস
বসেন চ [তু] দসেন রাজেন বধমানস [॥]

[দ্বিতীয়াংশ]

ত্রিনি অমৃতপদানি [ই অ] [নু]-অনুঠিতানি
নিয়ন্তি [স্বগং] দম চাগ অপ্রমাদ [॥]*

পাণিনি হইতে জানা যায় যে কৃষ্ণের সহচর ছিলেন সংকর্ষণ ; ইহার প্রমাণ ঘাসুণ্ডীর শিলালেখে বর্ণিত একটি শীলাপ্রাকার —যেটি ভাগবত সংকর্ষণ ও বাসুদেবের পূজার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। নানাঘাট [দাক্ষিণাত্য] গুহাভ্যন্তরস্থ শিলা লেখ হইতে কীথ প্রমাণ করিয়াছেন যে, ধম্ম [ধর্ম], ঈদ [ইন্দ্র], সংকমষণ [সংকর্ষণ] ও বাসুদেব—যাঁরা চন্দ [চন্দ্র] বংশসম্ভূত—এবং যম, বরুণ, কুবের ও বাসব এই চারজন লোকপালগণের প্রার্থনার পরে অংগিয়বংশজাত মহারথি কললার কন্যা কিছু দক্ষিণা দান করিতেছেন [*Epi Indica*, no. 1112, p. 121]। এই শিলালেখ প্রমাণ করিতেছে যে, ব্রাহ্মণ ও ভাগবতের মধ্যে একটা প্রীতির সূত্রপাত হইয়াছিল, এবং বাসুদেব এখন হইতে ব্রাহ্মণ্য-দেবতাদিগের গোষ্ঠীর মধ্যে আসন পাইলেন। এতএব, দক্ষিণাপথে ভাগবতধর্ম বিস্তৃতিলাভ করিল।

যেহেতু ভাগবতধর্মের শিলালেখ মথুরায় খুব বেশী পাওয়া যায় নাই অতএব মথুরায় ভাগবতধর্ম বিশেষ সমৃদ্ধি-লাভ করিতে পারে নাই। দ্বিতীয়তঃ, খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত কালে শক ও কুষাণগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন, যাঁরা শৈব অথবা বৌদ্ধ ছিলেন, ভাগবতধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর গুপ্তরাজ্যের অভ্যুদয়ে ভাগবতধর্ম এক বিশাল সাম্রাজ্যের জীবন্তধর্মরূপে গণ্য হইয়াছিল, কারণ সমসাময়িক শিলালেখ হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, পঞ্চনদ, রাজপুতানা, মগধ, মধ্য ও পশ্চিম ভারতে ঐ ধর্ম বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। গুপ্ত-রাজারা নিজেদের "পরম ভাগবত" বলিয়া ঘোষণা করিতেন এজন্য রাজারধর্ম জনগণের ধর্মরূপে পর্যবসিত হয়।

মনে হয়, ভাগবতধর্ম উজ্জীবিত হয় সমুদ্রগুপ্তের রাজত্ব কালে। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ শিলালেখে উক্ত আছে—কীরূপে তাঁহার পিতা ইন্দ্রালয়ে গিয়াছিলেন, কিরূপে তিনি ধনদ, বরুণ, ইন্দ্র ও অন্তকনামক দেবতাগণের সমকক্ষরূপে গণ্য হইয়াছিলেন [I. F. Fleet : Inscriptions of the early Gupta Kings and their successors (1837)], কিরূপে তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের ধর্মগুরু কশ্যপকে এবং তম্বুরু ও নারদকে লজ্জা দিয়াছিলেন। ইহারা সকলেই ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের দেবতা। অধিকন্তু, সমুদ্রগুপ্ত যে একজন 'শাস্ত্রতত্বার্থ ভর্তা'ও 'ধর্মপ্রাচীরবন্ধ' তাহাও উক্ত আছে। [Fleet

---

*সংস্কৃতে রূপান্তরিত করিলে এইরূপ দাঁড়ায় : "দেবদেবস্য গরুড়ধ্বজঃ [=শিখরস্থ—গরুড়মূর্তি সনাথ শিলাময়ঃ ধ্বজস্তম্ভঃ) অয়ংকারিতঃ ইহ হেলিওদোরেণ ভাগবতেন [=বৈষ্ণবধর্মান্তর্গত-ভাগবত-মার্গানুসারিণা] যবনদূতেন আগতেন মহারাজস্য অন্তলিকিতস্য উপান্তাৎ [=সমীপাৎ] সকাশং রাজ্ঞঃ কৌৎসীপুত্রস্য ভাগভদ্রস্য ত্রাতুঃ বর্ধেন চতুর্দশেন রাজ্যেন [চ] বর্ধমানস্য ॥

'ত্রীণি অমৃতপদানি ইহ স্বনুষ্ঠিতানি নয়তি স্বর্গং—দমঃ ত্যাগঃ

ছিলেন [গয়াতাম্রশাসন, ৩২৮—২৯. খৃঃ অঃ], "অশ্বমেধ-পরাক্রমঃ" বলিয়া কীর্তিত হইয়াছিলেন ও প্রচুর সুবর্ণদান করিয়াছিলেন। ইহার প্রমাণ তাঁহার উৎকীর্ণ ইরাণ শিলালেখ ও পরবর্তী স্কন্দগুপ্তের ভিতরী শিলালেখ [Fleet *ibid*]।

এই সব কীর্তিকলাপ হইতে প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণিত হয় না যে তিনি ভাগবতধর্মী ছিলেন, তবে তার অন্য প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। তাঁর এলাহাবাদ শিলালেখে নারায়ণ-বিষ্ণুর বাহন-চিহ্ন 'গুরুত্মন্' অংকিত আছে। হোলিওডারাস এর গরুড়-স্তম্ভ উৎকীর্ণ শিলালেখ হইতে জানা যায় যে, ভাগবতধর্মের চিহ্ন ঐ বাসুদেবভক্ত গরুড় ধ্বজ। সমুদ্রগুপ্তের বহু মুদ্রায় উক্ত গরুড়-চিহ্ন বর্তমান আছে [John Allan : *Catalogue of Coins of the Gupta Dynasties in the British Museum, London,* 1911]; বিশেষতঃ, গয়ার তাম্রশাসনে তিনি যে ভাগবতধর্মী তাহার প্রমাণ ক্ষোদিত আছে—তাঁহাকে 'পরম ভাগবত মহারাজাধিরাজ, এই আখ্যা দেওয়ায়। ইহাপেক্ষা প্রকৃষ্ট প্রমাণ আর হইতে পারে না।

সমুদ্রগুপ্তের উত্তরাধিকারিগণ ভাগবতধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং অনেকেই 'পরমভাগবত' এই গৌরবে বিভূষিত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত যে পরমভাগবত ছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় মথুরা ও গরুড় শিলালেখ[Fleet *ibid*] ও কয়েকটি রাজকীয় নালন্দশীল হইতে—[Hirananda Sastri M.A.S.I. no 66 pp 64 66]। গুপ্তাব্দ ৮২ (=খৃঃ অঃ ৪০১—০২) অব্দে উৎকীর্ণ উদয়গিরিগুহার শিলালিপি হইতে প্রকটিত হইয়াছে যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের অধীনস্থ "মহারাজ বিষ্ণুদাস" একজন ভাগবত [বিষ্ণুর উপাসক] ছিলেন। তাঁহার পুত্র [নাম অজ্ঞাত] দুইজন দেবতার উপাসক ছিলেন ;—একজন যুগলস্ত্রীসমন্বিত চতুর্ভুজ বিষ্ণু, অপরজন দ্বাদশভুজা দেবী [সম্ভবতঃ, লক্ষ্মীর কোন প্রতীক (Fleet *ibid*)]। নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, এটি একটি বৈষ্ণবদেরই শিলালেখ। এই ৪০১—০২ খৃষ্টাব্দ হইতে, মনে হয়, কৃষ্ণ-বাসুদেব এবং নারায়ণ-বিষ্ণু পরস্পর অভিন্নরূপে গণ্য হইয়াছে বা একাত্ম হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের গড়হ শিলালেখ হইতে প্রকটিত হইয়াছে যে, গোড়া ব্রাহ্মণরা পরমভাগবত কোন দেবতাকে উপাসনা করিতেছেন। তাঁহার পুত্র প্রথম কুমারগুপ্তও পিতার ভাগবতধর্ম অনুসরণ করিয়াছিলেন, কারণ তাঁহার ভিটরী ও গড়হ শিলালিপি দুইটিতে "জিতম্ ভাগবতা" এই পদদ্বয় দিয়া প্রার্থনা শুরু হইয়াছে, এবং সম্রাটকে "পরম-ভাগবত" এই গৌরবসূচক অভিধান দেওয়া হইয়াছে। ভিটরী শিলালিপির গুপ্তাব্দ মুছিয়া গিয়াছে, কিন্তু গড়হ শিলালিপি যে খৃষ্টীয় ৪০৭-১৮ অব্দের তাহা জানা গিয়াছে।

কুমারগুপ্তের বিলসদ শিলালেখ (৪১৫-১৭ খৃঃ অঃ) ও মানকুয়ার শিলালেখ (৪৪৭-৪৯ খৃঃ অঃ) এই উভয় লিপিতে শৈবধর্মের পরিচয় পাওয়া যায়, উহাতে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাগবতধর্মের কোন নিদর্শন নাই। এজন্য অনুমিত হইতে পারে যে সম্রাট প্রথম কুমারগুপ্ত শৈব ছিলেন। কিন্তু তৎপুত্র সম্রাট স্কন্দগুপ্তের বিহার শিলালেখ হইতে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, ঐ শিলালেখে কুমারগুপ্তকে "পরম ভাগবত মহারাজাধিরাজ শ্রীকুমারগুপ্ত" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে [Fleet, *of cit,* (12) p, 50]। স্কন্দগুপ্তের ভিটরী শিলালিপিতেও কুমারগুপ্তকে উক্ত বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। অতএব সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, প্রথম কুমারগুপ্ত তাঁহার পূর্ব পুরুষদের ন্যায় ভাগবতধর্মী ছিলেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বী শৈবধর্মের প্রচার সহ্য করিয়াছিলেন ; তাঁহার ধানুকীচিহ্নযুক্ত মুদ্রায় গরুড় ও লক্ষ্মী দেবীর মূর্তি অংকিত আছে, এবং রজত মুদ্রাগুলিতে "পরম ভাগবত" ক্ষোদিত আছে।

পরবর্তী বুধগুপ্ত ও নরসিংহগুপ্তের রাজকীয় শিলমোহর হইতে কুমারগুপ্তের ভাগবতধর্মিত্ব সমর্থিত হইতে পারে। স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালের নানা বিবরণ হইতে ভাগবতধর্মের উপর বেশী মাত্রায় আলোকপাত হইয়াছে। স্কন্দগুপ্তের ৪৬৭-৪৮ খৃষ্টাব্দের গড়হ শিলালেখে উৎকীর্ণ বিবরণ হইতে প্রমাণিত হয় যে, গড়গার কোন মন্দির মধ্যে দেবতা অনন্ত স্বামীর [বিষ্ণুর] প্রতিষ্ঠা ও তাঁর উদ্দেশ্যে ভূ-দান করা হয় কোন বিশিষ্ট গ্রামে, [Fleet, *ibid*]। তাঁর ভিটরী শিলালেখে বিবৃত আছে যে, তিনি শার্ঙ্গী দেবতার প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁর পূজা প্রচলন করিয়াছিলেন। দেবতা শার্ঙ্গী হইলেন বিষ্ণু, কারণ, বিষ্ণু হস্তে শৃঙ্গনির্মিত ধনু ধারণ করেন বলিয়া তাঁর নাম শার্ঙ্গী, শার্ঙ্গধর বা শার্ঙ্গপাণি [Fleet, *ibid*]।

স্কন্দগুপ্তের জুনাগড় শিলালিপি ভগবান বিষ্ণুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ঐ লিপিতে আছে: (নিম্নে ইংরাজী দিলাম)

"Victorious is He (the God) Visnu, the perpetual abode of (the goddess) Laksmi, whose dwelling is the water-likely ; the conqueror of distress ; the completely victorious one' who for the sake of the happiness of (Indra), the lord of the gods, seized back from (the demon) Bali the goddess of wealth and splendour, who is admitted to be worthy of enjoyment (and) who had been kept away from Him for a long time"

[Fleet (14) pp 61-62]

স্কন্দগুপ্তের জনৈক জায়গীরদার 'পর্ণদত্তে'র জীবন দেবদেব গোবিন্দের [বিষ্ণুর] পদপূজায় উৎসগাকৃত হইয়াছিল, এবং তিনি এক বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পুত্র 'চক্রপালিত' দেবতা চক্রভৃতের [বিষ্ণুর] এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন [Fleet *ibid*, p 65]। এতদ্ভিন্ন স্কন্দগুপ্তের ৪৬৫-৬৬ খৃষ্টাব্দের তাম্রশাসনে উৎকীর্ণ লিপিতে ব্রাহ্মণদের 'দেববিষ্ণু' নামে অভিহিত করা হইয়াছে [fleet, *ibid*, p 71]। পরবর্তী গুপ্তসম্রাটগণ ও বৈষ্ণব ছিলেন; পুরগুপ্ত, তাঁহার পুত্র নরসিংহগুপ্ত ও পৌত্র দ্বিতীয় কুমার গুপ্তের রাজমুদ্রায় পদ্মাসীন। লক্ষ্মী দেবীর মূর্তি ও তৎপশ্চাতে জ্যোতিবলয় অঙ্কিত ছিল, ইহাদের যে সব মুদ্রায় ধানকী চিহ্ন থাকে তাহার বামদিকে গরুড় ধ্বজা অঙ্কিত থাকে [Allan, *Catalogue*, pp 135-143)।

সম্রাট বুধগুপ্তের ৪৮৩-৮৫ খৃষ্টাব্দের ইরাণ শিলালেখে চতুর্ভুজ বিষ্ণুর স্তব বর্ণিত আছে,—যে বিষ্ণুর শয্যা হইল চারিসমুদ্রের বক্ষ-প্রসারিত জলরাশি, এবং যে বিষ্ণু বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা; এবং যে বিষ্ণুর প্রতীক হইল গরুড় [Fleet, ibid (19), P. 90]।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগ হইতেই ধর্ম ক্রমশঃ জনপ্রিয় হইয়া উঠিল, এবং বিভিন্ন রাজবংশের মধ্যে "পরম ভাগবত" "পরমবৈষ্ণব" প্রভৃতি উপাধি সমাদৃত হইতে লাগিল। গুপ্তযুগ হইতেই বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারের অর্চনা হইতেই; বামন, বরাহ, মৎস্য ও কূর্ম অবতারের মধ্যে শেষোক্ত তিন অবতার বিষ্ণুর সহিত যুক্ত ছিল না, শতপথ ব্রাহ্মণে (এবং সম্ভবতঃ অন্যান্য ব্রাহ্মণেও) তার পরিচয় পাওয়া যায়। দশ অবতার সম্বন্ধে দেশে এক ঐতিহ্য বর্তমান আছে। বৌদ্ধ 'প্রত্যেকবুদ্ধ' সংক্রান্ত ধারণা হইতে অবতারবাদ সৃষ্ট হওয়া আশ্চর্য নয়। মহাভারতের নারায়ণীয় অধ্যায়ে চার অবতারের কথা আছে,—বরাহ, বামন, নৃসিংহ ও বাসুদেব-কৃষ্ণ; মহাভারতের অন্যত্র আরও দুই অবতার যুক্ত হইয়াছে, যথা, ভার্গব রাম ও দাশরথি রাম, অর্থাৎ সর্বসাকুল্যে ছয়জন, আবার, অন্যএক স্থানে হংস, কূর্ম, মৎস্য ও কল্কী যুক্ত হইয়া দশাবতারে পরিণত হইয়াছে। মৎস্যপুরাণ বলিতেছেন যে তিনজন দেবতা-অবতার ও সাতজন মনুষ্যাবতার। প্রথম তিনজন হইলেন,—নারায়ণ, নরসিংহ ও বামন, এবং শেষোক্ত সাতজন হইলেন,—দত্তাত্রেয়, মান্ধাতৃ, জামদগ্ন্যরাম, দাশরথি রাম, বেদব্যাস, বুদ্ধ ও কল্কি। বায়ুপুরাণে ঠিক ঐ কথাই আছে, কেবল বুদ্ধের পরিবর্তে আছে কৃষ্ণ। ভাগবতপুরাণ, অহির্বুধ্ন্য-সংহিতা, পাঞ্চরাত্র, দশাবতার চরিত [কাশ্মীরি কবিক্ষেমেন্দ্র রচিত, আনু, খৃঃ অঃ ১০৫০] ও জয়দেবের গীতগোবিন্দে (আনু, খৃঃ অঃ ১২০০) নানারূপ ও নানাসংখ্যক অবতারের কথা পাওয়া যায়।

ভারতীয় শিলালিপির বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে, কয়েকটি অবতারের পূজা প্রচলিত ছিল খৃষ্টীয় ৪র্থ হইতে ৮ম শতাব্দীর মধ্যবর্তী কালে। খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীর এক শিলালিপি হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে পরশুরামের পূজা ঐ সময়ে পশ্চিমভারতে প্রচলিত ছিল। শক ঋষভদত্ত (খৃঃঅঃ ১১৯—২৪) বলিতেছেন যে, জামদগ্ন্য রামের পবিত্র আশ্রম ছিল রামতীর্থ, যেটি বর্তমান বোম্বাই শহরের কয়েক মাইল উত্তরে অবস্থিত। কালিদাসের রঘুবংশের ১০ম সর্গে [আনু ৫ম খৃষ্টাব্দ, মতান্তরে ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দ] বিবৃত হইয়াছে যে অনন্তশয়নরূপী বিষ্ণু দশরথ নন্দন রূপে জন্মগ্রহণ করেন রাবনকে ধ্বংস করবার জন্য, বাকাটক রাজ্ঞী প্রভাবতী গুপ্তা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের অত্যন্ত ভগবদভক্ত কন্যা ভগবান রামগিরি স্বামীর। দাশরথি রামের পূজারিণী ছিলেন। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বরাহমিহির দাশরথি রামের

প্রকাশিত "The classical Age" পৃঃ ৪১৪]। কেরলের রাজা কুলাশেখর আলবর শ্রীরামের ভজনানন্দী ছিলেন। গুপ্তযুগের শিলালিপি হইতে বলরাম সংকর্ষণের পূজা সম্বন্ধে কোন সূত্র পাওয়া যায় না। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী হইতে পহলব বংশের মধ্যে 'বিষ্ণুলোপ' বাক্যটি প্রচলিত হয়, ইহাতে কৃষ্ণ ও বিষ্ণুর অভিন্নতা সূচিত করে, কালিদাসের মেঘদূতে [স্তবক নং ১৫] এই বিষ্ণু গোপের কথা আছে। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে মৌখরি-রাজা অনন্তবর্মা কর্তৃক বরাবর শৈলের কোন গুহায় কৃষ্ণমূর্তি স্থাপিত হয়। হুনরাজ তোরমানের সময়ে [আনু, খৃঃ অঃ ৫০০] নারায়ণাবতার বরাহের একটি প্রস্তরমূর্তি ইরাণের এক প্রস্তর মন্দিরে স্থাপিত হয়। বুধগুপ্তের দামোদরপুর শিলালেখে শ্বেতবরাহস্বামী ও কোকামুখস্বামী দুই দেবতাকে বরাহ অবতার রূপে গণ্য করা হইয়াছে। নেপালের কৌশিকী ও কোকানদীদ্বয়ের সংগমস্থলে যে বরাহক্ষেত্র আছে সেইখানে উক্ত দেবতাদ্বয়ের মন্দির বিদ্যমান ছিল। উত্তর বঙ্গের জনৈক অধিবাসী হিমালয়ের উক্ত বরাহ ক্ষেত্রে [কোকানদতীর্থে] তীর্থ করিতে যান, তিনি উক্ত দুই দেবতার মন্দির সন্দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দিনাজপুর জেলার দামোদরপুরের সন্নিকটস্থ জংগলে ঐ দুই দেবতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন [Indian His. Quaterly, vol XXV 56ff] দাক্ষিণাত্যের কদম্ব ও চালুক্যবংশীয়গণ বরাহ অবতারের পূজক ছিলেন।

যদিও পঞ্চরাত্র সাহিত্যে ব্যূহবাদের কথা বিবৃত আছে তথাপি সমসাময়িক গুপ্তযুগের শিলালেখ হইতে ব্যূহের সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের স্বতন্ত্র পূজার কথা শুনা যায় না। ব্যূহবাদের বিকল্প তিন দেবতা হইলেন বলদেব, কৃষ্ণ ও সুভদ্রা (একানংশা], পরবর্তী ভুবনেশ্বরে প্রাপ্ত শিলালিপিতে বলদেব, কৃষ্ণ ও সুভদ্রার পূজার কথা আছে।

ব্যূহবাদের প্রধানকেন্দ্র কাশ্মীরে চারিব্যূহের অন্তর্গত বৈকুণ্ঠচতুর্মূর্তির ভুজা প্রচলিত ছিল। খাজুরাহের শিলালেখ (খৃঃ অঃ ৯৫৪) নির্দেশ করিতেছে কোন একটি মূর্তি (চারি মূর্তির একটি) যেটির পূজা হিমালয় প্রদেশে প্রচলিত ছিল এবং পঞ্চরাত্র-ধর্ম ঐ স্থানে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। স্মরণ রাখিতে হইবে যে ভাগবত ও পঞ্চরাত্র প্রথমে অভিন্ন থাকিলেও গুপ্তযুগে বিভিন্নরূপে প্রকাশ পায় [রমেশচন্দ্র মজুমদার, Jour. Asi. Soc Bengal, vol IX 232ff)। ব্যূহবাদ ও অবতারবাদের মূলতঃ পার্থক্য আছে। হর্ষচরিতে ভাগবত ও পঞ্চরাত্রিক-গণের বিভিন্ন উল্লেখ পাওয়া যায়। দেবতারূপে গণ্য নারায়ণ ঋষি প্রথমে পঞ্চরাত্রিকগণ কর্তৃক আরাধ্য ছিলেন, এবং বৃষ্ণিবংশীয় বাসুদেব দেবতারূপে অর্চিত হইতেন ভাগবতগণের দ্বারা। এই দুই সম্প্রদায় পরে একাত্ম হইয়া যায়, কারণ নারায়ণ ও বাসুদেব তখন অভিন্নরূপে কল্পিত হয়।

সন্ধ্যায়

অরবিন্দ ভট্টাচার্য্য

আরেকটু না হয় বোসো। চারদিক স্তব্ধ হয়ে যা'ক
কুয়াশায়। এ ক্লান্ত নদীর বুকে একটি নির্বাক
প্রকৃতির নিঃশ্বাস কান পেতে শুধু শুনে যাও।

এখন সবাই শান্ত, গম্ভীর নীরব সন্ন্যাসী
আরেক সূর্য্যের সাধনায় মগ্ন। আমি ভালবাসি
এ' নদী, প্রকৃতি, আর কালো হয়ে আসা নীলিমা ও।

কেমন অবাক লাগে যেন। মনে হয় আমাদেরো মনে
শত শত কাবেরীর জল বয়ে চলে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে—
হঠাৎ অজান্তে থেমে যায়, স্তব্ধ হয়ে আসে :

অলস মৃত্যুর টানে নিশ্চুপ জীবন সন্ধ্যায়
স্মৃতির আকাশটুকু ভরে যায় তারায় তারায়—
একটি অবাক মন ভেসে চ'লে : কোথা, জানেনা সে।

দুপুরের চিল

অমিয় চৌধুরী

রিভিসন্যাল সেটেলমেণ্ট অফিস।

তারই লাগাও বিনয়বাবুর চায়ের দোকানটা। ছোট-খাটো অথচ বেশ সাজানো-গোছানো দোকান। গোটা সাত আটেক খুঁটি পুঁতে তার ওপর পোড়া টিন দিয়ে ছাইয়ে দেওয়া হয়েছে। ছোটর মধ্যে একটি আলমারি আছে। একটা লম্বা টেবিল, তার পাশে গোটা দুই বেঞ্চিও আছে। দোকানের বাঁ দিকটাতে একটা কামিনী ফুলের গাছ আছে। যেন ঐ ফুলগাছটার ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে চালাটা। আর চালার দুধারে লম্বা লম্বা দুটো ক্যাম্বিশ খাটানো। ওগুলো অনেকদিন থেকেই আছে। অনেক বার মনে করেছেন বিনয়বাবু, ওগুলো পাল্টে দিয়ে চিরিচিরি বাখারির ওপর চিটে মাটি লাগিয়ে দিয়ে দুটো আড়াল তৈরী করে দেবেন দুপাশে, তাতে গ্রীষ্মকালে ঘরটাও ঠাণ্ডা থাকবে। কিন্তু কাজে আর তা সম্ভব করে উঠতে পারেননি—চলছে চলুক, অমনি একটা ঢিলেঢাল ভাব।

তবু দোকানটা চলে মন্দ না। সকালের দিকে একটু ঝিমিয়ে থাকে। বিশেষ লোকজন থাকে না। এ সময়-টাতে হীরালাল খাবার তৈরী করে। ছোট বাচ্চা সিধু ওকে হাতে হাতে জিনিষ জুগিয়ে দেয়। জল এনে রাখে কল থেকে। একটু দূরে টিন-বাজার থেকে বাজার করে নিয়ে আসে। বাঁধাকপি মটরশুঁটি এই সব দিয়ে সিঙ্গাড়া তৈরী হবে। সিঙ্গাড়া তৈরীতে হাত পাকিয়ে ফেলেছে হীরালাল খুবই। অফিসের বাবুরা তারিফ করে। একটা খেলে আর একটা চায়। সেই ভোর থেকে উঠে এই সব করতে হয় তাকে। একমাত্র ছুটির দিন আর রবিবার ছাড়া প্রত্যেক দিনই তাকে এমনি খাটতে হয়। অবশ্য খাটুনিতে আপত্তি নেই হীরালালের। শক্ত লোহার মত শরীরটা। একটু ফর্সা ফর্সা। নাকটা একটু চ্যাপ্টা মত। চুলগুলো কোঁকড়ানো। চোখগুলো হীরালালের একটু ছোট ছোট। তাতে কিছু আসে যায় না বলেই মনে করে হীরালাল। হাতের কব্জিতে যতদিন শক্তি থাকবে—ততদিন কোনও কিছু ভাবে না সে।

সকাল সাড়ে এগারোটা থেকেই ভিড়টা একটু একটু করে বাড়ে। এই কয়েক ঘণ্টা কোনও রকমে কাটাতে পারলে বাঁচা যায়। শুধু অফিসের বাবুরাই নন। সেই সঙ্গে বাইরের খদ্দেরও আসে অনেক। লম্বা লম্বা দাড়ি-ওয়ালা মিঞাজান থেকে আরম্ভ করে ঐ পাশে নতুন বাড়ীটা উঠছে ওখানে যে সমস্ত কুলিকামিনগুলো খাটছে তারা পর্য্যন্ত এসে দাঁড়ায়। ভারি বিরক্ত লাগে হীরালালের। একে একে জিনিষ নিলে তবু সামলানো যায়। এক সঙ্গে চাইলে কেমন করে পারবে হীরালাল? ওর তো আর দশটা হাত নেই। তা সত্বেও একলা ও যা তাড়াতাড়ি খদ্দের বিদেয় করে এমনি আর কেউ পারে বলে মনে হয় না। মিঞাজানেরা তো জিলিপি ছাড়া আর কিছু খাবে না। ঠিক সেই জন্যে তিন ধারার দিন দেখে দেখে হীরালালকে জিলিপিও তৈরী করে রাখতে হয়। ওরা সব অফিস আসে ব্যক্তিগত জমিজমার ব্যাপার নিয়ে। কেউ জাবদা নকলের দরখাস্ত করতে চায়। কেউ ফাইন্যাল পাবলিকেশনের রেকর্ড দেখতে চায়। ওদেরই তাড়াহুড়ো বেশী।

অস্থির হয়ে ওঠে হীরালাল। গজর গজর করতে করতে বলে, আমি একলা কি আর এত সামলাতে পারি। বাবুকে হাজার বার বলেছি, বাবু আর একটা লোক রাখুন। আর সিধু তো কচি বাচ্চা, ও আর কত খাটতে পারে?

বিনয়বাবু তখন চেয়ারে বসে বসে ঝিমোন। কথা

কানে যায় না তার। লম্বা ছিপছিপে দেহখানা সামনের দিকে খানিক ঝুঁকে পড়ে। মাঝে মাঝে আচমকা শিরদাঁড়া খাড়া করে তাকিয়ে দেখেন চারিদিকে। বেশ ভাল করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। দাম-টামগুলো সব ঠিকঠাক রাখছে তো হীরালাল বাক্সের মধ্যে! বলা যায় না, আজকালকার জোয়ান তো! কোনও কিছু বিশ্বাস নেই। চট্ করে একবার চারিদিকের খদ্দেরগুলোর দিকেও তাকিয়ে নেয়। তারপর আবার ঝিমোতে থাকে।

দোকানের এক পাশে মহাদেব মুহুরী বসে বসে লোকের কাজ করে দেয়। অনেক আনাড়ি আসে জমিজমা সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে। তাদের কাজ করে দেয়। এতক্ষণ একটা লোকের সঙ্গে বাজে বকছিল মহাদেব। হঠাৎ হেঁকে উঠলো, ওহে হীরালাল, এক কাপ চা আর একটা সিঙ্গাড়া দাও তো? দামটা এর কাছে নিয়ে নিও।

লোকটা বলে উঠলো. হ্যাঁ, হ্যাঁ দাও, আমি দামটা দিয়ে দেব। তা মুহুরী মশাই, নকলটি পেতে দেরী হবে ক'দিন?

সকাল বেলাকার লাল সূর্য্যটা এতক্ষণে মাঝ আকাশে উঠছে। চিরচির করে রোদ লাগছে গায়ে। যেন বয়লার থেকে গরম লোহা গলে গলে পড়ছে পথেঘাটে। দোকানের চালাটা গরম হয়ে গেছে। ঝাঁ ঝাঁ করছে রাস্তাটা। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে গেছে হীরালালের লোহাপিটা শরীরটায়। তবু যে যা চাচ্ছে তাকে তাই পরিবেশন করছে। সিধুটা তো জল দিতে দিতে হাঁপিয়ে উঠেছে একেবারে। গা দিয়ে ঘাম ঝরছে দর্ দর্ করে। ছোট্ট প্যাণ্টটা ভিজে গেছে ওর। হীরালাল ওর দিকে তাকিয়ে বলে, কি রে হাঁপিয়ে গেলি যে! একটু বস্। এই নে এই মিষ্টিটুকু খেয়ে জল খেয়ে নে। সকাল থেকে যে শালা কিছু খাসনি!

আবার কাজ করতে আরম্ভ করলো হীরালাল। অফিস থেকে ইংলিশ সেক্‌শনের টাইপিষ্টবাবু চা চেয়ে পাঠিয়েছেন। ওর আবার সাধারণ চা-এ পোষায় না। স্পেশাল অর্ডারে স্পেশাল চা। অর্থাৎ লিকার পুরু হবে, দুধ ঘন হবে। তা না হলে এক চুমুক দিয়ে চা ফেলে দেবে। দাম দেবে না। সে দামটা আদায় করবে বিনয়বাবু হীরালালের ওপর দিয়ে। এমনি করে এর আগে দু-চার আনা অকারণেই খসে গেছে হীরালালের পকেট থেকে।

অফিসের চ্যাংড়া পিওনটা বললো, এই হীরালাল ভাল করে চা করবি। টাইপিষ্টবাবুর মাথা ধরেছে, বেশ কড়া করে লিকার দিবি।

হীরালাল ততক্ষণে লিকার ছাঁকতে আরম্ভ করে দিয়েছে। একটা চামচা দিয়ে চিনিটা গুলতে গুলতে বলে, হ্যাঁ গো হ্যাঁ, দেখো গে গিয়ে—এ যা চা করেছি স্বয়ং দিল্ মোহিনী পর্য্যন্ত ভুলে যাবে!

হুঃ! তবেই হয়েছে! তুমি কি টাইপবাবুকে দিল্-মোহিনী ঠাউরেছো নাকি হীরালাল! বাবা, জমিদারের রক্ত এখনো ওর শরীরে বইছে! নেহাৎ সখের চাকরী, কি বলবো হীরালাল, ও একটি চিজ। শালা ছুড়ে দিলে শব্দ হয়! বলে মুখে একটা বিচিত্র শব্দ করে ফেলে পিওনটা।

ওর মুখের ভঙ্গী দেখে হেসে ফেলে হীরালাল। বলে, তা দিল্‌মোহিনী না বলো, দিল্ মোহন তো বলতে পারো।

ধ্যেৎ ও শালা কিচ্ছু না। একেবারে কাঠ-খোট্টা পাথর। মুখখানা বিরক্তিতে ভরে যায় পিওনটার। হীরালালের হাত থেকে চা-এর কাপটি নিতে নিতে বলে, শালা এক নম্বরের বজ্জাত, খালি খাটাবে। এই ত্যাখো না, সকাল দশটা থেকে এই একটা বাজলো, এর মধ্যে না হোক দশবার পোষ্টাপিস পাঠালে নিজের কাজে। যেন শালার বাপের চাকর আমি।

হো হো করে হেসে ওঠে এবার হীরালাল। সঙ্গে সঙ্গে বিনয়বাবু হকচকিয়ে যান। তাড়াতাড়ি চোখ কচলে চেয়ে দেখেন ভাল করে। ধমকে ওঠেন, এ্যাই হীরে, এত জোরে হাসছিস্ কেন? দেখতে পাচ্ছিস না পাশেই অফিস চলছে। হারামজাদার যত দিন যাচ্ছে তত জ্ঞান বাড়ছে। সাহেব শুনলে বলবেন কি! ইডিয়ট কোথাকার! তুই কি এখান থেকে আমার ব্যবসাটা ওঠাবি নাকি ভাবছিস্!

চোখ রাঙ্গানিতে চুপ করে যায় হীরালাল। ছোট্ট ড্রামটা থেকে জল নিয়ে চায়ের জলের হাঁড়িতে ঢেলে দেয় মুখ চুপ করে। হাঁড়ির জল কমে গেছে। পিয়নটা বেগতিক দেখে চা-এর কাপ হাতে সরে পড়ে সেখান থেকে,

আড়ালে আড়ালে বিনয়বাবুকে মুখ ভ্যাংচাতে ভ্যাংচাতে। বিনয়বাবু বলেন, এই তোকে সাবধান করে দিচ্ছি হীরে, আর যদি অফিসের কোনও লোক সম্বন্ধে অমনি কথা বলতে দেখি তোকে—তবে তোরই একদিন কি আমারই একদিন! ভারী একেবারে ইয়ে হয়ে গেছিস্ না? বেশী ফাজলামো কর'বি তো ঘাড় ধরে বের করে দেব, এই বলে দিচ্ছি!

দোকানদারের কথার উত্তরে বিশেষ কোনও কথা বলতে পারে না হীরালাল। ওটা ওর স্বভাবও নয়। কেন জানে না হীরালাল, কথা বলবার কায়দাটা ওর আজও আয়ত্তে আসেনি। এক কথা বলতে গিয়ে আর এক কথা এসে পড়ে। তাই বিশেষ কোনও কথা বলতে পারে না। বলতে ভরসাও পায় না বড় একটা। কে জানে কোন্ দিক থেকে বিপত্তি এসে পড়ে বলা যায় না। তাছাড়া ও নিজেও তো কাজটা বিশেষ ভাল করেনি। কি দরকার ওর কে কেমন মানুষ তা নিয়ে। যে যা আছে সে তাই। তার বেশীও না, কমও না। তাহলে টাইপিষ্টবাবু ভাল লোক হোন্ আর রগ-চটা হোন্ তাতে ওর কিছুই আসে যায় না। ও শুধু বরাত খাটবার মালিক। যেমন হুকুম করবে সেই হুকুম তামিল করবে। সেই হুকুম অনুযায়ী চা করবে। আর অমনি জোরে হেসে ওঠাটাও ওর উচিত হয়নি মোটেই। হাজার হলেও অফিস আওয়ার শেষ হয়নি এখনো। বড় সাহেবও আজ টুরে যাননি। ঘন ঘন বেল বাজছে। এমন সতর্ক মুহূর্ত্তে অসতর্কের মত কেন যে হঠাৎ হেসে উঠলো, তা এখন এই মুহূর্ত্তে আর ভেবে পাচ্ছে না হীরালাল। একটা কথা তবু পাক খেয়ে যায় মনের মধ্যে তার, কাজটা তার উচিত হয়নি।

কিন্তু উচিত না হলেও তো আর ফেরানো যায় না। অগত্যাই জামাটা খুলে ফেলে ওপাশের শিকটার মধ্যে তুলে রাখে হীরালাল। বেলা হয়েছে অনেক। দেড়টা বেজে গেছে। অফিসের লোকগুলো সব কেটে পড়বার তাল করছে। আজ শনিবার। সুতরাং এর পরে আর থাকা যায় না। অফিসের বাবুদের ভেতরে অনেকে বিদেশে বৌ-ঝি রেখে এসেছে। তারা শনিবার দিন আড়াইটার ট্রেণে বাড়ী ফিরবে। রোববারটা থেকে সোম-বার ফিরে আসবে সাড়ে ন'টার ট্রেণে। বিদেশ মানে বেশী দূর নয়। দু তিনটে ষ্টেশন পরেই। কিন্তু এই এত বেলাতেও খাওয়া হয়নি হীরালালের। সেই সকাল বেলায় গোটা দুই রুটী আর খানিকটা গুড় খেয়েছে। তার পরে আর পেটে কিছু পড়েনি। পেটটা পুড়ে যাচ্ছে হীরালালের। পেটের ক্ষুধা চোখের তারায় ফুটে বেরুচ্ছে যেন। শিশিটা থেকে সরষের তেল নিয়ে চুলে দিতে দিতে বলে হীরালাল, বাবু, বেলা তো অনেক হয়ে গেছে। খেয়ে আসুন গে গিয়ে এবার, অফিসের ছুটী হয়ে গেছে।

ততক্ষণে দোকানে লোক কমে এসেছে অনেক। দোকানদার চলে যান বাড়ীর দিকে। অবশ্য খুব বেশী খিদে লেগেছে বলে মনে হয় না দোকানদারের। দোকানে বসে বসে এরই মধ্যে গোটা চারেক সিঙ্গাড়া খেয়েছে। দুটো রসগোল্লা খেয়েছে। মাংসের চপ খেয়েছে গোটা তিনেক। আর চা যে কতবার চলেছে তার হিসেব নেই। তবু ভাত চারটি খেতে হবে বলেই খাওয়া। নইলে এই ফুটিফাটা রোদ্দুরে মাথার ঘি গলিয়ে বাড়ী যাবার মত বোকা তিনি নন। তা ছাড়াও আর একটা কারণ আছে। ভাল করে সমস্ত শরীরটায় জল ঢেলে ঠাণ্ডা করতে হবে। মাথাটাও গরম হয়ে গেছে আজ তাঁর। বেশ ঝিমুচ্ছিলেন, হারামজাদা হীরেটা হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলে ওর।

হারামজাদা হীরেটা তখন জ্বলেপুড়ে মরে। খালি পা। তামার উত্তপ্ত গলা পাতের মত পীচের রাস্তায় পা পড়ছে আর ফোস্কা পড়ে যাচ্ছে একটা একটা করে। ওপরে আকাশ পোড়াচ্ছে মাথা, নীচে পা পোড়াচ্ছে রাস্তা। আর অসহ্য ক্ষুধায় বুক পোড়াচ্ছে। পথ চলতে চলতে হঠাৎ মনে হল হীরালালের বাচ্চা ছেলেটা অর্থাৎ সিধুকে খাইয়েছে তো। হ্যাঁ খাইয়েছে। বেচারাকে দেখে বড্ড মায়া হয় হীরালালের। বড় রোগা ছেলেটা। একটু জোরে বকে দিলে চোখ ছলছলিয়ে ওঠে। ঐ ছেলেটাকেই বসিয়ে রেখে এসেছে হীরালাল দোকানের ভার দিয়ে। তা ও-ও চালিয়ে দিতে পারবে বেশ। এ সময়ে আর ক'টাই বা খদ্দের আসবে। খদ্দের যা আসবার তা অফিস টাইমেই এসে গেছে। মাথার চুলে তেলটুকু বেশ ভাল করে মাখতে মাখতে চললো হীরালাল। এই আলু পচা গরমে কি জলে ডুবে স্নান না করলে তৃপ্তি পাওয়া যায়? এদিক ওদিক চাইলো হীরালাল। পথে বিশেষ লোকজন নেই।

নেহাৎ যাদের না বেরুলে নয় তারাই বেরিয়েছে। চৌরাস্তার মোড়ে সাইকেল-রিক্সওয়ালারা রিক্সার গদিতে শুয়ে একরাশ ঝিমুনি নিয়ে চোখ বুঁজে পড়ে আছে। আর দুএকটা বরফওয়ালা ফাটা-ফাটা গলায় আর্তনাদ করছে পথ দিয়ে যেতে যেতে। তারি সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দুপুরের রূপালী আকাশ চিড়ে ছুটে আসছে দুএকটা শঙ্খ-চিলের উৎকট চীৎকার। দত্তপুকুরের পাড়ে নিমগাছটার ডালে বসে বসে অলস কণ্ঠে কা কা করছে একটা ডাক। অকারণে পাখা ঝটপট্ করছে।

দত্তপুকুর থেকে ফিরতে বেশ খানিকটা দেরীই হয়ে যায় আজ হীরালালের। গতকাল স্নান করবার সময় পায়নি। তার আগের দিনও নামমাত্র মাথায় একটু জল ঢেলে নিয়েছিল হীরালাল। দুতিন দিনের ধুলো জমে আছে মাথায় ও গায়ে। তার ওপর অবিশ্রান্ত ঘাম পড়ে ময়লা-গুলো পচেছে গায়ে গায়েই। যাচ্ছেতাই দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। জামা কাপড়েও যে আজ কতদিন সাবান পড়েনি তার ঠিক নেই। গেঞ্জিটার তো মোটামুটি রং পালটে গেছে। চিটচিটে ময়লাতে কাদা-কাদা হয়ে গেছে। সবগুলোতে ভাল করে সাবান দিল হীরালাল। পুকুরের পাথরটার ওপর আছড়ে আছড়ে ভাল করে কাচলো। এগুলো এক্ষুণি গিয়ে শুকুতে দেবে সে। ওগুলো শুকুলে গায়ে চড়িয়ে সিনেমা দেখতে যাবে মনে করেছে। বেশ ভাল একটা হিন্দি বই এসেছে। বাজারে খুব নাম করেছে নাকি বইটা। বেশ ভাল ভাল গান আছে। মুহব্বৎকী গানা!

মুহব্বৎ! মুখখানা হঠাৎ ঝলমলিয়ে যায় হীরালালের। মুখে জল নিয়ে পিচকারীর মতো ফেলতে ফেলতে জলের দিকে তাকিয়ে যেন অন্য একটি মুখ দেখতে পায়। আঠেরোটা বসন্ত-মাখা একটি নিটোল মুখ। ভাসা-ভাসা চোখ। কালো কুচকুচে মুখখানার ঠিক মধ্যিখানে একটি চক্‌চকে কাঁচপোকার টিপ। ঢেউ-খেলানো বুকের ওপর একটি পুরন্ত যৌবনের মিঠি উত্তাপ। আচমকা মনে পড়ে যায় হীরালালের। বাতাসীর আসবার কথা আছে একটু পরে।

তাড়াতাড়ি স্নান সেরে উঠে আসে হীরালাল। আবার সেই গোটা গোটা ফোস্কার তীব্র জ্বালা। মাথার ওপর ঢল নামা সূর্যের গলা আগুন ঝরানো। তপ্ত মৃত্তিকার উষ্ণ শ্বাস। তবু যতখানি পারা যায় পা চালিয়ে আসে। হীরালাল। পেটটা এবার আরও পুড়ছে। পুড়ছে না, ধুঁকছে।

দোকানে ঢুকতে গিয়েই হঠাৎ চোখাচুখি হয়ে যায় বাতাসীর সঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে বাতাসীর মুখখানা লালচে আভায় শরমিত হয়ে পড়ে। একটা উষ্ণ অথচ মিষ্টি উত্তাপের স্রোত বুঝি সর্ সর্ করে নেমে এসে হীরালালের শিরা উপশিরার ভেতর দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে মুচকি একটা হাসি ঠোঁটে নিয়ে। অদ্ভুত একটা মুগ্ধতা চোখে নিয়ে। গত রাত্রের কথা স্মরণ করে মধুর লজ্জায় ভরে যায় সারা মনটা। ভালও লাগে যথেষ্ট। ভাল শুধু আজ নয়, অনেক দিন থেকেই লাগে বাতাসীকে। সেই যেদিন কামিনগিরি করতে এসেছে বাতাসী বাংলা-পাড়ার নতুন যে বাড়ী উঠছে সেইখানে। প্রথম দিন দেখেই চার জোড়া চোখ মিলে গেছিল পলকের জন্যে। পলকের জন্য অদৃশ্য আকর্ষণে জড়িয়ে পড়েছিল ওরা দুজনেই ঠিক সেই জন্যে, ঠিক সেইজন্যেই বাতাসী দু একদিন অন্তরই আসে বিনয়বাবু দোকানে। চা খাওয়ার অছিলা নিয়ে। কিংবা অতিরিক্ত গরম পড়ার দরুণ জল চাইবার অজুহাত নিয়ে এসে হাত পেতেছে হীরালালের কাছে। ঘন কালো চোখের তারা-জোড়া তার সেঁটে গেছে হীরালালের মুখের দিকে চেয়ে। হেসেছে হীরালাল।

বিনয়বাবুর চোখের আড়ালে রাতের অন্ধকারে হীরালালের পেশী-বহুল হাতটা এগিয়ে এসেছে বাতাসীর দিকে। বাতাসী দুহাত বাড়িয়ে দিয়েছে হীরালালের গলার দিকে। বাতাসীর নরম বুকের ছোঁয়ায় চোখের পাতায় অলসতা জমে এসেছে হীরালালের। বাতাসীর শরীরের কোষে কোষে বসন্তের পলাশলাল আগুন ছড়িয়ে পড়েছে।

দোকানদার ফিরে এসেছে খেয়ে-দেয়ে। বাতাসীকে বলছে, তোর কি কি চাই বল্। আমি দিয়ে দিচ্ছি। হীরালাল তো এইমাত্র স্নান করে এলো। ও এখন খাবে-দাবে তবে তো!

বাতাসী বলে, সি কি গো! এই ধুমখুটি বেলা হইন্ গেল আর উকে তুমরা আখুনো খেতে দাও নাই খো!

আচ্ছা ভদ্দর মুক তুমরা! আমি কচ্ছিনকালেও এমন দেখি নাই গো!

না, না, তা হবে কেন—ঐ হীরালালই নিজে খায় না। ও বলে, দোকানটা একটু না সামলে ও খাবে না। তা আমি কি করবো বল্? নিজের দোষ ঢাকতে চেষ্টা করেন দোকানদার। লক্ষ্য করে হীরালাল, বিনয়বাবুর দুটো পিঙ্গল চোখ লেপ্টে গেছে বাতাসীর শরীরের ভাঁজে ভাঁজে। বাগদীদের মেয়ে বাতাসী। গায়ে ব্লাউজ চড়িয়ে আসেনি। বুকের খানিকটা কাপড় সরে গেছে। নরম একটু অংশের কোমল একটি ভাঁজ চোখে পড়ছে। বিনয়বাবু সেইদিকে তাকিয়ে ঠোঁট চাটছেন।

বাতাসীর সেদিকে নজর নেই। ও হীরালালের দিকে চেয়ে বলে, হা রে এত বেলা পয্যন্ত প্যাটে কছু না পড়লে যে ব্যামো হইন যাবে। সিদিকে খ্যাল আছে? তখুন তুর মা থালভরী তো আর সগ্গ থিকে নেমে এসে তুর সেবা করবে না গো!

বাতাসীর কথা শুনে হাসে হীরালাল। জামা-কাপড়-গুলো থেকে জল নিঙড়ে ফেলতে ফেলতে বাতাসীর দিকে তাকায়। সেই মুহূর্ত্তে বাতাসীর মুখে সিঁদুর ছড়িয়ে যায় হঠাৎ। গত রাত্রের অনুযোগ আর রাক্ষুসে প্রেমোন্মত্ততার কথা মনে পড়ে যায় বোধ হয়। কিন্তু সামলে নেয় বাতাসী। দোকানদার বিনয়বাবু জানতে পারলে খুব খারাপ হয়ে যাবে। বুকের কাপড়টা গুছিয়ে নিয়ে বলে বাতাসী, তুর বাপু জ্ঞানগম্যি নাই হীরে, ভাল করে সুমুয় মতন না খেলে থি পিত্তি পড়ে যাবে।

বিনয়বাবু এবার কথা বলেন ওদের কথার মধ্যেখানেই, এ্যাই বাতাসী, তোর কাছে আমি দুটো টাকা পাবো, সেদিন জিনিস নিলি। তা টাকাটা আর দিবি না নাকি ভাবছিস। তা না দিস তো—

ক্যানে গো, তুমার টাকা তো দিন্ দিইছি!

টাকা দিয়ে দিয়েছিস! কই কখন দিলি? মনে মনে হিসেব করে নেন বিনয়বাবু। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভাবতে চেষ্টা করেন। না, স্মরণ করতে পারছেন না। বলেন, মিথ্যে কথা বলবার আর জায়গা পাস্ নি?

মিছে কথা বলবো ক্যানে গো দোকানি! তুমার টাকা তো দিন দিইছি, ওই ছোঁড়াকে শুধোও ক্যানে! সামান্য একটু জ্বালা প্রকাশ পায় বাতাসীর কথায়। দোকানদারের চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শোনা তার ধাতে সইবে না। সে আওরৎ এবং তাদের জাতে সে সুন্দরী আওরৎ। ও কারুকে ভয় করে না।

দোকানদারের চোখদুটো জ্বলে ওঠে দপ্ করে। বলে এই হীরে, তোর কাছে ও টাকা দিয়ে গেছে! কই টাকাটা দিস্ নি তো আমাকে! শুয়োরের বাচ্চা কোথাকার! এখন থেকে টাকা গাঁপ্ করতে শিখেছো!

একটু আগের ঝকঝকে মুখটা পাণ্ডুর হয়ে এসেছে হীরালালের। অসবর্ণ রহস্যের মত একটা কুৎসিত ভাবনা যেন কিলবিলিয়ে উঠলো মনের মধ্যে সহসা। জামা কাপড়-গুলো সামনের টানানো দড়িটাতে মেলে দিয়ে চুপচাপ মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলো।

আরও চড়ে গেল বিনয়বাবুর গলা, এ্যাই বাঁদর, উল্লুক কোথাকার, তোর বাপের টাকা পেয়েছিস্ তুই! ফ্যাল্ ফ্যাল্, বলছি টাকা!

চোখের সামনে চাপ চাপ আতঙ্ক যেন গলা বাড়িয়ে ভেংচি কেটে ওঠে হীরালালকে। ইস্ আচ্ছা বিপদে পড়া তো বাতাসীকে নিয়ে। এই এতটা বেলা হল। অফিসের দরজা-কবাট বন্ধ করে দারোয়ান চ'লে গেছে কখন। এখনও পর্য্যন্ত খাওয়া হয়নি হীরালালের। এমনি সময়ে আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেল! আমতা আমতা করে বলে হীরালাল, না বাবু টাকা দেয় নি ও!

হীরালাল একটা ইশারা করে দেয় বাতাসীকে। বাতাসী সেটা বুঝতে পারে না। একটা জ্বালা-ধরা আক্রোশ ফুঁসে ওঠে যেন। হীরালাল তাকে দোকানদারের সামনে অপদস্থে ফেলে দিতে চায়! চোখ দুটো জ্বলে ওঠে বাতাসীর! অনেকটা এই গ্রীষ্মের দুপুরে রোদের মত। সবকিছু গোলমাল হয়ে যায়। হিসিয়ে ওঠে ও, কি বললি হতভাগা! আর একবার বল্ কথাটো, মুখে ঝাঁটা মেরে তুর মুখ ভেঙ্গে দেবো না! বলি কাল রাতের বেলায় সুদে আসলে উসুল করে নিলি না রে মুখপোড়া ড্যামনা!

অ্যাঁ! এই ব্যাপার! রক্তাক্ত ক্রোধে আগুন ঠিকরে পড়ে বিনয়বাবুর চোখ থেকে। কাছে সরে এসে হঠাৎ হীরালালের চুলের মুঠি ধরে হেঁচকা টান দিয়ে ফেলে দেয় মাটিতে। তারপর কিল চড় ঘুঁসি চলে অবিরাম। বুনো

জানোয়ারের মত আক্রমণ করে ওকে। তার সঙ্গে যাচ্ছেতাই গালাগালি। বুঝতে পেরেছে দোকানদার। একটা ক্রূর অবিশ্বাসের জন্ম নেয় মনে তাঁর। তার সঙ্গে খানিকটা শত্রুতার বিষও। চেনে না হীরালাল ওঁকে! ওর মত বয়সে বহু মেয়ের সর্বনাশ করেছেন। নিজেদের জমিদারীর এলাকায় অনেক রক্তাক্ত কাণ্ড ঘটেছে। সেই সামন্ত-তান্ত্রিকতার রক্ত এখনো শরীরের শিরায় শিরায় টগবগিয়ে ছুটছে। আবার, আবার কশে এক চড় মারে হীরালালের গালে।

তবু আশ্চর্য্য! হীরালাল কাঁদে না। কোনও অস্ফুট আর্ত্তনাদ বেরিয়ে আসে না তার বুকের পাঁজর ফুঁড়ে। চোখের তারা তেমনি উজ্জ্বল। শুধু চাপা একটা বেদনার ছায়া যেন ফুটছে ওর চোখের দুটি কোলে। দাঁতের কশ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। পায়ের হাঁটু দুটো মুচকে গেলো একটু—অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। তবু নির্বিকার। বুক চেপে মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকে ঠিক তেমনি।

দোকানদারের রাগ আরও বেড়ে যায়। অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করতে থাকে। আর বাতাসী যেন বোবা বনে গেছে একেবারে। একটা বোবা ব্যথায় বুকের ভেতরটা হিম হয়ে আসে যেন তার। কোন কথা বেরুচ্ছে না মুখ দিয়ে। আচমকা কি যেন ঘটে গেল, ঠিক বুঝতে পারছে না বাতাসী। কুচকুচে মুখখানা আরও কালো হয়ে এসেছে ওর। চোখের পাতা জোড়া ভিজে এসেছে। দোকানের সামনে, বিশেষ করে হীরালালের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে লজ্জা করছে তার। বেচারা এখনো খায়নি! সেই সাত সকালে উঠে থেকে 'গতর' গলিয়ে খাটছে। অথচ এই বেলা পড়ে আসছে—এ সময় শান্তি করে দুটো খাবে, তা না বেচারা পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে হতচ্ছাড়া দোকানদারটার কাছে। কিন্তু দোকানদারই বা দায়ী কিসের? বাতাসী নিজেই তো দায়ী সে জন্যে! কি দরকার ছিল বেফাঁস কথাটি বলে ফেলবার! আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না বাতাসী। আস্তে আস্তে সরে আসে সেখান থেকে।

দোকানে আর বিক্রি হবার সম্ভাবনা কম। এই অবেলায় আর কেউ জিনিষ নিতে আসবে না। রাগে দেন দোকানদার। আরও সব জিনিষগুলো সামলে সুমলে রেখে বেরিয়ে আসেন। বাচ্চা সিবুটাকে নিজের বাড়ি পাঠিয়ে দেন। লোকের ফরমাশ খাটবার জন্য।

ততক্ষণে ধুলামাখা শরীরটাকে তুলে ধরে কোনও রকমে উঠে বসেছে হীরালাল। হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে চুপচাপ নিঃসাড় হয়ে বসে আছে। ভাত ওর বাড়াই ছিল। ওগুলো আর খায়নি হীরালাল। মুখে রোচে নি। দুটো তিনটে কাক এসে ভাতগুলো নিয়ে ছিটোচ্ছে।

সমস্ত দিনের রোদজ্বলা আকাশটা ধুঁকতে ধুঁকতে মুমূর্ষু রোগীর মত এক সময় পুড়ে কালো হয়ে আসে। পশ্চিম দিকচক্রবালের গায়ে খানিকটা রক্ত লেপ্টে যায়। সারা দিন তেতে পুড়ে ঝলসানো মাটিটা ভাপ ছাড়ে। মফঃস্বল সহরের বাড়িগুলোর কার্ণিস কার্ণিসে বিষণ্ণ রোদ চাঁৎ হয়ে পড়ে পড়ে জিরিয়ে নেয় খানিক ক্ষণের জন্য। তবু ঠিক তেমনি করেই হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে থাকে হীরালাল—দোকানের সম্পর্ক অফিসের সঙ্গে—অফিসের ছুটি হলেই দোকানও নির্জন নিঃঝুম।

রাত্রে বেঞ্চিটার ওপর শুয়ে শুয়ে সেই কথাটাই ভাবছিল হীরালাল। ভালুকের থাবার মত চাপ চাপ অন্ধকার গাঢ় হয়ে এসেছে আশে পাশে। সমস্ত দিনের সহুরে ফাজলামিটা থেমে গেছে। বারান্দায় বারান্দায় মশারী টাঙ্গিয়ে শুয়ে পড়েছে সহরের যান্ত্রিক লোকগুলো—আর ওপর তলায় ননীর পুতুলেরা ফ্যান খুলে মলমলের বিছানায় শুয়ে শুয়ে হয়ত এতক্ষণে জাপটা জাপটি সুরু করে দিয়েছে ফিসফিসে অন্ধকারে। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে হীরালাল দোকানের ওপাশে ভাঙ্গা ঘরের চাতালে শুয়ে শুয়ে কালু মুচিটা কাতরাচ্ছে খুব। হতভাগার হাত-পা গুলো কুষ্ঠ ঘায়ে গলে গলে যাচ্ছে। অথচ তা সত্ত্বেও সকালে উঠেই ও কাজে ছুটে যায়। চামড়ার কারখানায়। হাজার বার বলেছে হীরালাল—ওকে হাসপাতালে যেতে। তাও সেখানে যাবে না। ও বলে, হাসপাতালের বাবুরা নাকি বলেছে সীট পাওয়া যাবে না।

শুয়ে শুয়ে ভাবছিল হীরালাল। বিশ্রী কতকগুলো ভাবনার ছায়া এসে অস্বস্তিতে ভরে গিয়েছিল মনটা। ঘুম

গিঁটে দুঃসহ যন্ত্রণা। মাথার চুলের গোঁড়ায় যেন হুল ফুটছে হীরালালের। তার ওপর মশারীটাও তো ছিঁড়ে গেছে। টাঙ্গাতে ভরসা পায়নি। ঝাঁক ঝাঁক মশা এসে বসে পড়ছে গায়ে। হুল বিঁধে রক্ত চুষে নিচ্ছে। হীরালালের মনে হল, এই শালার মশাগুলো ঠিক দোকানদারের মত। কোনও মায়া মমতা নেই। শালার আচ্ছা কঠিন জান। পাথর বলে, আমি হার মানি। আর বাতাসীটাও যে এত বুড়বক—তা কি করে জানবে হীরালাল! হীরালাল জানতো বাতাসী আর কিছু না হোক্ চালাক-চতুর আর চটপটে বটে! সে ধারণা ওর পাল্টে গেছে। ওরা সব পারে। তা না তো কি! এত ভাল করে ইশারা করে দিল হীরালাল বাতাসীকে, তা ইশারাটা বুঝতেই চাইলো না। খামোখা মার খাওয়ালে দোকানদারকে দিয়ে। পাশ ফিরে শোয় হীরালাল। বেঞ্চিটাতে ছারে খাচ্ছে। খাক্, শালা যত পারে খাক্। দেখাই যাক্ একবার জীবনটা কোনখানে গিয়ে কি রূপ নেয়।

ভাবতে ভাবতে সামান্য একটু তন্দ্রার মত এসেছিল। বেশ ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে। যেন ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে। আর বাতাসটা দিচ্ছে বলেই হয়ত মশাগুলোও একটু কম লাগছে। হাত-পা নড়াতে পারছে না হীরালাল। কাঠ হয়ে পড়ে আছে বেঞ্চিটার ওপর। রাত তখন অনেক। ঝুলে পড়া হাতটা ঘুমের ঘোরে নিজের বুকের ওপর রাখতে গিয়ে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল হীরালালের। পালকের তৈরী একটা হাত তার কপালে, পিঠে, পিঠ থেকে বুকের দিকে নামছে একটু একটু করে। ভারি নরম, ভারি সুখস্পর্শ হাতখানা। ঘুমের ঘোরে তখনো চোখের পাতাগুলো বুঁজে ছিল হীরালালের। হাতটা চেপে ধরে সে নিজের মুঠোর মধ্যে। একটু একটু করে টেনে নেয় নিজের বুকে। অন্তরের কাতরানিটা থেমে আসে। হাতটা ধরে আরও টান দেয় হীরালাল। একটু একটু করে নেমে আসে সমস্ত শরীরটা। একটা মজবুত যৌবনমাখা আত্মা। বুকের বাঁ পাশের পাঁজরে শিহরণ ছড়িয়ে পড়ে তার। তারপর কাছে, একেবারে নিজের পেশী-বহুল গায়ের ওপর গরম নিঃশ্বাস পায়।

বাতাসী বলে, তুর খুব লেগেছে লয়?

একটি নরম মাখন শরীরের উত্তাপ নেয় নিজের দেহের রক্তে রক্তে। বলে, তুই ভারী বোকা বাতাসী!

বাতাসী বলে, তা আমি কি করে জানবো বল্, তুকে অমনি করে উনুনমুখো মারবে।

তোকে আমি ইশারা করে দিলাম, তাও বুঝলি না তুই?

বুঝতে পারি নাই বলেই তো কথাটো বাতিন্ দিলাম। তুর দেহিটোতে খুব ব্যাদনা করছে লয় রে হীরে? অন্ধকারেও বেশ বুঝতে পারে হীরালাল, বাতাসীর চোখের পাতা ভিজে এসেছে। গলার স্বর কেঁপে কেঁপে যাচ্ছে।

চোখ খুলে তাকায় এবার হীরালাল। যন্ত্রণা-কাতর দেহটা তুলে উঠে বসে। চেয়ে চেয়ে দেখে বাতাসীর মুখটা আর বেদনা-কাতর দেহটা। বলে, তুই ওর জন্যে ভাবিস্ না রে! ওসব দুদিন বাদেই ঠিক হয়ে যাবে!

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে বাতাসী। সেই কথাটা—যে কথাটা শূন্য বাতাসের কোলে কানে কানে ফিরেছে, ছড়িয়ে গেছে ওদের চোখে-মুখে সমস্ত অবয়বে, অন্তরের সেই ভালবাসাটা যেন ডুকরে কেঁদে ওঠে। চোখে জল আসে আবার। বেচারা হীরালালের দাঁতের কশ বেয়ে রক্ত ঝরাটা এখনো যেন তার অন্তরের ভিত চিরে চিরে রক্ত ঝরাচ্ছে। রুদ্ধশ্বাস ধোঁয়ায় ঘিরে ফেলছে। আঁচলে বাঁধা মুড়ির ঠোঙ্গাটা বের করে হীরালালের সামনে ধরে বাতাসী। বলে, এই লে, খেয়ে লে এই ক'টা মুড়ি!

মুড়ি! অবাক্ হয়ে চাইলো হীরালাল বাতাসীর দিকে। চাপা-পড়া খিদেটা যেন আবার বিছের কামড়ের মত চিড়বিড়িয়ে উঠছে। বলে, আমি এখনো পর্য্যন্ত কিছু খাইনি, তুই কি করে জানলি তা?

বারে, আমি জানবো না! জানিস্ হীরে, সেই দোকর বেলা থিকে আমার জানটা ক্যামন ক্যামন করছিল। আমি ঠিক ভেবে লিইছিলাম, তু আখুনো কুছু খাস নাই। তাই বিকেল বেলা থেকে আমি বেনে-বৌ-এর কাছে যেঞে বসেছিলাম। মুড়ি লিলম, ত্যাবে এলম। আস্তে আস্তে আবার স্বাভাবিক হয়ে এলো বাতাসীর গলা। মুখখানা খুশী খুশী হয়ে উঠলো হীরালালের মুড়ি খাওয়া দেখে। বললো, ইখানে জল কুথা পাবো?

এই ছাখ ঐ পাশে হাঁড়ীটাতে জল আছে। গেলাশ-পত্তর তো বিচ্ছু নেই।

গেলাশ নাই খো! তা'লে কি করা যায়! ভাবনায় পড়ে যায় বাতাসী। শুধু মুড়ি চিবিয়ে জল না খেয়ে কি থাকতে পারা যায়। খানিক ভাবতেই মাথায় বুদ্ধি খেলে যায় তার। শেষ পর্য্যন্ত ছোট খোকাকে দুধ খাওয়ানোর মত দু-হাতে করে আঁচলা আঁচলা জল এনে খাইয়ে দেয় হীরালালকে। বিচিত্র হাসিতে ঝলমলিয়ে উঠতে উঠতে। পাগলা বাতাসের মাতলামোতে গা ঢলিয়ে দিতে দিতে।

কোনও ভাঙ্গন ধরলো না। রাত্রির বুকে কাঁদন জাগলো না কোনও। চারপাশের অন্ধকার এসে লেপ্টে গেল না ওদের চোখের তারায়। শুধু খানিক গুমরে গুমরে উঠলো। রুদ্ধশ্বাস সাপের মত ফুঁসে ফুঁসে উঠলো বাতাসী হীরালালের হাত-পাগুলো টিপে দিতে দিতে। তার সমস্ত সত্তা যেন আঘাতে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো। মুড়ি ক'টা খেয়ে নিয়ে উবু হয়ে শুয়েছিল হীরালাল বেঞ্চিটার ওপর। ওর পিঠের কাছে বসে বসে পেশীগুলো টিপে টিপে দিচ্ছিল বাতাসী। মার খাওয়ায় ব্যথাটা একটু কম পড়বে, এই আশায়।

বাতাসী হঠাৎ বলে উঠলো, তু কি করবি মনে লিছিস্?

কিসের? জিজ্ঞেস করলো হীরালাল।

অত করে যে তুকে ঢেমনাটা মারলে, তা এমনি শুধু শুধু সয়ে যাবি?

তা ছাড়া আর উপায় কি বল?

আহা, মরদের কথা শোন ক্যানে? বলি, মরদ হয়ে জন্মেছিস্, মরদের মত কাজ করতে পারিস্ না? বিরক্তির রেখা ফুটে ওঠে বাতাসীর মুখে। খানিক পরে বলে, বেশ তুকে কিছু করতে হবে নাখো! আমি লিজেই যা করবার করবো। বেটা আমাকে চেনে না তো! উর ইজির-পিঁজির উজিন্ দোবো আমি!—হ্যাঁ।

বাতাসীর কথা শুনে হেসে ফেলে হীরালাল। অন্ধকারে হাতটা ঘুরিয়ে বাতাসীকে টেনে নেয় নিজের কাছে। গ্রীষ্মের রাত্রিটা বিচিত্র অনুভূতিতে ভরে যায়। বাতাসীর দেহে হাত রেখে আকর্ষণ করে। অলস হয়ে আসে দুজোড়া চোখের পাতা। গরম নিশ্বাসে অন্ধকার দোকান ঘরটাতেও বুঝি শিহর ছড়িয়ে যায়। রাত্রিটা কোথায় কোন অন্ধকারে বুক চেপে কাঁদছিল। এতক্ষণে আবার হাসতে শুরু করেছে। জলজ্বলে দুটো আত্মার চোখে ধূসর বিতৃষ্ণা মুছে নেমেছে নীড়ের স্বপ্ন।

নীড়ের স্বপ্ন তারা আরও কতক্ষণ বুনে যেত বলা যায় না। বোশেখ মাসের হিমধরা গাছপালার ফাঁক দিয়ে হঠাৎ অন্ধকারটা পাতলা হয়ে আসতে শুরু করে দিয়েছে। গুমোট সহরটা নড়ে-চড়ে উঠবে আর খানিক পরেই। আর খানিক পরেই বারান্দায় মশারী টাঙ্গিয়ে শুয়ে-থাকা লোক-গুলো কাশতে সুরু করে দেবে। তবে আজ রবিবার! অন্য দিনের মত বোবা যন্ত্রণাগুলো দশটা বাজার আগেই অফিসে ছুটে আসবে না। আর কালু মুচিও কাতরাতে কাতরাতে ছুটবে না কারখানার দিকে। তবু সহরের ঘুম ভাঙ্গবে। তবু লোকগুলো বিছানা ছেড়ে উঠবে। জিরিয়ে জিরিয়ে বিশ্রাম নেবে। বসে বসে খাবার খাবে। সুতরাং বাতাসীকে বললো হীরালাল, এবার যা। তোর ঘরে বোধ-হয় দেখ্‌গে গিয়ে হুলুস্থুল পড়ে গেছে এতক্ষণ। সকাল হতে তো আর দেরী নেই।

বাতাসী বলে, ধূর, তুও যেমনি একা, আমিও তেমনি একা। খাটি, খাই ক্যারু কথায় কাণ নাই। তা তু তা-হলে ঘুমো আরও। আমি চল্‌লাম।

পাতলা অন্ধকারে মিলিয়ে যায় বাতাসীর শরীরখানা। সেদিন আর আসে না সে। আসে পরের দিন, অফিস বসার পর। অফিস আওয়ারটা যখন জমে এসেছে, বড় সাহেবের ঘরে ঘন ঘন স্প্রাং-এর বেল বাজছে ঠিক তখনি।

হীরালাল তখন উনুনে তেল চাপিয়েছিল। বড় সাহেবের বরাত, পঞ্চাশটা চপ চাই। হায়য়াণ করা ফুটবল-প্লেয়াররা সব আসছে। অফিসের টীমের তরফ থেকে ফাইন্যাল খেলা খেলতে। কিন্তু পথের বাঁকের দিকে চেয়েই আবার চমকে গেল হীরালাল। বাতাসী আসছে। অন্য দিনের মত খালি গায়ে নয়। আজ একটা লাল ব্লাউজ পরেছে! কপালের ঝিলিক-দেওয়া টিপটা চকচকে চোখে পথ চেয়ে চেয়ে আসছে যেন। কাপড়টা আঁট করে জড়িয়ে ফিরিয়ে পরা। নিটোল দেহখানা দুলতে দুলতে নাচতে নাচতে আসছে যেন। কিন্তু ভয়ে বুক কাঁপতে

লাগলো হীরালালের। সেদিনকার কাণ্ডটার পর থেকে বড় বেশী সচেতন হয়ে উঠেছে সে। বাতাসীকে অনেক-বার বলে দিয়েছে যে দোকানে সে যেন আর না আসে। এলে পরে তার ঝুঁকি সইতে হবে হীরালালকে। তা সে পারবে না। আর যা খিটখিটে দোকানদার!

দোকানদার হঠাৎ খিঁচিয়ে উঠলেন, অমন করে ছাগলের মত দেখছিস্ কি, যা করছিস্ তাই কর্।

বাচ্চা সিধুটা এক থলি বাজার কাঁধে করে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে দাঁড়ায় হীরালালের সামনে। হাঁপাতে হাঁপাতেই বলে, হীরুদাদা, বাজারটো নামিন্ লাও তো মাথা থিকে।

মুখে কোনও কথা বলে না হীরালাল। উঠে গিয়ে বাজারগুলো নামিয়ে নেয় সিধুর মাথা থেকে। ততক্ষণে একেবারে দোকানে এসে পৌঁচেছে বাতাসী। ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরে মুখ খানা চুপসে গেছে যেন ওর। ব্লাউজখানা ঘামে ভিজে গিয়ে লেপ্টে গেছে বুকের মধ্যেখানের ভাঁজটাতে। দেখলো হীরালাল, সেই দিকে তাকিয়ে ফ্যাক ফ্যাক করে হাসছে দোকানদার। আশে-পাশে এত লোকজন; তবু বেহায়ার মত লোভাতুর দুটো চোখ যেন আছড়ে আছড়ে পড়ছে বাতাসীর দেহের ওপর। যেন কাপড়-চোপড় চিড়ে ভেতরে ঢুকবার জন্য আঁকু-পাকু করছে।

খানিক থেমে বাতাসী এগিয়ে গেল বিনয়বাবুর দিকে। বললো, কই দাও আমার টাকাটা!

টাকা! টাকা কিসের! নিমেষে সম্বিৎ ফিরে পান দোকানদার। বলে, তুই আমার কাছে টাকা পাস কোন কালে?

বাবু, মিছে কথা বলো না, ধম্মে সইবে না!

কি বললি, মিথ্যে কথা বলছি আমি। মারবো মুখে জুতোর বাড়ি, তো তোর মুখ ভেঙ্গে দেব না মাগী! চোখে রক্ত জমে যায় দোকানদারের। দাঁতে দাঁতে কসানি লাগে। চোয়াল শক্ত হয়ে আসে।

আর সেই মুহূর্ত্তে যেন আগুন ছড়িয়ে যায় বাতাসীর মুখে-চোখে। মুখ বেঁকিয়ে বলে ওঠে চীৎকার করে, উঁ ভারি আমার এক ছিদেমের দোকানদার রে! মুখে জুতোর বাড়ি মারবে! কই মারো দিকিনি কত তোমার ক্ষেমতা দেখি!

খবরদার! খবরদার বলছি—যা তা কথা বলবি না!

বলবে না তো তুকে ভয় করে বসে থাকবে রে ঢেমনা! তুর মত কত দোকানদার আমার দেখা আছে। তু টাকা ফ্যাল্, আমি চলে যাবো। রুদ্ধ আক্রোশে ফেটে পড়ে বাতাসী। চাপা গোমরানিতে অস্থির হয়ে পড়ে।

তুই আমার কাছে টাকা পাস্ কোন্ কালে? ধাপ্পা-বাজি করে টাকা আদায় করবার আর জায়গা পাসনি?

চীৎকারে আর হট্টগোলে ততক্ষণে অফিস থেকে লোক বেরিয়ে এসেছে অনেক। পিওনগুলো সব ছুটে এসেছে। বাইরে যারা এসেছিল তারাও ঘিরে দাঁড়িয়েছে দোকানটার আশে-পাশে। জোড়া জোড়া কৌতূহলী চোখ আছড়ে পড়েছে ওদের দুজনের ওপর।

ওদের মধ্যে থেকেই বলে উঠলো একজন, এ্যাই, এ্যাই মাগী! চিল্লাচ্ছিস্ কেন এমনি করে, দেখতে পাচ্ছিস্ না সামনেই একটা অফিস।

বাতাসী হাত নেড়ে নেড়ে বলে, চিল্লেয়িছি কি আর সাধে বাবু, স্তাখো কেনে, কাল রেতের বেলায় আমার কাছে যেয়ে, কি বলবো বাবু, এমন হ্যাংলা লুক আমি আর দুটো দেখি নাই।

সঙ্গে সঙ্গে হাসিতে ফেটে পড়লো গোটা ভিড়টা। চাপা চাপা কৌতূহল, রসিকতা আর মন্তব্য। একজন বলে, তা বিনয়বাবু, এসব অভ্যেস আপনার কতদিনকার?

আর একজন বলে, রাত্রি যখন কাটিয়েছেন তখন পাওনাটাও ওকে দিয়ে দেওয়া উচিত আপনার।

চ্যাংড়া পিওনটা চাপা গলায় বলে, হুঁ শালার মেয়ে-ছেলের গন্ধ পেলে আর কিছু চায় না দোকানদারটা।

দোকানদার তখন আবদ্ধ জানোয়ারের মত ফুঁ-ছিলেন। চোখ দুটো দপ্ দপ্ করছিল ক্রোধের জ্বালায়। নেহাৎ মেয়েমানুষ বলে চুপ করে গেলেন, নইলে বাতাসীর আজ হাড়ে-মাসে এক করে দিতেন! ছি, ছি, এতগুলো লোকের সামনে মাথা কেটে দিল হতচ্ছাড়ী।

হতচ্ছাড়ী কিন্তু আর বেশীক্ষণ দাঁড়ায় না সেখানে। সময় বুঝে সরে পড়ে। বড় সাহেবও এসে দাঁড়িয়েছেন বারান্দায়। পিওন, কেরাণীরা যেন ল্যাজ গুটিয়ে পালাতে আরম্ভ করে দিয়েছে। আর মুখ লাল করে বসে আছেন বিনয়বাবু। বকটা পুড়ে যাচ্ছে তার অপমানের জ্বালাতে।

অসহ্য একটা গোঙ্গানি ছটফট করছে অন্তরে অন্তরে। ইচ্ছে করছে, আছড়ে মেরে ফেলেন তিনি ঐ শুয়োরের বাচ্চা হীরালালটাকে। ইচ্ছে করছে, ওর গর্দানটাকে চিরে চিরে ফালা ফালা করে দেয়। সমস্ত বুঝতে পেরেছেন বিনয়বাবু। ঐ শয়তান আর শয়তানীটার কেরামতী এই সব। সে দিনকার মারার পাল্টা অপমান-শোধ।

ভয়ঙ্কর চোখের দৃষ্টিটা ছুঁড়ে দেন হীরালালের দিকে। গর্জন করে ওঠেন, বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা বলছি আমার দোকান থেকে!

সেকি! জ্বালা-ছড়ানো দুপুরটা হঠাৎ সেই মুহূর্ত্তে যেন ধাঁধা ছড়িয়ে দিল হীরালালের চোখে। তেলের কড়াটা নামিয়ে রাখলো বিঁড়ের ওপর। এতক্ষণ শুদ্ধ বিস্ময়ে আর কাঁপা-কাঁপা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে বসে ছিল সে। চোখ দুটো বড় বড় হয়ে এসেছিল। সবকিছু গোলমাল হয়ে, ওলট-পালট হয়ে গেছিল। মাথা ঝিমঝিম করছিল। বাতাসী এতক্ষণ কি করে গেল, কি বলে গেল কিছু যেন বুঝতে পারছিল না। দোকানদারের কথায় এবার উঠে দাঁড়ালো হীরালাল।

দোকানদার আবার হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, এই নে তোর চোদ্দ দিনের মাইনে, এক টাকা করে চোদ্দ টাকা। আর কোনও দিন এ দোকানে পা দিবি না বলে রাখছি—হারামজাদা! শুয়োর কোথাকার!

হীরালাল বললো, চোদ্দ টাকা নয় বাবু। বারো টাকা সেদিনকার দুটো টাকা পাবেন আমার কাছে।

পথে এসে যখন নামলো হীরালাল, দুপুরের রোদ তখন একেবারে মাথার ওপর। আসবার সময় সিধুর চোখ দুটোর দিকে চেয়ে বুক কেঁপে উঠলো হীরালালের। অনেকদিন ধরে এক সঙ্গে কাজ করেছে ওরা। একটা মায়া পড়ে গেছে। গভীর মমতা। লক্ষ্য করে দেখছিল হীরালাল, একটা রক্তক্ষয়ী চাপা কান্না যেন থমকে দাঁড়িয়ে আছে ওর চোখে। তবু চলে আসে হীরালাল। এদিক-ওদিক চেয়ে দেখে। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে শুয়ে আছে সবাই। ঘূর্ণী হাওয়ায় ধুলোর মেঘ ছুটে যাচ্ছে পথের এপাশ থেকে ওপাশে। চোখে কিছু দেখতে পাওয়া যায় না। সব ঝাপসা।

শুধু শোনা যায়, নির্জন দুপুরের রোদ-পোড়া আকাশের নীলে তখনো পাক খেয়ে খেয়ে গলা ফাটাচ্ছে একটা চিল। হয়ত আকাশটাকেও ফাটিয়ে দিতে চাচ্ছে।

হিন্দু সমাজের উপর মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রভাব কেন বেশী

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

বাংলার হিন্দু সমাজের উপর নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রভাব এত বেশী হইবার কারণ কি? তাঁহার মতন রাজা, মহারাজা, ধনী, জমিদার, ব্রাহ্মণ জমীদার তাঁহার পূর্ব্বে, তাঁহার সময়ে ও তাঁহার পরেও ত আরও ছিল, তথাপি তাঁহার প্রভাব যেমন বেশী এমনটী আর কাহারও নহে। সকলেই শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার এই প্রভাব স্বীকার করে। নবদ্বীপের সান্নিধ্য ইহার অন্যতম কারণ হইলেও সবটা বা বেশী কিছুটা নহে। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলেও, মহাকুলীন ছিলেন না—রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রোত্রিয় শ্রেণীর ছিলেন। আমরা এ বিষয়ে কিছু তথ্যগত আলোচনা করিব; আমাদের আলোচনায় ত্রুট থাকা সম্ভব, দেখাইয়া দিলে অনুগৃহীত অনুভব করিব।

২। বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলের পরিমাণ প্রায় ৯৩,০০০ বর্গমাইল। ইংরাজ শাসিত অখণ্ড বাংলার পরিমাণ ৭৭,০০০ বর্গ মাইল; আমরা এই শেষোক্ত বাংলার তথ্যাদি লইয়া বিশেষ আলোচনা করিব। আমাদের বিশ্বাস এই ক্ষুদ্রতর বাংলার তথ্যাদি আলোচনা করিয়া যে সিদ্ধান্তে পৌছিব তাহা প্রকৃত সত্যের খুব কাছাকাছি হইবে। কারণ প্রথমেই আমরা বাংলা ভাষা-ভাষী অঞ্চলের শতকরা ৮৩ ভাগ লইয়া আলোচনা করিতেছি; আর এই অঞ্চলে বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যা আনুপাতিক হিসাবে আরও বেশী।

৩। মোগল যুগের শেষে ইংরাজ রাজত্বের সূত্রপাতে যে সব বড় বড় জমীদারী ছিল তাহার পরিমাণ, জমীদারী ছিল জমীদাররা কি জাতি তাহা নিম্নে দিলাম। তখনকার দিনে জমীদারদের অন্য বিষয়ে প্রতাপ ও ক্ষমতা থাকিলেও সমাজের উপর প্রভাব খুবই কম ছিল। জাতি হিসাবে, ব্রাহ্মণ হইলে, প্রভাব থাকিত ও ছিলও।

রাজ		পরিমাণ		জাতি
১। নদীয়া	—	৩,১৫১ বর্গমাইল	—	ব্রাহ্মণ
২। নাটোর	—	১২,৯০৯ „	—	ব্রাহ্মণ
৩। দিনাজপুর	—	৪,১১৯ „	—	কায়স্থ
৪। বর্দ্ধমান	—	৫,১৭৪ „	—	পাঞ্জাবী ক্ষত্রিয়
৫। বিষ্ণুপুর	—	১,২৫৬ „	—	মল্লক্ষত্রিয়
৬। বীরভূম	—	৩,৮৫৮ „	—	মুসলমান
৭। পুর্ণিয়া	—	৫,১৭৪ „	—	মুসলমান

পরিমাণ সম্বন্ধীয় তথ্যগুলি আমরা ফার্মিঙ্গার সাহেব সম্পাদিত ফিফথ্ রিপোর্টের ২য় খণ্ডের ৩৫৯, ২৯৬, ৩১৬, ৪০৭, ৩৯৬, ৩৩৩ ও ৩৬৫ পৃঃ হইতে লইয়াছি।

৪। উপরোক্ত বড় বড় জমিদারী বা রাজের মধ্যে নদীয়ারাজ ও নাটোর রাজ ব্রাহ্মণবংশীয়। এজন্য প্রভাব তাঁহাদেরই বেশী হইতে পারে; অন্যান্য রাজের হইতে পারে না। নাটোর রাজের পরিমাণ নদীয়া-রাজের চারিগুণ; তথাপি তাঁহাদের প্রভাব খুবই কম, কৃষ্ণচন্দ্রের তুলনায়। এইরূপ হইবার একটি কারণ নাটোর-রাজ আরম্ভ হয় নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর (১৭০৭—১৭২২) আমলে; আর নদীয়ারাজ আরম্ভ হয় মহারাজ মানসিংহের সুবেদারীর আমলে (আন্দাজ ইং ১৫৯৬ সালে)। নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা পূর্ব্বে পূজারী ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া শুনা যায়; তিনি মুর্শিদকুলি খাঁর অনুগ্রহে "অর্দ্ধ বঙ্গেশ্বর" হওয়ার অনেকেই তাঁহাকে সুনজরে দেখিত না, বলিত "রঘুনগুনি বাড়"। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নদীয়া রাজবংশ বুনিয়াদী বংশ; আর নাটোর রাজবংশ "নূতন বড়-মানুষের" বংশ। এইটি নাটোরের প্রভাব তাদৃশ বেশী না হওয়ার একটা কারণ হইতে পারে বলিয়া মনে করি।

৫। নাটোর রাজবংশের সুনাম মহারাজা রামকৃষ্ণের সাধনা ও রাণী ভবানীর দান-ধ্যান হইতে হইয়াছে। রাণী ভবানীর সময় আন্দাজ ইং ১৭১৪ হইতে ১৭৯৩ পর্য্যন্ত। তাঁহার দান-ধ্যান, বাংলার বহুস্থানে দেবালয় প্রতিষ্ঠা ও পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত দেবস্থানের সেবাপূজার ব্যবস্থা, পুনঃ প্রতিষ্ঠা প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছে। বর্ত্তমান কাশী দুই রাণীর—রাণী অহল্যাবাইয়ের ও রাণী ভবানীর প্রতিষ্ঠিত। ঔরঙ্গজেবের অত্যাচারে কাশী বিশ্বনাথ শূন্য, মন্দির শূন্য; এমন কি পঞ্চক্রোশী কাশীর যে সীমানা তাহাও লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল। রাণী ভবানী বহু ব্যয়ে বহু চেষ্টায়, বড় বড় পণ্ডিতদের সহায়তায়, "পদ্ধতি" পুস্তকাদি আলোচনা করিয়া কাশী পরিক্রমার জন্য পঞ্চক্রোশীর সীমানা নির্দ্ধারণ করিয়া স্তম্ভ ও রাস্তা, পাশে পাশে ধর্মশালা স্থাপন করেন। ইং ১৭৫৩ সালে কাশীতে ভবানীশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা করেন। কাশীর সুবিখ্যাত দুর্গাবাড়ি, দুর্গা-কুণ্ডু, ভক্তিবাটীর 'কুরুক্ষেত্র তলাও', পিশাচ-মোচনের কুণ্ড, আদি-কেশবের ঘাট প্রভৃতি তাঁহার কীর্ত্তি। তিনি কাশীতে দ্বিতীয় অন্নপূর্ণা রূপে বিরাজমানা ছিলেন। একবার তিনি কাশীতে ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠা করিবার মানসে সঙ্কল্প করেন যে এক বৎসর একদিন নিত্য গঙ্গাস্নান সারিয়া এক পক্ষে যাবতীয় গৃহস্থালীর দ্রব্যাদি ও একবৎসর একদিনের সপরিবারে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা সহ দান করিবেন। বাঙ্গালি ব্রাহ্মণেরা কাশীর মাটি লইলে যশদান গ্রহণ করা হয়, তাহাতে সোনা চুরির পাপ স্পর্শ করে বলিয়া এই দান লইতে অস্বীকার করেন। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণেরা এই দান লইতে স্বীকার করেন; এমতে কাশীতে ৩৬৫ খানি বাড়ি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণকে দান করেন। ফলে কাশীতে বহু মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা হয়। রাণী ভবানীর দানের তুলনা হয় না। দুঃখের বিষয় রাণী ভবানীর দানের প্রামাণ্য তালিকা সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

রাণী ভবানী বাংলা ১২০০ সালে, জোড়া পুণ্যের বৎসর মারা যান। তাঁহার মৃত্যুর সওয়া শত বৎসর পরেও আমরা বাড়ুয্যে মহাশয়কে—যিনি কাশীতে পরমানন্দ ব্রহ্মচারী রূপে সাধারণে পরিচিত ছিলেন, রাণী ভবানীর নাম শুনিলেই কপালে দুইহাত তুলিয়া প্রণাম করিতে দেখিয়াছি। তিনি বলিতেন রাণী ভবানী নাম শুনিলেও পুণ্য হয়। কিন্তু রাণী ভবানীর হিন্দু সমাজের উপর—তাঁহার দিব্য জীবনের ও দানের ও কীর্ত্তির উদাহরণ বা আদর্শ ছাড়া তাদৃশ প্রভাব দেখা যায় না বা শুনা যায় না। এইরূপ হইবার কারণ কি? একটি কারণ এই যে তিনি স্ত্রীলোক ও বিধবা বিষয়ে সাক্ষাৎভাবে সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে চাহেন নাই। অন্যান্য যেগুলি কারণ বলিয়া আমাদের মনে হয় তাহা পরে প্রসঙ্গ ক্রমে আলোচনা করিব।

৬। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, সম্পূর্ণ উপাধি মহারাজ রাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র অগ্নিহোত্রী রাজপেয়ী ভূপ বাহাদুর ইং ১৭১০ হইতে ইং ১৭৮৩ সাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। এমতে তিনি রাণী ভবানীর সমসাময়িক ছিলেন। ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে লিখিয়াছেন যে:—

"নদীয়া প্রভৃতি চারি সমাজের পতি।
কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ শুদ্ধশান্তমতি॥"

দিল্লীর বাদশাহ বর্দ্ধমানের মহারাজাকে "মহারাজাধিরাজ বাহাদুর" খেতাব দিলে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র দিল্লীতে ঐ উপাধি পাইবার জন্য দরবার করেন। তাহাতে বাদসাহ বলেন যে এক সুবেদারের অধীন এলাকায় দুইজন "মহারাজাধিরাজ বাহাদুর" থাকিতে পারে না। আগে যদি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র দরবার করিতেন তাহা হইলে তাঁহাকেই এই উপাধি দিতাম, কারণ তিনি সর্ব্বগুণান্বিত বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তবে আমি তাঁহার ন্যায় সর্ব্ব গুণান্বিত ব্যক্তিকে এমন উপাধি দিব যে ইহার পূর্ব্বে কেহ এই উপাধি পান নাই, এই বলিয়া তিনি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে "মহারাজরাজেন্দ্র" এই উপাধি দেন।

ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকার সম্বন্ধে লিখিয়াছে যে:—

"অধিকার রাজার চৌরাশী পরগণা।
গাড়ি জুড়ী আদি করি দপ্তরে গণনা
রাজ্যের উত্তর সীমা মুরশিদাবাদ।

দক্ষিণের সীমা গঙ্গাসাগরের ধার।
পূর্ব্ব সীমা ধূল্যাপুর বড়গঙ্গা পার॥
ফরমানী মহারাজ মনসবদার।
সাহেব নহবৎ আর কানগোহ ভার॥
কোঠায় কাঙ্গুরা বড়ী নিশান নহবৎ।
পাতশাহী শিরপা সুলতানী সুলতানৎ॥
ছত্রদণ্ড আড়াণী চামর মোরছল।
সরপেচ মোরছা কলগী নিরমল॥
দেবীপুত্র নামে রাজা বিদিত সংসারে।
ধর্ম্মচন্দ্র নাম দিলা নবাব যাহারে॥
সেই রাজা এই অন্নপূর্ণার প্রতিমা।
প্রকাশিয়া পূজা কৈল। অনন্ত মহিমা॥"

এক সুবেদারের অধীন এলাকায় দুইজন মহারাজাধিরাজ বাহাদুর থাকিতে পারে না বাদসাহ বলিয়াছিলেন। দ্বারবঙ্গের মহারাজা লক্ষ্মীশ্বর সিংহ বড়লাটের আইন সভার সদস্য ছিলেন। তিনি অতি তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। একবার বড়লাট লর্ড ডফেরিনকে আমন্ত্রণ করিয়া দ্বারবঙ্গে লইয়া যাবেন। লাট সাহেব তাঁহার প্রাসাদে রাত্রিবাস না করিয়া রেলের সেলুনে রাত্রিবাস করেন—এজন্য লক্ষ্মীশ্বর সিংহ বাহাদুর ফিরিবার কালে বড়লাটের সহিত দেখা করেন নাই। তিনি মহারাজাধিরাজ বাহাদুর উপাধি পাইবার চেষ্টা করিলে ইংরাজ সরকার বলেন যে একই লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের শাসনাধীনে এলাকায় দুইজন মহারাজাধিরাজ থাকিতে পারে না। পরে ইং ১৯১২ সালে বিহার বাংলা হইতে আলাহিদা প্রদেশ হইলে দ্বারবঙ্গের মহারাজা রামেশ্বর সিংহ বাহাদুর পাটনার লাটের Executive council এর মেম্বর থাকাকালীন বহুচেষ্টা করেন। প্রথমে ইংরাজ সরকার এই উপাধি দিতে রাজি হয়েন নাই, পরে মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত উপাধি-বর্জ্জন আন্দোলন চলিতে থাকিলে শাসনের ভাঙ্গা-হাটে তাঁহাকে মহারাজাধিরাজ উপাধি দেন। এমতে বর্ত্তমান মহারাজাধিরাজ বাহাদুর দ্বিতীয় উপাধিধারী; বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মহতাব বাহাদুরের ন্যায় সাত পুরুষে উপাধিধারী নহেন। এখন ত নূতন জমানায় মুড়ি-মিছরির একদর; সব উপাধিই ত লোপ পাইয়াছে।

৭। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার রাজ্যমধ্যে বহু দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেন। কাশীতে জ্ঞানবাপীর সংস্কার করেন। এই জ্ঞানবাপীতে ঔরঙ্গজেব বিশ্বনাথের মন্দির ভাঙ্গিয়া, অপবিত্র করিয়া, মসজিদ নির্ম্মাণ করিলে, বিশ্বনাথের পাণ্ডারা বিশ্বনাথকে লুকাইয়া রাখেন। ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"কাশীতে বান্ধিলা জ্ঞানবাপীর সোপান।"

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র একবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে কাশী কাঞ্চী প্রভৃতি স্থান হইতে আগত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা বলেন যে কলিযুগে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে নাই; তৎপরিবর্ত্তে সমফলপ্রদ বাজপেয়া যজ্ঞ বাংলা দেশে গত ৭।৮ শত বৎসরের মধ্যে আর কেহ যে এই যজ্ঞ করিয়াছেন, তাহা শুনি নাই,; এ বিষয়ে কোনও জনশ্রুতিও নাই। বাজপেয়ী যজ্ঞ সমাপনান্তে তিনি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের বিদায় দিবেন, এমন সময়ে খবর আসিল যে তাঁহার রাজ্যমধ্যে এক শ্বেতবরাহ ধরা পড়িয়াছে। শ্বেতবরাহের রং সাদা, এক বিঘত করিয়া দুটি সোনালি শৃঙ্গ; আর পায়ের খুর ঘোঁড়ার ন্যায় জোড়া, একখণ্ড—গরুর খুরের ন্যায় চেরা নহে। এই সংবাদ শুনিয়া কাশী, কাঞ্চী হইতে আগত শাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণেরা আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিলেন, বলিলেন মহারাজ! আপনি যজ্ঞের ফল হাতে হাতে পাইয়াছেন। মহারাজা প্রশ্ন করিলেন—এই শ্বেতবরাহ লইয়া আমি কি করিব? পণ্ডিতেরা বলিলেন যে আগামী অমাবস্যায় আপনি পিতৃপুরুষগণের মাংসাষ্টক শ্রাদ্ধ করিবেন ও এই শ্বেতবরাহের মাংস পোড়াইয়া পিণ্ড দিবেন; আপনার ২১ কোটী কুল উদ্ধার হইবেন। অবশিষ্ট মাংস কি হইবে জিজ্ঞাসা করায়, পণ্ডিতেরা বলিলেন—কেন আপনি খাইবেন; শ্বেতবরাহের মাংস অতি শুদ্ধ। মহারাজা বলিলেন—আমাকে ভাবিতে ৩ দিন সময় দিন। পরে মহারাজা ৩ দিন উপবাসী থাকিয়া বলিলেন যে আমি মাংসাষ্টক শ্রাদ্ধ করিব না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা বলিলেন কেন? আপনি কি শাস্ত্র-বাক্য বিশ্বাস করেন না? মহারাজা বলিলেন যে শাস্ত্র সত্য; আমি মাংসাষ্টক শ্রাদ্ধ করিলে আমার ২১ কোটি কুল উদ্ধার পাইবেন সত্য; কিন্তু আমি ৮৪ পরগণার সমাজপতি; আমার দেখাদেখি যাহার বুনোশূয়োর খাইবার ইচ্ছা হইবে, সে বুনোশূয়োর মারিয়া মাংসাষ্টক শ্রাদ্ধ করিবে ও শূয়োরের মাংস খাইবে। আমার দেখাদেখি সমাজে অনাচার প্রবেশ করিবে।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র শুধু "আপনি আচরি ধর্ম্ম অপরে শিখায়" এর আদর্শ গ্রহণ করেন নাই; আমার আচরণের ব্যভিচারি নকল করিয়া যাহাতে সমাজের শৃঙ্খলা নষ্ট হয় এইরূপ আচরণ করিতেও নারাজ ছিলেন। তিনি আদর্শ সমাজপতি ছিলেন। সাধে কি ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন:—

"রাজা রাজচক্রবর্ত্তী ঋষি ঋষিরাজ।
ইন্দ্রের সমাজ সম যাঁহার সমাজ॥

ইহা চাটুকারের স্তাবকতা নহে। ইহা মহারাজের আসল চরিত্রের বর্ণনামাত্র।

৮। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ইংরাজকে ডাকিয়া আনিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন বলিয়া অনেকে তাঁহার নিন্দা করেন। সিরাজ উদ্-দৌল্লা অত্যাচারী ছিল—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে নবাব রাণী ভবানীর মতন অর্দ্ধবঙ্গেশ্বরীর বিধবা কন্যা তারাকে হারেমজাত করিবার জন্য সিপাই পাঠাইতে পারে, যে তারা মন্সারাম বাবাজীর আখড়ায় লোক বাধা না দিলে নবাবের হারেমে যাইত, যে তারাকে রক্ষা করিবার জন্য রাণী ভবানীর মতন শক্তিশালিনী জমীদার মিথ্যা মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা ও মিথ্যা শবদাহের ভান করিতে হইয়াছিল, সে নবাব সাধারণের উপর যে কি অত্যাচার করিত তাহা সহজেই অনুমেয়। সিরাজ উদ্-দৌল্লা বাদসাহী

দৌহিত্র হিসাবে—ওয়ারিষ সূত্রে। কতকটা বর্ত্তমান নিজাম-বাহাদুরের স্বাধীন হওয়ার মতন—নামে ও কাজে নিজাম, অথচ দিল্লীর অধীন নহেন।

নবাব আলিবর্দ্দীও সকল মুসলমানের স্থায় পারিলে হিন্দুর দেবস্থান নষ্ট করিতেন। উড়িষ্যার সহকারী সুবেদার বিদ্রোহ করিলে, তাঁহাকে দমন করিবার কালে আলিবর্দ্দী, ভারতচন্দ্রের ভাষায়,

"উড়িষ্যা করিল ছার লুটিয়া পুড়িয়া।
বিস্তর লস্কর সঙ্গে অতিশয় জুম।
আসিয়া ভুবনেশ্বরে করিলেক ধূম॥
"ভুবনে ভুবনেশ্বরে মহেশের স্থান।
দুর্গাসহ শিবের সর্ব্বদা অধিষ্ঠান॥
দুরাত্মা মোগল তাহে দৌরাত্ম্য করিল।

* * * *

লুটিয়া ভুবনেশ্বর যবন পাতকী॥
নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।
বিস্তর ধার্ম্মিক লোক ঠেকে গেল দায়॥"

নবাবকে তাড়াইতে হইলে সাহায্য লইতে হয়, হয় ইংরাজের না হয় মহারাষ্ট্রীয় বর্গীদের। বর্গীদের ভীষণ অত্যাচারে তাহাদের নাম মুখে আনা যায় না—কাজে কাজেই বাধ্য হইয়া ইংরাজের সাহায্য লইতে হয়। আমাদের দেশাত্মবোধ হইতেছে ইংরাজকে বে-ধড়ক গালাগালি, ইংরাজের দোষ দেখাইতে পারিলেই আমাদের নিজেদের সমস্ত দোষ স্খালন হইয়া গেল, ইহাই হইতেছে আমাদের মনোবৃত্তি।

৯। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র বহু ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মোত্তর দান করিয়াছিলেন, এজন্য একটা প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে যে যে ব্রাহ্মণের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের "ছাড়" নাই, সে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণই নয়। এমন এই প্রবাদের মূলে কতটুকুর সত্য আছে যা থাকিতে পারে তাহা নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিব।

অখণ্ড বঙ্গে বিভিন্ন আদম-সুমারীর সময় ব্রাহ্মণদের সংখ্যা নিম্নলিখিত মত ছিল যথা:—

১৮৮১—১০,৮০,৩৮৪ জন ; ১৯১১—১২,৫৩,৮৩৮ জন
১৮৯১—১১,২৯,৮০৪ " ; ১৯২১—১৩,০৯,৫৩৯ "
১৯০১—১১,৬৬,৯১৯" , ১৯৩১—১৪,৪৭,৬৯১ "

৫০ বছরে ব্রাহ্মণেরা বাড়িয়াছেন শতকরা ৩৪·০৭ জন করিয়া। যদি আমরা ইং ১৮৮১ সালের পূর্ব্বের ১০০ বা ১৯০ বৎসর তাঁহারা এই হারে বাড়িয়াছিলেন ধরিয়া লই ত খুব অন্যায় হইবে না। ইংরাজ রাজত্বের গোড়ার দিকে, অর্থাৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর প্রজা-সংখ্যা যে দ্রুত ভাবে বাড়িয়া ছিল তাহার অন্যান্য প্রমাণ আছে। এমতে আমাদের হিসাব মতে তাঁহাদের সংখ্যা ইং ১৭৮১ ও ইং ১৭৭১ সালে এইরূপ হয়। যথা:—

১৭৮১—৬,০১,০০০
১৭৭১—৫,৯৬,০০০

ব্রাহ্মণ বাংলায় আনায় তাঁহাদের গত ৫০, বছরের বৃদ্ধিটা অযথা স্ফীত হইয়াছে। একথাও যেমন সত্য, তেমন ইং ১৮৭২ সাল থেকে ইং ১৯৩১ সালের মধ্যে সমগ্র বর্দ্ধমান বিভাগের লোক-সংখ্যা (যে বর্দ্ধমান বিভাগে বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণদের মধ্যে শতকরা ৩৮ জন—পূর্ব্বে আরও বেশী বলিয়া মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে) দুইবার কমিয়া গিয়াছিল। বর্দ্ধমান বিভাগের জনসংখ্যা হ্রাসবৃদ্ধির হিসাব নিয়ে দিলাম। যথা:—

	শত করা— বৃদ্ধি (+), কমি (—)
১৮৭২—১৮৮১	—২·৮
১৮৮১—১৮৯১	+৪·০
১৮৯১—১৯০১	+৭·২
১৯১১—১৯২১	—৪·৯
১৯২১—১৯৩১	+৭·৪

গত ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে যশোহর, নদীয়া প্রভৃতি স্থান দারুণ ম্যালেরিয়া বা মহামারীতে বিধ্বস্ত হয়। পরে এই মহামারী বর্দ্ধমান বিভাগে ষষ্ঠ দশকে প্রবেশ করিয়া দেশ উজাড় করিতে থাকে।

হাণ্টার সাহেব তাঁহার ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল এ্যাকাউণ্ট অব বেঙ্গলের হুগলী জেলার বিবরণীতে লিখিয়াছেন (৪৩৬-৪৩৭ পৃঃ দেখুন) যে:—

Statement showing the mortality due to fever in Certain villages of Hugli Distirct

No. of villages :—60

Population before Fever	No. of Deathes
78 607	40,124
Pohulation in 1870 71	**Years in which the discese appealod**
38,483	1862—69

অর্থাৎ লোক-সংখ্যা না বাড়িয়া শতকরা ৫১ জন করিয়া কমিয়া গিয়াছিল।

এমতে মনে হয় বহিরাগতদের দ্বারা ব্রাহ্মণদের যে সংখ্যা বাড়িয়াছে এবং তাহার ফলে বৃদ্ধির হার যে পরিমাণে স্ফীত হইয়াছে, বর্দ্ধমান বিভাগে ও মধ্যবঙ্গে মহামারীর ফলে তাঁহাদের সংখ্যা ও বৃদ্ধির হার সেই পরিমাণে বা তাহার অধিক পরিমাণে কমিয়াছে। মোটামুটী মিনাবে আমরা ব্রাহ্মণদের যে সংখ্যার হিসাব করিয়াছি তাহা প্রকৃত সংখ্যার খুব কাছাকাছি হইবে।

১০। বাংলা ১১৭৬ সালে মন্বন্তর হয়, এবং বাংলার একতৃতীয়াংশের উপর লোক মারা যায়। বাংলা সন ১১৭৬ সাল ইংরাজী ১৭৬৯—১৭৭০ এর সমান। ইং ১৭৭১ সালে ব্রাহ্মণদের যে হিসাব করিয়াছি ইহা মন্বন্তরের পরের হিসাব। এখন দেখা যাউক মন্বন্তরের পূর্ব্বে তাঁহাদে

Land System পুস্তকে (যাহা Land Revenne Commission-এর ২য় খণ্ডে ছাপা হইয়াছে) লিখিয়াছেন যে :—

According to Sir W, W. Hunter, 35 per cent of the total and 50 per cent of agricultnral population passed away in the famino of 1770, He also states that "in 1771 more than ⅓ of the cultural land was rcurned in the public accounts as 'deserted', In 1776, the entries in this column exceeded ½ of the total, For the first 15 years after the famine. depopulation steadily increased."

যদি আমরা ধরিয়া লই যে জন-সংখ্যার যে পরিমাণ লোক মন্বন্তরে মরিয়াছিল ব্রাহ্মণদের মধ্যেও সেই পরিমাণ লোক মারা গিয়াছিল এবং তৎপরবর্ত্তী ১৫ বৎসর ধরিয়া জন-সংখ্যা মায় ব্রাহ্মণদের সংখ্যা কমিয়াছিল, তাহা হইলে আমাদের লব্ধ ১৭৭১ সালে ব্রাহ্মণদের সংখ্যা—৫,৬৬,০০০, ব্রাহ্মণদের প্রকৃত সংখ্যা অপেক্ষা যথেষ্ট বেশী।

ব্রাহ্মণেরা নিজের হাতে চাষ করেন না। এজন্য তাঁহাদের মধ্যে মৃত্যুর পরিমাণ (শতকরা ৩৫ জন) অপেক্ষা কম এবং পরবর্ত্তী ১৫ বৎসরে তাঁহাদের সংখ্যা সাধারণ চাষীদের ন্যায় দ্রুত না কমিলেও বাড়ে নাই ধরিয়া লইলে অসঙ্গত হয় না। এমতে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পূর্ব্বেও তাঁহাদের সংখ্যা ৫,৫০,০০০ ধরিলাম। কিছুটা বাদ দিলাম এইজন্য যে তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা যাযাবর বৃত্তি করিয়া জীবন-ধারণ করিতেন তাঁহারা মারা গিয়াছিলেন। মোটামুটি হিসাবে ৫,৫০,০০০ প্রকৃত সংখ্যার খুব কাছাকাছি হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি।

১১। এক্ষণে আমরা ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পূর্ব্বে কত "ঘর" ব্রাহ্মণ ছিল, তাহার হিসাব করিব। নদীয়ার কালেক্টার সাহেব ইং ১৮০২ সালে থানা-সুবারীর হিসাব বা গ্রামে গ্রামে বাড়ির হিসাব হইতে লোক-সংখ্যা নির্দ্ধারণের বেলায় গড়ে প্রত্যেক বাড়িতে ৬ জন করিয়া লোক ধরিয়াছেন। হান্টার সাহেবের ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল এ্যাকাউন্ট অব বেঙ্গল, নদীয়া খণ্ড ৩৪ পৃঃ দেখুন। তথনকার দিনের নদীয়া বর্ত্তমান কালের (ইং ১৯৩১) নদীয়া জেলা অপেক্ষা বহু বড় জেলা ছিল।

বুকানন হ্যামিল্টন পূর্ণিয়া জেলা সম্বন্ধে যে হিসাব তাঁহার বিবরণীর ৬০০ হইতে ৬০৩ পৃষ্ঠায় দিয়াছেন, তাহা হইতে হিসাব করিলে গড়ে পরিবার বা "ঘর" প্রতি লোকের সংখ্যা হয় ৬.০৮ জন করিয়া। আর আমরা যদি ভিখারীর ও ভবঘুরের সংখ্যা বাদ দিই, তাহা হইলে গড় দাঁড়ায় ৬.১৩ জন করিয়া।

ব্রাহ্মণেরা সাধারণতঃ সদাচারী ও স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মাদি পালন করিয়া থাকেন। এমতে তাঁহাদের মধ্যে শিশু-মৃত্যু বা অকাল মৃত্যু প্রভৃতি কম হইবে আশা করা যায়। ইং ১৯৩১ সালে এ বিষয়ে একটী তদন্ত হয়, তদন্তের ফলাফলের চুম্বক নিম্নে দিলাম। যাঁহারা এ বিষয়ে আরও জানিতে চাহেন তাঁহাদের ইং ১৯৩১ সালের বাংলার আদম-শুমারীর রিপোর্টের ১৬৬ পৃঃ দেখিতে অনুরোধ করি।

Average number of Children Surviving to each family according to duration of marriage.

Duration of marriage	Brahman	Muslims	Other Hindus
0—6	0·9	0 9	0·9
7—13	2·3	2·2	2·0
14—16	3·4	3·0	2·9
17—26	4·1	3·5	3·4
27—32	4·3	3·6	3·9
33 & Over	4·7	4·0	4·0

দেখা যায় ব্রাহ্মণদের মধ্যে জীবিত সন্তানসংখ্যা মুসলমানদের ও সাধারণ হিন্দু অপেক্ষা বেশী। সর্ব্ব গড় যেখানে ৪.২ জন, ব্রাহ্মণদের মধ্যে সেখানে গড় ৪.৭। বাপ-মাকে ধরিয়া ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রতি পরিবারে ২+৪.৭=৬.৭ জন করিয়া হয়; আর তাহার বিধবা মাতা বা মাতা-পিতা থাকিলে পরিবারের জন-সংখ্যা আরও বাড়িয়া যায়। কিন্তু গড়ে বিধবা মাতা বা মাতা-পিতা সর্ব্ব ক্ষেত্রে থাকে না। আবার ব্রাহ্মণেরা একান্নবর্ত্তী যৌথ হিন্দু পরিবার প্রথার পক্ষপাতী; অন্ততঃ পক্ষে দেড়শত দুইশত বৎসর পূর্ব্বে আরও ছিলেন। তাঁহারা বিধবা ভগ্নী, মাসী, পিসিকে যেভাবে পরিবার মধ্যে রাখিয়া পালন করিতেন বা এখনও বহুক্ষেত্রে করেন, তাহা অন্যান্য হিন্দুর আদর্শ স্থানীয়। এজন্য আমরা ব্রাহ্মণদের মধ্যে পরিবার বা "ঘর" প্রতি সে সময়ে, অর্থাৎ ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পূর্ব্বে অন্ততঃ পক্ষে ৭জন করিয়া লোক ছিল ধরিতে হইবে। আমাদের ব্যক্তিগত মত যে ৭.৫ জন করিয়া ধরা উচিৎ।

১২। এ মতে সে সময়ে ব্রাহ্মণ পরিবারের বা ঘরের সংখ্যা হইতেছে ৫,৫০,০০০÷৭=৭৮,৫৭১টী। এক কথায় ৭৮,০০০ "ঘর" ছিল। ৭.৫ দিয়া ভাগ দিলে "ঘরে"র সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৩,৩৩৩টী—কিন্তু এইটি আমাদের ব্যক্তিগত মত বলিয়া বাদ দিলাম। এ বিষয়ে আরও তথ্য পাইলে আরও সঠিক ভাবে ব্রাহ্মণদের মধ্যে পরিবারের বা "ঘরে"র সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হইত।

১৩। পূর্ব্বেই বলিয়াছি নদীয়া রাজ্যের আয়তন ছিল ৩,১৫১ বর্গ মাইল। রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর বাংলার জেলাসমূহের আয়তন ও দেওয়ানী, ফৌজদারী ও রাজস্ব সম্বন্ধীয় এলাকা কখন কি ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে ইং ১৯১৮ সালে এক পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। এই পুস্তিকা সরকারী প্রকাশন—যদিও তাহা সাধারণকে বিক্রয় করা হয় না। নদীয়া-রাজ্যের বিস্তৃতি সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন যে বর্ত্তমানের নদীয়া জেলার সদর ও রাণাঘাট মহকুমা ও মেহেরপুরের ক্ষুদ্র এক অংশ, ২৪পরগণা জেলার বারাসত ও সুন্দরবন বাদে বসির-হাট মহকুমার অবশিষ্ট অংশ, যশোহর জেলার বনগাঁ মহকুমা ও যশোহর সদর মহকুমার দক্ষিণ-পূর্ব্ব অংশ, এবং খুলনা জেলার সাতক্ষীরা

মহকুমার পশ্চিমাংশ পর্য্যন্ত এই রাজ্য বিস্তৃত ছিল। ইং ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় সাতসিকা পরগনা এবং সরস্বতী ও ভাগীরথীর মধ্যবর্ত্তী সমস্ত জায়গা এই রাজ্যভুক্ত ছিল। তাঁহার ঐ বইয়ের ৪২ পৃঃ দেখুন।

ফার্মিঞ্জার সাহেব সম্পাদিত ফিফ্‌থ রিপোর্টের ২য় খণ্ডের ৩৬২—৩৬৩ পৃষ্ঠায় যে ৮২ পরগণা (ভারতচন্দ্র কিন্তু ৮৮ পরগণা বলিয়াছেন) লইয়া নদীয়া-রাজ্য-তাহার তালিকা দেওয়া আছে। তাহাতে মনে হয় যে গঙ্গা বা ভাগীরথীর পশ্চিমেও মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ্য বা জমিদারী ছিল। তবে এই বিষয়ে পরগণার নাম তাহার বিস্তৃতি সম্বন্ধে আমাদের সম্যক জ্ঞান না থাকায়, অপরের শোনা কথায় বিশ্বাস করিয়া, আমরা এই বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই। ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন যে নদীয়া-রাজ্যের "পশ্চিমসীমা গঙ্গা ভাগীরথী খাদ"। ভারতচন্দ্র লিখেন ইং ১৭৫২ সালে ; আর ফার্মিঞ্জার সাহেবের বইতে যে হিসাব দেওয়া আছে তাহা হইতেছে বাংলা ১১৭২ সালের—১৭৬৫ ৬৬ সালের। এই কয় বৎসরের মধ্যে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার রাজ্য বাড়াইয়াছিলেন ধরিলে—যাহা খুবই সম্ভব, কোনও অসঙ্গতি থাকে না।

১৪। বাংলার ব্রাহ্মণদের যদি বাংলার উপর সমান বিস্তৃতি (geographical distribution) হইত, তাহা হইলে নদীয়া রাজ্যে $\frac{৭৮,০০০}{৭৭,০০০} \times ৩,১৫১ = ৩১৯২$ "ঘর" ব্রাহ্মণ থাকিত। কিন্তু ব্রাহ্মণদের বিস্তৃতি বাংলার সব অংশে সমান নহে। কোন কোন স্থানে, যেমন ভাগীরথী বা গঙ্গার দুই ধারে, রাঢ়ে, বিক্রমপুরে খুব বেশী, আবার কোন কোন স্থানে কম। বাংলার ১,০০০ ব্রাহ্মণদের মধ্যে সরকারী বিভাগ অনুযায়ী বাস করেন (১৯৩১ সালে) :

১,০০০

বিভাগ	পরিমাণ বর্গমাইলে	জন	বিভাগের প্রতি ১০০ বর্গ-মাইলে
বর্দ্ধমান	১৩,৯৮৪	৩৮৪'২	২'৭৪৪ জন
প্রেসিডেন্সী	১৭'৮৫৩	২৯৮'২	১'৬৭৫ „
রাজসাহী	১৯'১৬৩	৭৪'৮	০'৩৯১ „
ঢাকা	১৪,৮২৯	১৭৪'৯	১'১৮১ „
চট্টগ্রাম	১১,৬৯২	৬৭'২	০'৫৭৫ „
	৭৭,৫২১	৯৯৯০২	

সুন্দরবনে এখনও জন-বসতি নাই। ১৫০।২০০ বৎসর আগে ইহার বিস্তৃতি আরও বেশী ছিল এবং জন-বসতিও ছিল না। এজন্য আমরা প্রেসিডেন্সী বিভাগের পরিমাণ হইতে ৪,০০০ বর্গ মাইল বাদ দিলাম। রাজসাহী বিভাগে দার্জ্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার পরিমাণ তখনকার দিনে জঙ্গলপূর্ণ ও ব্রাহ্মণ-বসতি শূন্য বলিয়া বাদ দিলাম। বাদ দিয়া হিসাব এইরূপ দাঁড়ায়। যথা :—

বিভাগ	প্রতি ১০০ বর্গমাইলে ব্রাহ্মণ-বসতি (ব্রাহ্মণদের মধ্যে হাজার করা অংশ)
বর্দ্ধমান	২'৭৪৫ জন
প্রেসিডেন্সী	২'১৬১ „
রাজশাহী	০'৪৯৮ „
ঢাকা	১'১৮১ „
চট্টগ্রাম	০'৫৭৫ „

এই হিসাবে নদীয়া-রাজ্যে ব্রাহ্মণদের ১০০০ জনের মধ্যে ৬৮ জন বাস করিতেন। "ঘরে" সংখ্যা হিসাব করিলে দাঁড়ায় ৬৮ × ৭৮,০০০ ১,০০০ = ৫৩০৪ ঘর।

কিন্তু আরও এক কারণে এই "ঘরের" সংখ্যা বাড়িবে।

গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থানসমূহ সকল হিন্দুর। বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণদের অত্যন্ত প্রিয়।

দানধর্ম্মে আছে :—

ভাদ্রকৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং যবেদাক্রমতে জলম।
তাবদ্‌গর্ভং বিজানীয়াৎ তদূর্দ্ধং তীরমুচ্যতে ॥

অর্থাৎ ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর দিন স্বভাবতঃ গঙ্গার জল যতদূর যায়, ততদূর পর্য্যন্ত গঙ্গার গর্ভ জানিবে।

ব্রহ্মপুরাণে বলা হইয়াছে যে :—

প্রবাহমবধিং কৃত্বা যা বদ্ধস্ত চতুষ্টয়ম।
অত্র নারায়ণঃ স্বামী নান্যঃ স্বামী কদাচন ॥

অর্থাৎ গঙ্গার প্রবাহ হইতে আরম্ভ করিয়া চারিহস্ত পরিমিত স্থানের অধীশ্বর নারায়ণ, উহাতে আর কাহারও অধিকার নাই।

এই ব্যবস্থা খুব সম্ভবতঃ নদীপথে নৌকায় গুণ টানিবার জন্য ও নৌকা ঘাটে বাঁধিবার জন্য করা হইয়াছে। এক্ষণে দেখিতে পাই অনেকে গঙ্গার দুই ধারে এই নারায়ণ ক্ষেত্র দখল করিয়া প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া লইয়াছেন।

গঙ্গার তীর সম্বন্ধে ব্রহ্মপুরাণ বলিয়াছেন যে :—

সার্দ্ধহস্তশতং যাবৎ গর্ভতস্তীরমুচ্যতে।

অর্থাৎ গঙ্গার গর্ভ হইতে দেড়শত হস্ত পরিমিত স্থান তীর। স্কন্দপুরাণে আছে যে :—

তীরাদ্ গব্যূতি মাত্রন্তু পরিতঃ ক্ষেত্র মুচ্যতে। তত্র দানং তপো-হোমো গঙ্গায়াং নাত্র সংশয়ঃ। অত্রস্থাস্ত্রিদিবং যান্তি যে মৃতাস্তেঽ পুনর্ভবাঃ।

অর্থাৎ তীর হইতে সকলদিকে দুইক্রোশ মাত্র স্থানকে ক্ষেত্র বলা হয়। উক্তস্থানে কৃত দান, তপস্যা, হোম গঙ্গায় কৃত কর্ম্মের তুল্য, এ বিষয়ে সংশয় নাই। এই ক্ষেত্রস্থিত ব্যক্তিগণ মরিয়া স্বর্গে গমন করে, তাহাদের আর জন্ম হয় না।

ব্রহ্ম পুরাণে আছে যে :—

অত্র দূরে সমীপে বা সদৃশং যোজনদ্বয়ম।
গঙ্গপরাং মরণে নেহ নাত্র কার্য্যা বিচারণ।

অর্থাৎ এই গঙ্গাক্ষেত্রের দূরেই হউক আর নিকটেই হউক দুই যোজন মধ্যে সর্ব্বস্থান তুল্য, এই স্থানে মরিলে গঙ্গামরণ তুল্য ফল হয়, এ বিষয়ে বিতর্ক নাই।

২ যোজন=৪ ক্রোশ=৮ মাইল। এই সব স্থান গঙ্গাক্ষেত্র। এই সব স্থানে বর্ত্তমানে, কলকারখানার যুগেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি ভদ্র লোকেদের ঘনবসতি; পূর্ব্বেও যতদূর জানিতে পারা যায় ঘন বসতি ছিল, এখনও আছে।

২৪ পরগণা জেলার ভাগীরথী তীরস্থ কয়েকটি থানার জেলার সমস্ত ব্রাহ্মণদের শতকরা ৩৩ জন আছেন (১৯১১) পরিশিষ্ট দেখুন। হুগলী, হাওড়া, নদীয়া ও বর্দ্ধমানে অনুরূপ হইবে বলিয়া মনে হয়। গঙ্গাক্ষেত্র বলিয়া খ্যাত বহুস্থান, এই সব জেলার বারোআনা বলিলে অত্যুক্তি হয় না নদীয়া রাজ্যের এলাকাভুক্ত ছিল। এমতে আমরা পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের "ঘরের" সংখ্যা, ৫৩০০ কে শতকরা ২০ করিয়া বাড়াইলাম কম করিয়া ২০ ধরিলাম দুই কারণে, প্রথমতঃ কলিকাতার সান্নিধ্যবশতঃ বহু ব্রাহ্মণ হয়ত হালে আসিয়াছেন; দ্বিতীয়তঃ কলকারখানা স্থাপিত হওয়ায় পশ্চিম হইতে অনেক ব্রাহ্মণ হয়ত আসিয়াছেন। ৫৩০০+১/৫ ×৫৩০০=৬,৩৬০ "ঘর" ব্রাহ্মণ নদীয়া রাজ্যের মধ্যে বাস করিতেন বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি।

১৫। পূর্ব্বে দেড়শত দুইশত বৎসর পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গে ও উত্তরবঙ্গে ব্রাহ্মণের অনুপাত ও সংখ্যা আরও কম ছিল বলিয়া মনে হয়। পাকিস্তান হইতে যে সমস্ত উদ্বাস্তু ব্রাহ্মণ পরিবার আসিয়াছেন, তাঁহাদের অনেককে প্রশ্ন করিয়া জানিয়াছি তাঁহারা ৪, ৫, ৬ বা ৭ পুরুষ আগে হিন্দু জমীদারগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া বা চাকুরী উপলক্ষে তথায় গিয়া বসবাস করেন। ইহাদের অধিকাংশই রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। যাঁহারা ৪, ৫ পুরুষ আগে গিয়াছিলেন তাঁহাদের পূর্ব্ব বাসস্থানের সহিত কিছু কিছু সম্পর্ক আছে; হয় ভিটা বাড়ির অংশ, নয় অশৌচ সম্পর্ক।

রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের ভৌগলিক বিস্তৃতি ও ইহার পরোক্ষ প্রমাণ। রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের ভৌগলিক বিস্তৃতি দিলাম। যথা:—

বিভাগ	সংখ্যা পুরুষ—স্ত্রীলোক	প্রতি ১,০০০ পুরুষে স্ত্রীর অনুপাত
বর্দ্ধমান	৮১,০০০—৮৩,৫৯০	১,০৩২
প্রেসিডেন্সী	৪০,৭৩১—৩৬,৬৪৫	৯০০
রাজসাহী	৮,৯১০— ৭,১১৭	৭৯৮
ঢাকা	১৮,৩৩৮—১৫,৭৪৬	৮৫৯
চট্টগ্রাম	... ...	...
	১,৪৮,৯৭৯—১,৪৩,০৯৮	৯৬০

রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাল্পতা আছে, প্রতি ১০০০ পুরুষে ৯৬০ স্ত্রীলোক। এই অনুপাতটি স্বাভাবিক ধরিয়া, বিভিন্ন বিভাগে যে পার্থক্য দেখা যায় তাহা সাজাইয়া দেওয়া হইল। যথা:—

বিভাগ	বেশী বা কম স্ত্রীলোকের সংখ্যাল্পতা
বর্দ্ধমান	১,০৩৬--৯৬০=+৭৬
প্রেসিডেন্সী	৯০০—৯৬০=—৬০
রাজশাহী	৭৯৮—৯৬০=—১৬২
ঢাকা	৮৫৯—৯৬০=—১০১
চট্টগ্রাম	... ...

ইহা হইতে মনে হয় যে পূর্ব্ববঙ্গে বা উত্তরবঙ্গে বহু চাকরী করিতে সম্প্রতি গিয়াছেন, স্ত্রীকে সঙ্গে লয়েন নাই। ঢাকা বা অন্যত্র হইতে তাঁহারা বিভাগের বাহিরে যাইলে এই সংখ্যাল্পতা কমিয়া যাইত। কেহই যে যায়েন নাই বা কেহ যে সস্ত্রীক কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চলে আইসেন নাই, এ কথা আমরা বলিতেছি না।

১৬। এই প্রসঙ্গে বাংলার রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের সংখ্যা ও বিস্তৃতি দেওয়া আবশ্যক বলিয়া মনে করি।

বিভাগ	রাঢ়ীর সংখ্যা	মোটর রাঢ়ীর শতকরা	বারেন্দ্রের সংখ্যা	মোট বারেন্দ্রে শতকরা
বর্দ্ধমান	১,৬৪,৫৯০	৫৬'৪	২,২১৫	৩'৭
প্রেসিডেন্সী	৭৭,৩৭৬	২৬'৫	৯'৯৮৬	১৬'৯
রাজশাহী	১৬,০২৭	৫'৫	৩৩,৩৪৫	৫৬'৫
ঢাকা	৩৪,০৮৪	১১'৭	১৩,৫১৩	২২'৯
চট্টগ্রাম	...	...	...	...
বাংলা	২,৯২,০৭৬	১০০'১	৫৯,০৫৯	১০০'০

রাঢ় অঞ্চল বর্দ্ধমান বিভাগে, সেখানে এখনও অর্দ্ধেকের বেশ কিছু বেশী রাঢ়ী ব্রাহ্মণ বাস করেন। বরেন্দ্রভূমি রাজশাহী বিভাগ, সেখানেও অর্দ্ধেকের বেশ কিছু বেশী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ আজও বাস করেন। উভয়ের শতকরা অনুপাতের সমতা বিশেষভাবে চিন্তনীয়।

রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের পরস্পরের অনুপাত হইতেছে ১০০ : ২০।

১৯৩১ সালের বাংলার আদম-শুমারীর রিপোর্টে যে, তথ্যাদি দেওয়া আছে তাহা হইতে উপরোক্ত তথ্য ও সিদ্ধান্ত দিলাম। কিন্তু তথ্যগুলির সম্বন্ধে আমাদের কিছু সন্দেহ আছে। চট্টগ্রাম বিভাগে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের সংখ্যা অল্প হইতে পারে, কিন্তু একদম নাই বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

তাহার পর ১৪॥ লক্ষ ব্রাহ্মণদের মধ্যে ৯, ৭৮, ০০০ জন নিজেদের শ্রেণী বলেন নাই। অবশ্য রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের ব্যাসোক্ত ব্রাহ্মণ বা সপ্তশতী ব্রাহ্মণদের ন্যায় স্বস্ব শ্রেণী গোপন করিবার কোন হেতু নাই, তথাপি অনেকে যে তাচ্ছিল্য করিয়া স্বস্ব শ্রেণী বলেন নাই এ কথা সহজেই বিশ্বাস করা যায়। যেখানে ব্রাহ্মণদের মধ্যে শতকরা ৬৭০৬ জন নিজেদের শ্রেণী বলেন নাই সেখানে তথ্যের মূল্য বহু পরিমাণে কমিয়া যায়।

তবে মনে হয় রাঢ়ী ও বারেন্দ্রের সংখ্যা ও তাঁহাদের অনুপাত মোটামুটি ঠিক্। আমাদের অনুমানের স্বপক্ষে একটী যুক্তি দেখাইব। ৫৩ গাঁই হইতে বর্ত্তমানের রাঢ়ী শ্রেণী উদ্ভূত হইয়াছে। প্রত্যেক গাঁই বা গ্রামে যদি ৫ "ঘর" বলিয়া ব্রাহ্মণ ছিল ধরি, তাহা হইলে "ঘরের" সংখ্যা হয় ২৮০। এই ২৮০ ঘর হইতে যদি ২, ৯, ২, ০০০ জন রাঢ়ী ব্রাহ্মণ হয়েন, তাহা হইলে ৭০০ "ঘর" "সপ্তশতী" হইতে ৭, ৩০, ০০০ জন সপ্তশতী হইবে বর্ত্তমানে। ইহারা নিজেদের শ্রেণী বলেন নাই ধরিলে ও ব্যাসোক্ত ব্রাহ্মণদের ধরিলে ৯, ৭৮, ০০০ জন নিজেদের শ্রেণী কেন যে বলেন নাই, তাহার মোটামুটি একটা হদিস্ পাওয়া যায়। অবশ্য এইটী আমাদের অনুমান মাত্র। এ সম্বন্ধে আরও তথ্য অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

(আগামী বারে সমাপ্য)
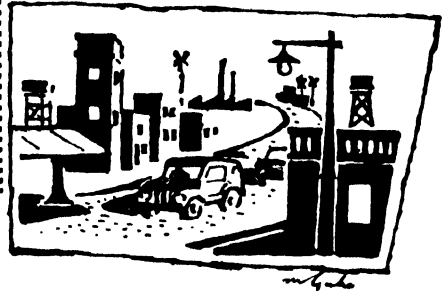
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রমন ডাক্তারের সেই এক ঢাক এক কাঁসি।

পিটিং পিটিং বাজছে বাঁশবাগানের এক কোণের বাড়ীতে। রমন ডাক্তার একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছে। নিমন্ত্রিতদের অনেকেরই এখনও দেখা নেই।

নীলকণ্ঠবাবু সকাল সকাল এসে দেখা করে গেছেন, রাত্রে বাইরে খাওয়া নিষেধ।

হঠাৎ অবনীর হাঁকডাকে বাঁশবাগান মুখর হয়ে ওঠে।

—দেখে আয় ভূষণা, কাকে ঠাকুর বলে। একেবারে Living কাত্তিক। রমন ডাক্তার এগিয়ে আসে।

—এসো মুখুয্যে!

হ্যাঁ এলাম। তা বুঝলা ডাক্তার, তোমার ভূষণের ঠাকুর গড়া আর হিতবাদীর ছবি ছাপা প্রায়ই এক।

—মানে? ডাক্তার ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারেনা। ভূষণও বাবুর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। বলে চলেছে অবনী!

—মানে, সব ছবিই সেই কালো খানিকটা ছাপ। নীচে লেখা সুরেন্দ্রনাথ, না হয় বিপিনপাল, না হয় দেশবন্ধু, তেমনি ভূষনের ঠাকুর গড়া সেই মুখ সেই হাত সেই সব কিছু, Only নীচে সিংহ দেখে বুঝবা দুর্গা, নীচে মহাদের দেখলে কালী, আর ময়ুর দেখ তো কাত্তিক। ঠাকুর গড়েছে বটে মিষ্টির ওই জলটোপ হে।

—সেই খান থেকেই আসছো তাহলে?

অবনী মুখুয্যের এত শীতেও কেমন গরম বোধ করছে। মিষ্টি লোহারনী বাঘের চোখ তুলে আনতে পারে, তারক-বাবুর খামারের তৈরী চোরাভাটির সরেস মাল দিয়ে বামুন সজ্জনকে আজ তৃপ্ত করেছে মিষ্টি।

দুচোখে কেমন গোলাপী আমেজ।

স্বয়ং বড়বাবু এলেন তিনিও যেন মেজাজেই রয়েছেন।

তারকরত্নবাবুর হাতে ঝকমক করছে হীরের আংটি, কোঁচাটা হাতে রাখবার সামর্থ্য আর যেন নেই, সারা পথ লুটিয়ে এসেছে।

লালধুলো রঞ্জিত কোঁচার আগের দিক। কোন রকমে চেয়ারে বসে বলে ওঠে—হ্যাঁ, ছুঁড়ির নজর আছে হে ডাক্তার। একেবারে ইন্দ্রভুবন বানিয়েছে। আর সানাইটাও বেশ বাজায় ভালো, কি বল মুখুয্যে?

অবনীমুখুয্যে বেশ মাথা নেড়েই যেন সোমের মাথায় তেহাই দিচ্ছে।

—যা বলেছেন।

রমন ডাক্তারের উৎসব এবার জমলোনা। মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণই হয় ডাক্তার। খাবার জায়গা হয়েছে সকলে প্রায় এসেছে নাহয় লোক পাঠিয়েছে, আসেনি একজন সে ওই অশোক।

এদিকে রাত হচ্ছে, এদের শরীর মেজাজও ভাল নেই।

তারকবাবু বলে—না আসে তা কি আর করবে হ্যাঁ সে আবার ওই পুজোতে জমেনি?

কেমন একটু অর্থপূর্ণহাসি খেলে যায় ওর মুখে। অবনী মুখুয্যে এতক্ষণ যেন উসখুস করছিল। বগলে খবরের কাগজ নিয়ে সারা গ্রাম চষে বেড়ায় খবর সংগ্রহের আশাতেই।

এমন সরস খবরটা খানিকটা চেপে রাখবার চেষ্টাই করেছে—দেখছিল সবে এগোচ্ছে, এগোক—তারপর ছাড়বে। কিন্তু এই ফাঁকে সেই মহামূল্য সংবাদটি ছাড়বার লোভ সামলাতে পারে না অবনী মুখুয্যে।

বেশ তাক বুঝেই খবরটা ছাড়ে!

—আজ্ঞে সে তো কার্ত্তিক-ফার্ত্তিকের ব্যাপারে নাই।

—সে কি হে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তিনি সরস্বতীর ভক্ত—সেইখানেই আছেন বোধ হয়।

—সরস্বতী! তারকরত্ন একটু বিস্মিত হয়। রমন ডাক্তারই বলে ওঠে এখন সরস্বতী কোথায় পেলে হে? অবনী জবাব দেয়—আজ্ঞে মাটির নয় জ্যান্ত সরস্বতী। ওই যে এসেছে সদর থেকে। নীলকণ্ঠবাবুর বাড়ীতে—

বাকী কথাটা বলতে হয় না। ওর হাসিতে ফেটে পড়ে। কেমন একটা বিচিত্র মুখরোচক সংবাদ—নীলকণ্ঠবাবুর মেয়ে প্রীতির কথা বলছ?

—ঠিক ধরেছেন আজ্ঞে। অশোকবাবু সেখানেই যান কিনা!

—তাই নাকি!

কি ভাবছে তারকরত্ন। ওদের হাসির ধারাল শব্দ তখনও মিলোয়নি।

হঠাৎ দরজার কাছে অশোক ঢুকতে গিয়েই কথাটা কানে আসতে থমকে দাঁড়াল।

এটা সে মোটেই ভাবেনি, বিশ্বাস করাতো দূরের কথা—সামান্য এই ব্যাপারটাকে নিয়ে ওরা যে ঘোঁট পাকাবে, তা কল্পনাও করেনি অশোক।

সারা গা যেন জ্বলছে অসহায় রাগে,

নেমতন্ন খেতে যাওয়া আর হল না, আবছা অন্ধকারেই ফিরে এসে পথে নামল।

গাছ গাছালির বুকে আলো পড়েছে। নিশুতি গাঁ জনহীন পথ। একাই চলেছে অশোক।

রাতের হিম বাতাসে শীত লাগে!

প্রীতির কথা মনে পড়ে, তাকে জড়িয়ে এইসব বিশ্রী কথা কোনদিনই কল্পনা করেনি অশোক, অবনী মুখুয্যের চিমসে মুখে সুচলো গোঁফের ডগায় কি এক তীক্ষ্ণ গরল-জ্বালা লুকিয়ে আছে আজ তার কিছুটা পরিচয় পেয়েছে অশোক।

নিস্তব্ধ পল্লীর অন্ধকারে জেগে আছে অবিনাশের সুরটা। কি এক মায়াময় সেই সুর, রাতের নিরন্ধ্র অন্ধকারে কি এক নিবিড় দুঃসহ ব্যথায় কেঁদে উঠেছে আকাশ বনানী।

রাতের হিমেল আকাশে অস্বচ্ছ-ম্লান বেদনার আভায় কাঁপছে দু একটা তারা।

কি যেন যাদু আছে ওই সুরে।

একক সুরটা উঠছে—সঙ্গে রয়েছে টিকাবার মৃদু ঠেকা। জাত-বাজিয়ের মত বেহাগের রূপ আলাপ করে চলেছে অবিনাশ।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে অশোক।

ওই সুরে মিশিয়ে আছে কোন হারিয়ে যাওয়া দিনের কথা, তার হারানো মায়ের দুচোখের শ্যামস্নিগ্ধ চাহনি; আজও যেন দূর আকাশে তারার আলো বেয়ে ওই সুরের ঝরণা ধারায় নেমে আসে তাঁর আশীষধারা—কল্যাণস্পর্শ।

দুচোখ বুজে আসে।

—হেঁই মা গো…

হঠাৎ কার আর্তনাদ আর বিস্মিত কণ্ঠের কথা শুনে চমকে ওঠে অশোক—চোখ মেলে চাইল।…মিষ্টি লোহারনী দেখেছে অশোকবাবুকে পথে দাঁড়িয়ে ওর বাজনা শুনতে—প্রথমটা ঠাওর করতে পারেনি। এই হিমের মধ্যে শীতরাতে কে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে!

অবিনাশও এতটা খেয়াল করেনি তাকে।

মিষ্টির আর্তনাদ শুনে চোখ মেলে চাইল অশোক, নিজেই অপ্রতিভ বোধ করে, দুচোখ যেন জলে ভরে এসেছে।

—পথে কেনে আজ্ঞে—ওরে বাবারে-ইকি হয়।

অশোক ওকে নিরস্ত করে না—এমনি শুনছিলাম ওর বাজনা পথে যেতে যেতে। রাত হয়ে গেছে, চলি।

চলে গেল অশোক…নিজের অন্তরের কি এক নিবিড় বেদনার সঙ্গে আজ মুখোমুখি পরিচিত হয়ে আজকের

অপমান ওই অপবাদ খানিকটা সইবার শক্তি যেন সে অর্জন করেছে।

…এগিয়ে চলে।

নিশুতি আঁধার নেমেছে গ্রামে, আবছা অন্ধকারে খড়ে-ঘরগুলো মনে হয় যেন এক একটা পুরানো আদিম কালের ঢিপি, কোনরকমে ওর মধ্যে আত্মগোপন করে আছে একশ্রেণীর জীব, চারিদিকে তার অন্তহীন বিভীষিকা আর হিংস্র পশুর রাজ্য।

ভয়ে জমাট আতঙ্কে মানুষ পরাজিত হয়ে আত্মগোপন করেছে ওই বল্মীক স্তূপের অতলে।

—কে যায়।

কঠিন কণ্ঠস্বরে কে এগিয়ে আসে। থমকে দাঁড়াল অশোক। মুখে এসে পড়ে এক ঝলক টর্চের আলো।

ছোটবাবু!

এমোকালী আর ভুবন কামার এগিয়ে আসে।

অশোকও বিস্মিত হয়—তোমরা!

হাসে কালীচরণ;

—চলুন এগিয়ে দিয়ে আসি, রাতবিরেতে ফাকা মাঠ পার হয়ে একা যাতায়াত করবেন না।

—কেন রে?

—দিন সময় ভাল নয় ছোটবাবু। চলুন।

এ পাড়া থেকে ও পাড়া; মাঝখানে পুকুরের পাড়। একদিক মজে গেছে; তার পরই সুরু হয়েছে বন, নেতাড়ে বন, ওদিকে শুশুনিয়া পাহাড় থেকে এদিকে দামোদরের ওপারে দুর্গাপুর মাসরার জঙ্গলে গিয়ে লেগেছে। গ্রামের বসতির মাঝখানে ওইটুকুপথ যেন বনের যোগসূত্র।

শীতের হাওয়ামুক্ত প্রান্তর থেকে এসে লাগে—হু হু হাওয়া। ধানক্ষেত থেকে শিশির ধারার টুপটাপ ক্ষীণ শব্দ কানে আসে।

স্তব্ধ উদার দিগন্ত সীমা লাল কাঁকুরে ডাঙ্গার প্রান্তে বনের আবছা কালো সীমারেখা। এদিকে লাল প্রান্তর আর কাজলাদিঘীর পরই আবার বন। কয়েকটা ধান ক্ষেতে তখনও পাকা ধান পড়ে আছে।

হঠাৎ একটা খস্ খস্ শব্দ।

জোরালো টর্চের আলোয় কেমন ঝলসে ওঠে জ্বলন্ত নীল চকচকে চোখ, বাতাসে একটা বোটকা বিশ্রী গন্ধ।

—ছোটবাবু।

এমোকালী কিছু বলবার আগেই চিতে বাঘটা জল খাওয়া বাকী রেখে লাফ দিয়ে সরে গেল বনের দিকে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে ওরা।

স্তব্ধ দিগন্তসীমা তারাজ্বলা রাত্রির নিবিড় রূপ—সুপ্তিমগ্ন গ্রাম সবকিছুর উর্দ্ধে যেন কোন হিংস্র আদিম জীবন এখানে প্রাধান্য বিস্তার করে রয়েছে।

তারই ভয়ে সব কিছু নির্বাক স্তব্ধ।

—চল কালী।

—ওরা এগিয়ে চলে, আঁধারে টর্চটা জ্বলছে মাঝে মাঝে।

তারকবাবু ক'দিন একটু চিন্তায় পড়েছিল, নীলকণ্ঠ-বাবুকে গ্রামের সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের প্রায় সকলেই মানে গনে। লোকটা সৎ এবং বলতে কইতে পারে। বিশেষ করে সদরে কোট কাছারি আমলা মহলে এখনও পুরোনো দিনের খাতিরটুকুর কিছু অবশিষ্ট আছে।

তাই নীলকণ্ঠবাবু উঠে পড়ে লাগলে ভৈরবের মরা মামলা—সেই পুরোনো আমলের তালিমারা শোলেনামা খুঁজে আবার জিইয়ে তুলতে পারে।

তাই একটু চিন্তায় পড়েছিল।

আর কিছুর জন্য নয়। টাকা পয়সা খাজনা দিতে হবে—এমন কি তামাদী চারপণ অবধি, তাছাড়া হালসন সমেত বকেয়া মিটাতে হবে। আর সম্মান এবং জেদ এর প্রশ্ন।

ওরা যদি যেচে আসে কিছু দান খয়রাত চায় তারক-বাবু বিবেচনা করতে পারে, হাজার হোক দেবোত্তর ব্যাপার একেবারে হক মারতে চায় না।

কিন্তু মামলার মুখে তখন পয়সার চেয়ে মান অপমান আর জেদের কথাই বড় হয়ে ওঠে।

অবনী মুখুজ্যে সতীশ ভটচায আরও দু একজন আসে সকালেই। শীতের দিন চা এর ব্যাপারটা একটু রাখে বড়বাবু। ছোট ভাই শিবরত্ন এটা ঠিক পছন্দ করেনা। ব্যবসাদার লোক সে—হাড়কেপ্পন, একটি পয়সাও বাজে খরচ করা তার পোষায় না। আড়ালে গজগজ করে।

—পেছকাস্তার হাকিম হয়েছেন কিনা। তাই ঠাট বেড়েছে।

অর্থাৎ ইউনিয়ম বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট হয়েছে তারকবাবু সুতরাং তার নিজস্ব একটা আড্ডা—দল ও গড়ে উঠেছে। তাদের হাতে রাখতে হয়, তার উপর আছে সার্কেল-অফিসার হাকিম দারোগাবাবুদের আনাগোনা, হোক খরচ তবু তারকরত্ন যেন একটা তৃপ্তির সন্ধান পেয়েছে।

জমিদারী চালিয়ে ও এত খাতির সম্মান পায়নি।

—শীতের সকাল।

মিষ্টি রোদ বার-বাড়ীর প্রশস্ত আঙ্গিনায় এসে পড়েছে। ও দিকে চক-মেলানো প্রাচীর-ঘেরা খামার বাড়ীর ফটক দিয়ে ধান বোঝাই গাড়ী মাঠ থেকে আসছে—গোটা কতক মুনিষ পাঁজা পাঁজা ধান পালুই দিচ্ছে গাড়ী খালাস করে। আবার শূন্য গাড়ীগুলো ফিরছে মাঠের দিকে। উত্তুরে বড় বড় বলদের গলায় ঘণ্টা বাজে টং টাং। শীতের বাতাসে বন থেকে হাওয়া আসে—শুকনো হাওয়া। তাতে ভেসে যায় ওই উদাস শব্দটুকু।

সোনা ধানের পালুই উঠছে। নিজের খাস হালেই প্রায় শদেড়েক বিঘে জমি রেখেছে বড়বাবু; তার উপর এক চকে পঞ্চাশ বিঘা ওই ভৈরবনাথের দেবোত্তর জমি।

মস্ত গোটা চারেক পালুই উঠছে খামারের পুকুরের চার পাড়ে।

পুকুরেরও প্রয়োজন, অনেকেরই তা আছে। তবে গ্রামেই বাইরে এদিক ওদিকে, না হয় এ গাঁ সে গাঁয়ে। বড় বড় দিঘী পুকুর সে সব। তাতে দরকার-অদরকারে সহসা রাতের বেলাতেও মাছ মেলেনা। তাই খামারের পুকুরেই সখ করে মাছ পুষেছে তারকবাবু।

জলে মাছে সমান। হাততালি দিলে মাছ লাফ দিয়ে ডাঙ্গায় পড়বে। রাত বিরেতে অতিথি, সদরওয়ালা সাহেব, অন্য কেউ এলে মাছের অভাব হয় না।

অবনী মুখুয্যে তাই বলে।

—একেই বলে পুরুষ। দিগ্বিজয়ী পুরুষ।

হাসে তারকবাবু। বড় পৈতৃক বাড়ীর কার্নিসে রোদ লেগেছে—বের হয়ে এসেছে পায়রাগুলো। সীমাসংখ্যা হীন পায়রা—বাপুজি আমল থেকেই তারা বাস করছে আর বংশবৃদ্ধি করে চলেছে বিনাবাধায়।

সতীশ ভটচায গরম চা খাওয়া কিছু দিন হ'ল রপ্ত করেছে। নিজেই কোথা থেকে বিধান বের করেছে ইতিমধ্যে।

—পানীয়ে দোষ নেই, ও খেয়ে সব পুজো-আজাই চলে। অবনী বলে ওঠে—শুনেছি, জলযোগ করেই বের হও ভটচায।

ভটচায কথা বলে না। আপনমনে চায়ের কাপে ফুঁ দিতে থাকে।

ওদের মুখেই কথাটা শুনেছে তারকবাবু।

—তা হলে মামলা আপাততঃ মুলতুবীই রইল।

মাথা নাড়ে সতীশ ভটচায, আরে বাপ—মারেনি টিক-টিকি তার ব্যাটা ওলন্দাজ। তুই চাকরীই না হয় করতিস কোর্টে, তাই বলে মামলার কি বুঝিস? মশা যাবে হাতীর সঙ্গে লড়তে!

অবনী মুখুয্যে পুরোনো খবরের কাগজখানা পড়ছিল। মুখ তুলে বলে ওঠে—যা বলেছ। লোকের নাচনে নেচে নীলকণ্ঠ খুড়ো হাকছিল ভৈরবের মামলা করবো, এখন চুপসে গেছে।

মনে মনে একটু খুশীই হয়েছে তারকবাবু।

সকালের রোদ তখন ও কুয়াসার আভায় লাল প্রান্তরের বুকে ধোঁয়াটে হয়ে রয়েছে।…চড়াই এর নীচে শাল বনের বুকে এসেছে পাতা ঝরার হলদে আভা।

গলা খাটো করে বলে অবনী।

—মেয়েটাই বেশ কেশ দিয়েছে বাপকে। ব্যস নাচন-কোঁদন সব বন্ধ। হাসছে তারকবাবু—বল কি হে?

—হ্যাঁ। অবনী বেশ জোর দিয়েই কথাটা বলে।

—মেয়েটার বুদ্ধিশুদ্ধি আছে। হাজার হোক লেখাপড়া শিখছে তো, আর বাপের ওই একটি মেয়ে—বেশ গুছান। বাপ মামলায় টাকা উড়োবে—তা উড়বে কার টাকা? এই জন্যই তো মেয়ে সদর থেকে এসে হাজির হয়েছে।

তারকরত্নবাবু ওই মেয়েকে দেখেছে এক নজর।

বেশ বুদ্ধিমতী আর সুন্দরীও বলা যায়, এইবার নাকি বি-এ পরীক্ষা দেবে।

বাতাসে ভেসে আসে বাড়ীর দিক থেকে রেডিওর সুর। জীবন রেডিও খুলেছে।

নীরব নিস্তব্ধ এই পরিবেশে ওই কর্মহীন সুর ভাল

লাগেনা তার। জীবন ও কাযকর্ম যেন কিছুই করবেনা, পড়াশোনাও করলোনা। এতকষ্ট করেও খরচ-খরচা করে, হেলু মাষ্টারকে পিছনে লাগিয়েও জীবনকে হাইস্কুলের দরজা আর পার করা গেলনা, যতদূর ঠেলা যায় ঠেলেছে—একেবারে হাইস্কুলের শেষ ঘরের সীমানা অবধি—তারপর আর চৌকাঠ ডিঙোতে পারেনি জীবন।

হাল ছেড়ে দিয়ে আসে!

—করবি কি?

—বাপের কথায় জীবন জবাব দেয়—ব্যবসা করবো।

সে চেষ্টাও করছে আজ পর্য্যন্ত তারকবাবু। কিছু মূলধন মালপত্র দিয়ে বাসন তৈরীর ব্যবসাতেই নোতুন করে নামিয়েছে। কাচা পয়সা রোজকারও বেশ হয়।

কিন্তু জীবন যেন অন্য ধাতের।

শালের আগুন-তাপে গিয়ে দাঁড়াতে কেমন বিশ্রী লাগে, কাপড় জামায় কয়লার কষ লাগে। কারিগরদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েও পারেনা। অকারণেই ধমক গালাগাল দিয়ে বসে।

কোন রকমে সামলে চলেছে তারকবাবু, সেখানেও যেন সমস্যা দেখা দিয়েছে এইবার। জোর করে দাবানো চলবেনা।

এসময় মাঠে গিয়ে দাঁড়ালেও কায হয়। এতবড় জমিদারীখানা, হালের চাষ।

কিন্তু জীবনের তাও কেমন লাগে, শীতের বাতাসে গা হাত পা চড় চড় করে। ধানের শিষে ফেটে যার হাত পা।

মুনিষ মাজিদের সঙ্গে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা-কেমন অসহ্য মনে হয়।

চুপ করে কি ভাবছে তারকবাবু।

বাতাসে রেডিওর সুর ভেসে ওঠে। দিনের বেলায় এই খাঁ খাঁ লাল কর্ষিত প্রান্তরে ওই চাঁদ, ফুল আর ভালবাসার গান কেমন বিশ্রী লাগে। ও অন্য জগতের সুর। কড়াস্বরেই হুকুম করে।

—রেডিও বন্ধ করে দিয়ে বাবুকে একবার আসতে বল। ডেকে দে ওকে।

জীবন সবে বন্ধুবান্ধব নিয়ে আড্ডা জমিয়েছিল দোতালার ঘরে। ঋষি ডোমকে হাজির হতে দেখে একটু বিরক্ত হয়।

এদেরই বয়সীই সে—দু চার বছর হয়তো বড় হবে। কিন্তু গোকুলের মধ্যে এমন একটা কিছু সহজ ভাব আছে, যাতে তার মিশতে কোন বাধা হয় না। তাছাড়া একটা কাযও চলে এখানে।

জুয়ার আড্ডা! বাঘের ঘরেই ঘোঘের বাসা। কেউ সন্দেহ করবেনা যে বড়বাবুর চকমিলানো দালানের কোন নিভৃত কোঠার তারা জুয়ার আড্ডা বসায়।

জীবনও ক্রমশঃ রপ্ত হয়ে উঠেছে এই নেশায়, দুর্বার এক নেশা; গোকুল তার দীক্ষাগুরু, সেই সঙ্গে আনুসঙ্গিক জুটেছে।

আরও কয়েকজন এসে জোটে।

গোকুল বলে চলে মিষ্টির দিন গেছে, এখন আর ওর আছে কি বল?

ওরা গোকুলের দিকে চেয়ে থাকে। গোকুলের দুচোখে কি এক শয়তানী নেশা। দেখছে নিবদ্ধ দৃষ্টিতে কেমন করে জীবনের সদ্য তরুণ মুখের নিষ্পাপ নিষ্কলুষ ছাপ-এর উপর নবজাগ্রত কোন উদগ্র নেশার মাদকতা ফুটে বের হচ্ছে, ধীরে ধীরে বড়শিতে গেঁথে যেমন করে জলের উধাও মাছকে নিপুণ শিকারী তীরের প্রান্তে টেনে আনে তেমনি যেন কোন নির্মম খেলা খেলছে গোকুল ওকে নিয়ে।

তবে? জীবনের মনে একটা বিচিত্র উন্মাদনা, কঠিন মৃত্তিকা ভেদকরে অন্য কোন সত্তার নোতুন আবির্ভাব ঘটছে।

গোকুল হাসছে—যেতে দে! কইরে—

অর্থাৎ ওটাকে—ওই নবজাগ্রত কোন বেদনাময় চেতনাকে আরও প্রবল করে তুলতে চায় সে আপাতত ওটা চাপা দিয়ে।

আরও কজন জুটেছে।

ঘরের মধ্যেই চাএর কাপ আর বিড়ি সিগারেট এসে পড়ে। তাসগুলো নিপুণ হাতে নাড়াচাড়া করছে গোকুল। এ বিদ্যাটা সে শিখেছে ঈশ্বরে জুয়াড়ীর কাছ থেকে, সেই তার শিক্ষাগুরু। প্রথমদিন সেই তাতাপোড়া রোদে পড়েল পুকুরের ধারে প্রথম দেখা হয়েছিল সেই দিনই পূজারী গোকুল হাতের পূজার ফুল আর রেকাবির সেই মুষ্টিভিক্ষার চাল জলে বিসর্জন দিয়ে ধরেছিল এই তাস—তিন তাসের

…দান পড়ছে।

টাকা সিকি দু আনি।

হঠাৎ এমনি সময় ঋষি ডোম উঠে এসে খবর দেয় জীবনকে। বড়বাবু ডাকছেন যি গো।

বিরক্ত হয়ে ওঠে জীবন। সবে এই দানে কিছু আমদানী হয়েছে তার। খেলার নেশায় পেয়ে বসেছে। এমনি সময় ওই মূর্তিমান রসভঙ্গের মত এসে হাজির হয়েছে ঋষি।

তাস থেকে মুখ না তুলেই জিজ্ঞাস করে—কেন রে?

ঋষি আড়চোখে কারবার দেখছিল। গোকুল আর তার হাতে ওই তাস—সামনে পয়সা দেখেই অনুমান করে নেয় ব্যাপারটা। বিরক্তই হয়েছে বুড়ো, এ বাড়ীর অনেক দিনের চাকর।

জীবনের প্রশ্নে জবাব দেয়—কি করে তা জানবো? বলেন কেনে এগে-মেগে বাবু আগুন হয়ে উঠেছে, চলেন কেনে শিঘিরির।

—ধ্যাত্তোর!

হাতের তাস ফেলে উঠে দাঁড়াল জীবন।

এবেলার মত এমন জমাটি আড্ডা ভেঙ্গে গেল।

চল যাচ্ছি।

ঋষি নেমে গেল।

ওরাও যাচ্ছে। গোকুল অল্পসময়ের মধ্যেই মন্দরোজকার করেনি।

দানের পয়সাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে নেমে যাচ্ছে। হঠাৎ পিছন থেকে জীবনের ডাকে থমকে দাঁড়াল।

পুরোণো আমলের বাড়ী। সিঁড়িও এইটুকু সরু—আলো বাতাসের ঢোকার পথ নেই। আবছা এক ফালি আলো মাথার উপরের ঘুলঘুলি দিয়ে এসে পড়েছে গোকুলের মুখে।

দুটো বড় বড় চোখে তার কি এক প্রলোভনের নেশা; চার চৌকো হাড় ওঠা মুখ—যেন একটা বুনো হেড়োল অন্ধকার রাতে হঠাৎ ঝোপের পাশে কোন শিকার দেখে থমকে দাঁড়িয়েছে।

চক্ চক্ করছে দুটো চোখ রাতের আঁধারে বন্য কোন আদিম লালসায়! জীবনের দিকে চাইল সে।

জীবনের সর্বাঙ্গ কাঁপছে।

—হ্যাঁরে, সেই যে বলছিলি?

ঠিক পরিষ্কার করে কথাটা বলতে পারছে না জীবন, ভয় আর লজ্জা লাগছে। প্রথম অন্যায় করার লজ্জা।

হাসে গোকুল, এসব তার খুব জানা। তার শিকার এরাই—বেঁচে থাকবার অবলম্বন! কাছে এসে গলা নামিয়ে বলে—ঠিক আছে। ওসব ঠিক হয়ে যাবে। শুধু কিছু… ডান হাতের দুটো আঙুল এক করে টাকা বাজাবার ইসারা করে দেখায়।

—বেশ! নিয়ে যাবি ওবেলা।

জীবন সায় দেয়।

হাসছে গোকুল।…শেষ বাবের মত সাবধান করে জীবন। খবরদার কেউ যেন জানতে না পারে।

…ফিসফিসানি কণ্ঠস্বর সিঁড়ির ওই বন্ধ গুমোট রহস্যান্ধকারে কেঁপে ওঠে। এ বাড়ীর প্রতিটি ইঁট যেন চাপা কোন বিদ্রূপে হাসছে।

…এই ওরা দেখে এসেছে কয়েক পুরুষ ধরেই। এমনি করে সিঁড়ির ধাপে ধাপে তারা নেমে গেছে কোন অন্ধকার অতলে, সেই অধঃপতনের নির্মম সাক্ষী ওরা। আজও যেন তাই হাসছে—নীরব নির্মম সেই হাসি।

বেলা বেড়ে উঠেছে।

লালডাঙ্গার বুকে মিঠে রোদ কেমন স্বপ্নময় স্পর্শ আনে। কাঠাল গাছের মসৃণ পাতায় রোদের নিবিড় স্পর্শ—ওদিকে সুরু হয়েছে শালবন সীমা ক্রমশঃ উৎবাই—এর বুক দিয়ে নেমে গিয়ে আবার উঠেছে—উঠে গেছে আকাশ কোলের দিকে। সবুজ আর হলুদে মেশামেশি।

পাখী ডাকছে।…ধান বোঝাই গাড়ীগুলো আসছে মাঠ থেকে। বাতাসে উঠছে পিতল পেটার টং টং শব্দ। বাঁশবাগানের ওদিকে দিঘীর কালো জল পার হয়েই কামারপাড়ায় লেগেছে কর্ম-ব্যস্ততা, এই সময় তাদেরও কাযের মরসুম। সারা বছর চাষী-বাষীরা তারও নীচের শ্রেণীর যারা দিন-মজুর তারা দিন গোণে—কবে আসবে সোনা ফসলের এই নিশ্চিন্ত দিনগুলো। পেট ভরে খেতে পাবে—কায পাবে। সঞ্চয় করতে পারবে দু-চারটে বাসন-কোসন, সারা বছরের নিদারুণ অভাবের দিনে নকড়া ছ-কড়ায় তাই বন্ধক দিয়ে ফ্যান-ভাত জোটাবে দু-একটা দিন।

কামারপাড়ার খদ্দেরও তাই এ সময় বেশী। অতুল কামারের ছেলেরা পাশাপাশি দুটো শালে কায করছে, দিনরাত কামাই নেই। আরও কয়েকটা শালেও পিতল-কাঁসার কায চলেছে। এমনি সময় তাদের মাথায় বড়বাবুর সেই হুমকি যেন টনক নড়িয়েছে। ভয়ও পেয়েছে তারা, চিন্তায় পড়েছে। কি করা যায়।

মহাজনের সরকারকে আজ সকালেই এমোকালী নিয়ে গিয়ে বন পার হয়ে বড় রাস্তায় বাসে তুলে দিয়ে এসেছে। সরকার মশাই যাবার সময় অতুল কামারকেই বলে যায়—আপনারা ভেবে-চিন্তে দেখুন।

—তাই দেখি।

—তবে একটু শীগ্গীর জানাবেন। বোঝেন তো মরসুমেই মাল না তুলতে পারলে আমরাই বা পাবো কি!

অতুল কামার সায় না দিয়ে পারেনি।

—তা তো বটেই আজ্ঞা! আমরা শলা করেই জানাচ্ছি।

—বেশ!

ভক্তিযুক্ত হয়ে বুড়ো প্রণাম করে সরকার মশাইকে! যোড়হাত করে বলে ওঠে—বেরাহ্মণ-দেবতা। তাঁকেও ঠাঁই দিতি পারিনি।

হাসে বুড়ো—না, না। রাতে ছোটবাবুর ওখানে বেশ ভালোই ছিলাম। মহাশয় লোক।

গলা নামিয়ে বলে ওঠে বুড়ো অতুলকে।

—ওকে হাতে রাখুন কর্মকার মশাই, কাযে দেবে। ওরা কি ভাবছে। অতুলও ভেবেছে ওই কথাটা। আর সকলেই। একজনের আশ্রয় ভরসা না পেলে ওই দুর্দান্ত তারকরত্নবাবুর হাত থেকে তাদের নিষ্কৃতি নেই।

অতুল আজ শালে বসেনি। কেমন যেন গা-হাত-পা বেদনা করছে অনবরত হাতুড়ি পিটে। তাই আজ জিরোণ নিচ্ছে।

খড়ো বাড়ীর উঠানে একটা চারপাইএ বসে আছে বুড়ো। এক পাশে পুই লতাটা শীতের হাওয়ায় কচি পাতা মেলে লকলক করে উঠছে।

বুড়ো কাকে দেখে একটু অবাক হয়। এ সময় ছোটবাবুকে এখানে দেখবে ঠিক ভাবতে পারেনি।

—আপুনি। ওরে·· একটা মোড়া-টোড়া কিছু দিয়ে যা। অশোক তার আগে নিজেই ওদিকে গড়ানো একটা লোহার হাল দিয়ে তৈরী ছোট মোড়া তুলে এনে নিজেই বসেছে।

···বুড়োর কাছে কথাটা আজ পাড়বে।

অশোক কাল রাত্রে সদরের ওই সরকার মশায়ের কাছে কথাটা আলোচনা করেছিল। যদি দাদন না নেয় মহাজনের ঘরে এরা এমনিই মাল যোগান দিলে মহাজন বেশ ভাল দাম দিয়েই কিনবে।

তাতে বাণী থাকবে গড়পড়তা একটা লোকের প্রায় ছ-সাত টাকা, আর এখন পায়, দেড় টাকা, এক টাকা বারো আনা বড় জোর।

হাসে বুড়ো, জীর্ণ দেহে কেমন একটা অসহায় ভাব। ওর কথায় হাসছে—সবই তো জানি ছুটবাবু। কিন্তুক মাথা যে না বিকোলে কামারের প্যাট চলে না। ঘরে আমার ছটো খাটিয়ে মরদ—তাতেও নুন আনতে পান্থা থাকে না, সবই বরাত আজ্ঞা।

কেমন বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই বরাত আর অদৃশ্য দেবতার অপার মহিমার উপর অচলা ভক্তি স্থাপন করে অসহায়ের মত বসে আছে। সকালের রোদ বেড়ে উঠেছে।

বুড়ো বলে ওঠে—যা দিনকাল চলেছে ছোটবাবু, তাতে জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বাদ করা ঠিক হবেক নাই—খ্যাষম্যাষ যা থাকে কপালে—

হঠাৎ ভুবনের বৌকে চা আনতে দেখে মুখ তুলে চাইল বুড়ো। কলাইকরা দুটো কাপে করে বৌটা চা এনেছে। খেজুর গুড় দিয়ে তৈরী চা—রংটা কালো। ওর সুন্দর হাতে কেমন যেন একটু বেমানান।

বড় বৌ এর বয়স হয়েছে একটু—তবু এখনও রূপ যায় নি। ছেলেপুলে নেই। দুর্গাপুরের মেয়ে—অশোকদের পৈতৃক বাড়ীর গাঁয়েই, সেই সুবাদেই বের হয় ওর সামনে।

—চা এনেছ দেখছি।

অতুল চা-টা হাতে নিতে নিতে বলে—বৌমা আমাকে আবার নেশাটা ধরিয়ে দিয়েছে বটে।

হাসে কদম। মিষ্টি সলাজ একটু হাসি!

বুড়ো বলে—সত্যিই ছুটবাবু, নেন চা জুড়িয়ে গেল। মুড়ি ভাজছি গরম মুড়ি কুসুম বীজ ভাজা দিয়ে আনবে চাট্যি!

সলজ্জ কণ্ঠে কদম বলে ওঠে। বাড়ীর বড় বৌ।

সংসারের চাকাটা সবই তাকে সচল রাখতে হয়। মুড়ি ভাজছিল। আগুনের তাপে সুন্দর রংটা আরও টকটকে হয়ে উঠেছে।

…বুড়ো অতুল হাসছে—আর কি কুসুম বীজ চিবোবার দাঁত আছে।

তা এনে দেবো চাট্টি ছোটবাবুকে।

—না। না। বাড়ী থেকে খেয়েই বেরুচ্ছি।

কদম একটু যেন হতাশই হয়। গলা নামিয়ে বলে—তা তো হবেনই ঠাকুঃপো। গরীবের ঘরে চাল-ভাজা—হঠাৎ কাকে ঢুকতে দেখে মাথায় ছোট কাপড়টা তুলে ঘোমটা দেবার চেষ্টা করে সরে গেল।

—লোকটা যেন চুপি চুপি অন্দর মহলে ওদের দেখতেই ঢুকেছে, এক নজর দেখার পরই হঠাৎ এদের বসে থাকতে দেখে গলা খাঁকারি দিয়ে বৌ-ঝিদের সাবধান করার কথা মনে পড়ে যায় লোকটার!

গলা ঝাড়তে ঝাড়তে এগিয়ে আসে হরিনারায়ণ মুখুয্যে। ইউনিয়নবোর্ডের আদায়কারী। বগলে ময়লা ন্যাকড়া জড়ানো দপ্তর—হাতে দড়ি বাঁধা একটা দোয়াত ঝুলছে। পিছনে পাইক ঋষি ডোম। হাতে একটা কম্বল পাট করে জড়ানো। হরিনারাণ এক খরচায় ডবল কায করে, একদিকে বোর্ডের আদায়কারী, অন্য দিকে তারক-রত্নের গদারগাঁ মৌজার তহশীলদার। পিছনে ঋষি ডোম সেই চলমান কাছারীর প্রতিভু; কম্বলখানা সঙ্গেই নিয়ে যায়। যত্রতত্র পেতে বসেই কাছারীর কায সুরু করে দেয়। সেই সঙ্গে একটি ছোট্ট হুঁকোও থাকে—তাতে কাছারীর ইজ্জৎও বাড়ে, আর হরিনারাণের তামাকের তেষ্টাও মেটে।

—এই যে অতুল।

অশোকবাবুকে এখানে দেখে একটু বিস্মিত হয়েছে হরিনারাণ, বড়-বৌ চা দিয়ে গেল তা দেখেছে। সমস্ত মনোভাব চেয়ে যাওয়া হরিনারাণের সহজাত ধর্ম, নইলে তারকবাবুর এষ্টেটের কাযে লাগতে পারতো না। সহজ-ভাবেই অশোককে নমস্কার জানায়—নমস্কার ছোটবাবু। তা সকাল বেলাতেই বেড়াতে বার হয়েছেন।

হরিনারাণ জবাবের অপেক্ষা না রেখেই ইতিমধ্যে মোবাইল অপিসের কায সুরু করেছে। বসে পড়েই লাল মোড়কের খাতা খুলে পাতা উলটাচ্ছে। বই হাতে করলেই আর ওই কম্বলের আসনে বসলেই বোধ হয় হরিনারাণ বদলে যায়। হাঁড়ির মত মুখখানা গম্ভীর হয়ে ওঠে—চাদরের ফাঁক দিয়ে ফতুয়ার বাইরে হাতে দোদুল্যমান ঢোলের মত ইষ্ট-কবচটা দেখা যায়।

—কইহে অতুল, দাও দিকি গত তিন সনের খাজনাটা, আর হাল চৌকিদারী টাক্সো—সব শুদ্ধ ধরো চৌদ্দ টাকা তিন আনা।

—চৌদ্দটাকা!

হরিনারায়ণ ব্যাঙএর মত মুখখানা করে বলে ওঠে—হাঁ করছ যে হে? এতকরে ফেলে রাখলে জমবেনা?

অতুল আমতা আমতা করে জবাব দেয়—তা তো বটেই আজ্ঞে, দিনকতক সময় দ্যান। মালপত্র চালানদিই সদরে, ই ক্ষেপেই দিয়ে দোব ফিরে এলে।

অশোক উঠে গেল। এ সময় তার না থাকাই ভালো।

—একদিন বাড়ীতে যেও অতুল।

—যাবো আজ্ঞে।

অতুলও উঠে দাঁড়িয়ে অশোককে এগিয়ে দেয়। হরিনারাণ ওদের দিকে চেয়ে থাকে। ইতিমধ্যে ঋষি কোত্থেকে হুঁকোটা সেজে এনেছে। এগিয়ে দেয় ওর দিকে।

—সেবা করুন আজ্ঞা।

হরিনারাণ জলবিহীন হুঁকোটা টেনে চলেছে।

শীতের সকালে মন্দ লাগেনা। ওটা টানতেই যেন কলজেয় ভরসা পায়। এবার গলাচড়িয়েই জানান দেয় হরিনারাণ।

—এসন বাকী পড়লে আর আমার দ্বারা হবে না অতুল। সোজা বাঁবড়োর বটতলায় গিয়ে জমা দিয়ে আসবে। ওই দশ টাকাই তোমার খরচ খরচা নিয়ে ধরো পঁচিশটাকা দাঁড়াবে। তখন বাবু পেছু দিওনা।

কথাগুলো চুপকরে শুনে যায় অতুল। টাকা নাই, থাকলে আজই দিয়ে দিত। ওদিকের দাওয়াথেকে বড় বৌ মুড়ি ভাজা বন্ধ করে অসহায় দৃষ্টিতে শ্বশুরের দিকে চেয়ে থাকে।

হরিনারাণের চোখে চোখ পড়তেই সরে গেল বৌটা।

লোকটা বিড়ালের মত কেমন কপিশ নীল দৃষ্টি মেলে চেয়ে রয়েছে। বিশ্রী মোটা ওই কদাকার লোকটা।

…হরিনারাণ গলা বেশ তুলেই যেন কদম-বৌকে শুনিয়েই অতুলকে বলে ওঠে—তালে চৌকিদারী টাক্সো? ওটা বাকী পড়লে ধরো তোমার ঘর দরজার কপাট—গরু বাছুর, থালা ক্রোক করেই আদায় করা হবে।

হঠাৎ জীর্ণ দরজাটা ঠেলে কাকে ঢুকতে দেখে হরিনারাণ চাইল। ঢুকছে এসো কালী।

পরণে শালের সেই কালিঝুলি মাখা ছোট কাপড়-খানা। কাঁধে শালকাটা বড় হাতুড়ি, বলিষ্ঠ দুর্মদ দেহে পেশীগুলো ফুলে উঠেছে।

…স্থির দৃষ্টিতে সে হরিনারাণের দিকে চেয়ে দেখে—চমকে উঠেছে হরিনারাণ।

…অতুল কর্মকার ও।

ঘটনাটা নিমেষের মধ্যে ঘটে যায়। ঋষি ডোমও এসব ইসারা বোঝে। চকিতের মধ্যে কম্বলটা গুটিয়ে নিয়ে হরিনারাণ দপ্তর বগলে নিয়ে ওদিকের খোলা দরজা দিয়েই স্যাৎ করে গলে যায়।

অতুল ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারেনা।

—ও আজ্ঞা!

কে কার কথা শোনে। হরিনারাণ ঋষি দুজনেই তখন বোধ হয় ওপাশের কুলির দিকে এগিয়ে গেছে।

হঠাৎ কালীর দিকে নজর পড়তেই থেমে গেল বুড়ো। কালী ঘুটের বস্তা নিতে এসেছিল বাড়ীতে শালে যাবার পথে, হঠাৎ ওকে দেখে চকিতের মধ্যে ব্যাপারটা ঘটে যাবে জানে না।

—কি হল গো মামা!

হঠাৎ হাসির শব্দে মুখ তুলে চাইল কালী।

কদম-বৌ হাসছে।

—ভাজবৌ!

কালী এগিয়ে যায় ওই দিকে। অতুলও বিব্রত বোধ করে বাইরের দিকে গেল মুহুরী মশায়কে দেখতে।

হাসছে তখনও কদম!

—গেল!—হেসেই যে গেলা, ও ভাজবৌ!

কদমের এমনিতেই হাসি আসে। মোটা লোকটার স্বভাব, ওর হিংস্র চাহনির অর্থ বুঝতে কদমের বাকী নেই।

তারপরই কালীকে ঢুকতে দেখে—চমকে উঠেছিল হরিনারাণ। কামারপাড়ার সম্বন্ধে অহেতুক আতঙ্ক অনেক-কিছুই জাগে ওদের মনে।

…সুতরাং হরিনারাণ চকিতের মধ্যেই কর্তব্য স্থির করে নিয়েছে। ভীতু শয়তান ওই লোকটা।

—আমরণ, হেসেই কুটিকাটি হলা গো।

কদম কথা বলে না—তপ্ত খোলায় একমুঠো চাল দিয়ে নিপুণ হাতে খুচিগুলো নেড়ে চলেছে। চালগুলো সাদা ধপধপে মুড়িতে পরিণত হচ্ছে। শব্দ উঠছে—বিচিত্র একটা শব্দ।

—ধ্যুত্তোর। কালীচরণ ওসব বোঝে না, দাওয়া থেকে ঘুটের বস্তাটা কাঁধে ফেলে বের হয়ে গেলো শালের দিকে।

অতুল ফিরে এসেছে। মুহুরীমশায় তখন পড়েল পুকুরের পাড় দিয়ে হনহনিয়ে চলেছে। ডাকাডাকি করেও সাড়া মেলে না।

—কি হল বলদিনি বড়-বৌ।

শ্বশুরের কথার জবাব দিল না কদম। মুড়ি ভেজে চলেছে। পট পট শব্দ উঠছে, হুহু জ্বলছে কাঠের আগুন। গরমে তাতে ঘেমে উঠেছে কদম।

তখনও হাসি হাসে। ছোটবাবু থাকলে মন্দ হ'ত না ব্যাপারটা।

অশোক মনে মনে কথাটা অনেক ভেবেছে। একটা কিছু করা দরকার, স্থায়ী কোন কায। সেই রাত্রে সরকার-মশাইএর মুখ থেকেও সব খবর নিয়েছে। কাঁসা পিতল এবং আশপাশের গ্রামের তাঁতীদের ব্যাপারও জানে। বাঁকুড়ার তাঁতীদের নামও বাইরে প্রচুর। তারাও কারিগর হিসাবে সুপরিচিত। কিন্তু সেই সেকেলে তাঁত আর সেই মোটা সুতো দিয়েই তারা কায করে। বানায় শুধু গামছা আর মোটা ধুতি, কেউ কেউ বানায় চাদর।

—বনমালী তাঁতীও সেদিন বলেছিল অশোককে—একবার একশো বিশের সুতো কিছু দ্যান—হাতের কাযই দেখাই বাবু।

অশোককে সত্যিই বনমালী তাদের এলেম দেখিয়ে-ছিল। তাদের অবস্থাও দেখেছে অশোক—দেনার দায়ে আর দাদনের চাপে মাথা মিশিয়ে দিয়েছে মাটির সঙ্গে।

…অন্ততঃ বানানোর ব্যাপারে একটা সমবায় গড়বার

চেষ্টা করেছে অশোক। কিন্তু ওদের কথাটা নিজে জানায় নি। ওরা অভাব আর দুঃখটা বুঝে—যেদিন নিজেরাই উৎসাহী হবে সেদিন পথের সন্ধান দেবে অশোক। অন্ততঃ চেষ্টা করবে।

এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করবার পরামর্শ দেবার কেউ নেই। বরং উলটে অনেক কথাই শোনাবে।

কোথায় যেন তারকবাবু অবনীবাবু ওদের অনেকেই ওকে এড়িয়ে চলে। [ক্রমশঃ

ধর্মশাস্ত্রবিহিত তিথি

শ্রীবাণী চক্রবর্তী এম-এ

ধর্মের উপরই সমস্ত বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। "ধর্মঃ শ্রেয়ঃ সমুদ্দিষ্টং শ্রেয়োঽভ্যুদয়লক্ষণম্" এই ভবিষ্য পুরাণের বচন হইতে আমরা ধর্মের স্বরূপ জানিতে পারি। অর্থাৎ বিধিবোধিত মঙ্গলজনক এবং উন্নতি-শীল বিষয়ই ধর্ম। এই জন্য ধর্মের অনুষ্ঠান বেদ ও ঋষিবাক্য সম্মত। যাহাই ইন্দ্রিয়গোচর হইবে তাহাই ধর্ম নয়। স্মার্ত রঘুনন্দন ধর্মের নির্দেশ করিয়াছেন—

"দ্রব্যক্রিয়াগুণাদীনাং ধর্মত্বং স্থাপয়িষ্যতে।
তেষামৈন্দ্রিয়কত্বেঽপি ন তাদ্রূপ্যেণ ধর্মতা॥
শ্রেয়ঃ সাধনতা হ্যেষাং নিত্যং বেদাৎ প্রতীয়তে।
তাদ্রূপ্যেণ চ ধর্মত্বং তস্মান্নেন্দ্রিয় গোচরঃ॥

অর্থাৎ ঘৃতপ্রভৃতি দ্রব্য, অগ্নিতে আহুতিরূপ ক্রিয়া ও শুক্লত্বাদি গুণ—ইহাদের ধর্মত্ব স্থাপিত করা হইবে কিন্তু ইহারা ইন্দ্রিয়গোচর হইলেও স্বরূপে ধর্মপদের বাচ্য নহে, কেননা ইহাদের হিতকারিতা বেদ হইতে প্রতীত হয়। এই হিতকারিতারূপই ধর্ম, সুতরাং উহা ইন্দ্রিয় গোচর নহে।

মনু বলিয়াছেন—ধর্মের প্রমাণ বেদ, স্মৃতি ও সদাচার—

"বেদোঽখিলো ধর্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্।
আচারশ্চৈব সাধূনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ॥"

বর্তমানকালে যাঁহারা ধর্মের মধ্যে বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া ধর্ম শাস্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ করেন, তাঁহারা কখনই প্রকৃত ধর্মের সন্ধান পাইতে পারেন না।

বর্তমানে অনেকে ধর্মশাস্ত্রসম্মত গুপ্তপ্রেসপঞ্জিকার গণনাসিদ্ধমতকে স্বীকার না করিয়া দৃগ্‌গণনাসিদ্ধ বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত পঞ্জিকার তিথি গ্রহণ করিতেছেন। এখন এই দৃগ্‌গণনা ধর্মশাস্ত্রসম্মত কিনা তাহা দেখা প্রয়োজন।

৬০,৬৫ বৎসর পূর্বে দৃগ্‌গণনাসিদ্ধ বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকাখানি প্রথম প্রকাশিত হয়। সেই সময় নানাস্থানে ২।১ জনবিশিষ্ট ব্যক্তি উহার প্রচলন কল্পে বিপুল চেষ্টা ও সভাসমিতি বিচারাদি করাইয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। কোন পণ্ডিতই উহা সমর্থন করেন নাই। তৎকালে বোম্বাই সহরে আহূত পণ্ডিত সভায় শ্রীনিবাসাচার্য প্রণীত তিথিনির্ণয়কারিকা নামক গ্রন্থের মতানুসারে 'বাণবৃদ্ধি' (প্রায় ৬ দণ্ড পর্যন্ত বৃদ্ধি অর্থাৎ আড়াই মুহূর্ত বৃদ্ধি) এবং 'রসক্ষয়' (প্রায় ৭ দণ্ড পর্যন্ত ক্ষয় অর্থাৎ তিন মুহূর্ত ক্ষয়) তিথিই ধর্মকার্যে গ্রহণীয়। কিন্তু দৃক্‌সিদ্ধ তিথিতে অতিরিক্ত হ্রাস ও বৃদ্ধি (অর্থাৎ ১০ দণ্ড পর্যন্ত ক্ষয় ও ৭ দণ্ড পর্যন্ত বৃদ্ধি) হওয়ায় ধর্মকার্যের ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয় বলিয়া তাহা গ্রহণীয় নহে এই সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল। আর পরবর্তীকালে ১৩২২ সালে ১৬ই পৌষ তারিখে কলিকাতায় ব্রাহ্মণ-সভাগৃহে ভটপল্লীর পরমাচার্য পূজ্যপাদ স্বর্গীয় পঞ্চানন তর্করত্ন মহোদয় প্রমুখ পণ্ডিতবৃন্দের নেতৃত্বে দেশের স্মার্ত ও জ্যোতির্বিদগণের এক সভায় পঞ্জিকা সংস্কার সম্বন্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে ধর্মশাস্ত্রের সহিত বিরোধ না হইলে দৃগ্‌গণনা মনোনীত হইবে। এখন এই দৃগ্‌গণনা যে ধর্মশাস্ত্রের নিবন্ধকারগণের সহিত বিরোধ ঘটাইতেছে তাহা দেখান হইতেছে। আর গুপ্তপ্রেসাদি প্রাচীন প্রচলিত মত পূর্ববর্তী সকল স্মৃতি-নিবন্ধকারগণের মতের সহিত ঐক্য স্থাপন করিতেছে। যেমন—পশ্চিম ভারতীয় নিবন্ধকার হেমাদ্রি কালনির্ণয় প্রকরণে বলিয়াছেন—"যদ্য-প্যত্যন্তহ্রাসো ভবতি তথাপি ত্রিমুহূর্তাধিকহ্রাসাভাবাৎ"—অর্থাৎ চরম-ক্ষয়স্থলেও তিন মুহূর্তের অধিক ক্ষয় হয় না।

দক্ষিণভারতীয় নিবন্ধকার ও অদ্বিতীয় মীমাংসক পণ্ডিত মাধবাচার্য তাঁহার কালমাধবে—"ষড়্‌ঘটি কান্তঃ ক্ষয়ঃ", মধ্যভারতীয় বীরমিত্রোদয় নামক নিবন্ধকার "ত্রিমুহূর্তাধিক ক্ষয়াসম্ভবেন" এবং দক্ষিণভারতীয় প্রসিদ্ধ নিবন্ধক গদাধর তাঁহার কালসার নামকনিবন্ধে এইমত সমর্থন করেন।

বাংলাদেশের জীমূতবাহন, শূলপাণি ও রঘুনন্দন এবং এমন কি জ্যোতিষ শ্রেষ্ঠ বরাহমিহিরের টীকাকার ভট্টোৎপল পর্যন্ত এই তিন মুহূর্ত ক্ষয় ও আড়াই মুহূর্ত বৃদ্ধি স্বীকার করেন।

কিন্তু গ্রহণ গণনা দৃক্‌সিদ্ধমতে সাধন করিতে হয়। কারণ চক্ষুদ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়াই গ্রহণ নিমিত্ত কর্মে অধিকারী হওয়া যায় বলিয়া যে কোন উপায়ে চাক্ষুষ দেখিয়া গ্রহণ ইত্যাদি কর্ম সাধন করিতে হয়। শাস্ত্রে আছে—

"চক্ষুষা দর্শনং রাহোর্যত্তদ্ গ্রহণ মুচ্যতে"

অর্থাৎ চক্ষু দিয়া রাহুর দর্শন হইলেই তাহাকে গ্রহণ বলা হয়। সূর্য

সিদ্ধান্ত মতে—গ্রহদিগের দৃক্‌কর্মসংস্কার, আয়ন সংস্কার ও অক্ষিসংস্কার করিতে হয়। নক্ষত্রগ্রহাদি বিষয়ে আয়ন ও অক্ষিসংস্কার রূপ দ্বিবিধ দৃক্‌কর্ম সংস্কার সাধন করিতে হয়। কিন্তু এই অত্যন্ত হ্রাসবৃদ্ধি সম্পন্ন দৃক্‌সিদ্ধ তিথি গ্রহণাদি কার্যে ব্যবহৃত হইলেও কখনই ধর্মকার্যে গ্রহণীয় নহে, এই তিথিতে কখনও কখনও কর্মের লোপ পর্যন্ত দেখা দেয়।

স্মৃতিনিবন্ধকারগণ যে এই তিন মুহূর্ত ক্ষয় ও আড়াই মুহূর্ত বৃদ্ধি নির্দিষ্ট করিয়াছেন তাহা তাহাদের স্বকপোলকল্পিত নয়। ঋষিবাক্য হইতেই ইহা পাওয়া যায়। যথা মৎস্যপুরাণের ২২ অধ্যায়ে আছে—

"অপরাহ্ণে তু সম্প্রাপ্তে অভিজিদ্ রৌহিণোদয়ে।
যদত্র দীয়তে জন্তোস্তদক্ষয়মুদাহৃতম্॥"

অর্থাৎ উদীয়মান অষ্টম বা নবম মুহূর্তরূপ গৌণাপরাহ্ন সম্পৃক্ত তিথিতে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে যে দ্রব্য দেওয়া হয় তাহা অক্ষয়ফলজনক হইয়া থাকে। রঘুনন্দন এখানে উদয় শব্দ দ্বারা উদয়াচল সম্বন্ধ অর্থাৎ খণ্ডতিথিরও গ্রাহ্য ধরিয়া ইহাকে তিথি খণ্ড বিশেষের নিয়ামক বলিয়াছেন।

মৎস্যপুরাণের—

"ঊর্দ্ধং মুহূর্তাৎ কুতপাদ্ যন্মুহূর্তচতুষ্টয়ম্।
মুহূর্তপঞ্চকং বাপি স্বধাভবনমিষ্যতে॥"

এই বচন দ্বারাও অষ্টম ও নবমমুহূর্তরূপ বলার দরুণ দুইটি বচনেই এক গৌণাপরাহ্নের নির্দেশ করায় পুনরুক্ততাবশতঃ বিধ্যনুবাদ দোষ হইয়া পড়ে। এই দোষ পরিহারের জন্যই মৎস্যপুরাণের "অপরাহ্ণে তু সম্প্রাপ্তে" এই বচনে ঐ অষ্টম ও নবম মুহূর্ত তিথির সম্পূর্ণ প্রাপ্তি অপেক্ষিত হইতেছে না। উদয় সম্বন্ধ ধরা হইতেছে। শূলপাণি শ্রাদ্ধ-বিবেকপ্রকরণে এবং রঘুনন্দন মলমাসতত্ত্বেও ইহা উল্লেখ করিয়াছেন।

দৃক্‌সিদ্ধ গণনায় মৎস্যপুরাণের বচনে পূর্বদিনে অপরাহ্নপ্রাপ্ত তিথি আপরাহ্নিক শ্রাদ্ধে অযোগ্য হইয়া পরদিনের তিথি ১০ দণ্ড ক্ষয় তো দূরের কথা যদি ৮ দণ্ড ক্ষয়ও হয়, তাহা হইলেও ঐ পরদিনের তিথির অষ্টম মুহূর্তে উদয়কাল সম্পর্ক ঘটিতে পারে না। সুতরাং শ্রাদ্ধের ও লোপ হইয়া পড়ে। এইরূপ অত্যধিক ক্ষয় ধর্মবিশিষ্ট দৃকসিদ্ধ মতের তিথি ধর্মকার্যের বিধিবহির্ভূত বলিয়া কথনই ধর্মশাস্ত্র সম্মত নয়। তাহা উপরিউক্ত আলোচনায় বোঝা যায়।

আমার অধ্যাপক ভট্টপল্লী নিবাসী অদ্বিতীয় স্মার্ত পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহোদয়ের নিকট হইতে আমি সম্যক্ এই বিষয়ে উপদেশ লইয়াছি।

আমারে উন্মাদ করে

শ্রীরঞ্জিতবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঐশ্বর্য ভাণ্ডারময়ী চারুচিত্রাবতী—
উন্মুক্ত পৃথিবীরূপা শান্তিনিকেতন :
প্রকৃতির সে নিয়মে লাবণ্যলতিকা
আদান প্রদানে তোলে বিড়ম্বনা সুর।

সমস্ত সত্বারে ঘিরে আলোড়ন বাণী
দেহের প্রস্তুতি পর্বে গ্রহণের ডাক ;
সব কিছু বিনিময়ে তারে চেয়ে প্রাণ—
প্রেমের সন্ন্যাসী রূপে একধ্যেয় 'প্রিয়া'।

শক্তিহারা চৈতন্যের বিবেক যখন—
বিনাশের চিতা বহ্নি জ্বালে আসি নিজে ;
অসম্ভব কল্পনা এ শুনায় আমায় :
চিত্তের বিকল রূপ করে বিশ্লেষণ।

স্নায়ুকেন্দ্রে তবু তার সুরের বিস্তার—
অহরহ হাহাকারে ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস :
সময়ের চিত্তজয়ী থাকে দূরে দূরে,
মধুর সুরভি তার দিক হতে দিকে।

চাঁদের সুষমা মাখা শুভ্র পুষ্পমুখী—
আমারে উন্মাদ করে সপ্তবর্ণা রূপে।

বাবরের আত্মকথা

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় এম-এ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

হিন্দুস্থানের বৈশিষ্ট্য

হিন্দুস্থানের বিশেষ গুণ এই যে দেশটা বিশাল এবং এখানে সোনা-রূপার প্রাচুর্য্য খুব বেশী। বর্ষাকালে এখানকার আবহাওয়া চমৎকার। সে সময় কোনও কোনও দিন পনরো এমন কি কুড়িবার পর্য্যন্ত বৃষ্টি হয়। বর্ষা ঋতুতে এমনভাবে প্লাবন নেমে আসে যে নদী পূর্ণ হয়ে যায় এবং যেখানে অন্য সময় জল থাকে না সে সব জায়গাও জলে পূর্ণ হয়ে যায়। মাটি ক্রমাগত বৃষ্টির জলে ভিজে ওঠায় আবহাওয়া হয়ে ওঠে তৃপ্তিকর। এই সময়কার শীতোষ্ণ আরামদায়ক কোমল তাপ মাত্রার সত্যই তুলনা হয় না। কিন্তু এর দোষ এই যে হাওয়ায় একটা ভিজে স্যাঁৎসেঁতে ভাব থাকে। বর্ষাকালে আমাদের দেশের ধনুক দিয়ে তীর নিক্ষেপ করা যায় না। তীর ধনুক অকেজো হয়ে পড়ে। শুধু তীর ধনুকই নয়—বর্ম্ম, বই, পোষাক পরিচ্ছদ আসবাবপত্র সব তাতেই এই স্যাঁৎসেঁতে ভাবের মন্দ প্রভাব দেখা যায়। এখানকার বাড়ীও মজবুতভাবে তৈরি না হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বর্ষা ঋতুর মত শীত ও গ্রীষ্মেও ভাল আবহাওয়া পাওয়া যায়। কিন্তু যখন উত্তুরে হাওয়া বয় তখন সেই হাওয়ায় প্রচুর পরিমাণে ধুলোমাটি উড়তে থাকে। বর্ষা ঋতুর সূচনার কিছুদিন আগে পাঁচ ছয় বার এই রকম হাওয়া প্রবল বেগে বইতে থাকে। সেই সময় এমন ধুলো বালি উড়তে থাকে যে কাছের লোককেও চোখে দেখা যায় না। এখানকার লোকেরা একে বলে আঁধি। গ্রীষ্ম ঋতুতে সূর্য্য যখন বৃষ এবং মিথুন রাশিতে, সেই সময় এখানে তাপ বৃদ্ধি হয়—কিন্তু এমন গরম তখন হয়না যে অসহ্য হয়ে ওঠে। বাল্‌খ এবং কান্দাহারের গরমের সঙ্গে এই গরমের তুলনা হয় না। এখানকার গরম ঐ দেশ গুলির গরমের অর্দ্ধেকও নয়।

হিন্দুস্থানের আর একটি সুবিধা হচ্ছে এই যে এখানে প্রতিটি কাজ ও ব্যবসায়ের জন্য প্রচুর লোক পাওয়া যায়। প্রত্যেক কাজ এবং চাকুরির জন্য সব সময়েই এক এক দল লোক প্রস্তুত হয়ে থাকে—যাদের পূর্ব্বপুরুষরা সেই কাজ বা ব্যবসা পুরুষানুক্রমে করে এসেছে। মোল্লা সেরিফ উদ্দিন আলি ভেজদি তাঁর জাফর আমার এক অদ্ভুত কথা লিখেছেন। যখন তাইমুর বেগ পাথরের মসজিদ তৈরী করেন তখন নাকি আজির বাইজান। হিন্দুস্থান ও অন্যান্য নানা দেশ থেকে তিনি পাথর কাটার জন্য মজুর নিয়ে আসেন এবং দৈনিক দুই দল মজুর এই মসজিদ তৈরীর কাজে খাটে। একমাত্র আগ্রাতেই আমার প্রাসাদ নির্ম্মাণের জন্য সেই জায়গা থেকেই দৈনিক ছয়শ আশি জন মজুর নিযুক্ত করি। আগ্রা, সিক্রি, বিয়ানা, ঢোলপুর, গোয়ালিয়র এবং কোয়েলে (আলিগড়) আমার কাজের জন্য দৈনিক এক হাজার চারশ একানব্বই জন পাথর কাটার লোক নিযুক্ত হয়। এই ভাবে অন্য কাজ ও ব্যবসার জন্য অসংখ্য কর্ম্ম-দক্ষ লোক হিন্দুস্থানে পাওয়া যায়।

রাজস্ব

বেরাহ থেকে বেহার পর্য্যন্ত দেশগুলি আমার সাম্রাজ্যের অধীনে আসায় [বেহার বাবরের অধিকারে আসে ১৫২৯ সালে] সাম্রাজ্যের রাজস্ব দাঁড়ায় ৫২ কোটি টাকা। আট, নয় কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ী কতকগুলি পরগণা সেখানকার রাজা ও রহিস্‌রা বহুকাল থেকে ভোগ করে থাকেন সম্রাটের প্রতি তাঁদের আনুগত্যের জন্য।

*　　*　　*　　*

রজব মাসের ২৯ শে তারিখ শনিবার আমি কোষাগারের অর্থ পরীক্ষা করে ধন বিতরণ করতে আরম্ভ করি। কোষাগার থেকে সত্তর লক্ষ টাকা হুমায়ুনকে দিই। এ ছাড়া তাকে দিই একটা প্রাসাদ যার আসবাবপত্রের কোনও তালিকা করা হয়নি। কোনও কোনও আমিরকে দশলক্ষ টাকা, কাউকে বা আট লক্ষ, সাত লক্ষ বা ছয় লক্ষ টাকা দান করি। আফগান, হাজরাস, আরব, বেলুচি এবং অন্যান্য দেশের লোক যারা আমার সৈন্যদলে ছিল তাদের পদমর্য্যাদাও গুণানুসারে কোষাগার থেকে অর্থদান করি। প্রত্যেক ব্যবসায়ী, প্রত্যেক বিদ্বান ব্যক্তি এক কথায় প্রতিটি লোক যারা আমার সঙ্গে সৈন্যদলে যোগ দিয়েছিল তাদের এমন অর্থ উপহার দিই যা তাদের সৌভাগ্যের দ্যোতক বলেই গণ্য করা যেতে পারে। কাবুলের অধিবাসীদের উৎসাহদানের জন্য নারী ও পুরুষ, স্বাধীন ও ক্রীতদাস, শিশু কিংবা বৃদ্ধ প্রত্যেককে দান স্বরূপ একটি করে মুদ্রা পাঠিয়ে দিই।

আমি যখন আগ্রায় আসি তখন গ্রীষ্ম ঋতু। আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে এখানকার সমস্ত অধিবাসী পালিয়ে যায়। সেইজন্য এখানে কোনও খাদ্য শস্য কিংবা পশুখাদ্য খুঁজে পাওয়া যায় না—যা দিয়ে আমাদের কিংবা অশ্বদের আহারের ব্যবস্থা হতে পারে। গ্রামগুলিও আমাদের প্রতি শত্রুতা ও ঘৃণার জন্য বিদ্রোহী হয়ে চুরিডাকাতি সুরু করে দেয়। রাস্তায় চলা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কোষাগারের অর্থ বিলি করার পর এমন সময় ছিল না যাতে উপযুক্ত লোক পাঠিয়ে নানা পরগণা এবং বিশিষ্ট জায়গাগুলি রক্ষা করতে পারি। এ বছর এমন অসাধারণ গরম যে তাপ অসহ্য হয়ে উঠেছে। মরুভূমিতে লু লেগে চলেছে

—যেমন লোক মারা পড়ে তেমনি অনেক লোক সর্দি-গরমিতে মরতে লাগলো।

এই সব কারণে আমার দলের যে সব বেগ এবং বাছাই করা অনুচর মনের বল হারিয়ে ফেলে তাদের সংখ্যা নগণ্য নয়। তারা হিন্দুস্থান ত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করে ফিরে যাওয়ার জন্য তৈরী হতে লাগল। বয়স্ক বেগরা যারা সত্যই সর্ব্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ কেবল তারাই যদি এইরূপ অভিপ্রায় জানতো তাতে সত্যই কিছু দোষের ছিল না। কারণ তাদের এইরূপ ভাবপ্রবণতা প্রকাশ পেলে আমার নিজস্ব বুদ্ধির ওপর আমার এমন আস্থা আছে যে সেই বুদ্ধির দ্বারা বিচার বিবেচনা করে তাদের মতামতের ঔচিত্য অনৌচিত্য সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারতাম। কিন্তু তাদের একই কাহিনী নানাভাবে ইনিয়ে বিনিয়ে বারংবার আবৃত্তি করে এমন লোককে শোনানো হচ্ছে—যে লোক নিজের চোখেই সমস্ত ব্যাপার দেখছে এবং যে নিজেই সে ব্যাপারে বিবেচনা করে একটা ধীরস্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে। এটা কি রকমের শালীনতা যে সৈন্যদলের শেষ সেনাটি পর্য্যন্ত এই রকম বুদ্ধিহীন কাঁচা রকমের মতবাদ প্রকাশ করতে পারে? এটা বিশেষ বাঞ্ছনীয় যে যখন আমি কাবুল থেকে যাত্রা করি শেষবারের মত, তখন নীচু থাকের অনেক লোককে ও সম্মানজনক বেগের পদবীতে উন্নীত করে এই ধারণা করেছিলাম যে তারা আমাকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করবে এবং আমি যদি জলে কিংবা আগুনে প্রবেশ করার পথই বেছে নিই তাহলে তারাও আমাকে অকুণ্ঠচিত্তে সেই পথেই অনুসরণ করবে এবং আমি যে পথে অগ্রসর হব তারাও সন্তুষ্টচিত্তে সেই পথেই এগিয়ে আসবে। এটা আমার কখনই কল্পনায় আসেনি যে তারাই আমার কার্য্যের জন্য জবাব দিহি করবে এবং যারা আমার যে সব কার্য্যে ও অভিপ্রায়ে সম্মিলিতভাবে সভায় ও মন্ত্রণা পরিষদে সমর্থন জানিয়েছিল তারাই এখন বেঁকে দাঁড়িয়ে তাদের বিরুদ্ধতার কথা ঘোষণা করবে। কাবুল থেকে বেরিয়ে আসার পর ইব্রাহিমকে যুদ্ধে পরাজিত করে আগ্রা দখল করার সময় পর্য্যন্ত খাজা কিলান প্রশংসা-জনক ব্যবহার করেছে। সে সর্ব্বদা বীরের মত কাজ করেছে এবং বীরের মতই তার মতামত ব্যক্ত করেছে। কিন্তু আগ্রা দখল করার কয়েক দিনের মধ্যেই তার সমস্ত মতামতের আমূল পরিবর্ত্তন হয়ে গেল। সকলের চেয়ে খাজা কিলানই এখন ফিরে যাওয়ার সঙ্কল্পে স্থির হয়ে রইলো।

আমার সৈন্যদলের মধ্যে ফিসফিসানি শুনতে পেয়ে আমার সমস্ত বেগকে পরামর্শ সভায় উপস্থিত হতে ডাকলাম। আমি তাদের বললাম যে যুদ্ধ হয় এবং সাম্রাজ্য স্থাপনের মত কাজ অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধ পরিচালনার জন্য সেনাদল ছাড়া হয় না। রাজা এবং অভিজাত শ্রেণীর কোনও অস্তিত্ব থাকতে পারে না—যদি প্রজা বা অধীনস্থ প্রদেশ না থাকে। অনেক বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টায়, অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করে, দীর্ঘ কষ্টকর পথ অতিক্রম করে, নানাভাবে সৈন্য সংগ্রহ করে নিজেকে এবং যুদ্ধ এবং রক্তপাতের ফলে আল্লার অসীম অনুগ্রহে পরাক্রমশালী শত্রুকে পরাজিত করে আমি অসংখ্য প্রদেশ ও রাজ্য জয় করেছি এবং সেগুলো এখন অধিকার করে আছি। এখন এমন কি ব্যাপার ঘটে গেল এমন কি দুঃখকষ্ট আমাদের ভোগ করতে হচ্ছে যে যে রাজ্য আমরা নিজেদের শক্তিক্ষয় করে জয় করেছি সেই বিজিত রাজ্য বিনা কারণে পরিত্যাগ করে হতাশা এবং অস্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে আবার কাবুলে ফিরে যাব? যে কেউ আমাকে বন্ধু বলে স্বীকার করে সে যেন কখনই এমন প্রস্তাব আমার কাছে উত্থাপন না করে। যদি তোমাদের মধ্যে এমন কেউ থাকে যে কিছুতেই এখানে থাকবার কথা মেনে নিতে এবং এখান থেকে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তন করতে ইচ্ছুক নয় সে চলে যাক। আমার এই যুক্তি-সঙ্গত এবং নিরপেক্ষ প্রস্তাব শোনার পর বাধ্য হয়েই অনিচ্ছা সত্ত্বেও অসন্তুষ্ট সৈন্যদল তাদের রাজদ্রোহকর প্রস্তাব ত্যাগ করলো। খাজা কিলান থাকতে অনিচ্ছা প্রকাশ করা ঠিক হলো যে তার অধীনে অনেক সৈন্য থাকায় সে কাবুলের জন্য আমার উপহারগুলি পাহারা দিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করবে। কাবুল ও গজনিতে আমার সৈন্য সংখ্যা খুব অল্প থাকায় আমি তাকে এই নির্দ্দেশ দিই যে এই জায়গাগুলো যেন ঠিকভাবে সুরক্ষিত থাকে এবং যেন খাদ্যসম্ভারের কোনও অপ্রতুল না হয়। গজনির শাসন ভার আমি তার উপর অর্পণ করি—যার রাজস্ব বাৎসরিক তিন লক্ষ মুদ্রা। খাজা কিলান হিন্দুস্থানের প্রতি এমন বিরূপ হয়ে উঠেছিল যে তার যাওয়ার সময় দিল্লীর কতকগুলি বাড়ীর দেওয়ালে এই কবিতাটি লিখে রেখে যায়!—

(তুর্কিতে)

'নিরাপদে যদি সিন্ধু
হতে পারি পার।
এইমুখো আর কভু
হবো নাকো আর।
হিন্দে ফিরিতে যদি
পুনঃ ইচ্ছা হয়।
লজ্জায় আমার যেন
মাথা কাটা যায়।'

যখন আমি হিন্দুস্থানে সশরীরে বর্ত্তমান তখন এরূপ একটি কবিতা রচনা করে প্রকাশ করা প্রত্যক্ষভাবে অসৌজন্যের লক্ষণ। আমাকে ত্যাগ করে যাওয়ার সঙ্কল্প আমার ক্ষোভের কারণ হয়েছিল—কিন্তু তার এই আচরণ তার অপরাধ দ্বিগুণ করে দিল। আমি কোনও রকমে প্রস্তুত না হয়েই তাড়াতাড়ি একটি কবিতা লিখে তার কাছে পাঠিয়ে দিই।

(তুর্কিতে)

'বাবর! আল্লার অসীম দয়া তোমার উপর।
হও নতশির শত শত বার উদ্দেশে তাঁহার।
সিন্ধু, হিন্দ, আরও রাজ্য, যিনি করেছেন দান।

গরমে অস্থির হয়ে ভাব যদি শীতল স্থানের কথা,
মনে ভাব একবার গজনির অসহ্য শীত তুষারের কথা।'

সাওয়ান উৎসবের কয়েক দিন ধরে সুবৃহৎ হল ঘরে একটা বড় রকমের ভোজের আয়োজন হয়। সুলতান ইব্রাহিমের নিজস্ব প্রাসাদের মধ্যস্থলে অর্দ্ধ-গোলাকার ছাদের নীচে চার দিকে পাথরের স্তম্ভশ্রেণীযুক্ত এই বিশাল কক্ষ এই উপলক্ষে স্বর্ণখচিত সান, কোমর বন্ধ সহ তরবারি এবং সোনার জিন সহ ঘোড়া আমি হুমায়ুনকে উপহার দিই। চিন্ তাইমুর ও মহম্মদ সুলতানকে স্বর্ণখচিত শান, কোমর বন্ধ সহ তরবারি এবং ছোরা দিই। অন্যান্য বেগ ও কর্ম্মচারীদেরও পদমর্য্যাদা-নুযায়ী দেওয়া হয় কোমর বন্ধ সহ তরবারি, ছোরা এবং সম্মান জনক পোষাক। মোটের উপর সেদিন একটি জিন সহ ঘোড়া, কোমরবন্ধ সহ দুই জোড়া তরবারি, মিনা করা ২৫ টি ছোরা, বহুমূল্য পাথর খচিত দুইখানি ছোরা এবং আঠাশটি পোষাক উপহার দেওয়া হয়। এই ভোজের দিন মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছিল। এই দিন তেরবার বৃষ্টিপাত হয়। যারা বাইরে বসেছিল তারা সম্পূর্ণ ভাবে ভিজে যায়।

আমার প্রায়ই মনে হয় যে হিন্দুস্থানের প্রধান অসুবিধা হচ্ছে কৃত্রিম জলাধারের অভাব। সঙ্কল্প করলাম—যে জায়গা আমি বাস করবার জন্য নির্বাচন করছি সেখানেই কৃত্রিম জলাশয়, জল আনবার যান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং সুপরিকল্পিত আমোদ প্রমোদের ক্ষেত্র তৈরীর বন্দোবস্ত করব। আমার আগ্রায় আসার কয়েকদিন পরই স্থান নির্ব্বাচনের উদ্দেশ্য নিয়ে যমুনা পার হয়ে যাই এবং ঐ দিকটা পরীক্ষা করে দেখতে থাকি যে জায়গাটা উদ্যান রচনার উপযুক্ত ক্ষেত্র কিনা। কিন্তু সমস্ত জায়গাই এমন কুশ্রী ও নচ্ছারজনক যে বীতশ্রদ্ধ হয়ে আবার যমুনা পার হয়ে ফিরে আসি। সৌন্দর্য্যের অভাব এবং এ দেশের অসন্তোষজনক পরি প্রেক্ষিতে আমার উদ্যান রচনার কল্পনাকে ত্যাগ করতে হলো। কিন্তু আগ্রার কাছাকাছি কোনওরূপে একটা উপযুক্ত স্থান খুঁজে না পাওয়ায় যে জায়গা পাওয়া যাচ্ছে, তারই সদ্ব্যবহার করা ছাড়া গত্যন্তর ছিলনা।

প্রথমে একটি বড় ইঁদারা খনন করে স্নানাগারে জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা করি। তারপর যে ভূমিখণ্ডে তেঁতুল গাছ এবং আর কোন বিশিষ্ট জলাশয় আছে সেইখানে কাজ সুরু করি। জলাশয়টি আরও বড় করে তার পাড় ভালভাবে বাঁধিয়ে ফেলা হয়। তারপর পাথরের প্রাসাদের সম্মুখের বড় দরবার হল এবং পুষ্করিণীটির সংস্কার করি। অন্তঃপুরের কক্ষগুলির সম্মুখের বাগান এবং সেই কক্ষগুলির সুসংস্কৃত করা হয়। এইভাবে কাজ করতে করতে হিন্দুস্থানী রীতি অনুযায়ী যে সব প্রাসাদ ও উদ্যান অপরিচ্ছন্ন ও শৃঙ্খলাবিহীন ছিল, সেগুলো যথা-সাধ্য নিয়ম মাফিক কায়দায় সজ্জিত করা হলো। কোণায় কোণায় উদ্যান রচনা করলাম। প্রতিটি বাগানে গোলাপ ও নাসিসাস্ গাছ রোপণ করা হলো। কেয়ারি করে মুখোমুখি এই গাছগুলো রোপণ করা হলো।

হিন্দুস্থানে তিনটি জিনিষ আমার বিরক্তি উৎপাদন করেছে—এক গরম, দুই ঝোড়ো হাওয়া, তিন ধুলো। গ্রীষ্মকালে গরম হাওয়া এমন প্রবল হয় যে এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া কারও ক্ষমতায় কুলোয় না।

স্নানাগারে যেখানে স্নানের জল রাখার টব অথবা চৌবাচ্চা থাকে, সেগুলো পাথরের তৈরী। জলধারা শ্বেতপাথরের এবং এই কক্ষের আর সব যেমন মেঝে ও ছাদ লালপাথরের তৈরী। আমার অন্যসব অনুচর যারা নদীর ধারে জমি সংগ্রহ করেছিল, তারা সেখানে উদ্যান রচনা এবং পুষ্করিণী খনন করে। তারা চরখি তৈরী করে নদী থেকে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করে। হিন্দুস্থানের লোক যাদের এই রকম ভাবে সাজানো কোনও জায়গা পূর্ব্বে কখনও দেখেনি এবং কি পদ্ধতিতে জায়গাগুলিকে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করে তোলা যায় তার কোনও ধারণা নাই—তারা যমুনা তীরের এই দিকটায় নতুন তৈরী প্রাসাদ ও বাগান দেখে বিস্মিত হয়ে এই জায়গার নামকরণ করে—'কাবুল'।

আগ্রা দুর্গের ভিতরে প্রাসাদ ও দুর্গ প্রাকারের মাঝে একটা খালি জায়গা ছিল। আমি এই জায়গায় কুড়ি ফিট চতুষ্কোণ একটা কূপ খনন করার নির্দ্দেশ দিই। হিন্দুস্থানী ভাষায় এই রকম বড় কূপ যাতে নামার সিঁড়ি আছে তাকে ওয়েল বলে। এখানে উদ্যান-রচনা করার আগেই এই কূপ খনন করা আরম্ভ হয়। বর্ষাকালে যখন মজুররা এই কূপ খননের কাজে ব্যস্ত তখন কয়েকবার মাটির ধ্বস নেমে তারা মাটির নীচে চাপা পড়ে। রাণা সঙ্গর সঙ্গে আমার ধর্ম্মযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আমি এই কূপ খননের কাজ শেষ করতে আদেশ দিই—ফলে একটি মনোরম ওয়েল তৈরী হয়ে যায়। এই ওয়েলের মধ্যে তিনতলা একটি বাড়ী তৈরী করা হয়। নীচ তলাতে তিনটি খোলা কক্ষ কূপের মধ্য দিয়ে এখানে যাওয়া যায়। সারি সারি সিঁড়ি বেয়ে নামবার পর তিনটি পৃথক পৃথক কক্ষে প্রবেশ করার পর দেখা যাবে। একটি কক্ষ অপরটির চেয়ে তিন সিঁড়ি পরিমাণ উচু। সব শেষের কক্ষ থেকে আর কয়েকটি সিঁড়ি নীচে নেমে গিয়েছে। যে ঋতুতে কূয়োর জল কমে আসে-তখন সেই সিঁড়ি দিয়ে আরও নীচে কূয়োর জলে নামা যায়। বর্ষাকালে যখন জল ওপরে ওঠে, নীচ তলার সব চেয়ে উঁচু ঘরটার ওপর পর্য্যন্ত জল আসে। দোতলায় বাঁকা পাথরের তৈরী একটি কক্ষ এবং নিকটেই আর একটি গম্বুজওয়ালা ঘর যেখানে বলদরা চাকা ঘুরিয়ে জল তোলে। ওয়েলের ওপরের প্রান্ত থেকে অর্থাৎ কূয়োর ওপর থেকে পাঁচ ছয়টি সিঁড়ির নীচ দিয়ে এই কক্ষের প্রত্যেক দিকে যাওয়ার জন্য আর এক প্রস্থ করে সিড়ি গিয়েছে। এই কক্ষের প্রবেশ পথের বিপরীত দিকের দেওয়ালে এই বাড়ী নির্ম্মাণের তারিখ একটা পাথরে খোদাই করা আছে দেখা যায়। এই কূপের পাশেই আর একটা গর্ত্ত এমনভাবে খনন করা হয়েছে যে তার তলদেশ কূপের মাঝামাঝি গভীরতার চেয়ে কিছু উচু। পূর্ব্বে উল্লিখিত গম্বুজ ঘরে বলদগুলো জল তোলার জন্য যে চাকা ঘোরাচ্ছে, সেই জল পাশের গর্ত্তটায় পড়ছে। এই

শেষোক্ত গর্ত্ত থেকে আর একটি চাকার সাহায্যে দুর্গ প্রাচীরের সমান উঁচু জায়গায় জল তুলে উঁচু বাগানগুলিতে সেই জল ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। যে জায়গায় কূপের সিঁড়ি ওপরে উঠে এসেছে, সেই খানটায় একটা পাথরের ঘর তৈরী করা হয়েছে। কূপের চারিদিকের বেষ্টনীর বাইরে পাথর দিয়ে একটি মসজিদ ও নির্ম্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু এটা খুব খারাপভাবে হিন্দুস্থানের রীতি অনুসারে তৈরী।

১৫২৬ সালের ঘটনাবলী

মহরম মাসে বেগ উইস্ ফারুকের জন্মের সংবাদ নিয়ে উপস্থিত হলো। যদিও আগেই একজন পত্রবাহক পদব্রজে এই সংবাদ নিয়ে আমার কাছে এসেছিল। তবুও বেগ উইস্ এই মাসে সেই সুসংবাদ তার নিজমুখে আমাকে শোনানোর জন্য হাজির হলো। সাওয়াল মাসের ২৩শে তারিখ শুক্রবার সন্ধ্যায় তার জন্ম হয়। তার নাম রাখা হয় ফারুক।

বিয়ানা এবং আরও কয়েকটি জায়গায় গোলাবর্ষণ করার উদ্দেশ্যে ওস্তাদ আলি কুলিকে একটি বড় কামান নির্ম্মাণ করতে নির্দ্দেশ দিই। কারণ, এই দেশগুলো তখনও আমার বশ্যতা স্বীকার করেনি। কতকগুলো হাফর ও আরও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করে নিয়ে সে আমার কাছে লোক পাঠিয়ে জানান যে কামান তৈরীর সব সরঞ্জাম ঠিক করা হয়েছে। ওস্তাদ আলি কি ভাবে কামান ঢালাই করে আমরা দেখতে পেলাম। যে জায়গায় কামান ঢালাই করা হবে তার চারদিকে আটটি হাফর ও আরও সাজসরঞ্জাম রক্ষিত আছে। প্রত্যেক হাফরের নীচে এক একটি নালী—যে নালীটা কামান ঢালাই এর ছাঁচ পর্য্যন্ত গিয়েছে। আমার পৌছানোর পরই তারা বিভিন্ন হাফরের গর্ত্ত খুলে ফেলে। উত্তপ্ত তরল ধাতু সেই সব নালীর মধ্য দিয়ে ছাঁচের মধ্যে প্রবেশ করতে লাগলো। কিছুক্ষণ এইভাবে চলবার পর নানা হাফরের মধ্য দিয়ে সেই তরল ধাতুর প্রবাহে কামানের ছাঁচ সম্পূর্ণ পূর্ণ হওয়ার আগেই বন্ধ হয়ে গেল। হাফর অথবা গলিত ধাতুর সম্বন্ধে বোধ হয় কোনও রকম অসতর্কতা ঘটে ছিল। ওস্তাদ আলি কুলি খুবই অনুতপ্ত হয়ে পড়লো। এমন কি সে ছাঁচের মধ্যে গলিত ধাতুর ভিতর ঝাপিয়ে পড়তেও উদ্যত হলো। তার লজ্জা দূর করার জন্য তাকে আমরা উৎসাহিত করতে লাগলাম এবং তাকে একটা সম্মানসূচক পোষাক ও দিলাম। দুই দিন পর সেই ছাঁচ ঠাণ্ডা হলে ছাঁচের আবরণ খুলে ফেলা হয়। ওস্তাদ আলি খুব আনন্দিত হয়ে আমার কাছে লোক পাঠিয়ে সংবাদ দেয় যে কামানের যে কক্ষে গোলা পোরা হয় তাতে কোনও দোষ নাই এবং বারুদের কক্ষটা ও ঠিক ভাবে তৈরী করে ফেলা হয়েছে। গোলার কক্ষটি উঁচু করে তুলে সেটাকে ঠিক করে নিতে সে কয়েক জনকে কাজে লাগায় এবং নিজে বারুদ কক্ষটির কাজ শেষ করার ভার নেয়।

তমারজেন ব্যাদ থেকে ফতে খাঁর জ্বার নিয়ে মেহিদ খাজা তাকে আমার দরবারে নিয়ে আসে। ফতে খাঁকে আমি সাদর অভ্যর্থ[illegible] জানাই। তার পিতার রাজ্য এবং তার সঙ্গে আরও কিছু যো[illegible] করে তাকে অর্পণ করি যার মূল্য চল্লিশ লক্ষ টাকা। হিন্দুস্থানে [illegible] সব আমির খুব বেশী অনুগ্রহভাজন—তাদের নানা উপাধি দেওয়া রীতি আছে। এই রকম উপাধির একটি হচ্ছে—'আজিম'। হুমায়ু ছাড়া এই উপাধি আর কারও লাভ করা সঙ্গত নয় মনে করে আ[illegible] এই নামের উপাধি বাতিল করে দিই।

সফর মাসের ২০শে তারিখ বুধবার তেঁতুল গাছের পাশে পুষ্করিণী তীরে চাঁদোয়া খাটানো হয়। সেখানে একটি ভোজের আয়োজন ক[illegible] ফতে খাঁকে নিমন্ত্রণ করি। তাকে সুরাপান করিয়ে একটি পাগড়ি এব[illegible] মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত সম্মান সূচক একটি সম্পূর্ণ পোষাক উপহা[illegible] দিই। তাকে অনুগ্রহ দেখিয়ে এবং সম্মানে ভূষিত করে নিজের দে[illegible] ফিরে যাওয়ার জন্য বিদায় দিই। ঠিক হয় যে তার পুত্র মামুদ খাঁ আম[illegible] দরবারে থাকবে।

এই বছরের রবিউল আওয়াল মাসের ১৬ই তারিখ শুক্রবার এক বিশেষ ঘটনা ঘটে। ব্যাপারটি এই—সেই হতভাগ্য মহিলা-ইব্রাহিমের মা শুনতে পেয়েছিল যে আমি হিন্দুস্থানের পাচকদের তৈ[illegible] খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে থাকি। তিন চার মাস আগে যখন হিন্দুস্থানে[illegible] খাদ্য রন্ধন ও তা আহার করার ব্যবস্থা হয়ে উঠলো না, তখন আম[illegible] ইচ্ছা হলো যে ইব্রাহিমের বাবুর্চিদের এখানে ডেকে আনা হোক পঞ্চাশ কি ষাট জন বাবুর্চির মধ্যে চার জনকে নির্বাচন করে কা[illegible] নিযুক্ত করা হলো। ঐ মহিলা এই কথা জানতে পেরে একজন লোক[illegible] পাঠিয়ে খাদ্য পরীক্ষক আমেদকে ডেকে আনে। একজন ক্রী[illegible] দাসীর হাতে কাগজে মোড়া এক আউন্স পরিমাণ বিষের গুড়া খাদ্য পরীক্ষকের হাতে দিতে বলে। আমেদ সেই বিষ আমার একজ[illegible] বাবুর্চির হাতে দেয়। সে তখন বাবুর্চিখানার কাজ করছিল। তা[illegible] এই প্রলোভন দেওয়া হয় যে কাজ হাসিল করতে পারলে তাকে চা[illegible] জেলা পুরস্কার স্বরূপ দেওয়া হবে। সে যেন এই বিষের গুঁড়া কোনও উপায়ে আমার খাদ্যের সাথে মিশিয়ে দেয়। ইব্রাহিমের আর একটি ক্রীতদাসীকে সেই প্রথমা ক্রীতদাসীর পিছু পিছু পাঠায়—[illegible] হাতে আমেদকে দেওয়ার জন্য বিষ পাঠানো হয়—এইটি দেখবার [illegible] যে সেই বিষ সত্যই আমেদের হাতে পৌছে কিনা। ভাগ্য ভাল সেই বিষ খাদ্য রান্নার পাত্রে ফেলা হয় না—ফেলা হয় থালার ওপ[illegible] রসুইয়ের পাত্রে বিষ না ফেলার কারণ এই যে আমার খাদ্য পরীক্ষক[illegible] ওপর এমন নির্দ্দেশ দেওয়া ছিল যে হিন্দুস্থানী পাচকদের প্রতি ত[illegible] দৃষ্টি রাখতে হবে এবং যখন রান্না হবে সেই রান্নার পাত্র থেকেই খ[illegible] পরীক্ষা করতে হবে। যখন রান্না করা মাংস প্লেটে ঢালা হয় ত[illegible] আমার নির্বোধ অজ্ঞ খাদ্য পরীক্ষকরা অন্যমনস্ক ছিল। আমেদ [illegible] সুযোগে বিষের গুঁড়োর অর্দ্ধেকটা একটা প্লেটে কয়েকটা পা[illegible] রুটির ওপর ছড়িয়ে এবং তার ওপর মাখন-ভাজা মাংস রাখে। [illegible] বিষের গুঁড়ো ভাজা মাংসের উপর অথবা রান্নার পাত্রে ছড়িয়ে [illegible]

তাহলে আরও গুরুতর অবস্থা দাঁড়াতো। কিন্তু মনের স্থৈর্য্য হারিয়ে ফেলার জন্য অর্দ্ধেকের বেশী বিষই উনুনের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল।

শুক্রবার অপরাহ্নের নামাজের পর ওরা আমার খানা সাজায়। আমি খরগোসের মাংস খেতে খুব ভালবাসি। এই মাংস কিছু তার সঙ্গে অনেকটা গাজর-ভাজা। আমি তখনও বিস্বাদজনক কিছু বুঝতে পারিনি। আমি দুই এক টুকরো শুক্নো ঝলসানো মাংস খাই। সেইটি খাবার পর আমি বমি বমি ভাব অনুভব করি। আগের দিনও এই রকম পোড়া মাংসের একটা অংশ খেয়ে আমার কেমন বিস্বাদ লেগেছিল। ঐ রকমই আমার মনে হচ্ছে বমি বমি ভাবটার ব্যাখ্যা এ ভাবেই করেছিলাম। আবার আমার বমির ভাব হতে থাকে। খাবার প্লেট সম্মুখে থাকতেই আমার পেট এমন গুলিয়ে যায় যে দুই তিন বার প্রায় বমি করে ফেলবো বলে মনে হয়। শেষে কিছুতেই বমির ভাব দমন করতে না পেরে বাইরে যাই। বাইরে আসবার পথেই আমরা বুক ধড় ফড় করে ওঠে এবং যেতে যেতেই মনে হলো বমি করে ফেলবো। বাইরে আসার পরই অনেকটা বমি হয়ে গেল।

আগে কখনও খাদ্য গ্রহণ করার পর বমি করিনি। এমন কি মদ খাওয়ার পরও এমন কখনও হয়না। আমার মনে তখন সন্দেহের উদ্রেক হয়। আমি পাচকদের আটক করে রাখবার জন্য আদেশ দিই। একটা কুকুরকে ঐ খাবার খাইয়ে তাকে বন্ধ করে রাখার জন্য হুকুম করি। পরদিন সকাল বেলা প্রথম প্রহরের পর কুকুরটা পীড়িত হয়ে পড়ে। তার পেটটা ফুলে ওঠে এবং খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে বলে বোধ হয় তার দিকে ঢিল ছুঁড়লে এবং নানা ভাবে উত্যক্ত করলেও তাকে শোয়া অবস্থা থেকে দাঁড় করানো গেল না। দুপুর পর্য্যন্ত কুকুরটা এই অবস্থায় ছিল তার পর সে উঠে দাঁড়ালো এবং সুস্থ 'হয়ে উঠলো। দুইজন যুবকও এই খাদ্যের কিছু কিছু খেয়েছিল। পরদিন সকালে তারাও খুব বমি করতে থাকে। তাদের মধ্যে একজন খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ে। যাহোক তারা দুইজনই শেষ পর্য্যন্ত বেঁচে যায়।

বিপদের ঝঞ্ঝা আমার উপর
দিয়ে বয়ে গেল।
নিরাপত্তা ফিরে পেলাম শেষে,
প্রাণ রক্ষা হলো।
মহান আল্লা করিলেন
নবজীবন দান।
পর পার হতে ফিরে এলাম,
পেলাম নব প্রাণ।
যেন মাতৃগর্ভ হতে আবার
আমার জন্ম হলো।'

* * *

'আমি ভেঙ্গে পড়েছিলাম।
আমি মরে গিয়েছিলাম।
তবুও আবার ফিরে পেলাম জীবন।
মৃত্যু থেকে জীবনে উত্তরণ—
এই নতুন করে পাওয়া প্রাণ
সবই ঈশ্বরের দান, ভুলিনি কখন।

* * *

মহম্মদ বকসিকে পাচকদের নজরবন্দী করে রেখে তাদের জেরা করতে আদেশ দিই। অবশেষে, তারা সমস্ত ব্যাপারই প্রকাশ করে যা আমি আগেই উল্লেখ করেছি।

সোমবার দরবার দিনে আমি সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, প্রধান প্রধান লোক, বেগ এবং উজিরদের দরবার কক্ষে আসবার জন্য নির্দ্দেশ দিই। দুইজন পাচক এবং দুইজন স্ত্রীলোককে দরবার কক্ষে আনিয়ে প্রশ্ন করা হয়। তারা ব্যাপারটির খুঁটি নাটি বিষয় সবই প্রকাশ করে বলে। খাদ্য পরীক্ষককে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলার জন্য হুকুম দিই। পাচকদের জ্যান্ত ছাল ছাড়িয়ে নেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়। একজন স্ত্রীলোককে হাতীর পায়ের তলায় নিক্ষেপ করে পিষে মেরে ফেলার এবং আর একজনকে তোপের মুখে উড়িয়ে দেওয়ার জন্য নির্দ্দেশ দিই। ইব্রাহিমের মাকে বন্দী শালায় রাখার জন্য আদেশ জারি করি। সে নিশ্চয়ই তার গুরুতর অপরাধের জন্য আল্লার দরবারে উপযুক্ত শাস্তি পাবে।

শনিবারে আমি শুধু দুধপান করি। সুরায় কিছু 'মাখতুম' ফুল মিলিয়ে ঘেঁটে নিয়ে সেটাও পান করি। আল্লার অসীম দয়ায় আমার পীড়ার আর কোনও চিহ্ন রইলো না। আমি আগে কখনও ধারণা করতে পারিনি যে জীবন এমন মধুময় বস্তু।—কবি বলেছেন—

'মৃত্যুর দুয়ারে আসে যেই জন,
জীবনের মূল্য বোঝে সে তখন।'

এই ভয়ঙ্কর ঘটনাগুলির কথা যখনই আমার স্মৃতিপথে উদিত হয় তখনই মনে হয় যেন মূর্চ্ছিত হয়ে পড়বো। আল্লার করুণা আমাকে নবজীবন দান করেছে। কেমন করে আমার রসনা এই কৃতজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করবে? আমার বিতৃষ্ণার ভাব দূর করে ফেলবো মনস্থ করে যা যা ঘটেছিল তার প্রত্যেকটি ঘটনা লিখে রেখেছি। যদিও ঘটনাগুলি বীভৎস এবং মুখ দিয়ে উচ্চারণ করা উপযুক্ত নয় তবুও সর্ব্বশক্তি মান ভগবানের অনুগ্রহে সুখের দিনগুলি আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। আমি সুখ ও সমুজ্জ্বল স্বাস্থ্য নিয়ে দিন অতিবাহিত করছি।

[বাবর এই সময় দিল্লীর রাজা হয়ে বসেছিলেন—তাঁকে কোনও ক্রমেই হিন্দুস্থানের সম্রাট বলা চলে না। পানিপথের যুদ্ধে তিনি আফগানদের শক্তি চূর্ণ করতে পেরেছিলেন। তাঁকে রাজপুতদের প্রধান হিন্দুরাজা রাণা সঙ্গর সাথে এখন যুদ্ধে লিপ্ত হতে হবে। হিন্দুস্থানের যোদ্ধা জাতির মধ্যে রাজপুতরা সব চেয়ে যুদ্ধকুশলী। বাবরের সমস্ত অভিযান এ পর্য্যন্ত তাঁর স্বধর্মী মুসলমানদের বিরুদ্ধেই চালিত হয়েছে। এখনই সর্ব্ব প্রথম তিনি বিধর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে যাচ্ছেন।

এর নামই জেহাদ—অর্থাৎ ধর্ম্মীয় যুদ্ধ। রাজপুত জাতি বীর, অধ্যাবসায় শীল। যুদ্ধে ও রক্তপাতে নির্ভীক। জাতীয়তা বোধে উদ্দীপ্ত হয়ে তারা তাদের শিবিরের বীরদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাদের সম্মান রক্ষার জন্য সব সময়েই প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। তাদের অসমসাহসিকতা ও বীর্য্যবত্তার কথা ও তাদের সৈন্য সংখ্যার বিপুলতার কথা শুনে বাবরের সৈন্যরা বেশ কিছু আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল।]

যে কামান ওস্তাদ আলি কুলি তৈরী করেছিল, ঢালাই করবার সময় যার গোলা-কক্ষ অক্ষত আছে জানা গিয়েছিল এবং যার বারুদ-কক্ষ পরে ঠিকমত ঢালাই করে কাজের উপযুক্ত করা হয়েছিল—যার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হয়েছে—সেই কামান দিয়ে কিভাবে ওস্তাদ আলি গোলা বর্ষণ করে তা দেখবার জন্য রবিবার সেখানে যাই। কামান থেকে কতদূর গোলা নিক্ষিপ্ত হতে পারে সেইটা দেখার উদ্দেশ্য ছিল। অপরাহ্নের নমাজের কাছাকাছি সময় কামানটি দাগা হয়। দেখা গেল—এর গোলা একহাজার দু'শ পদক্ষেপ পরিমিত জায়গা দূরে গিয়ে পড়েছে।

প্রথম জেহাদি মাসের ৯ই তারিখে বিধর্ম্মীদের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ করার জন্য যাত্রা সুরু করি। সহরের উপকণ্ঠ পেরিয়ে সমতল ক্ষেত্রে তাঁবু ফেলে তিন চার দিন সৈন্য সংগ্রহ করতে এবং তাদের যথারীতি উপদেশ দিতে অপেক্ষা করি। হিন্দুস্থানের লোকদের উপর আমার বিশেষ আস্থা না থাকায় আমি তাদের এলোমেলো ভাবে নানাদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ানোর জন্য আমিরদের নিযুক্ত করি।

এই জায়গাতেই সংবাদ আসে যে রাণা সঙ্গ তার প্রায় সমস্ত সৈন্য নিয়ে বিয়ানার কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে। আমার যে সৈন্যদল আগে পাঠিয়েছি তারা দুর্গে পৌঁছতে পারেনি এমন কি দুর্গের লোকদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেনি। বিয়ানার দুর্গরক্ষী সৈন্যগণ দুর্গ থেকে অনেক দূর অসতর্ক ভাবে এগিয়ে যায়। শত্রুপক্ষ অকস্মাৎ তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করে।

আমার মনে হলো, এখন যে রকম অবস্থা তাতে কাছাকাছি জায়গার মধ্যে শিবির স্থাপন করার মত উপযুক্ত স্থান হবে সিক্রি—সেখানে পর্য্যাপ্ত জল পাওয়া যাবে। কিন্তু এও হতে পারে যে বিধর্ম্মীরা সেখানে জলের উৎসগুলি অধিকার করে সেখানেই শিবির ফেলবে। সেইজন্য আমি সৈন্যদের যুদ্ধ সাজে সাজিয়ে নিয়ে এগিয়ে গেলাম।

কয়েকজন বেগকে অগ্রগামী সৈন্যদের পালা ক্রমে ভার নিয়ে এগিয়ে যেতে এবং শত্রুপক্ষের কার্য্যকলাপের সন্ধান নিতে নির্দ্দেশ দিই। যেদিন এই কাজের ভার আবদুল আজিজের ওপর পড়ে, সে কোনও রকম সাবধানতা অবলম্বন না করেই সিক্রির দশ মাইলের মধ্যে এগিয়ে যায়। বিধর্ম্মী সৈন্যদল যখন এগিয়ে আসছিল তখন তাদের আব্দুল আজিজের বুদ্ধিহীন বিশৃঙ্খল ভাবে এগিয়ে আসার ব্যাপারটা নজরে পড়লো। যখন তারা এটা জানতে পারে তখন তাদের পক্ষের চার পাঁচ হাজার সৈন্য ধেয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আব্দুল আজিজের সঙ্গে এক হাজার কি দেড় হাজার সৈন্য ছিল। শত্রুসৈন্যের অবস্থান ও তাদের সংখ্যা সম্বন্ধে বিবেচনা না করেই তারা যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়লো। ঠিক প্রথম আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই কতকগুলি সৈন্য বন্দী হয়ে যায় এবং তাদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে ফেলা হয়। আমার কাছে অনবরত দূত আসতে থাকে এই সংবাদ নিয়ে যে শত্রু আমাদের কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে। আমরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তখনই প্রস্তুত হয়ে নিলাম। ঘোড়াদের যুদ্ধসজ্জা পরাণো হলো। তারপরই ঘোড়ায় চড়ে রওনা হলাম। গোলন্দাজদের কামান নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার আদেশ দিলাম। দুই মাইল অগ্রসর হওয়ার পরই দেখা গেল শত্রুসৈন্য পিছিয়ে পড়েছে।

বাঁ দিকে একটা বড় পুষ্করিণী দেখতে পেয়ে জলের সুবিধার জন্য সেখানেই শিবির স্থাপন করি। কামানগুলো সম্মুখ দিকে রেখে সেগুলো একটার সাথে একটা শিকল দিয়ে বাঁধা হয়। প্রতি দুইটি কামানের মধ্যে ষোলো ফুট জায়গা ফাঁক রাখা হয়। মুস্তাফা রুমি রুমি-রীতি অনুসারে কামানগুলো সাজিয়ে ফেলে কামান পরিচালনা ব্যাপারে সে অত্যন্ত দক্ষ। বুদ্ধিমান ও কর্ম্মঠ। ওস্তাদ আলি কুলি তার প্রতি ঈর্ষা পরায়ণ হওয়ায় আমি তাকে হুমায়ূনের সঙ্গে দক্ষিণ দিকে থাকতে বলি। যে সব জায়গায় কামান ছিলনা সেখানে হিন্দুস্থানি পথ পরিষ্কারক ও কোদাল চালক সৈন্যদের গড়খাই খননের কাজে নিযুক্ত করি।

বিধর্ম্মী সৈন্যদের সাহসিকতা, আকস্মিক অগ্রগতি, বিয়ানাতে তাদের কৃতকার্য্যতা এবং শা'মনসুর ও আর যারা বিয়ানা থেকে এসেছিল তাদের মুখ থেকে শোনা শত্রুপক্ষের অসীম সাহসের উচ্চ প্রশংসা—এই সব মিলিয়ে আমার সৈন্যদের ভীতির সঞ্চারের কারণ হয়। আব্দুল আজিজের পরাজয়ে সেই ভীতি চরমে ওঠে। আমার সৈন্যদের মনোবল ফিরিয়ে আনতে এবং বাহ্যতঃ আমার অবস্থান ঘাটি সুদৃঢ় করতে কাঠ নির্ম্মিত কতকগুলি তেপায়ার মত জিনিষ তৈরী করা হয়। এক একটি তেপায়া ষোলো ফুট দূর দূর বসিয়ে ষাঁড়ের চামড়ায় পাকানো দড়ি দিয়ে বেঁধে ঘাঁটি শক্ত করতে নির্দ্দেশ দিই। যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র তৈয়ারী করতে কুড়ি পঁচিশ দিন কেটে গেল।

এই সময়ে কাবুল থেকে পাঁচশ' লোক এখানে পৌঁছে গেল। মহম্মদ সেরিয়া নামে একজন সয়তান-স্বভাবের জ্যোতিষী তাদের সঙ্গে আসে। বাবা দোস্ত সুচি যাকে সুরা আনার জন্য কাবুলে পাঠানো হয় সে গজনির কয়েক রকমের উৎকৃষ্ট সুরা তিন সারি উটের পিঠে চাপিয়ে ঐ দলের সঙ্গেই এখানে আসে। যখন অতীতের ঘটনা এবং অসময়োচিত আজগুবি সংবাদ ছড়ানোর জন্য আমার সৈন্যরা তখনও ভয়ে ও আতঙ্কে অস্থির হয়ে আছে সেই সময় দুষ্টবুদ্ধি মহম্মদ সেরিয়া কোথায় আমাকে সাহায্য করবে তা না করে সে যাকেই শিবিরে পাচ্ছে তাকেই বলে বেড়াচ্ছে যে এই সময়টা পশ্চিম দিকে মঙ্গল গ্রহ বর্ত্তমান সেজন্য যে কেউ তার বিপরীত দিক থেকে যুদ্ধ চালাবে তারাই পরাস্ত হবে। যারা এই সয়তান জ্যোতিষীর সঙ্গে আলোচনা করলো তারাই আরও হতাশ হয়ে পড়লো। তার এই মূর্খের মত ভবিষ্যদ্বাণীতে কর্ণপাত না করে আমি এইরকম অবস্থায় যে সমস্ত সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন তাই করতে অগ্রসর হলাম এবং আমার সৈন্যগণ যাতে মনোবল ফিরে পেয়ে শত্রুর সঙ্গে লড়তে পারে তেমন অবস্থা সৃষ্টির উদ্যমে লেগে গেলাম।

জেমাদি-উল আওয়াল মাসের ২৩শে তারিখ সোমবার অশ্বারোহণ করে সৈন্যদলের অবস্থান ঘাটি পরিদর্শনের জন্য বেরিয়ে পড়ি। ঘোড়ার পিঠে থাকার সময় আমার মনে এইরূপ আত্মসমালোচনা গভীর ভাবে চলতে থাকে যে—আমি বারংবার যে বিষয়ে চিন্তা করেছি অর্থাৎ কোনও নিষিদ্ধ কাজ করলে সক্রিয় ভাবে অনুতপ্ত হবো এইরূপ মনোভাবের কিছু মাত্র অস্তিত্ব এখনও আমার মনের মধ্যে রয়েছে কিনা। আমি নিজের মনেই বলতে লাগলাম :—

'হে মোর আত্মা !

পাপের আনন্দে রহিবে মগন

আর কত দিন ?

কর অনুতাপ, অনুতাপ কভু

নহে স্বাদহীন।

বল, পাপে কতদূর কলুষিত হয়েছে

তোমার মন ?

নিরাশয়ে ডুবে পাপের আনন্দ

মজেছ যখন !

বল. কতটা জীবন এই ভাবে তুমি

নিঃশেষ করেছ ?

কতদিন, বল কতদিন, ইন্দ্রিয়ের

দাস হয়ে আছ ?

* * * *

'ধর্ম্মযুদ্ধ যুঝিবার তরে হয়েছ বাহির।

দেখেছ মৃত্যুর দৃশ্য—যে পথ তোমার মুক্তির।

আত্মাকে রক্ষার হেতু প্রাণ ডালি দেয় যেই জন।

একলা তো তুমি জানো, সেই লভে অনন্ত জীবন।

নিষিদ্ধ ভোগেচ্ছা থেকে সদা দূরে যাক,

পাপ হতে নিজের জীবন মুক্ত রাখ।

এই ভাবে চিন্তা করে মনে মনে করিলাম পণ,

লোভ থেকে দূরে সরে' সুরাপান করিব বর্জ্জন।'

সোনা ও রূপার পান পাত্র, পেয়ালা আরও যে সব পাত্রে সুরাপান বৈঠকে সুরা পরিবেশন করা হয় সেগুলো আনিয়ে ভেঙ্গে ফেলার জন্য আদেশ দিই। আমার নিজের মনকে পবিত্র করার জন্য সুরাপানের অভ্যাস ত্যাগ করার সঙ্কল্প করি। সোনা ও রূপার পান পাত্রের টুকরা গুলি দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করার জন্য নির্দেশ দান করি। আমার অনুতাপের প্রায়শ্চিত্তে প্রথম যে ব্যক্তি যোগ দেয় তার নাম আসাস্। সে আমার মতই প্রতিজ্ঞা করে যে দাড়ি কাটবে না, দাড়ি রাখবে। সেই রাত্রে এবং পরদিন অনেক আমির সভাসদ, সৈন্য এবং এমনও আরও কয়েকজন যারা চাকুরি করেনা সংখ্যায় প্রায় তিনশ জন তারা নিজেদের সংস্কারের শপথ গ্রহণ করে। যে সুরা আমাদের কাছে ছিল তা মাটিতে ঢেলে ফেলা হয়। আমি হুকুম দিই—যে সুরা বাবা দোস্ত নিয়ে আসছে তাতে নুন ছড়িয়ে ভিনিগার তৈরী করা হোক। যেখানে মদ ঢেলে ফেলা হয় সেখানে একটা পাথরে বাঁধাই ইদারা খনন এবং তার কাছেই দানসত্র তৈরী করা হয়। আগেই আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম দলিলের ওপর যে কর ধার্য্য আছে মুসলমানদের সে কর হতে রেহাই দেব। যখন আমি প্রায়শ্চিত্তের শপথ গ্রহণ করি সেই সময় মহম্মদ সারবান এই কথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আমি বলি—তুমি আমাকে এই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ঠিক করেছ। আমার সমগ্র রাজ্যে দলিলের ওপর ধার্য্য কর তুলে দিলাম। মুসলমানরাই এই কর থেকে রেহাই পাবে। আমার কার্য্যাধ্যক্ষদের ডেকে উপরোক্ত ঘটনা দুটির বিবরণ লিপিবদ্ধ করে আমার ফর্ম্মান সমগ্র সাম্রাজ্যের মধ্যে বিলি করতে আদেশ দিই।

আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি কোনও কোনও কারণে আমার অধীনস্থ ছোট বড় সব শ্রেণীর মধ্যেই সাধারণ ভাবে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। এমন একটা লোকও ছিলনা যে সাহসের সঙ্গে কথা বলতে পারে অথবা বলিষ্ঠ ভাবে মত প্রকাশ করতে পারে। উজিররা—যাদের কাজ হচ্ছে সৎ পরামর্শ দেওয়া এবং আমিররা যাদের কাজ হচ্ছে রাজ্যের ধন সম্পত্তি ভোগ করে আমাকে যথা সময়ে সাহায্য করা—তারা কেউই বীরের মত কথা বলছিল না এবং তাদের পরামর্শে ও হাবভাবে মোটেই সাহসিকতার চিহ্ন ছিলনা। আমার এই অভিযানের সমস্ত সময়েই একমাত্র খলিফাই প্রশংসনীয় আচরণের পরিচয় দিয়েছিল এবং সমস্ত ব্যাপারেই শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য অম্লান চেষ্টা করেছিল। আমার সৈন্যদের সর্ব্বময় হতাশার ভাব এবং মনোবলের অভাব দেখে আমি অবশেষে একটা মতলব ঠিক করি। সমস্ত আমির ও কর্ম্মচারীদের সমবেত করে তাদের সম্বোধন করে বলি 'অভিজাত ভদ্রব্যক্তি ও সৈন্যগণ! প্রত্যেক মানুষকেই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করলে মরতে হবে। আমরা সবাই এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করবে। একমাত্র ঈশ্বরই অপরিবর্ত্তনীয় ও চিরজীবী। জীবনের মহোৎসবে যে কেউ আসুক না কেন এই উৎসব সমাপ্তির পর তাকে মৃত্যুর পেয়ালা পান করতে হবে। এই নশ্বর সরাইখানায় যেই এসে পৌঁছুক না কেন তাকে এই দুঃখের আবাস পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিতে হবে। তাহলে, অগৌরবের বোঝা নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে সম্মানের সঙ্গে মৃত্যু বরণ করাই কি কাম্য নয় ?

'খ্যাতি নিয়ে যদি মারা যাই

সেই হবে আনন্দ অপার।

খ্যাতিটা আমারই থাক।

মৃত্যু নিক শরীর আমার।

মহান আল্লা আমাদের প্রতি প্রসন্ন। এমন অবস্থায় তিনি আমাদের ফেলেছেন যে যদি রণক্ষেত্রে মৃত্যু বরণ করি তা হলে আমরা শহিদের সম্মান লাভ করবো। যদি আমরা বেঁচে যাই তাহলে আল্লার কাজ সুসম্পন্ন করায় জয়ের গৌরবে উচ্চশির হবো। সেইজন্য এসো আমরা। প্রত্যেকে পবিত্র কোরাণ স্পর্শ করে এই শপথ বাক্য উচ্চারণ করি যে আমরা কেউ এই যুদ্ধ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার কথা চিন্তা করিব না যতক্ষণ প্রাণ আমাদের দেহ থেকে বেরিয়ে না যায় ততক্ষণ এই যুদ্ধক্ষেত্র এবং নরমেধ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেব না।

প্রভু ভৃত্য, ছোট. বড় সকলেই আগ্রহভরে পবিত্র কোরাণ হাতে তুলে নিয়ে আমি যে ভাবে বল্লাম সেই ভাবে শপথ করলো। আমার মতলব আশ্চর্য্য সুন্দর ভাবে সফল হ'লো। সেই সাফল্য দূরে, নিকটে বন্ধু বা শত্রু সর্ব্ব এই সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল।

(ক্রমশ
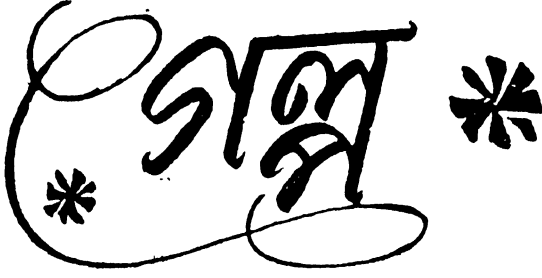
মরা জোনাকি

অর্ণব সেন

জোনাকি দেখলে রঞ্জতের অনেক কথাই মনে পড়ে। তবে সব সময় নয়। মনে পড়ে ছোটবেলায় সে ছোড়দির রেশমী রুমালে জোনাকি ধরত। অনেকগুলো জোনাকি এক সঙ্গে ধরে রুমালে পুরে ও তৈরি করত বিনা ব্যাটারির টর্চ লাইট। এখনও প্রায়ই তার সে কথা মনে পড়ে। সেই দিনগুলোর কথা এতদিনের এত ঘটনা, কাহিনী, চিন্তার বোঝার নিচে থেকেও মাঝে মাঝে উঁকি দেয়। সেই নির্জন বাংলো বাড়ি, ফুলের বাগান, অজস্র রঙ-বেরঙের ফুল, প্রজাপতি, বেতের চেয়ারে বসা ছোড়দি, ছোড়দির রেশমী রুমাল—সব কিছু কেমন করে যেন ছবির মতো স্থির হয়ে বেঁচে রইল। আর বেঁচে রইল সন্ধ্যেবেলা ছোড়দির সঙ্গে ছুটে ছুটে জোনাকি ধরা।

সেই বয়সে সেই ছোটবেলায় জোনাকির এই আলো নিয়ে সে অনেক ভেবেছে। আশ্চর্য হয়েছে। ছোড়দিকে সে জিজ্ঞেস করেছে অনেকবার। ছোড়দি অনেক কিছুই বলেছে। অবাক্ হয়ে শুনেছে সে। সব কিছুর মানেও বোঝেনি। ফসফরাস না কি যেন আছে, তাই বুঝি জ্বলে। যাক্ সে কথা। রঞ্জত জোনাকি ধরত প্রায়ই। কিন্তু আবার ছেড়ে দিত। তার ভয় হতো। যদি মরে যায়! আর আশ্চর্য! হলোই ঠিক তাই। এক সন্ধ্যায় ও আর রুমাল খুলে দেয়নি। পরের দিন সকালে সবগুলো মরে পড়ে ছিল। এ ওর ভাল লাগেনি। জোনাকি ধরার খেলা বন্ধ করল ও তারপর। অবশ্য শুধু এ জন্যে নয় ঠিক, মা-বাবার বকুনিতেও হয়তবা।

তারপর কলকাতা। সেই রূপ কথার রাজ্য ছেড়ে শহর কলকাতার জীবন। নানা তরঙ্গ, নানা ঢেউ। জোনাকির আলো একবার নেভে, একবার জ্বলে। এ যেন মানুষের আকাঙ্খার মতো। নিভে গিয়েও জ্বলে, জ্বলেও নিভে যায়। ছোটবেলায় বাবা বলতেন, 'তোমার ইঞ্জিনীয়ার হতে হবে।" মা বলতেন, ডাক্তার হতে হবে।' কিন্তু সেই দুই আকাঙ্খা নিভেছে যথাসময়ে। আরও আশ্চর্য, সে যা জীবনে ভাবেনি, তাই হলো। আবার তাকে ফিরে আসতে হলো সেই চা-বাগানের দেশে হয়ত এই সে চেয়েছিল: নির্জন চা-বাগান, তার ওপর সেডট্রীর বিষণ্ণ ছায়া' দিগন্তে নীলাভ কুয়াশা। কলকাতার কথা তার অনেকবার মনে পড়ত। মনে পড়ত অনেক কিছুই। জোনাকির আলো জ্বলে, নেভে।

এমন ভাবে হঠাৎ দেখা হবে সে ভাবেনি। কিন্তু নিখিলবাবু ঠিকই চিনতে পেরেছিলেন। রবিবার দিন সে খেয়াল বসে হাটে গিয়েছিল। তখনই দেখা।

'তুমি বিমলবাবুর ছেলে রঞ্জত না?' বলেই যেন অপ্রস্তুত হয়েছিলেন ভদ্রলোক।

রঞ্জত অবাক হয়ে মুখ ফিরিয়েছিল।

'হ্যাঁ। আপনি?' ও কি বলবে ঠিক ভেবে পায়নি।

'আরে, তোমার কি মনে আছে?' কত ছোট ছিলে তুমি!'

তারপর একে একে অনেক কিছু শুনল রঞ্জত। তারও মনে পড়ল। ওদেরই বাড়ির কাছে থাকতেন নিখিলবাবু। অনেকবার অনেক দিনও বেড়াতে গিয়েছে ওঁরাও এসেছেন ওদের বাড়ি! সব কিছু আবার মনে পড়ল ওঁর। স্মৃতির জোনাকিগুলো যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'তোমাকে যেতে হবে কিন্তু আমাদের বাড়ি। খুব কাছেই তো। দু'মাইলও হবে না। যাবে, কেমন?'

'নিশ্চয় যাব।' রঞ্জত উত্তর দিয়েছিল।

'কবে যাবে, কাল?'

'যাব। কাল বিকেলে!'

'যেও ঠিক। তোমার মাসিমা খুব খুশি হবেন।'

বাড়িটা খুঁজে পেতে দেরি হয়নি রজতের। সাইকেলটা গেটের পাশে বেড়ার গায়ে রাখল ও। তারপর গেট খুলে ভেতরে ঢুকল। সত্যিই ভাল লেগেছিল ওর। দু'ধারে ফুলবাগান। মাঝখান দিয়ে নুড়িপাথর বিছানো পথ। সেই পথ পার হয়ে ও বারান্দায় পৌছল। লতা গাছ, টবের ফুল, আর সুন্দর অর্কিড-ঝোলানো বারান্দা। ছায়া-স্নিগ্ধ শান্তিঘেরা বাড়ি।

'এই যে এস! এইমাত্র কাজ থেকে ফিরলাম। এস ভেতরে।' নিখিলবাবু এগিয়ে এলেন।

রজত ঘরে ঢুকল মাথা নিচু করে।

'বস, লজ্জা কেন? পরপর ভাবছ কেন? তোমার বাবার সঙ্গে আমার কতখানি ঘনিষ্ঠতা ছিল তা'তো আর জানা নেই তোমার।'

রজত বসল বেতের চেয়ারটায়। একটু দূরে টেবিল। টেবিলে নিকষ-কালো ফুলদানিতে কয়েকগাছি রজনীগন্ধা, আর গোলাপি পাহাড়ি ফুল। ডালিমের দানার মতো ছোট ছোট ফুল ডালে স্তরে স্তরে সাজানো। কি নাম তা সে জানে না। রজত মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল। সমস্ত ঘর-খানিতে সে খুঁজে পেল এক সুঠাম নিটোল শুচিতা।

'তোমার বাবার স্বাস্থ্য কেমন আছে?'

'ভালোই, তবে এখন আর তেমন খাটতে পারেন না। রিটায়ার করেছেন তো বছর তিনেক হলো।'

'আমারও রিটায়ারের সময় হয়ে এল। বছর দুই আছে আর। আমার চাকরি তো তোমার বাবার মতো ঘোরা-ঘুরির চাকরি না। এই দেখো না, সারাটা জীবন এই জঙ্গলেই কাটিয়ে দিলাম।'

'আপনার ফুলবাগানটা ভারি সুন্দর।' রজত বলল অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই।

'তাই নাকি? হ্যাঁ, আমার একটু ঝোঁক আছে। তাছাড়া দীপারও খুব ঝোঁক। ও দীপার সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেওয়া হয়নি। এই দীপু!' চিৎকার করে ডাকলেন নিখিল বাবু। 'এ ঘরে আয়।'

ঠিক তখনই পর্দা ঠেলে ঢুকল দীপা।

'এই যে, এ হলো রজত। কাল তোকে এর কথাই তো বলছিলাম। তোর তো মনে নেই। একেবারে ছোট ছিলি তুই তখন। আমার ছোট মেয়ে বুঝলে রজত! এবার বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে এসেছে।'

'নমস্কার।' রজত হাত তুলে নমস্কার করল। দীপা মৃদু হেসে হাত তুলে নমস্কার করল। 'বসুন, চা নিয়ে আসি।' খুব শান্ত নিচু গলায় বলে বেরিয়ে গেল দীপা।

'বেশি দেরি করিস্ না।' স্মরণ করিয়ে দিলেন নিখিলবাবু।

দেরি হয়নি। রজত গল্প করছিল নিখিলবাবুর সঙ্গে। ডুয়ার্সের চায়ের সঙ্গে দার্জিলিং এর চায়ের তফাত, ভারতীয় চায়ের বাজার, দিশী চা কোম্পানী আর বিদেশী চা কোম্পানীর পার্থক্য।

'বাবা, পর্দাটা একটু সরাবে?' দীপার গলার স্বর শোনা গেল।

'এই যে যাই। নিখিলবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। দীপা খাবারের দুটো প্লেট দুহাতে নিয়ে ঘরে ঢুকল। তোর মা কোথায় রে?'

'রান্নাঘরে।' দীপা উত্তর দিল খাবারের প্লেট রাখতে রাখতে।

'তুই এখানে বোস্. আমি তোর মাকে ডেকে আনি।' নিখিলবাবু বেরিয়ে গেলেন।

দীপা দাঁড়িয়েছিল টেবিলের পাশে।

'নিন, আরম্ভ করুন।'

'এত খাবার খাব কেমন করে?'

'এত কোথায়? সামান্যই তো। কতটুকুই বা করেছি!'

'আপনি বসুন।' রজত বলল।

'বসছি, আপনি আরম্ভ করুন।'

দীপা এগিয়ে গিয়ে বসল চেয়ারে।

রজত খেতে আরম্ভ করল।

'কাল বাবার কাছে আপনাদের অনেক গল্প শুনলাম। আশ্চর্য, আমার কিচ্ছু মনে নেই।'

'আমার কিন্তু বেশ আছে। তবে আপনি খুব ছোট ছিলেন তো।'

দীপা লজ্জা পেল। রজত সেই প্রথম, প্রথমবার মুখ তুলে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইল দীপার দিকে। দীপা চোখ তুলতেই ও চোখ নামাল লজ্জায়।

নিখিলবাবু ঘরে এসে ঢুকলেন।"

'এস, লজ্জা কি গো? ভেতরে এস। এই যে রজত তোমার মাসিমা।'

রজত উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেল প্রণাম করতে।

'সুন্দর কাটল সন্ধ্যেবেলাটা।' যাওয়ার আগে বলল রজত। 'আবার আসবেন দু'একদিনের মধ্যে। বড় একা লাগে।' বলেছিল দীপা। 'আবার এস কিন্তু বাবা, আমাদের ভুলে যেয়ো না।' বলেছিলেন মাসিমা। 'তোমার নিজের বাড়ির মতো আসা যাওয়া করবে'—বলেছিলেন নিখিলবাবু।

নির্জন চা-বাগানের পথ দিয়ে সাইকেলে আসতে আসতে তার বারবার মনে পড়ছিল কথাগুলো। সুন্দর, সবকিছুই। কালো পিচের রাস্তা। চা-বাগানের ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক। অন্ধকারে জোনাকির দীপ্তি। কদাচিৎ-আসা একটি মোটর বা লরীর দ্রুতগমন। 'আবার আসবেন দু'-একদিনের মধ্যে, বড় একা লাগে'—দীপা বলেছিল। তার ম্লান শান্ত মুখ, গভীর দৃষ্টি', চোখের দীর্ঘ পল্লব, চোখের কোলে ক্লান্তির সংগোপন ছায়া—ঠিক এই মুহূর্ত্তগুলোই আবার মনে পড়ল রজতের।

আবার সে গিয়েছিল। দু'একদিনের মধ্যেই। প্রথমে ভেবেছিল যাবে না। কি হবে গিয়ে? মিথ্যে মায়াবী হরিণ খোঁজা। কিন্তু মোহ, সুন্দরের মোহ, শেষ পর্যন্ত এগিয়ে দেয় মানুষকে, এও সে জানত। দীপাকে সে রূপসী বলে ভাবতে পারেনি। রূপসী তাকে মোটেই বলা চলে না। কিন্তু সেই বাড়ি, নির্জন শান্তি, ফুলের বাগান, ছায়াময় স্নিগ্ধতা—সবকিছু যেন ছায়া ফেলে গেছে দীপার মধ্যে।

প্রথমদিন দীপা এসেছিল বারান্দা পর্যন্ত, পরের দিন এল গেট পর্যন্ত। এরপর আরও ক'দিন। খুব বেশি সময় লাগেনি। সবকিছুই যেন তৈরি ছিল, সাজানো ছিল। ধীরে ধীরে এক সঙ্গে রাস্তায় বেড়াতে আরম্ভ করল ওরা। এ যেন জানাই ছিল ওদের, এ হবেই। শুধু প্রয়োজন ছিল বলার। তাও বেশি দেরি হয়নি। সেই দিন এল। কিন্তু তখনও বাকি ছিল অনেক কিছু।

শনিবার দিন রাতে ওখানেই খাওয়ার কথা ছিল। সেই ওরা বিকেলে বেড়াতে বেরিয়েছিল এক সঙ্গে। চা-বাগানের পাথর নুড়ি বিছানো রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে শুখা নদীর কাঠের ব্রিজ পর্যন্ত। যখন অস্তগামী সূর্যের শেষ আলো দীপার চুলের ওপর মিলিয়ে গেল, কিচ কিচ্ শব্দে ডাকতে ডাকতে টিয়াপাখির ঝাঁক যখন পাহাড় থেকে ফিরে গেল, দীপা যখন ব্রিজের রেলিংএর ওপর ঝুঁকে পড়েছিল, ঠিক তখন বলল রজত—নিচু গলায় ধীরে ধীরে ফিস্‌ফিস্ করে বলল—দীপা যেন তৈরিই ছিল শোনবার জন্যে। শুনে এতটুকু চঞ্চল হয়নি ও। কেবল স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল মাটির দিকে। অনেকক্ষণ পরে বলল, 'কিন্তু সবকিছু তো জানা নেই আপনার। আপনি কতটুকুই বা চেনেন আমাকে? আমার সম্পর্কে সবকিছু তো জানেন না।' 'রজত বলেছিল, 'আমার যেটুকু জানা প্রয়োজন সেটুকু আমি জানি।' 'না, জানেন না। আমি কাল জানাব চিঠিতে।' দীপা উত্তর দিয়েছিল। অনেকক্ষণ দুজনেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর অন্ধকার নামল। চা-বাগানে নির্জন রাস্তা দিয়ে ফিরতে ফিরতে রজতের মনে পড়েছিল ছোটবেলার কথা। গভীর অন্ধকারে নিঃসঙ্গ জোনাকির দীপ্তি। জোনাকির আলো একবার জ্বলে, আর একবার নেভে—মানুষের আকাঙ্ক্ষার মতো। চা-গাছের ঘনপাতার ফাঁকে অন্ধকার ক্রমশ গাঢ় হলো। আরও গাঢ় হলো।

দীপার চিঠি পাওয়ার আগেই আরও এক নতুন সত্য সে খুঁজে পেল। জোনাকির যে ক্ষীণ দীপ্তি সে খুঁজে পেয়েছিল -তা যেন নিভে গেল সে রাতে। খাওয়ার পর রজতের সঙ্গে গল্প করতে করতেই কথাটা বললেন নিখিলবাবু। 'তোমাকে আমি নিজের ছেলের মতো স্নেহ করি। তাই একথা তোমায় বলছি।' বলে আরম্ভ করেছিলেন। 'দীপার বিয়েটা এই চাকরিতে থাকতে থাকতেই দিয়ে দেব। তারপর নিশ্চিন্ত। দীপকের ফাইন্যাল পরীক্ষার রেজাল্টটা বেরতে যা বাকি।' হ্যাঁ, দীপককে প্রথমটা চেনেনি রজত। বুঝতেও পারেনি। পরে ধীরে ধীরে সমস্ত কিছু স্পষ্ট হলো ওর কাছে। দীপককে দীর্ঘকাল পড়ার খরচ দিয়ে এসেছেন তিনি। অদ্ভুত ভাল ছেলে। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের রত্ন। এমন ছেলে হাজারে একটা মেলে না। রেজাল্ট বেরনোর সময় হয়ে গিয়েছে। শিগ-গিরিই হয়ত সে একদিন আসবে।

রজতের আর কিছু শোনার প্রয়োজন ছিল না। সে শুধু বলেছিল, 'হ্যাঁ, সত্যিই সুন্দর হবে।' নিখিলবাবু ও পরিতৃপ্তির হাসি হেসে বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, এমন ছেলের জন্যে টাকা খরচ করেও তৃপ্তি।' 'তা ঠিক।'

একটু পরে নিখিলবাবু আবার বললেন, 'তা রজত, তুমি এখানে এই চা-বাগানের চাকরিতে ঢুকে নিজেকে নষ্ট করছ কেন? কি আছে এখানে? ভাল কোন কিছুর জন্যে চেষ্টা কর। ইয়ংম্যান, এভাবে নিজেকে নষ্ট করছ কেন?

রজত লজ্জিত হয়েছিল, 'না, চেষ্টা তো করছি। দেখি, চলে যাব এখান থেকে। থাকব না।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয় চলে যাবে। এমন ভাবে নিজের সর্বনাশ কর না। কি আছে এখানে চা বাগানে? আছে শুধু টাকা। শিক্ষা নেই, রুচি নেই, সমাজ নেই, মেশবার মতো মানুষ নেই। এখানে কেন থাকবে? আমার উপায় ছিল না অন্যত্র যাওয়ার। কিন্তু তুমি কেন থাকবে? তুমি চেষ্টা কর, নিশ্চয় উন্নতি করবে।'

রজত ঠিক করেছিল আর সে কোন দিন যাবে না। ভেবেছিল সব কিছুর শেষ এখানেই। দীপার চিঠি পেয়ে ও অবাক হয়েছিল। কিন্তু আবার ভেবেছিল সব কিছুই এখানে শেষ। ইতি। দীপা লিখেছিল, 'সেদিন বাবার কাছে সব কিছুই শুনেছ নিশ্চয়। তোমার ভালবাসার ডাক ফিরিয়ে দেওয়ার শক্তি আমার নেই। তুমি বিশ্বাস কর, তোমার ভালবাসার কাছে আমি বড় দুর্বল, অসহায়। সব জেনেও তোমায় ভালবেসে ফেললাম। আমার প্রতিজ্ঞা থেকে চ্যুত হলাম। কিন্তু বাবার এত দিনের সাধ-স্বপ্ন কেমন করে ভেঙে দেব? তুমি আমাকে ভুলে যাও। আমাকে আমার কর্তব্য করতে দাও। আমার অনুরোধ, তুমি এখান থেকে চলে যাও। তুমি নিজেকে নষ্ট কর না। তুমি চেষ্টা কর। অনেক বড় হবে তুমি। ভালবাসা নিও। অনেক কিছু বলার ছিল। কিন্তু কিছুই তো বলতে পারলাম না। ইতি।'

রজত সেই চিঠির উত্তর দেয়নি। দেওয়ার কোন প্রয়োজন মনে করেনি। তার কারণ ও ধরে নিয়েছিল, সব শেষ এখানে। এখানেই ইতি। তবে ওর হাসি পেয়েছিল। উন্নতি? কি উন্নতি? উন্নতি করা বলতে কি বোঝায়? বড় হওয়া, উন্নতি করা, কোন কিছু হওয়া—এর মানে দীপা নিশ্চয় ধরে নিয়েছে ভাল চাকরি, ভাল মাইনে, ভাল পোষাক, গাড়ি-বাড়ি। সুন্দর, সত্যিই সুন্দর। দীপার সব কিছুই সুন্দর। ফিরিয়ে দেওয়ার ভঙ্গিটি কত সুন্দর, কমনীয়, শান্ত। অথচ কি নিষ্ঠুর।

আর সে যায়নি, নিখিলবাবুর পর পর দুটো চিঠি পেয়েও সে যায়নি। তার বিকেলবেলাগুলো আবার তেমনি নির্জন নিঃসঙ্গ, বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে। কাজের পর একা-একা ও ঘুরে বেড়িয়েছে চা বাগানের মাঝের সরু পথগুলো ধরে। এই গাছপালা, পাখি, নির্জনতা, সব কিছু তার কাছে একঘেয়ে পুরণো মনে হয়েছে, কিন্তু তাও তার ভাল লেগেছে। ঘুরতে ঘুরতে অন্ধকার হলে সে চুপচাপ বসেছে মাঝে কোথাও পথের পাশে। সেই অন্ধকারে জোনাকি দেখলে তার অনেক কথাই মনে পড়েছে। অনেক দিনের অনেক ঘটনা। আজকাল আর একটা উপমা ওর মনে আসে। নির্জন অন্ধকারে একটি কি দুটি নিঃসঙ্গ জোনাকি দেখলে ওর মনে হয় যেন কোন্ বিরাট বিস্তৃত নদীর বুকে ম্লান আলো-জ্বলা ডিঙি নৌকোর নিঃশব্দ চলাফেরা। মানুষের অসংখ্য ভাবনাগুলো যেন অন্ধকারে জোনাকির মতো খুঁজে খুঁজে ফেরে। কি তা সে জানে না। অনেক কিছু তার করার ছিল, কিন্তু কিছুই তো হলো না করা। কিইবা সে করতে পারে! মা, বাবা, ছোড়দি তার চৈতন্যে ছায়ার মতো অস্পষ্ট। কে ওরা, কি চায়? সে কিইবা করতে পারে? কেনই বা করবে? করেই বা কি লাভ? সে কি চায় তা তো সে জানে না। আমরা অনেকেই জানি না। চরম পাওয়া তো আমরা পেতে পারি না। চরম কিছু তো আমরা হতেও পারি না।

কিন্তু শেষ তো হলো না। তাকে আবার যেতে হলো। প্রথমে দীপার চিঠি। তারপর নিখিলবাবুর একান্ত অনুরোধ। ফিরিয়ে দেওয়ার সামর্থ্য তার ছিল না। মানুষ আসলে দুর্বল, রজত ভেবে দেখেছে। তাই সেদিন বিকেলে আবার যেতে হলো।

এই সেই বাড়ি। শান্তির নীড়। সত্যিই সেই বাড়ি। হয়ত তার দৃষ্টি রঙ বদলে গিয়েছিল কিংবা অন্য কিছু। টেবিলে ফুলদানিতে শুকনো ফুল। ঘরময় ছড়ানো খবরের কাগজ। বিশৃঙ্খল চেয়ারগুলো। বিপর্যস্ত উদ্‌ভ্রান্ত

মতো নিখিলবাবু। বুঝতে খুব বেশি সময় লাগেনি তার। নিখিলবাবুর অসংলগ্ন কথাবার্ত্তা থেকেই সে মূল বক্তব্যটুকু উদ্ধার করতে পেরেছিল। দীপক, তাঁর অদ্ভুত ভাল ছেলে—দীপক অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করছে। দীপাকে বিয়ে করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। এ জন্য নিখিলবাবু যেন তাকে ক্ষমা করেন। বলা বাহুল্য পরীক্ষায় সে ভালভাবেই পাশ করেছে।

দীপাকে ও দেখেছিল ঠিক আগের মতোই। এ ঘটনা তার ওপর কোন রেখাপাত করেছে বলে মনে হয়নি। তবে বাবার ব্যথা হয়ত ওকে আহত করেছিল। নিখিলবাবু যেন অসহায় হয়ে রজতের কাছে আত্ম-সমর্পণ করলেন! তাই সব কিছু শেষ হয়েও আবার নতুন করে আরম্ভ হলো।

আবার সেই এক সঙ্গে বেড়ানো। চা বাগানের নির্জন পথে নুড়ির ওপর পা ফেলার শব্দ, পাখির ডাক, সেড্-ট্রির ছিমছাম ছায়া, পলাশ ফুলের রক্তরাগ। আর সব চেয়ে সুন্দর দীপার গভীর কালো চোখের দৃষ্টি—যা খুসিতে উজ্জ্বল।

'তোরা এত রাত করে ঘুরিস্ না দীপু। সস্নেহ স্বরে বলেন নিখিলবাবু। 'দেখো রজত, চা বাগানের এই রাস্তাগুলো খুব ভাল না।'

দিনের পর দিন সেই আসা-যাওয়া। দীপার আবদার অভিমান। ভাল লাগত রজতের, কিন্তু কোথায় যেন বাজত। দীপার ভালবাসা, আবদার, অভিমান হয়ত সবই নিটোল খাঁটি, কিন্তু তবু এসব তো হতো না, যদি না···। তা ছাড়া হয়ত সবই মেকী। কই যেদিন দীপক ছিল সেদিন তো দীপা আসেনি।

'চল, আজ অনেক দূর যাব।' দীপা বলেছিল।

'কত দূর?'

'চল না! নিরুদ্দেশে যাব।'

হাঁটতে হাঁটতে ওরা এগোতে লাগল। দীপা কথা বলছিল অজস্র, অনর্গল। ঝর্ণার মতো অবিরত কথার স্রোত। তার আকাশ-নীল শাড়ি। প্রজাপতি খোঁপা। ... দৃষ্টি। একটা আবেশ করা সৌরভ।

'এখানেই বসি দীপা। আর হাঁটতে ভাল লাগছে না। বড় ক্লান্ত আমি। ভাল লাগছে না।'

'এখানে বসবে? বেশ বস।'

ঘাসের ওপর দুজনে বসল পাশাপাশি। 'তুমি যেন আজকাল কেমন হয়ে গেছ। কোন কিছুই তোমার ভাল লাগে না।'

'তাই নাকি? এত লক্ষ্য কর তুমি! আচ্ছা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, দীপককে তোমার মনে পড়ে আজকাল?'

দীপা বিরক্ত স্বরে বলল—হঠাৎ ওকথা তোমার মানে? তুমি সন্দেহ কর আমাকে?'

'মানে কিছুই নয়। তাকে কি তুমি ভুলতে পেরেছ?' রজত মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করল। তারপর বিষণ্ণ হাসি হাসল আকাশের দিকে মুখ তুলে।

'ভোলা?' বিদ্রূপ ভরে হেসে উঠল দীপা, 'মনে রেখেছিলাম কবে?'

'তবে প্রথম আমাকে অমন চিঠি কেন লিখেছিলে?'

'উপায় ছিল না তখন তাই। কিন্তু তুমি হঠাৎ এ কথা তুললে কেন?'

'এমনি।'

'না, এমনি নয়। আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পার না। তাই না? এটা তো আমার পেশা, ব্যবসা তাই না? চমৎকার!'

'তুমি ভুল বুঝছ দীপা। আমি তা বলতে চাইনি।'

'না, তা কেন বলতে চাইবে?'

'বেশ তো, সবই বুঝলাম। কিন্তু এত ভালবাসাই যদি ছিল তা হলে দীপককে ফেলে তখন আসতে পারলে না কেন? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পার?,

'আমার কর্ত্তব্য নেই?' দীপা চিৎকার করে উঠল।

'তোমার ত্যাগ নেই। অন্তত সেদিন ছিল না।'

দীপা মুখ নিচু করল দু' হাঁটুর ওপর। রজত জানত সে কাঁদছে, কিন্তু সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেনি। কারণ জানত এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে মানুষকে সান্ত্বনা দিতে যাওয়া ভুল। আর সান্ত্বনা দেওয়ার ক্ষমতাও অনেক জায়গায় মানুষের থাকে না।

ওরা বসে থাকতে থাকতেই অন্ধকার নামল চা-বাগানের ওপর। ঘন অন্ধকার দানা বাঁধল সবুজ চা-পাতার ফাঁকে ফাঁকে। একটি কি দুটি জোনাকির ম্লান

আলো ভেসে বেড়াতে লাগল! অন্ধকারের অসীম সমুদ্রে নিঃসঙ্গ ম্লান আলো। কোন্ বিরাট বিস্তৃত অন্ধকার নদীর ওপর ডিঙি নৌকোর ম্লান আলোর নিঃশব্দ চলাফেরা!

জোনাকি দেখলে রজতের অনেক কথাই মনে পড়ে। ছোটবেলায় সে ছোড়দির রেশমী রুমালে জোনাকি ধরত। এক সন্ধ্যায় ও আর রুমাল খুলে দেয়নি। পরের দিন সকালে সবগুলো মরে পড়ে ছিল। ও ওঁর ভাল লাগে নি। মরা জোনাকির আলো দপ্ দপ্ করে জ্বলে না মানুষের আকাঙ্ক্ষার মতো। আজ তা ও বুঝতে পারে। বুঝতে পারে মরা জোনাকির আলো যখন নিভে যায় তখন আর তা জ্বলে না। মানুষের মন অন্ধকারে জোনাকির মতো কি যেন খুঁজে খুঁজে ফেরে। কি তা সে জানে না। রজত জানে না, কোন্ দিন যেন তার মনের জোনাকিগুলো মরে গিয়েছে। তাই তার আকাঙ্ক্ষা আর জ্বলবে না ভাল-বাসার দীপ হয়ে।

মুর্ত্তিমান্ বৈদিক ভারত তুমি

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

শত বর্ষোত্তরক্ষণে তোমার জনম দিনে জয়ন্তী উৎসবে,
এপারে ওপারে আজ আনন্দের পটভূমে হয়েছে উদ্ভব
বৈচিত্র্যের সমারোহে একটি নিবিড় ঐক্যতান
সে কি নহে তব অবদান?
পার্থসারথীর সম যুযুধান, প্রজ্ঞা তব বোধিসত্ত্ব সম,
মুর্ত্তিমান্ বৈদিক ভারত তুমি। অনিন্দ্যসুন্দর সর্ব্বোত্তম
সভ্যতার জীবন্ত বিগ্রহরূপে, হে বিবেক স্বামী!
সপ্তর্ষিমণ্ডল হোতে এসেছিলে নামি
রামকৃষ্ণ-লীলা-সহচর!
বিকীর্ণ করেছ বিশ্বে ভারত-আত্মার জ্যোতি নিত্য নিরন্তর।

বোধির অতীত স্তরে সমাধি মন্দিরে
যে প্রদীপ জ্বলে নিশিদিন, তারে তুলে ধীরে ধীরে
করে,গেলে নীরাজন;
শ্মশানের চিতাভস্ম স্পর্শে তব হয়েছে কাঞ্চন।
স্তুতি আর সম্মানের বহু উর্দ্ধে তুমি,
মোরা তব আবির্ভাবে সূর্য্যস্নাত, ধন্য মোর এই মাতৃভূমি।

দুর্য্যোগ-দুর্দ্দিনে যবে ধর্ম্মভ্রষ্ট জীবন-সংহতি,
পাশ্চাত্য আদর্শ লভি সহিতেছে সহস্র দুর্গতি
ব্যভিচারে মত্ত যাত্রীদল,
হিংসার করাল রাত্রি বিভীষিকা সাথে অবিরল
উন্মত্ত প্রেতের নৃত্যে বীভৎস-উল্লাসে,
মেঘে মেঘে চমকে বিজলী স্বদেশের ভাগ্যাকাশে,
সেইক্ষণে নিরক্ষর ব্রাহ্মণের বেশে
ত্রাণ কর্ত্তা ভগবান এলো একা। তুমি অবশেষে
তার পদ-চিহ্ন রেখা
বক্ষে ধরি এলে ছুটে—দিলে দেখা।

গুরুদত্ত মন্ত্র লভি সারা বিশ্বজনে
শিখায়েছ জীবসেবা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম শিবজ্ঞানে চিন্ময় মননে।

নাস্তিকের মত এসে শেষে যাঁর চরণে শরণ
নিলে বহু তর্ক-যুক্তি দ্বিধা দ্বন্দ্ব সাথে অনুক্ষণ
করিয়া সংগ্রাম। তাঁরি কথা শুনায়েছ ঘরে ঘরে
ভুবনমঙ্গল তরে।
প্রকাশানন্দের মত বারবার
তোমারে দেখেছি আমি গৌরাঙ্গ লীলার
শ্রেষ্ঠ ভূমিকায়।
বীর্য্য আর বিশ্বাসের শক্তিধর! দেখেছি তোমায়
জীবের কল্যাণ তরে কী বেদনা করিয়াছ ভোগ
শিরে নিয়ে যুগের দুর্য্যোগ।

তুমি তো বহিয়া গেলে সিন্ধুবক্ষে এক হয়ে সব জলধারা
আনন্দে আপন হারা।
জীবনের চিত্রলেখা মরণের কূলে
করিয়াছ আলিম্পিত। বোধিপীঠমূলে
পেতেছ আসন মহাভাবে,
চিদানন্দে শুনায়েছ বহুরূপে ভগবান সবার সম্মুখে,
অপার্থিব লীলা তার পার্থিব জগতে চলে সর্ব্ব দুঃখ সুখে।

ভারতের সনাতন সাধনার হয়ে উদ্গাতা
দূর করি যত বিঘ্ন বাধা,
বিশ্বধর্ম্ম সম্মেলনে কহিয়াছ রামকৃষ্ণ বাণী
গৈরিক পতাকা ধরি। স্বদেশের মুক্তিদাতা! ভক্তি অর্ঘ্য আনি
তোমারে বন্দনা করি, প্রাণের প্রণতি দিয়ে হে মহাজীবন!
দেশে দেশে তব নামে আজো হেরি আত্ম-প্রদীপন।

স্মৃতিচারণ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অঘটন বলতে কলকাতায় একটি ভূতুড়ে কাণ্ডের কথা বলি। না বললেও চলত, কারণ ভূতুড়ে কাণ্ড তো ভূতনাথের করুণার কাহিনী নয়—নানা অবোধ্য কর্মফলের প্রায়শ্চিত্ত বগায় উৎপাত। তবু এ-অঘটনটির উল্লেখ করছি শুধু একটি কারণে যে, এতে ক'রে প্রতিপন্ন হয় যে জাগতিক অনেক কিছুর দিশা পায় না আমাদের মানবিক বুদ্ধি—এবং অসিদ্ধ হয় বৈজ্ঞানিক মনের হসনীয় ঘোষণা—যে যুক্তি দিয়ে সব কিছুরই হদিশ পাওয়া যায়। শ্রীঅরবিন্দের মতন আশ্চর্য বুদ্ধি কালে-ভদ্রে দেখা যায়। এহেন মহামনীষীও বলতেন যে ভাগবতী লীলার নাগাল পেতে পারে না মানুষের যৌক্তিক পার্থিব মন Physical mind, সাবিত্রীতে তাই লিখেছেন :

Our reason cannot sound lifes mighty sea
But only counts its waves and scans its foams,

> জীবন-মহাসিন্ধুর যুক্তি কবে পায় তল ?—শুধু
> ঢেউ গোণে বসি তীরে, ফেনপুঞ্জ করে বিশ্লেষণ।
> আর এর কারণ শুধু এই যে,
> "...Not by reason was creation made
> And not by reason can the truth be seen,
> রচিত হয় নি বিশ্ব প্রবুদ্ধ যুক্তির শক্তিবলে,
> পারে না লভিতে বুদ্ধি যুক্তি কভু সত্যের নিদান।

ভৌতিক অঘটনের পালাগান সুরু করবার আগে পেশ করি—খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক বন্ধুবর প্রিয়দারঞ্জন রায়ের সঙ্গে যুক্তি ও বিজ্ঞান নিয়ে কিছু আলোচনা, কিছু বা বিতণ্ডার কথা। একে গৌরচন্দ্রিকা হিসেবেই ধরতে পারো।

প্রতিবার কলকাতায় গেলেই তাঁর সঙ্গে সময় ক'রে দেখা করি—কারণ প্রিয়দাবাবু ঠিক গড়পড়তা বৈজ্ঞানিকের কোঠার পড়েন না। তিনি হয়ত নিজে মানতে চাইবেন না, কিন্তু তাঁর মধ্যে যে-ধরণের "অবৈজ্ঞানিক" গভীরতার সহজ স্থিতি তথা বিকাশ লক্ষ্য করেছি তার জন্তে খানিকটা অন্ততঃ দায়ী তাঁর ধর্মের প্রতি হিন্দুসম্ভব শ্রদ্ধা, নৈলে তাঁর বিজ্ঞানে শ্রদ্ধা তাঁকে আজ পুরোপুরি বস্তুতান্ত্রিক শূন্যবাদী ক'রে দাঁড় করাত—যেমন ওদেশের অনেক বৈজ্ঞানিককেই করিয়েছে। ইদানীন্তন বুদ্ধিবাদী ও বৈজ্ঞানিকদের প্রভাবে প'ড়ে ভারতবর্ষকে আমরা যতই কেন না সেকেলে (medieval) ও গতানুগতিক (tradition-bound) ব'লে অবজ্ঞা করি, প্রিয়দাবাবুর কাছে গেলেই আমার মনে হয় যে বিজ্ঞানের এ-জয়-জয়কারের যুগে তিনি যে তাঁর বিজ্ঞানভক্তিকে আজো সর্বার্থসাধিকা মনে করতে পারেন নি—তার কারণ তাঁর বাইরের মনে বিজ্ঞানের চমকপ্রদ রং ঝিক্‌মিক্‌ ক'রলেও তাঁর অন্তরে এখনো অধ্যাত্মসাধনায় একটা সলজ্জ শ্রদ্ধার দীপ্তি নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায় নি। এর কারণ—আমি বলব—তিনি রক্তে ও মজ্জায় ভারতীয়। তাই তো বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর নানা অতি-প্রশস্তিতেও আমার মনে বিরস ভাব জেগে ওঠে না—যেমন ওঠে অনেক গোঁড়া ও হাল্কা বৈজ্ঞানিকের গাজোয়ারি ঘোষণায় ও একদেশদর্শিতায়। ভারতীয় রক্ত বলতে কি বুঝছি ব্যাখ্যা করতে প্রিয়দাবাবুর একটি পত্র থেকে কয়েক লাইন উদ্ধৃত করি। তিনি আমাকে লিখেছিলেন একবার (১০,৯,১৯৫৯) : "বিজ্ঞান মানুষকে শক্তি বা ধনসম্পদ আহরণ করতে সাহায্য করতে পারে, ভোগের জন্তে নানা উপকরণও ফাঁপিয়ে তুলতে পারে, কিন্তু মানুষের আত্মবিকাশে তার দিশারি হ'তে পারে না। বিজ্ঞান নৈর্ব্যক্তিক—impersonal—ব'লে আমাদের স্বভাবের আবেগ-গোত্রীয় অনুভব লোকে উচ্চতর ইষ্টার্থদের—higher values—বিকাশেও সহায় হতে অক্ষম।...তাই যদি কোনো বৈজ্ঞানিক জোর ক'রে বলেন যে বৈজ্ঞানিক সত্যসন্ধানের পদ্ধতিতেই আমরা পরম সত্যনির্ণয়ে পৌছব, বা মুক্তি কী বস্তু তার দিশা পাব, তাহ'লে তাঁকে কিছুতেই সমর্থন করা যায় না।" (তাঁর ইংরাজী পত্রের তর্জমা এটুকু)

কিছুদিন আগে তিনি আমাকে বাংলায় একটি পত্র

লিখেছিলেন তাতে আরো পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর ভাবুকতার—যার গুণে তিনি আমাদের মন টানেন। সে পত্রে তিনি লিখেছিলেন (১৯,১০,১৯৬১ কলকাতা থেকে) "অনেক সময় মনে হয় সবই বুঝি ফাঁকিবাজি।… দেহের অবসানে দেহীর কোনো অস্তিত্ব থাকে কি না এ নিয়ে পণ্ডিতেরা এবং সাধুসন্তেরা অনেক আশা ভরসা দিলেও অকাট্য প্রমাণ ভিন্ন আমাদের ম'ত বিজ্ঞানসেবী মানুষের মনের সংশয় ঘোচে না। তাই আপনার 'অঘটন আজো ঘটে' বর্গীয় লেখাগুলি আমি মন দিয়ে পড়ি, বিশেষতঃ যখন আপনি সত্যঘটনাকে ভিত্তি ক'রে লেখেন।"

একথা যে-কোনো গতানুগতিক বৈজ্ঞানিক বলতে পারতেন, কিন্তু এর পরেই প্রিয়দাবাবু তাঁর এমন একটি ভাবনাকে রূপ দিয়েছেন যার সঙ্গে ভারতীয় চিন্তাধারার গভীর মিল আছে। তাঁর সে উক্তিটি হচ্ছে এই—"অনেক সময় ভাবি—বিজ্ঞান বহির্জগতের রহস্য উদঘাটনে এক প্রকার অসাধ্য সাধন করেছে বলা যায়, কিন্তু অন্তর্জগতের স্বরূপ ও নানা প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বেশি কিছু জানতে পারে নি। তবে হয়ত বৈজ্ঞানিক পন্থাই মানুষকে এপথে অগ্রসর হবার উপায় নির্দেশ করবে, নয়ত মানুষ যে-বিশ্বকল্যাণের জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠেছে তার সন্ধান মিলতে পারে না। আজ বিশ্বব্যাপী ধ্বংসলীলার আশঙ্কা ও আতঙ্ক হচ্ছে এর প্রমাণ।"

বিজ্ঞানের সন্ধানে সীমা কোথায়—প্রিয়দাবাবুর মতন চিন্তাশীল অনেক বৈজ্ঞানিকই ক্রমশঃ ধরতে পারার কিনারায় আছেন একটু একটু ক'রে। কিন্তু তবু বিজ্ঞান বহির্জগতে বস্তুবিচার বিশ্লেষণের প্রসাদে যে "অসাধ্যসাধন" করেছে, তার ফলে একধরণের মোহ অনেক বৈজ্ঞানিককে পেয়ে বসেছে—যাঁরা মনে করেন এই মহামহীয়ান্ প্রহেলিকাময় বস্তুবিশ্বের গোলোক-ধাঁধা থেকে নিঃসারণের পথও ভবিষ্যতে বিজ্ঞানই খুঁজে বার করতে পারবে বিজ্ঞান-অনুমোদিত বুদ্ধির আপন সর্তে।

একটা গল্প বলি। এক সাধক ছিলেন, খুব উচ্চ অবস্থায় পৌচেছিলেন ত্রিশ চল্লিশ বৎসর সাধনা ক'রে। নিরন্তর জপতেন গীতার দুটি উক্তি "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং তথৈব ভজাম্যহং"—অর্থাৎ "আমারে যে ভজে যেছে "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—সব ধর্ম ছেড়ে আমার শরণ নিলেই পরম সিদ্ধি। প্রার্থনায় শুধু তিনি বলতেন: "ঠাকুর মৎস্য, কূর্ম, বরাহ—তোমার যে-রূপে ইচ্ছে দর্শন দিও—কেবল হাতী বাদে। কিন্তু বঙ্কুবিহারীর চলন-বলন ধরণ-ধারণ সবই বাঁকা তো—তিনি আচম্বিতে গণেশের মূর্তি ধ'রে হাজিরি দিলেন ভক্তের সামনে। ভক্ত তখন বুঝলেন—সর্ত ক'রে শরণাগতি হয় না—আর শরণাগতি বিনা নেই প্রেমসিদ্ধি।

বিজ্ঞানের দ্রুত প্রতিষ্ঠার ফলে বৈজ্ঞানিকেরা ঠিক এমনি ভাবেই চাইছেন সত্যকে: "সত্য! তুমি এসো, কেবল সাবধান! বৈজ্ঞানিক সংখ্যা-বিচারের Statistics পথে হাজিরি না দিলে মানব না তোমাকে 'অকাট্য সত্য' ব'লে।" সত্য ঠাকুর নিশ্চয় মুখ টিপে হাসেন বৈজ্ঞানিকের এ-দাবি-কণ্টকিত সর্তে। পরমহংসদেবকে এক দুর্ধর্ষ তার্কিক বলেছিলেন: "যদি কোনো মহাপুরুষ আমাকে দেখিয়ে দিতে পারেন হাতে হাতে যে পরলোক আছে—তাহ'লেই মানব, নৈলে নয়।" পরমহংসদেব হেসে বলেছিলেন: "মহাপুরুষদের দায় পড়েছে। তুমি মানো না মানো কী যায় আসে তাঁদের?"

এ-কথায় বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিকেরা বড় রাগ করেন, বলেন: "কী? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা? আমরা যাকে মঞ্জুর করব না সে সত্য ব'লে কল্কে পাবে? কক্ষণো না, রইল সে একঘরে হ'য়ে।" যোগীঋষিরা একথায় পাল্টা রাগ করেন না, শুধু স্নিগ্ধ হেসে বলেন মনে মনে: "ভায়া, আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল। পরম সত্যকে পাওয়া যায় না কোনো আত্মাভিমানী সর্ত ক'রে। পেতে হ'লে সব আগে ছাড়তে হবে বুদ্ধির দর্প, হাঁক ডাক। চোখের জলে অনাথা দ্রৌপদীর মতন কাতর সুরে 'সগতীনাং গতির্ভব' ব'লে ডাকলে তবেই তিনি আবির্ভূত হ'য়ে সংশয়-সংকট থেকে তারণ করবেন, নৈলে নয়।"

আমার বলবার উদ্দেশ্য এই যে, গহন আত্মিক শক্তি তথ্য বা তত্ত্বের পরীক্ষা হ'তে পারে না কোনো কুলীন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। যাঁরা চান এসব অঘটনকে কোনো কোনো সংখ্যাবিচারী নিকষে ক'ষে তবে মঞ্জুর করতে, তাঁদের কাছে সব গভীর নেপথ্য-তত্ত্বই অগোচর থেকে

বৈজ্ঞানিক ল্যাবরেটরির বকযন্ত্রে ও টেস্ট-টিউবে আবির্ভূত হবে না কোনোদিনই। শুধু তাই নয়, অধ্যাত্ম সত্যের প্রকৃতিই এম্‌নি যে সে যুক্তির পর্দায় ছায়াপাত করে না, বুদ্ধির নিকষ দাগ কাটে না। এই কথা শ্রীঅরবিন্দ আমাকে লিখেছিলেন ১৯৩৫ সালে একটি পত্রে: "Even in ordinary non-spiritual things the action of invisible and subjective forces is open to doubt and discussion in which there could be no material certitude—while the spiritual force is invisible in itself and also iuvisible in action." (অর্থাৎ এমন কি আধিভৌতিক জগতেও অদৃশ্য বা ব্যক্তিগত শক্তিদের সম্বন্ধে সংশয়ী আলোচনা ক'রে কোনো নৈশ্চিত্যে পৌছনো যায় না, কাজেই নানা অধ্যাত্ম শক্তির সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা দেবে বলো—যখন তারা শুধু যে স্বরূপে অলক্ষ্য তাই নয়—তাদের ক্রিয়াকলাপও চাক্ষুষ করা যায় না?)

"আর এই জন্যেই"—লিখেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ—"যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা বিড়ম্বনা যে, অমুক অমুক ফল ফলেছে তমুক তমুক আত্মিক শক্তির ক্রিয়ায়। কাজেই এসব ক্ষেত্রে প্রত্যেককে তার নিজের ধারা অনুসারেই চলতে দেওয়া ছাড়া গতি নেই—কেন না যোগীরা নানা আত্মিক সত্যকে অঙ্গীকার করেন তো কোনো অকাট্য প্রমাণ বা যুক্তির এজাহারে নয়—করেন হয় উপলব্ধির বা বিশ্বাসের আলোয়, না হয় হৃদয়ের অন্তর্দৃষ্টি বা গভীর বোধের নির্দেশে—যে-দৃষ্টি বা বোধি দৃশ্যমানের আড়ালে নেপথ্য তত্ত্বকে প্রত্যক্ষ দেখতে পায়।

তাই—শ্রীঅরবিন্দ এত জোর দিয়ে আমাকে লিখেছিলেন: "The spiritual consciousness does not claim in that way it can state the truth about itself, but not fight for a personal acceptance" (অধ্যাত্ম চেতনা শুধু সত্য সম্বন্ধে তার দর্শন বা উপলব্ধিকে পেশ ক'রেই খালাস, বলে না: সবাইকেই এসব মানতে হবে—না মানলে যুদ্ধং দেহি।")

প্রিয়দাবাবু উদার বৈজ্ঞানিক তথা দরদী বুদ্ধিবাদী, তবু যোগীদের গ্রহণ-বর্জন-পদ্ধতি সম্ভবতঃ তাঁর চোখে নির্ভর-বলেছেনই—সত্যদ্রষ্টা যোগীরা মোটেই মাথা ঘামায় না—তাঁদের সত্যনির্ণয়ের নিকষকে বরণ করল না করল। তাঁরা চলবেনই চলবেন—নিজের অন্তরের আলোয় তীর্থলক্ষ্যের পানে। কেবল একটি কথা বলবার আছে: প্রতি জিজ্ঞাসুই তার জিজ্ঞাসার উত্তর চাইবেন তাঁর স্বধর্মনির্দিষ্ট পথে—তথাস্তু। কেবল এইটুকু বিনম্র স্বীকৃতি প্রত্যেকেরই থাকা বাঞ্ছনীয় যে, আমি যাকে বরণীয় মনে করছি বা যে-ভাবে সত্যকে পরখ করতে চাইছি সে-পথে যারা সত্যসন্ধানে না চলে তারা সবাই মরীচিকামুগ্ধ। কাজেই ধরো, বিদেহী আত্মার অস্তিত্ব আছে কিনা এ-সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা যে-জাতীয় প্রমাণকে "অকাট্য" উপাধি দেন যোগীরা—সে-জাতীয় প্রমাণ বিনাও যদি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার এজাহারে আত্মার অবিনশ্বরতাকে মঞ্জুর করেন তবে তাঁদের ভ্রান্ত বলবার কোনো যৌক্তিক অধিকারই বৈজ্ঞানিকদের নেই, থাকতে পারে না। জীবন-সমুদ্র বিশাল, তার নানা তরঙ্গের আবর্তের নানা লীলা, নানা রং অতলে কত শত নাম-না-জানা মণিমুক্তা প্রচ্ছন্ন রয়েছে। নানা ডুবুরি নানা পদ্ধতিতে ডুব-সাঁতার কেটে রকমারি মণিমুক্তা আহরণ করেন, নানা তরীতে নানা পালে নানামুখা হাওয়ায় নানা বন্দরে পৌছন। বেশ তো! বৈজ্ঞানিকেরা চলুন তাঁদের নিজের পথে—নিজের বুদ্ধি বিবেক বিচারের আলোয়, কবি-শিল্পীরা চলুন তাঁদের স্বকীয় পথে—সৌন্দর্যের ডাকে সাড়া দিয়ে উত্তীর্ণ হোন নানা রসের, রূপের ভাবরাজ্যে, আবার যোগী ধ্যানীরা উড়ে চলুন তাঁদের নিজস্ব ভঙ্গিতে—ধ্যানের পাথেয় শান্তি মৈত্রী করুণার বৈকুণ্ঠকে বরণ ক'রে, কোন্‌টা ধ্রুবতারা আর কোন্‌টা আলেয়া—শুধু তাঁদের যোগালোকলব্ধ আলোয় যাচাই ক'রে এগিয়ে চলুন। যোগীরা স্বভাব-সহিষ্ণু, তাই বৈজ্ঞানিকদের মনোবৃত্তিকে বোঝেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা স্বভাবে রোখালো, তাই যোগী ঋষিদের ধ্যানলব্ধ বাণীকে বলেন সোনার হরিণ, মায়াকল্পনা। এইখানেই তর্ক ওঠে বাগ্বিতণ্ডার কোঠায়, যেখানে কোনো প্রশ্নের নিষ্পত্তি হ'তে পারে না। তবে ভরসার কথা এই যে, প্রিয়দাবাবু এ-জাতীয় অসহিষ্ণু বৈজ্ঞানিক নন, তাই বলেন না—যে-কথা আমাকে লিখেছিলেন কোনো গোঁড়া এক বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক আমার

আজো ঘটে। ভুল দিলীপ, ভুল! অঘটন কোনোদিনই ঘটে নি, ঘটছে না বা ঘটবে না।" উত্তরে আমি তাঁকে কতিপয় দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রশ্ন করি: "এবার?" তাতে তিনি উত্তর দেন: "এবার একটু ফাঁপরে পড়েছি বৈকি, কারণ কোথায় তোমার ভুল হচ্ছে ঠিক ধরতে পারছি না, অথচ তোমার কথা মেনে নেওয়াও অসম্ভব। তবে এটুকু আমি মানি যে, যেটুকু দেখতে পাচ্ছি তাতে মনে হয় যে হয়ত খতিয়ে তুমিই জিৎলে—কারণ যোগের জপতপের পথে তুমি শান্তি পেয়েছ—যেখানে বিজ্ঞানের বুদ্ধিবাদী পথে আমাদের দোদুল্যমান্ মন শুধু সংশয় ও অশান্তির অথই জলে হাবুডুবু খাচ্ছে।"

ইনি হ'লেন পাশ্চাত্য রোখালো বৈজ্ঞানিকদের সগোত্র —"মরি তো মর্যাদা ছাড়ব না" যাঁদের জপমন্ত্র। অথচ মজা এই যে, এ-জাতীয় বৈজ্ঞানিকের যুক্তিতে বিশ্বাসের পিছনে অবিশ্বাস থাকে লুকিয়ে। তাই তো এত অশান্তি—যুক্তি-তর্ক হালে পানি পায় না ব'লেই! পক্ষান্তরে, আর এক জাতের বৈজ্ঞানিক দেখা যায়—(যাঁদের আমি দরদী ব'লে বরণ করি, যেমন প্রিয়দাবাবু)—যাঁদের অবিশ্বাসের পিছনেও গাঢাকা হ'য়ে থাকে অতীন্দ্রিয় অনুভব, উপলব্ধিতে ঠিক্ বিশ্বাস না হোক—মরিয়া-না-মরে-রাম বর্গীয় শ্রদ্ধা। আর এ-শ্রদ্ধা ম'রেও মরে না কেন—তার মূল খুঁজতে গেলে পাওয়া যাবে ভারতীয় সংস্কার—আমরা যাকে পরম বরদ মনে ক'রে থাকি, কেন না আমরা বুদ্ধির তুফানে বহু হাবু-ডুবু খেয়ে তবে এই প্রত্যয়ে পৌচেছি যে সে-তুফান দৃষ্টিকে সব সময়ে স্বচ্ছ করে না, তাই পারে না পরম মুক্তি বা প্রজ্ঞার দিশা দিতে—বলে: বুদ্ধির দূরবীণে যে-সুদূর বন্দরের দেখা মেলে না—সে-সত্য নামঞ্জুর।

একটা উদাহরণ দেই। এবার কলকাতায় প্রিয়দাবাবুর সঙ্গে কথায় কথায় জ্যোতিষ নিয়ে তর্ক উঠল। তিনি বললেন: "মানি না।" আমি বললাম: "মানেন না, কারণ বুদ্ধি দিয়ে ঠাহর পান না—জ্যোতিষ সত্য হ'তে পারে কেমন ক'রে? কিন্তু হায়! এ আমি অকাট্য ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানি—একাধিক দৃষ্টান্ত দিতে পারি।" প্রিয়দাবাবু হেসে বললেন: "কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই যে জ্যোতিষীর পাঠ ভুল হয়।" আমি বললাম: "তাতে কি? অমোঘ ডাক্তারি ওষুধও অনেক ক্ষেত্রে ফলে না, তাই ব'লে কি ডাক্তারি-ওষুধের শক্তিমত্তা 'নামঞ্জুর' বলবেন? কিম্বা ধরুন ভূত। এক সময়ে আমি যৌবন-দৃপ্ত যৌক্তিক বুদ্ধিকে মেনে বলতাম যে ভূত নেই বা তান্ত্রিক অভিচার-শক্তি সব কুসংস্কার। কিন্তু এসব স্থলে অনেকক্ষেত্রে জাল জুয়াচুরি আছে একথা মেনে নিয়েও বলা চলে না যে ও সবই ফক্কিকারি। আপনি বলবেন: বিজ্ঞান মঞ্জুর করতে পারে কেবল সংখ্যা-বিচারের পুঞ্জীভূত এজাহার। উত্তরে আমি বলব: এ-পদ্ধতিতে সত্য নির্ণয় বিজ্ঞানের পথ হ'তে পারে—কিন্তু তা ব'লে তাঁদের একথা মেনে নেওয়া চলে না যে, সর্ববিধ সত্যের দেখাই মিলতে পারে কেবল এই একটিমাত্র বাঁধাধরা বৈজ্ঞানিক পথে। একটা উদাহরণ দেই: নানা অভিচার-শক্তি যে দূর থেকে মানুষের অনিষ্ট করতে পারে, বিদেহী আত্মার দেখা পাওয়া যায়—এর অকাট্য ব্যক্তিগত প্রমাণ পেয়েছি আমি তিন চারটি ক্ষেত্রে। তাই অনেকক্ষেত্রে জালিয়াৎ বিদেহী আত্মা নিজেকে মূল মহাত্মা ব'লে জানান দেয় বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে তান্ত্রিক-শক্তি ব্যর্থ হয় ব'লেই সরাসরি রায় দেওয়া চলে না যে, সব ক্ষেত্রেই তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়। অন্য ভাষায়: যে-সব ক্ষেত্রে তারা যথার্থ আত্মপরিচয় দিয়েছে ব'লে না মেনে গত্যন্তর নেই সে-সব ক্ষেত্রেও তাদের বরখাস্ত করা চলে না—এই অপলকা যুক্তিতে যে বিজ্ঞানের সংখ্যাবিচারী পদ্ধতিতে তাদের ঢেলে সাজানো যায় না। আসলে জীবন এতই জটিল ও দুরবগাহ যে কেউই বলতে পারে না যে—শুধু অমুক অমুক যুক্তিসিদ্ধ পথেই সে-জটিলতার গ্রন্থিমোচন হ'তে পারে, বাকি সব পথই বিপথ, সুতরাং নামঞ্জুর। আমাদের সনাতন উপনিষদের ঋষিরা বারবারই ঠেকে শিখে, তবে ঘোষণা করেছেন যে পরম সত্য তর্কাতীত (অতর্ক্য) তথা যুক্তির নাগালের বাইরে কেন না—"নতত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাক্ গচ্ছতিঃ নো মনঃ"—চক্ষু বাক্ মন কিছুই পায় না তার এলাকায় পৌছতে।

এ ভূমিকা করলাম আরো একটি কারণে; এ-সব তর্কাতর্কির দুতিন দিন পরেই প্রিয়দাবাবু তাঁর এক বন্ধুকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন খানিকটা নাজেহাল হ'য়েই বলব। কারণ বন্ধুটির ভৌতিক অভিজ্ঞতা অযৌক্তিক হওয়া সত্ত্বেও এতই অকাট্য যে, প্রিয়দাবাবু-যে-প্রিয়দাবাবু

তিনিও বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছেন—যে-কথা তাঁর বন্ধু আমাকে তাঁর পত্রের শেষে লিখেছেন। এবার বলি এই দুর্দান্ত অঘটনটির কথা।

এ-বন্ধুটির নাম গোপন রাখছি শুধু এই জন্যে যে, তিনি আমাকে এ-ঘটনা বলেছিলেন হয়ত ধ'রে নিয়ে যে এ অঘটনের কথা আমি প্রকাশ করব না। তবে এ-দুর্দৈবের কথা আজ কলকাতার অনেকেই জেনে ফেলেছেন—মুখে মুখে র'টে গেছে···তাই আশা করি বন্ধুবর রুষ্ট হবেন না—যদি তাঁর এজাহার আমি প্রকাশ করি। ইন্দিরাও আমাকে দিন ধরে বলেছিলেন এ দুর্বিপাকের কথা, দ্বিতীয় দিন এনেছিলেন তাঁর বালকপুত্র প্রবীরকে—যাকে কেন্দ্র ক'রে এ-ভূতুড়ে উৎপাতের সুরু হয়। আমাকে তিনি একটি চিঠিতেও উপদ্রবটির একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিয়েছেন, তাই থেকেই উদ্ধৃত করি—আমার নিবন্ধের বহর কথাতে। তিনি আগে অধ্যাপক ছিলেন, এখন অবসর নিয়ে কি একটা ব্যবসা করেন বললেন। পত্রে ভুক্তভোগী লিখেছেন (২০,১০,১৯৬১)—

শ্রীদিলীপকুমার রায়, পরমপ্রীতিভাজনেষু—

আমার জীবনে সম্প্রতি এমন একটি ঘটনা ঘটেছে যা প্রিয়দারঞ্জন রায় মহাশয় আপনাকে জানাতে বলেছেন। তাই উপলক্ষেই পুনরায় আপনাকে এ-পত্র দেওয়া।

"আগেই ব'লে রাখি—পুনর্জন্মবাদ বা ভুতপ্রেতে আমার বিশ্বাস কম। এ নিয়ে একসময়ে আচার্য শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও স্বামী অভেদানন্দের সঙ্গে আমি অনেক আলোচনা করেছি। কিন্তু এবারকার বিষয়বস্তু পরোক্ষ অনুভূতির লক্ষ্য প্রসূত নয়—প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার এজাহার।

"সংক্ষেপে: গত ১৯শে আগস্ট হঠাৎ আমার দোতলার ঘরে সকাল আটটায় ভীষণভাবে ঢিল ও ইঁট পড়তে থাকে, ফলে জানালার সমস্ত সার্সী ভেঙে যায়।··· পুলিশে খবর দিলাম কিন্তু তাদের সামনেই সমানে ঢিল পড়তে থাকে—এমন কি কয়েকটা ছিটকে তাদের গায়েও লাগে। তারা ব্যাপারটার তল না পেয়ে লালবাজারে সংবাদ দিয়ে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট থেকে লোক আনায়। পুলিশ দুতিনজন পাড়ার ছেলেকে ধরে নিয়ে গেল, কিন্তু ঢিল-পড়া থামলো না।···কূল কিনারা করতে পারল না কেউই।

"সোমবার দুপুরে আমার বালকপুত্র শ্রীমান্ প্রবীরকে নিয়ে ঘরের দরজা জানালা বন্ধ ক'রে আলো জেলে পড়াচ্ছি এমন সময় বন্ধ ঘরেই ঢিল কয়লা কাঁচ ইত্যাদি পড়তে লাগলো। পুলিশ তখনো পাহারা দিয়ে চলেছে—মনে রাখবেন। তখন প্রথম সন্দেহ হ'ল যে এ অন্য ব্যাপার—হয়ত ভূতেরই উপদ্রব। গেলাম কয়েকজন তান্ত্রিকের কাছে। তারা এসে পূজাঅর্চা ঝাড়ফুক যত পারে ক'রে চলল তিন চারদিন ধ'রে; কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। আমার ঘরের মধ্যে যত বই কাগজপত্র ফাইল প্রভৃতি আছে সব অদৃশ্য হাতের টানে চারিদিকে ছিটকে ছিটকে পড়তে থাকে। আমি হেঁকে বলি: 'আচ্ছা, 'আমার হাতে কিছু ফেলো,' অমনি শেলফ্ থেকে বই এসে পড়ে হাতে; 'আচ্ছা, এবার পায়ে ফেলো তো'—অমনি বই পায়ে এসে পড়ে। বন্ধ আলমারি থেকে টাকার থলি উড়ে গিয়ে পড়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ছবির পিছনে। সবচেয়ে দারুণ ব্যাপার ঘটল—যখন প্রবীরের গায়ে অদৃশ্য হাতে চড়-চাপড় চলতে লাগল। সে খুবই কাতর হ'য়ে পড়ল। সময়ে সময়ে ছুঁচ ফোটায়। অসহ্য যন্ত্রণায় বেচারি কাঁদতে থাকে।···

"একমাস এইভাবে চলল। পণ্ডিচেরিতে শ্রীমাকে লিখে জানালাম। সেখান থেকে তাঁর আশীর্বাদের ফুল পাঠালেন স্বামী পূর্ণানন্দ। হাতে সেই ফুল বেঁধে দিলাম, কিন্তু বাঁধা ফুল খুলে খুলে পড়তে থাকে।···প্রিয়দাবাবু এসব আদৌ বিশ্বাস করেন না, কিন্তু আমি বলাতে অবিশ্বাস করতেও পারলেন না, তাই বললেন আপনাকে জানাতে—যদি ব্যাপারটার কোন সুরাহা হয়।"

এসবই নিছক ভৌতিক উপদ্রব—নিঃসন্দেহ। কোনো বিদেহী আত্মার কাজ। সে অনেক কথা, ব'লে ফল নেই—আরো এই জন্যে যে, কেউই বিশ্বাস করবেন না সে-সমাধান। তবু যে এত কথা লিখলাম সে শুধু এইজন্যে যে, দূরদর্শন, রকমারি অপ্রাকৃত অঘটন, বিদেহী আত্মার মূর্তি ধ'রে খবর দেওয়া—যা', পরে হুবহু সত্য ব'লে প্রমাণ হয়েছে—এজাতীয় নানা অঘটনের সঙ্গেই সম্প্রতি আমার একাধিকবার পরিচয় ঘটেছে। সেসব অলৌকিক আবির্ভাবের অন্ততঃ বারো আনা আমি প্রকাশ করি নি। মাত্র নাকি বার আনা (বিশেষ ক'রে ভাগবতী করুণার অব-

তরণের তথ্য) আমার কয়েকটি লেখায় প্রকাশ করেছি শুধু এইজন্যে যে, এসব ঘটনার এজাহারে একটি কথা প্রতিপন্ন হয়: যে যোগবিভূতি, ঐশী কৃপা ও আত্মার অবিনশ্বরতা সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রবাক্যের অন্ততঃ সাড়ে পনেরো আনা অপ্রতিবাদ্য সত্য।

* * *

কাশীনরেশ লিখেছিলেন কলকাতা থেকে ফিরবার পথে কাশীতে তাঁর অতিথি হ'তে। মহারাজ নিজে আচার-নিষ্ঠ তথা ভক্ত। তার উপরে ভজন অত্যন্ত ভালোবাসেন। আমাকে লেখেন যে একদিন শিবালা মন্দিরে গীতা পাঠ করতে হবে—আর একদিন ভজনগান।

আমরা আটজন কলকাতা থেকে রওনা হই ৯ই নভেম্বর। উঠি তাঁর সুরম্য অতিথিশালায়। প্রকাণ্ড প্রাসাদ, চারদিকে সুদুর-বিস্তীর্ণ বাগান, দুটি রাজরথ সর্বদাই হাজির। পরমানন্দেই দিনগুলি কেটেছিল আমাদের। আমরা বলতে ইন্দিরা ও আমি ছাড়া আমাদের দুটি সিন্ধুদেশীয় শিষ্য ব্রিগেডিয়ার থাডানি ওরফে শ্রীকান্ত, মোহন সাহানি—আমাদের নানা বইয়ের প্রকাশক—এবং আমাদের কলকাতার অন্নদাতা ও অন্নদাত্রী মিলন সেন ও তজ্জায়া শ্রীমতী বাণী। মিলন ও বাণী আমাদের বিশেষ 'অনুরাগী'—কলকাতায় আমাদের হাজারো ঝক্কি যে ভাবে বয় প্রতিবৎসরে তাতে বিস্ময় জাগে বৈকি। বলতে ভুলেছি এ-সদাশয় স্নেহময় দম্পতীর সঙ্গে ছিল ওদের অষ্টবর্ষীয়া কন্যা রাকা ও পঞ্চবর্ষীয় পুত্র প্রেমল। রাকা বিশেষ গানভক্ত। প্রেমলও কম যায় না—পূজা করে মন্দিরে। মোট কথা, কাশীতে পরিবেশ ছিল বড় চমৎকার—সবাই মিলে মহানন্দে গঙ্গাস্নান, তরণীবিহার। নানা মূর্তির দোকানে দেখে শাদা পাথরের একটি চমৎকার শিবমূর্তি ও একটি কৃষ্ণমূর্তি সংগ্রহ করা—সব জড়িয়ে সময় কেটেছিল তরঙ্গ ক'রে।

মিলন সেন　গুরুপ্রসাদ　নাসির　প্রেমল　বাণী　ইন্দিরা দেবী　দিলীপ　রাকা　শ্রীকান্ত

১০ই নভেম্বর সন্ধ্যায় কাশীনরেশ প্রায় ছ... নাগরিককে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। আমি প্রথমে সংস্কৃত কৃষ্ণস্তব ক'রেই গীতায় ভক্তিবাদ সম্বন্ধে ইংরাজিতে বললা[ম] প্রায় ঘণ্টাখানেক। শেষ করলাম গানে। কী ভাবে—বলি সংক্ষেপে।

আমি ইংরাজি অমিত্রাক্ষরে গীতার ত্রিশচল্লিশ শ্লোকের অনুবাদ আবৃত্তি ক'রে ব্যাখ্যা করেছিলাম—গীতাকার ভক্তিকে কী চোখে দেখেছেন। যা বলেছিলা[ম] তার সার মর্ম এই যে, গীতার ভক্তি অশ্রুসর্বস্ব কি আবেগ সম্বল নয়। ভক্তিতে অশ্রু আবেগ উচ্ছ্বাসেরও স্থান আছে কিন্তু ভক্তির উত্তমরহস্যের চাবিকাঠি শুধু পরম শরণাগতি[র] হাতে—যার দীক্ষামন্ত্র: "সর্বধর্ম পরিত্যাগ ক'রে ভগবানে[র] শরণ নেওয়া।" ভক্তির সুরু স্বধর্মপালনে, সারা—স্বধর্মে[র] বিসর্জনে, কারণ স্ব বলতে বোঝায়—আমি, আর শরণা[-] গতির আরাধ্য হ'ল—তুমি: আমি ও আমার ছেড়ে তুমি ও তোমার বলতে বলতে আত্মবিলাপ। শেষে বললাম "গীতার শরণাপত্তির একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত দিতে চা[ই] ইন্দিরা দেবীর মীরাভজন গেয়ে।" ব'লে গাইল[াম] হিন্দিতে:

সুন রি সখী তোহে আজ কহু মম—কৈসে সজন পারে

যোগী ঋষি জিস মুখকো তরসেঁ ময় অবলা বো রিঝায়ে॥

পুরো হিন্দি গানটিঃ সুধাঞ্জলি”-তে আছে। বাংলা অনুবাদটি আমার অনামীর ২৭৬ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে। আমি টীকা করেছিলাম এই ব'লে, “এই গানটির বাণী—পূর্ণ শরণাগতির। সে-বাণীর প্রাণের কথা কী? না, ঠাকুর আকাশের ভগবান্ নন—আমাদের অন্তরঙ্গ। তাই যে-মুহূর্তে আমরা তাঁকে জানি আপন হ'তে আপন ব'লে—অশ্রুজলে তাঁকে আবেদন জানাই যে তাঁকে না পেলে আমার দিন কাটে না—সে-মুহূর্তে তিনি সাড়া না দিয়েই থাকতে পারেন না। তাই মীরা বলেছেন: জ্ঞান-ধ্যান, মন্ত্র-তন্ত্র, যোগ-যাগ নয়—শুধু চোখের জলে তাঁকে ডাকা—'আমায় রাঙা পায়ে ঠাঁই দাও ঠাকুর' ব'লে তাঁর আশ্রয় চাওয়া। তাঁকে জানতে আমি চাই না—পারিও না—চাই শুধু তাঁর শরণ নিয়ে জন্মসার্থক করতে: হরির লীলার কী বা জানি আমি? সে আকাশ, পাখী আমি যে। পড়িতে চরণে দিল ঠাঁই—গণি' আপন আমার স্বামী সে। শিশু সুরে কেঁদে ভাসিলে অমনি আসে সে ত্বরিত চরণে শরণাগতির পথে শুধু সখী পেয়েছি সে মনোমোহনে।'

আমার ভাষণটির প্রাণের কথাটি আমি গানের মধ্য দিয়ে যেন বেশি সহজে ফোটাতে পেরেছিলাম সেদিন রাতে। ভাষার বর মস্ত বর সন্দেহ কি? কিন্তু তার চেয়েও বড় বর—গান গাইতে পারা। কারণ গানের আছে সুরের পাখা, ভাষার আছে শুধু কথার চরণ। তাই গান যে-নীলমণির নাগাল পায় সহজেই—ভাষা পায় হয়ত তার ক্ষণিক আভাষ—তার বেশি নয়। বড় জোর ছুঁতে পারে, কিন্তু ধরতে গেলেই দেখে—সব হাওয়া।

* * *

দ্বিতীয় দিন মস্ত শামিয়ানার নিচে জমায়েৎ হয়েছিলেন প্রায় দুহাজার লোক। সামনে শিবমন্দির, কাছে কলকল্লোলিনী গঙ্গা, শ্রোতা শুধু কাশীর বহু পণ্ডিত অধ্যাপক গুণী জ্ঞানী নয়—ভক্ত জিজ্ঞাসু সাধক সন্ন্যাসী। গান গাইতে গাইতে পুণ্যতীর্থের পরম পরিবেশে মন ভুলে গেল পার্থিবতার হাজারো পিছুটান। অনেকেই আর্দ্র হ'য়ে উঠলেন যখন সবশেষে গাইলাম ইন্দিরার বাঁধা মীরাভজন:

নিখিল রসের নিধান তুমিই, সাধি প্রেম তব সাথে,
সব বিকিকিনি তব সাথে, হার জিতও তব প্রসাদে,
তোমার কাছেই হাসি কাঁদি চাই পায়ে ঠাঁই হে তোমারি
আর কেহ নয়—তুমি শুধু পিতা মাতা সখা সহচারী।

গানের শেষে এক সঙ্গীতরসিক আমাকে চলতি কথায় বাহবা দিয়ে বললেন: “আপনার গান শুনেছিলাম পঁয়ত্রিশ বৎসর আগে লক্ষ্ণৌয়ে সঙ্গীত সম্মেলনে।” কাশীনরেশ ছিলেন পাশেই দাঁড়িয়ে টুকলেন (ইংরাজিতে): “কিন্তু সে ছিল কনফারেন্স, এ মন্দির। সে-গান ছিল ওস্তাদি গান, আজকের গান—মীরাভজন। দুয়ের তফাৎ আশমান জমিন।” শুনে চম্‌কে গেলাম, পরে বলেছিলাম কাশী-নরেশকে যে, ভজনগায়ক ওস্তাদি-পন্থী শ্রোতার জন্যে গান গায় না; গায় এম্‌নিতর ভক্তের জন্যেই।

পরদিন রামনগরে তাঁর রাজপ্রাসাদে গান হ'ল। কিন্তু সেদিন গান জম্‌ল না কিছুতেই। কত চেষ্টা করলাম, কিন্তু গানে আমার ভক্তি নামল না। এক রাজসভাসদ পরে বলেছিলেন: “পরশু মন্দিরে আপনার গানে বুকের মধ্যে কেমন ক'রে উঠেছিল, সাধুজি! কিন্তু কাল রাজপ্রাসাদে কী হ'ল?”

আমি করুণ হেসে বলেছিলাম: “দি ওলড্ ওলড স্টোরি, স্তর! ভক্তি নামল না কিছুতেই। তাই ভজন গাইতে গিয়ে গাইলাম শুধু গান। ভালোই হ'ল—হয়ত একটু একটু ক'রে সম্প্রতি মনে অহঙ্কার জমছিল যে, আমি ভজন গাইতে পারি। দর্পহারী হেসে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে শুধু তিনি পারালেই পারি, নৈলে নয়। উপনিষদে পড়েন নি কি—একখণ্ড তৃণকেও ঝড়ে সরাতে পারে না আগুন পোড়াতে পারে না—যদি না বিধাতা বাদ সাধেন?” মনে মনে আরো একটু বললাম—স্বগতঃ অনুতাপে: “ভবিষ্যতে মনে রাখতে চেষ্টা করব যে, ভজন গান রাজপ্রাসাদে রাজপরিষদের মধ্যে জমে না, জমে শুধু ভক্তসংসদে।

* * *

কাশীতে এবার ফের দেখা হ'ল বন্ধুবর শ্রীকালীপদ গুহরায়ের সঙ্গে—যাঁকে আমি আমার “অঘটন আজো ঘটে” উৎসর্গ করেছি। তাতে লিখেছি:

“দিয়েছ শান্তি হে গুপ্তযোগী কত অশান্ত পান্থে
মুক্তির দিশা দেখায়ে তোমার জীবন দৃষ্টান্তে···

পেয়েছ প্রেমের শক্তি
পরকে আপন ক'রে নিয়ে কাছে টানতে।"

দিলীপকুমার ও কালীপদ গুহ রায়

বড় বিচিত্র মানুষ কালীদা! বলতে কি, তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানি না। তাইতো তাঁকে "গুপ্তযোগী" উপাধি দিয়েছি। তাঁর আচরণ দেখে আমার প্রায়ই মনে পড়ে—ভাগবতে বিষ্ণুর অদিতিকে চুপি চুপি বলা: "তোমার গর্ভে আমি বামন হ'য়ে জন্মাব বলিকে অপদস্থ করতে. কিন্তু একথা কদাচ প্রকাশ কোরো না ঘুণাক্ষরেও—'সর্বং সম্পৎস্যতে দেবি দেবগুহ্যং সুসংবৃতম্'—দেবতার অভিপ্রায় গুহ্য রাখলে তবেই সিদ্ধিলাভ হয়।"

কালীদা একথায় বিশ্বাস করেন, তাই কাউকেই বলেন না নিজের কোনো কথা। কিন্তু আত্মগোপন করলে হবে কী—তাঁর ব্যক্তিরূপে যে পদেপদেই উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে এক চিত্তাকর্ষী দীপ্তি—কিম্বা উপমা দেওয়া যেতে পারে: চুম্বক যেমন লোহাকে টানে তিনিও তেম্‌নি বহু লোককেই টেনে আপন ক'রে নেন। এক সময়ে স্বদেশী আন্দোলনে জেলে গিয়েছিলেন। তারপর বিবাহ ক'রে গৃহী হ'য়ে পরে যোগী হন। আজকাল গঙ্গাতীরে কাশীবাসী—গত চার বৎসর, কারণ তাঁর বৃদ্ধা মা যখন কাশীতেই দেহরক্ষা করবে, মাতৃভক্তপুত্র তাই আর কোথাও যান না কাশী ছেড়ে—শুনতে পাই তাঁর জীবনে নাকি দু-দুটি বিদেহী মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু একথা তিনি নিজমুখে আমাকে বলেন নি, শুনেছি প্রথম বন্ধুবর হেরম্ব মুখোপাধ্যায়ের মুখে, পরে শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের কাছে। কে বলেছিল মনে করতে পারছি না—শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ও শ্রীগোপীনাথের সঙ্গে কালীদার নাকি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথালাপ চলে। অনুমান করছি এ-সংসদে নানা সাধনা সম্বন্ধে গুহ্য কথাই হয় সচরাচর। এ-ও শুনেছি শ্রীকৃষ্ণপ্রেম কালীদাকে বারণ ক'রে দিয়েছে কোনো গুহ্য কথাই আমার কাছে ফাঁশ না করতে, কারণ আমি সবাইকে ব'লে ফেলবই ফেলব। এ-গুজব সত্য কিনা জানি না, তবে যেটা জানি সেটা এই যে কালীদা তাঁর নিজের সাধনা বা উপলব্ধি সম্বন্ধে আমাকে কোনো কথাই বলেন নি। এতে হয়ত ভালোই হয়েছে, কারণ কে জানে—হয়ত আমি সত্যিই না ব'লে থাকতে পারতাম না। তবে আমার সান্ত্বনা এই যে স্বয়ং গীতার ঠাকুর আমার সাফাই গেয়েছেন: "প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহং কিং করিষ্যতি?"—অর্থাৎ যার প্রকৃতি ব'লে ফেলা—সে বোবা হ'য়ে থাকতে পারে না হাজার চাপ দিলেও। তাছাড়া, আমি সত্যিই তো "চুপ্-চুপ্-কেউ-না শুনে ফেলে যেন" জাতীয় অনুশাসনে হাঁপিয়ে উঠে, করি কী বলো? মহৎ কিছু দেখলে উল্লসিত হ'তে এবং আশ্চর্য কিছু দেখে বিস্মিত হ'তে আমি শুধু যে ভালোবাসি তাই নয়, পাঁচজনকে ডেকে এ-জাতীয় উল্লাস ও বিস্ময়ের ভাগীদার না করলে যেন আমার আশ মিটতে চায় না। অবশ্য সর্ববিধ গুহ্য কথাই যে প্রকাশ করি এমন নয় (বলতে কি, গত বারো বৎসরে আমি অত্যাশ্চর্য অঘটন যা যা দেখেছি তার বারো আনাই প্রকাশ করি নি এই ভয়ে যে—প্রকাশ করলে লোকে আমাকে মিথ্যাবাদী বলবেই বলবে) কিন্তু যে সব কথা শুনলে মন উন্নত হয়—যথা মহৎসাধক বা ভাগবতী করুণা সম্বন্ধে আমার নানা চোখে-দেখা ও প্রাণে-পাওয়া অঘটন সেসব তথ্য গোপন করব কী দুঃখে? তাই প্রাণের মায়া ছেড়ে বলি কালীদা সম্বন্ধে যা প্রাণ চায়।

তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখা হয় গুরুদেবের দেহরক্ষার প্রায়

ডোরা স্বামী   দিলীপকুমার   ইন্দিরা দেবী   কালীপদ গুহ রায়

দুদিন পরে : ঠিক হ'ল আমরা এক ট্রেণেই মান্দ্রাজ থেকে দক্ষিণদিকে পাড়ি দেব ; কালীদা ভিল্লুপুরমে ট্রেণ বদ্‌লে যাবেন সোজা রমণ-আশ্রমে, আমরা ফিরব গুরুহীন গুরুগৃহে।

বলতে ভুলেছি, ইতিপূর্বে—১৯৫১ সালে—হেরম্ব আমাকে একটি পত্রে লিখেছিল কালীদাকে ইন্দিরার শ্রুতাঞ্জলি দেখাতেই তিনি প্রথম পাতায় তার ছবি দেখে বলেন : "প্রেম ও আলোয় গড়া—a being of light and love—কিন্তু বেশিদিন বাঁচবে না। বছর তিন-এর মধ্যে একটা দারুণ ফাঁড়া আছে, কাটা শক্ত।" ১৯৫২ সালে কালীদার সঙ্গে দেখা হ'তে এ-প্রসঙ্গ তুলব ভেবেও তোলা হয় নি নানা কারণে। পরে ১৯৫৪ সালে ইন্দিরা যখন শয্যাশায়ী হ'য়ে নাভিশ্বাসের পরেও আশ্চর্য ভাবে বেঁচে যায় ঠাকুরের প্রত্যক্ষ বরে—তখন কালীদার কথা ফের মনে হ'য়েছিল ব'লেই তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করলাম।

কিন্তু না, আরো একটি অঘটন ঘটেছিল তাঁর মাধ্যমে। বলা হয়ত ঠিক নয়, কিন্তু গীতার সান্ত্বনা যখন আছে—"স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ," তখন ব'লেই ফেলি, ক্ষতি কী ?

পণ্ডিচেরিতে আমার একটি গুরুভাই ন—আমাকে শ্রীঅরবিন্দের দেহান্তের পরে বলেন এই গল্পটি কালীদা সম্পর্কে—পরে কালীদাও সায় দিয়েছিলেন গল্পটি আরো খুঁটিয়ে ব'লে। ব্যাপারটা এই : শ্রীঅরবিন্দের দেহান্তের এক বৎসর আগে একদা ন—কালীদার সঙ্গে কলকাতার হিমাদ্রি আফিসে কথায় কথায় বলে যে শ্রীমুনসি প্রমুখ ভারতীয় নেতারা ১৯৫২ সালে ঘটা করেই শ্রীঅরবিন্দের আশী বৎসরের জন্মোৎসব করবেন ঠিক হ'য়েছে। কালীদা বলেন : বৃথা, শ্রীঅরবিন্দ ততদিন ইহলোকে থাকবেন না। ন—তর্ক তুলতে কালীদা একটি কাগজে শ্রীঅরবিন্দের আসন্ন তিরোধানের তারিখ লিখে কাগজটি মুড়ে তার হাতে

দেড়বৎসর পরে—১৯৫২ সালে ১২ এপ্রিল তারিখে। মান্দ্রাজে তখন আমি ও ইন্দিরা ছিলাম উডল্যাণ্ড হোটেলে গ্রামোফোনে কয়েকটি গান দিতে। হবি তো হ, সেখানে একদিন সকালে হঠাৎ "পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ"—অকস্মাৎ দেখা কালীদা-সনাথ হেরম্বর সঙ্গে ! হেরম্ব আরো আরো বহু যোগী মুনি তপস্বীকে চেনে। গুরুদাস ব্রহ্মচারীর কথাও শুনি প্রথম তার কাছেই। পণ্ডিচেরির শ্রীঅরবিন্দ, তিরুভান্নামালাইয়ের শ্রীরমণ মহর্ষি, আনন্দাশ্রমের শ্রীরামদাস, আলমোড়ার শ্রীকৃষ্ণপ্রেম, পুরীর নঙ্গা বাবা, কাশীর বীতরাগানন্দ—আরো সে-কত যোগীর আশ্রমেই যে তার যাওয়া আসা !

নানা দিক দিয়েই এই স্নেহশীল, স্বভাবনম্র মানুষটিকে "বিচিত্র" অভিধা দেওয়া যায়। গৃহী হ'য়েও উদাসী, সংসারী হ'য়েও সৎসঙ্গবিলাসী, আলাপী হ'য়েও অপ্রগলভ ! কারুর নিন্দা কখনো শুনি নি ওর মুখে। কালীদার সম্বন্ধে ও-ই প্রথম বলে : "প্রেমিক মানুষ তিনি।" নিজে যে স্নেহশীল সে স্নেহশীলকে চিনবে না তো চিনবে কে ? কিন্তু কালীদার কথাই বলি, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

মান্দ্রাজে কালীদার সঙ্গে আমার দেখা হ'তেই তিনি হেরম্বকে বললেন আরো দুদিন মান্দ্রাজে থাকাই চাই। হেরম্বর সঙ্গে উনি যাচ্ছিলেন তিরুভান্নামালাইয়ে রমণ মহর্ষির আশ্রমে। একটি পুরো কামরা রিজার্ভ করা হ'ল

দিয়ে বলেন : "রেখে দিন আপনার কাছে এখন খুলবেন না, আপনার গুরুদেব গতাসু হ'লে পর মিলিয়ে নেবেন।" এ—কাগজটি দুদিন কাছে রেখে গভীর অস্বস্তি বোধ ক'রে কালীদার কাছে গিয়ে ফিরিয়ে দেয়, বলে: "এ-কাগজ আপনার কাছেই থাকুক।" (কালীদা এবার আমাকে কাশীতে বলেন : "এ-কে সাবাস দিতেই হবে যে অদম্য কৌতূহল সত্ত্বেও কথা রেখেছিল।") কালীদা তখন তাঁর অনুগত বন্ধু ৺অমলেন্দু দাশকে ডেকে কাগজটি তার জিম্মায় দেন। ১৯৫০ সালে ৫ই ডিসেম্বর-এ শ্রীঅরবিন্দের আকস্মিক তিরোধানের পরে অমলেন্দুবাবু কাগজটি খুলে দেখেন তারিখটি লেখা আছে—৫ই ডিসেম্বর ১৯৫০।

[ক্রমশঃ

রবি-বন্দনা

শ্রীকুড়রাম ভট্টাচার্য্য

গ্রীষ্ম গগনে আগুন লেগেছে বুঝি,
জমাট নীলিমা জ্বলে পুড়ে হ'লো ছাই,
তৃষ্ণার বারি বৃথায় মরি যে খুঁজি,'
মর্তের বুকে একটুকু মায়া নাই।
জন-কান্তারে জ্বলে দাবানল ধুধু,
দহনে তাহার পুড়িছে মানুষ-শব,
অমৃতের আশে মহাউল্লাসে শুধু
দানবের দলে লেগেছে মহোৎসব।
কোথা' সে আশার শুভ আশ্বাস ওরে,
মানুষ ভুলেছে মানুষের অধিকার,
কে শুনাবে হায়, কত শতাব্দী পরে
স্বপ্নপুরীর খুলিবে স্বর্ণদ্বার!
সহসা পবন স্পন্দিত কিশলয়ে
শঙ্খ নিনাদে ধরণীরে দিলো ডাক
"মনে রেখো, আজি নবীন সূর্য্যোদয়ে
আসিয়াছে শুভ পঁচিশে বৈশাখ।"
জনমিলে কবি, মর্তের দেবালয়ে
নরকুলরবি তুমি হে জ্যোতিষ্মান,
কুয়াশার বুকে আশার বার্তা ল'য়ে
বিলাইতে এলে সত্যের জয় গান।
দেখে গেলে হেথা দয়াহীন ধরণীতে
শক্তিমানের উদ্ধত আচরণ,
শুনে গেলে শুধু অসহায় কাকুতিতে
অপমানিতের অবাধিত ক্রন্দন।
অন্যায়রোধী তোমার রুদ্রবীণে
সুর-তরঙ্গে উঠিয়াছে ঝংকার,
স্মরি' তোমা' কবি, আজি এ জন্মদিনে
আনত শীর্ষে প্রণমিনু শতবার।

একটি অদ্ভুত মামলা

ডঃ শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আমরা এইদিনকার মত তদন্ত শেষ করে থানায় ফিরে দেখলাম যে থানার ঘড়িতে প্রায় বাঁরোটা বাজতে চলেছে। আমি আমাদের এই বিচকেকে একখানা চেয়ারে বসিয়ে তার খাবার জন্যে এক ভাঁড় রাবড়ী, বড়ো বড়ো রসগোল্লা ও কয়েকটা সন্দেশ আনিয়ে নিয়ে বিচকেকে বললাম, নাও ভাই। এগুলো খেয়ে নাও, আরে এতে কি? আমি তো বলেছি তোমাকে একটা ভালো কায জুটিয়ে দেবো। বিচকে এতো যত্ন আত্তি বোধ হয় জীবনে কোনও দিনই কারুর কাছে পায় নি। এতোগুলো সুস্বাদু খাবার সামনে দেখে চোখ ফেটে জল বেরিয়ে পড়লো। আমার বারংবার অনুরোধে অতি সন্তর্পণে সে খাবারগুলোতে হাত দিয়েও তা সে চেষ্টা করেও মুখের দিকে এগিয়ে নিতে পাচ্ছিল না। কিছুক্ষণ আঙ্গুলের ডগা দিয়ে সেগুলো নাড়াচাড়া করে সে বলে উঠলো, আমাকে কিন্তু, স্যার কেউ এতো সব খেতে দেয় নি। কোনও বাড়ীতে নেমন্তন্ন হলেও ওরা আমাকে সেখানে নিয়ে যায় না। আমাকে বাড়ী পাহারা দেবার জন্যে ওরা বাড়ীতেই রেখে বের হয়।

ওঃ, তাই না'কি? তাহলে তো তোমার বড্ড কষ্ট, আমি ইতিমধ্যে বিচকের প্রতি অপুলিশ-সুলভ সহানুভূতি-শীল হয়ে উঠেছিলাম। এই সহানুভূতির মধ্যে আমাদের স্বভাবসুলভ কোনও অকৃত্রিমতা ছিল না। আমি অকৃত্রিম সহানুভূতির সহিতই তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তাহলে তো পড়াশুনাও তোমার ওখানে হয় না! ওরা তোমাকে এতো কষ্ট দেওয়া সত্বেও তুমি ওদের ওখানে থাকো কেন ভাই।

আজ্ঞে! ওরা হচ্ছে আমার বাপ-মার এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়। ওদের অবস্থাও যে খুব ভালো তা নয়। তারা পড়াশুনার ব্যবস্থা আমার করবেই বা কি করে? বেচারাম একটা রসগোল্লা হতে আরও একটা ছোট টুকরা সন্তর্পণে ভেঙে নিলে। বোধহয় সে বহুক্ষণ ধরে আমেজ করে এই দুর্লভ খাবারগুলো একটু একটু করে খেতে চায়। এই নূতন ভাঙা টুকরোটা সে তাঁর দাঁতের ফাঁকে গলিয়ে দিয়ে ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরে উত্তর করলো—ওরা কতো কষ্ট করে তবে নিজের ছেলেদের স্কুলে পাঠায়। না না, আমাকে স্কুলে পাঠাবার মতো এতো পয়সা ওদের কোথায়? তা ছাড়া ওদের ছেড়ে আমি আসবোই বা কি করে? এতদিন তো ওরা আমাকে আশ্রয় দিয়েছে, খেতেও—আমি না হলে ওদের বাজারটাজার সব করে দেবে কে? না না। ওদের আমি ছেড়ে যেতে পারবো না। তবে ওনাদের ছোট ছেলের সাহায্যে আমি একটু-আধটু ইংরাজী বাংলা শিখে নিয়েছি। আমি পাড়ার ক্লাবে যাই ওখানকার লাইব্রেরীর বই পড়তে। ওদের ওখানে অনেক রহস্য সিরিজের বই আসে। এই সব বইয়ে কতো গোয়েন্দার গল্পও আমি পড়েছি। তাই আপনাদের পুলিশের কায আমি খুব ভালো করেই করতে পারবো।

আমার কাছে সিক্রেট সার্ভিসের কিছু টাকা মজুত ছিল। তা থেকে ত্রিশ টাকা আমি এই ছেলেটির মুঠির মধ্যে গুঁজে দিলাম। এই তিনখানা দশ টাকার নোট তার মুঠির মধ্যে মড় মড় করে উঠলো। অনেকক্ষণ ধরে বোধ হয় সে তার উত্তাপ অনুভব করছিল। এর একটু পরে সে হাত খুলে সেখানে তিনখানা দশ টাকার নোট দেখে বিস্ফারিত নেত্রে সেইদিকে চেয়ে রইল। এর পর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে

আমার দিকে ফেল ফেল করে চেয়ে সে বলে উঠলো—ও বাবা! এতো টাকা? আমি তো ছোট ছেলে। এতো টাকা আমি কি করবো? এ—একি আমাকে আপনি দিলেন?

আচ্ছা। তোমার পড়া-শুনা ভালো লাগে না। না, তোমার হাতের কায শেখা ভালো লাগে? আমি সস্নেহে তার গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি যদি একটি ফ্যাক্টরীতে হাতের কাজ শিখতে চাও তো বলো। আমি তোমাকে কাল থেকেই সেখানে লাগিয়ে দেবো। কিন্তু তোমাকে আমাদের এই তদন্তেও একটু সাহায্য করতে হবে। তোমাকে আনাচে-কানাচে সন্তর্পণে ঘুরে জেনে আসতে হবে—তোমাদের পাড়ার এই ভদ্রমহিলা তাদের বাড়ীর পিছনকার বাড়ীটাতে যাতায়াত করেন কিনা? তা ছাড়া ওদিককার ঐ কম্পাউণ্ড-ওয়ালা বাড়ীটাতে ঝাড়-পোঁছের কাজ চলছে। সেই বাড়ীতে নূতন কেউ এলো কিনা—তাও তোমাকে জেনে আসতে হবে। অবশ্য এ সব কাজের জন্য তুমি আরও অনেক টাকা আমাদের কাছ হতে পাবে।

আজ্ঞে! তা এ এমন কি আর কঠিন কাজ, বেচারাম এইবার আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে আমাকে বললো, এই রহস্য জানবার চেষ্টা করছিলাম বলেই না পাড়ায় আমার এতো বদনাম, সব মেয়েদেরই আমি নিজের মা-বোনের মত দেখে থাকি। আমি এই ভদ্রমহিলার পিছনে কয় দিন ঘুরেছি বটে, কিন্তু সত্যি বলছি এতে একেবারে আমার কোনও মন্দ উদ্দেশ্য ছিল না। এই ভূতুড়ে বাড়ী দুটোর রহস্য জানবার জন্যেই আমি এতো সব করেছি। কিন্তু এ সব কাযের জন্য আমি আপনাদের নিকট হতে কোনও পারিশ্রমিক চাই না। এ যা দিয়েছেন এই তো অনেক টাকা। এ-ও আমি নিতাম না। কিন্তু কেন নিলাম তা আমি আপনাদের পরে একদিন জানাবো।

আমি এই নির্লোভী নিষ্পাপ বালকটির দিকে মুগ্ধ নয়নে একবার চেয়ে দেখে লজ্জায় মুখটা কিছুক্ষণের জন্য অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলুম। আমরা কোনও সমাজ সংস্কারক নই, আমরা হচ্ছি বেতনভুক পুলিস অফিসার। তাই নিজেদের কার্য্যসিদ্ধির জন্যে এমন এক নিষ্কলঙ্ক উদ্যোগী তরুণমতি ভাবপ্রবণ বালককেও এক জঘন্য ইন্‌ফরমার-এর কাযে দীক্ষিত করে তুলতে হচ্ছে। চোর ডাকাতদের হাতে ও পড়লে তারা তাকে চোর ডাকাত করতো। এখন পুলিশের হাতে পড়ায় ওদেরই অপর পিঠ গুপ্তচরের কাজে শিক্ষিত করে তোলা হচ্ছে, এই যা তফাৎ—আমি এইবার ক্ষুণ্ণ মনে সরকারী নথাপত্রের জন্য এই সুকুমারমতি বালকের একটি বিবৃতি সাবধানে লিপিবদ্ধ করতে সুরু করে দিলাম। কাউকে গোয়েন্দার কাযে নিযুক্ত করতে হলে সরকারী কানুন মতে তাদের জীবনীও ইতিবৃত্ত নথীভুক্ত করার রীতি আছে। তার এই বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

'আমার নাম বেচারাম কর। আমার বর্ত্তমান বয়স ষোল বৎসর। আমাদের গ্রাম ছিল পদ্মা নদীর ধারে। সেখানে আমি পিতামাতার সঙ্গে বাস করতাম। আমার বাবা কলকাতায় কায করতেন। মধ্যে মধ্যে ছুটিতে তিনি বাড়ী আসতেন। মাঝ দরিয়ায় ষ্টিমার এসে থামলে আমি মার সঙ্গে ছোট পানসী নৌকা করে এগিয়ে যেতাম। আমাদের এই ছোট নৌকা ঢেউএর তালে তালে লাফাতে লাফাতে ষ্টীমারের গায়ে লাগলে—বাবা ষ্টীমারের গায়ে লাগানো সিঁড়ি দিয়ে নেমে আমাদের নৌকায় এসে উঠতেন। এরপর আমার বয়স যখন আট বছর তখন গ্রামের ধারে পদ্মা নদীর কিনারা ভাঙতে সুরু করে দিলে। এখন আমাদের পুরা গ্রামটাই পদ্মানদীর গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। বাবা খবর পেয়ে মা'কে ও আমাকে নিয়ে এই শহরে চলে এলেন। আমাদের গ্রামের মাটিকে মা আমার বড্ড ভালোবাসতেন। কিছুদিন পরে শোকে মুহ্যমান হয়ে তিনিও চলে গেলেন। বাবা তো সকালে বেরিয়ে কতো রাত্রে বাড়ী ফেরেন—আমি একা একা বাড়ীতে মা'র জন্যে আর কতো কঁাদবো বলুন তো? এর পর বাবা একদিন আমাদের এই আত্মীয়দের বাড়ীতে রেখে কোথায় চলে গেলেন। এদের কাছে শুনেছি তিনি আবার বিয়ে করে এখন শ্বশুর বাড়ীতেই থাকেন। কতদিন যে তিনি আমার কোনও খবর নেন নি তা আমার মনেও পড়ে না। এঁরা বলে তো—তার কোনও ছেলে নেই এইরূপ এক মিথ্যা ব'লে তিনি পুনর্বিবাহ করেছেন। পাছে তারা জানতে পারে যে তাঁর একটি ছেলে আছে, এই ভয়ে উনি ভুলেও এদিকে পা' বাড়ান না। কিন্তু, স্যার, আমার বড্ড তাঁকে

দেখতে ইচ্ছে করে। আমি তাঁকে মনে মনে ভক্তি করি। তাঁর এতো সব অসুবিধে না থাকলে নিশ্চয়ই তিনি এসে আমাকে আদর করে যেতেন। আমার বাবা এখন কোথায় থাকেন তা ওনাদের মত আমারও জানা নেই।

এঁ্যা! এই ছেলেটা বলে কি? তাহলে এরও গ্রাম পদ্মা নদীর ধারে ছিল। এই রহস্যময়ী নারীর গ্রামটিও তো এদের গ্রামেরই মতো পদ্মা নদীর জলে তলিয়ে গিয়েছে। এই মহিলাটি এই বালকের পিতার গ্রামবাসী হওয়াও অসম্ভব নয়। এইরূপ অবস্থায় এই বালকটির পিতাকে খুঁজে বার করতে পারলে এই মহিলার গ্রামীণ জীবন সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য তার কাছ হতে সংগ্রহ করা যেতে পারে। এই সাংঘাতিক রকম কেসের নিখোঁজ সংবাদ-দাতার সম্বন্ধেও অনেক কিছু তার কাছ হতে আমরা জেনে নিতে পারবো। মনে মনে এই নূতন পথে তদন্ত করবো ঠিক করে—আমি বালকটিকে এই মামলা সম্বন্ধে আরও কয়েকটি প্রশ্ন করলাম। আমাদের প্রশ্নোত্তর গুলির প্রয়োজনায় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

প্রঃ—আচ্ছা খোকা। এদের ওপর তোমার দৃষ্টি তো সজাগ ছিল। তা'ছাড়া তুমিই পাড়ায় বেশী ঘুরাফিরা করো। এখন মনে করে বলো তো, যে বয়স্ক একটা লোক ঐ মহিলাটির বাড়ী সম্প্রতি আনাগোনা করতো তাকে কি তুমি দেখলে চিনতে পারবে? লক্ষ্মী সোনা ভাই। একটু মনে করে তার চেহারা কিরকম তা আমাদের বলে দাও:

উঃ—আজ্ঞে! ওঁকে পাড়ার অনেকেই ভালো করে দেখেছে। আমি ওঁকে শুধু একবার মাত্র দেখেছি। আমি যে ওদের ঐ বাড়ীর রহস্যের সন্ধানের তালে আছি, তা বোধ হয় উনি জানতে পেরেছিলেন। তাই আমাকে দূর হতে দেখা মাত্র উনি সুট করে ওনার ঐ বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়তেন। এর পর উনি এদিককার এই রাস্তা দিয়ে এই বাড়ীতে কখনও আর ঢুকেছিলেন বলে মনে হয় না। খুব সম্ভবতঃ এর পর থেকে উনি এই বাড়ীর পিছনের বাড়ীর মধ্যে দিয়ে এই বাড়ীতে এসেছিলেন ব'লে মনে হয়। একদিন আমার এক বন্ধুর ত্রিতলের ছাদে উঠে ওঁর মত একটা লাল আলোয়ান গায়ে লোককে ঐ পিছন-দিককার এই বাড়ীটার কম্পাউণ্ডের ওপর দিয়ে ওপারের রাস্তায় আমি বেরিয়ে যেতেও দেখেছিলাম। ঐ লোকটার চেহারা কিন্তু দূর হতে ঠিক আপনার চেহারার মত মনে হয়। ঠিক হুবহু আপনার মত লম্বা চেহারার গড়ন ওর। এই লোকটাকে কিন্তু আমার খুব ভালো মনে হয় নি। তবে ওর মুখটা আমি ভালো করে দেখে নিতে পারি নি।

প্রঃ—হুঁ। আচ্ছা, আর একটা কথা তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করবো। আজকে শুনলাম একটা আধাবয়সী লোকের সঙ্গে ওখানে সকালের দিকে একটা দারুণ বচসা হয়ে গিয়েছে। এই সময় কি তুমি ওদিকটায় গিয়েছিলে। তুমি কি ও লোকটাকে অন্যদের মত দেখেছিলে।

উঃ—আজ্ঞে। এ পাড়ার লোকেদের মুখে শুনেছি যে আজ সকালে এই মহিলাটির সঙ্গে একটা লোকের রাস্তার ওপরই বচসা হয়েছিল। এই লোকটা ওঁর বাড়ীতে ঢুকে কি সব বলেছিলেন, তাই এই মহিলাটি ক্রুদ্ধ হয়ে নিজেই তাকে বাড়ী হতে বার করে দেয়। আমি খবর পেয়ে এই দিকেই ছুটে আসছিলাম। ভদ্রলোক বেশীক্ষণ রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা কাটাকাটি করতে চান নি। আমি এখানে এসে পৌঁছবার আগেই ভদ্রলোক সরে পড়তে পেরেছিলেন। আপনি সামনের যে বাড়ীর বৈঠক-খানায় বসেছিলেন, ওঁদের বাড়ীর মেয়েরা ওপরের বারান্দা থেকে ওনাদের কথা কাটাকাটি শুনেছে। ওঁদের আপনি একবার এই সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে দেখুন না। পাছে ওদের এই ব্যাপারে সাক্ষী দিতে হয়, সেই জন্য ওঁরা এ'সব কথা ভেঙে বললেন না। আমাদের পাড়ার সম্পর্কীয় বড়-ঠানদিও ওঁদের এই বারান্দায় বসেছিলেন। অন্ততঃ তিনি এ বিষয়ে নিশ্চয়ই আপনাদের সাহায্য করবেন। আচ্ছা! আমি ঐ বাড়ীর বুড়ী-ঠানদির কাছ হতে গোপনে এসব কথা জেনে আসবো এখন।

এদের পাড়ার এই এজমালী বুড়ী-ঠানদিকে জিজ্ঞাসা-বাদ করার আমাদেরও যে ইচ্ছে ছিল না তা নয়। কিন্তু এতো শীঘ্র তাঁকে এই ব্যাপারে টানাটানি না করাই ভালো মনে হলো। এদিকে আমাদের এই নূতন সংগৃহীত বালক-সুহৃদ বিচককে আরও কয়েকটি প্রশ্ন আমি করবো মনে করেছিলাম। এমন সময়ে ওদের পাড়ার প্রায় দশ বারো-জন ভদ্রলোক সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। এদের

উপস্থিতি আমাদের বুঝিয়ে দিল যে এই বহুজননিন্দিত বালকটির পাড়ায় জনপ্রিয়তাও কম নয়, অনুমানে বুঝলাম যে এঁরা বালকটি গ্রেপ্তার হয়েছে সন্দেহে তাকে মুক্ত করতে এসেছেন।

'আরে মশাই, আপনাদের একটু বিরক্ত করতে আসতে হলো'—এঁদের দলের একজন এগিয়ে এসে নমস্কার জানিয়ে বলে উঠলেন—সাধে কি আমাদের আসতে হলো, মশাই। আমার মাকে এই ছেলেটা ঠান্‌দী বলে ডাকে। মাও আমার ওকে নিজের নাতির সামিলই মনে করে। তিনি পাড়া মাত করে সকলের দোরে দোরে গিয়ে, এই ছেলেটাকে ছাড়াবার জন্যে এমন চেঁচামেচি সুরু করে দিলেন যে আমরা ওকে জামিনে আনবার জন্যে আপনাদের এখানে উমেদারী করতে আসতে এক প্রকার বাধ্যই হয়েছি।

এই ভদ্রলোকদের কথাবার্ত্তা শুনে বুঝলাম যে—যার কেউ নেই তাঁর জন্যে আছেন বোধ হয় স্বয়ং ঈশ্বর। তাই প্রয়োজন হলে তিনি এমনি কত নিঃসম্পর্কীয় ঠানদি প্রভৃতির মূর্ত্তি ধরে বিপদের দিনে এগিয়ে এসে থাকেন। এদিকে থানার ঘড়িতে প্রায় দুটা বাজতে চলেছে। আর এখানে বেশীক্ষণ দেরী করা চলে না। আমরা এই বালকটিকে সানন্দে তাদের হাতে তুলে দিয়ে তাকে ইসারায় জানালাম যে কাল যেন সে একবার আমাদের সঙ্গে দেখা করে যায়। তারপর এই অভ্যাগতদের তাদের এতটা কষ্ট স্বীকারের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে আহারের জন্য থানার উপরের কোয়ার্টারে উঠে এলাম। সেই সঙ্গে মনে মনে ঠিক করে নিলাম যে সুবিধা মত একদিন এই ঠান্‌দিটিকেও এই ব্যাপারে কিছুটা জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে এখন। এই সময় আমাদের এ কথাও মনে হচ্ছিল যে, এতো লোক এই বালকটির জন্যে আগ্রহশীল হয়ে উঠেছে। কিন্তু এর আশ্রয়দাতারা একবারও এর জন্যে খোঁজ-খবর করলে না কেন? খাওয়া-দাওয়ার সময়ে এত ভাবলে চলে না। তাই এখনকার মত সকল চিন্তায় ক্ষান্ত দিয়ে আমরা যে যার বাসায় উঠে এলাম।

প্রত্যুষে ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে কালকেকার অসমাপ্ত তদন্তের বিষয়টুকু প্রথমে মনে পড়ে গেল। শয্যার উপরে শুয়ে শুয়েই ভাবছিলাম—কোথায় কোথায় আজ তদন্ত করা যাবে। একবার মনে হলো বেচারামের আশ্রয়দাতাদের একবার জিজ্ঞাসাবাদ করে আসা যাক। তাদের সাহায্যে বেচারামের গুণধর পিতাঠাকুরকে খুঁজে বার করা যাবে। আবার ভাবলাম—তাতে এমন খুব বেশী লাভ হবে কি? পরক্ষণেই মনে হলো একজন সহকারী অফিসারকে আজই বেনারস শহরে পাঠিয়ে দিলে কি রকম হয়, সেখানে গিয়ে ঐ মহিলার বাড়ীর আসল মালিকদের জিজ্ঞাসাবাদ করারও তো বিশেষ প্রয়োজন। ভদ্রলোকের এখানকার বন্ধুর মুখে শুনলাম তাঁরও একটি পুত্র আছে। তার বয়স তো হিসাব মত চব্বিশ বা পঁচিশ হবে। এদিকে এখানকার ঐ জখমী যুবকেরও তো এই একই বয়েস। এদের দুজনার মধ্যে কোনও সম্পর্ক নেই তো? এ ছাড়া ওপারের প্রাঙ্গণওয়ালা বাড়ীটাতেও একবার খোঁজ-খবর করা দরকার। তারপর ট্যাক্সি নং B L T (c) 42 মালিককেও তো আমাদের একবার চাই। তা হলে নিউ তাজমহল হোটেলেই প্রথমে আমরা ধাওয়া করি। হয়তো কালকার সেই ও-বাড়ীর মোচ-ওয়ালা তদারককারী বাবুটিরও সেখানে সাক্ষাৎ পাওয়া যেতে পারে। এদিকে আমাদের এই মামলার প্রাথমিক সংবাদদাতাটিকেও তো খুঁজে বার করতে হবে। ঐ আহত যুবকটীর অভিভাবকদের তো এখানে কোনও পাত্তা পাওয়া গেল না। তাদেরও তো আমাদের খুঁজে বার করতে হবে। ওখানকার রহস্যময়ী মহিলার অফিসে আজ একবার হানা দিলে কি রকম হয়। এ ছাড়া ঐ মহিলার সেই জমীদার-পত্নী বান্ধবীটির ও তাঁর জমীদার-স্বামীর মতি-গতি সম্বন্ধেও আমাদের ওয়াকিবহাল হতে হবে। তাহলে আজ কোন দিকের তদন্ত আমাদের প্রথম আরম্ভ করা উচিৎ হবে।

এমনি অনেক কথাই আমি শুয়ে শুয়ে ভেবে চলেছি। আমার চিন্তার যেন কোনও শেষ নেই। শেষবেশ আমি ঠিক করলাম যে আজকে তাজমহল হোটেলের তদন্তটাই শেষ করে আসা যাক। এমনি কতো সব চিন্তায় মাথাটা এক ঝাঁক পোকার মত কিলবিল করে উঠছিল। এমন সময় হঠাৎ আমার ঘরে দেওয়ালের দিকে নজর পড়ে গেল। দেওয়ালের ঘড়িতে দেখা যায় যে প্রায় সাতটা বাজতে চলেছে। সহকারী অফিসার কনকবাবুকে সাতটার আগেই অফিসে আসতে বলেছিলাম। এতক্ষণ হয়তো তিনি

সেখানে এসে আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আমি আর দেরী না করে তড়াক করে শয্যা ছেড়ে উঠে মেঝের উপর দাঁড়ালাম। অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে বেশভূষা করে নেওয়া আমাদের নিকট এক অতি সহজ ব্যাপার। জীবন সংগ্রামে জয়ী হওয়ার জন্যে এই ক্ষমতা অভ্যাস দ্বারা আমাদের অর্জ্জন করতে হয়েছে। মাত্র দুই মিনিটে ও কম সময়ের মধ্যে আমি বেশভূষা শেষ করে দ্রুতগতিতে দরজা খুলে বার হতে যাচ্ছিলাম। এই সময় দরজার ওপার হতে আমাদের গৃহ-ভৃত্য গরম চায়ের একটা ট্রে নিয়ে আমার শোবার ঘরে ঢুকছিল। আর একটু অসাবধান হলেই হয়তো উভয়ের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হয়ে চায়ের পেয়ালা ভেঙে টুকরা টুকরা হয়ে যেতো। আমি তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গিয়ে ইসারায় তাকে এগুলো নীচেকার অফিস ঘরে নিয়ে আসতে বললাম। এর পর তর তর করে আমি সিঁড়ি ব'য়ে নীচে নামতে সুরু করলাম। এদিকে হতবিহ্বল গৃহ-ভৃত্যটিও সেই একই ভাবে ট্রে হাতে আমার পিছু পিছু এলো। আমি মনে মনে স্থির করে-ছিলাম যে আজকের মধ্যেই এই মামলার রহস্যের একটা হেস্ত-নেস্ত করে ফেলতে হবে। এক প্রকার লাফাতে লাফাতে নেমে আফিসে এসে দেখলাম—সহকারী কনকবাবু ইতিমধ্যেই সেখানে এসে গিয়েছেন। একটু লজ্জিত হয়ে আসন গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই গৃহভৃত্য চায়ের ট্রেটী আমাদের উভয়ের মধ্যবর্ত্তী টেবিলের উপর রেখে দিয়ে গেল। গৃহভৃত্য ভিকুয়াম আপন কর্ত্তব্য শেষ করে চলেই যাচ্ছিল। আমি মধ্যপথে তাকে থামিয়ে সহকারী কনক-বাবুর জন্যেও ঝটপট আর এক কাপ চা এখানে দিয়ে যাবার জন্যে আদেশ করলাম। কালকার এই অদ্ভুত মামলাটা চিন্তা করতে করতে মাথা ধরে গিয়েছে। এক্ষুণি একটু গরম চা পেটে পড়লে সুফল ফলতে পারে। কিন্তু সহকারী অফিসারের জন্য আর এক কাপ চা এসে পৌছানো পর্য্যন্ত লোভ সংবরণ করাই ভালো। এর একটু পরে সহকারীর চায়ের কাপ এসে পৌছানো-মাত্র আমরা উভয়ে প্রাতঃ-কালীন চা পান করতে করতে আমাদের এই মামলার বিষয় আলোচনা সুরু করে দিলাম। [ক্রমশঃ

জন্মান্তরে

শ্রীআশুতোষ সান্যাল এম-এ

শত জন্ম-জন্মান্তর প্রিয়া হ'য়ে রহো তুমি মোর—
তরু-ঢাকা এ কুটীরে, মায়া-মাখা ঝিঁঝি-ডাকা গাঁয়,
চাঁদ-ওঠা ফুল-ফোটা সাঁজে! ওগো এমনি করিয়া
একগোছা কৃষ্ণকলি যত্নে তুলি' পরিয়ো খোঁপায়,
পান-রাঙা ঠোঁটে মিঠে ফুটাইয়া হাসির ঝলক
ক্ষণতরে। তারপর ধীরে ধীরে এসো মোর পাশে
হেলিয়া দুলিয়া শ্বেত মরালীর মতো লাস্যভরে
দিবা শেষে। এই মতো গগনের গর্ভ বিদারিয়া
জ্যোতির্ম্ময় স্বর্ণবর্ণ শিশু শশী আসিবে বাহিরি'
গাঢ় ধ্বান্তধূলিজালে দূর করি' রশ্মি শলাকায়!
এই মতো গা'বে গান নাম-নাহি-জানা কোন্ পাখী
অবিরল নানা সুরে। হিল্লোলিত সেই কলগীতে
ভাসিবে ভুবনখানি উল্লসিত ফুলের মতন
নদী জলে। তারপর?—স্নিগ্ধশান্তি আসিবে নামিয়া
তাল-নারিকেল-ঘেরা মোর পল্লী-গৃহের প্রাঙ্গণে;
একমুঠি জ্যোৎস্না যেন পুষ্পবনে রহে মুরছিয়া
মেদুর আবেশে মোর শয্যালগ্ন বাতায়ন-পাশে;
যুগল-হৃদয়স্পন্দ বাজে যেন রাতের বীণায়!

ছিন্নপত্রের রবীন্দ্রনাথ

শৈলেনকুমার দত্ত

॥ এক ॥

ছিন্নপত্র (১৩১৯) প্রকাশের অনেক পরে পত্র ধারার (১৩৪৫) ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ নিজেই একবার লিখেছিলেন—"তখন আমি ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম বাংলার পল্লীতে পল্লীতে, আমার পথ-চলা মনে সেই-সকল গ্রামদৃশ্যের নানা নতুন পরিচয় মনে মনে চমক লাগাচ্ছিল, তখন-তখনি প্রতিফলিত হচ্ছিল চিঠিতে; কথা কওয়ার অভ্যাস আমাদের মজ্জাগত, কোথাও কৌতুক—কৌতূহলের একটু ধাক্কা পেলেই তাদের মুখ খুলে যায়। যে বকুনি জেগে উঠতে চায় তাকে টে'কসই পণ্যের প্যাকেটে সাহিত্যের বড়ো হাটে চালান করবার উদ্যোগ করলে তার স্বাদের বদল হয়। চারদিকের বিশ্বের সঙ্গে নানা কিছু নিয়ে হাওয়ায় আমাদের মোকবিলা চলছেই, লাউড স্পীকারে চড়িয়ে তাকে ব্রডকাস্ট করা হয় না। ভিড়ের আড়ালে চেনা লোকের মোকাবিলাতেই তার সহজরূপ রক্ষা হতে পারে।

ছিন্নপত্র আলোচনা প্রসঙ্গে আলোচ্য মন্তব্যটি বিশেষ ভাবে প্রণিধান-যোগ্য। ঠাকুর বাড়ির চৌহদ্দির বাইরে যে জগৎ আছে তার সঙ্গে বালক রবীন্দ্রনাথ এবং কিশোর রবীন্দ্রনাথের যোগ অল্প হলেও সম্পর্ক-হীন নয়। নিঃসীম দুপুরের ফেরীওলা, নির্জন ঘাটের নিরীহ স্নানার্থী, জটাবহুল বট গাছের নির্বাক কথোপকথন শুনেই তিনি দুপুর কাটাতেন; তারপর হঠাৎ প্রকৃতির প্রকোপে পড়ে এখান থেকে পেনেটিতে যাবার ছাড়পত্র পেয়েছিলেন। কিন্তু সেখানেও সম্পর্ক নিবিড় হয়নি। তাঁর অনেক দিনের সাধ অপূর্ণই থেকে গেছে। পরিণত বয়সে জীবনস্মৃতি (১৩১৯) তে তিনি নিজেও সেকথা স্বীকার করেছেন—"বাংলা দেশের পাড়া-গাঁটাকে ভালো করিয়া দেখিবার জন্য অনেক দিন হইতে মনে আমার ঔৎসুক্য ছিল। গ্রামের ঘরবস্তি চণ্ডীমণ্ডপ রাস্তাঘাট খেলাধূলা হাটমাঠ জীবনযাত্রার কল্পনা আমার হৃদয়কে অত্যন্ত টানিত। সেই পাড়াগাঁ এই গঙ্গাতীরের বাগানের ঠিক একেবারে পশ্চাতেই ছিল, কিন্তু সেখানে আমাদের যাওয়া নিষেধ। আমরা বাহিরে আসিয়াছি কিন্তু স্বাধীনতা পাই নাই। ছিলাম খাঁচায়, এখন বসিয়াছি দাঁড়ে—পায়ের শিকল কাটিল না এবং এর পরেও তিনি বিলাত গেছেন, পিতৃদেবের সঙ্গে হিমালয়ে অনেকদিন কাটিয়েছেন, কিন্তু তবুও তাঁর মন অতৃপ্ত থেকে গেছে। ঠিক এই সমস্ত কারণেই তিনি যখন কর্মের তাগিদে শিলাইদহে আসেন তখন এই বিস্তৃত পল্লী-প্রকৃতির কোলের কাছে এসে, এই অর্ধনগ্ন ম্যালেরিয়া-জর্জর দেশবাসীর সঙ্গে মেশেন, তখন তাঁর অন্তর যেন ভরে ওঠে অনেক পাওয়ার গভীরতায়। তাছাড়া ছিন্নপত্রের পত্রগুলি লেখা হয় বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। বাংলা দেশের তখন অনেক বিস্তৃতি। এই বিরাট মাতৃত্বের আস্বাদ নিয়ে তিনি তখন ঘুরে বেড়াচ্ছেন বোলপুর—বোয়ালিয়া—বালিয়া—চুহালি—কটক—তিরণ—সোলাপুর—সাজাদপুর—শিলাইদহ—পতিসর—কালিগ্রাম—কুষ্টিয়া—কোলকাতা থেকে বন্দোরা সমুদ্রতীর পর্যন্ত। বাংলার আশেপাশে এবং বহুদূর দিয়েও। এই বিরাটত্বের মধ্যে তাঁর মানস-চক্ষু যেন ভরে উঠেছে শৈশবের কাঙ্খিত কামনা বাসনায়। অখণ্ড অবসরের মধ্যে তিনি এ সমস্ত কামনা বাসনাগুলি ভোগ করেছেন অতলস্পর্শ তৃপ্তি নিয়ে। 'চতুর্দিকে অবসরের বেড়া দিয়ে, ঘিরে নিয়ে, তাকে বেশ অনেক খানি মিলিয়ে দিয়ে ছড়িয়ে দিয়ে, চতুর্দিকে বিছিয়ে দিয়ে তাকে ষোল আনা আয়ত্তে এনেছেন।

এই প্রভাব তিনি সযত্নে রেখে গেছেন তাঁর ছোট গল্পে—সর্বোপরি ছিন্নপত্রের পাতায় পাতায়। তিনি বুঝেছিলেন যে, যে কথা গল্পে লেখা যায় না, কবিতায় ছন্দোবদ্ধ করা যায় না তাকে চিঠিতে সার্থকরূপ দেওয়া যায়। তাই যা দেখেছেন, যা শুনেছেন—সব সেই মুহূর্ত্তেই রূপ দিয়েছেন চিঠিতে। তিনি নিজেও সেকথা স্বীকার করেছেন—"কারও কারও মন ফোটোগ্রাফের wet plate এর মতো, যে ছবিটা ওঠে সেটাকে ফুটিয়ে কাগজে না ছাপিয়ে নিলে নষ্ট হয়ে যায়। আমার মন সেই জাতের। যখন যে কোনো ছবি দেখি, অমনি মনে করি এটা চিঠিতে ভালো করে লিখতে হবে।" (৭১ সংখ্যক পত্র)

॥ দুই ॥

ছিন্নপত্রের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ভাষা এবং বিষয়বস্তুর সাধাসিধে রূপও বিশেষ ভাবে উল্লেখনীয়। আশপাশের চিঁথ-ছোঁড়া দূরত্বের পরিবেশ, কাছাকাছির মানুষ, গরুবাছুর রাখাল নদী-নৌকো নিয়ে যেন তিনি ভাষার বাহু খেলেছেন। সহসা অতিপনত্বের যে একটা অস্ফ আস্বাদ আছে তা তিনি বার বার অনুভব করেছেন এবং নিজের সমস্ত ভাবপ্রবণতা দিয়ে সেগুলি চিত্রিত করবার চেষ্টা করেছেন। এ প্রবণতাকে তিনি কাব্যে রূপ দিতে পারতেন, গল্পে শে পারতেনই। কিছু সাহিত্যিক অনুভূতি এবং ছন্দ অলংকারের দোহাই মানতে গিয়ে সত্যিকারের রসহানি হয় সে জন্যে চিঠিতে লিখেছেন এবং বেশীর ভাগই এক জনকে। মূল চিঠি থেকে প্রকাশের আগে যতটুকু বাদ দেওয়া হয়েছে সেটুকু থাকলে আমরা কি বলতে চাইতাম জানি না—কিন্তু এখন ছিন্নপত্রকে ডায়ারি পাঠানো বলতে কোনো সঙ্কোচ নেই। প্রতিটি দিন মুহূর্তকে ধরে রাখার এমন প্রাণপণ প্রয়াস সত্যিকারের কোনো চিত্রশিল্পী করতে পারতেন কিনা সন্দেহ। রবীন্দ্রনাথের এ অনায়াস-সাফল্য বর্ণনা তাঁর কবি এবং চিত্র শিল্পীর সমন্বিত রূপ।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য পড়ে তাঁকে ভাবপ্রবণ বা প্রকৃতির পূজারী বলতে যাঁরা বেশী রকমের উল্লাস প্রকাশ করেন, শুধু মাত্র ছিন্নপত্রের কয়েকটি পৃষ্ঠা পড়ে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের এই প্রকৃতি-প্রেমিক সত্তাটির কোনো বিশেষণের সন্ধান দিতে পারবেন না। শনিবারে সূর্য যে রবিবারে নতুন ভাবে উদয় হয়; বুধবারের সূর্যাস্ত যে শুক্রবারের সূর্যাস্ত থেকে প্রাকৃতিক দৃষ্টিতে আলাদা একথা তিনিই সাহস করে বলতে পেরেছেন। হাতী রঙের মেঘ এসে যখন আকাশে ঝড় জলের বার্তা ঘোষণা করেছে তিনি তখন চেষ্টা করেছেন তাঁর এই মুহূর্তের অনুভূতিটুকুর যথাযথ ভাষারূপ দিতে। প্রকৃতির নানা রূপ-রঙের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর লেখনীও ভাষা জুগিয়েছে। বাংলা সাহিত্যে এ ভাষার কোনো নমুনা নেই। ভাষা তো নয়, যেন নৃত্যপটিয়সী কোনো নর্তকীর চলার ছন্দ কথাবলার অনুরণন! একটু নমুনা দেই: "সেই পারস্য এবং আরব দেশ, দামাস্ক, সমর খন্দ, বুখারা আঙুরের গুচ্ছ, গোলাপের বন, বুলবুলের গান, শিরাজের মদ—মরুভূমির পথ, উটের সার, ঘোড় সওয়ার পথিক, ঘন খেজুরের ছায়ায় স্বচ্ছ জলের উৎস—নগরের মাঝে মাঝে চাঁদোয়া-খাটানো সংকীর্ণ বাজারের পথ, পথের প্রান্তে পাগড়ি এবং ঢিলে কাপড় পরা দোকানি খরমুজ এবং মেওয়া বিক্রি করছে—পথের ধারে বৃহৎ রাজ প্রাসাদ, ভিতরে ধূপের গন্ধ, জানলার কাছে বৃহৎ তাকিয়া এবং কিংখাব বিছানো জরির চটি, ফুল পায়জামা এবং রঙিন কাঁচুলি-পরা আমিনা জোবেদি সফি—পাশে পায়ের কাছে কুণ্ডলায়িত গুড় গুড়ির নল গড়াচ্ছে, দরজার কাছে জমকালো কাপড়-পরা কালো হাবষি পাহারা দিচ্ছে এবং এই রহস্যপূর্ণ অপরিচিত সুদূর দেশে, এই ঐশ্বর্যময় সৌন্দর্য-ময় ভয়ভীষণ বিচিত্র প্রাসাদে, মানুষের হাসিকান্না আশা-আকাঙ্খাকে নিয়ে কত শত সহস্র রকমের সম্ভব-অসম্ভব গল্প তৈরি হচ্ছে" (১১৯ সংখ্যক পত্র)।

বস্তুতঃ এ ভাষার তুলনা নেই। ছাড়ানো-বিছানো ঢিলে-ঢালা গদ্যে যে কতখানি ছন্দ আনা যায়—ছন্দকার রবীন্দ্রনাথ যেন তারই পরীক্ষা করেছেন। মনে হয় তিনি যেন ভাষা দিয়ে নানান সুতোর একটি কাপড় বুনেছেন আর সমস্ত অনুভূতির রং দিয়ে তার পাড় তৈরি করেছেন। এ শাড়ি উৎকট-শিরোনামা কোনো আপাতসুন্দরীর পরণীয় নয়; এ কাজল গাঁয়ের লাজ-নম্রা কল্যাণী বধুটির নিত্য বসন। তার রূপ এবং কোমলতার যোগ্য অংশীদার।

॥ তিন ॥

পাথর থেকে যারা হীরে সংগ্রহ করে তারা যেমন প্রথমে সঞ্চয় করে তারপর নির্বাচনে মন দেয়, রবীন্দ্রনাথও ঠিক তাই করেছেন। ছিন্ন-পত্রের মধ্যে যেন বাংলার অতি-সাধারণ চরিত্রগুলি জড়ো হয়েছিল আর পরবর্তী জীবনে তার থেকে তাঁর সূক্ষ্মবিচার বুদ্ধি এবং সাহিত্যের নমনীয়তা দিয়ে এক একটি চরিত্র গড়েছেন। রতন-ফটিক-মৃন্ময়ী এতদিন ছিন্নপত্রের কাদার তালে মিশেছিল, গল্পকার রবীন্দ্রনাথের হাতে এসে তাদের অস্তিত্বকে আলাদা করেছে। আমরা নতুনভাবে চিনেছি তাদের। বস্তুত ছিন্নপত্র সৃষ্টি না হলেও হয়তো গল্পগুচ্ছ সৃষ্টি হত, কিন্তু গল্পগুচ্ছের মধ্যে যে সময়ের ঠাস বুনুনি এবং সৃষ্টির যে শ্রেণীবদ্ধতা সেটাতে নিশ্চয়ই ফাঁক থাকত। মৃণ্ময়ী হিরণ্ময়ী না হলেও তার রক্ত মাংস মজ্জায় ভেতরের প্রাণ বস্তুটাকে আমরা এত সহজে শ্বাস-প্রবণ করে তুলতে পারতাম না নিশ্চয়ই।

হিসেব করলে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি এবং সাহিত্য জীবনে ছিন্নপত্রের একটা স্বতন্ত্র যুগ চিহ্নিত করা যায়। Thackeray র সেই পুরোনো I describe what I see কথার প্রতিধ্বনি তুলে তিনিও যে বলেছেন—"আমার যা মনে উদয় হয়েছে আমি তাই বলে খালাস—তার পরে সমুদ্র সমভাবে তরঙ্গিত হতে থাকুক, আর মানুষ হাঁসফাঁস করে ঘুরে ঘুরে বেড়াক" (৭৭ সংখ্যক পত্র), এটি অত্যন্ত সত্যি কথা।

ছিন্নপত্র কাব্য নয়, ছিন্নপত্র উপন্যাস নয়, এমন কি ছিন্নপত্র ডায়ারিও নয়; ছিন্নপত্র স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের দিগ্-নির্দেশিকা। মানুষ-গাড়ি-যন্ত্র-জীব-জন্তু এবং নদী নালী-পাখি-পাখালি নিয়ে যে বাস্তব জগৎ তা থেকে সাহিত্য জগত যে কত দূরে; সাধারণ দু চক্ষু থেকে সাহিত্যের তৃতীয় নয়ন যে কত ওপরে—ছিন্নপত্র কবি রবীন্দ্রনাথকে তাই দেখিয়েছে; কলাকুশলী রবীন্দ্রনাথকে তাই শিখিয়েছে। তাই কবি রবীন্দ্রনাথ, গল্পকার রবীন্দ্রনাথ যদি সত্যিকারের পথিক হন—ছিন্নপত্রের রবীন্দ্রনাথ তাহলে তারই পথদ্রষ্টা।

কবিগুরুর খেয়া

শ্রীসমীরণ চক্রবর্ত্তী

গিরি-নির্ঝরিণী পাষাণ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া, কখনো দলিয়া, মথিয়া ধারা-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়া চলে। চৈতালি, কল্পনা, ক্ষণিকা ও নৈবেদ্যে আমরা লক্ষ্যকরিয়াছি রবীন্দ্রচিন্তার ধারা-বৈচিত্র্য। দেখিয়াছি, জীবনা-নুভূতির অপূর্ব্ব রসতরংগলীলা। চৈতালি হইতেই কবি মনে একটা ভাব উঁকি দিয়াছে যে, এই জগৎ ও জীবনের রূপ-রস-শব্দ স্পর্শ ভোগের সীমানা পার হইয়া একটি বৃহত্তর জীবন লোক আছে যেখানে মানবজীবন আপনাকে সার্থক করিয়া চিনিতে পারে। এই চিন্তা তরংগ কবির বিভিন্ন কাব্য-নদীর ঘাটে ঘাটে লাগিয়াছে—কোথাও আঘাত সশব্দ, কোথাও ধ্বনিহীন। "খেয়া" কাব্যগ্রন্থে দেখি সেই লীলানুভূতির এক অনাস্বাদিতপূর্ব্ব তরংগোচ্ছাস। প্রাচীন ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার পথেই যে ভারতের মুক্তি তাহার ইংগিত নৈবেদ্যে। আর নৈবেদ্যের ঈশ্বরানুভূতি যে ভয়-বিস্ময় মিশ্রিত তাহা খেয়াতে নবরূপ লাভ করিয়াছে —এখানে সেই অনন্ত, লীলাময় হইয়াছেন লীলা-বৈচিত্রের মধ্যে হারা-ইয়া গিয়াছেন, ঐশ্বর্য্যময়। রাজা, দাতা, প্রিয়, পথিক, ঝড় প্রভৃতিরূপে তাঁহার আত্মপ্রকাশ।

বিচিত্র রসানুভূতির মধ্যদিয়া যে অনন্তের আস্বাদন তাহাই "মিষ্টি"ক কবিতার মর্ম্মবাণী। যাহা অসীম, অনন্ত, যাহা অরূপ তাঁহাকে বুঝিবার জন্য সংকেত বা প্রতীকের প্রয়োজন। Symbolism is the language of the mystic. তাই খেয়াতে কবি সংকেতের আশ্রয় লইয়াছেন, সেই বিরাট বিভু বস্তুকে দেখিবার জন্য এবং দেখাইবার জন্য। খেয়ার 'সমুদ্র', 'বিদায়', 'ঘাটের পথে' প্রভৃতি কবিতায় মধ্যে লক্ষ্য করা যায় যে কবি সেই অনন্তের উপলব্ধির জন্য কত আকাঙ্খিত, কত উৎকণ্ঠিত! অসীমের স্পর্শে কবিচিত্ত বিগলিত হইয়াছে 'জাগরণ', 'প্রভাত' প্রভৃতি কবিতার স্তবকে স্তবকে। 'দান' 'ত্যাগ' প্রভৃতি কবিতায় কবি ভগবানকে দেখিয়াছেন ভীষণ মূর্ত্তিতে, রুদ্রের ভয়ালরূপে। রুদ্রমূর্ত্তিতে সেই বিরাটের রূপদর্শনের অপূর্ব্ব ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাঁহার 'আগমন' কবিতায়। 'আগমন' সম্বন্ধে কবি নিজেই বলিয়াছেন—"খেয়াতে আগমন ব'লে যে কবিতা আছে সে কবিতায় যে মহারাজ এলেন তিনি কে? তিনি যে অশান্তি! সবাই রাত্রে দুয়ার বন্ধ করে শান্তিতে ঘুমিয়েছিল, কেউ মনে করেনি তিনি আসবেন। যদিও থেকে থেকে দ্বারে আঘাত লেগেছিল, যদিও মেঘগর্জ্জনের মতো ক্ষণে ক্ষণে তাঁর রথচক্রের ঘর্ঘর ধ্বনি স্বপ্নের মধ্যেও শোনা গিয়েছিল, তবু কেউ বিশ্বাস করতে চাচ্ছিল না যে তিনি আসছেন—পাছে তাদের আরামে ব্যাঘাত ঘটে! কিন্তু দ্বার ভেঙে গেল, এলেন রাজা।"
এই ভাবে—

'ঝড়ের সাথে হঠাৎ এল,
দুঃখ-রাতের রাজা'।

খেয়ার প্রথম কবিতা 'শেষ-খেয়া'। ভোগময় কর্মময় জীবনে তটভূমি হইতে অধ্যাত্ম জীবনের পারে পৌছিবার জন্য কবি গাহিয়াছেন—

আমায় নিয়ে যাবি কেরে
বেলা-শেষের শেষ-খেয়ায়।

জীবনের বৈষয়িকতার ধূলিজালে কবিমন আচ্ছন্ন। তাই আনন্দ ও চির-শান্তির লোকে তাহার যাত্রা। সেই জন্যই 'ঘাটের পথ' কবিতায় কবি দিনের কাজ শেষ করিয়া কিসের আশায় যেন বসিয়া আছেন!

এই আনাগোনা কিসের লাগি যে
কী কব, কী আছে ভাষা!

দিন-শেষে রাত্রির তামস তমিস্রা আঁধার-লোক সৃষ্টি করে। জীবমন ভরিয়া ওঠে কান্নায় দুঃখে। কবি-জীবন যখন দুঃখের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে তখনও কিন্তু তিনি নির্ভীক, শান্তভাবে সেই দুঃখের দেবতাকে 'দুঃখমূর্তি' কবিতায় রূপ দিয়াছেন—

দুখের বেশে এসেছ ব'লে
তোমারে নাহি ডরিব হে,
যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা
নিবিড় ক'রে ধরিব হে।

কবি আপনার জীবন-পথে সাথী পাইয়াছেন অনেক—অনেক ভক্ত—অনেক পরিচিত-জন। তাহাদের সহিত একান্তভাবে মিলিত হইয়া জীবনের উত্তাপ উত্তেজনা ভোগ করিয়াছেন অনেক। কিন্তু আর নয়। কবি 'বিদায়' কবিতায় তাঁহার আপনজন হইতে বিদায় লইয়া চলিয়াছেন অধ্যাত্মচিন্তালোকে—

বেড়াই ঘুরে অকারণের ঘোরে
তোমরা সবে বিদায় দেহো মোরে।

কবি এইবার 'প্রতীক্ষা' করিয়া আছেন সেই অনন্তের আগমনের জন্য, সেই শুভমিলন-মুহূর্ত্তটির জন্য—

বসে আছি শয়নপাতি ভূমে,
তোমার এবার সময় হবে কবে।

কবি যাঁহার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন তিনি যে কৃপাময়। মহা আড়ম্বরে ভগবৎ সাধনে তাহাকে পাওয়া যায়না। শ্রুতি যথার্থই বলিয়াছেন—'আমি যাহাকে বরণ করি, কেবল মাত্র সেই আমাকে পায়।' অতি সহজে, অপ্রত্যাশিত ভাবে তাহার কৃপা প্রকাশিত হয়। 'ফুল—ফুটানো, কবিতায় কবি এই সিদ্ধান্তেই পৌছিয়াছেন যে অধ্যাত্ম জীবন বোধের জন্য

প্রথম এবং প্রধান প্রয়োজন কৃপার 'ন মেধয়া, ন বহুনা শ্রুতেন'। বৈষ্ণবসাধক এবং ভগবান যীশুর অনুরক্তগণ এই কৃপার কথাই আপন আপন মন্ত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। কবির 'ফুল ফুটানো' কবিতায় এই কৃপারই ইংগিত আছে—

যতই বলিস্ যতই করিস্, যতই ওরে তুলে ধরিস্,
ব্যগ্র হয়ে রজনী দিন,
আঘাত করিস্ বোঁটাতে,
তোরা কেউ পারবি নে গো
পারবিনে ফুল ফোটাতে।

কৃপাই যাঁহাকে পাইবার একমাত্র পথ সেই ভগবানকেও কিছু দান করিতে হয়। সেই দান প্রেম-ভক্তি। রাজরাজেশ্বরও প্রার্থীরূপে আমাদের কাছে আসেন।......রাজা স্বর্ণরথ হইতে নামিয়া নিঃস্ব ভিখারীর কাছে চাহিলেন ভিক্ষা। ভিক্ষুক কম্পিত হস্তে দিলেন এক কণা চাল। দিনের শেষে কুটিরে আসিয়া দেখিলেন ভিক্ষালব্ধ সামগ্রীর মাঝে এক কণা স্বর্ণ। তাই কবি 'কৃপণ' কবিতায় আক্ষেপ করিয়াছেন—

দিলেম যা রাজভিখারীরে
স্বর্ণ হয়ে এল ফিরে,
তখন কাঁদি চোখের জলে,
দুটি নয়ন ভরে,
তোমায় কেন দিইনি আমার
সকল শূন্য করে।

এই ভাবে কবি 'খেয়া'তে জীবনের জটিলতা, আড়ম্বরপূর্ণতা, উচ্ছলতা পরিত্যাগ করিয়া অনাড়ম্বর, আনন্দময়, সংসার কোলাহল-শূন্য অধ্যাত্মলোকে—'সবপেয়েছির দেশের অধিবাসী হইতে চাইতেছেন—

'নাইক পথে ঠেলাঠেলি, নাইক ঘাটে গোল,
ওরে কবি এইখানে তোর কুটির খানি তোল।'

জীবনের কান্না হাসিতে, আমাদেরই চারি পাশের নিসর্গ প্রকৃতিতে আমরা সেই অনন্তেরই তো ছবি দেখি—স্পর্শ পাই। খেয়ার এই অধ্যাত্মভাবের সঙ্গে ঋষি অরবিন্দের 'who' কবিতার মর্মবাণীর মিল দেখিতে পাই—

"All music is only the sound of this laughter. All beauty the smile of his passionate bliss, Our lives over His heart beats."

স্মরণের কবি রবীন্দ্রনাথ

সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

প্রায় আটান্ন বছর আগের কথা। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন বিয়াল্লিশ। সেদিন ছিল ৭ই অগ্রহায়ণ ১৩০৯ সাল—বিশ্বকবির জীবনে এক বিষাদময় দিন। রবীন্দ্রনাথের কর্ম্মসঙ্গিনী ধর্ম্মসঙ্গিনী প্রিয়তমা মৃণালিনী দেবী ইহলোক ত্যাগ করলেন। বেদনাপ্লুত-বিরহের বাষ্পে ঢাকা শোকাকুল হৃদয় সে সময় সান্ত্বনা পেয়েছিল এইভাব গম্ভীর, বিষাদ-করুণ কবিতা সম্ভার রচনায় ও প্রকাশে। পৃথিবীর খেলাঘরে যে মহীয়সী রমণী রবীন্দ্রনাথের হৃদয় জয় করেছিলেন তাঁর সহসা অকালে বিদায় কবিপ্রাণে এক তুমুল তরঙ্গ তুলেছিল, এক বিষাদময় শূন্যতার সৃষ্টি করেছিল। বেদনায় ব্যথিত হৃদয় কাতর হ'য়ে উঠেছিল প্রেয়সীর আকস্মিক তিরোধানে। তাঁরই স্মৃতির উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ রচনা করলেন তাঁর কতগুলি 'স্মরণ' কবিতা পুস্তক।

জোড়াসাঁকোর বিরাট বাড়ীতে বহু আত্মীয়কুটুম্ব সমন্বিত ঠাকুর-পরিবারে মৃত্যু-ঘটনা স্বাভাবিক ও অদূর ব্যবধানের। বয়স্ক ও পিতৃমাতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের এই ধরাধাম থেকে একে একে বিদায় নিতেই হ'বে—এই স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু বয়ঃকনিষ্ঠ, স্নেহভাজন ও প্রেমাস্পদেরা যখন অপ্রাপ্ত বয়সে বিদায় নেয় তখন বেদনায় আপ্লুত হ'য়ে ওঠে মন, ব্যথায় কাতর হয়ে ওঠে হৃদয়। পৃথিবীর নশ্বরতা জাগে অন্তরে,-সংসারের মায়ার বন্ধন হয়-শিথিল, মন হয় উদাসীন বৈরাগ্য আসে জীবনে। জীবন-স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ 'মৃত্যু শোক' অধ্যায় সংসারে প্রিয়জনের বিয়োগ-কাহিনী সামান্য লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রথমে স্নেহশীলা মাতার মৃত্যু ও পরে তাঁর বাড়ীর ছোট বৌঠান কাদম্বিনী ওরফে কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যা তরুণ মনে এক অদ্ভুত ও অবিস্মরণীয় রেখাপাত করেছিল।

রবীন্দ্রনাথের স্নেহময়ী জননী যখন সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করলেন তখন কবির বয়স মোটে চোদ্দ। শিশুদের যত্নের ভার তখনকার ছোট বৌঠান জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহধর্ম্মিনী কর্ম্মিষ্ঠা ষোড়শী কাদম্বরীর উপর পড়ল। সেদিনের লোকের বোধ ও অনুভূতি পরবর্ত্তীকালে কবি তার জীবন-স্মৃতি'তে লিখে রেখে গেছেন।

"সে দিন প্রভাতের আলোতে মৃত্যুর যে-রূপ দেখিলাম্ তাহা সুখ-সুপ্তির মতোই প্রশান্ত ও মনোহর। জীবন হইতে জীবনান্তের বিচ্ছেদ
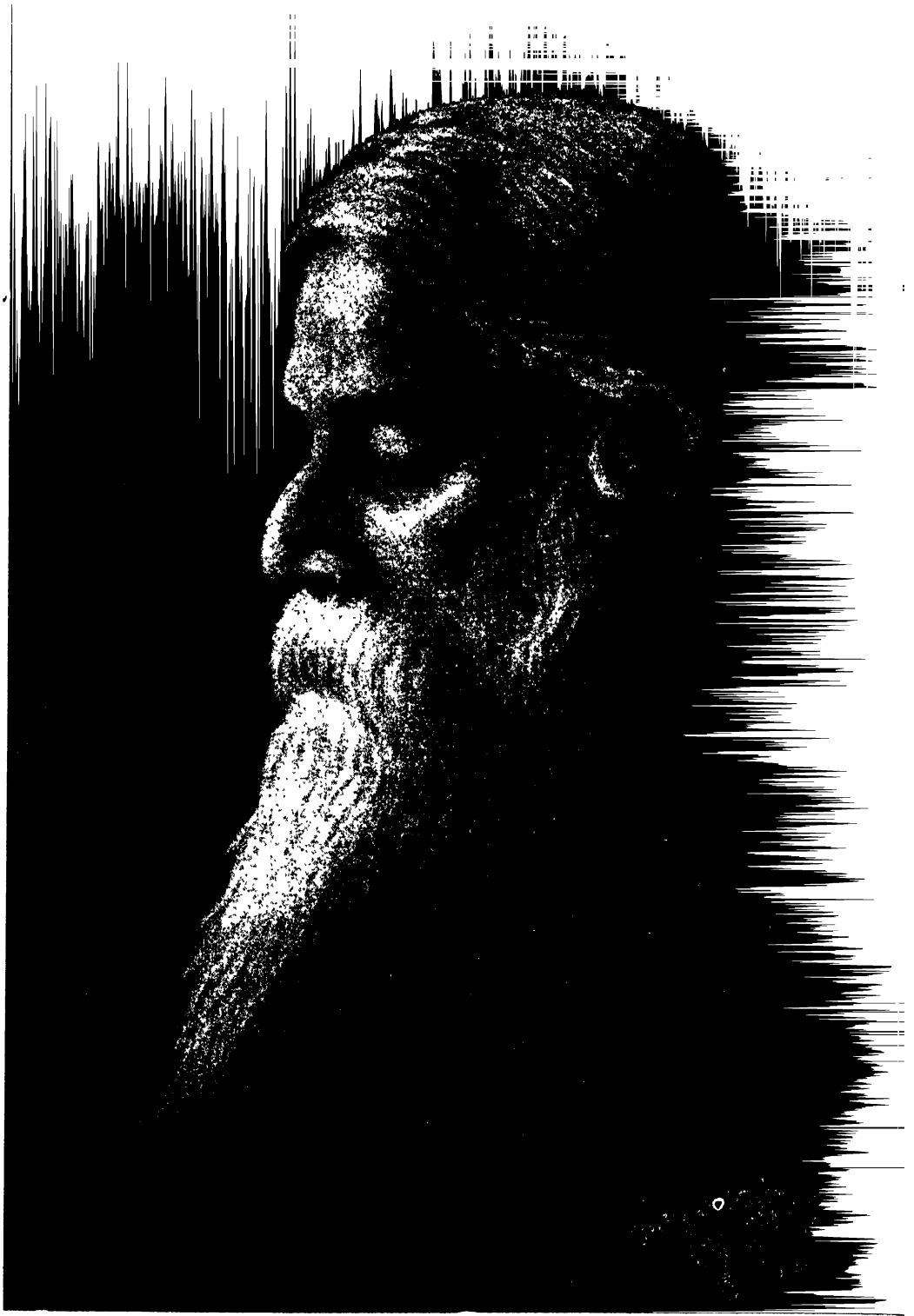
"এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত

হুঁকার তৃপ্তি

ফটো : বংশী দালাল

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

স্পষ্ট করিয়া চোখে পড়িল না। কেবল যখন তাঁহার দেহ বহন করিয়া বাড়ির সদর দরজার বাহিরে লইয়া গেল, আমরা পশ্চাৎ পশ্চাৎ শ্মশানে চলিলাম—তখনই শোকের সমস্ত ঝড় যেন একেবারে একদমকায় আসিয়া মনের ভিতরটাতে এই একটা হাহাকার তুলিয়া দিল যে, এই বাড়ির দরজা দিয়া মা আর একদিনও তাঁহার নিজের এই চিরজীবনের ঘরকরণার মধ্যে আপনার আসনটিতে আসিয়া বসিবেন না।……" কিন্তু আশ্চর্য্য ! মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্ত্রীবিয়োগে যাননি শ্মশানে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায়। শুদ্ধ উপাসনায় বসে আছেন এক অচিন্ত্যের ধ্যানে উপনিষদের ঋষিকল্প পুরুষপ্রবর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

তার পরের মৃত্যু ঘটনা হ'ল কাদম্বরী দেবীর (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী) মৃত্যু। এই মৃত্যুর চিরবিচ্ছেদ-বেদনা এত মর্ম্মান্তিক ও হৃদয়বিদারী ছিল তা বিশ্বকবির আপন ভাষায় এবম্বিধ।

"কিন্তু আমার চব্বিশ বছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গে যে পরিচয় হইল তাহা স্থায়ী পরিচয়। তাহা তাহার পরবর্ত্তী প্রত্যেক বিচ্ছেদশোকের সঙ্গে মিলিয়া অশ্রুর মালা দীর্ঘ করিয়া গাঁথিয়া চলিয়াছে। শিশুবয়সের লঘু জীবন বড়ো বড়ো মৃত্যুকেও অনায়াসেই পাশ কাটাইয়া যায়—কিন্তু অধিক বয়সে মৃত্যুকে অত সহজে ফাঁকি দিয়া এড়াইয়া চলিবার পথ নাই। তাই সেদিনকার সমস্ত দুঃসহ আঘাত বুক পাতিয়া লইতে হইয়াছিল। * * * * *

"চারিদিকে গাছপালা মাটিজল চন্দ্রসূর্য্য গ্রহতারা তেমনি নিশ্চিত সত্য ছিল—এমন কি, দেহ-প্রাণ হৃদয়মনের সহস্রবিধ স্পর্শের দ্বারা যাহাকে আমাদের সকলের চেয়ে বেশী সত্য করিয়াই অনুভব করিতাম সেই নিকটের মানুষ যখন এত সহজে একনিমিষে স্বপ্নের মত মিলাইয়া গেল—তখন সমস্ত জগতের দিকে চাহিয়া মনে হইতে লাগিল, এ কী অদ্ভুত আত্মখণ্ডন ! যাহা আছে এবং যাহা রহিল না, এই উভয়ের মধ্যে কোন মতে মিল করিব কেমন করিয়া !"

শ্রীমতী কাদম্বরীর মৃত্যুর পরবর্ত্তী কবিতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে, বিশেষ ক'রে যে কবিতায় অতীন্দ্রিয়তা প্রকাশ পেয়েছে তা'তেই সেই অনন্যসাধারণ মহীয়সী মহিলার লোকান্তরিতা মূর্ত্তি সম্ভবতঃ মানসসুন্দরী, লীলাসঙ্গিনী, ছায়াসঙ্গিনী প্রভৃতি রূপে ছায়াপাত করেছিল কবির অন্তরে।

৺জ্যোতিরিন্দ্র-গৃহিণী কাদম্বরী দেবীর অকাল মৃত্যু—৮ই বৈশাখ ১২৯১ সাল, ইংরাজি ১৯শে এপ্রিল ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ। রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ 'ছবি ও গান' প্রকাশিত হয়েছে ১২৯০ সালে এবং 'কড়ি ও কোমল' ১২৯৩ সালে। 'মানসী' প্রকাশিত হয় ১২৯৪ সালে। 'কড়ি ও কোমলে' 'স্মৃতি' শীর্ষক কবিতায় কবি ছন্দোবদ্ধ করলেন।

"সেই হাসি সেই অশ্রু সেই সব কথা
মধুর মূরতি ধরি' দেখা দিল তা'
তোমার মুখেতে চেয়ে চাই নিশিদিন
জীবন সুদূরে যেন হয়েছে বিলীন।

'ক সে মূরতি ধরিয়া দেখা দিল ?

কড়ি ও কোমলের কবিতাগুলির রচনা কালের স্থান, বার ও তারিখের নির্দ্দেশ নাই। তবু মনে হয় কাদম্বরী দেবীর বিরহ কবি-হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করেছিল। 'মানসীতে তাঁর 'সুরদাসের প্রার্থনায় 'মানবী-আকারে' কে সে দেবী—যাঁর কাছে লজ্জাকাহিনী বলতে লজ্জা নাই—

"পবিত্র তুমি, নির্ম্মল তুমি, তুমি দেবী, তুমি সতী,
কুৎসিৎ দীন, অধম পামর, পঙ্কিল আমি অতি।
তুমিই লক্ষ্মী, তুমিই শক্তি,
হৃদয়ে আমার পাঠাও ভক্তি,
পাপের তিমিরে পুড়ে যায় জলে কোথা সে পুণ্যজ্যোতি ॥"
কে সে পবিত্র সতী ? কে সেই দেবী ?
"তবে তাই হ'ক হয়োনা বিমুখ দেবী তাহে কিবা ক্ষতি,
হৃদয় আকাশে থাক না জাগিয়া দেহ হীন তব জ্যোতি।"

'কড়ি ও কোমলে'র কবির মন্তব্যে কবির নিজের ভাষায় এই কথাই প্রকাশিত হয়েছে—

'কড়ি ও কোমলে যৌবনের রসোচ্ছ্বাসের সঙ্গে আর একটা প্রবল প্রবর্তনা প্রথম আমার কাব্যকে অধিকার করেছে, সে জীবনের পথে মৃত্যুর আবির্ভাব। যাঁরা আমার কাব্য মন দিয়ে পড়েছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন এই মৃত্যুর নিবিড় উপলব্ধি আমার কাব্যের এমন একটি বিশেষ ধারা, নানা বাণীতে যার প্রকাশ। 'কড়ি ও কোমলে' তার প্রথম উদ্ভব।"

ব্যক্তিগত কবিজীবনে শোকের কাহিনীর মূল্যও লৌকিকভাবে প্রথম পদক্ষেপ হয়, তাঁর স্ত্রী বিয়োগে। তারপর পরবর্ত্তী জীবনে পুত্র-বিয়োগ, কন্যাবিয়োগ, জামাতা-বিয়োগ আর আত্মীয় বন্ধু প্রিয়জন বিয়োগ প্রভৃতি সংসারের নানা শোকাবহ ঘটনা কবিমনের শান্তি ও স্থৈর্য্যকে ক্ষণে ক্ষণে বিচলিত করেছিল সত্য, কিন্তু কোনদিন বৈক্লব্য আনেনি তাঁর চিন্তা ও ভাবধারার স্বচ্ছতায় ও সাবলীলতায়।

এক-গুচ্ছে বাঁধা প্রকৃত 'স্মরণ' কবিতার সূত্রপাত হয় তাঁর 'স্মরণে' পূর্ব্ববর্ত্তী রচনায় ও স্মৃতির সামান্য মন্থন আছে তাও নিবিড় নয়। সহধর্ম্মিণীর স্মৃতির উদ্দেশে রচিত কবিতাগুলি ১৩১০ সালে মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত কাব্য গ্রন্থাবলীতে প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই কবিতাগুলি একত্র করিয়া 'স্মরণ' শীর্ষক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। মৃত্যুর সঙ্গে পরিচয়ের এক উদগ্র স্মৃতি হৃদয়ে জাগরূক। অনুভব করেছেন কবি ওর আগে জীবন দেবতাকে,' মানসসুন্দরীকে,, তাঁদেরই সব লীলা যেন স্বীয় জীবনের রঙ্গমঞ্চে অনুভব করতে লাগলেন বিশ্বকবি।

স্মরণের সাতাশটী কবিতায় প্রিয় বিয়োগের এক মূর্ত্তিমতী আলেখ্য শিশিরসিক্ত শুভ্র যূথিকার মত বিকশিত হ'য়ে ওঠেছে। প্রথম আঘাত যে দিল, সে আজ নাই।

'প্রেম এসেছিল চলে গেল সে যে খুলি দ্বার
আর কভু আসিবে না।

বাকি আছে শুধু আরেক অতিথি আসিবার
তারি সাথে শেষ চেনা।
সে আসি প্রদীপ নিবাইয়া নিবাইয়া দিবে একদিন
তুলি লবে মোরে রথে।
নিয়ে যাবে মোরে গৃহ হ'তে কোন গৃহহীন
গ্রহ তারকার পথে।"

সেই অমৃত মৃত্যুর পথচেয়ে বসে আছেন বিশ্বকবি। স্বপ্নে মৃত। প্রেয়সীকে দেখছেন,—

"মৃত্যুর নেপথ্য হ'তে আরবার এলে তুমি ফিরে
নুতন বধূর সাজে হৃদয়ের বিবাহ মন্দিরে
নিঃশব্দ চরণপাতে। ক্লান্ত জীবনের যত গ্লানি
ঘুচেছে মরণ-স্নানে। অপরূপ নবরূপখানি
লভিয়াছ এবিশ্বের লক্ষ্মীর অক্ষয় কৃপা হ'তে

তাই তিনি তাঁর আর এক কবিতায় মৃত্যুর মাধুরী বাণী প্রকাশে প্রয়াস পেয়েছেন, গভীর অনুভূতির বিশ্লেষণে ও উদাত্ত ভাবের আবেগে।—

"তুমি মোর জীবনের মাঝে
মিশায়েছ মৃত্যুর মাধুরী
চির বিদারের আভাদিয়া
রাঙায়ে গিয়েছ মোর হিয়া
এঁকে গেছ সব ভাবনার
সূর্য্যাস্তের বরণ চাতুরী।"

* * * *

তুমি ওগো কল্যাণ-রূপিণী,
মরণেরে করেছ মঙ্গল।
জীবনের পরপার হ'তে
প্রতিক্ষণ মর্ত্যের আলোতে
পাঠাইছ তব চিত্তখানি
মৌন প্রেমে সজল কোমল।"

জীবনের পরিশেষে মৃত্যুর সত্তার গভীর অনুভূতিতে পরলোকগতা প্রিয়তমার উদ্দেশ্যে বলেছেন

"তুমি মোর জীবন-মরণ
বাঁধিয়াছ দুটী বাহুদিয়া।"

স্মৃতির উপাসনা, অপ্রত্যক্ষের আরাধনা বিরহেই সূচিত হয়। তাই অতীত স্মৃতি অন্তর আকাশে প্রতিভাত হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ বললেন—

"হে লক্ষ্মী, তোমার আজি নাই অন্তঃপুর।
সরস্বতী রূপ আজি ধরেছ মধুর
দাঁড়ায়েছ সংগীতের শতদল দলে
মানসসরসী আজি তব পদতলে
নিখিলের প্রতিবিম্বে রচিছে তোমার।"

মৃণালিনী দেবী ছিলেন শান্তিনিকেতন স্থাপনায় কবির এক নিরলস কর্ম্মসঙ্গিনী। আপনার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বঞ্চিত ক'রে ছাত্রদের জন্য প্রাচীন আশ্রমের গুরুগৃহে গুরুপত্নীর মত আহার্য্য প্রস্তুত ও সাংসারিক খুঁটিনাটীর প্রতি তাঁর সতত জাগ্রত দৃষ্টি বিদ্যমান ছিল। প্রথমযুগে শান্তিনিকেতন' পরিচালনার ব্যয়নির্ব্বাহে স্বীয় অঙ্গের স্বর্ণাভরণ পর্য্যন্তদান করিতে কোনদিন তিনি কুণ্ঠিতা হননি। কর্ম্মব্যস্ততার মাঝে স্বামী স্ত্রী মিলনেরও। প্রচুর অবকাশ ছিল না। সেই প্রাচীন দিনের কথা স্মরণে হয়তো কবির মনে হয়েছিল যেন অতি কর্ম্মব্যস্ততায় সহধর্ম্মিণীর সকল মনের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা হয় নি, স্ত্রীর প্রতি যথার্থ কর্ত্তব্যপালন করা হয়তো হয়নি বর্ত্তমানের মাপকাঠিতে

"তোমার সকল কথা বল নাই, পারনি বলিতে,
আপনারে খর্ব্ব করি রেখেছিলে. তুমি হে লজ্জিতে,
যতদিন ছিলে হেথা। ... ...
... ...
আপনার অধিকার নীরবে নির্ম্মম নিজ করে
রেখেছিলে সংসারের সবার পশ্চাতে হেলা ভরে।

প্রেমের চরম পরীক্ষা বিরহে-বিচ্ছেদাহত প্রেমের পরম প্রকাশ সর্ব্বব্যাপিনী প্রীতিতে। পৃথিবীর নৈশ নিস্তব্ধতায় মন যখন প্রিয় চিন্তায় মগ্ন, তখন ধরনীর গাম্ভীর্য্য ও আত্মার গাম্ভীর্য্য পৃথক সত্তার ঊর্দ্ধলোকে একীভূত হয়। প্রীতিরসে হৃদয় সুসিক্তিত হ'য়ে এক অননুভূতপূর্ব্ব শান্তি-ধামে নীত হয়। ব্যষ্টির মধ্যে যার বিকাশ, সে রূপ পায় সমষ্টিতে, নিখিলের চিত্তে, জনগণের হৃদয়ে—"এসেছে একান্ত কাছে ছাড়ি দেশকাল

হৃদয়ে মিশায়ে গেছ ভাঙ্গি অন্তরাল।
তোমারি নয়নে আজি হেরিতেছি সব,
তোমারি বেদনা বিশ্বে করি অনুভব

স্মৃতির কাহিনী বিরহের বেদনায় বিবিক্তিত হ'য়ে ওঠে মনের আকাশে। তাই স্মরণে আসে অতীত দিনের বিস্মৃত অথচ অগোচরে সঞ্চিত কাহিনী অতি সুস্পষ্টরূপে।

"এ সংসারে একদিন নববধূ বেশে
তুমি যে আমার পাশে দাঁড়াইলে এসে
রাখিলে আমার হাতে কম্পমান হাত
সেকি অদৃষ্টের খেলা, সে কি অকস্মাৎ?"

প্রিয়ার পুরাতন প্রত্নাবলী প্রেয়সীর নিজস্ব মঞ্জুষা হতে একদিন আবিষ্কৃত হ'তে কবি লিখলেন—

"দেখিলাম খানকয় পুরাতন চিঠি
স্নেহমুগ্ধ জীবনের চিহ্ন দুচারটি
স্মৃতির খেলনাকটি বহু যত্ন ভরে
গোপনে সঞ্চয় করি রেখেছিলে ঘরে।"

প্রেমের দান সত্যই সঞ্চয়ের বস্তু। তার প্রকৃত মূল্য নিরূপিত হয় সংগ্রাহকের মমতাবোধ ও প্রেমপ্রীতির মাধুর্য্যে। এরা হ'ল স্মৃতির প্রিয় ক্রীড়নক।

যৌবনের রঙিণ চশমা চোখে প'রে আপন হাতে লেখা প্রেমপত্রগুলি পুনরায় পড়ার সুযোগ হ'লে মনে স্মৃতির রোমন্থন সুরু হয় এবং নিজের হারিয়ে-যাওয়া পুরাতন-আমিকে পুনরায় উপলব্ধি করা যায়। আজকের আমি ও অতীতের আমি এই দুই পৃথক সত্তায় নিজেকে বিচার ও বিশ্লেষণ করা যায় সুদীর্ঘ সময়ের অক্ষরেখায়।

'স্মরণের' সাতাশটি কবিতার মধ্যে চতুর্দ্দশপদী কবিতা বা সনেট উনিশটী—কোথাও চতুর্দ্দশ অক্ষরে একটি পদ, কোথাও আবার আঠারটি অক্ষরে পদ। বাকী ক'টী কবিতার মধ্যে কয়েকটি সঙ্গীত ও কয়েকটি ছোট কবিতা পর্য্যায়ে বা লিরিক শ্রেণীর।

স্ত্রীবিয়োগ স্মরণে রচিত 'স্মরণ' কাব্য ছাড়াও তিনি মাঝে মাঝে সমসাময়িক বঙ্গবিখ্যাত পুরুষপুঙ্গবদের প্রয়াণে রচনা করেছিলেন তাঁর অতিপ্রসিদ্ধ স্মরণ কবিতা, কখন বা স্মরণ দোঁহা বা স্মরণ-কণিকা।

অতিপ্রসিদ্ধ স্মরণ-কবিতার মধ্যে অতি স্মরণীয় রচনা, দেশবন্ধুর মহাপ্রয়াণে যেটি রচিত হয়।

'এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।'

এ এক অবিস্মরণীয় ভাবসম্ভারে ভরপুর অলোকসামান্য পুরুষের জীবনের অমর বাণী।

অপরাজেয় কথাশিল্পী উপন্যাসসম্রাট শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে তিনি লিখলেন এক স্মরণ চতুষ্টক।

"যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে
দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি'
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে ধরি'"।

তাঁর ভ্রাতুস্পুত্রী শোভনাদেবী সরস্বতীর তিরোভাবে যে স্মরণিকা রচনা করেছিলেন আজও তা' শিবপুর মহাশ্মশানের শিলাফলকে লিপিবদ্ধ আছে।

"শোভনা,
অস্তরবি কিরণে তব জীবন শতদল
মুদিল তার আঁখি।
মরমে যাহা ব্যপ্ত ছিল স্নিগ্ধ পরিমল
মরণে নিল ঢাকি।
লয়ে গেল সে বিদায়কালে মোদের আঁখিজল
মাধুরী-সুধা সাথে
নূতন লোকে শোভনারূপ জাগিবে উজ্জ্বল
বিমল নবপ্রাতে।"

১৩২৯ সালে ছন্দের যাদুকর কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অকাল মৃত্যুতে কলিকাতায় যে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয় রবীন্দ্রনাথ সেখানে 'সত্যেন্দ্রনাথ স্মরণে' কবিতাটি পাঠ করেন। তিনি প্রিয়ভক্তের শোকে এত মূহ্যমান হয়েছিলেন যে তাঁকে বারবার অশ্রুসংবরণ করতে হয়েছিল। 'পূরবী'তে প্রকাশিত 'সত্যেন্দ্রনাথ' শীর্ষক কবিতাটি স্মরণের এক দীর্ঘ মৃতের বহুগুণাবলী উদ্ভাসিত কবিতা।

কিন্তু যারা পেয়েছিল প্রত্যক্ষ তোমায়
অনুক্ষণ, তারা যা হারালো তার সন্ধান কোথায়,
কোথায় সান্ত্বনা? বন্ধু মিলনের দিনে বারম্বার
উৎসবরসের পাত্র পূর্ণ তুমি করেছ আমার
প্রাণে তব, গানে তব, প্রেমে তব, সৌজন্যে, শ্রদ্ধায়,
আনন্দের দানে ও গ্রহণে। সখা, আজ হতে হায়
জানি মনে, ক্ষণে ক্ষণে চমকি উঠিবে মোর হিয়া
তুমি আস নাই বলে, অকস্মাৎ রহিয়া রহিয়া
করুণ স্মৃতির ছায়া ম্লান করি দিবে সভাতলে
আলাপ আলোক হাস্য প্রচ্ছন্ন গম্ভীর অশ্রুজলে॥

* *

ধরণীতে প্রাণের খেলায়
সংসারের যাত্রা পথে এসেছি তোমার বহু আগে,
সুখে দুঃখে চলেছি আপন-মনে; তুমি অনুরাগে
এসেছিলে আমার পশ্চাতে, বাঁশিখানি হাতে লয়ে,
মুক্ত মনে, দীপ্ত তেজে, ভারতীর বরমাল্য সাথে।
আজ তুমি গেলে আগে; ধরিত্রীর রাত্রি আর দিন
তোমা হতে গেল খসি, সর্ব আবরণ করি লীন
চিরন্তন হলে তুমি, মর্ত্ত কবি, মুহূর্তের মাঝে।

বিশ্বভারতীর ইসলামিক সংস্কৃতির অধ্যাপক ও প্রাক্তন ছাত্র মৌলানা জীয়াউদ্দিনের অকালমৃত্যুতে 'জীয়াউদ্দিন' শীর্ষক কবিতা রচনা ও শান্তিনিকেতনে আহুত শোকসভায় তা পাঠ করেন।

"তব জীবনের বহু সাধনার যে পণ্য ভার ভরি
মধ্যদিনের বাতাসে ভাসালে তোমার নবীন তরী
যেমান তা হোক মনে জানি তার
একটা মূল্য নাই।
যার বিনিময়ে পাবে তব স্মৃতি
আপন নিত্য ঠাঁই।
সেই কথা স্মরি বার বার আজ
লাগে ঠিক কার প্রাণে।
অজানা জনের পরম মূল্য
নাই কি গো কোনখানে।"

বিখ্যাত শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিরোধানে শান্তিনিকেতন হ'তে ১৯,৮,৩৮ তারিখে তিনি লিখলেন—

রেখার রঙের তীর হ'তে তীরে
ফিরেছিল তব মন,
রূপের গভীরে হয়েছিল নিমগন।
গেল চলি তব জীবনের তরী
রেখার সীমার পার

তরূপ ছবির রহস্য মাঝে
অমল শুভ্র তার ॥

'পুনশ্চে' কবি দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যু শোকে ১১ই ভাদ্র ১৩৩৯ সালে 'বিশ্বশোক' কবিতায় কবি লিখলেন—

'চিরকালের সেই বিরহ তাপ
চিরকালের সেই মানুষের শোক
নামলো হঠাৎ আমার বুকে ;
এক প্রাবনে থরথরিয়ে কাঁপিয়ে দিল
পাঁজরাগুলো
সব ধরণীর কান্নার গর্জ্জনে
মিলে গিয়ে চলে গেল অনন্তে
কী উদ্দেশে কে তা জানে।'

জীবনে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জেনে বিশ্বকবি তাঁর মহাপ্রয়াণে তাঁর অভিরুচি সম্মত কাজ যাতে হয়, তাঁর গুণমুগ্ধ ভক্ত-ভাবুক ও সহানুভূতিশীল সুধীবৃন্দকে এক অপূর্ব্ব নির্দ্দেশ দিয়ে গেছেন, নিজের তিরোধানের স্মরণে। মাইকেল মধুসূদন লিখে গিয়েছিলেন কবরাবরণের উপর স্মৃতিলিপি—

"দাঁড়াও, পথিকবর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে। 'তিষ্ঠক্ষণকাল। এ সমাধিস্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহা নিদ্রাবৃত
দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন!

কিন্তু বিশ্বকবি লিখলেন—

"যখন রবনা আমি মর্ত্ত্য-কায়ায়
তখন স্মরিতে যদি হয় মন
তবে তুমি এস হেথা নিভৃত ছায়ায়
যেথা চৈত্রের এই শালবন।

* * * *

বাসা যার ছিল ঢাকা জনতার পারে
ভাষাহারাদের সাথে মিল যার,
যে-আমি চায়নি কারে ঋণী করিবারে
রাখিয়া যে যায় নাই ঋণভার।
সে আমারে কি চিনেছে মর্ত্ত-কায়ায়
কখন স্মরিতে যদি হয় মন
ডেকোনা ডেকোনা সভা, এসো এ ছায়ায়
যেথা এই চৈত্রের শালবন।"

শতবর্ষ আগে

শ্রীগোপাল মুখোপাধ্যায়

আজি হ'তে শতবর্ষ আগে
কে তুমি মহান কবি আবির্ভূত হ'লে
বিপুলা এ' ভবে,
আজি হ'তে শতবর্ষ আগে!
সেই নব বৈশাখের প্রভাতের আনন্দের
লেশমাত্র ভাগ,
সে দিনের কোনো ফুল, বিহঙ্গের কোনো গান
সে দিনের কোনো রক্তরাগ—
পাঠাইলে সিক্ত করি কবিতার সুরে
শত অনুরাগে
আজি হ'তে শতবর্ষ আগে ॥

তবু তুমি একবার খুলিয়া দক্ষিণ দ্বার
বাতায়ন পরে
সুদূর দিগন্তে চাহি কল্পনায় অবগাহি
ভেসে যাও দূরে—
একদিন শতবর্ষ পরে
চঞ্চল পুলক রাশি কোন স্বর্গ হতে ভাসি
নিখিলের মর্মে আসি লাগে,
নবীন ফাল্গুন দিন সকল বন্ধন-হীন
উন্মত্ত অধীর,
উড়ায়ে চঞ্চল পাখা পুষ্পরেণু গন্ধমাখা
দক্ষিণ সমীর
সহসা আসিয়া ত্বরা রাঙায়ে দিতেছে ধরা
যৌবনের সুরে,
সে দিনের শতবর্ষ পরে,
যেদিন উতলা প্রাণে, হৃদয় মগন গানে
নানা কবি জাগে—
কত কথা পুষ্পপ্রায় বিকশি তুলিতে চায়
অনুরাগ ভরে ;
একদিন শতবর্ষ পরে ॥
আজি হ'তে শতবর্ষ আগে
গেয়েছিলো কত গান সে কোন প্রভাত রবি
নবীন সে রাগে!
আজিকার নিদাঘের আনন্দ অভিবাদন
পাঠায়ে দিলাম তাঁর তরে,
আমার বৈশাখী গান মধুর নিদাঘ দিনে
বাঁশীর গুঞ্জন ঝঙ্কারে—
হৃদয় স্পন্দনে তার, ভ্রমর গুঞ্জনে আর
গীত বীণা রবে—
আজি হ'তে শতবর্ষ আগে।*

* এই কবিতাটি কবিগুরুর "১৪০০ সাল" কবিতার অনুকরণে কবিগুরুরই প্রতি একটি শ্রদ্ধার্ঘ্য ॥—রচয়িতা।

ভগবদ্-প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ

নরেন্দ্র দেব

রাজা রামমোহন রায় বহু কুসংস্কারে কলুষিত হিন্দুধর্মের অন্ধকার যুগে বেদ-উপনিষদের প্রশ্নাতীত প্রমাণের সাহায্যে যে নূতন আলোক সম্পাত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাতে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হ'য়ে ব্রহ্ম-বিহারকেই হিন্দুর পরম আদর্শ ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম জেনে সাগ্রহে বরণ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ আশৈশব মানুষ হয়ে উঠেছিলেন সেই মহৎ ধর্মের আদর্শে অনুপ্রাণিত শান্ত পরিবেশের মধ্যে। স্বধর্মনিষ্ঠ পিতার অধ্যাত্মজীবনের প্রভাব রবীন্দ্রনাথকে কিশোর বয়স থেকেই ঈশ্বরানুরাগী করে তুলেছিল।

পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ নিজেই এ সম্পর্কে বলেছিলেন—"যে-সংসারে প্রথম চোখ মেলেছিলুম সে ছিল অতি নিভৃত। আমার জন্মের পূর্বেই আমাদের পরিবার সমাজের নোঙর তুলে দূরে বাঁধাবাটের বাইরে এসে ভিড়েছিল। আচার, অনুশাসন, ক্রিয়াকর্ম সমস্তই সেখানে বিরল। পূর্ব যুগের নানা পালাপার্বণের পর্যায় নানা কলরবে সাজে সজ্জায় যা এতদিন চলাচল করছিল, আমি তার স্মৃতির বাইরে পড়ে গেছি। আমি এসেছি যখন, তখন পুরাতন কাল সদ্য বিদায় নিয়েছে। নূতন কাল সবে এসে নামলো, তার আসবাবপত্র তখনও এসে পৌছয়নি।

এই নিরালায় এই পরিবারে যে স্বাতন্ত্র জেগে উঠছিল তা স্বাভাবিক।"

রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-চেতনা স্ফুরণের মূলে এই নিরালা পরিবেশ অনেকটা সাহায্য করেছিল। এ ছাড়া আশৈশব পারিবারিক ব্রাহ্ম আবহাওয়া, বেদের সূত্র, উপনিষদের শ্লোক, প্রার্থনা, উপাসনা, তাঁর মনে একটা সাত্ত্বিক সুর এনে দিয়েছিল। সব চেয়ে বড় কথা, তাঁর মহান পিতার স্নেহাশিষপূতঃ প্রভাব বালকের চিত্তকে পরমার্থতত্ত্ব সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। উপনয়নকালে গায়ত্রীমন্ত্রের যে ব্যাখ্যা পিতার মুখে শুনেছিলেন, জীবনে কোনও দিন তার মহিমা বিস্মৃত হননি। এ সম্বন্ধে কবি নিজে তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে লিখে রেখে গেছেন :—

"একবার পিতা আসিলেন আমাদের তিন জনের উপনয়ন দিবার জন্য। বেদান্তবাগীশকে লইয়া তিনি বৈদিক মন্ত্র হইতে উপনয়নের অনুষ্ঠান নিজে সংকলন করিয়া লইলেন। অনেকদিন ধরিয়া দালানে বসিয়া বেচারামবাবু প্রত্যহ আমাদিগকে ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থে সংগৃহীত উপনিষদের মন্ত্রগুলি বিশুদ্ধ রীতিতে বারম্বার আবৃত্তি করাইয়া লইলেন। যথাসম্ভব প্রাচীন বৈদিক পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া আমাদের উপনয়ন হইল। মাথা মুড়াইয়া বীরবৌলি পরিয়া আমরা তিনবটু তেতলার ঘরে তিন দিনের জন্য আবদ্ধ হইলাম।

নূতন ব্রাহ্মণ হওয়ার পরে গায়ত্রী মন্ত্রটা জপ করিবার দিকে খুব একটা ঝোঁক পড়িল। আমি বিশেষ যত্নে এক মনে ওই মন্ত্র জপ করিবার চেষ্টা করিতাম। মন্ত্রটা এমন নহে যে, সে-বয়সে উহার তাৎপর্য আমি ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে পারি। আমার বেশ মনে আছে আমি 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' এই অংশকে অবলম্বন করিয়া মনটাকে খুব করিয়া প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিতাম। কী বুঝিতাম, কি ভাবিতাম, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা কঠিন।

আমার একদিনের কথা মনে পড়ে—আমাদের পড়িবার ঘরে শানবাঁধানো মেঝের এক কোনে বসিয়া গায়ত্রী জপ করিতে করিতে সহসা আমার দুই চোখ ভরিয়া কেবলই জল পড়িতে লাগিল। জল কেন পড়িতেছে তাহা আমি নিজে কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আসল কথা, অন্তরের অন্তঃপুরে যে কাজ চলিতেছে বুদ্ধির ক্ষেত্রে সকল সময়ে তাহার খবর আসিয়া পৌছায় না!"

রবীন্দ্রনাথ পিতার সঙ্গে হিমালয় যাত্রাকালে কিছু দিন বোলপুরে ছিলেন। সেখানে এই গৃহকোণে আবদ্ধ বালকের সর্বপ্রথম প্রকৃতির প্রসারিত কোলে অবাধ মুক্তির আনন্দস্বাদ লাভ হয়েছিল। উন্মুক্ত প্রান্তর, অনন্ত নীলাকাশ, খোয়াইয়ের শীর্ণ জলধারা—তাঁর চোখে যে অপূর্ব নিসর্গ-চিত্র তুলে ধরেছিল তাতেই এই প্রথম ঘর-ছাড়া কিশোর বালক মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। মাত্র ১১ বৎসর

বয়স। তখন থেকেই তাঁর মধ্যে কবিতা লেখার ঝোঁক এসেছিল। বোলপুরে বাগানের প্রান্তে একটি শিশু নারিকেল গাছের তলায় মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে বালক রবীন্দ্রনাথ আপন মনে কবিতা রচনা করতেন একখানি নীল কাগজের খাতায়। সেদিন কবির জন্ম হয়েছিল উদার বিশ্বপ্রকৃতির কোলে।

হিমালয় যাত্রার পথে রবীন্দ্রনাথ পিতার সঙ্গে বোলপুর ও অন্যান্য স্থান ঘুরে অমৃতসরে আসেন। এখানে শিখগুরু-দ্বারে তিনি শিখেদের সঙ্গীতের সুরে উপাসনা ও ভজনগানে পিতাকে যোগ দিতে দেখে বিস্ময় ও আনন্দে অভিভূত হয়েছিলেন। প্রাদেশিকতার কোনও ছায়া তাঁর মনকে আঁধার করতে পারেনি। বালক রবীন্দ্রনাথের চিত্তে গুরুদ্বারের পবিত্র পরিবেশ গভীরভাবে মুদ্রিত হয়েছিল। সান্ধ্য উপাসনায় প্রতিদিন তিনি পিতাকে ব্রহ্ম-সঙ্গীত শোনাতেন। বাল্যকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর মধুর-কণ্ঠে স্বভাবতই অতি সুন্দর গান করতে পারতেন। বাড়ীতে ব্রহ্মোপাসনা কালে প্রতিদিন ভগবানের উদ্দেশে সঙ্গীতে প্রার্থনা নিবেদন করা হ'ত। রবীন্দ্রনাথ শুনে শুনে সেই গানগুলি কণ্ঠস্থ করেছিলেন। সে সঙ্গীতের অর্থ তিনি সেই অল্প বয়সে বুঝতেন কিনা কে জানে, কিন্তু গাইতেন অত্যন্ত ভাবের সঙ্গে। অন্তরের সবটুকু দরদ দিয়ে। পরে অবশ্য বিভিন্ন সঙ্গীত শিল্পীদের নিকট তাঁর কিছুটা সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল।

বালক রবীন্দ্রনাথ একবার দুটি ঈশ্বরের স্তবগান রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে যথারীতি সংসারের দুঃখ কষ্ট ও ভবযন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণের আবেদনও ছিল। এই কবিতা দুটি তাঁর পিতার এক বন্ধু শুনে এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি সে রচনা দুটি নিয়ে মহর্ষিকে শুনিয়েছিলেন। বালকের রচিত এই পরমার্থিক কবিতা শুনে মহর্ষি হাস্য সম্বরণ করতে পারেন নি। কিন্তু, এই বালকই একদা কিশোর বয়সে একাধিক ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেছিলেন। মহর্ষির কানে এ সংবাদ গিয়ে পৌঁচেছিল। তিনি পুত্রকে ডেকে পাঠিয়ে তার রচিত গানগুলি শোনাতে বলেন। এর মধ্যে বিশেষ করে একখানি গান মহর্ষির অত্যন্ত ভাল লেগেছিল। রবীন্দ্র-অনুরাগীরা সকলেই জানেন সে গানটি—

"নয়ন তোমারে পায়না দেখিতে,
রয়েছো নয়নে নয়নে;
হৃদয় তোমায় পায়না জানিতে
হৃদয়ে রয়েছো গোপনে।"

পুত্রের এই সঙ্গীতপ্রতিভা ও রচনাশক্তির পরিচয় পেয়ে খুশী হয়ে মহর্ষি ছেলেকে পাঁচশতটাকা পুরস্কার দিয়ে ছিলেন। তিনি বিশেষভাবে আনন্দিত হয়েছিলেন এই সুকুমারমতি বালকের মধ্যে পরমার্থিক ভাবের বিকাশ দেখে। কিশোরবয়সেই যে ভগবদপ্রেমের বীজ রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয়েছিল, দেখা যায়, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কবির অন্তরে তার প্রভাব ধীরে ধীরে বেড়েই চলেছিল। তাঁর কাব্যে, সঙ্গীতে, প্রবন্ধে, নিবন্ধে এই ভগবদ্ প্রেম বহুরূপে প্রকাশ পেয়েছে।

রবীন্দ্রজীবনের ও রবীন্দ্র সাহিত্যের এ এক বিরাট দিক। উচ্চাঙ্গের দার্শনিক তত্বের সঙ্গে ওতোপ্রোত হ'য়ে আছে ভক্তি, বিশ্বাস, প্রেম ও ব্রহ্মস্বাদজনিত আনন্দের স্বর্গীয় অনুভূতি। সত্য ছিল তাঁর জীবনের ধ্রুবলক্ষ্য। কবির প্রিয় উপনিষদের বাণী হ'ল-'অসতো মা সদ্গময়'—অসত্য হতে আমাকে সত্যে নিয়ে যাও। বাক্যে চিন্তায় কর্মে সত্য হ'তে হবে, তাহলেই যিনি বিশ্ব জগতে সত্য, যিনি বিশ্ব সমাজে সত্য, তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্মিলন সত্য হয়ে উঠবে—কবি তাই গেয়েছেন—

"সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি,
ধ্রুব জ্যোতি তুমি অন্ধকারে!"

উপনিষদে এ প্রার্থনাও আছে—'তমসো মা জ্যোতির্গময়।' তিনি যে জ্ঞানস্বরূপ-বিশ্বজগতের মধ্যে তিনি যেমন ধ্রুব জ্যোতিরূপে, ধ্রুব সত্যরূপে আছেন'—তেমনি সেই সত্যকে যে আমরা জানছি—সেই জ্ঞান তো জ্ঞানস্বরূপেরই প্রকাশ! কবি বলেছেন, গায়ত্রী মন্ত্রে একদিকে যেমন ভূলোক ভুবর্লোক স্বর্লোকের মধ্যে তাঁর সত্য প্রত্যক্ষ করবার নির্দেশ আছে, তেমনি অন্যদিকে আমাদের জ্ঞানের মধ্যে তাঁর জ্ঞানকে উপলব্ধি করবারও উপদেশ আছে। বিশ্বভুবনের মধ্যে সেই সত্যের সঙ্গে মিলতে হবে, জ্ঞানের মধ্যে সেই জ্ঞানের সঙ্গে মিলতে হবে। ধ্যানের দ্বারা, যোগের দ্বারা এই মিলন। তাই ভগবদপ্রেমিক কবির মুখে শুনি—

"বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো,
সেই খানে যোগ তোমার সাথে আমারো।"

এরপর কবি বলছেন উপনিষদের প্রার্থনা হল—'মৃত্যোর্মাহম্ তংগময়'। আমরা আমাদের প্রেমকে মৃত্যুর মধ্যে পীড়িত ও খণ্ডিত করছি, তোমার অনন্ত প্রেম, অখণ্ড আনন্দের মধ্যে তাকে অমৃত লোকে নিয়ে গিয়ে সার্থক কর। আমাদের অন্তঃকরণের বহু বিভক্ত রসের উৎস—হে রস-স্বরূপ'! তোমার পরিপূর্ণ রস-সমুদ্রে মিলিত হ'য়ে চরিতার্থ হোক।

"এ কি অমৃতরসে চন্দ্র বিকশিলে
এ সমীরণ পুরিলে প্রাণ হিল্লোলে?
এ কি গভীর বাণী শিখালে সাগরে,
কী মধু গীতি তুলিলে নদী কল্লোলে?"

এমনি করেই এই চরাচর সৃষ্টির রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দ কবিকে প্রতিদিন প্রতি রাত্রিই বিস্ময়াভিভূত করে বিশ্ব-স্রষ্টার মহিমা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। এই পৃথিবীর আলো, এর বাতাস, এর আকাশ, এর নদী, গিরি, বন, শ্যামল-প্রান্তর, সবুজ শস্যক্ষেত্র, তরুলতা, বনস্পতি, এর পশু পাখী কীট পতঙ্গ সবই তাকে সেই জগৎপিতা 'একোহং বহুস্যাম' কীর্তির মধ্যে পৌঁছে দিয়েছে। কবি আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে গেয়েছেন

"এ কী আকুলতা ভুবনে
এ কী চঞ্চলতা পবনে,
এ কী মধুর মদির রস রাশি
আজি শূন্য তলে চলে ভাসি
ঝরে চন্দ্র-করে এ কি হাসি
ফুল গন্ধ লুটে গগনে।
এ কী প্রাণভরা অনুরাগে
আজি বিশ্ব জগত জন জাগে
আজি নিখিল নীল গগনে
সুখ পরশ কোথা হ'তে লাগে।

এই যে পৃথিবীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল রূপ থেকে কবি ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্ম এক অরূপ রতনের অস্তিত্বের সুখপরশ অনুভব করেছিলেন, এই অনুভূতিই ক্রমে তাঁকে ভগবদাভিমুখী করে সাধনপথে টেনে নিয়ে চলেছিল। তিনি গেয়ে উঠেছেন মুগ্ধ হয়ে—

"বিশ্ব বীণারবে বিশ্ব জন মোহিছে
স্থলে জলে নভোতলে বনে উপবনে
নদী নদে গিরিগুহা পারাবারে
নিত্য জাগে সরস সঙ্গীত মধুরিমা
নিত্য নৃত্যরস ভঙ্গিমা!—"

এই বহির্জগৎ থেকে অন্তর্জগতে জগদীশ্বরের আত্মপ্রকাশের যে অনুভূতি তাঁর মধ্যে এসেছিল, তিনি সেই অভিজ্ঞতা নিয়েই জোর করে আমাদের বলেছেন—'হবে, দেখাপাবে, আমি বলচি, এই চোখ দিয়েই, এই চর্মচক্ষু দিয়েই এমন দেখা দেখবার আছে যা চরম দেখা—তাই যদি না থাকতো তবে, আলোক বৃথা আমাদের জাগ্রত করছে, তবে এত বড় বড় এই গ্রহতারা চন্দ্র সূর্য খচিত, সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ বিশ্ব-জগৎ বৃথা আমাদের চারিদিকে অহোরাত্র নানা আকারে আত্মপ্রকাশ করছে। অন্ধকার রাত্রির তপস্যার পর জ্যোতির্ময় দিবালোকের প্রকাশ যেন ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতোই ঝরে পড়ে।'

কবি উতলা হ'য়ে উঠে বললেন—

"আজ আলোকের ওই ঝর্ণাধারায় ধুইয়ে দাও,—
আপনাকে মোর লুকিয়ে রাখা, ধূলায় ঢাকা, ধুইয়ে দাও"

বলছেন তিনি আমাদের ডেকে, "এই আলোকের ঝর্ণাধারায় বিধৌত জগতের পানে স্পষ্ট করে চেয়ে দেখ, নির্মল দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে দেখ, পদ্ম যেমন সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়ে সূর্যকে দেখে তেমনি করে দেখ। কাকে তুমি দেখবে? যাঁকে চোখে দেখা যায় না, ধ্যানে পাওয়া যায়? না, তাঁকে না। যাঁকে চোখে দেখা যায় তাঁকেই। সেই রূপের নিকেতনকে—যাঁর থেকে গণনাতীত রূপের ধারা অনন্তকাল ঝরে পড়ছে! চারিদিকেই রূপ। কেবলই একরূপ থেকে আর এক রূপের খেলা! কোথাও তার আর শেষ পাওয়া যায় না!'

"মধুর তোমার শেষ যে না পাই, প্রহর হল শেষ,
ভুবন জুড়ে রইল লেগে আনন্দ আবেশ॥"

কবি বলেছেন, 'তিনি আমাদের পরম সম্পদ, আমাদের পরম আশ্রয়, আমাদের পরম আনন্দ, তিনি আমাদের প্রতি-দিনের সমস্ত সম্পদ, প্রতিদিনের সমস্ত আশ্রয় এবং প্রতি-দিনের সমস্ত আনন্দের মধ্যেই।

তার সন্ধানে আমাদের কোথাও যেতে হয় না।

আমাদের ধন জন, আমাদের ঘর দুয়ার, আমাদের সমস্ত রসভোগের মধ্যেই পরম রূপে রয়েছেন তিনি।'

"জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে
বন্ধু হে আমার, রয়েছো দাঁড়ায়ে
এ মোর হৃদয়ের বিজন আকাশে!"

প্রতিদিন প্রভাতে কবি তাঁর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হতেন, আমাদের ডেকে বলেছেন, প্রভাতের এই পবিত্র প্রশান্ত মুহূর্তে নিজের আত্মাকে পরমাত্মার মধ্যে একবার সম্পূর্ণ সমাবৃত করে দেখে, সমস্ত ব্যবধান দূর হয়ে যায়। নিমগ্ন হয়ে যাই, নিবিষ্ট হয়ে যাই। তিনি নিবিড়ভাবে আমাদের আত্মাকে গ্রহণ করেছেন এই উপলব্ধির দ্বারা একান্ত পরিপূর্ণ হয়ে উঠি।'

"শুভ্র আসনে বিরাজো অরুণ ছটা মাঝে
নীলাম্বরে ধরণী পরে
কিবা মহিমা তব বিকাশিল!
দীপ্ত সূর্য তব মুকুটোপরি,
চরণে কোটি তারা মিলাইল।
আলোকে প্রেমে আনন্দে
সকল জগত বিভাসিল।"

পরমভাগবত ভিন্ন প্রতিদিন প্রভাতে এমন মুক্ত দৃষ্টি মেলে কে সেই বিশ্বনাথের বিশ্বরূপ দেখতে পায়? কবি তাই বলেছেন—তিনি সত্য। কিন্তু, শুধু সত্য বলেই তিনি তৃপ্ত হননি, বলেছেন, তিনি 'আনন্দ রূপমমৃতং' অর্থাৎ তিনি আনন্দস্বরূপ, অমৃতস্বরূপ! সেই আনন্দ রূপের সন্ধান ক'রো—

"বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ ধারা।
বাজে অসীম নভোমাঝে অনাদি রব
জাগে অগণ্য রবি-চন্দ্র-তারা!"

'এঁরই ধ্যান করো। উপাসনার সময় এঁরই কৃপা প্রার্থনা করো; তিনি কাঠ, পাথর নন। লোহার মতো কঠিনও নন। তিনি 'রসো বৈ সঃ'। তিনিই আনন্দ স্বরূপ।

"রহি রহি আনন্দ তরঙ্গ জাগে
রহি রহি প্রভু তব পরশ মাধুরী
হৃদয় মাঝে আসি লাগে!"

* * *

"পূর্ণ আনন্দ, পূর্ণ মঙ্গল রূপে হৃদয়ে এসো,
এস মনোরঞ্জন
আলোকে আঁধার হৌক চূর্ণ অমৃতে মৃত্যু করো পূর্ণ
করো গভীর দারিদ্র্য ভঞ্জন।"

কবি বলেছেন, উপনিষদেও এই কথাই জোর গলায় বলা হয়েছে—'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।' বলেছেন—'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।' আপন সৃষ্টির মাঝে যিনি প্রকাশ পাচ্ছেন, তাঁর যাকিছু রূপ তা আনন্দ রূপ! ভগবানের এই আনন্দরূপ মানুষের কাছে ধরা দেয় একমাত্র গভীর প্রেমের ক্ষেত্রে। মানুষের মধ্যে যখন সত্যপ্রেম জাগ্রত হয়ে ওঠে তখন সেই প্রেমময়কে লাভ করার আনন্দের আর অন্ত থাকে না। এ সম্বন্ধেও উপনিষদ বলেছেন 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কদাচন' এই আনন্দ যিনি পান তাঁর আর কোনোকালেই কোনো ভয় থাকে না। তিনি হ'য়ে ওঠেন 'অভী'। ভারতবর্ষ এরই জন্য সাধনা করেছে যুগ যুগ ধরে। ভারতবর্ষের হৃদয় মৈত্রেয়ীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—'যেনাহং নামৃতস্যাম কিমহং তেন কুর্য্যাম?' অমৃত লাভই যদি না হয় তবে এ মানবজন্মটাই বৃথা।" রবীন্দ্রনাথ ভারতের ঋষি কবি, তাই মৃত্যুর সীমানা পার হয়ে অমৃতের পানেই তাঁর সাধনার গতি ছিল। তিনি অসংখ্য সঙ্গীতের মধ্যেই এই অমৃতলাভের অভিলাষই ব্যক্ত করে গেছেন—

"ডুবি অমৃত পাথারে—যাই ভুলে চরাচর,
মিলায় রবি শশী, নাহি দেশ, নাহি কাল,
নাহি দেখি সীমা,
প্রেমামৃত হৃদয়ে জাগে, আনন্দ নাহি ধরে।"

* * *

"হৃদয় মন্দিরে, প্রাণাধীশ, আছে গোপনে
অমৃত সৌরভে আকুল প্রাণ, হায়,
ভ্রমিয়া জগতে না পাই সন্ধান—"

* * *

"অন্তরে জাগিছ অন্তরযামী,
তবু, সদা দূরে ভ্রমিতেছি আমি।"

প্রাণাধীশের জন্য চলেছে তখনও কবির ব্যাকুল অন্বেষণ। তখনও জীবন-দেবতার আবির্ভাব ঘটেনি তাঁর জীবনে।

দিবা-নিশি ফিরছেন তাঁর সন্ধানে। কাতর অন্তরে প্রার্থনা করছেন—

"স্বামী তুমি এস আজ
অন্ধকার হৃদয় মাঝে
পাপে ম্লান পাই লাজ
ডাকি হে তোমারে !"

এই আহ্বান, এই ভগবৎ-উপলব্ধির আকুতি চলেছিল কবির মনে দীর্ঘকাল ধরে—কেঁদেছেন এই বলে—

"দুয়ারে বসে আছি প্রভু সারা বেলা
নয়নে বহে অশ্রুরাশি !"

কাতরভাবে জানিয়েছেন—

"তব প্রেম লাগি দিবানিশি জাগি
ব্যাকুল হৃদয় ."

অকপটে স্বীকার করেছেন—

"তোমায় জানিনে হে, তবু মন তোমাতে ধায় !"

কিন্তু, এ চাওয়া তাঁর পাওয়ার দ্বারা সফল হয়ে উঠছে না—কবি চেয়েছিলেন :—

"নিকটে দেখিব তোমারে বাসনা করেছি মনে,
চাহিবনা হে চাহিবনা হে দুর দুরান্তর গগনে
দেখিব তোমারে গৃহ মাঝারে, জননী স্নেহে, ভ্রাতৃপ্রেমে,
শত সহস্র মঙ্গল বন্ধনে !"

তাই তো কবি উচ্চকণ্ঠে বলতে পেরেছিলেন—

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়,
সহস্র বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির সাধ !"

এই সংসার বন্ধনের মধ্যে থেকেই তিনি আপন ইষ্টলাভের সাধনায় তদ্‌গতচিত্ত হয়ে তপস্যা করেছেন। কাতর হয়ে বলেছেন—

"নাথ হে, প্রেম পথে সব বাধা ভাঙিয়া দাও,
মাঝে কিছু রেখনা, রেখনা,
থেকনা, থেকনা দুরে।"

প্রার্থনা করেছেন "হে জনগণের হৃদয়াসনসন্নিবিষ্ট বিশ্বকর্মা! তুমি যে আজ আমাদের নিয়ে তোমার কোন মহৎকর্ম রচনা করছো, হে মহান আত্মা, তা এখনও আমরা সম্পূর্ণ বুঝতে পারিনি। তোমার ভগবৎশক্তি যে আমাদের বুদ্ধিকে কোনখানে স্পর্শ করেছে, সেখানে কোথায় তোমার স্পর্শ লীলা চলেছে, তা এখনও আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। হে পরমাত্মন্, আমাদের সচেতন করো, তোমার মহত্ত্ব আমাদের উপলব্ধি করাও।"

"আর রেখনা আঁধারে, আমায় দেখতে দাও,
তোমার মাঝারে আমার আপনারে
আমায় দেখতে দাও !"

বলছেন— "তোমার ভুবন জোড়া আসনখানি
হৃদয় মাঝে বিছাও আনি।"

প্রার্থনা করছেন—"আমার সত্য মিথ্যা সকলি ভুলায়ে দাও,
আমায় আনন্দে ভাসাও।
না চাহি তর্ক, না চাহি যুক্তি,
না জানি বন্ধ, না জানি মুক্তি
তোমার বিশ্বব্যাপিনী ইচ্ছা আমার
অন্তরে জাগাও।"

"জগতে তোমার বিচিত্র আনন্দরূপের মধ্যে এক অপরূপ অরূপকে নমস্কার করি : ভয় দূর হোক, অশ্রদ্ধা দূর হোক, অহংকার দূর হোক, তোমার থেকে কিছুই তো বিচ্ছিন্ন নয়, সমস্তই তোমার এক অমোঘ শক্তিতে বিধৃত। সমস্ত ভেদ-বিভেদের উর্ধ্বে প্রচারিত হোক তোমার প্রেমের বাণী। [ক্রমশঃ
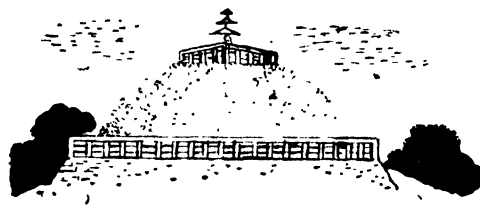
কিউপিড্ ও সাইকি

(গ্রীক গল্প)

অনুবাদিকা—অনুভা বোস

এক ছিল রাজা আর তাঁর তিনটি মেয়ে। তিনজনই ছিল রূপলাবণ্যে ঢলঢল। কিন্তু সবচেয়ে ছোট মেয়ে সাইকির সৌন্দর্য্য তার বোনেদের হার মানাত। সাইকিকে মনে হত যেন মর্ত্ত্যের দেবী। তার সৌন্দর্য্যের খ্যাতি সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল। বহু দূর দূর হতে লোক আসত তাকে দেখতে এবং তারা তাকে সত্যিকারের দেবীর মতন পূজা করত। সাইকির রূপের উপাসনায় মগ্ন হয়ে ভুলে যেত তারা সৌন্দর্য্যের দেবী ভীনাস (venus)কে। ক্রমে ক্রমে ভীনাসএর মন্দির অবহেলায় জীর্ণ হয়ে ভগ্নস্তূপে পরিণত হল। তাঁর প্রিয় শহরগুলি জনমানবশূন্য হয়ে পড়ল আর তাঁর পূজার অর্ঘ্য পেতে লাগল মর্ত্ত্যের এক মানবী।

ভীনাস কিন্তু চুপ করে থাকার পাত্রী নন। যখনই তিনি কোন অসুবিধায় পড়তেন তখন তিনি তাঁর ছেলের সাহায্য নিতেন। তাঁর ছেলে হল সেই অপূর্ব্ব রূপবান যুবক—যাকে কেউ বলে কিউপিড, কেউবা বলে প্রেম। যার বাণের সামনে স্বর্গ এবং মর্ত্ত্যের লোক অসহায়। ভীনাস তাকে গিয়ে তাঁর দুর্দ্দশার কথা বললেন—আর আদেশ দিলেন —"বৎস, তুমি তোমার শক্তির প্রয়োগ কর যাতে এই মেয়েটি পৃথিবীর নিকৃষ্ট এবং নিম্নতম প্রাণীর প্রেমে পড়ে।" কিউপিড হয়ত তাই করতেন যদি না ভীনাস তাঁর সামনে সাইকিকে আনতেন। ভীনাস হিংসায় রাগে ভুলে গেলেন যে সাইকির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য স্বয়ং কিউপিডকেও মুগ্ধ করতে পারে। তাই কিউপিড যখন সাইকিকে দেখলেন, তখন নিজেই নিজের বাণে বিদ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি কিন্তু তাঁর মাকে কিছুই বললেন না। আর ভীনাসও সন্তুষ্ট মনে ফিরে গেলেন সাইকির দুর্ভাগ্যের চিন্তায় বিভোর হয়ে।

ভীনাস কিন্তু যা ভাবলেন তা হল না, সাইকি কারোই প্রেমে পড়ল না এবং সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় যে সাইকির প্রেমেও কেউ পড়ল না। যুবকেরা তার সৌন্দর্য্য দেখে এবং তার পূজা করেই সন্তুষ্ট ছিল। কেউ তাকে বিয়ে করতে চাইল না। সাইকির অন্য দুই বোনেদের—যারা তার চেয়ে দেখতে অনেক খারাপ ছিল, খুব ভাল বিয়ে হল দুই রাজার সঙ্গে। অপূর্ব্ব রূপসী সাইকি একলা বসে থাকত ম্লান মুখে, আর ভাবত সবাই তাকে পূজা করল কিন্তু কেউ তাকে ভালবাসল না। কেউ তাকে আপন করে নিতে চাইল না।

এদিকে সাইকির মা বাবা খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তার বাবা গেলেন এপোলোর (apollo) কাছে জানতে কি করে তার মেয়ের জন্য স্বামী পাওয়া যায়। এপোলো উত্তর দিলেন, কিন্তু সে এক ভয়ংকর উত্তর। এপোলোকে কিউপিড্ সব কথা খুলে বলেছিলেন এবং তাঁর সাহায্য চেয়েছিলেন। তাই এপোলো বললেন যে সাইকিকে শোকের পোষাক পরিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় একলা রেখে আসতে হবে। সেখানেই তার ভাবী স্বামী—একটি ভয়াবহ পাখাওয়ালা সাপ—যে স্বর্গের দেবতাদের চেয়ে শক্তিমান— এসে তাকে নিয়ে যাবে এবং তার স্ত্রী করবে।

এই ভীষণ নিয়তির কথা শুনে সাইকির বাড়ীতে সবাই দুঃখে ভেঙ্গে পড়ল। তারা তাকে মৃত্যুর দূত কালো-পোষাক পরিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় কাঁদতে কাঁদতে রেখে এল। কিন্তু

সাইকি তার সাহস বজায় রাখল, সে তাদের বলল—"আমার জন্য তোমাদের আরও আগে দুঃখ করা উচিত ছিল, কারণ এই রূপই আমার কাল হল। এখন তোমরা যাও। আমি খুশী যে আমার সময় ফুরিয়েছে।" তারা এই সুন্দরী অসহায় মেয়েটিকে একলা ফেলে চলে এল। আর বাড়ী এসে সব দরজা জানলা বন্ধ করে কাঁদতে লাগল।

সেই পাহাড়ের চূড়ায় অন্ধকারে সাইকি একলা বসে তার ভয়ংকর অদৃষ্টের অপেক্ষা করতে লাগল। যখন সে কাঁদতে লাগল তখন মিষ্টি বাতাস বইতে লাগল। এই বাতাস হল বায়ুর দেবতা zephyr—তিনি তাকে উঠিয়ে নিলেন। সাইকি হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে পাহাড়ের চূড়া থেকে নেমে এল নরম ঘাসে ঢাকা সমতল ভূমির ওপর। ফুলের গন্ধে ছিল যায়গাটা আমোদিত। এই শান্ত সুন্দর সমাবেশে সাইকি তার দুঃখকষ্ট ভুলে নিদ্রাদেবীর কোলে ঢলে পড়ল। তার ঘুম ভাঙ্গল এক সুন্দর নদীর পাড়ে। সেই-খানে ছিল এক বিরাট প্রাসাদ। মনে হয় কোন দেবতার জন্যে তৈরী। তার থামগুলি ছিল সোনার, আর দেওয়াল-গুলি রূপার। মেঝে ছিল মূল্যবান পাথরের। চারধার ছিল নিস্তব্ধ। প্রাসাদ মনে হল জনমানবহীন। সাইকি ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে গেল। প্রাসাদের বৈভব এবং ঐশ্বর্য্যে সে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সে যখন ভাবছে ভিতরে ঢুকবে কি ঢুকবে না—তখন তার কানের কাছে কথা শুনতে পেল। সে কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। কারা যেন বলল তাকে যে এটা তারই বাড়ী। সে যেন নির্ভয়ে ভেতরে গিয়ে স্নান করে বিশ্রাম করে। তার জন্য রাজসিক খাবারের আয়োজন করা হবে। তারা আরও বলল—"আমরা তোমার চাকর; তোমার সব ইচ্ছা পূর্ণ করব।"

স্নান করে সাইকির খুব আনন্দ হল। আর যা খাবার সে খেল, তা এর আগে সে কখনও দেখে নাই। যখন সে খাচ্ছিল তার চার পাশে মিষ্টি বাজনা বাজছিল আর গান হচ্ছিল। সে কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না! শুধু শুনতে পাচ্ছিল। সারাদিন সে একলাই ছিল এই অদ্ভুত অদৃশ্য সাথীদের সঙ্গে। ক্রমশ যত রাত হতে লাগল তার কেন জানি মনে হতে লাগল যে রাত্রে তার স্বামীও তার সঙ্গেই থাকবে। যখন সে তার স্বামীকে তার পাশে অনুভব করল এবং তার কথা শুনল—তখন তার সব ভয় ভাবনা দূর হয়ে গেল। যদিও সে তাকে দেখতে পেল না তবুও সে নিশ্চিত ছিল যে তার স্বামী কোন সাংঘাতিক প্রাণী নয়। সে তারই বহু-আকাংখিত প্রেমিক এবং স্বামী—যার জন্য সে এতদিন অপেক্ষা করে ছিল।

এই আধাআধি মিলনে সাইকির মন ভরত না, কিন্তু তাতে সে খুব সুখী ছিল। তার সময় কেটে যাচ্ছিল দ্রুতগতিতে। একদিন রাত্রে তার অদৃশ্য স্বামী তাকে গম্ভীরভাবে বলল—"সাইকি, তোমার বিপদ ঘনিয়ে আসছে তোমার দুই বোনেদের রূপে। তারা আসছে সেই পাহাড়ের চূড়ায় যেখান হতে তুমি অন্তর্হিত হয়েছিলে। তারা তোমার জন্যে দুঃখ করবে, কাঁদবে। কিন্তু সাবধান! তুমি তাদের দেখা দিওনা—তাহলে তারা তোমার জন্য বিপদ ডেকে আনবে এবং তোমার সর্বনাশ করবে।" সাইকি কথা দিল যে সে তাদের দেখা দেবে না, কিন্তু পরদিন সে তার বোনেদের জন্য খুব কাঁদল। যখন তার স্বামী এল তখনও সে কাঁদছিল। তার স্বামীর আদর সোহাগও তার কান্না থামাতে পারল না। তখন বাধ্য হয়ে স্বামী তাকে বোনেদের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দিল। আর বলল—"তোমার যা ইচ্ছা হয় কর, কিন্তু তুমি তোমার বিপদ ডেকে আনছ। শুধু একটা কথা মনে রেখো যে তারা আমাকে দেখতে চাইলেও তুমি তাতে স্বীকার হবে না—কারণ তাহলে চিরদিনের জন্য আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে।" সাইকি কেঁদে বলল যে সে কখনও একাজ করবে না। সে মরতে প্রস্তুত, কিন্তু তাকে ছেড়ে বাঁচতে পারবে না। শুধু সে তার বোনেদের একবার দেখতে চায়।"

পরদিন সকালে পাহাড়ের চূড়া হতে—সেই মিষ্টি বাতাস নিয়ে এল দু বোনকে। সাইকি—তাদের জন্য অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিল। তাকে দেখেই বোনেরা আনন্দে জড়িয়ে ধরল। হাসি কান্নায় কেটে গেল কয়েক মুহূর্ত। কেউ কোন কথাই বলতে পারল না। তারপর সাইকি বোনেদের তার প্রাসাদে নিয়ে গেল। সাইকির ঐশ্বর্য্য দেখে, তার প্রাসাদের অপূর্ব্ব গান শুনে দুই বোনের মন হিংসায় ভরে গেল। তারা জানতে চাইল যে এ বাড়ীর

মালিক এবং সাইকির স্বামী কে। কিন্তু সাইকি তার কথা রাখল। সাইকি তাদের বলল যে তার স্বামী একজন যুবক এবং এখন সে শিকারে গেছে। তারপর সে তাদের হাত মণি-মুক্তায় ভরে বায়ুর দেবতাকে বলল তাদের পাহাড়ের চূড়ায় পৌছিয়ে আসতে। তারা চলে গেল কিন্তু তাদের মন-ঈর্ষায় পুড়ে যাচ্ছিল। তাদের ধনরত্ন তো সাইকির ঐশ্বর্য্যর কাছে তুচ্ছ। হিংসায় আর রাগে তারা জল্পনা কল্পনা করতে লাগল যে কি করে সাইকির সর্ব্বনাশ করা যায়।

সেইদিন রাত্রে সাইকিকে তার স্বামী আবার সাবধান করে দিল, আর বলল সে যেন তার বোনেদের দ্বিতীয়বার আসতে না দেয়। সাইকি কিন্তু মানল না তার কথা। বলল—'আমি তোমাকেও দেখতে পাইনা। অন্য কাউকেও দেখবার অনুমতি কি আমার নাই—এমন কি আমার প্রিয় বোনেদেরও—সে হয় না।" বাধ্য হয়ে স্বামী তাকে অনুমতি দিল। আর কিছুদিনের মধ্যেই দুই বোন তাদের কূ-মতলব নিয়ে এসে হাজির হল।

তারা সাইকিকে নানা প্রশ্ন করে বুঝে গেল যে সাইকি তার স্বামীকে কখনও চোখে দেখে নাই এবং সে নিজেও জানেনা তার স্বামী কে। কিন্তু তারা তাকে তাদের মনের কথা জানতে দিল না। তাকে গিয়ে খুব মিষ্টি সুরে বলল—'সাইকি নিজের বোনেদের কাছে তোমার দুরবস্থার কথা লুকিয়ে কি লাভ। আমরা জানি—তোমার স্বামীকে। এপোলো দেবতা তাঁর ভবিষ্যৎ-বাণীতে বলেছিলেন যে তোমার স্বামী একটা সাংঘাতিক সাপ। এখন তোমার প্রতি দয়া দেখাচ্ছে, কিন্তু একদিন রাত্রে সে তোমাকে খেয়ে ফেলবে।

সাইকির মন দুঃখে আর ভয়ে শিউরে উঠল। এতদিন সে ভাবত—কেন তার স্বামী তাকে দেখা দেয় না। তাহলে নিশ্চয় কোন কারণ আছে। সে ত কিছুই জানেনা তার বিষয়ে। তার স্বামী বোধহয় দেখতে ভীষণ কুৎসিত। তা না হলে সে অবশ্যই দেখা দিত। এইসব ভেবে কাঁদতে কাঁদতে সে বোনেদের বলল যে, হয়ত তাদের কথাই ঠিক—কারণ সে তার স্বামীর সঙ্গে শুধু অন্ধকারে থেকেছে। নিশ্চয় তার এমন কোন দোষ আছে যার জন্য সে দিনের বেলা লুকিয়ে থাকে। এই বলে সে তার বোনেদের সাহায্য চাইল।

তার বোনেরা আগে থেকেই ঠিক করে এসেছিল যে কি বলবে। তারা তাকে পরামর্শ দিল—"রাত্রে তুমি একটা ছোরা আর প্রদীপ লুকিয়ে রাখ। যখন তোমার স্বামী গভীর ঘুমে মগ্ন থাকবে তখন তুমি বিছানা থেকে উঠে প্রদীপ জ্বালিয়ে ছোরা নিয়ে আসবে, আর নিজের মন শক্ত করে স্বামীরূপী ভয়ংকর প্রাণীটার বুকে বসিয়ে দেবে। আমরা কাছাকাছি থাকব, সেই প্রাণীটা মরে গেলে তোমাকে নিয়ে যাব।" এই বলে বোনেরা অন্য ঘরে চলে গেল।

সাইকি মহা ভাবনায় পড়ল যে সে কি করবে। সে তাকে ভালবাসে। তার স্বামী বড় প্রিয় তার কাছে। না না—সে ত একটা ভীষণ সাপ তাকে সে ঘৃণা করে। সে তাকে মেরে ফেলবে...না না মারবে কেন? আগে তার জানতে হবে যে সে কে—কিন্তু জানবারই বা কি আছে? এই ভাবে সারাটা দিন তার মানসিক দ্বন্দ্বে কেটে গেল। ক্রমশঃ সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। ভাবতে ভাবতে সাইকি ঠিক করল যে সে আগে তার স্বামীকে দেখবে।

রাত্রে যখন তার স্বামী ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ল সাইকি ধীরে ধীরে উঠে সাহস সঞ্চয় করে প্রদীপ জ্বালাল। পা টিপে টিপে সে বিছানার কাছে এসে প্রদীপ তুলে ধরল তার স্বামীকে দেখতে। দেখেই তার মন আনন্দে ভরে উঠল। কোন কুৎসিৎ দৈত্য ছিল না সে বিছানায়। এক অপূর্ব্ব রূপবান যুবক ঘুমাচ্ছিল। তার রূপের আভায় প্রদীপের শিখা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সাইকির মন লজ্জায় ভরে গেল তার স্বামীকে দেওয়া কথা রাখতে পারল না বলে —কিন্তু আনন্দে উত্তেজনায় তার শরীর কাঁপতে লাগল। আর প্রদীপ থেকে একফোঁটা গরম তেল তার স্বামীর (যে স্বয়ং কিউপিড্ ছিল) কাঁধে পড়ল। কিউপিড্ চমকে জেগে উঠলেন। বাতি দেখে বুঝলেন সাইকি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছে। কিন্তু কোন কথা না বলে ছুটে বেরিয়ে গেলেন ঘর হতে।

সাইকিও পেছনে পেছনে ছুটতে লাগল রাত্রির অন্ধকারে। সে তাঁকে দেখতে পেল না, কিন্তু তাঁর কথা শুনতে পেল। কিউপিড তার নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন— "সাইকি বিদায়। যেখানে বিশ্বাস নাই সেখানে প্রেমও নাই।" সাইকি অবাক বিস্ময়ে ভাবতে লাগল—'কিউ-

পিড আমার স্বামী! আমি এত অভাগিনী যে এরকম সম্পদ পেয়েও পেলাম না। আমার স্বামী কি চিরদিনের জন্য চলে গেলেন? আচ্ছা যাই হোক্" সাইকি নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল—"সারাজীবন আমি তাঁকে খুঁজব। আমার প্রতি যদি তাঁর একটুকুও ভালবাসা না থাকে, তাও বুঝবেন যে আমি তাঁকে কত ভালবাসি।" এই ভেবে সে রওয়ানা হল। কোথায় যাবে সে কিছুই জানেনা। শুধু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—যে স্বামীকে খুঁজে বার করতেই হবে।

এর মধ্যে কিউপিড্ পোড়ার জ্বালায় অস্থির হয়ে তার মা ভীনাস এর কাছে গিয়ে এর সব কথা খুলে বললেন। ভীনাস সব শুনে চটেই আগুন। তিনি ছেলের ব্যথার কোন প্রতিকার না করে, তাকে একলা ফেলে বেরিয়ে পড়লেন সাইকির খোঁজে। ঠিক করলেন মেয়েটিকে উচিৎ শিক্ষা দিতে হবে।

বেচারী সাইকি সাধনা করে স্বর্গের দেবতাদের সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করছিল। সে রোজ ভক্তিভরে প্রার্থনা করত। কিন্তু কোন দেবতাই ভীনাস-এর বিরুদ্ধে যেতে রাজী হল না। সাইকি দেখল যে স্বর্গে এবং মর্ত্ত্যে কোথাও তার আশা নাই। তখন সে এক শেষ চেষ্টা করে দেখতে চাইল। সে ঠিক করল সে সোজা ভীনাস এর কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইবে এবং তাঁর সেবা করে তাঁকে তুষ্ট করবে। কে জানে—তাঁর ছেলে যদি বা থাকে তাঁর কাছে। এই ঠিক করে সাইকি বেরিয়ে পড়ল ভীনাসএর উদ্দেশে।

যখন সে ভীনাসএর কাছে এল তখন তিনি বিদ্রূপ করে বললেন—"স্বামী খুঁজতে এসেছ। কিন্তু তাকে ত পাবে না। সে ত পোড়ার যন্ত্রণায় প্রায় মারাই যাচ্ছিল। আর তুমি যা বাজে মেয়ে। অনেক সাধনা এবং কর্ম্ম করলে হয়ত বা একটা প্রেমিক পেতে পার। আমি দয়া করে তোমাকে এ বিষয়ে কিছু শিক্ষা দিব।" এই বলে তিনি যত রকমের ছোট বীজ আছে সেগুলিকে একত্র করে একটা ছোট খাট পাহাড় তৈরী করলেন, আর আদেশ করলেন—"আজ সন্ধ্যার আগে এগুলিকে আলাদা আলাদা করে বেছে রাখতে হবে। তোমাকে এ কাজ তোমার ভালর জন্যই দিলাম।" এই বলে তিনি চলে গেলেন।

সাইকি একলা বসে চুপ করে তাকিয়ে রইল স্তূপটার দিকে। নিষ্ঠুর আদেশে তার চিন্তা করবার ক্ষমতাও হারিয়ে গেল। সে বুঝলে যে এ কাজ করা কখনই সম্ভব নয়। তার এই দুঃখের সময় সাহায্য করতে মানুষও এল না, দেবতাও এল না। এল একদল ছোট ছোট পিঁপড়ে। তারা নিজেদের মধ্যে বলল—"ভাইরা সব এস। আমরা এই দুঃখী মেয়েটিকে সাহায্য করি।" দলে দলে সবাই এল আর তাড়াতাড়ি বহু পরিশ্রম করে সবগুলি বীজ আলাদা আলাদা করে সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখল। ভীনাস এ-স এর কাজ হয়ে গেছে দেখে ভীষণ রেগে গেলেন। তিনি সাইকিকে বললেন যে তার কাজ এখনও ফুরায় নাই। তারপর তাকে এক টুকরা শুকনো রুটি দিয়ে মাটির ওপর ঘুমিয়ে থাকবার আদেশ দিয়ে তিনি চলে গেলেন তার নরম বিছানায়। ভাবলেন যে সাইকিকে এরকম উপাস ও কষ্টে রাখলে তার সৌন্দর্য্য কিছুটা নষ্ট হবে। ততদিন কিউপিড্‌কে নিজের ঘরে বন্ধ করে রাখবেন।

পরদিন সকালে তিনি সাইকিকে আরেকটা কাজ দিলেন। খুব বিপজ্জনক কাজ। বললেন—"ওই যে নদীটা দেখছ, তার পাড়ে অনেক ঘন ঝোপ আছে। সেখানে সোনালী লোমওয়ালা ভেড়া চরে বেড়ায়। তুমি আমার জন্য তাদের গায়ের সোনালী উল নিয়ে এস।" দুঃখী মেয়েটি যখন নদীর তীরে এল তার খুব ইচ্ছা হল সে নদীতে প্রাণ বিসর্জ্জন দেয়। সে এক-পা এক-পা করে জলে নামল। হঠাৎ তার গায়ের কাছে মিষ্টি শব্দ শুনতে পেয়ে থমকে দাঁড়াল। তাকিয়ে দেখে ছোট্ট একটি সবুজ বেত। বেত বলছিল—"সাইকি নিজেকে মেরো না। ভাববার কি আছে। ভেড়াগুলি সত্যি অতি হিংস্র। তবে তুমি ভয় পেয়ো না। তুমি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করো। সন্ধ্যা-বেলায় ভেড়াগুলি নদীর পাড়ে বিশ্রাম করতে আসে। তখন তুমি ঘন ঝোপে যাও। সেখানে কাঁটা গাছের ওপর তাদের গায়ের লোম পাবে।"

সাইকি তাকে ধন্যবাদ দিয়ে তার কথামত কাজ করল এবং তার নির্দয় মনিবের জন্য সোনালী উল নিয়ে এল। ভীনাস ক্রূর হাসি হেসে সেটা গ্রহণ করে বললেন—"তোমাকে নিশ্চয় কেউ সাহায্য করেছে। যাই হোক্, এবার আমি পরীক্ষা করে দেখব যে সত্যি সত্যি তোমার এত সাহস এবং বুদ্ধি আছে কিনা। ওই যে কালো জল দেখতে পাচ্ছ পাহাড়ের গায়ে—সেটা হল সেই সাংঘাতিক নদীর যাকে বলে 'ঘৃণা' বা Styx. তুমি এই পাত্রটা সেই নদীর জলে ভরে নিয়ে এস।" এই কাজটা ছিল সবচেয়ে মারাত্মক। সাইকি জলপ্রপাতের কাছে এসে দেখল যে একমাত্র পাখী ছাড়া সে জল কেউ আনতে পারবে না। কারণ পাথরগুলি ছিল অতি মসৃণ—যাতে পা পিছলে যায় আর নদীর কালো জল পড়ছিল প্রবল বেগে। কিন্তু প্রথম দুই কাজ হয়ে যাওয়াতে সাইকির মনে হল এবারও নিশ্চয় কেউ না কেউ দয়া করে সাহায্য করবে। এবার তার ত্রাণকর্ত্তা ছিল একটা চিল। সে তার হাত থেকে পাত্রটা নিয়ে তাতে ভরে আনল কালো নদীর কালো জল।

এতেও ভীনাসের মন টলল না। সাইকির সাফল্যে তাঁর ক্রোধ আরও বেড়ে গেল। এইবার তিনি সাইকিকে একটা বাক্স দিলেন পাতালপুরীতে নিয়ে যেতে—আর রাণী প্রসারপিনা (Proserpine)কে বলতে যে তিনি যেন তাঁর সৌন্দর্য্য দিয়ে এটা ভরে দেন। ভীনাসের এটা খুবই

দরকার, কারণ ছেলের সেবা করাতে তাঁর সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়ে গেছে।" তাঁর আদেশানুসারে সাইকি বেরিয়ে পড়ল পাতালপুরীর উদ্দেশে। এবার একটি স্তম্ভ তার সাহায্য করল। সে তাকে বলে দিল কিভাবে পাতালপুরীর রাণীর কাছে যাবে। "প্রথমে একটা সুরঙ্গ দিয়ে মৃত্যুর নদীর কাছে যাও। সেখানে মাঝি চারণ (charon)কে এক পয়সা দিলে সে তোমাকে নদী পার করে দেবে। সেখান থেকে সোজা রাস্তায় গেলে রাজবাড়ী পৌঁছাবে। রাজপ্রাসাদের বিশাল দরজার রক্ষী হল সেরবেরাস—তিন-মাথাওয়ালা কুকুর। তাকে একটা ছোট কেক্ দিলেই সে তোমার বন্ধু হয়ে যাবে এবং তোমাকে ভেতরে যেতে দেবে।"

স্তম্ভের কথামত সব কাজ হল। প্রসারপিনা সানন্দে রাজী হলেন ভীনাসকে সাহায্য করতে। সাইকিও বাক্সটা নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে চলল মহা উৎসাহে।

এইবার সাইকির কৌতূহল এবং অহংকার তার শত্রু হল। সে ভাবল যে এটা খুলে দেখবে কি আছে। আর সাইকি নিজেও একটু লাগাবে। সে জানত যে এত কষ্ট করা সত্ত্বেও তার সৌন্দর্য্য বাড়ে নাই। সে নিজেকে আরও সুন্দর করতে চাইল। যদিই বা কিউপিডএর দেখা পাওয়া যায়! এই সব ভেবে সে আর লোভ সামলাতে পারল না। বাক্সটা খুলে ফেলল। বিস্মিত হয়ে দেখল তাতে কিছুই নাই। কিন্তু তখনি তার চোখের পাতা ভারী হয়ে উঠল এবং সে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ল।

এই সময় স্বয়ং কিউপিড এসে সাহায্য করলেন। তার ক্ষত অনেক আগেই শুকিয়ে গিয়েছিল এবং সাইকিকে দেখবার জন্য তার মন উতলা হয়ে উঠেছিল। প্রেমকে আর কতদিন আবদ্ধ রাখা যায়। ভীনাস তাঁর দরজায় তালা দিয়ে রেখেছিলেন; কিন্তু জানালা খোলা ছিল। কিউপিড পালালেন জানালা দিয়ে, আর নিজের স্ত্রীকে ব্যাকুল হয়ে খুঁজতে লাগলেন, সাইকি রাজপ্রাসাদের খুব কাছেই ঘুমিয়েছিল। কিউপিড নিমেষের মধ্যে দুষ্ট ঘুমকে বাক্সে বন্ধ করে ছোট্ট একটা তীর মেরে সাইকিকে জাগালেন—আর বললেন প্রসারপিনার বাক্স তাঁর মাকে দিয়ে আসতে। তিনি আশ্বাস দিলেন যে এরপর সব ঠিক হয়ে যাবে।

আনন্দে আত্মহারা সাইকি তাড়াতাড়ি রওয়ানা হল। কিউপিড উড়ে গেলেন অলিম্পস্ (Olympus)এ। মার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য সোজা চলে গেলেন স্বর্গের রাজা জুপিটার (Jupiter)এর কাছে এবং তাঁর আবেদন জানালেন। দেবতাদের রাজা পর্য্যন্ত কিউপিডের কথামত কাজ করতেন। তিনি বললেন—'যদিও তুমি আমাকে তোমার তীরে বিদ্ধ করে অনেক জ্বালাতন করেছ, একবার ষাঁড়ে পরিণত করে আমার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছ, তা সত্ত্বেও আমি তোমার কথাই মানলাম।"

এই বলে জুপিটার সব দেবতাদের একত্র করলেন এবং সবার কাছে এমন কি ভীনাসের কাছেও ঘোষণা করলেন যে কিউপিড ও সাইকির বিবাহ হয়ে গেছে এবং তিনি নববধূকে অমরত্ব দান করবেন। মারকুরী (Mercury) সাইকিকে নিয়ে এল প্রাসাদে। জুপিটার সাইকিকে অমৃত পান করতে দিলেন যাতে সে অমর হয়ে গেল। ছেলের বৌ যখন দেবী হয়ে গেল তখন ভীনাসএরও কোন আপত্তি রইল না। তিনি ভাবলেন—সাইকি নিজের স্বামী ও সন্তানদের নিয়ে এত ব্যস্ত থাকবে যে মর্ত্ত্যের লোকদের সঙ্গে মিশবার সুযোগ পাবে না। তাই তাঁর পূজারও কোন ব্যাঘাত হবে না।

সাইকি ও কিউপিড খুব আনন্দে এবং সুখে থাকতে লাগলেন। প্রেম (কিউপিড) ও আত্মা (সাইকি) খুঁজে পেল পরস্পরকে। বহু দুঃখের পর মিলন হল তাদের। যে মিলনে আছে শুধু আনন্দ—নেই কোন বিচ্ছেদ।

বিলাপ

(P. B. Shelleyর 'A Lament')

অনুবাদঃ জীবনকৃষ্ণ দাশ

হে ধরণী, হে জীবন, হায়রে সময়!
তোমাদের শেষ সিঁড়ি নিলেম আশ্রয়,
অতিক্রান্ত পথে চেয়ে বুক কাঁপে যেন;
যৌবন-গরব পুনঃ তোমাদের হবে কি উদয়?
আর নয়, ওরে আর হবে না কখনো!

দিবস-রাত্রির বুক থেকে, হায় একি!
প্রফুল্লতা পাখি হয়ে উড়ে গেছে দেখি;
মধুচৈত্র, গ্রীষ্ম ঋতু, ভয়াবহ শীত
ব্যথায় ভাঙিছে মন, আনন্দে বারেক দোলাবে কি?
নহে, আর নহে, কভু নহে, সুনিশ্চিত!

ইংলণ্ডের শ্রমিক ও মালিকদের সাথে

শ্রীনির্মলচন্দ্র কুণ্ডু, এম-এ, ডি-এস ডব্লু

পাউণ্ড-শিলিং পেন্সের দেশে এসেছি।

ইংলণ্ডের শ্রমিকদের অবস্থা ও ইংলণ্ডের শিল্পের শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক সন্তোষজনক; তাই এদেশের শ্রম-পরিচালনা (Labour Administration) দেখাই আমার উদ্দেশ্য।

ইংলণ্ডের পাঁচকোটী অধিবাসীর মধ্যে-আড়াই কোটি শ্রমিক। কলকারখানায় কাজ করে দু কোটী শ্রমিক—আর কৃষি শ্রমিক হ'ল ৫০ লক্ষ। গত ৫০ বৎসর ধরে ইংলণ্ড হয়ে আছে সারা দুনিয়ার বিশ্বকর্মা। জগতের বিভিন্ন দেশে যন্ত্র সামগ্রী রপ্তানি করাই হোল বৃটেনের একচেটিয়া ব্যবসায়। গত ১৯৬০ সালের গ্রেটব্রিটেনের মোট রপ্তানীর মূল্য হোল ৩,৬৭৪ মিলিয়ন পাউণ্ড। এতে এদেশের লোকের মাথা পিছু গড়ে রপ্তানী দাঁড়ায় ৭০ পাউণ্ড। ইংলণ্ড জগতের সবচেয়ে শিল্পোন্নত দেশ। আর এই দেশেই ঘটেছিল শিল্প বিপ্লব (Industrial Revolution) সকল দেশের আগে।

বর্ত্তমান কালে ইংলণ্ডের শিল্পে যে শান্তি বিরাজ করছে তার মূলে আছে এখানকার শ্রমিকদের বলিষ্ঠ ট্রেড ইউনিয়ন ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের পূর্ণ সহযোগিতা। ইউনিয়ন নেতারা কালেকটিভ বারগেনিং এর দ্বারা অর্থাৎ মালিক পক্ষের সঙ্গে দরকষাকষির মারফৎ শ্রমিকদের মজুরী ও চাকুরীর সর্ত্তাবলী চুক্তিভুক্ত করে নিয়ে থাকে। এই হোল—এ দেশের প্রচলিত রীতি। এ দেশের বড় শিল্পের মধ্যে—ইলেকট্রিসিটি, যানবাহন (রেল ও মোটর ট্রান্সপোর্ট) গ্যাস ও কয়লা আগেই জাতীয়করণ হয়ে গিয়েছে। এই সব শিল্পে ও ইঞ্জিনিয়ারিং, সিগারেট, সুতীও নাইলন, ডক প্রভৃতিতে মালিক পক্ষ ইউনিয়নের সঙ্গে জাতীয় চুক্তিতে (National Agreementএ) আবদ্ধ। যে সব শিল্পে সারা দেশের জন্য জাতীয় চুক্তি নাই সেখানেও কারখানার মালিক স্থানীয় স্বীকৃত ইউনিয়নের সঙ্গে নিজ নিজ কারখানার জন্য স্বেচ্ছাচুক্তি-(Voluntary Agreement) এর দ্বারা শ্রমিকদের মজুরী, খাটুনীর সময়, ওভার টাইম প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করে নেয়—যাতে ভবিষ্যতে কোনরকম মনোমালিন্যের সম্ভাবনা না থাকে। মোট ফল দাঁড়িয়েছে—শ্রমিকদের কাজ করার দুর্দম আগ্রহ ও তৎপরতা।

ইংলণ্ডের ছোট শিল্পের জন্য ১৯৫৭ সালের মজুরী কাউন্সিল আইন (Wages Council Act, 1957) এর দ্বারা ৬০টি শিল্পে ন্যূনতম বেতন, বাৎসরিক বেতন সহ ছুটি ও ওভারটাইমের ব্যবস্থা হয়েছে। আর ১৯৪৮ সালের কৃষি মজুরী আইনে (Agricultural wages Act, 1948) কৃষি শ্রমিকদের অনুরূপ ব্যবস্থা আছে। উক্ত আইন দুটির মাধ্যমে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সরাসরি হস্তক্ষেপের ফলে, দেশের ছোট শিল্পে ও কৃষিকাজে শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষের সম্ভাবনা একেবারে তিরোহিত হয়েছে বললেই চলে।

মালিক কর্ত্তৃক স্বেচ্ছায় ইউনিয়ন স্বীকৃতি, জাতীয় চুক্তি ছাড়াও, ইংলণ্ডের প্রতিটি কারখানায় দ্বিপক্ষীয় যুক্ত পরামর্শ কমিটি (Joint Industrial council) স্থাপন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিল্পের উন্নতি, অধিকতর উৎপাদন, শ্রমিক কল্যাণ, দুর্ঘটনা নিবারণ প্রভৃতি বিষয়ে মালিককে যুক্তি দেওয়া—এই কমিটির কাজ। মালিক পক্ষও কমিটির যুক্তি অনুযায়ী কাজ করতে দ্বিধাবোধ করে না। বর্ত্তমানে দ্বিপক্ষীয় যুক্ত কমিটি ইংলণ্ডের শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ।

দৈনন্দিন কাজে যদি মতবিরোধ হয়, তা কারখানার সপষ্ট্রয়ার্ড (সুপার ভাইজর) ম্যানেজারের গোচরে এনে কারখানার মধ্যেই তার অবসানের চেষ্টা করে। যদি তাতে বিরোধের অবসান না হয়, ইউনিয়নের স্থানীয় কমিটি

অতি সত্বর হস্তক্ষেপ ক'রে বিরোধের মীমাংসা করে। এর ফলে সকল বিরোধই কারখানার মধ্যে মিটমাট হয় ও সাধারণতঃ বিরোধ বড় আকারে দেখা দিতে পারে না।

ইংলণ্ডের শ্রমিক আন্দোলনের দিক হতে দেখা যায়—ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস একটি মাত্র কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা। এর সঙ্গে যুক্ত (Affiliated) আছে ১৮৩টী ইউনিয়ন। এদেশের মোট ট্রেড ইউনিয়ন সভ্য হোল ৯০ লক্ষ। এই বিশাল শ্রমিক সংস্থা—ইংলণ্ডের শ্রমিকদের একটা জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট শ্রমনীতি তৈরী করেন না। স্থানীয় ইউনিয়ন-গুলির বেলাতে ও দেখা যায় কারখানার মালিক ইউনিয়ন নেতাদের সঙ্গে অগ্রিম পরামর্শ না ক'রে কারখানার কোন নূতন নিয়ম চালু করেন না। ইংলণ্ডের কোন কোন কারখানায় একাধিক ইউনিয়নও আছে। কিন্তু ইউনিয়ন গুলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই আর রাজনৈতিক রেষারেষিও নাই। মালিক পক্ষ চুক্তি সম্পাদনকালে একাধিক ইউনিয়নের সঙ্গে আলোচনা করেন,—ইউনিয়নগুলিও শ্রমিক স্বার্থে একযোগে মালিকের সঙ্গে মজুরী ও চাকুরীর সর্ত্তাবলী নিয়ে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এদেশের ইউনিয়ন কর্মীদের যথাযথভাবে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা আছে—যাতে কর্মীরা মালিক পক্ষের সঙ্গে আলোচনা ও প্রয়োজন মতো দরকষাকষি (Collective bargaining) করতে পারদর্শী হতে পারে।

এখানে আসার পর প্রথমতঃ বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের শ্রম দপ্তরের উর্দ্ধতন অফিসারদের বিভিন্ন শ্রম বিষয়ে বক্তৃতা শুনেছি। অতঃপর বৃটেন সফর-কালে বিভিন্ন কারখানা ও কৃষি পরিদর্শন করেছি এবং মালিক ও শ্রমিকদের সঙ্গে মিলিত হয়েছি। ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীও বৃষ্টস এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপকদের সঙ্গে আলোচনার সুযোগ লাভ করেছি। আমার এই সফরের পরিপ্রেক্ষিতে বুঝেছি—আমরা কত পিছনে পড়ে আছি।

বৈশাখ-বন্দনা

অরূপ ভট্টাচার্য্য

বর্ষ শেষে এ ধরণীর শ্যাম অঙ্গন হ'তে
চৈত্র গেল বিদায় নিয়ে ঝরা পাতার পথে
মরুৎ হোলো বাঁধন হারা
আমের বনে জাগলো সাড়া
বৈশাখ সে এলো ফিরে সোনার আলোর রথে
চৈত্র গেল বিদায় নিয়ে ঝরা পাতার পথে॥
হে বৈশাখ জানি জানি তপন তাপস তুমি
তুমি অমর্ত্ত্য, তোমার আলয় তবু মর্ত্ত্যভূমি
নও কৃশানু, নও অশনি
তুমিই ধরার সঞ্জীবনী
ধন্য আকাশ, ধন্য বাতাস তোমার চরণ চুমি'
হে বৈশাখ জানি জানি তপন তাপস তুমি

কে বলে তোমায় রুদ্র, তোমার মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর ?
নিদাঘ তোমার তাপে কর পৃথ্বীরে জর্জ্জর
তুমিই ত মেঘ সৃষ্টি ক'রে
বৃষ্টি ঝরাও ভুবন ভ'রে
উর্ব্বরিয়া ওঠে তখন বিশ্ব চরাচর
কে বলে তোমায় রুদ্র, তোমার মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর ?
হে বৈশাখ এসো এসো জানাই সম্ভাষণ
প্রতি বছর এমনি দিনেই তোমার নিমন্ত্রণ
তুমি ঋতুর অগ্রগামী
প্রণাম করি তোমায় আমি
স্পর্শে তোমার হৃদয় আমার কর নিরঞ্জন
হে বৈশাখ এসো এসো জানাই সম্ভাষণ॥
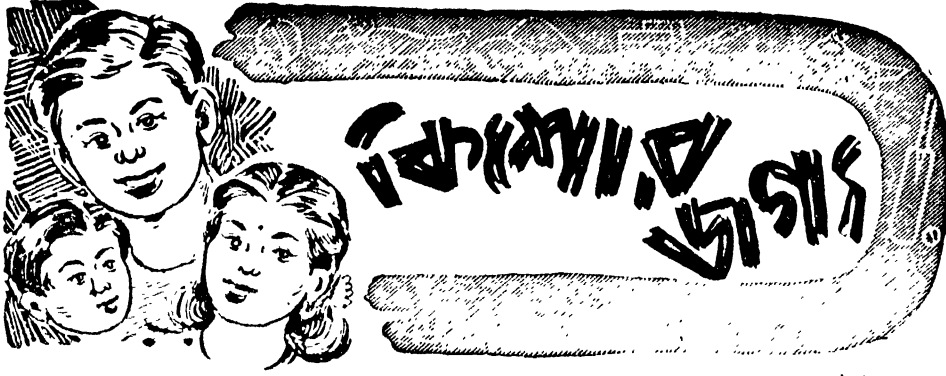
খাদ্য সমস্যা ও বিজ্ঞান

উপানন্দ

আজ সব চেয়ে বড় সমস্যা হয়ে উঠেছে খাদ্য সম্পর্কে। পৃথিবীতে উত্তরোত্তর লোকবৃদ্ধি হচ্ছে। নৈসর্গিক উৎপাতে, দুর্ঘটনায়, যুদ্ধে মহামারীতে যে পরিমাণে লোক ক্ষয় হচ্ছে, তার চেয়ে বহুল পরিমাণে মানুষের বংশবৃদ্ধি হওয়াতে বহু চিন্তাশীল ব্যক্তির চিত্তচাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। এ সম্বন্ধে আজ তোমাদের কাছে কিছু বল্‌বো। গত এক হাজার বছরের হিসাব নিয়ে দেখা গেছে, পৃথিবীর জনসংখ্যা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে নয় গুণে এসে দাঁড়িয়েছে। এদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করবার দায়িত্ব রয়েছে বর্তমান মানব সমাজের, কিন্তু দায়িত্ব পালন ঠিক মত হোতে পারছে না, সমস্যার ও সমাধান হচ্ছে না।

আজকের দিনে পৃথিবীর তেরো আনা লোক আধ-পেটা খেয়ে দিন কাটায়, পেট ভরে খেতে পায় তিন আনা লোক। তোমরা বোধ হয় জানো, পেট ভরে খাওয়ার একটি একক মান আছে। এই মানকে ক্যালোরি বলে। ক্যালোরি অর্থে আমরা বুঝি খাদ্য শক্তি। দেহের তাপ রক্ষা করা, আর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিচালনার শক্তি সঞ্চয় করা হয় খাদ্যের মাধ্যমে। প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করে খাদ্য। উপযুক্ত খাদ্য না পেলে শক্তির হ্রাস হয়, দুর্বল হয়ে পড়ে মানুষ আর নানা ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে শেষে প্রাণ ত্যাগ করে। পেট ভরে খাওয়া পেলে দেহের প্রয়োজনীয় শক্তি লাভ করা যায়, শারীরিক পুষ্টি সাধন হয়। যে দেশের অধিকাংশ ব্যক্তিরই শরীর পুষ্ট, সে দেশ শক্তিশালী।

শরীরের পুষ্টি সাধনের পক্ষে একান্ত দরকার প্রোটিন, ভিটামিন ও লবণ জাতীয় খাদ্য। শক্তি অর্জ্জনের পক্ষে এককই হচ্ছে ক্যালোরি বা খাদ্যশক্তি। অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করে খাদ্যশক্তির প্রয়োজনীয়তা। তার মধ্যে অন্যতম শরীরের আয়তন। যার শরীরের আয়তন যত বেশী, তার শরীর রক্ষার পক্ষে তত বেশী আবশ্যক ক্যালোরি বা খাদ্যশক্তি। কোন দেশের লোকেরা পেট ভরে খেতে পায় কিনা—তা নির্ণয় করতে হোলে তোমাদের লক্ষ্য করতে হবে, সে দেশের লোকদের ভাগ্যে, মাথা পিছু পড়ে যতটা ক্যালোরি আবশ্যক তা জুটছে কিনা। এটা আমরা লক্ষ্য করেছি।

আমরা দেখেছি পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশ লোক আমাদের প্রাচ্য ভূখণ্ডে। দুর্ভাগ্যের বিষয় প্রাচ্য-ভূখণ্ড আর ল্যাটিন-আমেরিকার অধিবাসীরা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম ক্যালোরি বা খাদ্যশক্তি পেয়ে থাকে। রাজসিক খাদ্যের কথা ছেড়েই দিলাম, পুষ্টিহীন খাদ্যের মাপ কাঠি দিয়ে বিচার করতে গিয়ে দেখা গেছে পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশের মধ্যে সব চেয়ে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি ভারতবর্ষের। ভারতের জনসাধারণের ভাগ্যে খাদ্যশক্তি লাভ হয় খুব কম, তাই এদেশের লোক আধমরা হয়ে আধপেটা খেয়ে কোন রকমে বেঁচে থাকে। জ্যাম্পায়ারের মত এদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে এক শ্রেণীর লোক এই ভারতে মেদস্ফীত হয়ে উঠছে। তার কারণ তারা অর্থস্ফীত—আর রাজসিক খাদ্য লাভ করে বহাল তবিয়তে আছে।

তোমরা জানো আমাদের ভাগ্য নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলছেন, তাঁরা অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর ও সুযোগবাদী। কারো সমাজ-বোধ নেই। কেউ যদি একবেলা পেট ভরে খেতে পায় অমনি এঁদের চোখ পড়ে। তাই আলু মাছ, মাংস সব ঠাণ্ডা ঘরে রেখে দেওয়া হয়, চড়া দরে মাল ছেড়ে নিজেদের পেট ভরাবার জন্যে। যাঁরা রাষ্ট্র চালনা করেন তাঁরা এদের প্রশ্রয় দেন। কিন্তু অন্যান্য স্বাধীন দেশের লোকের মধ্যে জাতীয়তা-বোধ, সমাজবোধ ও মানবিকতার জ্ঞান আছে। তাই তারা ছোট বড় সবাইকে শক্তিশালী করবার জন্যে সচেষ্ট, তাই তাদের দেশে ঔষধে, পথ্যে, আহার্য্য দ্রব্যে ভেজাল নেই,

তাদের দেশের রাষ্ট্রনীতি আদর্শ বিসর্জন দিয়ে উৎকোচ গ্রহণের রীতি বা পদ্ধতি অবলম্বন করে না। তোমরা বোধ হয় জানো ভারত-বাসীর মত আত্মত্যাগী, স্বার্থপর ও নীতিজ্ঞানবর্জিত জাতি পৃথিবীতে বিরল। খাদ্যসঙ্কটকে আরও জটিল করে তুলে দেশের লোককে মরণের পথে এগিয়ে দিচ্ছে তারা—যাদের হাতে রয়েছে খাদ্য বাজারের চাবি কাঠি, আর রয়েছে খাদ্যে ভেজালের অপকৌশল। দিন দিন যাচ্ছে আমাদের দেশের লোকেরা খাদ্যশক্তিকে ক্রমেই হারিয়ে ফেল্‌ছে। দুধ, মাছ, মাংসের দর আগুন হয়ে উঠেছে, যাদের ক্রয় শক্তি নেই—আর সেত পুষ্টির অভাবে শরীর ভেঙে পড়ছে।

ইতিপূর্ব্বেই বলেছি অপুষ্টিকর খাদ্যভোজী দেশগুলির ভেতর আমাদের ভারতবর্ষ শীর্ষস্থান অধিকার করে রয়েছে। পুষ্টিকর খাদ্য বলতে মাছ, মাংস আর দুধকে বোঝায়, এদিক দিয়ে বিচার করলে ডেনমার্ককে সবচেয়ে ভাগ্যবান বলতে হয়। মাথা পিছু ডেনমার্ক ১০ কিলোগ্রাম মাছ, ৮৩ কিলোগ্রাম মাংস, আর ২৩০ কিলোগ্রাম দুধ পায়, আর আমাদের ভাগ্যে মাথা পিছু কম পক্ষেও ১ কিলোগ্রাম মাছ, ১ কিলোগ্রাম মাংস, আর ৮৩ কিলোগ্রাম দুধ জোটে, পরিকল্পনার চোটে এও কমে যাবে। আজকাল যে রকম খাদ্যের দর বাড়ছে তাতে অনেকের পক্ষে মাছ মাংস ও দুধের আশা ত্যাগ করতে হবে, ক্যালোরির অভাব উত্তরোত্তর বাড়বে। যুদ্ধে দেশ এর সাবালকত্বের ওপর দৃষ্টি করে তোমাদের মস্তিষ্ক চালনা করতে হয় খুব বেশী, বাড়ে করে নিয়ে বইয়ের পাহাড় তোমাদের ছাত্রজীবনের সর্বনাশ শুরু হয়েছে, পরীক্ষার সময় হতভাগ্য প্রশ্নগুলোকে মুখস্থ করে করে লেখার চেষ্টা করতে হয়, ফলে যে পরিমাণে মানসিক পরিশ্রম হয় সে পরিমাণে প্রয়োজনীয় খাদ্য-শক্তি লাভ হয় না। কম বয়সে দিনে দিনে হয় তোমাদের চশমা, একটু পরিশ্রম করলে তোমাদের বুক ধড়ফড় করে, মাথা ধরে, স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়, শোথ বা প্রভৃতি শরীর অধিকার করে জীবনকে বিপন্ন করে তোলে। তোমরা যে বেঁচে আছ এইটেই আমাদের ভাগ্যের জোর। আজকের দিনে জিনিসপত্রের দর যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে যেটুকু খাদ্যপ্রাণ আছে, সেটুকুও এরপর জুটবে না। প্রতিকারহীন আবেষ্টনীর মধ্যে শোনা যায় বুভুক্ষুর চাপা ক্রন্দনধ্বনি।

উত্তর আমেরিকা অষ্ট্রেলিয়া ও ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশগুলির অধিবাসীরাই পেট ভরে খাবার সংস্থান করে নিতে পারে। ডেনমার্কের লোকেরা বা ইউরোপ আমেরিকার শিল্পোন্নত দেশগুলির লোকেরা যে হারে মাছ মাংস দুধ খেতে পায়, অনুরূপ ভাবে যদি পৃথিবীর সব দেশের লোকের পক্ষে খেতে পাওয়া সম্ভব হোতো—তা হোলে দেখা যেতো বিভিন্ন দেশে মোট যে পরিমাণে মাছ ও দুধ পাওয়া যাচ্ছে তাতে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার শতকরা ত্রিশ জন লোকের চাহিদাও মিটানো যায় না—আর মোট যে পরিমাণে মাংস উৎপন্ন হচ্ছে তাতে শতকরা নয় জনের দাবী ও অপূর্ণ থেকে যায়। এখন তোমরা দেখতে পাচ্ছ শিল্পোন্নত দেশগুলির মাপ কাঠিতে বিচার করলে পৃথিবীর মোট উৎপাদন আর মোট জন সংখ্যার ভেতর বর্ত্তমানে কিরূপে ভাব-সাম্যের অভাব।

বিগত ১৯১০ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ছিল ২৮'৭ কোটি, ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে পেয়ে শেষে ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে দাঁড়িয়েছে ২৪০ কোটিতে। বিশেষজ্ঞরা হিসেব করে বলেছেন, বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা দাঁড়াবে ৬২৫ কোটিতে। তা হোলে বুঝে দেখ, তখন খাদ্যসমস্যা কি রকম জটিল হবে।

আমেরিকার একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের শরীরের ওজন ইন্দো-নেশিয়ার পূর্ণবয়স্ক লোকের শরীরের ওজনের চেয়ে দেড়গুণ। কাজেই আমেরিকানদের শরীর পুষ্টির জন্যে অনেক বেশী ক্যালোরি বা খাদ্যশক্তির দরকার। এর ওপর আছে জলবায়ুর প্রভাব। শীতপ্রধান দেশের লোকের বেশী ক্যালোরি আবশ্যক। ওরা খায় বেশী, পরিশ্রম ও করতে পারে খুব।

পৃথিবীর উত্তরোত্তর জনবৃদ্ধি ও খাদ্যশক্তি সম্পর্কে আলোচনা করে ম্যালথাস ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে যে মতবাদ প্রকাশ করেছিলেন তাতে ভয়ে শিউরে উঠেছিলেন অনেকে। প্রশ্ন উঠেছিল তবে কি পৃথিবীর অধিকাংশ লোক না খেতে পেয়ে মরে যাবে। অবশ্য আজও সে মতবাদের প্রভাব বহু চিন্তাশীল মনের ওপর স্থায়ী রয়েছে। যে সময়ে তিনি জনসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর খাদ্য সঙ্কটের ভয়াবহ পরিণতির কথা ভবিষ্যতের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেছিলেন, সে সময় থেকে আমরা অনেক খানি এগিয়ে চলেছি। আজ বিজ্ঞানের নতুন নতুন তত্ত্ব প্রচুর খাদ্য উৎপাদনের পক্ষে আলোক সম্পাত করেছে। তিনি জানতে পারেন নি যে নতুন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কারের ফলে এমন টেকনোলজির আবির্ভাব হবে, আর এরই মাধ্যমে যেমন মোট ফসলের পরিমাণ বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে, তেমনই বৃদ্ধি হবে আবাদী জমির পরিমাণ। ম্যালথাস বলেছিলেন—খাদ্য-উৎপাদনের হার যখন জনসংখ্যা বৃদ্ধি হারের সঙ্গে বিন্দুমাত্র সমতা রাখতে পারবে না, তখন অনিবার্য্য কারণেই মানুষ হয়ে উঠবে কুক্রিয়াসক্ত, আর মনুষ্য সমাজে দেখা দেবে অনাহার, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গাহাঙ্গামা, নৈতিক অধঃপতন, আদর্শের বিচ্যুতি, পাপ, অনাচার আর মৃত্যু। ম্যালথাস ছিলেন যুক্তিবাদী মনীষী, তাই যুক্তির ওপর ব্যাখ্যা করে গেছেন মানুষের ভাগ্য-লিপির—এঁর মত এমন ভাবে আর কেউ মনুষ্যজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভাবেন নি।

ম্যালথাসের মতবাদ প্রচারের পঞ্চাশ বছর পরে এলেন লিবিগ, ইনি কৃত্রিম রাসায়নিক সারের তত্ত্ব প্রকাশ করলেন। তারপর দেখা দিল টেকনোলজীর দ্রুত উন্নতি, হাজার হাজার টন সার প্রস্তুত হোতে লাগলো কারখানাতে। গত ৬২ বছরের মধ্যে রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে বহু দেশের ফসল দ্বিগুণ হয়ে গেছে। উনবিংশ শতকের মাঝা-মাঝি আয়ারল্যাণ্ডের লোকদের প্রধান খাদ্য ছিল আলু। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে আলুর একরকম পচন রোগ হয় তাতে বহু আলু নষ্ট হয়ে যায়, আর একারণে দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় ও দশলক্ষ লোক প্রাণ হারায়। এখন বীজাণু নাশক রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগের ফলে আর সেরূপ অবস্থা হয় না। জমির ফসল বৃদ্ধির জন্যে রাসায়নিক সারের বিস্তৃত প্রয়োগ

মশাই—মুসলমানের ধর্ম্ম, খৃষ্টানের ধর্ম্ম আর আপনাদের ইহুদী ধর্ম্ম—এ তিনটির মধ্যে কোন ধর্ম্ম সত্য? অর্থাৎ, কোন ধর্ম্ম মানলে ভগবানকে পাওয়া যায়?

সুলতানের আহ্বানে মহাজন মেল্‌শিজেদেক বেশ ভয় পেয়েই এসেছেন…এখন এ প্রশ্ন শুনে তাঁর মনে হলো, নিশ্চয় সুলতান তাঁকে কথার ফাঁদে ফেলে তাঁর অনিষ্ট করবেন! কিন্তু সুলতানের এ কথার কোনো জবাব না দেওয়াও অনুচিত হবে! তাই নিশ্বাস ফেলে ইহুদী মহাজন মেল্‌শিজেদেক বললেন—শাহেনশাহ, আপনার এ কথায় আমার মনে পড়ছে বহুদিন আগেকার একটি পুরোনো কাহিনী!

সুলতান সালাদিন বললেন—বলুন, আপনার সেই কাহিনী!

তখন মহাজন বললেন—অনেক দিন আগে এক রাজা ছিলেন…রাজার যেমন প্রতাপ, তেমনি ঐশ্বর্য্য…মণি-মাণিক্যের বিরাট ভাণ্ডার ছিল তাঁর। এই সব মণি-মাণিক্যের মধ্যে রাজার ছিল বিচিত্র একটি আংটি… আংটিটি যেমন দামী, তেমনি চমৎকার দেখতে। এ আংটি নিজের বংশে চিরকাল যাতে সুরক্ষিত থাকে, সেজন্য রাজা ব্যবস্থা করলেন—এ বংশের রাজা হবেন, এ আংটির মালিক এবং এ বংশের রাজারা মারা যাবার সময় তাঁর ছেলেদের মধ্যে যাঁকে সিংহাসনের অধিকার দিয়ে যেতে চাইবেন, তাঁকে দিয়ে যাবেন এ আংটি। অর্থাৎ, এ আংটি যে ছেলে পাবে—প্রজারা এবং অমাত্য-সভাসদরা তাঁকেই বসাবেন এ রাজ্যের সিংহাসনে। পুরুষানুক্রমে এমনি ব্যবস্থা এ-বংশে চলে এলো প্রায় দুশো বছর ধরে। তারপর যে রাজা বসলেন সিংহাসনে, তাঁর তিনটি পুত্র…তিন পুত্রই সমান গুণী, সমান জ্ঞানী, সমান বীর। তিন রাজপুত্র রাজাকে খুব ভালোবাসেন…রাজাও তিন পুত্রকে সমান ভালোবাসেন—কাকেও কম নয়, কাকেও বেশী নয়! রাজা বৃদ্ধ হলেন…তখন তাঁর মনে হলো, মৃত্যু আসন্ন… কোন ছেলেকে তিনি সিংহাসনের অধিকারী করে যাবেন? কাকে রেখে কাকে দেবেন রাজ্য?…রাজার মনে ভাবনা হলো! তিনি তখন করলেন কি, চুপিচুপি জহুরী ডাকিয়ে তার হাতে আংটিটি দিয়ে, তাকে ব'ললেন—ঠিক এর জোড়া দুটি আংটি তৈরী করে দিতে হবে…এমন হওয়া চাই যে কোন আংটিটি আসল আর কোন দুটি নকল, তোমার তৈরী, কারো সাধ্য হবে না—দেখে ঠিকঠাক বলতে পারবে! সাবধান…এ কথা তুমি জানবে আর আমি জানবো… তাছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি জানবে না…তৃতীয় ব্যক্তি জানলে, তোমার গর্দ্দানা যাবে!

রাজার আদেশে জহুরী আসল আংটির মাপে আরো দুটি নকল আংটি তৈরী করে এনে রাজার হাতে দিলে, রাজা দেখে চিনতে পারলেন না—কোনটি আসল, আর কোন দুটি জহুরীর তৈরী নকল। তিনি চুপিচুপি তিন ছেলেকে আলাদা আলাদা ডেকে তিনজনকে একটি একটি করে আংটি দিলেন। তিন ছেলেই জানলো, সেই পেয়েছে রাজার আংটি—যার জোরে সিংহাসনে হবে তার অধিকার! তারপর কিছুদিন বাদে রাজার মৃত্যু হলে তিন ছেলে, নিজেদের আংটি পরে সিংহাসনের দাবী জানালো! রাজ্যের অমাত্য-সভাসদরা আর প্রজারা দেখলো তিনজনের আংটি…তিনটি অবিকল এক… কোনটার সঙ্গে কোনোটার এতটুকু তফাৎ নেই। মহা সমস্যা…এ সমস্যার মীমাংসা হলো না! কাজেই দেখছেন শাহেনশাহ, খৃষ্টান, মুসলমান, ইহুদী—এরা সকলেই তেমনি সেই এক ভগবানের সন্তান…কে কিভাবে তাঁর সাধনা করবে সে এক সমস্যা…সুতরাং সকলেই নিজের নিজের মনের মতো ভগবানকে পাবার জন্য সাধনা করছে…কার সাধন ব্যবস্থা আসল, আর কার কোনটা নকল—এ সমস্যার কোনোকালে সমাধান হবে না!

সুলতান সালাদিন দেখলেন, ইহুদী মহাজন তাঁর ফাঁদে ধরা পড়বার নয়…মেল্‌শিজেদেক রীতিমত বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ব্যক্তি। মেল্‌শিজেদেকের কাহিনী শুনে খুশী হয়ে সালাদিন বললেন—টাকা কর্জ্জ নেবার কথা…যত সুদ মহাজন চাইবেন, তাই তিনি দেবেন…এবং টাকা মারা যাবারও কোনো সম্ভাবনা নেই।

সালাদিনের কথায় ইহুদী মহাজন সুলতানকে অনেক টাকা ধার দিলেন এবং সালাদিনও এ টাকা সুদ সমেত যথাসময়ে শুধু শোধ করলেন তা নয়। বিচক্ষণ মহাজনকে তিনি শেষ পর্য্যন্ত রাজ্যের বিশিষ্ট মন্ত্রীর আসন দিয়ে দরবারে নিজের পাশে-পাশে রাখলেন।

—
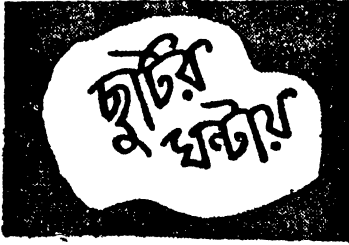
চিত্রগুপ্ত

এবারে তোমাদের বিজ্ঞানের যে বিচিত্র মজার খেলাটির কথা বলছি, সেটির নাম—'জলের বুকে দুরন্ত-ছিপির খেলা'। এ খেলাটি ভালোরকম রপ্ত করে নিয়ে তোমাদের আত্মীয়-বন্ধুদের সামনে ঠিকমতো দেখাতে পারলে, তাঁদের তোমরা অনায়াসেই রীতিমত অবাক করে দিতে পারবে। খেলাটি দেখাতে হলে যে সব সরঞ্জাম প্রয়োজন, সেগুলি নিত্যই ঘরোয়া-সামগ্রী··· কাজেই তোমরা একটু চেষ্টা করলেই এ সব সরঞ্জাম নিজেদের বাড়ীতে বসেই সংগ্রহ করতে পারবে। তাছাড়া এ খেলার কলা-কৌশল আয়ত্ত করাও এমন কিছু কঠিন দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়—সহজেই সে সব কায়দা তোমরা শিখে নিতে পারবে। এবারে শোনো—এ খেলাটির আসল রহস্য।

জলের বুকে দুরন্ত-ছিপির খেলা ঃ

বিজ্ঞানের বিচিত্র মজার এই খেলাটি দেখাতে হলে যে সাজসরঞ্জামের দরকার, প্রথমে সেগুলির কথা বলি। এ খেলা দেখানোর জন্য জোগাড় করতে হবে—পাঁচটি একই মাপের 'কর্ক' (Cork) বা শোলার তৈরী শিশি-বোতলের ছিপি, দুটি লম্বা-ছাঁদের ছুঁচ, এক গামলা জল, একটি ছুরি, চার টুকরো কর্পূরের চাকতি, আর একটি সুতোর গুলি (অথবা একশিশি গঁদের আঠা আর খানিকটা লম্বা কাগজের ফিতা)। সরঞ্জামগুলি সংগ্রহ হবার পর উপরের ১নং ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে লম্বা ছুঁচ দুটি নিয়ে একটি ছিপির ভিতর দিয়েসে দুটিকে আড়াআড়ি-ধরণে এফোঁড়-ওফোঁড় করে
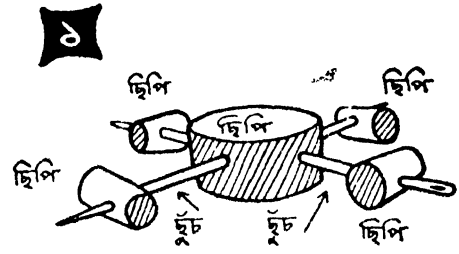
ফুঁড়ে 'ক্রশের' (Cross) ছাঁদে গেঁথে নাও। এই-ভাবে 'ক্রশটি' রচিত হলে, ছিপির বাইরের দিকে ছুঁচের যে চারটি ডগা বেরিয়ে রয়েছে, সেই চারটি ডগার প্রত্যেক প্রান্তে একটি-একটি করে 'কর্ক' বা শোলার ছিপি এঁটে দিতে হবে। ছুঁচের ডগায় শোলার ছিপি এঁটে দেবার পর, ঐ চারটি ছিপির বাইরের প্রান্তে এক-একটি করে কর্পূরের চাকতি বসিয়ে সুতোর পাক দিয়ে জড়িয়ে সেগুলিকে বেশ মজবুত-ধরণে প্রত্যেক ছিপির গায়ে এঁটে
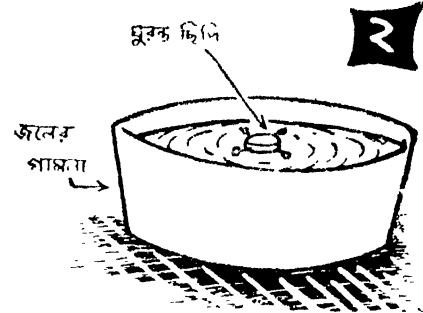
বসিয়ে দাও—উপরের ২নং ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, ঠিক তেমনি ভঙ্গীতে।

এবারে ঐ গামলায় রাখা জলের বুকে ছুঁচ আর শোলার ছিপি দিয়ে রচিত 'ক্রশটিকে' সাবধানে ভাসিয়ে দাও। গামলার জলে এই 'ক্রশটি' ভাসিয়ে দেবার কিছুক্ষণ পরেই দেখবে, সেটি আপনি থেকেই চর্কা-বাজীর মতো বোঁ-বোঁ করে ঘুর্ণীপাক খেয়ে ঘুরতে সুরু করেছে।

এমন ঘুর্ণী কেন হয় জানো? কর্পূর-ছুঁচ আর শোলা আঁটা ছিপির 'ক্রশ' জলের বুকে আপনাআপনি ঘুরপাক খাবার কারণ হলো—জলের উপরভাগের আকর্ষণ-ক্ষমতা। অর্থাৎ ছিপির প্রান্তে-আঁটা কর্পূরের টুকরোগুলি গামলার জলে গুলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সে-জলের উপরভাগের আকর্ষণ-ক্ষমতা হ্রাস পায়। তখন ছিপির অপর প্রান্তের

জলে আকর্ষণ-ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবার ফলে, ছিপিটি সেদিকে ঘুরতে সুরু করবে। এমনিভাবে প্রত্যেকটি ছিপিই ঘুরতে থাকে এবং তারই জন্য শোলা আর ছুঁচের তৈরী 'ক্রুশটিও' ঘূর্ণীপাক খেয়ে দুরন্ত হয়ে ওঠে। এই হলো বিজ্ঞানের বিচিত্র এই মজার খেলাটির আসল রহস্য।

এবার তোমরা নিজেরা হাতে-কলমে পরখ করে ছাখো—'জলের বুকে দুরন্ত-ছিপির খেলার' কলা-কৌশলটুকু।

পরের বারে এ ধরণের আরো কয়েকটি মজার খেলার হদিশ দেবার চেষ্টা করবো।

সবচেয়ে উঁচু বাড়ি

সিদ্ধার্থ গংগোপাধ্যায়

পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু বাড়ি—আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরের এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং। শহরের ফুটপাথের উপর থেকে এর চূড়োর উচ্চতা তেল বারোশো আটচল্লিশ ফুট। রাস্তার চাইতে তেত্রিশ ফুট নীচে অবধি এর আরও একটি তলা আছে। এতে সব শুদ্ধ একশো দুখানা তলা, আর তার উপরে রয়েছে এরোপ্লেনদের নিশানা দেখাবার একটা টাওয়ার।

বেশীদিন নয়, মাত্র একত্রিশ বছর আগে এটা তৈরী হয়েছিল। নিউইয়র্কের পার্বত্য ভূমি পরীক্ষা করে ইঞ্জিনীয়াররা দেখেছিলেন যে, তার ওপর সাড়ে বারোশো ফুট উঁচু একটা বাড়ি দাঁড়াতে পারবে। সবশুদ্ধ এটা তৈরী করার সময় খরচ হয়েছিল বিশ কোটি টাকার কাছাকাছি।

এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং—সারা বাড়িটাই যেন গোটা একটা শহর। এতে প্রায় বিশ হাজারের মতো লোক বাস করে। শহরের অনেক বড় বড় কোম্পানীর অফিসও এই বাড়ীতে আছে। নীচের তলাগুলোয় রয়েছে নানা রকম জিনিষের দোকান-পসার, রেস্তোরাঁ আর হোটেলখানা।

সবচেয়ে নীচের তলা থেকে একদম উপরের তলা পর্যন্ত রয়েছে আঠারোশো ষাট ধাপের সিঁড়ি। ওঠা নামার জন্যে অবশ্য সর্বদাই বাহাত্তরটি 'এক্সপ্রেস' লিফ্‌ট যাতায়াত করছে। 'এক্সপ্রেস' লিফ্‌টের অর্থ—এক একটি লিফ্‌ট এক-একটি বিশেষ তলার জন্যে বাঁধা রয়েছে—সেটী তার যাওয়া-আসার মাঝখানে অন্য আর কোন তলায় থাম্‌তে পারবে না। এই লিফ্‌টগুলো প্রতি মিনিটে হাজার ফুট ওঠা-নামা করতে পারে। বাড়ীটিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে গুছিয়ে রাখার জন্যে দু'শো লোককে মাইনে দিয়ে রাখা হয়েছে।

এই বাড়ীর ওপর থেকে নীচে বাইরের দিকে তাকালে নতো সব অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ে। বরফ পড়বার সময় যেন মনে হয়, বরফের পুঞ্জগুলো ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠে আসছে। যখন ঝড় ওঠে, তখন সারা বাড়িটাকে একটা ধুলোর চাদরে জড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। উপরের দিকের তলাগুলোয় যারা জানলার পাশে কাজ করে, বাতাস তাদের ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে মাটিতে ফেলে দেবার চেষ্টা করে।

ইঞ্জিনীয়ারেরা বলেছেন, নিউইয়র্কের মতো শক্ত পাহাড়ে মাটি পেলে তাঁরা মাটির উপর থেকে দু'হাজার ফুট পর্যন্ত উঁচু একটা বাড়ি বানাতে পারেন নির্ভয়ে। এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং'এর ভিত মাটির অনেক অনেক গভীর পর্যন্ত চলে গেছে। আর সেই জন্যেই বাতাস আর তুষার ঝড়ের হাত এড়িয়ে এটা দাঁড়িয়ে রয়েছে দীর্ঘ একত্রিশ বছর ধরে।

ধাঁধা আর হেঁয়ালি

মনোহর মৈত্র

১। ছাঁটা-ছবির আজব-হেঁয়ালি ঃ

আমাদের চিত্রশিল্পী-মশাই সেদিন তাঁর ঘরে বসে এক-মনে ছবি আঁকছিলেন। তিনি আঁকছিলেন, তোমাদের বিশেষ-পরিচিত অতি-সাধারণ একটি পাখীর ছবি—যে পাখী বন-জঙ্গলেও দেখতে পাওয়া যায় এবং মানুষের ঘরেও

প্রতিপালিত হয়। চিত্রকর-মশাই যখন ছবি-আঁকায় ব্যস্ত, এমন সময় তাঁর এক বন্ধু এসে বাড়ীর দরজায় কড়া নাড়লেন। বাইরে কড়া-নাড়ার শব্দ শুনে চিত্রকর-মশাই হাতের কাজ ফেলে রেখে শশব্যস্তে ছুটলেন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। চিত্রশিল্পী-মশাই যখন বাড়ীর বাইরে তাঁর পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে কথাবার্তায় মেতে রয়েছেন, এমনি সময় তাঁর ছোট্ট মেয়ে ভুটু ঘরে এসে হাজির। ভুটুর হাতে একখানি কাঁচি—তার মায়ের সেলাইয়ের বাক্স থেকে তুলে নিয়ে এসেছে, তাই দিয়ে নানা রকমের ছবি কাটবার মতলবে। ঘরে ঢুকে ভুটু দেখে—তার বাবার ছবি-আঁকবার সরঞ্জামের পাশে পড়ে রয়েছে চমৎকার একটি পাখীর ছবি। ঘরে কেউ নেই, তার উপর হাতে রয়েছে মায়ের সন্ত-কেনা কাঁচিখানা···ভুটু আর লোভ সামলাতে পারলো না···তার হাত নিশ্ পিশ্ করে উঠলো কাঁচি দিয়ে পাখীর ঐ ছবিখানা কুচি কুচি করে কেটে ফেলবার বাসনায়। সে তাড়াতাড়ি পাখীর ছবিখানা হাতে তুলে নিয়ে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলো। নাঃ, কেউ নেই আশেপাশে কোথাও···বাবা বাইরে বন্ধুর সঙ্গে গল্পে মেতে রয়েছেন··· মা তার সংসারের কাজকর্মে ব্যস্ত···পুরোনো চাকর দেওকীরাম গেছে বাজারে··· কাজেই এমন সুযোগ আর মিলবে না। ভুটু আর একমুহূর্ত্ত দেরী না করে, পরম-উৎসাহে এলোমেলোভাবে কাঁচি চালিয়ে তার বাবার আঁকা সুন্দর এক-রঙা সেই পাখীর ছবিখানাকে কেটে নিমেষে ছয় টুকরো করে ফেললো। ঠিক সেই সময় বাইরে বন্ধুকে বিদায় জানিয়ে চিত্রশিল্পী-মশাই ফিরে এলেন ঘরে···এসেই দেখেন তাঁর দুষ্টু মেয়ের কাণ্ড···অত পরিশ্রম করে আঁকা পাখীর ছবিটাকে সে ইতিমধ্যেই কাঁচি দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে! চিত্রশিল্পী-মশাই মহা ফাঁপরে পড়লেন···সামনেই বৈশাখ মাসের কাগজে ছাপার জন্য ছবিটি ছাপাখানায় পাঠাতে হবে · হাতে সময় নেই এতটুকু ···আর দুষ্টু মেয়েটা এমন বিভ্রাট বাধিয়ে বসলো ছবিখানা কাঁচি দিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলে! যাই হোক, মেয়েকে একচোট বকুনি দিয়ে, চিত্রশিল্পী-মশাই তখনি লেগে গেলেন এলোমেলোভাবে-ছাটা পাখীর ছবির সেই ছোট-বড় ছয়টি কাগজের টুকরোকে আবার সমানভাবে সাজিয়ে জোড়া দেবার কাজে। কিন্তু তিনি যতই চেষ্টা করেন, কিছুতেই আর সেই এলোমেলোভাবে-ছাটা ছয়টি টুকরো সাজিয়ে পাখীর আসল চেহারার ছাঁদে আনতে পারেন না! শেষে হিমশিম খেয়ে ছুটে এলেন আমাদের দপ্তরে—এলোমেলোভাবে-ছাটা পাখীর ছবির সেই ছয় টুকরো কাগজ সঙ্গে নিয়ে। উপরে চিত্রশিল্পী মশাইয়ের আঁকা এক-রঙা পাখীর ছবির সেই এলোমেলো-ভাবে-ছাটা ছয়টি কাগজের টুকরোর প্রতিলিপি দেখানো রয়েছে। দ্যাখো তো চেষ্টা করে, তোমরা কেউ যদি বুদ্ধি খাটিয়ে ঐ ছয়টি টুকরোকে কায়দা করে সাজিয়ে তোমাদের বিশেষ-পরিচিত সেই অতি-সাধারণ পাখীর চেহারার সন্ধান পাও। এ কাজ করতে হলে, কেতাবের পাতায় ছাপা নক্সাটিকে কাঁচি দিয়ে কেটে, বরং উপরের ঐ নক্সার
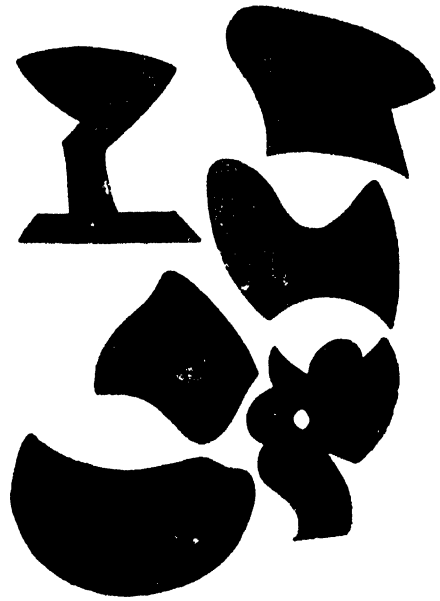
উপরে একখানা পাৎলা 'ট্রেসিং-পেপার' (Tracing Paper) ধরণের কাগজ বসিয়ে, এলোমেলোভাবে-ছাটা ছয়টি টুকরোর হুবহু প্রতিলিপি এঁকে নাও। তারপর সেই প্রতিলিপি আঁকা ছয়টি টুকরোকে সুষ্ঠুভাবে কাঁচি দিয়ে কেটে নিয়ে, সুকৌশলে সাজিয়ে চিত্রশিল্পী মশাইয়ের আঁকা পাখীর আসল চেহারাটি খুঁজে বার করো। যদি এ কাজটি করতে পারো তো বুঝবো—তোমরা বুদ্ধিতে রীতিমত দড়।

২। 'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা ঃ

এমন একটি খাবার বস্তুর নাম করো, যাহা খাইতে খুব তিতো এবং তাহার মাঝের অক্ষর ছাড়িয়ে দিলে খুব ভাল একটি ফল বুঝায়, আর শেষের অক্ষর ছাড়িয়া দিলে—দেশের রাজ-সরকার বা গভর্নমেণ্টকে তাহা দিতে হয়।

রচনা : নন্দদুলাল চট্টোপাধ্যায় (রঘুনাথগঞ্জ)

চৈত্র মাসের 'ধাঁধা আর হেঁয়ালির' উত্তর ঃ

১। বেড়াল-ছানা আর পশমের গোলার হেঁয়ালির উত্তর ঃ

১নং পশমের-গোলাটি আছে কালো-ডোরাওয়ালা বেড়ালছানার খর্পরে, ২নং পশমের গোলাটি—শাদা-বেড়ালছানার কবলে এবং ৩নং পশমের গোলাটি রয়েছে সাদাকালো ছোপওয়ালা বেড়ালছানার জিম্মায়!

'কিশোর-জগতের সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা আর হেঁয়ালির' উত্তর ঃ

২।

```
  ৮৮৮
   ৮৮
    ৮
    ৮
    ৮
 ----
 ১০০০
```

৩। ছায়াপথ।

গত মাসের সব ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে

১। কমলেশচন্দ্র (সারতা), ২। রিনি ও রনি মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), ৩। পুতুল, সুমা, হাবলু ও টাবলু মুখোপাধ্যায় (হাওড়া), ৪। জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় (বালুরঘাট), ৫। বাপ্পা ও পম্পা সেন (কলিকাতা), ৬। অরিন্দম, সুপ্রিয়া ও অলকানন্দা দাস (কৃষ্ণনগর), ৭। সিদ্ধার্থশঙ্কর ঘোষ (কলিকাতা)।

গত মাসের দুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ

১। পুপু ও ভুটন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), ২। সৌরাংশু ও বিজয়া আচার্য্য (কলিকাতা), ৩। কুনু মিত্র (কলিকাতা), ৪। সুব্রতকুমার পাকড়াশী (কানপুর), ৫। শচীন্দ্রনাথ শৌ (শ্রীপুর, হুগলী), ৬। আলো, শীলা ও রঞ্জিত বিশ্বাস (কাশীপুর), ৭। অরূপ, শ্যামলী ও শিখা চৌধুরী (ফুটিগোদা), ৮। চন্দন, নন্দন ও বন্দিতা লাহিড়ী (আসানসোল), ৯। রামহরি চট্টোপাধ্যায় (রাধাবাজার, নবদ্বীপ), ১০। তপতী, করবী, তাপসী, শুক্লা, রমা, অনিতা ও শ্বেতা (গিরিডি), ১১। পাপা, বুবু, নীলু (গিরিডি), ১২। গৌতম ও নীতা ঘোষ (কলিকাতা), ১৩। বিদ্যুৎ ও প্রদ্যোৎ মিত্র (জয়নগর)।

গতমাসের একটী ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ

১। পিণ্টু হালদার (বর্দ্ধমান)

২। স্বপন মজুমদার ও মুরারী চৌধুরী (ফুটিগোদা)

৩। বাবুলাল, কাজল, ইলা, ভাই, বুলা, সুস্মিতা স্বপন (ফুটিগোদা)

৪। মাষ্টার গাকু ও বনানী সিংহ (গয়া)

৫। দীপঙ্কর ও অজিতকুমার বন্দোপাধ্যায় (মেদিনীপুর)

৬। তীর্থঙ্কর, জয়ন্তী ও সুধীরা বন্দোপাধ্যায় (মেদিনীপুর)

৭। জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় (শ্যামনগর)

৮। সুলেখা চট্টোপাধ্যায় (শ্যামনগর)

৯। সুজাতা (বাতানল, হুগলী)

আজব দুনিয়া

জীবজন্তুর কথা

দেবশর্ম্মা বিচিত্রিত

পিপীলিকাভুক্ : এরা বিচিত্র এক ধরণের 'দন্তহীন' জীব, বনে-জঙ্গলে পিঁপড়া, উই, পোকামাকড় আর উই ও পিঁপড়ার ডিম উদরসাৎ করে জীবনধারণ করে। দন্তহীন হলেও, এ সব জীব, এদের মুখের ভিতরের সুদীর্ঘ কেঁচোর মতো সরু-ছাঁদের জিভ দিয়ে শীকার ধরে খায়। এদের এই লম্বা জিভের উপর থাকে বিচিত্র একধরণের চট্‌চটে আঠাযুক্ত লালা... সেই লালাওয়ালা লম্বা জিভ দিয়ে এরা পিঁপড়া ও পোকামাকড় ধরে মুখের মধ্যে টেনে নিতে পারে অনায়াসেই। পিপীলিকাভুক্ প্রধানতঃ দুই জাতের হয়... একটি জাতের বাস ভারতবর্ষ আর সিংহলে, অন্য জাতের নমুনা মেলে দক্ষিণ আমেরিকায়। আমেরিকার পিপীলিকাভুক আকারে প্রায় চার-পাঁচ ফুট লম্বা হয়। এদের গায়ের রঙ কটা ও ধূসর, মুখের গঠন লম্বাটে ও ছুঁচালো ছাঁদের, ঘাড়ে ও পিঠে থাকে বড় বড় লোম, শরীরের দুই পাশ ও ল্যাজ রীতিমত লোমশ - কালো ও ধূসর রঙে মেশানো। এদের সামনের পায়ের আঙুলে থাকে বড় বড় বাঁকানো নখ, তবে পিছনের পায়ের নখ ততখানি বড় নয়। এরা নিশাচর জীব, রাতের আঁধারে খাদ্য-সন্ধান করে বেড়ায় বনে জঙ্গলে।

ইল্যান্ড : এরা বিচিত্র এক জাতের 'এ্যান্টিলোপ' [illegible] বা কৃষ্ণসার' ধরণের প্রাণী .. দেখতে কতকটা হরিণের মতো, কতকটা গরু-ছাগলের মতো। প্রাণীতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা মনে করেন—এ সব এ্যান্টিলোপ জীব অনেকাংশে হরিণের মতো [illegible] গোষ্ঠীভুক্ত। কারণ, [illegible] শিং [illegible] থেকে স্বতন্ত্র হলেও, [illegible] এ সব 'এ্যান্টিলোপ' [illegible] ঠিক তেমনি ধরণের হয়। এ্যান্টিলোপ জীবদের ভিতরে ইল্যান্ড আকারে বড়, [illegible] প্রায় বড় একটি [illegible] মতো হয়। এদের গায়ের রঙ গাঢ় ধূসর। [illegible] আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণ, পূর্ব ও [illegible] অঞ্চলে। ইল্যান্ডের স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই শিং থাকে। তবে স্ত্রী ইল্যান্ডের শিং পুরুষ-জীবের শিংয়ের চেয়ে বেশী লম্বা হয়। এদের শিংয়ের [illegible] স্ক্রুপের মতো প্যাঁচানো ছাঁদের। গরুর মতো ইল্যান্ডেরও গলায় গল কম্বল ও ল্যাজের প্রান্তে কেশ গুচ্ছ থাকে। এ সব প্রাণীরা সচরাচর বাস করে আফ্রিকার নিবিড় জঙ্গল আর মরু-অঞ্চলে। এরা বহুদিন এক ফোঁটা জল পান না করে দিব্যি আরামে জীবনযাপন করে। এরা তৃণভোজী জীব।

আরগোনট : এরা বিচিত্র একধরণের সামুদ্রিক জীব—ভয়ঙ্কর 'কাটল-মাছের' সমগোত্রীয়... তবে অতটা নির্মম-নিষ্ঠুর আর কুৎসিত নয়। এরা সাগর-জলে শামুকের মতো শক্ত খোলার মধ্যে বাস করে। 'কাটল মাছের মতো এদেরও লম্বা লম্বা কয়েকটি বাহু আছে—এই বাহুগুলি এদের হাত আর পায়ের কাজ করে। সাগর জলে সাঁতার দিয়ে বেড়ায়। এরা সচরাচর জলের বুকে বাহুগুলি [illegible] মেলে বেড়ায়... সমুদ্রের তলদেশে [illegible] দিকে [illegible] ঝোঁক দেখা যায়। এরা আলগাভাবে খোলার [illegible] মধ্যে বাস করে—শুধু একজোড়া মাংসপেশীর বাঁধনে খোলার সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। এতটুকু বিপদের আশঙ্কা দেখলেই এরা খোলার [illegible] মধ্যে আত্মগোপন করে। তার ফলে খোলাটি এদের দেহের ওজনে ভারী হয়ে সমুদ্রের তলদেশে তলিয়ে যায় নিমেষে। এজন্য এদের ধরা খুবই শক্ত ব্যাপার। [illegible] মতো চওড়া যে দুটি বাহু থাকে, দূর থেকে সেগুলিকে দেখায় যেন পালতোলা জীব। ঐ বাহু দিয়ে এরা খোলাটিকে ঢেকে রাখে।

'আনন্দমঠের' তুলনায় 'প্রজাপতির নির্বন্ধ'

শ্রীমতী লীলা বিদ্যান্ত

আধুনিক বাংলা উপন্যাসে মনোবিশ্লেষণের যুগ।

'চোখের বালি' উপন্যাসের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ একটা দাবী করে ব'সেছেন। তিনি লিখেছেন—বাংলা উপন্যাসে মনোবিশ্লেষণ তিনিই প্রথম প্রবর্তন করেছেন। এর আগের যে বাংলা উপন্যাস—তাতে বাইরের ঘটনার সমাবেশেই গল্প তৈরী হয়ে উঠেছে। যে ঘটনাগুলো ঘটেছে, মানুষের মনস্তত্ব তার জন্যে দায়ী নয়। কিন্তু আধুনিক যুগের উপন্যাস বাইরের স্থূল ঘটনার বুনুনি দিয়ে তৈরী নয়—তা মানুষের মনস্তত্বের সূক্ষ্ম নিয়মে গড়ে ওঠে। এই প্রসংগে রবীন্দ্রনাথ 'বিষবৃক্ষের' উল্লেখ করেছেন। নগেন্দ্রনাথ কুন্দকে ভালবাস্‌ল, কিন্তু কেন ভালবাস্‌ল তার কোন মনস্তাত্বিক ব্যাখ্যা লেখক দেননি। সূর্য্যমুখীর মত রূপে গুণে অতুলনীয়া স্ত্রী থাকতে নগেন্দ্রের মত এক চরিত্রবান পুরুষ কেন যে কুন্দকে ভালবাস্‌ল তার কি কারণ? নগেন্দ্রের বন্ধু অবশ্য বলেছেন যে ওটা তার রূপের মোহ। কিন্তু ভালবাসার তত্ব কি সত্যিই এত সরল? শুধু বাইরের রূপ দেখেই একজন চরিত্রবান পুরুষ আকৃষ্ট হবে, তার মধ্যে অন্য কোন গূঢ়তর কারণ নেই—আধুনিক কালের পাঠক এটাকে এত সহজে মেনে নিতে পারে না। 'চোখের বালি' উপন্যাসে বিনোদিনীর প্রতি মহেন্দ্রের আসক্তি, কুন্দের প্রতি নগেন্দ্রের আসক্তিরই অনুরূপ। কিন্তু সেখানে একমাত্র বিনোদিনীর রূপই অঘটন ঘটায়নি, তা ঘটিয়েছে মহেন্দ্রের মায়ের ঈর্ষা। রূপ যৌবনের জন্য পুরুষের আসক্তি আছে বটে, কিন্তু সহজ অবস্থায় মানুষ সেই আসক্তিকে আপনার ধর্ম ও কর্তব্যের উপরে জয়ী হ'তে দেয় না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "সহজ অবস্থায় মানুষের ভিতরকার পশু এমন নির্লজ্জ ভাবে দাঁত নখ বের করবার অবকাশ পায় না।" মা যখন দেখলেন যে এক মায়াবিনী তার হাত থেকে তার ছেলেকে কেড়ে নিচ্ছে, তখন তিনি অন্য মায়াবিনীর শরণ নিলেন। যৌবনের যে সম্বল তার নিজের হাতে নেই, সেই সম্বল যার প্রচুর পরিমাণে আছে, তাকে দিয়েই ঐ মায়াবিনী বধূর হার ঘটাবেন—এটাই ছিল তাঁর অজ্ঞাত মনের ইচ্ছা।

কিন্তু 'প্রজাপতির নির্বন্ধে' কোথায় এই সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ? এ তো স্থূল প্রেমের কাহিনী ব'লে মনে হয়। যুবক-যুবতীর পরস্পরের দেখা হ'তেই যে প্রেম—এ কাজ হ'ল প্রাণ-প্রকৃতির, অর্থাৎ একে বলা যেতে পারে Animal instinct—প্রাণ নিজেকে চিরায়িত করবার জন্যে এই আকর্ষণের সৃষ্টি করেছে। এর মধ্যে সূক্ষ্ম মনের কোন স্থান নেই। বরং এই উপন্যাসে দেখি, লেখক মনস্তত্বের বেলায় একটা মস্ত বড় ভুল করেছেন। শৈলবালা বিধবা মেয়ে। কবি দেখিয়েছেন যে তার একমাত্র লক্ষ্য কী করে ছোট দুটি বোনের জন্য সৎপাত্র যোগাড় করা যায়। শ্রীশ এবং বিপিনের প্রতি তার লোভ। সে বলে—"আহা ছেলে দুটি চমৎকার।" কিন্তু এই চমৎকারিতা তার নিজের জীবনকে ছোঁয় না কেন? বিধবা-বিবাহের প্রতি কবির যে বিরাগ ছিল তাও নয়। বিদ্যাসাগরের মাহাত্ম্য বর্ণনা কর্‌তে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের এই কাজের একান্ত সমর্থন করেছেন। তা ছাড়া সেই 'নিষ্কৃতি' কবিতায় মঞ্জুলিকা আর পুলিনের গল্প।

'কাব্যের উপেক্ষিতা' প্রবন্ধে কবি সংস্কৃত সাহিত্যের উপেক্ষিতাদের মর্মবেদনার কথা বলেছেন। তাদের বেদনা কাব্যের মধ্যে উদ্‌ঘাটিত হয়নি। সে কথা কবির দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। কিন্তু এই কবি পাঠকের মর্মমূলে সেই বেদনা, সমবেদনা জাগিয়েছে। কিন্তু কবি নিজেও যে সেই উপেক্ষিতা উর্মিলা, অনসূয়া, প্রিয়ংবদা ও পত্রলেখাদের দলে আর একটি নাম সংযোগ করলেন তার কি জবাব? কবি নিজেই বলেছেন বিধবা হ'লেও মেয়েদের শরীর পাষাণময় হ'য়ে যায় না। কিন্তু শৈল কি পাষাণে গড়া?

এই উচ্ছল প্রণয়-তরংগের মাঝখানে সন্ন্যাসিনী শৈলবালা কবি-হৃদয়ের করুণার পরিচয় তো দেয় না।

'প্রজাপতির নির্বন্ধে' কবির লক্ষ্য স্বদেশের মংগল।

এমনি ক'রে কবি এই উপন্যাসে সমাজ-সংস্কার, মনো-বিশ্লেষণ, সব কিছু প্রশ্ন এড়িয়ে গেছেন। এই জন্যে গেছেন যে এই উপন্যাসে তার মনের অভিনিবেশ ছিল অন্যদিকে। সেই একটি বিষয়কে সবদিক থেকে দেখাবার এবং দেখাবার চেষ্টায় কবি অন্য সমস্ত অবান্তর প্রসংগ এড়িয়ে গেছেন।

সেই বিষয়টি হ'ল স্বদেশের মংগল। বংকিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠের' লক্ষ্যও স্বদেশের স্বাধীনতা।

বংকিমচন্দ্র 'আনন্দমঠে' স্পষ্টতঃই তাঁর সেই লক্ষ্যের কথা বলেছেন। বংকিমচন্দ্র গদ্য সাহিত্যের লেখক, তিনি কবি নন। তাই তাঁর বক্তব্যও স্পষ্ট। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কবি, তাই 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাসে তাঁর বক্তব্য অত প্রত্যক্ষভাবে স্পষ্ট নয়। কাব্যকলার কারুকার্যের নীচে, রসাবতরণের অন্তরালে কবির বক্তব্য ঢাকা প'ড়ে আছে, তা অপেক্ষা ক'রে আছে অভিনিবেশশীল পাঠকের জন্যে—যে তার রসাবতরণের মর্মমূলে আপনার রসদৃষ্টি নিয়ে পৌছতে পারে। বাইরে দেখলে মনে হয় এই উপন্যাস লঘু প্রেমের চপল কাহিনী। এই জন্যেই এই উপন্যাসকে মনে হয় প্রহসন। এর মধ্যে হাসির খোরাক অনেক আছে, কিন্তু সেই হাসির আড়ালে রয়েছে কবির 'গোপন অশ্রুজল।' স্বদেশের দুর্দশায় যে বেদনা কবির মনে জেগেছে সেই বেদনার উত্তাপেই এই উপন্যাসের মধ্যে ঝরে পড়েছে হাসির নির্ঝরিণী। এদিক থেকে দেখতে গেলে এই উপন্যাস সমস্ত রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এমন করে হাসির আড়ালে তত্ত্ব পরিবেশনের উদাহরণ রবীন্দ্র-সাহিত্যেও আর কোথাও নেই। কবিকে নিজেও যেখানে গভীর কথা বল্‌তে হয়েছে, সেখানে তা গভীর সুরেই বলেছেন। কিন্তু এই উপন্যাসে আমরা দেখি কবির এই কবিতার বাস্তব অনুসরণ ; কবি লিখেছেন—

> "গভীর সুরে গভীর কথা
> শুনিয়ে দিতে চাই
> সাহস নাহি পাই,
> হাল্‌কা ক'রে বলি তাই
> আপন কথাটাই।"

এই উপন্যাসে কবি স্বদেশের মংগল সম্বন্ধে যে সব কথা বলেছেন, তাঁর সেই সমস্ত মত সমসাময়িক কালের লোকের কাছে উপন্যাসের বিষয় ব'লে মনে হবে, কবি এই ভয় করেছেন।

এমন ক'রে হাসি ও তত্ত্বের সুন্দর মিলন শুধু বাংলা সাহিত্যে কেন, পৃথিবীর যে কোন দেশের সাহিত্যে বিরল।

সংস্কৃত আলংকারিক কাব্যের উপদেশকে বলেছেন প্রিয়ার উপদেশ। প্রিয়া যেমন মিষ্টি হাসি হেসে প্রিয়তমের মন ভোলায়, তাকে আপনার মতে নিয়ে আসে, কবিও তেমনি তাহার মোহন হাসি দিয়ে পাঠককে তার নিজের মতের অনুযায়ী ক'রে তোলেন। 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাসে আলংকারিকের এই উপমা রবীন্দ্রনাথের হাতে সার্থক হয়েছে।

সংস্কৃত আলংকারিকরা যে সমস্ত রসের নাম করেছেন, তার মধ্যে দেশাত্মবোধ নামক রসের উল্লেখ নেই। সে রস বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে প্রথম নিয়ে এসেছেন কবি মধুসূদন। তার পরেই হ'ল বংকিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ।' কিন্তু 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাসের রস কী ? এ প্রশ্নের উত্তরে প্রথমেই মনে হয়—এর রস হ'ল প্রণয়, সেটা সংস্কৃত আলংকারিকের মতে সবচেয়ে আদিম রস। কিন্তু মন দিয়ে পড়লে বোঝা যাবে যে—এ উপন্যাসের রস আদিমতম রস নয়, এর রস হ'ল বাংলা সাহিত্যের অধুনাতম রস—সেই স্বদেশাত্মবোধ।

স্বদেশের দুঃখ দুর্দশার কারণ, তার প্রতীকারের উপায়, দেশের মংগলের জন্যে যারা কাজ করবে তাদের আদর্শ, দেশের মংগলের জন্যে কাজ কী হবে এবং কেমন ক'রে সে কাজ আরম্ভ করা যাবে, এই সমস্ত নিয়ে কবি যে গভীর চিন্তা করেছেন, তাঁর সেই চিন্তালব্ধ সত্যই কবি এই উপন্যাসের মধ্যে নানা প্রসংগ তুলে দেখিয়েছেন।

এই উপন্যাসে কবি যে সমস্ত বিষয়ের কথা নিয়ে আলোচনা করেছেন সেগুলোকে আমরা এই রকম ক'রে ভাগ করতে পারি।

১। দেশের সেবা যারা করবে তাদের সন্ন্যাস গ্রহণ করতেই হবে, অথবা তারা গৃহধর্ম পালন ক'রেও দেশের সেবা করতে পারে কিনা, অর্থাৎ নরনারীর মিলন স্বদেশ-সেবার প্রতিকূল কি অনুকূল ?

২। স্বদেশের সেবায় বা সামাজিক কাজে নারীর অধিকার ও উপযোগিতা।

৩। নারীর সামাজিক কাজে যোগ দেবার বিরুদ্ধে নানা রকম যুক্তিতর্ক।

৪। দেশের সেবায় নারীর কর্তব্যের ক্ষেত্র।

৫। স্বদেশ সেবার কর্ম প্রণালী।

৬। কর্মীদের মধ্যে ঐক্য বন্ধন স্থাপনের উপায়।

৭। দেশের সেবায় একক সাধকের সাধনাও ব্যর্থ নয়।

এর থেকেই দেখা যাবে যে বংকিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠের' সংগে এই উপন্যাসের কতখানি মিল এবং আলোচনা করলে, আমরা কোথায় কোথায় এই দুইজনের মধ্যে অমিল, তাও দেখতে পাব।

স্বদেশের উদ্ধার বলতে বংকিমচন্দ্র বুঝেছেন রাজনৈতিক স্বাধীনতা উদ্ধার, আর এই স্বাধীনতা উদ্ধারের উপায় বলতে বংকিমচন্দ্র বুঝেছেন সশস্ত্র বিপ্লব। তাই 'আনন্দমঠ' দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্যে সশস্ত্র বিপ্লবের কাহিনী। কিন্তু বংকিমচন্দ্র শুধু এটুকুই বুঝেছেন, আর কিছু বোঝেন নি—এ কথা আমরা আনন্দমঠের উপসংহার পড়লে আর বলতে পারি না। আনন্দমঠের উপসংহারে আমরা দেখি যুদ্ধে সম্পূর্ণ জয়লাভ করেও স্বদেশের স্বাধীনতা লাভ করা গেল না। তার কারণ দেশের সামাজিক অবনতি, লোকশিক্ষার অভাব, বিজ্ঞানচর্চার অভাব এবং সত্যিকারের জ্ঞানের বদলে দেশে কুসংস্কারের প্রাদুর্ভাব। বংকিমচন্দ্র এই কথাই বলতে চেয়েছেন যে দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা দেশের সামাজিক উন্নতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে। সামাজিক উন্নতি বিনা রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করেও কোন লাভ নেই। এই জন্যেই বংকিমচন্দ্রের "মহাপুরুষ'' বা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "ভারত ভাগ্য বিধাতা" এ দেশে ইংরেজ রাজত্বের মেয়াদ বাড়িয়ে দিতে চাইলেন—এ কথাটা যে বংকিমচন্দ্র শুধুই ইংরাজ প্রভুকে খুশী করবার জন্যেই লিখেছেন তা বলা যায় না, এটা ছিল তাঁর মনে বিশ্বাস। ঠিক এর মতই রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায়, নানা প্রবন্ধে বলেছেন এবং সেই জন্যেই তিনি 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাসে কোন রাজনৈতিক স্বাধীনতার আকাংখার, কোন সশস্ত্র আন্দোলনের উল্লেখ করেন নি, এতে তিনি বলেছেন দেশের গঠনমূলক কাজের কথা! এই জন্যেই আনন্দমঠের বিপ্লব কেন্দ্র গভীর জংগলের মধ্যে—আর এই উপন্যাসের কর্মকেন্দ্র হ'ল ইংরাজের রাজধানী কলকাতায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নানা রচনায় বার বার ক'রে এই কথায় বলেছেন যে আমাদের স্বদেশের দুর্গতির কারণ বিদেশী শাসন নয়, বরং বিদেশী শাসন আমাদের সামাজিক দুর্গতিরই ফল। আমাদের নৈতিক দুর্গতি সামাজিক দুর্গতির ছিদ্র দিয়েই যে বিদেশী শাসনের শনি ঢুকেছে—এই কথা রবীন্দ্রনাথ বার বার বলেছেন।

বংকিমচন্দ্র দেখিয়েছেন যে যারা দেশহিতে জীবন নিয়োগ করবে তারা ব্রত উদ্ধার না হওয়া পর্য্যন্ত মেয়েদের সংস্রব সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করবে। এ সন্ন্যাস—ব্রত উদ্ধারের জন্যেই, অন্যথা নর-নারীর মিলন বা গৃহধর্ম কোন দোষের জিনিষ নয়। তাই ভবানন্দ মহেন্দ্রকে বলছে—"আমরা মায়া কাটাই নাই, আমরা ব্রত রক্ষা করি।" কিন্তু এ ব্রতপালন যে সহজ নয় সে কথাও বংকিমচন্দ্রের অজানা ছিল না। তাই তিনি দেখালেন যে জীবানন্দ এবং ভবানন্দের মত মহামনা সন্তানও ব্রত রক্ষা করতে পারেন নি। বংকিমচন্দ্র এই ব্রতভংগের জন্যে দায়ী করেছেন রমণীর রূপলাবণ্যকে। ব্রতভংগকারীদের প্রতি তার সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। কিন্তু তবু বংকিমচন্দ্র এটাকে পাপই বলেছেন এবং এই পাপের জন্যে প্রায়শ্চিত্তের বিধান করেছেন। তা ছাড়া শান্তি ও জীবানন্দের জীবনের যে আদর্শ তিনি দেখিয়েছেন সেটাও স্বভাবের বিরোধী। তাই বংকিমচন্দ্রের আদর্শ, স্বভাবের বিরোধী। মানবোচিত দুর্বলতার প্রতি তাঁর সমবেদনা থাকলেও সে দুর্বলতাকে তিনি পাপই মনে করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতে স্বভাব নয়। স্বভাব, সে যে দেবতারই দান। তাই ব্রতভংগকারী চিরকুমারসভার সভ্যদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের শুধু সমবেদনা ছিল না। ছিল তার সর্বাংগীণ সমর্থন। পুরবালা যখন চিরকুমারসভার সভ্যদের বিষয়ে বলল—"প্রজাপতির সংগে তাদের যে লড়াই।"

তখন অক্ষয় বলছে—"দেবতার সংগে লড়াই ক'রে পারবে কেন? তাকে কেবল চটিয়ে দেয় মাত্র!" স্বভাবের বিরোধিতা করতে গেলে স্বভাব আরো প্রবলভাবে আপনার অধিকার জারী করে। রবীন্দ্রনাথের মতে মানুষ

'যদি ভাবেন ওঁকে খুশী করা সহজ...'

প্রতিকূলে ধর্মাচরণ করতে পারে না, স্বভাবের অনুকূলেই—মানুষের ধর্মাচরণ সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের মতে স্বভাব ও ধর্ম এ দুয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। নরনারীর মিলনের মন্ত্র দেবতার আপন হাতের দান। মহৎ ব্রত পালনের জন্ম দেবতার এই দানকে ব্যর্থ করতে হবে রবীন্দ্রনাথ তা মানেন না—।

আমাদের দেশে এবং হয়ত অন্যত্রও একটা মতবাদ আছে যে, কোন মহৎ কাজ করতে গেলে নারীর সংগ বর্জন করতে হবে। এই নিয়ে 'আনন্দমঠে'—শান্তি ও সত্যানন্দের সংগে তর্কে শান্তি পুরাকাহিনী থেকে উদাহরণ দিয়ে বলছে—"অর্জুন যখন যাদবী সেনার সংগে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কে তাহার রথ চালাইয়াছিল? দ্রৌপদী সংগে না থাকিলে কি পাণ্ডব কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যুঝিত?"

সত্যানন্দ যখন শান্তিকে বললেন যে "তুমি আমার দক্ষিণ হস্ত ভাঙিয়া দিতে আসিয়াছ—" তখন শান্তি বলল "আমি আপনার দক্ষিণ হস্তে বল বাড়াইতে আসিয়াছি—আমি ব্রহ্মচারিণী,প্রভুর কাছে ব্রহ্মচারিণীই থাকিব।" এর থেকে মনে হয় বংকিমচন্দ্রের এই মতই ছিল যে মহৎ আদর্শ নিয়ে যদি নরনারী মিলিত জীবন যাপন করে, তবে তাতে মহৎ ব্রতের বিঘ্ন হয় না। শান্তিকে দিয়ে জীবানন্দের স্বদেশ-সেবার কোন বিঘ্ন হয়নি, শান্তি সন্তান সম্প্রদায়ের অনেক কাজেই সহায় হ'য়েছিল। কিন্তু তবু জীবানন্দ শান্তির সংগে থেকে যে ব্রত ভংগ করেছেন তার জন্যেও তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হ'ল। শান্তিই তাকে উপদেশ দিল যে স্বদেশ সেবার সুখ থেকে বঞ্চিত হওয়াই হবে তাদের প্রায়শ্চিত্ত।

চিরকুমারসভায় শ্রীশের যে মত, সে মত আমাদের দেশে প্রচলিত হয়েছিল। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিবেকানন্দের মত এই রকমই ছিল। শ্রীশ বলছে "ভারতবর্ষে সন্ন্যাস ধর্ম ব'লে একটা প্রকাণ্ড শক্তি আছে। তার জটা মুড়িয়ে ছাই ঝেড়ে ফেলে,ঝুলিটা কেড়ে নিয়ে তাকে সৌন্দর্য্যে এবং কর্ম নিষ্ঠায় দীক্ষিত করতে হবে।" সে বলছে "আমার সন্ন্যাসীর কাজ হবে মানুষের চিত্ত আকর্ষণ।' সন্ন্যাসীর সাজ বর্ণনা করে শ্রীশ বলছে—"গায়ে চন্দন, কানে কুণ্ডল, মুখে হাস্য।" শ্রীশ বলছে—"সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে রুচি, বুদ্ধি, কার্য্যক্ষমতা, চিত্তের প্রফুল্লতা, সব বিষয়ে গৃহস্থের আদর্শ হতে হবে।" সে বলছে "এই রকম এক দল শিক্ষিত যুবক যদি ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে গিয়ে শিক্ষাপ্রচার ক'রে বেড়ায়—তাতে ফল হয় কি না?" পুরানো কালের শুষ্ক, ছাই মাখা, অলস, ভিক্ষা-সম্বল সন্ন্যাসের জায়গায় এই নবীন সন্ন্যাসের আদর্শ স্বামী বিবেকানন্দ এদেশে প্রচার করলেন। কিন্তু এই সন্ন্যাসেও রবীন্দ্রনাথের সম্মতি নেই। অন্ততঃ এই সন্ন্যাসও যে দেশ সেবার জন্যে অপরিহার্য্য,একথা তিনি মানেন নি। এ সন্ন্যাস গ্রহণের উপযোগী মানুষ সংসারে কেউ কেউ থাকতে পারে, কিন্তু এটা সমস্ত দেশ সেবকের বেলাতে খাটে না। এর বাইরে থেকেও দেশের সেবা করা চলে। পূর্ণ বলছে—"আমার মতে গৃহস্থ-সন্তানকে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত না ক'রে গৃহাশ্রমকে উন্নত আদর্শে গঠিত করাই শ্রেয়।" এই জন্যেই আমরা দেখি যে চিরকুমারসভার পরিণামে ব্রতভংগের প্রায়শ্চিত্তের বদলে রয়েছে সভার নিয়ম পরিবর্তন! যে নিয়ম স্বভারেব বিরোধী তাকে পতিবর্তন করতেই হবে। চন্দ্রবাবু যখন চির-কৌমার্য্য ব্রত উঠিয়ে দেওয়া বিষয়ে রসিকবাবুর পরামর্শ চাইলেন, তখন রসিকবাবু বললেন—"উঠিয়ে দিন, নইলে কোনদিন সে আপনি উঠে যাবে।" চন্দ্রবাবু বললেন—"আপনি ঠিক বলেছেন। যে জিনিষ বলপূর্বক আসবেই—তাকে বল প্রকাশ করতে না দিয়ে আসতে দেওয়াই ভাল।" স্বভাব যদি আপনাকে সমাজসম্মত উপায়ে চরিতার্থ করতে না পারে, তা হ'লে সে অসামাজিক বিকৃত উপায়ে নিজেকে চরিতার্থ করতে গিয়ে সমাজের অকল্যাণ ঘটায়। যেখানেই সন্ন্যাসী সম্প্রদায়—সেখানেই এই বিকৃতি যে কী রকম বহুল প্রচলিত, এ সত্য অস্বীকার করবার উপায় নেই।

স্বভাবের শক্তি তার অনিবার্য্য অবশ্যম্ভাবিতা ছাড়াও স্বভাবধর্ম পালনের মধ্যেই রয়েছে জীবনের সার্থকতা—কবির এই মত। স্বভাবকে ব্যর্থ করলে জীবনকেই ব্যর্থ করা হয়। এর বিরুদ্ধে অনেকে যে যুক্তি দিয়ে থাকেন সে কথাই আমরা পাই শ্রীশের মুখে। শ্রীশ বলেছে—"সমস্ত বড় কাজেই তপস্যার দরকার। নিজেকে নানা ভোগ থেকে বঞ্চিত না করলে, নানা দিক থেকে প্রত্যাহার ক'রে না আনলে, কোন মহৎ কাজে মন দেওয়া যায় না।" কিন্তু এর জবাবে কবির বক্তব্য শুনতে পাই বিপিনের মুখে—"সে

কথা মানি। কিন্তু সব মাসেই তো ধান ফলে না। শুকিয়ে মরতে গেলে না হ'ক শুকিয়ে মরাই হবে, ফল ফলবে না। তাই আমার মতে আমাদের স্বভাবসাধ্য অন্য কোন রকম কাজ অবলম্বন করাই ভাল"। শ্রীশ যখন উদ্‌বিগ্ন হ'য়ে বল্‌ছে "প্রতিদিন আমরা যেন আমাদের সংকল্প থেকে দূরে চ'লে যাচ্ছি—", তার উত্তরে বিপিন বল্‌ছে—"একদিন একটা সংকল্প করেছিলাম বলেই যে তার জন্যে নিজেকে শুকিয়ে মারতে হবে আমি তো তার মানে বুঝি নে।" সে বল্‌ছে, "অনেক সংকল্প আছে যা ব্যাঙাচির লেজের মত, পরিণতির সংগে সংগে আপনি খসে যায়। কিন্তু যদি লেজটুকুই শুধু থাক্‌ত আর ব্যাঙটা যেত মরে—তাহালে সে কী রকম হ'ত?" প্রতিজ্ঞা জীবনেরই অংশ। জীবনকে ব্যর্থ করে প্রতিজ্ঞা পালনের কোন অর্থই নেই। জীবনকে চরিতার্থ করবার জন্যে প্রতিজ্ঞা-ভংগ হ'লেও ক্ষতি নেই। মানুষটাকে মেরে ফেলে প্রতিজ্ঞাকে বাঁচিয়ে রাখা ঠিক যেন ব্যাঙটাকে মেরে তার লেজটাকে জীইয়ে রাখার চেষ্টার মত। শ্রীশ বল্‌ল—"বিপিন, তোমার তানপুরা ফেল"; বিপিন বল্‌ল "এই ফেললাম, তাতে পৃথিবীর কোন ক্ষতি হবে না।" যদি কোন মানুষ প্রতিজ্ঞা করে যে সে রসচর্চা ছেড়ে কেবলমাত্র কঠিন কাজ কর্‌বে, তা' হলে পৃথিবী তার পথ চেয়ে কাঁদতে বস্‌বে না। পৃথিবীর আনন্দ মেলা যেমন চল্‌ছিল, তাকে বাদ দিয়েও তেমনি চলবে, শুধু যে হত-ভাগ্য নিজেকে এই আনন্দ থেকে বঞ্চিত করবে সেই একা শুকিয়ে মরবে।

শ্রীশ যখন পূর্ণকে জানাল, "আমরা মনুষ্যত্বের কোন উপকরণ থেকে নিজেদের বঞ্চিত কর্‌ব না। আমরা ললিত সৌন্দর্য্য এবং কঠিন শৌর্য্য উভয়কেই সমান আদরে বরণ কর্‌ব, কেবল স্ত্রীলোকের কোন সংস্রব রাখব না, তখন পূর্ণ বলল—কিন্তু নারী কি মনুষ্যত্বের সর্বপ্রধান উপকরণের মধ্যে গণ্য নয়। তাকে বাদ দিলে ললিত-সৌন্দর্য্যের প্রতি কি সমাদর রক্ষা হবে?" পূর্ণ বলল—"মনুষ্যজন্ম আর পাব কিনা সন্দেহ, অথচ হৃদয়কে চিরজীবন যে পিপাসার জল থেকে বঞ্চিত কর্‌তে যাচ্ছি তার পূরণস্বরূপ আর কোথাও আর জুটবে কি? মুসলমানের স্বর্গে হুরী আছে, হিন্দুর স্বর্গেও অপ্সরার অভাব নেই—কিন্তু চিরকুমারসভার স্বর্গে সভাপতি এবং সভ্য-মহাশয়দের চেয়ে মনোরম আর কিছু পাওয়া যা'বে কি?"

স্বভাবের অনিবার্য্য প্রবলতা, মহৎ ব্রতে নারী-সংগের উপকারিতা বা অনুপযুক্ততা, সব কিছু বিচার-বিবেচনা বাদ দিয়ে কবি এই বলতে চান যে নারীকে বাদ দেওয়া যে হৃদয়কে তার পিপাসার জল থেকে বঞ্চিত করা। জীবনকে এমন করে বঞ্চনা কর্‌লে মানুষ কোথায় তার কোন ক্ষতি-পূরণ খুঁজে পাবে?

এই জন্যই চিরকুমারসভার যে প্রহসন, তাতে সেই বিশেষ চিরকুমারসভার বিশেষ কটি কৌমার্য্য যুবকদের প্রতি কবির বিদ্রূপ উদ্যত হয়নি; যারা এ ব্রত নিয়েছিল তারা যে কেমন করে নারীর মায়ামন্ত্রের কাছে হার মান্‌ল—এ নিয়ে ঠাট্টা করা কবির উদ্দেশ্য নয়, কবি এই দেখাতে চেয়েছেন যে, যারা এই রকম ব্রতপালনের নিয়ম করে তারা কত বড় ভুলই না করে, মানুষের স্বভাব ধর্মের প্রবল বন্যায় তাদের এই নিয়মের বাঁধ কেমন করে ভেঙ্গে যায়। দেবতার হাতে গড়া নিয়মকে কি মানুষের নিয়ম ঠেকিয়ে রাখতে পারে? তাকে হার মানতেই হয়। [ক্রমশঃ

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

১২

উৎপলের একখানি উপন্যাসের নতুন সংস্করণ হবে। সে কিছু বাড়াতে বদলাতে চায় কিনা জানবার জন্যে পাবলিসার তাকে চিঠি দিলেন। সেই সঙ্গে জানালেন জবাবটা সে যেন শুধু চিঠিতে কি ফোনে না দিয়ে নিজেই একবার দয়া করে আসে। উৎপল তাঁর অনুরোধ রাখবার জন্যে তাঁর দোকানে গিয়ে হাজির হল। দোকানটি ছোট। কিন্তু প্রকারে ছোট নয়। কয়েক বছরের মধ্যে এঁরা অনেক টায়টেল বাড়িয়ে ফেলেছেন। বিশিষ্ট লেখকদের আকর্ষণ করে এনেছেন। যে তিনচারজন কর্মচারী কাউন্টারে কাজ করছেন তাঁদের হাত কামাই নেই, মুখ কামাই নেই। প্রকাশক সুধাময় দত্ত উৎপলকে দেখে বললেন, 'এই যে আসুন উৎপলবাবু। কী ব্যাপার বলুন তো। আপনায় খবরের পর খবর পাঠাচ্ছি, দেখাই নেই আপনার। আপনি কি কলেজ ষ্ট্রীটে যাতায়াত ছেড়ে দিলেন নাকি?'

উৎপল ভিতরে গিয়ে তাঁর পাশের চেয়ারটিতে বসে বলল, 'না ছাড়ব কেন।'

সুধাময়বাবু বললেন, তবে? এ মুখো যে হচ্ছেন না একেবারে। ব্যাপারটা কি। না কি আড়াল দিয়ে আর কোথাও যাতায়াত করছেন?'

উৎপল বলল, 'যত আড়ালই দেই আপনার চোখ এড়াবার কি জো আছে? আপনার কি যে সে দৃষ্টি?'

সুধাময়ও হাসলেন, বললেন, 'স্বীকার করেন তাহলে? শুনুন আপনার দূরের সুর তো ফের প্রেসে দিচ্ছি! বদলাবেন টদলাবেন নাকি কিছু?'

উৎপল বলল, 'না। কী আর বদলাব।'

যুবক সেলসম্যানটি বইয়ের তালিকায় পেনসিলের দাগ দিচ্ছিল—সে ঘাড় ফিরিয়ে হেসে বলল, 'আমি তো আপনাকে আগেই বলেছিলাম উৎপলবাবু একটি লাইনও বদলাবেন না। সে ধরণের মানুষই উনি নন। একবার লিখে দিয়েছেন এই ঢের। তারপর তার ওপর ফের কলম ধরা? তা ওঁর কুষ্টিতে নেই। প্রুফ দেখাবার বেলায় আমি তা বুঝেছি। তিন চার ফর্মার মত প্রুফ জমিয়ে রেখে শেষে একদিন সব ফেরত দিয়ে বললেন— আপনারাই সব দেখে নেবেন। কলমও ধরেননি একবার। অথচ কেউ কেউ প্রুফের ওপর একেবারে নতুন নতুন চ্যাপটার লিখে দেন।'

পরেশ সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নিল।

সুধাময়বাবু বললেন, 'আপনাকে আর একটি ব্যাপারে দেখা করবার জন্যে খবর দিয়েছি।'

উৎপল বলল, 'বলুন।'

সুধাময়বাবু বললেন, 'আপনার দূরের সুর ভাবছি মাস-খানেক পরে প্রেসে দেব। তার আগে নতুন একখানা কিছু দিন না।'

উৎপল একটু নৈরাশ্যের সুরে বলল, 'নতুন বই আর কই লেখা হল?'

সুধাময়বাবু বললেন, 'হল না? বসলেই তো হয়ে যায় মশাই। লিখে দিন না একখানা! আমি যেন কার কাছে শুনলাম আপনি লিখছেন, বেশ নতুন আর বড়গোছের একখানা বই-ই লিখছেন। আর কারো সঙ্গে কথাটথা বলেছেন নাকি?"

উৎপল বলল, 'কী যে বলেন। বইয়ের নামে দেখা নেই, কথা বলে কী হবে?'

সুধাময়বাবু একটুকাল উৎপলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বয়স পঞ্চাশ পার হয়ে গেছে। মাথার চুলে কানের কাছে অল্প অল্প পাক ধরেছে। শুধু কথাবার্ত্তায়

নয়, আকৃতি প্রকৃতিতেও বেশ বৈষয়িক ধরণের মানুষ। সামান্য পুঁজি নিয়ে ব্যবসায়ে নেমেছিলেন। নিজের বুদ্ধি আর অধ্যবসায়ের জোরে অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছেন।

তিনি বললেন—'বেশ, না লিখে থাকলে লিখুন। এই তো লিখবার বয়েস, খাটবার বয়েস। জোরসে কলম চালিয়ে যান। এর পরে আর হবে না মশাই। প্রত্যেকেরই এক একটা সময় আসে। সেই সময়ের মধ্যে যদি কিছু করতে পারলেন, বাস, হল। আর তা যদি না পারলেন, সময় যদি একবার সরে গেল তাহলে আর হল না। কতজনকে দেখলাম। তখন দিনরাত কলম গুতিয়েও কোন ফল হয় না।'

উৎপল স্মিতমুখে সুধাময়বাবুর অভিজ্ঞতাজাত অমূল্য উপদেশ শুনে যেতে লাগল।

একটু বাদে গলা নামিয়ে সুধাময়বাবু বললেন, 'আপনি সেবার টাকার কথা বলেছিলেন। নতুন বইয়ের বাবদ কিছু আগাম নিয়ে যেতে পারেন। না না, আগের বই বাবদ এখন কিছু দিতে পারব না। সেকেণ্ড এডিশনের বই। ছাপাটাপা হোক—প্রেস খালি পাওয়াই এক সমস্যা। প্রেস পাই তো, কাগজ পাইনে, কাগজ পাইতো প্রেস পাইনে। আপনাদের তো আর এ সব ঝামেলা পোয়াতে হয় না মশাই। আপনাদের কি। আপনারা তো লিখেই খালাস।'

আর একদিন আসবো বলে সুধাময়বাবুকে নমস্কার জানিয়ে উৎপল উঠে পড়ল।

এখানে এলে সুধাময়বাবু উৎপলকে ঠিক এ ধরণের অনুপ্রেরণা দিয়ে থাকেন। আগেও দিয়েছেন। যদিও ওধরণের তাগিদে কারো পক্ষে লেখা সম্ভব নয়, পরিমাণটা সমূহ অর্থকরী হলেও তাকেই সিদ্ধির একমাত্র মান বলে উৎপল স্বীকার করে না, তবু মাঝে মাঝে এসে সুধাময়বাবুর এই ধরণের উপদেশামৃত শুনতে তার ভালো লাগে। উৎপল ওঁর কথাবার্ত্তা শোনে, আর মনে মনে হাসে। কখনো বা লেখা সম্বন্ধে ওঁর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে নিজের দৃষ্টিভঙ্গিকে মিলিয়ে দেখে, তুলনা করে দেখে। সুধাময়বাবু বই ছাপতে পারলেই খুসি। সব বই নয়, যে ধরণের বই বিক্রী হবে ওর ধারণা, সেই সব বই ভালো করে ছেপে বেঁধে প্রকাশ করতে পারলেই ওঁর পরমার্থ লাভ। অর্থই ওঁর পরমার্থ। কিন্তু উৎপলের তো নয়। অর্থ যদিও তার কাছে অতি প্রয়োজনীয় বস্তু তবু তাই সব নয়। এমন কি যশও সমগ্রের অংশ মাত্র। প্রকাশকের মত তারও যেন শুধু প্রকাশেই পরমার্থ। চিন্তাকে অনুভূতিতে বাক্যের অবয়ব দেওয়ার আনন্দ। সে আনন্দ দুর্লভ ক্ষণস্থায়ী—বোধ হয় সেইজন্যেই দুর্মূল্য। সে আনন্দের কাছে অন্য সব তৃপ্তি ম্লান তুচ্ছ। সুধাময়বাবু কি সেই সুধার স্বাদ কল্পনা করতে পারেন? লিখতে পারার আনন্দ—আর না লিখতে পারার যন্ত্রণার কথা ধারণা করতে পারেন? নিজের লেখা দিনকয়েকবাদে নিজের কাছে বাসি আর বিস্বাদ হওয়ার নৈরাশ্য অনুমান করতে পারেন? হয়তো পারেন না।

তবু সুধাময়বাবুর কাছে আসতে উৎপলের ভালো লাগে—'লিখুন লিখুন, লিখে যান'—যত ভিন্ন উদ্দেশ্য আর অর্থ নিয়েই বলা হোক, এই ধ্বনি উৎপলকে উৎসাহিত করে। অন্তত তার মত অখ্যাত তরুণ লেখককে একজন প্রকাশকও যে মাঝে মাঝে বলেন, 'চাই, চাই আপনার লেখা চাই' তাতে উৎপল চরিতার্থ হয়। সুধাময়বাবু অবশ্য উৎপলের লেখা পড়েন না। কারো লেখাই পড়েন কিনা সন্দেহ, পড়লেও কতটুকু উপভোগ করেন তা আরো বেশি সংশয়কর। তবু তিনি লেখক আর পাঠকের মধ্যে সেতু। মিলনের ঘটক। মধ্যমণি।

উৎপল সতীশঙ্কর রায়কে নিয়ে যে বই লিখছে, তা কি সুধাময়বাবু শুনতে পেয়েছেন? কোথেকে শুনলেন? নাকি এও তার বিশুদ্ধ অনুমান। আন্দাজে ঢিল ছোঁড়া। যেমন আরো পাচজন লেখককে বলেন—উৎপলকেও তেমনি বলছেন। নইলে যে লেখা এখন পর্যন্ত তাঁর মনের মধ্যে জট পাকাচ্ছে, সেই জটাজাল ভেদ করে এখনো সুরধনীর মত সমতলে প্রবাহিত হয়ে আসেনি—সেই অন্তঃশীলার খোঁজ সুধাময়বাবুর পাবার তো কথা নয়। এ বই কবে লেখা হবে কে জানে। উপন্যাসের চেহারা পাবে কিনা তাও উৎপল জানে না। উপন্যাস ছাড়া তো সুধাময়বাবু কিছু ছাপতে রাজী হবেন না। কিন্তু যদি সতীশঙ্কর রায়ের জীবন বৃত্তান্তকে অবলম্বন করে উপন্যাস একখানা উৎপল লিখতেও পারে তাও কি নিজের প্রকাশককে দিতে পারবে? মাসের পর মাস তাকে টাকা দিয়ে সেই অলিখিত বইয়ের স্বত্ব অলিখিতভাবেই কি মিসেস রায়

কিনে রাখছেন না ? উৎপল এ পর্যন্ত তার কোন বইয়ের স্বত্ব বিক্রি করেনি। শুধু এডিশন রাইট বিক্রি করেছে। আজকাল কোন লেখকই স্বত্ব বিক্রির হীনতা স্বীকার করে না—তার বই বাজারে চলুক আর নাই চলুক। উৎপল শুনেছে তিরিশের দশকেও এখনকার অনেক প্রবীণ প্রখ্যাত লেখক নামমাত্র দামে বইয়ের কপিরাইট বিক্রি করে দিয়েছেন। উৎপলের ভাগ্য ভালো, সেই যুগ পার হয়ে সে লেখক হিসাবে জন্মেছে। মিসেস রায়কে নিজের লেখার স্বত্ব নিজের লেখকত্ব বিক্রি করে দিয়ে উৎপল কি পুনর্মূষিক হতে চায় না কি ? না কক্ষণো না। তা হতে পারে না। মিসেস রায় যত ব্যক্তিত্বশালিনী—যত রূপ গুণ বিত্তা আর বিত্তের অধিকারিণীই হন না কেন, উৎপল তার স্বত্ব বিক্রি করতে পারে না। তা হলে এ মাস থেকে টাকা নেওয়া বন্ধ করতে হয়। বেশ, তাই করবে। নতুন করে নতুন সর্তে চুক্তি করতে হবে। উৎপল তাতে গররাজী হবে না। কিন্তু সব সর্তের মূল কথা স্বত্ব উৎপলের নিজের থাকবে।

খানিক বাদে নিজের কাণ্ড দেখে উৎপলের হাসি পেল। কালনেমির লঙ্কা ভাগ করে লাভ কী। যে বইয়ের একটি পাতাও সে আজ পর্যন্ত লিখে উঠতে পারল না, শুধু কাগজ ছেঁড়া আর খসড়ার অদল বদলের মধ্যে যা আজও সীমাবদ্ধ—তার স্বত্ব উপস্বত্ব নিয়ে এই মুহূর্তে দুশ্চিন্তায় না ডুবলেও উৎপলের চলবে।

হঠাৎ কাঁধের ওপর কার থাবা পড়তে উৎপল চমকে উঠে মুখ ফেরাল। হেসে বলল, 'আরে তুমি !'

চিন্ময় বলল, 'হ্যাঁ। আমি তোমাকে তোমার পাবলিশারের দোকানে ঢুকতে দেখলাম,বেরোতে দেখলাম—তারপর এই হনহন করে ছুটতেও দেখছি। ব্যাপার কি বলতো। যাচ্ছ কোথায় ?'

অনেকদিন বাদে কলেজের এই পুরোণো বন্ধুটির সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় উৎপল খুসি হল, হেসে বলল, 'যদি বলি গোল্লায় যাচ্ছি।'

চিন্ময় বলল, 'বিশ্বাস করব না। তোমার সে ক্ষমতা নেই। গোল্লায় যেতে হলে মনের জোর দরকার। তোমার সে জোর নেই।'

উৎপল বলল, 'পকেটের জোরের কথা বুঝি ভুলে গেলে।'

চিন্ময় বলল, 'ভুলব কেন। তোমার পকেট যে আজকাল ভারি তা কে না জানে। শুনেছি আজকাল কলম ধরলেই দেখতে না দেখতে দু-পকেট ভরে ওঠে। আমরা তো শুধু মুখবাজি করেই গেলাম।'

চিন্ময় চক্রবর্ত্তী হুগলী জেলার গ্রামাঞ্চলে একটি নতুন কলেজে প্রফেসারী করে। সপ্তাহে পাঁচদিন ছাত্রদের বিত্তা দান করে ছুটির দুদিন কলকাতায় কাটিয়ে যায়। এখানে তার বাবা-মা আছেন, স্ত্রী-পুত্রও আছে তাঁদের কাছে নিরাপদ আশ্রয়ে। উৎপলের মত জীবিকার অনিশ্চয়তা নেই চিন্ময়ের, জীবনও শান্তির নীড়ে সুখের সন্ধান পেয়েছে। তার সঙ্গে উৎপলের তুলনাই হয় না।

উৎপল বলল, 'লেখকদের সম্বন্ধে অমন একটা ধারণা থাকা ভালো। কিন্তু এমন ধারণা যদি মুদি, বাড়িওয়ালার সবাইরই থাকত, তাহলে সংসার কী সুখেরই যে হত !'

চিন্ময় হেসে বলল, 'তোমার সুখ কোনকালেই হবে না। তুমি চিরকালের পেশিমিষ্ট। কিন্তু সবাইর কাছেই তো লেখকদের অবস্থা আজকাল বেশ ভালো। দেশে এন্তার বই বেরোয়, এন্তার বিক্রি হয়। কয়েক বছর যেতে না যেতেই লেখকরা বাড়ি-গাড়ির মালিক হয়। শুনি আর আঙুল কামড়াই। আর কলেজ লাইফে আমিও তো শুরু করেছিলাম। গল্প কবিতা দুই-ই কলেজ ম্যাগাজিনে বেরোত। মনে আছে তোমার ? কিন্তু এখন তিনটে কলম ভাংগলেও আর দুটো লাইন মিলাতে পারিনে ভাই। সব অভ্যাস। সবই অভ্যাসের ওপর নির্ভর করে।'

রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে বিনা প্রতিবাদে উৎপল বন্ধুর মুখে অভ্যাসের মাহাত্ম্য বর্ণনা শুনে নিল। তারপর বলল, 'চল, এবার একটু চা খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে নেওয়া যাক। কোথাও গিয়ে বসা যাক খানিকক্ষণ।'

চিন্ময় সঙ্গে সঙ্গে হাতঘড়ির দিকে তাকাল, তারপর ব্যস্ত হয়ে বলল, 'না ভাই। চারটের সময় আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেণ্ট আছে। কথায় কথায় অনেক দেরি হয়ে গেল। আর একদিন সুস্থমত চা খাব এসে তোমার সঙ্গে।'

উৎপল বলল, 'আরে আমাকে ফেলে যাচ্ছ কেন ? যাবে কোথায় বলনা ? আমি তো তোমাকে হ্যারিসন রোডের মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দিতে পারি। নাকি তাতে তোমার আপত্তি আছে ?'

চিন্ময় হেসে বলল, 'বা রে, আপত্তি কিসের বলমা—আমার সঙ্গে। তুমি যাবে কোথায়?'

এবার গন্তব্যটা উৎপল আর গোপন করল না, বলল, পার্কসার্কাসের কাছাকাছি। বেগবাগান।'

চিন্ময় বলল, 'তাহলে তো ভালোই হল। চল এক সঙ্গে যাই। যদিও কলেজ থেকে বেরিয়ে তুমি ভিন্ন পথ নিয়েছ, তবু এখন মিনিট দশেক আমরা এক পথের পথিক হতে পারি। আমাকে যেতে হবে ইণ্টালী। আমি নেমে থাকব। তুমি রথে চড়ে এগিয়ে যেয়ো।'

দুজনে ট্রাম লাইন পার হল। বাস আসতে দেরি হচ্ছে দেখে চিন্ময় পার্কসার্কাসগামী একটি ট্রামে উঠে পড়ল। পিছনে পিছনে উৎপলও উঠল। ভাগ্য ভালো যে দুই বন্ধু পাশাপাশি বসবার সুযোগ পেয়েছে। এই পথটুকু ওরা গল্পে গল্পে যেতে পারবে।

কৌতূহলটা উৎপলেরই বেশি। একটু বাদে জিজ্ঞাসা করল, 'ইণ্টালীতে কোথায় যাবে?'

চিন্ময় বলল, 'সুরেশ সরকার রোড।'

উৎপল বলল, 'এবার যদি জিজ্ঞেস করি—কার বাড়িতে, তুমি নিশ্চয়ই অবাক হয়ে ভাববে লোকটা কী গ্রাম্য।'

চিন্ময় হেসে বলল, 'তা ভাববনা। আমি জানি গোয়েন্দা, স্ত্রীলোক আর লেখকের বাস গ্রামেই হোক, আর সহরেই হোক তারা স্বভাব কৌতূহলী। যাচ্ছি প্রবোধ দত্ত নামে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে। নাম শুনে থাকবে প্রবোধ দত্তের। বিপ্লবী কর্মী ছিলেন সেকালের। সতীশঙ্কর রায়দের কনটেম্পরারী। বোধ হয় একই দলে কি উপদলে কাজ করেছেন। এখন কংগ্রেসী এম-এল-সি। প্রভাব প্রতিপত্তি আছে। এবার তুমি জিজ্ঞেস করবে—কী উদ্দেশ্যে যাচ্ছি, এই তো?'

উৎপল বলল, 'জিজ্ঞেস করতে পারি তবে বলা না বলা তোমার ইচ্ছে। যদি গুহ্য কোন ব্যাপার হয় তাহলে আর বলবার দরকার নেই।'

চিন্ময় বলল, 'ব্যাপারটা গোপনই বটে। তবে তোমাকে বলতে বাধা নেই। আশা করছি তুমি নিশ্চয়ই কথাটা ফাঁস করবে না, আমার প্রতিদ্বন্দ্বীও হবে না।'

উৎপল হেসে বলল, 'তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। তোমার গোপন কথা আমি মনের সিন্দুকে তালা-চাবি দিয়ে রাখব। আর রাইভালরির কথা বলছ? কোন ক্ষেত্রেই তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার যোগ্যতা আমার নেই।'

চিন্ময় হেসে বলল, 'ঈশ বিনয়ের অবতার একেবারে।' তারপর ব্যাপারটা মোটামুটি খুলেই বলল চিন্ময়। মফঃস্বলে পচে মরতে তার আর ইচ্ছা নেই। কলকাতার কলেজগুলিতে সে অনেকদিন ধরেই চেষ্টা করছে। কিন্তু প্রবেশ-পত্র পাওয়া সহজ নয়। এবার যে কলেজে ঢু মারতে যাচ্ছে, তার কমিটিতে প্রবোধবাবু প্রভাবশালী সদস্য। সরকারী শিক্ষাদপ্তরের সঙ্গেও তাঁর জানা-শোনা আছে। তাই চিন্ময় আশা করছে যদি কিছু একটা সুরাহা হয়। প্রবোধবাবু চিন্ময়ের অপরিচিত নন। বাবার বন্ধুদের একজন। তবে কিছু করবেন কি করবেন না সেটা তাঁর মর্জির ওপর নির্ভর করে।

উৎপল চিন্ময়ের বাকি কথাগুলিতে আর তেমন কান দিতে পারছিল না। প্রবোধ দত্ত যে সতীশঙ্কর রায়ের সমসাময়িক এবং সহকর্মী এই তথ্যটুকুই তার মনের মধ্যে নেমে রয়েছে।

মৌলালীর পরের ষ্টপে এসে চিন্ময় যখন নামল উৎপলও সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়ল।

চিন্ময় অবাক হয়ে বলল, 'একী, এখানে নামলে যে। তুমি তো আরো খানিক দূর যেতে পারতে। নাকি এখান থেকে বাস নেবে? 'ওই যে একটা এইট-বি আসছে।'

উৎপল বলল, 'না চিন্ময়, আপাতত এইট-বিতে যাচ্ছিনে। তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।'

চিন্ময় বলল, 'সে কী। আমার সঙ্গে কোথায় যাবে?'

উৎপল বলল, 'প্রবোধবাবুর সঙ্গে আমার একটু পরিচয় করিয়ে দেবে। ভয় নেই তোমাদের বেশি সময় নষ্ট করব না। শুধু পরিচিত হয়ে থাকব। দু'চার মিনিটের মধ্যেই চলে আসব। যদি ভরসা পাই বরং আর একদিন এসে ওঁর সঙ্গে আলাপ-টালাপ করা যাবে।'

চিন্ময় বলল, 'ব্যাপার কি বলতো। হঠাৎ যে রাজনৈতিক নেতাদের ভক্ত হয়ে উঠলে। তোমার তো এসব অভ্যাস কোনকালে দেখিনি। তুমি যেমন খেলার মাঠে চিরকাল অনুপস্থিত, রাজনৈতিক বক্তৃতা সভাতেও তেমনি

তোমার টিকিটি দেখা যেতনা। হঠাৎ হল কী তোমার। প্রবোধবাবুর খোঁজে কী দরকার পড়ল।'

পাছে চিন্ময় সন্দেহ করে সেও চাকরির উমেদার, তাই উৎপল তার উদ্দেশ্যের খানিকটা আভাস দিল বন্ধুকে। একটু ইতস্তত: করে বলল, 'আমি একটা বই লিখছি। তাতে ওই পিরিয়ডের একটু ছিঁটে-ফোঁটার দরকার হবে।'

চিন্ময় হেসে ওঠে বলল, 'ও, তাই বলো। তাহলে তোমার মনেও কামগন্ধ আছে। তুমিও একেবারে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরোওনি। 'চল তাহলে। ওই যে দোতলা বাড়িটা দেখা যাচ্ছে, ওই বাড়ি।'

উৎপল লক্ষ্য করল পুরানো একটা ভাড়াটে বাড়ি। নিচে কিসের একটা কারখানার মত মনে হচ্ছে। ভিতর থেকে নানা রকমের মিশ্রিত শব্দ আসছে। ওপরের ঝুল-বারান্দায় কালো কৃশ এক বর্ষীয়ান ভদ্রলোক রেলিংএর ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছেন।

চিন্ময় অনুচ্চস্বরে বলল, 'উনিই।'

[ক্রমশঃ

রবীন্দ্র সঙ্গীতের ভূমিকা

শ্রীজয়দেব রায়

রবীন্দ্রনাথের গান আমাদের গৌরব বলিলে বোধ হয় সব কথা বলা হইবে না—রবীন্দ্রসঙ্গীত আমাদের অন্যতম জাতীয় পরিচয়। তাঁহার কাব্য, কথাসাহিত্য, দর্শন, জীবন প্রভৃতি লইয়া আলোচনা হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার গানের বিষয় এখনও তেমন লেখনী মাধ্যমে পরিচিত হইবার সুযোগ হয় নাই। অবশ্য গানের পরিচিত কণ্ঠে—নীরস প্রবন্ধের মধ্যে তাহার মূল্য অর্থহীন; তবু ইহা যে কবির গান সেই সাহসেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

পাশ্চাত্য দেশেও সঙ্গীতের একটা আলোচনাগত দিক আছে। গানের পক্ষে সুর সর্বস্ব হইলেও তাহার রসাবরণ ভেদ করিবার জন্য বাচন-ভাষণের প্রয়োজন আছে। গীতিসাহিত্য বিষয়ে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই, তাঁহার গানকে সাহিত্যের অঙ্গে ধরিয়া অনেক আলোচনা হইয়াছে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের কথায় তাঁহার সুরকেই প্রাধান্য দিতে হইবে।

তাঁহার অসংখ্য গানের সমষ্টি স্বতন্ত্র সুরসাগর বিশেষ, নানা ভাবের গান নানা রসের পর্যায় নানা সুরে ছন্দে রূপ পাইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও স্রষ্টার স্পর্শের পরিচয় সৃষ্টি বিচিত্র গীতি রীতিতে প্রকাশ করিতেছে—যে অপূর্ব সুরের মোহিনী-মায়া আমাদের অন্তরলোককে মুগ্ধ করে তাহার নামই রবীন্দ্র-সঙ্গীত। পুরাতন রাগরাগিনী এবং ছন্দে তিনি গান গাঁথিয়াছেন তবু সেগুলি নবীন হইয়া দেখা দিয়াছে, তাঁহার কাব্যেরই স্পর্শে, রবীন্দ্র কাব্য হইতে তাহার সঙ্গীতকে বিমুক্ত করাও সম্ভব নয়।

আমাদের রসশাস্ত্রের নানা রসকে তিনি গানে গানে ব্যবহার করিয়াছেন। সেগুলি সার্থক হইয়া উঠিয়াছে একটি স্বতন্ত্র 'গীতিরসে'। এই গীতিরসের উদ্বোধনে তিনি আহ্বান করিয়াছেন তাঁহার সুর-লক্ষ্মীকে—

জাগ' জাগরে' জাগ' সঙ্গীত
চিত্ত-অম্বর কর তরঙ্গিত।
নিবিড় নন্দিত প্রেম কম্পিত হৃদয় কুঞ্জ বিতানে।
মুক্ত বন্ধন-সপ্ত সুর তব করুক বিশ্ববিহার।
সূর্যশশি নক্ষত্রলোকে করুক হর্ষপ্রচার।
তানে তানে প্রাণে প্রাণে গাঁথ নন্দন হার।
পূর্ণ কর রে গগন—অঙ্গন তাঁর বন্দনা গানে।

এই ভাবে গানের পর গানে তিনি সাধনা করিয়া গিয়াছেন: হয়ত তিনি নিজের আনন্দের জন্যই গান বাঁধিয়াছিলেন, আজ আমরা বাহির দ্বার হইতে সেই আনন্দের কণামাত্র প্রসাদ পাইয়াই ধন্য মনে করিতেছি। হয়ত তিনি সেই জীবন দেবতাকেই কেবল তৃপ্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। হয়ত তিনি জীবন ভোগ করিতেই গান গাহিয়াছিলেন, আজ আমরা সকলে তাঁহার সঙ্গে একত্রে সেই সুরলোকের আনন্দ অনুভব করিতেছি—

সে গান আজিও নানা রাগ রাগিনীতে
শুনাই তাহারে আগমনী সংগীতে
যে জাগায় চোখে নূতন দেখার দেখা।
যে এসে দাঁড়ায় ব্যাকুলিত ধরনীতে
বন নীলিমার পেলব সীমানাটিতে,
বহু জনতার মাঝে অপূর্ব একা॥
অবাক আলোর লিপি যে বহিয়া আসে
নিভৃত প্রহরে কবির চকিত প্রাণে,
নব পরিচয়ে বিরহ ব্যথা যে হানে
বিহ্বল প্রাতে সংগীত সৌরভে,
দূর আকাশের অরুনিম উৎসবে॥

কবি নিজে তাঁহার গানের ভূমিকা লিখিয়া গিয়াছেন বিচ্ছিন্নভাবে নানা-স্থানে, তিনি নিজেই ছিলেন তাঁহার গানের মুখ্য ভোক্তা সমজদার। তিনি নিজেই তাঁহার গানের সীমার সন্ধান পান নাই, তাই আনন্দোচ্ছ্বাসে বলিয়াছেন—

আমার আপন গান আমার অগোচরে
আমার মন হরণ করে,
নিয়ে সে যায় ভাসায়ে সকল সীমারই পারে।

[রবীন্দ্র সঙ্গীতের ভূমিকা স্বরূপ আমরা তাঁহার লিখিত নিজের দুইটি প্রবন্ধকে গণ্য করিতে পারি—(১) সঙ্গীতের মুক্তি (সবুজপত্রে প্রকাশিত) (২) আমাদের সঙ্গীত (ভাদ্র ১৩২৮ সবুজ পত্রে প্রকাশিত) এবং বিচ্ছিন্ন ভাবে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ছেলেমানুষী প্রশ্নের উত্তরে। সুর ও সঙ্গিতে।

[শৈশব হইতেই গানের আড়ালেই কবি আত্মগোপন করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার গানের প্রথম সার্থক পরিচয় প্রসঙ্গে রহস্য করিয়াছিলেন—ভানুসিংহের জন্মকাল সম্বন্ধে চারিপ্রকার মত দেখা যায়। শ্রদ্ধাস্পদ পাঁচকড়িবাবু বলেন—ভানু সিংহের জন্মকাল খৃঃ ৪৫১ বৎসর পূর্বে...আবার কোন মূর্খ নির্বোধ গোপনে আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের নিকট প্রচার করিয়া বেড়ায় যে ভানু সিংহ ১৮৬১ খৃঃ জন্মগ্রহণ করিয়া ধরাধাম উজ্জ্বল করেন।" (নবজীবন, ১২৯১ শ্রাবণ, পৃঃ ৫৭। বৈষ্ণব পদাবলীর বিচ্ছিন্ন গানগুলির মনোভাবের সূত্রের সন্ধান করিয়া তাহার ধারাবাহিকতা দান করা হইয়াছে বৈষ্ণব পদাবলী সংগ্রহে; কবির নানা

রসের গানগুলিকে ও সেই ভাবেই গীতি-চয়নিকায় সঞ্চয়ন করা হইয়াছে কবি নিজেই পদাবলী সম্পাদন করিয়াছিলেন :—

"অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙ্গালী যে বৈষ্ণব কবিগণের পরিচয় গ্রহণ করেন করেন না, আমাদের বোধহয় ইহার একমাত্র কারণ বৈষ্ণব কাব্য-শাস্ত্রের অতি বিস্তৃতি। বটতলার "পদ কল্পতরু" প্রত্যেক সংস্করণে কিছু না কিছু রূপান্তর লাভ করে ; প্রথমতঃ আমরা তাহার ৪.৫ খানি সংস্করণের শ্রীরামপুরের পদকল্পতরু মিলাইয়া লইয়াছি। পদামৃত সমুদ্র, পদ-কল্পলতিকা এবং শ্রীগীতচিন্তামণি হইতেও যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি। কিন্তু কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি সে সম্বন্ধে আমাদের প্রধান সহায়—দানশীলা মহারাণী স্বর্ণময়ী মহোদয়ার গুরু-কুল শ্রীখণ্ডের মোহান্ত মহাশয়ের গৃহে রক্ষিত কীটদন্ত হাতের লেখা পুরাণো পুঁথির রাশি। বলা বাহুল্য, তথাপি অনেক অসম্পূর্ণতা রহিয়াগিয়াছে। কতকগুলি ভণিতা মিলে নাই—দুই একটিতে এক আধটিতে এক আধটা লাইনের পর্যন্ত অভাব আছে। কোন কাব্যরসজ্ঞ পাঠকের যদি জানা থাকে অথবা—কিঞ্চিৎ যত্ন করিয়া যদি কেহ সে অভাব পূর্ণ করিয়া দিতে পারেন, তবে ভরসা করি, তাঁহার অনুগ্রহে দ্বিতীয় সংস্করণে এবারকার অসম্পূর্ণতা দূর হইতে পারিবে। বেশী টীকায় রসাম্বু ভাবকতার বিঘ্ন করে বলিয়া ইচ্ছা-ক্রমেই সে সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করা হয় নাই।"

উপরের ভূমিকাটি রবীন্দ্রনাথ এবং শ্রীশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত "মহাজন পদাবলীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট কবিতাগুলির একত্র সংগ্রহ" নামে 'পদরত্নাবলী' (বৈশাখ ১২৯২) হইতে গৃহীত। ঐ বৎসরই কবির নিজের গানগুলির অনুকরণে—প্রথম চয়নিকা হয়। ভূমিকায় ছিল :—"১২৯২ সনের শেষদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রবাবু যতগুলি সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন প্রায় সেগুলি সমস্তই এই পুস্তকে মুদ্রিত হইল।" রবীন্দ্র সঙ্গীতের এই আদি সঙ্কলনটির নাম 'রবিচ্ছায়া'—নামটি বোধ হয় কবির দেওয়া, নিজেকে প্রচার করিবার এই তাঁহার প্রথম সুযোগ। 'রবিচ্ছায়া'র তিনটি ভাগ—ব্রহ্ম সঙ্গীত, জাতীয় সঙ্গীত এবং বিবিধ সঙ্গীত।

তাঁহার সকল গানেরই পরবর্তী সঙ্কলনে এই তিনটি ভাগ নির্দিষ্ট ছিল 'রবিচ্ছায়া' সম্পাদনা করেন যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র। বাংলাদেশের সেই সময়ের প্রসিদ্ধ পত্রিকা 'সঞ্জীবনী'তে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন হইতে কবির প্রচার উত্তম সম্বন্ধে ধারণা হইবে :—বাবু যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত। রবীন্দ্রবাবু ২৫ বৎসর পার না হইতেই একজন বিখ্যাত কবি ও প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ লেখক বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত হইয়াছেন। সঙ্গীত প্রণয়নে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা আছে। সঙ্গীতগুলি যেমন সরল সুমিষ্ট কবিত্বে পূর্ণ, তেমনি মনোহারিনী রাগিণীতে আবদ্ধ। এমন হৃদয়মুগ্ধকর সঙ্গীত বাঙ্গালীর মধ্যে আর কেহ প্রণয়ন করিতে পারেন কিনা আমরা জানিনা। সংগ্রাহক মহাশয় রবিবাবুর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সংগীতগুলি প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালীর সঙ্গীত পিপাসা নিবৃত্তির এক বিশেষ সুবিধা করিয়াছেন। রবিচ্ছায়া বাঙ্গালা ভাষার এক অপূর্ব সৃষ্টি। এ জন্য রবিবাবু ও যোগেন্দ্রবাবু উভয়কেই ধন্যবাদ দিতেছি।" (২০শে বৈশাখ ১২৯২)।

২২শে অগ্রহায়ণ ১২৯২ সালের পত্রিকার সংবাদ :—"রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় মুগ্ধ হন নাই' এমন শিক্ষিত বাঙ্গালী বিরল। তিনি কবিতা লিখিত বঙ্গ ভাষায় এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন। সেই রবীন্দ্রনাথের সংগীতগুলি 'রবিচ্ছায়া' নামে বিক্রীত হইতেছিল। যদি কখনও হৃদয় মনকে ক্ষণকালের নিমিত্ত সংসারের অতীত করিতে অভিলাষ হয়, যদি কখনও বিষাদময় অন্ধকার জীবনে জ্যোৎস্নালোকে আনয়ন করিতে মানস থাকে তবে আপনাদের জন্য সুবিধার সময় আসিয়াছে।" সে যুগের ভাষায় রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্বন্ধে এই এক অপূর্ব উক্তি হইয়াছিল। কবির এই চয়নিকা সঙ্কলনে 'যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্রের কৃতিত্ব ছিল। নিজেই তাঁহার কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছেন :—"শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র মহাশয় আমার কতকগুলি গান নানা খাতা-পত্র হইতে উদ্ধার করিয়া রবিচ্ছায়া নাম দিয়া একটি গানের বহি করেন। সেজন্য পাঠকেরা না হউক আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছি।"

তাঁহার পরবর্তী সঙ্কলন 'গানের বহি ও বাল্মীকি প্রতিভা'—১৮১৫ শক ৮ই বৈশাখে। ভূমিকায় কবি বলিতেছেন :—"রবিচ্ছায়া গ্রন্থ নিঃশেষ হইয়া এবং ইতিমধ্যে অনেকগুলি গান নূতন রচিত হইয়াছে। এই কারণে নূতন পুরাতন সমস্ত গান লইয়া বর্তমান গ্রন্থখানি প্রকাশ। অবশেষে পাঠকদিগের নিকট নিবেদন এই যে গ্রন্থের অধিকাংশ গানই পাঠ্য নহে। আশা করি, সুর সংযোগে শ্রুতি যোগ্য হইতে পারে।"—রবীন্দ্রনাথের গান সম্পর্কে ঐ সাবধানবানী তাহারপর বহুজন বহুবার উচ্চারিত করিয়াছেন।

এই চয়নিকাটিতে প্রায় ৩৫২টি গান আছে তিনটি ভাগে, গানের বহি, বাল্মীকি প্রতিভা এবং ব্রহ্ম সঙ্গীত। তাহার পর ১৩০৩ সালে প্রকাশিত সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থাবলীর 'গান' অংশ এবং ১৯০৩ খৃঃ মোহিতচন্দ্র সেনের কাব্য গ্রন্থের ৮ম ভাগ তাঁহার অত্যাধুনিক গানের সঙ্কলন। ১৯০৮ সালের যোগীন্দ্রনাথ সরকার সম্পাদিত 'গান' গ্রন্থে কবির আরও একটি অংশ সংযোজন হয়—বাউল নামে ১৯০৯ সালের 'গানে' অনুষ্ঠান-সঙ্গীত' নামে একটি নূতন অংশ যুক্ত হয়। ১৯১৪ সালে 'গানে' ধর্ম-সঙ্গীতকে ভিন্ন ভাবে চয়ন করা হয়। ১৯১৫ সালের ইণ্ডিয়ান প্রেসের কাব্যগ্রন্থের গানের খণ্ডটি দশম খণ্ড। তাহার পর ১৯২৫ সালে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কবির সেই সময়ের আধুনিক গানগুলির সঙ্কলন করেন।

কবির শেষ চয়নিকার নাম 'গীতবিতান'—প্রকাশিত হয় ১৯৩৯খৃষ্টাব্দে। গীতবিতানের ভূমিকায় কবি বলিয়াছেন—গীতবিতান যখন প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তখন সংকলন কর্তারা সত্বরতার তাড়নায় গানগুলির মধ্যে বিষয়ানুক্রমিক শৃঙ্খলা বিধান করিতে পারেন নি। তাতে কেবল যে ব্যবহারের পক্ষে বিঘ্ন হয়েছিল তা নয়, সাহিত্যের দিক থেকে রসবোধের ও ক্ষতি হয়েছিল! সেই জন্যে এই সংস্করণে ভাবের অনুষঙ্গ রক্ষা ক'রে গানগুলি সাজানো হয়েছে। এই উপায়ে, সুরের সহযোগিতা না পেলেও পাঠকেরা গীতিকাব্য রূপে এই গানগুলি অনুসরণ করতে পারবেন।"

কবির কিন্তু ভুল হইয়াছিল, কালানুক্রমিক সংগ্রহই তাঁহার গানের বিষয়ানুক্রমিক সূচি করিয়াছেন এই ভাবে :—(গান, বন্ধু, প্রার্থনা, বিরহ, সাধনা ও সংকল্প, দুঃখ, আশ্বাস, অন্তর্মুখে, আত্মবোধন, জাগরণ নিঃসংশয়, সাধক, উৎসব, আনন্দ, বিশ্ব, বিবিধ, সুন্দর, বাউল, পথ, শেষ, পরিণয়,) স্বদেশ, প্রেম, প্রকৃতি, বিচিত্র, আনুষ্ঠানিক এবং পরিশিষ্ট।

গানের মূল রসটি সুরের। তাহার সজ্জা সুন্দরতর হইত সুরের পর্য্যায়ে ভাগ করিলে। এমনিতেই কবির সমস্ত গানই প্রেমের গান। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিশ্বপ্রেমিক, তাঁহার ভাগবতী গীতিও মানবীয় প্রেম অঙ্গেই প্রকাশিত হইয়াছে।

শেষ জীবনে সঙ্গীতের এই দীর্ঘপথের সীমায় আসিয়া তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছেন—"আমাদের শিল্প-সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা আমরা হারাইতেছি। আমাদের জীবনের সঙ্গে তাহার যোগ নিতান্তই ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। আমাদের ঘরে ঘরে গ্রামোফোন রেডিওতে যে সকল সুর বাজিতেছে, থিয়েটার হইতে, সিনেমা হইতে যে সকল গান শিখিতেছি তাহা শুনিলেই বুঝিতে পারিবে। আমাদের চিত্তের দারিদ্র্যে কদর্যতা যে কেবল প্রকাশ মান হইয়া উঠিয়াছে তাহা নহে, সেই কদর্যতাকেই আমরা অঙ্গের ভূষণ বলিয়া ধারণ করিতেছি।"

গানের মুক্তি সুরে। সুরবিহীন অবস্থায় গান কথার সমষ্টি মাত্র; রবীন্দ্রনাথের গানে কিন্তু সুর ছাড়াও কিছু মূল্য আছে। কবি ছিলেন সুকণ্ঠের অধিকারী, নিজের সকল গানের সুর তিনিই দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সহকর্মীরা সেই সুরকে স্বরলিপির বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া চির-কালের জন্য সুরক্ষিত করিয়াছেন। কিন্তু যতক্ষণ না গানের গায়কের কণ্ঠে সুরের স্থান হয় ততক্ষণ রবীন্দ্র সঙ্গীত বাক্যের সমষ্টি মাত্র। কবি তাঁহার গানের শিক্ষার জন্য চিরকাল উৎসাহী ছিলেন। আজ তাঁহার অবর্তমানে সেই সুরের মর্য্যাদা ক্রমে বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে।

চিরকালই আমাদের ধর্ম শাস্ত্রের মতো সঙ্গীতকেও একটি নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমায়িত রাখা হইয়াছিল; অনধিকারীর পক্ষে তাহার প্রয়োজনই ছিল না। অবশ্য সকল রসশাস্ত্রের মতই সঙ্গীতেরও মুক্তি তাহার রসিকেরই কাছে।

সঙ্গীতকে হিন্দুস্থানী ওস্তাদরা ক্রমেই স্থবির করিয়া তুলিতেছিলেন, কবি ভগীরথের আবির্ভাবে তাহার মুক্তি হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথই এক সময়ে বলিয়াছেন :—

"এই জন্য সঙ্গীত আজ পর্যন্ত সেই সকল অশিক্ষিত লোকের মধ্যেই বদ্ধ—যাহাদের সম্মুখে প্রকাশ নাই, যাহারা অক্ষম স্ত্রীলোকের মতো নিজের সমস্ত ধনকে গহনা গড়াইয়া রাখিয়াছে। তাহাকে কেবল বহন করিতেই পারে, সর্বতোভাবে ব্যবহার করিতে পারে না। এমন কি ব্যবহারের কথা আভাস দিলেই তাহারা আতঙ্কিত হইয়া ওঠে, মনে করে ইহা তাহাদের সর্বস্ব খোয়াইবার পন্থা।"

ব্রহ্মসঙ্গীতের যুগে কাঙালীচরণ সেন এবং শান্তিনিকেতনের যুগে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচালনায় রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রথম সার্থক পরিচিতি লাভ করে। চিরকালই তাঁহার বাড়ীর আত্মীয়স্বজন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হইতে সৌম্যেন্দ্রনাথ পর্যন্ত সবাই ছিলেন গীতি প্রচারের অনুরাগী—সহায়ক। সঙ্গীত ভবনের প্রতিষ্ঠার পর হইতে তাঁহার গান শেখার কেন্দ্রীয় প্রচার পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রীর ন্যায় মহারাষ্ট্রীয় সুর শিক্ষকের সহায়তালাভ করিয়াছিলেন কবি। তিনি দেবনাগরি অক্ষরে গীতাঞ্জলির গানগুলির স্বরলিপি করিয়াছিলেন। ডক্টর আরনল্ড বাকের ফরাসী ইংরেজী ভাষায় রবীন্দ্রনাথের ২৬টি গানের স্বরলিপি করেন।

অরণ্য স্বাদ

বীরু চট্টোপাধ্যায়

এ এক অরণ্যস্বাদ, ঘিরে থাকে মন;
মৃত্যু মাখা সবুজের বিষণ্ণ নির্জন।
নিশাচর দীর্ঘশ্বাসে শত আপদের,
ক্রূর অন্ধকার রাত; হিংস্র শ্বাপদের

লালসায় লোলজিহ্ব দৃষ্টিভরা বিষ,
ছোবলের স্তরে স্তরে ঝরে অহর্নিশ।
বন্য এক তৃষ্ণা জ্বলে, শিকারের লোভে,
অকারণে ফুঁসে ওঠে সীমাহীন ক্ষোভে।

সহসা দাবাগ্নি বুঝি তীক্ষ্ণ বাণ হেনে
বনভূমি দগ্ধ করে শান্তি দেয় এনে।

❀ অতীতের স্মৃতি ❀

[পুরোনো আমলে আমাদের সমাজ ও জীবনযাত্রার প্রণালী কেমন ছিল তা জানবার আগ্রহ অনেকেরই আছে। সেই আগ্রহ মেটাবার জন্য সেকালের বহু বিচিত্র আলেখ্য সঙ্কলন করে একালের পাঠকপাঠিকাদের ধারাবাহিকভাবে উপহার দেবার ব্যবস্থা এই বিভাগে করা হলো। এ সব আলেখ্য থেকে রসগ্রাহী পাঠকপাঠিকা সেকালের সঙ্গে একালের রীতিনীতি, আচার-সংস্কার প্রভৃতির তুলনামূলক বিচার করে যেমন চিন্তার খোরাক পাবেন, তেমনি দেশের সামাজিক বিবর্তনের বিচিত্র ইতিহাসের সঙ্গেও সুপরিচিত হতে পারবেন। যেদিন অতীত হয়ে গেছে সেদিনটিকে আর আমরা ফিরে পাবো না, কিন্তু সেদিনের ভালোমন্দ অনেক বিষয় দেখে ও বিগত-কালের বিস্মৃত ভালোটুকু গ্রহণ করে আজকের এই সমস্যা-কণ্টকিত জীবনে হয় তো অনেকখানি স্বাচ্ছন্দ্য ও ভবিষ্যৎ-উন্নতির ইঙ্গিত খুঁজে পাবো।—সম্পাদক]

সেকালের আমোদ-প্রমোদ

পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায়

বাংলার কবি বলে গেছেন, ‘এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ, তবু রঙ্গভরা…’ কথাটা খুব সত্য। কেন না বাঙালীর জীবনে দুঃখ-দুর্দ্দশা-দুর্গতি চিরদিনই লেগে আছে। তার জন্য বাঙালী কোনোদিনই মুষড়ে ভেঙ্গে পড়েনি। সেই দুঃখ-দুর্দ্দশার ভিতর দিয়েই বাঙালীর কাব্য-কলা, শিল্প-কলা, সাহিত্য-সৃষ্টি, সঙ্গীত, নাট্য-কলা প্রভৃতির বিচিত্র বিকাশ বিশ্ব-সভায় বিশেষ বরণীয় হয়ে উঠেছে…বাঙালীর ‘বারো-মাসে তেরো-পার্ব্বণ’ বাদ পড়েনি এবং নানা দুঃখ-দুর্দ্দশা সত্বেও বিবিধ আমোদ-প্রমোদ নিয়ে বাঙালী বরাবর নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এবারে সেকালের বাঙলাদেশের কয়েকটি আমোদ-প্রমোদের আলেখ্য পরিবেষণ করা হলো…এগুলি থেকে বিগত উনবিংশ শতাব্দীর কয়েকটি জনপ্রিয় উৎসব-অনুষ্ঠানের সুস্পষ্ট পরিচয় মিলবে—আমাদের দেশ তখন ছিল ইংরাজ শাসনাধীনে।

* * *

মাহেশের রথযাত্রা

(সমাচার দর্পণ, শনিবার, ৫ই জুন, ১৮১৯)

স্নানযাত্রা। আগামী মঙ্গলবার ৮ জুন ২৭ জ্যৈষ্ঠ মোং মাহেশে জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা হইবেক। এই যাত্রা দর্শনার্থে অনেক ২ তামসিক লোক আবালবৃদ্ধ-বনিতা আসিবেন ইহাতে শ্রীরামপুর ও চাতরা ও বল্লভপুর ও আকনা ও মাহেশ ও রিসিড়া এই কএক গ্রাম লোকেতে পরিপূর্ণ হয় এবং পূর্ব্বদিন রাত্রিতে কলিকাতা ও চুঁচুঁড়া ও ফরাসডাঙ্গা প্রভৃতি সহর ও সন্নিকটবর্ত্তি গ্রাম হইতে বজরা ও পানসী ও ভাউলে এবং আর ২ নৌকাতে অনেক ধনবান লোকেরা নানাপ্রকার গান ও বাদ্য ও নাচ ও অন্য অন্য ২ প্রকার ঐহিক সুখসাধন সামগ্রীতে বেষ্টিত হইয়া আইসেন পরদিন দুই প্রহরের মধ্যে জগন্নাথদেবের স্নান হয়। যে স্থানে জগন্নাথের স্নান হয় সেখানে প্রায় তিন চার লক্ষ লোক একত্র দাঁড়াইয়া স্নান দর্শন করে।

পুরুষোত্তমক্ষেত্র ব্যতিরেকে এই যাত্রা এমন সমারোহ অন্যত্র কোথাও হয় না।

* * * *

সং

(সমাচার দর্পণ, ১৪ই এপ্রিল, ১৮২১)

চুঁচুড়ার সং।—গত সপ্তাহে মোকাম চুঁচুড়াতে অনেক২ আশ্চর্য্য সং করিয়াছিল। তাহার মধ্যে শ্রীশ্রীরামজীকে রাজা করিয়াছিল ও শ্রীমতী রাধাকে রাণী করিয়াছিল এবং

সুন্দর নৌকাতে নৌকাখণ্ড যাত্রা হইয়াছিল এবং শরৎকালীন দশভূজামূর্ত্তি এবং শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধ এই ২ রূপ অনেক প্রকার সং হইয়াছিল ইহার অধ্যক্ষ চুঁচুড়া শহরবাসী সকল ও কলিকাতাস্থ অনেকে। কিন্তু দুই ভাগে দুই কর্ম্মকর্ত্তা একজনের নাম খোঁড়া নবু, দ্বিতীয় চোরা নবু। এবৎসর এ সংগে খোঁড়া নবুর জয় হইয়াছে। গত বৎসর সং হইয়াছিল না—এ বৎসর উত্তমরূপ হইয়াছে ইহাতে অনুমান হয় প্রতি বৎসর হইতে পারে।

সখের কবি

(সমাচার দর্পণ, ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৮২৫)

সকের কবিতার বৃত্তান্ত।—পটলডাঙ্গানিবাসি শ্রীযুক্ত বাবু রূপনারায়ণ ঘোষাল মহাশয়ের বাটীতে শ্রীশ্রীবাগ্‌দেবী পূজোপলক্ষে কলিকাতা মহানগরীয় অনেক বর্দ্ধিষ্ণু সন্তানেরা ঐ স্থানে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক সকের কবিতা পরস্পর গাহনা করিয়াছেন তাহাতে আড়পুলি ও বাগবাজারের উভয় দলের সজ্জা এবং নৃত্য সন্দর্শনে বর্দ্ধিষ্ণু মহাশয়েরা যথেষ্ট তুষ্ট হইয়া নিশাবসানে স্ব২ ভবনে গমনকালীন আড়পুলির দলাধ্যক্ষকে সন্তোষপূর্ব্বক ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

* * * *

RAJA BUDDINATH ROY

(Bengal Hurkaru, 13th December, 1826)

On Saturday last, the generous Rajah Buddinath Roy, entertained a select and respectable body of ladies and gentlemen at his garden house on the Barrackpore Road, among whom was the Right Honourable the Vice President. The amusements of the evening consisted of wrestling and fights between several kinds of beasts. In the former the natives shewed great dexterity and considerable time elapsed before each knocked his fellow down; but with respect to the latter, the animals were too timid and domesticated to engage in anything like a contest.

Some native jugglers performed some remarkable feats to the astonishment of the admiring company.

Two Balloons were let off—one of which owing to the wire which supported the spirits of wine breaking fell at a distance of a few hundred yards from the place of ascent;
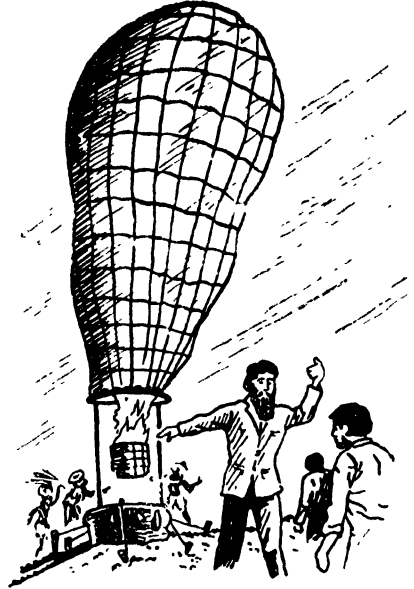
the other rose majestically in the air and was soon out of sight; it fell after an interval of about an hour at the commencement of the Dum Dum Road.

A little after dusk the party sat down to a sumptuous entertainment provided by Messrs Gunter aud Hooper. Several artificial fireworks were let off in the course of the evening and the native nautches were continued to a late hour.

At his departure his Lordship and the whole of the party expressed their utmost satisfaction with the amusements and entertainment provided by this hospitable native gentleman.

* * * *

হাফ-আখড়াই

(সমাচার দর্পণ, ২৪শে জানুয়ারী, ১৮২৯)

কবিতা সঙ্গীত সংগ্রাম।—এই নগর মধ্যে শ্রীযুত বাবু গুরুচরণ মল্লিকের দয়েহাটার বাটীতে গত ৬ মাঘ শনিবার রাত্রিতে বাগবাজারনিবাসি ও যোড়াসাঁকোনিবাসিদিগের দুই দলে কবিতা সংগীতের ঘোরতর সমর হইয়াছিল; তদ্বিশেষ এই বাগবাজারবাসি নানাকাব্যাভিলাষি রসিক রসজ্ঞ গান-বাদ্যাদি বিদ্যায়বিজ্ঞবিশিষ্ট সন্তান কএক জন এক সম্প্রদায়—তন্মধ্যে শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র বসু অগ্রগণ্য অর্থাৎ দলপতি। আর যোড়াসাঁকোস্থ ব্রাহ্মণ কায়স্থ তন্তুবায় প্রভৃতি কএক ব্যক্তির এক দল, এ দল বড় সবল যেহেতুক শ্রীযুত বৃন্দাবন ঘোষাল ও শ্রীযুত রামলোচন বসাক ইহারদিকের দুই জনের দুই দল ছিল এই উভয় দল মিলিত হইবায় সবল বলা যায়। দুই দলপতি অতিবিলম্বে অর্থাৎ দুই প্রহর রাত্রির পর প্রায় এক ঘণ্টার সময় স্বজনগণ সমভিব্যাহারে আসরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথমতঃ বাগবাজারবাসিরা গানারম্ভ করিবেন তদুদ্যোগ সে সাজ বাজান কারণ যন্ত্রের মিলন-করণে অধিক যন্ত্রণা মন্ত্রণাপুর্ব্বক সভাস্থ প্রায় সকলকেই দিলেন—ফলতঃ বিস্তর বিলম্ব হওয়াতে প্রায় তাবতে তিক্ত-বিরক্ত হইলেন এমত সময়ে একেবারে যন্ত্রিবরে ঢোলক তাম্বুরা মোচঙ্গ মন্দিরা পরিপাটী সিটিবাদ্যোদ্যম করিলেন তাহা শ্রবণে বহুজনে ধন্যবাদ করিলেন অনন্তর গানারম্ভ প্রথমতঃ ভবানীবিষয় পরে সখাসম্বাদ পরে খেঁউড় ইহাতে উভয় দলে কবিতা কৌশলে তান মান বাণস্বরূপ হইয়া ঘোরতর সমর হইয়াছিল সে রণে রসিক বিচক্ষণ-সমূহের মনোরঞ্জন হইয়াছিল যেহেতুক গায়কগণের মৃদু-মধুর মনোহর সুস্বর তালমান কবিতা রচনা বিবেচনা করত কে না সুখী হইয়াছিলেন কবিতাযুদ্ধ সুদ্ধ এই দেখা গেল এমত নহে ইহার পূর্ব্বে অপূর্ব্ব ২ গীত শুনা গিয়াছে কিন্তু সম্প্রতি এমত বোধ হইয়াছে যে কবিতা সংগ্রাম এ অবধি বিশ্রাম বা হয় বুঝি এমতে আর হবে না এই প্রকার গানে রাত্রি অবসানের পর দিন দিনমানে ৮ ঘণ্টা বেলা-পর্য্যন্ত হইয়াছিল। উভয় পক্ষের জয় পরাজয়হেতুক শ্রীযুত বাবু বীরনৃসিংহ মল্লিক বিবেচক স্থির হইয়াছিলেন তিনি তাবতের সাক্ষাৎকার বাগবাজারবাসিদিগের জয় কহিয়া দিবায় তাঁহারা জয়পতাকা উড্ডীয়মান করত অর্থাৎ জয়ঢাকস্বরূপ জয়ঢোল বাদ্বিয়া রাজপথে পথিক লোককে সন্তুষ্ট করত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

* * *

বুলবুলি-পাখীর লড়াই

(সমাচারদর্পণ, ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৩৪)

বহুকালাবধি এতন্নগরে একটা মহামোদের ব্যাপার আছে বুলবুলাখ্য পক্ষিগণের যুদ্ধ ঈক্ষণে অনেকে সুখী হইয়া থাকেন এজন্য ধনবান এবং সুরসিক বিচক্ষণগণের মধ্যে কেহ২ ঐ সুখ বিলক্ষণাস্বাদনকারণ সম্বৎসরাবধি উক্ত পক্ষিপালনকরণ বহু ধন ব্যয় করিয়া থাকেন। শীতকালে একদিবস যুদ্ধ হয়—সংপ্রতি গত ১৪ মাঘ রবিবার শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেবের বাটীতে ঐ যুদ্ধ হয়। তাহাতে মহাসমারোহ হইয়াছিল যেহেতুক দেববাবুর পক্ষিদলের বিপক্ষ হরিফ শ্রীযুত বাবু হরনাথ মল্লিকের একদল পক্ষী এতদুভয় পক্ষির পক্ষাধিপ মহাশয়েরা ঐ যুদ্ধদর্শনে আত্মীয় স্বজন সজ্জনগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন।…শ্রীযুত মহারাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর জয় পরাজয় বিবেচনা নিমিত্ত শালিস হইলেন। পরে উভয় দলের পক্ষির ঘোরতর সমর করিল…দুই প্রহর দুই ঘণ্টার পর মল্লিকবাবুর পক্ষ পক্ষি পরাজিত হইলে সভা ভঙ্গ হইল।—চন্দ্রিকা

* * *

বেলুন উড়ানো

(সম্বাদভাস্কর, ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৮৪৯)

বেলুন ২ বলিয়া সাধারণ লোকেরা যেমন উৎসাহ-যুক্ত হইয়াছিলেন তেমনি বেলুন দেখিয়া বিষাদ লইয়া গৃহে গমন করিয়াছে, গত সোমবারে বেলুন উড়িবার কথা ছিল তজ্জন্য লক্ষ ২ লোক রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুরের বাগানে গমন করেন কিন্তু মেগ্রি সাহেব সে দিবস বেলুন উড়াইলেন না, কহিলেন বেলুন উড়াইতে হইলে বেলা দশ-ঘণ্টা অবধি তাহার অনুষ্ঠান করিতে হয়, অদ্য দুই প্রহর পর্য্যন্ত বৃষ্টি গিয়াছে, কোন উদ্যোগ হয় নাই, সুতরাং অদ্য

হইতে পারে না। অতএব নিশ্চয় করিলেন তৎপর বুধবারে মেগ্রি সাহেব ঐ আকাশগামি যন্ত্র দ্বারা দুই ক্রোশ উচ্চে আকাশে দর্শন দিবেন, তাহাতেই বুধবারে উক্ত রাজোদ্যান লোকারণ্য হয়, কিন্তু সে দিবস মেং মেগ্রি বেলা দুই প্রহর তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত রাজ বাগানের উভয় দ্বারে দৌড়াদৌড়ী করিয়া বেড়াইলেন, আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম সাড়ে চারিঘণ্টা সময়ে তুমি উড়িবে এইরূপ বিজ্ঞাপন দিয়াছ, তিনঘণ্টা যায় কোন উদ্যোগ দেখি না, ইহার কারণ কি? সাহেব কহিলেন অতি শীঘ্র হইবে, কিন্তু তাহার পরেও অর্দ্ধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত নগদ এক ২ টাকায় টিকিট বিক্রীর টাকা কুড়াইয়া বেলুনে ধূম পূর্ণ করিতে গেলেন, তাহাতে প্রথম ধূম গ্যাসের ধূম দেন নাই বেলুনের মধ্যে কয়েকজন খালাসি দ্বারা বিচালী পোড়াইতে আরম্ভ করিলেন, এইরূপে বিচালীর ধূমে বেলুনের উপরিভাগ ফুলিয়া উঠিলে গ্যাসে অগ্নি দেন, দুই পিপা গ্যাস ধূমেতে কি এক বৃহৎ বেলুন উড়িতে পারে, বিশেষতঃ শীতকালে শেষ বেলায় শিশির পড়ে, শিশির ঠেলিয়া ধূম উপরে উঠিতে পারে না, অতএব বেলুন উড়িতে পারে নাই, পাঁচ ছয় হস্ত উঠিয়া অমনি পড়িয়া মরিল, ইহাতে দর্শক লোকেরা তৎক্ষণাৎ মেগ্রি সাহেবের দাড়ী ধরিয়া টানিতে আরম্ভ করেন।...

রামলীলা

(সম্বাদভাস্কর, ৪ঠা অক্টোবর, ৮৪৯)

রামলীলা।—শ্রীযুক্ত রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুরের বাগানে রামলীলার ভারি সমারোহ হইয়াছে প্রতি দিবসীয় শেষবেলায় রাজোদ্যানে এবং তচ্চতুর্দ্দিগে রাজপথে তিন-চারি শত গাড়ী উপস্থিত হয়, এবং অনূ্যন ১৫।১৬ সহস্র লোক বাগানের মধ্যে যাইয়া রামলীলা দেখেন রামলীলার জন্য কলিকাতা নগরে গাড়ি পালকীভাড়া দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে—শেষ বেলায় কলিকাতা নগরীয় বড় রাস্তায় গাড়ির ভিড়ে লোকেরা চলিতে পারে না।...

* * *

ঘোড়-দৌড়

(সংবাদপ্রভাকর, ২৩শে জানুয়ারী, ১৮৬৪)

পাইকপাড়ার ৺রাজা নৃসিংহচন্দ্র রায়ের বিখ্যাত রম্যোদ্যানে নগরবাসী এবং নগরের পার্শ্ববর্ত্তী সম্ভ্রান্ত ঘোড়সোয়ার বাবুগণ যে ঘোড়দৌড়ের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, বিগত দুই রবিবার অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময়ে তাহা দর্শনার্থ বিস্তর এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত ও অপর সাধারণ ব্যক্তিগণ এবং কয়েকজন ইংরাজ, যবন, ইহুদি ও মণ্ডল গমন করিয়াছিলেন, বাবুদিগের অশ্ব চালনার কৌশল সন্দর্শনে সকলেই যথেষ্ট পুলকিত হইয়াছেন, প্রথম বারের বাজির বাজী পবনবেগে ধাবিত হইয়া সকলের বিশেষ আমোদ বর্দ্ধন করে, দ্বিতীয় বারে বিজয়লোভী উভয়ে দ্রুত অথচ একত্র ভাবে গমন করেন যে, তাহাতে জয়পরাজয় নিরূপণ হয় না।

তৃতীয় বারের দৌড়ে কেমরালজিমান এবং নীলদর্পণ নামক অশ্বদ্বয় জয়লাভ করিয়াছে, কলিকাতাবাসী ঘোড়সোয়ার বাবুদিগের মধ্যে মৃত বাবু দীননাথ দত্ত ও অন্যান্য কএক জন, গড়ের মাটে ঘোড়দৌড়ে সাহেবদিগকে পরাজয় করিয়াছেন বটে, কিন্তু এতদ্দেশীয়দিগের বাজি রাখিয়া ঘোড়দৌড়ের স্বতন্ত্র স্থান নিরূপিত হয় নাই, দুই বৎসর কাল তাহা মৃত রাজা নৃসিংহচন্দ্র রায়ের উদ্যানে হইতেছে।

আগামী দিবসেও এই ঘোড়দৌড়ের মেলা খোলা হইবেক।...

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা—

গত ৯ এপ্রিল ভারতের নূতন প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু নিম্নলিখিত ১৭ জন পূর্ণমন্ত্রী ও ৬ জন রাষ্ট্রমন্ত্রী লইয়া নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করিয়াছেন। উপমন্ত্রীদের নাম তিনি পরে ঘোষণা করিবেন। পূর্ণ মন্ত্রী—(১) শ্রীজহরলাল নেহরু—প্রধান মন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী (২) শ্রীমোরারজী দেশাই—অর্থমন্ত্রী (৩) শ্রীজগজীবন রাম—পরিবহন ও যোগাযোগরক্ষা মন্ত্রী (৪) শ্রীগুলজারিলাল নন্দ—পরিকল্পনা, শ্রম ও নিয়োগ মন্ত্রী (৫) শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী—স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী (৬) সর্দার শরণ সিং—রেলমন্ত্রী (৭) কে, সি, রেড্ডী—বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী (৮) শ্রীভি, কে, কৃষ্ণ মেনন—প্রতিরক্ষা মন্ত্রী—(৯) শ্রীএস-কে, পাতিল—খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রী (১০) হাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিম—সেচ ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী (১১) শ্রীঅশোক কুমার সেন—আইন মন্ত্রী (১২) শ্রীকেশব দেব মালব্য—খনি ও ইস্পাত মন্ত্রী (১৩) শ্রীবি, গোপাল রেড্ডি—প্রচার ও বেতার মন্ত্রী (১৪) সি, সুব্রহ্মণ্যম—ইস্পাত ও ভারী-শিল্প মন্ত্রী (১৫) ডক্টর কে, এস, শ্রীমালি—শিক্ষামন্ত্রী (১৬) শ্রীহুমাউন কবীর—বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক বিভাগের মন্ত্রী (১৭) শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহ—সংসদীয় বিভাগের মন্ত্রী। নিম্নলিখিত ৬ জন রাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন—(১) শ্রীমেহের চাঁদ খান্না—পূর্ত, গৃহ-নির্মাণ ও সরবরাহ মন্ত্রী—(২) শ্রীমানুভাই শা—বাণিজ্য ও শিল্প বিষয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মন্ত্রী (৩) শ্রীনিত্যানন্দ কানুনগো—বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী (৪) শ্রীরাজ বাহাদুর—পরিবহন ও যোগাযোগ রক্ষার জাহাজী মন্ত্রী (৫) শ্রীএস, কে, দে—সমাজ উন্নয়ন, পঞ্চায়েতী রাজ ও সমবায় মন্ত্রী (৬) ডাক্তার সুশীলা নায়ার—স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের বয়স—

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার নূতন ১৭ জন মন্ত্রীর মধ্যে মাত্র এক-জনের বয়স ৫০ এর কম—তিনি শ্রীঅশোক কুমার সেন—৪৯ বৎসর। সর্বাধিক বয়স শ্রীনেহরু ও শ্রীহাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিমের—বয়স ৭৩ বৎসর। মোরারজী দেশাই—৬৬, কৃষ্ণ মেনন—৬৫, জি-এল-নন্দ—৬৩, এস—কে—পাতিল ও সত্যনারায়ণ সিংহ—৬২, কে—সি—রেড্ডি—৬০, কে—ডি—মালব্য—৫৯, লালবাহাদুর—৫৮, হুমাউন কবীর—৫৬, গোপাল রেড্ডি ও শরণ সিং—৫৩, জগজীবন রাম—৫৪, কে—এল—শ্রীমালি—৫৩, সি—সুব্রহ্মণম—৫২। মন্ত্রীদের গড় বয়স ৫৯,৭ বৎসর।

বাংলায় সাহিত্য-পুরস্কার—

খ্যাতিমান কথা সাহিত্যিক শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) 'হাটেবাজারে' উপন্যাস লেখার জন্য এবং শ্রীজিতেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় মৌলিক-গবেষণামূলক গ্রন্থ পঞ্চোপাসনা পুস্তক লেখার জন্য ১৩৬৮ সালের রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করিয়াছেন—পশ্চিম বঙ্গ সরকার প্রদত্ত এই রবীন্দ্র পুরস্কার—উভয়েই ৫ হাজার টাকা করিয়া পাইবেন। আনন্দবাজার পত্রিকা ও দেশ পত্রিকা প্রদত্ত 'প্রফুল্ল কুমার সরকার পুরস্কার' পাইয়াছেন—কবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক এবং 'সুরেশ চন্দ্র মজুমদার পুরস্কার' পাইয়াছেন—কথা-সাহিত্যিক শ্রীনরেন্দ্র নাথ মিত্র—প্রত্যেকে এক হাজার টাকা পাইবেন। আনন্দবাজার পত্রিকা ও দেশ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅশোক কুমার সরকার এবার তাঁহার মাতামহী ৺সরলাবালা সরকারের নামে আর একটি বিশেষ পুরস্কার দিয়াছেন—তাহা পাইয়াছেন—শ্রীপুলিন বিহারী সেন—তাহাও এক হাজার টাকা! অমৃতবাজার পত্রিকা ও যুগান্তর প্রদত্ত 'শিশির কুমার পুরস্কার' পাইয়াছেন—ডক্টর অধ্যাপক বিমান বিহারী মজুমদার এবং মতিলাল পুরস্কার পাইয়াছেন শ্রীবিমল মিত্র—প্রত্যেকটির পরিমাণ এক হাজার টাকা। বিশিষ্ট কবি হিসাবে এ বৎসর উল্টোরথ পুরস্কার পাইয়াছেন—ডক্টর অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্র—ঐ পুরস্কারের

মূল্য ৫ শত টাকা। এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স মৌচাক পত্রিকার নামে শিশু সাহিত্য লেখার জন্য ৫ শত টাকায় যে পুরস্কার দান করেন—এবার তাহা পাইয়াছেন শ্রীযুক্তা সুখলতা রাও।

পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী—

গত মাসের ভারতবর্ষে—আমরা পশ্চিমবঙ্গের নূতন ১৬ জন মন্ত্রীর নাম প্রকাশ করিয়াছি। তাহার পর নিম্নলিখিত ১১ জন রাষ্ট্রমন্ত্রী কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন—(১) শ্রীসৌরীন্দ্র নাথ মিশ্র (উপমন্ত্রী ছিলেন)—শিক্ষা (২) শ্রীতেনজিং ওয়াংদি (উপমন্ত্রী ছিলেন)—পশু-প্রজনন ও পশু-চিকিৎসা (৩) শ্রীস্মরজিৎ ব্যানার্জি—(উপমন্ত্রী ছিলেন)—স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিরক্ষা শাখা (৪) শ্রীচারুচন্দ্র মহান্তি (উপমন্ত্রী ছিলেন) খাদ্য, সরবরাহ (৫) শ্রীচিত্তরঞ্জন রায় (উপমন্ত্রী ছিলেন) সমবায় (৬) শ্রীঅর্দ্ধেন্দু শেখর নস্কর (উপমন্ত্রী ছিলেন)—আবগারি (৭) শ্রীআশুতোষ ঘোষ (উপমন্ত্রী ছিলেন) উন্নয়ন ও মৎস্য (৮) শ্রীবীজেশচন্দ্র সেন (নবাগত) গৃহ নির্ম্মাণ—(৯) ডাঃ প্রবোধ কুমার গুহ (নবাগত) শ্রম (১০) ডাঃ সুশীল রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় (নবাগত) স্বাস্থ্য (১১) শ্রীপ্রমথরঞ্জন ঠাকুর (নবাগত) উপজাতি কল্যাণ। উপমন্ত্রী হইয়াছেন নিম্নলিখিত ১০ জন—(১) সৈয়দ কাজেম আলি মির্জা (উপমন্ত্রী ছিলেন) পূর্ত (২) শ্রীজিয়াউল হক (উপমন্ত্রী ছিলেন) স্বায়ত্ত শাসন ও পঞ্চায়েৎ (৩) শ্রীমায়া ব্যানার্জি (উপমন্ত্রী ছিলেন)—শিক্ষা (৪) শ্রীতারাপদ রায় (নবাগত) সেচ ও জলপথ (৫) শ্রীমতী রাধারাণী মহাতাব (নবাগতা) জেল ও সমাজ কল্যাণ (৬) শ্রীকানাই লাল দাস (নবাগত) ভূমিরাজস্ব (৭) শ্রীজয়নাল আবেদিন (নবাগত) স্বাস্থ্য (৮) শ্রীমতী সাকিলা খাতুন—(নবাগতা) উদ্বাস্তু ও পুনর্বাসন (৯) শ্রীযুক্ত মুক্তিপদ চ্যাটার্জি—(নবাগত) শিক্ষা (১০) শ্রীমহেন্দ্র নাথ ডাকুয়া (নবাগত)—শিল্প ও বাণিজ্য। গতবারের উপমন্ত্রী শ্রীরজনী কান্ত প্রামাণিক এবার উপমন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াও সে পদ গ্রহণ করেন নাই—কাজেই তিনি দল হইত বাদ পড়িয়াছেন। এবার একজন রাষ্ট্রমন্ত্রীকে ও একজন উপমন্ত্রীকে শিক্ষা দপ্তরের এবং একজন রাষ্ট্রমন্ত্রী ও একজন উপমন্ত্রীকে স্বাস্থ্য দপ্তরের ভার দেওয়া লইয়াছে। পরিবহন দপ্তরটি কোন রাষ্ট্রমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী পান নাই—পরে হয় ত কেহ পাইবেন। মৎস্যদপ্তর মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়ের অধীনে আছে—তবে রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীআশুতোষ ঘোষ মৎস্য ওউন্নয়ন দপ্তরের কাজ পাইয়াছেন। গতবার মন্ত্রী রাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী লইয়া মোট সংখ্যা ছিল ২৯—এবার হইয়াছে ৩৭।

শ্রীঅতুল্য ঘোষ ও কংগ্রেস—

কয়মাস পূর্বে 'ভারতবর্ষ' ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল যে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস-নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ শীঘ্রই নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইবেন। ৩১শে মার্চ দিল্লীর খবরে প্রকাশ—রাজস্থান, মহীশূর, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা ও বিহার রাজ্য শ্রীঅতুল্য ঘোষকে নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভাপতি পদের জন্য প্রস্তাব করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ হইতে বহু দিন কেহ এই সম্মান লাভ করেন নাই—শ্রীঅতুল্য ঘোষ এই সম্মান লাভ করিলে বাঙ্গালী মাত্রই—শুধু তাহা কেন, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যার অধিবাসীরা পর্য্যন্ত আনন্দিত হইবেন।

লণ্ডনে ভারতের হাই-কমিশনার—

গত ৫ই এপ্রিল দিল্লীতে ঘোষণা করা হয় যে শ্রীএম-সি (মহম্মদ আলি করিম) চাগলা লণ্ডনে ভারতের হাই-কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি পূর্বে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রাষ্ট্রদূত ছিলেন এবং আইন-জ্ঞানের জন্য সারা ভারতে প্রসিদ্ধ।

কলিকাতায় প্লাবন-রোধ—

১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে কলিকাতা ও সহরতলীতে যে অভূতপূর্ব প্লাবন হইয়াছিল তাহার কারণ অনুসন্ধান ও প্রতীকার ব্যবস্থা স্থির করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি কমিটী গঠন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি সে কমিটীর সুপারিশ প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত ৬টি ব্যবস্থার কথা বলা হইয়াছে—(১) ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থার উন্নয়ন ও নিয়মিতভাবে পয়ঃপ্রণালীভুক্ত এলাকার মেরামতি ও পলী অপসারণ (২) প্রয়োজনবোধে বিভিন্ন পাম্পিং ষ্টেশনগুলির কার্য্যক্ষমতাবৃদ্ধি (৩) বর্তমানে পয়ঃপ্রণালী বহির্ভূত এলাকায় বৃষ্টির জল সরাইবার জন্য পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা। (৪) বানতলার বর্তমান সেডিমেনটেসন ট্যাঙ্কের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি (৫) জল অপসারণের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বানতলা হইতে কুলটী পর্য্যন্ত কর্পোরেশনের বর্ত্তমান

ওয়াটার ক্যানেল পুনর্গঠন (৬) হাড়োয়া কুলটী গাং-নদীর উন্নয়ন। মোটের উপর সত্বর ব্যবস্থাগুলি কার্য্যে পরিণত করা প্রয়োজন। এবার বর্ষা বেশী হইবে—কাজেই সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।

বিদ্যুৎ সরবরাহ ও বাংলা—

ডি-ভি-সি (দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন) কর্ত্তৃপক্ষ বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গকে উপেক্ষা করিয়া বিহার রাজ্যে অধিক পরিমানে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতেছেন—এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্প্রতি ডি-ভি-সি কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্বে ডি-ভি-সি উৎপাদিত বিদ্যুৎ শক্তির শতকরা ৫৫ ভাগ বিহার ও ৪৫ ভাগ পশ্চিম বাংলা পাইত—সম্প্রতি বিহারকে ৬০ ভাগ ও পশ্চিম বাংলাকে ৪০ ভাগ দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। অথচ ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা হইলে বিহার ৫০ ভাগ ও পশ্চিম বাংলা ৫০ ভাগ পাইবে। পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎশক্তি অভাবের জন্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সাধারণ অধিবাসীরা দারুণ অসুবিধা ও কষ্টভোগ করিতেছে। এ অবস্থায় এই বিষয়টির উপযুক্ত আলোচনা ও ব্যবস্থা প্রয়োজন।

কলিকাতায় পূর্ণাবয়ব মূর্ত্তি—

পশ্চিমবঙ্গ সরকার শীঘ্রই কলিকাতায় কয়েকটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিবেন। (১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২) চিত্তরঞ্জন দাশ ও (৩) সুভাষচন্দ্র বসু—তিনজনের মূর্তি গড়ের-মাঠে প্রকাশ্য স্থানে রাখা হইবে—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীকে মূর্তিগুলি নির্মাণের ভার দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া তিলক শতবার্ষিকী সমিতি লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি নির্ম্মাণ করাইয়া রাজ্য সরকারকে দিবেন—তাহাও গড়ের মাঠে রাখার ব্যবস্থা করা হইবে। কলিকাতা সহরে এই সকল মহাপুরুষের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

পশ্চিম বাংলার সম্মান—

গত ১৯৫৩ সাল হইতে ১৯৬১ সাল পর্য্যন্ত ৯ বৎসরে ভারত সরকার যে রাষ্ট্রীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার দিয়াছেন, তাহার মধ্যে ৬টি পশ্চিম বাংলার লোক পাইয়াছে। সেই ৬টির বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল—(১) ১৯৫৫—পথের পাঁচালী পরিচালক সত্যজিৎ রায় (২) ১৯৫৬—কাবুলীওয়ালা—তপন সিংহ (৩) ১৯৫৮—সাগর সঙ্গমে—পরিচালক—দেবকীকুমার বসু (৪) ১৯৫৯—অপুর সংসার—পরিচালক সত্যজিৎ রায় (৫) ১৯৬০—অনুরাধা—পরিচালক—হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় (৬) ১৯৬১—ভগিনী নিবেদিতা—পরিচালক—বিজয় বসু। বাকী মাত্র ৩টি অবাঙ্গালী পরিচালক পাইয়াছেন। আমরা বাঙ্গালী পরিচালকগণকে অভিনন্দিত করি।

নূতন রাজ্যপাল—

রাষ্ট্রপতি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কুমারী পদ্মজা নাইডু ও মহীশূরের রাজ্যপাল মহারাজা শ্রীজয়চাদরাজাকে পুনর্নিযুক্ত করিয়া স্ব স্ব রাষ্ট্রে রাজ্যপালের কাজ চালাইয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি নিম্নলিখিত ৪টি রাজ্যে নূতন রাজ্যপাল নিয়োগ করা হইয়াছে—(১) মহারাষ্ট্রে ডাক্তার শ্রীপ্রকাশের স্থানে ডাঃ পি-সুব্বারায়ণ (২) রাজস্থানে সর্দ্দার গুরুমুখ সিংএর স্থানে ডাক্তার সম্পূর্ণানন্দ (৩) উত্তর প্রদেশে ডাক্তার বি রামকৃষ্ণ রাওএর স্থানে শ্রীবিশ্বনাথ দাস (৪) বিহারে ডাক্তার জাকির হোসেনের স্থানে শ্রীঅনন্তশয়ন আয়েঙ্গার। আমরা নূতন ৪জন ও পুরাতন ২জন রাজ্যপালকে অভিনন্দিত করি।

শ্রীনেহরু নেতা নির্ব্বাচিত—

গত ৩রা এপ্রিল দিল্লীতে কংগ্রেস সংসদ দলের সভায় শ্রীজহরলাল নেহরু পুনরায় ভারতের কেন্দ্রীয় লোকসভা ও রাজ্যসভা দলের সদস্যগণের নেতা নির্বাচিত হইয়াছেন। গত ১৫ বৎসরকাল শ্রীনেহরু দলের নেতারূপে ভারত রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর কাজ করিতেছেন—আরও ৫ বৎসরকাল তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রীর কাজ করিতে হইবে। শ্রীনেহরুর শরীর ভাল না থাকায় তিনি ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন না। আমরা শ্রীনেহরুকে তাঁহার এই সম্মান লাভে অভিনন্দিত করি, এবং প্রার্থনা করি, তাঁহার পরিচালনাধীনে ভারত-রাষ্ট্র দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হউক। তিনিও সুস্থ শরীরে ভারত রাষ্ট্রের সেবা করিতে থাকুন। পৃথিবীতে আর কোন রাজনীতিক নেতার এই ভাবে ১৫।২০ বৎসর প্রধান মন্ত্রিত্ব করার সৌভাগ্য হয় নাই। সে দিক দিয়া শ্রীনেহরুর জীবন অসাধারণ বলা যায়।

॥ বর্ষ-বরণ ॥

ও হে সুন্দর মরি মরি—
কি দিয়ে তোমায় আজি বরণ করি ?

শিল্পী—পৃথ্বী দেবশর্ম্মা
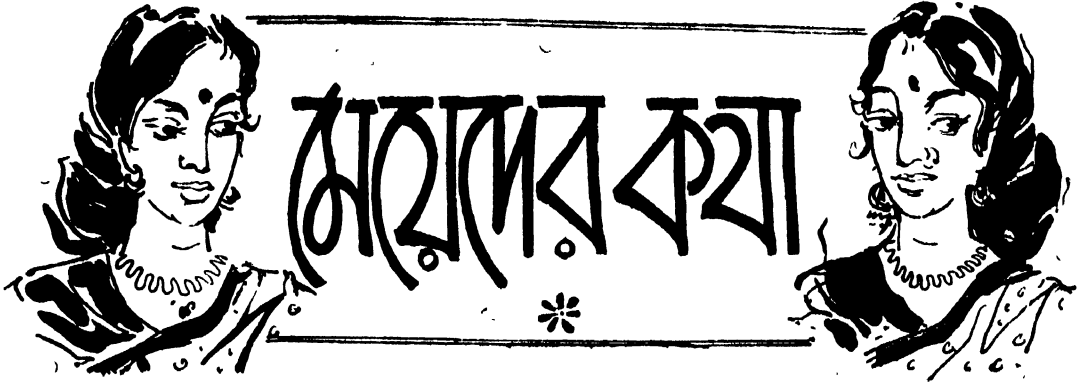
স্ত্রীণাং চরিত্রম্

মিসেস্ গোয়েল্

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৪)

মাতৃ-প্রধান সমাজের মেয়েরা নিশ্চয়ই একটু বেশী পুরুষ-প্রকৃতির, আর পুরুষেরা শিশু-প্রকৃতির। পুরুষেরা তাদের উপর নির্ভর করেই নিশ্চিন্ত, আর মেয়েরা পুরুষজাতির লালনপালন ও বর্ধনের ভার নিয়ে পরিতৃপ্ত। কিন্তু পুরুষ-প্রধান সমাজে যখন নারী মাতৃপ্রধানভাব নিয়ে বেড়ে উঠে তার মধ্যে পুরুষেরা দেখতে পায় পুরুষালি ভাব, যাকে আবার অনেক পুরুষ পছন্দও করে থাকে। আমাদের দেশে নারী-পুরুষের সমান অধিকার অবশ্যই শাসনতন্ত্র অনুসারে। কিন্তু এই সাম্য এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কি?

পাঞ্চালী যখন হাইস্কুলে ভর্তি হয়েছে তখন ভারতে নারী-জাগরণের জয়গান চলছে পূর্ণোদ্যমে। স্কুলের হেড্ মিস্ট্রেস্ ছিলেন চিরকুমারী বনলতা চক্রবর্তী। মানুষ বলতে তিনি শুধ্ নারীকেই বুঝতেন। তাঁর দৃষ্টিতে—"Every man is a woman, and any woman a king." প্রত্যেকটি মেয়েকে তিনি পুরুষের সমকক্ষ হয়ে, এমন কি পুরুষের চেয়ে বেশী শক্তিশালী হয়ে গঠিত হতে উপদেশ ও প্রেরণা দিতেন। বিবাহিতা শিক্ষয়িত্রীদের কটাক্ষ করতে কখনও ভুলতেন না। ছাত্রীদের মধ্যে মেয়েলিভাব দেখলে রেগে যেতেন। তাই পাঞ্চালী তাঁর সুনজরে পড়বে তাতে আর আশ্চর্য কি? তিনি পাঞ্চালীর দৈহিক শক্তির অনেক পরীক্ষা নিলেন। সে লাফ, দৌড়, সাঁতার সব কিছুতেই তার সমবয়সী মেয়েদের পরাজিত করে বিজয়িনীর পুরস্কার অর্জন করল প্রত্যেক বৎসরের প্রতিযোগিতায়। বনলতা চক্রবর্তী নিবারণ রায়কে অভিনন্দন জানালেন, "আপনার এই মেয়ে হাজার ছেলের কাণ কাটবে" মনের আনন্দে নিবারণ রায় বাড়ী ফিরে এলেন মেয়েকে নিয়ে। সগৌরবে সব বিবৃত করলেন সোহাগিনী দেবীর কাছে। সব শুনে কত খুশী হলেন সোহাগিনী। দুজনেই তখন করুণার চক্ষে দেখতে লাগলেন তারক রায়ের ছেলে-মেয়েদের। সত্যি যখন পাঞ্চালী গাড়ী ভর্তি করে পুরস্কার নিয়ে আসত, তখন উমাতারার ছেলেমেয়েগুলি হা-করে তাকিয়ে থাকত। সোহাগিনী দেবী তা লক্ষ্য করে বেশ গর্ব বোধ করতেন।

যদি সমাজে সত্যিকারের সাম্য প্রতিষ্ঠিত হত নারী-পুরুষের মধ্যে,তবে নারী-পুরুষের অনেক প্রকারের মানসিক বিকৃতি দূর হয়ে যেত আপনি থেকে। পুরুষ-প্রকৃতির নারী প্রথমতঃ পুরুষের সঙ্গ বেশী ভালবাসে। তারপর যখন সামাজিক কারণে শুধু নারী-সমাজে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য হয় তখন তার একটা স্বজাতি-প্রেম বৃদ্ধি পেতে থাকে। স্কুলের কোন দিদিমণিকে দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করে পূজা করে, আর সমবয়সীদের প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। শুধু

তাই নয়, তাদের দেহের প্রতিও তার আসক্তি জন্মে। কিন্তু সে যখন প্রতিযোগিতায় সকলকে হারিয়ে দিয়ে সম্মুখে এগিয়ে চলে, পুরুষকে পরাভূত করার দুর্বার বাসনা তাকে পেয়ে বসে। এরকম একটা বাসনা যখন পাঞ্চালীর মনে প্রবল হয়ে উঠেছিল তখনই সঞ্জয় গুহর সঙ্গে তার দেখা হয়।

সেদিন ছিল স্কুলের পুরস্কার বিতরণী সভা। সকলের চেয়ে বেশী পুরস্কার হাতে নিয়ে স্টেজের উপর দাঁড়িয়ে প্রণাম জানাল সকলকে পাঞ্চালী। অনুষ্ঠান দেখতে এসে সঞ্জয় গুহ সত্যি সত্যি মুগ্ধ হয়ে গেল। সঞ্জয় সে বছর বি-এ পাশ করেছে। মাথায় তার লম্বা চুল, পরণে আর্দ্দির পাঞ্জাবী, মুখখানা মেয়েলি। নিশ্চয়ই কবিতা লেখে সে। যতক্ষণ সে সভায় ছিল ততক্ষণ যেন কেমন তন্ময় হয়ে লক্ষ্য করছিল পাঞ্চালীর সর্ব্বাঙ্গের স্বচ্ছন্দ ও সাবলীন গতি, ভঙ্গি। পাঞ্চালীও লক্ষ্য করল সঞ্জয়ের করুণ দৃষ্টি। বড় ভালো লাগল তার। একটি পুরুষের করুণ চোখ তার বীর পদক্ষেপের নীচে যেন লুটিয়ে পড়ছে। তার অন্তরে কেমন একটা উল্লাস যেন মেঘনার ঢেউএর মত জেগে উঠল।

তার কিছুদিনের মধ্যেই সঞ্জয়ের সঙ্গে পাঞ্চালীর বিয়ে হয়ে গেল। বনলতা দেবী তার বিয়ের কথা শুনে সত্যি বিরক্ত হয়েছিলেন। সোহাগিনী দেবীকে তিনি বড় আক্রমণই করেছিলেন—"মেয়েটাকে পুরুষের হাতে ছেড়ে না দিলে আপনাদের তৃপ্তিই হচ্ছিল না।" সোহাগিনী দেবী আক্রমণে বিপর্যস্ত হন নি। বললেন, "পুরুষটাই মেয়েটার পায়ে লুটিয়ে পড়ল।"

"সে কি রকম?"

"মেয়ের মা হয়ে কি রকম করে বলি এসব কথা? ছেলেটার মেয়েলি চেহারাই মেয়েটাকে পাগল করল। কি বিনিয়ে বিনিয়ে রোজ রোজ কবিতা পাঠাতে লাগল। কর্ত্তা রেগে মেগে কি একটা করতে যাচ্ছিলেন। আমি মেয়ের মন বুঝে তাঁকে বারণ করলুম। যাই হোক ছেলেটাও মন্দ নয়, বি-এ পাশ করেছে। হাইস্কুলের এসিষ্টেণ্ট হেড্‌মাষ্টার। বি-টি পাশ করলেই হেড্‌মাষ্টার হবার সম্ভাবনা রয়েছে।"

"এখন সে বি-টি পাশ করলে মেয়ে হেড মাষ্টারের স্ত্রী হবে। আর চারটি বছর অপেক্ষা করলে মেয়েই হেড-মিস্ট্রেস হবার যোগ্য হত তো?"

"তা হোত।" সোহাগিনী পেরে উঠেনি বনলতার সঙ্গে।

সোহাগিনী দেবীর বাবা রামশরণ গুপ্ত ভাগলপুরে থাকেন। পাঞ্চালীর বিয়ের সময়ে তিনি অসুস্থ বলে আসতে পারেন নি। পাটনা ইউনিভারসিটিতে ফিজিওলজির প্রফেসর ছিলেন তিনি। চাকুরি থেকে অবসর নিয়ে ভাগলপুরে বসবাস করছিলেন। নাতনী ও নাত্-জামাইকে দেখবার আগ্রহে তিনি সুস্থ হয়ে উঠেই চলে এলেন কোলকাতায়। নাতনীকে তিনি অনেকদিন দেখেন নি। বড় হয়ে সে কেমন হয়েছে তা তিনি বড় ঔৎসুক্যভরে লক্ষ্য করলেন। লক্ষ্য করলেন নাতনী-জামাইকেও। কেমন যেন তাঁর মনে একটা অদ্ভুত কৌতুক ও বিরক্তি একসংগে জেগে উঠল। একদিন তিনি দেখলেন—জামাই মুখে স্নো পাউডার মেখে তৈলহীন ফুলে-ওঠা চুল আঁচড়িয়ে সিল্কের পাঞ্জাবী পরে প্যাণ্ট আর সার্ট পরে নাতনীর পেছনে পেছনে সন্ধ্যার আঁধারে বেরুচ্ছেন। কি রকম তাঁর খারাপ লাগল। দুজনকে ডেকে তিনি বললেন—"শোন, রাগ করো না, তোমরা কোলকাতার ছেলে আর মেয়েরা। তোমাদের ছেলেদের সব মেয়েলি ভাব, আর মেয়েদের সব পুরুষালি-ভাব। এরি নাম তোমাদের প্রগতি!"

উত্তরে হো হো করে হেসে দুজনে বেরিয়ে গেল। বুড়ো দাদু চেয়ে রইল ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে।

[ক্রমশঃ

পশম-রাখার ঝাঁপি

রুচিরা দেবী

প্রত্যেক সুগৃহিণীর ধারণা—সংসারে কোনো সামগ্রীই তুচ্ছ বলে উপেক্ষা করবার নয়…আজ যে জিনিষটি নিতান্তই বাজে এবং অপ্রয়োজনীয় মনে হচ্ছে, কাল দেখবেন, সেটিই একান্ত আবশ্যকীয় হয়ে উঠেছে। এজন্য ছোট-বড় সব গৃহস্থ-সংসারেই টুকিটাকি নানা রকমের সামগ্রী সযত্নে সঞ্চয় করে রাখার রেওয়াজ দেখা যায়। এ সব টুকিটাকি জিনিসপত্র শুধু যে সংসারের অভাব-অনটন মেটাবার সহায়তা করে তাই নয়, সামান্য চেষ্টা করলেই দৈনন্দিন কাজকর্ম্মের অবসরে এগুলি দিয়ে নানা ধরণের সুন্দর-সুন্দর কারুশিল্প-সামগ্রীও রচনা করা যায়। আজ এ-ধরণের টুকিটাকি জিনিষ দিয়ে বিচিত্র একটি কারুশিল্প-সামগ্রী রচনার কথা বলছি…নিছক শিল্প-চর্চ্চা ছাড়াও, ব্যবহারিক দিক থেকে গৃহস্থ-সংসারে এ জিনিষটির প্রয়োজনীয়তা আছে অনেকখানি।

পাশের ১নং ছবিতে বিচিত্র কারুকার্য্যময় যে কৌটাটি দেখছেন, সেটি নান রকমের টুকিটাকি-সামগ্রী দিয়ে রচিত অভিনব-ছাঁদের 'পশম-রাখার ঝাঁপি' (Knitting Box)। যাঁরা পশম দিয়ে নানা ধরণের পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি বোনবার কাজকর্ম্ম করেন, তাঁদের পক্ষে এ-ধরণের ঝাঁপি খুবই উপকারে আসবে। অর্থাৎ বোনবার সময়, পশমের সুতোর গুলি (Ball of Knitting Wool) ঢাকনি-আঁটা এই 'ঝাঁপির' (Knitting Box) ভিতরে রেখে, উপরের ঢাকনির মাঝখানে গোলাকার যে ছোট্ট 'ফুটো' (Hole) রয়েছে, সেই 'ফোকরের' মধ্যে দিয়ে পশমের সুতোর মুখ বাইরে টেনে নিয়ে এসে অনায়াসেই বোনার-

কাঁটায় (Knitting Needles) কাজ করতে পারবেন এবং পশমের গুলি ঢাকনি-আঁটা 'ঝাঁপির' ভিতরে সংরক্ষিত থাকার ফলে, বোনবার সময় অযথা সুতোয় জট্ পাকিয়ে কাজের কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে না। এ-ধরণের 'পশম-রাখা ঝাঁপি' তৈরী করা সহজ এবং এমন কিছু ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপারও নয়। এমনি 'ঝাঁপি' তৈরী করতে হলে যে সব উপকরণ দরকার, সেগুলি নিতান্তই ঘরোয়া সামগ্রী—প্রত্যেক গৃহস্থ-সংসারেই এ সব সাজ-সরঞ্জাম অনায়াসেই মিলবে। আপাততঃ এ-ধরণের 'পশম-রাখার ঝাঁপি' তৈরী করতে হলে যে সব সাজ-সরঞ্জাম প্রয়োজন, তার কথা বলি। এ কাজের জন্য চাই—ঢাকনি-সমেত একটি খালি টিনের কৌটা—সাধারণতঃ 'বার্লি' (Barley), 'ওট্‌মিল' (Oatmeal), বা 'পরিজ্' (Porridge) ভর্ত্তি যে সব টিনের কৌটা বাজারে কিনতে পাওয়া যায়, তেমনি-ধরণের একটি খালি কৌটা হলেই চলবে। এছাড়া চাই—টিনের পাত কাটবার ছোট একটি—কাটারি, একটি হাতুড়ি, একশিশি গঁদের আঠা, একখানি কাঁচি, আধগজ বেশ চওড়া রঙীণ রেশমের ফিতা এবং ঢাকনি-সমেত টিনের কৌটাটি
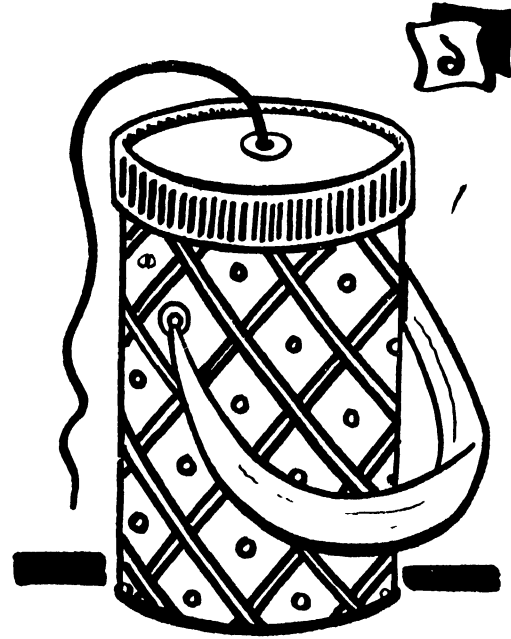
আগাগোড়া মুড়ে দেওয়া যায় এমনি মাপের নক্সাদার রঙীণ কাগজ খানিকটা। বই-খাতার মলাট দিতে দপ্তরীরা সচরাচর যে-ধরণের মজবুত ও রঙীণ-নক্সাদার কাগজ (Marble-Paper, Cover-Paper, অথবা Wall-Paper) ব্যবহার করেন, টিনের কৌটা মুড়ে দেবার জন্য সেই রকম কাগজ। তবে টিনের কৌটাটি মুড়তে হবে নক্সাদার কাগজে এবং ঢাকনির জন্য ব্যবহার করবেন মানানসইধরণের কোনো একরঙা কাগজ। ১নং ছবিটি দেখলেই এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট আভাস পাবেন। 'পশম-রাখা ঝাঁপির' হাতলের সুদীর্ঘ রেশমী-ফিতাটিও যেন মানানসই রঙের হয়, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার।

উপরোক্ত উপকরণগুলি সংগৃহীত হবার পর, নীচের ২নং ছবির ভঙ্গীতে নক্সাদার-রঙীণ কাগজটিকে কাঁচি দিয়ে মাপমতো ছাঁদে কেটে নিয়ে, সে কাগজের 'অন্দর-দিকে' (Inner Facing) ভালো করে গঁদের আটার প্রলেপ মাখিয়ে টিনের কৌটার গায়ে পরিপাটিভাবে সেঁটে দিন।
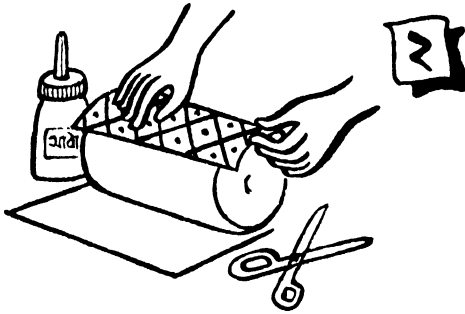
এ কাজের পর, কাগজ-আঁটা টিনের কৌটাটিকে ছায়া-শীতল স্থানে খোলা-বাতাসে রেখে ভালো করে শুকিয়ে নিন—তাহলেই নক্সাদার-রঙীণ কাগজটি টিনের কৌটার গায়ে পাকাপাকিভাবে এঁটে বসবে। এবারে বাটালি ও হাতুড়ির সাহায্যে টিনের কৌটার ঢাকনির মাঝখানে পশমের সুতোর জন্য অন্তত: ⅛″ ইঞ্চি মাপের একটি গোল গর্ত (Round Hole) রচনা এবং টিনের কৌটার গায়ে হাতলের ফিতা পরানোর জন্য দু'পাশে আরো দুটি গোলাকার গর্ত রচনা করুন। এই গোলাকার গর্তের দুই মুখে অর্থাৎ টিনের ঢাকনির ভিতরের ও বাইরের দিকে দুটি দুটি করে 'টেপা-বোতাম' অর্থাৎ 'Safety-Buttons'এর মত ছাঁদের গোল-চাকতি (Round Discs as used in Note-Book Reinforcements) এঁটে বসিয়ে দিন—সচরাচর নোট-বুকের সুতো-পরানো ফুটোর দু' মুখে যে-ধরণের গোল-চাকতি বসানো থাকে, তেমনি ধরণের বোতাম-জাতীয় জিনিষ। এ জিনিষ বাজারে কিনতে পাওয়া যায়—দপ্তরীরা এর সন্ধান দিতে পারবেন। টিনের ঢাকনির গর্তের দুই প্রান্তে এ-ধরণের 'চাকতি-বোতাম' বসানো ভালো, না হলে ব্যবহারকালে গর্তের মুখে ধারালো টিনের-পাতের ঘসড়ানি লেগে পশমের সুতো ও হাতলের ফিতা সবিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যাই হোক, কৌটা ও ঢাকনির গর্তের মুখে তিন জোড়া 'চাকতি-বোতাম' বসানোর পর, নীচের ৩নং ছবির ধরণে কৌটার ঢাকনির কিনারাটি আগাগোড়া এক-রঙা কাগজ রেশমের ফিতা দিয়ে পরিপাটিভাবে মুড়ে দেবেন। ঢাকনির কিনারায়
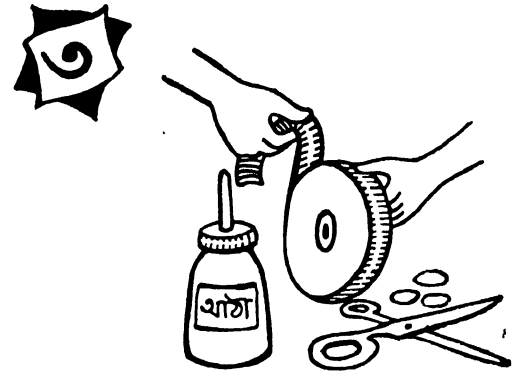
কাগজ বা রেশমের ফিতা আঁটবার সময় পূর্বোক্ত-প্রথানুসারে কাগজ বা কাপড়ের 'অন্দর-দিকে' (Inner Facing) ভালো করে গঁদের আটার প্রলেপ মাখিয়ে, ফিতাটিকে টিনের গায়ে এঁটে জুড়ে দিয়ে সেটিকে ছায়া-শীতল জায়গায় খোলা বাতাসে রেখে শুকিয়ে নিতে হবে।

কাগজ ও ফিতায় মোড়া টিনের কৌটা আর ঢাকনি ভালো করে শুকিয়ে নেবার পর, 'পশম-রাখা ঝাঁপির' হাতলের ফিতা (Ribbon Handle) বসানোর কাজ। 'ঝাঁপির' হাতলের ফিতা রচনার জন্য অন্ততঃপক্ষে ৩½″ ইঞ্চি চওড়া রেশমী-ফিতা নেবেন। এবারে কাগজ-মোড়া টিনের কৌটার দু'পাশে দুটি গর্তের মধ্যে রেশমী-ফিতার প্রান্ত প্রবেশ করিয়ে দিয়ে, 'ঝাঁপির, ভিতর-

দিকে সে দুটি মুখে বড়সড়-ছাঁদের 'গিঁট' (Knot) বেঁধে দিন—তাহলে টিনের কৌটোর গায়ের ফোকরের মধ্যে দিয়ে হাতলের ফিতাটি কোনমতেই আর ফশকে বেরিয়ে আসতে পারবে না—মজবুতভাবে আঁটা থাকবে। নীচের ৪নং ছবিটি দেখলেই এ ব্যাপারটুকু আরো স্পষ্টভাবে বুঝতে
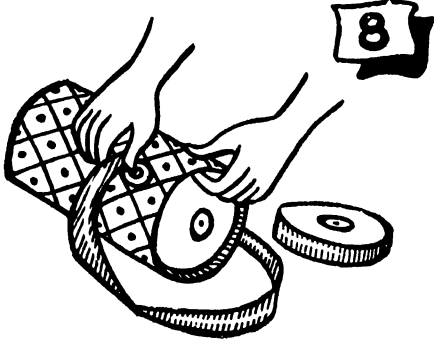
পারবেন। হাতলের ফিতা রচনার সঙ্গে সঙ্গেই 'পশম-রাখা ঝাঁপি' তৈরীর কাজ শেষ হবে।

এবারে নক্সাদার-রঙীণ কাগজ-মোড়া টিনের কৌটার ভিতরে পশমী-সুতোর গুলি (Ball of knitting Wool) রেখে, সুতোর একপ্রান্ত ঢাকনির 'ফুটোর' মধ্যে দিয়ে গলিয়ে বাইরে টেনে এনে, 'ঝাঁপির' মুখে ঢাকা এঁটে দিন। তারপর বোনবার-কাঠিতে পশমের সুতো পরিয়ে কাজ সুরু করে দিলেই পরম নিশ্চিন্ত-আরামে পশমী-পোষাক বুনতে পারবেন···কাজের সময় পশমের সুতোয় 'জট' পাকানোর এতটুকু উপদ্রব ঘটবে না আর।

যাঁরা পশম-বোনার কাজ করেন, তাঁদের পক্ষে এই 'পশম-রাখা ঝাঁপি' খুবই উপযোগী হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। বারান্তরে এ ধরণের টুকিটাকি-জিনিষের সাহায্যে আরো কয়েকটি অভিনব কারুশিল্প-সামগ্রী রচনার কথা আলোচনা করবার ইচ্ছা রইলো।

পশমের পুতুল

রোচনা হালদার

আজকাল ঘরে-ঘরে মেয়েরা সাধারণতঃ রঙ-বেরঙের পশম দিয়ে নানা ধরণের পোষাক-পরিচ্ছদ তৈরী করেন। কিন্তু পোষাক-পরিচ্ছদ ছাড়াও, সামান্য একটু চেষ্টা করলেই, রঙীণ পশম দিয়ে আরো অনেক রকমের সৌখীন শিল্প-সামগ্রীও রচনা করা যায়। আজ এমনি ধরণের বিচিত্র একটি সৌখিন শিল্প-সামগ্রী রচনার কথা বলছি···এ সামগ্রীটি হলো রঙীণ পশমের তৈরী গৃহসজ্জার উপযোগী অভিনব-ছাঁদের একটি পুতুল—নীচে ছবিতে একটি পুতুলের নমুনা দেওয়া হলো—পুতুলটি বেশ মজার আকারের···এটির নাম 'হাম্প্‌টি-ডাম্প্‌টি পুতুল বা 'Humpty Dumpty Doll'।

এধরণের পশমের পুতুল তৈরী করতে হলে যে সব সাজ-সরঞ্জাম প্রয়োজন, প্রথমেই তার একটা ফর্দ্দ জানিয়ে রাখি। 'হাম্প্‌টি-ডাম্প্‌টি' পুতুলটি রচনার জন্য চাই—লাল, সাদা ও কালো রঙের '3 Ply, বা 'তিন-তারের, তিনটি পশমের গোলা (Small Balls of 3-ply wool)। পুতুলের চোখ দুটির জন্য চাই অল্প খানিকটা

আসমানী-রঙের পশম। একজোড়া ১২ নং পশম-বোনবার কাঠি (No 12 Knitting Needles) আর পুতুলের খোলটুকু ভরাট করে তোলবার জন্য এক বাণ্ডিল পরিষ্কার তুলো (cotton)।

এ সব সরঞ্জাম জোগাড় হবার পর, হাতের কাজ সুরু করবার পালা। পুতুলটি বুনতে হবে, আগাগোড়া '১ ঘর সোজা আর ১ ঘর উল্টো' 'স্টকিং-ষ্টিচ' (Stocking Stitch) প্যাটার্ণে এবং ডবল উলের ব্যবহার করে। পুতুলের মাপ হলো—পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত ৩৳" ইঞ্চি দীর্ঘ এবং দেহের বেড় ৪৳" ইঞ্চি চওড়া।

পশম দিয়ে এ পুতুলটি বোনবার পদ্ধতি হলো—১২ নং কাঠিতে লাল-রঙের পশমে পুতুলের দেহের নিম্নাংশ থেকে ৬টি ঘর বুনে তুলতে হবে। বোনবার সময়, 'স্টকিং-ষ্টিচ' অর্থাৎ '১ ঘর সোজা আর ১ ঘর উল্টো' পদ্ধতিতে কাজ করে প্রতি লাইনের গোড়ায় এবং শেষে একটি করে ঘর বাড়াতে হবে। এভাবে ৫ লাইন অর্থাৎ ১৬ ঘর বুনতে হবে। তারপর আরো ৬ লাইন সোজা বুনে যাবেন।

এমনিভাবে বোনবার পর, লাল-রঙের পশম ছিঁড়ে সাদা-রঙের পশম জোড়া দিন। এবারে সাদা-রঙের পশমে ৮ লাইন বুনে ফেলুন। তারপর ৪ লাইনের উভয়দিকে জোড়া বুনুন (৮ ঘর)। এবারে ঘর বন্ধ করুন।

ঠিক এই পদ্ধতিতে কাজ করে পুতুলের দেহের অপর-অংশটি বুনে নিন। ঘর-বন্ধ-করা অংশ ছেড়ে রেখে উল্টোদিকে জোড়া দিন। এবারে সোজা করে পুতুলের দেহের খোলটুকু ভালো করে তুলো দিয়ে ভরাট করে ফেলুন। তারপর কালো-রঙের পশম দিয়ে পুতুলের দেহের খোলের উপরাংশে, উপরের নক্সার ছাঁদে বড়-বড় দুটি গোল চোখ ও একজোড়া ভুরুর রেখা রচনা করতে হবে। এই সঙ্গে কালো-রঙের পশম দিয়ে চোখের তারা দুটিও রচনা করে নেওয়া প্রয়োজন। চোখ আর ভুরু রচনার পালা শেষ হলে, লাল-রঙের পশম দিয়ে পুতুলের নাক আর ঠোঁট রচনা করুন। তাহলেই পশমের পুতুলের মুখ আর দেহ তৈরী হয়ে যাবে।

এবার পশমের পুতুলের পদ-রচনার কাজ সুরু করতে হবে। এ কাজের সময়, লাল-রঙের পশম দিয়ে ৭ ঘর তুলে ১৬ লাইন বুনে ফেলুন। তারপর ঘর বন্ধ করবেন। একই পদ্ধতিতে পুতুলের পা দুটি বুনে ফেলতে হবে। এ-ধরণে বোনবার পর, আড়াআড়িভাবে সেলাই করে, পায়ের খোল দুটির ভিতরে তুলো ভরে দেবেন। পায়ের খোল দুটিকে আগাগোড়া সুডৌল-ছাঁদে তুলো ভরে নেবার পর, পুতুলের দেহের নীচের অংশ সুষ্ঠুভাবে সেলাই করে জুড়ে নিতে হবে।

এমনিভাবে পদ-রচনার পালা চুকিয়ে, পশমের পুতুলের হাত দুটি রচনার কাজ সুরু করতে হবে। পুতুলের হাত রচনার সময়, সাদা-রঙের পশম দিয়ে ৬ ঘর তুলে ৮ লাইন বুনবেন। তারপর ঘর বন্ধ করবেন। এ পদ্ধতিতে কাজ করে পুতুলের অপর হাতটিকেও বুনে ফেলবেন। এবারে পুতুলের দুই হাতের দুটি অংশকেই আড়াআড়িভাবে সেলাই করে, হাতের খোলের ভিতরে তুলো ভরে দেবেন। তুলো ভরাট করে দেবার পর, এক-এক টুকরো সাদা-রঙের পশম নিয়ে দুটি হাতেরই তালুর দু'লাইন উপরে সুষ্ঠুভাবে সেলাই করে জুড়ে দিন। তাহলেই পশমের পুতুলের হস্ত-রচনার কাজ শেষ হবে।

এ কাজের পর, পশমের পুতুলের পায়ের জুতো রচনার পালা। পুতুলের পায়ের জুতো দুটি তৈরীর জন্য—কালো-রঙের পশম দিয়ে ২ ঘর তুলতে হবে এবং ১ লাইন বুনে, দুদিকে ২ ঘর বাড়িয়ে, ২ লাইন শুধু সোজা বুনবেন। তারপর দুদিকে ১ ঘর করে কমিয়ে ঘর বন্ধ করবেন। এমনিভাবে তিনটি টুকরো বুনতে হবে। এবারে জুতো দুটিকে সেলাই দিয়ে জুড়ে জুতোর খোলের মধ্যে ভালো করে তুলো ভরে দেবেন। তুলো ভরাট করার পর, জুতো দুটিকে পুতুলের পায়ের সঙ্গে সেলাই করে জুড়ে দিতে হবে। তাহলেই পশমের তৈরী বিচিত্র 'হাম্প্‌টি-ডাম্প্‌টি' পুতুল রচনার কাজ শেষ হবে।

পশমের পুতুল তৈরী করবার এই হলো মোটামুটি পদ্ধতি। পরে এ ধরণের আরো কয়েকটি অভিনব কারুশিল্প-সামগ্রী রচনার কথা জানাবার বাসনা রইলো।

সুধীরা হালদার

অন্যান্যবারের মতো এবারেও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের কয়েকটি জনপ্রিয় খাদ্য রন্ধন-প্রণালীর কথা বলছি। আপাততঃ বিচিত্র-অভিনব যে মুখরোচক মহারাষ্ট্রীয় খাবার রান্নার বিষয়ে মোটামুটি আভাষ জানাচ্ছি, সেটি নিরামিষ-জাতায়। কারণ, গুজরাঠীদের মতো মহারাষ্ট্রবাসীরাও বেশীর ভাগই নিরামিষ-ভোজী এবং এঁদের নানা রকম নিরামিষ-খাবার রান্নার প্রণালীও অনেকটা একই ধরণের। এঁদের খাবারদাবারে সাধারণতঃ দুধ, টক দই, শাক-শব্জী, ডাল, আটা, ব্যাসম, নারিকেল আর ঘি প্রভৃতি উপাদান ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এবারে যে মহারাষ্ট্রীয় খাবার রান্নার কথা বলছি, তার নাম—'খাঁণ্ডভি'।

'খাঁণ্ডভি' ঃ

এ খাবারটি রান্নার জন্য যে সব উপকরণ প্রয়োজন, গোড়াতেই তার একটি মোটামুটি তালিকা দিয়ে রাখি। অর্থাৎ এ খাবারটি রাঁধবার জন্য চাই—এক চায়ের কাপের মাপে পানীয়, জল এক চায়ের কাপ-মাপের ঘন ঘোল, এক চায়ের কাপ মাপে ব্যাসম, আধ চায়ের চামচ-ভোর সরষে, আধ (চায়ের) চামচ হলুদ, দেড় চায়ের চামচ ঘি, প্রয়োজনমতো নুন, দুটি কাঁচা লঙ্কা, সামান্য একটু হিং, অল্প খানিকটা নারিকেল-কোরা আর খুব মিহি-করে কুচানো ধনে-শাক। এ সব উপকরণ সংগ্রহ হবার পর রান্নার পালা। রান্নার কাজের সময় গোড়াতেই জল আর ঘোলের সঙ্গে ব্যাসমটুকু ভালো করে একত্রে মিশিয়ে নিতে হবে। তারপর আদা আর লঙ্কা ভালোভাবে বেটে নিয়ে, লেইয়ের মতো করে রাখুন। এ কাজ সেরে, রান্নার মশলা অর্থাৎ শুকনো লাল-লঙ্কা, হিং, সরষে আর হলুদ বাদ রেখে, অন্য উপকরণগুলিকে উনানের-আঁচে-বসানো পাত্রে ঢেলে হাতার সাহায্যে নাড়াচাড়া করে সবটুকু আগাগোড়া একত্রে বেশ ভালো করে মিশিয়ে নিন। এ কাজ করবার সময়, যতক্ষণ পর্য্যন্ত পাত্রের ভিতরকার ঐ একত্রে-মেশানো উপকরণগুলির জল না মরে যায়, ততক্ষণ এমনিভাবে রান্না করতে হবে। এবারে একখানি পরিষ্কার থালা নিয়ে, সেটিতে ঘিয়ের প্রলেপ মাখিয়ে বেশ ভালভাবে তেলা করে নিন এবং উনানের-আঁচে-বসানো পাত্রের ভিতরকার গরম-থকথকে মিশ্রিত-পদার্থটুকু বেশ পাতলা থাকতে থাকতে পরিপাটিভাবে থালাতে ঢেলে রাখুন। এবারে থালায় ঢেলে-রাখা রান্না-করা মিশ্রিত-পদার্থটিকে আগাগোড়া লম্বালম্বি-ছাঁদে এবং বেশ চওড়া আকারে ছুরির লাইন টেনে টুকরো টুকরো করে কেটে নিন। তারপর ঘিয়ের প্রলেপ মাখিয়ে হাতের আঙুলের ডগাগুলি বেশ তেলা করে নিন। আঙুলগুলি তেলা করে নেবার পর, ছুরি দিয়ে কাটা মিশ্রিত-পদার্থের টুকরোগুলিকে পরিপাটিভাবে পাকিয়ে নিয়ে, পুনরায় প্রায় আধ-ইঞ্চি খানেক পুরু এবং গোলাকার-ছাঁদে কেটে রাখুন। এবারে এই গোলাকার-টুকরোগুলির উপর আন্দাজমতো খানিকটা মশলা অর্থাৎ শুকনো লাল-লঙ্কা, হিং, সরষে এবং হলুদ গুঁড়ো ছড়িয়ে দেবেন। তাহলেই বিচিত্র-মুখরোচক মহারাষ্ট্রীয় খাবার 'খাঁণ্ডভি' রান্নার কাজ শেষ হবে। অতঃপর, পরিবেষণের আগে, থালায়-ঢেলে-রাখা মসলা-ছড়ানো রান্না-খাবারের গোলাকার-টুকরোগুলির উপরে আন্দাজমতো পরিমাণে সামান্য একটু নারিকেল কোরা আর খুব মিহি করে কুচানো ধনে-শাক ছড়িয়ে দিতে হবে।

এই হলো ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের জনপ্রিয় মহারাষ্ট্রীয় খাবার 'খাঁণ্ডভি' রান্নার মোটামুটি প্রণালী।

বারান্তরে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের আরো কয়েকটি অভিনব খাদ্য-রন্ধন-প্রণালীর বিষয় আলোচনা করবার ইচ্ছা রইলো।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বীরুদাসের পরামর্শ শুনে দমভোর টানার ফলে দমটা ফুরিয়ে গেল, বলিদানটা আর দিতে হোল না। বলিদানের পশুটা তাই এখনও দিব্যি বেঁচে রয়েছে, মাঝে মাঝে ঘাড় বেঁকিয়ে তেরছা চোখে তাকায় আমার পানে, এক একবার ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে ওঠে। যা বলতে চায় তা বুঝি। বলতে চায়, ঠকে মরেছ। ঠকে মরবার জন্যেই জন্মেছ, আহাম্মক কাঁহাকা।

হিসেব যখন মেলাতে বসি তখন তাই মনে হয়। মনে হয়, কত কি না হোতে পারত। ইঁট কাঠ দিয়ে তৈরী না হোক, খড় বাঁশের এক আখড়া হোতই। গরু থাকত আখড়ায়, সেই গরুর দুধে গৌরাঙ্গসুন্দরের নিত্যসেবা চলত। তারপর গরুর খড়ের জন্যে একটু ক্ষেত-খামার হোতই। ক্ষেত-খামারে জল দেবার জন্যে একটু পুকুর—আর পুকুর পাড়ে দুটো ফলের গাছ, সবই হোতে পারত, সেদিন দমভোর টেনে দমটুকু যদি না ফুরিয়ে ফেলতাম। দম ফুরিয়ে যাওয়ার দরুণ না পারলাম এগোতে, না পারলাম পিছুতে। সাচ্চা দরবারের এক কোনায় ঘাপটি মেরে পড়ে রইলাম। ফল ফলল অচিরাৎ, সাচ্চা দরবারে যারা সাচ্চা মাল কিনতে আসে তারা ঠিক খুঁজে বার করলে। জহুরিতে জহর চেনে এবং জহুরি কখনও জহর চিনতে পেরে হৈ হট্টগোল বাধায় না। খোল-খরতাল বাজিয়ে ধেই ধেই করে নেচে বাঁশ খড় দিয়ে আখড়া বানিয়ে ছাড়ে যারা —তারা জহর চেনবার জহুরি নয়, তারা বড়জোর চিনতে পারে কচু। কোন কচুতে মুখ চুলকাবে, কোন কচু মাখনের মত মোলায়েম, এইটুকুই বেছে বার করবার ক্ষমতা আছে তাদের। কিন্তু কচুর মধ্যে এমন কি পদার্থ আছে, যার জন্যে আড়াল দিয়ে আগলে রাখতে হবে। কচুর জহুরিরা তাই লুকোছাপার ধার ধারে না। আর আসল জহুরি জহর চিনতে পেরে জহরটিকে সামলাবার জন্যে ব্যতিব্যস্ত হোয়ে ওঠে। জহরের সংবাদটি পাঁচ কানে পৌঁছে গেলে খোয়া যাবার ভয়।

সামলাবার কথাটাই আগে কানে ঢুকল। ফিসফিস করে একজন বললেন—"একেবারে খাঁটি মাল, যাকে বলে ছাই-চাপা আগুন। কেমন ভদ্দরলোকটি সেজে রয়েছেন। প্রথম থেকেই আমার সন্দেহ হোয়েছিল, ঐ বেঁটে সাধুটা সেবা করে মরছে কেন? এতকাল সাচ্চা দরবারে আসছি, কই বাবা, কখনও তো দেখিনি ঐ বেঁটে বীরুদাসকে কারও পা ধুইয়ে দিতে! তারপর নজর রাখলাম দূর থেকে! উঃ জলজ্যান্ত কেউটের বাচ্চা! একটা একটা করে বোতল হাতে ধরিয়ে দিচ্ছে বীরুদাস, আর অমনি গলগল করে গলায় ঢালছে। এ বাব্বাঃ; সাক্ষাৎ সেই তিনিই। সামলাতে যদি পারিস, পাঁচকান যদি না হয়, ঠিক কৃপা করবেন। নয়ত ফুস—যাঃ, এ সব মাল হাতে পেলে সঙ্গে সঙ্গে গাপ্ করতে হয়।"

কথাগুলি যাকে বললেন জহুরি মশায়—তিনিও পাকা লোক। চাপা গলায় বললেন—"সরে আয়, সরে আয়, দূর থেকে নজর রাখতে হবে। রাত আরও বাড়ুক, নিশুতি হোলেই দেখবি, ঠিক উঠে পড়বেন। তারপর চলবেন নিজের কাজে, যেখানে যাবেন সেখানে যাব পিছু পিছু,

সেখানে গিয়ে ধরব। এখানে এই বাবার বাড়িতে কিছুতেই ধরা দেবেন না, থামকা হৈ-চৈ হবে, লোক জমবে। আর অমনি ভোল পাল্টাবেন। পাঁচজনের কাছে ধরা দেবার জন্মে এখানে উদয় হন নি।"

অতঃপর তাঁরা সরে গেলেন। কতদূর গেলেন ঠিক বুঝতে পারলাম না। তাতে আরও বেড়ে গেল অস্বস্তি। তফাৎ থেকে কেউ নজর রাখছে আমার ওপর, এটুকু জানা থাক্‌লে কেমন যেন সুড়সুড় করে সর্বশরীর, কিছুতে স্থির থাকা যায় না।

আস্তে আস্তে উঠে বসলাম। আন্দাজ করবার চেষ্টা করলাম, রাত কত হোল, কতক্ষণ পড়ে ঘুমিয়েছি। পুকুর ঘাটে এসে যখন বসি তখন ঢাক বাজছিল, বাবা তখন রাতের আহারাদি সেরে নিচ্ছিলেন। বীরুদাস আমার বাঁ পায়ের তলা থেকে একটা কাঁচের টুকরো টেনে বার করে গামছা ভিজিয়ে পুকুর থেকে জল এনে রক্তটা ধুয়ে গামছা-খানাই শক্ত করে পায়ে জড়িয়ে দিয়ে গেছে। একটা বোতল আছড়ে ভেঙেছিল বীরুদাস, সেই কাঁচের ওপর পা দিয়েই ঐ ফ্যাসাদ বেঁধেছিল। বীরুদাস কাঁচটা টেনে বার করে পাখানা বেঁধে দিয়েছিল। জহুরিরা সেটি তফাৎ থেকে দর্শন করে বিগলিত হোয়ে পড়েছেন। বীরুদাসের মত একটি জাত-সাপ যার চরণ ধুইয়ে দিয়েছে সে না জানি কত বড় একটি ওঝা!

ওঝা বলতে সচরাচর সবাই বোঝে—এমন একজন গুণী ব্যক্তি যিনি সাপে কামড়ালে বিষ নামাতে পারেন বা ভূতে ধরলে ভূত ছাড়াতে পারেন। ওঝার বিদ্যে শিখতে গিয়ে ঐ বিষ আর ভূত সম্বন্ধেই মানুষ জ্ঞানলাভ করে। তারপর একদিন নিজেই নিজের শক্তির পরিমাণ দেখে তাজ্জব বনে যায়। দেখে, যে কোনও রকম মুশকিলে পড়লেই মানুষ তার কাছে ছুটে আসছে। জুয়া, ফটকা, আয়কর-বিক্রয়-কর, প্রেমে পড়া, পরীক্ষা পাশ করা, শত্রুদমন, ঘুষ দেওয়া, এমন কি—ভোটে জিততে হোলেও মানুষে ওঝার কাছে গিয়ে পড়ে। তখন আর ওঝাকে বিষ বা ভূত নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না। দেখতে দেখতে সে একটি মহাপুরুষ বনে যায়। মহাপুরুষ বনবার পরে একমাত্র কৃপা দান করা ছাড়া আর কিছুই দান করতে হয় না। কৃপার বিনিময়ে যা লাভ হয়, তাতে বাড়ি গাড়ি দাড়ি ভুঁড়ি সর্ব্বস্বই রাখা চলে, এবং মহাপুরুষদের কোনও রকম ট্যাক্সর দায়ে পড়তে হয় না।

মনে মনে একটি চুমকুড়ি দিয়ে শরীরটাকে পায়ের ওপর খাড়া করার চেষ্টা করলাম। সম্ভব হোল না, বাঁ ঠ্যাংখানি ধরিত্রী পৃষ্ঠে ছোঁয়াতে গেলে মাথার তালু পর্য্যন্ত চিড়িক মেরে উঠছে। অগত্যা অবার বসে পড়তে হোল। বসে দু' চোখ বুজে মতলব ঠাওরাতে লাগলাম। কি করা যায়। শ্রীচরণের তলায় সামান্য এক টুকরো কাঁচ ঢোকার দরুণ একজন অসামান্য মহাপুরুষের উত্থানশক্তি রহিত হোয়ে গেছে, এটা জানাজানি হোলে পসার প্রতিপত্তি জমানো কি সম্ভব হবে! এক টুকরো কাঁচে যাঁকে খোঁড়া করে ফেলতে পারে, তিনি কি করে মানুষের সর্ব্ববিধ আধি-ব্যাধি ত্রিতাপ জ্বালা দূর করবেন! সুযোগের মত সুযোগ দিয়েও বাবা ছলনা করছেন। শ্মশানের গদির চেয়ে ঢের দামী গদি নজরের সামনে নাচছে। শুধু একটু কষ্ট করে উঠে গিয়ে চড়ে বসা, সে কষ্টটুকু করারতো সামর্থ্য নেই। বাবার ছলনা আর কাকে বলে!

হায় রে হায়, ছলনার শক্তি যে কতখানি তা' কি তখন মনের কোনেও ধারণা করতে পেয়েছিলাম!

হঠাৎ সেই খোঁড়া ঠ্যাংখানার ওপরে চাপ পড়ল। যন্ত্রণার চোটে মুখ দিয়ে একটু বিদকুটে গোছের আওয়াজ বেরিয়ে গেল, চোখ মেলে দেখি, উপুড় হোয়ে পড়ে একজন পায়ের ওপর কপালটা চেপে ধরেছে। যার কপাল তাকে চিনতে এক মুহূর্ত্ত দেরি হোল না। দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণাটা সহ্য করতে লাগলাম। চরণের ওপর কপাল চেপে ধরবার মত উৎকট ভক্তি কোথা থেকে আমদানি হোল আচম্বিতে, ভেবে ঠিক করতে পারলাম না।

প্রায় মিনিট খানেক লাগল ভক্তির তোড়টা কমতে। তারপর সোজা হোয়ে হাঁটু গেড়ে বসল নিতাই সামনে। বসে সেই অন্ধকারেই নির্নিমেষ নেত্রে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ আমার চোখের দিকে! শেষে ফিসফিস করে বললে—"আমি যাচ্ছি গোঁসাই; ভোরের গাড়িতে আমরা চলে যাব। আমার জন্যে তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না।"

অবাধ্য ঠোঁট দু'খানার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়ল—"কোথায়?"

"বৃন্দাবনচন্দ্র যেখানে নেন।" দু'হাত জোড় করে

কপালে ঠেকিয়ে বলতে লাগল নিতাই—"বৃন্দাবনের পথেই পা বাড়ালাম। গোড়ুই মশাই তাঁর সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে—রাধারাণীর শ্রীচরণে একটু ঠাঁই পাবার আশায় চললেন আমার সঙ্গে। জীবন ভোর বহু অন্যায় করেছে লোকটা, নিজের হাতে—বহু লোককে খুন করে পুঁতেছে। সেই পাপে ওর সংসার ছারখার হোয়ে গেছে, এগারটা ব্যাটা, বউ নাতিনাতনী সব দু'দিনের মধ্যে ওলাওঠায় শেষ হোয়েছে। এত দিন ওর বুকের মধ্যে আগুন জ্বলছিল অহর্নিশি, আজ হঠাৎ রাধারাণীর কৃপায় সে আগুনে জল পড়েছে। সব ফেলে রেখে চলেছে ও আমার সঙ্গে। দেখি যদি একটা জীবকেও শান্তি দিতে পারি।"

নির্বাক হোয়ে শুনতে লাগলাম। শ্রীবৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে যে পা বাড়িয়েছে তাকে কি ঘোরানো যায়! এক মাত্র 'জয় রাধে' ছাড়া বলার মত কিছুই খুঁজে পেলাম না।

রাধারাণীর নাম কি যখনতখন বদন থেকে বেরতে পারে। ওধারে এমন পদার্থে আকণ্ঠ বোঝাই হোয়ে আছে যে—হাঁ করলেই উৎকট গন্ধে ভক্তির আমেজটুকু কেটে যেতে পারে। সেই ভয়ে ঠোঁট আর ফাঁক করলাম না।

একটু চুপ করে থেকে নিতাই বলতে লাগল—"ভয়ানক ভুল করেছিলাম গোঁসাই, মহাঅপরাধ হোয়ে গেছে আমার। তোমার চোখে সবই সাদা হাড় আর কালো কয়লা, তোমাকে ছাই ভস্মের লোভ দেখিয়ে বাঁধতে গিয়েছিলাম। তুমিও আমার সঙ্গে ছলনা করছিলে চমৎকারভাবে। আজ সকালে সেই হাড়গুলো দেখে নিজেকে আর সামলাতে পারলে না। বীরুদাস বললে, তারপর শুধু বোতল বোতল গিলেছ, তোমার আসল পরিচয় দিয়েছি আমি বীরুদাসকে, বীরুদাস আর তোমার চরণছাড়া হবে না। আমাদের গাড়িতে তুলে দিয়েই আসছে সে তোমার কাছে। বলেছে, কোনও শ্মশানে আর তোমাকে যেতে দেবে না। এখানেই তোমার গদি বানিয়ে দেবে।"

মাটিতে হাতের ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল নিতাই। মনে হোল বড্ড বেশী ক্লান্ত হোয়ে পড়েছে যেন। আর একটু হোলেই হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলতাম ওর হাতখানা, সেই মুহূর্ত্তে থামের পাশে যেন খুক খুক করে একটু কাশির শব্দ হোল। চমকে উঠে দু'পা পিছিয়ে দাঁড়াল নিতাই। ওর শেষ প্রার্থনাটা শুনলাম—"আশীর্ব্বাদ কোর গোঁসাই যেন তোমার মত শক্তি পাই। আর যেন ভুল না করি! যে নজরে তুমি দেখ, সেই নজর যেন হয় আমার। সাদা হাড় আর কালো কয়লা—দেখে আর যেন না মজে মরি।"

অত বড় আশীর্ব্বচনটা একটু গুছিয়ে বলবার আর সুযোগ পেলাম না। কয়েক ধাপ উঠে নিতাই অদৃশ্য হোয়ে গেল। পরমুহূর্ত্তেই জহুরি দু'জন এগিয়ে এলেন। আবার পাছে চোট লাগে ঠ্যাংখানায়—তাই আগে থাকতে সাবধান হোলাম। বললাম—"কি চাও?"

একজন ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠলেন। আর একজন বললেন—"রক্ষে কর বাবা, আমাদের ছলনা কোর না বাবা, রক্ষে কর বাবা।"

বললাম—"মহাপাপ করেছ, বিশ্বাসঘাতকতা মহাপাপ, এখন কাঁদলে কি হবে, পাপের শাস্তি ভুগতেই হবে।"

নির্বাক হোয়ে গেল দু'জনেই। বুঝলাম, ঢিলটা ঠিক জায়গায় ছোঁড়া হোয়েছে। বিশ্বাসঘাতকতা বাক্যটির আওতায় হেন ব্যাপার নেই যা পড়ে না। চুরি-চামারি ঘুষ দেওয়া ঘুষ নেওয়া প্রেম ভালবাসা বন্ধুত্ব বিলকুল বিশ্বাস-ঘাতকতার জালে জড়িয়ে যায়। ঐ কথাটি ফস করে মুখ থেকে বেরবার ফলে পাকা জহুরিরাও বোবা বনে গেল। ভাবতে লাগল বোধহয়, জীবনে যা কিছু লাভ হোয়েছে, সবই বিশ্বাসঘাতকতার ফলে হোয়েছে। লোকসান যা কিছু হোয়েছে, তার জন্যেও ঐ বিশ্বাস-ঘাতকতাই দায়ী।

বেশী ভাববার আর সুযোগ দিলাম না। বললাম—"কবুল কর, বাবার স্থান সাচ্চা দরবার, সাচ্চা মনে কবুল কর সব। বাবার সঙ্গে ছলনা করতে চেষ্টা করলে বাঁচবে না।"

ওরা কবুল করল। মহানগরীতে ওরা জাঁদরেল কারবার করে। কারবারটির নাম হোল ঠিকাদারী। সরকারের কর্ম্মচারীদের বড় মানুষ বানাবার মহান ব্রত ঘাড়ে নিয়ে ওরা কারবার করে। সবই চলছিল ঠিকঠাক, হঠাৎ প্যাঁচ লেগে গেছে। সম্পত্তি যা করেছে তা তো সব যাবেই, উপরন্তু শ্রীঘর বাস করতে হবে কয়েক বছর। তাই ওরা বাবার পায়ে এসে আছড়ে পড়েছে।

হাঁ, বিশ্বাসঘাতকতা ওরা করেছে। বলা চলে, বিশ্বাস-

ঘাতকতাই ওদের কারবারের মূলধন। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা বাদ দিলে কি কারবার করা চলে! একশটা রাঘব-বোয়ালের হাঁ বুজিয়ে দু' পয়সা ঘরে তুলতে হোলে একটু-আধটু বিশ্বাসঘাতকতা করতেই হয়।

বাবাকেও তো দু' হাতে দিয়ে এসেছে লাভের অংশ। মাসে একবার দু'বার এসেছে বাবার বাড়িতে, চড়িয়েছে বেলপাতা আর গঙ্গাজল। এবারও মানত করেছে, বিপদ থেকে উদ্ধার পেলে সোনার ত্রিশূল আর সোনার সাপ চড়াবে। সাতদিন ওরা পড়ে আছে সাচ্চা দরবারে, শুধু বাবার চরণামৃত আর ফল খেয়ে আছে। সাত দিন পরে বাবার দয়া হোল, সাক্ষাৎ মহাপুরুষের দর্শন পেয়ে গেল; এবার ওদের রক্ষা করতেই হবে। নয়ত মহাপুরুষের সামনেই বুকে চাকু বসিয়ে আত্মহত্যা করে ফেলবে।

বলতে বলতে সত্যিই একজন কোমর থেকে একটা কি বার করলে। ক্লিক্—একটু আওয়াজ হোল। পরমুহূর্তে দেখলাম, প্রায় আধ হাত লম্বা একখানা ফলা চকচক করছে।

বেশী বাড়াবাড়ি করতে আর সাহস হোল না। বললাম —"ঠিক আছে, যাও তোমরা ফিরে। এক সপ্তাহ পরে আবার এস। বাবার কৃপায় তোমরা রক্ষা পাবে।

কাঁচা ছেলে নয় ওরা। মহানগরীতে ঠিকাদারী করে খায়, ওদের ঠকানো সহজ নয়। তৎক্ষণাৎ একজন বলে বসল—"তাহ'লে আপনিও চলুন প্রভু আমাদের সঙ্গে। আমরা আপনার সেবা করব। যা হুকুম করবেন তামিল করব। এই বিপদ থেকে উদ্ধার তো পাবই যখন আপনাকে ধরতে পেয়েছি। বিপদের জন্যে আর আমরা ভাবি না। কিন্তু আপনাকে আমরা ছাড়ব না প্রভু, আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যাবই। আমাদের ছলনা করলে এখানেই আমরা জল না খেয়ে শুকিয়ে মরব।"

আবার সেই ছলনা!

ছলনার আওতায় কত কি না পড়ে!

অমন ভক্তদের ছলনা করতে পারেন একমাত্র বাবা। কারণ বাবার শরীরটি পাষাণে গড়া। তাড়াতাড়ি কর্তব্য স্থির করে ফেললাম। বীরুদাস আসছে ওধারে, সে নাকি এখানেই গদি বানিয়ে দেবে। তার আগে যদি মহানগরীর পথে এগিয়ে যেতে পারি, তা'হলে গদিটা মহানগরীর বুকেই পাতা হোতে পারে।

জিজ্ঞাসা করলাম—"গাড়ি আছে তোমাদের সঙ্গে? রেল গাড়ীতে পাঁচজনের সঙ্গে আমি যেতে পারি না।"

আছে, মস্ত গাড়ি পড়ে আছে ক'দিন মোহন্ত মহারাজের বাড়ির সামনে। সূর্যোদয়ের আগেই সে গাড়ি মহানগরীতে পৌছে দিতে পারে।

অতএব আর বিলম্ব করলাম না। ওদের দু'জনের কাঁধে দু'হাত দিয়ে কোনও রকমে গাড়িতে গিয়ে চড়লাম। বৃন্দাবন যাত্রীদের গাড়ি ছাড়বার অনেক আগে সাচ্চা দরবারের এলাকা ছাড়িয়ে আমাদের গাড়ি মহানগরীর পথে ছুটে চলল। দামী গদির মধ্যে ডুবে বসে নিতাইয়ের শেষ কথাগুলোই একবার মনে মনে আওড়ে নিলাম—"আশীর্বাদ কর গোঁসাই, যেন তোমার মত নজর হয়। সাদা হাড় আর কালো কয়লা দেখে আর যেন না ঠকে মরি।"

আশীর্ব্বাদটা খোলা মনে নিজেকেই নিজে করে ফেললাম।

সমাপ্ত

সন ১৩৬৯ সালের রাষ্ট্রগত বর্ষফল

উপাধ্যায়

দ্ব্যাত্মক অগ্নি সংজ্ঞক ধনু রাশিতে বঙ্গাব্দ ১৩৬৯ সালের বর্ষ প্রবেশ বর্ষারম্ভ সময়ে মেষে, রবি বুধ ও শুক্র, কর্কটে চন্দ্র রাহু, মকর কেতু-শনি, কুম্ভে বৃহস্পতি ও মীনে মঙ্গল অবস্থিত। বর্ষারম্ভে গ্রীষ্ম-প্রবাহ বর্দ্ধমান। শুষ্ক আবহাওয়া। দক্ষিণপূর্ব্ব এশিয়ায় প্রবল ঝটিকা আর তৎসহ নানাদিকে বারিবর্ষণ হবে। বিশ্বমানব সমাজের মধ্যে মানসিক অশান্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। সর্ব্বত্র যুদ্ধাতঙ্ক ও অর্থ-নৈতিক কৃচ্ছ্রতাই হবে অশান্তি আর উদ্বেগের স্রষ্টা। লালচীনের স্পর্দ্ধা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। তার অন্যায় আচরণ ও এক-গুঁয়েমিভাব বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে দূষিত আবহাওয়ার সৃষ্টি করবে। প্রকৃত যুদ্ধকে এড়িয়ে চল্‌বার প্রচেষ্টা ব্যাহত হবে। খণ্ড খণ্ড যুদ্ধের মাধ্যমে শেষে বিশ্ব সমরানল প্রজ্জ্বলিত হবার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। জার্ম্মানীকে কেন্দ্র করে একদিকে যেমন অশুভ ঘটনার সমাবেশ হবে, অপরদিকে তেমনই দূরপ্রাচ্যে ও মধ্যপ্রাচ্যে সমরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়ে বিশ্বে ভীতি উৎপাদন করবে। লালচীনের পররাজ্যে লোলুপতার পরিণাম ভয়াবহ। রাশিয়ার সঙ্গে তার মতবৈষম্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। ফলে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সাহচর্য্য তিরোহিত হবার বিশেষ সম্ভাবনা। ঘনঘটাচ্ছন্ন রাজনৈতিক আকাশ গাঢ় কৃষ্ণ মেঘে আবৃত করবে মিশর, তুরস্ক, সৌদি আরব, ইরান, ইরাক, আলবানিয়া, লিথুয়ানিয়া, স্পেন, আবি-সিনিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রকে। শুধু এরাই সঙ্কট দুর্যোগের মধ্যে বিপন্ন হবেনা, প্যালেষ্টাইন, সিরিয়া, সাইপ্রাস, আয়ার্ল্যাণ্ড, মরক্কো, এশিয়া মাইনর, টাঙ্গানাইকা, এঙ্গোলা, কঙ্গো, আলস্কা, আলেকজান্দ্রিয়া পর্টুগাল, বেল-জিয়ম, ব্রেজিল, লেবানন, রোডেসিয়া প্রভৃতি দেশগুলিও অশুভ ঘটনার ভিতর বিপর্য্যস্ত হবে। এদের বর্ত্তমান পরিস্থিতির পরিবর্ত্তন আর নূতন পটভূমিকার সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী। পৃথিবীতে শস্যবৃদ্ধি, প্রবল ঝটিকা, ভূকম্পন, লোকক্ষয়, কতিপয় অদ্ভুত নূতন ব্যাধি, গ্রীষ্মও হিম প্রবাহের আধিক্য, সুবৃষ্টি ইত্যাদি যোগ আছে।

বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণে ভারতবর্ষ বর্ত্তমানবর্ষে বিব্রত হবে। উনত্রিশে শ্রাবণ থেকে চব্বিশে পৌষ পর্য্যন্ত দিনগুলি অত্যন্ত অশুভ। এসময়ে ভারতের রাজনৈতিক সামাজিক ও প্রাকৃতিক অবস্থা বিশেষ দুর্দ্দশাপ্রদ। পনরোই আষাঢ় থেকে পনরোই কার্ত্তিক পর্য্যন্ত সময়ের ভিতর জলপ্লাবন, দুরন্ত ঝটিকাপ্রবাহ, জন-বিক্ষোভ, সর্ব্ব-জনবরেণ্য বিশিষ্ট বিদগ্ধ ব্যক্তি ও রাজনৈতিক জননেতার প্রাণহানি বা পতন, আকস্মিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, ধর্ম্মঘট প্রভৃতি ঘটনাগুলি গভীর তাৎপর্য্য পূর্ণ। বত্রিশে শ্রাবণ থেকে নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যের দর যেমন চড়ে যাবে, অনেকগুলি দ্রব্য চোরাবাজারের মধ্যে আত্মগোপন হেতু দুষ্প্রাপ্য হবে, কোন রকমে কোনটা পাওয়া গেলেও চোরাকারবারীর কবল থেকে নেবার সময় বেশ পয়সা ছড়াতে হবে। একারণে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের শোচনীয় দুর্গতি। উপজাতি সমস্যা বিশেষতঃ নাগাসমস্যা খুব জটিল হয়ে উঠ্‌বে। ভারতের এই দুঃসময়ে সমাজঘাতী নীতি অবলম্বন করে এক শ্রেণীর পশ্বাচারী ব্যবসায়ী দারুণ অর্থস্ফীত হবে, আর তারা বিস্তার করবে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি। একাধিক দ্রব্যের উপরে করভার-বৃদ্ধি করে জন সাধারণের চিত্ত বিক্ষুব্ধ করা হবে। ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের বিভিন্ন ধারায় বহুলোক অভিযুক্ত হবে। গুপ্তহত্যা, ষড়যন্ত্র-মূলক কার্য্য কলাপ, বৈদেশিক শত্রুকে ভারত ভূমিতে পদার্পণ করবার জন্য গুপ্ত ষড়যন্ত্র ও যোগাযোগ, হত্যা, খুন, প্রবঞ্চনা, রাহাজানি, সাম্প্র-দায়িকতা ও ভাষা সমস্যা আন্দোলন প্রভৃতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাকি-স্তানীরা ভারতে অনুপ্রবেশ করে সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটাবার চেষ্টা করবে। তা ছাড়া ঘুষ, প্রতারণা জালিয়াতি আইন ও শৃঙ্খলা বর্জ্জনের জন্য দুঃসাহসি-কতা প্রকাশ, উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের মধ্যে অনেকেরই নৈতিক অবনতি, আদর্শের বিচ্যুতি, ও চারিত্রিক অধঃপতন, ঔষধপথ্য ও আহার্য্য দ্রব্যে ভেজাল বৃদ্ধি প্রভৃতি দেশের মানসিক সুস্থতার পরিপন্থী হয়ে রাষ্ট্র উন্ন-য়নের পথ কণ্টকাকীর্ণ করবে। বেকার-সমস্যার সমাধান হবে না। উদ্বা-

পুনর্বাসন প্রহসনে পরিণত হবে। আসামের দিকে অমঙ্গলের সম্ভাবনা খুব বেশী। রাষ্ট্রের উপরতলার লোকগুলোর মধ্যে অনেককে বিনাশ কিম্বা পতনের সম্মুখীন হোতে হবে। দেশরক্ষায় নিযুক্ত সৈন্যদলের কিছু কিছু বিনষ্ট হবার আশঙ্কা থাকায় আরও চিন্তার কারণ। উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন দেশ বহু প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সৎ-কর্ম্মশীল ধর্ম্মপরায়ণ ও আদর্শবান ব্যক্তিগণের হানিযোগ।

পশ্চিম-বাংলার অবস্থা এবৎসর অতিশোচনীয় ও ভয়াবহ। নানা প্রকার আকস্মিক উপদ্রবে এই রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত হবে, ব্যাহত হবে উন্নয়ন ও ক্রমোন্নতির প্রচেষ্টা। যোলই আষাঢ়ের পর থেকে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে, প্লাবন, দুর্য্যোগ, ঝড় ও ভূমিকম্প দেখা দেবে। যোলই আশ্বিন শনি বক্র ত্যাগ করলে অর্থনৈতিক দুর্দ্দশা কিছুটা লাঘব হবে। সাংসারের বণ্টননীতির দোষে কৃষক সম্প্রদায় ও উটজ শিল্পীসম্প্রদায় বিশেষরূপে ক্ষতি ভোগ করবে। বৎসরের মধ্যভাগে মন্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে একটু অদল বদল হবে। শান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্ট হবে, গণ বিক্ষোভ, বৈপ্লবিক ভিত্তির উপর যে সব কার্য্যকলাপ, আচার ও আচরণ প্রত্যক্ষ করা যাবে, সেগুলির পশ্চাতে নিহিত থাকবে রাজনৈতিক দলীয় স্বার্থসিদ্ধির সক্রিয়তা। সুদীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত চাপা অসন্তোষের পরিণতি হয়ে উঠবে বিশেষ চিন্তার বিষয়। বহু বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান দুর্দ্দশাগ্রস্ত হবে। গণ আন্দোলন উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পাবে, কেন্দ্রীয় সরকারের অসহযোগ ও অসন্তোষ আরও তাৎপর্য্যপূর্ণ ও গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠবে। বর্ত্তমান বর্ষে বাংলার কতিপয় কৃতীসন্তান, বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তি, শিল্পপতি ও নেতার জীবনাবসান, পতন ও বিপর্য্যয় ঘটবে। মহামারী ও দুর্ভিক্ষের প্রকোপ। নূতন অপরিচিত রোগের প্রাদুর্ভাব ও তজ্জনিত বহু লোকক্ষয়। শস্য হোলেও নানাভাবে নষ্ট হবে।

পাকিস্থানের ক্রমোন্নতি যোগ। বৈদেশিক সাহায্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে বহু বিষয়ে এই রাষ্ট্র স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে। দুর্নীতি দমনের প্রচেষ্টা কিছুটা সাফল্যমণ্ডিত হবে। প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ দেখা দেবে। প্লাবন ও প্রচণ্ড ঝটিকার আশঙ্কা আছে। জনবিক্ষোভ গণআন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন প্রভৃতি সক্রিয় হয়ে উঠবে। রাষ্ট্রের কতকগুলি বিভাগের (যেমন ডাক, শিক্ষা, শিল্প, পরিবহন, পূর্ত্ত ও স্বরাষ্ট্র) উন্নতির যোগ। দেশের বিভিন্ন স্থানে ষড়যন্ত্রকারীদের যাবতীয় প্রচেষ্টা শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যাবে, বৈদেশিক নীতিতে খ্যাতি ভারত অর্জ্জন করবে। পাক্ প্রেসিডেন্টের পক্ষে বৎসরটী অনুকূল নয়। বৎসরের মধ্যভাগে মহামারীর প্রকোপ দেখা যাবে, তাছাড়া কোন নূতন রোগের আবির্ভাবে বহু লোকক্ষয়! বসন্ত, কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতি প্রাদুর্ভাব হেতু বহু জীবনের অবসান। পাকিস্থানে কয়েকজন নেতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবন হানি ঘটবে।

রাশিয়ার পক্ষে বর্ত্তমান বর্ষটী অশুভ প্রদ, ক্রুশ্চেভের বিরুদ্ধে জনমত গঠিত হবে। দলীয় চক্রান্ত দেখা দেবে, তজ্জন্য আলোড়নের সৃষ্টি হবে। পররাষ্ট্র নৈতিক মর্য্যাদা অক্ষুন্ন থাকবে। বৈজ্ঞানিকআবিস্কার, চিকিৎসার উন্নতিকল্পে নানাবিধ আবিস্কার পরিলক্ষিত হয়। যুদ্ধ পরিহারের নীতি অনুসৃত হবে। ইংলণ্ডে দলীয় আদর্শ সংঘাতের দরুণ মন্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে কিছু পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা। যুদ্ধ পরিহারের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। রাশিয়ার সঙ্গে ইংলণ্ডের কোন কোন বিষয়ে মতৈক্য ঘটবে। বৎসরের মধ্যভাগে শ্রমিক বিক্ষোভ গুরুত্ব ব্যঞ্জক। পরোক্ষভাবে কোন দেশকে সাহায্য করতে গিয়ে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে জড়িত হোতে পারে। আমেরিকায় প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের প্রাবল্য। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেও ঘটবে। কতিপয় মার্কিণ বিশিষ্ট ব্যক্তি ও নেতার মৃত্যু। মার্কিণ প্রেসিডেন্টের প্রতি দেশবাসীর গভীর আস্থা ও আনুগত্য পরিলক্ষিত হয়।

ইতিপূর্ব্বে ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের বর্ষারম্ভে বিশদভাবে পৃথিবীর রাষ্ট্রগত বর্ষফল বলা হয়েছে, সুতরাং বাঙলা সনের বর্ষ প্রবেশ সময়ে সংক্ষিপ্ত-ভাবে বিশ্বের ফলাফল বলা গেল। পশ্চিম বাঙলা সম্পর্কে চিন্তার কারণ আছে, পূর্ব্ব থেকে রাষ্ট্র কর্ণধারগণ ও সমাজহৈতিষী ব্যক্তি মাত্রেই বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দিলে কিছুটা সঙ্কট দুর্য্যোগের কবল হোতে মুক্ত হওয়া যাবে। এই দুর্ব্বৎসরে স্বার্থপরতার পরিবর্ত্তে প্রত্যেক ব্যক্তিকে পরার্থ-পরতার জন্য আত্মোৎসর্গ বিধেয়, নতুবা পশ্চিম বাঙলার বিশেষ বিপন্নতাও নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি জাতির আত্মবিলোপ সাধনের সহায়ক হয়ে উঠবে। ভারতবর্ষে বৈদেশিক আক্রমণ হোলেও রাষ্ট্রিক ও সামরিক শক্তির কর্ম্ম তৎপরতার ফলে সে আক্রমণ প্রতিহত হবে। কোন একজন মহামানবের আত্ম প্রকাশের সম্ভাবনা। এঁরই সম্বন্ধে বহুদিন ধরে চলেছে মানব মনের আলোড়ন।

ব্যক্তিগত দ্বাদশরাশির ফলাফল

মেষরাশি

অশ্বিনী ও কৃত্তিকা নক্ষত্রজাতগণের পক্ষে উত্তম সময়। ভরণী জাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট ফল। উত্তম স্বাস্থ্যসুখ, নানা উপায়ে লাভ, মাঙ্গলিক উৎসব অনুষ্ঠান, বিলাস ব্যসন দ্রব্যাদি লাভ, উত্তম বিত্তার্জ্জন শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে সাফল্য ইত্যাদি সূচিত হয়। শেষার্দ্ধ অপেক্ষা প্রথমার্দ্ধ শুভ। স্বাস্থ্য ভালোই যাবে, দ্বিতীয়ার্দ্ধ অপেক্ষা প্রথমার্দ্ধ উত্তম। স্বাস্থ্যবান ব্যক্তিদের সুস্থতা অটুট থাকবে। পুরাতন ব্যাধি-গ্রস্ত ব্যক্তিদের সতর্কতা আবশ্যক, বিশেষতঃ যারা রক্তের চাপবৃদ্ধি, উদর, বক্ষ ও ফুস্ ফুস্ সংক্রান্ত পীড়ায় ভুগছে, তাদের পক্ষে অত্যন্ত সতর্ক হওয়া বাঞ্ছনীয়। গৃহে শান্তি ও সুখ অব্যাহত থাকবে। জন্ম বিবাহ প্রভৃতি শুভ ঘটনাগুলি পরিলক্ষিত হয়। ভ্রমণ, পিক্‌নিক ও আমোদ প্রমোদের আতিশয্য। দ্বিতীয়ার্দ্ধে কিছু মনোমালিন্য, কলহ, ক্লান্তিকর ভ্রমণ ও অবাঞ্ছিত কষ্টভোগ। আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক। প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ। ব্যয়াধিক্য হেতু আশানুরূপ সঞ্চয়ের অভাব।

কতকগুলি মতলব বাজ বন্ধু বা পরিচিত ব্যক্তির কুপ্রচেষ্টার ফলে কিছু কিছু ক্ষতি। স্পেকুলেশনে কিছু সাফল্য। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবিগণের পক্ষে মাসটী উত্তম নয়। চাকুরিজীবিদের পক্ষে শুভ। নূতন পদমর্য্যাদা লাভ, পদোন্নতি অথবা অন্যান্য অনুকূল পরিবর্ত্তন। কর্ম্মপ্রার্থীগণ দর্শনেচ্ছু হোলে বা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিলে শুভ সুযোগের সম্ভাবনা আছে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবিগণের পক্ষে মাসটী মোটের ওপর ভালো—কর্ম্মপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে না। মহিলাদের আগ্রহ ও আকর্ষণ যে সব বিষয়ের উপর দেখা যায়, সে সব বিষয়ে হস্তক্ষেপ করলে, তারা সাফল্য লাভ করবে। অবৈধ প্রণয়ে আশাতীত সাফল্য। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে উত্তম পরিস্থিতি হেতু আত্মপ্রসাদ লাভ। মানমর্য্যাদা বৃদ্ধি, প্রভাব-প্রতিপত্তির বিস্তৃতি, উত্তম বিবাহ, দাম্পত্য সুখ, সন্তান লাভ, উত্তম সংসর্গ ও বন্ধু লাভ, বিলাসব্যসন দ্রব্যাদি উপভোগ, সম্ভোগ সুখের আতিশয্য, নানা প্রকার লাভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের উন্নতি। রেসে লাভ]

বৃষরাশি

কৃত্তিকা জাতগণের পক্ষে উত্তম। রোহিণী ও মৃগশিরা জাতগণের পক্ষে মধ্যম এবং একই রূপ ফল। প্রথমে কর্ম্মে ঔদাসীন্য ও আসক্তির হ্রাস ঘটলেও মোটামুটি সাফল্য ও সৌভাগ্যলাভ। বিলাস ব্যসন দ্রব্যাদি লাভ ও-উপভোগ, বন্ধুলাভ, পুরাতন বন্ধুদের দুই এক জনের অভাব বোধ, বন্ধু বিয়োগ হেতু মানসিক কষ্ট, অপ্রত্যাশিত ভাবে অপ্রিয় পরিবর্ত্তন, ব্যয়বৃদ্ধি, উত্তম বিদ্যার্জ্জন, শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে উত্তম ফল, শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বীদের অপপ্রচেষ্টার জন্য মানসিক কষ্ট, কষ্টপ্রদ ভ্রমণ। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালো। তবে কিঞ্চিৎ শারীরিক দুর্ব্বলতা। সন্তানাদির পীড়া, তজ্জন্য চিকিৎসকের আশ্রয় গ্রহণ প্রয়োজনীয়। পারিবারিক ক্ষেত্র প্রীতিপ্রদ, সুখশান্তির সক্রিয়তা। মাসের শেষের দিকে কিঞ্চিৎ কলহাদির সম্ভাবনা, তাও স্ত্রীর সঙ্গে। তবে মারাত্মক কিছু নয়, স্বজনবর্গের সঙ্গে কিছু মনান্তর—এগুলি গুরুতর হবে না। অর্থোপার্জ্জনের প্রাবল্য, অবহেলার জন্য মধ্যে মধ্যে আর্থিক ক্ষতি, আয়বৃদ্ধি ও সঞ্চয়। প্রথমার্দ্ধে ধন ও আয়ের আধিক্য শেষার্দ্ধে ব্যয় প্রবণতা। একটু সতর্ক হোলে জমার দিকে অর্থের বেশী অঙ্কপাত হোতে পারে। স্পেকুলেশনে ব্যর্থতা। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে উত্তম সময়। শস্যোৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি। চাকুরিজীবিরা অনুকূল আবহাওয়ায় পুষ্ট হবে। পদোন্নতি, মর্য্যাদা, ও প্রশংসার সম্ভাবনা। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবিদের অবস্থা হ্রাসবৃদ্ধি সম্পন্ন, কখন অত্যন্ত লাভ কখন বা ক্ষতি। মহিলাদের অতীব উত্তম সময়। অবৈধ প্রণয়ে আশাতীত সাফল্য এবং অপ্রত্যাশিত লাভ। সুখস্বচ্ছন্দ্যতার অব্যাহতগতি। পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে কর্তৃত্বের অধিকার জনিত আত্ম প্রসাদলাভ। প্রণয়সুযোগলাভেচ্ছু নারীর প্রণয় যোগাযোগ, বাগ্‌দত্তার বিবাহ, কোর্টসিপে ও সন্তোষ জনক প্রভৃতি। সামাজিক অনুষ্ঠানে বা ভ্রমণে যে ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মিশ্র সম্মেলন, সেক্ষেত্রে যোগদানের সময় অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে মেলা মেশা বা সান্নিধ্য বর্জ্জনীয়। কৃত্তিকাজাত নারীর যৌন সংসর্গস্পৃহার প্রাবল্য যোগ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর উত্তম সময়। রেসে জয়লাভ।

মিথুন রাশি

মৃগশিরাজাতগণের পক্ষে উত্তম সময়। আর্দ্রা এবং পুনর্ব্বসুর পক্ষে মধ্যম। মাসটী সকলের পক্ষে বেশ আশাপ্রদ এবং ভালোভাবে অতিবাহিত হবে। উত্তরোত্তর সাফল্যলাভ, বিলাস ব্যসন সম্ভোগ, উত্তম শক্তিসম্পন্ন সুহৃদলাভ, সৌভাগ্যও সুখাতিশয্য, শত্রু জয়, প্রতিদ্বন্দ্বীর পরাক্রম হ্রাস, মাঙ্গলিক উৎসব অনুষ্ঠান ও তৎসম্পর্কে সক্রিয় অংশগ্রহণ। রক্তগত শনির জন্য কিছু শারীরিক ও পারিবারিক কষ্ট, উদ্বেগ বা অশান্তির সম্ভাবনা। কিন্তু এগুলি মারাত্মক নয়। উত্তম স্বাস্থ্যের অক্ষুন্নতা, মানসিক শান্তি, ঘরে বাহিরে মত ভেদের অভাব, ঐক্য প্রীতি, বিবাহ, সন্তান জন্ম প্রভৃতি শুভ ঘটনার সম্ভাবনা, বিলাসিতায় অবগাহন। আর্থিক উন্নতি। লাভের বৃদ্ধি, অর্থস্ফীতি, সৌভাগ্যের বৃদ্ধি। মাসের শেষের দিকে কিছু ব্যয় বৃদ্ধি। স্পেকুলেশনে ক্ষতি। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে উত্তম সময়। গৃহ জমি ও বিনিময় সংক্রান্ত ব্যাপারে লাভ, বাড়ী বা জমি কেনা বেচায় লাভের আধিক্য। কৃষির অবস্থা আশাতীত উত্তম হওয়ায় কৃষিজীবির সৌভাগ্যবৃদ্ধি। চাকুরির ক্ষেত্র অত্যন্ত সন্তোষ জনক, অবহেলিত কর্ম্মীরা উপর ওয়ালার সুনজরে এসে উন্নতি করবে, তাদের পদোন্নতির সুযোগ ব্যাহত হবে না। বেকার ব্যক্তিদের কর্ম্মলাভ, অস্থায়ী কর্ম্মীর স্থায়ীপদে প্রতিষ্ঠা। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির লাভাধিক্য ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি। মহিলাদের মনোমত ইচ্ছাগুলি পূর্ণ হবে। অবৈধ প্রণয়িনীদের আশাতীত সুযোগ ও সাফল্যলাভ। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে উত্তম অনুকূল আবহাওয়া। দীর্ঘ ভ্রমণ ও তজ্জনিত প্রচুর আনন্দ। সামাজিক মর্য্যাদা ও সম্মান লাভ এবং জন প্রিয়তা অর্জ্জন। বিবাহের যোগাযোগ। উত্তম বিবাহ। মঞ্চ ও চিত্রশিল্পী সঙ্গীত ও চারু কলা নিপুণা ও কবি সাহিত্যিকারখ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন। বন্ধুদের পরামর্শ গ্রহণ সম্পর্কে মহিলাদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম সময়। রেসে আংশিক ক্ষতি কিন্তু লাভের মাত্রাধিক্য যোগ্য।

কর্কটরাশি

পুষ্যানক্ষত্রজাত ব্যক্তিগণের পক্ষে উত্তম সময়, অশ্লেষাজাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট সময়, পুনর্ব্বসুজাতগণের পক্ষে মধ্যম সময়। সকলেরই ভাগ্যে এই মাসটি মিশ্রফল দাতা। প্রথমার্দ্ধ অপেক্ষা শেষার্দ্ধই সৌভাগ্যপ্রদ। উদ্দেশ্যসিদ্ধি লাভ, বিলাসিতা, উত্তমশক্তি সম্পন্ন বন্ধুর প্রচেষ্টার সাফল্য ও সুখ সমৃদ্ধিলাভ। ক্লান্তিকর ভ্রমণ, দৈহিক শ্রান্তি অনুভূতি, কিছু অবাঞ্ছনীয় পরিবর্ত্তন, অকারণ কলহ প্রভৃতিও প্রত্যক্ষ করা যায়।

স্বাস্থ্যের অবনতি না ঘটলেও দুর্ঘটনার ভয় আছে। পদব্রজে মোটর বা ট্রেণে ভ্রমণকালে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা। স্বজনবন্ধুবর্গের সহিত কলহ বিবাদ। আর্থিক অবস্থা আশাপ্রদ নয়। অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে শত্রুতা ও মনোমালিন্য। অর্থের প্রচেষ্টায় ব্যর্থতা ও তজ্জনিত কিছু ক্ষতি। আত্মীয় স্বজন ও স্ত্রীলোকই ক্ষতির কারণ। কিন্তু তবু ও লাভ ও অর্থাগম একেবারে বন্ধ হবে না। দানের আনুকূল্যে, উপঢৌকন অথবা অংশীদারের দাক্ষিণ্যে লাভও অর্থপ্রাপ্তির যোগ। গতানুগতিক আয়ের নিম্নে এসে অর্থনৈতিক সঙ্কট ঘটবে না। স্পেকুলেশনে অগ্রসর হলেই বিপত্তি। ভূম্যধিকারী, বাড়িওয়ালা ও কৃষিজীবির পক্ষে মাসটি ভালো নয়। শস্যহানি, ক্ষেত্রনাশ ও খাজনা বা ভাড়া আদায়ে দুর্ভোগ আছে। জমি বা বাড়ি কেনা বেচা, গৃহনির্মাণ বা সংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে হস্তক্ষেপ বর্জ্জনীয়। প্রথমার্দ্ধে চাকুরীজীবিদের অসুবিধা ভোগ, শেষের দিকে অবস্থার উন্নতি। দীর্ঘদিনের বাসনা পূর্ণ হবে। চাকুরিপ্রার্থীর কর্মক্ষেত্রের নিয়োগকর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দেওয়া প্রভৃতির মাধ্যমে সাফল্য। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে মাসটি সর্ব্বোত্তম। মহিলাদের পক্ষে ও অশুভ সম্ভাবনা নাই। উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির সহিত নূতন পরিচয় ও বন্ধুত্ব, সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিপত্তি ও খ্যাতি পারিবারিক ক্ষেত্রেও কর্ত্তৃত্ব করবার অধিকার প্রাপ্তি। অবৈধ প্রণয়ে সুযোগ ও সুখ স্বচ্ছন্দতা, ভ্রমণ, পিকনিক, দীর্ঘভ্রমণ প্রভৃতির মাধ্যমে আনন্দলাভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম মাস। রেসে পরাজয়।

সিংহ রাশি

মঘা ও উত্তরফল্গুনীজাতগণের উত্তম সময়। পূর্ব্বফল্গুনীর পক্ষে মাসটি মোটের উপর সকলের পক্ষে ভালো বলা যায়। শেষার্দ্ধ অপেক্ষা প্রথমার্দ্ধই বিশেষ ভালো। ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি, সাফল্য লাভ, নূতন বিষয়ে অধ্যয়নে অনুরাগ, বিবাহাদি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, বিলাসব্যসন দ্রব্যাদি প্রাপ্তি মাসের প্রথমার্দ্ধে। শেষার্দ্ধে ভ্রমণজনিত ক্লান্তি, বাধা বিপত্তি কলহবিবাদ প্রভৃতির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য সুখ। যারা বহুদিন থেকে উদর ও চক্ষুঘটিত পীড়ায় বা রক্তের চাপ বৃদ্ধি রোগে ভুগছে তাদের পক্ষে প্রথমার্দ্ধে বিশেষ দৃষ্টি নেওয়া দরকার। শেষার্দ্ধে দুর্ঘটনা বা আঘাত প্রাপ্তির সম্ভাবনা। পারিবারিক সুখস্বচ্ছন্দতা ও শৃঙ্খলা অটুট থাকবে, মতানৈক্যের সম্ভাবনা নেই। আমোদ প্রমোদ, বিলাসিতা প্রভৃতির জন্য কিছু ব্যয়াধিক্য। অংশীদার অথবা স্ত্রীর মাধ্যমে লাভ। অন্যান্য বিষয় ভালো হোলেও অর্থের দিকটা ভালো বলা যায় না। স্পেকুলেশনে অর্থাগম। লাভ হোলেও কিছু অর্থক্ষতি যোগ। বাড়িওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে মাসটি সুবিধাজনক নয়। মামলা মোকর্দ্দমার আশঙ্কা করা যায়। চাকুরিজীবির পক্ষে উত্তম সময়—পদোন্নতি, সম্মান, খ্যাতি ও প্রতিপত্তিলাভ। চাকুরিপ্রার্থী হয়ে পদ-নিয়োগ-কর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ কিম্বা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দেওয়া ব্যর্থ হবে না। বেকার ব্যক্তির আশাপ্রদ পদপ্রাপ্তি। বৃত্তিজীবি ও ব্যবসায়ীর পক্ষে উত্তম।

স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি অনুকূল। সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে উত্তম পরিস্থিতি অবৈধ প্রণয়ে সাফল্যলাভ। প্রণয়ের ক্ষেত্রে আশাতীত সাহিত্য শিল্পকলা, সঙ্গীত প্রভৃতি চর্চ্চায় যারা আত্মনিয়োগ করেছে, তাদের প্রতিভার স্ফুরণ ও অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি হবে। উত্তম বিবাহ ও সৌভাগ্যবৃদ্ধি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম সময়। রেসে লাভ।

কন্যা রাশি

উত্তরফল্গুনী জাতব্যক্তিগণের পক্ষে উত্তম সময়। চিত্রার পক্ষে মধ্যম এবং হস্তার পক্ষে নিকৃষ্ট সময়। এ রাশি জাতগণের কোন উল্লেখ যোগ্য ভালোমন্দ নেই। ক্লান্তিকর ভ্রমণ, স্বাস্থ্যের অবনতি। কর্ম্মপ্রচেষ্টায় সাফল্য, লাভ, বিলাস ব্যসন দ্রব্যাদি লাভ, কলহবিবাদ ও মনান্তর, নূতন বিষয় অধ্যয়নে জ্ঞানবৃদ্ধি। উদর ও গুহ্যপ্রদেশ ও মূত্রাশয়ে কিষ্টভোগ। অতিরিক্ত গরম বোধ, রক্তের চাপবৃদ্ধি প্রভৃতি মাসের শেষার্দ্ধে। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন ও স্ত্রীপুত্রাদির সঙ্গে মত ভেদজনিত অশান্তি, এমন কি মনান্তর। আর্থিক অবস্থা মাঝামাঝি। ব্যয়বৃদ্ধি যোগ। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। দৈনন্দিন জীবন যাত্রার মান সংরক্ষণে সতর্কতার প্রয়োজন, অন্যথা ব্যয়াধিক্য হেতু চিন্তার কারণ ঘটতে পারে। বাড়িওয়ালা ও ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে মাসটি উত্তম বলা যায় না। ভাড়াটিয়ার আচরণ প্রতিকূল হওয়ার সম্ভাবনা, জমি খাজনাসংক্রান্ত ব্যাপারের অশান্তির সৃষ্টি এমন কি মামলা মোকর্দ্দমা, ফসলের ক্ষতি প্রভৃতি সম্ভব। গৃহ ও জমির উদ্দেশ্যে এমাসে অর্থনিয়োগ অনুচিত। চাকুরিজীবির পক্ষে মাসটী প্রতিকূল। উপরওয়ালার বিরাগভাজন হবার সম্ভাবনা। চাকুরিস্থলে অপ্রত্যাশিতভাবে অবাঞ্ছিত পরিবর্ত্তন ও এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বদলি হওয়ার অবস্থা। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে নিকৃষ্ট সময়।

মহিলাদের পক্ষে মাসটি মন্দ নয়। সময়ে সময়ে নৈরাশ্য জনক পরিস্থিতি ঘটবে। অবৈধ প্রণয়ে বিপত্তি। পূর্ব্ব থেকে যারা অবৈধ প্রণয়িনী তাদের পক্ষে সতর্কতা আবশ্যক। নতুবা মারাত্মক পরিবেশের সৃষ্টি হবে। স্ত্রীলোকের দৈহিক কষ্ট ও পীড়ার সম্ভাবনা। সামাজিক ক্ষেত্রে দুর্ণাম। পারিবারিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে আশাভঙ্গ ও মনস্তাপ গৃহের বাহিরের সকল প্রকার কার্য্যকলাপ থেকে নিজেকে এমাসে অপসারিত করা বাঞ্ছনীয়। চাকুরিজীবি স্ত্রীলোকেরাও নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলার মধ্যে দিন যাপন করবে, প্রলুব্ধ হবার সম্ভাবনা। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে অশুভ সময়। রেসে জয়লাভ।

তুলারাশি

চিত্রানক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিগণের পক্ষে উত্তম, স্বাতী ও বিশাখানক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তিগণের পক্ষে মধ্যম। মাসটি মিশ্রফলদাতা। শত্রুজয়, উত্তম স্বাস্থ্য, লাভ, সুখ ও সৌজন্য, মাঙ্গলিক উৎসব অনুষ্ঠান প্রভৃতি। শরীর মোটামুট ভালোই যাবে তবে উদরে কিম্বা গুহ্যপ্রদেশে সামান্য পীড়া। ভ্রমণে ক্লান্তি। পারিবারিক ক্ষেত্রে ঐক্য ও সুখস্বচ্ছন্দতা, মধ্যে মধ্যে স্ত্রী পুত্র ও আত্মীয় স্বজনের সংগে সামান্য মনোমালিন্য। আর্থিক অবস্থা এক ভাবে যাবে। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। বাড়িওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির

পক্ষে মাসটি উত্তম বলা যায় না। সম্পত্তি বা গৃহ কেনা বেচা বর্জ্জনীয়। সম্পত্তি তদারকের জন্য ভ্রমণের প্রয়োজন হবে। চাকুরিজীবির পক্ষে মাসটি মিশ্রফলদাতা. প্রথমার্দ্ধ অনুকূল, দ্বিতীয়ার্দ্ধ প্রতিকূল। প্রথমাদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাফল্য। শত্রু জয়, উপরওয়ালার প্রীতিভাজনহবার সম্ভাবনা দ্বিতীয়ার্দ্ধে হুঁসিয়ার হয়ে অফিসের কাজ করা দরকার। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে মাসটী মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়, একভাবে সময় অতিবাহিত হবে।

স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী অত্যন্ত অনুকূল ও শুভপ্রদ। অবৈধ প্রণয়ের ক্ষেত্রে সাফল্য। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে উত্তম পরিস্থিতি। পুরুষের সাহচর্য্যে নানা প্রকার লাভ, উত্তম ভ্রমণ। দ্বিতীয়ার্দ্ধে স্বাস্থ্য হানির সম্ভাবনা আছে, কঠিন পরিশ্রম বর্জ্জনীয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে সময়টী মধ্যম। রেসে অর্থক্ষতি।

বৃশ্চিক রাশি

অনুরাধাজাতগণের উত্তম সময়, জ্যেষ্ঠাজাতগণের নিকৃষ্ট এবং বিশাখাজাতগণের মধ্যম সময়। দ্বিতীয়ার্দ্ধটী প্রথমার্দ্ধ অপেক্ষা বিশেষ অনুকূল। অর্থলাভ. আনন্দ, প্রচেষ্টায় সাফল্য, শত্রুজয়, শক্তি ও প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি, জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি। লোকের কাছে সম্মান হ্রাস, ক্ষতি, স্বজন বন্ধুবিয়োগ, মনোমালিন্য, অবাঞ্ছিত ঘটনার জন্য শত্রু পীড়া ভোগ। শরীর প্রায়ই খারাপ হবে। গুরুতর ব্যাধির আশঙ্কা নেই। প্রথমার্দ্ধে মানসিক অবস্থা মোটেই ভালো যাবে না, হজমের গোলমাল হোতে পারে। দুর্ঘটনার আশঙ্কা আছে এজন্যে ভ্রমণের সময়ে সতর্কতা আবশ্যক। দ্বিতীয়ার্দ্ধে সন্তানের পীড়া জনিত উদ্বেগ। ঐক্য ও সম্প্রীতি পারিবারিক ক্ষেত্রে অটুট থাকবে। শেষের দিকে স্ত্রীর সঙ্গে সামান্য মনান্তর ঘট্‌বে।

ধনলাভ ও আয়বৃদ্ধি, যোগটী প্রথম দিকেই বিশেষ প্রত্যক্ষ হবে। কারো জন্যে জামিন হওয়া বিপত্তির কারণ হবে। দ্বিতীয়ার্দ্ধ অপেক্ষা প্রথমার্দ্ধ ভালো। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে মাসটী মধ্যম। সন্তোষজনক শস্যোৎপত্তি। চাকুরি জীবির পক্ষে প্রথমার্দ্ধটী অনুকূল না হোলে ও শেষার্দ্ধ উত্তম হবে। প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার যোগ। পদনিয়োগ কর্ত্তার নিকট চাকুরিপ্রার্থীর উপস্থিতিও অনুকূল। অফিসে জনপ্রিয়তা অর্জ্জন, উপর ওয়ালার প্রিয়পাত্র হওয়ার যোগ, ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে মাসের প্রারম্ভে মধ্যম হোলে ও ক্রমশঃ সন্তোষ জনক হবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী অনুকূল নয়। অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে হুঁসিয়ার হওয়া আবশ্যক। অবৈধ প্রণয়িনীর বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে উত্তম পরিস্থিতি। অপরিচিত পুরুষের সংস্পর্শে আসা অবাঞ্ছনীয়। শেষার্দ্ধে ভ্রমণ, আনন্দ উপভোগ, ভালোবাসা, কোর্টসিপ বিবাহ প্রসঙ্গ প্রভৃতি সূচিত হয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটী অনুকূল নয়। রেসে পরাজয়।

ধনু রাশি

মূলা ও উত্তরাষাঢ়াজাতগণের পক্ষে শুভ. পূর্ব্বষাঢ়াজাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট সময়। সাফল্য, সম্মান ও সুখ, উত্তম বন্ধুত্ব, প্রিয় বন্ধু ও স্বজনবর্গের সাক্ষাৎ। প্রথমার্দ্ধে শারীরিক কষ্ট, উদরঘটিত অথবা গুহ্য প্রদেশে পীড়া, অজীর্ণ, উদরাময় বা আমাশয়ের প্রবণতা। নগদ টাকার টান ধরবে, পাওনা দারের তাগাদা, অর্থের লেন দেন ব্যাপারে ক্ষতির আশঙ্কা, আর্থিক প্রচেষ্টায় ব্যর্থতা। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে মাসটী আদৌ সন্তোষজনক নয়। সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে ভ্রমণের সম্ভাবনা। চাকুরির ক্ষেত্র বিশেষ খারাপ নয়, তবে সম্পূর্ণ ভালো বলা যায় না। এজন্য অফিসের সকল কাজে হুঁসিয়ার হয়ে চলা আবশ্যক। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে মাসের প্রথমার্দ্ধটী উত্তম, শেষার্দ্ধ নৈরাশ্য জনক। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী উত্তম, অবৈধ প্রণয়ের ক্ষেত্রে শুভ যোগ। নিজ গৃহে অথবা স্বজনবর্গের গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। শেষ সপ্তাহে কোর্টসিপ বা প্রণয় সংক্রান্ত বিষয়ে অগ্রসর না হওয়া উচিত। তা ছাড়া পরপুরুষের সান্নিধ্যে আসাও বাঞ্ছনীয় নয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটী আশাপ্রদ নয়। রেসে জয় লাভের কোন আশা নেই।

মকর রাশি

উত্তরাষাঢ়াজাত গণের পক্ষে উত্তম। শ্রবণা ও ধনিষ্ঠাজাত গণের পক্ষে মোটামুটি ভালো। উত্তম স্বাস্থ্য, লাভ, প্রচেষ্টায় সাফল্য, সুখ স্বচ্ছন্দতা, সৌভাগ্য বৃদ্ধি, গৃহে সন্তানের জন্মদিন হেতু মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি, পিত্ত প্রকোপ ও বায়ু বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। পারিবারিক সুখ, বিবাহোৎসব, বিলাস ব্যসনাদি সূচিত হয়। অর্থ প্রাপ্তি যোগ, বিভিন্ন উপায়ে লাভ, ধনবৃদ্ধি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভ্রমণ। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে উত্তম সময়। ভূম্যাদি ক্রয়, গৃহাদি নির্ম্মাণের সম্ভাবনা। চাকুরি জীবির পক্ষে শুভ। পদোন্নতির সম্ভাবনা আছে। চাকুরি-প্রার্থীর পদ নিয়োগ কর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ বা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ব্যর্থ হবে না। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে উত্তম সময়। স্ত্রীলোকের পক্ষে সুসংবাদপ্রাপ্তি, সুখকর ভ্রমণ, প্রিয় বন্ধু ও স্বজন ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ, বিদ্যার্জ্জনে বা শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে বিশেষ সাফল্য, নূতন বিষয়ে অধ্যয়ন ও তজ্জনিত আনন্দ লাভ। অবৈধ প্রণয়ে আশাতীত সাফল্য। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে উত্তম পরিস্থিতি ও সুন্দর পরিবেশ। সম্পত্তি লাভের যোগ। উপহার উপ ঢৌকন প্রভৃতি প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম সময়। রেসে জয়লাভ।

কুম্ভ রাশি

ধনিষ্ঠাজাতগণের পক্ষে উত্তম সময়, শতভিষা ও পূর্ব্বভাদ্রপদজাত গণের পক্ষে একই প্রকার মিশ্র ফল। মাসটী বিশেষ অনুকূল বলা যায় না। কিছু কিছু কষ্টভোগ আছে। দ্বিতীয়ার্দ্ধটী অনেকটা ভালো।

বহু প্রকার উদ্বিগ্নতা, দুশ্চিন্তা, কর্ম্মে বাধা, শারীরিক অসুস্থতা, শত্রু পীড়ন, প্রতিদ্বন্দ্বীদের অপকৌশল, স্বজন বিরোধ প্রভৃতির আশঙ্কা আছে। বায়ু পিত্ত ও যকৃতের দোষজনিত স্বাস্থ্যহানি। বিশেষ পারিবারিক অশান্তি ঘট্‌বে না। • মাসের বেশীর ভাগ সময়েই অর্থের টানাটানি। অর্থ লাভের প্রচেষ্টায় ব্যস্ততার জন্য ক্ষতি। এমাসে ব্যয়াধিক্য ও অর্থের অনাটন গভীর ভাবে অনুভূত হয়। অপরের জন্য জামিন হওয়া বিপজ্জনক। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে মাসটী অনুকূল। সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে মামলা মোকর্দ্দমার সম্ভাবনা। চাকুরির ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা নেই। মাসের শেষের দিকে উপরওয়ালার প্রীতি অর্জ্জন। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়। অবৈধ প্রণয়ে আশাতীত লাভ, সামাজিক পারিবারিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা ও মর্য্যাদা। শিল্প কলা, সঙ্গীত সাহিত্য প্রভৃতির দিকে যাদের ঝোঁক আছে, তাদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ ঘটবে। জ্ঞান লাভ, বিদ্যার্জ্জন প্রভৃতি সুচিত হয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ। রেসে পরাজয়।

মীনরাশি

উত্তরভাদ্রপদ জাতগণের পক্ষে উত্তম সময়। রেবতীজাতগণের পক্ষে সময়। পূর্ব্বভাদ্রপদগণের পক্ষে মধ্যম। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, সুখ সমৃদ্ধি, লাভ, সম্মানপ্রাপ্তি, উত্তম স্বাস্থ্য, শত্রুজয়, প্রভৃতি। রক্ত পিত্ত ও উত্তাপ বৃদ্ধি। অগ্নিভয় দুর্ঘটনার আশঙ্কা। পারিবারিক স্বচ্ছন্দতা, স্বজন বন্ধু বিয়োগ, ব্যয়বৃদ্ধি। আর্থিক প্রচেষ্টায় সাফল্য। বাড়িওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে শুভ নয়। অহেতুক ভ্রমণ। চাকুরির ক্ষেত্র ভাল বলা যায়। বেকার ব্যক্তির চাকুরিপ্রাপ্তি। অস্থায়ীপদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির কর্ম্ম স্থায়ী হবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির উত্তম সুযোগ ও সময়। মহিলাদের পক্ষে সময়টি বিশেষ শুভ। সুন্দর পরিবেশের মধ্যে আত্মপ্রসাদ লাভ। অবৈধ প্রণয়ে আশাতীত সাফল্য। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে উত্তম পরিস্থিতি, দাম্পত্য সুখস্বচ্ছন্দতা, জনপ্রিয়তা অর্জন এবং নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদের মধ্যে অবগাহন। 'কোর্টসিপ, শেষ সপ্তাহে পরপুরুষের সান্নিধ্যে আসা বর্জনীয়, গার্হস্থালী ব্যাপারে নিজেকে কেন্দ্রীভূত রাখা আবশ্যক, বাহিরে যাতায়াত ও মেলা-মেশার পরিণতি প্রীতিপ্রদ নয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ। রেসে জয়লাভ।

—

ব্যক্তিগত দ্বাদশ লগ্ন ফল

মেষ লগ্ন

দাঁতের পীড়া, পাকযন্ত্রের পীড়া বেদনাঘটিত পীড়া প্রভৃতির সম্ভাবনা। দেহভাবের ফল শুভ নয়। ধনভাব মধ্যবিধ। সহোদরের দ্বারা উপকৃত হবার যোগ। স্বজনবিরোধ, মাতার শারীরিক অসুস্থতা, স্ত্রীর শারীরিক অবস্থা ভালো যাবে না। কর্ম্মোন্নতিযোগ। সন্তানের স্বাস্থ্যভাব শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রণয়ভঙ্গ, শুভাশুভ ফল। বিদ্যার্থীর ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম সময়। সংস্কৃতি শাস্ত্রের ফল ভালোই বলা যায়।

বৃষলগ্ন

শারীরিক অবস্থা শুভ। ধনাগম উত্তম। সহোদরের সহিত সদ্ভাবের অভাব। সম্বন্ধু লাভ। বন্ধুর সাহায্যে কোন অভিনব কার্য্যে প্রতিষ্ঠা-লাভ। মাতার স্বাস্থ্য ভালো যাবে। শুভকার্য্যে ব্যয়বৃদ্ধি। তীর্থভ্রমণ। চাকুরিতে উন্নতি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যবিধ ফল। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ সময়।

মিথুনলগ্ন

শারীরিক অবস্থা ভালো নয়। অপরিমিত ব্যয়। সাময়িক ঋণ যোগ। সহোদর ভাবের ফল শুভ। সন্তানের বিদ্যায় উন্নতি। মাতার স্বাস্থ্য উত্তম। ভাগ্যোন্নতি যোগ। নূতন গৃহাদি নির্ম্মাণ ও সংস্কারাদিতে অর্থব্যয়। অবিবাহিত ও অবিবাহিতাদের বিবাহ প্রসঙ্গ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়।

কর্কটলগ্ন

শারীরিক কষ্ট এবং পীড়াদির সম্ভাবনা। ব্যয়বৃদ্ধি, স্ত্রীর পীড়াদি। আর্থিক অবস্থা উত্তম। চাকুরির ক্ষেত্রে পরিবর্ত্তন। সন্তানের স্বাস্থ্য ভালোই যাবে ও লেখাপড়ায় উন্নতি। গণিতশাস্ত্রের ফল সন্তোষজনক। প্রণয়লাভ। নূতন কর্মে অর্থ বিনিয়োগ করার জন্য ক্ষতির সম্ভাবনা। স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রেমলাভ ও আর্থিক সুখস্বচ্ছন্দতা। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যবিধ ফল।

সিংহলগ্ন

পিত্তাধিক্যজনিত পীড়া। আকস্মিক অর্থপ্রাপ্তি। গুপ্তশত্রুবৃদ্ধি। প্রতিযোগিতামূলক কার্য্যে সাফল্য। সহোদরের সহিত মনান্তর। কৃষি-জাতদ্রব্য ও খাদ্যব্যবসায়ীর পক্ষে উন্নতি ও সুযোগ। পিতার শারীরিক অসুস্থতা ও তজ্জনিত দুশ্চিন্তা। দাম্পত্যপ্রণয়। পত্নীভাব উত্তম। সন্তানের লেখাপড়া উন্নতি। সন্তানসন্ততিগণের বিবাহ যোগ। মিত্র-লাভ। নূতন গৃহাদি নির্ম্মাণ ও সম্পত্তি ক্রয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম সময়।

কন্যালগ্ন

শারীরিক অসুস্থতা। ধনভাব উত্তম। ধনাগম যোগ। সহোদর ভাব শুভ। সহোদরের সাহায্যে আর্থিকোন্নতি। সন্তানভাব শুভ। সন্তানের লেখাপড়ায় উন্নতিযোগ। কন্যা বা পুত্র সন্তানের বিবাহ বা বিবাহের আলোচনা। ভাগ্যভাব শুভ। মাতার দীর্ঘকাল ব্যাপী পীড়া ভোগ। দাম্পত্যপ্রণয়। নূতন গৃহাদি নির্ম্মাণ ও সংস্কারাদিতে অর্থব্যয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়।

তুলা লগ্ন

দাঁতের পীড়া, রক্তসম্বন্ধীয় পীড়া, পারিবারিক অশান্তি ও মানসিক উদ্বেগ। ধনাভাবের ফল নৈরাশ্যজনক। অপরিমিত অর্থব্যয় হেতু ঋণযোগ। আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের সহানুভূতি। শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষতঃ সংস্কৃত ও গণিতশাস্ত্রের ফল অধিকতর শুভ। কর্ম্মস্থান নিতান্ত মন্দ নয়। কর্ম্মস্থানে গুপ্তশত্রুর দ্বারা অনিষ্টের আশঙ্কা। সাধভক্ষণ, বিবাহ, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে যোগদান, রাজানুগ্রহ লাভ। মাতার শারীরিক অবস্থা সুবিধাজনক নয়। বিদেশ গমন ও তীর্থপর্য্যটন। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভাশুভ সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

বৃশ্চিকলগ্ন

শারীরিক ও মানসিক স্বচ্ছন্দতার অন্তরায়। অর্থাগম। সহোদ'র ফল অশুভ। সাংসারিক ব্যাপারে সহোদরের সহিত মনোমালিন্য। বন্ধুভাবের ফল সম্পূর্ণ শুভ। সম্বন্ধুলাভ এবং বন্ধুর সাহায্যে অর্থাগম। সন্তানের শারীরিক অসুস্থতা, বিদ্যালাভে বিঘ্ন। পত্নীভাব শুভ। মাতা পিতার শারীরিক স্বচ্ছন্দতা। দাম্পত্যপ্রণয়। চিকিৎসাদি গবেষণামূলক কার্য্যে সুনাম। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ।

ধনুলগ্ন

শারীরিক ও পারিবারিক স্বচ্ছন্দতা। অর্থাগম যোগ। ব্যয়াধিক্য হেতু দুশ্চিন্তা। সন্তানের লেখাপড়ায় উন্নতির যোগ। কন্যার বিবাহ বা বিবাহের আলোচনা। পত্নীর স্বাস্থ্যহানি। মাতার শারীরিক অবস্থা ভালো, ধর্ম্মকার্য্যে ও তীর্থ ভ্রমণে প্রবল ইচ্ছা। শিল্প সাহিত্যাদি চর্চ্চায় মনোনিবেশ। মিত্রলাভযোগ। কোন উচ্চ বংশ সম্ভূত মিত্রের সাহায্যে অনেক সময় উপকৃত হবে। ধর্ম্ম ও ভাগ্যভাব শুভ। তীর্থ পর্য্যটনে ব্যয়বৃদ্ধি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভাশুভ।

মকরলগ্ন

দেহ ভাব অশুভ। রক্ত সম্বন্ধীয় পীড়া, বায়ুঘটিত পীড়া, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা। মানসিক অশান্তি। ধনাগম। অপরিমিত ধনক্ষয় হওয়ায় মানসিক চাঞ্চল্য। সহোদর ভাব শুভ। ভ্রাতৃস্নেহ লাভ। মিত্রলাভ ও মিত্রের সাহায্যে উপকার প্রাপ্তি। বিদ্যোন্নতি যোগ। সন্তানের স্বাস্থ্যোন্নতি। সাময়িক ঋণযোগ। শত্রুবৃদ্ধিযোগ। পত্নীর পারিবারিক অসুস্থতার জন্য মানসিক চাঞ্চল্য ও অর্থব্যয়। ধর্ম্মানুষ্ঠান ও তীর্থভ্রমণ। চাকুরির ক্ষেত্রে পদোন্নতির আশা। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম সময়।

কুম্ভলগ্ন

শারীরিক সুস্থতা, মানসিক কুশলতা ও ধনাগমযোগ। সহোদরভাবের ফল শুভ। সহোদরের সাহায্যে আর্থিকোন্নতি। বন্ধুর সাহায্যে আর্থিকোন্নতি বা পদোন্নতি। কন্যা বা পুত্রসন্তানের বিবাহ বা বিবাহের আলোচনা। স্ত্রীর উত্তম স্বাস্থ্য, ভাগ্যভাব শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম সময়।

মীনলগ্ন

আকস্মিক আঘাত; রক্তপাত, পাক যন্ত্রের পীড়া ও বেদনাসংযুক্ত পীড়া ভোগের আশঙ্কা। ধনাগম, সঞ্চয়ের আশা কম। অপরিমিত অর্থব্যয়। ক্রোধের মাত্রাবৃদ্ধি ও ধৈর্য্যচ্যুতি। আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের সহিত নির্ম্মম ব্যবহার ও তজ্জনিত অপ্রিয়ভাজন হবার সম্ভাবনা। সম্বন্ধু লাভ। মাতার প্রাণসংশয় পীড়া। পড়াশুনায় পরীক্ষা বিষয়ে রেখা গণিতের ফল সন্তোষজনক নয়। সাংসারিক ব্যাপারে পিতার সহিত মতানৈক্য। পুত্রকন্যার বিবাহ বা বিবাহের আলোচনা। শিল্প সাহিত্যাদি চর্চ্চায় মনোনিবেশ সম্ভব হবেনা। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো যাবে না। মতানৈক্য ঘটবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম সময়। বিদ্যার্থীর ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যবিধ ফল।

১৩৭১

শ্রেষ্ঠ সম্মান

বিগত ১৯৬১ সালের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্ররূপে রাষ্ট্রপতির পুরস্কার ও স্বর্ণপদক লাভ করেছে বাংলার ছবি "ভগিনী নিবেদিতা"। বাংলা ছবির শ্রেষ্ঠ পুরস্কার অর্জন এই প্রথম নয়—আগেও পাঁচ বার বাংলা ছবি এই সম্মান লাভ করেছে, তবুও বাংলা ছবির এই শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতিতে বাঙ্গালী মাত্রেই সুখী হয়েছেন। আর ভারত সরকারও ধন্যবাদাই হলেন স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম শতবার্ষিকীর সময় স্বামীজীর প্রিয় শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতার জীবনী অবলম্বনে রচিত চিত্রটিকে শ্রেষ্ঠ সম্মান দিয়ে।

শ্রীসত্যজিৎ রায় পরিচালিত ইংরাজি প্রামাণ্য চিত্র "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর" গত বৎসরের শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য চিত্র রূপে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক পেয়েছে। শ্রীরায় পরিচালিত ও প্রযোজিত বাংলা "সমাপ্তি" চিত্রটিও রাষ্ট্রপতির রৌপ্য পদক লাভ করেছে। শ্রীহরি, এস, দাশগুপ্ত প্রযোজিত হিন্দী চিত্র "হট্টগোল বিজয়" বৎসরের শ্রেষ্ঠ শিশু-চিত্ররূপে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণ-পদক লাভ করেছে। এই ছবিটি পরিচালনা করেছেন যুগ্মভাবে শ্রীবুলু দাশগুপ্ত ও শ্রীরঘুনাথ গোস্বামী। ইংরাজী ভাষায় রচিত চিত্র "Citrus Cultivation" শ্রেষ্ঠ শিক্ষামূলক চিত্র রূপে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক পেয়েছে। এ ছাড়া গুণানুসারে সার্টিফিকেট ও রৌপ্যপদক পেয়েছে আরও চৌদ্দটি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় রচিত চিত্র। এই সমস্ত চিত্রের পরিচালক, প্রযোজক ও শিল্পীগোষ্ঠী আজ সকল চিত্রামোদীর অভিনন্দনের পাত্র। আমরাও তাঁদের আমাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। বিশেষ করে জানাই "ভগিনী নিবেদিতা" চিত্রের পরিচালক শ্রীবিজয় বসু ও নিবেদিতা চরিত্রে রূপদানকারিণী শ্রীমতী অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়কে। আশা করি ভবিষ্যতে বাংলা-চিত্র আরও বহু বহু বার শ্রেষ্ঠ চিত্রের সম্মান লাভ করবে—এ দেশেই শুধু নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও।

ভারতে বিদেশী চিত্র-নির্ম্মাণ

ভারতীয় পটভূমিকায় চিত্র-নির্ম্মাণের ঝোঁক অনেক নামকরা হলিউড্ চিত্র-নির্ম্মাতাদের মধ্যে আজকাল দেখা যাচ্ছে। শুধু পটভূমিকাতেই নয়, অনেকে আবার বিদেশী

— ভূপেশ গুহ —

বাঙ্গালী নৃত্য-শিল্পী শ্রীভূপেশ গুহ এমেরিকার বহু রাষ্ট্রে ভারতীয় নৃত্য-কলা প্রদর্শন করে ও শিক্ষা দিয়ে যথেষ্ট

ছাব্বিশ বৎসর বয়স্কা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসিনী *Marti Stevens*কে তার প্রথম ছবি "All Night Long"এর তারকারূপে এখানে দেখা যাচ্ছে। এই চিত্রে অভিনয় করবার আগে মার্টি যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে থিয়েটার, ক্যাবারে প্রভৃতিতে নেমেছিল। Jazz সঙ্গীত মুখরিত ও প্রচণ্ড ঘাত-প্রতিঘাত-সমন্বিত এই চিত্রটিতে মার্টির বিপরীতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন Patrick McGoohan. তা ছাড়া Dave Brubeck, Johnny Dankworth ও Charlie Mingus প্রভৃতি বিখ্যাত জ্যাজ্ সঙ্গীতজ্ঞরাও এই চিত্রে অংশ গ্রহণ করেছেন।

টেলিভিসনের জন্য ভারতীয় নানা ঘটনাবলীর চিত্রও তোলবার জন্য আগ্রহান্বিত বলে জানা গেছে। তাছাড়া ভারতীয় চিত্রের পরিবেশক হবার জন্যও অনেক বিদেশী খবরাখবর নিতে আরম্ভ করেছেন।

ভারতে এসে যেসব বিদেশী চিত্র-নির্ম্মাতা দেশীয় দৃশ্যাবলীর মধ্যে চিত্র নির্ম্মাণ করে গেছেন তাঁদের কাছ থেকে দুই দিক থেকেই দেশীয় লোকেরা লাভবান হয়েছে। প্রথমতঃ বিদেশী কোম্পানীরা এখানে এসে জলের মতন টাকা খরচ করায় দেশীয় কর্ম্মীরা, যাঁরা ওঁদের অধীনে কাজ করেন, বিশেষ লাভবান হন। দ্বিতীয়তঃ টেক্‌নিসিয়ান্ বা কলাকুশলীরা, যাঁরা ওঁদের সঙ্গে কাজ করেন, তাঁরা শুধু টাকার দিক দিয়েই নয়—কলাকুশলতার দিক থেকেও অনেক কিছু, বিশেষ করে পাশ্চাত্য উন্নত টেক্‌নিক্‌ও শিখে নিতে পারেন। তাই বিদেশী চিত্রনির্ম্মাণকারী কোম্পানীগুলিকে, যাঁরা এদেশে চিত্র নির্ম্মাণ করতে চান, তাঁদের সর্ব্বরকম সুযোগ সুবিধা দিয়ে এদেশে চিত্র নির্ম্মাণ করতে দেওয়া উচিত। অবশ্য এটাও লক্ষ্য রাখতে হবে যে অজ্ঞতাবশতঃ বা অন্য কোনও কারণে যেন বিদেশীরা আমাদের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী অন্যায় বা অশোভন কিছু চিত্রায়িত না করে ফেলেন।

* * *

গত ছয় সপ্তাহ ধরে একাদিক্রমে মহিশূর ও মাদ্রাজের গহন অরণ্যে "সুটিং" করে পরিচালক John Guillermin তাঁর "Tarzan Goes To India" নামক য়্যাড্‌ভেঞ্চার চিত্রটির কাজ প্রায় শেষ করে এনেছেন। আধুনিক ভারতের চিত্তাকর্ষক পটভূমিকায় বহু কর্ম্মী ও শিল্পীর সমাবেশে এই যে টার্জ্জন চিত্রটি নির্মিত হচ্ছে, তা বোধ হয় ভারতে-প্রস্তুত বহির্দৃশ্যাবলী সম্বলিত সর্বোত্তম চিত্র হবে।

কাবিনী নদীর কাছে যে বিরাট বিস্ফোরণের দৃশ্যটি এই চিত্রে গ্রহণ করা হয়েছে তাতে ২৫০০এর বেশী কর্ম্মী এবং টার্জ্জনের ভূমিকাভিনেতা Jock Mahoney, Feroz Khan, Mark Dana, Leo Gordon, Elephant boy Jai, Jagdishraj প্রভৃতি শত শত শিল্পী যোগদান করেছিলেন। প্রযোজক Sy Weintraub কোনও ত্রুটি রাখছেন না এই জঙ্গল চিত্রটির নির্ম্মাণে। প্রায় তিনশতরও ওপর হাতীকে এই চিত্রটির সুটিং-এ নামান হয়েছে। তা

ছাড়া দক্ষিণ ভারতের নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলী—টিপুসুলতানের শ্রীরঙ্গপত্তম দুর্গ, মহিশূরের ললিতা প্রাসাদ, বৃন্দাবন কানন, বন্দীপুরের গভীর জঙ্গল, কাবিনী নদী প্রভৃতি টেক্‌নিকলারে ও সিনেমাস্কোপ পদ্ধতিতে গৃহীত হয়ে এই চিত্রে দেখা যাবে।

"অতল জলের আহ্বান" চিত্রে
তন্দ্রা বর্মন

প্রসিদ্ধ ভারতীয় সঙ্গীত পরিচালক শঙ্কর জয়কিষণ এই চিত্রের সুরসৃষ্টি করছেন এবং এই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম একজন ভারতীয় সুরকার একটি আন্তর্জাতিক বিদেশী চিত্রে সুরসংযোগ করলেন। সব মিলিয়ে মনে হয় এই বিদেশী ও ভারতীয় কলাকুশলীদের কর্ম্ম-সমৃদ্ধ "Tarzan Goes To India" চিত্রটি ভারতে তৈরী একটি অতি-চমকপ্রদ চিত্ররূপে মুক্তি লাভ করে আন্তর্জাতিক চিত্র-জগতে বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করবে।

***

[বাংলার প্রসিদ্ধ মুষ্টি যোদ্ধা শ্রীরবিন সরকার বর্ত্তমানে বিলাতের চিত্র-জগতে ক্যামেরাম্যানের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। শ্রীউমেশ মল্লিকের ইংরাজী রঙ্গীন ছবি "Men and Angels"-এও শ্রীসরকার সহকারী রূপে কাজ করবেন। বহুদিন ওদেশের চিত্র জগতের

রবীন সরকার

সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকায় তাঁর যা অভিজ্ঞতা হয়েছে তার কিছু কিছু শ্রীসরকার সিনেমা অনুরাগী পাঠক পাঠিকাদের এই বিভাগে জানাবেন।

পঃ পীঃ সম্পাদক]

ছবি তোলার ব্যাকরণ

রবীন সরকার

সিনেমার ছবি তুলতে হলে বিশেষ করে তিনটি বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হয়। সেই তিনটি জানা থাকলে সুবিধা অনেক হবে। যেমন—রীতি, নিয়ম, নির্দ্দেশ ও পথ।

রীতি যদি জানা থাকে তবে প্রযোজক ও পরিচালক তাঁদের কাজ সহজে করতে পারবেন। তাতে কেবল নিজেরাই উপকৃত হবেন না—সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মীরা ও জনসাধারণও উপকৃত হবে।

নিয়ম না মেনে চললে কাজ ভাল হয় না। তবে প্রয়োজনবোধে নিয়ম ভাঙ্গা যেতে পারে কিছু ভাল ফল পাবার জন্য।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের লোক এই *Paul Harris.* ইনিও "All Night Long" চিত্রেই প্রথম অভিনয় করলেন এবং ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ তাঁর ভূমিকাটিকে দক্ষতার সঙ্গেই রূপদান করেছেন। Rank Orga-nisation-এর পক্ষে চিত্রটির প্রযোজনা ও পরিচালনা করেছেন Michael Relph ও Basil Dearden.

নির্দ্দেশ ও পথ থাকা চাই। তা না হলে ছবি চলতে পারে না বা দর্শনীয় হতে পারে না। ছবি চলে—এডিটিং বা সম্পাদনার ওপর, লেখা বা ছবি তোলার ওপর, সাজান গোছান বা কম্পোজিসনের ওপর, ক্যামেরা পরিচালনার ওপর এবং সাধারণ জ্ঞানের ওপর।

রীতি—অর্থাৎ এই ভাবে চ'লে আসছে বলেই সকলের মনে একটা জ্ঞান এসে গেছে যে একটা ছবির পর অন্য ছবি আসে যখন, তখন তাকে আনতে হয় 'কাট্' করে বা 'ডিজলভ্' অথবা 'মিক্স' করে, কিংবা 'ফেড্ স ইন্' ও 'ফেড্ স আউট' দ্বারা। অনেক সময় ডান বা বামদিকে তাকালেও যে গতির সৃষ্টি হয়—সে রীতির অর্থ অনেকেই জানেন মনে করি।

এখন একটা ক্যামেরা থেকে আর একটা ক্যামেরায় যেতে হলে বিশেষ করে টেলিভিসন্ ক্যামেরায়—এই 'কাট'-এর রীতিতে চলতে হয়। এতে সময় উত্তীর্ণ বা অতিবাহিত হয়েছে বোঝায় না—একটানা গতি বোঝায় মাত্র। রাম এক ঘর ছেড়ে অন্য ঘরে চলেছে। তখন দুটি ক্যামেরা বসাতে হয়। একটা দিয়ে দেখাল সে ঘর ছেড়ে বার হচ্ছে পিছন থেকে—আর একটি দেখাল সামনে থেকে মুখের ভাব সমেত সে চলে আসছে।

যখন একটি ক্যামেরা দ্বারা ঐ দৃশ্য তোলা হয় তখন পিছন থেকে দেখাল সে চলে যাচ্ছে। 'কাট্' করে ক্যামেরা সামনে এনে বসিয়ে দেখাল যে সে বার হয়ে আসছে।

একটানা সময় বোঝাতে 'কাট্' ব্যবহার হয়। একটা দৃশ্যে এটা দেখান, ওটা দেখান ইত্যাদি যখন চলতে থাকে তা বোঝাবার জন্যও 'কাট'-এর দরকার হয়।

সময় অতিবাহিত হয়েছে বোঝাতে গেলে অথবা এক-জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গিয়েছে বোঝাতে গেলে 'ডিজলভ্' বা 'মিক্স' রীতি চলে থাকে। রাম বাড়ীর থেকে বার হয়ে মোটরে চড়ল। গাড়ী চললো। ডিজলভ করে দেখালো যে গাড়ী এসে জাহাজ ঘাটে ভিড়েছে। এতটা পথের ছবি তুলে ফিল্ম নষ্ট করতে চায় না। তাই সকলে এখন এই রীতি অনুযায়ী বুঝে নিতে পারে যে সময় অতিবাহিত হয়ে কর্মস্থলে হাজির হয়েছে।

স্বপ্ন দেখছে। 'মিক্স' করে স্বপ্নর ছবি দেখানো হল। আবার 'মিক্স' করে দেখানো হলো যে সেই স্বপ্ন দেখছে। সময় অতিবাহিত হয়েছে বোঝাতে গেলে এই রীতিই ব্যবহৃত হয়।

প্রেক্ষাগৃহে বসে আছেন। আলো নিভে গেল। পর্দার গায়ে আস্তে আস্তে আলো ফুটে বার হল—দেখা গেল ছবি। একে বলে 'ফেড্-ইন'। অধ্যায় আরম্ভ হল। তারপর কতকগুলি দৃশ্য দেখানোর পর আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে গেল। তাতে বোঝা গেল যে অধ্যায় শেষ হল বা আরও বেশী সময় অতিবাহিত হল।

এই সকল রীতি এখন দর্শকরা মেনে নিয়েছেন। এর ভিতর বেশী কিছু কালোয়াতি বা বাড়াবাড়ি করতে গেলেই ছবির অর্থ অন্যরকম হয়ে যাবে। ব্যাকরণ ছাড়া যেমন ভাষা অশুদ্ধ হয় তেমনি রীতি ছাড়া ফিল্ম অচল হয়। এইগুলি মনে রাখতেই হবে।

যা-তা করে ছবি তুলে গেলেই হয় না। নিয়ম মানতে হবে, নির্দেশ ও পথ অনুযায়ী চলতে হবে। ছবির প্রাণ স্বজন হয় সম্পাদনার দ্বারা। সম্পাদকই এর জন্য দায়ী।

ছবি যখন 'ফেডস্ ইন্' হচ্ছে তখন আগে সাউণ্ড বার হবে না। তাতে ভালো হয় না। ছবির সঙ্গে সঙ্গে সাউণ্ড দিতে হয়। তবে যদি কোন কারণবশতঃ সাউণ্ড আগে দেওয়া হয়—তবে তার সঙ্গে সঙ্গেই দেখাতে হবে যে সাউণ্ডটা কিসের।

ধরা যাক্—আমার ছবিতে, যেটা আমি কল্পনা করে রেখেছি, তাতে আমি আগে সাউণ্ডের যে সূচনা দিয়েছি সেটা হচ্ছে চাবুকের শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে ছবি ফুটে উঠল। দেখা গেল যে একটি যুবক যন্ত্রণায় ছটফট করছে। চাবুক হাতে একটি লোক তার সামনে দাঁড়িয়ে। এটা সহজে বোঝা গেল যুবকটিকে চাবুক মারা হচ্ছিল যার শব্দ প্রারম্ভে শোনা গিয়েছিল।

তবে টেলিভিসন্ বা কোন বিজ্ঞাপন চিত্রে আগে শব্দ আসবে না। শব্দ ও ছবি যাতে সঙ্গে সঙ্গে আসে তা দেখতে হবে সব সময়।

কোনও লেখা যদি ক্যামেরার চোখ দিয়ে দর্শকদের পড়াতে হয় তাহলে যাতে লেখা পড়া যায়, সেই মত সময় দিতে হয়। একজন চিঠি লিখছে। আমরা তার লেখা দেখছি। এখন যদি খুব ধীরে ধীরে লেখা পরপর ছবিতে উঠতে থাকে তাতে পড়তে ভাল লাগবে না। সেইজন্য পড়ার গতির সঙ্গে চিঠির গতি যাতে সঙ্গে সঙ্গে হয় তা দেখতে হবে।

চিঠিতে লেখা এক, আর বাণীতে অন্য কথা চলছে—তা যেন না হয়। শব্দ ও চিঠি যেন একযোগে চলে তা দেখা উচিত।

যখন দৃশ্যের উপর ঘোষণা বা বাণী চলতে থাকে তখন যাতে ছবির সঙ্গে বাণীর মিল থাকে তাও দেখতে হবে।

তবে আজকাল ইউরোপে কেউ কেউ এই সব ব্যাকরণ অনেক সময় মেনে চলছে না দেখা যায়। বোধহয় নূতনত্ব আনবার জন্য। এতে ছবিও অবশ্য খারাপ হবে না যদি গল্পের গাঁথুনি ঠিকমত রূপায়িত করবার ক্ষমতা থাকে।

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

খেলার কথা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

ভারতবর্ষ ওয়েষ্ট-ইণ্ডিজ—৩য়

ভারতবর্ষ : ২৫৮ রান (পতৌদির নবাব ৪৮, দুরাণী নট-আউট ৪৮ এবং জয়সীমা ৬১। হল ৬৪ রানে ৩, ওরেল ১২ রানে ২ এবং সোবার্স ৪৬ রানে ২ উইকেট)

ও ১৮৭ রান (সারদেশাই ৬০, মঞ্জরেকার ৫১ এবং সুত্তি ৩৬। গিব্‌স ৩৮ রানে ৮ এবং স্টেয়ার্স ২৪ রানে ২ উইকেট)

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ : ৪৭৫ রান (জো সলোমন ৯৬, রোহন কানহাই ৮৯, ফ্র্যাঙ্ক ওরেল ৭৭, কনরাড হান্ট ৫৯ সোবার্স ৪২, এ্যালেন নট-আউট ৪০ এবং ম্যাকমরিস ৩৯। দুরাণী ১২৩ রানে ২, নাদকার্ণী ৯২ রানে ২, বোরদে ৮৯ রানে ২ এবং উমরীগড় ৪৮ রানে ২ উইকেট)

বার্বাদোজ দ্বীপের রাজধানী ব্রিজটাউনের কেনসিংটন ওভাল মাঠে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের তৃতীয় টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষ এক ইনিংস এবং ৩০ রানে পরাজিত হয়—১৯৬২ সালের টেস্ট সিরিজে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের কাছে ভারতবর্ষের উপর্যুপরি তৃতীয় পরাজয়। বার্বাদোজ দলের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসের খেলায় গ্রিফিথের বলে মাথায় দারুণ আঘাত পেয়ে ভারতীয় দলের অধিনায়ক নরী কণ্ট্রাক্টর হাসপাতালে শয্যাশায়ী ছিলেন। ফলে তিনি এই খেলায় যোগ দিতে পারেননি। তাঁর জায়গায় দলের সহ-অধিনায়ক পতৌদির নবাব দল পরিচালনা করেন। তৃতীয় টেস্ট খেলায় ফ্র্যাঙ্ক ওরেল টসে জয়লাভ করেও ভারতবর্ষকে প্রথম ব্যাট করতে ছেড়ে দেন। প্রথম দিনেই ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ২৫৮ রানে শেষ হয়। খেলার বাকি ১০ মিনিট সময়ে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল কোন উইকেট না নষ্ট করে ৫ রান করে। দ্বিতীয় দিনের খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ৪ উইকেট খুইয়ে ২৬৩ রান করে।

পতৌদির নবাব

তৃতীয় দিনের খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের ৪২৭ রান দাঁড়ায়, ৮ উইকেটে। এই দিনের সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার খেলায় ১৬৪ রান যোগ হয় ৪টে উইকেট পড়ে। ফলে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ১৬৯ রানে অগ্রগামী হয়।

চতুর্থ দিনে ৪১৫ রানের মাথায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংস শেষ হ'লে তারা ২১৭ রানে এগিয়ে যায়। এই রান তুলতে ১২ ঘণ্টা ২২ মিনিট সময় লেগেছিল। চতুর্থ দিনে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ৭২ মিনিট খেলেছিল। এইদিনে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ২টো উইকেট পড়ে ১০৪ রান ওঠে।

পঞ্চম দিনে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস চা-পানের বিরতির ১৮ মিনিট আগে ১৮৭ রানে শেষ হলে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ এক ইনিংস ও ৩০ রানে জয়লাভ করে। লাঞ্চের সময় ভারতবর্ষের স্কোর ছিল ১৪৯ রান, ২ উইকেটে। সারদেশাই ৬০ এবং মঞ্জরেকার ৪১ রান ক'রে নট-আউট ছিলেন। সারদেশাই এবং মঞ্জরেকারের তৃতীয় উইকেটের জুটি তখন হাত জমিয়ে খেলছিলেন; ওরেল আট জন বোলার লাগিয়ে এই জুটি ভাঙতে পারেন নি। লাঞ্চের সময়ের খেলার অবস্থা দেখে অনেকেরই ধারণা হয়েছিলো খেলা অমীমাংসিত থেকে যাবে। কিন্তু যার জন্যে ক্রিকেট খেলার ঐতিহ্য সেই অপ্রত্যাশিত সাফল্য লাভ করলেন গিবস, লাঞ্চের পরবর্ত্তী খেলায়। লাঞ্চের আগে গিবস ৩৭ ওভার বল দিয়ে একটা উইকেটও পাননি। কিন্তু লাঞ্চের পরবর্ত্তী খেলায় তিনি যেভাবে বোলিংয়ে সাফল্য লাভ করেন তার তুলনা একমাত্র 'তুক-তাকের' সঙ্গেই করা চলে। গিবস ১৫.৩ ওভার বল দেন এবং ১৪টা মেডেন পান আর মাত্র ৬রান দিয়ে ৮টা উইকেট পান। লাঞ্চেব পর ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস মাত্র ১ ঘণ্টা ২০ মিনিট চলেছিল। হল সম্পর্কে ভারতবর্ষের যে ভয় ছিল, গিবস সম্পর্কে সে রকম ভয় ছিল না। সুতরাং গিবস তৃতীয় টেষ্ট খেলার প্রথম ইনিংস পর্য্যন্ত উপেক্ষিত ছিলেন—তাঁর থলিতে তখন ভারতবর্ষের ৯টা উইকেট ঢুকেছে। আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলায় লান্স গিবস প্রথম নাম করেন ১৯৬০-৬১ সালের অস্ট্রেলিয়া সফরে। সিডনির তৃতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে গিবস চারটে বলে ৩টে উইকেট পান—একচুলের জন্যে তিনি 'হ্যাটট্রিক' থেকে বঞ্চিত হ'ন। এর জন্যে গিবসকে বেশীদিন আক্ষেপ ক'রে বসে থাকতে হ'ল না। এডলেডের চতুর্থ টেস্টের প্রথম ইনিংসের খেলাতেই তিনি 'হ্যাটট্রিক' করেন। এই ঐতিহাসিক-প্রসিদ্ধ অস্ট্রেলিয়া সফরে লান্স গিবস ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের বোলিং এভারেজ তালিকায় ৩৯৫ রানে ১৯টা উইকেট (এভারেজ ২০.৭৮) পেয়ে শীর্ষস্থান লাভ করেন। হলের উইকেটের সংখ্যা ছিল ২১টা, ৬১৬ রানে (এভারেজ ২৯.৩৩)। হল পেয়েছিলেন দলের পক্ষে সর্ব্বাধিক উইকেট।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফর—৪র্থ টেস্ট ঃ

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ: ৪৪৪ রান (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। কানহাই—১৩৯, ম্যাকমরিস ৫০, রডরিগস ৫০, ওরেল ৭৩

পলি উমরিগড়

নট আউট এবং হল ৫০ নট আউট। উমরিগড় ১০৭ রানে ৫ এবং নাদকার্নী ৬৯ রানে ২ উইকেট)

এবং ১৭৬ রান (৩ উইকেটে। হাণ্ট ৩০, ম্যাকমরিস ৫৬ এবং নার্স ৪৬ নট আউট। দুরাণী ৬৪ রানে ৩ উইকেট)

ভারতবর্ষঃ ১৯৭ রান (উমরিগড় ৫৬, পতৌদির

নবাব ৪৭ এবং বোরদে ৪২। হল ২০ রানে ৫, রডরিগস ৫১ রানে ৩ এবং সোবার্স ৪৮ রানে ২ উইকেট)

এবং ৪২২ রান (উমরীগড় ১৭২ নট আউট, দুরানী ১০৪, মেহেরা ৬২ এবং নাদকার্ণী ২৩। গিবস ৯১২ রানে ৪ এবং সোবার্স ১১৬ রানে ৩ উইকেট)

ত্রিনিদাদের রাজধানী পোর্ট-অব-স্পেন সহরের মাঠে বেশীর ভাগ টেস্ট খেলাই আগে ড্র ছিল। এবার ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল যাত্রা পাল্টেছে। ১৯৬২ সালে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের সঙ্গে ভারতবর্ষের ২টো খেলা (১ম ও ৪র্থ টেষ্ট) হয়েছে পোর্ট-অব-স্পেনেএবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের জয় হয়েছে দুটো খেলাতেই। বর্ত্তমানে এখানের টেস্ট খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে—খেলা ১১, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের জয় ২, হার ৩ এবং খেলা ড্র ৬।

বিগত তিনটি টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষের ব্যাটিংয়ের ব্যর্থতা বিবেচনা ক'রে চতুর্থ টেস্টে তাই ব্যাটিংয়ের ওপর বেশী জোর দেওয়া হয়। ফলে চতুর্থ টেস্টে ভারতীয় দলে যে এগার জন খেলোয়াড় স্থান পান তাঁরা সকলেই ব্যাটসম্যান হিসাবে খ্যাত। কিন্তু কাজের খেলায় দেখা গেল একই ফল দাঁড়িয়েছে—ব্যাটিংয়ে চরম ব্যর্থতা।

চতুর্থ টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসে নামকরা আট জন ব্যাটসম্যান ৪৮ রান করেন এবং দ্বিতীয় ইনিংসে সাত জনে ৪৮ রান। চতুর্থ টেস্টে ভারতবর্ষ 'ফলো-অন' করে ৭ উইকেটে হেরেছে। এবারের সফরের টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষের এই প্রথম 'ফলো-অন'। পর পর চারটে টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষের পরাজয়ে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল ভারতবর্ষের বিপক্ষে আলোচ্য টেস্ট সিরিজের পাঁচটা খেলায় জয়লাভের যে মহা সুযোগ লাভ করেছে তা কি তারা সহজে হাতছাড়া করবে?

চতুর্থ টেস্টে পলি উমরাগড়ের বীরত্বপূর্ণ খেলা উভয় দলের পক্ষে বিশেষ উল্লেখযোগ্য খেলা। উমরীগড় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংসে ১০৭ রানে ৫টা উইকেট পান এবং প্রথম ও দ্বিতীয় ইনিংসে যথাক্রমে ৫৬ ও ১৭২ নট-আউট রান ক'রে দলের পক্ষে প্রতি ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্ব্বোচ্চ রান করেন। তাছাড়া উমরীগড়ের দ্বিতীয় ইনিংসের ১৭২ নট আউট রান আলোচ্য টেস্ট সিরিজের বিগত চারটি খেলায় ব্যক্তিগত সর্ব্বোচ্চ রান হিসাবে রেকর্ড হয়েছে। শুধুমাত্র এই সব পরিসংখ্যান দিয়ে উমরীগড়ের খেলার যথার্থ গুরুত্ব প্রকাশ পায় না। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংসের ৪৪৪ রানের থেকে ভারতবর্ষ প্রথম ইনিংসে ২৪৭ রান কম ক'রে 'ফলো-অন' করে; দ্বিতীয় ইনিংস খেলার চতুর্থ দিনে দলের ১৯২ রানের মাথায় ভারতবর্ষের ৪র্থ উইকেট পড়ে যায়—দলের অস্থায়ী অধিনায়ক পতৌদির নবাব মাত্র এক রান ক'রে আউট হ'লেন—ফলে এই দিনে মাত্র ৬ রানের যোগফলে দু'টো উইকেটের পতন হ'ল। এই অবস্থায় উমরীগড় ৫ম উইকেটের জুটিতে দুরানীর সঙ্গে খেলতে নামেন। এর পর তাঁর চারজন খেলার সঙ্গী দুরাণী, স্থূর্ত্তি, বোরদে এবং সারদেশাই বিদায় নিলেন—দলের রান ৮ উইকেট পড়ে ২৭৮। দলের কি শোচনীয় দুরবস্থা! লাঞ্চের সময় দলের রান দাঁড়ায় ২৮৫ (৮ উইকেটে), উমরীগড় ৬৩ এবং নাদকার্নী ২ রান করে উইকেটে নট-আউট। লাঞ্চের পর ভারতবর্ষের যে ১৩৭ রান ওঠে তার মধ্যে একা উমরীগড়েরই রান ছিল ১০৯, নাদকার্নীর ২১ এবং কুন্দরানের ৪। এই থেকেই সহজে অনুমান করা যায় উমরীগড়ের খেলার দাপট, মনের দৃঢ়তা এবং দায়িত্ববোধ। সর্ব্বশেষ উইকেটে খেলতে নামেন কুন্দরাম এবং এই শেষ অর্থাৎ দশম উইকেটের জুটিতে ৫১ রান ওঠে—এর মধ্যে এক ঘণ্টার খেলায় কুন্দরাম করেন ৪ রান এবং বাকি রান উমরীগড়ের। কুন্দরামকে হলের বলের মুখ থেকে যতদুর বাঁচিয়ে নিজে খেলেছেন। দ্বিতীয় ইনিংসে লাঞ্চের পরের খেলায় উমরীগড় হলের বলকে গড় করেন নি, একবার এক ওভারেই ১৪টা রান তুলে দেন। তাঁর এই নট আউট ১৭২ রান তুলতে সময় লাগে ২৪৮ মিনিট। বাউণ্ডারী মারেন ২২টা।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ টসে জয়লাভ ক'রে প্রথম ব্যাট করার সুযোগ নেয়। প্রথম দিনের খেলায় দলের ৬টা উইকেট পড়ে ২৬৮ রান ওঠে। উইকেটে নট আউট ছিলেন রড-রিগস (২৫) এবং গিবস (০)। লাঞ্চের সময়ের স্কোর ১০১ (১ উইকেটে) এবং চা-পানের সময়ের ২০৪ (৩ উইকেটে)। দ্বিতীয় উইকেটে ম্যাক্‌মরিস এবং কানহাই ১২২ মিনিটে দলের ৯১৯ রান তুলে দিয়ে খেলার ভিত সুদৃঢ় করেন। কানহাই এই দিনে ১৩৯ রান করে খেলা থেকে বিদায় নেন। তিনি ৯৫টা বাউণ্ডারী এবং ২টো ওভার

বাউণ্ডারী মারেন। এই চতুর্থ টেস্ট পর্য্যন্ত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ৪টে সেঞ্চুরী হয়েছে—২য় টেস্টে ৩টে (সোবার্স ১৫৩, কানহাই ১৩৮ ও ম্যাক্মরিস ১২৫) এবং ৪র্থ টেস্টে ১টা (কানহাই ১৩৯)। কানহাইয়ের এই নিয়ে তাঁর টেস্ট খেলোয়াড়-জীবনে ৭টা সেঞ্চুরী, ভারতবর্ষের বিপক্ষে তৃতীয় সেঞ্চুরী।

খেলার দ্বিতীয় দিনে লাঞ্চের সময় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের রান দাঁড়ায় ৩৪৬ (৯ উইকেটে); উইকেটে ছিলেন ওরেল এবং হল। দলের ৪৪৪ (৯ উইকেটে) রানের মাথায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। ওরেল ৭৩ এবং হল ৫০ রান করে নট-আউট থেকে যান। নবম উইকেটের জুটিতে ওরেল এবং হল ৯৮ রান তুলে দিয়ে যে কোন দলের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় নিজ দেশের পক্ষে নবম উইকেট জুটির নতুন রেকর্ড করেন। এই দিনে ভারতবর্ষের ৫টা উইকেট পড়ে গিয়ে মাত্র ৬১ রান ওঠে। উইকেটে নট-আউট থাকেন উমরীগড় এবং পতৌদির নবাব—মাত্র ৭০ মিনিটের মধ্যে। ভারতবর্ষের পাঁচটা উইকেট পড়ে যায় ৩০ রানের মধ্যে ওয়েসলে হল বাম্পার বা বাউন্সার বল না দিয়েই এই ৫টা উইকেট পান মাত্র ১২ রানে। ওপেনিং ব্যাটসম্যান মেহেরা ৭০ মিনিট খেলে ১৪ রান করেন। তাঁর জুটি হিসাবে খেলেছিল সারদেশাই, মূর্ত্তি, মঞ্জরেকার এবং জয়সীমা। এই দিনে ৬ষ্ঠ উইকেটের নট-আউট জুটি উমরীগড় এবং পতৌদির নবাব দলের ৩১ রান যোগ ক'রে দলের ভাঙ্গন রোধ করেন।

তৃতীয় দিনে ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটি ভেঙ্গে যায় দলের ১২৪ রানের মাথায়। এই জুটিতে উমরীগড় এবং পতৌদির নবাব ৯৩ রান তুলে দেন। লাঞ্চের সময় রান দাঁড়ায় ১৭৯ (৯ উইকেটে); অর্থাৎ এই দিনে ৪টে উইকেট পড়ে দু' ঘণ্টার খেলায় রান ওঠে ১১৮। উইকেটে তখন বোরদে এবং কুন্দরাম। বোরদে তাঁর ৪২ রানের এবং দলের ১৯৭ রানের মাথায় আউট হলে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হয়ে যায়। লাঞ্চের পর ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস মাত্র ২০ মিনিট স্থায়ী ছিল। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ৪৪৪ রানের থেকে ভারতবর্ষ ২৪৭ রান পিছনে পড়ে 'ফলো-অন' করে। এই দিনের খেলায় দলের ১৮৬ রান ওঠে, ২ উইকেট পড়ে। প্রথম উইকেট (জয়সীমা) পড়ে দলের ১৯ রানে। তারপর ২য় উইকেটে মেহেরা এবং দুরানী ১৪৪ রান তুলে দেন ১৯৬ মিনিটে। মেহেরা নিজস্ব ৬২ রানে আউট হন। দুরানী এবং মঞ্জরেকার যথাক্রমে ৯১ এবং ৯ রান ক'রে এই দিন নট-আউট থাকেন।

তৃতীয় দিনে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের খেলায় ওয়েসলে হল বল করেন নি। দ্বিতীয় ইনিংসে মেহেরা এবং দুরানীর ২য় উইকেটের জুটিতে যে ১৪৪ রান হয় তা আলোচ্য টেস্ট সিরিজে যে ভারতবর্ষের পক্ষে কোন উইকেটের জুটিতে প্রথম সেঞ্চুরী।

চতুর্থ দিনে লাঞ্চের সময় স্কোর দাঁড়ায় ২৮৫, ৮ উইকেট পড়ে। তখন উইকেটে নট-আউট ছিলেন উমরীগড় (৬৩) এবং নাদকার্নী (২)। লাঞ্চের মধ্যে ভারতবর্ষের ৬টা উইকেট পড়ে গিয়ে মাত্র ৯৯ রান যোগ হয় পূর্ব দিনের ১৮৬ রানের (২ উইকেটে) সঙ্গে। এই ৬টা উইকেট পান সোবার্স এবং গিবস, প্রত্যেকে তিনটে ক'রে উইকেট। ৯ম উইকেট পড়ে দলের ৩৭১ রানের মাথায়—নাদকার্নী দেড় ঘণ্টা ব্যাট ক'রে ২৩ রান ক'রে রান-আউট হন। নাদকার্নী এবং উমরীগড়ের ৯ম উইকেটের জুটিতে ৮৭ মিনিটের খেলায় দলের ৯৩ রান যোগ হয়। শেষ ১০ম উইকেটে খেলতে নামেন কুন্দরাম। কুন্দরাম মাত্র ৪ রান ক'রে আউট হন; কিন্তু তিনি এক ঘণ্টা উইকেটে থাকার দরুণ উমরীগড় তাড়াতাড়ি আরও রান তুলে দেন। ১০ম উইকেটের জুটিতে দলের ৫১ রান যোগ হয়। ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস ৪২২ রানে শেষ হলে ভারতবর্ষ ১৭৫ রানে অগ্রগামী হয়। উমরীগড় ১৭২ রান ক'রে নট-আউট থাকেন। এই রান তুলতে তাঁকে ২৪৮ মিনিট খেলতে হয়েছিল, বাউণ্ডারী মেরেছিলেন ২২ বার। এই দিনে এক ঘণ্টার খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ কোন উইকেট না হারিয়ে ২৩ রান তুলে দেয়।

খেলার পঞ্চম দিনে চা-পানের জন্যে খেলা ভাঙ্গতে যখন আর ৮ মিনিট বাকি তখন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১৭৬ রান পূর্ণ করে দেয়। পঞ্চম দিনে প্রয়োজনীয় ১৫৩ রান তুলতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৩টে উইকেট পড়ে যায়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৭ উইকেটে জয়লাভ করে।

ইস্টার্ণ-জোন ডেভিস কাপ ঃ

ইস্টার্ণ-জোন ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার সেমি-

ফাইনালে ভারতবর্ষ ৪—০ খেলায় ইরানকে পরাজিত ক'রে পূর্ব্বাঞ্চলের ফাইনালে উঠেছে। প্রথম রাউণ্ডের খেলায় ইরাণ ৩—২ খেলায় মালয়কে পরাজিত ক'রে সেমি-ফাইনালে ভারতবর্ষের সঙ্গে মিলিত হয়। প্রথম রাউণ্ডে ভারতবর্ষ ৫—০ খেলায় পাকিস্তানকে পরাজিত ক'রে সেমি-ফাইনালে উঠেছিল।

পূর্ব্বাঞ্চলের অপরদিকের সেমি-ফাইনাল খেলায় ফিলিপাইন ৩—২ খেলায় জাপানকে পরাজিত করে পূর্ব্বাঞ্চলের ফাইনালে ভারতবর্ষের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই ফাইনাল খেলা আরম্ভ হবে আগামী ২৮শে এপ্রিল, দিল্লীতে।

অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজ বোট রেস ঃ

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় বনাম কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ বাৎসরিক নৌকা চালনা প্রতিযোগিতায় কেম্ব্রিজ পাঁচ লেংথে অক্সফোর্ডকে পরাজিত করে। প্রতিযোগিতার দূরত্ব ৪ মাইল ৩৭৪ গজ পথ অতিক্রম করতে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯ মিঃ ৪৪ সেঃ সময় লেগেছিলো। ১৯৬২ সালের প্রতিযোগিতা ছিল উভয় দলের ১০৫তম বাৎসরিক প্রতিযোগিতা।

ক্যালকাটা হকি লীগ ঃ

ক্যালকাটা হকি লীগের প্রথম বিভাগের 'এ' গ্রুপে মোহনবাগান (১৮টা খেলায় ৩৪ পয়েণ্ট) এবং 'বি' গ্রুপে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব (১৮টা খেলায় ৩৫ পয়েণ্ট) শীর্ষস্থান লাভ করেছে। 'এ' গ্রুপে রানার্স-আপ হয়েছে কাষ্টমস এবং 'বি' গ্রুপে মহমেডান স্পোর্টিং। দ্বিতীয় বিভাগে লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে বি. এন. আর (১৫টা খেলায় ৩০ পয়েণ্ট)

স্বাক্ষর : কালকেতু

নির্যাতিত মানুষের অস্ফুট বেদনায় যে-সব কবির কণ্ঠ মুখর হয়ে উঠেছে কালকেতু তাঁদের অন্যতম। প্রায় প্রতি কবিতাতেই কবির বিপ্লবী মনের বিদ্রোহী আত্মার স্বাক্ষর রয়েছে—যে বিদ্রোহী ভেঙ্গে দিতে চায় জীবনের সকল অবিচার অনাচারের শৃঙ্খল—ব্যাকরণের নীরস নিয়ম, আর অলস আয়াসের সুখ-নিদ্রা।

[প্রকাশক—রজত নন্দী। ২৪ এন্ জ্যোতিষ রায় রোড, কলিকাতা-৩৩। মূল্য—এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা]

—স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

কেদারতুঙ্গ বদ্রীনারায়ণে : শ্রীমতী প্রীতিকণা আদিত্য

হিমালয় ভ্রমণ নিয়ে এ পর্যন্ত যে সকল মহিলা সাহিত্য রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীমতী আদিত্য সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচনায় প্রাণের সরলতা ও ভক্তি সুপরিস্ফুট—তীর্থ ভ্রমণের কাহিনীতে যা একান্ত প্রয়োজনীয়। রচনায় মধ্যে 'পেশাদারী লেখকের লিপিকুশলতার পালিশের অভাব' বলতে ভূমিকা লেখক কি বলতে চেয়েছেন বইটি পড়ে বুঝতে পারা গেল না। ছাপা ও প্রচ্ছদপট ভালই, পাঠকমহলে এ গ্রন্থের আদর হবে আশা করি।

[প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২। মূল্য—দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।]

শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গ-সংস্কৃতির রূপরেখা : বিনয় চৌধুরী

আলোচ্য গ্রন্থে রাজা রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও আলোচনা প্রত্যক্ষ হোলো। বঙ্গ সংস্কৃতির এই সব জীবন্ত বিগ্রহকে গ্রন্থকার সংযম-সুন্দর লিখন-শৈলীর পারিপাট্যে অপূর্ব্ব-রূপ মূর্ত্তি দিয়েছেন। এঁদের সমকালীন ঐতিহাসিক অঙ্গরাগেও গ্রন্থকার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। অবতরণিকায় বলা হয়েছে—'এই রচনাটিকে বঙ্গ-সংস্কৃতির ধারাবাহিক সম্পূর্ণ ইতিহাস মনে করলে ভুল করা হবে। এতে তার ক্ষীণ রেখাটিমাত্র ফোটাবার চেষ্টা করেছি'—গ্রন্থকারের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। আশা আছে সাহিত্য রসিকগণের কাছে গ্রন্থখানি সমাদর লাভ করবে।

[প্রকাশক—শ্রীঅমলকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য-চয়নিকা, ৫৯, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য—দুই টাকা।]

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬
ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

অস্ত রবির রশ্মি আভায়—

শিল্পী—শ্রীপঙ্কজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

জ্যৈষ্ঠ—১৩৬৯

দ্বিতীয় খণ্ড | ঊনপঞ্চাশত্তম বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

বুদ্ধদেব ও রবীন্দ্রনাথ

ডক্টর মতিলাল দাশ

আমাদের জীবন কৃষ্ণরাত্রির গভীর অন্ধকারে ছাওয়া, যন্ত্রণা ও দাহনের পীড়নে প্রতিমুহূর্ত্ত নিপীড়িত। ক্লান্তি ও ব্যথায় কাতর। আমরা তাই মহামানবের সঙ্গ যাচ্ঞা করি—যাঁদের জীবনে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতির দিব্য স্ফুলিঙ্গ জ্বলেছে, যাঁরা অভয় আনন্দের স্পর্শ পেয়েছেন, যাঁরা মর্ত্ত্যমানুষের কাছে অমৃতলোকের কথা পরিবেশন করেছেন।

ভারতের ইতিহাসে এমনই দুজন ক্রান্তিদর্শী মহামানব—বুদ্ধদেব ও রবীন্দ্রনাথ—তাঁরা নিজেদের মহত্ত্বে যত্রকালের সীমাকে অতিক্রম করে চিরন্তন মানবের সঙ্গী হয়ে রয়েছেন।

বাইরে থেকে উভয়ের মধ্যে অনেক ব্যবধান—একজন রাজপুত্র হয়ে সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী, অন্যজন ধরণী-দুলাল ভোগ ও ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে লালিত, একজন মানব-জীবনে ভগবানকে অস্বীকার করছেন—অন্যজন চিরদিন অজানা সত্তার চরণে মাথা নত করে আশীর্বাদ ভিক্ষা করেছেন—অথচ ভারত-সংস্কৃতির চিন্ময় সত্যে উভয়ে ধন্য, সেই অমৃত অধিকারে উভয়েই প্রতি-ভারতীয়ের একান্ত আপন জন—একান্ত স্মরণীয়, একান্ত বরণীয়।

১৯৩৫ সালের ১৮ই মে বৈশাখী পূর্ণিমার ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে বুদ্ধদেবকে তিনি অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি করেন। তাঁকে তিনি নরোত্তম বলেছেন—মহামানব বলেছেন।

বুদ্ধের প্রতি এই অকৃত্রিম অনুরাগের সাথে তাঁর ছিল

উপনিষদের প্রতি অসামান্য ভক্তি। সাধারণ ভূমিকায় তিনি লিখেছেন—"To me the verses of the upanisads and the teaching the Baddha have ever been things of the spirit and therefore endowed with boundless vital growth and I have used them both in my owr life and my teaching"

সাধারণের মাঝে প্রচলিত ধারণা যে বেদান্ত ও বুদ্ধবাণী আকাশ পাতাল প্রভেদ—আত্মবাদী ঔপনিষদিক শিক্ষার সাথে অনাত্মবাদী বুদ্ধের কথায় কোথাও কোনও সামঞ্জস্য নেই। এই ধারণা যে কতখানি ভুল, রবীন্দ্রনাথের উপরের উক্তি থেকে তা প্রমাণিত হবে।

পরিশেষে কবিতা পুস্তকের "বুদ্ধদেবের প্রতি" কবিতায় তিনি যে ভক্তির অঞ্জলি দিয়েছেন তা অনন্য শ্রদ্ধায় পুষ্পিত।

ওই নামে একদিন ধন্য হল দেশ দেশান্তরে
তব জন্মভূমি।
সেই নাম আরবার এ দেশের নগর প্রান্তরে
দান করো তুমি।
বোধিদ্রুম তলে তা সেদিনের মহাজাগরণ
আবার সাথক হোক, মুক্ত হোক মোহ-আবরণ
বিস্মৃতির রাত্রি শেষে এ ভারতে তোমারে স্মরণ
নবপ্রাতে উঠুক কুসুমি।
চিত্ত হেথা মৃতপ্রায়, অমিতাভ, তুমি অমিতায়ু,
আয়ু করে দান
তোমার বোধন মন্ত্রে হেথাকার তন্দ্রালস বায়ু
হোক প্রাণবান
খুলে যাক রুদ্ধদ্বার, চৌদিকে ঘোষুক শঙ্খধ্বনি,
ভারত অঙ্গন তলে আজিকে নব আগমনী
অমেয় প্রেমের বার্ত্তা শতকণ্ঠে উঠুক নিঃস্বসি
এনে দিক অজয় আহ্বান!

এ প্রশস্তি ব্যবহারিক কর্ত্তব্যে লেখা নয়। একেবারে অন্তরের আকুতিতে ভরা। ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথ সবাই জানেন—আজীবন উপনিষদের রসে পুষ্ট হয়েছেন অতএব বুদ্ধ বাণীর সাথে উপনিষদের সত্যের সামঞ্জস্যকে আমাদের সন্ধান করতে হবে—সেই সামঞ্জস্যকে যদি উপলব্ধি না করি তাহলে এই দুই মহামানবকে আমরা আদৌ বুঝতে পারব না। এই দুই মহাপুরুষ—ভারতের যে সংস্কৃতি অবিচ্ছিন্ন—আপন জীবনে তাকে বিকশিত ও প্রকাশিত করেছেন। বুদ্ধদেব ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই যুক্তিবাদী। কুসংস্কারের তিমির জীবনকে উভয়ে শাণিত যুক্তিবলে ছিন্নভিন্ন করেছেন। মহাত্মা গান্ধী যখন বিহারের ভূমিকম্পকে অস্পৃশ্যতার ফল বলে ঘোষণা করলেন, তখন একমাত্র রবীন্দ্রনাথই জনপ্রিয় নেতার এই যুক্তিহীন উক্তির ভীষণ প্রতিবাদ করেছিলেন। যুক্তিহীন বিচারে ধর্মহানি হয়, বৃহস্পতির এই বচন বুদ্ধদেবও গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বারংবার আপন শিষ্যগণকে প্রমাণিত সত্যকে গ্রহণ করতে বলেছেন। শিষ্যগণকে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন—"আমরা গুরুকে ভক্তি করি, আমরা যা বলছি গুরুর প্রতি ভক্তির জন্য বলছি—এই কথা কি তোমরা বলবে। শিষ্যগণ বলিলেন—"না ভগবান্" "অতএব তোমরা নিজে যা নির্ণয় করেছ—নিজে যা বুঝতে পেরেছ, নিজে যা অনুভব করেছ, তোমরা ভাল তাই বাসবে নয় কি ? "হাঁ ভগবান!" "বেশ বলেছ, তোমরা আমার শিক্ষা ঠিক নিতে পেরেছ-আমার শিক্ষা প্রত্যক্ষ, আকালিক, সর্বতোগামী-প্রত্যেক যুক্তিবাদী মানুষই তা উপলব্ধি করতে পারবে।"

অন্যত্র গৌতম বলেছেন—"হে ভাদিয়—শোনা কথায় বিশ্বাস করবেনা, কিংবদন্তী বা গুজবে বিশ্বাস করবে না, কেবল শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস করবেনা, কেবল তার্কিক সিদ্ধান্তে বিশ্বাস করবে না—মনোমত হলেই কোনও সত্যকে মানবেনা—কিংবা বলবেনা—বুদ্ধ আমার গুরু অতএব মানি। কেবল যখন তুমি নিজে অন্তর্দৃষ্টির সহায়তায় বুঝতে পার—এটী পাপ, এ অকল্যাণ করে, দুঃখও গ্লানি আনে, তখনই সেটা পরিত্যাগ করবে। যুক্তি ও বিচারের প্রতি এই সুগভীর শ্রদ্ধায় এই দুই মহামানব এক পরম ঔজ্জ্বল্যে প্রকাশিত হয়ে রয়েছেন।

বুদ্ধদেবের কথায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:—"ভগবান বুদ্ধ তপস্যার আসন থেকে উঠে আপনাকে প্রকাশিত করলেন, তাঁর সেই প্রকাশের আলোকে সত্যদীপ্তিতে প্রকাশ হল ভারতবর্ষের। মানব-ইতিহাসে তাঁর চিরন্তন আবির্ভাব ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে ব্যাপ্ত হল দেশে দেশান্তরে। ভারতবর্ষ তীর্থ হয়ে উঠল

অর্থাৎ স্বীকৃত হল সকল দেশের দ্বারা। কেননা বুদ্ধের বাণীতে ভারতবর্ষ সেদিন স্বীকার করেছে সকল মানুষকে। সে কেবলি আজ্ঞা করেনি। এইজন্যে সে আর গোপন রইল না। সত্যের বন্যায় বর্ণের বেড়া দিল ভাসিয়ে; ভারতের আমন্ত্রণ পৌছাল দেশ বিদেশের সকল জাতির কাছে। এল চীন ব্রহ্মদেশ জাপান, এল তিব্বত মঙ্গোলিয়া। দুস্তর গিরি-সমুদ্র পথ ছেড়ে দিলে অমোঘ সত্য বার্ত্তার কাছে। দূর হতে দূরে মানুষ বলে উঠল, মানুষের প্রকাশ হয়েছে, দেখেছি—মহান্তং পুরুষং মেমং পরস্তাৎ" এই অমোঘ সত্যবার্ত্তা ও জগৎকবি রবীন্দ্রনাথের বাণী। 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ' নামক কবিতায় তিনি জাতির অহং-কারকে নির্মম ভাষায় গালি দিয়ে বলেছেন:—

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

কারণ মানুষের স্পর্শকে দূরে ঠেকাতে গেলে মানুষের প্রাণের ঠাকুরকেই ঘৃণা করা হয়। সে পাপের কথা ভারত-বাসীকে ভুলতে হবে। মানুষকে অবহেলা করে আমরা জাতির শক্তিকে নির্বাসিত করেছি। পরিত্রাণের একমাত্র পথ—মানুষের নারায়ণকে নমস্কার। যতদিন তা না হবে, যতদিন মৃত্যুই জাতির পরিণাম হবে।

কবি তাই ভারতের মহামানবের সাগরতীরকে পুণ্যতীর্থ করবার জন্য সকলকে আহ্বান করেছেন—এখানে মানুষ 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবেনা ফিরে, এখানেই সকল মানুষ আনতশিরে এক মহামিলনে আবদ্ধ হবে, তাই তিনি ডাক দিলেন :—

এসো হে আর্য্য, এস অনার্য্য,
হিন্দু মুসলমান।
এসো, এসো আজ তুমি ইংরাজ
এসে এসো খ্রীষ্টান।
এসো ব্রাহ্মণ শুচি করি মন,
ধরো হাত সবাকার।
এসো হে পতিত করো অপনীত
সব অপমান ভার
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা
মঙ্গল ঘট হয় নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র করা
তীর্থনীরে
আজি ভারতের মহামানবের
সাগর-তীরে।

বুদ্ধদেব এসেছিলেন সকল মানুষের জন্যে, সকল কালের জন্যে। তাঁর সেই জগজ্জয়ী আহ্বান প্রকাশ পেয়েছিল সর্ব-জীবের প্রতি অপরিমেয় মৈত্রী ভাবনার অনুশাসনে। তিনি যে নির্বাণ দিতে চেয়েছিলেন সে শূন্যতা নয়—সে পরম পূর্ণতা। সকলের অভিমুখে আত্মাকে ব্যাপ্ত করবার পদ্ধতিই তিনি শিখিয়েছেন মৈত্রী ভাবনায় মধ্যে। প্রতিক্ষণ ভাবতে হবে—সকল জীব সুখী হোক, শত্রুহীন হোক, অহিংসিত হোক, সকল প্রাণী আপন যথালব্ধ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত না হোক। এই মঙ্গল ভাবনা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে নীচের অনুজ্ঞার মাঝে :—

মাতা যথা নিয়ং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্‌খে
একস্মি সব্বভূতেসু মানসং ভাবয়ে অপরিমাণম্।
মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণম্
উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ অসম্বাধং অবেরমসপত্তম্।
তিট্‌ঠঞ্চরং নিসিন্নো বা সয়ানো বা যাবতস্স
বিগতমিদ্ধো
এতং সতিং অধিট্‌ঠেয্যং ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাহু।

মা যেমন নিজের একটি পুত্রকে আয়ু দিয়ে রক্ষা করেন, সমস্ত প্রাণীতে সেইরূপ অপরিমেয় করুণায় মনোভাব জাগ্রত করবে। উর্ধে, অধোদিকে, চারিদিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য, হিংসাহীন, শত্রুতাহীন অপরিমিত মানস এবং মৈত্রী রক্ষা করবে। যখন দাঁড়িয়ে আছ বা চলছ, বসে আছ বা শুয়ে আছ, যে পর্য্যন্ত না ঘুমাও ততক্ষণ এই মৈত্রীভাবে অধিষ্ঠিত থাকাকে ব্রহ্মবিহার বলে।

এই ব্রহ্মবিহারের পরিকল্পনা এক অপূর্ব্ব বস্তু। অপরিমিত মানসে অপরিমিত মৈত্রীর অবাধ অবারিত বিস্তার। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন যে 'এই পদ্ধতিকে তো কোনক্রমেই শূন্যতা লাভের পদ্ধতি বলা যায় না। এই তো নিখিল লাভের পদ্ধতি। এই তো আত্মালাভের পদ্ধতি পরমাত্মালাভের পদ্ধতি।"

বুদ্ধদেবের ব্রহ্ম বিহারের মূল ভাব কিন্তু উপনিষদে সুব্যক্ত আছে। ঈশোপনিষদে পাই :—

যস্তু সর্বানি ভূতানি আত্মন্যেবানু পশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥
যস্মিন্ সর্বানি ভূতানি আত্মৈ বা ভূদ্বি জানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনু পশ্যতঃ॥

যিনি সকলের মধ্যে আপনাকে ও আপনার মধ্যে সকলকে দেখেছেন, তিনি ত কাউকে ঘৃণা করতে পারেন না। সকল প্রাণী যার বোধের আলোকে এক হয়ে গেছে, তার কোথাও মোহ নেই, কোথাও শোক নেই।

উপনিষদের এই মন্ত্রবাণী রবীন্দ্রনাথের আচারে ও আচরণে, লেখায় ও ভাবনায় নব নব রূপ গ্রহণ করেছে। আমিত্বের প্রসারের এই মুক্তির বাণীকে তিনি মনে প্রাণে গ্রহণ করেছেন। আপন স্বার্থে, আপন অহঙ্কারে অবরুদ্ধ-চৈতন্যে প্রচ্ছন্ন না থেকে উদার আলোকে আত্মাকে বিকাশ করবার কথাই তিনি বারংবার বলেছেন। যে সত্যে আত্মায় সর্বত্র প্রবেশ, সেই সত্যকে বিকাশ করতে তিনি বারংবার আহবান জানিয়েছেন। বুদ্ধ জন্মোৎসবে তাই তিনি বলেছেন :—

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব
ঘোর কুটিল পন্থ তার, লোভ জটিল বন্ধ।
নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী
কর ত্রাণ মহাপ্রাণ আন অমৃতবাণী
বিকশিত কর প্রেমপদ্ম, চির মধু নিষ্যন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে হে অনন্ত পুণ্য
করুণা ঘন, ধরণীতব কর কলঙ্ক শূন্য।

বুদ্ধদেবের অমেয় প্রেমের বাণীকে রবীন্দ্রনাথ নিজের সাধনায় পরম সত্য বলে উপলব্ধি করেছেন এবং মানুষের চলবার ইতিহাসে তাকে একান্ত উচ্চ আসন দিয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশ্বতোমুখী প্রেম তার শাশ্বত নির্ভরতা পেয়েছে বিশ্বনাথের প্রেমে। কিন্তু বুদ্ধদেব ত বিশ্বেশ্বরকে মানেন নি—এই বিরোধের সামঞ্জস্য কোথায়? বুদ্ধদেব মানুষকে দুঃখের মাধ্যমে জাগাতে চেয়েছেন, সমস্ত দুঃখময় সমস্ত ক্ষণিক এই কথা বলে তিনি দুঃখ মোচনের সাধনায় মানুষকে ব্রতী হতে বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ জগতে আনন্দ যজ্ঞে আপনার নিমন্ত্রণ জেনে কেবল আনন্দের বাণী বাজিয়েছেন। এই সুগভীর ব্যবধানের মধ্যে কেমন করে এই দুই মহাপুরুষের ঐক্য ও সুসঙ্গতি জানা যাবে? বুদ্ধদেব অনাত্মবাদী, রবীন্দ্রনাথ আত্মবাদী—এ দুয়ের মাঝে তাই কোথাও কোনও মিল নেই—এই কথাই কি সত্য নয়?

না, সত্য নয়, বুদ্ধদেবের সাধনাকে এই নেতিবাচক সূত্রে আবদ্ধ করা চলে না। তিনি অমিতাভ, তিনি আপনার অজস্র আলোকে দিক্ দিগন্ত উদ্ভাসিত করেছিলেন—সেই আলোককে অস্বীকার করা চলে না।

বৌদ্ধধর্মের অধ্যাত্মবাদের দার্শনিক দিকটা তাই একটু আলোচনার প্রয়োজন। বুদ্ধদেব তার বহুধা বিচিত্র আলোচনায় আত্মাকে কোথাও অস্বীকার করেন নি। আত্মানং বিদ্ধি—আত্মাকে জান—এই ত সব চেয়ে গভীর উপদেশ। বুদ্ধদেবও তার সাধনায় সেই আত্মার সন্ধান করেছিলেন। বেদান্তকে তিনিই পূর্ণতা দিয়েছেন, যা আত্মা নয় তাকে চিনেই তিনি আত্মাকে উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন।

বেদান্তবিদ্ বলেন—আত্মাকে মন পায় না, বাক্য তার কাছ থেকে ফিরে আসে। অথচ সেই অনির্বচনীয়কে প্রকাশের জন্য বারংবার নিস্ফল প্রয়োগ করে বসি! বুদ্ধ দেখালেন, পৃথিবীর যা কিছু সবই আত্মা নয়—সবই অনাত্ম—কিন্তু অনাত্মই তার শেষ কথা নয়—অনাত্মার পর আছে এক পরম সুখকর নির্বাণ—যেখানে মৃত্যু নেই, জরা নেই—সেই পরমশান্ত সুখময় অবস্থাই ত আত্মার অধিষ্ঠান-ভূমি। বেদান্ত যাকে মোক্ষ বলেছেন, বুদ্ধ তাকে নির্বাণ বলেছেন। বৈদান্তিকের আত্মোপলব্ধি আর বুদ্ধের নির্বাণ একই লক্ষ্যে নিবদ্ধ।

বুদ্ধদেব অনাত্মবাদের পথেই অনির্বচনীয় জ্ঞানের অগম্য আত্মাকে ধরতে চেয়েছিলেন, আত্মার কথায় তাই তিনি সতত মৌনাবলম্বন করতেন—মৌনতা দিয়ে ছাড়া সেই অগম্য, অপ্রাপ্য, অবোধ্যকে কেমন ভাবে ব্যাখ্যা করা চলতে পারে।

বুদ্ধ তার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে অনুভব করলেন—আমরা যাকে অহং বলি—যে ব্যক্তিত্বের সীমারেখা তার ক্ষুদ্রতা দিয়ে আমাদিগকে রাত্রিদিন দুঃখ দিচ্ছে—সে আমি নই, সে আমার আত্মা নয়। অতএব সেই অহংবোধকে সমূলে নির্মূল করতে হবে—সেই অহঙ্কারের বশেই আমি অজস্র, অপরিমিত এবং অবারিত আনন্দে মগ্ন হতে পারব, সেই আনন্দই আত্মানন্দ-সেখানেই আমি আত্মারাম।

তাই নির্বাণ নঙর্থক নয়, সমর্থক। তাই নির্বাণ লাভের পর বুদ্ধদেব কর্মহীন নিষ্ক্রিয়তায় ডুবে যান নি, কল্যাণপূতকর্মে সারাজীবন ব্যয় করেছেন। আজ নির্মম নিঃসীম শুদ্ধতায় মানব জীবন কলুষিত, তাই সহজে আমরা এই অহংবিসর্জনকে উপলব্ধি করতে পারব না। কিন্তু বেদান্ত ও বুদ্ধ একই কথা বলেছেন—মানুষকে নির্মম ও নিরহঙ্কার হতে হবে।

এই কথাটি কবি অত্যন্ত সুন্দর ভাবে তাঁর কবির ভাষায় ব্যক্ত করেছেন:—"অহং আমাদের সেই রকম জিনিষ—অত্যন্ত কাছে এই জিনিষটা আমাদের সমস্ত বোধ-শক্তিকে চারিদিক থেকে এমনি আবৃত করে রেখেছে-যে অনন্ত আকাশভরা অজস্র আনন্দ আমরা বোধ করতেই পারছিনে—এই অহংটার যেমনি নির্বাণ হবে, অমনি অনির্বচনীয় আনন্দ এক মুহূর্ত্তে আমাদের কাছে পরিপূর্ণ রূপে প্রত্যক্ষ হবেন। সেই আনন্দই যে বুদ্ধদেবের লক্ষ্য —তা বোঝা যায় যখন দেখি তিনি লোকলোকান্তরে জীবের প্রতি মৈত্রী বিস্তার করতে বলছেন। জগতে যে অনন্ত আনন্দ বিরাজমান—তারও যে ওই প্রকৃতি সে যে যেখানে যা কিছু আছে সমস্তর প্রতি অপরিমেয় প্রেম। এই জগদ্ব্যাপী প্রেমকে সত্য করে লাভ করতে গেলে নিজের অহংকে নির্বাসিত করতে হয়, এই শিক্ষা দিতেই বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হয়েছিলেন—নইলে মানুষ বিশুদ্ধ আত্মহত্যার তত্ত্বকথা শোনবার জন্য কখনোই তাঁর চারদিকে ভিড় করে আসত না।"

গীতাতেও ঠিক একই কথা শ্রীকৃষ্ণের মুখে ফুটেছে:—

> অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
> নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃক্ষমী ॥

অতএব সর্বভূতে মৈত্রী এবং অহং বিনাশ অভেদাত্মক এবং সেই কথা স্মরণ করে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হব যে —বুদ্ধের অনাত্মবাদের মধ্যে আমাদের ভয়ের কিছু নেই। সেই অনাত্মবাদ অহং বিনাশের মঙ্গলময় পথ। অখণ্ড, অচ্ছিদ্র শীলপালনের সাথে 'আমিকে' বিসর্জন দিলেই পথ সুগম ও সহজ হয়ে ওঠে। বুদ্ধ যে পরম বৈদান্তিক সে কথা কঠোপনিষদে দুটি শ্লোকের সাথে বুদ্ধের অনুশাসনের তুলনা মূলক সমালোচনা করলে আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হবে। কঠোপনিষৎ বলছেন:—

> যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্যহৃদি শ্রিতাঃ।
> অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥২।৩।১৪
> যদা সর্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ
> অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদ্ধ্যনুশাকসন।২।৩।১৫

যে সকল কাম মানব-হৃদয়ে আছে—সেই আশ্রিত কামনা-গুলি যখন বিশীর্ণ হয়ে বিলীন হয়, তখন মরণধর্মা মানুষই অমর হয় এবং এই দেহেই ব্রহ্মকে সম্ভোগ করে। জীবিত কালেই যখন হৃদয়ের বন্ধন সমূহ বিনষ্ট হয়, তখন মর মানুষ অমৃত লাভ করে। এইটুকু মাত্র সর্ববেদান্তের উপদেশ।

বুদ্ধদেব কি একই কথা বলেন নি? তিনি ইহজীবনে নির্বাণ লাভ করে বলেছিলেন যে আমি অমৃতকে অধিগত করেছি। তিনি আরও বলেছেন—তৃষ্ণা বা কাম অনাদিকাল থেকে মানুষকে সংসারচক্রে বেঁধে রেখেছে—তাই তৃষ্ণা-ক্ষয়েই সংসারচক্র থেকে মানুষ মুক্তি পাবে।

বুদ্ধ তাই সনাতন ধর্মের বিদ্রোহী সন্তান নন। তিনি সনাতন ধর্ম দীপ—তিনি সর্ব মানুষের মঙ্গল কামনায় জাত হয়েছিলেন—তিনি সনাতন ধর্মকে বহু জনহিতের জন্য বহুজন-সুখের জন্য দেশে দেশান্তরে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, তিনিই ঋগ্বেদের অনুশাসন অনুসরণ করে বিশ্বমানবকে আর্য্য করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন—তিনিই যজুর্বেদের মন্ত্রকে আপন জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন—তিনিই কেবল বলতে পারেন—

> যসেমাং কল্যাণীং কামাবদানি জনেভ্যঃ
> ব্রহ্মরাজনভ্যাং শূদ্রায় পর্য্যায় শ্বায় পরণায় চ।

কারণ তিনি কোনও আড়াল না রেখে মুক্তহস্তে আপন সত্যকে সারা জগতে প্রকাশ করেছিলেন।

জগদ্দল পাথরের মত শত শত কুসংস্কার আজও আমাদের জাতীয় চিত্তকে মলিন ও কলুষিত করে রেখেছে। বুদ্ধ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই মানুষকে এই মোহ থেকে মুক্ত করতে চেয়েছেন।

মধ্যমনিকায়ে একটি সুন্দর সুক্ত আছে। সুন্দরিক ভরদ্বাজ একদিন বুদ্ধকে এসে প্রশ্ন করলেন—আপনি কি বাহুকে স্নান করেন?

বুদ্ধ প্রশ্ন করলেন:—"ব্রাহ্মণ! বাহুক নদীর প্রয়োজন কি? বাহুক কি করে?"

ব্রাহ্মণ—ভগবান গৌতম! লোকে মনে করে বাহুক লোককে পুণ্যদান করে—বাহুকে স্নান করলে পাপ প্রজ্বলিত হয়ে যায়।

বুদ্ধ—পাপকর্মা বাহুকে বারংবার স্নান করেও শুচি ও পবিত্র হয় না—বাহুকে বা অন্য কোনও তীর্থে স্নানে কোনও ফল হয় না। যে মানুষ পাপী, যে মানুষ নিষ্ঠুর, তাকে তীর্থ-স্নান পুণ্যবান করে না। যার মন পবিত্র তার নিকট প্রতিদিন শুভ তিথি। হে ব্রাহ্মণ, আমার কথা শোনো, তোমার প্রেম ও করুণাকে প্রসারিত করো, সত্য কথা বলো। প্রাণীদের হত্যা করো না। চুরি করো না, কৃপণ হয়ো না—ধর্মে বিশ্বাস রাখো—তাহলে গয়ায় যেতে হবে না। তোমার নিজের কৃপানন্দকেই সমস্ত তীর্থে পাবে।"

এই মিথ্যা বিশ্বাসের নাগপাশ থেকে মানুষকে মুক্ত করে বুদ্ধ বলেছিলেন :—

সব্ব পাপস্স অকরণম্
কুশলস্স উপসম্পদা।
স চিত্ত পরিচয়া দাপনম্
এতম বুদ্ধান শাসনম্।

কোনও পাপ কাজ করো না, সব সময় মঙ্গল কর্ম কর, নিজের মনকে নির্মল কর—এই মাত্র বুদ্ধের অনুশাসন। কবির ভাষায় তাই বুদ্ধের কাছে নিবেদন করব—

মোহ মলিন অতি দুর্দিন—
শঙ্কিত-চিত্ত পান্থ
জটিল গহন পথ সংকটে—
সংশয় উদ্‌ভ্রান্ত।
করুণাময়, মাগি শরণ—
দুর্গতি ভয় করহ হরণ,
দাও দুঃখ-বন্ধ-তরণ
মুক্তির পরিচয়।
মহা শান্তি, মহাক্ষম
মহা পুণ্য মহা প্রেম।

আমরা অচলায়তনের অন্ধকারে বিভীষিকায় ভ্রান্ত হয়ে চলেছি—সেখানে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবের মতই জ্ঞান-সূর্য্যের-উদয় সমারোহ চেয়েছেন। আমাদের ভ্রান্তিকে, আমাদের মিথ্যাভয়কে, আমাদের দৌর্বল্যকে তিনি বারংবার অনুপম ভাষায় আঘাত করে আমাদের জাগাতে চেয়েছেন। যে কর্ম অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায় পরিপূর্ণ হয়, সেই কর্মে আমাদের আহ্বান করেছেন, যে উদারতা মানুষকে ছোট করে না—মানুষের সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেয় না—সেই উদারতায় বসুধাকে আলিঙ্গন করতে বলেছেন, চিত্তকে ভয়-শূন্য করে জ্ঞানকে সর্বদা মুক্ত রাখতে উপদেশ দিয়েছেন। বুদ্ধদেবের মত তিনিও মানুষকে আত্ম-নির্ভর হতে বলেছেন। গীতাঞ্জলিতে তাই তাঁর প্রার্থনা উদাত্তস্বরে জাগ্রত হয়েছে—

বিপদে মোরে রক্ষা করো
এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখ তাপে ব্যথিত চিত্তে
নাইবা দিলে সান্ত্বনা
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।
সহায় মোর না যদি জুটে
নিজের বল না যেন টুটে
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি
লভিলে শুধু বঞ্চনা
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।

কুশল কর্ম বুদ্ধদেবের সর্বোত্তম শাসন। নিজের নির্বাণ লাভের পরেও তিনি মৃত্যু দিন পর্য্যন্ত লোক সেবায় প্রবৃত্ত ছিলেন। কর্মের প্রতি এই সুগভীর শ্রদ্ধা রবীন্দ্রনাথেও বর্ত্তমান।

মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি,
মুক্তি কোথায় আছে?
আপনি প্রভু সৃষ্টি বাঁধন প'রে
বাঁধা সবার কাছে।
রাখোরে ধ্যান থাকরে ফুলের ডালি
ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধূলাবালি
কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে
ঘর্ম পড়ুক ঝরে।

কিন্তু হৃদয় বিশালতায়, মঙ্গল কর্মের পোষকতায় এবং অন্যান্য বহুবিধ ভাবে উভয়ের ঐক্য থাকলেও এক স্থানে উভয়ের ঐক্য মেলে না—রবীন্দ্রনাথ ভক্ত একান্তভাবে ব্রহ্মনিষ্ঠ। তাঁর সমস্ত জীবন বিশ্ববিধাতার চরণে পূজায় অঞ্জলি। কিন্তু বুদ্ধ বচনে এই ভক্তি ধর্মের একান্ত অভাব। বুদ্ধ

ভগবানকে মানেন নি—উপাসনায় সার্থকতা প্রচার করেন নি।

রবীন্দ্রনাথ এই দুরূহ সমস্যার এক সমাধান করেছেন। বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদ প্রবন্ধে তিনি বলেছেন যে বৌদ্ধধর্মের সবলতার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে—হীনযানও পূর্ণ ধর্ম নহে, মহাযানও পূর্ণ বৌদ্ধধর্ম নহে। তিনি বলেছেন—সংসারের অতীত কোনও পূজনীয় সত্তাকে স্বীকার না করা বৌদ্ধধর্মের নিত্য সত্য নহে।

ভক্তির প্রতি আদিম বৌদ্ধধর্মের অপমান মহাযানে প্রতিকার লাভ করেছে। জাপানে অমিত বৌদ্ধধর্ম মহাযান মতবাদ থেকে উত্থিত হয়েছে, জাপানে দেখি বৌদ্ধ বুদ্ধের প্রতি একান্ত নির্ভরতাকে ধর্মের পরাকাষ্ঠা মনে করেছে। হোমেনের লেখা থেকে রবীন্দ্রনাথ উদ্ধৃতি করেছেন যে আমরা অমিত বুদ্ধের দয়া বলেই জন্মমৃত্যুর সমুদ্র উত্তীর্ণ হতে পারি।'

সত্যকার বুদ্ধবাণী কি, আজও আমরা তা সঠিক জানি না। হীনযান ও মহাযানের মূল ধারা বুদ্ধের সাধনায় ছিল—একথা স্বীকার করাই যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। পরে অবশ্য নব নব ভাবধারায় সঞ্জীবিত ও পুষ্ট হয়ে দুই পরস্পর-বিরোধী পৃথক যানে পরিণত হয়েছে, কিন্তু মূলে উপনিষদের আত্ম-বাদ ও উপাসনা এবং বুদ্ধের নবাবিস্কৃত অনাত্মবাদ ও আত্মশক্তিতে মুক্তিলাভের পন্থা নিশ্চয়ই মহামানব বুদ্ধের মনীষায় একটি সুষ্ঠু সমাধান লাভ করেছিল, এই বিশ্বাসই আমাদের নিকট সত্য বলে প্রতিভাত হয়।

জ্ঞান ও কর্মকে বুদ্ধ নিয়েছিলেন আর ভক্তিকে বিসর্জন দিয়েছিলেন—একথা মানলে মানব চিত্তের একটি বিশেষ আকাঙ্খাকে তিনি ধরতে পারেন নি, এই কথা বলতে হয়। তার কিন্তু তাতে কুশাগ্রবুদ্ধি পরম কারুণিক মহামানব বুদ্ধকে মহিমাচ্যুত করা হয় বলেই মনে করি।

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি। এই হল বুদ্ধ ত্রিশরণ। বুদ্ধের অমেয় প্রেমের চিরন্তন স্বাক্ষর রয়ে গেছে এই বজ্রবাণীর মন্ত্রে। সিয়াম কবিতায় কবি এই অনুপম মন্ত্রের শক্তির কথা অহেতুক আনন্দে উপলব্ধি করে প্রকাশ করেছেন :—

ত্রিশরণ মহামন্ত্র যবে
বজ্রমন্দ্র রবে
আকাশে ধ্বনিতে ছিল পশ্চিমে পুরবে
মরুপারে, শৈলতটে, সমুদ্রের কূলে উপকূলে,
দেশে দেশে চিত্তদ্বার দিল কবে খুলে
আনন্দ মুখর উদ্বোধন—
উচ্ছাস ভাবের ভার ধরিতে নারিল যবে মন
বেগ তার ব্যাপ্ত হল চারিভিতে
দুঃসাধ্য কার্তিতে, কর্মে, চিত্রপটে, মন্দিরে মূর্ত্তিতে
আত্মদান সাধন স্ফূর্ত্তিতে
উচ্ছসিত উদার উক্তিতে
স্বার্থঘন দীনতার বন্ধন মুক্তিতে—

এই ত্রিশরণ মন্ত্রটি বুদ্ধদেবের অপূর্ব দান। তিনি নিজের জন্য কোনও গৌরব চান নি। পরমগুরু হয়েও নিম্নতম শ্রদ্ধার অর্ঘ্যটুকুও দাবি করেন নি। তিনি বলেছেন—মুক্তি দানের বস্তু নয়, কৃপার বস্তু নয়। প্রত্যেক মানুষকে তা আহরণ করতে হবে আপন শক্তিতে। মনুষ্যত্বের মহিমাকে তাই বুদ্ধদেব সুগভীর সম্মান জানিয়ে নিজেকে কেবল পথি-কৃৎ বলেছেন। ধর্মপদের ১৬৫ শ্লোকে আছে—

আত্তনাব কতং পাপম্
আত্তনা সংকিলিস্সতি
আত্তনা অকতং পাপম্
আত্তনাব বিশুতি
শুদ্ধি অশুদ্ধি পাচাতম
নাঞ্ঞো অঞ্ঞোং বিশোধয়ে।

মানুষ আপনা আপনি পাপ করে, আপনাকে আপনিই ক্লেশ দেয়। আপন দেখাতেই পাপ থেকে বিরত হয়, আপনার দ্বারাই বিশুদ্ধ হয়। শুদ্ধি বা অশুদ্ধি আত্মকৃত, একে অন্যকে কখনও উদ্ধার করতে পারে না।

বুদ্ধ কেবল পথ দেখান। পথিকৃতের ভক্তি তার প্রাপ্য কিন্তু তার বেশী কিছু নয়।

বুদ্ধকে আমরা মানব, শ্রদ্ধা করব, কারণ কবির ভাষায় তাঁর মন্ত্র অমৃতবাণী।

"যে বাণীর সৃষ্টি ক্রিয়া নাহি জানে শেষ
নব যুগ পত্রসাথে দিবে নিত্য নূতন উদ্দেশ
সে বাণীর ধ্যান
দীপ্যমান করি দিবে নব নব জ্ঞান

দীপ্তির ছটায় আপনার

এক সূত্রে গাঁথি দিবে তোমার মানস রত্নহার।'

মানুষ যেখানে একক সেখানে সে ব্যর্থ, তৃণ শক্তিহীন, রজ্জু শক্তিমান। তাই বুদ্ধের ব্রতকে যারা পালন করবে—তাদের মঙ্গললাভের জন্যই সংঘ। সংঘ জীবনেই মানুষ পাপে অনাসক্তি ও বিরতি লাভ করতে সহজ সুযোগ পায়। কিন্তু সংঘের প্রতিষ্ঠা বুদ্ধ বচনে। বুদ্ধ যে আদর্শ দেখিয়ে গেছেন, যে পথের নির্দ্দেশ দিয়ে গেছেন, তাকে যদি আমরা না মানি, তাহলে বুদ্ধের তপস্যা এবং আত্মদান ব্যর্থ হয়ে যাবে। পরিনির্বাণের পূর্বে তিনি আনন্দকে বলেছিলেন—'হে আনন্দ, আমার অবর্ত্তমানে তোমাদের দুঃখ করবার কিছু নেই—আমার কথাগুলি স্মরণে রেখো। যা কিছু আমরা ভালবাসি তা থেকে একদিন সরে যেতে হবেই। যা জাত একদিন তার ধ্বংস হবেই। আমি যখন থাকব না, তখন ধর্মই তোমাদের আশ্রয় হোক।" বুদ্ধ, সংঘ ও ধর্ম এই ত্রিশরণের দীপ্তি তার নূতন কিরণজালে পৃথিবীকে প্রদীপ্ত করুক।

কবির প্রার্থনায় কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও আজ যেন বলি :—

ক্রন্দনময় নিখিল হৃদয় তাপদহন দীপ্ত
বিষয়-বিষ বিকারজীর্ণ ক্ষিপ্র অপরিতৃপ্ত
দেশ দেশ পরিল তিলক রক্তকলুষগ্লানি
তব মঙ্গল শঙ্খ আন তব দক্ষিণ পাণি
তব শুভসঙ্গীতরাগ তব সুন্দর ছন্দ
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্ত পুণ্য
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।

তোমার মুখ

মায়া বসু

তোমার মুখের রেখাগুলো আজ আড়াল করেছে কোন
সুকৃষ্ণ কালো মেঘ?
উড়িয়ে কি তাকে নেবে না আরেক কালবৈশাখীর মত,
দুরন্ত বায়ু বেগ!
উধাও আকাশে সেকি রবে নিশ্চল?
ঝরাবে না তার ঘনীভূত ব্যথা অন্তর্বেদনায়
কয়েকটি ফোঁটা জল?

ব্যর্থ শ্রীহীন মঞ্জরীহীন রিক্ত সে প্রশাখায়
জীবনের আয়োজন
মেলেনা মেলেনা তবু পলাতক ধেয়ে আসে বার বার,—
এই প্রজাপতি মন।
ঝিকিমিকি জলে সময়ের মুঠো কী যে
হিজিবিজি আঁকে,
তোমার মুখের ছায়াখানি দেখি সেই তরঙ্গে দোল!
—ব্যাকুল দুহাতে কী করে ধরব তাকে?

শেষ হয় যদি বসন্ত বনে পুষ্প পরিক্রমা—
প্রথম ঋতুর ক্ষমাহীন ক্রোধ পিঙ্গল দুটি চোখ,
রাখবে না তার এতটুকু স্মৃতি জমা?
ঝলকে ঝলকে বিগলিত আভা স্রোতে
নিঃশেষে তাকে মুছে নেবে নাকি বিস্মরণের ঢেউ—
হৃদয়ের গুহা পথে?
শূন্য দ্বীপের সৈকত তীর সাগর অনেক দূর
রুক্ষ সে বালুচর!
কুটিল হাওয়ারা ভ্রুকুটি শানায়, বিদ্যুদ্দাম গতি
তুলছে ধুলোর ঝড়।
মহা-প্রলয়ের তাণ্ডব লীলা প্রচণ্ড নর্ত্তনে
ছিন্ন ভিন্ন করে বুক পৃথিবীর;
তোমার মুখের একটি রেখাও কাঁপে না সে ঘূর্ণিতে!
দর্পণে তার শুভ্র ছায়াটি স্থির।
দূর বন্দরে দীপ্ত শিখায় জেগে থাকে বাতি ঘর—
ওখানে বন্দী জীবন দেবতা রুদ্র বৈশ্বানর॥
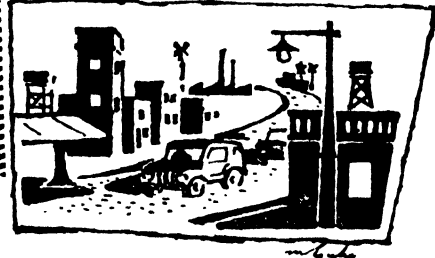
(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

নীলকণ্ঠবাবু রোদপিঠকরে কাগজখানা পড়ছিলেন, কালকের সান্ধ্য কাগজ। এখানে অনেক কষ্টে তিনি আনাবার ব্যবস্থা করেছেন। সহর—দূর কোন গতিশীল মহাজীবনের সঙ্গে ওই একটু ক্ষীণ যোগসূত্র। মাঝে মাঝে আগেকার সেই কর্মব্যস্ত জীবনের কথা মনে পড়ে।

আজ পল্লীর এই স্তিমিত বয়োজীর্ণ সমাজের বিকৃত ধারার মাঝে এসেছে নীচতা আর আলস্যের পঙ্কিল শৈবাল-দাম, গতিরুদ্ধ হয়ে গেছে।

তারই মাঝে আটকে পড়েছেন তিনি। যেন অসহায় বন্দী একটি জীব।

...হঠাৎ অশোককে আসতে দেখে কাগজখানা ফেলে ওর দিকে চাইলেন।

—এসো!

—অশোক এগিয়ে এল।

সেদিনের সেই কথাগুলো মনে পড়ে। ভৈরবের মামলার ব্যাপারে অশোক সেদিন পরিস্কার অসম্মতিই জানিয়ে দিয়েছিল। হয়তো এখনও নীলকণ্ঠবাবুর মনে কোথায় আঘাতই দিয়েছে সে কথাটা তাই আর তুললো না অশোক।

নীলকণ্ঠবাবুই বলেন—সেদিন ঠিকই বলেছিলে অশোক। ওসবের সার্থকতা আছে কিনা এ নিয়ে আমিও ভেবেছিলাম—

প্রীতি বাবাকে চা দিতে এসেছিল, অশোকের সঙ্গে দেখা হতেই একটু হাসির আভা দেখা দেয় মুখে; অশোক বলে ওঠে

—চা এখুনিই খেয়ে আসছি।

প্রীতি যাবার সময় বলে ওঠে—বাবা, হাটে যেতে হবে কিন্তু।

নীলকণ্ঠবাবু ওর কথা বোধহয় শুনতেই পাননি। নিজের মনেই কি ভেবে চলেছেন। বলে ওঠেন—দেখলাম, দেবতার অভাব-অবহেলার চেয়ে আজ মানুষের অভাব, মানুষের প্রতি অবহেলাটাই যেন বড় হয়ে দেখছি চোখে।

অশোক কথা বলে না।

কথাটা সেও ভাবে, কিন্তু এমনি তুলনামূলকভাবে ভেবে দেখেনি। তারও মনে হয় সত্যিই। চোখের উপর দেখছে অতুল কামার কেন—আরও কত লোকের উপর ওদের অবিচার। কিন্তু কতটুকু তার সামর্থ যে সব অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারে—যতদিন না তারা নিজেরা সেই প্রতিবাদের ভরসা পায়—ততদিন তাদের হয়ে আর কেউ প্রতিবাদ করে তাদের আগলে রাখবে এটাও সম্ভব এবং সঙ্গত নয়।

অশোক বলে ওঠে—একটা সমবায় সমিতির কথা ভাবছিলাম—

নীলকণ্ঠবাবু ওর দিকে মুখ তুলে চাইলেন—অর্থাৎ!

—ধরুন এই কর্মকারদের বাসন—তাঁতিদের কাপড়-চোপড় নিয়ে প্রথম—তার পর সম্ভব হয় এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভ।

অশোকের তরুণ স্বপ্ন-দেখা মনে ভবিষ্যতের উজ্জল ছবি একটার পর একটা ফুটে ওঠে। অশোকও দেখেছে এতদিন ধরে এই প্রচলিত নিয়ম।

বাসন কাপড়চোপড় নিয়ে কি মুনাফা করে উর্দ্ধতন একটা শ্রেণী—এইখানে ওদের চোখের উপরই। দেখেছে বর্ত্তমান কৃষি-ব্যবস্থার গলদ।

বলে ওঠে—ধরুন আমাদের গ্রামেই মোট হয়তো হাজার বিঘে আবাদী জমি আছে। তাতে চাষ আবাদ করতে হয়তো একশো জন মুনিষ—পঞ্চাশজোড়া বলদ লাগে। কিন্তু হিসেব করে দেখুন গে—ঘরে ঘরে মরা পেটো বাছুর ছায়ের মত বলদ—তাও প্রায় একশো জোড়া আছে আর চাষ আবাদে পড়ে আছে প্রতি চাষীর ঘরে দুতিনজন করে প্রায় চারশো জন মুনিষ মাহিন্দার। সব যদি কো-অপারেটিভে করা যায় তাহলে প্রথমেই বিরাট একটা অপচয়—পরিশ্রম বাঁচানো—

প্রীতিই কথাটা বলে ওঠে—যে লোকগুলো বেকার হবে তাদের উপায়?

অশোক প্রীতির দিকে চাইল। প্রশ্নটা তার মনেও উঠেছিল। প্রীতিই বলে ওঠে—বিকল্প কোন ব্যবস্থা, ধরুন কোন ফ্যাক্টরী বা অন্য কিছু থাকলে তবেই এই আমূল পরিবর্ত্তন করা সম্ভব। এই এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভ

—অশোক জবাব দেয়—তার আগে এ সম্বন্ধে কিছু করা যায় না?

নীলকণ্ঠবাবু ভাবছেন। অনেকদিন থেকেই তিনি এই সর্বনাশটা দেখে আসছেন। ঘরে দশ বিঘে পনেরো বিঘে জমি নিয়ে এরা আর করবার কিছু না পেয়ে চাষ করার নামে খরচই করে এসেছে হাল বলদ মুনিষ রেখে, দেন'র দায়ে জড়িয়ে পড়েছে। ধুকে ধুকে কোনরকমে অস্তিত্বটুকু টিকিয়ে রেখেছে—'চাষী গেরস্থ' এই ভুয়ো সম্মানের মোহে।

লেখাপড়া শেখবার সুযোগও পায়নি, পেয়েছিল যারা, তারা খেনো-জমিদারীর গর্বে বুক ফুলিয়ে বাইরে গিয়ে জাহির করে এসেছে—গোলামী করবো না, কাদাঘেঁটে খাবো!

এই করে অক্ষম আলস্য আর নীচ স্বার্থান্ধ পরিবেশের দেশজোড়া দুঃখ অভাবের অন্ধকারে শিয়ালের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আজও তারা টিকে আছে সর্বত্র।

বাধা দেবে তারাই। মরবে তবু বাঁচবার পথ খুঁজবে না। চোখবাঁধা বলদের মতই ঘুরপাক দেবে সেকেলে সেই ঘানিঘরের চারিপাশে—তবু চোখ খুলে উদার আকাশের দিকে চাইবার সাহস নেই—আলোকে ভয় করে, চোখ ধাঁধিয়ে আসে।

বলে ওঠেন নীলকণ্ঠবাবু—সেদিন এখনও আসেনি অশোক।

—তবে?

—দুঃখ দুদিন আরও আসুক, নয় তো কোন বিরাট ধাক্কা আসুক; যেদিন এরা চাষ করবার লাঙল দেবার মুনিষ পর্য্যন্ত পাবে না; তারা অন্য কোন জীবিকার সন্ধান পাবে। অজন্মা হয়ে পড়ে থাকবে ক্ষেত, সেদিন এরা এগিয়ে আসবে—ভাববে ওই যৌথ চাষের কথা। সর্বনাশ সামনে এলে—সব হারাবার কথাটা সত্য হলে তখনিই ভাববে অর্ধেক নিয়েই তৃপ্ত থাকি—সেইদিনই এরা ওই যৌথের কথা ভাববে। ভায়ে ভায়েই যেখানে ফৌজদারী, সেখানে যৌথের কথাও স্বপ্ন। বাধা দেবে ওই বামুন কায়েত চাষীরাই।

নীলকণ্ঠবাবু যেন বেদনাভরা কণ্ঠে কথাগুলো বলেন।

অশোক কি ভাবছে। দেখেছে ও সমাজের মাথায় ওই জাতি আর সংস্কারের দোহাই দিয়ে যারা বসে আছে—তারাই এই অনর্থের মূল।

—চাকাকি তবু ঘুরবে না?

—ঘুরবে!

প্রীতি অশোকের দিকে চেয়ে থাকে। অশোক বলে ওঠে।

—ঘুরবে, তবে উপর থেকে নীচের দিকে সহজে চাকা নামে না, নামে তখনিই যখন নীচের থেকে ঠেলে উপরে উঠতে যায়। নীচু আর ওপর, দুদিকের টানের পাল্লায় যার

ভার বেশী সেই জেতে—চাকা নীচু দিক থেকে চাপ দেয় উপরের দিকে।

কথাটা অশোক যেন বিশ্বাস করছে।

দেখেছে উপরের সমাজে ঘুণ ধরেছে—নানা আধিব্যাধি, আলস্য আর অকর্মণ্যতার ঘুণ।

এক শ্রেণী তাই অন্তরে অন্তরে নোতুন করে বাঁচবার পথ দেখছে।

—বাবা।

নীলকণ্ঠবাবু প্রীতির ডাকে মুখ তুলে চাইল। হঠাৎ হাটের কথাটা মনে পড়ে তাঁর।

উঠে পড়েন তিনি—এই যে যাচ্ছি।

প্রীতিও পাকাগিন্নীর মত আওড়ে চলে—উচ্ছে বেগুন সঙ্গে কাচকলা নেবে, তারপর কপি—হ্যাঁ আলু কিনো না, বাড়ীতেই আছে।

অশোক হেসে ফেলে—যজ্ঞি বাড়ী ব্যাপার যে—

প্রীতি ছোট্ট জবাব দেয়—ওসব ভাবতে হয় না।

—না। পাতপাড়ি ভাত খাই।

নীলকণ্ঠবাবুর সঙ্গে বের হয়ে আসছে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে প্রীতি, ওর দিকে যেন চেয়ে রয়েছে সে।

সকালের সোনারোদ সবে গেরুয়া রং ধরেছে, শীতের শিরশিরে হাওয়া বাঁশবনের পাতায় হলুদ আভা এনেছে—ঝরে পড়ছে ওরা দমকা বাতাসে। পত্রহীন তিরোল গাছের হিজিবিজি ডালগুলো আকাশে কি যেন অদৃশ্য আখরে এক মৃতকাব্য রচনা করেছে।

ধানের গাড়ী ঢুকছে মাঠ থেকে গ্রামে। পুরোদমে ধান কাটা চলেছে। শীতের বাতাসে খেজুর গুড়ের মিষ্টি গন্ধ।

খামারে খামারে ধান।···ছোট ছোট কয়েক বিঘে জমির চাষী এরা, এদের মধ্যে দু একজন একটু সঙ্গতিপন্ন, বাকী সকলেরই অবস্থা—অন্ন ভক্ষ ধনুর্গুণঃ—গোছের। কোনরকমে বন থেকে কিছু কাঁটাগাছ এনে ছোট্ট একটু জায়গা ঘিরে মন্দিরের মত ছোট ছোট কয়েকটা ধানের পালুই করেছে।

অনেকের অবস্থা আরও শোচনীয়। মা লক্ষ্মী ঘরে ঢোকবার আগেই দোকানদার ছানুদাস লোকজন বস্তা নিয়ে এসেছে। এতদিন সেই ভাদ্র আশ্বিন থেকে বাকীতে খেয়েছে—সেই বাকী টাকা সুদ সমেত আদায় করে নিয়ে যাবে ওই ধানে। তাই একদিকে পাটা পেতে ধান পিটান হচ্ছে—সারা বছরের সঞ্চয় পরিশ্রমে অর্জিত ওই সোনাধান তুলে দিতে হবে ওদের হাতে।

···হঠাৎ ধরণী মুখুয্যে লাফ দিয়ে ওঠে—মুনিষটাকে ধান কয়েকপণ সরাতে দেখে। নিতে বাউরী ওর বাড়ীর মুনিষ, রেওয়াজ হিসাবে সারা বছর যে মুনিষ খাটবে তাকে দৈনিক মজুরী ছাড়া পাঁচকাঠা জমির ধান দেওয়া হয়, উপরি পাওনা হিসাবে। বোঁটাড়ের ধান মুনিষেরই প্রাপ্য।

নিতেবাউরী মুনিষের হালচাল দেখে একটু সন্দিহান হয়েই ধান ক'পণ আগে থেকে সরিয়ে রাখছে। পরে পাবে কিনা কে জানে।

গর্জে আসে ধরণী—এ্যাও।

আজ্ঞে বোটাড়ের ধান।

ফেটে পড়ে ধরণী—সাদাড়িবোত্‌, বোঁটাড়ে খেন্তে আইচে? সারা বছর চাষ করেছিস?

—সী কি কথা হেই মা গো।

জবাবটা দেয় নিতের সিট্‌কে বৌটা।

লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়েছিল সে সোনাধানের দিকে। নিতে বাউরীর পাঁচ সাত দিনের মজুরী ধান বাকী। খবর পেয়ে সেও ঝুড়ি নিয়ে এসেছিল। ধরণী গর্জন করে বলেছে—বোঁটাড়ে দেবে ওকে! কভি নেহি—

নিতে বাউরীও জোয়ান মদ্দ—কথা কম বলে।

সে তার নায্য পাওনা ক'পোণ ধান মাথায় তুলতে যাবে। লাফ দিয়ে এসে ধরেছে ধরণী।

তারপরই বেধে যায় কাণ্ডটা।

নিতে বাউরীর মাথা থেকে টানাটানিতে ধানের আটিগুলো পড়েছে ধানীর উপর; ছিটকে পড়ে ধরণী মুখুয্যে কাঁটাবেড়ার উপর। হাত পা ছড়ে গেছে। উঠে পড়েই দুমদাম লাথি চড় চালাতে থাকে সে।

নিতে থমকে দাঁড়িয়েছে।

—ঠাকুর!

—অ্যাও্‌। থানা পুলিশ করেগা। খামার থেকে ধান লুট করবি শালা বাউরী!

—সেকি আজ্ঞে!

···বৌটা চেঁচাচ্ছে—হেই মা গো! ও ঠাকুর!

ধরণী যেন মৌকা পেয়ে যায়—তুই সাক্ষী ছেনো। বেক্ষরক্তপাত করে কিনা ব্যাটা বাউরী!

—ঠাকুর পাঁচদিনের খোরাকী ধান?

—একটি দানা নেহি দেঙ্গা—থানা কোটে যা!

অশোক এসে পড়েছে সেই সময়। নীলকণ্ঠবাবুও রয়েছেন সঙ্গে। নিতের বৌটা চেঁচাচ্ছে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে নিতে, বলিষ্ঠ দুর্মদ যোয়ানটার নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে, দাঁত দিয়েও। কেমন যেন অসহায় একটি মানুষ। পায়ে পায়ে সরে গেল।

বৌটা চীৎকার করছে—ধরম দেখবেক! ছারেখারে যাবা ঠাকুর। হলহল গরীবের ভাত মারা। দেই ঠাকুর এখনও দিন আত করছো—ইয়া দেখবা নাই?

…চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে ওরা।

…ধরণী মুখুয্যে তখনও চেঁচাচ্ছে—আজই ষোল আনা ডাক করিয়ে এর বিচার করবো। বুকে বসে দাড়ি ওপড়াবি? জমিদারীতে বাস করবি—আবার বাড়! জুতিয়ে …বাউরীপাড়ার মাঠ ওই চকের কোন এক কড়া-কান্তির হিস্যাদার ওই ধরণী মুখুয্যে, সেই এককড়ার জমিদারের মেজাজটা ক্রমশঃ যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

নীলকণ্ঠবাবু অশোকের দিকে চাইলেন।

কথা কইল না অশোক।

শান্ত পল্লীর আকাশে তখনও একটা করুণ নালিশের ব্যর্থ সুর শোনা যায়। নিতের বউটা কাঁদছে।

—হেই ঠাকুর! তুমি ইয়ার বিচের করো ঠাকুর!

…একটা চিল উড়ছে আকাশে—দূর আকাশে।

তারকবাবু বিচারে বসেছেন।

প্রেসিডেণ্ট হাকিম এই পদাধিকারে তিনি এ অঞ্চলের অলিখিত কোন দলিল বলে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। বাড়ীর বাইরেই খানিকটা ফাকা ডাঙ্গা—ধীরে ধীরে উঠে গেছে জঙ্গলের দিকে।

ফাঁকা মাঠে ছড়ানো দু একটা অশ্বত্থ কেঁদ আমগাছ; বাঁশবাগানে শীতের হাওয়া লেগেছে—হাওয়া বইছে শস্যরিক্ত প্রান্তর থেকে।

অবনীমুখুয্যে ইউনিয়নবোর্ডের রকে বসে কাগজ পড়ছে। সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে ফোড়ন কাটে।

না হয় ফাঁক খোঁজে কেউ কোন নালিশ ফরিয়াদ করতে এলেই এগিয়ে যায়।

—মুসাবিদা করে দিই দাঁড়া।

—আজ্ঞে! লোকটা ইতস্ততঃ করে।

ওদিকে অবনী ইতিমধ্যে কাগজ কলম বের করে বসে গেছে।

—বল! দেখ মুসাবিদার চোটেই রায় উলটে দিচ্ছি।

অবনীমুখুয্যের অবশ্য সে ক্ষমতা আছে। সেই মুসাবিদার মামলা গড়াতে গড়াতে সদর পর্য্যন্ত যাবার পথই করে রেখে দেয়।

ওরাও তা বুঝতে পেরেছে। তাই এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে।

—আজ্ঞা। রবিখন্দ চুরির মামলা। ষোল আনাই দণ্ড দিয়েছে।

ওদিকে তারকবাবু তখন বোর্ডের ট্যাক্স বসানোর নোতুন হিসাব করছে। আশপাশে ঘুর ঘুর করছে গোকুল।

কাউকে না দেখে বলে ওঠে।

—আজ্ঞে গোপগাঁয়ে কুসুমবাবুর আজকাল বোল বোলাও, শুনছি ধানকল বসাবে।

—তাই নাকি! তারকবাবু খবরটা শুনে একটু অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। তাকে ছাড়িয়ে যাক কেউ—এ সে চায় না। অন্ততঃ তাই কল বসাবার আগে ট্যাক্স পাকাপাকি বসাবার ব্যবস্থাই করবে সে।

—ঠিক জানিস!

গোকুল হাসে—আজ্ঞে এ চাকলার হাড়ির খপর জানি।

হাসছে তারকবাবু। তা সে জানে।

তাই বোধহয় ওকে হাতে রাখে, তাছাড়া গোকুলকে ভয় করে এড়িয়ে চলে এ চাকলার সকলেই। সেই গোকুলেরও দরকার—একটা আশ্রয়।

সেও বুঝে শুনে বড় গাছেই ভেলা বেঁধেছে। এমনি সময় এসে হাজির হয় হরিনারাণ। বানের আগে খড়কুটো ভেসে আসার মত আগেই এসে হাজির হয়েছে খষি ডোম।

একটা পাতলা ছিপছিপে চেহারা।

এসে একেবারে তারকবাবুর পায়ের কাছেই ধপাস্ করে বসে পড়ে।

—কি হলরে? অবনীমুখুয্যেও এসে পড়েছে।

ঋষি হাঁপাচ্ছে—এজ্ঞে এমো কালী, কাঁধে ইয়া পোছাপেটা হাতুড়ী নিয়ে হরিনারাণ বাবুকে—গোকুল চুপ করে থাকে।

চমকে ওঠে তারকবাবু—সেকি রে!

হরিনারাণ মোটা থলথলে শরীর নিয়ে এসে যেন কোন রকমে লতিয়ে পড়ে রকে।

—জল! একটু জলদে বাবা।

গোকুলই টিনের গেলাসে জল গড়িয়ে এনে দেয়। একনিশ্বাসে সব জলটা কোঁক কোঁক করে গিলে হাপরের মত ফোস ফোস শব্দে দম নিতে থাকে সে।

—কি হয়েছে!

জাবেদাখাতা রোকড় ছাতা চারিদিকে ছত্রাকার করে ছড়ানো।

আর্তনাদ করে ওঠে হরিনারাণ।

—আজ্ঞে ক্ষ্যামদিন বড়বাবু। কুনাদিন অপঘাতে ওই কামারপাড়ার গুণ্ডোরাই খাস করে দেবে।

ঋষি তড়পাচ্ছে—একেবারে ওর বাড়ীর উঠোনে কিনা, তাই জবাবটা দিতে পারলাম আজ্ঞে।

—থাম তুই।

তারকবাবু ঋষি ডোমকে থামিয়ে দেয়।

—কেউ সাক্ষী ছিল? অবনী পাকা উকিলের মত জেরা করে।

—আজ্ঞে বাড়ীর ভেতর, মেয়েছেলেরা।

মনে মনে কি ভাবতে থাকে তারকবাবু। গজগজ করে।

—কামারপাড়ার ওরা বড্ড বেড়েছে, ওই অতুলের গুষ্ঠী।

—ইয়েস, ভেরি ট্রু। অবনীবাবুও সায় দেয়।

হরিনারাণ খাতা জাবেদা কুড়িয়ে নিয়ে ওধারে গিয়ে সেরেস্তা পেতে বসলো। জানে তারকবাবু, হরিনারাণই এর জবাব দিতে পারে। আর কাঁয ছেড়ে দেওয়া ওদের ভয়ে—হরিনারাণের কাছে ওটা একটা অবাস্তব কল্পনা।

তবু আজ মনে হয় তারকবাবুর কাছে এমোকালী আর কামারপাড়ার লোকদের ওই প্রতিবাদ ক্রমশঃ ধুঁইয়ে উঠছে।

একদিন জলে উঠতে দেরী হবে না।

নিতে বাউরীকে দেখে ওর দিকে চেয়ে থাকে তারকবাবু। নিতে এসেছে নালিশ জানাতে।

ধরণী মুখুয্যের নামে নালিশ।

—আজ্ঞে বোটাড়ের ধান, তিন দিনের মজুরী ধান—সব হাকিয়ে দিইছে, হেই বড়বাবু।

অবনীই বলে ওঠে—আর্জি করে এনেছিস?

—আর্জি! অবাক হয়ে চাইল নিতে ওর দিকে।

তারকবাবুরও যেন ক্লান্তি এসে গেছে এসবে। জবাব দেয়—হ্যাঁ হ্যাঁ লিখে আনগে। কাল রবিবার, পরদিন আসবি—

ব্যাপার দেখেই মিইয়ে গেছে নিতে।

—আজ্ঞে লিখে দিলে কিছুই হবেনা বড়বাবু। আইছি ডাকান এখুনি, দেখেনে সব ঠিক হয়ে যাবে।

হরিনারাণ যেন গ্রামের এদের সকলের উপরই হাড়ে চটে উঠেছে—কালীর ওই ব্যাপারের পর থেকেই। ব্যাটারা সবই নেমখারাম বেইমান। কোন মায়া দয়া নেই ওদের উপর।

কড়াস্বরে বলে ওঠে—ব্যাটা বাউরী কোথায় মদমেরে পড়েছিলি—খাটতে যাসনি ভরা চাষে, না হয় ধুরমার ধান কাটায়। গড়ের হদ্দ হয়েছে বোটাড়ে ক্ষেতে। আমি জানিনা?

—আজ্ঞে! মিছে কথা।

—চোপ, জিব টেনে সলতে পাকিয়ে দোব।

চুপ করে যায় নিতে, অবাক হয়ে গেছে। হকচকিয়ে গেছে। এদের এখানে লিখে-পড়ে এসে নালিশ করে কি ফল হবে তা অনুমান করতে পেরেছে সে।

অন্য সকলের মত কান্নাকাটি করে হুমড়ি খেয়ে পা ধরতে পারে না নিতে। নিজের হক্ জানাবার দাবীও নেই, শুধু ভিখেরীর মত ভিক্ষে করা আর কাঁদা, এটা যেন কেমন অসহ্য ঠেকে তার কাছে।

...চুপ করে বের হয়ে গেল নিতে। তার ফরিয়াদ করবার কোন ঠাঁই-ই নেই।

কেউ ওর দিকে ফিরেও চাইল না, শুনতেও চাইল না

তার অভিযোগ—তার জন্য সমবেদনা সহানুভূতি প্রকাশ তো দূরের কথা।

বেলা বেড়ে ওঠে। লালডাঙ্গার অভ্ররোদ ঝকমক করে—জনহীন প্রান্তর আর বনসীমা কেমন উদাস রৌদ্র-মাখা একটি নীরব বেদনায় গুমরে কাঁদে। তারই মাঝে চলেছে নিতে বাউরী—ওর বুকেও নীরব দুঃসহ কোন জ্বালা।

রাজ্যি জোড়া বেড়-খামার আর খামার। রাজ্যের ধান পর্বতের মত পালুই করে রাখা হয়েছে…ওরই দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে নিতে বাউরী।

খামারের ইঁটের প্রাচীর এক জায়গায় খানিকটা ধ্বসে পড়েছে, ডাঙ্গার গড়ানি জলস্রোতের মুখেই পাচীলটা—বালি-কাঁকর ঢাকা একফালি শুকনো নালা বর্ষার সময় জলের তোড়ে মেতে ওঠে—তারই ধাক্কায় পাচীলটা মাঝে মাঝে ধ্বসে পড়ে। হঠাৎ সেই ভাঙ্গার কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে নিতে বাউরী।

নির্জন মধ্যাহ্ন। অশ্বত্থ গাছে কোথায় একটা ঘুঘু ডাকছে—হাওয়ায় কাঁপে কেঁদ গাছের পাতাগুলো।

কি ভাবছ—নিতে বাউরী।

ধান! হেলাফেলা ধান!

মাঠের বুকে ওরা সারা বছর জলে ভিজে রোদে পুড়ে ধান ফলিয়েছে—সেই ধান ঢুকেছে অবনী মুখুয্যে—ধরণী—তারকবাবু ওদের সবার খামারে। তার ঘরে ছেলে-বৌ উপোসী। নালিশ ফরিয়াদ করবার উপায়ও নেই।

…বৌটার শুকনো মুখ আর কান্না মনে পড়ে। আসবার সময় দেখেছে শূন্য ঝুড়িটা উঠোনে ফেলে দিয়ে বৌটা মাথা ঠুকছে। ছেলে-মেয়েগুলো কাঁদছে।

পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় নিতে।

…বেশী না—এত ধানের পাহাড় থেকে গণ্ডা কয়েক ধান নিলে কিছু যাবে আসবে না তারকবাবুর। দুটো দিন তার ছেলে-বৌ ভাত পাবে।

…পাপ!

…হাসে নিতে! তার প্রতি অন্যায়ের যদি বিচার না হয়—তার অন্যায়ের বিচারও করবার অধিকার কোন বিচারকের নেই।

…চুপি চুপি এগিয়ে যায় পালুইএর দিকে। চারিদিকে ছড়ানো ধান থেকে তুলছে কয়েক আটি ধান, পুরুষ্ট সতেজ সোনা ধানের মঞ্জরী—দেখলে চোখ জুড়ায়।

আঁটি বাঁধতে যাবে হঠাৎ খড়পালুইএর ওদিকে নির্জন জায়গাটায় কাদের দেখে থমকে দাঁড়াল। বীভৎস সেই দৃশ্য! কে যেন নিতে বাউরীর মুখে কসে চাবুক মেরেছে! লজ্জায় ঘৃণায় সরে এল নিতে।

‥কেমন দিনের রোদও ম্লান হয়ে গেছে। বাতাসে কিসের দুর্গন্ধ। সব যেন কেমন পচে ধ্বসে গেছে।

নিজের চোখকে অবিশ্বাস করতে পারে না—বেজা বাউরীর বউটা—আর বড়বাবুর ছেলে জীবনবাবু। দুজনকে ওখানে ওই অবস্থায় দেখবে কল্পনাও করেনি—উন্মাদ হয়ে গেছে ওই বিচারকএর পুত্র, ওদের অন্তরে অন্তরে পচন ধরেছে—থিকথিক করছে পোকা।

বেজা বাউরীর বউএর হাসির শব্দ তখনও কানে আসে—হাসছে নির্লজ্জ মেয়েটা। সরে এল নিতে।

ওরা ওর চেয়েও যেন অনেকখানি নীচে নেমে গেছে, ওই তারক—জীবনবাবুর দল। ওরাও চোর—নইলে গোপনে তাদের ঘরের বৌ-ঝিএর ইজ্জৎ চুরি করতে যেতো না।

কাঁপছে ওই আড়ালের খড়গুলো—হাসির শব্দ।… কি যেন একটা জড়িত কণ্ঠের গর্জন শোনা যায়—একটা ক্রুদ্ধ উন্মাদ পশু গর্জ্জন করছে।

হুড়মুড়িয়ে আলগা কতকগুলো খড় পড়ে গেল। তখনও হাসছে মেয়েটা!

পায়ে পায়ে সরে এল নিতে বাউরী।

ওদের ওই ধান ক'আঁটিও তুলে নিতে পারল না। কেমন একটা দুর্বার ধাক্কা সে পেয়েছে। ওদের ধান ছুঁতেও ঘেন্না হয়—পাপের বীজ থকথক করছে সর্ব্বত্র।

এগিয়ে আসছে বাউরী পাড়ার দিকে। এ সময় খাটিয়ে মরদ কেউ থাকে না, মেয়েছেলেগুলো গেছে গরুর-পাল নিয়ে, কেউবা এখন মাঠের আলে এদিক-ওদিক ছড়ানো ধানের শিষ কুড়োতে বের হয়—তবু এক আধসের ধান আসে ঘরে।

বটতলায় দেখে—বেজা বসে আছে ঝিম মেরে।

খড়পালুইএর আড়ালে সেই কুৎসিত বীভৎস দৃশ্যটা মনে পড়ে।

—বেজা! এ্যাই বেজা?

নিতের ডাকে সাড়াই দেয় না সে। কাছে এগিয়ে যায় নিতে—এ্যাই শালা। বলি কানে রা যেচ্ছে না?

—অ্যাঁ! চোখ তুলে চাইল বেজা, কেমন করমচার মত লাল দুটো চোখ, একটা মলিন ধুকুড়ি কাঁথা গায়ে দিয়ে রোদে থর থর করে কাঁপছে।

—জ্বর আইছে যি গো। ধুরমার জ্বর!

··ওর দিকে বেদনাহত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে নিতে। অসহায় একটা মানুষ—ও জানে না ওর ঘরে আগুন লেগেছে। একেবারে সেই আগুন সেঁধিয়েছে ওর জীর্ণ চালা ঘরের সারা ছাদনে।

—কি বলছো?

কথার জবাব দিল না নিতে, এগিয়ে গেল ওর ঝুপড়িটার দিকে। এতক্ষণে মনে পড়ে—উনুনে আগুন পড়েনি।

কালিমাখা মাটির হাঁড়িটাও আজ উনুনে চাপেনি—মা লক্ষ্মী বাড়ন্ত।

ছেলেগুলো বোধ হয় গরুপালে গেছে—না হয় ধানের শিষ সংগ্রহে, বৌটা ওর দিকে চাইল। হতাশা আর বেদনাভরা সেই চাহনি।

—পেলা কিছু?

কি জবাব দেবে! চুপ করে বসল নিতে।

—একটু জল দে দিনি? খাই-পিয়াস লেগেছে।

তেষ্টা লেগেছে নিতে বাউরীর, বুক জোড়া কেমন অসহায় একটা জ্বালা; মাটির ভাড়ের জলে তা যেন নিভে যাবার নয়।

মিষ্টির মনে একটা গুণগুণানি সুর। লোহার পাড়ার একধারে ছোট্ট বাড়ীটাও তার যেন ওই পরিবেশ থেকে আলাদা। থাকেও একটু ছিমছাম।

জলটোপ লোকটা কেমন একটু বিচিত্র ধরণের—মাঝে মাঝে মিষ্টিরও ওকে কেমন বিচিত্র ঠেকে। কথা বলে কম। দিন-রাতই কায নিয়ে আছে।···মাটির পুতুল থেকে অন্য কাযে হাত দিয়েছে। মাটি দিয়ে গড়ছে সেই মূর্তিটা—গদাই কুমোরের শালে পুড়িয়ে তবে জৌলুস আনবে।

বিচিত্র হাতী-ঘোড়া সব কিছু।

একটা নারীমূর্তি!···সরস্বতী গড়ছে—তন্ময় হয়ে।

মিষ্টি স্নান সেরে ফিরছে তালবনা থেকে। যৌবন এখনও যাই যাই করে যায়নি, দেহে মনের কোণে এখনও তার অবশিষ্ট কিছু রয়ে গেছে। মনের গোপনে আজ ধীরে ধীরে বাসা বেঁধেছে কি এক দুর্বার কামনা।

জলটোপই বলেছিল কার্তিক পুজো করবি কি রে?

হাসে মিষ্টি, সেই উদ্দাম লাস্যময়ী নারী কোথায় মিলিয়ে গেছে। জেগে উঠেছে পল্লীপ্রান্তরে ম্লান গোধূলির আলোয় কোন সলজ্জ নারী—যে ঘর চায়; সারা মনে কামনা করে পূর্ণ হোক তার ঘর।

বলে—হ্যাঁ। মানসিক করেছি।

—কার্তিকের কাছে মানসিক!

অবাক হয় জলটোপ, পুত্রেষ্টিযজ্ঞ এই কার্তিকের পূজা।

মাথা নীচু করে মিষ্টি, কোথায় যেন তার মনের গোপনতম দুর্বলতার সংবাদও ধরা পড়ে গেছে ওই নির্বিকার লোকটার কাছে।

···জলটোপ কথা বলে না। সন্ধ্যা নেমে আসে, সাঁঝ-প্রদীপ জ্বলে ওঠে—রোজ ওঠে শীতের উদাস সন্ধ্যায় শঙ্খ-ধ্বনির সুর। আকাশে—সবুজ আঁধার ঢাকা, বেণু-বন সীমায় জ্বলে ওঠে জোনাকির আলো।

···মিষ্টির মনে কেমন একটা সুর জাগে।

···আজও তার রেশ জেগে আছে মনে। মাঝে মাঝে আগেকার সেই উন্মাদ জীবনযাত্রার কথা মনে আসে। আজ সেই স্রোতমুখর ক্লেদাৎ জীবন থেকে দূরে সরে এসেছে সে—হারিয়ে গেছে, ভুলে যেতে চায় সেই মানুষ-রূপী পশু আর দানবদের সেই কুৎসিত বীভৎস চেহারা।

···স্নান সেরে ফিরছে। উঠোনে লকলকিয়ে উঠেছে একটা লাউ গাছ। সবুজ আবেষ্টনীতে চালটা ঢেকে ফেলেছে—ফুটেছে সাদা সাদা ফুল—ফলের আশা নিয়ে।

·· লোকটা তন্ময় হয়ে মাটির সেই মূর্তির গায়ে বাঁশের শিক চেঁছে চলেছে।

—কি করছিস?

কথা কইল না জলটোপ। মিষ্টি কাপড় বদলে এসে দাঁড়াল। সুন্দর একটি মূর্তি—সুঠাম তার দেহ সুষমা; মৃত মাটি যেন ধীরে ধীরে প্রাণ পাচ্ছে ওর হাতের আঁচড়ে।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মিষ্টি।

হঠাৎ কার অস্তিত্ব অনুভব করে জলটোপ।

—তুই! কি দেখছিস?

হাসে মিষ্টি—দেখছি তুই কেমন কারিগর।

—কেনে?

—মরা মাটিকেও জীয়ন্ত করতি লাগছে।

জিব কাটে জলটোপ—ই-কথা বলতে নাই রে। দেবতা—

কজ্জলপুরিত লোচনভারে,
স্তনযুগ শোভিত মুক্তাহারে

—মা সরস্বতীর কিছুই শেখলাম না মিষ্টি, মুখ্যু হয়েই এলাম তাই হয়ে রইলাম।

মিষ্টি কথা বলে না, লোকটার দিকে চেয়ে থাকে সে।

দুপুরের মিষ্টি রোদ কেমন সুন্দর হয়ে ওঠে—ছায়া নামে উঠোনে। কোথায় ঘুঘু ডাকছে উদাস সুরে—দমকা বাতাসে কাঁপছে তালপাতাগুলো; হলদে ফুলের মত ঝরছে দমকা বাতাসে বাঁশ গাছের বিবর্ণ পাতাগুলো। তারই মাঝে মিষ্টি ওর দিকে চেয়ে থাকে।

—ওঠ্। বেলা গড়িয়ে এল। সিনান ভাত করবি না?

হ্যাঁ। উঠছি।

জলটোপ মাটিমাখা হাত ধুতে থাকে।

হঠাৎ মিষ্টিকে এগিয়ে আসতে দেখে ওর দিকে চেয়ে থাকে জলটোপ। ওর নিঃশ্বাস লাগে গালে—মিষ্টির দুচোখে কি এক দুর্বার নেশার আঘ্রাণ।

…ওকে যেন দুহাত দিয়ে কাছে টেনে নেয়। হাসছে লোকটা।

…দেখ মুখময় মাটী লেগে গেল তোর।

লাগুক। সর্ব্বাঙ্গে লাগুক!

হাসছে মিষ্টি, কেমন দুচোখে ওর টলটলে৷ অশ্রু। কাঁদছে!

—ই কি রে!

কান্নাভেজা স্বরে বলে ওঠে মিষ্টি।

—ওই কাদামাটি দিয়ে আমাকে নোতুন করে গড়তে পারো না কারিগর?

আমার সব কিছু বদলে?

অবাক হয়ে চেয়ে থাকে জলটোপ মিষ্টির দিকে। কাঁদছে মেয়েটা—হয়তো অতীতের বেদনায় সে কাঁদছে—আজকের নোতুন মিষ্টি—নোতুন নারী। নোতুন জীবনের স্বপ্নবিভোর একটি মন।

…কোথায় পাখা ডাকছে—নিদারুণ তৃষ্ণায় ওর সুরটা নীল অসীম আকাশে উধাও হয়ে যায়।

—ফটিক জল! ফ—টি—ক—জল—

অতৃপ্ত একটি সুর পৃথিবী থেকে উর্দ্ধাকাশের দিকে উঠে চলেছে দুঃসহ কি বেদনায়।

[ক্রমশঃ

নিশিগন্ধা

শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত এম-এ

সন্ধ্যার আঁধার মেখে যে-ফুলটি ফুটেছে নীরবে
নিশিগন্ধা সে-ফুলের নাম।
সে এনেছে সঙ্গে ক'রে অতি দুর দেশের সুরভি,
স্মৃতিময় রূপ অভিরাম।
কালের কাজল পরা পথিক বধুর আঁখি দুটি,
তার পাপড়ির তলে একান্তে করে যে ফুটি ফুটি :
নির্বিন্ধ্যার স্রোত ধারা তার বুকে এসে,
অনেক দুরের কথা বলে' গেল যেন ভালোবেসে।

অঙ্গে তার কারুণ্যের শুভ্র প্রসাধন,
সুদুরের শূন্যতায় চেয়ে থাকা সে-দুটি নয়ন,
অতীত রাত্রির পথে যে-নারীর কোমল মমতা
ছড়াতো পিয়াসী স্বপ্ন, তারি বুকে লেখা আছে
সে-মনের কথা।
তারি মুখে আঁকা আছে সে-মুখের হাসিটির রেখা।
অবন্তীর জানালায় সে-নারীরে দেখা যেতো একা—
ব্যথা তার লেগে আছে এ-ফুলের বিবর্ণ অধরে।

তাই আজ মনে আশা এ-রাত্রির অতন্দ্র প্রহরে;
একে নিয়ে চলে যাবো অতীতের দুর জন্মান্তরে।

এশীয় পরিকল্পনা সম্মেলন ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা

শ্রীআদিত্য প্রসাদ সেনগুপ্ত এম, এ

বর্তমানে ভারত, সিংহল, ব্রহ্মদেশ ইত্যাদি দেশে কিভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের চেষ্টা চলছে সেটা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, সরকারী উদ্যোগের উপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাই বলে বৈষয়িক উন্নয়নের ব্যাপারে বেসরকারী উদ্যোগের গুরুত্ব নেই একথা বলা ঠিক নয়। কিভাবে এই ব্যাপারে সরকারী এবং বেসরকারী উদ্যোগের পারস্পরিক দায়িত্ব নির্দ্ধারণ করা যাবে সেটাই হল বিবেচ্য বিষয়। সমস্ত এশীয় রাষ্ট্রের বিশ্বাস, যদি খুব তাড়াতাড়ি এবং ব্যাপকভাবে বৈষয়িক উন্নয়ন সম্ভব করে তুলতে হয় তাহলে সরকারী উদ্যম প্রয়োজনীয়। বিশেষ করে পরিকল্পিত অর্থনীতির উপর যে সব রাষ্ট্র অধিকতর পরিমাণে গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং যে সব রাষ্ট্রের জাতীয় জীবনের সাথে পরিকল্পিত অর্থনীতি জড়িত হয়ে পড়েছে, তাঁদের সরকারী উদ্যম গ্রহণ করতেই হবে। তবে লক্ষ্য করার বিষয় হল এই যে, সরকারী উদ্যম কতটা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় সে সম্পর্কে মত-বিরোধ আছে। কোন কোন দেশ বেশী মাত্রায় সরকারী উদ্যম গ্রহণ করেছেন। আবার কোন কোন দেশ কর্ত্তৃক অল্পমাত্রায় সরকারী উদ্যম গৃহীত হয়েছে। এছাড়া এশীয় রাষ্ট্রগুলো কর্ত্তৃক বৈষয়িক উন্নয়নের জন্য গৃহীত পদ্ধতিও ঠিক এক ধরণের নয়। অর্থাৎ আমরা বলতে চাইছি, যে সব অনগ্রসর দেশ কৃষিপ্রধান তাঁরা স্বভাবতঃই কৃষির উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠেন। এখানে আরো একটা কথা বলে রাখা দরকার। কয়েক বছর ধরে আমরা লক্ষ্য করে আসছি, অর্থনীতির ক্ষেত্রে ঘাটতি ব্যয়ের নীতি যেন ক্রমে ক্রমে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করছে। যাতে উন্নয়ন পরিকল্পনা শীঘ্র কার্য্যকরী করা যেতে পারে সেজন্য ঐ নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা হচ্ছে। অবশ্য ঐ নীতির অসুবিধা এবং গলদ যথেষ্ট আছে। তবে যদি সুচিন্তিতভাবে ঘাটতি ব্যয়ের পদ্ধতি কাজে লাগান যায় তাহলে সুফল লাভের আশা আছে।

১৯৬১ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে নয়াদিল্লীতে ইকাফের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এশিয়ার বৈষয়িক উন্নয়ন পরিকল্পনা রচয়িতাদের প্রথম সম্মেলন সুরু হয়েছিল। ঐ দিন সম্মেলনের উদ্বোধন করে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বলেছেন, জনকল্যাণ পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত, কারণ তা না হলে পরিকল্পনা সফল হবেনা। তিনি এই মর্ম্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, এশিয়া এবং দূর-প্রাচ্যের দেশগুলোর বৈষয়িক উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলো কার্য্যকরী করার ব্যাপারে ভারতের পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া যাবে। দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়ার দেশগুলোকে নিজেদের ভিতর নিবিড়তম অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। শ্রীনেহরু এই মর্ম্মে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন যে, পশ্চিমা দেশগুলোকে যদি অন্ধভাবে অনুকরণ করা হয় তাহলে ফল ভাল হবে না, কারণ অন্ধ অনুকরণের ফলে নূতন নূতন সমস্যা এবং অসুবিধা দেখা দিবে। প্রত্যেক দেশকে নিজস্ব পথে তাঁর সমস্যাগুলোর সমাধান করতে হবে। শ্রী নেহরুর মতানুসারে পরিকল্পনা রচনা করার দায়িত্ব যাঁদের উপর ন্যস্ত—তাঁদের লক্ষ্য হবে তিনটি। প্রথমতঃ প্রত্যেক লোককে আত্ম-বিকাশের সমান সুযোগ দিতে হবে। দ্বিতীয় লক্ষ্য হল জনকল্যাণ। তৃতীয়তঃ অসাম্য হ্রাস করতে হবে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত সম্মেলন এশীয় রাষ্ট্রগুলোকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করার একটা প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা। সমস্যাজর্জ্জরিত রাষ্ট্রগুলো বুঝতে পারছেন, যদি তাঁরা পরস্পর পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে থাকেন তাহলে তাঁরা দুর্ব্বল হয়ে পড়বেন। কিন্তু যদি তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারেন তাহলে একদিকে যেরকম সামগ্রিকভাবে তাঁদের শক্তি বৃদ্ধি পাবে সেরকম অন্যদিকে তাঁদের উৎসাহের মাত্রা বেড়ে যাবে।

সম্প্রতি আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইউরোপীয় সাধারণ বাজার গঠিত হয়েছে। এই বাজারের উৎসাহী স্রষ্টা হলেন পশ্চিম-ইউরোপীয় দেশগুলো। পূর্ব্ব-ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোকে নিয়ে আরেকটা বাণিজ্য জোট গঠন করা হয়েছে বলে জানা গেছে। সে জোটের নেতা হলেন সোভিয়েট রাশিয়া। এছাড়া মাত্র অল্প কয়েকদিন আগে ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলো একটা আঞ্চলিক বাজার গঠন করেছেন। এরা যে সাধারণ মুদ্রা-বিনিময় ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন সেটার গুরুত্ব আরো বেশী। সুস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে, চারদিকে আঞ্চলিক বাণিজ্য জোট গঠনের আয়োজন চলছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এশীয় রাষ্ট্রগুলোর পক্ষে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তি দৃঢ় করার প্রশ্ন গভীর-ভাবে চিন্তা করা নিশ্চয় দরকার। গভীরভাবে চিন্তা করার প্রয়োজনীয়তা খুব তীব্র হয়ে উঠেছে এজন্য যে, পশ্চিম ইউরোপীয়, ল্যাটিন আমেরিকান এবং সোভিয়েট প্রভাবিত বাণিজ্য জোটের বাইরে যে সব দেশ রয়েছেন তাদের বেশীর ভাগই বিভিন্ন ধরণের অসুবিধার সম্মুখীন। বিশেষ করে বাণিজ্যজোটভুক্ত দেশের সাথে যদি এমন কোন দেশকে বাণিজ্য করতে হয় যেটা জোটের অন্তর্ভুক্ত নন—তাহলে বিভিন্ন প্রকার বাণিজ্য শুল্ক দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকেনা। মোট কথা হল এই যে, প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে অবাধ বাণিজ্যনীতি অনুসৃত হচ্ছেনা। তাই বাঁচবার প্রয়োজনে আঞ্চলিক বাণিজ্য-জোট দানা বেঁধে উঠছে এবং পৃথিবীর এক একটা

বিশেষ অঞ্চলের দেশগুলো স্বার্থ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যিক সহযোগিতা গড়ে তোলার জন্য দৃঢ়পদক্ষেপে এগিয়ে আসছেন।

এশিয়ার বৈষয়িক-উন্নয়ন পরিকল্পনা রচয়িতাদের সম্মেলনে ইকাফ এলাকায় অবস্থিত দেশগুলোর উর্ধ্বতন নীতিনিয়ামকবৃন্দ, বৃটেন, সোভিয়েট রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি দেশের প্রতিনিধিরা অংশ গ্রহণ করেছেন। সম্মেলনে দুটো বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল বলে জানা গেছে। প্রথমতঃ ইকাফ এলাকায় দশবছরব্যাপী অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ফলাফল পর্য্যালোচনা করা খুব প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ পরিষদ এবং আঞ্চলিক উপদেষ্টা সংস্থা গঠন করার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত এবং ব্যবসাবাণিজ্য ও পরিকল্পনা তৈরী করার ব্যাপারে অধিকতর পরিমাণে আঞ্চলিক সহযোগিতা সম্ভবপর করে তোলাই হল পরিষদ এবং আঞ্চলিক উপদেষ্টা সংস্থা গঠনের মূল উদ্দেশ্য। এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যদি একটা সাধারণ বাজার গড়ে তুলতে হয়, কিম্বা সাধারণভাবে অর্থনৈতিক সহযোগিতা সম্ভবপর করে তোলা প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয়ে থাকে, তাহলে একটা জিনিষ বিশেষভাবে দরকার। সে জিনিষটি হল এই যে, যা'তে তাঁদের নিজেদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় হয় সেজন্য এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোকে সচেষ্ট হতে হবে। শ্রীনেহরু বলেছেন, মানবমন এবং হৃদয়ের পরিবর্তন ছাড়া "প্রত্যেকে আমরা প্রত্যেকের তরে" এই মনোভাব উদ্বুদ্ধ সমাজ রচনা করা যাবেনা। কাজেই মানবমন এবং হৃদয়ের পরিবর্ত্তনকে পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা দরকার। তাছাড়া এক্ষেত্রে শিক্ষার গুরুত্বও অনেকখানি। কেবলমাত্র শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের হৃদয় এবং মনের ভিতর প্রবেশ করা সম্ভবপর। শ্রীনেহরু প্রতিনিধিবৃন্দকে বলেছেন, ভারতে গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের আত্মনির্ভরশীল করার উদ্দেশ্যে গ্রামপঞ্চায়েতের হাতে অনেক ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁর মতানুসারে বৈদেশিক সাহায্যের উপর খুব বেশী নির্ভর করলে জনসাধারণ উদ্যমহীন হয়ে পড়বেন।

আজকের দিনে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এশিয়ার বেশীরভাগ রাষ্ট্র ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ থেকে মুক্তি লাভ করেছে। এটা সত্যি আনন্দের কথা। ঐ সব রাষ্ট্রে এখন নুতনভাবে অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গড়ে তোলার জন্য ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চলেছে। এই প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে নিশ্চিতভাবে মনে হবে, নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রের পরিকল্পনা-রচয়িতাদের সম্মেলন খুব গুরুত্বপূর্ণ। শুধু তাই নয়। একটা নুতন পথের সন্ধান দেওয়া হয়েছে, মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে, বৈষয়িক উন্নয়ন এবং পুনর্গঠনের জন্য দুটো জিনিষ খুব দরকার। প্রথম জিনিষ হল—বৈদেশিক সাহায্য। দ্বিতীয় জিনিষ হচ্ছে —ক্যাপিটাল গুড্‌স্। এজন্যই প্রশ্ন উঠেছে, যদি ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের মত একটা এশিয় সাধারণ বাণিজ্যিক-জোট গঠনের পরিকল্পনা তৈরী করা হয় তাহলে সে পরিকল্পনা সমর্থিত হবে কিনা। সহজে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাবে না। স্বভাবতঃই প্রত্যেকটি এশিয় রাষ্ট্র নিজের জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে চাইবেন। অর্থাৎ যদি কোন রাষ্ট্র বুঝতে পারেন, উন্নত দেশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় রাখলে মাল রপ্তানীর ব্যাপারে তাঁর সুবিধা হবে তাহলে সে রাষ্ট্র নিশ্চয় এশিয়ার অনুন্নত রাষ্ট্রগুলোর বাণিজ্যিক জোটে যোগদান করতে চাইবে না। তদুপরি এশিয়ার দেশগুলোতে একই ধরণের শাসন ব্যবস্থা চালু নয়। কোন কোন দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চোখে পড়ছে। আবার কোন কোন দেশ কমুনিষ্ট শাসন-ব্যবস্থার অধীনে রয়েছে। এছাড়া কোন কোন দেশ আবার নানাপ্রকার সামরিক জোটের মাঝে গাঁটছড়া বেঁধে রেখেছে। তাই মনে হচ্ছে, ইউরোপীয় বাজারের পরিকল্পনার মত এশিয় সাধারণ বাণিজ্যিক জোটের পরিকল্পনা চালু করতে গেলে সাফল্য লাভ করা যাবে না। অন্ততঃ বর্তমানে এই ধরণের পরিকল্পনা সফল হবার সম্ভাবনা নেই বল্লেই চলে।

জাপানী প্রতিনিধি মিঃ সাতারু যোশীহুয়ে তাঁর নিজের দেশের উৎপাদন সম্পর্কে বলেছেন, যুদ্ধোত্তরকালে উৎপাদনের উচ্চহার মোটেই কমেনি এবং পণ্যের মূল্য অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছে। মিঃ আই এ ইয়েভেনকো হলেন সোভিয়েট প্রতিনিধি। সোভিয়েট রাশিয়ায় পরিকল্পনা কতটা সফল হয়েছে সে সম্পর্কে সমবেত প্রতিনিধিবৃন্দের মনে একটা সুস্পষ্ট ধারণা জন্মাবার জন্য তিনি উৎপাদনের পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বুঝাতে চেয়েছেন, বিপ্লবের পরে পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার ফলে সোভিয়েটরাশিয়া অর্থনীতির দিক থেকে খুব কম সময়ের মধ্যে গোটা বিশ্বে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে উঠেছে। অবশ্য এশিয়া এবং দূরপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলো যাতে রাশিয়ার পরিকল্পনা সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা থেকে লাভবান হতে পারে সেজন্য রুশ সরকার সুযোগ দিতে রাজী আছেন বলে সোভিয়েট প্রতিনিধি সম্মেলনকে জানিয়েছেন। মিঃ এস হুতাসোইত হলেন ইন্দোনেশীয় প্রতিনিধি। তাঁর বক্তব্য হল, বৈষয়িক উন্নয়ন এবং পরিকল্পনা রচনার ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গী আঞ্চলিক হওয়া বাঞ্ছনীয়, কারণ এইক্ষেত্রে আন্তর্জ্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গীর তুলনায় আঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গী নাকি অধিকতর ফলপ্রসূ।

আমাদের দেশে ভবিষ্যতে ক্যাপিটাল গুড্‌স্ তৈরী করা হয়ত আর অসম্ভব হবে না। যদি সত্যি ক্যাপিটাল গুড্‌স্ তৈরী করা যায় তাহলে নিশ্চয় জাতীয় সঞ্চয় বেড়ে যাবে এবং বর্দ্ধিত জাতীয় সঞ্চয়ের সুযোগ নিয়ে ভারত নিকটবর্ত্তী রাষ্ট্রগুলো থেকে অধিকতর পরিমাণে ভোগ্য পণ্য ক্রয় করতে পারবেন। এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোতে যদি ভবিষ্যতে এই ধরণের অর্থনৈতিক অবস্থার উদ্ভব হয় তাহলে তাঁদের পক্ষে একটা এশীয় সাধারণ বাজার গঠনের জন্য চেষ্টা করা কষ্টকর নাও হতে পারে।

মিঃ ইউ নিটন হলেন ইকাফের কার্য্যকরী সম্পাদক। তিনি বলেছেন, এ যাবৎ আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রের ভিতর সীমাবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু এখন যা'তে জাতীয় অর্থনৈতিক নীতিগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যেতে পারে সেজন্য আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার প্রশ্নটি উচ্চ পর্য্যায়ে বিবেচনা করা দরকার। তিনি এই মর্ম্মে আশা প্রকাশ করেছেন যে, এশিয়া এবং দূরপ্রাচ্যের দেশগুলোর অর্থনৈতিক

পরিকল্পনাকারীদের মধ্যে উচ্চতম পর্য্যায়ে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হবে। সিংহলী প্রতিনিধি শ্রীপি শ্রীবর্ধন বলেছেন, নয়াদিল্লীর সম্মেলনে যে সব রাষ্ট্র যোগদান করেছেন সমস্যার গুরুত্বের দিক থেকে তাঁদের মধ্যে তারতম্য থাকা অসম্ভব নয়। তবে মূলতঃ সমস্যা এক। সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু পরিকল্পনার মানবিক দিকের উপর যে গুরুত্ব আরোপ করেছেন শ্রীপি শ্রীবর্ধন সে গুরুত্বকে ঠিক বলেই মনে করেন। সিংহলী প্রতিনিধি আরো বলেছেন—বাৎসরিক ভিত্তির বদলে দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে উন্নত দেশগুলো যদি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন তাহলে ভাল হয়। এর কারণ আর কিছুই নয়। যদি দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে সাহায্য দেওয়া না হয় তাহলে উন্নয়নমূলক ব্যাপক পরিকল্পনা-গুলো কার্য্যে পরিণত করতে বেশ কয়েক বৎসর লেগে যাবে। বর্তমানে নৈতিক এবং ব্যবসায়িক এই দুটো দিক থেকে অগ্রসর দেশগুলো অনুন্নত দেশগুলোকে সাহায্য দেওয়া বাঞ্ছনীয় বলে মনে করে থাকেন। আশা করা যাচ্ছে, এই প্রকার সাহায্যের ফলে একদিকে যেরকম আন্তর্জ্জাতিক উত্তেজনা কমে যাবে সেরকম অন্যদিকে পণ্যের বাজার সম্প্রসারিত হবে।

মিঃ থাট তুন হলেন বর্মী প্রতিনিধিদলের নেতা। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের প্রস্তাব উত্থাপন করে তিনি বলেছেন, ইকাফ এলাকায় অবস্থিত দেশগুলোর মধ্যে যাতে অর্থনৈতিক সহযোগিতা সম্ভবপর হয় সেজন্য শ্রীনেহরু যে আবেদন জানিয়েছেন সে আবেদন সমর্থনযোগ্য। ফিলিপাইনের প্রতিনিধির নাম হল মিঃ ইসিড্রো ম্যাকাসপ্যাক, বর্মী এবং সিংহলী প্রতিনিধি যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তিনি সে অভিমত মোটামুটিভাবে সমর্থন করেছেন। মার্কিণ প্রতিনিধি বিভিন্ন দেশের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাগুলোকে সোজাসুজি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, বৃটিশ প্রতিনিধি মিঃ ম্যাকে তাঁর দেশের পক্ষ থেকে এই প্রকার সোজাসুজি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেননি—কিম্বা এমন কিছু বলেননি যা থেকে অনুমান করা যেতে পারে, সোজাসুজি সাহায্য পাওয়া যাবে। তিনি কেবলমাত্র পারস্পরিক বুঝাপড়া এবং বিশ্বাসের উপর জোর দিয়েছেন। ইউনেস্কো প্রতিনিধি ডাঃ এ, এফ, এম, কে রহমান এই মর্ম্মে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, প্রধানতঃ শিক্ষার উপরই রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভর করে। তবে যে সব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন তাঁরা এর প্রতিবাদ করেছেন। তাদের বক্তব্য হল, শ্রমিককে যদি তাঁর প্রাপ্য না দেওয়া হয় তাহলে অর্থনৈতিক উন্নতির কোন সম্ভাবনা নেই। পরিকল্পনা রচয়িতাদের মনে রাখা দরকার, উৎপাদনের সাথে কাজের পরিবেশ এবং শ্রমিকের কর্ম্মোৎসাহের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। মিঃ জোসেফ খুচমান হলেন চেকোস্লোভাকিয়ার প্রতিনিধি। উন্নয়ন-শীল রাষ্ট্রগুলোতে বৈষয়িক উন্নয়নের যে সব প্রচেষ্টা চলেছে তিনি তাঁর দেশের পক্ষ থেকে সে সব প্রচেষ্টায় গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তিনি পরস্পরের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ভারতীয় পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য শ্রী পি সি মহলানবীশ এশীয় পরিকল্পনা রচয়িতাদের সম্মেলনে বলেছেন, পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর কাছ থেকে যে সাহায্য পাওয়া যাবে সেটা বৈষয়িক উন্নয়নের জন্য খরচ করাই বাঞ্ছনীয়। তাঁর মতানুসারে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল লক্ষ্য হল দুটো। প্রথম লক্ষ্য হচ্ছে আধুনিককরণ। দ্বিতীয় লক্ষ্য হল শিল্পায়ন। তিনি আরো বলেছেন, শেষোক্ত লক্ষ্যকে অনুন্নত দেশগুলোর দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় প্রাধান্য দেওয়া দরকার। তাছাড়া ঐ সব দেশে যখন কোন স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা রচিত হবে, তখন যাতে কৃষি এবং শিল্পের মধ্যে সর্ব্বদা ভারসাম্য বজায় থাকে সেদিকে নজর দিতে হবে। শ্রীমহলানবীশ জোর দিয়ে বলেছেন, মাথাপিছু উৎপাদন না বাড়লে জীবন যাত্রার মান উন্নীত হবার আশা নেই এবং পশুশক্তি ও মনুষ্য শক্তি বদলে যদি বিদ্যুৎচালিত যন্ত্র প্রবর্তিত হয় তাহলেই মাথাপিছু উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। অধ্যাপক মহলানবীশের ব্যক্তিগত ধারণা হল, যে ধরণের উন্নত অবস্থায় পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো এসে পৌঁচেছে সেটা কৃষি উৎপাদনের ভিত্তিতে কখনও সম্ভবপর হতনা।

আমরা আগেই বলেছি, মিঃ ইউ নিউন হলেন ইকাফের কার্য্যকরী সম্পাদক। বিগত ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি নয়াদিল্লীতে বলেন, সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সংখ্যাতত্ত্ববিদদের নিয়ে ইকাফ জাপানে আরেকটা সম্মেলন ডাকার প্রস্তাব করেছেন। সে সম্মেলনের উদ্দেশ্য হবে বিভিন্ন দেশের কর্ম্মধারা আলোচনা করা। নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত এশীয় সম্মেলনে যে সব প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে সে সব প্রস্তাব কার্য্যকরী করার জন্য একটা টেকনিকাল কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির মোট-সদস্যসংখ্যা হল নয় জন। অর্থাৎ ব্রহ্মদেশ, মালয়, ভারত, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, পাকিস্তান, থাইল্যাণ্ড এবং ইরাণ থেকে প্রতিনিধি নিয়ে ঐ টেকনিকাল কমিটি গঠন করা হয়েছে। এশীয় পরিকল্পনা-রচয়িতাদের সম্মেলন সম্পর্কে দি ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা সম্পাদকীয় প্রবন্ধে যে মন্তব্য করেছেন সেটা এখানে উল্লেখ করার মত। পত্রিকাটি বলেছেন—"Quite appropriately the conference has devoted much attention to the problems of closer Asean economic co-operation: friends in Western Europe and Latin America have set the experts thinking on similar lines in this region. Behind this is a feeling that insufficient attention has been paid to the scope for mutual assistance among Asian countries, the ECAFE paper on the subject has hopefully focussed attention on the possibilities of discovering a regional besis for import substitution. distribution of industries in the region to achieve economics of large-scale production and establishment of an Asian development bank."

'আনন্দমঠের' তুলনায় 'প্রজাপতির নির্বন্ধ'

শ্রীমতী লীলা বিদ্যান্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

কবি দেখিয়াছেন—শ্রীশ এবং বিপিন এক পলকের চকিত দেখায় নৃপ এবং নারকে ভালোবেসেছে। তাদের চকিত চাহনি যেন মনের মধ্যে নিকষ সোনার রেখার মত আঁকা হয়ে গেল। এমন হবেই তো। এই যে যৌবনের ধর্ম। শ্রীশ এবং বিপিন সভার জন্যে যে প্রবন্ধ লিখবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, এর পরে সে কাজে তারা আর হাত দিতে পারছে না। যৌবনের অতৃপ্ত আকাংখা তাদের চিত্ত-বিক্ষেপ ঘটাচ্ছে। অতৃপ্ত আকাংখা নিয়ে মানুষ কোন কাজ করতে পারে না। মানুষ তখনই কাজে মন দিতে পারে, যখন তার নিজের জীবন চরিতার্থ হয়েছে। অতৃপ্ত ব্যর্থ জীবন নিয়ে মানুষ কোন কাজের যোগ্য হতেই পারে না—কবি এটাই দেখাতে চেয়েছেন।

তারপরে কবি দেখিয়েছেন যে মানুষের এই স্বভাব তার কর্ম-পথের বিঘ্ন নয়। নারী-পুরুষের কর্মের পথে বাধা নয়। সে তাকে বীর্যের পথে আনন্দের প্রেরণা যোগায়। নারী-পুরুষকে দেয় আনন্দ। কবির মতে যাতে মানুষের আনন্দ, তাতেই তার কর্মের প্রেরণা। এই কথাই তো বলেছেন উপনিষদ, যিনি পরম পুরুষ, যিনি এই সৃষ্টি-বিধাতা, তিনি আনন্দের প্রেরণাতেই এই বিশ্ব-সৃষ্টি করেছেন। আনন্দের প্রেরণাতেই তো সমস্ত প্রাণ বেঁচে আছে। "কো প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশঃ আনন্দ ন স্যাৎ"। রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন 'যদি পৃথিবী থেকে গান কবিতা সব লোপ পেয়ে যায়, তবে বোঝা যাবে কেজো লোকেরা তাদের কাজের প্রেরণা পায় কোথা থেকে।' কবি লিখেছেন পুরুষকে বীর্যের সম্মান দেবার জন্যেই তো দেব-রাজ মহেন্দ্র নারীকে সংসারে পাঠিয়েছেন—

"নারী সে যে মহেন্দ্রের দান—
এসেছে জগৎ তলে পুরুষেরে দানিতে সম্মান।"

স্বদেশের সেবায় নারীরও উপযোগিতা আছে। নারীর সাহচর্য, নারীর প্রেরণা না হ'লে একা পুরুষ স্বদেশের মংগল করতে পারে না।

কবি এ কথা বলেছেন যে মানুষের সংগ ছাড়া, শুধু সংকল্প নিয়ে কাজের উৎসাহ বজায় রাখতে পারে না। বিশেষ করে নারীর সংগ পুরুষের জীবনে একান্ত প্রয়োজন। নির্মলার সংগে বিয়ের প্রস্তাব ক'রে পূর্ণ লিখেছে—"সভা হইতে যখন গৃহে ফিরিয়া কাজে হাত দিতে যাই তখন সহসা নিজেকে একক মনে হয়। উৎসাহ যেন আশ্রয়হীন লতার মত ভূলুন্ঠিত হইয়া পড়িতে চাহে।" পূর্ণ লিখেছে—"অনেক চিন্তা করিয়া স্থির বুঝিয়াছি যে কৌমার্য ব্রত সাধারণ লোকের জন্য নহে। তাহাতে বল দান করে না, বল হরণ করে। স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরের দক্ষিণ হস্ত, তাহারা মিলিত থাকিলে তবেই সংসারের সকল কাজের উপযোগী হইতে পারে।" নিঃসংগ পুরুষ কাজের উৎসাহ কাজের শক্তি পায় না। নারীর সংগ পেলেই পুরুষ বেশি করে কাজের যোগ্য হ'তে পারে, সাধারণ মানুষের বেলায় এ কথাই সত্য।

কবির এই কথাটা বল্‌বার জন্যেই চিরকুমার সভার সভাপতির ভাগ্নি নির্মলা দাবী জানাল যে সেও চিরকুমার সভার সভ্য হবে। সে তার মামাকে বল্‌ল—"আমি দেশের কাজে তোমাকে সাহায্য কর্‌ব।" সে বল্‌ল—"তোমার ভাগ্নে না হ'য়ে তোমার ভাগ্নি হ'য়ে জন্মেছি ব'লেই কি তোমার কাজে যোগ দিতে পার্‌ব না? তবে এতদিন আমাকে শিক্ষা দিলে কেন, নিজের হাতে আমার সমস্ত মন-প্রাণ জাগিয়ে দিয়ে শেষ কালে কাজের পথ রোধ ক'রে দাও কী ব'লে?" কবি বল্‌তে চান—শিক্ষিতা নারী শুধুই গৃহকর্ম নিয়ে দিন কাটাতে পারে না—তাতে তার মনের ক্ষুধা তার কর্মের আবেগ পরিতৃপ্ত হয় না। এ ছাড়া পুরুষেরও সে কর্মের উৎসাহ বাড়িয়ে তোলে। নির্মলার এই প্রস্তাবের পরক্ষণেই পূর্ণ এল চন্দ্রবাবুর বাসায়।

নির্মলার প্রস্তাবের সম্পূর্ণ অর্থ না বুঝেই পূর্ণ বল্‌ল—"একথা শুন্‌লে আমাদের উৎসাহ বেড়ে ওঠে।" চন্দ্রবাবু বল্‌লেন —"স্ত্রীলোকের সরল উৎসাহ পুরুষের উৎসাহে যেন নূতন প্রাণ সঞ্চার কর্‌তে পারে। আমি নিজেই সেটা আজ অনুভব কর্‌ছি।" পূর্ণ বল্‌লে—"আমিও সেটা বেশ অনুমান কর্‌তে পারি।" সে বল্‌ল—"পুরুষের উৎসাহকে নবজাত শিশুটির মত মানুষ ক'রে তুল্‌তে পারে কেবল স্ত্রীলোকের উৎসাহ।" নির্মলার উৎসাহ চন্দ্রবাবুকে যেন এক নূতন উদ্যম দান কর্‌ল, আর কবি যে দেখিয়েছেন যে পূর্ণের কথাগুলো শুধুই নির্মলাকে খুশী কর্‌বার জন্যে—তাও সত্যি নয়। কবি নিজের অন্তরের নিবিড় উপলব্ধির কথাই দিয়েছেন পূর্ণের মুখে। দেশ সেবায় নারীর উপযোগিতা সম্বন্ধে যে বিভিন্ন তর্ক উঠতে পারে, সে সমস্ত তর্ক ও আপত্তির কথা কবি দিয়েছেন শ্রীশের মুখে। চন্দ্রবাবু যখন সভার সভ্যদের কাছে এই প্রস্তাব উত্থাপন কর্‌লেন তখন শ্রীশ প্রবল আপত্তি ক'রে বল্‌ল—"আমাদের সভার যে সকল উদ্দেশ্য তা স্ত্রীলোকের দ্বারা সাধিত হবার নয়।" বিপিন মেয়েদের পক্ষ সমর্থন করে বল্‌ল—"আমাদের সভার উদ্দেশ্য সংকীর্ণ নয় এবং বৃহৎ উদ্দেশ্য সাধন কর্‌তে গেলে বিচিত্র শ্রেণীর বিচিত্র শক্তির লোকের বিচিত্র চেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়া চাই। স্বদেশের হিতসাধন একজন স্ত্রীলোক যে রকম পার্‌বেন, তুমি সে রকম পার্‌বে না এবং তুমি যে রকম পার্‌বে, একজন স্ত্রীলোক সে রকম পারবেন না।" এর উত্তরে শ্রীশ বল্‌ল—"স্ত্রীলোকেরা যে কাজ কর্‌তে পারেন তার জন্যে তাঁরা স্বতন্ত্র সভা করুন, আমরা তার সভ্য হবার প্রার্থী হব না, আর আমাদের সভাও আমাদেরই থাক্। মাথাটা চিন্তা করে মরুক, উদরটা পরিপাক কর্‌তে থাক, পাকযন্ত্রটা মাথার মধ্যে এবং মস্তিষ্কটি পেটের মধ্যে প্রবেশ চেষ্টা না কর্‌লেই ব্যস্।" কিন্তু কবি মনে করেন যে এ মতও ঠিক নয়। স্ত্রী ও পুরুষের সভা বা কাযের ক্ষেত্র এক সংগে হবে, তা আলাদা হবে না—এ কথা বল্‌তে গিয়ে তিনি বিপিনের মুখে এর উত্তর দিয়েছেন, "কিন্তু তাই ব'লে মাথাটা ছিন্ন ক'রে এক জায়গায় আর পাকযন্ত্রটি আর এক জায়গায় রাখলেও কাজের সুবিধা হয় না।" স্ত্রী ও পুরুষ যে জীবনে নিতান্তই পরস্পরের কাছাকাছি, তারা যে একই সজীব দেহের দুটি অংশ বিশেষ। তাদের আলাদা করতে গেলে যে জীবনের সজীবতাই চলে যাবে। নির্জীব মনপ্রাণ নিয়ে স্ত্রী বা পুরুষ কেউই কোন কাজ কর্‌তে পার্‌বে না। স্ত্রী-পুরুষের মিলনে, তাদের পরস্পরের সান্নিধ্যে যে আনন্দ জেগে ওঠে—সেই তো জোগায় কর্মের প্রেরণা। কর্মের ক্ষেত্রে স্ত্রী ও পুরুষকে আলাদা করবার প্রস্তাব ঠিক যেন সজীব দেহের অংগপ্রত্যংগকে টুকরো করে আলাদা করা। কিন্তু শ্রীশ এ যুক্তি মান্‌তে চায় না। সে বলে— "সৈন্যদের মত একতালে আমাদের চল্‌তে হবে। স্বাভাবিক দুর্বলতা বা অনভ্যাসবশতঃ যাদের পিছিয়ে পড়বার সম্ভাবনা, তাদের দলে নিলে আমাদের সব কিছুই ব্যর্থ হবে।"

কিন্তু এই ধরণের আপত্তিই একমাত্র আপত্তি নয়, আর একদল লোকের আপত্তি অন্য ধরণের। তাদের ধারণা যে এসব কাজে নেমে এলে মেয়েদের মাধুর্য্য নষ্ট হয়ে যায়। তাই আমরা দেখি পূর্ণ বল্‌ছে—"আমাদের এই সমস্ত কাজে অগ্রসর হ'য়ে এলে তাতে তাঁদের মাধুর্য্য নষ্ট হয়" এর পরেই সেই সভার মধ্যে হ'ল নির্মলার আরক্তিম আবির্ভাব। পূর্ণ তাঁকে বল্‌ল—"দেবী, এই পংকিল পৃথিবীর কাজে কেন আপনার পবিত্র দু'খানি হস্ত প্রয়োগ কর্‌তে চাচ্ছেন।" এর জবাবে বিপিন বল্‌ল—"পৃথিবী যত বেশী পংকিল—তার সংশোধন কার্য্য তত বেশী পবিত্র।" চন্দ্রবাবু বল্‌লেন, "মহৎ কার্য্যে যে মাধুর্য্য নষ্ট হয় সে মাধুর্য্য সযত্নে রক্ষা কর্‌বার যোগ্য নয়।" এমনি ক'রেই কবি এই আপত্তির খণ্ডন করেছেন। মহৎ কাজে যে সৌন্দর্য্য বা মাধুর্য্য নষ্ট হয়, কবি সেই মাধুর্য্যের অর্থ বোঝেন না। মহৎ কাজের মধ্যেই নারীর মাধুর্য্য সার্থক, কবির এই মত। মহৎ কাজে সংগ এবং প্রেরণা দেবে ব'লেই তো দেবরাজ নারীকে এমন সুন্দর ক'রে সংসারে পাঠিয়েছেন। এর পরে এই প্রসঙ্গে আরও আলোচনা আমরা শুন্‌তে পাই সভার পরবর্তী অধিবেশনে। সেখানে আমরা দেখি, নির্মলাকে দেখবার পর শ্রীশের আপত্তির প্রবলতা চলে গেছে। বরং শ্রীশ বল্‌ল—"আমার তো বোধ হয় আমাদের দেশে যে এত সভাসমিতি, আয়োজন অনুষ্ঠান, অকালে ব্যর্থ হয়, তার প্রধান কারণ সে সকল কাজে স্ত্রীলোকদের যোগ নেই।" এও কবির নিজের মনের কথা। মেয়েরা বাইরের সামাজিক কাজে

যোগ দেবে এতে সমাজ আপত্তি করবে,এও একটা আশংকা আছে। কিন্তু সমাজের আপত্তি মেনে চললে তো সমাজের উন্নতি হয় না। তাই শ্রীশ যখন বলল—"আমি শুধু সমাজের আপত্তির কথাটা ভাবি।" তার উত্তরে বিপিন বলছে—"সমাজকে অনেক সময় শিশুর মত গণ্য করা উচিত। শিশুর সমস্ত আপত্তি মেনে চললে শিশুর উন্নতি হয় না। সমাজ সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা খাটে।"

রবীন্দ্রনাথের একটা মত এই যে,একদল মানুষ যদি অন্য কোন একদল মানুষকে অপমান করে, তাকে অজ্ঞান ও অশিক্ষার মধ্যে রেখে তাকে পিছনে ফেলে রাখতে চায়, তাতে যে শুধু সেই লোকেদের ক্ষতি হয় তা নয়। এতে তাদের নিজেদেরও ক্ষতি হয়। যাকে পিছনে রাখা হয়, আগের মানুষকে সে পিছনে টেনে রাখে, তাকে এগোতে দেয় না, এই কথা কবি লিখেছেন 'অপমান' কবিতায়—

"যারে তুমি নীচে রাখ—
সে তোমারে টানিছে যে নীচে,
পশ্চাতে রেখেছ যারে
সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।
অজ্ঞানের অন্ধকারে
আড়ালে রাখিছ যারে,
তোমার মংগল ঘেরি
গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।"

এই কথা যেমন উচু জাত নীচু জাতের বেলায় খাটে ঠিক তেমনি এই কথাটাই মেয়ে ও পুরুষের বেলাতে খাটে। পুরুষ মানুষরা যদি মেয়েদের ঘরে বন্ধ ক'রে রাখে তা'হলে তাদের জীবনও ঘরে বাইরে খণ্ডিত হ'য়ে থাকবে, তাদের ঘরের জীবনও বাইরের জীবন একই উচু সুরে বাঁধা হ'তে পারবে না। তারা বাইরে গিয়ে বড় বড় কথা বলবে কিন্তু ঘরে এসে ভুলে যাবে। চন্দ্রবাবু বলছেন—"কেবল পুরুষ নিয়ে যারা সমাজের ভাল করতে চায়, তারা এক পায়ে চলতে চায়! এই জন্যেই খানিক দূর গিয়েই তাদের ব'সে পড়তে হয়। সমস্ত মহৎ চেষ্টা থেকে মেয়েদের দূরে রেখেছি ব'লেই আমাদের দেশের কাজে প্রাণ সঞ্চার হচ্ছে না। আমাদের হৃদয়, আমাদের কাজ, আমাদের আশা বাইরে ও অন্তঃপুরে খণ্ডিত। সেই জন্যে আমরা বাইরে গিয়ে বক্তৃতা দিই, ঘরে এসে ভুলি।...স্ত্রী জাতিকে অবহেলা ক'রনা। স্ত্রী-জাতিকে যদি আমরা নীচু ক'রে রাখি তাহ'লে তারাও আমাদের নীচের দিকেই আকর্ষণ করেন। তাহ'লে তাদের ভারে আমাদের উন্নতির পথে চলা অসাধ্য হয়। দু-পা চ'লেই আবার ঘরের কোণে এসে আবদ্ধ হ'য়ে পড়ি। তাদের যদি আমরা উচ্চে রাখি, তা হ'লে ঘরের মধ্যে এসে নিজের আদর্শকে খর্ব করতে লজ্জা বোধ হয়। আমাদের দেশে বাইরে লজ্জা আছে, কিন্তু ঘরের মধ্যে সেই লজ্জাটি নেই। সেই জন্যেই আমাদের সমস্ত উন্নতি কেবল বাহ্যাড়ম্বরে পরিণত হয়।"

মেয়েদের সামাজিক কাজে যোগ দেবার পক্ষে আর একটা বাধা হ'ল পুরুষের স্বার্থপরতা। পাছে তাদের সুখ-সুবিধার ত্রুটি ঘটে—এই জন্যে তারা মেয়েদের ঘরে বন্ধ ক'রে রাখতে চায়। এই প্রসংগে শৈল বলছে নির্মলাকে—"দেখুন পুরুষেরা স্বার্থপর, তারা নিজেদের সুখের জন্যে মেয়েদের ঘরে বন্ধ করে রাখে, চন্দ্রবাবু যে আপনাকে আমাদের সভার কাজে দান করেছেন এতে তাঁর মহত্ব প্রকাশ পায়।"

এমনি করে কবি নানা দিক থেকে এই প্রশ্নটিকে পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন যে মেয়েদের সামাজিক কাজ করবার অধিকার থাকা উচিত, তা না হ'লে পুরুষের একার কাজে সমাজের উন্নতি হবে না।

দেশের কাজে মেয়েদের যোগ দেওয়া উচিত—এ কথা সবচেয়ে বংকিমচন্দ্রই বলেছেন। কিন্তু বংকিমচন্দ্র শান্তি ও কল্যাণী এই দুই বিপরীত চরিত্রের মধ্য দিয়ে এই কথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে দেশের কাজে সেই মেয়েই যোগ দিতে পারে—যে মেয়ে পুরুষের সংগে থেকে পুরুষোচিত বিদ্যায় শিক্ষিত হ'য়ে উঠেছে। যে মেয়ের সে শিক্ষা নেই, সে আত্মত্যাগ ক'রে নিজের স্বামীকে দেশের কাজে দান ক'রেই দেশের সেবা করতে পারে। এই জন্যেই বংকিম-চন্দ্র শান্তির নাম দিয়েছেন প্রতিষ্ঠা, আর কল্যাণীর নাম দিয়েছেন বিসর্জন। শান্তিকে সন্তানদের দলে নেবার আগে বংকিমচন্দ্র তার জন্যে পুরো এক পরিচ্ছেদ লিখে-ছেন। সেখানে বংকিমচন্দ্র শান্তির বিশেষ শিক্ষার বর্ণনা করেছেন। শান্তি পুরুষবেশে সন্ন্যাসীদের দলে থেকে পুরুষের মত গাছে চড়া, তীর-ধনু ছোঁড়া শিখেছে। সন্তানদের দলে থেকে শান্তি যে কাজ করছে তার বর্ণনায় আমরা পাই—শান্তি যুদ্ধক্ষেত্রে সন্তানদের শত্রু সৈন্যের

অবস্থান জানিয়ে দিচ্ছে। সে বৈষ্ণবী সেজে শত্রু শিবিরে গিয়ে তাদের খবর জেনে সন্তান বাহিনীকে গিয়ে সতর্ক ক'রে দিল। এ কাজের জন্যে কাজে লেগেছে তার অশ্বারোহণ বিদ্যা। সে লিণ্ডাল সাহেবকে ঘোড়া থেকে ফেলে দিয়ে তার ঘোড়া ছুটিয়ে এসে মহেন্দ্রকে খবর দিল। অবশ্য শান্তি অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করছে বা প্রাণ-হত্যা করছে এমন কথা বংকিমচন্দ্র কোথাও বলেন নি। বরং শান্তি যুদ্ধবিদ্যা জেনেও কখন প্রাণ-হত্যা করে নি—এ কথাই বংকিমচন্দ্র বলেছেন। নির্জন বনের মধ্যে ইংরাজ সেনাধ্যক্ষের হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নিয়ে শান্তি তাকে বল্ল—"আমি স্ত্রীলোক, কাহাকেও আঘাত করি না।" সন্তান সম্প্রদায়ই হ'ক্ বা ডাকাত দলই হ'ক্, তাদের সংগে মেয়েরা যোগ দিয়েছে এ কথা বংকিমচন্দ্র লিখেছেন এবং এ জন্যে তারা পুরুষোচিত যুদ্ধবিদ্যা, মল্লযুদ্ধ, যুজুৎসু ইত্যাদি শিক্ষা করেছে—এও বংকিমচন্দ্র দেখিয়েছেন। কিন্তু মেয়েরা যুদ্ধ ক'রে প্রাণহত্যা করছে এ কথা বংকিমচন্দ্রের ভালো লাগেনি। এই জন্যেই বংকিমচন্দ্র দেবী চৌধুরাণীর বর্ণনায়ও দেখিয়েছেন যে সে ডাকাত দলে যোগ দিয়ে কখনো ডাকাত বা প্রাণহত্যা করেনি। সে শুধু গরীব-দুঃখীদের দান করেছে। কিন্তু তবু বংকিমচন্দ্র মেয়েদের জন্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়া অন্য কোনো সামাজিক কর্মক্ষেত্রের উল্লেখ করেন নি। মেয়েদের বিশেষ শিক্ষা বল্‌তে তিনি যুদ্ধবিদ্যা আর মল্লযুদ্ধই বুঝেছেন। বংকিমচন্দ্র মেয়েদের কর্মক্ষেত্র বল্‌তে দুই প্রান্তসীমা বা দুই একস্ট্রিম বুঝেছেন। হয় মল্লযুদ্ধ শিখে ডাকাত দলে যোগ দেওয়া; নয় খিড়কি পুকুরে গিয়ে বাসন-মাজা। হয় শান্তির মত ঘোড়ায় আর গাছে চড়া, নয় কল্যাণীর মত ঘরে বসে পুঁথি পাঠ করা। হয় আত্মপ্রতিষ্ঠা নয় আত্ম-বিসর্জন। প্রতিষ্ঠা ও বিসর্জনের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন ক'রে মেয়েদের জীবনে সেই আদর্শ বংকিমচন্দ্র দেখান নি। 'প্রজাপতির নির্বন্ধে' স্ত্রী-সভ্য নির্মলার কর্ম এবং কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে নির্মলা ডাক্তারের কাছে নিয়মিত শিক্ষা লাভ করছে সে প্রাথমিক চিকিৎসা এবং রোগচর্য্যা সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করে ভদ্রলোকের মধ্যে সেই শিক্ষা প্রচারের জন্যে কয়েকটি অন্তঃপুরে গিয়ে শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হয়েছে। শৈল যদিও পুরুষ বেশে সভার সভ্য হয়েছে, তবু আসলে সেও তো মেয়েই। তাই তার কাজের বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—সে—সরকার থেকে ভারতীয় কৃষি সম্বন্ধে যত রিপোর্ট বেরিয়েছে তার থেকে জমিতে সার দেওয়া সম্বন্ধীয় অংশটুকু সংকলন ক'রে সহজবোধ্য বাংলায় একটি পুস্তিকা প্রণয়ন ক'র্ছে। সে বই থেকে চন্দ্রবাবুর ব্যবহারের জন্যে নোট তৈরী করে রাখছে। এমনি ক'রে সে ঘরে বসেবসেই সভার কাজ অনেক দূর অগ্রসর ক'রে রাখছে। পুরুষের চেয়েও মেয়েদের কর্মের নিষ্ঠা বেশী—রবীন্দ্রনাথ এ কথা বলেছেন। শ্রীশ, বিপিন এবং পূর্ণ যখন চিত্তবিক্ষোভ-বশতঃ নিজেদের প্রতিশ্রুত প্রবন্ধ লেখায় হাত দিতে পারে নি, শৈল তখন নীরবে কাজ করে যাচ্ছে। শ্রীশ বল্‌ছে শৈলকে—"সভার পুরাণো সভ্যদের আপনি লজ্জা দিয়েছেন।"

এমনি ক'রে আমরা দেখি যে রবীন্দ্রনাথের মতে মেয়েদের কর্মক্ষেত্র পুরুষের সংগে সংযুক্ত হ'লেও তার কর্মের ধরণ হবে আলাদা। সে কাজ হবে মেয়েদের স্বভাবের সংগে সংগত। স্বভাবের সংগে অসংগত কোন কাজ মেয়েরা করবে—এটা রবীন্দ্রনাথ কল্পনাও করতে চান নি। তাই মেয়েদের শিক্ষাও হবে পুরুষের থেকে আলাদা, কবি এই বলেছেন। মেয়েদের কাজ সেবা-শুশ্রূষা, মেয়েদের কাজ পুস্তিকা-প্রণয়ন-জাতীয়ও হ'তে পারে। এই জন্যেই আমরা দেখি যে আনন্দমঠের শান্তি রবীন্দ্রনাথের চোখে মেয়েদের আদর্শ নয়। পুরুষের কর্ম-সংগিনী হওয়া মানে এ নয়, যে মেয়ে-পুরুষের কর্মের কোন পার্থক্য থাকবে না। তাদের কর্ম তাদের স্বভাব অনুযায়ী আলাদা আলাদা হবে, কিন্তু সভা তাদের একত্রই থাকবে। যে কোন বৃহৎ উদ্দেশ্যের মধ্যে কর্মের বিচিত্র বিভাগ থাকে। পুরুষ ও নারীর মিলনে বৃহৎ উদ্দেশ্য সব দিক দিয়ে সার্থক হয়ে উঠবে, কবির এই মত। খিড়কী পুকুরে একগলা ঘোমটা দিয়ে বাসন মাজাতে নারী-জীবনের কোন সার্থকতার কথা রবীন্দ্রনাথ বলেন নি। আবার ঘোড়ায় চড়ে শত্রুকে ঘোড়া থেকে ফেলে দিয়ে, শত্রু-শিবিরের গোপন খবর সরবরাহের কাজেও তিনি মেয়েদের নিয়োগ করতে চাননি। মেয়েরা আপন সংসারে যে সমস্ত কাজ করে—সেই কাজই তারা বৃহত্তর সমাজের ক্ষেত্রে করবে—কবির এই মত। তারা সংসারের কাজ ক'রে অবসর সময়ে সমাজের কাজ করবে।

তাদের কর্মের ক্ষেত্র শুধু ছোট সংসারের সীমার মধ্যে বদ্ধ না থেকে দেশের বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসারিত হ'ক, তবেই তো দেশের উন্নতি হ'তে পারবে। কিন্তু কোন কারণেই মেয়েদের মেয়ে-সুলভ প্রকৃতি ঘুচিয়ে ফেল্‌তে হবে—এতে কবির মত ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ স্বদেশের সেবা বল্‌তে বুঝেছেন গঠনমূলক কাজ। তিনি বিপ্লব বোঝেন নি। এটা রবীন্দ্রনাথের দৃঢ় অভিমত ছিল যে আমাদের স্বাধীনতার অপলাপ ঘটেছে আমাদেরই সমাজের অন্তর্নিহিত ত্রুটির জন্যে। তাই আমরা যদি নিজেদের সমাজকে উন্নত আদর্শে গড়ে তুল্‌তে না পারি, তা হ'লে বিদেশী বিজেতাকে দোষ দেওয়া বৃথা। প্রজাপতির নির্বন্ধের চন্দ্রবাবু যেন কবির নিজেরই প্রতিরূপ। কবি স্বদেশের গঠনমূলক কাজের যে পদ্ধতি চিন্তা করেছেন, চন্দ্রবাবুর মুখে আমরা তার কথাই শুনি। চন্দ্রবাবু ক্ষীণদৃষ্টি। সাম্‌নের জিনিষ তার চোখে পড়ে না। কিন্তু তার দৃষ্টি ভাবী কালের দিকে প্রসারিত। চন্দ্রবাবু সর্বদাই অন্যমনস্ক। তার আশে-পাশের মানুষদের আকার-ইংগিত, তাদের গোপন মনোভাব—কোন কিছুই তার চোখে পড়ে না। তিনি আপনার ভাবে আপনি বিভোর। তার সমস্ত মন স্বদেশের মংগলের প্রতি অভিনিবিষ্ট। এই জন্যে লোকে তাকে বাইরে থেকে পাগল ব'লেই মনে করে। এই রকম তন্ময়চিত্ত সাধকের কথাই, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন তার গানে—

> "কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ
> জ্বালিয়ে তুমি ধরায় এস—
> সাধক ওগো পাগল ওগো—
> প্রেমিক ওগো—"

চিরকুমারসভার কার্য্য পদ্ধতি সম্বন্ধে চন্দ্রবাবুর প্রস্তাব এই রকম—

(১) আমাদের সাধারণ জ্বর-জ্বালার কী রকম চিকিৎসা তা শিখতে হবে। ডাঃ রামরতনবাবু আমাদের প্রতিদিন এক ঘণ্টা ক'রে বক্তৃতা দেবেন।

(২) আমাদের কিছু কিছু আইন অধ্যয়নও দরকার। অবিচার অত্যাচার থেকে রক্ষা করা, কার কতদূর অধিকার এটা চাষাভুষোদের বুঝিয়ে দেওয়া আমাদের দরকার।

দেশহিতব্রতে যে চিকিৎসা-বিদ্যা, অন্ততঃ প্রাথমিক চিকিৎসা একটা আবশ্যক শিক্ষা—এ কথা আমরা আনন্দমঠেও দেখতে পাই। ভবানন্দ যখন কল্যাণীর চিকিৎসা করে তার মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার করলেন, তখন বংকিমচন্দ্র লিখেছেন—অন্যের অপরিজ্ঞাত নানা রকম প্রক্রিয়া ভবানন্দ প্রয়োগ করেছিলেন। এর থেকে আমরা বুঝি যে সন্তান দলের মধ্যেও চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা ছিল। বিপ্লবীরা অনেকেই চিকিৎসাবিদ্যা জানতেন। পরবর্তী কালে আনন্দমঠের অনুপ্রেরণায় বাংলায় যে বিপ্লব আন্দোলন জেগে উঠেছিল, তারও মধ্যে আমরা দেখেছি যে অনেক চিকিৎসক তাতে ছিলেন। বিপ্লবী দলের মধ্যে চিকিৎসার জন্যও চিকিৎসকের দরকার হয়। কারণ তাদের অনেক সময়ই আত্মগোপন ক'রে থাকৃতে হয় বলে প্রকাশ্য চিকিৎসার কোন বন্দোবস্ত হ'তে পারে না। রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য বিপ্লব নয়—সমাজ সংগঠন। সমাজ সংগঠনের জন্যে চিকিৎসাবিদ্যা নিতান্তই দরকার। দেশের মানুষকে রোগমুক্ত সুস্থ জীবন দান কর্‌তে না পার্‌লে সামাজিক উন্নতি বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা আস্‌বে কোথা থেকে ?

মানুষকে তার নিজের নিজের অধিকার বুঝিয়ে দেওয়া যে অন্যায়ের প্রতীকারের সবচেয়ে প্রথম ও প্রধান উপায় এটা রবীন্দ্রনাথের একটা বদ্ধমূল অভিমত। রবীন্দ্রনাথ "অরবিন্দের প্রতি" কবিতায় লিখেছেন—

> "এই সব মূঢ় মূক ম্লান মুখে
> দিতে হবে ভাষা—
> এই সব ভগ্ন শুষ্ক দীর্ণ বুকে
> ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা—
> ডাকিয়া বলিতে হবে
> যে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে—
> যখনি দাঁড়াবে তুমি
> তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।"

আনন্দমঠেও আমরা দেখি যে মহেন্দ্রের কথার উত্তরে অসহিষ্ণু হ'য়ে ভবানন্দ মানুষের এই অধিকারের উল্লেখ করছেন। ভবানন্দ বল্‌ছেন, "দেখ, সাপ মাটিতে বুক দিয়ে হাঁটে। তাহার অপেক্ষা নীচ জীব আমি তো আর দেখি না। সাপের ঘাড়ে পা দিলে সেও ফণা ধরিয়া ওঠে। তোমার কিছুতেই ধৈর্য্য নষ্ট হয় না ? দেখ, যত দেশ

আছে, কোন দেশের এমন দুর্দশা…সকল দেশের রাজার সংগে রক্ষণাবেক্ষণের সম্বন্ধ, আমাদের রাজা রক্ষা করে কই ?"

চন্দ্রবাবু সভার সভ্যদের যে কাজের নির্দেশ দিয়েছেন, তা এই রকম।

(১) শৈলের কাজ হ'ল জমিতে সার দেওয়া সম্বন্ধে পুস্তিকা প্রণয়ন।

(২) শ্রীশ লণ্ডন নগরীতে স্বেচ্ছাকৃত দান দ্বারা কত বিচিত্র জনহিতকর অনুষ্ঠান প্রবর্তিত হয়েছে সে সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা করবেন।

(৩) বিপিন ইয়োরোপীয় ছাত্রাগারগুলির নিয়ম ও কার্য্য প্রণালী সম্পর্কে প্রবন্ধ রচনা করবেন।

(৪) নির্মলা প্রাথমিক চিকিৎসা ও রোগীচর্য্যা শিখে সেই শিক্ষা ভদ্রলোকদের অন্তঃপুরে গিয়ে প্রচার করবেন।

(৫) আর চন্দ্রবাবু বলছেন—"সকলেই জানেন আমাদের দেশে গোরুর গাড়ী এমন ভাবে নির্মিত যে পিছনে ভার পড়লেই গাড়ী উঠে পড়ে এবং গরুর গলায় ফাঁস লেগে যায়। আবার কোন কারণে গোরু যদি পড়ে যায় তবে বোঝাই সুদ্ধ গাড়ী তার ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়ে। এরই প্রতিকার করবার জন্য আমি উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত আছি। আমরা মুখে গো-জাতি সম্বন্ধে দয়া প্রকাশ করি, অথচ প্রত্যহ সেই গরুর সহস্র অনাবশ্যক কষ্ট নিতান্ত উদাসীন-ভাবে নিরীক্ষণ করে থাকি। আমার কাছে এইরূপ মিথ্যা ও শূন্য ভাবুকতার অপেক্ষা লজ্জাকর ব্যাপার জগতে আর কিছু নেই। ··

…আমি রাত্রে গাড়োয়ান পল্লীতে গিয়ে গরুর অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। গরুর প্রতি অনর্থক অত্যাচার স্বার্থ ও ধর্ম উভয়ের বিরোধী। হিন্দু গাড়োয়ানদের মধ্যে একটা পঞ্চায়েত করবার চেষ্টায় আছি।"

কবি জানতেন দেশের মংগল শুধু যে বড় বড় আয়োজন অনুষ্ঠানের উপরেই নির্ভর করে আছে, তা নয়। দেশের সর্বাংগীণ উন্নতি করতে হ'লে দেশের কোন কিছুকেই ছোট বলে তুচ্ছ করলে চলবে না। ছোট এবং বড় প্রত্যেকটি জিনিষের প্রতিই মনোযোগ দিতে হবে।

(৬) চন্দ্রবাবু বলছেন—"আমরা যদি গ্রামের নিত্য-ব্যবহার্য্য ঢেঁকি, কুলো প্রভৃতি জিনিষগুলোকে কোন অংশে বেশী সস্তা বা মজবুত বা বেশী কাজের উপযোগী করতে পারি, তা হ'লে তাতে করে চাষাদের সমস্ত মন সজাগ হ'য়ে উঠবে। পৃথিবী যে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই, এটা তারা বুঝবে।"

চন্দ্রবাবু বলছেন—"ভেবে দেখ দেখি—এতকাল ধরে আমরা যে শিক্ষা পেয়ে এসেছি উচিত ছিল আমাদের ঢেঁকি কুলো থেকে তার আরম্ভ হওয়া! আমাদের ঘরের মধ্যে আমাদের সজাগ দৃষ্টি পড়ল না, যা যেমন ছিল, তা তেমনিই রয়ে গেল। আমাদের হাতের কাছে যা আছে আমরা না তার দিকে ভালো ক'রে চেয়ে দেখলাম—না তার সম্বন্ধে কিছুমাত্র চিন্তা করলাম। মানুষ অগ্রসর হচ্ছে অথচ তার জিনিষ-পত্র পিছিয়ে আছে এ কখনো হ'তেই পারে না। আমরা পড়েই আছি। ইংরাজ আমাদের কাঁধে ক'রে বহন করছে। তাকে এগোনো বলে না। আমাদের ছোট-ছোট গ্রাম্য জীবনযাত্রা পল্লীগ্রামের পংকিল পথের মধ্যে বদ্ধ হ'য়ে অচল হ'য়ে আছে। আমাদের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে সেই গরুর গাড়ীর চাকা ঠেলতে হবে।"

এখানে কবি যা বলেছেন তাই নিয়েই তিনি রচনা করেছেন তার শ্রীনিকেতনের পল্লীমংগল কেন্দ্র। মানুষ যে সমাজে বাস করে, মানুষ যা নিয়ে কাজকর্ম করে, জীবিকা উপার্জন করে, তার থেকে মানুষের শিক্ষা স্বতন্ত্র হ'য়ে থাকা উচিত নয়। এই হল গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষার গোড়ার কথা। এই শিক্ষাপদ্ধতি সবচেয়ে প্রথম প্রবর্তিত করেন রবীন্দ্রনাথ।

মানুষের সভ্যতা—মানুষের সমাজের বিকাশ যে তার কর্মযন্ত্রের বিকাশের উপরে নির্ভরশীল, রবীন্দ্রনাথ এখানে তাই বলেছেন। চন্দ্রবাবু ঢেঁকিকুলোর উল্লেখ ক'রে বলছেন—"এই সমস্ত ছোট ছোট সংস্কার কার্য্যে চাষাদের মনে যে রকম আন্দোলন হবে, বড় বড় সংস্কার কার্য্যেও তা হবে না।" কর্মযন্ত্রের ক্রমবিকাশ, কর্মযন্ত্রের পরিবর্তনই মানুষকে পরিবর্তনশীল সভ্যতার প্রতি সচেতন ক'রে তোলে।

(৭) চন্দ্রবাবুর বিচিত্র পরিকল্পনার মধ্যে আমরা সমবায় সমিতি স্থাপনের উল্লেখও পাই। চন্দ্রবাবু বলছেন "সন্ন্যাসীরা একটাকা করে সেয়ার নিয়ে একটা ব্যাঙ্ক খুলে বড়ো বড়ো পল্লীতে নূতন নিয়মে এক একটা দোকান বসিয়ে আসবে—ভারতবর্ষের চারিদিকে বাণিজ্যের জাল বিস্তার ক'রে দেবে।"

(৮) দেশী বাণিজ্য যে দেশের দারিদ্র্য ঘোচানর সর্বপ্রধান উপায় একথা বলেছেন চন্দ্রবাবু। তিনি স্বদেশী দেয়াশলাই প্রস্তুতের কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব ক'রেছেন। এই ব্যবসায়ে কত টাকা বিদেশে যায় তার বিস্তৃত বিবরণ তিনি সভ্যদের সাম্‌নে প্রস্তুত করছেন।

(৯) চন্দ্রবাবু বল্‌ছেন—আমাদের মধ্যে একদল এক জায়গায় স্থায়ী হ'য়ে ব'সে কাজ কর্‌বে, আর একদল পর্য্যটক সম্প্রদায় ভুক্ত হবে। যারা পর্য্যটক হবে তারা যে দেশে যাবে, সেখানকার সমস্ত তথ্য তন্ন তন্ন ক'রে অনুসন্ধান কর্‌বে। তাদের ভূতত্ত্ব, প্রাণীবিজ্ঞান, জরীপ, ম্যাপ প্রস্তুত, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, প্রাচীন লিপির উদ্ধার, পুরানো পুঁথিসংগ্রহ ইত্যাদি করতে হবে। চন্দ্রবাবু বল্‌ছেন—"তা হ'লেই ভারতবর্ষীয়দের দ্বারা ভারতবর্ষের যথার্থ বিবরণ লিপিবদ্ধ হবার ভিত্তি স্থাপিত হবে, হণ্টার সাহেবের উপর নির্ভর করে কাল কাটাতে হবে না।"

আমরা দেখি রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসে চন্দ্রবাবুর মুখে যে সমস্ত পরিকল্পনার কথা দিয়েছেন তিনি নিজে সেই সমস্ত পরিকল্পনায় হাত দিয়েছিলেন। বংকিমচন্দ্র ও আনন্দমঠে লোকশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ দেশের সাধারণ মানুষকে নানা দরকারী বিষয়ে শিক্ষিত ক'রে তোলার উদ্দেশ্যে শান্তি-নিকেতন থেকে লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা প্রণয়ন ও প্রচারের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই গ্রন্থমালার অনেক পুস্তিকা তিনি নিজে রচনা করেছেন এবং অন্য অনেক পুস্তিকা বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ লোকদের দ্বারা তিনি রচনা করিয়েছেন।

চন্দ্রবাবুর এই সমস্ত পরিকল্পনার মধ্যে স্বদেশকে জানার কথা আছে, আবার সেই সংগে বিদেশকেও জান্‌তে হবে, বিদেশের কাছ থেকে যা কিছু শিক্ষা করবার যোগ্য তাও শিক্ষা কর্‌তে হবে, একথাও আছে। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-প্রেম অন্ধ ভক্তি নয়, তা বিচারশীল, তা কর্ম-পরায়ণ।

স্বদেশের সেবার জন্য উপযুক্ত হ'তে হ'লে যে, দীর্ঘদিন ধ'রে শিক্ষা লাভ কর্‌তে হবে একথা বংকিমচন্দ্রও বলেছেন। সন্তানদের সন্ন্যাস এই শিক্ষার জন্যেই। রবীন্দ্রনাথও এই শিক্ষার কথা বলেছেন। চন্দ্রবাবু বল্‌ছেন "আমি বল্‌ছিনে যে সকলকেই সব বিদ্যা শিখতে হবে। অভিরুচি অনুসারে ওর মধ্যে আমরা কেউ একটা, কেউ বা দুটো তিনটে শিক্ষা করব।…ধরো-পাঁচ বছর, পাঁচ বছরে আমরা প্রস্তুত হ'য়ে বেরতে পারব। যারা চিরজীবনের ব্রত গ্রহণ করবে, পাঁচ বছর তাদের পক্ষে কিছুই নয়।" রবীন্দ্রনাথের এই নীতিই আজ ব্যাপকভাবে বাস্তব রূপ নিয়েছে আমাদের সরকার-পরিচালিত গ্রামসেবক গ্রামসেবিকা ট্রেনিং কোর্সের মধ্যে।

দেশের সেবা করতে গেলে কর্মীদের মধ্যে ঐক্য বন্ধন দরকার। এক হবার উপায় বল্‌তে গিয়ে চন্দ্রবাবু বল্‌ছেন—"বন্ধুগণ কাজই একমাত্র ঐক্যের বন্ধন। যারা একসংগে কাজ করে তারাই এক। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা সবাই মিলে একটা কোনো কাজে প্রবৃত্ত না হব ততক্ষণ আমরা যথার্থ এক হ'তে পারব না।"

কিন্তু কাজের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হ'ল মতভেদ। শ্রীশ ও বিপিনের বিভিন্ন প্রস্তাব নিয়ে মতভেদের মধ্যদিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই মতভেদের বিপদের কথা বল্‌তে চেয়েছেন। একদল লোক থাকে যারা বড় বড় প্রস্তাব করে, কিন্তু তাদের সে সমস্ত প্রস্তাব কাজে পরিণত করা সম্ভব হয় না। তার চেয়ে এমন কোন কাজের প্রস্তাব করাই উচিত—যা তখনি তখনি আরম্ভ করে দেওয়া সম্ভব। কাজ আরম্ভ ক'রে দিলেই পরে সে আপনার বেগ আপনি সঞ্চার করতে থাকে এবং ধীরে ধীরে বাড়্‌তে থাকে। শ্রীশের প্রস্তাব—"আমাদের সবাইকে সন্ন্যাসী হ'য়ে ভারতবর্ষের দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে দেশহিতব্রত নিয়ে বেড়াতে হবে।" এ এমন একটা কাজ—যা শ্রীশ বা বিপিন কেউই তৎক্ষণাৎ আরম্ভ করতে পারে না। তাই বিপিন বলল—"সে ঢের সময় আছে। যা কালই শুরু করা যেতে পারে এমন কোন কাজ বল। যদি পণ ক'রে বস—যে মারি তো গণ্ডার, লুঠি তো ভাণ্ডার—তা হ'লে গণ্ডারও বাঁচবে, ভাণ্ডারও বাঁচবে এবং তুমি ও যেমন আরামে আছ তেমনি আরামে থাক্‌বে। আমি প্রস্তাব করি আমরা প্রত্যেকে দুটি করে বিদেশী ছাত্র পালন কর্‌বো। তাদের পড়াশোনা এবং শরীর মনের সমস্ত চর্চার ভার আমাদের উপরে থাক্‌বে।"

কিন্তু বড় বড় ভাব যার মনে—তার কাছে এই রকম ক্ষুদ্র প্রস্তাব ভাল লাগে না। তাই শ্রীশ বিপিনকে ধিক্কার দিয়ে বল্‌ল—"যদি ছেলে মানুষই করতে হয়, তা হ'লে নিজের ছেলে কী দোষ করেছে।" এমনি করে শুরু হ'য়ে গেল দুই বন্ধুতে ঝগড়া এবং এই রকম ঝগড়ার পরিণতি কী হয় তাও কবি দেখিয়েছেন। মতের ঝগড়া শেষকালে ব্যক্তিগত গালাগালিতে পরিণত হয়।

কবি নিজে কিন্তু বিপিনের সঙ্গেই সহমত। প্রত্যেক শিক্ষিত লোক যদি অন্ততঃ দুটি করে ছাত্রের শিক্ষার ভার গ্রহণ করে—তা হ'লে তাতে দেশের অনেক উপকার হয়—অথচ এ কাজটা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। এটা সহজেই এবং কালই আরম্ভ ক'রে দেওয়া যেতে পারে।

এই মতভেদ এবং ফলে ঝগড়ার যে বিপদ তার থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় কি—এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত তাঁর অনেক প্রবন্ধে আমরা পড়েছি। সেই মতই তিনি এই উপন্যাসে দিয়েছেন পূর্ণর মুখে। চন্দ্রবাবু যখন প্রস্তাব সম্বন্ধে পূর্ণর মত জিজ্ঞাসা করলেন, তখন পূর্ণ বল্‌ল—"আজ বিশেষ করে সভ্যদের মধ্যে ঐক্য-বিধানের জন্য একটা কাজের প্রস্তাব করা হয়েছে। কিন্তু কাজের প্রস্তাবে ঐক্যের লক্ষণ যে কী রকম পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে, সে আর কাউকে চোখে আংগুল দিয়ে দেখাতে হবে না। এর মধ্যে আমি যদি আবার একটা তৃতীয় মত প্রকাশ ক'রে বসি, তা হ'লে বিরোধানলে আহুতি দান করা হবে। তাই আমি প্রস্তাব করি—সভাপতি মহাশয় আমাদের কাজ নির্দেশ করে দেবেন, আমরা তাই শিরোধার্য্য ক'রে নিয়ে বিনা বিচারে পালন করে যাব। ঐক্য বিধান এবং কার্য্য সাধনের এই একমাত্র উপায় আছে। তখনকার স্বদেশী আন্দোলনের দিনে কবি সভায় যে বক্তৃতা দিয়েছেন, তাতেও তিনি এই কথাই বলেছেন যে—আমাদের মধ্যে একজনকে নেতা নির্বাচন ক'রে নিয়ে বিনা বিচারে তার আদেশ পালন ক'রে যেতে হবে। কাজের ক্ষেত্রে কবি এক-নেতৃত্ব বা ডিক্‌টেটরশিপের সমর্থক ছিলেন, একথা বল্‌তেই হবে। নানা মুনির নানা মতে কথনো কাজ হয় না, অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হয়—অনেক রাঁধুনীতে ঝোল নষ্ট হয়, এটা সব দেশের সব কালেরই একটা সুপরিচিত সত্য। বংকিমচন্দ্রেরও মত ছিল একাধিনায়কত্ব। সত্যানন্দ ছিলেন সন্তান সম্প্রদায়ের একমাত্র অধিনায়ক। দলের অন্য সকলে তাঁর আদেশ বিনা-বিচারে পালন করবে এই ছিল নিয়ম। তাই তো যখন জীবানন্দ সত্যানন্দকে বন্দী হ'য়ে সিপাহীদের সংগে যেতে দেখলেন, তখন ও তিনি সত্যানন্দের অনুসরণ না ক'রে তাঁর সাংকেতিক আদেশ পালন করতেই বলেন।

যারা কোন মহৎ কাজ ক'রবে তাদের পক্ষে অহংকার একটা বড় শত্রু। অনেক সময় তারা মনে করে যে এক-মাত্র তারাই শ্রেষ্ঠ এবং অন্য সবাই তাদের চেয়ে নিকৃষ্ট। এই মনোভাব কবি দেখিয়েছেন শ্রীশের মধ্যে। চন্দ্রবাবু যখন বল্‌লেন "আমাদের সভার সভ্যসংখ্যা অল্প হওয়াতে কারো হতাশ্বাস হবার প্রয়োজন নেই', তার উত্তরে শ্রীশ বল্‌ল—"হতাশ্বাস, সেই তো আমাদের সভার গৌরব। আমাদের মহৎ আদর্শ কি সর্বসাধারণের উপযোগী? আমাদের সভা অল্প লোকের সভা।" কিন্তু এই আত্মম্ভরিতা ভালো নয়। তাই চন্দ্রবাবু শ্রীশকে সাবধান করে বলছেন —"কিন্তু আমাদের আদর্শ উচ্চ এবং বিধান কঠিন বলেই আমাদের বিনয় রক্ষা করা কর্তব্য! সর্বদাই মনে রাখা উচিত আমরা আমাদের সংকল্প সাধনের যোগ্য না হ'তেও পারি। ভেবে দেখ—পূর্বে আমাদের মধ্যে এমন অনেক সভ্য ছিলেন যাঁরা হয়ত আমাদের চেয়ে সর্বাংশে মহত্তর ছিলেন এবং তাঁরাও নিজের সুখ এবং সংসারের প্রবল আকর্ষণে একে একে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছেন। আমাদের কয়-জনের পথেও যে প্রলোভন কোথায় অপেক্ষা করছে,তা কেউ বলতে পারে না, সেই জন্য আমরা দম্ভ পরিত্যাগ করব।"

মহৎ কাজে সাথী বেশি পাওয়া যায় না। কিন্তু তাই বলে যে প্রকৃত কর্মী, সংগীর অভাবে সে নিরুৎসাহ হয় না। একক-সাধকের সাধনাও কথনো ব্যর্থ হয় না। মানুষের একক একান্ত সাধনা কোন একদিন মহৎ ফল প্রসব করে, কবির এই ছিল আন্তরিক বিশ্বাস। এই কথাই কবি দিয়েছেন পূর্ণর মুখে—"আমরা একে একে স্খলিত হই বা না হই, তাই ব'লে আমাদের এই সভাকে পরিহাস করবার অধিকার কারো নেই। কেবলমাত্র যদি আমাদের সভাপতি মশায় একা থাকেন, তবে সেই একক তপস্বীর তপঃ প্রভাবে আমাদের পরিত্যক্ত সভাক্ষেত্র পবিত্র

উজ্জ্বল হয়ে থাক্‌বে এবং তার চিরজীবনের তপস্যার ফল দেশের পক্ষে কখনই ব্যর্থ হবে না।"

এই একক তপস্যার হোমাগ্নি জ্বালিয়ে ছিলেন কবি তার তপোবনে। কবি দেশের জন্যে যে কাজ করে গেছেন তাতে তার সংগী সেদিন বেশি ছিল না। চিরকুমারসভা যেমন সভাপতি এবং তিনটি মাত্র সভ্য নিয়ে আরম্ভ হয়েছিল, কবির দেশহিতব্রতেও কবি নিজে এবং আর দু চারটি ভক্ত শিষ্য ছাড়া সেদিন আর কেউ তাঁর সাথী ছিল না। কিন্তু তবু কবি নিরুৎসাহ হন নি। একক সাধনায় তাঁর ছিল গভীর বিশ্বাস।

চন্দ্রবাবু বল্‌ছেন—"আমাদের ব্রত, অসাধ্য নয়। তবে দুঃসাধ্য বটে, তা ভালো কাজ মাত্রেই দুঃসাধ্য।" তিনি বল্‌ছেন—"কোন কালে মহৎ চেষ্টাকে মনে স্থান না দেওয়ার চেয়ে চেষ্টা করে অকৃতকার্য্য হওয়াও ভাল।" কোন মংগল চেষ্টা আপাতদৃষ্টিতে ব্যর্থ হলেও তা একেবারে ব্যর্থ হয় না। কোনো একদিন তা সফল হবেই—কবি এই বিশ্বাস করতেন। তাই তো কবি তার গানে গেয়েছেন—

"জীবনে যত পূজা হ'ল না সারা
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।"

প্রত্যেক বড় কাজের জন্য দরকার—আশা ও উৎসাহ। আশংকা এবং সন্দেহকে মন থেকে দূর করতে না পারলে বড় কাজে হাত দেওয়া চলে না। শ্রীশ বল্‌ছে—"সন্দেহ জিনিষটা নাস্তিকতার ছায়া। মন্দ হবে, ভেঙে যাবে, নষ্ট হবে, এসব ভাব আমি কোনো অবস্থাতেই মনে স্থান দিই নে।...সন্দেহ, শংকা, উদ্বেগ—এগুলো মন থেকে দূর ক'রে দাও। বিশ্বাস এবং আনন্দ না হ'লে বড়ো কাজ হয় না।"

এই বিশ্বাস এবং এই আনন্দই জোগান দিয়েছে কবিকে তার বিপুল কর্মের উদ্যম। একাধারে এতবড় কবি পৃথিবীতে কোনো কালে কোনো দেশে আর কি হ'য়েছে?

আরো একটা দিক থেকে 'প্রজাপতির নির্বন্ধে'র সঙ্গে আনন্দমঠের তুলনা করা যেতে পারে। আনন্দমঠে বংকিমচন্দ্র গুরুতর বিষয়ের মাঝে মাঝে হাস্যরস পরিবেশন ক'রেছেন। মাতাল গোরা সেনাধ্যক্ষের সিপাহিদের প্রতি ডাকাতকে বিয়ে করবার অসম্ভব আদেশ—আর প্রৌঢ়া রমণীর মনে যুবতীসুলভ আশা-আকাংখার কথা বলে বংকিমচন্দ্র পাঠককে হাসিয়েছেন। প্রৌঢ়া স্থূলাংগী গৌরী-দেবীর পাঁচ হাত কাপড়খানা নিয়ে টানাটানি করে পরম ব্রীড়াবতী তরুণী সাজবার আকাংখার কথা শুনে হাসি পায়, কিন্তু মেয়েমানুষের প্রকৃতিগত এই দুর্বলতার সংগে ও আনন্দমঠের মহৎ উদ্দেশ্যের কোনো সম্পর্ক নেই। পরিহাস নিতান্তই অপ্রাসংগিক এবং অবান্তর। কিন্তু 'প্রজাপতির নির্বন্ধে' কবির বিদ্রূপের লক্ষ্য সে দিনের নব্য, অপদার্থ অথচ ফাজিল ইংগবংগ-সমাজ। দেশের অনেক অপদার্থ যুবক—দেশে যাদের বিদ্যাবুদ্ধি কেউ কোনদিন স্বীকার করে নি, তারাই বিলাত গিয়ে নিজেদের অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব'লে ঠিক ক'রে ফেলেছে এবং নাকে মুখে চোখে অজস্র কথা ব'লে ভেবেছে যে তাদের বুদ্ধি একেবারে খুলে গেছে। অপদার্থ কুলীনের ছেলে দারুকেশ্বর অক্ষয়কে বল্‌ছে—"আমাদের বিলেত পাঠাতে হবে।" অক্ষয় জবাব দিচ্ছে—"সে তো হবেই, তার না কাট্‌লে কি শ্যাম্পেনের ছিপি খোলে? দেশে আপনাদের মত লোকের বিদ্যাবুদ্ধি চাপা থাকে, বাঁধন কাট্‌লেই একেবারে নাকে মুখে চোখে উছলে উঠ্‌বে।"

কোনো কালে লোকের ধারণা ছিল যে রবীন্দ্র-সাহিত্যে পৌরুষ নেই, তাতে মেয়েলি মিহি সুরেরই প্রাচুর্য্য। কিন্তু মেয়েদের প্রতি শ্রদ্ধা—পৌরুষের একটা প্রধান লক্ষণ। রবীন্দ্রসাহিত্যে মেয়েদের প্রতি বিদ্রূপ বিরল। পুরুষ কবির বিদ্রূপ উদ্যত হ'য়েছে কাপুরুষের প্রতি। মেয়েদের দুর্বলতাকে তিনি ক্ষমা ক'রে গেছেন।

'আনন্দ মঠে' ঋষি বংকিম প্রথম স্বাধীনতার মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন। অবশ্য তাঁরও আগে সেই মন্ত্রই উচ্চারিত হয়েছিল কবি মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' কাব্যে। বাংলা তথা ভারতের জাতীয়-কবি মধুসূদন বাংলা তথা ভারতের যে আশা-আকাংখার সূচনা করলেন তাই স্পষ্টতর রূপ নিল বংকিমের আনন্দমঠে। আনন্দমঠের অনুপ্রেরণায় বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলন—বাংলায় বিপ্লব প্রথম জেগে উঠেছিল এবং সেই আন্দোলন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। বংকিমচন্দ্র যদিও কবি নন, কিন্তু তাঁর লেখা বাস্তবের চেয়ে বেশি রোমান্টিক। আনন্দমঠের পথহারা

অরণ্য, বড় বড় বীরদের রোমাঞ্চকর বীর্য্যের কাহিনী, এ সবই রোমান্সের উপাদান। আনন্দমঠে স্বাধীনতা-লাভের জন্যে কর্ম্মপদ্ধতির সুনির্দিষ্ট নির্দেশ তত নেই—যত আছে স্বাধীনতার আকাংখাকে জাগিয়ে তোলার অগ্নিমন্ত্র। তাই আমরা দেখি, বংকিমচন্দ্র তাঁর রোমান্টিক লেখা দিয়ে যে স্বাধীনতার আকাংখাকে জাগিয়ে তুলেছিলেন প্রজাপতির নির্বন্ধে, সেই আকাংখাই সুনির্দিষ্ট রূপ নিয়েছে। ঠিক যেমন প্রথম যুগের নীহারিকা-পুঞ্জের মধ্য থেকে ধীরে ধীরে তারা ফুটে উঠ্‌তে থাকে তেমনি মধুসূদনের মেঘনাদবধের ভাষা গাঢ়তর রূপ নিল আনন্দমঠে—আর আনন্দমঠের ঘনায়িত অগ্নিবাষ্পভরা নীহারিকাপুঞ্জ সুনির্দিষ্ট সুপরিকল্পিত জ্যোতিষ্কের রূপ নিল প্রজাপতির নির্বন্ধে। ভারতের এই জাতীয় লেখকদের হাতে গ'ড়ে উঠেছে ভারতের ইতিহাস। মেঘনাদবধ, আনন্দমঠ এবং প্রজাপতির নির্বন্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক একটা যুগের সূচনা ক'রেছে। এদের মধ্যে রয়েছে সমগ্র দেশের এক একটা যুগের জাতীয় আশা-আকাংখার কথা। পূর্ববর্তী লেখক ভারতবর্ষে অগ্নিযুগের প্রবর্ত্তন কর্‌লেন—আর পরবর্তী কবি সেই দাবানলকে যেন গৃহস্থের ঘরের আগুন ক'রে তুললেন। আনন্দমঠে যে আশা রোমান্সে দিশাহারা ভাষায় ব্যক্ত হ'য়েছে, সেই আশাই সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনারূপে দেখা দিয়েছে চিরকুমার-সভায়। তাই আজ দেখি আনন্দমঠের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত ভারত আজ তার অগ্নিস্রাবের অবসানে চিরকুমারসভার প্রশান্ত কর্মপদ্ধতির মধ্যে আপনার ইতিহাসকে পূর্ণতার পথে এগিয়ে নিয়ে চ'লেছে।

'মা'

শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১

তুলসীতলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করার ছবি
ভুলতে আমি পারিনি গো, তাইত বসে ভাবি।
মনে তাদের কত ব্যথা, কত গানের সুর
হাসি দিয়ে ঢেকে রেখে করেছে মধুর!
সারা জীবন বিলিয়ে দিল তাদের জীবন-বোধ,
একটুখানি হাসি দিয়ে কেউ করেনি শোধ।
আহা! এই যে ছবি, কত মধুর,
নাইরে তুলনা
এদের মাঝেই লুকিয়ে আছে কতজনের 'মা'।

২

বাংলা দেশের ঘরে ঘরে দেখবে তুমি ভাই
এই মা মধুর আবেশ ভরা, তুলনা তার নাই।
আজকে সে যে হারিয়ে গেছে,
কোন খোঁজ নাই
সেই ছবিটী খুঁজে পেতে আবার ফিরে চাই।

৩

শাঁখের আওয়াজ শুনে সবাই
আসত ঘরে ফিরে—
নৌকা যে সব ভাসিয়ে ছিল
ভিড়ত এসে তীরে।
ক্লান্ত দেহে যখন সবাই পড়ত রে ভাই ঘুমে
শিয়র পাশে জাগত সে যে,
নয়ন দিত চুমে।
জ্বরের ঘোরের প্রলাপ বকা
সারা দেহ বেদন-ভরা—
তার চেয়েও বেদনা ভরা ওরে তাদের বুক
সেবা করেই পেল তারা
সারা জীবন সুখ
এই সুখেরই মাঝে যে ভাই লুকিয়ে আছে দুঃখ।
আহা! এই যে ছবি, কত মধুর, নাইরে তুলনা
—নাইরে উপমা
এদের মাঝেই লুকিয়ে আছে কত জনের 'মা'।

মীমাংসা

অনিল মজুমদার

সকাল বেলা অফিসে বসে কাজ করছিলেন Capt Sen টেলিফোনটা বেজে উঠল, ক্রিং ক্রিং।

Sen Speaking' রিসিভারটা তুলে জবাব দেন Capt Sen।

'Capt. King here, good morning, Sir.

'Same to you, King, what's the news ?'

'Brigade Hogot. had allowed one seat to you , you may allow one of your men to leave He must report to the transit Camp tomorrow morning positively,

'Any thing else ?'

'Nothing so far, thank you'

'thanks' রিসিভারটা নামিয়ে রাখেন Capt Sen. পরক্ষণেই বেল টিপে orderly কে ডাক দেন। ঘরে ঢুকলো রাম সিং। সেলাম ঠুকে সামনে দাঁড়ালো তাঁর।

'জমাদার সাবকো বোলাও'

'জী, হুজুর' সেলাম ঠুকে বেরিয়ে গেল রাম সিং।

একটু পরেই ঢুকলো জমাদার স্বামীনাথম। অভিবাদন পর্ব শেষ করে বললে 'Did you Call me, Sir।

—yes, one is to go on leave tomorrow. Will you please send me the leave file.

—Right, Sir.

সেলাম করে বেরিয়ে গেল জমাদার স্বামীনাথন।

দেশে যাওয়ার ছুটী, তাও মাত্র একমাসের। কিন্তু এর জন্যে কত কি করতে হয়। যে কারণে ছুটী চাওয়া তার verification হয় ভারতবর্ষে, জেলা-শাসক যদি সব কিছু অনুসন্ধান করে ছুটি অনুমোদন করেন তবেই ছুটি পাওয়া যায়, ন.১৫ নয়। চুপ করে বসে থাক তোমার বরাতের ওপর নির্ভর করে ? এর নামই মুখ্য, মানুষের দামও নেই, ছাড়ানও নেই।

নিজের কথাটাও চিন্তা করেন Capt. Sen। আজ তিন বছরের ওপর তিনিও দেশছাড়া। যদিও তিনি অবিবাহিত—তবু তাঁর মা আছেন, দুটি ভাই আছে, একটি আদরের বোন আছে, নাম এষা। কতদিন দেখেন নি তাদের। এ কয় বছরে হয়ত তাদের কত কি পরিবর্তন হয়েছে। মা হয়ত আরও বুড়িয়ে গেছেন, ভাই দুটো হয়ত এতদিন মস্ত লায়েক হয়ে উঠেছে, আর এষা—কে জানে হয়ত সে আজকাল জানলার ধারে বসে শেষের কবিতা হাতে অমিত রায়ের স্বপ্ন দেখে। এ সব কথা চিন্তা করতে ও ভাল লাগে Capt Senএর, কিন্তু তারপর! তারপর আর কিছু নেই, সুদিনের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু উপায় নেই। অবিবাহিতদের ছুটি পাওয়াও খুব শক্ত।

শখ করে যুদ্ধে আসেন নি Capt Sen। এসেছেন অনেকটা দায়ে পড়েই। বাপমায়ের বড়ছেলে—বাপ নেই, তাই মাথার ওপর অনেক দায়িত্ব। ভাই দুটোকে মানুষ করতে হবে, বোনের বিয়ে দিতে হবে, কত কি। ইচ্ছে ছিল পাশ করে private practice করবেন, কিন্তু পাশ করেই ত কেউ পশার জমাতে পারে না, সেটা সময়-সাপেক্ষ, অথচ টাকার প্রয়োজন। যুদ্ধ লাগতে সে প্রয়োজন যেন আরও ভীষণ ভাবে বেড়ে উঠলো। কি করেন, যুদ্ধে নাম লেখালেন, তাতে যাহোক সমস্যার কিছুটা সমাধান হলো।

বহুদেশ ঘুরেছেন Capt Sen এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়। শেষকালে এসে উপস্থিত হয়েছেন ইরাণের এই নির্জন পার্বত্য এলাকায়। তা কত দিনের জন্যে কে জানে। বর্তমানে তিনি একটি Staging postএর

officer Commanding—ছোট খাট হাসপাতাল, রুগীর সংখ্যা খুবই কম—মাঝে মাঝে আশপাশ থেকে দু চার জন জ্বর জ্বালা নিয়ে আসে, খারাপ কিছু হলেই চালান হয়ে যায় বেস্ হসপিটালে। ফাইল নিয়ে ঢুকলো স্বামীনাথম। Capt. Sen তাকে ফাইলটা রেখে যেতে বললেন।

হাতের কাজকর্মগুলো সেরে Capt. Sen ছুটির ফাইলটা খুলে উল্টে পাল্টে দেখতে লাগলেন। ছুটির প্রার্থী অনেকেই, তবে দুজনের দরখাস্ত ভারতবর্ষ থেকে ফেরৎ এসেছে—জেলা-শাসক দুজনেরই ছুটি অনুমোদন করেছেন। একজন ইউনিটের মেথর ভিখারীরাম, তার মায়ের অসুখ, অপর জন যদুসিং—একজন নার্সিং অর্ডার্লি, তার হচ্ছে স্ত্রীর অসুখ। এই দুজনের মধ্যে একজনকে ছাড়তে হবে—কিন্তু কার যে যাওয়া কত জরুরী সেইটেই হচ্ছে চিন্তার বিষয়।

এ নিয়ে অনেকক্ষণ মাথা ঘামালেন Capt. Sen কিন্তু কোন কিছু কূল-কিনারা করতে পারলেন না। শেষ পর্য্যন্ত সব চাপাচুপি দিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়লেন। ভাবলেন যাহোক পরে করা যাবে। এখানে ওখানে ঘুরলেন খানিকক্ষণ, পাঁচজনের সঙ্গে পাঁচটা কথাবার্ত্তাও বললেন—কিন্তু মাথা থেকে চিন্তা গেলনা, বরং আরও জেকে ধরলো।

খবর চাপা থাকে না, ভিখারীরাম যদুসিং ঠিক এর আঁচ পেয়ে গেছে। এখন সবই নির্ভর করছে Capt Sen-এর মর্জির ওপর। এখন তাঁকে কি করে সন্তুষ্ট করা যায়, এই উদ্দেশ্য নিয়েই তারা তাঁর আশেপাশে ঘুরতে লাগলো। ভিখারীরাম লোকটা অত্যন্ত দুষ্টপ্রকৃতির—ইতিপূর্বে তার অনেকবার সাজা হয়েছে, সেদিক থেকে যদুসিং লোক খুব ভাল, ইউনিটের সবাই তাকে পছন্দ করে। ভিখারীরাম সেদিন যেন হঠাৎ বদলে গেল, কাজেও যেন মন পড়ে গেল ভীষণভাবে, অযথা একবার Capt Senএর কাছ বরাবর এসে মস্ত একটা সেলাম দিলে, Capt Sen যদিও তাকে দেখে শুধু একটু মনে মনে হাসলেন। Wardএ ঢুকতেই যদুসিংএর সঙ্গে দেখা, বেচারা এমন করুণভাবে একবার Capt Senএর দিকে তাকালে তাতে তাঁর একটু দুঃখই হলো।

Capt Senএর একজন সহকারী আছেন—নাম St বিনায়ক যোশী। ভদ্রলোক বিয়ে করেই যুদ্ধে এসেছেন, তাই কাজের সময় কাজ করেন, আর অবসর সময়ে স্ত্রীর চিন্তা করেন। দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে Capt Sen শেষ পর্য্যন্ত তাঁর তাঁবুতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। এমন অসময়ে Capt Senকে দেখে St যোশী একটু আশ্চর্যই হলেন। বললেন 'হঠাৎ এমন অসময়ে Sen ?'

—অবাক হচ্ছ, না ?

—সত্যিই তাই। এ সময়ে তো তুমি বেশ লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমোও।

—সে চেষ্টা যে করিনি তা নয়, তবে কি জানি কেন ঘুমটা আজ এলো না।

—বল কি ? এটা যে নতুন মনে হচ্ছে। যা হোক ব্যাপার কি বলত ?

—আজকের খবর জানো ?

—কি খবর ?

—Brigade Hd Qr আজ আমার unitএর এক-জনকে ছুটি দিতে চায়।

—বল কি Sen, এত খুব ভাল খবর। উত্তেজিত হয়ে বলেন St যোশী।

—ভয় নেই, তুমি আমি বাদে। হেসে জবাব দেন Capt Sen.

—St যোশী বোধ হয় যতখানি খুসী হয়েছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশী দমে গেলেন। বললেন, তবে আর কি, যাকে হোক একজনকে ছেড়ে দাও।

—কাকে দিই, সেইটেই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভিখারীরাম কিম্বা যদু সিং—দুজনের একজনকে ছাড়তে হবে।

—এ নিয়ে ভাববার কি আছে। যদু সিংকে ছেড়ে দাও, শুনেছি ওর নাকি স্ত্রীর খুব অসুখ।

St যোশীর কথায় Capt Senএর মন যেন তেমন সায় দিলে না। তাই একটু তাচ্ছিল্যভরেই বললেন—'বাঃ তুমি ত দেখছি বেশ এক কথায় সব মিটিয়ে ফেললে। তোমার কি এইটেই মত ?

Capt Senএর কথায় St যোশী বোধ হয় একটু ক্ষুন্নই হলেন। তবু সে ভাবটা চেপে রেখে বললেন, 'এটা শুধু আমার মত নয়, বোধ হয় অনেকেরই। পরিবার বলতে

স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদেরই বোঝায়, Armyও এটা স্বীকার করে। তোমার কি মত ?

—আমার কোন মত নেই যোশী, যখন কোনটাই আমার নেই—হেসে জবাব দিলেন Capt Sen। এই কথা বলে Capt Sen তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে এলেন।

দূরে অনেক দিন কাটিয়েছেন Capt Sen। অনেক রকমের রোগী দেখেছেন, অনেক রকম রোগেরও চিকিৎসা করেছেন, কিন্তু কোনদিন এমন একটা সমস্যার মধ্যে পড়েন নি। তিনি ডাক্তার, ষ্টেথিস্কোপ দিয়ে বুকের স্পন্দন শোনেন, সেই অনুযায়ী রোগ নির্ণয়ও করেন—কিন্তু হৃদয়ের স্তরে স্তরে মানুষের যে কত রকমের ভাবের আদান-প্রদান হয় সে খবর তিনি রাখেন না, সেইটেই তিনি আজ জানতে চান এবং সেই দিয়েই এই সমস্যার সমাধান করতে চান।

বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যে হ'ল। অন্ধকার নেমে এল পৃথিবীর বুকে। দেখতে দেখতে দূরের পাহাড়গুলো সব তারই মধ্যে আত্মগোপন করলে। আর্দ্দালি এসে তাঁবুতে আলো জ্বেলে দিলে। Capt Senও বেরিয়ে পড়লেন সন্ধ্যে দিতে।

ততক্ষণে আকাশে চাঁদ উঠেছে। পাহাড়গুলো সব আবার আকাশের গায়ে গায়ে ভেসে উঠেছে। বাতাস বইছে—ঠাণ্ডা, কনকনে, হাড়মাস যেন কাঁপিয়ে দিচ্ছে তাতে। গায়ে গ্রেট কোটটা চাপিয়ে, কলারটাকে কান অবধি তুলে দিয়ে—তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়ালেন Capt Sen। সিগারেটের পর সিগারেট ধ্বংস করেন আর ভাবেন—এখন কি করা যায়। সময় বড় অল্প, কালই বিকেলে একজনকে ছেড়ে দিতে হবে, আজ রাত্রের মধ্যেই যা হোক একটা মীমাংসা করে ফেলতে হবে।

অস্থির হয়ে ওঠেন Capt Sen। এ হেন শীতে ও কানদুটো তার অসম্ভব গরম হয়ে ওঠে, কিন্তু কি করবেন কিছুই ঠিক করতে পারেন না। যতই তিনি চিন্তা করতে চান ততই যেন তিনি সব গুলিয়ে ফেলেন। আস্তে আস্তে তিনি নিজের ওপর ভরসা হারিয়ে ফেলেন।

তাঁবুতে ফিরে আসেন Capt Sen। অত্যন্ত শ্রান্ত মনে হয়। একখানা ইজি-চেয়ারে শরীরটা এলিয়ে দেন তিনি।

পাশের টেবিলে খানকয়েক চিঠি পড়ে। রোজ সন্ধেবেলা এরকম চিঠির গোছা তাঁর কাছে আসে। সেগুলো তিনি দেখেশুনে Unit Censor stamp বসিয়ে দেন। প্রাথমিক censor তাঁকেই করতে হয়। ভাল লাগেনা দৈনন্দিন এই এক ঘেয়ে শীতে :

আলতো ভাবে এক একখানা চিঠি তুলে দেখেন। তাঁর Unitএর লোকজনের লেখা, না হয় দুচারজন রোগীর লেখা চিঠি। বেশীর ভাগই হাহুতাশ আর দুঃখের কাহিনী, সবাই চেয়ে আছে কবে যুদ্ধের সমাপ্তি হবে, কবে আবার তারা তাদের প্রিয়জনের সঙ্গে মিশবে। কিন্তু এখন আশা নয়, দুরাশা, যুদ্ধ যে কোনদিন শেষ হবে তাই মনে হয় না।

একখানা চিঠি দেখেন ইংরাজিতে লেখা। একজন ইংরেজ সার্জেণ্ট দিন কয়েক হলো তার হাসপাতালে এসেছে তার লেখা। মন দিয়ে পড়তে সুরু করলেন Capt Sen। বিরাট চিঠি, লিখেছে তার স্ত্রীকে, ঠিক অন্যসব চিঠির মত নয়, বেশ খানিকটা নতুনত্ব আছে তাতে। এক জায়গায় সে লিখেছে—'এতদিন জানতাম তুমিই আমার সবার চেয়ে আদরের। কিন্তু কদিন এই হাসপাতালে শুয়ে সে ভুলটা আমার ভাঙ্গল, দেখলাম—তোমার চেয়ে ঢের আদরের জিনিষ আমার আছে যেটা আমি জেনেও জানতে পারিনি। জ্বরের ঘোরে অনেক সময় ভুল বকতাম—কিন্তু যখনই আমার জ্ঞান ফিরে আসত তখনই দেখতাম আমার মাকে—তিনি যেন আমার পাশে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। আশ্চর্য হলাম, যখন তোমাকে আমি একদিনও দেখলাম না। জানি এ হয়ত আমার মনের ভুল—কিন্তু তবু এ ভুল হয় কেন ?

চিঠিখানা শেষ করে বন্ধ করে রাখলেন Capt Sen। বুকখানা তার খুসীতে ভরে উঠল।

তাঁবু ছেড়ে তখনই বেরিয়ে পড়লেন তিনি। পরের দিন সকালেই ভিখারীরাম Transit campএ চলে গেল।

পূবের আকাশটা যেন আলোয় ঝলমল করছে।

তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্যটাই দেখছিলেন Capt Sen—হঠাৎ তাঁর পিঠে হাত পড়তেই চমকে উঠলেন তিনি। পিছন ফিরে দেখলেন যোশী দাঁড়িয়ে।

—এত কি ভাবছ সেন ?—জিজ্ঞেস করলে যোশী।

Capt Sen একবার তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে চেয়ে থাকেন।

কথার জবাব দিলেন না। সকালের আলো পড়েছে পাহাড়ের মাথায়, উজ্জল একটি স্বপ্নের মত মাকে মনে পড়ে।

হিন্দু সমাজের উপর মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রভাব কেন বেশী

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

১৭। এইবার আমরা নদীয়া-রাজ্যে ব্রহ্মোত্তরের বিষয় আলোচনা করিব। ফিফ্‌থ রিপোর্টে আছে :—

"The native aumeeny investigations (and their authority should be relied on, till better can be produced) discovered sources of territorial revenue equivalent with 2, 42, 842 [Bighas] *Plateka*, to Sa, Rs, 15, 85, 798, besides bagee zemeen and chakeran 1, 75, 731 bezas, to be rated at an equal number of rupees annual rent ;—all derived from 2099 farms, including„ 3,403 villages, of which the particulars' are to be supported, of course forthcoming.

(Ferminger's Fifth Report, vol 11 p 364)

বাংলা ১১৭২ সালে (= ইং ১৭৬৫-৬৬) মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের হস্তবুদ ছিল ১০,৯৭,৪৫৪৲ ; ইহার উপর বাজে জমীনের বিঘা প্রতি ১৲ টাকা খাজনা ধরিলে দাঁড়ায় ১৫,৭৩,১৮৫৲ টাকা ; কিন্তু ফিফ্‌থ রিপোর্টে বলা হইয়াছে ১৫,৮৫,৭৯৮৲ টাকা হইবে। পূর্ব্বোক্ত ১০,৯৭,৪৫৪৲ টাকা সম্বন্ধে ফিফ্‌থ রিপোর্টে বলা হইয়াছে "such was, or should have been, the net rental of Nuddeale" । আমরা ১৫,৮৫,৭৯৮৲ টাকা—১৫,৭৩,১৮৫৲ টাকা = ১২,৬১৩৲ টাকার পার্থক্য কি কারণে হইল তাহা ধরিতে পারি নাই।

এক্ষণে ৪,৭৫,৭৩১ বাজে জমীনের মধ্যে কতটা চাকরান জমীও কতটা ব্রহ্মোত্তর ছিল তাহার হিসাব করিব। স্যর জন্ সোর তাঁহার ইং ১৭৮৯ সালের ১৮ই জুন তারিখের বিখ্যাত রিপোর্টের ১১১ নং প্যারাগ্রাফে আছে যে :—

"From the records of the investigation set on foot in 1777, it appears that the alienated lands under the two distinctions specified were as follows :

	Begas
Chakeran or land allotted for the main tenance of public servants	12,04,847·5
Bajee Jumma or land held by Brahmans and others	43,96.095
Total Begas	56,00,942·5

And admitting per grant's speculation of alienated land in districts which were not endohsed the investigation,, we must add begas 27,75,000 to the above, making a total of begas 83,75,942 , adopting his rate of one rupee and a half per bega, the quantity would yield 1,25,63,913 rupees per annum."

উপরোক্ত হিসাব হইতে জানিতে পারি যে হবে বাংলায় (যাহার আয়তন ৯৩০০ বর্গমাইল হইবে) মোট বাজে জমীনের পরিমাণ ৮৩,৭৬,০০০ বিঘা। এই হিসাবে নদীয়া-রাজ্যে হওয়া উচিৎ ২,৮৩,৭৯৩ বিঘা। কিন্তু আমীনী তদন্তের ফলে দেখিতে পাইতেছি ৪,৭৫,৭৩১ বিঘা—প্রায় ডবল।

স্যর জন্ সোর মিনিট হইতে জানিতে পারি যে বাজে জমীন বা যে জমীর উপর খাজনা ধার্য্য নাই তাহার মধ্যে চাকরান জমীর পরিমাণ হইতেছে শতকরা ২১ ৫ ভাগ ; আর বাকী হইতেছে প্রধানতঃ ব্রহ্মোত্তর। বাকী জমীর মধ্যে মহাত্রান, দেবোত্তর, পীরোত্তর প্রভৃতি থাকিলেও ব্রহ্মোত্তরের সংখ্যা ও পরিমাণ এত বেশী যে সাধারণে নিস্কর জমী বলিলেই ব্রহ্মোত্তর বুঝেন।

নদীয়া রাজ্যের ৪,৭৫,৭৩১ বিঘার মধ্যে উপরোক্ত হারে চাকরান জমী বাদ দিলে ব্রহ্মোত্তরাদির জন্য থাকে—

মোট বাজে জমীন—	৪,৭৫,৭৩১ বিঘা
বাদ চাকরাণ জমী (শতকরা ২১৫ হিসাবে)	—১,০২,২৮২ „
ব্রহ্মোত্তরাদি :	৩,৭৩,৪৪৯ বিঘা

১৮। আমরা যে নদীয়া-রাজ্যে চাকরাণ জমীর পরিমাণ বেশী করিয়া ধরিয়াছি তাহা একটু পরে দেখাইব। এক্ষণে ব্রহ্মোত্তরের পরিমাণ সম্বন্ধে বর্দ্ধমান রাজ্যের সহিত তুলনা করিব। বর্দ্ধমান-রাজ্যের পরিমাণ ৫,১৭৪ বর্গ মাইল। ইহার মধ্যে নিস্কর জমীর পরিমাণ হইতেছে ৫,৬৮,৭৩৬ বিঘা।" "The history thus alienated and ascertained by Mr. Johnstone, after an arduous scrutiny of 70 persons for eight months in 1763-4 A. D. (since which, the quantity has certainly not diminished) was 5,68,736 begas, making "near fifth part of all arable productive ground in the

Zamindary. * * * These possessors are, undoubtedly, for the most part, the official land-holder himself clandestinely his minials, and the mutseddies of the khalsa ; whose acquiescence to such collusive benefices, under the sanctified appellations of religious or charitable gifts' at different times became necessary, as they were in their nature wholly fradulent, and sure to be resumed, if made known to the Mussulman government."

(Fermingers Fifth Report Vol II P 416)

প্রতি বর্গমাইলে নিষ্কর, ব্রহ্মোত্তরাদি জমীর পরিমাণ হইতেছে :—

বর্দ্ধমান-রাজ্য—১০৯'৯ বিঘা
নদীয়া-রাজ্যে—১১৮'৫ "
নদীয়া-রাজ্যে বেশী—৮'৬ বিঘা

বর্দ্ধমান-রাজ্যে এই নিষ্কর সম্বন্ধে উপরের উক্তিসমূহ সম্পূর্ণ প্রযুজ্য না হইলেও, বহুলাংশে যে প্রযুজ্য ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেমতে নদীয়া-রাজ্যে ব্রহ্মোত্তরাদির পরিমাণ প্রতি বর্গ মাইলে আরও বেশী।

১ বর্গ মাইল=৬৪০ একর বা ১৯৩৬ বিঘা। উপরোক্ত হিসাব হইতে জানিতে পারি যে সে সময়ে প্রতি বর্গ মাইলে (১৯৩৬ বিঘার মধ্যে) চাষের পেল জমির পরিমাণ হইতেছে ৫×১১০=৫৫০ বিঘা। আর এইটী হইতেছে বর্দ্ধমান-রাজ্যে।

"The Zamindary of Burdwan, 5814. Square miles in extent, is the most compact, best cultivated, and in proportion to its dimensions, by far the most productive in annual rent to the proprietory sovereign, which, under British administration, not only of all such districts within the Soubah of Bengal but compared to any other of equal magnitude throughout the whole of Hindostan. the boasted Hindoo territory of Tanjore, × × × can only be reckoned in point of original proprietary income in the secondary class ; and as to the Zamindary of Benares, so often contrasted with the neighbouring province of Behar, to expose the declining state of the latter under the company's management, it can not at all be brought in competition with Burdwan ; for even if allowed to yield near double the grose rental, its dimensions are twice and a half larger." [Ibid p 497]

বর্দ্ধমান-রাজ্যে যদি এই অবস্থা হয়, অর্থাৎ প্রতি বর্গমাইলে চাষের যোগ্য জমীর পরিমাণ ৫৫০ বিঘা হয়, তাহা হইলে নদীয়া-রাজ্যে, যেখানে চাষের যোগ্য জমীর পরিমাণ, বিশেষ করিয়া তুলনায় অনেকটা অনুর্ব্বর—নদীয়া জেলায়, ৫৫০/০ বিঘার অনেকটা কম হইবে।

কতটা কম ছিল সঠিক বলা সম্ভব হইবে না। তবে ইং ১৮৭০ সালে—এই সময়ে একশত বৎসর পরে, যখন সেফ্ ভ্যালুয়েসান হয়, তখন বর্দ্ধমান ও নদীয়া জেলায় নিম্নলিখিত মত ভ্যালুয়েসান করা হয়। আর সে সময়ে কয়লার-খাদ প্রভৃতি খুব কম থাকায় এই নির্দ্ধারিত ভ্যালুয়েসানের খুব একটা ইতর বিশেষ হইবে না।

জেলা	পরিমাণ বর্গ মাইলে	১৮৭০ সালের সেস্ ভ্যালুয়েসান
বর্দ্ধমান	৩, ২৬৭	৭৪, ৯৪, ০৯৯ টাকা
নদীয়া	২, ৮৮৭	২৫, ৭২, ২৬৩ "

প্রতি বর্গমাইলে সেস্ ভ্যালুয়েসান্ হিসাব করিলে এইরূপ দাঁড়ায়। যথা :—

বর্দ্ধমানে—	২২৯৩'৯ টাকা	১,০০০
নদীয়ায়—	৮৯১ "	৩৮৮,৪

এই হিসাব অনুযায়ী বর্দ্ধমানে যে স্থলে প্রতি বর্গমাইলে ৫৫০/ বিঘা চাষের যোগ্য জমী ছিল নদীয়ায়·সেখানে প্রতি বর্গ-মাইলে ২১৩'৬ বিঘা চাষের যোগ্য জমি ছিল। নদীয়া রাজ্যের সমস্তটাই কিন্তু নদীয়া জেলার মতন অনুর্ব্বর নহে। এজন্য নদীয়া রাজ্যে প্রতি বর্গমাইলে চাষের জমী ইহার মাঝামাঝি ধরিলাম, অর্থাৎ (৫৫০+২১৪)/২= ৩৮২ বিঘা। আর ইহার মধ্যে ব্রহ্মোত্তরাদিতে দেওয়া হইয়াছে ১১৮'৫ বিঘা বা মোটামুটি শতকরা ৩১ ভাগ।

১৯। আমরা নদীয়া রাজ্যের চাকরান জমীর পরিমাণ যে বেশী করিয়া ধরিয়াছি তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিব। বর্দ্ধমান রাজ্যে ব্রহ্মোত্তরাদির পরিমাণ,বেশী করিয়া ৫, ৬৮,৭৩৬ বিঘা দেখান হইয়াছে। ইহার সিকি পরিমাণ জমী চাক্‌রান হইবে—এমতে চাক্‌রান জমীর পরিমাণ ১, ৪২, ২০০ বিঘা। বর্দ্ধমান রাজ্যের ৫০০০ গ্রামের জন্য ২ জন করিয়া পাইক ধরিয়া ১০,০০০ পাইক এর জন্য ৪ লাখ টাকা মুনফা ও ৫০০০ গ্রামের ৫০০০ পাটওয়ারীর জন্য ৩ লাখ টাকা মুনাফা দেওয়ার কথা আমরা ফিফ্‌থ রিপোর্টে পাঠ করি (৪১৬ পৃঃ)। এই ১৫,০০০ লোককে যদি চাকরান জমী দেওয়া হয়, তাহা হইলে (প্রত্যেক পাটওয়ারী পাইকের ২গুণ জমী পাইয়াছে ধরিয়া) প্রত্যেক পাইক পায় ৭.৮ বিঘা করিয়া জমী। এইরূপ হিসাবে নদীয়া রাজ্যের ৩০০০ গ্রামের পাইক ও পাটওয়ারী পায়—৬,০০০ পাইক×৩০০০ পাটওয়ারী=৬,০০০ পাইক=১২,০০০ পাইক পায় ১২০০০×৭.৮ বিঘা ৮৪,০০০ বিঘা বা ৯৬,০০০ বিঘা। কিন্তু আমরা চাক্‌রানের পরিমাণ ধরিয়াছি ১,০২,০০০ বিঘা।

২০। নদীয়া রাজ্যে চাক্‌রান জমী বাদ দিয়া ব্রহ্মোত্তরাদি নিষ্কর জমীর পরিমাণ ধরা হইয়াছে মোট বাজে জমীন ৪, ৭৫, ৭৩১ বিঘা

বাদ সুবে বাংলার গড় হিসাবে শতকরা ২৯,৫ বিঘা জমী বা ১, ০২, বিঘা—৩, ৭৩, ৪৪৯ বিঘা। এই ব্রহ্মোত্তরাদি জমীর মধ্যে আছে মহত্রাণ, দেবোত্তর, পীরোত্তর প্রভৃতি জমী। এইরূপ ব্রহ্মোত্তর, নহে অথচ নিস্কর জমীর পরিমাণের একটা হিসাব যা আন্দাজ করা আবশ্যক। লেখক কায়স্থ, তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষদের যে ৪,০০, ০০০ বিঘা জমীদারী ছিল, তন্মধ্যে ব্রহ্মোত্তর জমী ও কায়স্থ, বৈষ্ণদের দেওয়া মহত্রাণ ও মস্‌জিদ, ইদগাদির জন্য দেওয়া জমীর অনুপাত এইরূপ :—

	শতকরা
ব্রহ্মোত্তর	৯৩·৯৪ ভাগ
মহত্রাণ ; পীরোত্তর প্রভৃতি	৭·৬ "
	১০০·১০০ ভাগ

অন্য একটী রাজ পরিবারের ম্যানেজারের নিকট হইতেও অনুরূপ হিসাব প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাদের জমীদারী বাংলার বিভিন্ন জেলায় ও পূর্ণিয়াতে অবস্থিত।

আমার এই অনুপাত হয়ত সর্ব্বত্র প্রযুত্য না হইতে পারে এই ভাবিয়া সর্ব্বাপত্তি খণ্ডনার্থ মহত্রাণাদির পরিমাণ নিস্কর জমীর শতকরা ১০ ভাগ ধরিলাম। এ মতে নদীয়া-রাজ্যে নিট ব্রহ্মোত্তর জমীর হিসাব এইরূপ দাঁড়ায় :—

নিস্কর ব্রহ্মোত্তরাদি জমী—৩, ৭৩, ৪৪৯ বিঘা
বাদ মহত্রাণ, পীরোত্তরাদি ৩৭, ৩৪৫ "
নিট্ ব্রহ্মোত্তর জমী— ৩,৩৬১০৪, বিঘা

এই ৩,৩৬,০০০ বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমীর সবটাই মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র যে দান করিয়াছিলেন, তাহা নহে—তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষরা ও বিভিন্ন পরগণা যাহা তিনি তাঁহার রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন, তাহাদের পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জমীদাররাও বহু ব্রহ্মোত্তর দান করিয়া ছিলেন। এই সব দানের হিসাব নাই। সম্রাট আকবরের সময় সুবে বাংলার ৬৮২ পরগণার প্রায় সকল জমীদারেরাই কায়স্থ ছিলেন। আইন-ই-আকবরীতে আছে—কায়স্থ জমীদারদের ব্রাহ্মণ প্রতিপালক বলিয়া বরাবর সুনাম আছে। তাঁহারাও বহু ব্রহ্মোত্তর দান করিয়া থাকিবেন। কিন্তু কি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের—কি এই সব কায়স্থ জমীদারদের—মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের যেরূপ দাতা বলিয়া সুনাম আছে সেরূপ নাম ডাক নাই।

৮২ পরগণা লইয়া নদীয়া রাজ্যের পরিমাণ ৩,১৫১ বর্গ মাইল। গড়ে প্রত্যেক পরগণা ৩৮,৪ বর্গমাইল বা ৭৪, ৪০০ বিঘা। প্রত্যেক পরগণায় জমীদার যদি প্রত্যেক পুরুষে ১০০/ বিঘা করিয়া জমী মাতৃ-শ্রাদ্ধে, পিতৃ-শ্রাদ্ধে, বা বিশেষ বিশেষ নিরা ধর্ম্ম উপলক্ষে ব্রহ্মোত্তর দান করিয়া থাকেন বলিয়া ধরিয়া লই—তাহা হইলে খুব বেশী করিয়া ধরা হইল মনে করি, কারণ এইরূপ ব্রহ্মোত্তর দানের স্মৃতি বা কথা জনশ্রুতিতে বা গল্পে শুনিতে পাই না। সাত পুরুষে এইরূপ দানের পরিমাণ হইবে ৭০০/বিঘা ব্রহ্মোত্তর আর ৭ পুরুষ মোটামুটি ১৭৫ হইতে ২১০ বৎসর। রাজা টোডরমল বাংলার আসল জমী সুমার করেন ইং ১৫৮২ সালে। তখন ব্রহ্মোত্তর দানের কথা বিশেষ শুনিতে পাই না। কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বের মধ্যভাগ আন্দাজ ইং ১৭৬০ ধরিলে পাই ১৭৮ বছরের ব্যবধান। এই সময়ের মধ্যে ব্রহ্মোত্তর দানের পরিমাণ পরগণা প্রতি ৭০০/ বিঘা ধরিলে বেশী বলিয়াই মনে হয়—যদিও কোনও কোনও জমিদারের দান খুব বেশী ছিল। পূর্ব্ব-দানের পরিমাণ প্রতি বর্গ-মাইলে দাঁড়ায় ১৮।১৯ বিঘা করিয়া।

আমরা নদীয়া রাজ্যে প্রতি বর্গ-মাইলে ব্রহ্মোত্তরাদিতে দানকৃত জমীর পরিমাণ পূর্ব্বে ১২৮৫ বিঘা পর্য্যন্ত ধরিয়াছি। ইহা হইতে মহত্রাণ ইত্যাদি বাবদ শতকরা ১০ ভাগ বাদ দিলে ব্রহ্মোত্তরের পরিমাণ হল ১১৮৫—১১,৮ বিঘ=১০৬,৭ বিঘা। পূর্ব্বের দেওয়া ১৯ বিঘা বাদ দিলে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়া ব্রহ্মোত্তরের পরিমাণ হয় ৮৭০৭ বিঘা। আমরা আরও কম বলিয়া ৮০ বিঘা ধরিলাম। নদীয়া রাজ্যে তিনি ব্রহ্মোত্তর দান করিয়াছিলেন ২,৫২,০৮০ বিঘা জমী, এক কথায় তুলক্ষ বিঘা জমি।

২১। প্রত্যেক পাইক্ ৭.৮ বিঘা করিয়া জমী পাইত বলিয়া আমরা সাব্যস্ত করিয়াছি; প্রত্যেক পাটোরী পাইত ১৫.১৬ বিঘা জমী। প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে মহারাজা যদি ২০/০ বিঘা করিয়া জমী দিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি ২,৫২,০০০ ÷২০ =১২,৬০০ ঘর ব্রাহ্মণকে জমী দান করিয়াছিলেন। কাহাকে কাহাকেও তিনি আরও বেশী জমী দান করিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্রকে মূলাজোড়ে বাসের জন্য ৯৬/০ ও গুস্তিয়ায় ১০৪/০ বিঘা জমীদান করিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্র ছিলেন তাঁহার সভার কবি; তাঁহাকে তিনি রায়গুণাকর উপাধি দিয়াছিলেন। এই দানের পরিমাণ ব্যতিক্রম হিসাবে ধরা সঙ্গত।

আমরা যদি তিনি ১০,০০০ ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মোত্তর দান করিয়াছিলেন ধরি তাহা হইলে কম করিয়াই ধরা হইল মনে করি। পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি নদীয়া-রাজ্যে তখনকার দিনে ৬,৩৪০ "ঘর" ব্রাহ্মণ ছিল। সংখ্যা ইহার খুব বেশী হইবে না। এমতে সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে তাঁহার রাজ্য-মধ্যে প্রত্যেক "ঘর" ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মোত্তর দিয়াছিলেন এবং রাজ্যের বাহিরে বহু গুণবান, পণ্ডিত ব্রাহ্মণকেও ঘ-শ্রেণীর রাঢ়ী শ্রেণীর—মহারাজা নিজে শ্রোত্রীয় রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ—বহু ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করিয়াছিলেন।

তাঁহার আমলে রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণের সংখ্যা ছিল $\frac{৫৬৬}{১৪৪৮}$ × ২,৯২,০০০ =১,১৪০০। আর "ঘর" সংখ্যা ছিল ১,১৯,০০০ /৭=১৬,২৮৬ বা মোটামুটি হিসাবে ১৬,৩০০ ঘর। নদীয়া-রাজ্যের সকল ব্রাহ্মণকে রাঢ়ী শ্রেণীর ধরিলে, রাজ্যের বাহিরের ১০,০০০ ঘরের মধ্যে তিনি ৪,০০০ ঘরকে ভূমি দান করিয়াছিলেন।

সকল ব্রাহ্মণ, কি রাঢ়ী শ্রেণীর কি অন্য অন্য শ্রেণীর ব্রহ্মোত্তর পাইবার উপযুক্ত নহেন। তথাপি এ কথা জোর করিয়া বলা চলে যে নিজ রাজ্য-মধ্যে যা নিজ শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাঁহারই কিছুমাত্র পাণ্ডিত্য বা শ্রমা ছিল তাহাকেই তিনি ব্রহ্মোত্তর দান করিয়াছিলেন।

২২। বহু ব্রাহ্মণ তাঁহাদের বাস্তু-ভিটা, যাহার জন্য পূর্ব্বে তাঁহাদের মহারাজাকে খাজনা দিতে হইত, নিষ্কর' বা 'ছাড়' করাইয়া লইয়াছিলেন। প্রত্যেক গ্রামেই এখনও দুই চারিজনের কাছে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের "ছাড়" দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল নিষ্কর যথার্থরূপেই "সিদ্ধ নিষ্কর" নহে, যাহাকে বলে "থামকাটা লাখেরাজ" তাহাই।

এক্ষণে এই বাস্তুভিটা জমীর পরিমাণ কত? ইং ১৯৪৬ সালে বাংলা সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ইসাহক্ রিপোর্টে দেখা যায় যে মোট জমীর পরিমাণ ৪৩,১৭২,০৫৯.৪৩ একর; আর ইহার মধ্যে ভিটা ইত্যাদির পরিম্যাণ ৩৭৮,৪১৮,৯৯ একর। শতকরা ৩৮'৮ একর বা ২'৬৪ বিঘা করিয়া হইতেছে গড়ে ভিটা বাড়ির পরিমাণ। এক্ষণে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় অপেক্ষা লোক-সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছে, কাজে কাজেই লোকে আজকাল ঘেঁষাঘেঁষি বাস করে ধরিয়া তখনকার দিনে প্রত্যেক "ঘরের" ৫ বিঘা করিয়া জমীর উপর ভিটা-বাড়ি ছিল ধরিয়া লইলাম। এই অনুমান সত্য হইলে মহারাজা নদীয়া-রাজ্যের ৬,৩৬০ "ঘর" ব্রাহ্মণকে নিষ্কর করিয়া দিয়াছিলেন ৬,৩৬০ × ৫ = ৩১,৮০০ বিঘা জমি।

বাকী ২,৫২,০৮০—৬১,৮০০ = ২১০২৮০ বিঘা তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ব্রহ্মোত্তর স্বরূপে বা টোলের জন্য নয় বৃত্তি স্বরূপে দান করিয়াছেন। ৭৮,০০০ "ঘর" ব্রাহ্মণের মধ্যে বর্দ্ধমান বা প্রেসিডেন্সী বিভাগে বাস করেন শতকরা ৬৮ ২ জন, অর্থাৎ ৫৩,১৯৬ "ঘর"। ইহাদের মধ্যে পণ্ডিত, সর্ব্ব-রাজ্য মান্য, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের সংখ্যা শতকরা দশজন করিয়া ধরিলে বেশী ধরা হয় বলিয়া আমাদের ও যাঁহাদের সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি তাঁহাদেরও মত। দক্ষিণবঙ্গে ৫৩২০ "ঘর" ব্রাহ্মণ ব্রহ্মোত্তর দান পাইবার যোগ্য। ইঁহাদের মধ্যে মহারাজা দিয়াছেন বাকী ২,২০,০০৯ বিঘা জমী; গড়ে প্রত্যেক "ঘর" পাইয়াছেন ৪১ ৪২ বিঘা করিয়া জমী।

কিছুসংখ্যক ব্রাহ্মণ তাঁহাদের বাসস্থানের দূরত্ব হেতু, যেমন মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ার প্রান্তবাসী, এই দানের সুযোগ গ্রহণ করিতে পারেন নাই; আবার কিছুসংখ্যক ব্রাহ্মণ লজ্জা বশতঃ এই দান করেন নাই; আবার কিছু সংখ্যক ব্রাহ্মণ, পূর্ব্ব হইতে অন্যান্য জমীদারগণ কৃত ব্রহ্মোত্তরের অধিকারী হওয়ায়, এই দানের অনুপযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় বা দান গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক থাকায়, দান পান নাই। মোটামুটি হিসাবে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ গড়ে ৫০/ বিঘা করিয়া ব্রহ্মোত্তর পাইয়াছিলেন।

২৩। মহারাজার এই ব্রহ্মোত্তর দানের ফল দক্ষিণ-বঙ্গের প্রায় সমস্ত ব্রাহ্মণ সমাজ পাইয়াছিলেন এবং কৃতজ্ঞচিত্তে মহারাজার মহানুসরণ করিয়াছিলেন। শুধু যে মহারাজার সহিত তাঁহাদের দাতা-গৃহীতা সম্পর্ক ছিল তাহা নহে; মহারাজা নিজে নিষ্ঠাবান, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে আস্থাশীল, ক্রিয়াবান ও ইহার পৃষ্ঠপোষক। এই সব কারণে মহারাজার ব্রাহ্মণ-সমাজের উপর প্রভাব অসীম।

সমগ্র হিন্দু সমাজের উপর, বিশেষ করিয়া কায়স্থ আদি ভদ্রজাতিদের মধ্যে, ব্রাহ্মণদের প্রভাব খুব বেশী ছিল। তাঁহারা স্মৃতি অনুযায়ী ব্যবস্থা অনুযায়ী মায়ের গঙ্গা-যাত্রা, নিজের প্রায়শ্চিত্ত হইতে দায়-ভাগ অবধি জীবনের সর্ব্ব-কর্ম্ম চলিত। আর সে যুগে ব্রাহ্মণদের চরিত্রবল খুব বেশী ছিল; সহজেই তাঁহারা সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেন।

মহারাজা নিজ চরিত্রবলে, বুদ্ধিবলে প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষে ব্রাহ্মণ-সমাজের মধ্য দিয়া সমগ্র হিন্দু-সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে, তাঁহার সময়ে বা তাঁহার পরে আর কেহ ছিলেন না বা হয়েন নাই।

২৪। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ৮৪ পরগণার (আমরা ফার্মিঙ্গারের সম্পাদিত ফিফ্‌থ রিপোর্টে ৮২ পরগণার উল্লেখ দেখিতে পাই) ও চারি সমাজের সমাজপতি ছিলেন। ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলের "গ্রন্থ-সূচনা" অধ্যায়ে (সাঃ পঃ সংস্করণের ১৭ পৃঃ) লিখিয়াছেন:—

"নদীয়া প্রভৃতি চারি সমাজের পতি।
কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ শুদ্ধশান্ত মতি॥"

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় "বাংলার পাল-পার্ব্বণ"-এ লিখিয়াছেন। "দুর্গাপূজার পরেই ব্যাপকতার দিক হইতে কালীপূজার নাম করা যাইত × × × তবে দীপান্বিতা কালীপূজা সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয়। কিন্তু এই পূজার খুব প্রাচীন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রাচীন কোনো স্মৃতি গ্রন্থে ইহার উল্লেখ নাই। তন্ত্রসার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক নিবন্ধগুলিতে কোনো উৎসবেরই উল্লেখ পাওয়া যায় না। ১৬৯৯ শকাব্দে (১৮৭৮ সাল) রচিত কাশীনাথের অপেক্ষাকৃত আধুনিক শ্যামাপূজাবিধিতে এই পূজার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। কাশীনাথ পুরাণ ও তন্ত্র হইতে নানা বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন—দীপান্বিতা অমাবস্যার দিন কালীপূজার অনুষ্ঠান প্রশস্ত। ইহা হইতে সন্দেহ হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকেও এই পূজা তেমন প্রসিদ্ধিলাভ করে নাই। এই কারণেই বোধ হয় নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার সকল প্রজাকে এই পূজা করিতে আদেশ দিয়াছিলেন এবং জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, পূজা না করিলে গুরুদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। এই আদেশের ফলে প্রতিবৎসর দীপান্বিতার দিন নদীয়ায় দশ সহস্র কালীমূর্ত্তি পূজিত হইতে থাকে?" পৃ ৩১ তিনি Wordএর A View of the History, Literature and Mythology of the Hindus" পুস্তকের ২।১২৪ এর নির্দেশ দিয়াছেন।

ইং ১৯৫৯ সালের ২৯শে অক্টোবর তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় আছে:—

"বঙ্গদেশে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজার প্রবর্তন সম্পর্কে অনেকের ধারণা যে, গুরুর আজ্ঞায় বা স্বপ্নাদেশে কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র সর্বপ্রথম মৃন্ময়ী প্রতিমা গঠন করাইয়া শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজা করেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপৌত্র গিরীশচন্দ্রের সময় এই স্থানের চন্দ্রচূড় তর্কচূড়ামণি নামক এক নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কর্তৃক শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী মাতার মূর্ত্তিপূজা প্রথম প্রচলিত ও পূজাপদ্ধতি

বিধিবদ্ধ হয় এবং কৃষ্ণনগর রাজবংশের চেষ্টায় ইহা ক্রমে সাধারণে প্রচলিত হয়।"

চন্দননগরের ফরাসী সরকারের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীই নাকি ঐ অঞ্চলে সর্ব্ব-প্রথম জগদ্ধাত্রী পূজা করেন। ইন্দ্রনারায়ণ কৃষ্ণচন্দ্রের সমসাময়িক এবং তাঁহার সহিত হৃদ্যতা ছিল। এমতে মনে হয় কৃষ্ণচন্দ্রই এই পূজার প্রবর্ত্তক। গিরিশচন্দ্রের তাদৃশ প্রতিপত্তি ছিল না। চিন্তাহরণবাবু লিখিয়াছেন যে:—"অনেকের ধারণা, জগদ্ধাত্রী পূজা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। কিন্তু এ ধারণা অভ্রান্ত বলিয়া মনে হয় না। বৃহস্পতি ও শ্রীনাথ দুইজনেই এই পূজার উল্লেখ করিয়াছেন। [কৃত্যতত্ত্বার্ণব ১১৫ পৃঃ ও বর্ষক্রিয়া কৌমুদী ৫২৩ পৃঃ] সর্ব্বত্র এই পূজার তেমন প্রচলন নাই সত্য, তবে কৃষ্ণনগর, চন্দননগর প্রভৃতি স্থানে ইহার জনপ্রিয়তা দুর্গাপূজার অপেক্ষাও বেশী।"

কলিকাতার হাটখোলার দত্তবাটিতে জগদ্ধাত্রী পূজা হয় না কেন মহামহোপাধ্যায় চণ্ডীচরণ তর্কতীর্থ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন যে জগৎরাম দত্ত যখন নিমতলাঘাট ষ্ট্রীটে নূতন ঠাকুর-দালান করিয়া পূজাদি আরম্ভ করেন তখন তাঁহাকে জগদ্ধাত্রী পূজা করিতে বলায় তিনি 'নূতন পূজা' করিতে অনিচ্ছুক হয়েন। এই ঠাকুর দালান ওয়ারেন হেষ্টিংয়ের পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন যে "চৈত্রের শুক্লা অষ্টমীতে অনুষ্ঠিত বহুপ্রচলিত অন্নপূর্ণা পূজার সুস্পষ্ট উল্লেখ প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। তবে গোবিন্দানন্দ কর্ত্তৃক কালিকাপুরাণ হইতে উদ্ধৃত একটি বচনে এইদিনে দুর্গাপূজার বিধান দেওয়া হইয়াছে। আবার বৃহস্পতি, শ্রীনাথ ও গোবিন্দানন্দ এই তিনজনেই দেবীপুরাণ হইতে যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে নবমীর দিন মহিষমর্দিনীর পূজার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা হইয়াছে। অথচ ইঁহারা কেহই এই সময়ে বাসন্তী দুর্গাপূজার উল্লেখ করেন নাই। মনে হয় তাঁহাদের সময়ে চৈত্রমাসে দেবীর এক দিনের পূজোৎসব প্রচলিত ছিল। তাহাই কালক্রমে অন্নপূর্ণা পূজার রূপ ধারণ করিয়াছে।"

ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ ফসল-রাজস্ব দিতে না পারায় কয়েদ করেন (আনুমানিক ইং ১৭৪২ এর পরে ২।১ বছরের মধ্যে) তখন—

"অন্নপূর্ণা ভগবতী মূরতি ধরিয়া।
স্বপন কহিলা মাতা শিয়রে বসিয়া॥
শুন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র না করিহ ভয়।
এই মূর্ত্তি পূজা কর দুঃখ হবে ক্ষয়॥
চৈত্র মাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমী নিশায়।
করিহ আমার পূজা বিধি ব্যবস্থায়॥
সেই আজ্ঞা মত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়।
অন্নপূর্ণা পূজা করি তরিলা সে দায়॥"

মহারাজা অন্নপূর্ণা পূজা করিলে তাঁহার দেখাদেখি অন্যান্যরাও এই পূজা করেন।

দেখা যায় যে বাংলার তিনটি বিশিষ্ট দেবীপূজা, শ্যামাপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা ও অন্নপূর্ণাপূজার মহারাজা প্রবর্ত্তক না হইলেও বহুল প্রচারক। আরও ছোটখাট কি কি পূজার প্রবর্ত্তন বা লুপ্ত বা প্রায়-লুপ্ত পূজার প্রবর্ত্তন বা উদ্ধার করিয়াছিলেন তাহা সঠিক ভাবে জানিতে পারি নাই। শুনিতে পাওয়া যায় যে যাঁহারা নদীপথে প্রায়ই ভ্রমণ করেন তাঁহারা দশহরার দিনে মূর্ত্তি গড়িয়া গঙ্গাপূজা করিলে মঙ্গল হয়—মহারাজা এই ব্যবস্থা পণ্ডিতগণের দ্বারা আবিষ্কার করিলে তাঁহার "দেয়ানের পেশকার বসু বিশ্বনাথ"-এর দেশ—শান্তিপুরের নিকট বাগাচড়ায় তাঁহাদের বাড়ি—এইরূপ গঙ্গাপূজার প্রবর্ত্তন হয়।

শুনা যায় যে পূর্ব্বে দুর্গাপূজার ভাসানের সময় কোন বাড়ির দুর্গাপ্রতিমা আগে যাইবে তাহা লইয়া রেষারেষি' এমন কি লাঠালাঠি হইলে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র এই নিয়ম করিয়া দেন যে যাহার বাড়িতে আগে দুর্গাপূজা আরম্ভ হইয়াছে, তাঁহাদের প্রতিমা আগে যাইবে। এইরূপ পর পর ঠাকুর ভাসান হইবে। এই কথা আমরা ২৪ পরগণাও হুগলীর ভাগীরথী কূলে কয়েকটি গ্রামে শুনিয়াছি।

মুঙ্গেরে (বিহার রাজ্যে) সর্ব্বপ্রথম মেথরদের পূজিত দুর্গাপ্রতিমা যায়, ধুমধাম বিশেষ নাই, তাহার পর বিহারীদের অর্চ্চিত 'বড়ি দুর্গা' যায়েন—খুব বাদ্যোদম ও রোশনাই সহ, এইরূপ পর পর ছোট বড় অনেক ঠাকুর ভাসান যায়। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বিহারীবাবুরা বলেন যে মেথররা সর্ব্বপ্রথম দুর্গাপূজা করে, সেইজন্য তাহাদের ঠাকুর আগে যাইবে—এই নিয়ম নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র করিয়াছেন। মুঙ্গেরের সহিত কৃষ্ণচন্দ্রের সম্পর্কের মধ্যে দেখিতে পাই যে নবাব মিরকাশিম তাঁহাকে মুঙ্গেরের কেল্লায় কিছুকালের জন্য আটক রাখেন এবং তাঁহাকে থলির ভিতর পুরিয়া গঙ্গায় ডুবাইয়া মারিবার হুকুম দেন। হুকুম তামিল হইবার পূর্ব্বেই জেনারেল এলারবার আসিয়া পড়ায় নবাব পলাইয়া যায়েন ও কৃষ্ণচন্দ্র রক্ষা পায়েন। আমাদের মনে হয় মহারাজার নিয়মের যুক্তিযুক্ততা সকলেই মানিয়া লইয়াছেন। এমতে মহারাজার প্রভাব খুব দূরপ্রসারী ও হিন্দুসমাজের কল্যাণকর।

ঢাকার রাজা রাজবল্লভ বিধবা-বিবাহের স্বপক্ষে কাশীকাঞ্চী হইতে ও বাংলাদেশের বড় বড় পণ্ডিতদের মত সংগ্রহ করেন; কিন্তু মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বিরোধিতায় বাংলার বিধবা-বিবাহ চলে নাই। সকলেই মহারাজার মত মানিয়া লইয়াছিলেন। কেন যে তিনি বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা আমরা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি।

২৪পরগণা জেলার কত ব্রাহ্মণ ভাগীরথীতীরস্থ 'গঙ্গাক্ষেত্রে' বাস করে এই বিষয়ে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে তথ্যগুলি দেওয়া যাউক। ইং ১৯১১ সালে ২৪পরগণা জেলায় মোট ব্রাহ্মণের সংখ্যা ছিল ৯১,০০৩ জন। আয়তন ৪,৮৪৪ বর্গমাইল।

থানাওয়ারী হিসাবে আয়তন

থানা	সংখ্যা	বর্গমাইল
নৈহাটি	৮,৬১৮	৯৬
দমদম	১,২৫৪	৫০
খড়দহ	২,২৩৩	৯৭
নোয়াপাড়া	৫১৮	৯৭
বারাকপুর	৫,৯৩০	১৩
বরাহনগর	৯,৯২৬	৮
বারাসত	৫,৪৫৪	৯৮
	২৯,৯২৩	২৮৮

কাশীপুর-চিৎপুর মানিকতলা ও গার্ডেন রীচ মিউনিসিপ্যালিটি	৭,৮৪০	১০

বারুইপুর	৪,১২৬	৯৫
জয়নগর	৫,০৩৫	৬০
সোনারপুর	৫,০১৮	৪১
বেহালা	১,৩০৬	৩৭
	১৫,৪৮৫	২৩৩

বারাকপুর হইতে বারাসতের দূরত্ব ৮ মাইলের মধ্যে। থানার সমস্ত এলাকা কিন্তু ৮ মাইলের মধ্যে নহে। দমদম থানার সবটাই ভাগীরথী হইতে ৮ মাইলের মধ্যে। কাশীপুর-চিৎপুর ও মানিকতলা মিউনিসিপ্যালিটির সবটাই ৮ মাইলের মধ্যে। গার্ডেন-রীচ হুগলী নদীর (গঙ্গার) তীরে হইলে 'কাটি-গঙ্গা' বলিয়া গঙ্গার মাহাত্ম্য ইহাতে নাই। এই সব মিউনিসিপ্যালিটির জন সংখ্যা ছিল :—

	১৯১১	আয়তন
কাশীপুর চিৎপুর	৪৮,১৭৮	৩'২
মানিকতলা	৫৩,৭৬৭	৩'৪
গার্ডেন রীচ	৪৫,২৯৫	৩'৪

কাশীপুর-চিৎপুরে হিন্দুর সংখ্যা খুব বেশী, মানিকতলা ও গার্ডেন-রীচে মুসলমানের সংখ্যাধিক্য। এজন্য আমরা গার্ডেন-রীচকে পূর্ব্বোক্ত কারণে বাদ দিয়া বাকী ২টী মিউনিসিপ্যালিটিতে ব্রাহ্মণের সংখ্যা ৭,৮৪০এর ২/৩ অংশ ধরিলাম।

আদিগঙ্গার তীরবর্তী বারুইপুর আদি ৪টী থানায় ব্রাহ্মণের সংখ্যা হইতেছে ১৫৫৮৫ জন। এক্ষণে আদি-গঙ্গা বহতা নাই বলিলেই হয়; তথাপি স্থানীয় লোকে এই আদিগঙ্গার খাদের জলের মাহাত্ম্য আছে বলিয়া স্বীকার করে। আরও একটা আশ্চর্য্যের বিষয় এই—আদি-গঙ্গার খাদের জলে সহজে পোকা হয় না; পার্শ্ববর্তী দীঘির জলে হয়। "গঙ্গাক্ষেত্রে' বাস করে ব্রাহ্মণের সংখ্যা প্রথম ৭টী থানা ধরিয়া ২৯,৯৩৩ জন। কাশীপুর-চিৎপুর প্রভৃতি এলাকার লোক (২/৩ ধরিয়া) যোগ করিলে হয় ৩৫,১৫৯। মোটামুটী ৩৫ হাজার ধরিলে জেলার ব্রাহ্মণদের মধ্যে শতকরা ৩৮'২ জন গঙ্গা-ক্ষেত্রে বাস করেন। আর আদি-গঙ্গার তীরবর্ত্তী ৪টী থানার ব্রাহ্মণদের যোগ করিলে এই অনুপাত বাড়িয়া হয় শতকরা ৫৫'৬ জন। আমরা সর্ব্বাপত্তিখণ্ডনার্থ এই অনুপাত শতকরা ৬৩জন ধরিলাম।

সমগ্র ২৪পরগণার আয়তন ধরিলে প্রতি বর্গমাইলে ব্রাহ্মণের সংখ্যা ১৮'৮ বা ১৯জন করিয়া। গঙ্গা বা ভাগীরথীতীরবর্ত্তী প্রথম ৭টী থানার প্রতি বর্গমাইলে ১০৪ জন; কাশীপুর-চিৎপুর প্রভৃতি ৩টী মিউনিসিপ্যালিটিতে ৭৮৪ জন করিয়া; আর আদি-গঙ্গার তীরবর্ত্তী ৪টী থানায় ৬৬জন করিয়া।

আদি-গঙ্গা মজিয়া গিয়াছে ২০০ বৎসরের উপর, আর বর্ত্তমানে ভাগীরথীতীরে বা গঙ্গাক্ষেত্রে বাস করিবার আগ্রহে বহু ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন এই ২০০ বৎসরের মধ্যে। তথাপি আদি-গঙ্গার তীরে ব্রাহ্মণ-বসতির ঘনত্ব ভাগীরথীতীরবর্ত্তী বসতির ঘনত্বের প্রায় ২/৩ অংশ হইতেছে।

হাওড়া ও হুগলীজেলায় ব্রাহ্মণদের সংখ্যা যথাক্রমে ৭৯,৯১৯ ও ৮৮,৯৭২জন। ইহার মধ্যে গঙ্গাতীরবর্ত্তী থানায় ব্রাহ্মণদের সংখ্যা হইতেছে :—

হাওড়া	২৯,৬৫২	বলাগড়	৩,৩০৪
বালি	৬,২৭৪	চুঁচুড়া	৫,৭৭৫
সাঁকরেল	৩,৫১০	চাতরা	২,৩০৭
	৩৯,৪৩৬	শ্রীরামপুর	১২,০০৬
হাওড়া জেলার শতকরা	৫০'৬	উত্তরপাড়া	৮,৯০৪
		ভদ্রেশ্বর	৩৫১৮
			৩৮,৮৯৪
		হুগলীজেলার শতকরা	৪৬২

২৪পরগণা, হাওড়া ও হুগলীর তিনটি জেলার সমষ্টির শতকরা ৪৭ জন গঙ্গাক্ষেত্রে বাস করে।
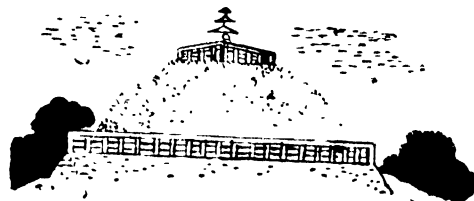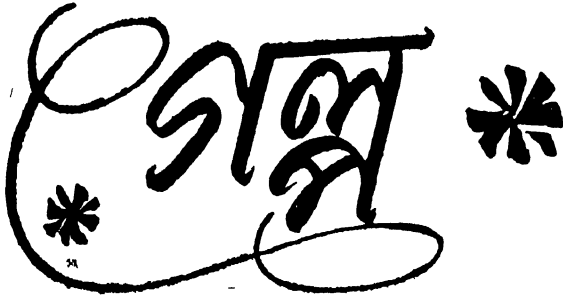
একটি ছবি

গৌর আদক

চারিদিক নিস্তব্ধ—বাহিরের শ্রাবণের ধারার একঘেঁয়ে সুর, ভিতরে টাইম-পিসের টিকটিক্ শব্দ রাত্রির স্তব্ধতাকে বার বার আঘাত করছে। চারিদিকে জিনিষপত্র ছড়িয়ে গেছে। এই রকম অবস্থা কতদিন চলবে বলতে পারি না। বাহিরের বারান্দায় প্রভুভক্ত হরির নাসিকাধ্বনি গভীরতা ভেদ করে তীব্র স্বরে বেজে যাচ্ছে! শত চেষ্টা করেও আরাধ্য নিদ্রা-দেবীর কৃপাদৃষ্টি এই চক্ষু-যুগলের দিকে ফেরাতে পারলাম না। ক্রমে অবস্থা সহ্যের সীমা অতিক্রম করে চলেছে।

প্রথমেই ভুল করলাম—পারিবারিক জীবনে নিজের নিঃসঙ্গতার কথা বলা হয়নি। গৃহিণী শূন্য গৃহ, গৃহিণীর প্রয়োজন হয়নি, তাই অনাবশ্যক বোঝার পরিকল্পনা গ্রহণ করি নাই। বেশ আরামেই ছিলাম একটি বাংলো দখল করে, অভাব ছিলনা কিছুই—হরিহর-আত্মা হরির প্রভুর সেবায় পরিচিত ভুক্তভোগীদের সংসার যন্ত্রণার বাহুল্য-বর্জিত হতাশায় তৃপ্তি অনুভব করতাম। মেসে বা কোন হোটেলে যাই নাই—প্রাতে ২ টাকা বাঁচাইতে গিয়া জীবন-যাত্রা প্রণালী অসহ্য হয়ে ওঠে। সিঙ্গল সীটের রুম বহুকষ্টে অন্যায় সেলামী দিয়ে আদায় করলেও তাতে লাভের আশা খুব কমই থাকে। যে কোন রেস্তোরায়ই অবিবাহিত ভদ্রলোকের ঘরটি বারোয়ারী-তলার বৈঠকখানায় পরিণত হয়। তাই প্রভুভৃত্য উভয়েই একান্ত আপনজন হয়ে একটি বাংলো নিয়েছিলাম। সামনে ছোট্ট বাগান; তারমাঝে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ছোট দখিণ-মুখো দুটো কোঠা। ৬১৲ টাকা ভাড়া সুবিধাই ছিল।

কিন্তু হঠাৎ সরকারী সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্টের উচ্ছেদ সাধনে বহুকিছু ওলটপালট হয়ে গেল। ১৫ হাজার কর্মচারীর ছাঁটাই অর্ডার এলো—৫০ হাজার লোকের অনাহারে মৃত্যুর পুর্বে ঘোষণা করা হলো, আর আমরা যারা নিজের স্থায়ী পদে আবার ফিরে এলাম তাদেরও কম অসুবিধায় পড়তে হলো না। এককথায় একরাশ মাহিনা কমে গেল, তার উপর এদিকওদিকের আয়ের আশাও ত্যাগ করতে হলো—তাই বন্ধুবর অনুপমের আত্মীয়ের পরিত্যক্ত ৩০৲ টাকার বাড়িতে রাতারাতির মধ্যে চলে এলাম।

এই বাড়ী বদল করতে গিয়ে একবার মনে জাগল গৃহিণীর অভাব। এই সময় তীক্ষ্ণ ঈর্ষা অনুভব করলাম—বন্ধুগণের কথা স্মরণ করে। যাই হোক, উপস্থিত সর্বচিন্তা ত্যাগ করে গভীরভাবে নিদ্রাদেবীর আরাধনায় রত হলাম। কিন্তু সব সাধনাই ব্যর্থ হলো। মাথার কাছে জানালাটা ঝড়ো হাওয়ায় খুলে গেলো, উঠে পড়লাম। বৃষ্টি একটু কমেছে। কালো পর্দার গায়ে জড়িয়ে চুমকির মত দুচারটে তারা বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে আছে। কোন এক অজানা অনুভূতিতে মনটা ভরে উঠলো। আস্তে আস্তে জানালাগুলো ভালো করে খুলে দিলাম। এমন সময় আমার অনুসন্ধানী দৃষ্টি ঘরের দেওয়াল আলমারীর খোলা দরজায় গিয়ে ধরা পড়ল! তাকের উপর ব্রাউন কাগজে মোড়া একটী যেন কি দেখা যায়। এগিয়ে এসে সেটা হাতে তুলে নিলাম, লাল রিবনে বাঁধা। কৌতুহল দমন করা অসম্ভব হয়ে পড়ল। খুলে ফেললাম প্যাকেটটা। বিস্ময় জানার আগ্রহকে অতিক্রম করল। একটী সুন্দর কারুকার্য্য-বহুল ফ্রেমে বাঁধান ফটো। অবাক হয়ে দেখলাম—কি অপূর্ব্ব সুন্দর ছবি। অসাধারণ লাবণ্যমণ্ডিত তলতলে একটী তরুণীর আকৃতি। নিখুঁত একটী মুখমণ্ডল—ভাসা-ভাসা কালো ভ্রমরের মত চোখ, সব মিলিয়ে কি যেন এক মায়া মেশান। মনে হয় জীবন্ত কোন তরুণী আমার দিকে সলজ্জ দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে। বঙ্কিম ভ্রূযুগলে

যেন অজানা শিল্পী তাঁর প্রতিভার সব কিছু ঢেলে দিয়েছেন, তারি মাঝে ছোট্ট একটি টিপ—সব কিছু মিলিয়ে যেন স্বপ্ন রাজ্যের মানসী মুর্ত্তির একটি রূপ চোখের সামনে ভেসে উঠলো। অবাক হয়ে দেখতে লাগলাম—কি এক অজানা আবেশময় অনুভূতিতে প্রাণ-স্পন্দন দ্রুত হতে আরম্ভ করল। যেন একটী সুন্দরী তরুণী আমার সামনে বসে আছে। পাতলা দুটি ঠোঁটে হাসির আভাস। বয়স বোধ হয় ২০।২২-ই হবে, কিন্তু কোমলতায় আরো কমই দেখায়। অযত্নে রক্ষিত কেশরাশির দু-এক গাছি কপালে মুখের সামনে এসে তাকে অনিন্দ্যসুন্দরী করে তুলেছে। এত সুন্দরী তরুণীর কত চমৎকারই না নাম। স্বপ্না, মালবিকা, পাপিয়া—না হয় তনিমা, পরাগ অথবা অনিলা, মৃদুলা, কিছু একটী। কয়েক মুহূর্ত্তে মনের একান্তে লুকানো স্থানে একটি অনুরাগের রেখা দেখা দিল। নিজের আগতপ্রায় প্রৌঢ়ত্বের কথা একেবারেই ভুলে গেলাম, একটী স্নেহ-কোমল স্পর্শের অভাব ভাবে অনুভব করলাম, যে বেদনা চেপে রাখাও যায় না—আবার প্রকাশ করার সহজ-ভঙ্গিও আসে না। তরুণীর এখনো বিয়ে হয়নি, হয়ত চেষ্টা সন্ধান মিলতে পারে। নিজেকে ভয়ানক অসহায় মনে হলো। জীবনসঙ্গিনী ভিন্ন জীবনের সার্থকতা—অন্ধকারে তার সত্যতা উপলব্ধি করলাম। নিজের বয়সের দ্বিধা চলে গেলো। পুরুষ তো হাতের আংটী যখনই পরবে তখনই জ্বলবে। তার আবার বিয়ের বয়স! ২৫ বছরে বিয়ে করলেও যা—৪৫ বছরে করাও তাই। যখন মন প্রস্তুত হবে তখনই বিবাহ সম্ভব। হঠাৎ কল্পনারাজ্যে ছেদ পড়ল। কে এই তরুণী? গতকাল শৈলেনবাবুরা চলে গিয়েছেন। তাঁরা নিশ্চয়ই এটা ফেলে গিয়েছেন। বন্ধুবর অনুপমের কাছে শুনেছি শৈলেনবাবুর একটী বিবাহযোগ্যা কন্যা আছেন। হঠাৎ লক্ষ্য পড়ল ছবির তলায় ফ্রেমের উপর ছোট্ট করে লেখা আছে—Portrait by—Borne and Shepherd, Calcutta. বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠলো—কিছুদিন আগে অনুপ বলেছিলো সে একটীবার Boune and Shepherd এ যাবে একটী ছবি আনতে। যেতেই হবে—বিশেষ লোকের ছবি, সেদিন আমি হেসেই জবাব দিয়েছিলাম—গিন্নীর নাকি? সে বলেছিলো "এক রকম তাই হবে।" হঠাৎ একটা ঘন অন্ধকারময় মেঘের চিন্তাকাশে সন্দেহের রেশ দেখাদিল। তবে কি এই জন্য অনুপ রোজই অফিস-ফেরতা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ত ব্যারাকপুরের এই বি, টি, রোডের উদ্দেশ্যেই? শুনেছি শৈলেনবাবুরা ঢাকায় তাদের বাড়ির পাশেই ছিলেন। তা সত্ত্বেও সে নিরপরাধী সুনন্দাকে বিয়ে করল। আবার তারই সরলতার সুযোগ নিয়ে নিজের অমার্জ্জনীয় শৈশব প্রণয়ের রস আস্বাদন করছে। সমস্ত মনটা বিরক্তিতে ভরে উঠলো। ছিঃ ছিঃ—আমার বন্ধু হয়ে তার প্রবৃত্তি এত ছোট। নিজের স্ত্রী বর্ত্তমান থাকতে সে অপরের সঙ্গে প্রণয় করে বেড়াচ্ছে। এক বেদনা অনুভব করলাম। মনের মধ্যে অব্যক্ত চিন্তা করতে করতে কখন ভোরে কাক ডেকে উঠলো বুঝতে পারলাম না।

সকাল বেলা একটু তন্দ্রাচ্ছন্নর মতন পড়ে আছি হঠাৎ অনুপের স্বর কানে গেল "শ্যামলদা এখন ঘুমচ্ছ নাকি?" মুহূর্ত্তের মধ্যে বিদ্রোহের অগ্নি মনের মধ্যে জ্বলে উঠলো। ফটোটা তাড়াতাড়ি মাথার বালিশের তলায় চেপে রাখলাম। অনুপ এসেই বক্তৃতা আরম্ভ করল—আজকে তোমাকে আমার বাসায় যেতে হবে। নন্দাতো সকাল হতে না হতেই তাগাদা দিচ্ছে—"শ্যামলদার নিশ্চয় রাত্রে ঘুম হয়নি—তুমি খোঁজ নিয়ে এসো।" যাক ভালো কথা, শৈলেনবাবু কাল দেশে যাবার আগে বলে গেলেন—তাঁদের একটা ফটো ফেলে গিয়েছেন, তুমি পেয়েছো নাকি? অকস্মাৎ সুনন্দার করুণ মুখখানি চোখের সামনে ভেসে উঠলো। আমি অবলীলাক্রমে মাথা নেড়ে অস্বীকার করলাম। মনের ঘৃণা আরো জমে উঠলো। সুনন্দার জন্য বেদনা অনুভব করলাম। শয়তান অনুপ সকাল না হতে হতেই ফটোটীর তাগাদায় এসেছে। অনুপ নিজেই তন্ন তন্ন করে ঘরের মধ্যে অনুসন্ধান করে রান্নাঘরে হরির সন্ধানে গেলো। আমি তারি মধ্যে ফটোটী একেবারে গদীর তলায় লুকিয়ে রাখলাম—নিজের গোপনীয় একান্ত আপনার জিনিষ হারিয়ে যাবার ভয়ে। অবোধ হরি স্বীকার করলো—আলমারীর মধ্যে সে রাত্রি বেলা হলদে কাগজে জড়ানো একটী জিনিষ দেখেছিল। অনুপ ক্ষীণ অনুযোগের সহিত বল্ল—"কাল রাত্রে ছিল অথচ আজ সকালের মধ্যে কোথায় গেলো বলতো?" অনুপ বলে যেতে লাগলো—আহা ছবিটি পাওয়া গেল না। এটা শৈলেনবাবুর দিদিমার ছবি। গত বছর ভিসা হওয়ার পর

তিনি পাকিস্তান থেকে এই বাড়ীতে এসেছিলেন। তাঁর বয়স একশত বৎসর পূর্ণ হওয়ায় শৈলেনবাবু কত ঘটা করেই না তাকে নূতন ভাত খাওয়ালেন, কারণ শৈলেনবাবুর মা মারা যাবার পর তিনিই শৈলেনবাবুকে মানুষ করেছিলেন। তাই তিনি স্পেশাল চার্জ্জ দিয়ে তাঁর ছোটবেলাকার একট ছোট ফটো থেকে নূতন করে এনলার্জ করলেন। তারপরই দিদিমা মারা গেলেন। অল্পদিনেই আমাকে কতখানি না ভালবেসেছিলেন। তখন আর চোখে ভাল দেখতে পেতেন না। তবুও একদিন আমাদের বাড়ীতে গিয়ে নন্দাকে বলে এলেন, জামাই তোর চেয়ে আমাকে বেশী ভালবাসতে আরম্ভ করেছে। তাই আমিও মাঝে মাঝে তাঁকে বড়-গিন্নী বলে ডাকতাম। সব শেষ হয়ে গেলো। অনুপ একটা গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করলো। "আগামী পরশু তার মৃত্যুবার্ষিকী—তার আগেই ফটোটি শৈলেনবাবুকে খুঁজে পাঠাতে হবে। অকস্মাৎ বজ্রাঘাতে আমার তলাকার মাটি যেন সরে গেলো। আমি বেত্রাহত শিশুর মত অপরাধীর মুখে জিজ্ঞাসা করলাম--কি নাম ছিল রে? অনুপ উত্তর দিল—মাতঙ্গিনী দাসী।—হঠাৎ উঠে পড়লাম, বিছানা মাদুর তোলপাড় করে অনুসন্ধানের ভঙ্গীতে ছবিটা ফেরত দিলাম। আমার জীবনের একটামধুরাত্রির সমাপ্তি হলো একটি ছবিতে।

পাখির ডাক

শ্রীপ্রভাতকুমার শর্ম্মা

অবসরে শুনি ফাঁকে ফাঁকে
পাতার আড়াল হ'তে পাখিগুলি ডাকে শুধু ডাকে--
ডাকে বারবার
ভুলিয়া তৃষ্ণার বারি ক্ষুধার আহার।
সুমিষ্ট সতেজ কণ্ঠ ভাবোদ্দীপ্ত সুর
ঊর্দ্ধে উঠি স্তরে স্তরে
চৌদিকে পড়িছে ঝরে
বিছানো রৌদ্রের মত সঙ্গীত প্রচুর।
সুরের লহরী তুলি এরা ডাকে কারে
কোন সুদূরের দেবতারে
বারে বারে করি স্তুতিগান
করিছে আহ্বান
আপন জীবন উপচারে
পূর্ণকণ্ঠ সঙ্গীতের ধারে?
এরা ডাকে যারে
সে রয়েছে আপনার মর্ম্মের মাঝারে
আপনার হ'তে সে আপন
হৃদয় রতন।
আপনারে খুঁজিয়া না পায়—
আপন ছায়ায়
আপনারে করেছে অন্তর—
তাই নিরন্তর
আপনারে ডাকে আর ডাকে—
অবসরে শুনি ফাঁকে ফাঁকে।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

এ গল্পটি সেদিন প্রিয়দাবাবুর কাছে করতে পারতাম, যখন তিনি জ্যোতিষ সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। ঐ সঙ্গে আরো একটি ভবিষ্যদ্বাণীর কথা বলবার লোভ সামলেছিলাম অনেক কষ্টে—বৈজ্ঞানিক তো, অবৈজ্ঞানিক সত্যকে পেশ করতে ভয় করবে না? তবে গল্পটি আজ ব'লেই ফেলি যখন প্রসঙ্গ উঠল।

ইন্দিরার এক প্রিয় মুসলমান সখা বেলার বেগম ও তার ভাই সুলতান জোর ক'রে ইন্দিরার হাতের ছাপ নিয়ে তার নাম ধাম না ব'লে নরওয়েতে সিকেলকো রীড নামে এক সন্ন্যাসীকে (মঙ্ক) পাঠায়—১৯৪৫ সালে। সুদূর তুষারের দেশে রীড সাহেব এ ছাপ দেখে অভিভূত হ'য়ে ২৩শে মার্চ ১৯৪৫ সালে এক দীর্ঘচিঠি লেখেন ইংরাজিতে। এ-পত্রের কপি আমি শ্রীঅরবিন্দকে পাঠিয়েছিলাম—কারণ এ-করকোষ্ঠির সাড়ে পনের আনা মন্তব্য তথা ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছিল। তার মধ্যে শুধু দুটি পাঠের কথাই বলব আজ। রীড সাহেব ইন্দিরা সম্বন্ধে কিছুই না জানা সত্ত্বেও নরওয়ে থেকে সুলতানকে লিখেছিলেন: "সত্যজিজ্ঞাসা, মনঃকষ্ট ও অধ্যাত্মশান্তির জন্যে তৃষ্ণা এঁর প্রবল হবে—বিশেষ ক'রে কোনো একটি মানুষের প্রভাবে। ফলে ৩০ বৎসর বয়সে এঁর জীবনের গতি সম্পূর্ণ বদলে যাবে। নিশ্বাসের কষ্ট হবে দেখতে পাচ্ছি—৩৪ বৎসর বয়সে রক্তক্ষরণে দারুণ হাঁপানীতে মৃত্যুর ফাঁড়া। যদি বাঁচেন তবে ৪৫ বৎসর পর্যন্ত বাঁচতে পারেন—তার পরে না।" (ইন্দিরার দারুণ হাঁপানির কথা রীড সাহেব জানতেন না—সে কে—কোথায় থাকে—কী বৃত্তান্ত কিছুই জানতেন না।)

৩৪ বৎসর পর্যন্ত করকোষ্ঠির রায় হুবহু মিলে গেল। ১৯২০তে ইন্দিরার জন্ম। উনত্রিশবৎসর বয়সে—১৯৪৯এ ও যোগের দিকে ঝোঁকে, ১৯৫০-এ দীক্ষা নেয়, শ্রীঅরবিন্দের দেহান্তের পর দিন—৬ই ডিসেম্বরে—বম্বে থেকে চ'লে আসে—একত্রিশে পা দেবার আগেই সংসারিণী হয় পূর্ণ যোগিনী। তার পর ঠিক ৩৪ বৎসর বয়সে ১৯৫৪ সালে আগষ্টে পুনায় রক্তবমন সুরু হ'ল—৬ই সেপ্টেম্বর নাড়ী ছেড়ে গেল। বাঁচল যে ভাবে কৃষ্ণের প্রত্যক্ষ করুণায়—সে এতই অবিশ্বাস্য যে আমি দুচারজনকে ছাড়া বলি নি, কারণ জানি যে লোকে বিশ্বাস করবে না কিছুতেই, ভাববে আমি ষোলো আনা বানিয়ে বলছি—যদিও এ অঘটনের অন্তত দশজন সাক্ষী আছে, যাদের মধ্যে স্যার চুনিলাল মেতা অন্যতম। বুদ্ধিকে যখন মানুষ জ্ঞানের একমাত্র বিচারক ও দিশারি ব'লে বরণ করে, তখন যা কিছু বুদ্ধির নাগালের বাইরে—তাকেই বুদ্ধিপূজারী কাজীর বিচারে নস্যাৎ ক'রে দিতে চায় এককথায়। কিন্তু করলে হবে কি, বুদ্ধিকে আঁকড়ে ধরলেই যে সে আশ্রয় দিতে পারে একথায় আজকের দিনে বুদ্ধিলোকের দিক্‌পালেরাও আর যেন তেমন আস্থা রাখতে পারছেন না—বারবার ঘা খেয়ে ঠেকে শিখছেন যে, সুসময়ে নীলাকাশের নিচে শান্ত সমুদ্রে বুদ্ধির নৌকাবিহারে যুক্তির হাল ধ'রে রকমারি সুখবন্দরে পৌছানো গেলেও জীবনের নানা ঝড় তুফানেই সে-হাল ধরতে না ধরতে নৌকা হয় বানচাল, আর বুদ্ধির নিপুণতম যুক্তিতর্কও হয় নাজেহাল।

বুদ্ধিকে আমিও আবাল্য প্রাণপণেই পূজা ক'রে এসেছি—জীবনের সব উদ্‌ভ্রান্তি, কুসংস্কার, মোহের প্রতিষেধক ব'লে মেনে নিয়ে। কিন্তু যতই দিন যায় ততই দেখতে পাই—বুদ্ধির লক্ষ্য নয় পরম জ্ঞান, তার কাজ হ'ল জীবনযাত্রার আমাদের সংসারের সঙ্গে রফা করে মিলেমিশে চলতে শেখানো এবং বিজ্ঞানলোকে নানা প্রাকৃতিক তথ্য ও আইনকানুনের খবর নিয়ে ঐহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করা, অসুখ বিসুখে বেদনা কমানো, নানা দৈবদুর্যোগের হাত থেকে বাঁচানো—আরো নানা দৈনন্দিন সুব্যবস্থা করা। যে-বুদ্ধিমন্তেরা বলেন—বুদ্ধি আরো অনেক কিছু পারতো শেষমেশ সবজান্তার কোঠায় পৌছলো ব'লে—

তারা অভিমানের ফেরে প'ড়েই এত বড় ভুল সিদ্ধান্তকে ঠিক সিদ্ধান্ত ভেবে হাবুডুবু খান অথই জলে—অন্তিমে নাস্তানাবুদ হ'য়ে কবুল করতে বাধ্য হন—বিখ্যাত মনীষী লোয়েস ডিকিন্সের সুরে সুর মিলিয়ে : Nothing that is important can be proved by reason : এ-সূত্রটির ভাষ্য এই যে, যেমন বুদ্ধি শুধু যে আমাদের হৃদয়ের সবচেয়ে বড় চাহিদার কোনো নির্দেশ করতে পারে না তাই নয়—যে-আলো হৃদয়ে নামলে বাইরের কালোর চিহ্নও থাকে না তার দিকে তাকানোর দিশাই সে দিতে পারে না। বুদ্ধি পারে অনেক কিছু। পারে—মানুষের পার্থিব সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সুব্যবস্থা করতে, পারে কোনো লক্ষ্য চিহ্নিত হ'লে তার পথের নির্দেশ দিতে। কিন্তু কোন লক্ষ্যসিদ্ধিতে অন্তরাত্মার পরমমুক্তি তার বিধান দিতে পারে—শুধু আত্মার অন্তর্দৃষ্টি, বুদ্ধির বহির্নেত্র নয়। বুদ্ধি পারে কোনো প্রতিপাদ্যের স্বপক্ষে যুক্তি জড়ো ক'রে তার ওকালতি করতে—কিন্তু নানা মুনির নানা যুক্তির মধ্যে কোন্‌টা অকাট্য—বুদ্ধি বুঝতে পারে না। তাই একজন সত্যনিষ্ঠ মানুষ যাকে চমৎকার মনে করেন—আর একজন সমান সত্যনিষ্ঠ তাকে মনে করতে পারেন সর্বনাশা—এবং ক'রেও থাকেন—নিত্যনিয়ত এই দ্বেষাদ্বেষি রেষারেষির জগতে। এই কথাই শ্রীঅরবিন্দ আমাকে একবার লিখেছিলেন একটি পত্রে (১৯৩৬ সালে, ১৩ই জানুয়ারি) : "As a matter of fact there is no universal infallible reason which can decide and be the umpire between conflicting opinions, there is only my reason, X's reason, K's reason multlplied up to the discordant-innumerable, Each according to his view of things, his opinion, that is, his mental constitution and preferance" (অর্থাৎ এ জগতে বিশ্বজনীন বুদ্ধি বা যুক্তি ব'লে এমন কোনো নিয়ন্তা নেই যে নির্দেশ দিতে পারে হাজারো মতামতের হানাহানির মধ্যে কোন্‌টা ঠিক আর কোন্‌টা ভুল। আছে শুধু আমার যুক্তি, তোমার যুক্তি, যদুর মধুর যুক্তি—এম্‌নি ক'রে তাল পাকাও এক অসংখ্য ঝনঝনার প্রচণ্ড বেসুর। খতিয়ে, প্রত্যেকেই যুক্তিতে জাহির করে তার নিজের দৃষ্টিভঙ্গি, পক্ষপাত বা মনের গড়ন অনুসারে)।

শুধু তাই নয়, জগতের ইতিহাস শান্তভাবে পর্যালোচনা করলে একটা সত্য ফুটে ওঠে দীপ্ত প্রভায় : যে—দেশে-দেশে কালে-কালে শ্রেষ্ঠ মানুষ বহু ঠেকে তবে এই অবিসংবাদিত উপলব্ধিতে পৌচেছেন যে, জীবনের সবচেয়ে বড় বর ক্ষণিক ইন্দ্রিয়সুখ বা দেহবিলাস নয়—কারণ এ সুখ অতি ক্ষণায়ু—যার উল্টোপিঠে আছে শুধু গভীর অবসাদ, বিস্বাদ, অতৃপ্তি। বহুবিচারী বুদ্ধি বা বিজ্ঞানী মনীষার কীর্তিকলাপ হাজার "অসাধ্যসাধন" করলেও—শূন্যপথে হাজার উড়ো-জাহাজ চালিয়ে নানা গ্রহে পৌছে আমাদের চমকে দিলেও—পারে না সেই অধ্যাত্ম প্রতিভার প্রতিস্পর্ধী হ'তে—যে ভাগবতী করুণার আবাহনে পায় দয়ার আলো, মৈত্রীর মধু, প্রেমের অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তি। এই প্রতিভাই সবচেয়ে বড় প্রতিভা, কেন না শুধু তারি দৃষ্টিতে শ্রুতিতে ফুটে ওঠে রূপের পথে অরূপের দিব্যজ্যোতি, সাধনার পথে প্রেমের বাণী : ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ"—শুধু "ভক্তির আলোয় ভক্ত দেখতে পায় ভগবানের স্বরূপ ও বহুবিচিত্র রূপায়ণ।" আর এ দৃষ্টি যাঁরা পেয়েছেন, এ বাণী যাঁরা শুনেছেন, শুধু তাঁরাই সর্ব্বজীবে শিবকে দেখে, সেই প্রেমসুন্দরের সাধর্ম্য লাভ ক'রে হ'তে পারেন তাঁর মতন "সর্ব্বভূতহিতেরতাঃ।"

কালীদার কথা বলতে গিয়ে প্রেমের প্রসঙ্গ এসে গেল—এ ঠিকই হয়েছে। কারণ তিনি যোগসাধনার পথে প্রেমের আলো হৃদয়ে পেয়েছেন বলেই সে আলোতে দেখতে পেয়েছেন পরমতম বরদাতা হ'ল—প্রেম স্নেহ প্রীতি দরদ অনুকম্পাবর্গীয় মস্তিষ্কবৃত্তির লীলাখেলা নয়। কেবল একটি কথা আছে। বুদ্ধির একটি মস্ত দান এই যে, সে যদি বিনম্র শ্রদ্ধায় যথার্থ আত্মিক প্রেমের আলোকে বরণ করতে শেখে, তাহ'লে সে আলোর বরে সে পরিষ্কার দেখতে পায় কতদূর অবধি মানস বুদ্ধিবিচারের দৌড়। অর্থাৎ দেখতে পায় তার দৃষ্টিপরিধির সীমা। তাই তখন সে বুদ্ধির চেয়ে বড় যিনি—তাঁর কাছে মাথা নিচু ক'রে তাঁর হুকুমবরদার হ'তে অপমান বোধ করেন না আর, বরং আরো উল্লসিতই হয়ে ওঠে এই আনন্দময় সত্যকে

উপলব্ধি ক'রে যে, নিরভিমান না হ'লে কেউই পেতে পারে না সেই পরম জ্ঞান—যার জননী ভক্তি। এই কথাই বলেছিলেন আমাকে জ্ঞানিশিরোমণি রমণ মহর্ষি: "ভক্তি জ্ঞানমাতা।" কালীদা রমণ মহর্ষিকে অগাধ শ্রদ্ধা করেন আরো এই জন্যে যে, এই ভক্তি বা প্রেমের আলোর খবর তিনি নিজেও পেয়েছেন তাঁর প্রাণের অন্তঃপুরে। তাই তিনি পরকে আপন করতে পারেন এত সহজে—যে কথা ডোরস্বামী একবার আমাকে একটি পত্রে লিখেছিলেন। তাঁর কথা এই প্রসঙ্গে এসে গেল এও ভালোই হ'ল, কারণ অনেকদিন থেকেই ভাবছি এই মহাত্মার সম্বন্ধেও স্মৃতিচারণী ভঙ্গিতে কিছু লিখতেই হ'বে।

* * *

দুঃখ শোক তাপ ও ভয়ের কবলে কখনো পড়েনি, এমন মানুষ সংসারে নেই বললে নিশ্চয়ই অত্যুক্তি হবে না—বিশেষ ক'রে ভয়। রমণ মহর্ষি একদিন আমাকে বলেছিলেন: আমাদের শাস্ত্রে আছে ছয়টি রিপু জয় করা চাই—কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য। কিন্তু এদের জয় করার পরেও পরম মুক্তির পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাকে সপ্তম রিপু ভয়।

ভয় কি আমাদের একটা? আশৈশব আমাদের ভয়ে ভয়েই কাটল—যে কোনো সিদ্ধির শেখরচারী হই না কেন, ভয় মাথার উপর খাঁড়ার মত ঝোলে—কখন পড়ে কে জানে?—যাকে সাহেব-পুরাণে বলে Damocles' Sword; তাই মুনি-ঋষিরা ভর্তৃহরির একটি প্রখ্যাত শ্লোককে বৈরাগ্যের মন্ত্র ব'লে এত সাদরে বরণ করেন:

ভোগে রোগভয়ং কুলে চ্যুতিভয়ং বিত্তে নৃপাণাদ্ ভয়ম্।
মানে দৈন্যভয়ং বলে রিপুভয়ং রূপে তরুণ্যা ভয়ম্॥
শাস্ত্রে বাদিভয়ং গুণে খলভয়ং কায়ে কৃতান্তাদ্ ভয়ম্।
সর্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবা ভয়ম্॥

অর্থাৎ

ভোগে রোগ ভয়, কুলে চ্যুতিভয়, বৈভবে ভয় অরিরাজের
মানে—দৈন্যের, বলে—শত্রুর, রূপে ভয়—মোহিনীর ফাঁদের,
পণ্ডিত ভয় করে পণ্ডিতে, গুণী—খলে, দেহী যমকে ডরে,
সকলেই ভয়ে সারা ভবে, শুধু বৈরাগ্যই শঙ্কা হরে।

ডোরাস্বামী সেই আরো বিরল মহাজনদের দলে, যাঁরা ভয় পেয়ে বৈরাগী হ'তে লজ্জা পান। দয়ালবাগের এক গুরু সাধু প্রায়ই বলতেন—যে ভয়কে জয় করতে পারে কেবল সে-ই যে পুরোপুরি অনাসক্ত হ'তে পেরেছে—কেবল সে-ই বলতে পারে গৌরব ক'রে:

রাজার আসনে বসাবি আমারে কিরে?
এমনি রাজ্যশাসন করিব তবে—
যেমন শাসন কেহ কভু করে নাই।
রাখিতে আমারে চাস কি ভাঙা কুটিরে?
করিব ভিক্ষা এমনি সগৌরবে
যেমন ভিক্ষা করে নাই কেহ, তাই!

ডোরাস্বামীরও ছিল এই আদর্শ: ভয় পেয়ে ত্যাগ নয়, অনাসক্ত হ'য়ে ভোগ। তাঁকে দেখে মনে পড়ত ঈশোপনিষদের উপদেশ—তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ—বাইরে ভোগী হও অন্তরে ত্যাগী হ'য়ে, পরের ধনে লোভ না ক'রে—"মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্"। হয়ত এই জন্যই শ্রীঅরবিন্দকে তিনি আকৈশোর প্রাণের দিশারি ব'লে বরণ করেছিলেন স্বদেশী যুগ থেকে—এরি নাম মহাবীর, অভী, অনাসক্ত, সমদর্শী। এখানে তাঁর সঙ্গে বারীনদার কতক মিল ছিল। ছাড়তে হয় ছাড়ব, ভুগতে হয় ভুগব, কেবল ভয় পাব না—পাব না—পাব না—এমন কি জীবন পর্যন্ত পণ করতে—এইই ছিল দুজনেরই জপমন্ত্র। শ্রীঅরবিন্দের কথা বলতে যাঁর চোখে আলো জ্ব'লে উঠত—সেই উপেনদাও একদিন আমাকে বলেছিলেন এই ধরণের একটি কথা অভয় সম্পর্কে, কেবল আরো একটু এগিয়ে গিয়ে: "দাদা, যে আদর্শের জন্যে বারীন, ক্ষুদিরাম, কানাই, যতীনদের দল পুরু করতে ছুটেছিলাম আমিও—কি না এককথায় প্রাণ দেওয়া—সে আদর্শ বড় না বলবে কে? কিন্তু তার চেয়েও বড় আদর্শ হ'ল—কোনো মহাসিদ্ধির জন্যে ম'রে-বাঁচা নয়—বেঁচে থাকা—বাঁচার মতন বা—একান্তী হ'য়ে তপস্যা করতে পারা, হাজারো নিরাশায় হার না মেনে মরুর পর মরু পার হওয়া। আবেগের মাথায় না ক'রে প্রাণ দেওয়া কঠিন হ'লেও লক্ষ লক্ষ লোক করেছে একাজ। কিন্তু কোনো মহৎ আদর্শের জন্যে প্রবাসী হ'য়ে ধন মান প্রতিষ্ঠা কিছুই না চেয়ে ত্রিশবৎসর ধ'রে তপস্যা করতে হ'লে শ্রীঅরবিন্দের মতন আধার চাই।"

উপেনদার এ-উক্তিটির মর্ম যেন আমি নতুন ক'রে উপলব্ধি করেছিলাম ডোরাস্বামীকে দেখে। তবে একদিন আমি বলেছিলাম যে শ্রীঅরবিন্দের জন্যে তাঁকে ধনীর প্রাসাদ ছেড়ে অকিঞ্চন যোগী হ'তে দেখে আমার প্রায়ই মনে পড়ত—ভাগবতে ত্রিভুবনাধিপ বলির একটি উক্তি :

সুলভা যুধি বিপ্রর্ষে হ্যনিবৃত্তাস্তনুত্যজঃ।
ন তথা তীর্থ আয়াতে শ্রদ্ধয়া যে ধনত্যজঃ॥

আমার "ভাগবতী কথা"—য় আমি এর ভাষ্য করেছিঃ

হে ব্রহ্মর্ষি! যুদ্ধে প্রাণ করে বলিদান
লক্ষ লক্ষ বীর। কয়জন দান করে
সর্বস্ব অকুতোভয়ে?

ডোরাস্বামী এই বিরল দানবীরদের অন্যতম ছিলেন স্বভাবে, তাই তাঁর "সর্বস্ব" তিনি অকুতোভয়ে নিবেদন করতে পেরেছিলেন গুরুচরণে। হয়ত যোগী হ'তে তিনি চান নি, কিন্তু চেয়েছিলেন মনে প্রাণে বড় আদর্শের জন্যে ছোট সুখ ছোট ভোগ ছাড়তে। তাই তাঁকে এত মুগ্ধ করেছিল শ্রীঅরবিন্দের লোকোত্তর তপঃশক্তি। মেটারলিংক তাঁর বিখ্যাত segesse et Destinee গ্রন্থে লিখেছেন একটি গভীর কথা! যে—যখনই দেখবে কেউ এক কথায় সব ছেড়ে মহাবীরের (hero) পদবী পেল, তখনই ধ'রে রাখতে পারো যে, সে বহুবৎসর ধ'রে দিনের পর দিন স্বপ্ন দেখেছে মহাবীর হবার, নৈলে সে কিছুতেই পারত না এক কথায়ই দুঃসাহসের আগুনে ঝাঁপ দিতে। ডোরা-স্বামীর সম্বন্ধে একথা পূর্ণ প্রযোজ্য। সুদূর মাদ্রাজে ব'সে শ্রীঅরবিন্দের চরিত্রবল, প্রতিভা, অগ্নিগর্ভ প্রবন্ধ সবই তাঁকে বহুদিন থেকেই অনুপ্রাণিত করেছিল দেশের জন্যে সর্বস্ব পণ করার আদর্শে। তাই আরো অনেক শ্রীঅরবিন্দ-ভক্তের মতন তিনিও প্রথমে তাঁর বিপ্লবী আদর্শের ভাবেই সব ছাড়তে চেয়েছিলেন। পরে তাঁকে ভালোবাসলেন সর্বান্তঃকরণে। তখন কী হ'ল? না, শ্রীঅরবিন্দ যা চান আমিও তাই চাইব। মিল্টন বলেছিলেন—He for God only, she for God in him ডোরাস্বামীর যোগ-দীক্ষার সম্বন্ধেও একথা বলা যায়। শ্রীঅরবিন্দ বললেন তাঁকে—"দেশ স্বাধীন হবেই হবে, ভেবো না। আমি চাই তুমি দেশের চেয়ে আরো বড় আদর্শকে বরণ করো—সর্বস্ব পণ করো ভগবানের জন্যে।" ডোরাস্বামী আমাকে বলেছিলেন—'আমি শুনে সকুণ্ঠে বলেছিলাম: কিন্তু আমি কি পারব যোগী হ'তে।' শ্রীঅরবিন্দ বললেন: 'নিশ্চয় পারবে, নৈলে তোমাকে ডাকতাম না।' অমনি আমি বললাম: 'তথাস্তু, নেব দীক্ষা—আপনি যে পথে চালাবেন সেই পথেই চলব আমি।'

এই যে এককথায় গুরুর কাছে আত্মনিবেদন করতে পারা—এর নামই তো যোগী, আর যোগী ছাড়া কে পারে বরণ করতে অভয় ও সর্বস্বদানের আদর্শ? যার স্বভাবে নেই পরিণাম চিন্তা, স্বধর্মে যে অসাবধানী, তাকে বিচক্ষণরা নাম দেন মূঢ়। কিন্তু গতানুগতিক সঞ্চয়ী যারা তারাই তো খতিয়ে হারায় জমাতে চেয়ে, জেতে তারাই যারা বিশ্ব হারিয়ে পায় বিশ্বনাথকে। যোগি-কবি এই (জর্জ রাসেল] বলেছেন ঃ

What shall they have, the wise who stay
By the familiar ways……
Who shun the infinite desire
And never make the sacrifice
By which the soul is changed to five?

অর্থাৎ

কী পাবে তাহারা, সেই সাবধানী সুবিজ্ঞের দল
চলে যারা চেনাপথে—অনন্তের দুরাশা উছল
করে যারা পরিহার—করে নাই কভু ত্যাগ হায়,
বরে যার অন্তরাত্মা রূপান্তর লভে বহ্নিতায়?

ডোরাস্বামী কোনোদিনও ছিলেন না সেই সাবধানী সুবিধের দলে—দরদস্তুর করা যাদের জপমালা। ভয় পেতেন না ছাড়তে, লজ্জা পেতেন শুধু ভীরু হ'তে। তাই সে-যুগেও তিনি নিয়মিত মাদ্রাজ থেকে গুরুর আশ্রমে যেতেন যখন তখন জেনে শুনে যে পুলিশ শুধু যে পিছু নেবে তাই নয়, যে-কোনো মুহূর্তে ফেলতে পারে ফ্যাসাদে।

এসবই আমি শুনেছিলাম তেত্রিশ বৎসর আগে—যখন আমি পণ্ডিচেরি প্রয়াণ করি সংসার ছেড়ে। তাই তো আরো চাইতাম তাঁর পুণ্য সঙ্গ, আরো মুগ্ধ হতাম তাঁর নম্র সৌকুমার্যে, সঙ্গীতানুরাগে, নির্লোভ চরিত্রে ও সদাপ্রসন্ন আচরণে। পণ্ডিচেরি আশ্রমে আমি দুটি

মাত্র গুরুভাইকে সর্বান্তঃকরণে ভালোবেসেছিলাম: বারীনদা ও ডোরাস্বামী নিয়তির বিচিত্র বিধানে ঠিক এই দুজনই পরে পণ্ডিচেরি আশ্রমের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য হন। এজন্যে উভয়কেই গভীর দুঃখ পেতে হয়েছিল, নৈলে কি যে—গুরুর জন্যে যে সংসার ছেড়েছে সে চাইতে পারে তাঁর কাছ থেকেও দূরে যেতে—তাঁর কোনো বিধান মেনে নিতে না-পারার দরুণ? যাঁরা বারীনদা বা ডোরাস্বামীর নিন্দা করেন তাঁদের মনের ছাঁচ ছোট, কল্পনা নিস্তেজ—নৈলে তাঁরা বুঝতে পারতেন—কত বেদনায় এই দুই সর্বত্যাগীকে বৃদ্ধ বয়সেও ছাড়তে হয়েছিল সেই গুরুর আশ্রয়—যাঁকে তাঁরা চিরদিন ভক্তি করে এসেছেন দেবতার মত। ডোরাস্বামী আজও শ্রীঅরবিন্দকে গভীর ভালোবাসেন, বারীনদা ও শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত শ্রীঅরবিন্দকেই প্রণাম করেছেন গুরু ব'লে—খানিকটা হয়ত একলব্যের মতনই বলব। আমি জানি না, এই দুই মহামতির অন্তর্দ্বন্দ্ব ও স্বপ্নভঙ্গের পুরো ইতিহাস। তবে তাঁরা আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং আমি তাঁদের গভীর ভক্তি করতাম ব'লে সেই প্রেমের অন্তর্দৃষ্টিতে এটুকু বুঝেছিলাম যে তাঁরা উভয়েই উত্তরকালে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে বাধ্য হয়েছিলেন সত্যনিষ্ঠার খাতিরেই, কোনো ব্যক্তিগত প্রত্যাশা ভঙ্গের ফলে নয়, গুরুদ্রোহিতার ঝোঁকে তো নয়ই।

কেউ কেউ বলেন—ডোরাস্বামী পর পর দুটি কৃতী পুত্রের মৃত্যুশোকের দরুণই গুরুস্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আমি জানি একথা কত অসত্য—শুধু ডোরাস্বামী স্বভাবে গুরুপূজারী ছিলেন ব'লেই নয়, তিনি এমনি একটি স্নিগ্ধ সরলতা নিয়ে জন্মেছিলেন যে তাঁকে দেখে আমার প্রায়ই মনে পড়ত বিখ্যাত ফরাসী সমালোচক স্যাঁৎ ব্যভ-এর (Sainte Beauve) একটি বিখ্যাত উক্তি: "Il y a des natures qui naissent pures et qui recu quand meme le don de l'innocence." এর ভাষ্য এই যে, কোনো কোনো ধীমান্ শুধু যে অলস স্বভাব নিয়ে জন্মায় তাই নয়, সেই সঙ্গে পায় এমন সরলতার বর যা সেই অমলতাকে ধারণ করে; জীবনের জাঁতায় চূর্ণবিচূর্ণ হ'লেও এ-হেন মহাজন মলিন হয় না, বলে না—"হার মেনেছি।" এ-হেন তীর্থযাত্রী ভুল করলে সোজা কবুল করে—"ভুল করেছি," কিন্তু মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে নিজের সাফাই গাইতে রাজি হয় না।

পণ্ডিচেরিতে আমার ডোরাস্বামীর সঙ্গে প্রথম দেখা হয় ১৯১৮ সালে আগষ্ট মাসে। তখনো আমি (সংসারী না হ'লেও) ছিলাম খানিকটা মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমই বলব: গান গেয়ে বেড়াই যত্রতত্র, দোটানায় হাঁফিয়ে উঠেছি, অথচ শ্যামের জন্যে কুলের নোঙর কাটবার সাহস পাচ্ছিনা। তাই হয়ত ডোরাস্বামীর স্নিগ্ধ হাসি ও দ্বন্দ্বহীন বিশ্বাস দেখে সংসার ছাড়বার জন্যে আরো ব্যগ্র হ'য়ে উঠি—শুধু তাঁর মুখে শ্রীঅরবিন্দের মহত্ত্ব সম্বন্ধে নানা কথা শুনেই নয়—খানিকটা তাঁর সমৃদ্ধ ব্যক্তিরূপের ছোঁয়াচেও বটে। এত গুণে গুণী মানুষ যে-কোনো দেশেই মেলা ভার: উদার, সঙ্গীত-কোবিদ, দানবীর, চরিত্রবান্, সর্ববিধ বদভ্যাস থেকে মুক্ত, পরোপকারী, অনাড়ম্বর, অজাতশত্রু, জনপ্রিয়—সর্বোপরি সত্যনিষ্ঠ ও নির্লোভ। মান্দ্রাজের একজন প্রধান উকিল হ'য়েও কোনোদিন মিথ্যা কেস নেন নি—এবং মক্কেল এলে আগে তাকে বলতেন সম্ভব হ'লে আপোষে নিষ্পত্তি করতে—জেনে যে, এতে ক'রে মক্কেলের ফী কমবে বৈ বাড়বে না। একথা পরে "হিন্দু" পত্রিকায় পড়ি—মান্দ্রাজের চীফ-জাসটিসের বক্তৃতায়। ডোরাস্বামী যখন মান্দ্রাজের জজ হবার মুখেই প্র্যাকটিস ছেড়ে দিয়ে সর্বস্ব গুরুচরণে দান ক'রে ফকির হন, তখন মান্দ্রাজের জজেরা তথা উকিলেরা সবাই বার বার বলেছিল তাঁর এই আশ্চর্য নির্লোভতা তথা সত্যৈকান্তব্রতের কথা।

অতঃপর যখন ১৯২৮ সালের শেষে আমি পণ্ডিচেরি রওনা হই শ্রীঅরবিন্দকে গুরুবরণ ক'রে তখন মান্দ্রাজে "যাত্রাভঙ্গ" করি এই নবলব্ধ আতিথেয় বন্ধুর প্রাসাদে—পাম গ্রোভে। সত্যিই "প্রাসাদ" যাকে বলে—বিস্তীর্ণ উদ্যানের মাঝখানে শ্বেতস্তম্ভাবৃত আলোহাওয়া ভরা উদার রম্যনিলয়—মনে হ'ল গৃহস্থের স্বভাবের সঙ্গে গৃহের মিল আছে বটে! আমার কথা তখনো তাঁকে আমি নিজে কিছু বলি নি, তিনি লোকমুখে শুধু শুনেছিলেন যে আমি কূলের মায়া কাটিয়ে সদ্য ঝাঁপ দিয়েছি যোগজীবনের অকূলপাথারে।

তিনি যখনই স্থির করেছিলেন সব ছেড়ে এইভাবে অকূলবিহারী হবেন—যাকে ইংরাজিতে বলে burning

one's boats—কিন্তু তখনো শ্রীঅরবিন্দ-আশ্রমের শতাধিক সাধকের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয়ভার প্রধানতঃ তাঁকেই বহন করতে হ'ত। আমরা আরো শুনেছিলাম যে, গুরুদেবের নির্দেশেই তিনি ওকালতি করছেন—শুধু আশ্রমের কথা ভেবে। মান্দ্রাজে তখন তাঁর বিপুল পসার—কম ক'রেও মাসিক দশ বারো হাজার উপায় করেন—কিন্তু এ কলির দাতাকর্ণ প্রতিমাসে যত-কম-টাকায়-সম্ভব সংসার চালিয়ে বাকি সমস্ত আয়ই মাস মাস গুরুচরণে নিবেদন করতেন গুরুসেবার্থে। এ-প্রসঙ্গে স্বতঃই মনে পড়ে মহাত্মা উকিল শ্রীতারাকিশোর চৌধুরীর কথা—যিনি কাঠিয়াবাবা বাবার কাছে সন্ন্যাস দীক্ষা নিয়ে সন্তদাস বাবাজী নামে পরিচিত হবার পরও বৎসরাধিককাল কলকাতার হাইকোর্টে ওকালতি ক'রে সত্তর হাজার টাকা ঋণশোধ করেন বৃন্দাবনে গুরুর নবনির্মিত আশ্রম-ব্যপদেশে। কিন্তু এ ছাড়া সাধক জীবনের সঙ্গে ঐহিক বৃত্তির সমন্বয় সাধন ক'রে শুধু গুরুসেবার্থে অর্থোপার্জন ও শেষে যথাকালে তাও ছেড়ে সর্বস্ব গুরুচরণে নিবেদন ক'রে ফকির হওয়ার এমন আদর্শ আর দেখেছি ব'লে মনে তো পড়ে না।

ফকির ব'লে ফকির। একটা সামান্য দৃষ্টান্ত দেই—না, "সামান্য" বলি কেন? পাদপ্রদীপের সামনে "হিরো" হ'তে পারে অনেকেই, অন্তত বীরত্বের ভঙ্গি ক'রে নিজেকে তথা অপরকেও ঠকাতে পারে হয়ত; কিন্তু যে-সুদূর, ছায়ার নেপথ্যে বহুর সপ্রশংস দৃষ্টি বা করতালি পৌঁছয় না, সেখানেও যে-মানুষ একান্ত অজ্ঞাতবাসে তার আদর্শকে অনুসরণ করতে পারে শুধু তার আদর্শবাদ সম্বন্ধেই পুরোপুরি নিঃসংশয় হওয়া যায়। ব্যাপারটা এই:

পণ্ডিচেরি আশ্রমের পাঠাগারে মান্দ্রাজের হিন্দু পত্রিকা আসত। অনেকেই কাড়াকাড়ি করত—ভিড়ের মধ্যে ভালো ক'রে কাগজ পড়া ভার। তাই আমি আমার এক গুরুভাই ভেঙ্কটরমনের কাছে প্রস্তাব করি যে—ডোরাস্বামীকে ডাক দেওয়া যাক—আমরা প্রত্যেকে ফি মাসে মাসদুটাকা করে চাঁদা দিলে হিন্দু কিনে ক'ষে পড়তে পারব পরপর। তাতে ভেঙ্কটরমন বলে হেসে: "ডোরাস্বামী মাস দুটাকা ক'রে হাতখরচ পেতেন তাও বন্ধ ক'রে দিয়েছেন যে—জানো না?" আমি শুনে চম্‌কে গেলাম—ঠিক হ'ল আমি মাসে চারটাকা দেব, আর ভেঙ্কটরমন দুটাকা। এই ভাবে ডোরাস্বামীকে আমরা হিন্দু পাঠাতাম।

ভাবো একবার: এ সৌখীন নিঃস্ব হওয়া নয়—যাকে বলে নিখুত নিষ্কিঞ্চন হওয়া—অক্ষরে অক্ষরে! এর পরে আমি গুরুদেবের কাছ থেকে মাস মাস ৪০্ ক'রে পকেটখরচ নিতে বেশ একটু কুণ্ঠাবোধ করতাম। কিন্তু করি কি? আমার মাসিক চিঠিপত্র বইয়ের খরচই ছিল বিশ পঁচিশ, তাছাড়া আমি আশ্রমের কোকো খেতে পারতাম না, বাজার থেকে চা কিনে স্টোভে ফুটিয়ে খেতাম সদলবলে—বহু চেষ্টা করেও মাসে চল্লিশ টাকায় কুলিয়ে উঠতে পারতাম না—আর ডোরাস্বামী আশ্রমের একটি মাত্র ছোট ঘরে দিনের পর দিন কাটাতেন হাসিমুখে যেন রাজার হালে আছেন! একদিন তাঁর এক মোটর-চালক পণ্ডিচেরি এসে তাঁকে এভাবে থাকতে দেখে চোখের জল সামলাতে পারে নি। এর পরেও বলবে কি যে, সিংহাসন ও পর্ণকুটিরে সম-আনন্দে বিরাজ করা সম্বন্ধে যে-কবিতাটি উদ্ধৃত করেছি সেটি অত্যুক্তি?

বলেছি—ডোরাস্বামী প্রথম দিকে শ্রীঅরবিন্দকে নিছক রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লবী বীর ব'লেই বরণ করেছিলেন। একাধিকবার তাঁর চোখ চিকচিক ক'রে উঠতে দেখেছি যখনি তিনি উল্লেখ করতেন গুরুদেবের স্নেহের, করুণার, স্নিগ্ধ সম্ভাষণের। কয়েক বৎসর আগে যখন তিনি পুণায় আমাদের আতিথ্য স্বীকার ক'রে আমাদের ধন্য করেছিলেন তখনও তিনি আবার বলেছিলেন তাঁর একটি প্রিয় স্মৃতিচারণী গল্প—কী ভাবে গুরুদেব একটি চিঠি তাঁর মার্ফৎ পাঠিয়ে ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে—লিখেছিলেন: "ডোরাস্বামীকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারো আমাদেরই একজন ব'লে।" এ-গল্পটি ডোরাস্বামী কতবারই যে করেছেন—আর যখনই করতেন ভক্তিকৃতজ্ঞ আবেগে তাঁর স্বর গাঢ় হ'য়ে আসত, বলতেন: "দিলীপ! তোমাকে বলছি কারণ তুমি জানো কী আশ্চর্য ভালোবাসতে পারতেন তিনি—যার টানে মানুষ তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে নিঃস্ব হ'য়েও মনে করত যেন বিশ্ব পেয়েছে। তুমি জানো কারণ তুমিও ছিলে তাঁর অন্তরঙ্গ।"

১৯৪৬ সালে যখন স্যর স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ তাঁর

বিখ্যাত সন্ধিপত্র নিয়ে দিল্লীতে গান্ধিজির কাছে দরবার করেন তখন শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন যে ক্রিপস্ সাহেবের প্রস্তাব গ্রহণ করলে মুসলিম লীগের প্রতিপত্তি ক'মে যাবে, কেন না হিন্দুরাই বড় বড় ক্ষমতার পদ পেয়ে যাবেন, ফলে মুসলীম লীগের হর্তাকর্তা বিধাতা জিন্না সাহেব সেধে আসবেন হিন্দুদের সঙ্গে রফা ক'রে সহযোগ করতে। পরে অনেকেই স্বীকার করেছিলেন যে হিন্দু-নেতারা ক্রিপস্‌কে প্রত্যাখ্যান ক'রে অপদস্থ না হ'লে মুসলিম লীগের পাল্লাভারি হ'ত না—এবং ভারত দ্বিখণ্ডিত হবার লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি পেত। ডোরাস্বামীর মনে কিন্তু সে সময়ে বিলক্ষণ সন্দেহ ছিল ইংরাজদের সততা সম্বন্ধে। তবু শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে ডেকে বুঝিয়ে বলতেই তিনি গুরুর আজ্ঞায় গেলেন সোজা গান্ধিজির কাছে—এমনিই ছিল তাঁর গুরুভক্তি যার প্রভাবে তাঁর জীবনে বিপ্লব ঘটে যায়। তাই তো তিনি মানুষ যাকিছু জীবনে বহুবাঞ্ছিত মনে করে, সে-সবকে হাতে পেয়েও পায়ে ঠেলে এক কথায় চলে যেতে পেরেছিলেন পণ্ডিচেরির হাস্যহীন গম্ভীর যোগাশ্রমে গুরুদাস হ'য়ে গুরুসেবা করতে। কীর্তির দিক্ দিয়েও একি একটা সহজ কীর্তি?

তবে একটা কথা এখানে ব'লে রাখা ভালো: ডোরাস্বামী স্বভাবে সামাজিক মানুষ বলতে আমি এ ইঙ্গিত করতে চাই নি যে—তিনি যোগের অধিকারী ছিলেন না। নিশ্চয়ই ছিলেন, নৈলে কি তিনি ভগবান্ শ্রীরমণ মহর্ষির প্রিয়পাত্র তথা পূজারী হ'তে পারতেন? তাঁর মুখে কতবারই শুনেছি মহর্ষির অপরূপ চরিত্রের নানামুখী মহিমার কথা। তিনি ডোরাস্বামীকে পুত্রাধিক স্নেহ করতেন—ডোরাস্বামী কতদিনই তো তাঁর সঙ্গে খেয়েছেন শুয়েছেন—হাসি গল্পালাপে কাল কাটিয়েছেন—গীতায় অর্জুনের উক্তি মনে পড়ে: যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি বিহারশয্যাসন ভোজনেষু—একেবারে অক্ষরে অক্ষরে! ডোরাস্বামী মহর্ষির কাছে কাছে থাকতেন ছায়ার মতনই—যখন মহর্ষির বাহুমূলে দুষ্টক্ষত—ক্যান্সার হয়। কী অনটল অবিশ্বাস্য সহশক্তি মহর্ষির!—বলতেন ডোরাস্বামী সাশ্রু-নেত্রে। অসহ্য ব্যাথায়ও—সমানই হাসিমুখে সবাইকে আশী-র্বাদ করে গেলেন শেষ পর্যন্ত। বলতে কি, মহর্ষির দিকে আমার টান হয় প্রথম ডোরাস্বামীরই মুখে তাঁর মহিমার কথা শুনতে শুনতে—বিশেষ ক'রে তাঁর অচলপ্রতি[illegible] জীবন্মুক্ত অবস্থার গুণগান। স্থানাভাব তাই শুধু একটি মাত্র উদাহরণ দিয়েই ক্ষান্ত হব—মহর্ষিকে ডোরাস্বামী কী গভীর ভালোবেসেছিলেন তার একটু আভাষ দিতে।

"একদিন"—বললেন ডোরাস্বামী—"মহর্ষির বাহুতে ফের অস্ত্রোপচার করা হ'ল—ক্লোরোফর্ম না ক'রে। মহর্ষি অচল অটল—কিন্তু তাঁর বাহু থেকে অবিরল রক্তস্রাব দেখতে দেখতে আমার বুকের মধ্যে কেমন ক'রে উঠল দিলীপ! আমি কেঁদে ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। পরে শুনলাম মহর্ষি পরে আমার এক বন্ধুকে বলেছিলেন হেসে: 'ডোরাস্বামীকে কিছুতেই বোঝাতে পারি নে যে আমি আমার দেহ নই!' অর্থাৎ আমি কষ্ট পাই অনর্থক—না বুঝে যে, দেহের দুঃখ মহর্ষির আত্মাকে স্পর্শও করতে পারে না।" তাঁর মুখে রমণ মহর্ষির কথা শুনতে শুনতে আমার প্রায়ই মনে হ'ত—এক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে আমার একটু মিল আছে হয়ত। অর্থাৎ আমার যেমন দুটি গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীঅরবিন্দ, ডোরাস্বামীরও তেম্‌নিদুটি গুরু—শ্রীঅরবিন্দ ও রমণ মহর্ষি। তাই তো যখন তাঁর জীবনে এসেছিল পুত্রশোক—(আর একটি নয়, পর পর দুটি নন্দনন্দ যুবক-পুত্রের অকালমৃত্যু)—তখন তিনি রমণ মহর্ষির শান্তিময় সান্নিধ্যে ফিরে পান আত্মকর্তৃত্ব।

কিন্তু এ-দুঃখের টাল সাম্‌লানোর কীর্তির চেয়ে আরো মহৎ কীর্তি তাঁর এই যে—যে-গুরুর জন্যে তিনি ফকির হয়ে-ছিলেন সে-গুরুর আশ্রয় ছাড়তেও তাঁর বাধে নি, যখন তাঁর মনে হয়েছিল যে না ছাড়লে তিনি সত্যনিষ্ঠ থাকতে পারবেন না। এ-শোকাবহ অন্তর্দ্বন্দ্বের ইতিহাস হয়ত তিনি একদিন বলবেন নিজেই। আমার নিজের মনে হয় বলা তাঁর উচিত, কারণ তাহ'লে লোকে জানবে যে এ-টাকা-আনা-পাইয়ের জগতে শুধু ক্ষুদ্রমনা সুবিধাবাদীতেই ভরা নয়—এখানে এমন মহাজন আজো দেখা যায় যাঁরা গভীর আশাভঙ্গের ক্ষোভেও বিশ্বাস হারিয়ে সিনিক হন না। শুধু তাই নয়, ডোরাস্বামীর চরিত্রের অপরূপ কোমলতার পিছনে গা ঢাকা হ'য়ে থাকত একটি আশ্চর্য তেজস্বী পৌরুষ যে ভুল করলে তাকে ভুল ব'লে সনাক্ত করতে কুণ্ঠিত তো হয়ই না—বরং লোকনিন্দার ভয়ে মিথ্যার সঙ্গে রফা ক'রে মান বাঁচাতেই লজ্জা পায়। আমি নিজে এ

দম্পতী

ফটো : হিমাংশু সিংহ

দৃশ্য

ফটো : পরিমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

জন্যেই তাঁকে বরাবর সবচেয়ে বেশি ভক্তি ক'রে এসেছি —এই অভী সত্যনিষ্ঠার জন্যে। সংসারে ভুল কে না করে? কায়া ভ্রমে কোনদিনও ছায়াকে বরণ করে নি বা ঠকবার ভয়ে কাউকে কখনো বিশ্বাস করে নি ব'লেই প্রবঞ্চিত হয়নি এমন মানুষ অবশ্য থাকতে পারে—কেবল তাদের উপাধি: অল্পজীবী, ক্ষুদ্রপ্রাণ। দিল-দরিয়া যাঁরা তাঁরা শুধু যে ভাগ্যকে দোষ দিয়ে সস্তা সান্ত্বনা পেতে চান না তাই নয়। সব ছাড়তে পারেন এক কথায়। যারা পরিণাম চিন্তা বরণ ক'রে গা গুণে গুণে পথ চলে, নিরন্তর হিসেব করে কত দিয়ে কত পেল, তারা দেশের দশের একজন হ'তে পারে, সমাজের স্তম্ভ ব'লে জনস্তুতও হ'তে পারে, কেবল পারে না সেই ক্ষণজন্মাদের সংসদে ঠাঁই পেতে —যেখানে কীর্তির চেয়ে দুরাশার দাম বেশি, প্রতিষ্ঠার চেয়ে ত্যাগের, নামের চেয়ে অভিসারের। মহাকবি গেটে এই শ্রেণীর দুরাশীকেই পূজার্হ ব'লে বরণ করেছিলেন:

Sag es niemand, nur den Weisen,
Denn die Menge gleich verhoenet:
Das Lebend'ge will ich preisen
Das nach Flammentodt sich sehnet.

কোরো না প্রকাশ—যাহা আমার নিগূঢ় মর্মতলে
অনির্বাণ অমলিন জলে;
কহিও জ্ঞানীরে শুধু—নহিলে এ-হেন বাণী সবে
বাতুল-প্রলাপ সম কবে;
বোলো তারে—আমি অর্ঘ্য দেই সেই দুঃসাহসী প্রাণে—
ধায় যে অকূল-অভিযানে,
আদর্শের তরে দেয় আহুতি যে হোমাগ্নি শিখায়
সর্বস্ব তাহার দুরাশায়।

মনে পড়ে—ত্রিবন্দ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে স্বামী তপস্যানন্দের উচ্ছ্বাস ডোরাস্বামীর সম্বন্ধে। তিনি বলেছিলেন আমাকে: "আপনারা বাঙালী দিলীপবাবু, আপনাদের মধ্যে গুরুর জন্যে সর্বত্যাগের দৃষ্টান্ত মেলে। কিন্তু আমাদের—মানে, তামিলদের—মধ্যে অন্তত এ-যুগে কেউ ভাবতেই পারে না যে কোনো সুস্থমস্তিষ্ক মানুষ হঠাৎ এমন পাগলামি ক'রে বসতে পারে। কে না জানত যে ডোরাস্বামী অচিরে হাইকোর্টে জজ হবেন? যে-সময়ে উনি এ-সম্মান ছেড়ে পণ্ডিচেরিতে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন সে সময়ে ওঁর 'রোরিং প্র্যাকটিস'। তাই তামিল বিচক্ষণদের মধ্যে সে-সময়ে একটা সাড়া প'ড়ে গিয়েছিল—ডোরাস্বামীর মতন স্বনামধন্য কৃতী পুরুষের এ-হেন অভাবনীয় ত্যাগে। অনেকেই বলেছেন আমাকে বিজ্ঞ হেসে: 'এ যে—এ যে মিডীভাল!'

আমি তাঁকে বলেছিলাম: "স্বামীজি, কালিদাস বলেছিলেন 'পুরাণম্ ইত্যেব ন সাধু সর্বং'—যা কিছু সেকেলে তা-ই প্রশংস্য নয়। কিন্তু ঠিক তেমনি পাল্টে বলা যায় 'আধুনিকম্ ইত্যেব ন সাধু সর্বং'—যা কিছু একেলে তা-ই আহা-মরি নয়। তবে ডোরাস্বামীকে একটু কাছ থেকে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তাই আপনি যা বললেন তার সঙ্গে একটু জুড়ে দিতে চাই: যে, ডোরাস্বামী পাগলের মতন 'অভাবনীয় ত্যাগ' করবার আগেও বিচক্ষণদের দলে নাম লেখাতে চান নি। কারণ সর্বত্যাগ করবার আগেও তিনি কম পাগলামি করতেন না দিনের পর দিন: শুধু যে মক্কেলরা নধর দক্ষিণা দিতে চাইলেও কোনো মিথ্যা কেস নিতেন না তাই নয়—প্রায়ই তাদের সদুপদেশ দিতেন সব আগে তাদেরই মঙ্গলের কথা ভেবে: যে, মকদ্দমা না ক'রে আপোষে রফা করাই শ্রেয়। শুনেছেন কখনো কোনো বিচক্ষণ বর্ধিষ্ণু উকিলকে এভাবে নিজের আয়ের দিকে দৃষ্টি না রেখে মক্কেলকে শুভ-বুদ্ধির নির্দেশ দিতে? হিন্দুতে মাদ্রাজের চীফ জাস্টিসের ডোরাস্বামী প্রশস্তিতে আমি একথা পড়েছি, কাজেই এ বাজে গুজব নয়। শুধু তাই নয়—ডোরাস্বামী যখন হাইকোর্ট থেকে বিদায় নিয়ে পণ্ডিচেরিতে চ'লে এলেন ফকির হ'য়ে—তখন এমনকি তাঁর প্রতিযোগীরাও বলেছিল বিষণ্ণ সুরে: এমন সদাশয় বন্ধু আর পাব না।' জুনিয়র উকিলরা চোখের জল ফেলেছিল এমন উদার হাসি আর দেখব না' ব'লে।"

এহেন মানুষ যখন উত্তরকালে গুরুর আশ্রমের সঙ্গে সব আদানপ্রদানের সংশ্রব ত্যাগ করতে বাধ্য হন, তখন তাকে কী দুঃখ পেতে হয়েছিল বাইরে কেউ জানতে পারে নি—কারণ তিনি কাউকে দোষ দেন নি—নীরবে চ'লে গিয়েছিলেন সোজা রমণ মহর্ষির কাছে। মহর্ষির শান্তি সান্নিধ্য তাঁর দুর্দিনে তাঁর কাছে এসেছিল বিধাতার বর হ'য়েই বলব। কিন্তু বড় আধার ছোট পরীক্ষা পাশ ক'রে পার পায় না তো, তাই ডোরাস্বামীকেও পুত্র শোকের সঙ্গে সঙ্গে

সইতে হ'ল আরো দুটি গভীর শোক : প্রথম, ১৯৫০ সালে এপ্রিলে রমণ মহর্ষি দুষ্টক্ষতে রক্তক্ষরণে দেহরক্ষা করলেন, এবং তার পরেই ৫ই ডিসেম্বর শ্রীঅরবিন্দ করলেন মহা-প্রয়াণ। ডোরাস্বামী মাদ্রাজ থেকে ছুটে এসে শ্রীঅরবিন্দের মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে না কি কেঁদে বলেছিলেন : "আমি না গিয়ে তিনি কেন গেলেন ?" শ্রীঅরবিন্দের কথা বলতে আজও তাঁর চোখে জল ভরে আসে। পুণাতে একবার তিনি ইন্দিরা ও আমাকে বলেছিলেন : "তোমরা কেন যখন তখন বলো—আমি গুরুচরণে এত দিয়েছি, তত দিয়েছি—যখন আমি যা দিয়েছি পেয়েছি তার চতুর্গুণ ? তাছাড়া আমি সাধ্যমত যা পারতাম দিতাম—'দাতা' নাম কিনতে তো নয়—শুধু দান করার আনন্দে। এ ধুলোবালির জীবনে এমন আনন্দ কি আর আছে, বলো তো দিলীপ ? শুধু দেওয়া—অকুণ্ঠে বিলিয়ে যাওয়া। আমি প্রায়ই বলি —ইন্দিরা, যারা দেওয়ার আনন্দের স্বাদ পায় নি তাদের মতন দুর্ভাগ্য আর নেই। খৃষ্টদেব বলেছিলেন কি সাধে : 'It is more blessed to give than to receive ?' আমি উত্তরে তাঁকে প্রণাম ক'রে বলেছিলাম : "আপনি আমাদের গৃহে অতিথি হয়েছেন এতে আমরা ধন্য হয়েছি—আমাদের কুটির পবিত্র হয়েছে।" অত্যুক্তি বলবে কি ?

এহেন বরেণ্য মহাজন আজ শান্তি পেয়েছেন কালীদার স্নেহাশ্রয়ে। বৎসরে অন্তত চার পাঁচ মাস তিনি কালীদার আতিথ্যেই কাটান। কালীদা তাঁকে কোনো মন্ত্র দীক্ষা দিয়েছেন কি না জানি না (কারণ বলেছি, কালীদা মন্ত্রগুপ্তিতে বিশ্বাস করেন), তবে একটু জানি যে, তিনি আজ কালীদার স্নেহাস্পদ, অন্তরঙ্গ। কাশীতে তাই এবার এই দুটি যথার্থ অসামান্য মানুষের সংস্পর্শে এসে আমাদের গভীর আনন্দে দিন কেটেছিল। রোজই সকালে কালীদার সঙ্গে নানা হাসি গল্পে আলোচনায় আমাদের সময় কেটে যেত তর তর ক'রে।

কাশীতে এবার একটি চমৎকার ইরাণী অভিজাতের সঙ্গে বন্ধুত্ব হ'ল। তাঁর নাম সৈয়দ হুসেন নাসির। পারস্যের শিক্ষাসচিব—Education Minister. যেমন রমণীয় চেহারা তেমনি কমনীয় আচরণ! কিন্তু শুধু কান্তি শান্তি আচরণের আভিজাত্যই নয়, মানুষটি সত্যিকার জিজ্ঞাসু তথা চিন্তাশীল। গীতা আট দশবার পড়েছেন—শ্রীঅরবিন্দের রচনার সঙ্গেও গভীর পরিচয় আছে। কাজেই বন্ধুত্ব হয়ে গেল বৈকি দেখতে দেখতে। জীবনে একটি সম্বন্ধ সহজেই বড় তৃপ্তিকর হ'য়ে ওঠে—যখন আমি যাকে ভক্তি করি তুমিও তাকে ভক্তি করো—common admiration, community of worship, তার উপর মুসলমান অভিজাত হ'য়ে গীতা ও শ্রীঅরবিন্দের ভাবের ভাবুক, সোজা কথা নয় তো। নাসির বললেন—রবীন্দ্রনাথ পারস্যে তাঁর পিতার অতিথি হয়েছিলেন, তাই আরো উজিয়ে উঠলাম। আমার ভজন ও গীতার বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলেন। বললেন : "গীতাকে আমি এ যাবৎ কর্মযোগের শাস্ত্র ব'লেই জানতাম, তাই মুগ্ধ হয়েছি আরো জেনে যে গীতায় মূল বাণী ভক্তি, জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয়…" ইত্যাদি।

কালীদার কথা উল্লেখ করতে নাসির সাগ্রহে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে গেলেন ও দুজনে মিলে মনের সুখে কোরান ও সুফীদের ঈশ্বরবাদ নিয়ে অনেক আলোচনা করলেন। কালীদা সুফী-ধর্মে বেদান্তের প্রভাব সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন, কিন্তু এ-স্মৃতিচারণে সে-আলোচনার অনুলিপি দেওয়া সম্ভব নয়। এ-কথার তবু উল্লেখ করলাম শুধু এই জন্যে যে—কালীদার কোরান ও সুফীবাদ সম্বন্ধেও এত পড়াশুনা আছে দেখে চমৎকৃত হয়েছিলাম আমরা সবাই। নাসির বললেন : "Remarkable man! I am glad you took me to him." কালীদার কাছে আরো অনেক বিদেশী জিজ্ঞাসু আসেন। একবার আমার সঙ্গে স্যর পল ডিউক গিয়েছিলেন—কালীদার সঙ্গে তন্ত্র আলোচনা করতে। এবারও তন্ত্র সম্বন্ধে কালীদা অনেক কথা ব'লে শেষে বললেন শ্রীগোপীনাথ কবিরাজের কথা : "He is the last word on Tantra—এত-বড় তন্ত্রজ্ঞ ভূভারতে দুটি নেই।

কাশীতে এবার এই ভাবে শুধু পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে আলাপ ক'রে নয়, নতুন বন্ধুর দেখা পেয়ে মন আমার প্রহৃষ্ট হয়েছিল। তবে কাশীতে কবে আমি অহৃষ্ট হয়েছি ? দশাশ্বমেধ ও কেদারঘাটে প্রত্যহ গঙ্গাস্নান, গঙ্গাবক্ষে নৌকাবিহার, সৎসঙ্গ, সদালোচনা, মিলন-বসীর সদা-প্রফুল্ল সহযোগ—সব জড়িয়ে এবারকার কাশীবাস আমার কাছে বিশেষ ক'রেই স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে। [ক্রমশঃ

রবীন্দ্রকাব্যে বৈষ্ণবপ্রভাব

অমিতাভ চক্রবর্ত্তী রায়চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা মৌলিক। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কবির জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক, তাঁহার কয়েকটি কবিতার মধ্যে বৈষ্ণবপদাবলীর প্রভাব দেখা যায়। বৈষ্ণবপদাবলীর প্রতি কবির যে অনুরাগ আছে তাহা তাঁহার কৈশোরে লিখিত 'ভানুসিংহের পদাবলী'তে পরিলক্ষিত হয়। ইহা বৈষ্ণবপদাবলীর অনুকরণে কবির কৈশোরিক প্রচেষ্টার এক সার্থক নিদর্শন। এই পদাবলীতে একুশটি পদ আছে। ইহার প্রত্যেকটি পদই প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদের মৈথিলী মিশ্রিত ব্রজবুলির পদের অনুকরণে লিখিত। এই পদাবলী যখন ছদ্মনামে ভারতীতে প্রকাশিত হইতেছিল তখন ডক্টর নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জার্ম্মানীতে থাকাকালীন য়ুরোপীয় সাহিত্যের সহিত আমাদের গীতিকাব্যের তুলনা করিয়া লিখিত তাঁহার একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকায় ভানুসিংহকে প্রাচীন পদকর্ত্তারূপে প্রচুর সম্মান দিয়াছিলেন। এই গ্রন্থখানি লিখিয়াই তিনি 'ডক্টর' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব কবিদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা ও অনুরাগের পরিচয় তাঁহার সোনার তরী কাব্যের 'বৈষ্ণব কবিতা' নামক কবিতায় এবং চণ্ডিদাস-বিদ্যাপতি সম্পর্কে আলোচনাতেও পাওয়া যায়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে তাঁহার কবিতায় বৈষ্ণব প্রভাবের কারণ কবির বৈষ্ণবানুরাগ প্রসূত।

রবীন্দ্রকাব্যে বৈষ্ণবপ্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে বৈষ্ণবভাব বা সহজিয়া ভাব কাহাকে বলে তাহা জানিতে হইবে। 'সহজিয়া' শব্দটি সংস্কৃত 'সহজ' বা 'সহজাত' শব্দ হইতে আসিয়াছে। 'রাগানুগ-দর্পণ' নামক একখানি অপ্রকাশিত গ্রন্থে সহজিয়া শব্দের নিম্নোক্তরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে—"সহজ ভজন শব্দের অর্থ এই যে, জীব চৈতন্যস্বরূপ আত্মা। প্রেম আত্মার সহজ ধর্ম্ম। যে ধর্ম্ম যে বস্তুর সহিত একত্র উৎপন্ন হয় তাহা সহজ।" সহজিয়াগণের মতে মানবের মধ্যেই ভগবানের যাবতীয় তৃপ্তি ও যাবতীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। মানব ভগবানের প্রতিকৃতি স্বরূপ। জন্মপরিগ্রহ করাতে মনের মানব রূপান্তরিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই ভগবৎসুলভ বৃত্তিগুলি আদৌ হারায় নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় রক্ষিত একখানি সহজিয়া পুঁথিতে আছে—

> "এই মত মানুষ ঈশ্বর জাতিগণ
> লুকাইতে নাহি পারে স্বভাব কারণ ॥
> ঈশ্বর স্বভাব যদি মনুষ্য স্বভাব হয়।
> স্বভাবের গুণে তারে ঈশ্বর বা হয়।"

অর্থাৎ সহজিয়াগণের মতে প্রেমই মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি এবং এই প্রেমের দিক্ দিয়া ঈশ্বরের সহিত মানুষের সাদৃশ্য আছে বলিয়া মানুষ ভালবাসার যোগ্য। চণ্ডিদাসও মানুষকে এই কারণে অতি উচ্চে স্থান দিয়াছেন—

> "শুনহ মানুষ ভাই,
> সবার উপরে মানুষ সত্য
> তাহার উপরে নাই।"

বৈষ্ণবগণের এই মানব প্রেম রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সংক্রামিত হইয়াছিল। এই সহজিয়াতত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা তাঁহার লিখিত একটি প্রবন্ধের অংশ বিশেষে পাওয়া যাইবে—"যাহাকে আমরা ভালবাসি কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। এমন কি জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করার অন্য নাম ভালবাসা। প্রকৃতির প্রেম অনুভব করার নাম সৌন্দর্য্য সম্ভোগ। সমস্ত বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধ্যে এই গভীর তত্ত্বটি নিহিত রহিয়াছে। বৈষ্ণবধর্ম্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেম সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে, মা আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না—সমস্ত হৃদয়খানি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়াই শেষ করিতে পারে না, তখন আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে, প্রভুর জন্য দাস আপনার প্রাণ দেয়, বন্ধুর জন্য বন্ধু আপনার স্বার্থ বিসর্জ্জন করে, প্রিয়তম এবং প্রিয়তমা পরস্পরের নিকট আপনার সমস্ত আত্মাকে সমর্পন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন এই সমস্ত প্রেমের মধ্যে একটা সীমাতীত ঐশ্বর্য্য অনুভব করিয়াছে।"—পঞ্চভূত মনুষ্য ব্যক্তিকে ভালবাসিয়া অন্তরকে উপলব্ধি করিবার বাসনা করে, কবির 'ধ্যান', 'পূর্ব্বকালে' 'অনন্তপ্রেম', 'জীবন মধ্যাহ্ন' প্রভৃতি কবিতাগুলিতে এই ভাবে রহিয়াছে।

কতকগুলি কবিতায় কবির প্রকৃতি-প্রীতির ব্যাকুলতাই পৃথিবী ও মানুষকে নির্ব্বিচারে ভালবাসার প্রেরণা কবিকে দিয়াছে। অবশ্য এই প্রকৃতি প্রীতি ভগবৎপ্রীতি ভিন্ন আর কিছুই নয়। কারণ প্রকৃতিও ঈশ্বরেরই এক অংশ। এই সকল কবিতার মধ্যে মানসীর 'অহল্যার প্রতি', সোনার তরীর 'সমুদ্রের প্রতি', 'বসুন্ধরা', 'আজি বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে' ও কয়েকটি সনেটকল্প রচনা উল্লেখযোগ্য। এই সকল সনেটে নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ মর্ত্ত-জীবানুরাগের পংক্তি পাওয়া যায়—"লক্ষ কোটি জীব লয়ে এ বিশ্বের মেলা, তুমি জানিতেছ মনে সব

ছেলেখেলা," "চাহি না ছিঁড়িতে একা বিশ্বব্যাপী ডোর, লক্ষকোটি প্রাণী সাথে একপতি মোর", "বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে, আমি একা বসে রব মুক্তি সমাধিতে ?" কবির বনের প্রীতি 'এবার ফিরাও মোরে', 'স্বর্গ হইতে বিদায়', 'আমার একলা ঘরের আড়াল ভেঙে বিশাল ভবে' 'একা আমি ফিরব না আর এমন করে', 'বিশ্বমাঝে যোগে যোগে যেথায় বিহারো', 'যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন', 'ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক পড়ে', 'হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থ', 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ', 'প্রাণ', 'কাঙালিনী' প্রভৃতি মানব-প্রীতি সম্পর্কিত কবিতাগুলিতে পরিলক্ষিত হয়।

সহজিয়া তত্ত্বের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে নিষ্কাম সৌন্দর্য্যানুভূতি বা প্রেম। যাহা কামজ বা দেহজ নহে—তাহাই পবিত্র। শ্রীকৃষ্ণ-রাধিকার প্রেম, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তের প্রেম—এই জাতীয় অনুভূতি বা প্রেম। বৈষ্ণব সাহিত্যের 'রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম কাম গন্ধ নাহি তায়' বা 'ন সো রমণ ন হাম রমণী' প্রভৃতি পংক্তিগুলিতে বা বৈষ্ণব দার্শনিকেরা যার বর্ণনায় 'স্বার্থগন্ধহীন', 'অকৈতব' প্রভৃতি বিশেষণ ব্যবহার করিয়াছেন—সেই ভাবের উক্তিগুলি রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতায় দেখা যায় যে কবির সৌন্দর্য্যদর্শন লৌকিকতা ও বিচার-বোধের অতীত হইয়া নিষ্কাম হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল কবিতার মধ্যে প্রথমেই 'উর্ব্বশী'কে গ্রহণ করা যায়। উর্ব্বশীকে কবি তাঁহার সমস্ত সৌন্দর্য্যানুভূতি দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তবুও উর্ব্বশী সম্পর্কে মানুষের বা কবির যে আকর্ষণ, তাহা দেহজ বা কামজ নয়—তাহা অপার্থিব আকর্ষণ মাত্র। উর্ব্বশী সম্পর্কে কবি যাহা লিখিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য।

"উর্ব্বশী যে কী, কোনো ইংরাজী তাত্ত্বিক শব্দ দিয়ে তার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করতে চাইনে, কাব্যের মধ্যেই তার অর্থ আছে। এক হিসাবে সৌন্দর্য্যমাত্রই এব্‌স্ট্র্যাক্‌ট্—সে তো বস্তু নয়—সে একটা প্রেরণা যা আমাদের অন্তরে রসসঞ্চার করে। 'নারীর' মধ্যে সৌন্দর্য্যের যে প্রকাশ, উর্ব্বশী তারই প্রতীক। সে সৌন্দর্য্য আপনাতেই আপনার চরম লক্ষ্য—সেইজন্য কোনো কর্ত্তব্য যদি তার পথে এসে পড়ে তবে সে কর্ত্তব্য বিপর্য্যস্ত হয়ে যায়। এর মধ্যে কেবল এব্‌স্ট্র্যাক্‌ট সৌন্দর্য্যের টান আছে তা নয়। কিন্তু যে হেতু নারীরূপকে অবলম্বন করে এই সৌন্দর্য্য, সেইজন্য তার সঙ্গে স্বভাবতঃ নারীর মোহও আছে। সেলি যাকে ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল—বিউটি বলেছেন, উর্ব্বশীর সঙ্গে তাকেই অবিকল মেলাতে গিয়ে যদি ধাঁধাঁ লাগে, তবে সেজন্য আমি দায়ী নই। গোড়ার লাইনে আমি যার অবতারণা করেছি, সে ফুলও নয়, চাঁদও নয়, গানের সুরও নয়—নিছক নারী মাতা কন্যা বা গৃহিণী সে নয়,—যে নারী সাংসারিক সম্পর্কের অতীত, মোহিনী, সেই।"

এই প্রসঙ্গে তিনি আর একজায়গায় লিখিয়াছেন, "দেবতার ভোগ নারীর মাংস নিয়ে নয়, নারীর সৌন্দর্য্য নিয়ে। হোক্‌না সে দেহের সৌন্দর্য্য, কিন্তু দেহতো সৌন্দর্য্যের পরিপূর্ণতা সৃষ্টিতে এইরূপ—সৌন্দর্য্যের চরমতা মানবেরই রূপে। সেই মনের রূপের চরমতা স্বর্গীয়। উর্ব্বশীতে সেই দেহ-সৌন্দর্য্য ঐকান্তিক হয়েছে, অমরাবতীর উপযুক্ত হয়েছে।"

সৌন্দর্য্য সম্পর্কে কবির কাম-সম্পর্ক-হীনতার তত্ত্বটি কবি স্পষ্টভাবে 'আবেদন' এবং 'বিজয়িনী' কবিতায় বলিয়াছেন—"আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর" বা "অকাজের কাজ যত, আলস্যের সহস্র সঞ্চয়" প্রভৃতি উক্তির মধ্যে কবির কামনাহীন সৌন্দর্য্যানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। 'বিজয়িনী' কবিতার নিম্নলিখিত পংক্তি কয়টিতে কবির উপরোক্ত ভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়—

"পরক্ষণে ভূমি পরে
জানু পাতি বসি নির্ব্বাক বিস্ময় ভরে
নতশিরে পুষ্পধনু পুষ্পশর ভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা-উপচার
তূণ শূন্য করি।"

তৃপ্তিহীন ভোগের জন্য যে রূপের কাছে মদন আসিয়াছিল, সেই রূপকেই পূজা করিয়া সে আনন্দ পাইল এবং পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিল,' কবির কামগন্ধহীন ইন্দ্রিয়াতীত বিশুদ্ধ-সৌন্দর্য্য-উপলব্ধির ব্যগ্রতা 'সুরদাসের প্রার্থনা বা আঁখির—অপরাধ নামক কবিতায় দেখা যায়—

"হৃদয় আকাশে থাকেনা জাগিয়া দেহহীন
তব জ্যোতি ?
বাসনা-মলিন আঁখি-কলঙ্ক ছায়া ফেলিবেনা তায়।"

এই কামনাহীনতা মানসীর 'নিষ্ফল প্রয়াস', 'হৃদয়ের ধন,' কড়ি ও কোমলের 'দেহের মিলন', 'পূর্ণ মিলন,' 'মোহ ও মরীচিকা', 'বিবসনা' প্রভৃতি কবিতায় দেখা যায়।

বৈষ্ণবদর্শনের আর একটা দিক্ হইতেছে বিরহ। বৈষ্ণব কবিগণের মতে বিরহের মধ্য দিয়া ভালবাসা পূর্ণতা লাভ করে। প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনের ব্যাকুলতা তাহাদিগকে ভালবাসার গভীরস্তরে পৌঁছাইয়া দেয়। তাহাদের এই মিলন-ব্যাকুলতার ফলে তাহারা পরস্পরকে বিশ্বসংসারের সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ করে—ক্ষুদ্র গণ্ডি ছাড়িয়া তাহারা ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে বৃহত্তর গণ্ডিতে। কবির এই ভাবের প্রকাশ দেখা যায় সোনার তরীর 'মানস সুন্দরী'র নিম্নলিখিত পংক্তিগুলিতে—

"মিলনে আছিলে বাঁধা
শুধু এক ঠাঁই, বিরহে টুটিয়া বাধা
আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছ প্রিয়ে,
তোমারে দেখিতে পাই সর্ব্বত্র চাহিয়ে।"

কৃষ্ণবিরহে শ্রীরাধিকা সকল জগৎ এইরূপ কৃষ্ণময় দেখিয়াছিলেন, আবার রবীন্দ্রনাথের 'উর্ব্বশী' কবিতায় বিরহ-কাতর পুরুরবাও উর্ব্বশীকে সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। তাই নিরলঙ্কারা লতাকে দেখিয়া তাহার প্রিয়াভ্রম হইল এবং 'কোপবশে ত্যক্তভূষণা আর্দ্রনয়না তন্বী শ্যামাঙ্গী এইতো প্রিয়া'—এই বোধে যেই সে সেই লতাকে আলিঙ্গন করিল অমনি মিলন-মণির স্পর্শে তাহা উর্ব্বশীর রূপ ধারণ করিল।

"বিচ্ছেদেরই ছন্দ লয়ে মিলন ওঠে পূর্ণ হয়ে"—কবির এই ভাব

রূপপরিগ্রহ করিয়াছে চিত্রার 'স্বর্গ হইতে বিদায় ও মানসীর 'বিরহানন্দ' কবিতায়।

যে বিরহ বেদনায় কাতর হইয়া বিদ্যাপতির রাধা বলিয়াছিলেন,—'কৈসে গময়ব হরি বিনু দিন রাতিয়া' সেই কাতরতা আমরা কবির সুরদাসের কথার মধ্যেও পাই—

"হরি—হীন সেই অনাথ বাসনা পিয়াসে জগতে ফিরে।
জড়ে তৃষা,—কোথা পিপাসার জল অকুল লবণ—নীরে।"

প্রকৃতি মানুষের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। বর্ষার দিনে মিলনের কামনা এত অত্যুগ্র হইয়া উঠে যাহা অন্য কোন ঋতুতে দেখা যায় না। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে বর্ষা ঋতুতে সকল কাজের ছুটি হইয়া যাইত, তখন প্রবাসী মিলনের ব্যাকুলতা লইয়া গৃহে ফিরিত—গৃহেও প্রিয়জন আগমন প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া দিন গুণিত। এই ভাবটি ভারতের নরনারীর মনের সঙ্গে নিবিড় হইয়া মিলিয়া গিয়াছিল—বর্ষা তাহাদের নিকট বিরহ-দশা-মোচনের অগ্রদূতী রূপে আবির্ভূত হইত। এইজন্য মহাকবি কালিদাস হইতে বিদ্যাপতি পর্য্যন্ত সকল প্রাচীন কবি বর্ষাকে বিরহের ঋতু রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ষায় বিরহ জাগে—তখন প্রাণের আকুতি প্রণয় প্রতিবেদনে পরিব্যক্ত হইতে চায়। তাই বৈষ্ণব-কবিদের শ্রীরাধিকা বর্ষাসমাগমে অভিমানক্ষুব্ধ অন্তরে মিলন-ব্যাকুলা হইয়া মেঘের নব নব রূপান্তরের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করে, রবীন্দ্রনাথ ও বহু জায়গায় বর্ষার এই বিরহ বেদনার রূপকে দেখিয়াছেন—বিরহীর বেদনা রূপধরে দাঁড়ালো, ঘন বর্ষার মেঘ আর ছায়া দিয়ে গড়া সজল রূপ"—ঋতু উৎসব, শেষ বর্ষণ।

"দুর্দ্দান্ত বৃষ্টি। বৃষ্টির দিনে যাকে ভালবাসে তার দুই হাত চেপে ধরে বলতে ইচ্ছে করে—জন্মজন্মান্তরে আমি তোমার।"—শেষের কবিতা।

বর্ষাঋতুতে প্রেমিকার বিরহ-বেদনা কবির 'বর্ষারদিনে,' 'আকাঙ্ক্ষা,' 'একাল ও সেকাল', 'মেঘদূত' প্রভৃতি কবিতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কবির জীবন-দেবতা শ্রেণীর কবিতাগুলিতে কবি নিজের সহিত জীবনদেবতা স্বরূপ শক্তির যে মধুর সম্পর্ক কল্পনা করিয়াছেন, তাহাতেও বৈষ্ণবীয় মাধুর্য্য আরোপিত হইয়াছে। কবি এই শক্তিকে অনুরাগের দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন এবং তাঁহার সহিত বৈষ্ণব-জনোচিত মধুর সম্পর্ক স্থাপন করিয়া একটা সান্ত্বনা অনুভব করিয়াছেন। এই ভাব কবির নিজের আলোচনাতেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—"মনে কেবল এই প্রশ্ন উঠে, আমি আমার এই আশ্চর্য্য অস্তিত্বের অধিকার কেমন করিয়া রক্ষা করিতেছি—আমার উপরে যে প্রেম যে আনন্দ অশ্রান্ত রহিয়াছে, যাহা না থাকিলে আমার থাকিবার কোনো শক্তিই থাকিত না, আমি তাহাকে কি কিছুই দিতেছিনা?" কবির এই শ্রেণীর কবিতার মধ্যে 'সোনার তরী', 'নিরুদ্দেশ যাত্রা', 'সাধনা', 'মানস সুন্দরী'. 'অন্তর্যামী', 'জীবন দেবতা', ও 'সিন্ধুপারে' প্রধান।

কবির এই বৈষ্ণবীয় মাধুর্য্য লক্ষ্য করা যায় কবির 'অরূপের' আরাধনায়। এই কবিতাগুলির বেশীর ভাগই কবির গীতাঞ্জলী, গীতালী, গীতিমাল্য, বলাকা প্রভৃতি গীত সঞ্চয়নের মধ্যে আছে। কবির অরূপের ধ্যানের সহিত বৈষ্ণবদের কৃষ্ণধ্যানের সাদৃশ্য আছে। অরূপকে কবি সমস্ত কিছু সমর্পণ করিয়া তাঁহার সহিত একাত্মা হইতে চাহেন। অরূপের মধ্যেই তিনি বিশ্বদর্শন করিবার অভিলাষ করেন। বৈষ্ণবরাও শ্রীকৃষ্ণের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে চাহেন এবং অর্জুন এই শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেই বিশ্বরূপদর্শন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা কল্পনা করিয়াছেন। কবির অরূপানুভূতির চমৎকার অভিব্যক্তিগুলি নিম্নলিখিত পংক্তিগুলিতে পাওয়া যায়।

"পরশ যাঁরে যায় না করা
সকল দেহে দিলেন ধরা,
এইখানে শেষ করেন যদি
শেষ করে দিন তাই—"

"এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর।"

"কাণ্ডারী গো এবার যদি পৌঁছে থাকি কূলে
হাল ছেড়ে দাও, এখন আমায় হাত ধরে লও তুলে।"

কবি এই অরূপানুভূতিকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহার নিম্নলিখিত প্রবন্ধের অংশবিশেষে—"আমাদের আত্মার মধ্যে অখণ্ড ঐক্যের আদর্শ আছে। আমরা যা কিছু জানি, কোন না কোন ঐক্যসূত্রে জানি।...কাব্যে চিত্রে গীতে শিল্পকলায় শ্রীকুশিল্পীর পুজাপাত্রে বিচিত্ররেখায় যখন আমরা পরিপূর্ণ একেকে চরমরূপে দেখি তখন আমাদের আন্তরাত্মার একের সঙ্গে বহির্লোকের একের মিলন হয়।"

(তথ্য ও সত্য—সাহিত্যের পথে)

কবির এই 'পরিপূর্ণ একের চরম রূপ' হইতেছে অরূপ; আবার বৈষ্ণবদের নিকট ইহাই হইতেছে—সকল রূপের আধার রূপাতীত শ্রীকৃষ্ণ।

এইতো গেল ভাবের কথা। রবীন্দ্রকাব্যের ভাষাতেও বৈষ্ণবপ্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বস্তুতঃ পদাবলীর ভাষাচাতুর্য্য আয়ত্ত করিবার জন্যই আমরা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এক শক্তিমান কবির পরিচয় পাই। পদাবলীর ভাষাকেই অবলম্বন করিয়া কবির গীতিময় কবিতাসমূহতে তাঁহার রোমাণ্টিক ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে। ভানুসিংহের পদাবলীকে বাদ দিলে সোনার তরী ও মানসীতেই কবির এই পদাবলী-আশ্রিত ভাষাবৈশিষ্ট্যের দৃষ্টান্ত বেশী পরিমাণে মিলে। এই দুই কাব্যের বিশেষ উল্লেখযোগ্য পংক্তিগুলি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

যাহা লয়েছিনু ভুলে সকলি দিলাম তুলে থরে বিথরে; বাদল ঝরঝর গরজে মেঘ, পবন করে মাতামাতি, শিথানে মাথা রাখি বিথান কেশ; স্বপনে কেটে যায় রাতি; কলসে লয়ে বারি—কাঁকন বাজে নূপুর বাজে চলিছে পুরনারী; পারেতে যেন বসিয়াছিল ধরিয়াছিল কর, এখনো তার পরশে যেন সরস কলেবর; এমনি দুইপাখী দোঁহারে ভালবাসে তবু ও কাছে নাহি যায়, খাতার ফাঁকে ফাঁকে পরশে মুখে মুখে নীরবে চোখে চোখে চায়; মরমে গুমরি মরিছে কামনা কেমনে—বাঁচিবে নিপুণ বেণী বিনায়ে যতনে; কমল ফুল বিমল

বাজে কঙ্কন কিঙ্কিনী মন্ত্র বোল ; চিনি লব দোঁহে ছাড়ি ভয়লাজ, বক্ষে পরশি দোঁহে ভাবে বিভোল ; যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ—এস ওগো এস মোর হৃদয় নীরে ; ওই যে শবদচিনি নূপুর রিনিকিঝিনি, কে গো তুমি একাকিনী আসিছ ফিরে, আমারি এই আঙিনা দিয়ে যেয়োনা, অমন দীন নয়নে তুমি চেয়োনা ; বিকল হৃদয় বিবশ শরীর ডাকিয়া তোমারে কহিব অধীর কোথা আছ ওগো, করহ পরশ নিকটে আসি ; মরমে গুমরি মরিছে কামনা কত ; আমার প্রাণ তোমারে সঁপিলাম ; প্রভৃতি। (সোনার তরী)

বেলা যে পড়ে এল জল কে চল…কোথা সে ছায়া সখি কোথা সে জল ; লাজে ভয়ে থরথর ভালবাসা সকলের তার লুকাবার ঠাঁই কাড়িয়া নিয়ে ; পরাণে ভালবাসা কেন গো দিলে, রূপ না দিলে যদি বিধি হে ; কাঁচল পরি আঁচল টানি ; উরসে পড়ি যূথীর হার বসনে মাথা ঢাকি ; তোমার লাগিয়া তিয়াগ যাহার সে আঁখি তোমারি হোক ; শুধু আমারি জীবন মরিল ঝুরিয়া চিরজীবনের তিয়াসে ; ঘরে যারা আছে পাষাণে পরাণ বাঁধিয়া—কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব ; মনে কি করেছ বঁধু ও হাসি এতই মধু, প্রেম না দিলেও চলে শুধু হাসি দিলে, তোমার আঁখির মাঝে হাসির আড়ালে ; কখনো সারারাত ধরে হাত দুখানি, রহিগো বেশবাসে কেশ পাশে মরিয়া ; কে জানে সে ফুল তোলে কিনা কেউ ভরি আঁচোর ; গান শুনে আঃ ভাসে না নয়নে নয়ন লোর ; চেয়ে আছে আঁখি, নাইও আঁখিতে প্রেমের ঘোর ; আকুল বাতাসে মদির সুবাস বিকচ ফুলে ; এমন করিয়া কেমনে কাটিবে মাধবী রাতি ; মনে পড়ে সেই হৃদয় উচ্ছাস নয়ন কূলে ; ইত্যাদি। (মানসী)

রবীন্দ্রকাব্যের ভাব ও ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলীর এইরূপ প্রভাব বিস্ময়কর নহে। কারণ রবীন্দ্রনাথ পূর্ব্ববর্তী ভারতীয় সাধকদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন খাঁটি বৈষ্ণব। এই বৈষ্ণব হইবার জন্য আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মগ্রহণের প্রয়োজন চাই। মানুষের প্রকৃতি অনেক সময় মানুষের ধর্ম্ম নির্ণয় করে। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় সহজিয়া সাধক, যিনি মানব প্রেমের প্রচার তাঁহার সাহিত্যের সর্ব্বত্র করিয়া গিয়াছেন তাঁহাকে বৈষ্ণব বলিতে বাধা নাই। কিন্তু প্রথমেই বলিয়াছি—রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা মৌলিক। তাঁহার ভাব ও ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলীর এত প্রভাব থাকা সত্ত্বেও তাহা যে মৌলিক আখ্যা পাইয়াছে তাহার একমাত্র কারণ—রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব ভাব ও ভাষাকে স্বীয় প্রতিভার বলে এক নূতন রূপে রূপায়িত করিয়া আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন।

ভালবাসার কুঁড়ি

শ্রীমতী সুজাতা সিংহ

জানিনে
সেদিন শুভ কি অশুভ তিথি, যেদিন
তোমায় প্রথম দেখলেম—
নিজেকে হারালেম,
একি ভালবাসা, না এ মোহ ?
জানি নে।

তবে ?
তোমায় শুধু ভাবি এবং ভাবছি
যেদিন প্রথম তোমায় দেখলেম,
সেদিন থেকেই জাগল কি
আমার পুলক আর প্রেম ?
জানি নে।

মনোলীনা,
তুমিও আমায় ভাবছ কি না
মনের কোণে ? ভালবাসছ কিনা,
ভালবাসবে কিনা কোনোদিনো,
জানি নে।

তবুও
মনের মুঠি দিয়ে, সুধাপূর্ণ
অন্তরে তোমায় রেখেছি ধ'রে—
কত যে জোরে, তুমি জানছ কি না
জানি নে।

শুধু এইটুকু জানি—
তোমায় ভুলতে হার মানি।

একটি অদ্ভুত মামলা

ডঃ শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

'একটা বিষয় আমার বার বার মনে হচ্ছে, স্যার' আমার সহকারী চায়ের এক চুমুক শেষ করে বললেন, 'এই মহিলাটী ঐ সাঙ্ঘাতিকভাবে আহত যুবকটীকে নিয়ে তার বাড়ীতে একাই থাকেন। ওঁর বাড়ীতে একটা ঝি-চাকরও দেখলাম না। ডাক্তারও আসছেন বটে; কিন্তু কিছুক্ষণ থেকে তারাও চলে যাচ্ছেন। ওপরের ফ্ল্যাটেও তো কেউ থাকে না। উনি নিজের বাড়ীতে নিজে সর্ব্বেসর্ব্বা। ওঁকে সাহায্য করবার মত চতুষ্পার্শ্বে কেউই নেই। তা' ছাড়া ওঁর খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারও তো আছে। ওঁদের বাজার হাট বাইরে থেকে কে করে আনে। এদিকে বড় রাস্তার দিককার দরজা জানালা তো ওদের সব সময়েই বন্ধ থাকে। কোনও ঝি-চাকর বা বাজার-সরকারকে তো ও-পাড়ার কেউ-ই ওঁর এই বাড়ীটাতে আজ পর্য্যন্ত ঢুকতে দেখলো না। ইদানিং তো উনি তাঁর ঐ রোগীর সেবাতেই ব্যস্ত আছেন। এর মধ্যে একদিনও তিনি বাড়ী থেকে বার হন নি যে কোনও হোটেল-টোটেল থেকে উনি খাওয়া-দাওয়া করে আসবেন। তার উপর রোগীর পথ্য আহার্য্য ও ঔষধ-পত্রও তো কেউ না কেউ ওঁকে এনে দেয়। কিন্তু এ-সব কায কখন কোন পথে হয়ে থাকে, এইটেই আমাদের প্রথমে জানা উচিত মনে হচ্ছে। আমার মতে আর গোপন তদন্ত না করে সোজা-সুজি ওঁকে এই সব ব্যাপারে আমাদের চ্যালেঞ্জ করে জিজ্ঞেস করা উচিত হবে।'

'আরে! এই সব প্রশ্ন আমার মনেও যে না জেগেছে তা নয়,' আমি সহকারী-অফিসারকে আশ্বস্ত করে উত্তর করলাম, 'তবুও আমি ইচ্ছে করেই ওঁকে এ-সব বিষয়ে কোনও প্রশ্ন করিনি। আমাদের প্রশ্নের থেই থেকে আমাদের অভিসন্ধি উনি জানতে পারলে আমরা এই সাংঘাতিক মামলা আদালতে প্রমাণ করবার জন্যে—তা না হলে কবে আমি এদের ক'টা আস্তানাই খানাতল্লাস করে সেগুলো একেবারে তছনছ করে ফেলতাম।

এই মামলার ব্যাপারে এই ভদ্রমহিলা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী কিনা তা এখনও আমরা নির্দ্ধারণ করতে পারিনি। এই অবস্থায় তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তায় আমাদের একটু সাবধানতা অবলম্বন করাই উচিত হবে। এখন চলো আজ নিউ-তাজমহলের তদন্তটা সেরে আসি গে—'

মামলা সম্পর্কে এমনি কথাবার্ত্তা আরও কিছুক্ষণ চালিয়ে আমরা উঠে পড়ছিলাম। এমন সময় আমাদের বেচারাম ওরফে বিচকে সেখানে এসে উপস্থিত হলো। আমরা অবাক হয়ে দেখলাম—বেচারাম এক অদ্ভুত বেশভূষা করেছে। তার পরণে একটা লাল গেঞ্জি ও একটা কালো হাফপ্যাণ্ট। পায়ে কোনও জুতো নেই। তবে বাম হাতে একটা রঙিণ ছোট থলে ও ডান হাতে একটা দশ টাকার নোট।

'আরে বেচারাম, এসে গেছো ভাই তুমি। তা হঠাৎ এতো সকালে এখানে?' বেচারামের উপস্থিতিতে একটু আশ্চর্য্য হয়ে গিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার হাতের এই দশ টাকা মাত্র বেঁচেছে? আমাদের কাছ হতে তো ত্রিশ টাকা নিয়েছিলে, তা'হলে এর মধ্যে কুড়ি টাকাই তুমি খরচ করে ফেলেছো?

আজ্ঞে! আপনাদের কাছ হতে আমি টাকা-কড়ি চাইতে আসি নি,' বেচারাম ওরফে বিচকে একটু মৃদু হেসে উত্তর করলো—তবে আপনাদের দেওয়া ত্রিশ টাকা কালই আমি খরচ করে ফেলেছি। আপনাকে তো আমি আগেই

বলেছি যে আমি আমার এক দুর-সম্পর্কীয় পিসেমশাই-এর বাড়ীতে থাকি। আমার পিসেমশাই সম্প্রতি এতো অসুস্থ যে উঠে হেঁটে আর বেড়াতে পারেন না। এদিকে আমার বৃদ্ধ পিসীমা কস্মিনকালে বাড়ী হতে কোথাও বার হননি। তাঁদের ছোট ছোট ছেলেরা তাদের স্কুল নিয়েই ব্যস্ত। এদানিং ওদের আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী হয়ে যাওয়ায় বাজারে ঠিক এই ত্রিশ টাকাই দেনা হয়ে গিয়েছিল। দেনদারদের তাগাদার বহরে আমার মনে হতো—কারও কাছে ঐ ক'টা টাকা কেড়ে নিয়ে তা এদের দিয়ে দিই। এমন সময় ভাগ্যগুণে এই ক'টা টাকাই আপনাদের কাছ হতে অযাচিত-ভাবে পেয়ে গেলাম। আমি ওঁদের যা কিছু দেনা তা আপনাদের ঐ টাকা ক'টা দিয়ে শোধ করে দিয়েছি। তবে সেই সঙ্গে আপনাদের কাযটাও যে করিনি তা মনে করবেন না।'

'বটে বটে। তাহলে আমাদের কাযও তুমি কিছু করেছো,' আমি এইবার উৎসুক হয়ে বেচারামকে জিজ্ঞেস করলাম, এখন এই দশ টাকা ও এই রঙিণ থলেটা নিয়ে চলেছো কোথায়? পিসেমশাই পিসীমাদের জন্যে বাজার করে আনতে?'

'কি'ই যে আপনি বলেন? একটু ক্ষুণ্ণ মনে বেচারাম উত্তর করলে, 'ওঁরা কি আর রোজ দশ টাকার মত বাজার করতে পারেন? আপনাদের এই মামলার একটা সুরাহা করবার জন্যেই আমি এই বাজার-সরকারের কায নিয়েছি।'

আমরা দুজনাই বেচারামের এই হেঁয়ালীপূর্ণ উক্তি শুনে অবাক হয়ে যচ্ছিলাম। কিন্তু পরে তার কাছে সকল কথা শুনে আমি উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠলাম, 'সাব্বাস ভাই বেচারাম। তোমার এই উপকার আমরা জীবনে ভুলব না।' তারপর আদর করে বেচারামকে কাছে বসিয়ে তার বিবৃতিটী লিপিবদ্ধ করতে সুরু করে দিলাম। তার এই বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

"কাল এখান থেকে ফিরে গিয়ে বিকালের দিকে আপনাদের কায করবো ঠিক করলাম। এদিকে এই মহিলাটীর বাড়ীর রাস্তার দিকের জানালা ও সেই সঙ্গে ওঁদের বাড়ীর প্রবেশ-পথেরও ছোট দরজাটা বন্ধ দেখা গেল। এদিকটা উনি এমন ভাবে আঁট শাঁট করে বন্ধ রেখেছেন যে একটা মাছি ঢুকবারও উপায় নেই। তাই এই বাড়ীর পিছনের বাড়ীটার ওপারের রাস্তায় এসে আমি উপস্থিত হলাম। সেখানে এসে দেখি সেই কমপাউণ্ডওয়ালা বাড়ীর সদর গেটে ইতিমধ্যেই একজন দরোয়ান মোতায়েন হয়েছে। আমাকে দেখে দরোয়ান-বাবু খেঁকরে উঠে বলে উঠলো—এ ছোকরা এখানে চাও কি? এর কি উত্তর হবে তা আমার আগে থেকেই ভাবা ছিল। আমি সঙ্গে সঙ্গে তার এই প্রশ্নের উত্তরে বললাম, একটা নকরী-টকরী দরোয়ানজী। খুব সম্ভবতঃ এই বাড়ীর নূতন আগন্তুকরা একটা নকরের জন্যে একে ব'লে রেখেছিল। আমার কথা শুনে দরোয়ানজী খুশী হয়ে তার হাতের খৈনিটা মুখের মধ্যে ফেলে দিয়ে বললো, ঠিক হ্যায়। নকরী একটো হামাকেও জরুরত আছে। এরপর সে আমাকে নিয়ে একেবারে এই বাড়ীর মালিকানীর কাছে এনে উপস্থিত করলো। আমি তাঁর কাছে কান্নাকাটী করে বললাম, মাজী, আমার বাপের খুব অসুখ। মধ্যে মধ্যে আমাকে বাড়ী যেতে দিলে আমি সকাল, সন্ধ্যে ও দুপুরেও ওখানকার সব কিছু কাযই করতে পারবো। আমার এই নূতন মনিবানী এতে গররাজী না হয়ে আমাকে কুড়ি টাকা মাসিক মাইনেতেই বহাল করে দিলেন, আর সেই সঙ্গে আমাকে এই সব নূতন পোষাকও আনিয়ে দিলেন। আমাকে মধ্যে মধ্যে ফাই-ফরমাজ-খাটা ও সকাল সন্ধ্যায় অতিথি এলে তাদের চা-খাবার সরবরাহ করার কাজ দিয়েছেন। এখন এই কটা টাকা আমাকে দিয়ে এক জোড়া সাদা জুতো, একটা সাদা মোজা ও সাদা হাফ সার্ট কি'নে নিতে বললেন। এইসব পোষাক পরে আমাকে ওঁর অতিথিদের সামনে জল খাবার ও পান সিগারেট নিয়ে আসতে হবে। এখন এতে আমি আমার পিসেমশাইকে টাকা দিয়েও সেই সঙ্গে আপনাদেরও খবর দিয়ে সাহায্য করতে পারবো।"

এই তুখোড় বালক বেচারামের বিবৃতিটী লিপিবদ্ধ করে আমি সহকারীর দিকে চেয়ে একটা স্বস্তির হাসি হেসে নিলাম। আমার সহকারী অফিসারও এই একই রকমের একটা হাসি মুখে ফুটিয়ে তুলে আমাকে আশ্বস্ত

করলেন। এখন কথা হচ্ছে এই যে—এই আদর-যত্নের কাঙ্গাল কারও কাছ হতে মায়ের মত আদর যত্ন পেয়ে একেবারে আমাদের হাতছাড়া না হয়ে যায়। ভাবপ্রবণ মানুষরা ছোট-বড়ো সব এক রকমেরই হয়ে থাকে। আজ এরা যেটা সত্য মনে করে, কাল সেটা তাদের কাছে মিথ্যে প্রতিপন্ন হয়ে উঠে। এদের কাছ হতে যদি কিছু আদায় করবার থাকে তা তাড়াতাড়ি আদায় করে নেওয়াই শ্রেয়ঃ। আমি আমাদের এই বালক-ইন্‌ফরমারের দিকে ভালো করে একবার স্নেহের দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে তাকে এই সম্পর্কে কয়েকটা প্রশ্ন করে কয়েকটী প্রয়োজনীয় বিষয় জেনে নেবো ঠিক করলাম। আমাদের এই সব প্রশ্নোত্তরগুলির প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

প্রঃ—আচ্ছা খোকা! তোমার আশ্রয়দাতা পিসেমশাই-এর জন্য তোমার চিন্তার তো অন্তঃ নেই। কিন্তু তোমার এখনও পর্য্যন্ত জীবিত-বাবাকে তোমার দেখতে ইচ্ছে হয় না? তিনি এখন কোথায় আছেন তার খবর কি তুমি একটুও রাখো?

উঃ—গত ছয় বছর হলো বাবার আমার কোনও খোঁজ নেই। আমরা পিসেমশাই-এর সঙ্গে আগে যে বাড়ীতে থাকতাম, সেটা ইমপ্রুভমেণ্ট-ট্রাষ্ট ভেঙ্গে ফেলায় আমরা এখানকার এই বাড়ীতে উঠে আসি। এখানকার এই বাড়ীর ঠিকানা জানলে বাবা হয়তো আমাকে একবার নিশ্চয় দেখে যেতেন। শরীর ভালো থাকার সময় পিসেমশাই ওঁর অনেক খোঁজ করেও তাঁকে খুঁজে পান নি। ওঁর নূতন শশুর বাড়ীর ঠিকানাও তিনি পিসেমশাইদের বলেন নি। আমার বাবার কথা মনে পড়লেই আমার চোখে জল আসে বাবু। আপনারা যাবেন একবার —আমার বাবার খোঁজ-খবর করে তাঁকে খুজে বার করতে? আমি আপনাদের এই মামলার রহস্য সন্ধান করে দেবো। কিন্তু তার প্রতিদানে আপনাদের আমার বাবাকে খুঁজে এনে দিতে হবে কিন্তু—।

[আমি মনে মনে ভাবলাম, হায় রে, অবোধ বালক! তোমার নিরুদ্দেশ পিতাকে এই মামলাতে যে আমাদেরও চাই। তোমার অজ্ঞাতে তোমাকে দিয়েই তাঁকে আমরা খুঁজে বার করবো। কিন্তু কেন তাঁকে আমরা চাই তা জানলে তুমি কি আর আমাদের কোনও বিষয়ে সাহায্য করবে? এই বালকটীর পিতার সম্বন্ধেও আমার হয় তো একটা অহেতুক সন্দেহ এসেছিল। কিন্তু এই সন্দেহের ভিত্তি থাকুক বা না থাকুক, তা তখনও পর্য্যন্ত আমার সহকারীকেও প্রকাশ করি নি। আমি আমার মনের কথা মনেই চেপে রেখে এই বালকটীকে আবার জিজ্ঞাসাবাদ সুরু করে দিলাম।]

—'তা ভাই, এ আর এমন কঠিন কি কাজ। তিনি আজ পর্য্যন্ত বেঁচে থাকলে তাঁকে আমরা খুঁজে বার করবোই', আমি বালক বেচারামের গালের উপর গড়িয়ে পড়া একফোঁটা চোখের জলের উপর স্থির দৃষ্টি রেখে উত্তর করলাম। 'এখন তোমাকে আমাদের আরও কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তুমি এই সুযোগে ওদের ঐ বাড়ীর পিছন দিকটা ভালো করে দেখে নিয়েছো তো?

উঃ—তাতে আর কি আমার কোনও ভুল হয় নাকি? আমি প্রথম হতেই এই তালেই ছিলাম। ওদের এই উভয় বাড়ীর মধ্যবর্ত্তী পাঁচিলটার মাঝখানে একটা বড়ো দরজা—ওঁরা সম্প্রতি ফুটিয়ে নিয়েছেন ব'লে মনে হলো। এই পাঁচিলটী এই বড়ো বাড়ীর পাঁচিল ব'লেই এটা তারা সহজেই তৈরী করতে পেরেছেন। এই বাড়ী দুটোর অবস্থান এমন যে—ওপার থেকে এপারে কি হচ্ছে বা না হচ্ছে তা জানা দুষ্কর।

প্রঃ—আচ্ছা! তোমার এই নূতন মনীবানীর বয়েস কতো? আর একটা কথা হচ্ছে এই যে—ও বাড়ীর সেই ভদ্রমহিলা কি একবার ঐ মধ্যবর্ত্তী দরজা খুলে এ বাড়ীতে এসেছিলেন? যখন ওদের বাড়ীতে তুমি ঢুকতে পেরেছো, তখন এই সব একটু তোমাকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

উঃ—আজ্ঞে! এখনও পর্য্যন্ত এবাড়ী ওবাড়ী এঁদের কাউকে করতে আমি দেখিনি। তবে বড় বাড়ী থেকে একজন আধাবয়সী ঝি ও একটা বুড়া চাকর ওই ছোট বাড়ীতে কয়েকবার আনাগোনা করেছে। আমার মনে হয় স্যার, ওরাই ঐ ছোট বাড়ীর মহিলাটীর বাজার-হাট সব করে দিয়ে থাকে। এই দুই বাড়ীর গিন্নীদের মধ্যে খুব বেশী ভাব-সাব থাকা অসম্ভব নয়, স্যার। এতো আপনারা ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? এই তো একবেলার বেশী

ওদের বাড়ীতে আমি ঢুকি নি। কিন্তু বেশীদিন ওদের বাড়ী আমি চাকরের কায করতে পারবো না। আপনি না বলেছিলেন যে—একটা ফ্যাক্টারীতে মাসে ৫০ টাকা মাইনেতে আমার শেখবার ব্যবস্থা করে দেবেন। এখন হতেই ঐ চাকরীটা আমার জন্যে ঠিক করে রাখুন। কয়েকমাস টাকা জমিয়ে একবার আমি বাংলার বাইরে আমার বাবাকে একবার খুঁজে বার করবার চেষ্টা করবো। আমার এখানকার পিসিমা বলেন যে তিনি নিশ্চয় উত্তর ভারতে কোনও শহরে বসবাস করছেন। তাঁকে একটীবার দেখা দিয়ে প্রণাম করেই আমি চলে আসবো। কালকে বাবু আমি আমার মা-বাবা দুজনাকেই স্বপ্নে দেখেছিলাম। আরও কতোদিন আমি তাঁদের এমনি স্বপ্নের মধ্যে দেখেছি, তাই—

এই বালক-বেচারামের এই সব উক্তি হতে আমি অন্ততঃ এইটুক বুঝেছিলাম যে, এই ভাবপ্রবণ কর্ত্তব্য-পরায়ণ বালককে নিজেদের তাঁবে রাখবার জন্যে দুটি মোক্ষম অস্ত্র আমাদের হাতে আছে। এর একটী হচ্ছে তার বাবাকে খুঁজে বার করে দেওয়া, আর অপরটী হচ্ছে বেশী মাইনের কোনও ফ্যাক্টরীতে ওর কাজ শেখার ব্যবস্থা করা। এই দুইটী বিষয়ে আশা দিয়ে এই ছেলেটীকে বহুদিন আমরা আমাদের তাঁবে রাখতে পারবো। তবু আমাদের [সাবেকী] তৃতীয় অস্ত্র স্বরূপ আমি আমাদের সিক্রেট সার্ভিস ফণ্ডের আরও ত্রিশটা টাকা টেবিলের ড্রয়ার হতে বার করে তার হাতে তুলে দিলাম। কিন্তু আমাকে আশ্চর্য্য করে সে টাকা কটা আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে বলে উঠলো, 'না স্যার, এখন আর টাকার আমাদের দরকার নেই। যদি কখনও দরকার হয় তাহলে চেয়ে নেবো, রাখুন'। এই অদ্ভুত মামলার অদ্ভুত সহায়ককে যথাযথভাবে আরও কয়েকটা উপদেশ দিয়ে আমি তখনকার মত তাকে বিদায় দিলাম। তারপর তার চলার পথের দিকে একবার স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আমি সহকারীকে উদ্দেশ করে বললাম, 'এমন নির্লোভ ইন্‌ফরমার একজন জোগাড় করা পুলিশ অফিসারদের পক্ষে নিশ্চয়ই একটি সৌভাগ্যের বিষয় বলতে হবে। সহকারী অফিসার কনকবাবুকে এই কথাটা অম্লান বদনে বলতে পারলেও মনে মনে আমি ভাবলাম—সত্য কি এই বালকটী একজন পুলিশ-নিযুক্ত মামুলী ইন্‌ফরমার? না, একে কোনও এক অজ্ঞাত ঐশ্বরিক শক্তি দুষ্টের দমনের জন্য তাকে উদ্বেলিত করে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

'আমার কিন্তু আরও একটা কথা মনে হচ্ছে। এইটির হয়তো কোনও মূল্যই নেই। কিন্তু তবু এইটে কাল থেকে বারে বারে আমার মনে উঠছে, আমি ঠোঁটে ঠোঁট চেপে গভীরভাবে চিন্তা করে সহকারী-অফিসার কনকবাবুকে বললাম, এই ছেলেটা যেমন তার বাবাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, তেমনি ওর বাবাও বোধহয় ওকে খুঁজে ফিরছে। এই ছেলেটীর সম্পর্কিত পিসিমার কথা যদি ঠিক হয়, তাহলে বুঝতে হবে—এর বাবা প্রায় আট বছর পরে এই শহরে ফিরেছেন। ইতিমধ্যে ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের কল্যাণে 'মহল্লাকে মহল্লা' সাফা হয়ে গিয়েছে। খুব সম্ভবতঃ ভদ্রলোক এদিকে তাঁর এই ছেলেটীকে খুঁজতে এসেই এই মহিলাটীর খপ্পরে পড়ে গিয়ে থাকবেন। খুব সম্ভবতঃ মহিলাটীর সঙ্গে পুনর্মিলিত হওয়া মাত্র তার নিজের ছেলের কথা ভুলে গিয়ে থাকতেন। এর ফলে তিনি তাঁর ছেলের সন্ধান পেয়েও কিছুদিন থেকে সরে থাকতে চেয়েছিলেন। ইতিমধ্যে ঐ আহত যুবকটি মধ্য পথে এখানে এসে একটা অনর্থ বাঁধিয়ে দিয়ে থাকবে। কিন্তু তাই যদি হয় তাহলে আমাদের এই মামলার নিখোঁজ প্রাথমিক সংবাদদাতাটী কে হতে পারে? এ ছাড়া আর একজন মধ্যবয়স্ক লোকের কথাও তো আমরা কাল শুনে এলাম। এই লোকটীকেই বা এই ভদ্রমহিলা এমন করে কাল সকালে অপমান করে তাড়িয়ে দিলে কেন? এই অপমানিত লাঞ্ছিত ব্যক্তি ও আমাদের এই মামলার প্রাথমিক সংবাদদাতা একই ব্যক্তি নয় তো? যদি তাই হয় তা'হলে আমাদের এই মামলার কিনারা হওয়ার সম্ভাবনা সুদূর পরাহত নয়। পূর্ব্বরাগ কখন কার মধ্যে কিভাবে কতখানি জেগে উঠবে তা কেউই বলতে পারে না।

'এ আপনি কি সব আজে-বাজে ভাবছেন স্যার। কতকগুলি পরস্পরের সহিত সম্পর্কশূন্য বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে এক সূত্রে গেঁথে আপনি অযথা একটা রীতিমত উপন্যাস তৈরী করে ফেলছেন।' আমার সুযোগ্য সহকারী কনকবাবু প্রতিবাদ করে বললেন, 'আমাদের এই মামলার

প্রাথমিক সংবাদদাতার মধ্যে এইরূপ কোনও ঈর্ষা বা দ্বেষ থাকলে তিনি এই ছেলেটীর আহত হওয়ার ব্যাপারে সেই-দিন এতো ছুটাছুটি করে বেড়াতেন না।

সহকারী-অফিসার কনকবাবুর এই অভিমতের মধ্যে যে যুক্তি না ছিল তা নয়। তবু বারে বারে আমার মনে হচ্ছিল যে এই রহস্যময়ী নারীটী এতো সহজ পথের যাত্রিণী কিছুতেই হতে পারে না। আমি মনে মনে ঠিক করলাম যে এই বেয়ারাদকে বিদায় দিয়ে অন্ততঃ তিনটী জায়গায় এই মামলা সম্পর্কে তদন্ত কার্য্য এখুনি সমাধা করা দরকার। নিউ-তাজমহল হোটেলের লোক-জনদের, বিচকের মেসমশাইদের এবং বিচকেদের সে এজমালী ঠানদিদিকে আজই আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করবো ঠিক করলাম।

[ক্রমশঃ

কুমাউঁরাণী—নৈনীতাল

শ্রীপরিমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শৈলাবাসগুলি শীতে উপেক্ষিতা। বছরের অন্য সময় কিন্তু এদের হাতছানি মানুষের কাছে হয়ে ওঠে দুর্বার। রূপগুণের বিচারে এদের মধ্যে আবার নৈনীতাল একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। কেউ কেউ একে "ছোটা-কাশ্মীর" বলে। আবার কারুর কারুর মতে নৈনী হ্রদ ইংলণ্ডের উইণ্ডার-মিয়ার এবং সুইটজারল্যাণ্ডের লুছারিনের সঙ্গে তুল্য। এর নামটী বিশ্লেষণ করলেই বৈশিষ্ট্যের ছাঁদটি বুঝতে পারা যাবে। হিন্দি ভাষায় 'তলাব' কথার অর্থ বড় জলাশয়, আর এরই উত্তর তীরে অবস্থিত 'নৈনা' দেবীর পুরোনো মন্দির। এ দুয়ের সংমিশ্রণে বর্তমান নাম দাঁড়িয়েছে নৈ নী তা ল। কিন্তু স্কন্দ পুরাণে এই হ্রদ ত্রি-ঋষি (আত্রি, পুলস্ত্য, ও পুলহ) সরোবর বলে উল্লিখিত আছে। হিমালয় পর্বতমালার সমস্ত কুমাউ অঞ্চলটাই দেবতাদের লীলাভূমি বলে প্রসিদ্ধি লাভ করে এসেছে। সুতরাং এমন একটী সুন্দর স্থানে ঋষিরা ধ্যানের আসন পাতবে—এতে আর আশ্চর্য হওয়ার কি আছে।

বর্তমান যুগে সর্বসাধারণের কাছে এর রূপ প্রকাশিত হয় ১৮৩৯ খৃঃ। সে সময় ব্যারণ নামে এক সাহেব ঘুরতে ঘুরতে একে দেখতে পেয়েই এর রূপে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি নাকি তৎকালীন বৃটিশ সরকারের কাছে লিখেছিলেন যে তার হাজার দেড়েক মাইল পরিক্রমার মধ্যে তিনি এমন রমণীয় স্থান দেখতে পাননি। সেই থেকেই নৈনীতালের

নৈনা দেবীর মন্দির

বর্তমান উন্নতির আরম্ভ।

তা ব্যারণ সাহেব মিথ্যে লেখেন নি। উত্তর-পূর্ব

সাধারণ দৃশ্য

আবার মাথা ঘোরান গা-গোলান বাস যাত্রা। কিন্তু যাত্রা শেষে দেখলাম—শরত আকাশের রোদ যেন সরোবরের নীল-স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে। তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইলাম। বাসের বাইরে কয়েক ডজন কুলি আর হোটেলওয়ালার ওকালতি কিছুই যেন শুনতে পাচ্ছিলাম না।

রিক্সা করে রওনা হলাম হোটেলের উদ্দেশ্যে হ্রদের তীর ধরে। কত বিচিত্র নর-নারী, কত ঘোড়সওয়ার পাশ কাটিয়ে গেল, কিন্তু এসব তখন কিছুই আমাকে আকর্ষণ করতে পারে নি। সরোবর তখন আমার সমস্ত অন্তর জয় করে নিয়েছিল। নজরে পড়ল কয়েক জোড়া রাজহাঁস। মনে হচ্ছিল যেন ওরাও সরোবরের স্বপ্নে বিভোর হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে।

হোটেলে এসে স্নান এবং প্রাতরাশ শেষ করে বেড়িয়ে পড়লাম। বিশ্রামের কথা মনেই আসেনি। প্রথমেই নজরে পড়ল বেশ কয়েকটী ভিঙির নীরব আহ্বান। লোভ

গতিতে মাইল পঁচিশ বাসের যাত্রা যখন এক সময়ে এর দক্ষিণ তীরে থেমে যায় তখন কিন্তু আর সব ভুলে যেতে হয়। পথের কষ্ট তখন তুচ্ছ মনে হয়। ধরুন আমাদের কথাই বলি। দেরাদুন থেকে সন্ধ্যের দিকে গাড়িতে চেপে এসে ভোর রাত্রে নামতে হয়েছিল বেরিলী। কুলির তাড়ায় আর আমাদের অজ্ঞতায় মিলে যখন এসে একটা লোকাল ট্রেনে উঠেছি, মাল তখনও ওঠেনি, গাড়ি ছাড়ল। কি আর করব, বাধ্য হয়ে চেন টেনে ট্রেন থামিয়ে কর্তৃ-পক্ষের সঙ্গে কথা কাটা-কাটি করে তবে রেহাই। দু-তিন ষ্টেশন বাদেই আবার গাড়ি বদল ; সেখান থেকে কাঠগোদামে নেমে বাসের টিকিটের জন্য লাইন। দেখলাম লেডিস ফার্ষ্ট'এর ব্যবস্থা আছে। গৃহিণীর হাতে পয়সা গুঁজে দিয়ে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াতেই দেখলাম কাজ হয়ে গিয়েছে। সুতরাং বর্তমান যুগে পথে নারী-বিবর্জিতা নিশ্চয়ই আর সে যাইহোক, তারপর
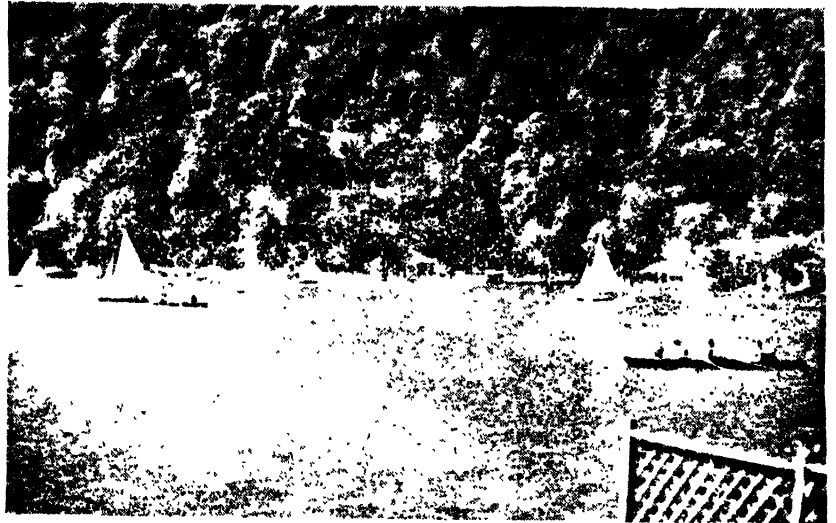
ইয়ট আর নৌকার মেলা

সামলাতে পারলাম না। নৌকায় উঠে মাঝিকে বললাম—বৈঠা আমার হাতে দিতে। সে দুহাত তুলে ভীষণ আপত্তি জানাল। ওকে বুঝিয়ে বললাম যে আমি পূর্ববঙ্গের মানুষ, বড় বড় নদীতেও নৌকো চালিয়েছি। খুব অনিচ্ছা-সহ বৈঠা আমার হাতে দিয়েছিল। কিন্তু দুএক চাপ দেয়ার পরই সে একগাল হেসে বলল—কি করে জানব বাবুজি, তুমি এত ভাল নৌকো চালাতে জান। কি জান, এখানকার কর্তারা বড় আপত্তি করে। বলে 'তলাব' প্রায় ১৫০০ গজ লম্বা, ৫০০ গজ চওড়া, আর কোথাও কোথাও এর গভীরতা ৫০০ ফুট, বিপদ ঘটতে কতক্ষণ। কথাটা অনস্বীকার্য।

এসব নৌকা-বিহারের জন্য অবশ্য 'রেট' মাফিক পয়সা দেয়ার নিয়ম। কিন্তু চালকদের অধিকাংশই ভাড়াকরা নৌকা বেয়ে নিজের ও ঘর-সংসার রক্ষার চেষ্টা করে। সুতরাং রুজি-রোজগার এপথে সামান্যই। সুতরাং এরা 'রেটের' বাইরে পয়সা আদায় করতে কসুর করে না। আর যারা নিজের নৌকো চালায় তারা একটু গর্ব করেই বলে—বাবুজি, ওদের মত ত আর পরের নৌকো নয় আমার! তবে কি জানেন, "লাইসেন" এত বেশী যে সে দিয়ে আর কিছুই থাকে না। এমনি নৌকো ছাড়াও আছে ইয়ট্ (yacht)। তবে ওগুলি অ-সভ্যদের জন্য নয়। তবে মোটা টাকা চাঁদা দিলে নাকি সাময়িকভাবে খাতায় নাম লেখানো যায়।

যাদের কাছে নৌকো বিহার তেমন ভাল লাগে না, তাদের মধ্যে অনেকে ঘোড়-সওয়ার হয়ে সরোবর প্রদক্ষিণ করে।

নৈনীতালের উচ্চতা যদিও ৬৩৫০ ফুটের বেশী নয়, কিন্তু সরোবরটি প্রায় চারিদিক থেকেই পাহাড়ে-ঘেরা বলে বাইরের দুনিয়া থেকে অদৃশ্য। তবে বাইরের জগতের দৃশ্য নৈনীতাল থেকে একেবারে অদৃশ্য নয়। চীনা-শৃঙ্গে (৮৫৬৮ ফুঃ) উঠে দেখতে পাওয়া যায় তুষারমৌলী-হিমালয়ের বদ্রিনাথ, ত্রিশূল, নন্দাদেবী এবং নন্দাকোট প্রভৃতি। এছাড়া ল্যাণ্ডস-এণ্ড (৬৯৫০ ফুঃ) থেকে ৬০০০ ফুট নীচেকার তড়াই অঞ্চলের বনভূমি চোখের সামনে সবুজের গালচে প্রসারিত করে ধরে। চীনা শৃঙ্গ এবং ল্যাণ্ডস-এণ্ডে পায়ে হেটে আসা যায়, তবে অনেকে আসেন ঘোড়-সওয়ার হয়ে।

হ্রদের ঠিক লাগা উত্তরেই আছে প্রকাণ্ড খেলার মাঠ। হকি, ফুটবল, ক্রিকেট সবই খেলা হয় ওখানে। পাশেই আছে সিনেমা আর স্কেটিং ক্লাব। সাঁতারের ব্যবস্থাও আছে। তবে ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে ওদিকে বড় কেউ একটা ঘেঁষে না।

নৌকা বিহার

এসব হৈ-চৈর মধ্যে সারাটা দিন একরকম অজান্তেই কেটে যায়। দিনের আলো নিভে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নৈনীতালের রূপ একেবারে পাল্টে যায়। এত প্রদীপ (অবশ্য বিদ্যুতের) যে দেওয়ালীকেও হার মানায়। হ্রদের জলে আলোর প্রতিফলন এক স্বপ্নময় জগতের আবহাওয়া এনে দেয়। সারাদিন যারা এদিক ওদিক ঘুরে সময় কাটিয়েছে, তারা এখন ফিট্‌ফাট্ হয়ে হ্রদের তীর ধরে ঘুরে বেড়ায়, নয়ত রেস্তোঁরাগুলিতে ভিড় জমায়। রাত যত

বাড়তে থাকে শীতের প্রকোপও ততই মানুষকে আস্তে আস্তে নিজ নিজ হোটেলের দিকে টেনে নিয়ে গিয়ে নৈশ-ভোজন শেষ করে বিছানায় আশ্রয় নিতে বাধ্য করে।

যাদের খুব সকালে ওঠার অভ্যাস—তাদের কথাই নেই, আমার মত লোক যার কাছে সূর্যোদয় দেখা একটা ঘটনা, তারও ঘুম ভেঙ্গে যায় সেই সাত সকালে। নবারুণ আভা তখন পর্যন্তও দেখা দেয়নি। বিছানায় শুয়ে শুয়েই কিসের একটা আওয়াজে আকৃষ্ট হয়ে বারান্দায় গিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়-কৌতুকে একেবারে আবিষ্ট হয়ে গেলাম। প্রায় শতখানেক ভেড়ার এক প্রকাণ্ড লাইন। সবার পিঠেই দুধারে ঝুলছে দুটো কাঠ কয়লার ব্যাগ। একটা নির্দিষ্ট স্থানে এলে এদের বোঝা নামানো হচ্ছে আর ভেড়াটা সরে গিয়ে আবার লাইনে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম করছে। একটুকুও গোলমাল নেই। শুনতে পেলাম এরা প্রায় চার-পাঁচ মাইল দূর থেকে বয়ে নিয়ে আসে এই কাঠ-কয়লার পসরা! দেরাদুন অঞ্চলে কাঠ-কয়লা আসে মানুষের পিঠে পিঠে ছ-সাত মাইলের ব্যবধান থেকে।

নৈনীতাল একাই একশ। তবু একে কেন্দ্র করে আরও কয়েকটী মনোরম সরোবর এবং দর্শনীয় স্থান দেখবার জন্য বাসের সুবন্দোবস্ত আছে। এদের মধ্যে খুরপা, ভাওয়ালী, ভীমতাল, সটতাল, নওকুচিয়াতাল, রামগড় ও মুক্তেশ্বর প্রধান। রাণীক্ষেত নৈনীতাল থেকে ৩৭ মাইল, আর আলমোড়া ৪৪ মাইল।

ফিরে আসার দিনটি যেন অলক্ষে এসে পড়ে: নানা ঘটনায় ঠাসা দিনগুলি যেন হঠাৎ শেষ হয়ে যায়। তাই বাসটা ছেড়ে দে'য়ার সঙ্গে সঙ্গে মনটা বিদায়ের ব্যথায় টন্ টন্ করে ওঠে।

বাবরের আত্মকথা

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় এম-এ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনাবলী

শেষ জেমাদি মাসের ১৩ই তারিখ শনিবার কামানগুলি টেনে নিয়ে এবং সৈন্যব্যূহের দক্ষিণ, বাম এবং কেন্দ্র যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হয়ে যে ভূমি আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেছিলাম সেইখানে সৈন্যগণ পৌঁছে গেল। অনেক তাঁবু আগেই খাটানো হয়েছিল। আরও তাঁবু খাটানোর জন্য আমার সৈন্যরা যখন তোড়জোড় করছিল তখন সংবাদ এলো যে শত্রুসৈন্য দেখা যাচ্ছে। আমি তৎক্ষণাৎ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে আদেশ দিই যে প্রত্যেক সৈন্য কালবিলম্ব না করে নিজ নিজ জায়গায় উপস্থিত হোক এবং কামানগুলি ও সৈন্যশ্রেণী সঠিকভাবে সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা করুক।

আমার যুদ্ধজয়ের ফতেনামা যা সেখ জইন্ লিপিবদ্ধ করেছে যাতে ইসলামের সৈন্যরা কি ভাবে বিধর্ম্মীদের অগণিত সৈন্যের সম্মিলিত যুদ্ধসজ্জার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছো তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে—সেইটিই কোনওরূপ পরিবর্ত্তন না করে আমার আত্ম-চরিতে সংযুক্ত করে দিলাম।

সেখ জইনের ফতে নামা

মুখবন্ধ—হে মহান আল্লা, তুমি বিশ্বাসীদের রক্ষক, তোমার অনুচরদের সহায়ক। ধর্ম্মযুদ্ধের সৈনিকদের সমর্থক, বিধর্ম্মী শত্রুদের ধ্বংসকারক।

হে মহান আল্লা, ইসলামধর্ম্মের স্তম্ভ যারা তুমি তাদের মর্য্যাদাদান-কারী, যারা বিশ্বাসী তাদের তুমি সাহায্যকারী পৌত্তলিকদের তুমি ধ্বংসকারী। বিদ্রোহী শত্রুদের তুমি পর্য্যুদস্তকারী, যারা অন্ধকারের জীব তাদের তুমি নিধনকারী।

হে জগতের প্রভু, পৃথিবীর সমস্ত ভূমি তোমারই। তোমার আশীর্ব্বাদ তোমার সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ মানব মহম্মদের উপর বর্ষিত হোক যিনি গাজিদের প্রভু এবং বিশ্বাসীদের সমর্থক—আর তোমার করুণা বর্ষিত হোক তাঁর পথাবলম্বনকারীদের ওপর শেষ বিচারের দিন পর্য্যন্ত, যাঁরা ঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন।

আল্লার কাছ থেকে উপর্য্যুপরি পাওয়া দানগুলির জন্য তাঁর স্তুতি করার এবং বারংবার তাঁকে ধন্যবাদ জানানোর কারণস্বরূপ হয় এরই ফলে আবার লাভ করা যায় তাঁরই করুণা। কারণ, ভগবানের একটি করুণার দানের জন্য তাঁর জয়গান তাঁর প্রাপ্য এবং তারপর আবার তাঁর করুণা ফিরে আসে। কিন্তু সেই সর্ব্বশক্তিমানের পরিপূর্ণ ভাবে ধন্যবাদ দেওয়া মানুষের ক্ষমতার বহির্ভূত। প্রবলপরাক্রান্ত মানুষও ভগবানের প্রতি বাধ্যবাধকতা যথাযথভাবে পালন করার বিষয়ে অসহায়। প্রকৃতপক্ষে ভগবানকে তাঁর দয়ার জন্য যথার্থ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা অসম্ভব, যদিও তার চেয়ে আর কোনও জিনিষই

...ড় নয় এই পৃথিবীতে। পরাক্রান্ত বিধর্মীদের পরাজিত করা এবং অতুল ধনসম্পদশালী, নীতিহীন অবিশ্বাসীদের রাজ্য জয় করে নেওয়ার ব্যাপারটির মত জাগতিক আর কোনও ব্যাপারই পবিত্রতর নয়। বিচারশীল ব্যক্তির চোখে ভগবানের এই আশীর্ব্বাদ অপেক্ষা আর কিছুই বড় নয়। আল্লা মহান! তাঁর এই মহৎ আশীর্ব্বাদ ও অনুগ্রহের জন্য তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ। এই আশীর্ব্বাদ লাভের জন্য শিশুকাল থকে এ পর্য্যন্ত ঠিক পথে চালিত একটি মন (বাবর) সক্রিয় ছিল। জগতের রাজা যিনি, যিনি তাঁর করুণা, প্রার্থনার অপেক্ষা না করেই বর্ষণ করেন। তিনি তাঁর করুণার বাক্সের চাবিকাঠিটি জয়ী নবাবের (বাবর) হাতে তুলে দিয়েছেন—যাতে বিজয়ী বীরপুরুষদের নাম মহান গাজিদের নামের সঙ্গে স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে যায়। বিজয়ী সৈন্যদের সাহায্যে ইসলামের ধর্মনিশান সর্ব্বোচ্চ শিখরে গাঁথা হয়ে গেল। এই সৌভাগ্যের বিবরণ দেওয়া হচ্ছে।

রাণা সঙ্গ এবং তাঁর সহচরগণ

ইসলাম ধর্ম রক্ষক আমাদের সেনারা জয়ের আলোকে হিন্দুস্থান আলোকিত করেছে—যার বাণী পূর্ব্ব পূর্ব্ব লিপিতেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। দৈব-অনুগ্রহে ইসলামের পতাকা দিল্লী, আগ্রা, জৌনপুর, খারিদ, বেহার ইত্যাদি প্রদেশে উচ্চে তুলে ধরা হয়েছে এবং সেই স্থানগুলির বিধর্ম্মী ও মুসলিম অনেক সর্দ্দারই আমাদের সৈন্যদের প্রাধান্য স্বীকার করে আমাদের সৌভাগ্যবান নবাবের বশ্যতা আন্তরিকভাবে স্বীকার করেছে। কিন্তু বিধর্ম্মী রাণা সঙ্গ যদিও প্রথমে আনুগত্যের ভাব দেখিয়েছিল কিন্তু পরে অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে বিধর্ম্মীদের প্রধান হয়ে দাঁড়ালো। সয়তানের মত মাথা পেছনে হেলিয়ে এই অভিশপ্ত বিধর্ম্মী এক বিপুল সৈন্যদল গঠন করলো। এইভাবে এক দঙ্গল ছোটলোকের ভিড় একত্রিত হলো—যাদের কারও গলায় সোনার হার, কারো গলায় সুতো (উপবীত), কারো কোমরে বিরক্তিকর বিধর্ম্মীর চিহ্ন।

সাম্রাজ্যের সূর্য্য হিন্দুস্থানে উদয় হওয়ার এবং সাহানসার খিলাফতের (বাবর) আলো ছড়িয়ে পড়ার পূর্ব্বে এই অভিশপ্ত বিধর্ম্মীর (সঙ্গ) কর্ত্তৃত্ব—যে তার শেষ বিচারের দিনে একজন বন্ধুও পাবেনা—এমন ছিল যে বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর—যেমন দিল্লীর সুলতান, গুজরাট ও মাণ্ডুর সুলতানরা কেউই অন্যান্য বিধর্ম্মীদের সাহায্য ভিন্ন এর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারতেন না। প্রত্যেকেই এবং সকলেই তাকে তোষামোদ করেছে এবং তার মতে সায় দিয়ে এসেছে। তবে উঁচুদরের রাজারা এবং রইস্‌রা ও শাসক ও সেনাপতিরা যারা এই যুদ্ধে এখন তার আদেশ মেনে নিয়েছে এবং তার সঙ্গী হয়েছে তারা কিন্তু এই যুদ্ধের পূর্ব্বে তার বশ্যতা স্বীকার করেনি এবং এর প্রতি মোটেই বন্ধুভাবাপন্ন ছিল না। বিধর্ম্মীদের নিশাণ ইসলামের অধিকার ভুক্ত রাজ্যের দুইশ' সহরে উড়েছে—যেখানে মসজিদ এবং পবিত্র স্থানকলুষিত হয়েছে ও যেখান থেকে বিশ্বাসী মুসলমানদের স্ত্রীপুত্রকন্যাকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। হিন্দুদের গণনানুসারে এক লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায়ী রাজ্যে একশ' অশ্বারোহী, এক কোটি রাজস্ব আদায়ী রাজ্যে দশ হাজার অশ্বারোহী এবং রাণা সঙ্গর অধীনস্থ দশকোটি টাকা রাজস্ব আদায়ী রাজ্যে এক লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য থাকা উচিত। অনেক প্রসিদ্ধ বিধর্ম্মী যারা এতদিন পর্য্যন্ত তার কোনও সাহায্য করেনি—তারা শুধু ইসলামধর্ম্মবিদ্বেষী বলেই সঙ্গের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। কলঙ্কিত পতাকাধারী দশ জনের যাদের ভাগ্যে আছে নির্ম্মম শাস্তি ভোগ—তাদের ছিল অনেক জনবল, প্রভূত সৈন্য এবং বিস্তৃত রাজ্য।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় সালাবুদ্দিন (খুব সম্ভব ইনি ছিলেন হিন্দু রাজপুত থেকে ধর্ম্মান্তরিত মুসলমান—যাঁর হিন্দু নাম ছিল—সিলহাদি, যাঁর কথা বাবর লিখেছেন। তাঁর পুত্র রাণা সঙ্গর কন্যাকে বিবাহ করে। তাঁর জায়গির ছিল রেসিন ও সারংপুর। তিনি খানুয়ার যুদ্ধ দলত্যাগ করে বাবরের সঙ্গে যোগ দেন।)—যাঁর রাজ্যে ছিল ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী, বাগড়ের রাওয়াল উদয় সিংএর ছিল বারো হাজার, মিওয়াতের হাসান খাঁর ছিল বারো হাজার। ইদরের বারমল ছিল চার হাজার, নরপৎ হারার ছিল সাত হাজার, কাচের সাতরইয়ের ছয় হাজার, ধরম দেওয়ের ছিল চার হাজার, বীর সিং দেওয়ের ছিল চার হাজার এবং সিকেন্দারের পুত্র মহম্মদ খাঁয়ের—যদিও কোনও জিলা বা পরগণা ছিল না তবুও সে, দশহাজার অশ্বারোহী সংগ্রহ করেছিল আধিপত্য লাভের আশায়।

হিন্দুস্থানের গণনার রীতি অনুযায়ী সর্ব্বসমেত দুইলক্ষ এক হাজার সৈন্য সমবেত হয়ে তাদের নিজেদেরই পরিত্রাণের আশা ছিন্ন করেছিল। সংক্ষেপে বলতে গেলে সেই উদ্ধত বিধর্ম্মী—যে কুসংস্কারে অন্ধ ও অন্তরে দয়ামায়া শূন্য—অন্যান্য দুর্ভাগা ও নরকের যাত্রীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ইসলাম—অনুগামীদের এবং আল্লার সৃষ্ট মানবদের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং যার শিরে আল্লার আশীর্ব্বাদ সর্ব্বদাই বর্ষিত হচ্ছে এমন যে মহম্মদ তাঁর অনুশাসনের ভিত্তি ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছিল। রাজকীয় সৈন্যদের নায়কগণ ভগবানের অভিসম্পাত রূপে সেই এক চক্ষু দজ্জালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের কানায় সত্তা ভালভাবে বুঝিয়ে দিল যে যখন দুর্ভাগ্য আসে তখন চোখ অন্ধ হয় এবং এই সত্য তাদের চোখের ওপর ভাসতে লাগলো যে—কেউ যদি সত্য ধর্ম্মের উন্নতির জন্য চেষ্টা করে সে তার নিজের আত্মারই উন্নতি সাধন করে। ধর্ম্মের নীতির প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে তারা অবিশ্বাসী ও ভণ্ডদের বিরুদ্ধে জেহাদ সুরু করলো।

শেষ জেমাদি মাসের ১৩ই তারিখ শনিবার (২৭সে মার্চ, ১৫২৭)—যে তারিখটি আল্লার আশীর্ব্বাদে পূত হয়ে আছে—ইসলামের সৈন্যগণ বিয়ানা রাজ্যের অধীনস্থ খানুয়ার একটি পাহাড়ের ধারে শিবির স্থাপন করে। সেখান থেকে শত্রুসৈন্য দুই ক্রোশ দূরে অবস্থান করছিল। মহম্মদের ধর্ম্মের শত্রু অভিশপ্ত বিধর্ম্মীরা ইসলামীয় সৈন্য সমাবেশের সংবাদ পেয়ে তাদের হতভাগ্য সৈন্যদের সজ্জিত করে পর্ব্বত সদৃশ দৈত্যের মত আকৃতির হস্তীদের ওপর অশেষ আস্থা স্থাপন করে এগিয়ে আসতে লাগলো যেমন করে হস্তী যূথের অধিনায়ক ইসলামের পবিত্র ভূমি কাবাকে ধ্বংস করতে এগিয়ে এসেছিল।

[এই কথা গুলির ইঙ্গিত এই।—এ্যাবিসিনিয়ার খ্রীষ্টান ইউমেনের রাজা আব্রাহা মহম্মদের জন্মসনে তাঁর সৈন্য ও হস্তীযূথ নিয়ে মক্কার কাবা ধ্বংস করতে অগ্রসর হয়। মক্কাবাসীরা এই বিপুল সৈন্য বাহিনী দেখে নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতে পলায়ন করে, কারণ তাদের নগর এবং ধর্ম্মস্থান রক্ষা করার ক্ষমতা ছিলনা। কিন্তু ভগবান এই দুইটিরই রক্ষার ভার নেন। কারণ, আবরাহা যখন মক্কার নিকট উপস্থিত হয়ে এই নগরীতে প্রবেশ করার আয়োজন করছেন। সেই সময় যে বৃহদাকার হস্তীতে তিনি উপবিষ্ট ছিলেন—যার নাম ছিল মামুদ—সে সহরের আরও নিকটে যেতে অস্বীকার করলো। যখনই তাকে সহরের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছিল—তখনই সে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ছিল। কিন্তু তাকে বিপরীত দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য মুখ ঘুরিয়ে নিলেই সে উঠে দাঁড়িয়ে বেশ জোরেই চলতে সুরু করছিল। যখন এই ব্যাপার চলছে তখন দেখা গেল এক বিশাল ঝাঁক পাখী সমুদ্রের দিক থেকে উড়ে এলো, তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে তিনটি পাথর—একটি তাদের চঞ্চুতে, আর দুইটি তাদের প্রত্যেক পায়ে। এই পাথর গুলো তারা আবরাহার প্রত্যেকটি লোকের মাথায় ফেললো এবং সেই পাথরের আঘাতে প্রত্যেকটি লোকই মারা গেল। যারা অবশিষ্ট ছিল তারাও বন্যার প্লাবনে ও মহামারিতে ধ্বংস হলো। শুধু একাকী আবরাহা সেনায়াতে পৌঁছাতে পারে এবং সেখানেই মারা যায়।]

'সেই মৃত্যু সন্ধ্যায়, হস্তী বলে বলীয়ান
আবরাহের ছিল যে ভরসা,
গজ বাহিনীর পরে' কলঙ্কিত হিন্দুগণ
একই ভাবে করেছিল আশা।
অমানিশার চেয়েও অন্ধকার,
ঘৃণ্য, কলুষিত,
নক্ষত্রের চেয়েও সংখ্যায় অধিক,
অগণিত।
আগুনের শিখার মত ? না—না—
ধোঁয়ার মত।
মেঘ মুক্ত আকাশের নীচে তারা
হলো উপনীত।
তারা মাথা উঁচু করে দাঁড়ালো,
তারা দ্বন্দ্বে আহ্বান জানালো।
পিপীলিকা শ্রেণীর মত
দক্ষিণ ও বামদিক থেকে
হাজার হাজার অশ্বারোহী
ও পদাতিক নির্গত হলো।'

তারা যুদ্ধ করার ইচ্ছায় আমাদের সৈন্য শিবিরের দিকে এগিয়ে গেল। ইসলামের পবিত্র যোদ্ধাগণ, যারা শৌর্য্যের উদ্যানে সতেজ বৃক্ষ—শ্রেণীবদ্ধ হয়ে এগিয়ে এলো, যেন সারিবদ্ধ পাইন গাছ তাদের মাথা আকাশের দিকে উঁচু করে তুলে এগিয়ে আসছে। আল্লার কাজে যে সব সেবক নিযুক্ত তাদের অন্তরে যেমন সদাই উজ্জ্বলপ্রভা বিদ্যমান, তেমনি তাদের উচ্চশিরে পরিহিত শিরস্ত্রাণের ঔজ্জ্বল্য। এই সৈনিক শ্রেণী যেন আলেকজেন্দারের লোহার দেওয়াল। মুসলিম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকের আইনানুযায়ী তারা ঋজু, দৃঢ় এবং বলবান—যেন তারা সুগঠিত একটি অট্টালিকা 'যারা ভগবানের নির্দ্দেশে কাজ করে তারা নিশ্চয়ই সফলতা অর্জ্জন করে'—এই নীতিবাক্য অনুযায়ী তারা সৌভাগ্যশালী এবং কৃতকার্য্য হয়েছিল।

'সৈন্যব্যূহ মধ্যে কেউ ছিল না ভীক,
সাহানশার পণের মত তারা ছিল শক্ত,
ইসলাম ধর্ম্মের তারা সবাই ছিল ভক্ত
ভয়ে কারও বুক করেনি দুরু দুরু।
তাদের পতাকা যেন আকাশ
ছুঁয়ে গেল।
তাদের জয়ে আল্লার নিশ্চিত,
জয় হলো।'

খুব সাবধানে এবং বিজ্ঞোচিতভাবে রুমের নিয়মানুযায়ী গোলন্দাজ বাহিনীকে কামানের গাড়ীগুলির কাছে দাঁড় করানো হলো। আমাদের সম্মুখভাগে পরস্পর শৃঙ্খলাবদ্ধ কামানের গাড়ীগুলি। বস্তুতঃ ইসলামের সৈন্য এমনভাবে সজ্জিত হয়ে দাঁড়ালো যে তাদের দৃঢ় চিত্ততা ও বুদ্ধির দীপ্তি দেখে যেন সমগ্র আকাশ তাদের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। সৈন্য সজ্জার আয়োজন ও সংগঠনে নিজামউদ্দিন কঠোর পরিশ্রম করেছিল এবং সৌভাগ্যের দ্যোতক তার উত্তম সম্রাটের বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল বিচারে যথারীতি স্বীকৃতি পেয়েছিল।

[ক্রমশঃ]

ভগবদ্-প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ

নরেন্দ্র দেব

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বিশ্ববিধাতার সঙ্গে একাত্মতা স্থাপনে কবির মনের এই যে আকুতি—এর পরিচয় আমরা কবির অধিকাংশ রচনার মধ্যেই পাই। তিনি একাধারে নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মবাদী, আবার সাকার সগুণ দেহবাদীও ছিলেন, যেমন আমরা শ্রীশংকরাচার্যের মধ্যেও দেখতে পাই। কবি সর্বত্যাগী ভোলা মহেশ্বর দিগম্বর শঙ্করের বহুবার স্তবগান করেছেন—বলেছেন, তিনি আনন্দময়! তিনি সকল দেবতার মধ্যে খাপছাড়া। কবি সেই নীলকণ্ঠকে বর্ষা-বিধৌত নীলাকাশের রৌদ্র-প্লাবনের মধ্যে রূপায়িত হতে দেখেছেন। মৃত্যুর মধ্যে দেখেছেন সেই মহাকালের উলঙ্গ শুভ্র মূর্তি! নিবিড় মধ্যাহ্নের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে শুনেছেন তাঁর ডিমি ডিমি ডমরু বাজছে। গেয়ে উঠেছেন কবি তাঁর জয়গান—

"দেবাদিদেব মহাদেব!
অসীম সম্পদ অসীম মহিমা—
মহাসভা তব অনন্ত আকাশে,
কোটি কণ্ঠ গাহে জয় জয়হে!"

বলেছেন, সুখ প্রতিদিনের সামগ্রী, কিন্তু আনন্দ প্রত্যহের অতীত। সুখ শরীরের কোথাও পাছে ধূলা লাগে বলে সংকুচিত, আনন্দ ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া নিখিলের সঙ্গে আপনার ব্যবধান ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দেয়। এইজন্য সুখের কাছে ধূলা হেয়। আনন্দের পক্ষে ধূলা ভূষণ। পাছে কিছু হারায় বলিয়া সুখ সর্বদাই ভীত; আনন্দ যথাসর্বস্ব বিতরণ করিয়াই পরিতৃপ্ত। এই জন্য সুখের পক্ষে রিক্ততা—দারিদ্র্য, আনন্দের পক্ষে দারিদ্র্যই—ঐশ্বর্য। এই জন্য কেবল ভালটুকুর দিকেই সুখের পক্ষপাত, আনন্দের পক্ষে ভালো মন্দ দুইই সমান। বলেছেন, আমাদের প্রতিদিনের এক-রঙা তুচ্ছতার মধ্যে হঠাৎ ভয়ংকর তাঁহার জলজ্জটা-কলাপ লইয়া দেখা দেন। তখন কত সুখমিলনের জাল লণ্ডভণ্ড, কত হৃদয়ের সম্বন্ধ ছারখার হইয়া যায়! হে রুদ্র, তোমার ললাটে যে ধ্বক ধ্বক অগ্নিশিখার স্ফুলিঙ্গ মাত্রেই অন্ধকারে গৃহের প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে, সেই শিখাতেই লোকালয়ে সহস্রের 'হাহা' ধ্বনিতে নিশীথ রাত্রে গৃহদাহ উপস্থিত হয়। হায়, শম্ভু! তোমার নৃত্যে, তোমার দক্ষিণ ও বাম পদক্ষেপে সংসারে মহাপুণ্য ও মহাপাপ উৎক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।...তোমার এই রুদ্র আনন্দে যোগ দিতে আমার ভীত হৃদয় যেন পরাঙ্মুখ না হয়। সংহারের রক্ত আকাশের মাঝখানে তোমার রবি-করোদ্দীপ্ত তৃতীয় নেত্র যেন ধ্রুবজ্যোতিতে আমার অন্তরের অন্তরকে উদ্ভাসিত করিয়া তোলে।...হে মৃত্যুঞ্জয়! আমাদের সমস্ত ভালো এবং সমস্ত মন্দের মধ্যে তোমারি জয় হোক।'

"জয় রাজরাজেশ্বর! জয় অপরূপ সুন্দর!
জয় প্রেমসাগর, জয় ক্ষেম-আকর,
তিমির তিরস্কর, হৃদয় গগন ভাস্কর!"

মানুষের সুখদুঃখ ভগবানের দান। কিন্তু ঈশ্বর মানুষকে ভিক্ষুক করেননি। কবি উপলব্ধি ক'রতে পেরেছেন যে, মানুষ শুধু চেয়েই কিছু পায় না, প্রার্থিত বস্তু সে দুঃখের তপস্যা করিয়াই পায়। তার বাঞ্ছিত যা-কিছু ধন সে তো তার নয়, সে সমস্তই বিশ্বেশ্বরের। কিন্তু দুঃখ যা, সে তার নিতান্তই আপনার। তাই মানুষ বলে—

"শান্তি সমুদ্র তুমি! গভীর অতি
অগাধ আনন্দ রাশি।
তোমাতে সব দুঃখ জ্বালা করি নির্বাণ
ভুলিব সংসার,
অসীম সুখ সাগরে ডুবে যাবো!

ভগবানকে ডেকে তিনি বলেছেন, হে রাজা! তুমি আমাদের দুঃখের রাজা।...হে দুঃখের ধন, তোমার প্রচণ্ড আবির্ভাবের মহাক্ষণে যেন তোমার জয়ধ্বনি করতে পারি। হে দুঃখের ধন, তোমাকে চাইনা—এমন কথা যেন সেদিন ভয়ে না বলি। "কী ভয়, অভয় ধামে তুমি মহারাজা, ভয় যায় তব নামে!" কেনই বা ভয় করবেন? কবি তো একথা নিশ্চয় করে জানতেন।

"এই আবরণ ক্ষয় হবে গো, ক্ষয় হবে,
এই দেহমন ভুমানন্দময় হবে
চোখে আমার মায়ার ছায়া টুটবে গো
বিশ্ব কমল প্রাণে আমার ফুটবে গো
এ জীবনে তোমারই নামে জয় হবে।

কবির এ বিশ্বাস ব্যর্থ হয়নি। তিনি তাঁর চির-বাঞ্ছিতের দুর্লভ-দর্শন পেয়েছিলেন! নিজের ঐকান্তিক প্রত্যয়, ধ্যান ও সাধনার গুণে কবির কামনা পূর্ণ হয়েছিল। তিনি আনন্দে বিহ্বল হ'য়ে গেয়ে উঠেছেন—

"পেয়েছি সন্ধান তব অন্তর্যামী
অন্তরে দেখেছি তোমারে।"

তার পরই প্রসন্ন অন্তরে বলেছেন—

"পেয়েছি অভয় পদ, আর ভয় কারে?
আনন্দে চলেছি ভব পারাবার পারে।"

ঈশ্বরের শক্তির বিকাশকে তিনি প্রভাতের জ্যোতিরুন্মেষের মধ্যে দেখেছেন, ফাল্গুনের পুষ্প পর্য্যাপ্তির মধ্যে দেখেছেন, মহাসমুদ্রের নীলাম্বু নৃত্যের মধ্যে দেখেছেন, কিন্তু সকলের চেয়ে বড় করে দেখেছেন নিখিল মানবের অন্তরের মধ্যে। তাই ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন—'হে ঈশ্বর! তুমি আজ আমাদের বৃহৎ মনুষ্যত্বের মধ্যে আহ্বান করো। তুমি আমাদিগকে বিভিন্ন জীবনের প্রাত্যহিক জড়ত্ব হইতে, প্রাত্যহিক ঔদাসীন্য হইতে উদ্বোধিত করো, প্রতিদিনের নির্বীর্য্য নিশ্চেষ্টতা হইতে উদ্ধার করো! যে কঠোরতায়, যে আত্মবিসর্জনে আমাদের সার্থকতা, তাহার মধ্যে আমাদের প্রতিষ্ঠিত করো। দূর করো সমস্ত আবরণ, আচ্ছাদন, সমস্ত ক্ষুদ্র দম্ভ, সমস্ত মিথ্যা কোলাহল, সমস্ত অপবিত্র আয়োজন। মনুষ্যত্বের অভ্রভেদী চূড়াবিশিষ্ট নিরাভরণ নিস্তব্ধ রাজনিকেতনের দ্বারের সম্মুখে আজ আমাকে দাঁড় করিয়ে দাও।

"পদপ্রান্তে রাখো সেবকে,
শান্তি সদন সাধন-ধন দেব দেব হে!
সর্বলোক পরম শরণ,
সকল মোহ কলুষহরণ,
দুঃখ তাপ বিঘ্নতরণ, শোক শান্ত স্নিগ্ধ চরণ,
সত্যরূপ—প্রেমরূপ হে!"

একটা প্রচলিত কথা আছে—"বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর!" কবি বলেন, এ বিশ্বাস ঠিক জ্ঞানের সামগ্রী নয়। 'ঈশ্বর আছেন' এইটুকু মাত্র বিশ্বাস করাকে বিশ্বাস বলি নে। আমি যে বিশ্বাসের কথা বলচি—এ বিশ্বাস সমস্ত চিত্তের একটি উচ্চ অবস্থা। এ একটা অবিচলিত ভরসার ভাব। মন এতে ধ্রুব হ'য়ে অবস্থিতি করে। আপনাকে সে কোনো অবস্থায় নিরাশ্রয় বা নিঃসহায় মনে করেনা।...

এই জন্য দৃঢ়-বিশ্বাসী লোকের কাজকর্মে বেশ একটা জোর আছে, কিন্তু উদ্বেগ নেই। মনের মধ্যে নিশ্চয় অনুভব করে সে—যে তার একটা দাঁড়াবার স্থান আছে।...একটা অত্যন্ত বড় আশ্রয়ে চিত্তের দৃঢ় নির্ভরতা; এই জায়গাটিকে ধ্রুব সত্য বলে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করাই হচ্ছে সেই বিশ্বাস—যে-মাটির উপর আমাদের ধর্ম-সাধনা প্রতিষ্ঠিত।

এই বিশ্বাসটির মূলে একটি উপলব্ধি আছে। সেটি হচ্ছে এই যে—ঈশ্বর সত্য!

"তাঁহারে আরতি করে চন্দ্র তপন,
দেব মানব বন্দে চরণ;
আসীন সেই বিশ্বশরণ
তাঁহার জগত মন্দিরে।"

বিশ্বজগতের এই জগদীশ্বরও মানুষের কাছে নত হন। কিন্তু কখন? কোনখানে? যেখানে তিনি সুন্দর; যেখানে তিনি রসোবৈসঃ। সেখানে আনন্দকে মানুষের সঙ্গে ভাগ না-করে তাঁর ভোগ করা চলবে না। সকলের মাঝখানে নেমে এসে সকলকে তাঁর ডাক দিতে হয়।...স্নেহের আনন্দভারে দুর্বল ক্ষুদ্র শিশুর কাছে পিতামাতা যেমন নত হয়ে পড়েন, জগতের ঈশ্বর তেমনি করেই আমাদের দিকে নত হয়ে পড়েন...এইটেই হচ্চে আমাদের পক্ষে চরম কথা। ভগবানের সকলের চেয়ে পরম পরিচয় হচ্ছে এইখানে।

ধর্মের চরম লক্ষ্যই হ'চ্ছে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন সাধন। সুতরাং সাধককে একথা সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে,কেবল বিধিবদ্ধ পূজার্চনা, আচার অনুষ্ঠান ও শুচিতা রক্ষার দ্বারা তা হ'তে পারে না। হৃদয়ে রসের আবির্ভাব ঘটলে তবেই তাঁর সঙ্গে মিলন হয়। কিন্তু এ কথা মনে রাখতে হবে ভক্তিরসের বা প্রেমরসের যে দিকটি সম্ভোগের দিক, কেবল সেই দিকটিকেই একান্ত করে তুললে দুর্বলতা ও বিকার ঘটে। তাই, কবি তাঁর জীবনদেবতাকে জানিয়েছেন:

"ভয় হয় পাছে তব নামে আমি
আমারে করি প্রচার হে।
মোহবশে পাছে ঘিরি আমায় তব
নাম গান অহংকারে হে॥"

তিনি বলেছেন, মানুষের মধ্যে যখন রসের আবির্ভাব না থাকে, তখন মানুষও জড়পিণ্ড মাত্র। তখন ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, ভাবনাই তাকে ঠেলে ঠেলে কাজ করায়। সে কাজে পদে পদেই তার ক্লান্তি। সেই অবস্থাতেই মানুষ অন্তরের নিশ্চলতা থেকে বাহিরেও কেবলি নিশ্চলতা বিস্তার করতে থাকে। তখনই তার যত খুঁটি-নাটি, যত আচার-বিচার, যত শাস্ত্র-শাসন! এই সময়ে মানুষের মন গতিহীন হ'য়ে পড়ে বলেই, সে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে। তখন তার ওঠা-বসা, খাওয়া-পরা সকল দিকেই বাঁধাবাঁধি। তখনই সে ওই সব নিরর্থক কর্ম স্বীকার করে—যা তাকে সম্মুখের দিকে অগ্রসর করে না, যা তাকে অন্তহীন পুনরাবৃত্তির মধ্যে একই জায়গায় কেবলই ঘুরিয়ে মারে।

রসের আবির্ভাবেই মানুষের মনের জড়ত্ব ঘুচে যায়।... তখন সচলতা তার পক্ষে আর অস্বাভাবিক নয়, তখন অগ্রগামী গতিশক্তির আনন্দেই সে কর্ম করে। সর্বজয়ী প্রাণশক্তির আনন্দেই সে দুঃখকে নির্বিবাদে স্বীকার করে নেয়। সেই কর্মই তাকে মুক্তি দেয় এবং দুঃখ তার ক্ষতির কারণ না হয়ে গৌরবের ধন হ'য়ে ওঠে। সে তখন বলে—

"হৃদয় বেদনা, বহিয়া প্রভু এসেছি তব দ্বারে
তুমি অন্তর্যামী হৃদয়স্বামী সকলি জানিছ হে!
যত দুখ লাজ দারিদ্র্য সংকট আর জানাইব কারে?
অপরাধ কত করেছি নাথ মোহপাশে পড়ে॥"

মানুষ তার গভীরতর অন্তরেন্দ্রিয় দ্বারা বিশ্বের অগোচরে বিশ্বনাথের সঙ্গে যোগের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। বাইরের সব কিছু সম্পদ পেয়েও সে তৃপ্ত নয়। পরমলাভের আকাঙ্ক্ষা তাকে অস্থির করে তোলে। যা কিছু পেয়েছে, তার মধ্যে সম্পূর্ণতার অভাব বোধ করে সে। যা সে পাচ্ছে না—তারই মধ্যে যে আসল পাবার সামগ্রীটি রয়েছে তার, এই একটি সৃষ্টিছাড়া প্রত্যয় তাকে তাড়না করে নিয়ে যায় পার্থিব সুখ সম্পদের উর্ধ্বে। সে বলে—

"তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা
যেথা আমি যাই নাকো, তুমি প্রকাশিত থাকো
আকুল নয়ন জলে ঢাল গো করুণা ধারা॥"

অনেক ভ্রমকে সে হয়ত সত্য বলে ভুল করেছে, অনেক কাল্পনিক মূর্তিকে সে তার ধ্যানের রূপ বলে খাড়া করেছে। কিন্তু কবি বলেন, মানুষের এই অজানাকে জানবার মনোবৃত্তিটিকে উপহাস করবার কোনো কারণ দেখি নে।... গভীর জলে জাল ফেলে সে হয়ত এ পর্যন্ত বিস্তর পাঁক তুলেছে, কিন্তু তবুও তার এ চেষ্টাকে অশ্রদ্ধা করতে পারিনে। সকল দেখার চেয়ে বেশি দেখা, সকল পাওয়ার চেয়ে বেশি পাওয়ার দিকে মানুষের চেষ্টা নিয়ত প্রেরিত হচ্ছে, এইটেই একটি আশ্চর্য ব্যাপার।

মানুষের এই শক্তিটিই বলিষ্ঠ সত্য এবং এই শক্তিটিই সত্যকে গোপনতা থেকে উদ্ধার করবার এবং মানুষের চিত্তকে গভীরতার নিকেতনে নিয়ে যাবার মূল। এই শক্তিটি মানুষের কাছে এত সত্য যে একে জয়যুক্ত করবার জন্য মানুষ দুর্গমতার কোনো বাধাকেই মানতে চায় না।

সেই যে আমাদের চিরজীবনের সাধনার ধন, সেই যে যাকে পেলে আমাদের পরমানন্দ—তিনি অনন্ত—তিনি অব্যক্ত। শেষ নেই, শেষ নেই। জীবন শেষ হয়ে এলেও তবু তাঁর শেষ নেই!

"তার অন্ত নাই গো, যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ
তার অণু পরমাণু পেল কত আলোর সঙ্গ
ও তার অন্ত নাই গো, অন্ত নাই!"

এমনি করে অনন্ত যদি পদে পদেই আমাদের কাছে ধরা না দিতেন, তবে অনন্তকে আমরা কোনো কালেই ধরতে পারতুম না। তিনি আমাদের কাছে অপরিচিতই থেকে যেতেন। কিন্তু, তাঁকে যে আমরা জীবনের প্রত্যেক স্তরেই অনুভব করতে পারছি। শৈশবের লালিত্যে তিনি, বাল্যের সুকুমার সৌন্দর্যে তিনি, যৌবনের দীপ্ত শক্তি সামর্থ্যে তিনি, আবার বার্ধক্যের নির্ভরতার মধ্যেও তিনি। খেলার হেলা-ফেলার মধ্যেও পূর্ণরূপে তিনি, সংগ্রহ সঞ্চয়ের মধ্যেও পূর্ণরূপে তিনি, আবার ত্যাগ ও তিতিক্ষার মধ্যেও পূর্ণরূপে তিনি। এই জন্য জীবনের পথটা আমাদের কাছে এমন

"সীমার মধ্যে অসীম তুমি—বাজাও আপন সুর
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ—তাই এত মধুর !
কত বর্ণে, কত গন্ধে, কত গানে, কত ছন্দে,
অরূপ তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয়পুর !"

এ পথটা আমরা ছাড়তে চাই না। কেন না, এ পথে তিনি যে আমাদের সঙ্গেসঙ্গেই চলেছেন। পথের উপর আমাদের যে ভালবাসা—এতো তাঁরই উপর ভালবাসা। মৃত্যুর প্রতি আমাদের যে অনীহা তার ভিতরের মূল কথাটি এই যে, হে প্রিয়, জীবনকে তুমিই আমাদের কাছে প্রিয় করে রেখেছো। ভুলে যাই, জীবনকে যিনি প্রিয় করেছেন, মরণেও তিনি আমাদেরই সঙ্গে চলেছেন।

অনন্ত বলেই তিনি সর্বদা সর্বত্র ধরা দিয়েই আছেন। তাঁর আনন্দরূপের অমৃতরূপের প্রকাশ—সকল দেশে, সকল কালে। সেই প্রকাশ যাঁরা মানব জীবনের মধ্যে দেখেছেন, মৃত্যুর পরেও তাঁকে নূতন করে দেখতে পাবেন তাঁরা। অনন্ত চিরদিনই সকল দেশে সকল কালে সকল অবস্থাতেই আমাদের কাছে স্বপ্রকাশ। এই তাঁর আনন্দের লীলা। তাই তিনি কখনো পুরাতন হন না। চিরদিনই তিনি নূতন। নূতন করেই তাকে জানবো, নূতন করেই তাঁকে পাবো, নূতন করেই আবার আনন্দলাভ করবো।

"তোমায় নূতন করে পাবো বলেই
হারাই ক্ষণে ক্ষণ,
ও আমার ভালবাসার ধন !
দেখা দেবে বলেই তুমি হও যে অদর্শন।"

আমাদের আত্মার যে সত্য সাধনা—তার লক্ষ্য হল যিনি শান্তং শিবমদ্বৈতং তাঁর স্বরূপ জানা। তাঁকে জানার মধ্যেই আমাদের পরিপূর্ণতা। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দেখেছি এই জানার ব্যাকুলতা, এই দর্শনের আকুলতা। তাঁর নানা রচনার মধ্যে—বিশেষ করে কাব্যে ও গানে আমরা কবির এই আকুতির অগণিত পরিচয় পাই।

"এ মোহ আবরণ খুলে দাও দাও হে
সুন্দর মুখ তব দেখি নয়নভরি"—

অথবা,

"মাঝে মাঝে তব দেখা পাই
চিরদিন কেন পাই না।
কেন মেঘ আসে হৃদয় আকাশে
তোমারে দেখিতে দেয় না।"

মন তখনও চঞ্চল, তখনও গতিপথের সন্ধান মেলেনি, বলছেন—

"সংশয় তিমির মাঝে না হেরি গতি হে
প্রেম আলোকে প্রকাশো জগপতি হে
বিপদে সম্পদে থেক না দূরে
সতত বিরাজো হৃদয় পুরে
তোমা বিনা অনাথ আমি অতি হে।"

পরম প্রিয়র দেখা যখন পাচ্ছেন না কিছুতেই—কবি তখন ভাবছেন—আমি বোধহয় নিঃশেষে তাঁকে আত্ম-সমর্পণ করতে পারিনি বলেই তিনি আমার কাছে ধরা দিচ্ছেন না !

"আমার যা আছে আমি সকলি দিতে পারিনি
তোমারে নাথ !
আমার লাজ ভয়, আমার মান অপমান
সুখ দুখ ভাবনা।"

ভগবানের চরণে সর্বস্ব নিবেদন ক'রে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ করতে না পারলে তাঁর সঙ্গে এক হওয়া যায় না। কবি এরই জন্ম সাধনা করেছিলেন দীর্ঘদিন। তাঁর কাছে সকল দেবতাই সেই একই বিশ্ব-দেবতার অখণ্ড প্রকাশরূপে প্রতীয়মান হয়েছিল। তিনি কখন 'শিব' 'শিব' করে ভোলানাথের ভজনা করেছেন, কখনো বা 'কালী' 'কালী' বলে শ্যামামায়েরও স্তব করেছেন :—

"কালী, কালী, কালী, বলো রে আজ !
নামের জোরে সাধিব কাজ—
ঐ ঘোর মত্ত করে নৃত্য রঙ্গ মাঝারে,
ঐ লক্ষ লক্ষ যক্ষ রক্ষ ঘেরি শ্যামারে,
ঐ লট্ট পট্ট কেশ পাশ অট্ট অট্ট হাসেরে,
ওরে, বলরে শ্যামা মায়ের জয় !

বাল্মীকি-প্রতিভার মধ্যে কবির এই যে শ্যামা বিষয়ক সঙ্গীতগুলির সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় হয়, একমাত্র শক্তিসাধক কালীভক্ত ভিন্ন অপরের কণ্ঠে এ সুর শোনার আশা করা যায় না।

"রাঙাপদ পদ্মযুগে প্রণমি মা ভবদারা
আজি এ ঘোর নিশীথে পূজিব তোমারে তারা।

সুর নর থর থর—ব্রহ্মাণ্ডে বিপ্লব করো
রণরঙ্গে মাতো মাগো ঘোর উন্মাদিনী পারা !
উর কালী কপালিনী, মহাকাল সীমন্তিনী
লহ জবা পুষ্পাঞ্জলি মহাদেবী পরাৎপরা ।"

এ গান-রচনার সময় কবির বয়স বছর তেইশ চোব্বিশের বেশি হবে না। কিন্তু, তিনি ছিলেন জন্ম-সাধক, জাতক ভক্ত, শ্রীভগবানের উদ্দেশে তিনি যেদিন প্রথম স্তবগান রচনা করেছিলেন—তখন তো তিনি একটি কিশোর বালক মাত্র। তাই দুরন্ত যৌবনে তাঁকে দেখি আমরা ভীমা-ভৈরবী শ্যামার মুগ্ধ উপাসকরূপে—

"এত রঙ্গ শিখেছো কোথা মুণ্ডমালিনী ?
তোমার নৃত্য দেখে চিত্ত কাঁপে চমকে ধরণী।
ক্ষান্ত দেমা শান্ত হ মা, সন্তানের মিনতি
রাঙা নয়ন দেখে নয়ন মুদি ওমা ত্রিনয়নী ।"

এর পাঁচ বছর পরে পরিণত-যৌবনেও কবির মুখে আমরা আবার এই শ্যামা-সঙ্গীত শুনেছি। কবির বয়স তখন প্রায় তিরিশের কাছাকাছি।

"উলঙ্গিনী নাচে রণ রঙ্গে !
আমরা নৃত্য করি সঙ্গে,
দশ দিক আঁধার করে মাতিল দিক্‌বসনা !
কালো কেশ উড়িল আকাশে,
রবি সোম লুকালো তরাসে—
রাঙা রক্ত ধারা ঝরে কালো অঙ্গে !"

যৌবনের এই ঘোর শাক্ত-কবিকে আমরা আবার পরে পরম শিবভক্ত শৈব রূপে এবং পরিণত বয়সে পরম বৈষ্ণবের মতো হরিনামে ভাবোন্মত্ত হ'য়ে নাম সংকীর্তন করতে শুনি। কাতর কণ্ঠে তিনি বলছেন—

"তার তার হরি ! দীন জনে,
ডাকো তোমার পথে করুণাময়,
পূজন-সাধন-হীন জনে !"

শ্রীহরির চরণে আত্ম-নিবেদনের সুরে বলেছেন—

"ওহে জীবন-বল্লভ, ওহে সাধন-দুর্লভ,
আমি মর্মের কথা, অন্তর ব্যথা কিছুই নাহি কবো ;
শুধু জীবন মন চরণে দিনু বুঝিয়া লহ সব—

ভক্তিবিনম্র এই বৈষ্ণব দীনতা আমরা কবির একাধিক সঙ্গীতের মধ্যে পাই—

"ধূলায় রাখিও পবিত্র করে
তোমার চরণ ধূলিতে
ভুলায়ে রাখিও সংসার তলে,
তোমারে দিয়ো না ভুলিতে ।"

অথবা :—

"আমার মাথা নত করে
দাও হে, তোমার চরণ ধূলির তলে।"

একসময় তিনি নাম গানে একবার বিভোর হ'য়ে উঠেছিলেন—

"তোমারি নামে নয়ন মেলিনু
পুণ্য প্রভাতে আজি।
তোমারি নামে খুলিল হৃদয়
শতদল দল রাজি ॥
তোমারি নামে নিবিড় তিমিরে
ফুটিল কনক লেখা।
তোমারি নামে উঠিল গগনে
কিরণ বীণা বাজি ॥"

শ্রীহরির চরণে একেবারে আত্মসমর্পণ করে কবি বলেছেন—

"বাঁচান বাঁচি, মারেন মরি, বলো ভাই ধন্য হরি !
ধন্য হরি ভবের নাটে, ধন্য হরি রাজ্য পাটে,
ধন্য হরি শ্মশান ঘাটে, ধন্য হরি ! ধন্য হরি !"

হরিনামে তবু যেন কবির তৃপ্তি হ'চ্ছে না !

গাও হে তাঁহারি নাম—
রচিত যাঁর এ বিশ্বধাম।

বার বার তাঁকে ডেকে বলছেন—

"তোমারি নাম বলবো নানা ছলে,
বলবো একা বসে আপন মনের ছায়া তলে!
বলবো বিনা ভাষায়, বলবো বিনা আশায়
বলবো মুখের হাসি দিয়ে, বলবো চখের জলে !"

এই নামের সাধনায় ক্রমে কবি একেবারে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন। দিবানিশি নাম কীর্ত্তনে মেতে উঠে গাইতেন—

"আমার মুখের কথা তোমার নাম দিয়ে দাও ধুয়ে,

রক্তধারার ছন্দে আমার দেহ বীণার তার
বাজাক আনন্দে তোমায় নামেরি ঝংকার।
ঘুমের পরে জেগে থাকুক নামের তারা তব
জাগরণের ভালে আঁকুক নামের আখর নব।
সব আকাংখা আশায় তোমার নামটি জ্বলুক শিখা,
সকল ভালবাসায় তোমার নামটি রহুক লিখা।
সকল কাজের শেষে তোমার নামটি উঠুক ফলে
রাখবো কেঁদে হেসে তোমার নামটি বুকে কোলে।
জীবন-পদ্মে সঙ্গোপনে রবে নামের মধু
তোমায় দিব মরণ ক্ষণে তোমারি নাম বঁধু।"

কবির এ সাধনা ব্যর্থ হয়নি। তাঁর ভক্তির আবেগে,প্রেমের প্রভাবে, ধ্যান তপস্যা ও নাম গানে প্রীত হয়ে কবির জীবন-দেবতা তাঁকে দেখা দিয়েছিলেন। কবির প্রগাঢ় ভগবদ-প্রেম তাঁকে ভগবানের একান্ত সান্নিধ্যে নিয়ে গিয়েছিল। কবি যে তাঁর সাধন-ধনের সামীপ্য সাযুজ্য ও সালোক্য লাভ করতে পেরেছিলেন এ স্বীকৃতি আমরা তাঁর সঙ্গীতের মধ্যেই পাই। তাঁর এই আকুতি—

আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি
দিবস কাটে বৃথায় হে,
আমি যেতে চাই তব পথ পানে
কত বাধা পায় পায় হে!

কিন্তু, বাধা তাঁর কেটে গিয়েছিল। আঁধার দূর হয়ে হৃদয়ের প্রান্তে আলোর আভাস দেখা দিয়েছিল—

"আমার হৃদয় সমুদ্র তীরে কে তুমি দাঁড়ায়ে?
কাতর পরাণ ধায় বাহু বাড়ায়ে!"

কবি সাগ্রহে আহ্বান জানাচ্ছেন—

"ওহে সুন্দর, মম গৃহে আজি পরমোৎসব রাতি,
রেখেছি কনক মন্দিরে কমলাসন পাতি।
তুমি এস হৃদে এস, হৃদি বল্লভ হৃদয়েশ!
মম অশ্রু নেত্রে করো বরিষণ করুণ হাস্য ভাতি!"

এইবার চরাচরে কবি তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন—

"তোমার মধুর রূপে ভরেছো ভুবন,
মুগ্ধ নয়ন মম, পুলকিত দেহ মন!"

বাঞ্ছিতের দর্শন লাভে কৃতজ্ঞ কবি বলছেন—

"তুমি আপনি জাগাও মোরে তব সুধা পরশে,
হৃদয়নাথ, তিমির রজনী অবসানে হেরি তোমারে!
"হেরি তব বিমল মুখভাতি, দূর হ'ল গহন দুখরাতি"

আনন্দে বিহ্বল হয়ে কবি তখন গাইছেন—

"আনন্দ লোকে মঙ্গলালোকে, বিরাজ সত্যসুন্দর!
মহিমা তব উদ্ভাসিত মহা গগন মাঝে,
বিশ্ব জগত মণিভূষণ বেষ্টিত তব চরণে!"

তখন সেই পরম পুরুষের চরণে অন্তর লুটিয়ে দিয়ে কবি বলছেন—

"একি করুণা করুণাময়! হৃদয় শতদল উঠিল ফুটি
অমল কিরণে তব পদতলে
অন্তরে বাহিরে হেরিনু তোমারে, লোকে লোকে
লোকান্তরে,
আঁধারে আলোকে সুখে দুঃখে হেরিনু হে,
স্নেহে প্রেমে জগতময়—চিত্তময় হে!"

তারপর আমরা কবিকে দেখি—ইষ্ট-প্রাপ্তির আনন্দে তিনি বিভোর! তিনি পূর্ণ পরিতৃপ্ত হয়ে গদগদকণ্ঠে বলছেন—

"তোমারি রাগিণী জীবন কুঞ্জে বাজে যেন সদা বাজেগো!
তোমারি আসন হৃদয়পদ্মে রাজে যেন সদা রাজে গো!
তব নন্দন-গন্ধ মোদিত ফিরি সুন্দর ভুবনে
তব পদরেণু মাখি লয়ে তনু সাজে যেন সদা সাজে গো!"

হৃদয়-মন্দির এতদিন শূন্য ছিল। বিগ্রহের আবির্ভাব ঘটেনি। এইবার দেবতার প্রকাশে তা পূর্ণ হ'ল।

"মন্দিরে মোর কে আসিল রে!
সকল গগন অমৃত মগন,
দিশি দিশি গেল মিশি অমানিশি দূরে দূরে;
সকল দুয়ার আপনি খুলিল
সকল প্রদীপ আপনি জ্বলিল,
সব বীণা বাজিল নব নব সুরে সুরে!"

শুধু কি তাই? বলেছেন:

"আলোয় আলোকময় করে হে এলে আমার আলো!
আমার নয়ন হ'তে আঁধার মিলালো, মিলালো।"

চির-আকাঙ্ক্ষিত বিশ্বরূপ দর্শন ক'রে কবি কৃতজ্ঞ অন্তরে তাঁকে জানাচ্ছেন—

"মহারাজ! একি সাজে এলে হৃদয়পুর মাঝে,
চরণ তলে কোটি কোটি শশী সূর্য মরে লাজে;
গর্ব সব টুটিয়া মূর্চ্ছি পড়ে লুটিয়া—
সকল মম দেহ মন বীণা সম বাজে

এ আলোচনা আমরা দেখতে পাচ্ছি কবির ভগবদপ্রেম সাধনার মূলমন্ত্র হ'ল—

"আমি রূপে তোমায় ভোলাব না, ভালবাসায় ভোলাবো।
আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলবো না গো, গান দিয়ে দ্বার
খোলাব'

সমাপ্ত

মাটিলডা রেড্

মলয় রায়চৌধুরী

ভাবছিল ছাব্বিশ বছরের মেয়েটি। এক কোণে বসে ভাবছিল ও বক্তার বিরুদ্ধতা করবে কিনা। ওর মনে হল—বক্তা যা বলছেন তা সর্বাংশে সত্য নয়। কয়েদীদের বিষয়ে বলছিলেন বক্তা। উনি বলছিলেন যে এমন কিছু কয়েদী আছে যাদের পেছনে সমাজ মিছিমিছি সময় এবং অর্থের অপচয় করে। ওঁর মতে এ সমস্ত কয়েদীর চরিত্র কোনোকালেই ভাল হতে পারে না।

তবুও মেয়েটি বিরুদ্ধতা করল। ছোটবেলা থেকেই কয়েদীদের দেখেছে মেয়েটি, তাই ও জানে কয়েদীদের ভালকরা যায় কিনা। মঞ্চের ওপর গিয়ে দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করল মেয়েটা : পৃথিবীতে এমন কোনও লোক নেই যার চরিত্রকে সংশোধন করা না চলে……there is no person who is absolutely incorrigible.

অন্যান্য ডেলিগেটরা অবাক হয়ে গেল মেয়েটির কথা শুনে। কি মেয়েটা! কেউ যা বলতে সাহস করেনি—তাই যে বলল ও!

জার নিমন্ত্রণ করলেন এই সাহসী মেয়েটিকে। কিন্তু নিমন্ত্রণে যোগ দিলনা মেয়েটি। মেয়েটি জানত যে সমাজের এই উচুঁ দিকটার সঙ্গে যদি সম্পর্ক রাখে সে, তাহলে কোনও কয়েদী আর বিশ্বাস করবেনা তাকে, বরং তাকে ভয় করবে। মতান্তরের জন্যে ফিরে গেল সে নিজের দেশে। ফিনল্যাণ্ডে। নিজের দেশের হয়ে সে যোগ দিতে এসেছিল ১৮৯০ সালে রাশিয়ার পেট্রোগ্রাড-এ অনুষ্ঠিত ইণ্টারন্যাশানাল পেনাল কংগ্রেস—এ।

মেয়েটি হল মাটিলডা রেড। ফিনল্যাণ্ডের ভাসা জেলার গভর্ণর ব্যরন কার্ল ওস্তাভ রেড এবং ব্যরনেস এলেনোরা গ্রান সেন সৎজেরনা রেড—এর নবম সন্তান মাটিলডা রেড। জন্ম ৮ই মার্চ, ১৮৭৪ সালে।

সেকালের ফিনল্যাণ্ডে কয়েদীদের বাধ্যতামূলক কর্তব্য ছিল রাজনৈতিক কর্মচারীদের গৃহে কাজ করা। মাটিলডার পিতা গভর্ণর হওয়ার ছোট বেলা থেকেই কয়েদীদের সঙ্গে সে পরিচিতা ছিল। একবার মাটিলডা যখন সাত বছরের—তখন সে দেখে একজন কয়েদীকে কুকুরের মত শৃঙ্খলিত করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সে দৃশ্য দেখতে তাকে বারণ করা হলে সে বলল : ওরা যদি এত কষ্ট সহ্য করতে পারে তাহলে আমি এ দৃশ্যটুকু সহ্য করতে পারব নিশ্চয়।

এর পর হতে প্রায়ই তিনি কারাগার ভ্রমণে যেতেন। তাঁর পিতা এতে রাগ করতেন বটে, কিন্তু তবুও মাটিলডা ভ্রমণ বন্ধ করলেন না। প্রায়ই ভ্রমণের ফলে কয়েদীরা তাঁর বন্ধুর মত হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু এই সময় হঠাৎ তাঁর পিতা কাজে ইস্তফা দিয়ে হেলসিঙ্কিতে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন সংসার। সেখানে গিয়ে মাটিলডা দেখলেন কয়েদীদের দিয়ে রাস্তা মেরামতের কাজ করান হচ্ছে। হেলসিঙ্কিতেও কারাগার ঘুরে ফিরে দেখলেন তিনি। তারপর তিনি সুবিখ্যাত ভিলানস্টাড ও আর কাকোলা দেখলেন। এই দুটি স্থানে সবচেয়ে খারাপ কয়েদীদের রাখা হত।

প্রচুর কারাগার ভ্রমণের ফলে এবং কয়েদীদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগে জেলখানার কাজে পোক্ত হয়ে উঠলেন মাটিলডা কুড়ি বছর বয়সেই। একবার এক কয়েদী ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর ওপর, মাটিলডা যখন তাকে বোঝালেন তখন কয়েদীটি তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়।

মাটিলডা রেড্

আরেকবার এক খুনী আসামীর সেল—এ তিনি একলাই চলে যান। কয়েদীটি তাঁর সাহস এবং দয়ার কেঁদে ফেলে এবং তাঁকে নিজের জীবনের সমস্ত ঘটনা জানায়।

ক্রমে জানতে পারলেন মাটিলডা যে কারাগারে আবদ্ধ থেকেও সমাজের সাহায্যে আসতে পারে কয়েদীরা। বহু কয়েদীকে তিনি অনুপ্রেরণা যোগালেন কাজ করার জন্যে। শেখালেন—সমাজ ঘৃণা করলেও কি করে মানুষ শান্তিতে থাকতে পারে।

একজন কয়েদী যখন তাঁকে একবার জানাল যে সে জীবনে একটাও

ভাল কাজ করেনি—ভাল কাজ করার সুযোগই পায়নি—তখন মাটিলডা তাকে একগ্লাস জল দিতে বললেন তার কাপে। ইতস্তত করার পর কয়েদীটি যখন দিল জল—তখন মাটিলডা তার সামনে পান করেই দেখিয়ে দিলেন যে ভালকাজ সকলেই করতে পারে পৃথিবীতে।

১৯১২ সালে মাটিলডার কারাগারে ভ্রমণ প্রায় বন্ধ হয়ে এল। স্থানীয় কয়েদীদের হাসপাতালটির অবস্থা ছিল ভীষণ খারাপ। বহু চেষ্টা করলেন হাসপাতালটির উন্নতির জন্যে, কিন্তু কর্তৃপক্ষরা সাধারনত যা করে থাকেন তাই করলেন—উদাসীন রইলেন। তিনি গভর্ণরকে জানালেন এবং প্রিজন বোর্ডকেও জানালেন কিন্তু কোনও ফল হলনা তাতে। সব শেষে এক সাংবাদিককে জানালেন। সংবাদপত্র জনসাধারণের মনে আলোড়ন আনল। ওদিকে কারাগার কর্তৃপক্ষ তাঁদের প্রতিকূলে জনসাধারণকে প্রবাহিত করায় মাটিলডার কারাগার ভ্রমণ দিলেন বন্ধ করে। তাঁরা জানালেন যে মাটিলডা যদি একান্তই যেতে চায় তাহলে তাঁকে সঙ্গে একজন কারাগার কর্মচারী রাখতে হবে।

মাটিলডার পক্ষে এ ছিল অসম্ভব। তিনি জানতেন যে সঙ্গে কেউ থাকলে কয়েদীরা তাঁকে তাদের কথা জানাবেনা এবং অবিশ্বাস করবে।

কিন্তু এর পরই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হল। যুদ্ধ মানেই মৃত্যু এবং কারাগার। অতএব প্রয়োজন হল মাটিলডার। ওদিকে আবার সাদা আর লালের ঘরোয়া যুদ্ধ আরম্ভ হল ১৯১৭ সালে। মাটিলডা নিরপেক্ষ রইলেন এবং দুদলের কয়েদী আর আহতদের দেখাশুনো করতে লাগলেন; এই সময়ে নিজের টেবিলের ওপর ফুলদানীতে একটি সাদা আর একটি লাল গোলাপ রাখতেন তিনি। তাঁর মতে দুরঙ-এর দুটি ফুল যদি এক সঙ্গে থাকতে পারে তাহলে দুরকম মত নিয়ে মানুষ কেন থাকতে পারবেনা।

অনেকে তাঁর যুক্তিতে সায় দিত, অনেকে দিত না। তবুও পরামর্শ এবং সহযোগিতার জন্যে সকলেই আসত তাঁর কাছে।

তাঁকে যখন আবার কারাগারে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হল তখন তাঁর আর স্বাস্থ্য ছিলনা পূর্বের মত। তবুও তিনি যতটুকু পারতেন করতেন। তাঁর এই একনিষ্ঠতার জন্যে বহুবার নিজের দেশের হয়ে কারাগার সম্বন্ধীয় বিশ্বসংস্থা এবং বিশ্বসভায় যোগ দেবার আহ্বান পেয়েছেন। জীবনের প্রতিটি দিন সমাজের মঙ্গলের জন্যে কাটিয়ে গেছেন তিনি।

১৯২৮-এর বড়দিনে মৃত্যু হয় মাটিলডা রেড-এর। উনত্রিশে ডিসেম্বর সেন্ট জন চার্চের পাশে সমাধিস্থ করা হয় তাঁকে। তাঁকে সমাধিস্থ করার সময় একজন প্রাককয়েদী স্বগতোক্তি করে: কয়েদীদের মায়ের মৃত্যু হল আজ। "......She was indispensable... she belonged to us."

ইবন্‌বতুতা আর তীর্থযাত্রীদল। এই সহরের কাজীর কাছে আত্ম-পরিচয় দিলেন শ্রেষ্ঠ বাগ্মী রূপে। কাজী বললেন দেশ ভ্রমণেই যখন বেরিয়েছেন, তখন ভারতবর্ষে কিম্বা চীনে যদি যাবার ইচ্ছে থাকে তা হোলে যেন আমার ভায়েদের কাছে যেতে ভুলবেন না। ফরিদউদ্দীন থাকে ভারতের সিন্ধুপ্রদেশে আর বুরহান উদ্দীন থাকে চীনে। ইবন্‌-বতুতা এই কথাতেই প্রেরণা পেলেন এই সব দেশের দিকে আসতে। এরপর সদলবলে মিশরের রাজধানী কায়রোতে এলেন। মিশরের প্রাচীন ঐতিহ্য আর সহরের সৌন্দর্য্য তাঁকে আকৃষ্ট করলো। তারপর পায়ে হেঁটে বিশাল মরুভূমি পেরিয়ে এলেন গাজাতে। সেখান থেকে হেব্রন, যীশুর জন্মস্থান বেথ্‌লেহেম দেখে জেরুজালেমে পৌঁছুলেন। দামাস্কাসে এসে তিনি আনন্দে আত্মহারা। তাঁর ধারণা এর মত অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যমণ্ডিত সহর পৃথিবীতে বিরল।

আবার সুরু হোলো পথ চলা। শেষে পথশ্রান্ত হয়ে এলেন আরব দেশে ১৩২৬ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। সঙ্গে একটি তীর্থযাত্রীর দল। সকলেরই হজের দিকে টান, মক্কা দর্শন। পথে পড়লো মদিনা। এটাও শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান। তীর্থযাত্রীর দল সেখানে থামলেন। নমাজের পর দেখলেন হজরত মহম্মদের সমাধি মন্দির আর বেদী, ভক্তিভরে স্পর্শ করলেন সেই সুপ্রাচীন তালগাছটী যার গায়ে ঠেস দিয়ে হজরত ধর্ম্মোপদেশ দিতেন।

মক্কা শহরে এসে ইবন্‌বতুতার মনপ্রাণ ভগবদ্‌মুখী হোলো। মক্কার অধিবাসীদের মধ্যে তিনি দেখেছেন কতকগুলি চারিত্রিক বিশেষ গুণ আর অন্তরের উচ্চভাব। এখানকার স্ত্রীলোকেরা অসাধারণ সুন্দরী, অতিশয় ধর্ম্মপ্রাণা ও ভদ্র। কয়েকদিন থেকে তীর্থকৃত্য করে আবার এলেন মদিনায়। একদল যাত্রী বাগ্‌দাদে যাবার জন্যে প্রস্তুত। উনিও তাদের সঙ্গী হোলেন। তাদের সঙ্গে পার হোলেন নাজ্‌দের মরুভূমি। বাগ্‌দাদে এসে দেখলেন বহু পুষ্করিণী, তাঁর সময়ের পাঁচশো বছর পূর্ব্বে পুষ্করিণীগুলি কাটিয়ে গেছেন খলিফা হারুণ অল-রসিদের স্ত্রী সুবেদা বেগম। এলেন আলির সমাধির কাছে। আলি হজরতের জামাতা আর শিয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। তারপর নাজাফ থেকে বসরা, বসরা থেকে সুস্তার, সুস্তার থেকে ইস্পাহানে এলেন কাজী ইবন্‌বতুতা। সিরাজে এসে পারস্যের শ্রেষ্ঠ প্রেমিক শেখ সাদীর সমাধি ক্ষেত্রের ওপর দিলেন তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধাপূর্ণ লাল গোলাপের অর্ঘ্য। এরপর তাব্রিজ, মাসুল প্রভৃতি শহর ঘুরে আবার ফিরে এলেন মক্কায়। এখানে বড় বড় তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতদের সঙ্গে তত্ত্বালোচনায় মগ্ন হোলেন। কাটালেন একাধিক ক্রমে তিনটী বছর মক্কায় তার খ্যাতি প্রতিপত্তি বেড়ে গেল, এখানে কয়েকজন শ্রেষ্ঠ সুন্দরীকে বিয়ে করলেন। কিন্তু এরা এই যাযাবর মানুষটিকে ধরে রাখতে পারলো না। ১৩৩০ খৃষ্টাব্দে আবার সুরু হোলো তাঁর যাত্রা।

এরপর জেবিদ, শামা প্রভৃতি অঞ্চল ঘুরে এলেন এডেনে। শহরের চারিদিকে পাহাড়ের প্রাচীর। এডেন তাঁর অন্তর স্পর্শ করলো না। এডেন ছেড়ে তিনি আফ্রিকার পূর্ব্ব কূল ধরে বরাবর নীচের দিকে নেমে গেলেন। সে দিক থেকে ফিরে এলেন যোফারে, সেকালের লোকেরা ওকে বলতো ওফির। এদিক ঘুরে চলে এলেন হরমুজ সহরে। সুফী পণ্ডিতদের সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা করে পেলেন পরম তৃপ্তি। দ্বিতীয়বার তাঁর আরব প্রদক্ষিণ হোলো পূর্ব্ব-পশ্চিমে। নেজদ্‌এর শাসনকর্ত্তা ওঁকে সঙ্গে নিয়ে মক্কা যাত্রা করলেন। ১৩৩২ খৃষ্টাব্দে আবার তাঁর মক্কাযাত্রা। এরপর এক জেনোয়াবাসীর জাহাজে চড়ে আনাতোলিয়ায় নেমে পড়েন।

ক্রিমিয়ায় এসে চললেন কষ্টমুনিতে। দুরন্ত দুর্য্যোগের মধ্য দিয়ে পার হোলেন কৃষ্ণসাগর। ঘোড়ায় টানা মাল গাড়ীতে উঠে কিপ্‌চাক মরুভূমি অতিক্রম করতে হোলো। এলেন কামগড়ে কাফার নির্জ্জন পথ দিয়ে। কাফা থেকে ফিয়োদোসিয়া, ফিয়োদোসিয়া থেকে সারাতে এসে হাজির হোলেন। সারায় তিনি দেখেছেন তুর্কীদের স্ত্রীজাতির ওপর সম্মান প্রদর্শন। আবার সুলতানের আনুকুল্যে অষ্ট্রাখানে পৌঁছুবার সুযোগ পেলেন। ভল্‌গা নদীর তীরে ছিল অষ্ট্রাখান। এখানে কিছুদিন সম্রাটের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। সম্রাটের গ্রীকপত্নী কাজীর সঙ্গে কন্‌ষ্টান্টিনোপলএ তাঁর পিতৃগৃহে এলেন। এখানে কিছুদিন কাটিয়ে বোখারা আসবার সময় বিরাট মরুভূমি পার হোতে হোলো। ওঁর আসার কিছুকাল আগে চেঙ্গিস খাঁ সহরটাকে বিধ্বস্ত করে গেছে, তার নিদর্শন দেখে মনে ব্যথা পেলেন।

বোখারা ছেড়ে সাক্‌সারের কাছে এসে তিনি সম্রাট তিরমাসিরীনের পেলেন সাদর অভ্যর্থনা। সুন্দরতম নগরী সমারকন্দ। এখান থেকে তিরমিজ, তারপর অক্‌সাস পেরিয়ে বা নব চড়ার ওপর দিয়ে দেড় দিন পায়ে হেঁটে বাল্‌খ্‌এ উপস্থিত হোলেন এই—বালখ্‌ সম্বন্ধে বহু বছর আগে হিউএন সাং প্রশংসা করে গেছেন অতি সুন্দর সহর বলে, কিন্তু ইবন্‌বতুতা দেখেছেন ধ্বংসস্তূপ আর জনতা বিরল বসতি-হীন একটি শ্মশান। মন্তব্য করেছেন—'এসবই চেঙ্গিসের কীর্ত্তি।'

ওখান থেকে হিরাট পর্যন্ত আসতে দেখেছেন চতুর্দ্দিকে ধ্বংসস্তূপ আর বিধ্বস্ত সহর। এরপর এলেন হিন্দুকুশ পর্ব্বতের পাদদেশে। তার পর বহু কষ্ট বহু বিপদ তাঁর ওপর দিয়ে চলে গেছে, শেষে এসে পড়লেন চারিকার নামে এক সহরে। এ সহরটী কাবুলের কিছু উত্তরে। অবশেষে কাবুলের ভেতর দিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করলেন। তীর্থযাত্রা করবার জন্যে দীর্ঘ সাত বছর পূর্ব্বে যে যাত্রার হয়েছিল সুরু, ইসলাম জগতের পুণ্যতীর্থ আরব আর তার চারিদিকের সমস্ত অঞ্চলগুলি পরিক্রমা করে হিন্দুকুশের পাদদেশে টেনে দিলেন তার সমাপ্তি রেখা।

১৩৩৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে খাইবারের গিরি সঙ্কট পেরিয়ে ভারতবর্ষের সীমান্তে এসে হাজির হোলেন কাজি শেখ আবু আব্দুল্লা ইবন্‌বতুতা। সে সময়ে ভারতবর্ষের দাস রাজ্য বংশের সবে-মাত্র অবসান হয়েছে, দিল্লীর সিংহাসনে বসেছেন গিয়াসুদ্দীন তোগলকের প্রাণঘাতী পুত্র সুলতান মহম্মদ ইবন্‌তোগলক, যিনি ইতিহাসে পাগলা মহম্মদ তোগলক নামে পরিচিত। ভারতের সীমান্তে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে গুপ্ত চরের মাধ্যমে খবর পেলেন সুলতানের শাসনকর্ত্তা—এ কয়ন

বিদেশী মুসলমান ভারতের সীমানা পার হয়ে সীমান্ত প্রদেশ চলে এসেছেন। শাসনকর্তার মাথায় টনক্ নড়লো।

এদিকে কাজী অপেক্ষা করছিলেন দিল্লী যাবার জন্যে, মহম্মদ তোগলক তাঁকে আমন্ত্রণ করবেন এই ছিল তাঁর আশা। হঠাৎ দেখা হয়ে গেল সিন্ধের শাসন কর্তার সঙ্গে। ইনি ছিলেন বতুতার পূর্ব্বপরিচিত হিরাটের কাজী। দীর্ঘ তুমাস পরে দিল্লীর সম্রাটের কাছ থেকে দূত এলো সুলতানের সভায় নতুন আগন্তুককে নিয়ে যাবার জন্যে। বতুতাকে প্রতিজ্ঞা পত্রে সই কর্‌তে হোলো এই সর্ত্তে যে, তিনি চিরদিন ভারতের ভেতর বসবাস কর্‌বার জন্যেই এখানে এসেছেন।

দানব প্রকৃতির সুলতান মহম্মদ তোগলক ইবন্ বতুতাকে পরম সমাদর করে ছিলেন। তাঁকে প্রচুর অর্থও দিয়েছিলেন। দিন কতক ইবন্ বতুতা সম্রাটের সুনজরে ছিলেন, পরে অপ্রিয় হয়ে উঠ্‌লেন। কিছু দিন বেশ লাঞ্ছনা ভোগ কর্‌তে হয়েছে। শেষে তাঁর ওপর মহম্মদ তোগলকের অনুকম্পা হোলো। ১৩৪১ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে তাঁকে সুলতান মক্কা যাবার অনুমতি দিলেন। সুলতান তাঁকে চীন দেশে ভারতের রাষ্ট্র দূতের পদে অভিষিক্ত করেছিলেন। ১৩৪২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে চীন সম্রাটের জন্যে প্রচুর উপঢৌকন, দাসদাসী, রত্নালঙ্কার, এক হাজার অশ্বারোহী সেনা, একশো নৃত্য গীত কুশলী হিন্দু মেয়ে আর পনরো জন খোজা নিয়ে জাহাজে চড়ে ইবন্ বতুতা যাত্রা কর্‌লেন। ভারতের নানাস্থানে তখন বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছে মহম্মদের কুশাসনে। পথে এক বিরাট বিদ্রোহী বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হোলেন। শেষ পর্য্যন্ত বন্দীও হোলেন। সুকৌশলে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু যে দূত চীন সম্রাটের উপহার নিয়ে যাচ্ছিল তাকে বিপ্লবীরা হত্যা কর্‌লো। উপহার গুলি বিপ্লবীদের হাতে পড়ে লণ্ড ভণ্ড হয়ে গেল। কালিকট বন্দরে কাজি দীর্ঘ তিনমাস অপেক্ষা কর্‌লেন ভালো আবহাওয়ার জন্যে। যে সময়ে সমুদ্রে ভাসবার উদ্যোগ কর্‌লেন সে সময়ে আবার বিপন্ন হয়ে পড়্‌লেন, সকালে জাহাজ ছাড়বার আগের রাত্রে প্রচণ্ড ঝড়ের বেগে কালিকাটের উপকুল গেল হারিয়ে। সে জাহাজে ছিল তাঁর সমস্ত মাল পত্র শ্বেতাঙ্গক্রীত দাসদাসী আর ধন দৌলত। কুইলন গেলেন, সেখানেও জাহাজের কোন খবর মিল্‌ল না। পরে জান্‌তে পার্‌লেন সুমাত্রার রাজার কবলে গিয়ে সব পড়েছে, যা কিছু ছিল সব লুটপাট হয়েছে। অর্থ নেই, খাদ্য নেই, এমন কি সঙ্গে দ্বিতীয় বস্ত্র পর্য্যন্ত নেই এমন দুর্দ্দশার মধ্যে পড়্‌লেন তিনি। হিনয়ে এসে বিপন্ন হোলেন। পলায়ন কর্‌লেন। মালদ্বীপের রানীর কাছে পরিচয় পাঠালেন। তিনি ইবন্‌বতুতাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। বতুতা সেখানকার একজন কাজী হোলেন। মালদ্বীপে কাজী স্থায়ী ভাবে বাস কর্‌তে সুরু কর্‌লেন এবং ক্রমে ক্রমে কর্‌লেন চারটি বিবাহ। অতঃপর কাজী ইবন্‌বতুতা হোলেন ঘোরতর সংসারী ও স্ত্রৈণ।

কিছুকাল পরে আবার বেরিয়ে পড়্‌লেন। ঝড়ের মুখে তাঁর জাহাজ সিংহলে এসে হাজির হোলো। সিংহল থেকে সুমাত্রা ঘুরে—মালয় দ্বীপপুঞ্জের পূর্ব্ব উপকূল দিয়ে চল্‌তে লাগলেন। ৭১ দিনে চীন সমুদ্র পার হোলেন। কিছুদিন চীন দেশে থেকে সোজা চলে এলেন পারস্যে। অলেকজান্দ্রিয় থেকে ১৩৪৯ খৃষ্টাব্দে কাজী আবার গেলেন মক্কায়। সেখান থেকে মরক্কো হয়ে আফ্রিকার নিগ্রোদেশ পর্য্যটন সুরু কর্‌লেন। এরপর ১৩৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইবন্‌বতুতা তাঁর সমস্ত পর্য্যটন শেষ করে ফেজে ফিরে আসেন আর সেখান কার সুলতানের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পর্য্যটনের সামগ্রিক পরিধি হোলো ৭৫ হাজার মাইল। বাঙ্গলা দেশকে কাজী বলেছেন—'জঙ্গলে ঢাকা অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশ। এদেশের সব জিনিষই এত সস্তা যে একটিমাত্র দিনার (সোনার মোহর)-এর বদলে একজন ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসী পাওয়া যায়,—বাংলা দেশেও ইবন বতুতা একমাসের ওপর ছিলেন।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ-কাহিনীর সার-মর্ম্ম :

ব্রেট্ হার্ট

রচিত

দি আউটকাষ্টস্ অফ্ পোকার-ফ্ল্যাট

সৌম্য গুপ্ত

[উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আমেরিকায় যে সব কৃতী-সাহিত্যিক তাঁদের বিচিত্র রচনা-সম্ভারে সারা জগতে যশঃ-খ্যাতি লাভ করেছিলেন, সুবিখ্যাত কথাশিল্পী ব্রেট্ হার্ট তাঁদের অন্যতম। তাঁর গল্প-উপন্যাসগুলি রচনাশৈলীর গুণে সারা পৃথিবীতে আজও সমাদৃত হয়ে আসছে। ব্রেট্ হার্টের জন্ম ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে…আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে। গরীবের ঘরের ছেলে, সেজন্য বাল্যকালে শিক্ষালাভ করবার বিশেষ সুযোগ পাননি। স্কুলের মাষ্টার, ছাপাখানার কম্পোজিটার, এমন কি খনিতে কাজ করেও কোনোমতে জীবিকা অর্জ্জন করেছেন। এমনিভাবে অপরিসীম দুঃখ-দুর্দ্দশা সহ্য করে সামান্য কাজকর্ম্মের অবসরে নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখে ব্রেট্ হার্ট শেষে সাহিত্য-রচনায় মনোনিবেশ করেন। গদ্যে-পদ্যে বহু গ্রন্থ লিখে তিনি ক্রমে যশস্বী হয়ে ওঠেন এবং তেত্রিশ বছর বয়সে একখানি মাসিক-পত্র সম্পাদনে ব্রতী হন। এই মাসিক-পত্রিকা সম্পাদনাকালে ব্রেট্ হার্ট দেশে-বিদেশে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেন। 'দি আউটকাষ্টস্ অফ্ পোকার-ফ্ল্যাট' কাহিনীটি ইংরাজী-সাহিত্যের একটি উৎকৃষ্ট সম্পদ। সুপ্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিক ব্রেট্ হার্ট ১৯০১ সালে পরলোকগমন করেন।]

গিরি-বন-নদীতে ঘেরা সমৃদ্ধ গ্রাম—পোকার-ফ্ল্যাট। গ্রামে হঠাৎ দুর্নীতির প্রসার হতে সমাজপতিরা নির্ম্মমভাবে সে দুর্নীতি-দলনে উদ্যোগী হলেন। সব চেয়ে মারাত্মক যে

দুর্বৃত্ত-অনাচারী; সমাজের বিচারে তার হলো ফাঁসি-কাঠে প্রাণদণ্ড। চোর-জুয়াচোর, জুয়াড়ী, মাতাল, কুচক্রী—কাকেও মাপ করা নয়···সকলের সম্বন্ধে বিহিত শাস্তির ব্যবস্থা হলো!

ওকহার্ষ্ট একজন বিদেশী লোক···এ গ্রামে এসে সে জুয়ার আড্ডা খুলে ছিল···তার আড্ডায় জুয়া খেলায় গ্রামের বহু লোকের প্রচুর ধনক্ষয় হচ্ছিল, ওকহার্ষ্টকে ধরে এনে সাজা দেওয়া হলো—এখনি এ গ্রাম ছেড়ে চলে যাও—ডেরাডাণ্ডা গুটিয়ে! এ গ্রামে যদি পরের দিন তাকে দেখা যায়, তাহলে তাকে ফাঁশি-কাঠে লটকে দেওয়া হবে!

এক বুড়ী ছিল এ গ্রামে—তার নাম সিপটন· সকলে বলতো 'মাদার সিপটন'। বুড়ী ছিল দারুণ কুঁদুলী···কারো ভালো দেখতে পারতো না···সকলের অহিত সাধন করা ছিল তার কাজ। তাকেও হুকুম দেওয়া হলো—চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে গ্রাম ত্যাগ করে চলে যেতে হবে···এ গ্রামে চব্বিশ ঘণ্টার পর তার দেখা পেলে, তাকেও ফাঁশি-কাঠে লটকানো হবে।

পোকার-ফ্ল্যাট গ্রামে ছিল এক তরুণী—গ্রামের লোকজন তার নাম দিয়েছিল—'ডাচেস্'। তরুণীটি লোকের সর্ব্বনাশ করে ফিরতো···তাকেও হুকুমজারি করা হলো—অবিলম্বে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে, নাহলে ঐ ফাঁশি-কাঠের শাস্তি!

আর ছিল গ্রামে এক মাতাল—লোকে তাকে বলতো—বিলি খুড়ো। সে ছিল যেমন নেশাখোর, চুরি-জুয়া-চুরিতেও তেমনি ওস্তাদ। তাকেও হুকুম দেওয়া হলো—চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে গ্রাম থেকে বিদায় হও, নাহলে ফাঁশি-কাঠে ঝুলবে!

নিরুপায়! এখানকার বাস তুলে এরা চারজনে এক-জোট হয়ে পথে বেরুলো। বিলি খুড়ো আর ডাচেস্ চললো ঘোড়ায় চড়ে· ওকহার্ষ্ট আর মাদার সিপটন চললো পায়ে হেঁটে। একজন সমাজপতি চললেন তাদের সঙ্গে—পাশে পাশে ঘোড়ায় চড়ে···হাতে বন্দুক···অনাচারী-চারজনকে তাঁদের গ্রাম থেকে বার করে দেবার জন্য।

গ্রামের প্রান্তে এসে সমাজপতি বললেন—হ্যাঁ, এবার যেখানে খুশী যাও তোমরা···এ পোকার-ফ্ল্যাট গ্রামে আর ফিরবে না···ফিরলে, বুঝেছো তো—ফাঁশি!

এ কথা বলে সমাজপতি ঘোড়া ছুটিয়ে গ্রামে ফিরলেন···ওরা চারজন চললো গ্রাম ত্যাগ করে প্রান্তর পথে!

ধূ-ধূ পথ···কোথায় এর শেষ, কে জানে! সামনে পাহাড়, বন···পাশে পাহাড়, বন, নদী···এ পাহাড়, বন, নদী পার হতে কতদিন লাগবে···আশ্রয় কোথায় মিলবে···খাবারই বা কোথায় মিলবে···কেউ জানে না।

ডাচেস্ বললে—পথে পড়েই মরতে হবে, দেখছি!

বিলি খুড়ো বললে—বাঁচতে চাই···বাঁচতে হবে···যেমন করে পারি, বাঁচবোই!

ওকহার্ষ্ট চুপ করে রইলো। নীরবে সে অনেক সুখ-দুঃখ অম্লান বদনে সহ্য করেছে—কোনো কিছু তার অসহ্য লাগে না।

পাহাড়-পথ উঁচু-নীচু···দু'পাশে বন-জঙ্গল···ক'জনে চলেছে সেই পথে। ডাচেস্ বললে—এর পর কোনো গ্রাম বা শহর মিলবে?

মাদার সিপটন বললে—এর পরে আছে শহর স্যাণ্ডি-বার···কিন্তু সে কি এখানে!···বহু দূরে!

ওকহার্ষ্ট বললে—এই পাহাড়ী-পথ ভেঙে চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে সেখানে পৌঁছুনো···দুঃসাধ্য ব্যাপার।

নিঃশ্বাস ফেলে ডাচেস্ বললে—শরীর আমার এলিয়ে পড়ছে···ঘোড়া থেকে কখন পড়ে মরি বুঝি!

কিন্তু উপায় নেই···দাঁড়িয়ে থাকা চলে না···চলতেই হবে! ক'জনে চলেছে···চলেছে···চলেছে···পাহাড় ঘুরে, নদীর ধার ঘেঁষে, জঙ্গল ভেদ করে···

বেশ খানিকদূর এগুবার পর ডাচেস্ ঘোড়ার পিঠের উপর থেকে মাটিতে গড়িয়ে পড়লো···বললে—তোমরা যাও, যেখানে খুশী! আমার এখানেই কবর!

জায়গাটার চারিদিকে ছোট-বড় পাহাড়ের প্রাচীর···বন-জঙ্গলও আছে···জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই কোথাও।

বিলি খুড়ো বসলো পথের ধারে···বসে মদের বোতল খুললো। ওকহার্ষ্ট গেল নদীতে মুখ-হাত ধুতে! হঠাৎ একদিক থেকে শোনা গেল চলন্ত ঘোড়ার পায়ের শব্দ···সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বর ভেসে এলো—আরে, ওকহার্ষ্ট নাকি?

কে তার নাম ধরে ডাকে? ডাক শুনে ওকহার্ষ্ট চেয়ে দেখে—তার বহুদিনের পরিচিত বন্ধু টম্ সিম্পসন!

ওকহার্ষ্ট শুধোলো—তুমি এখানে হঠাৎ?

সিম্পসন বললে—আমার সঙ্গে আছে পিনে উড্স্… তাকে আমি বিবাহ করবো—তাই চলেছি পোকার-ফ্ল্যাটে।

সিম্পসনের পিছনে ঘোড়ায় চড়ে একটি কিশোরী… কিশোরী বেশ সুন্দরী…তার দিকে চেয়ে সিম্পসন বললে—এই হলো পিনে! যাক্, এতদিন বাদে যখন দেখা হলো, এসো, আজ এখানে সকলে মিলে 'পিক্‌নিক্' করা যাক্।

ওকহার্ষ্ট বললে—কিন্তু আমাদের কাছে খাবার-দাবার কিছু নেই!

সিম্পসন বললে—তাতে কি! আমাদের কাছে খাবার-দাবার যা আছে—অঢেল—সাতদিন আরামসে খাওয়া চলবে!…তাছাড়া আকাশের চেহারা দেখছো…মেঘ যা জমছে…এখনি ঝড় আসবে—সঙ্গে সঙ্গে বরফ পড়া সুরু হবে! একটু আগেই একটা কাঠের ঘর দেখে এসেছি… খালি ঘর—চলো, সেখানে গিয়ে মাথা গোঁজা যাক্! তারপর দুর্য্যোগ কাটলে, আমরা যাবো পোকার-ফ্ল্যাটে—তোমরা যেয়ো যেখানে যেতে চাও!

তাই হলো। পথের ধারে খালি কাঠের ঘরে আশ্রয় এবং চকিতে ভীষণ ঝড় নামলো—যেন পৃথিবীখানাকে উপড়ে ছিঁড়ে ফেলবে!…

এ দুর্য্যোগ চললো সমানে—যেমন ঝড়, তেমনি বরফ পড়া। ঘরের মধ্যে ক'জনে কোনোমতে আশ্রয় নিয়েছে আর সিম্পসনের-আনা খাবার খাওয়া চলেছে…কিন্তু মনে বেশ আতঙ্ক—এ দুর্য্যোগ আরো ক'দিন যদি চলে, তখন বরচাপা পড়ে বেঘোরে প্রাণ হারাতে হবে! সকলে মনমরা…শুধু বিলি খুড়ো হাসছে, গান গাইছে…তার মনে কোনো চিন্তা নেই, ভয় নেই!

ক'দিন কাটলো…তারপর একদিন সকালে ঘুম ভেঙ্গে ওকহার্ষ্ট দেখে বিলি খুড়ো ঘরে নেই। ওকহার্ষ্টের মনে সন্দেহ… বেরিয়ে গিয়ে দেখে—ঘোড়াগুলো নেই। বুঝলো, ঘোড়া চুরি করে বিলি খুড়ো পালিয়েছে। ডাচেস্ আর মাদার সিপটনকে এ খবর জানালেও ওকহার্ষ্ট কিন্তু সিম্পসন আর পিনেকে আসল ব্যাপার খুলে বললো না। ওকহার্ষ্ট তাদের বললে—ঘোড়াগুলো পালিয়েছে…বিলি খুড়ো গেছে ঘোড়াদের খুঁজতে।

বাইরে প্রচণ্ড তুষার-ঝটিকা…সবাই কাঠের ঘরেই পড়ে রইলো। খাবার-দাবার এখনো যা আছে…ডাচেস্ বললে—ভাগ্যে চোর খাবারগুলো নিয়ে যায়নি!

ওকহার্ষ্ট কিন্তু ঘরে রইলো না…সে বললে—আমি বেরুই…আশপাশের বন থেকে জ্বালানি কাঠ জোগাড় করে আনবো…সে কাঠ জ্বালিয়ে এই দারুণ শীতের হাত থেকে বাঁচতে পারবো।

সিম্পসন আর ওকহার্ষ্ট কাঠ কেটে আনে…সে কাঠ জ্বেলে আশ্রয়-কুটিরে আগুন পোহানো হয়…ওদিকে খাবার ক্রমে ফুরিয়ে আসছে!

মাদার সিপটন দিনে দিনে শুকিয়ে যাচ্ছে…ওঠবার ক্ষমতা নেই! পিনেও খুব দুর্বল…উঠতে পারে না। মাদার সিপটন দেখলো…দেখে বললে—কোণে ঐ পুঁটলিতে খাবার রেখেছি…পিনেকে খেতে দাও! ছেলেমানুষ…আহা! ও খাবারটুকু, আমি বাঁচিয়ে রেখেছি এতদিন!

ঘরের কোণে পুঁটলির মধ্যে খাবার…মাদার সিপটন খায়নি…সে খাবার দেওয়া হলো পিনেকে।

বাইরে তখনও বরফ পড়ার বিরাম নেই। শেষে মরিয়া হয়ে ওকহার্ষ্ট বললে সিম্পসনকে—তুমি যাও পোকার-ফ্ল্যাটে…লোকজনকে ডেকো আনো…সাহায্য না পেলে পিনেকে বাঁচাতে পারবো না। এ ঝড় আর বরফ পড়া তো থামছে না!…কোনো চিন্তা করো না…আমি এখানে আছি!

সিম্পসন গেল পোকার-ফ্ল্যাটে…দু'দিন পরে সে ফিরলো সেখান থেকে—লোকজন সঙ্গে নিয়ে! তখনো বরফ পড়ছে চারিদিকে…পথে বরফ জমে আছে।

সিম্পসন এসে দেখে—পিনে আর ডাচেস্ অঘোরে ঘুমোচ্ছে…তাদের জাগাতে গিয়ে দেখে—তাদের দেহে প্রাণ নেই। মাদার সিপটনও মরে পড়ে আছে। ওকহার্ষ্টকে পাওয়া গেল না ঘরের কোথাও!

খুঁজতে খুঁজতে বাইরে বরফে ঢাকা একটা পাইন গাছে ছোরায় গাঁথা একখানা জুয়াখেলার তাস পাওয়া গেল… সে তাসের গায়ে আঁকা-বাঁকা হরফে লেখা রয়েছে—'এই গাছের নীচে পাবে ওকহার্ষ্টের দেহ…ভাগ্যের সঙ্গে জুয়াখেলায় হার মেনে সে অবশেষে আত্মহত্যা করেছে।

বরফ খুঁড়ে খুঁড়ে পাওয়া গেল ওকহাষ্টের প্রাণহীন-দেহ আর তার হাতের পিস্তল! অসহায় সঙ্গীদের কষ্ট-দুর্দ্দশা দেখে মনের দুঃখে নিরুপায় হয়ে অভাগা ওকহাষ্ট শেষে এমনিভাবেই দুনিয়া থেকে চির-বিদায় নিয়েছে।

নির্জ্জন-প্রান্তরে সেই তুষার-স্তূপের মাঝে ওকহাষ্টের প্রাণহীন দেহের পানে তাকিয়ে সিম্পসন আর পোকার-ফ্ল্যাটের লোকজন ম্লানে মনে ভাবলো—গ্রামের সমাজপতিরা যদি এসব অভাগাদের ফাঁসি দিতেন, তাহলে বেচারী পিনেকে হয়তো এমন ভাবে পথে পড়ে বেঘোরে প্রাণ হারাতে হতো না!

—

চিত্রগুপ্ত

এবারে তোমাদের বিজ্ঞানের বিচিত্র-মজার যে খেলার কথা বলছি, সে-খেলাটির নাম—'জল থেকে খড়িমাটি সৃষ্টির ভেল্কী'। বিজ্ঞানের এই অভিনব-খেলার কায়দা-কৌশলটুকু ভালোভাবে রপ্ত করে নিয়ে তোমাদের আত্মীয়-বন্ধুদের সামনে ঠিকমতো দেখাতে পারলে, তাঁদের তোমরা অনায়াসেই তাক লাগিয়ে দিতে সক্ষম হবে।

জল থেকে খড়িমাটি সৃষ্টির ভেল্কী ঃ

তোমরা সকলেই জানো—বাতাসের মধ্যে রয়েছে দু'রকমের 'গ্যাস' (Gas)—'অক্সিজেন' (Oxygen) আর 'নাইট্রোজেন' (Nitrogen)। পৃথিবীর প্রত্যেক প্রাণী—মানুষ আর জীবজন্তু সবাই, প্রতি প্রশ্বাসে বাতাসের সঙ্গে খানিকটা 'অক্সিজেন' গ্রহণ করে এবং প্রতি প্রশ্বাসের সঙ্গে খানিকটা 'কার্ব্বনিক এ্যাসিড' (Carbonic Acid) বাতাসে ছেড়ে দেয়। প্রশ্বাসের সঙ্গে এই যে 'কার্ব্বনিক এ্যাসিড' বাতাসে বেরিয়ে যায়, সেটি সৃষ্ট হয় প্রত্যেক প্রাণীর শরীরের মধ্যেই। অর্থাৎ বিবিধ খাদ্য-সামগ্রীর মধ্যে যে 'অঙ্গার' বা 'কার্ব্বন' (Carbon) থাকে, তারই 'দহন-ক্রিয়ার' ফলে, পৃথিবীর সকল মানুষ আর জীবজন্তুর শরীরে সারাক্ষণই 'উত্তাপ' (Heat) জন্মায়। জীব-শরীরের ভিতরকার এই 'উত্তাপ অঙ্গার' বা 'কার্ব্বনের' সঙ্গে বাইরের বাতাস থেকে সংগৃহীত 'অক্সিজেন' গ্যাসের সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয়—'কার্ব্বনিক এ্যাসিড'। প্রসঙ্গক্রমে, বিজ্ঞান-জগতের আরো একটি বিচিত্র-নিয়মের কথা এখানে তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। তোমরা জানো, বেঁচে থাকার জন্য প্রত্যেকটি প্রাণী যেমন সারাক্ষণই নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বাতাস থেকে প্রয়োজনমতো 'অক্সিজেন' গ্রহণ আর 'কার্ব্বনিক এ্যাসিড' বা 'কার্ব্বন ডায়োক্সাইড' (Carbon Dioxide) ত্যাগ করছে, তেমনি বিশ্বের গাছপালা-উদ্ভিদও তেমনি নিজেদের জীবনধারণ ও পুষ্টিসাধনের উদ্দেশ্যে প্রাণীদের নিঃসৃত সেই 'কার্ব্বন-ডায়োক্সাইড' টেনে নিয়ে, অনবরতই বাতাসে ছড়িয়ে দিয়ে চলেছে আর-পক্ষের একান্ত-আবশ্যক 'অক্সিজেন'। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে পৃথিবীর মানুষ আর জীবজন্তুর জীবনধারণ ও পুষ্টির জন্য যেমন 'অক্সিজেন' দরকার, গাছপালা-উদ্ভিদরাজির জন্য তেমনি চাই 'কার্ব্বন ডায়োক্সাইড' অর্থাৎ একের সঙ্গে অপরটির একেবারে অঙ্গাঙ্গী-সম্পর্ক···জগতে বেঁচে থাকার জন্য সৃষ্টি-প্রহর উভয়েরই উভয়কে একান্ত প্রয়োজন। বিজ্ঞানের বিচিত্র এই তথ্যটুকু সম্বল করেই এবারের আলোচ্য আজব-ভেল্কীর খেলাটি রচিত হয়েছে। এ খেলাটি দেখাতে হলে, যে-সব সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োজন, গোড়াতেই তার একটা ফর্দ্দ দিয়ে রাখি। অর্থাৎ, এ খেলার জন্য দরকার একটি লম্বা কাচের অথবা কোনো ধাতুর তৈরী ফাঁপা নল (Hollow Glass or Metal-made Pipe), খানিকটা 'ক্যালসিয়াম্-পাউডার' (Calcium Powder) বা চূণ, এক পাত্র পরিষ্কার জল আর একটি কাঁচের শিশি কিম্বা গেলাশ।

এ সব সরঞ্জাম জোগাড় হবার পর, খেলা দেখানোর আয়োজন। তবে তার আগে, 'ক্যালসিয়াম্' বা 'চূণের'

বৈজ্ঞানিক-ক্রিয়া-কলাপ সম্বন্ধে দু'একটা **দরকারী কথা** বলে রাখা দরকার। তোমাদের মধ্যে যারা স্কুল-কলেজে বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রী, তারা হয়তো জানো যে **'ক্যালসিয়ামের'** সঙ্গে 'অক্সিজেনের' ছোঁয়াচ লাগলে **'চুন'** তৈরী হয়। এই 'চুনের' সঙ্গে যদি 'কার্বনিক এসিডের' ছোঁয়াচ লাগে, তাহলে সৃষ্টি হয়—'খড়িমাটি' বা 'চক' (Chalk)। 'চুন' সহজেই জলে মিশে যায় এবং 'চুনের জল' হয় রঙ-হীন, স্বচ্ছ-নির্মল, পরিষ্কার—কোথাও এতটুকু ঘোলাটে-চিহ্ন থাকে না সে-জলের উপরভাগে। কিন্তু 'চক' বা 'খড়িমাটি'-গোলা জল এমন স্বচ্ছ-নির্মল হয় না...পরিষ্কার-জলে খড়ির গুঁড়ো মেশালেই, সে জল ঘোলাটে দেখায়। তাছাড়া চুনের মতো খড়ির গুঁড়ো জলে মিশে যায় না... সবটুকুই জলের পাত্রের তলায় থিতিয়ে পড়ে থাকে—আদৌ গোলা যায় না। খেলা দেখানোর আয়োজনকালে, এ কথাটি বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার।
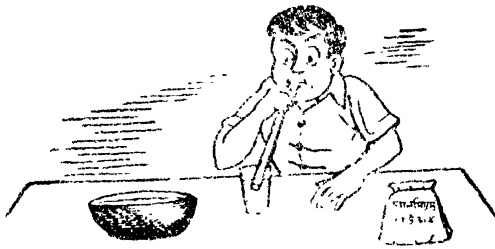
এবারে খেলাটি দেখানোর কলা-কৌশলের কথা বলি। প্রথমেই দর্শকদের সামনে একটা টেবিলের উপরে খেলার সাজ-সরঞ্জামগুলিকে পরিপাটিভাবে সাজিয়ে রেখে পরিষ্কার জল-ভরা পাত্রের মধ্যে 'ক্যালসিয়াম-পাউডার' বা 'চুনটুকু' ঢেলে দাও। 'চুন' ভালোভাবে জলে মিশে যাবার পর উপরের ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনিভাবে ঐ ফাঁপা-নলের একটি প্রান্ত 'ক্যালসিয়াম্' বা চুন-মেশানো পাত্রের জলে ডুবিয়ে, নলের অন্য প্রান্তে মুখ দিয়ে, খুব সন্তর্পণে এবং চুনের পাত্রের উপরভাগের স্বচ্ছ-নির্মল রঙ-বিহীন জলটুকু শুষে টেনে নিয়ে খালি শিশি অথবা গেলাশের ভিতরে রাখো। এমনিভাবে পাত্রের ভিতর থেকে চুনের জলটুকু কাঁচের শিশি বা গেলাশের মধ্যে স্থানান্তরিত করে নেবার পর, ঐ ফাঁপা নলটিকে পুনরায় স্বচ্ছ-নির্মল বিশুদ্ধ 'চুনের জল'-পূর্ণ শিশি বা গেলাশের মধ্যে ডুবিয়ে, সেই জলে নিশ্বাসের ফুঁ-দিতে থাকো। তাহলেই দেখবে, ঐ শিশি বা গেলাশের ভিতরকার 'চুন' বা 'ক্যালসিয়াম্' মেশানো পরিষ্কার জলটুকু ক্রমশঃ 'কার্বনিক-এ্যাসিডের ছোঁয়াচ লেগে 'খড়িমাটিতে' রূপান্তরিত হয়ে ঘোলাটে ও শাদা-রঙের দেখাবে। তবে কিছুক্ষণ ফুঁ দেওয়া বন্ধ রেখে এই ঘোলাটে জলটুকু যদি থিতুতে দেওয়া যায়, তাহলে দেখবে—শিশি বা গেলাশের উপরভাগের জল আর চুনের জল নেই, এবং জলপাত্রের তলদেশে জমে রয়েছে খড়ির গুঁড়ো। এমনিভাবেই নির্মল-স্বচ্ছ 'চুনের জলে' বিজ্ঞানের বিচিত্র উপায়ে 'খড়িমাটি' সৃষ্টি করা সম্ভব। এ খেলাটি যদি আরো বেশী মজাদার ও চমকপ্রদ করে তুলতে চাও, তাহলে অবশ্য, দর্শকদের সামনে জলের পাত্রে 'চুন' বা 'ক্যালসিয়াম' না মিশিয়ে, সে কাজটুকু ভেল্কীর খেলা দেখানোর আগেই সেরে রেখো নেপথ্যে—সকলের অলক্ষ্যে! এই হলো এবারের মজার খেলাটির আসল রহস্য।

এমনটি কেন হয় সে কথা জানিয়ে আজকের মতো আলোচনা শেষ করি। শিশি বা গেলাশের মধ্যে 'ক্যালসিয়াম' বা চুন-মেশানো পরিষ্কার জলে নলের সাহায্যে প্রশ্বাসের ফুঁ দেবার সঙ্গে সঙ্গে 'কার্বনিক গ্যাস' প্রয়োগ করা হলো। তার ফলে, চুনের জলটুকু 'কার্বনিক এ্যাসিড' বা 'কার্বন ডায়োক্সাইডের সংস্পর্শে এসে ক্রমে 'চক' বা খড়িমাটিতে রূপান্তরিত হলো। আগেই বলেছি, 'চক' বা 'খড়িমাটি' জলে গোলা যায় না। সুতরাং খড়িমাটির শাদা গুঁড়ো সৃষ্টি হয়ে জলে ভেসে বেড়ানোর ফলে, স্বচ্ছ-নির্মল চুনের জলটুকু ক্রমশঃ ঘোলাটে ও শাদা-রঙের হয়ে উঠলো। তবে এ জলে তখন আর 'চুন' বা 'ক্যালসিয়াম' নেই, তার বদলে সৃষ্টি হয়েছে 'চক' বা 'খড়িমাটির গুঁড়ো'!

এখন তোমরা নিজেরা হাতে-কলমে পরখ করে দ্যাখো—বিজ্ঞানের বিচিত্র-মজার এই অভিনব খেলাটি!

ধাঁধা আর হেঁয়ালি

মনোহর মৈত্র

১। বিন্দু আর সরলরেখার

আজব হেঁয়ালি ঃ
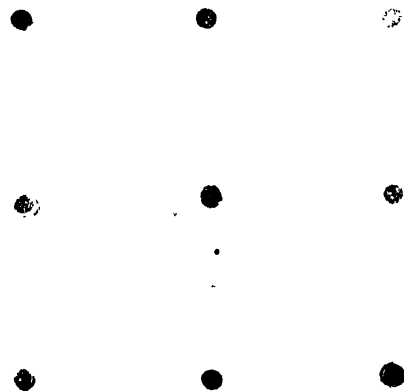
উপরের ছবিতে পর-পর তিন-লাইনে চৌকোণা (Square) ছাঁদে সাজানো রয়েছে, মোট নয়টি বিন্দু (Dots)। এই নয়টি বিন্দুর যে কোনো প্রান্ত থেকে পর-পর তিনটি করে বিন্দু ছুঁয়ে পেন্সিলের সাহায্যে এমন কৌশলে লম্বালম্বি, আড়াআড়ি এবং কোণাকুনিভাবে চারটি মাত্র সরল রেখা (Straight Lines) টেনে এমন কায়দায় নক্সা আঁকো যাতে ঐ নয়টি বিন্দুর প্রত্যেকটির সঙ্গে কোনো-না-কোনো সরল রেখার যোগসূত্র বজায় থাকে—অর্থাৎ একটি বিন্দুও যেন না কোনো সরল রেখার সংস্পর্শের বাইরে বাদ পড়ে থাকে। তবে মনে রেখো, প্রথম বিন্দু থেকে সুরু করে শেষ বা নবম বিন্দুটি পর্য্যন্ত আগাগোড়া কাগজের উপর থেকে পেন্সিলটিকে একবারও না উঠিয়ে নিয়ে বরাবর এক-টানাভাবে কাজ চালিয়ে এই সরল রেখা চারটিকে এঁকে ফেলতে হবে। এ সব নিয়ম মেনে যদি এই আজব হেঁয়ালির সঠিক সমাধান করতে পারো তো বুঝবো—তোমরা বুদ্ধিতে সত্যই খুব বাহাদুর হয়ে উঠেছো।

২। 'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা ঃ

দোলের দিন দিদি আমায় মিষ্টি কিনে খেতে কিছু পয়সা দিলে। মিষ্টি কিনতে গিয়ে রাস্তায় ক'জন ভিখারীকে দেখে ইচ্ছা হলো—পয়সাগুলো ওদের দিয়ে দিই। পয়সা ওদেরই বেশী প্রয়োজন। কিন্তু ওদের পয়সা দিতে গিয়ে এক সমস্যায় পড়লুম। ওদের সবাইকে যদি একটা করে পয়সা দিই, তাহলে আমার কাছে একটা পয়সা বাড়তি থেকে যায়। আর ওদের প্রত্যেককে যদি দুটো করে পয়সা দিই, তাহলে একজন ভিখারী কিছুই পায় না। তোমরা বল দেখি, পরে মোট ক'জন ভিখারী আর আমার কাছে কতগুলো পয়সা ছিল ?

রচনা : রামহরি চট্টোপাধ্যায় (নবদ্বীপ)

৩। বিশ্ব-প্রসিদ্ধ নাম ··
অতি সুন্দর ধাম,
প্রথমার্দ্ধে মাথায় যায়,
দ্বিতীয়ার্দ্ধে থাকা যায়।

রচনা : মণীনাথ মুখোপাধ্যায় (গিরিডি)

বৈশাখ মাসের 'ধাঁধা আর হেঁয়ালির' উত্তর ঃ

১। ছাঁটা-ছবির আজব-হেঁয়ালি ঃ

পাশের ছবিটি দেখলেই বুঝতে পারবে আমাদের চিত্র-শিল্পী-মশাইয়ের আঁকা তোমাদের বিশেষ পরিচিত অতি-সাধারণ পাখীর ছবিটি আসলে ছিল একটি মোরগের চেহারা। অর্থাৎ এলোমেলোভাবে-ছাঁটা ছবির ছয়টি টুকরো

ঠিকমতো সাজাতে পারলে উপরের ঐ মোরগের চেহারা দেখতে পাবে।

'কিশোর-জগতের সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধার উত্তর ঃ

২। কবুলা

গত মাসের সব ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে

অনুরাগ, ইলা, পরাগময়, বিরাগময়, সুরাগময়, ধীরাগময়, সিপ্রাধারা ও মণিমালা হাজরা (বড়বড়িয়া, মেদিনীপুর); আলো, শীলা ও রঞ্জিত বিশ্বাস (কাশীপুর, কলিকাতা); চিন্ময়, গোকুল, প্রদ্যোৎ ও বিদ্যুৎ মিত্র (জয়নগর, মজিলপুর); বাপ্পা ও পম্পা সেন (কলিকাতা); সুলেখা, শ্রীলেখা ও জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় (শ্যামনগর, ২৪ পরগণা); জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় (বালুরঘাট)।

গতমাসের একটী ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ

সুব্রতকুমার পাকড়াশী (কলিকাতা); শত্রাজিৎ দাশ (কলিকাতা); দীপ্তি, স্বপ্ন, প্রতিমা, জয়শ্রী, শীলা, নীলা, দিব্যেন্দু, বিশ্বাস, নীতা, মঞ্জুলিকা, শ্যামলী, ভারতী (?); অরিন্দম, সুপ্রিয়া ও অলকানন্দা দাস (কৃষ্ণনগর); দীপঙ্কর ও তীর্থঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (মেদিনীপুর); গৌতম, সুজাতা, পুরবী ও অমিতাভ কোঙার (বাতানল, হুগলী); সুধীরা, সুনীতি ও জয়ন্তী (মেদিনীপুর); সুমন্ত, সুশান্ত, সুকান্ত ও বনানী সিংহ (গয়া); রবীন্দ্রনাথ দিন্দা, হেমন্ত জানা (শিউলীপুর, মেদিনীপুর); গৌতম, কল্পনা, অশোক, নীতা, মঞ্জু, রূপশ্রী, নন্দিতা পূর্ণেন্দু ও আভা (কলিকাতা); রণজিৎ, কৃষ্ণা, অমিতাভ, স্বপন, কাবেরী ও বাবুল ঘটক (বাঁশদ্রোণী); তপতী, করবী, তাপসী, পাপা, বুবু, শুক্লা, রমা, নীলু, অনিতা ও শ্বেতা (গিরিডি); মণীন্দ্র, রবীন্দ্র ও রেবা মুখোপাধ্যায় (গিরিডি); সিদ্ধার্থশঙ্কর ঘোষ (কলিকাতা)।

আজব দুনিয়া

জীবজন্তুর কথা

দেবশর্ম্মা বিচিত্রিত

রক্তচোষা বাদুড়: এরা বিচিত্র একধরনের নিশাচর জীব - চামচিকার জাতভাই তবে আকারে বড় এবং স্বভাবটিও হিংস্র। এরা নানা রকম ক্ষুদ্রকায় জীবের রক্ত-মাংস খেয়ে জীবনধারণ করে। ভারতবর্ষে আর দক্ষিণ-আমেরিকায় এদের দর্শন মেলে। আমেরিকার রক্তপায়ী 'ভ্যাম্পায়ার' বাদুড়েরা ভারতীয় বাদুড়ের চেয়ে আকারেও বড় এবং স্বভাবেও আরো বেশী ভয়ঙ্কর। আমেরিকার রক্তচোষা-বাদুড়েরা গরু, ঘোড়া, এমন কি মানুষের রক্তপান করে। শোনা যায়, এ সব ভয়ানক বাদুড় নাকি ঘুমন্ত জীব-জন্তু দেহে তীক্ষ্ণ দাঁত দিয়ে ছ্যাঁদা করে রক্ত চুষে খায়...এমনই নিপুণ কৌশলে, যে ঘুমন্ত প্রাণীরা একটুকু টের পায় না এদের দংশন! এরা রাতের অন্ধকারে শীকার-অন্বেষণে চারিদিকে ঘুরে বেড়ায় আর দিনের বেলা গাছের ডালে আশ্রয় নেয়।

বহুবাহু-তারামাছ: এরা অভিনব এক-ধরণের সামুদ্রিক জীব – তারামাছের বংশের প্রাণী। ডাঙার বুকে শেয়াল শকুনি, কাক আর কুকুর যেমন পচা-আবর্জ্জনা থেকে সুরু করে যাবতীয় খাবার খেয়ে বেড়ায়, এ সব বিচিত্র জীবও তেমনি সব-কিছু খায় ও সমুদ্রকে সর্ব্বদা আবর্জ্জনামুক্ত করে রাখে। এজন্য সমুদ্রের ছোট-ছোট জীব, এ সব 'তারামাছকে' খুবই ভয় করে চলে। তারামাছ নানা রকমের – তবে এই জাতের তারামাছের দেহ নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত ...এদের মূল-দেহকাণ্ড থেকে একরাশ বাহু-উপবাহু বেরিয়ে থাকে – দেখলে মনে হয় যেন একটি বিচিত্র 'লতা' বা 'সমুদ্রের শ্যাওলা-ঝাঁঝি। এই সব বাহু মেলে এরা সাগরের বুকে ভেসে-চলে বেড়ায় এবং শ্যাওলা-ঝাঁঝির গায়ে জড়িয়ে থাকে। তাছাড়া ছোট মাছ বা অন্যান্য সামুদ্রিক-জীব দেখলেই এরা এদের এই সব বাহু-উপবাহু প্রসারিত করে পরমানন্দে শীকার ধরে খায়। এদের মুখটি থাকে ঐ গোল দেহ-কাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে। এদের বাহুগুলি সাপের মতো লম্বা এবং নমনীয়-পেলব ছাঁদের।

গেলাডা-বেবুন: এরা বিচিত্র এক-জাতের বেবুন – বাস আফ্রিকার আবিসানিয়া প্রদেশে আর আরব দেশের পাহাড়ী-জঙ্গলে। এরা আকারে প্রায় তিন হাত দীর্ঘ হয় এবং এদের মাথার দু পাশে, পিঠে আর গলায় কেশরের মতো বড়-বড় লোম থাকে। ল্যাজের ডগাটিও কেশ ঘন লোমে ভরা। যেমন বিকট এদের চেহারা, তেমনি কড়া-মেজাজ... একবার ক্ষেপে গেলে আর রক্ষা নেই, বনের বাঘ-সিংহকেও পরোয়া করে না। এরা সাধারণতঃ দল বেঁধে বাস করে এবং বনের ফলমূল খেয়ে জীবন কাটায়। তবে ফলমূলের অভাবে পোকামাকড়, গিরগিটি, টিকটিকি, পাখীর ডিম আর কাঁকড়া-বিছে খেতেও এদের আপত্তি নেই। এরা খুবই চালাক-চতুর জীব...দল বেঁধে বাঁদরামী করে বেড়ায়। বিপদ দেখলেই অদ্ভুত সাঙ্কেতিক শব্দ করে।

সংস্কৃত নাটক ও ভারতীয় সংস্কৃতি

শ্রীমতী দীপ্তি চট্টোপাধ্যায়

পৃথিবীর সব সাহিত্যেই নাটকের স্থান অতি উচ্চে। কারণ নাটকের মাধ্যমে সাক্ষাত্তাবে যে শিক্ষা ও আনন্দ একাধারে লাভ করা যায়, তা' অন্য কোনও উপায়ে দুর্লভ। সেজন্য আমাদের দেশে আদর্শমূলক ও ধর্ম্মমূলক নাটকের সম্মান চিরকাল। তবে সংস্কৃত সাহিত্যে চৈতন্য যুগের ২১৪টী নাটক ছাড়া ধর্ম্মমূলক বা আদর্শমূলক সংস্কৃত নাটক নেই বল্লেই চলে।

সেজন্য আমাদের পক্ষে বিশেষ আনন্দের বিষয় এই যে কলিকাতার সুবিখ্যাত গবেষণাগার প্রাচ্যবাণী মন্দির সম্প্রতি ধর্ম্মমূলক ও আদর্শমূলক নাটক মঞ্চস্থ করে সংস্কৃত শিক্ষার সংপ্রসারণে ব্রতী হয়েছেন। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিতপ্রবর ডক্টর যতীন্দ্রবিমল ও ডক্টর রমা চৌধুরী —এঁদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক বহু-কালের। এঁদের প্রতিষ্ঠিত প্রাচ্য-বাণী মন্দিরের সংস্কৃত—পালি নাট্য সম্প্রদায় ভারতের বহু স্থানে এবং ভারতের বাহিরেও একসঙ্গে সংস্কৃত প্রচার ও আধ্যাত্মিক ভাবধারার প্রসারে ব্রতী হয়ে সকলের অশেষ ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। আমার সৌভাগ্য হয়েছে এঁদের সঙ্গে বহু স্থানে যাবার এবং সর্ব্বস্থানেই আমরা দেখেছি, কি বিপুল আগ্রহে এই নব-নাট্য-আন্দোলনকে দেশবাসী ও বিদেশীয়েরা অভিনন্দিত করেছেন। বিগত ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর থেকে ৭২ সালের এপ্রিলের মধ্যে মাদ্রাজে সর্ব্ব-ভারতীয় বৈষ্ণব সম্মেলনে, পন্ডি-চেরীস্থ শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে সর্ব্বভারতীয় শ্রীঅরবিন্দ সঙ্ঘ সম্মেলনে; বৃন্দাবনস্থ ইউনেস্কো ও কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত

ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ্‌, ডাঃ চৌধুরীর সংস্কৃত নাটকাবলীর উচ্চমান ও বর্ত্তমান কালোপযোগিতা বিষয়ে ভাষণ দিতেছেন।

নিখিল বিশ্বের পণ্ডিতমণ্ডলীর সাংস্কৃতিক সম্মেলনে, মায়াপুরস্থ শ্রীশ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মোৎসবে, এতদ্ভিন্ন হাওড়ায় দুইবার, কলিকাতা বেদান্ত মঠে একবার, দক্ষিণেশ্বর ইণ্টার-ন্যাশন্যাল গেষ্ট হাউজে একবার, বরাহনগরে ভোলানন্দগিরির মঠে একবার এবং প্রাচ্যবাণী মন্দিরের বার্ষিক অধিবেশনে একবার—আরো ছয়বার বিশেষ কৃতিত্বের সহিত প্রাচ্য-বাণী মন্দির সংস্কৃত নাটকের অভিনয় করেছেন। অভিনীত হয়েছে সর্ব্বত্র ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বিরচিত বহু-অভিনীত সুবিখ্যাত সংস্কৃত নাটক "ভক্তি বিষ্ণুপ্রিয়ম্" "শক্তি-সারদম্", "মহাপ্রভু হরিদাসম্" এবং শ্রীরামানুজ বিষয়ক "বিমল যতীন্দ্রম্" প্রভৃতি।

ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ্‌কে ভারত সরকারের মন্ত্রিবর্গের সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়া নাটক দর্শনে রত দেখা যাইতেছে। ডাঃ রাধাকৃষ্ণের ডানদিকে ডক্টর চৌধুরীকে দেখা যাইতেছে। সর্বপ্রথমে উপবিষ্ট শ্রীবিষ্ণুহরি ডালমিয়া।

আমাদের সর্ব্বশেষ সফর হলো—ভারতের কেন্দ্রস্থল নয়াদিল্লীতে। নয়াদিল্লীর ইণ্টারন্যাশন্যাল একাডেমী অব ইণ্ডিয়ান কালচার এবং রামায়ণ বিদ্যাপীঠের সাদর আমন্ত্রণে বিশ জনের বিরাট এক দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আমরা দিল্লীতে গিয়েছিলাম ইষ্টারের বন্ধে। আমাদের অন্যান্য ভ্রমণের মত এবারের ভ্রমণের সুদীর্ঘ পথটীও যেন নিমিষেই কেটে গেল আনন্দ-কোলাহলে। তারপর দিল্লীতে পা দেওয়ার মুহূর্ত্ত থেকেই স্নেহ, ভালবাসা, আদর-আপ্যায়নের স্রোতে আমরা যে ভাবে প্লাবিত হলাম—তা' সত্যই কোনও প্রকারে ভুলবার নয়। ষ্টেশনে অভ্যর্থনার জন্য সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত জে, ডালমিয়া, ডক্টর রঘুবীর এবং বহু উচ্চপদস্থ সুধীব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন এবং আমাদের ২০ জনের প্রত্যেকের গলায় তাঁদের অশেষ স্নেহের নিদর্শনস্বরূপ ঝুললো প্রকাণ্ড মোটা মোটা ফুলের মালা। সেই মালার সৌরভেই আমাদের দিল্লী প্রবাসের স্বল্প দুটী দিন আমোদিত হয়ে রইল।

বিষ্ণুপ্রিয়া নাটকে নবদ্বীপে বিষ্ণুপ্রিয়া মহাপ্রভুর পাদুকা গ্রহণ করেন। মহাপ্রভু—শ্রীসুনীল দাস। বিষ্ণুপ্রিয়া—শ্রীমতী মধুশ্রী রায়।

আমাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হলো সুবিখ্যাত বিড়লা মন্দির ধর্ম্মশালায়। এঁদের অতুলনীয় ব্যবস্থা সত্যই চমক-প্রদ। আমাদের নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল ইণ্টারন্যাশন্যাল কাউন্সিল অব ওয়ার্লড এফেয়ারসের রঙ্গমঞ্চ সুবিখ্যাত সাপ্রু হাউসে। অতি অপূর্ব্ব এই প্রেক্ষাগার। এটি

একাউষ্টিক এবং এয়ার কনডিশনড। প্রায় সাত শত লোকের জায়গা ছিল এবং অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে—এই নাটকগুলি দেখবার জন্য পর পর দুই দিনই প্রভূত জনসমাগম হয় এবং অনেকেই প্রবেশাধিকার না পেয়ে ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে ফিরে যান। সংস্কৃত নাটকের অভিনয় দর্শনের জন্য দিল্লী নগরীতে এতটা উৎসাহ আমরা একেবারেই আশা করিনি।'

প্রথম দিন ২১শে এপ্রিল শনিবার সন্ধ্যা ছয়টা থেকে রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত বেদান্তাচার্য্য শ্রীরামানুজের পুণ্য জীবনী অবলম্বনে ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বিরচিত "বিমল-যতীন্দ্রম্" অতি সুন্দর ভাবে অভিনীত হয়। এই নাটকের
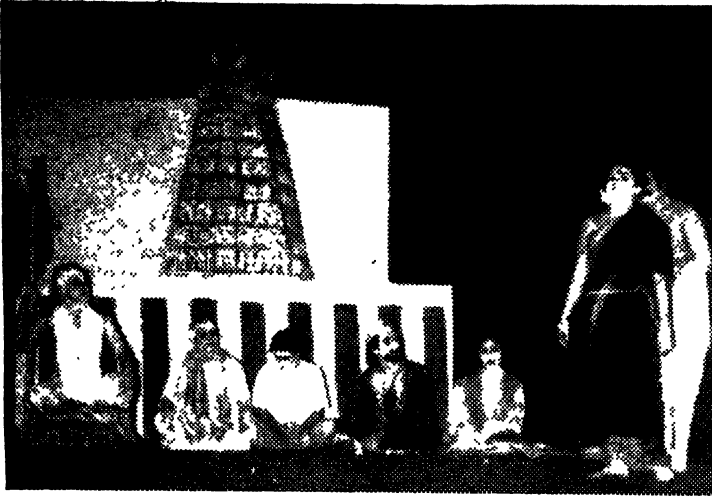
"বিমলযতীন্দ্রম্" নাটকের শেষ দৃশ্যে রামানুজ শিষ্য ও শিষ্যাবৃন্দকে উপদেশ দিচ্ছেন।

অভিনয় ইতঃপূর্ব্বে মাদ্রাজে সর্ব্বভারতীয় বৈষ্ণব সম্মেলন এবং বৃন্দাবনে ইউনেস্কো—ভারত সরকারের নিখিল বিশ্ব-আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলনে বিশেষ প্রশংসা লাভ করে। অত্যন্ত গৌরবের বিষয় যে দিল্লীতেও এই নাটকটী বিশেষ সমাদৃত হয়। সেই দিন প্রধান অতিথি ছিলেন সুবিখ্যাত মনীষী শ্রীকাকা সাহেব কালেলকার এবং সুপ্রসিদ্ধা সাধিকা রাহেনা বহেন তায়েবজী। অভিনয় দর্শনান্তে শ্রীযুক্ত কাকা সাহেব ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর সংস্কৃত রচনা-শৈলীর, ভাষার মাধুর্য্য এবং সাবলীলতার উদাত্ত প্রশংসা করেন। বহেন তায়েবজীও এত অভিভূত হয়েছিলেন যে তিনি আমাদের প্রত্যেককে জড়িয়ে জড়িয়ে আদর করলেন এবং অশ্রু-বিপ্লাবিত চক্ষে গদগদ কণ্ঠে নাটকের ভাষা মাধুর্য্য, ভক্তিরস এবং অভিনয়ের উচ্চমানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। অন্যান্য কত লোক যে এই ভাবে উদাত্ত প্রশংসা করেছেন আমাদের হাত ধরে, তার ইয়ত্তা নাই। সকলেই এক বাক্যে বল্‌লেন যে সংস্কৃত অভিনয় যে এত সহজবোধ্য, এত সুমধুর, এত প্রাণস্পর্শী হতে পারে, তা' কল্পনার অতীত ছিল।

সভার প্রারম্ভে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের রীডার ডাঃ জোশী, সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত শিক্ষা-বিশারদ ডাঃ রঘুবীর, প্রভৃতি সুধীবর্গ—দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, ইণ্টারন্যাশন্যাল একাডেমি অব কালচার প্রমুখ বহু সুবিখ্যাত শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সংস্থার পক্ষ থেকে ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরীকে অভিনন্দন ও মাল্যদান করেন।

সত্যই শ্রীভগবানের কৃপায় প্রথম দিনের অনুষ্ঠান সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়েছিল এবং প্রেক্ষাগৃহে তিলধারণের স্থান ছিল না। সকলেই শেষ পর্য্যন্ত অতি নীরবে উপবিষ্ট ছিলেন এবং একটী ভাবগম্ভীর, ভক্তিপূত পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। আবার বলছি, এতটা সমাদর আমাদের কল্পনার অতীত ছিল।

দ্বি তী য় দি নে—বা ই শে এপ্রিল রবিবার একই স্থানে মহাপ্রভুর জীবন-সঙ্গিনী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার জীবনচরিত অবলম্বনে ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বিরচিত সুবিখ্যাত ও বহু-অভিনীত "ভক্তি-বিষ্ণুপ্রিয়ম্" নামক সংস্কৃত নাটক অতি সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়। সুবিখ্যাত দার্শনিক ও উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ প্রায় একঘণ্টা উপস্থিত ছিলেন। তিনি অভিনয় দর্শনে অত্যধিক প্রীত ও অভিভূত হন। তিনি ডক্টর চৌধুরী দম্পতিকে পৃথকভাবে অভিনন্দিত করেন এবং যাবার আগে ষ্টেজে দাঁড়িয়ে নাটকের সরল মধুর ভাষা, ভক্তিঘন ভাবধারা, মধুর সঙ্গীত এবং অভিনয়ের উচ্চমানের বিষয়ে বহুল প্রশংসা করেন। তিনি বলেন যে বর্ত্তমান যুগে এরূপ সরল সহজ সংস্কৃত নাটকের প্রয়োজন সমধিক। এতে একাধারে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রচার এবং ভক্তিধর্ম্মের প্রসার অনিবার্য্য।

তিনি আরো বললেন—নেপালের মহারাজার জন্ম তাঁকে তাড়াতাড়ি যেতে হচ্ছে; না হলে শেষ পর্য্যন্ত থেকে তিনি দেখে যেতেন।

এইদিন শিক্ষা দফ্তর, অর্থ দফ্তর, সাংস্কৃতিক দফ্তর প্রমুখ বহু বিভিন্ন দফ্তরের সেক্রেটারী, জয়েণ্ট সেক্রেটারী প্রভৃতি বহু উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী সান্নুগ্রহে উপস্থিত ছিলেন। তা'ছাড়া বিভিন্ন কলেজের ও বিশ্ববিস্তালয়ের অধ্যাপকমণ্ডলী, সাধু-সন্ন্যাসিমণ্ডলী, রাজনীতিবিদ্ প্রভৃতির সমাগম হয়েছিল। তাঁরা সকলেই নাট্যাভিনয়ের অত্যুচ্চ প্রশংসা করেন। সভান্তে চৌধুরী দম্পতীকে সুবিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দেবেশ দাশ অভিনন্দিত করে উচ্ছ্বসিত ভাবে বলেন যে, বর্ত্তমান যুগে ডাঃ চৌধুরীর নাটকগুলি কালিদাসের নাটকের অপেক্ষাও সমধিক প্রয়োজন। কারণ এই নাটকগুলি এত সুন্দর, সাবলীল, মধুর, সহজ সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত যে, ভারতের এবং ভারতের বাহিরেও এগুলি অভিনীত হলে সকলেরই সহজবোধ্য হবে এবং সেই সঙ্গে ভারতের শাশ্বত সংস্কৃতিরও প্রচার হবে। সভাস্থ সকলেই একযোগে তাঁর এই কথায় করতালিযোগে হর্ষপ্রকাশ করেন।

রামানুজ নাটকের শেষের দিকের দৃশ্যে কুরেশের ভূমিকায় শ্রীঅনিন্দ্যসুন্দর চট্টোপাধ্যায় এবং চোলরাজের ভূমিকায় শ্রীমিহির চট্টোপাধ্যায়কে দেখা যাইতেছে।

অতি-অপূর্ব্ব আমাদের অভিজ্ঞতা। শ্রীযুক্ত দেবেশ দাশ এবং অন্যান্য সকলে এও বললেন যে—প্রাচ্যবাণীর এই অভিনয় বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল করেছে। সত্যই এরূপ অপূর্ব্ব সার্থকতা মহাপ্রভু ও জননী বিষ্ণুপ্রিয়ার আশীর্ব্বাদের ফল।

আর একটী অতি আনন্দের বিষয় এই যে, দিল্লীর ইংরাজী এবং হিন্দী সমস্ত পত্রিকা আমাদের এই অনুষ্ঠান দুটীর উদাত্ত প্রশংসা করেছেন এবং বহু ছবি প্রকাশিত করেছেন। যেমন দিল্লীর শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র ষ্টেটসম্যানের বিশিষ্ট পৃষ্ঠায় ২৩শে এপ্রিল, ১৯৬২ তারিখে নাট্য সমালোচক (Drama critic) বলছেন—

"This play (Bhakti Visnupriyam) in its best moments, opened windows in the ski and quite flew out of the picture-frame stage

Of the players, Visnupriya was a sensitiv portrayal. We liked Advaitacharya's vigorousl expressed humanism and Nyayachanchu an Tadrahuccha's equally vigorous requery. Bu there was no hurdy-gurdy of conflict in th play. Not the dust of plans, the fever o social wel fare. Only in the midst of fluency a curiosity stilled world, an ecstatic world It was as though one came suddenly upon a mountain stream ; chill-blue and clear and found oneself thirsty."

এইভাবে Indian Express, Sunday Standard, হিন্দী হিন্দুস্থান, নবভারত প্রভৃতি সংবাদপত্রে সাংবাদিকেরা আমাদের অনুষ্ঠানের উদাত্ত জয়গান করেছেন।

আনন্দের পসরা এখানে শেষ হয়নি। আরেক আনন্দের বিষয়ও আছে। সেটি হল দিল্লীস্থ অল ইণ্ডিয়া রেডিওর সমাদর ও সহযোগিতা। তাঁরা আমাদের অভিনয়গুলির অংশবিশেষ রেকর্ড করে নেন এবং বিগত ২৪শে এপ্রিল ৮॥টায় ন্যাশনাল প্রোগ্রামে "ভক্তি-বিষ্ণুপ্রিয়ম্"এর কিছু অংশ প্রচারিত করেন।

অভিনয়াংশে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন রামানুজও মহাপ্রভুর ভূমিকায় শ্রীসুনীল দাস এবং বিষ্ণুপ্রিয়ার ভূমিকায় শ্রীমতী মধুশ্রী রায়। তাঁহাদের অপূর্ব্ব উচ্চারণ এবং ভাবগম্ভীর অভিনয় সকলেরই মনোহরণ করে। অন্যান্য পুরুষের ভূমিকায় ছিলেন শ্রীমৃত্যুঞ্জয় মিশ্র, শ্রীযুক্ত মিহির চট্টোপাধ্যায়, শ্রীদিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকানাই ভট্টাচার্য্য, শ্রীশিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীঅনিন্দ্যসুন্দর চট্টোপাধ্যায় এবং নারীদের ভূমিকায় অধ্যাপিকা শ্রীমতী শান্তি চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীমতী উর্মি চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীগৌরীকেদার ভট্টাচার্য্য ও পূর্ণেন্দু রায়। তবলা সঙ্গত করেন শ্রীকালিদাস চক্রবর্তী। মঞ্চ পরিচালনা করেন শ্রীঅনাথশরণ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ।

প্রাচ্যবাণীর সংস্কৃত-পালি নাট্যসঙ্ঘ

স্বপ্নের মত দুটি দিন কেটে গেল। বিদায়ের ক্ষণে অশ্রুসজল চক্ষে প্রায় সমগ্র দিল্লী নগরী যেন ভেঙ্গে এল ষ্টেশনে। আমাদের প্রত্যেকের গলায় আবার ঝুল্‌লো স্নেহসিক্ত মোটা মোটা অনেক মালা। ঝুড়ি ঝুড়ি খাবার, পুষ্পকোপহার প্রভৃতিতে আমাদের কম্পার্টমেণ্ট ভরে গেল। সহাস্যবদন মল্লিকপুরের শ্রীযুক্ত সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে দেখে পুরানো বন্ধুদর্শনে আমরা পরম উৎফুল্ল হলাম। সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবার আমাদের ভাষা নেই। শ্রীযুক্ত জয়দয়াল ডালমিয়ার নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ-যোগ্য। তা'ছাড়া শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর বিড়লা, ডক্টর রঘুবীর, শ্রীযুক্ত রামভক্ত কপীন্দ্র, শ্রীযশঃপাল জৈন, শ্রীযুক্ত প্রভুদত্ত শাস্ত্রীজি, কালীবাড়ীর সেক্রেটারী শ্রীচন্দ্রকুমার দত্ত ও পণ্ডিতপ্রবর শ্রীগুরুপদ স্মৃতিতীর্থ, সুবিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দেবেশ দাশ, অল ইণ্ডিয়া রেডিও'র দিল্লী-ডাই-রেক্টার ডাঃ মারহাটে, ড্রামা ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত চিরঞ্জীব, মিউজিক ডেপুটী ডাইরেক্টার শ্রীযুক্ত সুরেশ চক্রবর্ত্তী, অর্থ সচিব শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দম, সেণ্ট্রাল সংস্কৃত বোর্ডের সেক্রেটারী ডাঃ রামকরণ শর্মা, শ্রীযুক্ত মন্মথরঞ্জন চৌধুরী, শ্রীবেঙ্কটেশন, ডাঃ সারদা দেবী, বৃন্দাবন বিড়লা মন্দিরের শ্রীযুক্ত শর্মাজী, দিল্লীস্থ বিড়লা মন্দিরের অন্যান্য কর্মচারী, অল ইণ্ডিয়া রেডিও'র ডিরেক্টর-জেনারেল ডাঃ ভাট, সাপ্রু হাউজের কর্ত্তৃপক্ষ এবং কর্মচারিবৃন্দ প্রভৃতির নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতার অবধি নাই।

আর সকলের উপরে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের পরম প্রিয় ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী ও ডাঃ রমা চৌধুরীকে, যাঁরা তাঁদের সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছেন সংস্কৃত সাহিত্য, ভারতীয় ধর্ম্মদর্শন প্রচারের জন্য। তারা যেভাবে ভারতে ও ভারতের বাহিরেও ভারতের শাশ্বত সংস্কৃতির দীপশিখা বহন করে যাচ্ছেন—তাতে যে ভারতের অনুপম দিব্য আলোক সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁরা আমার আজন্ম বন্ধু। তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আমার হয়ত সাজে না। তবে এই কথাই বলি—শ্রীভগবান্‌ তাঁদের মঙ্গল করুন। মঙ্গল করুন—প্রাচ্যবাণীর সেবকবৃন্দ ও সেবিকাবৃন্দের—যাঁরা এইভাবে ভারতের শাশ্বত আদর্শ প্রচারে ব্রতী হয়েছেন।

প্রথম যুগের বাংলা উপন্যাস

নিরুপমা বন্দ্যোপাধ্যা

সাহিত্যের প্রথম প্রকাশ পদ্যে, গদ্য এলো তার অনেক পরে, বাস্তব প্রয়োজনের খাতিরে। পৃথিবীর সমস্ত দেশের প্রাচীন সাহিত্যেই পদ্যের মাধ্যমে গল্প রচনার প্রচেষ্টা দেখতে পাওয়া যায়। ইংরাজী 'ব্যালাড' ও ভারতের 'গাথা' কাব্যের মধ্যে সুন্দর সুন্দর কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায়। সাহিত্যে গদ্যের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে গল্প-কাহিনী পূর্ণরূপ লাভ করে; কিন্তু জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতি একটা বিশেষ স্তরে না পৌঁছানো পর্যন্ত সে জাতির সাহিত্যে উপন্যাস রচিত হয় না। বাংলা সাহিত্য কাব্যআখ্যায়িকায় যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল; উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বাংলা গদ্যের সৃষ্টি হ'ল, কিছু গল্প, উপকথা, নক্সাও রচিত হ'ল, কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাবে বাংলার শিক্ষিত সমাজ যতদিন সংস্কৃতির সেই বিশেষ স্তরে উন্নীত হয়নি, ততদিন উপন্যাসেরও সৃষ্টি হয়নি। উপন্যাস আধুনিক যুগের সৃষ্টি; সাহিত্য প্রাচীনতা থেকে মুক্ত না হ'লে উপন্যাসের সৃষ্টি সম্ভব হয় না।

বাংলা উপন্যাসের প্রকৃত জন্মদাতা সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রকেই বলা হয়ে থাকে। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'র আত্মপ্রকাশ বাংলা সাহিত্যের একটি স্মরণীয় ঘটনা একথাও সত্য। কিন্তু নবজাত বাংলা গদ্যে দুর্গেশনন্দিনীর মত একটি সর্বাঙ্গসুন্দর উপন্যাসের রচনা কি করে সম্ভব হ'ল এবং বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাসই কি উপায়ে একেবারে পরিণত রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলো, একথাটা চিন্তা করে দেখলে আমরা তাদের সন্ধান পাবো —যাঁরা বাংলা উপন্যাসের ভিত্তি গড়ে তুলেছিলেন। বাংলা উপন্যাসের সুন্দর, সুগঠিত, কারুকার্যময় রূপ দেখে আজ আমরা গর্ব বোধ করি, কিন্তু এর মাটির তলায় ভিতটিকে যাঁরা সুদৃঢ় করে গড়েছিলেন তাঁদের কথা আজ আর আমরা স্মরণ করি না। সাহিত্যের ইতিহাসের পাতায়ও এঁরা সকলে নিজের যোগ্য স্থান লাভ করতে পারেন নি।

বঙ্কিমপূর্ব বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস-রচয়িতাদের মধ্যে একজন মাত্র সমালোচকদের স্বীকৃতি লাভ করেছেন এবং পাঠকদের কাছেও কিছুটা পরিচিত হয়েছেন, তিনি 'আলালের ঘরের দুলাল' এর লেখক 'টেকচাঁদ ঠাকুর' বা প্যারীচাঁদ মিত্র। সে যুগে প্রচলিত বিদ্যাসাগরী সাধুভাষার রীতি সম্পূর্ণ বর্জন করে প্যারীচাঁদ কথ্যভাষায় এই গ্রন্থটি রচনা করেন। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু মূলতঃ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নব বাবু বিলাস' নামে নক্সা থেকে গৃহীত হ'লেও ভাষার নূতনত্ব, সমসাময়িক কলিকাতার সমাজ জীবনের বাস্তবচিত্র, 'বক্‌চাচা'র মত অবিস্মরণীয় চরিত্রচিত্রণ প্রভৃতি গুণে এই গ্রন্থটি সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস বলে স্বীকৃতি লাভ করে। কিন্তু একটু বিচার দেখলেই বোঝা যাবে যে 'আলালের ঘরের দুলাল' সম্পূর্ণাঙ্গ উ' নয়। কাহিনী একটি আছে, কিন্তু তার বিশেষ কোন গুরুত্ব নেই তা সুসংবদ্ধও নয়। বিচ্ছিন্ন সামাজিক চিত্র এবং বিচিত্র চরি যথাযথ বর্ণনা দেওয়াই লেখকের উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয়। ব্যঙ্গ রচিত কয়েকটি নক্সা ও চরিত্রের সমষ্টি ছাড়া 'আলাল'কে আর বলা যায় না, পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস তো কোন মতেই বলা চলে না। ন মতিলালের চরিত্রে কোন অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই, কাহিনীর শেষে তার পরি অত্যন্ত আকস্মিক এবং তাও হল বাইরের ঘটনার চাপে, কোন মান বিবর্তনের ফলে নয়। পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে, বিশেষতঃ বঙ্কিমচ উপন্যাসে 'আলালে'র বিশেষ কোন প্রভাবই দেখতে পাওয়া যায় একমাত্র ভাষার ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্র 'বিদ্যাসাগরী, ও 'আলালী' ভা মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন এই কথা বলা হয়ে থাকে। 'আলালী ভা কথাটি পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিষ প্রস্তাব' এ টেকচাঁদ ঠাকুরের ভাষা সম্বন্ধে প্রথম ব্যবহার করেন। তি এই ভাষা সম্বন্ধে বলেছেন, "পত্নী বা পাঁচজন বয়স্যের সহিত পাঠ করি আমোদ করিতে পারি, কিন্তু পিতাপুত্রে একত্রে বসিয়া অসঙ্কুচিত হ কথনই পড়িতে পারি না। বর্ণনীয় বিষয়ের লজ্জাজনকতা উহা পড়ি না পারিবার কারণ নহে, ঐ ভাষার কেমন একরূপ ভঙ্গী আছে যা গুরুজন সমক্ষে উচ্চারণ করিতে লজ্জাবোধ হয়।" তাঁহার মতে, "হা পরিহাসাদি লঘুবিষয়ের বর্ণনায় আলালী ভাষা মনোহারিণী, কে গুরুতর বিষয়ের জন্য এই ভাষা উপযোগী নহে।" বঙ্কিমচন্দ্র নিজে 'আলালী' ভাষায় বিশুদ্ধির অভাব লক্ষ্য করেছেন এবং উন্নত ভাবস প্রকাশের অনুপযোগী বলে মনে করেছেন। 'দুর্গেশনন্দিনী'র ভাষা সঙ্গে 'আলালী' ভাষার তুলনা করলে দেখা যাবে—এই দুইখানি গ্রন্থে ভাষায় কোনই মিল নেই।

বাংলা সাহিত্যে প্রথম উপন্যাস জাতীয় সামাজিক কাহিনী রচ করেন শ্রীমতী ম্যালেন্স। তাঁর রচিত 'ফুলমনি ও করুণার বিবর একটি উদ্দেশ্যমূলক কাহিনী। খ্রীষ্টধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করাই এ গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য। শ্রীমতী ম্যালেন্স ইংরাজ রমণী, বাঙালীদের মধে খ্রীষ্টধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য তিনি অতি সহজ ও সরল বাংলা এই পুস্তক রচনা করেন। 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত হ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে, তারও পাঁচ বছর আগে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমতী ম্যালেন্স যে সরল বাংলাভাষায় এই গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন তা আজ তেমনি সরল বলে মনে হবে, কোথাও দুর্বোধ্য ঠেকবে না। কিন্তু

'আলাল' এর ভাষা ফারসী শব্দের বাহুল্যে আজ আর সরল নেই, বহুস্থানেই দুর্বোধ্য।

ফুলমনি ও তার পরিবার আদর্শ খ্রীষ্টান পরিবার। লেখিকা ফুলমনির বাড়ীর বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখছেন :

"তাহার চতুর্দ্দিকের বেড়া নুতন দরমা ও নুতন বাঁশ দিয়া বাঁধা ছিল এবং তদুপরি একটি সুন্দর ঝিঙালতা উঠিয়াছিল। উঠানের একপাশে গরুর একখানি ঘর দেখা গেল, তাহার মধ্যে একটি গাভী ও একটি বৎস ধীরে ধীরে জাওনা খাইতেছে। গোশালার ছাতের উপরে অনেক পাকা লাউ দেখিলাম।"

এ ভাষা একেবারে খাঁটি বাংলা—সংস্কৃত বা ফারসীর বাহুল্য নেই, আলালী ভাষার মত লজ্জাকর অশালীনতাও নেই। তবে লেখিকা যেখানে বাইবেলের অনুবাদ করেছেন সেখানে ভাষায় ইংরাজী বাক্য গঠনরীতি দেখতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের চরিত্রচিত্রণে লেখিকার কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। সবকটি চরিত্রই লেখিকা নিপুণতার সঙ্গে এঁকেছেন, তবে করুণার বিচিত্র অঙ্কনেই লেখিকা বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। করুণা প্রথমে 'অলস, কর্ত্তব্যবিমুখ, কলহপরায়ণ ও মিথ্যাবাদী' ছিল ; ফুলমণি ও লেখিকার সংস্পর্শে এসে তার চরিত্রের পরিবর্তন হ'ল এবং সে ফুলমণির মতন আদর্শ খ্রীষ্টান রমণীতে পরিণত হ'ল। করুণার চরিত্রকে লেখিকা যেভাবে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত করে তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতির পথে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তা বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। 'আলাল'এর নায়ক মতিলালের মত করুণার পরিবর্তনে কোন আকস্মিকতা নেই।

লেখিকার বাস্তবচিত্র অঙ্কনের শক্তিও অসাধারণ। তাঁর লেখনী আমাদের মনকে মুহূর্তের মধ্যে সে যুগের একটি বাঙালী খ্রীষ্টান সমাজের একেবারে মাঝখানে নিয়ে উপস্থিত করে। এই উপাখ্যানটিতে বাস্তবধর্মী সামাজিক উপন্যাসের প্রায় সব লক্ষণই বিদ্যমান। কিন্তু কতগুলি কারণে এই গ্রন্থটি শিক্ষিত বাঙালী সমাজের কাছে অপাংক্তেয় হয়ে ছিল। প্রথম এবং প্রধান কারণ এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। লেখিকা নিজেই এই গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেছেন :

It is a book specially intended for Native Christian women ; I have endeavoured to show in it practical influence of Christianity on the various details to domestic life.

গ্রন্থটির স্থানে স্থানে হিন্দুদেবদেবীর প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা হয়েছে। বাঙালী খ্রীষ্টানরা যাতে হিন্দু দেবদেবীর নামে নিজেদের পুত্র কন্যাদের নাম না রাখে সেজন্য গ্রন্থের শেষে একটি নামের তালিকাও দেওয়া হয়েছে। এ সম্বন্ধে লেখিকা লিখছেন। "খ্রীষ্টাশ্রিত লোকেরা ঐ সকলকে (হিন্দু দেবদেবীকে) মিথ্যা ও পাপিষ্ঠ জানে, অতএব তাহাদের নাম ঘৃণাপূর্বক ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।" এই ধরণের হিন্দুবিদ্বেষ ও খ্রীষ্টধর্মের মাহাত্ম্য বর্ণনার জন্য সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য সমালোচকেরা এই গ্রন্থটির সমাদর ও প্রচারের বিরোধী ছিলেন। এজন্য বাংলা সাহিত্যের এইরূপ একটি মূল্যবান গ্রন্থ বহুদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে আত্মগোপন করেছিল। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি এই গ্রন্থটি পুনরুদ্ধার করে প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে এটিই বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস। বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে 'ফুলমনি ও করুণার বিবরণ'এর একটি স্থান আছে একথা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু এই গ্রন্থটিকে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসও বলা চলে না। এর প্রধান কারণ কাহিনীটি লেখিকা ডায়েরীর মত করে লিখেছেন এবং সুসংবদ্ধ কাহিনীর চেয়ে লেখিকার প্রতিদিনের দেখা বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলির প্রাধান্যই বেশী। চরিত্রচিত্রণ সে যুগের পক্ষে প্রশংসনীয় হলেও ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত এবং চরিত্রের দ্বন্দ্ব পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের উপযুক্ত নয়। তথাপি ধর্ম-বিদ্বেষের কথা ভুলে গিয়ে আজ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই গ্রন্থটির উপযুক্ত স্থান নির্দেশ করতে কার্পণ্য করা উচিত নয়।

প্রথমযুগের যে উপন্যাসটির প্রভাব পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে বিশেষতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে সবচেয়ে বেশী করে পড়েছে, সে গ্রন্থটিকে তার পূর্ণমূল্য আমরা আজও দিইনি। ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে আমরা জানি পারিবারিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ, আচার প্রবন্ধ প্রভৃতির রচয়িতা হিসাবে। বর্তমান যুগে যৌথ পরিবার ভেঙ্গে গেছে, সামাজিক আচার নিয়মও গেছে বদলে, তাই ভূদেবের খ্যাতিও আজ ম্লান। ঔপন্যাসিক ভূদেব প্রাবন্ধিক ভূদেবের খ্যাতির আড়ালে ঢাকা পড়ে গিয়েছিলেন ; আজ তাঁকে সেই আড়াল থেকে বাইরে এনে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করা খুবই কঠিন কাজ। অধ্যাপক কনক বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূদেব চৌধুরী প্রভৃতি কয়েকজন এ বিষয়ে সচেষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু রক্ষণশীল সাহিত্যসমালোচকেরা ভূদেবের উপন্যাসটিকে তার পূর্ণ মর্যাদা দিতে তখনও রাজি ন'ন।

'আলালের ঘরের দুলাল' যে বৎসর প্রকাশিত হয়, সেই বৎসরই অর্থাৎ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' গ্রন্থটিও প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটির দুটি ভাগ, একটির নাম 'সফল স্বপ্ন'—অন্যটির নাম 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'। এই 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' যে বাংলা সাহিত্যে প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস এ বিষয়ে মতদ্বৈধের কোন অবকাশ নেই। 'সফল স্বপ্ন' একটি ছোটগল্পের মত কাহিনী, কিন্তু 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' আকারে খুব বৃহৎ না হলেও পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের সমস্ত লক্ষণই এতে বিশেষভাবে পরিস্ফুট। কাজেই একে প্রথম বাংলা উপন্যাস বললেও অত্যুক্তি হয় না। 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'এর কাহিনী মুখ্যতঃ কন্টারের 'রোমান্স অব্ হিষ্টরি-ইণ্ডিয়া'র অন্তর্গত 'দি মারহাট্টা চীফ, অবলম্বনে রচনা করা হয়েছে। কিন্তু মৃতিকর যেমন খড়ের কাঠামোর উপর মাটি, রং আর বিচিত্র সাজপোষাক দিয়ে অপূর্ব সুন্দর মূর্তি গড়ে তোলে, ভূদেব তেমনি কল্পনা ও মননশক্তির সাহায্যে এক আশ্চর্য সুন্দর উপন্যাস গড়ে তুলেছেন। ঔরঙ্গজেব-কন্যা রোশিনারা মারাঠা-বীর শিবাজীর হাতে বন্দী হ'ন এবং কিছুদিনের মধ্যে উভয়ে পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হ'ন। কিন্তু ঘটনার বিপর্যয়ে তাঁদের মিলন ব্যাহত হ'ল। প্রেমাস্পদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় রোশিনারা নিজেকে চির-

জীবন প্রিয়মিলন থেকে বঞ্চিত করে রাখলেন। শুধু দু'জনের দুটি অঙ্গুরী পরস্পরের স্মৃতিচিহ্ন হয়ে রইল। ঐতিহাসিক পটভূমিকায় এই সামান্য একটি কাহিনীর মাধ্যমে লেখক নরনারীর প্রেম-ভালবাসা, বিরহ-মিলন, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব এবং সর্বোপরি রোমান্সের যে আবেগ ফুটিয়ে তুলেছেন তা বাংলা সাহিত্যে অভিনব। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে এ জাতীয় রোমান্স রচনায় আর কেহই সাহসী হ'ন নি। 'আলালের ঘরের দুলাল' এ উপন্যাসের এই বিশিষ্ট লক্ষণটির অভাব দেখতে পাওয়া যায়। 'আলালে'-এ লাম্পট্য আছে, কিন্তু প্রেম নেই। এই গ্রন্থে দেখি শিবজীর হাতে বন্দী রোশিনারা তাঁকে শত্রু বলেই মনে করছেন, কিন্তু দিনে দিনে শিবজীর বীরত্ব, মহত্ব, দেশপ্রেম, নারীজাতির সম্মান রক্ষা প্রভৃতি সদ্গুণের পরিচয় পেয়ে তাঁর প্রতি অনুরক্ত হ'লেন এবং শিবজীর আদর্শকেই নিজের আদর্শ বলে গ্রহণ করলেন। এই আদর্শ রোশিনারাকে এতদূর প্রভাবিত করেছিল যে বাদশাহদুহিতা দিল্লীতে ফিরে গিয়েও সমস্ত বিলাসিতা বর্জন করেছিলেন। তিনি শিবজীর জীবন থেকে এই শিক্ষাই পেয়েছিলেন—'পরমেশ্বর মনুষ্য জীবন কেবল হাসিয়া খেলিয়া আমোদ প্রমোদ কাটাইবার জন্য সৃষ্ট করেন নাই।...জগতে এমত পদার্থও আছে যাহার জন্য জীবন এবং জীবনের সমুদয় সুখ পরিত্যজ্য হইতে পারে।' একদিকে শিবজীর প্রতি অনুরাগ, অন্যদিকে পিতা ঔরঙ্গজেবের অত্যাচার, মাঝখানে রোশিনারা অসহায়, নিরুপায় ও অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত। রোশিনারা চরিত্রের ক্রমবিকাশ এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব লেখক অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন।

ভূদেবের অঙ্কিত শিবজী চরিত্রেও এইরূপ একটি মহৎ উপন্যাসের নায়কের উপযুক্ত। শৌর্যে, বীর্যে, মহত্বে, দেশপ্রেমে, কর্তব্যপরায়ণতায় শিবজী বাংলা সাহিত্যের বীরনায়কদের পূর্বপুরুষ। পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে ভূদেবের এই উপন্যাসটির প্রভাব অপরিসীম। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' স্কটের 'আইভ্যান হো'র আদর্শে রচিত কিনা তা নিয়ে আমাদের বাক্‌বিতণ্ডার অন্ত নেই। অথচ ভূদেবের এই উপন্যাসটির সঙ্গে 'দুর্গেশনন্দিনী'র যে কতদিকে মিল আছে সে কথা কেউ বিচার করে দেখেননি। রোশিনারার মত আয়েষাও জগৎসিংহের শত্রুকন্যা এবং তাঁরই মত আহত শত্রুর সেবা করতে এসে আয়েষার মনে প্রণয়-সঞ্চার হয়। শিবাজীচরিত্রের কিছু প্রভাব জগৎসিংহের উপর থাকলেও দুটি চরিত্রের মধ্যে অনেক পার্থক্যও আছে। কিন্তু আয়েষা যেন রোশিনারারই প্রতিমূর্তি। রূপে গুণে অতুলনীয়, বীরত্ব ও কোমলতার সমন্বয়ে মনোহারিণী, সর্বোপরি প্রেমাস্পদের মঙ্গলের জন্য আত্মসুখ-বিসর্জনে মহীয়সী—রোশিনারা এবং আয়েষা ভারতের আদর্শ নারী-চরিত্রের দুটি সার্থক রূপায়ণ।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সমস্ত ঐতিহাসিক উপন্যাসে যে 'গুরুদেব' চরিত্রটি নিরন্তর আদেশ, উপদেশ ও পরামর্শ দিয়ে নায়কের মঙ্গল সাধন করেছেন, তার পূর্বরূপ দেখি শিবাজীর গুরু রামদাস স্বামীর মধ্যে।

ভাষার দিক থেকে বিচার করলেও 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'এর ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গীর সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার মিল দেখা যায়। এই গ্রন্থটির ভাষায় আভিধানিক শব্দের দু'একটি প্রয়োগ থাকলেও তা সুখপাঠ্য, আজ একশ বছর পরেও কোথাও কিছু দুর্বোধ্য বলে মনে হয় না। ভাষার গাম্ভীর্য, ওজস্বিতা ও প্রসাদগুণ বার বার বঙ্কিমচন্দ্রকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। কাহিনীর সুরুতে লেখক একটি বর্ণনা দিয়েছেন—তার সঙ্গে 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রারম্ভিক বর্ণনার ভাষার খুবই মিল আছে। বর্ণনাটি এইরূপ :

পর্বতসকল মানচিত্রে দেখিলে যেরূপ প্রাচীরবৎ সমান উচ্চ বোধ হয়, বাস্তবিক সেরূপ নহে। তাহাদিগের মধ্যে মধ্যে ছেদ থাকে, এবং সেই দ্বার অবলম্বন করিয়াই নির্ঝরিণী সমস্ত নির্গত হয়।...... একদা তত্রত্য উপত্যকা বিশেষে বহুসংখ্যক ব্যক্তি—কেহ বা পাদচারে, কেহ বা অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গমন করিতেছিল। চতুর্দ্দিকস্থ পর্ব্বতীয় শিলাসকল উদ্ভিদসম্বন্ধ রহিত হওয়াতে দিবাভাগে অত্যন্ত উত্তপ্ত হয় বলিয়া তাহারা সুস্নিগ্ধ সমীরণবাহী সন্ধ্যাকালের প্রতীক্ষায় ছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ সূর্যাস্ত না হইতে হইতেই উদগ্র গিরিশিখর-ছায়ায় সেই কুটিল পথ একেবারে অন্ধতমসাবৃত হইতে লাগিল।

উপরের আলোচনা থেকে একথাটা আশা করি বেশ স্পষ্ট হয়েছে যে 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'ই সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ বাংলা উপন্যাস। 'ভূদেব রচন-সম্ভার'এর ভূমিকায় অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী বলেছেন, "বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে ইহার অসীম মূল্য বলিয়া আমার ধারণা।" কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, এই গ্রন্থটির যথার্থ মূল্য দিতে অনেক সমালোচকই এখনও কুণ্ঠা বোধ করেন।

বঙ্কিমপূর্ব আর একখানি গ্রন্থের কথা না বললে এ আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা' গ্রন্থে লিখেছেন, "শ্রীযুক্ত প্যারীচাঁদ মিত্র বাঙ্গালা উপন্যাসের সৃষ্টিকর্ত্তা, কিন্তু তাহা হাস্যরসের উপন্যাস। পাইকপাড়ার রাজাদিগের সম্পর্কীয় গোপীমোহন ঘোষ প্রকৃত বাঙ্গালা উপন্যাসের সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহার লেখনী হইতে প্রথম বাঙ্গালা উপন্যাস বিনিসৃত হয়, সেই প্রথম উপন্যাসের নাম 'বিজয়বল্লভ'। কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাসের সৃষ্টিকর্ত্তা আমাদের পরম বিজ্ঞান্বিত শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়।

রাজনারায়ণ বসু যে গ্রন্থটিকে 'প্রকৃত' প্রথম উপন্যাস বলে অভিহিত করেছেন তার প্রথম প্রকাশ হয় ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে। বিজ্ঞাপনে (ভূমিকা) গ্রন্থকার লিখেছেন :

ইংলণ্ডীয় ভাষায় 'নবল' নামে মনোহর প্রসিদ্ধ উপাখ্যান গ্রন্থ সকল যে প্রণালীতে সঙ্কলিত হইয়া থাকে সেই প্রণালী অনুসারে এই পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে ; কিন্তু আমার এই উদ্যম সম্পূর্ণরূপে সফল হইবার কোন সম্ভাবনা বোধ হইতেছে না। যেহেতু ইউরোপীয় লোকদিগের কার্য্যসকল যেরূপ অদ্ভুত ও চমৎকারজনক, ভারতবর্ষীয় লোকদিগের প্রায় সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং এতদ্দেশীয়

লোকের উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় ইংরাজী নবলের স্থায় প্রবন্ধ রচনা করা সুকঠিন।

লেখক এই 'সুকঠিন কাজেই' হস্তক্ষেপ করেছিলেন এবং ব্যর্থ যে হননি তার প্রমাণ বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের পরেও ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। একটি প্রচলিত রূপকথাকে অবলম্বন করে কাহিনী রচনা করলেও লেখকের যে আধুনিক উপন্যাস রচনাই উদ্দেশ্য ছিল তার প্রমাণ বিজ্ঞাপনেই আছে। বিজয়বল্লভ অযোধ্যার রাজপুত্র, কিন্তু সৎমায়ের চক্রান্তে জন্মক্ষণেই সে নদীতে বিসর্জিত হয় এবং এক জেলের দয়ায় রক্ষা পায়। পরে মগধের রাজকন্যা চম্পকলতাকে সে এক বাঘের হাত থেকে রক্ষা করে এবং নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে নায়কনায়িকা পরস্পর মিলিত হয়। সুসংবদ্ধ কাহিনী, বিচিত্র চরিত্র ও ঘটনার সমাবেশ, নায়কনায়িকার প্রেমের ক্রমপরিণতি প্রথম যুগের এই বাংলা উপন্যাসটিকে বৈশিষ্ট্য দান করেছে। এই উপন্যাসটিতে সংস্কৃত উপাখ্যানের প্রভাবও বিশেষ ভাবেই দেখা যায়। বিজয়বল্লভ ও রাজকন্যার প্রথম সাক্ষাতের পর রাজকন্যা 'দৈহিক অবসন্নতার ছলে এক একবার দণ্ডায়মানা হইয়া পশ্চাতে বিজয়বল্লভের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে করিতে অন্তঃপুরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।' এই দৃশ্যটি কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'এর দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার প্রথম সাক্ষাতের দৃশ্যকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

'বিজয়বল্লভ'এর ভাষাতেও ফারসী বা ইংরাজীর অনুসরণ নেই, ভাষা সম্পূর্ণ সংস্কৃত প্রভাবিত। রাজবাড়ীর বাগানে রাজকুমারীকে বিজয়বল্লভ যখন প্রথম দেখলেন তখন তাঁর মনের ভাব বর্ণনায় লেখক বলছেন:

"শরৎকালের পূর্ণ শশধর যেমন বিরলপত্র বিটপের অন্তরাল হইতে অলৌকিক মাধুর্য্য বিস্তারপূর্ব্বক জনসমূহের নয়নানন্দ বর্দ্ধন করে, সেই প্রকার বৃক্ষ শাখার অভ্যন্তরে রাজকন্যার মুখচন্দ্রমণ্ডলের শোভা বিজয়বল্লভের দৃষ্টিপথে আবিভূত হইয়া তাঁহাকে নিতান্ত বিমোহিত করিল।"

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় এই গ্রন্থটির কিছু কিছু প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। রাজবাড়ী ও তার চারিদিকের বাগান 'কৃষ্ণকান্তের উইল'এর বারুণিপুকুরের সংলগ্ন বাগানের বর্ণনা স্মরণ করিয়ে দেয়। বিন্ধ্যাচল বাসী তান্ত্রিককে আমরা কপালকুণ্ডলার কাপালিকের মধ্যে নতুনরূপে দেখতে পাই। বিজয়বল্লভের স্বপ্ন আর কুন্দনন্দিনীর স্বপ্ন এক না হলেও এই দুইএর মধ্যে সাদৃশ্য আছে। সাহিত্য হিসাবে এই উপন্যাসটি 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'এর মত অতটা সার্থক না হলেও এর ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়—১৮৮১ সালের পর এই গ্রন্থটির আর বোধহয় পুনর্মুদ্রণ হয়নি। এই গ্রন্থটি এখন দুষ্প্রাপ্য। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে যে কপিটি আছে তার প্রথম দিকের পাতাগুলি ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে গেছে, শেষের দিকের পাতাগুলিও আর বেশীদিন পাঠ্য থাকবে না। অতি সত্বর এই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থটির পুনর্মুদ্রণ না হলে পরবর্তী কালের অনুসন্ধিৎসু পাঠকের পক্ষে এই গ্রন্থটি সংগ্রহ করা অসম্ভব হ'য়ে উঠবে। এ বিষয়ে অগ্রণী হলে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের পূর্বে যে কয়টি বাংলা উপন্যাস বৈশিষ্ট্যের দাবী নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল তাদের মধ্যে অন্যসব কয়টিকে বাদ দিয়ে একমাত্র 'আলালের ঘরের দুলাল'কে প্রথম বাংলা উপন্যাস বলে স্বীকার করা এবং একমাত্র সম্মানের আসন দেওয়া বোধহয় সমীচীন নয়। 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' এবং 'বিজয়বল্লভ'-এর বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে যথার্থ স্থান নির্দেশ করা প্রয়োজন, কিন্তু 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'কে প্রথম বাংলা উপন্যাসের সম্মান দেওয়া এবং বাংলা উপন্যাসের রচনার ক্ষেত্রে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের বিশিষ্ট দান স্বীকার করা কর্তব্য বলে মনে করি।

আশ্রয়

বীরু চট্টোপাধ্যায়

হোক না নির্জন দ্বীপ, হে নাবিক তবু তো আশ্রয়,
নোনা জল, নোনা মৃত্যু থেকে তুমি হয়েছ নির্ভয়।
নারিকেল কুঞ্জে কুঞ্জে মিঠে মিঠে বাতাসেরা দোলে।
ওদিকে তো ঢেউএ ঢেউএ শ্বেত-জিহ্ব
ক্রুদ্ধ ফণা তোলে।

ঝরণার মিঠে জল, আর কিছু মিঠে ফল, আর কিবা চাই।
নিশ্চিত মরণের, মিছে প্রাণ হরণের ভয় সে তো নাই।
একদিন দেখা দেবে, কাছে এসে তুলে নেবে
তোমার জাহাজ।
ততকাল থাক হেথা সারা দেহ ঘিরে করি বন্যতার সাজ।

জীবন চাকায় তখন ও এখন

শ্রীনাথ

অন্ধকারের মধ্যে জ্বলছে জোনাকী ; সৃষ্টি করছে ক্ষণিক আলোর। একটা, দুটো, তিনটে গুণবার চেষ্টা করছে সৌরিশ—বিছানায় শুয়ে। জানলাটা রয়েছে খোলা। মিউনিসিপ্যালিটির আলো নেই রাস্তাটায়, বদলে আছে ছোট ছোট ঝাঁকড়া গাছের জঙ্গল, আর আছে সৌরিশের ঘরের পাশেই অনেক দিনের পুরান একটা তেঁতুল গাছ। ঘন অন্ধকার ওই তেঁতুল গাছটাকে রয়েছে ঘিরে। মেঘহীন-আকাশ, ছত্রাকারে ছিটিয়ে রয়েছে নক্ষত্র। তা-ও সৌরিশের নজরে আসে খোলা জানলাটার মধ্যে দিয়ে। চোখে ঘুম নেই। মনে হচ্ছে ওই তেঁতুল গাছটাকে ঘিরে যে অন্ধকার নেচে বেড়াচ্ছে সেই অন্ধকারই সৌরিশের জীবনে নাচতে চলেছে আগামী কাল থেকেই। উপায় কি? অসহায় চোখে চায় সৌরিশ এ পাশ থেকে ও পাশে। সরে আসে দৃষ্টিটা জানলাটার পাশ থেকে। ঘরে জ্বলছে মৃদু ভাবে হ্যারিকেনটা। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সব, বালিখসা দেওয়াল। রংহীন আড়া বরগা দাঁত বের করে হাসছে, ভেংচাচ্ছে মুখ। শ্রীহীন ঘর, এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে রয়েছে জিনিষ-পত্র। দুটো ভাঙ্গা বাক্সও রয়েছে। ঘরের মাঝখানে এসেই থেমে গেল দৃষ্টি। অ-কাতরে ঘুমুচ্ছে—সরোজিনী। আর সরোজিনীকে দুহাতে আঁকড়ে রয়েছে তারই পনেরো বছরের ছেলে সুধীর। ব্যথায় টন্ টন্ করে উঠল বুকটা সৌরিশের। কোন রকমে ঠেলে আনা সংসারটাকে এবার থামাতে হবে—হবেই। ক্ষীণ আলোর একটুকরো রশ্মি খেলা করে বেড়াচ্ছে সুধীরের মুখে। দুঃখ হয় ছেলেটার জন্যে। কেন, কেন ও হলো? কেন জীবনটাকে দুর্বিসহ করে তুললো সৌরিশের। একটা নিঃশ্বাস পড়ল। আবার দৃষ্টিটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে এলো, ফেললো জানলাটার উপর। কেমন ঝাপসা হয়ে আসছে চোখ দুটো। অব্যক্ত বেদনায় হৃদয়টা উঠছে ককিয়ে। গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়ছে ব্যথার টুকরো। শরীরটা কেমন ঝিমিয়ে আসছে—।

ডিষ্ট্রিক্ট-জজ্ প্রণব রায়ের পা-দুটো জড়িয়ে যখন কেঁদে উঠেছিল সৌরিশ, তখন কি এক অজানা আক্রোশে প্রণব রায়ের চোখ দুটো উঠেছিল জ্বলে। বিরক্তি-ভরা কণ্ঠে বলে উঠেছিলেন, "বলেছি তো—আমার দ্বারা সম্ভব নয়"।

"হুজুর, না খেতে পেয়ে মরে যাব"। ডুকরে উঠেছিলো সৌরিশ। "আর এক বছর এক্সটেনশন্ করুন। আমাকে ভাতে মারবেন না হুজুর।"

ক্রূর হাসিতে ভরে উঠেছিল প্রণব রায়ের চোখ দুটো। "আমি কি করব? যাও, বিরক্ত করো না"। সৌরিশকে আর কোন কথা বলবার অবকাশ না দিয়েই অন্দরের দিকে পা বাড়িয়ে ছিলেন প্রণব রায়।

সাতাশ বছরের কাজটা কেমন এক নিমিষেই না-কচ হয়ে গেল। বয়েস হয়েছে, কিন্তু শক্তি তো যায়নি, তবে? জিজ্ঞাসার শেষ নেই। শেষ নেই যেমন জীবনের। অন্ততঃ সৌরিশের জীবনের। আজকে ও নিজেই নিজের মৃত্যু কামনা করছে। চোখের সামনে স্ত্রী-পুত্র শুকিয়ে মরে যাবে, এ কথা ভাবতেই কেমন শরীরের সমস্ত শিরাগুলো দপ্-দপিয়ে উঠল। জ্বালা করে উঠল চোখ। জল আসছে কি?

সুখের সংসার চেয়েছিল গড়তে। কিন্তু একি গরল ওঠে এলো ওর মুখ দিয়ে। আকাশ ফাটিয়ে আজ চীৎকার করলেও ফিরে আসবে না সেই দিন, যেদিন ছিল ও একক। একটু বেশী বয়েসেই সৌরিশের জীবনে এসে দাঁড়াল সরোজিনী। কিন্তু কেন এসেছিল—কেন? আর

এলোই যদি—তবে কেন নিয়ে এলো না ওর ভাগ্যকে সুখের বাঁধনে বেঁধে। একি জ্বালা? এত দুঃখের মধ্যেও হাসি পেলো সৌরিশের। সরোজিনীর শীর্ণ দেহের দিকে তাকিয়ে। কি ছিলো ও, আর কি হয়েছে?

ওই যে দূর আকাশে জ্বলছে নক্ষত্র। ওরই মত ছিল—সরোজিনী। মিষ্টি, নরম। আকর্ষণ করত। ধীরে ধীরে টানতো সৌরিশকে। সেই টানের স্রোতে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিল সরোজিনীর নরম দুটো বাহুর মধ্যে। চেয়েছিল শান্তি, পেয়েছিলও। কিন্তু অশান্তি এসে বাসা বাঁধল—যেদিন এলো ওই সুধীর সরোজিনীর কোলে—সেই দিনই সমস্ত চিন্তা আর দুঃখ হৃদয়টাকে ভারী করে তুললো। যাকে ওজন দিয়ে মাপা যায় না।

শাঁখের তিনটে ফুঁ শেষ হতে না হতেই কেমন একটা আর্ত্ত চিৎকার বেরিয়ে এসেছিল সরোজিনীর মুখ দিয়ে।

অজানা ভয়ে সমস্ত নিষেধ অমান্য করেই ছুটে গিয়েছিল সৌরিশ সরোজিনীর ঘরের দিকে। থমকে দাঁড়িয়েছিল সরোজিনীর নোংরা বিছানাটার পাশে! "কি—কি হয়েছে"? ব্যাকুল গলায় জিজ্ঞাসা করেছিল সৌরিশ।

"ওগো একি হলো? চোখ কই এর"? ডুকরে উঠেছিল সরোজিনী।

"চোখ"। বিস্ময়-ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়েছিল সৌরিশ। "কি বলছ"?

"এই দেখ"। অনেক কষ্টে উঠে বসেছিল সরোজিনী। হাঁ হাঁ করে উঠেছিল ধাই। কিন্তু কোনো নিষেধ সেদিন মানে নি। "এই দেখ"। দুহাতে তুলে ধরেছিল নবজাতক শিশুটিকে।

শিউরে উঠেছিল সৌরিশ—চমকে উঠেছিল। অন্ধ—ছেলে অন্ধ। বোবা হয়ে গিয়েছিল মন। ভাষা গিয়েছিল হারিয়ে। কোন কথা না বলে পালিয়ে এসেছিল সরোজিনীর পাশ থেকে সৌরিশ।

তারপর একটু একটু করে বড় হলো ছেলে। ঠাণ্ডা, ধীর। কান্না নেই, নেই দুষ্টুমী। যেখানে শুইয়ে রাখে সরোজিনী, সেখানেই পড়ে থাকে চুপ-চাপ। হয়তো হিসাব করে নিজের দুর্ভাগ্যের।

"ওগো"—কাছে এসে দাঁড়ায় সরোজিনী ছেলেকে কোলে করে।

"কি"? গুমড়ে ওঠা মনটাকে স্ববশে আনবার আপ্রাণ চেষ্টা করে সৌরিশ।

"দেখছ, কেমন শান্ত এ, কেমন ধীর। কি নাম রাখবে এর"? একটু কাছ ঘেঁষে দাঁড়ায় সরোজিনী সৌরিশের।

"তুমিই বল"?

"এর নাম থাকবে সুধীর। বেশ নাম, না"?

"হ্যাঁ"। ছোট্ট উত্তর দেয় সৌরিশ। "কাছারী যাবার বেলা হয়েছে। ভাত দাও"।

"দিচ্ছি"। ছেলেকে শুইয়ে রেখে চলে যায় রান্না ঘরে সরোজিনী।

আর সৌরিশ অপলকে তাকিয়ে থাকে ছেলের দিকে। কি সুন্দর হয়েছে! কি-মিষ্টি!! ঠিক সরোজিনীর মতই। কিন্তু ওর সমস্ত সৌন্দর্য্য হরণ করে নিয়েছে চোখ দুটো। একটা নিঃশ্বাস ফেলে তুলে নেয় সৌরিশ ছেলেকে। তন্ময় হয়ে দেখে।

সরোজিনীর ডাকে চমক ভাঙ্গে সৌরিশের। খেতে যায়। তারপর এক সময় চলে যায় কাছারী। দৈনন্দিন কার্য্যধারা চলে। ডাক দেয়—বাদী, বিবাদীকে। মামলা উঠে। শেষ হয়। পুরাণ যায়, নতুন আসে। কাছারীর শেষে এর ওর কাছে হাত পেতে এক টাকা, দু'টাকা এমন কি তিন টাকাও উপরি পায় সৌরিশ। মুনসেফবাবুর পিওন ও।

হেসে খেলে চলে গিয়েছে অনেকগুলো বছর। কিন্তু আজ? আজ নেমেছে অন্ধকার। ওই সুধীরের মতই।

পাশের বাড়ীর দেওয়াল-ঘড়িটা রাত্রি ঘোষণা করে চলেছে। একটা বেজে গিয়েছে অনেকক্ষণ আগে, এবার দুটো বাজলো। কেমন নিঃস্তেজ হয়ে আসছে সৌরিশের দেহটা। অবুঝ শিশুর মতো ছটফট করছে মন। ঘুম নিয়েছে বিদায় চোখের পাতা থেকে। এবার উঠে বসে সৌরিশ। বালিসের তলা থেকে বের করে বিড়ির কৌটাটা। ধরায় একটা। ধোঁয়া ছাড়ে। কাশে খক্-খক্ করে। তারপর অনেক—অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে ক্লান্ত শরীরটার উপর নেমে আসে নিদ্রার শ্রান্ত প্রলেপ।

* * * *

সরোজিনীর ডাকে ঘুম ভাঙ্গে সৌরিশের। বেলা

হয়েছে। ঝল্‌মল্‌ করছে রোদ। উঠে বসে। মুখ হাত ধুয়ে চায়ের কাপে চুমুক দেয়। "সুধীর কোথায়"? জিজ্ঞাসা করে সৌরিশ।

"ও ঘরে আছে"। উত্তর দেয় সরোজিনী।

"ওঃ! বাজারে যেতে হবে, ঝোলাটা দাও"।

"দিচ্ছি"—চলে যায় সরোজিনী ঘর থেকে।

আলনায় টাঙ্গানো জামাটা টেনে নিয়ে গায়ে দেয় সৌরিশ। সরোজিনীর হাত থেকে ঝোলাটা নিয়ে বার হয় বাড়ী থেকে।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে বাইরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয় সৌরিশ।

"কোথায় চললে এখন"? জিজ্ঞাসা করে সরোজিনী।

"যাই, একটু ঘুরে আসি। কাছারীর ওধার থেকে"—উত্তর দেয় সৌরিশ।

"একটু ঘুমুলে পারতে"?

"ঘুম আমার আসবে না সরো"। আস্তে আস্তে জবাব দেয় সৌরিশ।

মুখ নিচু করে সরোজিনী। কোন কথা বলতে পারে না।

* * * *

"কি ব্যাপার সৌরিশদা"? জিজ্ঞাসা করে মন্মথ।

"আর ব্যাপার ভাই। ভাল লাগলো না তাই চলে এলাম তোদের কাছে"।

খুশী হয় মন্মথ সৌরিশের কথায়। বলে, "মাঝে-মধ্যে এসো। তোমরা পুরাণ লোক, অনেক কিছুই ঘাত-ঘোঁৎ জানতে"।

"হুঁ"—আনমনা হয়ে যায় সৌরিশ।

"তা কি করবে, মনে করেছ"? জিজ্ঞাসা করে মন্মথ।

"কি আর করবো, খাব আর ঘুরে বেড়াবো"। নিঃস্তেজ গলায় উত্তর দেয় সৌরিশ।

"কিছুই করবে না? চলবে কেমন করে"?

"ভগবান জানেন"—অসহায় ভাবে বলে ওঠে সৌরিশ।

"এক কাজ করো সৌরিশদা। এখানে একটা দোকান করো"।

"দোকান"—বিস্ময় প্রকাশ করে সৌরিশ।

"হ্যাঁ, দোকান"—একেবারে সরে আসে মন্মথ সৌরিশের কাছে। "চায়ের দোকান একটা করতে পারলে হয়তো চলে যাবে তোমার—সৌরিশদা"।

"দোকান তো রয়েছে এখানে? তবে"—

সৌরিশের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে ওঠে মন্মথ। "আমরা যাব তোমার দোকানে"।

"ভেবে দেখি ভাই"। চিন্তিত স্বরে উত্তর দেয় সৌরিশ।

"হ্যাঁ দেখ"। হঠাৎ কলিং বেলের আওয়াজে ছুটে যায় মন্মথ।

একরাশ চিন্তা নিয়ে বাড়ী আসে সৌরীশ। সরোজিনী কোন আপত্তি করে না। বলে, "ভালই তো যদি চালাতে পারো। তা ছাড়া কিছু একটা না করলে চলবে কেন। সংসার তো বসে থাকবে না"।

"জানি সরো, সব জানি। কিন্তু ভয় হয় শেষ পর্য্যন্ত না তরী ডোবে"। সন্দেহ সুরে বলে ওঠে সৌরিশ।

ভাল একটা দিন দেখে সত্যিই সৌরিশ জজ্‌-কোর্টের মাঠে খোলে তার দোকান। পরিপূর্ণ মন নিয়ে। প্রথম দিনের বিক্রী দেখে আনন্দিত হয়। দেহের রক্ত আবার চলতে আরম্ভ করে। ভীড় করে মন্মথ, গোবিন্দ, মুরারীর দল! নানান কথায় মৃদু হাসির ঢেউ আছড়ে পড়ে সৌরিশের ভাঁটা-পড়া মুখটায়। না—বৃথা হয়নি। সংসারের ভাবনাটা আজ আর বড় বলে মনে হচ্ছে না। চলে যাবে কোনো রকমে এই রকম বিক্রী হলে। আশার-আলো দেখতে পায়। দিন শেষ হয়। খুশী মনে দোকানটা বন্ধ করে বাড়ীর পথে পা বাড়ায় সৌরিশ।

* * * *

"জানিস্‌ গোবিন্দ, আজকে রায় বেরোলো কেস্‌টার"। চায়ের গেলাসে ছোট একটা চুমুক দিয়ে বলে উঠে প্রভাত!

"বেরিয়ে গেলো? ক'বছর করে হলো"? নিস্ক্রিয় গলায় বলে গোবিন্দ।

"পাঁচ বছর। কিন্তু আমার কি মনে হয় জানিস্‌ গোবিন্দ, কেস্‌টা সম্পূর্ণ সাজানো"। একটা বিড়ি ধরাতে ধরাতে বলে প্রভাত।

"আমারও"—পাশ থেকে বলে ওঠে মন্মথ। "কিন্তু জজ্-সাহেব কেন যে সাজা দিলেন বুঝতে পারলাম না। ছেলেটার জীবনটাই নষ্ট হলো"।

আর একজন খদ্দেরকে চা দিতে দিতে বলে উঠে সৌরিশ। "কি কেস্‌রে প্রভাত"?

"আর বলো না সৌরিশদা। সেই একই রকম ন'-বছরের একটা বাচ্চা মেয়ের উপর অত্যাচার"।

"বুঝেছি"? কেমন রহস্যময় গলা সৌরিশের।

"কি বুঝেছ সৌরিশ দা"? কথা বলে গোবিন্দ।

"ও সব কেসে সাজা হবেই। জজ-সাহেব কাউকে ছেড়ে দেবে না, বুঝলি"?

"কেন"? জিজ্ঞাসা করে প্রভাত।

"সে অনেক কথা। পরে একসময় শুনিস্"। চাপা দিতে চাইলো সৌরিশ কথাটা।

"খদ্দের তো নেই এখন, তুমি বলো সৌরিশদা"? আব্দার ধরে গোবিন্দ।

একটা বিড়ি ধরিয়ে বসে সৌরিশ নিজের জায়গায়। "আজ থেকে বার বছর আগে আমাদের জজ-সাহেব তখন মুনসেফ ছিলেন কোন এক কোর্টের। জায়গাটার নাম আর বললাম না তোদের"। আরম্ভ করে সৌরিশ। "বাসা ভাড়া করে থাকতেন সহরের একটা কোণায়। সুন্দর লোক, অমায়িক ব্যবহার। উকিল, মহুরী আর পিওন পেয়াদারা সকলেই খুশী মুনসেফ প্রণব রায়ের ব্যবহারে। কিন্তু একদিন সব পালটে গেল। মুনসেফবাবুর পিওন ছিল তখন অনাদি বলে একটা লোক। সে এক রাতের আঁধারে দিল গা ঢাকা। কিন্তু প্রণব রায়ের জীবনে দিয়ে গেল সব চাইতে বড় একটা দাগা। যার জন্যে মূল্য দিতে হচ্ছে প্রতিটি মানুষকে। যে অন্যায় করেনি তাকে ও"।

"তের বছরের একটা মেয়ে ছিল প্রণব রায়ের। সুন্দর, সুঠাম দেহে সবে মাত্র শাড়ীর প্যাঁচ কষতে আরম্ভ করেছে। মুখে দিতে আরম্ভ করেছে হাল্কা রুজ, লিপষ্টিক্। মারণাস্ত্র অবশ্য সেই মেয়েই তৈরী করেছিল। মুগ্ধ করতে চেয়েছিল পুরুষকে তার অপরিণত মন নিয়ে। সারা শরীরে রিম্‌ঝিম্, রিম্‌ঝিম্ করে রক্তগুলো তুফানের নিশানা দিয়ে চলছিল। *ঠিক সেই সময়—হ্যাঁ সেই সময় অনাদির মনে* জেগে উঠল সেই পশুটা। সমস্ত বাধা আর ভয় উপেক্ষা করে একদিন সেই মিষ্টি রজনীগন্ধা'র ঝাড়টাকে থেঁতলে, মাড়িয়ে, মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে নিঃখোঁজ হয়ে গেল অনাদি।" থামে সৌরিশ। বিড়িটা মুখে দেয়। টানতে গিয়ে দেখে নিভে গিয়েছে। আবার ধরায়।

"সেই মেয়েটার কি হলো"? কথা বলে মন্মথ।

"কি আর হবে? বিয়ে হলো, ছেলে হলো, সবই হলো"।

"আর সেই পিওন অনাদির"?

"উধাও, নো পাত্তা। তাইতো সেই অপমানের প্রতিশোধ নিয়ে চলেছেন জজ্ সাহেব নিরীহ পিওনগুলোর উপর। তাইতো নির্দ্দোষ লোক পাচ্ছে সাজা—বিশেষ করে তারা—যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নারীহরণ ও ধর্ষণের"। নিস্তেজ কণ্ঠে বলে সৌরিশ।

"সেইজন্যেই কি জজ-সাহেব তোমার কাজের মেয়াদ বাড়ালো না সৌরিশদা"? জিজ্ঞাসা করে প্রভাত।

"আমার তো তাই মনে হয়"। সৌরিশের স্বরে ব্যথার আভাষ।

চুপ করে গেল মন্মথ, প্রভাত, গোবিন্দরা। এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে ছিল দৃশ্য মাঠটার উপর। ছুটোছুটি করছে জনকয়েক লোক। উকিলবাবুরা গাউন নিয়ে খাচ্ছেন হিম্‌সিম্। বিরাট অশ্বথ গাছটা কাঁপছে মৃদু বাতাসে, কিংবা অসহ্য রোদের প্রকোপে। সত্যি গরম যা পড়েছে। মানুষগুলো হাঁফাতে আরম্ভ করেছে। কণ্ঠতালু যাচ্ছে শুকিয়ে। ঘামে ভিজে যাচ্ছে জামা কেমন অস্বস্তিকর দিন। কতদিন এমন চলবে—কে জানে?

নির্ব্বিকারভাবে টাটের উপর বসে সৌরিশ বিড়ি টেনে চলেছে। কেমন ভাবলেশহীন মুখ। একের পর এক চিন্তা এসে ঘিরে ধরছে। ডালপালা বিস্তার করবার চেষ্টা করছে সৌরিশের মনটায়।

"যাই সৌরিশদা। আমার ওটা লিখে রেখ"। ভাঙ্গা বেঞ্চিটা থেকে উঠতে উঠতে বলে মন্মথ।

"আবার লিখতে হবে"? কপালটা কুঁচকে যায় সৌরিশের। *"লিখেই তো চলেছি মন্মথ। অনেক বাকী পড়ে গিয়েছে, 'এবার কিছু করে করে দে, বুঝলি"?*

"দেবো—দেবো সৌরিশদা। সব শোধ করে দেব।"

হাসতে হাসতে বলে মন্মথ। "একটু আগুন দাও তো"? কাছে এগিয়ে যায় মন্মথ সৌরিশের।

নিজের দেশলাইটা বের করে দেয় সৌরিশ। বিড়ি ধরায় মন্মথ। ধোঁয়া ছাড়ে একমুখ। রিং করবার চেষ্টা করে। কিন্তু অসহ্য গরমের ভারী নিঃশ্বাস এলো-মেলো করে দেয় মন্মথর চেষ্টাকে। বিড়িটা মুখে করেই দোকান থেকে চলে আসে মন্মথ।

* * *

গড়িয়ে গড়িয়ে চলে গেল তিনটে বছর। চোখ ঝলসানো রূপ আর নেই কোর্টের। জমজমাটি ভাবটাও উধাও হয়েছে। ঝিমিয়ে এসেছে। গতি গিয়েছে পাল্‌টে। এখানে ওখানে আর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে না মানুষ। ছুটোছুটি আছে, আছে ব্যস্ততার ঢেউ। কিন্তু তবু—তবুও চিড় খেয়েছে ওর হৃৎপিণ্ডে। জমিদারী গ্রহণ করেছে সরকার। তাই কোর্টের কাজ গিয়েছে কমে। লোকের আনাগোনাও হয়েছে স্তিমিত।

আবার চিন্তার রেখা পড়ে সৌরিশের কপালে। সংসারের কথাটা বড় বেশী করে মনে পড়ে। দুরু দুরু করে উঠে বুক। অজানা ভয়ে জড়ো-সড়ো হয় মন। একটা অনিশ্চয়তার সংশয় ওকে ঘিরে ধরে। দোলা দেয়। মন্মথ গোবিন্দরা ওকে ডোবাচ্ছে। টাকার অংক যাচ্ছে বেড়ে। এরকম করে চললে ডুবতে হবে—হবেই।

শক্ত হবার চেষ্টা করে সৌরিশ। দিল-দরিয়া মনটা গোটায়। কড়া কথা বলে মন্মথকে।

শোনে মন্মথ। উত্তর দেয় না কথার। সহজভাবেই নেয়, হেসে— উড়িয়ে দেয়।

বুঝতে পারে সৌরিশ। এবার সাঙ্গ হবে খেলা। তলাতে হবে অতলে। মনটা শুধুই পাকাল মাছের মত ছট্‌ফট্ করে। পথ খোঁজে। কোন্ পথে হবে সুরাহা। কোথায় পাবে আলো—বাঁচবার ও বাঁচাবার?

পুঁজি গিয়েছে আস্তে আস্তে কমে। দোষ কার? ভাবনার শেষ নেই। হয়তো শেষ হবে না কোন্ দিনও। আজই সর্ব্বপ্রথম উপলব্ধি করলো সৌরিশ, দোকানের আশা করতে হবে ত্যাগ। টেনে হেঁচড়ে কিছুতেই আর চালানো যাবে না একে। সহজভাবে খেয়ে পরে বাঁচতে দেবে না মানুষ। পাক খাচ্ছে চিন্তা। একষট্টি বছরের পাকা মনটা দিশাহারা হয়ে পড়ে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে সুধীরের মুখটা। কি সুন্দর অথচ কি ভয়ঙ্কর। কত অসহায় ও। সুধীরের মুখটা মনে পড়তেই সরোজিনীর মুখটা ভেসে ওঠে সৌরিশের সামনে। কিছুতেই সুধীরকে পৃথকভাবে ভাবতে পারে না সৌরিশ। মা আর ছেলে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে পড়েছে সৌরিশের কাছে।

সরোজিনীর মুখটা মনে পড়তেই ব্যথায় ভরে ওঠে—সৌরিশের চিন্তা-মুখর মনটা। কি উত্তর দেবে ওকে? কেমন করে শোনাবে জীবন যুদ্ধে হেরে যাওয়ার কথা। কত সহজেই ঘায়েল করলো মন্মথরা। হয়তো কিছুই মনে করবে না সরোজিনী। শুধু ধিক্কার দেবে নিজের অদৃষ্টকে। হয়তো মুখের কুঁচকে যাওয়া চামড়াগুলো অসহায়ভাবে বার-কয়েক উঠবে নড়ে। ছানিপড়া চোখ দুটো দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় গড়িয়ে নামবে জল। অবুঝ বাতাস সরোজিনীর অর্দ্ধেকের বেশী পেকে-যাওয়া চুলে লাগাবে দোল, আর ওই দোলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মাথা নাড়াবে সরোজিনী। আস্তে আস্তে থেমে বলবে, "ভেঙ্গে পড়ো না তুমি। মাথার উপর ভগবান আছেন"। কথার শেষে হয়তো আলতো-ভাবে সৌরিশের কাঁধে সারাদিনের কর্ম্মক্লান্ত হাতটা রাখবে সরোজিনী।

চিন্তার গতি থেমে যায় আচমকা শঙ্করের কথায়—"বাবু রাত হয়েছে, দোকান বন্ধ করবেন না"?

সত্যিই রাত হয়েছে। অন্ধকার ঘিরে ধরেছে পৃথিবীটাকে। একটা নিঃশ্বাস ফ্যালে সৌরিশ। "শঙ্কর, ঝাঁপগুলো ফেলে দে"।

দোকানের ঝাঁপ ফেলে শঙ্কর। গেলাস্‌গুলো গুছিয়ে রাখে।

"শঙ্কর"। মৃদুভাবে ডাকে সৌরিশ।

"বলুন"? কাছে এসে দাঁড়ায় শঙ্কর।

"এই নে"—ওর হাতে গুঁজে দেয় সৌরিশ পাঁচটা টাকা।

অবাক হয় শঙ্কর। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকে সৌরিশের মুখের দিকে।

"কাল থেকে তোকে আর আসতে হবে না"—ঠাণ্ডা গলায় বলে সৌরিশ।

"কেন"? আর্ত্ত চীৎকার বের হয় শঙ্করের মুখদিয়ে।

"দোকান আমি তুলে দিচ্ছিরে।" সৌরিশের গলাটা আশ্চর্য্য ভাবে কেঁপে ওঠে।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে শঙ্কর। হঠাৎ ফুঁপিয়ে ওঠে, ডুকরে ওঠে। এক টাকা দু-আনার জীবন শেষ হবার ভয়ে ও শিউরে ওঠে।

আর একটা কালো পর্দা সরে যায় সৌরিশের চোখের সামনে থেকে। নিজের বীভৎস রূপটা ফুটে ওঠে শঙ্করের কান্নার মধ্যে দিয়ে। সৌরিশের চোখের কোণে দু'ফোঁটা জল চিক্ চিক্ করে।

*   *   *   *

আলো—আলো আর আলো। আকাশে শুরু হয়েছে আলোর খেলা। হাল্কা হাওয়ায় ছুটছে মেঘগুলো। চাঁদটা হাসছে। দু একটা তারা ওই উজ্জ্বল আলোর ভেতর দিয়েও মারছে উঁকি। আর পৃথিবীর বুকে সৃষ্টি করছে মায়া। একই জিনিষকে দেখছে মানুষ নতুনভাবে, নতুনরূপে।

সৌরিশও দেখছে সামনের তেঁতুল গাছটাকে। ছম্‌-ছমে ভাবটা চলে গিয়েছে গাছটার। পাতাগুলো দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট ভাবে। একটা প্যাঁচা উড়ে এসে বসলো গাছটায়। সেটাও দেখলো সৌরিশ।

এত আলো রয়েছে পৃথিবীতে। কিন্তু সৌরিশের এই ছোট্ট চারদেওয়ালের মধ্যে চির-অন্ধকার করছে বিরাজ। উঠে বসলো সৌরিশ বিছানাটার উপর।

রাত আস্তে আস্তে গভীর হচ্ছে। আর সেই সঙ্গে জঠরটা পাক খাচ্ছে অসহ্য ভাবে। কপালটা দপ্‌দপ্‌ করছে। ঝিম্‌ঝিম্ করছে শিরা-উপশিরা। খাওয়া হয়নি রাতে—সরোজিনীরও। কদিন থেকে এমনিই চলছে। সাড়ে বার টাকার জীবন শুরু হয়েছে। সাড়ে বার টাকাতেই চালাতে হচ্ছে মাস। জীবনে এমন দিন কখনও আসবে ভাবতে পারে নি সৌরিশ। এই কি জীবন? প্রতিবেশীর মুখ চেয়ে চলে এসেছে কটা দিন। কিন্তু ধার বলে আর কতদিন চাওয়া যাবে ওদের কাছে। পথ—পথ একটা বের করতেই হবে। টাকা রোজগারের পথ। যেমন করেই হোক।

কুরে কুরে খাচ্ছে সৌরিশের বুকটা চিন্তার পোকাটা। রাত মানেই যেমন অন্ধকার নয়, তেমনি জীবন মানেই বাঁচা নয়। বাঁচার মত বাঁচতে হবে। দেহকে দিতে হবে খাদ্য। আর সেই খাদ্যের সন্ধানে মানুষ পাগলের মত ঘুরছে টো-টো করে এখান থেকে ওখানে, ওখান থেকে এখানে। বিচিত্র এই পৃথিবী। অদ্ভুত এর জীব। আর তারও চাইতে অদ্ভুত মানুষেরই সৃষ্ট নিয়মগুলো। সারা জীবন কাজ করে যাদের কাছ থেকে মাত্র পাওয়া যাবে সাড়ে বারটা টাকা জীবন ধারণের জন্যে: কি প্রয়োজন এই ঠাট্টার! কি প্রয়োজন এই প্রহসনের? নাটকের অংক শেষ হওয়ার মত শেষ করে দিক সরকার চাকরী-জীবনের চিহ্নটাকে। পেনসন্! আলো-ঝলো-মলো বাইরের দিকে ছুঁড়ে দেয় সৌরিশ কথাটা। আর কথাটা ছুঁড়ে দেবার পরই শুনতে পায় সৌরিশ একটা কান্নার শব্দ। কান্নাটা অনেকক্ষণ থেকেই গোমরাচ্ছিল সৌরিশের অনেক-দেখা বুকটায়। কিন্তু আশ্চর্য্য এতক্ষণ নিজেই বুঝতে পারেনি সৌরিশ তার নিজেরই কান্নাটাকে! তবে—তবে কি এই কান্নাই বুকে করে বিদায় নিতে হবে পৃথিবী থেকে? কিন্তু কেন? অসহায় সৌরিশ সত্যিই এবার ভেঙ্গে পড়ে—মুখটা গুঁজে দেয় ময়লা তেল-চিটে বালিশটার মধ্যে। কান্না দিয়েই এই পৃথিবীর শুরু, আর কান্না দিয়েই হবে এর শেষ?

অনেক—অনেকক্ষণ পরে কান্নার বেগটা কমে এলে মুখটা তোলে সৌরিশ। তাকায় বাইরের দিকে। চাঁদটা পূব থেকে পশ্চিম আকাশে নিয়েছে আশ্রয়। আলো তেমনিই আছে। একটুও ক্ষুণ্ন হয়নি ওর জ্যোতি। স্থান-চ্যুত হয়েও। স্থানচ্যুত তো হয়েছে সৌরিশ। কিন্তু ওরই জীবনে নেমে এলো কেন অন্ধকার?

হঠাৎ প্লেনের শব্দে চিন্তামুখর মনটা স্তব্ধ হয় সৌরিশের। সেই সঙ্গে আটকে যায় দৃষ্টি। রোজকার মতই ঠিক চারটের সময় যাচ্ছে প্লেনটা তার নির্দ্দিষ্ট জায়গায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই দৃষ্টিকে অতিক্রম করে মিলিয়ে গেল প্লেনটা। কিন্তু কিছুতেই মনের বাইরে যেতে পারে না সৌরিশের। একই সময়ে, একই গতিতে আর একই জায়গায়, যে গিয়েছে, যে যাচ্ছে, সে যাবে। সেই রকম একটা গতি হাতড়ে ফিরছে সৌরিশ অতল মনের গভীরে। বিড় বিড় করে সৌরিশ—পেতে হবে—যেমন করেই হক—পেতেই হবে আমাকে।

অস্থির এক উত্তেজনায় সৌরিশের বুকের রক্ত তোলপাড় করছে। নাচছে উদ্দামভাবে। ঘুরছে পৃথিবী···।

দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে নিয়ে এলো সৌরিশ ঘরের মধ্যে। মনটাকেও। চোখ দুটো জ্বলছে। এ জ্বলার বুঝি শেষ হবে না কোন দিনও।

নাক ডাকছে সরোজিনীর। এই এক বিশ্রী অভ্যাস ওর। বিরক্ত হয়ে মুখটা ফিরিয়ে আনতে গিয়ে থমকে যায় সৌরিশের দৃষ্টি। সমস্ত ভাষা হরণ করে সুধীর।

ওঠে দাঁড়ায় সৌরিশ। ঘুমন্ত সুধীরের কাছে এসে দেখে অপলকে।

সুধীরের বুকটা নিঃশ্বাসের তালে তালে উঠা-নামা করছে। ঘুমের মধ্যেই হাসছে ও।

ধ্বক্ করে উঠল সৌরিশের বুকটা। একটা ক্ষণ-আলো ওর মনকে আলোকিত করতে চাইলো। ভয় পেলো সৌরিশ। পালিয়ে এলো সুধীরের কাছ থেকে। বসলো নিজের জায়গায়।

চাঁদটা একেবারে পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়বার আগেই পূব আকাশে ফুটে উঠলো আলো। আর ঠিক সেই সময় সৌরিশের দু-চোখের তারা উঠলো ঝল্‌মল্ করে। সমস্ত ভয় আর ভাবনার, ন্যায় আর অন্যায়ের গলা টিপে হত্যা করে উঠে দাঁড়াল। আলনায় টাঙানো জামাটা গায়ে দিল। সন্তর্পণে এগিয়ে গেলো। "সুধীর—সুধীর"। চাপা গলায় ডাকলো দু-বার।

"হুঁ"। ঘুম জড়ানো গলায় উত্তর দিল সুধীর।

"শোন বাবা"। সুধীরের হাতটা ধরলো সৌরিশ।

উঠে বসলো সুধীর। "কি"? জিজ্ঞাসা করলো আস্তে আস্তে।

"আয় আমার সঙ্গে"। আহ্বান জানায় সৌরীশ।

"কোথায়"? নিয়মের ব্যতিক্রমে কৌতূহলী হয় সুধীর।

"আয়-ই না"। নিজেই সুধীরের জামাটা পরিয়ে দেয় সৌরিশ এই সর্ব্বপ্রথম। বাইরে বের হয় ওরা দুজনে। বাপ আর ছেলে।

আর ওদিকে তখনও গভীর ঘুমে সরোজিনী রয়েছে ডুবে। একবার চিন্তা করতেও পারলো না ও। জীবনের তাড়নায় জীবিকার সন্ধানে কোন পথে পা বাড়ালো বাপ আর ছেলে।

এমনিই হয়, এমনিই হচ্ছে, এমনিই হবে। তবুও চলবে পৃথিবী।···
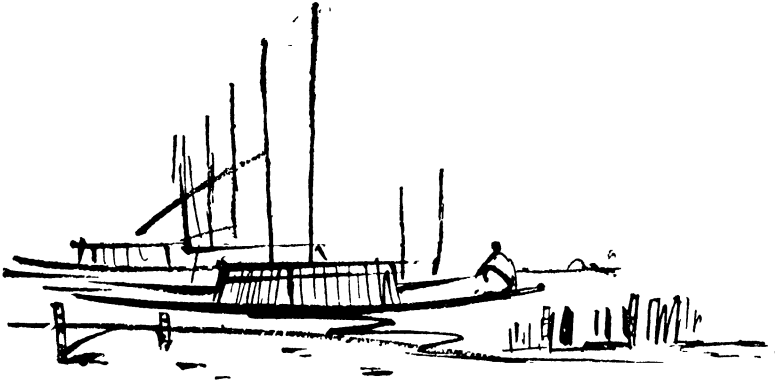
❋ অতীতের স্মৃতি ❋

সেকালের আমোদ-প্রমোদ

পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায়

২

রথযাত্রা, রামলীলা, সখের কবি, হাফ্-আখড়াই, বুলবুলি-পাখীর লড়াই, বাগান-পার্টি, ঘোড়দৌড়, বেলুন-ওড়ানো প্রভৃতি নানা ধরণের আমোদ-প্রমোদ ছাড়াও, বিগত উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজ-শাসিত বাঙলা দেশে, সেকালের আরো যে সব জনপ্রিয় উৎসব-অনুষ্ঠানের প্রচলন ছিল, এবারে তৎকালীন বিভিন্ন প্রাচীন সংবাদ-পত্র থেকে তার কয়েকটি বিচিত্র আলেখ্য সঙ্কলন করে দেওয়া হলো। এ সব আলেখ্য-নিদর্শন থেকে একালের অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকারা সেকালের বাঙলা দেশের বিবিধ রসানুগ্রাহীতার সুস্পষ্ট পরিচয় পাবেন।

* * *

পাঁচালি

(সমাচার দর্পণ, ১৯শে জুন, ১৮১৯)

জগন্নাথ মঙ্গল।—মোং কলিকাতাতে জগন্নাথ মঙ্গল নামে এক নূতন পাঁচালি গান সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে জগন্নাথ দেবের সকল বিবরণ আছে এবং রাগ ও রাগিনী ও তালমানেতে পূর্ণ অদ্যাপি সর্ব্বত্র প্রকাশ হয় নাই।

* * *

মুখোশ-পরা নাচের আসর

(কলিকাতা গেজেট, ২৪শে মার্চ্চ, ১৭৮৫)

The Masquerade on Monday night was conducted very much to the satisfaction of the company. The rooms and tents were fitted up with taste, in a style entirely new to this Country.

The following were the most remarkable characters :

Huncamunca, an admirable mask, and astonishingly well supported the whole night.

An Oxonian, by a Lady, who supported the character with great spirit.

Three admirable Sailors, who sang a glee.

A very good Milkmaid.

A Naggah, very capital.

A smart Ballad Singer, but was so modest she could not venture to sing.

*

ইংরাজী নববর্ষের উৎসব

(কলিকাতা গেজেট, ৩রা জানুয়ারী, ১৭৮৮)

New Yeat's Day : A very large and respectable company, in consequence of the invitation given by the Right Hon'ble the Governor General, assembled on Tuesday (New Year's Day) at the Old Court House, where an elegant dinner was prepared. The toasts were as usual echoed from the Cannon's mouth, and merited this distinction from their loyalty and patriotism.

In the evening the Ball exhibited a Circle, less extensive but equally brilliant and beautiful with that which graced the entertainment in honor of the King's birthday···The supper tables presented every requisite to gratify the most refined Epicurean, The ladies soon resumed the pleasures of the dance, and knit the rural braid, in emulation of the Poet's Sister Graces, till four in the morning, while some disciples of the Jolly God of wine testified satisfaction in Poems of exultation,

* * *

মল্লযুদ্ধ

(সমাচার দর্পণ, ১৩ই আগষ্ট, ১৮২৫)

কুস্তি লড়াই।—বর্ত্তমান মাসের নবম দশম দিবসে বৈকালে মোং ধর্ম্মপুরের শ্রীযুত বাবু শ্রীনাথ জমিদারের বাগানে মল্লযুদ্ধ হইয়াছিল। স্বদেশীয় বিদেশীয় মোগল পাঠান মুসলমান বাঙ্গালি তাহারা ২ জন এক একবার মল্ল যুদ্ধ করিয়াছিল। যত লোক সেখানে কুস্তি করিতে আইসে তাহারা পারিতোষিক পায় যে ব্যক্তি জয়ী হয় তাহার অধিক প্রাপ্তি হয় এই কুস্তি দর্শনে হৃষ্টমনে ঐ স্থানে শ্রীযুত বিচারকর্ত্তা সাহেব লোকেরা ও আর ২ ইংরেজ লোকেরাও উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং অনেক মান্য লোকও গিয়াছিলেন তাহাতে জমিদার মহাশয় সকলের উত্তমরূপ সম্মান রাখিয়াছেন।
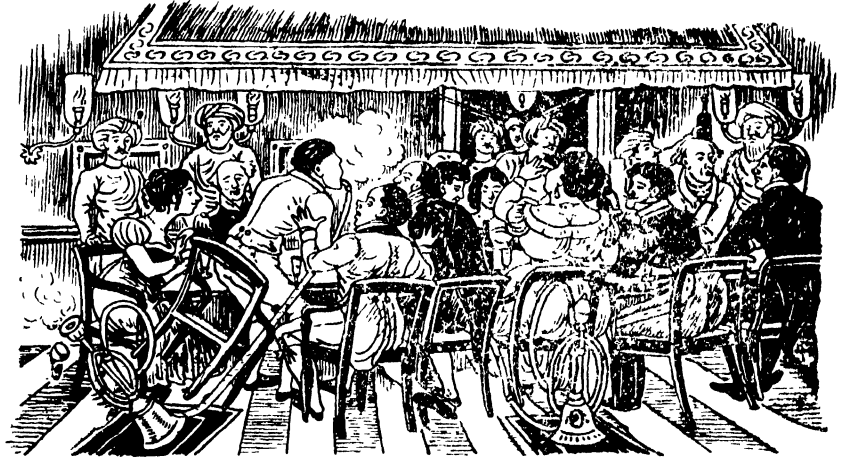
* * *

যাত্রাভিনয়

(সমাচার দর্পণ, ১৯শে আগষ্ট, ১৮২৬)

মণিপুরের যাত্রার সম্প্রদায়।—পাঠকবর্গের জ্ঞাপনার্থে নূতন কোন সংবাদ দৃষ্টিগোচর বা শ্রুতিগোচর হইলে প্রকাশ করিতে হয় এপ্রযুক্ত লিখিতেছি মণিপুরের এক সম্প্রদায় যাত্রাওয়ালা সংপ্রতি আসিয়াছে ইহারা এই কলিকাতার মধ্যে কোন ২ স্থানে যাত্রা করিয়াছে কেহ ২ দেখিয়া থাকিবেন সংপ্রতি ২৯ শ্রাবণ শনিবার রাত্রিতে কলুটোলা নিবাসি শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীলের বৈঠকখানায় ঐ যাত্রা হইয়াছিল তাহাদিগের নৃত্যগীতাদি আরম্ভ ও শেষপর্য্যন্ত দর্শন ও শ্রবণ করিয়া তদ্বিবরণ স্থূল লিখিতেছি।

আশ্চর্য্য সম্প্রদায় এই স্ত্রীলোকের দল। স্ত্রীলোকেতে কৃষ্ণ সাজি করয়ে কৌশল। ললিতা বিশখা চিত্রা আর রঙ্গদেবী। সুদেবী চম্পকলতা তং বিদ্যাদেবী। ইন্দুরেখা সাজি সবে রাসলীলা করে। পুরুষে বাজায় বাদ্য নারী

তাল ধরে। কৃষ্ণের সহিত রঙ্গ করয়ে রসিকা। রসিকার রূপ শুন নাহিক নাসিকা। গুণবতীদিগের গুণ অতি উচ্চস্বরা। শুনিলে সে মিষ্টস্বর না যায় পাসরা। বাদ্য-তালে নৃত্য বটে কিন্তু লম্ফঝম্ফ। গান করে জয়দেব মুদ্রা তার কম্প।

* * *

দুর্গোৎসব

(সমাচার দর্পণ, ১৮২২)

···কলিকাতার পশ্চিমে শিবপুর গ্রামে এক ব্যক্তি এক দুর্গা প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পূজায় তাবদদ্রব্য আয়োজন করিয়া ঐ প্রতিমাতে স্ফূর্ত্তি দিয়াছে প্রত্যেক টিকিট এক টাকা করিয়া আড়াই শত টিকিট হইয়াছে। যাত্রার আদেশ

প্রাইজ উঠিবে সেই ব্যক্তির নামে সংকল্প হইয়া ঐ প্রতিমা পূজা হইবেক।…

*　*　*

(সমাচার দর্পণ, ১৮৩১)

…গোমাংসের নাম শ্রবণে পিধান করেন এমত অনেক দক্ষিণাচারি বাবুর দিগকে দেখিয়াছি তবে কি নিমিত্ত তাহারা দুর্গার্চন বাটীতে বিফষ্টেক ও মটন চপ ও বৎস মাংস ও ব্রাণ্ডি সাম্পেন সেরি ইত্যাদি নানা প্রকার মদিরা আনয়ন করেন।…

*　*　*

(সমাচার চন্দ্রিকা, ১৩ই অক্টোবর, ১৮৩২)

…শ্রীশ্রী৺পূজার সময়ে যে প্রকার ঘটা কলিকাতায় হইত এক্ষণে তাহার ন্যূন হইয়াছে কেননা ৺বাবু গোপীমোহন ঠাকুর ও মহারাজ সুখময় রায় বাহাদুর ও বাবু নিমাইচরণ মল্লিক প্রভৃতির বাটীর সম্মুখ রাস্তায় প্রায় পূজার তিন রাত্রিতে পদব্রজে লোকের গমনাগমন ভার ছিল যেহেতুক ইঙ্গরেজ প্রভৃতির লোকের শকটাদির ও যানবাহনের বহুল বাহুল্যে পথ রোধ হইত।…

*　*　*

(জ্ঞানান্বেষণ, ১৪ই অক্টোবর, ১৮৩২)

…সেই সকল বাটীতে ইতর লোকের স্ত্রীলোকেরাও স্বচ্ছন্দে প্রতিমার সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইয়া দেখিতে পায় এবং বাইজীরা গলি ২ বেড়াইতেছেন তত্রাপি কেহ জিজ্ঞাসা করে নাই…এবং যাহারদের বাটীতে পাঁচ সাত তরফা বাই থাকিত এ বৎসর সেই বাটীতে বৈঠকিগানের তালেই মান রহিয়াছে।…

*　*　*

(জ্ঞানান্বেষণ, ১৮৩৯)

বর্ত্তমান বর্ষীয় শারদোৎসবোপলক্ষে নৃত্য সং দর্শনার্থ খ্রীষ্টিয়ানগণের মধ্যে অত্যল্প মনুষ্য আগমন করিয়াছিলেন এতদ্দর্শনে আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি। আর যখন সর্ব্বসাধারণে একেবারে এতদ্বিষয়ে উৎসাহ পরিত্যাগ করিবেন তখন আমরা আরও অধিক সন্তুষ্ট হইব।

*　*　*

শ্যামা পূজা

(জ্ঞানান্বেষণ, ২৩শে নভেম্বর, ১৮৩৩)

কলিকাতায় শ্যামাপূজার রাত্রিতে উৎপাত।—

শ্রীযুত ডেবিড মেকফার্লেন সাহেব কলিকাতা পোলীসের চীফ ম্যাজিষ্ট্রেট।

নীচে লিখিতব্য কলিকাতানিবাসি লোকেরদের দরখাস্ত।

আমরা সর্ব্বসাধারণের অনিষ্টজনক বিষয় যাহা শীঘ্র নিবারণকরণের যোগ্য তাহা আপনকার কর্ণগোচর করিতেছি প্রতি বৎসর শ্যামাপূজার রাত্রিতে মোসলমান ও ফিরিঙ্গি এবং কাফ্রি ও খালাসিরা প্রজ্বলিত পাঁকাঠি হাতে করিয়া রাস্তায় দৌড়িয়া বেড়ায় এবং ঐ অগ্নিময় পাঁকাঠির দ্বারা মনুষ্যকে মারে ও শরীর এবং বস্ত্রাদি দগ্ধ করে বিশেষতঃ গত শ্যামাপূজার রাত্রিতে ঐ ব্যবহার যেরূপ করিয়াছে তাহা অন্যান্য বৎসরাপেক্ষা অধিক অতএব আমরা অতিনম্রভাবে নিবেদন করিতেছি আপনি দয়াপূর্ব্বক এবিষয় বিবেচনা করিয়া যাহাতে এ কর্ম্ম আর না হইতে পারে এমত আজ্ঞা করিবেন ইতি। ১৮৩৩।১২ নভেম্বর।

আমরা সর্ব্বদা আপনকার মঙ্গল প্রার্থনা করিব।

শ্রীদক্ষিণানন্দ মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য।

এ অনিষ্টজনক বিষয় নিবারণ করা উচিত কিন্তু এবৎসর হইয়া গিয়াছে অতএব দরখাস্তকারিরা আগত বৎসর পুনর্ব্বার দরখাস্ত করিলে পোলীশ এবং অন্যান্য লোকেরা ইহাতে মনোযোগ করিবেন এবং যদ্যপি বাধা না থাকে তবে ঐ সম্পূর্ণ ব্যবহার রহিত করা যাইবেক ইতি।—

*　*　*

সরস্বতী পূজা

(সম্বাদভাস্কর, ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৮৪৬)

সরস্বতী পূজা।—গত শনিবার কলিকাতা নগরে সরস্বতী পূজা অতি বাহুল্যরূপে হইয়াছে বিশেষতঃ তিনজন সম্ভ্রান্ত লোকের অর্থাৎ শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ দেব শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণকৃষ্ণ মল্লিক শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজনাথ ধর এই তিন প্রধান ধনীর বাটীতে উত্তমরূপ আমোদ হইয়াছিল আশুতোষ বাবুর ভবনে অর্দ্ধ আখড়াই হয় তাহাতে দুই দল ভদ্রলোক

তবাদ দ্বারা সমাগত ভদ্রগণকে সন্তোষপ্রদান করিলেন শুনা গেল ঐ সংগ্রামে জোড়াসাঁকো নিবাসি ভদ্রদল জয় প্রাপ্ত হইয়াছেন বাবু প্রাণকৃষ্ণ মল্লিক মহাশয়ের বাটীতে রাত্রি দশ ঘণ্টাকাল ফিরোজ খাঁ নামক প্রসিদ্ধ গায়কের গানারম্ভ হইয়াছিল···তৎপরে দুই দল বিশিষ্ট···করেন তাহাতে একদল···প্রশংসিত পাঁচালীকর পরাণ মিত্র··· ব্রজনাথ ধর মহাশয়ের···স্থানেও অর্দ্ধ আখড়াই হইয়াছিল ব্রজনাথ বাবু ও তৎকনিষ্ঠ সহোদর বিনীত স্বভাবে সকলকে বসাইয়া পরমামোদে সন্তুষ্ট করিয়াছেন শুনিলাম ধর-বাবুর বাটীর আখড়াই গানে বাবু মোহনচাঁদ বসু জয়ী হইয়াছেন···

*　　*　　*

(সম্বাদ ভাস্কর, ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৪)

রাজবাটীর শ্রীশ্রী৺সরস্বতী পূজা।—গত ২১শে মাঘ। শ্রীশ্রী৺পূজোপলক্ষে রাজবাটীতে বিশেষ সমারোহ হইয়াছিল···প্রথমতঃ নর্ত্তকীদিগের নৃত্য গীতাদি হইয়া পরে ভাটপাড়া নিবাসি গোবিন্দ যোগির যাত্রা হয় এইরূপে দুই প্রহর তিনঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকিয়া পরে হজুরালী গাত্রোত্থান করেন, কথিত আছে এবৎসর বারাণসী ও কলিকাতাদি হইতে ১২ তায়ফা নর্ত্তকী আসিয়াছে এতদ্ভিন্ন যাত্রা ও গায়ক অনেক আগত হয়।···

*　　*　　*

বাই-নাচ

(সমাচার দর্পণ, ১৬ই অক্টোবর, ১৮১৯)

···শহর কলিকাতায় নিকী নামে এক প্রধান নর্ত্তকী ছিল কোন ভাগ্যবান লোক তাহার গান শুনিয়া ও নৃত্য দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া এক হাজার টাকা মাসে বেতন দিয়া তাহাকে চাকর রাখিয়াছেন। ··

এক রজনীর মধুর কাহিনী

চুনীলাল গঙ্গোপাধ্যায়

এক রজনীর মধুর কাহিনী লেখা মরমের মাঝে :
আজো মোর কানে বাজে ;
আকাশ-বাতাস পাগল করানো মনোমাতনের সুর,
সেই রাত ছিলো উতলা প্রাণের উল্লাসে ভরপুর।
একটি নিশির তরে
সাধের বাসর ঘরে
কাটিয়েছিলাম অতি আনন্দে আমি জনৈক যাত্রী
বিফলতা ভরা সারা জীবনের সে এক সফল রাত্রি।
চারিদিকে মোরে ঘেরিয়া অনেকে ছিলো যে অনুক্ষণ,
তবু তার মাঝে কাহারে কেনো গো খুঁজেছিলো দুনয়ন—
মনে শুধু পড়ে যায়
কাঙাল প্রাণের সবটুকু মমতায়।
চোরা চোখ মোর দেখেছিলো তাকে বারেক বাঁকায়ে আঁখি
অর্থ তাহার সেও বুঝেছিলো নাকি ?
তাই কি আমাকে পুলক বিভোল প্রাণে
দরদী দৃষ্টি দিয়েছিলো প্রতিদানে !
তারপরে যবে গিয়েছিলো সবে আপন-আপন কাজে,
সেই নিরালায় কয়েছিনু তারে ডেকোনা আনন লাজে।
ঘোমটাখানিরে ধীরে-ধীরে তুলে ধরে
মুখপানে মোর চেয়ে-চেয়ে লাজভরে
বলেছিলো বধূ আজি হতে আজীবন
তোমার আমার মধু মিলনের একদেহ এক মন।
সেই থেকে হায় কতো রাত এলো বহুদিন গেলো চলে
তখনো খুসিতে অথবা নয়ন জলে,
কেটে গেলো মোর কতো না রাত্রি-দিন
দুঃখ-সুখের নানান রাগিণী বাজালো বক্ষবীণ।
তবু মাঝে-মাঝে আজি ওকে অকারণে
একান্ত একা মনে
সুমধুর সেই হারাণো রজনী স্মরণে আনিতে চাই
স্মৃতি ছাড়া যার অবশেষ কিছু নাই।
পিছে-ফেলে-আসা একদা নিশার সেই যে একটি ক্ষণ
নিলো বারবার কতো শতবার আমার অনেকক্ষণ।
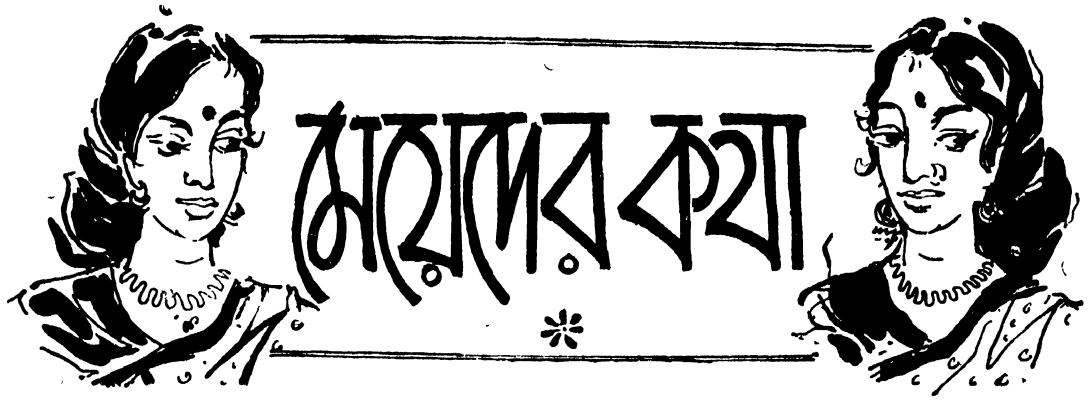
স্ত্রীণাং চরিত্রম্

মিসেস্ গোয়েল্

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৫)

পাঞ্চালীর আগ্রহে সঞ্জয়কে বিলাত যেতে হল শিক্ষা বিষয়ে একটা উপাধি সংগ্রহের সন্ধানে। পাঞ্চালীর মা ও বাবার উৎসাহ তাতে যথেষ্টই ছিল। পাঞ্চালীকেও যেতে হল শুধু সঞ্জয়কে দেখা শোনা করবার উদ্দেশ্যে। সঞ্জয় তাতে আনন্দিত হয়েছিল কিংবা হয়নি—তা জানা যায় না, জানবার দরকারই বা কি ?

পাঞ্চালী বিলাত গিয়ে যত সহজে মেমসাহেবে পরিণত হয়েছিল, সঞ্জয়ের পক্ষে সাহেব হওয়া তত সহজ ছিল না। কত গালি দিয়ে তবে পাঞ্চালী তাকে ক্লাবে যাওয়া, পরনারীর কটীবেষ্টন করে নৃত্য করা প্রভৃতি শিখিয়েছেন। সেদিন নাচের শেষে একটী টেবিলে বসে একটু পাঞ্চ সেবন করছিল পাঞ্চালী আর সঞ্জয়। তাদের টেবিলে এগিয়ে এসে বসলেন এক অ্যামেরিকান্ মহিলা। বয়স তাঁর বেশ হয়েছে। হয়ত পঞ্চাশ হবে। কিন্তু ভালো স্বাস্থ্যের গৌরব তাঁর যৌবনকে ছিনিয়ে নিতে দেয় নি। তিনি লণ্ডনে বেড়াতে এসেছেন। নাম মিসেস কার্লহাম্। হোটেলে এসে তিনি কারো জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। ভারতীয় তরুণ আর তরুণীকে দেখে তিনি কৌতুক বশতঃ এগিয়ে এলেন। পাঞ্চালী ভাব জমাতে শিখেছে। মহিলাকে সে কড়া পানীয় এগিয়ে দিল। বলল, 'একটু পান করে আমায় সম্মানিত করুন।'

মহিলার চোখে "তথাস্তু ."

তিনি আতিথেয়তা স্বীকার করলেন। খুব বেশী পান করলেন। তারপর অজস্র কথায় মুখর হয়ে উঠলেন। বললেন, 'তোমরা ভারতের ছেলে মেয়ে। সতী-সাবিত্রীর দেশের মেয়ে লণ্ডনের হোটেলে বসে মদ খাচ্ছ ?"

সঞ্জয় লজ্জিত বোধ করল। পাঞ্চালী তার তীক্ষ্ণ গলায় জবাব দিল, "সারা জগত যেখানে এগিয়ে চলছে, আমরা সেখানে পিছিয়ে থাকতে পারি না।"

'ছি ছি! কত ছেলেমানুষ তোমরা। তোমাদের দেশে যখন মহামানব গান্ধী মুক্তির সংগ্রাম করছেন তোমরা এখানে বসে মদ খাচ্ছ ?"

"আপনি যে খেলেন ?"

"খেলুম বলেই, বলছি। খেলুম বলেই মুখ খুলেছে। তোমাদের অনেক কথা বলব। এ লণ্ডনের চেয়ে আমাদের নিউ ইয়র্ক অনেক বেশী সমৃদ্ধ। আমাদের দেশের নারী পুরুষ সভ্যতায় শিক্ষায় তোমাদের চেয়ে, তোমাদের কেন লণ্ডনের চেয়েও অনেক অগ্রসর। এ খবর রাখো ?

"কিছু কিছু।"

"কিন্তু তারা তাতে কি পেয়েছে ? নারী হারাচ্ছে নারীত্ব। পুরুষ হচ্ছে যন্ত্রের দাস। জান একদল অত্যুৎ

সাধনার সৌন্দর্যের গোপন কথা...

'লাক্স আমায় সুন্দর রাখে'
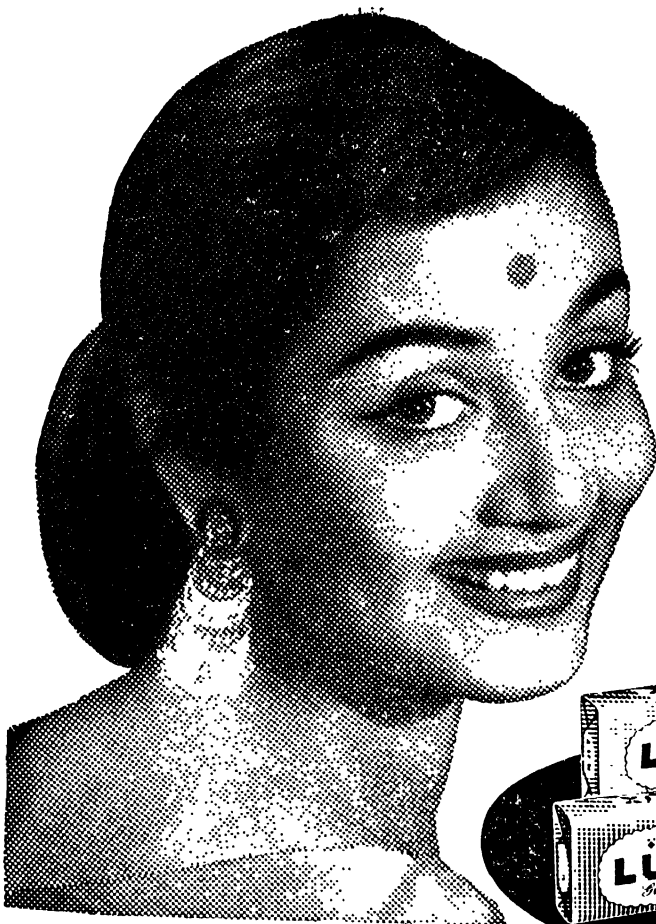
সুন্দরী সাধনা বলেন, 'লাক্স সাবানটি আমি ভালবাসি আর এর রঙ গুলোও আমার ভারী ভাল লাগে!'

LTS. 111-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

সাহী নারী ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে নারী আন্দোলন (Feminist Movement) আরম্ভ করেন। নারীর দাসীত্ব দূর করার উদ্দেশ্যে তাঁরা সর্বাগ্রে বিবাহ প্রথার বিলোপ সাধন করতে চান। তারা চান মাতাই হবে সন্তানের একমাত্র পরিচয়। মায়ের নাম অনুসারেই হবে সন্তানের নাম। পুরুষদের ইঞ্জিনিয়ারিংএর ক্ষেত্র ব্যতিরেকে সমস্ত কার্য থেকে বহিস্কৃত করা হবে। রাজনীতির ক্ষেত্রেও থাকবে নারীর পূর্ণ অধিকার। সেই থেকে আজ ১৯৩০ সাল পর্যন্ত নারীর অধিকারের সংগ্রাম চলেছে। নারী পেয়েছেও অনেক। সারা জগতের নারীর তুলনায় আমেরিকার নারীরা আজ সকলের চেয়ে ঐশ্বর্যশালিনী। কিন্তু তারা কি সুখী? পাশ্চাত্যের অনুকরণ করতে যাওয়ার আগে ভালকরে ভেবে দেখো, তারা কি সুখী?"

"বিবাহ মানব সমাজের একটি মস্ত বড় ব্যবস্থা। কিন্তু বিবাহ-ব্যবস্থাই আজ বড় সমস্যার সম্মুখীন। সমাজ-নীতির পণ্ডিতেরা তার ক্ষণভঙ্গুরতা দেখে বিচলিত হচ্ছেন। আমেরিকায় কত শত বিবাহ পুতুলের খেলাঘরের মত ভেঙ্গে যাচ্ছে। বিবাহ ভঙ্গ মানেই সমাজের বিপদ, অশান্তি। কত সন্তান নিরাশ্রয় হয়ে পড়ছে খাম খেয়ালী দম্পতির খেয়ালে।"

"নারী পুরুষের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা যত বেড়ে যাবে তাদের মধ্যে ভালোবাসার সম্ভাবনা তত কমে যাবে। একই ঘরে দুজন সমান ব্যক্তিত্বের মানুষ থাকা বড় কঠিন। আদর্শগতভাবে আমরা যতই ভাবি না কেন, বাস্তবে তা সম্ভব নয়। যে-ভাবেই হোক, গৃহে চাই একজন পুরুষ যিনি প্রকৃত পক্ষে পুরুষ, আর চাই এক নারী যিনি প্রকৃতই নারী। নইলে সে গৃহে সুষ্ঠু সন্তানপালন সম্ভব হয় না। নারী পুরুষের যত বেশী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চায়, ততই সে পুরুষের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। সংসারে তারা অশান্তি সৃষ্টি করে। অ্যামেরিকার, শুধু অ্যামেরিকার কেন, পাশ্চাত্য জগতের কত সংসার এভাবে ভেঙ্গে যাচ্ছে।"

"আচ্ছা, স্বামী স্ত্রীতে সমাজের কাজ, সরকারের কাজ সমান ভাবে করছে, তাতে কি ক্ষতি হচ্ছে? সংসারের তাতে তো মঙ্গলই হবে?"—বলে ওঠে পাঞ্চালী।

"ছাই হবে। যে-সংসারের মা বাপের মতন কাজে চলে যায়, সে সংসারের ছেলে-মেয়ে মানুষ হতে পারে না। আর স্কুল মিষ্ট্রেসের কাছে ছেলে মেয়ে মানুষ করার ভার আছে বলেই অ্যামেরিকার সহরগুলি দস্যু তস্করে ভরে যাচ্ছে। ছেলেগুলি দুর্দান্ত হচ্ছে। মেয়েগুলি কি অসভ্যই না হচ্ছে!"

"আপনিও একথা বলছেন?"

"কেন আমার মুখে এসব কথা মানায় না নাকি?" আমি সব দেখে শুনে ঠকে তবে একথা বুঝেছি। তোমাদের মত বাইরের চাকচিক্য দেখে মিথ্যা আনন্দোল্লাস দেখে আমি ভুলতে পারি না। তুমি বল যে সব মেয়েরা ঘর ছেড়ে অফিসে গিয়ে বিজ্‌নেস্‌ করছে, সেক্রেটারী হচ্ছে, আর অহরহ বড় সাহেবের মধুর বচন মনোযোগ দিয়ে শুনছে, লিখছে, কাজ করছে, অনেক সময় আবার দেহ দিয়ে মন দিয়ে সেবা করছে অর্থের বিনিময়ে তার কাজ বড়, না যে সুগৃহিণী স্বামীর জন্য তার সংসারটা সুন্দর করে গুছিয়ে রাখছে, আর অহোরাত্র তার সুস্থ সুন্দর সন্তানের কলকণ্ঠে বিভোর হয়ে থাকছে, তার কাছ বড়? কার জীবনের সার্থকতা বেশী। সতীর জীবনের না ভ্রষ্টার? সারা জগতের নারীকে একদিন ঠেকে শিখতে হবে একথা। আমার মুখের কথায় কারো প্রত্যয় হবে না।"

হোটেলের দরজায় দেখা দিলেন একজন বর্ষীয়ান সাহেব। অমনি মিসেস ফার্ণহাম্‌ তাদের দুজনকে বিদায় জানিয়ে তার সঙ্গে চলে গেলেন।

সঞ্জয় বলল, "মহিলার কথা খুব মূল্যবান্‌।"

পাঞ্চালী রেগে-মেগে বলল, "বাজে! যত সব ব্যাক-ডেটেড্‌, কনজারভেটিভ্‌ বুড়ী।"

"কেন গালি দিচ্ছ ভদ্রমহিলাকে?" বলে এগিয়ে এল মধুর-কণ্ঠী এলেন। বয়স বেশী নয়। পাঞ্চালীর বয়সী সে। নারী মুক্তির একজন মস্ত বড় নেত্রী। সঞ্জয়কে তার খুব ভাল লেগেছে। পৃথিবীর নানান দেশের পুরুষের সঙ্গ-লাভ করার একটা মস্ত বড় মোহও আগ্রহ তার আছে। কিন্তু পাঞ্চালী সঞ্জয়কে যে ভাবে চোখে চোখে রাখে, তাতে সঞ্জয় সে সুযোগ পায় নি। পাঞ্চালী হচ্ছে সেই ধরণের মেয়ে, যারা নিজেরা পরপুরুষের সঙ্গে রঙ্গ করতে ভালবাসে কিন্তু স্বামীদের উপর কড়া নজর রাখে। এলেন পাঞ্চালীর বন্ধুত্বও আকাংক্ষা করত, তাই

সঞ্জয়কে নিয়ে মতামাতি সে করেনি। পাঞ্চালী এই বিদেশে এলেনকে পরমবন্ধু বলেই জেনেছে। এলেনের কাছেই পাঞ্চালী শিখছে, বিলাতী কায়দা, নারী-প্রগতির নারী-মুক্তির নূতন মন্ত্র। তাকে পেয়ে খুশিতে ভরে উঠল পাঞ্চালীর মন। হোটেল বয়কে সে শেম্পেন দেবার আদেশ করল। এলেনকে তার পাশের চেয়ারে বসিয়ে বলে গেল সেই অ্যামেরিকান্ বুড়ীর কথা সঞ্জয় যার প্রশংসা করছিল, আর যে জন্যে পাঞ্চালী চটে গিয়েছিল। সব শুনে ঢলে পড়ল এলেন সঞ্জয়ের চেয়ারের হাতলে। সে পাঞ্চালীর কথা শুনতে শুনতে অনেক সুরা পান করেছে। তাই তার মন গিয়েছে খুলে। সঞ্জয়কে সে অনেক কথা বলল ফিস্ ফিস্ করে। পাঞ্চালীও এগিয়ে দিল তার কান এলেন কি বলে তা শোনার উদ্দেশ্যে। এলেন বলে চলল।

"সঞ্জয়, ইউরোপে এসেছ। নারীমুক্তির সংগ্রাম দেখে যাও। তোমরা পুরুষেরা মেয়েদের আর ঘরে গর্ভধারণের যন্ত্র হিসাবে আটকে রাখতে পারবে না জেনে রেখো। ঐ বুড়ী দুঃখ করছিল না, বিবাহ ক্ষণ ভঙ্গুর হয়ে পড়েছে বলে। বিবাহ থাকবেই না জগতে—তোমাদের হাজার বছরের পুরাণো নোংরা বিয়ের নিয়ম। বল, সমাজের আর ধর্মের কি অধিকার আছে নারীর দেহের ওপর। সে তার দেহ নিয়ে মন নিয়ে যা খুশি করতে চায় করবে। আমি কি মনে করি জান? আমি মনে করি, নারী পুরুষের মধ্যে আইনগত, ধর্মগত কোন বিধি নিষেধ থাকতে পারে না। বিয়ের অনুষ্ঠান না করেও একটি নারী ও আর একটি পুরুষ একত্রে শান্তিতে বাস করতে পারে। বিবাহিত জীবনের যে সকল উদ্দেশ্য রয়েছে সে সমস্তই তারা নিজের জীবনে সফল করতে পারে। দুজনেই তখন দুজনের মনের পরিচয় পেতে পারে, পরিচয় পেতে পারে অন্যের রুচির, চরিত্রের, মেজাজের। দুজনের মধ্যে সকল রকম পরীক্ষা চলবে এসময়ে। তারপর যদি তারা মনে করে উভয়ের বিবাহ হওয়া দরকার তারা বিবাহ রেজিষ্টারের অফিসে চলে যাবে। কারণ সন্তান যদি তারা চায় তার আইনগত ভবিষ্যত তো তারা নষ্ট করতে পারে না। কিন্তু দুজনের মধ্যে যদি ভাব পাকা না হয়, তবে একে অন্যকে ছেড়ে যেতে পারে, কোন আপত্তি নেই।

জান পাঞ্চালী আমি এ পর্যন্ত সাতজন পুরুষকে নিয়ে পরীক্ষা করেছি। কিন্তু একজনকেও—"

"আমি কিন্তু একজনকে নিয়ে পরীক্ষা করেছি, আর তাকে নিয়েই…।" বলল পাঞ্চালী।

"তুমি বড় লাকী পাঞ্চালী।"

সান্তনা দিল এলেন সঞ্জয়ের চোখে মুখে তার উৎসুক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে।

লাজুক সঞ্জয় এত সব কথা সহ্য করতে পারছিল না। মেয়েলি সুরে বলল, "চল আমরা উঠি।"

(চলবে)

——

কাগজের কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

ইতিপূর্ব্বে কাগজের কারু-শিল্পের নানা রকম সৌখিন ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী রচনার বিষয় আলোচনা করেছি। এবারেও সেই-ধরণের আরো একটী সৌখিন অথচ নিত্য-প্রয়োজনীয় কাগজের কারুশিল্প-সামগ্রী তৈরীর কথা বলছি। এ জিনিষটি হলো—চ্যাটাই, দর্ম্মার মাদুর ও আসন বুননের ছাঁদে, রঙ-বেরঙের কাগজের লম্বা-লম্বা ফিতার টুকরো বুনে বিচিত্র 'Table-Mat' বা 'খুঞ্চিপোষ' অর্থাৎ '.ট্রে' (Tray), বারকোষ কিম্বা টেবিলের উপরে সাজানো গরম বা ঠাণ্ডা খাবার-পাত্রের তলায় পাতবার উপযোগী ছোট-ছোট আসন। এ-ধরণের 'খুঞ্চিপোষ' বা 'আসন' বিছানোর রেওয়াজ আজকাল অনেক আধুনিক গৃহস্থ-

সংসারেই দেখতে পাওয়া যায়। কারণ, এ সব 'খুঞ্চিপোষ' বা 'আসন' বিছানোর ফলে, শুধু যে খাদ্য-পরিবেষণের পারিপাট্য বৃদ্ধি পায় তাই নয়, গনগনে-গরম অথবা কন্‌কনে-ঠাণ্ডা খাবারের পাত্রটির স্পর্শে 'ট্রে', বারকোষ কিম্বা টেবিলের রঙ-পালিশ এতটুকু মলিন বা ক্ষতি গ্রস্ত হবার সম্ভাবনা থাকে না! এ ধরণের 'খুঞ্চিপোষ' তৈরী করা খুব একটা দুঃসাধ্য এবং ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার নয়—গৃহস্থ-সংসারের সামান্য কয়েকটি ঘরোয়া-উপকরণের সাহায্যে এগুলি অনায়াসেই রচিত হতে পারে। 'খুঞ্চিপোষ' বা 'Table-Mat' দেখতে কেমন হবে, নীচের ১নং চিত্রটি দেখলেই তার সুস্পষ্ট আভাস পাবেন।
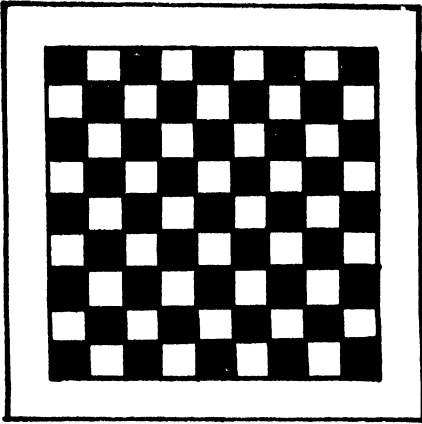
উপরের নক্সানুসারে রঙীন কাগজের ফিতা বুনে 'খুঞ্চিপোষ' তৈরী করতে হলে যে সব উপকরণ প্রয়োজন, প্রথমেই তার একটি তালিকা দিয়ে রাখি। এ কাজের জন্য দরকার—সচরাচর 'নিমন্ত্রণ-পত্র' বা 'Invitation-Card' এর জন্য যে ধরণের ঈষৎ-পুরু কাগজ ব্যবহার করা হয়, সেই ধরণের বড়-বড় খানকয়েক রঙীন কাগজ, একখানি ভালো কাঁচি, লাইন-টানবার জন্য একটি 'স্কেল-রুলার' (Scale-Ruler), একটি, ভালো পেন্সিল একখানি ক্ষুরের 'ব্লেড' (Razor-Blade), একটি পেন্সিলের দাগ-মোছবার 'Eraser' বা 'রবার', এবং বুরুষ বা তুলি সমেত একশিশি গঁদের আঠা অথবা কাগজের বুকে 'পিন্‌-আঁটবার ষ্টেপলার' (Stapler) যন্ত্র।

উপকরণগুলি জোগাড় হবার পর, কাগজের 'খুঞ্চিপোষ' রচনার কাজে হাত দেবার আগে প্রথমেই স্থির করে নেওয়া প্রয়োজন—'খুঞ্চিপোষগুলি', বড়-ছোট বা মাঝারি—কোন মাপের হবে। পছন্দমতো মাপ-অনুসারে আলাদা-আলাদা রঙের ক'খানি কাগজ বাছাই করে
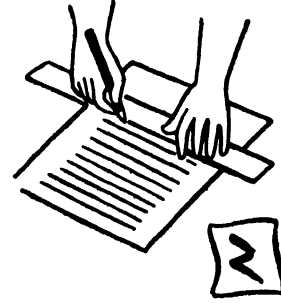
নিয়ে উপরের ২নং চিত্রের ভঙ্গীতে প্রত্যেকটি কাগজের বুকে পেন্সিল ও স্কেল-রুলারের সাহায্যে একের পর এক ফিতা-ছাঁটাইয়ের নিশানা রেখাগুলিকে আগাগোড়া সুচিহ্নিত করে ফেলুন। এ কাজের সময়, কাগজের চার-কিনারায় ১" ইঞ্চি পরিমাণ অংশ ছেড়ে রেখে প্রয়োজনমতো মাপ-অনুসারে স্কেল-রুলারের সাহায্যে ফিতা-ছাঁটাইয়ের প্রতিটি লাইনের মধ্যে বরাবর ½" ইঞ্চি মতো জায়গা ফাঁক দিয়ে পেন্সিলের এক-একটি 'নিশানা-রেখা, আঁকুন। প্রথম কাগজটির বুকে আগাগোড়া পেন্সিলের 'নিশানা-রেখা' চিহ্নিত করে নেবার পর, সন্তর্পণে ক্ষুরের ব্লেডখানিকে চালিয়ে প্রত্যেকটি 'রেখাকে' পরিপাটিভাবে চিরে ফেলতে হবে। প্রতিটী লাইনের কোথাও যেন এতটুকু অসমান-চিহ্ন না থাকে, সেদিকে বিশেষ নজর রাখা দরকার।

এবারে দ্বিতীয় কাগজখানির বুকে নীচের ৩নং চিত্রের

ভঙ্গীতে আগাগোড়া ½" ইঞ্চি অংশ ফাঁক রেখে 'স্কেল-রুলারের' সাহায্যে পেন্সিলের রেখা টেনে, কাগজের রঙীন-ফিতা ছাঁটাইয়ের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনমতো মাপ-

অনুসারে 'নিশানা-লাইনগুলিকে' একের পর এক সুচিহ্নিত করে নিন। এইভাবে পেন্সিলের রেখা-চিহ্নিত করে নেবার পর, প্রত্যেকটি লাইনের দাগে-দাগে পরিপাটিরূপে কাঁচি চালিয়ে দ্বিতীয় কাগজখানিকে ছেঁটে 'বুননের-ফিতাগুলিকে' (Weaving-Strips) রচনা করতে হবে। বলা বাহুল্য, এ ক্ষেত্রেও প্রত্যেকটি ফিতার কোথাও যেন এতটুকু অসমান-চিহ্ন না থাকে—সেদিকে সবিশেষ লক্ষ্য রাখবেন।

এমনিভাবে প্রথম কাগজখানিকে আগাগোড়া চেরাই এবং দ্বিতীয় কাগজখানিকে আগাগোড়া ছাঁটাই করে 'বুননের-ফিতা' রচনার পর, 'খুঞ্চিপোষ' বোনবার (Weaving the Strips) কাজে হাত দিতে হবে। 'খুঞ্চি-

পোষ' বোনবার সময়, উপরের ৪নং চিত্রে যেমন দেখানো হয়েছে, ঠিক তেমনি ভঙ্গীতে প্রথম-কাগজখানিকে সমতল জায়গায় রেখে, এক-এক ঘর অন্তর, চেরাই-করা-লাইনের ফাঁকে-ফাঁকে, দ্বিতীয়-কাগজখানি থেকে ছাঁটাই-করে-রাখা অন্য-রঙের এক-একটি ফিতা নিয়ে চ্যাটাই-বোনার ধরণে আগাগোড়া বুনে যেতে হবে। অর্থাৎ, বোনবার সময় প্রথম লাইনে রঙীন-কাগজের ফিতাটিকে 'একঘর তুলে এবং একঘর ছেড়ে'—বরাবর ঐ প্রথম-কাগজের 'চেরাই-করা-লাইনের' ভিতর দিয়ে সুষ্ঠুভাবে গেঁথে নিতে হবে। প্রথম লাইনটি গেঁথে শেষ করবার পর, এমনিভাবে ক্রমান্বয়ে বাকী লাইনগুলিকেও এক-একটি করে বুনে ফেলবেন।
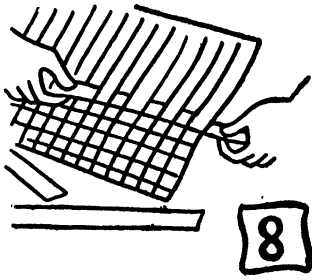
বিভিন্ন রঙের কাগজগুলিকে আগাগোড়া এভাবে বুনে ফেলবার পর, প্রত্যেকটি কাগজের-ফিতার প্রান্তে গঁদের আঠার প্রলেপ অথবা 'ষ্টেপ্লার' (Stapler) যন্ত্রের সাহায্যে 'পিন' (Pin) দিয়ে পাকাপোক্ত-ধরণে অপর-কাগজের অন্দর-দিকের কিনারার সঙ্গে জুড়ে দিলেই, অভিনব এই 'খুঞ্চিপোষ'-রচনার কাজ শেষ হবে।

এবারে এই বিচিত্র 'খুঞ্চিপোষটিকে' 'Waterproofing' অর্থাৎ 'জল-সিঞ্চিত হবার সম্ভাবনা-মুক্ত করার' ব্যবস্থা। এজন্য কাগজের 'খুঞ্চিপোষখানির' উপরে আগাগোড়া দু'তিন পোঁচড়া পাতলা 'Shellac' বা চাঁচ-গালার প্রলেপ লাগিয়ে ভালোভাবে বাতাসে রেখে শুকিয়ে নিলেই পাকাপোক্ত কাজ হবে এবং জিনিষটিও আর ঠাণ্ডা-গরমের ছোঁয়াচ লেগে সহজেই বিনষ্ট হয়ে যাবে না।

কাগজের বিচিত্র 'খুঞ্চিপোষ' বা 'Table- Mat' তৈরীর এই হলো মোটামুটি পদ্ধতি। বারান্তরে, এ ধরণের আরো কয়েকটি অভিনব কারুশিল্প-সামগ্রী রচনার হদিশ দেবো।

এমব্রয়ডারীর বিচিত্র নক্সা

সুলতা মুখোপাধ্যায়

আজকাল প্রায় প্রত্যেক সংসারেই বাড়ীর মেয়েরা দৈনন্দিন-কাজকর্মের অবসরে নিজেদের হাতে নানা ধরণের বিচিত্র-সৌখিন অপরূপ-কারুকলাময় সুচী-শিল্পের সামগ্রী বানিয়ে গৃহসজ্জার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে থাকেন। এজন্য তাঁরা সর্ব্বদাই নূতন-নূতন ছাঁদের অভিনব 'নক্সা' বা 'প্যাটার্ণের' অনুসন্ধান করেন। তাঁদের সেই চাহিদা মেটাবার জন্য, এবারে বিভিন্ন রঙের রেশমী-সুতো দিয়ে শাদা বা রঙীন কাপড়ের বুকে এমব্রয়ডারী-কাজ করবার উপযোগী বিচিত্র একটি সুচী-শিল্পের 'নক্সা' বা 'প্যাটার্ণ' (Pattern) পরপৃষ্ঠায় দেওয়া হলো।

এ নক্সাটি হলো—ডাল-পাতা ও কুঁড়ি সমেত কয়েকটি 'কাঠ-গোলাপ' (Wild Roses) ফুলের গুচ্ছ। রঙ-বেরঙের রেশমী সুতো দিয়ে এমব্রয়ডারী করে এ নক্সাটিকে অনায়াসেই পর্দা, বিছানা-ঢাকা, 'টেবিল ক্লথ' 'ট্রে-ক্লথ' (Tray-cloth), বালিশের ওয়াড় এবং 'কুশন-ঢাকা' (Cushion-cover) ভূষিত করার কাজে ব্যবহার করা চলবে। এ নক্সাটি এমব্রয়ডারী করতে হলে পাকা-রঙের

ও মজবুত-টেঁকসই ধরণের ভালো রেশমী-সুতো ব্যবহার করবেন এবং যে-কাপড়ের উপরে সূচী-শিল্পের কাজ করে

এ নক্সাটিকে ফুটিয়ে তুলবেন, সেটি যেন ঈষৎ-পুরু 'লিনেন (Linen) বা ঐ জাতীয় মোটা খশখশে (Thick and Matt type) ছাঁদের কাপড় হয়, সেদিকেও নজর রাখা প্রয়োজন। উপরের নক্সা-অনুসারে ডালপাতাগুলিকে আগাগোড়া এমব্রয়ডারী করতে হবে—গাঢ়-সবুজ (Deep Green) রঙের রেশমীসুতোয় ফুলের কুঁড়ি আর পাতাগুলিকে ফুটিয়ে তুলতে হবে—হালকা সবুজ (Light Green) রঙের রেশমী-সুতোর এবং ফুলের পাপড়িগুলির, 'বাইরের কিনারার' জন্য ব্যবহার করবেন—হালকা-গোলাপী (Light Pink) রঙের রেশমী-সুতো আর ভিতরের কিনারার জন্য—শাদা রঙের (White) রেশমী-সুতো। ফুলের রেণুর জন্য প্রয়োজন—গাঢ়-হলদে রঙের (Deep Yellow) রেশমী-সুতো এবং ফুলের রেণু-দলের মাঝখানে যে গোলাকার চক্রটি রয়েছে, সেটিকে এমব্রয়ডারী করতে হবে—গাঢ় লাল (Deep Red, Scarlet or Crimson) অথবা বাদামী রঙের (Brown) রেশমী সুতো দিয়ে।

নানা রঙের রেশমী-সুতো দিয়ে এমব্রয়ডারী কাজ করবার আগে, একটি কাগজের বুকে উপরের ঐ ফুল-পাতার নক্সাটিকে প্রয়োজনমতো ছোট বা বড় আকারে পরিপাটিভাবে এঁকে নিন। তারপর সেই প্রতিলিপি-আঁকা কাগজখানিকে কাপড়ের যে-অংশে নক্সা-রচনা করবেন, সেই জায়গায় বসিয়ে কাগজখানির নীচে এক টুকরো 'কার্ব্বন-পেপার Copying Carbon Paper রেখে, নক্সাটীকে পেন্সিলের রেখা টেনে নিখুঁতভাবে কাপড়ের গায়ে এঁকে নিন। এমনিভাবে কাপড়ের বুকে নক্সার প্রতিলিপিটিকে এঁকে নেবার পর, রঙীন রেশমী-সুতো দিয়ে এমব্রয়ডারীর কাজ সুরু করবেন। এ কাজের সময় সর্ব্বদাই মনে রাখবেন—সেলাইয়ের ছুঁচে (Embroidery Needle) যে রঙীন সুতোটী দিয়ে সূচীকার্য্য করবেন, সেই রঙের 'তিন-ফালি-সুতো' (Three Strands) পরিয়ে নিয়ে কাজ করতে হবে। আমাদের মতে, প্রথমেই ফুলগুলিকে এমব্রয়ডারী করে নেওয়া ভালো। সুতরাং উপরোল্লিখিত বিভিন্ন রঙের রেশমী-সুতো ব্যবহার করে 'লং-ষ্টিচ' (Long Stitch) এবং 'শর্ট-ষ্টিচ' (Short Stitch) পদ্ধতিতে সূচী-কার্য্য চালিয়ে প্রত্যেকটি ফুলের বাইরের ও ভিতরের কিনারা এমব্রয়ডারী করুন। তারপর উপরোক্ত রঙের রেশমী-সুতোর সাহায্যে 'সাটীন-ষ্টিচ' (Satin Stitch) পদ্ধতিতে ফুলের রেণু-দলের মাঝখানে যে গোলাকার চক্রগুলি রয়েছে সেগুলিকে একের পর এক এমব্রয়ডারী করে ফেলুন। এবারে উপরের নির্দ্দেশানুসারে পছন্দমতো রঙীন রেশমী-সুতো দিয়ে 'রানিং-ষ্টিচ' (Running Stitch) পদ্ধতিতে এমব্রয়ডারী কাজ করে ফুলের রেণুগুলিকে ফুটিয়ে তুলুন।

ফুলগুলির সূচী-কার্য্য শেষ হলে, হাল্কা সবুজ-রঙের রেশমী সুতো দিয়ে 'সাটিন-ষ্টিচ (Satin Stitch) পদ্ধতিতে গাছের পাতা আর ফুলের কুঁড়িগুলিকেএমব্রয়ডারী করে ফেলুন। এবারে গাঢ় সবুজ রঙের রেশমী-সুতো দিয়ে গাছের ডালপালা আর পাতার শিরাগুলিকে 'ষ্টেম্ ষ্টিচ' (Stem Stitch) পদ্ধতিতে এমব্রয়ডারী করে নিলেই, সূচী-শিল্পের কাজ সাঙ্গ হবে।

এই হলো, রঙীন রেশমী সুতো দিয়ে উপরের বিচিত্র নক্সাটিকে এমব্রয়ডারী করবার মোটামুটি কৌশল।

বারান্তরে, এ ধরণের আরো কয়েকটী এমব্রয়ডারী সূচী-শিল্পের বিচিত্র নক্সার নমুনা দেবার বাসনা রইলো।

——

সুধীরা হালদার

এবারে দক্ষিণ-ভারতের পরম-মুখরোচক বিশেষ জনপ্রিয় একটি আমিষ-রান্নার কথা জানাচ্ছি। ভারতবর্ষের দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীরা প্রধানতঃ নিরামিষভোজী হলেও, এ প্রদেশে মাছ, মাংস এবং ডিমের নানা রকম উপাদেয় আমিষ-খাবারেরও প্রচলন আছে। এ সব বিচিত্র-সুস্বাদু আমিষ-রান্নাগুলি আজ শুধু দক্ষিণাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ নেই, সারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেও রীতিমত সমাদর লাভ করেছে। দক্ষিণ-ভারতের এই সব বিচিত্র-অভিনব আমিষ-খাদ্যের মধ্যে—'মালাবার-কারীর' (Malabar Curry) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দেশী ও বিদেশী সমাজের খাদ্য-রসিক মহলেও এ খাবারটির রীতিমত চাহিদা ও সুখ্যাতি আছে। আজ তাই জনপ্রিয় এই দক্ষিণ-ভারতীয় আমিষ-খাবার 'মালাবার-কারী' রন্ধন-প্রণালীর মোটামুটি আভাস দিয়ে রাখি।

মালাবার-কারী ঃ

'মালাবার-কারী' রান্নার জন্য যে সব উপকরণ প্রয়োজন, গোড়াতেই তার একটা মোটামুটি ফর্দ্দ জানিয়ে রাখি। এ খাবারটি রান্নার জন্য চাই—আধসের মুরগী, ছাগল অথবা ভেড়ার মাংস, একটি নারিকেল, চার-পাঁচটি আলু, চার-পাঁচটি পেঁয়াজ, আদার টুকরো, তিন-কোয়া রসুন, দু'তিনটি কাঁচা লঙ্কা, এক চায়ের চামচ চালের গুঁড়ো, এক চায়ের চামচ ধনে, আধ চায়ের চামচ জীরা, আধ চায়ের চামচ হলুদ, আধ চায়ের চামচ সরষে, চার চায়ের চামচ 'ভিনিগার' (Vinegar) বা 'সির্কা', এবং বড় চামচের এক চামচ ভালো ঘি বা মাখন। উপরে যে ফর্দ্দ দেওয়া হলো, সেই ফর্দ্দের হিসাব-অনুসারে, প্রায় পাঁচ-ছয়জনের মতো খাবার রান্না করা যাবে...তবে আরো বেশী লোকের জন্য 'মালাবার কারী' বানাতে হলে—উপরোক্ত পরিমাণ-অনুসারে বাড়তি উপকরণ সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে হবে—সে কথা বলাই বাহুল্য!

এ সব উপকরণ সংগ্রহ হবার পর, রান্নার পালা। কিন্তু সে কাজ সুরু করবার আগে, মাংসটিকে প্রয়োজনমতো টুকরো-টুকরো করে কেটে পরিষ্কার জলে ভালোভাবে ধুয়ে নিন। তারপর রান্নার মশলা অর্থাৎ ধনে, সরষে, হলুদ আর জীরা বেশ করে বেটে মণ্ডের (Pulp) মতো করে রাখুন। এবারে পেঁয়াজ, লঙ্কা, আদা, ও রসুন বেশ মিহি করে কুচিয়ে ফেলুন এবং নারিকেলটিকে ভালোভাবে কুরে, সেই কোরা-নারিকেল নিঙড়ে, চায়ের পেয়ালার তিন পেয়ালা পরিমাণ 'দুধ' বা রস (Cocoanut Milk) বার করুন! এ কাজের পর আলুগুলিকে ছাড়িয়ে দু'টুকরো করে কেটে নিন।

এ পর্ব্ব চুকলে, উনানের আগুনের আঁচে রন্ধন-পাত্র চাপিয়ে ঘি বা মাখন দিয়ে রান্নার ঐ কুচানো মশলাগুলিকে প্রায় মিনিট পাঁচেককাল ভালো করে ভেজে ফেলুন। মশলাগুলি ভাজা হলে উনানের আঁচে বসানো রন্ধন-পাত্রের মধ্যে নারিকেলের 'দুধ' বা 'রস' (Cocoanut Milk) এবং চালের গুঁড়ো বাদে, বাকী উপকরণগুলি অর্থাৎ মাংসের ও আলুর টুকরো প্রভৃতি ঢেলে দিয়ে, কিছুক্ষণ ভালো করে 'কষে' নিন। মাংসটিকে আগাগোড়া সুষ্ঠু-ভাবে 'কষে' নেবার পর, রন্ধন-পাত্রে চালের গুঁড়ো, বাকী নারিকেল-কোরা আর নারিকেলের 'দুধ' বা 'রসটুকু' ঢেলে মিশিয়ে দিন। এবারে মাংস আর আলুর টুকরো-গুলি বেশ নরম ও সুসিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত রন্ধন-পাত্রটিকে উনানের আঁচে বসিয়ে রেখে রান্নার কাজ করে চলুন।

এইভাবে রান্নার ফলে, কিছুক্ষণ বাদে মাংসের টুকরো-গুলি নরম ও সুসিদ্ধ হয়ে গেলে, যদি দেখেন যে 'ঝোল' বা 'কারী' (Curry) খুব বেশী ঘন-থকথকে হয়ে উঠেছে, তাহলে রন্ধন-পাত্রে আন্দাজমতো পরিমাণে সামান্য গরম জল মিশিয়ে দিয়ে আরো অল্প একটু সময় উনানের আঁচে ফুটিয়ে নিলেই রন্ধন-কার্য্য শেষ হবে।

এবারে উনানের উপর থেকে রন্ধন-পাত্রটিকে সাবধানে

নামিয়ে নিয়ে, অন্ত একটি পরিষ্কার ডেক্‌চি বা গামলাতে খাবারটিকে ঢেলে রাখুন। তাহলেই দক্ষিণ-ভারতের বিচিত্র উপাদেয় আমিষ-খাদ্য-'মালাবার-কারী' রান্নার পালা চুকবে। এখন পরম-মুখরোচক অভিনব এই রান্নাটি পরিপাটিভাবে পরিবেষণ করুন, আপনার প্রিয়জনদের পাতে —তাঁরা এই রসনাসুখকর সুস্বাদু খাবারটি খেয়ে যে বিশেষ পরিতৃপ্তি লাভ করবেন, সে কথা বলাই বাহুল্য।

পরের মাসে এ ধরণের আরো কয়েকটি বিচিত্র-অভিনব উপাদেয় ভারতীয়খাবার রান্নার বিষয় জানাবার বাসনা রইলো।

........? শিল্পী—পৃথ্বী দেবশর্ম্মা
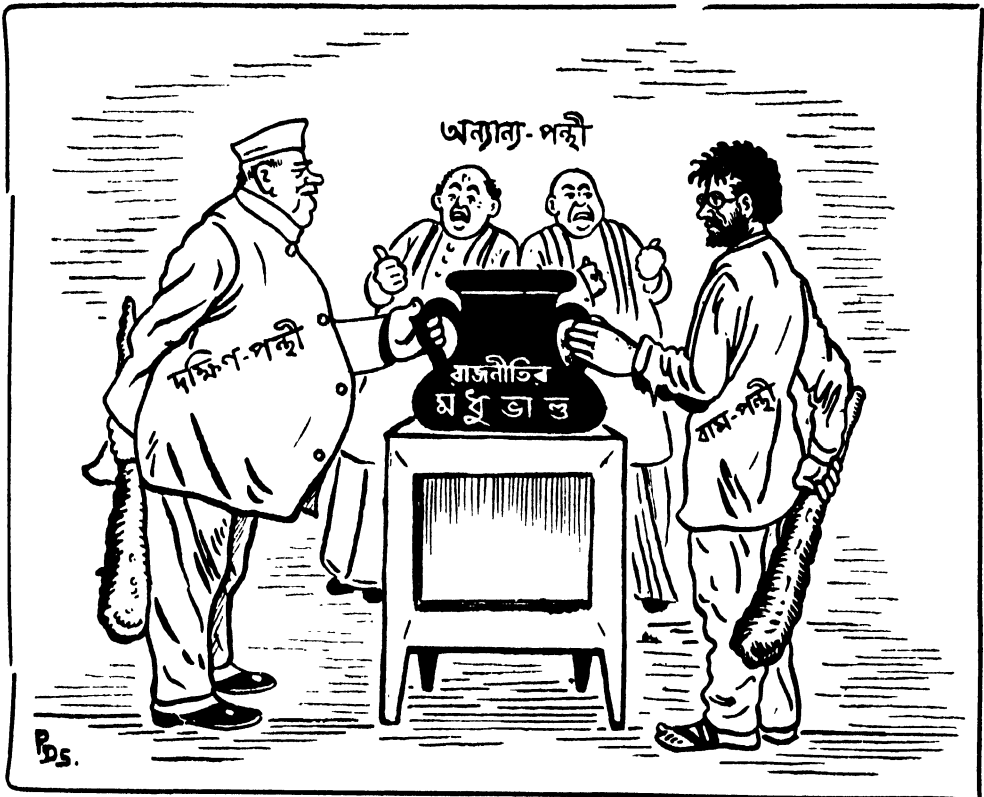
শ্রীনেহরুকে হত্যার চেষ্টা—

গত ৩রা মে রাষ্ট্রপুঞ্জের অধিবেশনে কাশ্মীর প্রসঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনা কালে ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীভি.কে. কৃষ্ণমেনন বলেন—ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু যখন কুলুতে অবসর যাপনের জন্য যান, তখন পাকিস্তানী গুপ্তচর দ্বারা তথায় তাঁহাকে হত্যা করার চেষ্টা হইয়াছিল। সেই পাকিস্তানী গুপ্তচরকে গ্রেপ্তার করিয়া দণ্ডিত করা হইয়াছে। এই সংবাদ শুনিয়া রাষ্ট্র সংঘের সভায় উপস্থিত সকল সদস্য চমকাইয়া উঠেন। পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ কতহীন হইয়াছে তাহা এই সংবাদে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার পর পাকিস্তান শাসকদের প্রতি ভারতীয়দের মনোভাব কিরূপ হইয়াছে, তাহা সহজে অনুমান করা যায়।

অধ্যাপক সুহৃদ চন্দ্র মিত্র—

বিশিষ্ট বাঙ্গালী মনস্তত্ত্ববিদ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক ডঃ সুহৃদচন্দ্র মিত্র গত ৪ঠা মে শুক্রবার শেষ রাত্রে ৬৭ বৎসর বয়সে কলিকাতায় পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার পত্নী ও একমাত্র কন্যা বিদ্যমান। তিনি ১৮৯৫ সালে কলিকাতার এক খ্যাতিমান পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯১৯ সালে এম-এ পাশ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হন ও ১৯২৬ সালে জার্মাণী হইতে ডক্টর উপাধি লাভ করেন। তিনি সাইকো-এনালিসিস বিষয়ে ১৯৫৯ পর্যন্ত অধ্যাপনা করিয়াছেন ও মনোবিদ্যা বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন সারাজীবন তিনি মনোবিদ্যা সম্বন্ধে বহু বাংলা ও ইংরাজি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন ও ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে নেতৃত্ব করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে একজন ঐ বিষয়ে বিশেষজ্ঞের অভাব হইল।

শ্রীসুধীরচন্দ্র ঘোষ—

২৪ পরগণার বেলঘরিয়াস্থ ইণ্ডিয়া পটারীজ লিমিটেড ও ভারত পটারীজ লিমিটেডের কর্ণধার শ্রীসুধীরচন্দ্র ঘোষ, বি, এস, সি ; এল, এল, বি ১৯৬২-৬৩ সালের জন্য নিখিল ভারত পটারী উৎপাদক সমিতির সভাপতি পুনঃনির্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীঘোষ ১৯৪৬ সাল হইতে পটারী শিল্পের সঙ্গে যুক্ত আছেন এবং প্রতিষ্ঠান দুইটির কর্ণধার হিসাবে বহু বাঙ্গালী যুবকের অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা করিতেছেন।

শ্রীসুধীরচন্দ্র ঘোষ
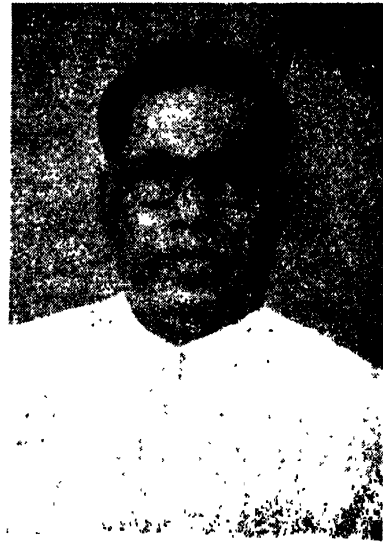
পটারী শিল্প ছাড়াও তিনি চিনি, কাপড়ের কল প্রভৃতি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত আছেন। শ্রীঘোষ ১৯৩২ সাল হইতে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত রাজবন্দী ছিলেন। স্বীয় প্রতিভা ও অসাধারণ কর্মতৎপরতার গুণে শ্রীঘোষ আজ শিল্পক্ষেত্রে শীর্ষস্থানে উঠিতে পারিয়াছেন। শ্রীঘোষের বর্তমান বয়স ৫৫ বৎসর, তিনি অবিবাহিত। আমরা তাঁহার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি কামনা করি।

কাশ্মীরের উপর হস্তক্ষেপ—

গত ৭ই মে দিল্লীতে লোকসভায় প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু ঘোষণা করেন—পাক অধিকৃত কাশ্মীর ও চীনা-সিংকিয়াং-এর মধ্যে সীমানা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে আলো-

চনার জন্য পাক-চীন ঘোষণার দ্বারা চীন ও পাকিস্তান কাশ্মীরের উপর ভারতের সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। সমগ্র কাশ্মীর রাজ্য ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ—কাজেই সীমানা সম্পর্কে চীন ও পাকিস্তান কোন ব্যবস্থা করিলে ভারত তাহা স্বীকার করিবে না। শ্রীনেহরু গতবার যখন পাকিস্তানে যান; তখন পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া ছিলেন। সে যাহা হউক, চীন কর্তৃপক্ষ যেমন ভারতের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছে—পাকিস্তান কর্তৃপক্ষও তেমনই চীনের সহায়তায় ভারতের সহিত যুদ্ধ করিতে ব্যগ্র হইয়াছে। এ অবস্থায় ভারতের পক্ষেও যুদ্ধ না করিয়া বসিয়া থাকা চলিবে না। পাকিস্তান প্রায় প্রত্যহ ভারত রাষ্ট্রের জমী ও নানাবিধ সম্পত্তি কাড়িয়া লইতেছে। এ অবস্থায় শ্রীনেহরু কেন যে এখনও কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই, তাহা বুঝা কঠিন। এ বিষয়ে ভারত রাষ্ট্রের মনোভাব সর্বসাধারণ জানিতে না পারিলে তাহারা শান্তি পাইবে না।

বিধান পরিষদের নির্বাচন—

পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভার সদস্যগণ গত ২৪শে এপ্রিল নিম্নলিখিত ৯ জনকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিধান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত করিয়াছেন—(১) মহম্মদ সৈয়দ মিয়া—কংগ্রেস (২) সুধীর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—কংগ্রেস (৩) রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীআশুতোষ ঘোষ—কংগ্রেস (৪) মনোরঞ্জন গুপ্ত—কংগ্রেস (৫) পরিষদের সহকারী অধ্যক্ষ ডঃ প্রতাপচন্দ্র গুহরায়—কংগ্রেস (৬) শ্রীকৃষ্ণকুমার চট্টোপাধ্যায়—কংগ্রেস (৭) সুবোধ সেন—কমুনিষ্ট (৮) যতীন চক্রবর্তী—আর-এস-পি (৯) অমর প্রসাদ চক্রবর্তী—ফরোয়ার্ড ব্লক। শ্রীনিকুঞ্জ বিহারী মাইতি বিনাবাধায় রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন—তিনি নিজে প্রাক্তন মন্ত্রী ও পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মন্ত্রী শ্রীযুক্তা আভা মাইতির পিতা। মেদিনীপুর স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কেন্দ্র হইতে ডাঃ রাস বিহারী পাল বিনা বাধায় বিধান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন আমরা সকলকে অভিনন্দিত করি।

পাকিস্তান হইতে হিন্দু বিতাড়ন—

কিছুদিন পূর্বে মালদহ জেলায় একটি হিন্দু মিছিল মুসলমান জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হইলে তাহা লইয়া মালদহে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা আরম্ভ হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, মালদহ জেলা পূর্ব পাকিস্তানের সন্নিহিত, কাজেই গত কয় বৎসর ধরিয়া পূর্ব পাকিস্তান হইতে বহু মুসলমান বেআইনী ভাবে মালদহে প্রবেশ করিয়া তথায় বসবাস করিতেছে ও ফলে মালদহ জেলায় মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা খুব বাড়িয়া গিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃপক্ষ ইহা জানিয়াও ইহার প্রতীকারের কোন ব্যবস্থা করেন নাই। সরকারী কর্তৃপক্ষ তৎপরতার সহিত কঠোর ভাবেই মালদহের গোলমাল বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার পর পূর্ব পাকিস্তানের সংবাদপত্র সমূহে মালদহের হাঙ্গামা সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত মিথ্যা সংবাদ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়—মুর্শিদাবাদ জেলায় কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা না হইলেও ঢাকার সংবাদপত্র সমূহে প্রকাশিত হয় যে মুর্শিদাবাদ জেলায় দাঙ্গায় বহু মুসলমান নিহত হইয়াছে। মালদহ সম্বন্ধে বহু মিথ্যা সংবাদ প্রকাশিত হইলে ঢাকা, রাজসাহী, মৈমনসিংহ, খুলনা প্রভৃতি জেলাতে মুসলমান অধিবাসীরা হিন্দুদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করে—বহু গৃহ লুণ্ঠিত হয়, বহু গৃহে অগ্নিসংযোগ করা হয়, বহু হিন্দু নারী অপহৃত ও ধর্ষিত হয় ও শেষ পর্যন্ত বহু হিন্দু খুন হইয়াছে। এই ভাবে সারা পূর্ব পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এমন ভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে যে তথায় হিন্দুদের পক্ষে বাস করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। সেখানকার পাসপোর্ট কর্তৃপক্ষ হিন্দুদিগকে পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করার অনুমতি দিতেছে না—ফলে বেআইনীভাবে নৌকাযোগে বহু হিন্দু পরিবার রাজসাহী হইতে মুর্শিদাবাদে ও খুলনা হইতে ২৪ পরগণায় চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে। তাহাদের রক্ষার ব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বিব্রত হইতে হইতেছে। এখন পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ এরূপ দাঙ্গা বন্ধ করিবার কোন উপায় অবলম্বন করেন নাই। যে সকল হিন্দু গত ১৫ বৎসর ধরিয়া নানা অপমান, অসুবিধা ও কষ্টভোগ করিয়া গৃহ ও সম্পত্তির লোভে পাকিস্তানে বাস করিতেছিল, তাহারা চলিয়া আসিলে মুসলমানগণ তাহাদের সম্পত্তি বিনামূল্যে পাইয়া ভোগ দখল করিবে—ইহাও হাঙ্গামা সৃষ্টির অন্যতম মূল কারণ। এ অবস্থায় ভারত কর্তৃপক্ষ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানের একদল মুসলমান অধিবাসী গত ১৫ বৎসরে দেশত্যাগী হইয়া পশ্চিমবঙ্গে ও আসামে

চলিয়া আসিয়াছে। তাহাদের মনোভাব যাহাই হউক না কেন, মানবতার দিক দিয়া ভারত কর্তৃপক্ষ তাহাদের রক্ষা করার ব্যবস্থা করিয়াছে। তাহার উপর সম্প্রতি যে ভাবে ও যেরূপ অধিকসংখ্যায় পূর্ববঙ্গ হইতে হিন্দুরা চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে তাহাদের পুনর্বাসনের আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করা সুকঠিন বলিয়া মনে হইতেছে। অনেকে মনে করেন, পাকিস্তানের সহিত যুদ্ধ হইলে সহজে এ সকল সমস্যার সমাধান হইয়া যাইত।

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়—

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় আই-সি-এস পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উন্নয়ন কমিশনার ছিলেন। তিনি গত ৮ই মে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে কবিগুরুর পৈতৃক গৃহে অবস্থিত রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার-রূপে কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া তিনি বলেন—রবীন্দ্রনাথ সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের পূজারী ছিলেন—নূতন বিশ্ববিদ্যালয় সঙ্গীত, নাটক, নৃত্য ও চিত্রকলার গবেষণা দ্বারা সে আদর্শ প্রচার করিবে। আপাততঃ নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা-বিভাগ খোলা হইবে—ক্রমে বিজ্ঞান বিভাগ খোলারও ব্যবস্থা হইবে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় 'বিশ্বভারতীর পরিপূরক হিসাবে কাজ করিবে। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় সুপণ্ডিত এবং শাসন কার্যে অভিজ্ঞ। তাঁহার মত যোগ্য-ব্যক্তির উপর রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যভার ন্যস্ত হওয়ায় সকলেই আনন্দিত।

ঢাকায় নাগা-নেতা ফিজো—

নাগা বিদ্রোহের নেতা ফিজো গত ৫ই মে লণ্ডন হইতে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় আসিয়া পৌছিয়াছেন। বহু নাগা বিদ্রোহী আসাম হইতে পলাইয়া পূর্বেই পূর্ব পাকিস্তানে আসিয়াছেন। ফিজো ঢাকায় আসিয়া তাহার বিশ্বাসী অনুচর কাইডোর সহিত মিলিত হইয়াছেন। গত ১লা মে বহু বিদ্রোহী নাগা ভারত সীমান্ত অতিক্রম করিয়া পাকিস্তানে গিয়াছে। পাক-নেতারা নাগা-নেতাদের সহিত পরামর্শ করিয়া ভারত আক্রমণের চেষ্টায় আছে। এই পরিস্থিতি সম্বন্ধে গত ৭ই মে শিলং-য়ে এক উচ্চ পর্যায়ের আলোচনা বৈঠক হইয়াছে। বিদ্রোহী নাগাদের দমন করিবার জন্য ভারত কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত ব্যবস্থায় মন দিয়াছে। ভারত এখন চারিদিক দিয়া বিপন্ন—চীন ও পাকিস্তান ভারতের বিরোধী—বহু ছোট ছোট দল চীন-পাকিস্তানের সহিত মিলিত হইয়া ভারতের শত্রুতা করিতে উৎসুক। ভারত কর্তৃপক্ষ কি শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ এড়াইয়া চলিতে সমর্থ হইবেন?

নেপাল-ভারত আলোচনা—

নেপালের রাজা মহেন্দ্র দিল্লীতে আসিয়া ৫ দিন ধরিয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সহিত নেপাল-ভারত সমস্যার আলোচনা করিয়াছেন। আলোচনার পর ২৩শে এপ্রিল শ্রীনেহরু ও মহেন্দ্রের এক যুক্ত বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে! ঐ বিবৃতি সকলকে হতাশ করিয়াছে—কারণ নেপালের সহিত ভারতের সমস্যাগুলির সমাধানের কোন ব্যবস্থা তাহাতে নাই। নেপালে যে ভারত-বিরোধী প্রচার কার্য চলিতেছে তাহা রাজা মহেন্দ্রকে জানানো হইলেও কোন ফল হয় নাই। কাঠমুণ্ডু-লাসা সড়ক সম্বন্ধে ভারতের ভুল ধারণাও দূর করার ব্যবস্থা হয় নাই। এইরূপ পররাষ্ট্র ব্যাপারে মত প্রকাশ করা কঠিন হইলেও একথা বিবৃতি হইতে বুঝা যায় যে—এতদিন নেপালের সহিত ভারতের যে মৈত্রীর সম্পর্ক ছিল তাহা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে যদি কোন যুদ্ধ হয়, তখন নেপালের সাহায্য লাভ করা সহজ হইবে না।

পাকিস্তানের দুরভিসন্ধি—

পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ তাহাদের রাজ্যে যে মানচিত্র প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে জলপাইগুড়ি জেলার হলদীবাড়ী থানা পাকিস্তানের রাজ্য বলিয়া দেখাইয়াছেন। শুধু পূর্ব-পাকিস্তানের এরূপ অন্যায় মানচিত্র তৈয়ার করা হয় নাই—পশ্চিম পাকিস্তানের মানচিত্রে জুনাগড় ও মানভাডার রাজ্য এলাকা পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্গত বলিয়া দেখানো হইয়াছে। এই ভাবে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ কত যে মিথ্যা প্রচার করিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। ইহার জবাব কি—তাহাই বিচারের বিষয়।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম—

গত ৩রা মে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু দিল্লীর রাজ্যসভায় পাকিস্তান কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করিয়া দিয়া দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলিয়াছেন—পাকিস্তান যদি হুমকী মত কাশ্মীরে উপজাতীয়দের আক্রমণ করে, তাহা হইলে সর্বাত্মক যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। পাকিস্তান রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা

পরিষদে যে চীৎকার, গালি গালাজ করিয়া সত্যকে বিকৃত করিয়াছে, তাহা দ্বারা সে কোনরূপ লাভবান হইবে না। সে আমেরিকার নিকট আরও সামরিক সাহায্য লাভের জন্য ঐরূপ চীৎকার করিয়াছে। ভারত সে জন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়া আছে। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে পাকিস্তান সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে বটে, কিন্তু সে ক্ষতির কথা তাহারা চিন্তা করে না। ভারত যুদ্ধে লিপ্ত হইলে তাহার সকল গঠন-কার্য বন্ধ হইয়া যাইবে বলিয়া ভারতকে যুদ্ধের সুযোগ পাইয়াও ইতস্তত করিতে হইতেছে। তবে ভারত যে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে, তাহা পাকিস্তানেরও অজ্ঞাত নহে।

জাল আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট—

কলিকাতা পুলিসের জালিয়াতী-নিরোধ বিভাগ গত ২৮শে এপ্রিল শনিবার জাল আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট তৈয়ারীর একটি অফিসের খোঁজ পাইয়া কয়েকজনকে ঐ সম্পর্কে গ্রেপ্তার করিয়াছে। নেতাজী সুভাষ রোডের একটি অফিস হইতে ঐ জাল পাসপোর্ট দেওয়া হইত এবং চেতলার একটি বাড়ীতে সেগুলি তৈয়ার করা হইত। মানুষ কত নীচ হইলে এই ভাবে জাল পাসপোর্ট তৈয়ার করিয়া দেশের সর্বনাশ করে তাহা চিন্তার অতীত। এক দল মানুষ অর্থা-র্জনের জন্য কোনরূপ অন্যায় কাজ করিতে পিছপাও হয় না; তাহাদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা না হইলে দেশ কখনই উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে না। আজ চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রকেই স্বার্থশূন্য হইয়া এই কাজের প্রতিবাদ করিতে হইবে এবং সরকারী কর্তৃপক্ষ যাহাতে কঠোরতার সহিত এই দুর্নীতি দমন করে, সে জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করিতে হইবে।

পাক অধিকারে ভারতীয় এলাকা—

গত ৩রা মে দিল্লীতে রাজ্য সভায় শ্রীমতী লক্ষ্মী মেনন জানাইয়াছেন যে—পাকিস্তান ভারতীয় ইউনিয়নের জম্মু কাশ্মীর এলাকায় মোট ৩২২৮৩ বর্গ মাইল এলাকা বল-পূর্বক দখল করিয়া আছে। ঐ এলাকায় পাকিস্তান সামরিক ঘাটিও নির্মাণ করিয়াছে—তবে নিরাপত্তার খাতিরে সে সংবাদ প্রকাশ করা যায় না।

রাশিয়া কর্তৃক ভারতের পক্ষ সমর্থন—

৪ঠা মে রাষ্ট্রপুঞ্জের অধিবেশনে বক্তৃতাকালে রাশিয়ার প্রতিনিধি কাশ্মীরের ব্যাপারে ভারতকে পূর্ণ ভাবে ও বিনা সর্তে সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলেন—১৪ বৎসর পূর্বে কাশ্মীরে গণভোট করা যাইত। কিন্তু পাকিস্তান কোন সর্তে সম্মত না হওয়ায় এখন গণভোটের দাবী তামাদি হইয়া গিয়াছে। কাশ্মীর ভারতরাজ্যের একটি অংশ—কাজেই পাকিস্তান সেখানে কিছু করিলে রাশিয়া তাহা বরদাস্ত করিবে না। রাশিয়ার এই ভাষণের পর রাষ্ট্রপুঞ্জে কাশ্মীর আলোচনার কোন ফল নাই।

নূতন রাষ্ট্রপতি—

ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডক্টর শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ ১০ বৎসরেরও অধিককাল কার্য করিবার পর অবসর গ্রহণ করায় তাঁহার স্থলে উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন গত ১৩ই মে নূতন রাষ্ট্রপতির কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণন খ্যাতনামা দার্শনিক ও অধ্যাপক—তিনি তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য সারা পৃথিবীতে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণনের স্থানে ডঃ জাকীর হোসেন উপরাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হইয়াছেন—ডঃ হোসেন সম্প্রতি বিহারে রাজ্যপাল ছিলেন—তিনিও অধ্যাপকরূপে কর্ম-জীবন আরম্ভ করেন এবং গত ৪২ বৎসরকাল গান্ধীজির সহকর্মীরূপে দিল্লীর একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন। ধর্ম-নিরপেক্ষ ভারতে ডঃ হোসেনের মত একজন সুপণ্ডিত ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় মুসলমান উপরাষ্ট্রপতি হওয়ায় সকলেই আনন্দিত হইবেন। রাধাকৃষ্ণন গত ১০ বৎসর উপরাষ্ট্রপতির কাজ করিয়া সর্বত্র রাজনীতিবিদ্ বলিয়াও খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

সুধীররঞ্জন সেন—

গত ২৩শে বৈশাখ রবিবার রাত্রে কবিরাজ সুধীররঞ্জন সেন পঞ্চতীর্থ কলিকাতায় ৫৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। বরিশাল জেলার গুঠিয়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত বৈদ্যবংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসের নেতৃত্বে ১৯২১ সালে পাঠ্যাবস্থায় তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া কয়েকবার কারাবরণ করেন। ১৯৪২ সালে স্বগৃহে তিনি অন্তরীণ ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি ন্যাশন্যাল মেডিক্যাল কলেজ হইতে ডাক্তারী পাশ করিয়া এল, এম, এস এবং

সংস্কৃত শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখায় পঞ্চতীর্থ উপাধি লাভ করেন। কলিকাতা বেতার কেন্দ্র হইতে এবং বাঙলার বাহিরেও বিহার পাঞ্জাব প্রভৃতি বহু স্থানে তিনি গীতা ও চণ্ডীর সুললিত ব্যাখ্যা করিয়া যথেষ্ট সুনাম লাভ করেন। তিনি আজীবন যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ কলেজ ও শ্যামাদাস বৈদ্যশাস্ত্রপীঠে অধ্যাপনা কার্যে নিযুক্ত ছিলেন।

স্কুল ফাইনালের পাঠ্য-তালিকা—

৩রা এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ যে, পশ্চিমবঙ্গের মধ্য-শিক্ষা পর্ষদ ১৯৬৫ সাল হইতে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার পাঠ্য-তালিকা সংশোধন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে উচ্চ মাধ্যমিকের ন্যায় স্কুল ফাইনালেও পাঠ্য-তালিকায় হিউম্যানিটিজ (কলা), বিজ্ঞান, কারীগরী, কৃষি, বাণিজ্য এবং মেয়েদের জন্য বিশেষ পাঠ্য—এই কয়টি ভাগে ভাগ করা হইবে। বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক ও স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার পাঠ্য তালিকায় যে বিরাট পার্থক্য হইয়াছে, তাহা দূর করাই নূতন সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য। কত দিনে সকল স্কুল-ফাইনাল বিদ্যালয়কে উচ্চ-মাধ্যমিকে উন্নীত করা হইবে, তাহার স্থিরতা নাই। কাজেই এই নূতন ব্যবস্থা দ্বারা পার্থক্য দূর করা একান্ত প্রয়োজন। সত্বর যাহাতে এ ব্যবস্থা কার্যে পরিণত হয়, সে জন্য মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নূতন পরিচালককে আমরা এ বিষয়ে অবহিত হইতে অনুরোধ করি।
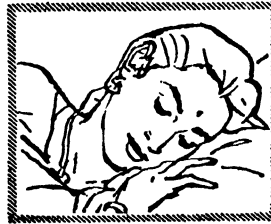
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ডাকতে হলনা। আগন্তুকদের পায়ের শব্দ পেয়ে প্রবোধবাবু নিজেই এগিয়ে এলেন। চিন্ময়কে যে তিনি চেনেন তা তাঁর ঠোঁটের মৃদু হাসিতে বোঝা গেল। কালো শীর্ণ দীর্ঘাকার চেহারা। বেশে বাসে কোন রকম আড়ম্বর নেই। পরণে খদ্দরের ধুতি। গায়ে একটা শাদা ফতুয়া। পায়ে চটি। মাথার চুল বিশেষ পাকেনি। উৎপল ভালো করে লক্ষ্য করল। শুধু রুক্ষ রেখাসঙ্কুল মুখ দেখলে বোঝা যায় বয়স হয়েছে। চোখের দৃষ্টি সাধারণ স্বাভাবিক। একটু বরং নিষ্প্রভ। এঁর হাতে হয়তো একদিন আগ্নেয়াস্ত্র ছিল, মুখে অগ্নিময়ী বাণী। কিন্তু এই শান্ত নিরীহ ভদ্রলোককে দেখে সেই ভাস্বর পুরুষকে আজ কল্পনা করা শক্ত।

প্রবোধবাবু বললেন—'এসেছ চিন্ময়। তুমি কোন মফ:স্বল কলেজে যেন আছ আজকাল? কবে এলে কলকাতায়।' চিন্ময় বলল 'কাল। আমার এই বন্ধুটির সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই। এর নাম উৎপল সেন—লেখক। আর ওঁর কথাতো তোমাকে আগেই বলেছি—ইনি আমার কাকাবাবু।'

উৎপল একটু নত হয়ে নমস্কার জানাল। বিনিময়ে প্রবোধবাবুও একটু হাত তুললেন। ওঁর মুখের গাম্ভীর্য দেখে উৎপলের মনে সংশয় হল উনি হয়তো পদস্পর্শ প্রত্যাশা করেছিলেন। প্রবীণ প্রখ্যাত ব্যক্তি। পায়ে হাত দিলেও দোষের হতনা। হয়তো তাতে কার্যোদ্ধারে সুবিধে হত।

'চলুন ঘরে গিয়ে বসি।'

প্রবোধবাবু তাদের দুজনকে নিয়ে পাশের ঘরে ঢুকলেন।

দেয়াল ঘেঁষে গোটা ছয়েক বইয়ের আলমারি। বেশির ভাগই রাজনীতি অর্থনীতির বই। কিছু দর্শন আর ধর্মতত্ত্বও আছে। সামনে একখানা টেবিল। পিছনের গদি আঁটা চেয়ারটিতে প্রবোধবাবু নিজে বসলেন, সামনে যে শক্ত কাষ্ঠাসনগুলি ছিল সেগুলি অতিথিদের দেখিয়ে দিলেন। একটি ছোকরা চাকর এসে ফ্যান খুলে দিয়ে আদেশের প্রত্যাশায় দাঁড়াল।

প্রবোধবাবু তাকে বললেন, 'দুকাপ চা নিয়ে এসো শ্যাম।' চিন্ময় একটু অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে বলল, 'দু কাপ কেন কাকাবাবু। আপনি খাবেন না!'

প্রবোধবাবু বললেন, 'আমি একটু আগে খেয়েছি। বেশি চা আজকাল আর সহ্য হয় না। তারপর তোমার খবর কি বল। আচ্ছা চল, তোমার কাজের কথাটাই আগে সেরে নিই। তারপর তোমার বন্ধুর সঙ্গে এসে আলাপ করব। আমাকে আবার পাঁচটায় বেরোতে হবে।' একবার হাত ঘড়িটির দিকে তাকালেন।

উৎপল উঠতে যাচ্ছিল প্রবোধবাবু বললেন—'না না আপনি বসুন। আমরা ওদিকে যাচ্ছি।

চিন্ময়কে নিয়ে প্রবোধবাবু ঘরের বাইরে চলে গেলেন। টেবিলের ওপর একটা টাইম টেবল। একটি টেলিফোন, পাশে পাতা খোলা ফোন-গাইডটা রয়েছে। উৎপল ভাবল যদি বেশি দেরি হয় এখানে থেকে মিসেস রায়কে একটা ফোন করে দেব। কিন্তু প্রথম দিনের আলাপেই কি প্রবোধবাবুর ফোন ব্যবহার করতে চাওয়া সঙ্গত হবে? তিনি হয়তো চার্জটা নেবেন না। কিন্তু মনে মনে অপ্রসন্ন হতে পারেন। তাছাড়া মিসেস রায়কে কী বলবে উৎপল? 'আজ অন্য কাজে একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। আজ আর যাবনা।' মিসেস রায় বলবেন, 'বেশ তো—না এলেন।' আরো একদিন তাই বলেছিলেন। ফোনে আর একদিন উৎপল তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিল। টেলি-

ফোনে আরো মিষ্টি শোনায় ওঁর গলা। আরো কম-বয়সী মনে হয়। আচ্ছা মিসেস রায়ের আসল বয়স কত হবে? উৎপল শুনেছে—স্বামীর সঙ্গে ওঁর বয়সের অনেক ব্যবধান ছিল। সে ব্যবধান কত? বয়স যাই হোক, মিসেস রায়কে বয়স্কা বলে মনে হয় না। এমনকি তিরিশ বত্রিশ বলেও চালিয়ে দেওয়া যায়। শরীরের অদ্ভুত গড়ন ভদ্রমহিলার। আশ্চর্য, ঘরে এমন স্ত্রী থাকতে সতীশঙ্কর কেন অন্য বন্ধনের সন্ধান করতেন? স্ত্রীর সঙ্গে কি তাঁর মনের মিল ছিল না? না কি মিল থাকলেও তার মনে নতুনত্বের আকর্ষণ প্রবল ছিল? ওটা কারো কারো অভ্যাস। উৎপল এ ধরণের চরিত্র দেখেছে। এঁরা যে স্ত্রীকে কম ভালবাসেন তা নয়, স্ত্রীর ওপর কর্তব্যের ত্রুটি করেন তাও নয়, আরো অনেকের সঙ্গে সংযুক্ত না থাকতে পারলে তাঁদের চলে না। কিন্তু কোন স্ত্রী কি এ ধরণের বহুবল্লভ স্বামীর বাহুবন্ধনে সুখী হন! দাদার থিয়েটার-ক্লাবে কয়েকজন মেয়ে আছে। বউদি তাদের নাম পর্যন্ত শুনতে পারেন না। এই নিয়ে দুজনের মধ্যে এখনো বেশ দাম্পত্য-কলহ চলে। কোন স্ত্রীই স্বামীকে অন্য স্ত্রীর ওপর আসক্ত দেখতে পারেনা। পরস্পরের ওপর শুধু আধিপত্য নয়, একাধিপত্য দাম্পত্যজীবনের প্রথম শর্ত। মিসেস রায় নিশ্চয়ই সুখী ছিলেন না।

প্রবোধবাবু চিন্ময়কে নিয়ে ফিরে এলেন। বন্ধুর মুখ দেখে উৎপলের মনে হল—কিছু আশা আর আশ্বাস তার ভাগ্যে আজ জুটেছে। প্রবোধবাবু চিন্ময়ের চাকরিটি হয়তো করে দেবেন।

'আপনাকে একা বসিয়ে রেখেছি।' প্রবোধবাবু বললেন, 'অবশ্য শুনেছি লেখকরা একা থাকতেই ভালবাসেন। একা থাকা তাঁদের দরকারও। সব সময় হাট-বাজারের মাঝখানে থাকলে তাঁরা লিখবেন কী করে। হাঁা, আপনি কী লেখেন গল্প উপন্যাস?

চিন্ময় বলল—'কাকাবাবু তো ঠিকই আন্দাজ করেছেন। কী করে বুঝলেন?'

প্রবোধবাবু বললেন—'বোঝা এমন আর শক্ত কী। এদেশের লেখকদের মধ্যে বেশির ভাগই হয় কবি, না হয় গল্পলেখক। কিছু মনে করবেন না। যাতে দায়িত্ব কম, পরিশ্রম কম, আমাদের দেশের লেখকদের সেইদিকেই ঝোঁক বেশি। কেবল রস আর রস। আমরা শুধু রসেই হাবুডুবু খেয়ে মরলাম। জীবনের আরো একটা দিক যে আছে—জ্ঞান যার ভিত্তি, কঠিন কর্ম যার ভিত্তি—সেদিকে কজনের নজর যায় বলুন?'

প্রথম পরিচয়েই ভদ্রলোক উৎপলের বৃত্তির তুচ্ছতার কথা তুললেন। যাঁরা রসের নামে ক্ষেপে ওঠেন এ ধরণের মানুষ উৎপল আরো দেখেছে। এদের সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। তবু বিনা প্রতিবাদে উৎপল ছেড়ে দিলনা। হেসে বলল, 'আপনি ক্রিয়েটিভ লিটারেচারকে কোন মূল্য দেন না?'

শ্যাম চা নিয়ে এল। প্রবোধবাবু নিজেই দুটি টিরেষ্ট উৎপলদের সামনে পেতে দিলেন। তারপর বললেন, 'নিশ্চয়ই দিই। কিন্তু তা সত্যি সত্যিই ক্রিয়েটিভ হওয়া চাই। ছাপাখানা আছে, কাগজকালি আছে, মায়ের কাছে শেখা ভাষাটা আছে, সেই ভাষায় যে যা খুশি বানিয়ে লিখল, হয়তো নিজেও বানালোনা অন্যের লেখার নকল করল—আর অমনি মহৎসৃষ্টি হল তা আমি মনে করিনে। এই অকিঞ্চিৎ-পটুত্ব আপনাদের ক্রিয়েটিভ লিটারেচারে যত চলে তেমন আর কোথাও চলে না। সাধারণ একজন ছুতোর মিস্ত্রীকেও হাতের কাজ শিখতে হয়। হাতুড়ি বাটালি ধরতে জানতে হয়। কিন্তু লেখকদের বোধ হয় সেটুকু শিক্ষারও দরকার নেই। আমাদের আমলে হাতে-খড়ির রেওয়াজ ছিল। আজকাল তা উঠে গেছে। আজ-কাল বোধ হয় আপনারা কলম হাতে নিয়েই জন্মান।

চিন্ময় চোখের ইসারায় বন্ধুকে থামাতে চেষ্টা করল। কিন্তু উৎপল বলল—'তা ঠিক নয়। কেউ আমরা কলম হাতে নিয়ে জন্মাইনে। জন্মাবার কয়েক বছর পরে ভদ্র-ঘরের সবাইর হাতেই কলম গুঁজে দেওয়া যায়। সে কলম শেষ পর্যন্ত একেকজন একেক ধরণে ব্যবহার করেন। ভাগ্যবানেরা শুধু চেক সই করেন। কাউকে দু-চারখানা চিঠি-পত্রের বেশি কিছু লিখতে হয়না। আবার বেশির ভাগ লোককেই বুড়ো বয়স পর্যন্ত দশটা পাঁচটা সেই কলম চালিয়ে যেতে হয়। নিশ্চয়ই কলমের নানা রকমের ব্যবহারই আছে। কেউ বা ভারি ভারি প্রবন্ধ লেখেন। কেউবা হালকা গল্প লিখে সাধারণ পাঁচজনের মনোরঞ্জন করেন। সমাজে সবারই স্থান আছে।'

প্রবোধবাবু এতক্ষণ মন দিয়ে শুনছিলেন। এবার উৎপলের দিকে চেয়ে একটু হাসলেন, 'স্থান নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সবই পীঠস্থান নয়। কিন্তু আমাদের দেশের অনেক লেখক তাই মনে করে থাকেন, তাঁরা যে যেখানে থেকে দাঁড়ান অমনি যেন সেটা পূজোর বেদী হয়ে ওঠে। অন্তত তাই তাঁরা চান। যিনি কলম ধরলেন তিনিই যেন পীর হলেন, পয়গম্বর হলেন। কী তাঁর দম্ভ। বাপরে! কিন্তু আসলে ওই যে আপনি মনোরঞ্জনের কথা বললেন, ওইটাই সার কথা, বেশির ভাগ লেখকই তার সমাজের এণ্টারটেইনার ছাড়া কিছু নয়। যেমন সার্কাসওয়ালা সার্কাস দেখায়, ম্যাজিকওয়ালা ম্যাজিক দেখায়, এও অনেকটা তেমনি। তার চেয়ে বেশি নয়। এ কথাটা লেখকরা মনে রাখলে আর কিছু না হোক তাঁরা বিনয়ী হতে পারেন।'

উৎপল চুপ করে রইল। তার আচরণে কি কোন অবিনয় ফুটে উঠেছে? সে তো যা বলবার নম্রভাবেই বলেছে। কিন্তু কোন কিছু বলতে গেলেই, কোন বিষয় সম্বন্ধে তর্ক তুললেই প্রবীণেরা তাকে ঔদ্ধত্য বলে মনে করেন; আচ্ছা প্রবোধবাবু লেখকদের সম্বন্ধে যা বললেন তাই কি ঠিক? তারা সমসাময়িক সমাজের বিশেষ বিশেষ স্তরের চিত্তবিনোদনকারী? তাদের আর কোন ভূমিকা নেই! কৃষক, মজুর, মুদী, শিক্ষক, উকিল, ডাক্তার—মানুষের বাস্তব প্রয়োজন মিটান বলে তারা সমাজের পক্ষে যেমন অপরিহার্য, লেখক, চিত্রশিল্পী, গায়ক, অভিনেতা তেমন নন, ম্যাজিসিয়ান ও সার্কাসপ্রদর্শক তেমন নন। এঁরা সমাজের বাড়তি অংশ। দৈনন্দিন জীবনের জন্যে এঁরা নন, এঁরা শুধু উৎসবের সঙ্গী। এঁরা সমাজের অঙ্গ না, অঙ্গের অলঙ্কার। কিন্তু লেখকদের মধ্যে কি এমন কেউ কেউ নেই যাঁরা শুধু অলঙ্কার নন, যাঁরা সমাজের চিন্তাকে রূপ দেন, বাক্যকে মার্জিত করেন, কখনো শাণিত, কখনো মধুর করেন, তার ত্রুটি, বিচ্যুতিকে শোধন করেন, লক্ষ্যকে স্পষ্টতর এবং অভীপ্সিতকে নিকটতর করে আনেন। আপন সাধনায় নিজের মাতৃভাষার প্রকাশ ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেন; নিশ্চয়ই তারা আছেন। সমাজ সেই সব লেখককে মর্যাদার আসনে বসায়, তাঁদের আসন যুগ থেকে যুগে দেশ থেকে দেশে বহন করে নেয়। শুধু সেই সাধনা আর সিদ্ধির মধ্যেই লেখক আপন অস্তিত্বকে সমর্থনযোগ্য করে তুলতে পারেন, অপরিহার্য করে তুলতে পারেন। কিন্তু সেই দুশ্চর সাধনা আর বিপুল সিদ্ধি যে শত শত লেখকের নেই, তাদের কী সান্ত্বনা? তাঁদের স্থান সমাজের কোন সিঁড়িতে? মিথ্যা বলেননি প্রবোধবাবু। তারা রাস্তার সার্কাসওয়ালা ম্যাজিকওয়ালাদেরই সগোত্র। কিন্তু তাদের অস্তিত্বই বা নিরর্থক বলা হবে কেন? কয়েকটি মুহূর্ত ধরে কিছুসংখ্যক মানুষের মনে যে কয়েকবিন্দু আনন্দের রস তাঁরা সঞ্চার করেন, নিজেদের কাজের মধ্যে মগ্ন থেকে যে তৃপ্তিটুকু তাঁরা আহরণ করেন তাতেই তাঁদের সার্থকতা। কিন্তু এই একফোঁটা আশ্বাসে কি মন ভরে! মানুষ বিনয়ে তৃণের চেয়ে সুনীচ হতে পারে, কিন্তু তার লক্ষ্য মহীরুহের দিকে। আশাআকাঙ্খায় সে বনস্পতি। সত্যি বড় অযথা সময় নষ্ট করছে উৎপল। যে কাজের ভার সে নিয়েছে তার যোগ্যতা উৎপলের নেই, সেই কাজও উৎপলের যোগ্য নয়।

'কাকাবাবু, আমার এই বন্ধুট আপনার কাছে একটা দরকারে এসেছে। নিজে মুখ ফুটে বলতে পারছে না।'

চিন্ময়ের কথা শুনে উৎপল একটু বিশেষ ভঙ্গিতে তার দিকে তাকাল! লেখকদের সম্বন্ধে প্রবোধবাবুর যা ধারণার পরিচয় পেয়েছে, তাতে ওঁর কাছে নিজের বিশেষ কাজের কথাটুকু আজ আর তার তুলবার ইচ্ছা ছিল না।

প্রবোধবাবু একটু হেসে বললেন, 'তোমার বন্ধুটিকে খুব লাজুক বলে তো মনে হয় না। নিজেদের পক্ষ উনি বেশ সমর্থন করতে পারেন।'

চিন্ময় বলল, 'ও প্রথম প্রথম একটু ছটফট করে। তারপর বিরোধী পক্ষের একটু খোঁচা খেলেই পালাবার পথ পায় না। তখন ও অন্য পক্ষের অস্ত্র নিয়ে নিজেকে ঘা মারতে থাকে। আমার এই বন্ধুটির কলমের বল হয়তো এক-আধটু আছে, কিন্তু মনের বল একেবারেই নেই।'

প্রবোধবাবু বললেন, 'কথাটা কি ঠিক বললে চিন্ময়? যাঁর নিজের মনের বল নেই, তাঁর কলমের বল আসবে কোত্থেকে? তাঁর সম্বল শুধু বাগ-বিভূতি, কথার মারপ্যাঁচ। তাঁর লেখায় শুধু দুর্বল চরিত্রের স্ত্রী-পুরুষের ভীড়। কিছু মনে করবেন না উৎপলবাবু। আপনার লেখা সম্বন্ধে আমি কিছু বলছিনে। আপনার কোন বই আমার পড়া হয়ে ওঠেনি। নানা বাজে কাজে ব্যস্ত থাকি। ফিকশন-

টিকশন আর পড়া হয়ে ওঠে না। যেটুকু সময় পাই অন্য ধরণের কিছু পড়ি। একটা বয়স ছিল যখন হাতে যা পড়ত তাই পড়তাম। কিন্তু এখন আর তা পারিনে। হ্যাঁ বলুন, আপনার কাজের কথাটা এবার শুনি।'

উৎপল বলল, 'আজ থাক না।'

চিন্ময় বলল, 'না না থাকবে কেন। তুমি বরং কথাটা কাকাবাবুকে আজ জানিয়ে রাখো। তারপর আর একদিন এসে—এতো আর দু-এক দিনের ব্যাপার নয়। কাকাবাবু, আমাদের উৎপল আপনাদের আমল সম্বন্ধে একটা বই লিখতে চাইছে।'

প্রবোধবাবু বললেন, 'আমাদের আমল? কেন এ আমলটা কি একচ্ছত্র ভাবে তোমাদেরই? আমি কিন্তু তা মনে করিনে। আমার সমবয়সীরা যাই মনে করুন না কেন, তোমরা আমাদের মেসোমশাই আর কাকাবাবু বসে যত দূরে ঠেলে রাখোনা কেন, আমি নিজেকে অত দূরকালের মনে করিনে। আমি যেমন সেকালের ছিলাম তেমনি একালেরও আছি। মানুষের যৌবন তার চিন্তায় আর কর্মে। শুধু লোল চর্ম দেখেই তোমরা যদি আমাকে বাতিল করে দিতে চাও—'

চিন্ময় বলল, 'আপনাকে বাতিল করব আমাদের সাধ্য কি। আর তা করতে যাবই বা কেন। তা ছাড়া আপনি যাই বলুন, আপনার চর্ম এখন পর্যন্ত মোটেই লোল হয়নি। শারীরিক পরিশ্রমও আপনি আমাদের চেয়ে বেশি ছাড়া কম করেন না।'

প্রবোধবাবু খুসি হলেন। একটু হেসে বললেন, 'শরীরকে ফিট রাখবার জন্যে কিছু হাত-পা নাড়তে হয় বই কি। নিচে যে শব্দ শুনছ ওটা একটা ওয়ার্কশপের। আই-এস্-সি পাশ করে একটি ভাইপো বেকার বসেছিল। বললাম,কেন আর পাঁচজনের পা ধরে ধরে সাধাসাধি করবি, নিজের হাত অন্য কাজে লাগা। হাতুড়ি-বাটালি ধর। ঘর পায়না খুঁজে, পায় না। নিচের তলাটা ছেড়ে দিলাম। তা এই দু-বছরে ভাইপোটি কাজ নেহাৎ মন্দ করেনি। কারখানাটা দাঁড়িয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে। এরই মধ্যে জন কুড়ি লেবারার নিতে হয়েছে। দুটো শিফ্‌টে কাজ হয়। আমার নামটা ওদের হাজিরা খাতায় নেই। কিন্তু লোকজন কম দেখলে আমিও গিয়ে হাত লাগাই। ভাইপো হাঁ হাঁ করে ছুটে আসে। আমি বলি, 'বাপু, এ হাতে অনেক কিছু করেছি। আজ তোমার মেশিন চালালে আমার জাত যাবে না।'

চিন্ময় আবার প্রসঙ্গের খেই ধরিয়ে দিল, 'কাকাবাবু, উৎপলের ইচ্ছে আপনাদের সেই যুগ সম্বন্ধে কিছু লেখে। তার শৌর্য-বীর্য মহত্বের কাহিনী। দেশের স্বাধীনতার জন্যে যুবকদের সেই প্রাণকে পণ রেখে ছুটে চলা। সেই উদ্দাম উদ্দীপনা। সেই জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীনদের কথা কি তেমনভাবে লেখা হয়েছে বলে মনে করেন?'

প্রবোধবাবু মাথা নাড়লেন, 'না হয়নি। তেমন লেখক আজও আসেন নি। তার জন্যে যত্ন চাই, নিষ্ঠা চাই। এলো-মেলো টুকরো টুকরো ভাবে যেটুকু লেখা হয়েছে তা প্রায়ই স্মৃতিকথা। সে যুগের গোটা ইতিহাস আজও অলিখিত। তোমার বন্ধু কি তাই লিখতে যাচ্ছেন?'

প্রবোধবাবু একটু হেসে উৎপলের দিকে তাকালেন। তাঁর হাসিতে দৃষ্টিতে অবিশ্বাসটুকু গোপন রইল না।

সেই অবস্থায় আর একবার তীরবিদ্ধ হল উৎপল। কিন্তু হেসেই জবাব দিল, 'না, আমার সেই উচ্চাকাঙ্খা নেই। আপনি ঠিকই ধরেছেন। সেই গোটা যুগ নিয়ে ইতিহাস লেখার পরিকল্পনা আমার নেই, এমন কি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখবার দায়িত্বও আমি নিচ্ছি নে। তার জন্যে যোগ্যতর মানুষ আছেন?'

প্রবোধবাবু একটু ভ্রূ-কুঁচকে রইলেন। তারপর বললেন, 'আপনি তাহলে কী লিখতে যাচ্ছেন?'

উৎপল বিনীতভাবে বলল, 'আমার লক্ষ্য খুবই সামান্য। সেই যুগের একজন সাধারণ কর্মীর জীবন—কিন্তু পুরোপুরি জীবনী নয়—জীবনের রেখা চিত্র এঁকে রাখাই আমার ইচ্ছে।' যার যেটুকু সাধ্য তার সাধ তার বাইরে যায়না। টানাটানি করে কোন লাভও নেই। ধরুন সেই ভদ্রলোক—ঠিক পুরোপুরি ভদ্র নন। আরো পাঁচজনের মত দোষে-গুণে মানুষ। গুণের চেয়ে দোষের কলিটাই ভারি। স্খলন পতন ত্রুটি পদে পদে।'

প্রবোধবাবু একটু উত্যক্ত হয়ে বললেন, 'এই যদি আপনার প্রশ্ন হয় আমি বলি উৎপলবাবু সে যুগ নিয়ে কিছুই আপনার লিখে দরকার নেই। অমন লোক

আপনাদের এই আমলেই আপনাদের মধ্যে হাজার হাজার লাখ লাখ আছে। তাদের নিয়ে হাজার হাজার চুটকি গল্প লেখাও হচ্ছে। কিন্তু তারা জাতির ইতিহাসের কেউ নয়। তুচ্ছ মানুষ নিয়ে তুচ্ছ গল্প লেখার কোন মানে নেই। সে গল্প লোকে আজ পড়ে, কাল ভোলে। যাঁরা অবিস্মরণীয় তাঁদের কথাই লিখে রাখা উচিত। পারুন না পারুন সৎকাজের জন্যে চেষ্টা করে যাওয়াটাও সততা। আমি আপনাদের ন্যাচারালিষ্টদের বিশ্বাস করিনে, রিয়ালিজিমেও আমার আস্থা নেই। যদি আপনি তেমন কাউকে নিয়ে কিছু লিখতে চান আমার ক্ষুদ্র সামর্থ্যে যতখানি কুলোয় আমি আপনার নিশ্চয়ই সাহায্য করব। কিন্তু যা আমার কাছে অসঙ্গত বলে মনে হয় তা যদি আপনি করতে যান, আমি প্রাণপণে বাধা দেব। কিছুতেই ক্ষমা করব না।'

শ্যাম এসে খবর দিল বাইরের কয়েকজন ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন।

প্রবোধবাবু বললেন, 'আসতে বলো। তাঁরা বড় দেরি করে এলেন।'

চিন্ময় আর উৎপল দুজনেই উঠে দাঁড়াল।

চিন্ময় বলল, 'চলি কাকাবাবু।'

প্রবোধবাবু বললেন, 'এসো—কী হয় না হয় খবর দিয়ো।'

চিন্ময় বলল, 'নিশ্চয়ই দেব।'

উৎপলের নমস্কারের জবাবে তিনি নিঃশব্দে ছোট একটু নমস্কার জানালেন! ভদ্রতা করেও একটি কথা বললেন।

বাইরে এসে চিন্ময় একটু হেসে বলল—"কিছু মনে কোরো না ভাই। বুড়ো আজকাল ভারি রগচটা হয়ে গেছেন। আগে এমন ছিলেন না মুখে কতবার যৌবন যৌবন করলেন। কিন্তু ওঁর বুঝবার সাধ্য নেই, কথায় কথায় অমন করে চটে ওঠাই আসলে জরার লক্ষণ।'

উৎপল বলল 'হুঁ।'

তারপর ভাবতে ভাবতে বন্ধুর পিছনে পিছনে চলতে লাগল। একটু বাদে সার্কুলার রোডে পড়ে চিন্ময় তার কাছ থেকে বিদায় নিল। নিতান্ত অভ্যাসেই দক্ষিণ মুখো বাসটিতে উঠে বসল উৎপল। বসে ভাবতে ভাবতে চলল। সেও অভ্যস্ত ভাবনা। অভ্যাস ছাড়া কী।

ক্রমশঃ

সমাপ্তি

প্রজেশকুমার রায়

ভয়ঙ্করে যে করে সুন্দর,
মৃত্যুকে যে করে মনোহর,
তা'র চেয়ে প্রেমময় কেউ আর নয়—
মরণে ঘোষণা করে যা'ব তারই জয়।
একদিন শেষ হ'য়ে
আস্‌বে এ-পৃথিবীর মন্দ আর ভালো,
নিদারুণ মর্ম্ম-জ্বালা,
বাসনার রূঢ়তীব্র আলো ;—

যত তর্ক, যত দ্বন্দ্ব
একদিন আস্‌বে ফুরায়ে ;
জীবনের জ্বর সে-ও
ধীরে ধীরে আস্‌বে জুড়ায়ে—
ক্লান্ত চোখে শান্ত আলো,
তারপরে তা-ও আর নয়—
বাজ্‌বে কৃষ্ণের বাঁশি,
অন্ধকার হ'বে কৃষ্ণময়॥

পটারী শিল্পের উন্নয়ন

শ্রীসুধীরচন্দ্র ঘোষ

আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পটারি শিল্পের একটী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। বহুল সম্ভাবনাময় এই শিল্পটী কিরূপ দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে নিম্নে প্রদত্ত হিসাব হইতে সে সম্বন্ধে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা হইবে :—

উৎপাদিত দ্রব্য	১ম পরিকল্পনার শেষ বৎসরে উৎপাদনের পরিমাণ	২য় পরিকল্পনার শেষ বৎসরে উৎপাদনের পরিমাণ
চীনামাটীর বাসনপত্র	১৫,১৪৪ টন	২০,৪৪৪ টন
'স্যানিটারি দ্রব্যাদি	২,৭১২ "	৬,৬০০ "
গ্লেজড্ টাইলস্	২,২৭৩ "	৫,৪০০ "
এইচ টি ইনসু লেটারস্	৩৭২ "	২,৫০০ "
এল, টি ইনসুলেটার্স্	৩,৮৮৭ "	৬,০০০ "

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে এই সমস্ত জিনিষের চাহিদা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। আশার কথা বর্তমানে কয়েকটী উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান তাহাদের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিতেছে এবং এই শিল্পে নবাগত কয়েকটী প্রতিষ্ঠানও আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সুতরাং আশা করা যায় যে অদূর ভবিষ্যতে আমরা পটারী শিল্পে শুধু স্বয়ং সম্পূর্ণই হইব না, বেশ কিছু পরিমাণে অন্যান্য দেশে রপ্তানী করিতেও সমর্থ হইব। তবে ইহা করিতে হইলে সরকারের তরফ হইতে মাল আদান প্রদানের জন্য পরিবহনের সুব্যবস্থা, প্রভূত পরিমাণে কয়লার যোগান এবং বিদ্যুত সরবরাহ ইত্যাদি ব্যাপারে সাহায্যের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কেন না এই কয়েকটী ব্যাপারে বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির কোন হাতই নাই। উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাহাদের উৎপাদিত দ্রব্যের গুণগত উৎকর্ষের দিকেও সবিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে উৎপাদন হার যাহাতে অহেতুক বৃদ্ধি না পায় সেইদিকেও তাহাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তাহা না হইলে, ইংলণ্ড ও জাপানের ন্যায় শিল্পোন্নত দেশগুলির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া পটারী শিল্পের রপ্তানী বাণিজ্যে প্রবেশ করা দুরূহ হইবে।

আমাদের দেশে 'এইচ, টি, ইনসুলেটর্স্' এর উৎপাদনের পরিমাণ খুবই অল্প এবং ইহার ফলে আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটানোর জন্য এখনও আমাদের বৎসরে ১২০ হইতে ১৫০ লক্ষ টাকার মত উক্ত দ্রব্য আমদানী করিতে হয়। তৃতীয় পরিকল্পনা কালে এইচ, টি ইনসুলেটর্স্ এর চাহিদা বাড়িয়া বৎসরে ২০,০০০ টনের মত হইবে ; অথচ, ১৯৬১ সালে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২,৫০০ টন। পটারী শিল্পকে আমাদের আকাঙ্ক্ষিত স্তরে উন্নীত করিতে হইলে কিরূপ আন্তরিক ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টার প্রয়োজন তাহা সহজেই অনুমেয়।

'প্রেস্‌ড্-পোর্স্‌লিন' সম্বন্ধে এখানে কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় সরকারের ডেভেলপমেণ্ট-উইং, সুইচ্-গীয়ার ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম নির্ম্মাণকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের সহায়তায় আমাদের দেশে 'প্রেসড-পোর্স্‌লিনের বর্তমান ও ভবিষ্যত চাহিদা সম্বন্ধে যে সমীক্ষা করিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে এই বস্তুর বর্তমান বাৎসরিক চাহিদার মূল্য ১১১ লক্ষ টাকা এবং ১৯৬৫-৬৬ সালে ইহা দাঁড়াইবে ৩০০ লক্ষ টাকায়। সুতরাং, ইহার উৎপাদনে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জ্জন করা বিশেষ প্রয়োজন। ইহার জন্য পটারী শিল্পে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির অবিলম্বে যত্নবান হওয়া উচিত। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানীর ব্যাপারে কোন অসুবিধা হইলে উক্ত 'ডেভেলপমেণ্ট-উইং' সে ক্ষেত্রে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত। আশা করা যায় এই সুযোগ কাজে লাগাইতে উৎপাদনকারীরা দ্বিধা করিবেন না। প্রসঙ্গতঃ ইহা উল্লেখ করা যায় যে কেন্দ্রীয় সরকার ৬০ এম্পিয়ার পর্য্যন্ত 'ফিউজ-ইউনিট' আমদানী করা নিষিদ্ধ করিয়া দিতে সম্মত হইয়াছেন।

পটারী শিল্প সম্বন্ধে ইহা বলা যায় যে, শ্রমবিনিয়োগের

দিক হইতে ইহা বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ। আমাদের দেশের বেকার সমস্যা খুবই তীব্র। দুইটি পরিকল্পনা কাল অতিক্রান্ত হওয়ার পরও এই সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান করা সম্ভব হয় নাই। ক্ষুদ্র শিল্প হিসাবে বহু সংখ্যক প্রতিষ্ঠান যদি গড়িয়া তোলা যায়, তাহা হইলে অনেক লোকের কর্ম্ম-সংস্থান করা যাইবে। এই দিক হইতে Bengal Ceramic Institution'এর প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। এঁদের সহায়তায় এইরূপ অনেকগুলি ক্ষুদ্র পটারী শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। সরকারী ও বে-সরকারী প্রচেষ্টায় সংগঠিত এইরূপ প্রতিষ্ঠানগুলি কলিকাতা ও মফঃস্বল অঞ্চলে ১,৫০০ লোকের কর্ম্মসংস্থান করিয়াছে। এইরূপ ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান আহমেদাবাদ ও খুরজা অঞ্চলেও সন্তোষজনকভাবে পরিচালিত হইতেছে। খুরজা অঞ্চলে National Small Industry Corporation ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদিত সমুদয় দ্রব্য ক্রয় করিয়া লইয়া ইহাদের বিপন্ন সমস্যার সমাধান করিয়াছে। এই সুবিধা বিশেষ করিয়া কলিকাতা ও আহমেদাবাদ অঞ্চলের প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রেও দেওয়া যাইতে পারে।

আমাদের দেশের বেশিরভাগ উৎপাদনকারীরা পটারী উৎপাদনের প্রয়োজনীয় সকল প্রক্রিয়াগুলি একই প্রতিষ্ঠানে সম্পন্ন করিয়া থাকেন। কিন্তু বিভিন্ন স্তরের উৎপাদনের পরিমাণও গুণগত উৎকর্ষ উভয়েরই উন্নতি হইবে। ইংলণ্ড ও জাপানের ন্যায় শিল্পোন্নত দেশে এই নীতির সার্থক প্রয়োগ হইয়াছে।

এখন পটারী শিল্পে আরোপিত আবগারী শুল্ক সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্। ১৯৬১ সালের অর্থ আইন অনুযায়ী নিম্নলিখিত হারে শুল্ক ধার্য্য করা হইয়াছে :

(ক)	বাসনপত্রাদি	১৫½	(মূল্যানুযায়ী)
(খ)	স্যানিটারি দ্রব্যাদি	১৫½	„
(গ)	গ্লেজড্ টাইল্‌স্	১০%	„
(ঘ)	অন্যান্য দ্রব্যাদি	১০%	„

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর নিকট প্রদত্ত এক স্মারকলিপিতে নিখিল ভারত পটারী উৎপাদক সমিতি জানাইয়াছেন যে এই ক্ষেত্রে ধার্য্য শুল্কের হার খুব বেশী হইয়াছে এবং ব্যবহারকারীদের উপর ইহার প্রতিক্রিয়া বিরূপ হইবে। কেন্দ্রীয় রাজস্ববোর্ডের নিকট প্রেরিত আর একটী স্মারক লিপিতে উক্ত সমিতি জানাইয়াছেন যে ১৯৬১ সালের অর্থ আইনের ২৩-খ তালিকায় বর্ণিত দ্রব্যাদির তালিকার আওতায় বর্ত্তমানে ভারতে প্রস্তুত অনেক পটারী-দ্রব্যই পড়ে না।

পটারী শিল্পের সমস্যাগুলির মধ্যে কাঁচা মাল—বিশেষ করিয়া চীনা মাটী এবং কয়লা সরবরাহের সমস্যাই প্রধান। পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার রাজ্যের অন্তর্গত দামোদর উপত্যকা অঞ্চল, উড়িষ্যা, কেরালা, আহমেদাবাদ এবং রাজস্থানের বিভিন্ন অঞ্চলে চীনা মাটী পাওয়া যায়। আরও কতকগুলি স্থানে উৎকৃষ্ট চীনা মাটী আছে; কিন্তু সেই সকল স্থান হইতে উহা লইয়া আসার জন্য প্রয়োজনীয় রাস্তা বা রেল পথের যোগাযোগ নাই। উপযুক্ত পথ বা পরিবহনের অভাব ছাড়াও আরও একটী অসুবিধা হইল যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে প্রাপ্ত চীনা মাটীর গুণগত উৎকর্ষে কোন সামঞ্জস্য নাই। গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদগুলির (যেমন লৌহ, কয়লা ইত্যাদি) অবস্থান সম্বন্ধে যেমন ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান করা হইয়া থাকে চীনা মাটীর ক্ষেত্রে তাহা অনুপস্থিত। ইহা ছাড়া খনির মালিকদের পক্ষে ঠিকভাবে সম্ভাবনাপূর্ণ চীনা মাটীর আকরগুলির সদ্ব্যবহার করা হয় না। অল্পদিন আগে পর্য্যন্ত চীনা মাটীকে গুরুত্বহীন সামান্য দ্রব্য বলিয়া গণ্য করা হইত এবং রাজ্য সরকারগুলি কর্ত্তৃক খনির মালিকদিগকে অল্প দিনের জন্য 'লীজ' দেওয়া হইত। নূতন করিয়া 'লীজের' মেয়াদ বৃদ্ধির অনিশ্চয়তার জন্য এই সকল ক্ষেত্রে বৃহৎ মূলধন লগ্নী করা হয় নাই। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া উপরোক্ত অসুবিধাগুলি দূরীকরণে মনোযোগ দেওয়া সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলির আশু কর্ত্তব্য এবং ভারতবর্ষে যে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট ধরণের চীনা মাটী প্রচুর পাওয়া যায় বিশেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা তাহার উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলি কর্ত্তৃক গবেষণা করা উচিত। পটারী শিল্পে কয়লা একটি অত্যাবশ্যকীয় বস্তু। প্রয়োজনীয় পরিমাণে কয়লা সরবরাহের অভাবে এই শিল্প অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কয়লা সরবরাহের অভাবের জন্য দায়ী ত্রুটীপূর্ণ পরিবহন ব্যবস্থা এবং এই অবস্থার যদি শীঘ্র উন্নতি না হয় তাহা হইলে অনেকগুলি পটারী শিল্প প্রতিষ্ঠান হয়ত অদূর ভবিষ্যতে বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। ওয়াগন সরবরাহ সম্পর্কিত নানা রকম বিধি-নিষেধের ফলে কলিকাতা ও পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের বেশীর ভাগ উৎপাদনকারীদের—বিশেষ করিয়া যেগুলি ক্ষুদ্র শিল্পের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়—টন প্রতি ২০্ বেশী খরচ করিয়া খনি হইতে ট্রাকে করিয়া কয়লা আনিতে হয়।

দক্ষ ও নিপুণ কর্ম্মীর প্রয়োজন পটারী শিল্পে খুব বেশী। কিন্তু ইহার অভাব এই শিল্পের খুব তীব্র ভাবে অনুভূত হয়। কলিকাতা, বারাণসী ও বোম্বাই ছাড়া ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থানে উচ্চ পর্য্যায়ে 'সেরামিক টেক্‌নলজী' শিক্ষা দেওয়া হয় না। বেঙ্গল সেরামিক্ ইনষ্টিটিউট হইতে ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট পর্য্যায়ে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে এবং খুব শীঘ্রই এই প্রতিষ্ঠান হইতে বি-এস্-সি (টেক্) ডিগ্রী দেওয়া হইবে। পটারী সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে কলিকাতায় অবস্থিত সেন্ট্রাল গ্লাস এণ্ড সেরামিক্ রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের প্রভূত অবদান রহিয়াছে। সমস্ত রকমের প্রয়োজনীয় সরঞ্জামে সমৃদ্ধ ও সুখ্যাত ডাঃ আত্মারাম কর্ত্তৃক

নিপুণভাবে পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠানটি পটারী শিল্পের উন্নতির পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং এই শাখায় উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ দানের জন্য রাজ্য সরকার সমূহ ও কেন্দ্রীয় সরকারের আরও তৎপর হওয়া উচিত। এই প্রতিষ্ঠান সমূহে গবেষণালব্ধ তথ্যাদি ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি যাহাতে সকল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট সহজলভ্য হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং পটারী শিল্পের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য এই সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে।*

* লেখক একজন সুপরিচিত পটারী শিল্পপতি এবং নিখিল ভারত পটারী উৎপাদক সমিতির সভাপতি।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আমরা সানন্দে ঘোষণা করিতেছি আগামী আষাঢ় মাসে 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকা পঞ্চাশ বৎসরে পদার্পণ করিবে। মহাকালের যাত্রাপথে অর্ধশতাব্দীব্যাপী তার এই অবিচ্ছিন্ন গতি নিঃসন্দেহে অতি গৌরবময়। আগামী আষাঢ় মাস হইতে পূর্ণ একটি বৎসর সুবর্ণজয়ন্তী বৎসর হিসাবেই প্রতিপালিত হইবে এবং আলোচ্য বর্ষের প্রতিটি সংখ্যাই হইবে বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই সুবর্ণজয়ন্তী বৎসরের প্রথম সংখ্যা—আগামী আষাঢ় সংখ্যা হইতে 'ভারতবর্ষ' যাঁহাদের রচনা সম্ভারে বিশেষ সমৃদ্ধ ও সর্বপ্রকারে আকর্ষণীয় হইয়া আত্মপ্রকাশ করিবে তাঁহাদের মধ্যে আছেন—

সীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ
ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীকালিদাস রায়
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক
ডঃ শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত
শ্রীনরেন্দ্র দেব
শ্রীদিলীপকুমার রায়
শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
শ্রীমন্মথনাথ রায়
ডঃ শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী
শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসুধাংশুকুমার বসু
ডঃ রমা চৌধুরী
শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী
শ্রীমতী রাধারাণী দেবী
জসীম উদ্দীন
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
বনফুল
শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র
শ্রীপরিমল গোস্বামী
শ্রীমনোজ বসু
শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়
শ্রীপৃথ্বীশ ভট্টাচার্য
শ্রীসমরেশ বসু
শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র
ডঃ শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল
শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
শ্রীবিরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু
শ্রীমতী প্রতিভা বসু
শ্রীপ্রফুল্ল রায়
শ্রীমতী মায়া বসু

ইত্যাদি আরও অনেকে।

এজেন্টগণ, পূর্ব হইতেই যোগাযোগ করুন। বিজ্ঞাপনদাতাগণ, সত্বর হউন। পূর্বাহ্নেই বিজ্ঞাপনের স্থান সংগ্রহ করুন।

কর্মাধ্যক্ষ
"ভারতবর্ষ"

জ্যোতিষের টুকিটাকি

উপাধ্যায়

জন্ম কুণ্ডলীতে রবি থেকে চন্দ্র কেন্দ্রে থাকলে অধম যোগ। জাতকের নৈতিক চরিত্র অত্যন্ত নীচু হবে। তার আর্থিক অবস্থা হবে শোচনীয়। জ্ঞানের অভাব আর বুদ্ধি বৃত্তি হবে অত্যন্ত দুর্বল। রবি থেকে চন্দ্র পণফরে অর্থাৎ দ্বিতীয়, পঞ্চম, অষ্টম ও একাদশ স্থানে থাকলে মধ্যম যোগ। নৈতিক চরিত্র মধ্যম হবে। রবি থেকে চন্দ্র অপোক্লিমে, অর্থাৎ তৃতীয় ষষ্ঠ নবম এবং দ্বাদশে থাকলে বরিষ্ঠ যোগ। এতে নৈতিক চরিত্র উত্তম হয়। চন্দ্র নিজের অংশে অথবা মিত্রাংশে থেকে বৃহস্পতির দ্বারা পূর্ণ দৃষ্ট হলে শুক্রের ক্ষেত্রে বা দিবাভাগে কিম্বা রাত্রে জন্ম হোলে জাতক সুখী ও ঐশ্বর্য্যবান হবে। চন্দ্র থেকে ষষ্ঠ সপ্তম এবং অষ্টমে বুধ বৃহস্পতি ও শুক্র থাকলে অধিযোগ হয়। পাপ গ্রহ দ্বারা দৃষ্ট বা একত্র থাকলে অধিযোগের ফল খারাপ হয়। অধিযোগে জাত ব্যক্তি সৈন্যাধ্যক্ষ, মন্ত্রী বা রাজা হোতে পারে। জাতক দীর্ঘ জীবি, স্বাস্থ্যবান মহাভাগ্যবান, শত্রুজয়ী ও শক্তি সম্পন্ন হয়। চন্দ্রের দ্বিতীয়স্থানে রবি ভিন্ন অন্যগ্রহ থাকলে সুনফা আর দ্বাদশে থাকলে অনফা যোগ হয়। চন্দ্রের উভয় পার্শ্বে অর্থাৎ দ্বিতীয় ও দ্বাদশ স্থানে গ্রহ থাকলে দুরুধুরা যোগ। এক শ্রেণীর পণ্ডিতরা বলেন চন্দ্র থেকে চতুর্থে ও দশমে গ্রহ থাকলে তবে উপরোক্ত সুনফা অনফা ও দুরুধুরা যোগ সক্রিয় হয়। অন্য এক শ্রেণীর পণ্ডিতরা বলেন চন্দ্রের নবাংশ রাশি থেকে দ্বিতীয় ও দ্বাদশে গ্রহ থাকলে তবে ঐ তিনটী যোগের ফল পাওয়া যায়। চন্দ্রের চতুর্থে যে কোন গ্রহ থাকলে সুনফা, দশমে থাকলে অনফা, চতুর্থ ও দশমে থাকলে দুরু ধুরা এবং চতুর্থ ও দশমে গ্রহ না থাকলে কেমদ্রুম যোগ হয়। চন্দ্রের দ্বিতীয় ও দ্বাদশে কোন গ্রহ না থাকলেও কেমদ্রুম যোগ। চন্দ্রাবস্থিত নবাংশের দ্বিতীয় ও দ্বাদশ নবাংশে গ্রহ যোগে এবং বিয়োগে উক্ত প্রকার নিয়মে উক্ত সুনফাদি চারি প্রকার যোগ কল্পনীয়। সুনফা, অনফা ও দুরুধুরা যোগ কারক গ্রহ লগ্নাপেক্ষা কেন্দ্রস্থ হোলে পূর্ণ শুভ ফল, পণফরস্থে মধ্য শুভ ফল ও অপোক্লিমস্থে হীন শুভ ফল প্রদান করে। সুনফা যোগে জাত ব্যক্তি ভাগ্যবান, গুণবান, অত্যন্ত বিখ্যাত এবং শাস্ত্রজ্ঞ হবে। সে ব্যক্তি সকলের আকর্ষণীয় হবে তার উত্তম গুণ গুলির জন্যে। তার প্রকৃতি হবে শান্ত। সে হবে সুখী, রাজা বা মন্ত্রী এবং জ্ঞানী। অনফা যোগে জাত ব্যক্তি উত্তম বক্তা, ধনী, আভিজাত্য মর্য্যাদা সম্পন্ন, নীরোগী, উত্তম চরিত্র বিশিষ্ট, বিখ্যাত, প্রফুল্ল ও উত্তম বেশ ভূষা সম্পন্ন হবে। তাঁর আহার ও পানীয় উত্তম হবে। দুরুধুরা জাত ব্যক্তির বক্তৃতার জন্য খ্যাতি হবে। সে হবে পরাক্রমী ও স্বাধীন চেতা। বাহন ও সুখৈশ্বর্য্য ভোগ করবে। আত্মীয় স্বজন ও সম্পত্তির দিকে দৃষ্টি থাকবে। তার উত্তম চরিত্র। সে নেতৃত্ব করবে। রাজ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করলেও কেমদ্রুম জাতব্যক্তির স্ত্রী ও স্বজন বন্ধুবিয়োগ ঘটবে, দুঃখ কষ্ট ও দারিদ্র্য ভোগ করবে। রোগে কষ্ট পাবে; দুর্ভাগ্যের ভেতর দিয়ে জীবন কাটাতে হবে। রবি ভিন্ন অন্য কোন গ্রহ লগ্ন বা চন্দ্র থেকে কেন্দ্রে থাকলে অথবা মঙ্গল থেকে সুরু করে পাঁচটী গ্রহের যে কোনটী চন্দ্রের সঙ্গে সহাবস্থান করলে কেমদ্রুম হয় না। চন্দ্রের দ্বিতীয়ে কিম্বা দ্বাদশে মঙ্গল থাকলে জাতক উৎসাহী, শৌর্যসম্পন্ন, ধনী ও দুঃসাহসিক হবে। বুধ থাকলে চতুর, মিষ্টভাষী, শিল্প কলাভিজ্ঞ। বৃহস্পতি থাকলে ধনী, ধর্মপ্রাণ, ও রাজ সম্মানী, শুক্র থাকলে অত্যন্ত ধনী ও ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করে সুখী হবে। শনি থাকলে অপরের ধনৈশ্বর্য্য বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতি ভোগ করবে, বহু কর্ম্মে লিপ্ত থাকবে এবং নেতা হবে। রাবণের কুম্ভলগ্ন ছিল। তার উত্থান পতনের কথা সর্ব্বজন বিদিত। কুম্ভলগ্ন জাত ব্যক্তি অদ্ভুত ভাবে উন্নতি করে ভাগ্যবিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হয়। তার কারণ তাদের অতিরিক্ত কাম প্রবণতা, ইন্দ্রিয়াসক্তি যৌন পিপাসা ও ব্যর্থপ্রেম। রাবণের অতিরিক্ত কামোদ্দীপনা ও ইন্দ্রিয় চরিতার্থের জন্য সীতা হরণ তার পতনের ও নিধনের কারণ হয়েছিল। আধুনিক কালেও দেখা যায়, যে শুক্র কুম্ভলগ্ন জাত ব্যক্তির পক্ষে সর্ব্বোত্তম এবং ইন্দ্রিয় সম্ভোগ সুখ দাতা, সে-ই অষ্টম এডওয়ার্ডের প্রেমের জন্য রাজ্য ত্যাগ ঘটিয়েছে। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে কুম্ভলগ্ন জাত অষ্টম

এডওয়ার্ড প্রেমের জন্য সিংহাসন ত্যাগ করেন আর তাঁর ভ্রাতা ষষ্ঠ জর্জ্জ ইংলণ্ডের অধীশ্বর হন। কুম্ভলগ্ন জাত ব্যক্তিরা কেন বিবাহ এবং প্রণয়ের ব্যাপারে দুঃখ ভোগ করে, তার কারণ জীবন যাত্রার পথে শনি বিরাট পতনের কারক হয়ে দাঁড়ায়। কুম্ভ লগ্নটী শনির ক্ষেত্রে অবস্থিত, এজন্যে শনি গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নেয় আর ঘাড় ধরে নীচে ফেলে দিয়ে জাতকের শোচনীয় অবস্থা ঘটায়, তাকে ধ্বংস করে। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের দশমে শনি তার এমন পতন ঘটিয়েছিল যে তার পক্ষে আর পৃথিবীতে মাথা তুলে দাঁড়াতে হয়নি। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ২রা মে বার্লিনে রাশিয়ান সৈন্য প্রবেশের প্রাক্ কালে হিটলারের পতন হয় এবং তিনি আত্মহত্যা করেন আর জার্ম্মানীর শোচনীয় পরিণতি ঘটে। কুম্ভলগ্ন জাতকের পক্ষে ভালোবাসার ক্ষেত্রে শোচনীয় অবস্থা হয়, প্রেমের জন্যে কাঙাল হয়ে বেদনা অনুভব করে আর কাম পিপাসার নিবৃত্তিও হয় না। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কুম্ভলগ্ন হোলেও এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। তার কারণ তাঁর কুণ্ডলীতে প্রবল সন্ন্যাস যোগ রয়েছে এবং তিনি পূর্ণ অবতারাংশে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন যা সচরাচর মানুষের ভাগ্যে ঘটে না। জন্ম কালে লগ্নাধিপতি শনি নিধন স্থানে অবস্থিত, শুক্র ও বৃহস্পতি দৃষ্ট, লগ্নে শুভগ্রহ এবং কর্ম্মাধিপতি চতুর্থস্থ এজন্য 'গুরুভ্যাং গুরু যোগাচ্চ সম্প্রদায় প্রভুঃ সদি। শাস্ত্রবা মানণীয়স্ত বচনং তস্য সংসাদি'—এই বচনানুসারে গুরু কৃপায় সিদ্ধি লাভ সহ সম্প্রদায়ের সৃষ্টিকর্ত্তা হবেন। মন্ত্রাধিপতি বুধ ও লগ্নাধিপতি শনি মুখ্য সম্বন্ধ করেছে। নবমাধিপতি তুঙ্গী শুক্র ও লগ্নাধিপতি শনি পরস্পর পূর্ণদৃষ্টি সম্বন্ধে আবদ্ধ। শনি পঞ্চম ভাব ও দশম ভাবকে পূর্ণ পরিমাণে দৃষ্টি করছে। সুতরাং শনি লগ্নপতি হয়ে পঞ্চম পতি ও বলবান শুভযুক্ত নবম পতির সঙ্গে সম্বন্ধ করে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবকে উচ্চশ্রেণীর কঠোর তপস্বী করেছে। (গুরু সম্বন্ধেন সম্প্রদায় সিদ্ধিঃ ইতি জৈমিনী সূত্রে) পত্নীভাব পাপ মধ্যগত, কাম কারক গ্রহ শুক্র তুঙ্গস্থ মন্ত্রাধিপতি হয়ে গুরুর সঙ্গে অবস্থিত, চতুর্থস্থ মঙ্গল পত্নী হানি কারক এবং প্রবল সন্ন্যাস যোগে জন্ম। তা ছাড়া পূর্ণ অবতারাংশে জাত এজন্যে জীবনে দাম্পত্য ভাব বা স্ত্রী সহবাস সুচিত হয় না, সংসারে থেকে সংসার হোতে নির্লিপ্ত বুঝায়। পরমহংস দেবের পক্ষে কুম্ভলগ্ন ব্যতিক্রম।

ব্যক্তিগত দ্বাদশরাশির ফলাফল

মেষরাশি

অশ্বিনী ও ভরণী নক্ষত্র জাত ব্যক্তির সময়টী শুভ, কৃত্তিকা জাত ব্যক্তির পক্ষে অধম। সুখ, উত্তম স্বাস্থ্য লাভ, সৌখিন দ্রব্যাদি উপভোগ, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, সৌভাগ্য প্রাপ্তি। গ্রহ বৈগুণ্য হেতু কেবলমাত্র অহেতুক অপবাদ, উদ্বেগ, অশান্তি, বন্ধুর সহিত কলহ এবং কিছু শারীরিক পীড়া। উদর শূল, শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট, হাঁপানি, প্রভৃতি পুরাতন ব্যাধিগ্রস্তদের মধ্যে দেখা দেবে। রক্তের চাপবৃদ্ধি যোগও আছে। প্রথমার্দ্ধে দুর্ঘটনার ভয়। গৃহে সন্তানের জন্ম, পারিবারিক শান্তি। সামাজিক প্রভাব ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি, বিবাহ প্রভৃতি উল্লেখ যোগ্য। স্বজনবন্ধুর সঙ্গে অল্পবিস্তর মতভেদ ও কলহ। আর্থিক দুশ্চিন্তা, সামান্য ক্ষতি বা আর্থিক অনটন দেখা দিলেও শেষ পর্য্যন্ত অর্থাগমের পথ প্রশস্ত হবে, নব প্রচেষ্টা ও উদ্যম আর্থিক ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করবে, হাতে দুপয়সা আসবে। স্পেকুলেশনে লাভ ক্ষতি সমান হবে, বিশেষ লাভ হবেনা। এজন্যে এদিকে না যাওয়াই ভালো। বাড়ী কেনা বেচা না করাই ভালো। পৈতৃক সম্পত্তি নষ্ট হবার আশঙ্কা আছে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে মাসটী মোটেই ভালো নয়। চাকুরি জীবির পক্ষে ভালো বলা যায়, যদিও মাঝে মাঝে উপর ওয়ালার কাছে কাজের জন্যে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। দেখা দিয়েও কাজের সুবিধা হবেনা তবুও বলা যেতে পারে একটু আধটুকু অসুবিধা সত্বেও পদ মর্য্যাদা বৃদ্ধি ও কর্ম্মোন্নতির সুযোগ আসবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবিদের পক্ষে সামান্য বাধা, এদেরও সাফল্য ও উন্নতি দেখা যায়। স্ত্রীলোকের পক্ষে খুব ভালো সময়। অবৈধ প্রণয়ে আশাতীত সাফল্য। নূতন নূতন আমুদে ও প্রেমিক বন্ধুলাভ। সামাজিক পারিবারিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে বেশ মর্য্যাদা লাভ আর কর্ত্তৃত্ব করবার সুযোগ। সামাজিক উচ্চস্তরে বিহার, আমোদ প্রমোদ ও বিবিধ অনুষ্ঠান যোগ দান। অতিরিক্ত উৎসাহ ও শক্তি অপচয়ের ফলে এমাসে স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে পারে। বন্ধু বান্ধবের সংস্রবে এসে নানা প্রকার প্রলোভন, উত্তেজনা বৃদ্ধি ও অমিতাচারের পরিবেশ সৃষ্টি হবে। এ গুলিকে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে বেশী প্রশ্রয় দেওয়া অনুচিত। সংযম ও মিতাচার আবশ্যক। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মধ্যম সময়। রেস খেলায়-কিছুটা লাভ হবে।

বৃষরাশি

কৃত্তিকা ও মৃগশিরা জাত গণের পক্ষে সময়টা কাট্‌বে ভালো। রোহিণীজাতগণের পক্ষে তেমন সুবিধে হবে না। প্রচেষ্টায় সাফল্য, বিলাস ব্যসন, আমোদ প্রমোদ, সুখ সম্ভোগ, লাভ, বিদ্যার্জ্জনে সাফল্য, শিক্ষায় উন্নতি, পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রভৃতি শুভ সুযোগ আছে। মাসের দ্বিতীয়ার্দ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রুরা কিছু কষ্ট দিতে পারে, অপ্রিয় পরিবর্ত্তন, ক্ষতি, শারীরিক কষ্ট প্রভৃতির সম্ভাবনা। ভ্রমণ এমাসে একেবারে বর্জ্জন করাই ভালো। সকল রকম প্রচেষ্টাতে কেবল বাধা। উদর, বুক, হৃদয় অথবা চোখ নিয়ে যারা অনেকদিন থেকে ভুগছে, তাদের প্রথমার্দ্ধে খুব নজর নেওয়া দরকার। রক্তের চাপবৃদ্ধিরোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের সাবধানতা আবশ্যক। পিত্তঘটিত পীড়া। পারিবারিক ক্ষেত্রে সামান্য কলহ মনোমালিন্য হোলেও ঐক্যসূত্র ছিন্ন হবে না। ঝগড়াটা বাধবে সংসারের খরচ পত্র নিয়ে, এছাড়া কিছু নয়। মাসের গোড়ার দিকে আর্থিক অবস্থাটা উজ্জল না হোলেও, যতদিন যাবে, পয়সা আসতে

থাকবে আর মুখে হাসি ফুটবে। দ্বিতীয়ার্দ্ধে ব্যয় বেড়ে যাবে, একটু আধটুকু ক্ষতি সহ্য করতে হবে। তাতে অবস্থার অবনতি হবেনা তবে আর্থিক সঞ্চয়ের ব্যাঘাত ঘটবে। স্পেকুলেশনে গেলে ক্ষতি অনিবার্য্য। সম্পত্তি নিয়ে দুর্ভোগ নেই বরং লাভ আর ভাড়া আদায় বৃদ্ধি। জমি বা বাড়ী কেনা বেচার টাকা ছাড়লেই মুস্কিলে পড়তে হবে। এ সব সঙ্কল্প সাময়িক ভাবে স্থগিত রাখা ভালো আগামী ভালো সময়ের জন্যে। বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারে ভ্রমণ হবে, ভ্রমণে আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবেনা। সম্পত্তির ব্যাপারে ঝগড়া বিবাদ, মামলা মোকর্দ্দমা, স্বত্ব স্বামিত্ব নিয়ে বাগ্ বিতণ্ডা বর্জ্জনীয়। চাকুরিজীবীদের প্রতিকূল পরিস্থিতি নয়। প্রথমার্দ্ধটী বেশ ভালো যাবে। তবে এমাসে উপরওয়ালার সঙ্গে মতভেদ জনিত অশান্তি ঘটতে পারে, এজন্যে বিশেষ সাবধান। প্রথমার্দ্ধে ব্যবসায় ও বৃত্তিজীবিকার ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত ভাবে অনুকূল আবহাওয়া কিন্তু এ আবহাওয়া দ্বিতীয়ার্দ্ধে হ্রাস পাবে। ব্যবসায়ে নব প্রচেষ্টা ব্যর্থতা ব্যঞ্জক ও ক্ষতিপ্রদ। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী মোটামুটি বেশ অনুকূল। অবৈধ প্রণয় উপভোগে প্রচুর আনন্দ, উপঢৌকন ও উপহার প্রাপ্তি, নূতন পোষাক পরিচ্ছদ, গন্ধ দ্রব্যাদি ও অলঙ্কারে সুসজ্জিত হবার যোগ। দাম্পত্য প্রণয়। সন্তান জন্ম। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে পরম তৃপ্তি। সামাজিক ক্ষেত্রে জনপ্রিয়তা লাভ ও উল্লেখযোগ্য হবার সুযোগ প্রাপ্তি। যন্ত্র ও কণ্ঠ সঙ্গীতে ছায়া চিত্রে ও রঙ্গমঞ্চে যারা নিজেদের নিয়োগ করেছে, তাদের সাফল্য ও প্রশংসা লাভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের উত্তম সময়। রেসে পরাজয়।

মিথুন রাশি

মৃগশিরা আর্দ্রা জাত গণের পক্ষে ভালো, পুনর্ব্বসুর পক্ষে সামান্য ক্ষতি। মোদ্দা কথা এমাসে মিথুন রাশির বেশ বহাল তবিয়তে কাটাবে। নব নব প্রচেষ্টায় সাফল্য, লাভ, সুখ সমৃদ্ধি বিলাসিতা, আত্ম প্রসাদ লাভ, ধন বৃদ্ধি, বিদ্যার্জ্জনে উন্নতি, শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে সাফল্য প্রভৃতি দেখা যায়। স্বজন কুটুম্বরা কিছু বেগ দেবে, তার জন্যে উদ্বিগ্নতা আর দুশ্চিন্তা, ক্ষতি ইত্যাদির সম্ভাবনা। শারীরিক অবস্থা ভালো যাবে। সংসারে যেটুকু ঝগড়া বা মনোমালিন্য হবে তাও ঘরে বাইরের আত্মীয় স্বজনের চাপে পড়ে। এ থেকে একমাত্র মানসিক অস্বচ্ছন্দতা ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। আর্থিক স্বচ্ছন্দতা ও উন্নতি। স্পেকুলেশনে লাভ হবে না। সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে অনুকূল আবহাওয়া। জমি বাড়ীর পিছনে কিছু টাকা ছেড়ে নিজেকে বেশ একটু গুছিয়ে নেওয়া যেতে পারে। গৃহ নির্ম্মাণ, খনির কাজ, চাষ আবাদ সব কিছুর ভেতরই ফুটে উঠবে সার্থকতা। ভূসম্পত্তি থেকে আয় বৃদ্ধি সুরু হবে, বাড়ী ভাড়া দিয়ে ও ঐ একই ব্যাপার। কৃষি কার্য্যেও বেশ লাভ। দমকা খরচার দরকার হোতে পারে কিন্তু একটু সতর্ক হোলে নিজেকে বাঁচিয়ে চলার পক্ষে কোন কষ্ট হবে না। চাকুরিজীবির পক্ষে এক ভাবেই মাসটা যাবে। তবে কাজে ফাঁকি না দিয়ে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে গেলে অফিসে সুনাম ও দক্ষতা বৃদ্ধির সময় আসবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে সুবর্ণ সুযোগ ও কর্ম্মতৎপরতার বৃদ্ধি। কথা বলবার অবকাশ হবে না, কেননা ক্রমাগত পয়সা আসতে থাকবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়। আমোদ প্রমোদ ও বিলাসিতার আধিক্যে মগ্ন হয়ে অপরিমিত ব্যয় করবে। অবৈধ প্রণয়িনীরা ভালো বাসার সুদৃঢ় ভিত্তির জন্যে প্রণয়ীর উদ্দেশ্যে নানা প্রকার দ্রব্যাদি ক্রয় করে হাত ফাঁকা করে ফেলবে। তরুণীরা তরুণদের সঙ্গে অতিরিক্ত মেশামিশি করবে আর ব্যয় প্রবণ হয়ে উঠবে। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্র উত্তম। দাম্পত্য সুখ বৃদ্ধি। শিল্পকলা নিপুণা স্ত্রীলোক সমাদৃতা হবে। রঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রীর খ্যাতি। গায়িকা ও যন্ত্র শিল্পীর সমাদর লাভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম সময়। রেসে জয়লাভ।

কর্কট রাশি

পুষ্যাজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম, পুনর্ব্বসুর পক্ষে মধ্যম ও অশ্লেষাজাত গণের পক্ষে অধম সময়। এমাসে আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে, উদ্দেশ্যসিদ্ধি, লাভ, বিলাস ব্যসন, নূতন পদ মর্য্যাদা বৃদ্ধি, সৌভাগ্য সুখ, বন্ধুলাভ, প্রভৃতির যোগ আছে। প্রতিকূল পরিবর্ত্তন, ক্ষতি, ক্লান্তিকর ভ্রমণ, ভগ্ন স্বাস্থ্য, কলহ বিবাদ ও অপমান, নব প্রচেষ্টায় অসাফল্য, দুর্ঘটনা প্রভৃতির সম্ভাবনা। এতদ্ সত্বেও মাসটা মন্দ যাবে না। শারীরিক দুর্ব্বলতা, ভ্রমণে ক্লান্তি ছাড়া বিশেষ কোন অসুখ নেই। দুর্ঘটনার ভয় আছে, ভ্রমণে সতর্কতা আবশ্যক। ঝগড়া বিবাদ বর্জ্জনীয়, পরিবর্ত্তনের দিকে না যাওয়াই ভালো। স্ত্রী পুত্রাদির কিছু অসুখ হোতে পাবে। পারিবারিক শান্তি বজায় থাকবে। বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে বা আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে কলহ বিবাদ মনোমালিন্য ইত্যাদি সূচিত হয়।

আর্থিক অবস্থা মোটের উপর ভালো, গড় পড়তার উপর আয় হবে, আর্থিক প্রচেষ্টায় সাফল্য। দ্বিতীয়ার্দ্ধটি বিশেষ ভালো যাবে। কিছু আর্থিক ক্ষতি হোলেও শেষ পর্য্যন্ত পুষিয়ে যাবে। স্পেকুলেশনে ক্ষতি। বাড়ী কেনা বেচার ব্যাপারে মাসটী সুবিধে জনক নয়। চাষবাসের জন্যে জমির উন্নতি করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে না। যাহোক বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে মাসটা নেহাৎ খারাপ যাবে না। চাকুরিজীবির পক্ষে উত্তম সময়। বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে। নূতন পদ মর্য্যাদা লাভ ও সম্মান বৃদ্ধি। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির শুভ পরিস্থিতি ও উত্তম সুযোগ। প্রথমার্দ্ধটী স্ত্রীলোকের পক্ষে অতীব শুভ সময়। অবৈধ প্রণয়ে, পর পুরুষের সান্নিধ্যে, আমোদ প্রমোদে, ভ্রমণে, নৃত্য গীতাদি উৎসবে, বিলাস ব্যসন ও প্রসাধনে অত্যন্ত আনন্দ লাভ, উপঢৌকন প্রাপ্তি এবং সম্ভোগসুখ লাভ। পারিপারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে মর্য্যাদা বৃদ্ধি। দাম্পত্য প্রীতি। বিবাহের মাধ্যমে প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর সংসারে প্রবেশ। কোর্টসিপে সাফল্য, নূতন নূতন পুরুষ বন্ধুর সংগ্রহে প্রীতিলাভ। এমাসে ঘরে বাইরে নানাপ্রকার প্রলোভনের ব্যাপার ঘটবে, এজন্যে পূর্ব্ব হোতে সতর্কতা আবশ্যক। চলাফেরায়, কথাবার্ত্তায় ও আমোদ প্রমোদে সংযত হওয়া ও শালীনতা রক্ষা কল্যাণ জনক। দ্বিতীয়ার্দ্ধটী খুব সুবিধা জনক নয়। বিদ্যার্থীর পক্ষে সময়টী মধ্যম। রেসে পরাজয়।

সিংহ রাশি

মঘা ও উত্তর ফল্গুনী জাতগণের পক্ষে উত্তম। পূর্ব্বফল্গুনী জাতগণের পক্ষে নিকৃষ্ট। সাফল্য, লাভ, বিলাসব্যসন, উত্তম ও শক্তি সম্পন্ন বন্ধু, প্রতিদ্বন্দ্বীও শত্রু জয়, সৌভাগ্য, নূতন বিষয়ে অধ্যয়ন ও চর্চ্চা, জ্ঞানবৃদ্ধি, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। প্রথমার্দ্ধে আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে কলহ ও মনান্তর, মানসিক কষ্ট, সর্ব্ব প্রকার উদ্বিগ্নতা। দুর্ব্বলতা ছাড়া বিশেষ কিছু অসুখ হবে না, ধারালো অস্ত্রে আঘাতের সম্ভাবনা। পরিবারবর্গের সঙ্গে অল্প-বিস্তর কলহ। দ্বিতীয়ার্দ্ধে এসব কিছু ঘটবে না। সন্তান জন্ম, বিবাহ অথবা অন্যান্য উৎসব অনুষ্ঠানে গৃহ আনন্দ মুখর হবে। আর্থিক স্বচ্ছলতা আয়বৃদ্ধিহেতু লাভ, আর্থিক প্রচেষ্টায় সাফল্য, গড় পড়্তা আয়ের ওপর অর্থাগম। ব্যয় বৃদ্ধি হোলেও আয়াধিক্যহেতু বিশেষ কষ্ট হবে না। স্পেকুলেসনে সাফল্যের যোগ, ভূম্যধিকারী বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবির পক্ষে উত্তম সময়। ভ্রমণের সম্ভাবনা। কৃষি ভূমি ও গৃহ সংক্রান্ত ব্যাপারে অর্থ নিয়োগ করতে পারলে পরে অবস্থার উন্নতি ও লাভের মুখ দেখা যাবে। বাড়ী ভূমি কৃষি সম্পদ প্রভৃতি কেনা বেচায় সন্তোষ জনক লাভ, সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে বাদ বিসম্বাদ বা গোলযোগ হোলেও শেষ পর্য্যন্ত জয় লাভ। চাকুরি জীবির উত্তম সময়। চাকুরি প্রার্থীর নিয়োগ কর্ত্তার কাছে যাওয়া বা পরীক্ষা দেওয়া ব্যর্থ হবে না, কর্ম্মে নিযুক্ত হবে। মুরুব্বিও জুটবে। প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করা যাবে। ব্যবসায়ে ক্রমোন্নতি ও প্রসার বৃদ্ধি, বৃত্তি জীবির উত্তরোত্তর লাভ ও অর্থাগম। যে সব স্ত্রীলোক সমাজে ঘুরে বেড়ায় ও সামাজিক পরিবেশে পরের মনস্তুষ্টি করে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত আর পুরুষ মহলে পসার প্রতিপত্তি করে নিয়েছে, তাদের অত্যন্ত শুভ সময়। অর্থ ও উপহারের প্রাচুর্য্য, সমাদর ও কর্তৃত্ব করবার অধিকার তারা পাবে। যে সব নারী গার্হস্থ্য জীবনের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ, তারা ও সুখ স্বচ্ছন্দতা, দাম্পত্য প্রণয়, বস্ত্রালঙ্কার, স্নেহ প্রীতি ও ক্ষমতা লাভ করবে। পারি বারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম। প্রসাধন সজ্জা, আসবাব পত্র ক্রয়, ঘর গোছানো, থিয়েটার সিনেমা দেখার নেশা প্রভৃতির দিকে চিত্ত কেন্দ্রীভূত হবে। পারিবারিক আভ্যন্তরীণ শান্তি ও গৃহ সংস্কার দেখা যায়। তাছাড়া বহু উৎসব অনুষ্ঠানে যোগ দেবার আমন্ত্রণ আসবে। বিদ্যার্থীও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম সময়। রেসে লাভ।

কন্যা রাশি

উত্তর ফল্গুনী ও চিত্রা নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। হস্তার পক্ষে নিকৃষ্ট সময়। বহু বিষয়ে মাসটী সকলের পক্ষেই বিশেষ আশা প্রদ নয়। তার কারণ বন্ধু বান্ধব ও স্বজন বর্গের সঙ্গে মতভেদজনিত অশান্তি, সুযোগবাদী বন্ধুর প্রতারণা ও প্রলুব্ধ করার অপকৌশল বিস্তার, স্বাস্থ্য হানি, চতুর্দ্দিকে শত্রুর সমাগম, ক্ষতি, আঘাত, নব পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টার প্রতিহত হওয়া, ভ্রমণে অবসাদ, ব্যয়বৃদ্ধি, মোকর্দ্দমার পরাজয় প্রভৃতি চিন্তার উদ্রেক করবে। এতদ্ সত্ত্বেও কিছু সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভ, সমৃদ্ধি আয়াস ও বিলাসিতা বৃদ্ধি ঘটবে। প্রথমার্দ্ধই উত্তম, শেষার্দ্ধ সুবিধাজনক নয় ও নিজের স্বাস্থ্য সেরূপ ভেঙে না পড়লেও স্ত্রী পুত্রদের শরীর ভালো যাবে না। নিজের রক্তের চাপ সম্পর্কে নজর রাখা দরকার। ঈষৎ আঘাত শরীরে পেলেই উপেক্ষা করা চলবে না, কেননা দূষিত ক্ষত সৃষ্টি হোতে পারে। ঘরে বাইরে স্বজন বন্ধুবর্গের সঙ্গে মনোমালিন্যের যোগ থাকায় আচার আচরণে হুঁশিয়ার হয়ে চলা দরকার। আর্থিক অবস্থা ভালোই হবে। নানাদিক থেকে অর্থ আসবে কিন্তু ব্যয়বৃদ্ধির জন্যে সমস্যার উদ্ভব হবে। ক্ষতি হবে, এজন্য নজর রাখা দরকার। স্পেকুলেসন একেবারেই চলবে না। সম্পত্তির ব্যাপারে সন্তোষজনক পরিস্থিতি বলা যায়না। আদায়পত্র তেমন হবে না, মামলা মোকর্দ্দমার সূত্রপাত হতে পারে। গৃহ ভূসম্পত্তি কেনাবেচায় ঠকতে হবে। গৃহাদি নির্ম্মাণ বা সংস্কার একান্ত আবশ্যক না হোলে বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে মাসটী ভালো বলা যায়না। চাকুরির ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক, কেননা যাদের ওপর নির্ভরশীল, তারা বিশ্বাসঘাতকতা করবে এবং ভ্রান্তপথে পরিচালিত করবে। ফলে উপরওয়ালার বিরক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে। নিজের বিবেকানুসারে অফিসের কাজ করলে বিপন্নতার সম্ভাবনা কম, পরপরামর্শ একেবারে বর্জ্জনীয়, তাতে চাকুরিস্থলে ক্ষতি হবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির প্রচুর লাভ ও ধনাগম। স্ত্রীলোকের পক্ষে অতি সাধারণ সময়। বাড়ীতে ভৃত্যাদির কার্য্যকলাপ বিশ্বস্তজনক হবে না। এমাসে নতুন চাকর নিয়োগ অনুচিত। ভৃত্যাদির ওপর কড়া নজর রাখা দরকার। বিবাহ সম্পর্কে মনোমত পাত্র পাওয়া যাবেনা। অবৈধ প্রণয়ে বিপত্তি। পরপুরুষের সান্নিধ্যে না আসাই ভালো। রুটিন মাফিক কাজ করে চললে কোন ভয় বা অপবাদের সম্ভাবনা নেই। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটী আশাপ্রদ নয়। রেসে পরাজয়।

তুলা রাশি

চিত্রাজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম, স্বাতী ও বিশাখাজাতগণের পক্ষে মধ্যম। শত্রুজয়, প্রচেষ্টায় সাফল্যলাভ, বিলাসব্যসন দ্রব্যাদি লাভ, সৌভাগ্যবৃদ্ধি, আয়বৃদ্ধি, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, জ্ঞানবৃদ্ধি, প্রভাব প্রতিপত্তি প্রভৃতি যোগ আছে। শেষার্দ্ধে দুঃসংবাদ প্রাপ্তি, ভ্রমণে কষ্টভোগ, শত্রুবৃদ্ধি, অপমান প্রভৃতির সম্ভাবনা। প্রথমার্দ্ধে শারীরিক অস্বচ্ছন্দতা নেই, দ্বিতীয়ার্দ্ধে শারীরিক কষ্ট। পারিবারিক শান্তি ব্যাহত হবে। এজন্যে কথাবার্ত্তায় আচার আচরণে খুব হিসেব করে চলা দরকার। আর্থিকক্ষেত্রে মিশ্রফল। আয় হবে কিন্তু দ্বিতীয়ার্দ্ধে কিছু কিছু আর্থিক ক্ষতি। আয়বৃদ্ধি যোগ থাকলেও স্পেকুলেসন বা বেপরোয়া ব্যয় বর্জ্জনীয়।

সম্পত্তি ব্যাপারে মাসটা মোটেই সুবিধাজনক নয়। বাড়ী চাষ আবাদ খনিসংক্রান্ত ব্যাপার স্পেকুলেসন চলতে পারে। সম্পত্তি যেসব বাড়ী বা জমি কেনা হয়েছে তা নিয়ে গণ্ডগোল হবে, আত্মসমর্থনের জন্যে প্রস্তুত হওয়া দরকার। বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে মাসটী মোটামুটি মন্দ যাবে না। চাকুরির ক্ষেত্রে প্রথমার্দ্ধ অনুকূল,

শেষার্দ্ধে সুবিধাজনক নয়। উপরওয়ালার বিরাগভাজন হবার সম্ভাবনা। প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতার ব্যাপারে সতর্কতা আবশ্যক। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির উন্নতিযোগ। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়। অবৈধ প্রণয়ে আশাতীত সাফল্য। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে উত্তম পরিস্থিতি। দাম্পত্যসুখ। জনপ্রিয়তা ও মর্যাদাবৃদ্ধি। ছায়াচিত্রে ও রঙ্গমঞ্চে যে সব নারী নিযুক্ত, তাদের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। তাদের উন্নতি যোগ। বিদ্যার্থী পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটী মন্দ নয়। রেসে লাভ।

বৃশ্চিক রাশি

জ্যেষ্ঠাজাত ব্যক্তিগণের পক্ষে অধম। অনুরাধাজাতগণের পক্ষে উত্তম। বিশাখাজাতগণের পক্ষে মধ্যম। প্রচেষ্টায় সাফল্য, আয়বৃদ্ধি, বিলাসব্যসন, সৌভাগ্য, শত্রুজয়, উত্তম স্বাস্থ্য, সুখ, বন্ধুলাভ, প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি শেষার্দ্ধে প্রত্যক্ষ করা যায়। ক্ষতি, কলহ, মনান্তর, অসৎসংসর্গ, উদ্বিগ্নতা, বাধাবিপত্তি, শত্রুপীড়া প্রভৃতি প্রথমার্দ্ধে পরিলক্ষিত হয়। সাধারণতঃ উত্তম স্বাস্থ্য, পূর্ব্বের ব্যাধি থেকে মুক্তিলাভ, মানসিক অশান্তি হবে, আঘাত ও দুর্ঘটনার ভয় আছে। সতর্কতা দরকার। পারিবারিক সুখস্বচ্ছন্দতার অভাব। আর্থিক প্রচেষ্টা সন্তোষজনক। সামান্য বাধা ঘটতে পারে। প্রতারণায় ক্ষতি। স্পেকুলেশনে সুবিধা হবে না। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে উত্তম সময়। বাড়ী ও ভূমির ব্যাপারে অর্থলগ্নী, ক্রয় বিক্রয় প্রভৃতি লাভজনক। উত্তরাধিকারসূত্রে বা দানপত্রের মাধ্যমে সম্পত্তিপ্রাপ্তি। চাকুরিজীবির পদোন্নতি অথবা বেতনবৃদ্ধি। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির উত্তম আয় ও লাভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। অবিবাহিতদের বিবাহ যোগ ও মধুযামিনী যাপন, উত্তম আনন্দপ্রদ, অপরিমিত ব্যয় ও নানা-প্রকার আমোদ প্রমোদ ও যৌনসম্ভোগসুখপ্রাপ্তি। অবৈধ প্রণয়িনীর উত্তম সময়, পরপুরুষের সান্নিধ্যে আশাতীত লাভ ও উপহার প্রাপ্তি। অনুরাধা নক্ষত্রজাতা নারীগণের প্রথমার্দ্ধে বিশেষ শুভ, সুখৈশ্বর্য্যভোগ। সামাজিক, পারিবারিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে সম্মান প্রতিষ্ঠা ও কর্ত্তৃত্বলাভ। দাম্পত্যপ্রণয়। শিল্পকলা, রঙ্গমঞ্চ, চলচ্চিত্র অথবা সখের বা পেশাদারী অভিনয়ে যে সব নারী নিযুক্ত, তাদের বিশেষ অর্থাগম, পসারপ্রতিপত্তি কার্য্যের প্রসারতা বৃদ্ধি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীদের শুভ সময়। রেসে লাভ।

ধনু রাশি

মূলা ও উত্তরাষাঢ়াজাত ব্যক্তির উত্তম সময়। পূর্ব্বাষাঢ়াজাতগণের পক্ষে মধ্যম। মাসটী খুব ভালোও নয়, মন্দও নয়। কিছু অসুবিধাভোগ। মানসিক দুঃখ। আত্মীয়স্বজন ও শত্রুদের জন্য দুর্ভোগ। উত্তেজনাবৃদ্ধি। প্রচেষ্টায় অসাফল্য, ভ্রমণে অবসাদ, অবাঞ্ছনীয় পরিবর্ত্তন, কলহ বিবাদ ও মনান্তর। প্রথমার্দ্ধে এইসব কষ্টভোগ, শেষার্দ্ধে জনপ্রিয়তা লাভ, সাফল্য, সুখ, শত্রুজয়। শরীর ভালো বলা যায়না, নিজের ও সন্তানাদির পীড়া। যারা উদর ও গুহ্যঘটিত পীড়ায় বেশীদিন ভুগছে তাদের সতর্কতা দরকার। কোন স্বজনব্যক্তি বা অন্তরঙ্গ বন্ধুর মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্তি প্রথমার্দ্ধে আর্থিক স্বচ্ছলতার অভাব। অর্থসংক্রান্তব্যাপারে কোন প্রকার নব প্রচেষ্টা বর্জ্জনীয়। কারো জন্য জামিন হওয়া চলবে না হোলে বিরক্তির কারণ ঘটবে। বন্ধুদের জন্যে ক্ষতি। সন্দেহজনক ব্যক্তির সংস্রব ত্যাগ আবশ্যক। স্পেকুলেসন বর্জ্জনীয়। রুটিনমাফিক কাজ করে যাওয়াই ভালো। গৃহ ও ভূসম্পত্তি সম্পর্কে টাকা লেনদেন কেনাবেচা প্রভৃতি এমাসে স্থগিত রাখা দরকার। চাষবাসে ও ভাড়া আদায় সম্পর্কে নানাপ্রকার অসুবিধাভোগ। প্রথমার্দ্ধে মামলা মোকর্দ্দমার আশঙ্কা আছে। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে মাসটী ভালো নয়। প্রথমার্দ্ধে চাকুরিজীবির পক্ষে উপরওয়ালার বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা। দ্বিতীয়ার্দ্ধে কিছুটা ভালো। এমাসে চাকুরিজীবিদের রুটিন মাফিক কাজ করে যাওয়াই ভালো। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী মোটেই অনুকূল নয়। অর্থের অভাববোধ হবে, মনোমত জিনিষপত্র কেনার পক্ষে প্রতিকূল পরিস্থিতি। পুরুষের সঙ্গে মতভেদ ও কলহ। প্রণয়ভঙ্গ। অবৈধ প্রণয়িনীর লাঞ্ছনাভোগ ও মনস্তাপ। সামাজিক, পারিবারিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে গোলযোগের সৃষ্টি হবে। আশাভঙ্গ, মানসিক কষ্ট, শত্রুবৃদ্ধি ও অর্থক্ষয়। দ্বিতীয়ার্দ্ধে কিছুটা ভালো হতে পারে। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটা অশুভ। রেসে পরাজয়।

মকর রাশি

উত্তরাষাঢ়া ও ধনিষ্ঠা জাত গণের পক্ষে উত্তম। শ্রবণার পক্ষে অধম সময়। প্রথমার্দ্ধটী উত্তম, শেষার্দ্ধ আশানুরূপ নয়। প্রথমার্দ্ধে প্রচেষ্টায় সাফল্য, সুখ স্বচ্ছন্দতা, বিলাস ব্যসন ও আমোদ প্রমোদ, লাভ, উত্তম স্বাস্থ্য, শত্রুজয়, সৌভাগ্য, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ও উৎসব, জনপ্রিয়তা এবং খ্যাতি। দ্বিতীয়ার্দ্ধে মানসিক অস্বচ্ছন্দতার জন্য নানা প্রকারে দুঃখ ভোগ, আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে অসদ্ভাব, স্বাস্থ্য হানি, ব্যর্থ ভ্রমণ, কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করলে বাধা ও অসাফল্য। হজমের দোষ, উদরাময়, আমাশয়, জ্বর ইত্যাদি সূচিত হয়, চিকিৎসা বিভ্রাটেরও সম্ভাবনা। আর্থিক অবস্থা প্রথমার্দ্ধে সন্তোষজনক। দ্বিতীয়ার্দ্ধে প্রতারণা, চুরি, ক্ষতি প্রভৃতির আশঙ্কা, অপরিচিত লোকের সঙ্গে কোন প্রকার কাজে জড়িত না হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারো জন্যে জামিন হোলে বিপত্তি ঘটবে। প্রথমার্দ্ধে হিসেব করে স্পেকুলেশন করলে, লাভ হবে। প্রথম দিকে বাড়ীওয়ালা ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে উত্তম। শেষের দিকে আশাপ্রদ নয়। নানা প্রকারে ক্ষতি। চাকুরির ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধাজনক নয়। প্রথম দিকে কিছুটা ভালো! খুব সতর্ক হয়ে চলা দরকার। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে মাসটী উল্লেখযোগ্য নয়। যে সব স্ত্রীলোক সামাজিক জীবন যাপন করে, তারা প্রথমার্দ্ধে বিশেষ সুখ শান্তি পাবে। তাদের অর্থাগম ও লাভ। বন্ধু বান্ধবের সমারোহ ঘটবে। অবৈধ প্রণয়িনী প্রথম দিকে বেশ আনন্দে কাটাবে, শেষের দিকে তাকে সতর্ক হয়ে চলা দরকার। কোন কন্যা বা পুত্রের প্রশংসনীয় বিশেষ সাফল্য ও সিদ্ধির

সংবাদ প্রাপ্তি। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে যারা রঙ্গমঞ্চে চলচ্চিত্র বা সঙ্গীত কলার ক্ষেত্রে আছে, তাদের উন্নতি খ্যাতি ও প্রতিপত্তি। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু উল্লেখযোগ্য নেই। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়। রেসে জয়।

কুম্ভ রাশি

পূর্ব্ব ভাদ্রপদ জাত ব্যক্তির নিকৃষ্ট সময়, ধনিষ্ঠা এবং শতভিষা জাত গণের উত্তম সময়। উত্তম বন্ধু, শত্রুজয়, লাভ সুখ, খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা, নূতন বিষয়ে অধ্যয়ন, জ্ঞান লাভ, বিদ্যার্জ্জনে সাফল্য। দ্বিতীয়ার্দ্ধে কিছু অসুবিধা ভোগ, স্বজন বন্ধুর সঙ্গে মনান্তর, কর্ম্মে বাধা, নানা প্রকারের উদ্বেগ, ও দুশ্চিন্তা, শত্রু বৃদ্ধি। শরীর ভালো যাবে না। নানা প্রকারের পীড়ায় কষ্ট ভোগ, উদরের গোলযোগ, হজমের দোষ, বমন, উদরের ভেতর থেকে রক্তস্রাব ও নানা প্রকার ব্যাধি উপসর্গ। কোনটি গুরুতর হবে না। আয়ের পথ বন্ধ না হোলেও ব্যয়বৃদ্ধির জন্যে আর্থিক চাপ জনিত কষ্টভোগ, ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। কোন প্রকার প্রচেষ্টায় সাফল্য মণ্ডিত হবে না। আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা নেই। প্রথমার্দ্ধে অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে টাকা কড়ির লেনদেন বর্জ্জণীয়। জমি থেকে আয় বৃদ্ধি। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবি পক্ষে মাসটী মধ্যম। চাকুরী জীবির পক্ষে সময়টী এক ভাবেই যাবে। বিশেষ কিছু ভালোমন্দ দেখা যায় না। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবির পক্ষে মোটামুটি ভালো। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়। জনপ্রিয়তা, বিলাস ব্যসন, মাতুলালয়ে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। বিদ্যা শিক্ষার দিকে বিশেষ নজর, নূতন বিষয়ে শিক্ষার আগ্রহ, পরীক্ষায় সাফল্য, কর্ম্মপ্রার্থী হয়ে নিয়োগ কর্ত্তার সহিত সাক্ষাতে কার্য্য সিদ্ধি প্রভৃতির যোগ আছে। অবৈধ প্রণয়ে আশাতীত সাফল্য। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্র উত্তম। চাকুরির ক্ষেত্রে যে সব নারী আছে, তারা উপর ওয়ালার অনুগ্রহ লাভ করবে। সাজসজ্জা, প্রসাধন, বস্ত্রালঙ্কারের জন্য ব্যয়বৃদ্ধি, এজন্যে টাকার টান ধরতে পারে। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম সময়। রেসে লাভ।

মীন রাশি

উত্তর ভাদ্রপদ জাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম, পূর্ব ভাদ্রপদ জাত গণের পক্ষে মধ্যম এবং রেবতীর পক্ষে নিকৃষ্ট। এমাসে মিশ্রফল, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা বন্ধুবিরোধ, স্বজনের সহিত কলহ, প্রচেষ্টায় বাধা, ক্ষতি, স্বাস্থ্য হানি, শত্রুতা, ক্লান্তিকর ভ্রমণ প্রভৃতি গ্রহবৈগুণ্য জনিত ফল। লাভ, সুখ, যশ, খ্যাতি, প্রভাব প্রতিপত্তি, শত্রুজয়, প্রমোদ জনক ভ্রমণ, উত্তম বন্ধু প্রভৃতি শুভ ফল ঘটবে গ্রহদের আনুকূল্য হেতু। শরীরের দিকে নজর না দিলে রক্ত দুষ্টি. পিত্ত প্রকোপ, বাত, শারীরিক উষ্ণতা জনিত কষ্ট প্রভৃতি দেখা দেবে। প্রথমার্দ্ধে যেভাবেই হোক দুর্ঘটনার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা। পারিবারিক পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ, সুখ স্বচ্ছন্দতা উপভোগ। ঘরে বাইরে আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে মতানৈক্য। নানা উপায়ে অর্থাগম। ব্যয় বৃদ্ধি জনিত সঞ্চয়ের আশা কম। প্রথমার্দ্ধে প্রতারকের দ্বারা ক্ষতি। অপরিচিত লোকের সঙ্গে কোন প্রকার লেনদেন অনুচিত। জামিন হওয়া বিপদ জনক। স্পেকুলেশন বর্জ্জনীয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবির পক্ষে উত্তম সময়। দ্বিতীয়ার্দ্ধে নব প্রচেষ্টায় সাফল্য। চাকুরিজীবির পক্ষে মাসটি অনুকূল। নূতন পদমর্য্যাদা, উচ্চপদ প্রাপ্তি, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাফল্য। বেকার ব্যক্তির চাকুরি লাভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তি জীবির পক্ষে বিশেষ সাফল্য। প্রথমার্দ্ধে স্ত্রীলোকের পক্ষে অনুকূল নয়। জনসমাজে অপ্রিয় হবার সম্ভাবনা। অবৈধ প্রণয়িনীর সতর্কতা আবশ্যক। পারিবারিক সামাজিক ও প্রণয়ের ক্ষেত্র শুভ। দাম্পত্য প্রণয় লাভ। গৃহে মাঙ্গলিক উৎসব অনুষ্ঠান। বিদ্যার্জ্জনে সাফল্য, শিল্পকলায় উন্নতি ও খ্যাতি। রঙ্গমঞ্চে ও চলচ্চিত্রে সাফল্য। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম। রেসে পরাজয়।

ব্যক্তিগত দ্বাদশ লগ্ন ফল

মেষ লগ্ন

উদরঘটিত পীড়া, ধনভাব শুভ। বিদ্যাস্থানের ফল শুভ। আত্মীয়ের সঙ্গে মনোমালিন্য। বন্ধু বিরোধ। মাতার অসুস্থতা। মানসিক অস্বাচ্ছন্দতা। স্ত্রীর পীড়াদির সম্ভাবনা। কর্ম্মোন্নতি যোগ। মধ্যে মধ্যে ব্যয়াধিক্য। স্ত্রীলোকের পক্ষে আশাভঙ্গ ও মনস্তাপ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

বৃষলগ্ন

জ্ঞাতির সঙ্গে অথবা গুরুতর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের সঙ্গে বিরোধ, সেজন্য অপবাদ। পরস্থ ব্যক্তিদের কাছে যশ। কর্ম্মের জন্য এবং স্বাস্থ্য-লাভের জন্য ভ্রমণ রাজপক্ষ অথবা পিতৃপক্ষ থেকে অর্থপ্রাপ্তি। শিরঃ পীড়া। পুস্তকাদির জন্য ব্যয়। বিদ্যা জনিত যশ। মানসিক ব্যাধির আশঙ্কা। বিবাহের ব্যাপারে নৈরাশ্য। অবৈধ প্রণয়ের ব্যাপারে অপবাদ। বিদেশে সাফল্য ও উন্নতি। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। স্বামীপক্ষ থেকে প্রাপ্তি যোগ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

মিথুনলগ্ন

শারীরিক অবস্থা শুভ নয়। ঋণ যোগ। ধনাগম সত্ত্বেও অপরিমিত ব্যয়। ব্যয় সঙ্কোচে ব্যর্থতা। ভাগ্যোন্নতির যোগ। সন্তানের লেখা-পড়ায় উন্নতি। কর্ম্মোন্নতি ও পদমর্য্যাদা বৃদ্ধি। নূতন গৃহাদি নির্ম্মাণ বা গৃহ সংস্কারে অর্থব্যয়, রবিশস্য ব্যবসায়ীর বিশেষ লাভ। অবিবাহিত ও অবিবাহিতাদের বিবাহ আলোচনা। স্ত্রীলোকের পক্ষে অব্যবস্থিত-চিত্ততার জন্য দুঃখ ভোগ, এছাড়া অন্যান্যভাব শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

কর্কটলগ্ন

স্ত্রীর জন্য অশান্তি বা ঝঞ্ঝাট। পরিবারস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে বিচ্ছেদ। নীচ কুলে বিবাহ বয়স্কা মহিলার সঙ্গে। অদ্ভুত ঘটনা। ব্যক্তিত্ব। আর্থিকোন্নতি। আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মনোমালিন্য। সন্তানের উত্তম স্বাস্থ্য ও লেখাপড়ায় উন্নতির যোগ। মাতার শারীরিক অসুস্থতা,

নূতন কর্ম্মে অর্থ বিনিয়োগ করার জন্য ক্ষতির আশঙ্কা। চাকুরির ক্ষেত্রে পরিবর্ত্তন। এ পরিবর্ত্তনে আর্থিক স্বচ্ছন্দতা পূর্ণভাবে থাকবে। দাম্পত্য প্রণয় অক্ষুণ্ণ। ব্যবসায়ে অংশীর বিপদের জন্য ক্ষতি, উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি লাভ। কর্ম্মস্থানে নানা শত্রুর উপদ্রব। চাকুরির ক্ষেত্রে পরিবর্ত্তন, লৌহ, কয়লা, পাট ব্যবসায়ে উন্নতি। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ সময়।

সিংহলগ্ন

বিশেষ পিত্ত প্রকোপ জনিত পীড়া। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি, আকস্মিক অর্থপ্রাপ্তি। সহোদরের সহিত বিরোধ, সুপহানি। মানসিক কষ্ট। চাঞ্চল্যের জন্য অর্থোপার্জ্জনে ও সফলতায় বিঘ্ন। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো, মাতার পীড়া, পিতার শারীরিক অসুস্থতা। ভূসম্পত্তি ব্যাপারে বিবাদ বিসংবাদ ও নানা রকম ঝঞ্ঝাট। ঋণ জনিত অশান্তি। সন্তানের লেখাপড়ায় উন্নতি। কন্যা বা পুত্রের বিবাহ। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি যোগ। স্ত্রীলোকের পক্ষে সময়টী মধ্যম। নূতন গৃহ লাভ, সম্পত্তি ক্রয়ের যোগ। মান সম্ভ্রম ও প্রতিষ্ঠা। অপব্যয়। অস্থাবর সম্পত্তি চুরি, প্রতারণা, বা দুর্ঘটনায় হোতে পারে, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

কন্যালগ্ন

বিদেশে ও বৈদেশিক ব্যাপারে, আইন আদালতের সংস্রবে, অথবা ভ্রমণের দ্বারা প্রতিষ্ঠা ও গৌরব লাভ, শারীরিক অসুস্থতা। আর্থিকোন্নতি যোগ। ধনাগমে কিঞ্চিৎ অন্তরায়, ভ্রাতৃভাবের ফল শুভ নয়। বৈষয়িক ব্যাপার নিয়ে ভ্রাতার সঙ্গে বা ভ্রাতৃস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে মনোমালিন্য। সন্তানের পীড়াদি ও উচ্চ বিদ্যালাভে এমাসে বাধা। জাতকের প্রণয়াদি ব্যাপারে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি। মাতার দীর্ঘকালব্যাপী পীড়ার যোগ, নূতন গৃহাদি নির্ম্মাণ ও সংস্কারাদিতে অর্থব্যয়। নারিকেল ও গুড় ব্যবসায়ে উন্নতি। ভাগ্যোন্নতি। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটী আশাপ্রদ নয়।

তুলা লগ্ন

রক্ত ঘটিত পীড়া। পারিবারিক অশান্তি। যথেষ্ট উদ্বেগ। আশাভঙ্গ। মনস্তাপ, সাময়িক ঋণ যোগ। ব্যয়ের মাত্রাধিক্য। আত্মীয় ও বন্ধু বান্ধবের সহানুভূতি। কর্ম্মস্থান শুভ হোলেও গুপ্ত শত্রুর দ্বারা অনিষ্টের চেষ্টা। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। ফাটকায় টাকা পাবার সম্ভাবনা। গ্রন্থকার হিসাবে খ্যাতি। মাতার জীবনাশঙ্কা। স্ত্রীলোকের পক্ষে মধ্যম সময় কিন্তু প্রণয় ঘটিত ব্যাপারে সাফল্য ও সুখ জনক অভিজ্ঞতা, বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম সময়। সংস্কৃত ও গণিত শাস্ত্রের ফল অধিকতর শুভ।

বৃশ্চিকলগ্ন—

শারীরিক ও মানসিক কষ্ট। সহোদরের সঙ্গে মনোমালিন্য। উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে বিরোধ। ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা। অর্থাগম বন্ধুভাব শুভ। দাম্পত্যপ্রণয় যোগ। সন্তানের শারীরিক অসুস্থতা বা পীড়া এবং বিদ্যালাভে বিঘ্ন। চিকিৎসাদি গবেষণায় সুনাম। ভাগ্যোন্নতিতে কিঞ্চিৎ বাধা। কর্ম্মস্থল ভালোই বলা যায়। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী ভালো বলা যায় না। নানা ঝঞ্ঝাট ও ক্ষতির কারণ ঘটবে। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়।

ধনুলগ্ন—

শারীরিক ও পারিবারিক স্বচ্ছন্দতার কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত ঘটবে। লৌহ, ধান্য ও চাউলের ব্যবসায় লাভ। ধনভাব উত্তম হোলেও ব্যয়াধিক্য হেতু বিব্রত হওয়ার সম্ভাবনা। ভ্রাতা বা তৎসম্পর্কীয় ব্যক্তির সহযোগে ও ব্যয় বৃদ্ধি হবে। সন্তানের লেখাপড়ায় উন্নতি। কন্যার বিবাহ সম্ভাবনা। পত্নীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ভালো যাবে না। শিল্পসাহিত্য চর্চ্চায় মনঃসংযোগ। ভাগ্যোন্নতির যোগ ভ্রমণাদি ব্যাপারে অর্থের টান। মিত্র লাভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ সময়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

মকরলগ্ন—

স্বাস্থ্য সম্পর্কে অশুভ, দেহ ভাবে ক্ষতির আশঙ্কা। শয্যাশায়ী হবার যোগ। রক্ত-সম্বন্ধীয় পীড়া, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা। চিকিৎসা বিভ্রাট ঘটতে পারে। আশাভঙ্গ ও মনস্তাপ। চিকিৎসার জন্য অর্থ ব্যয় হোলেও ধনাগমে বাধা হবেনা। সহোদর ভাব শুভ। মিত্রলাভ। মিত্রের সাহায্যে নানা প্রকার সুযোগসুবিধা। বিত্তোন্নতি যোগ। সন্তানের স্বাস্থ্যোন্নতি। সাময়িক ঋণ। শত্রু বৃদ্ধি। ধর্ম্মানুষ্ঠান ও তীর্থ ভ্রমণ। চাকুরি ক্ষেত্রে পদোন্নতি। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী আশাপ্রদ নয়। স্বামীর পীড়াদি কষ্ট। নৈরাশ্য জনক পরিস্থিতি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম সময়।

কুম্ভলগ্ন—

শারীরিক সুস্থতা মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যতা, জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য ভ্রমণ, বিদ্যা-বুদ্ধির দ্বারা খ্যাতিলাভ, দুর যাত্রার ক্ষতি, বিদেশ ভ্রমণ যোগ, সহোদর ভাবের ফল শুভ, সহোদরের সাহায্যে আর্থিকোন্নতি। সহৃদয় বন্ধুলাভ। সাহায্যে আর্থিকোন্নতি বা পদোন্নতি। সন্তানস্থানের ফল শুভ। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো। আশাযুক্ত মন। সন্তানের লেখাপড়ায় উন্নতি। পুত্র বা কন্যার বিবাহ। ভাগ্যোন্নতি। পিতার চিকিৎসার জন্য অর্থব্যয়ের পরিমাণ বেশী হবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়। সাফল্য ও উন্নতি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম সময়।

মীনলগ্ন—

শারীরিক ও মানসিক কষ্ট। আকস্মিক আঘাত রক্তপাত, পাকযন্ত্রের পীড়া ও বেদনা সংযুক্ত পীড়া ভোগ। যথেষ্ট বাধা সত্ত্বেও ধনাগম কিন্তু সঞ্চয়ের আশা কম। অনিচ্ছাসত্ত্বেও অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ অধিক। সময়ে সময়ে চিত্ত চাঞ্চল্য ও ক্রোধ বৃদ্ধি। আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে নির্ম্মম ব্যবহারের ফলে অনেকের নিকট অপ্রিয়ভাজন হবে। সম্বন্ধলাভ। মাতা বা মাতৃস্থানীয়ার জীবন সংশয়। পড়াশুনায় নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি। পরীক্ষা বিষয়ে আশাপ্রদ নয়। স্ত্রীর স্বাস্থ্য কিছু ভাল হোলেও দাম্পত্য কলহ বা স্ত্রীর সঙ্গে মতানৈক্য। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটী ভালোই যাবে, তবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মাসটী আশাপ্রদ নয়।

পাট ও পীঠ

শ্রী'শ'—

॥ বিদেশে বাংলা চিত্র ॥

লণ্ডনে সত্যজিৎ রায়ের অপুর তিনটি চিত্র ('পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত' ও 'অপুর সংসার') যে Academy Cinemaতে দেখান হয়েছিল অনেকদিন পরে সেখানেই আবার শ্রীরায়ের "জলসাঘর" বা "The Music Room" দেখান হল। এই Academy Cinema সিনেমা শিল্পের ছাত্র ও সমালোচকদের জন্য এঁদের প্রদর্শিত চিত্রগুলির যে গুণব্যাখ্যা প্রকাশ করেন তাতে "The Music Room" সম্বন্ধে একজায়গায় বলেছেন :—

......"As one watches the film the name of Y. B. Yeats comes more and more strongly to mind ; if Yeats had gone to India and had written a film script there, something like 'The Music Room' might well have been the result." আরও বলেছেন......"the deep human insight, the concern with people rather than sociological abstractions and the wonderfully sensitive feeling for the complexities of India's cultural heritage." "The Music Room" রাশিয়ান পরিচালক Yosit Heifitz's-এর চেকভ-এর বিখ্যাত গল্প অবলম্বনে নির্মিত "The Lady With the Little Dog" চিত্রটির সহিত Academy-তে দেখান হয়। এই দুটি চিত্র সম্বন্ধে Academy review বলেছেন—

"Both films distinguished by their sensitive concern with the feelings and problems of individual human beings : both exhibit a stylistic maturity, an artistic quality of what one can only call serenity, which has become exceedingly rare in the contemporary cinema."

*   *   *

মুক্তি প্রতীক্ষিত "অতল জলের আহ্বান" চিত্রে রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত বাংলা কথাচিত্র "ভগিনী নিবেদিতা" ভেনিসের ২৩শ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে পাঠাবার জন্য নির্ব্বাচিত করা হয়েছে। ভেনিসের চলচ্চিত্র উৎসবটি আগষ্টের ২৫ তারিখ থেকে ৮ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।

* * *

Cannes Film Festival-এ সত্যজিৎ রায়ের "দেবী" বা "Goddess" চিত্রটি দেখান হয়েছে। দর্শকরা বলেছেন 'চমৎকার', আর সমালোচকরা বলেছেন—চমৎকার কিন্তু একঘেয়ে ও শ্লথগতি। তবে ওস্তাদ আলি আকবর খাঁয়ের সঙ্গীতের ও সুব্রত মিত্র ফটোগ্রাফীর প্রশংসা সবাই করেছেন। আর বিরূপ সমালোচনা হয়নি শর্ম্মিষ্ঠা ঠাকুর, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় ও পুর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়ের চমৎকার অভিনয়ের।

* * *

"হাঁসুলী বাঁকের উপকথা" চিত্রটির আমেরিকায় ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রদর্শিত হবার সম্ভাবনা আছে। নিউ ইয়র্কের এস, এণ্ড, এ থিয়েটার্স চিত্রটির প্রযোজক শ্রীশ্যামলাল জালানকে ছবির একটি কপি পাঠাতে অনুরোধ করেছেন এবং "হাঁসুলী বাঁকের উপকথা"-র একটি কপি ইংরাজী সাব্-টাইটেল্ যুক্ত হয়ে শীঘ্রই আমেরিকা রওনা হবে।

* * *

Indian Embassy-র মাধ্যমে Government of Denmark শ্রীমৃণাল সেন পরিচালিত "বাইশে শ্রাবণ কথাচিত্রটিকে ডেন্‌মার্কের টেলিভিশনে দেখাবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। সুইডেন-এর টেলিভিসনেও এই চিত্রটির প্রদর্শনের সম্ভাবনা আছে। শীঘ্রই "বাইশে শ্রাবণ"-এর একটি কপি Stockholm যাত্রা করবে।

* * *

আর, ডি, বনসল প্রযোজিত "অতল জলের আহ্বান"এর একটি দৃশ্যপটে পরিচালক অজয় কর, ছবি বিশ্বাস, ছায়া দেবী ও আর, ডি, বি-র সেক্রেটারী বিমল দে।

খবরাখবর ঃ

'শিশির মল্লিক প্রডাক্‌সন্স'-এর নূতন চিত্রের নামকরণ করা হয়েছে "নবদিগন্ত"—আগে এর নাম হয়েছিল 'রুচিরা'। অগ্রদূত'-এর পরিচালনা করছেন এবং সঙ্গীত দিচ্ছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। প্রধান ভূমিকায় আছেন—সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, বসন্ত চৌধুরী, বিশ্বজিৎ, সন্ধ্যারায়, জহর গাঙ্গুলী ও পাহাড়ী সান্যাল।

* * *

'সুলতা পিক্‌চার্স'-এর পরবর্ত্তী চিত্র "চৌধুরীবাড়ী"-র পরিচালনা করবেন শ্রীরাজেন তরফদার। ডাঃ বিশ্বনাথ রায়ের এই গল্পটির ডায়লগ্ লিখবেন প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়। কণিকা মজুমদারকে দেখা যাবে নায়িকা চরিত্রে।

* *

প্রযোজক আর, ডি, বন্‌সালের পরবর্ত্তী চিত্র "সাত পাকে বাঁধা"-তে প্রধান ভূমিকাদ্বয়ে নামবেন সুচিত্রা

সেন ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। এই সর্ব্বপ্রথম নায়ক নায়িকা রূপে উভয়ের বিপরীতে দু'জনে অভিনয় করবেন। পরিচালনা করবেন শ্রীঅজয় কর এবং সঙ্গীত দেবেন শ্রীহেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

* * *

"উত্তম কুমার ফিল্মস্ প্রাইভেট্ লিমিটেড্" নামে যে নূতন কোম্পানী গঠিত হয়েছে তাঁরা পাঁচটি ছবি হিন্দী ও বাংলায় শীঘ্রই নির্ম্মাণ করবেন বলে জানিয়েছেন। এর মধ্যে দুটি চিত্রের কাজ একই সঙ্গে আরম্ভ করা হবে। হিন্দী চিত্রগুলিতে বোম্বাই-এর খ্যাতনামা শিল্পীরা বাংলার শিল্পীদের সঙ্গে অভিনয়ে নামবেন।

* * *

"এস, সি, প্রডাকসন্স'"-এর নির্ম্মীয়মাণ চিত্র "কাঁটা ও কেয়া"র নাম বদল করে "শুভদৃষ্টি" রাখা হয়েছে। চিত্রটির পরিচালনা করছেন চিত্ত বসু এবং প্রধান ভূমিকায় আছেন সন্ধ্যা রায় ও 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'-খ্যাত অরুণ মুখোপাধ্যায়। অন্যান্য ভূমিকায় দেখা যাবে সন্ধ্যা রাণী, ছবি বিশ্বাস, কালি বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর গাঙ্গুলী প্রভৃতিকে। মাসানজোর ড্যামে শীঘ্রই একটি বন্যার দৃশ্য গ্রহণ করা হবে।

* * *

বিদেশী খবর ঃ

বার্লিনের দ্বাদশ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব আগামী ২২শে জুন থেকে ৩রা জুলাই পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। বার্লিনের মেয়র Willy Brandit বার্লিনের Congress Hall-এ উৎসবের উদ্বোধন করবেন। ২৪টি কাহিনী চিত্র এবং বেশী ও কম দৈর্ঘ্যের তথ্য-চিত্রসমূহ জার্মান ভাষার সাব-টাইটেল্ যুক্ত হয়ে প্রদর্শিত হবে।

* * *

"Summer and Smoke" চিত্রে অভিনয় করে Geraldine Page হালিউডের Fereign Press Association প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার "Golden Globe" লাভ করেছেন। শ্রীমতী পেজ্‌কে Tennessee Williams-এর নাটকে অভিনয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী-রূপে Academy Award-এর জন্যেও প্রস্তাব করা হয়েছে।

* * *

সুদীর্ঘ ছয় বৎসর পরে বিখ্যাত চিত্রতারকা Grace Kelly অধুনা Princess Grace of Monaco চিত্রজগতে আবার ফিরে আসবার মনস্থ করেছেন। প্রসিদ্ধ পরিচালক Alfred Hitchcock-এর পরিচালনায় তাঁর "Marnie" নামক নূতন চিত্রের প্রধান ভূমিকায় গ্রেস্ আবার অভিনয় করবেন। ১৯১৫ সালে Hitchcock-এরই একটি চিত্রে অভিনয় করবার সময় গ্রেস্ প্রথম French Riviera-তে তাঁর স্বামী Prince Rainier of Monaco-র সাক্ষাৎ পান এবং ১৯৫৬ সালে তাঁরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তারপর থেকে বহুবার রটেছে যে গ্রেস্ আবার চিত্রজগতে ফিরে আসছেন, কিন্তু তা হয়নি। এবার কিন্তু সত্যসত্যই চিত্রজগতের তারকারাণী ও সত্যকার প্রিন্সেস গ্রেস্ আবার ক্যামেরার সামনে আত্মপ্রকাশ করবেন।

রটনা ও গুজব যাতে তাঁদের দাম্পত্য জীবনে অশান্তি আনতে না পারে সেজন্য গ্রেস্ জানিয়েছেন তাঁর স্বামীর সম্পূর্ণ সম্মতি নিয়েই তিনি এই সিদ্ধান্ত করেছেন। তাছাড়া আগামী জুলাই থেকে নভেম্বর অবধি যতদিন গ্রেস্ হলিউডে থেকে সুটিং করবেন ততদিন তাঁর স্বামী Prince Rainier উপস্থিত থেকে গ্রেসের সুটিং দেখবেন।

একটি পুত্র ও একটি কন্যার জননী ৩৩ বৎসর বয়স্ক প্রিন্সেস গ্রেস্ ব্রিটেনের Winston Graham লিখিত এই "Marnie" চিত্রটিতে অভিনয় করার জন্য ৫০০০০ পাউণ্ড পাবেন। তাছাড়া লভ্যাংশের ওপরও প্রায় দশ পারসেণ্ট পাবেন।

য়্যাল্‌ফ্রেড হিচ্‌কক্ বলেছেন এই সম্বন্ধে গ্রেসের সঙ্গে অনেকদিন ধরেই কথাবার্ত্তা চলছে। তাকে বইটি পাঠান হয়েছিল এবং তা পড়ে সে খুসিই হয়েছে। এখন এই একটি চিত্রেই সে নামতে মনস্থ করেছে কিন্তু তার ভাল লেগে গেলে সে চিত্রজগত থেকে যেতেও পারে।

বিশ্বের চিত্রামোদিরাও সেই আশাই করেন।

সম্পাদনা ঃ শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়
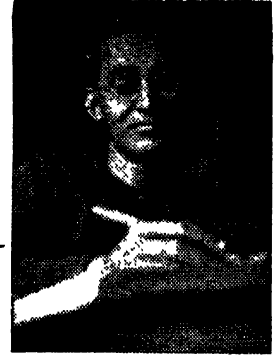
৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

জার্মান ফুটবল দলের ভারত সফর

ষ্টুটগার্টের ভি, এফ., বি ফুটবল দল তাঁদের ভারত সফর শুরু করেছেন কলকাতায় আই, এফ, এ দলকে ৩—১ গোলে পরাজিত করে। ফুটবল জার্মানীতে বিশেষ জনপ্রিয় খেলা। এবং এই খেলার উন্নতির জন্য ওয়েষ্ট জার্মান ফুটবল এ্যাসোসিয়েশন খেলা শিক্ষার বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছেন। এর অধীনে ২০ লক্ষের উপর খেলোয়াড় রয়েছে। এর মধ্যে ১'৪০০,০০০ জনের বয়স ১৮ বছরের উর্দ্ধে। ৩৫০,০০০ জনের বয়স ১৪ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে এবং ২৫০,০০০ জনের বয়স ১৪ বছরের উপর নয়। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ফুটবলে জার্ম্মানীর সবিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ১৯৫৪ সালে 'বিশ্ব-কাপ' প্রতিযোগিতায় সকলে হাঙ্গেরী অথবা দক্ষিণ আমেরিকার কোন দল জয়লাভ করবে এই আশাই করেছিলেন। কিন্তু অখ্যাত জার্মান ফুটবল দল এই 'কাপ' বিজয়ী হয়ে সকলকে চমকিত করে। এই বৎসর চিলিতে বিশ্ব প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। জার্মান জন সাধারণ সাগ্রহে এই প্রতিযোগিতার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে জার্মান দলের বিশ্ব প্রতিযোগিতায় বিশেষ উন্নত ফল প্রদর্শন করার সম্ভাবনা খুবই বেশী। এই প্রতিযোগিতার যে তালিকা প্রস্তুত

ভি, এফ., বি ফুটবল দল

হয়েছে তাতে জার্মান ফুটবল এ্যাশোশিয়েশন সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। আগামী ৩১শে মে জার্মান দল প্রথম খেলবে ইতালীর সঙ্গে। তারপর ৩রা, জুন্ খেলবে সুইজারল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। সবচেয়ে শক্ত খেলা হবে ৬ই, জুন্ চিলির সঙ্গে তাদের নিজের মাঠে। ১৯৬০ সালে ষ্টুটগার্টে জার্মানী ২—১ গোলে চিলিকে পরাজিত করে। কিন্তু পরের বছর চিলিতে খেলতে গিয়ে জার্মান দল ৩—১ গোলে পরাজিত হয়। এবারও জার্মানীকে চিলির বিরুদ্ধে তাদের নিজের দেশে খেলতে হবে। সেজন্য এই খেলার ফলাফলের উপর জার্মান জনসাধারণের আগ্রহ অত্যধিক।

ভি, এফ, বি ফুটবল দলের পুরা নাম হল 'ফোরেইন্ ভূয়ের বেভেগুঙ্গস্পিএল',এর মানে, এ্যাথেলেটিকস ক্রিড়ার ক্লাব। ভি, এফ, বি জার্মানীর একটি অন্যতম পুরাতন ক্লাব। ১৮৯৩ সালে এই ক্লাব স্থাপিত হয়। কলকাতায় এই জার্মান দলের আগমন হয়েছে। এই দলটি দু'বার জার্মান চ্যাম্পিয়ানশিপ এবং দু'বার জার্মান কাপ লাভ করেছে। এই দলে তিনজন জার্মান আন্তর্জাতিক খেলোয়াড় আছেন। সাভিৎসকি (গোলকিপার), ইনি ৯ বার জার্মান জাতীয় দলে খেলেছেন। রেটার (ফুল্ ব্যাক) ইনি ১৩ বার জাতীয় দলে খেলেছেন। জিজার (সেণ্টার ফরওয়ার্ড), ইনি ৫ বার জার্মান জাতীয় দলে এবং ১৯৫৬ সালের অলিম্পিক দলে খেলেছেন। বিশ্বের বিভিন্ন নামজাদা দলের বিরুদ্ধে এই দল স্বদেশে ও বিদেশে খেলেছে এবং বার্ণলে, টটেনহাম হর্সপার্স, গ্রাস্হপার প্রভৃতি শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছে। আই-এফ-এর বিরুদ্ধে খেলায় এই দলের খেলোয়াড়দের নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া বল আদান-প্রদানের নৈপুণ্য লক্ষ্য করা গেছে। আই-এফ-এ দলে মেলবোর্ণ অলিম্পিকের সাতজন খেলোয়াড় ছিলেন কিন্তু খেলোয়াড়দের নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ার ভাব অপরপক্ষ অপেক্ষা অনেক কম থাকায় তাঁরা পরাজিত হয়েছেন। জার্মান আন্তর্জাতিক খেলোয়াড় সেণ্টার ফরওয়ার্ড জিজারের খেলা চোখে পড়েছে।

——

খেলার কথা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফর—৫ম টেষ্ট ঃ

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ঃ ১ম ইনিংসে ২৫৩ রান (গারফিল্ড সোবার্স ১০৪, রোহন কানহাই ৪৪, ইষ্টন ম্যাকমরিস ৩৭। রঞ্জনে ৭২ রানে ৪, নাদকার্নী ৫০ রানে ৩, দুরাণী ৫৬ রানে ২ এবং বোরদে ৩৩ রানে ১ উইকেট পান) এবং ২য় ইনিংসে ২৮৩ রান (ওরেল নট আউট ৯৮, সোবার্স ৫০, ম্যাকমরিস ৪২ এবং কানহাই ৪১। সুর্ত্তি ৫৬ রানে ৩, দুরানী ৪৮ রানে ৩, রঞ্জনে ৮১ রানে ২, নাদকার্নী ১৩রানে ১ এবং বোরদে ৬১ রানে ১ উইকেট)।

ভারতবর্ষ ঃ প্রথম ইনিংসে ১৭৮ রান (বাপু নাদকার্নী ৬১, রুসী সুর্ত্তি ৪১ এবং পলি উমরীগড় ৩২। লেষ্টার কিং ৪৬ রানে ৫, লান্স গিবস ৩৮ রানে ৩, হল ২৬ রানে ১ এবং আলফ ভ্যালেনটাইন ২২ রানে ১ উইকেট পান) এবং

২য় ইনিংসে ২৩৫ রান (উমরীগড় ৬০, সুর্ত্তি ৪২, মঞ্জরেকার ৪০ এবং মেহেরা ৩৯। সোবার্স ৬৩ রানে ৫, হল ৪৭ রানে ৩ এবং কিং ১৮ রানে ২ উইকেট পান)।

কিংস্টনের পঞ্চম বা শেষ টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১২৩ রানে ভারতবর্ষকে পরাজিত ক'রে টেষ্ট সিরিজের পাঁচটি খেলাতেই জয়লাভের দুর্লভ সম্মান লাভ করেছে। আন্তর্জাতিক টেষ্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলকে নিয়ে মাত্র তিনটি দেশ টেষ্ট সিরিজের পাঁচটা খেলাতেই জয় লাভের সম্মান লাভ করেছে। এবং এ রকম ঘটনা মাত্র ৪বার ঘটেছে সুদীর্ঘকালের টেষ্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে। ১৯২০-২১ সালে অষ্ট্রেলিয়া সফররত ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে এবং ১৯৩১-৩২ সালে অস্ট্রেলিয়া সফররত দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া এই সম্মান লাভ করে। দীর্ঘকাল পর ইংল্যাণ্ড সফররত ভারতবর্ষের বিপক্ষে এই সম্মান পায় ইংল্যাণ্ড। তারপর ১৯৬২ সালের ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফরে ভারতবর্ষের বিপক্ষে

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের এই সম্মান লাভ। টেষ্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোন দেশ টেষ্ট সিরিজের পাঁচটা খেলাতেই দু'বার পরাজয় বরণ করেনি। টেষ্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এ এক শোচনীয় ব্যর্থতার দৃষ্টান্ত।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের অধিনায়ক ফ্র্যাঙ্ক ওরেল এই শেষ টেষ্ট খেলায় টসে জয়ী হন এবং প্রথম মহড়ায় ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন। প্রথম দিনেই ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের মত শক্তিশালী দলকে ভারতবর্ষ ২৫৩ রানে নামিয়ে দেয়। কিন্তু ভারতবর্ষ নিজেও প্রথমদিনের খেলায় বিপর্য্যয়ের ঘূর্ণীপাকে পড়ে—মাত্র ৩৩ রানে ৫টা উইকেট পড়ে যায়। প্রথম ইনিংসে ভারতবর্ষকে প্রথম দিনেই ঘায়েল করেন ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের নতুন টেষ্ট খেলোয়াড় লেষ্টার কিং, ২০ রানে ৫টা উইকেট নিয়ে।

খেলার দ্বিতীয় দিনে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ১৭৮ রানে শেষ হলে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ মাত্র ৭৫ রান বেশী করার গৌরব লাভ করে। দ্বিতীয় দিনে লাঞ্চের সময় ভারতবর্ষের রান ছিল ১৩৫, ৭টা উইকেট উইকেট পড়ে। দ্বিতীয় দিনে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের ২য় ইনিংসের খেলাও বিশেষ সুবিধার হয়নি। ৬টা উইকেট পড়ে ১৩৮ রান; অর্থাৎ ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের ১৭৮ রানে থেকে ২১৩ রানে বেশী।

তৃতীয় দিনে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের ২য় ইনিংসে ২৮৩ রানে শেষ হ'লে ভারতবর্ষ ৩৫৮ রানের ব্যবধানে পিছিয়ে থাকে। ভারতবর্ষের পুরো ২য় ইনিংসের খেলা বাকি এবং খেলার সময় ৭৪৫ মিনিট জয়; লাভের জন্যে ভারতবর্ষের প্রয়োজন ছিল ৩৫৯ রানের। খেলার মত খেলা খেললে এই অবস্থায় ভারতবর্ষের পক্ষে জয়লাভ মোটেই অসম্ভব ছিল না; কিন্তু এইদিনেই ভারতবর্ষের ২টো উইকেট পড়ে গিয়ে মাত্র ৩৭ রান দাঁড়ায়। বৃষ্টির দরুণ এইদিন ১০৮ মিনিট খেলা হয়নি।

চতুর্থ দিনেও বৃষ্টির জন্যে পুরো সময় খেলা হয়নি, মাত্র ১৪০ মিনিট সময় খেলা হয়। লাঞ্চের পর মাত্র ২০ মিনিট খেলা চলার পর এই দিনের মত খেলা বন্ধ হয়ে যায়। চতুর্থ দিনে ভারতবর্ষ ১৪০ মিনিটের খেলায় ৯৪ রান যোগ করে ৩টে উইকেট খুইয়ে। মোট রান দাঁড়ায় ১৩১, ৫টা উইকেট পড়ে। এই অবস্থায় ভারতবর্ষের পক্ষে জয়লাভের জন্যে প্রয়োজন ছিল ২২৮ রানের; খেলার সময় ৩৩০ মিনিট এবং ৫টা উইকেট পড়তে বাকি। খেলোয়াড় আছেন ৬জন—উইকেটে নটআউট মঞ্জরেকার (৩৬ রান) এবং উমরীগড় (১১ রান) তাছাড়া দুর্ব্বি, নাদকার্নী, কুন্দরাম এবং রঞ্জনে।

খেলার ৫ম অর্থাৎ শেষ দিনে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস ২০৫ রানে শেষ হয়ে যায়। উমরীগড়ের আউট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষের ২য় ইনিংসের খেলা শেষ হয়; উমরীগড় ৬০ রান করেন। দ্বিতীয় ইনিংসে সোবাস ৬৩ রানে ৫টা উইকেট পেলেও হল শেষের দিকে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিলেন। শেষের তিনটে উইকেট পান ওয়েসলে হল— ৭.৫ ওভার বলে মাত্র ৭ রান দিয়ে।

১৯৬২ সালের এই ভারতবর্ষ বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের চতুর্থ টেষ্ট সিরিজ শেষ হওয়ার পর ভারতবর্ষ বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজদলের টেষ্ট খেলা এবং টেষ্ট সিরিজের ফলাফল এই রকম দাঁড়িয়েছে:

টেষ্ট খেলার ফলাফল: মোট খেলা ২০, ওয়েষ্টইণ্ডিজের জয় ১০, ভারতবর্ষের জয় ০, খেলা ড্র ১০। টেষ্ট সিরিজের ফলাফল: টেষ্ট সিরিজ ৪, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের জয় ৪, ভারতবর্ষের ০। ওয়েষ্টইণ্ডিজ ১ম টেষ্ট সিরিজে (১৯৪৮-৪৯) ১—০ খেলায়, ২য় টেষ্ট সিরিজে (১৯৫৩) ১—০ খেলায়, ৩য় টেষ্ট সিরিজে (১৯৫৮-৫৯) ৩—০ খেলায় এবং ৪র্থ টেষ্ট সিরিজে (১৯৬২) ৫—০ খেলায় 'রাবার' লাভ করে। ১ম টেষ্ট সিরিজে৩টে, ২য় টেষ্ট সিরিজে ৪টে, ৩য় টেষ্ট সিরিজে ২টো টেষ্ট খেলা ড্র যায়।

বিভিন্ন দেশের বিপক্ষে টেষ্ট খেলা এবং টেষ্ট সিরিজের ফলাফল দাঁড়িয়েছে:

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের টেষ্ট ক্রিকেট: টেষ্ট খেলার ফলাফল: মোট খেলা ৯৪, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের জয় ৩১, হার ৩২ এবং খেলা ড্র ৩১ (১৯৬০—৬১ সালে অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে 'টাই' ম্যাচ নিয়ে)। টেষ্ট সিরিজের ফলাফল: মোট সিরিজ ২২, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের জয় ১০, হার ১০ এবং সিরিজ অমীমাংসিত ২।

ভারতবর্ষের টেষ্ট ক্রিকেট: টেষ্ট খেলার ফলাফল: মোট খেলা ৮২, ভারতবর্ষের জয় ৮, হার ৩৪ এবং খেলা

ড্র ৪০। টেষ্ট সিরিজের ফলাফল: মোট সিরিজ ১৯, ভারতবর্ষের জয় ৩, হার ১৩ এবং সিরিজ অমীমাংসিত ৩।

১৯৬২ সালের ভারতবর্ষ বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের টেষ্ট সিরিজের ব্যাটিং এবং বোলিংয়ের গড়পড়তার হিসাব:

ভারতবর্ষের পক্ষে ব্যাটিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় শীর্ষস্থান পেয়েছেন পলি উমরীগড়—খেলা ৫, ইনিংস ১০, নট আউট ১ বার, এক ইনিংসের খেলায় সর্ব্বোচ্চ রান ১৭২ নট আউট এবং মোট রান ৪৪৫ (গড় ৪৯—৪৪)। ভারতবর্ষের পক্ষে বোলিংয়ের গড়পড়তা তালিকাতেও শীর্ষস্থান পেয়েছেন পলি উমরীগড়—১৫৬ ওভার, ৬৭ মেডেন, ২৪৯ রানে ৯ উইকেট (গড় ২৭·৬৬)। ভারতবর্ষের পক্ষে সর্ব্বাধিক উইকেট পেয়েছেন সেলিম দুরাণী—৬০০ রাণে ১৭টা (গড় ৩৫—২৯), বোলিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় ৩য় স্থান।

ভারতবর্ষের প্রবীণ টেষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় পলি উমরীগড় ১৯৬২ সালের ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফরের সমস্ত খেলাতেও ভারতবর্ষের পক্ষে ব্যাটিং এবং বোলিং এভারেজ তালিকায় শীর্ষস্থান লাভ করেছেন। এবারের টেষ্ট সিরিজে উমারীগড়ের নট আউট ১৭২ রাণ (৪র্থ টেষ্ট) উভয় দলেরই পক্ষে এক ইনিংসের খেলায় সর্ব্বোচ্চ ব্যক্তিগত রাণ হিসাবে গণ্য হয়েছে এবং উমরীগড়ের এই নট আউট ১৭২ রাণ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের বিপক্ষে টেষ্ট খেলায় ভারতবর্ষের পক্ষে ব্যক্তিগত রাণেরও রেকর্ড।

ভারতবর্ষের বিপক্ষে ১৯৬২ সালের টেষ্ট সিরিজে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের পক্ষে ব্যাটিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় প্রথম স্থান পেয়েছেন ফ্র্যাঙ্ক ওরেল—খেলা ৫, ইনিংস ৬, নট আউট ২ বার, এক ইনিংসের খেলায় ব্যক্তিগত সর্ব্বোচ্চ রাণ নট আউট ৯৮ এবং মোট রাণ ৩৩২ (গড় ৮৩.০০)। নিজ দলের তালিকায় ২য় স্থান পেলেও রোহণ কানহাই উভয় দলের পক্ষে সর্ব্বাধিক মোট রাণ (৪৯৫ রাণ) করার গৌরব লাভ করেছেন; ব্যাটিংয়ে তাঁর গড় ৭০.৭১। উভয় দলের বোলিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় প্রথম স্থান পেয়েছেন ওয়েসলে হল—১৬৭.৪ ওভার, ৩৭ মেডেন, ৪২৫ রাণে ২৭ উইকেট (গড় ১৫.৭৮)। তাঁর এই ২৭ উইকেট আবার এবারের সিরিজে উভয় দলের পক্ষে সর্ব্বাধিক উইকেট পাওয়ার রেকর্ড। টেষ্ট সেঞ্চুরী (৭): ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের পক্ষে ৫টি সোবার্স ১৫৩, কানহাই ১৩৮ এবং ম্যাকমরিস ১২৫: (২য় টেষ্ট, কিংষ্টন); কানহাই ১৩৯ (৪র্থ টেষ্ট, পোর্ট অব স্পেন) এবং সোবার্স ১০৪ (৫ম টেষ্ট, কিংষ্টন)। ভারতবর্ষের পক্ষে ২টি—উমরীগড় নট আউট ১৭২ এবং দুরাণী ১০৪ (৪র্থ টেষ্ট, পোর্ট অব স্পেন)।

প্রথম বিভাগের হকি লীগ:

১৯৬২ সালের প্রথম বিভাগের হকি লীগ প্রতিযোগিতায় মোট ২০টি দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে—'এ' এবং 'বি' বিভাগে সমান ১০টি ক'রে দল ছিল। 'এ' বিভাগে মোহনবাগান প্রথম এবং কাষ্টমস ক্লাব দ্বিতীয় স্থান লাভ করে। 'বি' বিভাগে শীর্ষস্থান পায় ইস্টবেঙ্গল এবং রানার্স-আপ হয় মহমেডান স্পোর্টিং। প্রথম বিভাগের হকি লীগ চ্যাম্পিয়ান নির্দ্ধারণের জন্যে এই দুই বিভাগের প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকারী দলের মধ্যে লীগ প্রথায় খেলা হয়। এই খেলায় শীর্ষস্থান লাভ ক'রে মোহনবাগান ক্লাব ১৯৬২ সালের প্রথম বিভাগের হকি লীগ চ্যাম্পিয়ান হয় এবং ইস্টবেঙ্গল ক্লাব পায় ২য় স্থান। লীগের শেষ পর্য্যায়ের খেলায় মোহনবাগান ৩টে খেলায় ৫ পয়েণ্ট পায়—কাস্টমসকে ৪-০ গোলে এবং মহমেডান স্পোর্টিংকে ২-০ গোলে পরাজিত করে কিন্তু ইস্টবেঙ্গল দলের বিপক্ষে খেলা গোলশূন্য ড্র করে।

১৯৬২ সালের প্রথম বিভাগের হকি লীগ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ান হওয়ার ফলে মোহনবাগান আটবার লীগ চ্যাম্পিয়ান হ'ল—১৯৩৫, ১৯৫১-৫২, ১৯৫৫-৫৮ (উপর্যুপরি ৪ বার) এবং ১৯৬২। প্রথম বিভাগে কাষ্টমস ক্লাব ১৭বার লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়ে সর্ব্বাধিকবার লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার যে রেকর্ড করেছে তা আজও অক্ষুণ্ণ আছে। কাস্টমসের পরই রেঞ্জার্স এবং মোহনবাগান ৮বার ক'রে লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। রেঞ্জার্সের ৮ বার পূর্ণ হয়েছে ১৯৪৩ সালে এবং মোহনবাগানের ১৯৬২ সালে। পাঁচবার ক'রে লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে বি ই কলেজ এবং পোর্ট কমিশনার্স। বি ই কলেজ শেষ লীগ চ্যাম্পিয়ানশীপ পায় ১৯২০ সালে এবং পোর্ট কমিশনার্স ১৯৪৯ সালে।

প্রাথমিক পর্য্যায়ের খেলা

'এ' বিভাগ—চূড়ান্ত তালিকা

	খেলা	জয়	হার	ড্র	স্বঃ	বিঃ	পঃ
মোহনবাগান	১৮	১৭	০	১	৭২	৪	৩৪
কাস্টমস	১৮	১৩	১	৪	৪১	১৬	২৭

'বি' বিভাগ—চূড়ান্ত তালিকা

	খেলা	জয়	হার	ড্র	স্বঃ	বিঃ	পঃ
ইস্টবেঙ্গল	১৮	১৭	১	০	৫৩	২	৩৫
মহঃ স্পোর্টিং	১৮	১১	৪	৩	২৭	১২	২৬

চূড়ান্ত পর্য্যায়ের তালিকা

	খেলা	জয়	হার	ড্র	স্বঃ	বিঃ	পঃ
মোহনবাগান	৩	২	০	১	৬	০	৫
ইস্টবেঙ্গল	৩	১	০	২	১	০	৪
মহঃ স্পোর্টিং	৩	১	২	০	০	৩	২
কাস্টমস	৩	০	২	১	০	৪	১

আগা খাঁ হকি ঃ

১৯৬২ সালের আগা খাঁ হকি (বোম্বাই) প্রতিযোগিতার ফাইনালে মারাহাট্টা লাইট ইনফ্যানট্রি দল (বেলগাঁও) অপ্রত্যাশিতভাবে ১-০ গোলে টাটা স্পোর্টস ক্লাবকে (বোম্বাই) পরাজিত করে।

গোল্ড কাপ ঃ

১৯৬২ সালের গোল্ড কাপ হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে সেণ্ট্রাল রেলওয়ে ৩-১ গোলে পাঞ্জাব পুলিসদলকে পরাজিত করে।

বছরের ৫ জন ক্রিকেট খেলোয়াড় ঃ

ক্রিকেট খেলার বিশ্ব-বিখ্যাত 'উইসডেন' (Wisden) বর্ষপঞ্জী ১৯৬১ সালের সংস্করণে অন্যান্য বছরের মত 'বছরের পাঁচজন ক্রিকেট খেলোয়াড়' এই অধ্যায়ে যে পাঁচজনের নাম প্রকাশ করেছে তাঁরা সকলেই অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়। এই পাঁচজনের মধ্যে আছেন ১৯৬১ সালের ইংল্যাণ্ড সফরগামী অস্ট্রেলিয়ান দলেরই চারজন—রিচি বেনো, নর্মান ও'নীল, এল্যান ডেভিডসন এবং বিল লরী। পঞ্চমজন ইংল্যাণ্ডের সামারসেট কাউণ্টি ক্রিকেট দলের অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড় বিল এ্যালে।

বেটন কাপ ফাইনাল ঃ

১৯৬২ সালের বেটন কাপ হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে গত বছরের প্রথম বিভাগ হকি লীগ প্রতিযোগিতার যুগ্ম-বিজয়ী এবং এ বছরের রানার্স-আপ ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব ১—০ গোলে গত বছরের বেটন কাপ বিজয়ী সেণ্ট্রাল রেলদলকে পরাজিত ক'রে দ্বিতীয়বার বেটন কাপ জয়লাভের গৌরব লাভ করেছে। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব ১৯৫৭ সালে বেটন কাপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে প্রথম ওঠে এবং বেটন কাপ জয় করে। এবছর ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব ৩য় রাউণ্ডে ৩—০ গোলে দিল্লী ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টস দলকে, ৪র্থ রাউণ্ডে ২—১ গোলে ইণ্ডিয়ানেভী দলকে এবং সেমি-ফাইনালে ২—১ গোলে মাদ্রাজ ইঞ্জিনীয়ারিং দলকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে ওঠে। অপরদিকে সেণ্ট্রাল রেলওয়ে ৪র্থ রাউণ্ডে ১—১ ও ২—০ গোলে কাষ্টমসকে এবং সেমি-ফাইনালে ১—১ ও ২—০ গোলে টাটা স্পোর্টস দলকে পরাজিত করে ফাইনালে ইষ্টবেঙ্গল দলের সঙ্গে মিলিত হয়। এবছরের হকি লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান ক্লাব ৩য় রাউণ্ডে ৩—০ গোলে খালসা ব্লুজ দলকে পরাজিত ক'রে ৪র্থ রাউণ্ডে ০—২ গোলে টাটা স্পোর্টস দলের কাছে পরাজিত হয়।

ডেভিস কাপ পূর্ব্বাঞ্চলের ফাইনাল ঃ

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ডেভিস কাপ লন টেনিস প্রতিযোগিতার পূর্ব্বাঞ্চল খেলার ফাইনাল ভারতবর্ষ ৫—০ খেলায় ফিলিপাইনকে পরাজিত ক'রে পর পর দু'বছর মূল প্রতিযোগিতার ইণ্টার-জোন সেমি-ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে। ভারতবর্ষের পক্ষে খেলেছিলেন [illegible] জয়দীপ মুখার্জি, এবং প্রেমজিৎলাল।

বঙ্গ রঙ্গ মঞ্চ ঃ শ্রীবিনয় চৌধুরী

প্রাচীন কাল থেকে অতি আধুনিক কাল পর্যন্ত বাঙলা দেশের বঙ্গ মঞ্চের একটি সুন্দর ইতিহাস রচনা করেছেন বিনয় বাবু। তাঁর এ রচনার অজস্র তথ্যের ভাণ্ডার থেকে জিজ্ঞাসু পাবেন জ্ঞান, নাট্যামোদী পাবেন সম্যক্ দৃষ্টি. আর শিল্পীরা পাবেন উৎসাহ। প্রকাশনা প্রশংসা যোগ্য।

[প্রকাশক—শ্রীঅমল কান্তি বন্দ্যোপাধ্যায। সাহিত্য চয়নিকা, ৫৯, কর্ণ ওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬ মূল্য—২৲।]

—শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্র রচনা-কোষ ঃ

শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব, শ্রীবাসুদেব মাইতি

রবীন্দ্র সাহিত্যের পঠন-পাঠন সারা ভারতেই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। রবীন্দ্র-সাহিত্য নিয়ে গবেষণারও যথেষ্ট প্রয়াসও সারা দেশের পণ্ডিতদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। এ সকল গবেষণা কার্যে এই গ্রন্থটি যে বিশেষ সহায়ক হবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সত্যি বলেছেন, "পুস্তকখানি আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট শাখার অতি প্রয়োজনীয় গবেষণামূলক পঞ্জীপুস্তক বলিয়া বিবেচিত হইবে।" সংকলকারিদ্বয়কে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

[পরিবেশক—ক্যালকাটা পাবলিশার্স ১৪ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য—ছয় টাকা।]

বৃত্ত ও বৃত্তান্ত ঃ জীবেশ মৈত্র

কলিকাতার একটি বাড়ীর কাহিনী লিখেছেন জনপ্রিয় বান্ লেখক কাহিনীর মানুষগুলি সব জীবন্ত। প্রতিদিন কার জীবনে হয়ত আমরা তাদের সাক্ষাত পাই কিন্তু তারা আমাদের চোখে তেমন করে ধরা পড়ে না। কাহিণীর দর্পণে তারা যেন স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে।

[প্রকাশক—সুনন্দা প্রসাদ ভাদুরী। ৬৩, কমল রোড। মূল্য—২·৫০।]

—স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

গল্পে নীতি (পৌরানিক গল্প) কার্ত্তিকচন্দ্র দাশ গুপ্ত

প্রবীণ শিশু সাহিত্যিক শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র দাশ গুপ্ত মহোদয়ের লিখিত নটা পৌরাণিক গল্প আলোচ্য গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। এগুলি বহু পূর্ব্বেই বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রত্যেকটি গল্পই শুধু চিত্তা কর্ষক নয়, শিক্ষাপ্রদও বটে। সকল শ্রেণীর বালক বালিকাদের উপযোগী করে সরল ভাষায় রচিত হয়েছে। এ গ্রন্থের সাহচর্য্য পেলে ছেলে মেয়েরা উন্নত আদর্শের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হবে। গল্পগুলির গঠন কৌশল ও বর্ণনা পারিপাট্য বিশেষ প্রশংসনীয়। আমাদের বিশ্বাস বালক বালিকারা পড়ে আনন্দ পাবে। প্রচ্ছদ পট, ছাপা ও বাঁধাই উত্তম।

[শ্রীবলরাম ধর্ম্ম সোপান প্রকাশনী বিভাগ খড়দহ—২৪ পরগণা মূল্য—এক টাকা]

—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু প্রণীত উপন্যাস "কুমারী মন" (২য় সং)—৩·৫০

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত রহস্য-কাহিনী "বহ্নি-পতঙ্গ" (২য় সং)—৩·৫০

দৃষ্টিহীন প্রণীত উপন্যাস "সে ডাকে আমায়"—৩৲

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "অবাক পৃথিবী"—৩৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

ঊনপঞ্চাশত্তম বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড ; পৌষ—১৩৬৮—জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

মাসানুক্রমিক—চিত্রসূচী